

ভারতবর্ষ

পৌষ—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

আশ্রমধর্ম্ম ও হিন্দু-জীবন

অধ্যাপক শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

ভারতীয় হিন্দুর যে ধর্ম্ম—অর্থাৎ যাহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক ভাবে হিন্দু-জীবনকে বিশিষ্ট একটি ধারায় বহু সহস্র বৎসর যাবৎ পরিচালিত করিয়াছে এবং এখনও বহু পরিমাণে করিতেছে—তাহাই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম। ইহার স্বরূপ-দ্যোতক একটা সংজ্ঞা দিতে হইলে এই নামেই তাহা দিতে হইবে। কেন দিতে হইবে গত শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও হিন্দু সমাজ' শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা কিছু করিয়াছি। বর্ণ-ধর্ম্ম ও আশ্রম ধর্ম্ম এই দুইটি কথার যোগে 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' এই নামটি হইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্মের কথা সমাজবিন্যাসের কথা, আর আশ্রম ধর্ম্মের কথা ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার কথা। পূর্ব্বের ঐ প্রবন্ধে বর্ণধর্ম্মের মূল কথাগুলির একটা আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। বর্ত্তমান এই প্রবন্ধে এখন আশ্রম ধর্ম্মের কথা যথাসাধ্য বলিবার চেষ্টা করিব।

ধর্ম্মের আদর্শ যতই উচ্চ হউক, সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাদি যতই সমীচীন ও সুনীতিসঙ্গত হউক, ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ নিজেরা ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে সবই বৃথা। আদর্শ কেবল মুখের কথা, আর বিধি ব্যবস্থা সব পুঁথির পুঁজি মাত্র হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতে তাই একদিকে যেমন সমাজস্থিতির উদ্দেশ্যে বর্ণ-ধর্ম্মের, আর দিকে তেমনই ধর্ম্মপরায়ণ ও মোক্ষাভিমুখ চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে আশ্রম ধর্ম্মের, প্রতিষ্ঠা হয়। সমাজধর্ম্মের সঙ্গে ব্যক্তিগত ধর্ম্ম যে অবিচ্ছেদ্য একরূপ অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, একটু চিন্তাশীল সকলেই তাহা স্বীকার করিবেন। ভারতে সেই সমাজধর্ম্মের ভিত্তি ছিল, 'চাতুর্ব্বর্ণ্য, আর ব্যক্তিগত ধর্ম্মের ভিত্তি ছিল 'চতুরাশ্রম।' সমগ্রতায় হিন্দুজীবনের ধর্ম্ম যাহা, তাই তাহা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নামে পরিচিত হইয়াছে।

মানুষ এই সংসারে জন্মিয়াছে; সংসারে বহু কর্ত্তব্য তাহার আছে, সব তাহাকে পালন করিতে হইবে। আবার বিষয়-বাসনা আছে, তাহারও একটা চরিতার্থতা তাহার চাই। উদ্দাম বিষয় বাসনা প্রবৃত্তিমার্গে যথেচ্ছ ভোগের দিকে তাহাকে লইয়া যাইতে চায়। কিন্তু নিবৃত্তি মার্গে একটা নিয়মের মধ্যে ইহাকে সংযত রাখিতে না পারিলে সংসারে তাহার কর্ত্তব্য সে পালন করিতে পারেনা। কেবল

তাহাই নয়। সংসারে সে জন্মিয়াছে কেবল বিষয় ভোগের জন্যও নহে, কেবল সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনের জন্যও নহে। এই সংসার-চক্রে বদ্ধ জীব সে। চক্রের আবর্ত্তনের মধ্য দিয়াই ক্রমে তাহাকে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। বদ্ধাবস্থা হইতে ক্রমে মুক্ত হইবে, ভাগবতী লীলায় ইহাই তাহার জীবনের মূল লক্ষ্য। আধ্যাত্মিক যে জ্ঞানের বল ও সাধনার ফল এই লক্ষ্যের পথে তাঁহাকে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে, সেই বল ও সেই ফল এই সংসারের মধ্যেই তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। এইভাবে এই সংসারে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এবং তাহা হইতে ক্রমে মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের * সিদ্ধিতেই জীবনের পূর্ণসিদ্ধি তাহার লাভ হয়, সর্ব্বতোভাবে জীবজীবন তাহার চরিতার্থ হয়। সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানার্জ্জনে ও সঙ্গে কতকগুলি সুনিয়মের অনুশীলনে উন্নত চরিত্র গঠনের চেষ্টা তাহাকে করিতে হইবে। সংসার-জীবনে যথাশক্তি সেই চরিত্রমহিমায় স্থিতি, ক্রমে প্রবৃত্তির পথ হইতে নিবৃত্তির পথে অন্তর্ম্মুখ মনের গতি এবং তাহা হইতে আত্ম দর্শনে মোক্ষ লাভ, এইরূপ একটা ধারায় জীবন পরিচালিত হইলেই চতুর্ব্বর্গে সিদ্ধিলাভ মানুষের হ পারে। বাল্যাবধি একটা শিক্ষার, সাধনার ও ধর্ম্ম শা (spiritual and moral disciplineএর) মধ্য এই আদর্শ-ধারায় জীবন যাহাতে পরিচালিত হয়, ভাবেই চতুরাশ্রমের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ এবং ভৈক্ষ্য বা পরিব্র চারিটি আশ্রম ছিল এই। তপস্যা বা সাধনার ভূ আশ্রম বলে। সিদ্ধিলাভের জন্য জীবনের চারিটি ব চারি প্রকার নিয়ম সংস্থানের মধ্য দিয়া তদুপযোগী সা ক্রম চলিবে। তাই এই চারিটি ভাগের বা তাহার বি বিশেষ অবস্থাগুলির নাম হইয়াছে চারি আশ্রম, ত চারি প্রকার সাধনভূমি। একটির ধর্ম্ম তার পরটির মানুষকে প্রস্তুত করিয়া তোলে এবং এই ভাবেই জী ব্যাপী সাধনার ক্রম চলে।

বাল্যে—সাধারণতঃ অষ্টম হইতে দ্বাদশ বৎসরের ম দ্বিজজাতীয় বালকের উপনয়ন-সংস্কার হইবে। তা অন্যূন চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে সে থাকিবে বেদাধ্যয়ন ও যথাসম্ভব নিজ নিজ বৃত্তির উপযোগী শি লাভ করিবে। এই সময়ে কতকগুলি নীতির অনু হইয়াও তাহাকে চলিতে হইবে, যাহার সাধারণ নাম 'যমনিয়ম'। প্রাচীন শাস্ত্রমতে অহিংসা, সত্যক অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, মধুরতা, নির্ম্মলতা প্রভৃতি অন্তে গুণ সমূহের নাম 'যম'। আর স্নান, উপবাস, যজ্ঞ, গু সেবা, বেদাধ্যয়ন, মৌনব্রত প্রভৃতি বাহিক কতকগু অনুষ্ঠানকে বলা হইয়াছে 'নিয়ম'। তবে এইগুলির ম ব্রহ্মচর্য্য, গুরুশুশ্রূষা এবং অধ্যয়ন এই কয়েকটি প্রধ এবং শিষ্যের পক্ষে একরূপ অপরিহার্য্য ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়া ইহাই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম এবং জীবনের প্রথম আশ্রম সাধনার ক্ষেত্র। শিক্ষালাভ এবং সাধুচরিত্র গঠনই যে ইহ প্রধান লক্ষ্য ছিল, এ কথা বলাই বাহুল্য।

চব্বিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের মধ্যে এই আশ্রমের শি ও সাধনা সম্পূর্ণ হইত। তখন গুরুর আদেশে ব্রহ্মচারী ব্রত ত্যাগ করিয়া শিষ্য গৃহে ফিরিতেন এবং যথারী বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন।

এই তাঁহার সাংসারিক জীবন আরম্ভ হইল এবং ইহা ছিল জীবনের দ্বিতীয় আশ্রম। দ্বিতীয় এই গার্হস্থ্য আশ্র

* একদিকে যেমন সাংসারিক জীবভাবে বহু বাসনার পরিতৃপ্তি, অপর দিকে তেমনই আবার 'নিত্যমুক্তস্বভাববান্ সচ্চিদানন্দস্বরূপ' শিবত্বের অভিব্যক্তি, পূর্ণ আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে হইলে এই দুই-ই মানবের পক্ষে আবশ্যক। এদেশের ভাষায় ইহার একটির নাম 'ভুক্তি', অপরটির নাম 'মুক্তি'। মায়ার বন্ধনে বাঁধিয়া জীবকে যিনি 'ভুক্তিমুখ' করিয়াছেন, তিনিই আবার ভুক্তিপরায়ণ জীবকে সেই বন্ধন মোচন করিয়া মুক্তির দিকে লইয়া যান। ব্রহ্মময়ী সেই মহামায়া তাই 'ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনী' এই বিশেষণে অভিহিতা হইয়াছেন। ভুক্তি মুক্তিরূপ এই আত্ম-সিদ্ধিকে এ দেশের প্রাচীন আচার্য্যগণ চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধি এই নাম দিয়াছেন। সকলের আগে ধর্ম্ম। যথাযোগ্য শিক্ষা-দীক্ষার ফলে ধর্ম্ম কি তাহা বুঝিয়া, ধর্ম্মে স্থির থাকিয়া, ধর্ম্মবিহিত পথে অর্থোপার্জ্জন লোকে করিবে। সেই অর্থে বিষয়-সম্ভোগাদিতে 'কাম' অর্থাৎ বিষয়বাসনার পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। তারপর সেই ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মপথে এই বাসনার পরিতৃপ্তি মানবকে নিবৃত্তিমুখ করিবে। তাহা হইতেই শেষে তাহার মোক্ষলাভ হইবে। এই ভাবে মানবজীবনে যাহা কিছু কাম্য বা অভীষ্ট হইতে পারে, এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যেই যে সব তাহা রহিয়াছে, তাহার বাহিরে আর কিছু থাকিতে পারেনা, সহজেই এ কথাটা আমরা বুঝিতে পারিব। 'চতুর্ব্বর্গ' এই একটি কথার মধ্যে যেমন ভাবে মানবের ব্যক্তিগত জীবনের সকল সার্থকতার সঙ্কেত রহিয়াছে, এখন আর কোনও ভাষার কোনও কথার মধ্যে আছে কিনা জানি না।

যথাবিহিত কোনও বৃত্তি গ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনে তিনি স্ত্রীপুত্রকুটুম্বগণের ভরণপোষণ করিবেন, তাহাদের লইয়া বিষয় সম্ভোগে তৃপ্ত হইবেন এবং সামাজিক অন্যান্য কর্ত্তব্য পালন করিবেন। ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—চতুর্ব্বর্গের মধ্যে এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি এইভাবে গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার লাভ হইবে। সঙ্গে সঙ্গে যে তিনটি ঋণ লইয়া মানুষ এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তাহাও এই সময়ে তাঁহার পরিশোধ হয়। এই তিনটি ঋণ দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ। দেবতার প্রসাদে এই পৃথিবীর ধনধান্যাদি সম্পদ মানুষ ভোগ করিতেছে। যাগ-যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় সর্ব্বভূতের হিতার্থে তাহা দান করিলে দেব-ঋণ পরিশোধ হয়। হিন্দুরা আরও বিশ্বাস করেন, মানবহিতার্থে দৈবশক্তির ক্রিয়াশীলতাও এই সব কর্ম্মে বৃদ্ধি পায়। সেই শক্তি মানুষকে যাহা দান করিয়াছেন, তাহারই বলে এইভাবে তাহাকে বৃদ্ধি করাও এই দেব-ঋণ পরিশোধের একটি উপায়।

বিদ্যা জ্ঞানের যে অধিকারে মানসিক উৎকর্ষ আমরা লাভ করি, তাহার জন্য ঋষিদের কাছে আমরা ঋণী। স্বাধ্যায়ে এই জ্ঞান আয়ত্ত করিতে পারিলে এবং যথাসাধ্য সেই জ্ঞান অপরকে দান করিতে পারিলেই তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ হয়। তারপর আমাদের দেহাশ্রিত এই জীবন আমরা পিতৃপুরুষদের হইতে পাইয়াছি। সন্তানের জন্মে বংশধারা রক্ষিত হইলে, তাহাদের যথোচিত প্রতিপালনে ও শিক্ষাদানে বংশের বিশিষ্টতা ও গৌরব রক্ষা করিতে পারিলে সেই পিতৃ-ঋণ হইতে আমরা মুক্ত হই। সমাজের সঙ্গে—কেবল সমাজ বলিয়া কেন,—সমগ্র এই ভূতসমষ্টির সঙ্গেও প্রত্যেকটি মানুষের সম্বন্ধ কত নিকট এবং সেই নৈকট্যে ইহাদের উপরে তাহার কর্ত্তব্যও যে কত গুরু বলিয়া এ দেশের আচার্য্যগণ অনুভব করিয়াছিলেন, এই ঋণত্রয়ের সংজ্ঞা এবং তাহার পরিশোধের ব্যবস্থা হইতে তাহা বেশ উপলব্ধি করা যায়। গৃহস্থের নিত্যকর্ত্তব্যাদির আলোচনা প্রবন্ধে কথাটা আরও ভাল করিয়া আমরা বুঝিতে পারিব।

একদিকে অর্থোপার্জ্জন, পরিজন প্রতিপালন ও বিষয় সম্ভোগ, অপরদিকে সামাজিক বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদন—এই সব লইয়াই গৃহস্থের গার্হস্থ্য জীবন অতিবাহিত হয়। বয়স অধিক হইয়া উঠিলে এই সব কর্ম্মে শক্তি ও আগ্রহ কমিয়া আইসে। ধর্ম্মপরায়ণ ও মোক্ষকামী গৃহস্থের চিত্তে একটা সংসার বিরাগের ভাবও দেখা দেয়। পুত্রেরাও এই সময়ে বয়ঃপ্রাপ্ত ও সংসারের ভার গ্রহণের যোগ্য হইয়া উঠে। শাস্ত্র তাই উপদেশ দিয়াছেন, গৃহস্থ এই সময়ে পুত্রদের উপরে সংসারের ভার দিয়া একা অথবা সস্ত্রীক বনে অর্থাৎ সাংসারিক কর্ম্মকোলাহল ও বিষয়-প্রলোভনাদির বাহিরে জন বিরল কোনও পবিত্র স্থানে গমন করিবেন এবং নিয়ত অধ্যয়নে, কঠোর ব্রতে ও তপস্যায় সেখানে জীবনযাপন করিয়া আত্ম জ্ঞানলাভে যত্নশীল হইবেন। এই অবস্থার নাম বানপ্রস্থ আশ্রম।

এরূপ কোনও স্থানে গিয়া এইরূপ কঠোর ব্রতে ও তপস্যায় জীবনযাপন করা যে সকল গৃহস্থের সম্ভব হইত না, তাঁহাদের পক্ষে ভগবান্ মনু এইরূপ ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—

ত্রিবিধ ঋণ হইতে যথাবিধি মুক্ত হইয়া যোগ্য পুত্রের হস্তে সংসারের সকল ভার অর্পণ করতঃ নিশ্চিন্তভাবে মধ্যস্থের ন্যায় গৃহস্থ গৃহেই বাস করিবেন এবং নির্জ্জন স্থানে (নির্জ্জন নদীতীরে কি দেবস্থানে কি নিজ নিজ পূজাগৃহে) একাকী থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মহিত চিন্তা করিবেন। একাকী এইরূপ চিন্তাধ্যানপরায়ণ হইলেই মানুষের পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে। *

এই শিক্ষা ও আদর্শের ধারা সেই প্রাচীনকাল হইতে এমনই ভাবে চলিয়া আসিতেছে, যে এখনও বহু এমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গৃহস্থ দেখা যায়, যাঁহারা কেহ গৃহে কেহ বা কাশী, নবদ্বীপ, বৃন্দাবন প্রভৃতি ধামে জীবনের শেষভাগ এইভাবে যাপন করেন।

যাহা হউক, এই বানপ্রস্থ আশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া ব্রতে, তপস্যায়, স্বাধ্যায়ে ও আত্ম-চিন্তায় সমধিক উন্নতিলাভ হইলে, জীবনের চতুর্থ ভাগে বানপ্রস্থী যাঁহারা পারেন সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন। †

---

* মহর্ষি পিতৃদেবানাং গত্বানৃণ্যং যথাবিধি।
পুত্রে সর্ব্বং সমাসজ্য বসেন্মাধ্যস্থমাশ্রিতঃ॥
একাকী চিন্তয়েন্নিত্যং বিবিক্তে হিতমাত্মনঃ।
একাকী চিন্তয়ানোহি পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি॥
মনু, ৪, ২৫৭—২৫৮

† সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদের পক্ষেই ইহা সম্ভব হইত এবং ব্যবস্থাও একটি হয়, যে ব্রাহ্মণই মাত্র শেষ এই আশ্রমের অধিকারী।

সর্ব্বশেষে এই দুইটি মন্ত্রে অতি ব্যাপক দুইটি তর্পণ করিতে হইবে, যথা—

"ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীত কুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপন্তু ভুবনত্রয়ম্॥"
"ওঁ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্তং জগৎতৃপ্যতু।"

দেবযজ্ঞ।—অদৃশ্য যে সব নৈসর্গিক শক্তি—যাঁহারা চেতন ও পুরুষবিধ সত্ত্ব বটেন—পরমেশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়া এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদেরই দেবতা এই সংজ্ঞা ঋষিরা দিয়াছেন। হোমে ও বলিতে ইঁহাদের তুষ্টি হয় এবং ইঁহাদের বল বৃদ্ধি পায়। ইহার রহস্য কি, রহস্য কিছু আছে কিনা, তাহার আলোচনার মধ্যে যাইবার প্রয়োজন এস্থলে কিছু নাই। ঋষিরা এইরূপ বলিয়াছেন এবং আস্তিক হিন্দুরা বিশ্বাসও ইহাতে করেন। ইঁহাদের এই তুষ্টি ও পুষ্টি বিধানার্থ নিত্য যে হোম ও বলির ব্যবস্থা আছে, তাহাই দেবযজ্ঞ।

নৃযজ্ঞ।—মানুষ সকলেই আমাদের অতি আপন জন। নিজ নিজ গৃহে সকলেই নিজ নিজ অশনবসনাদি আহরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আবার নানা কর্ম্মে অনেককেই গৃহ ছাড়িয়া দূরে যাইতে হয়। এইভাবে যে কেহ আমার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তাহাকেই অন্নপানীয় ও আশ্রয়দানে আমাকে পরিতুষ্ট করিতে হইবে। তাই অতিথিসেবা নৃযজ্ঞের অর্থাৎ নরসেবার প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ভরণীয় ও প্রতিপাল্য যে কোনও ব্যক্তিকে অশনবসনাদি দানে সেবা করাও নৃযজ্ঞের অন্তর্ভুক্ত। মনুসংহিতা তৃতীয় অধ্যায় ১১৪, ১১৫ ও ১১৬ শ্লোকে তাই আছে—

'যে অবিচক্ষণ পরিবারভুক্ত নববধূ, বালকবালিকা, রোগী, গর্ভিণী এবং আশ্রিত ও অতিথি প্রভৃতিকে ভোজন না করাইয়া নিজে অগ্রে ভোজন করে, সে জানে না যে মরণের পর তাহার দেহ কুক্কুর গৃধ্র ও শৃগালের ভক্ষ্য হয়। ব্রাহ্মণগণকে, জ্ঞাতি ও দাসাদি ভরণীয়গণকে ভোজন করাইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, গৃহস্থ-দম্পতী তাহাই ভোজন করিবেন।'

দয়ায় ভিক্ষা দিয়া, অন্নসত্রাদি খুলিয়া, নিরন্ন মা[illegible] অন্নদান করা যায়। তাহারও ব্যবস্থা ও রীতি এ[illegible] আছে। কিন্তু আপন গৃহে যত্ন করিয়া আপন জনের অন্নদানাদি রূপ সেবায় সেব্য ও সেবক উভয়েরই [illegible] তৃপ্তি ও আনন্দ হয়, অন্য কোনও ভাবে তাহা হয় 'নৃযজ্ঞ' নামের সার্থকতা ইহাতেই হইয়াছে।

ভূতযজ্ঞ।—সকলের উপরে জ্ঞানমূর্ত্তি পর[illegible] তারপর পিতৃগণ ও দেবগণ, সমান জৈব স্তরে অপর সব [illegible] এবং নিম্নস্তরে ইতর প্রাণিগণ সকলের সঙ্গেই আমার [illegible] রহিয়াছে। এই সম্বন্ধের যোগ আমাকে মনে রাখিতে হ[illegible] এবং যাহা ইহাদিগকে দেয় তাহাও আমাকে দিতে হই[illegible] তাই ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও নৃযজ্ঞের ন্যায় ভূতয[illegible] একটা ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা এই যে, নানাবিধ [illegible] শুদ্ধভাবে ও যত্নে স্থানে স্থানে ইহাদের উদ্দেশ্যে রা[illegible] হইবে। অভিরুচিমত ইহারা আসিয়া তাহা গ্রহণ করি[illegible] ইহাই ভূত বলি। এই বলিদানই ভূতযজ্ঞ।

গার্হস্থ্য-ধর্ম্মের অঙ্গীয় নিত্যক্রিয়াপদ্ধতির মধ্যে পঞ্চযজ্ঞ প্রধান একটি অনুষ্ঠান বলিয়া বিহিত হয়।—' সন্ধ্যা' আর একটি প্রধান অনুষ্ঠান। প্রাতে মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে—অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে সূর্য্যাস্তে এবং উভয়েই মধ্যক —এই তিনটি সন্ধি সময়ে নির্দ্দিষ্ট কোনও পদ্ধতি অনু[illegible] ভগবদুপাসনার নাম 'ত্রি-সন্ধ্যা'। ভারতীয় ঋ[illegible] বলেন, এক একটি সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া অসংখ্য জগৎ[illegible] নিখিল এই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হ[illegible] অভিব্যক্ত হইয়াছে, যাহার আশ্রয়ে বা শক্তিতে সুশৃ[illegible] একটা নিয়মে এই অভিব্যক্তির ধারা চলিতেছে, এবং অভিব্যক্তির ধারা একটা পূর্ণতা লাভের পর যাহ[illegible] সংহৃত বা বিলীন হইবে, তাহাকে ঋষিরা 'ব্রহ্ম'এই [illegible] দিয়াছেন। সকলের মূলে এইরূপে কিছু একটা আছে 'ওঁ তৎসৎ'—ইহা ব্যতীত মূল স্বরূপে বা স্বভাবে এই ব্রহ্ম কি, যোগবলে তাহার একটা অনুভূতি মাত্র সিদ্ধ পুরুষ[illegible] হইতে পারে; কিন্তু বিশিষ্ট কোনও লক্ষণে তাহাকে [illegible] বুঝাইতে পারেন না। "অবাঙ্‌মনসোগোচরম্' অ[illegible] বাক্য ও মনের অগোচর বা অতীত বলিয়াই ঋষিরা ইঁ[illegible] কথা বলিয়াছেন। বিশ্বব্যাপক মূল সত্তা বা তত্ত্বের [illegible] ভাবকে তাঁহারা 'নির্গুণ' ব্রহ্ম বলিয়াছেন। কিন্তু য[illegible]

নির্গুণ, তাহা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বিকার, তাহা হইতে কিছুই হইতে পারে না। 'সগুণ' ও বহুধা ক্রিয়াশীল এই ব্রহ্মাণ্ড কি ভাবে তবে তাহা হইতে অভিব্যক্ত হইল? ঋষিরা বলেন, নির্গুণ এই ব্রহ্মে প্রচ্ছন্ন এমন একটা ভাব বা শক্তি আছে, যাহার প্রকাশে বা জাগরণে 'নির্গুণ' এই ব্রহ্ম 'সগুণ' হন, অর্থাৎ সৃষ্টির ইচ্ছা ও সৃষ্টিমূলক যাহা কিছু চেতন ক্রিয়াশীলতা তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পায়, এবং পরমপুরুষ পরমেশ্বরের বা ভগবানের স্বরূপতা ও স্বভাব তিনি ধারণ করেন। এই যে ভাব বা শক্তি যাহার প্রকাশে বা জাগরণে নির্গুণ ব্রহ্মে সগুণ পরমেশ্বরত্ব প্রকাশিত হয়, তাহাকে 'মায়া' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। 'মায়া' বলিতে একটা একটা কিছু সীমার মধ্যে আনা বুঝায়। মানুষের বাক্য-মনের অতীত নির্গুণ ব্রহ্ম ইহার প্রভাবে জ্ঞানের সীমার মধ্যে অর্থাৎ মানুষ কতকটা বুঝিতে ও বর্ণনা করিতে পারে এমন একটা অবস্থায় আসেন, তাই এইভাব বা শক্তিকে 'মায়া' এই নাম দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ কিছু একটা আছে, যাহার প্রভাবে জ্ঞানাতীত নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞানগোচর সগুণস্বরূপ গ্রহণ করেন, ইহা ব্যতীত এই 'মায়া' সম্বন্ধেও স্পষ্ট কোনও সংজ্ঞা কেহ দেন নাই। 'অনির্ব্বচনীয়' বলিয়াই ইহার কথা ঋষিরা উল্লেখ করিয়াছেন।

জগত্তত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনের শেষ প্রশ্নের উত্তর পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধি পৌছায় না। ইহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা পরমেশ্বর বলিলেও প্রশ্ন উঠিবে, ইনি কোথা হইতে আসিলেন, ইঁহার কারণ কি? তখন বলিতেই হইবে, ইঁহার কারণ বা মূলতত্ব কিছু আছে, যাহা বুঝি না, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি আর যায়না। এই যাহা বুঝিনা, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধি আর যায়না, তাহাই নির্গুণ ব্রহ্ম। আত্মস্থিত অথচ প্রচ্ছন্ন একটা শক্তির জাগরণেই নির্গুণ ব্রহ্ম সগুণ পরমেশ্বর হন—একথাটাও মানিতে হইবে,—যদিও এই শক্তির তত্বরহস্য আমরা ধরিতে পারিনা।

যাহা হউক, এই পরমেশ্বর হইতেই অসংখ্য জগতের সমগ্র স্বরূপ এই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হইয়াছে। প্রত্যেকটি জগতের কেন্দ্রশক্তি এক একটি সূর্য্য এবং সূর্য্য হইতেই গ্রহাদি প্রসূত হইয়া তাহার তেজেই জীবিত রহিয়াছে। সুতরাং এ কথা আমরা বলিতে পারি, এক একটি জগতে পরমেশ্বরের যে সত্তা, তাহা সেই জগতের কেন্দ্রশক্তি সূর্য্য-রূপেই প্রথমে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তাহা হইতে ক্রমে বিভিন্ন গ্রহ ও গ্রহবাসী জীবাদির উদ্ভব হইয়াছে। জীবের দেহ, দেহের যাহা জীবনী ক্রিয়া, জীবের প্রাণন মনন চেতন-জ্ঞান সবই এই সূর্য্য হইতে আসিতেছে। সকলের মূল এই সূর্য্য। জীবত্বের স্রষ্টা ও জীবধর্ম্মের প্রেরয়িতা এই সূর্য্যই এক একটি জগতে পরমেশ্বরের মূল বিভূতি—তাঁহারই এক একটি খণ্ডস্বরূপ পৃথক্ এক একটি ঈশ্বর—যাঁহাদের সকলকে লইয়া—যাঁহাদের বিভুরূপে তিনি পরমেশ্বর। উপনিষদে ঋষি তাই গাহিয়াছেন—

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥"

আমরা পৃথিবী রূপ একটি গ্রহবাসী জীব। এই গ্রহের ও গ্রহবাসী জীব আমাদের সবিতা এবং প্রাণমনচেতনার প্রেরয়িতা আমাদের নিকটতম ঐ ব্রহ্মবিভূতি সূর্য্য। এই সূর্য্যের যে 'ভর্গ' অর্থাৎ সজীব ও চেতন যে ব্রহ্মজ্যোতিঃ ইহাতে রহিয়াছে—তাঁহার ধ্যানে সেই জ্যোতিঃর প্রেরণা নিজের মধ্যে গ্রহণ করিবার চেষ্টাই সন্ধ্যা উপাসনার প্রধান অঙ্গ। সন্ধ্যা উপাসনায় ধ্যেয় ও জপ্য যে গায়ত্রী মন্ত্র—সবিতৃদেবের এই ভর্গের ধ্যানে এই প্রেরণা লাভের প্রার্থনাই তাহার কথা। সূর্য্যরূপে ভগবান্ আমাদের এই জগতে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, এই জাগতিক সব ব্যাপারের অধিপতি ও নিয়ন্তা হইয়া আছেন। আমার এই দেহ, দেহাশ্রিত প্রাণমন চেতনা, সব তাঁহা হইতেই আসিয়াছে, সংস্বরূপে, চিৎস্বরূপে ও আনন্দ-স্বরূপে তাঁহার মধ্য দিয়াই সচ্চিদানন্দ সেই ভগবানের সঙ্গে আমি যুক্ত হইয়া রহিয়াছি। তাই এই সবিতৃদেবকে অবলম্বন করিয়া ভগবদুপসনার এই পদ্ধতি ঋষিরা পরিকল্পনা করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণে ক্রমে এই যোগের সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিলেই জীবের মোক্ষলাভ হয়, এবং সেই সিদ্ধির পক্ষে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর কি হইতে পারে জানিনা।

পঞ্চ যজ্ঞ ও ত্রিসন্ধ্যা দ্বিজবর্ণীয় প্রত্যেক গৃহস্থের পক্ষে প্রত্যহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হয়। এইগুলিকে শাস্ত্রকারগণ নিত্যকর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, যাহা না করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয়, অর্থাৎ মানব-জীবনের

ব্য লঙ্ঘিত হয়। এই সব নিত্যকর্ম্ম না করিলে পাপ আছে, ঃ করিলে বিশিষ্ট কোনও পুণ্যলাভ কাহারও হয় না। ার অর্থ দেহরক্ষার প্রয়োজনে দৈনিক আহার বিশ্রামাদির —মানবচরিত্রকে মোক্ষাভিমুখ পথে পরিচালিত করিবার াজনে এসব করিতেই হইবে, না করিলে নয়। কিন্তু লাম বলিয়া বড় ভাল কিছু করিলাম, দেবতার বিশেষ গ্রহ কিছু ইহার বিনিময়ে কিনিয়া রাখিলাম, এরূপ কেহ করিবেন না।

সাধারণ ভাবে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল ন্ত নিত্যকর্ম্মের সকল বিধি-ব্যবস্থাতেই সাধু গৃহস্থের কে জীবনযাত্রার এইরূপ একটি ধারা দেখিতে পাওয়া ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে (রাত্রি চারিদণ্ড থাকিতে) জাগ্রত ন। প্রথমেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এবং নবগ্রহের অধিষ্ঠাতৃ াণকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নিকটে সুপ্রভাত কামনা বেন। মন্ত্র যথা—

ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনি রাহু কেতূ
কুর্ব্বন্তি সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥

তার পর ভগবানকে স্মরণ করিয়া মনে মনে বলিবেন,—

"লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥"

তার পর প্রাচীন মহাপুরুষদের এবং উপাস্য দেবদেবীদের করিয়া মনে মনে আবার বলিবেন,—

"অহং দেবো না চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈ বাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং
নিত্য মুক্ত স্বভাববান্॥"

হার পর ইষ্টদেবতা ও গুরুকে মনে মনে পূজা ও প্রণাম করিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও ইহাদের অবিরোধী কামের, অর্থাৎ দিবসে কি কি ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, কোন্ প্রয়োজনে বিহিত কি কর্ম্মে কি অর্থ আহরণ করিতে হইবে, এবং উভয়ের অবিরোধে কি কাম্য সাধন করিতে হইবে এই সব চিন্তা করিবেন। তার পর পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া শয্যাত্যাগ করিবেন। শৌচক্রিয়াদি সমাপনান্তে স্নান তর্পণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা করিবেন। ইহা হইল প্রাতঃকৃত্য।

তার পর দেবপূজাদি ও বেদ বেদাঙ্গ পাঠ অর্থাৎ ব্রহ্ম-যজ্ঞ করিয়া গৃহস্থ পোষ্যবর্গের নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিবেন।

ইহা শেষ হইলে মধ্যাহ্ন স্নান ও মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিতে হইবে। তার পর অগ্নিহোত্রাদি দেবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ ইত্যাদি সমাধা করিয়া গৃহস্থ আহার করিবেন।

এইভাবে মধ্যাহ্নকৃত্য শেষ হইলে অপরাহ্নের প্রথম ভাগে গৃহস্থ পুরাণ ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পাঠ করিবেন। তার পর দেবমন্দির দর্শন ও আত্মীয় স্বজনগণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করিয়া আসিবেন। তখন সায়াহ্ন উপস্থিত হইবে। স্নান করিয়া গৃহস্থ সায়ংসন্ধ্যা করিবেন। তার পর আহারাদি করিয়া পারিবারিক বিষয়কর্ম্মাদি যাহা থাকে, তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন। ইতিমধ্যে বিশেষ বিশেষ যে কোনও কর্ম্মের প্রয়োজন হইবে, তাহা সমাধা করিবেন। এসব সম্বন্ধে বিশেষ কোনও নিয়ম থাকিতে পারে না।

বলা বাহুল্য, বৃত্তিস্থ সাধু ব্রাহ্মণ গৃহস্থেরাই সাধারণতঃ এই নিয়মে চলিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে ঠিক এই ভাবে চলা সম্ভব হইত না। তবে প্রাতঃ পূর্ব্বাহ্ন মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নের প্রধান ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি তাহারাও যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেন। অধ্যয়নাদির সময় নিজ নিজ বর্ণের বিহিত বিষয় কর্ম্মই তাঁহাদের বেশী দেখিতে হইত।

এই সব নিত্য কর্ম্ম ব্যতীত নানারূপ যাগ যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণ, আত্মীয় কুটুম্ব ও দরিদ্রজনকে ভোজনে ও দানে এই সব সময়ে তুষ্ট ও তৃপ্ত করিতে হইত। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণ বা নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া এই সব ক্রিয়া সম্পাদিত হইত, এই জন্য এই গুলির নাম হয় 'নৈমিত্তিক ক্রিয়া'।

এইরূপ সব ক্রিয়ার মধ্যে 'দশ সংস্কার' নামে দশটি

…নুষ্ঠান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গর্ভাধান, পুংসবন, …সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামন, অন্নপ্রাশন, …চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ এই দশটি অনুষ্ঠানের নাম …শ সংস্কার। নামগুলি হিন্দু সন্তান সকলেরই পরিচিত …এবং কোন কোনও স্থানে এখনও হিন্দুগৃহস্থের গৃহে …অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সকলেই দেখিয়াছেন; বিস্তৃত …বৃতির প্রয়োজন এই স্থলে বিশেষ কিছু নাই। মাতৃগর্ভে …জীবের আবির্ভাবের সূচনা হইতে ভ্রূণাবস্থায় তাহার বৃদ্ধি, …ন্মের পর পূর্ণ বয়ঃপ্রাপ্তি এবং তখন তাহার …গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ—এই কালযাবৎ তাহার শুদ্ধি ও …কল্যাণ কামনা করিয়াই এই সব অনুষ্ঠান সম্পাদনের …ব্যবস্থা হয় এবং তাই নাম হয় 'সংস্কার'। নৈমিত্তিক …ক্রিয়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া …যায় যে, যে পারে করিবে; না করিলে প্রত্যবায় কিছু …নাই। তবে করিলে বিশেষ বিশেষ ফল লাভ হয়। …কিন্তু দশ সংস্কারগুলির অনুষ্ঠান, যে ভাবে হউক, সকলকে …করিতেই হইবে। নতুবা কাহারও শোধন বা সংস্কার …হয়না। দ্বিজসন্তান কেহ দ্বিজত্বলাভ করিতে পারেনা, …শাস্ত্রবিহিত কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অধিকারী হয়না। প্রত্যহ …করিতে হয়না, তাই এইগুলিকে নিত্যকর্ম্মও বলা যায়না, …অথচ নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলের অবশ্য কর্ত্তব্য। পারিলে …করিব, না পারি করিবনা, এভাবে উপেক্ষাও করা যায়না, …সাধারণতঃ নৈমিত্তিক কর্ম্ম যেরূপ করা যায়। তাই ঠিক …নৈমিত্তিক না বলিয়া এ-গুলিকে পৃথক একটা শ্রেণীতে ফেলা …হইয়াছে। পিতামাতার আদ্য ও বার্ষিক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদিও এই দশসংস্কারের ন্যায়ই সময়-বিশেষে অবশ্য করণীয় আর একশ্রেণীর ক্রিয়া।

ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম্মনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস কি ভাবে এদেশে হইয়াছিল, এই আশ্রমধর্ম্মে বিশেষতঃ ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমের অনুশাসন-পদ্ধতি হইতে তাহার পরিচয় আমরা পাই। ধর্ম্মপথে মানবজীবনকে পরিচালিত করিবার পক্ষে আশ্রম ধর্ম্মানুশাসনে যে আদর্শের স্থাপনা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আর কি হইতে পারে জানিনা। এই আদর্শ পালনে রাজ্যশাসনে কি সমাজশাসনে সাধারণতঃ কাহাকেও বাধ্য করা হইত না। বাল্যাবধি শিক্ষা-দীক্ষার এবং সাধুজীবনের সাধারণ দৃষ্টান্তের প্রভাবে আপনা হইতেই যাহার পক্ষে যতদূর সম্ভব এই আদর্শধারার পথে মানুষ চলিত, চলিয়া আনন্দ লাভ করিত এবং এই আনন্দই তাহাকে এই পথে স্থির রাখিত। সকল নিয়মের অনুশাসন হইতে মানুষ মুক্ত হইত; শেষ সেই ভৈক্ষ্য আশ্রমে, যখন জীবনব্যাপী সাধনার ফল এই মুক্তির যোগ্য তাহাকে করিয়া তুলিত, এই মুক্তিতে আপন আত্মার কি লোকসমাজের অকল্যাণকর কোনও পথে যাইবার সম্ভাবনা আর তাহার থাকিত না, সত্যই সে আপনাতে 'নিত্যমুক্তস্বভাববান্ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ'কে উপলব্ধি করিত, করিয়া সত্য সত্যই মনে প্রাণে বলিতে পারিত,—

"অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি
ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং
নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥"



উপন্যাস

মাটীর দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৪)

বাড়ী হতে বার হওয়ার নাম করলে সৈকতের গা ছম ছম করে, মনে হয় আর যে কেউ দেখলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি দাদারা, বিশেষ করে বড়দার সঙ্গে দেখা হয়।

ইন্দ্রনীলও তাকে বার হওয়ার জন্যে বিশেষ পিড়াপিড়ী করে না। অস্বস্তিও বোধ হয়, আবার তৃপ্তির আনন্দও আসে।

সৈকত ইন্দ্রনীলের পানে চায়—

মনে হয় রজনীগন্ধার বনের উপর দিয়ে কাল-বৈশাখী চলে গেছে। ঝড়ে সব গাছ মাটীতে নুয়ে পড়েছিল, আবার তারা উঠলেও প্রকৃত জীবনীশক্তির বিকাশ আজও হয় নি। পাতাগুলো চিরে শত টুকরো হয়ে গেলেও তাদের চিহ্ন আছে, কিন্তু ফুল যে ফুটেছিল তার চিহ্ন পড়ে আছে মাটীর উপর, গাছে নয়।

বাড়ীতে খুব কমই তার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। সেদিন জানালা দিয়ে সৈকত দেখতে পেয়েছিল কৌষিকীকে—তার হাসিও দেখেছিল,—প্রসন্ন উদার হাসি, সব পাওয়ার সার্থকতার হাসি।

পা হতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করে জ্বলে উঠেছিল, মনে হয়েছিল ছুটে গিয়ে ওই বেহায়া মেয়েটাকে বেশ দু-কথা শুনিয়ে দেয়।

ছুটতে গিয়ে হঠাৎ সে থতমত খেয়ে দাঁড়াল, কি অধিকার—তারই বা কি অধিকার আছে? কৌষিকীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের যে সম্পর্ক তার সঙ্গেও তো তাই, বিশেষ কোন অধিকার সে তো পায় নি।

বড়দার পত্রের কথা মনে হল।

দাঁতে ঠোঁট চেপে সৈকত দাঁড়াল। চোখে ফুটে উঠল অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য,—বেদনার তীব্র রশ্মি-জ্বালা, জল নয়, সৈকত ব্যথা পেয়ে কোনদিন চোখের জল ফেলে নি। অনুনয় বিনয় করতে সে শেখেনি, নিজের জোরে সে দখল করতে চায়।

কিন্তু এখানে দখল করার দাবিই যে অগ্রাহ্য হয়ে যাবে—

ওরে নিরুপায় মেয়েটী, উপায় নেই—কোন উপায় নেই। পথ কই। আলো—যে আলোয় সে পথ দেখতে পাবে? আশ্রয় কই—?

আজ এ আশ্রয় সে ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশ্রয় তাকে খুঁজতে হবে যে; দর্প করে একটা দিন—এমন কি একটা বেলাও সে পথে কাটাতে পারবে না। কি অসহ্য উপায়হীনতা—একদিন যার কল্পনাও হয়েছিল অসহ্য, আজ সৈকতের জীবনে তাই হল পরম সত্য।

অথচ আশ্রয় ছিল—

সৈকত মনের পাতায় চোখ বুলিয়ে গেল। সে কেবল বুলিয়েই যাওয়া মাত্র, কোথাও তো তার দৃষ্টি থেমে গেল না।

চোখ চলে গেল একবারে শেষে, যার ও-দিকে আর আলো পাওয়া যায় না,—সীমাহীন নিঃশব্দ অন্ধকার। অন্ধকারকে সাগরের সঙ্গে কোন কোন কবি তুলনা করেছেন, কিন্তু সাগরের ঢেউ চোখে পড়ে, এখানে সে ঢেউ আছে কিনা, তা তো এ পর্য্যন্ত, কেউই দেখতে পায় নি।

উঃ, দম বন্ধ হয়ে যায় ওই বিরাট বিপুল নিঃশব্দ অন্ধকারের পানে চাইতে। গায়ে গায়ে লেপটে রয়েছে, বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই—একটা সূঁচ পর্য্যন্ত ওর মধ্যে যাওয়ার পথ নেই। ওই অন্ধকারের মধ্যে ডুব দিতে সৈকত পারবে না। গেটে ওই অন্ধকার দেখেই সে চীৎকার করে উঠেছিল আলো—আলো—আরও আলো!

সৈকত জোর করে চোখ ফিরিয়ে আনলে।

অন্ধকারাচ্ছন্ন আলো—যেন সন্ধ্যা অথবা ভোর, দিনের বিদায় বা দিনের আগমন ;—কিন্তু সেও ভালো—সেও সে জীবনে বরণ করবে।

অদৃশ্য কেউ আছে কি—যে ফুল ফুটায়, দিনের আলো ফুটায়, আবার সব মুছিয়ে কালোয় ঢেকে দেয় ?

না, আজও সৈকত স্বীকার করবে না, কিছুতেই না। পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার—ছি ?—সত্যই তো, পাপই বা কি, পুণ্যই বা কি ? আজ যে অবস্থায় যে জায়গায় সৈকত এসে দাঁড়িয়েছে, প্রার্থনা করে সে যদি জীবনে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের বিকাশ পেতে চায়, পাবে কি ?

প্রার্থনা—

কথাটা মনে করতেও যেন হাসি পায়।

মানুষগুলো কি বোকা। ওরা আকার দিতে পারলেই বাঁচে, সে আকারেরও আবার বৈচিত্র্য থাকা চাই। অদৃশ্য মহাশক্তি,—নাম দেওয়া হল ভগবান।

সৈকত চুপ করে বসে ভাবতে লাগল।

ভাবতে ভাবতে সে কখন নির্দ্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের কথা ভাবছিল,—এই মুহূর্ত্তে সে আবার পূর্ব্ব চিন্তার মাঝখানে ফিরে এল।

অধিকার—হ্যাঁ, অধিকার তার মোটেই নেই। আজ যদি ইন্দ্রনীল বলে—তোমায় আমার দরকার নেই, তা হলে বড় জোর তাকে দু'টো কথা বলা চলে মাত্র, আর কিছু নয়। হ্যাঁ, ওই যে দুটি মন্ত্র, ওই যে দুটি কথা—ওই যে গোটা-কতক সাক্ষী রাখা—ওরই দাম যে অনেক। আজ সৈকত নিজের হাত নিজে কামড়াতে পারে, নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে পারে ; তাতে কারও এতটুকু ক্ষতি হবে না।

তার মিলনের সাক্ষী কে ? উদার অনন্ত আকাশ, তারা, চন্দ্র, সূর্য্য। কিন্তু ওরা চিরকালের মূক, কোনদিন মুখ ফুটে বলবে না, এরা পরস্পরের ডাকে সাড়া দিয়েছিল, এদের মিলন সেদিন ছিল পরম সত্য, সূর্য্যের আলোর মতই পরিষ্কার।

সৈকত দুই হাতে চোখ ডলতে লাগল।

যাই হোক, যেমন করেই হোক—স্থান চাই, দাঁড়ানোর মত—বসবার মত এতটুকু স্থান। সৈকত অপমানিত হয়ে বার হতে চায় না, সে মাথা উঁচু করে স্পর্দ্ধার সঙ্গে বার হতে চায়।

স্পর্দ্ধার সঙ্গে—

সৈকতের মুখে ক্ষীণ হাসির রেখাটুকু জেগে ওঠে—স্পর্দ্ধা—? মিথ্যা কথা, স্পর্দ্ধা করার স্পর্দ্ধা তার আর নেই, তার স্পর্দ্ধা ধূলোয় মিশিয়ে গেছে, ধূলোর মাঝখান হতে তাকে চিনে নেবার উপায় নেই।

সৈকত দুই হাতের মধ্যে মুখখানা রেখে ভাবতে লাগল—উপায় কি, সে কি করবে ?

সেদিন সন্ধ্যায় ইন্দ্রনীল যখন বার হওয়ার উদ্যোগ করছিল, তখন সৈকত গিয়ে তার কাছে দাঁড়াল।

গভীর স্নেহের সঙ্গে তাকে কাছে টানবার ব্যর্থ প্রয়াস করে ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কি হয়েছে সৈকত—মুখ এত ভার কেন ?"

হেসে উঠে সৈকত বললে, "মুখ ভার কোথায় দেখলে ? হ্যাঁ, আজ চল না একটু বেড়িয়ে আসি, সন্ধ্যাও হয়ে গেছে, কেউ অত লক্ষ্য করবে না।"

ইন্দ্রনীল মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে বললে, "আজ থাক সৈকত, আমার ফিরতে অনেক রাত হবে।"

মুহূর্ত্তে সৈকতের মুখখানা অন্ধকার হয়ে গেল ; সে মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে পেছন ফিরলে।

ইন্দ্রনীল ডাকলে, "সৈকত—"

সৈকত ফিরলে না।

এগিয়ে গিয়ে তারে জোর করে দাঁড় করিয়ে তার কাঁধের উপর দুখানা হাত রেখে ইন্দ্রনীল বললে, "শোন, রাগ করে যেয়ো না, আমার কথাটা শুনে যাও। কৌষিকী মজুমদারের বাড়ী আজ আমার নিমন্ত্রণ আছে, ফিরতে সেই জন্যেই অনেক রাত হবে, তাই তোমায় নিয়ে যেতে পারছি নে।"

সৈকত একবার মাত্র চোখ তুলে তার পানে চাইলে ; সে দৃষ্টিতে বার হল আগুনের ঝলক ; চোখ নামিয়ে সে বললে, "আমি তা জানি,—তোমায় এ জন্যে আর কিছু না বললেও চলে।"

ইন্দ্রনীলের হাত দুখানা সরিয়ে দিয়ে সে বার হয়ে গেল।

(২৫)

অনেকদিন পরে মেরু ফিরে এসেছে, তার স্বামী রঞ্জিত রায়ও সঙ্গে আছে। কোলে একটি শিশু, বৎসর খানেক তার বয়স হবে।

নির্ম্মল ছেলেটিকে কোলে নিয়ে টিপে নাচিয়ে তাকে অস্থির করে তুললে—ছেলেটি যখন কান্না সুরু করলে তখন তাকে মেরুর কোলে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, "এমন প্যানপেনে ছেলেটাকে কোথায় পেলি মেরু,—নাকে কান্না যেন লেগেই আছে।"

মেরু হেসে উঠে বললে, "বাপরে, যা করে তুমি টিপেছ বড়দা, ওতে ওর আর লাগবে না?"

মুখ গম্ভীর করে নির্ম্মল বললে, "অমনি করে তোরা ছেলেদের মাথা খাস মেরু—এমন কোমল করে দিস যাতে ওদের দ্বারা আর কোন কাজ চলে না। এই ছেলে—একটু টিপলে যে চীৎকার করে, সে আবার করবে দেশের কাজ,—সে আবার সইবে কষ্ট? জানিস মেরু, আমাদের দেশের মায়েরা ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে জানে না, ভূত করে গড়ে।"

ডাক্তার রুদ্র গম্ভীর মুখে বললেন, "সত্যি কথা, এটা অস্বীকার করবার যো নেই মেরু। বিলেতে দেখেছি—"

সুবিমল সেদিনকার সংবাদ-পত্রটার ওপর চোখ রাখলেও তার কাণ ছিল এইদিকে। ডাক্তার রুদ্রের বিলেতের কথা তুলবামাত্র সে কাগজখানা নামিয়ে রাখলে—

"রাখ তোমার বিলেতের কথা রঞ্জন,—ওই যে কথায় কথায় বিলেতের উপমা দেওয়া—ওটা আমি আদতে সইতে পারি নে। হাঁা, তুমি এ-দেশের কথা তোল,—কেন, এখানে বড়লোক কেউ নেই—কেউ হয় নি? এ দেশের মায়েরা সন্তান মানুষ করতে পারেন না এ মিথ্যে কথাটা অমন অসঙ্কোচে বলো না। মনে রেখো-বিলেত আমাদের দেশ নয়, আমাদের দেশ সর্ব্বদাই আমাদের দেশ—আর কিছু নয়।"

রঞ্জন হেসে উঠে বললে, "অত চটিতং কেন? যাদের যা ভালো সেটা বলা কিছু দোষের নয়, সেটা তুমিও মনে করো। সত্যি আমরা বিলেতের লোকদের কাছে অনেক রকমে ঋণী সে কথা তুমি স্বীকার করতে বাধ্য সুবিমল। মনে কর দেখি—মুসলমানদের অধিকারে আমাদের অবস্থা কি হয়েছিল,—আমাদের জাতি বলতে নামটাই ছিল মাত্র, জাতীয়তা ছিল কি? সব হারিয়ে বিষহীন ঢোঁড়ার মতই এ জাতি পড়ে ছিল, যে যত পেরেছে একে লাথিই মেরে গেছে, কেউ শিখায়নি মাথা তুলে ফোঁস করবার অধিকার এরও আছে। রোস, তর্ক পরে করো সুবিমল, আগে আমার বক্তব্যগুলো বলতে দাও। এক কালে এদেশে মানুষ ছিল সেই গর্ব্বটা মনে জাগিয়ে রাখার মত নির্ব্বুদ্ধিতা দুনিয়ায় আর নেই। মানুষকে মানুষ করে গড়ে তুলবার শক্তি-বুদ্ধি, জ্ঞান আমরা পেয়েছি ওদেরই কাছ হতে, এ-কথা আজ অস্বীকার করলে দারুণ মিথ্যাবাদী হতে হবে। জাতীয়তা—তার জন্যে গর্ব্ব করার শক্তি ওরাই আমাদের দিয়েছে, একতার আবশ্যক ওরাই শিখিয়েছে। বলুন বড়দা, আপনি তো এ সম্বন্ধে অনেক ভাবেন, বলুন—আমার কথা সত্যি কিনা।"

নির্ম্মল মাথাটা দুলিয়ে বললে, "নিশ্চয়ই সত্যি—এর মধ্যে যে একটুও ভুল আছে তা আমি স্বীকার করি নে। তবে এ কথাটা সত্যি রঞ্জন—ওরা আমাদের অনেক কিছু যা দিয়েছে, যা নিয়ে আমরা অনেক পেয়েছি ভেবে ভারি খুসি হয়ে প্রাতসন্ধ্যা ওদের মঙ্গলকামনা করে যাচ্ছি, সে সবই খোসাভুষি মাত্র, শ্বেতসারটুকু চুষে খেয়ে ওরা ওইটুকুই মাত্র আমাদের দিয়েছে।"

মেরু বললে, "নাও, হচ্ছিল এক কথা—এল আর এক কথা।"

বড়দা অকস্মাৎ সচকিত হয়ে উঠল—"হ্যাঁ হ্যাঁ, তোর ছেলের কথা হচ্ছিল—না মেরু?"

সুবিমল উঠে দাঁড়াল,—"তোমরা কথা বল, আমি চলছি, অনেক কাজ রয়েছে ওদিকে।"

খুব তাড়াতাড়ি সে বার হয়ে গেল।

নির্ম্মল মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বললে, "আসল কথা কি জানো? এই সুবিমল এককালে ছিল বিলেতের পরম ভক্ত, আজকাল ও ওদের সভ্যতাটা আর মোটেই পছন্দ করতে পারছে না। ও হয়েছে যেন কালাপাহাড়ের সেকেণ্ড এডিশান,—যাকে দেখতে পারবে না তার একেবারে মূলোচ্ছেদ করতে চায়,—তার পরে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে একেবারে উড়িয়ে দেয়। আজকাল হঠাৎ হয়ে পড়েছে ভারতীয় সভ্যতার দারুণ ভক্ত।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসু নেত্রে নির্ম্মলের পানে চাইলে—

নির্ম্মল বললে, "তুমিও তো অনেক কথা জানো রঞ্জন, কাজেই সে সম্বন্ধে আর কোন কথা না তোলাই ভালো।"

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, "মিঃ চ্যাটার্জ্জি এখানে আছেন —আর সৈকত ?"

মেরু মুখ ফিরালে।

অন্যমনস্কভাবে বড়দা বললে, "শুনেছি ওরা এখানে এসেছে। কাল হঠাৎ ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেছল মিঃ মজুমদারের বাড়ীতে,—আমি তার সঙ্গে কথা বলতে পারি নি।"

রঞ্জন মুখ কুঞ্চিত করে বললে, "সত্যিই ঘৃণা হয়, কেন না - "

বাধা দিয়ে নির্ম্মল বললে,—"ঘৃণা ? ভুল করছ রঞ্জন, ঘৃণা নয়, ঘৃণা আমি তাকে করতে পারলুম না। ভেবেছিলুম তাকে ঘৃণাই করব,- কিন্তু আশ্চর্য্য মানুষ সে,—সে যখন আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে তার হাতখানা বাড়িয়ে দিলে, তখন আমি মুগ্ধবিস্ময়ে কেবল তার মুখের পানে তাকিয়ে রইলুম। কি ভাবছিলুম জানো ? ভাবছিলুম—এত সুন্দর মানুষ হতে পারে ? এত সুন্দর মুখ, এত সুন্দর চোখ,— এত সুন্দর অমায়িক সরল ব্যবহার—?"

মেরু চকিতে মুখ ফিরিয়ে একবার বড়দার পানে চাইলে—

নির্ম্মল বলতে লাগল—"না, ওকে আমি দোষ দেব না, দোষ দেওয়াও চলে না। জানো ভুমি—কুশ্রীতা অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—হাজার গুণ থাকলেও একমাত্র কুশ্রীতার আবরণের তলায় চাপা পড়ে যায়। সুশ্রীদের দাবি আছে, ওরা মানুষের মনের ওপর প্রভাবও বিস্তার করে অনেকখানি, যাতে ওদের দোষ দোষ বলে গণ্য হতে পারে না। সাময়িক একটু আঘাত হয় তো দেয়, কিন্তু সৌন্দর্য্যই সে আঘাতের বেদনা নিঃশেষে মুছে দিতে পারে। হ্যাঁ, গুণ নয়, কাজ নয়, কেবল সৌন্দর্য্য, যাকে সোজা সরল কথায় রূপ বলতে পারা যায়।"

রঞ্জিত রায়ের মুখে ঘৃণাপূর্ণ হাসির রেখা ফুটে উঠল, বললে; "কিন্তু এ-কথাও জানবেন বড়দা, ওদের সৌন্দর্য্যের তলায় আছে নিষ্করুণ কঠোর প্রাণ, জগতে যত কিছু অঘটন ঘটিয়েছে ওই সুন্দরেরাই,—"

বাধা দিয়ে বড়দা বললে, "সেটাকেই ওদের অপরাধ বলে ধরো না রঞ্জন, ওটাকে বরং গুণ বল। সৌন্দর্য্য সত্যিই মহৎ গুণ—দাবি নিয়ে আসে, দাবি নিয়েই যায়। দুনিয়ায় এ পর্য্যন্ত যত যা কিছু ঘটনা হয়ে গেছে, আজও হয়ে আসছে, বল দেখি—তার মূলে কি এই দাবিই নেই ? জানো, আমি যদি পৃথিবীর একচ্ছত্র নৃপতি হতে পারতুম, আমি আগেই আদেশ দিতুম—যারা সুশ্রী, এই সুন্দর পৃথিবীতে কেবল তারাই বাস করবে,—যারা কুশ্রী তাদের হত্যা করা হোক, তাদের নির্জ্জনে যাবজ্জীবন বাস করবার আদেশও দেওয়া হোক। এতে ফল হতো এই—কালোরা লুপ্ত হয়ে যেত, সুন্দর পৃথিবীতে থাকত কেবল সুন্দর মানুষেরা।"

মেরু শুষ্ক হাসি হেসে বললে,—"তাহলে কালোদের বেঁচে থাকাই ঝকমারি দাদা ? বেচারারা যাবে কোথায়— কি করবে—ওরা কি জন্মাবে না ?"

নির্ম্মল একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, "আঃ, কোন রকমে তা যদি হতো তা হলে তো বাঁচা যেত। আমেরিকার দেখাদেখি সমস্ত দেশ আজ জন্মশাসন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, কেন—আগে এই বিশ্রী ছেলেমেয়ের জন্মানোটা বন্ধ করে দিক না ? সে দিকে কেউ মাথা দেবে না, যত সব উদ্ভট ব্যাপার নিয়েই মত্ত হয়ে রয়েছে। রোস, রাতারাতি খালিফ হারুণ অল রসিদ যদি হতে পারি —কাল সকালেই কুশ্রী পুরুষ মেয়েদের ফায়ার করতে আদেশ দেব।"

রঞ্জিত খুব খানিকটা হেসে নিলে—

বললে, "যাক, সেটা দূর-ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা। বড়দা. মিথ্যে স্বপ্ন না দেখাই ভালো, কেন না ও-স্বপ্ন কোনদিন সত্য হবে না। সত্যি যা তারই আলোচনা আজ হোক। মিঃ চ্যাটার্জ্জি জীবনভোরই উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে কাটিয়ে দিন, সমাজ-বিগর্হিত কাজ করে যান, সমাজকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিন, আপনি তবু তাঁকে ঘৃণা করতে পারবেন না, কেন না তিনি পরম সুন্দর, তাঁর সব দোষই তাই আপনার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। আর আমরা বেচারীরা—সুন্দর নই বলেই যা কিছু দুঃখ কষ্ট সবই আমাদের সইতে হবে—আশ্চর্য্য !"

নির্ম্মল বললে, "সুন্দর না হওয়া একটা মস্ত বড় অপরাধ সেইটাই শুধু জেনে রেখে দিস মেরু, কালোর অপরাধ পদে পদে, তাই অন্ধকার কেউ দেখতে পারে না, আলোকেই সবাই চায়।"

মেরুর খোকাটীকে কোলে তুলে নিয়ে সে উঠে পড়ল।

(২৩)

অনেকদিন পরে মেরুর সঙ্গে দেখা—

সে মেরু আজ নেই, এ মেরু স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা।

ইন্দ্রনীল এসে তার পাশে—ঠিক অনেকদিন আগেকার মতই দাঁড়াল।

মেরু হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল,—এই মুহূর্ত্তে সে এমন একজনকে কাছে পেতে চাইল—যে তাকে ইন্দ্রনীলের আকর্ষণ হতে মুক্ত রাখতে পারবে। স্বামী, সে চলে গেছে কর্ম্মস্থলে, খোকা বেড়াতে গেছে সুব্রতার সঙ্গে।

মেরু স্বপ্নেও ভাবে নি তার বাল্যসখী হিন্দোলের বাড়ীতে ইন্দ্রনীলের যাতায়াত আছে। নিশ্চিন্ত ভাবে সে নিজেও বেড়াতে এসেছিল,—মাঝে আর একটা দিন আছে মাত্র, তারপরই তাকে চলে যেতে হবে স্বামীর কাছে মাদারীপুরে।

যে স্মৃতি অনেক কষ্টে বিবর্ণ হয়ে এসেছিল, অন্ততঃ পক্ষে মেরু তাই মনে করেছিল, অকস্মাৎ সে স্মৃতি হয়ে উঠল অতি উজ্জ্বল,—মেরু একেবারে বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে ইন্দ্রনীল বললে, "চমৎকার, আজ যে তোমার দেখা এখানে মিলবে তা আমি মোটেই আশা করি নি। আজ কয়দিন ধরে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করবার চেষ্টা করেছি, হয়ে ওঠে নি।"

ক্ষীণকণ্ঠে মেরু বললে, "আমাদের বাড়ী যান নি কেন, গেলেই হতো⋯"

বলেই সে চুপ করে গেল—মনে পড়ল—কথাটা বলা নেহাৎ অশোভন হয়ে গেছে, জেনেশুনেই ওকে অপমান করা হল।

কিন্তু ইন্দ্রনীল এ অপমান গায়ে মাখলে না, একটু হেসে বললে, "যাওয়ার কি যো আছে, সে সাহস থাকলেও অপমান সইতে যেতে চাই নে। একই বাড়ীতে ও-রকম দুটো কাণ্ড ঘটে গেল—"

"দুটো কাণ্ড—"

মেরু জিজ্ঞাসু নেত্রে তার পানে তাকাল।

ইন্দ্রনীল বললে, "ও-ধারের বারাণ্ডায় চল, অনেক কথা বলবার মত আছে, সব বলব।"

মেরু স্থিরদৃষ্টি তার মুখের উপর রেখে বললে, "কিন্তু আমার তো থাকবার যো নেই, এখনই বাড়ী যেতে হবে।"

ইন্দ্রনীল হাসলে "ভয় নেই মেরু, যে-জন্তে বাড়ী যেতে চাচ্ছ, তা আমি জানি। একদিন তোমায় হয়তো অনেক প্রতারণাই করেছি, তা বলে আজ করব না এটুকু বিশ্বাস তুমি আমায় করো—কেননা আজ তুমি স্বামীর স্ত্রী, সন্তানের মা। কুমারী মেরুকে যা খুসি বলতে পেরেছি, তার সঙ্গে যা খুসি ব্যবহার করতে পেরেছি, পর-স্ত্রী বা সন্তানের মায়ের সঙ্গে তেমন কিছুই করব না।"

তার উজ্জ্বল মুখের পানে তাকিয়ে মেরু ভারি লজ্জিতা হয়ে পড়ল, তার মনে হল,—এ ভাবটা তারই প্রকাশ করা উচিত ছিল—ইন্দ্রনীলের পক্ষে যা অশোভন তার পক্ষে তাই শোভন হতো। তার এখন সঙ্কুচিতা হওয়ার সময় আছে কি?

মনে হল—তার স্বামী তাকে কতখানি ভালোবাসে, তার উপরে কতখানি নির্ভর করে।—

মনে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় করে সে বললে, "চল, তবু আমায় একটু সকালে ফিরতে হবে, আমার ছেলে ফিরে আসবে।"

"আমি তা জানি"—বলে ইন্দ্রনীল অগ্রসর হল।

নির্জ্জন বারাণ্ডা,—এদিকে কেউই বড়-একটা আসেনা। দেয়ালে একটা আলো নীল আবরণের মধ্যে জ্বলছিল। নিচে বাগানে হেনাফুল ফুটেছিল,তার গন্ধ সান্ধ্য বাতাসে উপরের বারাণ্ডা পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

একখানা চেয়ারে মেরুকে বসিয়ে ইন্দ্রনীল তার সামনে চেয়ার একখানা টেনে নিয়ে বসল, মাঝখানে ব্যবধান রইল ছোট একখানা তেপায়া টেবল।

তাতেই কনুয়ের ভর দিয়ে দুটি করতলের উপর মুখ রেখে ইন্দ্রনীল নিস্তব্ধে মেরুর পানে চেয়ে রইল।

মেরু অস্থির হয়ে উঠল—উসখুস করতে লাগল। এ রকম নিস্তব্ধভাবে বসে থাকা সে মোটেই পছন্দ করতে পারছিল না।

তবু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে জিজ্ঞাসা করলে, "কি দরকার—কি কথা বলবে বল, আমি এমন করে চুপচাপ বসে থাকতে পারি নে, আমার ছেলে হয়তো ফিরে এসেছে এতক্ষণ।"

শান্তভাবে ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে, "হয়তো এখনও ফেরেনি কেননা খুব বেশীক্ষণ সুব্রতা বেড়াতে যায়নি। আমি যখন

আসি তখন সে মোটরে উঠছে দেখে এসেছি। আমি এসেছি এখনও এক ঘণ্টা হয়নি মেরু।"

মেরু অধীর হয়ে বললে, "তা না হোক, আমি বাড়ী যাব, এ রকম করে বসে থাকতে আমি পারিনে।"

সে উঠতেই ইন্দ্রনীল তার হাতখানা চেপে ধরলে "একটু বসো মেরু,—পাঁচমিনিট্; ভয় নেই, এটুকু বিশ্বাস আমায় কর।"

হাতখানা ছাড়িয়ে নেওয়ার ইচ্ছা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল, তবু মেরু হাত ছাড়াতে পারলে না, চলে যাওয়ার দারুণ ইচ্ছা সত্ত্বেও সে বসে পড়ল। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠল, "আজ আপনি কেন আবার আমায় কাছে টানছেন বলুন দেখি? সত্যি, আমি আপনাকে সইতে পারছি নে, সত্যি, আমি আপনাকে আজ ঘৃণা করি, আপনাকে আমি ভুলে যেতে চাই। আমার স্বামী আছে, আমার সন্তান আছে, আমায় এমন করে—"

সে দুই হাতে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল।

ইন্দ্রনীল শান্ত দৃষ্টিতে তার পানে খানিক চেয়ে রইল, তারপর গভীর স্নেহে তার হাত দুখানা মুখের উপর হতে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে কেবলমাত্র বললে "ছিঃ মেরু—"

মেরু হাত সরালে না, তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে অশ্রু-ধারা ঝরে পড়তে লাগল।

ইন্দ্রনীল তার পাশে এসে দাঁড়াল, তার মাথাটা নিজের কোলের দিকে টেনে নিয়ে গভীর স্নেহে সে কেবল তার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—একটী কথাও বললে না।

দীর্ঘ তিনটী বৎসর মাঝখানে কেটে গেছে,—মেরু জোর করে মনকে বুঝিয়েছিল, সে ইন্দ্রনীলকে ভুলে গেছে, আর কোনদিন তাকে সামনে দেখলেও তার মধ্যে এতটুকু ভাবান্তর আসবে না।

হায়রে বালির বাঁধ, এতটুকু একটা ঢেউয়ের ভরও সইল না—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেলে, তুমি যে ছিলে সে চিহ্নটুকুও উপরে জেগে রইল না।

ইন্দ্রনীলের কোলে মাথা রেখে মেরু ফুলে ফুলে কাঁদছিল—

অনেকক্ষণ পরে শান্তকণ্ঠে ইন্দ্রনীল ডাকলে—"মেরু"—

মেরু চোখ মুছে মুখ তুলে একবার তার পানে তাকালে।

ইন্দ্রনীল বললে, "আমার সব কথা আজ থাক, এর পর কোনদিন যদি সময় পাই—বলব। আজ রাত হয়ে গেছে, পাঁচমিনিটের জায়গায় তিন কোয়ার্টার কেটে গেছে, তোমায় আর আমি আটক করে রাখতে চাইনে। চল, তোমায় তোমাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসি।"

মেরু আর্দ্রকণ্ঠে বললে, "না থাক—আমি একাই যাব।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে সে বললে, "কিন্তু এ কি করলেন আপনি, কেন এ রকম করলেন?"

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে উঠে ইন্দ্রনীল বললে, "কই, কি করেছি?"

মেরু উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বলে উঠল, "কিছু করলেন না—কিছু না—"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল—

তার মাথাটা দুইহাতে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললে, "না, কিছু করিনি,—কিছু করতে পারিনে মেরু, কারণ তুমি এখন স্ত্রী, তুমি মা, এই তোমার শ্রেষ্ঠ গৌরব, তোমার সব বিস্মৃতি-ছেঁচা মাণিক। দুনিয়ার মাঝে মেয়েদের সব চেয়ে সেরা গৌরব কি জানো,—মা হওয়া,—তাদের সব কামনা বাসনার পরিসমাপ্তি ওইখানে। তোমার মধ্যে এ আলোড়ন সত্যিই শোভন নয় মেরু, স্বামীকে তুমি পেছনে ফেলতে পারো, তোমার সন্তানকে পারো না। স্বামীকে একদিন ভালোবাসতে না পেরে থাকো—আজ পারতে হবে কেবল তোমার সন্তানের বাপ বলে।"

মেরু মুখ তুললে,—

"কিন্তু—কিন্তু আমি যে পারলুম না,—আমার সকল চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল যে।"

ইন্দ্রনীল তার কপালের উপর যে চুলগুলো পড়েছিল সে-গুলো সরিয়ে দিতে দিতে বললে, "ও-কথা বললে তো চলবে না মেরু,—চেষ্টা ব্যর্থ হল বলেই হাল ছাড়া চলবে না, আবার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। দুনিয়ার যত ছেলেমেয়ের বিয়ে হয় সকলেই কি সকলকে ভালোবাসতে পারে? খোঁজ করলে জানা যাবে—এদের মধ্যে অনেকে অন্যকে ভালোবাসে, তবু কি তারা স্বামী-স্ত্রী হয়ে

পরস্পরকে ভালোবাসেনা? তাদের জীবন ওই ব্যর্থতার মধ্যেই সফলতায় ভরে নেয়, তারাই যখন মরে যায়—জগতে হয় তো আদর্শ পতি-পত্নীর দৃষ্টান্ত রেখে যায়, তাদেরই চিতাভস্ম নেওয়ার জন্যে কত লোক মারামারি কাড়াকাড়ি করে। আদর্শ পুরুষ বা মেয়ে জগতে অতি বিরল, কদাচিৎ যদি মেলে।"

মেরু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে,—বললে, "তুমি যদি না আসতে, হয়তো সেটা আবার সম্ভব হতো। আমি তো ভুলে গিয়েছিলুম তুমি আছ, তুমি আবার কোনদিন আসবে। আমি তোমার ভয়ে তিন বছর কলকাতায় আসি নি, বহুদূরে রয়েছি, থাকার আশাও করেছিলুম—"

ইন্দ্রনীল একটু হাসল,—"কিন্তু ওইখানেই যে ভুল করেছ মেরু। আমায় যদি নিতান্ত স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে, সেইটাই ভালো হতো, সহজে আবার আমার সঙ্গে মিলতে পারতে। আমায় অসাধারণ ভেবেই তো সব মাটী করলে, আমায় এড়াতে যত চেয়েছ তত কাছে এসে পড়েছ; বাঁধন যত আলগা করতে চেয়েছ— ততই কঠিন হয়ে বসেছে।"

(২৭)

একান্ত অসহায়ভাবে তার চোখের উপর চোখ রেখে মেরু বললে, "আমি এখন কি করব?"

ইন্দ্রনীল বললে, "যেমন আছ তেমন ভাবেই চলবে, তার অতিরিক্ত করবে না। আমার কথা বলবে, আমায় তোমার নিজের ভাই বলে ভাব, আমিও তোমাকে বোন বলে সকলের কাছে পরিচয় দিতে পারব।"

মেরুর মুখে শুষ্ক একটু হাসির রেখা ফুটে উঠল, "নেহাৎ নভেলি কথা, কেননা বাস্তবে এর কোথাও জায়গা নেই। মনের মাঝে একটা ভাব রেখে প্রকাশ্যে আর একটা ভাব ব্যক্ত করা যায় না। অনেক নভেলে ও-রকম ঘটনা পড়তে পাওয়া যায়, কিন্তু সেটা একেবারেই অস্বাভাবিক নয় কি?"

মেরু একদিন ইন্দ্রনীলেরই শিষ্যা ছিল—

ইন্দ্রনীল নিস্তব্ধে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, "তোমায় বেশী কি বলব মেরু, তোমার ভুল নিয়ে তোমায় তিরস্কার করবার শক্তি আমার নেই, কেন না আমার নিজের ভুল আমার চোখে পড়ে গেছে, আর তারই ফল আমার ভুগতেও হচ্ছে।"

মেরু বলতে গেল, "সৈকত—"

বাধা দিয়ে ইন্দ্রনীল বললে, "না, আমার জীবনে সে এতটুকু ভুল হয়ে আসেনি, বরং সে সত্য হয়েই এসেছে, এ কথা আজও জোর করে বলতে পারব মেরু। তাকে বিয়ে করিনি—এইটাই সকলের চোখে মস্ত বড় অপরাধ রূপে দেখা দেবে, কিন্তু আমার ভালোবাসাটাই কি সত্যি নয় মেরু? তোমরা ওকে যাই বল না, আমি বলব অন্ধকারে আলোর বিকাশ করেছে সেই ভালোবাসা; আজও পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সে। না, ভুল সে নয়—ভুল আমি নিজে, ভুল আমার অন্ধ।"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থেকে সে বললে, "আজ বলা হল না —হয় তো বলার সময় আর হবে না। দেখা যদি নাও হয়, কোনদিন তোমায় পত্রে জানাব মেরু,—।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেরু উঠল—

"আমায় একটা পথ দেখিয়ে দাও—"

ইন্দ্রনীলের মুখ হাসিতে দৃপ্ত হয়ে উঠল, বললে "বেশ, আমি নিজেই অন্ধ, পথ খুঁজে পাচ্ছি নে, আমি তোমায় পথ দেখাব– চমৎকার নির্ভরতা যা হোক।"

চলতে চলতে মেরু একবার থমকে দাঁড়িয়ে ইন্দ্রনীলের মুখের পানে চাইল।—

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেখছ মেরু—?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেরু বললে, "দেখছি, বাইরে দেখে মন বুঝতে পারা যায় কি না।"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল—"কিছু বোঝা যায় না, যে বলে মুখ দেখে মন বুঝতে পারা যায়—সে মিছে কথা বলে—সে মূর্খ। আমার প্রকৃতি সকলেই জানে—তবু জেনে-শুনে তোমরা আমার কাছে এসে পড়—দোষ আমার কি? তোমরা অর্ঘ্য এনে দাঁড়িয়েছ, আমি না চাইতে আমার পায়ে ঢেলে দিয়েছ—আমি কুড়িয়েছি, আবার যখন বাসি হয়ে গেছে, ফেলে দিয়েছি। এর জন্যে আমার অপরাধী করো না মেরু, অপরাধ কেবল তোমার নয়,—তোমাদের, তোমাদের মেয়ে জাতিটার। তোমরা আমাদের সমান হতে চাও, কিন্তু কোথায় সে দৃঢ়তা,—তোমরা এমন ভাবে নুয়ে পড়—তখন তোমাদের নিয়ে যা খুসি আমরা করতে

পারি। আশ্চর্য্য এই—তোমরা অনেক দেখে তবু আমার কাছে এসো, দোষ না করেও দোষী হই আমি, কলঙ্ক তুলে নিই মাথায়। কিন্তু তা হোক,—আমি জানি সে দোষ আমার নয়, কলঙ্কে আমি ডরাইনে। কিন্তু আশ্চর্য্য ভাবি তোমাদের জাতিটাকে,—একজন লোককে জেনেছ, তবু তাকেই তোমরা অর্ঘ্য দিতে এসো।"

মেরু ক্ষীণ কণ্ঠে কি বলতে গেল, তাকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনীল বললে, "উঁহু, দোষ তোমার একার নয় এ-কথা আমি হাজার বারই বলব। তোমাদের জাতটা ভারি সন্দিগ্ধ, কিন্তু অল্পেতেই তোমরা নিজেদের হারাও, অনেক দেখে-শুনে আমি এ সহজ জ্ঞান লাভ করেছি। এই দেখ তুমি,—প্রথমটায় আমার মুখের দিকে চাইবে না, আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত বলবে না, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে তুমিই আবার পথ দেখতে চাইছো—আশ্চর্য্য নয়? কিন্তু একটা কথা মনে রেখো মেরু, তুমি এখন স্ত্রী, তুমি এখন মা,—তোমার কর্ত্তব্য সামনে, দায়িত্ব অনেক বেশী।"

মেরু সোজা ভাবে ইন্দ্রনীলের পানে চাইলে। অনেক কথাই মনে জেগে উঠেছে,—শুনাতে পারবে কি? কিন্তু না, থাক, মুহূর্ত্তে তার দুর্ব্বলতা প্রকাশ হয়ে গেছে, সে নিজেই তার জন্যে অনুতপ্ত; আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু বলবে—?"

"না—"

সামনেই মোটর দাঁড়িয়ে ছিল, মেরু উঠে পড়ল। সিটে বসে মুখ বাড়িয়ে বললে, "আমার দায়িত্ব, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি ঠিক রয়েছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, কোনদিন ভুলব না আমি স্ত্রী—আমি মা। মুহূর্ত্তের ভুলে যা করে ফেলেছি তার জন্যে নতুন করে অনুতাপের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে। ভেবেছিলুম আপনাকে ভুলে যাওয়াই আমার কাছে পরম আর চরম সার্থকতা, কিন্তু এখন দেখছি—সত্যি তা নয়, বরং আপনাকে মনে জাগিয়ে রাখাই আমার চরম সার্থকতা হবে—আমার সামনে আপনিই থাকবেন বিভীষিকা হয়ে—সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ শাস্তি। আর কিছু নয়, দুঃখ এইটাই রইল মিঃ চ্যাটার্জ্জি—মা হয় তো হতে পারব, সত্যিকার স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করে যেতে পারলুম না। মেয়েদের পক্ষে এটা যে কতখানি শাস্তি সেটা আপনি ধারণা করতে পারবেন না, কারণ আপনার জগতে বর্ত্তমান থাকা মানে দুর্ভাগা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। তবু বলব—বন্ধুর কাজ করেছেন, আমার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমায় সজাগ করে দিয়েছেন, আমার ভুলটাকে আমায় ধরিয়ে দিয়েছেন।"

ইন্দ্রনীল শান্তভাবে বললে, "তার কারণ - মাকে আমি শ্রদ্ধা করি মেরু,—স্ত্রীকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি, মাকে নিয়ে পারি নে। হয় তো এ আমার দুর্ব্বলতা, তবু বলব—এই দুর্ব্বলতাই আমার মুকুট হোক,—এইটুকু দুর্ব্বলতা অনেক মাকে রক্ষা করবে।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে সে আবার বললে—"মা,—আকাশের মত উদার, পৃথিবীর মত সহ্য-শীলা, সাগরের মত গভীর স্নেহ সে কেবল মা, আর কেউ নয়। সে শেখে তখন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, সন্তানের জন্যে নিজেকে তুচ্ছ করা। জানো মেরু, আমি সে দুটি চোখে দেখতে পাই। সন্তান বিছানায় পড়ে বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমোয়, মায়ের মনে শান্তি নেই, সারা রাত সে নিশ্চিন্ত ভাবে ঘুমাতে পারে না, কতবার উঠে ঘুমন্ত সন্তানের মুখের পানে চেয়ে বসে থাকে। তার সমস্ত কামনা, বাসনা, আশা আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি লভেছে ওই সন্তানে। মা তাই আত্মহারা হয়ে বসে থাকে তার মুখের পানে চেয়ে। সে স্ত্রী নয়—কন্যা নয়, সে তখন মা, কেবল মা—সে মাতৃমূর্ত্তির পানে চেয়ে আমার মত লোকের মনও নুয়ে পড়ে,—মনে পড়ে অদূর ভবিষ্যতের কথা, নিবিড় অন্ধকার-জাল ছিঁড়ে যায়—ভেসে ওঠে জ্বলজ্বলে ভবিষ্যৎ। সন্তান তার মাকে ঠিক যেমন ভাবে পেতে চায়, মাকে ঠিক তাই হতে হবে, জগতে সেই যে শিশুর দেবী—তার কোলই যে সন্তানের স্বর্গ। দুনিয়া নরক—কিন্তু ওর মাঝে—নিবিড় অন্ধকারে একটী মাত্র প্রদীপ জ্বেলে যে বসে আছে, আমি যে ওকে চিনি—ও যে মা। মেরু, তোমায় তাই আজ ফিরিয়ে দিলুম, স্ত্রী বলে নয়, কন্যা বলে নয়, ভগিনী বলে নয়, কেবল মা বলে, শিশুর আশাস্থল বলে, কল্যাণী বলে।"

সে ফিরল—

"আচ্ছা এবার বিদায়—"

মেরুর বুক ঠেলে কান্না আসছিল, কেবলমাত্র বললে, "বিদায়—"

মোটর ছাড়ল—

মেরু ছুই হাতে মুখখানা ঢেকে ফেললে, ঝর ঝর করে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

বিদায়—বিদায়,

হাঁা, এই বিদায়ই চির বিদায় হোক, মেরু তোমার কাছে চিরকালের জন্তে মরে যাক।

আঃ, আজ যদি মৃত্যু হতো—কি সুখেরই হতো। তার স্বামী জানত সে সতী, লোকে জানত সে পতিব্রতা, ভবিষ্যতে তার সন্তানের জ্ঞান হলে সে জানত তাকে আদর্শ দেবী। তার ভিতরকার কালি ফুটে উঠত না, কেউ তার সত্য পরিচয় জানত না।

আকাশের গায়ে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদখানা আস্তে আস্তে ভেসে উঠছিল, মেরু তার পানে চেয়ে ভাবছিল।

মানুষের মন পরিবর্ত্তিত হয় কে বলে? কে বলে ভালোবাসা মরে যায়? প্রলেপ হয় তো তার উপরে অনেক পড়ে, সে নিজ্জীব ভাবে মনের এককোণে পড়ে থাকে, হঠাৎ একদিন আজকের মতই প্রকাশ হয়ে যায়। তখন বেগ তার হয় ছুর্নিবার, কোন রকমে তার গতি ঠেকাতে পারা যায় না—ভবিষ্যৎ সামনে নাচলে সেই দিকেই মানুষ চলে।

মা—মায়ের সম্মান—

আবার চোখে জল ভরে আসে—

সে কেউ নয় সে শুধু মা—শুধু মা। তার খোকন তাকে উচ্চ সম্মান দিয়েছে, তার খোকন তার মুকুটমণি।

তবু মেরু তাকে চায় নি, না চাইতে সে এসেছে, সে মেরুকে আধ আধ সুরে মা বলে ডাকে। এই সন্তান, যার হাসি দেখলে মায়ের বুক ভরে যায় আনন্দে, যার মুখ মলিন দেখলে মায়ের বুক ভরে ওঠে অসীম বেদনায়, সেই সন্তান যদি কোনদিন জানতে পারে তার মা কেমন ছিল—

ওঃ,—বড় জ্ঞান দিয়েছ, তাই গুরুর আসন মেরু তোমায় দিচ্ছে ইন্দ্রনীল। আজও সে ভেসে যেত, সে তার কর্ত্তব্য ভুলে গিয়েছিল, তার দায়িত্ব-বোধ ছিল না, তুমি তাকে ফিরিয়ে দিলে, তার ভবিষ্যৎ পথ দেখিয়ে দিলে।

মেরু স্তব্ধ হয়ে দূর আকাশের পানে চেয়ে রইল—মোটর তখনও চলছিল।

নিজের অতীত জীবনের কথা মেরুর মনে ভেসে উঠেছিল, মেরু সব ভুলে গিয়ে সেই ছবিই দেখছিল—

সে-দিন সে স্ত্রী ছিল না, মা ছিল না, সে ছিল শুধু মেরু। কারও দিকে চাইবার দরকার ছিল না, চায়ওনি সে কোন দিন; নিজের সুখ, ছুঃখ, আনন্দ বিষাদ নিয়েই সে তন্ময় হয়ে থাকত।

এসে দাঁড়াল ইন্দ্রনীল, আস্তে আস্তে সে মেরুকে নিজের পাশে টেনে নিলে। তখন কোথায় গেল রঞ্জিত, কোথায় গেল মেরুর আত্মাভিমান; মেরু রইল শুধু মেরু, শুধু নারী—আর কিছু নয়।

তারপর কত কি। কত কথা, কত হাসি, কত কান্না, কত প্রতিজ্ঞা। এমনই চাঁদের আলোর তলায় তারা দুজনে হাত ধরে, নিঃশব্দে পথ চলেছে,—সামনের ওই বড় তারা—যেটা পশ্চিমের কোলে আস্তে আস্তে ঢলে পড়ছে, সে প্রতিদিন তাদের দেখতে পেত। তারা বেড়াত, তারা মুখে কথা না বললেও অন্তর তাদের কথায় ভরে উঠত, সে কথা ফুটত তাদের চোখে—তাদের হাতের আঙ্গুলে—

মেরু চমকে উঠল—মোটরখানা হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠেছে।—

ছিঃ ছিঃ, কি ভাবছে সে, এ কি অবান্তর ভাবনা। কে ইন্দ্রনীল, কে মেরু? তারা কতদূরে, আজ ওদের পরস্পরের ভাবনা করাও মহাপাপ ব'লে গণ্য হবে—। আত্মগ্লানি,—অনন্ত বেদনা—

হাঁা, এই তার চিরসাথী। সে আজ মুক্ত নয়—সংসার তাকে বেঁধেছে তার কোলে সন্তান দিয়ে; আজ সে মা, শুধু মা। তার সন্তানকে সে গড়ে তুলবে নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে, তবু সে কি এত ভাবে?

ধড়াস্ করে মোটর দাঁড়িয়ে গেল—বাড়ী এসেছে, নামতে হবে।—

ক্রমশঃ



প্রাচীন ভারতীয় অট্টালিকা

ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পি এইচ, ডি,

খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক প্রকারের অট্টালিকা ছিল; যথা, প্রাসাদ, প্রস্তর-গুহা, কূটাগার, পন্নশালা, মণ্ডপ, সুধর্ম্মা, সভা, অর্দ্ধযোগ, বিহার, হস্তীশালা প্রভৃতি। হর্ম্মগুলিতে সুদৃশ্য তোরণ ব্যবহৃত হইত। এতদ্ব্যতীত তৎকালে খাল ও সুড়ঙ্গ প্রভৃতি খণিত হইত। হর্ম্ম্যগুলির সম্মুখভাগ ইষ্টক, শিলা ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। ইহাদের সোপানগুলি ইষ্টক, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। অট্টালিকায় বারান্দা থাকিত। প্রাচীরের নিম্নদেশ ইষ্টক-নির্ম্মিত হইত এবং ধূম বহির্গত হইবার জন্য হর্ম্ম্যের একটী করিয়া চিম্‌নি থাকিত। গৃহের নিম্নতল ইষ্টক, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্য পথ থাকিত। স্নানের গৃহ তিনভাগে বিভক্ত থাকিত এবং প্রত্যেক ভাগ প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। প্রাচীর-গুলি ইষ্টক, প্রস্তর বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত হইত। স্নান-গৃহের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ থাকিত এবং ঐ সকল গৃহে জল-প্রবেশের জন্য ছিদ্র থাকিত। স্নান-গৃহে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত চৌকী ব্যবহৃত হইত। বৌদ্ধ বিহারগুলির দ্বারদেশে চৌকাট ব্যবহৃত হইত। পূর্ব্বে বিহারগুলি কর্দ্দম-নির্ম্মিত ছিল, কিন্তু পরে সেইগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত হইয়াছিল। তিন প্রকার জানালার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়; রেলিং দেওয়া, কারুকার্য্যযুক্ত, জাল দেওয়া এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত জানালা। জানালায় খড়খড়িও থাকিত। হর্ম্ম্যগুলিতে শ্বেত, কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ ব্যবহৃত হইত। বিহারের অভ্যন্তরে তিন প্রকার গৃহ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে কতকগুলি গৃহকে পাল্‌কির মত দেখাইত। কাষ্ঠ-নির্ম্মিত "গরাদে" ব্যবহৃত হইত। বারান্দাগুলিও সাধারণতঃ তিন প্রকারের ছিল—খোলা, ঢাকা এবং ঝোলা। প্রত্যেক হর্ম্ম্যের মধ্যে একটী উপাসনা, একটী জলের এবং একটী ভাণ্ডার ঘর থাকিত। প্রাসাদগুলি স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত হইত এবং তাহাদের বারান্দা থাকিত। লঙ্কার রাজার প্রাসাদগুলি খুব উচ্চ ছিল। দুটঠগামণির লৌহ প্রাসাদ ছিল এবং ঐ প্রাসাদটী উচ্চে নয় তোলা ছিল। ইহাতে নয়শত গৃহ ছিল।

কূটাগার নামে একপ্রকার হর্ম্ম্য ছিল; তাহার উপরিভাগ পর্ব্বত শৃঙ্গের মত দেখাইত। 'সুধর্ম্মা' নামে ইন্দ্রের একটী সভা ছিল। ইহার প্রবেশদ্বার তোরণ সদৃশ এবং ইহার উপরিভাগে অনেকগুলি চূড়া ছিল। সাধারণতঃ মণ্ডপগুলি অস্থায়ী কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। সভা-গৃহগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল; এখানে বিচার-কার্য্যও হইত। কোশল সম্রাট্ প্রসেনজিতের প্রাসাদদ্বার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা একটী তোরণ সদৃশ এবং ইহার উপরে বহু উচ্চ চূড়া ছিল।



বৌদ্ধ-বিহার

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে কোন একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে যে জমির উপর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবে তাহা সমতল করা হইত। তৎপর মাটীতে খুঁটী পুঁতিয়া দেওয়া হইত এবং জমির পরিমাণ লইবার জন্য মাপ করা হইত। অট্টালিকার মানচিত্রও অঙ্কিত হইত। অট্টালিকাগুলি এরূপভাবে নির্ম্মিত হইত যে

তাহার এক অংশে অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিরা আশ্রয় পাইত, অন্য এক অংশ দুঃস্থ ও আশ্রয়হীন ব্যক্তিদিগের জন্য নির্দ্ধারিত থাকিত ; অন্য অংশে অপরিচিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দেওয়া হইত ; অপর এক অংশে ব্রাহ্মণদিগকে ও অন্য এক অংশে বিদেশী বণিকদিগের আশ্রয়ের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। ব্যবহৃত বস্তুর জন্য একটী ভাণ্ডার গৃহ থাকিত এবং প্রত্যেক গৃহের দরজাগুলি বহির্দ্দিকে খোলা হইত। সাধারণের খেলাধূলার জন্য একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। সাধারণের জন্য উপাসনা গৃহ এবং বিচার-কার্য্যের জন্য আদালত-গৃহ নির্ম্মিত হইত। গৃহগুলিকে সুসজ্জিত করিবার জন্য সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করা হইত। এগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীরা পরিকল্পনা করিতেন। বণিকপুত্র মহোষধের তত্ত্বাবধানে একটী প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। একটী অর্দ্ধযোজন বিস্তৃত সুবৃহৎ সুড়ঙ্গ (tunnel) নির্ম্মিত হইয়াছিল। নির্ম্মাণের পূর্ব্বে নির্ম্মাণকারী ঐ স্থানটী পরিদর্শন করিয়াছিলেন। মাটী কাটিবার পর যাহাতে মাটী ধসিয়া না পড়ে সে জন্য কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ফলকের বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। সুড়ঙ্গ কাটা শেষ হইলে মাটীগুলি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুড়ঙ্গটী ইষ্টক-নির্ম্মিত ছিল এবং স্থানে স্থানে বায়ু-প্রবেশের দ্বার ছিল। ইহার উপরিভাগে কাষ্ঠফলক ছিল এবং ঐ কাষ্ঠফলকগুলি সিমেণ্টের দ্বারা গ্রথিত ছিল। ঐ সুড়ঙ্গের ৮০টী বড় দরজা এবং ৬৪টী ছোট দরজা ছিল। ঐ দরজাগুলির ভিতরে এমন একটী স্থান ছিল যাহা চাপিয়া ধরিলে দ্বার বন্ধ বা খুলিয়া যাইত। এই সুড়ঙ্গের দুই ধারে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। যখন একটী ঘর খোলা হইত তখন সকল ঘরগুলি খুলিয়া যাইত এবং একটী ঘর বন্ধ হইলে সকল ঘর বন্ধ হইয়া যাইত। এই সুড়ঙ্গটীর দুই পার্শ্বে চিত্র-শিল্পীরা বহু প্রকারের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। সেকালে সময়োচিত (seasoned) কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইত।

মধ্যে মধ্যে হর্ম্ম্যগুলি ভাল ভাবেই মেরামত করা হইত। চূণ, বালি ভাল করিয়া খসাইয়া ইষ্টকের উপর নূতন করিয়া বালি ধরান হইত। জানালার ছিটকানীগুলি খারাপ হইলে উহার স্থানে নূতন ছিটকানী সংলগ্ন হইত। দ্বারের অর্গল ভাঙ্গিয়া গেলে নূতন অর্গল প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইত। হর্ম্ম্যের বহির্ভাগ এবং অন্তর্ভাগ চূণকাম কিংবা রং করা হইত।



শৈল গুহা

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে একটী ত্রিতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রত্যেক তলটী বৌদ্ধরেলিংয়ের দ্বারা পৃথক করা হইয়াছিল। এই প্রাসাদের সম্মুখভাগের সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন তলটী একটী খোলা স্তম্ভপূর্ণ গৃহের মত দেখাইত এবং ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী সাধারণ স্তম্ভ ছিল। উপর তলাগুলিতে দুইটী করিয়া দালান ছিল এবং অনেক জানালা এবং দরজা ছিল। সেকালে হরিদ্রাবর্ণের মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবহার ছিল। প্রাচীনকালে বহুসংখ্যক রাজমিস্ত্রী, কামার, ছুতার ও রং মিস্ত্রী গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্যে নিযুক্ত হইত। ১

১ এই প্রবন্ধটী প্রণয়ন করিতে যে সকল পুস্তক হইতে আমি সাহায্য পাইয়াছি তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল : –

1 Fausboll's Jataka
2 Cullavagge of the Vinaya Pitaka
3 Sumangalavilas'ni
4 Samanta pasadika
5 Childers' Pali Dictionary
6 Pali Text society's Pali Dictionary ইত্যাদি

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন মজুমদার

কানাই পল্লীর তরুণ যুবক। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ; সে ত' প্রকৃতির নগ্ন দেহের একটি আভরণ মাত্র। মানুষের রুচি-মার্জ্জিত শহরের সঙ্গে তার কোন দিন পরিচয় ঘটে নি ; সেজন্যে তার মনে কোন দ্বন্দ্বও হয়নি। সে মূর্খ চাষীর ছেলে, পাড়াগাঁ তার আপন, পল্লীর তরুণ যুবকরা তার সঙ্গী, চাষীর জীবন তার উদ্দেশ্য, —জীবনের গতানুগতিক চরম পথ ; সঙ্গীদের সঙ্গে পাড়া-গেঁয়ে খেলাধূলা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। যা হয় দশজনের, তারও তাই হচ্ছিলো। তাই হবে বলে সে জানতো, দশজনেও জানতো। হঠাৎ হাওয়া গেল উল্টে, মন হলো চঞ্চল, প্রাণ উঠলো দুলে, জীবনের গতি গেলো এলে, চরম পথ হলো কুয়াশাচ্ছন্ন, নির্দ্দিষ্ট পথ হলো অনির্দ্দিষ্ট।

কানাইয়ের শহরের কোন জ্ঞান নেই, কোন কল্পনাও নেই মনে ; ভাবতে পারে, ত্রিবর্ণে রঞ্জিত করতে পারে এমন সম্পদও সে কোন দিন পায়নি। গাঁয়ের জমিদার-পুত্র জমিদারীর কোন কাজে এসেছিলেন দেশে। তাঁরি নিকট কুড়িয়ে পাওয়া ছবিতে দেখা শহরের কথা, মুখের কথাতে, ছবিতে পেয়েছিলো রূপকথার মায়াপুরী বাস্তবে। তাই মানস-পট হলো শুভ্র, অহর্নিশি চললো রঙ-বেরঙে আলিম্পনা। কল্পিত শহরের প্রলুব্ধ, মোহিনীময়, আবেশময় হাওয়া এলো ছন্দে ছন্দে গুঞ্জরিয়ে, অভিভূত করে দিলো মাতাল মদিরার মত। দিনরাত্তির শুধু শহরের আকর্ষণ তাকে শূন্যপথে উড়িয়ে নিয়ে চলে। চেয়ে আছে, বা চোখ বুজে আছে, তবু দেখে শহরের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ; কানে শোনে শহরের সদা-জাগ্রত কোলাহল। স্বপ্ন আসে জাগরণে, স্বপ্ন দেখা দেয় ঘুমের ঘোরে, গভীর রাত্তিরে যায় ঘুম ভেঙ্গে, সচকিতে চেয়ে দেখে, অদিশায় হাতড়ায়, হতাশ হয় স্বপনের অলীক মায়ায়। তার নেই মুক্তি, নেই নিষ্কৃতি, চরণে ফুলের কাঁটা ফুটিয়ে ক্ষণিকের তরে ধরে রাখবার মত শক্তি পল্লী-সুন্দরীর নেই। শহর! রাজপথ, দু'ধার সাজানো বড় বড় দালান কোঠা স্বর্গ ভুলে দিয়েছে তার চির উন্নত শির, সমস্ত স্থান থেকে চয়ন করে নিয়ে আসা সাজানো বাগান রাস্তার মোড়ে মোড়ে, মোটর, ট্রাম, বাস, রেলগাড়ি, আকাশ-রথ (এরোপ্লেন) কত কি। স্বর্গ-স্বর্গ-স্বর্গ! অলিতে গলিতে দোকান, মহল্লাতে মহল্লাতে বাজার, থিয়েটার, বায়োস্কোপ, সার্কাস্, এটা সেটা কত কি আশ্চর্য্য রকম ব্যাপার স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় এত লোক? নিশ্চয়ই বোম্বাই শহর ইন্দ্রপুরী।

সূর্য্যদেব যখন পশ্চিম নীলাকাশে পদাঘাত করেন সৌন্দর্য্যের শেষ রক্তাভাযুক্ত মেঘের স্তবে, পাহাড়ের চূড়ায়, বনবনানীর উচ্চ শিরে আলিম্পনা করেন, তখন হয় পাড়াগাঁ নিঝুম ; আর শহরে, বৈদ্যুতিক আলো জ্বেলে সূর্য্যদেবকে বিদায়-আরতি দে'য়া হয় যখন তিনি তুলাপেঁজা স্তূপাকৃত মেঘরাশি থেকে, উচ্চ কলের চিমনী থেকে, মন্দির মস্জিদের গম্বুজ থেকে অস্ত রাগের বৈচিত্র্যময় রূপমাধুরী মাত্র ধীরে ধীরে টেনে নেবার প্রয়াস করেন। চিমনীর ধূসর ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে লতিয়ে লতিয়ে ধূপশিখার মত অনন্তে মিশে আরতির আড়ম্বর বৃদ্ধিই করে। শহরে আঁধার নেই, রাত্তিরের বিভীষিকা নেই, দিনের মত সহজ, সরল, পরিষ্কার ; শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ওপর মানুষের রুচি-মার্জ্জিত সম্পদ দিয়ে ঐশ্বর্য্যশালী করে, চিরমধুর, চিরসুন্দর, অফুরন্ত জ্যোৎস্নাময়, চিরষোড়শী সুন্দরী করে তুলে। নেই কোন ভয়, নেই বিভীষিকা, নেই কোন কিছুর দারিদ্র্য।

আর পল্লীগাঁয়ের? সূর্য্য ডুববার সঙ্গে সঙ্গে আঁধার, ভয়াবহ জমাট অন্ধকার পাতালপুরীর মত নির্জ্জন, নীরব, নিথর, নিস্তব্ধ, পাগলা ঝড়ো ঝঙ্কার যমরাজ প্রলয়নাচে ধেয়ে আসে মৃত্যুবার্ত্তা নিয়ে, সুবিধে না হ'লে দিয়ে যান দুঃখ দুর্দ্দশা নির্ম্মম ভাবে। মড়মড়ি কড়কড়ি ডালপালা ভেঙ্গে পড়ছে, বাড়ী-ঘর উড়ে চলে যাচ্ছে ; কত কি মৃত্যু অভিসারের আড়ম্বর। সাপ, শেয়াল, পাগলা কুকুর, বাঁদর, ভূতপ্রেত কত কি ভয়ঙ্কর জীব পল্লীর আনাচে কানাচে অহরহ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পল্লীগাঁয়ে কি আছে? কিছু নেই, কিছু নেই, একঘেয়ে পড়া পাহাড়ী মাঠ, বন

রূপ দেখে সত্যি, খাঁটি মনের অভিজ্ঞতা মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ে। শহরের ঐশ্বর্য্য, সুখ সমৃদ্ধি যেন মরুমায়া, মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত্তের নিকট মায়া সরোবর, প্রমত্ত প্রেমিকের নিকট দুর্দ্ধর্ষ সংস্কারবদ্ধ অসূর্য্যম্পশ্যা রূপসী, শিশুর চাঁদ ধরা। এ ঐশ্বর্য্যের নিকট ঘেঁসা যায় না, অনুভব করে সুখী হওয়া যায় না, নয়ন মুদে আরামে গা এলানো যায় না, শুধু দেখা যায়, আপন পর নির্দ্দেশ করে, অসামঞ্জস্যের বিকৃত অবস্থা বুঝিয়ে দেয়, কল্পনায় তুষানল জ্বালে, তিলে তিলে পুড়িয়ে অঙ্গার করে দিতে থাকে। জলের ভেতর থেকেও যদি জল পান না করতে পারা যায় তবে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য মানুষের আর কি থাকতে পারে? কানাই মনে মনে ভাবে এর চেয়ে যেন পল্লীগাঁ ছিলো ঢের ভাল। বাল্যবন্ধুরা ছিলো অনেক ভাল, অনেক আপনার জন। কী দিন ছিলো! যখন যা খেয়াল চাপতো তাই করতো। আম, জাম, পেয়ারা, কাঁকড়ী, খরমুজা, আক, কুল প্রভৃতি দল বেঁধে চুরি করে খেতো, চুরি করে খাওয়াতে কত আমোদ ছিলো। চুরি করে সব জিনিষ নিয়ে বনে ঢুকতো, গাছের ডালে পুকুরের ধারে বসে নানা কথাবার্ত্তার মাঝে ফেলেছেড়ে খেতো। বড় বড় গাছের ডালে ডালে লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করতো, বনের মাঝে লুকোচুরি খেলতো; মাসে অন্ততঃ একদিন গভীর বনে লুকিয়ে বনভোজন করতো। সে দিন কি আর কখনো আসবে? কাউকে না বলে চুপি চুপি জিনিষ পত্তর যোগাড় করা, পাড়াপড়সীর চোখে ধুলো দিয়ে লুকিয়ে বনে পালানো, হল্লা করে বনভোজন করা কত কঠিন ছিলো, অথচ কত সহজ, কত বড় উৎসব ছিলো।

'হোলীর আমোদ!' বলেই কানাইয়ের মুখ লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। ভেবে চল্লে—দুর্গাবাঈকে চুপি চুপি কেমন আবীর গোলাতে লাল করে দিয়েছিলো।

দোলের উৎসব! ছেলে মেয়ে, যুবক যুবতী, বুড়ো বুড়ী সব্বাই মদ খেয়ে ঢলাঢলি করছিলো, দীর্ঘ একটি বৎসরের পর তেপান্তরের দুঃখ-দুর্দ্দশাময় মাঠ পেরিয়ে ক্ষণিকের সুখ এসেছে, সব্বাই আমোদে প্রমত্ত—কারো কোন দিকে হুঁস নেই, সে বন্ধুদের এড়িয়ে পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট স্থানে হতাশায় ব্যাকুল, অস্বস্তিময় দুর্গাবাঈকে হঠাৎ পেছন থেকে জড়িয়ে ধরে লালকে লালময় করে দেয়। চুম্বনে চুম্বনে অগ্নিশিখার মত লাল ও উত্তপ্ত করে দিয়েছিলো। দুর্গাবাঈ তাকে ভালবাসতো বলে বন্ধুদের কত মিষ্টি-ঝরা ঠাট্টা, বিদ্রূপ, কৌতুক, গোপন হিংসা।

সেই বড় গাছটা! মস্ত বড় কদম গাছ, কত মোটা, কত সরু অসংখ্য ডালপালা। এত বড় বনে এই বিকট কদম গাছটা যেন বৃক্ষরাজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেমনি উঁচু তেমনি চারিদিক বিস্তৃত। প্রাচীন লোকেরা বলেন—এ গাছটা নাকি শ্রীকৃষ্ণের সময়কার। এ গাছটায় শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা দোল খেলতেন। আজো সমস্ত গাছটা কদম ফুলে ভরে যায়, কচি কোমল সবুজ পাতাগুলির ফাঁকে ফাঁকে বের হয়ে থাকে লালের ওপর সাদা শির-তোলা পাপড়ী, কে বলবে যে এগুলো ফুলের রেণু। দূর থেকে মনে হয় যেন শত শত, সহস্র সহস্র ফুলের তোড়া স্তরে স্তরে সজ্জিত হয়ে আছে। সমস্ত তোড়া নিয়ে একটি মস্ত বড় তোড়া, এই তোড়ার ওপর শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন, আর শ্রীকৃষ্ণ বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে শ্রীরাধাকে প্রেম-মোহে আচ্ছন্ন করে সুখ-সমুদ্র কল্লোলে ভাসিয়ে দিতেন। সে গাছটায় কেউ কখনো উঠেনি, সে গাছটার নিকট কেউ একা যেতে সাহস পেতো না। একদিন সে বাজি রেখে দর্পভরে সে গাছটায় উঠেছিলো. শ্রীকৃষ্ণ তাকে ক্ষমা করেননি, দর্প চূর্ণ করে এক ধাক্কায় নীচে ফেলে দেন। যদিও কেউ ওদের প্রত্যক্ষ দেখেনি তবে পূর্ব্বপুরুষরা নাকি দেখেছিলেন। কলিকালে যদিও কেউ শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পায় না, তবে গাছের অবস্থা থেকে বেশ বুঝা যায়, ভগবানের মাহাত্ম্য বেশ উপলব্ধি করতে পারা যায়। ভূত প্রেত ঐ গাছটার চারিদিকে দিনরাত্তির পাহারা দেয়। একদিন সে কি ভয়ই না পেয়েছিলো। সে ভয়ে তার জ্বর হয়, কি ভয়ানক জ্বর, দু'দিন কোন হুঁসই ছিলো না, বাঁচবার কোন আশা ছিলো না।

দুর্গাবাঈ তাকে বাঁচিয়ে তোলে। সত্যিকারের প্রেম না থাকলে কি প্রেমিকরাজের হৃদয় জয় করা যায়? রাধা নিজের প্রতিবিম্ব দিয়েছিলেন দুর্গাবাঈর অন্তরে, তাই তিনি প্রেমের আদর্শকে অপমান করতে পারেননি। দুর্গাবাঈ তাকে ভালবাসতো, গভীর ভাবে

ভালবাসতো! কানাইয়ের প্রাণ মোচড় দিয়ে উঠে, নয়ন জ্বালা করে, টস্ টস্ করে দু'তিন ফোঁটা অশ্রুও ঝরে। ক্ষণকালের মধ্যে অস্থির হয়ে পড়ে, নয়ন বিস্তৃত করে পল্লীর পানে তাকায়, যে অতীতকে হেলা ভরে ত্যাগ করেছিলো; কখনো স্মৃতিপটে স্থান দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলো, সেই অতীত পানে না তাকিয়ে পারেনা, মন আপনি দুর্দ্ধর্ষ গতিতে চলে, নইলে বড় ব্যথা পায়, অস্বস্তি বোধ করে। সেই পল্লী! পল্লী-রমণীরা কলসী কাঁখে সারি সারি চলে যেন যমুনার কূলে যায় অভিসারে। যুবকরা হাঁ করে তাকায়, খেলাধূলায় মন বসেনা। কেউ প্রিয়াকে অলক্ষ্যে ভ্রূকুটি করে, কেউ মুচকি হাসে. পল্লীবালারা লজ্জায় আরক্ত হয়, মাথা নত করে, কেউ হয়ত কোন ভ্রূক্ষেপ করেনা; বর্ষীয়সী কেউ থাকলে কলিকালের যুবকদের বেহায়াপণার জন্যে বকাবকি করে। প্রমত্ত প্রেমিক দল যুবতীদের শুনিয়ে শুনিয়ে গান ধরে, প্রেমের গান বহু রাগিণীতে বিশ্রী ঐক্যতানের সৃষ্টি করে। ছোট ছেলে-মেয়েরা কেমন ছিঁ-ছিঁ-রিঁ-রিঁ করে ছোটে—কেবলি ছোটে, যেন কোন হুঁস নেই, ওদের যেন নেই রদ্দুর, নেই শীতবর্ষা; কিছুতেই আর আশা মেটেনা। কি দুষ্টু! এই ফুল পাড়লে, মাথায় গুঁজলে, বউবর সাজলে, পাকা সংসারীর মত সংসার করলে, যেন সত্যিকার স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী। মিলে মিশে খেলাধূলা করলে, আবার ঝগড়া বিবাদ করে পাতানো সংসার ভেঙ্গে দিলে। দুষ্টুমি বুদ্ধি মাথায় ঢুকলো; গাছের ডালপালা, ফুল, ফুলের কুঁড়ি ভেঙ্গে-চুরে খুব আমোদ করলে। কি ধৈর্য্য, কি সখ! খেলা—কেবল খেলা। ওদের বয়সে সেও তো—কানাই হঠাৎ চমকে ওঠে, অতীত আলিম্পনা ঝাপসা হয়ে যায়।

কানাইকে বন্ধুবান্ধব, পড়াপড়সী সব্বাই প্রবোধ দেয়, নানা কথা বলে প্রাণ মন সতেজ সজীব করবার চেষ্টা করে। নতুন নতুন বিদেশে এলে সবারই মন খারাপ হয়, ও কিছু না, দু'দিনে মন ঠিক হয়ে যাবে। এ বয়সে কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে নাড়া-চাড়া করতে হয়, নইলে কি মন ভাল হতে পারে! যৌবনে যুবতী স্ত্রী ঘরে না এলে মন স্বস্তি পাবে কেন; ক্ষেপা তরঙ্গ স্থির হবে কেন? সংসারী হলেই সব দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা দূর হয়ে যাবে। কানাই মনকে প্রবোধ দেয় যে তার অস্বস্তি, অস্থিরতা, বিমর্ষতা, দুর্ব্বলতা দেশত্যাগে নয়, নতুন স্থানে বলে নয়, রূপসী যুবতী স্ত্রীর অভাবে শুধু নয়, মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে। উত্থিত হতে হলে দেহটা ভারি বোধ হবেই, ভারি বোধ হওয়া স্বাভাবিক। সে তো ছেলেমানুষ নয়, তাকে এখন উঠতে হবে, ঠেকে-অঠেকে উঠবার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। উঠতে হলেই ত নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে, খামখেয়ালী ছাড়তে হবে।

(৩)

প্রায় পাঁচ বছরের কথা, কানাইয়ের বিবাহিত জীবন চলছে। প্রথম বৎসরটি কি করে কাটলো তা কানাই নিজেও টের পায়নি, যোড়শী স্ত্রী গঙ্গাবতীও টের পায়নি; হয়তো কখনো টের পেতোনা যদি গঙ্গাবতী সন্তানের জননী না হতো। কানাই হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর যুবক, পল্লীর মুক্ত হাওয়ায় বর্দ্ধিত হয়েছে, তাই তার সর্ব্বাঙ্গ থেকে একটা সহজ, সরল, উজ্জ্বল সৌন্দর্য্য-দীপ্তি বিচ্ছুরিত হয়।

হঠাৎ শহরে এসেছে, তাই ক্ষুধিত প্রাণে অনন্ত পিপাসার তীব্র জ্বালা। সে পল্লীর যুবক, শহরের মেয়েকে বিয়ে করতে পারা একটু কঠিন ও উঁচু দরের মনে করে। গঙ্গাবতীকে যখন সত্যি সত্যি বিয়ে করতে সক্ষম হলো, তখন নিজকে ধন্য মনে করেছিলো; কৃতজ্ঞতায় উৎফুল্লে গঙ্গাবতীর খেয়ালে নিজকে অতি সহজে অর্পণ করে দিল। গঙ্গাবতী মনে করতো কানাই অমূল্য রত্ন। পূর্ব্ব জন্মে শিবের মাথায় পূর্ণ ভক্তিতে ফুল বেলপাতা না দিলে এমন স্বামী লাভ করা যায় না। কানাইয়ের টাকা আছে, প্রাণের প্রসারতা উঁচু দরের, প্রেম অমলিন, অমিত, হৃদয়ে মস্ত বড় ক্ষুধা সদা উন্নতির পথে চালিত করে। গঙ্গাবতী জানেনা হৃদয়ের অত বড় ক্ষুধা কানাইয়ের মত লোকের পক্ষে মহা ক্ষতিকর; উন্নতির চরম শিখরে না তুলে অধঃপতনের পাতালে হঠাৎ ফেলে দিতে পারে।

যাক্! গঙ্গাবতী ভাবে এমন স্বামী ক'জনে পায়। তার কত সমবয়সী বন্ধু আছে, সকলেরই বিয়ে হয়েছে, কেউ কি স্বামীকে এমন আপনার করে পেয়েছে? কেউ কি স্বামীর মধ্যে দেবতার প্রভাব পায়, কেউ কি বন্ধুতা পায়, কেউ কি শ্রদ্ধা পায়, কেউ কি সমান অধিকার পায়? সে স্বামীর মাঝে পায় দেবত্ব, বন্ধুত্ব,—পৌরুষ, নারীত্বে পূর্ণ শ্রদ্ধা। তার প্রায় বন্ধুই ত' বিবাহিত জীবনকে অভিশপ্ত জীবন মনে

করে ; অত্যাচারে পীড়নে, প্রেমহীন দাম্পত্য জীবনের মর্ম্ম-বেদনায় মরণ আকাঙ্ক্ষা করে দিবানিশি।···

কানাই ভাবতো যে গেঁয়ো লোক হয়ে শহরের মেয়ে বিয়ে করা সহজ কথা নয়, বিশেষতঃ কুলি সর্দ্দারের একমাত্র মেয়েকে বিয়ে করা! এ বস্তির প্রত্যেক যুবক গঙ্গাবতীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, গঙ্গাবতীর বাড়িতে নিত্তি ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতো, শহরের বহু ধনী প্রতিপত্তিশালী যুবক গঙ্গাবতীকে মাথায় তুলে নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কেউ তাকে পায়নি! কানাই অচেনা বিদেশী চাল-চুলোর ঠিক নেই, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন নেই, তবু গঙ্গাবতীকে বিয়ে করতে তো পেরেছে! এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য মানুষের আর কি হ'তে পারে?

এমনি ভাবে দু'জন দু'জনের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব খুঁজে বের করতো, আর গভীর প্রেমরসে ভরপুর হয়ে মিলনের সন্ধিস্থলে গভীরতরভাবে আবদ্ধ হোতো! গঙ্গাবতীর বয়স তখন ছিলো তের, কানাইয়ের ছিলো বিশ, তাই তাদের প্রেম হয়েছিলো নিত্য আকর্ষণময়, অফুরন্ত, বৈচিত্র্য-ময়। কেউ কারো আড়ালে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারতো না, বন্ধু-বান্ধবের ঠাট্ট বিদ্রূপেও কানাই ঘর থেকে বের হতোনা, গঙ্গাবতীও কানাইকে বের হ'তে দিতো না। বৃদ্ধ সর্দ্দার সর্ব্বদা বাহিরে গল্প-গুজব করে সময় কাটাতো। কানাই মিল থেকে ফিরে এসে আর বের হতো না, হাত মুখ ধুয়ে নির্জ্জন বাড়ীতে স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করে সময় কাটাতো। দু'জনে আলাপ করতে করতে এত তন্ময় হতো যে কারো কোনদিকে জ্ঞান থাকতো না, বৃদ্ধ সর্দ্দার বার্দ্ধক্যের ভুল বশতঃ প্রেমালাপে বাধা দিয়ে অপ্রস্তুত হতো। যে দিন বন্ধুরা কানাইকে জোর করে ধরে নিয়ে যেতো বা মিলের ছুটির পর কোন উৎসবে জোর করে নিয়ে যেতো—বা গঙ্গাবতীর বন্ধুরা গঙ্গাবতীর সঙ্গে আলাপ যুড়ে কানাইয়ের আগমন-পথ রুদ্ধ করে দিতো, সে দিন দু'জনের মধ্যে মস্ত বড় মানের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হতো, আর কখনো এত বড় অন্যায় করবেনা বলে কঠিন প্রতিজ্ঞা করে মান ভাঙ্গতে হতো।

এমনি করে একটানা একটি বৎসর কেটেছিলো, দ্বিতীয় বৎসর একটানা গতিকে একটু মন্থর করে দেয়। প্রথম বৎসরটি কি করে গেল তা তারা কেউ কোনদিন ক্ষণকালের জন্যে লক্ষ্য করবার ফুরসুৎ পায় নি। দ্বিতীয় বৎসর যখন চাঁদের আলো নিয়ে একটি ফুটফুটে মেয়ে এসে গঙ্গাবতীর বুক জুড়ে আসন পাতে, তখন কানাই স্বাভাবিক অনাদরে বাহিরের দিকে একটু হেলে পড়ে। এমনি করে এদের প্রেমের অভিনয় ধীরে ধীরে শেষ হ'য়ে যায়। শেষ হওয়াটা কি কঠিন? গঙ্গাবতীর মেয়ে-অন্ত প্রাণ, সন্তানের দিকে সকল দৃষ্টি এনে ফেলে, ওদিকে কানাই বন্ধুদের মজলিসে জমে যায় ; অধঃপতনের পথ ত' সহজ ও খোলা।

এমনি করে পাঁচটি বছর কাটলো। পাঁচটি দীর্ঘ বৎসরে জীবনের গতি এক-ঘেয়ের মাঝে এসে ঠেকে দাঁড়ালো। আর এগুতে চায় না। কানাই চায় সদা নতুন, বৈচিত্র্য। সে আর একঘেয়ে দাম্পত্য জীবনের মাঝে নিজেকে ধরে রাখতে পারছেনা – পারলো না। একটি নারীর অধীনে সে পাঁচটি বৎসর কাটিয়েছে। এ দীর্ঘকালে একজন কত দিতে পারে বা নেবার মত কিই বা নিতে পারে। একটি নারীর এমন কি সম্পদ থাকতে পারে যাতে সে সেই মধুচক্রের চারধারে গুঞ্জরিয়ে ঘুরতে পারে। বিরক্তি ধরে গেছে, বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে। এক স্রোতে চলছে, তাতে না আসে জোয়ার, না হয় উত্থান-পতনের আলোড়ন ; তাতে আবর্জ্জনায় স্রোতকে বিশ্রী করে তুলছে মাত্র। যদি সন্তান না হতো তবে কি হতো জানিনে, সন্তানের আগমনকে অত বড় কুরূপ দিয়ে ভাবা বড় কঠিন! হয়তো কানাই কুপথে যেতো, দ্রুত না যাক্ ধীরে ধীরে যেতো। তখন ত গঙ্গাবতীর মন-প্রাণ বিভক্ত হতো না!

কানাই যদিও অশিক্ষিত কুলী-যুবক, তবু সে দুনিয়াকে চেনে, দুনিয়ার হালচাল বুঝতে পারে, তার ভাববার শক্তি আছে। সে জানে মানুষের জীবন ক্ষণকালের তরে, কতক্ষণের জীবন তা কেউ বুঝতে পারেনা, যদি কাল মরি তবে কালের আশায় আজকার দিনটা ব্যর্থ করবো কেন? মনের ক্ষুধা যে দিকে চালান যায় ঠিক সেই দিকেই চলবে। সে চলার মাঝে ভালমন্দ দুই হতে পারে, কিন্তু ফলটা ত' ভবিষ্যতের হাতে। কানাই মনকে বুঝায়, বিবেককে কশাঘাত করে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে হবে, অতএব বর্ত্তমান হোক দুর্দ্ধর্ষ, দুর্জ্জয়, অপ্রতিহত। সে নিজের সুখ-সুবিধে খুব বড় করে দেখে, নিজের স্বার্থ সর্ব্বত্র বজায় রাখে, মনে যা জাগে তাই করে। জীবনে টাকার আরাধনা করে এসেছে, চিরজীবন

টাকার আরাধনা করবেও। বন্ধুবান্ধব ভিন্ন দিন চলে না, মদ খেয়ে মাতাল না হতে পারলে চলে না। সুখ পেতে হলে প্রচুর পরিমাণ টাকা চাই। হাতের টাকা বহুদিন ফুরিয়ে গেছে। সংসারের খরচ চালানোই কঠিন। দিন দিন সংসারের খরচ কেবল বেড়েই চলছে। সর্দ্দার মারা গেছে, এখন তাকে সংসারের সকল খরচ চালাতে হয়। সে একা কত টাকা রোজগার করতে পারে যাতে সংসার-খরচ চলবে, এবং তার আমোদ আহ্লাদও চলতে পারে? গঙ্গাবতী ত' পরের টাকায় সংসার চালাচ্ছে চোখ বুজে এবং ছেলেপিলে নিয়ে বেশ মজা করে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু তার উপায় কি? বৎসরে একটি করে সন্তান হচ্ছে এখন উপায়? সে এসেছে দু'দিন ভোগ করতে, উৎসব করতে, জীবন-মদিরা পান করতে। এখন সে সংসার প্রতিপালন করবে, না বন্ধুদের নিয়ে কুপল্লীতে মজলিস করবে?

সংসার যে আর চলেনা। না চলে নাই চলুক, তার কি? তেলজল কি কখনো মিশে? আলোড়নে ক্ষণকালের জন্যে মিশতে পারে, কিন্তু উত্তাপে তেলের ও জলের বৈসদৃশ্য সম্পর্ক বের হয়ে পড়ে। পরস্পরের কি দরদ থাকতে পারে? না থাকাই স্বাভাবিক এবং বাঞ্ছনীয়। কানাই নিজে রোজগার করে নিজের জন্যে। স্ত্রী পুত্রকন্যা একগোষ্ঠী লোকের জন্যে ত' সে জীবনটা মরুভূমি করতে পারে না, নিজের ব্যক্তিত্ব ত' ত্যাগ করতে পারে না, প্রাণের আকাঙ্ক্ষাকে ত' হত্যা করতে পারে না। অতগুলি সন্তান হলো কি তার দোষে না তার ইচ্ছায়? সে চায় কামনার পরিতৃপ্তি কিন্তু তার ফল ত' সে চায় না। সে যদি গঙ্গাবতীকে বিয়ে না করতো তবে কি অতগুলি সন্তানের জন্যে সে দায়ী হতো? কানাই চায় ব্যবসায়ী নারীদেহ, সে চায় না প্রেমের গভীরতার মাঝে দুর্ব্বল মুহূর্ত্তের দেহের মিলন, সে চায়না কোন পক্ষের অধিকার তার কামনা পূরণের পরিণামে। ভাবে, রাগে তার হাড় জ্বলে, ঘরের পানে তাকালে অস্বস্তি বোধ করে। ছেলেপিলেগুলির যেমনি চেহারা, তেমনি সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার খাই খাই স্বভাব, যেন দুর্ভিক্ষের কতকগুলি কীট। ছেলেপিলের কথা মনে হতেই তার রাগে গা জ্বলে। ছেলেপিলেগুলি উড়ে এসে পড়ে খাচ্ছে, খেয়ে খেয়ে সব ফতুর করে দিলো। কার ধন কে খায়? না! সে এত বড় অত্যাচার সহ্য করবে না। কি সম্পর্ক তার এদের সঙ্গে? তার ক্ষতিই বা কি? সন্তান হচ্ছে, প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী হতেই হবে। হচ্ছে, হোকনা? সে শুধু জন্মদাতা, আর তো কোন সম্পর্ক নেই। যে দশমাস পেটে কীটগুলি সাদরে ধারণ করে, তারপর দারিদ্র্যের উপাদানগুলিকে দীর্ঘজীবন ললাটে লিখে দিয়ে দুনিয়ার বুকে অভিনন্দন দিয়ে নিয়ে আসে, সেই তাদের হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কানাইয়ের কি মাথা-ব্যথা পড়েছে! তার একটুকুও দরদ নেই, স্নেহ, ভালবাসা, রক্তের আকর্ষণ একটুকুও অনুভব করতে পারেনা। ঘরের সঙ্গে সম্পর্কই বা কতটুকু। সারাদিন ত' হাড়খাটুনি মিলের কাজ, তারপর মজলিস। যেদিন টাকাকড়ি থাকে সেদিন ত' ঘরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই, মিলের ছুটির পর মদ ও নারী। যে কয়েকদিন নিতান্ত টাকা থাকে না, সে কয়েকদিন তার অহিফেনের মজলিস হয় রাত্তির প্রায় দু'টো পর্য্যন্ত। রাত্তিরে ঘুমোবার জন্যে ও তৈরি খাবার পাবার জন্যেই তো ঘরে আসা, বউ রাখা। মাথা গুঁজবার ঠাঁই কি এ শহরে মিলে! মাথা-পিছু ছ'ফিট স্থান; নিজেরই ভাল করে ঠাঁই হয়না, অপরকে দেবে কি করে?

নিত্যি কুপল্লীতে থাকবার ঠাঁই হয় না, বন্ধুদের বাড়িতে রাত কাটানো যায় না, সরকারী বাগানে পুলিসের অত্যাচারে টেঁকবার উপায় নেই। যদি অপর কোথায়ও ঠাঁই মিলতো তবে সে মরতেও বাড়ি আসতো না। খাবার ও শোবার জন্যেই ত' বাড়ি আসা, তাও রোজ আসা হয় না। এমনি বদমাইস ছেলেপিলে যে এক দণ্ড স্বস্তি দেয় না। একটু বিশ্রাম করবার জন্যে বাড়ি আসা তা যে ওদের কত পুণ্যির জোর তা স্বীকার করে না, এমনি বদমাইস! যেমনি মা তেমনি তার সন্তান! 'এটা দাও!' 'ওটা চাই!' 'বাবা! তুমি রোজ আসনা কেন? মা বড্ড কাঁদে!' 'তুমি বড্ড দুষ্টু! মার সঙ্গে কেবল ঝগড়া কর কেন?' আব্দার কি! গা জ্বলে যায়! এক মুহূর্ত্ত কি টেঁকবার উপায় আছে? কি দরদ! এ গোষ্ঠী মরলেই ভাল। লখিয়া (বেশ্যা) কিংবা লছমী (বন্ধুর বোন, গুপ্ত চরিত্রহীনা নারী) এক জনকে ঘরে এনে সুখের সংসার পাতানো যাবে। কেউ কারো ধার ধারবে না, শুধু রাত্রির অভিসার। কি সুবিধেই হবে, কত খরচ তার কমবে! ধাড়ী মাগী মরেও না, সহজ পথেও আসে না! বন্ধুবান্ধব আসতে

চায়, দু' চারটা আলাপ-সালাপ করতে চায়, আর ত' কিছু নয়। কেউ আলাপ-সালাপ করলেই কি সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায়? দুটি মিষ্টি কথায় তার মদ খাওয়ার খরচ বাঁচে, কিছু অর্থেরও সুবিধে হতে পারে। এতে এমন কি দোষ? দু'টি কথাতেই দোষ আর প্রায় ঘরে ঘরে যে সুন্দরী মেয়েরা গোপনে অর্থ রোজগার করে! সে ত' কত বন্ধুর বাড়ি গিয়ে আমোদ আহ্লাদ করে, বন্ধুরাই চালাকি করে মিলনের পথ পরিষ্কার করে দেয়। দেবেই না কেন? গরিব লোক কি না খেয়ে মরবে? বাইরেও সতী রয়ে গেলো, অর্থকষ্টেও মরতে হলো না। গঙ্গাবতী দুনিয়ার হালচাল সব জানে ও বুঝে। এমনি বজ্জাত মাগী যে কোথায় কোন ফাঁকে ধরা পড়ে যায় তারি ভয়ে সে কারো ছায়া মাড়ায় না। দিন রাত আছে ছেলেমেয়ে ও সংসার নিয়ে। যৌবনক্ষুধার চঞ্চলতা পর্য্যন্ত নেই। কি চতুর মেয়ে! ছেলেমেয়েদের আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে কিছু বল্‌লে গঙ্গাবতী আড়ালে দাঁড়িয়ে ফোঁস ফোঁস করে? তেজ আছে! চার ছেলের মা হলো তবু সোহাগ যায়না! ঢঙ্ করে কথা বলা হয় না, মুখখানা আষাঢ়ের মেঘের মত গম্ভীর করে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে পৃথক বিছানায় শুয়ে থাকে। এসব ঢঙ কি কানাই ভুলে? তার সতীত্ব বজায় রাখতে হয় না, যাদের সতীপণার বড়াই আছে ওরা আপনি এসে পায় ধরে সাধাসাধি করবে। তার যত দিন অর্থশক্তি আছে তত দিন নারীদেহের অভাব হবে না। নেহাত খাওয়া-পরার ও ঘুমোবার অভাব, নইলে এক লাথি মেরে চলে যেতো। কানাই বিশ্রী মুখভঙ্গী করে বিড় বিড় করে বকে এবং সত্যি সত্যি জোরে লাথি মারে মেঝেয়। আপন রোষে এক মনে স্ত্রী পুত্রকন্যার মাথা চটকাতে আরম্ভ করে।...

কানাই প্রায় দিনই মাতাল হয়ে পথে-ঘাটে পড়ে থাকে; পুলিসের রুলের গুঁতো খেয়ে টলতে টলতে বাড়ী ফেরে। বমি করে ঘর-দোর নোংরা করে, বিশ্রী রকম মাতলামী করে। কোন কোন রাত মাঠে ঘাটেই পড়ে থাকে, শেষ রাত্তিরে বাড়ী এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। স্ত্রীপুত্রকন্যাকে হিঁচড়ে ঘুম থেকে জাগায়। সারা রাত্তির জেগে থাকে নি বলে স্ত্রীকে ঘুসি চড় মারে। মাতালের ফণী-রক্ত চক্ষু দেখে কেউ কোন প্রতিবাদ করে না, ভয়ে জড়-সড় হয়ে চুপ করে অত্যাচার সহ্য করে। ভীতার্ত্ত ছেলে-মেয়েরা আকস্মিক ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে থেমে যায়, ভয়ে জননীর কোলে আত্মগোপন করে। কোলের শিশু বুঝেনা, ভয়ে খুব চেঁচাতে আরম্ভ করে, কানাইর কিল থাপ্পড়ে আরো বেশি চেঁচিয়ে কান্না জুড়ে দেয়। কানাই চরিত্র খুইয়ে দ্রুত অধঃপতনের নিম্ন স্তরে নামতে লাগলো। সে শুধু চরিত্রহীন মাতাল নয়, অত্যাচারী, পাষণ্ড। (ক্রমশঃ)

শঙ্করগড় বা গড়োয়া

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রাইভেট্ জেনিসনের সহিত আমার পরিচয় হয় এলাহাবাদে,—সে ফোর্টে থাকিত। একদিন কথা-প্রসঙ্গে সে আমাকে বলিল, তুমি ত বেড়াইতে ও প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন সব দেখিতে ভালবাস, একবার 'গড়োয়া' বা শঙ্করগড় বেড়াইয়া এস না কেন? আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বল ত সেখানে কি আছে? সে কহিল, একটা পুরাতন দুর্গ, অনেক পুরাতন মূর্ত্তি আর ভাঙ্গা পাথরের বাড়ী-ঘর অনেক কিছুই সেখানে দেখিতে পাইবে। আরও বলিল যে, আমাদের 'ক্যাম্প' শীতের সময় উহার কাছাকাছি একটি নদীর ধারে পড়িয়াছিল, আমরা অনেক সময় তখন ওখানে বেড়াইতে গিয়াছি। প্রাইভেট্ দলভুক্ত হইলেও এই তরুণ যুবকটির শিক্ষা-দীক্ষা ঐ শ্রেণীর লোকদের মত ছিল না। সে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়াছে এবং ভারতের নানা ধর্ম্ম ও সমাজের সংবাদ সে রাখে। আর সে ছিল ধর্ম্মপ্রাণ-যুবক। তাহাকে একদিন একটি সিগ্‌রেট পর্য্যন্ত টানিতে দেখি নাই বা সদালাপ ও ধর্ম্ম সম্পর্কিত বা সাহিত্য সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া কোন কথা বলিতে শুনি নাই। তাহার প্রাণে ধর্ম্ম-ব্যাকুলতা ছিল।

আমি বলিলাম—জেনিসন্, তোমাকেও আমাদের সঙ্গী

হইতে হইবে। সে সন্তুষ্ট হইয়া কহিল,—আমাকে ছুটির দরখাস্ত করিতে হইবে, তুমি আমাকে চিঠি দিও, আমি ছুটি লইয়া সঙ্গী হইব। সেই ব্যবস্থা করিলাম। তারপর একদিন অগ্রহায়ণের শেষে আমরা কয়েকজন মিলিয়া শঙ্করগড়ের দিকে যাত্রা করিলাম। সঙ্গী হইলেন,—মিঃ জেনিসন, অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দেব, এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির এঞ্জিনিয়ার শ্রীআশুতোষ গুপ্ত, ইণ্ডিয়ান প্রেসের শ্রীমান্ হরিনাথ ঘোষ ও সুরেনবাবুর পুত্র ও নাতি শ্রীমান্ অরু ও বীরু, দুই তরুণ কিশোর।

বেশ শীত পড়িয়াছিল। ষ্টেশনে আসিলাম শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে। আমরা সকলে মিলিয়া G. I. P. লাইনের জব্বলপুর-যাত্রী একখানা মধ্যম শ্রেণীর গাড়ী অধিকার করিয়া বসিলাম। অধ্যাপক সুরেনবাবু সাবধানী লোক। প্রাতরাশের জন্ম কিছু পুরি, তরকারি ও চাট্নি সঙ্গে আনিয়াছিলেন। আশুবাবুও কিছু খাবার আনিয়াছিলেন, কাজেই প্রাথমিক জলযোগের দিক্ দিয়া আমাদের সংগ্রহ ভালই বলিতে হইবে।

গাড়ী বেগে যাইতেছিল। দুই দিকে তৃণ-গুল্মমণ্ডিত খোলা মাঠ, বাড়ীঘর আর পেয়ারার বাগান। শীতের প্রসন্ন রৌদ্র-তেজে সকলই যেন প্রফুল্ল ও সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল। শঙ্করগড়ের কাছাকাছি পাহাড় দেখা গেল। প্রস্তরাকীর্ণ এই রুদ্র ও বন্ধুর পাহাড়গুলি বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে বেশ দেখাইতেছিল।

আমরা বেলা ৯-৩০ মিনিটের সময় শঙ্করগড় ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম। ষ্টেশনে নামিবামাত্রই আশুবাবুর পরিচিত একজন হিন্দুস্থানী বন্ধুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনিও আমাদের সহিত এক গাড়ীতেই শঙ্করগড় আসিয়াছেন। আশুবাবু বন্দুক সঙ্গে লইয়াছিলেন,—শঙ্করগড়ে অনেক শিকার পাওয়া যায় বলিয়া। কাজেই আশুবাবুর হাতে বন্দুক দেখিয়া তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আপনারা কি শিকার খেলিতে আসিয়াছেন?' আশুবাবু বলিলেন—না। তারপর জেনিসনকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সাহেবটি কে?" আমরা তাহার পরিচয় দিলাম। আমাদের কাছে শুনিলেন যে আমরা 'গড়োয়া' দেখিতে যাইতেছি, তখন তিনি বলিলেন—আমার একান্ত ইচ্ছা, আজ আপনারা আমার আতিথ্য গ্রহণ করেন। আমি ষ্টেশনের সম্মুখেই তাঁবু ফেলিয়াছি, সঙ্গে চাকর, বামুন সব আছে; কোন অসুবিধা হইবে না। গড়োয়া দেখিয়া ফিরিতেও অনেক বেলা হইবে, আর গাড়ী ত রাত্রি সাড়ে আটটার আগে নাই। আশুবাবু প্রথমটায় অস্বীকার করিলেন, কিন্তু আমাদের সকলের মুখের সম্মতি-সূচক ভাব দেখিয়া রাজী হইলেন,—আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। জীবনে অনেকবার বিদেশে এইরূপ মুখের খাবার ফেলিয়া দুর্ভোগ ভুগিয়াছি, কাজেই এমন সাদর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করা কোনমতেই ঠিক্ নয় মনে করিয়াছিলাম। এইবার প্রসন্ন মনে গড়োয়ার দিকের পথ ধরিলাম। খাওয়ার ব্যবস্থার ভার এই নূতন পরিচিত বন্ধুর উপর দিয়া যে কত বড় বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছিলাম, সে কথা পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

শঙ্করগড় ষ্টেশনটি খোলা মাঠের মধ্যে অবস্থিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিক ঘিরিয়া শ্যামল বনভূমি। দূরে দূরে গিরিমালা দূর দিগন্তে যাইয়া মিলিত হইয়াছে। কে জানে কোন্ দেশে তাদের এই সবুজশ্রী শেষ হইয়া গিয়াছে।

শঙ্করগড় গ্রামটি বেশ বড়। ম্যাক্ডোনেল্ (Macdonell) উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় রহিয়াছে। আর আছে এখানকার রাজার বাড়ী। গড়োয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্নের জন্যই শঙ্করগড়ের প্রসিদ্ধি। ষ্টেশন হইতে একটি পথ বরাবর গড়োয়া পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। জুবাই পাহাড়ের শোভা এখান হইতে পরম রমণীয় মনে হয়। ঐ পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া নানা স্থানে চালান দেওয়া হয়। শঙ্করগড় হইতে একটি ব্রাঞ্চ লাইন জুবাই পাহাড়ের নীচে চলিয়া গিয়াছে। এই সব গ্রাম ও পাহাড়গুলির মালিক হইতেছেন 'বারার' রাজা।

ষ্টেশন হইতে গড়োয়ার দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। পথ কতকদূর পর্য্যন্ত বেশ ভাল; এমন কি মোটর গাড়ী চলিতে পারে। বাকী দুই মাইল পথকে পথ বলা চলে না। পথের দুইধারে গুল্মের আকারের এক প্রকার ছোট ছোট কুল গাছ। ঐসব ছোট গাছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে কুল লাল টুক্টুকে হইয়া পাকিয়া আছে। খাইতেও বেশ ভাল—মিষ্টি। এত ছোট কুলের গাছ আর কোথাও কখনও দেখি নাই। পথের মাটি লাল—রাঙামাটির পথ,

অসংখ্য প্রস্তরের স্তূপ। একটু অন্যমনস্ক হইলেই হুঁছোট খাইয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা আছে। আমরা হাঁটিয়া চলিয়াছিলাম।

প্রায় আড়াই মাইল পথ আসিয়া একটি ছোট নদীর পাড়ে আসিলাম। নদীর পাড়ে—বিস্তৃত আমের বাগান ও সবুজ তৃণমণ্ডিত শ্যামল ক্ষেত্র। জেনিসন্ বলিল—এই নির্জ্জন বনভূমিতেই সেইবার তাহাদের 'ক্যাম্প' পড়িয়াছিল। প্রতি বৎসর শীতকালে তাহারা কিছুদিনের জন্য এখানে আসে। এ-বিষয়ে এলাহাবাদ জেলার বিবরণী পুস্তকে লিখিত আছে :—"The place is best known on account of the remains at Garhwa and also for the military camp of exercise which is held during the cold weather by the garrison of Allahabad on the old artillery range to the north-east."

এখানকার একটি গ্রামের নাম পরতাবপুর। গ্রামে ছত্রি জাতীয় লোকের বাসই বেশী। ইহারা কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে। খোলা মাঠের মধ্যে গ্রাম। চারিদিক বেড়িয়া পাহাড় ও বন। দুইদিকের বনজঙ্গলের মধ্যস্থিত সংকীর্ণ পথ ধরিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে একটা পথের বাঁক পার হইয়াই পাহাড়ের পশ্চাতে দেখিতে পাইলাম—গড়োয়া গড়ের লোহিত প্রাচীর। এই নির্জ্জন বনভূমিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে এইরূপ প্রাচীর-বেষ্টিত এমন একটি সুন্দর স্থান থাকিতে পারে তাহা ভাবি নাই। কবে, কোন্ সে নৃপতি এই নিভৃত প্রদেশে এমন করিয়া একটি সুন্দর দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস জানিবার কৌতূহল আপনা হইতেই মনের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয়।

গড়োয়ার প্রথম পরিচয়ের জন্য আমরা পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুযোগ্য কর্ম্মচারী, স্বর্গীয় বাবু শিবপ্রসাদের নিকট ঋণী। তিনি এই গড়োয়া আবিষ্কার করিয়া সাধারণের নিকট প্রচার করেন। একটি মালভূমির উপর শঙ্করগড় অবস্থিত। কৌশাম্বি হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ইহার দূরত্ব পনের মাইল হইবে। 'ভিটা' নামক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান হইতেও প্রায় ঐরূপই দূর হইবে। এদিকে ভাটগড় নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম আছে, সেখান হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র দুই ক্রোশ। প্রাচীন মানচিত্রে এ-স্থানের নাম লেখা আছে শুধু Fort. অর্থাৎ গ্রাম্য-প্রচলিত 'গড়োয়া' শব্দ হইতেই ইহা গড়, Fort এই ইংরাজী নামে রূপান্তরিত হইয়াছে।

গড় বলিতে আমাদের কাছে দুর্গের যে এক বিরাট আকারের কথা মনে হয়, এ গড় কিন্তু সেরূপ কিছুই নহে। অতি প্রাচীন কালে গড়োয়া দেখিতে কেমন ছিল, সে-কথা বলিতে পারি না। এখন ইহার চারিদিক বেড়িয়া প্রাচীর, আর প্রাচীরের মধ্যে কয়েকটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। কোথায় থাকিত সৈন্য, কোথায় থাকিত অস্ত্রশস্ত্র, কোথায় বা থাকিতেন রাজা, কে বলিতে পারে? পূর্ব্বে যে প্রাচীর ছিল তাহা বেলে পাথরের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সে প্রাচীরের যখন ভগ্ন দশা, তখন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বারার একজন পূর্ব্বতন নৃপতি রাজা বিক্রমাদিত্য ইহার সংস্কার করিয়াছিলেন। একটি নদীর বুকের উপর গড়োয়ার এই স্বপ্নপুরী দাঁড়াইয়া আছে। দুর্গের নীচের ভূ-ভাগ ঢালু হইয়া আসিয়াছে।

গড়ের চারিদিক বেড়িয়া গড়খাই (Ditch)। এখনও সামান্য জল আছে, কিন্তু তেমন গভীর নহে।

পুরাতন প্রাচীরের উপর যে নূতন প্রাচীর গাঁথিয়া তোলা হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। নূতন প্রাচীরের গায়ে গোলাকার ছিদ্র আছে. বোধ হয় বন্দুক ছুঁড়িবার জন্য ঐরূপ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে গড়োয়া দুর্গে যে পথ দিয়া প্রবেশ করিতে হইত, সে পথ এখন বন্ধ, সেখানে অর্দ্ধভগ্নাবস্থায় একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অশ্ব পড়িয়া আছে। তাহার কাছে যে খোদিত লিপি ছিল, সেই প্রস্তরখণ্ড অদৃশ্য হইয়াছে।

পূর্ব্বে গড়োয়া কেমন ছিল জানি না। আশে-পাশের লোকেরাও তাহা বলিতে পারে না। তবে চারিদিকে যেরূপ প্রস্তর স্তূপ পড়িয়া আছে, তাহাতে মনে হয় বুঝি বা একদিন ইহার আয়তন আরও অনেক বড় ছিল। এখন ইহা দেখিতে অষ্টকোণ-বিশিষ্ট। পশ্চিম দিকের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩০০ ফিট, উত্তরের ২০০ ফিট, পূর্ব্বের ১৮০ ফিট। গড়োয়ার ভিতরে আসিবার তোরণ-দ্বার এখন দক্ষিণ দিকে। অনেকগুলি পাথরের সিঁড়ি বাহিয়া তবে উপরে উঠিতে হয়। সিঁড়ির নীচে, একটি অতি পুরাতন ইঁদারা আছে,—এই ইঁদারার জল অতি মিষ্টি। আমরা উহা পান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলাম।

গড়োয়ার উপরে উঠিয়া দেখিলাম পশ্চিম দিকে একটি বিস্তৃত জলাশয়; সে জলাশয়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ × ৬০০ ফিট। পশ্চিম দিকের প্রাচীর ঐ জলাশয়ের বাঁধের কাজ করিতেছে। উহার দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া নদীটি চলিয়া গিয়াছে। বর্ষার সময় যখন দুই দিকের দুইটি জলাশয়ের জল কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া যাইত, তখন সেই জলরাশি উত্তর দিকের মাঠের মধ্যস্থিত একটি পয়ঃপ্রণালী দিয়া বাহির হইত। পূর্ব্বদিকে নদীর পশ্চিমে বহুদূরে পাথরের বাঁধ প্রস্তুত করিয়া দেওয়ায় ঐ দিকের জল আর প্রবহমান নহে। পূর্ব্বদিকে গড়ের কাছেও বাঁধ থাকায় এবং মধ্যস্থলে গড়ের অবস্থানের জন্য নদী এদিকেও বাধা পাইয়া একটি হ্রদের আকারে পরিণত হইয়াছে।

এক সময়ে এই হ্রদের জল আসিয়া দুর্গের চরণ চুম্বন করিত। এখন গড়ের কাছ হইতে জল প্রায় ৪০০।৫০০ ফিট দূরে সরিয়া গিয়াছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চারিদিক বেড়িয়াই সোপানশ্রেণী জলের দিকে নামিয়া গিয়াছে। সে সময়ে নির্ম্মল সলিলপূর্ণ এই হ্রদের শোভা অতুলনীয় ছিল। দুইদিকে এইরূপ দুইটি হ্রদ, তাহারই মাঝখানে এই লাল বেলে পাথরে গড়া দুর্গ-প্রাচীর, ধবল প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দির-চূড়া, না জানি কি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিত। এখন একদিকের হ্রদের বুকে জল নাই, অন্যদিকের হ্রদের বুকে এখনও স্বচ্ছ কাল জল, সামান্য হিল্লোল স্পর্শে বুকের মধ্যে ঢেউ তুলিয়া ছুটাছুটি করে।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে গড়োয়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহার সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া যায় সরকারি বিবরণীতে। তখন এখানে আসিতে কেহ সাহস করিত না। সে সময়ে গড়োয়ার প্রাচীরের ভিতরের অংশ ছিল দুর্ভেদ্য জঙ্গলে পূর্ণ,—সেখানে থাকিত বাঘ, ভালুক, সাপ প্রভৃতি হিংস্রজন্তু। অনেক কষ্টে তিন চারি বৎসরের চেষ্টায় যখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ইহার ভিতরকার জঙ্গল পরিষ্কার করিলেন, তখন এখানকার অসংখ্য মূর্ত্তি, মন্দির, বাড়ী, অলিন্দ, খোদিত লিপি প্রভৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। তারপর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে, কেহ গড়োয়ার সংবাদ বড় একটা রাখে না।

আমরা বেলা প্রায় বারটার সময় গড়োয়ার সোপান সন্নিকটে পৌঁছিয়াছিলাম। তখন শীতের রৌদ্র বেশ আরামপ্রদ মনে হইতেছিল। আমাদের পথপ্রদর্শক জেনিসন্ সকলের আগে মহা আনন্দে প্রস্তর-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া গড়োয়ার প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল এবং সেখান হইতে প্রাচীরের পাশে দাঁড়াইয়া উচ্চ কণ্ঠে আমাদের আহ্বান করিতে লাগিল। তাহার সেই আহ্বানে আমরা সকলেই সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া চলিলাম; তরুণ যাহারা তাহারা বীরপদবিক্ষেপে প্রাচীর বাহিয়াই গড়োয়ার দুর্গমধ্যে আরোহণ করিতে লাগিল। এই ভাবে আমরা সকলে গড়োয়ার সুবিস্তৃত অঙ্গনতলে আসিলাম। যাহা আশা করি নাই, তাহাই দেখিলাম। প্রাচীর-বেষ্টিত শ্যামল প্রাঙ্গণভূমে প্রথমেই দৃষ্টি পড়িল একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত মন্দিরের প্রতি।

একদিন এই মন্দিরটি যে সুগঠিত ছিল সে বিষয়ে এতটুকু সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মন্দিরের চূড়া, দেয়াল নাই, যাহা আছে তাহা অতি সামান্য। কিন্তু দৃঢ় গঠিত সোপানশ্রেণী এখনও তেমনই আছে। সোপানের দুই পার্শ্বে দুইটি মূর্ত্তির কথা পরে বলিব।

গড়োয়ার এই বিস্তৃত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ও পার্শ্বে অনেক মন্দিরের, গৃহের ও অলিন্দের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। এখানকার সোপানশ্রেণী এবং এখানকার শ্রীমূর্ত্তিগুলি সব এক সময়ের নহে। সকলের অপেক্ষা প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন এখানে যে কয়টি আছে, সেগুলি গুপ্ত রাজাদের সমকালীন। তাহাদের মধ্যে একটি দীর্ঘ প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম, কতকটা পাথরের কড়ি-কাঠের মত। উহার গায়ে অনেক কিছু খোদিত রহিয়াছে।

এখানকার শ্রীশ্রীসূর্য্যদেবের মূর্ত্তিটি অতি সুন্দর ও সুগঠিত। এই মূর্ত্তিটির পাশে এক রাজার মূর্ত্তি। তাহার মাথার পাগ্ড়ী একটু বিচিত্র রকমের। মধ্যস্থলে কে জানে কোন্ সে রাজা দাঁড়াইয়া আছেন, পোষাক পরিচ্ছদ তেমন রাজোচিত নহে—চারিদিকে লোকজন ভিড় করিয়া চলিয়াছে। একজন অনুচর রাজার মস্তকে ছত্রদণ্ড ধরিয়া-ছেন। এই প্রস্তরখণ্ড দুইটি কয়েকটি প্রস্তর-স্তম্ভের উপর স্থাপিত।

ভারতবর্ষে গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। এখানকার মন্দিরের একটি কক্ষের মধ্যে গুপ্ত রাজাদের সমকালীন কয়েকটি খোদিত-লিপি আছে। এই লিপিগুলি

অসম্পূর্ণ। আমরা তাহার কিছু পাঠোদ্ধার করিয়াছি। এ বিষয়ে সরকারি বিবরণী হইতেও সাহায্য পাওয়া গিয়াছে। লিপিটি এইরূপ :— উপরের দিক্‌টা এমনি অস্পষ্ট যে ভাল করিয়া পড়া যায় না। আমরা কোন্ পংক্তিটিতে কিরূপ লিখিত আছে, তাহার উল্লেখ করিলাম।

১। [পরম ভাগবত—মহারাজাধিরাজ শ্রী—]
চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য ·······

২। [সংবৎসবে ·······

৩। দিবসপূর্ব্বায়াং··· ···



সূর্য্য-মূর্ত্তি

৪। ক—মাতৃদাস—প্র [মুখ]······

৫। প্যায়নার্থং রাচি·········

৬। দা—সত্র—সামাণ্য (ন) ব্রাহ্ম [ণ]

৭। দীনারৈর্দ্দশভিঃ ১০

৮। যশ্চৈনং ধর্ম্ম সন্দং (স্কং) [ব্যুচ্চিন্দ্যাৎ স পঞ্চ-ভির্মহাপাতকৈঃ সং]

৯। যুক্তঃ স্যাদিতি।

১০। পরম ভাগবত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্ত-রা-]

১১। জ্যসংবৎসরে ৮০।৮······

১২। পূর্ব্বায়াং পাটলিপুত্র······

১৩। হস্তস্য ভার্য্যা

১৪। আত্মপুণ্যোপচয়া (র্থং)

১৫। সদা—সত্র—সামান্ত—ব্র [াহ্মণ]

১৬। দীনারাঃ দশ ১০

১৭। ধর্ম্মস্কন্দং (স্কং) ব্যুচ্ছিন্দ্যাৎ [স পঞ্চভির্মহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদিতি।

অপর খোদিত লিপি এইরূপ :—

১। জিতাং ভগবতা। প [রম ভাগবত—মহারাজাধিরাজ]

২। শ্রীকুমার গুপ্ত—রাজ্য [সংবৎসরে]

৩। দিবসে ১০··· ··

৪। ·························

৫। সদা সত্র—সা [মান্য]······

৬। দত্তা দীনারাঃ ১০

৭। তি সন্তে চ দীনারাস্ত্র

৮। ন্দ্যাৎ স পঞ্চ মহাপাতকৈঃ সংযুক্তঃ স্যাদিতি]

৯। গোয়িনা লক্ষণা।·········

আর একটি লিপির পাঠ এইরূপ—

১। জিতাং ভগবতা। পরম ভাগবত—[মহারাজাধি

২। রাজ শ্রীকুমার গুপ্ত—রাজ্য—সংবৎস] রে ৯০।৮

৩। ········ [দিবস] পূর্ব্বায়াং পট্ট······

৪। ·········আত্মপুণ্যোপ

৫। ·· ·· ···কালীয়ং সদাসত্র

৬। ···কস্য তলকনিবন্ সে (?)

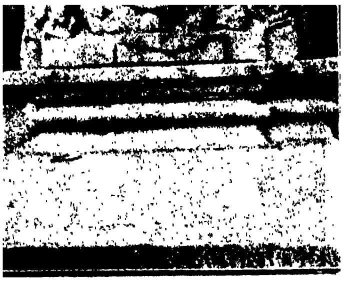
৭। ···ত্যং দীনারাঃ দ্বাদশ

৮। ······স্যাম্বুরোত্ত (?) স্ত চ্ছ

৯। ····· [সং] যুক্ত [ঃ] স্যাদিতি

আমরা উপরে যে লিপি কয়টির পরিচয় দিলাম, তাহা হইতে জানা যায়, এই খোদিত-লিপি কয়টি মহারাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন। এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণও আছে, কেননা 'পরম ভাগবত' এই উপাধি চন্দ্রগুপ্তের (দ্বিতীয়) ছিল। ভিটারি ও বিহারের খোদিত লিপিতে তাঁহার এই উপাধির উল্লেখ আছে। তারপর লিপিতে রাজধানী পাটলিপুত্রের নাম রহিয়াছে। পাটলিপুত্র গুপ্ত

রাজাদের রাজধানী, সে কথা সকলেই জানেন। "দিনার" শব্দের ব্যবহার হইতেও ইহা বেশ বুঝা যায় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালেই এই খোদিত লিপির জন্ম। গুপ্ত রাজাদের সুবর্ণ মুদ্রার নাম ছিল দিনার। এইরূপ অনুমান করা যাইতেছে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) বার্ষিক দশ দিনার কোনও বিশেষ কারণে দান করেন, তাঁহার সেই দান পুত্র কুমারগুপ্তও অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। গাড়োয়ার লিপির সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাঁচীস্তূপের লিপির সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। এই অর্থদান দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাহাকে কি কারণে করেন এবং কুমারগুপ্তও



ব্রহ্মা-মূর্ত্তি

তাহা বলবৎ কেন রাখেন তাহা বলা কঠিন। গড়োয়ার এই লিপিটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া গেলে হয় ত অনেক কথা জানা যাইত। এই লিপির কতকাংশ কলিকাতা যাদুঘরে আছে।

আমরা দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের কাছে আসিয়া কয়েকটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তিনটি মূর্ত্তিই উপবিষ্ট। পূর্ব্বে এই মূর্ত্তি কয়টি কোথায় কোন্ মন্দিরে কি ভাবে অবস্থিত ছিল তাহা বলা কঠিন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিনটি মূর্ত্তির আকার অতি বৃহৎ। প্রত্যেকটি মূর্ত্তির নীচেই খোদিত-লিপি আছে। যোয়ালাদিত্য নামে একজন যোগী এই সব মূর্ত্তি স্থাপন করেন। ব্রহ্মা মূর্ত্তির নীচে লিখিত আছে ১। শ্রীভট্টানন্ত সুতেনায়ং জালাদিত্যেন যোগিনা ·· ২। চিত্র······কৃতো ব্রহ্মা জানকর্ম্মস······য়ঃ।

বিষ্ণু মূর্ত্তির নীচের লিপি ১। শ্রীভট্টানন্তসুতেনায়ং জালা দিত্যেন যোগি না···বিষ্ণুরাম··· ২। কীর্ত্তিত ····· এখানে বিষ্ণু মূর্ত্তির সহিত রাম নাম সংযুক্ত দেখা যায়, কাজেই প্রতিষ্ঠাতার খোদিত-লিপির অনুযায়ী আমরা এই মূর্ত্তিটিকে বিষ্ণুরাম মূর্ত্তি বলিয়া উল্লেখ করিলাম।



রুদ্র-মূর্ত্তি

রুদ্র বা শিব মূর্ত্তির নীচে লিখিত আছে—

১। শ্রীভট্টনন্ত সুতেনায়ং জালাদিত্যেন যোগিনা জানভ····· সম

২। যুক্তো রুদ্রোয়োরো (?)···রু···কৃতঃ···

এই খোদিত-লিপি কয়টি পড়িয়া জানা যায় যে এই তিনটি মূর্ত্তিই ভট্টানন্ত বা অনন্তভট্ট নামক ব্যক্তির পুত্র জালাদিত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভাটগড়—সেকালের ভাটগ্রাম হওয়া অসম্ভব নহে। এখনও ভাটগড়

ও গড়োয়া যাতায়াতের পথে ইষ্টক ও প্রস্তর প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদয় খোদিত-লিপি পড়িয়া মনে হয় যে ভট্টগ্রাম বা ভাটগড় গ্রামটি দশম শতাব্দীর বেশী প্রাচীন নহে। চন্দ্রগুপ্তের খোদিত-লিপি ও মূর্ত্তির নিম্নস্থিত কুটিল লিপি হইতে মনে হয় যে 'গড়োয়া' অতি প্রাচীন স্থান—খৃষ্টিয় প্রথম শতকের পূর্ব্বেও এ-স্থানের প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু সে সময়ে ইহার নাম কি ছিল বলিতে পারা যায় না। আর কেই বা তেমন করিয়া তার অনুসন্ধান করিয়াছে?

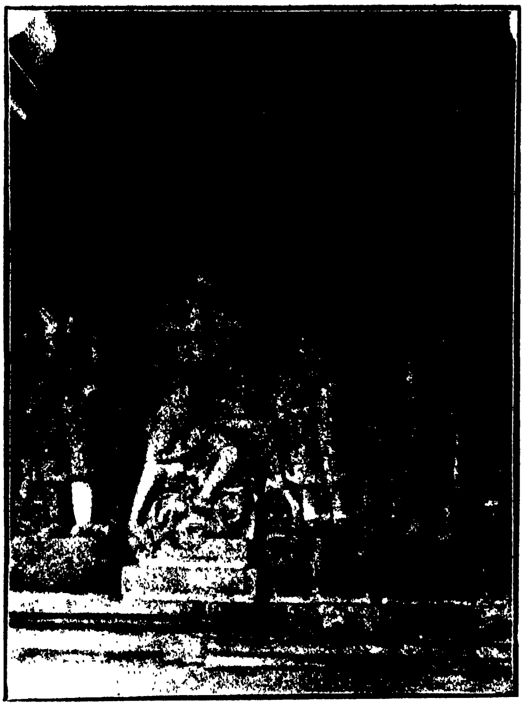
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের মূর্ত্তি ছাড়া এখানে বরাহবতার, মৎস্যাবতার, পরশুরাম, বুদ্ধ, নৃসিংহ প্রভৃতি দশাবতারের সমুদয়



পরশুরাম, বুদ্ধ ও নৃসিংহ

রহিয়াছে। বুদ্ধ মূর্ত্তিটিও দণ্ডায়মান ভাবে খোদিত। তাহাদের কোন কোনটির নীচেও খোদিত-লিপি আছে। কোথায় কোন্ দেবমন্দিরে এই শ্রীমূর্ত্তিগুলি বিরাজমান ছিল, তাহা বলা যায় না। সম্ভবতঃ প্রাঙ্গণের মধ্যস্থিত যে বৃহৎ মন্দিরটি আজ অর্দ্ধ-ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে—সেখানেই ঐ সকল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া আমরা মন্দিরের কাছে আসিলাম। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মন্দিরটি অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫৫ ফিট হইবে এবং প্রস্থে হইবে ৩০ ফিট। মন্দিরের প্রবেশের দরজাটি পূর্ব্বদিকে। মন্দিরটি দুইভাগে বিভক্ত। একটি মণ্ডপ, অপরটি বিগ্রহের অবস্থান—গর্ভ-গৃহ। ষোলটি প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ মন্দিরটি ধারণ করিয়া আছে। গর্ভগৃহভাগ চতুষ্কোণ। মন্দিরে যে বেদীর উপর একদিন দেবমূর্ত্তি বিরাজমান থাকিত, আজ তাহা শূন্য। প্রদীপ শিখার কৃষ্ণ চিহ্ন এখনও দেওয়ালের গায়ে চিহ্নিত আছে। মন্দিরের বারান্দায়ও কোন মূর্ত্তি নাই। কে এই মন্দির কবে কোন্ যুগে বিগ্রহশূন্য করিল, আজ তাহা



বরাহ প্রভৃতি দশাবতারের মূর্ত্তি

কে বলিবে? কোন্ দেব বা দেবী-মূর্ত্তি এই মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, কেহ তাহা জানে না। কোন খোদিত-লিপি হইতেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায় না। যিনি পরে এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার খোদিত-লিপিতেও কোন দেবতার নাম নাই। কোন তীর্থ-যাত্রীও এখানে আসিয়া এমন কোন লিপি মুদ্রিত করিয়া যান নাই যাহা হইতে জানিতে পারি কোন্ দেবতার আরতির ঘণ্টা-

রবে এই মন্দির-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইত ! কোন্ দেবতার স্তবগীতি ভক্ত-কণ্ঠে উচ্চারিত হইত।

মন্দিরের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেই দুইটি প্রস্তর-নির্ম্মিত স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গায়ের খোদিত-লিপি হইতে মন্দির প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় পাওয়া যায়। নীচে মন্দিরের সোপানের পার্শ্বে একটি মূর্ত্তি আছে, অনেকে মনে করেন উহা প্রতিষ্ঠাতার মূর্ত্তি। এখানে খোদিত লিপি সমূহের প্রতিলিপি দিলাম।

১।···স্য প্রবর্দ্ধমান-বিজয়-রাজ্য সংবৎসর শতেষ্টা চত্বারিঙ্‌শদুত্তরে মাঘ মাস দিবসে একবিঙশতিমে

২।···পুণ্যাভিবৃদ্ধার্ণং বঙভিংঙ (ভিং) কারয়িত্বা অনন্তস্বামিপাদং প্রতিষ্ঠাপ্য গল্প ধূপস্রগ···

৩।···স্ফুট প্রতিসংস্কার করণার্থং ভগ [ব]। চিত্রকূট স্বামি-পাদীয় কোষ্ঠে (?) ত প্রবেশ্য মতি··· ··

৪।······লা দত্তা দ্বাদশ।

যৈনং ব্যুচ্ছিন্দ্যাৎস পঞ্চভিঃ মহাপাতকৈঃ স [ং] যুক্তঃ স্যাদিতি ॥

উত্তরদিকের প্রস্তর স্তম্ভে লিখিত আছে ঃ—

১। শ্রীনবগ্রামভট্টগ্রামীয় বস্তব্য কায়স্থ

২। ঠাকুর শ্রীকুন্দপাল পুত্র ঠাকুর শ্রীরণ পালস্য।

৩। মূর্ত্তিঃ গণিত কবৈয়ং সংবৎ ১১৯৯

৪। সূত্রধার শ্রীচিত সৈ পুত্র শ্রী··· ·· ৫। বল্ হন

এইরূপ স্পষ্ট ও অস্পষ্ট লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১১৯৯ সংবতে অর্থাৎ ১১৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির-দ্বার প্রথম উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার নাম রণ পাল। রণ পালের পিতার নাম কুন্দ পাল। জাতিতে শ্রীবস্তব্য কায়স্থ। যুক্তপ্রদেশে এখনও অনেক শ্রীবস্তব্য কায়স্থ আছেন। এই খোদিত লিপিটিতে তাহার উল্লেখ আছে। ইহা একটি প্রাচীন নিদর্শন।

যে সময়ে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন নবগ্রাম নামে একটি গ্রামও স্থাপিত হয়। নবগ্রামের পরিচয় এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু বর্ত্তমান ভাটগড় বা বুড়গড় এখনও প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। গড়োয়া হইতে এই গ্রামটি মাত্র দেড় মাইল উত্তরদিকে অবস্থিত। ভাট-গ্রামের সর্ব্বত্র ইঁট, পাথর ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া মনে হয় যে এক সময়ে ভাটগ্রাম একটি প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিবের মূর্ত্তির কাছে এক রাজার মূর্ত্তি আছে। রাজা অশ্বপৃষ্ঠে আসীন। তাহার পোষাক পরিচ্ছদ দেখিয়া জানিতে পারা যায়, মুসলমানদের এদেশে আসিবার পূর্ব্বে হিন্দু রাজাদের কেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল। রাজার মূর্ত্তির কাছে তাহার মন্ত্রীর মূর্ত্তিও আছে, তাহা অপেক্ষাকৃত ছোট।

রাজার নাম বোধ হয় শঙ্কর দেব ছিল। গড়োয়ার চারিদিকের প্রস্তর-প্রাচীর তিনি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের অল্প দূরে দুইটি 'বাউলি' আছে। মাঝখানটায় জঙ্গলে ভরা। সিঁড়ি বাহিয়া নীচে



শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

নামিতে হয়। সিঁড়ি এখনও অভগ্ন রহিয়াছে। একদিন হয় ত এই সোপান বাহিয়া কুললনারা বাউলির জল সংগ্রহ করিতেন।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া সব দেখিতে লাগিলাম। এক কোণের একটি মন্দির মধ্যে অতি বৃহদাকারের শ্রীসূর্য্য মূর্ত্তি বিরাজমান। এত বড় বিরাট সূর্য্য মূর্ত্তি আমি এ পর্য্যন্ত আর কোথাও দেখি নাই।

এই প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানের চারিদিক্ ঘিরিয়া যে বাসগৃহ

ছিল তাহা এখনও ছোট ছোট কক্ষ সমূহ দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। বোধ হয় একদিকে মন্দিরের বাহিরের দিক্‌টাতে পুরোহিতেরা, অতিথি অভ্যাগত ও সন্ন্যাসীরা বাস করিতেন।—আজ এই স্তব্ধ বিজনে দুইদিকে পর্ব্বত শ্রেণী, ঘন শ্যামল বনানী ;—আর একদিকের হ্রদের বুকের কৃষ্ণ-সলিলরাশি অতীতের সাক্ষ্য। মূক মন্দির কোন কথা বলে না, বিগ্রহেরা পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ আর পূজা ও আরতির জন্য আন্তরিক আগ্রহের সহিত ছুটিয়া আসে না। সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লুবাই পাহাড়ের অন্তরালে নিবিড় অরণ্য মধ্যে লুকায়িত ছিল। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ভয়ে কেহ কাছেও ঘেঁসিত না। এক সময়ে এখানে সিংহও বাস করিত।

আমরা চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মূর্ত্তির পদতলে আসিয়া বসিলাম। বসিয়া ছবি তুলিলাম ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম।

সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। মন্দিরের চারিদিক বেড়িয়া সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। চারিদিকের গাছের পাতাগুলি শীতের উতলা পবনে দুলিতেছিল। আমরা ধীরে ধীরে আবার সকলে শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম।

এঞ্জিনিয়ার আশুবাবু ও মিঃ জেনিসন্ শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু কোন শিকার তাঁহাদের মিলে নাই। শিকারীরা বলেন, এখানে অনেক শিকার মিলে।

রাঙামাটির আঁকা বাঁকা পথে আমরা শঙ্করগড় ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া চলিলাম। শুক্লপক্ষের চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ আকাশে দেখা দিল। দূরে গিরিশ্রেণীর পশ্চাতে শঙ্করগড় গড়োয়া লুকাইয়া গেল।

সেই যে ভদ্রলোক, তিনি আমাদের প্রচুর খাদ্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। চায়ের সঙ্গে পুরী, মিঠাই ও শঙ্করগড়ের বিখ্যাত 'লেনচা' মিঠাই খাইয়া সমুদয় শ্রান্তি দূর করিলাম।

এলাহাবাদ ফিরিয়া আসিতে রাত্রি এগারটা বাজিয়াছিল। মিঃ জেনিসন্ আর সৈন্যদলে নাই ; এখন সে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক হইয়াছে। আমি তাহার নিকট হইতে এখনও নিয়মিত ভাবে পত্র পাই।

শঙ্করগড়—বাস্তবিকই স্বপ্নপুরী। যুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে কত যে ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান আছে, তাহা এখনও আমাদের অনেকেরই অজ্ঞাত।

ইতিহাসের স্মৃতি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি-এ

ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়েছিনু কবে,
সব কথা প্রায় আমি ভুলে গেছি তার ;
কিন্তু বুকে আঁকা আছে, চিরদিন র'বে
গোপনে নিহত দুটী সে রাজকুমার।

২

কোন সে সুদূর দেশে, কোন দূর যুগে,
নির্ম্মম নৃশংস কাণ্ড হলো অনুষ্ঠিত,
শুধু দুটী কচি মুখ জাগে মোর বুকে,
বিশাল ইংলণ্ড হয় কোথা অন্তর্হিত !

৩

ভারতের ইতিহাসও ভুলিয়াছি হায়,
ধ্বংস হলো কত রাজ্য, এলো কত জাত,
অশ্রু-সাগরের নীরে সবি ডুবে যায়
জাগে মাত্র একমাত্র তীর্থ সোমনাথ।

৪

মন্দির ভাঙার কথা নূতন ত নয়,
চিতোরের ধ্বংস নয় কম শোকাবহ,
কেন তারি লাগি মোর বুকে শুধু রয়
চিরদিন সমভাবে ব্যথা দুর্ব্বিসহ।

৫

আরবের কারবালা কি মহাশ্মশান,
মন মোর ঘুরে ফেরে 'ফোরাতে'র তীরে,
চারি দিকে শুনি রব হোসেন হাসান
সব নীর হারা হয় মোর আঁখি-নীরে।

৬

বুঝিতে পারিনে আমি কোন্‌টা যে বড়,
তিনটীই সমভাবে টানে মোর মন,
প্রেম নয় তবু দেখি এ কেমনতর—
বেদনা করিয়া দেয় জগৎ আপন।

গল্প

অসমাপ্ত

শ্রী রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বি-এ

'ওগো, হচ্ছে কি এতো রাত্তিরে ? এসো না ! শুন্‌চো, শীলা ?'

'আঃ—জ্বালিয়ো না বাপু !'

'ক্যানো জ্বালাবো না ? তোমাকে বে' করেছিলুম কি Publisherরা exploit করবে ব'লে ?—জবাব দাও না যে !'

'কি বকর-বকর করচো ! খুকুর ঘুম ভাঙালে ভালো হবে না ব'লে দিচ্ছি ।'

'একশো বার জাগাবো । এই তো চিম্‌টি কাটলুম, কাঁদ্‌ রে খুকু !'

'কাঁদুক্‌ না, মরে গেলেও আমি ধরবো না ।'

'এঃ, ধরবে না—চালাকি ! খুকুমণি কাঁদবে আর উনি লিখবেন গপ্পো ! ভারী ইয়ে কি না ! এঃ—আবার চাল হয়েচে—কথার জবাব দে'য়া হয় না ! দুঃতোর ছাই—কাঁদেও না মেয়েটা—'

'হচ্ছে কি, শুনি ? নাঃ—জ্বালালে, বাপু, তোমার জন্যে যদি দু মিনিট কেউ লিখতে পারে !'

'পারবেই তো না ! রাত জেগে লেখা ! ভারী একেবারে—হ্যাঁ ! যদি অসুখ করে, তোমার মেয়ে দেখবে কে ?'

'থামো, বাপু, আমি রাত জেগে লিখলেই অসুখ করবে—আর নিজে যখন সারা রাত জেগে লেখেন তখন আর অসুখ হ'তে জানে না ! দেখবো এবার থেকে আমিও—ক' পাতা লিখতে পারো ! স্বার্থপর কোথাকার ! আমার সুনাম সইতে পারেন না কি-না ; বুঝি নে কিছু !'

'অতো বেশি বুঝেই তো ওই দশা ! এখন আলোটা নিবোও লক্ষ্মীটি ; ঘুম আসচে না,—তারপর তুমি যতো পারো লিখো !'

'বেশ—হ'লো তো ! আমি চললুম লাইব্রেরীতে, আজ রাত্তিরে আর ওপরে আসচিনে—'

'কে আসতে বলেচে, যেনো উনি না থাকলে আমার ঘুম হবে না আর কি ! যাও না—আমি খুকুকে নিয়ে দিব্যি ঘুমোবো'খন ।'

'বেশ, যাচ্ছি—চেঁচিয়ে ম'লেও সাড়া দোবো না !'

'না দিলে—'

'আচ্ছা, দেখবো—চললুম কিন্তু—'

'তোমার মেয়ে নিয়ে যাও বাপু, কাঁদলে আমি ধরতে পারবো না ; আমার ব'য়ে গেছে কি-না ।'

'বেশ নিয়ে যাচ্ছি, চল্‌ রে খুকু—'

'ভালো হবে না, শীলা ! আমি একা থাকবো বুঝি ?'

'বাঃ রে, এই যে খুকুকে নিয়ে যেতে বললে ?'

'খুকুর মা'কে তো আর যেতে বলিনি !'

'বলো নি ?

'উঁহুঁ—'

'মিথ্যুক কোথাকার !'

'পতি পরম গুরু গালাগাল দিও না, শীলা !'

'এঃ—ভারী আমার ইয়ে ! গুরু না গোরু !'

'হে পরম দয়ালু যীশু, তুমি এই নির্ব্বোধিনীকে ক্ষমা করিয়ো, এ জানে না কাহাকে কি সম্বোধন করিতেছে ! আমেন্‌ !'

'হে পরম কারুণিক, ঈশ্বরের একজাত পুত্র, তুমি ইহার ধৃষ্টতার কারণ ইহাকে মার্জ্জনা করিও—আমেন্‌ !

—'ওঃ - কী ভুল করেচি সীতাকে বিয়ে না করে ! সেদিনও আমার সঙ্গে বটানিক্‌স্‌এ দেখা ! কিছুতেই ছাড়লে না, বাড়ী নিয়ে গিয়ে ন' কাপ চা খাওয়ালে, গান শোনালে—'

'ওঃ—সেদিনও অরুণদা আমায় চিঠি লিখেচেন ! কি চমৎকার চিঠি লেখেন ! চিঠিগুলো ছাপাবো । আমাকে X'masএ কাশ্মীর যেতে লিখেচেন । যাবো এবার—নিশ্চয় যাবো । ক্যানো যাবো না ? আলবৎ যাবো ; কে

আট্‌কাবে? যাবোই তো—ইঃ—কাশি, দেখো না! থাইসিস্ হয়েচে নাকি সীতার কথা ভেবে ভেবে? আরো হোক্—হবে না? বটানিক্‌স্‌এ Romance চলচে আমায় না জানিয়ে! আর রাতদিন চা—হবে না, বাপু? এই যে এতো নিষেধ করি—ওকি! ওমা—কি করচো!! ও খুকু—ওগো, অমন ক'চ্ছো ক্যানো?—'

'শীলা—বুঝি তোমার কথাই ঠিক, থাইসিস্‌ই বটে···'

'ওগো, ব'লো না অমন ক'রে—তোমার পায়ে পড়ি—'

'আরো শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরো, শীলা—ভয় করচে!'

'ওমা—কি হবে! ও খুকু—ওগো, রামসিংকে পাঠাবো ডাক্তারবাবুর কাছে?'

'না—না—ডাক্তার কি করবে? শুধু তুমি···আঃ—এমনি ক'রে যদি মরি, তোমার বুকে—আঃ! হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ—কেমন জব্দ!'

'যাঃও—বড্ডো ভয় লাগিয়ে দিছলে তুমি!'

'সত্যি—বুক টিপ্-টিপ্ করচে তো এখনো!'

'না! না, ছাড়ো, যা-ও—ভারী ইয়ে!'

'সেই জন্যেই তো বিয়ে!'

'অভদ্র কোথাকার!'

'একশো বার; উঁ-হুঁ, ছাড়বো না তো!'

'না গো, পায়ে পড়ি—দেখো, আমার গল্পোটা শেষ করতেই হবে, নইলে মান থাকবে না—'

'না থাকলো; মান চাইনে, মন চাই! কি সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে চাঁদের আলোয়—হাস্নুহানার গন্ধ পাচ্ছো! না-না, চুপ্ করো, শীলা—

'For Heaven's sake, hold thy tongue,
and let me love···'

'ওঃ—ধার-করা কবিতা আওড়াতে সবাই পারে।'

'আলবৎ পারে; কিন্তু—এটা পারে?'

'যাঃও!'

'কোথায় যাবো?'

'সীতার কাছে—'

'দুঃৎ—তুমি আজ কি লিখছিলে, শীলা?'

'গল্প।'

'কি গল্প?'

'ব'লবো না—'

'তবে আমিও ছাড়বো না, সারারাত ধ'রে রাখবো।'

'ব'য়ে গেলো—'

'নাঃ—শীলা, যাও, লেখাটা শেষ করো আলো জেলে—'

'উঁ হুঁ—আমার ঘুম পাচ্ছে—'

'ইঃ—পেলেই হ'লো!'

'তবে—একটা গল্প বলো!'

'তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, শীলা!'

'বাঃ রে খুকুর মা হ'য়েই আমি বুড়ী হলুম নাকি?'

'কাজ নেই বুড়ী হ'য়ে, আমিও তাহ'লে বুড়ো হ'য়ে যাবো। দ্যাখো, শী—'

'কি বল্‌চো?'

'না, থাক্—'

'বলো না গো—'

'আচ্ছা, শীলা—আগেকার দিনগুলো তোমার মনে পড়ে?'

'পড়ে না আবার! তুমি আমায় কম জ্বালিয়েচো!'

'কিন্তু দোষ তোমার ছিলো, শীলা! আমার একটা চিঠির জবাবও তুমি দিতে না। যা-ও দিতে—দু-চার লাইন। suicide যে করিনি—'

'কি লিখবো বলো? তুমি লিখতে কবিতা, বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে পারতুম না ভয়ে, পাছে—তোমার কবিতা প'ড়ে তারা তোমার প্রেমে পড়ে যায়—'

'ওঃ—হৃদয় স্থির হও—'

'এই?—আমি তখন ফিলজফির নোট্ মুখস্ত ক'রে কূল পাইনে। বাংলায় জ্ঞানও ছিলো অগাধ; ম্যাট্রিকে চল্লিশ পেয়ে পাশ। তবু—তোমার সঙ্গে টেক্কা দে'য়ার জন্যে দশবার ক'রে মস্তো লম্বা চিঠি draft করি আর ছিঁড়ি। প'ড়ে আর পাঠাতে সাহস হয় না; নিরুপায় হ'য়ে ওই চার লাইন লিখতুম—ভালো আছি। তুমি কবে ফিরবে? নতুন বই বেরুলেই আমাকে পাঠিয়ো। মন দিয়ে পড়চি—এই সব লিখতুম। বহু কষ্টে একদিন একটা কাব্যি ক'রে চিঠি খাড়া করলুম, পড়লুম দিদির হাতে ধরা, ব্যস্—আর যাই কোথা! সেই থেকে চিঠি আর লিখতুম না। তোমার দশ পাতা চিঠি কিন্তু কামাই হ'তো না!'

'দশ পাতা? অতো কি লিখতুম গো?'

'ছাই ভস্ম! সব গাদা করা ছিলো এতোকাল, মাস

আষ্টেক ধ'রে রাত্তিরে সেগুলো পুড়িয়ে খুকুর দুধ গরম করচি, ফুরোয় না—'

'অ্যাঁ! আমার সেই সব বুক-ভাঙা চিঠি পুড়িয়ে ফেলচো? হায়—হায় রে! আমি দিব্বি সেগুলো দু' বছর ব'সে এক-এক ক'রে সীতার কাছে পাঠাতুম, না হয় ছোটো শালীটাকে—লায়েক হ'য়ে উঠেচে—'

'Moral wreck! Debauch কোথাকার!'

'আর তোমার চিঠিগুলো?'

'আমার চিঠি? আমি কা'কে কবে লিখিচি!'

'ক্যানো, তোমার অরুণদার কাছে; সেগুলোতে কি থাকতো, লীলা? Hygeineএর essay? না Ethics?'

'মিছে কথা!'

'মিছে কথা?'

'Sure!'

'দেখাবো?'

'যদি পারো।'

'থাকগে; আমার দায় পড়েচে!'

'পারলে তো!'

'আচ্ছা দেখাচ্ছি, কাছে এসো—'

'উঁ-হুঁ—'

'তবে যাও।'

'যাবো না তো! শোবো; আমার ঘুম পেয়েচে।'

'তবে ঘুমোও।'

'নাঃ—হ্যাঁগা, বল্‌লে না শেষ করি কি ক'রে গল্পটা?'

'বাঃ রে—আমায় মোটে বল্‌লে না, আমি কি ক'রে বলবো?'

'না—সত্যি বলো—'

'Hero কে?'

'অচলেশ—'

'চুরি।'

'হলেই বা—'

'আই, সি, এস্, বুঝি?'

'উঁহুঁ, হ'লো না; আর্টিষ্ট্।'

'সর্ব্বনাশ,—শান্তিনিকেতনে পাঠাওনি তো!'

'না—কাঁতনে তাল্ টুরে পাঠিয়েচি; প্যারী ঘুরেচে—এখন ইতালী—'

'বেশ করেচো, দূরেই ভালো; আর heroine?'

'দীপালিকা—'

'মন্দ নয়, লোভ হচ্ছে; দুরস্তিকা হ'লে আরো ভালো হ'তো। যবনিকার Editor বুঝি?'

'উঁহুঁ, Loretoর মেয়ে; এখন ঘরে ব'সে tremendously study করচে।'

'কি পড়াচ্ছো আজকাল?'

'Shaw শেষ করিয়ে D. H. Lawrence ধরিয়েচি।'

'ভালো করো নি। তার পর?'

'তার পর—তুমি বলো।'

'Fantasia of the Unc nscious পড়িয়েচো?'

'হুঁ—কবে—'

'ফ্রয়েড্?'

'হ্যাঁ—'

'তবে থিসিস্ লেখাও।'

'পারবে না।'

'অচ্ছা, স্কুল মিষ্ট্রেস্ ক'রে দাও। কালীঘাট—শ্যামবাজার Monthly থাকবে, একদিন আনতে ভুল ক'রে হঠাৎ একটা অসভ্য Conductorএর হাতে অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়বে—এমনি সময় Versityর একটা brilliant scholar situationটা save করে ওঁর বাড়ী চা খেতে যাবে; সেখানে ওর সঙ্গে দেখা Briefless Barrister, Some Rayর সঙ্গে, চলুক dnel—'

'দুঃৎ! haggard!'

'পরোয়া নেহি, একটা মেয়ের টুশান্ নিয়ে তাদের বাড়ীতে পাঠাও, রোজ সন্ধ্যে-বেলা; দুষ্টুমি ক'রে মেয়েটা একদিন নিয়ে যাক্—দাদার চারতলার garretএ। সেখানে তার দাদা anthropologyতে first class first!'

'উঁহুঁ—ওসব চলবে না, অবস্থা খুব ভালো—'

'O. K. Sociology ঢুকিয়ে দাও—'

'জমবে না, dry!'

'তা হ'লে Pathos চালাও—টি, বি—'

'তা-ও হয় না, রীতিমতো athlete।'

'ভালোই তো, Airএ পাঠাও—না—না, cinemaয় পাঠাও—cinemaয়—জোয়ান্ বাংলা ছুটুক ওর পেছনে।'

'বিপদ ঘটবে, বুড়ো বাপ রয়েছেন—'

'তা হ'লে—তা হ'লে—the idea! মোটরে ওকে পাঠাও বহু দূরে—ওর পেট্রোল্ যাক্ ফুরিয়ে, না হয় গোরুর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা লেগে এঞ্জিন যাক বিগ্‌ড়ে, তার পর—মোটর ছেড়ে দিয়ে ও একা বেরিয়ে পড়ুক পথের ডাকে; হঠাৎ দেখা হোক্ একটা বিশ্ব-বেদের সঙ্গে; হিমালয়ের একটা Unexploited রাজ্যে চলুক ওদের Primitive Romance!'

'Abnormal!'

'কুছ পরোয়া নেই—একেবারে sub-normal ক'রে দাও! আনো একটা নিপুণ দন্ত-পুং, চা'র সঙ্গে চলুক ওদের Sexologyর আলাপ—'

'উঁ হুঁ, ঘোরতর man-hater!'

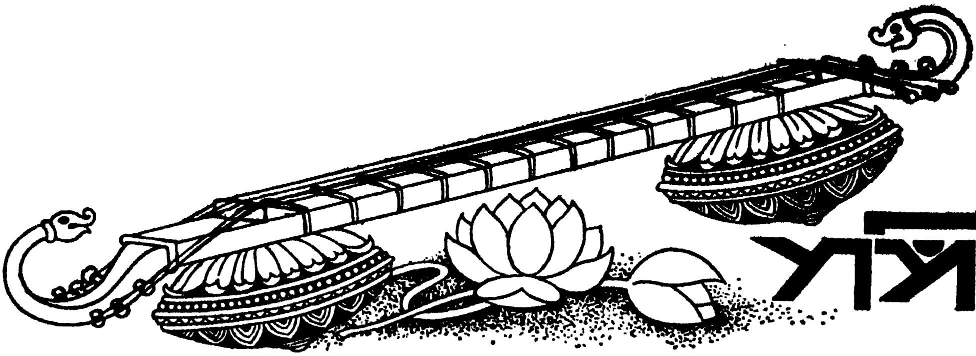
'তবে যে বল্‌লে, heroকে পাঠিয়েচো ইতালী!'

'সে হচ্ছে calf-loveএর hero—'

'বেশ তো, তাকেই ফিরিয়ে আনো।'

'এতো শীগ্‌গির?'

'তবে ঘুমোও'…



সঙ্গীত

কথা, সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

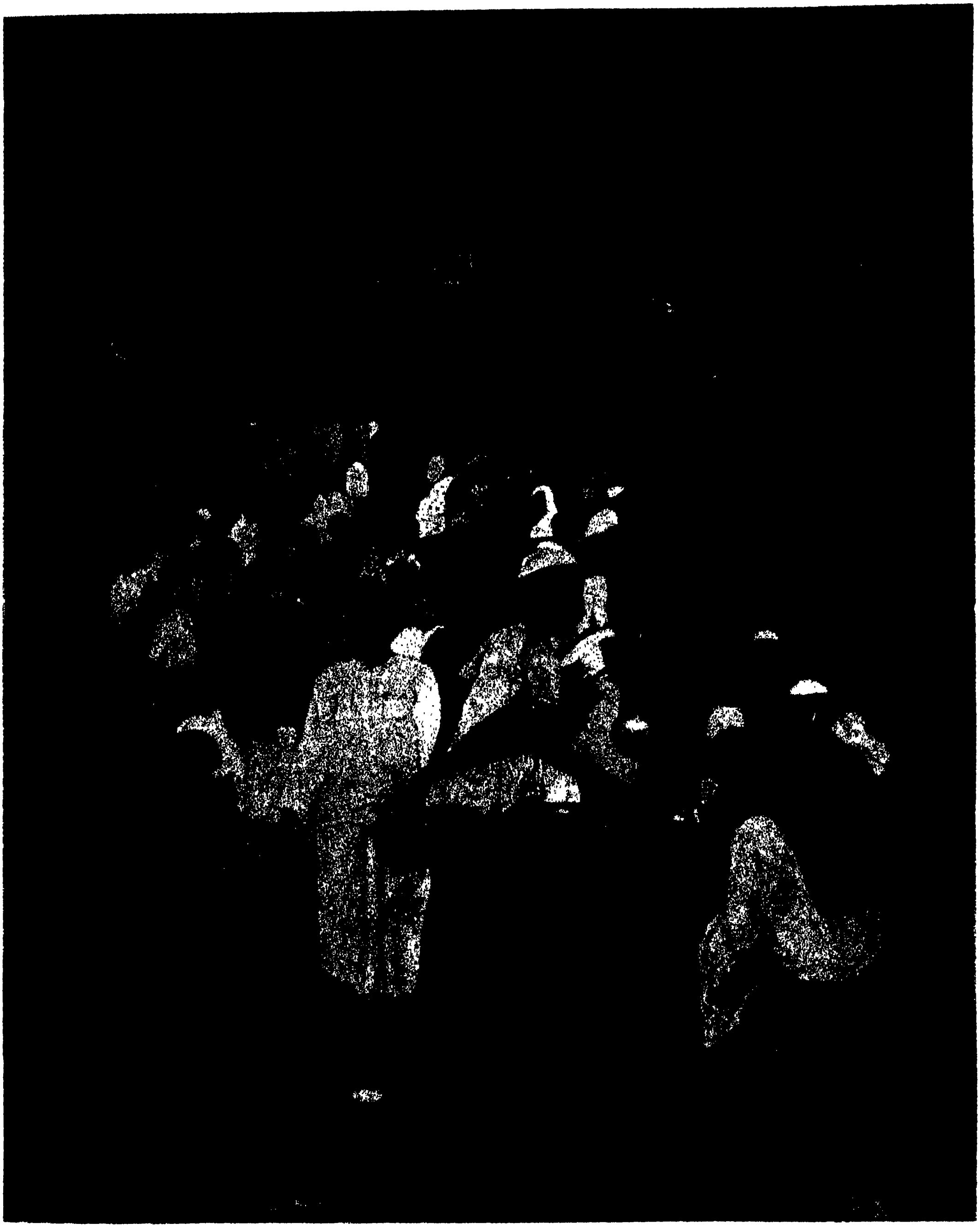
গান

ওকে   যায় বাজায়ে বাঁশী
নিতি মোর দুয়ারে।
তার   বাঁশরীর সুরে মনে হয় সখি
যেন চিনি আমি তারে॥
অন্তরে তার কি ব্যথা-গান—
ভরিয়াছে সুরে বাঁশরীর প্রাণ;
যেন   তার কোন হারানিধি খুঁজি'
ফিরিছে সে দ্বারে দ্বারে॥
তারে   ডেকে আন সখি আমার এ ঘরে
যদি সে খুঁজিতে চায়—
তার হারা-চাঁদে,—আজি মধু রাতে
যদি সে ফিরিয়া পায়।
যা' কিছু আমার সকলি তাহার
বহিতে যে নারি একেলা এ-ভার;
সখি,   বারেক আসিতে মোর আঙিনাতে
ব'লো তারে বারে বারে॥

+ ৩
সা রা | রপা -া -া | -া -া পা
ও কে যা • য়্ • • বা

১ ২ ৩
II { পা ধা পমা | পা -ধা -র্সণা | -ধণধা -পা গা | মা মধা পা I
জা য়ে বাঁ শী • •• ••• • নি তি মো র

১ + ৩
I মা জ্ঞা রা | -া (সা রা | রপা -া -া | -া -া পা) } I
দু য়া রে • ও কে যা • য়্ • • বা



বাজার

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

২ ৩
I রজ্ঞা -মপা | মরা মা জ্ঞা | -রজ্ঞরা সা সা I
তা০ ০র্ বাঁ শ রী ০র্ সু রে

০ ১ ২ ৩
I ধ্া ণ্া সরা | -গমা মা মা | মা ধা ধা | ধা ণা র্সা I
ম নে হ০ ০য়্ স খি যে ন চি নি আ মি

I ধণা -ধণা ণদা | -পদপমা রা জ্ঞা | জ্ঞপা -া -া | -া -া পা II
তা০ ০০ রে ০০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

০
[পা -ণণা পা] ১ ২ ৩
II { পা -া পা | মা গমা -গমা | পা না না | নর্সা -া -া I
অ ন্ ত রে তা০ ০র্ কি ব্য থা গা ০ ন্

I র্সা র্সর্রা র্রর্মা | র্জ্ঞর্রা র্সা র্সা | না র্সা নর্সা | র্রর্সা সণা -ধণধপা } I
ভ রি০ য়া০ ছে০ সু রে বাঁ শ রী০ ০র্ প্রা ০০ণ্

I পা পর্রা র্রা | -র্সা র্সর্রা -া | র্সনা র্সা ণা | ধণধা পা পা I
যে ন তা র্ কো ন্ হা রা নি ধি০ খুঁ জি

I মগা মা জ্ঞা | রা সন্া সা | সরা -মপা -ধর্সা | ণধা -পমা -গমা I
ফি রি ছে সে দ্বা০ রে দ্বা০ ০০ ০০ রে০ ০০ ০০

I পা মজ্ঞা রা | -া সা রা | রপা -া -া | -া -া পা II
দু য়া রে ০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

শেয়র্* II সনা সা রা জ্ঞা রা -মজ্ঞা | -মজ্ঞা -মজ্ঞা -রজ্ঞা রা সা -া |
তা০ রে ডে কে আ ০ ০ ০ ০ন্ স খি ০

| সা সরা -সরজ্ঞা -রজ্ঞরা -সণ্া -ধ্ণ্সা | মা মা মা মা -া -া |
আ মা ০০০ ০০০ ০০ ০০০ র্ এ ঘ রে ০ ০

| মধা ধা ধা পা ধা পধণা | -পধা -র্সা র্রর্সা ণা -ধণধা -পমা |
য দি সে খুঁ জি তে০০ ০০ ০ ০ চা ০০০ ০য়্

৬

| মপা -ধা পমা পা মজ্ঞা রা | -া -া -া -া । । |
তা০ য় হা রা চাঁ দে ০ ০ ০ ০ ০ ০

| সা সর্সা র্সা র্সা র্সর্রা র্সর্রা | -র্সর্রর্সা -ণা -া -ধণধা -পা -মা |
আ জি০ ম ধু রা০ তে০ ০০০ ০ ০ ০০০

| মা মা রমপধা পমা মজ্ঞা জ্ঞা | রজ্ঞা -রজ্ঞা -মা সা -া -া |
য দি সে০০ ফি রি য়া পা০ ০০ ০ য়্ ০ ০

[পা ণণা পা] ১ ২ ৩
তালে :—I { পা পা পা | মা গমা -গমা | পা না নর্সা | র্সা র্সা -া I
যা কি ছু আ মা০ ০র্ স ক লি০ তা হা র্

I র্সা র্সর্রা র্রর্মা | জ্ঞর্রা র্সা র্সা | না র্সা নর্সর্রা | নর্সা র্সণা -ধণধপা } I
ব হি০ তে০ যে০ না রি এ কে লা০০ এ০ ভা ০০র্

I পা পর্রা র্রা | র্সা র্রা র্সা | নর্সা -নর্সা ণা | ধা পা পা I
বা রে ক আ ঙি তে মো০ ০র্ আ ঙি না তে

I মগা মা জ্ঞা | রা সন্া সা | সরা -মপা -ধর্সা | ণধা -পমা -গমা I
ব' লো তা রে বা০ রে বা০ ০০ ০০ রে০ ০০ ০০

I পা মজ্ঞা রা | -া সা রা | রপা -া -া | -া -া পা II II
দু য়া রে ০ ও কে যা ০ য়্ ০ ০ বা

* "শেয়র্" গাহিবার সময় সঙ্গত বন্ধ রাখিয়া সুর টানিয়া টানিয়া গাহিতে হয়। এই নিমিত্ত "শেয়র্" অংশটুকুর স্বরগ্রাম একতালা ছন্দে ভাগ না করিয়া, গায়কের সুবিধার জন্য মোটামুটি সুরে ভাগ করিয়া দেওয়া হইল। —স্বরলিপিকার।



স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যে কথা বল্‌ব, যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করব, তা আমার পূর্ব্বে প্রকাশিত দুইটী প্রবন্ধে লিখিত সময়ের অনেক আগের কথা। সেই জন্যই প্রথমেই নিবেদন করেছিলাম যে, আমার এই সকল প্রবন্ধে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারব না। এবার আমি যাঁর কথা বলব, তিনি বাঙ্গালী জাতির পরম পূজনীয় স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পবিত্র জীবন-কথা বিবৃত করার জন্য আমি আমার দুর্ব্বল লেখনী ধারণ করি নাই। যে সাধনার বল থাকলে, যে শক্তি সামর্থ্য থাক্‌লে গুরুস্থানীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌরবোজ্জ্বল, মহনীয় জীবন-কথা কথঞ্চিৎও বলা সম্ভবপর হয়, সে সাধনা, সে শক্তি-সামর্থ্য আমার নাই। আমি সে অসাধ্য-সাধন করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করছি নে। আমি বহুদিন পূর্ব্বের একটী ঘটনার কথা বল্‌ব; এবং সে ঘটনার নায়ক স্বর্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।

পূজনীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার কবে, কোথায়, কি অবস্থায় হয়েছিল, সেই কথাটাই এতকাল পরে—সুদীর্ঘ প্রায় ৬৫ বৎসর পরে আপনাদের কাছে নিবেদন করতে চাই।

পূর্ব্বেই বলেছি, সে অনেক দিন আগের কথা। আমি তখন আমাদের গ্রামের (নদীয়া জেলার কুমারখালী) বাঙ্গালা স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। সাল, তারিখ আমি ঠিক বল্‌তে পারব না; মনে হচ্চে সে হয় ত ইংরাজী ১৮৭০ কি ১৮৭১ অব্দ। তখন আমার বয়স এই এগার বারো বৎসর।

আমাদের গ্রামে বহুদিন পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত একটা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল এবং এখনও আছে। সেই সুবৃহৎ বিদ্যালয়-গৃহের একটী প্রকোষ্ঠে আমাদের বঙ্গ-বিদ্যালয় ছিল। দুই বিদ্যালয়ের কর্ত্তা একজনই ছিলেন। এই বঙ্গ-বিদ্যালয় যিনি প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁর নাম পরলোকগত হরিনাথ মজুমদার; তিনি "কাঙ্গাল হরিনাথ" নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। সে সময়ে তাঁর প্রণীত "বিজয়-বসন্ত" উপন্যাস পড়ে কেহই অশ্রুসংবরণ করতে পারতেন না; পরবর্ত্তী কালে তাঁর বাউলের গানে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ একেবারে প্লাবিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথা আমার 'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থে বলেছি; পারি ত পরে আরও বল্‌ব।

আমি যখন বঙ্গ-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীতে পড়ি, সেই সময় একদিন শুন্‌তে পেলাম যে, বিদ্যালয়সমূহের ইন্‌স্পেক্টর ভূদেববাবু দুই-একদিনের মধ্যে আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আস্‌ছেন। স্কুলের শিক্ষকগণ, ছাত্রগণ এবং গ্রামের ভদ্রলোক সকলে একেবারে মহা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। কেমন ভাবে তাঁকে অভ্যর্থনা করা হবে, তারই আলোচনা হ'তে লাগল। পাড়াগাঁয়ের স্কুল দেখবার জন্য ইন্‌স্পেক্টরের আগমন, সে ইন্‌স্পেক্টরও আবার যে-কেউ নহেন, বাঙ্গালীর গৌরব ভূদেববাবু; সুতরাং গ্রামের লোক যে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তার আর কথা কি?

আমাদের সেই স্কুলের সীমানার প্রান্ত থেকে আমাদের গ্রামের তলবাহিনী গৌরী নদী এখন অনেকদূর সরে গিয়েছে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন নদীর ঠিক উপরেই আমাদের স্কুল ছিল। শুনতে পাওয়া গেল যে, ভূদেববাবু কুষ্টিয়া থেকে নৌকাযোগে আসবেন, যদিও তখন আমাদের গ্রামের উপর দিয়ে রেলপথ গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত গিয়েছিল।

স্কুলের সম্মুখে, যেখানে তিনি নৌকা থেকে নামবেন, সেখানে এক প্রকাণ্ড তোরণ নির্ম্মিত হোলো, নানা রঙ্গের পতাকা ও পত্র-পুষ্পে তোরণ শোভিত হোলো, ঘাট থেকে স্কুলের বারান্দা পর্য্যন্ত লাল কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হলো। দুই দিন আর ছাত্র, শিক্ষক ও গ্রামের লোকের অন্য কাজের অবকাশ রইল না। আমি তখন এগার বারো বছরের, আমি এই সমারোহ ব্যাপারের জন্য কত দেবদারু পাতা যে টেনে আনলাম, কত বাঁশ যে কাঁধে করে বইলাম, বড় ছেলেদের হুকুম তামিল করবার জন্য কত যে দৌড়াদৌড়ি করলাম, তা আর বলতে পারিনে।

আমাদের উৎসাহ দেখে কে? এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই সুদূর-অতীতের দৃশ্য আমি চোখের সম্মুখে দেখতে পাচ্ছি।

নির্দ্দিষ্ট দিন এসে পড়ল। পূর্ব্বদিনই আমাদের গ্রাম থেকে একখানি সুসজ্জিত পান্‌সী নৌকা কুষ্টিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। যেদিন ভূদেববাবু আস্‌বেন, সেদিন সকল ছাত্রকে ভাল কাপড়-চোপড় পরে আসবার জন্য মাষ্টার মহাশয়েরা আদেশ দিয়েছিলেন। যে সকল ছাত্রের অবস্থা ভাল, এমন কি যারা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, তারাও ভাল কাপড় পরে এসেছিল। আমি পিতৃহীন; অতি দীন দরিদ্রের ছেলে আমি। আমি ভাল কাপড় কোথায় পাব? আমি আমার মলিন ছেঁড়া কাপড় এবং ততোধিক মলিন একখানি ছোট চাদর গায়ে দিয়ে যথাসময়ে স্কুলে গেলাম; প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, জুতা জামা পরিধানের ভাগ্য আমার হয় নি।

যাক্‌ সে কথা। যখন দূরে নিশান-শোভিত পান্‌সী দেখতে পাওয়া গেল, তখন শিক্ষকমহাশয়েরা সেই লাল কাপড় মণ্ডিত পথের দুই পার্শ্বে ছাত্রগণকে সারিবন্দী ভাবে দাঁড় করাতে আরম্ভ করলেন। যাদের বসন-ভূষণ ভাল, তাদেরই দুই পার্শ্বে প্রথম সারিতে দাঁড় করাইয়া দিলেন। তাদের পিছনে দ্বিতীয় সারি। আমি মলিন বস্ত্র-পরিহিত দরিদ্রের ছেলে, আমার স্থান হোলো সকলের শেষ সারিতে। এই রকমই আবহমানকাল হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ হয়নি, কিন্তু সেই সকলের পিছনের সারি থেকে তখন যে ভূদেববাবুকে মোটেই দেখতে পেলাম না, এ কষ্টের কথা আমার এখনও মনে আছে।

যথাসময়ে ভূদেববাবু নৌকা থেকে নামলেন, স্কুলের কর্ত্তারা এবং গ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে, ঘিরে ধরে স্কুলের মধ্যে নিয়ে গেলেন। যাঁরা তাঁর দর্শনলাভ করলেন, তাঁরা করযোড়ে প্রণাম করলেন; আমিও শিক্ষক মহাশয়গণের আদেশমত পিছন থেকেই করযোড়ে প্রণাম করলাম। কাকে যে প্রণাম করলাম, দেখতেও পেলাম না। তারপর আমরা ধীরে ধীরে স্কুলের মধ্যে গিয়ে নিজ নিজ আসনে বস্‌লাম। তখন বেলা এগারটা।

বারোটা বেজে গেল, একটাও বেজে গেল—ভূদেববাবু ইংরাজী স্কুলই পরিদর্শন করছেন, আর আমরা বাঙ্গালা স্কুলের ছাত্রেরা দুয়ারের দিক চেয়ে বসে আছি। বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই, চুপ করে বসে থাকতে হবে। আমাদের পণ্ডিত মহাশয়েরা নিম্নস্বরে বলাবলি করতে লাগলেন, ভূদেববাবু হয় ত বাঙ্গালা স্কুল দেখতে আসবেন না, আড়াইটার সময় নৌকায় উঠবেন। শুনে মনে বড়ই কষ্ট হোলো। এই দুইদিন ধরে যাঁর জন্য বাগানে বাগানে ঘুরে দেবদারু পাতা ও ফুল সংগ্রহ করেছি, বড় বড় ছাত্রদের হুকুম মত বাঁশ টেনেছি, দড়ি এগিয়ে দিয়েছি, তাঁকে একবার দেখবার সৌভাগ্যও আমাদের হবে না?

ভগবান আমাদের কাতর আবেদন শুনেছিলেন। দেড়টার পর পণ্ডিত মহাশয়েরা ব'লে উঠলেন "সব ঠিক হয়ে বোসো, ভূদেববাবু আসছেন। তিনি এলেই সবাই দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে ভুলো না।"

একটু পরেই কাঙ্গাল হরিনাথকে অগ্রবর্ত্তী করে ভূদেববাবু আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। হাঁ, মনে মনে যে ছবি এঁকে ফেলেছিলাম, তার থেকেও জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি! এমন সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন আমাদের পল্লীগ্রামে অতি কমই ঘটে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, যীশুখৃষ্টের ছবির মত চেহারা কাঙ্গাল হরিনাথের পার্শ্বে অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি! এখনও সে দৃশ্য মনে আছে।

ভূদেববাবু প্রথম শ্রেণীতে এসে, আমরা কি কি বই পড়ি সেই কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তার পরই কাঙ্গাল হরিনাথ বললেন, "একটু আবৃত্তি শুনবেন না?" ভূদেববাবু বল্‌লেন "বেশ ত।"

আমি বাল্যকাল থেকেই কাঙ্গাল হরিনাথের ভক্ত ছিলাম। তিনি আমাকে বড়ই ভালবাসতেন। তাঁরই আদেশে, আমি যখন যে কবিতার বই পেয়েছি, তার আগাগোড়া মুখস্থ করে ফেলেছি। বহুদিন পর্য্যন্ত আমার এ অভ্যাস ছিল; ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা যে কত কণ্ঠস্থ করেছিলাম, তার হিসাব দিতে পারিনে; অথচ, আমি হলফ করে বল্‌তে পারি, এই সুদীর্ঘ জীবনে আমি কোনদিন দুই লাইন কবিতাও লিখতে পারিনি।

থাক সে কথা। কাঙ্গাল হরিনাথ আমাকেই একটা কবিতা আবৃত্তি করতে বল্‌লেন। এই কালো চেহারা, মলিন বস্ত্র-পরিহিত, পায়ে জুতা গায়ে জামা নেই, এমনই একটী ছেলেকে আবৃত্তি করবার জন্য অগ্রসর হ'তে দেখে ভূদেব বাবু কি মনে করেছিলেন বল্‌তে পারিনে।

কাঙ্গাল হরিনাথের আদেশ পেয়ে আমি দাঁড়িয়ে হাত যোড় করে আবৃত্তি করলাম। আমাদের সময়ে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্য ছিল পরলোকগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত 'মিত্রবিলাপ কাব্য'। আমি একটুও না ভেবেচিন্তে সেই কাব্য থেকে আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলাম। এখন তার সবটা বল্‌তে পারব না, কয়েক লাইন মনে আছে। তা এই—

"কেন স্মৃতি দেখাইছ সে স্বপন আর।
সে আনন্দ পড়ে মনে,
দেখি হায়, পরক্ষণে,
সকলি আঁধার।
প্রস্ফুটিত প্রায় যবে ফুল
করে দিক্ সৌরভে আকুল,
সহসা করাল কাল করিল সংহার।"

কিসে কি হোলো বুঝতে পারলাম না। আমার ঐ আবৃত্তি শুনে মহাত্মা ভূদেবের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো। তিনি যে ইন্‌স্পেক্টর, তিনি যে দেশমান্য, বরেণ্য, ব্রাহ্মণ-কুলতিলক ভূদেব বাবু, সে কথা ভুলে গেলেন—তিনি অগ্রসর হয়ে এই মলিনবস্ত্র-পরিহিত, নগ্নগাত্র, নগ্নপদ কায়স্থ কিশোরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। একটী কথাও তাঁর মুখ দিয়ে তখন বের হ'লো না।

একটু পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর পণ্ডিত মহাশয়কে একটা দোয়াত কলম আনতে বললেন। তাঁর হাতে একখানি বড় বাঁধানো বই ছিল। সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা খুলে কি লিখলেন। তারপর সেই বইখানি আমার হাতে দিয়ে বল্‌লেন "জলধর, আমার কাছে আর বই নেই, তাই এই-খানিই তোমাকে দিলাম। আমার আশীর্ব্বাদ।" আমি তখন নতজানু হ'য়ে 'ভূদেব' ভূদেববাবুর পায়ের ধুলা নিলাম। তার পরই তিনি সকলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর চলে যাওয়া আর দেখতে পেলাম না—আমরা তখন স্কুল ঘরের মধ্যে আটক।

ভূদেববাবু আমাকে আশীর্ব্বাদ করে যে বইখানি দিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানি ইংরাজি বই। তার নাম "Spectator" তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিল—

কল্যাণবর
শ্রীমান্ জলধর সেনকে
স্নেহাশীর্ব্বাদ
শ্রীভূদেব দেবশর্ম্মণঃ

সে বইখানি আমি কৃপণের অমূল্য রত্নের মত বহুদিন রক্ষা করেছিলাম, গর্ব্বভরে কতজনকে সে বই দেখিয়েছি। তারপর যখন আমি হিমালয়ে চ'লে যাই, তখন একখানি নেকড়ায় বেঁধে আমার জ্যেঠাইমার পুরাতন কাঠের সিন্দুকে সেখানি রেখে যাই। অনেকদিন পরে ফিরে এসে বইখানি বার করে দেখি, বই আর নেই—পোকায় কেটে তাকে একেবারে শেষ করেছে। বইখানি থাক্‌লে আজ আমি পরম গর্ব্বভরে আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার সকলকে দেখাতাম। আমার দুরদৃষ্ট!

তার কয়েক বৎসর পরে আমি পূজনীয় ভূদেববাবুর চরণ দর্শন করতে হুগলীতে তাঁর আবাসে গিয়েছিলাম। সে কথাটাও এখানে বলি।

আমি যখন জেনারেল এসেম্‌ব্লি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি। সেই সময় হুগলীর একটী ছেলে আমাদের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর নাম ভুলে গিয়েছি; তিনি যে চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী, তা আমার মনে আছে। তিনি প্রতিদিন বাড়ী থেকে এসে কলেজ করতেন।

একদিন কলেজে বসে কথাপ্রসঙ্গে ভূদেববাবুর নাম তিনি করলেন, বল্‌লেন হুগলীতে তাঁদের বাড়ীর অনতিদূরেই ভূদেববাবুর বাড়ী; তাঁয় সঙ্গে ভূদেববাবুর বাড়ীর সকলেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। তাঁর কথা শুনে আমার ইচ্ছা হোলো, তাঁর সঙ্গে গিয়ে একবার ভূদেববাবুর চরণ দর্শন করে আসি। বন্ধুকে বল্‌লাম, অনেক দিন আগে, যখন আমি দেশে বাঙ্গালা স্কুলে পড়তাম, তখন ভূদেববাবুকে দেখেছিলাম, তিনি আমাকে আশীর্ব্বাদ করেছিলেন, হয় ত চিন্‌তেও পারবেন। কি উপলক্ষে ভূদেববাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সে কথা আর বন্ধুকে বললাম না। তিনি বল্‌লেন "বেশ ত, এই শনিবারেই দুইটার পর আমার সঙ্গে হুগলী চল না। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আমি তোমার সাথে গঙ্গাপার হয়ে নৈহাটীতে তোমাকে রেলে তুলে দেব।"

আমি তাঁর সঙ্গে সেই ব্যবস্থাই করলাম এবং পরবর্ত্তী শনিবারে কলেজের ছুটীর পর তাঁর সঙ্গে হুগলী গেলাম।

নৈহাটীতে গাড়ী থেকে নেমে ঘাটে গিয়ে গঙ্গাপার হয়ে হুগলী উপস্থিত হলাম।

বন্ধু বল্‌লেন "চল, আগে ভূদেববাবুর বাড়ীতেই যাই ; তারপর আমাদের বাড়ীতে কিছু খেয়ে তোমাকে নৈহাটীতে রেখে আসব।" আমি হুগলী যাবার সময় আমার সেই 'অমূল্য রত্ন', ভূদেববাবুর দেওয়া 'Spectator' খানি একটা কাগজে মুড়ে সঙ্গে নিয়েছিলাম, সেইখানিই যে আমার পরিচয়-পত্র।

গঙ্গার উপরেই ভূদেববাবুর বাড়ী। তিনি তখন গঙ্গার দিকের একটা বারান্দায় একখানি চেয়ারে বসেছিলেন, সম্মুখে একটা টেবিলে কতকগুলি বই ও কাগজপত্র ছিল।

বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে বন্ধুকে বল্‌লাম "আমি এখানে দাঁড়াই, তুমি খবর নিয়ে এসো।"

বন্ধু বল্‌লেন "তার দরকার হবে না, এ বাড়ীতে আমার অবারিত-দ্বার। এ সময় তিনি কোথায় বসেন, তা আমি জানি। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

তাই কর্‌লাম। বাড়ীতে প্রবেশ করে গুটি দুই ঘর অতিক্রম করে গঙ্গার দিকের বারান্দায় গেলাম। ভূদেব-বাবু ফিরে চাইতেই আমি তাঁর সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলাম। আমার সঙ্গী বল্‌লেন "ইনি আমার সঙ্গে পড়েন। এঁর নাম জলধর সেন। ইনি আপনাকে দেখতে এসেছেন।"

ভূদেববাবু বল্‌লেন "বেশ, বেশ, বোসো।"

আমি বুঝতে পারলাম তিনি আমাকে চিন্‌তে পারেন নাই ; পারবার কথাও নয়। কত স্থানে কত লোক, কত স্কুলের ছেলেকে তিনি দেখেন, তাঁর কি আমার মত একটা পাড়াগেঁয়ে ছেলের কথা মনে থাকতে পারে ? এই কথা ভেবেই আমি অভিজ্ঞান-স্বরূপ, তাঁর দেওয়া বইখানি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। আমি তখন মোড়ক খুলে সেই বইখানির প্রথম পৃষ্ঠা মুক্ত করে তাঁর হাতে দিলাম। তিনি সেই লেখাটার দিকে চেয়েই তাড়াতাড়ি চেয়ার থেকে উঠে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্‌লেন, "তুমি সেই জলধর, এত বড় হয়েছ। আমি তোমায় চিন্‌তে পারি নি, মনে কিছু কোরো না বাবা ! কলেজে পড়ছ, বেশ, বেশ।"

আমার বন্ধু বল্‌লেন "জলধর স্কলারশিপ পেয়েছে।" আমি বল্‌লাম "সে আপনারই আশীর্ব্বাদে।" ভূদেববাবু হেসে বল্‌লেন "মা সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ বাবা !"

তখন তিনি চাকরদের ডেকে জলখাবার আন্‌তে বল্‌লেন। আমার দিকে চেয়ে বল্‌লেন "জলধর, মনে করে যখন এসেছ তখন আজ এখানেই থাক, কা'ল বিকেলে আমি লোক সঙ্গে দিয়ে তোমাকে কলকাতায় পৌঁছে দেব।"

আমি বল্‌লাম "আমি কলিকাতায় এক মহাজনের আড়তে থাকি, তাঁরা দয়া করে দুটো খেতে দেন। তাঁদের না ব'লে এসেছি। সন্ধ্যার পর আড়তে না গেলে তাঁরা ব্যস্ত হবেন।"

ভূদেববাবু বল্‌লেন "বলে এলেই পারতে। তা বেশ, জল খেয়েই আজ যাও। আর একদিন এসো এমনি এক রবিবার সুমুখে করে বুঝেছ।"

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। তারপর প্রচুর জলযোগ করে, সেই মহাত্মার পদধূলি ও আশীর্ব্বাদ মাথায় নিয়ে সেই দেব-নিকেতন থেকে বেরিয়ে এলাম। বেলা শেষ হয়েছিল, বন্ধু-গৃহে আর যাওয়া হোলো না। তিনি গঙ্গাপার হয়ে নৈহাটীতে আমাকে রেলে তুলে দিয়ে গেলেন।

তারপর আর ভূদেববাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয় নি, দেখা করতে যাই নি—পরীক্ষায় ফেল করে কোন্ মুখ নিয়ে তাঁর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াব।

এতকাল পরে সেই দেবপ্রতিম ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ মহাত্মার 'স্মৃতি-তর্পণ' করে কৃতার্থ হলাম। *

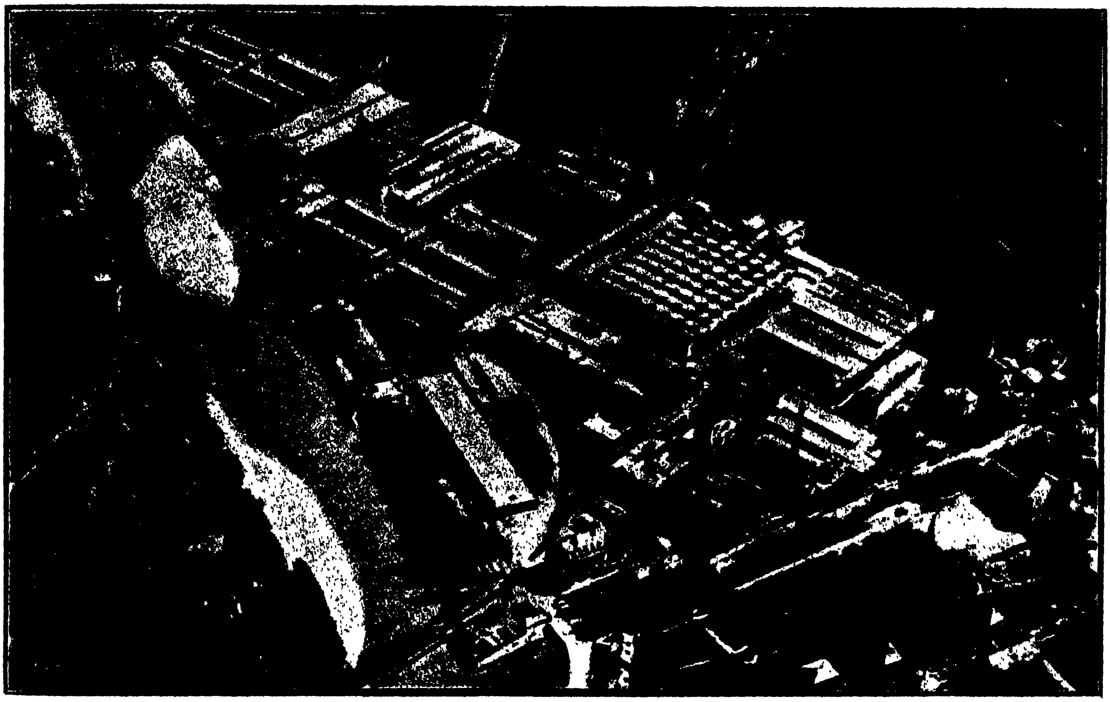
* এই 'স্মৃতি-তর্পণে'র প্রথম দিকের কিয়দংশ 'এডুকেশন গেজেটে'র ভূদেব স্মৃতি-সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।



শ্রমশিল্পে সুইট্জারল্যাণ্ড

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ, বি-এ

'সুইট্জারল্যাণ্ড' দেশটী যদিও ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, প্রভৃতি দেশগুলি হইতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কিন্তু তাহা



চিপিলিসের কল-যন্ত্র

হইলেও পৃথিবীর সমস্ত উৎপাদক দেশগুলির (manufacturing countries) মধ্যে আপনার একটী বিশিষ্ট স্থান গড়িয়া লইয়াছে। সুইট্জারল্যাণ্ডের ঘড়ী, দিয়াশালাই, জমাট দুগ্ধ, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, প্রভৃতি বর্ত্তমান পৃথিবীর প্রত্যেক সুসভ্য দেশের অধিবাসগিণের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত বস্তু আপনার উৎকর্ষের জন্য সর্ব্বত্র সমাদৃত



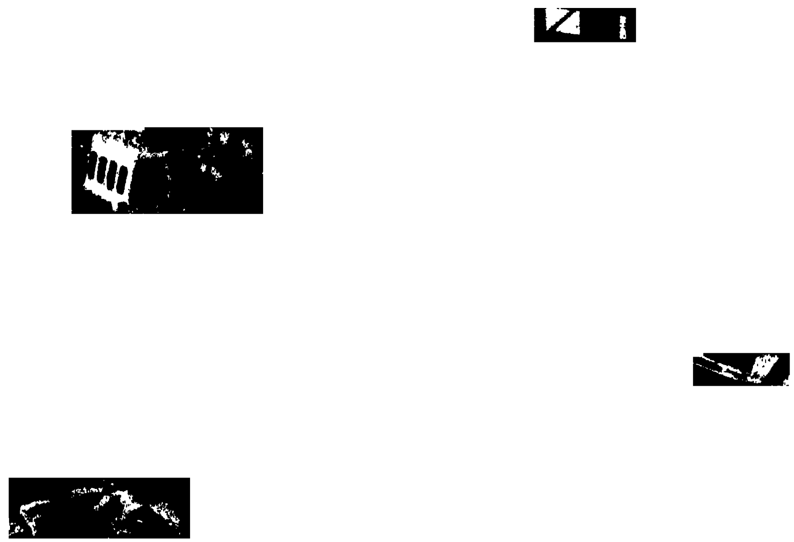
গো-পালক



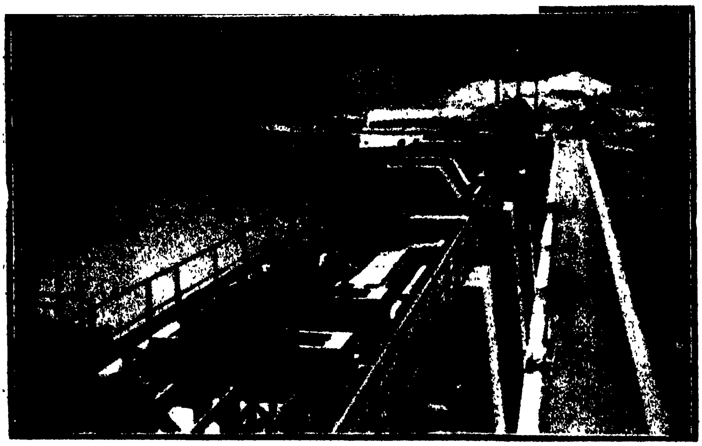
সিমেনথাল গরু

হইয়াছে এবং ইহাদের বহুল প্রচারে ব্যবসায়ীজগতে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের এক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করিয়াছে।

কিন্তু আসলে, সুইট্‌জারল্যাণ্ড দেশটার প্রাকৃতিক-সম্পদ (natural resources) বলিতে বিশেষ কিছু নাই এবং সম্ভবতঃ সেই কারণেই ইহার অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে আকর্ষণ দেখা গিয়াছে।…সুইট্‌জার-



কল ঘর



গুইডেল কুইভারের জল-প্রণালী

ল্যাণ্ডের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এক সময় অতিশয় শোচনীয় স্তরে আসিয়া উপনীত হয়! সুইস্ ভ্রাতাগণ এক সময়ে দেশে অন্ন সংস্থান না করিতে পারিয়া অপর দেশে ভাড়াটিয়া সৈন্য (Mercenary soldiers) হিসাবে চাকুরী লইয়া পলাইতে বাধ্য হয়।…তাই বহুদিন হইতে আপনার মাতৃভূমির অর্থ-নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য সুইস্‌গণের মধ্যে যে প্রচেষ্টা দেখা যায় তাহাই কালে কিরূপ গৌরবময় সাফল্য লাভ করিয়াছে তাহা দেখিবার বিষয়। সত্যই বিভিন্ন শ্রমশিল্পে সুইট্‌জারল্যাণ্ড যে



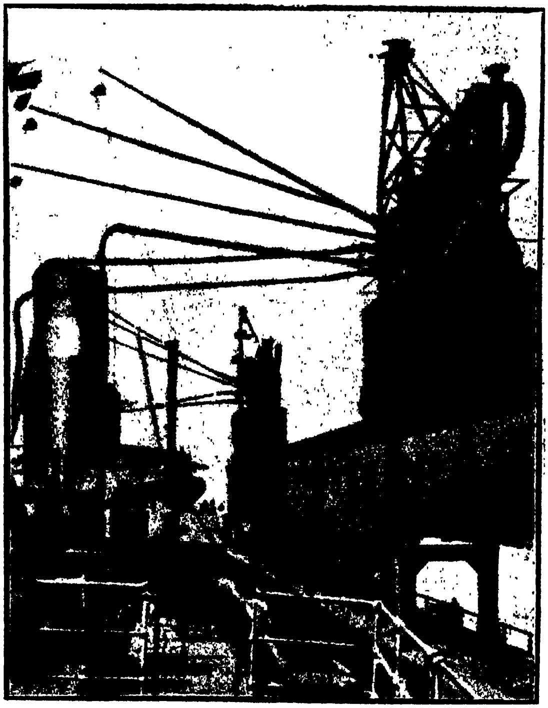
রাসায়নিক কারখানা



ঘড়ি প্রস্তুতের কারখানা

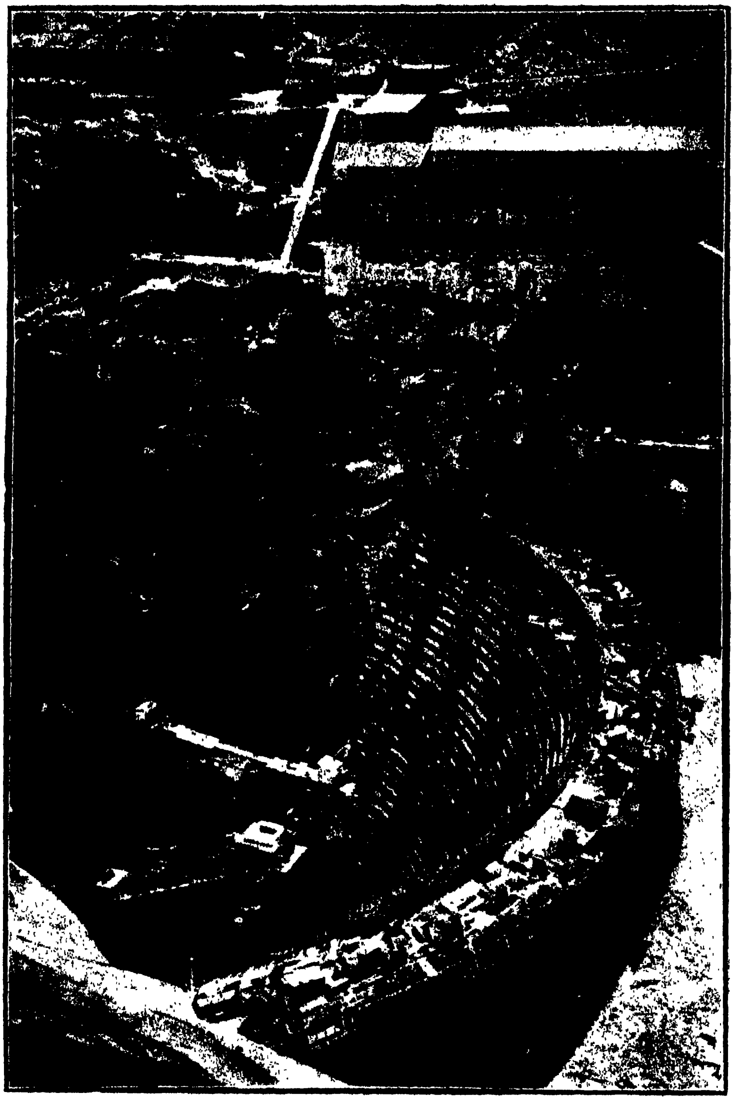


কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম কাজ



গমের কল

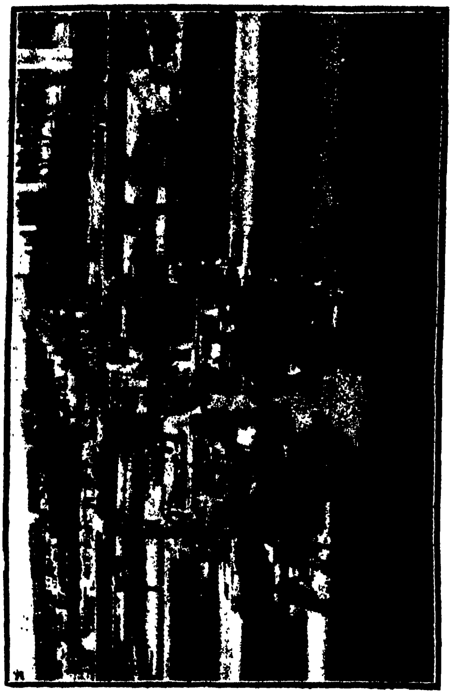
অসামান্য উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! যে সমস্ত কারণে সুইট্জারল্যাণ্ড এই উন্নতিলাভে সমর্থ হইয়াছে তাহার মধ্যে এইগুলি প্রধান (১) অর্থকরী শিক্ষা (Professional Education). (২) কলকারখানা সম্বন্ধীয় আইন-কানুন (Factory legislation). (৩) 'বিপদ এবং বেকার-বীমা' (Accident & unemployment Insurances). (৪) কলকারখানায় একদল শ্রেষ্ঠ যন্ত্র-বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারী (Technical staff) নিয়োগ। (৫) সুইস্ জাতির অতিশয় শ্রমপরায়ণতা (৬) সুইস্ জাতির



গ্রিমসেলের বাঁধ

অর্থ সঞ্চয়ের স্পৃহা বিশ্ববিদ্যালয় ও ষ্টেটের সহযোগিতায় এখানে অর্থকরী বিদ্যার প্রচলন বিশেষ সম্ভবপর হইয়াছে। দেশের Federal constitutionএর ২৭ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক canton অর্থাৎ state কয়েকটী করিয়া প্রাথমিক শিক্ষালয় রাখিতে বাধ্য। কারণ দেশের আইন অনুযায়ী প্রত্যেক বালককে প্রাথমিক শিক্ষা লইতেই হইবে! কাজে কাজেই দেশের কুলী ও নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অনেকেই লিখিতে পড়িতে জানে। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য সুইট্জারল্যাণ্ডে সাতটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগুলি Basle, Berne, Lansuné, Geneva, Zurich, Neuchâtel, Fribourg-এ স্থাপিত আছে। 'জুরিক' সহরে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ হইতে Swiss Federal Institnte of Technology নামে যে প্রতিষ্ঠানটী রহিয়াছে তাহা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। এখানে ইউরোপের অপরাপর দেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া অধ্যয়ণ করিয়া থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য শিখিবার জন্য কয়েকটী বিদ্যালয়ও আছে। সেগুলি হইতে "Maturite commerciale" তক্মা পাওয়া যায়। তাহার দ্বারা যে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করা যায়।

১৮৭৪ খৃঃ সুইজ ষ্টেট সমস্ত কল-কারখানার উপর এক আইন প্রয়োগ করেন। এই আইন অনুযায়ী কোন সুইজ কারখানায় কেহ ১১ ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারিবে না এইরূপ স্থির হয়। ১৯০৫ খৃঃ এই আইন একটু পরিবর্ত্তিত হয়। তখন দিনে নয় ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিবার বন্দোবস্ত হয়। ইহার পর ১৯১৯ খৃঃ হইতে সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা করিয়া কার্য্য করিবার বিধি স্থির হইয়াছে। ইহার মধ্যে



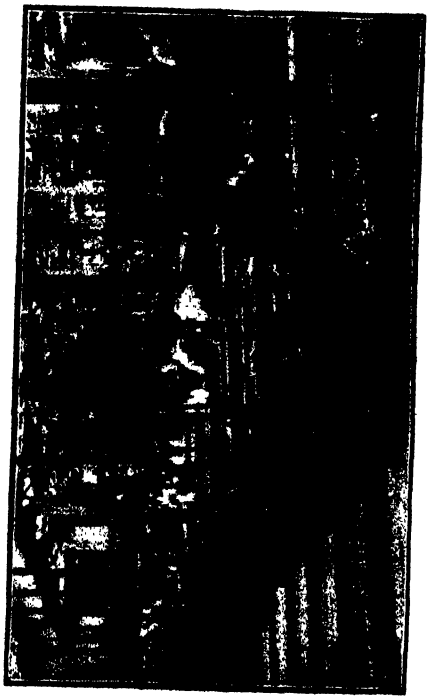
কাকংক কল



বার্লীন সমুদ্র-তট

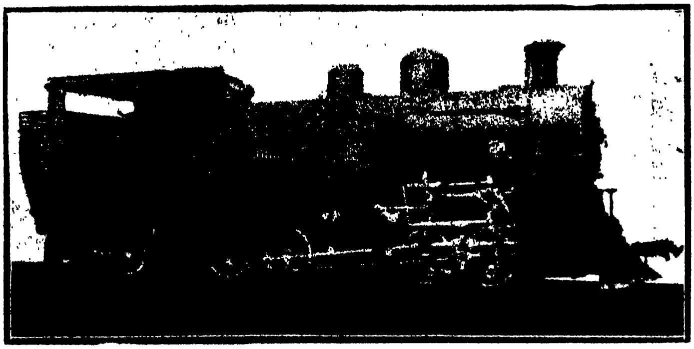


লোহের কারখানা



ছুরির কল

অবশ্য বিশেষ কারণ বলিয়া বিবেচিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষ এক-আধ দিন ছুটি মঞ্জুরও করেন। সুইস ষ্টেট শ্রমিকগণের সুখ-



ভারতবর্ষের জন্য এঞ্জিন



রেলগাড়ী

সুবিধার বিষয়ে বিশেষ 'liberal' : ইউরোপ বা অন্যত্র যে সমস্ত 'আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক সম্মিলনী'তে শ্রমিকগণের সুবিধার জন্য যাহা বিধেয় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা আপনার রাজ্যে অকুণ্ঠিত চিত্তে চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহার ফলে আজকাল কোন সুইস কারখানায় পারতপক্ষে শ্বেত ফস্‌ফরাস্ ব্যবহার হয় না (কারণ ইহা হাতে করিয়া নাড়াচাড়া করিলে অচিরে মানুষের দন্ত ক্ষয় হইতে থাকে এবং তাহা শেষ পর্য্যন্ত এক যন্ত্রণাদায়ক রোগে পরিণত হয়) এবং স্ত্রী শ্রমিকগণের রাত্রে কারখানায় কাজ করা নিষিদ্ধ। কত বয়স হইলে বালক-বালিকারা কল-কারখানায় কাজ করিতে পারিবে তাহাও সুইস ষ্টেট নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

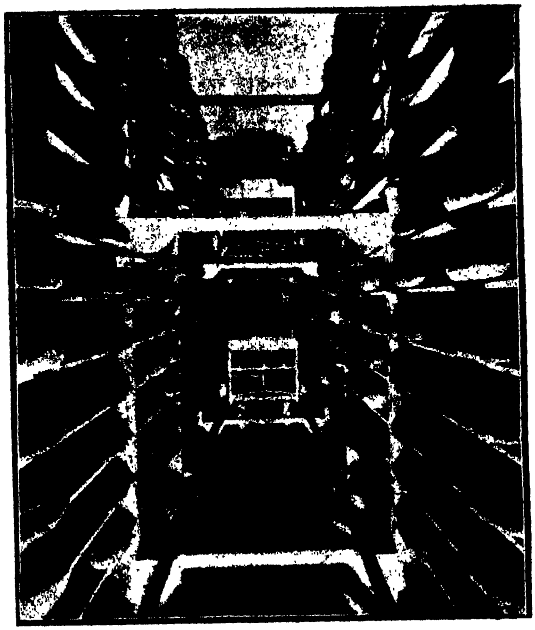
বর্ত্তমানে সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শ্রমিক-গণের বেতনের 'সংখ্যক-হার' (Index Figure) যে স্থানে উঠিয়াছে তাহাতে এক U. S. A. ছাড়া পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। ·· ১৯১৪ খৃঃ এই 'সংখ্যক-হার' ছিল—১০০। ১৯২০ খৃঃ তাহা ২২৪ সংখ্যায় হঠাৎ উঠিয়া যায়। শেষে ১৯২৭ হইতে উহা ১৩০ করা হইয়াছে। আমরা একটী তালিকা দিতেছি তাহাতে পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় সুইট্‌জার-ল্যাণ্ডের শ্রমিকগণ কিরূপ বেতন পাইয়া থাকে তাহার 'সংখ্যক-হার' দেখা যাইবে। জার্ম্মেণী—৯৩ ; ফ্রান্স—৯৫ ; গ্রেট ব্রিটেন—১০৫; ইতালী—১১৮ ; ডেনমার্ক—১২৮ ; ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্—১৩০ ; সুইট্‌জারল্যাণ্ড—১৩০।

১৯২০ খৃঃ সুইট্‌জারল্যাণ্ডে ঐ 'সংখ্যক-হার' ২২৪ উঠিয়া গিয়াছিল কারণ তখন যুদ্ধের ঠিক পরে বলিয়া দেশের জীবন-ধারণের খরচা (Charge of Living) অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল।

সুইস ষ্টেটের আর একটী বিশেষত্ব হইতেছে 'সামাজিক বীমা ব্যবস্থা' (Social Insurances). দেশে সর্ব্বসমেত ১১৪০টী রেজিষ্টার্ড বীমা কোম্পানী আছে। ইহার মধ্যে আবার 'unemployment Insurances', 'Sickness Insurances', 'Old age Insurances', 'Accident Insurances' প্রভৃতি কয়েকটী বিভাগ আছে। দেশের



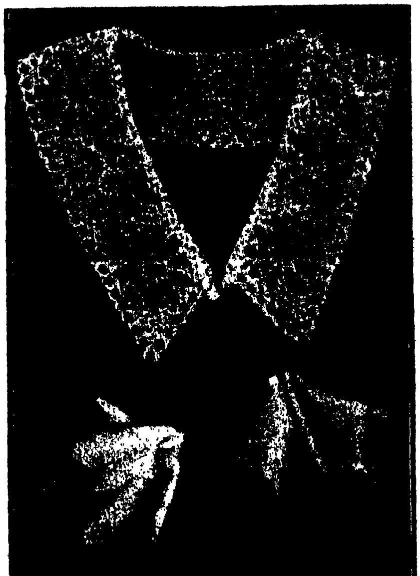
সূচের কাজের নমুনা



পনিরের ভাণ্ডার



যন্ত্র-বিভাগ



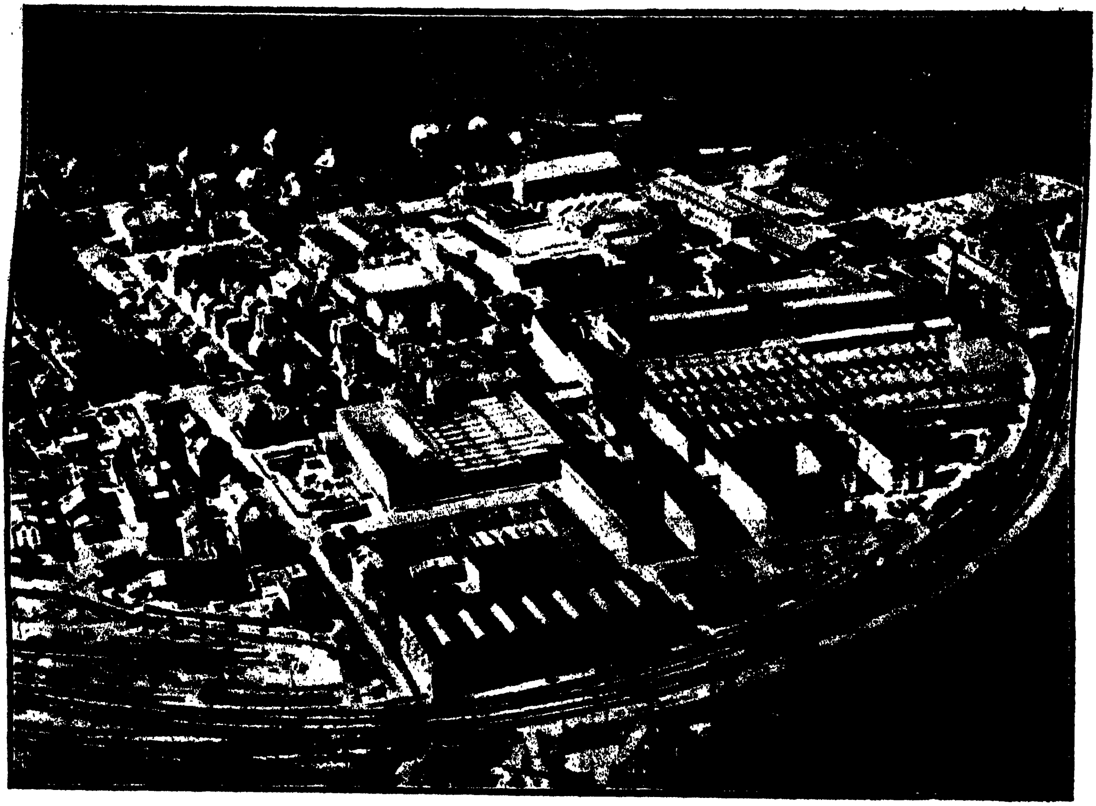
সূচের কাজের নমুনা

কুলী-মজুর এবং আরও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে ১,৫৬০,০০০ জন লোক এই সমস্ত বীমা-কোম্পানীতে নাম 'রেজিষ্ট্রি' করাইয়াছে। এই সমস্ত বীমা-কোম্পানীর দ্বারা যে সমস্ত Premiums সংগৃহীত হইয়াছে ১৯৩২ খৃঃ হিসাব অনুযায়ী ৮,৮২৬,৪৮৭ সুইস ফ্রাঙ্ক।

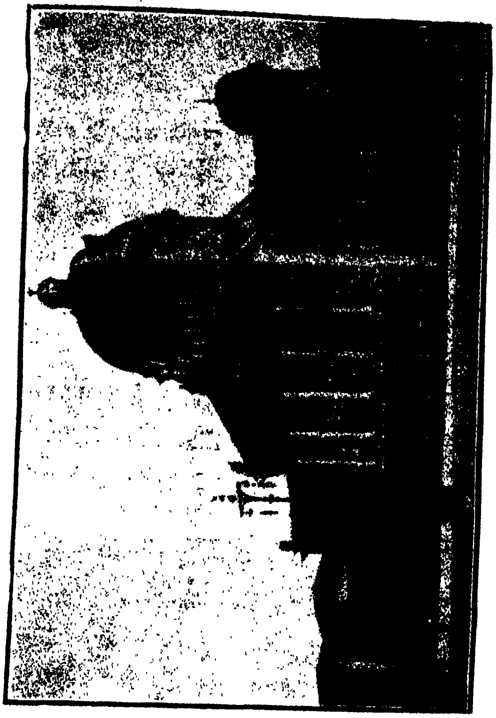
এই সুন্দর বীমা ব্যবস্থা থাকায় সুইট্‌জারল্যাণ্ডের শ্রমিক-জগতে এক নূতন অধ্যায় সুরু হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত শ্রমিক কলকারখানার কাজ করিত তাহাদের যদি কোন কার্য্যকরী অঙ্গ বিকল হইয়া যাইত তাহা হইলে তাহারা ভবিষ্যতে আর কোন কার্য্য করিতে না পারিয়া পরের গলগ্রহ হইয়া জীবন কাটাইয়া দিত। কিন্তু এখন আর সেইরূপ হইতে পারে না। যাহাদের কলকব্জায় লাগিয়া হাত-পা বিপন্ন, বিকল হইবার সম্ভাবনা আছে তাহারা Disabled Insurance করিয়া রাখে। তাহাতে ভবিষ্যতে হাত-পা বিকল হইয়া যাইলে যে অর্থ পায় তাহা দ্বারা ভবিষ্যৎ-জীবন সুখে কাটাইয়া দিতে পারে।

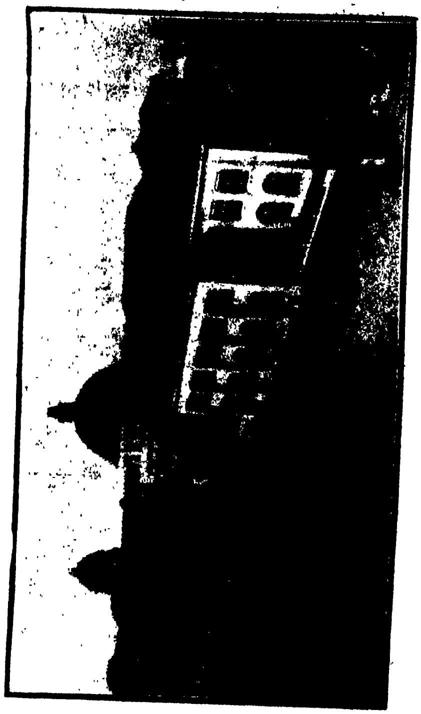
সুইস পণ্যদ্রব্যগুলির ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং জার্ম্মেনীতেই কাট্‌তি অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। গত ১৯৩০ খৃঃ মাত্র গ্রেট-ব্রিটেনেই ২৬২·৬ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক মূল্যের সুইস পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে সুইস জিনিষের কাট্‌তি নেহাৎ কম নয়। ভারতবর্ষে সুইস দ্রব্যাদির প্রতি বৎসরে কাট্‌তি ২৪·২ লক্ষ ফ্রাঙ্ক করিয়া।

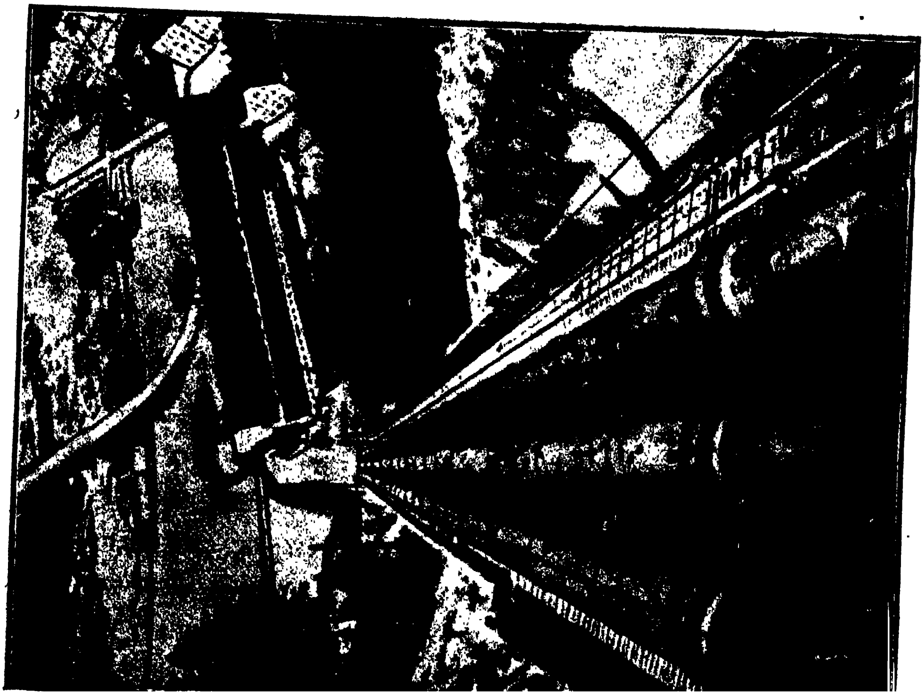
সুইট্‌জারল্যাণ্ডের বয়ন-শিল্প দেশের প্রাচীন শিল্পগুলির মধ্যে একটী। রেশমের শিল্পাগারগুলি 'জুরিকে'র আশে পাশের Cantonগুলিতে অবস্থিত। এই সমস্ত স্থানে ৩০,০০০ তাঁত বসান আছে। এগুলির সংখ্যা নেহাৎ কম নয়! সারা ইউরোপ ও আমেরিকায় যতগুলি তাঁত আছে ইহা তাহার এক ষষ্ঠতম অংশ (অবশ্য কেবল রেশম শিল্পে); প্রতি বৎসর প্রায় ২০০ লক্ষ সুইস ফ্রাঙ্ক মূল্যের রেশমের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হইয়া থাকে। 'জুরিক', 'ম্যারিস', 'সেণ্টগল' প্রভৃতি স্থানে বহু কাপড়ের কল আছে। এখানে



কারখানার দৃশ্য


বার্ণের পার্লিয়ামেন্ট ভবন


জুরিখের টেকনলজি ভবন


আমষ্টেগের জলের পাইপ

আধুনিক প্রচলিত যে সমস্ত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন তাহা সমস্তই আছে। কারখানাগুলিও বিরাট। প্রায় সাড়ে পঁয়ত্রিশ হাজার কর্ম্মচারী এই সমস্ত কারখানায় কাজ করে। বর্ত্তমানে একশত চল্লিশ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মূল্যের দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয় এবং তাহা নানা দেশে বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

সুইস জাতি সূচি-শিল্পেও বিশেষ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। 'সেণ্টগল' ও 'অ্যাপেজেল' প্রভৃতি স্থানে সূচি-শিল্পের কেন্দ্র। বর্ত্তমানে মহিলাগণের 'গাউন' ও 'আন্ডার-উয়ারে'র উপর হাতের বুটী তোলার ফ্যাশান হওয়াতে এই শিল্পে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আসিয়াছে। সুইস মসলিন Nansoocs, crépe dé chine উপর নানা সূচের

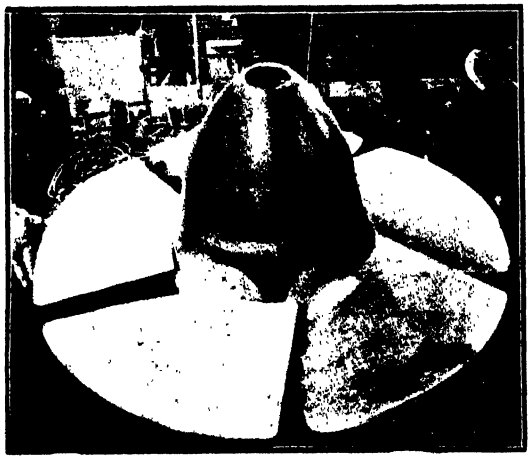


বারবেরাইনের বৈদ্যুতিক যন্ত্র

ফোঁড়ের কাজ পাশ্চাত্যমহিলাজগতে এক উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। এই শিল্পটীতে বহু সুইস নারী অন্ন সংস্থানের সুযোগ লাভ করিয়াছে।

অপরাপর শিল্প বিষয়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া 'সুইট্-জারল্যাণ্ডে'র যন্ত্র-শিল্পের কথা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। সমস্ত দেশটার বিভিন্ন যন্ত্রশিল্প ভিত্তি করিয়া আছে বৈদ্যুতিক শক্তির (Electric powers) উপর। দেশের বহু দূরবর্ত্তী স্থানেও বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া যাওয়া হইয়াছে। দেশে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রতিষ্ঠা হইবার পর হইতেই সর্ব্বত্র 'Federal' অথবা 'Secondary' রেলপথ-গুলিতে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে। Amsteg-এ বৈদ্যুতিক-শক্তি সৃষ্টি করিবার যে power-plantটী আছে তাহা বর্ত্তমান কালের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ power-plant গুলির অন্যতম। সুইট্জারল্যাণ্ড দেশটী কয়েকটী শক্তিশালী জাতির মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া তাহাকে অপরাপর দেশের সহিত যোগসূত্র (Communication) রাখিতে হইয়াছে —মালপত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে (Trans potation). ইহা একমাত্র দেশের সুগঠিত বৈদ্যুতিক রেলপথের প্রচলনের দ্বারা সম্ভব হইয়াছে।

একজন ফরাসী লেখক একবার সুইট্জারল্যাণ্ড সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "The Swiss milk, their Cows and live peaceably." এ কথাটা খুবই সত্য। সুইস জাতি যে



কাপলান টারবাইনের চাকা

কেবল যন্ত্রশিল্পেই আপনাদের ডুবাইয়া রাখিয়াছে তাহা নয়! দেশে বহু গো-চারণের মাঠ এবং Breeding Farms আছে। সুইস জাতি গাভীর যত্ন করিতে জানে। দেশে স্বাস্থ্যবতী গাভীর সংখ্যা অল্প নয়! সুইস পনির বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত। গত ১৯৩০ সালে সুইট্জারল্যাণ্ড হইতে নব্বুই লক্ষ ফ্রাঙ্কের উপর মূল্যের পনির নানা দেশে বিক্রয়ার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। সুইস ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে Hotel-Keeping একটী লাভবান ব্যবসা। Arosa, Davos, Leysin প্রভৃতি স্থানের যক্ষ্মা চিকিৎসালয়গুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

বিয়ের আগে বিয়ে

প্রবোধকুমার সান্যাল

নন্দরাণী তীরবেগে উপর থেকে নীচে নেমে এলো। চোখে মুখে তার উত্তেজনা, নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত, মাথার এলো-খোঁপা আলুথালু। সুরবালা দাঁড়িয়েছিলেন বৈঠকখানার দরজায়, বাড়ীর সরকার মশায়কে ভাঁড়ারের ফর্দ্দ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ; নন্দরাণী রুদ্ধ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাক্‌ল, মা ?

মা ফিরে তাকালেন।

এদিকে এসো, শিগ্‌গির এসো একবার—

যাই বাছা,—মা বললেন, ফর্দ্দটা সরকার মশাইকে—

অধীর কণ্ঠে নন্দরাণী বললে, থাক্ তোমার ফর্দ্দ, আসতে বলছি না, একবার চট্ ক'রে—?

মা এলেন। মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ওমা, সকালবেলা এমন গন্ধ-হারানো চেহারা কেন, নাদু ?

উত্তেজনায় নন্দরাণীর চোখের বড় বড় তারা দুটো জ্বালা করছিল। কম্পিত চাপা কণ্ঠে সে বললে, তোমরা নাকি আমার বিয়ের চেষ্টা করছ ?

মা শিউরে উঠে হেসে বললেন, কে বললে এমন সর্ব্বনেশে কথা ?

ওই যে শুনলুম বাবা আর মেজকাকা বারান্দায় দাঁড়িয়ে বলাবলি করছিলেন। সত্যি কথা বলো কিন্তু, নৈলে, আমি ভয়ানক কাণ্ড করব।

হাসিমুখে মা বললেন, কী অন্যায়, আমি দিচ্ছি বারণ ক'রে। ছি ছি, এত বড় মেয়ের কি কেউ বিয়ে দেয় ? এমন ত কোথাও শুনিনি! ওরা পুরুষের জাত কিনা, বড়োসড়ো মেয়ে দেখলেই ষড়যন্ত্র করতে বসে।

তুমিই যত নষ্টের মূল!—নন্দরাণীর গলার ভিতরে কান্না উঠে এলো।

মুখ ফিরিয়ে সুরবালা বললেন, সরকার মশাই, বাড়ীতে ভয়ানক বিপদ ঘটল, আইবুড়ো মেয়ের বিয়ের কথা উঠেছে—আপনি ওই নিয়ে এখন যান্।

আচ্ছা বৌমা।—ব'লে বৃদ্ধ সরকার মশায় তাঁর বিরল-দন্তে হেসে বেরিয়ে গেলেন।

সুরবালা বললেন, চল্ ত দেখি, নাদু, ওদের কতখানি আস্পর্দ্ধা···আজ আর রক্ষে রাখ্‌ব না—

নন্দরাণী বললে, থাক্, আর সীন্ ক'রে কাজ নেই, ঢের হয়েছে। এই ব'লে সে উপরের সিঁড়িতে গিয়ে উঠ্‌ল ; সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে পুনরায় বললে, আজ থেকে কলেজ যাবো না, পড়ব না, খাবো না,—কিচ্ছু করব না। চ'লে যাবো মামার বাড়ী। এমন অত্যাচার আমার ওপর ? আমি মরব।—দ্রুতপদে সে উপরে উঠে গেল।

ও ঠাকুর, ছানাটা যেন পুড়ে যায় না, উনুনের ওপর আলগোছে ধ'রে থেকো।—বলতে বলতে সুরবালা রান্না-ঘরের দিকে চ'লে গেলেন।

বেলা সাড়ে নটার পর রমেশবাবু ঢুকলেন নন্দরাণীর ঘরে। নন্দরাণী একখানা বই সাম্‌নে খুলে বসেছিল। এটা নিজের মুখের চেহারা গোপন রাখার উপায়। রমেশবাবু বললেন, তোমার কি আজ ফাষ্ট আওয়ারে ক্লাশ নেই, মা ?

মাথাটা আরো হেঁট ক'রে নন্দরাণী বললে, আছে, বাবা।

তবে ত এখুনি গাড়ী আসবে। তোমার এখনো নাওয়া খাওয়া—

আজ আমি হেঁটে যাবো।

বাবা বললেন, তাহ'লে ত আরো তাড়াতাড়ি করা দরকার, হেঁটে যখন যাবে···এখান থেকে এক মাইল ডায়োসেসন্—কেমন ?

তা হবে। ব'লে নন্দরাণী তাড়াতাড়ি কেবলমাত্র একখানা তোয়ালে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কলেজে তাকে যেতেই হোলো। ইতিমধ্যে মা'কে নন্দরাণী খুঁজলে না, সুরবালাও সামনে এলেন না। বাবা কেবল দু'একবার তার খাবার দালানে পায়চারি ক'রে গেলেন। সুরবালা তাঁকে যেন কি ইসারা করলেন।

নন্দরাণী কলেজে গেল হেঁটে।

দিন চারেক পরে তার উত্তেজনাটা কিছু কম্‌ল। প্রথম ধাক্কা আর নেই, এখন নন্দরাণী শাদা চোখে চেয়ে দেখছে। ক্লাসে রেবার সঙ্গে পরামর্শ করেছে, বিয়ে যদি করতেই হয় তবে আই-সী-এস্‌ বরকে। ওরা শিক্ষিত আর সংস্কৃত। কি বলিস, রেবা?

রেবা বললে, আমি ফার্ষ্ট ইয়ার থেকেই এ-কথা ভাবছি, ললিতাদিও তাই বলছিল—

নাচ বলো, গান বলো, শিল্প-সাহিত্য বলো, আই-সী-এস্‌ ছাড়া আর গতি নেই। ওরাই সচ্চরিত্র, কারণ ওরা বিলেত-ফেরত।

কানাঘুষোটা বাড়ীতে দিনে দিনে স্পষ্ট হ'য়ে উঠ্‌ছে, নন্দরাণীর প্রতিবাদের কোনো ফল হয় নি। বাবা জানিয়েছেন, পাত্র সম্বন্ধে নন্দরাণীর মতামত নেওয়া হবে। সেই একমাত্র ভরসা। নন্দরাণী প্রতীক্ষা ক'রে রইল।

সুরবালা বললেন, ওই ত অতটুকু মেয়ে, সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছে। ওর বিয়ে এখন আমি দেবো না। কি বলিস্‌, নাদু?—কণ্ঠে তাঁর কৌতুক ফুটে ওঠে।

নন্দরাণী উত্তর না দিয়ে ঘর থেকে চ'লে যায়; মা'র কথা শুনলে বিরক্ত হয়ে ওঠে মন।

সেদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে নন্দরাণী ভাবছিল, তাকে কলেজে পড়তে হচ্ছে উচ্চ শিক্ষার জন্য নয়, পাশ ক'রে ডিগ্রি পাবার জন্য। বিয়ের অলঙ্কারের মধ্যে এটাও একটা। তার ভাবী স্বামী বন্ধুসমাজে গর্ব্ব ক'রে বেড়াবেন শিক্ষিতা স্ত্রী পেয়ে। ডিগ্রিটা হবে তার অঙ্গের একটি অলঙ্কার—যেমন খোঁপার ফুল, যেমন কানের দুল। সে-অপমানও সহ্য হবে যদি পাত্র হয় আই-সী এস্‌। আই-সী-এস্‌রা নিরাপদ, তারা ইস্পাতের ফ্রেমে আঁটা। নন্দরাণী জানে, ছেলেদের উচ্চাশা—ভালো চাকরী; মেয়েদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা—আই-সী-এস্‌।

বইগুলো হাতে চেপে নন্দরাণী ভাবছিল, তার বন্ধু নীরার বিয়ে হয়েছে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে, তাকে অতিক্রম না করলেই চলবে না। চেহারা যেমনই হোক্‌ আই-সী এস্‌ হতেই হবে। নৈলে ভালো পাত্র আর কোথায়? বাবা বলেন, নতুন উকীলরা উপবাসী; নতুন য়্যাড্‌ভোকেট্‌রা শ্বশুরের অর্থে চাপকান্‌ কেনে; নব্য ব্যারিষ্টাররা সীনিয়রদের খোসামোদ ক'রে কাজ আদায় করতে, সম্ভ্রম বিকিয়ে পসার জমায়,—নন্দরাণীর নাসা কুঞ্চিত হয়ে এলো।

কিছুকাল পরে এক বিবাহেচ্ছু অধ্যাপকের খোঁজ পাওয়া গেল। কি ভাগ্যি যে, গণ-গোত্রে মিল্‌ল না, তাই রক্ষা। ওরা শিক্ষার অভিমানে স্ফীত, উপদেশ ছড়ানো আর অনধিকার আলোচনা—এই নিয়ে ওদের দিন কাটে। হয়ত কলেজ-ফেরতা দুপুরবেলা বাড়ীতে এসে অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে থীসিস্‌ শোনাতে বসবে। কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে। অধ্যাপকের চেয়ে বীমার দালাল ভালো, বিনয় এবং একাগ্রতা তাদের সহজাত। ওজন ক'রে ওরা স্ত্রীদের ভালোবাসে না। মিথ্যা কথা মনোহর ক'রে বলে।

তাদের ক্লাসের বেচারি নির্ম্মলার কথা তার মনে পড়ছে। অমন চমৎকার মেয়ে কিনা বাজে একটা আদর্শের জন্য বিয়ে করতে গেল ক্ষিতীশ পালকে? স্বদেশী জেল-খাটা রাজনীতিক ক্ষিতীশ পাল, স্বামী হিসেবে তার মূল্য কি? জেল যার কাছে তীর্থস্থান, ঘরে কি তার মন বসবে? যদি বা বসে তবে তার আত্মপ্রশংসার জ্বালায় রাত্রে ঘুমোবার উপায় থাকবে না। পুলিশসম্পর্কে তার দুঃসাহসের গল্প বানিয়ে ব'লে নির্ম্মলার কাছে অতিরিক্ত আদর পাবার চেষ্টা করবে; জেলে যাবার আগে কেঁদে ককিয়ে স্ত্রীর জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলবে; বেচারি নির্ম্মলার প্রাণ হবে ওষ্ঠাগত। নন্দরাণীর হাসি পেলো।

ব্যবসায়ী স্বামী নন্দরাণীর খুব পছন্দ। পছন্দ নানা কারণে। অগাধ অর্থ আর অখণ্ড অবসর। লোহার সিন্দুকের চাবি থাকবে তার আঁচলে বাঁধা। স্বামীর সঙ্গে কোনোদিন মান-অভিমানের পালা গাইতে হবে না। 'বাজার বড় মন্দা'—এই বাণী শুনেই কাট্‌বে দিন। মাথায় টাক্‌, মুখে দোক্তা-দেওয়া পান, পেটে ভুঁড়ি, আঙুলে গোটা পাঁচেক আংটি, পায়ে কালো কম্বলের মোজা আর শাদা ক্যাম্বিশের জুতো। চমৎকার একটি নাদুগোপাল! তা হোক। অধ্যাপকের চেয়ে বুদ্ধিমান, রাজনীতিকের চেয়ে সক্রিয়। স্ত্রীর শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে উদাসীন, স্ত্রী সেবাদাসী হ'লেই খুসি।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে জান্‌লার বাইরে চেয়ে নন্দরাণী আকাশ-পাতাল কল্পনা করছিল। এই যে ঢেউটা উঠ্‌ল, এ যে কোন্‌ তটে গিয়ে লাগবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

তার এই প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় চিড় খেয়েছে, সংসার আর তাকে স্বস্তিতে থাকতে দেবে না। বাবা আছেন, কাকারা আছেন, প্রতিবাদ করা চলবে না, মুখ বুজে তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে সে যা কিছু স্থির ক'রে রেখেছে আজ সমস্ত একে একে মিথ্যা হয়ে দাঁড়াল। সংসারে যে এমন ফাঁকি আছে এ তার জানা ছিল না।

মা ঘরে এসে ঢুকলেন। আলোটা নেবানো। একবার ডাকলেন, নাদু ? ও মা—

সাড়া নেই। সুরবালা বিছানায় এসে ব'সে নন্দরাণীর মাথাটা কাছে টেনে নিলেন। জানা গেল, সে জেগেই রয়েছে। ঘরের ভিতরের বাতাসটা ঘন নিশ্চল হয়েছিল, বোধ করি শরৎকালের প্রথম ভাগ। নন্দরাণীর গলার কাছে হাত দিয়ে সুরবালা দেখলেন, ঘামে তার গায়ের জামাটা পর্য্যন্ত ভিজে গেছে। বললেন, সনু দেখি, জামাটা খুলে দিই ?

আঃ থাক্ জামা, খুলতে হবে না ছাই।—নন্দরাণী বিরক্ত হয়ে মায়ের হাতের ভিতরে মুখ গুঁজে শু'লো।

মা বললেন, অত লজ্জায় আর কাজ নেই, সনু···ঘেমে একেবারে যে নেয়ে উঠেছিস।—ব'লে তিনি জোর ক'রে তার গায়ের জামা ছাড়িয়ে নিলেন। এমন সময় কে যেন দরজার কাছ দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছিল, মা মুখ ফিরিয়ে বললেন, মহেন্দ্র নাকি রে ?

হ্যাঁ, মা।

পাখাটা খুলে দিয়ে যা ত' বাবা ?

মহেন্দ্র অন্ধকারে হাতড়ে একটা সুইচ টিপে পাখাটা চালিয়ে দিলে। নন্দরাণী বললে, আলো আর জ্বালতে হবে না, যা।

মহেন্দ্র চলে যাবার পর সুরবালা কথা পাড়লেন। হেসে বললেন, বিয়ের পরেও আমার ওপর এমনি ক'রে রাগ করবি ?

নন্দরাণী বললে, বিয়ে আমি করব না।

বেশ, আমিও তাই বলি। বিয়ে তোর মা করেনি, মাসি করেনি, তুইও করিসনে।—সুরবালা হাসি চাপছিলেন।

নন্দরাণী চুপ ক'রে রইল।

সুরবালা বললেন, সন্ধ্যেবেলা যে ছেলেটার কথা তোকে বল্‌ছিলুম তাকে কি পছন্দ হয় না রে ?

কোন্ ছেলেটা ?—নন্দরাণী মুখ তুললে।

অবস্থা বেশ ভালো, সুখের ঘর। ছেলে একেবারে বিদ্যের জাহাজ। একজন নামজাদা লেখক।

লেখক ?

হ্যাঁ, সাহিত্যিক।

রুদ্ধকণ্ঠে নন্দরাণী বললে, যন্ত্রণা, ভয়ানক যন্ত্রণা দিচ্ছ, মা, তোমরা আমাকে। লেখককে বিয়ে করেছে আমাদের সেই অশ্রুকণা, মনে নেই তোমার ? কোন্ কোন্ বিখ্যাত লোক তার ওপর প্রবন্ধ লিখেছে, রবিঠাকুর সার্টিফিকেট দিয়েছেন কিনা, তার ফর্দ্দ দিবারাত্রি শুনতে শুনতে অশ্রু হায়রাণ! সেদিন 'বৈকুণ্ঠের খাতা' প্লে দেখে এসেছ মনে নেই ? ও আমি পারব না, তা তোমরা যাই বলো। পুরণো লেখা শুনতে শুনতে প্রাণ যাবে। হয়ত রাত জেগে তার ফেরৎ-দেওয়া লেখা নকল করতে হবে। হয়ত আদ্ধেক রাতে থিয়েটারি ঢঙে কথা আরম্ভ করবে! তার চেয়ে বরং একটা বীমার দালালকে খুঁজে আনো।

সুরবালা নীরবে রইলেন। জান্‌লা দিয়ে নতুন শরৎকালের বাতাস আসছে। আকাশে তারকার দল। আজকে আর মেঘ নেই। সুরবালা মেয়ের মাথার চুলের ভিতরে হাত বুলোতে লাগলেন।

এমন সময় নীচে যেন কা'র কণ্ঠস্বর শোনা গেল। উপরের বারান্দা থেকে রমেশবাবু সাড়া দিয়ে বললেন, নিরঞ্জন নাকি ? ওপরে এসো।

মা তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামলেন। বললেন, আমি যাই, নাদু অনেকদিন পরে এসেছে নিরঞ্জন।—তিনি চ'লে গেলেন। নন্দরাণী উঠে বসে পুনরায় জামাটা গায়ে দিতে লাগল।

নিরঞ্জন তার বাবার বন্ধুপুত্র। বাল্যকাল থেকেই এ-বাড়ীতে তার যাতায়াত। সম্প্রতি সে বি-এ পাশ করেছে। ইন্‌জিনিয়ারিং পড়তে বিলেত যাবার চেষ্টায় আছে, পাসপোর্টের জন্ত আবেদন করেছে। খুব সম্ভব রমেশবাবুর কাছে এসেছে পরিচয়-পত্র নিতে।

জামাটা গায়ে দিয়ে নন্দরাণী কাপড়টা গুছিয়ে ঘর থেকে বেরুলো। বারান্দা দিয়ে ঘুরে ও-দিকের বৈঠকখানায়

এসে দাঁড়াল। ঘরে তখন মজ্‌লিশ বসেছে। একটা কুশন্‌ চেয়ারে গিয়ে সে মাথা হেলিয়ে বসলো। নিরঞ্জন হেসে তাকালো তার দিকে। রূপের দিক থেকে দুজনেই কম নয়।

রমেশবাবু বসে আছেন, পাশে রয়েছেন সুরবালা, বারান্দায় দাঁড়িয়ে মেজকাকা তাঁর দাদাকে লুকিয়ে সিগারেট্‌ টানছেন,—নন্দরাণী বললে নিরঞ্জনদা, বিলেত যাবার ফিকির জাঁটলে শেষ পর্য্যন্ত? বাবার জমীদারিটা ফোঁপ্‌রা ক'রে তবে ছাড়বে, কেমন?

নিরঞ্জন হেসে বললে, যা বলেছিস, নাহু, তুই বা কম কি? আই-সী-এসকে বিয়ে করতে চাইলে রমেশকাকার সম্পত্তিটা কি অক্ষুণ্ণ থাকবে?

নন্দরাণীও হাসলে। বললে, সেটা হবে সৎপাত্রে দান, কিন্তু তুমি? পার্টি আর আউটিংয়ে মাসে মাসে তোমার কত লাগবে, শুনি?

সুরবালা বললেন, মেয়ের জিবের ধার ছাখো। মাসিক-পত্রগুলো তুই পড়া ছেড়ে দে, নাহু—

নন্দরাণী বললে, ছাড়বো কেন, বাঙালী ছেলের বিলিতি কেলেঙ্কারী ওতে প্রায়ই ছাপা হয়, এই জন্তে?

মেজকাকা বারান্দা থেকে সোৎসাহে বললেন, রাইটলি সার্ভ্‌ড্‌!

নিরঞ্জন মৃদু মৃদু হাসছিল। বললে, সবাই নানা রকম পড়াশুনো ক'রে কিন্তু তুই কেমন ক'রে নিজের পাঠ্য বেছে নিস, বল্‌ ত, নাহু?

নন্দরাণী বললে, মা, তোমার কুপুত্তুরকে সাবধান করো ব'লে দিচ্ছি। নিরঞ্জনদা, ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল্‌!—এই ব'লে সে উঠে চ'লে যাচ্ছিল, মা ইসারা ক'রে দিতেই নিরঞ্জন দৌড়ে গিয়ে খপ্‌ ক'রে নন্দরাণীর হাতটা ধ'রে ফেললে, বললে, ইঃ মেয়ের রাগ কম নয়!

ছাড়ো বল্‌ছি।

ছাড়বো না,—

ছাড়বে না?

নিরঞ্জন বললে, মাথা কাটালেও না।

সুইসেন্স্‌—ব'লে নন্দরাণী আবার ফিরে এসে বসল। সুরবালা আর রমেশবাবু হেসে উঠলেন। সকলের ধারণা ওরা দুজনে এখনো ছেলেমানুষ। ওদের বিবাদটা চিরন্তন।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে ব'সে নিরঞ্জন বললে, কাল সকালের গাড়ীতে যাবো কেষ্টনগর, ফিরব দিন চারেক বাদে। যদি দরকার হয় তবে আপনি কিন্তু একটা ফোন্‌ করবেন কমিশনরকে, মনে থাকবে ত রমেশকাকা?

রমেশবাবু বললেন, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

সুরবালা বললেন, জাহাজ ছাড়ার তারিখ কত?

সতেরোই অক্টোবর।

ওঃ এখনো অনেক দেরি।

নন্দরাণী বললে, এমন করছে যেন আজ রাত্তিরেই ও যাবে উড়োজাহাজে! ভারি ত বিলেত যাবে, তার আবার এত। বিলেত আবার দেশ!

নিরঞ্জন হাসিমুখে বললে, আঙুরগুলো টক্‌।

আজ্ঞে না মশাই। খালাসীরাও যায় বিলেতে, কিন্তু নেপালের রাণী থাকেন নিজের রাজ্যে। বিলেত যাবার আর বাহাদুরি ক'রো না।

সত্যি, কী অন্যায় আমার! তোর সঙ্গে করি তর্ক। খালাসী যে, সেও যায় বিলেতে, কারণ সে পুরুষ; আর মেয়েমানুষ রাণী হলেও বন্দী!

আমার খাবার কি দেওয়া হয়েছে? ওগো—ব'লে রমেশবাবু হেসে উঠে চ'লে গেলেন। সুরবালা বললেন, চলো দেখিগে, তোরা বোস একটু বাছা, আসছি। নিরঞ্জন, আজ খেয়ে যাবি, বাবা, এখানে। ব'লে তিনিও গেলেন বেরিয়ে।

নন্দরাণী ব'সে ব'সে পা ঠুকছিল মাটীতে। নিরঞ্জন বললে, ঝগড়া থাক্‌, কেমন আছিস বল্‌, নাহু।

নন্দরাণী বললে, তুমি কেমন আছ?

বলা কঠিন। মনটা কেবল সুয়েজ ক্যানাল্‌ পার হয়ে চলেছে। যাক্‌ সে কথা, শুনলুম তোর নাকি বিয়ের কথা হচ্ছে?

অবাক কল্লে তুমি। বুড়ো ধাড়ি মেয়ে হলুম, বিয়ের কথা না হওয়াই অন্যায়।

নিরঞ্জন হেসে ফেললে, থার্ড ইয়ারে উঠে তোর মুখ ফুটেছে। কথা চল্‌ছে কা'র সঙ্গে? হতভাগ্যটি কে?

তোমার শোনবার অধিকার নেই।

ও বাবা, এত? হায়রে, জাত আর কুল মিল্‌ল না ব'লে কি আমি এতই অযোগ্য!

জাত-কুল মিললেই বা তোমাকে বিয়ে করত কে শুনি? হয়ে কেন মরিনি!—ব'লে নন্দরাণী ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

বটে।—নিরঞ্জন বললে, আর আমাদের আবাল্য প্রেমটা বুঝি কিছুই নয়? রূপ আর গুণ আমার কিসে কম বল্ ত?

মুখে কাপড় চাপা দিয়ে নন্দরাণী হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বললে, রূপ নিয়ে পুরুষকে কিন্তু এমন অহঙ্কার করতে আর কোথাও শুনিনি। জাহাজ থেকে নামলে বিলেতের মেয়েরা না তোমাকে কিড্ন্যাপ ক'রে নিয়ে যায়!

নিরঞ্জন রাগ ক'রে বললে, তুই কি মনে করেচিস আমি প্রেম করতে পারিনে?

নন্দরাণী একবার বারান্দার দিকে তাকালো। তারপর বললে, বেহায়াপনা ক'রো না। তুমি সব পারো, হোলো? বি-এ পাশ-করা ছেলের আবার প্রেম! ওরা মেয়েদের 'ফলো' করতে জানে, ভালোবাসতে জানে না।

নিরঞ্জন যেন একটু দ'মে গেল। বললে, কলেজের ছাত্রের ওপর তোর এত রাগ কেন?

রাগ নয়:—ব'লে নন্দরাণী হাসলে, বললে, বেশ লাগে ওদের। অনভিজ্ঞ, নির্বোধ দুটো চোখ। ওদের অতি-বুদ্ধির ফাঁক দিয়ে অনর্গল নির্বুদ্ধিতা বেরিয়ে পড়ে। সেদিন রমা বলছিল—

নিরঞ্জন বললে, তুই নিশ্চয় অজয় চৌধুরীর কথা বলচিস।

কে তোমার অজয় চৌধুরী জানিনে। সেদিন রমা বলছিল, বন্ধুদের কাছ থেকে ওরা প্রেমপত্র লেখা শিখে আসে, ইংরেজি নভেলের ডায়লগ্ মুখস্থ ক'রে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে।

থামলি কেন, ব'লে যা। তোষামোদকে বলে প্রেম,—ব'লে যা?

নন্দরাণী বললে, সত্যি বলছি, নিরঞ্জনদা। রমা বলছিল, ওরা ফুল দিয়ে বউকে খুশি করে, ঝগড়ার ভেতর দিয়ে নাটক খোঁজে, স্ত্রীর রূপের নিন্দে শুনলে আত্মহত্যার ভয় দেখায়। আমার ত খুব ভালো লাগে ওদের।

দুজনেই হাসতে লাগল।

নিরঞ্জন বললে, কোনো মেয়ে আমার দিকে চাইলেই মনে হয় আমাকে সে ভালোবাসতে পারে। আমি ত কো-এডুকেশনের দয়ায় বুঝতে পেরেছি বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বীরপুরুষ অনেক।

নন্দরাণী বললে, ও-বাড়ীর বেলার কথায় হেসে মরি। ওদের কলেজে কো-এডুকেশন আছে। হঠাৎ সেদিন ওর সীটে একখানা চিঠি পাওয়া গেল। যেমন ভুল বাংলা, তেমনি ভুল উপমা। বেলা বলে, ছেলেদের আন্তরিকতার চেয়ে আতিশয্য বেশি। ওদের আগ্রহ খুব, কিন্তু জানেনা জয় করতে। মেয়েদেরো ছলনা আছে জানি, কিন্তু ওদের অছিলা দেখলে হাসি পায়। তোমাদের একটু সংযত হওয়া দরকার, নিরঞ্জনদা।

অসংযম মেয়েদের প্রিয়।

থামো, প্যারাডক্স ক'রো না। কলেজের ছেলেরা প্রেমিক হবার চেষ্টা করতে গিয়ে পুরুষ হ'তে ভুলে যায়। যাকে ভোলানো যায় না, তাকে আকর্ষণ করতেই আনন্দ। পুরুষ হবে বৈরাগী ভোলানাথ, তবে ত!

ওরে বাবা, এ-মেয়ে বাঁচলে হয়।—ব'লে নিরঞ্জন মুখ বিকৃত ক'রে হাসলে।

এমন সময় নীচে থেকে দুজনের খাবার ডাক পড়ল। ওরা উঠে নেমে গেল।

নিরঞ্জন আর নন্দরাণী আসনে বসল। ঠাকুর পরিবেশন করতে লাগল।

সুরবালা এক সময়ে বললেন, নাদুর বিয়েতে আমার এখন মত নেই, নিরঞ্জন। তবু যদি বিয়ে হয় তুই কি দেখে যাবিনে, বাবা?

নিরঞ্জন বললে, বেশ কথা আপনার, খুড়িমা। ও যেদিন শ্বশুরবাড়ী যাবে, আমি বুঝি তখন হা হুতোশ করবার জন্যে পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব? তার চেয়ে বিলেতে নেমন্তন্ন চিঠি পাঠাবেন।

নন্দরাণী বললে, ডাকটিকিটের পয়সাটা রেখে যেয়ো।

মেয়ে কি বললে শোনো।

শোনবার মতন কথা নাদু বলে না। আচ্ছা, খুড়িমা, কলেজের ছাত্ররা নাদুর পছন্দসই নয়, কেন বলুন ত?

সুরবালা বললেন, ওরা বড় বাধ্য, বড় অনুগত। তোরা নাকি বাছা রোদ্দুরে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকিস পরীক্ষার আলোচনা নিয়ে?

নিরঞ্জন মুখ তুলে তাকালো।

বলে আমার ও-বাড়ীর মেয়েরা। বলে যে ছাত্রীদের সঙ্গে াৎ দেখা হয়ে যাবার আশায় তোদের এই দুর্ভোগ। ওরা সলে তোরা নাকি সপ্ত স্বর্গে যাস, বাবা, এ কি সত্যি?

একদম মিথ্যে!—নিরঞ্জন ফেটে উঠ্ল।

আহা, তাই যেন হয়, বাবা।

উত্তেজিত হয়ে নন্দরাণী বললে, ওরা লজ্জা পায় না দেখে ামাদের লজ্জা করে। একসঙ্গে অতগুলো ছেলে, কা'র কে চাই বলো ত? কা'কে ফেলি?

তিনজনেই প্রবল স্বরে হেসে উঠলেন।

নন্দরাণী বললে, বেলা বলে, একজনের দিকে চেয়ে চ'লে লে ওদের মধ্যে আবার ঝগড়া বাধে। প্রত্যেকেই বলে, ার দিকে নয়, আমার দিকে চেয়ে হেসে গেল। এই য়ে লাঠালাঠি!

চোখ পাকিয়ে নিরঞ্জন বললে, আর মেয়েদের মধ্যে ঝি ঈর্ষা নেই?

আছে। সেটা মনোমালিন্য আনে, তাই ব'লে তোমাদের ন লাঠালাঠি করে না—বুঝলে?

বুঝলুম।—ব'লে নিরঞ্জন আহার শেষ করলে।

যাবার আগে সে রমেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলো। রবালা বললেন, রাত অনেকটা হয়েছে বাবা, সাবধানে স। কেষ্টনগর থেকে ফিরে আবার একদিন আসিস।

নন্দরাণী সঙ্গে সঙ্গে নীচে নেমে এলো। পিছন থেকে লে, ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছ কেন, নিরঞ্জনদা, বাইরের ঘরে কটু বসে যাও না?

নিরঞ্জন বললে, একটা বদ্ অভ্যাস করেছি তাই লাচ্ছি তাড়াতাড়ি।

ওমা, কি অভ্যেস গো?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আচ্ছা আয়, একটু বসেই যাই।—লে বাইরের ঘরে এসে দুজনে দুখানা চেয়ারে হেলান্ য়ে ব'সে পড়ল।

বদ্ অভ্যেসটা কি শুনি? জুয়ার আড্ডায় যাতায়াত? বে তুমি দূর হয়ে যাও, বসতে দেবো না।

পরম নিশ্চিন্ত মনে বসে নিরঞ্জন বললে, নান্থ, তোর াথে মুখে বিয়ের রং ধরেছে। কিন্তু তুই যে রকম ঁখুঁতে, স্বামীকে নিয়ে কি ঘর করতে পারবি?

নন্দরাণী একটু হাসলে, তারপর কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে, তুমি ছেলেমানুষ, নিরঞ্জনদা।

নিরঞ্জন হেসে বললে, আই-সী-এস্ ছাড়া তুই যখন বিয়েই করবিনে, তখন ভরসা ক'রে রইলুম। কপালে এখন হাকিম জুটলে হয়!

তোমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

একটু দরকার আছে, কারণ, কোন্ আঘাটায় গিয়ে পড়বি তাই একটু মায়া হচ্ছে।

কপালে আগুন তোমার মায়ার!—ব'লে নন্দরাণী মাথাটা ফিরিয়ে নিলে।

দুজনেই তারপর নীরব। এক সময় নন্দরাণী বললে, নিরঞ্জনদা, বিলেত থেকে ফিরলে তোমার এ আত্মীয়তা বোধ হয় আর থাকবে না, কেমন?

খুব সম্ভব।

মেম বিয়ে করে আসবে নাকি?

প্রেমের পর জাতবিচার মান্‌ব না।

আমাদের সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করবে?

সেটা ত এখনই করছে।

নন্দরাণী জ্বলন্ত চোখে চেয়ে উঠে যাবার চেষ্টা করতেই নিরঞ্জন তার হাতটা ধ'রে ফেল্‌লে। নন্দরাণী বললে, তোমার মুখ দেখতেও ঘেন্না করে, ছাড়ো।

নিরঞ্জন তাকে আবার টেনে বসালো। এবং তারপর যা কোনোদিন দেখা যায়নি,—পকেট থেকে সে সিগারেট আর দেশালাই বা'র করলে। বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষে চেয়ে নন্দরাণী তীব্রকণ্ঠে বললে, এই নোংরা অভ্যেস করেছ তুমি, এর চেয়ে যে জুয়া খেলা ভালো ছিল, নিরঞ্জনদা?

সিগারেট ধরিয়ে একটান্ টেনে নিরঞ্জন বললে, আমার অধঃপতনে তোর চোখে জল এলো, মনে হচ্ছে।

দাঁড়াও, আমি মা'কে ব'লে দিচ্ছি। বি-এ পাশ ক'রে লায়েক হয়েছ, কেমন? বিলেত যাবার আগেই সিগারেট, সেখানে গিয়ে ত মদ ধরবে!

জোরে একটা টান্ দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে নিরঞ্জন বললে, মদ আর সিগারেট ত ভদ্রলোকেই খায়, রাস্তার কুকুর কি খায় ও-সব? সিগারেট খেতে খুব ভালো রে।

নন্দরাণী বললে, ভালো না ছাই।

সত্যি বলছি ভাই, নান্থ, মনটা খুব খটুফুল হয়।

সত্যি ?

তোর দিব্যি, একদিন খেয়ে দেখিস।

*

*

এর পর গেছে তিন মাস।

নিরঞ্জন বিলেত পৌঁছেচে, তার চিঠি এসেছে উড়ো জাহাজে। রমেশবাবু পূজোর সময় সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ ক'রে গিরিডিতে এসে রয়েছেন। বারগাণ্ডার ব্রাহ্ম পাড়ায় সুন্দরী ব'লে নন্দরাণীর সম্বন্ধে কানাকানি চল্‌ছে : এবং ইতিমধ্যে নন্দরাণীর বিয়ের আলোচনাটাও বেশ ঘন হয়ে উঠেছে। একটি ছেলের সম্পর্কে রমেশবাবু পাকাপাকি করবার মনস্থ করেছেন। ছেলেটি আই-সী-এস নয় বটে, কিন্তু যোগ্য পাত্র হিসাবে যে কোনো শিক্ষিত মেয়ের আদর্শ। রক্ষণশীল হিন্দুমতে বিয়ে হবে।

নন্দরাণী বাড়ীর বুড়ো চাকর দীনবন্ধুকে নিয়ে ইশ্রি নদীর পাড়ে পাড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়, আর ভাবে এখনো তার মৃত্যু হয় না কেন। জীবনটা তার নষ্ট হোলো। দেখা যাচ্ছে বিয়ের জন্যই তার পাশ করা আর কলেজে পড়া। তার পক্ষে সবচেয়ে বড় পরিচয়-পত্র এই যে, সে সুন্দরী এবং পাশ-করা বিবাহযোগ্যা মেয়ে!

বাল্যকাল থেকে নিজের জীবনটা তার মুখস্থ। ফ্রক্ ছেড়ে সাড়ী, বেণী খুলে এলো খোঁপা—একটির পর একটি স্তর তার চোখে ভাসছে। ভুলে ঘাঘ্‌রা পরলে তার বাড়ন্ত গড়নের দিকে চেয়ে ঠাকুমা শাসন ক'রে দিতেন। সাড়ী আর সেমিজ যখন গায়ে উঠ্‌ল, বন্ধ হয়ে গেল পাড়ার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা। স্কুলের গাড়ী এলে স্কুলে যাওয়া, আর সেই গাড়ীতেই ফিরে আসা।

স্বাধীন তাকে হতেই হবে,—আর আই-সী-এস্ ছাড়া ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অর্থ অন্যে কে বুঝবে? বেচারি অণিমা! বিয়ের পরে আর আই-এ পরীক্ষা দেবার হুকুম পেলে না। শৈবলিনীকে ত বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করা পর্য্যন্ত বন্ধ করতে হয়েছে। তাই ব'লে রত্নাবলীর মতোও সে হ'তে চায় না। স্বামী স্বনামধন্য প্রফেসর,—তিনি কলেজ চ'লে গেলে রত্নাবলীর অবারিত ছুটি। বুইক্‌খানা নিয়ে সে সমস্ত দিনটা কল্‌কাতা শহর চ'ষে বেড়ায়। এমন শোনাও গেছে, কোনো কোনো ছেলেবন্ধু নিয়ে সে যায় ইম্পিরীয়ল্ রেস্তোঁরায় ব'সে আড্ডা দিতে। এমন স্বাধীনতা নন্দরাণীর পছন্দ নয়।

চলো, দীনবন্ধু, সন্ধ্যে হয়ে এলো।

এসো দিদি।—দীনবন্ধু আগে আগে চলে।

বাড়ীতে ঢুক্‌লেই একটা চাপা হাওয়া,—কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। মায়ের সঙ্গে চোখচোখি হয়ে গেলে যেন একটা ব্যথার ছায়া নেমে আসে। নিজের ঘরের দিকে নন্দরাণী চ'লে যায়।

সেদিন সকালবেলাকার আয়োজনটা দেখে নন্দরাণীর বুকের ভিতরটা টিপটিপ করতে লাগল। সুরবালা মেয়ের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছেন। রমেশবাবু এক সময় জামা কাপড় প'রে বাইরে এলেন। এ ঘরে ঢুকে দেখলেন, নন্দরাণী পাথরের মতো ব'সে রয়েছে। মেয়ের মনোভাব জান্‌তে তাঁর আর বাকি ছিল না।

বললেন, নাছ্‌, এখন তবে চললুম মধুপুরে। ফিরতে দেরি হবে না আমার। হ্যাঁ, ওই পাত্রের সঙ্গেই ব্যবস্থা করা গেল। ছেলেটি ভালো। আইন্ পরীক্ষায় এবার পাশ করতে পারেনি বটে, তবে ওর সম্বন্ধে বেশ আশা করা চলে। পয়সা-কড়ি মন্দ নেই। আজ পাকা দেখে আসব।

নন্দরাণী মাথা হেঁট ক'রে রইল।

রমেশবাবু বলতে লাগলেন, ভট্‌চাযি্য মশাই ষ্টেশনে অপেক্ষা করছেন, অঘোর আচাযি্য সঙ্গে যাবেন, ও-বাড়ীর সুধীরও যাবে।—তারপর পিছন ফিরে দরজার আড়ালে সুরবালাকে দেখে বললেন, জামাই তোমার ভালই হবে গো।

সুরবালা মৃদুকণ্ঠে বললেন, ছেলেটির নাম কি?

নামটি শুন্‌তে ভালো: হরিদাস কানুনগো।—বলতে বলতে রমেশবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

তপ্ত লৌহশলাকা কে যেন নন্দরাণীর কানে ঢুকিয়ে দিলে; আকণ্ঠ ঘৃণায় তার গা বমি বমি করতে লাগল।

হরিদাস কানুনগো? আইন পরীক্ষায় ফেল্-করা? —নন্দরাণী মনস্থির করলে, আত্মহত্যা ক'রে সে এ-জীবনের জ্বালা জুড়োবে। কিন্তু তার আগে প্রবল আবেগে সে বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ল। বালিশটা ভিজে যেতে লাগল দরদর অশ্রুধারায়।

তার পরদিন বিলেতে নিরঞ্জনের কাছে চিঠি লিখে জীবনের মতো সে বিদায় নিলে।

ব্যথা ও বেদনায় উদাসীন,—অশ্রুমুখী নন্দরাণী দীনবন্ধুকে য়ে পথে বেরিয়ে পড়ে। জীবনটা ব্যর্থতার একটা যেন র্ঘ তালিকা। উঁচু-নীচু মাঠের ধারে, সাঁওতালী পল্লীতে, নি-মঙ্গলের হাটে, রেল-ষ্টেশন-ইয়ার্ডে এবং এখানে-ওখানে রাণী ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়ায়। দীনবন্ধু দিদিমণির রি অনুগত।

স্থির হয়ে গেছে কাল তার পাকা দেখা।

কাল পাকা দেখা, আজকে মুক্তির শেষ নিশ্বাস নিয়ে তে হবে। সকালবেলা কিছু মুখে দিয়ে নন্দরাণী দীনবন্ধুর জ বেরিয়ে পড়ল। সাঁওতালী বাজারে কিছুক্ষণ রাফেরা ক'রে সে ষ্টেশনের ধারে বেড়াতে গেল। এক য় বলল, দীনুদা. আজ এত ভিড় কেন ভাই?

বুড়ো দীনবন্ধু বললে, শনিবার কিনা, এরা সব উশ্রীর কে যাবে বেড়াতে।

ওমা, কি হ্যাংলা গো, উশ্রী আবার মানুষে যায়! চা, পুরণো একটা ফল্,—ভিক্টোরিয়া ওয়াটার্ফলের াছে উশ্রী?—নন্দরাণী তাচ্ছিল্যভরে তাদের দিকে াকালো।

এমন সময় দীনবন্ধু একটা দলের দিকে তাড়াতাড়ি গিয়ে গেল। একটি ফুট্‌ফুটে সুন্দরী তরুণীর কাছে গিয়ে লে, নীলাদিদি, চিন্‌তে পারো?

সবাই তাকে চিন্‌ল। নীলা বুড়োর হাত ধ'রে বললে, র পাকি, দীনুদা। ওমা, তুমি এখানে? উনি কে?

উনি আমার মনিবের মেয়ে।—ব'লে দীনবন্ধু নন্দরাণীর ঙ্গে সকলের পরিচয় করিয়ে দিলে। বুড়ো সব রকম ায়দাকানুন জানে। বললে, নাদুদিদি, এঁরা আমার রণো মনিব।

নীলা নন্দরাণীর হাত ধ'রে বললে, আসুন। ও ড়মামা, পালাচ্ছেন কেন, পরিচয় করুন আমার বন্ধুর সঙ্গে।

যিনি এগিয়ে এলেন দল ছেড়ে, তিনি যুবক। এমন প নন্দরাণী আর জীবনে দেখেনি। পশ্চিমে রাঙা হারা। ডালিম আর আঙুরের দেশে যেন তার জন্ম। চুলগুলি পর্য্যন্ত ঈষৎ তাম্রবর্ণ। সবিনয় নমস্কার বিনিময় করতে গিয়ে রাঙা মুখে রক্ত ফুটে উঠ্‌ল। নন্দরাণী বললে, এখানে কি বাড়ী আপনাদের?

আজ্ঞে না, আমরা যাবো উশ্রীতে।—যুবকটি বললেন, এসো, নীলা, ওঁরা রয়েছেন দাঁড়িয়ে।—কথাগুলি যেন সুরের ঝঙ্কার। চোখ দুটি নির্লিপ্ত, কালো। বলিষ্ঠ কমনীয় দেহ, দীর্ঘ আকৃতি,—যেন গোলাপের দেশের রাজকুমার। নন্দরাণী ক্ষণেকের জন্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে।

নীলা বললে, আসুন না, উশ্রীতে যাওয়া যাক্ একসঙ্গে মোটরে। উশ্রী আপনার ভালো লাগে না?

নন্দরাণী বললে, বেশ লাগে, চলুন। উনি আপনার মা বুঝি?

নীলা বললে, হ্যাঁ।

আর ও-দুটি মেয়ে?

ওদের নাম সুধীরা, আর ললিতা। আমাদের পাশের বাড়ীতে এসে উঠেছে। ওরা বড়মামার খুব ভক্ত।—বলেই নীলা উচ্ছল হাসিতে পথ মুখর ক'রে তুললে।

নন্দরাণী মুখ তুলে বললে, আপনার বড়মামা ওঁদের ভক্ত নন্?

মোটে না। বড়মামার চোখ আকাশে। দয়ামায়ার গন্ধও নেই ওঁর শরীরে। দেখি বিয়ের পরে বড়মামা কি করেন।

বিয়ে হবে বুঝি শিগ্‌গির।

হ্যাঁ।—নীলা বললে, বাস্তবিক, আপনাকে কত দিন থেকে দেখবার ইচ্ছে ছিল। আপনার বাবাকে লক্ষ্ণৌতে আমি মেশোমশাই ব'লে ডাকতুম। এমন চমৎকার মানুষ। আপনার সঙ্গে যাবো আমি আপনাদের বাড়ীতে, কেমন?

বেশ ত। ব'লে নন্দরাণী একবার বক্রদৃষ্টিতে দূরে চেয়ে দেখলে, চল্‌তে চল্‌তে সুধীরা আর ললিতা সাগ্রহে নীলার বড়মামার সঙ্গে গল্প করবার চেষ্টা করছে।

মোটরে উশ্রীর জঙ্গলের কাছে পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগল। নীলা, নন্দরাণী আর দীনবন্ধু একখানা মোটরে।

আর একখানায় সুধীরা, ললিতা, বড়মামা, আর নীলার মা। সবাই নেমে পদব্রজে পাহাড়ের ধারে শালের জঙ্গল আর সাঁওতালী পল্লী পার হয়ে যখন জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছল, বেলা তখন এগারোটা বাজে।

নীলার বড়মামা কাছে এগিয়ে এসে সবিনয়ে বললেন, আপনার আর দীনবন্ধুর এখানে নেমন্তন্ন। তিনটে কি চারটের মধ্যে আপনার ফিরে গেলে চল্‌বে না?

ঘাড় নেড়ে নন্দরাণী জানাল, চল্‌বে। নীলার মা এসে আদর ক'রে তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, কষ্ট হবে না ত? আমাদের ভাগ্যি ভালো, মনের মত অতিথি পাওয়া গেল। এমন মিষ্টি স্বভাব আমি দেখিনি।

নীলা বললে, সত্যি, মা, নাদুদিদি কি চমৎকার!

পিক্‌নিক্ শেষ হ'তে বেলা তিনটে বাজল। ললিতা আর সুধীরার হুড়োহুড়ির বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। ওদের বেহায়াপনাটা নীলার মাও পছন্দ করলেন না। এক সময় মৃদুকণ্ঠে তিনি বললেন, মণ্টুকে ওরা ভারি বিরক্ত করে।

নন্দরাণী তাদের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল। এখানে কোনো মন্তব্যই মানায় না। কানের মধ্যে তার কেবলই ঝঙ্কৃত হতে লাগল, মণ্টু, মণ্টু!—এবং এ কথাটাও সে মনে মনে অনুভব করলে, লক্ষ সুধীরা আর ললিতা ওর পদপ্রান্তে গড়াগড়ি দিলেও ওর মন টলানো যাবে না। সত্যকারের চরিত্রবানকে বুঝতে অল্প সময়ই লাগে।

সবাই ফিরে এলো। বেলা সাড়ে চারটেয় ট্রেণ। গাড়ী এসে দাঁড়াতেই নীলার মা বললেন, চলো না মা, আমাদের সঙ্গে মধুপুরে? তোমাকে ছাড়তে কিছুতেই মন সরছে না।

নন্দরাণীর মাথায় ভূত চাপলো। এ জীবনে তার আনন্দ কোথায়? বাবা যিনি, তিনি তার সমস্ত জীবনকে অপমান করতে বসেছেন, স্বেচ্ছাচারের রথ চালিয়ে চলেছেন তারই বুকের উপর দিয়ে,—তার জীবন ত নিরর্থক হোলো। আজ একদিনের জন্য অবাধ্য হওয়া যাক্, জানানো যাক্ যে তারো আছে স্বাধীন সত্তা, আত্মস্বাতন্ত্র্য। মুখ ফিরিয়ে সে বললে, দীনুদা, কি বলো?

তুমি যা বলো দিদিমণি।

নন্দরাণী নীলার মায়ের দিকে ফিরে বললে, খুব ভালো রকম অতিথি সৎকার করবেন ত?

আপনার লোককে কি অতিথি, বলে' পাগ্‌লি?—ব'লে ভদ্রমহিলা তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

চলুন তবে যাই আপনাদের সঙ্গে। ব'লে নন্দরাণী টিকিট ক'রে দীনবন্ধুকে নিয়ে গাড়ীতে উঠল।

সুধীরা আর ললিতা মুখ-চাওয়াচায়ি ক'রে বললে, গিরিডির greedy!

পরদিন মধুপুরের বাড়ীতে যখন পূর্ণোদ্যমে অতিথিসৎকার চল্‌ছে, সেই সময় বেলা এগারোটা নাগাৎ নীচের তলায় গোলমাল শোনা গেল। মণ্টুবাবুর হাত ধ'রে যাঁরা উপরে উঠে এলেন, নন্দরাণী স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখলে, তাঁরা বাবা আর মা। তাঁদের পাশে নীলা ও তার মা, মণ্টুর মা ও বাবা, বাড়ীর পণ্ডিত, তাদের ভট্‌চায্যি মশাই, এবং অন্যান্য সকলে।

রমেশবাবু হেসে বললেন, নাদু, তোমার মাত্রাজ্ঞান একটু কমে গেছে। সংরক্ষণশীল বংশে তোমার জন্ম, বিয়ের আগে আমাদের বাড়ীর কোনো মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতে আসেনি। তুমি এলে।

সুরবালা হাসতে হাসতে বললেন, আমার কিন্তু দোষ নেই, নাদু, এ বিয়েতে আমার একটুও মত ছিল না।

নন্দরাণী সকলের দিকে একবার অর্থহীন দৃষ্টিতে চোখ বুলিয়ে নিলে, তার কোনো চেতনা ছিল না। মণ্টু ছিল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। তার দিকে একবার চেয়ে নন্দরাণী মাথা হেঁট ক'রে ঘরে গিয়ে ঢুক্‌লো।

নীলা ছুটে এলো পিছনে পিছনে। নন্দরাণীর পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে বললে, উপন্যাসকেও হার মানালেন। আপনি আর দিদি নন্, আপনি আমাদের বড় মামীমা। আশীর্ব্বাদ করুন।

নন্দরাণী তার চিবুক নেড়ে দিয়ে বললে, আশীর্ব্বাদ করি একদিন যেন মনের মতন স্বামী পেয়ো।—বলতে বলতে তার নিজেরই মুখখানি আনন্দে আর অশ্রুতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল।

শাঁখ বাজালেন নীলার মা।

দিব্য-প্রসঙ্গ

শ্রীঅযোধ্যানাথ বিদ্যাবিনোদ

৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে রামচরিত' নামে একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া আনেন। উহা ১৯১০ ব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। উহার চয়িতা কবি সন্ধ্যাকর নন্দী পালরাজ মদনপালের সভাকবি এবং বির পিতা মদনপালের পিতা রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন, ইহা াব্য হইলেও ইহাতে একটি ঐতিহাসিক সত্য নিহিত রহিয়াছে। ালরাজ দ্বিতীয় মহীপাল অত্যাচারী হইয়া উঠিলে সামন্ত নরপতিগণ কত্র হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত ও নিহত করেন ; এবং তাঁহাদের ায়ক পালরাজলক্ষ্মীর অংশভুক্ দিব্য বঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ব্যের পরে তাঁহার ভ্রাতা রুদ্র ও তৎপরে ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম সিংহাসনে ারোহণ করেন। এই সময়ে নিহত পালরাজ মহীপালের ভ্রাতা রামপাল ারতের বিভিন্ন অংশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক ভীমকে পরাভূত করিয়া ংহাসন অধিকার করেন। কবি লিখিয়াছেন—দিব্য কৈবর্ত্তজাতীয় লেন। এই ঘটনাটি সম্পর্কে দিব্যপক্ষ বা নিরপেক্ষ পক্ষের কোন দর্শন আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। দিব্য-বংশধরগণ যখন সম্পূর্ণরূপে ভ্রষ্ট ও পালদের পদানত তখন পালদের রাজসভায় বসিয়া কবি উহা চনা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহাদের সম্বন্ধে কবির পক্ষপাতের কোন রণ নাই বরং বিপক্ষতাই স্বাভাবিক। আর এই জন্যই তিনি দিব্য ভীমের অনুকূলে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অযথার্থ মনে করা যায় না।

দিনাজপুর জেলায় মহারাজ দিব্যের প্রতিষ্ঠিত দিবর দীঘির পুণ্যতটে াহার জয়স্তম্ভের পাদদেশে গত সরস্বতী পূজার বন্ধে তাঁহার এক স্মৃতি ৎসব সম্পাদিত হয়। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ াহাদুর নেতৃপদ গ্রহণ করেন। রামচরিতের উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনাটি াহিত্যে ও ইতিহাসে 'কৈবর্ত-বিদ্রোহ' নামে অভিহিত হইতেছে দেখিয়া ৎসবক্ষেত্রে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—"একাদশ তাব্দীতে বাঙ্গালার জনসাধারণ মহাবীর দিব্যকে রাজারূপে নির্ব্বাচিত রিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার ইতিবৃত্ত যাহাতে যথাযথ ভাবে ইতিহাসে ানলাভ করে তজ্জন্য এই সভা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকবৃন্দকে নুরোধ করিতেছেন।" গত আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' ডক্টর রমেশচন্দ্র জুমদার এই প্রসঙ্গে 'ঐতিহাসিকের কৈফিয়ৎ' দিতে গিয়া বলিয়াছেন য, দিব্য-প্রসঙ্গের সহিত রাজনির্ব্বাচনের কোন সম্পর্ক নাই।

দিব্য নামে যে তৎকালে এক সামন্তপ্রধান ছিলেন এবং মহীপালের সিংহাসনচ্যুতির পর তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ যে সেই সিংহাসনে অধিরূঢ় হন ইহাতে মতদ্বৈধ নাই। ইহা ঐতিহাসিক সত্য (Fact) ; র্ত্তমানে ঐতিহাসিক গ্রন্থে আলোচ্য ঘটনাটিকে যে সংজ্ঞায় অভিহিত ইতে দেখি তাহা ঐতিহাসিক তথ্য নহে পরন্তু ব্যাখ্যা—Interpretation মাত্র। স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে ছাত্রগণ ইহাকে 'কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ' নামে পাঠ করে। 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহে'র কি অর্থ ছাত্রগণের নিকট প্রকাশিত হয় দেখা যাউক। 'কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ' বলিলে স্বতঃই ধারণা হয় যে "কতকগুলি কৈবর্ত্ত সুপ্রতিষ্ঠিত পালসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান করে এবং পাল সম্রাট নিহত হইলে তাহারা সিংহাসন অধিকার করিয়া বসে।" ইহাতে একটি সার্ব্বজনীন গৌরবকে অস্বীকার করিয়া সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক বিজয় বা ব্যক্তিবিশেষের জয় ঘোষণা করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকে বড় করিয়া ধরা হয়। ফলে দিব্য তথা কৈবর্ত্তজাতির প্রতি বালকদিগের মনে যে কেবল অশ্রদ্ধার ভাব জাগরিত হয় তাহা নহে, তাহারা ঐতিহাসিক সত্যেরও কদর্থ গ্রহণ করে। কোন ঐতিহাসিক অস্বীকার করিবেন না যে, দিব্যের স্বপক্ষভুক্ত মিলিতানন্ত সামন্তচক্রমধ্যে দেশের সর্ব্বসম্প্রদায়ের গণ্যমান্য সামন্তগণ বিদ্যমান ছিলেন। যে সংজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা যুক্তিসঙ্গত এবং বালকদিগের মনে যাহা সত্যের অপলাপ না করিয়া কোনরূপ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ কুভাব বা কদর্থ আনয়ন না করে সেই সংজ্ঞায় ঘটনাবলীকে বিশেষিত করা সঙ্গত হইলে আলোচ্য ঘটনাকে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ নামে অভিহিত করা কখন সমীচীন বোধ হয় না। স্বয়ং রমেশ বাবুই ঘটনাটিকে 'কৈফিয়তে' কখন 'কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ' কখন 'দিব্য বিদ্রোহ' কখন 'প্রজা-বিদ্রোহ' কখন 'রাজদ্রোহ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

নিম্নে দুইটি অনুরূপ ঘটনা বিবৃত করিতেছি—

(১) সুলতান গিয়াসুদ্দিনের কর্ম্মচারী গণেশ গিয়াসুদ্দিনের পৌত্র সামসুদ্দিনকে হত্যা করিয়া গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। আবার গণেশের পৌত্রকে হত্যা করিয়া সামসুদ্দিনের পৌত্র পুনরায় সুলতান হন।

(২) মোগল রাজসরকারের ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারী বিদ্রোহী সের খাঁ হুমায়ুনকে বিতাড়িত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সেকেন্দার শূরকে হত্যা করিয়া হুমায়ুন পুনরায় সিংহাসন অধিকার করেন।

যে মাপকাঠিতে দিব্যের কৃত কর্ম্মকে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ বলা হয় সেই মাপকাঠি অনুসারে বিচার করিলে এই দুই ঘটনা সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ হইয়া পড়ে। কিন্তু কেহ তাহা বলেন না। যশোহরের প্রতাপাদিত্য আইনানুগভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত মোগলসাম্রাজ্যে অনুগতভাবে থাকিতে থাকিতে সহসা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। কিন্তু মোগল সেনাপতি তাঁহাকে বন্দী করায় বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। প্রতাপের বিদ্রোহ সফল হইয়াছিল, এমন কথা কেহ বলেন না। তথাপি এই বিদ্রোহকে কেহ 'কায়স্থ-বিদ্রোহ' বলা দূরে থাকুক বিদ্রোহই বলেন না।

রমেশ বাবু বিদ্রোহ সংজ্ঞার সমর্থনে বলিয়াছেন—"রামচরিতের ১ম পরিচ্ছেদের ২৭শ শ্লোকের টীকায় শাস্ত্রীমহাশয়ধৃত 'ডমরমুপপুরং' স্থলে 'ডমরমুপপ্লবং' পাঠ রহিয়াছে। অধ্যাপক ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত লেখক এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে মূল পুঁথি আনিয়া নাকি উহা দেখিয়াছেন। সত্য সত্যই উপপুর স্থানে উপপ্লব থাকিলে কবি ঘটনাটিকে বিদ্রোহরূপে দেখিয়াছেন, বলিতে হয়। শুনিয়াছি, মূল পুঁথিখানি লর্ড কর্জ্জনের সময় সমুদ্রপারে বোডলিয়ন লাইব্রেরীতে চলিয়া গিয়াছে। তবে 'উপপুর' 'উপপ্লব' হওয়া উচিত ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত বসাক মহাশয় ১৩৩৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এক আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার বলার উদ্দেশ্য, শাস্ত্রীমহাশয় মূল রামচরিতের ঐস্থানের পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই; করিলে দেখা যাইত, সন্ধ্যাকর দিব্য-সম্পর্কিত ঘটনাকে বিদ্রোহই বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—"মূল পাণ্ডুলিপিতে ডমরং পদের পর যদি বাস্তবিকই লিপিকর প্রমাদবশতঃ 'উপপ্লবং' পদ স্থলে 'উপপুরং' পদ লিখিত থাকিয়া থাকে তথাপি পাঠোদ্ধারকালে শাস্ত্রীমহাশয়ের উচিত ছিল, বন্ধনীমধ্যে উপপুরং পদটিকে উপপ্লবং পদরূপে সংশোধিত করিয়া তদীয় মেমোয়ারে ছাপান"। বসাক মহাশয়ের মতে দুই প্রকারে উপপ্লব উপপুরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রথমতঃ পাঠোদ্ধার দোষে, দ্বিতীয়তঃ মূল পাণ্ডুলিপিকারের লিপিপ্রমাদ বশতঃ। শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রাচীন পুঁথি ও শিলালিপির পাঠনৈপুণ্য লইয়া কেহ কোন দিন সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই। এ বিষয়ে সকলে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়া থাকেন। আর দিব্যের স্বজাতীয়ের প্রতি তাঁহার কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল—এমন কেহ বলিবেন না। দ্বিতীয় আপত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য, মূল পাণ্ডুলিপিকার কে? সন্ধ্যাকর স্বয়ং? তাহা হইলে এ কথা বলিতে হয় বসাক মহাশয়ের পাঠ-সংস্কার দিব্যকে বিদ্রোহী প্রমাণ করিবার জন্যই তাঁহার কল্পনাসুরঞ্জিত। এই প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়। উদ্ধৃত অংশে বসাক মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন ১৩৩৩ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মূল পাণ্ডুলিপির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। অতএব ধারণা করিতে পারি যে, মূল পাণ্ডুলিপিতে উপপ্লব পাঠ থাকিলেও ঐ সময় পর্যন্ত তাঁহারা উহা জানিতেন না। তাহা হইলে কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তৎপূর্ব্বে ঐ ঘটনাটিকে বিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন?

কাহারও চরিত্রের বিরুদ্ধে তাঁহার শত্রুপক্ষ যাহা বলেন অন্যত্র স্বতন্ত্র প্রমাণ না পাইলে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তি তাহাই নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করেন না। বহু মুসলমান লেখক লক্ষ্মণ সেনকে 'ভীরু কাপুরুষ', শিবাজী মহারাজকে 'পার্ব্বত্য মূষিক' নামে, মোগলগণ শেরশাহকে 'অনধিকারী' নামে ও বহু পাশ্চাত্য লেখক সিরাজৌদ্দলাকে দুর্নীতিপরায়ণ লম্পট নামে অভিহিত করিয়াছেন বলিয়া বর্ত্তমান যুগের কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক শিবাজী, লক্ষ্মণসেন, শেরশাহ বা সিরাজকে ঐ নামে অভিহিত করেন না। সুতরাং শত্রুপক্ষীয় কবির পক্ষে দিব্যের কৃত কর্ম্মকে উপপ্লব বলা স্বাভাবিক হইলেও বর্ত্তমান যুগের কোন নিরপেক্ষ লেখকের পক্ষে তাহা কি সঙ্গত হইতে পারে?

'রামচরিতে' দিব্যকে দুইএক স্থানে দিব্বোক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। আর ভোজবর্ম্মা ও মদনপালের তাম্রশাসনে দিব্বোক নাম নাই; দিব্য আছে। কিন্তু স্কুলপাঠ্য ইতিহাস সমূহে শ্রুতিকটু দিব্বোক নামই গৃহীত হইয়াছে। ইঁহাদের জাতি সম্পর্কে একাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত কৈবর্ত্ত শব্দেরও অনুসরণ করা হইয়াছে। ইহার উপর ভীমের উৎকৃষ্ট চরিত্র সাবধানে পরিত্যাগ করায় বিদ্যালয়ে দিব্য ভীমাদির প্রতি আদৌ উচ্চমনোভাব জাগ্রত হয় না, বরং অশ্রদ্ধাই জন্মে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত রমেশ বাবুর দুইখানি স্কুলপাঠ্য ইতিহাস হইতে দিব্যসম্পর্কিত ঘটনাটি হুসেন শাহ সম্পর্কিত ঘটনার সহিত উদ্ধৃত করিতেছি।

১। (ক) "মহীপাল বড়ই অত্যাচারী ছিলেন। প্রজারা ইঁহার দুর্ব্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া দিব্বোক নামক এক কৈবর্ত্তের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া ইঁহাকে বধ করে এবং দিব্বোক বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন।" (৫ম ৬ষ্ঠ মানের পাঠ্য 'ভারতের ইতিহাস' ৫৫ পৃষ্ঠা)

(খ) "বঙ্গদেশে খোজাদের প্রভুত্বের ফলে নানাপ্রকার গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হয়। অরাজকতায় ও অত্যাচারে অস্থির হইয়া হিন্দুমুসলমান নায়কগণ একত্র মিলিত হইয়া শেষ হাবসী রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এই বিদ্রোহের নায়ক উজীর আলাউদ্দিন হোসেন শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।" (উক্ত ইতিহাস ৮৭ পৃষ্ঠা)

২। (ক) "কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ—তাঁহার (২য় মহীপালের) নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারে কৈবর্ত্ত দিব্বোকের নায়কতায় প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া মহীপালকে সিংহাসনচ্যুত করে।" (ম্যাট্রিকপাঠ্য 'ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ৮২ পৃঃ)

(খ) "আলাউদ্দিন হোসেন শাহ—খোজারাই রাজশক্তি পরিচালনা করে। অরাজকতায় অস্থির হইয়া অতঃপর হিন্দুমুসলমান আমীরগণ আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামক এক জন যোগ্যব্যক্তিকে রাজা নির্ব্বাচিত করেন।" (উক্ত ইতিহাসের ১৩৭ পৃঃ)

রমেশ বাবু তরুণমতি ১০।১২ বৎসরের ছাত্রছাত্রীগণের নিকট ভারতের ইতিহাসে দিব্য ও হোসেনশাহ উভয়কেই বিদ্রোহী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু কিশোর কিশোরীদিগের নিকট সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই দুই মহাপুরুষের পরিচয় দিবার সময় একের কৃত কর্ম্মকে সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহে চিহ্নিত ও অপরের কৃত কর্ম্মকে বিদ্রোহ হইতে গৌরবময় রাজ-নির্ব্বাচনে উন্নীত করিলেন! এ পার্থক্যের কারণ কি? রমেশ বাবু কি আশঙ্কা করেন যে, কিশোরকিশোরীর পক্ষে হুসেনশাহের রাজ-নির্ব্বাচন-কল্পনা সহজবোধ্য হইলেও দিব্যের রাজ-নির্ব্বাচন সেরূপ সহজবোধ্য নহে? কিংবা তিনি কি মনে করেন, বর্ত্তমান সময়ে হুসেনশাহ ও তৎস্বধর্ম্মাবলম্বিগণের গৌরব-কাহিনী বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরব-কাহিনী অপেক্ষা কিশোরকিশোরীদিগের নিকট অধিকতর মঙ্গলজনক বা প্রীতিকর?

'রামচরিতে'র 'মিলিতানন্ত সামন্তচক্র' পাঠ হইতে জানা যায় 'বরেন্দ্রের সমস্ত প্রজাপুঞ্জ সমস্ত সামন্তচক্র' দিব্যের অধিনায়কত্বে উত্থিত

ইয়াছিল। উদ্ধৃত ১। (ক) চিহ্নিত অংশে দেখাইয়াছি রমেশবাবুও াহা স্বীকার করেন। কিন্তু সামন্তগণ মহীপালের শূন্য সিংহাসনে াহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা তিনি বলেন নাই। রায় বাহাদুর রমা-সাদ চন্দ মহাশয় ১ম পরিচ্ছেদের ৩৮ শ্লোকের 'উপাধি ব্রতিনা' পদের াখ্যা দ্বারা বুঝাইয়াছেন—"দিব্য উচ্চাভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া বরেন্দ্রী ধিকার করেন নাই। উপায়ান্তর না থাকায় রাজপদ স্বীকার করিতে ধ্য হইয়াছিলেন।" ইহার পর দিব্য, রুদ্র, ভীম নির্ব্বিবাদে রাজকার্য্য র্য্যালোচনা করায় স্বতঃই মনে হয়, উহাতে বঙ্গের অনন্ত সামন্তচক্রের রিপূর্ণ সম্মতি ছিল। নতুবা রাজ্যের কোথাও না কোথাও দিব্যাদির রুদ্ধে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করিত এবং শত্রুপক্ষীয় প্রত্যক্ষদর্শী কবি সঙ্কোচে তাহা প্রকাশ করিতেন। পক্ষান্তরে মিলিতানন্ত সামন্তচক্রকে য়েকজন সামন্তের সমাবেশ বলিয়া মনে করিলে অষ্টম শতাব্দীতে গাপালের রাজনির্ব্বাচনেও অবিশ্বাস করিতে হয়। কেবল গোপালের ত্র ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনোক্ত—'মাৎস্যন্যায়মপোহিতু প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাং রং গ্রাহিতঃ' পাঠ হইতে আমরা গোপালের রাজনির্ব্বাচনকাহিনী ানিতে পারি। ধর্ম্মপাল বলিতেছেন—অরাজকতা দূর করিবার জন্য কৃতিপুঞ্জ গোপালের করে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ল্পনা সত্য হইলে এই প্রকৃতিপুঞ্জ দুর্দ্দশাগ্রস্ত একত্রীভূত বঙ্গবাসী হইতে ারেন না। ইঁহারা গোপালের পিতা ধনাঢ্য বপ্যটের অনুগত য়েকজন লোক হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ এই প্রশস্তি শত্রুপক্ষীয়ের হে, গোপালের পুত্র ও উত্তরাধীকারীর।

দিব্য বা দিব্যোক একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন এবং দুঃস্থ াঙ্গালীকে এক মহাবিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া চিরকালের জন্য াঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—এই ঐতিহাসিক সত্যটুকুই তাঁহার ্যাতির পক্ষে যথেষ্ট।"—ইতিহাসে রমেশ বাবু যদিও ইহা প্রকাশ করেন াই তথাপি তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক দিব্যকে এই প্রশংসাপত্র দিয়াই ঙ্কর্লাচত্বে বলিয়াছেন—"পক্ষান্তরে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই বদ্রোহের ফলেই সুপ্রতিষ্ঠিত পালরাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। বাঙ্গালার রাজ-ক্তি ক্ষীণ হয়। বঙ্গদেশ বহু খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হয় এবং পরিণামে বদেশী কর্ণাটগণের পদানত হয়।" রাধাগোবিন্দ বাবুও বলিয়াছিলেন—দেশ তখন (ভীমের রাজত্বকালে) একরূপ অরাজক।—ইহার নেতা াই। অকর্ণধার নৌকার মত তাহা যেন কোথায় ভাসিয়া চলিতেছে, সই জন্য রামপাল প্রজাবর্গকে নানারূপ অর্থদানাদি দ্বারা সন্তোষিত রিয়া তাহাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৩৩১ ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী') রমেশ বাবু ও রাধাগোবিন্দ বাবুর এই ারণা কল্পনা মাত্র। ইহা সত্য হইলে ভীমের শাসনের সাফল্য সম্বন্ধে ্রত্যক্ষদর্শী শত্রুপক্ষীয় কবি বহু প্রশস্তি রচনা করিতেন না। তিনি লখিয়াছেন, "রাজা ভীমকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ লাভ করিয়া-ছল; সজ্জনগণ অযাচিত দান লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী কল্যাণযুক্ত ইয়াছিল—"ইত্যাদি। দিব্যের সিংহাসন প্রাপ্তিতে বঙ্গরাজ্য ছারখার য় নাই। তৎকালে রাজশক্তি প্রবল ছিল না, প্রজাশক্তিই প্রবল ছল। মহীপালের গর্হিত আচরণে যখন পালসাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ড়িতেছিল তখন সামন্ত নায়কগণ তৎকালীন শ্লাঘ্যজন দিব্যের নেতৃত্বে জশক্তি অধিকার করিয়া রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করেন। এ চেষ্টা প্রশংসনীয় নহে। পরে রামপাল কর্ত্তৃক সমগ্র ভারত হইতে সংগৃহীত ন্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নব রাজশক্তি তথা বঙ্গের প্রজাশক্তির কণ্ঠরোধে, বাঙ্গালীর দ্বারা বাঙ্গালীর পরাজয়ে বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। রামপাল স্বীয় রাজধানী রামাবতীর ভিত্তি বীর প্রজার চূর্ণীকৃত অস্থিপঞ্জরের উপর প্রতিষ্ঠা না করিয়া যদি বাঙ্গালাদেশে শক্তি সঞ্চয় করতঃ সফলকাম হইতেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা বিদেশী কর্ণাটগণের পদানত হইত না। রামপাল যে বিদেশীয়গণের সাহায্য লইয়াছিলেন তাহার জন্য দিব্য কিংবা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বা তদানীন্তন সামন্তশক্তি দায়ী হইতে পারেন না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার 'বিশ্বকোষের' রাজন্য কাণ্ডের ১৩৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—প্রজারঞ্জক, বুদ্ধিমান ও শক্তি-শালী নরপতি ভীমকে পরাজিত কর রামপালের সহজসাধ্য ছিল না। সেইজন্য তিনি পিতৃপ্রজাগণের উপর নির্ভর না করিয়া সমগ্র ভারত হইতে শক্তিসঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হন। ৺বসন্তকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁহার 'বৈদ্যজাতির ইতিহাসে'র ৭২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"২য় মহীপালের রাজত্বকালে যখন গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল—তখন মাহিষ্য-বংশীয় দিব্যোক ও ভীম প্রজাবর্গের হৃদয়ে যে রত্নসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করেন পরবর্ত্তী সময়ে পালভূপাল রামপাল গৌড়রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিলেও তাহার পুনরুদ্ধার করিতে পারিলেন না।" স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন—"রামপাল বরেন্দ্রের পুনরধিকারের যে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন তাহা সাম্রাজ্যের এক অংশের বিরুদ্ধে অপর অংশের যুদ্ধ—civil war—নহে —একদল ভাড়াটিয়া (marcenary) সৈন্যের সাহায্যে প্রজাশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান মাত্র।" (১৩২২ ফাল্গুন সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী') পরে ব্যথিত চিত্তে মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন—"রামপালের বিপুল বাহিনী কর্ত্তৃক ভীম ও হরির পরাজয় কেবলমাত্র ব্যক্তিবিশেষের জয় পরাজয় নহে। ইহা একটি মহাব্রতের অবসান কাহিনী। দিব্যোক কর্ত্তৃক এই মহাব্রতের আরম্ভ হইয়াছিল; সে ব্রত উদ্‌যাপিত হইবার পূর্ব্বেই রামপালের ক্রীতদাস সামন্তরাজগণ তাহার ধ্বংসসাধন করিলেন" (১৩২২ চৈত্র সংখ্যা 'মানসী ও মর্ম্মবাণী')

শিলালিপি ও তাম্রশাসনে যাহা নাই তাহা যদি ইতিহাসে গ্রাহ্য না হয়, তাহা হইলে ইতিহাসের তিন-চতুর্থাংশ বাদ দিতে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—আদিশূরের অস্তিত্ব ও বল্লাল সেনের কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টি সম্পর্কে আজও কোন সত্য প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক প্রবাদ মাত্র রহিয়াছে। কিন্তু ইহা কতক ব্যক্তির চিত্তবিকাশের অনুকূল বলিয়া ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া হয় না। আবার কাহারও কাহারও চিত্তবিকাশের প্রতিকূল বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে স্কুলপাঠ্য ইতিহাস লেখকগণ আলাউদ্দিন খিলিজি, মহম্মদ তোগলক প্রভৃতির চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে লিখিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র বাঙ্গালী জনসাধারণের চিত্তবিকাশের অনুকূল দিব্যের ইতিহাস কেন স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বিকৃত করিয়া রাখা হইবে, বুঝি না। দিব্যস্মৃতি উৎসবের প্রধান পুরোহিতরূপে রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলিয়াছিলেন—"যে দুই জন মহাপুরুষ বিশেষ বিপৎকালে এ দেশে অনন্ত সামন্তচক্রের মঙ্গলময় ঐক্যের সুমতি উদ্‌-বোধিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চরিতকথা আমাদের স্মরণীয়, মননীয় এবং কীর্ত্তনীয়। এইরূপ স্মরণ, মনন, কীর্ত্তন আমাদের মনে ঐক্যের সুমতি উদ্বোধনের সহায়তা করিতে পারে। ইহাই দিব্যস্মৃতি উৎসবের সার্থকতা। আর এক কারণেও এই উৎসব বড় সময়োপযোগী হইয়াছে। শিক্ষিত বাঙ্গালী আজ আত্মনির্ভর ও আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে। তাহাকে আবার দেশের দিকে ফিরাইয়া আনিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় দেখা যায় না।"

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র মাসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বর্ষারও অবসান হোল। এখন সমস্ত আকাশ অবর্ণনীয় গাঢ় নীল, কোথাও লেশমাত্র মেঘের মালিন্য নেই। কাঁচা সোণার মতো রোদ জ্যোতির্ম্ময় নীল আকাশে ঝলমল ক'রচে দেখা যায়। এমনি এক রৌদ্র-ঝলমল দিনে সকাল বেলা ন'টার সময় উত্তরপাড়ার রিটায়ার্ড সাবডিভিশনাল অফিসারের ছবির মতো সুন্দর বাড়ীখানির গেটের সামনে এসে থামল একখানি ট্যাক্সি, ট্যাক্সি থেকে সুটকেশ হাতে যে আরোহী নামল—সে যুবক। যুবকটি দীর্ঘ, স্বাস্থ্যবান এবং অত্যন্ত সুশ্রী, এতো সুশ্রী যে একটিবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কঠিন। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের ভাড়া চুকিয়ে তার বিনীত সেলামের প্রত্যুত্তর দিয়ে যুবকটি গেটে ঢুকল। তার অসাধারণ সুন্দর চেহারা অঙ্গের প্রসাধন এবং গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে এ-কথা সহজেই বোঝা যায়, যুবকটি বিশেষ কোন সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্ভুক্ত। বাড়ীর ঠিক সামনেই খানিকটা জমি, তাকে দ্বিধা বিভক্ত ক'রে একটি রাঙা পথ বাড়ীর গায়ে লাগোয়া ক্রমোচ্চ সোপানগুলির তলায় গিয়ে ঠেকেচে। রাঙা-পথটার এক পাশে কঞ্চির বেড়া দিয়ে ঘেরা বিভিন্ন বর্ণের দেশী ও বিলাতী ফুলের কুঞ্জ। তারই ঘন সুগন্ধ আশে পাশের বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। অন্য-পাশে সবুজ ঘাসে মোড়া লন, তার উপরকার ইজি চেয়ার-টাকে কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলি চেয়ার পড়ে র'য়েছে দেখা গেলো। এইখানে বসেই হয়তো গৃহস্বামী হাস্যমুখর সবান্ধব সন্ধ্যা উপভোগ করেন। চারদিক চেয়ে যুবকটির মন বেজায় খুসী হ'য়ে উঠল। চমৎকার বাড়ীর চারপাশের আবহাওয়া, আর ছোটর উপর বাড়ীখানি কী ডিসেণ্ট! মনের আনন্দে ফট্ ক'রে একটি ফুল বোঁটা থেকে ছিঁড়ে নাকের তলায় ধরে গন্ধ নিতে নিতে ক্রমোচ্চ সোপানগুলি পেরিয়ে সে উপরে উঠল। বাইরে তিনখানি ঘর, কিন্তু জন-প্রাণী নেই, এমন কি আশ-পাশে একটা চাকরকেও দেখতে পাওয়া গেলো না। এই অবস্থায় সকলে যা করে যুবকটি তাই করল। সটান সামনের ঘরটায় ঢুকে সুটকেসটা টেবিলের উপর রেখে সশব্দে চেয়ারটা টেনে ব'সে পা দুটো টেবলের তলায় যতখানি যায় প্রসারিত ক'রে দিল। তারপর টেবলের উপরকার কলিঙ বেলটা বাজাল ক্রিঙ্ ক্রিঙ্ ক্রিঙ। ঠিক তার একটু পরেই দরজার সামনে শশব্যস্ত চাকরের আর্বির্ভাব। এইখান থেকেই এ গল্পের সুরু।

'তোমার বাবু কোথায়?'

চাকরটা যুবকটির মাথা থেকে পা অবধি ভালো ক'রে দেখে নিয়ে জবাব দিল: 'বাবু? বাবু তো এই মাত্তর কলকাতায় চ'লে গেলেন, এবেলা তো আর ফিরবেন না।' কথাটা ব'লে একটু ইতস্তত: করে অবশেষে প্রশ্ন ক'রল: 'কলকেতা থেকে আসচেন? আপনার নাম বিজনবাবু?'

'হাঁ' যুবকটি বিস্মিত কণ্ঠে বললে: 'কিন্তু তুমি আমাকে চিনলে কি করে?'

চাকরটা সমগ্র দন্তপংক্তি বিকশিত ক'রে বললে: 'আজ্ঞে বাবু, আপনাকে চিনতে কি আর ভুল হয়। তাছাড়া মা'র কাছে শুনেচি আপনি আজ আসবেন। আপনার জন্যেই তো এতোক্ষণ ব'সে ছিলুম। এই মাত্তর যেই বাড়ীর ভিত্‌রে গেচি আর বেলের শব্দ। আপনি একটু বসুন বাবু, আমি মাকে খপর দিয়ে এই এলুম ব'লে।'

একটু পরে ফিরে এসে টেবলের উপর থেকে সুটকেসটা তুলে নিয়ে কৃতার্থ হ'য়ে সে বললে: 'আসুন, বাবু, মা ডাকচেন।'

ভাইকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে আসতে ব'লে সবিতা নিজেকে বেশ সংযত ক'রে নিলে। আজ ন'বছর পরে ভাই আসছে তার সঙ্গে দেখা ক'রতে। সবিতার মা বাবা কেউ বেঁচে নেই, সে সম্পর্কে আপনার ব'লতে মাত্র একজন আছে, সে হ'চ্ছে তার এই ভাই বিজন। কিন্তু সেও তো না থাকারই মধ্যে। ন'বছর আগে যখন স্বামী মারা যান তখন বাবার সঙ্গে একবার এসেছিলো দেখা ক'রতে। তারপর

এম-এ পাশ ক'রে সেই যে চাকরী নিয়ে শিলঙ গেলো, ন' বছর আর এ মুখো হলো না। এমনি ক'রে যে দূরেই থাকে, যার সঙ্গে নিজের জীবনের সুখদুঃখ আনন্দ বেদনার কোন যোগসূত্র নেই হাজার রক্তের সম্বন্ধ থাক না কেন তাকে আপনার ব'লে ভাবা যায় কী ক'রে? বিজন তো তাকে পরই ক'রে দিয়েছে। এই দীর্ঘ দিন পরে বুঝি দিদিকে তার মনে প'ড়ল? যাই হো'ক সে এসেছে এই আনন্দের অনুভূতি সবিতার অত্যন্ত তীব্র হ'য়ে উঠল। বিজনকে এখন আপনার ব'লে কাছে পাবার কল্পনা করা তো তার দুরাশা। এখন সে কত বড়! তার কত সম্মান! তার কাছে আজ হয়তো সবিতার স্নেহের কোন মূল্যই নেই।

বিজনের প্রতীক্ষায় সবিতা দালানে এসে দাঁড়াল। বিজন চাকরের সঙ্গে এসে সবিতাকে দেখেই 'এই যে দিদি' ব'লে তাড়াতাড়ি নিচু হ'য়ে পায়ের ধুলো মাথায় নিলে। সবিতা তার মাথায় হাত দিয়ে নীরবে আঙুলের প্রান্তভাগ চুম্বন ক'রল। ভাইকে দেখে এবং তার উচ্ছ্বসিত কণ্ঠের 'দিদি' ডাক শুনে সবিতা এমনি আনন্দ-বিহ্বল হ'য়ে প'ড়েছিলো যে, তৎক্ষণাৎ কোন কথাই তার মুখ দিয়ে বার হ'লো না।

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বিজনের মুখের দিকে চেয়ে সবিতা বললে: 'হাঁ রে এমনি ক'রেই বুঝি দিদিকে পর ক'রে দিতে হয়? নইলে বেঁচে আছি কি মরে গেছি সে খোঁজও তো রাখিসনে?'

বিজন তৎক্ষণাৎ জবাব দিল: 'আমি জানতাম তুমি বেঁচে আছ এবং ভালোই আছ, নইলে হাকিম সায়েব কি একটা চিঠিও দিতেন না, দিদি?'

ব'লে বিজন হো হো ক'রে হেসে উঠল। তার এই উচ্ছ্বসিত হাসি ও কথাবার্ত্তার ধরণ মুহূর্ত্তকালের মধ্যে সবিতাকে সুদূর অতীতের বিস্মৃত-প্রায় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এ সেই হাসি। ন বছর আগেকার বিজনকে তার মনে পড়ল। তখন তার কথার ধরণ ছিলো ঠিক এমনি। এমনি কারণে অকারণে তার হাসি উঠত উচ্ছ্বসিত হ'য়ে। কালের অপ্রতিহত প্রভাব তার প্রাণের প্রাচুর্য্যকে একেবারে নিঃশেষ করতে পারেনি দেখে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে সবিতার বুক দুলে উঠল। কারণ, দেখা হবার ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত তার এই আশঙ্কা ছিলো, হয়তো এই কটা বছরের মধ্যে বিজনের কত পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, আজ তার কথায় ব্যবহারে হয়তো তাকে সেই বিজন ব'লে চেনাই যাবে না। মানুষের পরিবর্ত্তন তো অস্বাভাবিক নয়।

সবিতার কয়েকটা প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে বিজন বললে: 'আপিসের কাজে এসেছিলাম কলকাতায়, তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো। তা না হ'লে আরও যে কতদিন দেখা হো'ত না, দিদি। এদিকে তো আসাই হ'য়ে ওঠে না। তার ওপর আবার যে রকম কুঁড়ে আমি।'

'তুমি যে আমার এখানে এসেচো সে আমার সৌভাগ্য', সবিতা তার মুখের দিকে চেয়ে সুর বদলে বললে: 'হাঁরে তোকে আর চাকরী নিয়ে কতদিন ওখানে প'ড়ে থাকতে হবে? একবার সায়েবদের ব'লে ক'য়ে দেখনা, ভাই, যদি তোকে কলকাতায় বদলি করে।'

সবিতার করুণ কণ্ঠের এই মিনতি বিজনের হৃদয়কে নিমেষের জন্যে গভীর ভাবে স্পর্শ করল। দিদির যে ব্যথা কোথায় তার তো তা অজানা নেই। বিজন যে চিরদিন তার নাগালের বাইরে এক নির্ব্বান্ধব অনাত্মীয়ের দেশে চাকরী নিয়ে প'ড়ে থাকবে এ যেন সবিতা কোন মতেই সহ্য করতে পারে না। এ কথা সবিতার এই প্রথম নয়, প্রত্যেক চিঠিতে সে এই অনুরোধ ক'রে এসেছে। সেই সব কথা স্মরণ ক'রে বিজন ব্যথিত না হ'য়ে পারলে না। দিদির এই বেদনা তো অসঙ্গত নয়। কিন্তু সে আচরণে এবং কথায় নিজের এই দুর্ব্বলতা প্রকাশ হ'তে দিল না। হেসে কণ্ঠস্বর সহজ ক'রে কিম্বা করবার চেষ্টা ক'রে বললে: 'তার জন্যে কি কম চেষ্টা ক'রেচি, দিদি, কিন্তু কোন ফলই হয়নি। নইলে বালীগঞ্জের অমন বাড়ী ভাড়া দিয়ে কে আর বিদেশে প'ড়ে থাকতে চায় বলো?"

'তাহ'লে তোর কলকাতায় বদলি হ'য়ে আসবার আশা আর নেই?'

'কি ক'রে জানবো? সে ওপরওলারাই জানেন। তাঁদের মর্জ্জি।'

সবিতার মুখ বিবর্ণ হ'য়ে উঠল। তার সব আশার মূলে পড়ল নির্ম্মম কুঠারাঘাত। এক মুহূর্ত্ত ভায়ের মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে বললে: 'তোকে সারাজীবন

তাহ'লে এমনি বাউণ্ডুলের মতন ওখানে প'ড়ে থাকতে হবে? বিয়ে-থাও কোনদিন ক'রবিনে বল্?'

'অগত্যা', বিজন বিশেষ একটা রহস্যের ভঙ্গী ক'রে ব'লে উঠল।

'না তা কিছুতেই হবে না', সবিতা আর থাকতে না পেরে সজোরে ব'লে উঠল: 'যেখানেই থাকো এবার তোমাকে বিয়ে-থা ক'রে সংসারী হ'তে হবে। আমার চোখের সামনে তুমি যে চিরদিন ভবঘুরের মত ভেসে ভেসে বেড়াবে এ আমি কিছুতেই দেখতে পারবো না।'

সবিতার দু'চোখ অকস্মাৎ জলে ভ'রে গেলো।

সর্ব্বনাশ! বিজন ভীত হ'য়ে উঠল। আর এ প্রসঙ্গকে আমল দিলে সবিতা হয়তো চোখের জলের নদী বইয়ে দেবে, এই অবস্থায় এইখানে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য বিশেষ উপভোগ্য হবে না। চকিতে একবার চারধার দেখে নিয়ে বিজন তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল: 'দোহাই দোহাই, দিদি, ও সব সমস্যার সমাধান করবার ঢের সময় পাবে। আপাততঃ ভ্রাতৃ-সৎকারের দিকে মন দাও। সেই যে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি, একবার ব'সতেও তো বললে না। এদিকে যে 'পারে না বহিতে পা দেহ ভার।'

এবার কথা শেষ ক'রে সে আর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে হেসে উঠতে পারলে না।

সবিতা চোখ মুছে ধরাগলায় চাকরটাকে উদ্দেশ ক'রে বললে: 'ভোলা বাবুকে দিদিমণির শোবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা আমি যাচ্চি' বিজনকে বললে: 'এতোকাল পরে এলি দশ পনেরো দিন এখন থাকবি তো?'

'দশ পনেরো দিন?' বিজন হেসে বললে: 'দশ পনেরো দিন এখানে থাকলে আপিসে জন্মের মত ছুটি হ'য়ে যাবে। কাল রবিবার রাত আটটায় শিলঙ মেলে আমাকে যেতেই হবে।'

২

সবিতার নির্দ্দেশমত ভোলাকে অনুসরণ ক'রে বিজন তেতালার একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল। সুটকেসটা একপাশে রেখে বিজনের অনুমতি নিয়ে ভোলা নীচে নেবে গেলো। বিজনের মনটা গিয়েছিলো বিস্বাদ হ'য়ে। সামান্য একটা কারণে সবিতা একেবারে কেঁদে ভাসিয়ে দিল! কী অসহ্য এমনতরো বাড়াবাড়ি। সৌভাগ্য তার সেখানে এ বাড়ীর আর কেউ ছিলো না। তাহ'লে লজ্জায় মাথা কাটা যেত আর কি। সবিতা তার নিজের বোন, সেই হিসাবে বিজনের এই দূর প্রবাসে চিরকাল অবস্থানের জন্যে তার দুঃখ করার অভিযোগ করার একটা সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু বিয়ে করাবার জন্যে এমনতরো জেদাজেদি কেন? মেয়ের পাণিগ্রহণ না ক'রলে বুঝি মানুষ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ ক'রতে পারে না? কেন সবিতার মনে এমন অর্থহীন ধারণা বদ্ধমূল হ'য়ে আছে? সবিতা তার সম্বন্ধে কিছুই জানে না, কিন্তু সে তো জানে জীবনকে সব দিক দিয়ে কেমন ক'রে সে উপভোগ ক'রছে। কিন্তু ঘরে ঢুকতেই তার মনের সরসতা আবার ফিরে এলো। ঘরটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই তার মন ব'লে উঠল: বাঃ কী সুন্দর!

মাঝারি গোছের সাজানো-গোছান ঝকঝকে শোবার ঘরখানি। কিন্তু আসবাবপত্রের আড়ম্বরে একেবারে ভারাক্রান্ত নয়, বরঞ্চ আসবাবপত্রের এই স্বল্পতা ঘরখানিকে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় শ্রী দিয়েচে যে দু'দণ্ড চেয়ে থাকতে সাধ হয়। বিজনের উৎসুক দৃষ্টি চারদিকে ঘুরতে লাগল। ঘরখানির উত্তর ও পশ্চিমে দুটি খোলা জানালা, তাদের গায়ে টাঙানো ঘন নীল পরদা দু'খানি বাইরের উচ্ছ্বসিত হাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে ফেঁপে ফুলে উঠছে। ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকের দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে যে খাটখানি আছে তার বুকে নরম পুরু গদির উপর দুধের মত শাদা ধপধপে চাদরখানি এমনি সুন্দরভাবে টান ক'রে বিছানো র'য়েছে যে খাটের মাথার দিকে উঁচু ক'রে বালিশ রাখা সত্বেও কোথাও একটি মাত্র রেখাও পড়েনি। পূবদিকের দেয়ালে গাঁথা রঙীন আলমারি দুটির ঠিক মাঝখানে দামী ড্রেসিং টেবলের উপর একগোছা চুলের কাঁটা, কয়েকটা ফিতে, চিরুণি, ক্লিপ, গন্ধ তেলের শিশি প্রভৃতি যাবতীয় কেশের সরঞ্জাম। উত্তরদিকের জানালার পাশে ছোট আলনাটির গায়ে দু'খানি ভিন্ন রঙের কুঁচোনো শাড়ী দুটি, ব্লাউজ দুটি, সেমিজ পাশাপাশি শোভমান এবং তার ঠিক নীচে একজোড়া ডিসেণ্ট স্লিপার অব্যবহৃত হ'য়ে প'ড়ে র'য়েছে। ঘরের এককোণে নীচু ছোট টুলের উপর সবুজ ঝিলিমিলি দেওয়া নীল বাল্‌বের সুন্দর টেবল ল্যাম্প। আর এককোণে কয়েকখানা আধময়লা শাড়ী সেমিজ ধোবার

জন্যে অপেক্ষা ক'রছে। ঘরটি নিখুঁত। চারদিক চেয়ে বিজন ভারি আরাম পেলো। এ'যার ঘর তার যে রুচি স্থূল নয়, একথা খুব সহজে বোঝা যায়। নানা কারণে দেহ তার অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছিলা, সুটকেস থেকে একখানা বই বার ক'রে নিয়ে সেই নরম কোমল বিছানার উপর পরিশ্রান্ত দেহভার ডুবিয়ে দিল। কয়েক মিনিট এমনি সুমধুর আলস্যের মধ্যে কাটিয়ে হঠাৎ তার মন এক কৌতুক রসে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। আচ্ছা ধরেই নেওয়া যাক্‌ দিদির কান্নাকাটিতে গ'লে বাধ্য হ'য়ে সে বিয়েই করল। মেয়েটি খুব সুশ্রী। সেই সুশ্রী মেয়েকে পাশে নিয়ে এমনি এক ঝকঝকে শোবার ঘরে এমনতরো নরম পুরু ধপধপে বিছানায় দেহ ডুবিয়ে এমনি ক্লান্তিহর অবসর কেমন কাটে? ঘর এমনি নিভৃত স্নিগ্ধ, সেখানে সে তার মুখের উপর ঝুঁকে তন্ময় হ'য়ে মৃদুকণ্ঠে আলাপ ক'রছে। তাদের সেই অস্ফুট গুঞ্জনে ধীরে ধীরে একটি গাঢ় আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠেছে তাদের চারপাশে। মেয়েটির সুঠাম দেহের আশ্চর্য্য স্পর্শ তার আবেশ বিহ্বল অবগাঢ় দুটি চোখ, মুখের রক্তিমা-দীপ্তি, কেশের মৃদু গন্ধ হয়তো তখন বিজনের সমস্ত চেতনাকে তীব্র সুরার মতো আচ্ছন্ন অভিভূত ক'রে রেখেছে। কল্পনায় ছবিটির রঙ তার মনে পুরোপুরি ঘনিয়ে উঠবার আগেই বিজন সেটাকে জোর ক'রে নষ্ট ক'রে হেসে উঠল, মন্দ নয়, এমন রৌদ্রালোকিত সুন্দর দিনটি, বৃক্ষপত্রের অবিশ্রাম সঘন কম্পনে যখন আশপাশ মুখর তখন আমার মন এক অর্থহীন কল্পনাকে কেন্দ্র ক'রে মধুচক্র রচনা করবার ব্যর্থ প্রয়াস ক'রছে।

অথচ তার মনের এই ক্ষণিক কল্পনার কথা যদি সে গল্পচ্ছলেও তার শিলঙের বন্ধু-বান্ধবের কাছে করে, তারা মনে মনে জানে, বিজন উনিশের ঘরের নামতা মুখস্থ ক'রেও বিশ্বাস ক'রবে না। তারা সময় কাটাবে তবুও কোন মেয়েকে একান্ত আপনার কল্পনা ক'রে সময় নষ্ট করবে না। তার বন্ধুদের এ মনোভাবের কারণ আছে। শিলঙ-প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে তার খ্যাতি ও সম্মান সব চেয়ে বেশি। তার প্রধান কারণ তিনটি। বিজন উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, দেখতে খুব সুশ্রী এবং চাকরীটিও ভালো। মানে, সম্মান ও অর্থ প্রচুর। বর্তমানের পাঁচশো টাকা মাইনে ভবিষ্যতে হাজারকেও অনেক ছাপিয়ে যাবে। এই সবের জন্যে সেখানকার অনেক অভিজাতগণের লুব্ধ ও সতর্ক দৃষ্টি ছিলো এই প্রিয়দর্শন অবিবাহিত যুবকটির উপর। হাঁ জামাই যদি ক'রতেই হয় তো এই ছেলে। কিন্তু বিজন কোন কালেই এই সব আভাষ ইঙ্গিতকে আমল দিত না। বরঞ্চ জীবনে নারীর যে কোন প্রয়োজন আছে এ কথাটাই সে ক'রতো অস্বীকার। চাকরীর সময়টুকু ছাড়া তার অবসর আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠত বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে আমোদ ক'রে, বিলিয়ার্ড খেলে, মোটর ক'রে সদলবলে দূরের কোন পাহাড়ের নিভৃত-স্নিগ্ধ স্থানে গিয়ে পিকনিক ক'রে, গানের মজলিসে গিয়ে গান শুনে ও কখনো কখনো গান গেয়ে। বই পড়াটা ছিলো তার নেশার মতো। প্রতিদিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে সে দেশ বিদেশের সাহিত্য নিয়ে মশগুল হ'য়ে প'ড়ত এবং মাসের শেষে একটা মোটা টাকা ব্যয় হো'ত এই বই কেনার জন্যে। তাদের পাঁচজনের উৎসাহে একটি সাহিত্য সভা সেখানে গড়ে উঠেছিলো, ঐখানে তার উপস্থিতি ছিলো নিয়মিত। সাহিত্য নিয়ে সে পাঁচজনের সঙ্গে গভীরভাবে আলোচনা ক'রত ও মাঝে মাঝে স্ত্রীগুণার্গের পক্ষ নিয়ে ইবসেনের ধারালো অস্ত্রকে ভোঁতা ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবার জন্যে পাঁচজনের বিরুদ্ধে ঘোর তর্ক ক'রত। জীবনটাকে সে এমন ভাবে গড়ে তুলেছিলো যে, কারোরই বোঝবার যো ছিলো না ওর মধ্যে কোথাও এতোটুকু অপূর্ণতা র'য়েছে। তার দিকে চেয়ে তাকে বিচার ক'রলে তার নিজের মত আমাদেরও মনে হবে, এমন পরিপূর্ণভাবে জীবনকে উপভোগ ক'রতে কম লোকেই পারে। বিজন নারীর কোন প্রয়োজন জীবনে স্বীকার করত না। কিন্তু না স্বীকার ক'রলেই বা ছাড়ে কে? তাই নাছোড়বন্দা বন্ধু-বান্ধবের পাল্লায় প'ড়ে মেয়ে দেখা নামক কর্ম্মভোগটা তাকে ক'রতে হ'য়েছিলো। সে কতবার গেছে মেয়ে দেখতে এবং মেয়ে দেখে বাড়ী ফেরবার সময় যখন বন্ধু উদগ্রীব হ'য়ে প্রতীক্ষা ক'রছে মেয়েটির রূপযৌবনের স্তুতি শোনবার জন্যে, তখন বিজন গৃহস্বামীর আদর আপ্যায়নের ও তাঁদের রন্ধন নৈপুণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে অন্য কথার অবতারণা ক'রেছে। এই ভাবে সে যে কতবার কত জনকে নিরাশ ক'রেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এই কয়েক মাস আগেকার কথা। এক নাছোড়বন্দা বন্ধু একরকম জোর ক'রেই এক বড়লোকের বাড়ী তাকে নিয়ে

গেলো মেয়ে দেখাতে। সে ব'লেছিলো এইবার এই মেয়েকে দেখে পছন্দ না ক'রেই সে পারবে না। মেয়ে দেখা হ'য়ে যাবার পর গাড়ী ক'রে বাড়ী ফেরবার সময় বিজন যখন গত রাত্রে পুনরায় শেষ করা টুর্গেনিভের 'ফাদার এণ্ড চিলড্রেন'এর বাক্যারম্ভের কথা ভাবছিলো তখন বন্ধুটি যে বক্তৃতা সুরু ক'রে দিল তার মর্ম্মার্থ ও মর্ম্মান্তিক অর্থ হ'চ্ছে এই যে, নারীছাড়া পুরুষের জীবন তো মরুভূমি। পুরুষের জীবনে সরসতা আনতে পারে একমাত্র নারী। বিজনের এই ব্রাইট ফিউচার; এখন তার নারীর প্রেরণার ভয়ানক প্রয়োজন। পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত যত মনীষী জন্মগ্রহণ ক'রে পৃথিবীকে ধন্য ক'রে গেছেন তাঁদের সকলকে প্রেরণা দিয়েছে—নব-নব সৃষ্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত ক'রেছে এই নারী পবিত্র গৃহ-লক্ষ্মীরূপে। বন্ধু উচ্ছ্বাস থামিয়ে তার মুখের দিকে চাইতেই বিজন হেসে ব'লেছিলো, 'একটা মস্ত ভুল কথা বললে বন্ধু! গৃহলক্ষ্মী নারীর প্রেরণা ছাড়াও অনেক মনীষী পৃথিবীকে ধন্য ক'রে গেছেন। নিউটন বিথোফেন মাইকেল এঞ্জেলো, প্লেটো, শোপেনহর, স্পেনসর এঁরা কি মনীষী ছিলেন না?' তার এই কথার কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে বন্ধু গভীর নৈরাশ্যে স্তব্ধ হ'য়ে রইল। নাঃ ও যখন এইভাবে নারীর প্রয়োজনকে জীবনে অস্বীকার করে তখন বিয়ে করা ওর পক্ষে অসম্ভব এবং শিলঙ-প্রবাসী সকলের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল র'য়ে গেলো, বিজন একজন নারী-বিদ্বেষী। কেউ কেউ ওর ভবিষ্যৎ শ্বশুর হবার গৌরবের আশা ত্যাগ ক'রলেন, কেউ কেউ ক'রলেন না; মনকে সান্ত্বনা দিলেন এই ব'লে যে, এটা একটা তার চাল। আসলে কোন মেয়ে তার মনের মতো হোচ্ছে না ব'লে বিজন এজন্যতরো ভাব দেখাচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে যারা একটুখানি চিন্তাশীল তারা তার এই আচরণের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য কি তাই নিয়ে গবেষণা ক'রে এই সিদ্ধান্তে অবশেষে উপনীত হোল যে, বিজন কোন মেয়ের কাছ থেকে ঘা খেয়ে সমস্ত নারী জাতির উপর এইভাবে প্রতিশোধ নিচ্ছে। বিজন সব রকম মন্তব্য শুনলো ও হাসল। কিন্তু শিলঙের সকলেই তার বিয়ের আশা ত্যাগ ক'রলে। সেই বিজন যদি কোন মেয়েকে একান্ত আপনার কল্পনা ক'রে একটু সময়ও কাটায়, তবে তারা এটা বিশ্বাস ক'রবে কী ক'রে?

মিনিট পনেরো পরে সবিতা ঘরে এলো; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে: 'শুয়ে আছিস?'

'হুঁ' বিজন মধুর আলস্য উপভোগ করতে করতে বললে: 'বেশ লাগছে।'

সবিতা বিজনের মুখের সামনে এসে বললে: 'নে এখন ওঠ, ভোলা জল-টল সব ঠিক ক'রছে, উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছাড়।'

'তার আর দরকার নেই দিদি' বিজন বললে: 'আমি চান ক'রে কাপড় বদলে তবে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি।'

'তা হোক তুমি এখন ওঠো দিকিনি' সবিতা বললে: 'মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেলো। ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া কাপড় প'রে থাকা হবে না। তোমাদের তো দেহে ঘেন্না-পিত্তি নেই, কিন্তু আমি এসব অনাচার বাড়ীতে সইতে পারিনে। আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘিন ঘিন করে।'

বাঙ্গালী ঘরের মেয়েদের যদি শুচিবায়ুতার পরীক্ষা করা হয় তাহ'লে সবিতা যে প্রথম শ্রেণীর প্রথমা নির্ঘাৎ হবেন তাতে বিজনের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তথাপি সে এমন একটা অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর কাজ থেকে রেহাই পাবার জন্যে প্রাণপণ প্রয়াস ক'রল। দুটি হাত যুক্ত ক'রে বললে: 'তোমার দিব্বি ক'রে ব'লচি, দিদি, বিশ্বাস করো ছত্রিশ জাত ছোঁয়া তো দূরের কথা আজ সকালে অতোগুলো সংখ্যার মানুষই দেখিনি। কেবল এক পাঞ্জাবীর মোটর ক'রে এখানে এসেছি; কিন্তু তার স্পর্শ-সুখের সৌভাগ্য হয়নি। তোমার কথা ভেবে ভাড়ার টাকাটা তার লোমশ করকমলে আলগোছা দিয়েছিলাম।'

তার কথা বলার ধরণে সবিতা হেসে ফেললে, বললে: 'আর রঙ্গরসে কাজ নেই। যতই চালাকী করো না কেন কাপড় না বদলালে আমি ছাড়বো না।' তারপর তাড়া দিয়ে বললে: 'নে ওঠ; কেন মিছিমিছি দেরি ক'রচিস।'

বিজন অনুনয় বিনয় ক'রে বললে: 'তোমার পায়ে পড়ি, দিদি, এই সকাল বেলায় মিছিমিছি আর এ হাঙ্গামায় আমাকে জড়িয়ো না। বিশ্বাস করো—'

'আঃ এমন বাজে তর্ক করিস' সবিতা বিরক্ত হ'য়ে বললে: 'বার বার ব'লচি ও-কাপড়ে থাকা হবে না, তবু—কি রে ভোলা, বাবুর জল তোয়ালে সব ঠিক ক'রে

রেখেছিস ? তুই ওঠ্ তোর জামা কাপড় স্যুটকেস থেকে বার ক'রে দিচ্ছি।'

বিজন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠল। কড়া পুলিশের এলাকায় প'ড়েছে, সেখানে কোন যুক্তি-তর্ক খাটবে না। সবিতাকে স্যুটকেশ থেকে জামা কাপড় বার ক'রতে দেখে সে যন্ত্র-চালিতের মত চাকরকে অনুসরণ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। মুখ ধুতে ধুতে সৃষ্টিকর্ত্তার উপর ভারি কুপিত হ'য়ে উঠল। মনে মনে বললে : যদি সবিতার মধ্যে শুচি-বায়ুতা ও স্নেহ-প্রবণতা কিছু কম পরিমাণে দিতে, তবে তোমার এতো বড় সৃষ্টিটা কী রসাতলে যেত।

কিছুক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরে এলে পর সবিতা বললে : 'হাঁ এখন কেমন হোল বল্ দিকি ? রাস্তার ধুলো-নোঙরা-মাখা কাপড়ে থাকা কি ভালো। ওতে ব্যামো হ'তে পারে। নে আয় ব'স।'

সবিতা এইবার কথা ব'লতে সুরু ক'রলো। বাঙ্গালী মেয়েদের স্বভাব (অন্ত দেশের মেয়েদের কথা তো জানিনা) কিছুদিন অদর্শনের পর কোন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলে প্রথমেই সে তাকে পরম আন্তরিকভাবে কয়েকটি প্রশ্নবাণ বর্ষণ করে। তা যেমন মামুলি, তেমনি মর্ম্মান্তিক। সবিতা বাঙ্গালীর মেয়ে, কাজেই তার এ স্বভাবের ব্যতিক্রম হবে কী ক'রে ? প্রথম সাক্ষাতে সে যে সব প্রশ্ন ক'রতে ভুলেছিলো এখন কাজ-কর্ম্ম চুকিয়ে এসে নিশ্চিন্ত হ'য়ে মনে ক'রে ক'রে সেই সব প্রশ্ন ক'রতে সুরু করল। তার প্রত্যেকটি কথায় ছিলো নিবিড় আন্তরিকতা, স্নেহের উচ্ছ্বাস, কিন্তু বিজনের নিঃশ্বাস একটুখানি পরেই রুদ্ধ হ'য়ে আসবার উপক্রম হোল। নিবিড় আন্তরিকতাভরা স্নেহসিক্ত কথাগুলি ইনজেকসনের সূঁচের মত তার দেহে ফুটতে লাগল। অসহায় করুণ চোখে মাতৃসমা দিদির মুখের দিকে তাকিয়ে সে অসাধারণ ধৈর্য্যের সঙ্গে তার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে যেতে লাগল। না দিয়ে যে নিস্তার নেই। বিজনের তখনকার মনের ভাবকে গুছিয়ে লিখলে এই রকম হয় : ভগবান ভ্রাতৃস্নেহ জিনিষটা অতি উপাদেয় ও পবিত্র এতে কোন ভুল নেই, কিন্তু মাঝে মাঝে এই ভ্রাতৃস্নেহ যে কী মর্ম্মন্তুদ হ'য়ে ওঠে তা যদি তুমি জানতে, করুণাময়, তাহ'লে এ স্নেহ সৃষ্টি ক'রে তুমি এতোখানি গৌরবান্বিত হ'তে পারতে না।

একটুখানি পরেই সবিতা থামল। সবিতা যে যথার্থই বিজনকে স্নেহ করে এই মুহূর্ত্তে সেই মহাসত্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে দিদির প্রতি শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় বিজনের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে উঠল।

তারপর সুরু হোল এ-কথা সে-কথা। সবিতার স্নেহ যতই কেন না তার কাছে মর্ম্মন্তুদ হোক সবিতার কাছে তা সত্য। কথা ব'লতে ব'লতে বিজন ভাবছিলো তার দিক দিয়েও আত্মীয়তা করা তো দরকার, নইলে ভালো দেখায় না। তাই একথা সেকথার পর এক সময়ে বললে : 'অনেকদিন তো বাড়ী থেকে কোথাও যাওনি, দিদি ; চলোনা মাস দু'য়েকের জন্তে শিলঙে। একটা নতুন দেশ দেখাও হবে, শরীরটাও সেরে আসবে।'

সবিতা প্রীত হ'য়ে হেসে বললে : 'তার উপায় নেই রে ! বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাওয়া আমার আর সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয় ? মনে ক'রলে কি আর দিনকতক শিলঙে বেড়িয়ে আসতে পারো না ?'

সবিতা আস্তে আস্তে বললে : 'উঁহু ; তা পারি না।'

'আচ্ছা তোমার যাওয়ার বাধাটা কি আগে শুনি ?' বিজন ভয়ানক আত্মীয়তা দেখিয়ে বললে : 'তারপর না হয় সে সমস্যার সমাধান ক'রে দেওয়া যাচ্ছে।'

সবিতা বললে : 'বাধা যে কত তা ব'লে শেষ করা যায় না। প্রধান বাধা আমি চ'লে গেলে এতো বড় সংসারটা দেখবার কেউ নেই। রাণু ছেলেমানুষ, তার ওপর তো সংসারের ভার দেওয়া যায় না। আর আমি ছাড়া বাড়ীতে মেয়ে ব'লতে তো ঐ এক রাণু।'

বিজন বিস্মিত হ'য়ে বললে : 'রাণু ? রাণু কে দিদি ?

সবিতা ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বললে : 'তুই রাণুকে চিনিসনে ?'

বিজন অম্লান বদনে বললে : 'কই না।'

সবিতা কয়েক মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে : 'ঠিকই তো। তুই রাণুকে চিনবি কি ক'রে। এখানে এলে আত্মীয় ভেবে যাতায়াত ক'রলে তবে না জানা-শুনো চেনা-পরিচয় হয়। তা তুই তো এ পথ ভুলেও কখনো মাড়াবিনে। আমরা তোর পর বৈ তো নয়।'

বিজন হেসে বললে : 'এবার না হয় আপনার লোক ভেবে আত্মীয়ের মতো যাতায়াত করা যাবে ; কিন্তু এখন

অপরিচিতা রাণুকে আমার কাছে পরিচিতা করাও দিকি। এখানে এসেছি অথচ কাকেও জানিনে, চিনিনে সেটা তো বড় ভালো দেখায় না।'

সবিতাকে রাণীর পরিচয় দিতে হোল। রাণী তার ভাসুর প্রতাপকুমার রায়ের বড় মেয়ে। ভালো নাম তার মাধবী; সকলে বাড়ীতে তাকে রাণী ব'লে ডাকে। প্রতাপ বাবুর স্ত্রী যখন মারা যান তখন রাণী ও তার ছোট ভাই ক্ষিতি খুব ছোট। যায়ের মৃত্যুর পর থেকে নিঃসন্তান সবিতা এই দুটি ছেলে মেয়েকে বুকে ক'রে মানুষ ক'রেছে এবং এই দুটি ছেলে মেয়ে তার সমস্ত বুকখানা এমনভাবে জুড়ে র'য়েছে যে তাদের ছেড়ে দুদিনও কোথাও সে থাকতে পারে না। ব'লতে ব'লতে সবিতার গলা ধরে এলো। বিজন পুনরায় ভীত হ'য়ে উঠল। সবিতা আবার স্বর্গগতা যায়ের জন্যে চোখের জলের প্লাবন না এনে ফেলে! তাহ'লেই ষোল কলা পূর্ণ আর কি। বাঙ্গালীর মেয়েদের তো আর জানতে বাকি নেই, তাঁরা এক একটি করুণ রসের উৎস। অশ্রু দেবার জন্যে উন্মুখ হ'য়েই আছেন। কিন্তু সবিতা শোকোচ্ছ্বাসটা আপাততঃ বন্ধ রাখায় বিজন এমনি উল্লসিত হ'য়ে উঠল যে, তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে তার মুখ থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে প'ড়ল। এই নিঃশ্বাস টের পেলো সবিতা। বিগলিত চিত্তে ভাবলে, যায়ের অকাল মৃত্যুর কথা স্মরণ ক'রে সহৃদয় ভাই আমার কোনমতেই নিঃশ্বাস চেপে রাখতে পারলে না। সবিতা রাণীর পরিচয় দিল। রাণী গত বছর আই-এ পরীক্ষা খুব ভালো ভাবে পাশ ক'রেছে। তার কলেজে প'ড়ে আরো পাশ করবার প্রবল ইচ্ছা ছিলো, কিন্তু সবিতার উৎসাহের অভাবে সেটা হোয়ে ওঠেনি। রাণীর মত সর্ব্বগুণসম্পন্না মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, এই কথা ব'লে সবিতা পরিচয়পর্ব্ব শেষ ক'রল।

বিজন নীরব হ'য়ে রইল। নারী সম্বন্ধে চিরদিন যেমন সে লোকচক্ষে নির্ব্বিকার এইখানেও সেই রকম নির্ব্বিকার হ'য়ে রইল। সর্ব্বগুণাধার রাণী সম্বন্ধে তার কোন কৌতূহলই হোল না।

একটু পরে ভোলা এসে বললে: 'মা, বাবুর খাবার হয়েচে বামুন ঠাকুর ডাকচে।'

'যাই রে' ব'লে সবিতা উঠে দাঁড়াতেই বিজন বাধা দিয়ে ব'লে উঠল: 'দিদি দোহাই তোমার, আমার সঙ্গে আর যা করো তা করো কুটুম্বিতা ক'রো না। ও আমার সইবে না। এই সকাল বেলা আমি কিছুতেই খেতে পারবো না। তার চেয়ে বরঞ্চ দু'কাপ চা বেশি দিয়ো, আপত্তি ক'রবো না।'

সবিতা ভালো ক'রেই জানে এর পর তাকে খাওয়াতে রাজি করানো যাবে না; তবু কর্ত্তব্য হিসাবে বললে: 'খাবিনে কেন? তোর হ'য়েচে কি?'

'কি আবার হবে।' বিজন বললে: 'আমি সকাল বেলা কি কোনদিন কিছু খাই যে আজ খাবার জন্যে এমন পীড়াপীড়ি ক'রচো?'

'হাঁ তুমি সকাল বেলা খাও কি না তা আমার জানবার কথাই বটে' সবিতা ঠাট্টা ক'রে বললে: 'তুমি তিনশো পঁয়ষট্টি দিন আমার কাছে থাকো কিনা।' সে ভোলাকে বললে: 'রাণী কোথায়?'

'দিদিমণি চা তোয়ের ক'রচে।'

'তুই নীচে থেকে চা-টা নিয়ে আয়, আর রাণীকে এখানে পাঠিয়ে দে' সবিতা বললে: 'আর দেখ্, বামুন ঠাকুরকে অমনি ব'লে দিস বাবু এখন খাবে না।'　　(ক্রমশঃ)



তাসের দেশ

কমলেশ রায়

'জগৎ' শব্দের ব্যাকরণগত ভাব হচ্ছে—চলমান, গতিশীল। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নিয়ত গতিশীল। আকাশ বাতাস পূর্ণ ক'রে চারিদিকে গতির হিল্লোল উঠছে, প্রতি মুহূর্ত্তে নব চঞ্চল ছন্দে বিশ্ব-জগৎ নেচে চ'লেছে। নদী আপনার তরঙ্গ-নৃত্যে আপন-হারা হ'য়ে ছুটেছে, পাগল হাওয়া ফুলের বনে পাতার ঝলকে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে দিয়ে যায়, গ্রহ-নক্ষত্র অনন্ত আকাশের মাঝে অবিশ্রান্ত সঞ্চরণশীল, প্রতিটি আলোকরশ্মি কী প্রচণ্ড গতিতে আপনাকে বিরাট শূন্যের মাঝে বিলিয়ে দেয়। পণ্ডিতরা তাই নামকরণ করেছেন 'জগৎ'—আমি বল্‌ছি 'তাসের দেশ'।

জগতের এই গতিবেগ শক্তিরই প্রকাশ, এবং শক্তিই গতিবেগের কারণ। তবে শক্তিমাত্রেই গতিবেগের কারণ হ'তে পারে কি না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে। শক্তি অবিনশ্বর হ'লেও বিশ্বের নাম ব্যাকরণ-গত অর্থে চিরকাল 'জগৎ' থাকৃতে পারে কি না, সেটা বিশেষভাবে বিবেচনা ক'রবার বিষয়। সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে স্বভাবতঃই মনে হয়—শক্তিই যদি থাকে তবে 'জগৎ' অচল হ'বে কেন? আর, শক্তি যদি অবিনশ্বরই হয়, তবে সে এখনকার মতো মানুষের দাসত্বই বা চিরকাল ক'রবে না কেন? আমাদের চারিপাশে শক্তি ছড়াছড়ি যাবে অথচ তা' দিয়ে আমাদের কাজ হ'বে না—কল চল্‌বে না, সে কেমন কথা? কিন্তু কথাটি অসম্ভব নয়। বাস্তবিক আমাদের চারিপাশে শক্তির পর্য্যাপ্ততা সত্ত্বেও আমাদের কষ্টের সীমা নাই—কত কল-কব্জা বসিয়ে শক্তি পেতে হয়!

আমাদের চারিধারের বাতাসের মধ্যেই যে তাপ-শক্তি আছে তা'র পরিমাণ বড় অল্প নয়। বাতাস তো আমাদের কাছে অফুরন্ত; তবে তা'র শক্তি নিয়ে এঞ্জিন চালাই না কেন? প্রধান কথা হ'চ্ছে, শক্তি থাকলেই সেটা আমাদের কাছে কার্য্যকরী ভাবে প্রাপ্তব্য (available) হ'বে তা'র কোনও মানে নাই। এই শক্তি যেন বদ্ধ-জলের মতো প্রাণ-হীন—স্রোতস্বতী নদীর মতো নয়। আমেরিকা বা অন্যান্য দেশে জলের সাহায্যে কল চালানো হ'য়ে থাকে। এই জল হয় জলপ্রপাত, না হয় স্রোতস্বিনী নদীর। পুকুরের বদ্ধ জল কল চালাতে পারে কি? জল দিয়ে কল চালাতে হ'লে জলের প্রবাহ চাই। চাপের বৈষম্য বা জলতলের বিভিন্ন উচ্চতা থাক্‌লে জল প্রবাহিত হবে। তাপ-শক্তি দ্বারা কাজ পেতে হ'লে তাপেরও প্রবাহ প্রয়োজন। উষ্ণতা-বিভিন্নতায় তাপের প্রবাহ সৃষ্টি হয়। বাতাসের এই তাপ-শক্তি দিয়ে এঞ্জিন, অথবা সাগর-জলের উত্তাপ দিয়ে জাহাজ চালানো যেতে পারে, যদি তদপেক্ষা শীতল একটি স্থান নিকটে থাকে। কেবল মাত্র এইরূপ অবস্থায় বাতাসের বা সাগর-জলের তাপ ঐ শীতল স্থানে প্রবাহিত হ'বে;—এই সময় ঐ তাপ এঞ্জিন চালানোর পক্ষে প্রাপ্তব্য হ'বে। কিন্তু অনবরত তাপ প্রবেশ করায় শীতল তাপ-নিক্ষেপকটি ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হ'য়ে উঠবে, ফলে তাপ-প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে কলও বন্ধ হ'বে। এই জন্য নিক্ষেপকটি বরাবর শীতল রাখবার ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু এই ব্যবস্থার চেয়ে চল্‌তি ব্যবস্থাই সহজসাধ্য। চল্‌তি ব্যবস্থাটি হচ্ছে—বাইরের বায়ু-মণ্ডলকে নিক্ষেপকভাবে ব্যবহার করা ও জলন্ত কয়লাকে তাপের উৎসভাবে গ্রহণ করা। তাপের সাহায্যে যন্ত্র চালাতে হ'লে এই দুইটি দিক চাই-ই—তাপের উৎস ও তাপ-নিক্ষেপক (Source and Sink)। যে স্থানে এই বৈষম্য নাই, যেখানে উষ্ণতার সমতা হ'য়েছে, সেখানে কোনও যন্ত্র চল্‌বে না;—তা সে যত তাপ-শক্তি-ই থাকুক্ না কেন। এই শক্তি বদ্ধ, অব্যবহার্য্য।

ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেউ এইটা উপলব্ধি ক'রে ভাবলেন—এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার ক'রতে হ'বে—যে-টি বিনা ব্যয়ে অনন্তকাল চল্‌বে। শক্তির তো বিনাশ নাই। তাঁরা শক্তির অবিনশ্বরতার (conservation) কথাই কেবল ভেবেছিলেন, শক্তির প্রাপ্তব্যতা (availablity) সম্বন্ধে ভাবেন নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ক্লজিয়াস (Clausius) দেখালেন, এইরূপ চিরন্তন যন্ত্র (Perpetual Machine) অসম্ভব। তাঁর সময় থেকে তাপ-গতি বিজ্ঞানের (Thermodynamics) সৃষ্টি হ'ল। এই

দিকে ভাবতে গিয়ে জগতের একটি অপূর্ব্ব রূপ প্রকাশ হ'য়ে পড়ল।

জগতের সকল শক্তি সমান স্তরের নয়। কোনটি আমাদের কাছে সহজপ্রাপ্য, কোনটির প্রাপ্তব্যতা অল্প। কোনটি আমাদের কাছে প্রাণবন্ত; কোনটি বদ্ধ, মৃত, অপ্রাপ্তব্য। বিদ্যুৎ একটি উচ্চশ্রেণীর প্রাপ্তব্য শক্তি, কিন্তু তাপ ততটা নয়। আলোক-কিরণ কালো পর্দ্দায় শোষণ ক'রে অনায়াসে সম্পূর্ণভাবে তাপশক্তিতে রূপান্তর করা যায়, কিন্তু ঐ তাপকে পুনরায় পূর্ণভাবে আলোকে পরিণত করা যায় কি? আলোক অপেক্ষা তাপ নিম্নশ্রেণীর শক্তি। আলোকের অধঃপতনে (degradation) তাপের সৃষ্টি হয়। জগতে ক্রমান্বয়ে শক্তির অধঃপতন চ'লেছে—উত্থান নাই। যেটুকু বা আছে, তা' অত্যন্ত অল্প; বিশ্বের সমস্ত শক্তিকে উচ্চস্তরে পুনরুত্থিত ক'রতে পারা যায় না। শক্তি-প্রবাহ-পথে যেন টিকিটঘরের চাকা বসানো আছে; সকলকে একই দিকে চ'লে যেতে হ'বে, —চাকা একই দিকে কট্-কট্ ক'রে ঘুরবে,—উল্টামুখে বেরিয়ে আসবার উপায় নাই। শক্তি ক্রমাগত অধোমুখেই চ'লেছে, তা'র প্রাপ্তব্যতা দিনের পর দিন ক'মে আস্‌ছে। জীন্‌সের (Sir James Jeans) মতে ভবিষ্যতে শক্তির অধঃপতনের ফলে জগত স্থির, মৃত, নিশ্চল হ'য়ে যাবে।

প্রথমে দেখা যাক্, কিসের উপর শক্তির প্রাপ্তব্যতা নির্ভর করে। সুদক্ষ সেনাপতির অধিনায়কত্বে সৈন্যদল সুসজ্জিতভাবে চালিত হ'লে সৈন্যদলের শক্তি দৃঢ় ও কার্য্যকরী হয়। লক্ষ লক্ষ অসংবদ্ধ সৈন্য বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে যুদ্ধ-জয়ের কোনও আশা থাকে না। সৈন্যশক্তির অভাব নাই, গোলাগুলিরও অনটন নাই; কিন্তু সংবদ্ধতার অভাবে ঐ শক্তি মোটেই কার্য্যকরী ভাবে প্রাপ্তব্য নয়। শক্তি সুসজ্জিত ও একীভূত (organised) না হ'লে কোনও কাজেই লাগবে না। শক্তি যতই অসংবদ্ধ, বিক্ষিপ্ত হ'বে ততই তা'রা প্রাপ্তব্যতা জগতের কাছে কমে আস্‌বে। ক্লজিয়াস্ বলেছেন, জড়-জগতের অসংবদ্ধ বিক্ষিপ্তভাব (randomness) ক্রমশঃই বেড়ে চ'লেছে। বিশ্বের এই বিপর্য্যস্ততার পরিমাপক পরিমানটির নাম ক্লজিয়াস দিয়েছেন 'এণ্ট্রপি' (Entropy)। ক্লজিয়াসের ভাষায় ব'ল্‌তে হয়, —জগতের এণ্ট্রপি চরমের দিকে বেড়ে চ'লেছে।

মনোরাজ্যে এবং সামাজিক জীবনে ইহার ঠিক বিপরীত অবস্থা। সেখানে সর্ব্বদা শৃঙ্খলা গঠনের চেষ্টা চ'লেছে। মানুষ চিন্তায়, ব্যবহারে, সামাজিক বন্ধনে—সকল ক্ষেত্রেই সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলাসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে। যে যুক্তি, যে বিচার-বুদ্ধি মানুষের মধ্যে আজ দেখা দিয়েছে,—পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে তা'র আভাসও হয় তো পাওয়া যায় নাই। মনোরাজ্য চলেছে শৃঙ্খলার দিকে, rationalityর দিকে। যাক্ সে কথা; জড়-জগতই এখানে আলোচ্য বিষয়।

বাস্তবিক, সংবদ্ধ বা গোছালো ভাব এক একটি বিশেষ যত্নের ফল; অগোছালো অবস্থাই জড়-জগতের স্থায়ী (stable) অবস্থা। এই জন্য প্রকৃতি ধীরে ধীরে সেই স্থায়ী অবস্থার দিকে এগিয়ে চ'লেছে। প্রকৃতি সাম্য চায়। কোনও তুঙ্গতাভেদ (difference of potential) গুছিয়ে জড়ো করার ফল। মেঘে মেঘে যে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিদ্যুৎ সঞ্চিত হয়, তা'রা ভীষণ মেঘ-গর্জ্জনের মধ্য দিয়ে পরস্পর মিলিত হ'য়ে স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

শক্তির প্রাপ্তব্যতার কারণ শক্তির শৃঙ্খলা (organisation)। বাতাসের প্রতি অণু, সাগর-জলের প্রত্যেকটি অণু প্রচণ্ড গতিতে ছুটাছুটি করে; কিন্তু কেউ সংবদ্ধ নয়,—অত্যন্ত এলোমেলো। ইংরাজ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্ ব্রাউন (Brown) অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে জলের ভিতর ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা বা অন্য বস্তুকণাগুলিকে উন্মাদের মতো অবিশ্রান্ত ছুটাছুটি করতে লক্ষ্য করেন। তাঁ'র এই পর্য্যবেক্ষণ ব্রাউনীয় গতি (Brownian movement) নামে খ্যাত। ব্রাউনীয় গতির কারণ হ'চ্ছে, জলের অণুগুলির অবিশ্রান্ত বিক্ষিপ্ত গতি।

যদিও জলের প্রতি অংশ উষ্ণতা-সমতাপন্ন তথাপি প্রত্যেকটি অণু কী প্রচণ্ড গতিতে বেগবান! এখানে তো তাপের উৎস বা নিক্ষেপক ব'লে কিছু নাই! তবে কি ক্লজিয়াসের ধারণা ভুল? তবে কি বাতাসের শক্তি নিয়ে এঞ্জিন চালানো যাবে? তবে কি 'চিরন্তন যন্ত্র' সম্ভবপর?

আমরা যদি জীবাণুর মতো ক্ষুদ্র প্রাণী হ'তাম, তবে হয়তো ব্রাউনীয় বেগের সাহায্যে একে একে ধূলিকণা উপরে তুলে বিনা ব্যয়ে আমাদের বাসা তৈয়ারী ক'রতে পারতাম। তবে কণাগুলি কখন উপরে উঠ্‌বে, কখনই বা হঠাৎ নিচের দিকে নেমে যাবে, তারও কিছু ঠিক নাই। কিন্তু এখন

বস্তু অথবা শক্তির চিরবিভাজ্যমানতা মানসিক ধারণার পক্ষে অসম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, বিংশ শতাব্দীর কণিকাবাদ (Quantum Theory) আমাদের দেখিয়েছে যে, শক্তি চিরবিভাজ্যমান (infinitely divisible) নয়,—অন্ততঃ প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবর্ত্তন-ধারায় তো নয়-ই!

তাই বলছিলাম, তাসের দেশ! আমরা খেলি মাত্র বাহান্নখানি তাস নিয়ে; বিশ্বের খেলা চলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তাস নিয়ে। যত খেলা চলে, তাসে অনবরত ভাঁজ পড়ে, দিনের পর দিন নূতনরূপে বিচিত্র ভাবে সে তাস ছড়িয়ে পড়ে। খেলার এক দলে মানুষ, অন্য দলে প্রকৃতি। মানুষ স্বল্প-বুদ্ধি; সে হাতের তাস না সাজিয়ে খেল্‌তে পারে না। প্রকৃতি দেবীর তা' প্রয়োজন হয় না; তিনি কখনও তাস সাজা'ন না, ভাঁজা তাস হাতে তুলে নিয়েই খেল্‌তে বসেন। ফলে, মানুষের হয় বিপদ, খেলার সঙ্গে সঙ্গে তাস ক্রমে আরও হিজিবিজি হ'য়ে যায়;—তা'র হাতে-পাওয়া তাস কাজে লাগে না। খেলার জোর ক'মে যায়, উৎসাহ স্তিমিত হ'য়ে আসে। কে বল্‌তে পারে, প্রকৃতির এই তাসের খেলা সাঙ্গ হ'তে আর কতদিন আছে?

জরথুশ্‌ত্র

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্‌-এ

জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম্মের সহিত বাঙ্গালীর পরিচয় অতি অল্প। এককালে প্রাচীন ইরাণে এই ধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এখন এই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। বোম্বায়ের পার্শি সম্প্রদায় সাধারণতঃ জরথুশ্‌ত্রধর্ম্মাবলম্বী।

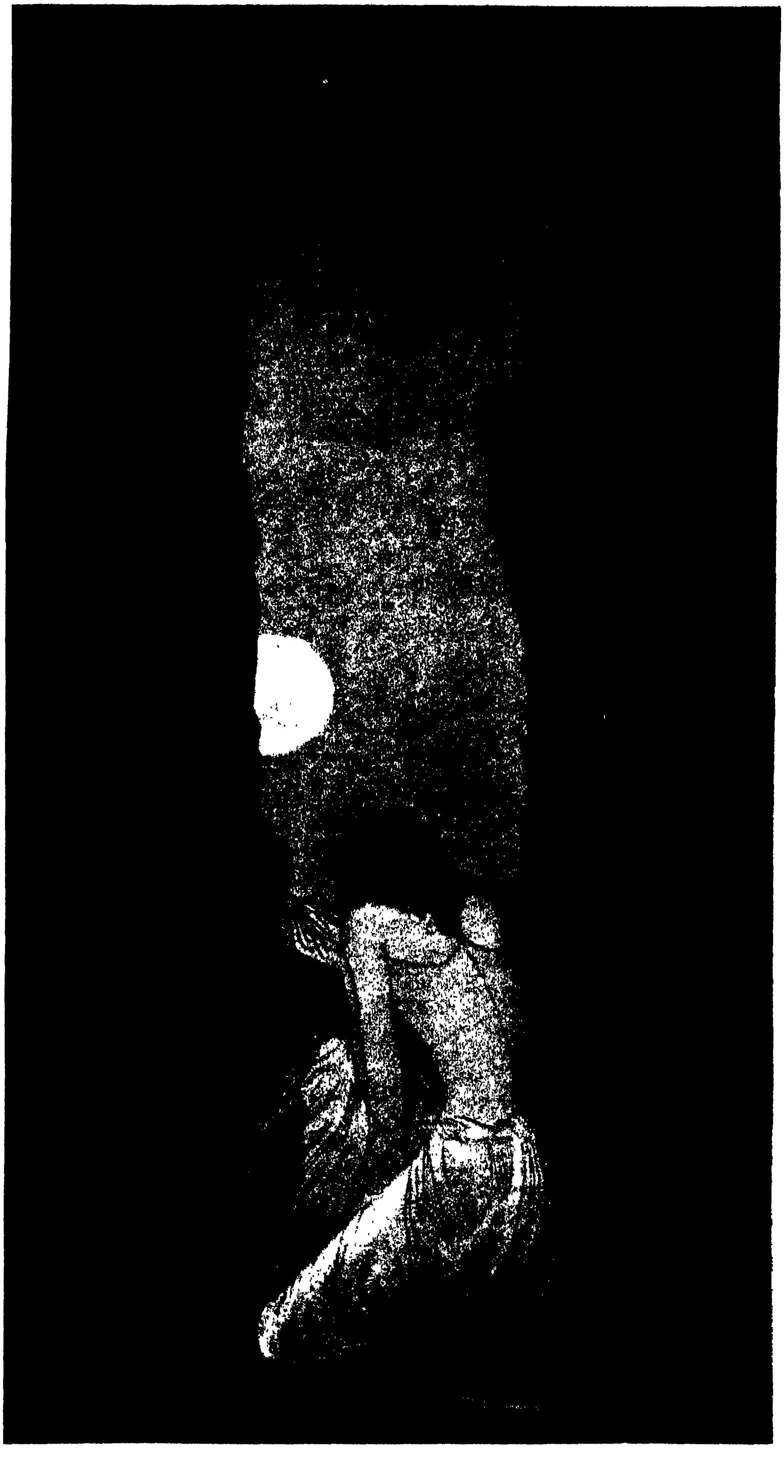
মহাপুরুষ জরথুশ্‌ত্র এই ধর্ম্মের প্রথম প্রচারক এবং প্রতিষ্ঠাতা। অহুরমজ্‌দার আদেশে তিনি এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। অবেস্তার ভাষায় অহুরমজ্‌দার অর্থ ঈশ্বর। জরথুশ্‌ত্রের ঐতিহাসিক বিবরণ সঠিক ও সম্পূর্ণ পাওয়া অসম্ভব। অবেস্তা ও পহ্লবী গ্রন্থসমূহে এবং গ্রীক্‌ ও রোমকগণের বিবরণ হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহারই উপর সমধিক নির্ভর করিতে হয়, অথচ এই সমস্ত বিবরণের অনেকাংশই অনৈতিহাসিক, কাল্পনিক এবং অতিরঞ্জিত। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কাহিনী, কিম্বদন্তী এবং উপাখ্যান প্রভৃতিও কিছু কিছু আছে। জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে এগুলিকেও উপেক্ষা করা চলে না।

এই মহাপুরুষের নামটিই একটি আলোচনার বিষয়। জরথুশ্‌ত্র, স্পিতম জরথুশ্‌ত্র, জরথুশ্‌ত্র স্পিতম এবং শুধু স্পিতম এই চারি নামেই ইঁহাকে অভিহিত হইতে দেখা যায়। স্পিতম উঁহার বংশগত নাম, ব্যক্তিগত নাম নয়। জরথুশ্‌ত্র নামের সহিত বংশনামের যোগ থাকায় এইরূপ অনুমান করা যায় যে, তৎকালে ইরাণে জরথুশ্‌ত্র নামের একাধিক লোকের বাস ছিল, অন্ততঃ ঐ নামের অন্য লোক থাকা অসম্ভব ছিল না। সুতরাং নাম-বিপর্য্যয়ের ভয়েই সম্ভবতঃ এইরূপ বংশ-নামের ব্যবহার। বাঙ্গালী পাঠকরা বড়ু, দ্বিজ, দীন প্রভৃতি বিশেষণযুক্ত বহু চণ্ডীদাসের পদ অবশ্যই শুনিয়া থাকিবেন। স্পিতম শব্দের অর্থ শ্বেততম অর্থাৎ পবিত্রতম। ইহা হইতে অনুমান হয়, জরথুশ্‌ত্র উচ্চবংশ হইতে উদ্ভূত।

জগতের অন্যান্য সকল মহাপুরুষেরই জীবনীর সহিত যেমন বহু অলৌকিক ঘটনা জড়িত থাকে, জরথুশ্‌ত্রের জীবনী-প্রসঙ্গেও সেইরূপ বহু আশ্চর্য্য কাহিনীর উল্লেখ আছে। এই কারণে কেহ কেহ জরথুশ্‌ত্রের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু এখন নিঃসংশয়িতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং মহম্মদ যেমন একদিন পৃথিবীতে সত্যসত্যই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, জরথুশ্‌ত্রও তেমনি। তিনি পৌরাণিক গল্পের নায়ক নন, প্রকৃতই একদিন রক্তমাংসের দেহ লইয়া এই মরলোকে তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইরাণীয় ধর্ম্মগ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অংশ গাথা। এই গাথা অংশে মানুষের মিথ্যা কল্পনার অবাধ অতিরঞ্জন নাই, আছে তাহার হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ, আর আছে তাহার দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সহজ অভিব্যক্তি। গাথার মধ্যে এই মহাপুরুষের কথা যেরূপ সশ্রদ্ধভাবে বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার অবসর থাকে না।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিমাত্রেরই জীবনী আলোচনা করিতে গেলে বাহিরের পরিচয়টার সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই কৌতূহল জাগে—জানিতে ইচ্ছা হয়, কোন্‌ সময়ে তাঁহার জন্ম, কোথায় বাসস্থান, কোন্‌ বংশ হইতে উৎপত্তি ইত্যাদি। অবশ্য অধিকতর প্রয়োজনীয় তাঁহার কর্ম্মজীবনের ইতিহাস।

জরথুশ্‌ত্র কোন্‌ সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সে সম্বন্ধে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। তবে বহু পণ্ডিতের এই মত যে, খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন। বলা বাহুল্য, সকলেই এই মত মানিয়া লন নাই, এ সম্বন্ধে বহু তর্ক বিতর্ক উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে। কিন্তু সে সব সমস্যা তুলিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করিব না। কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে



আবাহন

শিল্পী—শ্রীযুক্তা হাসিরাশি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

যে, রাজা বিশ্‌তাস্পের রাজত্বকালেই তাঁহার বাণী প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। বিশ্‌তাস্প জরথুশ্‌ত্রের একান্ত অনুগত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মকে তিনি কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্‌তাস্প যে জরথুশ্‌ত্রের সমসাময়িক ছিলেন সে সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। সুতরাং বিশ্‌তাস্পের সময় বাহির করিলেই জরথুশ্‌ত্রের সময় বাহির করা হইবে। বুন্দাহেশ্‌ হইতে দেখা যায় যে বিশ্‌তাস্পের সিংহাসনাধিরোহণ কাল আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬১৮ সাল। সুতরাং জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধে যে সময়ের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা একরূপ ঠিক বলিয়া ধরা চলে।

স্পিতম বংশের নাম তদানীন্তন ইরাণে কাহারও অজ্ঞাত ছিল না। বহু বীরপুরুষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ইরাণীয় রাজবংশের সহিত এই বংশের যোগ ছিল। পৌরুশস্প নামক এক পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই জরথুশ্‌ত্রের পিতা। জরথুশ্‌ত্রের মাতাও অতি পুণ্যবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার নাম দুঘ্‌দোবা। ঈশ্বর-ভীরু এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ এই দম্পতি সর্ব্বদাই সৎকর্ম্মে রত থাকিতেন। সুতরাং ঈশ্বরের অনুগ্রহও তাঁহাদের উপর পড়িয়াছিল। জরথুশ্‌ত্র তাঁহারই আশীর্বাদের ফল-স্বরূপ। পৌরুশস্পের পাঁচ পুত্র, জরথুশ্‌ত্র তন্মধ্যে তৃতীয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহে প্রত্যেক মহাপুরুষেরই আবির্ভাব সম্বন্ধে বহু অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ দেখা যায়। বুদ্ধ, খৃষ্ট, মহম্মদ সকলেরই নামের সহিত এইরূপ অলৌকিকতার যোগ আছে। অধিক কি, শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধেও এরূপ আশ্চর্য্য কথা কম শোনা যায় না। অথচ এই মহাপুরুষের আবির্ভাব ত বেশী দিনের কথা নয়। জরথুশ্‌ত্র সম্বন্ধেও এইরূপ কাহিনীর অপ্রাচুর্য্য নাই। এখানে দুই একটি নিদর্শন দিতেছি।

অহুরমজ্‌দা অনন্ত জ্যোতির আধার। দুঘ্‌দোবার জন্মকালে অহুরমজ্‌দার দেহ হইতে একটি আলোকরশ্মি স্বর্গলোক ভেদ করিয়া পৃথিবীতে নামে এবং নবজাত দুঘ্‌দোবার দেহে প্রবেশ করিয়া জরথুশ্‌ত্রের জন্মকাল পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরের সহিত মিলিত থাকে। জরথুশ্‌ত্রের জন্ম হয় তাঁহার মাতার পনর বৎসর বয়সের সময়। অবেস্তাতে দেখিতে পাই এই মহাপুরুষের জন্মকালে সমস্ত পৃথিবীময় যেন একটা উৎসব সমারোহ পড়িয়া গিয়াছিল। পত্রের মর্ম্মরধ্বনি তুলিয়া বৃক্ষলতা তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিল, পক্ষিকুলের কলকাকলীতে তাঁহার আগমনী শোনা গেল, নদনদী তরঙ্গ তুলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। দৈত্যদানব তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া গুহামধ্যে আশ্রয় লইল। পহ্লবীগ্রন্থের মধ্যে দেখা যায় মহাপুরুষের জন্মসম্ভাবনা অবগত হইয়া মাতৃগর্ভেই তাঁহার বিনাশের জন্য দুর্ব্বৃত্তগণ বহু ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদের সকল কৌশলই ব্যর্থ করিয়া তিনি ভূমিষ্ঠ হইলেন। মানবশিশুমাত্রই জন্মগ্রহণ করিয়া রোদন করে, কিন্তু তাঁহার বেলা বিপরীত ঘটিল। তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের শৈশবের সহিত জরথুশ্‌ত্রের শৈশবের বেশ তুলনা হইতে পারে। কংশের চক্রান্তের ন্যায় দুরাস্রোকের ষড়যন্ত্রে জরথুশ্‌ত্রকে বহুবার বিপদে পড়িতে হইয়াছিল কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় স্বীয় শক্তিবলেই তিনি সকল রকম বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সত্ত্বেও শত্রুরা বালক জরথুশ্‌ত্রকে কয়েকবার হত্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। ইঁহাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইয়াছে, কিন্তু দেহে উত্তাপ লাগে নাই। বৃষ ও অশ্বের পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ইঁহার দেহ পিষ্ট হইয়া যায় নাই। হৃতশাবক ব্যাঘ্রের গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইয়াও ইনি অক্ষতদেহে বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। জরথুশ্‌ত্রকে হত্যা করিবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল সেগুলি শুনিলেই ভক্ত-প্রহ্লাদের প্রতি হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারের কথা মনে পড়ে।

সাত বৎসরে পড়িতে না পড়িতেই জরথুশ্‌ত্রের বিদ্যারম্ভ হয়। জন্মের পর হইতেই সকলে তাহার মধ্যে একটা ঐশী শক্তি ও স্বর্গীয় তেজ অনুভব করিতে লাগিল। বাল্যকালেই প্রখর জ্ঞান এবং অপরিসীম বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া তিনি সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিলেন। ভাবীকালে যে উজ্জ্বল অগ্নিশিখা পৃথিবী আলোকিত করিবে তাহারই স্ফুলিঙ্গ তখন হইতেই দেখা গেল। পৌরুশস্প পুত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পরম জ্ঞানী ও বিদ্বান্ এক পণ্ডিতের উপর তাঁহার শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন।

দেশের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। মহাপুরুষ মাত্রেরই আবির্ভাবের পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশের যে অবস্থা হইয়া থাকে ইরাণেরও তাহাই হইয়াছিল। পাপীর অত্যাচারে পুণ্যবান্ পীড়িত, শক্তিমানের পশুবলে দুর্ব্বল অভিভূত, চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মের পরাভব অধর্ম্মের জয়, অন্যায়ের চক্রতলে ন্যায় যাহা কিছু সব পিষ্ট জর্জ্জরিত। যাতুধানগণ মায়াজাল বিস্তার করিতেছে, পিশাচগণ পৈশাচিক আচারে লিপ্ত, মিথ্যাচার ব্যভিচার দেশের বায়ু পর্য্যন্ত কলুষিত করিতেছে। পুণ্যের ক্ষীণতম আলোকরশ্মিটি পর্য্যন্ত যখন ইরাণদেশে নির্ব্বাপিতপ্রায় তখন তাহার উদ্ধারকল্পে অহুরমজ্‌দা জরথুশ্‌ত্রকে প্রেরণ করেন। মায়াবী দুরাস্রোবো এবং ব্রাত্রোক্‌রেশ্‌ প্রথম হইতেই জরথুশ্‌ত্রের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিল। দুরাস্রোবো ও ব্রাত্রোক্‌রেশ্‌ তদানীন্তন ধর্ম্ম আচরণ করিত। সে ধর্ম্ম ছিল অধর্ম্মেরই নামান্তর। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে এই দুই মায়িকের বিরুদ্ধে নিয়োজিত থাকিতে হইয়াছিল। হয়ত এই দুই দুর্জ্জনের বিরুদ্ধাচরণই তাঁহার স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসকে গভীরতর করিতে সাহায্য করিয়াছে।

পনর বৎসর বয়সে জরথুশ্‌ত্র উপবীত গ্রহণ করেন। ইরাণীয় শাস্ত্রমতে ঐ বয়সেই বাল্যকাল শেষ হয় এবং যৌবন আরম্ভ হয়। পনর হইতে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম্মসাধনার কাল।

যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয়ে তিনি বিশেষ মনোযোগী হন। ধর্ম্ম ও নীতি প্রচার করিয়া সমকালীন মানব-সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে তিনি অপরিসীম চেষ্টা করেন। গার্হস্থ্য জীবনই তাঁহার মতে আদর্শজীবন বলিয়া বোধ হয়। তিনি নিজে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং

তাঁহার পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ইরাণীয় শাস্ত্রে বলে জরথুশ্‌ত্রের তিন বিবাহ। পত্নীর মধ্যে হ্বোবি'ই ছিলেন সর্ব্বগুণসম্পন্না, সকল বিষয়ে জরথুশ্‌ত্রের যোগ্যা। ইঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যা।

জরথুশ্‌ত্রের গভীর মনীষা ও মৌলিক চিন্তার পরিচয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মধ্যেই দেখা যায়। দুর্নীতির প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, সত্যের প্রতি প্রগাঢ় আদর এবং শুচিতা রক্ষায় জন্য ঐকান্তিক প্রযত্ন তাঁহার ধর্ম্মের মূল মন্ত্র। এইগুলি যে মনুষ্য মাত্রেরই উন্নতির সহায়ক তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন।

তপশ্চর্য্যার জন্য তিনি একদিন বুদ্ধের ন্যায় গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। তপস্যায় তাঁহার বহুকাল কাটিয়াছিল। এই সময়টা তাঁহাকে বহু কৃচ্ছ্র-সাধন করিতে হয়। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে এ সম্বন্ধে বহু কথা শোনা যায়। কোথাও দেখি তিনি সাত বৎসর কাল মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি কুড়ি বৎসর কাল জনমানবহীন বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমিতে যাপন করিয়াছিলেন। আবার কেহ বলেন পর্ব্বতগুহাই তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী তপস্যার স্থান ছিল।

তপস্যাকালে সিদ্ধার্থের নিকট মার যে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছিল, জরথুশ্‌ত্রের নিকটও সেইরূপ করে। কিন্তু তিনি স্বীয় শক্তিবলে সে সব ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার তপশ্চর্য্যার সহিত খৃষ্ট ও বুদ্ধের সাধনা বেশ তুলিত হইতে পারে। বহু বাধা-বিঘ্ন লঙ্ঘন করিয়া, বহু প্রলোভন জয় করিয়া, বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া অবশেষে জরথুশ্‌ত্র পরম জ্ঞান—মহাসত্য লাভ করিলেন। সিদ্ধিলাভের কালে তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ত্রিশ বৎসর।

যে মহাজ্ঞান তিনি লাভ করিলেন অনির্ব্বাণ অগ্নিশিখার মত তাহা জাজ্বল্যমান হইয়া রহিল। সত্যই—

"অলৌকিক আনন্দের ভার,
বিধাতা যাহারে দেন তার বক্ষে বেদনা অপার।"

তখন সেই আনন্দ দুইহাতে বিলাইয়া দিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হয়, মন উন্মুখ হইয়া ছুটে। জরথুশ্‌ত্র মহামন্ত্র প্রচারের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সিদ্ধিলাভের পরবর্ত্তী দশবৎসরের মধ্যে তাঁহার সাতবার ভাবসমাধি হয়। এই সাত বারই তিনি অহুরমজ্‌দার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপ্রচারের পথ কোন মহাপুরুষের পক্ষেই কোন কালে নিষ্কণ্টক হয় নাই। যিশুখৃষ্টকে ত সে জন্য প্রাণই উৎসর্গ করিতে হইল। জরথুশ্‌ত্রকেও সেজন্য সারাজীবন ধরিয়া অনন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছে। প্রচারের আরম্ভকাল অর্থাৎ প্রথম দশ বৎসর তিনি কোন শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কত দুর্লঙ্ঘ্য বাধা, কত নিষ্ঠুর বিরুদ্ধাচরণ, কত অন্যায় অত্যাচার তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? কিন্তু তথাপি তিনি গভীর নিষ্ঠার সহিত অবিচলিতভাবে তাঁহার ব্রতপালন করিয়াছেন মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কল্পভ্রষ্ট হন নাই। ব্যর্থ প্রতীয়মান হইলেও এই দশ বৎসর সত্য সত্যই বিফল হয় নাই। এই দীর্ঘকালের প্রয়াস তাঁহাকে সাফল্যের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর করিয়া দিল। দশ বৎসর পরে জরথুশ্‌ত্র স্বীয় খুল্লতাতপুত্রকে প্রথম শিষ্যরূপে লাভ করিলেন। ইহার নাম মইধ্যোই মওংহ। এই ধর্ম্মের প্রতি মইধ্যোই মওংহের অগাধ অনুরাগ ছিল। ইহার দুই বৎসর পরে যে ঘটনাটি ঘটে, জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয়। বিশ্‌তাস্প (কাহারও মতে গুশ্‌তাস্প) নামক মহাবল রাজা এই ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। বিশ্‌তাস্পের এই ধর্ম্ম গ্রহণে ইহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়িল। ধীরে ধীরে এই ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িতে লাগিল। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই অনেকে এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারে অশোকের চেষ্টা ও শক্তি যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছিল জরথুশ্‌ত্রের বাণী প্রচারকল্পে বিশ্‌তাস্পের আগ্রহ ও অনুরাগ তদপেক্ষা অল্প সাহায্য করে নাই। রাজশক্তি পশ্চাতে থাকিলে ধর্ম্মমতের বহুল প্রচার সহজ হয়। সেই কারণেই জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম্ম দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল, এবং ধর্ম্মের বিস্তারের সঙ্গে জরথুশ্‌ত্রের খ্যাতি ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। জরথুশ্‌ত্র প্রচার কার্য্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দেশ-বিদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সকলেই তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া চিনিল। রোগী রোগমোচনের ইচ্ছায়, দুঃখী দুঃখনিবারণের অভিলাষে তাঁহার শরণাপন্ন হইতে লাগিল। তিনি সকলের কামনাপূর্ণ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া চলিলেন। শোনা যায় দিনবার দিয়া যাইতে যাইতে তিনি কোন অন্ধের দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া দেন। এই সব অলৌকিক কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নামও চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইল।

নূতন রাজ্য বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন অতি কঠিন কাজ। বিনা বিপত্তিতে কখনও তাহা সম্ভব হয় না। নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে যেমন রাষ্ট্রবিপ্লব, নূতন ধর্ম্ম প্রচলন করিতে হইলে তেমনি ধর্ম্মবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। আবার ধর্ম্মবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব কখনও কখনও সংমিশ্রিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। জরথুশ্‌ত্রীয় ধর্ম্মান্দোলনেও কুরুক্ষেত্রের অনুরূপ সংগ্রাম বাধিল। তুরাণ ও ইরাণের মধ্যে বিবাদ বর্ত্তমান ছিল প্রাগ্‌জরথুশ্‌ত্র কাল হইতেই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধও ইহাদের মধ্যে যখন তখন বাধিত। জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম্মমত তুরাণ মানিয়া লইল না, স্বাভাবিক বিদ্বেষই হয়ত ইহার কারণ। শুধু না মানিয়াই ক্ষান্ত হইল না, প্রচলিত ধর্ম্মমতের প্রতিকূল বলিয়া এই নূতন ধর্ম্মকে তাহারা অধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিল এবং ইহার প্রচার বন্ধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অল্পকাল মধ্যেই জাতি ও সম্প্রদায়গত বিবাদ ধর্ম্মকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়া ভীষণ সংগ্রামে রূপান্তরিত হইল। দুইপক্ষের দুইজন নায়ক, প্রত্যেকের সঙ্গেই অগণিত সৈন্যবাহিনী। ইরাণের নায়ক বিশ্‌তাস্প, তুরাণের নায়ক অরেজত্‌অস্প। যাহা হউক বহু রক্তপাতের পর বিজয়লক্ষ্মী বিশ্‌তাস্পেরই অঙ্কবর্ত্তিনী হইলেন। ধর্ম্মের নামে ভীষণ সংগ্রাম আরও অনেকবার হইয়াছিল কিন্তু এইরূপ সাংঘাতিক যুদ্ধ আর অধিক হয় নাই।

এই জয় জরথুশ্‌ত্রেরই জয়, ধর্ম্মের দ্বারা অধর্ম্মের জয়, পুণ্যের দ্বারা পাপের জয়। এই জয়ের ফলে জরথুশ্‌ত্রের ধর্ম্ম স্থায়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সমগ্র মানবজাতির আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি যে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছিলেন সার্থকতায় দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ হইল।

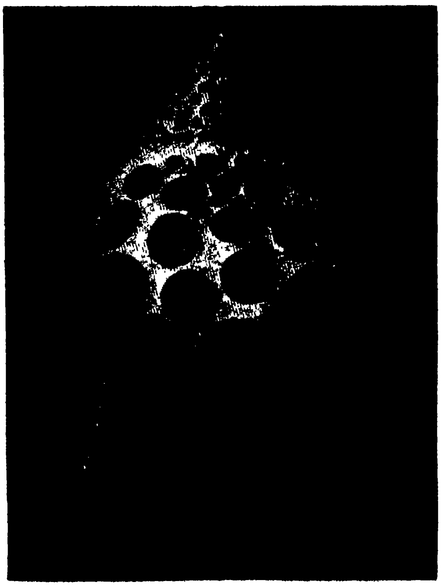
জরথুশ্‌ত্রের মৃত্যুকাহিনী রহস্যের জালে আচ্ছাদিত। মাত্র পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্য আমাদের দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন অথচ তাঁহার দেহত্যাগ সম্বন্ধে কত অদ্ভুত কথাই না শোনা যায়! জরথুশ্‌ত্রের মৃত্যু সম্বন্ধেও এইরূপ অলৌকিক কাহিনীর অপ্রাচুর্য্য নাই। কোন কোন মত অনুসারে, তাঁহার মৃত্যু সাধারণভাবে ঘটে নাই। স্বর্গ হইতে পবিত্র বজ্রশিখা আসিয়া তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করে। কাহারও মতে—কোন তারকা হইতে অগ্নিস্রোত তাঁহার দেহের উপর আসিয়া পড়ে এবং তাঁহাকে দগ্ধ করিয়া ভস্মে পরিণত করে। শত্রুপক্ষীয় কোন ব্যক্তির হাতে জরথুশ্‌ত্রের প্রাণ নষ্ট হয়, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ছিল ৭৭ বৎসর। দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিয়া এই আত্মত্যাগী মহর্ষি স্বীয় কর্ত্তব্য অবিচলিতভাবে পালন করিয়া গেলেন। তাঁহারই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি :—

"... মজ্‌দার বাণী পালন কর। মানবজাতির মঙ্গলার্থে সে বাণী তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। মিথ্যাচারীর পক্ষে তাহা অর্থহীন ও দুঃখকর, কিন্তু সত্যাশ্রয়ীর নিকট তাহা আনন্দের আধার এবং সুখের উৎস।"—যাস্‌ন ৩০,১১।

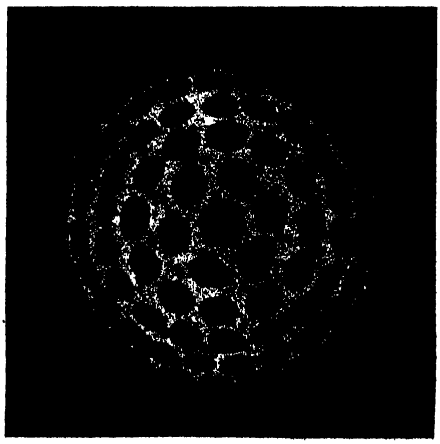
প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। অথচ জানবার আগ্রহ আছে অনেকেরই! দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়িয়ে কতলোক পৃথিবীর নব নব প্রদেশের পরিচয় লাভে পরিতৃপ্ত হ'চ্ছে। যাদুঘর (Museum) ও পশুশালা (Zoo) আজ জগতের সকল শ্রেষ্ঠ নগরেই স্থাপিত হয়েছে. মানুষের এই জানবার কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য। দেশে দেশে খেচরাবাস (Aviary) ও জলচরাশয় (Aquarium) নির্ম্মিত হ'য়েছে, উদ্ভিজ্জবন (Botanical garden) মালঞ্চ ও সব্জীবাগ (Horticultural farms) এবং কৃষি প্রদর্শনীরও অভাব নেই! তবু আজ আমরা এই বিপুল পৃথ্বীর কতটুকুই বা ঘুরে আসতে পেরেছি; আর এই অসীম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কতটুকু রহস্যই বা জানতে পেরেছি। বিজ্ঞান তার ক্ষুদ্র প্রদীপটি তুলে ধ'রে অল্প একটু আলোয় আমাদের যতটুকু দেখাচ্ছে তার বেশী আর কিছুই আমরা জানি না! চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়েনা এমন কত যে ক্ষুদ্রতম কীট পতঙ্গের অঙ্গে অঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্য ছড়ানো রয়েছে আমরা তা কল্পনা করতেও

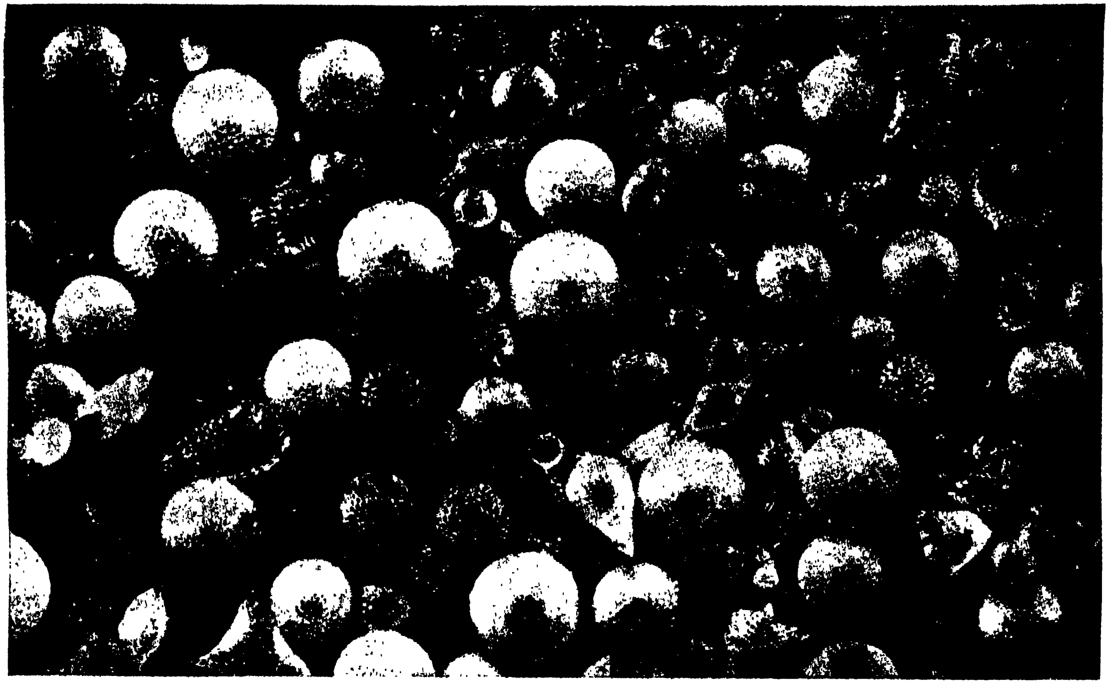


হসন্তিকা (এই পলিসিষ্টিনার খোলের আকৃতি একটি সুন্দর অগ্নিপাত্রের মত)



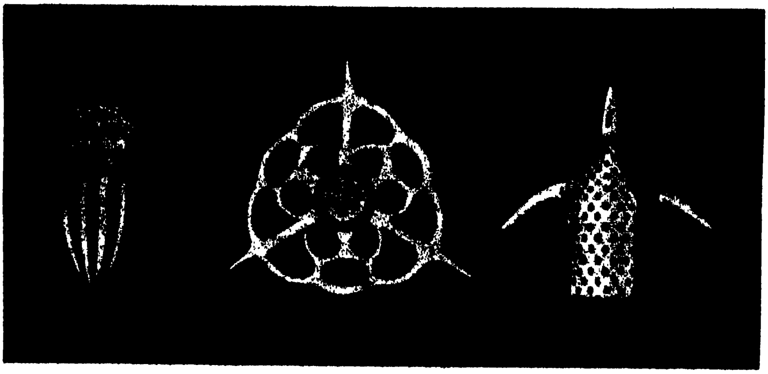
অগুরু পাত্র (এই পলিসিষ্টিনার খোলের আকৃতি একটি সুডোল অগুরু পাত্রের মত)

পারি না। 'পলিসিষ্টিনা' (Polycystina) নামে এক জাতীয় অতি ক্ষুদ্র সামুদ্রিক কীট আছে। এদের যে রূপ চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে তার কোনো আকৃতি নেই!



বিন্দুরূপ (ধূলিকণার মত অতি ক্ষুদ্র এক বিন্দুতে পলিসিষ্টিনাগুচ্ছের এতগুলি প্রাণী বিদ্যমান)

অনুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখবার আগে খোলা চোখে দেখে মনে হয় যেন কাচের উপর ময়দার গুঁড়ো ছড়ানো রয়েছে। কিন্তু সেই ময়দার গুঁড়ো



ত্রিমূর্ত্তি (পলিসিষ্টিনার তিন রকম খোলের অদ্ভুত আকৃতি)

তুচ্ছ ভেবে অবহেলা না করে যদি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাদের দিকে চেয়ে দেখো বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে থাকবে! সেই ময়দার গুঁড়োর মধ্যে ফুটে উঠবে যেন ময়দানবের মায়ায় গড়া অপরূপ সুন্দর আকৃতি! সেই সূক্ষ্মতম গঠনের সূক্ষ্মতম রেখাগুলি নানা আশ্চর্য্য মূর্ত্তিতে দেখা দেবে। তাদের সেই অদ্ভুত দেহের অদ্ভুত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চমৎকার গঠন দেখে মুগ্ধ হ'তে হবে।

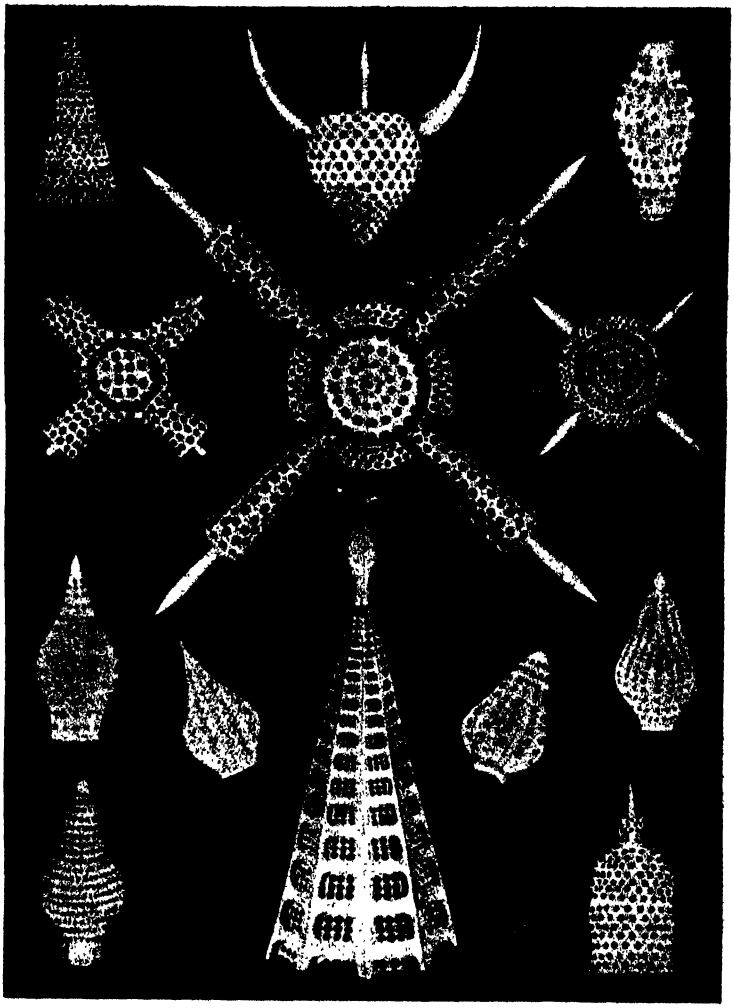
এদের নিয়ে আলোচনা, অনুসন্ধান ও অনুশীলনের মধ্যে আনন্দ আছে। দেখতে দেখতে সবিশেষ জানবার আগ্রহ বেড়ে ওঠে এবং সকলকে এদের সম্বন্ধে জানাবার আগ্রহও প্রবল হয়; কারণ সাদা চোখে এদের কোনো রূপ ও সৌন্দর্য্যইত' কারুর চোখে পড়ে না! অনুবীক্ষণের সাহায্যে যাঁরাই এদের আকৃতি দেখেছেন তাঁদের সকলকেই একবাক্যে ব'লতে হ'য়েছে যে জগতের আর কোনো জীবের কঙ্কালই এত অপূর্ব্ব সুন্দর ও এমন চমৎকার সুগঠিত নয়! অথচ, জাতি হিসাবে এরা পড়ে অতি নিম্নতম

বীজাণু শ্রেণীর মধ্যে। অর্থাৎ প্রাণী জগতের একেবারে নিকৃষ্টতম জীব এরা! Protozoa বা আগুপ্রাণী বিভাগের Rhizopods বা ভুজপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাণী জগতের শ্রেণীবিভাগ যদি তাদের আকৃতি ও গঠন-শোভার অনুপাতে করা হ'ত তাহ'লে নিঃসন্দেহ এই পলিসিষ্টিনা প্রথম শ্রেণীর সামুদ্রিক জীবের তালিকায় গিয়ে উঠতে পারতো! কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেছে যে এদের শরীর বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অংশ অতি সামান্যই! দেহের অভ্যন্তর বিভাগের কল-কব্জাও নিতান্ত সাদা-সিধে। এরা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রে নাকি একেবারে নেহাৎ আদিম অবস্থার অনুসরণে! অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম যুগের প্রথম জলকীটেদের মতই! সুতরাং, দেখতে যতই সুন্দর হোক না কেন, স্বভাবের দোষে চিরকাল এদের সেই জীব বিভাগের নিকৃষ্টতম শ্রেণীতেই পড়ে থাকতে হবে।

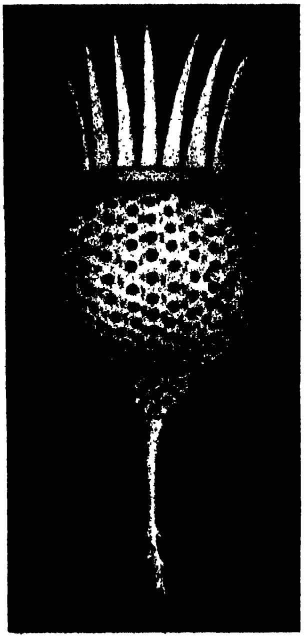
অণুবীক্ষণের সাহায্যে বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে এই সামুদ্রিক কীট পলিসিষ্টিনার একটা মূল' অংশ আছে যা থেকে এর চারিপাশ গড়ে ওঠে। হলদে রংয়ের অঙ্গ বা শরীরের চিহ্নও একটু আছে কিন্তু, সেটা উদ্ভিদ্ না প্রাণীদেহ এখনো তা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নি। অতি সামান্য একটু তৈলবিন্দুর ছিটে ফোঁটা মাত্র এর মধ্যে আছে দেখা যায় এবং তারই জোরে এরা জলের উপর ভেসে উঠতে পারে।

সজীব অবস্থায় এদের অঙ্গে অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য দেখা যায়—লাল নীল সবুজ হ'লদে গোলাপী বেগুণী প্রভৃতি নানা রংয়ের গাঢ় ও ক্রমশ ফিঁকে আভায় সে এক অপূর্ব্ব সমাবেশ, যা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। মৃত পলিসিষ্টিনার রকমারি কঙ্কাল সংগ্রহ ক'রে দেখা গেছে যে তার সংখ্যা বহুশত হয়েও তবু তার বৈচিত্র্য শেষ হয় না। প্রত্যেকটির গঠন অপরটি হ'তে ভিন্ন! এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেবল আকৃতি ও গঠনই নয়, প্রত্যেকটির নক্সাও বিভিন্ন এবং তা' এত রকমের যে গুণে শেষ করা যায় না। এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অস্থিকণা যা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিত দেখা যায় না। তার মধ্যে এত রকমের বিভিন্ন কারুকার্য্য, এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পবিন্যাস কি উপায়ে সম্ভব হলো এ কথা ভেবে দেখলে মানুষের শক্তির সীমা যে কত কম এবং তা যে কত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর তা সম্যক উপলব্ধি হয়।

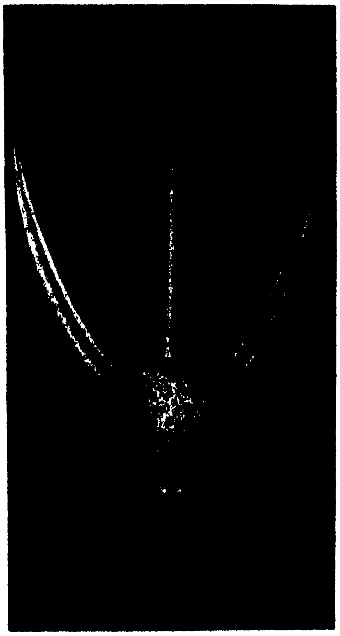


বহুচর্ম্মীর বিচিত্র রূপ (নং ১) (পলিসিষ্টিনার খোলের বিবিধ সুন্দর বিচিত্র রূপ)

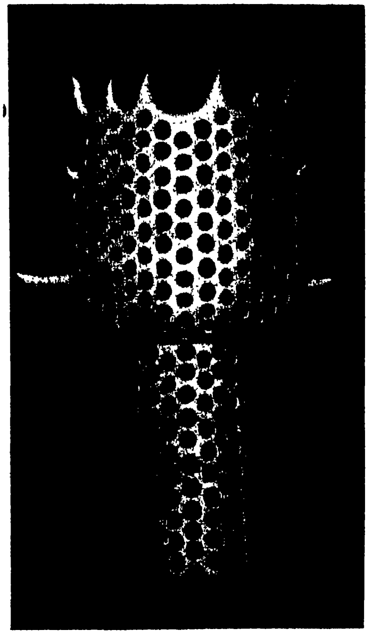
Rhizopods বা ভুজপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর এক প্রকার সামুদ্রিক কীট বা বীজাণু আছে তার নাম ফরামাইনিফেরা (Foraminifera) বা রন্ধ্রী। এও অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখা যায় না। এরাও বিচিত্র সুন্দর এবং অসংখ্য অভিনব আকারের। কিন্তু পলিসিষ্টিনা বৈচিত্র্যে ও বিভিন্ন সুদৃশ্য আকারের সংখ্যায় ফরামাইনিফেরা বা রন্ধ্রী বীজাণুকেও ছাপিয়ে গেছে! তাছাড়া, পলিসিষ্টিনার কঙ্কাল স্ফটিক প্রস্তরের ন্যায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল অথচ চকমকী পাথরের মতই কঠিন ও নিরেট। সমস্ত কঙ্কালটি যেন একখানি জহরত কুঁদে গড়া, কোথাও জোড়াতাড়া নেই। কঙ্কাল, তার আগাগোড়া কোথাও এমন কোনো স্থান নেই যেখানটা বিঁধ করা নয়। তবে হিসাব মত ওদের যেটাকে 'মেরুদণ্ড' বলা যেতে পারে, কেবলমাত্র সেই অংশটুকুই রন্ধ্রহীন। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে এর প্রত্যেক রন্ধ্রের অন্তর্গত পদার্থের সঙ্গে নাকি বীজাণুর সম্পূর্ণ যোগ থাকে এবং এদের বহিরঙ্গে যে জীবপঙ্কের (Protoplasm) প্রলেপ সংলগ্ন থাকে তারও উপর এদের কর্তৃত্ব চলে। পূর্ব্বেই বলেছি পলিসিষ্টিনার কঙ্কালের আকার নানা অসংখ্য রকমের ও অদ্ভুত সুন্দর গঠনের। কোনোটি বা ঝুড়ির মত, কোনোটি বা কমলালেবুর মত, গায়ে শড়কীর ফলার



পুষ্পরূপ (এই খোলটি ফুলের মত)



শৃঙ্গীরূপ



কুসুমদানী

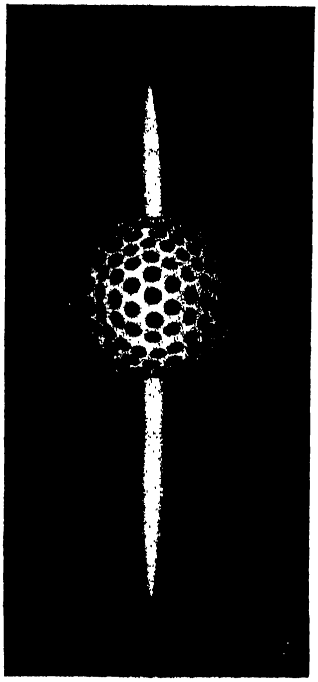
মত কাঁটা; কোনোটি বা কুলপীর খোলের মত, কোনোটি মুকুটের মত, কোনোটি রথের মত, কোনোটি ফুলদানীর মত, কোনোটি বা চীনে বলের মত,—সেই বলের মধ্যে বল— তার মধ্যে বল! সেই রকম খোলের মধ্যে খোল, তার মধ্যে খোল :—এই খোলগুলি বলের আকার—ক্রমশঃ বড় থেকে ছোট হ'য়ে এসেছে, কিন্তু যতই ছোট হোক্, প্রত্যেক বলের গায়ে খোলা জানালা আছে। মনে রাখতে হবে যে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় বল যেটি সেটাও সাদা চোখে দেখা যায় না, অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে চোখে পড়ে। তথাপি, যে বলের

কিন্তু ফরামাইনিফেরার কঙ্কাল চুণে পাথরের বা খড়ির মত নরম ও ভঙ্গুর। ফরামাইনিফেরাকে আমাদের ভাষায় 'রন্ধ্রী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে পলিসিষ্টিনাকেই ও নাম দেওয়া চলে, কারণ এর আর রন্ধ্র ছাড়া অন্যরূপ নেই! ফরামাইনিফেরার মধ্যে কিন্তু রন্ধ্রী ও নিরন্ধ্রী উভয়বিধ বীজাণুরই অস্তিত্ব আছে, তাই একে আবার দু'ভাগে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়েছে— রন্ধ্রী ও নিরন্ধ্রী।

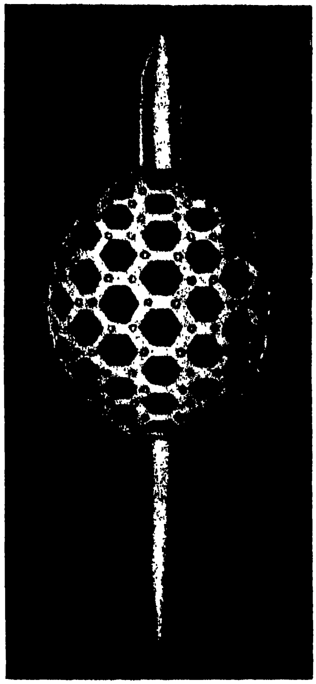
এই যে চকমকি পাথরের মত কঠিন ও স্বচ্ছ পলিসিষ্টিনার

ব্যাসের পরিমাপ কেবল এক ইঞ্চির দেড়শ ভাগের একভাগ মাত্র, তার মধ্যেও 'বাতায়ন' তৈরী আছে চোখে পড়ে। এরূপ আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত কারুকার্য্য, এত ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম পদার্থের উপর যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল তা ভেবে কিছু হদিশ পাওয়া যায় না। এই যে বলের মধ্যে বল—এর প্রত্যেকটিকে যথাস্থানে আটকে রেখেছে আবার চকমকি পাথরের একটি সূক্ষ্ম ডাণ্ডা। সুতরাং এই বলাকৃতি-বীজাণুর কঙ্কাল মোটেই পল্‌কা নয়, বরং বেশ মজবুত বলা যেতে পারে।

কোনো কোনো পলিসিষ্টিনা বা রঞ্জী বীজাণুর জেলীর মত অঙ্গ তার খোলের ভিতরে বাহিরে প্রত্যেক রন্ধ্রের মধ্যে ও উপরদিকে সেঁটে এঁটে থাকে। কোনো কোনোটির শরীর আবার খোলের উপরদিকে চূড়ার ভিতর ঢুকে যেতে পারে। শড়কীর ফলার মত যে একাধিক কাঁটা এদের গায়ে দেখা যায় বিশেষজ্ঞেরা বলেন ওগুলি ওদের মেরুদণ্ডের প্রান্তভাগ! এ থেকে বোঝা যায় যে এই প্রাণীজগতের আদি জীবগুলির প্রধান মেরুদণ্ডের অভাবে একাধিক অপ্রধান মেরুদণ্ডের প্রয়োজন ছিল। সজীব অবস্থায় এরা খাদ্যের অন্বেষণে অসংখ্য শুঁড় বার করে রাখে, কারণ একমাত্র স্পর্শের দ্বারাই এরা খাদ্যাখাদ্য চিনে নির্ব্বাচন ক'রে নিতে পারে। আর কোনো ইন্দ্রিয় এদের নেই। এই জন্যই প্রাণীজগতের এরা নিম্নতম জীব 'ভুজপদী' (Rhizopods) গণের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।



জেলের ফাৎনা

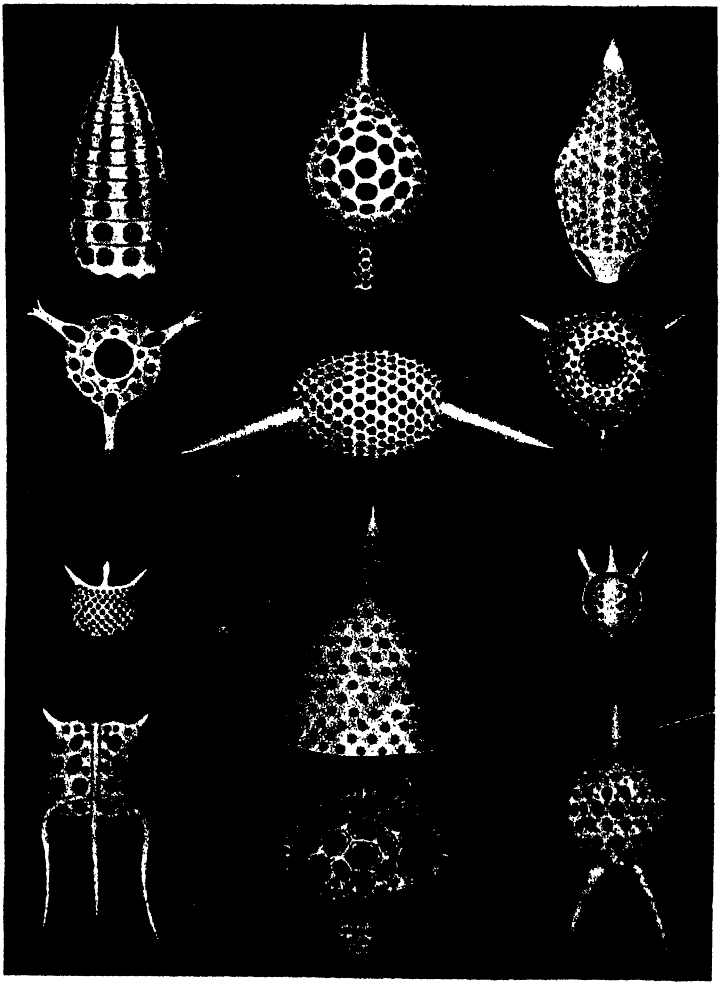


তাঁতির মাকু

ভূতত্ত্ববিদগণের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে জানা গেছে যে পৃথিবীর অধিকাংশ পাহাড়ের উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধন ক'রেছে এই পলিসিষ্টিনার দল। লাখে লাখে অগণ্য পলিসিষ্টিনা জড় হ'য়ে অনেক পাহাড়ের কলেবর বৃদ্ধি করে। সমুদ্রকূলে, দ্বীপের ধারে পাহাড়ের গায়ে সংখ্যাতীত রঞ্জী বীজাণুর অবস্থান চোখে পড়ে। আবার অতল সমুদ্রগর্ভেও প্রচুর পরিমাণে এদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্র গর্ভে যে সমস্ত পলিসিষ্টিনার সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি নাকি আকৃতিসৌষ্ঠবে ও নক্সার সৌন্দর্য্যে আর সমস্ত অন্যত্র সংগৃহীত পলিসিষ্টিনা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বারবেডো (Barbados) দ্বীপের পাহাড়ের গায়ে এদের সর্ব্বপ্রথম সন্ধান পেয়েছিলেন অণুবীক্ষণবিদ্ ভূপর্য্যটক ও প্রাকৃতিক রহস্যের অনুরাগী শ্রীযুক্ত এরেণবার্গ (Ehrenberg.) ১৭৯৫ খৃঃ অব্দ থেকে ১৮৭৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই আশী পঁচাশী বৎসরের কার্য্যকালের মধ্যে তিনি অধিকাংশ সময় ব্যয় ক'রেছিলেন এই পলিসিষ্টিনার গবেষণায়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যের অপরূপ রহস্য সম্বন্ধে তিনি যে চব্বিশখানি বই লিখে রেখে গেছেন, তার মধ্যে পলিসিষ্টিনার বিবরণ ও এর অদ্ভুত ইতিহাস অনেকগুলি পৃষ্ঠাই অধিকার করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে কেবলমাত্র বারবেডো দ্বীপেই নয় পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, এল্‌ব নদীর মুখে কক্‌সহাভেন্ দ্বীপে, নিকোবার দ্বীপমালায়, প্রায় দুহাজার ফুট উচ্চেও পর্ব্বত গাত্রে, কর্দ্দম, পঙ্ক, বেলেপাথর ও মেটে দলার মধ্যে রাশি রাশি পলিসিষ্টিনা জড়ো হ'য়ে রয়েছে। এখানকার প্রায় একশত বিভিন্ন আকৃতির পলিসিষ্টিনা পরীক্ষা ক'রে তিনি বারবেডো দ্বীপের তিনশ প্রকার পলিসিষ্টিনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে আশ্চর্য্য রকম ঐক্য বিদ্যমান।

এ'রেণবার্গের পরবর্ত্তী হেকেল্ (Haeckel) প্রভৃতি ভূতত্ত্ববিদেরা দেখিয়েছেন যে পলিসিষ্টিনা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রয়েছে। ভূগোলে এদের দান বড় কম নয়। সাইবেরীয়া, রীচমণ্ড, ভার্জ্জিনীয়া, স্যাক্সনী, ক্যাম্ব্রিয়া, সিসিলি প্রভৃতি প্রদেশের কতক অংশ এরাই গড়েছে। এঁর মতে—পলিসিষ্টিনা বিশেষভাবে যা বারবেডোর পাহাড়ে পাওয়া

এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে সব পলিসিষ্টিনার চিত্র প্রকাশিত হ'ল, সেগুলির ব্যাসের পরিমাপ কোনোটির এক ইঞ্চির একশ' ভাগের এক ভাগ—কোনোটির বা এক ইঞ্চির দুশো ভাগের এক ভাগ মাত্র! এই রকম তিরিশ লক্ষ পলিসিষ্টিনা যদি এক সঙ্গে জড় করা যায় তাহ'লে মাত্র এক ঘন ইঞ্চি পরিমাণ হবে তাদের সেই সমষ্টি!



রাজদণ্ড বহুচর্ম্মীর বিচিত্র রূপ। (নং ২)

গেছে, তার সঙ্গে রেডিয়োলারিয়ান (Radiolarians) জাতীয় রঙ্গী বীজাণুর ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। পলিসিষ্টিনার কঙ্কাল আর অন্য কিছুই নয়, গেঁড়ি গুগুলী শামুক প্রভৃতির খোলার মতই সেগুলি ঐ রঙ্গী বীজাণুর খোলা মাত্র! ওই কঙ্কালই ওদের জীবনের অবলম্বন।

পলিসিষ্টিনার সন্ধান মিলেছে এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ-মেরু-সমুদ্রে, অতলান্ত মহাসাগরে, ভূমধ্যসাগরে, আড্রিয়াটিক সমুদ্রে ও ভারত সমুদ্রে।

পলিসিষ্টিনা Rhizopods বা ভুজপদী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব'লে নির্দ্দিষ্ট হ'লেও হেকেল্ বলেন ওরা 'রেডিয়োলারীয়ান'

কীটের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল। তিনি এদের আবার দুটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। একটি হ'চ্ছে যাদের আকৃতি জালায়নযুক্ত বলের মত, আর একটি হ'চ্ছে যাদের ফারফোম্ করা বাদামী গড়ন বা ঝাঁঝ্‌রা-বিঁধ ডিমের মত দেখতে। তাঁর মতে বারবেডোর পলিসিষ্টিনাগুলি নাকি এক সময়ে ছিল গভীর সাগর তলে জমা হ'য়ে, পরে প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হ'য়েছে পর্ব্বত ও দ্বীপের জন্মকালে।

প্রশান্ত মহাসাগর তলের মৃত্তিকা পঙ্কে এখনো নাকি অসংখ্য রঙ্গী বীজাণু সজীব অবস্থায় বিদ্যমান আছে। সৃষ্টির আদিতে এদের প্রথম উৎপত্তি হ'য়েছিল, কিন্তু আজও তারা একেবারে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে মুছে যায় নি। গভীর সিন্ধুগর্ভের কর্দ্দম শয্যায় অবিকৃত অবস্থায় বেঁচে আছে। 'রেডিয়োলারীয়ান' সামুদ্রিক কীটানুর স্বগোষ্ঠির মত তারা আজও সেই গভীর সাগরপঙ্কে বিরাজ করছে।

জে'মূয়েলার নামে একজন প্রসিদ্ধ জার্ম্মাণ প্রকৃতি-বিশারদ পলিসিষ্টিনা সম্বন্ধে ব'লেছেন যে ওরা বহু বিঁধ করা চক্‌মকী পাথরের খোলের মধ্যে আবৃত এক রকম সামুদ্রিক জীব। এদের খোলের আকৃতি নানা রকমের এবং তাতে অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করা। গোলাকার, অণ্ডাকার, ত্রিভূজাকার ও নক্ষত্রাকারই খুব বেশী দেখা যায়। চক্‌মকী পাথরের খোলের অংশ অনেক ক্ষেত্রেই কাঁটার মত ছুঁচলো মুখ হয়ে বেড়ে লম্বা হ'য়ে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু তার মধ্যেও বেশ একটি ঐক্য ও ছন্দ দেখা যায়, তাই সেগুলি কোথাও বিসদৃশ ঠেকে না! কোনোটি সোজা লম্বা, কোনোটি পাক খেয়ে উঠেছে, কোনোটি সমান্তরালে বেঁকে বেঁকে বেরিয়েছে, কোনোটি বা আবার শাখা সংযুক্ত! চক্‌মকি পাথরের খোলের গায়ে যে বিঁধগুলি সেগুলির ফাঁদ বেশ বড় বড়, কাজেই দেখায় যেন জালির কাজ করা। ঝাঁঝরের বা চালুনীর ফুটোর মত ছোট নয়। যে অংশটুকু লম্বা হ'য়ে খোলের গা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে সেটুকু একেবারে নীরেট, তার কোথাও এতটুকু ফাঁপা নয় এবং তার গায়ে একটিও বিঁধ নেই। সচ্ছ স্ফটিকের মতো কঠিন ও উজ্জ্বল।

'ফরামাইনিফেরার' খোল চূণে পাথরের মত বা খড়ি-মাটির মত। কাজেই তা পলিসিষ্টিনার স্ফটিক খোলের মত সচ্ছ ও উজ্জ্বল নয়। কিন্তু রেডিয়োলারীয়ানের খোল কাঁচের চিম্‌নী ঢাকা আলোর মত চক্ চক্ করে। এই কারণেই সম্ভবতঃ হেকেল পলিসিষ্টিনাকে Rhizopods বা ভূজপদীর দলে ফেলতে অসম্মত। তিনি এ জীবাণুকে রেডিয়োলারীয়ান শ্রেণীর মধ্যে রাখবার পক্ষপাতী।

'পলিসিষ্টিনা' নাম হয়েছে এর খোলের ভিতর খোল, তার ভিতর খোল অর্থাৎ একাধিক খোল যুক্ত বলে। 'পলি' শব্দের অর্থ 'বহু' এবং 'সিষ্ট' ব'লতে খোল বা ঢাকনা বোঝায়, সুতরাং 'পলিসিষ্টিনার' বাংলা নাম রাখা যেতে পারে "বহুচর্ম্মী"।

"দীপালি"

শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ

ধরণীর বক্ষে নামে ঘোর অমানিশা,
দূর হ'তে দূরান্তরে ছড়ায় তমসা।
শ্যামারে বরিতে আজি শ্যাম আয়োজন
দিকে দিকে। জল, স্থল, উন্মুক্ত গগন
অসীম আঁধার মাঝে হ'ল একাকার।
আজি চন্দ্রহীন রজনীর ব্যথাভার
ঘুচাতে নারিল বুঝি অসংখ্য তারকা,
নারী-হস্তে জ্বলে তাই শত দীপশিখা
দীপ্ত করি বরানন। নীরব বিস্ময়ে
শূন্য হ'তে সন্ধ্যাতারা হেরিতেছে চেয়ে
ধরার সখীরে তার দীপান্বিতা বেশে,—
আঁধারের বক্ষ চিরি রাজে দেশে দেশে।
শ্রদ্ধাভরে কহে মুগ্ধ নর,—"হে কল্যাণি,
যুগে যুগে বরিও এ দীপালি রজনী।"

পাক-চক্র

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

পাত্র-পাত্রী পরিচয়

মাণিকতলার	হরেন মিত্র
গণেন মিত্র লেনের	মদনবাবু
মদন মিত্র লেনের	গণেনবাবু
রমেন	হরেন মিত্রের পৌত্র
প্রাণেশ	মদনবাবুর পুত্র

নলিনী, রোহিণী, সরোজ, কার্ত্তিক প্রভৃতি—
(Dreamers' Club) ড্রিমার্স ক্লাবের
মেম্বরগণ ও রমেনের বন্ধু

শিবচরণ	হরেনের হিন্দুস্থানী চাকর
অপর একজন ভৃত্য (আগন্তুক)	

—•—

সুরমা	মদনবাবুর স্ত্রী
অরুণা	হরেনের পুত্রবধূ ও রমেনের মাতা
কমলা	গণেনবাবুর স্ত্রী
মণিমালা	গণেনবাবুর কন্যা

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(হরেনের পৌত্র রমেনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আজ পাকস্পর্শ উপলক্ষে মহিলাগণের প্রীতি-ভোজন। নিমন্ত্রিতাদের সমাদরে আহারাদি করাইয়া রমেনের মাতা অরুণা এই মাত্র বিদায় দিয়াছেন। কেবলমাত্র তাঁহার বাল্যসখী কমলাকে এখনও যাইতে দেন নাই। কমলা মদন মিত্র লেনের গণেনবাবু উকিলের স্ত্রী।)

হরেন মিত্রের বাটীর অন্দরের বারান্দা

(হরেনের হিন্দুস্থানী চাকর শিবচরণ ও একজন আগন্তুক বাঙ্গালী ভৃত্য। আগন্তুকের হস্তে খুঞ্চিপোষ ঢাকা "ট্রে"তে একখানি শাড়ী ও কিছু মিষ্টান্ন)

আগন্তুক। কৈ গিন্নিমা কোথায়?

শিবচরণ। (বাঁকা বাঙ্গালা কথায়) কেনো, গিন্নিমাকে কি দরকার আছে?

আগন্তুক। (হিন্দি বলিবার চেষ্টায়) আরে, দেখ্‌তে পায়্‌তা নেই হায় যে আমি তত্ত্ব নিয়ে আস্‌তা? তা তোমাদের বিয়ে-বাড়ী এমন ভোঁ ভাঁ কেন হায়? এখানে একজন বোস্‌কে থাক্‌তে হয় না?

শিব। এই ত' সব বৈঠা ছিল। বহুত মাইয়ে ছেলে আস্‌ছিল, খানা-পিনা করিয়ে চলিয়ে গেলো। আজ যে বৌ-ভাত ছিল।

আগ। দূর্! বৌ-ভাত নেই—আইবুড়ো-ভাত বলো।

শিব। নেই, নেই—"হাব্‌ড়া" ভাত নেই—বৌ-ভাত।

আগ। হাব্‌ড়া-ভাত না তোমার মুণ্ডপাত! (একটু চিন্তা করিয়া) এ বাড়ীর কর্ত্তার নাম কি হায়?

শিব। হায়রেন মিত্রি।

আগ। তবে? আলবত্‌ আইবুড়ো-ভাত!

শিব। কেয়া? তোমার হুকুমসে হাব্‌ড়া-ভাত?

আগ। আ মলো যা! তবু তক্কো করতা?

শিব। আরে, তুমি কাঁহাসে আ'তা, বোলো ত'?

আগ। আমি কর্ত্তাবাবুর বেহাই বাড়ী থেকে আ'তা।

শিব। কাঁহাসে?

আগ। কর্ত্তার যে ছেলে মর্‌কে গিয়া ওই ছেলেকা শ্বশুর-বাড়ী থেকে?

শিব। আরে! কর্ত্তাবাবুর একঠো লেড়কা—জল-জিয়ান্তো! ই কাঁহাকা উল্লু?

আগ। তুমি মুখ সাম্‌লায়কে কথা ব'লো বল্‌চি। (কিঞ্চিৎ সন্দিগ্ধভাবে) এদের আদ্‌ বাড়ী বিক্রী কর্‌কে, তার পর এই বাড়ীটা ভাড়া কর্‌কে হায় ত?

শিব। বাড়ী বিক্রী? হামার বাবুকা বাড়ী বিক্রী? তোম্‌ হিঁয়া গালি দেনে আয়া—মার এক থাপ্পড়—(মারিতে গেল)।

আগ। দেখো—নেই ভাল হোগা, বল্‌চি। চ'ড়িয়ে

তোমাকে ছাতারে ক'রে দেগা। কুটুমবাড়ীর লোককে অপমান ক'রতে আস্‌তা তুমি?

শিব। আচ্ছা ঠারো—মাজীকো হাম্ আভি বোল্ দে'তা।

আগ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ছাতু কোথাকার! যা ব'লে দিগে। তোর মা'জী আমাকে ভাল রকম চিন্‌তে পার্‌তা।

(অরুণা ও কমলার প্রবেশ)

অরুণা। কি হ'য়েছে? অত রাগারাগি কিসের? এ লোকটি কে?

(আগন্তুক অরুণাকে দেখিয়া হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

শিব। উ বল্‌চে আপ্‌নে কুটুমবাড়ীসে আস্‌চে। বা কি হিয়াঁ আসিয়ে খালি গালি কর্‌চে।

অরুণা। (আগন্তুককে) তুমি কি তত্ত্ব নিয়ে এসেচ?

আগ। হাঁা মা, আইবুড়ো-ভাত নিয়ে এসেচি।

কমলা। (একটু হাসিয়া) বৌ-ভাতের দিন আইবুড়ো-ভাত এনেচ? দেখি, তোমার ঐ চিঠিখানা। (নাম ও ঠিকানা লেখা খামখানা লইলেন)

আগ। তাই ত মা! আমি ঠিক্ বুঝতে পার্‌চি নে। তোমরা ত একজনও আমাদের সে গিন্নিমা নও! একি হারাণ্ মত্রির বাড়ী নয়?

কমলা। এ ত' অন্য নাম লেখা র'য়েছে। এ হারাণ মৈত্রের বাড়ীর আইবুড়ো-ভাত।

আগ। হাঁা মা, হারাণ্ মত্রি।

অরুণা। সে ঐ পাশের বাড়ী। তুমি ভুল ক'রে এ বাড়ীতে এসেচ। পাশের বাড়ীতে যাও। ওদের মেয়ের আজ আইবুড়ো ভাত।

আগ। তাই যাই মা। আমি এসেই তোমাদের এই হুতুমথুমো চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম "তোদের কর্ত্তা-বাবুর নাম কি?" ও ব'ল্লে "হায়রেন মিত্রি"—তাতেই ত হায়রাণ্ হ'লাম, মা! আচ্ছা, মা! পেরণাম হই!

অরুণা। এসো বাছা! (আগন্তুকের প্রস্থান) পাশা-পাশি দু' বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া থাক্‌লে এম্‌নি মুস্কিল অনেক সময়ে হয়। এদের আবার তার ওপর নামেরও গোলমাল হ'য়ে গেছে।

কমলা। এইবার তবে আসি, ভাই! উনি অনেকক্ষণ থেকে বাইরে এসে ব'সে আছেন।

অরুণা। বৌমার একটা গান আজ গোলমালের মধ্যে তোমায় শোনাতে পারলাম না। খাসা গায়, ভাই!

কমলা। আর একদিন মণিকে সঙ্গে ক'রে এসে গান শুনে যাবো।

অরুণা। তোর মেয়ের বিয়ের কিছু ঠিক্ ঠিকানা হোলো?

কমলা। কৈ আর হোলো। চেষ্টা ত' অনেক কর্‌চেন। উনি বলেন অবস্থা খুব ভাল না হ'লে, সে ঘরে কিছুতেই মেয়ে দেবেন না।

অরুণা। ওলো! একটি ছেলের কথা মনে প'ড়েচে। তার মা আমাদের এই পাশের বাড়ীর বিজলীদির সই। অবস্থা ওদের খুব ভাল—আর ঐ এক ছেলে।

কমলা। তবে ছাখো ভাই, যদি এ সম্বন্ধ ঠিক্ ক'রে দিতে পারো।

অরুণা। তাঁর সইএর মেয়ের আইবুড়ো-ভাতের নেমন্তন্নে আজ নিশ্চয় তিনি ও বাড়ীতে এসেচেন। আমি ত এখনই ওখানে যাব। দেখা হ'লে কথাটা পাড়্‌বো।

(রমেনের প্রবেশ)

কমলা। চল্লাম বাবা রমেন। অনেক দিন আমাদের ওখানে তুমি যাও নি—একদিন যেও।

রমেন। যাব বৈ কি মাসীমা! মাঝে একটু ইয়েতে পড়ে গিয়েছিলাম; এইবার যাব। বাইরে কিন্তু মেসোমশাই তোমার যাবার জন্যে অনেকক্ষণ থেকে তাড়া দিচ্চেন। (অরুণার প্রতি) তুমি আর মাসীমার দেরী ক'রে দিও না, মা!

অরুণা। না রে, না—এই যাচ্চে। (রমেনের প্রস্থান) আচ্ছা তাড়া দিচ্চেন যা হোক্ তোর কর্ত্তা। যেন তাঁর গিন্নিটি একেবারে হাতছাড়া হ'য়ে গেল। ঐ আবার বাবা আস্‌চেন—নিশ্চয় তোর যাওয়ার জন্যেই তাড়া দিতে।

(হরেনের প্রবেশ)

হরেন। বৌমা! এই গণেনবাবু বড় তাড়াতাড়ি ক'র্‌চেন যাবার জন্যে।

অরুণা। এই যে বাবা! এখনই যাচ্চে—আর দেরী নেই।

হরেন। আচ্ছা, আচ্ছা। একটু তাড়া কোরো।

(হরেনের প্রস্থান)

কমলা। চল ভাই! যাবার সময় বৌমাকে আর একবার দেখে যাই। খাসা বৌ পেয়েচ! (কমলা ও অরুণার প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(হরেন মিত্রের সদর-বাটীর বসিবার ঘর। সম্মুখ দিয়া বাহিরে যাইবার পথ। ঘরখানি টেবিল, চেয়ার, টিপয় প্রভৃতিতে সজ্জিত। গণেনবাবু একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে খবরের কাগজ পড়িতেছেন। রসনচৌকি-বাদ্য বাজিতেছে। অল্পক্ষণ পরেই হরেন মিত্রের প্রবেশ)

গণেন। (খবরের কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া) আর একবার বাড়ীর ভিতরে গিয়ে যদি আপনি একটু তাড়া দিয়ে আসেন!

হরেন। এই মাত্র আমি আবার ব'লে আস্‌চি যে মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা ক'র্‌চেন। তাঁরা এই এলেন ব'লে—আর আপনার বেশী দেরী হবে না।

গণেন। যে আজ্ঞে! (আবার খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন। এমন সময় ব্যস্তভাবে মদনবাবু প্রবেশ করিলেন। গণেন তাঁহার দিকে একবার মাত্র চাহিয়া আবার খবরের কাগজে মনোনিয়োগ করিলেন।)

মদন। (সোজা হরেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া) আমি এঁদের নিয়ে যেতে গাড়ী এনেছি। একটু চট্ ক'রে যদি আস্‌তে ব'লে দেন?

হরেন। (মদনের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া) ও! তা আপনার এঁরা—

মদন। আমার স্ত্রী, মশাই! আপনার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ এসেচেন। আপনি শুধু ব'লে দেবেন—"গণেন মিত্র লেন, মদনবাবুর বাড়ী।"

হরেন। (কৌতুক-পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া) বটে! আচ্ছা আমি খবর দিচ্চি। (যাইতে যাইতে স্বগত) ইনি হ'লেন গণেন মিত্তিরের লেনের মদনবাবু, আর উনি হ'চ্চেন মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু! (মদনের দিকে ফিরিয়া) বসুন্, আমি খবর দিচ্চি।

মদন। থাক্—আমি বেশ আছি। আপনি তাড়া দিন গিয়ে।

হরেন। যে আজ্ঞে। (স্বগত) ইনি হ'লেন গণেন মিত্তিরের লেনের মদনবাবু, আর উনি হ'চ্চেন মদন মিত্তিরের লেনের গণেনবাবু। এ বড় মন্দ নয় ত!

(মৃদু হাসিতে হাসিতে হরেনের প্রস্থান। মদন মিত্র লেনের গণেনবাবু বসিয়া আছেন। গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু আফিসের পোষাকে পায়চারি করিতেছেন।)

গণেন। (মদনের প্রতি) আপনি একটু বসবেন না? কাঁহাতক পায়চারি কোর্ব্বেন?

মদন। না, এখন আর বস্‌তে পার্ব্বো না। ডাক্‌তে পাঠিয়েছি আমার স্ত্রীকে।

গণেন। ডাক্‌তে তো পাঠিয়েচেন—কিন্তু মেয়েদের নড়্‌তে চড়্‌তেই দিন কাবার।

মদন। আমার কাছে তা হবার যো নেই। এই দেখুন না! আপনিও বুঝি মেয়েদের নিয়ে যাবেন বলে বসে আছেন?

গণেন। হ্যাঁ অনেকক্ষণ অবধি।

মদন। তা চুপ করে বসে থাকলে ওই দশাই হয়। (অন্দরের দিকে চাহিয়া) ঐ যে আসচেন ইনি, আমি গাড়ীটা দরজায় লাগাতে বলি। (রাস্তার দিকে প্রস্থান)

(কমলা আপাদমস্তক সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়া বাহিরে আসিলেন ও রাস্তার দিকে চলিলেন)

গণেন। (হঠাৎ সেইদিকে দৃষ্টি পড়িতেই) ও যে আমার স্ত্রী! ওগো শুনচ (কমলার দিকে দ্রুত গমন)

কমলা। (একটু ঘোমটা তুলিতেই, তিনি যে একজন অপরিচিতের সঙ্গে চলিয়াছেন ইহা বুঝিতে পারিয়া) মা গো! (বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গিয়া গণেনের ঘাড়ে পতন ও তাঁহার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া অচেতনবৎ অবস্থান)

গণেন। ভয় কি? ভয় কি? এই যে আমি রয়েছি—হেঁ হেঁ আমি! আমাকে চিনতে পারচ না?

(কমলা একবার তাঁহার দিকে চাহিয়া অলসভাবে আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন)

গণেন। (একটা চেয়ারে বসাইয়া) তাই ত এ কি হোলো? বড় ভয় পেয়েচ—না? আচ্ছা—একটু চুপ করে ব'সে ঠাণ্ডা হও দেখি! ভয় কিসের? এই ত আমি এখানে রয়েছি।

(মদনবাবুর প্রবেশ)

মদন। কি হোলো? উনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন নাকি?

গণেন। (ব্যঙ্গভরে) আজ্ঞে হ্যাঁ! একেবারে ন্যাকা সেজে এলেন! এইজন্যে বুঝি বস্‌তে চাইছিলেন না? আচ্ছা বদ্‌মায়েসী মৎলব!

মদন। খবরদার! যা তা বলবেন না বলচি। এখনই অন্যায় কাণ্ড হবে।

গণেন। এর চেয়ে আবার কি অন্যায় কাণ্ড হবে শুনি?

(হরেনের প্রবেশ)

হরেন। কি হয়েচে? কি হয়েচে?

গণেন। দেখুন তো মশাই! এই লোকটা আর একটু হ'লে আমার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছিল আর কি? উল্লুকটার দেখচি একেবারে হুঁস্-পবন নেই!

মদন। আঃ—কি বল্‌ব স্ত্রীলোকের আশ্রয় নিয়ে আছ, নইলে তোমাকে একেবারে গুঁড়ো করে ছাড়তাম।

হরেন। আহা! ব্যাপারটা কি হোলো? আগে শুনি। কিছুই ত বুঝতে পারচি না।

মদন। ব্যাপার শুনুন আমি বলচি। আপনি বুঝে দেখুন।

গণেন। (কমলার প্রতি) ভ্যাখো—ওগো—তোমার জ্ঞান হয়েছে? (কমলা ঘোমটা বড় করিয়া টানিলেন)—আঃ বাঁচলাম। (কমলা উঠিতে উদ্যত হইলে গণেন তাহার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিল) না, না, এখনই উঠো না—আর একটু বোসো। ও লোকটা কি বল্‌তে চায়, সেইটা আমি শুনে যাবো।

মদন। (হরেনের প্রতি) আমি মশাই সকালবেলা খাওয়া-দাওয়া করে কাজে বেরিয়ে গেলাম—যাবার সময়ে আমার স্ত্রীকে বলে গেলাম যে "চাকরটাকে সঙ্গে করে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে মাণিকতলায় নেমন্তন্ন যেও। আমার তো বাড়ী ফিরতে সন্ধ্যা হয়, ফেরত-মুখে তোমায় আমার গাড়ীতেই তুলে নিয়ে যাবো।"

গণেন। তা ব'লে পরের স্ত্রীকে নিয়ে যাবার কথা ত আর ছিল না! আহাম্মুক কোথাকার!

মদন। দেখুন মশাই গালাগাল্ দিচ্চে।

হরেন। (গণেনকে) আহা—আপনি একটু স্থির হোন—আমায় বুঝতে দিন।

মদন। তারপর এখানে এসে, আমি আমার স্ত্রীকে ডাকতে পাঠিয়েছি। তার ঠিক পরেই, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে উনি নেমে এলেন। আমাদের সব মেয়েরাই তো প্রায় ঐ রকম করে যাওয়া আসা করেন, আর ঘোমটার ভিতর থেকে দেখাশুনাও করেন। তা' আমি মশাই চিনবো কি করে যে—

গণেন। (ক্রুদ্ধভাবে) নিজের স্ত্রীকে যে চেনে না, আর পরের পরিবারকে যে—

হরেন। (গণেনের প্রতি) একটু—আপনি একটু—

গণেন। আচ্ছা—আমি চুপ করে আছি। ও বলুক না—ওর কি বলবার আছে।

মদন। আচ্ছা চিন্‌ব কি ক'রে—আপনিই বলুন? আমার স্ত্রী যে কি কাপড়-চোপড় প'রে এসেচেন—আমি তাঁর আস্‌বার সময় ত দেখিনি। আমি আগে আগে যাচ্চি—আর উনি যখন পিছু পিছু আস্‌চেন—তখন ভাবলাম আমার স্ত্রীই আসচেন।

হরেন। যাক্—বুঝলাম যে ব্যাপারটা ইচ্ছে ক'রে কেউ করে নি। পাক-চক্রে এই রকম দাঁড়িয়ে গেছে।

গণেন। ওর ওসব কথা বিশ্বাস করবেন না মশাই! (উঠিয়া) দেখুন, ইনি একটু সুস্থ হয়েচেন—আমি তবে এঁকে এখন নিয়ে যাই। কিন্তু দেখ্‌বেন ও হতভাগা অন্য কারও পরিবারকে ভুলিয়ে নিয়ে না যায়! (স্ত্রীর হাত ধরিয়া তুলিয়া গমনোদ্যোগ) ওর নিজের পরিবার আছে কিনা তারই বা ঠিক্ কি?

মদন। আজ স্ত্রীলোকের কাছে থেকে খুব বেঁচে গেলে। কিন্তু—আমি এই প্রতিজ্ঞা করচি যে কখনও যদি তোমায় হাতে পাই ত' একেবারে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।

হরেন। থাক্, থাক্—আর কেন? (অন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়া ডাকিলেন) রমেন—ও রমেন!

(রমেনের প্রবেশ)

হরেন। (রমেনের প্রতি) এঁদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো।

রমেন। আসুন মাসীমা!

(স্ত্রীকে লইয়া গণেনবাবু রমেনের সহিত প্রস্থান করিলেন)

মদন। যাক, মশাই! এখন আমার স্ত্রীটিকে এইবার দয়া ক'রে আস্‌তে ব'লে দিন্।

হরেন। দেখুন—আমি এই মাত্র ভিতর থেকে দেখে এলাম—আমার বাড়ীতে আর কোনও নিমন্ত্রিত মেয়ে ত নেই, সবাই চ'লে গেছেন।

মদন। (বসিয়া পড়িয়া) এ্যাঁ সে কি মশাই! (একটু সামলাইয়া) না—নিশ্চয় আমার স্ত্রী এই বাড়ীতেই আছেন। আমাকে ঠকাতে সাহস করে এমন লোক

জন্মায় নি। আর যদি কেউ ঠকিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করে গিয়েই থাকে, আমি কিন্তু সহজে ছাড়বো না। আপনাদের কাছেই আমার স্ত্রী আদায় করে তবে আমি ছাড়বো। আপনার বাড়ী থেকে যখন হারিয়েচে তখন আপনারাই তার জন্যে দায়ী।

হরেন। তা এ অবস্থায় মানুষের ঐ রকম রাগ ত হতেই পারে। কিন্তু একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখতে হবে ত'—"কি হ'য়ে থাকতে পারে?"

মদন। আমার মাথা বেশ ঠাণ্ডা আছে। ও ছেঁদো কথা রেখে দিন। বার ক'রে দিন আমার স্ত্রী।

হরেন। দেখুন, তিনি হয় ত মন বদ্‌লে থাক্‌তে পারেন।

মদন। তার মানে?

হরেন। এই নিমন্ত্রণ রাখতে আসবো মনে করে, শেষে হয় ত আর এলেন না। একবার মোটরে গিয়ে চট্ কোরে বাড়ীটা দেখে আসুন না। মানুষের মন ত অমন বদলায়।

মদন। আপনার চেয়েও আমার স্ত্রীকে আমি বেশী ভাল জানি, বুঝেছেন?

হরেন। তা আর বুঝবো না কেন? এ আর এমন শক্ত কথাটা কি? আপনার স্ত্রীকে না জেনে, কি আর আপনি পরের স্ত্রীকে জান্‌তে যাবেন?

মদন। সে যদি একবার মনে করে যে কোথাও যাবে—বিশেষতঃ কোন বন্ধুর বাড়ী বা বাপের বাড়ী—তা হ'লে সে বজ্রাঘাত হলেও যাবে। বুঝেছেন? হারাণবাবুর স্ত্রী আমার স্ত্রীর ছেলেবেলাকার সই, আর তাঁর মেয়ের বিয়েতে সে আসবে না? এ অসম্ভব। আপনার বৌমাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন। হারাণবাবু আপনার ছেলে ত?

হরেন। হারাণ বাবু?' হারাণ মৈত্র?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—হারাণ মৈত্র। (ব্যঙ্গস্বরে) চেনেন না কি?

হরেন। ও হয়েছে—ঠিক হয়েছে।

মদন। (বিরক্তভাবে) ঠিক হয়েছে কি মশাই?

হরেন। ঠিকানা হয়েছে। আপনার স্ত্রীকে এখনই পাওয়া যাবে।

মদন। তাই বলুন—হিসেবের গরু অমনি বাঘে খাবে?

হরেন। আমি চট্ করে পাশের বাড়ীতে জিজ্ঞাসা করে পাঠাচ্চি—আপনার স্ত্রী সেইখানেই আছেন নিশ্চয়।

মদন। পাশের বাড়ীতে কি আবার?

হরেন। ঐ বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন হারাণবাবু। তাঁর মেয়ের বিয়ের আজ আইবুড়ো-ভাত।

মদন। ও! তাহলে আমারই ভুল হয়েছে। ইনি তবে ওই বাড়ীতে নিশ্চয়ই আছেন। (অপ্রতিভের হাসি)

হরেন। আপনি বুঝি ও বাড়ীতে আর কখনও যান নি?

মদন। আজ্ঞে না।

হরেন। বটে—তাই এমন কাণ্ডটা ঘটেছে।

মদন। (হাসিয়া) তবে আমি ওই বাড়ীতেই যাই —অনেক উপদ্রব করে গেলাম। নমস্কার মশাই!

হরেন। নমস্কার! (মদনের প্রস্থান) উপদ্রব ব'লে— ভূতের উপদ্রব!

(রমেনের বন্ধু—ড্রীমার্‌স্ ক্লাবের কতিপয় মেম্বর— নলিনী, সরোজ, রোহিণী প্রভৃতির প্রবেশ। তাহাদের সঙ্গে রমেনের পুনঃ প্রবেশ)

হরেন। এই যে রমেন! তোমার বন্ধুরা এসে পড়েচেন। তা হ'লে তুমি এঁদের বসাও। আমি এদিকের বন্দোবস্ত সব দেখি গে। (প্রস্থান)

রমেন। ব'সো ভাই! বসো তোমরা সব। কিন্তু কার্ত্তিক কৈ? সে এলো না যে? (সকলের উপবেশন)

সরোজ। কার্ত্তিকের একটা কিছু ঘটেছে, নিশ্চয়। আজ কাল তার একেবারে দর্শন পাওয়াই ভার হ'য়ে উঠেছে।

রোহিণী। ক'দিন পরে কাল সে একবার এসেছিল আমাদের ক্লাবে। খানিকক্ষণ শুধু শু'য়ে প'ড়েই রইল, তার পর চুপ্‌চাপ্ উঠে বেরিয়ে চ'লে গেল।

রমেন। এ লক্ষণটা ত' ভাল নয়। যেন কেমন কেমন ঠেকে!

নলিন। দ্যাখো! সেদিন ওর বাড়ীতে খবর নিতে গিয়ে শুনলাম যে একা সন্ধ্যার আগে কোথায় সে বেরিয়ে গেছে। সেখান থেকে মদন মিস্ত্রিরের লেন দিয়ে ক্লাবে আস্‌চি, ও মা! দেখি মূর্ত্তিমান একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হ'য়ে, এক ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

সরোজ। হতভাগা সেখানে কি করছিল?

নলিন। ক'রবে আর কি? সেই বাড়ীর কোনও মহিলা মধুরকণ্ঠে গান গাইছিলেন, ও রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাই গিলছিল।

রোহিণী। ও. তা হ'লে আমাদের আইবুড়ো কার্ত্তিক-টিকে রোগে ধ'রেচে। আচ্ছা ও-ই কেবল বল্‌ত না যে—মনকে যদি দাও প্রশ্রয়, অমনি প্রেম ক'র্‌বেন জেঁকে আশ্রয় ?

সরোজ। হ্যাঁ, ও দেখেচি। যাঁরা যত হৃদয়বলের বড়াই করে বেড়ান, লড়াই করবার ক্ষমতা তাঁদের ততই কম। খেলার বেলুন যত ফুলিয়ে নিয়ে বেড়াবে, তত সামান্য আঘাতেই সে ফুট্ করে ফেটে যাবে।

রোহিণী। আরে, কাল ক্লাব থেকে উঠবার সময় একখানা কাগজ পড়ে গেল কার্ত্তিকের পকেট থেকে। কুড়িয়ে নিয়ে দেখি—তারই হাতের লেখা একটি কবিতা অথবা গান।

নলিন ও সরোজ } দেখি, দেখি! তোমার কাছে আছে ?

রোহিণী। (একখানি কাগজ দেখাইয়া) এই যে। এটা নিয়ে ওর সঙ্গে একটু মজা করতে হবে। দাঁড়াও, রমেনকে দিয়ে এটাতে একটা সুর লাগিয়ে নিচ্চি।

নলিন। হ্যাঁ, রমেন হোলো গাইয়ে মানুষ। যাতে তাতে সুর লাগাতে ওর কসুর নেই। আর আমাদের মত এই কটা বেসুরো অসুরকে তাইতেই ত' জয় করেছে। কিন্তু কার্ত্তিক যে একেবারে সুর-সেনাপতি। সেখানে সুর-চালনা করতে গিয়ে দাঁত ভেঙ্গে না আসে।

(কার্ত্তিকের প্রবেশ)

রমেন। এই ত নাম কর্‌তে কর্‌তেই কার্ত্তিক এসে উপস্থিত।

সরোজ। আরে কি মনে করে হে কার্ত্তিক! হঠাৎ এসে পড়লে যে ? আজ কি মদন মিত্রের লেনে পাহারা-ওয়ালাগুলো প্রচণ্ডভাবে পায়চারি করে বেড়াচ্চে ? না খড়খড়িগুলো বেজায় বিদ্রোহী হয়ে বন্ধ থাকবার ব্যবস্থা করেছে ? না, কোনও কমলমুখীর পরিবর্ত্তে জানালায় আজ গালপাট্টার উদয় হয়েছে—যা দেখে হৃদয়-বস্তুটি হাতে কোরে তুমি সেখান থেকে চোঁ চাঁ দিয়ে একেবারে এইখানে উপস্থিত হয়েছ ?

কার্ত্তিক। থাম্ না। মিছিমিছি ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করবি ত ঘুঁষিয়ে দাঁত ভেঙ্গে দেবো। সব সময় ইয়ারকি ভাল লাগে না। আমার এখন, বলে, মাথার ঠিক নেই। (অর্দ্ধশায়িতভাবে বসিয়া পড়িল)

নলিন। এই দেখেছো ত ? Boxer ঘুঁষি বাগিয়েই আছেন। তার উপর আবার মাথার ঠিক নেই—সাবধানে কথা ব'লো সব।

রোহিণী। আহা! নিয়েছে মনপ্রাণ হরিয়া—

(সে আমার)

গুমরি মরি তাই রহিয়া রহিয়া

(কার্ত্তিক উঠিয়া বসিল ও পকেটে হাত দিয়া কতকগুলো কাগজের মধ্যে একটা কি খুঁজিতে লাগিল—পরে হাসিয়া ফেলিল)

কার্ত্তিক। হতভাগা চুরি ক'রেচে রে!

রোহিণী। আমি ত একটা রচনা চুরি করেচি। তার যা শাস্তি সে আমি নিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু যিনি তোমার মন প্রাণ বড় বড় দুটো জিনিষ হরণ ক'রেছেন, তাঁকে শাস্তি দেবে কি করে ?

নলিন। তাঁকে শাস্তি দেবার কোন ক্ষমতাই ওঁর নাস্তি। চুরি ত সে করে নি। উনি ঝিল্‌মিলির বাইরে থেকে ওঁর সর্ব্বস্ব তার অজ্ঞাতে হাতের কাছে ফেলে দিয়ে এসেছেন। এখনও সেখানে তার নজরও পড়ে নি, আর খবরও পৌঁছায় নি।

কার্ত্তিক। আচ্ছা এই নিয়ে তোমরা ঠাট্টা ক'র্‌চো, আর আমি প্রাণে মারা যাচ্চি!

রমেন। বলিস্ কি রে কার্ত্তিক! তোকে প্রাণে মার্‌তে পারে এনন কে সে ? বল্ ত তার রাস্তা আর আস্তানার নম্বরটা। আমি একবার সে প্রাণঘাতীর সন্ধানটা নিয়ে আসি।

রোহিণী। এই নাও। সেই প্রাণঘাতীর উদ্দেশে স্বয়ং কার্ত্তিকের রচনা।

রমেন। (কাগজ মনে মনে পড়িয়া) আরে বা! কেয়া তোফা। দাঁড়াও দাঁড়াও।

(একটু একটু সুর ভাঁজিয়া—গীত)

(বারেঁায়া)

নিয়েছে মনপ্রাণ হরিয়া।
গুমরি মরি তাই রহিয়া—রহিয়া॥
থির দামিনী যেন দেহের লাবণি,
বিকচ কমল বদন নিছনি,

নয়ন ঢল ঢল, তারা ভোমরা কালো—
চাহনি দেয় হিয়া মোহিয়া ॥
বাঁধুলী অধরে কত সুধা ধরে—
ভাষিতে হাসিতে অমিয় যে ঝরে,
তারে কি পাব না, সদা এ ভাবনা—
গিয়েছি হ'য়ে শেষে "মরিয়া" ॥

নলিন ও বন্ধুগণ। (করতালি দিয়া) বাহবা! বাহবা! অতি চমৎকার!

রমেন। যাক—এখন ঠিকানাটা বল দেখি, আমি তদ্বির করতে বেরিয়ে পড়ি।

নলিন। রাস্তাটা হচ্চে—"মদন মিত্র লেন"

রমেন। বটে, বটে! আর নম্বরটা?

কার্ত্তিক। নম্বরটা ত দেখিনি।

নলিন। তা দেখবি কি করে? খড়খড়িতে ত আর নম্বর ঝুলান থাকে না। যাক্ কিছু দরকার নেই। আমি সেদিন দেখেচি দরজায় লেখা আছে—গণেন্দ্রনাথ ঘোষ, উকিল হাইকোর্ট।

রমেন। বাস্—বাস্। আর বলতে হবে না। সে যে আমার বিশেষ জানাশোনা জায়গা। সেখানে গৃহ-স্বামী, তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা—সকলেই আমার বিশেষ পরিচিত। মেয়েটি এইবার আই এ-তে স্কলার্সিপ্ পেয়েছে, আর কি মিষ্টি যে গান গায়, তা কি আর বল্‌বো?

রোহিণী। প্রয়োজন নেই বলবার। আমরা সকলেই জানি—তার সাক্ষী কার্ত্তিকের এই অবস্থা।

কার্ত্তিক। রমেন, তুই ত এঞ্জিনিয়ার—তোর উপর ভার দিলাম একটা প্ল্যান্ করবার।

নলিন। আচ্ছা ভাই, তাই দাও। আমরা গৃহ-প্রবেশের নিমন্ত্রণ পেলেই হোলো। সব ত বন্দোবস্ত হয়ে গেল। এখন একবার তাসে বোস্ দেখি ততক্ষণ। রমেন তুই একটা গান ধর্।

রমেনের গীত (কীর্ত্তন)

সখা রে! কি আর কহিব তোরে?
সব হারায়েছি—যেদিন হেরেছি
তারে দুটি আঁখি ভ'রে (সব হারায়েছি গো)
(ও সেই—ঝিলিমিলির ফাঁকে ফাঁকে
দেখে তাকে, হারায়েছি গো)
(দিয়ে ভুলে ভুলে, তার হাতে তুলে,
সব যে আমার হারায়েছি গো)
(কিবা) মৃণাল ভুজবল্লরী, অঙ্গে লীলার লহরী—
হিয়া বিমোহন চলন বলন
পাগল করিল মোরে ॥
(আমি ক্ষেপে যে গেছি)
(মনের আগুন চেপে চেপে ক্ষেপে যে গেছি)
(মনের কথা আর বোলবো কারে—
তবে—দিন পাই ত বোলবো তারে)
(রাঁচি যেতে যে হবে—
যদি প্রাণে বাঁচি, তবেই রাঁচি যেতে যে হবে)
নীল নয়ন তারা – মধুপ মাতোয়ারা
ঢল ঢল নীলকমলে;
চলে গজরাজ সম— মনোরম অনুপম—
মন মম দলন করে ॥

কার্ত্তিক। (তাস হাতে করিয়া ডাকিল) Two Hearts! টু হার্ট্‌স্।

নলিন। বেশ ডেকেছ কার্ত্তিক! Two Hearts! বাঃ—ওতে আমি পাশ্ (Passed).

তৃতীয় দৃশ্য

মদনবাবুর বাটীর বারান্দা

সুরমা ও অরুণার প্রবেশ

অরুণা। তা হ'লে তুমি কাল বিকেলবেলা আমাদের বাড়ী আস্‌বে নিশ্চয় ত?

সুরমা। তুমি অত ক'রে ব'ল্‌চ—আমি না গিয়ে পারি কখনও?

অরুণা। আচ্ছা দিদি, তোমার মনে আছে একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ের কথা ক'দিন আগে তোমায় ব'লেছিলাম?

সুরমা। মনে আছে বৈ কি! তুমি সে মেয়েটিকে যে দেখাবে ব'লেছিলে—তার কি হোলো? ছেলের বিয়ে আমি এই মাসেই দেবো।

অরুণা। তা হলে তুমি যখন যাবে তখন সেই মেয়ে সঙ্গে ক'রে তার মাকেও আমাদের বাড়ী আস্‌তে বলে দেবো।

সুরমা। বেশ কথা! আমিও তাহ'লে ছেলেকে নিয়ে

যাব। ওরা নিজেরা পছন্দ ক'র্‌লে আর কারও দেখা-শোনার দরকারই হয় না।

অরুণা। তার পর, ছেলের যদি পছন্দ হয়, তাহ'লে তোমার কাছে আমার দু'টো কথা বলবার আছে। সে তখন ব'ল্‌বো। তুমি আমাদের বিজলী-দির সই, আমার নালিশ তোমায় শুন্‌তেই হবে।

সুরমা। আচ্ছা গো, আচ্ছা!

(হঠাৎ মদনের প্রবেশ)

মদন। দ্যাখো!

(অরুণা ত্রস্তভাবে ঘোমটা টানিল; মদন অপ্রতিভ হইয়া ফিরিতে যাইতেছিল। অরুণা ইসারায় "চল্লাম"—এই কথা সুরমাকে জানাইয়া প্রস্থান করিল)

সুরমা। (মদনকে) তোমার একি কাণ্ড বল দেখি?

মদন। কাণ্ড আবার কি? আমি কি ক'রে জান্‌ব যে তোমার সঙ্গে একজন—

সুরমা। দ্যাখো! মিছে ন্যাকামি কোরো না। কোন্ দিন তুমি এমন সময় বাড়ী আসো বল ত? আমার সইয়ের বন্ধু কতদিন পরে আজ দেখা কর্‌তে এসেছেন, অম্‌নি তোমার মাথার টনক্ ন'ড়ে উঠ্‌ল? আশ্চয্যি!

মদন। (অভিমানে) তুমি কি বল্‌চ যে ইচ্ছে করে আমি ওঁয়ার সুমুখে এসেচি?

সুরমা। (কৃত্রিম কোপে) হ্যাঁ—তাই ত বল্‌চি।

মদন। তুমি আমাকে এম্‌নি ভাবো যে এই বয়সে—

সুরমা। তাই ত আশ্চয্যি যে এই বয়সে—

মদন। তুমি থাকতে আমি

সুরমা। হ্যাঁ, আমি থাক্‌তে তুমি—ছি-ছি-ছি—একটু লজ্জাতেও বাধ্‌ল না?

মদন। শেষে তুমিও আমাকে এম্‌নি ক'রে—

সুরমা। ওঃ, শেষে তুমিও আমাকে এম্‌নি ক'রে—অবহেলা, অপছন্দ, অপমান কর্‌বে?

মদন। (ব্যস্তভাবে) তা কি পারি? কি বল্‌চ তুমি? তুমি কি জান না যে তোমাকে আমি কত ভালবাসি? তুমি রাগ কর্‌লে আমি চারিদিক শূন্য দেখি।

সুরমা। এই সেদিন তুমি ঐ অরুদের বাড়ীতেই আর এক ভদ্রমহিলাকে নিয়ে কি কাণ্ডই না বাধিয়েছিলে। তাকে তোমার নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে কি না—

মদন। (কাঁদ-কাঁদ ভাবে) সুরমা! তুমি এ কথা কি বিশ্বাস ক'রেচ যে আমি ইচ্ছে ক'রে—

সুরমা। আমার ঘেন্নায় জলে ডুবে মর্‌তে ইচ্ছে কর্‌চে।

মদন। (কাতরভাবে) এ্যাঁ?

সুরমা। (কোপের ভাণে) আমি কালই যাব সেই মহিলার সঙ্গে একবার বোঝাপড়া ক'র্‌তে। তারপর আমার যা মনে আছে।

মদন। আর আমি আজই যাব সেই ভদ্রলোক—হ্যাঁ ভদ্দরলোক না হাতী—সেই ছোটলোকটার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'র্‌তে। তারপর আমার মনে যা আছে। (হঠাৎ উত্তেজিতভাবে) দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দ্বন্দ্বযুদ্ধ! দু'গাছা লাঠি কিম্বা দু'খানা এগার ইঞ্চি—এর মধ্যে যে-টা সে বেছে নিতে চায় নিক্, তা'তে আমার কোনও আপত্তি নেই।

সুরমা। (কথঞ্চিৎ শান্ত কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে) কিন্তু তুমি তাদের নাম, ঠিকানা কিছু জানো?

মদন। তা' ত' জানা নেই।

সুরমা। (হতাশভাবে) তবে আর কোথায় আমি বোঝাপড়া ক'র্‌তে যাব?

মদন। (বিমূঢ়ভাবে) তবে আর আমিই বা কোথায় যুদ্ধ ক'র্‌তে যাব? (ক্ষণকাল চিন্তার পর) কেন সেই বুড়ো—যার বাড়ীতে ব'সে সে আমায় অপমান ক'র্‌লে—সেই বুড়োকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই তার নাম ঠিকানা সব পাবো।

সুরমা। (শান্তভাবে) ছিঃ—আবার তুমি সে মুখো হবে? আর ওরা হোলো তার আপনার জন—তোমাকে তাদের ঠিকানা বলে কখনও? ভয় হবে না ওদের তোমাকে দেখে?

মদন। তবে?

সুরমা। (চিন্তার ভাণ করিয়া) তবে—তবে—তবে, আর থাক্‌গে।

মদন। থাক্‌গে? কিন্তু, আমার সম্বন্ধে তুমি তাহ'লে—

সুরমা। (হাসিয়া) তোমাকে কি সত্যি আমি অবিশ্বাস ক'র্‌তে পারি?

মদন। (অত্যন্ত খুসী হইয়া) তবে-তবে না কী! তাই ত' বলি!—কিন্তু আমি যদি কখনও সে লোকটাকে হাতের মধ্যে পাই—তা হ'লে ছেড়ে কথা কইব না—এই তোমার বলে রাখ্‌লাম। হ্যাঁ, দ্যাখো—আজ আমি সকাল

সকাল এলাম তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ক'র্তে। প্রাণেশের বিয়ের আর দেরী করা চলেনা।

সুরমা। তা কি চলে? তোমার ত কিছুরই অভাব নেই। আর ঐ একটা ছেলে।

মদন। তার ওপর বিয়ের যখন ওর মন হ'য়েচে।

সুরমা। আমি কাল বিকেলে একটি মেয়ে দেখ্তে যাব। মেয়ে ভাল হ'লে সেইখানেই বিয়ে দিও।

মদন। নিশ্চয়! তোমার যেখানে পছন্দ হবে—সেই-খানেই ওর বিয়ে পাকা—এ তুমি স্থির জেনো।

সুরমা। আচ্ছা, এখন এসো। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, একটু জল মুখে দেবে এসো। (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

হরেন মিত্রের বাটীর কক্ষ

রমেন। আজ মাসীমা তাঁর মেয়ে মণিমালাকে নিয়ে যে আমাদের বাড়ী আস্চেন।

কার্ত্তিক। তোমার মাসীমা?

রমেন। গণেনবাবুর স্ত্রীকে আমি মাসীমা বলি। আমার মার সঙ্গে তাঁর বড় ভাব। দু'জনে একেবারে বোনের মত।

কার্ত্তিক। এম্নি বেড়াতে আস্চেন বুঝি?

রমেন। মা তাঁর আর একটি নতুন বন্ধুকেও নিমন্ত্রণ ক'রে এনেচেন। শুনলাম মণিমালাকে দেখাবার জন্য।

কার্ত্তিক। এ্যাঁ? বল কি? তাহ'লে এখন উপায়?

রমেন। তাই ত ভাবচি। দেখি কি উপায় ক'র্তে পারি। তুমি এইবার যাও দেখি—তাঁরা এখনই এসে প'ড়্বেন।

কার্ত্তিক। (কাতরভাবে) চলে যাব? আচ্ছা ভাই—যাচ্ছি; কিন্তু প্রাণটা তোমার হাতে দিয়ে গেলাম—এইটা মনে রেখো।

রমেন। ঐ যে মা তাঁর সেই বন্ধুকে নিয়ে এখানেই আস্চেন। চল্ আমরা স'রে পড়ি— (উভয়ের প্রস্থান)

(অরুণা ও সুরমার প্রবেশ)

অরুণা। ভাখো ভাই! তোমায় এ মেয়েটিকে নিতেই হবে। মেয়েটি যেমন সুন্দরী, তেমনি আবার লেখাপড়া—ঘরগেরস্থালী—কাজকর্ম্মে। বৌ নিয়ে তুমি সুখী হবে এ আমি নিশ্চয় বলতে পারি। আর একটি মেয়ে ওদের—সাধ আহ্লাদ ত করবেই তারা। (উভয়ের উপবেশন)

সুরমা। তবে আবার কি চাই? বেয়াই—বেয়ান—এঁরা মানুষ কেমন?

অরুণা। বেয়ান তোমার খুব ভাল হবে। বেয়াইও খুব ভদ্দর—আর একজন ভাল উকিল।

সুরমা। কি নাম তাঁর?

অরুণা। গণেন্দ্রনাথ ঘোষ।

সুরমা। থাকেন কোথায়?

অরুণা। উপস্থিত আছেন মদনমিত্রের লেনে। একটা কথা আছে কিন্তু ভাই!

সুরমা। কি কথা ভাই?

অরুণা। এইখানে বিয়ের কথা শুনে তোমার কর্ত্তা আবার না বেঁকে বসেন।

সুরমা। ইস্! আমি পছন্দ করে কথা দিলে—তাঁর আর বেঁকতে হয় না।

অরুণা। কিন্তু একটু গোল হয়ে গিয়েছিল—আর সে আমাদেরই বাড়ীতে। তোমার সেইটুকু শুধরে নিতে হবে ভাই!

সুরমা। কি গোল? বল না! এ যে হেঁয়ালী হয়ে যাচ্ছে।

অরুণা। হেঁয়ালী নয়।—কথাটা নিশ্চয় তুমিও শুনেচ। এই মেয়ের মাকে নিয়ে—

সুরমা। গোল উঠেছিল? ওরা কি এক ঘরে হয়ে আছে নাকি? ওমা!

অরুণা। আঃ, কি বলো তার ঠিক নেই। একঘরে হতে যাবে কেন? এই মেয়ের মাকে নিয়ে তোমার কর্ত্তা নিজের গাড়ীতে তুলতে যাচ্ছিলেন। (হাসিতে লাগিলেন)

সুরমা। (হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া) ওমা কি ঘেন্না! ইনি বুঝি সেই? আহা বেচারী নাকি ওঁয়াকে দেখে "মূচ্ছো" গিয়েছিল। তা হ্যাঁ ভাই, তুমি ত ওঁকে দেখেছ—ওঁর কি সত্যি সত্যিই মূর্চ্ছা যাবার মতন চেহারা?

অরুণা। আহা চেহারা দেখে মূর্চ্ছা যাবে কেন? ওতো আজকালকার মত নয়—একটু সেকেলে ভাবের। একগলা ঘোমটা দিয়ে তোমার কর্ত্তার মোটর গাড়ীর দিকে যাচ্ছিল; হঠাৎ ঘোমটা তুলেই দেখেছে পরপুরুষ; অমনি পেছন ফিরে ছুটে আসতে গিয়ে পড়বি ত পড় নিজের পুরুষটিরই ঘাড়ে। আর মূর্চ্ছা না গেলে কি চলে তখন?

সুরমা। উনি ও বাড়ী থেকে আমাকে তুলে নিয়ে ফেরবার সময় গাড়ীতে বসে এই সব কথা সেদিন বল্ছিলেন,

আর বলছিলেন যে তা'কে যদি একবার হাতের ভেতর পাই ত আমি দেখে নেবো।

অরুণা। সেই জন্যেই ত আমার ভয়। এ সম্বন্ধ হলে ত হাতের মধ্যেই পাবেন।

সুরমা। ইস্ আমার হাতের মুঠো থেকে নিজে তিনি ফস্‌কাতে পারলে তবে ত? তা ছাড়া যার সঙ্গে অমন ঝগড়া হ'ল তার নাম ধাম কিছুই ত আমাকে সেদিন বলতে পারলেন না; (হাসিয়া) ঐ রকম মানুষ উনি।

অরুণা। তোমায় ভাই আগে থাক্‌তে কথাটা বলে সাবধান করে রেখে দিলাম।

(কমলা ও মণিমালার প্রবেশ)

সুরমা। এঁরা এলেন বুঝি? ওমা—মেয়ে দেখে যে আর চোখ ফিরিয়ে আনা যায় না!

অরুণা। (কমলাকে) এসো ভাই এসো! আয় মণি, তুই এইখানে বোস। (কমলা ও মণিমালা বসিল)

সুরমা। (কমলার প্রতি) কি সুন্দর মেয়েটি আপনার! দেখলেই ঘরে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। (মণিকে) কি নাম মা তোমার?

মণি। শ্রীমতী মণিমালা দাসী।

(শিবচরণের প্রবেশ)

শিব। প্রাণেশ সাহেব এইঠো পাঠাইয়েছেন। (প্রাণেশের কার্ড দিল)

সুরমা। (অরুণার প্রতি) আমাদের খোকা এসেচে। তাকে ডেকে এখনই মেয়ে দেখিয়ে দাও—আবার কি তার কাজের তাড়া আছে।

অরুণা। (শিবচরণের প্রতি) এইখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসো।

(শিবচরণ প্রাণেশকে ডাকিতে গেল ও পরক্ষণেই তাহাকে ঘরের ভিতর পৌঁছাইয়া দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রাণেশের ক্ষীণ দেহখানি সাহেবী পোষাকে সজ্জিত। যেন উহাতে ত্রিভঙ্গ ভাব একটু দেখা যায়)

সুরমা। (প্রাণেশকে) ওরে, এইটি ক'নে। আমার ত খুব পছন্দ। তবু তুই নিজে একবার দেখে যা।

প্রাণেশ। (মণিকে) তোমার নাম কি?

মণি। শ্রীমণিমালা ঘোষ।

প্রাণেশ। কতদূর লেখাপড়া ক'রেচ?

মণি। আই, এ, পাশ ক'রেচি।

প্রাণেশ। কোন্ ডিভিসনে?

মণি। ফার্ষ্ট ডিভিসনে।

প্রাণেশ। Sports এ কোনও distinction আছে? এই High Jump কি Long Jump কিম্বা—

মণি। (জোর গলায়) না।

প্রাণেশ। Dancing?

মণি। না—

প্রাণেশ। মোটর Driving?

মণি। জানি।

প্রাণেশ। আমার মুখের দিকে চাও ত! (মণি খট্‌-মট্ করিয়া চাহিল) (সুরমাকে) আচ্ছা মা! আমি তাহলে এখন যাচ্ছি। বড় তাড়াতাড়ি আছে। ও পছন্দ-টছন্দ তুমি করো। (প্রাণেশের প্রস্থান)

অরু। যা মণি তোর বৌদির কাছে যা। সে ব'লে রেখেছে, এলেই তোকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে।

মণি। হ্যাঁ, আমি বৌদির গান শুনিগে। (মণির প্রস্থান)

অরু। যা বুঝলাম—বাবাজীর কনে পছন্দ হ'য়েছে খুব।

সুরমা। পছন্দ হবে না? আমার ছেলের চোখ আছে ত? তাহ'লে মেয়েটিকে আমায় দিচ্ছ?

কমলা। সে ত মেয়ের ভাগ্যি!

সুরমা। (অরুণার প্রতি) আমি আজ আসি ভাই, আবার একদিন তখন আস্‌ব। (কমলার হাত ধরিয়া) চল্লাম ভাই, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, তোমার মেয়েকেই আমি বউ ক'রবো। (প্রস্থান)

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। কি ঠিক্ হোলো মাসীমা। মণির বিয়ে ঐ খানেই হবে না কি?

অরু। হ্যাঁ; বেশ হবে।

রমেন। হ্যাঁ—তবে—ইয়ে—

কমলা। কেন, তোমার কি এ সম্বন্ধ পছন্দ নয়?

রমেন। (মার মুখের প্রতি চাহিয়া) এমন অপছন্দ কি—তবে একটু ইয়ে।

কমলা। তুমি জান ছেলেটিকে?

রমেন। জানি বৈ কি? বেশ বেশ—ইয়ে গোছের—আর, নামটা যেন কেমন। আচ্ছা মাসীমা, ধর যদি এই রকম

নাম হয়—যেমন সুধাংশু, কার্ত্তিক—হিমাংশু, কি কার্ত্তিক—আবার চেহারাতেও কার্ত্তিক, আর লেখায় পড়ায়, বংশে অবস্থায়—সবদিকে একেবারে কার্ত্তিক—সে যেমনটি হয় ?

অরু। ওর পাগলামী শুনিসনি কমলা। দে দেখি তেমন একটা পাত্র। তা নয় খালি সুধাকর—কার্ত্তিক ; কার্ত্তিক—সুধাকর।

রমেন। দেবো না ত কি ?—তুমি এক হপ্তা আমায় সময় দাও। বাস্। একেবারে যথার্থ কার্ত্তিক ধ'রে নিয়ে আসব।

কমলা। (পাশের ঘরের দিকে ফিরিয়া ডাকিল) কৈ রে মণি ! আয় এইবার।

(মণিমালার প্রবেশ)

মণি। রমেনদা ! বৌদির কাছে কেমন আমি গান শুনে এলাম !

রমেন। এই দেখ, কেবল বাড়ীতে গান—কী ভাল লাগে না। (যাইতে যাইতে চাপা গলায় মণির প্রতি) তোর বৌদি বেশ গায়—নারে মণি ? (রমেনের দ্রুত প্রস্থান—মণি মৃদু হাসিতে লাগিল)

অরু। ওর কথা শুনিস্নি কমলা। আজ বাড়ী ফিরেই ঘোষ মশাইকে ব'লে সব ঠিক ক'রে ফেলবি। তাঁকে "কিন্তু" হ'তে মানা করিস্। বরের মাকে আমি জানি। তিনি যখন অভয় দিয়েছেন, তখন আর তোর কোনও চিন্তা নেই।

কমলা। আচ্ছা তবে আসি দিদি।

অরু। এসো। (সকলের প্রস্থান)

(নলিনী, সরোজ ও রোহিণীর প্রবেশ)

সরোজ। রমেন !

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। এই যে সব এসেচ ! বোসো, বোসো। (সকলে বসিলেন)

রোহিণী। তারপর খবর কি বল ? আমাদের কার্ত্তিক কি ময়ূরের পিঠেই থাকবেন ? না চতুর্দ্দোলায় গিয়ে উঠবেন তাই বল দিকি শুনি।

রমেন। ওসব চতুর্দ্দোলা, চৌঘুড়ি চুলোয় যাক্, এখন শুধু চেলি-চন্দনই ওর জুটলে বাঁচি !

নলিন। কেন রে কি হোলো ? ও যে তোর ভরসাতেই বুক বেঁধে আছে।

রমেন। কপাল রে ভাই কপাল। কারও কিছু করবার সাধ্য কি ? আমার মা সেই মেয়েটির জন্যে, এরই মধ্যে, একটি সম্বন্ধ ঠিক করেচেন। এখন সে নড়চড় হওয়া বড়ই শক্ত।

রোহিণী। তবে উপায় ? ওদিকে কার্ত্তিক যে মারা যায় !

নলিন। সে সম্বন্ধ খুব ভাল নাকি ?

রমেন। হ্যাঁ, এক রকম ভাল বই কি ? তুমি তাদের খুব জান নলিন।

নলিন। কারা বল ত ?

রমেন। পাত্র হচ্ছে—গণেন মিত্রের লেনের মদন বাবুর ছেলে, প্রাণেশ। আমাদের বাড়ীতে ব'সে—এইমাত্র—দু' পক্ষের কথা দেওয়া হ'য়ে গেল। আমি উপস্থিত থেকেও বাধা দিতে পারলাম না।

রোহিণী। কিন্তু আমাদের বন্ধুর জন্যে যে কোন রকমেই হোক সে সম্বন্ধটা ভেঙ্গে দিতে হবে যে ? লোকে কত বড় বড় ব্যাপার গ'ড়ে তোলে, আর আমরা এটা ভেঙ্গে দিতে পারব না ?

নলিন। ঠিক ঠিক—তা আর পার্ব্বো না !

সরোজ। কিন্তু কেমন ক'রে ভাঙ্গা যাবে ?

রমেন। তোমার ত মদনবাবুর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ পরিচয় আছে, হ্যাঁ নলিন্ ?

নলিন। তা আছে।

রমেন। তুমি যে কোনও রকমে পার, একবার স্বয়ং মদনবাবুকে মেয়ে দেখতে গণেনবাবুর বাড়ী নিয়ে আস্‌বে। বাকী সব আমরা গুছিয়ে নেব।

নলিন। তা আমি খুব পার্ব্বো।

সরোজ। বেশ, তবে আজকের মত ঘরে যাওয়া যাক্। কাল কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া যাবে।

রমেন। আমি কার্ত্তিকটাকে ডেকে নিয়ে আজ একবার উকিল বাড়ীর ধারটা ঘুরে আসি গে।

(সকলের প্রস্থান)

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]



প্রলয়-তাণ্ডব

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

জাগ! জাগ! উঠ, নটরাজ।
উপেক্ষা জড়ের ধর্ম্ম দেবতায় লাজ।
পুঞ্জীভূত অনাচারে ভরা,
শঙ্কিতা—কম্পিতা কাঁদে ধরা;
সৃষ্টি'পরে মহা রিষ্টি ব্যাপ্ত, হের আজ।
সমাগত তাণ্ডবের কাল,
তবু সুপ্তিমগ্ন মহাকাল!
কিসে ক্লান্তি-শ্রান্ত শান্ত প্রমথ-সমাজ?
নিশ্চল পিঙ্গল জটা গিরিশিরে
ছিন্ন মেঘমাঝ!
জাগ! জাগ! উঠ, নটরাজ।

স্তব্ধ কেন পিনাকে টঙ্কার?
শুনিছ না—দুর্জ্জনের স্পর্দ্ধিত হুঙ্কার?
শুন, ওই গগন পবন
পূর্ণ করে' আর্ত্তের রোদন—
ও নহে যজ্ঞের মন্ত্র—ওঙ্কার-ঝঙ্কার।
হের, ধূমে গগন মলিন,
কোথা উহা হইবে বিলীন?
ও নহে হোমের ধূম—বারণ শঙ্কার।
ধর্ম্মের বিভূতি ম্লান, অধর্ম্মের বাড়ে
অহঙ্কার।
তবু স্তব্ধ পিনাকে টঙ্কার!

তন্দ্রাহীন তোমার নয়ন।
কে তাহে আঁকিল সুপ্তি—মোহ-আস্তরণ?
পুণ্য-রাজ্য মন্দিরের মাঝে
অনাচার সেথাও বিরাজে;—
অর্থ মাত্র পরমার্থ—ধর্ম্ম আবরণ;
ভেদনীতি গর্জ্জিছে প্রবল
উগারিছে ধ্বংসের অনল;
শকুনি মন্দির-চূড়ে লভেছে আসন।

কলুষিত দেবস্থান, লজ্জানত
দেবের নয়ন।
তন্দ্রাতুর তুমি, ত্রিলোচন!

ঘুমাল কি পন্নগ জটায়
অনাচার দংষ্ট্রাবিষে যা'র ভয় পায়?
সতী-অংশে জন্ম—গর্ব্ব যা'র,
সেই নারী করে হাহাকার—
দম্ভে দুষ্ট দুঃশাসন কৌরব-সভায়;
ক্লৈব্যাচ্ছন্ন পুরুষের দল
কলঙ্কিত করে সভাস্থল।
দুর্ব্বলের দুঃখ মাত্র সম্বল ধরায়।
তুল ক্রুদ্ধ ফণা, ফণী, নষ্ট কর
দুষ্ট-দুরাশায়।
নতশির শোভে কি তোমায়?

ভূমি'পরে পতিত ত্রিশূল—
ভয়ে যা'র চরাচর শঙ্কায় আকুল!
অত্যাচারী-বক্ষোরক্তে যা'র
নিবারণ হয় পিপাসার,
সে ভুলেছে নিজ ধর্ম্ম—এ কি মহাভুল!
লহ শূল তুলি' তবে করে,
ঝলকিয়া দীপ্ত রবিকরে
অভ্যুত্থিত পাপপুঞ্জ করুক নির্ম্মূল।
দক্ষের অশিব যজ্ঞ কর ভঙ্গ
নাশি' দর্পিকুল।
করে তব শোভুক ত্রিশূল।

মূক কেন তোমার বিষাণ?
সে কি হ'ল যোগমগ্ন, যোগেশ ঈশান?
ও মুখমাঝেতে পূর তা'রে,
গরজিয়া উঠুক হুঙ্কারে;
প্রলয়-শঙ্কায় বিশ্ব হ'ক কম্পবান;

জটাজালে ত্রিপথগাধারা
উছলিয়া হ'ক আত্মহারা ;
ভালে শশী হ'ক দীপ্ত রবির সমান।
গ্রহে গ্রহে তারকায় মহা ব্যোমে
প্রলয়ের গান
বিধূনিত করুক বিষাণ।

জাগ ! জাগ ! নটরাজ, তবে ;
উঠ মাতি', মহাকাল, প্রলয়-তাণ্ডবে।
ভূমিকম্পে ধরা যথা টলে
কাঁপুক মেদিনী পদতলে ;
স্থানচ্যুত গিরিশৃঙ্গ পড়ুক অর্ণবে ;
কক্ষচ্যুত লক্ষ গ্রহতারা
অন্ধকারে হ'ক আত্মহারা ;
মিশুক বজ্রের রব সাগরাম্বু-রবে ;
বিলোড়িত মহা শূন্য বায়ু সনে
প্রচণ্ড আহবে।
উঠ ! উঠ ! নটরাজ, তবে।

ধ্বংস-নৃত্যে মাত, মহাকাল।
বিদ্ধ কর শূলে তব সৃষ্টির জঞ্জাল।
নেত্রজাত বহ্নিতে, ভবেশ,
পুঞ্জীভূত পাপ কর শেষ ;—
দিগন্ত আচ্ছন্ন করি' চলজটাজাল।
শ্মশান রচনা ধরাতলে,
নষ্ট সৃষ্টি যা'ক রসাতলে ;
কর শেষ, হে মহেশ—তাণ্ডবের তাল।
রুদ্ররূপে, বিরূপাক্ষ, চূর্ণ কর
সৃষ্টির কঙ্কাল।
ধ্বংস-যজ্ঞে জাগ, মহাকাল।

দুর্গাচরণ নাগ

যে সকল মহাপুরুষ ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, দুর্গাচরণ নাগ মহাশয় তাঁহাদের অন্যতম। সর্ব্বসাধারণের নিকট তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই "সাধু নাগ মহাশয়" নামে পরিচিত ছিলেন। সংসারাশ্রমে থাকিয়া এবং গৃহী হইয়াও তিনি প্রকৃতই সন্ন্যাসীর ন্যায় বাস করিতেন।

পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আধ ক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বাঙ্গালা ১২৫৩ সালের ৬ই ভাদ্র তারিখে নাগ মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম দীনদয়াল ও মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। ৮ বৎসর বয়সে দুর্গাচরণ মাতৃহীন হন ; গৃহে এক বালবিধবা পিসীমাতা ছিলেন ; তাঁহার উপর দুর্গাচরণ ও তাঁহার ভগিনী সারদামণির লালনপালনের ভার অর্পিত হয়। দীনদয়াল আর বিবাহ করেন নাই।

দীনদয়াল দেব-দ্বিজ-পরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন ; তিনি কলিকাতায় কুমারটুলীতে রাজকুমার ও হরিচরণ পাল চৌধুরীদিগের গদীতে সামান্য চাকরী করিতেন।

দুর্গাচরণ শিশুকাল হইতেই অতিশয় মিষ্টভাষী, সুশীল ও বিনীত ছিলেন। বাল্যকালে নারায়ণগঞ্জে একটি বাঙ্গালা স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়া তিনি বাড়ী হইতে ৫ ক্রোশ দূরে ঢাকায় নর্ম্মাল স্কুলে ভর্ত্তি হন। সে সময়ে তাঁহাকে প্রত্যহ দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইত। মাত্র ১৫ মাস তিনি ঐ স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

অতি অল্প বয়সেই পিসীমার আগ্রহাতিশয্যে বিক্রমপুরের রাইজদিয়া নিবাসী জগন্নাথ দাসের একাদশ বর্ষীয়া কন্যা প্রসন্নকুমারীর সহিত নাগ মহাশয়ের বিবাহ হয়। একই রাত্রিতে তাঁহার ও তাঁহার ভগিনী সারদার বিবাহ হইয়াছিল। বিবাহের ৫ মাস পরে নাগ মহাশয় কলিকাতায় আসেন। কলিকাতায় পিতার বাসায় থাকিয়া তিনি দেড় বৎসর কাল ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারী পড়িয়াছিলেন ; তাহার পর তিনি বিখ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর নিকট প্রায় দুই বৎসর কাল হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন।

তিনি যখন কলিকাতায় ডাক্তারী শিক্ষাকার্য্যে তন্ময়

হইয়া বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পত্নী আমাশয় রোগে পরলোক গমন করেন। নাগ মহাশয় তাঁহার প্রথমা পত্নীর সহিত অধিক মেলামেশা করেন নাই। কাজেই বালিকার মৃত্যুতে তাঁহার কোনপ্রকার ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই। দুই বৎসর কাল শিক্ষার পর নাগ মহাশয় হোমিওপ্যাথি চর্চ্চা আরম্ভ করেন; তিনি একটি ছোট ঔষধের বাক্স কিনিয়া গরীব দুঃখীদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন। ক্রমে চারিদিকে তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সময়ে কলিকাতা হাটখোলার দত্তবংশসম্ভূত সুরেশচন্দ্রের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়।

সুরেশচন্দ্র ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন; তিনি নাগ মহাশয়কে মধ্যে মধ্যে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের ব্রাহ্ম সমাজে লইয়া যাইতেন। কেশবের বক্তৃতা শুনিয়া নাগ মহাশয় মুগ্ধ হইতেন। ব্রাহ্ম সমাজ হইতে প্রকাশিত 'চৈতন্যচরিত,' 'রূপ সনাতন,' 'মুসলমান সাধুগণের জীবন' প্রভৃতি পুস্তক আনিয়া নাগ মহাশয় আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। এই সময়ে তাঁহার চিকিৎসা ব্যবসায়ে অনুরাগ কমিয়া যায় ও তিনি রাত্রিদিন শাস্ত্রচর্চ্চা করিয়া দিন যাপন করিতেন; মধ্যে মধ্যে তিনি কাশীমিত্রের শ্মশান ঘাটে যাইতেন; মহানিশায় শ্মশানে বসিয়া তিনি জপ-ধ্যানও করিতেন।

পুত্রকে এইরূপ সংসার-বিরাগী হইতে দেখিয়া দীনদয়াল এই সময়ে পুত্রের দ্বিতীয় বার বিবাহ দিয়াছিলেন; দেওভোগ গ্রামেই তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পিতা-পুত্রে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন ও নাগ মহাশয় ডাক্তারী করিয়া অর্থার্জ্জনে মনোযোগী হন। তিনি পিতার নিকট কলিকাতায় থাকিতেন এবং তাঁহার পত্নী বৃদ্ধা পিসীমা'র নিকট দেশের বাড়ীতেই বাস করিতেন। দ্বিতীয় বার বিবাহের ৭ বৎসর পরে তাঁহার পিসীমা'র মৃত্যু হয়।

পিসীমা'র মৃত্যুর পর কিছুকাল তিনি শোকাচ্ছন্ন ছিলেন বটে, কিন্তু এই সময়ে ডাক্তারীতে তাঁহার পসার খুবই বাড়িয়া যায়। তিনি সকল লোকের নিকট অর্থ লইতে পারিতেন না। যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহার অধিকাংশই আবার দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। এই সময়ে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্য তিনি তাঁহার পত্নীকে কলিকাতায় লইয়া আসেন ও সুরেশচন্দ্রের বাড়ীর নিকট একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে থাকেন।

পিতা দীনদয়াল পুত্র ও পুত্রবধূকে একত্র পাইয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু পত্নীর সান্নিধ্যহেতু ধর্ম্মচর্চ্চায় বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় পুত্র দুর্গাচরণ সুখী হইতে পারেন নাই। তাঁহার পত্নীও নানাপ্রকারে পতিকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া শেষ পর্য্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাচরণের ধর্ম্মজীবনেরও উন্নতি হইতে থাকে; যে সময়ে তিনি দীক্ষা গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হন, ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ এক দিন তাঁহাদের কুলগুরু কামারপাড়া নিবাসী বঙ্কচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। পরদিনই তিনি দুর্গাচরণকে দীক্ষা দান করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান; শুনা যায় বঙ্কচন্দ্র কৌল-সন্ন্যাসী ছিলেন এবং এই ঘটনার এক বৎসর পরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দীক্ষা গ্রহণের পর দুর্গাচরণ ধর্ম্মচর্চ্চায় এত অধিক সময় ব্যয় করিতেন যে, রোগী আসিয়া অনেক সময়ে ফিরিয়া যাইত; সেজন্য তাঁহার অর্থার্জ্জন ক্রমে ক্রমে কমিয়া যায়। বৃদ্ধ পিতাকে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন; পিতাও পুত্রের মনোভাব বুঝিয়া এই সময়ে পুত্রবধূকে লইয়া দেশে চলিয়া যান।

সুরেশচন্দ্র ও দুর্গাচরণ তখন অধিকাংশ সময়ই ধর্ম্মালোচনায় অতিবাহিত করিতে থাকেন ও উভয়ে এক দিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ লাভ করেন। ঠাকুরের কৃপায় নাগ মহাশয়ের জীবনের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সেই সময়ে তিনি ঠাকুরের মুখে এক দিন ডাক্তারদিগের নিন্দা শুনিয়া নিজে ঔষধপত্রাদি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করেন ও পিতা পালবাবুদের যে কার্য্য করিতেন, তাহা গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে থাকেন। রামকৃষ্ণদেবের নিকট বহুবার যাতায়াতের পর তাঁহার সন্ন্যাস গ্রহণের প্রবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই ধর্ম্মালোচনা করিতে উপদেশ দেওয়ায় তাঁহার আর সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয় নাই। তবে তিনি চাকরী ছাড়িয়া দিয়া শুধু শাস্ত্রাদি পাঠেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পাল বাবুরা তাঁহার পিতার ও তাঁহার কার্য্যে এত প্রীত ছিলেন যে, যাহাতে নাগ মহাশয়ের গ্রাসাচ্ছাদনের কোনরূপ কষ্ট না হয়, তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। নাগ মহাশয়ও চাকরী ছাড়িয়া দেওয়ার পর জামা জুতা

ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং সামান্য মাত্র আহার গ্রহণ করিতেন। তিনি নিজে কখনই ভাল জিনিষ খাইতেন না—কিন্তু অপরকে খাওয়াইতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত ছিলেন।

নাগ মহাশয়কে কেহ কখনও বৈষয়িক ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করিতে দেখেন নাই; তাঁহার সম্মুখে কেহ কখনও বৈষয়িক ব্যাপারে আলোচনা আরম্ভ করিলে তিনি কৌশলে তাহা বন্ধ করিয়া দিতেন। তিনি কখনও কাহারও নিন্দা করিতেন না বা কোন লোকের কোন কার্য্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেন না। তিনি দীর্ঘ লঙ্ঘন দিতেন, এমন কি ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাসে থাকিতেন।

পথ চলিবার সময় তিনি কখনও কাহারও অগ্রে যাইতে পারিতেন না; এমন কি মুটে মজুরদিগকেও পথ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে যাইতেন। তিনি কাহারও ছায়া মাড়াইতেন না বা কাহারও বিছানায় বসিতেন না। নাগ মহাশয় রাগ-মার্গের সাধক হইলেও বৈধী ভক্তির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনি যেরূপ উগ্র সাধন করিতেন, অপরকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিতেন।

যে সময়ে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর জামাতা গোপাল বাবুর বাটীতে রামকৃষ্ণদেব শেষ রোগ-শয্যায় পড়িয়াছিলেন, সে সময়ে এক দিন নাগ মহাশয়কে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"ওগো, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বস—তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।" ঐ কথা বলিয়া রামকৃষ্ণ-দেব অনেকক্ষণ নাগ মহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া ছিলেন। ১৯২৩ সালে ৩১শে শ্রাবণ সংক্রান্তি দিনে রামকৃষ্ণদেবের লীলাবসান হইয়াছিল। ইহার পর বাগবাজার নিবাসী প্রসিদ্ধ ভক্ত বলরাম বসু পুরীতে বাস করিবার এবং পালবাবুরা নবদ্বীপে বাস করিবার জন্য নাগ মহাশয়কে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। নাগ মহাশয় তাহাতে সম্মত হন নাই।

নাগ মহাশয় দেশে যাইয়া প্রাণপণ যত্নে পিতৃ-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। দীনদয়াল তখন অক্ষম হইয়াছেন। দীনদয়ালের ইচ্ছানুসারে তিনি প্রতি বৎসর দেশের বাটীতে দুর্গা পূজা, কালী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা প্রভৃতির আয়োজন করিতেন। নাগ মহাশয়কে যে কেহ দেখিতে আসিত, তিনি তাহাদিগকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। যাহারা দুই তিন দিনের পথ হইতে আসিত, তাহাদিগকে আবার শয়নের স্থান দিতে হইত। যাঁহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতেন।

দেশের বাটীতে বাস করার সময় নাগ মহাশয় প্রায়ই কলিকাতায় আসিতেন। প্রতি বৎসর পূজার পূর্ব্বে তাঁহাকে কলিকাতায় বাজার করিতে আসিতে হইত। তাহা ছাড়া রামকৃষ্ণ-ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ, প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ স্বামীজীরাও দলে দলে প্রায়ই দেওভোগে গমন করিয়া নাগ মহাশয়ের গৃহে অতিথি হইতেন।

অশীতি বর্ষ বয়সে নাগ মহাশয়ের পিতা দীনদয়ালের স্বর্গলাভ হয়। পিতৃবিয়োগে নাগ মহাশয় কাতর হন নাই। বসত বাটী বন্ধক রাখিয়া ও অন্যবিধ উপায়ে মোট ১২শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করেন। পিতার সপিণ্ডকরণ শেষ করিয়া তিনি গয়াধামে যাইয়া পিণ্ডদান করিয়াছিলেন।

নাগ মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনার কথা শ্রুত হইয়া থাকে। সে সকল কথা আমরা এখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম না।

নাগ মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের সহধর্ম্মিণী ঠিক তাঁহারই অনুরূপ ছিলেন। তিনিও ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন এবং রাত্রিদিন সাংসারিক কার্য্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতেন। তাঁহার ন্যায় আদর্শ পতি-সেবা-পরায়ণা গৃহিণী অতি অল্পই দেখা যায়।

দেওভোগ ও তাহার নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের বহু লোক এবং ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জসহরনিবাসী বহু লোক সর্ব্বদা নাগ মহাশয়ের নিকট আসিতেন এবং অনেকেই শনি রবিবারে তাঁহার গৃহে বাস করিতেন।

পিতার পরলোকপ্রাপ্তির তিন বৎসর পরে ৫৩ বৎসর ৪ মাস ৭ দিন বয়সে জন্মভূমি দেওভোগে নাগ মহাশয়ের দেহান্তর প্রাপ্তি হয়।

ভল্লু সর্দ্দার

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশ্য গোড়াতেই স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে ভল্লুর বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। তাহার কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে; কিন্তু সন্দেহ করিলে চলিবে না। আমরা তাহার ঠিকুজি কোষ্ঠীর সহিত পরিচিত।

ভল্লুর জীবন-যাত্রা বোধ করি আরো কয়েক বৎসর দুষ্টামি করিয়া অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীনভাবেই কাটিয়া যাইত; কিন্তু হঠাৎ একদিন বায়স্কোপ দেখিতে গিয়া সব ওলটপালট হইয়া গেল। সে অপূর্ব্ব কয়েকটি আইডিয়া লইয়া বায়স্কোপ হইতে ফিরিয়া আসিল।

প্রধান আইডিয়া · সে নিজে একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার। যেমন তেমন সর্দ্দার নয়,—একদিকে যেমন দুর্দ্ধর্ষ অন্যদিকে তেমনি ন্যায়-পরায়ণ—দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করাই তাহার ধর্ম্ম। যদিচ, তাহার একযোড়া ভয়ঙ্কর গোঁফ নাই, এই এক অসুবিধা। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে গেলে, গোঁফ ডাকাতের সর্দ্দারের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ নয়। কারণ, দরোয়ান ছেদী সিংএর গোঁফ ত আছেই উপরন্তু গালপাট্টা আছে, কিন্তু তবু তাহাকে কোনও দিন দুষ্টের দমন কিম্বা শিষ্টের পালন করিতে দেখা যায় নাই। আসল কথা, আচরণ ডাকাত সর্দ্দারের মত হওয়া চাই, গোঁফ না থাকিলেও আসে যায় না।

কিন্তু সর্দ্দার হইতে হইলে ডাকাতের দল চাই। বায়স্কোপে সর্দ্দারের প্রকাণ্ড দল ছিল, তাহারা হুকুম পাইবামাত্র নানাবিধ অসমসাহসিক কাজ করিয়া ফেলিত, অত্যাচারী জমিদারের বাড়ী লুঠ করিয়া তাহাকে গাছের ডালে লট্‌কাইয়া দিত। ভল্লুর সে রকম দল কোথায়? অনুগত অনুচরের মধ্যে তিন বছরের অনুজা লিলি, আর একটি নিংলে কুকুরছানা—বাঘা। কোনো অদূর ভবিষ্যতে এই কুকুর শাবকটি মহা শক্তিশালী হইয়া উঠিবে এই আশায় তাহার উক্তরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

ইহারা দুজনেই ভল্লুর একান্ত অনুগত বটে কিন্তু আদেশ পাইবামাত্র কোনও অসমসাহসিক কাজ করিবে কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একবার একটা হুলো বিড়ালকে আক্রমণ করিবার জন্য ভল্লু বাঘাকে বহু প্রকারে উত্তেজিত করিয়াছিল কিন্তু বাঘা সম্মত হয় নাই, বরঞ্চ অত্যন্ত কাতরভাবে পুচ্ছ সঙ্কুচিত করিয়া বিপরীতমুখে প্রস্থান করিয়াছিল। আর লিলি—সে একে মেয়েমানুষ, তায় দৌড়িতে পারে না; দৌড়িতে গেলেই পড়িয়া যায়। তাহাকে দিয়া কোনও কাজ হইবে না।

কিন্তু এত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও ভল্লু ভগ্নোৎসাহ হইল না। অনুচর না থাকে, না থাক—সে নিঃসঙ্গভাবেই সর্দ্দার বনিবে। যদি তার ডাক শুনিয়া কেহ না আসে সে একলা চলিবে। বায়স্কোপেও ত ডাকাত সর্দ্দার একাকী দুর্গ-প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া বন্দিনী তরুণীকে উদ্ধার করিয়াছিল।

সে যা হোক, কিন্তু সর্দ্দার বনিয়া সে কোন্ কোন্ দুষ্টের দমন করিবে? কারণ, শিষ্টের পালন পরে করিলেও ক্ষতি নাই কিন্তু দুষ্টের দমন প্রথমেই করা দরকার। সর্ব্বাগ্রে তাগার মাষ্টার-মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। দুষ্ট লোক বলিতে যাহা-কিছু বুঝায়, সব দোষই মাষ্টার-মহাশয়ে বিদ্যমান। ভোর হইতে না হইতে তিনি আসিয়া হাজির হন। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি ভল্লুর অনুরাগ কিছু কম, বিশেষতঃ অঙ্কশাস্ত্রে সে একেবারেই কাঁচা। তাই, পরবর্ত্তী দু'ঘণ্টা ধরিয়া যে দারুণ অত্যাচার উৎপীড়ন চলিতে থাকে তাহা বলাই বাহুল্য। এত বড় অত্যাচারীকে শাসন করা ডাকাত সর্দ্দারের প্রথম কর্ত্তব্য।

কিন্তু ভাবিয়া চিন্তিয়া ভল্লু মাষ্টার-মহাশয়কে পরিত্যাগ করিল। তাঁহার চেহারাখানা এতই নিরেট, দেহের দৈর্ঘ্য-প্রস্থও এত বিপুল যে টিনের তরবারি দিয়া তাঁহার মুণ্ড কাটিয়া লওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছের ডালে ফাঁসি দেওয়াও ভল্লুর সাধ্যাতীত। দুঃখিতভাবে ভল্লু তাঁহাকে অব্যাহতি দিল।

আর শাস্তিযোগ্য কে আছে? ছেদী সিং দরোয়ান! ভল্লু মনে মনে মাথা নাড়িল। ছেদী সিংএর চেহারাটা দুষমণের মত বটে; কিন্তু কেবলমাত্র চেহারা দেখিয়া তাহার বিচার করিলে অন্যায় হইবে। সে প্রায়ই পেয়ারা, কুল,

কামরাঙা আহরণ করিয়া আনিয়া, চুপি চুপি ভল্লুকে খাওয়ায়; মাঝে মাঝে কাঁধে চড়াইয়া বেড়াইতে লইয়া যায়। অধিকন্তু সন্ধ্যার সময় কোলের কাছে বসাইয়া অতি অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কাহিনী-কিস্‌সা বলে—শুনিতে শুনিতে তন্ময় হইয়া যাইতে হয়। না—ছেদী সিং দরোয়ানকে পাপিষ্ঠ দুষ্কৃতকারীর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না।

তবে—আর কে আছে? বাবা? ভল্লু অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া চিন্তা করিল। অভাবপক্ষে বাবাকে পাপিষ্ঠ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাবা লোকটি নেহাৎ মন্দ নয়। মার-ধর তিনি একেবারেই করেন না, নিজের লেখাপড়া লইয়াই সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকেন, (যদিও, অত লেখাপড়া করা পাপিষ্ঠের লক্ষণ কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়)। উপরন্তু, ভল্লুর মাতার সহিত তাঁহার বিশেষ সদ্ভাব আছে বলিয়া মনে হয়। প্রায়ই তাঁহাদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস ও অন্তরঙ্গের মত কথাবার্ত্তা হইয়া থাকে—ভল্লু তাহা লক্ষ্য করিয়াছে। আবার মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ঝগড়াও হয়,—তখন ভল্লুর মা চোখে আঁচল দিয়া অস্পষ্ট ভগ্নস্বরে কি বলিতে থাকেন অধিকাংশ বোঝাই যায় না এবং বাবা মুখ ভারী করিয়া ধীরে ধীরে এমন দু'একটি বাক্যবাণ প্রয়োগ করেন যে, মায়ের কান্না আরও বাড়িয়া যায়। অতঃপর, ঝগড়া থামিয়া গেলে বাবা নিভৃতে মাকে অনেক আদর ও খোসামদ করিতেছেন ইহাও ভল্লুর চক্ষু এড়ায় নাই।

এরূপ ক্ষেত্রে কি করা যায়? ভল্লু বড় দ্বিধায় পড়িল। বাবাকে অন্তরের সহিত বদ্‌-লোক বলা চলে না; অথচ তাঁহাকে বাদ দিলে আর শাস্তি দিবার লোক কোথায়? তবে কি কেবলমাত্র দুষ্ট-লোকের অভাবেই একজন মহাপ্রাণ ডাকাত সর্দ্দারের জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইবে? মুণ্ড কাটিয়া ফেলিবার মত লোকই যদি পৃথিবীতে না থাকে, তবে ডাকাত হইয়া লাভ কি?

শীতের দ্বিপ্রহরে চিলের কোঠায় একাকী বসিয়া ভল্লু এইরূপ গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। এখন সে ধীরে ধীরে উঠিল। এই নৈষ্কর্ম্যের অবস্থা তাহার ভাল লাগিল না। একটা কিছু করিতে হইবে। যদি একান্তই পাষণ্ড-লোক না পাওয়া যায়—

ভল্লু দ্বিতলে অবতরণ করিল। কেহ কোথাও নাই—বাড়ী নিস্তব্ধ। মা বোধ হয় লিলিকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেও একটু শুইয়াছেন। ভল্লু মা'র ঘর অতিক্রম করিয়া চুপি চুপি কাকিমার ঘরে উঁকি মারিল। দেখিল, কাকিমা পালঙ্কের উপর বুকের তলায় বালিশ দিয়া শুইয়া করতলে চিবুক রাখিয়া উদাস-চক্ষে জানালার বাহিরে তাকাইয়া আছেন।

এই ঘরটি কাকিমার শয়নকক্ষ বটে, কিন্তু ব্যাপার গতিকে ভল্লুরও শয়নকক্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে ভল্লু নিজের মা'র কাছে শয়ন করিত; এই ঘরটা ছিল কাকার। মাস দেড়েক পূর্ব্বে কাকার বিবাহ হইল; তারপর কি একটা গণ্ডগোল হইয়া গেল,—ফলে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া বাহিরের একটা ঘরে আশ্রয় লইলেন এবং নব-পরিণীতা কাকিমা তাঁহার ঘর দখল করিলেন। ভল্লু বোধ-করি কাকিমার রক্ষক হিসাবেই তাহার শয্যায় শয়ন করিতে লাগিল।

সুতরাং কাকিমার শয়নকক্ষটিকে ভল্লুর শয়নকক্ষ বলা যাইতে পারে। এই ঘরেই তাহার যাবতীয় খেলার উপকরণ ও অস্ত্র-শস্ত্র লুকাইত ছিল। ডাকাত-সর্দ্দারের প্রধান আয়ুধ—একটি টিনের তরবারি—তাহাও এই ঘরে পালঙ্কের নীচে থাকিত। তরবারিটা বাড়ীসুদ্ধ লোকের চক্ষুশূল; সকলেরই আশঙ্কা ভল্লু ঐ তরবারি দিয়া কখন কাহার চোখে খোঁচা দিবে। তাই, ভল্লু সেটাকে অতি সঙ্গোপনে পালঙ্কের নীচে কম্বল চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল।

ভল্লু কিছুক্ষণ দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর নিঃশব্দে পা টিপিয়া প্রবেশ করিল। কাকিমার মাথার কাপড় খোলা, তাঁহার খোঁপায় সোনার শিকলে বাঁধা কাঁটাগুলি ভল্লু দেখিতে পাইল। কিন্তু কাকিমার উদাস দৃষ্টি জানালার বাহিরে প্রসারিত; কি জানি কি ভাবিতেছেন। তিনি ভল্লুর আগমন জানিতে পারিলেন না।

সাবধানে ভল্লু পালঙ্কের তলায় প্রবেশ করিল; কিন্তু তরবারি কম্বলের ভিতর হইতে বাহির করিতে গিয়া ঠুং করিয়া একটু শব্দ হইয়া গেল। কাকিমা চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন,—'কে রে! ভল্লু বুঝি? খাটের তলায় কি করছিস্?'

ধরা পড়িয়া গিয়া ভল্লু বলিল,—'কিচ্ছু না'—তারপর তরবারি হস্তে খাটের তলা হইতে হামাগুড়ি দিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ডাকাত-সর্দ্দারকে কাকিমার সম্মুখে হামাগুড়ি দিতে হইল বলিয়া ভল্লু মনে মনে একটু ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু বাহিরে গর্ব্বিত গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গীতে দাঁড়াইল।

তারপরই সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। দেখিল, কাকিমার সুন্দর চোখ দুটিতে জল টল্ টল্ করিতেছে!

কাকিমা চট্ করিয়া আঁচলে চোখ মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—'কি করছিলি!'

'কিচ্ছু না'—কাকিমার মুখের উপর সুবর্ত্তুল চোখের দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল—'তুমি কাঁদছ কেন?'

কাকিমা লজ্জিতভাবে মুখখানাকে আর একবার আঁচল দিয়া মুছিয়া বলিলেন,—'কৈ কাঁদছি?—তুই সারা দুপুর রোদ্দুরে রোদ্দুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ ত? আয়, আমার কাছে এসে শো।'

'না'—ভল্লুর কৌতূহল তথনও দূর হয় নাই, সে পুনরায় প্রশ্ন করিল,—'কাঁদছিলে কেন বল না। ক্ষিদে পেয়েছে বুঝি?'

'দূর!'

'তবে?'

'কিচ্ছু না।—তুই তলোয়ার নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস্? আয় আমার কাছে।'

'না—আমি এখন যাচ্ছি একটা কাজ করতে'- বলিয়া ভল্লু দ্বারের দিকে পা বাড়াইল।

কাকিমা তাহাকে ডাকিলেন,--'ভল্লু শুনে যা একটা কথা।'

ভল্লু অনিশ্চিতভাবে ফিরিয়া দাঁড়াইল—'কি?'

'কাছে আয়।'

ভল্লু সন্দিগ্ধভাবে কাকিমাকে নিরীক্ষণ করিল। তাহাকে ধরিয়া বিছানায় শোয়াইয়া রাখিবার অভিসন্ধি তাঁহার নাই কি?—নাঃ, কাকিমা ভাল লোক, তিনি এমন নির্দ্দয় ব্যবহার কখনই করিবেন না।

ভল্লু কাছে আসিয়া অধীরভাবে বলিল,—'কি?'

কাকিমার মুখ একটু লাল হইল; তিনি ভল্লুর হাত ধরিয়া তাহাকে খুব কাছে টানিয়া আনিলেন, তারপর প্রায় তাহার কাণে কাণে বলিলেন, —'তোর কাকা কোথায় রে?'

ভল্লু তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—'জানি না। বোধ হয় নীচে আছেন।'

কাকিমা আরও নিম্নস্বরে বলিলেন,—'দেখে এসে আমায় বল্‌তে পারবি? কাউকে কিছু বলিস্ নি, শুধু দেখে আসবি।'

'আচ্ছা' বলিয়া ভল্লু প্রস্থান করিল। এই সামান্য বিষয়ে এত গোপনীয় কি আছে সে বুঝিতে পারিল না।

নীচে নামিয়া ভল্লু বাহিরের দিকে চলিল। বাহিরের একটা ঘরে তক্তপোষের উপর ফরাস পাতা; তাহার উপর চিৎ হইয়া শুইয়া কাকা বৈরাগ্যপূর্ণ চক্ষে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া আছেন। ভল্লু দু'একবার ঘরের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিল কিন্তু কাকার ধ্যানভঙ্গ হইল না; তখন ভল্লু কাকিমাকে খবরটা দিয়া আসিবে ভাবিতেছে, এমন সময় তাহার কুকুর বাঘা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া লাফাইতে লাগিল এবং তরুণ অপরিণত কণ্ঠে ঘেউ ঘেউ করিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে লাগিল।

বাঘার বয়ঃক্রম তিনমাস, চেহারা অতিশয় কৃশ ও দুর্ব্বল। সে যে কালক্রমে ভয়ঙ্কর তেজস্বী বিলাতী কুকুর হইয়া দাঁড়াইবে এ বিষয়ে কেবল ভল্লুর মনেই কোনও সংশয় ছিল না। বাঘার গলার একটি বগ্‌লস্ কিনিয়া দিবার জন্য সে বাড়ীর সকলের কাছে জনে জনে মিনতি করিয়াছিল কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করে নাই।

চেঁচামেচিতে কাকা বিরক্তিপূর্ণ চোখ কড়িকাঠ হইতে নামাইয়া ভল্লুর দিকে চাহিলেন। ভল্লু তাড়াতাড়ি বাঘাকে লইয়া সরিয়া গেল।

বাঘা দীর্ঘকাল পরে প্রভুর সাক্ষাৎ পাইয়াছে—তাহার ক্ষীণ শরীরে যেন আর আনন্দ ধরে না। সে একবার বাগানের দিকে ছুটিয়া যায়, আবার ফিরিয়া আসিয়া ভল্লুর পায়ের উপর থাবা রাখিয়া সাগ্রহে তাহার মুখের পানে তাকায়, তাহার মনের ভাবটা—চল না বাগানে যাই। এমন দুপুর বেলা ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকতে তোমার ভাল লাগছে? চল চল, বাগানে কেমন ছুটোছুটি করব!

ভল্লু একটু ইতস্ততঃ করিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাঘার আমন্ত্রণ অবহেলা করিতে পারিল না। কাকিমাকে কাকার সংবাদ পরে দিলেও চলিবে—এত তাড়াতাড়িই বা কি! বিশেষতঃ কাকা ত কিছুই করিতেছেন না, কেবল চিৎ হইয়া শুইয়া আছেন। এ সংবাদ দু'ঘণ্টা পরে দিলেও কোনও ক্ষতি হইবে না। ভল্লু বাঘাকে লইয়া বাগানে চলিল।

বাড়ীর সংলগ্ন বাগানটা বেশ বিস্তৃত। মাঝে মাঝে আম, লিচু, গোলাপ-জামের গাছ—বাকিটা ফুলের গাছে ভরা। বর্ত্তমানে বিলাতি মরশুমি ফুলের শোভায় বাগান আলো হইয়া আছে। কোথাও একরাশ পপী উগ্র রূপের ছটায় মৌমাছিদের আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে। ওদিকে সুইট্-পী'র ঝাড় পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সহস্র ফুলের প্রজাপতি ফুটাইয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে দু'একটা চন্দ্রমল্লিকা কোঁকড়া মাথা দুলাইয়া নিষ্কলঙ্ক শুভ্র হাসি হাসিতেছে।

কিন্তু উদ্যান-শোভার দিকে ভল্লুর দৃষ্টি নাই। তাহার হাতে তরবারি, পশ্চাতে ভক্ত অনুচর। সে খুঁজিতেছে অ্যাড্‌ভেঞ্চার। কিন্তু হায়, এই ফুলের মরুভূমিতে অ্যাড্‌ভেঞ্চার কোথায়? বিমর্ষভাবে ভল্লু কয়েকটা ডালিয়া ফুলের পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দিল।

কিন্তু ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকিলে জগতে কোনো জিনিষই দুষ্প্রাপ্য হয়না, শত্রুও অচিরাৎ আসিয়া দেখা দেয়। অবশ্য কল্পনার জোর থাকা চাই। ভল্লু শত্রু অন্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ একটি চন্দ্রমল্লিকা গাছের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। গাঢ় লাল রঙের চন্দ্রমল্লিকা—একটি কঞ্চির ঠেক্‌নোতে ভর দিয়া সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভল্লু কল্পনার চক্ষে দেখিতে পাইল—এ চন্দ্রমল্লিকা নয়, মহাপাপিষ্ঠ জমিদার। ইহার অত্যাচারে বাগানের অন্য সমস্ত ফুল ভয়ে জড়সড় হইয়া আছে; উহার রক্ত চক্ষুর সম্মুখে অদূরে ঐ ভূ-লুণ্ঠিতা পরটুলাক্কার ফুলটি বন্দিনী তরুণীর মত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তেজনায় ভল্লুর চোখ জলজল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সে পঁয়তাড়া কশিয়া একবার শত্রুর চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিল, তারপর তরবারি আস্ফালন করিয়া কঠোর স্বরে কহিল,—'ওড়ে নড়াধম'—উত্তেজিত হইলে ভল্লুর উচ্চারণ কিছু বিকৃত হইয়া পড়িত।

নরাধম কোনো জবাব দিল না, কেবল আরক্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। বাঘা উৎসাহিতভাবে বলিল—'ভুক্ ভুক্—'

ভল্লু পদদাপ করিয়া বলিল,—'ওড়ে নড়াধম, তুই জানিস্ আমি কে? আমি ভল্লু সর্দ্দার—তোর যম।'

এতবড় দুঃসংবাদেও নরাধম বিন্দুমাত্র বিচলিত হইল না। ভল্লু তখন গর্জ্জন করিয়া বলিল,—'পাজি-উল্লুক-গাধা, এই তোর মুণ্ডু কেটে ফেললুম!' বলিয়া সবেগে তরবারি চালাইল।

দুর্ব্বিনীত নরাধমের মুণ্ড কাটিয়া মাটিতে পড়িল।

'ভল্লু!'—

হঠাৎ পিছন হইতে গুরু-গম্ভীর আহ্বান শুনিয়া ভল্লুর ক্ষাত্র-তেজের উত্তাপ এক মুহূর্ত্তে হ্রাসপ্রাপ্ত হইল; সে সভয়ে ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিল—কাকা! কাকার বৈরাগ্যপূর্ণ ললাটে বৈশাখী মেঘের মত ভ্রূকুটি। তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আসিতেছেন।

বাঘা কাকার আগমনের সাড়া পাইয়া কাপুরুষের মত আগেই সরিয়াছে। উপায় থাকিলে ভল্লুও সরিত কিন্তু কাকা এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন যে পলায়নের চেষ্টা বৃথা। কাল-বৈশাখীর ঝড়টা তাহার মাথার উপর দিয়াই যাইবে।

কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন; ভল্লুর শ্রবণেন্দ্রিয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—'এ কি করেছিস্?'

ভল্লু বাঙ্-নিষ্পত্তি করিল না। বাগানের ফুল ছেঁড়া বারণ একথা সে বরাবরই জানে এবং সাধ্যমত এ নিষেধ মান্য করিয়া আসিয়াছে। তবে যে আজ কোন্ দুরন্ত কর্ত্তব্যের তাড়নায় ঐ ফুলটাকে বৃন্তচ্যুত করিয়াছে তাহা কাকাকে কি করিয়া বুঝাইবে? ফুলটা যে ফুল নয়—একটা মহাপাপিষ্ঠ নরাধম, এ কথা কাকা বুঝিবেন কি? সকলের কল্পনা শক্তি সমান নয়; ভল্লু জানিত কাকা বুঝিবেন না। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং-তার চেয়ে নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ। ভল্লু নীরব রহিল।

কাকা ভল্লুর হাত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—'কেন ফুল ছিঁড়্লি?'

ভল্লু এবারও জবাব দিল না। কাকা তখন তাহার কাণ ছাড়িয়া চুলের মুঠি ধরিলেন, সজোরে নাড়া দিয়া বলিলেন, —'পাজি-উল্লুক গাধা, কতবার তোকে মানা করেছি বাগানের ফুলে হাত দিস্ নি। কেন ছিঁড়্লি বল!'

বারবার একই প্রশ্নে ভল্লু উত্যক্ত হইয়া উঠিল। তার উপর চুলের যন্ত্রণা! কাকার বজ্রমুষ্টি ক্রমে ক্রমে যেরূপ দৃঢ়তর হইতেছে, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত চুলগুলি তাহার মুঠিতেই থাকিয়া যাইবে। অথচ ভাব-গতিক দেখিয়া মনে হইতেছে একটা কোনও উত্তর না পাইলে কাকা শান্ত হইবেন না।

যন্ত্রণা ও উগ্র প্রয়োজনের তাড়ায় ভল্লুর মাথায় এক বুদ্ধি গজাইল। সে সজল চক্ষে চিঁ চিঁ করিয়া বলিল,—'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি।'

ইন্দ্রজালের মত কাজ হইল। সচকিতভাবে কাকা চুল ছাড়িয়া দিলেন, হতবুদ্ধির মত বলিলেন,—'কি বল্‌লি ?'

এতটা ভল্লুও প্রত্যাশা করে নাই; কিন্তু যে পথে সুফল পাওয়া গিয়াছে সেই পথে চলাই ভাল। সে আবার বলিল,—'কাকিমার জন্যে ফুল তুলেছি'—বলিয়া ভূপতিত ফুলটা সযত্নে তুলিয়া লইল; তারপর আবার আরম্ভ করিল—'কাকিমা বললেন—'

'কি বল্‌লেন ?'

খুল্লতাতের জেরায় পড়িবার ইচ্ছা ভল্লুর আদৌ ছিল না, বিশেষতঃ মোকাবিলায় মিথ্যা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণ বিদ্যমান। বয়ঃপ্রাপ্ত লোকেদের একটা মহৎ দোষ, তাহারা প্রত্যেকটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য না পাইলে চটিয়া যায়; কল্পনা বলিয়া যে ঐশী শক্তি মাথার মধ্যে নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে চায় না। ভল্লু কাকার প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল,—'কাকিমা বড্ড ফুল ভালবাসেন; রোজ খোঁপায় তিন্‌টে-পাঁচটা ফুল পরেন—'

খুল্লতাত অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আর বিলম্ব করা অনুচিত বুঝিয়া ভল্লু প্রস্থানোদ্যত হইল।

কাকা ডাকিলেন,—'ভল্লু—শোন্—'

ভল্লু খানিক দূর গিয়াছিল, সেখান হইতে ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল,—'আর কাকিমা তোমায় ডাকছিলেন—তুমি কোথায় আছ দেখতে বললেন'—বলিয়া ক্ষুদ্র পদযুগল সবেগে চালিত করিয়া দিল।

বাগানের নৈঋত কোণে একটি বড় আম গাছের নিম্নতম শাখায় ভল্লুর স্থায়ী আড্ডা ছিল। স্থূল শাখাটি ভূমির সমান্তরালে কাণ্ড হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল; তাহার ডগার দিকে বসিয়া দোল দিলে শাখাটি মন্দ মন্দ দুলিত।

এই শাখার ঘনপল্লবিত ডগায় বসিয়া একটা বড় রকম দোল দিয়া বিক্ষুব্ধচিত্ত ভল্লু ভাবিতে আরম্ভ করিল। বাঘা এতক্ষণ নিরুদ্দেশ ছিল; এখন, যেন কিছুই হয় নাই এম্‌নি ভাবে ল্যাজ নাড়িতে নাড়িতে গাছের তলায় আসিয়া বসিল। ভল্লু একবার ভর্ৎসনাপূর্ণ চক্ষে তাহার পানে তাকাইল। অনুচরের ভীরুতা তাহার মর্ম্মে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। তারপর পুনরায় সে ভাবিতে আরম্ভ করিল।

প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। দুষ্টের দমনব্রত গ্রহণ করিয়া ভল্লু চারিদিকে দুষ্ট অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে,—অথচ দুষ্ট, অত্যাচারী, দুর্ব্বৃত্ত বলিতে যাহা কিছু বুঝায় তাহার মূর্ত্তিমান বিগ্রহ ভল্লুর সম্মুখেই হাজির রাখিয়াছে। এতক্ষণ এটা সে দেখিতে পায় নাই কেন? কাকার মত মহাপাপিষ্ঠ নরাধম পৃথিবী খুঁজিয়া আর কোথায় পাওয়া যাইবে?

শুধু আজিকার এই ঘটনার জন্য নয়, কাকা যে একজন অবিমিশ্র পাষণ্ড ইহা তাহার অনেকদিন আগেই জানা উচিত ছিল। প্রথমতঃ তিনি ডাক্তার—ডাক্তারেরা যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে বদ-লোক এ কথা শিশু-সমাজে কে না জানে? লিলি পর্য্যন্ত জানে। ভল্লুর সামান্য একটু পেটের অসুখ হইতে না হইতে কাকা তাহার সমস্ত প্রিয় খাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়া এমন সব কটু, তিক্ত, কষায় ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করেন যে সে কথা স্মরণ করিলেই অন্নপ্রাশনের অন্ন ঊর্দ্ধগামী হয়। তাহার উপর তিনি একজন কঠোর ব্রহ্মচারী, মাথায় একটি ক্ষুদ্র টিকি আছে। ভোর পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে তিনি শয্যাত্যাগ করিয়া স্নান করেন; তারপর ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়া এমন ঘোর রবে কাঁসর-ঘণ্টা বাজাইতে আরম্ভ করেন যে পাড়ার ত্রিসীমানার মধ্যে আর কাহারও ঘুমাইবার উপায় থাকে না।

শুধু ইহাই নয়, নব-পরিণীতা কাকিমার সঙ্গে তাঁহার দুর্ব্ব্যবহার স্মরণ করিলেও তাঁহার নৈতিক দুর্গতি সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। বিবাহের পূর্ব্বে বাড়ীশুদ্ধ লোকের সহিত কাকার কথা কাটাকাটি বকাবকি চলিয়াছিল একথা ভল্লুর বেশ মনে আছে। যা হোক, শেষ পর্য্যন্ত কাকা হাঁড়ির মত মুখ করিয়া বিবাহ করিতে গেলেন। কিন্তু বিবাহ করিয়া আসিয়া তিনি অন্দর মহলের সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন। এই লইয়া বাড়ীতে অশান্তির শেষ নাই; ভল্লুর মা'র সহিত কাকার প্রায়ই বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। কাকা বায়স্কোপের দুষ্ট জমিদারের মত তির্য্যক্‌ হাসি হাসিয়া বলেন,—'আমি ত আগেই বলে দিয়েছিলুম!'

অথচ কাকিমা অতিশয় ভাল লোক; এতদিন তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ভল্লুর তাহা বুঝিতে বাকি নাই। লজঞ্চুস্‌ কিনিবার জন্য পয়সার প্রয়োজন হইলে তিনি চুপি

চুপি তাহাকে পয়সা দেন ; এমন কি, চোরাই মাল তাঁহার কাছে গচ্ছিত রাখিলে তিনি কাহাকেও বলিয়া দেন না। একবার কতকগুলি ডাঁশা কুল ও খানিকটা কাসুন্দি চুরি করিয়া ভল্লু কাকিমার জিম্মায় রাখিয়াছিল, তিনি সমস্ত কুল ও কাসুন্দি যথাসময়ে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, একটি কুল বা একবিন্দু কাসুন্দিও আত্মসাৎ করেন নাই। এরূপ গুণবতী নারী আজকালকার দিনে কোথায় পাওয়া যায় ? অন্ততঃ ভল্লুর জানা-শোনার মধ্যে এমন আর দ্বিতীয় নাই।

এ হেন কাকিমাকে কাকা অবহেলা করেন। শুধু অবহেলা করিলে ক্ষতি ছিল না, পরন্তু তিনি কাকিমার উপর অন্যায় উৎপীড়ন করিয়া থাকেন তাহাও সহজে অনুমান করা যায়। পূর্ব্বে দু' একবার কাকিমাকে বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফুঁপাইতে শুনিয়া ভল্লুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; আজ সে কাকিমার চক্ষে জল দেখিয়াছে। এসব কি মিছামিছি ? ভল্লুর দৃঢ় ধারণা জন্মিল, কাকা সুবিধা পাইলেই আসিয়া কাকিমার কাণ মলিয়া চুল ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া যান। নচেৎ কাকিমা অকারণ কাঁদিবেন কেন ?

যে-দিক দিয়াই দেখা যাক, কাকার মত দুর্নীতিপরায়ণ দমন-যোগ্য ব্যক্তি আর নাই।

কিন্তু দমন করিবার উপায় কি ? দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেওয়া বা তরবারি দিয়া মুণ্ডচ্ছেদ সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করিতে গেলে ভল্লুর জীবনের সুখ-শান্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। ক্রুদ্ধ কাকা হয়ত ভল্লুকে চিরজীবন ধরিয়া ভাত ডালের পরিবর্ত্তে গাঁদালের ঝোল ও বোতলের সুতিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই।

ভল্লু দীর্ঘকাল বদনমণ্ডল কুঞ্চিত করিয়া চিন্তা করিল কিন্তু কাকাকে জব্দ করিবার কোনও সহজ পন্থাই আবিষ্কৃত হইল না। তখন সে শাখা হইতে নামিয়া চিন্তাকুলচিত্তে ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিল। বাঘা এতক্ষণ বৃক্ষতলে লম্বমান হইয়া নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতেছিল, এখন উঠিয়া ডন্ ফেলার ভঙ্গিতে আলস্য ভাঙ্গিয়া প্রভুর অনুগামী হইল।

চন্দ্রমল্লিকা ফুলটি এতক্ষণ ভল্লুর হাতেই ছিল, অন্যমনস্ক ভাবে সে তাহার গোটাকয়েক পাপ্ড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল ; তবু ফুলের সৌষ্ঠব একেবারে নষ্ট হয় নাই। বাড়ীতে পৌঁছিয়া ভল্লু কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ নেত্রে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, তারপর অনিচ্ছাভরে উপরে কাকিমার ঘরের উদ্দেশ্যে চলিল।

বাড়ী তখনো নিঃশব্দ—বিশ্রামকামীরা বিশ্রাম করিতেছে। কাকিমার দরজার নিকট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ভল্লু থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কাকার কণ্ঠস্বর! কাকা চাপা অথচ উদাস স্বরে কথা কহিতেছেন। ভল্লু দরজার বাহিরে দেয়ালের সঙ্গে একেবারে সাঁটিয়া গিয়া শুনিতে লাগিল। কাকা বলিতেছেন—'সংসারে আমার রুচি নেই। আমি একলা থাকতে চাই—ছেলেবেলা থেকেই আমার প্রতিজ্ঞা স্ত্রীলোকের সংসর্গে আসব না। কারণ, দেখেছি যারা স্ত্রীর প্রলোভনে প'ড়ে সংসারে জড়িয়ে পড়েছে, তাদের দ্বারা আর কোনও বড় কাজ হয় না।'

কাকা নীরব হইলেন ; কিছুক্ষণ পরে কাকীমার অশ্রু-রুদ্ধ অস্পষ্ট কণ্ঠ শুনা গেল,—'তবে বিয়ে করেছিলে কেন ?'

'দাদা আর বৌদি'র কথা এড়াতে পারলুম না, তাই বিয়ে করতে হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে এই সর্ত্ত হয়েছিল যে, বিয়ে করেই আমি খালাস, তারপর আমার আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু এখন দেখছি, তাঁরা আমায় ঠকিয়েছেন, সর্ত্তের কথা তাঁদের মনে নেই।—কিন্তু সে যাক। একটা কথা তোমায় বলে দিই, মনে রেখো—আমার কাছে তোমার কোনোদিন কিছুর প্রয়োজন হবে না, সুতরাং আমাকে ডাকাডাকি করে মিছে উত্যক্ত কোরো না।'

'আমি ত তোমাকে ডাকিনি—'

ভল্লু দেখিল তাহার স্থান-ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। সে ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া নীচে চলিল। তাহার সামান্য একটা কথার সূত্র ধরিয়া কাকা কাকিমাকে তিরস্কার করিতেছেন, এখনি হয়ত সাক্ষী দিবার জন্য তাহার তলব পড়িবে। কাকার মত দুর্জ্জনের নিকট হইতে দূরে থাকাই নিরাপদ।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, তাহার মা নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া কাকাকে উদ্দেশ করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল স্বরে বলিতেছেন,—'ওমা—একি! সন্নিসি ঠাকুর একেবারে বৌয়ের ঘরে ঢুকে পড়েছ যে…'

নীচে নামিয়া ভল্লু দেখিল বাড়ীর ঝি বামা ভীষণ চেঁচামেচি সুরু করিয়া দিয়াছে ও একগাছা ঝাঁটা লইয়া বাঘাকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তাহার কথা হইতে ভল্লু বুঝিল যে, বামা ভাঁড়ার-ঘরের দাওয়ায় রৌদ্রে শুইয়া হাঁ করিয়া ঘুমাইতেছিল, বাঘা গিয়া সস্নেহে তাহার মুখ-গহ্বরের অভ্যন্তরে জিহ্বা প্রবিষ্ট করাইয়া তাহার আল্‌জিভ্‌ চাটিয়া লইয়াছে। বামা বাঘার উদ্দেশে যে সব বিশেষণ নিক্ষেপ করিতেছে তাহা শুনিলে কুকুরেরও কর্ণেন্দ্রিয় লাল হইয়া উঠে।

ভল্লুও নিঃশব্দে বাঘাকে খুঁজিতে আরম্ভ করিল। বামার আল্‌জিভ্‌ চাটিয়া লওয়া যে বাঘার অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তবু. সব দোষ কি বাঘার? বামা হাঁ করিয়া ঘুমায় কেন? আর, বাঘার গলায় একটা বগ্‌লস্‌ থাকিলে ত এমন ব্যাপার ঘটিতে পারিত না, বাঘাকে তখন স্বচ্ছন্দে বাঁধিয়া রাখা চলিত! দোষ বাঘার নয়,—দোষ বাড়ীর লোকের। তাহারা একটা বগ্‌লস্‌ কিনিয়া দেয় নাই কেন?

খুঁজিতে খুঁজিতে বাহিরের ঘরে কাকার তক্তাপোষের তলায় ভল্লু বাঘাকে আবিষ্কার করিল। বাঘা নিদ্রার ভাণ করিয়া এক চক্ষু ঈষৎ খুলিয়া মিটিমিটি চাহিতেছিল, ভল্লুকে দেখিয়া বাহির হইয়া আসিল।

ভল্লু বাঘার কাণ মলিয়া দিয়া চাপা তর্জ্জনে বলিল,—'পাজি কোথাকার! বামার মুখ এঁটো করে দিয়েছিস্‌ কেন?'

বাঘা বিনীতভাবে ল্যাজ নাড়িয়া অপরাধ স্বীকার করিল।

ভল্লু বলিল,—'মজা দেখাচ্ছি দাঁড়াও, এবার থেকে তোমায় বেঁধে রাখব।'

বাঘা পুচ্ছ-স্পন্দনে কাতরতা জ্ঞাপন করিল।

ভল্লু কিন্তু শাসনে কঠোর। খানিকটা ছেঁড়া কাপড়ের পাড় সে অন্য প্রয়োজনে সংগ্রহ করিয়াছিল, এখন তাহা পকেট হইতে বাহির করিল। সেটা বাঘার গলায় বাঁধিতে যাইবে এমন সময় হঠাৎ কাকার শয্যার উপর বালিশের পাশে একটা জিনিষ দেখিয়া তাহার চক্ষু পলকহীন হইয়া গেল। কাকার হাতঘড়িটা রহিয়াছে, ঘড়িতে চামড়ার বগ্‌লস্‌ সংলগ্ন। ব্যাণ্ড-শুদ্ধ রিষ্ট-ওয়াচ সে পূর্ব্বে দেখে নাই এমন নয়, বহুবার দেখিয়াছে; কিন্তু এখন তাহার মুগ্ধ নেত্র ঐ জিনিষটার উপর নিশ্চল হইয়া রহিল।

এক-পা এক-পা করিয়া অগ্রসর হইয়া সন্তর্পণে ভল্লু সোণার ঘড়িটি হাতে তুলিয়া লইল; তারপর ঘড়ি হইতে বগ্‌লস্‌ পৃথক করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না। তখন ভল্লু একবার দরজার দিকে তাকাইয়া ঘড়িশুদ্ধ বগ্‌লস্‌ বাঘার গলায় পরাইয়া দিল। দিব্য মানাইয়াছে। ঘড়িটি বাঘার লোমে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে—দেখা যায় না। ভল্লু আগ্রহ-কম্পিত হস্তে কাপড়ের পাড় বগ্‌লসে বাঁধিয়া অনিচ্ছুক বাঘাকে টানিতে টানিতে বাহির হইয়া পড়িল।

কাকা তখনও ফিরেন নাই, বোধ হয় মা'র সহিত তর্ক করিতেছেন। এই অবসরে ভল্লু বাগান অতিক্রম করিয়া একেবারে রাস্তায় গিয়া পড়িল।

* * * *

ভল্লু যখন বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভ্রমণের ফলে বিলক্ষণ ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল; ভল্লু বাঘাকে একটি নিভৃত স্থানে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

বাড়ীতে ঢুকিতেই মাংস রান্নার সুগন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। সে সটান রান্নাঘরে গিয়া বলিল,—'মা, ক্ষিদে পেয়েছে।'—বলিয়া একটা পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া গেল। মা মাংস ও রুটি তাহার সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

নিবিষ্ট মনে আহার করিতে করিতে ভল্লু শুনিতে পাইল, বাড়ীতে একটা কিছু গণ্ডগোল চলিতেছে। সে উৎকর্ণ হইয়া শুনিল। কাকা চাকরদের ধমকাইতেছেন; একবার 'সোণার ঘড়ি' কথাটা শুনা গেল। ভল্লুর বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

তারপরই বামা ঝি রান্নাঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া উপু হইয়া বসিল, ভারী গলায় বলিল,—'এ ঐ দরোয়ান ড্যাক্‌রার কাজ, বলে দিলুম বড় মা, দেখে নিও। ও ছাড়া এত বুকের পাটা আর কারুর নয়।—কি অনাছিষ্টি কাণ্ড মা, ছোট দাদাবাবুর বিছানার ওপর থেকে সোণার ঘড়ি চুরি! আমি ত বার-বাড়ী মাড়াইনে সবাই জানে। রান্নাঘর মুক্ত করে, বাসন মেজে, কাপড় কেচে, উঠোন্‌ ঝাঁট দিতেই বেলা কেটে যায়—তা বাইরে যাব কখন?

আর, এই এগারো বছর এ বাড়ীতে আছি, একটা কুটো হারিয়েছে কেউ বল্‌তে পারে না।—এ ঐ ঝ্যাঁটাখেগো দরোয়ানের কাজ; মিন্‌ষের মরণ-পালক উঠেছে কিনা, তাই মালিকের সোণার ঘড়িতে হাত দিতে গেছে!'

দরোয়ানের সঙ্গে বামার চিরশত্রুতা।

মা রান্না করিতেছিলেন, বামার সাফাই শুনিতে পাইলেও উত্তর দিলেন না। ভল্লুরও মুখ দেখিয়া মনের অবস্থা বুঝা গেল না। কিন্তু তাহার গলায় মাংসের টুক্‌রা আটকাইয়া যাইতে লাগিল। সে অতিকষ্টে আরও কিছু খাদ্য গলাধঃকরণ করিয়া উঠিয়া পড়িল, পাতের ভুক্তাবশিষ্ট মাংস ও হাড় বাটিতে লইয়া ধীরে সুস্থে রান্নাঘর ত্যাগ করিল। প্রত্যহ দুইবেলা নিজের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ সে স্বহস্তে বাঘাকে খাওয়াইত।

বাঘাকে খাওয়াইতে খাওয়াইতে ভল্লু শুনিল কাকার কণ্ঠস্বর ও মেজাজ উত্তরোত্তর চড়িতেছে, তিনি পুলিসে খবর দিবেন বলিয়া চাকরদের ভয় দেখাইতেছেন। বাবাও সেই সঙ্গে যোগ দিয়াছেন। চাকরেরা ভয়ে আড়ষ্ট ও নির্ব্বাক হইয়া আছে। ব্যাপার অতিশয় বিষম হইয়া উঠিয়াছে।

ভল্লু কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। বাঘার আহার শেষ হইলে সে তাহাকে লইয়া গুটি গুটি কাকার ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। ওদিকের বারান্দায় চেঁচামেচি চলিতেছে, এদিকে কেহ নাই। ভল্লু এপাশ ওপাশ চাহিয়া কাকার ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। ঘরটি অন্ধকার; ভল্লু অন্ধকারে লুকাইয়া তাড়াতাড়ি বাঘার গলা হইতে ঘড়ি ও বগ্‌লস খুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু বগ্‌লস বাঘার গলায় আঁটিয়া বসিয়া গিয়াছে—বোধ করি বাঘা মাংস খাইয়া মোটা হইয়াছে। ভল্লু অনেক চেষ্টা করিয়াও বগ্‌লস খুলিতে পারিল না, যতই তাড়াতাড়ি খুলিবার চেষ্টা করে, ততই হাত জড়াইয়া যায়। এদিকে সময় অতিশয় সংক্ষিপ্ত—এখনি হয়ত কেহ ঘরে আসিয়া ঢুকিবে।

ত্রাস্ত ভল্লু কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় অতি সন্নিকটে কাকার গলা শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। সর্ব্বনাশ! মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বাঘাকে তুলিয়া কাকার বিছানায় লেপের তলায় চাপা দিল, তারপর ঘরের সবচেয়ে অন্ধকার কোণে গিয়া দাঁড়াইল।

কিছুক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে কাটিয়া গেল। কাকা কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিলেন না, বকিতে বকিতে অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

এইবার ভল্লুর সমস্ত সাহস হঠাৎ তাহাকে ত্যাগ করিল। তাহার যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তস্করবৃত্তি আপাত-লোভনীয় বটে কিন্তু চিত্তের শান্তি বিধায়ক নয়। কাকার কণ্ঠস্বর দূরে চলিয়া গেলে ভল্লু ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। আর কোনোদিকে দৃকপাত না করিয়া একেবারে দ্বিতলে নিজের শয়ন কক্ষে গিয়া উপস্থিত হইল। কাকিমা ঘরে ছিলেন, তাহাকে জুতা-মোজা ও গরম জামা খুলিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আজ পড়তে বল্‌লি না ভল্লু, এখনি শুতে এলি যে?'

'বড্ড ঘুম পাচ্ছে' বলিয়া ভল্লু লেপের ভিতর ঢুকিয়া পড়িল।

ওদিকে বাঘাও নরম বিছানায় লেপের মধ্যে শয়নের ব্যবস্থা দেখিয়া নিঃশব্দে পরম পরিতৃপ্তির সহিত কুণ্ডলী পাকাইয়া নিদ্রার আয়োজন করিল।

* * * *

ভল্লু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ঘুমাইবার পর হঠাৎ একটা বিরাট গর্জ্জন শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। কাকিমাও ইতিমধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছিলেন—তিনিও চমকিয়া উঠিলেন।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; ভল্লু চোখ মেলিয়া দেখিল, কাকার রুদ্রমূর্ত্তি ঠিক খাটের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—হাতে একটা মোটা লাঠি। ভল্লু প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না, তারপর তাহার সব কথা মনে পড়িয়া গেল।

কাকা দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিলেন,—'ভুলো, বেরিয়ে আয় শিগ্‌গির লেপ থেকে—আজ তোকে—

ভল্লুর মুণ্ড এতক্ষণ লেপের বাহিরে ছিল, এখন তাহা ভিতরে অদৃশ্য হইয়া গেল। সে কাকিমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া শুইল।

রাত্রি তখন মাত্র দশটা। ভল্লুর মা বাবা শয়ন করিতে গেলেও নিদ্রা যান নাই; তাঁহারা চেঁচামেচি শুনিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। মা ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হয়েছে ঠাকুরপো?"

'হয়েছে আমার মাথা! ভুলো, বেরিয়ে আয় বলছি—'

মা শঙ্কিত হইয়া বলিলেন,—'কি করেছে ভল্লু?'

কাকা ক্রোধে হস্তদ্বয় আস্ফালন করিয়া বলিলেন,—'কি

করেছে' ওর ঐ হতভাগা কুকুরটাকে আমার বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল ; শুতে গিয়ে দেখি লক্ষ্মীছাড়া পেটরোগা কুকুর একেবারে লেপ বিছানার সর্ব্বনাশ করে রেখেছে।'

শুনিয়া ভল্লুর মাথার চুল পর্য্যন্ত কণ্টকিত হইয়া উঠিল। সে কাকিমার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একেবারে নিস্পন্দ হইয়া রহিল। কাকিমার শরীরটা এই সময় একবার সজোরে নড়িয়া উঠিল, যেন তিনি হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এ রকম ভয়ঙ্কর ব্যাপারে হাসিবার কি আছে তাহা ভল্লু ভাবিয়া পাইল না। গুরু ভোজনের ফলে বাঘা যে এমন বিদ্‌ঘুটে কাণ্ড করিয়া বসিবে তাহা ভল্লু দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

কাকা পূর্ব্ববৎ বলিতে লাগিলেন,—'শুধু কি তাই! কুকুরটাকে ঘাড় ধরে তুলতে গিয়ে দেখি তিনি আমার রিষ্ট-ওয়াচ গলায় পরে বসে আছেন।

ঘরের বাহিরে বাবা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন ; মা'র কলকণ্ঠ সেই সঙ্গে যোগ দিল। লেপের মধ্যে কাকিমার সর্ব্ব শরীর চাপা হাসির আবেগে ফুলিয়া ফুলিয়া দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

কাকা বলিলেন,—'তোমাদের হাসি পাচ্ছে, ঐ ঘড়ির জন্যে চাকরগুলোকে শুধু মারতে বাকি রেখেছি। ভাগ্যে পুলিসে খবর দেওয়া হয় নি, নয় ত কেলেঙ্কারির একশেষ হত ; পুলিস এসে দেখত, কুকুরের গলায় ঘড়ি বাঁধা রয়েছে।—না, এ সব হাসির কথা নয় ; ভুলোর বজ্জাতি বন্ধ করা দরকার।'

মা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'তা বেশ ত, কাল সকালে ওকে শাসন কোরো।'

কাকা বলিলেন,—'না বৌদি, সে হবে না। তুমি ওকে এখনি লেপের ভেতর থেকে বার করে আনো।'

মা মুখে আঁচল দিলেন, তারপর বলিলেন,—'কেন, তুমিই আনো না।'

'না না,—তুমি ওকে বিছানা থেকে বার করে আনো—তারপর আমি—'

'কেন বল ত? বিছানা ছুঁলে কি তোমার জাত যাবে?'

'না না—মানে—। আচ্ছা বেশ, কাল সকালেই হবে—' দ্বারের দিকে এক পা বাড়াইয়া কাকা দাঁড়াইলেন—'কিন্তু আমার বিছানা! আমি আজ শোব কোথায়?'

মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'বিছানা কি একেবারে গেছে?'

'শুধু বিছানা! সে ঘরে ঢোকে কার সাধ্য।'

মা হাসিভরা মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন,—'তাই ত! বাড়ীতে ত আর লেপও নেই। তাহলে তোমাকে এই ঘরেই শুতে হয়।'

কাকা বলিলেন,—'এত রাত্রে ঠাট্টা ভাল লাগে না বৌদি। একটা লেপ বার করে দাও, বৈঠকখানায় ফরাসের ওপরেই শুয়ে থাকব।'

'আর ত লেপ নেই।'

'নেই!'

'একখানা বাড়তি ছিল, সেটা তুমি গায়ে দিচ্ছিলে। আর কোথায় পাব।'

কাকা রাগিয়া বলিলেন,—'এ তোমার দুষ্টুমি—আসল কথা দেবে না। উঃ—এই মেয়েমানুষ জাতটা—। বেশ, র‍্যাপার গায়ে দিয়েই শোব।' বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন।

মা তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন,—'ছি ঠাকুরপো, ছেলেমানুষী কোরো না, আজ এই ঘরেই শোও। এই শীতে কেবল র‍্যাপার গায়ে দিয়ে শুলে অসুখে পড়বে যে।'

'তা হোক—হাত ছাড়।'

'লক্ষ্মী ভাই আমার, আজ রাতটা শোও—আমি ভল্লুকে আমার বিছানায় নিয়ে যাচ্ছি।'

'না।'

'তুমি সব বিষয়ে এত বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, আর এই সামান্য বিষয়ে এত অবুঝ হচ্চ! ধর্ম্ম-কর্ম্মে তোমার এত নিষ্ঠে, আর যাকে মন্ত্র পড়ে বিয়ে করেছ তাকে হেনস্থা করলে পাপ হয়, এটা বুঝতে পার না?'

'সে দোষ আমার নয়—তোমাদের। আমি বিয়ে করতে চাই নি।'

'বেশ, দোষ আমাদের, আমি ঘাট মান্‌ছি। কিন্তু বৌ ত কোনো দোষ করেনি।'

কাকা উত্তর দিলেন না, হাত ছাড়াইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

তিনি চলিয়া গেলে মা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—'মায়া, জেগে আছ নাকি?'

কাকিমাও একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—'হ্যাঁ।'

মা কিছু বলিলেন না, আরও কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

চারিদিক হইতে এই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলাফেলি দেখিয়া ভল্লুর খুল্লতাত-ভীতি অনেকটা কাটিয়া গেল। সে লেপের ভিতর হইতে মুণ্ড বাহির করিল। দেখিল, কাকিমা আলোর দিকে তাকাইয়া আছেন, তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতেছে।

কাকার নিষ্ঠুরতাই এই অশ্রুজলের হেতু তাহাতে সংশয় নাই। ভল্লু বিছানায় উঠিয়া বসিল, আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল,—'কাকিমা!'

চোখ মুছিয়া কাকিমা বলিলেন,—'কি?'

ভল্লু বলিল,—'কাকা নরাধম—না?'

কাকিমা উত্তর দিলেন না।

ভল্লু আবার বলিল,—'কাকা কারুর কথা শোনে না। মা'র কথা শোনে না, বাবার কথা শোনে না, তোমার কথা শোনে না—খালি আমাকে বকে। কাকা নরাধম।'

কাকিমা এবারও তাহার কথায় সায় দিলেন না, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন,—'ঘুমো ভল্লু, অনেক রাত হয়েছে।'

ভল্লু শুইল বটে কিন্তু তাহার ঘুম আসিল না। কাঁচা ঘুমের উপর কাকার উগ্র অভিযানে তাহার ঘুম চটিয়া গিয়াছিল; সে নীরবে শুইয়া ভাবিতে লাগিল।

ক্রমে এগারোটা বাজিয়া গেল; ঠং করিয়া সাড়ে এগারোটা বাজিল। তবু ভল্লুর চোখে ঘুম নাই। সে উত্তপ্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিতেছে। কাকিমা অনেকক্ষণ জাগিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে বুক-ভাঙা নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শেষে বোধ করি ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। ভল্লু একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, তাঁহার চক্ষু মুদিত, তিনি শান্তভাবে নিশ্বাস ফেলিতেছেন।

কাকিমার মুখের দিকে চাহিয়া ভল্লুর কাকার উপর ক্রোধ ও বিদ্বেষ আরো বাড়িয়া গেল। ডাকাত সর্দ্দারের আর কত সহ্য হয়! আজ দ্বিপ্রহর হইতে যে অমানুষিক অত্যাচার তাহার উপর হইয়াছে, তাহা না হয় সে সহ্য করিয়াছে; তাহার সাধের তরবারিটা ভাঙিয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে তবু সে কিছু বলে নাই। কিন্তু কাকিমার প্রতি এই নিষ্ঠুরতা—নারী নির্য্যাতন—সে কি করিয়া বরদাস্ত করিবে? ভল্লুর ক্ষুদ্র প্রাণের সমস্ত chivalry সঙ্গীন উঁচাইয়া খাড়া হইয়া উঠিল। যায় প্রাণ যাক্ প্রাণ—ভল্লু কাকাকে শাসন করিবেই!

কিন্তু—প্রতিহিংসার কল্পনায় রাত্রি জাগরণ করা যত সহজ, কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করা তত সহজ নয়। উপায় চিন্তা করিতে করিতে ভল্লুর ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল।

অবশেষে দীর্ঘ জটিল চিন্তার পর ভল্লু সিদ্ধান্তে উপনীত হইল। তাহার অধরে একটু হাসি দেখা দিল।

কাকা কাকিমার উপর অত্যাচার করেন বটে—কিন্তু দূর হইতে। ইহার প্রকৃত কারণ, তিনি কাকিমাকে ভয় করেন। বাড়ীর মধ্যে কাকা কেবল কাকীমাকেই ভয় করেন। প্রমাণ, কাকিমা এ বাড়ীতে আসার পর হইতে কাকা নিজের ঘর ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন; এমন কি বিছানা স্পর্শ করিবার সাহস পর্য্যন্ত তাঁহার নাই। মুখে তিনি যতই বীরত্ব প্রকাশ করুন না কেন, কাকিমার ভয়ে তিনি সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছেন। নচেৎ বাড়ীশুদ্ধ লোকের এত সাধ্য-সাধনা সত্ত্বেও তিনি কাকিমার সংস্পর্শে আসিতে গররাজি কেন?

এরূপ ক্ষেত্রে কাকাকে জব্দ করিবার একমাত্র উপায়—

ভল্লুর মুখের হাসি আরও বিস্তার লাভ করিল। সে ধীরে ধীরে শয্যা হইতে নামিল—কাকিমা জাগিলেন না। ঘড়িতে বারোটা বাজিল।

বিছানা ও লেপের তপ্ত আয়েস তাহার নষ্ট হইল; কিন্তু সঙ্কল্পিত কর্ত্তব্য পালন করিতে ভল্লু কোনো সময়েই পরাঙ্মুখ নয়। সে নিঃশব্দ পদক্ষেপে ঘরের বাহির হইল।

বাড়ী অন্ধকার। কোন্ অদৃশ্য স্থান হইতে একটা মট্ মট্ শব্দ আসিতেছে—যেন কে অন্ধকারে বসিয়া আঙুল মটকাইতেছে। ভল্লুর বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল; সে কিছুক্ষণ দুই মুঠি শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা অপ্রাকৃত নয়, একটা দরজার তক্তায় কীট গর্ত্ত করিতেছে। ভল্লু ধীরে ধীরে রুদ্ধ নিশ্বাস মোচন করিল। কিন্তু ভয় বস্তুটা এমনি যে বাস্তব অবাস্তবের অপেক্ষা রাখে না,—অন্ধকারে নিজের পদশব্দও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ভল্লুর প্রবল ইচ্ছা হইল, ফিরিয়া গিয়া বিছানায় শুইয়া

পড়ে,—কাজ নাই আর কাকাকে শাসন করিয়া। কিন্তু সে দাঁতে দাঁত চাপিয়া মনে মনে বলিল,—'আমি ভল্লু সর্দ্দার! আমি কাউকে ভয় করি না—কিছু ভয় করি না—'

তথাপি, চক্ষু দুটি দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়াই ভল্লু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিল। নিতান্ত পরিচিত পথ, তাই কোনো দুর্ঘটনা ঘটিল না। অবশেষে, নীচে ধুক ধুক করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সে বৈঠকখানার দ্বারে উপস্থিত হইল।

ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে। ভল্লু দেখিল, আপাদমস্তক র‍্যাপার মুড়ি দিয়া কাকা প্রায় বাঘার মতই কুণ্ডলিত হইয়া শুইয়া আছেন।

ভল্লু কাকার গা ঠেলিয়া ডাকিল,—'কাকা।'

কাকা চমকিয়া উঠিলেন,—'অ্যাঁ—কে!'—ভল্লুকে দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন,—'ভল্লু, কি হয়েছে রে!'

শীতের সহিত অন্যান্য মানসিক আবেগ মিশ্রিত হইয়া ভল্লুর দন্তবাদ্য আরম্ভ হইয়াছিল, সে বলিল,—'কাকিমার অসুখ করেছে—ত্‌তুমি শিগ্‌গির চল—'

'কি হয়েছে?'

ভল্লু বিপদে পড়িল। রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে সে আগে চিন্তা করে নাই; অথচ কাকা ডাক্তার, তাঁহাকে বাজে কথা বলিয়া প্রতারিত করা চলিবে না। পূর্ব্বে কয়েকবার কাল্পনিক রোগের উল্লেখ করিয়া ভল্লু ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

হঠাৎ তাহার একটা রোগের কথা মনে পড়িয়া গেল। কয়েক মাস আগে লিলি'র ঐ রোগ হইয়াছিল, (স্যাণ্টোনিন প্রয়োগে আরাম হয়)। লিলির যে রোগ হইয়াছিল তাহা কাকিমার হইতে বাধা নাই—বিশেষতঃ যখন উভয়েই মেয়েমানুষ। ভল্লু ঢোক গিলিয়া বলিল,—দাঁত কিড়্‌মিড়্ করছেন।'

দাঁত কিড়্‌মিড়্ করিতেছে! হিষ্টিরিয়া নাকি? কাকা ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এত রাত্রে—! বিচিত্র নয়। আজ রাত্রে ঐ সব বকাবকির পর—হয়ত—

কাকা জিজ্ঞাসা করিলেন,—'আর কি করছে?'

'আর কিছু না—শুয়ে আছেন।'

হুঁ—হিষ্টিরিয়াই বটে! কাকা একটু দ্বিধা করিলেন। কিন্তু অনুতপ্ত মানুষের কাছে কঠোর ব্রহ্মচারীর পরাজয় হইল। তিনি আলমারি হইতে একটা বেঁটে শিশি লইয়া সংক্ষেপে বলিলেন,—'চল্।'

ভল্লুর বুকের ভিতর ধড়াস-ধড়াস করিতে লাগিল। কঠিন ও বিপজ্জনক বিষয় ঘটনোন্মুখ হইলে ঐরূপ সকলেরই হয়। সে নিঃশব্দে কাকার অনুসরণ করিল।

কাকা উপরে উঠিয়া ঘরের দ্বারের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন; তারপর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

খাটের পাশে দাঁড়াইয়া রোগিণীর অনাবৃত মুখের দিকে চাহিতেই একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব মধুর অনুভূতি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া গেল। কিন্তু তিনি তখনই মনকে যথোচিত কঠিন করিয়া হস্তস্থ শিশির মুখ খুলিয়া রোগিণীর নাকের সম্মুখে ধরিলেন।

কাকিমা শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঠিক এই সময় দ্বারের কাছে খুট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। কাকা ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন—দ্বার বন্ধ; ভল্লু ঘরে নাই।

তিনি এক লাফে গিয়া দরজায় টান মারিলেন—দরজা খুলিল না। বাহির হইতে শিকল লাগানো।

কাকা চাপা গর্জ্জনে বলিলেন,—'ভল্লু! শিগ্‌গির দোর খোল্ পাজি—নৈলে খুন করব।'

কিন্তু ভল্লু তখন পাশের ঘরে গিয়া বাবার লেপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

* * *

পরদিন ভোর হইতে না হইতে ভল্লুর ঘুম ভাঙিল।

মা বাবা তখনো সুপ্ত; ভল্লু চুপি চুপি উঠিয়া বাহিরে আসিল।

কাকিমার দরজা তেমনি বাহির হইতে শিকল লাগানো, অর্থাৎ কাকা সারারাত্রি বাহির হইতে পারেন নাই। বিজয়-গর্ব্বে ভল্লু সর্দ্দারের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; সে নিজমনে একবার কিরাত নৃত্য নাচিয়া লইল। ভবিষ্যতে তাহার ভাগ্যে যাহা আছে তাহা ত আছেই, তাই বলিয়া বর্ত্তমানের বিজয়োল্লাস ত আর দমন করিয়া রাখা যায় না।

কিন্তু কাকা কিরূপ নির্য্যাতন ভোগ করিতেছেন তাহা স্বচক্ষে দেখিবার লোভও সে সম্বরণ করিতে পারিল না। জানালার একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল—ভল্লু তাহাতে চোখ লাগাইয়া উঁকি মারিল।

যাহা দেখিল, তাহাতে স্তম্ভিত বিস্ময়ে চক্ষু চক্রাকার করিয়া ভল্লু সরিয়া আসিল। তারপর দৌড়িতে দৌড়িতে মা'র ঘরে ফিরিয়া গেল। ঘুমন্ত মা'কে নাড়া দিয়া জাগাইতে জাগাইতে উত্তেজনা-সংহত কণ্ঠে বলিল,—'মা! মা! কাকা কাকিমাকে তিনটে-পাঁচটা চুমু খেয়েছে।'

"সংবাদপত্রে সেকালের কথা" *

স্যর যদুনাথ সরকার, কেটি, সি-আই-ই

তৃতীয় খণ্ডে এই স্থায়ী মূল্যবান গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল। মাত্র চারি বৎসরের মধ্যে এত বড় দীর্ঘ পুস্তক অসাধারণ পরিশ্রম ও মনোযোগ-ব্যয়ে এত বিশুদ্ধতার সহিত সঙ্কলিত ও মুদ্রিত করিয়া শেষ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া সম্পাদককে গৌরবান্বিত মনে করিতে হইবে, কারণ আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে বড় বড় কাজ আরম্ভ করিয়া বহু বর্ষ ধরিয়া অসমাপ্ত রাখা হয়, অবশেষে লেখক ও ক্রেতারা সকলেই অতীতের মধ্যে গণ্য হন। বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটির আরব্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বঙ্গে—এবং সমগ্র ভারতে —যে নবজীবন আরম্ভ হয় তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক প্রমাণ-ভাণ্ডার বা মৌলিক উপাদান সংগ্রহ স্বরূপ এই মহাগ্রন্থ দ্রুত শেষ করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমাদের সমাজ ও ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সাহিত্য, সভ্যতা ও রাজধানী এ সকলের ইতিহাস-সেবকদের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। সাধারণ পাঠকেরাও ইহাতে অনেক স্থলে অত্যন্ত কুতূহলপ্রদ সংবাদ পাইবেন; বিশেষতঃ অদ্ভুত বিবাহের, শ্রাদ্ধের ও বাবুয়ানার বৃত্তান্তগুলি সত্য অথচ উপন্যাসের মত মনোরম। 'সেকালের কথা' পড়িবার পর 'আলালের ঘরের দুলাল'কে আর কাল্পনিক বলিতে ইচ্ছা করে না, উহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণ হইতেছে।

এই তৃতীয় খণ্ডের প্রকাশ দুই জনের বদান্যতায় সম্ভব হইয়াছে—ব্রজেন্দ্রবাবু তাঁহার প্রাপ্য ৬২৫৲ টাকা পরিষদকে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং একটি ফণ্ড ও এক জন দাতার নিকট ২০২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। আর ধন্যবাদ দিতে হইবে বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীকে; তাঁহারা এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড কিনিয়া নিঃশেষপ্রায় করিয়াছেন, দ্বিতীয় খণ্ডও ফুরাইতে চলিয়াছে। নিশ্চয়ই এই সব পূর্ব্ব ক্রেতারা তৃতীয় খণ্ড কিনিয়া শীঘ্র নিজ নিজ সেট্ সম্পূর্ণ করিবেন। পরিষদের অন্য কোন গ্রন্থ এত দ্রুত বিক্রয় হয় নাই; এই নভেলের রাজত্বকালে এরূপ ঘটনা আমাদের বড়ই তৃপ্তির বিষয়।

তৃতীয় খণ্ডকে প্রথম দুই খণ্ডের পরিশিষ্ট বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেই দুই খণ্ডে বর্ণিত কাল ১৮১৮-১৮৪০ ছাড়িয়া ইহা অধিক অগ্রসর হয় নাই। এই শেষ খণ্ডের ১-১৯০ পৃষ্ঠায় ১৮১৮-১৮৩০ সালের এবং ১৯১-৪৩২ পৃষ্ঠায় ১৮৩০-১৮৪০ সালের ঘটনা দেওয়া হইয়াছে; এবং এই দুই অংশেরই পৃথক পৃথক সূচী রচিত হইয়াছে। সুতরাং ক্রেতারা তৃতীয় খণ্ড ছিঁড়িয়া উপরোক্ত দুই ভাগ পৃথক করিয়া প্রত্যেককে সূচী সহিত প্রথম বা দ্বিতীয় ভলুমের সহিত বাঁধিয়া লইবেন। ইহাতে পাঠের ও ইতিহাস-চর্চ্চার সুবিধা হইবে।

ইহার ডবল-কালাম্ ৩৬ পৃষ্ঠা ব্যাপী সূচী (যোগেশচন্দ্র বাগল কৃত) আমাদের যে কত বেশী উপকার করিবে তাহা ভুক্তভোগী লেখক ও পাঠক মাত্রেই জানেন।

'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র তৃতীয় খণ্ডটি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত, যথা, শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম্ম ও বিবিধ। কোন্ বিভাগে কিরূপ উপকরণ পাওয়া যাইবে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি :—

শিক্ষা-বিভাগে :—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু-কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতার ও মফঃস্বলের স্কুল, শ্রীরামপুর কলেজ, কাশী সংস্কৃত কলেজ, স্ত্রীশিক্ষার কথা, সেকালের পণ্ডিতদের কথা, সভা সমিতির কথা প্রভৃতি।

সাহিত্য-বিভাগে :—নূতন সাময়িক পত্র ও পুস্তকাদির কথা, সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা, ভারতীয় বর্ণমালার পরিবর্ত্তে রোমান বর্ণমালা প্রচলন প্রস্তাবের কথা, ইত্যাদি।

সমাজ-বিভাগে : সেকালের নৈতিক অবস্থা, শাসন,

* "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," ৩য় খণ্ড। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। ৪৮০ পৃ. + ৯ খানি চিত্র। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্-মন্দির, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩।০, পরিষদের সদস্য-পক্ষে ২।০ মাত্র।

দেশের স্বাস্থ্য এবং বাঙ্গালা দেশের সকল সম্ভ্রান্ত লোকজনের কথা।

ধর্ম্ম-বিভাগে :—ধর্ম্মকৃত্য, ধর্ম্মব্যবস্থা, ধর্ম্মস্থান, ধর্ম্মসভা প্রভৃতির কথা।

বিবিধ-বিভাগে :—কলিকাতা ও মফঃস্বলের রাস্তাঘাট-নির্ম্মাণের কথা, বিভিন্ন স্থানের ইতিবৃত্ত; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা।

এক কথায় বলিতে গেলে এই সব বিভাগের প্রত্যেকটিই বিষয়বস্তুর প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্যে মূল্যবান্। উদাহরণস্বরূপ আমি দুই-চারিটি অতি প্রয়োজনীয় সংবাদের আভাষ দিতেছি :—

কিছুদিন হইতে একটি ধারণা প্রচার লাভ করিতেছে যে রাজা রামমোহন রায়ই হিন্দু কলেজের (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজের) আদি-কল্পক। কিন্তু ডেবিড হেয়ারই যে প্রকৃত-পক্ষে হিন্দু কলেজের আদিকল্পক তাহার প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থের ১৯৫ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাইতেছে :—

"কলিকাতার সম্বাদ পত্রেতে হিন্দু কালেজের আরম্ভের বিষয়ে কিয়ৎকালাবধি একটা বাদানুবাদ হইতেছে। সর এড্‌বার্ড ইষ্ট সাহেবের যে প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন হইবে এবং শ্রীযুত ডাক্তর উইল্‌সন সাহেবের যে ছবি কালেজ ঘরে স্থাপন করা যাইবে এই উভয় বিষয়ক কথা উত্থাপন করণ সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটের সম্পাদক তদ্বিষয়ে এই দোষার্পণ করিলেন যে শ্রীযুত হের সাহেব কালেজের আদি কল্পক এবং কালেজের যাহাতে উপকার হয় ইহাতে তিনি অত্যন্ত মনোভিনিবেশ করিয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বোক্ত দুই সাহেবের তুল্য সম্ভ্রান্ত না হওয়াতে তাঁহার বিষয়ে সম্ভ্রামক উদ্যোগ কিছু করা যায় নাই এতদ্বিষয়ক বাদানুবাদেতে যে সকল লিপ্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা বোধ হয় যে শ্রীযুত হের সাহেব ঐ কালেজের প্রথম-কল্পক এবং তিনি ঐ কালেজের বিষয়ে প্রথম এক পাণ্ডু-লেখ্য প্রস্তুত করেন।..."

বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংবাদপত্র কোন্‌খানি তাহা লইয়া অনেক দিন হইতে বাদানুবাদ চলিতেছে; কেহ বলেন শ্রীরামপুর মিশনের 'সমাচার দর্পণ,' কেহ বলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি'ই আমাদের আদি সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ'ই যে বাঙ্গালা ভাষার আদি সংবাদপত্র 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'র ২৫০-৫১ পৃষ্ঠায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এ-বিষয়ে 'সমাচার দর্পণ' সম্পাদক লেখেন :—

"আমাদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেট নামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমার দিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশতেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

তবে এ-কথাও জানা গেল যে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র, এবং বাঙ্গালী-প্রবর্ত্তিত প্রথম সংবাদ পত্র—গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের 'বাঙ্গাল গেজেট'।

আলোচ্য গ্রন্থের ৩০-৮ পৃষ্ঠায় কতকগুলি সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র মুদ্রিত হইয়াছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগের বাঙ্গালী সমাজের চিত্র হিসাবে এগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। স্থানাভাবে ইহার কোনটি উদ্ধৃত করা গেল না।

গ্রন্থের আর একটি বিশেষত্বের উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। কলিকাতা কেন, সমস্ত বাঙ্গালা দেশের এমন কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার নাই যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপের কথা ইহাতে পাওয়া না যায়। পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবার, জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবার, জোড়াসাঁকো-রাজবাড়ীর রায়-পরিবার, কলিকাতার মল্লিক-পরিবার, দে-পরিবার (রামদুলাল দে, ছাতুবাবু প্রভৃতি,) শোভাবাজার রাজপরিবার, টাকীর রায়-চৌধুরী পরিবার, বর্দ্ধমান, ভূকৈলাস ও কাসিমবাজার রাজপরিবার—এইরূপ কত

সম্ভ্রান্ত পরিবারের ইতিহাসের উপকরণ 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'য় নিহিত আছে। তাঁহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ যদি আদিপুরুষগণের যথার্থ বিবরণ জানিতে চাহেন তবে এই গ্রন্থ রাখিবেন।

এক জন ফরাসী চিত্রকর কর্ত্তৃক শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অঙ্কিত, বাঙ্গালীর পূজা-পার্ব্বণের ও কলিকাতার রাস্তা-ঘাটের নয়খানি দুষ্প্রাপ্য চিত্রের প্রতিলিপি এই গ্রন্থখানির মূল্য আরও বাড়াইয়া দিয়াছে।

বাচ্চু

শ্রীসুধীরকুমার মুখোপাধ্যায়

দেবীপুর হইতে আসিবার পথে মণিবাবু ছোট একটি বাঁদর লইয়া আসিলেন। বাঁদরটিকে তিনি একটি গাছের তলায় মুমূর্ষু অবস্থায় পাইয়াছিলেন। সেখানেই তাহার শুশ্রূষা করিয়া সে কিছু সুস্থ হইলে তাহাকে বাড়ীতে আনা হইল। মণিবাবু জমীদারী সেরেস্তার নায়েব। বাড়ীতে থাকিবার মধ্যে তাঁহার স্ত্রী, একটি শিশুপুত্র আর তাঁহার বিবাহিতা ভগিনী বিজনবাসিনী।

বিজনের স্বামী কলিকাতায় চাকরী করেন। বিজন সেখানেই থাকে—সম্প্রতি মাস কয়েকের জন্য এখানে আসিয়াছে।

বাঁদরটিকে পাইয়া বিজনের আনন্দ আর ধরে না। ইতিমধ্যে সে ইহার একটি নামও দিয়াছে—'বাচ্চু'। বাচ্চু আসিয়া তাহার কর্ম্মহীন দিনগুলির প্রায় সমস্ত অবসর আনন্দপূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

একদিন বাচ্চুর জন্য তাহাকে একটি জামা সেলাই করিতে দেখিয়া তাহার বৌদি বলিলেন—ঠাকুরঝি, একটা বাঁদরের জন্যে যা খাটছ, ছেলের জন্যেও বুঝি কোন মা অত খাটে না। ও তোমার ছেলেরও বাড়া দেখছি।

বিজন এই কথার উত্তরে ছোট্ট একটি 'ধ্যেৎ' বলিয়া চলিয়া গেল। অন্তরাল হইতে নিঃসন্তান ভগিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মণিবাবু স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে, বিজনের বুভুক্ষিত মাতৃ-হৃদয় বাচ্চুর নিকট তাহার বুভুক্ষা নিবারণের উপাদান অন্বেষণ করিতেছে।

একজনের বিন্দুমাত্র স্নেহ বাচ্চু এখনও লাভ করিতে পারে নাই, সে মণিবাবুর স্ত্রী বিদ্যুল্লতা। বিদ্যুৎ যে তাহার প্রতি বিরূপ একথা বোধ হয় সে বুঝিয়াছে, তাই বিদ্যুৎকে দেখিলেই তাহার মুখে-চোখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠে।

প্রথম দিনকয়েক তাহাকে একটি সরু শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, এখন আর তাহা হয় না। নির্ব্বিঘ্নে এঘর ওঘর করার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইয়া এখন তাহার স্বাভাবিক চপলতা অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে।

বিদ্যুৎকে ঘরে ঢুকিতে দেখিবামাত্র বাচ্চু সে ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়—কিন্তু মণিবাবু ঘরে থাকিলে তাঁহার কাঁধে উঠিয়া বিদ্যুতের প্রতি মুখভঙ্গী করে। বিজন বলে—দাদা, ওর কিন্তু খুব বুদ্ধি, বৌদি যে ওকে ভালবাসে না তা ও বুঝতে পেরেছে, তুমি থাকলে বৌদি ওকে মারতে পারবে না তাও ও জানে।

বিদ্যুৎ বলিল—তোমাদের ভাই-বোনের ওর প্রতি প্রাণের দরদ ও বেশ বুঝতে পেরেছে। গত জন্মে ও নিশ্চয় তোমাদের আত্মীয় ছিল।

গ্রীবা বাঁকাইয়া ঈষৎ হাসিয়া বিজন বলে—না বৌদি, গত জন্মে নয়, এই জন্মেই আত্মীয় হয়েছে, দাদার বিয়ের পর।

বিদ্যুৎ বোধ হয় বিজনের এই ইঙ্গিত বুঝিতে পারে, তাই কিছু না বলিয়া গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া অন্য ঘরে চলিয়া যায়।

সেদিন বিজন তাহার ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল—দাদা, শীগ্‌গির দেখে যাও, হতভাগা কি করেছে!

মণিবাবু গিয়া দেখিলেন, বাচ্চু টেবিলের উপর চিঠির কাগজ লইয়া দোয়াত ও কলম দিয়া চিঠি লিখিবার চেষ্টা করিতেছে। দোয়াতের কালিতে সারা কাগজটিকে মসীলিপ্ত করিয়া কলমের নিব্‌টিকে অব্যবহার্য্য করিয়া তাহার এই পত্র লেখার ভঙ্গী দেখিয়া তিনি না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বাম হাতটিকে টেবিলের উপর লীলায়িত করিয়া দিয়া চেয়ারে বসিবার বিজনের বিশিষ্ট ভঙ্গীটির নির্ভুল অনুকরণ দেখিয়া মণিবাবু বুঝিলেন যে, কোনদিন হয়ত সে বিজনকে চিঠি লিখিতে দেখিয়াছে আর তাহার এই চেষ্টা তাহারই অনুকরণ।

মণিবাবুকে ঘরে দেখিবামাত্র সে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বিজনের বস্ত্রাঞ্চলে লুকাইল। বিজনের কাপড় তাহার হাতের কালিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মণিবাবু বলিলেন —দাঁড়া, বেটাকে আজই তাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

বিজন বলিল—থাক না দাদা, কীই বা এমন করেছে? তাড়িয়ে দিলে আবার কোথায় গিয়ে না খেয়ে মরবে, কে জানে!

বিজনের কথাই রহিল— বাচ্চুকে তাড়ান হইল না।

এমন সময় একদিন বিজন প্রবাসী স্বামীর পত্র পাইল। স্বামী তাহার দেশের বাড়ীতে আসিতেছেন, বিজনকেও সেখানে লইয়া যাইতে চাহেন, কিছুদিন সেখানে থাকিয়া কর্ম্মস্থানে যাইবেন।

বিজনের যাওয়ার সংবাদ বাচ্চু বুঝিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। তবে যখন সে তাহাকে আদর করিয়া চিবুক ধরিয়া বলিল—'আজ চলে যাচ্ছি, বাচ্চু, আমায় ছেড়ে থাকতে পারবি?—' তখন বাচ্চুর মুখ-চোখের ভাব দেখিয়া সকলেই বুঝিলেন, সে আর কিছু না বুঝিলেও শীঘ্রই যে তাহাকে বিজনের স্নেহলাভে বঞ্চিত হইতে হইবে তাহা সে বুঝিয়াছে।

এ কয়দিন যেন সে বিজনের প্রতি বেশী অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে ঘুমাইলে বাচ্চু তাহার চুলগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করে, দাঁড়াইয়া থাকিলে লাফাইয়া তাহার কোলে উঠিতে যায়, বিজন চোখে হাত দিয়া কান্নার ভাণ করিলে সে তাহার হাত চক্ষু হইতে খুলিয়া লয়।......

আজ বিজনের যাইবার দিন। গতকল্য রাত্রিতে তাহার স্বামী আসিয়াছেন। বিজনকে তাঁহার কাছে বসিয়া গল্প করিতে দেখিয়া বাচ্চু যে খুসী হয় নাই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জামাইবাবুকে একা পাইলেই সে তাঁহাকে কিল দেখায়, মুখভঙ্গী করে ও বিজনকে একা পাইলে আঁচল ধরিয়া তাঁহার কাছে যাইতে নিষেধ করে। বিদ্যুৎ বলে, ও জামাইএর সতীন।......

একটি গরুর গাড়ীর ভিতর বিজন ও তাহার স্বামী গিয়া বসিল। বাচ্চ বাহির হইতে তাহা দেখিল।

গাড়ী গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের শেষে তালপুকুরের পাড়ে ছোট্ট একটি তেঁতুল গাছের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বিজন বলিল—'দেখ, দেখ, হতভাগার কাণ্ড, আমাদের আগেই ও এসে গাছে বসে আছে।' বিজনের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাচ্চু এক লাফে গাড়ীর গরুগুলিকে শশব্যস্ত করিয়া তাহার কোলে আসিয়া বসিল। তারপর তাহার স্বামীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তাহার কোলে মুখ লুকাইল। জামাইবাবু হাসিয়া ফেলিলেন।

বিজন বলিল—যা, বাড়ী ফিরে যা, লক্ষ্মী। কিন্তু বাচ্চুর সেরূপ কোন ইচ্ছা দেখা গেল না।

জামাইবাবু বলিলেন—থাক না সঙ্গে।

— না, দাদা আবার ভাববেন।

—দু' একদিন পরে পাঠিয়ে দেব'খন, না হয় কাল একখানা চিঠি লিখে দিলেই হবে।

তাহাই হইল। বাচ্চু বিজনের সাথে চলিল।

জামাইবাবুর পত্রের উত্তরে মণিবাবু লিখিলেন যে, কলিকাতা যাইবার সময় রেলগাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বে উহাকে তাড়াইয়া দিলে ঠিক বাড়ী চলিয়া আসিবে। রাস্তা-ঘাট উহাদের ভুল হয় না।......

যাইবার দিন বাচ্চুকে একটি ঘরে আটকাইয়া তাঁহারা ষ্টেশনের দিকে চলিলেন। চাকরকে বলিয়া দিলেন আধ ঘণ্টা পরে যেন উহাকে ছাড়িয়া দেয়। তাঁহাদের মনে ছিল না যে ঘরের জানালা দিয়া ষ্টেশনের রাস্তাটি সম্পূর্ণ দেখা যায়।

ষ্টেশনে গিয়া বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। ট্রেণ আসিতেই তাঁহারা গিয়া উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

গাড়ীর গতিবেগ বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, এমন সময় কোথা হইতে বাচ্চু আসিয়া হাজির। তাঁহারা উভয়ে

সবিস্ময়ে দেখিলেন, সে লাইনের ধারে ধারে গাড়ীর সহিত পাল্লা দিয়া ছুটিতেছে। বিজন তাহাকে হাত নাড়িয়া ফিরিবার ইঙ্গিত করিতেই সে সিঁড়িতে উঠিবার চেষ্টা করিয়া একটি লাফ দিয়া গাড়ীতে উঠিতে গেল। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইল না। নিমেষের মধ্যে বাচ্চুর পদস্খলন হইল ও সে ট্রেণের নীচে অদৃশ্য হইল।

জামাইবাবু মুখ বাড়াইয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু দেখা গেল না। তাহার দেহ তখন ট্রেণের চাকার ঘূর্ণ্যাবর্ত্তের সাথে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। চলন্ত ট্রেণের ঘর্ঘর শব্দে ও শিকলের ঝনঝনানিতে যেন তাহার মৃত্যুর আর্ত্তনাদের সুর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

ট্রেণ অবিরাম গতিতে হু হু করিয়া সম্মুখের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূরে বনানীর সীমান্ত অস্তাচলগামী সূর্য্যের রক্ত-রাগে রঞ্জিত করিয়া সন্ধ্যা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে। দিকচক্রবালের উপর প্রসারিত হইয়া আসিতেছে অন্ধকারের কৃষ্ণ অবগুণ্ঠন। বিজন জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া ছিল।

তাহার স্বামী বলিলেন—যাকগে নাও, আমাদের আর দোষ কি? তোমার দাদার যেমন উৎকট সখ? শুনে হয় ত আবার খাওয়া-দাওয়া ত্যাগ করবেন।

বিজন কথা বলিল না। তাহার স্বামীর অজ্ঞাতে, আসন্ন-সন্ধ্যার তরল অন্ধকারের অন্তরালে শুধু কয়েক ফোঁটা অশ্রু তাহার শুভ্র কপোল বাহিয়া বাহিরে গড়াইয়া পড়িল।

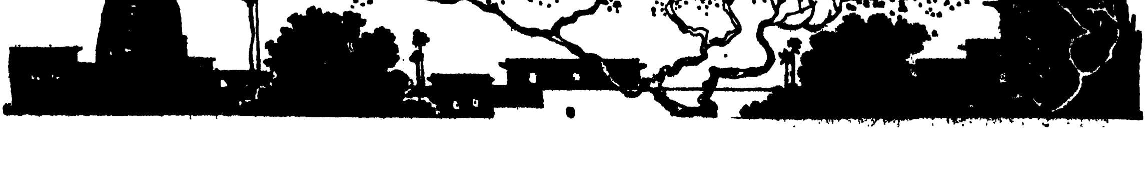
প্রজাপতির মৃত্যু

শ্রীরামেন্দু দত্ত

বন্ধ ঘরের দুয়ার খুলিয়া
দেখি জানালার কাছে
প্রজাপতি এক পত পত করি'
উড়িয়া ঠেকিছে কাচে।
যতবার যায় মুকতির আশে
ব্যাহত হইয়া ফিরে
স্বচ্ছ কাচের আঘাত লাগিছে
তাহার কোমল শিরে।
কাজের মানুষ, ব্যস্ত-বাগীশ,
কাব্যের নাহি ফাঁক্—
খুলিতে গিয়েও ভাবি, "দেরী হ'বে
জানালা বন্ধ থাক্—"

* * *

তিন দিন পরে আজিকে আবার
সে ঘরে প্রবেশ করি'
দেখি, মাথা কুটে কাচের দেউলে
প্রজাপতি আছে মরি'!
চির-নিদ্রায় সুখে সে ঘুমায়,
জোড়া দুটি পাখা তা'র
যেন কর-যোড়ে কি মিনতি ক'রে
ত্যজিল জীবন-ভার!
ক্ষণিকের সেই কাল-আলস্যে
যে প্রাণি-হত্যা হ'ল—
শত সুখ মাঝে শেল সম বাজি,
বুকে তা বিঁধিয়া র'ল।



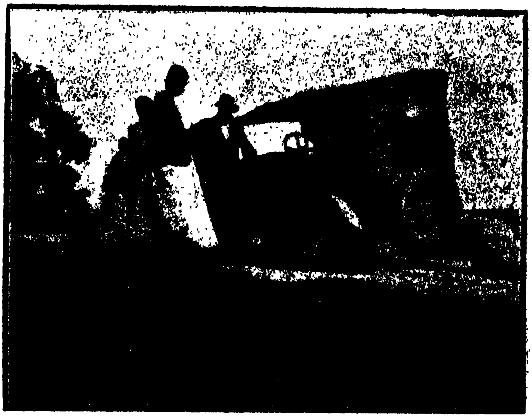
রাজগীর

অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল

পূর্ব্বের কথামত বঙ্গবাসী কলেজের বর্ত্তমান প্রিন্সিপাল প্রশান্তবাবু যখন বড়দিনের ছুটীতে সস্ত্রীক এসে পৌছলেন, তখন স্থির হলো যে ২৫শে ডিসেম্বর আমরা বিহারের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাজগীর ও নালন্দা দেখতে যাবো। মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিসেস্ পাল ও মিসেস্ বোস্ ('আভা'ই লিখতে যাচ্ছিলুম। কিন্তু তার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে অন্যান্য ভদ্র-মহিলাকে যেমন বলা হয়, তাকে ও মিসেস্ বোসই বলতে হবে, সুতরাং নিরুপায়!), ডাক্তার ভূপেন ব্যানার্জ্জি, মিঃ প্রশান্ত বোস, আমাদের 'ফুলকাদা', ভোম্বল ও লেখক মিলে একটা ছোট খাটো টুরিষ্ট্ পার্টি গঠিত হলো এবং অতি প্রত্যূষে হাতে পায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আমরা রওয়ানা হলুম; সঙ্গে লটবহরের মধ্যে গোটা কয় টিফিন্ কেরিয়ার, জলের কুঁজো ইত্যাদি। তখনো পথে লোক চলাচল আরম্ভ হয় নি, আমাদের দুখানি মোটরগাড়ীর শব্দই ভোরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে, আমাদের নিয়ে ঘণ্টায় কুড়ি মাইল বেগে ছুটে চলেছিল।

আমাদের প্রোগ্রাম ছিল বক্তিয়ারপুরে চা-পান। বক্তিয়ারপুর পাটনা থেকে আটাশ মাইল দূরে। সেখানে ফুলকাদা'দের আত্মীয় মণীন্দ্রবাবু ছিলেন, সুতরাং পত্রযোগে আগেই বন্দোবস্ত হয়েছিল যে আমরা তাঁকে ভোরবেলা চা-যোগে অতিথি সৎকারের সুযোগ করে দেবো। আমরা বেলা প্রায় আটটার সময় গিয়ে বক্তিয়ারপুরে তাঁর বাড়ীতে পৌছলুম। অতিথি সৎকারের যথাযোগ্য ব্যবস্থা প্রস্তুতই ছিল! একে ত শীতকালের ভোরবেলা, সেই দারুণ শীতে আটাশ মাইল কন্‌কনে হাওয়া ভেদ করে হাওয়া-গাড়ীর অভিযান; তারপর শুধু চা নয়, একেবারে রীতিমত টা সহযোগে গরম গরম চা-পান, সে যে কী উপাদেয় তা' বলে বুঝানো শক্ত, লেখা ততোধিক! চা-টার সঙ্গে নরম গরম খানিকটা মিষ্টি রোদও উপভোগ করে, আমরা আবার গন্তব্যপথে রওয়ানা হলুম।

পাটনা থেকে বক্তিয়ারপুর পর্য্যন্ত রাস্তা মোটরগাড়ী যাতায়াতের জন্য উপযুক্ত করে গড়া, কিন্তু বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর পর্য্যন্ত তেত্রিশ মাইল, একমাত্র গো-শকট ছাড়া অন্য যে কোন যানের পক্ষে দুর্গম ও দুঃসাধ্য। সে জন্য অনেকেই বক্তিয়ারপুর থেকে রাজগীর যেতে, মার্টিন কোম্পানীর যে লাইট্ রেলওয়ে আছে তার আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। সুতরাং এই দুর্গম পথে যাত্রার প্রারম্ভে আমরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে দুখানি মোটরে চেপে বসলুম। 'Ladies first'; সুতরাং তিনজন ভদ্র মহিলা প্রথম গাড়ীর আরোহিণী হলেন, সঙ্গে তাঁদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য গেল ভোম্বল। পশ্চাৎগামী যানে আমরা বাকী চারজন রওয়ানা হলুম। বক্তিয়ারপুর থেকে বিহার শরীফ্ পর্য্যন্ত প্রায়



রাজগীর-পথে দৈব-দুর্ব্বিপাকের একটি দৃশ্য
হ্যাটকোট পরিহিত লেখক, পর্য্যবেক্ষণরত ডাঃ ব্যানার্জ্জি
তৎপশ্চাতে ভোম্বল ও সর্ব্বপশ্চাতে 'ফুলকাদা'

পোনর মাইল রাস্তা একটু ভাল, সুতরাং গাড়ী দুখানি ঘণ্টায় দশ মাইল করে যাচ্ছিল বলে বিশেষ কষ্ট কিছু হয় নি কিন্তু বিহার শরীফ্ পার হয়েই হলো আমাদের কষ্টের আরম্ভ। বিহার থেকে আধ মাইলের মধ্যেই রাস্তায় একটা সেতু আছে। একটা লোক একপাল মহিষ নিয়ে ওদিক থেকে আস্‌ছিল, বার বার হর্ণ দেওয়া সত্ত্বেও লোকটা মহিষগুলোকে সরিয়ে না নেওয়াতে সেগুলি বাঁচাতে গিয়ে

১৬

আমাদের গাড়ীর ধাক্কা লাগলো পোলের লোহার খুঁটির সঙ্গে! সেটা ড্রাইভারেরই নির্ব্বুদ্ধিতার ফল; তার উচিত ছিল গাড়ীকে দাঁড় করিয়ে মহিষের পালকে যেতে দেওয়া। সুতরাং এই ধাক্কা কোন রকমে সামলে নিয়ে, আমাদের কেউ কেউ তাকে বকতে লাগলুম, আর কেউ বা মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ দিলুম। ততক্ষণে প্রথম গাড়ীখানা অনেক দূরে দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে।

তারপর আর এক মাইল যেতে না যেতেই আবার দুর্দ্দৈব। একটা বুড়ো লোক, মাথায় প্রকাণ্ড বোঝা, কাঁধে লাঠি নিয়ে আমাদের দিকে আসছিল; আমাদের গাড়ী ছুটে চলেছে, ড্রাইভার লোকটাকে মাঝের রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে দিলে হর্ণ, আর অম্নি লোকটা রাস্তার এক পাশে সরে না গিয়ে, উল্টো দিক থেকে ছুটে একেবারে এসে



রাজগীর—মন্দির ও তৎসংলগ্ন সপ্তধারা

পড়লো গাড়ীর সামনে। সমস্বরে আমরা হৈ হৈ করে চীৎকার করে উঠ্‌লুম, আর একটা বিকট শব্দ করে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল। একেই বলে এক চুলের জন্য বেঁচে যাওয়া; লোকটার নেহাৎ আয়ুর জোর ছিল বলতে হবে, না হলে সেদিন ড্রাইভার ব্রেক্ কস্‌তে এক সেকেণ্ড দেরী কল্লেই হয়েছিল আর কি? সেবার যদিও ড্রাইভারের বিশেষ কোন দোষ ছিল না, তবু আমরা তাকে বার বার 'হুসিয়ার' হয়ে চালাবার উপদেশ দিয়ে আবার এগিয়ে চল্লুম।

একে ত উঁচু নীচু রাস্তা; বর্ষাকালে পথে জল দাঁড়িয়ে যায়। তার উপর গো-যানের অনবরত যাতায়াতের ফলে রাস্তার যা দশা হয়, তাতে অনায়াসে চষা ক্ষেতের মত ধানের ফসল হয়: একবার অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে এই রাস্তায় মোটরে যাবার সময় যা' বিপদে পড়েছিলুম, তাই বন্ধুদের সঙ্গে গল্প কর্ত্তে কর্ত্তে চলেছিলুম! সেবার সঙ্গে ছিলেন আমার সেজ মামা ও মামী, মিসেস্ পাল ও তার মেঝ ভাই (আমার প্রিয় শ্যালক) রণু। রাস্তার সামনে অল্প একটু জল দাঁড়িয়ে আছে ভেবে ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে নিতে গেল, আর অম্নি পেছনের দুটি চাকা কাদায় বসে গেল। তাড়াতাড়ি আমরা বাইরে নেমে এলুম। ড্রাইভার গাড়ী চালিয়ে যতই চাকা উঠাতে চেষ্টা করে, ততই তা' আরো ভূগর্ভে বসে যায়; এম্নি করে চাকার প্রায় চার ভাগের তিন ভাগ কর্দ্দমাক্ত ধরণী গ্রাস করে বসলেন। জানি না যুদ্ধ-রত কর্ণের চাকা ভূগর্ভে বসে যাওয়ায় কি রকম মনের অবস্থা হয়েছিল; কিন্তু আমাদের যা' হয়েছিল তা' অতীব শোচনীয়। মাথার উপর রোদ বেড়ে যাচ্ছে, তার উপর অগ্নিদেবেরও কৃপা হয়েছে, কারণ অনেক চেষ্টায়ও ঝড়ো হাওয়ার মত দমকা হাওয়ার মুখে, পথে ষ্টোভ জ্বালানো সম্ভবপর হয় নি! পথে লোকজনের চলাচলও বিরল, গাঁও অনেক দূরে সুতরাং সাহায্য লাভের আশা নেই! কী আর করা যায়, মামা, শ্যালক, আর আমি 'রামকিষণ' ড্রাইভারের সাহায্যে চাকা ঠেলে উঠাতে চেষ্টা কল্লুম, কিন্তু বৃথা আশা! এম্নি সময় দুটি লোক একখানা ডুলি কাঁধে সে পথে যাচ্ছিল। ডুলির বাঁশের সাহায্যে যদি চাকা উঠানো সম্ভবপর হয় এই ভেবে, তাদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে বাঁশটা চাওয়া হলো, কিন্তু শুনে কে? অকুণ্ঠিত-চিত্তে, নির্ব্বিকারভাবে আমাদের বিপদে একটুও দৃক্‌পাত না করে লোক দুটি চলে গেল! নিরুপায়ভাবে একটি গাছের সংকীর্ণ ছায়ায় কোন রকমে প্রখর রোদের হাত থেকে মাথা কটি বাঁচিয়ে আমরা পথে দাঁড়িয়ে রইলুম। প্রায় একঘণ্টা পরে আবার দূরে আর একখানি ডুলি দেখা গেল! আমি মামাকে বল্লুম, এ সুযোগ ছাড়া হবে না। এ লোক-গুলি যদি বাঁশ দিতে অস্বীকার করে তবে জোর করেই বাঁশ কেড়ে নেবো, কারণ আপাততঃ আমি সর্ব্বশক্তিমান পুলিশের "দারোগা" ছাড়া আর কেউ নই। বলা বাহুল্য, আমার পরিধানে যে খাকীর শর্ট শার্ট ও মাথায় হ্যাট্ ছিল, তাহাতে এক মুহূর্ত্তে আমাকে পুলিশের লোক করে দিলে।

রণু বল্লে, "আচ্ছা প্রথম টাকার লোভ দেখিয়ে কাজ হয় কিনা দেখা যাক্।" কিন্তু "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।" অগত্যা তখন "দারোগাই" হতে হলো; তদনুযায়ী মেজাজ ২০০ ডিগ্রি ফারেণহিটে চড়িয়ে পকেট হতে নোটবুক্ আর পেন্‌সিল বের করে, একটা অশ্রাব্য গালিতে লোক দুটিকে নিজের ক্ষমতা জানিয়ে জিজ্ঞেস্ কল্লুম "ক্যা নাম ?" পূর্ব্ব নির্দ্দেশমত, ড্রাইভার বল্লে যে ডি, এস, পি সাহেব শিওয়ান থানা ইনস্‌পেকসন করতে যাচ্ছেন। লোকগুলি ডি, এস, পি বলতে যেন কিছুই বুঝতে পাল্লে না, এম্নি ভাব দেখালে। তারপর মামা যখন বল্লেন "বড়া দারোগাসাব" তখন লোকগুলি আভূমি সেলাম করে, আরো দু-চারজন লোক ডেকে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদায় দাঁড়িয়ে ডুলির বাঁশের সাহায্যে গাড়ীখানা উঠিয়ে দিয়ে জল দিয়ে যতটুকু সম্ভব পরিষ্কার করে দিলে! যাক্ বাঁচা গেল! গাড়ীতে উঠে ষ্টার্ট দিয়েছি এম্নি সময় সেলাম করে লোকগুলি "কুছ ইনাম" চাইলে! ভারী রাগ হলো, দারোগার কাছে আবার পুরস্কার চায়, হেঁকে জোর গলায় বল্লুম "—শিউয়ান্ থানামে চলো, হুঁয়াই মিলেগা!" লোকগুলি আর দারোগা সা'বকে ঘাঁটানো উচিত হবে না মনে করে, বোধ করি বা কিছু অসন্তুষ্ট চিত্তেই নিজের পথে চলে গেল। বাবার শ্যালক ও আমার শ্যালক দুজনেই দারোগার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে অবাক্! আমার পত্নীকে গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখে আমি বল্লুম "কি গো দারোগানী, এবার তা'হলে প্রফেসারি ডাক্তারি সব ছেড়ে দিতে হলো দেখছি!" পেটে বোধ হয় তখন হুতাশন দাউ দাউ করে জ্বল্‌ছিল তাই তিনি এ রহস্য সইতে না পেরে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই থেকে এখনো তিনি মাঝে মাঝে দারোগানী বলে অভিহিত হন, কিন্তু এখন আর রাগ করেন না।

বন্ধুরা জিজ্ঞেস্ কল্লেন "তারপর"! তারপর কখনো বা রেলওয়ে লাইনের উপর দিয়ে গাড়ী চালিয়ে, কখনো বা জলের পাশ কাটিয়ে, দুটো টায়ার ও টিউবের দফা-রফা করে গিয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছিলুম!

প্রশান্তবাবু বল্লেন "তবু আবার মোটরে এলেন!" একটু হেসে মাথা, বুক, হাটু ও পায়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বল্লুম "ভাবনা কি, দারোগা সাজতে কতক্ষণ, আর তা না হলে এ্যাড্‌ভেঞ্চার কি হলো!" এ্যাড্‌ভেঞ্চার কথাটা যখন বলি, হাল্কাভাবেই বলেছিলুম, কারণ তখনো স্বপ্নেও ভাবি নি যে রাজগীরের পথে এ্যাড্‌ভেঞ্চারের চরমই হবে।

বর্ষায় যে পথের এ রকম অবস্থা, পৌষমাসে বড়দিনের সময়ও যে তার অবস্থা বিশেষ কিছু ভাল ছিল, এমন নয়। গোযান-কর্ষিত পথের উপর সদ্য মাটির বোঝা চাপানো হয়েছে স্থানে স্থানে, এই আশায় যে গোযানের চাকার নিষ্পেষণে আবার রাস্তাটি ভাল হয়ে উঠ্‌বে। জানি না আমাদের একান্ত আপনার নিজস্ব গো-শকটের আরোহীরা এহেন পথে কতটুকু আরাম করে যাওয়া আসা করেন; কিন্তু বাষ্পীয় শকটে যে আরোহীদের দুর্দ্দশার চরম হয় তা' ভুক্ত-ভোগী বলে আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। এম্নিভাবে মোটর গাড়ীতে ঘোড়ার কদমে চলা প্র্যাক্‌টিস্ করে করে এসে বক্তিয়ারপুর ও রাজগীরের মাঝামাঝি নালন্দার পথের



দুঃসাধ্য পর্ব্বতারোহণরত মিসেস্ বোস্ ও
তৎপশ্চাতে মিসেস্ পাল

মুখে এসে পৌছলুম। কথা ছিল আমরা নালন্দা আগে দেখে, পরে রাজগীরে যাবো; কিন্তু যেখান হতে নালন্দার রাস্তা ডানদিকে বেরিয়ে গেছে সেখানে কটি লোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পাল্লুম যে আমাদের অগ্রগামী গাড়ী নালন্দার পথ না ধরে সোজাসুজি রাজগীরের পথে চলে গেছে! কেন এমন হলো ঠিক বুঝতে না পেরে, অগত্যা আমরাও সোজা রাজগীরের পথ ধল্লুম।

প্রায় আড়াইশো কি তিনশো গজ এগিয়ে গেছি, এম্নি সময় ঘটলো বিপদ্! পথে এক স্থানে বেশ খানিকদূর পর্য্যন্ত মাটি কেটে ফেলা হয়েছে, তার উপর অনবরত গরুর গাড়ী যাতায়াতের ফলে, দুটি গভীর খাদের সৃষ্টি হয়েছে রাস্তার

দুদিকে! একবার যদি তাতে গাড়ীর চাকা বসে, তবে উঠানো মুস্কিল, এই না ভেবে ড্রাইভার যেমন সেগুলি এড়িয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছে, অম্নি গাড়ীর চাকা পথ হতে স্খলিত হয়ে ছুটে তীরবেগে নীচের দিকে চল্লো! ভূপেনবাবু চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "হুসিয়ার," আমরা সবাই চোখের সামনে দেখছি দারুণ বিপৎপাত, হয়ত বা আর বাঁচার আশা নাই। ড্রাইভার প্রাণপণে ব্রেক কষে গাড়ীকে রুখ্‌তে চেষ্টা কচ্ছে কিন্তু পেরে উঠছে না। ভীষণ শব্দ করে গাড়ী একটা প্রকাণ্ড তাল গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে থামলো ও কাত হয়ে গেল! ঝন্‌-ঝন্‌ করে সম্মুখের কাঁচখানা ও হেড্‌লাইট একটি ভেঙ্গে খসে পড়ে গেল! আমাদের সকলেরই অল্প বিস্তর ধাক্কা খেতে হলো, তবু ভগবানের অসীম দয়া বলতে হবে যে এত বড় দৈবদুর্ব্বিপাকেও আমরা অক্ষত ছিলুম। পতনোম্মুখ গাড়ী হতে লাফিয়ে পড়েই আমাদের ভাবনা হলো, না জানি আগের গাড়ী কি রকম করে এগিয়ে গেছে! যখন পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেল যে ধাক্কাটি শুধু হেড্‌ লাইট ও কাঁচের উপর দিয়েই গেছে, ভগবানের দয়ায় এমন কি ইঞ্জিনখানা বিগ্‌ড়োয় নি, তখন আমরা আমাদের অক্ষত দেহে ও অক্ষত ইঞ্জিনে পরিত্রাণের জন্য ভগবানকে অসংখ্য প্রণিপাত জানালুম।

আমরা প্রথম গাড়ীখানির জন্য খুবই চিন্তিত ছিলুম, তাই সকলে মিলে গাড়ীকে ঠেলে রাস্তায় তুলে আবার রওয়ানা হলুম! গাড়ীতেই প্রশান্তবাবুর ক্যামেরা ছিল, ভূপেনবাবু দুঃখ করে বল্লেন "আহা হা একটা ফটো নেওয়া উচিত ছিল, এই অবস্থায়।"

আমি হেসে বল্লুম "Better luck next time."

বন্ধুরা সমস্বরে বল্লেন "সে সৌভাগ্যে কায নেই!" কিন্তু কায নেই বল্লেই কি সৌভাগ্যকে ঠেকানো যায়, আমরাও সেদিন পারি নি।

গাড়ী যখন আবার চলতে আরম্ভ কল্লে, তখন মনের অবস্থা একটু সাধারণ আকার ধারণ করতে না করতেই আমার মুখে রহস্যের ভাষা ফুটলো, "আহা, কী সুযোগই হয়েছিল, এক সঙ্গে পাঁচ পাঁচটা বিধবা হতো; তিনজন যথাস্থানে, আর দুজন সুসংবাদটি পেয়ে!" বলা বাহুল্য, আমার বন্ধু তিনটির একজনও এ রহস্যে হাসিমুখে যোগ দিতে পারেন নি। বোধ হয় তাঁদের মনের স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্তির latent period আমার অপেক্ষা কিছু বেশীই হবে!" ভূপেনবাবু চিন্তিতভাবে বারবার বলছিলেন "আগের গাড়ী ভালোয় ভালোয় রাজগীরে পৌছুলে হয়।"

খানিক দূরে এগিয়ে যেতে না যেতেই দেখা গেল ডাক্তার ব্যানার্জ্জির আশঙ্কা নেহাৎ অমূলক নয়। দূর হতে অগ্রগামী গাড়ী খানাকে আমাদের দিকে মুখ করে, কাত হয়ে রাস্তার উপর পড়ে ও অদূরে ভদ্রমহিলাদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফুলকাদা সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বল্লেন "ওকি, ওরা ওখানে এম্নি দাঁড়িয়ে কেন?" ভূপেনবাবু বল্লেন "আর গাড়ীই বা উল্টো মুখে দাঁড়িয়ে কেন? নিশ্চয়ই দুর্ঘটনা কিছু ঘটেছে!" দু-মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘটনাস্থলে পৌছে দেখি, গাড়ী তিনখানা চাকার উপর হেলে দাঁড়িয়ে, এবং চতুর্থ খানা প্রায় কুড়ি হাত দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর তিনটি ভদ্রমহিলা পথে দাঁড়িয়ে বিড়ম্বনা ভোগ কচ্ছেন; বেচারা ভোম্বল অনেক চেষ্টায়ও তাদের কিছুতেই আশ্বস্ত করে উঠ্‌তে পাচ্ছে না! আমাদের সন্নিকটবর্ত্তী হতে দেখে তাদের মনে ভরসা হলো, এগিয়ে এসে মিসেস্‌ পাল বল্লেন "আর একটু হলেই আমরা সবাই গিছলুম আর কি?"

ব্যাপার খুব গুরুতর নয় দেখে আমি বল্লুম "নিজেরা গিছ্‌লে, কি বিধবা হতে গিছ্‌লে, ঠিক করে বলা শক্ত!"

উৎসুক ভাবে প্রশ্ন হলো "কেন?" তখন আমরা আমাদের ও ভদ্রমহিলারা তাদের দুর্ঘটনার বিশেষ বিবরণ দিতে দিতেই মিনিট দশ কেটে গেল। প্রথম গাড়ীর ড্রাইভার দূর হতে স্খলিত চাকাখানি কুড়িয়ে এনে বল্লে সে চাকার একটিও বোল্ট নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! খোঁজ খোঁজ করে, সবাই পথের ধূলি ঘেঁটে খুঁজতে লাগলুম কিন্তু একটাও পাওয়া গেল না। মনে হলো, গাড়ী চলতে চলতে একটি একটি করে পাঁচ পাঁচটা বোল্ট্‌ খুলে কোথায় না কোথায় পড়ে গিয়ে থাকবে, অবশেষে যখন শেষটিও খসে গেল, তখুনি গাড়ী পথে দাঁড়িয়েছে, তার আগে নয়! ওরা ব্যস্ততা বশতঃ হাতের ডানদিকে নালন্দার পথ ছেড়ে এগিয়ে গিছ্‌লো, ইতিমধ্যে আমাদের গাড়ীর দুর্ঘটনা হলো। সুতরাং দেরী দেখে এরা গাড়ী ফিরিয়ে ব্যাপার কি দেখতে যাবে, এম্নি সময় নিজেরাই বিপদাপন্ন হয়ে পড়লো! এখন উপায়! অনেক খোঁজাখুঁজির পরও আর একটিও বোল্টের যখন সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন বাকী তিনটি চাকা থেকে

একটি করে বোল্ট খুলে, চতুর্থ চাকাটিকে কোনও রকমে কাযের উপযোগী করে লাগিয়ে নেওয়া ঠিক হলো! দুইজন ড্রাইভার তাই লাগাতে যাচ্ছে, তখন বল্লুম "দাঁড়াও!"

"কেন" বলে সকলেই আমার পানে চাইলেন।

আমি বল্লুম "এ সুযোগ ছাড়া হবে না; প্রশান্তবাবু শীগ্‌গির ছবি নিন, কারণ একবার "Better luck next time" বলেই যে সৌভাগ্যের পুনরভিনয় হয়েছে, সে সুযোগ হারিয়ে আর পুনরাবৃত্তি ইচ্ছে করা উচিত নয়।" আমাদের সেই বিপদাপন্ন অবস্থায় প্রশান্তবাবু যে ছবি ক্যামেরাগত করেছিলেন, পাঠক-পাঠিকাগণের সম্যক্ উপলব্ধির জন্য তারই একখানি এতৎসঙ্গে সন্নিবেশিত করা হলো।

যাক্ এম্নি পথের এডভেঞ্চার শেষ করে যখন আমরা গিয়ে রাজগীরে পৌছলুম, তখন সূর্য্য ঠিক মাথার উপরে উঠে গেছেন এবং বেলা সাড়ে বারোটার উপর বেজে গেছে। রাজগীর অথবা রাজগৃহ ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান। শুধু তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক মহাভারতেও জরাসন্ধের রাজধানীরূপে রাজগৃহের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রাজগৃহ তৎকালীন মগধের রাজধানী ছিল এবং কথিত আছে এখানেই নাকি মগধরাজ জরাসন্ধ পাণ্ডবগণ কর্তৃক নিহত হয়। এখানেই গৌতম বুদ্ধ "গৃধ্র-শৃঙ্গ" (Vultures peak) নামক পাহাড়ের উপর অনেকদিন ছিলেন ও শিষ্যদের ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। বুদ্ধ-গয়ায় সমাহিতভাবে অবস্থানের পূর্ব্বে তিনি মগধের রাজধানী রাজগৃহে অনেকদিন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন; এজন্য রাজগীর বৌদ্ধদের একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র ও প্রতিবৎসর সুদূর চীন, জাপান ও ব্রহ্মদেশ থেকে অনেক বৌদ্ধ এ স্থানে তীর্থদর্শন মানসে আগমন করেন। রাজগীর জৈনদেরও একটি তীর্থস্থান, কারণ রাজগীরের প্রত্যেকটি পাহাড়ের উপর শ্বেতাম্বর, দিগম্বর প্রভৃতি মহাবীরের মন্দির অবস্থিত। জৈনদের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ধরম-শালাও আছে। প্রতিবৎসর নানাস্থান থেকে তীর্থকামেচ্ছু অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী লোকের এখানে আগমন হয়ে থাকে। অতি কষ্ট-সাধ্য দুরারোহ পর্ব্বতের উপর উঠে জৈন-মন্দির দর্শন করতে পাল্লে নাকি তাদের অনেক পুণ্য সঞ্চয় হয়। তা ছাড়া এখানে হিন্দুদেরও একটি মন্দির আছে। হিন্দু-মন্দির-প্রাঙ্গণেই উষ্ণ জলের সপ্তধারা প্রস্রবণ অবস্থিত। এখানে আরো অনেকগুলি উষ্ণ জলের প্রস্রবণ ও তৎসন্নিহিত কুণ্ড আছে—সেগুলিতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান সকলেই স্নান করতে পারে। কিন্তু হিন্দু-মন্দির সংলগ্ন ব্রহ্ম-কুণ্ডে হিন্দু ব্যতীত অপর জাতীয় লোকের প্রবেশাধিকার নেই। সম্প্রতি মুসলমানেরাও সেখানে প্রবেশাধিকারের দাবী কচ্ছেন এবং এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আদালতে মামলা চলছে! অপর জাতিসমূহের সপ্তধারায় ও ব্রহ্মকুণ্ডের জলে স্নানের অধিকার এই বিচারের উপরই নির্ভর কর্চ্ছে! এই সকল উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান কল্লে নাকি নানা দুরারোগ্য ব্যাধির হাত হতেও আরোগ্যলাভ করা যায়। তা ছাড়া রাজগীরের আবহাওয়া,



পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত মহিলাত্রয়—বামে মিসেস্ পাল, মধ্যে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও দক্ষিণে মিসেস্ বোস্

স্বাস্থ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম বলে, এ স্থান একটি স্বাস্থ্যনিবাস বলে পরিচিত! সেজন্য হাওয়া পরিবর্ত্তন ও ভগ্নস্বাস্থ্য-পুনর্লাভের জন্য প্রতিবৎসর শীতকালে এখানে অসংখ্য লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে!

রাজগীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যসত্যই অপূর্ব্ব! চারিদিকে উঁচু উঁচু পাহাড়, শুষ্ক নীরস কঠিন পাথরে গড়া নয়, তরু-লতাপাতায় ঘেরা যেন এক [illegible] দৃশ্যপট বলে মনে

হয়। সব কটি পাহাড়ের গায়েই জৈন-মন্দির পর্য্যন্ত পাহাড় কেটে রাস্তা করা হয়েছে, যেন সবুজ শাড়ীর লাল পাড় পাহাড়কে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং নির্জ্জনতা-প্রিয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসক যাঁরা—রাজগীর তাঁদের কাছে অতীব প্রিয় স্থান। তা ছাড়া উষ্ণ প্রস্রবণগুলির জলের গুণাগুণ প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য অনেক রসায়নবিদ্, বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকও এখানে গবেষণার জন্য আসেন।

হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম্মাবলম্বী লোকের তীর্থস্থান বলে এখানে প্রতিবৎসর কয় বার মেলা হয়। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা সমতলক্ষেত্রে মেলা হয়। মাটীর দেয়ালে ঘেরা গাছের ছায়ায় যাত্রীদের জন্য বিশ্রামের একটি স্থান আছে। আমরা সেকানে প্রকাণ্ড একটি বটগাছের নীচে গাড়ী দুখানি রেখে, সপ্তধারার গরম জলে স্নান কর্ব্বার জন্য উপযুক্ত কাপড়-চোপড় নিয়ে বেরিয়ে এলুম। খানিকটা দূরে গিয়ে অনেকগুলি সিঁড়ি পার হয়ে তবে হিন্দু-মন্দির প্রাঙ্গণে পৌছতে হয়। সেখানেই চারিদিকে উঁচু পাঁচীল ঘেরা সপ্তধারা, তার তিনটি দিয়ে অবিরলধারে গরম জল ঝরে পড়ছে। সেই জলই নীচে একটা কুণ্ডে ধরে রাখা হয়েছে, তার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। তীর্থস্থান বলে পাণ্ডারদল আমাদের ঘিরে জটলা কচ্ছিল, তাদের একজনকে পাণ্ডাত্বে বরণ করে বাকী সকলকে বিদায় দিলুম। কুণ্ডের দোর বন্ধ করে, অন্য কাউকে প্রবেশ করতে না দিয়ে, মহিলারা আগে স্নান করে এলেন। তারপর আমরা সবাই মিলে খুব ফুর্ত্তি করে প্রথমে কুণ্ডে অবগাহন কল্লুম ও পরে বাইরের জলস্রোতে আবার স্নান করে বদ্ধ জলে অবগাহনের দোষটুকু কাটিয়ে নিলুম। পৌষ মাসের শীতে এ রকম উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান সত্যই খুব উপাদেয় ও আরামদায়ক। প্রথম জলকে বেশ গরম ও অসহ্য বলে মনে হয় কিন্তু দু-এক মিনিটের মধ্যেই তা যখন গায়ে সহ্য হয়ে যায়, তখন খুবই ভাল লাগে। সপ্তধারার নিকটেই ভূপেন বাবুর একজন বন্ধু মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে দেখা ও পরিচয় হলো। তিনি বিহার শরীফে মুন্সেফ, বড়দিনের ছুটী কাটাবার জন্যে সস্ত্রীক রাজগীরে এসে জৈনদের একটি ধরম-শালায় বাস কচ্ছেন।

স্নানের পর আমাদের আড্ডায় ফিরে এসে আমরা টিফিনকেরিয়ারের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যভাণ্ডারের সদ্ব্যবহারে মনোনিবেশ কল্লুম। পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই সঙ্গে যা' কিছু ছিল একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেল। তখন আমাদের একজন ড্রাইভার ভূপেন বাবুর হাতে একটা শ্লিপ দিল, পাটনার ডাক্তার ত্রিবেদী লিখছেন যে তিনি ক'দিন রাজগীরে তাঁবু করে ছিলেন, আজ চলে যাচ্ছেন, আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে রাত্রিবাসের জন্য তাঁর তাবু নিজের বলে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের স্নান করে ফিরতে দেরী হবে বলে তিনি অপেক্ষা করতে পাচ্ছেন না, সেজন্য খুব দুঃখিত ইত্যাদি!"

বলা বাহুল্য আমাদের কাহারও রাজগীরে রাত্রিবাসের মত সদিচ্ছা একটুও ছিল না। কিন্তু ডাক্তার ত্রিবেদীর এই অযাচিত সাহায্যের ইচ্ছা সর্ব্বপ্রথম আমারই মনে রাজগীরে রাত্রিযাপনের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুল্লে। আমি বল্লুম "সুযোগ যখন হয়েছে, তখন ছাড়া উচিত হবে না।"

ডাক্তার ভূপেন বাবু বল্লেন "তাইত! বোধ হয় রাত্রিবাস কপালে আছে!"

ফুলকাদা' বল্লে "আবার কি?"

ভোম্বল বল্লে "নিশ্চয়।"

প্রশান্ত বাবু বল্লেন "থেকে গেলে মন্দ হয় না।"

"কিন্তু ভদ্রমহিলাদের কি মত?" কথাটা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুখে "রাণীর কি মত" এম্নি শুনাইল।

মিসেস্ ব্যানার্জ্জি স্বভাব-শান্ত সুরে বল্লেন "আমি যদিও কাচ্চা-বাচ্চাকে ছেড়ে এসেছি তবু থাকতে রাজী আছি।"

মিসেস্ পাল নিমরাজীর ভাবে বল্লেন "শীতে বড্ড কষ্ট হবে, খাব কি?" আমি বল্লুম "তিনখানা ইটের উপর একটা হাঁড়ী চড়িয়ে দিলেই চলবে।"

মিসেস্ পাল অগত্যা সকলের আগ্রহ দেখে বল্লেন, "রেবাদি যখন কাচ্চাবাচ্চা ছেড়ে থাকতে রাজী, তখন আমি আর আপত্তি কোর্ব্ব না, কিন্তু রাত্তিরে ভাত খাওয়া চাই-ই চাই।"

আভারাণী, খুড়ি মিসেস্ বোস্ এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসেছিলেন, এবার তাঁর মুখে গররাজির ভাষা ছুটলো "আমি কিন্তু কিছুতেই থাকবো না।" সে দুর্জ্জয় পণের মুখে তার দাদাদের (ফুলকাদা' ও ভোম্বল), প্রিয় জামাই-বাবুর (অর্থাৎ লেখকের), ছোটকাকার বন্ধু ভূপেনবাবুর, এমন কি রেবুদি' ও মিসেস্ ব্যানার্জ্জির সকল অনুরোধ

উপরোধই প্রতিহত হয়ে গেল ! প্রশান্তবাবু অতি নরমভাবে "সকলে যখন বলছেন, থাকলে কি হয় না, বোধ হয় থাকাই উচিত" ইত্যাদি বলছিলেন, কিন্তু তাতে যে "কিছুতেই না", 'হাঁ' হবে তার কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছিল না। তখন আমি বল্লুম "আচ্ছা, তবে তুমি তোমার কর্ত্তার সঙ্গে নিরিবিলিতে পরামর্শ করেই যা' হোক ঠিক কর, আমরা ততক্ষণ ওদিকের কটি কুণ্ড দেখতে যাই, তোমরা পরে এস।" এই বলে আমরা সদলবলে তাদের বিশ্রান্তালাপের সুযোগ দিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। প্রায় মিনিট পোনর কি কুড়ি পরেই দুজনে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হলেন; বলা বাহুল্য আমরা সবাই মিলে যে দুর্জ্জয়-পণ ভঙ্গ করতে পারি নি, প্রশান্তবাবু অতি প্রশান্তভাবে সেই অসাধ্য সাধন করতে সমর্থ হয়েছেন। মিসেস্ বোস হাসিমুখে বল্লেন "জামাইবাবু, আপনারা রাগ করবেন বলেই থেকে গেলুম, বিকেলে চা কিন্তু না হলে চলবে না !"

হাসিমুখে ভরসা দিলুম "কুছ্ পরোয়া নেই।" কিন্তু মনে জানতুম "কাণা কড়ির ভরসাও নেই !" তখন চিন্তা হলো পাটনায় প্রত্যেকের বাড়ীতে খবর না দিলে সবাই ভাবনায় পড়বেন। ভগবানই সুযোগ করে দিলেন; হঠাৎ ডাক্তার বি, কে, রায়ের সঙ্গে দেখা, তিনি সেদিনই পাটনায় ফিরবেন। সুতরাং তাঁর মারফৎ পাটনায় সংবাদ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত মনে আমরা ওদিকের পাহাড়ে চড়বার পথ ধল্লুম।

জৈন-যাত্রীদের সুবিধার জন্য পাথর কেটে পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে উপরে উঠবার রাস্তা তৈরী হয়েছে। কোথাও বা ধাপে ধাপে উপরে উঠতে হয়, কোথাও বা সমতল পথে পাহাড় ঘুরে যেতে হয়, আবার কোথাও বা পায়ের চাপে খানিকটা মাটি ধসে পড়ে! এম্নি অবস্থায় খানিক এগিয়ে একটু বিশ্রাম করতে হয়, তার পর একটু উঠতে না উঠতেই আবার পরিশ্রান্ত হয়ে পড়তে হয়। বিশেষতঃ সঙ্গিনীরা অনভ্যস্ত বলে অতি কষ্টে হাতে হাঁটুর উপর ভর দিয়ে পাহাড়ের উপর উঠছিলেন। ক্যামেরা হস্তে প্রশান্তবাবু তেম্নি অবস্থায় কখানি স্ন্যাপ নিলেন। তার পর খানিকটা সমতল ভূমি পেয়ে সবাই যখন বিশ্রাম-সুখ উপভোগে রত, সেই অবস্থায় সকলের একসঙ্গে এবং পুরুষদের ও মেয়েদের আলাদাভাবে ফটো নেওয়া হলো।

তারপর আবার আরোহণের পালা! কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতেই আভারাণী রণে ভঙ্গ দিলেন। বেচারা ভোম্বলকেও সঙ্গে সঙ্গে আটকে রাখলেন। খানিকটা এগিয়ে দেখা গেল প্রশান্তবাবুর গতিও মন্থর হয়ে এসেছে! আমি তখন অনেক দূরে সকলের আগে এগিয়ে চলেছি। পশ্চাতে ফুলকাদা' ও ভূপেনবাবু, আর আরো দূরে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি ও মিসেস্ পাল অতি কষ্টে উপরে উঠছেন। আর একটু এগিয়ে পিছনে ফিরে দেখি তাদের দুজনের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এল, আর দুজনে পাশাপাশি দুটি পাথরে বসে পড়লেন। আর একটু পরেই পাহাড়ের



পাহাড়ের উপর বিশ্রামরত পুরুষ যাত্রিগণ। উপরে— ডাক্তার ব্যানার্জ্জি ও লেখক এবং নীচে বামে ফুলকাদা ও দক্ষিণে ভোম্বল

উপর পাটনার ব্যারিষ্টার মিঃ সহায়এর সঙ্গে দেখা! খানিকক্ষণ তাঁর সঙ্গে গল্প করে, আমরা দুজন একসঙ্গেই পাহাড়ের উপর জৈন-মন্দিরের প্রাঙ্গণে পৌছলুম। মিনিট কয় পরেই ফুলকাদা' ও ভূপেনবাবুও উপরে পৌছলেন। পশ্চিমের আকাশে সূর্য্য তখন ঢলে পড়বার উপক্রম কচ্ছেন, সুতরাং আমাদের ভাগ্যে বেশীক্ষণ পাহাড়ের উপর বিশ্রাম-লাভ ঘটলো না, তিন জনে এক সঙ্গে (মিঃ সহায় আগেই

নেমে গিছ্লেন) নামতে আরম্ভ কল্লাম। অর্দ্ধপথে মিসেস্ ব্যানার্জ্জি, মিসেস্ পাল ও ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হলো, শুনতে পেলুম পত্নীসহ প্রশান্তবাবু অনেকক্ষণ নীচে নেমে গেছেন।

পর্ব্বতারোহণের অবশ্যম্ভাবী ফল ক্লান্তি ও ক্ষুধা দুইই বেশ টের পাচ্ছিলুম। অথচ সন্ধ্যা হয় হয়, আর প্রস্তাবিত তিনখানি ইটের উপর একটা হাঁড়ী ও চালডালের কোন ব্যবস্থাই তখনো হয় নাই। বাজারও খুব কাছে নয়, আর আভারাণীর চা না পেলে চলবে না জেনে, ভূপেনবাবু বন্ধু মিঃ চৌধুরীর নিকট একটি ছোকরা পাণ্ডাকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যে 'আমরা সন্ধ্যায় তাঁর ওখানে অনাহূত ভাবেই চা'পানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ কল্লুম'; তারও কোন জবাব পাওয়া যায় নাই! সুতরাং অবস্থা খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছিল না। পাহাড় হতে কোন রকমে নেমেই স্থির হলো, একদল অগ্রগামী হয়ে মিঃ চৌধুরীকে আমাদের চা-পানরূপ অতিথি-সৎকারের কথাটা মনে করিয়ে দিতে যাবেন, আর একদল অনতিবিলম্বে গিয়ে উপস্থিত হবেন। আর যদি মিঃ চৌধুরী নিজে রাত্রিতেও অতিথি-সৎকারের কোন প্রস্তাব করেন, তবে মৃদু আপত্তি ছাড়া কেউ বিশেষ আপত্তি কর্ব্বেন না; কেননা দেখলুম আমার 'তিনটি ইটের উপর একটি হাঁড়ীতে' কেউই বিশেষ আস্থাবান্ নন, আর আমিও যে খুব ছিলুম তা হলফ্ করে বলতে পারি না। তবে অন্য কোন সম্ভব উপায়ের অভাবে, অগত্যা নিজের মতকে প্রচার করতে হচ্ছিল আর সবাইকে ভরসা দিতে।

যাক্, অনাহূত চা-পানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাত্রার প্রারম্ভেই মিঃ চৌধুরীর উত্তর এল "আপনারা দয়া করে এলে সুখী হ'ব।"

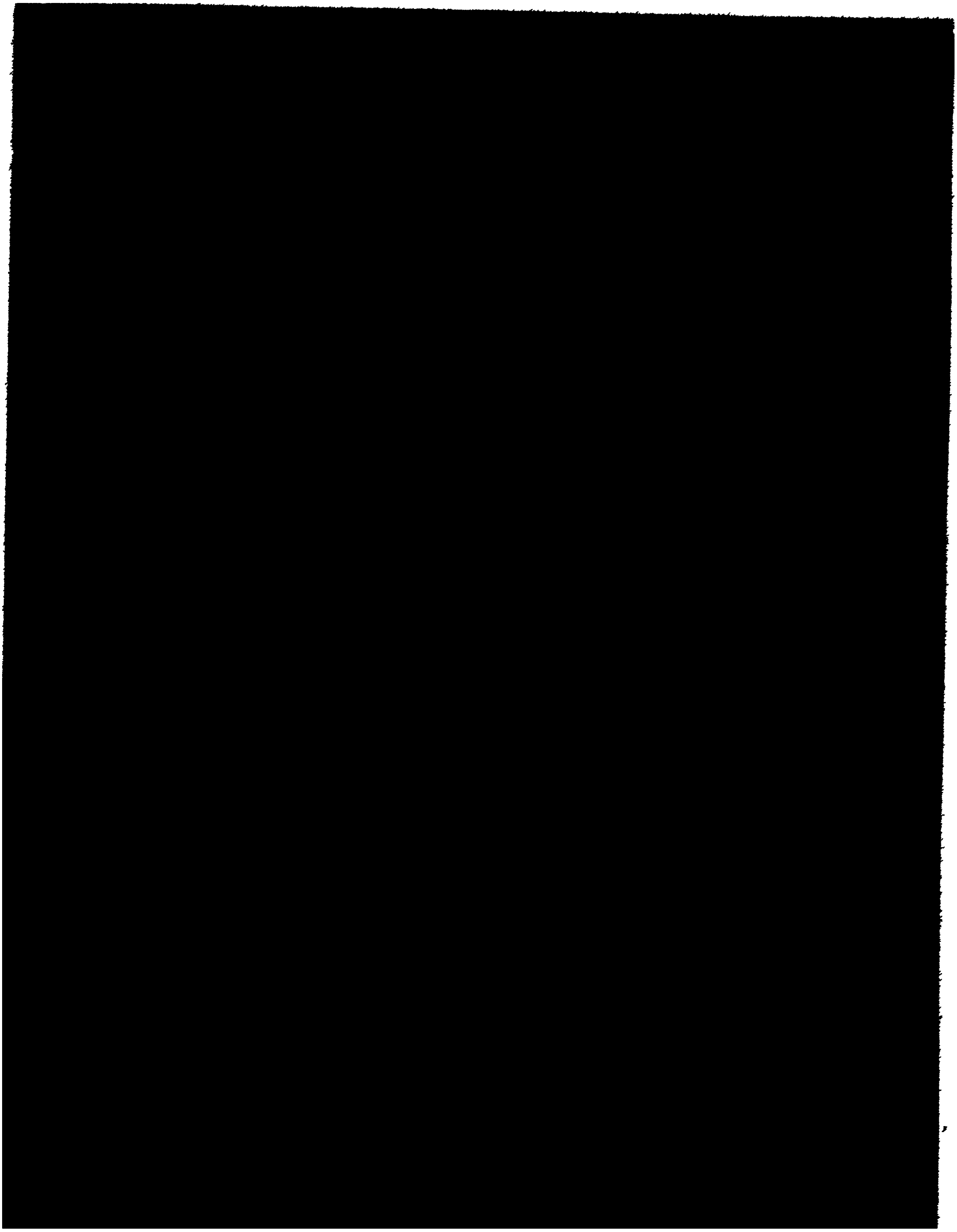
দয়া করতে আমাদের কারো যে আপত্তি কিছু আছে এমন মনে হলো না, অধিকন্তু মিসেস্ বোসকে কথা দেওয়া হয়েছে সন্ধ্যায় চা অবশ্যই পাওয়া যাবে। সুতরাং আমরা অনতিবিলম্বে, গাড়ীতে চড়ে গিয়ে জৈন ধরমশালায় মিঃ চৌধুরীর আবাসস্থলে উপস্থিত হলুম, তাঁকে অতিথি সৎকাররূপ পুণ্য সঞ্চয়ের সুযোগ ও সুবিধা করে দিতে।

আমাদের গাড়ী ধরমশালার দ্বারে পৌছতে না পৌছতে মিঃ চৌধুরী ও মিসেস্ চৌধুরী বেরিয়ে এসে আমাদের সম্বর্দ্ধনা করে নিয়ে গেলেন। দেখে অবাক্ হয়ে গেলুম, মিঃ চৌধুরী চেয়ারটেবিল, আসবাবপত্র, লোকজন সবই সঙ্গে করে এনে জৈন ধরমশালায় আস্তানা করেছেন, কে বলবে যে এটা তার বাড়ী নয়! ভদ্রমহিলারা অন্দরমহলে চলে গেলেন, আমরা বসে বৈঠকখানায় নানা বিষয়ে গল্প করতে আরম্ভ কল্লুম। প্রায় পনেরো মিনিটের মধ্যেই গরম গরম চা আর তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক যা' এল, তাতে কে বলবে যে মিঃ চৌধুরী রাজগীরে বেড়াতে গেছেন, আর আমরা তাঁর গৃহে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ' করেছি। এরকম আয়োজন-বাহুল্য সত্ত্বেও মিঃ চৌধুরী বার বার বলছিলেন, বিদেশে কিছুই আয়োজন নেই, আপনারা কিছু মনে কর্ব্বেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি।" সেদিন মিঃ চৌধুরীর আতিথেয়তার সঙ্গে বিনয়েরও প্রশংসা আমরা না করে পারি নি!

নানা প্রসঙ্গে কথাবার্ত্তা ও পরিতৃপ্তি সহকারে চা-টা খাওয়ার পর মিঃ চৌধুরী যখন সবিনয়ে বল্লেন "আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, তবে আমার স্ত্রী ও আমার অনুরোধ যে আপনারা দয়া করে রাত্রিতেও এখানে ডাল-ভাত যাহোক্ কিছু খেয়ে যান—জানেনই ত প্রবাসে—"

বাধা দিয়ে আমি বল্লুম "আপনাকে আর কত কষ্ট দেবো!"

ভূপেনবাবু বল্লেন "তুমি এতটা কষ্ট নাই বা কল্লে!" ফুলকাদা' বল্লে "এতগুলি লোক—"। প্রশান্তবাবু বোধ করি বা উপযুক্ত রকম কিছু বলবার চেষ্টা কচ্ছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কিছু বল্লেন না। ভোম্বল ওদিকের চেয়ারে বসে দিব্যি আরামে ঘুমুচ্ছিল! বিশেষ কিছু আপত্তি করা হবে না, আগেই ঠিক ছিল; সুতরাং হলোও তাই। আমরা আবার মিঃ চৌধুরীকে আর এক দফা অতিথি-সৎকারের সুযোগ দান করতে অবলীলাক্রমে রাজী হয়ে গেলুম; শুধু মনে মনে ভয় রইলো যে ভদ্রমহিলারা খাবার বিশেষ আপত্তি করে, সকল আয়োজন পণ্ড না করে বসেন। কিন্তু পরে দেখা গেল চাগাকীতে তাঁরাও নেহাৎ কম যান্ না। সে রাত্রিতে ধরমশালার বারান্দায় মাটিতে বসে কলাপাতায় মোটা চালের ভাত, অড়হর ডাল, গরম গরম বেগুন ভাজা ও নিরামিষ তরকারী দিয়ে আমরা যা' পরিতৃপ্তির সহিত আকণ্ঠ ভোজন করেছিলুম, তেমনটি চব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা রকম উপাদেয় খাদ্য সংযোগে



আশীর্ব্বাদ

শিল্পী—শ্রীযুক্তা শান্তি দেবী

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

ভুরি ভোজনেও খুব কম পেয়েছি। সব চেয়ে অবাক্ হয়ে গেলুম দেখে, যে পরিচিত মহিলাটি সর্ব্বদা এক টেবিলে খেতে বসে এক মুঠোর বেশী ভাত কখনও খান না, আর নিরামিষ যাঁর কখনো গলার নীচে যায় না, তিনিও বার দুইতিন ভাত চেয়ে নিয়ে অখণ্ড পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাল ভাত গলাধঃকরণ কচ্ছেন। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম্! বাস্তবিক সেদিন মিঃ চৌধুরী ও মিসেস চৌধুরী অতিথি-সৎকাররূপ পুণ্যের অনেকটাই অর্জ্জন করেছিলেন, তা' অস্বীকার কর্ব্বার উপায় নেই। আমরা অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হতে চৌধুরী দম্পতীকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাত প্রায় বারোটায় পুনরায় গাড়ীতে উঠ্লুম। আমি বল্লুম "যা হোক আভা, তুমি চা না খেয়ে ছাড়লে না দেখছি!" ভূপেনবাবু আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বল্লেন "আর আপনিও ভাত পেয়ে খুসী হয়েছেন বোধ করি—। শেষে আপনার কথাও রইলো।"

ডাক্তার ত্রিবেদীর পরিত্যক্ত তাঁবুগুলিতে রাত্রিতে শোবার কি ব্যবস্থা করা যায়, পথে মোটরে বসে তারই জল্পনা কল্পনা হচ্ছিল। সঙ্গে পথের সম্বল কম্বল মোটে দুখানি; আর অন্ধকার রাত্রির সহায় একটি টর্চ্চ্। স্থির হলো, তাঁবুর ভিতর খড় বিছিয়ে মেয়েরা একটা, আর পুরুষরা আর একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে; বালিশের পরিবর্ত্তে গাড়ীর স্প্রিংএর গদীগুলি ব্যবহার কল্লেই চলবে! এ রকম ব্যবস্থা ঠিক করে, তাঁবুর সম্মুখে পৌছে দেখা গেল, তাঁবুগুলিতে তিলধারণের স্থানও নেই। রাত বারোটা পর্য্যন্ত অধিকারীর কোন সাড়া না পেয়ে, রাজগীরে কায কচ্ছিল যত মজুর, সকলে দারুণ শীতে সে রাত্রির মত তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে। যে তাঁবুর ভরসায় আমরা রাত্রিতে সেখানে থাকতে মনস্থ করেছিলুম, তার অধিকার হতে পর্য্যন্ত বঞ্চিত হয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লুম। অবশ্য আমরা ইচ্ছা কল্লেই তাদের ডেকে উঠিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু তাতে আমাদেরই বা সুবিধা বিশেষ কি, আর গরীব বেচারাদের কষ্টের অন্ত নেই! সুতরাং নিরুপায়ভাবে আমরা বটগাছের অতি স্নিগ্ধ সুশীতল (পৌষ মাসের রাত্রিতে) ছায়ায়, মোটর গাড়ীতেই রাত কাটানো স্থির কর্লুম—অর্থাৎ এড্‌ভেঞ্চারের চরম কর্ত্তে হবে! কিন্তু আমাদের ভাবনার অতীত আরো দুর্দ্দৈব যে আমাদের সে রাত্রিতে ভোগ করতে হবে, তা আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারি নি!

দারুণ শীতে, উপযুক্ত শীতবস্ত্রের অভাবে, খোলা মাঠের মধ্যে, গাছের নীচে মোটরগাড়ীতে বসে রাত কাটানো, ভদ্র-মহিলাদের ত কথাই নেই, আমাদের পক্ষেও এই প্রথম। ভদ্রমহিলাদের দুজন (মিসেস বানার্জ্জি ছাড়া) এ দুর্ভোগের জন্য আমাদের উপর চটে গিয়ে বাক্যবাণ বর্ষণ করতে লাগলেন। আমরা ততক্ষণে একখানা গাড়ী আগাগোড়া স্ক্রীণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে, আর একখানা স্ক্রীণের অভাবে একটা তেরপাল দিয়ে ঢেকে যতদূর শীতের হাত হতে নিজেদের রক্ষা করা সম্ভব তাই কল্লুম! একখানা গাড়ীতে পেছনের সীটে তিনজন মহিলার ও সম্মুখে ভোম্বলের স্থান হলো; আর একখানাতে, পেছনের সীটে প্রশান্তবাবু, ফুলকাদা' ও আমি বসলুম, আর ভূপেনবাবু সামনের সিট্ অধিকার কল্লেন। দুখানা কম্বল শুধু পা ঢাকা ছাড়া আর কারো কোন কাজে লাগলো না। মেয়েরা ঘোমটা টেনে কাণ বন্ধ কল্লেন, আর আমরা ঘোমটার অভাবে রুমাল দিয়ে কাণ ঢেকে 'কাণের ভিতর দিয়া' শীত যাতে "মরমে" না পশিতে পারে তার চেষ্টা কল্লুম। ড্রাইভার দুটি তাঁবুর মধ্যে মজুরদের ঠেলে কোন রকমে একটু স্থান করে নিলে!

নীরব নিস্তব্ধ রাত্রি। অদূরে পাহাড়ের উপর বয়স্কাউট-দের ক্যাম্প। সেখান থেকে একটা হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোর রশ্মি ছাড়া সূচীভেদ্য অন্ধকার দূর করবার মত আর কিছু ছিল না। অদূরে দু একজন মজুরের নাসিকা-গর্জ্জন ও দু একটি নৈশ পক্ষীর পাখার ঝাপ্টার শব্দ ছাড়া আর টু শব্দটি পর্য্যন্ত নাই! আমরা উপায়বিহীনভাবে গাড়ীতে বসে দারুণ শীতে কাঁপছি, আর মহিলাদের কষ্টের কথা ভেবে দুঃখ কচ্ছি, এমন সময় বোধ হয় শীত নিবারণের জন্যই আভা কসে গীত ধর্লে—হাসির গান; বেশ স্পষ্টই বোঝা গেল তাঁরা তখনও ঘুমিয়ে পড়তে পারেন নি! আমাদেরও একই অবস্থা—সুতরাং আরম্ভ হলো—হাসি-ঠাট্টা ও রহস্য! কেউ বা গাইছেন, কেউ বা চিমটি কাট্‌ছেন, কেউ বা মোটরগাড়ীতেই তব্‌লা ঠুকছেন, আর কেউ বা নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মোটরের ভেঁপু বাজাচ্ছেন। স্পষ্টই বোঝা গেল সে রাত্রিতে ঘুমাবার মত ইচ্ছা কারো

নেই—কোন রকমে রাতটা কাটিয়ে দিতে পাল্লে হয়! ঘড়ীতে তাকিয়ে দেখি তখন প্রায় দুটা বাজে।

এম্নি হল্লা করতে করতে যখন ক্লান্ত দেহে আমাদের কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে আর আমাদের চোখে একটু তন্দ্রার ঘোর লেগে এসেছে তখন হঠাৎ একটা বিকট চীৎকার আর সঙ্গে গোঁ গোঁ শব্দ! তা' এতই আকস্মিক যে প্রথমে ঠিক করে উঠতে পারিনি, যে পাশে মেয়েদের গাড়ীতে ডাকাত পড়লো না আর কিছু! একমাত্র সম্বল টর্চ্চটিও হাত হতে নীচে পড়ে গেছে; অনেক কষ্টে তা খুঁজে নিয়ে জ্বালিয়ে দেখি আমাদেরই পাশে প্রশান্তবাবুর ফিট্ হয়েছে। মুখ চোখের সে কী ভীষণ অবস্থা, মুখে ফ্যানা উঠ্ছে আর গোঁ গোঁ শব্দ হচ্ছে! ও গাড়ী থেকে আভা ছুটে এল; সবাই এসে কেউ বা মাথায় জল দিতে লাগ্লুম, কেউ বা বাতাস করতে লাগলেন। নিস্তব্ধ রাত্রিতে সেই ভীষণ চীৎকারে পাহাড়ের উপর থেকে স্কাউটরা ছুটে এল, মুটে মজুররাও এসে চারদিকে ভীড় করে দাঁড়ালো। অনেক কষ্টে তাদের সরিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চোখে মুখে জলের ঝাপ্টা দিতে দিতে ও দু একবার বমি করে প্রশান্তবাবু একটু সুস্থ হলেন। তাঁকে তখন কম্বল চাপা দিয়ে আমাদের গাড়ীর পিছনের সিটে শুইয়ে দেওয়া হলো! পরে শুনলুম, এ ভাবে ফিট্ নাকি তাঁর নূতন নয়, আরো আগে দুএকবার হয়েছে। সারা দিনের অনিয়মে ও পরিশ্রমে, দেহ ও মনের অবসাদেই এরকম হয়ে থাকবে। রাত্রি তখন সাড়ে তিনটা!

মেয়েরা আবার গাড়ীতে গিয়ে বসলেন। আমি আর ফুলকাদা' আমাদের শেষ-আশ্রয়ও হারিয়ে গাছের নীচে খড়কুটো জ্বালিয়ে আগুন করে নিজেদের শীতের হাত হতে বাঁচাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। তাও কি সহজে হয়! অনেক কষ্টে যদি বা আগুন হল, শরীরের একদিক গরম করি, আর হাড়ভাঙ্গা কন্‌কনে শীতে আর একদিক আড়ষ্ট হয়ে যায়। তখন আবার সেদিক গরম করি, আবার ফিরে অন্যদিক গরম করতে হয়—এ যেন উল্টেপাল্টে উনুনের উপর রুটি সেঁকা! গাড়ীর কাঁচের ভিতর দিয়ে মেয়েরা তাই দেখছেন, আর হেসে লুটোপুটি খাচ্ছেন, বেশ বুঝতে পাল্লুম কিন্তু উপায় কি? তাজা আগুন দেখে ভূপেনবাবুও বেরিয়ে এলেন, ভোম্বলও এল, এমন কি শেষে ভদ্রমহিলারা পর্য্যন্ত। অনাহূতভাবে খড়কুটো, কাঠ নিয়ে শেষে দেখি দু'চার জন মজুরও এসে আমাদের মজলিশ বড় করে তুল্লে! স্থির হলো, আর নয় এড্‌ভেঞ্চারের যথেষ্ট হয়েছে! প্রশান্তবাবু একটু সুস্থ মনে কল্লেই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজগীর ত্যাগ করতে হবে। আমার অবশ্য আর একটা প্রস্তাব ছিল যে যাত্রার পূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডে ও সপ্তধারার গরম জলে স্নান করে আবার শরীরকে একটু তাজা করে নেওয়া—কিন্তু আর কেউ বড় একটা তা' সমর্থন কল্লেন না। ওদিকে ভোম্বল সকলকে তাড়া দিচ্ছিল "এবার সবাই নিজেদের পরিষ্কার করে নিন্, অর্থাৎ অত্যাবশ্যকীয় প্রাতঃ-কৃত্য শেষ করে নিন্!" সকলেই যার যার নিরিবিলি স্থান খুঁজে অত্যাবশ্যকীয় কাযটা অন্ধকার থাকতে থাকতেই সেরে নিলুম। ভোম্বল সকলের ছোট বলে, মেয়েদের ফাই ফরমাসটা তাকেই খাটতে হলো!

প্রশান্তবাবু একটু ঘুমিয়ে অল্প সুস্থ বোধ কচ্ছিলেন! কিন্তু রাত্রিতে এই অসুখের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত ভাবে কথা বলছিলেন। আমরা ততক্ষণে সকলেই প্রস্তুত! সুতরাং ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সকলে 'দুর্গানাম' করে রাজগীরের এড্‌ভেঞ্চার শেষ করে গাড়ীতে চড়লুম।



সাময়িকী

নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান—

বিলাতের 'ফিনান্শিয়াল টাইমস' পত্র সংবাদ দিতেছেন, শীঘ্রই ১৫ কোটি টাকা মূলধন লইয়া বাঙ্গালায় একটি নূতন লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে ইংরাজ, মার্কিণ ও জার্ম্মাণ ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থের সঙ্গে ভারতবাসীর স্বার্থও থাকিবে। মার্কিণের বিখ্যাত পেরিণ এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর ডাক্তার চার্লস পেজ পেরিণ ভারতবর্ষ হইতে লণ্ডনে উপনীত হইয়া এই কারখানা স্থাপনের সব ব্যবস্থা করিতেছেন। স্থির হইয়াছে, কুল্‌টীতেই এই কারখানা স্থাপিত হইবে। আপাততঃ এই কোম্পানী টাটা বা ভারতের আর কোন লৌহ ও ইস্পাতের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবেন না এবং সেই সব কারখানা হইতে লৌহ কিনিয়া তাহাতে রেলের ধুরা, চাকা প্রভৃতি প্রস্তত করিবেন। বর্ত্তমানে এই সব দ্রব্য বিলাত ও অষ্ট্রিয়া হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে।

নূতন কোম্পানী যে বিলাতের কারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় প্রবৃত্ত হইবেন, এমন মনে হয় না—তবে অষ্ট্রিয়ার সহিত প্রতিযোগিতা সম্ভব।

বলা হইয়াছে, এই কারবারে বিলাত, মার্কিণ ও জার্ম্মাণীর ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ থাকিবে এবং তাহার সঙ্গে ভারতের স্বার্থও থাকিবে। এই যে সম্মিলন, ইহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। ভারতের কথা আমরা পরে বলিব।

বিদেশ হইতে মূলধন আমদানীতে আপত্তি করা বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব বা সঙ্গত নহে। এ বিষয়ে ভারতীয় ফিশক্যাল কমিশন এইরূপ সমীচীন মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, হিসাব করিলে দেখা যায়, বিদেশী ধনী ব্যবসার লাভ পাইলেও যে দেশে মূলধন প্রযুক্ত হয় সেই দেশই মুখ্যতঃ লাভবান হয়। ভারতবর্ষে মূলধনের অভাব অবশ্য-স্বীকার্য্য এবং এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য মূলধনের প্রয়োজনও অত্যন্ত অধিক। সুতরাং এদেশে যে মূলধন পাওয়া যায় যদি তাহার সহিত বিদেশাগত মূলধন যোগ করা যায়, তবে শিল্প প্রতিষ্ঠার কার্য্য দ্রুত অগ্রসর হয়। ইহা ভিন্ন বিদেশী ধনী মূলধনের সঙ্গে সঙ্গে আরও কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। কাযের বিশেষ শিক্ষা সে সকলের অন্যতম। বর্ত্তমানে আমাদিগকে শিল্প প্রতিষ্ঠা ও শিল্পে উন্নতিসাধনের জন্য বহু পরিমাণে বিদেশীদিগের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এ দেশে কারখানার কলকব্জাও বিদেশ হইতে আনিতে হয় এবং টাটার কারবারেও বিদেশী বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিতে হইয়াছে।

বিদেশী মূলধনের উপযোগিতা পরীক্ষা করিবার জন্য কয় বৎসর পূর্ব্বে যে কমিটী গঠিত করা হইয়াছিল, তাহার সভ্যরা বলিয়াছিলেন, দেশ হইতে আবশ্যক মূলধন সংগৃহীত হওয়াই অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু প্রয়োজনে বিদেশী মূলধন বর্জ্জন করা যায় না। ভারতবর্ষে যে মূলধনের একান্ত অভাব আছে, তাহা এখন আর বলা যায় না; কারণ বিলাত স্বর্ণমান ত্যাগ করা হইতে এ দেশ হইতে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। তবে পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বর্ণের বিনিময়ে যে টাকা পাওয়া যাইতেছে, তাহা শিল্পে বা ব্যবসায়ে প্রযুক্ত হইতেছে না—হইলে দেশের শ্রী ফিরিত, সন্দেহ নাই। ব্যবসা মন্দার জন্য মফঃস্বলের অনেক ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়ায় বাঙ্গালার ধনীরা আরও শঙ্কিত হইয়া হাত গুটাইয়াছেন।

এদিকে এখন বিলাত ব্যতীত অন্যান্য দেশও এ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল, এ দেশের কয়জন ব্যবসায়ীর সহিত একযোগে কয়েকজন জাপানী ব্যবসায়ী এ দেশে কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারা দুই কারণে বাঙ্গালায় কল প্রতিষ্ঠাই সুবিধাজনক মনে করিয়াছিলেন—(১) মার্কিণ হইতে যে সব জাহাজ প্রায় খালি অবস্থায় পাট লইতে কলিকাতা বন্দরে আইসে, সেগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়ায় মার্কিণ হইতে তূলা আমদানী করা যাইবে এবং (২) বোম্বাইয়ের তুলনায় বাঙ্গালায় শ্রমিক-

চাঞ্চল্য অনেক অল্প। সে কল্পনা আজও কার্য্যে পরিণত হয় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হইবার হয়ত বিলম্বও নাই। জাপানীদিগের সহিত একযোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে একটি ছোট লৌহের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যদি এইরূপে বিদেশীরা এ দেশে অনেক কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করে, তবে যে এ দেশের লোকের কলকারখানা প্রতিষ্ঠার পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে, তাহা বলা বাহুল্য। প্রস্তাবিত কারখানায় যে ভারতবাসীর স্বার্থও থাকিবে, বলা হইয়াছে, সে কি কেবল—শ্রমিকের পরিশ্রমিকে ও কেরাণীর বেতনে?

বিদেশী মূলধন আমদানী কমিটী যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা আমরা প্রয়োজন ও কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করি। এখন যে সব কারবার এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সে সকলের মূলধন টাকায় (অর্থাৎ পাউণ্ডে নহে) স্থির করিতে হইবে, সে সকলের মূলধনের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ এ দেশে বিক্রয়ার্থ দিতে হইবে, কোম্পানীর ডিরেক্টার বা পরিচালকসঙ্ঘে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয় রাখিতে হইবে এবং কারখানায় ভারতীয়দিগের শিক্ষালাভের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন— এ দেশের লোক যাহাতে শিল্পে অর্থ-নিয়োগ করেন, সে বিষয়ে আবশ্যক আয়োজন করিতে হইবে। সে জন্য প্রচারকার্য্য প্রয়োজন হইতে পারে।

এ দেশে বিদেশীরা যে অনেক শিল্পে ভারতবাসীর পূর্ব্বেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বাঙ্গালায় পাটশিল্প এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাট বাঙ্গালার একচেটিয়া সম্পদ হইলেও কলিকাতার নিকটে গঙ্গার উভয় কূলে যে বহু পাটকলে চট ও থলিয়া উৎপন্ন হয়, তাহার প্রায় সবই বিদেশীর; সংপ্রতি ভারতীয়রা এই দিকে অগ্রসর হইয়াছেন বটে, কিন্তু এখন আর অধিক কল স্থাপনের সুবিধা নাই।

তাহার পর জাহাজের কথা। এদিকেও ইংরাজ কোম্পানী জলপথগুলি প্রায় অধিকার করিয়া আছেন। পরবর্ত্তীরা যে প্রবল প্রতিযোগিতাই অনুভব করেন, কেবল তাহাই নহে; পরন্তু তাঁহাদিগকে নানারূপে বিব্রত ও বিপন্ন করিবার চেষ্টাও যে হয় না, এমন নহে। এখনও আমরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখিতেছি। সংপ্রতি গঠিত একটি স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী (নিউ ইণ্ডিয়া) একখানি মাত্র জাহাজ ভাড়া লইয়া কলিকাতা হইতে রেঙ্গুনে যাত্রী ও মাল বহন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী কোম্পানী যাত্রীর ও মালের ভাড়া যেরূপ হ্রাস করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় কোম্পানীর পক্ষে দীর্ঘকাল প্রতিযোগিতা করা দুষ্কর হইতে পারে। কেবল যদি স্বদেশী কোম্পানী সহ্য করিতে পারেন, তবেই স্থায়ী হইবেন। এ বিষয়ে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর ইষ্ট-বেঙ্গল ষ্টীমার কোম্পানীর দৃষ্টান্ত যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা বলা বাহুল্য। সরকারের পক্ষেও অযথা ভাড়া হ্রাস দণ্ডনীয় করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে আমরা ভারতীয় বাণিজ্য নৌ-বহর কমিটীর নির্দ্ধারণ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সরকারকে অনুরোধ করিব। দেশের উপকূল বাণিজ্যে দেশের লোকের জাহাজের অধিকার যে সর্ব্বাগ্রে স্বীকার্য্য কমিটী তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। সরকারের মাল ও ডাক বহনের ভারও দেশীয় কোম্পানীর পাওয়া সঙ্গত। দেশের লোকের সমবেত চেষ্টায় যে সব জাহাজ কোম্পানী বা অন্য যে সব কারবার প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সকলকে যাহাতে বিদেশী ব্যবসায়ীদিগের অন্যায় প্রতিযোগিতা সহ্য করিতে না হয়, তাহা করা কি সরকারেরই কর্ত্তব্য নহে? যে সব বিদেশী কোম্পানী বহুকাল লাভ করিয়া ধন সঞ্চয় করিয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে কিছুকাল লোকসান সহ্য করা কষ্টসাধ্য নহে—কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা যে সমর্থনযোগ্য নহে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

বিমানে বঙ্গ-নারী—

বিমান চালনার কার্য্যে য়ুরোপে ও মার্কিণে মহিলারা কৃতিত্ব দেখাইয়া আসিতেছেন। এখন তাঁহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালী নারীরাও সেই কার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে যে বিমান দুর্ঘটনার বিবরণ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতে নিহত ব্যক্তিদিগের স্মৃতি-রক্ষার্থ যে দাশ-রায় স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হইতে মহিলা শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে—স্থির হইয়াছে। তদনুসারে প্রার্থীদিগের মধ্যে তিন জনকে প্রথম মনোনীত করা হয়—

(১) কলিকাতা বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী কুমারী অঞ্জলি দাশ,

(২) লাহোরে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক,

(৩) শ্রীহট্টের রমা গুপ্তা।

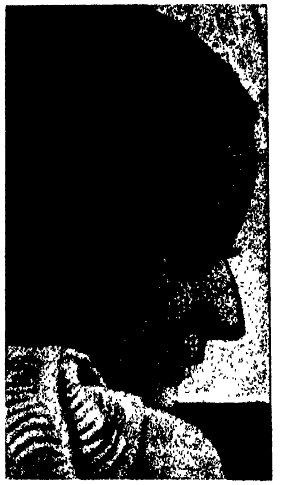
তখন স্থির হয়, এক ঘণ্টা কাল বিমানবিহারের ফল পরীক্ষা করিয়া এই তিন জনের মধ্যে প্রথম স্থানীয়াকে ১ হাজার টাকা ও দ্বিতীয় স্থানীয়াকে ৫ শত টাকা বৃত্তি দিয়া দমদমায় বিমান ক্লাবে তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সংপ্রতি তহবিলের সম্পাদক জানাইতেছেন যে, প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের কুমারী



কুমারী অঞ্জলি দাশ



কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক



রমা গুপ্তা

অশোকা রায়কত বি, এ, বিমানচালনা শিক্ষার জন্য বৃত্তি পাইবেন, স্থির হইয়াছে। ইঁহার শিক্ষাফল দেখিয়া আগামী জানুয়ারী মাসের শেষভাগে দ্বিতীয় বৃত্তি প্রদান করা হইবে এবং সেই সময় কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিককে বৃত্তি প্রদানের বিষয় বিবেচিত হইবে। কুমারী ইন্দুলেখা যদি বৃত্তি লাভ করেন, তবে লাহোর বিমান ক্লাবে তাঁহার শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ্রীমতী মৃণালিনী সেনই বাঙ্গালী মহিলাদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিমানে আরোহণ করেন। তখন তাহাতেই অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর আজ প্রগতিশীলা বঙ্গাঙ্গনারা বিমানচালনা-বিদ্যা শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃতি পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ব্যবধান রাখিয়াছেন, তাহা দূর করা সম্ভব না হইলেও নারীরা এখন পুরুষের সঙ্গে আর সর্ব্ববিষয়ে তুল্যাধিকার-লাভকামী হইতেছেন। কিন্তু ইহার ফল কি হইবে, সে বিষয়ে অনেকেরই বিশেষ সন্দেহ আছে। যে গৃহ নারীর কর্ম্মক্ষেত্র, সেই গৃহের কর্ত্তব্য—মাতার কার্য্য যদি অবহেলিত হয়, তবে যে সমাজের তাহাতে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না, তাহা বলা বাহুল্য। লর্ড সিংহ যখন বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের গভর্ণর ছিলেন, সেই সময় তাঁহার পত্নী কোন মাসিকপত্রে এক প্রবন্ধে বর্ত্তমান কালে ভারতীয় মহিলাদিগের সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনত্রুটি ও বিলাস-বাহুল্যের উল্লেখ করিয়া আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বাঙ্গালী মহিলাদিগের বিমানচালন-বিদ্যার্জ্জনের সার্থকতা কি তাহাও বুঝা যায় না।

মুকবধির শিল্পী—

শ্রীমান বিপিনবিহারী রায় চৌধুরী মুকবধির। ইনি কলিকাতা মুকবধির বিদ্যালয়ে ও সরকারী শিল্প বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে বিলাত যাত্রা করেন। ইনি তথায় রয়েল কলেজ অব আর্টে শিক্ষা ও উপাধি লাভ করিয়া গত ২৪শে অক্টোবর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন। গত ২৮শে অক্টোবর কলিকাতা মুকবধির ক্লাব তাঁহাকে এক সভায় সম্বর্দ্ধিত করেন।

তথায় তিনি তাঁহার অভিজ্ঞতার বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত মূকবধিরদিগকে উৎসাহিত করিবে, সন্দেহ নাই।

গোপালকৃষ্ণ দেবধর—

ভারত-ভৃত্য সমিতির সভাপতি গোপালকৃষ্ণ দেবধরের অকাল মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোকগত গোপালকৃষ্ণ গোখলে সেবার ভিত্তির উপর ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তদবধি দেবধর মহাশয় সেই সমিতির স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে পুনায় তাঁহার জন্ম হয় এবং পুনায় ও বোম্বাইয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আর্য্য শিক্ষা সমিতির উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার পর—ভারত-ভৃত্য সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে তিনি তাহাতে যোগ দেন এবং বোম্বাই শাখার সভাপতি হয়েন। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন। তিনি জনহিতকর কার্য্যে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন এবং ১৯১০ খৃষ্টাব্দে পুনায় সেবা সদন সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি কিছুদিন পুনায় একখানি দেশীয় ভাষায় পরিচালিত পত্রের সম্পাদকও ছিলেন।



গোপালকৃষ্ণ দেবধর

জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বিলাতী সরকারের নিমন্ত্রণে ভারতবর্ষ হইতে যে কয় জন সাংবাদিক য়ুরোপে গমন করেন তাঁহাদিগের মধ্যে তিনিই বোম্বাই প্রদেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ছিলেন। ঐ নিমন্ত্রণে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রের সম্পাদক কস্তুরীরঙ্গ আয়াঙ্গার, বাঙ্গালা হইতে 'ইংলিশম্যান' পত্রের সম্পাদক মিষ্টার স্যাণ্ডব্রুক ও 'দৈনিক বসুমতী'পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এবং পঞ্জাব হইতে 'পয়সা আখবর' পত্রের মৌলবী মাবুব আলম এই কয়জনও গিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে অন্য প্রতিনিধিরা ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কেবল মিষ্টার দেবধর বিলাতে ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে শিক্ষা ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির কার্য্য-পদ্ধতি অধ্যয়ন করিবার জন্য কয় মাস বিদেশে অবস্থান করেন। সেই অধ্যয়ন ফলে তাঁহার বিশ্বাস জন্মে, এ দেশে সমবায় নীতির প্রবর্ত্তন ব্যতীত লোকের অবস্থার উন্নতি সাধনের অন্য সহজ উপায় নাই। তিনি সমবায় নীতিতে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নতি সাধনে এমন চেষ্টিত ছিলেন যে, ভারতের নানা প্রদেশে ও বহু দেশীয় রাজ্যে সমবায় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি আহূত হইতেন। গত ১৮ বৎসর তিনি বোম্বাইয়ের প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কের এক জন ডিরেক্টার ছিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে সমবায় নীতি প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করেন। তিনি কেন্দ্রী ব্যাঙ্কিং কমিটীর এক জন সভ্যও ছিলেন।



গোপালকৃষ্ণ গোখলে

মিষ্টার দেবধর কৃষির উন্নতি ব্যতীত দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নহে, ইহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং কৃষি বিষয়ে যে রয়াল কমিশন নিযুক্ত হয় তাহাতে তাঁহার সাক্ষ্যে তিনি সেই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের কৃষি সমিতির সভাপতি ছিলেন।

মিষ্টার দেবধর ভারতবর্ষের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং বন্যা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় নানাস্থানে লোককে সাহায্য দান ব্যবস্থায় তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন।

এইরূপে তিনি ভারত-ভৃত্য সমিতির আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষে—বিশেষ বোম্বাই প্রদেশে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে—নানা জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের কার্য্যে সর্ব্বদা অবহিত ছিলেন।

রাজনীতিতে তিনি মডারেট দলভুক্ত ছিলেন এবং শাসন-সংস্কারের প্রকৃতি সম্বন্ধে মতভেদ হেতু মডারেটরা যখন বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অতিরিক্ত অধিবেশন বর্জ্জন করেন, তখন নাকি তাঁহারই আগ্রহে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সেই অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।

সরকার তাঁহাকে পদক ও উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তদাস—

গত ২০শে কার্ত্তিক বৃন্দাবনযাত্রার পথে বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী মোহান্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস দেহরক্ষা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর হইয়াছিল।

১২৬৫ বঙ্গাব্দে আসাম শ্রীহট্টে বামৈ গ্রামে তারাকিশোর চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি রামায়ণ মহাভারতাদি পুরাণের কথা শিক্ষা করেন। দশ বৎসর বয়সে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পর তিনি শ্রীহট্ট মিশন স্কুলে প্রবেশ করিয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন ও আসামের পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন বটে, কিন্তু আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম্মে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন হেতু তাঁহার পিতা অর্থপ্রদান বন্ধ করায় তিনি মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে প্রবেশ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা প্রবল হয় এবং তিনি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন। এদিকে তিনি আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনীতিক আন্দোলনেও যোগ দেন। এই সময়ে তিনি বিলাতে যাইবার চেষ্টা করেন কিন্তু সফলকাম হয়েন নাই। তাঁহার পিতা কলিকাতায় আগমন করেন এবং ব্রাহ্মসমাজ বর্জ্জন সম্বন্ধে তাঁহার অবাধ্য পুত্রকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়েন। এক জন ভৃত্যই তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া তারাকিশোরের জীবন রক্ষা করে।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পরিবার প্রতিপালন কর্ত্তব্য মনে করিয়া বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সিটী স্কুলে ও কিছুদিন জয়নগর হাই স্কুলে শিক্ষকের কায করেন। এই সময়েই তিনি এম, এ, পরীক্ষা দেন ও দর্শনশাস্ত্রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। পরে তিনি সিটী কলেজে অধ্যাপনা করিতে থাকেন।

তিনি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসু হইয়া তৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধু সন্ন্যাসীর নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। এক দিন একটি সার্কাসে কোন য়ুরোপীয়



বৈষ্ণবাচার্য্য সন্তদাস

খেলোয়াড়কে দৃষ্টির দ্বারা উত্তেজিত ব্যাঘ্রকে বশীভূত করিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তার গতি-পরিবর্ত্তন হয়। তাঁহার মনে হয়, খেলোয়াড় যেমন দৃষ্টিশক্তির দ্বারা পশুকে বশীভূত করিতে পারেন, প্রকৃত গুরু তেমনই মানসিক শক্তির দ্বারা শিষ্যের মনের পাশবিক বৃত্তি সংযত করিতে পারেন।

তিনি হিন্দুমতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মজিলপুর গ্রামনিবাসী কাশীনাথ দত্তের পরামর্শে যোগ-সাধনায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস হেতু নূতন শক্তি অনুভব করেন।

কিন্তু তখনও তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেন নাই। তথাপি ব্রাহ্মধর্ম্মে আর পূর্ব্ববৎ শ্রদ্ধা না থাকায় তিনি সিটী কলেজের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতে থাকেন।

পিতার অনুরোধে তিনি আইন পরীক্ষা দেন ও তাহাতে উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করেন। হবিগঞ্জ আদালতে একটি ফৌজদারী মামলায় তাঁহার খ্যাতি-বিস্তার হয় এবং মফঃস্বলে তিন বৎসর ওকালতী করিয়া তিনি অস্থায়ীভাবে কলিকাতায় আগমন করেন। ব্যবহারাজীবের ব্যবসা করিবার সময় যোগ-সাধনায় তাঁহার আগ্রহ ও উৎসাহ হ্রাস পায় নাই।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। আইনে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং তিনি ব্যবসায়ে মনোযোগী ছিলেন—সেই জন্য অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার বিরাট পসার হয়। কিন্তু তিনি সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মনে হয়, যোগ-সাধনায় "ব্রহ্ম-দর্শনের দ্বার উদ্ঘাটিত" হয় না। তখন তিনি অন্য গুরু লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন ও স্থির করেন, পত্নীর জন্য কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া দিয়া ব্যবসা ত্যাগ করিয়া গুরুর সন্ধানে বাহির হইবেন। এই সময়—এক ছুটীর দিন—তাঁহার মনে গঙ্গার কূলে বসিয়া ধ্যান করিবার বাসনা বলবতী হয় এবং তিনি গঙ্গাতীরে উপনীত হইয়া একটি ঘাটে বসিয়া গঙ্গার কথা ভাবিতে থাকেন। তিনি বলিয়াছেন :—

"আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া খুব কাতরভাবে গঙ্গাদেবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে আমার মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করি। দেখিলাম যে, আমার চক্ষুর সমক্ষে হিমালয়ের যে স্থান হইতে গঙ্গা উদ্ভূতা হইয়াছেন সেই মূল গঙ্গোত্রী গোমুখী-স্থান সহসা প্রকাশিত হইল এবং সেই স্থানে বিরাজমান উমামহেশ্বরও আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। আমি বিস্মিত হইয়া ঐ স্থান ও তাঁহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম, নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলাম। অতঃপর মহেশ্বর একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্র আমাকে উপদেশ দেন এবং এইরূপ জ্ঞাপন করিলেন যে, এই মন্ত্রের জপের দ্বারা আমি যথার্থ সদ্গুরু লাভ করিব। ইহার পরই তিনি এবং সেই গঙ্গোত্রীর স্থানের দৃশ্য আমার আর দৃষ্টিগোচর হইল না। আমি যে স্থানে সেই স্থানে এবং গঙ্গাজীকে সম্মুখে দেখিলাম।"

ইহার পর রামদাস কাঠিয়া বাবাজীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে এবং তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। ১৩০১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে জন্মাষ্টমীতে তিনি পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষান্তে গুরুর সহিত ব্রজ পরিক্রমা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করিতে থাকেন।

এই সময় তিনি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কয়খানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং ধর্ম্মালোচনায় অধিক মনোযোগ দেন।

যে সময় সকলেই আশা করিতেছিলেন, তিনি হাইকোর্টের জজের পদ লাভ করিবেন, সেই সময় তিনি সংসারে বীতরাগ হইয়া বৃন্দাবনে মন্দির প্রস্তুত করান এবং ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাস-সঙ্কল্প করেন। তাঁহার বৃন্দাবন যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ আমরা করিতেছি। বৃন্দাবন যাত্রার দিন বা তাহার পূর্ব্বদিন তিনি একবার পুরাতন বন্ধুদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ জন্য হাইকোর্টে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সন্ন্যাসীর জীবন যাপন-সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহাকে দেখিয়া সার রাসবিহারী ঘোষ জিজ্ঞাসা করেন, "তারাকিশোর, তুমি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছ?" তারাকিশোর বাবু বিনীতভাবে তাঁহার সেই অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলে সার রাসবিহারী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন, "তুমিই জিতে গেলে।"

সন্ন্যাসী তারাকিশোরের নাম সন্তদাস হয়।

বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর মধ্যে তিনিই প্রথম বৈষ্ণব চারি সম্প্রদায়ের ব্রজবিদেহী মোহান্ত পদে বৃত হইয়াছিলেন।

তিনি বহু ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এবং নানাস্থানে তাঁহার বহু শিষ্য আছেন। বৃন্দাবন যাত্রার কয়দিন মাত্র পূর্ব্বেও তিনি সমবেত ভক্তদিগকে "ব্রহ্মের স্বরূপ ও জীবের স্বরূপ" প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন।

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষিত যে সকল বাঙ্গালী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সাধনমার্গে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নারায়ণ স্বামী মাদ্রাজে কয় বৎসর পূর্ব্বে দেহ রক্ষা করেন। তিনি "কালী কম্বলীওয়ালার" শিষ্য ছিলেন। শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও তারাকিশোর বাবুর মত হাইকোর্টের উকীল ছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া

তিনি শঙ্কর পরমানন্দ নামে পরিচিত হয়েন এবং পুরীতে শঙ্কর মঠে স্বীয় অধিকার ত্যাগ করিয়া বারাণসীতে যাইয়া দেহরক্ষা করেন। বৈষ্ণবাচার্য্য ব্রজবিদেহী মোহান্ত সন্তদাসও আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গমন করিলেন।

এই সকল ধর্ম্মগুরু এই জড়বাদবিড়ম্বিত যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং ইহকালসর্ব্বস্ব মতের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়াও প্রাচীন ভারতের সেই পুণ্যপূত আদর্শ রক্ষা করিয়াছেন। তাই মনে হয়—

"যথা অগ্নিহোত্র দ্বিজ দীপ্ত রাখে অগ্নি নিজ,
চিরদীপ্ত র'বে হুতাশন"

এই ধর্ম্মপ্রাণতার হুতাশনে আমাদিগের বর্ত্তমান যুগের সভ্যতার শ্যামিকা এক দিন দগ্ধ হইয়া যাইবে এবং ভারতের গোমুখীমুখ হইতে ধর্ম্মের পাবনীধারা আবার ত্রিতাপতপ্ত মানবকে শান্তিদান করিবে।

রমেশ-ভবন—

১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর যখন কর্ম্মবহুল জীবনে অসমাপ্ত কার্য্যের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত পরলোকগত হয়েন, তখন তাঁহার গুণানুরক্ত স্বদেশবাসীরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ এই কার্য্যে অগ্রণী হয়েন এবং সারদাচরণ মিত্র নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তখন বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের সেই কথা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছে—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই।" বাঙ্গালীর প্রাসাদ হইতে কুটীরে যে সহস্র সহস্র পুঁথি অনাদরে নষ্ট হইতেছে, বাঙ্গালার ভগ্ন দেবায়তনে ও মৃত্তিকার নিম্নে যে সব মূর্ত্তি ও স্তম্ভ লুকাইয়া ইতিহাসের উপকরণ রক্ষা করিতেছে—সে সকলের উদ্ধার সাধনের প্রয়োজন বুঝিয়া তখন সেই সব সংগৃহীত হইতেছে। স্থির হয়, যিনি সিভিল সার্ভিসে জিলা শাসনের কার্য্যের বিরলপ্রাপ্ত অবসরের মধ্যেও যৌবনে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন, যিনি উপন্যাসের সাহায্যে ইতিহাস-পাঠ-বিমুখ বাঙ্গালীকে বঙ্গ-বিজয়ের, মোগল শাসনের,! রাজপুতের অধঃপতনের ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের উত্থানের ইতিহাস বুঝাইয়াছিলেন, যিনি ঋগ্বেদের অনুবাদ ও হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের পরিচয় বাঙ্গালীকে প্রদান করিয়াছিলেন, যিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ও বাঙ্গালী কৃষকের ইতিহাস বহুদিন পূর্ব্বে রচনা করিয়াছিলেন, যিনি বিলাতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ শাসনে ভারতের আর্থিক অবস্থার বিস্তৃত বিবরণ রচনা করিয়া আর্থিক ব্যাপারে দেশের চিন্তার ধারা নূতন পথে প্রবাহিত করিয়াছিলেন এবং রামায়ণ ও মহাভারতের সারসংগ্রহ ইংরাজী কবিতায় প্রকাশ করিয়া ইংরাজকে এ দেশের সভ্যতার ও মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন—তাঁহার জন্য প্রত্নোপকরণ রক্ষা গৃহ নির্ম্মাণই স্মৃতিরক্ষাকল্পে শোভন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেল—কাশিমবাজারের জমীদার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রদত্ত—পরিষদ-মন্দির সংলগ্ন ৭ কাঠা জমীর উপর নির্ম্মাণ জন্য কল্পিত রমেশ ভবনের



রমেশচন্দ্র দত্ত

ভিত্তি স্থাপন করেন। বহু চেষ্টায় তাহার প্রথম তল নির্ম্মিত হইয়াছে। অথচ এ দেশের জল-বায়ুতে নিম্নতলে রক্ষিত পুঁথি, পট ইত্যাদি অল্পদিনে নষ্ট ও বিবর্ণ হইয়া যায়।

এতদিনেও যে এই গৃহের দ্বিতীয় তল গঠনের জন্য ৩০ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল না, ইহাতে মর্ম্মাহত হইতে হয়। মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞান সভার অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশের পর আড়াই বৎসরে "বঙ্গসমাজ চল্লিশ সহস্র টাকা (মাত্র) স্বাক্ষর করিয়াছেন" বলিয়া ১২৭৯ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কত আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন। আর এই যে তাহার পর—৬০ বৎসরেরও অধিককাল পরে ২৫ বৎসরে বাঙ্গালায় রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিবার জন্য আবশ্যক ৩০ হাজার

টাকা সংগৃহীত হইল না—ইহা কি বিশেষ আক্ষেপের বিষয় নহে ?

বাঙ্গালা সাহিত্যে রমেশচন্দ্রের দান সামান্ত নহে। কিন্তু তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেই বঙ্গ-ভারতীর সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' রমেশচন্দ্রের প্রথম রচনা Three Years in Europe পুস্তকের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "লেখকের নিকট আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ এই যে, এই পুস্তকখানি বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করেন।" তাহার অন্যতম কারণ, তখনও এ দেশে "অনেকেরই বোধ আছে, বিলাতে বাঙ্গালীতে মোট বয়, বাঙ্গালীতে ভূমি চষে; কেন না 'সাহেব' কি মোট বহিবে, না লাঙ্গল ধরিবে ?" রমেশচন্দ্র সাহিত্য-গুরুর এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমরা যে বঙ্কিমচন্দ্রকে রমেশচন্দ্রের বঙ্গ-ভারতী সেবার গুরু বলিয়াছি, তাহার কারণ রমেশচন্দ্রই তাঁহার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র চাকরীতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রমেশচন্দ্রের পিতাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং সেই সূত্রে রমেশচন্দ্র তাঁহার স্নেহ লাভ করেন। তিনি যখন 'বঙ্গদর্শন' প্রচার আরম্ভ করেন, তখন এক দিন আলোচনা-প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস-বর্ণিত চরিত্র সম্বন্ধে মত প্রকাশ করায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যে তোমার যদি এমন অনুরাগ, তবে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা কর না কেন ?" তিনি বাঙ্গালা লিখিবেন, এ কল্পনাও অসম্ভব বলিয়া রমেশচন্দ্র সে কথায় বিস্ময় প্রকাশ করিলে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "তোমার মত শিক্ষিত বাঙ্গালীরা যে রচনা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিবেন, তাহাই পদ্ধতি হইবে।" তিনি অন্য প্রসঙ্গে বুঝাইয়া দেন, রমেশচন্দ্রের জ্ঞাতিদিগের ও মধুসূদন প্রভৃতির ইংরাজী রচনা স্থায়ী হয় নাই—কিন্তু মধুসূদনের বাঙ্গালা রচনা কালজয়ী। এই কথায় রমেশচন্দ্রের মনে বাঙ্গালা রচনার বাসনার উদ্রেক হয় এবং তিনি তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' রচনা আরম্ভ করেন।

রমেশচন্দ্র বাঙ্গালার বরেণ্য সন্তানদিগের অন্যতম। আমরা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, লেডী প্রতিমা মিত্র তাঁহার মাতামহের স্মৃতিসৌধ সম্পূর্ণ করিতে উদ্যোগী হইয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। পরিষদ-মন্দির গঠনকালে দেখা গিয়াছে—অন্যান্য প্রতিষ্ঠানেও সেই অভিজ্ঞতা লাভ করা হইয়াছে—যে, এক জন বা কয় জন লোকের ঐকান্তিক চেষ্টা ব্যতীত কার্য্য সম্পন্ন হয় না—বড় বড় সমিতির দ্বারা কায হয় না। লেডী প্রতিমা মিত্র সিমলায় কালীবাড়ীর বিস্তার সাধনে—তথায় বাঙ্গালীদিগের নানা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে যে সাফল্য লাভ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার পিতৃদেব প্রমথনাথ বসু মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইয়াছে। তাই আমাদিগের বিশ্বাস, রমেশ-ভবন সম্পূর্ণ করিতে তাঁহার প্রচেষ্টা ফলবতী হইবে এবং অল্পকাল মধ্যেই এই ভবন বাঙ্গালার ইতিহাসের গবেষকদিগের গবেষণার কেন্দ্র হইবে।

রাজস্থানের ঐতিহাসিক—

ভারতবাসীর নিকট কর্ণেল জেমস টডের নাম সুপরিচিত ও সম্মানিত। কেবল ঐতিহাসিকরা নহেন, পরন্তু বহু কবি ও ঔপন্যাসিক তাঁহার বিরাট কীর্ত্তি রাজপুতানার ইতিহাস হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য সমৃদ্ধ করিয়াছেন। কবি রঙ্গলাল যে 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' রচনা করিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র যে 'রাজসিংহে' রাজপুত রণকৌশল বর্ণনা করিয়াছিলেন, রমেশচন্দ্র যে 'জীবন সন্ধ্যায়' ভারতের ইতিহাসের তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন—এই তিন জনই যে ভারতে দেশাত্মবোধের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন—সে টডের অমর গ্রন্থের উপকরণ-সাহায্যে। এই বিদেশী লেখক ভারতবাসীর পুরাতন ইতিহাসের আলোচনা করিয়া নূতন ইতিহাসের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শতবর্ষ পূর্ব্বে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২০শে মার্চ্চ তারিখে বিলাতে টডের জন্ম হয় এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে—অল্প বয়সে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরী লইয়া বাঙ্গালায় আগমন করেন। চাকরীতে তাঁহার দক্ষতার যত পরিচয়ই কেন প্রকট হউক না, তিনি সৌভাগ্যশালী ছিলেন না।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, তখন এক দিকে পিণ্ডারীদিগের অত্যাচারে ও অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণে রাজপুতানার পুরাতন

রাজ্যগুলি বিপন্ন—ধ্বংসোন্মুখ। ইহার পর এক বৎসরের মধ্যে পিণ্ডারীদিগের কুকার্য্যের সমর্থনকারী পেশাওয়া বাজীরাওকে সংযত হইতে হয় এবং পিণ্ডারীরা শাসিত হয়। ইহার পরই কতকগুলি সন্ধির ফলে পুরাতন রাজপুত রাজ্যগুলির নষ্ট সম্পদের উদ্ধার সাধিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে টড সিন্ধিয়ার দরবারে ইংরাজ রেসিডেন্টের সহকারী থাকিয়া কার্য্যদক্ষতার পরিচয় দিয়া ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাজপুতানার পলিটিক্যাল এজেন্টের পদ লাভ করেন। তৎকালে পিণ্ডারী দস্যুদলের অত্যাচারে দেশের দুর্দ্দশার বর্ণনা টডের ইতিহাসে দেখা যায়ঃ—

"যে উদয়পুরের পুরপ্রাচীরমধ্যে পূর্ব্বে ৫০ হাজার গৃহ ছিল, এখন তথায় ৩ সহস্রের অধিক গৃহে অধিবাসী নাই; আর সব গৃহ জনশূন্য—গৃহের কড়ি প্রভৃতি লোক ইন্ধনের জন্য ব্যবহার করিতেছে। * * * পিণ্ডারীদিগের অত্যাচার-ফলে কেহই নিরাপদ নহে। তাহারা যে সব দ্রব্য লইয়া যাইতে পারিত না, সে সব দগ্ধ ও নষ্ট করিয়া যাইত; এই বর্ব্বররা স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিয়া—পিতামাতার সম্মুখে সন্তানদিগকে নিহত করিয়া পৈশাচিক আনন্দানুভব করিত।"

টডের চেষ্টায় দেশে শান্তি স্থাপিত হয় এবং তিন শত পরিত্যক্ত নগর ও গ্রাম আবার অধিবাসীতে পূর্ণ হয়। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবর রাজপুতানা পরিভ্রমণকালে লিপিবদ্ধ করেন—টডের আগমনের পূর্ব্বে তথায় সমৃদ্ধি ছিল না এবং ধনী-দরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সকলেই টডকে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

কিন্তু নিজ জাতির মধ্যে টডের শত্রু ছিল—তাহারা তাঁহার কার্য্য-সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া রটনা করিতে থাকে যে, তিনি দেশীয় রাজন্যগণের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ অবহিত এবং তাঁহাদিগের অর্থের বশীভূত হইয়াই তাঁহাদিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। পিণ্ডারী যুদ্ধের পর যোগ্যতম ব্যক্তি বিবেচনা করিয়াই কলিকাতা হইতে ইংরাজ সরকার তাঁহাকে উদয়পুরের রেসিডেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সব নিন্দাবাদে চঞ্চল হইয়া তাঁহারা টডের সঙ্গে আর এক জন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন। বিরক্ত হইয়া টড ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন এবং ৫৩ বৎসর বয়সে বিলাতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উদয়পুরে অবস্থানকালে তিনি বিশেষ শ্রম সহকারে রাজপুতদিগের ইতিহাসের প্রভূত উপকরণ সংগ্রহ করেন এবং সেই সকল হইতে রাজপুতানার বিস্তৃত ইতিহাস রচনা করেন। এই কার্য্যে তিনি ভারতীয় পণ্ডিতের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

টড এ দেশের—হিন্দুদিগের ইতিহাস সম্বন্ধে যে মত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজপুতানার ঐতিহাসিক গ্রন্থের অভাব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, রাজপুতরা বহুদিন শত্রুর সহিত সংগ্রামে বিব্রত ছিলেন—কখন কখন গিরি-গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং খাদ্য রন্ধন



কর্ণেল জেম্‌স্ টড

হইলেও তাহা উদরস্থ করিবার সময় পাইবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সেরূপ অবস্থা ইতিহাস রচনার পক্ষে অনুকূল নহে। আর সেই সময় বহু গ্রন্থ নষ্ট হওয়াও অনিবার্য্য। জয়পুরের রাজা জয় সিংহ স্বয়ং যে দৈনন্দিনলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা মূল্যবান। তাহা 'কল্পদ্রুম' নামে অভিহিত। বিদ্যানুরাগী জয় সিংহ রাজপুতদিগের ইতিহাসের অনেক উপকরণ সংগ্রহও করিয়াছিলেন—তাহার কতকাংশ টড পাইয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাহার অনেক অংশ তাঁহার অপদার্থ উত্তরাধিকারীর অবহেলায় নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এখনও নানা স্থানে অনেক মূল্যবান পুঁথি পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে টড বলিয়াছেন, যুরোপে যে ভাবে ইতিহাস লিখিত হয়, ভারতে সে ভাবে হইত না। হিন্দুদিগের সকল কার্য্যই তাহাদিগের ধর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাহাদিগের শিল্প ও সাহিত্য যেমন—ইতিহাসও তেমনই সেই বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। কিন্তু পুরাণে ইতিহাসের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান। শত বর্ষের অধিককাল পূর্ব্বে টড যাহা লিখিয়াছিলেন, আজ তাহা যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং পুরাণের মধ্যে যে ঐতিহাসিক বিবরণ আছে, তাহার উদ্ধার-সাধনচেষ্টা চলিতেছে। এই চেষ্টা সফল হইলে যে ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস লিখিত হইতে পারিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

আজ তাঁহার মৃত্যুশতবার্ষিকীতে আমরা ভারতবর্ষের একাংশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের লেখক টডের প্রতি আমাদিগের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি।

বাঙ্গালায় জাপানী কবি—

জাপানের খ্যাতনামা কবি মিষ্টার নাগুচী এ দেশ পরিভ্রমণে আসিয়াছেন। ইনি কলিকাতায় নানা উপলক্ষে বক্তৃতা দিয়াছেন এবং সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন। সে আজ অনেক দিনের কথা—জাপানী সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ কাকাজু ওকাকুরা বাঙ্গালায় আসিয়া জাপানের সহিত এ দেশের মনীষাগত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার সাহিত্যিক সমাজে তাঁহার আদরের অভাব হয় নাই। ইহার পরে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমন্ত্রিত হইয়া জাপান ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। তথায় তিনি বিশেষ আদর আপ্যায়ন লাভ করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের মনীষীরা যদি ভাবের আদান-প্রদান করেন, তাহাতে যে উপকার হয়, তাহা বিশেষ স্পৃহনীয় ও উল্লেখযোগ্য। ওকাকুরা মহাশয় তাঁহার 'প্রাচীর আদর্শ' নামক মনোজ্ঞ পুস্তকে বুঝাইয়াছেন—এশিয়া এক ও অভিন্ন; গিরিশ্রেণী ও নদনদী এশিয়াকে বিভক্ত করিয়া তাহার ঐক্যই পরিস্ফূট করে। এক দিন ভারতীয় সভ্যতা জাপানে নূতন সভ্যতার ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালার বন্দর হইতে বাঙ্গালী বণিক যেমন পণ্য লইয়া, বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারক তেমনই ভাবের পণ্য লইয়া সুদূর প্রাচীতে গমন করিতেন। অর্দ্ধ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক কাল পূর্ব্বে হেমচন্দ্র জাপানকে "অসভ্য" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। আজ জাপান প্রতীচ্য সভ্যতায় উন্নত জাতিসমূহের সমকক্ষ। আজ জাপানের নিকট ভারতবাসীর শিখিবার অনেক জিনিষ আছে। উভয় দেশের মধ্যে ভাব-বিনিময় ফলে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হইলে যে উভয় দেশেরই উপকার হইবে, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সেই জন্য আমরা এই জাপানী কবির এ দেশে আগমনে প্রীতিলাভ করিয়াছি।

ইরাকে ভারতবাসী—

ইরাকের সরকার বসোরায় ভারতীয় বণিকদিগকে সে দেশ ত্যাগ করিতে আদেশ করিয়াছেন। অথচ ইরাক যে আজ স্বাধীন রাজ্য হইয়াছে, সে ভারতবাসীর সাহায্যে। ইংরাজ সেনাবল যখন মেসোপোটেমিয়া জয় করিতে গমন করে, তখন সে সেনাবলে ভারতবাসীরই আধিক্য ছিল। ইরাকের যুদ্ধক্ষেত্রে অন্যূন ৪০ হাজার ভারতবাসী প্রাণ দিয়াছে এবং আরও ৪০ হাজার আহত হইয়াছিল। বিজয়ী ইংরাজ সেনাপতি জেনারল মড যখন বাগদাদে প্রবেশ করেন, তখন তিনি বাগদাদ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল, ইংরাজ বিজেতৃরূপে তথায় গমন করেন নাই, পরন্তু তুর্কীদিগের অত্যাচার ও অনাচার হইতে ইরাকীদিগের উদ্ধার সাধনের সাধু সঙ্কল্প লইয়াই তথায় গমন করিয়াছেন। সেই ঘোষণাপত্রে ইরাকে তুর্কীদিগের কয় শতাব্দীব্যাপী অত্যাচারের ফল বর্ণিত হইয়াছিল। ইংরাজ যে প্রয়োজনেই কেন ইরাক জয়ে অভিযান করিয়া থাকুন না—ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করা সে অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল—ইংরাজ ইরাক জয় করাতেই যে ইরাক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহা অবশ্য-স্বীকার্য্য। আর ইংরাজের ইরাক বিজয় যে ভারতবাসীর সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইত না, তাহা যুদ্ধের ইতিহাস পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে—বাগদাদ বিজয়ের পরও বসোরায় ভারতীয় শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫ হাজার ছিল। তখন বসোরার হাসপাতালে ১৫ হাজার ও আমারার হাসপাতালে ৭ হাজার ভারতীয়ের স্থান ছিল। তৎকালীন বড়লাট লর্ড হার্ডিং স্পষ্টই স্বীকার

করিয়াছিলেন—তিনি ভারতবর্ষ উজাড় করিয়া সৈনিক ও সমর-সরঞ্জাম ইহাকে পাঠাইয়াছিলেন—India was bled white.

তাহার পর ইরাকে পাঠাইবার জন্য যে ভাবে পঞ্জাবে লোক-সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা আজ আর করিব না। সে বিষয় লইয়া তৎকালে বিলাতের সংবাদপত্রেও তীব্র সমালোচনা হইয়াছিল।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আজ স্বাধীনতালাভ করিয়া ইরাক ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। অবশ্য আমরা জানি, রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার স্থান নাই বলিলেও বলা যায়। কিন্তু সেই জন্যই যখন সন্ধিসর্ত্ত হয়, তখন ইংরাজ যে কেন সন্ধিসর্ত্তে ভারতবাসীর অধিকার নির্দ্দেশ করেন নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়।

এখন জিজ্ঞাস্য—

(১) ইরাকের সরকার ভারতবাসীদিগের মত অন্য বিদেশীদিগকেও বিতাড়িত করিতে উদ্যত হইয়াছেন কি?

(২) ইরাকী সরকার যদি ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে সে দেশে বাণিজ্যাধিকারে বঞ্চিত করেন, তবে ভারতবর্ষ প্রতিশোধে ইরাকীদিগের এ দেশে ব্যবসা করিবার অধিকার-লোপ ও ইরাকের সহিত ব্যবসা বন্ধ করিতে পারিবে কি না?

আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির নিকট যে কুব্যবহার পাইয়া আসিয়াছি, তাহার প্রতিশোধাত্মক আইন করিবার চেষ্টা ভারত সরকার সমর্থন করেন নাই; ব্যবস্থা পরিষদের ইংরাজ সদস্যদিগের ত কথাই নাই। জাতির আত্মসম্মান যদি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, তবে, প্রয়োজনে প্রতিশোধাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য—সে কর্ত্তব্যে অবহেলা কাপুরুষোচিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারত সরকার ও বিলাতের সরকার এ বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, তাহা দেখিবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

দীপনারায়ণ সিংহ—

বিহারে বিখ্যাত কর্ম্মী দীপনারায়ণ সিংহ পরলোকগত হইয়াছেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয় এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ করিয়া তিনি তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর তেজনারায়ণ সিংহ কর্ত্তৃক বিলাতে প্রেরিত হয়েন। তেজনারায়ণ বিহারে কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষাবিস্তারে সহায় হইয়াছিলেন। সেবার ফিরিয়া আসিয়া তিনি পুনরায় বিলাতে গমন করেন এবং ব্যারিষ্টার হইয়া প্রত্যাগমন করেন। তদবধি তিনি রাজনীতিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি বার বার পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন ও কিছুদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে গান্ধীজীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া তিনি অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন। আইন ভঙ্গ আন্দোলনেও তিনি যোগ দিয়াছিলেন ও সেজন্য কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সম্পত্তি ন্যাসরূপে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন—তাহার আয় হইতে কতকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অর্থ-সাহায্য প্রদত্ত হইবে এবং কারীগরী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে। মৃত্যুর অত্যল্পকাল পূর্ব্বে তিনি পৃথিবীর প্রায় ২০টি দেশ ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সোঽহং স্বামী—

গত অগ্রহায়ণ মাসের 'ভারতবর্ষে' সোহং স্বামীর (পরলোকগত শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে শ্রীসমরেন্দ্রকিশোর বসু তাহাতে কয়টি ত্রুটির উল্লেখ করিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন। লেখক জানাইয়াছেন, ১২৬৮ বঙ্গাব্দে শ্যামাকান্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি লক্ষ্ণৌ সহরে "তিব্বতী বাবার" নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। লেখক বলিয়াছেন, প্রতীচীর বিখ্যাত ব্যায়ামবীর স্যাণ্ডো এদেশে আসিবার পূর্ব্বেই শ্যামাকান্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি স্যাণ্ডোকে তাঁহার সহিত বল পরীক্ষার জন্য আহ্বান করেন নাই। শ্যামাকান্ত বাবুর বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থের একান্ত অভাব। আমরা আশা করি, ভবিষ্যতে যিনি এই ব্যায়ামবীর সন্ন্যাসীর জীবনী রচনা করিবেন, তিনি সমরেন্দ্র বাবুর উক্তিগুলির যাথার্থ্য বিচার করিবেন।

এলাহাবাদে সঙ্গীত সম্মিলন—

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন ও এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বার্ষিক অনুষ্ঠান গত ৩০শে অক্টোবর এলাহাবাদে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিম্নলিখিত শিল্পী-গণ সম্মানলাভ করিয়াছেন—

১। কুমারী সান্ত্বনা ভট্টাচার্য্য—নৃত্য

২। কুমারী রেণুকা সাহা—সেতার



সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত বালিকাগণ

হইয়াছে। একশত পঁচিশজন সঙ্গীতজ্ঞ সম্মিলনে এবং প্রায় দুইশত ত্রিশজন প্রতিযোগী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান



শ্রীযুত দেবীপ্রসন্ন ঘোষ

ইনি প্রসিদ্ধ সেতার বাদক এনায়েৎ খাঁর ছাত্রী। গত চারি বৎসরই ইনি এইরূপ প্রতিযোগিতায় শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রশংসা অর্জ্জন করিয়া সম্মানলাভ করিয়াছেন। এবারের সাফল্যের ফলে তিনি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতেও আহুত হইয়াছেন।

৩। কুমারী শোভা ভট্টাচার্য্য – নৃত্য

৪। কুমারী শোভা কুণ্ডু—সেতার

৫। কুমারী সুধা মাথুর—তবলা

৬। কুমারী বিভাসকুমারী দেব বর্ম্মণ – কণ্ঠ-সঙ্গীত

৭। কুমারী বিন্দুবাসিনী রায়—হার্ম্মোনিয়াম

৮। শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন ঘোষ—তবলা

ইনি কলিকাতার পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ছাত্র। এমেচার তবলা বাদকগণের মধ্যে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে নিখিল বঙ্গ প্রতিযোগিতাতেও প্রথম স্থান লাভ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে ইনি ভারতের

অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলা বাদক খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ সাহেবের নিকট শিক্ষা করিতেছেন।

৯। শ্রীযুক্ত সন্তোষকৃষ্ণ বিশ্বাস—তবলা

১০। শ্রীযুক্ত এন, আর, ভট্টাচার্য্য —হার্ম্মোনিয়াম

এলাহাবাদে এক সপ্তাহ কাল এই সম্মিলন ও প্রতিযোগিতা চলিয়াছিল এবং ভারতের সকল প্রদেশের বহু খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় সকল শিল্পীই অদ্ভুত কৌশলাদি প্রদর্শনে সকলকে চমৎকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ভট্টাচার্য্য পরিবারের শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় "চ্যাম্পিয়নসিপ কাপ" প্রাপ্ত হইয়াছেন; তাঁহারা উপর্য্যুপরি তিন বৎসর প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। কলিকাতার সঙ্গীত-কলা-ভবন দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া "রাণার্স আপ কাপ"



চ্যাম্পিয়নসিপ কাপ-বিজয়ী ভট্টাচার্য্য পরিবার

প্রাপ্ত হইয়াছেন। জব্বলপুরের জ্ঞানসদন কলাভবন ও বিশ্বাস পরিবারের শিল্পীরা প্রতিযোগিতায় সমতুল্য বিবেচিত হইয়া তৃতীয় স্থান লাভ করায় "তৃতীয় কাপ" পাইয়াছেন। সঙ্গীত শিক্ষকগণের মধ্যে প্রোফেসার গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্ত্তীর ছাত্রগণই মোটের উপর অধিক সম্মান লাভ করায় তাঁহাকে "শিক্ষকদিগের প্রথম পুরস্কার" দেওয়া হইয়াছে। প্রোঃ এন, আর, যোশী ও প্রোঃ বেণীপ্রসাদ উভয়ের ছাত্রগণ সমান সম্মান লাভ করায় উভয়েই "দ্বিতীয় পুরস্কার" পাইয়াছেন।



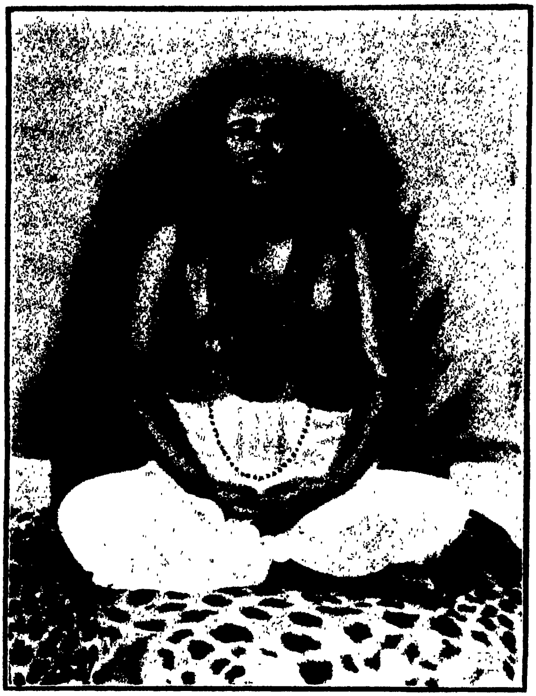
স্বামী নিগমানন্দ পরমহংস—

আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী বিগত ১৩ই অগ্রহায়ণ শুক্রবার কলিকাতাস্থ ৪৫।১ বি, বিডন ষ্ট্রীটস্থ ভবনে ১-১৫ মিনিটের সময় ৫৭ বৎসর বয়সে ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুতবপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে বৈরাগ্যোদয়ে সত্যলাভের আশায় তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন এবং বহু তীর্থস্থান ও দুর্গম পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে সদ্‌গুরুর কৃপায়



কুমারী রেণুকা সাহা

অল্প সময়ে তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ ও প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। নিজ সাধনা সমাপনান্তে সমাধিলাভের পর, জগতের হিতসাধন-কল্পে শ্রীশ্রীজগদ্‌গুরুর সেবা, সনাতন ধর্ম্মের প্রচার, সৎশিক্ষা বিস্তার ও জীবসেবারূপ মহান্ ব্রত



স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব

অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের মনোরম সাধন-ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় তিনি লোকসমাজে আগমন করেন। ব্রহ্মচর্য্য অনুকূল সংযম ও তপস্যার উপর ছাত্র-জীবন যাহাতে সু-গঠিত হইয়া উঠে এই অভিপ্রায়ে তিনি "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নামক পুস্তক লিখেন। পরে তিনি যোগীগুরু, তান্ত্রিকগুরু, জ্ঞানীগুরু, প্রেমিকগুরু নামক আরও কয়েকখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সমাজে যাহাতে আদর্শ গৃহী এবং আদর্শ ত্যাগীর উদ্ভব হয়—সেই শিক্ষাপ্রদানের কেন্দ্রস্থলরূপে আসামের নিভৃত-নির্জ্জন প্রদেশে 'সারস্বত মঠ' নামে একটী মঠ এবং বাঙ্গালার পাঁচ বিভাগে ৬টী আশ্রম ও সুদূর পল্লীতে পল্লীতে একই উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূলে 'সারস্বতসঙ্ঘ' নামে অনেক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বহু জনহিতকর কার্য্যেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার জন্মভূমি কুতবপুর গ্রামে তিনি একটী ইংরাজী বিদ্যালয়, একটী দাতব্য চিকিৎসালয় ও রোগী নিবাস স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম-মঠের আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং ভাবধারা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং স্থায়ী হয়, সেজন্য তাঁহার জীবিতকালেই তিনি ৬জন সন্ন্যাসী এবং ৫জন গৃহী শিষ্যকে লইয়া একটী "ট্রাষ্ট-সভা" গঠন করেন এবং তাঁহাদের উপর আশ্রম-মঠের সমুদয় ভার অর্পণ করেন।

ব্যায়ামবীর শৌর্য্যেন্দ্রকুমার—

বঙ্গবাসী কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান্ শৌর্য্যেন্দ্র দাশগুপ্ত (বয়স ১৮ বৎসর) শরীর চর্চ্চা করিয়া কলিকাতার অনেক পল্লীতেই পরিচিত হইয়াছেন। পেশী-চালনা এবং গলদেশ দ্বারা লৌহদণ্ড বক্র করাই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। শৌর্য্যেন্দ্রকুমার ঢাকা জিলার তেওতাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। বাল্যকাল হইতেই শ্রীমান্ শরীর চর্চ্চার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান্। বর্ত্তমানে ইনি কলিকাতা ক্যানিং হোষ্টেলের



শৌর্য্যেন্দ্রকুমার

ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীযুক্ত তারাচরণ মুখোপাধ্যায়ের অধীনে ব্যায়ামচর্চ্চা করিতেছেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার শরীরের উন্নতি ও ক্রীড়ায় পারদর্শিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মৃত্যু

সমুদ্রগুপ্ত

বাপ মায়ের বড় আদরের মেয়ে শিউলি, তবু তার অসুখ হইয়াছে। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিবেন, অসুখ হওয়াই পৃথিবীর নিয়ম এবং নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। শিউলির বাবা ও মা মনে করে নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, অন্ততঃ থাকা উচিত। কিন্তু সকলের মনে করা-না-করা উপেক্ষা করিয়া যে চরম নির্ম্মম সত্য আমাদের চোখের সামনে দেদীপ্যমান, তাহা এই যে শিউলির অসুখ হইয়াছে।

সত্যই শিউলির অসুখ হইয়াছে। ভয়ানক অসুখ। ডাক্তারেরা ভয় পাইয়াছে, শিউলির বাবা ও মা ভয় পাইয়াছে, আত্মীয় স্বজন ভয় পাইয়াছে, পাড়ার হিতৈষীরা পর্য্যন্ত নিশ্চিন্ত নাই। ব্যাপারটা যে সাধারণ নয় তাহাতে তোমাদের সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

বাড়ীতে বিবাহের উৎসব চলিতেছিল। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ের বিবাহে যেমন উৎসব হয়—অর্থাৎ যে উৎসবে কন্যার পিতার হাসি ও অশ্রু গঙ্গা ও যমুনার মত মিলিয়া যায়। কালিদাস যদি সত্যই বাঙ্গালী হইতেন, আর শকবিজয়ী মহাসম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বাঙ্গালা দেশের অবস্থা যদি আজিকার মত থাকিত, তবে মহাকবির অমর ছন্দে আমরা এই গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের বর্ণনা অবশ্যই পাইতাম।

সন্ধ্যার দিকেই বিবাহ সম্পূর্ণ হইয়াছে। শেষ রাত্রিতে বাড়ীর সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হয়তো বর ও কন্যা জাগিয়া আছে। জাগিয়া থাকাই উচিত, কারণ কিছুদিন পরে তাহাদের সকল কথা ফুরাইয়া যাইবে এবং গভীর রাত্রিতে ঘুমানো ছাড়া আর কিছু করিবার থাকিবে না।

শিউলির পিসীর বিবাহ, চারিটি বোনের মধ্যে দ্বিতীয়টি।

ভোর হইয়াছে। বাড়ীর প্রায় সকলেই জাগিয়াছে। শিউলির বাবা জাগে নাই। পাকের ঘরে ভাঙ্গা একটা তক্তপোষের উপরে ছিন্ন শয্যা, তাহার বুকেই শিউলির বিলাত-ফেরত বাবা শ্রান্তিতে হেলিয়া পড়িয়াছে। সূর্য্যের আলো এবং মানুষের দৃষ্টি তার গায়ে ঠিকরাইয়া পড়িতেছে, চারিদিকে অস্পষ্ট গুঞ্জন ক্রমশঃ সাবলীল কোলাহলে পরিণত হইতেছে, তবু তার ঘুমের শেষ নাই।

হঠাৎ চোখ মেলিয়া নরেন দেখিল, তার ছোট বোন—শিউলির বড় পিসী—তাহাকে ঠেলিতেছে। সে উঠিয়া বসিল। শিউলির জ্বর। শিউলি কেমন করিতেছে।

নরেন লাফাইয়া উঠিল।

শিউলির বাবা নিতান্ত ছেলেমানুষ। আমাদের এই সোনার বাঙ্গালা দেশে জন্মিয়াছে বলিয়াই তাহাকে পিতা-রূপে কল্পনা করা যায়, কারণ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে তাহার সমবয়সীরা জীবন-নাটকের অঙ্কগুলি এত তাড়াতাড়ি শেষ করিতে পারে না। নরেন লেখাপড়া শিখিয়াছে অনেক। সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া নানাদেশে বেড়াইয়া তাহার অভিজ্ঞতাও কম হয় নাই। তবু তার বয়স মাত্র পঁচিশ বৎসর এবং সে নিতান্ত ছেলেমানুষ।

বয়স যার পঁচিশ বৎসর তাহাকে নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিলে তোমরা রাগ করিতে পার, কারণ তোমরা বাঙ্গালা দেশের পাঠক, কারণ তোমরা বিচরণ কর সেই দেশে, যেখানে যৌবন আষাঢ়ের রৌদ্রের মত ক্ষণস্থায়ী এবং অবাস্তব। কিন্তু নরেন সত্যই নিতান্ত ছেলেমানুষ। মেয়ের বাবা হইয়াও তার মুখের দীপ্তি এবং চোখের তীব্রতা অস্তমিত হয় নাই। সে যখন হাসে তখন চৈত্রের ঝড়ের মত চতুর্দ্দিক আন্দোলিত করিয়া লয়। সে যখন পথে চলে তখন পথের বুকে আঘাত লাগে।

নরেন যে নিতান্ত ছেলেমানুষ তার আরও প্রমাণ আছে। সে সাংসারিক হিসাবে পাকা নয়, একথা তার দাদামহাশয় বারবার বলিয়াও তাহাকে সতর্ক করিতে পারেন নাই। বাজারে যাইয়া আজও সে এক পয়সার জিনিষ দেড় পয়সায় কিনিয়া ফেলে। পাশের বাড়ীর মালিকের সঙ্গে পথঘাট লইয়া পাঁচ বৎসর যাবৎ যে মোকদ্দমাটা চলিতেছে তাহার নিগূঢ় তথ্যটুকু নরেন কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না। সংসার সমরে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পাইবার আশা নরেনের একেবারেই নাই।

নরেন এত ছেলেমানুষ যে রমাকে এখনও ভালবাসে। সত্যই ভালবাসে। বিয়ের পর চারিটি বৎসর চলিয়া

গিয়াছে, একটি মেয়ে হইয়াছে, তবু নরেন রমাকে ভালবাসে। নরেন সারাদিন রমাকে দৃষ্টি দ্বারা আহত করে, সারারাত কথার ঢেউ তুলিয়া রমাকে কাঁপাইয়া দেয়। নরেন প্রতি সপ্তাহে রমাকে দুইখানা চিঠি দেয়,—এমন কি তিনখানা পর্য্যন্ত ;—এবং সময় মত উত্তর না পাইলে অভিমান করে। রমার মাথা ধরিলে নরেন চিন্তিত হয় এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া রমার মাথার উত্তাপ আরো বাড়াইয়া দেয়। অতএব নরেন যে ছেলেমানুষ—নিতান্তই অবুঝ ছেলেমানুষ—তাহাতে সন্দেহ নাই।

নরেনের প্রিয়তমা রমা—শিউলির মা রমা—সেও নিতান্ত ছেলেমানুষ। সে পাক করিতে গেলে গৃহস্বামীর তৈল ও লবণ বেশী খরচ হয়। সে এত অসাবধানভাবে চলে যে তার জামাকাপড় অন্যের চেয়ে বেশী লাগে। কাপড় যথেষ্ট পরিমাণে ময়লা না হইতেই সে ধোপাবাড়ী পাঠাইয়া দেয়। অনাবশ্যকভাবে বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের কাছে চিঠি লিখিয়া সে ডাক বিভাগকে অতিরিক্ত সাহায্য করে। বয়স তার উনিশ চলিতেছে, সে দেড় বৎসর আগে মেয়ের মা হইয়াছে, তবু সংসারের পেটেণ্ট ছাপ তার ফুটন্ত দেহ ও মনের বর্ণ-বৈচিত্র্য আহত করিতে পারে নাই।

রমার ক্ষুদ্র জীবনের ইতিহাসে ঘটনা অনেক ঘটিয়াছে। গিরিরাজতনয়ার মত পিতামাতার আদরিণী কন্যা রমা, নাচিয়া খেলিয়া পাদ্রীদের স্কুলে হাজিরা দিয়া সে জীবনের প্রথম পনরটি বৎসর অনায়াসে কাটাইয়া দিয়াছে। তারপর মা মেয়ের চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলেন, সেই চিন্তা বাবার মনে সংক্রামিত হইল এবং দিগ্বিজয়ী বরের সন্ধানে চতুর্দ্দিকে লোক ছুটিল। শ্রাবণের রৌদ্র-দীপ্ত বৃষ্টি ধারার মধ্যে নরেনের করস্পর্শে রমার ছাত্রী জীবনের উপর যবনিকাপাত হইল।

যবনিকার অন্তরালে যে জীবন পড়িয়া রহিল তাহার সুরটুকু কিন্তু প্রেয়সী রমার সারাটি দেহ ও মন আন্দোলিত করিতে লাগিল। বাল্যের বিচিত্র পুলকোচ্ছ্বাস সে ভুলিতে পারিল না। নব-যৌবনা ঝরণার মত চঞ্চলা রমা নিজের নূতন জীবনের স্রোতে আত্মহারা হইল, অবগুণ্ঠিতা বধূর মত সলজ্জভাবে নিজের গতি সঙ্কুচিত করিতে পারিল না। রমার হাসি ও কান্না কালবৈশাখীর দমকা হাওয়ার মতই আকস্মিক, শ্রাবণের বৃষ্টি ধারার মতই তীক্ষ্ণ।

নরেনকে রমা ভালবাসে। অকালে আহরিত মুকুলটির মত কিশোরী রমাকে নরেন পিতামাতার ক্রোড় হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়াছে, কিন্তু রমার মনে হয় যেন নরেনের বুকেই তার জন্মজন্মান্তরের আশ্রয়। রমার প্রেম পদ্মার রুদ্র ঢেউয়ের মত নয়, মেঘনার ঈষৎ শান্ত অথচ নিরন্তর প্রবহমান স্রোতের মত। সে স্রোতে বাধা নাই, তাহার বেগে ময়লা জমিতে পারে না। নরেনকে ভাসাইয়া নিবার জন্য সে স্রোতই যথেষ্ট।

বিবাহের আড়াই বৎসর পরে শিউলি রমার কোলে আসিয়াছে। রমার বধূজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে মাতৃরূপে। কিন্তু মেয়ে যখন মা হইল তখনও তার গতি রুদ্ধ হইল না। রমা আগের মতই তীক্ষ্ণ, আগের মতই হাস্যময়ী। শুধু মাতৃত্বের চাপে ঝরণাটি যেন একটু বেশী প্রশস্ত হইল। রমা মা হইলেও তাহাকে চিনিতে দেরী হয় না।

কিন্তু যে কথা বলিতেছিলাম—শিউলির ভয়ানক অসুখ হইয়াছে। বিয়ের দিন দ্বিপ্রহরে তার জ্বর হইয়াছিল, কিন্তু সেই উৎসব-কোলাহলের নীচে দেড় বৎসরের মেয়ের সামান্য জ্বরের সংবাদ স্বভাবতঃই চাপা পড়িয়া গেল। সেজন্য তোমরা মনে করিও না যে শিউলি অবহেলিতা, অনাদৃতা। শিউলি তার বাপমায়ের এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের আদরিণী, শিউলি সকলের নয়নের মণি। কিন্তু তবু উৎসবের মাদকতা শিউলির অসুখ সকলের দৃষ্টির বাহিরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। হয়তো তাই শিউলির অভিমান হইয়াছে—দেড় বছরের মেয়ে বড় অভিমানিনী—এবং সেই অভিমান তিক্ত রোষে তার সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে।

শিউলির জ্বর বাড়িয়াছে। শিউলির বিকার হইয়াছে। শিউলি বাঁচিবে না।

প্রভাতের আলো তখনও তেমন স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠে নাই। ফুটন্ত সূর্য্যের লজ্জাবনত রশ্মি শ্রাবণের মেঘান্ধকারে একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বৃষ্টি হইতেছে না, কিন্তু বৃষ্টি হইবার প্রায় নিশ্চিত সম্ভাবনাটুকুই তোমার অন্তর নিষ্প্রভ করিবার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি ?

নরেন মায়ের ঘরে আসিয়া দেখিল, মা শিউলিকে কোলে নিয়া বসিয়া আছেন। দেড় বছরের মেয়ে ঠাকুরমার বড় বাধ্য। এত বাধ্য যে মাকে ছাড়িয়া দিনের অধিকাংশ

এবং রাত্রির সমস্তটুকুই ঠাকুরমার কাছে কাটাইয়া দেয়। ঠাকুরমা নিজে পাঁচটি মেয়ের মা, অভাব নিপীড়িত সংসারে নূতন মেয়ের আগমনে তাঁহার বিশেষ প্রীত হইবার কথা নয়। তবু কি জানি কেন এই হাস্যময়ী নাত্নীটি বিনা আয়াসেই তাঁহার কোল ও মন জুড়িয়া বসিয়াছিল।

মা বলিলেন, দেখ নরেন, কাল দুপুরে ওর জ্বর হ'য়েছে। খুব বেশী জ্বর নয় ব'লে আমরা কেউ তেমন গ্রাহ্য করি নি, কিন্তু আজ শেষ রাত থেকে যেন কেমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে। তুই ডাক্তার ডাকাবার বন্দোবস্ত কর।

পঁচিশ বৎসর বয়সের মধ্যে নরেন মৃত্যুর দৃশ্য দেখে নাই এমন নয়, কিন্তু মৃত্যুর যথার্থ তীব্রতা সে যেন কখনও পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। মৃত্যু যে কত নির্ম্মম, মৃত্যুর কাছে মানুষ যে কত অসহায় তাহা নরেন আজ বুঝিতে পারিল। জ্বর হইলেই মানুষ বাঁচে না এমন নয় এবং শিউলির শুধু জ্বরই হইয়াছে—তবু অকস্মাৎ বিষাক্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস নরেনের সমস্ত চৈতন্য তিক্ত ও ম্লান করিয়া দিল।

শিউলি কি সত্যই সব ছাড়িয়া যাইবে?

গ্রামের বড় ডাক্তার, কর্ত্তব্যবোধের চেয়ে মর্য্যাদাবোধ তাঁহার অনেক বেশী তীব্র। সাড়ে ছয়টায় তাঁহাকে খবর দেওয়া হইল, কিন্তু সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন মিলিল না। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে সরকারী মেডিক্যাল স্কুলের নিম্নতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি গ্রামের প্রাণদাতার দায়িত্বপূর্ণ পদে নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তিনি সে যুগের লোক যখন মাতৃভাষায় মেডিক্যাল স্কুলে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা চলিতে পারিত। নিজের প্রাচীনত্বের গৌরবে ডাক্তার বাবু মনে করেন যে রোগীর সুবিধার প্রতি দৃষ্টিপাত করা তাঁহার পক্ষে নিতান্তই অনাবশ্যক। তাঁহার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় কালযাপন করা যে মৃত্যুপথযাত্রীর একমাত্র কর্ত্তব্য সে বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এদিকে নরেনের চোখের উপরে তার বড় আদরের শিউলি জ্বরের তাপে পুড়িয়া যাইতেছে। শিউলির ঈষৎ গৌর বর্ণ ক্রমশঃ পাণ্ডুর হইতেছে, তার দীপ্ত মুখের রক্তিম আভা ধীরে ধীরে নীল হইয়া উঠিতেছে, তার বড় বড় উজ্জ্বল চোখ দুইটি অসহ্য ব্যথার ভারে বার বার মুদ্রিত হইতেছে।

ডাক্তার আসিলেন, কিন্তু গ্রামের বড় ডাক্তার নয়, পাশকরা হইলেও নিতান্ত ছোকরা এক ডাক্তার। তাঁহার যত্নে সহস্র রোগীর স্বর্গলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে কিনা বলা যায় না, কিন্তু গ্রামের লোক বোধহয় তাঁহাকে এখনও নিতান্ত নাবালক বলিয়াই মনে করে।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই থামিব মনে করিয়াছিলাম, কারণ দেড় বছরের একটি মেয়ের মৃত্যুকাহিনী তোমাদের তৃপ্তিদায়ক হইবে না। কিন্তু মৃত্যু তো কেবলমাত্র শিউলির নয়, মৃত্যু শিউলির রোগশয্যার পাশে যাহারা দিনরাত বসিয়া থাকে তাহাদেরও। শিউলি মরিবার ভয় দেখাইয়া জানাইয়া দিল যে তোমরাও মরিবে এবং হয়তো ইতিমধ্যেই মরিয়াছ।

বাহিরের পাতলা অন্ধকার ভেদ করিয়া বৃষ্টি ও বাতাসের দাপাদাপি চলিতেছে। দক্ষিণের ছোট ঘরে ডাক্তার শুইয়া আছেন, কিন্তু বারবার ডাক পড়িতেছে বলিয়া ঘুমাইতে পারিতেছেন না। কয়েকমাস আগে ডাক্তার বাবুর একটি ছোট মেয়ে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রয়াস ব্যর্থ করিয়াছিল। পরিশ্রান্ত বিনিদ্র ডাক্তারের মুদ্রিত চোখের আশে পাশে সেই মেয়েটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

ডাক্তারকে ডাকিয়া দিয়া নরেন ধীরে ধীরে খালের পারে যাইয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ বর্ষা, বাড়ীর দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক ঘেষিয়া যে খালটি বহিয়া যাইতেছে তাহা নববিবাহিতা কিশোরীর মত যৌবনে ভরপুর এবং চাঞ্চল্যে উজ্জ্বল। শীতের সময় এবং গ্রীষ্মকালে খালটি শুকাইয়া যায়, তখন তাহার আশে পাশে জনসমাগমের চিহ্নমাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না এবং বেত-কাঁটার বনে ঝিল্লীর কলরব ছাড়া আর কোন শব্দ শোনা যায় না। বর্ষার আগমনীর সাড়া পাইলে নিস্তব্ধতার এই গুমোট অকস্মাৎ উঠিয়া যায় এবং নৌকার গতি শব্দের সহিত পথিকের কোলাহল এবং মাঝির সঙ্গীতের অপূর্ব্ব সম্মিলন হয়।

গভীর রাত্রি, খালে নৌকার চলাচল বন্ধ, বৃষ্টি ও বাতাসের দাপাদাপিতে জলের শব্দ তীক্ষ্ণতর হইয়াছে। এ যেন মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তিম ক্রন্দন। নরেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল আর তিনটি মাস—হাঁ—মাত্র নব্বইটি দিন ও রাত্রি—পরে খালটির মৃত্যু হইবে। তখন কোথায় থাকিবে তার দেহের স্তরে স্তরে উচ্ছলতার এই সমারোহ, কোথায় থাকিবে এই কুলপ্লাবী উদ্দাম প্রবৃত্তি!

বর্ষার বৃষ্টির এমন একটা আকর্ষণ আছে যাহার কাছে তুমি আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে। ডাক্তারের ছুরির চেয়েও তীক্ষ্ণ ঐ ফোঁটাগুলি তোমার চোখে বিঁধিবে, কাঁচের মত স্বচ্ছ জলের ধারা পৃথিবীর এবং আকাশের মর্ম্মকথা তোমার কাছে উদ্‌ঘাটিত করিবে।

একটা আমগাছের নীচে নরেন দাঁড়াইয়া আছে। পশ্চিমের ঘরে শিউলির বিছানার পাশে রমা শ্রান্তিতে ঢুলিয়া পড়িতেছে। নরেন ও রমার মধ্যে ব্যবধান অনেকখানি। জিব্রাল্টার পার হইয়া আটলান্টিকের ঘনকৃষ্ণ বারিরাশি ভেদ করিয়া পি. এণ্ড. ও. কোম্পানীর বিরাট জাহাজ নরেনকে বুকে করিয়া চলিতেছে, আর ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি ছোট সহরের একখানা বাড়ীতে রমা ঘুমাইয়া আছে। না, নরেন আরও অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। রমার ছায়া নরেনের মন হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারের বুকে মিলাইয়া যাইতেছে।

গরীবের ঘরের বউ রমা, সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকে। মেয়ে যখন তখন কোলে উঠিতে চায়, তার বড় বড় চোখ দুইটি জলভারে কাঁপিতে থাকে, সে আবেদন রমা ঠেলিতে পারে না। বই পড়িবার অভ্যাসটুকু যাইয়াও যায় না, দুপুরে বাড়ীখানা ঘুমের ঘোরে ঢলিয়া পড়িলে রমা তিন বৎসর আগেকার মাসিকপত্র নাড়াচাড়া করে। বাবার চিঠি সময়মত না পাইলে মন কেমন করে। রমার দেহে ও মনে ব্যস্ততার অভাব নাই।

রমা বলে, আমার চিঠি লেখার অভ্যাস নেই মোটেই, বেশী কথা আমি লিখ্‌তে পারি না, আমার ছোট চিঠি পেলে তুমি রাগ ক'রো না যেন। তবু নরেন রাগ করে, বলে, অমন শ্রীচরণেষু মার্কা চিঠি না লিখলেই পার। আরো অনেক কিছু সে বলিতে যায়, রমা হঠাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু মনের কোণে যেন একটু কালো দাগ শেষ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। সংসারের ডাকে রমার হরিণ-চোখ চারিদিকে ছুটিয়া যায়, নরেন সেই মুগ্ধ দৃষ্টি একাগ্র করিয়া রাখিতে পারে না। বিশাল বিশ্বের অধিবাসিনী রমা, সহস্র ব্রত উদ্‌যাপন করিবার ভার তাহার উপর। সমুদয় মঙ্গল ও অমঙ্গলের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া সূর্য্যমুখীর মত সে নিঃশেষে নিজকে নিবেদন করিবে কিরূপে?

নরেন ভাবে, কেন এমন হইল? যে দূরে ছিল সে কাছে আসিল, যে অপরিচিতা ছিল সে হইল কণ্ঠলগ্না—কবির কাব্যে এ রহস্যের বিশ্লেষণ নাই। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পরে এ সূর্য্যাস্ত কেন আসিতেছে? অন্তর আজও আলোকিত, আকাশ আজও দীপ্ত, পৃথিবী আজও রঙের সমুদ্রে সদ্যস্নাতা,—কিন্তু তবু এই আলো, এই দীপ্তি, এই রঙ্‌ অস্তায়মান মাধুর্য্যের লক্ষণ।

নিজের দিকে তাকাইয়া নরেন দেখিল, অতীত শুধু আসন্ন মৃত্যুর মত ঝল্‌কাইয়া উঠিতেছে মাত্র। তার জীবনে অতীত কেবল রূপকথার মোহময় স্মৃতি, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। যুগযুগান্তর পূর্ব্বে নরেন নামে একটি প্রিয়দর্শন বালক বই বগলে নিয়া পাঠশালায় যাইত। বইখানি জলছবির ছাপে ভরা। পণ্ডিত মহাশয়ের ঘুমন্ত দৃষ্টির অন্তরালে পড়ুয়া পুকুরটির দিকে এবং পুকুর পাড়ে দণ্ডায়মান গাছগুলির দিকে চাহিয়া থাকিত। সন্ধ্যার সময় গাছগুলি ঠাকুরমার সুরের সাথে সুর মিলাইয়া রাজপুত্র ও রাজকন্যার রোমান্স বিবৃত করিত। গভীর রাত্রে বৃষ্টির ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ ঘুমের পর্দ্দা ভেদ করিয়া মনটি জলসিঞ্চিত করিয়া দিত।

তারপর সেই প্রিয়দর্শন বালকটি গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিল। সহরের সীমারেখায় নদী, সেই নদী সমুদ্রে মিশিয়াছে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর জল। জলের রঙ্‌ নীল, আকাশের রঙও নীল। নূতন জামায় ধোপার দেওয়া নীলের দাগ। দেখিয়া মনে হয় যেন আমার মনটিও নীল হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রথচক্র ঘর্ঘর রবে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাতে অগণিত ভক্ত। নরেনের ভক্তির অভাব নাই, তবু সেই ঘর্ঘররব মথিত করিয়া একটি কথা তার মনে বারবার সাড়া দেয়—"Myself and what is mine, to you and yours is now converted." স্বর্ণমানের আবশ্যকতা আলোচনা করিতে করিতে নরেন ভাবে,—"Myself and what is mine···"। রমার 'বিবাহ-ধূমারুণ-লোচনশ্রী' পান করিতে করিতে নরেন ভাবে, —"Myself and what is mine···"

চারি বৎসর পরের কথা। ইতিহাসের গবেষণায় ব্যাপৃত নরেন এখন বলে যে সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাসে বত্রাওনের

নবাবের নামোল্লেখ নাই এবং বজ্রাগুন নবাব-তনয়ার প্রেমকাহিনী নিতান্তই কবিকল্পনা প্রসূত। পাথুরে প্রমাণের বাহিরে সত্যের অস্তিত্ব নাই। শিল্পের সৌন্দর্য্য আর মন দিয়া অনুভব করা যায় না, ঘষিয়া মাজিয়া বিচার করিতে হয়। সন্ধ্যায় মাঠে না বেড়াইয়া চায়ের মজলিসে যোগ দিতে ইচ্ছা হয়। ইডেন গার্ডেনের কৃত্রিম জলধারার পাশে বসিয়া নরেন ফোর্টের দিকে চাহিয়া থাকে এবং অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সমস্যা তার মন আলোড়িত করে। দুই বেলা ছাত্র পড়াইয়া নরেন লাইফ্ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দেয়, মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ক্যাস্ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে। চাকুরীর অভাবে সংসার আর চলে না। এত দেনা হইয়াছে যে মাসিক পঁচিশ ত্রিশ টাকা সুদ জমিতেছে। বোন আর একটি বড় হইয়াছে। পূজার সময় বাড়ীতে না গিয়া কলিকাতায় থাকিলে কয় টাকা বাঁচে, নরেন স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহার হিসাব করে।

নরেন বলে, রমা, তোমায় দুঃখের মাঝে টেনে আনা আমার মোটেই উচিত হয় নি। কত অভাব আমাদের…। রমা মৃদুস্বরে অনুযোগ দেয়। যে মাধুর্য্য দুঃখকে অতিক্রম করে তাহার একটি বুদ্‌বুদ্ উঠিতে না উঠিতেই মিলাইয়া যায়।

তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হইবে, অথচ রমার চিঠির জবাব আজ না দিলেই নয়। প্যাডখানা টানিয়া লইয়া নরেন লিখিল,—তোমার চিঠি পাইয়াছি। তুমি বড় চিঠি না দিলে আমিও আর বড় চিঠি দিব না। ইতি—তোমারি, ইত্যাদি। নিজের কাছেও যেন নরেন স্বীকার করিল না যে আজ বড় চিঠি না লিখিবার কারণ রমার কৃপণতা নয়, নিজের সময়াভাব। এই চিঠি পাইয়া রমা বড় রাগ করিল। রমা আজও রাগ করে। নরেন আশ্বস্ত হইল।

ততক্ষণে বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।

নরেন ভাবিতেছে—শিউলির বিবাহ হইয়াছে। শিউলি এখন ছেলের মা। শিউলী লিখিয়াছে—বাবা, তোমার অসুখের খবর শুনিয়া বড় চিন্তিত আছি। সংসার ফেলিয়া আমার তো কোথাও পা বাড়াইবার উপায় নাই। তুমি রোজ চিঠি দিতে ভুলিও না। যে শিউলি অসহায় হাস্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছোট ছোট তুলার মত নরম হাত দুইটি বাড়াইয়া দিত, সে আজ তাহার নিজের সংসার ফেলিয়া পা বাড়াইতে পারিবে না।

হঠাৎ মায়ের ডাক শোনা গেল, নরেন, এদিকে আয় তো একবার।

শিউলি মরিয়াছে, শিউলির মা মরিয়াছে, শিউলির বাবা মরিয়াছে।

যে জগতে কেহই বাঁচিয়া নাই সেখানে নরেনের ছায়া-মূর্ত্তি ফিরিয়া দাঁড়াইল।

খেয়ালী

শ্রীচিত্তরঞ্জন রায় চৌধুরী

একদা নদী কূলে
বসিয়া তরুমূলে
হেরিনু বারিরাশি।

গরবে পাল তুলে
কত না হেলে দুলে
চলেচে তরী ভাসি॥

ও পাড়ে তরু সারি
দেখিনু ফাঁকে তারি
তীরে ঐ কুঁড়েখানি।

কবে যে ঝড়ো বায়ু
কুটীরে ক্ষীণ আয়ু
করেচে নাহি জানি॥

বসিয়া নাতি দূরে
গাহিচে মৃদু সুরে
দুখিনী এক নারী
গাইচে কি যে গান
চাইচে কিবা দান
বুঝিতে নাহি পারি

* *

খেয়ালী আঁখি লোরে
গাঁথিচে প্রেম ডোরে
বসিয়া প্রেম মালা।
অভাগী নাহি জানে
প্রেমে যে কত হানে
জানে সে শুধু "জ্বালা"



কোয়াড্রাঙ্গুলার ক্রিকেট ঃ

বোম্বাই সহরে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্রিকেট কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় মুস্লিমদল এবারও বিজয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। প্রথম খেলায় মুস্লিমদল ইউরোপীয়ানদের এক ইনিংস ও ১০৬ রানে পরাজিত করেন। প্রথম ইনিংসে মোট রান হয় ৩৫৭, ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি ১৪৮ (নট্ আউট্) ও কাদ্রি ৮৪ রান করেন। ইউরোপীয়দের প্রথম ইনিংস মাত্র ১৪৮ রানে শেষ হলে, তাঁরা ফলো-অন্ করতে বাধ্য হলেন। সর্ব্বোচ্চ রান ৫৩ হপ্কিন্স করেন, বাঙ্গলার স্কিনার ২, লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন) ১৯, গুর্লে ০ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে, মোট রান ১০৩ হয়; তন্মধ্যে স্কিনার ৫, লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন) ১৭, গুর্লে ০ রান করেন।



ওয়াজির আলি (ক্যাপ্টেন)

দ্বিতীয় খেলা হয় হিন্দুদের সঙ্গে পার্শীদের। প্রথম ইনিংসে, হিন্দুরা মোট ২৮১ রান করেন। ক্যাপ্টেন সি কে নাইডু ১২৯ রান, মার্চ্চেণ্ট ৭০, সি এস নাইডু ৩৪, অমরনাথ ২৫। বাঙ্গলার কার্ত্তিক বোস ও এস ব্যানার্জ্জি কোয়াড্রাঙ্গুলার প্রতিযোগিতায় খেলতে মনোনীত হন, কিন্তু তাঁরা কেহই বাঙ্গলার মান রাখতে পারেন নি। কে বোস শূন্য করেই পালসেটিয়ার বলে ভাবিজদারের হাতে আটকে গেলেন। ব্যানার্জ্জি ৭ রান করেই কাপাদিয়া দ্বারা ষ্ট্যাম্পড হলেন। ব্যানার্জ্জি একটা উইকেটও নিতে পারেন নি।



সি কে নাইডু

পার্শীরা প্রথম ইনিংসে মোট ২২৪ রান করেন। তন্মধ্যে পালিয়া ৪৩, খোটে ও পালসেটিয়া প্রত্যেকে ৩৮, কন্ট্রাক্টর ৩৭। দ্বিতীয় ইনিংসে, হিন্দুরা ৭ উইকেটে মোট ২৭২ রান করেন। আহত অবস্থায় মার্চ্চেণ্ট বাম হাতে ব্যাট করে ৩০ (নট্ আউট্) থাকেন। বোস ১৫ রান করে রান-আউট্ হয়ে যান, লালসিং ১০৭ (নট্ আউট্), অমরনাথ ৬৫, সি কে নাইডু ২২, ব্যানার্জ্জি ১০।



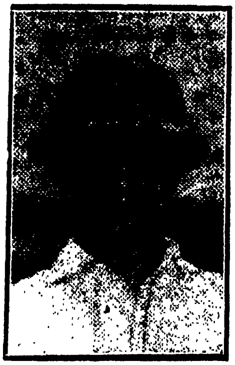
সি লংফিল্ড (ক্যাপ্টেন)
ইউরোপীয়ান দল

দ্বিতীয় ইনিংসে, পার্শীরা ৪ উইকেটে ১১০ রান করলে সময় হয়ে যাওয়াতে খেলাটি ড্র হলেও প্রথম ইনিংসের ফলাফলের উপরে হিন্দুরা ফাইনালে মুস্লিমদের সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা অর্জ্জন করেন।

ফাইনাল খেলায় প্রথম ইনিংসে

মুস্লিমরা ৮ উইকেটে মোট ২৯১ রান করে। সি এস নাইডু একাই ৬জনকে আউট করেন। অমরনাথ ও মণিলাল এক এক উইকেট পান। মহম্মদ হুসেন ৭২, ওয়াজির আলি (ক্যাপ্টেন) ৬৪, বাপোরিয়া ৬৪।

হিন্দুরা প্রথম ইনিংসে মোট ২৮৮ রান করতে সক্ষম



কে বোস (বাঙ্গলার)
হিন্দু দল



ডি ডি হিন্দেলকার
হিন্দু দল

হন। সি কে নাইডু ১০১, সি এস নাইডু ২৭, চম্পক মেটা ২৫, অমরনাথ ২৩, লালসিং ২৩। নিসার, মুবারক আলি ও আমীর ইলাহি প্রত্যেকে ৩টি উইকেট ও নাজির আলি এক উইকেট নেন।

মুস্লিমরা দ্বিতীয় ইনিংসে (৭ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড) ৩৫৭ রান করেন। ওয়াজির আলি ১০৮, নাজির আলি (নট্ আউট্) ১০০, বাপোরিয়া ৪৩, মুস্তাক আলি ৩৯, নাখুদা ৩৮।

হিন্দুরা দ্বিতীয় ইনিংসে মোট ১৪৫ রান করে সকলে আউট হয়ে গেলে মুস্লিমরা ২২১ রানে জয়ী হয়ে এবারও চ্যাম্পিয়ান রয়ে গেলেন। সি কে নাইডু ৫৩, হিন্দেলকার ৪১, মার্চেণ্ট আহত থাকায় ফাইনাল খেলায় যোগ দিতে পারেন নি। অমরনাথ অতি আনাড়ির মতো খেলেছেন। তিনি ওয়াজির আলির 'ফুল পিচ' বল পিটাতে গিয়ে তাঁর হাতেই ধরা পড়েন। চা পানের পরে মাত্র ১৬ রানে হিন্দুদের ৫টি উইকেট যায়।

সি কে নাইডুও অসাবধনতা বশতঃ জোর পিটাতে গিয়ে আউট হয়েছেন। হিন্দুরা বেলা ১২-১০এ ব্যাট করতে নামেন। তখন মাত্র চার ঘণ্টা সময় ছিল নাইডুর পঞ্চাশ রান পূর্ণ হবার পরে আড়াই ঘণ্টা সময় ছিল, কিন্তু সি কে নাইডু, অমরনাথ, লালসিং ও জয়ের মতো কাই ব্যাটস্‌ম্যানদের নিয়েও রান সংখ্যা তুলতে না পারা আশ্চর্য্যের বিষয়। খেলা শেষ হতে মাত্র আধ ঘণ্টা ছিল, হাতে পাঁচটা উইকেট তখনও খেলাটি বাকী অন্ততঃ ড্র হওয়া খুব উচিত ছিল। দিবাকর এল বি ডবলিউ হয়ে যেতেই, খেলোয়াড়রা স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ষ্টাম্প তুলে নিলে প্যাভিলনের দিকে যেতে লাগলে দর্শকরাও মাঠে নেমে পড়ে তাঁদের অনুসরণ করলে। কিন্তু সি এস নাইডুর খেলা তখনো বাকী এবং ক্যাপ্টেন নাইডুও ঘোষণা করেন নি যে তাঁদের সকল খেলোয়াড়রা আউট হয়েছেন। সি এস নাইডু প্রবল জ্বর সত্ত্বেও ব্যাট করতে আসছিলেন। সময় তখন মাত্র দশ মিনিট ছিল। গোডাম্বে ও সি এস নাইডুর একজনকে ঐ সময়ের মধ্যে আউট না করতে পারলে খেলা ড্র হয়ে যাবে। মাঠ থেকে জনতা পরিষ্কার করতে সময় লাগবে দেখে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর সি এস নাইডুকে আর মাঠে না যেতে দিয়ে মুস্লিমদের চলে আসতে ক্যাপ্টেন নাইডু বললেন। মুস্লিমরা ২২১ রানে জয়ী হয়ে গেলেন।



জয়



ভাজিবদার

আম্পায়রিং মোটেই ভাল হয় নি। প্রথম ইনিংসে লালসিংয়ের ব্যাট বলে না ঠেকতেও তাঁকে কট্ আউট্ ঘোষণা করা এবং দ্বিতীয় ইনিংসে হিন্দেল-কারের হাতে 'কট্' হয়ে বাপোরিয়া চলে যাওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আউট না দেওয়া সত্যই বিস্ময়কর।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ঃ

বোম্বাই সহরে ৪ঠা ডিসেম্বর হতে পাতিয়ালা মহারাজার অষ্ট্রেলিয়াদলের সঙ্গে পাতিয়ালা যুবরাজের ভারতীয় দলে চারদিন ব্যাপী ভারতে প্রথম ম্যাচ খেলা হয়।

আকাশ বেশ পরিষ্কার, প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শক সমবেত ও স্থানাভাবে অনেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছে। যুবরাজ টস্ জিতে, ওয়াজির আলি ও ন্যাভলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। ন্যাভল হেন্‌ড্রির দ্বিতীয় বল 'কাট্' করতে ক্যাচ তুললে অক্সেনহামের হাতে ধরা পড়ে গেলেন।



রাইডার

অমরনাথ যোগ দিলেন, কিন্তু ওয়াজির আলি লেদারের বলে ক্যাচ তুলে হেন্‌ড্রির হাতে কট্ হলেন। দু'টি উইকেট মাত্র ৮ রানে গেলো। সি কে নাইডু এসে অমরনাথের সঙ্গে যোগ দিলেন। অমরনাথ লেদারের বলে চারটি পর পর বাউণ্ডারী করলে রাইডার উভয় বোলারই পরিবর্ত্তন করে আইরন্‌মঙ্গার ও অক্সেন্‌হামকে বল দিতে দিলেন। সি কে নাইডু আইরন্‌মঙ্গারের বল বাউণ্ডারীতে প্রথম পাঠালেন এবং পরে আরো দু'টি বাউণ্ডারী করলেন। তাঁর খেলা দেখে দর্শকরা উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। নাইডু একটা ওভার বাউণ্ডারী করলেন কিন্তু পরের বলটি জোরে মারতে গিয়ে বোল্‌ড হয়ে গেলেন।

অমরনাথ অক্সেনহামের বল 'কাট' মেরে এলিসের হাতে আটকে গেলেন। অমরনাথের মোট রান ৩৩এর মধ্যে ৭টা বাউণ্ডারী ছিল। পালিয়া এসে কোন রান না করেই গেলেন। ক্যাপ্‌টেন যুবরাজ এলেন ও পরের ওভারে অক্সেনহামের প্রথম বলটিই ওভার বাউণ্ডারী করলেন; ছয়, ছয়, ও চার করলেন পর পর চারটি বলে। মেয়ার বল দিতে এলেন। যুবরাজ তাঁর বলেও ছয় ও চার করলেন। পরে মেয়ারের বলেই বোল্‌ড হয়ে গেলেন। মোট ৪০ রানের মধ্যে যুবরাজ ৫টা ছয় ও ১টা চার করেন। লালসিং যোগ দিলেন। সি কে নাইডু লেদারের বলে ৩৬ রান



যুবরাজ পাতিয়ালা

করে গেলেন। অমর সিং এলেন ও মেয়ারের প্রথম বলটিই ওভার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন; পরের বলে দুই করে তৃতীয় বলে আউট হয়ে গেলেন।

বিশ্রামের পরে আধঘণ্টায় ভারতীয়দের খেলা শেষ হলো। মোবারক আলি কোন রান না করে কট আউট হলেন। আমীর ইলাহী মেয়ারের বলে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়ে ১০ রান করলেন, তার মধ্যে ১টা ছয় ছিল। তারপরে তিনি আউট হলে, নিসার এসে কিছু না করেই আউট হয়ে গেলে ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১৬৩ রানে।

অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলতে নামলেন ওয়েণ্ডেলবিল ও হেনড্রি। নিসারের বলে হেনড্রি এক রানও না করে

গেলেন আর অমর সিংএর তৃতীয় ওভারে ওয়েণ্ডেলবিল ৬ রানে আউট হলেন। মরিসবী ও রাইডারের সহযোগিতায় খেলার পরিবর্ত্তন হলো। মরিসবী অমর সিংএর বলে বাউণ্ডারী ও পরের ওভারে নিসারের বলে বাউণ্ডারী করলেন, রান সংখ্যা পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেলো, পঞ্চাশ মিনিটে। পালিয়া ক্যাচ ধরতে না পারায় রাইডার বেঁচে গেলেন।

চা পানের পর, মরিসবী ও রাইডার পিটিয়ে না খেলে খুব সতর্কতার সঙ্গে সোজা বল ছাড়া অন্য বল আটকে খেলতে লাগলেন। নিসার, মোবারক আলি, অমর সিং, আমীর ইলাহী, অমরনাথ, পালিয়া প্রভৃতিকে বল করতে দিয়েও যুবরাজ উইকেট নিতে পারলেন না। দিনের শেষে দুজনেই নট আউট রয়ে গেলো—দুই উইকেটে স্কোর ১২৪, রাইডার ৫৯, মরিসবী ৫৪।

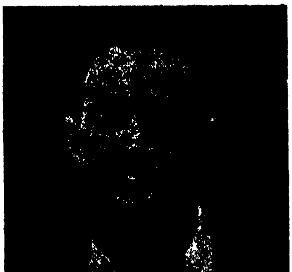


অমরনাথ



লাল সিং

দ্বিতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হলো। রাইডার ও মরিসবী ব্যাট করতে নামলেন। গতকল্য স্থাভাল মরিসবীর দুটি ক্যাচ ধরতে ও রাইডারকে অতি সহজ ষ্ট্যাম্প করতে পারেন নি, রাইডার তখন মাত্র ১২ রান করেছিলেন। আজকের খেলাতেও কম করে সাতটি ক্যাচ মাটিতে পড়ে গেছে। স্থাভাল নিসারের বলে মরিসবীকে ছেড়ে দিলেন, অমরনাথ অমরসিংয়ের বলে লাভকে লুফতে পারলেন না; একটু পরে অমরসিং নিসারের বলে শ্লিপে অক্সেনহামের ক্যাচ ফসকে গেলেন। স্থাভাল আবার লাভকে অমরসিংহের বলে ছেড়ে দিলেন। নিসার ও মুস্তাক আলিও দু'টি ক্যাচ ফেলে দিলেন। এত খারাপ ফিল্ডিং সত্বেও ভারতীয় বোলাররা অষ্ট্রেলিয়াদের মোট ২৬৮ রানে আউট করতে পেরেছেন বলে তাঁরা প্রশংসা পেতে পারেন।



নাজির আলি

রাইডার খুব কৃতিত্বের সঙ্গে ১০৪ রান করে নিসারের বলে স্থাভালের হাতে কট হলেন। মরীসবী ৬৭ করে আউট হলেন।

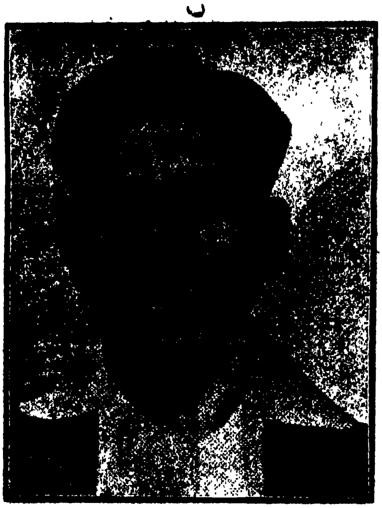
নিসার ৭২ রান দিয়ে ৬ উইকেট, অমরসিং ৬৪ রানে আর আমীর ইলাহী ৫৭ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন।

অমরসিং একহাতে চমৎকার ক্যাচ ধরে লেদারকে আউট করলে ও নিসার আইরণমঙ্গারের উইকেট উড়িয়ে দিলে অষ্ট্রেলিয়াদের প্রথম ইনিংস ২৬৮ রানে ২৯০ মিনিট খেলার পরে শেষ হলো।

ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো ওয়াজির আলি ও পালিয়াকে দিয়ে। ওয়াজির আলি ৪ রান করেই আউট হলে অমরনাথ যোগ দিলেন। পালিয়া ১৪ করে এল বি ডবলিউ হলো। সি কে নাইডু এসে ১৬ রান ও অমরনাথ ৪১ মোট স্কোর ৮২ দুই উইকেটে হলে, সেদিনের মতো খেলা শেষ হলো।

তৃতীয় দিনেই খেলা সমাপ্ত হ'লো। অমরনাথ ও সি কে নাইডু ব্যাট করতে নামলেন। অমরনাথ আইরনমঙ্গারের বল জোর মারতে গিয়ে ক্যাচ তুলতে হেন্ড্রি ছুটে গিয়ে ধরলেন। ৪১ রানে আউট হলেন তার মধ্যে ৪টি বাউণ্ডারী ও বাকীগুলি প্লেসিংএর জন্য হয়েছিল। লালসিং যোগ দিলেন। সি কে নাইডু লেদারের বল আগিয়ে মারতে গিয়ে এলবি

ডব্লিউ হলেন। মোট ৯৯ রানে ৪টি উইকেট গেলো। যুবরাজ এলেন ও আইরণমঙ্গারের বল বাউণ্ডারী করলেন।



এম এম নাইডু (মহারাষ্ট্র)

অষ্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি পুণাতে করেছেন। বোলারদের সকল কৌশল ব্যর্থ করে উপর্য্যুপরি 'ছয়ের' বাড়ী মেরেছেন। এম এম সির বিপক্ষে অমরনাথ প্রথম সেঞ্চুরি করে ক্রিকেট জগতে বিখ্যাত হয়েছিলেন, কিন্তু পরে আর একটাও সেঞ্চুরি করতে পারেন নি। আশা করি, নাইডু পরবর্ত্তী নিখিল ভারত দলে মনোনীত হবেন এবং কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হবেন

পরের বলটি ওভার বাউণ্ডারী করতে গিয়ে ক্যাচ তুললে মরিসবী ছুটে গিয়ে লুফ্লেন। ক্যাচটি খুব সুন্দর ধরা



ওয়েণ্ডেলবিল (অষ্ট্রেলিয়া)



ব্রায়াণ্ট (অষ্ট্রেলিয়া) এ পর্য্যন্ত ইনিই সর্ব্বোচ্চ স্কোর ১৫৫ করেছেন

হয়েছিল, রাইডার তাঁর পিঠ চাপড়ে দিলেন। অমরসিং এলেন, এবং খুব ধীরভাবে খেলতে লাগলেন। রান সংখ্যা খুব কম হতে লাগলো। ২টি বল বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। অক্সেনহামের একটি বল 'মিস্' করলে দেখা গেলো যে 'বেল' পড়ে গেছে। আউট হয়েছেন ভেবে অমরসিং চলে যেতে, দর্শকরা 'নট্-আউট' বলে চীৎকার করে উঠলো। আম্পায়ার বাপু অমর সিংকে আউট দিলেন না, কারণ বল মিস্ হবার পরে তিনি বল দেখতে পান নি। লেগ আম্পায়ার নির্ব্বাক রইলেন যে হেতু তাঁকে কোন আপীল করা হয় নি। ৩৩ রান করে আইরনমঙ্গারের একটি বল এগিয়ে মারতে গিয়ে অমরসিং এলিসের হাতে ষ্টাম্পড আউট হয়ে গেলেন। তিনি একটি ওভার বাউণ্ডারী ও ৪টি বাউণ্ডারী করেছিলেন। নাভাল এলেন ও গেলেন; লাল সিং ১০ রান করে গেলেন, আমীর ইলাহী এলেন ও দু রানে গেলেন, মোবারক আলি ১২ রান করে নট আউট থেকে গেলেন, নিসার আউট হলে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস পুনরায় ১৬৩ রানেই সমাপ্ত হলো।



মরিসবী (অষ্ট্রেলিয়া)

বিশ্রামের পর ব্রায়াণ্ট ও ওয়েণ্ডেল বিল এসে খুব সতর্কতার সঙ্গে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলেন। মাত্র ৫৯ রান করলেই অষ্ট্রেলিয়ারা জয়ী হবেন। নিসার ও অমর সিং বল দিতে সুরু করলেন। রান সংখ্যা অতি ধীরে উঠলো ৫৭। অমর সিংয়ের বল জোরে পিটিয়ে 'উইনিং ষ্ট্রোক্' দিতে গিয়ে ব্রায়াণ্ট ক্যাচ তুলে ন্যাভালের হাতে আটকে গেলেন। মরিসবী এলেন ও নিসারের বলে ২ রান করলে অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের প্রথম খেলায় অষ্ট্রেলিয়া নয় উইকেটে জয়ী হলো।

অষ্ট্রেলিয়ানদের চল্লিসের উপরে রানের তালিকা ঃ

(নিখিল ভারতের বিরুদ্ধে বোম্বাইয়ের প্রথম ম্যাচ পর্য্যন্ত)

১৫৫—ব্রায়াণ্ট (বোম্বে)

*১৩৯—রাইডার (গুজরাট)

১০৭—ওয়েণ্ডেল বিল (বোম্বে)

* ১০৬—ম্যাক্‌কার্টনে (জামনগর) আহত হয়ে চলে যান

১০১—রাইডার (মহারাষ্ট্র)

১০৪—রাইডার (যুবরাজের ইলেভন)

৯০—মরিস্‌বী (গুজরাট)

৭২—মরিস্‌বী (রাজপুতানা ও সি আই)

৭০—ওয়েণ্ডেল বিল (মহারাষ্ট্র)

৬৭—মরিস্‌বী (যুবরাজের ইলেভন)

৬২—হেনড্রি (মহারাষ্ট্র)

* ৬০—ব্রায়াণ্ট (মহারাষ্ট্র)

৫৯—মরিস্‌বী (সিন্ধু)

* ৫৩—ব্রায়াণ্ট (জামনগর)

* ৫৩—এলিস (বোম্বে)

৫১—অল্‌সপ্‌ (সিন্ধু)

৪৭—ওয়েণ্ডেল বিল (জামনগর)

৪৬—লাভ্‌ (সিন্ধু)

* ৪৪—অক্সেনহাম (সিন্ধু)

* ৪৩—হেনড্রি (রাজপুতনা ও সি আই)

৪২—মেয়ার (ডব্‌লিউ, আই, ষ্টেটস্‌)

৪০—মরিস্‌বী (বোম্বে)

অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের রানের তালিকা ঃ

১২৪—এম এম নাইডু (মহারাষ্ট্র)

১১৫—জয় (বোম্বে)

৭১—হাবেওয়ালা (বোম্বে)

৫৯—জয় (বোম্বে)

৪২—মণিলাল (জামনগর)

৪২—হংসরাজ (রাজপুতানা ও সি আই)

৪১—কাদ্রি (বোম্বে)

৪১—অমরনাথ (যুবরাজ ইলেভন)

৪০—মণিলাল (জামনগর)

অষ্ট্রেলিয়ানদের বোলিং ঃ

অক্সেনহাম—

৭ উইকেট ১৩ রানে— (রাজপুতানা)

৭ উইকেট ৩১ রানে— (রাজপুতানা)

৫ " ২৮ " — (ডবলিউ আই ষ্টেটস্‌)

৫ " ৪০ " — (ডবলিউ আই ষ্টেটস্‌)

৫ " ৩২ " — (জামনগর)

৫ " ৭ " — (সিন্ধু)

৫ " ২৮ " — (সিন্ধু)

৩ " ৩৭ " — (যুবরাজ ইলেভন)

মেয়ার—

৫ " ১০১ " — (বোম্বে)

৩ " ১৯ " — (ডব্‌লিউ আই ষ্টেটস্‌)

৪ " ৬৩ " — (" ")

৪ " ৩৬ " — (গুজরাট)

৩ " ২৯ " — (")

৩ " ৭৩ " — (বোম্বে)

৫ " ৫০ " — (যুবরাজ ইলেভন)

স্লাগেল—

৭ " ৫৩ " — (মহারাষ্ট্র)

৫ " ২৪ " — (সিন্ধু)

রাইডার—

৪ " ১৪ " — (গুজরাট)

লেদার—

৩ " ৬০ " — (বোম্বে)

৪ " ১১ " — (গুজরাট)

আইরনমঙ্গার

৫ " ৭০ " — (যুবরাজ ইলেভন)

ভারতীয়দের বোলিং ঃ

৫ উইকেট ২৫ রানে—জিয়াউল হাসান (রাজপুতানা)

৪ " ৬৮ " — রামজি (ডব্‌লিউ আই ষ্টেটস্‌)

৪ " ৭৭ " — ডাঃ গুড়টু (")

৪ " ৯১ " — ইব্রাহিম (সিন্ধু)

৪ " ১৩৩ " — রিচার্ডস্‌ (বোম্বে)

৩ " ২৩ " — সি এস নাইডু (রাজপুতানা)

৩ " ২৫ " — ডাঃ গুড়টু (জামনগর)

৬ " ৭২ " — নিসার (যুবরাজ ইলেভন)

যুবরাজ পাতিয়ালার ভারতীয় দল ঃ

	প্রথম ইনিংস		দ্বিতীয় ইনিংস	
ওয়াজির আলি	কট্ হেনড্রি, বো লেদার	২	কট্ মেয়ার, বো লেদার	৪
ন্যাভাল	কট্ অক্সেনহ্যাম, বো হেনড্রি	০	এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	০
অমরনাথ	কট্ এলিস, বো অক্সেনহ্যাম	৩৩	কট্ হেনড্রি, বো আয়রনমঙ্গার	৭১
সি কে নাইডু	বো লেদার	৩৬	এল-বি, বো লেদার	২৭
পালিয়া	কট্ এলিস, বো অক্সেনহ্যাম	০	এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	১৪
যুবরাজ	বো মেয়ার	৪০	কট্ মরিসবী, বো আইরনমঙ্গার	৫
লালসিং	নট্ আউট্	২৫	এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	১০
অমরসিং	বো মেয়ার	৮	ষ্টাম্পড এলিস, বো আয়রণমঙ্গার	৩৩
মোবারক আলি	কট্ হেনড্রি, বো মেয়ার	০	নট্ আউট্	১২
আমীর ইলাহী	বো মেয়ার	১৪	কট্ ওয়েণ্ডেলবিল, বো আইরনমঙ্গার	২
নিসার	কট্ অক্সেনহ্যাম, বো মেয়ার	০	কট্ ব্রায়াণ্ট, বো আইরনমঙ্গার	৬
	অতিরিক্ত	৫	অতিরিক্ত	৯
		মোট—১৬৩		মোট—১৬৩

পাতিয়ালা মহারাজার অষ্ট্রেলিয়ান দল ঃ

হেনড্রি	বো নিসার	০		
ওয়েণ্ডেলবিল	বো অমরনাথ	৬	নট্ আউট্	৩০
মরিসবী	কট্ ন্যাভাল, বো নিসার	৬৭	নট্ আউট্	২
রাইডার	কট্ ন্যাভাল, বো নিসার	১০৪		
ব্রায়াণ্ট	কট্ ন্যাভাল, বো অমরনাথ	১৮	কট্ ন্যাভল, বো অমরসিং	২৩
লাভ্	এল-বি, বো নিসার	১৫	অতিরিক্ত	৪
অক্সেনহ্যাম	কট্ ও বো আমীর ইলাহী	১৮		
এলিস	বো নিসার	৮	(১ উইকেটে)	মোট—৫৯
মেয়ার	নট্ আউট্	১১		
লেদার	কট্ অমরনাথ, বো আমীর ইলাহী	০		
আইরনমঙ্গার	বো নিসার	৪		
	অতিরিক্ত	১৭		
		মোট—২৬৮		

ভারতে এসে নিখিল ভারত দলের সঙ্গে বোম্বাইয়ের খেলা পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ারা যে কয়টি ম্যাচ খেলেছেন, তার ফলাফল :

বিপক্ষ	স্থান	টস জয়ী	ফল
রাজপুতানা ও মধ্যভারত	আজমীর	অষ্ট্রেলিয়া	সাত উইকেট
অল্ সীলোন	কলম্বো	অল্‌সীলোন	এক ইনিংস ও ১২৭ রানে
ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টেট	রাজকোট	ষ্টেট	৬ উইকেট
জামনগর	জামনগর	জামনগর	ড্র
গুজরাট	আমেদাবাদ	গুজরাট	ইনিংস ও৮৬রানে
সিন্ধু	করাচী	সিন্ধু	ইনিংস ও ৯০ রানে
মহারাষ্ট্র	পুণা	অষ্ট্রেলিয়া	ড্র
বোম্বাই	বোম্বাই	অষ্ট্রেলিয়া	ড্র
যুবরাজের দল	বোম্বাই	অষ্ট্রেলিয়া	নয় উইকেট

ট্রায়াল ম্যাচ ঃ

অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টীম গঠন সম্পর্কে দেড় দিন ব্যাপী লংফিল্ড টুয়েলভ ও হোসী টুয়েলভের ট্রায়াল ম্যাচ খেলা হয়ে গেছে। লংফিল্ডের দল মোট ২৪১ রান করে সকলে আউট হন। লংফিল্ড ও এস্ ব্যানার্জ্জি উভয়েই ৬৭ রান করেন। দু'জনেই চমৎকার খেলেছেন। ব্যানার্জ্জি বোলিংএ বিশেষ কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। হোসীর দলে কমল ভট্টাচার্য্য বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তিনি ৫৬ রান করে স্মিথের বলে কিংয়ের হাতে আটকে গেলেন। হোসী ৪৯ রান করে রান আউট হয়েছেন। হোসীর দল ৮ উইকেটে মোট ২৩৯ রান করলে বেলা শেষ হ'লে খেলা ড্র হয়।

বোলিংএ—হোসীর দলের পক্ষে—হিলউড ৫০ রানে ২ উইকেট, জে এন ব্যানার্জ্জি ৪৩ রানে ৩ উইকেট, কে ভট্টাচার্য্য ২২ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। লংফিল্ড দলের পক্ষে—লংফিল্ড ২৩ রানে ৩ উইকেট, স্কট ৩৩ রানে ২

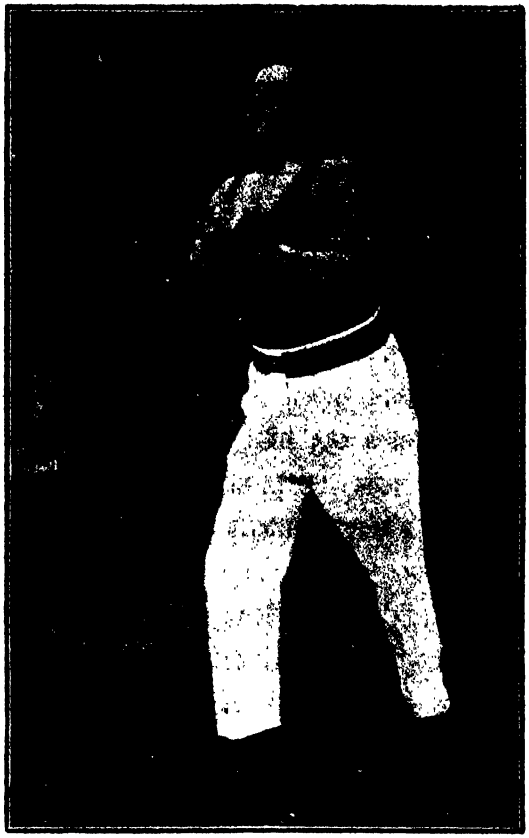
লৌহক্রীড়ায় ভারতবাসী ঃ

শ্রীপ্রমদাচরণ মজুমদার বি, এস্-সি, এম্-বি

আজ বাঙ্গলার ছেলেরা শরীর-চর্চ্চার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। তাই পল্লীতে পল্লীতে ব্যায়াম-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যুবকগণও ব্যায়াম-চর্চ্চায় দিন দিন বেশ কৃতিত্ব লাভ করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ফিরিবার আশা এখন করা যেতে পারে। আজ-কালকার অধিকাংশ ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে ছেলেদের লোহার পাটী বা রড্ লইয়া শক্তির পরিচয় দিতে দেখি। মহাভারতে পড়িয়াছি অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র ভীমের শক্তির পরিচয় পাইয়া ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে চাপিয়া মারিবার মনে মনে বাসনা করিয়াছিলেন। তাই ভীমকে বারবার আলিঙ্গন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পঞ্চ-পাণ্ডব তাহার সামনে একটা লোহার ভীম ধরিলেন ধৃতরাষ্ট্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া এমন চাপ দিলেন যে সেই লৌহ-ভীম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল।

আমাদের দেশে লৌহক্রীড়ার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে প্রথমে মনে পড়ে মাদ্রাজ নিবাসী ব্যায়াম বীর রামমূর্ত্তির কথা। বহুকাল আগে রামমূর্ত্তি কলিকাতায় সার্কাস লইয়া আসেন এবং তাহাতে অন্যান্য শক্তি-ক্রীড়ার সহিত লোহার শিকল ভাঙ্গা দেখান। এই রামমূর্ত্তিই প্রথম প্রমাণ করেন, যে লোহার শিকল দ্বারা প্রকাণ্ড জানোয়ার বাঁধিয়া রাখা যায় মানুষ শক্তি ও কৌশলে তাহা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারে। রামমূর্ত্তির পর প্রথম শিকল ভাঙ্গা দেখান স্বর্গীয় ভবেন্দ্রনাথ সাহা (ভীম ভবানী), তার পর আহিরীটোলার সুরেন্দ্রমোহন সেনও (গদিরামবাবু) শিকল ভাঙ্গিয়া ছিলেন।

বিশ্ব ব্যায়ামবীর ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লৌহ-শৃঙ্খল কঠিনতর উপায়ে ভাঙ্গেন। শিবপুরের একটী ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে জনৈক পালোয়ান একটী লোহার শিকল ভাঙ্গিবার আগে ঘোষণা করেন যে, তাহার মত এ রকম লোহার শিকল ভাঙ্গিতে কেহ পারেন নাই এবং কেহ ভাঙ্গিতে পারিলে তিনি একখানি স্বর্ণপদক তাহাকে দান করিবেন। বসন্তকুমার সেই প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার বীরহৃদয় এই আহ্বানে নাচিয়া উঠিল, তিনি কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া একেবারে ব্যায়াম-প্রাঙ্গণে গিয়া উপস্থিত। তাঁহার ঘাড়ে শিকল লাগাইয়া দেওয়া হইলে বসন্তকুমার চোখের পলক ফেলিতে না ফেলিতে সেই শিকলটী ভাঙ্গিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছিলেন। পর দিনই গদিরামবাবুর নিকট হইতে একটী শিকলের নমুনা লইয়া তিনি আরও মোটা শিকল কিনিয়া তাহা কিছুদিন অভ্যাসের পর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। একবার ছোট আদালতের নাট্যাভিনয় উপলক্ষে তিনি ষ্টার থিয়েটারের মঞ্চে শিকল ভাঙ্গা দেখাইয়াছিলেন। সেই শিকল পুলিস্



বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কণ্ঠনালীর দ্বারা ½ ইঞ্চি মোটা ও ৯ ফুট লম্বা রড্ বাঁকাইতেছেন ও সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীর হাতকড়া ভাঙ্গিতেছেন

থেকে তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, বসন্তকুমার উহা অবলীলাক্রমে ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

তাহার শিকল ভাঙ্গা সবচেয়ে দেখিবার জিনিষ হইয়াছিল নর্দার্ণ ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবে স্যর্ আর এন মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে। এইখানে বসন্তবাবু দুইটী খেলা দেখাইয়াছিলেন।

জমিতে দাঁড়াইয়া কপালের উপর একটী ১৬ ফুট লম্বা বাঁশ খাড়া করিয়া রাখিলে তাহার উপরিভাগে দুইজন দুষ্ট বালক নানারূপ কসরৎ করিতে থাকে এবং বসন্তবাবু অপূর্ব্ব কৌশলে একটী ডাবার উপর দাঁড়াইয়া তাহার টাল সামলাইতে থাকেন। শেষে বালকদ্বয় সহ কপালে বাঁশ লইয়া তিনি একটী উঁচু সিঁড়ি বাহিয়া উঠেন ও নামেন এবং মাতালের ভাণ করিয়া অতীব কৌশল জনক নানারূপ ক্রীড়াভিনয় দেখান। ইহার পরই প্রায় আধ ইঞ্চি মোটা লৌহদণ্ডের তৈয়ারী শিকল বসন্তকুমারকে দেওয়া হয় ভাঙ্গিবার জন্য। বসন্তবাবু ঘাড়ে শিকল বাঁধিয়া শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন কিন্তু শিকল ভাঙ্গিল না। সকলে মনে করিলেন এ শিকল ভাঙ্গা বসন্তকুমারের অসাধ্য। তিনবার অকৃতকার্য্যতার পর তিনি সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করিলে শিকল ছিন্ন হইল ও তার দুই চার টুকরা চারি তলার উপরিস্থিত পালে গিয়া লাগিল।

কামানের গোলা লইয়া খেলাও লৌহ-ক্রীড়ার মধ্যে। এই খেলা কলিকাতায় প্রথম দেখান মুরাল সাহেব (Mr. Mural). মুরাল সাহেব Hippodrome Circusএ কামানের গোলা ও 'সেল' লইয়া শক্তি ক্রীড়া দেখাইয়া যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। মুরাল সাহেবের পর এই খেলা প্রথম দেখান স্বর্গীয় নটবর বন্দ্যোপাধ্যায়। নটবরবাবুর পর শ্রীযুত গৌরহরি সেন (রাম সিং গোর) এই খেলা দেখাইয়া বেশ নাম করেন। তিনি ২৮২ পাউণ্ডের ওজনের একটী কামানের গোলা শূন্যে ছুড়িয়া ঘাড়ে পিঠে ফেলিতেন। চারিটী লোহার গোলা শূন্যে ছুড়িয়া লোফালুফি করিতেন এবং পিঠে ও বুকে নানারকমে গড়াইতেন। ২০ ফুট উচ্চ হইতে পতিত একটী কামানের গোলা (১৯২ পাউণ্ড পর্য্যন্ত) তিনি হাসিতে হাসিতে ঘাড়ে ফেলিতেন এবং কামান ও কামানের চাকা লইয়া অভূতপূর্ব্ব শক্তি-ক্রীড়া দেখাইতেন।

ঘাড়ে করিয়া লোহার কড়ি বাঁকান কলিকাতায় প্রথমে দেখান আমেরিকার বিখ্যাত কুস্তিগীর মিঃ জিবিস্কো। ইহার পর সিটি কলেজের প্রফেসর রাজেন ঠাকুরতা ও তাহার শিষ্য ভূপেশ কর্ম্মকার, নীলমণি দাস, বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাহার শিষ্য সুশীল সাহা, গোপাল দাস, চুণী বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন পাল এবং অল্প বয়স্ক বালক কমল-কৃষ্ণ পাল কড়ি বাঁকাইয়া শক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

এই কড়ি বাঁকান কতকগুলি সম্পূর্ণ নূতন ধরণে করিয়া বসন্তবাবু নূতন রেকর্ড স্থাপন করেন। তাঁহার প্রথম কড়ি বাঁকান দেখি হাওড়ায় এক ব্যায়াম প্রদর্শনীতে। দুইটী কাষ্ঠ স্তম্ভের উপরিভাগে কেবল মাথা ও গোড়ালি রাখিয়া শূন্যে ভাসমান বক্ষের উপর একটী প্রকাণ্ড পাথর রাখিয়া তাহার উপর একখানি কড়ি (৭" × ৪" × ২২") রাখিয়া ১২জন ব্যক্তি তাহা অনবরত ঝাঁকুনি মারিয়া ধনুকাকারে বাঁকাইয়া দিলেন। সেই বক্র কড়িখানি তিনি শুইয়া পায়ের চেটোর উপরে রাখিলে ১২জন ব্যক্তি আবার উল্টা দিকে তাহা বাঁকাইয়া দেন। তিনি কেবলমাত্র ডান পায়ের উপর একটী কড়ি বাঁকাইয়াছেন। এক সঙ্গে বুক ও পায়ে করিয়া দুই-খানি কড়ি (৬" × ২½" × ১৪") বাঁকাইয়া তিনি অসীম শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। হাত ও পা মাটীতে রাখিয়া শরীর খিলানাকারে রাখিয়া পেট বুক ও উরুর উপর রাখিয়া তিনি এক সঙ্গে তিনখানি বড় কড়ি বাঁকাইয়াছেন। একটী প্রকাণ্ড লোহার কড়ি কোমরে রাখিয়া তাহার দুই পার্শ্বে ৮ জন লোক ঝুলাইয়া তিনি তাহা ঘুরাইতেন। সেদিনও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আগত গ্রেট এম্পায়ার সার্কাসে তিনজন বিদেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যায়াম বীর Capt. George Joneseo, Jelli Goldstim এবং Aurel Lincoln কতিপয় লৌহ-ক্রীড়া দেখাইয়া challenge করিলে বসন্তবাবু তাহাদের আহ্বান গ্রহণ করিয়া কতিপয় লৌহ-ক্রীড়ায় তাহাদের challenge করেন, কিন্তু ঐ ব্যায়ামবীরগণ বসন্তবাবুর আহ্বান গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ হন।

বাঙ্গালীর মধ্যে রাজেনবাবু প্রথমে লোহার পাটী হাতে জড়ান দেখান। এখন বাঙ্গালী ব্যায়াম বীরদের মধ্যে অনেকেই আড়াই বা তিন ইঞ্চি লোহার পাটী হাতে জড়াইতে পারেন। ব্যায়ামবীর নীলমণি দাস প্রথম কাঠে পেরেক মারা দেখান। বুকের উপর 'রোলার' তোলেন প্রথম ময়মনসিং নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্রবাবু। তাহার পর রাজেন বাবু সেলার্স সার্কাসে তিন টন রোলার বুকে তোলা দেখাইলে আমাদের দেশের ব্যায়ামবীরগণ এই ক্রীড়া করিতে অভ্যাস করেন। ব্যায়ামবীর শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী, দিগেন দেব, কেশব সেন তিন টন রোলার বুকে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বুকের উপর আট টন রোলার তোলেন শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রোলার তোলায় বসন্তকুমার একটী অপূর্ব্ব

কৃতিত্ব দেখাইয়া ব্যায়াম জগতে একটী চিত্ত-চাঞ্চল্যকর ব্যাপারের সৃষ্টি করেন। তিনি দুইখানি বিশেষভাবে তৈয়ারী মহিষ গাড়ী (প্রত্যেকটীর ওজন ১ টনের উপর), প্রত্যেকটীর উপর দুইটী করিয়া দুই টন ওজনের বোঝার ও ১০ জন লোক সহ, ভাঙ্গা কাঁচের উপর শায়িত অবস্থায় অনাবৃত বুক ও পেট এবং কব্জির উপর দিয়া চালান এবং এইরূপ একখানি গাড়ী অনাবৃত কণ্ঠনালির উপর তোলেন। এই খেলায় তিনি কখনও বালিস বা তক্তা ব্যবহার করেন নাই। এইরূপ ক্রীড়া পৃথিবীতে কেবল বসন্তকুমারই দেখাইয়াছেন বলিয়া জানি। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় Carl Hagenbeck সার্কাসে পমি (Pomi) নামে একজন ইটালীবাসী একটী নূতন লৌহ-ক্রীড়া দেখান। তিনি পৃষ্ঠের পেশীর সাহায্যে একটী লোহার প্লেট ধরিয়া একটী chariot টানেন এবং শূন্তে ঝোলেন। এই খেলা দেখিয়াই বসন্তবাবু কেবলমাত্র পৃষ্ঠের পেশীর সাহায্যে একটী মোটর টানেন এবং একটী নাগরদোলায় আটজন ব্যক্তিকে ঝুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হন। বসন্তবাবুর পর তাঁহারই শিষ্য চুণী বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপে শূন্তে ঝোলেন এবং একখানি গরুর গাড়ী টানেন। আর কেহ এই খেলা করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না। বসন্তবাবু তাঁহার এই খেলা ও আরও কতিপয় World's record শক্তি-ক্রীড়া ঐ সার্কাসে দেখাইবার জন্ত সার্কাসের ম্যানেজারকে পত্র লেখেন ও খেলার ছবি পাঠাইয়া দেন। Mr. Hagen beck ও সার্কাসের ম্যানেজার Mr. Richard Sawade বসন্তবাবুকে বিশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার অদ্বিতীয় সাধনার ভূয়সী প্রশংসা সহ একখানি পত্র দেন। লৌহ-ক্রীড়ায়ও বসন্তবাবুর পরিচয় অনন্তসাধারণ। মাথার পাতলা পেশীর উপর তাঁহার এত অধিকার জন্মিয়াছে যে একটী আধ ইঞ্চি মোটা রড্ তাঁহার মাথায় মারিয়া বাঁকান হইয়াছে, কিন্তু তিনি মোটেই কষ্ট অনুভব করেন নাই। কয়েদীর হাতকড়া পর পর তিনটী তাঁহার হাতে পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে তিনি নিমিষের মধ্যে তাহা মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পেটের উপর কামারের 'নেয়াই' রাখিয়া ১০ মিনিট কাল লোহা পেটা হইয়াছে, তিনি অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিয়াছেন। শরীরের বিভিন্ন অংশ বোতল ভাঙ্গার উপর রাখিলে তাহার উপর ছেনী বসাইয়া দুইজন ব্যক্তি অনবরত হাতুড়ি মারিয়াছে কিন্তু তাঁহাকে তিলমাত্র কাবু করিতে পারে নাই। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন চর্ম্মের উপর তাঁহার মানসিক শক্তির অদ্ভুত প্রভাব। এই সব ক্রীড়ায় ব্যায়াম জগতে অদ্বিতীয় বলিয়া পরিচিত আমাদেরই বাঙ্গলার ছেলে চির নবীন ব্যায়ামবীর বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কণ্ঠনালীর সাহায্যে লোহার রড্ বাঁকান প্রথমে দেখান কটকের একজন ব্যায়ামবীর। তিনি বার ফুট লম্বা ও আধ ইঞ্চি রড্ বাঁকাইতেন। আমাদের দেশের কয়েকজন ব্যায়ামবীর তাহার পর ১২ ফুট লম্বা এবং ⅝ ইঞ্চি মোটা রড্ কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া বাঁকান। বসন্তবাবু ইহারও একটী রেকর্ড করিয়া সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছেন।

বসন্তবাবুর হাতে হাতকড়া পরাইয়া তাঁহার কণ্ঠনালীতে একটী ⅝ ইঞ্চি মোটা ও ৯ ফুট লম্বা রডের অগ্রভাগ লাগাইয়া দেওয়া হইলে তিনি কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া রড্টী বাঁকাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়াটীও ভাঙ্গিয়া ফেলেন।

শরশয্যায় শয়ন :

মহাভারতের বীর আচার্য্য ভীষ্মদেবের শেষ শয্যা হইয়াছিল কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রের শরশয্যা। তীর্থস্থানে বা রাস্তা ঘাটে সন্ন্যাসীদের পেরেকের বিছানার উপর শুইয়া থাকিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। শরশয্যা অর্থাৎ লৌহ শলাকার বিছানার উপর শুইয়া প্রথম ব্যায়াম-ক্রীড়া দেখান ফরাসী ব্যায়ামবীর ইউলিয়েট্। ১৯২৭ সালে ডিসেম্বর মাসে শেলার্স রয়েল সার্কাসে ইনি শরশয্যায় শয়ন করিয়া বুকের উপর ছয়জন লোক তোলেন।

বসন্তবাবুর এক বন্ধু ঐ খেলার কথা বসন্তবাবুকে বলেন এবং পরদিনই উভয়ে ঐ খেলা দেখিতে যান। এই খেলা দেখিয়া বসন্তবাবুরও উহা শিখিবার বড়ই ইচ্ছা হয়। তিনি সেই দিনই সার্কাসের খেলার পর ইউলিয়েট্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং এই কার্য্যে তাঁহার সাহায্য চান। ইউলিয়েট্ সাহেব তাঁহাকে বলেন—"This is my bread, excuse me please"। বসন্তকুমার দমিবার ছেলে নন, দুইমাস কাল অক্লান্ত সাধনার পর তিনি ঐ ক্রীড়ায় কৃতকার্য্যতা লাভ তো করিলেনই অধিকন্তু ইউলিয়েট্ সাহেবের চেয়ে

টের বেশী ওজন বহন করিতে পারিয়াছিলেন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটী বিশিষ্ট ব্যায়াম প্রদর্শনীতে বসন্তবাবু এই খেলা প্রথম দেখান। এইখানে তিনি শুইয়া ঊর্দ্ধ পদদ্বয়ের উপর একখানি আট দশ মণ ওজনের পাথর তুলিয়া তাহার উপর দশজন লোককে কিছুক্ষণ রাখেন, তৎপরে চার ফুট লম্বা আড়াই ফুট চওড়া কাঠের উপর মাথা এগার ইঞ্চি লম্বা তীক্ষ্ণাগ্র লৌহশলাকা সমূহের উপর খালি গায়ে শুইয়া (মাথা ও পা মোটেই জমিতে না রাখিয়া) তিনি বুকের উপর বাইশ মণ পাথর ভাঙ্গেন ও ঐ পাথরের উপর এগার জন লোককে প্রায় ছয় সাত মিনিট দাঁড় করাইয়া রাখেন। এখানে তিনি আর একটী বিশেষ শক্তিপরিচায়ক খেলা দেখান। একটী বৃহৎ Studebaker গাড়ীর পিছনে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপরপ্রান্ত বসন্তবাবু ধরিলে মাঝখানের বার চোদ্দ হাত দড়ি গোলাকার করিয়া জমির উপর রাখা হয়। গাড়ী পূর্ণ শক্তিতে (ঘণ্টায় ৫০ মাইল হিসাবে) ধাবমান হইয়া কিছু দূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। accelatorএ পুনঃ পুনঃ চাপ দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। স্বর্গীয় দেশ-প্রিয় এই অসম সাহসিক শক্তি দেখিয়া বসন্ত কুমারকে 'The great Lion of Asia' উপাধি দিয়াছিলেন।

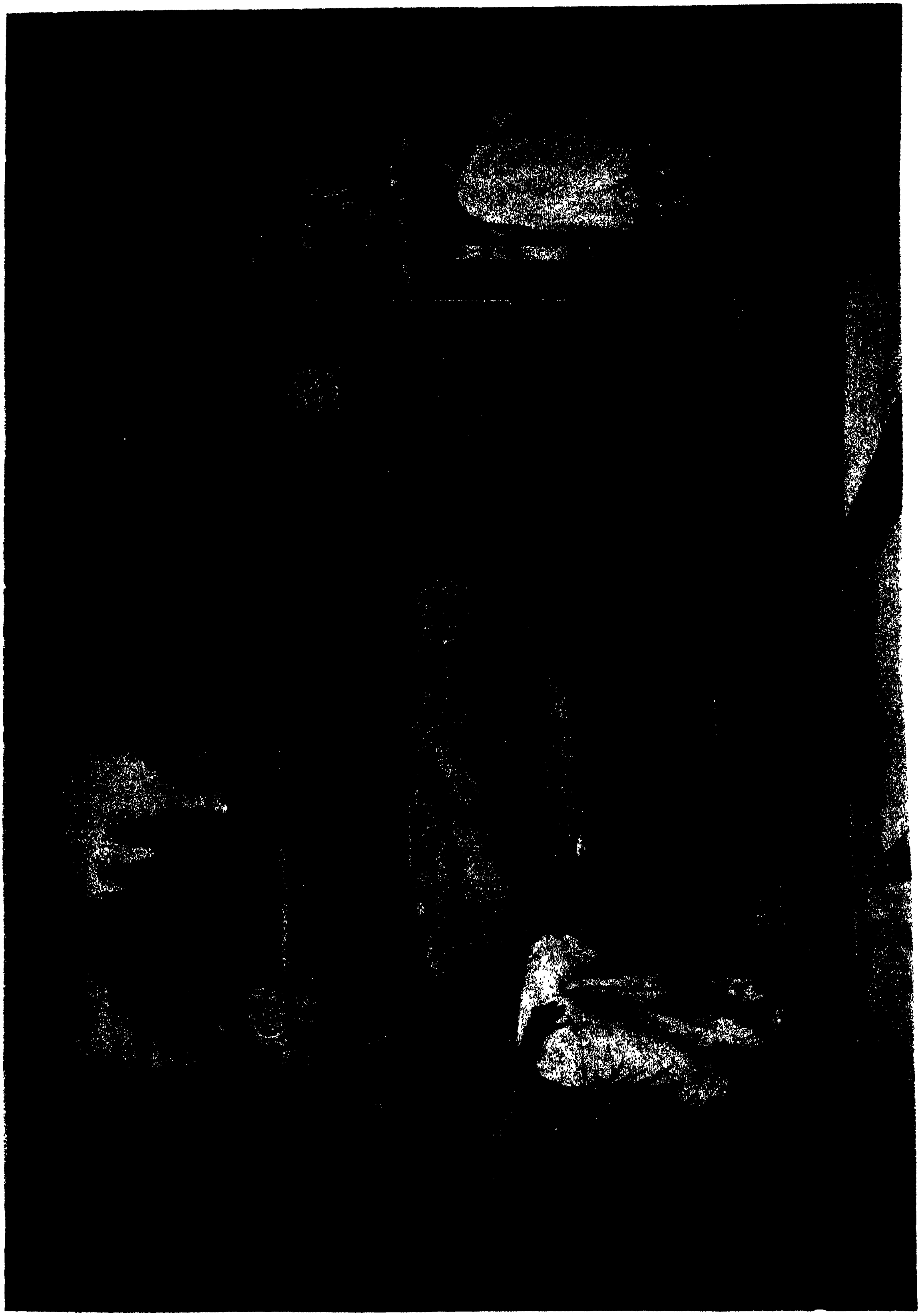
একবার স্কটিস চার্চ্চ কলেজের একটী উৎসবে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বসন্তবাবু শরশয্যায় শুইয়া বুকের উপর পাথর রাখিলে পর পর তিনজন ব্যক্তি সাত আট ফুট উচ্চ হইতে তাঁহার বুকের উপর লাফাইয়া পড়েন। সে দিন তদনীন্তন ভাইস্ চ্যান্সেলার Dr. Urquhart বসন্তবাবুকে 'The Great Hercules of India বলিয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই শরশয্যায় শুইয়া বসন্তবাবু বুকের উপর দুই মিনিটকাল দুই টন ওজন এবং একটী প্রকাণ্ড হাতী পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কতিপয় উৎসবে তিনি হাতে হাতকড়া ও পায়ে বেড়ি বাঁধা অবস্থায় লৌহ শলাকার বিছানার উপর শুইয়া কতকগুলি অভাবনীয় দুঃসাহসিক খেলা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বসন্তবাবুর লৌহ শলাকার উপর শুইয়া ভার বহনের রেকর্ড বিশ্বের রেকর্ড (World's record) বলিয়া পরিগণিত।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীমতী অপরাজিতা দেবী প্রণীত কবিতা "পুরবাসিনী"— ১॥০
শ্রীমণি ধর প্রণীত "সূর্য্যসাধনা ও প্রাণায়াম শিক্ষা"— ১।০
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "যোৎগীর বাসর"— ১।০
শ্রীহৃষিকেশ মৌলিক প্রণীত ছেলেদের গল্পের "গায়ে কাঁট"— ।৶০
শ্রীযুক্ত স্বামী সুরেশ্বরানন্দ প্রণীত ধর্ম্মপুস্তক "মুক্তিপথে"— ॥০
কবিরাজ শ্রীধীরেন্দ্রশেখর রায় প্রণীত "আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ"— ॥০
শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের উপন্যাস "শোনো মন দিয়ে"— ॥০
শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রীতিমত "নাটক"— ১৲
শ্রীপ্রভাময়ী মিত্র প্রণীত "নাটক"— ১৲
শ্রীঅসিত মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "আবিসিনিয়া"— ১॥০
শ্রীহারাণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "আবিষ্কারের সাধনা"— ।৶০
শ্রীসুধীরচন্দ্র রায় প্রণীত "সোনালী পদ্ম"— ।৶০
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "চালিয়াৎ ছেলে"— ।৶০
শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত "রাক্ষসের দেশে"— ।৶০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta





ভারতবর্ষ

মাঘ—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

জৈমিনির ধর্ম্ম-মীমাংসা

শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কসরস্বতী

মীমাংসা দর্শনের ১ম অধ্যায়ের ১ম পাদে প্রধানতঃ ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্ম্মের লক্ষণ ও তাহার প্রামাণ্যকল্পে শব্দ এবং বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নির্ণীত হইয়াছে। সেই অপৌরুষেয় শব্দ—বেদ, যজ্ঞকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড এই দুইভাগে বিভক্ত। যজ্ঞকাণ্ড ধর্ম্মতত্ত্ব, আর জ্ঞানকাণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব। ধর্ম্মতত্ত্ব-অজ্ঞাতসার মানব ব্রহ্মতত্ত্বের অধিকারী হইতে পারিবে না বিবেচনায় মহামুনি জৈমিনি পূর্ব্বে এই দর্শনে ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা করেন। সুতরাং এই শাস্ত্র পূর্ব্ব-মীমাংসা, ধর্ম্ম-মীমাংসা, কর্ম্ম-মীমাংসা, যজ্ঞবিদ্যা ইত্যাদি নামে প্রসিদ্ধ।

ত্রিকালজ্ঞ জৈমিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা বেদ-বিহিত যজ্ঞধর্ম্মের লক্ষ্য, তখনই তিনি চোদনা-(প্রবৃত্তি) মূলক যজ্ঞানুষ্ঠানকে ধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন এবং ভাষ্যকারও "যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্ত দেবাস্তানিধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্" এই উক্তি দ্বারা তাহা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকারের ধারণা এই "ধৃ+মনিন্ ধর্ম্ম, তাহার অর্থ ধারণ। ধর্ম্ম যাগযজ্ঞই তখন মানবদিগকে ধারণ করিতে পারিত; যজ্ঞেশ্বরের উদ্দেশ্যে অগ্নিমুখে প্রদত্ত ঘৃতাদি মেঘাকারে পরিণত হইয়া মর্ত্ত্যজগতে বর্ষিত হইত ও তদুৎপন্ন শস্যাদি তখন জীবজগৎকে বাঁচাইয়া রাখিত (১)। সুতরাং সেই যজ্ঞানুষ্ঠানই মানবের আদি ধর্ম্ম।"

ত্রেতাযুগেও বেদ বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদিতে মানবের আস্থা ছিল। এমন কি, লঙ্কেশ্বর রাবণকেও তখন বৈদিক ভাষ্য করিতে দেখা যায় (২)। তাই যাগযজ্ঞাদির সভ্যতা

(১) অগ্নৌ প্রাপ্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিঃ বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ॥
মৈত্র্যুপনিষৎ।

(২) পদচ্ছেদাদিনা বেদা ব্যাখ্যাতা রাবণাদিভিঃ।
যাস্কাদিভির্নিরুক্তাদ্যৈরঙ্গৈর্নীতাশ্চসাঙ্গতাম্॥
প্রশস্তপাদভাষ্যধৃত দেবীপুরাণ।
বিদিত্বা বেদার্থং দশবদনবাণী পরিগতম্।
পরমার্থ প্রপা, গীতাটিপ্পনী।

যে অতি প্রাচীন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত এবং পরবর্ত্তীকালে সময় ও অবস্থা ভেদে ধর্ম্মের যে সকল প্রকার ভেদ হইয়াছে, তাহাও যজ্ঞান্ত নামে ব্যবহৃত থাকিয়া আজও সেই প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে; যেমন—পঞ্চ যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, ভূত-যজ্ঞ ইত্যাদি (৩)।

বেদোক্ত ধর্ম্ম—যজ্ঞ। বৈদিকযুগের মানবেরা ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু ও বরুণ দেবের উপাসনা করিতেন। সেই ধর্ম্মপদ্ধতিকে ইন্দ্র যজ্ঞ, অগ্নি যজ্ঞ ও বরুণ যজ্ঞ বলা হইত। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের কিছুকাল যাইতে না যাইতেই তখনকার এক অযাজ্ঞিক সম্প্রদায় বলিতে আরম্ভ করেন যে "পশু মারিয়া অগ্নিতে দিলে যদি সেই পশু স্বর্গে যায়, তাহা হইলে যজমান নিজ পিতাকে মারিয়া কেন স্বর্গে প্রেরণ না করেন (৪)? কাজেই যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম নহে।" এই প্রকার অপসিদ্ধান্তে মানবীয় চিত্তের ধারণা বিলুপ্ত-প্রায় হওয়ায় আর যখন যজ্ঞাদির ফল প্রত্যক্ষ হইত না, তখনই সমাজে শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মের প্রচলন হয়।

শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্ম—ব্রহ্মযজ্ঞ। আদি সৃষ্টিতে মানবের দৃষ্টি অন্তর্মুখী থাকায় তাঁহারা বেদের উপদেশ যেমন সহজে ধারণা করিতে পারিতেন, সৃষ্টি পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহির্ম্মুখী মানব আর তেমন ধারণা করিতে পারিতেন না। কাজেই বেদমন্ত্রজ্ঞ ঋষিরা তখন বেদকে গ্রন্থাকারে পরিণত করতঃ মানবদিগকে শুনাইতে আরম্ভ করেন। গুরুমুখে বেদপাঠ শুনিয়া ধারণা করায় তখন বেদের নাম শ্রুতি এবং তাহা উপাসক সম্প্রদায়কে ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী করিত বলিয়া তাহার অপর নাম উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা।

তখন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিরা উপদেশ করেন যে 'ওঁ' এই অনাহত শব্দের নাম ব্রহ্মবীজ। আর্য্যর্ষি শৌনক যেমন প্রণবরূপ ধনুর সাহায্যে জীবরূপ শরকে ব্রহ্মে নিয়োজনা করতঃ ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিয়াছিলেন (৫), সেইরূপ তোমরাও ব্রহ্মাগ্নিতে কর্ম্মাহুতি প্রদানে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, ব্রহ্মজ্ঞ হইতে পারিবে। অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে দৃষ্ট হয় যে, শ্রীভগবদ্গীতাও এই মুণ্ডক বাক্যের সমর্থন করে। গীতার শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদের আধ্যাত্মিক আভাষ এই—অর্জ্জ ধাতুর অর্থ প্রাণধারণ; অর্জ্জ+উনন্—অর্জ্জুন (প্রাণধারি-জীব সমষ্টি) এবং কৃষ্+ণক্—কৃষ্ণ (পরব্রহ্ম)। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—জীবগণ! তোমরা সংসারী মানব; তোমাদের সম্প্রতি ধর্ম্মযুদ্ধ উপস্থিত। তোমরা প্রণবের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদকে গাণ্ডীব (৬) এবং বিন্দু অর্থাৎ প্রাণকে শর মনে করিয়া স্থিরভাবে ব্রহ্মকে লক্ষ্য কর; তাহা হইলে যুধিষ্ঠিররূপ ধর্ম্ম-তরুর অন্তরালে থাকিয়া প্রণব-ধনুর সাহায্যে দুর্য্যোধনাদিরূপ শত শত ক্রোধকে (অজ্ঞানাদি পাপ রিপুকে) পরাজিত করিতে পারিবে (৭)। পরন্তু তোমাদের পঞ্চজনের (পঞ্চ প্রাণের) প্রতি আমার যে উপদেশ বাক্য, তাহারই নাম পাঞ্চজন্য এবং শঙ্খের অব্যক্ত ধ্বনিতে যেমন অন্য ধ্বনি বিলীন হয় (৮), সেইরূপ সকল শব্দই পাঞ্চজন্য শব্দে (ওঁকারে) লয় প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা

(৩) পাঠোহোমশ্চাতিথীনাং সপর্য্যা তর্পণং বলিঃ।
এতেপঞ্চ মহাযজ্ঞা ব্রহ্মযজ্ঞাদি নামকৈঃ॥

(৪) পশুশ্চেন্নিহতঃ স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমেন গচ্ছতি।
স পিতা যজমানেন তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে॥

চার্ব্বাক দর্শন।

(৫) ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরংহ্যুপাস নিশিতং সন্ধয়িত।
আয়ম্যতদ্ভাবগতেনচেতসা
লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সৌম্য বিদ্ধি॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় খণ্ড, ৩য় মন্ত্র।

(৬) প্রণবং ধনুঃ শরোহ্যাত্মাব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

মুণ্ডকোপনিষৎ, ২য় খণ্ড, ৪র্থ মন্ত্র।

(৭) যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধোঽর্জ্জুনো ভীমসেনোঽস্য শাখা।
মাদ্রীসুতৌ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং কৃষ্ণশ্চ ব্রহ্মচ ব্রাহ্মণাশ্চ॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১০ শ্লোক।

দুর্য্যোধনো মন্যুময়ো মহাদ্রুমঃ
স্কন্ধঃ কর্ণঃ শকুনিস্তস্য শাখা।
দুঃশাসনঃ পুষ্পফলে সমৃদ্ধে
মূলং রাজা ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী॥

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১১১ শ্লোক।

(৮) স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্
শক্নুয়াদগ্রহণায় শঙ্খস্যতু গ্রহণেন
শঙ্খধ্বস্য বা শব্দো গৃহীতঃ।

বৃহদারণ্যক ২য় অঃ ৪র্থ ব্রাহ্মণ।

শঙ্খ নামে আখ্যাত। যখন আমার পাঞ্চজন্য শঙ্খের ওঁকারাত্মক শব্দে বিভোর হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের ধ্বনিতে তোমরা জীব জগৎকে প্রতিধ্বনিত করিবে—অর্থাৎ "দেবায় দত্ত" জ্ঞানে সমস্ত কর্ম্মই যখন ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে পারিবে, তখনই আমার বিশ্বরূপ দর্শনে আমি কে চিনিয়া লইতে পারিবে, তখনই তোমাদের মনের সাধ মিটিয়া যাইবে।

এই প্রকারে শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মের প্রচলনে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর ভোগস্পৃহ মানব আর যখন শ্রুতির কথা শুনিতে চাহিতেন না বা শুনিয়াও ধারণা করিতে পারিতেন না। এবং অবস্থা দৃষ্টে যখন ঋষি দুঃখিত হইয়া মৈত্রেয়কে বলেন, "মৈত্রেয়! অন্তিম কলিতে সকলেই ব্রহ্মবাদ প্রচার করিবে, কিন্তু ভোগ বাসনায় মত্ত মানব আর ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবে না" (৯) তখনই সমাজে স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়।

স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম—পঞ্চযজ্ঞ। সংসারের অনন্ত ধারায় বিচলিত মানব যখন শ্রুত্যুক্ত ধর্ম্মে ফলের সংস্রব নাই দেখিয়া তাহাতে অরুচিসম্পন্ন হইয়া পড়েন, তখনই ঐহিক পারত্রিক ফলপ্রসূ ধর্ম্ম মানবের স্মৃতি-পথে উদিত হইবার নিমিত্ত মন্বত্রি প্রমুখ মহর্ষিবৃন্দ বেদমূলক স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। যাহার সংস্কারে স্বর্গাদি ফলদায়িকা ঐশীস্মৃতির জাগরণ হয় তাহারই নাম স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্ম। বেদ পাঠ, হোম, অতিথি সৎকার, তর্পণ ও বৈশ্বদেব বলি, এই পাঁচটি স্মৃতির পঞ্চ মহাযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ বর্ণন প্রসঙ্গে ইহাতে ব্যবসায়, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, সমাজ, বর্ণাশ্রম প্রভৃতির নিয়ম প্রণালী ও পরলোকের কথা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ উপদেশ করিয়াছেন যে, "মানব! ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মকে পুণ্ডরীকাক্ষ বলা হইয়াছে (১০)। তোমরা শুচি কি অশুচি হও, পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণুকে স্মরণ কর, দেখিবে তখন তোমাদের অন্তঃকরণ পাবক-শোধিত কনকের ন্যায় নির্ম্মল ও পবিত্র হইয়া যাইবে (১১)। বাণিজ্যের উন্নতি-কল্পে সমবায় সমিতি-গঠন-ক্রমে জীবিকানির্ব্বাহ করিবে; কিন্তু এই সমিতির সভ্য কেহ যদি কোম্পানীর ক্ষতি-সাধন করেন, তাহা হইলে সেই সভ্যকে তাহার ক্ষতি-পূরণ করিতে হইবে (১২)। শারীরিক স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত (১৩) শক্ত্যানুসারে সর্ব্বদা প্রাণায়াম বা অঙ্গচালনাদি ব্যায়াম করিতে থাকিবে (১৪)। শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীতে আমরা আরও দেখিতেছি যে, ভবিষ্যতে তোমাদের এমন দিন আসিবে, যখন বিশুদ্ধ জলের অভাবে তোমরা যন্ত্রোদ্ধৃত (কলের) জল পান করিবে (১৫) এবং কোনও রমণীকে কেহ অপহরণ বা বলাৎকারে তাহার সতীত্ব নাশ করিলে শাস্ত্রীয় বিধানে তাহাকে সমাজে গ্রহণ করিতে হইবে (১৬)। শাস্ত্রালোচনায় আরও অবগত হওয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা তেজ, বায়ু ও আকাশের সমবায়ে আতিবাহিক

(৯) সর্ব্বে ব্রহ্মবদিষ্যন্তি সর্ব্বে বাজসনেয়িনঃ।
নানুতিষ্ঠন্তি মৈত্রেয় শিশ্নোদরপরায়ণাঃ॥
বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য।

(১০) তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী।
যস্তোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্য উদিতঃ॥
ছান্দোগ্য, ১ম প্রঃ, ৭ম মন্ত্র।

(১) অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপিবা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥

(১২) সমবায়েন বণিজাং লাভার্থং কর্ম্মকুর্ব্বতাম্।
লাভালাভৌ যথাদ্রব্যং যথা বা সম্বিদাকৃতৌ॥
প্রতিষিদ্ধ মনাদিষ্টং প্রমাদাদ্ যচ্চনাশিতং।
সতর্দ্ধত্বাদ্ বিপ্লবাচ্চ রক্ষিতাদ্দশমাংশভাক্॥
যাজ্ঞবল্ক্য ২য় অঃ ২৬২, ২৬৩ শ্লোক।

(১৩) তচ্চনিত্যং প্রযুঞ্জীত যেন স্বাস্থ্যং প্রবর্ত্ততে।
অজাতানাং বিকারাণামনুৎপত্তিকরঞ্চ যৎ॥
বৃদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্য।

(১৪) ব্যায়ামো হি সদা পথ্যো বলিনাং স্নিগ্ধভোজিনাম্।
শক্ত্যার্থেন তু কুর্ব্বীত ব্যায়ামোহন্যতো ব্যথাম্॥
কুক্ষি ললাট গ্রীবায়াং, যদা ঘর্ম্ম প্রবর্ত্ততে।
শক্ত্যর্দ্ধং তদ্‌বিজানীয়া দায়াতোচ্ছাসমেবচ॥
লাঘবং কর্ম্ম সামর্থ্যং স্থৈর্য্যং ক্লেশ সহিষ্ণুতা।
দোষক্ষয়ো অগ্নিবৃদ্ধিশ্চ ব্যায়ামাদুপজায়তে॥
আচার প্রবন্ধ।

(১৫) শুচিনোতৃপ্তিকৃত্তোয়ং প্রকৃতিস্থং মহীগতম্।
চর্ম্মভাণ্ডস্থ ধারাভিস্তথাযন্ত্রোদ্ধৃতং জলং॥
অত্রি সংহিতা।

(১৬) বলাৎকারোপভুক্তা চ চৌরহস্তগতাপিবা।
স্বয়ং বিপ্রতিপন্নাবাপ্যথবা বিপ্রমাদিতা॥
অত্যন্ত দূষিতাপি স্ত্রী ন পরিত্যাগমর্হতি।
বাচস্পতিমিশ্রকৃত শুদ্ধিচিন্তামণি স্বভাবশুদ্ধি প্রকরণ।

(ত্রিভৌতিক) দেহে শূন্তে বিচরণ করে (১৭) পূরক-মন্ত্রে তাহাতে ক্ষিতি ও জল পূরণ করিলে মন্ত্রশক্তির ক্রিয়ায় প্রেতাত্মা গুরুত্ব লাভে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া শ্রাদ্ধীয় ভোগ্যবস্তু গ্রহণে সমর্থ হয় অর্থাৎ ক্ষিতি ও জলের অভাবে প্রেতাত্মাকে শূন্যমার্গে অবস্থিত ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেখিয়া শাস্ত্রকারগণ আতিবাহিকদেহে নীরক্ষীরাদি পূরণের ব্যবস্থা ও প্রেতাত্মার শ্রাদ্ধের বিধান করেন। এই সকল শাস্ত্রের প্রতিকূলে যখন এক সম্প্রদায় বলিতে আরম্ভ করিলেন "মৃতের আত্মা যদি পরলোকে যায়, তাহা হইলে পুত্রাদির মমতায় আবার ঘুরিয়া আসে না কেন? যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, উপবীত ও তিলকাদি ধারণ--বুদ্ধি ও পুরুষকাররহিত অলসের জীবিকা" (১৮)। তখনই সমাজে পুরাণোক্ত ধর্ম্মের প্রচলন হয়।

পুরাণোক্ত ধর্ম্ম—দৈব যজ্ঞ। বিশ্বনিয়ন্তা কালত্রয়ের অভিজ্ঞতায় যখন দেখিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাসী মানব ধর্ম্মের ইতিহাস অবগত না হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে চাহিবে না এবং স্বেচ্ছাচারে ক্রমে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে তখনই তিনি স্বয়ং ব্যাসরূপী হইয়া পুরাণশাস্ত্র এবং শিবরূপে তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়া রাখেন (১৯)। তৎপর ধর্ম্মযাজক ঋষিরা যখন বুঝিতে পারিলেন যে, বর্ত্তমানযুগের মানব কর্ম্মফলপ্রয়াসী অর্থাৎ কে কি কাজ করিয়া কিরূপ ফল পাইয়াছে তাহা জানিতে চায়, তখনই তাঁহারা বেদে যে সকল দেবতার প্রত্যক্ষ বর্ণনা রহিয়াছে তাহাদের ইতিহাস ও উপাসনাতত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। অভিধানে ইতিহাসের নাম পুরাবৃত্ত বা পুরাণ। সেই ঐতিহাসিক ধর্ম্মের নামই পৌরাণিক ধর্ম্ম। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে, একদা অঙ্গিরা বংশজাত ঘোরনামা ঋষি অন্তকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার নিমিত্ত "অক্ষিতমসি, অচ্যুতমসি ও প্রাণসংশিতমসি" এই মন্ত্রে স্তুতি করিয়াছিলেন (২০)। সেই বেদমন্ত্রের অনুরূপ ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে একদা অষ্টাবক্রনামা ঋষি আপনার অন্তকাল উপস্থিত জানিয়া "অক্ষিতমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করেন (২১)। সাধারণতঃ "ঘোর" অর্থে কৃষ্ণবর্ণ ও কুৎসিতাকার পুরুষকে বুঝায়। অষ্টাবক্র মুনিও কৃষ্ণবর্ণ ও কুৎসিতাকার ছিলেন সুতরাং ছান্দোগ্যের দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণই যে গীতার শ্রীকৃষ্ণ এবং ছান্দোগ্যের ঘোরনামা ঋষিই যে অষ্টাবক্র ঋষি তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রকার বেদে যযাতি ও নহুষের উল্লেখ থাকায় (২২) পুরাণে যযাতি ও নহুষের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে এবং ছান্দোগ্য ও কালিকোপনিষৎ দৃষ্টে পুরাণে কৃষ্ণ ও কালীকে কলির উপাস্য দেবতা বলা হইয়াছে। কারণ বিজ্ঞানে পাষাণ, মৃত্তিকা ও কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর দৃক্‌শক্তি বর্দ্ধক। কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষার ন্যায় বস্তুগুণে দিব্যচক্ষু স্ফুরণের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রে কালী, কৃষ্ণ ও শালগ্রাম প্রভৃতি উপাসনার ব্যবস্থা। সেই জন্যই বেদে ব্রহ্মচারীর চক্ষুতে অঞ্জন ধারণের পদ্ধতি; সেই জন্যই শাক্ত ও বৈষ্ণবের ললাটে মৃত্তিকা তিলক ধারণের বিধি। তাই মহর্ষি আপস্তম্ব বলেন—ফলার্থে রোপিত

(১৭) উর্দ্ধং গচ্ছন্তি ভূতানি ত্রীণি স্মাত্তস্য বিগ্রহাৎ
প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

(১৮) যদাগচ্ছেৎ পরং স্থানং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥
অগ্নিহোত্রস্ত্রয়োবেদা ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহস্পতিঃ॥
চার্ব্বাক দর্শন।

(১৯) নিস্তারায় চ লোকানাং স্বয়ং নারায়ণঃ প্রভুঃ।
ব্যাসরূপেন কৃতবান পুরাণানি মহীতলে॥
পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড।
আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজামুখে।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগমসম্মতঃ॥
আগমদ্বৈতনির্ণয়।

(২০) তদ্ধৈতৎ ঘোর আঙ্গিরসঃ দেবকী পুত্রায় কৃষ্ণায়
আক্তোবাচ। অপিপাস এব স বভুব সোহন্ত-
বেলায়ামেতত্ত্রয়ং প্রতিপদ্যেত অক্ষিতমসি,
অচ্যুতমসি, প্রাণসংশিতমসীতি।
ছান্দোগ্য উপনিষৎ।
ভাষ্য সংক্ষেপঃ।
আত্মা প্রাপ্য অক্, গতাবিত্যস্য রূপম্।
কৃষ্ণায়েতি তুমর্থে চতুর্থী।

(২১) যদক্ষিতস্তত্ত্বমসি পরমাত্মা নিরাময়ঃ।
অচ্যুতাধ্যায় বিশ্বাত্মন্ ত্রাহি মাং ভবসঙ্কটাৎ॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডশ্লোক।

(২২) যযাতের্যোনহুষস্য বর্হিষিদেবা
আসন্তে তেহধিব্রুবন্তু নঃ।
ঋগ্বেদ ১০ম মং, ৩৩ সূক্ত, ১ম মন্ত্র।

আম্রতরু যেমন প্রসঙ্গে ছায়া ও গন্ধ প্রদান করে, সেইরূপ ধর্ম্মাচরণে মানবের প্রাসঙ্গিক ফল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে (২৩)। তৎপর পৌরাণিক যুগ যাইতে না যাইতেই কলিপ্রভাবে যখন মানব ক্রমশঃ হীনশক্তি ও কৃশ-কলেবর হইয়া পড়ে, তখন লোকের আলাপ ব্যবহারে তাহা অনুভব ক্রমে আর্য্যর্ষিরা তন্ত্রোক্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন।

তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম—শক্তিযজ্ঞ। তন্যতে বিস্তার্য্যতে এই বুৎপত্তিগত অর্থে তন্ত্র পদটী নিষ্পন্ন (২৪)—চৈতন্যরূপিণী শক্তির উপাসনায় মানবের একাগ্রতা জন্মিলে চিত্তের স্থৈর্য্য আসিবে, চিত্তের স্থিরতায় মানসিক বল বৃদ্ধি পাইবে, মানসিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক শক্তির বিকাশ হইবে; সম্ভবতঃ এই সকল মহৎ উদ্দেশ্যেই তান্ত্রিক ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছিল। ইহা শক্তি সাধনার মূলসূত্র হেতু এই ধর্ম্মের নাম শক্তিযজ্ঞ। তান্ত্রিক ধ্যান রহস্যের আলোচনায় দেখা যায়, আদ্যাশক্তি কালিকা যেন স্বয়ংই ব্যক্ত করিতে-ছেন যে "ঘটের আকাশ দৃষ্টে যেমন খণ্ড আকাশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ আমার মূর্ত্তি দৃষ্টে উপাসকেরা আমাকে খণ্ড ব্রহ্ম বলিয়া মনে করে, কিন্তু সমষ্টির চক্ষে আমি পরব্রহ্ম। ক (ব্রহ্ম), আ (আকাশ), ল (পৃথিবী), ঈ (ঈক্ষণ) অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত আমার দৃষ্টি গোচর হওয়ায় আমি কালী নামে আখ্যাত। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি—এই উভয় পন্থীর কথাই আমার কাণে আসে বলিয়া বড়িশাকৃতি শবযুগ্ম (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি) আমার কর্ণভূষণ। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদানের নিমিত্ত আমি চতুর্ভুজা। আমার দ্বারা ভক্তের কেশ পাশ (মায়া-জাল) বিদূরিত হওয়ায় আমি মুক্তকেশী। পরব্রহ্মের পরিচারিকা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির ন্যায় কুরুকুল্লাদি অষ্ট-নায়িকা আমার অষ্টশক্তি; বেদান্তের শম-দমাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ আমার অষ্ট ভৈরব। এইভাবে শক্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে সাধকেরা সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারিবে।" কিন্তু কলি-কলুষিত মানব যখন কালক্রমে অত্যধিক ভোগী ও দুর্ব্বল হইবে, তখন তন্ত্রোক্ত সাধনাও তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না বুঝিয়া ত্রিকালদর্শী শাস্ত্রকারগণ তান্ত্রিক সাধন প্রণালীর ভিতর দিয়াই ভগবদুপাসনার আরো সহজ ও সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির বিধান করিয়া রাখেন। ইহার আভাষ পরবর্ত্তী বৈষ্ণবধর্ম্ম, সেবাধর্ম্ম ও ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিতর দিয়া পরিলক্ষিত হয়।

চৈতন্য ধর্ম্ম—নামযজ্ঞ। তান্ত্রিক যুগের মধ্য সময়েই শক্তি সাধনার উপাসনাপদ্ধতি আর মানুষকে ধারণ করিতে পারিত না। অধিকাংশ মানবের চিত্তে যখন শক্তিযজ্ঞ কঠিন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, সম্ভবতঃ তখনই চিন্ময় ব্রহ্মকে প্রেমভাবে ধরিয়া লইবার নিমিত্ত মহাত্মা চৈতন্যদেব রাধাতন্ত্রোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা পদ্ধতি (২৫) এবং ষোড়শবিকারবিনাশক হরেকৃষ্ণ নাম জগতে প্রচার করেন (২৬) এই ধর্ম্ম চৈতন্যদেবের মুখে প্রচারিত হওয়ায় তাহা চৈতন্য-ধর্ম্ম নামে অভিহিত। ইহাতে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি বিধান না থাকিলেও বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই ধর্ম্মকে নামযজ্ঞ বলিয়া থাকেন। যেহেতু "যাগযজ্ঞ কিছু নাই, নামযজ্ঞ কর ভাই" ইহা তাঁহাদেরই গীতি।

ব্রাহ্মধর্ম্ম—জ্ঞানযজ্ঞ। যখন পৌরাণিক ভবিষ্যদ্-বাণী মানব জগতের ভিতর দিয়া অক্ষরে অক্ষরে ফলিত হইতে আরম্ভ হয়, যখন অর্থকরী শিক্ষার প্রভাবে মানবকে ধর্ম্মশিক্ষা না করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণের অভিলাষী হইতে দেখা যায় (২৭), যখন বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বহু লোকের অনাস্থা ঘটিয়াছিল (২৮) বোধ হয় তখনই মহাত্মা রামমোহন রায় মহানির্ব্বাণ-

---

(২৩) আম্রফলার্থে রোপিতে যথাচ্ছায়া গন্ধাবনূৎপদ্যেতে।
এবং ধর্ম্মং চর্য্যমানমর্থাঅনূৎপদ্যন্তে ॥
আপস্তম্ব।

(২৪) তনোতি বিপুলানর্থান্ নানাশাস্ত্রসমন্বিতান্।
ত্রাণঞ্চ কুরুতে যস্মাত্তন্ত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
কালিকাগমতন্ত্র।

(২৫) কামবীজং সমুদ্ধৃত্য বাগ্‌ভবং তদনন্তরং।
রাধাপদং চতুর্থ্যন্তমুদ্ধরেদ্বরবর্ণিনি ॥
রাধাতন্ত্র ৩২ পটল ৭ম প্রঃ।
মন্ত্রচূড়ামণি প্রোক্তং সর্ব্বমন্ত্রৈক কারণম্।
সর্ব্বদেবস্য মন্ত্রাণাং কৃষ্ণ মন্ত্রস্যজীবনম্ ॥
রাধাতন্ত্র ১৭শ পটল ৬১ প্রমাণ।

(২৬) হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে ॥
রাধাতন্ত্র ২য় পটল ৮ম প্রঃ।

(২৭) অর্থশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রং বিহায় চ।
নিত্যমুদ্বিগ্ন মনসো ভবিষ্যন্ত্যন্তিমে কলৌ ॥
খিলহরিবংশ।

(২৮) বর্ণাশ্রমাচারবতী প্রবৃত্তি র্ন কলৌ যুগে ॥ বৃদ্ধযাজ্ঞবল্ক্য।

তন্ত্রোক্ত (২৯) ব্রহ্মোপাসনার সহজপদ্ধতি প্রচার করেন। ইহা ব্রহ্মোপাসনার প্রণালীহেতু পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানযজ্ঞ নামে অভিহিত হইয়া থাকিবে।

সেবাধর্ম্ম—ভূতযজ্ঞ। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মমতের প্রাবল্যে মানবের চিত্ত যখন উদ্বেলিতপ্রায়, এমন কি কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রকৃত মঙ্গল হইবে তাহা অবধারণ করা অনেকের পক্ষে সুকঠিন হইয়া পড়িল, মনে হয় তখনই পরমহংস রামকৃষ্ণদেব সর্ব্বধর্ম্ম সমন্বয়ে একপ্রকার মিশ্র ধর্ম্মের প্রচার করেন (৩০)। এই ধর্ম্ম মহাত্মা রামকৃষ্ণের মুখ হইতে প্রচারিত হওয়ায় তাহা "রামকৃষ্ণ মিশন" নামে প্রসিদ্ধ। কার্য্য কারণে বোধ হয় এই "মিশন" শব্দটী ইংরেজীতে বাণী প্রচার এবং বঙ্গ ভাষায় মিশ্র অর্থে প্রযুক্ত। ভগবান্ মনু এই শ্রেণীর ধর্ম্মকে ভূতযজ্ঞ (জীবসেবা) নামে অভিহিত করেন।

উপর্য্যুক্ত শাস্ত্রীয় আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, সময় এবং অবস্থাভেদে যুগে যুগে যে সকল ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা জৈমিন্যুক্ত যজ্ঞধর্ম্মেরই প্রতিধ্বনি। কারণ বেদে যে যজ্ঞের নাম আদিধর্ম্ম, সেই যজ্ঞকে ভিত্তি রাখিয়া বৈদিক যুগে যেমন যাগ যজ্ঞের বিধি, সেইরূপ শ্রুতির যুগে ব্রহ্মযজ্ঞ, স্মৃতির যুগে পঞ্চমহাযজ্ঞ, পুরাণের যুগে দেবযজ্ঞ, তন্ত্রের যুগে শক্তিযজ্ঞ, তৎপরবর্ত্তী যুগে নামযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ও জ্ঞানযজ্ঞের বিধান করা হইয়াছে। গীতা এবং মনুতে এই সকল বহুবিধ যজ্ঞের কথা উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও মূলতঃ সকল যজ্ঞই জৈমিনির কথিত চোদনা লক্ষণ (প্রবৃত্তি মূলক) এক যজ্ঞধর্ম্মেরই বাচ্য। এই গ্রন্থে যজ্ঞধর্ম্ম সুমীমাংসিত হওয়ায় ইহাকে কোনও সম্প্রদায় ধর্ম্মমীমাংসা এবং কোনও সম্প্রদায় অধ্বর-মীমাংসা বলেন।

(২৯) নাত্রবর্ণ বিচারোঽস্তি নোচ্ছিষ্টাদি বিচারণম্।
নকাল নিয়মোঽপ্যত্র শৌচাশৌচং তথৈবচ ॥
কিন্তস্য বৈদিকাচারৈস্তান্ত্রিকৈর্ব্বাপিতস্য কিং।
ব্রহ্মজ্ঞানস্য বিদুষঃ স্বেচ্ছাচারবিধিঃস্মৃতঃ ॥
অস্মিন্ ধর্ম্মে মহেশি স্যাৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পরোপকার নিরতো নির্ব্বিকারঃ সদাশ্রয়ঃ ॥ মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(৩০) ধ্যায়ন্তি তং বৈষ্ণবাশ্চ কৃষ্ণং শ্যামলসুন্দরং।
ত্রিশূলধারিণং কেচিৎ পঞ্চবক্ত্রং দিগম্বরং ॥
নানারূপঞ্চ পশ্যন্তি ধ্যানানুসারতশ্চ যাং।
সা দেবী প্রকৃতিঃ সূক্ষ্মা তেজোমণ্ডলবাসিনী।
আকাশো ভিদ্যতে যাদৃগ্ ঘটস্থাদিস্তথাচ সা ॥ ব্রহ্মাণ্ডতন্ত্র।

দূরের বাউল ডাকে!

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অশ্রুমতীর তীরে
ক্লান্ত হিয়ার কালো যবনিকা নামে ওই ধীরে ধীরে!
আঁধারে সন্ধ্যা বাজায়ে শঙ্খ এল যে খেয়ার ঘাটে,
বন্ধু আমার! আর কি গগনে বসিবে সূর্য্যপাটে?
দূরের বাউল ডাকে,
পারের মালিক বেয়ে এসে তরী নদীর ধারেতে হাঁকে।

গ্রামের বিসারী ক্ষেতে,
দীঘির কোলেও হিজল বনেতে হারাণো লিপিরে পেতে,
ব্যাকুল হইয়া ভ্রমিয়াছি আমি দীর্ঘ বরষ মাস;
আমার নয়ন ছিল যে ভিখারী, নাহি ছিল অবকাশ,
দিবানিশি চঞ্চলি—
প্রেমের পূজার ফুরালো লগন, হোলোনাক অঞ্জলি।

ভগ্ন বুকের কূলে,
কোন্ অতীতের সাগর বাহিয়া ঢেউ আসে দুলে দুলে!
বহুকাল পরে সেই লিপিখানি কুড়ায়ে এনেছ তুমি,
ওষ্ঠ কাঁপে যে বিদায় বেলায় কেসনে তাহারে চুমি!
আঁখি মোর জলভার,
জীবন পথের পাপিয়া দোয়েল করে এবে হাহাকার।

ছিঁড়ে ফেল কাজ নাই
যাবার সময়ে তোমাদের কাছে পরম শান্তি চাই।
তুমি তো জানো না কোনো বসন্তে জীবনের মধুমাসে,
পথিক বধূরে পেয়েছিনু আমি মাধবী লতার পাশে
তাহারি খোঁপার কোণে,
সোহাগ আখরে ছিল এই লিপি হারায়ে গেল যে বনে।

উপন্যাস

মাটীর দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(২৮)

সৈকত ড্রয়ার পরিষ্কার করছিল।

আজকাল পাকা গিন্নি সে, সংসারের ছোট বড় সব জিনিসেই তার দৃষ্টি, অনেক হিসাব করে সে চলে। কয়টা বছর আগে যে কেউ সৈকতকে দেখেছে, তারা আজ তাকে দেখে মোটেই বিশ্বাস করতে পারবে না।

হ্যাঁ, সংসারের কাজেই সে আরাম পায়, যতটুকু শান্তি ওতেই মেলে।

অনেকদিন হতে ঝোঁক ছিল ড্রয়ারটা গুছিয়ে ফেলবে, কি কুড়েমী আসে—কিছু হয়ে ওঠে না। আজ ইন্দ্রনীল একখানা কাগজ টানতে একরাশি চিঠিপত্র বার হয়ে পড়েছিল, সৈকত তা দেখেছিল।

ইন্দ্রনীল বার হয়ে যেতেই সে ড্রয়ার পরিষ্কার করতে ঢুকলো।

চাবি দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটের ওপর থাকে, সৈকত চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে ফেললে।

মাগো, কি অপরিষ্কার। এখানে কতকগুলো কাগজ ছড়ানো, ওখানে কতকগুলো চিঠি তালপাকানো অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

সৈকত ড্রয়ারের ভেতরে যা কিছু ছিল সব বার করে ফেললে। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী ফিরে ইন্দ্রনীল যখন ড্রয়ার খুলবে তখন সে আশ্চর্য্য হয়ে যাবে ও তার মুখখানা তখন কি রকম হবে সেইটাই কল্পনা করে সৈকতের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কিন্তু তাল পাকানো পত্রগুলো তার দৃষ্টি আকৃষ্ট করে কেন?

মেয়েদের মনে কৌতূহল স্বভাবসিদ্ধ, একবার জাগলে কিছুতেই দমন করা যায় না; ওইটুকুই ওদের বিশেষত্ব। বিশেষ করে যে কোন মেয়ের সম্বন্ধে বিশেষ খবর নেওয়ার ইচ্ছা তাদের দুর্নিবার; এর পরেও কথা আছে—যে খবর নিচ্ছে সে যদি নিজে দেখতে কুৎসিত হয়। নিজের সম্বন্ধে সৈকত বড় বেশীরকম সচেতন নয়; সে জানে সে কুশ্রী, মানুষকে আকৃষ্ট করতে তার কিছু নেই, না রূপ—না গুণ।

তবু ইন্দ্রনীল তাকে সত্যই ভালোবাসে—এ ছিল তার পক্ষে অসীম সান্ত্বনা। তুলনা করতে গেলে সে ভারি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে নিজের কাছে, তাই ইদানীং সে তুলনা করা ছেড়ে দিয়েছে।

একখানা পত্র বিশেষ করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, পড়বে না মনে করেও সে পড়ে ফেললে।

পত্র আসছে রেঙ্গুন হতে, লিখছে মিস পার্ক নামে একটী মেয়ে—

অগ্রে প্রণয় নিবেদন, বিগত দিনের সুখস্মৃতি ভরা। সে যথেষ্ট দুঃখ করেছে—ভারতীয়েরা এমনই হয়—একবার পেছন ফিরলে আর কোন কথা তাদের মনে থাকে না। যাই হোক মিস পার্ক শিগ্‌গীরই ভারতে আসবে, তখন মিঃ চ্যাটার্জ্জি যে নিস্তার পাবে না এ কথা ঠিক।

শুধু কি এই একখানি?

কৌতূহল দমন করতে উপদেশ দেওয়া খুবই সহজ, কাজে কেউ প্রতিপালন করতে পারে না এই যা দুঃখ। পরের বেলায় সৈকতও অনেক উপদেশ দিয়েছে, হয় তো ভবিষ্যতে আরও অনেককে উপদেশ দেবে, কিন্তু নিজের বেলা সে উপদেশ তার কার্য্যকরী হয় নি।

একটার পর একটা—সে অনেকগুলি পত্র পড়ে গেল। অধিকাংশই বিলেতের মেয়েদের হাহুতাশপূর্ণ, অনেকেই আশা করছে—তারা সুযোগ পেলেই ইণ্ডিয়ায় আসবে, সে দিন মিঃ চ্যাটার্জ্জির মুক্তি নেই।

মেরুর হাতের লেখা অথচ নামহীন পত্রও পাওয়া গেল,—উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র।

স্তব্ধ হয়ে সৈকত ভাবছিল—বিয়ের পরও এ দেশের মেয়ে এমন মন রাখতে পারে—স্বামীর প্রাণভরা ভালবাসা স্নেহ তার জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত করতে পারে না। মনে পড়ল সেদিন কি একখানা পত্রিকায় জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি ভারতনারী ও পাশ্চাত্য সম্বন্ধে একটী দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে ফেলেছেন।

সে ভদ্রলোক জোর করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ভারতীয় আবহাওয়া এদেশে সীতার মত সতী মেয়ে, রামের মত সৎ ছেলে তৈরী করতে পারে। যখন বৈদেশিক শিক্ষা ও সভ্যতা তার চাকচিক্য নিয়ে এদের সামনে এসে দাঁড়ায়, প্রথমটায় এরা মুগ্ধ হলেও শীঘ্রই নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং যতই বিপথে যাক শেষে চলে আসে নিজের স্থানে।

সৈকত ভাবছিল এ কথা কি সত্য? মানুষ তর্কের সময় অনেক কিছু অসম্ভবকে সম্ভব বলে প্রতিপন্ন ক'রে, অনেক মিথ্যাকে তারা যেমন মেনে নিতে চায় কেবল জিতবার জন্যে—এও ঠিক তাই। মিথ্যাকে মিথ্যা জেনেও সে ভদ্রলোক জোর করে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন সে মিথ্যা নয়—সে সত্য।

হায় রে, জোর করলেই যদি মিথ্যা সত্য হতো—তা হলে তো কথাই থাকতো না, অনেক কিছুই সত্য হয়ে থাকত। ঐশ্বরিক শক্তিতেই হোক বা প্রকৃতির নিজের বিধানেই হোক—মিথ্যা—চিরকাল মিথ্যাই থেকে যায়। অতি ক্ষীণ সত্য ও টিঁকে থাকে অসীম শক্তিশালী মিথ্যার রাজত্বে, তবু সে বেঁচে থাকা সপ্রমাণ করে।

মেরু কি পায় নি? অসীম প্রেমময় স্বামী। সুন্দর সাজানো সংসার, সকলের ওপর তার ছেলে। তবু আজও সে লুব্ধার মত হাত বাড়াতে চায়, চাঁদ ধরার নেশা তার আজও কাটে নি।

এ পত্রখানাও সৈকত ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখলে।

আর একখানা বাংলা লেখা পত্রও বিশেষ করে তাকে আকৃষ্ট করলে,—নীচে থাম লেখা অভ্র।

এ কি পত্র—

পড়তে পড়তে সৈকতের সমস্ত দেহ, সমস্ত মন বার বার শিউরে উঠতে লাগল।

অভাগিনী—অভাগিনী—

বাংলার মেয়ে এমনি করেই বুঝি নিজের সর্ব্বস্ব হারিয়ে ভিক্ষা চায়?

দেহের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, বুকের রক্ত টগবগ করে ফোটে।

এই মেয়েটিকে একদিন ইন্দ্রনীল তার আত্মীয় স্বজনের কাছ হতে ঠিক সৈকতের মতই ছিনিয়ে এনেছিল, দুনিয়ায় তার স্থান কোথাও রাখে নি, মুখ দেখাবার পথ পর্য্যন্ত রাখে নি। এ মেয়েটিও সৈকতের মত সর্ব্বস্ব দিয়ে ইন্দ্রনীলকে ভালবেসে এসেছে, আজ এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তার সে ভালোবাসা মিলিয়ে যায় নি।

সন্তানের মা সে—কেউ তাকে আশ্রয় দেয় নি, সে যেখানে গেছে সেখান হতে তাড়িতা হয়েছে, তার সন্তানকে কেউ মেনে নিতে চায় নি, দুনিয়ায় তার হতভাগ্য সন্তানের স্থান নেই।

আজ সে তার সন্তানের জন্যে ভিক্ষা চাচ্ছে—যা হয় কিছু দাও, সে সন্তানের ক্ষুধা আর সহ্য করতে পারছে না, কারণ সে মা। তার সর্ব্বস্ব বিনিময়ে যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে, তাকে সম্বল করেই পথ চলবে—চাই শুধু তার খাদ্য।

সে সন্তান কার—অভ্রের, না ইন্দ্রনীলের? সে আজ আইনের সহায়তায় তার সন্তানের আহার্য্য আদায় করতে পারত, কিন্তু সে তা চায় না। ইন্দ্রনীল তাকে ভুলে গিয়ে থাকতে পারে—সে ইন্দ্রনীলকে ভোলে নি, তাই সে দুনিয়ার সামনে ইন্দ্রনীলকে হেয় অপদস্থ করবে না।

ইন্দ্রনীল সুখী হোক, স্বচ্ছন্দে থাক, সে গাছতলায় পড়ে থেকে ঘৃণিত জীবন যাপন করবে, কাউকে কোনদিন বলবে না এ সন্তান কার। শুধু সে চায় কয়টা করে টাকা—আজ তাই হবে তার নারীত্ব বিসর্জ্জনের চরম পুরস্কার।

সৈকত দুই হাতে মাথাটাকে চেপে ধরলে।

পৃথিবী কি ঘুরছে—এর রং কি বদলে গেছে? কোথায় গেল সব—বাড়ী, ঘর, মানুষ, পথ, ঘাট?

সৈকত টলতে টলতে এসে একখানা সোফায় বসে পড়ল।

নিঝুম—নিস্তব্ধ—তার দেহটাই শুধু নয়, মনটা পর্য্যন্ত এমনই নিঃসাড় হয়ে গেছে সে কিছু ভাবতে পারলে না। অতীত ও বর্ত্তমান কোথায় যেন অন্ধকারে লীন হয়ে গেল, ওদের আর হাত বাড়িয়ে যেন ছোঁওয়া যায় না।

কিন্তু বেশীক্ষণ নয়, মুহ্যমান হয়ে বেশীক্ষণ থাকা সৈকতের পোষায় না, তাই সে মুহূর্তে নিজের দুর্ব্বলতা জয় করে ফেললে।

সে সুন্দরী নয়—তাই বোধ হয় আঘাত সইবার অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা তার আছে। এই বয়সখানির মাঝে সে চলতে গিয়ে অনেক হারিয়ে এসেছে, সম্বল করার জন্য আজ কিছু নেই। হোক সে রিক্তা, হোক তার অন্তর মুহ্যমান, তবু সে দাঁড়াবে। ওই মিথ্যার মাঝে যেটুকু সত্য মিশিয়ে আছে সেটুকু সে নেবে।

দাঁতে ঠোঁটটা সে বড় বেশী জোরেই চেপে ধরেছিল, যাতে তার ঠোঁট কেটে খানিকটা রক্ত বার হয়ে যাওয়ায় সে সত্যই আরাম পেলে। এই রক্তই তার মাথায় উঠে বিপ্লব বাধিয়ে দিয়েছিল, সে কি করবে তা ঠিক করতে পারছিল না।

কেবল এই পত্রখানা নিজের কাছে রেখে আর সবগুলো সে যেমন তেমন করে ড্রয়ারে তুলে ফেলে চাবি দিলে, তারপর নিজের ঘরে ফিরে এল।

বিছানায় শুয়ে পড়ে সৈকত ভাবতে লাগল সেই অভাগিনী মেয়েটির কথা—

যতই ভাবতে লাগল—কেবল ইন্দ্রনীলের ওপরই নয়, সেই মেয়েটির ওপর পর্য্যন্ত দুর্জ্জয় রাগে সে ফুলতে লাগল।

এত নিঃসহায়—কেন? সৈকত এত অপমান সইতে পারে না, সইতে পারবে না—। যে সেই মেয়েটির নারীত্বকে অবহেলিত—পদদলিত করে চলে এসেছে, তারই কাছে সে কাতরভাবে তার সন্তানের জন্যে আহার্য্য চায়—কি নিষ্ঠুর এই নমনীয়তা, কি ভয়ানক এই সহ্যশীলতা, কি মর্ম্মঘাতী এই বর্ব্বর ভালবাসা। মানুষের মনুষ্যত্ব হয়ে গেল এখানে হীন—অতি ঘৃণিত, মানুষের কাছে মানুষের দাম রইল না।

কিন্তু উপায়—উপায়ই বা কি?

আজ যদি সৈকতের অদৃষ্টেও এ দিন আসে?

আসতে পারে কি—আসবে। সৈকত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে দিন এসেছে। কিন্তু সৈকত এমন দীনার মত চলে যাবে না, যা হয় কিছু করবে। কি করবে তার আজ কিছু ঠিক না থাকলেও সে একটা কিছু করবে। আত্মহত্যা নিশ্চয়ই করবে না, জীবনটা এমন কিছু সস্তা নয় যে একবার হারিয়ে আবার ফিরে পাবে।

হাতের পত্রখানার ওপর সে আবার চোখ রাখলে—তারপর দারুণ ঘৃণাভরে সেখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

প্রার্থনা করতে এসেছ নারী—প্রার্থনা? একদিন যেখানে ছিল অধিকার—যেখানে ছিল অক্ষুণ্ণ প্রতাপ, সেখানে আজ হাত বাড়িয়ে অতি সঙ্কোচের সঙ্গে পায় পায় এগিয়ে আসছ—চাচ্ছ অনুকম্পা? ধিক—ধিক। এ রকম ভাবে দীনতা প্রকাশ করার চেয়ে তোমার মরণই যে ছিল অতি বাঞ্ছনীয়, তার চুম্বনই যে ছিল অতি সুন্দর—অতি রমণীয়। ধিক্,—মরণকে বরণ করতে পারলে না—চাইলে ভিক্ষা?

মানুষের বাঁচতে হবে একথাটা সত্য, কিন্তু সে কি এমনি করে—এমনি দয়ার দানের ওপর নির্ভর করে?

সৈকত দুইহাতে মুখখানা ঢেকে পড়ে রইল, তার নিজের অবস্থা সে ভাবছিল, আর ভাবছিল—যদি সেদিন তার ভাগ্যে আসে, সে নীরবে সয়ে যাবে না, আত্মহত্যাও করবে না, নেবে নির্ম্মম প্রতিশোধ।

তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

(২৯)

একদিনের জন্যে বার হয়ে ইন্দ্রনীল ফিরে এল চারদিন পরে।

সৈকতের কাছে সে যখন এসে দাঁড়াল, তখন ঘৃণায় সৈকতের পা হতে মাথা পর্য্যন্ত রি রি করে উঠল, সে চোখ তুলে তার পানে চাইলে না।

অনুতপ্তভাবে ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে "আমার ওপর রাগ করেছ—অভিমান করেছ সৈকত? মাত্র একদিনের জন্যে গিয়ে চারদিন দেরী হয়ে গেছে, কিন্তু এ দোষ আমার নয়। মিঃ মিটার কিছুতেই—"

সৈকত বাধা দিয়ে বললে "থাক, কৈফিয়ৎ না দেওয়াই ভাল, আমি তো কৈফিয়ৎ চাই নে। তুমি যা করছ তা বেশ ভালই—অতি চমৎকার, কিন্তু তারই জন্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার দরকার দেখছি নে।"

তার কথার সুরে ঝাঁজের আভাষ পেয়ে ইন্দ্রনীল খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

তারপরই হো হো করে হেসে উঠল, দুই হাতে সৈকতকে ধরে বুকের কাছে টেনে এনে বললে "বুঝেছি অভিমান, কিন্তু—"

জোর করে নিজেকে তার আলিঙ্গনপাশ হতে মুক্ত করে তফাতে সরে গিয়ে সৈকত বললে, "না, অভিমানও নয়, দুঃখও নয়, কিছু নয়। আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারব না, কিছুতেই না, তাই তুমি আমার কাছে কোন কৈফিয়ৎও দিয়ো না,—আমার কাছেও আর এসো না।"

মুহূর্ত্তমাত্র তার পানে নিষ্পলকে চেয়ে থেকে ইন্দ্রনীল বললে "তোমার কথার মানে কিছুই বুঝতে পারলুম না, সৈকত।"

সৈকত উত্তর না দিয়ে কেবল ড্রয়ারটা দেখালে।—

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "মানে—?"

আরক্তমুখে সৈকত বললে, "মানে ওর মধ্যেই রয়েছে, আমায় কষ্ট করে বুঝাতে হবে না।"

ইন্দ্রনীল অকস্মাৎ হো হো করে হেসে উঠল, তার সে হাসি আর থামে না—।

সৈকত কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র তার পানে চেয়ে থেকে মুখ ফিরালে। দারুণ ঘৃণায় তার মুখখানা তখন বিকৃত হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রনীল হাসি থামিয়ে বললে, "বুঝেছি তুমি কি বলতে চাও। ওই পত্রগুলোর কথা বলছো তো, তোমার চোখে পড়েছে তাই? সত্যি যদি ওগুলো আমার লুকিয়ে রাখারই মতলব হতো সৈকত, আমি ড্রয়ারে কখনও রাখতুম না অমন করে ফেলে—এটা বেশ জেনে রাখো। কোন অতীত যুগের কি কয়টা চিহ্ন, তাই নিয়ে তুমি যে আজ এমন কাণ্ড বাধাবে তা কি আমি জানি?"

"অতীতের ঘটনা—?"

সৈকত আর বলতে পারলে না।

ইন্দ্রনীল বললে, "তা নয় তো কি? জানো না, বিলেতে যারা যায় তাদের জীবনে এমন অনেক কাণ্ডই ঘটে থাকে, কেবল আমারই একা নয়। তোমার দাদা শিগ্‌গীরই আসছে, যদি পার তার—জীবনের খোঁজ নিলে এমন অনেক কাহিনী পাবে। দোষ বিশেষ আমাদের নেই। এ দেশ হতে সমুদ্র পারে গিয়ে যখন পড়ি, তখন আমরা মনে করি পুরাণ-বর্ণিত স্বর্গে এসে পড়েছি। ওখানকার মেয়েরা—এ দেশে যাদের আমরা দশ হাত তফাতে রেখে চলি, তারা এমন কাছে আসে—এমন আপনার লোক হয়ে যায়, যাতে আমরা আর নিজেদের সংযত রাখতে পারি নে। পুরুষকে দোষ দেবে—নিশ্চয়ই দেওয়া উচিত; কারণ সত্যই তারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, সত্যই তাদের মধ্যে সংযম নেই—কিন্তু তবু তারা সংযত থাকতে পারে যদি মেয়েরা সংযমী হয়। কিন্তু ওখানে এ দেশের সতীত্বের আদর্শ খুঁজে মেলে না সৈকত, পড়েছ তো—তবু আসল রূপটা ওদের চোখে দেখ নি। ওই যে পত্রগুলো ড্রয়ারের মধ্যে পেয়েছ, সে এই রকম সব মেয়েদের পত্র। যখন সামনে ছিলুম খেলেছি, পেছন ফেরার সঙ্গে আমি ওদের কথা ভুলে গেছি, ওদের কথা মন হতে মুছে ফেলেছি।"

সৈকত রুষ্টকণ্ঠে বলে উঠল, "থাক থাক,—এখানা কার পত্র বল তো?"

সে উপাধানের তলা হতে একখানা পত্র ইন্দ্রনীলের সামনে ছড়িয়ে দিলে।

কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে ইন্দ্রনীল বললে, "বাঃ, এখানাও যে পেয়েছ দেখছি। নাঃ, এমন করে সব যদি এনকোয়ারি করতে সুরু কর সৈকত, সত্যি আমি বেচারা মারা যাব।"

সৈকত পলকহীন নেত্রে তার পানে তাকিয়ে রইল, তার চোখ দিয়ে আগুন ঝরছিল।

ইন্দ্রনীল একটু হেসে বললে "এখন তোমার এ-সব নিয়ে মাথা ঘামানো সত্যই অন্যায় সৈকত—"

"অন্যায়—"

দাঁতের ওপর দাঁত রেখে সৈকত বললে "অন্যায় অন্যায়ই বটে। ভণ্ড, কাপুরুষ—"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল।

সৈকত কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল—"হাসতে লজ্জা করছে না—ভীরু, কাপুরুষ? একটি মেয়ের সর্ব্বনাশ করে, একটি নির্দ্দোষ শিশুকে পৃথিবীর বুকে টেনে এনে, তাদের সম্পর্কে এই নিস্পৃহতা প্রকাশ করতে একটু লজ্জা করলে না?"

ইন্দ্রনীল মাথা দুলিয়ে বললে, "না, কেন না তাতে লজ্জা করবার কিছু নেই। আমি যা করেছি সৈকত, অনেকেই তা করে থাকে, এর চেয়েও বেশী করে তা জানো? আজ ওই মেয়েটি তার ছেলের জনকত্বের দোহাই দিয়ে আইনের সাহায্যে আমার কাছ হতে ভরণ-পোষণের খরচ আদায় করতে পারে। বিলেত হলে কি করত জানো—ওই শিশুটা যাতে পৃথিবীর বুকে না থাকে—"

সৈকত দুই হাত কাণে চাপা দিয়ে আর্ত্তভাবে বলে উঠল, "থাক থাক—"

টেবিলের ওপরেই ইন্দ্রনীলের রিভলভারটা পড়ে ছিল, সৈকত হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সেটা তুলে নিলে—

ইন্দ্রনীলের বুক লক্ষ্য করে সে গর্জ্জে উঠল "তোমায় গুলি করে মারব, প্রস্তুত হও। যেমন করে লোকে শেয়াল কুকুর মারে, তেমনি করে তোমায় মারব।"

ইন্দ্রনীল নিজের মনে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে "আঃ, সত্যি তা হ'লে খুবই ভালো হয় সৈকত। মারতে পারবে—হাত একটু কাঁপবে না? ধরলুম—গুলি না হয় করলে, তখন হয়তো মনে পড়ল না—গুলি করার পরের দৃশ্যটা কি রকম হয়; কিন্তু তার পরেই পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে দৃশ্যটা চোখের সামনে ফুটে উঠবে, একবার সেটার কথা ভাবো। রক্তে চারিদিক ভেসে যাচ্ছে, সে রক্ত—আমার বুকের রক্ত, যাকে তুমি নাকি প্রাণাপেক্ষা ভালবাস—তারই বুকের রক্ত। চমৎকার—গুলি করতে ভাল, চোখ বুজে ফায়ার করলেই হল, কিন্তু তার পরই দেখতে পাবে জগতে তোমার সবচেয়ে বেশী নির্ভরের স্থান—আরামের স্থান—এই বুকটাই তুমি বিদ্ধ করেছ। মরতে আমার এক বিন্দু কষ্ট নেই, কারণ আমার সব সাধ পূর্ণ হয়ে গেছে, আর কোন আকাজ্ক্ষা আমার নেই। তার পরও বড় কথা, তোমার হাতের গুলি আমার বুকে বিঁধবে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাব—সে আমার হবে শেষকালের সান্ত্বনা, কিন্তু বেঁচে থেকে আজীবনব্যাপী কি সান্ত্বনা তুমি লাভ করবে সৈকত?"

সৈকত নির্ণিমেষ চোখে তার পানে চেয়ে রইল—তার হাত হতে কাঁপতে কাঁপতে রিভলভারটা সশব্দে মাটিতে পড়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম করে শব্দ হল, গুলিটা ছিটকে দেয়ালে গিয়ে বিঁধল।

সৈকত বসে পড়ল, দুই হাতে মুখ ঢেকে সে থর থর করে কাঁপতে লাগল।

এগিয়ে গিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ইন্দ্রনীল বললে, "ভয় কি সৈকত, তোমার হাতের গুলি আমার বুক বিঁধতে পারে নি, বিঁধেছে দেয়ালটা—"

সৈকত জোর করে তার হাতখানা ছুড়ে ফেলে কম্পিতকণ্ঠে বললে "তা আমি জানি,—তোমায় বাঁচতে দিলুম। জগতে আরও অনেকদিন তোমার কাজের জের টেনে চলতে দিলুম। কিন্তু মনে হয় আজই তোমার শেষ করে দিলেই ভাল ছিল, অনেকগুলি মেয়ে বাঁচত।"

ইন্দ্রনীলের মুখে তার চিরাভ্যস্ত সুন্দর হাসি আবার ফুটে উঠল—

"বার বার একই কথা বলো না সৈকত, দোষ শুধু আমাকেই দিয়ো না, দোষ তোমাদেরও। তোমরা এসেছ কেন, কেন আমার পরে নির্ভর করতে চেয়েছ, নির্ভর করেছ? সকল মেয়েই তো মরে না—মরেও নি। বলতে পার—সুব্রতা মরেছে, সুমিত্রা মরেছে; সুব্রতাকে চেন—কিন্তু সুমিত্রাকে চেন না, তবু মিসেস সাহা সোমকে চেন। ওদের কাছে ইন্দ্রনীল ব্যর্থ হয়ে গেছে—ইন্দ্রনীল ওদের কাছে জয়লাভ করে সুখী হতে চায় নি, পরাজয়ের মধ্যে অসীম শান্তি, অসীম আনন্দ, অসীম সুখ পেয়েছে। তোমরা যদি সামান্য একটুও দিতে সৈকত—ওই ব্যর্থতা যদি আমায় দিতে—আমার জীবন সত্যকার সফলতায় ভরে উঠত।"

মুহূর্ত্ত মাত্র নীরব থেকে হাতের সিগারেটটা দূরে ছুড়ে ফেলে ইন্দ্রনীল বললে "কিন্তু পারলে না—তোমাদের ঘৃণা আমায় মানুষ করতে পারলে না, আমার পথ তাই পরিষ্কার হল না, পথে আরও কাঁটা বিছিয়ে পড়ল। ভেব না সৈকত—আমি তোমার কথা ভাবি নে। সারাদিন ছদ্মবেশে থেকে তোমাদের সঙ্গে মিশে নিস্তব্ধ রাত্রে বিছানায় যখন ক্লান্ত দেহখানা বিছিয়ে দেই, তখন অতীত আর বর্ত্তমানের অনেক কথাই মনে পড়ে, কত ছবি আমার মনে জেগে ওঠে জানো? অবিশ্রান্ত ঘটনা—ঠিক যেন বায়স্কোপের ছবি—আসছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দাগ তারাও রেখে যায়; সে রেখা ভেসে ওঠে সেই একান্ত আমার একা-বিছানাটিতে। ভবিষ্যতের ভাবনা তোমরা সবাই ভাব, আমি ভাবতে পারি নে—আমার যে ভবিষ্যৎ আমার অজ্ঞাতে মনের মাঝে ছায়া ফেলতে আসে, তাকে দেখে আমি শিউরে উঠি—আমি ভয় পাই। আমার উজ্জ্বলতম ভবিষ্যৎ এমন ভীষণভাবে চিত্রিত করলে কে জানো—তুমি একা নও, তোমারই মত উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসংযমহীন কতকগুলো মেয়ে—"

সৈকত একেবারে বিবর্ণ হয়ে বলে উঠল—"উচ্ছৃঙ্খল, আত্মসংযমহীন—?"

ইন্দ্রনীল বললে, "সহস্রবার—লক্ষবার। তোমাদের শিক্ষা তোমাদের সৎপথে চালনা করতে যে পারে নি, একথা অতি পামর—অতি নরাধম আমি, আমি পর্য্যন্ত জোর করে বলছি; তোমার শক্তি থাকে তুমি আমায় বাধা দাও, প্রমাণ কর আমার কথা মিথ্যে। তোমাকে দিয়েই বলছি সৈকত, তোমার শিক্ষা যদি যথার্থ সৎশিক্ষা হতো—কুমারী তুমি, আমার সঙ্গে দূরদেশে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী-রূপে বাস করতে পারতে না। না, খুব গৌরবের কথা এটা ভেব না সৈকত, মেয়েদের পক্ষে কতখানি অপমানের, কতখানি অগৌরবের সত্যকার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান দিয়ে যদি সেটা একবার ভাবতে। আমি অকস্মাৎ তোমায় ত্যাগ করব না; কিন্তু যদিই ত্যাগ করি, আজই সামনে যে রাত আসছে সে রাতে তোমায় কে আশ্রয় দেবে সৈকত? তুমি যেখানে এসে আজ দাঁড়িয়েছ—আশ্রয় মিলবে আমারই মত লোকের কাছে, যারা মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে। কিন্তু মাঝে আর দুটো মাস মাত্র, তার পরেই তুমি যাকে এই পাঁকের মাঝে কুড়িয়ে পাবে।"

"তুমি—তুমি এ কথা বলছ—তুমি—"

দুর্ণিবার বেদনায় দুই হাতে বুকখানা চেপে ধরে সৈকত উপুড় হয়ে পড়ল। চোখে জল এল না,—তার চোখ চিরদিনই শুষ্ক,—সে শুধু ছটফট করতে লাগল।

(৩০)

ইন্দ্রনীল অপলক দৃষ্টিতে তার পানে খানিক চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়তে পড়তে সে সামলে নিলে, স্থিরকণ্ঠে বললে "হ্যাঁ, আমিই বলছি। বলতুম না সৈকত, কারণ এত সুন্দরী মেয়ের মধ্যে কুৎসিতা তুমি—তবু তোমায় আমি সত্যকার ভালবাসি। তবু বললুম, কারণ তুমি আমায় নির্দ্দয়ভাবে আঘাত দিয়েছ।"

খানিক চুপ করে থেকে সে বললে, "যাক, এ কথার মীমাংসা এখানেই হয়ে যাক। মোট কথা এটুকু জেনো—আজ আর তোমার কোথাও যাওয়ার পথ নেই। আমার ঘৃণা অবজ্ঞা, আদর অনাদর সব সয়েও তোমায় এখানে থাকতে হবে—"

সৈকত উঠে বসল। চুলগুলো খুলে গিয়ে তার বুকে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল, দুই হাতে সেগুলো পেছনে সরাতে সরাতে সে গর্জ্জে উঠে বললে "কখনও না, আমি—"

বাধা দিয়ে মৃদু হেসে ইন্দ্রনীল বললে "কিন্তু আর উপায় নেই সৈকত,—পথ নেই। তোমার সন্তান অনাগত নয়, এসে পড়েছে, দুমাস পরে সে ভূমিষ্ঠ হবে। কোথায় দাঁড়াবে, কে তোমায় অন্ততঃ তখনকার মত আশ্রয় দেবে?"

সৈকত নতমুখে কি ভাবছিল।

ইন্দ্রনীল বললে, "এই খানটাতে এসেই মেয়েরা চমকে যায়, এই ভবিষ্যতের কথা ভেবেই তাদের বিয়ে করতে হয়, তাদের পরাধীনা হতে হয়, এ কথাটা এবার বুঝতে পারছ সৈকত? সন্তান আসে বলেই তারা আগে হতে হয় পরম স্নেহময়ী, অনাগত ভবিষ্যতের ভাবনাও তাদের ভাবতে হয়। এ দেশ বিলেত নয়, জারজ সন্তানদের জন্যে দেশে দেশে হোম এখনও তৈরী হয় নি। যা দুই একটা আছে, সেখানে যে সব শিশু লালিতপালিত হয়—বিশ্বে তারা চির পরিত্যক্তই থেকে যায়। তোমার সে ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান হয়ে সামনে এসেছে—তোমার সন্তানকে রক্ষা করতে, তাকে জনসমাজে পরিচিত করতে এখন আমার আশ্রয়ে থাকার দরকার।"

সৈকত মুখ তুললে—

ধীরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে "আমার সন্তান কি নামে পরিচিত হবে?"

ইন্দ্রনীল আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললে "যে নামেই হোক, পরিচিত হবেই।"

সৈকত তবু জিজ্ঞাসা করলে "তোমার ধর্ম্মপত্নী বলে আমায় গ্রহণ করতে পারবে, আমার সন্তান ধর্ম্মসঙ্গতভাবে তোমার সন্তান নামে পরিচিত হতে পারবে?"

ইন্দ্রনীল হেসে উঠল—

"কি বাজে বকছো সৈকত, আজ তোমার কি হয়েছে বল দেখি? যত রাজ্যের ভাবনা সব এসে জমা হয়েছে তোমার মাথায়, অথচ সে সব ভাবনার মাথামুণ্ড কিছু নেই। ধর্ম্মপত্নী কাকে বলে—দুটো মন্ত্র পড়া, বাহ্যিক অনুষ্ঠান করা; আজ তারই জন্যে এত লালায়িত হয়ে পড়লে? আমাদের অন্তরে যে মিলন হয়েছে, সেটাকে তা হলে সত্য বলে মানতে তুমি রাজি নও?"

মুক্তকণ্ঠে সৈকত বললে, "না, আজ রাজি হতে পারছি নে। যতদিন নিজের জন্যেই নিজের দরকার বুঝেছি, ততদিন খুসির খেয়ালে চলেছি, পেছন ফিরে কোনদিকে চাইবার দরকার হয় নি। কিন্তু আজ আমি নিজের দরকার বুঝছি মায়ের প্রয়োজন হয়েছে বলেই—তাই নিজের চেয়ে মায়ের দাম এখানে বেশী হয়েছে।"

একমুহূর্ত্ত নীরব থেকে ইন্দ্রনীল বললে "কিন্তু আমার পিতৃত্বের দাবী—"

বাধা দিয়ে ঘৃণাভরে সৈকত বললে "নেহাৎ মিছে কথা, আমায় উপস্থিত প্রবোধ দেওয়ার কথা। পিতৃত্ব, কিন্তু সে তো তোমার এই নতুন নয়। একটি অভাগিনী মেয়ে একটি শিশুকে নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে শিশুর আশ্রয় নেই, খাওয়ার সংস্থান নেই—মনে কর, সে সন্তান কার। আজ আমার কোলে যে আসছে, কে বলতে পারে—পাছে সে দাবী করে এই ভয়ে কাছে পেয়ে কোনদিন তুমি তার গলা টিপে দেবে কিনা, তাকে কিছু খাইয়ে দেবে কিনা।"

ইন্দ্রনীল হাসতে লাগল—

"বাঃ, এই যে, মা না হয়েই সন্তানের ভাবনা ভাবতে শিখেছ। সত্যি সৈকত, এই জন্যেই মেয়েদের আমার বড় ভাল লাগে। মাকে আমি আমার প্রাণের শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করে দেই। সন্তান জন্মের সম্ভাবনা হতে মেয়েরা কতখানি উদ্বেলিত হয়ে ওঠে তার জন্যে। তখন সে সব ভুলে যায়—মনে হয় না তখন সে মেয়ে, বোন, স্ত্রী—তখন হয় সে শুধু মা। চমৎকার—সত্যি বড় চমৎকার—"

সৈকত উত্তর দিলে না, তার পা হতে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে যাচ্ছিল। নিদারুণ অপমানে রাগে দুঃখে সে কি করবে—তা ভেবে পাচ্ছিল না।

ইন্দ্রনীল টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললে "কিন্তু দোহাই তোমার, আমার সম্বন্ধে অতখানি কুৎসিত ধারণা তুমি করো না। ছোট ছেলেমেয়েদের সত্যি আমি ভালবাসি। ওরা মোমে তৈরী হাত পা নেড়ে কি চমৎকার খেলা করে, কি চমৎকার হাসে, কাঁদে; কি চমৎকার চীৎকার করে। এতটুকু একটি শিশুকে তুলতে না পারলেও তার খেলা দেখতে, হাসি কান্না দেখতে সত্যি ভারি ভাল লাগে। মিছে কথা বলছি নে সৈকত, আমার মত লোকও পথ চলতে চলতে কোন শিশুকে কাঁদতে দেখলে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। অতটুকু শিশু-দেবতার পবিত্র আশীষ, তার আমি ক্ষতি করতে পারি, তাকে আমি মেরে ফেলতে পারি, এ ধারণাটাও তোমার মনে এল—এই আশ্চর্য্য।"

সৈকত এ লোকটির নির্জ্জলা ন্যাকামো আর সইতে পারলে না, শক্তভাবে বললে "হ্যাঁ, এ ধারণা আমার মনে আসে—আমার মনে হয়—তুমি সব পার—সব করতে পার, তোমার অসাধ্য কিছু নেই।"

ইন্দ্রনীল বললে, "আর তোমাদের অসাধ্য—?"

কথাটা বলেই সে সৈকতের পানে চাইল।

সৈকত আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বললে, "আমাদের সাধ্য—"

ইন্দ্রনীল বললে "আমাদের অসাধ্য কিছু নেই। একা তুমি নও সমস্ত মেয়েরাই এ কথা বলে থাকে; তেমনই আমরাও একথা বলতে পারি সৈকত—তোমরা মেয়ে, কিন্তু তোমাদের অসাধ্যও তো কিছু নেই সৈকত, বরং অতি অসম্ভবকে তোমরাই সম্ভব করে আনো। পৃথিবীর ইতিহাস খুলে তার পাতা উল্টে গেলে দেখা যাবে—দুনিয়ায় যা কিছু অকল্যাণ, সবই সাধিত হয়েছে তোমাদের দ্বারা। অত বড় দেশ ট্রয় ধ্বংস হয়ে গেছে, গ্রীস রোম ভারতবর্ষ, কোন জায়গাতেই তোমাদের ধ্বংসলীলা ফুটে উঠে নি? যাঁরা তোমাদের চিনেছেন তাঁরা তোমাদের প্রাণপণে এড়িয়ে গেছেন, তোমাদের জাতিটাকে আমল দিতে চান নি। ইতিহাস পড়েছ সৈকত—মনে করে দেখ দেখি, কোন জায়গায় তোমরা নেই—বাদ গেছ?"

সৈকত অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল "তুমি যাও,—যাও তুমি এখান হতে, আমি আর তোমার কোন কথা শুনতে চাই নে, একটি কথাও না—"

ইন্দ্রনীল সোজা হয়ে দাঁড়াল—

"চমৎকার, আমি এখনই চলে যাচ্ছি, কিন্তু একেবারেই যাব না, আবার খানিক পরে তোমার রাগটা পড়ে গেলেই আসব। যাই বল-যাই কর, এটুকু মনে করো সৈকত—আমি তোমায় বাস্তবিক ভালবাসি। তোমার জন্যে আমায় অনেক ক্ষতি সইতে হয়েছে, অনেক বন্ধু আমি হারিয়েছি, যেখানে গেছি সেখানে বিদ্রূপ শুনেছি—তবু

তোমায় আমি ছাড়তে পারি নি। আমাদের মত অপদার্থ লোকেরা এমন কাজ অনেকেই করে থাকে, আমিও যে করি নি তা নয়—সে প্রমাণ তুমি যথেষ্ট পেয়েছ। তবে এমন করে কাউকে কেউ একান্ত সান্নিধ্যে রাখেনি,—আমিও রাখি নি—যেমন করে তোমায় রেখেছি। তাই বলছি সৈকত, আমায় যতটা ভয়াবহ মনে করেছ, হয় তো ততটা নই, ওই সামান্য কোমলতাটুকু আমার মধ্যে থেকে আমায় নষ্ট করে ফেলেছে, নচেৎ বেশই থাকতুম। সংস্কার জিনিসটাই এমনি—ছাড়ালেও ছাড়তে চায় না, চিরন্তন অভ্যাসের মত অত্যন্ত সহজভাবে সঙ্গে থেকে যায়, সে যে আছে সে অস্তিত্ব শেষটায় আর জানাই যায় না। আচ্ছা, তোমায় আর বিরক্ত করব না এখন, খানিকটা একা থাক, তারপর আবার যখন দেখা হবে তখন নিশ্চয়ই তোমায় স্বাভাবিকভাবে দেখতে পাব।"

আস্তে আস্তে সে বার হয়ে গেল।

বদ্ধদৃষ্টিতে সৈকত দরজাটার পানে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ দুই হাতে মুখ ঢেকে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ল—উচ্ছ্বসিতভাবে সৈকত কাঁদতে লাগল।

এমনভাবে সর্ব্বহারার মত কান্না তার জীবনে এই প্রথম।

ইন্দ্রনীল যদি থাকত সে নিশ্চয়ই আশ্চর্য্য হয়ে যেত।

(৩১)

রাত্রে এসে ইন্দ্রনীল যখন দরজা ঠেললে—সৈকত কোনও সাড়া দিলে না।

তাকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক ভেবে ইন্দ্রনীল নিজের ঘরে ফিরে গেল।

জানালার ধারে চেয়ারখানা টেনে এনে সে বসে পড়ল—

নীচে বাগানটা ভরে গেছে চাঁদের আলোয়—বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। ওপরে আকাশে হাসছে শুক্লা দশমীর চাঁদ, আশে পাশে জেগে আছে কত লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র।

আজই সুমিত্রার একখানা পত্র পাওয়া গেছে।

অনেকদিনই চলে গেছে সে চলে যাওয়ার পরে—ইন্দ্রনীল তখন ব্লকে কখানা ঘর নিয়ে ছিল, তার এ বাড়ী তখনও ভাড়া দেওয়া ছিল। বিলেতে যাওয়ার সময় কয়টা বছরের মত বালিগঞ্জের এ বাড়ীখানা সে ভাড়া দিয়ে গিয়েছিল, মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সে নিজের বাড়ীতে এসে উঠেছে।

সুমিত্রার কথা আজও তার মনে পড়ে।

দীর্ঘনিশ্বাস সে রোধ করতে পারে না।

সত্যই মানুষের চৈতন্য ফেরে অবশ্য অনেক পরে, অনেক আঘাত সহ্য করে। অনেক ঠেকে যে অভিজ্ঞতা মানুষ লাভ করে, তার দাম অনেক—

সুমিত্রা সেই অভিজ্ঞতাই লাভ করেছে। জীবনভোর সে শান্তি ও তৃপ্তির আশায় কেবল মরীচিকার পেছনেই ছুটে বেড়িয়েছে, তৃষ্ণায় তার বুক ফেটে গেছে, অথচ এক ফোঁটা জল সে পায় নি।

ইন্দ্রনীল তুলনা করে সাহা সোমের সঙ্গে।

বেচারা ডাক্তার সোম—ভারি কষ্টই পাচ্ছেন। আজ কয়দিন হতে তাঁর অসুখ, কলকাতায় এসেছেন। খবর পেয়ে ইন্দ্রনীল কাল হতে তাঁকে দেখতে যাচ্ছে।

ওই আত্মভোলা লোকটির গভীর বুকের তলায় সর্ব্ব-ত্যাগিনী স্ত্রীর জন্যই যে এতটা স্নেহ ভালবাসা আছে, তা ইন্দ্রনীল জানত না।

মিসেস সোমের কাছে বরাবরই সে শুনে এসেছে—তাঁর স্বামী তাঁর সম্বন্ধে একেবারেই উদাসীন। অসুখ হলেও কোনদিন জিজ্ঞাসা করেন নি—কেমন আছ। অতি বড় দুঃখেই তিনি স্বামী সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। সুখী হয়েছেন কি?

কে জানে সে কথা। হয় তো সেই কঠিন হৃদয়ের তলায় অনেকখানি প্রেমই জমা হয়ে আছে, বাইরে হতে কেউ তার সাড়া পায় না—মাঝে মাঝে তর্কের মুখে অতি গোপনীয় কথা দুই একটা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মেয়েদের মনের আড়ালে অনেক কিছুই চাপা থাকে; ইন্দ্রনীল জানে তার নাগাল পাওয়া যায় না।

সুমিত্রা আজ পত্র দিয়েছে—

জানিয়েছে সে তার এ স্বামীকে ডাইভোর্স করেছে। জীবনে সে যথেষ্ট ভুল করেছে, জ্ঞান যে তার ফিরেছে তাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সে পবিত্র জীবন যাপন করতে মনস্থ করেছে, পরীক্ষা করে দেখেছে তার বর্ত্তমান জীবনটাই সব-চেয়ে শান্তিজনক।

একটা নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল ভাবছিল—হয় তো মানুষ

সত্যই সত্যপথ চিনতে পারে, ভুলের পথে জীবন নাট্যের যবনিকা দেয় না।

জীবনের পরে সত্যই ইন্দ্রনীলের বিতৃষ্ণা জেগে উঠেছে, ভোগ-বিলাসে তার অতৃপ্তি এসেছে। কৌষিকী, হিন্দোল, মেরু, স্বর্ণ প্রভৃতি মেয়েরা আজ তার কাছ হতে চিরবিদায় নিয়েছে—ওরা সব আজ তার কাছে মরে গেছে।

ওদের যৌবন যেন আর নেই—মেয়েদের মধ্যে বিশেষত্ব আজ সে খুঁজে পায় না। একান্তভাবে তার মন পেতে চাইছে এমন একটি মেয়েকে—যে সত্যকার নারী, মা, গৃহিণী। কিন্তু কোথায় সে, কোথায় সে মেয়ে?

হয় তো আছে। ইন্দ্রনীলের মন সে মেয়ের উপস্থিতি মেনে নেয়, কিন্তু তার থাকার জায়গাটা কল্পনা করে সে বিবর্ণ হয়ে ওঠে, মলিন হয়ে যায়। সে মেয়ে রয়েছে দুর্ভেদ্য দুর্গের মাঝখানে অত্যন্ত নিরাপদভাবে। সেখানে যাওয়ার যে পথ আছে সে পথও তেমনি দুর্গম,—সে দুর্গে পৌছাবার আয়াস সহ্য করার ক্ষমতা থাকা চাই, ধৈর্য্য থাকা চাই, সাধনা থাকা চাই।

কল্পনায় ইন্দ্রনীল সেই মেয়েটির মূর্ত্তি মনে আঁকে।

সে গৃহশ্রী, সে লক্ষ্মীমূর্ত্তি, সে অন্নপূর্ণা। বাইরের ভোগ-বিলাস তাকে স্পর্শ করতে পারে না—নিজের প্রাচুর্য্যে সে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, তার চারিদিকে তাই শূন্যতা নেই, আছে পূর্ণতা।

রিক্ততা তাকে স্পর্শ করতে পারে নি, বেদনা তার অনুভূতি নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে—ফাঁক পায় না, এত-টুকু অবকাশ সে মেয়ে কাউকে দেবে না।

ইন্দ্রনীল দেখতে পায় লাল শাঁখাপরা তার হাত দুখানি সুন্দর, পা দুখানি আলতায় লাল, আরও দেখতে পায়—তার সিঁথায় সিঁদুর জ্বল জ্বল করে জ্বলছে—

অকস্মাৎ সে চমকে ওঠে—এ কি, কার কথা বলছে সে—এ যে সেই মেয়েটি, যে আহত মেয়েটিকে বুকে চেপে ধরেছিল—

ইন্দ্রনীল নিজেকে ফিরানোর চেষ্টা করে।

সামান্য পল্লীবাসিনী সে—

কিন্তু মিথ্যা সান্ত্বনা—মন বলে ওরই মধ্যে সব মেলে,—সাহস, শক্তি, সংযম, শিক্ষা—

ছলনা নাই, চাতুরী নাই, আছে মুখের ওপর স্পষ্ট উত্তর দেওয়া—

কিন্তু সৈকত—

ইন্দ্রনীল অকস্মাৎ আড়ষ্ট হয়ে যায়।

নিজের ওপরও রাগ হয় কম নয়।

বেচারা সৈকত—কোথায় ছিল, কোথায় এসেছে। আজ যে মাতৃত্ব সে লাভ করছে, এ সে মেনে নিতে পারছে না-একে পেয়ে সে সঙ্কুচিত—লজ্জিত হয়ে উঠেছে।

অবহেলিত—ঘৃণিত মাতৃত্ব—

যখন সন্তান বড় হয়ে জানতে চাইবে তার বাপ কে—সৈকত যাকে দেখাবে সে খুসিমত বাপ হতে পারে মাত্র, অধিকার বোধ নেই।

চাঁদ ক্রমে পশ্চিমে ঢলে পড়ছিল, নারিকেল গাছটার আড়ালে পড়েছিল—বাতাসে সরু সরু পাতাগুলি ঝির ঝির করে কাঁপছিল, তারই ফাঁকে চাঁদটাকে দেখে নেওয়া যাচ্ছিল মন্দ নয়।

ইন্দ্রনীল তার দিকে তাকিয়ে ভাবছিল।

আকাশের বা চাঁদের সৌন্দর্য্য নয়, ভাবছিল সৈকতের কথা।

সত্যই সে সৈকতকে ভালবাসে। সে কুশ্রী হলেও তার অন্তর আছে, প্রাণের বিকাশ তার মধ্যে ফুটতে সে দেখেছে, ইন্দ্রনীল তার কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছে।

আর সৈকত?

সেও কি নিজের সর্ব্বস্ব ইন্দ্রনীলকে দেয় নি? ইন্দ্রনীলের আজ জগতে আশ্রয় মিলবে, কিন্তু সৈকতের আশ্রয় কোথায়? ইন্দ্রনীলের সব দোষ আবার ঢাকা পড়ে যেতে পারে কারণ সে পুরুষ, কিন্তু সৈকত—তার দোষ তো ঢাকবে না।

মেয়েরা পুরুষদের সমান অধিকার পেতে যতই দাবি দাওয়া করুক, তবু ওরা পুরুষদের সমান হতে পারবে না, তবু তাদের অনেক পেছিয়ে থাকতে হবে, কারণ তারা মা।

তারা জগতে এসেছে কুড়াতে—সঞ্চয় করতে—নিজের সমস্ত দিয়ে তারা যা পায় তা অতি সামান্য; কিন্তু তাই হয় তাদের শৃঙ্খল—কারণ সে তাদের মাতৃত্ব।

অভাগিনী সৈকত—

আজ তারই জন্য ইন্দ্রনীলের প্রাণটা কাঁদছিল। না, ওকে ইন্দ্রনীল কোথাও যেতে দেবে না, যাতে ওর কষ্ট হয়

তা সে করতে দেবে না ; তার স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে—সে তাকে ছেয়ে রাখবে।

চাঁদ আস্তে আস্তে ডুবে গেল, আকাশটা তখনও উজ্জ্বল রঙ্গে রঙ্গিন হয়েছিল।

দূরে পথ দিয়ে দুই একখানা মোটর ছুটছিল, হর্ণের শব্দটাই কাণে আসছিল মাত্র। বাড়ীর সামনে গেটের দুধারে কয়েকটি বড় বড় ঝাউ গাছের পাতা হতে অতি মিষ্ট সন সন শব্দ ভেসে আসছিল। রাত্রিচর দুই একটা পাখী অন্ধকারে গাছের পাতায় বসতে পাতার শব্দ শোনা গেল।

একটা নিশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল উঠে দাঁড়াল।

আবার আস্তে আস্তে এসে সে সৈকতের ঘরের রুদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল, কাণ পেতে শুনতে চেষ্টা করলে ভেতর হতে অন্ততঃপক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দটা শোনা যায় কিনা।

দরজায় টোকা দিয়ে ডাকলে—"সৈকত—"

উত্তর পাওয়া গেল না।

কি একটা অজানিত আশঙ্কায় হৃদয় মন পূর্ণ হয়ে উঠেছিল—ইন্দ্রনীল আবার দরজায় ধাক্কা দিলে,—ডাকলে "সৈকত"—

ভেতর হতে বিকৃত কণ্ঠে সৈকত উত্তর দিলে, "আছি, তোমায় মিনতি করছি আর আমায় বিরক্ত করো না, তুমি আজ রাত্রের মত আমায় নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে দাও।"

ইন্দ্রনীল অনুনয়ের সুরে বললে "তবু একটিবারের জন্যে দরজা খোল, আমার একটা দরকার আছে।"

সৈকত তেমনই আর্দ্রকণ্ঠে বললে "দরকার কাল হবে, আজ তুমি যাও।"

ব্যগ্রকণ্ঠে ইন্দ্রনীল আবার ডাকলে "সৈকত—"

সৈকত উত্তর দিলে "ভয় নেই, আমি মরব না, আত্মহত্যা করব না। একবারও সে কথাটা যে মনে হয় নি তা নয়, কিন্তু তারপরই ভাবলুম তোমার মত একটা খেয়ালীর খেয়ালে পড়ে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দেওয়ার মত বোকামী আর নেই। অনেক ভেবে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করেছি,—আমার সন্তানের জন্য আমায় বাঁচতেই হবে—যতদিন তার আমাকে দরকার হয় অন্ততঃ ততদিনের জন্য। যাও, আর আমায় বিরক্ত কর না।

ইন্দ্রনীল একটা নিশ্বাস ফেলে সরে এল।

পাগল মেয়ে—কেবল তোমারই সন্তান—ইন্দ্রনীলের কেউ নয়?

কেউ নয়—সত্যই কেউ নয়। ইন্দ্রনীল কেবল সেই শিশুকে কেন, সৈকতকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করতে পারবে। এমন কোনও আইন নেই—

কিন্তু ছি, এ সব চিন্তাই বা তার মনে জাগছে কেন?

ইন্দ্রনীল জোর করে অন্য চিন্তা মনে জাগাবার চেষ্টা করতে লাগল। (ক্রমশঃ)

জৈত্র-যাত্রা

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

হয় নাই কভু জড়ের মরণ, নাইরে মরণ চেতনার ;
সবাই অমর, বিকশিত নর—মথি' অন্তর বেদনার
যুদ্ধের পর আসিছে যুদ্ধ' জাগে প্রবুদ্ধ সুরবীর,—
উদয়ের পর আসিছে উদয়—উজ্জ্বল' তার দূর তীর।

বজ্রে প্রহত বিজয়-ডঙ্কা স্থিতি ভূকম্পে আগুয়ান,
ঝড়ের বাতাসে আসিছে শুদ্ধি ; ক্রুদ্ধ নহে রে ভগবান।
চূর্ণ রেণুর কণায়-কণায় গড়িয়া উঠিছে অসীমায়,
ভিত্তির পরে নূতন ভিত্তি অশেষ কীর্ত্তি মহিমায়।

গতিবিভঙ্গে বাড়িছে চেতনা বাধার আঘাতে-আঘাতে,
মথিত ধারায় প্রেমের ঊর্ম্মি নাচিছে তাহায় জাগাতে।
বিরহে মিলনে শিহরি'-শিহরি' উথলে মাধুরী জীবনের,
উদিছে বৃদ্ধি—আসিছে ঋদ্ধি—সাধিছে সিদ্ধি ভুবনের।

ভাঙ্গিয়া রুদ্ধ গুহার দুয়ার উৎসরে প্রীতি-নির্ঝর—
করিছে সিক্ত তৃষিত কণ্ঠ, করিছে জীর্ণে নির্জ্জর ;
দুহিয়া পীযূষ বক্ষে-বক্ষে তুলিছে দুঃখ-নবনী—
চোখের ধারায় করুণা গড়ায় প্রেমেতে জড়ায় অবনী।

সীমায় অধীর চলে সুরবীর জয়ের পতাকা তুলিয়া—
প্রসারিয়া প্রাণ কর গো মহান্, বাধা-ব্যবধান ভুলিয়া।

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করে ধন্য হব, কৃতার্থ হব, তিনি বাঙ্গালা দেশের নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন, দেশের লোক তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা করত, ভক্তি করত। তিনি পরলোকগত মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে কে না জানত, কে না চিনত? তিনি ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা; বরিশালের আবালবৃদ্ধ-বনিতা, ধনী নির্ধন সকলের তিনি পরমাত্মীয় ছিলেন,—সমস্ত বরিশাল জেলার লোক অশ্বিনীবাবুর কথায় উঠিত বসিত—তাঁহার জন্য প্রাণ দিতে পারিত। পূর্ব্ববঙ্গের সে সময়ের যুবক দলের কমাণ্ডার-ইন-চিফ ছিলেন অশ্বিনীবাবু। বরিশালের যত কিছু অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান সকলের অগ্রণী ছিলেন অশ্বিনীকুমার। অশ্বিনীকুমারই ছিলেন বাঙ্গালার স্বদেশী যজ্ঞের প্রথম পুরোহিত; তাঁহারই প্রেরণায় বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের আন্দোলন আরম্ভ হয়। তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, তাঁহার দেশহিতে উৎসর্গীকৃত জীবন, তাঁহার অকপট ধর্ম্মনিষ্ঠা, তাঁহার মহানুভবতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা সত্যসত্যই তাঁহাকে দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এতকাল পরে আমার সেই সোদরাধিক প্রীতিভাজন, আদর্শস্থানীয় সুহৃদের স্মৃতি-তর্পণ করছি।

সে ইংরাজী ১৮৮৭ অব্দের কথা—প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। আমি তখন এল-এ ফেল করে ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দে মাষ্টারী করি। মাষ্টারী করা ছাড়া তখন আমার উপায়ান্তর ছিল না; একটু রয়ে-বসে চেষ্টা-চরিত্র করলে, কিছুদিন কোন সরকারী আফিসে ঘরের খেয়ে শিক্ষানবিশী করলে হয় ত কোন একটা ভাল চাকুরী জুটতে পারত। কিন্তু তখন আমি এমনই বিপন্ন, আমার তখন অর্থের এমন প্রয়োজন হয়েছিল যে, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এল-এ ফেল করে তার পরবৎসরই আমাকে চাকুরীতে প্রবিষ্ট হ'তে হয়েছিল। যে বৎসর আমি এল-এ ফেল করলাম, সেই বৎসরই আমার একমাত্র কনিষ্ঠ সহোদর শশধর আমাদের গ্রামের ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। আমি বৃত্তি পেয়েছিলাম, তাই দুই বৎসর কলেজে পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; আমার ভাই শশধর বৃত্তি পান নাই। তাঁরই পড়াবার খরচ সংগ্রহের জন্য আমাকে মাষ্টারী চাকুরী গ্রহণ করতে হয়েছিল। আমার ছোট ভাই শশধর খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। কেন যে তিনি ভালভাবে পাশ করতে পারলেন না, তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমরা দুই ভাই; শশধর আমার আড়াই বছরের ছোট ছিলেন। তাঁর বয়স যখন ছয় মাস, তখন আমরা পিতৃহীন হই; বড় হয়ে তিনি আমাকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভাই বলে যে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, আমাকে তিনি তাঁর জীবনের অবলম্বন বলেই মনে করতেন। তাই, আমি যখন ফেল হলাম, আর তিনি পাশ হলেন, তখন তিনি জেদ করতে লাগলেন যে, আমি আর এক বৎসর পড়ি। তিনি পড়াশুনা ত্যাগ ক'রে পনর কুড়ি টাকার একটা মাষ্টারী কি অন্য চাকুরী নিয়ে আমার পড়ার খরচ চালাবেন এবং নিজেও ঘরে পড়াশুনা করে মোক্তারী পরীক্ষা দেবেন। পিতৃহীন একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার এ প্রস্তাব আমি গ্রহণ করতে পারি নাই—আমি যে তার দাদা—সে যে আমার বড় আদরের পিতৃহীন ছোট ভাই। আমাদের সংসারের কর্ত্তা, আমাদের বড় দাদা শশধরের এই প্রস্তাব অনুমোদন করেছিলেন; কিন্তু আমি আমার পর পূজনীয় বড় দাদার আদেশ অমান্য করেছিলাম।

তখন বড় দাদা গোয়ালন্দের ফৌজদারী আদালতের পেস্কার ছিলেন, পরে হেড ক্লার্ক হন। তিনি চেষ্টা করে আমাকে গোয়ালন্দ স্কুলের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করিয়ে দিলেন। বেতন হোলো নগদ চব্বিশ টাকা পনর আনা—অর্থাৎ বেতন পঁচিশ টাকাই হোলো, তার থেকে মাইনে প্রাপ্তির রসিদ ষ্ট্যাম্পের দাম এক আনা কেটে নিয়ে স্কুলের কর্ত্তারা আমাকে চব্বিশ টাকা পনর আনা দিতেন। কলেজে পড়বার সময় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণের বক্তৃতা শুনে, স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করব, ম্যাট্‌সিনি গারিবল্‌ডি হব, দেশের মধ্যে দশজনের একজন হব বলে আকাশে যে

বাড়ী তৈরী করতাম, এক আঘাতে তা চূর্ণ হয়ে গেল—ভবিষ্যৎ দেশ-সেবার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল—বিধাতার বিধানে আমি হলাম এক গ্রামের স্কুলের পঁচিশ টাকা বেতনের থার্ড মাষ্টার। কি করব, ঐ কয়টী টাকা না হলে যে আমার ছোট ভাইয়ের কলেজে পড়া বন্ধ হয়। তাই, আমি ঐ ready-made চাকরী নিতে বাধ্য হয়েছিলাম—অপেক্ষা করবার আমার সময় ছিল না।

আর এই মাষ্টারী চাকুরীটি বেশ! ও-কাজের জন্য কোন প্রকার আয়োজন করতে হয়না, শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় পাশ বা ফেল হ'লেই মাষ্টারী করবার সনন্দ পাওয়া যায়। অমন সোজা চাকুরী আর নেই; একদিনের জন্যও মাষ্টারীর শিক্ষা গ্রহণ করতে হয় না। ছেলে পড়ানো বিদ্যাটা আমরা এতই সহজ করে নিয়েছিলাম! ওর জন্য সাগরেদী করতে হয় না—একেবারে ওস্তাদ শিক্ষক। তা, যাই বলি না কেন, ঐ সহজপ্রাপ্য (এখন কিন্তু দুষ্প্রাপ্য) চাকুরীর পথ খোলা ছিল ব'লে আমাদের মত ফেল করা মূর্খেরাও পার হয়ে গিয়েছিল।

থাকুক সে কথা। ১৮৮১ অব্দে পঁচিশ টাকা বেতনে গোয়ালন্দ স্কুলে থার্ড মাষ্টার হয়েছিলাম। দাদার কাছে থাকি, কোন ভাবনা নেই। মাইনের টাকা এনে বৌদিদির হাতে দিই; তিনি আমার ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ পাঠিয়ে দেন। খাই দাই, ছেলে পড়াই, পূর্ব্ব সংস্কার-বশে স্বদেশীও করি, ছেলেদের নিয়ে সভাসমিতি করি, বড়দের সঙ্গে মিশে দেশোদ্ধারেরও পাণ্ডাগিরি করি। গোয়ালন্দের উকিল মোক্তার, বড় বড় কর্ম্মচারী সকলেই আমাকে ভালবাসতেন ও আদর করতেন, কারণ আমি বাল্যকাল থেকেই গোয়ালন্দে ছিলাম। গোয়ালন্দের মাইনর স্কুল থেকেই পরীক্ষা দিয়ে পাঁচ টাকা বৃত্তি পাই, তারপর অবস্থা-বিপর্য্যয়ে সেই মাইনর স্কুল এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হলে আমি শিক্ষক হয়ে আসি। এই জন্যই আমি সকলের কাছে আবদার করতে পারতাম এবং তাঁরা সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতেন।

সেই যে ৮১ অব্দে ২৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টারী আরম্ভ করেছিলাম, ৮৫ অব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আমার সে মাইনে আর বাড়েনি। ঐ সালের শেষ ভাগে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষের শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। তাঁরা আমার বেতন ৫৲ টাকা বাড়িয়ে দিলেন। এ যে আমার যোগ্যতার পুরস্কার, সে কথা মনে করবেন না বন্ধু! পাড়াগাঁয়ের স্কুলের মাষ্টারদের যোগ্যতার পুরস্কার তখনও কেউ দেয়নি; এখনও দেয় না। আমার এ বেতন বৃদ্ধির কারণ এই যে স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষরা নানাভাবেই জানতে পেরেছিলেন যে আমাদের দরিদ্র সংসারে আর একটী লোক বৃদ্ধি হয়েছে। সেই নবাগত লোকটীর খোরাকি বাবদ তাঁরা আমার ৫৲ টাকা বেতন বৃদ্ধি করে দেন। সে নবাগত আর কেহ নন—আমার স্ত্রী। সেই বৎসরের প্রথম ভাগে আমি বিবাহ করি।

এইবার আসল কথা বলি। ১৮৮৬ অব্দের শেষ ভাগে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা নগরীতে জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে আমি গোয়ালন্দের জনসাধারণ কর্ত্তৃক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হয়ে যাই। তখনও কিন্তু আমার মধ্যে ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্ডির অস্তিত্ব লোপ পায়নি। ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস্ হয়। আমাদের দেশপূজ্য উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji) সেই কংগ্রেসের সভাপতি হন। তিনিই দ্বিতীয় বৎসরের কংগ্রেসকে কলিকাতায় আহ্বান করেন। দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন সর্ব্বজনমান্য দাদাভাই নৌরজী মহাশয়, অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়। দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই কংগ্রেসে যোগদান করেন, এমন কি মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় পর্য্যন্ত এই কংগ্রেসে বক্তৃতা করেন। আমি গণ্যমান্য না হলেও আমার প্রবাস-স্থানের প্রতিনিধি হয়ে এই কংগ্রেসে যোগ দিই।

প্রথম দিনের কংগ্রেসের অধিবেশন হয় টাউন হলে। কলিকাতার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি মনে করেছিলেন নানা স্থানের প্রতিনিধি ও দর্শকে এত অধিক লোক হবে যাদের স্থান ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে না হতে পারে।

কোন প্রকারে প্রথম দিনের কার্য্য শেষ হয়ে গেল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ও মূল সভাপতি তাঁদের অভিভাষণ পাঠ করলেন। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন গৃহে হল। সেইদিনের সভা শেষ

হওয়ার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ জলদ্‌গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন যে পরদিন টাউন হলে আবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে।

পরদিন যথাসময়ের পূর্ব্বেই টাউন হলে গেলাম। পূর্ব্ব দুই দিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলাম, তারি জন্যই সভারম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে টাউন হলে উপস্থিত হয়েছিলাম। আর সেই জন্যই প্রতিনিধিদের নির্দ্দিষ্ট আসনের প্রথম শ্রেণীতেই স্থান সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। তাতে আমার পক্ষে দেখা-শোনার যথেষ্ট সুবিধা হয়েছিল। প্রথম দিনের অধিবেশন আরম্ভ হবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বেই দেখতে পেলাম একটী গৌরবর্ণ যুবক মঞ্চের উপর এবং মঞ্চের চারিপাশে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন। যুবকটী দেখতে যেমন সুন্দর, তাঁর পরিচ্ছদও তেমনি পরিপাটী; দেখলেই বুঝতে পারা যায় তিনি খুব সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান। চোখে সোনার চশমা, গায়ে লম্বা একটা কোট, গলায় একটা আলোয়ান জড়ানো—সেই আলোয়ানের উপর দু-দুটো ব্যাজ্—একটী অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যের, আর একটী প্রতিনিধির। আর তিনি যে ভাবে বড় বড় রথীদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, সম্ভ্রান্ত অভ্যাগতদিগকে অভ্যর্থনা করছিলেন, তা দেখে বুঝতে পারলাম যে তিনি যুবক হলেও কংগ্রেসের একজন বড় পাণ্ডা। আমার পার্শ্বে যে বাঙ্গালী প্রতিনিধিটি বসে ছিলেন, তাঁকে ঐ যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে তিনি অবাক্ হয়ে বল্লেন, সে কি মশায়!—ওঁকে আপনি চেনেন না। উনি বরিশালের অশ্বিনীবাবু। আমি বিনীতভাবে বল্লাম, ওঁর নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু পাড়া-গাঁয়ে থাকি, তাই চিনতে পারি নি।

অনেকের স্বভাব আছে লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করে। আমার সে স্বভাব মোটেই তখনও ছিল না, এখনও নেই। আমি কারও সঙ্গে আপনা হ'তে আলাপ জমাতে পারিনে, এখন তো মোটেই পারিনে,—যৌবন কালেও পারতাম না। কাযেই দেশমান্য অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হোলো না। আমি সেই সৌম্যমূর্ত্তি যুবককে দূর থেকে দেখেই তৃপ্তি লাভ করলাম।

যথাসময়ে সভা আরম্ভ হ'ল। সেইদিনের দুইটি ঘটনা আমার বেশ মনে আছে। তার মধ্যে একটী—উত্তরপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধ অন্ধ জমীদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সভায় আগমন। দুইজন লোকের স্কন্ধে ভর দিয়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয় যখন মঞ্চের উপর এলেন তখন সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি তাঁকে চিনতাম না—তবুও সকলের দেখাদেখি আমিও দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। আমার পাশের সেই ভদ্রলোকটীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম—ইনিই সুপ্রসিদ্ধ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ক্ষীণ কণ্ঠ হ'তে যে বাণী প্রদত্ত হোলো, তার একটী কথা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারছিনে। অশীতিপর অন্ধ বৃদ্ধ বল্লেন—It is no wonder that objects such as these should have drawn distinguished gentlemen from all parts of the country when you find a blind old man like myself of 79 years of age bending under the infirmities of age, taking a part in the deliberations.

আর একটী যুবক সেদিন সত্যসত্যই আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিলেন। একটী প্রস্তাব সমর্থন করবার জন্য যখন তিনি মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন তখন সমবেত প্রতিনিধি ও দর্শক মণ্ডলী অবাক হয়ে সেই মূর্ত্তির দিকে চেয়ে রইলেন। যুবকের বয়স তখন পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর। পায়জামা-পরা, গায়ে লম্বা সাদা চাপকান, একখানি সাদা চাদর গলায় জড়িয়ে তার দুই প্রান্ত বুকের উপর দুইপাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, মাথায় পাগড়ী, কপালে শ্বেত চন্দনের ফোঁটা। সত্যসত্যই অপূর্ব্ব-দর্শন মূর্ত্তি। তিনি এসে দাঁড়াতেই আমি পাশের সেই ভদ্রলোকটীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম,—তিনি বল্লেন—চিনিনে মশায়, বোধ হয় পাঞ্জাবী কেউ হবে। তখন আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবার অবকাশ পেলাম না। যুবকটী গম্ভীর স্বরে টাউন হলের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। আর বক্তার কি উদাত্ত স্বর।—এই বৃদ্ধ বয়সেও সে দৃশ্য যখন মনে করি তখন আমি অতুল আনন্দ উপভোগ করি। এই যুবকের নাম অধুনা বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় মহাশয়। তিনি তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের উদীয়মান ব্যবহারাজীব।

কংগ্রেসের কথা এইখানেই শেষ করি।—ভারত উদ্ধার করে যথাকালে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম।

আবার সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই একঘর। রাজনীতি তখন ধামা-চাপা রইল। সংসারযাত্রা যথানিয়মে চলতে লাগলো।

ডিসেম্বর মাসের শেষে কংগ্রেস হয়ে গেল। জানুয়ারীর প্রথম ভাগে একদিন বিকেল বেলা আমার একটী প্রিয় ছাত্র আমার কাছে এসে বললেন যে, তিনি বরিশালের অশ্বিনী বাবুর কাছ থেকে একখানি পত্র পেয়েছেন। আমার এই ছাত্রটির নাম শ্রীমান পঞ্চানন ব্রহ্মচারী। এঁর বাড়ী বরিশালে এবং ইনি অশ্বিনীবাবুর অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাতুল বা কেউ গোয়ালন্দে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন, পঞ্চানন সেইখানে থেকে আমাদের স্কুলে পড়তো। তারি কাছেই ইতঃপূর্ব্বে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছিলাম। সে সময়ে একটী ব্যাপার দেখতে পেতাম, অশ্বিনী বাবুর ছাত্র, বন্ধু ও শিষ্যেরা যেখানেই যেতেন সেখানকারই আবহাওয়ার একটা পরিবর্ত্তন সাধিত করতেন—এমনই তাঁদের চরিত্রবল ছিল—এমনই উচ্চ আদর্শে তাঁরা গঠিত হয়েছিলেন।

শ্রীমান পঞ্চাননও সেই প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান আচার্য্য, আমার পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনও কলিকাতায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করে পঞ্চাননের গুণগান করেন। আর তার চরিত্র-মাধুর্য্য যে আমিই বিকশিত করে দিয়েছিলাম এ-কথা বলে আমাকে লজ্জিত করেন। প্রকৃতপক্ষে পঞ্চাননের জীবন অশ্বিনী বাবুর আদর্শে ই গঠিত হয়েছিল।

যাক্ সে কথা। পঞ্চানন আমাকে বললেন যে, অশ্বিনী বাবু কংগ্রেসের মত প্রচারের জন্য অতি শীঘ্রই ফরিদপুর ও ঢাকা অঞ্চলে আসবেন। তাঁর ইচ্ছা যে গোয়ালন্দে একদিন সভা করে কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করেন। তিনি লিখেছেন যে, গোয়ালন্দে তাঁর পরিচিত কেউ নেই, তবে বিগত কংগ্রেসে গোয়ালন্দ থেকে আমি প্রতিনিধি হয়ে গিয়েছিলাম—কংগ্রেসের কাগজপত্রে এ-কথা তিনি দেখেছেন। আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি কি না এই কথা তিনি জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন এবং এক দিনের জন্য তাঁর অবস্থানের কি সুবিধা হবে সে কথাও পঞ্চাননের কাছে জানতে চেয়েছেন। এ নিতান্তই অপ্রত্যাশিত অভাবনীয় ব্যাপার। যে অশ্বিনীকুমারকে কংগ্রেসমণ্ডপে দেখে তাঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করবার বাসনা আমার মনে উদিত হয়েছিল, সেই অশ্বিনীকুমার অযাচিতভাবে আমার সাহায্য চান এবং আমার আতিথ্য গ্রহণ করতেও উৎসুক।

অশ্বিনীকুমারের নির্দ্দিষ্ট দিনে গোয়ালন্দে সভার ব্যবস্থা আমি অনায়াসেই করতে পারি। কিন্তু তাঁর মত বড়-মানুষের ছেলেকে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে একদিনের জন্যও আতিথ্য গ্রহণ করবার অনুরোধ করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হ'ল। তখন পঞ্চাননকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে আমি বাড়ীর ভিতর বড়দাদার কাছে গেলাম। তাঁকে সব কথা বলতে তিনি বল্লেন—তাই তো—কি করা যায়! আমাদের এই ছোট চালা ঘর—খড়ের চাল—দরমার বেড়া। এ কুঁড়ে ঘরে তাঁর মত মহামান্য অতিথিকে ডেকে আনি কি করে?

বড়বৌদিদি বল্লেন—তাতে কি হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বিদুরের ক্ষুদ খেয়েছিলেন। ঠাকুরপো, তাঁকে আসতে লিখে দাও। আমরা প্রাণপণে তাঁর অভ্যর্থনা করব। কি বলিস সেজো। এই বলে তিনি তাঁর পশ্চাতে দণ্ডায়মান আমার স্ত্রীর গায়ে ঠেলা দিলেন। বড়দাদার সম্মুখে তো তিনি আর কথা বলতে পারেন না—ঘাড় নেড়ে বৌদিদির প্রস্তাবে সম্মতি দান করলেন। আমি উৎফুল্লচিত্তে বাইরে এসে পঞ্চাননকে বললাম দেখ পঞ্চানন, অশ্বিনীবাবু হয়ত মনে করেছেন—আমি গোয়ালন্দের অতি গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি। তুমি তাঁর সে ভ্রম ঘুচিয়ে দাও। তাঁকে লেখ, আমি ২৫ টাকা মাইনের গরীব স্কুল-মাষ্টার। আমার ঘর সত্যসত্যই কুটীর। তিনি এই সব শুনে যদি আমার বাড়ীতে পদধুলি দেন—আমি ধন্য হয়ে যাব—কৃতার্থ হয়ে যাব। তুমি তাঁকে চিঠি লেখ—আমিও কাল তাঁকে চিঠি লিখবো।

পঞ্চানন অশ্বিনীবাবুকে কি লিখেছিল জানিনে—খুব সম্ভব আমি যা বলেছিলাম তাই লিখেছিল। আমিও ঐভাবেই বরিশালে অশ্বিনীবাবুকে পত্র লিখেছিলাম। তার উত্তর তিনি আমাকে যা লিখেছিলেন—সে কথাগুলো ঠিক ঠিক বলতে পারব না—তবে এটুকু বেশ মনে আছে যে তিনি আমাকে "তুমি" বলে সম্বোধন করে লিখেছিলেন যে, গোয়ালন্দে যদি ঢাকার মাননীয় নবাব বাহাদুরের রাজ-প্রাসাদ থাকতো—আর সেখান থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ

আসতো, তা হলেও তিনি সে নিমন্ত্রণ অস্বীকার করে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আসতেন।

তার পাঁচ ছয় দিন পরে এক বুধবারে অশ্বিনীবাবুর পত্র পেলাম। তিনি পরবর্ত্তী শনিবার প্রাতঃকালে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপস্থিত হবেন, আমি যেন সেইদিন অপরাহ্ণে সভা করবার ব্যবস্থা করি এবং তাঁকে আমার বাড়ীতে নিয়ে আসি।

যথানির্দ্দিষ্ট শনিবারের প্রত্যুষে মেল গাড়ীতে অশ্বিনীবাবু গোয়ালন্দ ষ্টেশনে পৌছিলেন। একটী চাকর ব্যতীত সঙ্গে আর কেহ ছিল না। তাঁর আসবার দুইদিন আগে থেকেই আমরা সভার বিজ্ঞাপন ও নিমন্ত্রণ-পত্র সকলকেই দিয়েছিলাম। বাজারের নিকট প্রশস্ত ময়দানে সভার স্থান করা হয়েছিল। আমরা স্থির করেছিলাম উন্মুক্ত আকাশতলেই সভা হবে, কিন্তু বাজারের আড়তদার ও দোকানদারগণ সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। তাঁরাই সভামণ্ডপ প্রস্তুত করার ভার নিলেন, আর আমার প্রকাণ্ড রেজিমেণ্ট স্কুলের ছাত্ররা তাঁদের সহায়তা করতে লাগলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র ও বিজ্ঞাপন প্রচারের ভার স্কুলের ছাত্ররাই গ্রহণ করেছিলেন।

গোয়ালন্দের সর্ব্বপ্রধান উকিল যাদবচন্দ্র সরকার মহাশয় সভাপতির পদ গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন ও শনিবার প্রত্যূষেই ষ্টেশনে গিয়ে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করবেন এ কথাও স্থির হয়েছিল। আমাদের আরও একটা সুবিধা হয়েছিল। শনিবার কি উপলক্ষে অফিস আদালত স্কুল সমস্তই বন্ধ ছিল। তার জন্য আমাদের লোকবলও বেড়েছিল এবং ষ্টেশনে অশ্বিনীবাবুর সংবর্দ্ধনার বিপুল আয়োজনও আমরা করতে পেরেছিলাম।

শনিবার প্রত্যূষে সত্যসত্যই ষ্টেশনে লোকারণ্য হয়েছিল। গোয়ালন্দের গণ্যমান্য ব্যক্তি সকলেই সেই শীতেও ষ্টেশনে সমবেত হয়েছিলেন। আড়তদার, দোকানদার মুটে মজুর সবাই বরিশালের অশ্বিনীবাবুকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল, আর আমাদের স্কুলের আড়াই শত ছেলে লাল নিশান হাতে করে ষ্টেশনের সম্মুখে সারি বেঁধে দাঁড়িয়েছিল। যথাসময়ে গাড়ী ষ্টেশনে পৌছিলে একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী থেকে নামবার পূর্ব্বেই যাদববাবু গাড়ীর ভিতর উঠে তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা করে প্লাটফরমে নামালেন। তখনও বন্দে-মাতরম্ দেশে আসে নি, কাযেই সমবেত জনমণ্ডলী করতালি দিয়েই এই মহামান্য অতিথিকে অভ্যর্থনা করলেন।

অশ্বিনীকুমার গাড়ী থেকে নামলে, সুমুখে যাঁরা ছিলেন যাদববাবু তাঁদের সঙ্গে অশ্বিনীবাবুর পরিচয় করিয়ে দিলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর অশ্বিনীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কই, জলধর কই? এ সমস্ত ব্যাপারে আমি কোনদিনই এগিয়ে দাঁড়াই নে—তখনো দাঁড়াতাম না, এখনও না। আমি সে সময় কতকগুলি লোকের পিছনে দাঁড়িয়েছিলাম।

অশ্বিনীবাবুর প্রশ্ন শুনে যাদববাবু এদিক ওদিক চেয়ে দেখলেন যে আমি পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছি। তিনি তখন দৌড়ে গিয়ে আমাকে টেনে অশ্বিনীবাবুর সম্মুখে এনে বললেন—এই নিন আপনার জলধর।

অশ্বিনীবাবু সহাস্যমুখে বললেন—কথাটা ঠিক হোলো না—বলুন, এই নিন আমাদের জলধর। সকলে আনন্দধ্বনি করে উঠলেন। আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিতে গেলাম। তিনি হো হো করে হেসে বললেন—পায়ে কি আর এখন ধুলো আছে ভাই—এই বলেই আমাকে কোলের ভিতর জড়িয়ে ধরলেন—প্রণাম আর করা হোলো না।

ষ্টেশনের বাইরে এসে কে একজন বললেন, আপনার জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সদা-প্রফুল্ল-বদন অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করলেন—জলধরের বাড়ী এখান থেকে ক' ক্রোশ?

যাদববাবুই জবাব দিলেন—ক্রোশ তো নয়—আধ মাইলেরও কম।

অশ্বিনীবাবু বললেন—আপনারা ভুলে যাচ্ছেন আমি বরিশালের বাঙ্গাল অশ্বিনী দত্ত। এখনও প্রতিদিন সকালে উঠে আমি তিন চার ক্রোশ হাঁটি। তখন সকলে মিলে হাঁটতে হাঁটতেই আমার বাসায় এলেন। আমার বড় দাদা ষ্টেশনে যান নি, বাড়ীর ব্যবস্থাতেই ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আমাদের বাসার সম্মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমরা সকলে নিকটস্থ হলে যাদববাবু দাদাকে দেখিয়ে বললেন—ইনিই জলধরের দাদা দ্বারিকবাবু—আজ আপনি এঁরই অতিথি। বড়দাদা নমস্কার করবার জন্য হাত তুলতেই অশ্বিনীবাবু

নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন। তার পরই দাদা অতি মৃদু স্বরে বললেন—আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনি দয়া করে আমাদের বাড়ীতে এসেছেন।

সে কথার উত্তরে তিনি যা বললেন তা তাঁর মত সদাশয় মহৎ হৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। তিনি বললেন—আমি কি আপনার বাড়ী এসেছি। আমি আমার বাড়ীতেই এলাম—কোন শিষ্টাচার দেখাবেন না দাদা। আমি আপনার ছোট ভাই অশ্বিনী।

এমন করে কেউ যে নিতান্ত অপরিচিত ব্যক্তিকে একান্ত আপনার জন করে নিতে পারে, এ আমি পূর্ব্বে কখনো দেখি নি। অশ্বিনীবাবুর কথা শুনে উপস্থিত সকলে ধন্য ধন্য করে উঠলেন। আমার বড়দাদাও উপযুক্ত দাদা—তিনি বললেন, আমার একটু ভুল হয়েছিল অশ্বিনীকুমার—যাও তোমার বাড়ী ঘর তুমি দেখে নাও।

তার পর আমাদের বাইরের যে ঘরে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল সেই ঘরে প্রবেশ করে চারিদিক একবার চেয়ে দেখে বললেন—এ কি করেছেন দাদা—এ যে রাজ-অভ্যর্থনা!

করা হয়েছিল তো ভারী! একখানা চৌকির উপর বিছানা পেতে রাখা হয়েছিল—আর প্রতিবেশীদের বাড়ী থেকে ধার করে খানকতক ভাল চেয়ার, দুখানা টেবিল ও একটা আলনা আনা হয়েছিল। এই হোলো তাঁর রাজ-অভ্যর্থনা।

দাদা বললেন, আমি ওর কিছুই করিনি। যাঁরা করেছেন, যাও তাঁদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করো গিয়ে।

তাই যাচ্ছি বলেই কাপড়-চোপড় না ছেড়েই অশ্বিনী-বাবু ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর আমার হাত ধরে বল্লেন—চল জলধর—গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আসি। বাড়ীতে কে আছেন না আছেন, সে সব খবর আমি পঞ্চাননের চিঠিতে জানতে পেরেছি।

আমি তাঁকে সঙ্গে করে বাড়ীর ভেতর নিয়ে গেলাম। বড়বৌদিদি তখন বারান্দায় জলখাবার সাজাচ্ছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁর সুমুখে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে বললেন—আপনি যে বড় বৌদিদি তা আমি বুঝতে পেরেছি। কথা বলে আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

বড়বৌদিদি বুঝলেন—আচ্ছা লোকের হাতে পড়েছেন। কথা না বলে পারলেন না, বললেন—আশীর্ব্বাদ করি—ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক। অশ্বিনীবাবুর সেই হাসি। বললেন—ওর একটাও আমি চাই নে। যাক, সে কথা পরে হবে। কই আর এক লক্ষ্মী কই।

বৌদি বল্লেন— আপনার আসবার সাড়া পেয়েই সে ঐ ঘরে পালিয়েছে।

অশ্বিনীকুমারের কোন দ্বিধা সঙ্কোচ নেই—আমার শয়ন-ঘরের ভিতর প্রবেশ করে আমার স্ত্রীর হাত ধরে টেনে এনে বল্লেন—আমি ও লজ্জা টজ্জা মানব না। এ জীবটিকে কোথায় পেয়েছেন বৌদিদি?

বড়বৌদিদি বল্লেন—শিবনিবাসের কাছে দাওয়ানের বেড়ে। ওরে বাবা! শিবনিবাস! এই বলেই ছড়া কাটলেন—

"শিবনিবাসী তুল্য কাশী—
ধন্য নদী কঙ্কনা"।

বৌদিদি, আমি দাওয়ানের বেড়ের ইতিহাসও পড়েছি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দাওয়ান রঘুনন্দনের স্থাপিত এই দাওয়ানের বেড়। বড়বৌদিদি বল্লেন—এতও আপনি জানেন।—এ সেই দাওয়ান রঘুনন্দনের প্র-পৌত্রী। এখন এসে আমার স্কন্ধে ভর করেছেন।

আচ্ছা! সে পরিচয় পরে করা যাবে, এখন বাইরে গিয়ে হাত-পা ধুইগে।

বাইরে এসে সভার কথা জিজ্ঞাসা করতেই আমি তাঁকে বললাম, আজই সাড়ে তিনটেয় সভা হবে, বাজারের কাছে। সবই ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। আপনি জলটল খেয়ে বিশ্রাম করুন—আমি একবার দেখে আসি সব ঠিক হচ্ছে কি না। এই বলে আমি চলে গেলাম। যখন ফিরে এলাম তখন বেলা প্রায় একটা।

বাড়ী এসে তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি দাদার ঘরের বারান্দায় অশ্বিনীবাবু আহার করতে বসেছেন। তিনি তখন নিরামিষাশী ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন—দেখ জলধর, আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করতেই চেয়েছিলাম। তা তোমার ঐ লক্ষ্মীটী আমাকে বুঝিয়ে দিলেন যে তুমি হয় তো এ বেলা আসবেই না, একেবারে সভা শেষ করে আসবে। আমি ওর কথা বিশ্বাস করে তোমাকে ফেলেই খেতে বসেছি। দাদাকে বাইরের ঘরে নির্ব্বাসিত করে ওরা দুইজনে আমাকে নিয়ে পড়েছে।

বড় শক্ত বাঁধনেই তাই ফেললে আমাকে। তারপর যে কত কথা—কত হাসি তামাসা—সে সব কথা মনে হলেও এখন আমার চোখে জল আসে।

তারপর যথানির্দ্দিষ্টসময়ে অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটায় সভার অধিবেশন হ'ল। আমাদের স্কুলের পণ্ডিত মশায় স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে অশ্বিনীকুমারকে অভ্যর্থনা করলেন। অশ্বিনীবাবু আমাদের দেশের শাসন ও বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ সম্বন্ধে একঘণ্টার উপর বক্তৃতা করলেন। সকলের শেষে আমি ধন্যবাদ করলাম! সভার কার্য্য শেষ হ'ল। অশ্বিনীকুমার এই অনুষ্ঠান দেখে বড়ই সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর আমরা বাড়ী ফিরে এলাম। অশ্বিনীবাবু বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রে খানিকটা দুধ ব্যতীত আর কিছুই খেলেন না। গরীবের যা কিছু আয়োজন হয়েছিল আমরাই তার সদ্ব্যবহার করেছিলাম।

শয়নের কিছু পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার একবার বাড়ীর ভিতর গিয়ে আমারই সম্মুখে বড় বৌ দিদিকে বল্লেন—বৌদি, যা মনে করেছেন—তা নয়। অশ্বিনীকুমার কাল সকালে যাচ্ছেন না।

এ কথার জবাব আমার স্ত্রী দিলেন—কে আপনাকে যেতে বলছে মশায়! থাকুন না দশ পনর দিন আমাদের এখানে। সত্যসত্যই তাই ইচ্ছে করছে, এই বলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে অশ্বিনীবাবু বেরিয়ে গেলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে তাঁর চাকরটিকে বাড়ীতে রেখে আমাদের চাকরকে সঙ্গে নিয়ে অশ্বিনীবাবু বেড়াতে বেরুলেন। বেলা প্রায় আটটার সময় যখন ফিরলেন—তখন তাঁর পেছনে আমাদের চাকরের মাথায় একটা ঝাঁকা, আর একটা নগদা কুলীর মাথায় একটা ঝুড়ি। এই দৃশ্য দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ সব কি দাদা! অশ্বিনীকুমার হিন্দি বাত্ আওড়ালেন—তফাৎ যাও। কোহি বাত মাত্ বোলো। এই বলে লোক দুটোকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর চলে গেলেন—আমি আর তাঁর অনুসরণ করলাম না, কারণ জানতাম তখন বড়দাদা বাড়ীর ভেতর আছেন। বড়দাদা একটু পরেই বেরিয়ে এসে বললেন—দেখ গিয়ে জলধর, তোমার পাগলের কাণ্ড। বাজারের আর কিছু বাকী রাখে নি।

তার খানিকটা পরেই বাড়ীর ভেতর গিয়ে দেখি—উঠানের দড়ীর ওপর তাঁর গরম কোট ও শাল ঝুলছে; পায়ের জুতো মোজা খুলে উঠানে ফেলে দিয়ে-মহাপুরুষ বসে কুটনো কুটছেন। পাশে আর একখানা বঁটী নিয়ে আমার স্ত্রীও তাঁর সাহায্য করছেন।

আমি বললাম, দাদা ও কি, হাত কাটবেন যে?

আমার স্ত্রী জবাব দিলেন—ভগবান, তাই যেন হয়—যতদিন কাটা-ঘা না শুকোবে ততদিন তো আমাদের কথা মনে থাকবে।

অশ্বিনীকুমার বললেন—জলধর তোর এই গৃহিণীর জ্বালায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। এর কথারও অন্ত নেই—হাসিরও অন্ত নেই।

তারপর অশ্বিনীকুমার একবার রান্নায় যোগ দিচ্ছেন, আর একবার বা বাইরে এসে যাঁরা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁদের বলছেন—আমি কালকের অশ্বিনীকুমার নেই মশায়—আমি আজ এ বাড়ীর রাঁধুনী।

এই দুই দিনে অশ্বিনীকুমার আমার ক্ষুদ্র কুটীরকে একেবারে আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পরদিনের ভোরের ষ্টিমারে তিনি যখন ঢাকা রওনা হন, তখন তিনিও চোখের জল ফেলেন, আমার বৌদিদি ও আমার গৃহিণীও চোখের জল ফেলেন। কথা আর কেউ বলতে পারলেন না, উভয়পক্ষের চোখের জলেই বিদায় অভিনন্দন হয়ে গেল।

তার পর। তার পরের কথাও কি বলতে হবে? যখন অশ্বিনীকুমারের স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি তখন আর একটী দৃশ্যের কথা অতি সঙ্ক্ষেপে বলি।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার নয় মাস পরে এক দিন অপরাহ্নে গোলদীঘির ধারের ফুটপাথের উপর অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে আমার দেখা—আমি তখন হিমালয়ের যাত্রী।

অশ্বিনীকুমার সেই রাস্তার মধ্যেই আমাকে জড়িয়ে ধরে তিরস্কার করে বল্লেন, হ্যাঁরে জলধর, এত নিষ্ঠুর তুই,—এই ন' মাসের মধ্যে একটা খবরও দিলিনে। আমি শুষ্ক মুখে বল্লাম—খবর তো কিছু নেই দাদা,—সব খবর শেষ হয়ে গিয়েছে।

সে কি, আমি যে বুঝতে পারছিনে। আমি বললাম—শুনবেন দাদা! আপনার সঙ্গে শেষ দেখার চার মাস পরে

আমার একটী কন্যা-সন্তান হয়। বার দিন পরেই সেটী মারা যায়। তার বার দিন পরেই আমার গৃহিণীও সেই পথে যান। তার তিন মাস পরে আমার মাতাঠাকুরাণীও চলে গিয়েছেন। এখন আমি হিমালয়-যাত্রী।

এঁ্যা—কি বলিস্! এই বলে সেই মানব শ্রেষ্ঠ গোলদীঘির পার্শ্বের রেলিং-এ ভরদিয়ে নতমুখে দাঁড়ালেন। দুই চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। আমি চুপ করে তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম।

দুই তিন মিনিট পরেই আত্মসংবরণ করে অশ্বিনীকুমার ধীরে ধীরে বল্লেন—জলধর—এ আনন্দের হাট সকলের ভাগ্যে বেশীদিন টিঁকে না। হিমালয়ে যাচ্ছ, যাও। দেখ, যদি শান্তি পাও।

সহপাঠী

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম-এ

সামনের বার্থে বসিয়া নিবিষ্ট মনে পড়িয়া যাইতেছে, ও লোকটি কে?

এদিকে দুইটি বার্থ রিজার্ভ করা। কোনও ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ও তাঁহার স্ত্রী যাইতেছেন। মিসেস্ শোভনা মিত্র বাহিরের অপস্রয়মান পাহাড়ের দিকে তাকাইয়াছিলেন। মিঃ মিত্র শুইয়াই ছিলেন কিন্তু এখনও ঘুম আসে নাই। আলোর চারি পাশে কতকগুলি পোকা ঘুরিয়া মরিতেছে—তিনি সেই দিকেই চাহিয়াছিলেন।

শোভনা ওই কথাটাই ভাবিতেছিল—ও লোকটি কে? অমনি করিয়া নিবিষ্টমনে পড়িবার ভঙ্গিটি তাহার যেন পরিচিত; কিন্তু কবে কোথায় সে দেখিয়াছে তা মনে পড়ে না।

কি বই তাহাকে এত একমনা করিয়া রাখিয়াছে তাহাও জানা যায় না। বইটা মোটা, কিন্তু কাহার বা কি বিষয়ক তাহা জানিবার উপায় নাই। শোভনা বার বার ভাবিয়া দেখিতেছিল, কিন্তু লোকটার পরিচয় সমস্যার কিছুতেই সমাধান হইল না।

রাত্রি গভীর হইয়া উঠিল। অলস জোছনায় আবছা আলোর মাঝে দিকচক্রবাল মিশিয়া গিয়াছে। ট্রেণখানা একটানা গতিতে চলিয়াছে—

শোভনার মনে পড়িল—সে যখন এম. এ. পড়িত তখন পিছনের বেঞ্চে বসিয়া এমনি নিবিষ্টমনে একটি ছেলে কাজ করিয়া যাইত। শোভনা তখন ছিল পোষ্ট গ্রাজুয়েটের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছাত্রী। সকল ছাত্রই কোন না কোন উপায়ে তাহাকে উত্যক্ত করিয়াছে কিন্তু এই ছেলেটি তাহার কৃশ দেহ ও নিষ্প্রভ চোখ লইয়া একান্তে বসিয়া থাকিত—কোন দিন ভ্রূক্ষেপও করে নাই। আনমনা অবস্থায় সামনে পড়িয়া গেলে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। ছেলেটি তাহার ওই স্বাস্থ্য লইয়া যে পরিমাণ সিগারেট বিড়ি উড়াইত তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়। একদিন প্রফেসর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি কচ্ছ হে? সে উত্তর করিল.—একটু কাজ করছি।—কি কাজ? সে চুপ করিয়া রহিল। অন্য একটি ছেলে জবাব দিল—ও কাগজের এডিটারী করে, সেই আফিসের কাজই কচ্ছে। প্রফেসর তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ক্লাসে ওসব কাজ করা চলিবে না। সে অতি বিনীতস্বরে বলিল,—যদি ক্লাসে একাজ ক'রতে আপনি না দেন তবে আমার ক্লাসে আসা হবে না, আর তা না হ'লে চাকুরী ক'রবার আবশ্যকতাও কিছু নেই। প্রফেসর কিছু বলেন নাই—তারপর নিত্য পিছনের বেঞ্চে বসিয়া সে হয়ত গল্প বাছাই করিত, না হয় লিখিত। পরীক্ষা সে দেয় নাই, পরে দিয়াছে কি না কে জানে? চাকুরী করিয়া পড়িয়াই হয়ত এখন মানুষ হইয়াছে, নহিলে সেকেণ্ড ক্লাসে যাওয়া সম্ভব হইত না। এখন ও লোকটা কি করে? ওর নামও ত সে ঠিক জানে না।

যে লোকটা জগতের সব ভুলিয়া পুস্তকের হিজিবিজি

অক্ষরগুলির মধ্যে ডুবিয়া বসিয়া আছে তাহার জন্যই শোভনার মনটি আজ কৌতূহলী হইয়া উঠিল।

মিঃ মিত্র সহসা উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, শোভা—এক-কাপ চা দাও না। কিছুতেই আর ভাল লাগছে না।

শোভনা ফ্লাস্ক খুলিয়া তাহাকে এককাপ চা ঢালিয়া দিতেছিল। লোকটি সহসা তাহার দিকে না চাহিয়াই বলিল, আমাকে এককাপ দেবেন ত?

শোভনা ও মিঃ মিত্র আশ্চর্য্য হইয়া তাহার দিকে চাহিলেন। অপরিচিত মহিলার নিকট এমনভাবে চা' চাহিয়া লইতে ওর এতটুকুও সঙ্কোচ নাই কেন?

শোভনা ভাবিল, হয়ত ও তাহাকে চিনিয়াছে সেই জন্যই চা' চাহিয়া লইতে লজ্জাবোধ করে নাই। শোভনা মিঃ মিত্রের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া চা'র কাপ অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে রাখিয়া দিল। মিঃ মিত্র মনে মনে যা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া চা পান করিয়া যাইতে লাগিলেন।

পুস্তকের চার পাঁচ পৃষ্ঠা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চা' শেষ হইয়া গেল।

শোভনা আশ্চর্য্য হইল—ও কি এমনি অন্যমনস্ক, যে ধন্যবাদ দিতেও ভুলিয়া গেল!

ট্রেণ চলিয়াছে—

ও পাশের বার্থে এক ভদ্রলোক এতক্ষণ মুড়িসুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছিলেন। সহসা চোখ মুছিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণও একটা ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। ভদ্রলোক বলিলেন,—এই ভ্যাগাবণ্ড! দু'কাপ চা খেলে কেমন হয়?

বই হইতে মুখ তুলিয়া ও বলিল—বেশ হয়।

—এত ষ্টেশন গেল, দু'কাপ চা খেতে পারলি নি? তেষ্টাও পেলো না তোর?

—চা'র তেষ্টা অনেকক্ষণ পেয়েছে, কিন্তু পেলাম কই?

—দাঁড়া, ছাখ নিয়ে আস্‌ছি—

ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। ও পুনরায় বই পড়িতে লাগিল।

শোভনা আশ্চর্য্য হইয়া গেল—ও যে শুধু ধন্যবাদ দিতেই ভুলিয়া গেল তাহা নয়, চা' খাইয়াছে সে কথাও ভুলিয়া গেছে।

শোভনা ব্যথিত হইল—এমন অন্যমনস্ক লোক কাহার উপর নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে! এদের বাঁচিয়া থাকাই যে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার। ওই লোকটির ব্যক্তিগত জীবনে শোভনার হয়ত একটু কৌতূহল ছিল, তাই তাহার চা চাহিয়া পান করায় সে উত্যক্ত হয় নাই। অন্য কেহ হইলে সে ভাল রকম একটা জবাব দিয়া চা-তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া দিত।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিতে দিতে ভদ্রলোক চা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে বলিলেন—একটু ঘুমিয়ে নাও, সারা রাত্রি জেগে শেষে—

ও একটু রুষ্ট হইয়া জবাব দিল—স্বাস্থ্য সমাচার তোমার চেয়ে আমার কিছু কম জানা নেই। ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে পড়াটাই লাভজনক।

—সেকথা সত্য; তবে ২৪ ঘণ্টা ক'রে পড়ে তিরিশ বছর বেঁচে যে জ্ঞান সঞ্চয় করা যায়, তার চেয়ে বার ঘণ্টা ক'রে পড়ে ৭৫ বৎসর বেঁচে কি বেশী জ্ঞানলাভ করা যায় না?

—এটি এরিথমেটিক নয়। তুমি ঘুমোও না কেন—৭৫ বৎসরে চেয়ে হঠাৎ লাখ টাকা পেয়ে পরদিনই ভবলীলা সাঙ্গ করাটা আমার কাছে খুব ভাল মনে হয় না। I shall drink my life to the lees.

ভদ্রলোক আর তর্ক না করিয়া শুইয়া পড়িলেন। ও বই পড়িয়া যাইতে লাগিল, শোভনার ইচ্ছা করিতেছিল ওর সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার সমস্ত বিষয় জানিয়া লয়। কিন্তু দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা সে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিল না। এমনি করিয়া ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—

সকালে একটা গোলমালে শোভনার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখে, রাত্রের সেই আপনভোলা লোকটি রক্তচক্ষু করিয়া ক্রমাগত উচ্চৈস্বরে ইংরাজি বকিয়া যাইতেছে।

মিঃ মিত্র ততোধিক উচ্চৈস্বরে তাহার জবাব দিতেছেন। ঐ লোকটির বক্তব্য এই যে, গাড়ী হইতে তাহাদিগকে অবিলম্বে নামিয়া যাইতে হইবে। শোভনার অত্যন্ত রাগ হইল যে লোকটির বিমর্ষ ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া তাহার করুণা হইয়াছে, সে মিঃ মিত্রের মনকে উপেক্ষা করিয়া যাহাকে চা

দিয়াছে—সেই কিনা এমন ভাবে তাহাদিগকে নামাইয়া দিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে—এই প্রতিদান!

শোভনা ক্রুদ্ধ স্বরে জবাব দিল—কেন আমরা নেমে যাব? এ কথা ব'লবার আপনার কোন অধিকার নেই।

—নিশ্চয়ই আছে। জানেন, এটা ভাইস্রয়ের স্পেশাল ট্রেণ—এতে অন্ত লোক নেওয়া হয় না।

ওর বন্ধু বলিল—ওঁরা যে সব এ, ডি, সি—ওঁরা যাবেনই ত।

এ, ডি, সি, অন্ত গাড়ীতে যাবেন, আমার গাড়ীতে কেন?

এ, ডি, সি, বডিগার্ড—এরা সব ত সঙ্গেই যাবেন—নইলে তোমার সম্মান থাকবে কি ক'রে।

ও বলিল—আচ্ছা ধন্তবাদ, আপনারা যেতে পারেন। অবশ্য মনে রাখবেন ভাইস্রয়ের ধন্তবাদের মূল্য যথেষ্ট।

শোভনা এতক্ষণ হতভম্ব হইয়া তাহাদের কথা শুনিতেছিল—ব্যাপারটার কিছুই সে সঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কি যেন একটা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, ওর বন্ধু ইঙ্গিতে তাহাকে বারণ করিয়া দিল।

ওর বন্ধু স্যুটকেস হইতে দুইটি ওষুধের বড়ি বাহির করিয়া বলিল—এই ওষুধটুক খেয়ে নে ত ভাই।

—ভাইস্রয়ের ওষুধ খাওয়ার দরকার হয় না।

—বল কি? তারা ত ওষুধ খেয়েই বেঁচে থাকে।

—আমি মানি নে—

বন্ধুটি কিছুক্ষণ বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল। ও বলিতে লাগিল—কই। এক্সিকিউটিভ মিনিষ্টার সব কোথায়, স্পেশাল মিটিং ক'রবো এখন। সীমান্তপ্রদেশে বোমা-বর্ষণ করা হ'য়েছে কেন? তার জবাব আমি মিঃ চেটউডের কাছে চাই।

বন্ধু কোন জবাব না দিয়া পরের ষ্টেশন হইতে এক কাপ চা সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অলক্ষ্যে বড়ি দুইটি মিশাইয়া ওকে দিলেন। অল্পক্ষণ বাদেই ও ঘুমাইয়া পড়িল। ওর বন্ধুটি শোভনার সামনে মিঃ মিত্রের বেঞ্চে বসিয়া বলিলেন—আমি ওর হয়ে মার্জ্জনা চাইছি—ও যে দুর্ব্যবহার করেছে তার জন্তে—

বন্ধুটির চোখ দুটি ছলছল করিতেছিল। শোভনা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া ছিল। ও বলিল—ও আমার সহপাঠী, বছরখানেক হ'ল পাগল হ'য়ে গেছে। দরিদ্রের ছেলে টিউসনি করে চাকুরী করে এম, এ পাশ করেছিল কিন্তু চাকুরী মিলে নাই, অনশনে অত্যাচারে এমনি হ'য়ে গেছে—ওর অপরাধ—

শোভনা ভিজা গলায় বলিল—না আমরা বুঝিচি, আমরা কিছু মনে করিনি। ওঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

—রাঁচি। জগতে ওর কেউ নেই, আমার বন্ধু—কিন্তু বারমাস কে ওর পাগলামীর সঙ্গে যুঝবে? এই সেদিন আমার স্ত্রীকে কাপ ছুঁড়ে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। ওখানেই রেখে আসি।

ক্ষাণিক চুপ করিয়া বলিলেন—কে জানে! বাকী জীবন ওখানেই কাটবে কি না!

শোভনা শুধাইল—ওঁর অমন হল কেন?

—মানুষের সহন-শক্তির একটা সীমা আছে বলে মনে হয়, ও যা দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে তা বোধ হয় সহনাতীত—নইলে ও পাগল হবে কেন?

—উনি কোন্ বছর এম, এ পাশ করেন?

—১৯৩২ খৃষ্টাব্দে।

শোভনার আর সংশয় রহিল না—তাহার পরের বৎসর তাহা হইলে পরীক্ষা দিয়াছে! ও তাহারই সহপাঠী, ওর বন্ধুও তার সহপাঠী!

বন্ধুটি আবার বলিলেন—যতক্ষণ বই পড়ে ভাল থাকে; কিন্তু বই বেশী পড়লেই অমন আরম্ভ করে—ওর ধারণা ও ভাইস্রয়। ফার্ষ্ট ক্লাস ছাড়া রাঁচি যাবে না—গরীব কেরাণী টাকা কোথায় পাই—বহুকষ্টে এনেছি। বন্ধুকে সারাজীবনের মত পাগলা গারদে পাঠাচ্ছি—কম দুঃখে নয়।

শোভনা ছলছল চোখে বলিল—আপনি ত অনেকই করেছেন—

—কিছুই করিনি, বিবাহ করে মনটা সংকীর্ণ হ'য়ে গেছে। সংসারের জন্তে ভাবতে হয়, নইলে বন্ধুর জন্যে জীবনটা না হয় অন্যরকমই হ'তো—

সকলেই সহসা চুপ করিয়া গেলেন।

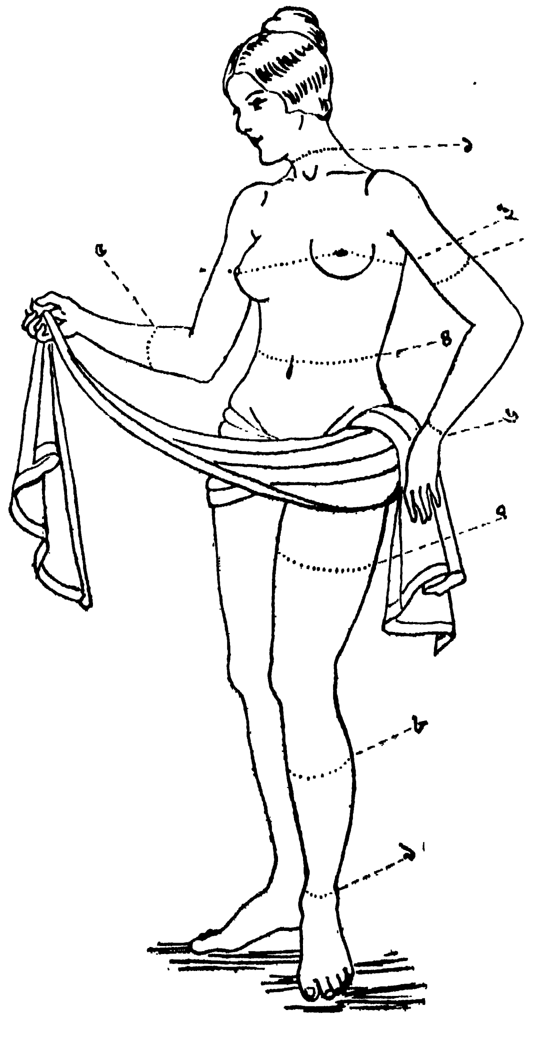
রাঁচি ষ্টেশনে গাড়ী ঠিক করিয়া বন্ধুটি ওকে ঘুমন্ত অবস্থায়ই তুলিয়া দিল।

ষ্টেশনের অদূরে শোভনার চোখের সামনেই গাড়ীখানি ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মাতৃজাতির শরীর চর্চ্চা

শ্রীনীলমণি দাশ (আয়রণ্ ম্যান্)

কোন ইংরাজ পণ্ডিত বলেছেন—'The wealth of a nation is truly the health of the people' আমাদের দেশ যে গরীব তার একটি কারণ দেশের লোকের স্বাস্থ্য খারাপ। পুরুষের স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় ঠিক করবার



জন্যে অনেক মনীষী অনেক পরিশ্রম করেছেন ও করছেন। কিন্তু মেয়েদের স্বাস্থ্যলাভের তেমন কোন সুব্যবস্থা নেই। সমাজ দেহে একটা অঙ্গকে চিরকাল অপুষ্ট ও রুগ্ন রেখে অপর অঙ্গ কখনও পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হ'তে পারে না। জাতির উন্নতি কামনা কর্‌তে হ'লে যাতে নরনারী উভয়ে স্বাস্থ্য ও শক্তির উত্তরাধিকারী ও উত্তরাধিকারিণী হ'তে পারে সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি রাখা উচিত। আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের চেষ্টা সেতু-বন্ধে কাঠবেড়ালীর সাহায্যের ন্যায় তা জানি, তথাপি যখন মাতৃজাতির নিকট থেকে ডাক এসেছে, তখন আমার সাধ্যমত মাতৃজাতির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য কিছু লিখব ও কয়েকটি ব্যায়ামের বিবরণ দে'ব।



১ (ক)

স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য রক্ষা কর্‌তে ব্যায়াম বিশেষ প্রয়োজন। নারী পুরুষের চেয়ে অধিক সৌন্দর্য্যের পূজারী। প্রত্যেক নারীর জানা উচিত যে পাউডার, স্নো, ক্রীম্ ইত্যাদিতে সৌন্দর্য্য লাভ করা বা রক্ষা করা যায় না। ব্যায়াম কর্‌লে হাত পা পুষ্ট, গোলগাল, নিটোল হয়; কোমরে, পেটে, পাছায় অতিরিক্ত মেদ জমতে পারে না; অথচ শরীরের লালিত্য বজায় রাখতে হ'লে যেটুকু মেদের

প্রয়োজন তারও অভাব হয় না। প্রাচীন গ্রীস ব্যায়ামের প্রয়োজন এত বেশী বুঝত যে গ্রীসে অসংখ্য ব্যায়ামাগার



২ (ক)

ছিল, যেখানে নরনারী নির্ব্বিশেষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ব্যায়াম অভ্যাস করত। তাই সৌন্দর্য্যের আদর্শ



২ (খ)

হিসাবে হার্‌কিউলিস্‌, এপেলো, ভেনাস ইত্যাদি এখনো বিরাজ করছে।

স্ত্রীলোকের ব্যায়াম প্রয়োজন কিনা, সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। তাঁরা বলেন—ব্যায়াম কর্‌লে নারীদের হাত, পা শক্ত হ'য়ে পুরুষের মত শরীর পেশীবহুল হ'য়ে পড়বে। ফলে কমনীয়তা নষ্ট হ'য়ে গিয়ে কাঠখোট্টার মত দেখতে হবে। কিন্তু তাদের জানা উচিত যে পুরুষের শরীরের গঠন একরূপ এবং নারীর শরীরের গঠন অন্যরূপ। পুরুষের মাংসপেশী বহির্ম্মুখী, ব্যায়াম কর্‌লে শক্ত হয় এবং ফুলে উঠে; কিন্তু নারীর মাংসপেশী ভিতরমুখী, ব্যায়াম কর্‌লে অত্যধিক মেদ নষ্ট হ'য়ে যায় এবং শরীর গোলগাল নিটোল হয়।

ইহা ছাড়া শক্তি সাহস ও আত্মরক্ষার জন্য ব্যায়াম প্রয়োজন। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্‌টালে নারীর উপর পাশবিক অত্যাচারের ২।১০টা মর্ম্মভেদী ঘটনার কথা চোখে পড়ে। অসহায় নারীর আর্ত্তনাদে বাংলার



৩ (ক)

আকাশ বাতাস যে ভোরে গেল। আজ যদি বাংলার নারী স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হতেন—যদি তাদের শক্তি ও



৩ (খ)

সাহস থাকত, তা হ'লে কি দুর্ব্বৃত্তেরা তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করতে পারত। বাংলার নারী! এ বিষয়ে তোমাদের চেতনা হয় না কেন? আর কতদিন পরামুখাপেক্ষী থেকে যাতনা সহ্য করবে? উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! উঠ! জাগ! নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কর—আত্মরক্ষার জন্য শক্তি অর্জ্জন কর—ব্যায়াম অভ্যাস কর।

ব্যায়াম অভ্যাস করবার পূর্ব্বে প্রত্যেক নারীর নিম্ন-লিখিত উপায়ে দেহের ওজন ও মাপ লওয়া উচিত। প্রতি মাসে না হয়, প্রতি তিন মাস অন্তর একবার ক'রে দেহের ওজন ও মাপ নিলে সহজে বুঝতে পারা যাবে, তাঁদের শারীরিক উন্নতি হচ্ছে কি না।

নাম…………………………………

বয়স……………তারিখ……………

উচ্চতা……………ওজন……………

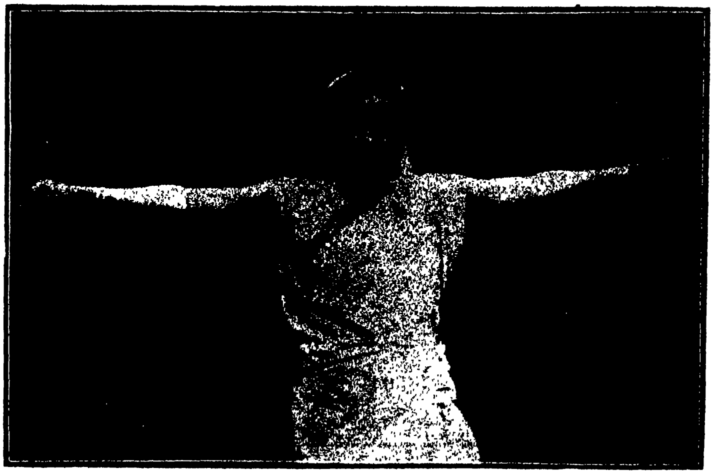
		(না ফুলাইয়া)		(ফুলাইয়া)
হাতের উপরের অংশ (Biceps)	…	”	…	”
হাতের নীচের অংশ (Forearm)	…	”	…	”
কব্‌জি (Wrist)	…	”	…	”
ঘাড় (Neck)	…	”	…	”
বুক (Breast)	…	”	…	”
কোমর (Waist)	…	”	…	”
জানু (Thigh)	…	”	..	”
পায়ের গুলি (Calf)	…	”	…	”

ব্যায়াম আরম্ভ করবার পূর্ব্বে ব্যায়ামকারিণীর একটা ছবি তুলে রাখলে ভাল হয়।

ব্যায়ামকারিণীর নিজ শরীরের বিভিন্ন স্থানের মাংসপেশীর নাম ও অবস্থানের অবগতির জন্য একটি ছবি দেওয়া গেল।

ছবির পরিচয়

(১) গলা (Neck), (২) বুক (Breast),



৪ (ক)

(৩) হাতের উপরের অংশ (Biceps), (৪) কোমর (Waist), (৫) হাতের নীচের অংশ (Forearm),

(৬) কব্‌জি (Wrist), (৭) জানু (Thigh), (৮) পায়ের গুলি (Calf), (৯) গুলফ্‌ (Ankle)।

এই ছবি দেখ্‌লে শরীরের কোন অংশকে কি বলে তা জানা যাবে এবং ইহা আরও মাপ লওয়া বিষয়ে



৫ (ক)

সহায়তা করবে। শরীরের কোন্‌ অংশের মাপ কোন্‌ স্থান থেকে নিতে হবে তা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাবে।

নিম্নে কতগুলি সচিত্র ব্যায়ামের বিবরণ দেওয়া হ'ল।



৫ (খ)

এই ব্যায়ামগুলি মুক্ত স্থানে অথবা ঘরের মধ্যে সমস্ত দরজা জানালা খুলে অভ্যাস করা যেতে পারে।

ব্যায়াম নং ১

হাত সামনের দিকে মুঠো ক'রে এবং নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান্‌।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে ডান হাত কনুই থেকে ভেঙে তুলুন এবং ১ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই সময় হাতের উপরের অংশ বগলের সহিত সংলগ্ন রাখুন এবং কনুই একটু উপরের দিকে তুলুন। পরে নিঃশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে হাত নামান ও পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এই-



৬ (ক)

রূপে বাঁ হাত প্রশ্বাস নিতে নিতে তুলুন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামান।

এইরূপে প্রতি হাত ১০ বার তুললে ও নামালে হাতের উপরের অংশের গঠন সুন্দর হবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে।

ব্যায়াম নং ২

হাত মুঠা ক'রে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন এবং শরীর সোজা রাখুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দু হাতই কনুয়ের কাছ থেকে ভেঙ্গে মুড়ুন এবং ২ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত প্রসারিত ক'রে ২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১০বার করলে হাতের উপরের অংশের গঠন সুন্দর হবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে!



৬ (খ)

(কেহ যেন মনে না করেন—পুরুষের মত Biceps উঠে মেয়েদের কমনীয়তা নষ্ট ক'রে দেবে।)

ব্যায়াম নং ৩

হাত পিছনের দিকে মুঠো ক'রে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিবে ৩ (ক) ছবির মত সোজা হ'য়ে দাঁড়ান্। (হাত যাতে শরীরের সহিত সংলগ্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন)

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে বাঁ হাত কনুই থেকে ভেঙ্গে উপরে তুলুন এবং ৩ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে হাত নামান, হাতের উপরের অংশ শরীরের সহিত সংলগ্ন রেখে নীচের অংশ (কনুই থেকে মুষ্টি পর্য্যন্ত) একটু পিছনদিকে ঢেলে দিন এবং ৩ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপে প্রশ্বাস নিতে নিতে ডান হাত তুলুন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামান।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১৫ বার করলে হাতের উপরের অংশ সুন্দর হবে এবং হাত গোলগাল নিটোল হবে।



৭ (ক)

ব্যায়াম নং ৪

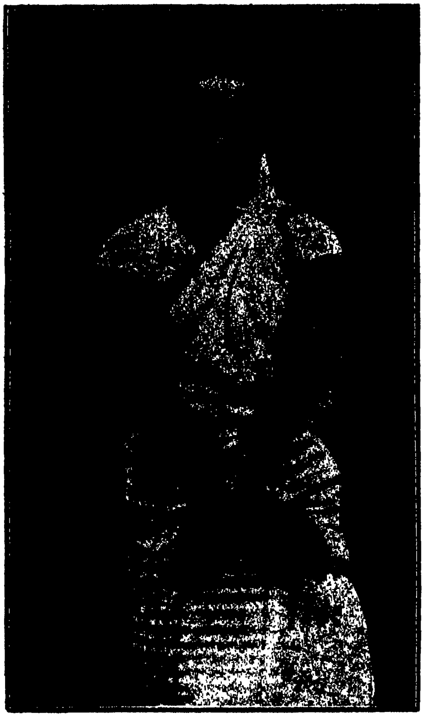
হাত মুঠো ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান্ এবং প্রসারিত হস্ত ভূমির সহিত সমান্তর (Parallel) রেখে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

পরে হাত সোজা রেখে কব্জির কাছ থেকে হাতের মুঠো arrowএর নির্দ্দেশমত Circle দিয়ে ঘোরান। যাতে না কনুইয়ের কাছ থেকে হাত বেঁকে যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখুন। এই ব্যায়াম অভ্যাসকালে সাধারণভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করুন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে যতক্ষণ না হাত ব্যথা হয় ততক্ষণ

করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে হাতের নীচের দিকের গঠন সুন্দর হয়।

৭ (খ)



পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দুহাত মাথার উপরে তুলুন এবং ৬ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস



৮ (ক)

ফেলতে ফেলতে হাত নামিয়ে ৬ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

ব্যায়াম নং ৫

হাত মুঠো ক'রে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে দুহাত সামনের দিকে তুলে ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দুহাত এক সঙ্গে প্রসারিত করুন এবং ৫ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১০।১২ বার করলে Heart ও Lungsএর জোর বাড়ে।



৯ (ক)

ব্যায়াম নং ৬

সোজা হ'য়ে ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়ান।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে ১০।১২ বার করলে Heart ও Lungs ভাল হয় এবং বক্ষের গঠন সুন্দর হয়।

ব্যায়াম নং ৭

সোজা হ'য়ে ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়ান।

পরে উভয় হস্ত সম্পূর্ণ প্রসারিত ক'রে দ্রুত circle দিয়ে



কুমারী নীলিমা চক্রবর্ত্তী লৌহপাটি বক্র করিতেছেন
(মাপ —৭ ফুট × ১ ½ ইঞ্চি × ⁵⁄₁₆ ইঞ্চি)

ঘোরান্। ঘোরাবার সময় হাত যখন মাথার উপরে উঠ্‌বে তখন ৭ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন এবং যখন নীচের দিকে নামিবে তখন ৭ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন।

এইরূপ ক্রমান্বয়ে ২০।২৫ বার কর্‌লে শরীরের উপরের অংশ—বুক, পিঠ ও কাঁধের গঠন ভাল হয়।

ব্যায়াম নং ৮

মাথার উপর হাত তুলে ৬ (খ) ছবির মতন দাঁড়ান। পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের অংশ বেঁকিয়ে হাত দিয়ে পা স্পর্শ করুন এবং ৮ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় নিশ্বাস ছেড়ে ২ সেকেণ্ড অপেক্ষা ক'রে পরে আবার প্রশ্বাস নিতে নিতে ৬ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে



১০ (ক)

১০ বার করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাসকালে যাতে না শরীরের নীচের অংশ (যেমন কোমর থেকে পা পর্য্যন্ত) বেঁকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন।



১১ (ক)

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে উচ্চতা ও হজমশক্তি বৃদ্ধি হয় এবং পৃষ্ঠের শিরার জোর বাড়ে।

ব্যায়াম নং ৯

ভূমির উপর চিৎ হ'য়ে শুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে ডান পা arrowএর নির্দ্দেশমত



১১ (খ)

তুলে ৯ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় যাতে পা শরীরের সহিত Perpendicular থাকে সে



১২ (ক)

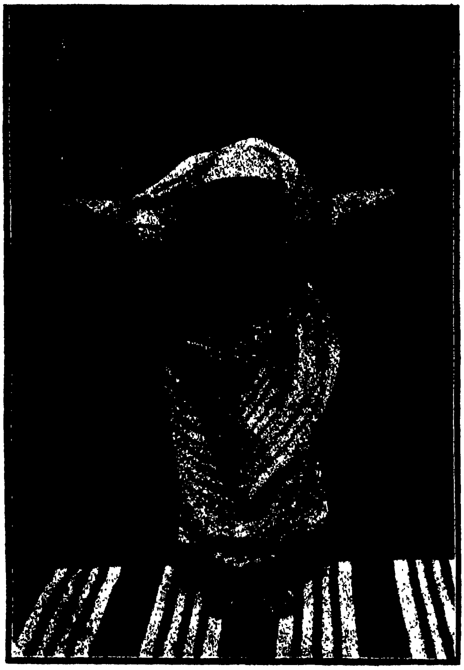
দিকে দৃষ্টি রাখুন এবং পায়ের আঙ্গুল উপর দিকে করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পা নামিয়ে পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এইরূপে প্রশ্বাস নিতে নিতে বাঁ পা তুলুন এবং নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে নামান।

এইরূপে ক্রমান্বয়ে প্রতি পা ১০ বার তুলে নামালে পেটের ও পায়ের উপরের অংশের এবং কোমরের আকার সুন্দর হয়। ইহা ছাড়া এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে হজমশক্তি বাড়ে।

ব্যায়াম নং ১০

৯ নম্বর ব্যায়ামের মত চিৎ হ'য়ে ভূমিতে শুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে দু-পা একসঙ্গে তুলে ১০(ক)



১৩ (ক)

ছবির আকার ধারণ করুন। পূর্ব্বের ন্যায় এই অবস্থায় পা যাতে শরীরের Perpendicular থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখুন এবং পায়ের আঙ্গুল উপরের দিকে করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে পা নামিয়ে পূর্ব্বের আকার ধারণ করুন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১০ বার অভ্যাস করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে ৯ নম্বর ব্যায়ামের মত ফল হয়।

ব্যায়াম নং ১১

হাত মাথার উপরে প্রসারিত ক'রে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ১১ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

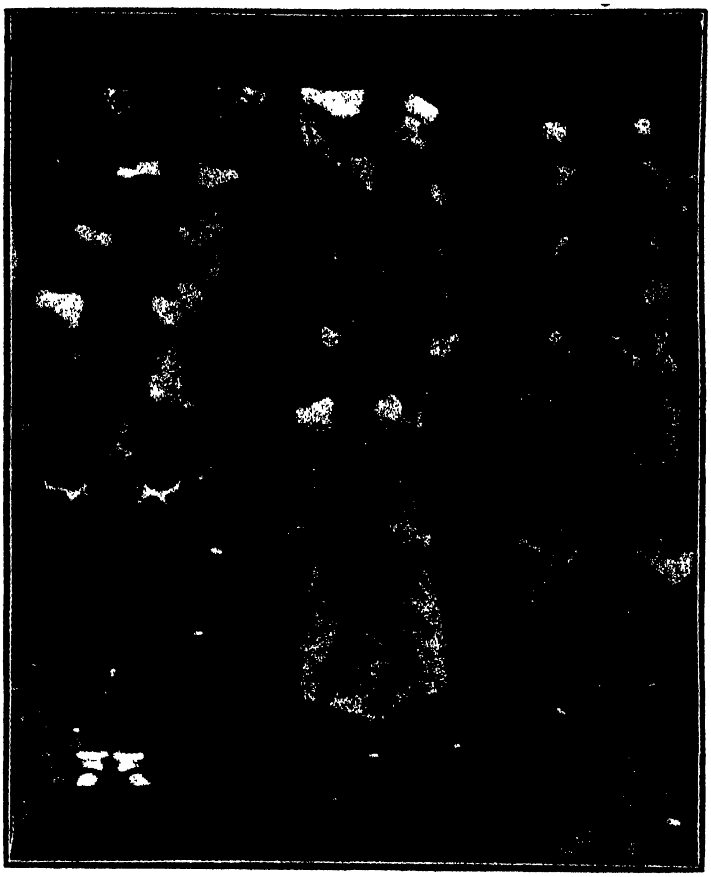
পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ভূমি থেকে আস্তে আস্তে তুলে হাত দিয়ে পা স্পর্শ করুন এবং ১১ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে ১১ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই ব্যায়াম অভ্যাস কালে মাথার সহিত হাত যাতে সংলগ্ন থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন এবং Jerk না দিয়ে পেটের মাংসপেশীর উপর ভর দিয়ে উঠুন।

শরীরের উপরের অংশ তোলবার সময় পা প্রায় ভূমি হ'তে উঠে যায়; সেইজন্য টেবিলে বা অন্য আসবাবের তলায় পা আটকে রাখলে—ভাল হয়। ১১(ক) ও (খ) ছবিতে পা টেবিলে সংলগ্ন করা হয়েছে।

ক্রমান্বয়ে এই ব্যায়াম ১২ বার করলে পেটের নিম্ন অংশের গঠন ভাল হয়। ইহাতে পেটের সমস্ত মাংসপেশীর ব্যায়াম হয় ও হজমশক্তি বাড়ে এবং ভুঁড়ি কমে। বাল্যকাল থেকে মেয়েরা এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে প্রসবের সময় কষ্টের লাঘব হয়।

ব্যায়াম নং ১২

সোজা হ'য়ে হাত প্রসারিত ক'রে দাঁড়ান এবং প্রসারিত হস্ত ভূমির সহিত Parallel রেখে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।



ব্যায়াম বিদ্যাপীঠের মেয়েরা ১৩ নম্বর ব্যায়ামটি একসঙ্গে অভ্যাস করছেন



১৪ (ক)

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে শরীরের উপরের অংশ কোমর থেকে বাঁ দিকে বাঁকান এবং হাত ভূমির সহিত Perpendicular ক'রে ১২ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। পরে



১৪ (খ)

নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় ২ সেকেণ্ড থাকবার পর পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্বাস



১৫ (ক)

নিতে নিতে ডান দিকে বেঁকুন এবং পরে নিশ্বাস ফেল্‌তে ফেল্‌তে আবার ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

(প্রতিবার যখন ৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করা হবে, তখন ২ সেকেণ্ড অপেক্ষা করা উচিত।)

এইরূপে ১ বার বাঁ দিকে—আর ১ বার ডান দিকে, ক্রমান্বয়ে ১০ বার করলে কোমরের গঠন সুন্দর হয় এবং হজম্ শক্তি বাড়ে।

ব্যায়াম নং ১৩

সোজা হ'য়ে ৬ (ক) ছবির মত দাঁড়ান ও কোমরে হাত দিন। পরে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ ডান দিকে দিয়ে circleএর মত ক'রে arrowএর নির্দ্দেশ মত ঘুরাতে থাকুন—যে পর্য্যন্ত না ক্লান্তি অনুভব করেন।

পরে ২ সেকেণ্ড বিশ্রামের পর বাঁ দিক দিয়ে circleএর মত ঘোরান। এই ব্যায়াম অভ্যাস কালে নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণভাবে গ্রহণ করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে কোমরের গঠন ভাল হয়



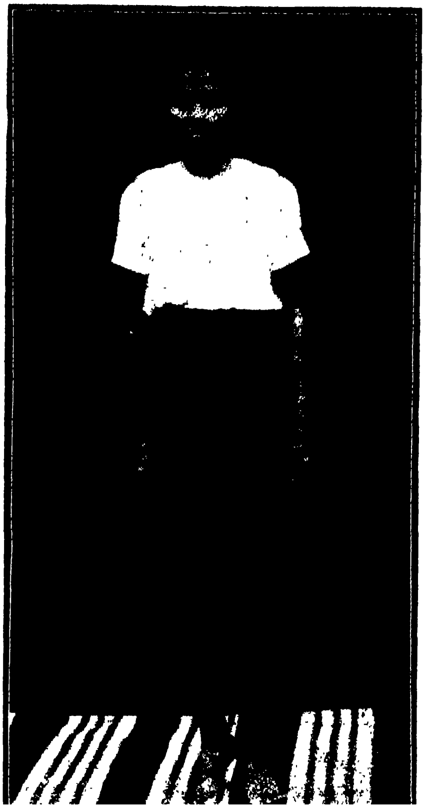
১৫ (খ)

এবং পেটের মাংসপেশীর শক্তি বৃদ্ধি হওয়ায় হজম্‌শক্তি বাড়ে।

ব্যায়াম নং ১৪

টেবিল বা টুলের উপর হাত রেখে ১৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন।

পরে প্রশ্বাস নিতে নিতে হাতের কনুয়ের কাছ থেকে ভেঙ্গে সমস্ত শরীরের ভার হাতের উপর দিয়ে দেহ নীচের দিকে নামান এবং ১৪ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন।



১৬ (ক)

পরে উঠুন এবং ১৪ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এখন নিশ্বাস ফেলুন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে ১০ বার করুন।

যখন এই ব্যায়াম টুলে বা টেবিলে হাত রেখে সহজ হ'য়ে যাবে, তখন ভূমির উপর হাত রেখে অভ্যাস করবেন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে হাতের উপরের অংশ নিটোল হয়, বুকের আকার বৃদ্ধি হয় এবং কোমরের ও পিঠের গঠন সুন্দর হয়।

ব্যায়াম নং ১৫

চেয়ার, টেবিল বা অন্য কোন জিনিষের উপর হাত রেখে সোজা হ'য়ে দাঁড়ান। পরে বাঁ-পা ভূমি থেকে তুলে পায়ের পাতা (গোড়ালি থেকে আঙ্গুল পর্য্যন্ত) নীচের দিকে করুন এবং ১৫ (ক) ছবির আকার ধারণ করুন। এই অবস্থায় ১ সেকেণ্ড থেকে পায়ের পাতা উপর দিকে করুন এবং ১৫ (খ) ছবির আকার ধারণ করুন। এইরূপে ক্রমান্বয়ে ২০ বার করুন। পরে বাঁ-পা ভূমিতে নামিয়ে ডান পা তুলে পায়ের পাতা পূর্ব্বের ন্যায় ১ বার



১৭ (ক)

নীচে আর ১ বার উপর দিকে ক'রে ক্রমান্বয়ে ২০ বার করুন।

এই ব্যায়ামকালে হাঁটু যাতে না বেঁকে, সে দিকে দৃষ্টি রাখুন। নিশ্বাস প্রশ্বাস সাধারণভাবে গ্রহণ করুন।

এই ব্যায়াম অভ্যাস করলে পায়ের পাতার গঠন ভাল হয় ও শক্তি বাড়ে।

(৬) যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্রত্যহ ব্যায়াম করেন তাঁদের গর্ভাবস্থায়ও ব্যায়াম করা উচিত। তবে প্রসবকাল যত নিকটবর্ত্তী হবে, তত ব্যায়ামের মাত্রা কমান উচিত। ব্যায়াম অভ্যাস রাখলে অল্প প্রসবযন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয় এবং দ্রুত প্রসব হয়। কিন্তু তা ব'লে যে স্ত্রীলোক কখনও ব্যায়াম করেন নি এবং অত্যন্ত দুর্ব্বল, তাঁরা যদি প্রসবযন্ত্রণা কম হ'বে মনে ক'রে প্রসবকালে ব্যায়াম আরম্ভ করেন, তা হ'লে তাঁদের শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

এই প্রবন্ধের ব্যায়াম-প্রদর্শনকারিণীদ্বয়ের নাম শ্রীমতী রেবা দাশ ও কুমারী নালিমা চক্রবর্ত্তী। কুমারী নীলিমা কেবল ৯, ১০, ১১ ও ১৬ নম্বর ব্যায়ামগুলি প্রদর্শন কর্‌ছেন এবং শ্রীমতী দাশ অপর সমস্ত ব্যায়ামগুলি প্রদর্শন কর্‌ছেন। শ্রীমতী রেবা দাশ লেখকের পত্নী এবং কুমারী নীলিমা লেখকের ছাত্রী। উভয়ে অল্পদিন মাত্র ব্যায়াম আরম্ভ করেছেন। ইঁহারা শারীরিক ব্যায়াম দ্বারা এত শক্তিশালিনী হয়েছেন যে অনায়াসে লৌহপাটি বক্র কর্‌তে পারেন।

মুদীর দোকান

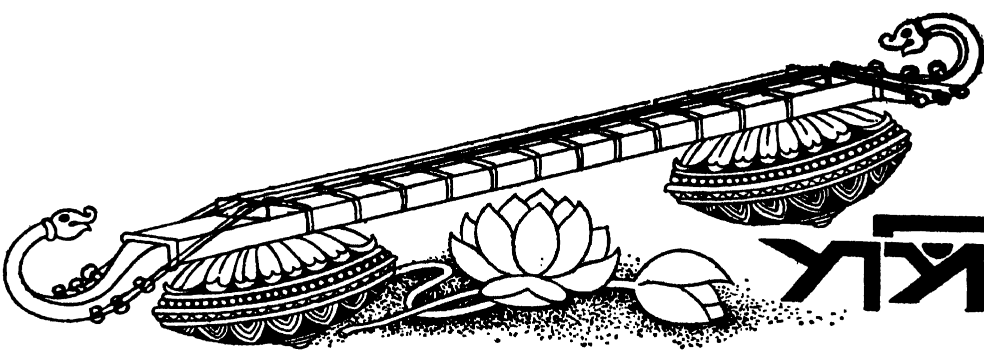
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

সাজান রয়েছে চাল, ডাল, নুন,
    ময়দা, চিনি ও সুজি;
খাঁটী সরিষার তৈল ও ঘৃত
    পাই নাই যাহা খুঁজি।
আল্‌কাতরার পিপা ও রয়েছে
    কেরোসিন টিন শত,
তিসি ও তামাক, খৈল, চিটাগুড়,
    নাম ল'ব আর কত।
যাহা চায় লোকে—যাহা দরকারী,
    সকল দ্রব্য হেরি,
ক্রেতা ও প্রচুর দোকান খানাকে
    রাখিয়াছে যেন ঘেরি।
কড়া ক্রান্তির কঠিন ক্ষেত্রে
    কি যেন খুঁজিছে প্রাণ,
সহসা পেলাম অনাস্বাদিত
    ধূপের স্নিগ্ধ ঘ্রাণ!
আর দেখিলাম দূরে একপাশে
    বসিয়া ভক্তিভরে,
বৃদ্ধ জনেক সজল নয়নে
    রামায়ণ পাঠ করে।
শুষ্ক নীরস রাজপুতানার
    চুঙ্গীর দপ্তরে,
জগন্নাথের 'পখাল' প্রসাদ
    আসিল কেমন করে?
নর্ম্মদার এই মর্ম্মর ঘাটে
    গোপী চন্দন আনি,
কর্ম্মের মাঝে ধর্ম্মের ফাগ
    কে করিল আমদানী?
ব্যবসার এই তাম্রলিপ্তে,
    লাভের সপ্তগ্রামে,
কোন সে ভক্ত সকল ভুলিয়া
    পূজিতেছে সীতারামে?
যেথা দিবানিশি ঢোল সহরৎ
    শুধু ডুগডুগি শুনি,
বুঝিনে সেখানে কেমনে উঠিল
    শুভ শঙ্খের ধ্বনি!
ঠোঙার এ দেশে হাতে দিল এসে
    এ যেন রে গুয়া পান,
তুলাদণ্ডের খণ্ড রাজ্যে
    কাব্যের অভিযান!
বুঝিনু দয়াল যে ভাবে থাকুক
    মানুষ তোমারে চায়,
তোমার চরণ সরোজের বাস
    সাত তাল ভেদি' যায়।
যতই হউক কঠিন কঠোর
    হউক স্বার্থপর,
তোমারে না লয়ে পারেনা, চাহেনা-
    মানুষ করিতে ঘর।
ব্যস্ত কেহ বা ধান চাল লয়ে
    কেহ লয়ে রূপা সোণা,
সবাকার মাঝে নীরবে চলিছে
    তোমারি যে আরাধনা!



মা আমায় ঘুরাবি কত ?

শিল্পী—শ্রী [illegible]



সঙ্গীত

কথা ও সুর ঃ – কাজী নজরুল ইস্‌লাম । স্বরলিপি ঃ – জগৎ ঘটক

মধুমাধবী সারং—ত্রিতালী

দক্ষিণ সমীরণ সাথে বাজো বেণুকা ।
মধুমাধবী সুরে চৈত্র পূর্ণিমা রাতে
বাজো বেণুকা বাজো বেণুকা ॥
বাজো শীর্ণা স্রোত-নদী-তীরে
বাজো ঘুম যবে নামে বন ঘিরে,
যবে ঝরে এলোমেলো বায়ে ধীরে
ফুল-রেণুকা ॥
মধু-মালতী বেলা-বনে ঘনাও নেশা,
স্বপন আনো জাগরণে মদিরা-মেশা ।
মন যবে রহেনা ঘরে—
বিরহ-লোকে সে বিহরে,
যবে নিরাশার বালুচরে
ওড়ে বালুকা ॥

[ণপা] ॥

II র্সণা পর্ণর্সর্রা র্রা র্রা | র্সা র্সা ণা -পা | মা -া ম্র্সা -া | -া -া -া -া I
দ• ০০০০ ক্ষি ণ স মী র ণ সা • থে • ০ • • •

I ণণা পা মা পা | মপা -মপমা রা -া | রা পা মা -া | রা রা সা সা I
বা• জো বে ণু কা •• ০ • ০ ম ধু মা ০ ধ বী সু রে

সা ন্‌স -রা সা | ণ্া প্া ন্া ন্া | নসা -া সা -া | -া -া -া -া I
চৈ ০০ • ত্র পূ র্‌ ণি মা রা • তে ০ ০ • •

I সসা রা রমা মা | মপা -া -া -া | ররা মা মপা পা | ণা -া -া -া II
বা• জো বে • ০ বা• জো বে ণু কা • • •

[ণা -া ণা ণা -না না. না না]

মা মা II { পা -া পা পা | ণা -পা পনা না | নর্সা -া র্সা -া | -া -া র্সা র্সা I

বা জো শী র্ ণা স্রো ০ ত ন দী তী ০ রে ০ ০ ০ বা জো

I না -র্সা র্রা র্রর্মর্গর্মা | র্রা র্রা র্সা র্সা | নর্সা -র্রা র্সর্রর্সা -া | ণা -া (-া -া) } I

ঘু ম্ য বে০০ না মে ব ন থি০ ০ রে০০ ০ ০ ০ ০ ০

I ণা ণা I পা পর্সা র্সর্রর্সা র্সা | ণাধ ণা পা পা | পমা -মপা পা -া | -া -া -া -া I

য বে ন্ব রে০ এ০০ লো মে লো বা য়ে ধী০ ০০ রে০ ০ ০ ০ ০

I মা পা মা পা | মপমা -া রা পা | মপমা মা রা রা | সা -া -া -া I

ফু ল রে ণু কা০০ ০ ০ ০ বা০০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

I সসা রা রমা মা | মপা -া -া -া | ররা মা মপা পা | পণা -া -া -া II

বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০ বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

া া II রা পা মা -মা | রা রা সা রা | সন্া -া -া -সা | সা -া -া -া I

০০ ম ধু মা ০ ল তী বে লা ব ০ ০ ০ নে ০ ০ ০

I রমা রা মা মা | মপা -া -া -া | সা রা রমা মা | মপা -া পা পা I

ঘ০ না ও নে শা০ ০ ০ ০ স্ব প ন আ নো ০ জা গ

I পণা -া পা -া | -া -া -া র্সা | ণা পা মা রা | সা -া -া -া I

র০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ম দি রা মে শা ০ ০ ০

[ণা -া ণা ণা ণা -না না না

I { মা -া পা পা | পণা -পা না না | নর্সা -া র্সা -া | -া -া -া -া I

ম ন্ য বে র০ ০ হে না ঘ ০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I না র্সা র্রা র্রর্মর্গর্মা | র্রা -া র্সা র্সা | নর্সা -র্রা র্সর্রর্সা -া | ণা -া -া -া } I

বি র হ লো০০ কে ০ সে বি হ০ ০ রে০০ ০ ০ ০ ০

I পা পর্রা র্সর্রর্সা র্সা | ণা ণা পা পা | পমা -গমপা পা -া | -া -া -া -া I

য বে০ নি০০ রা শা য্ বা লু চ ০০ রে ০ ০ ০ ০ ০

I মা পা মা পা | মপমা -া রা -পা | মপমা মা রা রা | সা -া -া -া I

ও ড়ে বা লু কা০০ ০ ০ ০ বা০০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

I সসা রা রমা মা | মপা -া -া -া | ররা মা মপা পা | পণা -া -া -া II II

বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০ বা০ জো বে ণু কা ০ ০ ০

গল্প

চির নবীন

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

শীতকালের সকাল বেলাটি কী মধুর হয়েই না দেখা দিয়েছে। সোণার বর্ণের রোদের ছটা এসে আমলকী তলায় পড়েচে, সেখানে বুধি গাইটা বাঁধা আছে, বেচারী রোগা হয়ে গেছে। সুধীরা করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে মনে ভাবচে, বেচারা খেতে পায় না ভালো করে, তাই না রোজ রোজ এমন রোগা হয়ে যাচ্ছে। আজ আমি যেমন করে পারি মা'র কাছ থেকে কপির পাতা চেয়ে এনে দেব। শিশির ভেজা ঘাসের উপর ক্রমশঃ সূর্য্যের আলো ছড়িয়ে পড়েচে। সুধীরার বয়স মোটে সাত আট বছর। তার আলেষ্টারের সাত আট জায়গায় রিপু করা, দু'এক জায়গায় তালি লাগানো। তবুও সে অবাক নয়নে শীতপ্রভাতের মেঘলেশহীন আকাশ ও সুপ্রচুর আলোর দিকে চেয়ে আছে। মনে এসে লাগচে একটা খুসীর আমেজ।

তাদের বাড়ীটা একটা পোড়ো আমবাগানের মধ্যে। এ দিকটা একেবারে ফাঁকা, লোকের বসতি প্রায় নেই বললেই চলে। আমবাগানের ভেতর দিয়ে একটা পায়ে-চলা রাস্তা গঙ্গার ধার অবধি গিয়েছে। গঙ্গা এখান থেকে এক মিনিটের রাস্তা। যেখানে বুধি গাই বাঁধা আছে সেইখানে দাঁড়িয়ে সুধীরা গঙ্গার শীত-সঙ্কুচিত শীর্ণ চেহারা, আর সাদা বালির চড়া স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এই পুরান বে-মেরামত একতলা বাড়ীখানি খুব শস্তা ভাড়ায় পেয়েচেন বলে উকীল বিজয়বাবু নিয়েচেন। এই বছর নিয়ে ঠিক ছ'বছর হোল তিনি পশ্চিমের এই নামজাদা শহরটিতে ওকালতী করতে আরম্ভ করেচেন। প্রথমে অনেক আশা ছিল, আদর্শ ছিল, আকাঙ্ক্ষা ছিল। এখন আশার পরিধি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এমন হয়েচে যে, তাঁর ওকালতীর আয় থেকে তাঁর সংসারটা চলে গেলেই তিনি খুসী। আর বড় বেশি কিছু চা'ন না। অথচ তাও চলচে না। আজ ছ'মাসের বাড়ী ভাড়া বাকী, মুদীর দোকানে দেনা। ঠিকে ঝি একটা ছিল, সেটাকেও তাঁর স্ত্রী মালতী কতদিন হোল ছাড়িয়ে দিয়েচেন। নিজের হাতেই সব কাজ করেন। বাসন মাজা থেকে আরম্ভ করে—রান্না করা, কাপড় কাচা, ঘুঁটে দেওয়া, সবই। এততেও কিন্তু খরচ চালানো যাচ্ছে না।

রান্না ঘরের দাওয়ায় একখানা জীর্ণ কম্বলের আসন পাতা, সামনে কলাই করা গোটা দুই চায়ের পেয়ালা, একটা চায়ের কেট্‌লি। একটা পেয়ালায় অনেকখানি অ-পীত চা পড়ে রয়েচে। মালতী বিষণ্ণ মুখে কপির শাক এবং ডাঁটা দিয়ে একটা তরকারী বনিয়ে রাখচেন। এই একটুখানি আগেই স্বামী এসেছিলেন, এসে ঐ আসনে বসে চায়ের পেয়ালাটি সবেমাত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। মালতী ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বললে, "ওগো, শোন, বাড়ীওয়ালার মা আজ আবার খুব ভোরে গঙ্গাস্নানের পথে এইখানে এসে আমাকে যা নয় তাই বলে গেলেন। ক'টাই বা টাকা বাকী। দিয়ে দাও না।"

বিজয়কুমারের প্রকৃতি খুব শান্ত। বিয়ের পরের প্রথম কয়েক বছর মালতী মনেও করতে পারে না, তিনি কোনদিন একটি কড়া কথা বলেচেন। কিন্তু ইদানীং হয়ে উঠেচে অন্য রকম। রাতদিন সংসারের প্রকাণ্ড দায়িত্ব এবং অর্থ কষ্টের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তাঁর প্রকৃতি অসহিষ্ণু হয়ে দাঁড়িয়েচে। অল্পতেই হয়তো রেগে ওঠেন, হঠাৎ যা তা ব'লে ব'সেন। স্ত্রীর এই ভীত করুণ অনুযোগ শেষ হতে না হতেই তিনি বারুদের মত বিস্ফারিত হয়ে উঠলেন, হাতের পেয়ালা জোর করে সুমুখের দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, "তুমি কী মনে করেচ? আমি কি ইচ্ছে করে বাড়ী ভাড়ার টাকা

দিচ্ছিনে, তুমি কি মনে কর আমি অনেকগুলো টাকা লুকিয়ে রেখে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে মিথ্যে কথা বলে বেড়াচ্চি? তা মনে করবে না কেন বল? এ তোমারই উপযুক্ত কথা হয়েচে। তোমার হাড়ে লক্ষ্মী নেই। সংসারে কত কত মেয়ে দেখা যায়, যাঁরা ঘরে পা দিতে না দিতেই ঘরের অবস্থা ফিরে যায়। সংসারের শ্রী উথ্‌লে ওঠে। তাই না, কথায় বলে স্ত্রীভাগ্যে ধন। আর তোমাকে দেখো না, যখন থেকে তোমাকে বিয়ে করেচি, দুঃখ কষ্টের আর পার নেই।

বাড়ী ভাড়ার টাকা আমি লুকিয়ে রাখি নাই গো, লুকিয়ে রাখি নাই।

তোমাদের জন্যে এবারে আমাকে ছুটে কোন এক দিকে পালাতে হবে।

মালতী আর দ্বিতীয় কথা বলে নাই। চুপ করে বিবর্ণ মুখে নিজের জন্যে এক পেয়ালা চা ঢালছিল, বিজয়বাবু হঠাৎ আসন থেকে উঠে পড়ে আলনা থেকে মান্ধাতার আমলের পুরাণ গায়ের কাপড়খানা টেনে নিয়ে দ্রুতপদে বার হয়ে গেলেন। রুটির রেকাবি, আর চায়ের পেয়ালা, তাঁর অমনি পড়ে রইল। মালতীর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যে আত্মসংবরণ করে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। সংসারের শত সহস্র করাল বাহু যেখানে উদ্যত সেখানে মনভার নিয়ে বসে থাকবার, সৌখীন শোক করবার অবসর তাদের মত অবস্থার লোকেদের রয়েচে কি?

উনুনে আঁচ ধরে উঠেচে, ডালের হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে সে হোক একটা কিছু তরকারী বনিয়ে নিতে বসেচে, এমন সময় সুধীরা কাছে এসে বললে "মা, বুধি খেতে পায় না। রোগা হয়ে গেছে কত, তাকে কপির শাক দেবে না মা?"

মালতী মেয়েকে তাড়া দিলেন, "না. না, গরুকে দিয়ে নষ্ট করতে হবে না। ওতে তরকারী হবে।"

সুধীরা তবুও একটুখানি জিদ করবার উপক্রম করতেই ঠাশ ঠাশ করে তার মা তাকে মেরে ব'সল। সুধীরা অবাক হয়ে তার মায়ের দিকে চাইল, যেন কাঁদতে ভুলে গেল। অভিমানে স্তব্ধ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলে গেল।

এর পরে মালতীর হাতের কাজ আর চলে না। সমস্ত সংসারের ভূমিকা প্রকাণ্ড একটা ভারের মত তাঁর মনকে পীড়ন করতে লাগল। শীতের স্বচ্ছ শীর্ণ গঙ্গা—বহুদূর বিস্তৃত শুভ্র বালুচর এবং তীরপ্রান্তবর্ত্তী কাশগুচ্ছের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। আকাশে কী অমলিন সূর্য্যালোক, পৃথিবীতে যদি এত সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির মাঝে এত শান্তি, তবু মানুষের ক্ষুদ্র জীবনকে ঘিরে এত কষ্ট কেন? রান্নাঘরের একটা খুঁটিতে ঠেশ দিয়ে শূন্য মনে বাইরের দিকে চেয়ে এই প্রশ্নটাই মালতীর মনের মধ্যে আনাগোনা করতে লাগ্‌ল।

ঐ একটিমাত্র মেয়ে, কত আদর যত্নে মানুষ করেচে তাকে, প্রথম যখন সে হয়, অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঝরাত্রিতে ঘুম ভেঙ্গে যেয়ে তারা ভরা আকাশের দিকে চেয়ে খুকীর কথা মনে করে, তাকে কেমন করে মানুষ করবে, তাকে কত ভাল করে শিক্ষা দেবে, কি আদর্শে মানুষ করবে; এই চিন্তা নিয়ে কত নিশুতি প্রহর কাটিয়ে দিয়েচে। তাকেই আজ প্রায় বিনা কারণে নির্দ্দয়ভাবে মেরে ব'সল।

সকাল থেকেই আজ মনটা ভাল নেই। সুধীরাকে অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে স্নান করিয়ে খাইয়ে দিয়েছে। স্বামী আজ সকাল সকাল কোর্টে চলে গিয়েছেন। মালতী চুপ করে নিজের ঘরে বসে আছে। উপস্থিত অনেকখানি সময়ের জন্য আর হাতে কোন কাজ নেই। মনটা তাই কত কি না ভাবচে। সামনের পতিত জমিটা ভাগে দেওয়া হয়েচে। মালী বৌ আর মালী দু'জনে মিলে তাতে সিঁচ করচে, শীগ্‌গীর বাঁধা কপির আর মূলার চারা লাগাবে বলে। ইঁদারা থেকে একটা প্রকাণ্ড চামড়ার থলিতে করে বলদকে দিয়ে তারা জল তোলাচ্ছে। আর নালা দিয়ে বয়ে বয়ে সমস্ত ক্ষেতময় জল আসচে। জল তোলার একটা একটানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ দুপুর বেলার নিস্তব্ধ প্রহরগুলির নিঃশব্দতাকে আরও ঘনীভূত—আরও প্রগাঢ় করে তুলেচে। সুধীরা চটি পায়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে মায়ের উপর থেকে অভিমান তার এখনও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই।

মালতীর মনে পড়ছিল এমনই শীতকালে, তারিখটা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে সাতাশে অগ্রহায়ণ তার বিয়ে হয়। বিয়ের দিনে তার এত শীত করছিল, বেনারসী কাপড়, এক গা গয়না…কিন্তু কি একটা অজানা পুলক, বিস্ময়, ভয়ে বুকটা কাঁপছিল। শীতে ইচ্ছা করছিল, খুব গরম একটা আলোয়ানে সমস্তটা মুড়ে চুপটি করে বসে থাকে। সেদিনও বাতাসে এমনই হিমগন্ধী শিশিরভেজা আর্দ্রতা ছিল। বাইরে অনেকক্ষণ থেকে একটা মোটরের হর্ণ শোনা যাচ্ছে।

সুধীরা দৌড়ে এসে বল্লে, "মা মা শান্তি মাসীমা এসেচেন!" শান্তি দেবী এই পাড়ারই বিখ্যাত উকীল শ্রীশবাবুর পুত্রবধূ। মালতীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব অনেকদিনের। অবস্থার পার্থক্য সত্ত্বেও মালতীর মধুর স্বভাব এবং গুণের জন্য শ্রীশবাবুর পরিবারে তার অত্যন্ত সমাদর ছিল।

চওড়া কালোপাড়ের শান্তিপুরে শাড়ী পরে একজন সুন্দরী মোটাসোটা মহিলা ঘরে ঢুকে ব'ললেন, "চল, চল, তোকে নিতে এসেচি। এদিকে ভারি মুস্কিলে পড়েচি ভাই, কলকাতার এক জায়গায় আমার ছোট ননদ ইলার বিয়ের কথাবার্ত্তা চ'লছিল। তাদের অনেকদিন থেকেই দেখতে আসবার কথা ছিল, আজ হঠাৎ এসে পড়েচে। বরের মামা, এক বন্ধু, আর বর নিজে। এইমাত্র এগারোটার ট্রেণে নামলো। মা বাড়ী নেই, বাবা কোর্টে গিয়েচেন। আমি তো ভেবে অস্থির। বাবাকে আর ওঁকে কোর্ট থেকে আসবার জন্য খবর পাঠিয়ে দিয়ে—আর ওঁদের নাবার খাবার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়েই আমি তোর কাছে ছুটে আসচি। জানিস তো ভাই সই, এদিকে সবটি ভালো হ'লেও ইলার রঙের ততটা জৌলুষ নেই। তাই ভাবচি ক'লকাতার লোকের চোখে ধরলে হয়। মা আমার উপর সংসারের সব ভার ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিয়ে পুরী, মাদুরা, কাশী, বৃন্দাবন করে বেড়াচ্ছেন। যাবার সময় বলে গেলেন, 'তোমার উপর আমার খুব বিশ্বাস বৌমা। তোমার হাতে এ সংসার আমার চেয়েও ভালো চলবে এ যদি না বুঝতে পারতুম, তবে কি আর এত নিশ্চিন্ত মনে সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারতাম —মা!'

এখন তিনি যদি এসে শোনেন, ইলাকে দেখতে এসে-ছিল, পছন্দ হয়নি, তাহলে কি মনে করবেন, ভেবে দেখ দিকি। ভয়ে আর ভাবনায় আমার হাতে পায়ে বল আসচে না। চল ভাই চল। ভালো করে তাকে সাজিয়ে দিবি, শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরী করে দিবি। তোর মত করে আর তাকে কে সাজাতে পারবে ব'ল।"

মালতী মৃদু হাসিয়া কহিল, "চল না ভাই, যাচ্ছি। তুমি হাঁফাতে হাঁফাতে যেন ছুটে এসেচ। ব'স না দু'দণ্ড। এক গ্লাস জল খাও, একটা পান··" "না রে না, আমার মরবারও ফুরসৎ নেই। আমার কথা কেমন করে বুঝতে পারবি বল। নিজে তো বেশ গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াচ্ছিস, সংসার বলতে একটি মাত্র মেয়ে, নিজে আর উনি। আমার মাথার উপরে একটা পাহাড়। দেওর, ননদ, নন্দাই, মা, বুড়ো শ্বশুর, একরাশ ছেলে মেয়ে, একপাল চাকর চাকরাণী। সকাল থেকে উঠে রাত বারোটা অবধি কেমন করে যে কাটে তা মোটে বুঝতে পারিনে। আচ্ছা, তা দিবি তো একটা পান মোটা করে সেজে দে। দেখিস ভাই আমি জর্দ্দা খাই, এলাচ মশলা যেন পানে দিয়ে বসিস নে।"

মালতী পান সাজিতে সাজিতে দু'একমিনিট ইতস্তত করে অবশেষে বললে, "কিন্তু ভাই শান্তিদি, ওঁকে বলা হোল না। কাছারী থেকে ফিরে আসবেন—এসে হয়তো ভাববেন। তাই ভাবচি · ওদিকে তোমাদের বাড়ী থেকে ফিরতেও বোধ হয় সন্ধ্যে হয়ে যাবে। শীতকালের বেলা···" শান্তিদেবী পান মুখে দিয়া জর্দ্দার কৌটা খুলতে গিয়ে বললেন, "ওমা, সন্ধ্যেতেই আসবি কেমন করে, বিকেলের দিকেই তো ওরা দেখবে। শীতকালের বিকেল মানেই সন্ধ্যে, তখনই তখনই আসবি কেমন করে, সেই একেবারে রাত্রের খাওয়া সেরে আসবি। তোর ভাবনা নেই রে, আমি বলে পাঠিয়েচি ওঁকে, বারলাইব্রেরীতে বিজয় ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হবে, তাঁকে বলে দেবেন, বৌ আর মেয়েকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েচি আমাদের বাড়ীতে, রাতের আগে ছাড়া পাবেন না। কোর্ট থেকে সোজা তাঁকেও আমাদের বাড়ীতে আসতে বলে দিয়েচি, সেইখানেই চা জলখাবার খাবেন।"

"এর মধ্যে তুমি সব ব্যবস্থাই করে রেখেচ, আচ্ছা আমি তা'হলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাপড়খানা ছেড়ে আসি।"

কাপড় বদলিয়ে মেয়েকেও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মোটরে উঠবার সময় শান্তি বললে "আরে দেখ ভাই, 'সাঁঝের তারকা আমি'···সেই গানটা দু'একবার ইলাকে তোর সঙ্গে নিয়ে গাইয়ে দি'স। তোর কাছ থেকেই গানটা শিখেছিল বটে কিন্তু তোর মত গাইতে পারে না। ওরা আবার গানও শুনতে চাইবে, এস্রাজ শুনবে,···আজকালকার ছেলে। সব দিকে দেখে শুনে নেবে। মস্ত বড়লোক—ক'লকাতার একজন নামজাদা বড় ডাক্তার হচ্ছে ঐ বরের বাপ। কাকা মস্ত বড় এটর্ণী, কাকার ছেলেপুলে নেই, ঐ ছেলেটিকেই নিজের ছেলের মত বড় ভালবাসে। পাত্রটিও এটর্ণী পড়চে, ভাবনা

তো আর নেই। মনে জানে, পাশ করে একবার বেরুতে পারলেই কাকা দাঁড় করিয়ে দেবে।"

মালতী ক্ষীণকণ্ঠে বললে, "বেশ তো, পাত্রটি দেখতে কেমন?"

"চমৎকার! এই তো যেয়েই দেখতে পাবি। আর সেইজন্যেই আমার ভাবনা হচ্চে বেশি—অত সুন্দর দেখতে নিজে, ইলাকে পছন্দ হবে তো। দেখা যাক, যা বরাতে আছে তাই হবে।"

গঙ্গার পাশের রাস্তা ধরে মোটর চলছে, ঝির ঝির বাতাস দিচ্ছে, মালতী একটি চওড়া কালো পাড়ের বাসন্তী রঙের শাড়ী পরেছিল, তাড়াতাড়িতে ব্রোচ দিয়ে মাথার কাপড় আটকিয়ে নেওয়া হয় নি, বাতাসে কাপড় খুলে আসচে মাথা থেকে, সুন্দর মুখের উপর অগোছালো চুলের দু'একটি গুচ্ছ এসে পড়েচে। সেইদিকে তাকিয়ে শান্তি বললে "তোর দিকে অবাক হয়ে চাই মালতী, কে বলবে যে তোর মেয়ে হয়েচে, তারও বয়স আবার সাত আট বছর। দেখলে মনে হয় যেন কচি মুখখানি, কতই বা আর বয়স। ইলা যদি তোর মত সুন্দর হোত, তাহলে আর আজকের দিনে আমাদের ভাবনার কী ছিল।"

মালতী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে একটা নিশ্বাস ফেললে। তার মনে দুটো ছবি পাশাপাশি ফুটে উঠল;—ইলা, তার বিয়ে হয়েচে সেই কলকাতার নামজাদা ডাক্তারের বাড়ীতে। ডাক্তার সাহেবের বড় আদরের পুত্রবধূ, এটর্ণী খুড়শ্বশুরের ততোধিক আদরের বৌমা! কত রোমান্স, কত আদর, কত ভালোবাসা। আর সে নিজে, ছোটবেলায় সবারই মুখে শুনত বিয়ের আগে যে, তার মত সুন্দরী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তার বাবা তাকে অতি যত্নে লেখাপড়া, গানবাজনা, সেলাই, এমন কি রান্না আর ঘর-সংসারের যত কাজ অবধি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শিখিয়েছিলেন। সবাই একবাক্যে বলত, যেমন সুন্দরী—তেমনই গুণবতী মেয়ে, এ যার ঘরে যাবে, তার ঘর আলো হয়ে উঠবে। তার আঙুলের ডগাগুলি ছিল পরম রমণীয়, রক্তাভ এবং চাঁপার কলির মত সুডৌল, ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। একদিন সে বাপের বাড়ীতে তরকারী কুটছিল, দূরসম্পর্কের এক দিদিমা ঠাট্টা করে বলেছিলেন "তোর ঐ আঙুল কি ঘরকন্নার কাজের জন্য ভগবান সৃষ্টি করেচেন ভাই!" সেই তারই জীবনের স্বপ্ন আজ দু'দিন যেতে না যেতেই কেমন করে মিলিয়ে গেল। বাকী রইল কেবল হাড় পাঁজর বার করা দৈন্যের একটা ভয়ঙ্কর চেহারা। রোমান্স, সে তো ওই সেদিনই তার জীবনে এসেছিল, সেদিন চাঁপা ফুলের গন্ধে তার স্বামীর তাকেই মনে পড়ে যেত। বিনিদ্র রাত্রির নক্ষত্রালোকের দিকে চেয়ে তিনি তারই স্নিগ্ধ ঘন পক্ষ্মময় চোখের গভীর অতলতার কথা ভাবতেন। ক'টা দিনই বা কাটল, আর তারই মধ্যে সব নিভিয়ে গেল।

তুচ্ছ বাড়ী ভাড়ার জন্যে বাড়ীওয়ালার বুড়ো মা রোজ দুবেলা অপমান করে যান, সেই কথাটা মাত্র স্বামীর কাছে বলতে যেয়ে সে কত বকুনি শুনল, তিনি কত কড়া কথা বললেন।

গঙ্গার দুপাশে সর্ষে আর অড়হরের ক্ষেতে রোদ এসে পড়েছে. ঝুরি নামানো বটগাছটার তলায় গোবৎস নিমীলিত নয়নে পরম আলস্যে আনন্দে মায়ের গাত্র লেহন করচে। ঐ নিশ্চিন্ত নির্ভরতার আনন্দের স্বাদ মালতী কতদিন ভুলে গেছে, কতদিন ভুলে গেছে কেবল আনন্দের, কেবল উদ্বেগহীনতার মধ্য দিয়ে একটি দিন কাটিয়ে দেওয়া।

মোটরটা এসে শ্রীশবাবুদের প্রকাণ্ড বাড়ীর গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াল। উৎসবের একটা আয়োজন, একটা ব্যস্ততা সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। চাকরেরা তোয়ালে, সাবান, স্পঞ্জ, হরেক রকমের স্নানের উপকরণ নিয়ে ছোটাছুটি করচে। গাড়ী থেকে নেমেই শান্তি দক্ষিণ দিকের ঘরখানার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে দিলে "ঐ ঘরে কনে রয়েচে, যা ভাই যেয়ে দেখগে, কি কত দূর করতে পারিস। আমি চল্লুম একবার রান্নাঘরের ওদিকে, চপ আর দই মাছটা আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না দেখিয়ে দিলে ঠাকুরের হাতে ঠিক মতটি হবে না। ওদিকে আর সময়ও নেই, বাবুরা স্নান করচেন!"

পাশের খাটের উপর একরাশি, কম করে বোধহয় বিশ ত্রিশখানা নানা রঙের কাপড় আর পাঁচ ছয়টা গয়নার ছোট ক্যাশ বাক্স সাজানো রয়েচে।

মালতী ধীরপদে দক্ষিণের ঘরে ঢুকে দেখলে, খোলা জানালার কাছে ইলা একখানি বই হাতে করে ব'সে আছে, এইমাত্র তার মাথা ঘষিয়ে দেওয়া হয়েছে। একরাশি আর্দ্র এলো চুল থেকে ঘন সুগন্ধ উঠছে।

কপোলে সলজ্জ অপরূপ আভা। তাকে দেখে মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললে "এই যে আপনি এসেচেন ভাই। বৌদি ভাবি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন আপনার জন্যে। দেখুন না তাঁর কাণ্ড!" আঙুল দিয়ে সে পালঙ্কের দিকে দেখিয়ে দিলে।

মালতীও সেইদিকে চেয়ে হেসে বললে "তাঁর আর দোষ কি. সব মেয়েমানুষকেই জীবনে এমনই এক আধবার পরীক্ষা দিতে হয়। আর সেই পরীক্ষার সফলতা বিফলতার উপর তার সারা জীবনের অদৃষ্ট অনেকটা নির্ভর করে। এমন দিনে কে না ব্যস্ত হয়, কার না বুক ঢিপ ঢিপ্ করে বলো ভাই।"

ইলা আপন মনে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল. তার মুখের উপর একটা মধুর ছায়া ক্ষণে ক্ষণে পড়তে লাগল। হাতের বইটা নাড়াচাড়া করতে করতে একটুখানি হেসে বললে, "আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা বলব—মালতী বৌদি, কাউকে বলবেন না তো?"

"না গো না, কাউকে ব'লব না। তোমার মনের গোপন কথা আমি কি আর কাউকে বলে দিতে পারি। হাতে ওটা কি বই? রবিবাবুর 'মানসী'? বাঃ, বাঃ, এখনই আর 'মানসী' কবিতার বই নিয়ে ব'সে না, ইলা। তুমি দেখচি বাড়ালে।"

ইলা লজ্জা পেয়ে বইখানা তাড়াতাড়ি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে বললে "কী যে বলেন বৌদি, তার ঠিক নেই। আপনারা এত ব্যস্ত হচ্চেন কেন বৌদি, সেইটে আমি বুঝতে পারচিনে।"—বলে ফেলেই ইলা গভীর লজ্জায় তাড়াতাড়ি মুখ নামালে।

মালতীর ভারি ভাল লাগছিল দেখতে, কিশোরীর মুখে প্রেমের এই নবারুণ রাগ। ভবিষ্যতের একটা মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকা।

তার আনত মুখখানি তুলে ধরে বললে "ব্যস্ত হবার কিছুই কি নেই ইলা?"

"না, না, তা আমি বলছিনে, আপনি বোধহয় জানেন এই যেখানে আমার সম্বন্ধ হচ্ছে সেখানে অনেকদিন আগে থেকেই তা আরম্ভ হয়েচে। ছোটদা আমায় একটা চিঠি দেখাচ্ছিল সেদিন, আপনি সেটা পড়বেন মালতী বৌদি? পড়ে কিন্তু আমাকে আবার ফেরত দিতে হবে।"

রবিবাবুর চয়নিকার পাতার মধ্য থেকে ইলা সুদৃশ্য খামের একখানি চিঠি বার করে মালতীর হাতে দিলে। চিঠিখানি ইংরেজীতে লেখা। মালতী বেশ ভাল রকমই ইংরেজী জানত। পড়ে দেখলে, ক'লকাতা থেকে কে একজন অজিত ব্যানার্জি লিখচে ইলার ছোটদাকে যে, 'তোমরা অত উতলা হচ্ছ কেন বল দেখি। আমি ইলাকে ছাড়া আর অন্য কাউকে বিয়ে ক'রব না। সেই আমার ভাবী বধূ। একটু রঙ ময়লা?…তাতে কী এসে যায়? কেন সুকুমার কি জানে না—শ্যামল রঙই ভারতবর্ষের সৌন্দর্য্যের আদর্শ। সমস্ত মহাভারত যে দ্রুপদনন্দিনীর অসামান্য রূপ লাবণ্যের কথা নিয়ে উচ্ছ্বসিত, সেই দ্রৌপদীই ছিলেন শ্যামলা, কৃষ্ণা। যেদিন ক'লকাতায় ছোট মাসীমার বাড়ীতে ইলাকে দেখেচি সেইদিনই মনে মনে ঠিক করেচি, বিয়ে যদি করতেই হয় তোমাদের বাড়ীতেই করব। অপর কোথাও নয়। কিন্তু সে দেখাটা গোপনে তোমার ষড়যন্ত্রে সংগঠিত হয়েছিল। আমাদের বাড়ীর লোক এখনও কেউ সে কথা জানে না। তাই বাবা হুকুম দিয়েচেন, একবার যথাশাস্ত্র কন্যা দেখার পর্ব্ব পালন করতে হবে, পাকাপাকি বিয়ের কথাবার্ত্তার আগে। অতএব ডিসেম্বরের পাঁচুই চললাম দলবল সহ তোমাদের বাড়ীতে। দু একদিনের জন্য অতিথি হতে। আমার কোনই আপত্তি নেই, সানন্দে রাজী হয়েচি, আর একবার দেখা হয়ে যাবে। তার পরে আর একদিন খুব সমারোহ করে ঢাক ঢোল শানাই বাজবে, তোমরা যাকে বল—চারি চক্ষুর মিলন—তা'ও ঘটবে। কিন্তু আসল শুভদৃষ্টি বিনা আয়োজনে একদিন নিঃশব্দে তোমারই ষড়যন্ত্রে ঘটেছিল। সে কথা চিরদিনই আমার মনে থাকবে, আর সেজন্য চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব ভাই।"

মালতী হাসিতে আর কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হয়ে চিঠিখানা খামে বন্ধ করে ইলার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে "ছোটদার চিঠিখানাও বুঝি তাই আর তাকে ফিরিয়ে দিতে মন সরচে না। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরচে। যাক, তোর কপাল ভাল ভাই। যাই, আমি এ খবর শান্তদিকে দিয়ে আসি। সে বেচারা ভাবনায় অস্থির হচ্চে।"

ইলা মালতীর আঁচল চেপে বললে, "কখনো না, এই না আপনি প্রতিজ্ঞা করলেন কাউকে বলবেন না। বৌদি যদি ভাবেন, ভাবতে দিন না। তাঁর মত গিন্নী মানুষরা একটা ভাবনা ছাড়া থাকতে পারে না।"

"আচ্ছা ব'লব না। তুই খেয়েচিস ইলা ?"

"অনেকক্ষণ বাপ্ রে, আজকের দিনে বৌদির শাসনের অন্ত নেই। ঠিক সময়ে খাওয়া—ঠিক সময়ে বিশ্রাম, চাই-ই নইলে যে মুখ শুকিয়ে যাবে। তাঁর জ্বালায় আর পারিনে। এদিকে নিজে ভূতের মত খাটচেন।"

"তা হোক, এ তাঁর আনন্দের খাটুনী।"

* * * *

বিকেলের দিকে যখন গঙ্গার জলের উপর সূর্য্যের সোনালি আলো অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়ে পড়েচে, সেই গোধূলি বেলাকার স্বর্ণাভায় কনে দেখানো হ'ল।

ইলাকে মালতী আপন মনের মত করে সাজিয়ে দিয়েচে। ঘন চুলের রাশি খোলা, দুপাশে সোনার ক্লীপ্ দেওয়া। বাঁদিকে একটি ক্রীম্ রোজ গোলাপ দু একটি পাতা শুদ্ধ ক্লীপের সঙ্গে আটকান। সোনালি রঙের কাপড় কুঁচিয়ে সুন্দর করে পরান। সে কাপড়ের রঙ যেন পৃথিবীর উপরকার অবসন্ন স্বর্ণাভ আলোর সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেছে। গায়ে দু'চারখানি বাছাই করা স্বর্ণালঙ্কার।

মালতীর কল্পনা যেন এই সুসজ্জিতা সুশ্রী মেয়েটির পিছু পিছু সভাস্থলে গেছে, কোন প্রিয় মুগ্ধ হৃদয়ের দৃষ্টিপাতে এই কিশোরী আরও লজ্জারুণ হয়ে উঠ্চে, এ যেন সে মনশ্চক্ষে দেখতেই পাচ্ছে।

ফিরে আসতে অনেকখানি রাত হয়ে গেল। আকাশে তখন শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না উঠেচে। শান্তি মালতীদের গাড়ীতে তুলে দিতে যেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে মালতীর হাত চেপে ধরে বললে "তোর পয় আছে রে, তুই না এলে আমি কি আর অমনই করে সাজাতে পারতুম—না অত সব আমার আসত। ওদের মেয়ে খুব পছন্দ হয়েচে ভাই। তোরই হাতের গুণ। যাক আমার একটা দুশ্চিন্তা কেটে গেল।"

মালতীর স্বামীও বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে এসে অবধি এতক্ষণ ওখানেই ছিলেন। বিজয়কুমার বললেন "আজকের সন্ধে টা বাস্তবিক চমৎকার কাটল! শ্রীশবাবুরা কী চমৎকার লোক!" তারপরে একটা নিশ্বাস ফেললেন। মোটরটা তখন জনবিরল তরুচ্ছায়াঘন নদীপার্শ্বের পথ দিয়ে ছুটছিল।

মালতী প্রশ্ন করলে "কী ভাবচ ?"

"ভাবচি আমাদেরই পুরাণ দিনের কথা। ঐ যে ছেলেটি দেখতে এসেছিল, তার চোখে স্বপ্নের ছায়া, ঐ ছায়া একদিন আমার আর তোমার চী নেও নেমেছিল। সে রোমান্সের আলো কতদিন ফুরিয়ে গেছে।"

মালতী একটুখানি হেসে বললে "দেখ, আমিও ঠিক ঐ কথাই কিছুক্ষণ আগে ভাবছিলুম। প্রথমটায় মনটায় একটু দুঃখ হয়েছিল। কিন্তু তারপরে হঠাৎ মনে হ'ল, সে স্বপ্ন, সে রোমান্স কি ফুরোবার ? ঐ মেয়েটি আর ঐ ছেলেটির জীবনে যা ফুটে উঠেচে, সে তো সেই একই উৎস থেকে বইচে। ওদের ভিতর দিয়ে নিজেদের জীবনকে যেন নূতন করে আবার আস্বাদ করলুম।"

"অনেকটা তাই।"—বিজয়কুমার স্ত্রীর একখানি হাত নিজের হাতে নিয়ে ব'ললেন "অনেকটা তাই—সেই জন্যেই আজ সারা সন্ধ্যাটা এমন চমৎকার কাটল। মনে হচ্চে অনেক দিন পরে যেন একটা হারানো জিনিষ খুঁজে পেয়েচি। তুমি কি আমাকে ক্ষমা করবে না মালতী সেই আগেকার দিনের মত, তেমনি সম্পূর্ণ তেমনি নিবিড় করে আমাকে তোমার জীবনে আবার ফিরিয়ে নেবে না ? আজকাল কত তুচ্ছ কারণে—কত অকারণে তোমার মনে কষ্ট দিই। সকাল বেলাকার ব্যাপারটা মনে করে অবধি দুঃখে অনুতাপে আমার বুক ফাটচে।"

মালতী কোন উত্তর না দিয়ে স্বামীর হাতের বন্ধনের মধ্যে নিবিড়ভাবে নিজের হাতখানি সমর্পণ করে জ্যোৎস্নাময় রাত্রির দিকে চেয়ে রইল।

সুধীরা গাড়ীর গদীতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বাড়ীতে পৌঁছে মালতী মেয়েকে কোলে নিয়ে সন্তর্পণে যখন বিছানায় শুইয়ে দিচ্চে, তখন পাশের বাড়ীওয়ালার বাড়ীতে কে রেকর্ডে একখানি গান দিয়েছিল,

"তোমায় নূতন করে পাবো বলে
হারাই অনুক্ষণ............
ওগো আমার ভালবাসার ধন।"

সুধীরাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে খাটের বাজু ধরে মালতী তৃপ্ত মনে খানিকক্ষণ গানখানি শুনলে। তারপরে গান যখন থেমে গেল তখনও সেই গানের রেশ তার মনে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল।

নাপোলী ও পম্পিয়াই

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

রোমা থেকে নেপ্‌ল্‌স বা নাপোলী রওনা হোলাম। নাপোলী ইতালীর অন্যতম বড় বন্দর, এর কাছেই বিখ্যাত পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষ।

ষ্টেসন থেকে বেরিয়ে সামনেই টারমিনাস হোটেলে আড্ডা নিলাম। নাপোলীর রাস্তায় বেরুলাম—সহর দেখবো বোলে। মনে হোলো কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বুঝি কোন্ যাদুমন্ত্রের মায়ায় সহসা ইউরোপ থেকে মিশর বা ভারতের কোনো মাঝারি সহরে এসে পড়েছি। হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, মোটর কদাচিৎ দু'একটা চলেছে; ভারবাহী গাধা খচ্চরই রাস্তায় বেশী। রাস্তাগুলো ধুলোয় পরিপূর্ণ—একটু জোর হাওয়া দিলেই চোখ মাথা ধুলোয় ভর্ত্তি হোয়ে যায়। রাস্তার ধারে, লোকের বাড়ীর দরজার পাশে আবর্জ্জনার স্তূপ জমা হোয়ে আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ঔজ্জ্বল্য সহরের বুকে কোথাও নাই। অধিবাসীরাও ঠিক তেমনি নোংরা—তারাই ত সহরের রূপসজ্জাকর। সকলেই চলেছে ঢিলেঢালা, ময়লা, ছেঁড়া কাপড়জামা



মল্লযোদ্ধা — নাপোলী যাদুঘরের দু'টী ব্রোঞ্জ-মূর্ত্তি

লাক্সেমবুর্গ প্রভৃতি ছোট দেশের ছোট সহরের সঙ্গেও এর তুলনা হয় না। আয়তনে ও লোকসংখ্যায় হয়ত নাপোলী অনেক সহরের চেয়ে বড়, কিন্তু সহরে আবহাওয়ায় ঢের নীচে। রাস্তাগুলো অধিকাংশই পিচ দেওয়া নয়—পাথর বাঁধান; তার ওপর দিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ছুটেছে ঘোড়া ও খচ্চরবাহী বিভিন্ন যানের লোহার হাল-বাঁধান চাকা; পরে, শরীরেরও সর্ব্বত্র নোংরামির চিহ্ন জাজ্বল্যমান। রাস্তার ধারের বাড়ীগুলোও তেমনি বিশ্রী বেখাপ্পা। কোনোটী হয়ত শতবর্ষের জীর্ণতা বুকে নিয়ে কঙ্কালগুলি প্রকাশ কোরে দাঁড়িয়ে আছে, আবার ঠিক পাশেই একটী রঙচঙে বাড়ী—যৌবনের প্রাচুর্য্যে টলমল করছে। কোনো বাড়ীটার চেহারা তার পাশেরটী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অপারগতার জন্য হয়ত এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে, কিন্তু এতে সহরের সমষ্টিগত সৌন্দর্য্য ব্যাহত ও ক্ষুণ্ণ হোয়েছে। কোনো কোনো বাড়ীর বারান্দা ও জানালা থেকে কাপড় জামা উড়ছে; বলা বাহুল্য শুকোচ্ছে—এ দৃশ্য



বিষাক্ত বাষ্পে ও ছাই-এ শ্বাসরুদ্ধ হতভাগ্য—প্রায় ১৮৫০ বছর আগে যে হতভাগ্যের দেহ ভস্মস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে ধীরে ধীরে ধূলোয় মিশিয়ে গেছে, তারই একটি মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি ভস্মস্তূপের মধ্যে যে অংশ ফাঁকা ছিল তারই মধ্যে মাটী ঢেলে এই ছাঁচ উঠেছে

ইওরোপের আর কোনো সহরে মিলবে না; এশিয়ার ও আফ্রিকার সহরে শুধু এ দৃশ্য দেখা যায়। রাস্তার দুধারে প্রকাণ্ড কাঁচ দেওয়া 'শো-কেস' নাই, ছিমছাম পোযাক-পরা দোকানী নাই—এখানকার অধিবাসীদের রুচি অনুযায়ীই দোকানপাট গড়ে উঠেছে। বাড়ীর নীচের তলাগুলিতে রাস্তার ধারের জানালায় বা দরজার ধারে বসে স্বর্ণকার সামনে আগুনের চুল্লী রেখে কাজ করছে, ঠুকঠাক হাতুড়ী পিটছে। কোনো বাড়ীতে ছুতার মিস্ত্রী সশব্দে করাত দিয়ে কাঠ চিরছে; কোথাও মুদী চারদিকে সাজান বস্তার থাকের মধ্যে বসে দাঁড়িপাল্লায় জিনিষ ওজন করছে। কোথাও দোতলার জানালা থেকে দড়ি বেঁধে গৃহিণী একটা ভাঁড় রাস্তার ধারে ফুটপাথে নামিয়ে দিয়েছে—সেখানে ছাগীপালক সেই ভাঁড়ে দুধ দুয়ে দিচ্ছে; এসব দৃশ্যও ইওরোপের আর কোনো সহরে দুর্লভ। বড় রাস্তার ধারের বাড়ীগুলো অন্য সহরে সাজান দোকান বা অফিস অথবা বাসগৃহ হিসাবেই ব্যবহৃত হয়; কাঠ চেরা বা সোণারূপার কাজ সেখানে সাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে কারখানায় হয়; প্রকাণ্ড রাস্তার সামনে হয় না। রাস্তার ধারে ফুটপাথেই বসে কেউ কমলালেবু—কেউ বা অন্য কিছু বেচছে—যা অন্যত্র বে-আইনী। আমার মনে আছে প্যারীতে একদিন ফুটপাথের ওপর দুটী কাগজের পুতুল সরু অদৃশ্য সুতোর সাহায্যে নাচিয়ে একটী পুরুষ ও একটী নারী দর্শকদের বেশ ভিড় জমিয়ে ফেলেছিল। দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা চাইতে আরম্ভ করেছে, এমন সময় নারীটি অস্ফুটকণ্ঠে বোল্লে "পোলিস"। ব্যস—ক্ষিপ্রগতিতে পুতুল দুটি পকেটস্থ করে মুহূর্ত্তের মধ্যে তারা ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হোয়ে গ্যালো। ফুটপাথে জিনিষ বিক্রী করা কোলকাতাতেও বে-আইনী; তবে গোলাকার চাকতির অপরিসীম মহিমায় আইন এখানে স্তব্ধ মূক; নইলে এখানে রাস্তার ধারে জিনিষ বিক্রী করে কত লোক যে পায়ে চলা পথিকদের অসুবিধা ঘটায়—তা ত আইন রক্ষকরা—ছোট কনেষ্টবল থেকে বড় হুজুর পর্য্যন্ত সকলেই দেখতে পান; তবু এখানে ত আইন চলে না! নাপোলীর রাস্তাগুলিতে ভিড়ও বেশ কম। লোকেরা চলেছে অলস স্বচ্ছন্দ গতিতে—সহরটা দেখেই মনে হয় এখানকার সময়ের গতি ইওরোপের অন্য দেশের চেয়ে মন্থর। এখানকার অধিবাসী সংখ্যা ৭,৭২,০০০ জন, আর মিলানোর ৭,২২,০০০ জন; অথচ মিলানো সহর হিসাবে শ্রেষ্ঠতর।



ভাবমগ্ন কবি—স্যাফো (Sappho) পম্পিয়াইএ প্রাপ্ত একটি মহিলা কবির রঙ্গীন চিত্র

একদিন এখানকার 'ন্যাশনাল মিউজিয়ামে' গেলাম। যাদুঘরটীর অনেক প্রদর্শক দরজার কাছেই পাওয়া যায়।

তারা এখানকার সরকারী 'রেট' একটি ছাপা কাগজে দেখালে; এক ঘণ্টার জন্ম প্রদর্শকদের পারিশ্রমিক ২৫ লিয়ার। এখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে আমার বেশ উঁচু ধারণা না হওয়ায় আমি ভরসা করে দাম দর করলাম। দেখলাম আমার অনুমান অমূলক নয়। শেষে একজন ১০ লিয়ারে রাজী হোলো।

যাদুঘরটির অধিকাংশ দ্রষ্টব্যই পম্পিয়াই ও হারকিউ-লেনিয়াম (Harculaneum) থেকে সংগৃহীত—দুটি সহরই প্রায় দুহাজার বছর আগে (৭৯ খৃঃ অব্দে) ভিসুভিয়াসের ভীষণ রোষে ধ্বংস হয়। পম্পিয়াই ছাই চাপা পড়ে, কিন্তু হারকিউলেনিয়াম গলিত লাভা প্রবাহে (lava—আগ্নেয়-গিরি থেকে উৎসারিত গলিত ধাতব পদার্থ) ধ্বংস হয়। পম্পিয়াইএর খনন কার্য্য তাই সহজতর—ছাই চাপা পড়ায় এখানকার বহু জিনিষ অটুট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে; ধাতব পদার্থগুলি অনেকদিন ছাই চাপা থাকায় শুধু সবুজ হোয়েছে; কিন্তু হারকিউলেনি-য়ামের খনন কার্য্য অত্যন্ত কঠিন হোয়ে উঠেছে। কঠিন লাভা প্রবাহের গর্ত্ত থেকে একে উদ্ধার করা খুব শক্ত, তাছাড়া খনন করলেও বহুদিনের জমাট বাঁধা কঠিন লাভার অঙ্কমুক্ত করে কোনো জিনিষকে অটুটভাবে উদ্ধার করা আরো দুঃসাধ্য। তবু অনেক জিনিষ এখান থেকেও পাওয়া গিয়াছে—এখানকার সমস্ত ধাতব জিনিষ জলন্ত লাভায় পুড়ে কাল হোয়ে গ্যাছে।

যাদুঘরে ঢুকে বাঁদিকের ঘরটি থেকে দেখতে সুরু করলাম। হারকিউলেনিয়ামে প্রাপ্ত মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি এই কক্ষে সাজান আছে। এর দরজার দুধারে দুটি প্রকাণ্ড মার্ব্বেলের স্তম্ভ আছে, তাদের তলার অংশ দামী আলাবাস্তার পাথরের—এ দুটি হারকিউলেনিয়ামে প্রাপ্ত। মূর্ত্তিগুলির অনেকের নীচেই শিল্পীদের স্বহস্তখোদিত নাম ও শিল্পপরিচয় এখনও আছে। এই কক্ষের অধিকাংশই তৎকালীন রাজা, পুরোহিত ও রাজপরিবারের আত্মীয় বন্ধুর প্রতিমূর্ত্তি। এর পরে একটী লম্বা 'হলে' ঢুকলাম; এখানকার মর্ম্মর মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই রোমা ও নিকটবর্ত্তী স্থান থেকে সংগৃহীত। তারপর একে একে অনেকগুলি কক্ষই দেখলাম। যাদুঘরটির মোট কক্ষ ২৪টি—তার মধ্যে কয়েকটি বেশ মনে আছে। একটি কক্ষের নামকরণ হয়েছে 'আইসিস কক্ষ' (Room of Isis)। পম্পিয়াই-এ আইসিস মন্দিরে প্রাপ্ত সব জিনিষ এখানে সাজান আছে। আইসিস দেবতা মিশরবাসীদের, কাজেই এই মন্দিরের



"ভেত্তির গৃহের" একটী কক্ষের দেওয়াল—দেওয়ালের চিত্র ও সজ্জা লক্ষ্য ক'রবার

সমস্ত উপকরণই মিশরীয় ভঙ্গীতে নির্ম্মিত। বহু মিশরবাসী ব্যবসাসূত্রে পম্পিয়াই সহরে থাকতো—বোধহয় এ মন্দিরের উপাসক ছিল তারাই। এই মন্দিরের যে সব দেওয়াল-চিত্র পাওয়া গিয়েছে সেগুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর তিনটি ঘরে পম্পিয়াই-এ প্রাপ্ত বহু দেবপ্রতিমা, বাগান সাজাবার মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রভৃতি অনেকগুলি দ্রব্য সাজান আছে। আমার মনে হলো সমগ্র যাদুঘরের মধ্যে এই তিনটী ঘরই বোধহয় সবচেয়ে বেশী সমৃদ্ধ; কয়েকটি মূর্ত্তি এত

চমৎকার যে না দেখলে ভাষায় সে সৌন্দর্য্য বোঝান যায় না। মনের ভাষা মূর্ত্তিগুলির চোখে মুখে যেন স্পষ্ট রূপ নিয়েছে—মনে হয় বুঝি ওরা প্রায় দু হাজার বছর আগের কাহিনী বলবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে রয়েছে—ওদের মুখে চোখে মনের বাণী মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে—হয়ত দরদী শ্রোতার অভাবেই ওরা কথা কইছে না। কতকগুলি মূর্ত্তির চুল, চোখ, ঠোঁট প্রভৃতি রঙ্গীন জায়গার রঙ্গ এখনও এত উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক আছে—মনে হয় এইমাত্র বুঝি শিল্পী রঙ্গ দেওয়া শেষ কোরে তুলি নামিয়ে রেখে কোথাও গ্যাছে। মূর্ত্তিগুলির চোখ বোধ হয় কোনো কাঁচ বা



বংশীবাদক—পম্পিয়াইএ প্রাপ্ত চিত্র

উজ্জ্বল দামী পাথরের—ভ্রম হয় এখুনি বুঝি পলক পড়বে; এত সুন্দর ও স্বাভাবিক। একটি ঘরে চুয়ান্নটি মূর্ত্তি আছে; সবগুলি একটি বাড়ীতে পাওয়া গিয়েছিল। এই সব অপূর্ব্ব মূর্ত্তি-শিল্প দেখার পর আবার মনে হোলো, এই দীর্ঘ ১৮৫৬ বছরে সূক্ষ্ম কলাশিল্প-জগতে মানুষ শ্রেষ্ঠতর কোনো সম্পদ দান কোরতে পেরেছে কি? আর একটি 'হলের' দুধারে গ্রীস ও ইতালীর খ্যাতনামা দার্শনিক, কবি, ঐতিহাসিক, নাট্যকারদের আবক্ষ প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তি রয়েছে। পম্পিয়াই গ্রীকদের স্থাপিত সহর, কাজেই গ্রীসীয় পণ্ডিতদের প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। ওপর তলায় গেলাম পম্পিয়াই-এ প্রাপ্ত ছবিগুলি দেখবার জন্য।

বহু পুরাণো হওয়ায় ও প্রকৃতির রুদ্ররোষে ছবিগুলির ঔজ্জ্বল্য ও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য (details) নষ্ট হোয়েছে। কয়েকটি ছবি এখনও এমন সুন্দর আছে যে দেখলে মনেই হয় না—সেগুলি দু হাজার বছর—বা তারও আগের আঁকা। অধিকাংশ ছবিই গ্রীক পুরাণোল্লিখিত ঘটনাবলী অবলম্বনে আঁকা। তবে শুধু ঘর সাজাবার জন্যই অনেক ছবি আছে—যার পেছনে কোনো ঘটনা নেই—যেমন থ্রি গ্রেসেস (Three Graces—তিনটি যুবতী); পরীর ছবি ইত্যাদি। সব ছবিরই গতি (tendency) নগ্নতার দিকে, পুরাণোল্লিখিত ছবির মধ্যেও বীরত্ব বা শক্তিব্যঞ্জক কোনো ঘটনা চিত্রিত নাই, সবই নগ্নতা ও রমণীর সৌন্দর্য্য প্রকাশের জন্য—অনেকগুলি রীতিমত অশ্লীল। এই ছবিগুলি ও পম্পিয়াইএর কয়েকটি রাস্তা এবং বাড়ী দু হাজার বছর আগেকার ইতালীর সহুরে অধিবাসীদের মনোবৃত্তি ও বিলাসিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। কয়েকটি মার্ব্বেলের ওপর অনেকগুলি ছবি আছে, তার মধ্যে দুটি বেশ ভাল আছে, বাকীগুলি অস্পষ্ট হোয়ে গিয়েছে। এই চিত্র-গৃহের দ্বারে কয়েকজন চিত্রকর ছবিগুলির প্রতিরূপ এঁকে বিক্রী কোরছে। অনেকে ঘরের মধ্যেই রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকছে। ছবিগুলি আসল ছবির কাছাকাছি বটে তবে সে যেন বৃদ্ধার যৌবনের রূপ। বয়স্থ জীর্ণ চিত্রগুলির অনুকরণে আধুনিক শিল্পীরা উজ্জ্বল রঙ্গে ছবিগুলি এঁকে সদ্য সদ্য বিক্রী কোরছে—এর ফলে অস্পষ্ট ঔজ্জ্বল্যহীন পরী বা ভেনাসের চিত্র বিলাতী নগ্নচিত্রে রূপান্তরিত হোয়ে উঠছে। এই শিল্পীদের সঙ্গে বেশ দাম দর করা চলে। আমি একটি 'মহিলা কবির' (গ্রীসের Sappho) চিত্র কিনেছিলাম—৫০ লিয়ার দাম চেয়ে শেষে ২৫ লিয়ারে দিলে। ছবির ঘর যতদুর মনে পড়ছে চারটি—এ ছাড়া মোজায়েক দ্রষ্টব্যের কয়েকটি ঘর আছে। এখানকার গ্রন্থাগারটি বেশ বড়। নাপোলী সহরের কোনো কেন্দ্র নাই অর্থাৎ কোলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ার বা লণ্ডনের ট্রাফালগার স্কোয়ারকে যেমন সহরের বাণিজ্যকেন্দ্র এবং এবং কোলকাতার শ্যামবাজার অঞ্চল ও চৌরঙ্গী এবং লণ্ডনের ওয়েষ্ট-এণ্ডকে প্রমোদকেন্দ্র বলা যেতে পারে,

নাপোলীর তেমন কিছু নাই। গোটা সহরে দ্রষ্টব্যের মধ্যে আছে একটা রাজপ্রাসাদ ও তার সামনের আটটি রাজ-প্রতিমূর্ত্তি। বিভিন্ন সময়ে যে সব বিভিন্ন দেশের রাজা নাপোলী অধিকার করেছেন, তাদেরই প্রতিমূর্ত্তি।

পম্পিয়াই যাবার জন্য কোনো গাইড পাওয়া যাবে কিনা হোটেলে জিজ্ঞাসা কোরলাম। তারা বোল্লে পম্পিয়াই ও ভিসুভিয়াস দেখান, ট্রেণ ভাড়া এবং মধ্যাহ্ন-ভোজন সব শুদ্ধ ১১০ লিয়ার নেবে। হোটেলের বাইরে এসে দাঁড়াতেই একজন লোক এসে জিজ্ঞাসা কোরলে —"পম্পিয়াই দেখতে যাবেন? আমি আফিসিয়াল গাইড।" জিজ্ঞাসা কোরলাম "দেখানো, ট্রেণ ভাড়া ও খাওয়া শুদ্ধ কত নেবে?" সে একটা কাগজ বের কোরে বোল্লে "১১০ লিয়ার, এই দেখুন অফিসিয়াল রেট।"

'রেট' যখন এক, তখন বাইরের অজানা লোকের সঙ্গে না গিয়ে হোটেলের লোকের সঙ্গে যাওয়াই সঙ্গত মনে হোলো—কাজেই তাকে বিদায় দিলাম। সে চলে যেতেই আর একজন এসে জিজ্ঞাসা কোরলে "পম্পিয়াই ভিসুভিয়াস দেখতে যাবেন?" বল্লাম "১০০ লিয়ারে রাজী থাক ত কথা কও।" সে রাজী হোয়ে গ্যালো—সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনে গিয়ে বেলা প্রায় ৯৷৷০ টায় ইলেকট্রিক ট্রেণে চড়ে বসলাম। সহর ছেড়ে ট্রেণ হু হু শব্দে মাঠের মধ্যে দিয়ে ছুটলো। লাইনের দুধারে সমতল কৃষিক্ষেত্র, কোথাও কমলালেবুর বাগান—গাছগুলো লাল হলদে কমলালেবুতে ঝুলে পড়ছে—কোথাও একটানা দ্রাক্ষাক্ষেত্র। শীতের প্রকোপে পাতাগুলো ঝ'রে গ্যাছে—শুকনো লতাগুলো পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নির্জ্জীব হোয়ে পড়ে আছে—বিয়োগবিধুরা শোকক্লান্তা সদ্য-বিধবার মত। রাস্তার ধারে ছোট ছোট গ্রাম, বাড়ীগুলি পাথরের এবং সেকেলে—কোথাও দু'চারটে আধুনিক বাড়ী কদাচিৎ চোখে পোড়ল—তাও সেগুলি কংক্রিটের বা অতি আধুনিক ভঙ্গীতে নির্ম্মিত নয়। ইতালীর আবহাওয়া, কুয়াসামুক্ত দিগন্ত, মেঘহীন স্বচ্ছ নীলাকাশ, প্রচুর অবারিত রৌদ্র, বিলাসবর্জ্জিত দরিদ্র কৃষক, মাঠের গ্রীষ্ম প্রধানদেশ সুলভ গাছপালা, পাড়াগাঁয়ের ঘর বাড়ী ইত্যাদি অনেক কিছু দেখে ভারতবর্ষকে মনে পড়ে, খুব বেশী মনে পড়ে।

পম্পিয়াই রেলষ্টেশন পম্পিয়াই সহরের ধ্বংসাবশেষের গায়েই। সহরে প্রবেশের কোনো দক্ষিণা নাই—তবে নাম ধাম লিখে দিতে হয় ও পাসপোর্ট দেখাতে হলো।

পম্পিয়াই দু একটি বাড়ীর ধ্বংসস্তূপ নয়—একটি সমগ্র সহরকে মাটীর বুক থেকে উদ্ধার করা হোয়েছে। সহরের চারধারের দেওয়াল, প্রধান ফটক, রাস্তা, বাড়ী ঘর, দোকান-পাট, স্নানাগার, বিচারালয়, মন্দির, বেশ্যাগৃহ, ওষুধের দোকান সব কিছু প্রায় সতরশ বছর পর মাটীর অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় আত্মপ্রকাশ করেছে। (প্রথম খনন কার্য্য আরম্ভ হয় ১৭৫৫ খৃঃ অব্দে)।



পম্পিয়াই অধিবাসীদের অঙ্গ সজ্জা ও সুন্দরীদের কেশ বিন্যাস—
"নেপলস" যাদুঘরে রক্ষিত মর্ম্মর মূর্ত্তি

পুরাণো সহরের রাস্তাঘাট বা ফটকের আসল নাম এখন আর জানবার উপায় নাই—তাই এখন এগুলির নূতন নামকরণ হোয়েছে। যে ফটকটি থেকে যে মুখো রাস্তা গিয়েছে সেই জায়গার নামানুসারে এখন সেই ফটকের নামকরণ হয়েছে। যে রাস্তার ওপর কোনো উল্লেখযোগ্য

বাড়ী বা মন্দির পাওয়া গিয়াছে সে রাস্তার সেই অনুসারে নামকরণ হয়েছে। সহরটির পাঁচটি ফটক আবিষ্কৃত হোয়েছে; প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিশ্বাস আরো ২টি ছিলো। আমরা ষ্টেশনের ফটক দিয়ে সহরে ঢুকলাম। ফটকগুলির দুপাশে দুটি গম্বুজ এখানকার বিশেষত্ব। প্রধান রাস্তা পাথর বাঁধান—দুহাজার বছর আগে যে সব যানবাহন এখানে চলাচল কোরতো তাদের চাকার নির্ম্মম ঘর্ষণে যে গভীর ক্ষতচিহ্ন এই রাস্তার পাষাণ বুকে অঙ্কিত হোয়েছে, দ্বিসহস্র বৎসর পরেও আজ তা এতটুকু ম্লান হয় নি—আজও তা যেমন গভীর তেমনি সুস্পষ্ট। রাস্তার দুধারে বেশ প্রশস্ত পায়ে চলার পথ (foot path) তারপর দোকানের



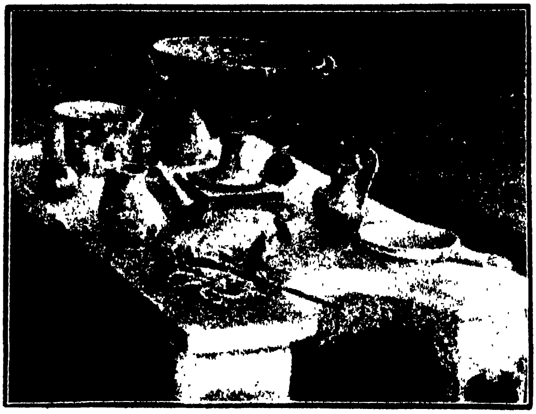
পম্পিয়াই-এর একটি দেওয়াল চিত্র—পম্পিয়াই-এর অধিকাংশ দেওয়ালই পৌরাণিক ঘটনাবলীর চিত্র শোভিত ছিল। এটিও একটি পৌরাণিক ঘটনার চিত্র। "বিয়োগান্ত কবির গৃহে (Tragic Poet) এটি আছে

সারি। রাস্তার ধারের ঘরগুলি যে দোকান ছিল, তা এদের প্রশস্ত খোলা সম্মুখাংশ থেকে এবং তার মাঝে কাঠের দরজা পরাবার সুস্পষ্ট খাঁজগুলি থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। শুধু যে দোকান ছিল তাই বোঝা যায় না, কিসের দোকান ছিল তাও বলা শক্ত নয়। মদের দোকানের সামনে টেবিলের মত উঁচু বাঁধান জায়গা আছে—তার ওপর অধিকাংশ দোকানেই মার্ব্বেল দেওয়া। মদের প্রকাণ্ড হাঁড়িগুলো এখনো মাটীতে পোতা আছে, শুধু মুখটি তাদের মাটীর ওপর। 'রেষ্টুর‍্যাণ্ট'গুলির বসবার জায়গা, উনুন, জিনিষ রাখবার তাক ইত্যাদি থেকে নিঃসংশয়ে বোঝা যায় যে সেগুলি 'রেষ্টুর‍্যাণ্ট' ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কোথাও কোনো বাড়ীর দেওয়ালে সাপ আঁকা আছে, কোথাও ফুটপাথের ওপরেই সাপ আঁকা আছে—এগুলি ওষুধের দোকানের চিহ্ন—ফুটপাথের যে দিকে সাপের মাথা আছে তার সামনের দোকানটিই ওষুধের দোকান। ওষুধের দোকানের এমনি বিশেষ চিহ্ন এখনও ইওরোপের কোথাও কোথাও আছে। জার্ম্মানীর বার্লিন সহরে এখনও 'চুলকাটা সেলুনের' সামনে একটা পেতলের থালা ঝোলান থাকে। রাস্তার ধারে পথচারীদের পানের জন্য জলের ফোয়ারা বা জলের কল ছিল। সবাই একটি বিশেষ জায়গায় হাত দিয়ে জল পান কোরতো—বহুবর্ষ ধরে এমনি হাতের ঘর্ষণে পাষাণের বুকে এই সব তৃষ্ণার্ত্তদের হাতের দাগ স্পষ্ট হোয়ে আছে—ক্ষয়ের মাঝেই তাদের স্মৃতি অক্ষয় হোয়ে আছে। রাস্তার মাঝে মাঝে দুটি কোরে পাথর দেওয়া—একদিক থেকে অন্যদিকে রাস্তা পারাপারের সময় এগুলির ওপর দিয়ে লোকে যাওয়া আসা কোরতো—কারণ সহরের জল নিকাশের প্রধান রাস্তা ছিল নাকি এই রাস্তাগুলি—তাই জলে পা না দিয়ে এই পাথরের ওপর দিয়ে যাওয়া আসার ব্যবস্থা ছিল।

কোথাও রাস্তার ধারে দেওয়ালের গায়ে লিঙ্গচিহ্ন আঁকা বা খোদা আছে—এগুলি বেশ্যা বাড়ীর স্থান নির্দ্দেশক। যে রাস্তায় ঐ চিহ্ন আছে, সেই রাস্তার সব বাড়ীই বেশ্যালয় নয়। সেই রাস্তায় আবার যে সব বাড়ীর দেওয়ালে বা দরজায় ঐ চিহ্ন আছে সেইগুলিই বেশ্যাগৃহ। কোথাও দেওয়ালের বদলে রাস্তার ওপর পাথরে এই চিহ্ন আছে—বোধহয় এইসব রাস্তায় যানবাহনের চলাচল ছিল না। কোথাও পূর্ব্বের ভাষায় লেখা আছে "রাস্তায় প্রস্রাব করিও না—প্রস্রাবাগারে যাও"—অর্থাৎ সহরে যে পৃথক প্রস্রাবাগারের ব্যবস্থা ছিল এ থেকে তা বোঝা যায়। এ রকম উপদেশ আজ দু-হাজার বছর পরেও সভ্য মানুষকে দিতে হয়। এর চেয়েও হাস্যকর উপদেশ দেখেছিলাম ইংলণ্ডের মিডল্যাণ্ড

প্রদেশের একটা ছোট রেলষ্টেশনের প্রস্রাবাগারে। সেখানে ভিতরে দরজার সামনেই লেখা ছিল "Adjust your dress properly" অর্থাৎ বাইরে যাবার আগে তোমার পোষাকটা ঠিকভাবে সামলে নাও। দু হাজার বছর পরে সুসভ্য ইংরেজ বাচ্ছাকে যদি ঐ উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজন থাকে—তবে পম্পিয়াইএর রাস্তায় ঐ উপদেশ মোটেই হাস্যকর নয়। কোথাও কোথাও দেওয়ালের গায়ে এক একটি বিশেষ চিহ্ন আছে—গাইড বোল্লে এগুলি তখনকার মিউনিসিপ্যালিটীর চিহ্ন।

সহরের রাস্তাগুলি বেশ সরল ও সমান্তর—মনে হোলো সহরটি নিজে থেকে আমাদের কাশী বৃন্দাবনের মত গড়ে ওঠে নি, কেউ যেন নিজের পরিকল্পনা মত একে সাজিয়ে তৈরী কোরেছে—যেমন নয়াদিল্লী গড়ে উঠেছে। পূর্ব্বে পম্পিয়াই থেকে সমুদ্র আরো কাছে ছিলো—এটি একটি প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। এর অধিবাসীরা ছিল ঐশ্বর্য্যশালী ও বিলাসী। সমুদ্রের ধারের বন্দর বোলেই বোধহয় এটি ছিল লাম্পট্যের লীলাভূমি—আজও সমুদ্রের তীরবর্ত্তী বড় বন্দরগুলি সাধারণতঃই গণিকাবহুল। এখানকার অধিবাসীদের বাসগৃহের চিত্রাদি থেকে বোঝা যায় তারাও



অসমাপ্ত আহার—এই সজ্জিত খাবার টেবিলটি ছাইচাপা অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে

অধিকাংশই ছিল লম্পটশিরোমণি। "হেসে নাও, দুদিন বইত নয়" এই ছিল তাদের জীবনের মূলনীতি।

(আগামী মাসে সমাপ্য)

যুগল

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নগুচির 'Myoto' হইতে জাপানী ভাষায় Myoto শব্দের অর্থ যুগল)

যে সুর গুমরি' মরে গোলাপের প্রাণে
সেই সুরে নারী কহে চুপি চুপি কানে
সুরভি বাণীর সম
—'ওগো প্রিয়, প্রিয়তম !'
কহিল পুরুষ প্রণয়-বিভল-হিয়া,
জলধির বুকে ওঠেনি উদ্বেলিয়া
হেন সুগভীর বাণী
—'মোর হৃদয়ের রাণী !'
জোছনার আলো সুকোমল পদভরে
নীরবে যেমন নামে মঞ্জরী 'পরে
তেমনি ঢালিয়া মধু
কহে নারী—'প্রাণ বঁধু !'

কহিল পুরুষ,—উথলিল তার স্বরে
সেই রব, যাহা গিরি শুধু বুকে ধরে,
—কেবল একটি কথা,
—'প্রিয়া', মথি' নীরবতা।
কলনিনাদিনী ঝরণা ধারার পারা
কহে নারী—'আমি তোমা মাঝে হ'ব হারা
তুমি যে সাগর মম,
ওগো প্রিয়, প্রিয়তম !'
গহন অটবী নীলাকাশ পানে চাহি'
তরুমর্ম্মরে যে সুর রে 'ওঠে গাহি'
সেই সুরে শুধু—'প্রিয়া'
গাহে পুরুষের হিয়া।"

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(৪)

গঙ্গাবতী অতি শৈশবে মাতৃহীন হ'য়ে পিতার বড় আদুরে হয়ে পড়েছিল। সংসারে পিতা কন্যা ভিন্ন ওরা অন্য কিছু জানতো না। স্নেহের বাঁধন এত বড়, এত সুন্দর, এত দৃঢ়, এত আকর্ষণীয় ছিল যে এরা নিজের ব্যক্তিত্ব দু'জনের মাঝে পেতো না। এদের চাহিদা, দেনা-পাওনা ছিল মাত্র দু'জনের মাঝে। গঙ্গাবতী জ্ঞান হ'বার পর হ'তে দেখছে শুধু জনককে, তার কোন কিছু মনে উদয় হ'লেই হাতিয়ে বেড়াতো পাবার জন্য, স্নেহময় পিতা মনের ভাব বুঝে সে অভাব পূরণ করে দিতেন। কোনদিন মাতার অভাব সে অনুভব করতো না। বৃদ্ধ জনক ছিল তার সেবায় জননীতুল্য। একজনের মাঝে সে জনক-জননীর বাস্তব মূর্ত্তি পেতো। বৃদ্ধ বহু সন্তান ও স্ত্রীকে হারিয়ে একমাত্র মেয়ে গঙ্গাবতীকে বাঁচিয়ে রাখতে সমর্থ হ'য়ে কতদূর যে আনন্দিত হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। গঙ্গাবতী ছিল শাপ-ভ্রষ্টা স্বর্গের দেবীর মত। বৃদ্ধ একমুহূর্ত্তের জন্য গঙ্গাবতীকে ছেড়ে থাকতে পারতো না, প্রাণ তার হাঁপিয়ে উঠতো। বৃদ্ধের নিকট যে, সে ছিল স্বর্গের দেবী। তাই সদা ষোড়শোপচারে দেবীর ভোগ দিতো। ছলনা করে বলতো অসুখ হয়েছে, গাটা কেমন করছে, নানা অছিলা করে নিজের খাবার মেয়েকে জোর করে খাওয়াতো। নিজে উপোষ করেও মেয়ের দুধ যোগাতো। বৃদ্ধ মিলে কাজ করে ক্লান্ত হয়েও মেয়েকে হেঁসেলে ঢুকতে দিতো না; পাড়াপড়সীর হাসি, ঠাট্টা, বিদ্রূপ, শাসনেও গঙ্গাবতীকে রান্না করতে দিতো না। অতি আদরযত্ন পেয়ে গঙ্গাবতী বড় জেদী ও দুষ্ট হয়ে পড়েছিল; যে বিষয়ে একবার গোঁ ধরতো—না করে কখনো ক্ষান্ত হতো না। ওর দুরন্তপনায় পাড়াপড়সীরা অতিষ্ঠ হয়েছিল। গঙ্গাবতী ছিল ছেলের বাড়া, ছেলেদের সঙ্গেই ছিল তার গতিবিধি বেশি এবং খেলাধুলা হতো ছেলেদের সঙ্গে। মেয়েদের সঙ্গে তার মিশ খেতো না। এমন দস্যি মেয়ে ছিল—যে সমবয়সী কোন ছেলেমেয়ে তার সঙ্গে কোন বিষয়ে এঁটে উঠতে পারতো না; ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে সব্বাইকে মারধর করতো। বড় বড় ছেলেদের পর্য্যন্ত কিল, থাপ্পড়, কামড় দিয়ে একশেষ করে দিতো। সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সে ছিল দলনেতা। সারাদিন খেলাধূলা করা এবং পরের জিনিষ চুরি করা, অপরের ক্ষতি করা ছিল মস্ত বড় কাজ। এ দলটাকে সব্বাই রীতিমত ভয় পেতো। বিশেষতঃ গঙ্গাবতীকে সব্বাই হিসাব করে চলতো, কারণ এরা কোন ফাঁকে কি মহা ক্ষতি করে বসে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। নিত্তি পাড়াপড়সীরা গঙ্গাবতীর নামে নালিস করতো। বৃদ্ধ সর্দ্দার মেয়ের হয়ে সকলের নিকট ক্ষমা চাইত, সামর্থ্য মত ক্ষতিপূরণ করে দিতো।

বৃদ্ধ একমাত্র মেয়েকে পর করতে হবে বলে বিয়ের নাম মুখে আনতো না। কেউ বিয়ের কথা তুললে চুপ করে যেতো, সে কোন্ প্রাণে এতটুকু মেয়েকে পরের হাতে দেবে, ব্যবধানে কি সে বাঁচতে পারে—না গঙ্গাবতী বাঁচবে? বহু লোক গঙ্গাবতীর বিয়ের জন্য অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করছিল, বৃদ্ধ কোন দিকেই মত দেয়নি, 'হাঁ' বা 'না'র মাঝে বহু দিন সমস্যাটাকে এড়িয়ে যায়। তার ইচ্ছে ছিল, এই কিন্তুর মধ্য দিয়েই যতদিন পারে চলবে। শেষটায় সমাজের নিন্দা, কটূক্তি, শাসন আরম্ভ হ'য়েছিল, বৃদ্ধ সর্দ্দার তাহাও উপেক্ষা করেছিল অপত্য-স্নেহের দুর্ব্বলতায়, জড়তায়। গঙ্গাবতীও বিয়ের নাম শুনলে ভয়ে জড়সড় হয়ে যেতো, বিবাহিত জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশার কাহিনী প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বাপের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করতো। এরকম সুখের, স্বাধীন জীবন ছেড়ে—বিয়ে করে অন্যের দাসী হ'তে চায়নি। গঙ্গাবতী বিয়ে করতে চায় না বলে বৃদ্ধ হ'য়েছিল অত্যন্ত খুশী, যদিও সে মুখে বিয়ের পক্ষে বক্তৃতা দিতো, নিজের বিবাহিত জীবনের সুখের কথা বলে বিয়ের পক্ষে মত করাতে চেষ্টা করতো। গঙ্গাবতী পিতার মনের প্রকৃত প্রতীক দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তো, পিতার বিয়ে দেবার জোর জবরদস্তি নেই, বরঞ্চ খুব

খুশী হন বিয়ে না হলে—বুঝতে পেরে মুক্তির নিশ্বাস নিয়ে উৎফুল্ল হতো।...হঠাৎ কানাই এদের মাঝে এসে একটা আলোড়নের সাড়া জাগায়। সে আলোড়নে বৃদ্ধ ও গঙ্গাবতী দু'জনেই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ উঠে পড়ে লেগে যায় কানাইকে ঘর-জামাই করবার জন্য, গঙ্গাবতী কানাই'র স্বভাব চরিত্র, রূপগুণে মুগ্ধ হয়ে অতি শীঘ্র আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। বৃদ্ধ যখন বিয়ের প্রস্তাব তুলে, তখন গঙ্গাবতী মনের মত মানুষ পেয়ে কোন আপত্তি তুলতে পারেনি। শ্বশুর শাশুড়ীর অত্যাচার নেই, স্বামীর ঘর করবার জন্য নিজের বাড়ী ছাড়তে হবেনা, পিতার স্নেহময় কোলটি থেকেই যাবে, বন্ধুদের ত্যাগ করতে হ'বে না, যা কিছু ছিল সবই থাকবে, পাবে মস্ত বড় সম্পদ।

গঙ্গাবতী যদিও নারী—তবু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নারীত্ব বিকাশ পায় নি; পুরুষের মাঝে সর্ব্বদা থাকতো বলে পৌরুষ স্বভাব প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রকৃতির নারী-কাঠামো ভিন্ন নারীর কোন লক্ষণ ছিল না। পাড়ার যুবকরা গঙ্গাবতীকে নির্জ্জনে পেয়ে যখন নারী-দেহ পাবার জন্য প্রলুব্ধ করতো, যৌন ক্ষুধা উত্তেজিত করেও যখন ব্যর্থ হ'তো তখন, জোর করে অধিকার করতে যেতো তার দুর্ব্বল নারীদেহ, গঙ্গাবতী পুরুষের বিসদৃশ ভাব দেখে কেমন হ'য়ে যেতো, সে ভাবতে পারতো না যে তার সঙ্গে এদের এত বিপর্য্যয় কেন? সে যে নারী—তা ভুলে যেতো, পশুপ্রবৃত্তি যুবকদের নিকট সে নিজেকে যুবক বলেই উঁচু করে ধরতো। তার পূর্ণ শৌর্য্যের নিকট কারো ক্ষমতা ছিল না যে তার দেহ কলঙ্কিত করে। কোন যুবক যখন তাকে ফুসলাতে চেষ্টা করতো, বা নির্জ্জনে অত্যাচার করতে চাইতো—গঙ্গাবতী দু'তিনটা মিষ্টি কথার পর দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে এমন ঘুসি বা লাঠির ঘা দিতো—যে কেউ আর তার দিকে ফিরে তাকাতে সাহস পেতো না। গঙ্গাবতী জয়ের অট্টহাসির নিকট মাথা নীচু করে সরে পড়তো। গঙ্গাবতী এমনি ভাবে স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে বড় হচ্ছিল। কোন বিপদে কাবু হতে হয়নি বলে সে নিজের স্বভাব চরিত্রের গতি সংযত করে নি। যতগুলি বিয়ের সম্পর্ক এসেছিল—তার প্রায় সবগুলিই সে নিজে ভেঙ্গে দিয়েছে, যে সব যুবক নিজে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল, গঙ্গাবতী ছেলেমানুষের পাগলামি বলে তাদের কথা শ্লেষের স্বরে উড়িয়ে দিয়েছিল; স্বামী হ'বার অনুপযুক্ত বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল; এমন কি অভিভাবকেরা, যারা বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসতেন তাঁদেরও অপমান করে—বকা-বকি করে তাড়িয়ে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি। কোন কোন অভি-ভাবককে স্পর্দ্ধাভরে বলেছিল 'কোন লজ্জায় বিয়ের প্রস্তাব করতে সাহস পেলেন! সেদিন আপনার ছেলে আমায় অপমান করেছিল বলে দু ঘুসি মেরেছিলুম। সে ঘুসি খেয়ে জ্বর হয় চার পাঁচ দিন, বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। এমন ছেলের মেয়ে হয়ে ঘরের কোণে থাকা উচিত; মাগীমুখো ছেলে—বিয়ে করতে চায় কি লজ্জায়, আমি হলে বিষ খেয়ে মরতুম।...'মেয়েদের সম্মান করতে শিখুক, নিজে মানুষ হোক প্রথম। পাড়ার বউ ঝিদের নষ্ট করে বুঝি সাহস বেড়ে গেছে, আমায় বিয়ে করবার সাহস করে!'...'আপনি এসেছেন এই যা রক্ষা! আপনার ছেলে এলে আর ফিরে যেতে হতো না, খুন করে ফেলতুম। মেয়েরা বুঝি মানুষ নয়? হারামজাদা গর্ভবতী স্ত্রীকে যে সেদিন খুন করলে, আজই চায় আবার বিয়ে করতে। বলবেন—এ আর কেউ নয়, গঙ্গাবতী! চাবকিয়ে দাঁত ভাঙ্গবে—গায়ের চামড়া তুলে ফেলবে।...এ ধরণের নারী হ'য়েও গঙ্গাবতী শেষটায় কানাইর প্রতিভার নিকট মাথা নীচু করে প্রণয় ভিক্ষা করেছিল। স্বভাবদোষে যদিও সে কানাইকে অপমান করতে ছাড়েনি, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের প্রস্তাবে পূর্ব্বের এক-গুঁয়েমী 'না' বলতে পারেনি—কারণ মন গোপনে অন্তরঙ্গতা করেছিল, মনে বড় ভাল লেগেছিল। নিতান্ত নারী হয়ে জন্মেছে, পিতা বৃদ্ধ হয়েছেন, স্নেহময় পিতার আদেশ—তাই সে যেন বাধ্য হয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল। যে গঙ্গাবতী চলছিল গঙ্গার মত হিমালয়ের গুহা থেকে প্রলয়বেগে, যার বেগ সহ্য করতে না পেরে ঐরাবত 'প্রিয়ার' স্থানে 'জননী' বলে নিস্তার পায়—তেমনি ভয়ঙ্কর গঙ্গাবতী কি করে আবার গঙ্গার মতই শান্ত হয়। নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে ধরণীকে সুজলা সুফলা করে? যে গঙ্গাবতী বিয়ে হয়ে গেলেও কাউকে তোয়াক্কা করতো না—নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতো সর্ব্বদা, সর্ব্বস্থানে, বয়োজ্যেষ্ঠদের পর্য্যন্ত গ্রাহ্য করতো না, সত্যের কোঠায় পা রেখে দশ পাঁচ কথা মুখের ওপর বলে দিতো, সমানে ও ছোটদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করতো, দস্যি ছেলেদের মত এগার বার বৎসর বয়সেও

মারধর করতো—সে কী মন্ত্রগুণে এমনি নীরব, গম্ভীর হলো? যৌবনের প্রণয়ের আগমন হেতু চঞ্চলতায়, সলজ্জ সজীবতায়, রূপ মাধুরীর সার্থক বিকাশে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো? কি মায়ার পরশে সে খাঁটি, পাকা গৃহিণী হয়ে উঠলো? স্বামী পুত্র কন্যাদের পেট ভরে খাইয়ে যা অবশিষ্ট থাকে—তা খায়, যেদিন অবশিষ্ট না থাকে—সেদিন উপোষ করে। কোন কোন দিন অভাব অনুসারে নিজের খাদ্য ছেলেমেয়েদের জন্য তুলে রাখে। মাতাল স্বামীর অত্যাচারে একটু প্রতিবাদ করে না। মারধর সহ্য ক'রে, প্রাণপণ চেষ্টা করে স্বামীকে রক্ষা করতে।

যে গঙ্গার পতন পৃথিবী সইতে পারতো না, ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে যেতো, এমনি প্রবল পরাক্রম মারাত্মক ছিল, সেই গঙ্গা যখন মহাদেবের জটাতে এসে আশ্রয় নেয় তখন অতি সহজ সরল শান্ত সুন্দর হয়ে পড়ে। নরনারীর মিলন এমনি মধুর, এমনি সুন্দর, এমনি আশ্চর্য্যজনক ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার! তাই বুঝি নর-নারীর মিলিত গীতে জগৎ স্তব্ধ, মুগ্ধ, হর্ষিত, পুলকশিহরণে মূর্চ্ছিত। জন্ম-দুঃখীর প্রাণে আনন্দ বর্ষিত হয়ে নিস্তব্ধ সজীব হয়, কালা-বোবা অন্ধদেরও অনুভূতিতে অন্তর্দৃষ্টি আসে, মিলনের মধু একভাবেই লাভ করে। যে গঙ্গাবতী গঙ্গার মত ভয়ঙ্কর ছিল, নিয়ম কানুন মানতো না, নিজের জোরে চলতো এবং অপরকে নিজের মতানুযায়ী চালাতো, তার এতবড় পরিবর্ত্তন কি নরনারীর মিলনে? যার অতীত জীবন এমনি ছিল, সে কি করে স্বামীর অত্যাচার, দুঃখ কষ্ট, দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করছে, কি করে আদর্শ নারীর মত সংসার করছে? এর কারণ কি—সে নারী? এর কারণ কি—সে মাতৃজগত? এর কারণ কি—তার বিকশিত মাতৃত্ব?

গঙ্গাবতী অদ্ভুত মেয়ে। দিন যত এগিয়ে যায়, ততই যেন সে আরো আশ্চর্য্যময়ী হয়। সে সুন্দরী, অসীম সুন্দর রূপ-যৌবন তার শতমুখে কেবলি বেড়েই চলেছে। এত রূপ, যাকে বলে রূপ যেন চুইয়ে পড়ছে! বয়স তার একুশ, কি বাইশ! হৃষ্টপুষ্ট চেহারা, লতিকা নয় লতিয়ে লতিয়ে চলে না, মোটা নাদুষ নুদুষ ঢবঢবেও নয়,—উঁচু, লম্বা চওড়া, দীর্ঘ একবোঝা কাল কেশ আহাঁটুচুম্বিত, মুখখানা গোল—অনেকটা যুক্ত প্রদেশের কুলিরমণীদের একচেটিয়া গোল মুখের মত, হাসলে যেন মুক্তা ঝরে, বিস্তৃত নয়ন, বিদ্যুতের মত চঞ্চল দীপ্তিশিখার লুকোচরির মাধুরিমা সদা-বিরাজিত। এলোকেশে বা এলোমেলো গোঁপায় যখন সে রাস্তায় আপন মনে পবিত্র মূর্ত্তিতে চলে—রাস্তার প্রত্যেকটি লোক তার পানে চেয়ে থাকে, তার উজ্জ্বল গৌরবর্ণের বিচ্ছুরিত আলোক-ছটায় মুগ্ধনেত্রে নির্ণিমেষ নয়নে তাকিয়ে ভাবে, এই রূপরাণী কি নন্দন কানন থেকে মানবী সেজে ধরায় এলো? এতো সুন্দর সে, এতো দীপ্তি তার দেহে, এতো আকর্ষণ তার সৌন্দর্য্যে যে রূপের পুজারীরা নীরবে সৌন্দর্য্যে প্রেমময় অর্ঘ্য নিবেদন করে, কেউ ভাবতে পারে না সে কুলিরমণী; যারা পরিচিত—তারাও ভুলে যায় তার ইতিহাস, তার ভূগোলের স্থান, মনে পড়লেও কষ্ট পায়।...

গঙ্গাবতীকে আর বিশদভাবে বর্ণনা করা যায় না, সে যে বিবাহিতা, সে যে গৃহিণী, সে যে নারীর শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিতে বিকাশিতা, তার কোলে সন্তানের দল। জননী! সে যে জননী! কিন্তু উপায় নেই—তাই একটু রূপ বর্ণনা করতে হল। প্রৌঢ়, যুবক মহলের লোলুপ দৃষ্টি থেকে একটু বের করে না আনলে যে নিতান্ত চলে না, তাই একটু বের করে আনলুম। এক কথায় সে সুন্দরী—খুব বেশী সুন্দরী, সচরাচর এত সুন্দরী যুবতী নারী মিলেনা, এতোই! হোক না, চারটি সন্তানের জননী—তবুও।

কুলি বস্তির হাওয়াটা যেন একটু উল্টে গেছে, দিন দিন কেবলি পরিবর্ত্তন হচ্ছে। অশিক্ষিত লোকরা প্রেমের ধার-ধারেনা, এ অতি সত্য কথা। এদের প্রেম নেই বলে জেনে এসেচি—সত্যই তো এরা প্রেমের কি বোঝে? দেহ, সেবা, ক্ষমতা এই তো জানে, এ পর্য্যন্তই ত এদের জ্ঞান। দু'টি কবিতা বলতে পারবে—না ভালবাসি কথার বহু রূপরস দিতে পারবে? শিক্ষিত রুচিমার্জ্জিত লোকের প্রেম কবিতায় ছন্দে ছন্দে—কিন্তু কুলি মজুদের তো সাহিত্য নেই, ভাষার ওপর আধিপত্য নেই, পেচিয়ে কথা বলে সৌন্দর্য্যও সৃষ্টি করতে পারেনা, প্রেম ফুটবে কি করে? প্রেমের বিকাশ হবে কি করে—যদি বীজ না পায় স্থান—না পায় খাদ্য! দুর্ব্বলের ব্রহ্মচর্য্য নেই, ধর্ম্মেরও ভয় নেই, সহজ সরল দৈহিক মিলন প্রশ্নের উত্তর 'হাঁ' বা 'না'। অতি সহজ প্রশ্ন, তার উত্তরও অতি সহজ। যাকে সভ্যলোক বলে নগ্নপশু-প্রবৃত্তি। এ অতি নগ্নরূপ—এর আত্ম-গোপনতা নেই উপন্যাসের মাঝে। এখন কুলি মজুরদেরও প্রেমের বহুরূপী

ঢেউ বয়; সভ্যতার কাব্যে—নগ্নরূপ ঢাকা থাকে। তাই গঙ্গাবতীর ভক্তের অভাব নেই, দিন দিন কেবল বেড়েই যাচ্ছে। বহু ভক্ত তার ব্যথার ব্যথী, দরদী, ভাষার মার্জ্জিত মাধুর্য্যে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করে। ভক্তের মাঝে প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থী দু'দলই আছে। নবীনপন্থীরা গুণ গায়, মেমের সঙ্গে, বড়লোকের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে, অভিনেত্রীদের সঙ্গে রূপের তুলনা করে—গঙ্গাবতীর রূপের প্রশংসা করে পঞ্চ মুখে, চরণ তলে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করে জীবন যৌবন ধন্য করে, নিত্যিকার অত্যাচারেও প্রকৃত প্রেমের বন্যাস্রোত একটু কমে না, হতাশ হয়ে সংযত হয়না; অপরদল কানাইএর মুণ্ডপাত করে, টাকা পয়সার লোভ দেখায়, কোন ভনিতা না করে সোজা দেহটা চেয়ে বসে, হাত বাড়াতে কুণ্ঠিত হয় না, ভয় পায় না।

যারা ভণ্ডের মুখোস পরে প্রেমের অভিনয় করে তাদের গঙ্গাবতী লাঠি, ঝাঁটা নিয়ে তাড়া করে না, চোদ্দ-গোষ্ঠীর নাম নিয়ে গালাগাল করে না এবং যারা কামলালসা প্রকাশ করে—দেহটা ধরবার জন্যে এগিয়ে আসে—তাদের ও না। নবীন বা প্রাচীনপন্থী কাউকে সে বাধা দেয়না, রুদ্রমূর্ত্তিতে ঝগড়া বিবাদও করে না। তার নিশ্চেষ্টতা, অবজ্ঞা, দৃঢ়তা, পবিত্রতার নিকট কেউ ঘেঁসতে পারে না। আশ্চর্য্য তার নিশ্চেষ্টতা! সে যেন অসীম, অণু পরমাণুর কথা তার কল্পনার বাইরে; কল্পনায় স্থান দিলে বা গ্রাহ্যর মধ্যে আনলে যেন নিজের বৃহত্তরতাকে অপমান করা হয়, খেলো করে দেওয়া হয়। নীরব তার অবজ্ঞা, অথচ কত কঠিন, কত তীক্ষ্ণ, কত ভয়ঙ্কর! পাষণ্ডরা লজ্জায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়, যাদের লজ্জা সরমের বালাই নেই—ওরা ভয়ে সরে পড়তে বাধ্য হয়; বিপ্রকর্ষণে যেমন দুই ধাতুকে দূরে নিক্ষেপ করে বা সরিয়ে রাখে—নিকটে ঘেঁসতে দেয় না—ঠিক তেমনি বিপ্রকর্ষণে পাষণ্ডরা নিকটে ঘেঁসতে পারে না। হিমালয়ের মত তার দৃঢ়তা পরখ করতে হয় না, অজ্ঞানতা-বশতঃ যে পরখ করতে যায় সে নিজেই চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। সবাইকে তার সৌম্য, উন্নত, প্রশান্ত, ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখেই দূর হ'তে সরে পড়তে হয়। স্বর্গীয় তার পবিত্রতা, ললাটে লেখা নেই, বায়ুর মত অনুভব করা যায়—না যায় দেখা, না যায় ধরা, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভূত করায়।

গঙ্গাবতীকে নীরব দেখে পাড়ার মেয়েরা হ'ল সন্দিগ্ধা। অল্প অল্প করে কাণাঘুসা চললো, গঙ্গাবতীর চরিত্রের ওপর কুৎসা রটাতে হল যত্নবান। এখানে বলে রাখি—গঙ্গাবতী আঠারো বছর বয়সে শেষ সন্তান প্রসব করে আর গর্ভবতী হয় নি; স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে, একরূপ স্বামীপরিত্যক্তা হয়ে ব্রহ্মচারিণীর মত জীবন চালাচ্ছে; তাই ভাল গঠনের দেহ দিন দিন কেবল সুন্দর ও আকর্ষণীয় হচ্ছে। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, যৌবন-ঐশ্বর্য্য কেবলি সুন্দর হ'তে সুন্দরতর হচ্ছে। গঙ্গাবতীর সৌন্দর্য্য ও ভক্তের প্রশংসাবাদ পাড়াপড়সীর ঈর্ষা ও চক্ষুঃশূল জ্বালার সৃষ্টি করলে। যে স্বামীপরিত্যক্তা, যে খুব গরীব, যার চারটি সন্তান, যে দুঃখিনী—সে দিন দিন কুৎসিত, কদাকার, রুগ্না না হয়ে—কি করে সুন্দর, হৃষ্টপুষ্ট হয়? গঙ্গাবতীর বাড়ীতে লোক যাতায়াত করে, সে যদি সতী হতো তবে কি করে এসব চরিত্রহীন লোকরা এমনি ভাবে ঘোরা-ফেরা করে? কৈ! গঙ্গাবতী ত' কাউকে ঝাঁটা মারে না, অকথ্য গালাগাল করে না, চেঁচামেচি করেনা; উৎপাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পাড়াপড়সীর নিকট সাহায্যও চায় না? নিশ্চয় সে অসতী, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি, মিনমিনে সয়তান; সোজা মানুষটি সেজে থাকে—যেন কিছু জানেনা, ওপরে সাধাসিধে, ভাল মানুষের আবরণ—অন্তরালে বীভৎসতা। যে ছেলেবেলায় খুব দুষ্ট ছিল, মদ্দা মেয়ে ছিল, যার সঙ্গী ছিল যুবকরা, যার দুরন্তপনায় পাড়ার লোক তটস্থ থাকতো—সে কি করে এমনি শান্ত-শিষ্ট, বোকা মানুষ সাজে? একি ভালর লক্ষণ? বকধার্ম্মিক সেজে মাছকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে! পাড়ায় গঙ্গাবতীর নামে খুব কুৎসা রটলো এবং মেয়ে মহলে বেশ আন্দোলন চললো। এদিকে যারা প্রেম করতে গিয়ে মূক অপমান পাচ্ছে, তারা আঁটতে লাগলো সাফল্যমণ্ডিত হ'বার ফন্দি; যারা দেহ চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তারা রটাতে লাগলো দুর্নাম এবং জোর করে অধিকার করবার জন্য করতে লাগলো শক্তিসঞ্চয়। যারা বহুদিন জোর করে অভিলাস পূর্ণ করতে গিয়ে ফিরে এসেছে, তার শৌর্য্যের প্রভাবে বেশী এগুতে পারে নি, তারা আক্রোশে কেবলি জ্বলে মরে। নিজেরা সন্দিগ্ধ হয়ে ঝগড়া করে, প্রতিযোগিতা করে—যেমনি পশুরা মারামারি করে, তেমনি। হায় পশু-প্রবৃত্তি! কতরূপ তোমার!

এ ত' গেল বস্তির উৎপাত। এ উৎপাত খুব কঠিন

নয়, মারাত্মক নয়—কারণ সে স্বাধীন নারী, তার মনের দৃঢ়তা আছে, শক্তি সামর্থ্য আছে, বস্তির হালচাল ভাল করেই জানে, বুঝে। পাড়ার বহু মেয়ে ঝগড়া বাধাবার জন্য, আমোদ করবার জন্য, শুনিয়ে শুনিয়ে মিথ্যা কুৎসা আলোচনা করে, বিশ্রী কথা ব্যাখ্যা করে—গঙ্গাবতী শুনেনি ভাব করে সরে পড়ে, তুচ্ছ কথার প্রতিবাদ করার দুর্ব্বলতা তার নেই, ভিত্তিহীন কথার মূল্য (importance) দিয়ে মিথ্যা ভিত্তির পথ তৈরি করে দিতে চায় না। বাজে বকবার সময় কৈ, একা যুদ্ধ করবেই বা কতজনের সঙ্গে? পাড়ার চরিত্রহীনা নারীদের কুৎসা স্পষ্ট মুখের ওপর চলে—কিন্তু ঝগড়া করবার মত ছোট মন তার নেই। সে প্রমাণ চায় না, প্রমাণ করেও না। সে জানে, বিশ্বাস করে, যুঝাটা বড় নয়, ভাল নয়, পবিত্রতাই বড়—শ্রেষ্ঠ। কুলি মজুরদের বিশাল বাহুকে, পাশবিক মনোবৃত্তিকে সে ভয় পায় না, গ্রাহ্যই করে না; ওদের চাবকিয়ে রাখবার মত মনোবল, দৈহিকশক্তি তার যথেষ্ট আছে। কিন্তু বাহিরের উৎপাতকে উপেক্ষা করতে পারলে না। সেজন্য সে শঙ্কিতা, ভীতা, তৎপর, সতর্ক। হিসেব করে কথা কয়, হিসেব করে চলে, ভেবেচিন্তে কাজ করে।

কানাই সংসারের কোন ধার ধারে না। নিজে যা রোজগার করে তার এক পয়সা সংসারে দেয় না। এখন তার মদ না হলে একবারেই চলে না; নিত্যি মদ খাওয়া চাই, কুপল্লীতে গিয়ে হল্লা করা চাই-ই। হাতের টাকা ফুরালে কুপল্লীতে স্থান পায় না, দিন কয়েকের জন্য ভাল মানুষ সেজে টাকা রোজগার করে—আবার উচ্ছৃঙ্খলতার মাঝে ডুব দেয়। বাড়ীতে বেশী আসে না, খাবারের সময় আসে, খেয়ে-দেয়ে চুপ করে সরে পড়ে, যেদিন খাবার না থাকে সেদিন ঝগড়া বিবাদ করে, মারামারি করে। যে সময় চাকরি থাকে না, মজুরী খাটতেও পারে না, বন্ধুবান্ধবের ওপর খাওয়া পরা করতে পারে না—সেদিন ভাল মানুষ সেজে বাড়ী আসে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে কৃত্রিম আদর যত্ন করে। গঙ্গাবতী ভুল বুঝে, স্বামীর প্রতি বিরূপ হয়ে থাকতে পারে না, স্বামীকে আদর যত্ন করে খাওয়ায়, সেবা করে। কানাই নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে চুপটি করে সরে পড়ে।

কানাই আসুক বা না আসুক—এক পয়সা সংসারে দেয় না, উপরন্তু ছলনা করে টাকা পয়সা নিয়ে যায়, রীতিমত খাওয়া দাওয়া করে। গঙ্গাবতীকে বাধ্য হয়ে মিলে কাজ নিতে হয়েছে। গম্ভীরভাবে মিলে কাজ করতে যায়, গম্ভীরভাবে কাজ করে বাড়ী ফেরে। কারো সঙ্গে নিতান্ত দরকার ভিন্ন কথা বলে না, কারো সঙ্গে বন্ধুতাও করে না। সে থাকে আপন মনে।

বাইরের উৎপাতের মধ্যে শ্যামজীর অনুগ্রহটাই হল মারাত্মক। শ্যামজী মিলের ছোটবাবু, মিলে কিছু অংশও (share) আছে। কুলিমজুর থেকে বড়বাবুরা তার ভয়ে কম্পিত, মুখের কথা খসলে লোকের চাকরি যায় এবং হয়। তিনি ক্রোড়পতি, সমাজে খুব প্রতিপত্তি তাঁর, ক্ষমতাও অসীম; যা সঙ্কল্প করেন তাই করতে পারেন, কোথাও এ পর্য্যন্ত পরাজিত হন নি। দেহটা তাঁর ঢাকার জালার মত, ঘাড় আছে কি নাই বোঝা যায় না; তবে ঘাড় আছে হলপ করে বলা যেতে পারে, মাথাটা দেহের পক্ষে অতি ছোট, ছোট মাথায় মস্ত বড় টাকা অর্থাৎ মস্তকবিস্তৃত টাক, ভুঁড়ি ও টাক দু' সুলক্ষণই বর্ত্তমান; অতএব টাকা প্রচুর পরিমাণে যে আছে তা না বললেই চলে। দেহের বর্ণনা সোজাভাবে করলে এই বল্‌তে হয় যে টাকপড়া ছোট মাথা, বিশাল ভুঁড়ি, মোটা মোটা হাত পা, রক্তবর্ণ গোল আঁখি, দূর থেকে মনে হবে একটি জালার ওপর একটি আস্তো নারিকেল বসানো আছে। শ্যামজীর চলাফেরার সময় আধভরা জলের কলসির মত গম্ গম্, ছম্ ছম্ শব্দ হয়। ভুঁড়ির বিশেষত্ব আছে; যেমনি মোটা ও ভারি, তেমনি তার বিকট আওয়াজ হয় ঘুমের ঘোরে, ছেলেমেয়েরা সে বিশ্রী শব্দে ভয় পেয়ে যায়। তিনি ভুঁড়ির জন্যে টেবিলের পাশে বসে লিখতে পারেন না, ভুঁড়ি আটকে যায় টেবিলে, আবার চেয়ার সরালে ছোট হাতে লিখা চলে না, টেবিল ছোঁয়া কঠিন হয়, তাই তিনি ডান পাশে টেবিল রেখে কাজ করেন।

ছেলেমেয়েরা এ হেন বিশেষত্বময় দেহ দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়ে, পালাতে পথ খুঁজে পায় না; কুলি রমণীরা দাঁতখিঁচুনি ও চরিত্রহীন স্বভাবের জন্যে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত থাকে, কুলি মজুররা তাঁকে বাঘের মত ভয় পায়, পদস্থ কর্ম্মচারীরা অপমান ও চাকরি যাবার ভয়ে মাথা তুলতে সাহস পায় না। যেদিন মদের মাত্রা বেশী হয় এবং

মেজাজ খারাপ থাকে—সেদিন মিলের সকল কর্ম্মচারী ও কুলি মজুরদের হৃদ্‌কম্প আরম্ভ হয়। গঙ্গাবতী দাঁত খিঁচুনি ও গালাগালকে ভয় পায় না, বরঞ্চ অল্প অল্প পেতে ইচ্ছে করে। সে চায় অন্যান্য কুলি-রমণীদের প্রতি যেমন ব্যবহার করা হয় ঠিক তেমন তার প্রতি হোক। অনুগ্রহে তার প্রাণ কাঁপে। সে ভয় পায় বড়লোকের মাতলামিকে, ছদ্ম সরলতাকে, ভালমানুষে-স্বভাবকে, অনুগ্রহকে। এ সব সহ্য করা যায় না, প্রতিকার করাও সহজ নয়। যার টাকা আছে লোককে দয়া করবে, চরিত্র স্খলতাবশতঃ মাতাল হবে, চরিত্রহীন হবে, তার কিছু যায় আসে না তাতে! কিন্তু তার প্রতি অনুগ্রহ, দয়া—যে তার পক্ষে মারাত্মক। সে ঠেকে ঠেকে লোক-চরিত্র শিখেছে। এ প্রকার ভালমানুষের ব্যবহার—অনুগ্রহই এক সময় তার কাল হয়ে দেখা দেবে, বাহিরে ভাল থাকবে, অন্তরালে অদৃশ্য আকর্ষণ টেনে নেবে নরকে—তখন থাকবে না বাঁচবার উপায়, থাকবে না মুক্তির পথ, নরকের পরশে মনও হয়ে যাবে নরকের দ্বার। এঁরা শিক্ষিত, ক্ষমতাশালী প্রভৃত অর্থাধিপতি, এঁদেরকে এড়িয়ে চলা যায় না, ছদ্ম-ভদ্রস্বভাব, মিষ্টি কথায় প্রশংসা করতে হয়, ভণ্ডামীকে বাহবা দিয়ে উজ্জ্বল করতে হয়, স্বার্থময় সাহায্যে জুতার নীচে লুটিয়ে কৃতজ্ঞ হতে হয়। এরা নাচাতে নাচাতে ক্লান্ত করে দেন, ছলনায় বোকা বানিয়ে রাখেন, মদিরা রূপ টাকার প্রভাবে মাতাল করে দেন, তারপর নর্ত্তকী আপনি বাহুতে আত্মসমর্পণ করে। এরা সাপ, হাড় নেই, এঁকে বেঁকে জড়িয়ে দংশন করেন। শত্রুর সঙ্গে যুঝা যায়, সতর্ক হওয়া যায়, এদিক কি ওদিক একটা কিনারা করা যায়, কিন্তু এঁরা যে ধোঁয়ার মত—যুঝা যায় না, প্রতিকার করা যায় না, শুধু অচেতন করে দেয়, ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

(৫)

শ্যামজী এখন ঠেকে শিখেছেন। ব্যবসায় বুদ্ধি সর্ব্বস্থানে খাটে না; বিশেষত প্রণয় ব্যাপারে। তিনি টাকার জোরে, অসীম প্রতিপত্তির জোরে—দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরে বহু নারীকে ভোগ করতে পেরেছেন। যার প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি পতিত হয়েছে তাকেই তিনি ছলে, বলে, অর্থে বশীভূত করে বাগান বাড়ীতে এনে অঙ্কশায়িনী করেছেন। রূপ থাকা সত্ত্বেও পুরাতনের মোহ কাটলে তিনি হতভাগিনীদের কপর্দ্দকহীন করে পথে দাঁড় করাতে এতটুকুও কুণ্ঠিত হন নি। যাদের পায়ে মাথা নত করেছেন দেহ জয় করবার জন্যে, তাদেরই পদাঘাত করেছেন—বিশ্ববিজয়ীর মত নতুনের মাতাল উদ্দীপনায়। এখানে বলে রাখা উচিত যে তিনি ব্যবসায়ী বেশ্যা ও ভদ্রমহিলাদের ওপর বড় বিরূপ; যদি কোন চরিত্রহীনা মহিলা—মুখোস-পরা নারী তাঁর ঐশ্বর্য্যের লোভে এগিয়ে আসে তবে তিনি সমাদরে গ্রহণ করেন, নতুবা তিনি প্রথম এগিয়ে যেতে সাহস পান না। এর কারণ বেশ্যাকে ভোগ করতে হলে টাকার প্রয়োজন, ফাঁকি চলে না, যথেচ্ছাচার চালানো যায় না, ওরা চুষে টাকা নিয়ে যায়। ভদ্রমহিলাদের ওপর লোভ খুব বেশীই ছিল, কারণ বিনা অর্থে স্খলিতা নারীকে যে ভাবে ইচ্ছে চালানোর খুব সুবিধে। ভাগ্য একটু বিরূপ, যৌবন যে কলঙ্কটিকা ললাটে দিয়েছিল এঁকে—সে আজও মুছে যায়নি। ভদ্রমহিলার ওপর জবরদস্তি করতে গিয়ে জুতার বাড়ী খেয়েছিলেন বহু নরনারীর সম্মুখে।

গরীব, দুঃখী, কুলিমজুর সুন্দরী রমণীদের ওপর লোভ বেশী, টাকার জোরে অভিলাষ অতি সহজেই পূর্ণ হয়। এ জীবনে তিনি বহু সতীকে অসতী করেছেন, ঘরের কুলবধূকে স্বামীর বক্ষ হতে কেড়ে এনে বেশ্যা করেছেন, কপর্দ্দকহীনাকে অর্থশালিনী করেছেন। সর্ব্বত্র জয়ী হয়ে তিনি নারীকে নারী বলে ধারণা করতে ভুলে গেছেন। তাঁর ধারণা ছিল নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট হয়েছে—তার নেই আপন সত্ত্বা, নেই তার নারীত্ব। হুকুম করলেই নারীরা এগিয়ে আসে; দু'এক পয়সা দেখালে পোষা কুকুরের মত জুতার নীচে পড়ে লুটিয়ে, জুতার ঠক্কর খেলে লেজ নাড়ে, পায়ের পাতা চেটে সুড়সুড়ি দেয়। তবে মাঝে মাঝে দু'একজন নারী বের হয়, তাদের লোক-দেখানো লজ্জা, কুসংস্কার, সতীত্বজ্ঞান একটু থাকে—তাই পোষ মানাতে দেরী হয়, কিন্তু টাকার চাক্ষুষ রূপে সবাই লুটিয়ে পড়ে, চাবুক মারলেও নড়ে না। শ্যামজীর ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতাকে বাতিল করে দেয়—প্রথম কিশোরী বাঈ।

কিশোরী বাঈ মিলে আসতো স্বামীর খাবার নিয়ে, অভাবে পড়লে মাঝে মাঝে মিলে দিনমজুরী করতো।

কিশোরীবাঈএর ওপর শ্যামজীর লোভ পড়ে। যেমনি লালসা জাগলো অমনি হুকুম দিলেন, কিশোরীবাঈ প্রস্তাব অতি তুচ্ছভরে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ঐশ্বর্য্যের মাদকতায় কিশোরীবাঈ মোহিত হয় নি, একটু এলে পড়ে নি। শ্যামজী শেষ অস্ত্র মেরেছিলেন। অবলা নারী জোর করে, ছল করে, কতক্ষণ পুরুষকামবহ্নির ক্ষমতা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। মেরে, কামড়িয়ে, খাঁমচিয়ে বহুক্ষণ আত্মরক্ষা করেছিল—শেষটায় প্রকৃতি তাকে আত্ম-সমর্পণ করতে বাধ্য করেছিল।

কিশোরীবাঈকে বশীভূত করবার জন্য যে সব অলঙ্কার ও টাকাকড়ি শ্যামজী দিয়েছিলেন সেগুলি দরোয়ানকে ঘুস দিয়ে কিশোরী পালিয়ে যায়। কিশোরী স্বামীর পায়ে পূর্ণ অধিকার পেয়ে, স্বামীর ভালবাসা পূর্ব্বের মতই অকৃত্রিমভাবে পেয়ে শির উচ্চে তুলে দাঁড়িয়েছিল; বাধা, বিপত্তি, ভয়কে অবজ্ঞা করে নারীহরণ মোকদ্দমা করেছিল। সে মোকদ্দমায় যদি ও বহু অর্থ ব্যয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু অপমান ও জঘন্য দুর্ণামের হাত হতে রক্ষা পান নি। ভদ্রসমাজে উপেক্ষা করে, ভদ্রমহিলারা তাঁর ত্রিসীমানায় আসে না এবং এত বড় অপমান ও দুর্ণামে শ্যামজীর স্ত্রী ফাঁসে ঝুলে আত্মহত্যা করেন।

প্রবাদ আছে 'মরলেও স্বভাব যায় না।' শ্যামজীর স্বভাবও বদলাল না। ফাঁস লটকিয়ে স্ত্রীকে মরতে দেখে শ্যামজী একটু দমে গিয়েছিলেন, মানে স্ত্রীর প্রেত-আত্মার ভয়ে সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকতেন, এমন কি রক্ষিতাদের বাড়ী গিয়ে রাত কাটানো দূরের কথা, চাকরবাকর নিয়ে নিজের ঘরে শুতে ভয় পেতেন। স্ত্রীর আত্মা স্বপনঘোরে শাসিয়ে যেতো, স্ত্রীর ভয়ে তিনি কিশোরীবাঈকে পুনঃ ধরে আনা ও তার স্বামীকে অত্যাচার করে প্রতিশোধ নেওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন। রোজ তিনবেলা কোনভাবে গায়ত্রী জপতেন সচকিতে চারিদিক চেয়ে, অবশ্য পূর্ব্বে পৈতা ছিল না, নতুন তৈরি করে নিতে হয়েছিল। ক্রমে মনের বিভীষিকা কেটে গেছে, গায়ত্রী জপার সময় হয়ে ওঠে না, সন্ধ্যা-আহ্নিকের বই, সরঞ্জাম আবার কোণঠাসা পড়েছে, পৈতেটা এখনো গলায় আছে।

সবাই ভেবেছিল, এমন কি কু-পথের সাহায্যকারী মোসাহেবের দল বিশ্বাস করেছিল যে শ্যামজীর পত্নী-বিয়োগে আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। শ্যামজী পত্নীশোকে সত্যই বড় কাতর হয়ে পড়েছেন; সতীর আত্ম-ত্যাগে স্বামীর জীবন পুণ্যপথে পরিবর্ত্তিত হল; ধর্ম্মে মতিগতি হচ্ছে, কোনদিন হয়ত সর্ব্ব ত্যাগ করে সাধু হয়ে যাবেন। যক্ষ্মা-রোগী যেমন চিকিৎসার ও স্থানের গুণে সাময়িক ভাল হয়, তেমনি শ্যামজীর মতিগতি হঠাৎ বিশৃঙ্খলতা ও ভীতিতে জড় হয়ে পড়েছিল মাত্র।

গঙ্গাবতী চরিত্রহীন পুরুষদের উৎপাতে টিঁকতে না পেরে শ্যামজীর মিলে এসে চাকরি নিলে। সুন্দরীদের জয় সর্ব্বত্র, সর্ব্ব সময়ে। গঙ্গাবতীর কাজ মেলাতে কোন বেগ পেতে হয়নি; সাদরে তাকে মিলে কাজ দিলে, যদিও সে কুলি রমণী এবং কোন নির্দ্দিষ্ট কাজে দক্ষা বলে খ্যাতিলাভ করে নি।

কয়েক হপ্তা এমনি কাটলো। গঙ্গাবতী কাজে আসে, আপন মনে কাজ করে, হপ্তা শেষে মজুরী নিয়ে বাড়ী ফেরে। হঠাৎ গঙ্গাবতী শ্যামজীর শ্যেন দৃষ্টিতে পড়ে যায়। যেমনি পূর্ণ-যৌবন চারিদিক ছেয়ে ঢেউ খেলে কেবলি আবর্ত্তন করে তোলে রূপ মাধুরিমা—তেমনি তার স্বাচ্ছন্দ্য, সরল স্বাভাবিক চরিত্র লোককে করে উদ্‌ভ্রান্ত। এত রূপ, এত বড় অসহায়তা লোককে যেমনি মুগ্ধ করে অতি মাত্রায়, তেমনি আবার সাহস-ভীতির মানসিক দ্বন্দ্বে সাহসকে বেপরোয়া করে দেয়। শ্যামজী এত বড় মূল্যবান অথচ সহজ শিকার হাতের কাছে পেয়ে নিজকে সংযত করতে পারলেন না, কাম অনলে আগুনের হলকার মত হলেন চঞ্চল, দিবা-রাত্র মন যেন বলে গঙ্গাবতীর যৌবন, রূপ, নারী দেহ—শুধু তারই জন্য সৃষ্ট হয়েছিল, তাই সে স্বামী অনাদৃতা, তারি নিকট আশ্রয়প্রার্থিনী। গঙ্গাবতী নিরাশ্রয় বলে কাম বাসনাকে আর সংযত করলেন না, চেষ্টাও করলেন না। একবার নাকালের চূড়ান্ত হয়ে এখন সাবধান হয়ে গেছেন, কুলিমজুর রমণীদের দেহটা যে মিলের সম্পত্তি নয়, তা বুঝতে পেরেছেন। এবার কাঁচা কাজ করলেন না, পথঘাট বেঁধে লোক লাগিয়ে প্রথম গঙ্গাবতীর খবর নিলেন ভাল করে। তাঁর অনুচররা গঙ্গাবতীর ইতিহাস জোগাড় ক'রে নিয়ে এলো। গঙ্গাবতী যদিও স্বামী-পরিত্যক্তা, গরীব, সন্তানের আহার যোগাতে পারে না—কিন্তু বড় তেজস্বিনী, সতীত্ব জ্ঞান বড় প্রখর, দু'তিনটে মিলের কাজ ত্যাগ করে

চলে এসেছে। সতীত্বে, নারীত্বে একটু ঘা পড়িলে এখান থেকেও অতি সহজে চলে যেতে পারে। শ্যামজী এবার অন্য পথ ধরলেন। ধীরে ধীরে বিষ খাইয়ে যেমনি মানুষকে নির্জ্জীব জড় করে শেষটায় মৃত্যুর মুখে ফেলে দেয়, মানুষ নিজের মহা সর্ব্বনাশের কথা বুঝতেও পারে না, তেমনি গঙ্গাবতীকে নির্জ্জীব জড় করবার জন্য শ্যামজী প্রেমের অভিনয় আরম্ভ করলেন; গঙ্গাবতীকে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করাবার জন্য চারদিকে মায়াজাল ফেলতে লাগলেন।

কুলিবস্তি পরিদর্শন করবার কোন প্রয়োজন পড়ে না, যদিও পুঁথিপুস্তকে নিয়মকানুন আছে—তবু কেউ মেনে চলেন না। কে যেতে চায়—সুখের সময় অপব্যয় করবার জন্য নোংরা বস্তি পরিদর্শন করতে। স্যাঁৎসেতে ঘরদোর, আলো নেই, নর্দ্দমা পচা, আবর্জ্জনা পচা, দুর্গন্ধময় বিষাক্ত বাতাস, বস্তির ঘরে ঘরে অসুখ-বিসুখ। ঘরে ঘরে অশান্তি, দুঃখদুর্দ্দশা, বিশৃঙ্খলা, হাহাকার। মাতাল নরনারীর বীভৎসতা, মাতাল চরিত্রহীন লোকের পাশবিক অত্যাচার অবলা স্ত্রীর ওপর। যার ঘরে সুন্দরী যুবতী তার ওপর চরিত্রহীনদের অত্যাচার, সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে কলঙ্ক, সমাজে মুখোস পরে ভেতরে ভেতরে পাপের ব্যবসায় চালায় নিজের স্ত্রী-কন্যা দিয়ে। অবশ্য সমাজে ভাল লোকও আছে, সে খবর আড়ম্বর করে জানাতে বসি নি, অন্যায়, অত্যাচার, হীনতা, পাপের চিত্রই দেখাবো। কলে টিপ্ টিপ্ করে অল্পক্ষণের জন্য জল পড়ে—তা নিয়ে ছেলে বুড়োদের হেঁচড়া হেঁচড়ি, ঝগড়া ঝাঁটি রোজই হয়। মাঝে মাঝে বাক্যুদ্ধ থেকে চড়াচড়ি, খাঁমচা-খাঁমচি, চুলাচুলি, ভাল করে মারামারিও হয়। অভাব অনাটন, রোগ শোক, দুঃখ দুর্দ্দশায় একঘেয়ে জীবন চালাতে চালাতে আর পারে না, স্বভাব আপনিই খিট্‌খিটে হয়ে যায়। এরা যখন তখন ঝগড়াঝাটি করে—আবার পরমুহূর্ত্তে সব ভুলে যায়, বিচার-বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মনের কোণে সব কিছু পেঁচিয়ে রাখতে পারে না—সরলতার মুখোস পরে ভয়ঙ্কর হতে পারে না।

পানীয় জল এক ফোঁটা মিলতে পারে না, জলের কারখানা থেকে যে নর্দ্দমা বস্তির গা ঘেঁসে চলে গেছে, তারই অপরিষ্কার জলে সারা গ্রীষ্মকাল সব কাজ চালায়, এমনই জলের অভাব। আবার বর্ষাকালে জলের বন্যা বয়, অজস্র বারিধারা রোধ করা যায় না। ছাদের সর্ব্বাঙ্গ ফাঁক, ফাটা। ঝম্ ঝম্ করে জল পড়ে নর্ত্তকীর মাতাল নৃত্যের মত নেশায়, ঝপ্ ঝপ্-করে জল পড়ে ছাদের ফাঁক দিয়ে। বিছানা পাতবার মত ঠাঁই পাওয়া ভাগ্যের কথা, গুটিয়ে রাখবার স্থান মেলে না। অবশ্য মিলের বাবুদের (কর্ম্মচারী—Officer) জন্য যে সব বাড়ী করে কোয়ার্টার করা আছে এবং আড়ম্বরভূষিত করবার জন্য বাঙ্গলো নাম দেওয়া হয়েছে—সেগুলির অধিকাংশই সংস্কারের অভাবে বিশ্রী অবস্থায় দাঁড়িয়েছে, দাঁড়াচ্ছে। বৃষ্টি নামলে জিনিষ-পত্তর নিয়ে টানাটানি করতে হয়, রাত্তিরে বিছানা গুটাতে হয়।

কুলিমজুরদের এমনই দুর্দ্দশা! আবেদন, নিবেদন বহুবার হয়েছে—কোন ফল হয়নি, আবেদন-পত্র নষ্ট কাগজ-পত্রের সঙ্গে নষ্ট হয়; মুখের আবেদন দয়া, অনুগ্রহ, যাচ্ঞা ব্যর্থ হয়। কেউ কোন খোঁজখবর নেয় না—জানালেও কর্ণপাত করে না। বহুদিন যাবৎ এমনি চলছিল, হঠাৎ কর্ত্তৃপক্ষ অনুগ্রহ করলেন, কুলিমজুররা আশা করলে এবার কর্ত্তৃপক্ষের দয়া হয়েছে, কারণ এবার মিলের খুব লাভ হয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত কেবল দশ নম্বর বাড়ী—যেখানে গঙ্গাবতী বাস করছে, সেটার পুনঃ সংস্কার হল। এ পাড়ার জলের খুব অভাব, যদিও অন্য পাড়ায় একি অবস্থা—তবু কেবল এ পাড়াতে দশ নম্বর বাড়ীর সম্মুখে কল বসানো হল। বস্তিতে গঙ্গাবতীর বাড়ীর চেয়ে বহু বাড়ীই খারাপ, তথাপি কেবল গঙ্গাবতীর বাড়ী মেরামত হল—কুলিমজুররা বহুবার আবেদন করেছে, এবারও আবেদন করেছিল—তবু তাদের বাড়ী মেরামত হলো না; আর গঙ্গাবতীর বাড়ী বিনা আবেদনে, একটু ভাল থাকা সত্ত্বেও মেরামত হলো দেখে সকল লোক চটে গেলো। কুলি পুরুষরমণীরা শ্যামজীর ও গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা রটাতে আরম্ভ করলো মনের আক্রোশে। কুৎসায় মুখ ভরে, গেয়ে সুখ পাওয়া যায়। কুৎসা অসম্ভব রকম অশ্লীল করে যতই আলোচনা করুক, তৈরী করুক, কিন্তু কোন প্রতিকার করতে পারলো না এরা। শ্যামজীকে মিলের বিধাতা-পুরুষ বললে অত্যুক্তি হয় না। মিলে চাকরি করতে হলে তাঁর সুখ্যাতি গেয়ে তোষামোদ করতেই হবে, এ ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই। এরা ভেতরে ভেতরে খুব জলে পুড়লো, কিন্তু বাইরে পোষা কুকুরের মত পায়ে লুটিয়ে

পড়লো। যখন শ্যামজী বললেন যে দশ নম্বর বাড়ীতে একটা খারাপ রোগী মরেছিল অতএব চূণ (white wash) না লাগালে বিষাক্ত বীজ ছড়াতে পারে (আমরা জানি, কুলিরাও জানে যে এগার নম্বর বাড়ীতে একটি যক্ষ্মা রোগী দু' বছর পূর্ব্বে মারা গিয়েছিল, অবশ্য দশ নম্বর ও এগার নম্বর বাড়ী একবারে লাগালাগি) ; তারপর একটা বড় ডাল ছাদের উপর এসে বাড়ীটা নষ্ট করে দিচ্ছে, বহু খোলা ভেঙ্গে গেছে, সময়মত না সারালে বাড়ীটাই নষ্ট হয়ে যাবে, তাতে মিলের বহু ক্ষতি হবে। বড়বাবু হুকুম দিয়েছিলেন— পূর্ব্বেই সারাতে, ব্যস্ততায় হয়ে উঠেনি। বর্ত্তমান, এ দুর্দ্দিনে মিলের এমন ক্ষমতা নেই যে সকল বাড়ী মেরামত করা যেতে পারে! কর্ত্তৃপক্ষের নজর পড়েছে, ভবিষ্যতে সমস্ত বাড়ীই পুনঃ মেরামত করা হবে।...

শ্যামজী গঙ্গাবতীকে কোন প্রলোভন দেখালেন না, পদস্খলিত করবার জন্য ফুসলাতেও চেষ্টা করলেন না। অদৃশ্য ক্ষমতার মত অলক্ষ্যে থেকে মজুরী বেশী করে দেওয়াতে লাগলেন, ঘরদোর ভাল করে দিলেন, জলের সুবিধে করে দিলেন। মিলের খাটুনিও একটু কমিয়ে দিলেন। বড় আশা করে বস্তি পরিদর্শন করতে কয়েক দিন গিয়েছিলেন; প্রবল ইচ্ছা ছিল—গঙ্গাবতীর সঙ্গে আলাপ-সালাপ করবার কোন সুবিধে হয়নি। কুলিমজুররা ঘিরে থাকে সর্ব্বদা এবং গঙ্গাবতী কোন গ্রাহ্যই করে না। গঙ্গাবতী এমনই তেজস্বিনী, এমনই স্বাধীন, স্পর্দ্ধিত রমণী যে চাকরির মায়ায় লোক-দেখানো তোষামোদ পর্য্যন্ত করে না। গঙ্গাবতীর বাড়ী গেলেন, সমস্ত কুলিমজুর যোড়হাতে কম্পমান অবস্থায় স্বার্থের জন্য অপরের অখ্যাতি রটিয়ে নিজের সুখ্যাতি গেয়ে গেয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল—আর গঙ্গাবতী ছোটলোকের পক্ষে অপরিচিত ভদ্রলোককে যেটুকু সম্মান দেখানো উচিত, তা পর্য্যন্ত দেখায়নি, অনুগৃহীতা বলেও একটু বিনয় দেখায়নি। সমস্ত কুলিমজুর শ্যামজীকে পেয়ে জীবন ধন্য মনে করেছিল, আর গঙ্গাবতী পথের লোকের মত নিরপেক্ষ, উদাসীন ভাব দেখিয়েছিল, গ্রাহ্যই যেন করেনি।

শ্যামজী যদিও অন্তরে ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, ধৈর্য্য রাখতে অক্ষম হয়ে পড়লেন, তবু প্রাণপণে নিজেকে সরিয়ে রাখতে লাগলেন। হাতে পাওয়া, মুষ্টিবদ্ধ জিনিষ পেয়েও যেন এমনই খেতে পারছেন না; খেতে অসুবিধা নেই, নিজের কোন আপত্তি নেই, কোন বাধাও নেই—তবু যেন যাই যাই করে যাওয়া হয়ে উঠছে না। লাভ, আপশোষ, সাহস ও ভয়ের মাঝে যে কার্য্য সম্পন্ন করবার শক্তিটা জড় আছে তা বুঝতে পারেন না। কার্য্যকরী শক্তিটা যে জড় আছে তা বুঝবার মত মনের গভীরতা নেই, প্রসারতা নেই। তাই গঙ্গাবতীর স্বেচ্ছাকৃত উপেক্ষায়, অপমানে এক একবার বারুদের মত জলে উঠেন, বুঝতে পারেন যে আশা এখনও পূর্ণ হয় নি, অভাব কেবল তীব্রই হচ্ছে— পূরণের দিকে একটু এগিয়ে যায় নি, তখনি নিজের মনে হুকুম করেন—গঙ্গাবতীকে চুলের মুঠা ধরে টেনে আনবার জন্য। দেয়ালে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি হয়, ধ্বনিও প্রতিধ্বনি মিলে বিকট স্বর ধরে। নাটকীয় ভঙ্গীতে ঘরে পদচারণ করতে করতে ভাবেন, হাত-পা' নেড়ে ভাবেন যে গঙ্গাবতীর এলো খোঁপার ঝুঁটি ধরে হিঁচড়ে এনে দেখিয়ে দেবেন যে তিনি বীরপুরুষ—আর সে অবলা নারী, তিনি অসীম ক্ষমতাশালী, ক্রোড়পতি, রাজা—আর সে দুর্ব্বলা ভিখারিণী, প্রজা, দাসী। আভিজাত্যচালে হাত নির্দ্দেশ করে বলেন যে তার জন্ম হুকুম করবার জন্য—মনের খেয়াল মেটাবার জন্য—মনের তীব্র ক্ষুধা মেটাবার জন্য—আর গঙ্গাবতীর জন্ম হুকুম নীরবে, সন্তুষ্টচিত্তে পালন করবার জন্য, সন্তুষ্টচিত্তে নিজকে উৎসর্গ করে খেয়াল মেটাবার জন্য। যতদিন ক্ষুধা মেটাতে পারে ততদিন প্রতিদান পাবে ঐশ্বর্য্য, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, তারপর পাঁকের ফুল পাঁকে গিয়েই পচবে। গঙ্গাবতীর কত বড় সৌভাগ্য যে শ্যামজী খাটো হয়ে তারি দুয়ারে এসে দাঁড়ান; তিনি ইচ্ছে করলেই মুহূর্ত্তে এই স্পর্দ্ধিতা, দুর্ব্বিনীতা, অপরিণামদর্শিনী, বাতুল-তুল্যা নারীকে দাসী করে সাজানো-ঘর আলো করতে পারেন—আর সে কিনা গ্রাহ্য করে না, ভ্রূক্ষেপও করে না!

শ্যামজী জলে উঠে নিজেই দগ্ধ হন, যত সহজ মনে করতেন তত সহজ আর মনে হয় না; হতাশে ক্রোধানলে বল, কৌশল প্রয়োগ করতে চান শেষ পর্য্যন্ত—আর সাহসে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। কিশোরীবাঈ সে শক্তি চূর্ণ করে দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে। পশুত্বের কার্য্যকরী উগ্রতা কিশোরীবাঈ বিভ্রান্ত করে দিয়েছে; বড় হুঁসিয়ার করে দিয়েছে; বড় দুর্ব্বল, সন্দিগ্ধ করে দিয়েছে; মোসাহেবরা

উৎসাহ দেয়, কবিত্বপূর্ণ রূপের বর্ণনা করে, বিশ্রী কথা বলে ক্ষিপ্ত করে, উৎসাহ দেয়, সাহস দেয়, উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ কেউ বের করতে পারে না। বোতলের পর বোতল মদ খায়, কল্পনায় গঙ্গাবতীকে জোর করে ধরে আনে কেউ, কেউ ফুসলিয়ে আনে, কেউ আনে রোমান্স করে, গঙ্গাবতী হাসতে হাসতে আসে, শ্যামজীকে মদ দেয়, নিজে খায়, নাচে, দেহ প্রদর্শন করতে করতে শ্যামজীর কোলে ঢলে পড়ে ইন্দ্রপুরীর অপ্সরার মত। মাতালদের যখন ঘুম ভাঙ্গে, নেশার ঘোর কাটে, তখন হাতের পাশে কিছু খুঁজে পায় না, কথার প্যাঁচ আর চলে না। দিনের খোলা স্পষ্ট আলোকে নারীহরণ ভয়টা বড় একটু জটিল হয়ে নয়নে ঠেকে। শেষ পর্য্যন্ত আশা থাকে শুধু। (ক্রমশঃ)

এস

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

নীরসে সরস করি' এস, শ্যাম জলধর !
শ্রীহীন রাধার কুঞ্জ বিনা রাধামনোহর ;
ফুটে না কুসুম কলি
গুঞ্জরি' না আসে অলি,
যমুনার জলবেণী লুটে বেলা-বালু-পর।
বিরহ ব্যথিত ব্রজ ; এস, শ্যাম জলধর।

তোমা বিনা, ব্রজেশ্বর, ব্রজ আজি অন্ধকার ;
তোমার বিলাসকুঞ্জে উঠে শুধু হাহাকার ;
পুলকিত বনমাঝে
বাঁশী তব নাহি বাজে,
বনপথে নাহি রাজে ছিন্নসূত্র ফুলহার—
জানায়ে তোমার তরে গোপিকার অভিসার

শোভে না কুসুম আর কদম্বের শাখা 'পরে ;
শীকর-শীতল বায়ে ফুলরেণু নাহি ঝরে ;
শ্রীহীন তমাল শাখে
পাখী আর নাহি ডাকে ;
ভুলিয়াছে নৃত্য শিখী—কেকারব নাহি ক'রে ;
উর্দ্ধমুখে গোঠে গাভী আছে চাহি' তোমা তরে।

জ্যোছনা নিশায় আর নাহি রাস—রসময় ;
গোপিকা নাহিক গণে ফাগুন দিবসচয়—
কবে দোল মহোৎসবে
আনন্দে মাতিবে সবে—
পুলক-চঞ্চল হিয়া, নাহি লাজ, নাহি ভয় ;
গোপিকা তোমার প্রেমে করিবে আপনা লয়।

জল ফেলি' ব্রজবালা জলে আর নাহি চলে
যৌবন-যমুনাকূলে তোমারে হেরিবে ব'লে।
বিকচ কদম্বমূলে
কাল কালিন্দীর কূলে
দিন যায়—দিন যায়—উঠে জলকলকলে—
তুমি যে ডেকেছ তা'রে বাঁশরী-বাদন-ছলে।

তোমার বাঁশরী স্বর পশিয়াছে কাণে যা'র,
সে কি মানে কোন বাধা—সে কি থাকে গৃহে আর ?
তুমি যা'র চিদাকাশে
কে তা'রে ফিরা'বে বাসে ?
অন্তর উজল যা'র কোথা তা'র অন্ধকার ?
তুমি প্রেম—তুমি ভক্তি—তুমি মুক্তি গোপিকার।

এস ফিরি' বৃন্দাবনে, এস, শ্যাম জলধর ;
বিপিনে যমুনাকূলে উঠুক বাঁশরী-স্বর।
বরণ জলদঘটা,
তাহে বিজলীর ছটা,
শিখিপুচ্ছ চূড়া শিরে—ইন্দ্রধনু মনোহর ;
রাধা হৃদিকুঞ্জে আসি' বিহর হে নটবর।

শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ

অধ্যাপক শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় গত আশ্বিন মাসের ভারতবর্ষে "শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে "শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন" এই ধারণাটি ভুল। তাঁহার মতে "শ্রীচৈতন্যদেব যে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি নিন্দা বা অমান্য করেন নাই, এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবসর নাই।" এই বিষয়ে সাধারণের ভুল ধারণার কারণ কি—তাহার আলোচনা করিয়া বসন্তবাবু লিখিয়াছেন :—

"এরূপ ভুল ধারণা হইবার আর একটি কারণ এই যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও কোনও পাঠ্যপুস্তকে এই ভুল কথা লেখা আছে। যথা, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের ভারতবর্ষের ইতিহাসে লেখা হইয়াছে Chaitanya did away with distinctions of caste (page 202); অর্থাৎ "শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন।" কথাটি যে কত ভুল তাহা শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে প্রামাণিক এবং সর্ব্বজনপরিচিত শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে।"

এই সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার সম্প্রতি আমার অবসর নাই এবং আবশ্যকতাও নাই। কিন্তু উপসংহারে বসন্তবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট আমার পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছেন, সুতরাং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যেটুকু দরকার তাহা সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি।

কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকেই এই 'ভুল ধারণা' আছে তাহা নহে। যে সমুদয় আধুনিক গ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাতেও ইহার উল্লেখ আছে। পরলোকগত সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সংস্কৃতশাস্ত্রবিৎ ছিলেন এবং বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম্মের ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বত্র প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। তিনি এই গ্রন্থে লিখিয়াছেন "Chaitanya also was a more courageous reformer in so far as he condemned the distinctions of castes " (৮৩ পৃঃ)

রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপণ্ডিত। বসন্তবাবু যে চৈতন্যভাগবতের দোহাই দিয়া তাঁহার মত সমর্থন করিয়াছেন সেই গ্রন্থ সম্বন্ধে দীনেশবাবু লিখিয়াছেন: "চৈতন্যভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি (চৈতন্য) হীন শূদ্র রামানন্দ রায়কে দিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তদীয় অনুচর ভক্ত কবিগণ নিজেদের ব্রাহ্মণ্য অভিমান লুপ্ত করিয়া শুধু দাস বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং ঈশান নামক ব্রাহ্মণ নিজের উপবীত ছিঁড়িয়া ফেলিয়া তাঁহাদের সেবার অধিকারী হইয়াছিলেন। "আমার ও আমার সেবকের কোন জাতি নাই" এই কথা তিনি অটল নির্ভীকতার সহিত প্রচার করিয়াছিলেন। একথা চৈতন্যভাগবতে দৃঢ়ভাবে উল্লিখিত আছে।" (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ষষ্ঠ সংস্করণ, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ করিয়াছেন; আমিও তাহা হইতে * কয়েকটি প্রমাণ উদ্ধৃত করিব। বসন্তবাবু লিখিয়াছেন যে চৈতন্যের ভৃত্য পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন (৪৯১ পৃষ্ঠা)—এমনি তাঁহার জাতিভেদ সম্বন্ধে কঠোরতা!

কিন্তু শূদ্রজাতীয় গোবিন্দ যখন মহাপ্রভুর ভৃত্য হইবার জন্য আবেদন করিল তখনকার যে বর্ণনা চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই তাহাতে ঠিক বিপরীত ধারণাই হয়। এই বর্ণনা হইতেই মহাপ্রভুর জাতিভেদ সম্বন্ধে ধারণা বুঝা যাইবে, এই জন্য মূল গ্রন্থের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

> "আর দিনে সার্ব্বভৌম আদি ভক্ত সঙ্গে
> বসিয়াছেন মহাপ্রভু কৃষ্ণকথা-রঙ্গে।
> হেনকালে গোবিন্দের হৈল আগমন;
> দণ্ডবৎ করি কহে বিনয়-বচন—
> "ঈশ্বর পুরীর ভৃত্য গোবিন্দ মোর নাম;
> পুরী গোসাঞীর আজ্ঞায় আইনু তব স্থান।
> *   *   *   *
> এত শুনি সার্ব্বভৌম প্রভুরে পুছিল –
> "পুরী গোসাঞী শূদ্রসেবক কাঁহাতে রাখিল?"
> প্রভু কহে—"ঈশ্বর হয় পরম স্বতন্ত্র;
> ঈশ্বরের কৃপা নহে বেদ-পরতন্ত্র।
> ঈশ্বরের কৃপা জাতিকুল নাহি মানে।
> বিদুরের ঘরে কৃষ্ণ করিল ভোজনে।
> *   *   *   *
> মর্য্যাদা হৈতে কোটি সুখ স্নেহ-আচরণে;
> পরম আনন্দ হয় যাহার শ্রবণে।"
> এত বলি গোবিন্দেরে কৈল আলিঙ্গন;
> গোবিন্দ করিল সবার চরণ-বন্দন
> *   *   *   *
> তবে মহাপ্রভু তারে কৈল অঙ্গীকার;
> আপন শ্রীঅঙ্গ সেবায় দিল অধিকার। (৩৩০—৩১ পৃষ্ঠা)

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীপাদ শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
দ্বিতীয় সংস্করণ—কালনা—১৩৩০ সাল

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সার্ব্বভৌম শূদ্রসেবকের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলা সত্ত্বেও মহাপ্রভু গোবিন্দকে যে শুধু ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন তাহা নহে. তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তিনি যে যুক্তি দেখাইলেন তাহাতে জাতিভেদের অসারতাই প্রতিপন্ন হইল।

চৈতন্যের যুগে শূদ্রকে স্পর্শ করাও বিষম অনাচার বলিয়া বিবেচিত হইত। চৈতন্য এই অস্পৃশ্যতা পরিবর্জ্জন করিয়া লোকের ভক্তি ও সম্ভ্রম আকর্ষণ করিয়াছিলেন ; চৈতন্যচরিতামৃত হইতেই আমরা ইহার প্রমাণ পাই :—

"হেনকালে আইল তথা ভবানন্দ রায় ;
চারিপুত্র-সঙ্গে পড়ে মহাপ্রভুর পায়।
সার্ব্বভৌম কহে—"এই রায় ভবানন্দ ;
ইঁহার প্রথম পুত্র রায় রামানন্দ।"

তবে মহাপ্রভু তাঁরে কৈল আলিঙ্গন ;

* * * *

রায় কহে—"আমি শূদ্র বিষয়ী অধম ;
মোরে তুমি স্পর্শ এই ঈশ্বর-লক্ষণ। (৩২৬ পৃষ্ঠা)

ইহার শেষ দুইটি পংক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি, চৈতন্যের কোন গুণে নীচজাতীয় হিন্দুগণ তাঁহার ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিল।

নীচজাতীয় লোকের সহিত আহার করিতেও যে চৈতন্যদেবের আপত্তি ছিল না—তাহার প্রমাণও চৈতন্যচরিতামৃতে পাই। মহাপ্রভু তাঁহার শিষ্যগণকে লইয়া আহার করিতে ভালবাসিতেন। ভোজনে বসিয়া তিনি পণ্ডিত রূপ ও সনাতন এবং এমন কি যবন হরিদাসকেও আহ্বান করিতেন। যথা—

"উদ্যান ভরি বৈসে ভক্ত করিতে ভোজন।
হরিদাস বলি প্রভু ডাকে ঘন ঘন ;
দূরে রহি হরিদাস করে নিবেদন—
ভক্ত সঙ্গে করুন প্রভু প্রসাদ অঙ্গীকার ;
এ সঙ্গে বসিতে যোগ্য নহোঁ মুঞি ছার।
পাছে মোরে প্রসাদ গোবিন্দ দেবে বহির্দ্বারে"
মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে। (৩৫২ পৃষ্ঠা)

এই প্রসঙ্গেই দেখিতে পাই ভোজনে বসিয়া অদ্বৈতাচার্য্য (পরিহাস-চ্ছলে) নিত্যানন্দকে বলিতেছেন যে, প্রভু তো সন্ন্যাসী—তাঁহার কোন দোষ হয় না—কিন্তু তিনি গৃহস্থ মানুষ, সর্ব্বজাতির লোকের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাওয়া তাঁহার পক্ষে অনাচার। নিত্যানন্দও পরিহাস করিয়া জবাব দিতেছেন যে অদ্বৈতের সঙ্গে একত্র ভোজনও তাঁহার পক্ষে দোষের (৩৫৩ পৃষ্ঠা)।

কেবল যে যবন হরিদাস মহাপ্রভুর শিষ্য হইয়াছিলেন তাহা নহে। কয়েকজন পাঠানকেও তিনি শিষ্য করিয়া সঙ্গে রাখিয়াছিলেন। অন্যান্য বহু যবনও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিল। "পশ্চিমে আসিয়া কৈল যবনাদি ধন্য"। বিজুলী খান নামে একজন পাঠান বৈরাগী হইয়া মহাভাগবত উপাধি পাইল—

সেই বিজুলী খান হইল মহাভাগবত।
সর্ব্বতীর্থে হইল তাঁর পরম মহত্ত্ব। (৪৩৮ পৃষ্ঠা)

এই মুসলমান ভক্তগণের যে মন্দির প্রবেশে কোন বাধা ছিল না, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি হইতে জানিতে পারা যায়—

ভক্ত সব ধাঞা আইলা হরিদাসে নিতে—
"প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিতে"।
হরিদাস কহে—"আমি নীচ জাতি ছার,
মন্দির নিকটে যাইতে নাহি অধিকার।
জগন্নাথ সেবক যাঁহা স্পর্শ নাহি হয়
তাঁহা পড়ি রহোঁ,—মোর এই বাঞ্ছা হয়।"
এই কথা লোক গিয়া প্রভুরে কহিল
শুনিয়া প্রভুর মনে বড় সুখ হৈল। (৩৪২পৃঃ)

শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু এই শ্লোক কয়টি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—"অস্পৃশ্য জাতীয় ব্যক্তি পরম ভক্ত হইলেও অস্পৃশ্যদের নিমিত্ত শাস্ত্র যে আচার নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা পালন করিবে—ইহাই মহাপ্রভুর অভিপ্রায়।"

কিন্তু ইহাই যদি মহাপ্রভুর অভিপ্রায় হইত তাহা হইলে তিনি এবং তাঁহার ভক্তগণ হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করিতেন না। মহাপ্রভু এবং তাঁহার ভক্তগণ যে যবন হরিদাসের মন্দির-প্রবেশ দোষণীয় মনে করিতেন না এবং সর্ব্বসাধারণের মন্দির প্রবেশের অধিকার স্বীকার করিতেন—তাহা ঐ শ্লোক কয়টি হইতে বেশ বোঝা যায়।

হরিদাসের কথা শুনিয়া "মহাপ্রভুর মনে সুখ হৈল"—ইহার ব্যাখ্যায় টীকাকার লিখিয়াছেন মহাপ্রভু—'হরিদাসের তাদৃশ দৈন্য শ্রবণে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। এতাদৃশ দৈন্য ভক্তির পরিচায়ক'। বস্তুতঃ ইহাতে অন্ত্যজ বা যবন জাতির যে মন্দির প্রবেশের অধিকার নাই প্রভুর এরূপ মনোভাবের কোন পরিচয় নাই। তাহা হইলে হরিদাসকে মন্দিরে আহ্বান করিবার কোন অর্থই থাকে না। মহাপ্রভুর বাক্য এবং কার্য্য হইতে ইহাই স্পষ্ট অনুমিত হয় যে তিনি এবং তাঁহার সম্প্রদায় জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানিতেন না, তবে যদি কেহ প্রচলিত আচার নিয়ম প্রতিপালন করিতে চাহিত, তিনি তাহাতে জোর করিয়া বাধা দিতেন না। যেমন হরিদাসের একত্র বসিয়া ভোজনে আপত্তি করায় চৈতন্যচরিতামৃতকার স্পষ্টই বলিয়াছেন "মন জানি প্রভু পুনঃ না বলিল তাঁরে।" মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধে যেমন, অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধেও তেমনি আর একটি দৃশ্য চৈতন্যচরিতামৃতে দেখিতে পাই।

"তবে মহাপ্রভু আইলা হরিদাস মিলনে,
হরিদাস করে প্রেমে নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
প্রভু দেখি পড়ে আগে দণ্ডবৎ হঞা
প্রভু আলিঙ্গন কৈল তাঁরে উঠাইয়া।
হরিদাস কহে—"প্রভু না ছুঁইও মোরে
মুই নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে।"

প্রভু কহে—"তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে,
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থ স্নান,
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান।
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন,
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন।" (১৮৩ পৃষ্ঠা)

ইহার পরই শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে—তাহার অর্থ—"যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম বিদ্যমান রহিয়াছে, সে চণ্ডাল হইলেও পূজ্যতম। যেহেতু যাঁহারা তোমার নাম গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের তপস্যা, হোম, সর্ব্বতীর্থে স্নান, সদাচার এবং বেদ অধ্যয়ন করা হয়"।

এখানে হরিদাসের আপত্তি থাকিলেও প্রভু নিজে যে জাতিভেদ এবং অস্পৃশ্যতা মানিতেন না এবং তাঁহার এই মত যে শাস্ত্র ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। মহাপ্রভু হরিভক্তি-বিলাসের যে শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়া রূপ ও বল্লভকে আলিঙ্গন করিলেন সেই ভগবদ্ উক্তির অর্থ এই—"চতুর্বেদাভ্যাসকারী ব্রাহ্মণ আমাতে ভক্তিশূন্য হইলে আমার প্রিয় হয় না, কিন্তু চণ্ডালও আমাতে ভক্তিমান হইলে আমার প্রিয় হয়। অতএব তাদৃশ ভক্তিমান বিপ্রের অভাবে তাদৃশ ভক্ত চণ্ডালই দানের পাত্র এবং তাহা হইতেই প্রতিগ্রহও করিবে। আর অধিক কি বলিব, সে ব্যক্তি আমার ন্যায় আদরের পাত্র।" (৪৪২ পৃষ্ঠা)।

এইরূপে মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবার সময় উল্লিখিত শ্লোক এবং ভাগবত হইতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। তাহার ভাবার্থ এই যে 'যজ্ঞ, দান, বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি দ্বাদশগুণযুক্ত ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ পদারবিন্দ হইতে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার অপেক্ষা যে মন বাক্য প্রাণ ভগবানে অর্পণ করিয়াছে তাদৃশ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। যেহেতু সেই চণ্ডাল কুল পবিত্র করে, কিন্তু সাতিশয় গর্ব্বিত সেই ব্রাহ্মণ আপনাকেও শুদ্ধ করিতে পারে না।'

বসন্তবাবু বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্যদেব বেদ পুরাণ মানিতেন—সুতরাং জাতিভেদও মানিতেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে শ্রীমদ্-ভাগবতে জাতিভেদের কথা অনেক স্থলেই আছে। কিন্তু এই ভাগবতের ও অন্যান্য শাস্ত্রের যে শ্লোকগুলি শ্রীচৈতন্য উদ্ধৃত করিয়া প্রকৃত ভক্তির নিকট জাতিভেদের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন তাহার দিকে বসন্তবাবু বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন হিন্দু-সংস্কারকগণ মুখে কখনও বেদ ও পুরাণের অপ্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন না—কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মত ও প্রদর্শিত পথ অনেক স্থলেই সনাতন ধর্ম্ম ও আচার হইতে ভিন্ন। চৈতন্যদেব বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বেদে আস্থার দোহাই দিয়া তিনি জাতিভেদ স্বীকার করিতেন এইরূপ যুক্তি সমর্থন করা যায় না।

বসন্তবাবু চৈতন্যচরিতামৃতের আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছেন যে চৈতন্যের বেদ পুরাণ ও শাস্ত্রে অচলা নিষ্ঠা ছিল এবং তিনি জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্পূর্ণ সমর্থন করিতেন। সমগ্র গ্রন্থের সাধারণ তাৎপর্য্য ও মূলতত্ত্ব এবং ভক্তির নিকট জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদনের জন্য যে সমুদয় অসংখ্য উপদেশ, দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্রবাক্য আছে—তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া বসন্তবাবু তাঁহার মত সমর্থনের জন্য নানাস্থান হইতে অসংলগ্ন কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এক ব্যক্তি মহাভারত পাঠ শেষ করিয়া তাহা হইতে মাত্র এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিল যে স্ত্রীলোকের একাধিক পতি থাকিতে পারে। বসন্তবাবুর চৈতন্যচরিতামৃতের বিশ্লেষণ দেখিয়া এই ব্যক্তির কথাই মনে পড়ে।

উপরে যে সমুদয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে মহাপ্রভু নিজে সর্ব্বজাতিকে স্পর্শ করিতেন, তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করিতেন এবং তাহাদের—এমন কি যবনের মন্দির-প্রবেশের অধিকার স্বীকার করিতেন। তিনি প্রাচীন ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুযায়ী বিশ্বাস করিতেন যে, যে হরিভক্ত সেই পবিত্র এবং ভক্তিধর্ম্মের নিকট উচ্চজাতি নীচজাতির কোন ভেদ নাই। তিনি নীচজাতি, এমন কি যবনকেও ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছেন এবং ভক্তি থাকিলে যবনও দ্বিজ সন্ন্যাসী হইতে শ্রেষ্ঠ ইহা তিনি মুক্তকণ্ঠে বারংবার বলিয়াছেন। মহাপ্রভুর সমগ্র জীবন ও উপদেশ স্মরণ করিলেও এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়।

ইহার পরেও যদি বসন্তবাবু বলেন যে শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে ব্যবস্থাগুলি অমান্য করেন নাই এবং এ বিষয়ে তিনি শাস্ত্র মানিয়া চলিতেন—তাহা হইলে বসন্তবাবুকে প্রশ্ন করি যে চৈতন্যদেব যাহা যাহা করিয়াছিলেন তিনি নিজে এবং তাঁহার দলভুক্ত শাস্ত্রীয় আচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তাহা করিতে প্রস্তুত আছেন কি? তিনি কি শূদ্র ও মুসলমানকে স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছেন? তাঁহাদিগকে লইয়া এক সঙ্গে ভোজন ও মন্দিরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে কি? ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ, ইহা কি বসন্তবাবু বিশ্বাস করেন? আমরা বসন্তবাবুর উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিতে চাই। আমার ইতিহাসে আমি লিখিয়াছি—"Chaitanya did away with distinctions of Caste and one of his principal followers was a Mohammadan."—বসন্তবাবু ইহার প্রথমাংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই অংশের অর্থ এরূপ নহে যে চৈতন্য সমগ্র হিন্দুসমাজ হইতে জাতিভেদ প্রথা তুলিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই যে চৈতন্য নিজের সম্প্রদায়ে জাতিভেদ মানিতেন না। এই উক্তি যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা নিরপেক্ষ পাঠক মাত্রেই চৈতন্যচরিতামৃত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন।



শ্রীদিলবাহার রচিত   শ্রীবিচিত্র শর্ম্মা চিত্রিত

পাগ্‌লাডাঙ্গা সাব্‌ডিবিসনের নবীন সাব-ডেপুটি মিঃ প্রদোষনাথ রায়ের চাকরি না করিলেও চলিত।

তাঁহার স্বর্গীয় পিতাঠাকুর মহাশয় বুদ্ধি খরচ করিয়া একমাত্র পুত্রের জন্য ব্যাঙ্কে জমার অঙ্কটি বেশ মোটা রকম ভারী করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। পৈত্রিক ভিটায় সন্ধ্যা দিবার জন্য এক পিসি ছাড়া বিশেষ কেহ না থাকায় প্রদোষনাথের ঘর-সংসার পাতা এখনও হইয়া ওঠে নাই।

সুতরাং সংসারে তাহার চিন্তার খোরাক জোটাইবার অন্য কোনও সহজ বস্তু না থাকায় অনেকগুলি আজগুবি দুর্ভাবনা প্রদোষনাথের মগজের ভিতর এক সঙ্গে ভিড় জমাইয়া তুলিল।

প্রথমেই তিনি ভাবিলেন, বদরপুর জেলার তিনটি সাব্‌-ডিবিসন উঠাইয়া দিয়া মাত্র পাগ্‌লাডাঙ্গা সাব্‌ডিবিসনটি রাখিলে শাসন কার্য্যের অনেক সুবিধা হইত এবং খরচও বাঁচিত। কিন্তু আপাততঃ তাহার কোনও সম্ভাবনা না থাকায় চিন্তার স্রোত ভিন্নপথ ধরিল।

বাঙ্গালীর জাতীয় পোষাকের কথাই ধরা যাউক। ধুতি বর্জ্জনীয়, কি গ্রহণীয়—সে তর্ক না তুলিয়া ধুতিকে না হয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। কিন্তু কাছা ও কোঁচার আবশ্যক কি? নারীজাতি কাছা না দিয়াও এই প্রগতির যুগে পুরুষদের সহিত সমান পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। লাঠি, সড়কী, তরবারী ইত্যাদির পুরুষোচিত ক্রীড়া ও নানাবিধ মল্লযুদ্ধে পারদর্শিতা দেখাইতেছে। পাশ্চাত্য দেশের নারীরাও সাধারণতঃ কাছা ব্যবহার করেন না। বিশেষতঃ বাঙ্গালার 'মেজরিটি' সম্প্রদায় বরাবর কাছা বর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। আর কোঁচা একেবারে ইম্‌পসিবল্‌।

আচ্ছা, বাঙ্গালীরা পায়জামা পরিলে কিরূপ হয়? দেশী কাপড়ের কলগুলি ফেল্‌ হইবে। স্যর প্রফুল্লচন্দ্র রায় চটিবেন। হয়ত ইহা লইয়া তিনি এমন এক 'এজিটেশন্‌' আরম্ভ করিবেন, যাহা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনের প্রায় কাছাকাছি হইয়া উঠিবে। সরকার পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িবেন। শুধু তাহাই নয়, এই পরিকল্পনার মূল উৎস স্বয়ং আমি—ইহা প্রকাশ পাইলে— * * *

কল্পনা আর অধিক দূর অগ্রসর হইল না।

মিলের মোটা ধুতিগুলি কাটিয়া পায়জামা করা যাইতে পারে। ইহাতে কাপড়ের কলগুলিও বাঁচে, পোষাক সংস্কারও হয়। সংস্কারের যুগে ইহা একটি মস্ত বড় 'এ্যাচিভ্‌মেণ্ট' হইবে!

কিন্তু নাঃ! ইহাতেও বিপদ আছে।

কুসংস্কার-বর্জ্জন-বিরোধী বাঙ্গালীর দল দারিদ্র্যের দোহাই পাড়িবে। বলিবে, গরীব দেশে নূতন ধুতি কাটিয়া পায়জামা করার খরচ বেশী, দেশের অধিকাংশ লোকের পেটে ভাত জোটে না—।

সেই মান্ধাতার আমলের পুরাতন যুক্তি!! দারিদ্র্য, পেটে ভাত নাই, বস্ত্রহীন!

এদেশের আপাততঃ কিছু হইবে না। হতভাগ্যরা রবীন্দ্র-সাহিত্য যদি বা কেহ কেহ পড়িল, কিন্তু সকলে বুঝিল না। কবি স্বজাতির উন্নতির ও সংস্কারের সকল চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া অতি দুঃখেই বলিয়াছেন,—

"চিরদিন অর্দ্ধাশনে কেটে গেছে যার
আজও তার অনশন হ'ল না অভ্যাস—"

হাল ছাড়িয়া দিয়া প্রদোষনাথ চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়া একটি চুরুট ধরাইলেন।

চুরুটের ধোঁয়ায় বোধকরি মগজের আর এক পর্দ্দা

খুলিয়া গেল। তিনি চেয়ার ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন—ইউরেকা! ওঃ! দি আইডিয়া! চাষ,—সায়েন্টিফিক্ এগ্রিকালচার!

মানভূম জেলার গোমো রেলষ্টেশনের কিছু দূরে "দি ন্যাশন্যাল কৃষী (!) ফার্ম্মের" সাইন বোর্ডের ইতিহাসের মূলে কিন্তু এই ডেপুটিবাবুর চুরুটের ধোঁয়া!

সাইনবোর্ডের ঠিক নীচেই বড় বড় অক্ষরে'মটো' লেখা আছে—

"ক'ষে চালাও হল।
মাজায় পাবে বল।"



চ্যই, চ্যই, চ্যুঃ, চ্যুঃ

পূজার ছুটীতে মিঃ পি, এন, রায় তাঁহার গোমোর কৃষি ফার্ম্মের বাংলোয় আসিয়া আড্ডা গাড়িয়াছেন।

ফার্ম্মের প্রতি গাছপালা, জীবজন্তু, চেতন অচেতন পদার্থের সহিত ডেপুটিবাবুর নামের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

ডিপ্‌টিবাবুর বাগান, ডিপ্‌টিবাবুর চাষের ভিণ্ডি, মায় ডিপ্‌টিবাবুর গাইয়া—এখানকার নেটিবদের দৈনন্দিন আলোচনার বিষয়।

সকাল আটটা বাজিতে পাঁচ মিনিট বাকী। ইহার মধ্যে গুটিকয়েক দেশোয়ালী ছোকরার দল ডিপ্‌টিবাবুর বাগিচার এক কোণে কাঁটা তারের বেড়ার ধারে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া আছে।

রোজ ঠিক এই সময়ে মিঃ রায় নিজহাতে তাঁহার আশ্রম পালিত গাভীকে খাদ্য প্রদান করেন। ছোকরার দল তাহাই দেখিবে।

বাংলোর ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া আটটা বাজিতেই মিঃ রায় চায়ের টেবিলের উপর খবরের কাগজটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। র‍্যাকের উপর হইতে টুপিটা মাথায় চড়াইয়া বাহিরের বারান্দায় আসিয়া হাঁক দিলেন,—"বাঙ্গা! এই বাঙ্গা!"

গোয়ালঘরের দিক হইতে উত্তর আসিল,—

"আইজ্ঞা, সব (অ) রেডি খোকাবাবু—" বাঙ্গা প্রদোষনাথের পৈত্রিক আমলের সম্পত্তি। ব্যাঙ্কের পাশ বহির সহিত উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁহার দখলে আসিয়াছে। সেই দাবীতে বাঙ্গা মিঃ রায়কে 'খোকাবাবু' বলিয়াই ডাকে, 'খোকা হাকিম' বলিতে পারে নাই।

মিঃ রায় বীর পদক্ষেপে গোশালার দিকে চলিলেন। পরিধানে খাঁকী সার্ট, হাফ্‌প্যাণ্ট, মাথায় সোলার টুপী, হাতে ছড়ি। তাঁহাকে দেখিয়া বেড়ার ওপারের অর্দ্ধনগ্ন ছোকরার দল বলিল, 'সেলাম সাব্।' মিঃ রায় ঘাড় নাড়িলেন।

গোয়ালঘরের সাম্নের খোলা জায়গায় একটি গাভী শৃঙ্খলিত অবস্থায় বাঁধা রহিয়াছে। তাহার শৃঙ্গদ্বয় একটি মোটা রশির দ্বারা বাঁধিয়া বাঙ্গা কসিয়া টানিয়া রাখিয়াছেন। মিঃ রায় প্রস্তুত হইতেই বাঙ্গা তাঁহার হাতে পুরা আট হাত বহরের এক লাঠি দিল। লাঠির মাথায় এক আঁটি বিচালি দড়ি দিয়া ভালভাবে জড়ান।

মিঃ রায় রাইবেঁশে নৃত্যের অনুকরণে লাঠির গোড়াটি শক্ত করিয়া ধরিয়া অগ্রভাগটি গাভীর মুখের দিকে আগাইয়া দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুখে চুমকুড়ি দিতে থাকিলেন, —"চ্যই—চ্যই—চ্যুঃ—চ্যুঃ—হেট্—"

তাঁহার মদনমনোহর মূর্ত্তি দেখিয়া গাভী যত বা চার পা তুলিয়া শিং নাড়িয়া ফোঁস্, ফোঁস করে, মিঃ রায় ততই পেছন হটিয়া হাতের লাঠি বাগাইয়া ধরেন। এদিকে মুখে চুমকুড়ির বিরাম নাই—চ্যই—চ্যই—চ্যুঃ—চ্যুঃ—হেট্—এ্যাও!

কিছুক্ষণ এইরূপ কসরৎ করিবার পর গাভীটি প্রকৃতির তাড়না অনুভব করিয়া ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইল।

মিঃ রায় দুইগজ হটিয়া আসিয়া হাঁকিলেন,—

বাঙ্গা! বাল্‌তি নিয়ে আয়; জল্‌দি করো, ফিপ্‌টি পারসেণ্ট্ নাইট্রেট। হুঁসিয়ার! যেন একটুও বরবাদ না হয়।

বাঙ্গা জবাব দিল,—হঃ।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন হইতে চাপা হাসির খিল খিল শব্দ ভাসিয়া আসিয়া মিঃ রায়ের কানের ভিতর দিয়া মরমে হুল ফুটাইয়া দিল।

তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন,—"এ্যাও! শাট্‌আপ্।"

কিন্তু পিছন ফিরিতেই যাহা চোখে পড়িল তাহাতে মিঃ রায় শুধু বিস্মিত নহে, দস্তুর মত হতভম্ব হইয়া গেলেন।

অপরিচিতা তরুণীর কানের দুল দুইটি তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। কয়েকটি প্রস্ফুটিত যূথিকা কোনও অনামী লতা পল্লবে অযত্ন গ্রথিত হইয়া তাঁহার অনাবৃত হাতের শোভা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছিল।

তরুণী ফিক্ করিয়া হাসিলেন; হাত দুইটি কপালের কাছ বরাবর উঠাইয়া বলিলেন,—সুপ্রভাত, মিঃ রায়! নমস্কার!

মিঃ রায় যন্ত্রচালিতের ন্যায় হাত দুইটি কপালে ঠেকাইলেন। গলাটি সাফ্ করিয়া লইয়া বলিলেন—সুপ্রভাত! আপনি—আপনার—

তরুণী—এদিকে বেড়াতে এসেছিলাম। আপনার ফার্ম্মের সাইন বোর্ড ও মটো দেখে সোজা ভিতরে এসে পড়েছি। অনুমতি নেবার কথাটা আর ভেবে দেখিনি। এখন দেখছি ভাল করিনি, অনর্থক আপনাকে বিরক্ত কর্‌লু্ম।

মিঃ রায়—না, না, নেভার। এ আর এমন কি? কত লোকই ত এম্নি আসে। আর সত্য সত্য এ ত আর আমার 'প্রফেসন' নয়। সকলে আসুক—দেখুক, এই আমি চাই।

তরুণী—কিন্তু একটু বিরক্ত হয়েছেন বৈ কি? যে রকম 'শাট্ আপ্' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, ভাবলাম বুঝি হাতের বিচুলি বাঁধা লাঠিটা নিয়েই তাড়া করেন। যা ভয় হয়েছিল।

তরুণী আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল।

মিঃ রায় অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। বলিলেন—ছিঃ ছিঃ, কি যে বলেন আপনি! আপনি একজন ভদ্রমহিলা—ইয়ে—আমার অতিথি, না, এ আপনার ভারি অন্যায়, অবিচার!

তরুণী মুখ টিপিয়া হাসিল। হাসি তাহার একটা রোগ না কি?

সে বলিল—লাঠিটা কিন্তু এখনও হাতে আছে, মিঃ রায়।

মিঃ রায় কোনও উত্তর না দিয়া বেড়ার ওপারের ছোকরাদের লক্ষ্য করিয়া হাঁকিলেন,—

"এ্যাও! ভাগো হিঁয়াসে!"

সঙ্গে সঙ্গে হাতের বিচালী-বাঁধা বংশখণ্ড সবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া কাঁটা তারের বেড়ার ধারে গিয়া ঠেকিল।

তরুণী—আপনার ত ভারী রাগ, যদি ওদের লাগত।

মিঃ রায়—আপনি ত কেবল আমার রাগই দেখছেন। আমি অসভ্য, গেঁয়ো, রাগী, ভদ্রমহিলার গায়ে হাত তুলি—

তরুণী—কি কর্ব্ব বলুন। আপনার কৃষি ফার্ম্ম দেখতে এলুম; 'শাট্ আপ্' বলে রুখে দাঁড়ালেন। ছেলেদের লাঠি ছুঁড়ে মার্ল্লে্ন। সত্য, আপনি বড় অল্পে চটে যান।

মিঃ রায়—বেশ।

তরুণী—রাগ কর্ল্লে্ন না কি? আপনার গো-পালন ত দেখলুম। এখন বোধ হয় মুর্গী হাঁস ইত্যাদির পালা।

মিঃ রায়—ওঃ! আপনি 'পোলট্রি' মিন কর্চ্ছেন? না, সে সব কিছু এখানে নেই। শুধু চাষ। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আপনার কিছুই দেখা হবে না। আসুন, 'ঢেঁড়স'এর কাল্‌টিভেসন্ কি প্রণালীতে হয়, দেখবেন চলুন।

মিঃ রায় বাঙ্গাকে ঢেঁড়সএর ফাইল আনিতে বলিলেন। মিঃ রায় অগ্রগামী ছিলেন। গরুটির নিকট দিয়া একটু সামলাইয়া লইয়া সে প্রশ্ন করিল—গরুটি দেশী না বিলাতী?



আইজ্ঞা, সব (অ) রেডি খোকাবাবু—

মিঃ রায়—দেখতে পাচ্ছেন ভাগলপুরী গাই। গেল বছর হরিহর ছত্রের মেলায় খরিদ, তবু বললেন বিলাতী।

তরুণী—আমি গরু ভাল চিনি না, মিঃ রায়! তাই জিগ্যেস্ কর্লুম। দিশি গরু কিনা, তাই আপনার 'যুনিফর্ম্ম' দেখে ভয় পায়।

মিঃ রায় রুমালে মুখ মুছিলেন। দুই-জনে ঢেঁড়সএর আবাদের নিকট আসিয়া পড়িলেন। বাঙ্গা ফাইল আনিয়া দিল। মিঃ রায় খাতা লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলেন,—

"দেখুন, ১৯শে বৈশাখ বীজ খরিদ সাড়ে পাঁচ আনা; ২২শে বীজ বপন, ৩০শে অঙ্কুরোদ্গম, ২রা জ্যৈষ্ঠ মাপিয়া দেখা গেল সওয়া ইঞ্চি বাড়িয়াছে, ৪ঠা পাঁচটি গাছ পোকায় নষ্ট করিয়াছে, ৭ই—"

যাইবার সময় সে আর একবার প্রবলবেগে শিং নাড়িল। মিঃ রায় শব্দ করিলেন—চ্যাই-চ্যাই—চ্যুঃ—

তরুণী বাধা দিল। বলিল, কিছু মনে কর্বেন না, মিঃ রায়! হিসেব ঠিক হয় নি। পাঁচটি চারা নষ্ট হওয়ায় লোকসানের অঙ্কটিও সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া উচিত। আমার মতে প্রতি গাছে এক পো হিসেবে ফসল ধর্লে মোট পাঁচপো ঢেঁড়স নষ্ট হয়েচে। কোল্কাতার বাজারে এর দাম কম পক্ষে দশ পয়সা।



আপনার ত এ দিকে বেশ টেষ্ট আছে দেখচি—

মিঃ রায় সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার মাননীয় 'ভিজিটর' এর মুখের দিকে চাহিলেন,—

"আপনার ত এদিকে বেশ টেষ্ট আছে দেখচি। আপনি ঠিক ধরেচেন, কিন্তু একা সব পেরে উঠি না। একজন লেখাপড়া জানা—অথচ এ সব দিকে 'ইনটারেষ্ট' আছে এমন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রাখা দরকার দেখচি।"

তরুণী পিছনে পিছনে আসিতেছিল। হাসি চাপিতে গিয়া বস্ত্রাঞ্চলে মুখ গুঁজিয়া বারকতক কাসির ভনিতা করিল।

এই যে মহর্ষি প্রদোষানন্দ স্বামী! বলি আশ্রমের

কুশল ত? এ্যাসিষ্ট্যান্ট আবার কাকে রাখছ হে? চেলা খুঁজচ্ না কি?

বহু পরিচিত অথচ বিস্মৃতপ্রায় কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া মিঃ প্রদোষনাথ মুখ তুলিতেই যতীন্দ্রনাথের সুপুষ্ট বাহুবন্ধনে ধরা পড়িলেন।

প্রদোষ—হ্যালো, যতীনদা! আরে তুমি কোথা থেকে? কবে এলে, কোথায় উঠেচো?

যতীন। মানে? আমি ভেবেছিলাম এ প্রশ্নোত্তর-মালার সহজ ও সরল অভিনয় তোমাদের মধ্যে ইতিপূর্ব্বেই হয়ে গেছে। অন্ততঃ অনিতার সহিত তোমার কথাবার্ত্তার ধরণ দেখে আমার তাই মনে হয়েছিল।

স্বামীর মুখের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অনিতা জবাব দিল—প্রদোষবাবু আমাকে চিন্তেই পারেন নি; তুমি এসেই সব মাটি ক'রে দিলে?

যতীন। সে কি? চিন্তে পারেনি? অথচ এ্যাসিষ্ট্যান্ট রাখা প্রভৃতি জরুরী পরামর্শ ত তোমার সঙ্গেই হচ্ছিল। তোমরা দুজনে আমাকে এপ্রিল-ফুল বানাচ্ছ না ত?

যতীন্দ্রনাথ হাসির উচ্চ কলরব তুলিল।

এবার হাসিবার পালা প্রদোষনাথের। কিন্তু তাহার কান্না পাইতেছিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া প্রদোষনাথ কর-জোড়ে কহিল, বৌদি আপনার কাছে আমার অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, মাপ চাইবার অধিকারও বোধ হয় আর নেই। কিন্তু আপনার চেহারারও বড় কম পরিবর্ত্তন হয়নি—বিশেষ আপনার চশ্মা—

—বিভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল—যতীন্দ্রনাথ পাদপূরণ করিল। কিন্তু অপরাধের মাত্রা কি বল্ছিলে হে? একটা রোমান্টিক কিছু কোরে ফেলনি ত?

অনিতা রাগিয়া জবাব দিল—আহা! বয়েস যত হচ্ছে, ছেলেমানুষি তোমার ততই বাড়্ছে—।

—অনু আমাকে একটু 'ভারিক্কি' গোছের দেখ্তে চায়, বুঝ্লে প্রদোষ; কিন্তু ওর সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা দেখ্লেম—যাক্গে এখন একপেয়ালা চায়ের জোগাড় তোমার এই কলের লাঙ্গলের রাজত্বে হবে কি? না হয় বরং অনিতাকে উপস্থিত এ্যাসিষ্ট্যান্ট হিসাবে নিতে পার, আমার আপত্তি নেই।

অনিতা অধরোষ্ঠ দংশন করিয়া ঈষৎ ভ্রূকুটি করিল।

প্রদোষনাথ উৎসাহের সহিত কহিল—বৌদি, যদি কিছু মনে না করেন, আমার সমস্ত সরঞ্জামই প্রস্তুত। চলুন বাংলোর বারান্দায় বসা যাক্।

পথ চলিতে চলিতে যতীন্দ্রনাথ বলিতে লাগিল—দীর্ঘ সাত বৎসর মগের মুল্লুকে কাটিয়ে মাতৃভূমির জন্য প্রাণটা



একটা রোমান্টিক কিছু কোরে ফেলনি ত?

একবার আনচান্ কোরে উঠ্ল। কারবারের দেখাশোনার ভার ভাইপোর হাতে দিয়ে সটান রওনা হওয়া গেল। গ্রামে কয়েকদিন কাটাবার পর অনিতার বাবার তাগিদ এলো—গোমোয় যাবার জন্য। তিনি এখানে 'এ্যান্টি-বেরিবেরি লজ্' তৈরী কর্চ্ছেন। কাল রাত্রের গাড়ীতেই সকলে এসে পড়েছি। তোমার ফার্ম্মের খবরটা গ্রামেই সংগ্রহ করেছিলাম। সকালে উঠে আমার একটু দেরী দেখে অনিতা আগেই বেরিয়ে পড়্ল; তারপর যা হয়েছে তোমরা দু'জনেই জান।

অনিতা বলিল—তারপর প্রদোষবাবু আমাকে ত চিন্তেই পার্লে'ন না, উপরন্তু—

প্রদোষ বাধা বলিল—বৌদি মাফ্ কর্বেন, অপরাধ আপনার কাছে করেছি—দণ্ডও আপনার কাছ থেকে নেব, আশা করি।

অনিতা বলিল—কিন্তু মনে থাকে যেন দণ্ডাজ্ঞা শুনে পেছোবেন না।

যতীন বলিল, নিশ্চয় না। আমার এখনি গাইতে ইচ্ছে কর্চ্ছে—ক'রে থাকি অপরাধ, প্রেম ডুরি দিয়ে বাঁধ।

এইরূপ হাসি তামাসার মধ্যে চা-পান শেষ হইল। অনিতা প্রদোষকে তাহাদের ওখানে সান্ধ্যভোজের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিল।

যতীন্দ্রনাথ ও প্রদোষনাথ পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছিল।

গৃহস্বামী ব্রজনাথবাবু সম্প্রতি বেরি বেরি হইতে উঠিয়াছিলেন। রাত্রে ডাক্তারের নির্দ্দেশমত একটি আস্ত ভুট্টা ও আধপোড়া লাল আটার এক টুকরা রুটি খাইয়া থাকেন। তিনি জামাতা ও তাঁহার বন্ধুর সহিত বসিতে পারিলেন না।

গৃহকর্ত্রী অদূরে বসিয়া থাকিয়া মাঝে মাঝে এটা খাও, সেটা খাও, ফেলিয়া রাখিলে চলিবে না—ইত্যাদি অনুযোগ করিতেছিলেন। পরিবেশনের ভার পড়িয়াছিল, অনিতার ছোট বোন্ আরতির উপর।

যতীন। চিংড়ির মালাইটা বেড়ে হয়েছে অরু!

প্রদোষ। হুঁ! আপনার রান্না বড় চমৎকার!

আরতির সুন্দর মুখশ্রীতে কে যেন আবীরের পোঁচড়া টানিয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি একহাতা গরম মাংসের ঝোল প্রদোষের হাতের উপর ঢালিয়া দিল। তারপর মাংসের পাত্রটা দুম করিয়া নামাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া পলাইল।

পাশের ঘর হইতে অনিতা সব গোছাইয়া দিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি আসিয়া আরতিকে রেহাই দিল।

এদিকে প্রদোষনাথের রুটিনের ক্রমেই গোলমাল হইতে লাগিল। সকাল আটটা বাজিলে তাহাকে ব্রজনাথবাবুর বাটীর চায়ের টেবিলে দেখা যাইতে লাগিল। ক্রমে, সকাল বিকাল দুইবেলা।

চায়ের আসরে একদিন যতীন্দ্রনাথ বলিল, প্রদোষ আজকাল দু' পেয়ালার জায়গায় তিন পেয়ালায় উঠিয়াছে। লিভারের পক্ষে ওটা ভাল নয়।

প্রদোষ বলিল—লিভার বেচারার দোষ কি বল? বয়েসও ত কম হোলো না।

যতীন্দ্রনাথ নেচার ষ্টাডি বিদ্যায় বড় মজবুত। ইস্কুলে বরাবর ভাল নম্বর রাখিয়াছে।

গতিক দেখিয়া সে প্রদোষের পিসিকে এক পত্র লিখিল।

পিসির উত্তর আসিল, বাবা যতীন—আশীর্ব্বাদ করি তুমি জোড়া ব্যাটার মুখ দেখ। তোমার কল্যাণে 'পদুর' বাপ-পিতোমোর ভিটেয় যদি সন্ধ্যে-পিদ্দিম পড়বার একটা উপায় হয়।

পত্র পড়িয়া যতীন মনে মনে বলিল, যেরূপ উৎসাহ দেখিতেছি—তাহাতে মাটীর পিদ্দিম দূরের কথা—প্রদোষ ভায়া পৈত্রিক ভিটায় এখন 'ডায়নামো' বসাইলেও আশ্চর্য্য হইব না।

তারপর? তারপর আর কি? অনিতা যাহা বলিয়াছিল তাহাই করিল, নিজ হাতে প্রদোষনাথের দণ্ডের ব্যবস্থা করিল। প্রদোষনাথ সে দণ্ডাজ্ঞা মাথা পাতিয়া লইল।

গোমোর ন্যাশন্যাল কৃষি ফার্ম্মের সাইন বোর্ডের স্থলে এখন সুদৃশ্য মার্ব্বেল পাথরে লেখা হইয়াছে—"প্রদোষ-আরতি"।

ঢেঁড়সএর আবাদ উঠাইয়া দিয়া প্রদোষনাথ এখন গোলাপের গুল-কলম ও জোড়-কলম লইয়া মাতিয়াছে।



বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কাঁচা সোণার রঙের চা ঝকঝকে কাঁচের পেয়ালায় পরিপূর্ণ হ'য়ে টলটল ক'রচে, বিজন পেয়ালাটা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে চায়ের পেয়ালার গায়ে আঁকা সূর্য্যাস্তের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইল। চুমুক দিয়ে নিঃশেষ ক'রতে যেন মায়া হ'চ্ছে। সাধ যাচ্ছে—মিনিটের পর মিনিট এর দিকে চেয়ে থাকতে। কিন্তু অবশেষে সৌন্দর্য্যের পিপাসা কণ্ঠের পিপাসার কাছে হার মানল। বিজন পেয়ালাটা মুখের কাছে তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে রসাস্বাদ ক'রে ক'রে চা খেতে লাগল। আর মনে মনে ধন্যবাদ দিল তাকে, যে তারই জন্যে খুব যত্ন ক'রে এমন চমৎকার চা তৈরী ক'রেছে।

এমনি সময় উনিশ কুড়ি বছরের একটি অতি সুশ্রী মেয়ে সলজ্জ হাস্যে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। তার পরণে একখানি আটপৌরে খদ্দরের শাড়ী এবং গায়ে হাতকাটা ডিসেন্ট ব্লাউজ। হাতে চারগাছা ক'রে সরু সোণার চুড়ি ছাড়া আর কোন অলঙ্কার চোখে পড়ে না, তবে খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রলে চোখে পড়ে—তার গলায় সোণার হারের একটুখানি চিক চিক ক'রছে। কালো নরম চুলগুলির অগোছালো খোঁপা ঘাড়ের উপর খুব আলতোভাবে ছুঁয়ে র'য়েছে; সবিতার স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠের আহ্বানে মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। বিজন চায়ের পেয়ালা হাতে ও মুখো হ'য়ে ব'সেছিল ব'লে তারা পরস্পরের মুখ দেখতে পেলে না—কিন্তু বিজন এই উপস্থিতির প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত অনুভব ক'রে প্রথমে কেমন যেন সঙ্কুচিত হ'য়ে উঠল।

এইবার সবিতার মুখে হাসি দেখা দিল। বিজনের দিকে চেয়ে সকৌতুকে হেসে বললে—'হাঁরে বিজন, একে চিনিস?'

বিজন ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে একবার মেয়েটির মাথা থেকে পা অবধি দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। সে দেখা নিমিষের জন্য। তথাপি তার মনে হোল, এইমাত্র যাকে সে দেখলে তার রূপ আছে, সে সুশ্রী, শুধু এই কথা বললে যেন তার দেহ-সৌন্দর্য্যের তিলার্দ্ধ পরিচয়ও দেওয়া হয় না। সে দেহ সুন্দর নয় সে দেহ আশ্চর্য্য। চিরকাল সে নারীকে অবজ্ঞায় পাশ কাটিয়ে গিয়েছে—জীবনে তাদের কোন প্রয়োজন স্বীকার করেনি; কিন্তু আজ এই মুহূর্ত্তে তার বিস্ময় মুগ্ধ মন ব'লে উঠল—এমন মেয়ের পরম প্রয়োজন হয়তো পুরুষের জীবনে থাকতে পারে—যার দ্বারা সে ফলবান হয়, সমৃদ্ধ হয়। আর মেয়েটির দুটি চোখ। টুর্গেনিভের নায়কের মত তার মনে হোল—Oh what glorious eyes she has!

'চিনি' ব'লে বিজন মেয়েটির দিকে চেয়ে হেসে বললে—'এতক্ষণ দিদির কাছে আপনার অসংখ্য গুণের কথাই শুনছিলাম, কিন্তু একটি গুণের পরিচয় এরই মধ্যে পেয়েচি। আপনি চমৎকার চা তৈরী ক'রতে পারেন।'

মেয়েটির সুশ্রী মুখখানি সরমে রাঙা হ'য়ে উঠল। সবিতার মুখের দিকে চেয়ে অভিযোগ ক'রে ব'ললে—'কাকীমা, তুমি তো বেশ। আমার নামে বুঝি যা তা বলা হোয়েচে? লোককে অপ্রস্তুত ক'রতে তুমি একখানি।' বিজনের দিকে চেয়ে বললে—'কাকীমার কথা আপনি শুনবেন না - কিন্তু! আমাকে খুব স্নেহ করেন ব'লেই আমার সম্বন্ধে এই সব বলেচেন। আসলে তা সত্য নয়।'

সবিতা হেসে বললে—'ইস্ আবার বিনয় হোচ্চে। তুই তো এখন পালাচ্চিস নে— দেখবি আমার সব কথা সত্যি কি না।'

বিজন হেসে বললে—'কিন্তু একটি অভিযোগ আপনার কাছে আমার করবার আছে। ভরসা দেন তো করি।'

মাধবী হেসে বললে—'বলুন আপনার কি অভিযোগ।'

'দিদি তখন বলছিলো' বিজন হেসে বললে—'আপনারা ছুটি দিচ্চেন না ব'লেই দিদি শিলঙে আমার কাছে যেতে পারচে না। এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়। দিদিকে দুদিন ছুটিও দেবেন না?'

'দেব না তো বলিনি। আপনার দিদিকে ছুটির জন্যে দরখাস্ত ক'রতে ব'লবেন!'

'দরখাস্ত করলেই ছুটি দেবেন তো?'

'তা এখন কী ক'রে বলবো? দরখাস্ত হাতে পেলে সে সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাবে' মাধবী বললে। 'তবে মনে

হয় আপনার দিদির দরখাস্ত মঞ্জুর হবে, কারণ এতদিন দিদির কাজ খুব সন্তোষজনক হোয়েচে।'

বিজন হো হো ক'রে হেসে উঠল। মেয়েটির এই চমৎকার সপ্রতিভ কথাবার্ত্তা, এই কুণ্ঠাহীন ব্যবহার—সমস্ত মিলিয়ে মনটা কী এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে কাণায় কাণায় ভরে উঠল; কোন মেয়ের সঙ্গে কথা ব'লে যে আনন্দ পাওয়া যায় তা আজ এই প্রথম জানল।

সবিতা খুসি হোয়ে বললে—'রাণীর সঙ্গে তুই কথায় পেরে উঠবিনে।'

'শুধু কথায় কেন' বিজন হেসে বললে। 'অনেক বিষয় ওঁর শ্রেষ্ঠত্ব সানন্দে স্বীকার করচি।'

মাধবীও তৎক্ষণাৎ বললে—আমিও কাকীমা সবিনয়ে এ কথার প্রতিবাদ করচি।'

সুটকেস থেকে যে বইখানি বার ক'রে বিজন বিছানার উপর রেখেছিল মাধবী সেই বইখানি দেখতে পেলে। কৌতূহলী হ'য়ে বললে -'বইখানা একবার দেখতে পারি?'

'অনায়াসে' বিজন তার হাতে বইখানি তুলে দিল।

মাধবী মুহূর্ত্তে তার কয়েকখানি পাতা উল্টিয়ে দেখে বিজনকে মৃদুকণ্ঠে বললে—'আপনি বুঝি জোরোম-কে-জোরোম-এর ভক্ত?'

প্রশ্নটা অকস্মাৎ বিজনকে আঘাত করল। মাধবীর সঙ্গে আলাপ হবার পর তার সুশ্রী দেহ, তার কুণ্ঠাহীন ব্যবহার এবং নিঃসঙ্কোচে আলাপের শক্তি তাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভুলিয়ে রেখেছিল—সে নারীবিদ্বেষী। কিন্তু এই মুহূর্ত্তে মাধবী যখন তার সঙ্গে সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হোল তখন অকস্মাৎ তার মনে হোল—তাই তো আমি যে নিজের অজ্ঞাতেই এই মেয়েটিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে ফেলেছি তার ব্যবহারে প্রীত হ'য়ে। স্বীকার করি মেয়েটি সুশ্রী, তার কথাবার্ত্তা ব্যবহার মধুর, গল্প ক'রে তার সঙ্গে সুখ আছে; এ ছাড়া আর তার মধ্যে কী আছে—যাতে আমি শ্রদ্ধা জানাতে পারি? আমার মধ্যে এ দুর্ব্বলতা এলো কোথা থেকে? আমার মুখের শ্রদ্ধাকে সত্য মনে ক'রে মেয়েটি আমার সঙ্গে সাহিত্য পর্য্যন্ত আলোচনা ক'রতে প্রবৃত্ত হোল। বিজন আর নিজের এই দুর্ব্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না, নিজেকে জোর ক'রে এই ব'লে উত্তেজিত ক'রতে লাগল, এই যাই হোক মেয়ে তো—কাজেই এর মধ্যে এমন কিছু পদার্থ নেই যাতে সে শ্রদ্ধাবান হবে! আর পড়াশুনা? তাও তার কতটুকু আছে? কখানা বই প'ড়েছে? প'ড়লেও কতটুকু বুঝেছে যে তার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা ক'রবে? সাহিত্য নিয়ে সত্যকার আলোচনা ক'রতে গেলে যে বিচার বুদ্ধি, পড়াশুনা ও সূক্ষ্ম রসবোধ থাকা প্রয়োজন তা কি কোন নারীর মধ্যে থাকা সম্ভব? এ তো সামান্য। আই-এ পাশ ক'রে দুচারখানা নামকরা বইয়ের প্রথম ও শেষের কয়েকখানা পাতা মানে না বুঝে প'ড়ে ভেবেছে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার অধিকার তার আছে। কী নির্ব্বুদ্ধিতা! বিজন মনে মনে তাচ্ছিল্যের হাসি হাসবার চেষ্টা ক'রল। সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবার মত জ্ঞান থাকা ত দূরের কথা- ওকে যদি জিগ্‌গেস করা হয়, হাওড়া ষ্টেশনে তুফান মেল পৌঁছতে কিছু বিলম্ব হ'তে পারে—এর ইংরেজি কি? তা কি ঠিক ক'রে ও ব'লতে পারে? হয়তো এইটুকুর মধ্যে কতকগুলো গ্রামারের ভুল করে বসবে। এই রকম করে মনে মনে তার বিদ্যা বুদ্ধিকে তুচ্ছ হীন ক'রে, নিজের দুর্ব্বলতা কাটিয়ে, মেয়েটির বিরুদ্ধে নিজেকে জোর ক'রে সে উত্তেজিত ক'রতে লাগল এবং মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে এমন কথা ব'লবে স্থির ক'রল, যাতে আর কথাটি কইতে না পারে। বললে—জোরোম-কে-জোরোম এর ভক্ত? আমি? মোটেই না। ওরকম বাজে রসিকতা আমার অসহ্য মনে হয়।'

মাধবী তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে রইল।

'চুপ ক'রে রইলেন কেন?'

'কি বলবো বলুন' মাধবী মৃদু হেসে বললে: 'ওর অসহ্য রসিকতাকে ভাল ব'লে তো আপনাকে সহ্য করাতে পারবো না।'

'আপনার কি সত্য ওর লেখা ভাল লাগে?'

'হাঁ' মাধবী মৃদুকণ্ঠে বললে: 'শুনে বোধ হয় আমার রসবোধের ওপর অশ্রদ্ধা হোল?'

'না, তা হবে কেন' বিজন হেসে বললে: সত্য এ আমি ধারণাই ক'রতে পারি না যে কোন গভীর চিত্ত রসিকের জোরোম-কে-জোরোম এর হিউমার সহ্য হয়।'

মাধবী হেসে বললে: 'আমি কিন্তু এমন অনেক ভাল লোককে জানি, যাঁরা জোরোম-কে-জোরোম খুব পছন্দ করেন।'

বিজন ভাবলে পরীক্ষা করবার এই ঠিক সময়, বললে: 'কেন করেন বলতে পারেন?'

'আমার মনে হয় অনাবিল হাস্য রসের খোরাক ওর লেখায় খুব বেশি পরিমাণে মেলে ব'লেই অনেকের কাছে ও এতো প্রিয়'—মাধবী বিনা দ্বিধায় ব'ললে। 'বড় বড় লেখকের চিন্তার সঙ্গে পরিচয় ক'রতে ক'রতে মন যখন ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, তখন সেই ক্লান্তি অবসাদকে দূর ক'রতে মানুষ চায়। জেরোম-কে-জেরোম-এর লেখা তখন মনকে সাময়িক নির্ম্মল রসের আনন্দে ডুবিয়ে রাখে, এই জন্যই তাকে ভাল লাগে, এই তো আমার মনে হয়।

বিজন এইবার একটুখানি বিস্মিত হোল। তার সম্বন্ধে যে ধারণা মনে দৃঢ় ক'রে তোলবার প্রয়াস করছিলো তা করা হয়তো উচিত নয়। যতটা তাচ্ছিল্য তার বিদ্যা বুদ্ধিকে মনে মনে ক'রেছিলো, অতটা না ক'রলেই হয়ত ভালো হোত। যদিও মাধবীর ঐ কথার মধ্যে জ্ঞানের নির্ম্মল দীপ্তি কিছু ছিল না, তার প্রকর্ষ-চিত্তের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয়ও সে পায়নি—তথাপি তার মনে হোল, মেয়েটির বোধশক্তি আছে। যা নিজে ভাল বুঝেছে, জেনেছে—পরের প্রতিকূল সমালোচনায় নিজের সেই বোঝার বিশ্বাসকে হারাতে চায় না। এটা কম কথা নয়। ভাল লেখকের বই তো সকলেই পড়ে, কিন্তু দুটি একটি কথার মধ্যে সেই লেখকের লেখার পরিচয় এমন ক'রে দিতে পারে কি কেউ—যদি তার রস গ্রহণের ক্ষমতাও বোধশক্তি না থাকে। বিজনের মন ভারি খুশি হোয়ে উঠল। যখন তার স্বভাবসুলভ বিদ্বেষ জোর ক'রে মাধবীর বিরুদ্ধে মনকে উত্তেজিত ক'রতে চেষ্টা ক'রছিল, তখন বুকের যেন কোন নিভৃত স্থান মেয়েটির জন্য বেদনায় আতুর হ'য়ে উঠছিল। যতই নারী বিদ্বেষ তার থাক না কেন, তবু আজ তার মন মেয়েটিকে সহজভাবে গ্রহণ করবার জন্যে অপ্রত্যাশিত-ভাবে লালায়িত হোয়ে উঠল। বিজন মনে মনে আরাম বোধ করলে এই ভেবে—যে আর তার বিরুদ্ধে মনকে অশ্রদ্ধান্বিত ক'রতে হোল না। করলে আজ সে হয়তো সত্যই দুঃখবোধ করতো।

মাধবীর কথার উত্তরে বিজন বললে—'এক সময় ছিল, যখন ওকে আমার ভাল লাগত। এখন আর তেমন লাগে না।'

'তবে কেন সঙ্গে নিয়েছেন?'

'তাড়াতাড়ির মাথায় গোলমাল হোয়ে গেছে'—বিজন এখন আর সত্য কথা স্বীকার করতে পারলে না; বললে—'যাক্ ওকথা। আপনার বুঝি পড়াশুনা করার অভ্যাস আছে?'

'সামান্য—সে না থাকারই মধ্যে'—মাধবী সলজ্জে বললে। 'সময় তো কাটাতে হবে।'

সবিতা এই সময় তাদের কাছে এলো। হেসে বললে—'ইস্ সামান্য বৈ কি। রাণী ঠিক তোর মতন। বই পড়তে পেলে আর কিছু চায় না। কত টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে বই কিনে যে বাজেখরচ ক'রেচে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগে না। মেয়েমানুষ এত বই পড়ার সখ কেন বাপু। কি বলিস তুই?'

বিজন গম্ভীর হোয়ে বললে—'ঠিক কথা। খুন্তি আর বেলুন যার হাতে শোভা পায়, বই হাতে করাটা তার পক্ষে বেয়াদপি। নেহাৎ কাকীমা ব'লে রক্ষা পেলেন, নইলে আপনাকে ক্রিমিনাল চার্জ্জে পড়তে হোত।'

মাধবী হাসতে হাসতে বললে: 'তা ঠিক। কাকীমা যদি হার হিটলারের মত বাঙ্গালা দেশে ক্ষমতা পেতেন, তাহ'লে বেথুন, ডায়োসেসন, আর সব মেয়েদের স্কুলগুলা রাতারাতি নিলামে উঠত।' সবিতার দিকে চেয়ে বললে: 'বাঙ্গালা দেশ থেকে স্ত্রী-শিক্ষা একেবারে তুলে দিতে—না কাকীমা?'

'দিতুমই তো' সবিতা বললে: 'তোর মত গণ্ডা গণ্ডা পড়ুয়া মেয়ে নিয়ে সংসারের কী উপকার হবে রে? বই প'ড়ে প'ড়ে এমন হ'য়েচিস, যে গায়ে এক ফোঁটা শক্তি নেই। কোন কাজ একা করতে পারবি নে, আমাদের মত কোন কালে খাটতে পারবি? নেহাৎ কপাল ভাল, তাই অজানা অচেনা—'

ব'লেই মাধবীর তীব্র কটাক্ষে সবিতা অকস্মাৎ থেমে গেল। মাধবী আরক্ত মুখখানি নত ক'রলে। বিজন একবার মাধবীর দিকে, একবার সবিতার দিকে বিস্মিত হ'য়ে চাইলে। কিন্তু তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে এই দুটি নারীর মধ্যে যে নাটকের অভিনয় হোল, তা বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করা তার পক্ষে সম্ভব হ'ল না।

তারপর একথা সেকথার পর সবিতা বললে: 'আর

তো আমি ব'সতে পারিনে, নীচে অনেক কাজ প'ড়ে র'য়েচে। তোরা দুজনে তাহ'লে গল্পগাছা কর আমি যাই'—ব'লে সবিতা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মাধবী আর বিজন অত্যন্ত লজ্জিত হ'য়ে সবিতার অনুপস্থিতির পর কী ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হবে এই সমস্যায় স্তব্ধ হোয়েছিল, ঠিক সেই সময় সবিতা ফিরে দাঁড়িয়ে বললে: 'ভাল কথা, হাঁ রাণী—ক্ষিতি কোথায়? আজ সকাল থেকে তো তার চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি। গেল কোথায় সে?'

'কোথায় আবার যাবে? শৈবালদার বাড়ী কেরম খেলচে' মাধবী বললে—'তার তো ঐ এক খেলা। রাত নেই, দিন নেই, কেবল খট্ খট্। কী ক'রে যে ভাল লাগে।'

মাধবীর কথার উত্তরে কি একটা ব'লতে গিয়ে সবিতা থেমে গেল। জুতার ভারি শব্দ করতে করতে কে যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। সবাই চকিত ও কৌতূহলি হোয়ে দরজার দিকে তাকাল। সবিতা এগিয়ে গিয়ে দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে আহ্বান করলে—'এই যে শৈবাল, এসো—এসো।'

'হাঁ কাকীমা—রাণু কোথায়? তার যে সকাল বেলা আমার কাছে যাবার কথা ছিল যায়নি কেন, জানেন?' বলতে বলতে শৈবাল ঘরের সামনে এসে কুণ্ঠিতা মাধবীর দিকে চেয়ে বললে—'বেশ! আমি তোমার জন্য বাড়ীতে ঠায় ব'সে আছি, আর তুমি দিব্বি নিশ্চিন্দি হ'য়ে এখানে গল্প ক'রচো। তোমার না সকাল বেলা আমার বাড়ী যাবার কথা ছিল, রাণু? যাওনি যে বড়?'

মাধবীর চোখমুখ পলকে রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠল। তার হ'য়ে জবাব দিল সবিতা। বললে—'আমার ভাই এসেচে কিনা, তাই তাকে ফেলে আর যেতে পারেনি। এই যে আমার ভাই বিজন। যার কথা তোমাদের প্রায়ই গল্প করতুম।'

'ও' বলে শৈবাল দুটি হাত যুক্ত ক'রে কপালে ঠেকিয়ে বললে—'বড় সুখী হোলুম পরিচয় ক'রে।'

'আমিও' বলে বিজন হেসে নমস্কার করলে।

'বসুন।'

'হাঁ, বসি।'

সবিতার সবচেয়ে দুর্ব্বলতা ছিল বিজনের সম্বন্ধে। ইতিপূর্ব্বে বহুবার বিজনের পরিচয় সে তাদের দিয়েছে এবং বলতে গেলে জিনিষটা সকলের কাছেই পুরাণো ও একঘেয়ে হ'য়ে উঠেছিল, দুর্ব্বলতার আধিক্যে সবিতা একথা বুঝত না। বিজন ও শৈবালের মুখোমুখি পরিচয় করিয়ে দিয়ে সবিতা আবার টাটকা ক'রে বিজনের পরিচয় দিতে গেল শৈবালকে। বলা তো যায় না—যদি ভুলে গিয়ে থাকে। সবিতা বলতে লাগল—বিজন শিলঙে খুব মোটা মাইনের চাকরী করে, একদিন সে ঐ আপিসের সর্ব্বেসর্ব্বা হবে, তখন তার মাইনের টাকার পরিমাণটাও হবে খুব লোভনীয়। তার ইউনিভার্সিটি কেরিয়র আশ্চর্য্য—অনেক বই পড়েছে। গান বাজনাতেও তার চমৎকার দখল; আবার এদিকে খামখেয়ালিতে ও তার জোড়া নেই। একই মানুষের মধ্যে এত রকম দুর্লভ গুণের সমাবেশ—ইত্যাদি ইত্যাদি।

উচ্ছ্বসিত প্রশংসার স্রোত আর হয়তো অনেকখানি এগোতে পারত কিন্তু বিজন আর স্থির থাকতে পারলে না। কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বললে—'দিদি, দোহাই আর এভাবে আমাকে শাস্তি দিয়ো না। তোমার চেয়ে এঁর বিদ্যে বুদ্ধি কোন অংশেই কম নয়। তোমার সার্টিফিকেট ছাড়াও ইনি এ রত্নটিকে যাচাই ক'রে নিতে পারবেন' শৈবালের দিকে চেয়ে হেসে বললে। 'আশা করি নারী-চরিত্রে আপনার কিছু অন্তর্দৃষ্টি আছে। থাকলে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—আমার এই দিদিটি অত্যুক্তি ক'রতে অদ্বিতীয়।'

শৈবাল হাসতে লাগল। কোন কথা বললে না।

মাধবী হেসে বিজনের মুখের উপর দুটি চোখ রেখে মিষ্টি গলায় বললে—'বিনয় করতে আপনিও কিন্তু অদ্বিতীয়।'

'কি রকম?'

'তা নয়তো কি? কাকীমা এখন আপনার সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে তো আপনার খুব সাধারণ পরিচয়গুলোই দেওয়া হ'ল। একে ঘটা ক'রে অত্যুক্তি বলে আর বিনয় করচেন কেন?'

'আমার আবার অসাধারণ পরিচয়ও আছে নাকি?'

'আছে বৈ কি' মাধবী মুখ টিপে হেসে বললে—'আর সে পরিচয় কাকীমা আমাকে আগেই দিয়েছেন।'

'দিদি বেশ' বলে মাধবীর দিকে চেয়ে বললে— আপনি দিদির কথা বিশ্বাস করেন ?'

'করি'

'তা'হ'লে আপনার কাকীমা মোটেই অত্যুক্তি করেন না, এই আপনার বক্তব্য' বিজন বললে। 'কিন্তু একটু আগে আপনার কাকীমাটি যখন আপনার প্রশংসাপূর্ণ পরিচয় দিলেন, তখন জোর করে সেটাকে অত্যুক্তি ব'লে অমন সরমে রাঙা হ'য়ে উঠলেন কেন ?'

মাধবী আরক্তমুখে কি ব'লতে গেল, বিজন বাধা দিয়ে বললে—'দয়া ক'রে বিনীত কথার বাণে জর্জ্জরিত ক'রবেন না। কিন্তু দিদি একটু ভুল করলে। আপিসে মোটা মাইনের চাকরী করি, এই গন্ধময় কথাটার বদলে বাপের পয়সায় দেশভ্রমণ করে বেড়াই এই কথাটা বসিয়ে দিলেই তো তোমার কৃপায় একেবারে দিলীপকুমার রায়ের উপন্যাসের নায়ক হ'য়ে উঠতে পারতাম।'

মাধবী খিল খিল ক'রে হেসে উঠল। শৈবালও হাসতে লাগল। শৈবাল ও মাধবী দুজনেই যখন হাসছে তখন বিজন নিশ্চয় একটা হাসির কথা ব'লেছে—সবিতা এমন ক'রে হাসতে লাগল যেন ঐ কথাটার রস সেই একা বুঝেছে। এই হাসির ফাঁকে শৈবাল নিমেষের মধ্যে আড়-চোখে দেখে নিলে মাধবী আনন্দ দীপ্ত মুখে একান্ত কৌতূহলী দৃষ্টিতে বিজনের মুখের দিকে চেয়ে তার প্রত্যেকটি কথার রস অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উপভোগ করছে। আর তার দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হোয়ে রয়েছে—বিজনের কথা শোনবার জন্য। আর একটা জিনিষ অতি সহজেই তার চোখে প'ড়লো, তা হ'চ্ছে বিজনের সঙ্গে মাধবীর আচরণ। সে আচরণে কোন বাধা নেই, বিঘ্ন নেই, লজ্জা নেই, যেন কত দিনের পরিচয় এমনি সহজ নিঃসঙ্কোচ, অনায়াসে তার কথা-বার্ত্তা ব্যবহার। এ সেই মাধবী, শৈবালের মুহূর্ত্তের মধ্যে স্মরণ হ'ল- লজ্জায় যে কারও সঙ্গে মুখ তুলে কথা পর্য্যন্ত ব'লতে পারত না। আজ হঠাৎ তার এমনতর পরিবর্ত্তন হ'ল কী ক'রে। শৈবাল এটাকে কিছুতেই সহজভাবে গ্রহণ ক'রতে পারলে না। এদিকে বিজনের রসিকতায় ও মাধবীর হাসিতে ঘরের আবহাওয়া চঞ্চলিত, মর্ম্মরিত হ'য়ে উঠল।

হাসি পরিহাস থামলে পর বিজন শৈবালকে বিনীতভাবে বললে : 'কিন্তু আপনার পরিচয় তো পেলাম না'। তারপর মাধবীকে বললে : 'এঁর পরিচয় আমাকে দিন !'

মাধবী রাঙা হ'য়ে দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে ব'লে উঠল—'আমি—আমি কি ব'লবো। ইনি—ইনি, বাঃ আপনি কাকীমাকে—বলো না তুমি কাকীমা।'

তার এই অসংলগ্ন কথায় বিজন অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল। শৈবালের পরিচয় দিতে মাধবীর এমনতর লাজরক্ত কুণ্ঠা প্রকাশ পেলে কেন ? বিস্ময়ের ভাবটা মুহূর্ত্তে কাটিয়ে বললে—'কাকীমা, কেন আপনি বলুন না।

ওঁর পরিচয় দিতে এত কুণ্ঠিত হ'চ্চেন কেন ?'

'বাঃ কুণ্ঠিত হব কেন' মাধবী নিবিড় লজ্জা গোপন করবার প্রয়াস ক'রে জোর ক'রে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললে। 'ও সব কাকীমাই ভাল পারে। আমার তেমন—'

বিজন আর তাকে কিছু না ব'লে সবিতার দিকে তাকালে। ঐ দীর্ঘায়তন সুশ্রী যুবকটির পরিচয় জানবার জন্য সে অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠেছিল। সবিতা পরিচয় দেবার উপক্রম ক'রতেই শৈবাল অকস্মাৎ বাধা দিয়ে বললে—'আমার পরিচয় জানবার জন্য ব্যাকুল হবার কোন কারণ নেই। সে এক সময় শুনলেই হবে।'

বিজন সে কথা কাণেই দিল না। উৎসুক হ'য়ে শৈবালের পরিচয় দেবার জন্য সবিতাকে জোরে তাগিদ দিল। শৈবাল বাধা দিয়ে বললে—'মিনতি করচি, আমাকে এখানে আর অপ্রস্তুতে ফেলবেন না। দেবার মত পরিচয় আমার কিছুই নেই। যেটুকু আছে—তা আপনার পরিচয়ের পাশে নিতান্ত নিষ্প্রভ মনে হবে।'

অজ্ঞাতে শৈবালের কণ্ঠস্বরে যে অভিমান ধ্বনিত হ'য়ে উঠল তার নিগূঢ় মর্ম্ম একজন ছাড়া কেউ হৃদয়ঙ্গম ক'রতে পারলে না। বিজন লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইলে। বললে—'ছি, ছি, কী যে আপনি বলেন।'

শৈবাল মাধবীর দিকে নিমেষে কটাক্ষপাত ক'রে বিজনকে বললে—'সত্যি কথাই ব'লচি, এর এক বিন্দুও বাড়ান নয়। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয়, তবে ওকেই জিগ্‌গেস ক'রবেন' এই ব'লে শৈবাল আঙ্গুল দিয়ে নতমুখী মাধবীকে দেখাল।

সবিতা এবং বিজন বার বার এই কথার প্রতিবাদ ক'রতে লাগল। কিন্তু শৈবাল আর এ কথার জের

টানতে দিল না। অকস্মাৎ নিজেকে এই সমস্ত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য সে একবার নড়েচড়ে ব'সলে এবং যে নির্ম্মল আনন্দ ও হাসি নিয়ে সে এই ঘরে ঢুকেছিল সেই নিঃশেষিত আনন্দ ও শুভ্র হাসি নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ক'রে শৈবাল মাধবীকে উদ্দেশ ক'রে বললে—'কিন্তু আর তো দেরি ক'রলে চ'লবে না, রাণু! এদিকে দশটা বেজে গেছে। এগারটার মধ্যে আমাদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।'

সবিতা বিস্মিত হ'য়ে বললে—'তোমরা আজ কোথাও যাবে নাকি?'

শৈবাল ততোধিক বিস্মিত হ'য়ে বললে—'বাঃ, রাণু আপনাকে কোন কথা বলেনি?'

'কই না।'

শৈবাল একবার মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে সবিতাকে বললে—'সে কি। কাল রাত্তিরে জ্যাঠামশায়ের সামনে পর্য্যন্ত কথা হ'ল—আজ রাণুকে নিয়ে কলকাতায় আমার মাসীর বাড়ী হ'য়ে থিয়েটার দেখতে যাব। অন্যদিন বেশি রাত্তির হবে ব'লে আজ রবিবার ম্যাটিনীতে যাওয়া ঠিক করলাম। এত কথা হ'ল রাণু একটাও বলেনি। স্রেফ্ ভুলে ব'সে আছে। আপনার এই ভাসুর-ঝিটির এবার চিকিৎসার দরকার হ'য়ে পড়েছে।'

সবিতা হেসে বললে—'তাই করানো উচিত, রাণীর যা ভুলো মন হ'য়েচে। এমন দরকারী কথাটাই আমাকে ব'লতে ভুলে গেলি?'

'উপায় কি' শৈবাল হেসে বললে—'বছর আট দশ আগে হ'লে না হয়—কানে হাত দিয়ে দেয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে দিতাম, কিন্তু এখন তো সে শাস্তি দেবার উপায় নেই। রাণু, ছেলেবেলাকার সে সব শাস্তির কথা তোমার মনে আছে?'

ব'লে শৈবাল হাসতে লাগল।

সবিতা শৈবালের মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'আজ কি তোমাদের না গেলেই নয়?'

'না কাকীমা, আজ যেতেই হবে' শৈবাল বললে: 'অন্যদিন হ'লে কথা ছিল, কিন্তু আজ না গেলেই চলবে না।'

'কেন?'

শৈবাল বললে: 'মাসীমার বাড়ীর মেয়েরা আজ আমাদের নেমন্তন্ন করেচে। সেখান থেকে তাদের থিয়েটার নিয়ে যেতে হবে। তারা সবাই আমাদের আশায় ব'সে থাকবে। এই অবস্থায় আমরা যদি না যাই, তাহ'লে তারা কি ভাববে বলুন।'

সবিতা আস্তে আস্তে বললে—'এতদূর যখন হ'য়ে আছে তখন যাওয়াই উচিত। খাওয়া-দাওয়া এবেলা তো এখানে ক'রে যাবে?'

'হাঁ খেয়েই যাবো' ব'লে শৈবাল মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—'তুমি তাহ'লে ঠিক হ'য়ে থেকো, আমি বারটার সময় গাড়ী নিয়ে আসবো। না, তাও ভুলে যাবে? কাকীমা আপনি রাণুকে মনে করিয়ে দেবেন না।'

মাধবীর কাণ দুটো তখন ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে। সে কোনরকমে 'তোমাকে একটা কথা ব'লবো এস' ব'লে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং একটু পরে শৈবালকে অনুসরণ করিয়ে দোতলার একটা ঘরে ঢুকলে।

শৈবাল বিস্মিত কণ্ঠে বললে—'ব্যাপার কি রাণু?'

মাধবী শৈবালের মুখের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললে—'আজ আমার যাওয়া হবে না, শৈবালদা।'

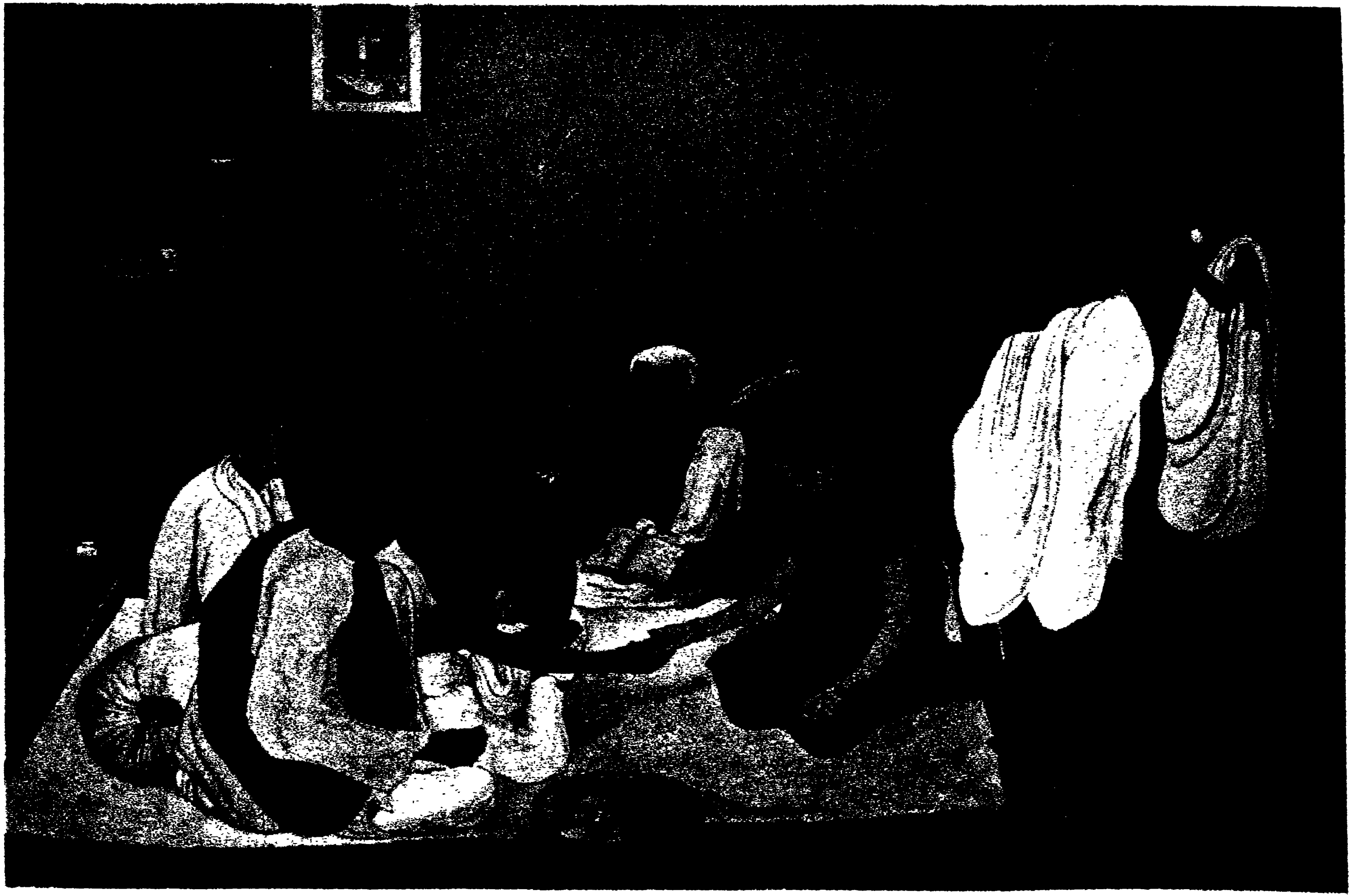
'যাওয়া হবে না—কেন?'

'কি ক'রে হবে বলো? বাড়ীতে অতিথি এসেচে যে।'

'বাড়ীতে অতিথি এসেচে, তাতে তোমার যাওয়া হবে না কেন?' শৈবালের কণ্ঠে এইবার ঈষৎ বিরক্তির আভাষ ফুটে উঠল। 'কাকীমার ভাই, তিনি বুঝবেন।'

'বাঃ, তা কি হয়। বাড়ীতে এমন একজন আত্মীয়, তাকে ফেলে গেলে তিনি কি ভাববেন' মাধবী ঈষৎ দ্বিধায় বললে—'আর এটা—এটা খুব ভদ্রতাও হবে না।'

শৈবালের সমস্ত মুখখানা অকস্মাৎ অপমানে রাঙা হ'য়ে উঠল। আজ মাধবীর প্রতি মন তার নানা কারণে ঠিক প্রসন্ন ছিল না। একমুহূর্ত্ত মাধবীর আনত মুখের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললে—'তাহ'লে এবার থেকে দেখচি তোমার কাছেই ভদ্রতা শিখতে হবে। কিন্তু এই মান্য আত্মীয়টির সেবার ভার যদি তোমারই নেবার মতলব ছিল, তবে মাসীমার বাড়ী যেতে—থিয়েটারে যেতে রাজি হ'য়েছিলে কেন?'



শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] [illegible] Bharatvarsha Halftone & Printing Works

তার কথার পেছনে যে তীব্র শ্লেষ ছিল তা নিঃশব্দে সহ্য ক'রে মাধবী শান্তকণ্ঠে জবাব দিল—'বিজনবাবু যে আজ আসবেন তা জানতাম না—তাই।'

'জানতে না?'

'না।'

শৈবাল আর স্থির থাকতে না পেরে জ্বলে উঠল। তীব্রকণ্ঠে বললে—'জানতে না? তুমি নিশ্চয় জানতে। আমাকে পাঁচজনের কাছে অপদস্থ করবার জন্যই তুমি এ ছল করলে।'

'ছল করলাম?'

'হাঁ, তাই। তুমি জান না—আজ এর জন্য আমাকে কতখানি অপ্রস্তুতে পড়তে হবে?'

'অপ্রস্তুত আবার কি' মাধবী বললে—'তুমি ব'লবে তার একজন আত্মীয় অনেকদিন পরে এসেচেন। এই অবস্থায় তাঁকে ফেলে যাওয়া উচিত—একথা মাসীমার মত বুদ্ধিমতী নিশ্চয় ব'লবেন না।'

'তাহ'লে তুমি যাবে না, এই কথা তো?'

'হাঁ। এই অবস্থায় আমি কিছুতেই যেতে পারব না' মাধবী দৃঢ়কণ্ঠে বললে—'আমাকে আর তোমার কোন দরকার আছে?'

'কিছুমাত্র না' রাগে মুখ ফিরিয়ে শৈবাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার বুকের ভেতরটা তখন জ্বালা ক'রছিল। সিঁড়ি দিয়ে নামবার আগে মাধবীর উদ্দেশে তীব্রকণ্ঠে শ্লেষ ক'রে ব'লে গেল—'আজ যে ব্যবহারটা আমার সঙ্গে ক'রলে, তা অতিথি-সৎকারের ফাঁকে একবার ভেবে দেখো। এ তোমারই উপযুক্ত হ'য়েচে।'

মাধবীকে আর একটি কথা বলবার অবসর না দিয়ে শৈবাল দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলো। (ক্রমশঃ)

জীবনের লক্ষ্য

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

কার্ত্তিকের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয় আমার প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। অনিলবাবু যে মত প্রচার করিতেছেন তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পর বিরোধী কথা পাওয়া যায়। তিনি বলিতেছেন যে ভোগই জীবনের লক্ষ্য; আবার বলিতেছেন যে কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি হইতেছে নরকের দ্বার। যে ব্যক্তি ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন, তাহাকে বলিতে হইবে যে তাঁহার ভোগ চাই। অর্থাৎ তাঁহার মনে ভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিবে। ইহারই নাম "কাম"। সুতরাং "কাম"কে ত্যাগ করিলে, ভোগকে কখনও জীবনের লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু অনিলবাবু বলিতেছেন যে কামকে ত্যাগ করা উচিত এবং ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। ইহা সম্ভব নহে।

ভোগকে কেন জীবনের লক্ষ্য করা উচিত হয় না, হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা স্পষ্টভাবেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ভোগ কখনও চিরস্থায়ী হইতে পারে না। এক দিন ভোগ শেষ হইবেই। ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে তখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হইবে। অনিলবাবু এ সমস্যার কোনও মীমাংসা করেন নাই। আশা করি তিনি এরূপ অসম্ভব কল্পনা করেন না যে ইহলোকের ভোগ চিরস্থায়ী হইবে। মানব জীবনের লক্ষ্য ভোগ নহে—লক্ষ্য ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বরলাভ ব্যতীত চিরকাল আনন্দ পাওয়া যায় না, ইহা সত্য। এজন্য একথা বলা একেবারে ভুল হয় না—যে আনন্দলাভই মানবজীবনের লক্ষ্য।

গীতা ও উপনিষদে আমরা তিন প্রকার আনন্দের কথা দেখিতে পাই। (১) ইহলোকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া যে আনন্দ, (২) মৃত্যুর পর স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট লোকে বিষয় ভোগের আনন্দ, (৩) ঈশ্বরলাভের আনন্দ। প্রথম ও দ্বিতীয় আনন্দ উভয়ই ভোগের অন্তর্গত। তৃতীয় আনন্দ ভোগের আনন্দ নহে। পরলোকের সুখভোগ ইহলোকের সুখভোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ উহা তীব্রতর এবং অধিককাল স্থায়ী। গীতায় প্রথমোক্ত আনন্দকে (ইহজীবনের সুখভোগকে) রাজসিক সুখ বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে (১৮।৩৮), * দ্বিতীয় আনন্দকেও (স্বর্গ-সুখকে) নিন্দা করা হইয়াছে (৯।২০, ২১) †। অতএব গীতাতে ইহ-

* বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥১৮।৩৮

"বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সংযোগে যে সুখ তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় বোধ হয়, কিন্তু পরে বিষের ন্যায় বোধ হয়। ইহার নাম রাজসিক সুখ।"

† তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥৯।২১

"তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষীণ হইলে মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসে। যাহারা বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহারা এইভাবে স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যাতায়াত করিয়া থাকে।"

লোকের ভোগ এবং পরলোকের ভোগ উভয়েরই নিন্দা আছে। কেবলমাত্র উপরিলিখিত তৃতীয় প্রকার আনন্দের—ঈশ্বরলাভজনিত আনন্দের—প্রশংসা আছে। যথা "সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তং সুখম্ আপ্নুতে"—সাধক ব্রহ্মলাভ করিয়া অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং।
মাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥৮।১৫

"আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মাগণ দুঃখের আলয় এবং অনিত্য পুনর্জন্ম লাভ করেন না—তাঁহারা পরম সিদ্ধি লাভ করেন।"

এখানে যাহাকে "পরম সিদ্ধি" বলা হইয়াছে, তাহাই যে গীতার মতে জীবনের লক্ষ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা কোনও প্রকার ভোগ নহে—তাহা ঈশ্বর লাভ।

উপনিষদের মতও এইরূপ। ইহলোকের ভোগ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,

পরাচঃ কামান্ অনুযন্তি বালাঃ
তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। কঠোপনিষদ

"যাহারা বাহ্য বিষয় ভোগ অনুসরণ করে তাহারা মৃত্যুর বিস্তারিত পাশে পতিত হয়।"

পরলোকের ভোগ সম্বন্ধে উপনিষদ বলিয়াছেন,

"তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে"

ছান্দোগ্য উপনিষদ্

"ইহলোকে কর্মের ফলে যে সুখভোগ হয় তাহা যেমন ক্ষয়শীল, পরলোকে পুণ্যের ফলে যে সুখভোগ হয় তাহাও সেইরূপ ক্ষয়শীল।"

জীবনের লক্ষ্য কি তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রেয়ীর মুখ দিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে,

"যেন অহং ন অমৃতা স্যাং, কিম্ অহং তেন কুর্য্যাং"

"আমি যাহাতে অমৃত না হইব, তাহার দ্বারা কি করিব।"

বলা বাহুল্য বিষয় সুখ ভোগ করিয়া কেহ "অমৃত" হইতে পারে না। সুতরাং বিষয় সুখভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত নহে।

অমৃতলাভের উপায় সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

"তম্ এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

"কেবলমাত্র ঈশ্বরকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মোক্ষলাভের অপর কোনও পথ নাই।"

সুতরাং উপনিষদেও ইহলোক ও পরলোক উভয়স্থানেই ভোগকে নিন্দা করা হইয়াছে এবং ঈশ্বরলাভ করিয়া মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতিলাভকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে।

অনিলবাবু যে প্রকার ভোগকে জীবনের লক্ষ্য বলিতেছেন তাহার স্বরূপ একটু আলোচনা করা যাক্। এই ভোগ পরলোকের নয়,—কারণ তিনি বলিতেছেন পৃথিবীকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করিতে হইবে, "ইহৈব" ইত্যাদি। সুতরাং তাঁহার লক্ষ্য যে ভোগ—তাহা ইহজন্মে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ ব্যতীত আর কিছু হইতে পারে না। তিনি অবশ্য বলিয়াছেন, "নীচ ইন্দ্রিয় ভোগ নহে।" একথা আমরা মানিতে প্রস্তুত আছি। কারণ ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগ, বৈধ এবং অবৈধ উভয় প্রকার হইতে পারে। বৈধ ভোগ পাপ নহে; অবৈধ ভোগই পাপ। সুতরাং অবৈধ বিষয়ভোগকে "নীচ ইন্দ্রিয় ভোগ" বলিয়া বাদ দিয়া, বৈধ বিষয় ভোগই অনিলবাবুর লক্ষ্য বলিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের সাহায্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া পৃথিবীকে ভোগ করা একেবারে অসম্ভব।

অনিলবরণবাবু তাঁহার লক্ষ্য ভোগকে কোনও কোনও স্থানে দিব্য ভোগ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন,—বলিয়াছেন, "দেবতাদের সাহচর্য্যে তাঁহাদের ন্যায়ই জীবনকে ভোগ করিতে হইবে।" এখানে কিন্তু অনিলবরণবাবু একটু গোল করিয়া ফেলিয়াছেন। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া দেবতাদের সাহচর্য্যে তাঁহাদের ন্যায় ভোগ হয়। কিন্তু পরলোকের কথা অনিলবাবু তুলিতে চাহেন না। অনিলবাবুর ইহা উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে দেবতাদের মত ভোগ করিতে হইলে পরলোকে যাইতে হইবে। ইহলোকে তাহার সম্ভাবনা নাই।

গীতা বলেন, কর্ম কর,—কর্মের ফল চাহিও না; ত্যাগ কর, ত্যাগের ফল—ভোগ চাহিও না। অনিলবাবু বলেন, ত্যাগ কর, ত্যাগের ফল—ভোগ পাইবার জন্য। অতএব অনিলবাবু গীতার ধর্ম অনুসরণ করিতেছেন না।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "মানব প্রকৃতির মধ্যে অশুভ যাহা কিছু আছে, খুঁটিয়া খুঁটিয়া বর্জ্জন করিতে হইবে।" মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রধান অশুভ হইতেছে ভোগের আকাঙ্ক্ষা, যাহার নাম কাম। কিন্তু অনিলবাবুর মতে ভোগের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে হইবে। অনিলবাবু বলিয়াছেন, "জগতের সর্বত্র যে ঈশ্বর বিরাজ করিতেছেন তাঁহাকে সমস্ত জীবন সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে হইবে।" কিন্তু অনিলবাবু ভুলিয়া যাইতেছেন যে, এভাবে জীবন সম্পূর্ণ সমর্পণ করিলে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা যায় না। জগতে কোনও বস্তু ভোগের অনুকূল, কোনও বস্তু ভোগের প্রতিকূল। যদি আমি ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করি, তাহা হইলে ভোগের অনুকূল বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিব। কিন্তু জীবন সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরে সমর্পণ করিলে, কোনও বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না; কারণ তখন এই বুদ্ধির উদয় হয় যে ঈশ্বর সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় সকল ঘটনা সংঘটিত হয়। বস্তুতঃ ভোগের আকাঙ্ক্ষা এবং ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ পরস্পর বিরোধী।

সমস্ত গীতা ও উপনিষদ শাস্ত্র মন্থন করিয়া অনিলবাবু তাঁহার প্রিয় ভোগবাদ সমর্থক মাত্র দুইটি বাক্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন। ভোগনিবারক যে বহু বাক্য রহিয়াছে সেগুলি তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই, পড়িয়াছে কেবল দুইটি ভোগ সমর্থক বাক্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই দুইটি বাক্য ভোগবাদ সমর্থন করে না। প্রথম বাক্যটি ঈশোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে :—

ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং জগৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মাগৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনং॥

"জগতের সকল বিকারশীল বস্তু ঈশ্বরের দ্বারা পরিব্যাপ্ত। অতএব ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কাহারও ধন আকাংক্ষা করিও না।"

"ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর" ইহার অর্থ এই যে শব্দস্পর্শাদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু মনের মধ্যে ত্যাগের ভাব থাকিবে,—বিষয় সকল "জগৎ" অর্থাৎ বিকারশীল, ক্ষণস্থায়ী, বিষয় ভোগের আকাংক্ষা থাকিলে পরিণামে দুঃখ হইবে, এজন্য বিষয় ভোগ করিবার সময়ও ভোগের আকাংক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে—অর্থাৎ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা হইবে না। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে অনিলবাবু "ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর" ইহার অর্থ করিয়াছেন "ভোগকে জীবনের লক্ষ্য কর।" অর্থাৎ উপনিষদের যাহা অভিপ্রায় তাহার বিপরীত। যাহারা ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করে তাহাদিগকে পরবর্ত্তী তৃতীয় শ্লোকে "আত্মহনোজনাঃ" বলা হইয়াছে—তাহারা আত্মঘাতী—কারণ তাহারা আত্মাকে পরিত্যাগ করিয়া বাহ্য বিষয় দ্বারা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য জীবন অতিবাহিত করে এবং এই সব আত্মঘাতী লোক মৃত্যুর পর "অন্ধেন তমসাবৃতাঃ" অর্থাৎ ঘোরতর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন "অসুর্য্য" লোকে গমন করিয়া থাকে। পুনরায় নবম শ্লোকে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে ইহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, অতএব "অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি" অর্থাৎ অন্ধকারে নিমগ্ন হয়। কেনোপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে বলা হইয়াছে "ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ"—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না; সুতরাং যাহারা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় ভোগই জীবনের লক্ষ্য করে তাহারা ব্রহ্মকে পায় না, পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। ভোগের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ না করিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না, এ কথা কঠোপনিষদে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকে লাভ করিবার উপায় "অধ্যাত্মযোগ" (কঠোপনিষদ, ২।১২)—অর্থাৎ বিষয় ত্যাগ করিয়া আত্মার সহিত মনকে সংযুক্ত রাখা, সুতরাং বিষয় ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকিলে তাহাকে পাওয়া যায় না। সাধুগণ ব্রহ্মকে লাভ করিবার জন্য বিষয় ভোগ ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন—"যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি" (কঠোপনিষদ্ ২।১৫)। যাহার মনে ভোগবাসনা নাই সেই ব্রহ্মকে দর্শন করিতে পারে—"তম্ অক্রতুঃপশ্যতি বীতশোকঃ" (কঠ—২।২০)। ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মার মধ্যে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিলে তাঁহাকে পাওয়া যাইবে—"কশ্চিৎ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ আবৃত্তচক্ষুঃ অমৃতত্বমিচ্ছন্" (কঠ—৪।১)। ভোগের দ্রব্য সকল অধ্রুব, তাহাদিগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে ধ্রুব বস্তু (ব্রহ্মকে) পাওয়া যায় না, এজন্য জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করেন না—"ধ্রুবম্ অধ্রুবেষু ইহ ন প্রার্থয়ন্তে" (কঠ—৪।২)। এই প্রকার ভোগবাদ বিরোধী বাক্যে উপনিষদ সকল পরিপূর্ণ। তথাপি অনিলবাবু বলেন, উপনিষদের মত এই যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে হইবে।

গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, "যাহার মন ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে প্রসক্ত তাহাদের পরমেশ্বরাভিমুখী সমাধি হয় না" (গীতা ২।৪৪)। 'যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ, তিনি আত্মাতেই তুষ্ট, কোনও বাহ্য বিষয় আকাংক্ষা করেন না" (২।৫৫)। বাহ্য বিষয় ব্যতীত ভোগ হয় না, সুতরাং স্থিতপ্রজ্ঞ কখনও ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিতে পারেন না। 'যখন ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হয়, তখন প্রজ্ঞা স্থির হয়" (২।৫৮)। বলা বাহুল্য ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত হইলে ভোগ হয় না। "শান্তিলাভ করিতে হইলে মমত্ববোধ বিসর্জন দিতে হয়" (২।৭১)। মমত্বজ্ঞান বিসর্জন দিলে ভোগ হয় না। "যোগিগণ আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম করেন" (৫।১১), ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলে ভোগের জন্যই কর্ম করিতে হয়; কিন্তু তাহা গীতার মতের বিরোধী। "ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে যে ভোগ হয় তাহা দুঃখের কারণ" (৫।২২), গীতা যাহাকে দুঃখের কারণ বলিয়াছেন তাহাকে জীবনের লক্ষ্য বলিলে একটু ভুল হয় না কি? বস্তুতঃ গীতা ভোগবাদের বিরুদ্ধ কথায় পরিপূর্ণ। সুতরাং ভগবান যে অর্জুনকে বলিয়াছেন, "শত্রু জয় করিয়া রাজ্য ভোগ কর" ইহার উদ্দেশ্য এরূপ নহে যে অর্জুন ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিবেন। ভগবান বহুবার বলিয়াছেন যে ঈশ্বরলাভকেই অর্জুন জীবনের লক্ষ্য করিবেন, এক্ষণে রাজ্যভোগ উপস্থিত হইয়াছে, অনাসক্তভাবে রাজ্যভোগ করিতে হইবে, এই পর্য্যন্ত।

একটি বালক রাগ করিয়া ভাত খায় নাই। তাহার পিতা তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন, "যাও, ভাত খাইয়া এস"। এক্ষেত্রে কেহ যদি বলেন যে বালকটির পিতার অভিপ্রায় এইরূপ যে তাঁহার পুত্র অন্ন ভোজন করাকেই জীবনের উদ্দেশ্য করিবে, তাহা হইলে তাঁহার যে ভুল হইবে, অনিলবাবুরও ঠিক সেইরূপ ভুল হইয়াছে।

অনিলবাবু লিখিয়াছেন "ত্যাগের নেশায় ভোগকে নিন্দা করিয়া, পরলোকের চিন্তায় ইহলোককে অবহেলা করিয়া ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে।" আমরা দেখিলাম যে গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ভোগের নিন্দা করিয়াছেন। উপনিষদের ঋষিগণ ভোগের নিন্দা করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগের নেশা হইয়াছিল কি না অনিলবাবুই বলিতে পারেন। কিন্তু ভোগকে নিন্দা করিলেই যে ইহলোককে অবহেলা করিতে হইবে তাহার কোনও অর্থ নাই। ভোগকে উপেক্ষা করিয়া ইহলোকের কর্ত্তব্য কর্ম করিতে হইবে ইহাই গীতার উপদেশ।

দেখিয়া সুখী হইলাম যে অনিলবাবু এবারের প্রবন্ধে বলিয়াছেন, 'পরলোক সত্য এবং মহান্"। পূর্বের প্রবন্ধে তিনি অন্যরূপ সুর ধরিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন যে নীটশের বাণী "যাহারা তোমাদিগকে পরলোকের আশা দিয়া রাখে তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না"—আধুনিক যুগবাণী, কালপুরুষের ইঙ্গিত। এ বিষয়ে অনিলবাবুর মত কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এজন্য আমার শ্রম সার্থক বোধ করিতেছি। কিন্তু পরলোক যদি সত্য ও মহান হয় তাহা হইলে ইহলোকে জীবনকে পূর্ণভাবে ভোগ করাকে জীবনের লক্ষ্য করা কেন অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে তাহা বেশ বোঝা যায় না। অনিলবাবু যেরূপ পরলোককে সত্য ও

মহান বলিয়া স্বীকার করিতেছেন যদি সেইরূপ ঈশ্বরকে আরও সত্য, আরও মহান বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য না করিয়া ঈশ্বরলাভকেই জীবনের লক্ষ্য করা উচিত ; তাহা হইলে আমাদের বিবাদ মিটিয়া যায়।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে আমার মতে হিন্দুধর্মশাস্ত্রের উপদেশ এই যে "যথনই সম্ভব সংসার ত্যাগ, কর্ম ত্যাগ করিয়া পরকালের চিন্তায় মগ্ন" থাকা উচিত। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে হিন্দুধর্ম সকল রোগীর জন্য এক prescription করে না। যাহাদের সংসার ত্যাগ ও কর্ম ত্যাগের অধিকার আছে, তাহারা অবশ্য ত্যাগ করিবে। কিন্তু খুব কম সংখ্যক লোকের এই অধিকার আছে। বাকী (এবং অধিকাংশ) লোকের পক্ষে সংসারে থাকিয়া নিজ নিজ কর্তব্য কর্ম করিতে হইবে ; কেহ শাস্ত্রচর্চ্চা করিবেন, কেহ যুদ্ধ করিবেন, কেহ কৃষিবাণিজ্য করিবেন, কেহ ব্যক্তিগত সেবা করিবেন। কিন্তু এই সব কর্ম করা হইবে ভোগকে লক্ষ্য করিয়া নহে, ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। ইহাই সংক্ষেপে হিন্দুধর্মের উপদেশ।

কিসে ভারতের সর্বনাশ হইল তাহা নির্দেশ করা আজকাল একটা ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রতিষ্ঠালাভ করিবার ইহাই আজকাল সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। কেহ বলিলেন, প্রতিমা পূজা করিয়া ভারতের সর্বনাশ হইয়াছে ; কেহ বলিলেন, জাতিভেদ হইতে সর্বনাশ—কেহ বলেন মেয়েদের অল্প বয়সে বিবাহ দিয়াই সর্বনাশ ; কেহ বলেন, মা কালীর কাছে পাঁঠা কাটা হয় বলিয়া ভারতের সর্বনাশ। যাহার যা খুসী সে তাহাই বলিতেছে। কিন্তু এরূপ হাস্যাস্পদ কথা খুব কমই শোনা গিয়াছে যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই ভারতের অধঃপতন এবং ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিলেই ভারত দ্রুত উন্নতি লাভ করিবে।

অনিলবাবু বলিয়াছেন যে "এই যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জ্যোতির্ময় দিব্য জীবন" আলোচনা করিলে না কি আমরা দেখিতে পাইব যে ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করা উচিত। এই যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষগণের মধ্যে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের খ্যাতিই সমধিক। তাঁহার উপদেশ ত "কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ" ; তাঁহার জীবনে ত তাহাই দেখিতে পাই। তিনি বলিতেন, গীতা গীতা বার বার করিলে যাহা পাওয়া যায় (অর্থাৎ ভোগী বা ত্যাগী) তাহাই গীতার সার উপদেশ। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনও ত ভোগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত বলিয়া বোধ হয় না। আধুনিক যুগের সিদ্ধ মহাপুরুষ আরও কয়েক জনের নাম করা যাইতেছে—স্বামী ভাস্করানন্দ, তৈলঙ্গস্বামী, রামদাস কাঠিয়া বাবাজি, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী ভোলাগিরি, বামাক্ষেপা, সন্তদাস মহারাজ। কই ইঁহারা ত কেহ ভোগকে জীবনের লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। পাছে আমরা শঙ্করাচার্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্যের নাম করি, এজন্য অনিলবাবু "আধুনিক" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু আধুনিক যুগের মহাপুরুষদের সাক্ষ্যও ত অনিলবাবুর মতের বিরুদ্ধে।

পূর্বের প্রবন্ধে অনিলবাবু লিখিয়াছিলেন যে শঙ্করাচার্য্য মায়াবাদ প্রচার করিবার ফলে "ঐহিক জীবনে ভারতের প্রকৃত অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। গার্হস্থ্য জীবনকে অতি হীন চক্ষে দেখা হইল, তাহাকে বিধি নিষেধের অসংখ্য বন্ধনে পিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল।" স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধগুলিকেই এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে—লোকাচার বা মেয়েলি আচারকে এখানে লক্ষ্য করা হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনিলবাবু বলিয়াছেন, "আমি শাস্ত্রের নিন্দা কোথাও করি নাই, মনুসংহিতা বা স্মৃতিশাস্ত্রকে আক্রমণ করি নাই।" খুব ভাল কথা। অতঃপর অনিলবাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 'হিন্দু সমাজ যে আজ অসংখ্য বিধিনিষেধের অত্যাচারে জর্জ্জরিত সে সবই যে মনুসংহিতা হইতে আসে নাই, বসন্তকুমারবাবু কি তাহা অস্বীকার করিতে পারেন ?" এ বিষয়ে আমার মত জানিবার জন্য যদি অনিলবাবুর কিছুমাত্র কৌতূহল হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে বলিতে পারি যে হিন্দু সমাজ বিধিনিষেধের অত্যাচারে যে পরিমাণে জর্জ্জরিত হইয়াছে তদপেক্ষা অনেক বেশী জর্জ্জরিত হইয়াছে গীতা উপনিষদের দুর্ব্যাখ্যা-কারীদের উৎপাতে। যে ব্যবস্থা মনোনীত না হইবে তাহাই বর্ত্তমান যুগের উপযুক্ত নহে এই বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইবে ; অর্থাৎ কোন্ কার্য্য কর্ত্তব্য ইহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য শাস্ত্র নির্দ্দেশের উপর নির্ভর না করিয়া নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা হইবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা গীতার ঠিক বিপরীত। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন কোন্ কর্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম অকর্ত্তব্য এ বিষয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ (গীতা ১৬।২৪)। প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজ বুদ্ধি অনুসারে কর্ত্তব্য নির্ণয় করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে তাহার ভুল করিবার সম্ভাবনা খুব বেশী ; (যেমন অর্জ্জুনের ভুল হইয়াছিল, তাঁহার মনে হইয়াছিল যে যুদ্ধ না করাই তাঁহার কর্ত্তব্য)। এইরূপ ভুল হইবার কারণ এই যে সাধারণ মানবের চিত্ত রাগদ্বেষের অধীন—কিন্তু শাস্ত্রবাক্য রাগদ্বেষহীন ঈশ্বরের উক্তি। পুরাতন যুগের সামাজিক ব্যবস্থা বর্ত্তমান যুগে চলিতে পারে না, এই ধুয়া পাশ্চাত্য জগতেই প্রথমে উঠিয়াছে এবং আরও অনেক ভুল মতের সহিত এই মতটিও আমাদের ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য দেশ হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। এই ধুয়া অনুসারে পাশ্চাত্য জগতে আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন, বিবাহপ্রথাটি বড়ই সেকেলে প্রথা, আধুনিক যুগে ইহা চলিতে পারে না ; ইত্যাদি।

অনিলবাবু বলিয়াছেন "মনুসংহিতার যুগ হইতে আমরা অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছি, ইহা অস্বীকার করা অন্ধ গোঁড়ামী ভিন্ন আর কিছুই নহে।" অনিলবাবু যদি আমাকে একজন অন্ধ গোঁড়া বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে আমি অবশ্য অত্যন্ত ব্যথিত হইব। কিন্তু আমার মনে হয় যে পাশ্চাত্য কুশিক্ষায় যাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে মনুসংহিতার (এবং অন্যান্য স্মৃতি শাস্ত্রের) ব্যবস্থাগুলি সকল যুগেরই সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলজনক। ইহার

সমর্থনে আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে গীতা ও উপনিষদ হইতে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি।* অনিলবাবু গীতা ও বেদ উভয়ই মানেন অথচ এই বাক্যগুলি অশ্রদ্ধা করেন—এই রহস্য তিনি না বুঝাইয়া "অন্ধ গোঁড়ামি" বলিয়া সমস্যাটির অতি সহজ মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় যুক্তি হিসাবে এই মীমাংসার কোনও মূল্য নাই। অমূল্য উপদেশ সকলের আকর মনুসংহিতার মধ্যে তিনি মক্ষিকাবৃত্তি দ্বারা দুইটি ত্রুটি খুঁজিয়া পাইয়াছেন। প্রথমতঃ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—"এখন কি সকল ব্রাহ্মণই শুধু যজন যাজন দান গ্রহণ প্রভৃতি বৃত্তি লইয়াই থাকিতে পারেন?" না, পারেন না। তখনও থাকিতেন না। মনুই ব্রাহ্মণের নানাবিধ বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, কতকগুলি প্রশংসনীয়, কতকগুলি নিন্দনীয়। যজন যাজন প্রভৃতি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ সৈনিকের বৃত্তি এবং কৃষি, বাণিজ্য, গোপালন প্রভৃতি বৃত্তিও গ্রহণ করিতে পারে, ইহা মনুরই বিধান। অতএব এক্ষেত্রে অনিলবাবু মনুসংহিতার দোষ ধরিতে গিয়া বিফলকাম হইলেন। অনিলবাবুর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে মনুসংহিতায় লেখা আছে যে শূদ্র বেদ শ্রবণ করিলে তাহার কানে সীসা গরম করিয়া ঢালিয়া দিতে হইবে। প্রাচীনকালে সত্য সত্যই যে যখন তখন শূদ্রদিগকে ধরিয়া তাহাদের কানে গরম সীসা ঢালিয়া দেওয়া হইত, ইহা সত্য নহে। সত্য হইলে, পুরাণে বা ইতিহাসে এরূপ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইত। কিন্তু এরূপ ঘটনার উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। বেদের কোনও উপদেশই যে শূদ্রকে প্রদান করা হইবে না, ইহাও ঐ নিয়মের উদ্দেশ্য নহে। কারণ বেদের যাহা সার উপদেশ—তাহা গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে, শূদ্রের তাহা পড়িতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু বেদমন্ত্র অসম্পূর্ণ ভাবে শিখিয়া শূদ্র যদি যজ্ঞ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলে সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে—এজন্য একটা ভীতিজনক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হইয়াছে মাত্র। অনিলবাবু পণ্ডিচারী আশ্রমের একজন বিশিষ্ট সাধক এজন্য তাঁহার মত কিছু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হইল।

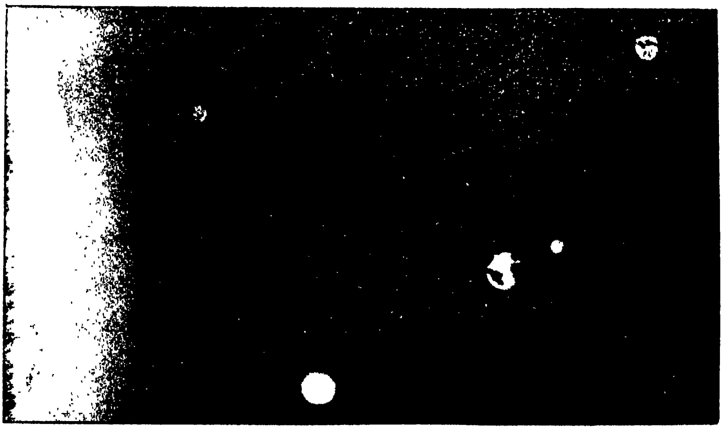
* তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥ গীতা ১৬।২৪
"যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ তৎ ভেষজম্ ইব শরীরিণাং" বেদ

পৃথিবীর প্রতিবেশী

শ্রীনরেন্দ্র দেব

পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশী 'মঙ্গল' গ্রহকে নিয়ে অনেক দিনই পৃথিবীর অধিবাসীরা মাথা ঘামাচ্ছেন। একদল বলছেন যে মঙ্গলে মানুষের বসবাস আছে এবং তারা না কি পৃথিবীর মানবক অপেক্ষা অধিকতর প্রতিভাশালী অর্থাৎ এক কথায় অতিমানব! শিক্ষায়, সভ্যতায়, জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে মঙ্গলবাসীরা পৃথিবীর মানুষকে অনেক পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে চলেছে!

মঙ্গলগ্রহ যে পৃথিবী অপেক্ষা অনেক উচ্চে একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই; কেন না জ্যোতির্বিদেরা দুরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় ক'রে নীহারিকাপুঞ্জের যে নক্সা প্রস্তুত ক'রেছেন তাতে পৃথিবী আছেন দেখা যায় মঙ্গলের অনেক নীচেয়। কিন্তু সে যাই হোক, এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে—যথার্থই কি মঙ্গলেও মানুষ আছে? ওই গ্রহটির প্রাকৃতিক ও নৈসর্গিক অবস্থা, ওর বায়ুমণ্ডল, জ্যোতির্ম্মণ্ডল অর্থাৎ মোটের উপর ওর পাঞ্চভৌতিক আবহ কি সত্যই মনুষ্যবাসের উপযোগী?

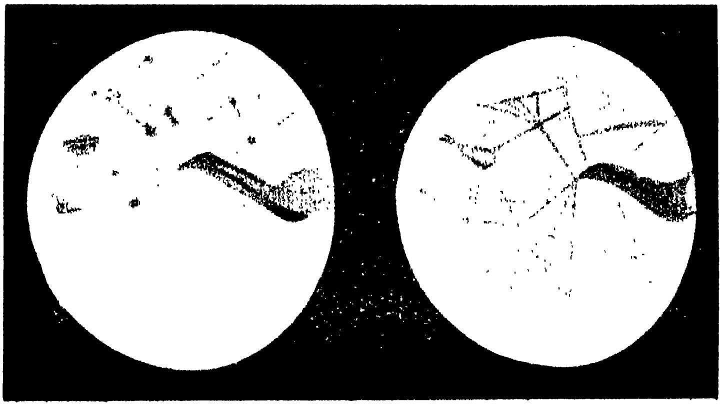


নীহারিকা পুঞ্জের নক্সা (সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী গ্রহগুলির পরস্পরের অবস্থান ও আকারের একটা মোটামুটি ধারণা হবে এ থেকে)

মনীষী রাস্কিন্ তাঁর "মডার্ণ পেন্টার্স্" পুস্তকের এক-

স্থানে লিখেছেন যে—"আপনাকে মনুষ্য বাসের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য পৃথিবীকে যেদিন নানা আয়োজন ক'রতে হ'য়েছিল, তার মধ্যে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হয়েছিল তার এমন একটি আঁধার অবগুণ্ঠনের বা আবরণের—যেটি ঠিক মধ্যবর্ত্তিনীর ন্যায়ই মানুষ ও পৃথিবীর নগ্নতার মাঝখানে আপনাকে বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিল। এরই অন্তরালে চলেছিল চিরস্থায়ী পৃথিবীর রূঢ় কঠিনতার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী মানুষের প্রাণ চঞ্চল লীলা!"

"এমন কি মানুষের স্বর্গবাসের যোগ্য হবার জন্য স্বর্গকেও প্রস্তুত হ'তে হয়েছিল। তার দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় আলোক



মঙ্গলগ্রহের চিত্র (শীতের প্রারম্ভে এই চিত্র নেওয়া হ'য়েছে। মাথার দিকে ফোঁটার মত সাদা দাগ প্রথম তুষারপাতের চিহ্ন। দক্ষিণের চিত্রটি এক সপ্তাহ পরে তোলা।)

শিখার—তার গভীর শূন্যতারও একটি গুণ্ঠন অপরিহার্য্য হ'যে উঠেছিল যার সাহায্যে সে মানুষের একান্ত ক্ষীণতা ও দৌর্ব্বল্যের অনুকূলে আপনার অসহনীয় গৌরবোজ্জ্বল মহিমাকে সংবরণ ক'রে রাখতে পারে। তবেই সম্ভব হয়েছিল মানুষের বৈচিত্র্যময় জীবন প্রবাহের সঙ্গে আকাশের অপরিবর্ত্তনীয় গতির এক আশ্চর্য্য মিতালী!"

"মানুষ ও পৃথিবীর মধ্যে এসেছিল সেদিন নব কিশলয় পল্লবচ্ছায়া! আকাশ ও মানুষের মধ্যে এসেছিল সেদিন নবঘন নীরদ মণ্ডল! তাই মানুষের জীবন হ'য়ে উঠেছে কতকটা শাখাচ্যুত পল্লবের ন্যায় অধোগামী, কতক বা লঘু শুভ্র বাষ্পতুল্য ঊর্দ্ধগামী।"

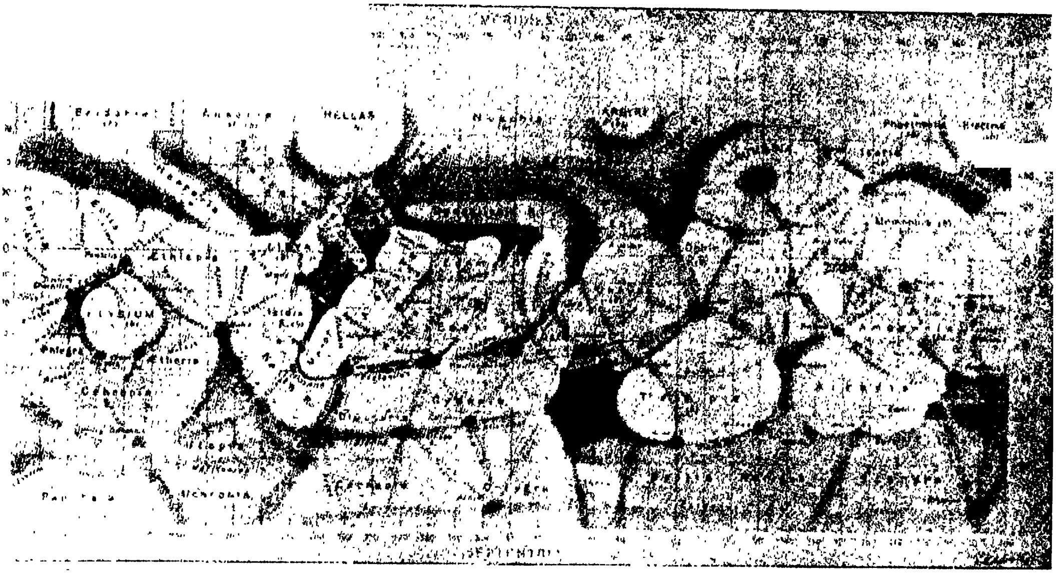
কবির কল্পনায় এই ছিল সেদিন নিজেকে মনুষ্যবাসের উপযোগী ক'রে তোলবার জন্য স্বর্গ মর্ত্ত্যের তথা গ্রহ নক্ষত্রের আয়োজন। বৈজ্ঞানিকের ভাষায় যা বলা হয়েছে তা' ভাষার দিক থেকে অন্য রকম শোনালেও, মোদ্দা কথাটা কিন্তু প্রায় একই। তাঁরাও বলেন বায়ু তাড়িত বৃক্ষপত্র এবং ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত বাষ্প চিহ্নই হ'চ্ছে মনুষ্যবাসোপযোগী গ্রহের প্রধান লক্ষণ! মনুষ্যবাসোপযোগী বলতে এইটেই বুঝতে হবে যে, তারা ঠিক মানুষ না হ'লেও—এমন কোনো জীব—যারা দেহে মনে অবিকল মানুষেরই সমকক্ষ। যে গ্রহের মধ্যে কেবলমাত্র অনাবৃত পাহাড় সূর্য্যালোকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং যার শূন্যতা শুধু শুষ্ক বাতাসে ভরা সেখানে জৈব প্রাণী বা শরীরী জীব থাকতে পারে না।

জীবনের প্রধান গুণই হ'চ্ছে জৈব দেহের সেই শক্তি—যা মৃত বস্তুকেও নিজের মধ্যে গ্রহণ ও আত্মসাৎ ক'রে নিতে পারে, অর্থাৎ যা অপর দেহকে ধ্বংস ও পরিপাক ক'রে নিজের পুষ্টি ও শক্তি অব্যাহত রাখে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী জীবনের মধ্যে পার্থক্য সেইখানেই—যেখানে উদ্ভিদ্ অনায়াসে জড়পদার্থ ও অজৈব বস্তুকেও গ্রাস করতে পারে, কিন্তু, প্রাণীর বাঁচবার জন্য প্রয়োজন হয় এমন বস্তুর, যার ইতিমধ্যেই জৈব পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। কাজেই, যেখানে প্রাণী আছে সেখানে উদ্ভিদ্ যে থাকবেই, এ যেমন অবিসম্বাদী সত্য, তেমনি উদ্ভিদ্ যেখানে আছে সেখানে যে জলের অস্তিত্ব আছে এ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হ'তে পারা যায়। কারণ জলই হ'চ্ছে একমাত্র নিরপেক্ষ দ্রাবণক্ষম পদার্থ এবং এই জলীয় পদার্থই উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েরই জীবন ধারণের পক্ষে প্রধান প্রয়োজনীয় পানীয়। সুতরাং উন্নত শ্রেণীর জীবের উদ্ভব ও প্রসার একমাত্র সেইখানেই সম্ভব—যেখানে প্রচুর জল ও পর্য্যাপ্ত উদ্ভিদের সমাবেশ আছে।

কিন্তু, যতদূর জানা গেছে, তাতে দেখা যায় যে জল দ্রব অবস্থায় থাকতে পারে একান্ত সঙ্কীর্ণ আবহের গণ্ডীর

মধ্যে। পৃথিবীর এই আবহের মধ্যে তাপমান ৩২ ডিগ্রীতে নামলেই জল আর দ্রব অবস্থায় থাকে না এবং তাপমান ২১২ ডিগ্রীতে উঠলেই জল একেবারে ফুটন্ত গরম হ'য়ে ওঠে! সাধারণতঃ দেখা যায় পৃথিবীর আবহ মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের ৬০ ডিগ্রীর মধ্যেই থাকে। কেবলমাত্র ভূমধ্য রেখার সন্নিহিত প্রদেশগুলিতেই মোটামুটি মধ্যম তাপক্রম হিসাবে ৮০ ডিগ্রীর কাছাকাছি উত্তাপ পাওয়া যায়। সুতরাং পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই জল বেশ দ্রব অবস্থায় নিরাপদে থাকতে পারে। কেবল উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের আবহই তাপমানের ৩২ ডিগ্রী নীচেয় থাকে; কাজেই, সেখানে জল জমে তুষার বা বরফের

আলোক ও উত্তাপ যে পরিমাণ এসে পড়ে, তার সাত ভাগের তিন ভাগ মাত্র 'মঙ্গল' গ্রহের উপর আসে। পৃথিবী যদি সূর্য্যের আলোক ও উত্তাপ পূর্ণ সাত ভাগ পাওয়ার ফলে মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের মাত্র ৬০ ডিগ্রীতে পৌছতে পেরে থাকে, তা'হলে সেই সাত ভাগের তিন ভাগ মাত্র পাওয়ার ফলে মঙ্গল মধ্যম তাপক্রম হিসাবে তাপমানের মাত্র দশ ডিগ্রীতে পৌছতে পারে। অথচ, দেখা যাচ্ছে যে তাপমানের ৩২ ডিগ্রীতে জল জমে বরফ হ'য়ে যায়! সুতরাং, মঙ্গলে তরল জল থাকা সম্ভব নয়। সেখানে জল তুষার, তুহিন বা বরফের মত জমাট অবস্থায় থাকতে পারে।



মঙ্গলগ্রহের নক্সা (কালো স্থানগুলি কোনো পুরাকালে হয়ত সমুদ্র ছিল এখন শুকিয়ে গেছে, পড়ে আছে শুধু গহ্বর! কালো রেখাগুলিকেই খাল বলে চালাবার চেষ্টা করছেন কেউ কেউ!)

আকার ধারণ ক'রেই থাকে। তবে এ দুই প্রদেশের কতকাংশ বৎসরের মধ্যে আট মাস তাপমান ৩২ ডিগ্রীর উপরে থাকে ব'লে এখানেও মানুষের বাস না থাক্, জীবনের অস্তিত্ব আছে। তাছাড়া, উষ্ণ দেশবাসী জীব-জন্তু এমন কি মানুষের যাতায়াতও এখানে নিয়ত দেখা যায়।

সুতরাং মঙ্গলগ্রহে মানুষ বাস করে কিনা এ প্রশ্নের সমাধান করতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার—মঙ্গলের আবহাওয়ার অবস্থা কি রকম। সৌরমণ্ডলের অবস্থান থেকে আমরা জানতে পারি যে পৃথিবীর উপর সূর্য্যের

চিরতুষারাচ্ছন্ন কোনো গ্রহের উপর সূর্য্যের আলোকপাত হ'লে তা' উজ্জ্বল হীরকখণ্ডের মত ঝল্‌মল্ করে। কিন্তু, মঙ্গলের কোনো জ্যোতি নেই। চন্দ্রের মতই মঙ্গলও একটি নিস্তেজ গ্রহ। দেখতে অগ্নিপিণ্ডের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ হ'লেও তার কোনো দ্যুতি প্রতিফলিত হ'তে দেখা যায় না। এ জন্য সহজেই মনে হ'তে পারে যে তবে কি মঙ্গলেও চাঁদের ন্যায় জলের অস্তিত্ব নেই? সেও কি চাঁদের মত শুধুই লতাগুল্মহীন অনাবৃত পাহাড় পর্ব্বতে ভরা? জ্যোতির্বিদেরা বলেন—তা নয়। তাঁরা দূরবীক্ষণ

যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ ক'রে দেখেছেন যে ঠিক পৃথিবীর ন্যায়ই মঙ্গলের দুই মেরুপ্রদেশও তুষার কিরীটে আবৃত, অন্যান্য অংশ নয়। শীতের সময় এই উভয় মেরু প্রদেশের তুষার আবরণ ক্রমশঃ অধিকদূর পর্য্যন্ত প্রসার লাভ করে, আবার গ্রীষ্মকালে তা' ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। শীত ও গ্রীষ্মে মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে এই যে পরিবর্ত্তন দেখতে পাওয়া যায়, কেবলমাত্র কঠিন পাষাণ চূড়ার পক্ষে এটা সম্ভব নয়। এ যে নিশ্চিত বরফ জমে ওঠা ও বরফ গলে যাওয়ার ব্যাপার, তা'তে আর কোনো সন্দেহ



গ্রীষ্মকালে মঙ্গলের রূপ (নিম্নের উজ্জ্বল অংশের জ্যোতির্বিদেরা নাম রেখেছেন "আয়েরিয়া"। সূর্য্যের তেজ কম থাকে যখন তখন এ অংশ সাদা দেখায়। মধ্যাহ্নে লাল মাটি স্পষ্ট চোখে পড়ে। কাল অংশটুকুর নাম রেখেছেন জ্যোতির্বিদেরা 'সায়ার্টিস্ মেজর'; এর উপরের বড় সাদা টিপটিকে বলে 'হেলাস্' দ্বীপ। তারও ঊর্দ্ধে একেবারে কিনারার সাদা টিপটি তুষারাচ্ছন্ন মেরুশিখর)

থাকতে পারে না। এখন কথা হ'চ্ছে এই যে—বরফ গলে গিয়ে কি অবস্থায় থাকে? তরল জলের রূপ ধারণ করে কি?

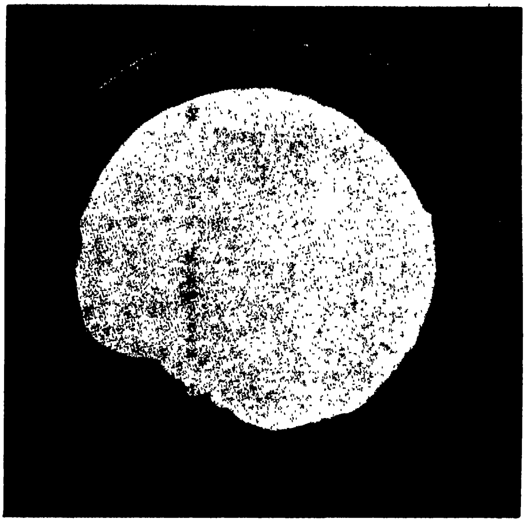
শীতের সময় পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে তুষরাবরণের প্রসার যতটা বাড়তে দেখা যায়, মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে কিন্তু অতটা চ'খে পড়ে না। আবার গ্রীষ্মকালে যখন কমতে থাকে পৃথিবীর মেরুপ্রদেশে তা কতকটা ক'মে আর কমে না! কিন্তু মঙ্গলের মেরুপ্রদেশে তা কমতে কমতে ক্রমশঃ একেবারে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে যায়। এই কারণে কেউ কেউ মনে করেন যে মঙ্গল শীতপ্রধান গ্রহ হ'তেই পারে না, বরং পৃথিবী অপেক্ষা সে অনেক বেশী উষ্ণতর, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে।

বিশেষজ্ঞেরা বলেন, এ ধারণা নিঃসন্দেহে বলে মেনে নেওয়া চলতো—যদি আমরা মঙ্গলের সম্পূর্ণ রূপ সকল দিক থেকে দেখবার সুযোগ পেতুম। কিন্তু দূরবীক্ষণের সাহায্যে মঙ্গলের যেটুকু অংশ আমরা দেখতে পাই সেটাকে মঙ্গলগ্রহের একটা মোটামুটি চেহারা বলা চলে না। পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে আছে সে শুধু তার সুন্দর মুখখানি। আমরা দেখতে পাই কেবলমাত্র তার হাসিমুখ বা প্রসন্নমূর্ত্তিটি! অর্থাৎ দূরবীক্ষণে দেখা যায় মাত্র মঙ্গলের অয়নান্তবৃত্ত-ভাগ—তার নিদাঘ মধ্যাহ্নের দীপ্ত রূপ! কিন্তু আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়—তার শীতকাতর হিমাবৃত অংশটুকু!

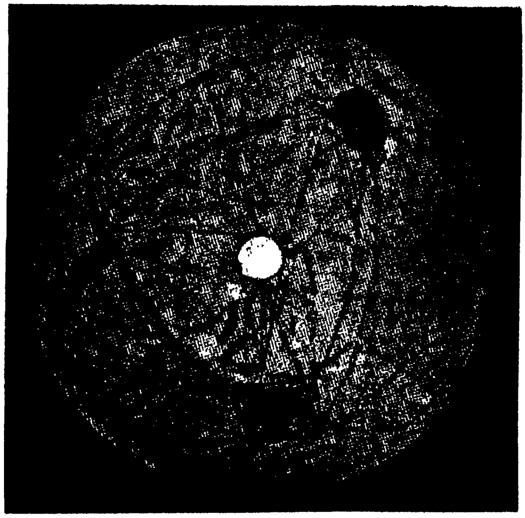
পৃথিবীর মধ্যম তাপক্রম মোটামুটি ৬০ ডিগ্রী হ'লেও তার অয়নান্তবৃত্তের তাপমান গ্রীষ্মকালে ১০০ ডিগ্রীরও উপরে উঠে যায়। সুতরাং পৃথিবীর পরিবর্ত্তনের এই অনুপাতে যদি মঙ্গলগ্রহের তাপমানের হিসাব ধরা যায়—তাহলে এর বিষুব-রেখার মধ্যভাগের তাপ ৫০ ডিগ্রীতে এসে দাঁড়ায়। দূরবীক্ষণে মঙ্গলের এই অবস্থাই আমাদের চোখে প'ড়ে। কিন্তু মঙ্গল সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানতে হ'লে এই গ্রহের মধ্যম তাপক্রম কি তা অবগত হওয়া দরকার,

তার আবহের ক্রম পরিবর্ত্তনের হিসাব পাওয়া চাই। মধ্যাহ্ন থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এর তাপক্রম কখন কি অবস্থায় থাকে, গ্রীষ্ম ও শীতে এর তাপক্রম কি এবং বিষুব-রেখা থেকে মেরুপ্রদেশ পর্য্যন্ত এর আবহক্ষেত্রের বিভিন্ন অবস্থা জানা চাই।

অনুমানে মনে হয় পৃথিবী অপেক্ষা মঙ্গলগ্রহে এই আবহ ও তাপক্রমের পরিবর্ত্তন অনেক বেশী। পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের পার্থক্যের উপরই এই অনুমান প্রতিষ্ঠিত। যতদূর জানা গেছে তাতে স্থির হয়েছে যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের যা বেগ বা গতি—মঙ্গলে তার পরিমাণ আট ভাগের তিন ভাগ মাত্র। অর্থাৎ, পৃথিবীতে দেখা যায় একটা কোনো ভারি জিনিস উপর থেকে নীচেয় পড়তে তার গতির সীমা প্রতি সেকেণ্ডে ১৬ ফুট পর্য্যন্ত! কিন্তু মঙ্গলগ্রহে যদি কোনো ভারি জিনিস উপর থেকে নীচেয় পড়ে তবে তার বেগ বা গতির সীমা এক সেকেণ্ডে ছ'ফুটের বেশী হবে না। এ থেকে বোঝা যায় যে মঙ্গল গ্রহের আবহাওয়ার অবস্থা পৃথিবী হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! পৃথিবীতে সওয়া তিন মাইলের কিছু উর্দ্ধে উঠলেই মাথার উপর দিকে আবহের চাপ একেবারে অর্দ্ধেক কমে যায়। আরও সওয়া তিন মাইলের কিছু উর্দ্ধে উঠ্‌লে বাকি চাপটুকুর আবার অর্দ্ধেক কমে যায়, এমনি ক'রে ক্রমেই কমতে থাকে। এই ভাবে যদি মঙ্গল গ্রহ থেকে উর্দ্ধে ওঠা যায়, তাহ'লে অন্ততঃ পৌনে ন'মাইল উপরে উঠলে তবে সেখানে আবহের চাপ অর্দ্ধেক কম পাওয়া যাবে এবং তার আবার অর্দ্ধেক কমে যাবে সাড়ে সতেরো মাইল উর্দ্ধে উঠলে। পৃথিবীর আবহের চাপ যে পরিমাণ দেখা যায়, মঙ্গলগ্রহের আবহ যদি ঠিক তদনুরূপ হ'ত, তাহ'লে তার চাপের পরিমাণ দাঁড়াতো পৃথিবীর আবহ চাপের তিনগুণ বেশী! অর্থাৎ, সে অবস্থায় মঙ্গল গ্রহের রূপ আমাদের দৃষ্টি গোচর হোত না! অথচ দূরবীক্ষণে মঙ্গলের রূপ আমরা বেশ সুস্পষ্টই দেখতে পাই! চাঁদের উপরটি যেমন পরিষ্কার আমাদের চোখে পড়ে, মঙ্গলের বহিরাবরণও ঠিক তেমনি পরিষ্কার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়! সুতরাং, এই একটা বিষয়ে এখন বেশ নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে মঙ্গলের উপরের আবহ আবরণ চাঁদের মতই অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও ক্ষীণ। হয়ত তা পৃথিবীর আবহ চাপের সাত ভাগের এক ভাগ মাত্র! অথবা, তার চেয়েও কম! কিন্তু এই লঘুত্বের হেতু হচ্ছে—সেখানে বায়ুর অত্যধিক স্বচ্ছতা বা অপ্রগাঢ়তা! তা যদি হয়, তাহ'লে এও সুনিশ্চিত যে পৃথিবীর আবহের পরিবর্ত্তনের তুলনায় মঙ্গলের আবহের পরিবর্ত্তন অনেক বেশী পরিমাণে বৈচিত্র্যময়!

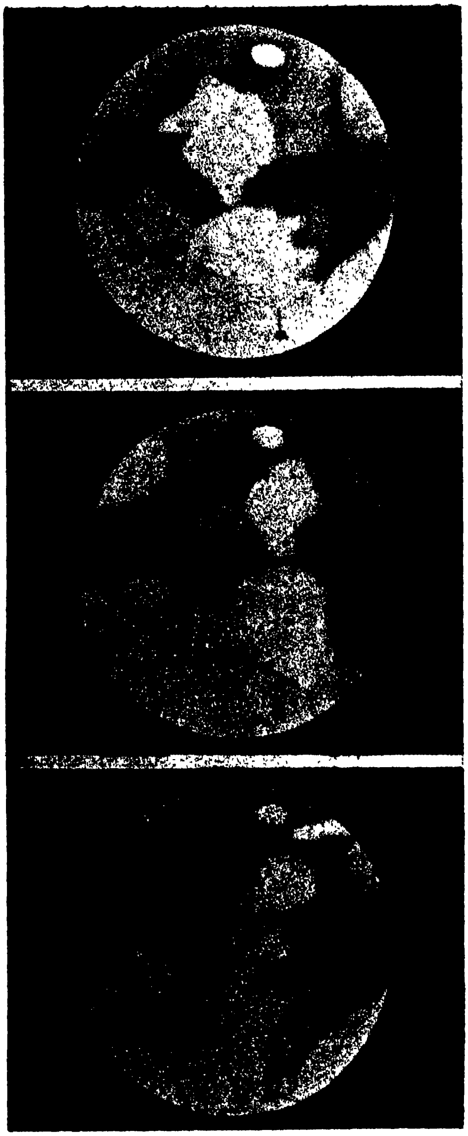


মঙ্গলের দক্ষিণ গোলার্দ্ধের মানচিত্র (শীতের সময় মেরু প্রদেশের তুষারাস্তরণ যে কতখানি বিস্তৃত হ'য়ে পড়ে, তা এ থেকে বোঝা যাবে)



মঙ্গলের উত্তর গোলার্দ্ধের মানচিত্র (গ্রীষ্মের দিনে মেরু প্রদেশের তুষারাবরণ কমে কত ছোট হ'য়ে পড়ে, তা এ থেকে জানা যাবে)

মঙ্গল গ্রহে ঋতুচক্রের পরিক্রমণ কিন্তু অত্যন্ত মন্থরগতিতে চলে। এর কারণ—সূর্য্যের উত্তাপ সেখানে অতি সামান্যই প্রবেশ করে এবং এই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণের বেগও নিতান্ত ক্ষীণ। একটা ঢিল ফেললে সেখানে যেমন এক সেকেণ্ডে ছ' ফুটের বেশী বেগে সেটা নীচের দিকে পড়ে না, অথচ পৃথিবীতে সেটা এক সেকেণ্ডে ষোলো ফুট ছোটার বেগে নামে, সেই রকম মঙ্গলগ্রহে তপ্ত বায়ু বা উষ্ণ বাষ্পও উপরদিকে ওঠে তেমনিই ধীর মন্থর গতিতে! কোনো কোনো 'মঙ্গল' গ্রহ-সন্ধানীরা লিখে গেছেন—সেখানে নাকি দিনরাত ঝড়ের বেগে বাতাস বইছে! দুর্য্যোগের দিনে সেখানে প্রলয় ঝঞ্ঝার উন্মত্ত নৃত্য সুরু হয়, ঘূর্ণী বাতাসও ঘোরতর আঁধির প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলে। তাঁদের এ অনুমান কিন্তু সত্য নয়। মঙ্গলের শান্ত নির্ম্মল সূক্ষ্ম আবহের অভ্যন্তরে এরূপ দানবীয় তাণ্ডব কোনো মতেই সম্ভব হ'তে পারে না। তাঁদের এই উদ্ভট অনুমানের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই! এ সমস্ত অনভিজ্ঞদের নিছক কল্পনা মাত্র!



মঙ্গলে মেঘোদয় (জনৈক জার্ম্মাণ জ্যোতির্বিদ মঙ্গলে বিষুব রেখার চারপাশে এই বাষ্পমণ্ডল দেখতে পান এবং এর আকারের দ্রুত পরিবর্ত্তন থেকে তিনি একে মেঘোদয় ব'লেই স্থির করেন। তাঁর এ অনুমান যদি নির্ভুল প্রমাণ হয়, তাহ'লে মঙ্গলে জীবের বাস অসম্ভব হবে না। কারণ যেখানে মেঘ দেখা যায় সেখানকার আবহাওয়া প্রাণী জীবনের অনুকূল)

মঙ্গলে মেঘোদয় (রূপান্তর)

মঙ্গলে মেঘোদয় (আবার রূপান্তর)

মঙ্গলগ্রহের মেরুশিখরে যে তুষার কিরীট দেখা যায়,

নিদাঘ সূর্য্যের খরতাপে যাঁরা তা' গলে যেতে দেখেছেন, তাঁদের এই সংবাদেরও দু'দিক থেকে প্রতিবাদ করা চলে। প্রথমতঃ যেরূপ সত্বর এই বরফের আবরণ গলে যায়, তাঁরা বলেন তাতে আর যাই হোক এটা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ হয়ে যায় যে সূর্য্যের উত্তাপে এমনটা সম্ভব নয়। কারণ পৃথিবী মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষা বহুগুণ বেশী সূর্য্যের উত্তাপ ভোগ ক'রে, তথাপি পৃথিবীর মেরু প্রদেশ চির তুষারাচ্ছন্নই থেকে যায়! তা'ছাড়া দ্বিতীয় কথা হ'চ্ছে মঙ্গলগ্রহ যে বছরের কোনো সময়ে যথার্থই গভীর তুষারাচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে—এর কোনো নিঃসন্দেহ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি এ পর্য্যন্ত; বরং সেখানে প্রবল তুষারপাত কোনো কালে সম্ভব হ'তে পারেনা বলেই মনে করার যথেষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। "মঙ্গলগ্রহে যখন দারুণ শীতের আবির্ভাব হয় তখন অতি ক্ষুদ্র জলকণাও জমে তুষার কণায় রূপান্তরিত হয় এবং তা সূর্য্যালোকে বরফের কুচির মতই চিক্‌মিক্ ক'রে" এমন কথাও কেউ কেউ বলেছেন। অপর পক্ষে দেখা যায় যে মঙ্গল গ্রহের মধ্যম তাপক্রম যদিও পৃথিবী অপেক্ষা অনেক কম, তবু সেখানকার দৈনিক আবহ অথবা বার্ষিক ঋতুর এমন একটা চরম পরিবর্ত্তন মোটেই অসম্ভব বা অভূতপূর্ব্ব নয়, যখন মঙ্গলের তাপমান প্রায় পৃথিবীর সম-পর্য্যায়ে এসে দাঁড়াতে পারে। বিশেষ করে—বিষুবরেখার অন্তর্গত প্রদেশে নিদাঘ মধ্যাহ্নে সূর্য্য যখন ঠিক মাথার উপর আসে, সেই সময় প্রতিদিন অন্ততঃ ঘণ্টা দুয়ের জন্য সেখানকার আবহ পৃথিবীর সঙ্গে সমান হ'য়ে ওঠবারই কথা। এই সম্পর্কে মঙ্গলগ্রহের আর একটা ব্যাপার মনে রাখা দরকার যে—সেখানকার আবহের চাপ অত্যন্ত লঘু হওয়ায় ফলে জল সেখানে তাপমানের ১০০ থেকে ১২৫ ডিগ্রীর মধ্যেই ফুটন্ত গরম হয়ে ওঠে, কিন্তু পৃথিবীর পক্ষে তাপমান ২১২ ডিগ্রীতে না পৌঁছলে জল ফুটন্ত গরম হয়ে ওঠা সম্ভব নয়! সুতরাং ঐ যে ক্ষুদ্রতম তুষার কণাগুলির জমে ওঠার সম্ভাবনা শোনা যায় সেগুলির বরং গলে যাওয়া বা শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই সমধিক!

মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে এই যে ধারণায় এসে পৌঁছেচেন বর্ত্তমান জ্যোতির্বিদেরা, তার কারণ, ঘন ঘন এই গ্রহটিকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নানাদিক থেকে বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে তাঁদের এই বিশ্বাসই দৃঢ় ও বদ্ধমূল হ'য়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মঙ্গলগ্রহের একাধিক আলোকচিত্র নিয়ে তাঁরা দেখেছেন যে এর ভৌগলিক অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। মঙ্গলগ্রহের মধ্যে যে অসংখ্য নদী বা খাল কাটা আছে ব'লে একটা সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে সেটা একেবারেই আজগুবি! আলোকচিত্রে প্রতিফলিত যে রেখাগুলিকে জলপ্রবাহ ব'লে ধ'রে নেওয়া হ'য়েছে তা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ পূর্ব্বেই বলেছি মঙ্গলে জলের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে সকালে ও সন্ধ্যায় সেখানে একটা লঘু শুভ্র তুষার আবরণ মেরু প্রদেশকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে, কিন্তু দিবসে দিবাকর তাপে তা মিলিয়ে যায় এবং মঙ্গলের লালমাটি সুস্পষ্ট চোখে পড়ে।

কিন্তু সে যাই হোক মঙ্গলের আবহাওয়ার এই এলোমেলো অবস্থায় পৃথিবীর প্রতিবেশী এই গ্রহটির মধ্যে কোনো উদ্ভিদের ভূমিষ্ঠ হওয়ার চেয়ে বেঁচে থাকা আরও কঠিন। প্রাণী বা জীবজন্তুর অস্তিত্ব ত' দূরের কথা, ক্ষুদ্র তৃণ-গুল্মের পর্য্যন্ত মঙ্গলগ্রহে বাস করা অসম্ভব! অতএব মঙ্গলে মানুষের বাস যে নেই একথা বলাই বাহুল্য!



পাক-চক্র

শ্রীবটকৃষ্ণ রায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গণেনবাবুর সুসজ্জিত কক্ষ

(টেবিলের ধারে বসিয়া গণেনবাবু কাগজ পত্র দেখিতেছেন। তাঁহার গায়ে ড্রেসিং গাউন, চোখ চশমা ও হাতে একটি লাল পেন্‌সিল। চোখ হইতে চশ্‌মা খুলিয়া ও পেন্‌সিল কাগজের উপর রাখিয়া 'কলিংবেল' টিপিলেন। একজন ভৃত্য প্রবেশ করিল।)

গণেন। ওরে! গাড়ী বার ক'র্‌তে বল।

ভৃত্য। দিদিমণি মোটর নিয়ে বেরিয়েছেন। মা ও গেছেন—বলে গেছেন এখনই ফিরবেন।

গণেন। আচ্ছা যা। ড্রাইভারকে কোথাও এখন যেতে মানা ক'রে দিস্‌।

(এমন সময় বাহিরে একটা গোলমাল শুনা গেল। ক্ষণ পরেই কার্ত্তিককে ধরিয়া লইয়া রমেন প্রবেশ করিল ও একটা ইজি চেয়ারে তাহাকে শোয়াইয়া দিল; পশ্চাৎ পশ্চাৎ মণিমালা ও তাহার মা ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিলেন।)

কমলা। দেখ দেখি তোমার মেয়ের কাণ্ড! ভাল মানুষ ছেলে রাস্তা দিয়ে আসছিল, আর তোমার মেয়ে—মহিষমর্দ্দিনী—একেবারে তার গায়ের ওপর গাড়ী তুলে দিলে!

রমেন। ওর বেশী লাগে নি, মাসীমা! তুমি মণিকে অত ব'কো না।

গণেন। কিরে মণি, তুই ছেলেটিকে মোটর চাপা দিয়েছিস্‌?

রমেন। না মেসোমশাই, চাপা নয়—শুধু ইয়ে—এই গায়ে একটুখানি ধাক্কা লেগে গেছ্‌ল।

মণি। আমার কোনও দোষ নেই বাবা; দেখলাম উনি ফুটপাথে উঠে যাচ্ছেন। আমি খুব আস্তে গাড়ীটা দরজায় লাগাচ্ছিলাম, এমন সময় উনি হঠাৎ নেমে দাঁড়াতেই, একটা মাডগার্ড একটু ওঁর গায়ে লেগে গেল।

কমলা। একটু লাগা নয় মণি! বাছা আমার "সপাটে" পড়ে গেল। কিন্তু এমন ভাল ছেলে গো, যে তখনই উঠে প'ড়ে হাস্‌তে লাগল—বলে "আমারই দোষ—আমার দেখা উচিত ছিল।"

রমেন। মণি, তুমি দৌড়ে "জলপটি" নিয়ে এসে ওর হাত দুটোয় লাগিয়ে দাও। (কমলার প্রতি) সত্যিই মণির কিছু দোষ নেই। ও যেন তোমাদের আস্‌তে দেখে কেমন ইয়ে হয়ে গেল। নিজেকে সামলাতে পারলে না।

গণেন। তবে আর মণির কি দোষ বল? হাঁ করে রাস্তা চল্‌লে, মানুষে তার কি করবে?

(মণি আসিয়া জলপটি লাগাইয়া দিল)

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, ওঁর দোষ একেবারেই নেই। আর, এখন আমি কোন ব্যথাই বুঝতে পারছি না। জলপটি দিতেই সব ব্যথা যেন জল হয়ে গেল।

গণেন। তোমার কোনও মতলব ছিল না ত হে বাবু!

কার্ত্তিক। (অপ্রতিভভাবে) আজ্ঞে?

কমলা। তোমার যেমন কথা--তোমার মেয়ে দিলে ধাক্কা, আর ওর থাক্‌ল মতলব।

গণেন। তুমি জান না—মতলব কখনও কখনও থাকে। বল না হে ছোক্‌রা, কিছু মতলব ছিল? সম্প্রতি মোটা টাকার লাইফ ইনসিওর করেচ না কি?

কার্ত্তিক। আজ্ঞে, না।

গণেন। (রমেনের প্রতি) আমি শুনেছি অনেক ছেলে 'লাভে' টাভে প'ড়েও ঐ রকম আত্মহত্যা করতে গিয়েছে।

কার্ত্তিক। (বিরক্তির ভাণ করিয়া) আমি loveএ পড়ে? উঃ—

কমলা। (তাড়াতাড়ি) না বাবা, না! ওসব কথার তুমি জবাব দিও না।

রমেন। কার্ত্তিক আমার বন্ধু, মেসোমশাই! ওর শরীরে—বা মনে—কোনও দোষ নেই। স্ত্রীলোককে ভালবাসা দূরে থাক, ওর কেমন তাদের ওপর একটা ইয়ে—অর্থাৎ কেমন একটা—মানে ভালবাসা ত সম্ভবই নয়, বরঞ্চ ইয়ে (মণি একটা জলপটি ভাল করিয়া লাগাইয়া দিতেছিল, পটিটা

তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। সে কুড়াইতে ভুলিয়া গিয়া রমেনের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল)।

কার্ত্তিক। (বেদনার ভাণ করিয়া) উঃ!

গণেন। আহা—মণি! দেখতে পাও না? পটিটা পড়ে গেছে যে! ভাল ক'রে লাগিয়ে দাও (পাশের ঘরে প্রস্থান)

(মণিমালা জলপটি পুনরায় লাগাইল)

কার্ত্তিক। আঃ—(মণির প্রতি গদগদভাবে চাহিতে —মণি চোখ ফিরাইয়া মুখ নত করিল)

রমেন। দেখ মাসিমা, আর্থিক অবস্থা এদের খুবই ভাল —আর লেখাপড়াতেও কার্ত্তিক বেশ পণ্ডিত। গেলবারে 'ল' পাশ করেছে। মা বাপের ছোট ছেলে। এবার ত ওর বিয়ে করা উচিত?—এ্যাঁ? কি বল মাসিমা? এখন বউ নিয়ে এলে সে কত আদরের বউ হবে! ও কিন্তু কিছুতেই—

কমলা। তেমন ভাগ্যিমানি মেয়ে জন্মে থাকলে তবে ত ওর বিয়ের মন হবে। রূপে-গুণে এমন ছেলেকে যারা জামাই পাবে তাদের কত বড় অদৃষ্ট! উনি আবার এই ছেলেকে বলেন—"আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল;" কথার ধরণ দেখ না!

রমেন। আমি কিন্তু ওকে ছাড়বো না, মাসীমা! একটি যথার্থ সুন্দরী মেয়ে—এই কিছু লেখাপড়া শিখেছে—ভাল গান-টান গাইতে পারে—এই রকম একটি মেয়ের সন্ধান করচি দাঁড়াও। বিয়ে কোর্ব্বো না বল্লেই বিয়ে কোর্ব্বো না? আর সুবিধেও যে আছে। বড় ছেলে ত নয়—কেবল বোন্ ছাড়া সব ঘরেই হবে। বেশী খুঁজতে হবে না।

কমলা। ওর পছন্দ ত নয়, তুই তোর নিজের পছন্দ মত কথা বলচিস্। লেখাপড়া, গান বাজনা ও সব কি ওর—

রমেন। না মাসীমা! ও বিয়ে করতে নারাজ বটে, কিন্তু মেয়েরা লেখাপড়া শেখে, গান গায়, এমন কি মোটর চালায়, তাও ওর পছন্দ।

(কার্ত্তিক মণিমালার মুখের প্রতি চাহিতেই মণির সহিত চোখো-চোখি হইয়া গেল। মুহূর্ত্ত পরে উভয়ে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল)

কার্ত্তিক। একটু ঠাণ্ডা জল! উঃ!

কমলা। যা না রে, মণি! সরবৎ তৈয়ারী আছে, একটু নিয়ে আয় দেখি। (মণির প্রস্থান)

রমেন। আমি ততক্ষণ একটা গাড়ী ডাকি মাসীমা।

কমলা। (একটু দূর হইতে) এখনই যেতে পারবে কি ও ছেলে?

রমেন। খুব পারবে।

কার্ত্তিক। (রমেনের দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া—এখানে আর একটু থাকিবার ইচ্ছা জানাইল) উঃ—উঃ—

রমেন। (কার্ত্তিকের নিকটে সরিয়া দাঁড়াইয়া, চাপা গলায়) এই চুপ কর্।

কমলা। বলচি, আর একটু থেকে গেলে হোতো না?

কার্ত্তিক। (কাতরভাবে) তা—একটুখানি—না হয়—উঃ—

রমেন। (নিম্নস্বরে) বাড়াবাড়ি করিস্‌নে হতভাগা! কাল তোকে ফের নিয়ে আসবো। (কমলার প্রতি) মাসীমা, আজ ওর—ইয়ে—যে চোট্‌টা লেগেছে, দেরী করে যেতে গেলে, হয়ত তখন আর ওকে নড়ানই যাবে না।

(সরবৎ লইয়া মণির প্রবেশ)

রমেন। এই কার্ত্তিক! আমি চট্ করে গাড়ীটা নিয়ে আসি— (প্রস্থান)

মণি। (সরবতের গ্লাস কার্ত্তিকের কাছে রাখিয়া)—একটুখানি সরবত—

কার্ত্তিক। (গ্লাস ধরিয়া তুলিতে অক্ষম এইরূপ ভাণ করিয়া) একি হোলো?—হাতটায় জোর পাচ্ছি না কেন? নিজে কি করে খাবো?

(গণেনের প্রবেশ)

গণেন। মণি! বেচারিকে তুমি খাইয়ে দাও না! একটু বিবেচনা নেই তোমাদের?

(মণি কার্ত্তিককে খাওয়াইতে লাগিল। সে পরমসুখে খাইতে লাগিল)

গণেন। (কমলার প্রতি) এই তোমার শিক্ষা আর শাসনে, মণিও সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। একটা কি অকারণ সঙ্কোচে মানুষের যেটা অবশ্য কর্ত্তব্য—তা করতেও সাহস পায় না।

কমলা। তোমার মেয়েকে মোটর চালাতেও কি আমি

শিখিয়েছি নাকি? একটু সেকেলে হলে বরং ওর ভালই হতো।

গণেন। (নিম্নস্বরে) হাঁ যেমন ভাল সেদিন নেমন্তন্ন বাড়ীতে তোমার হয়েছিল! সে-কেলে হ'য়ে চোখ না চেয়ে চলার চমৎকার শিক্ষা হ'য়েছিল ত?

(রমেনের প্রবেশ)

রমেন। গাড়ী এসেছে। এবার ওকে নিয়ে যাই মেসোমশাই!

গণেন। আচ্ছা—কিন্তু ছেলেটি কেমন থাকে, কাল জানিও। আর, যদি বেশ ভাল থাকে ত সঙ্গে করে এখানে বেড়াতে নিয়ে এসো।

কার্ত্তিক। কাল আমি ভালই থাকব নিশ্চয়!

রমেন। (নিম্নস্বরে) আঃ! থাম্‌না গাধা।

গণেন। তা হলে রমেন, কাল এখানে চায়ের নিমন্ত্রণ রইল—তোমাদের দুজনের।

রমেন ও কার্ত্তিক। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মদনবাবুর বাটীর কক্ষ

প্রাণেশ। আচ্ছা মা! বিয়ের দিনটা তোমরা অত দেরী করে ফেললে কেন বল দেখি?

সুরমা। এর মধ্যে পাঁজিতে যে আর দিন নেই, বাবা। ঐ দিনটা এ মাসের সব প্রথম বিয়ের দিন। তাও আবার লগ্ন সেই রাত্রি দু'টোর সময়।

প্রাণেশ। দ্যাখো, কেন যে তোমরা মিছে পাঁজি পাঁজি করে বেড়াও, তা জানিনে। এই সাহেবেরা ত পাঁজি পুঁথি দেখে না। ওদের বিয়ে হয় কি করে? আর তাতেই যেন ওদের সর্ব্বনাশ হচ্চে?

সুরমা। ওরে যাদের যা নিয়ম, সেটা মেনে চলতে হয়। পুরুষানুক্রমে যে তাই চলে আসচে।

প্রাণেশ। যে জিনিষটার কোনও মানে নাই তাই যদি তাঁরা নির্ব্বিবাদে মেনে আসতে পারেন, আমি তাঁদের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারি না।

সুরমা। বলিস কি তুই? অমন কথা মুখে আন্‌তে আছে?

প্রাণেশ। কেন থাকবে না? একটা যা-তা নিয়ম কোরে দিলেই হলো? তোমরা বলে পাঠাও যে ঐদিন আমি বিকেলবেলা বিয়ে কোর্ব্বো।

সুরমা। তাই নাকি হয়? এমন কথাও কখন শুনি নি। বল্‌তে পারিস তুই ওঁকে গিয়ে বল্‌গে যা। আমি ত এখনও পাগল হই নি, যে ঐ সব কথায় থাকবো।

প্রাণেশ। যা খুসী তোমরা কর। এর পরে কিন্তু যদি কিছু গোল হয় তখন আমাকে দুষো না।

(মদনের প্রবেশ)

সুরমা। কি সাহেব ছেলেই হয়েছে তোমার—বলে বিকেলবেলা বিয়ে করবো। (হাসিয়া) আবার বলে "বিয়ের দেরী ক'র্‌চ কেন?"

মদন। সাহেবদের সঙ্গে রাতদিন মেলামেশা করে ও একটু ঐ রকম হয়ে গেছে। ও সব দুদিনে এইবার সেরে যাবে। তা, হ্যাঁগা! আমি একবার ক'নেটি পর্য্যন্ত দেখতে যাবো না?

সুরমা। তুমি আর এখন দেখতে গিয়ে কি করবে? ছেলের যখন এমন পছন্দ হয়েচে যে আজই তাকে ঘরে আনতে চায়—তখন তোমার দেখতে গিয়ে কি লাভ? মেয়ে, কিম্বা তার বাপ মা, কি তাদের আর কোনও কিছু—যদি তোমার মনোমত নাই হয়, তবু তোমার ছেলের সুখের জন্য এখন আর কোন আপত্তি করা চলবে না।

মদন। তা বটে!

সরমা। ও গো, কে আসছে তোমার কাছে।

মদন। তাই ত! তুমি একটু সরে যাও।

(সুরমার প্রস্থান)

মদন। এই যে নলিনবাবু! কি মনে করে? আসুন, আসুন।

নলিন। এলাম আপনার কাছে দুটো কাজে। আপনার "লাইফ্" ত আমি ইনসিওর করিয়েছিলাম—এইবার ছেলেকেও একটু বলে দিন।

মদন। হ্যাঁ ও ক'র্‌বে। তবে সম্প্রতি ওর বিয়ের স্থির হয়েছে। সেইটে চুকে গেলে আমি ওকে বলে দেবো।

নলিন। বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে? এঁ্যা—বলেন কি? আমিও যে একটা ঘটকালি করতে এসেছিলাম। তা কোথায় স্থির হোলো?

মদন। উকিল গণেন ঘোষের মেয়ের সঙ্গে।

নলিন। মদন মিত্তিরের লেনে? এই সোমবার বিয়ের দিন ঠিক ছিল?

মদন। ছিল কেন? আছে।

নলিন। হ্যাঁ, কিন্তু সেখানে—আমার এই কার্য্যসূত্রে গিয়ে, যে-রকম কথাবার্ত্তায় বুঝলাম তাতে তাঁদের মতটা যেন বদ্‌লে গেছে বলে মনে হোলো। দেখুন, আমি যে মেয়েটির কথা বলছি—সেটি সকল রকমে ভাল। তারও এক জায়গায় বিয়ের স্থির ছিল—এই সোমবারে।

মদন। তার পর?

নলিন। তার পর পাত্র সম্বন্ধে কতকগুলো খবর পেয়ে সে বিয়ে তাঁরা দেবেন না। আমি যদি ঐ দিনে কোনও ভাল পাত্রের সঙ্গে এই মেয়ের বিয়ে দিতে পারি—তাহলে কন্যাকর্ত্তা একটা মোটা টাকা ইন্‌সিওর ক'র্‌বেন ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েচেন।

মদন। কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত না হলে ত—

নলিন। তাদের যে আবার ঐ দিনে বিয়ে নইলেই নয়। উদ্যোগ আয়োজন হ'য়ে গেছে কি না! (একটু চিন্তার ভাণ করিয়া)—তা হেস্তনেস্ত আমরা নিজেরাই ত করে নিতে পারি।

মদন। কেমন করে?

নলিন। আপনি গণেনবাবুর মেয়েকে দেখেছেন ত?

মদন। না।

নলিন। তাঁদের বাড়ীতেও যান নি?

মদন। না।

নলিন। ও! (একটু চিন্তা করিয়া) তাহলে একবার নিজে মেয়ে দেখবার অছিলায় যান না। তাহলেই হাওয়াটা বুঝতে পারবেন। তার পর না হয় আমি আপনাকে কাঁসারিপাড়ার সে মেয়ে দেখিয়ে আনবো। এর বাপ মস্ত জমিদার ছিলেন। মেয়ের নিজ নামে অগাধ বিষয় রেখে গেছেন।

মদন। বটে? তবে তাই যাওয়া যাবে।

নলিন। হ্যাঁ কালই যাবেন। নইলে অতবড় সম্বন্ধটাও হয় ত হাতছাড়া হয়ে যাবে। লোকে সন্ধান পেলে কি আর ছাড়বে মশাই!

মদন। আচ্ছা, কালই আফিসের ফেরত--ছ'টার সময়—ওদের ওখানটা হ'য়ে আসবো।

নলিন। যে আজ্ঞে। আমি তাহলে আবার এসে খবর নেবো। আজ উঠি! নমস্কার!

মদন। আচ্ছা, নমস্কার—

(নলিনের প্রস্থান)

* * * *

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রীমার্স্‌ ক্লাব সংলগ্ন লন্ (lawn)

(ক্লাবের ভোজ শেষ করিয়া জনকয়েক মেম্বর আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত। গল্প সিগারেট প্রভৃতি চলিতেছে।)

কার্ত্তিক। নাঃ - আজ এখানকার খাওয়াটা বড় জোর হ'য়ে গেল।

সরোজ। খেতে যাবার আগে রমেন যে রকম সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে, সে আগুন পেটের ভিতর ছড়িয়ে গিয়ে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবেই ত। কিন্তু ভাই তোমার প্রেমের লক্ষণগুলো বিলক্ষণ গোলমেলে।

কার্ত্তিক। কেন বল্ দেখি?

সরোজ। যে প্রেমিক প্রতীক্ষায় বসে আছে তার ক্ষিদে, তেষ্টা, ঘুম, কিছুই থাকে না। কিন্তু তোর যেন সব উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।

কার্ত্তিক। (কীর্ত্তন সুরে) ওরে!

পাব না বলিয়া তাহারে স্মরিয়া
মরি যে রে আপশোসে।
হতাশ হইয়া পেটটা ঠুসিয়া
খেয়েছি বেজায় ক'সে॥

নলিন। (গুড়গুড়ি হস্তে প্রবেশ)

আমি নলটি ধরিয়া—নয়ন মুদিয়া,
তামাক খাইব ব'সে॥

সরোজ। নলটা একবার দাওনা নলিন্‌দা! দুটো টান দিয়েই দিচ্চি—অনেকক্ষণ খাইনি।

নলিন। বঁধুয়া—বড় সুখের কথাটি ওরে!

দিব পরিপাটী দইএর মাথাটি
দুধের সরটি তোরে॥

কার্ত্তিক। আচ্ছা, আমি প্রস্তাব করচি যে তোমাদের

মধ্যে চট করে যে একটা তামাকের গান গাইতে পারবে সেই আগে টান্‌বে।

নলিন। Right you are! তবে শোনো, আমাকে যে তামাক ধরিয়েছিল তার নিজের বাঁধা গান।

(গীত)

গুড়গুড়ি তোর নলটি মুখে নিয়ে আমি কত আরাম পাই।
সকালে—একলা ব'সে, কি মজাসে, ভুড়ুক ভুড়ুক
গুড়ুক তামাক খাই।
বালাখানার মিঠে কড়া—তাওয়া দেওয়া কোল্‌কে ভরা,
তাকিয়ায় ঠেস লাগিয়ে, নলটি নিয়ে কেবল তুলি হাই॥
দুপুরে—একটু শু'লে, নলটি আমার ঘুমে ঢুলে,
আলসে প'ড়ে খ'সে, ভালবেসে যাচে বুকে ঠাঁই॥
রাতে—যখন তামাক টানি, গিন্নি পানের ডিবে আনি,
সোহাগে বস্‌লে কাছে, ভাবি পাছে বলে "গয়না চাই"।

সকলে। ফার্ষ্ট ক্লাস! নলিনদারই জয়।

কার্ত্তিক। (গুড়গুড়ির নলটি নলিনের হাতে দিয়া) এটি তোমারই নিশ্চয়!

সরোজ। (নলিনের প্রতি) তা হলে মদনবাবুকে কনে দেখার প্রস্তাবে রাজি করে এসেছ তুমি। বাহাদুর ছেলে যা হোক!

নলিন। হ্যাঁ সব ঠিক করে এসেছি মদনবাবুর সঙ্গে। কাল বৈকালে ছ'টা নাগাদ—তিনি স্বয়ং গণেন বাবুর বাড়ী আসছেন।

রোহিণী। বেশ! আমরা তার একটু আগে গণেন বাবুর ওখানে গিয়ে, তাঁর কাণে এমন মন্ত্র দেবো যে তাঁকে একেবারে তুবড়িটি তৈয়ারী করে রাখব। একটু ফুলকি মদনবাবুর মুখ থেকে পড়লে—আর দেখতে হবে না।

রমেন। আর কার্ত্তিক! তুমিও আমার সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির থাকবে। বুঝেছ?

কার্ত্তিক। বুঝি, আর না বুঝি—তোমার সঙ্গে যাবও ঠিক, আর হাজিরও থাকব নিশ্চয়।

রমেন। আজ আর তোর গায়ে ব্যথাটাথা কিছু নেই ত?

কার্ত্তিক। আরে রামোঃ! ঐ ধাক্কাটুকুতে ব্যথা হবে? খেপেছ তুমি?

রমেন। আচ্ছা তুই রাস্তা পার হয়ে বেশ ত ফুটপাথ অবধি উঠে এলি। আবার পেছিয়ে রাস্তায় নেমে গেলি কেন, বল্ দেখি?

কার্ত্তিক। ঐখানটাতেই ত' হোলো কবিত্ব।

রমেন। কবিত্ব? মোটরের ধাক্কার মধ্যে কবিত্ব কোথায়—তা ত' বুঝিনে।

কার্ত্তিক। (ভাবাবিষ্টের ভঙ্গীতে) ফুটপাথে সবে উঠেছি—এমন সময় মোটরের হর্ণ্ শুনে যেমন বাঁ দিকে চেয়েছি অমনি দেখি আমারই সেই মানস প্রতিমা আমার দিকে চেয়ে, চম্পক কোরকের মত আঙ্গুলগুলি দিয়ে, Horn এর Bulb টাকে নির্দ্দয়ভাবে নিপীড়িত করচেন। চূর্ণ কুন্তল নানারূপ লীলাভঙ্গে তাঁর মুখের উপর বিক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে যেন ক্ষিপ্ত করে দিলে (দ্রুত বলিয়া চলিল) অন্তরের ভেতর দোলা দিয়ে কে যেন আমাকে বল্লে—"কার্ত্তিক! এমন সুযোগ আর পাবি নে, এখন আর অগ্র-পশ্চাৎ ভাব্‌বার সময় নেই, অগ্র ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদ্দিকে রাস্তায় নেমে পড়্—তারপর তোর অদৃষ্ট।"

নলিন। আরে কেয়াবাৎ! একি কাণ্ড হোলো রে? ক্যাব্‌লা কার্ত্তিক একেবারে প্রকাণ্ড কবি হয়ে উঠল যে রে!

কার্ত্তিক। যখন মণিমালার মোটরের মাডগার্ড আমায় ধাক্কা দিয়ে ধরাশায়ী কল্লে, আমি সেই অবস্থায়—শুয়ে শুয়ে—আমার সর্ব্বস্ব তার শ্রীচরণ কমলে সমর্পণ করবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হলাম।

রমেন। ধন্য ত হলি, কিন্তু অন্য কথাটা তুই কি মোটেই ভাবলি নে? মোটর গাড়ীর একটা জঘন্য চরিত্র হচ্ছে এই—যে মানুষের দেহ চূর্ণ করে হাড়শূন্য করতে সে সকল যানের অগ্রগণ্য।

কার্ত্তিক। ওহে বুদ্ধিশূন্য! সাধারণ নিয়ম মান্য করতে গেলে সব সময় চলে না। চালকের নৈপুণ্য হিসাবে ও সব গাড়ীর ব্যবহার হয় বিভিন্ন। আমার অন্তরে একটা অসামান্য ভাবের বন্যা আসার জন্য, অন্য কথা আর তখন মনেই হোলো না।

রমেন। নেহাৎ ধাক্কা খেয়ে অক্কা পাওয়া তোর কপালে লেখা ছিল না তাই রক্ষা পেয়ে গেলি। তবে হ্যাঁ—করেছিস্ ভাল—no risk, no gain—এখন চল্।

চতুর্থ দৃশ্য

গণেন বাবুর সজ্জিত কক্ষ।

মণিমালা জিনিষ-পত্র গুছাইতেছে ও গান গাহিতেছে।

(গীত)

ওই সখি রে! যমুনাতীরে
বাঁশীর স্বরে মাতায়ে তোলে।
পরাণ যে রে কেমন করে
কাঁদন ভরা গানের বোলে॥
কাঁপন লাগে বুকের মাঝে,
কাঁকন পাছে চলিতে বাজে,
রণিলে নূপুর মরিব লাজে,
তাই সে আছে বাঁধা আঁচলে॥
ফিরিছে কাণু, লইয়া ধেনু,
ডাকিছে মোরে আকুল বেণু,
ব্যাকুল মনে ছুটিয়া এনু,
গোপন পথে সন্ধ্যা হ'লে—
চরণ রেণু কুড়ায়ে নেবো
বিরহ জ্বালা জুড়াবে ব'লে॥

[গণেন বাবু ও সরোজকে আসিতে দেখিয়া মণিমালার প্রস্থান]

(গণেনবাবু ও সরোজের প্রবেশ)

সরোজ। (পূর্ব্ববঙ্গের অনুকরণে) না মোশয়! অ্যাড্ডা বিহিত আপনার করতে অইব। অইলেনই বা তিনি রলোকের ছাইলা—যার ছাইলা তারই থাকেন জানি!

গণেন। (অন্যমনস্ক ভাবে) আপনার মামলাটা আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না!

সরোজ। হঃ! বোঝতে পারলেন না—না হি? আমি ঝ্ছি মোশয় বুঝ্ছি; আপনারে ইনসাল্টো করার ফি'ডা াপনার হাতের মধ্যে না পড়্লে কিছু কাজ অইব না। াই লয়েন। (পকেট হইতে ফি'র দরুণ টাকা বাহির রিয়া টেবিলে রাখিলেন)

গণেন। না—না, তা নয়। (টাকা লইলেন) আপনি লুন না—আর একটু আস্তে আস্তে বলবেন।

(উভয়ের উপবেশন)

সরোজ। উঁ! আচ্ছা আমি—আস্তেই কইছি।

গণেন। বলুন—একটু সংক্ষেপে; খালি কাজের কথাটুকু।

সরোজ। হঃ, কাজের কথা কইবার লাইগা আসছি—কাজ সাইরাই চইলা যাইমু। ঐ যে গণেন মিত্রের লেনে মদনবাবু কেডা আছে না—তার ছাইলা—(মুখ বিকৃত করিয়া) ওর নামডা যেন কেমন!

গণেন। আরে মশাই আপনাকে পে'রে ওঠা যাবে না। ব্যাপারটা কি বলুন।—

সরোজ। শোনেন—ওডা খুব ওড়্তে লাগছে—ওড়া বোঝেন না হি?

গণেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ—আপনি বলে যান।

সরোজ। এই ডানাকাটাদের সাথে লইয়া ওড়ছে আর কি! তাই কয়খানা গহনা আমার কাছে বন্দক রাখচে। অখন দেহি সে গুলান—(কতকগুলি কেমিক্যালের গহনা বাহির করিল)

গণেন। কে? মদনবাবুর ছেলে "প্রাণেশ"?

সরোজ। হ, মোশয়! আপনি চমক মাইরা ওঠেন ক্যান্? সে আপনার কোন কুটুম্ব না হি?

গণেন। (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ।—

সরোজ। হঃ! তা বুঝ্ছি। তবে আর আপনার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নাই। আপনারে দিয়া আমার কোন কামই অইব না। নমস্কার। (প্রস্থান)

গণেন। ওগো—শুন্চো? (কমলার প্রবেশ) তুমি শুনেছ—লোকটা যে সব কথা বলে গেল?

কমলা। তাই ত! এ সব কথা কে জানবে বলো?

গণেন। আমি মনে করতে পারতাম যে কেউ ভাঙ্চি দিতে এসেছে; কিন্তু লোকটা কথা কইতে সুরু ক'রেই—ফিয়ের দরুণ অতগুলো টাকা দিয়ে দিলে। টাকা খরচ ক'রে, মেয়ের বাপের কাছে কেউ ভাঙ্চি দিতে আসে—এ কথা কখনও শুনি নি।

কমলা। সত্যি এখন যে আমার বড় ভয় করচে গো! সে ছেলেকে দেখেই আমার "কেমন কেমন" মনে হয়েছিল; কেবল "অরুদি"র কথায় আমি অমত করি নি। আরও কত কি শুনতে পাবো তা কে জানে?

গণেন। এখন মনে হচ্চে এ সম্বন্ধ না এলেই ভাল হতো।

কমলা। হ্যাঁ নইলে এই কার্ত্তিক—সত্যিই কার্ত্তিক! দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়—আমি ওকেই জামাই করতাম।

গণেন। তা আমাদের একটা মেয়ে—ওর পক্ষে যা ভাল হবে—তা আমরা এখনো কোর্বো। এ আবার কে আসে? (কমলার প্রস্থান)

(মাতালের ভঙ্গীতে রোহিণীর প্রবেশ)

রোহিণী। আপনার নাম গণেনবাবু?

গণেন। (বিরক্তভাবে) হ্যাঁ—আপনি কে?

রোহিণী। আমার নাম অখিল—আপনি ত উকিল?

গণেন। আপনার কি চাই?

রোহিণী। আমি প্রাণেশের—প্রাণের বন্ধু—আমরা দুজনে booze—bosom friend.

গণেন। তা বেশ, এখানে কি দরকার?

রোহিণী। আমার আর কোনও প্রকার দরকার নেই, কেবল বন্ধুর জন্যে—booze—bosom friend এর জন্যে

গণেন। (রাগতভাবে) তা' আমার কাছে কি?

রোহিণী। আপনার কাছে যে এইমাত্র এসেছিল, সে আপনার হবু জামাইকে কাবু করবে বলে ঘুরে বেড়াচ্চে। ওর মকর্দ্দমা আপনি নর্দ্দমায় ফেলে দেবেন। আপনি নেবেন না, ওর মকর্দ্দমা।

গণেন। আচ্ছা, তার জন্যে মশাইয়ের আসার আবশ্যক ছিল না।

রোহিণী। না—না, তবু—আপনি হবু শ্বশুর—আমার প্রাণের বন্ধুর শ্বশুর (কাঁদিয়া ফেলিয়া) আপনি আমার গুরুজন। আপনাকে—(পা জড়াইয়া ধরিল)

গণেন। এই—এই—তুমি বাইরে যাও দেখি।

রোহিণী। সে লোকটা আমার বন্ধুর এখন শত্রু। সামান্য টাকার জন্য সে—(কাঁদিতে লাগিল)

গণেন। (একগাছা লাঠি দেখাইয়া) বেরোও বলছি। এটা দেখেছ?

রোহিণী। (উঠিতে উঠিতে) ওটা বুঝি আপনার অতিথ-মারা লাঠি? না বাবা—যাচ্চি—(যাইতে যাইতে) হবু জামাইয়ের Bosom friend—তবু অতিথ-মারা লাঠি—ওরে বাবা! সব মাটি!

(রোহিণীর প্রস্থান)

গণেন। (বসিয়া পড়িয়া) উঃ বাবা! এ কতদূরে গিয়ে পড়েছি? (হাতে মুখ ঢাকিয়া মাথা নীচু করিয়া বসিলেন)

(মদনের প্রবেশ)

মদন। কৈ মশাই? গণেনবাবু বাড়ী আছেন নাকি? তাঁকে একটু খবর দিতে হবে যে—গণেন মিত্র লেনের মদনবাবু এসেচেন।

গণেন। (মুখ তুলিয়া দেখিয়া গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া উঠিলেন)

মদন। একি? আপনি—তুমি? (অবজ্ঞার ভঙ্গীতে) তুমি এখানে কি কর্‌তে এসেছ?

গণেন। আজ্ঞে এটা আমার বাড়ী কি না। (অতি সম্মানের ভাণ করিয়া) এই অধীনেরই নাম গণেন্দ্রনাথ ঘোষ।

মদন। বটে? তুমিই গণেন? একেবারে যে বিনয়ের খনি সেজে বসে আছ? ল্যাজে পা পড়েছে বলে বুঝি?

গণেন। আমার বাড়ী ব'য়ে অপমান করতে এসেছেন না কি?

মদন। আঃ! আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম! কি দুর্ভাগ্য!

গণেন। অ—অতটা দুর্ভাগ্য—আমার মেয়ের অন্ততঃ—আর হচ্ছে না নিশ্চয়! তোমার ছেলেটি যে একেবারে মহীরাবণের বেটা অহীরাবণ, তা কে জানতো?

মদন। আমার ছেলে—এই তোমার মত জাম্বুবানের বাড়ীতে, তার জুতোর ধুলো—বুঝলে, জুতোর ধুলো ঝাড়তেও এসে দাঁড়াবে না।

গণেন। ত্যাখো, এতক্ষণ যে আমার জুতোটাও ঝাড়ি নি, তাই সে ছেলের বাপ্ আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা কইছে—এই রকম করে।

মদন। কি রাস্কেল?

[উভয়ের হাতাহাতি সুরু হইল, এমন সময় রমেন ও কার্ত্তিক প্রবেশ করিল। রমেন ইঙ্গিতে মদনের সহিত কার্ত্তিককে লড়িতে বলিয়া অপর কক্ষে লুকাইল—কার্ত্তিক হুঙ্কার দিয়া মদনের ঘাড়ে পড়িয়া গণেনকে ছাড়াইয়া লইল ও মদনকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং গণেন বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

গণেন। উঃ! আর একটু হলে ঐ পাষণ্ডের হাতে প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! বাঁচিয়েচ বাবা! আর কি বোলবো? উঃ (ভিতর দিকে প্রস্থান)

(কার্ত্তিক চেয়ারে বসিল)

(রমেন, কমলা ও মণিমালার প্রবেশ)

রমেন। ভাগিয়ে দিয়েছ ত? আমাদের কার্ত্তিকের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয় এমন মানুষ এখনও জন্মায় নি।

(কমলাকে ও মণিকে কার্ত্তিকের হাতখানি দেখাইয়া) এমনি হাত যেন মাখনের মত নরম। কিন্তু ঘুষি বর্ষণ করবার সময়ে যেন একেবারে বজ্রমুষ্টি (কার্ত্তিক হাসিতে লাগিল)

কমলা। আহা ছেলে আমাদের জন্যে কত কষ্টই পেলে। কাল মণি দিলে অত বড় ধাক্কা। আজ আবার ঐ দস্যির সঙ্গে যুদ্ধ। বাছার এখনও গায়ের ব্যথা সারে নি।

রমেন। না—না, কিছুদিন আগেই ওর একটা ইয়ে—এই ব্যথা লেগেছিল। সেইটেই কাল একটু যেন ফের বেড়ে গিয়েছিল। আজ আবার নরম পড়েছে।

কমলা। উনি একটা ভাল ব্যথার মালিশ জানেন, তাই লাগিয়ে দিতে বোলবো? ওঁর হাতে অনেক লোকের সেরেচে।

মণি। (রমেনের প্রতি মৃদুস্বরে) ডেকে আনবো বাবাকে?

রমেন। না, না, তাঁকে ডাকবার দরকার নেই। তুমি একটা কাজ করো দেখি।

মণি। কি?

রমেন। একটু চা নিয়ে এসো। ততক্ষণ মাসীমার সঙ্গে আমার দুটো কথা আছে।

মণি। চা তৈয়ারী আছে—এখনই আনচি।

(মণির প্রস্থান)

(কমলা ও রমেন একটু দূরে দাঁড়াইলেন)

রমেন। মাসীমা! মণিরও সম্বন্ধ ত ভেঙ্গে গেল দেখচি। অথচ এই সোমবারে বিয়ের সব আয়োজন তোমাদের ঠিক। এখন তোমাদের যদি কার্ত্তিককে পছন্দ হয় ত বলো। আমি বোধ হয় সব স্থির করে দিতে পারি।

(মণিমালা চায়ের ট্রে লইয়া আসিল ও কার্ত্তিকের কাছে টেবিলে রাখিল। কার্ত্তিক কিন্তু সোজা হইয়া বসিয়া কমলার উত্তর শুনিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।)

মণি। (কার্ত্তিকের প্রতি) চা খান। এইটেতে কিছু pastry আর নোন্‌তা খাবার আছে। আমি আর একটু মিষ্টি আনি। (মণির প্রস্থান)

(কার্ত্তিক একাগ্রমনে রমেন ও কমলার কথাবার্ত্তা শুনিতেছে, আর যন্ত্রচালিতের ন্যায় চা ও জলখাবার খাইতেছে।)

কমলা। (রমেনের প্রতি) তুমি পারবে ও ছেলেকে রাজী করতে?

রমেন। সেদিন মোটরের ধাক্কাতে ওর উপকার হয়েছে মাসীমা! বুদ্ধির মালমশলা ওর মাথায় একটু বোধহয় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো ছিল—নাড়াচাড়া পেয়ে সব ঠিক জায়গায় এসে জড়ো হয়েছে। মণিমালাকে বিয়ে করতে চায় কিনা—কাল আমি ওকে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। এক কথায় ও ফস্ করে বলে ফেল্লে—"হ্যাঁ"।

(কার্ত্তিক চায়ের বাটিতে একটা চুমুক দিয়া নিম্নস্বরে বলিল "আঃ")

কমলা। একটু আগে ওঁয়াকে এই কথাটিই আমি বলছিলাম। উনি কার্ত্তিকের উপর খুব সন্তুষ্ট।

কার্ত্তিক। (প্রসন্নমুখে চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া) আ—

কমলা। কার্ত্তিকের বাপ মা রাজী হলে আমরা ওর সঙ্গেই মণির বিয়ে দেবো।

কার্ত্তিক। (চায়ের বাটীতে আবার চুমুক দিয়া আ—)

রমেন। আমি তোমাদের সুমুখেই ওর মুখের কথা নিচ্চি দাঁড়াও, মাসীমা। (কার্ত্তিকের কাছে আসিয়া) তুই বিয়ে করতে রাজী আছিস ত?

(জলখাবার ও চা খাইতে লাগিল)

কার্ত্তিক। কাকে?

রমেন। এই ধর—মণিমালাকে।

কার্ত্তিক। (মৃদুস্বরে) আবার ধরবো কেন? ঠিক্ ঠিক্ বলো না।

রমেন। আচ্ছা মণিকে বিয়ে করবি ত?

কার্ত্তিক। (জোর গলায় অথচ লজ্জিতভাবে) বাবাকে বলো গে।

রমেন। তা তো বোলবোই। তিনি আমাকে বলেই রেখেছেন যে কার্ত্তিক যদি কোন মেয়েকে পছন্দ করে—আর

সে যদি ভাল ঘরের মেয়ে হয়—তাহলে তাঁর কোনও আপত্তি থাকবে না। তুই ভাল করে বল্, ঠিক্ রাজী কি না?

(খাবারের প্লেট হাতে মণির প্রবেশ)

কার্ত্তিক। বা রে! আবার কি করে বলব? তুই ভারি বোকা! (হাসিল)

রমেন। (হঠাৎ কার্ত্তিককে টানিয়া তুলিয়া) বেশ! এখন তবে এস খোকা (উভয়ে প্রস্থানোদ্যত)

কমলা। (রমেনের প্রতি) আহা দাঁড়াও—জলখাবার টুকু খেতে যাও। তুমিও একটু খেয়ে যাও।

কাত্তিক। আজ্ঞে, আমার যথেষ্ট হয়েচে। (মণির দিকে চাহিয়া) চা, জল খাবার—সব চমৎকার!

রমেন। আমি আর দেরী করতে পারচি নে—মাসীমা! আমি এখনই কার্ত্তিকের বাড়ী যাচ্চি। (একটু হাসিয়া) এবার যেন দুপক্ষের কর্ত্তারা নিজেরা দেখাশুনা করে কথা-বার্ত্তা ঠিক করে নেন। (রমেনের প্রস্থান)

(কমলা ও মণিমালা তাহাদের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিতে লাগিল)

পঞ্চম দৃশ্য

মদনের বাটীর কক্ষ

(সুরমা অপ্রসন্ন মুখে আগে আগে যাইতেছেন। প্রাণেশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলেছে, তাহার পোষাকে আজ বিশেষ পারিপাট্য। হাতে রূপা-বাঁধানো মোটা ছড়ি একগাছি।)

প্রাণেশ। ছ্যাখো মা! সব কথায় তুমি অমন রাগ কোরো না ব'লচি।

সুরমা। রাগ কোর্ব্বো না? বলিস্ কি? ভদ্রলোককে কথা দেওয়া হ'য়ে গেছে—আজ বাদে কাল বিয়ে—এখন তাকে কোন্ মুখে ব'ল্‌তে যাব—যে তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে আমার ছেলে আর রাজী নয়।

প্রাণেশ। তা তোমরা এত দেরী করলে কেন? আমি ত' তখনই তোমাদের বলেছিলাম। তা নয়, তোমরা দিন দেখ্‌তে ব'সে গেলে।

সুরমা। তা ত' ব'লেছিলি—আর এই ক'দিনে অম্‌নি মন বদ্‌লে গেল?

প্রাণেশ। যাবে না? বাড়ীর বাইরের পৃথিবীটা যে কি রকম জোর চ'ল্‌চে তা ত' জানো না! তাই বুঝ্‌তে পারো না সব। মিনিটে মিনিটে মানুষের মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিচ্চে।

সুরমা। তোর মাথা মুণ্ডু! যত অনাসৃষ্টি!

প্রাণেশ। শুধু তিনটে দিন তুমি সন্ধ্যাবেলা বালিগঞ্জের "লেকের" দিকটা কিম্বা পার্কের ভিতরটা ঘুরে এসো দেখি। কিম্বা এই সব বায়োস্কোপ থিয়েটারের কাছাকাছি রাস্তায় একটু হেঁটে বেড়িয়ে এসো দেখি—তা হ'লে বুঝ্‌বে ব্যাপারটা কি।

সুরমা। তোর কি হয়েছে বল্ দেখি?

প্রাণেশ। আমার আর একজনের সঙ্গে ভাব হয়েছে। সে কি রকম জানো মা? এই কতকটা মার্লিন ডেট্রিস্, কতকটা মে ওয়েষ্ট, কতকটা এলিসা ল্যাণ্ডি, কতকটা গ্রেটা গার্ব্বো। তার ওপর কি রকম নাচে! ওঃ মিস্ সিম্‌কিকেও হার মানিয়ে দেয়। (সুরমা একদৃষ্টিতে ছেলের মুখের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে চেয়ে আছেন) তার গান শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুম আসে; তার এসেন্সের গন্ধে অজ্ঞান হ'য়ে যেতে হয়। বুঝেছ? ট্রামে "বাসে" যারা রোজ চড়ে তারা সকলেই জানে—সে যে কি বস্তু। অন্ততঃ এক ডজন লোককে সে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে।

সুরমা। সেই মেয়েকে তুই বিয়ে ক'র্‌বি?

প্রাণেশ। নিশ্চয়! কত লোক, শুধু আমায় হিংসে ক'র্‌তে ক'র্‌তে স্রেফ্ আত্মহত্যা ক'র্‌বে। এ একটা conquest.

সুরমা। তুই পাগল হ'য়েচিস্, না একেবারে গোল্লায় গিয়েচিস্—আমি ঠিক্ বুঝ্‌তে পারচি নে।

প্রাণেশ। সে যাই বলো, আমি তোমার ও "মণিমালা ফণীমালাকে" তা ব'লে বিয়ে করচি নে। উঃ—কি সুন্দর নাম বল দেখি! "তুফান—তুফান"! আমি আজ সন্ধ্যা-বেলা নিয়ে আস্‌বো তুফানকে আমাদের বাড়ীতে। তখন বল্‌বে "হ্যাঁ, ছেলের পছন্দ আছে।"

সুরমা। খবরদার বল্‌চি, আনিস্ নে এ বাড়ীতে। উনি একথা শুনলে তোকে আর আস্ত রাখবেন না। এখন আমরা বলি কি এদের, আমি শুধু তাই ভাব্‌চি। কথা দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়া—একি সোজা অপমান!

(পিছনে চাহিতে চাহিতে ছুটিয়া মহাদেব চাকরের প্রবেশ)

মহাদেব। মা-জী! বাবু বাহারসে আয়া—যায়সে

পাগলাকা মাফিক হো কে। আউর হামসে লাঠি মাঙ্‌তা—বোল্‌তা "খুন করেঙ্গে"।

প্রাণেশ। (ভয়ে) বাবা তাহ'লে শুনেচেন না কি এরই মধ্যে!

মহাদেব। ওহি বাবু আ গয়া— (প্রস্থান)

(অপরদিকে মদনের প্রবেশ)

মদন। ওরে ব্যাটা মহাদেব! আমার লাঠিগাছটা কোথা? (লাঠি খুঁজিতে লাগিলেন)

সুরমা। (মদনের সম্মুখে আসিয়া) এখন লাঠি কি হবে? (মদনের অবস্থা দেখিয়া) ওমা! এ আবার কি? জামা কাপড় ছেঁড়া, চুলগুলো উস্কো খুস্কো, মুখে কাল্‌শিরের দাগ—কি হয়েছে তোমার?

মদন। আমি খুন ক'রবো—একধার থেকে মেরে লাট্‌ ক'রে দেবো।

(প্রাণেশ ত্রস্ত হইয়া ঘরের এককোণে আশ্রয় লইল)

সুরমা। কাকে গো?

মদন। (শূন্যে হাত ছুড়িয়া আপন মনে ও উচ্চৈঃস্বরে) আগে ঐ ব্যাটাকে, তার পর যাকে সাম্‌নে পাব।

সুরমা। বটে? আমাকেও খুন করবে না কি?

মদন। তোমাকে কেন খুন করতে যাবো? এই তোমার আদুরে ছেলে—যেখানে বিয়ে ক'রবেন ব'লে অজ্ঞান হ'য়েচেন—উঃ! কি অপমান করলে! আমি লাঠি-পেটা ক'রবো ব্যাটাকে। (ছুটিয়া প্রাণেশের হাত হইতে মোটা ছড়িটা কাড়িয়া লইলেন)

প্রাণেশ। (ভয়ে তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া) না বাবা! আর কাউকে আমি বিয়ে করবো না—ঐ গণেনবাবুর মেয়েকেই আমি বিয়ে ক'রব।

মদন। বটে! গণেনবাবুর মেয়েকে! (লাঠির খোঁচা দিয়া) তবে ওঠ্‌—বেরো আমার বাড়ী থেকে!

(প্রাণেশ আস্তে আস্তে উঠিয়া হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিল)

সুরমা। তবু—বেরুবে তোমার বাড়ী থেকে? কেন, ও ত' ব'ল্‌চে যে—গণেনবাবুর মেয়েকেই বিয়ে ক'রবে।

মদন। (ব্যঙ্গসহকারে) হ্যাঁ, করবে বৈ কি! তা আমাকে তা'রা যত অপমানই করুক্‌! কেমন? দু'জনে এক জোট্‌ হ'য়ে সব পাকাপাকি করা হ'য়েচে। নিশ্চয় সব কথা জেনে-শুনেই হ'য়েচে।

সুরমা। কি বল্‌চ তুমি?

মদন। এই জন্যে আমাকে বলা হ'য়েছিল "তোমার আগে যাবার দরকার নেই—যেদিন বিয়ে সেইদিন সকাল-বেলা আশীর্ব্বাদ ক'রতে ওদের বাড়ী গেলেই চলবে"। অর্থাৎ তখন আর বিয়ে ভাঙ্গা কিছুতেই চল্‌বে না। এই ত?

সুরমা। তুমি কি তাদের ওখানে গিয়েছিলে না কি?

মদন। আজ্ঞে হ্যাঁ—গিয়েছিলাম। (চোয়ালের ঘুঁষির দাগের উপর হাত দিয়া সকাতরে) উঃ! আমি এর শোধ যেমন করে পারি নেবো। (প্রাণেশের গায়ে আবার লাঠির খোঁচা দিয়া) যদি ওখানে বিয়ে ক'রতে চাস্‌ ত বেরো আমার বাড়ী থেকে!

প্রাণেশ। আমি ওখানে বিয়ে করবো না—এই আমি প্রতিজ্ঞা ক'রচি।

মদন। (খুসি হইয়া) বেশ! এই ত ছেলে! আচ্ছা, যা তুই—দেখে শুনে একটি মেয়ে পছন্দ ক'রে আয়। এবার তুই যে মেয়ে পছন্দ ক'রবি, আমি তারই সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো—আর এই দিনেই দেবো—এ আমার প্রতিজ্ঞা। ঐ জাম্বুবানটাকে তারপর আমি একদিন উত্তম মধ্যম শিক্ষা দেবো।

সুরমা। তুমি তার বাড়ী গেলে, আর সে এম্‌নি ক'রে তোমায় মারলে?

মদন। তার সাধ্য কি যে আমাকে মারে। ওকে দেখেই আমার রাগ চ'ড়ে গেল। ধ'রেছিলাম—তার টুঁটি টিপে। কোথা থেকে একটা ছোঁড়া এসে তাকে বাঁচিয়ে দিলে। এ বেটা যেন Machine Gunএর মত ঘুঁষি ছাড়ে। উঃ! (পুনরায় চোয়ালটা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল)।

প্রাণেশ। তা'কে একবার আমায় চিনিয়ে দিও ত' বাবা! আমি দেখে নেবো সে কেমন Boxer.

মদন। থাম্‌, বেটা অষ্টাবক্র! তোকে কে দ্যাখে তার ঠিক্‌ নেই! তুই যা সহজে পারবি তাই কর্‌—চট্‌ ক'রে একটা মেয়ে পছন্দ করে আয়। এই দিনে তোর বিয়ে দিতে না পারলে, এখন আর আমার মান থাকবে না। (মুখের উপর হাত চাপা দিয়া প্রস্থান)

প্রাণেশ। (লম্ফ দিয়া) মা! দ্যাখো—কি জোর

বরাত তোমার ছেলের। নইলে এত সহজে (ভাবের সহিত) ওঃ! যে একাধারে মার্লিন ডেট্রিস্, এলিসা ল্যাণ্ডি, মে ওয়েষ্ট, গ্রেটা গার্বো and so on & so on (অতিশয় প্রফুল্লমনে সুরমার পায়ে টিপ্ করিয়া একটা প্রণাম ও দ্রুত প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

কার্ত্তিকের বাটী

প্রীতিভোজনে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ উপস্থিত।

রোহিণী। আমাদের কার্ত্তিকের বিয়েটা কিন্তু হ'ল বড় মজার।

সরোজ। তা আর বল্‌তে! মাছ ধরার চার ফেল্‌লে প্রাণেশ, কিন্তু মাছ এসে লাগল কার্ত্তিকের বঁড়সীতে।

রোহিণী। তোমরাই ত প্রাণেশের চার ঘুলিয়ে দিলে। তার জন্যে আমার এখন একটু একটু দুঃখ হ'চ্চে।

নলিনী। দুঃখের কোনও কারণ নেই হে! তুমি সে খবরটা রাখো না বুঝি? প্রাণেশও যে কার্ত্তিকের সঙ্গে একই দিনে বিয়ে ক'রে ফেলেচে। সে এখন রীতিমত প্রেমের তুফানে হাবু-ডুবু। এই দেখ না তা'রা এল ব'লে। আমি একখানা কার্ড মিসেস্ ও মিষ্টারের নামে দিয়ে এসেছি। সাহেব লোক যখন নেমন্তন্ন নিয়েছে তখন তারা জোড়ে নিশ্চয় আস্‌বে।

সরোজ। বল কি? ভাল, ভাল—তবু ভাল। তা বিয়ে করে হাবুডুবু সবারই খেতে হবে—অল্প বিস্তর। শুধু প্রাণেশ কেন? ধর ত, ভাই! ধর ত নলিনদা—আজ সেই গানটা—সেই—"নয়কো সোজা—ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে"—

(গীত)

নলিন। নয়ক' সোজা—ঘাড়ের বোঝা বিয়ে হ'লেই বাড়ে।
বাঁধন যে তার বেজায় ক'ষে বসে—নাহি ছাড়ে॥
গেরস্তদের বাস্তুভিটে রাখ্‌তে আলো ক'রে
ব্যাস্ত হ'য়ে আসেন নেমে আস্তো চাঁদটি ঘরে;
সুধা ছড়ান তুষ্ট যখন, রুষ্ট হ'লে পরে
সৃষ্টি কালো-কিষ্টি করেন ডুবিয়ে অন্ধকারে॥

(বরবেশে কার্ত্তিক ও কণে-সাজে মণিমালাকে সঙ্গে করিয়া রমেনের প্রবেশ)

রমেন। অন্ধঠাকুর ভালবাসার ভূতটি চাপান ঘাড়ে,
বরাত কিন্তু ব'সে ব'সে কলকাঠিটি নাড়ে।

(তুফান সহ প্রাণেশের প্রবেশ)

নলিন। পাকচক্রে কারও মুখের গ্রাসটি শেষে কাড়ে—
(আর) হালছাড়া কেউ তুফান-ভরা প্রেমের পারাবারে॥*

* এই নাটিকার মাত্র দুইটি দৃশ্য পূর্ব্বে পত্রান্তরে প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতীয় বীমার সরকারী বিবরণ

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

গত নভেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট একচুয়ারীর ১৯৩৪ খৃঃএর রিপোর্ট বা ব্লু-বুক* প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে ভারতবর্ষের ৩৪১টি বীমা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯৪টি প্রতিষ্ঠান ভারতীয় এবং বাকী ১৪৭টি বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে ব্যবসায় চালাইতেছে। অর্থাৎ বিদেশী বীমা কোম্পানী অপেক্ষা স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা ৪৭টি বেশী—প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষেই ইহা বিশেষ আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

১৯৪টি ভারতীয় বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১৪৫টি কেবল জীবন বীমার কাজ করিয়া থাকে। ৩৪টি জীবন বীমার সহিত অন্যান্য বীমার কাজ এবং ১৫টি জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার কাজ করিয়া থাকে।

পক্ষান্তরে দেখা যায় বিদেশী কোম্পানীগুলির অধিকাংশই জীবন বীমা ছাড়া অন্য বীমার কাজ করিয়া থাকে—ইহার উদ্দেশ্য কি, তাহা পরে বিবৃত করা যাইবে।

১৪৭টি বিদেশী বীমা কোম্পানীর মধ্যে ১২৩টি জীবন বীমার কাজই করে না, কেবল ১১টি মাত্র কোম্পানী জীবন বীমায় কাজ করে—বাকী ১৩টি জীবন বীমার সহিত অপরাপর বীমার কাজ করিয়া থাকে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—ভারতবর্ষের বীমা কোম্পানীগুলির

* The Indian Insurance Year Book, 1934

মধ্যে কাজ কর্ম্মের বিশেষ তারতম্য আছে। অর্থাৎ ভারতীয় কোম্পানী-গুলি জীবন বীমার কাজ কর্ম্মের দিকে বেশী ঝুঁকিয়াছে এবং অ-ভারতীয় বা বিদেশী কোম্পানীগুলি সামান্য পরিমাণ জীবন বীমার কাজ করিয়া তাহাদের সমগ্র প্রচেষ্টাকেই অন্যান্য বীমার কাজের দিকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—বিদেশী কোম্পানীগুলির এই ব্যবসায়িক মনোভাবের কারণ এই যে, বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জাহাজী কারবার গুলির মালেকান স্বত্ব—বিদেশীর এবং সেই সকল বিদেশী ব্যবসাদারগণ নিজ নিজ ব্যবসায় সম্পর্কিত নানাবিধ বীমার কাজ সম্পূর্ণভাবে বিদেশী কোম্পানীগুলির একচেটিয়া করিয়া দিয়াছে। বিদেশী কোম্পানীগুলির পরস্পর সাম্প্রদায়িক সহযোগিতা ও পক্ষপাতিত্ব থাকিবারই কথা। জীবন বীমা সম্পর্কেও এ কথা বলা যায় যে, ভারতীয় কোম্পানীতে বিদেশীর জীবন বীমা আছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। দুই এক ক্ষেত্রে ভারতীয় বীমা প্রতিষ্ঠানে বিদেশীর জীবন বীমা থাকিলেও তাহার মূল কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায়—"You Scratch mine and I scratch yours" ডান পকেটের মাল হাতফিরতি হইয়া বাম পকেটে না আসিলে ভারতীয় ব্যবসায়কে সাহায্য করিবার পাত্র বিদেশী নহে। কিন্তু ভারতীয়গণের এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত আমরা প্রতিনিয়তই দেখিতেছি—'স্বদেশী' গ্রহণের যত বড় মন্ত্রবাই কেন আমরা জোর গলায় প্রচার করি। বিদেশী বীমা কোম্পানীর এই প্রকার সংখ্যা-বাহুল্য এবং প্রতি বৎসর নূতন বীমা সংগ্রহের আধিক্য—আমাদের দেশ বলিয়াই সম্ভব হইয়াছে। অন্য দেশে দেখিতে পাওয়া যায়—স্বদেশী বীমা কোম্পানীর সংখ্যা এবং কাজের আধিক্য এবং পসারপ্রতিপত্তিই সর্ব্বাধিক; কেবল কয়েকটীমাত্র বিদেশী কোম্পানী সেখানে কাজ কর্ম্ম করিতেছে।

সেইজন্য আজ ভারতবর্ষে স্বদেশী বীমার সংখ্যা যে বিদেশীর চাইতে অধিক এবং তাহাদের কাজের প্রসারও যে বিদেশী কোম্পানীগুলিকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে ইহা খুবই স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত—। ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশী অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে ক্রমশঃই অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতেছে ইহা তাহারই পরিচয়। একচুয়ারী মহাশয়ের এই তথ্যটি ভারতবাসীমাত্রকেই বিশেষভাবে উৎসাহিত করিবে। কিন্তু ইহার অপরদিকও আছে—সেকথা আমরা পরে বলিতেছি।

ভারতবাসীর উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধনের উপযোগী আরো কয়েকটি তথ্য আমরা—১৯৩৪ সালের আলোচ্য ব্লু-বুকে দেখিতে পাই।

ভারতবর্ষের সমস্ত বীমা কোম্পানীগুলির ১৯৩৩ সালের একীভূত নূতন জীবন বীমার পরিমাণ ১৮৩ হাজার বীমা পত্রে পর্য্যবসিত ৩৩ কোটি টাকা এবং এই বীমা সংক্রান্ত প্রিমিয়াম বা চাঁদার বার্ষিক আয় সর্ব্বসমেত ১৭১ লক্ষ টাকা।

ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীতে ২৪ কোটি টাকার ১৫৫ হাজার পলিসি বা বীমা-পত্র গৃহীত হইয়াছে—এবং তাহার বার্ষিক প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয় ১২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু সে স্থানে অ-ভারতীয় বা বিদেশী কোম্পানী মাত্র ৯ কোটি টাকার জীবন বীমার কাজ করিয়াছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, আলোচ্য বর্ষে ভারতীয়-বীমা-কোম্পানীর গৃহীত বীমাপত্রের গড়পড়তা দাম যেখানে ১,৫৫৫৲ টাকা—সেখানে বিদেশী কোম্পানীর গড়পড়তা বীমাপত্রের দাম হইয়াছে ৩,১২৬৲ টাকা। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীর সংখ্যানুপাতে ৯ কোটি টাকার নূতন জীবন বীমার কাজ আদৌ অবজ্ঞা করিবার মত নহে। কেন না আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিদেশী জীবন-বীমা কোম্পানীর সংখ্যা মাত্র ১১টি—এবং সেস্থলে স্বদেশী জীবন-বীমা কোম্পানীর সংখ্যা—১৪৫টি। অর্থাৎ ১৪৫টি স্বদেশী কোম্পানী ২৪ কোটি টাকার কাজ করিয়া থাকিলে মাত্র ১১টি বিদেশী কোম্পানীর পক্ষে ৯ কোটি টাকার কাজ করা কম কথা নহে;—ভারতীয় বা স্বদেশী কোম্পানীগুলির পক্ষে ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। কারণ, দেশের হাওয়া যখন ঘরমুখী হইয়াছে তখন আপন আপন মাল্লামাঝি ঠিক করিয়া, 'জয় মা' বলিয়া তরী ভাসাইবার সমুচিত আয়োজনের প্রয়োজন এবং দেশের শুভ বুদ্ধি উদ্বোধন করিবার প্রকৃত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে। মতি স্থির রাখিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থরক্ষার কথাই আমাদিগকে ভাবিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে কলহ-কোলাহল বন্ধ করিয়া, ভারতীয় আর্থিক কল্যাণসাধনে সমগ্র ভারতীয় বীমা কোম্পানীগুলির সংঘবদ্ধ হইবার আশু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

যাহা হউক, ভারতবর্ষের হাল নাগাদ মোট চলতি বীমার পরিমাণ ধরিলেও দেখা যায় যে উহা ১৯৩৩ সালের শেষ পর্য্যন্ত—৮৬৭ হাজার বীমাপত্রে বোনাস সমেত ১৯৩ কোটি টাকা রহিয়াছে। এই সাকুল্য চলতি বীমার বার্ষিক প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয়—৯২।৩ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর অংশ—৬৩৬ হাজার বীমাপত্রে চলতি ১১৪ কোটি টাকা এবং ইহার প্রিমিয়াম বা চাঁদার বার্ষিক আয়—৫½ কোটি টাকা। সে স্থানে বিদেশী কোম্পানীর ২৩১ হাজার বীমাপত্রে চলতি মোট বীমার পরিমাণ ৭৯ কোটি টাকার।

জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমার ব্যাপারে বিদেশী কোম্পানীগুলিই ভারতবর্ষে প্রধানতম স্থান অধিকার করিয়া আছে।

১৯৩৩ সালের অন্যান্য বীমা বাবদ প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয় হইয়াছিল মোট ২৫০ লক্ষ টাকা; তন্মধ্যে ভারতীয় কোম্পানীর অংশ মাত্র ৭১ লক্ষ টাকা এবং বিদেশী কোম্পানীর অংশ বাকী ১৭৯ লক্ষ টাকা।—তুলনায় হতাশ হইতে হয়।

উপরোক্ত ২৫০ লক্ষ টাকার মধ্যে—১২৮ লক্ষ টাকার—অগ্নিবীমা, ৪২ লক্ষ টাকার নৌ-বীমা এবং ৮ ½ লক্ষ টাকার হরেক রকম বীমা বাবদ আদায় হইয়াছে। ইহার মধ্যে ভারতীয় কোম্পানী প্রায় ৩০½ লক্ষ টাকার অগ্নি-বীমা, ৭ লক্ষ টাকার নৌ-বীমা এবং ৩৪ লক্ষ টাকার হরেক রকম বীমা বাবদ আদায় করিয়াছেন।

জীবন-বীমা ছাড়া অন্যান্য বীমা—যথা—অগ্নি, নৌ, দুর্ঘটনা প্রভৃতি বীমার ব্যাপারে ভারতবর্ষ কেন পিছাইয়া আছে তাহার প্রধান কারণ আমরা পূর্ব্বেই অনেকটা বলিয়াছি। যতদিন পর্য্যন্ত সুবৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও জাহাজী কারবারগুলির মধ্যে বিদেশী বণিকের স্বার্থ সর্ব্ব-প্রধান হইয়া থাকিবে, যতদিন শিল্প-ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসী নিজের স্থান স্বার্থ সংরক্ষণের অনুকূল করিয়া তুলিতে না পারিবে, ততদিন

শুধু জীবন-বীমা ছাড়া অন্য প্রকার বীমার ব্যাপারে ভারতবর্ষে—স্বদেশী বীমা-প্রতিষ্ঠানের প্রাধান্য লাভের উপযুক্ত সুযোগ ও সুবিধা আসিবে না।

কিন্তু সুযোগ সুবিধা আসিবার পূর্ব্বে আমাদের স্বদেশী বীমা-কোম্পানীগুলির একতাবদ্ধ হইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। কিছুদিন হইতে আমরা লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—যে আমাদের বিভিন্ন বীমা কোম্পানীর কর্ম্মীগণের মধ্যে এমন অশোভন ও অন্যায় প্রতিযোগিতা চলিতেছে এবং নিজ নিজ স্বার্থসেবার জন্য তাঁহারা ভবিষ্যতের সুমহান জাতীয় কল্যাণের কথা বিস্মৃত হইয়া কেবল আত্মকলহে এবং তাহার অনিবার্য্য পরিণতি নিন্দা ও গ্লানি প্রচারে পঞ্চমুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এ ধারণা করা অসঙ্গত নহে যে—বীমার কর্ম্মক্ষেত্রে আজ ভারতীয় কোম্পানীগুলির মধ্যে যে অবাঞ্ছিত প্রতি-যোগিতার দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার পশ্চাতে কোনও ভারতীয় বা তথাকথিত ভারতীয়-কোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষেরও সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ সহযোগ রহিয়াছে। আমাদের এই 'আত্মলাঘবকারী" পরশ্রী-কাতরতা জাতীয় কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আজ যদি আমাদের নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থে অন্ধ হইয়া আমারই দেশের বর্দ্ধমান অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের গৌরব ও সার্থকতায় শ্লাঘাবোধ না করিয়া হীন উপায়ে তাহাকেও হীন করিবার গোপন চেষ্টায় ব্যাপৃত হই, তাহা হইলে সকল জাতির কল্যাণ ও অভ্যুত্থানের পথে আমরাই ত বিপত্তির সৃষ্টি করিব। আজ দেশের এই আর্থিক সমস্যার দিনে আত্মস্থ হইয়া মহাজনের পথই আমাদিগকে অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

নূতন বীমার কাজ বৃদ্ধি করিবার জন্য পরস্পর যে প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু যে প্রতিযোগিতা আমাদের জাতিকে হীনবল ও বিদেশীর কাছে আমাদের সকল প্রচেষ্টাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে, যে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ ও বিদূষণ-বিস্তার পাল্লাপাল্লি চলিতেছে এবং যে অশোভন ও কুৎসিত প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া আজ বিদেশী কোম্পানীগুলি আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে তাহা কি আজ সংঘবদ্ধ ভাবে আমাদের পক্ষে পরিত্যাজ্য নহে?

আজ জীবন বীমার ক্ষেত্রে ভারতীয় বীমা কোম্পানীর অগ্রগতি দেখিয়া যেমন আনন্দ হয়, উৎসাহ আসে, তেমনি সংখ্যালঘিষ্ঠ বিদেশী কোম্পানীরা যে সমগ্র ভারতীয় বীমা কাজের ½ অংশেরও বেশীর অধিকারী তাহা দেখিয়া--নিজেদের দুর্ব্বলতায় লজ্জিত ও দুঃখিত না হইয়া পারি না।

আলোচ্য সরকারী বিবরণ পাঠে যদি আমাদের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, কোথায় গলদ রহিয়াছে সে সম্বন্ধে চৈতন্যের উদয় হয়, তবেই আমার এ আলোচনা কতকাংশে সার্থক হইল মনে করিব।

দেবতার স্বর্গ তাই মোর কাম্য নহে—

শ্রীমৃণাল সর্ব্বাধিকারী এম্-এ

মোরা মর্ত্ত্যবাসী, নহি স্বর্গের দেবতা,
সুখ, দুঃখ, মিলন, বিরহ সহি' কত
মোরা রচি দৃশ্যমান বস্তুরাশি যত
বক্ষে জাগে সৃষ্টির আনন্দ চঞ্চলতা।
মোরা নহি দেবতার চেয়ে ছোট কভু,
আঁখি চাহে খুঁজে নিতে শূন্যের কিনারা
সমুদ্র পর্ব্বতে মোরা নহি গতিহারা,
এ জগতে মোরাই মোদের শুধু প্রভু।
হেথায় বেদনা আছে, আছে সুখ শত
আছে প্রেম, জন্ম-মৃত্যু, মিলন বিরহ,
আছে আশা, নিরাশা যে অশেষ অসহ
তারি মাঝে মোরা থাকি প্রেম-স্বপ্নে রত
আমাদের প্রেম নহে দেবতার খেলা
দেবতার মত নহি নিষ্ঠুর নির্ম্মম;
আমাদের প্রেম অপরূপ অনুপম,
হৃদয়ে বেদনা জাগে বিদায়ের বেলা।
নয়ন রহে না শুষ্ক আসন্ন বিরহে
লীলা-বধূ ছেড়ে গেলে ধূলির ধরণী
মোরা রচি কাব্য গান স্মৃতির স্মরণি
দেবতার স্বর্গ তাই মোর কাম্য নহে।

অভিজ্ঞতার মূল্য

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল

সতের

সকাল কাছারীর শনিবার। দ্বিপ্রহরে মক্কেলের প্রতীক্ষার বালাই নাই। গ্রীষ্মের আতিশয্যে ঘরের মধ্যে হাফরের মত উষ্ণ বাতাস, বাহিরে উত্তপ্ত লু'এর প্রকোপ! দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, অলস ঘর্ম্মাক্ত দেহ এলাইয়া, হাত পাখার সাহায্যে কোন ক্রমে একবার চক্ষু বুজিতে পারিলে ঘণ্টা কয়েক নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে স্থান পাইয়া কোন গতিকে সেদিনকার মত অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়!

গৃহিণীর অভাবে অবিন্যস্ত গৃহ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেতাব কাগজ, দোয়াত কলম, আসবাব পত্রের মধ্যস্থলে একটা তক্তাপোষের ময়লা ফরাসের উপর শায়িত রামজনমের প্রগাঢ় সুপ্তি সেদিন অপরাহ্নে ভঙ্গ হইল—সহৃদয় বন্ধুবর্গের অযাচিত শুভাগমনে!

মুরলীমনোহর সম্প্রতি 'ব্রীজ' খেলা শিখাইয়া মোক্তার সাহেবের মানসিক ক্লেশ অপনোদনের আয়াস পাইতে-ছিলেন এবং সঙ্গীরূপে ব্রিজবিহারী ও রামপদারথ কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাতে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া-ছিলেন। অবশ্য অবকাশও ছিল পর্য্যাপ্ত—যেহেতু প্র্যাক্‌টিশের বাজার ইদানিং সকলেরই মন্দা যাইতেছিল।

যথারীতি তাসের বৈঠক বসিল বটে, কিন্তু আসর যেন আজ কিছুতেই জমিল না। মোক্তার সাহেবের অন্যমনস্কতায় প্রায়ই খেলা ভুল হইয়া যাইতে লাগিল এবং সেজন্য ব্রিজবিহারী কয়েকবার মৃদু তিরস্কারও করিলেন।

রামপদারথ বিজেতার আনন্দে বলিলেন—ওঁর কি আজকাল মাথার ঠিক আছে যে এত খেয়াল রেখে খেলবেন? উনি যে রাজি হয়ে এতক্ষণ খেলে যাচ্ছেন, এই তোমাদের সৌভাগ্য!

ঠিক এই সময়ে এক প্রকাণ্ড ভুল করার জন্য রাম-জনমকে অনেকগুলা 'ডাউন' দিতে হওয়ায় ব্রিজবিহারী তাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মুরলীমনোহর বলিয়া উঠিলেন—আরে, এই 'রবার'টা শেষ করে যাও!

রাগিয়া ব্রিজ বলিলেন—'রবার'! বারোশো 'ডাউন' দিয়ে তারপর আবার 'রবার'! যাঃ, এমন খেলা না খেলাই ভাল।

মুরলী হাসিয়া বলিলেন—তোমায় বুঝি এই সাড়ে ছয়টার ট্রেণে বাড়ী যেতে হবে, তাই মোক্তার সাহেবের দোষ দিয়ে উঠে পড়লে?

বাহির হইয়া যাইবার সময় ব্রিজবিহারী বলিয়া গেলেন—যাবই ত, বাড়ী যাব না? আমার ত আর ওঁর মত হাল হয় নি!

রামপদারথ উঠিয়া জুতা পরিতে লাগিলেন—তবে আমিও আর বসে কি করবো। এই বেলা যাত্রা করা যাক্।

মুরলীর স্ত্রী গিয়াছিলেন ভাগলপুরে—পিত্রালয়ে। সুতরাং তাঁহার কোথাও যাইবার তাড়া ছিল না। তাহা ছাড়া তাঁহার ফৌজদারী প্র্যাক্‌টিসই ছিল ভাল, সেজন্য উকীল হইলেও মোক্তার সাহেবের সহিত বনিত অন্য সকলের চেয়ে বেশী।

ফরাসের উপর দেহটাকে ছড়াইয়া তাকিয়ায় হেলান দিয়া মুরলীমনোহর বলিলেন—এ কিন্তু অন্যায় হচ্ছে মিসেস লালের। আপনার তক্‌লিফের কথাটা একবার ভেবে দেখা ত উচিত।

রামজনম একটি চাপা দীর্ঘশ্বাসের সহিত বলিলেন—আজ হয়ে গেল সাতদিন!

মুরলী হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন—আচ্ছা, দু'দিন থেকে কিশোরী বেশ ভালই আছে ত শুনছি? তবে আর কেন সেখানে পড়ে থাকা?

রামজনম হেঁট হইয়া মৃদু মৃদু দুলিতেছিলেন। একটু পরে মুখ তুলিয়া কহিলেন—কে বল্‌তে যাবে ভাই? তা হলে এখনই একটা ঝগড়া বেধে যাবে। কি গলতিই না করে ফেলেছি!

হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতার ভঙ্গীতে মুরলী বলিতে লাগিলেন—তখনই আপনাকে বলেছিলাম। স্ত্রীলোককে

স্বাধীনতা কোন প্রকারেই দিতে নেই, ওদের বিশ্বাসই বা কি? একবার হাতের বাইরে চলে গেল, আর নাগাল মেলা ভার। সব কাযেই এগিয়ে বসে থাক্‌বে। আরে, পর্দ্দা যে আমাদের দেশে প্রচলন করা হয়েছিল, সে অনেক দেখে শুনে, বুদ্ধি বিবেচনা খরচ করে। আপনারা গেলেন কিনা সেই পর্দ্দা তুলে দিয়ে, ওদের ঘরের বাহির করে, সব পুরুষদের চোখের সামনে ধরে, মিশতে দিতে! এতে আমাদের কত রকমের অসুবিধা, ওদের কত প্রকার বিপদের সম্ভাবনা, এখন মালুম হচ্ছে ত পদে পদে? বেশী দুর যেতে হবে না, চেয়ে দেখুন না বাঙ্গালা দেশে, এর ফল কী ভীষণ হয়েছে। আজকাল ক্রমে ক'লকাতায় এর ঢেউ বেশ এসেছে। সেখানে গিয়ে দেখ্‌বেন—মেয়েরা সব রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, অবাধে—হাতে ব্যাগ, পায়ে জুতা ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যার সঙ্গে খুসী মিশ্‌ছেন, যেখানে যখন ইচ্ছা যাচ্ছেন, অভিভাবকদের আর সাধ্য নেই যে তাঁদের আটক করে রাখেন। শুধু কি তাই? যার সঙ্গে যিনি প্রেমে পড়বেন, তাতে কোন কথা কইবার জো নেই; যদি কিছু বলতে যান ত অচিরেই দেখ্‌তে পাবেন হয় তারা অদৃশ্য, আর না হয়ত তাদের দেহ কোন ট্যাঙ্কে অমর বন্ধনে একত্র হয়ে ভাস্‌ছে! কি শোচনীয়, কী বীভৎস পরিণাম ভেবে দেখুন ত?

মোক্তার সাহেব চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শুনিতেছিলেন। হতাশ্বাসের স্বরে বলিলেন—ঐ ক'লকাতারই মেয়ে ত এই লীলা! ওখান থেকেই শিক্ষিত হয়েছে। ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

মূরলী চৌকীর উপর একটা চপেটাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—সেই ত হয়েছে আরও খারাপ! আজকাল লেখাপড়া শিখিয়ে আধুনিক নাটক নভেল পড়তে দিন্—আর সিনেমা থিয়েটার দেখিয়ে আমুন—ব্যস, আর কিছু করতে হবে না!

যুক্তিটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া রামজনম হতবুদ্ধির মত চাহিয়া রহিলেন।

মূরলী গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া কহিলেন—উদারনীতির এমন শিক্ষালাভ হবে তাহলে যে, স্বাধীন প্রেমের বিচিত্র গতির সম্ভব অসম্ভব পর্য্যায়ের তারে তারে মন প্রাণ একেবারে বাঁধা হয়ে থাক্‌বে! তারপর সুযোগ সুবিধার পথ ত আপনারা খুলেই দিয়েছেন!

এইবার রামজনম ব্যাপারটা কতক বুঝিতে পারিয়া দৃঢ়স্বরেই বলিলেন—আমি কিন্তু গোড়া থেকেই বাধা দিতে চেয়েছি, কতবার আপত্য করেছি, কিন্তু দেশের নেতাদের বিরুদ্ধে আমরা কতদুর কি করতে পারি বল?

মূরলী বলিয়া উঠিলেন—বেশ ত, উপস্থিত আশ্রম উঠে গেছে, সমিতি ভেঙ্গেছে। নেতাদের পৃষ্ঠও আর দৃষ্ট হয় না। এইবার ধীরে ধীরে রাস টেনে স্বস্থানে ফিরিয়ে আসুন! এ বিষয়ে আমি আপনাকে যথাশক্তি সাহায্য করবো কথা দিচ্ছি।

রামজনম যেন নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন—তুমি আর কি করবে তা'ত জানি না, আমিই পেরে উঠছি না! গোড়াতেই গলদ হয়ে গেলে—

বাধা দিয়া মূরলী চাপাস্বরে বলিলেন—গলদ শোধরাতে কতক্ষণ? আপনি এক কাজ করুন। চলুন আজই ডাক্তার লাহিড়ীর বাড়ী, আমি না হয় সঙ্গে যাচ্ছি। তাঁকে গিয়ে পরিষ্কার করে বলুন যে, কালই সকালে যদি মিসেস্ লাল ফিরে না আসেন—ত' এর একটা যথাযথ ব্যবস্থা আপনি পরশুই করবেন।

এ পরামর্শ কিন্তু রামজনমের মনঃপূত বোধ হইল না, কেন না তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন—তুমি জান না হে লীলার প্রকৃতি!

মূরলী তখন উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন—তবে যা ভাল বিবেচনা হয় করবেন। আপনার স্ত্রী, আপনি ভাল মন্দ বুঝবেন। কিন্তু আমার কথাটা মনে রাখবেন, আর আল্‌গা দিলে আয়ত্তের মধ্যে আন্‌তে পার্ব্বেন না। রামজনম সজোরে বলিলেন—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে আর কিছুতেই ভুল হবে না আমার!

আঠার

রাত্রে অত্যধিক গরম ও মস্তিষ্কের অস্বাভাবিক উত্তেজনার জন্য পরদিন সকালে রামজনমের নিদ্রা ভাঙ্গিতে দেরী হইয়া গেল। স্নানাদি সারিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেন আটটার পর।

পথিমধ্যে অনেক কিছুই ভাবিতে লাগিলেন কিন্তু কোন কল্পনা একটা স্থির পরিণতিতে উপনীত হইবার

পূর্ব্বেই বিভিন্ন প্রকার অসংলগ্ন চিন্তা মাথার মধ্যে আসিয়া তাহাকে পণ্ড করিয়া দিতে লাগিল।

একবার মনে হইল ষ্টেশন হইতে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া সোজা গিয়া লীলাকে যে কোন উপায়েই হউক লইয়া চলিয়া আসিবেন। কিন্তু সে খরচটা বাঁচিয়া যায় যদি ডাক্তার লাহিড়ীর সঙ্গে তাঁহার গাড়ীতে যাওয়া যায়। কিংবা যদি ডাক্তারকে ধরিয়া লীলার বিরুদ্ধে খুব কতকগুলা কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়—ত সে কি রকম হয়? ইহাপেক্ষা বোধ হয় মিষ্ট কথায় যদি নিজের অসুবিধা ইত্যাদি কারণ দেখাইয়া ডাক্তারের মারফৎ ডাকিয়া পাঠান যায়—ত আর বিবাদের আশঙ্কা থাকে না এবং লীলাও হয়ত অবিলম্বে ফিরিয়া আসে।

এই সব চিন্তায় মগ্ন হইয়া রামজনম অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে কানের নিকট হর্ণের শব্দে দুই লাফে রাস্তার অপর পাশে যাইতেই মোটরখানা তাঁহার গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে উচ্চহাস্যের পর শোনা গেল—উঠে আসুন মোক্তার সাহেব, আর একটু হ'লেই হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে হো'ত আর কি!

সোফারের পাশেই ডাক্তার লাহিড়ী—পিছনের সিটের দিকে হাত দেখাইয়া বলিলেন—আসুন, আসুন, আমার অনেক কায, দেরী কর্ব্বেন না।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিতে ভিতরে এক পা তুলিয়াই রামজনম স্তম্ভিত হইয়া গেলেন! এমন সময় গাড়ীখানা সশব্দে দুলিয়া উঠিতে তিনি কোনক্রমে টাল সামলাইয়া বসিয়া পড়িলেন—এক ধাক্কা দিয়া লীলাকে!

গাড়ী চলিতে লাগিল, রামজনম গোঁজ হইয়া মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। লীলা তখন তাঁহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া সস্নেহে কহিলেন—কী চেহারা হয়েছে বলত' এই ক'দিনে, চোখে দেখা যায় না! কেন ফাগুনি কি মরেছে?

রামজনমের মুখে আসিয়াছিল—আমিই যে মরিনি এই আশ্চর্য্য! অভিমানের ভারে কিন্তু কথাগুলি চাপা পড়িয়া গুমরাইতে লাগিল।

ডাক্তারবাবুর উদ্দেশে লীলা এবার বলিলেন—চলুন দাদামশাই, সোজা একেবারে আমাদের বাসায়—আর আমি কোথাও যা'ব না।

উত্তর আসিল—কিন্তু এও যে তোমাদেরই বাড়ী দিদি, আর বিশেষ করে আজ যে তোমরা আমার অতিথি।

ডাক্তার লাহিড়ীর বাটীর সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইল এবং তিনি দুইজনকেই হাত ধরিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত লইয়া গিয়া বৈঠকখানায় পাশাপাশি বসাইলেন। তারপর হাসিয়া বলিলেন—দেখ, এমনটি না হলে মানায়?

লীলা লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলেন। রামজনম উঠিবার ভাণ করিয়া বলিলেন—আমার একটা জরুরী কন্‌সাল্‌টেশন আছে লালা হরেকিষণরামের সঙ্গে। এখনই তাঁর কাছে যেতে হবে।

প্রত্যুত্তরে ডাক্তার বলিলেন—লালাজি সস্ত্রীক সকালের একস্‌প্রেসে পাটনা চলে গেছেন, তাঁর ভাইএর অসুখের তার পেয়ে। ভোরে এসেছিলেন আমার কাছে।

রামজনম কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না—লীলা বলিয়া উঠিলেন—আপনি কি আবার বেরোবেন নাকি দাদামশাই?

ডাক্তার বলিলেন—নিশ্চয়ই, এখনও আমায় তিন চার জায়গায় যেতে হবে। আগে দেখি তোমাদের কষ্ট দেবার ব্যবস্থা কতদূর কি হোল ভেতরে গিয়ে। ততক্ষণ—অনেকদিন পরে দেখা, তোমরা একটু বিশ্রম্ভালাপ কর না কেন!

ডাক্তার অন্দরে চলিয়া গেলে লীলাবতী রামজনমের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি অমন করে রয়েছো কেন, রাগ হয়েছে বুঝি?

উত্তরের অপেক্ষা একটু করিয়া, তাঁহার কাঁধের উপর একখানি হাত রাখিয়া লীলা মিষ্টস্বরে বলিলেন—খুব কষ্ট হয়েছে বুঝি এই ক'দিন ছেড়ে থাক্‌তে? কি কর্ব্ব বল, আমিও কি ছাই সুখে ছিলাম! গিয়ে এমন মুস্কিলে পড়ে গেলাম, না পারি থাক্‌তে, অথচ সাবিত্রী আর কিছুতেই আস্‌তে দিলেন না। একদিন দাদামশাইএর সঙ্গে চুপি চুপি চলে আসছিলাম, জানতে পেরে সাবিত্রী পায়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন—দিদি, তুমি চলে গেলে ওঁকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না! অগত্যা নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আমায় এতদিন থাকতে হয়েছিল। তাও যদি তুমি নিজে এক-আধবার যেতে, ত এত কষ্ট হ'ত না। অন্ততঃ ফাগুনিকে দিয়ে আমায় আনতে পাঠালে না কেন? আমি আস্‌বার আভাস জানাতে গেলেই

কিশোরীবাবুর মা তাই বল্‌তেন—তোমার যাবার তাগাদা ত কই আসে নি লীলা, এদিকে আমার ছেলে যে এখন তখন হয়ে রয়েছে। বাস্তবিক কেউ আর মনে করেনি যে অমূল্য প্রাণটি ফিরে পাওয়া যাবে! একমাত্র ছেলে, বাপ মার সে কাতরতা, সাবিত্রীর বিহ্বলতা যদি দেখতে, তোমার চোখেও জল আসতো।

রামজনম অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—আমিও ত বাপের এক ছেলে, কিন্তু আমার প্রাণ অত অমূল্য নয় বোধ হয়?

লীলা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন—ও মা, শোন কথা একবার! তোমার প্রাণের তুলনায় আমার কাছে অন্য কোন প্রাণ? তুমি কি ক্ষেপে গেছ না কি?

রামজনম সেইভাবেই উত্তর দিলেন—কি জানি কে ক্ষেপেছে। এই এতদিনে একবারও খোঁজ নিয়েছ আমার?

লীলা বলিয়া উঠিলেন—রোজ, রোজ। দাদামশাই গেলেই দুটি বেলা তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে তবে আমার অন্য কায। বিশ্বাস না হয় –

পর্দা সরাইয়া ডাক্তার ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই বলিলেন—সাক্ষী হাজির হায়, তাকে জেরা করে, জবানবন্দী নিয়ে, দেখ্‌তে পারেন মোক্তার সাহেব।

লাহিড়ীর কথা ও দাঁড়াইবার ভঙ্গীতে রামজনমের মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি তাহা চাপিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অগ্রসর হইয়া ডাক্তার তখন বলিলেন—কি? সাক্ষীর বহর দেখে মোক্তার সাহেব ঘাবড়ে গেলেন না কি?

লীলা উঠিয়া দাঁড়াইলেন—কি যে আপনার কথা দাদামশাই! উনি কি কখনও আমায় অবিশ্বাস করেন?

ডাক্তার লীলার নিকটে গিয়া বলিলেন - সেই ভাল। কিন্তু তোমার মানভঞ্জনের পালা শেষ হল লীলা?

অপ্রতিভভাবে লীলা রামজনমের মুখের দিকে চাহিলেন।

ডাক্তার বলিলেন—কি? জবাব নেই যে? ওদিকে আমার সব তৈরি।

রামজনম এবার বলিলেন—কিন্তু এতক্ষণ ফাগুনি বোধ হয় আমাদের রসুই সেরে ফেলেছে।

ডাক্তার উত্তর দিলেন—না, সে পথও বন্ধ। তাকে মানা করে পাঠিয়েছি—অনেকক্ষণ। এখন দশটা বাজলো। তাহার পর লীলার নিকট সরিয়া গিয়া চোখের ইঙ্গিত করিয়া চাপাস্বরে বলিলেন—এখনও বেশ গোল মেটেনি দেখ্‌ছি—একটু বেসুরো বাজ্‌ছে। তাহলে ওদিকে যাই, খাবার দিতে বলি, তুমি এদিকে ততক্ষণ—বুঝেছ কি না—সেই সুযোগে,—"দেহি পদবল্লভমুদারম্"—গেয়ে ফেল!

(ক্রমশঃ)

মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এ মাসে ভারতবর্ষের প্রচ্ছদপটে যে মহাপুরুষের চিত্র প্রকাশিত হইল, তিনি ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে পবিত্র কাশীধামে শিবত্ব লাভ করিয়াছেন। দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত বেদান্তশাস্ত্র মন্থন করিয়া তিনি "শ্রীগোপালবসু মল্লিক বক্তা" রূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহজ, সরল ও সুবোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া এবং তাহা বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার জন্যই আজ সংস্কৃত-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাও বেদান্তের রসাস্বাদন করিয়া ধন্য হইতেছেন। তিনি তাঁহার সময়ের একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা বহু সংখ্যক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি অন্য কোন পুস্তক রচনা না করিলেও তাঁহার বেদান্ত বিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকই তাঁহাকে চিরদিন বঙ্গদেশে অমর করিয়া রাখিবে। ১৭৫৮ শকাব্দের ১৯শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার দিবা এক দণ্ড থাকিতে মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ৺রাধাকান্ত সিদ্ধান্ত-বাগীশ। তর্কালঙ্কার মহাশয় মাতা-পিতার প্রথম সন্তান। ইঁহার জন্ম হইলে রামনাথ বিদ্যাভূষণ নামক জনৈক পণ্ডিত ইঁহার মাতার মাতুলের নিকট নিম্নলিখিত কবিতাটি দ্বারা জন্ম সংবাদ জ্ঞাপন করেন—

আপনার অগ্রজাসুতা হয়েছেন পুত্রযুতা
উনিশে কার্ত্তিক গুরুবার
দণ্ডেক দিবস স্থিতে জয়ধ্বনি চতুর্ভিতে
লিখিলাম মঙ্গল সমাচার।

তর্কালঙ্কার মহাশয় রাঢ়ীয় শ্রেণী ব্রাহ্মণের আদি বংশজকুল-সম্ভূত। ইহাঁর দশ কি একাদশ পুরুষ পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি রাঢ় দেশের অনির্দ্দিষ্ট কোন গ্রাম ত্যাগ করিয়া মৈমনসিংহ জেলার অন্তর্গত বর্ত্তমান সেরপুরে বাস করেন। ইহাঁর পিতা রাধাকান্ত সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় এ জেলার মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া কলাপ ব্যাকরণ ও নব্য স্মৃতির কয়েকখানি গ্রন্থ পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহার পর ইহাঁর পিতা পরলোক-গমন করিলে ইঁনি নবদ্বীপে যাইয়া ৺ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশ ও প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্নের নিকট ন্যায় এবং কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

কিছুকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় বিক্রমপুরের দীননাথ ন্যায়পঞ্চাননের নিকট স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আবার নবদ্বীপে যাইয়া পাঠ সমাপন করিলে তর্কালঙ্কার উপাধি প্রাপ্ত হন ও ১২৬৮ সালে সেরপুরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় চতুষ্পাঠীতে সমাগত বহু ছাত্রকে অন্ন ও বিদ্যাদান করিতেন।

ঐ সময়ে বারাণসী নিবাসী পণ্ডিত-স্বামীর ছাত্র হরচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কোন কারণে সেরপুরে যাইলে চন্দ্রকান্ত তাঁহাকে স্বগৃহে স্থান দেন ও তাঁহার নিকট বহুদিন বেদান্ত অধ্যয়ন করেন।

তিনি এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সামবেদান্তর্গত গোভিল গৃহ্যসূত্রের পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং তাহার কোন ভাষ্য না থাকায় নিজেই একটি ভাষ্য রচনা করেন। সোসাইটীর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার ভাষ্য দর্শনে পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া উক্ত পুস্তক ও তাহার ভাষ্য প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে চন্দ্রকান্তের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ কার্য্যসূত্রে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সহিত ডাক্তার (রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির পরিচয় হইয়াছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার অধ্যাপনায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেণ্ট ১৮৮৭ সালে তাঁহাকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। তিনি সেরপুরে বাসকালে ও সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার সময়ে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন—সংস্কৃত সাহিত্য—প্রবোধষটক, যুবরাজ-প্রশস্তি, সতী-পরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর, আনন্দতরঙ্গিণী, ভাবপুষ্পাঞ্জলি। সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র—গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, শ্রাদ্ধকল্পভাষ্য, গৃহ্যসংগ্রহভাষ্য।

ব্যাকরণ শাস্ত্র—শিক্ষা (বাঙ্গালা), সত্যবতীচম্পূ (বাঙ্গালা)। দর্শনশাস্ত্র—মহর্ষি কণাদ প্রণীত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলি-টীকা, তত্ত্বাবলী সটীক।

১৮৯৭ সালে তর্কালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

এই সময়ে কলিকাতা পটলডাঙ্গার শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্তশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ৫০ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তৃতা করার জন্য সর্ব্ব প্রথমেই তর্কালঙ্কার মহাশয় যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া নির্ব্বাচিত হন। তিনি ৫ বৎসর কাল বেদান্তশাস্ত্র সংক্রান্ত ৫টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ঐ সকল বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেই প্রদত্ত হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সর্ব্বসাধারণকে ঐ বক্তৃতা শুনিবার জন্য আহ্বান করায় তর্কালঙ্কার মহাশয় প্রথমে বক্তৃতা দিতে অসম্মত হন। তিনি অহিন্দুর নিকট বেদান্ত ব্যাখ্যা করার পক্ষপাতী ছিলেন না; পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ শুধু হিন্দু শ্রোতাদিগের উপস্থিতির ব্যবস্থা করায় তর্কালঙ্কার মহাশয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ৫ বৎসরের বক্তৃতাই বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ কার্য্যের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে ২৫ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন। তাঁহার প্রদত্ত বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাগুলি বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ।

অধ্যাপনা উপলক্ষে তাঁহার সহিত ম্যাকস্মুলার, কাওয়েল, ডাউসন, মনিবার উইলিয়ম প্রভৃতি বহু সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজেরও পরিচয় হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটী তাঁহাকে অনারারী সদস্য মনোনীত করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর পরে

শ্রীহেম চট্টোপাধ্যায়

আসামের কি একটা সহরে স্বনামধন্য ছয়গাঁও গ্রামের বাসিন্দা শ্রীমান্ রবি ওরফে ভানু চাটার্জ্জি টাইফয়েড রোগে শয্যাগত ছিল! ব্যারাম তত কঠিন না হোক্—মানসিক ভয়ে রোগী আধমরা হইয়া গিয়াছিল। ভানু চাটার্জ্জি সেবার মারা গিয়াছিল কিনা, এমন কোন নথি-পত্র আজ পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই, তবে লোক পরম্পরায় শুনিয়াছি তাহার মৃত্যু হইয়াছে; একথা উপরোক্ত গ্রামের দুইজন প্রতিবেশীর মুখে শুনিয়া তবে বিশ্বাস প্রত্যয় জন্মিয়াছে। এ সম্বন্ধে গল্প লিখিতে গিয়া বার বার ফিরিয়া আসিতেছিলাম!

কালীঘাট ট্রামে চাপিয়াছি। পাশে দুইজন ভদ্রলোক বলাবলি করিতেছিলেন, বোধকরি তাঁহারা 'বাঙ্গাল' দেশের লোক (বাংলা দেশের তো বটেই)—ছ্যাখেন মাইজ্যা খুড়ো, শোনছেন নি, ছয়গাঁয়ের রমণী খুড়ার ছেইলাডা নাকি মারা গেছে।

—কে কইল তোমাকে? আমি যেমন তারে কাইল দেখলাম জগুবাবুর বাজারে।

—ভুল ছ্যাখছেন! জ্বর বিকারে,…

—রমণীর কি ছেইলা আছে, গোটা কয়েক মাইয়া যেন দেখ্ছি।

—তার ভাইর তো ছেইলা-পেইলা আছে, আমি নিজেই দেইখ্যা আইছি!

—ভাইর থাক্‌লে কি নিজের অইল,…বলিয়াই ভদ্রলোক পাশ ফিরিয়া বসিলেন! পরে কহিলেন…আমি নিজের চোখে দেখ্ছি, আমার বিশ্বাস হয় না!

আর একজন বলিলেন—এই দেখি ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর মত কথা কয়েন। আমাগো "বিশু" শ্মশানে যাইব কইরা আছিল না। হে না আসামে থাকে!

আসাম কি একটুখানি সহর নাকি? অতি বড়… প্রকাণ্ড! লাটের সহর!

*　　*　　*　　*

ঘোর অন্ধকার রাত্রি। বাহিরে বরফ পড়িতেছে, শীত আজ একটু বেশী পড়িয়াছে। ভানুর সেদিন জ্বর বেশী ছিল না, তবে দুর্ব্বলতা ছিল! শেষ রাত্রিতে সে স্বপ্ন দেখিল, সে মরিতে চলিয়াছে, আশে পাশে ডাক্তারের আনাগোনা, হা' হুতাশ, ঔষধ, ইনজেক্‌শন। কিছুতেই কোন ফল হইতেছে না, ক্রমেই শরীর ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। ডাক্তারেরা জবাব দিয়া গেছেন। আর বড় জোর আধ ঘণ্টা! তার পরেই তাহাকে অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে হইবে। তাহার মনে এক আনন্দের জোয়ার জাগিয়া উঠিল। নূতন দেশ, নূতন সহর, নূতন গাছপালা, নূতন লোক—এসব দেখিবার সখ কাহার না হয়। সে তো তরুণ যুবক মাত্র।

অর্দ্ধঘণ্টা আর উত্তীর্ণ হইল না। হঠাৎ সমবেত কণ্ঠের রোল উঠিল "হরিবোল"! মাগো, বাবাগো,…ও দাদা ভাই…প্রভৃতি বিকট চীৎকারে দিগ্‌মণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল! পাড়াপ্রতিবেশীরা ঘুমের ঘোরে কান পাতিয়া শুনিলেন। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন, বৃদ্ধরা লেপের নীচে অর্দ্ধবৃত্তাকারে পড়িয়া থাকিয়া হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন। যুবকেরা বিরক্তির সহিত শয্যা ত্যাগ করিয়া বিছানার ওপর উঠিয়া বসিলেন। আর শিশুরা প্রলয় ক্রন্দনে পাড়াখানি মুখরিত করিয়া তুলিল!

সকলের মুখেই সেই এক – হায়, হায়, রব! চোখে জল না থাকিলেও কোন মতে চোখ অশ্রুসিক্ত করিয়াপরস্পর পরস্পরের দিকে চোখ চাওয়া-চায়ি করিতে লাগিল! কৈলাস খুড়ো স্থানীয় পুরোহিত, তিনিও আসিয়াছিলেন—কহিলেন, মদন-বাবু, আর দেরী কেন, একদিন সবারই যেতে হবে। বৃথা মায়া, বৃথা কান্না,…বলিয়াই ডে সাহেবের কাছে আগাইয়া আসিয়া কহিলেন—বিড়ি-সিগারেট আছে কিছু? দু'একটা দিতে পারো? এমন কন্‌কনে শীত কথনো দেখিনি বাপু,—বলিয়াই কৈলাশ শর্ম্মা হিহি করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন!

তারপর সহরের ব্যাপার, রাতারাতি দশটা জিনিষ

সংগ্রহ করিতে তেমন অসুবিধা বোধ হইল না। গরীমাসি ভাবে কাজ-কর্ম্ম এক রকম কাটিয়া গেল মন্দ না! শ্মশানে বসিয়াই দু'একজন সংসারী লোক চুপি চুপি বলাবলি করিতেছিল, লাইফ ইনসিওরেন্স আছে তো? প্রভিডেণ্ট ফণ্ড?

—নিশ্চয়ই আছে! সরকারের চাকুরে যখন! যা' হোক শ্রাদ্ধে কিছু ব্যয়-ব্যসন হবে দেখছি তা'হলে।

—কি বলো যে তুমি! কচি দুধের শিশুটা অকালে মারা গেল - তার আবার শ্রাদ্ধ-স্বস্ত্যয়ন। যাও, তুমি একেবারে ইডিয়টের মত কথা বলো!

আর একজন অফিসের লোক! মনে মনে হাসিয়া কহিল—হ্যালো ব্রাদার, কাল তো অফিসে গিয়েই ছুটী নিশ্চয় —কি বলো?

ব্রাদার শোকে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া কহিল—কাল কি আবার হাতে কলম উঠ্‌বে? কালকের দিনটাই মাটি!

—অত পেসিমিষ্ট হলে আর দিন চলেনা ব্রাদার! আজ রবি গেছে, কাল আমি, পরশু তুমি, নরশু হরিদাস, এ করেই তো সব শেষ হয়ে যাবে।

ভোরের সাথেসাথেই পাড়ায় পাড়ায় শুধু এক কথা—ভানু চাটার্জ্জি মারা গেছে। কেহ বা মুচ্‌কি হাসিয়া কহিলেন—আরে বলো কবি, নিশীথ রাতের পাপিয়া কবি!

দ্বিজেন্দ্র সায় দিয়া কহিল—রেখে দাও তোমার কবি-টবির কথা! রাবিস্‌ লিখে নাম কেনবার ফিকিরে ছিল! কেবল চালিয়াতি। রমেশবাবু বিজ্ঞের মত হাসিয়া কহিলেন —চালাকী দ্বারা কোন মহৎ কাজ সম্পন্ন হয় না।

দয়ানাথ সুমুখে দাঁড়াইয়াছিল, হঠাৎ বলিয়া উঠিল—লোকটা যখন মারা গেছে তখন তাকে নিয়ে আলোচনা না করাই ভালো! সে আজ ভালমন্দর অতীত!

বাজারের একটা দোকানে বসিয়া হৃষীকেশ বলিতেছিল —শুনেছেন মুঘরাজবাবু—রবীন্দ্রবাবু মারা গেছেন!

মাড়োয়ারী মুঘরাজবাবু চক্ষু দুটি কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন—মারা গেছেন। বড় আচ্ছা আদ্‌মীর লেড়কা ছিল বাবু। কুছু হিসাবও ছিল!

মঙ্গলচাঁদবাবু ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিলেন, কোন মর্‌গৈ?

মুঘরাজবাবু মুখ ব্যাদান করিয়া কহিলেন—ইনকামকো ভেগানা। (অর্থাৎ Nephew of the Incometax officer.)

দীপচাঁদ মিশ্রী কহিল—বায়োস্কোপমে থা'না বাবু দু'চার রোজ।

দোকানে একটা পুলিশ কনষ্টেবল গিয়াছিল কিছু সওদা করিতে, সে ও কথায় যোগদান করিয়া কহিল—এধি আনন্দীবাবুকি লেড়কা, বহুত আপশোষকা বাত হ্যায়!

সহরের আর এক প্রান্তে কয়েকজন রৌদ্র পোহাইতে-ছিল। রসিক কহিল—ছেলেটি অকালে মারা গেল! কমলা খেয়ে খেয়ে এল বিষম জ্বর···

কার্ত্তিকবাবু বিমর্ষভাবে কহিলেন, আপনাদের "পুঃ সঃ" নষ্ট হোয়ে গেল!

নরেশ হাসিয়া কহিল—আর সে কথা বলে লাভ কি দাদা! যাই বলেন না কেন, দোষেগুণে মানুষ। হয়তঃ তার অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, সে জন্য তার শুধু দোষারোপ করে নিন্দে করাও ঠিক নয়। কখন কার কি মতি-গতি হয়, কেউ কি বল্‌তে পারে! কিছু টাকা পয়সা ছিল তাই কোন মতে উৎরে গেছে। না হ'লে আমাদের মতই বাসায় বসে বসে ভেরেণ্ডা ভাজ্‌তে হোত!

জিতেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক সে পথে যাইতেছিলেন, তারিণী খুড়োকে সেখানে দেখিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। কহিলেন—কি হচ্ছে এখানে বসে? কাল কি হয়েছিল শুনেছেন তো? মায়ার সাহেব fileটা পাঠিয়ে দিতেই U. O. লিখে দিয়ে এসেছি। Draftটা দিতে হবে আজই! কেস্‌টা কিন্তু সিরিয়াস্‌।

নরেশবাবু ফটোগ্রাফি করিয়া খান, চাকুরীর তোয়াক্কা রাখেন না, বিষম চটিয়া কহিলেন—আপনাদের কি মশায় অফিসের কথাবার্ত্তা ছাড়া আর কোন আলাপ-আলোচনা নেই? ঘরে-বাইরে পথে ঘাটে খাওয়া শোওয়া সব সময়ই ঐ এক কথা! অফিস, সাহেব, আর সাহেব, অফিস! সেদিন বিন্দুদের বাসায় গিয়েছিলাম, শুনি হলধর দাদা বৌদিকে বল্‌ছেন লুচি খেতে খেতে,···ওগো জানো, সাহেব বড়বাবু আমাকে আজ thanks দিয়েছেন, বাজেট পাশ হোয়ে গেল কিনা। বৌদি কি রকম চোখে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোর্‌লে···বাজেট কি? এমন সময় আমি সেখানে গিয়ে

উপস্থিত। হাসির চেয়ে দুঃখই হ'ল বেশী। বল্লাম—দাদা, বৌদিকে আর বাজেট শিখিয়ো না। অল্প বয়সে মারা যাবে! কথাটাকে চাপা দেবার জন্য বল্লাম, আজ আর মনটাও ভালো নেই, যতীন দাশ মারা গেছে!

হলধরদাদা হাসিতে গিয়ে হঠাৎ গম্ভীরভাবে বল্লেন—কালও বাজারে দেখিছি! আমি চুপ করে থেকে বল্লাম, খবরের কাগজে পড়েন নি বুঝি? অনশনে যতীন দাশ—

খবরের কাগজ পড়বার সময় কোথায় ভাই? আগে অফিসই সাম্লাই! মনে মনে খুব হাসি পাইল, আর দুঃখও হইল।

জিতেশবাবু হাসিলেন—যতীন দাশ বল্তে সহরের যতীন বাবুকে মনে পড়ে, তা' হলে তো মন্দ নয় দেখ্ছি। গান্ধী বল্লে শেষে আমাদের অনাথবাবুকে টানাটানি করবে না তো! কারণ নতুন বাজারের সবাই ওকে গান্ধী বলে ডাকে।

সকলেই এবার হাসিয়া উঠিল। তারিণী একটুখানি ভাবিয়া কহিল—আজ আর অফিসে যেতে পা সরছে না,···

জিতেশবাবু উদ্বিগ্ন হইয়া কহিলেন—কেন, কেন?

—ভানু চাটার্জ্জি মারা গেছে!

—Who is he? বলিয়াই জিতেশবাবু চুপ হইলেন! তারিণীর চোখে জল আসিল, কহিল—আমাদেরই অফিসের এক ভদ্রলোকের ছেলে! জ্বর হোয়ে···

জিতেশবাবু নরম সুরে কহিলেন—Alas, may he rest in peace···কৃপা হি কেবলম্! বলিয়াই হন্ হন্ করিয়া পথ ধরিলেন।

দুপুরবেলা অফিস বসিতেই ছুটীর হুকুম হইল। শুধু ছুটী হইলে তো চলিবে না, শোকসভাও আহুত হইল। বড় সাহেব শ্রীযুক্ত ধর্ম্মদাস বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে কহিলেন—"আমি তাহাকে ভাল চিনি না, অফিসে শুধু দেখিয়াছি। তাহার মৃত আত্মার উদ্দেশে আজ আমরা এখানে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছি বটে, কিন্তু তিনি শোক দুঃখের পরপারে। করুণাময়ের চরণতলে বসে তিনি সনাতন ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করুন, ইহাই আমাদের আজিকার প্রার্থনা। তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি হোক্! ওঁ তৎসৎ ওঁম্!

অফিসের ভানুর সহকর্ম্মী গোপাল ঠাকুর, "কিং কঙ্" (এক ভদ্রলোকের nick name) প্রভৃতি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না, শোকের উচ্ছ্বাসে সভার আসরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া সভ্যগণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন।

মেয়েমহলেও আলাপ-আলোচনা কম হয় নাই। জনৈকা প্রৌঢ়া সভা জাঁকজমক করিয়া বসিয়াছিলেন। মিত্তির সাহেবের পাশের বাড়ীতে আলোচনা হইতেছিল! সৌদামিনী কহিলেন—শীতে লোক মারা যায় এই প্রথম দেখলুম! সুশীলা দুঃখ করিয়া কহিল—তা' তো যাবেই! শীতের সময় কাপড়-চোপড় না থাকে তো জ্বর হবেই, আর জ্বর হলেই নিমোনিয়া! ডাক্তারবাবুরা কি ছাই চিকিৎসা করেন, সামান্য ব্যায়রামটা পর্য্যন্ত ধরতে জানেন না! হ্যাঁ ছিল বটে সুশীল ডাক্তার, নাড়ী টিপেই ওষুধের ব্যবস্থা কোরত। কেউ কখনো মরেছে তার হাতে, এমনি হাতযশ ছিল তাঁর।

ঘোষাল গিন্নী সায় দিয়া কহিলেন—আমার কানুর অসুখের সময় বিপিন ডাক্তার কি ভুলই না করে ফেল্লে! ছেলে আমার যায় আর কি! শেষে তো সুশীলবাবুর শালাকে দেখিয়ে তবে রক্ষা!

রায়সাহেবের স্ত্রী অবজ্ঞার সহিত জবাব দিলেন—রেখে দে তোদের ডাক্তার-ফাক্তার। ঐ করেই তো দেশ উচ্ছন্ন গেল। কেন, মদন কবিরাজের কয়টা জ্বরকেশরী, আর মহা-নারদীয় লক্ষ্মীবিলাস বড়ী খাওয়ালে রোগী আপনি উঠে বসে কথা বল্‌ত না?

পলাশমণি ঘোমটার ফাঁকে ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া কহিল—কেন আমাদের পাড়ার মনোমোহন ডাক্তার তো খুব ভাল শুনেছি। হোমোপ্যাথিতে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী তিনি!

রায়সাহেবের স্ত্রী হাসিয়া, গলিয়া, লুটাইয়া পড়িবার মত ভাবে কহিলেন—হোমোপ্যাথি আবার ওষুধ নাকি, কলের জল, কলের জল! আর মনোমোহন আবার ডাক্তার। ছোটলোকের জন্য তার ওষুধ! খাসিয়ারা তার ওষুধ খায়!

ঠাকুরঝি স্ত্রীলোকটি একটু ঠোঁটকাটা—ফোড়ন দিয়া কহিলেন—বিনি পয়সায় ওষুধ দেয় কিনা, তাই তার নাম নেই। কেন, বৌঠান তোমার মনে নেই, রায়সাহেবের মৃগী ব্যারামের সময় ঐ মনোমোহন ডাক্তারই তো ভালো করলেন। কোথায় ছিল তখন মদন কবিরাজ—আর সিভিল সার্জ্জন!

রায়সাহেবের স্ত্রী গর্জ্জিয়া কহিলেন—মদন কবিরাজ ছিল না বটে, কিন্তু ব্যারামটা যে মৃগী তা'তো তিনি বারম্বার বলে গেলেন! তারপরে তো মনোমোহন ডাক্তার ওষুধপত্র দিয়ে সারিয়ে তোলে। আমার বিশ্বাস, মদন কবিরাজের চ্যবনপ্রাশের গুণেই ওর অসুখ অর্দ্ধেক সেরে যায়!

পলাশমণি কথাটা ঘুরাইয়া কহিল—কেন, ভানুর তো চিকিৎসার ক্রটি হয় নি। সরকারী সব ডাক্তার, বড় বড় খেতাবধারী,...গায়ে ফুঁড়ে ইনজেক্‌সন, রক্ত পরীক্ষা, এর ওপর আরো কত কি! আয়ু না থাক্‌লে বাঁচাতে পারে কেহ, বল দিকিন?

রায়সাহেবের স্ত্রী সুর নামাইয়া কহিলেন—তা' না হ'লে রাজ-রাজড়ারা অমর হয়ে থাক্‌তেন! সপ্তম এডওয়ার্ড মারা যেতেন না। তাদের কি ডাক্তারকবিরাজ, চিকিৎসকের অভাব ছিল?

তাহার কথার ভঙ্গীতে অনেকেই মুখ টিপিয়া হাসিলেন। তিনি তাহা লক্ষ্য করিয়া পুনরায় কহিলেন—হেসো না, সত্যই বলছি! বড় লোকের তো আর চিকিৎসার অভাব হয় না...

—চিকিৎসা বিভ্রাট হয়—বলিয়াই ঠাকুরঝি কহিলেন, কেন বড় ডাক্তারদের হাতে ঢের ঢের লোক মারা যায়।

সৌদামিনী একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—কাঁচা বউ রেখে মারা গেছে! চিকিৎসার কোন ক্রটি হয়নি! ঐ একমাত্র রোজগারী ছেলে। ভগবানের সূক্ষ্ম বিচার আমরা সহজে বুঝতে পারি না...কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেল বল দেখি!

পলাশমণির চোখ দুটি সহসা ছল ছল করিয়া উঠিল, কহিল—সর্ব্বনাশ আবার নয়। এর চেয়ে আর সর্ব্বনাশ কি হ'তে পারে মানুষের! আমার এখনো মনে পড়ে, ছোট্ট দুটি ভাই পলোগ্রাউণ্ডের আশে পাশে পাহাড়ে রোদে রোদে ঘুরে বেড়াত। সাথী ছিল হরলালবাবুর অমিয়, আর আমাদের সতু। আমি ভুলি নাই ঠাকুরঝি। কি সুন্দর চেহারা ছিল ছোটটির। সেইটি মায়ের বুক খালি করে কবেই চলে গিয়েছে! আর বড়টিও আজ চলে গেল। ওদের অদেষ্টই মন্দ, দিদি!

দিদি ওরফে ঘোষালগিন্নী চোখের কোনের অশ্রু মুছিয়া কহিল—মন্দ, আবার মন্দ নয়! সে কথা তুলে আর লাভ কি!

রায়সাহেবের স্ত্রী একটু কি ভাবিয়া কহিলেন—ছোক্‌রাটার চরিত্র নাকি বড় ভাল ছিল না, শুনেছি বড় মেয়েলোক ঘেঁষা ছিল। সহরেও বড় দুর্ণাম শুনেছি। কি সব মেয়েদের নাচ গান নিয়ে উন্মত্ত হয়েছিল কয়েকদিন!

ঘোষালগিন্নী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন—কই, আমরা তো এ-সব কথা শুনিনি?

—তোমরা শুনবে কি করে? ঘরের খবর নিয়েই ব্যস্ত তোমরা। বাইরের খবর তোমরা কি জান?,

ঠাকুরঝি মৃদু হাসিয়া কহিলেন—জানি বই কি দিদি, সবই জানি! আপনার মেয়েরা তো সেদিন গানবাজনা করছিল, আর সব মেয়েরা...

আকাশ হইতে পড়িবার মত ভাবে রায়সাহেবের স্ত্রী মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিলেন—কই আমার তো মনে পড়ে না। একবার শুধু ওরা কি এক সম্মিলনীতে গান গেয়েছিল!

—সে তো ভানুই করেছিল। আপনি নিজে গিয়ে না ভানুকে কি বলেছিলেন!

—হাঁ, হাঁ, তখন তো ভালই ছিল। মন্দের কথা শুনেছি তো পরে!

—খারাপ লোকে কত কি কথা বলে! কই আমাদের বেণু তো সেদিন নেচেছিল, সে তো কিছু বলে নি। বরং রবির প্রশংসাই করেছে।

—ওই রাঙামুখ দেখেই তোমরা সব ভুলে যাও! কথায় ও আছে—কিছুই তো বটে, নইলে কি আর রটে!

পরদিন সন্ধ্যাবেলা ছয়গাঁও গ্রামে এক টেলিগ্রাম পিওন আসিয়া হাজির। সন্দেশবাহী কোন সুসংবাদ কি দুঃসংবাদ লইয়া আসিয়াছিল সে নিজেই তাহা ভাল জানে না। পল্লীগ্রামে টেলিগ্রাম পিওন দেখিলে গ্রামবাসীদের অন্তরাত্মা সহসা কাঁপিয়া ওঠে এবং ভয়ে হাত-পা ভিতরে ঢুকিয়া যায়! পিওন দেখিয়াই হরিহর মুখুটি খড়ম পায়ে দিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া আগাইয়া আসিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পিওন সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল —আজ্ঞে চাটুয্যে বাড়ী কোনটা বল্‌তে পারেন!

—এই যে পাশের বাড়ী বলিয়াই হরিহর বড় তাড়াতাড়ি

টেলিগ্রামখানি হাতে লইয়া দুর্গানাম, গণেশ সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি বহু বাক্য বিড় বিড় করিয়া বকিয়া টেলিগ্রামখানি খুলিয়া দেখিতে লাগিলেন! খুলিয়া পড়িতেই তাহার মুখ হইতে একটা প্রচণ্ড অস্ফুটধ্বনি শ্রুত হইল…ও! বলিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন। পিওন তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ধরিতে গিয়া একেবারে হরিহরকে লইয়া পা ভাঙ্গিয়া বসিয়া পড়িল!

হরিহরের এই অবস্থা দেখিয়া অটল চৌধুরী, বিশ্বম্ভর মল্লিক, হারাণ দাদা, নিতাই পাঠক প্রভৃতি ছুটিয়া আসিলেন!

পিওন অবস্থা বেগতিক দেখিয়া পুরস্কার ইত্যাদির লোভ একেবারে ভুলিয়া গিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পথ দেখিল! এদিকে গ্রামে গ্রামে সান্ধ্য-আইন জারী হইয়াছে। সূর্য্য অস্তমিত হইতেই হারাণ-দাদা চম্পট দিলেন, বিশ্বম্ভর ভার-ভার্তিক লোক—দুঃখে শোকে একেবারে বসিয়া পড়িলেন। আজকালের কত ছেলে-ছোক্‌রা তো তাহারই সুমুখে ইহধাম ত্যাগ করিতেছে। ভানুর বাবা সেদিন মারা গেছে, এ-কথা তাহার স্পষ্ট মনে পড়ে! অটল চৌধুরী সান্ত্বনা-সূচক বাক্যে সমাগত লোকজনদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। আর পুরমহিলাদের গগনভেদী আর্ত্তনাদে পাড়ার লোকজন প্রজাবর্গ ছুটিয়া আসিল। তাহারা শোকে বিহ্বল হইয়া আইন-কানুন সমস্ত ভুলিয়া গেল!

কুকথা বাতাসের আগে ধায়। গ্রামময় সে সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া যাইতেই ধনী, নির্ধন, শিশু, যুবা - অশ্রুমোচন করে নাই, এমন লোক গ্রামে খুব কমই ছিল। তাহারা সকলেই যে ভানু চাটার্জ্জিকে স্নেহ করিত এমন নয়, কিন্তু ইহাদের ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা এক সময়ে গ্রামে গণ্য-মান্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ঘোষালদের বাঁধা ঘাটে বসিয়া ভগবান-দাদা অশ্রুমোচন করিয়া কহিলেন, বড় ফেঁপে উঠেছিল না নারায়ণ, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। তা' না হলে আর চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে কেন? ঘোর কলি হলেও ধর্ম্ম এখনও যায় নি—কি বলো গোপাল খুড়ো?

গোপাল খুড়ো হাই তুলিয়া হাতে তুড়ি দিয়া কহিল, ধর্ম্মের জয় চিরকাল। কি একাল, আর সেকাল। সব সময়েই একরকম। তোমার মনে নেই নারায়ণ, রামধনের ছেলেটি যেবার মারা গেল পাড়ার লোকে বল্‌লে (আমি বলিনি, ও পাপ কথা যেন শত্তুরের মুখেও না আসে) গোপাল খুড়োর অমন প্রকাণ্ড আম গাছটা রাতারাতি কেটে নিয়ে গেলো, আর তার এঁদো পুকুরের বড় বড়—দেখো এত বড়—কই মাছগুলি জাল পেতে দিনের পর দিন সাবাড় করলে! ধর্ম্ম সাক্ষী ছিলেন বলে তার সাজা হাতে হাতে রামধনকে পেয়ে যেতে হল! তাই বলি,…

বৃন্দাবন এমন সময় একখানি মাল্‌সী গানের সুর ভাঁজিয়া সে পথে আসিতেছিলেন! বৃন্দাবনকে আসিতে দেখিয়াই গোপাল খুড়ো সাত তাড়াতাড়ি চাদরের খুঁটে অশ্রু মুছিতে মুছিতে বলিয়া উঠিল—বিন্দু দাদা, ভানু আমাদের আর নেই। কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে আমাদের পাড়ায়। সোনার পাড়া শ্মশান হয়ে গেছে!

বৃন্দাবন সমস্তই জানিত, শুনিত। ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যা' হবার তা' হবেই, এ'নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি বলো তো, গোপাল! আমি জানি, অনেকে ছেলেটার অকালমৃত্যুতে সুখী হয়েছে। কারও পৌষ মাস, কারও সর্ব্বনাশ।

গোপাল একথা শুনিয়া কানে আঙুল দিয়া জিভ কাটিয়া কহিল—এমন লোকও পৃথিবীতে আছে নাকি! তাদের পোড়া যম চোখে দেখে না কেন!

বৃন্দাবন অতি দুঃখের মাঝেও হাসিয়া কহিল—আমি সব জানি গোপাল। আমি চোখ দেখে লোকের মনের কথা জান্‌তে পারি। সব আমি টের পাই, কিছু মুখে বলি না শুধু! সেবার মোকদ্দমার কথা আমার মনে নেই, গোপাল। ঘোষালদের সাথে চাটুয্যেদের যখন পুকুর নিয়ে দাঙ্গা হাঙ্গামা হয়, তুমি দণ্ডী চাটুয্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দাও নি? তোমার মেয়ে সুরমার সাথে ভানুর বিয়ে দেবার জন্য তুমি যে কাণ্ড করেছিলে? বিধির নির্ব্বন্ধ, তাই বিয়ে হল না। তুমি সেই থেকে ওদের ওপর বিষম খাপ্পা! আজ চাটুয্যেদের সব লোপ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমন একদিন তো সকলেরই আস্‌তে পারে—সে কথা একবারও ভেবে দেখো নি, না গোপাল? তোমরা কেউ এ বিপদের সময় একবার গিয়েছ? না পোলাও কালিয়া খাবার বেলা…

গোপাল লজ্জায় অধোবদন হইয়া কহিল—কই, আমি

কখনো ত কু-ভাব মনেও আনিনি দাদু। কালও গিয়েছি সেখানে!

—সেখানে গিয়েছ তামাসা দেখতে!

—ভগবান জানেন!

—ভগবানের নাম আর মুখে এনো না গোপাল। ভগবান নেই। ভগবান আছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না...বলিয়াই বৃন্দাবন হন্ হন্ করিয়া পথ চলিয়া গেল!

বৃন্দাবন চলিয়া যাইতেই গোপাল গোটা কয়েক লম্ফ-ঝম্প দিয়া চেঁচাইয়া কহিল—দেমাকের কথা শুন্‌লে নারায়ণ? বি-এ পাশ ছেলে থাক্‌লে এমন অহঙ্কার হয়? বছর আর ঘুরে আস্‌বে না, তোমরা দেখে নিয়ো...বলিয়াই বৃন্দাবনের উদ্দেশে অসংখ্য গালিগালাজ করিয়া সে ক্ষান্ত হইল না, রাগে গজ গজ করিতে করিতে বাঁধা ঘাট ছাড়িয়া গেল।

ঈশান ঘোষাল উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—রাগ করলে নাকি খুড়ো, বলি একটা কথা শুনে যাও!

গোপালের বিষম আস্ফালনে কাছা খুলিয়া গিয়াছিল। ডান হাতে কাছা দিতে গিয়া গোপাল অদূরে দাঁড়াইয়া বলিল—ভগবান আছেন, তিনিই এর বিচার করবেন। এখন আর শোনবার সময় নেই!

পাড়ার হরিধন মণ্ডল, পরাণ ধুপী, নেপাল কৈবর্ত্ত সে পথে যাইতেছিল। পিছনে আসিতেছিল নবাই সেখ, আকালী পালান, টোকানী সিকদার। টোকানী গলা কাসিয়া কহিল—কর্ত্তা, ধর্ম্ম নাই সংসারে। কলিতে শাস্ত্র সব মিথ্যা, নইলে পঁচিশ বছরের ছেলেটি সাতদিনের জ্বরে মারা যায়, কি বলেন?

ঈশান গীতার একটা শ্লোকের চরণ আওড়াইয়া কহিল,—বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...

অর্থাৎ পুরাণো বাঁশে ঘুণ ধরিলে যেমন তোমরা নূতন বাঁশ কাটিয়া আনো, তেমনি পুরাণো লোক মারা গেলে নূতন লোকের আমদানী হয়—কিন্তু কলিতে সবই উল্টা দেখ্‌ছি টোকানী!

পরাণ গালে হাত দিয়া কর্ত্তার কথাগুলি গিলিতেছিল, কহিল—ঠিকই কইছেন, নইলে আর শাস্ত্র কারে কয়? কর্ত্তা, গীতা কে লিখছিলেন?

—শ্রীকৃষ্ণ লিখেছিলেন!

—তাই তো এত ভাল কথা। সত্যযুগে বুঝি দেবতারা বই লিখতেন?

হরিধন চোখ ঘুরাইয়া আকাশের দিকে একবার চাহিয়া কহিল—কেন, শোন নি সেকালে দেবতারা পৃথিবীতে আস্‌তেন! মানুষের সাথে খেলা-ধূলা করতেন—কেন, আমাদের গোঁসাইজী বলেন নি?

নেপাল প্রায় একরকম কাঁদিয়াই কহিল—কর্ত্তা, বড় আশা ভরসা ছিল। বাবুর নাতি বড় হইব, চাকুরী করব, আমরা দশজনে দেশে দেশে সেই কথা বলে বেড়াইব, এ কি কম সুখের কথা! আমাদের মনোবাঞ্ছা পরমেশ্বর পূর্ণ করলেন না!

পরাণ সায় দিয়া কহিল—আর ছোটবাবুর চেহারাটা কি সুন্দর ছিল, যেন আমাগো দুর্গাপূজার কার্ত্তিক ঠাকুরের মত! দিদিমা কি এই শোক পাইয়া আর বাঁচবেন!

ঈশান ঘোষাল সান্ত্বনা দিয়া কহিল—যার যখন সময় হবে সে তখন চলে যাবেই! এতে আর বৃথা শোক করে ফল কি!

সন্ধ্যা হয়-হয় প্রায়। পরাণ হাই তুলিয়া, কাসিয়া পথ ধরিল এবং পথের বাঁকে বাগানের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে তাহার গা কেমন ছম্ ছম্ করিয়া উঠিল। মনের ভয়ে সে অনুচ্চকণ্ঠে গান ধরিল, "রবে না সুদিন—কুদিন, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে!"

খালের ওপার থেকে সনাতন হাঁকিয়া কহিল—আরে কেও, পরাণ নাকি? তামাক খেয়ে যাও!

পরাণ সায় দিয়া কহিল—আর তামাক খেতে পারি না সদু, গ্রামের খবর শুনেছ তো? চাটুয্যেদের...

সনাতন সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে কহিল—সবই ভগবানের ইচ্ছা, সে কথা বলে আর ফল কি!

পরাণ আর কোন জবাব দিল না। পথের মোড়ে দূরে শুধু শোনা গেল—একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

রাত্রি বেশী হয় নাই! সুচারু দিদির বারান্দায় বসিয়া কয়েকজন গ্রাম্য স্ত্রীলোক বৌ-ঝিরা ভানুর কথাই বলাবলি করিতেছিল। ছকির পিসী গলা ঝাড়িয়া কহিলেন—ভানুর মৃত্যু একটা অস্বাভাবিক ঘটনা, কি বলেন তরঙ্গিণী ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি একগালে পান ও আর একগালে দোক্তা

চিবাইতে চিবাইতে জবাব দিল—এবার ভেবেছিলাম রাধুর গলায় পৈতেটা ঝুলিয়ে দেব, কিন্তু তা' কি আর হল বৌঠান। তোমরা পাঁচজনে জানো—ভানুর মা আর আমি এক গোত্রের জ্ঞাতি, তেরাত্রির ওষুধ। লোকে ত তবু বলে—জ্ঞাতি জন ভাগ্‌নে, তিন নয় আপ্‌নে!

পান্নুর মাসী হি হি করিয়া হাসিয়া কহিল—দুত্তোর তোদের জ্ঞাতি ওষুধ। আজকাল আবার এসব কেউ মানে নাকি! ছেলেরা ঘরের বাহিরে গিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খায়! শুনেছি আমাদের কেদারের মুখে "ফিরপির" সাহেবের হোটেলে গিয়ে কি সব সুখাদ্য জিনিষ খেয়েছিল বলে ঠাণ্ডা-পিসীর ডাণ্ডা খেয়েছিল না! এগুলো পিসীর বাড়াবাড়ি না?

ঠাকুরঝি একেবারে হাসিয়া গলিয়া পড়িয়া কহিল—শুধু তাই নাকি? মেয়েরা একা রাস্তায় বেরোয়, দোকান করে, স্কুলে যায়, কলেজে পড়ে, ছেলেদের সাথে ইয়ারকী দেয়, আর সব কত কি গল্প শুনি! শোনেন নি মাসী, ভানুর মৃত্যু একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু। তিন দিনের জ্বরে কেউ কখনো মরে! আমি তো ছ'মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগে আজও রামকাকার ঘরে নারায়ণের প্রসাদ খেয়ে এলাম!

পান্নুর মাসী কহিল—শোনেন নি, জ্বরের ভিতর কমলা খেয়েই তো ভানুর বিকার হয়েছিল! কিন্তু তারা তো সহুরে সরকারী ডাক্তার!

ঠাকুরঝি চোখ কপালে ঠেকাইয়া কহিল—কমলা খেতে কোন পণ্ডিতে দিয়েছিল? সকল জ্বরে কমলা পথ্য চলে না। দেখো—আসামে বুঝি ডাক্তার নেই, তাই এত লোক কালাজ্বরে মরে! আহা ছেলেটাকে যদি দেশে নিয়ে আস্‌ত! দেশের জল-হাওয়া পেটে গেলে, গায়ে লাগলে অসুখ কখনো থাক্‌তে পারে। কেন মুখুয্যেদের জিতুর কি হয়েছিল? কলিকাতার সব ডাক্তার ফেল হয়ে যেতেই সোনাখুড়া নিয়ে এলেন দেশে! যেমন পদ্মার পাড়ে পা দেওয়া, ছেলে আঙুল ফুলে হ'ল কলাগাছ!

পান্নুর মাসী রাগ করিয়া উচ্চকণ্ঠে কহিল—গ্রাম-দেশে বুঝি আবার চিকিৎসা-পত্র চলে! ইনজেক্‌সান নেই, রক্ত-পরীক্ষা—

ঠাকুরঝি এবার বিষম ক্ষেপিয়া কহিল—শরীরে বিষ ঢুকিয়ে দিলে কখনো লোক বাঁচে! আর দেশের খোলা-মেলা ঘর বাড়ী কোথায় পাবে বলো ত। তাজা মাছ, দুধ, তরকারী, এসব কি আর সহরে তেমন জোটে?

—কেন জুটবে না ঠাকুরঝি! আজকাল সহরের চেয়ে গ্রামের জিনিষপত্রই দাম বেশী। যা' কিছু দেশে জন্মায়, সবই তো বিদেশে চালান হয়! দেশে থেকে কচুশাক আর চুণোপুঁটি খেয়ে লোক বেঁচে থাকে।

আদুরীর পিসী অন্য কথা পাড়িলেন। কহিলেন—আমাদের গ্রামেরই দুর্ভাগ্য, নইলে এমন সব দেশের রত্ন চলে যাচ্ছে কেন? তুমি আমি যেতে পারি না! পোড়ার যম তো আমাদের চোখেও দেখে না!

ঠাকুরঝি এবার সুর বদলাইয়া কহিলেন—কথায় আছে, যেজন যাবে গো চলে, কে তারে ধরে। সত্যই তাই! আমার অনু যেবার আমাদের বিপদ সাগরে ভাসিয়ে গেল, আমরা তো স্বপ্নেও ভাবি নি। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

ঈশান কোণে সত্য সত্যই একখানি কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল। গ্রাম্যবধূরা যে যাহার দিকে পথ পাইল, ছুটিয়া পলাইল! ক্রমে ক্রমে মেঘখানি দিগন্ত ছড়াইয়া পড়িল, ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিল, গাছ ভাঙিল, প্রলয়ের কলরোলে সংসার যেন গভীর উন্মাদনায় নাচিয়া উঠিল!

দিনের পর দিন গড়াইয়া যাইতে লাগিল! মাসও আসিয়া পুরিল। স্বদেশে বিদেশে যেখানে ভানুর যত আত্মীয়-স্বজন, শত্রু-মিত্র, বন্ধু-বান্ধব ছিলেন, ধীরে ধীরে অনেকের কানেই একথা গিয়া পৌঁছিল। কেহ মনে মনে দুঃখিত হইলেন, কেহ সুখী হইলেন, কেহ বা ভানু চাটার্জ্জির মৃত্যুতে পুরাণো শত্রুতার কথা মনে করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া লইলেন!

ঢাকায় একটি মেয়ের কথা বলি। এই মেয়েটির সাথে ভানুর এক সময়ে খুব ভাব ছিল। শৈল ভানুকে মনে-প্রাণে ভালবাসিত, কিন্তু কি একটা সামান্য বিষয় নিয়ে উভয়ের সাথে মনোমালিন্য হয়ে যায়। সেই থেকে চোখের চাওয়া-চায়ি পর্য্যন্ত ছিল না, কথা বলা তো দূরের কথা! কেহ কারও নাম শুনিলে পর্য্যন্ত বিষম ক্ষেপিয়া যাইত। কিন্তু মনে-মনে উভয়ে উভয়কে নাকি কি একরকম শ্রদ্ধার চোখে দেখিত! ভানুর মৃত্যু-সংবাদ শৈল একদিন লোক পরম্পরায় শুনিয়াছিল এবং তাহার জনৈক আত্মীয়ের

নিকট হইতে শুনিয়া শৈল মনে মনে খুব খুশী হইল এবং ভানুর মৃত্যুতে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! কিন্তু শৈল বোধ হয় তখন ভুলিয়া গিয়াছিল যে, এমন একদিন তাহারো আসিতে পারে এবং তাহাকেও শস্যশ্যামলা চিরাভিরামা পৃথিবী ছাড়িয়া অন্য এক অজানা দেশের উদ্দেশে যাত্রা করিতে হইবে!

বিকালবেলা বুলু আসিয়াছিল। শৈলকে দেখিয়াই কহিল—তোমাকে আজ এত অস্বাভাবিক দেখ্‌ছি কেন! মুখে যেন হাসি আর ধরে না। বিয়ের খবর আছে নাকি কিছু!

—হ্যাঁ, বুলু। তোমার কাছে প্রায়ই যে একটি দুষ্টু ছেলের কথা বলতাম, না? সেই ছেলেটি নাকি মারা গিয়েছে!

—ওমা, সেজন্য এত ফুর্ত্তি! তুমি ভাই, কি রকম! তোমার সে জন্য আনন্দের সীমা নেই!

—কেন করবো না! নিশ্চয়ই করবো! পৃথিবীতে তার চেয়ে আর বড় শত্রু আমার ছিল না! সে আমার সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল, তাই তাকে অভিশাপ দিয়েছিলাম!

—অভিশাপ,…! কি বলো শৈল? মানুষকে এমন অভিশাপও দিতে পারো তুমি, প্রাণে বাধে না? কি করেছিল সে? ছেলেটির নাম জানি কি…

—তার নামও মুখে আনা পাপ!

—এত অভিমান তোমার শৈল। কি, বল না, নামটি ভুলে গেছি ভাই!

—জানি না…

—না ভাই—বলো না!

শৈল হাসিয়া কহিল—নাম তো আর মুখে আন্‌ব না। আকারে ইঙ্গিতে বল্‌ব, বুঝে নিয়ো কিন্তু! পূব গগনে উঠ্‌ল রবি…

—অ বুঝেছি,…রবি!

—ছাই বুঝেছ, রবি মানে যতগুলো জানো বলে যাও…!

—তপন, কিরণ, ভানু, সূর্য্য,……

—এরি ভিতর একটি বেছে নাও।

—আমি ভাই অত হেঁয়ালী কথা বুঝি না, রেখে দাও তোমার ছ্যাবলামি। কিন্তু আমি জানি, আজ তুমি এত কথা বল্‌ছ, সেদিন পরস্পরের প্রতি দরদ দেখিয়ে এত কথা বলা, আর সেই গানটি · আমি কিছুই ভুলিনি শৈল,…

শৈলরাণী, শৈলরাণী
তোমার বুকে স্বপন সুখে
ঘুমিয়েছিলাম একটুখানি…

সেই শিলঙের পাহাড়িয়া দেশের বর্ণনা আর কত শুন্‌ব ভাই। সব বুঝি, সব জানি আমি, কিছুই ভুলিনি!

শৈল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—তবু আমি সুখী হয়েছি। আর কোন কথা বলো না!

বুলু বাসায় ফিরিয়া আসিল অভিমানভরে। সে জীবনে কোন দিন ভানু চাটার্জ্জিকে চোখে দেখে নাই, শুধু নাম শুনিয়া অশান্ত আত্মার উদ্দেশে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিল!

পরদিন স্কুলে ক্লাশে কোন একটি মেয়ে ‘বাঁশরী’ কাগজের পৃষ্ঠায় একখানি ছবি দেখাইয়া কহিতেছিল—উদীয়মান কবি ভানু চট্টোপাধ্যায় শিলং-শৈলে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দু’ চারিটি মেয়ে ছবিখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—এই নাকি ভানু চাটার্জ্জি, কোন কলেজে পড়ত রে রিণা?

রিণা বিভোর চোখে চাহিয়া কহিল—আমি কি করে জান্‌ব।

ধীরা হাসিয়া কহিল—যা চেহারা, কলেজে পড়ত কি রে? বুড়ো ধাড়ী ছেলে! হয়ত বাপ মা তাড়ানো ছেলে।

সংযুক্তা সায় দিয়া কহিল—না হয় পিকেটিং করে জেল খেটে এসেছে!

টিপী-ছায়া ও অসীম মায়া দুই বোনে ঘাড় নাড়িয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল—এ কিছুতেই হ’তে পারে না। সবুজ প্রাণ না হলে কি আর কবিতা ফোটে!

সংযুক্তা ঠাট্টা করিয়া কহিল—গেঁয়ো কবি, তার আবার সবুজ প্রাণ, না ছাই! এমন কবির অকাল-মৃত্যু ঢের ভাল!

অসীম-মায়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—তা’ বলে ছেলেটি মারা যাবে এত অল্প বয়সে, এমন কথায় আমি কিছুতেই সায় দিতে পারছিনে! দেখো সংযুক্তা, তোমার অত দেমাক ভাল নয়। না হয় তুমি গুণীই হ’লে, তা বলে

তুমি যা তা কথা মুখে আসবে, তাই বলবে। ধরো এখানে যদি ভানুর কোন আত্মীয় থাকত…

—কেন, তুমিই তো স্বশরীরে বর্ত্তমান আছ ?

—বেশ, আছি তো—বলিয়াই অসীম-মায়া মুখ ফিরাইল।

বিভার ছোট বোন ইভা কৌতুক করিয়া কহিল—ছিঃ, রাগ করতে নেই মায়া। বুঝলুম না হয় ভানু চাটার্জ্জির জন্য অতটুকু দরদ আছে, কিন্তু ভানু চাটার্জ্জিকে দেখলে, তার সাথে আলাপ করলে সংযুক্তারও একটু দরদ হোত বৈকি !

মায়া এবার হাসিয়া উঠিল, ঔৎসুক্যের সহিত কহিল—ভানু চাটার্জ্জি যদি ভাওয়ালের সন্ন্যাসীর মত আবার ফিরে আসে, তা' হলে কি মজা হয় রে ইভা! তুই কি তাকে দেখেছিস্ ?

—একদিন নদীতীরে দেখেছিনু তারে…

—এই বুড়ীগঙ্গার পাড়ে, সত্য সত্য ঢাকার সহরে ?

ইভা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল—সেদিনও যেন দেখেছি মনে পড়ে! যেন চেহারাটি চোখে ভাসছে!

—কি বলিস্ রে, তা' হলে জানাশোনা ছিল!

—অতটা ঠিক নয়। হারীনদার কাছে শুনেছি এবং তিনিই দূর থেকে দেখিয়েছিলেন।

—কেমন চেহারা রে……

—আমি জানি না ভাই—বলিয়াই সে ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল!

কলিকাতার একটা অপরিসর গলির মেসে বসিয়া জন কয়েক ফাজিল ছোক্‌রা "কুড়মুড়" চিবাইতে চিবাইতে বিষম হেস্তনেস্ত করিতেছিল! কে একজন নাকিসুরে গান ধরিয়াছিল—"ওরে ভাই—রতনপুরের নাইয়া, পঞ্চসারের গেরাম চেন নি—"

এমন সময় হীরালাল অফিস হইতে আসিয়া হাজির, তাহাকে আজ একটু বিমর্ষ দেখাইতেছিল! অফিসে কে একজনের কাছে ভানুর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাকে অমন ম্লানমুখে ঘরের ভিতর আসিতে দেখিয়া রতনপুরের নাইয়া কোথায় গিয়া যে লুকাইয়াছিল, তাহা কে জানে! হীরালালকে আর কেহ অমন গুমরো মুখে ঘরে ফিরিতে দেখে নাই। তাই কেহ তাহাকে সাহসী হইয়া কোন কথা বলিতে পারে নাই! হীরালাল সে রাত্রি ঘরে ফিরিয়া সেই যে দরোজা বন্ধ করিল, আর পরদিন দুপুরবেলা দরোজা খুলিয়াছিল।

*   *   *   *

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে রামনিধি তর্কভূষণ এবং নীলকণ্ঠ বিদ্যাবাগীশ অর্দ্ধোদয় যোগে বারাণসী ধামে অবগাহন মানসে গিয়াছিলেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁহারা দশম-বর্ষীয় একটি বালকের কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। নীলকণ্ঠ সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি এখানে কোথায় থাক ?

বালক ফ্যাল-ফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল—কোথায় থাকি জানি না, মা জানেন!

রামনিধি টিকি নাড়িয়া কহিলেন—যা বলেছি নীলকণ্ঠ, তাই না হয়ে আর যায় না! এ নিশ্চয়ই আমাদের গাঁয়ের সেই যে ছোড়াটা ছিল, কি না হে নাম,…আরে সেই যে,… আঃ মলো, ভুলে গেলাম বুঝি…এ যে তারই ছেলে!

নীলকণ্ঠ চক্ষু দুটি বিস্ফারিত করিয়া কহিল—হ'তে পারে কিন্তু দাদা, ভানু। যেমন নাম বলা রামনিধি তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—ঠিক বলেছ, ভানু, এ যে ভানুরই ছেলে! তোমার মনে নেই বুঝি, ছেলেটা তিন দিনের জ্বরে যে মারা গেল! এবং পরক্ষণেই ছেলেটির প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—বাবা, তোমাদের বাসা এখান থেকে কতদূর ?

ছেলেটি মৃদু হাসিয়া ভাসা-ভাসা চোখে চাহিয়া কহিল—বাসা ত আমাদের নেই, স্নানে এসে মাকে হারিয়ে ফেলেছি, এখন মন্দিরের বারান্দায়ই থাকি! মা বলে গেছেন, এই বারান্দার আশে-পাশে আমাকে বসে থাকতে, তিনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। আজ, না হয় কাল, না হয় দু'দিন বাদে, কিন্তু ফিরে তাঁকে আসতেই হবে! বালকের সুধাবর্ষী বাক্য শ্রবণ করিয়া রামনিধি একেবারে জল হইয়া গেলেন, তাঁহার দু'চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইল, ধীরে ধীরে কহিলেন—বাবা, ক'দিন হারিয়েছ!

—আজ এক বছর হল, মাকে হাঁসপাতালে নিয়ে গেছে আশ্রমের বাবুরা, মা ভাল হ'লে আবার ফিরে আসবে। বোধ করি এখনও অসুখ সারে নি!

নীলকণ্ঠ মনে মনে বলিয়া উঠিল—আর কবে সারবে!

এবং পরক্ষণেই রামনিধির মুখের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া রহিল। সেখানেও মেঘ জমিয়াছে বহুক্ষণ পূর্ব্বেই, এখন দম্‌কা হাওয়ায় জল নামিলেই হয়! কোন মতে আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল—বাবা, তুমি দেশে যাবে, তোমাদের বাড়ী, ঘর, সবই আছে; এখানে আর ক'দিন এভাবে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। বালক সরলভাবে বলিয়া উঠিল—আমাদের দেশে ত কেউ নেই, বাবা বহুদিন গত হয়েছেন, তাই আমরা এখানে ভিক্ষা-সিক্ষা করে কোন মতে দিনগুজরাণ করছিলুম, এর ভিতর মার হ'ল অসুখ! আশ্রমের বাবুরা নিয়ে গেলেন চিকিৎসার জন্য, আমিও যেতে চেয়েছিলুম—কিন্তু কিছুতেই নিতে চাইলেন না! মা-ই শেষে আমাকে এখানে থাক্‌তে বলে গেছেন! মার কথার অবাধ্য হ'ব, সে যে হ'তে পারে না!

নীলকণ্ঠ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—হায়! দণ্ডী চাটুয্যে, তুমি স্বর্গ থেকেও এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ, তোমার আশ্রয়ে থেকে কত শত জীব মানুষ হয়ে গেছে, কত লোক অনাহারে দুপুরবেলা এসে পাত পেতেছে, আর তোমারই বংশধরেরা আজ কাশীর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং হা-অন্ন, হা অন্ন করে দিন কাটায়। কোথায় তোমাদের সেই অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার!···বালক মাঝখানে বলিয়া উঠিল—মা অন্নপূর্ণা ত ওই মন্দিরের ভিতর থাকেন, আমি তাঁর কাছেই এখন থাকি—বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল! পরক্ষণেই দেশের কথার উল্লেখে অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে শত-সহস্র প্রশ্ন করিয়া উঠিল—আমাদের দেশের সেই তালগাছটা আছে তো? ময়না পিসী—মনোরমা মাসী—ভণ্ডুল মামার বৈঠকখানা—ঘোষালদের সেই বাঁধা ঘাট—কাজ্‌লাদীঘি?

বসনাঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া রামনিধি জবাব দিল—সবই আছে, শুধু তোমরা নেই, বাবা!

নীলকণ্ঠ বালকের চোখে মুখে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—বাবার কথা মনে পড়ে, দিদিমা, ঠাকুরমা, মনে আছে সব কথা। তোমার নামটা কি বাবা, আমিত ভুলে গেছি,···হাঁ, হাঁ, · শৈলেন·· না?···ডাক নামটা কি দাদু?

রামনিধি নীলকণ্ঠের মুখের পানে ক্ষণকাল চাহিয়া কহিলেন—এরি মাঝে ভুলে গেলে,·· "রাণ্টু"!

নীলকণ্ঠ শোকের আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিলেন—মনে নেই, গেল বছর বর্ষাকালে বৃষ্টি বাদল মাথায় করে ওরা দেশ ছেড়ে চলে এল! সেই অকাল কুষ্মাণ্ড পাঁচুলালের ব্যাভারটা মনে নেই তোমার! সতীর গায়ে হাত তুল্‌তে না তুল্‌তেই ছ'মাসের ভিতরই সব শেষ হ'য়ে গেল!

রামনিধি সায় দিয়া কহিলেন—কে বলে কলিযুগে ঈশ্বর নেই! যে বিশ্বাস করে তার কাছে চিরদিনই আছে! এবং পরক্ষণেই আকাশের দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন—এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে, এখনও দিন রাত্রি সবই আছে, তবু পাপীর জয় দেখে বড় দুঃখ হয় নীলকান্ত!

নীলকান্ত ঘাড় নাড়িয়া কহিল—কোথায় হয়, পাপীর শাস্তি এ যুগেই ভগবান দেবেন, সেজন্য ভাবনা মিছামিছি করে ফল কি দাদা?

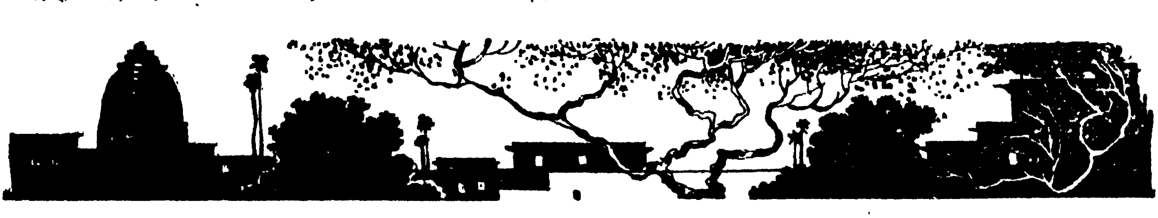
বালক পুনরায় প্রশ্ন করিল—আমাদের তমস-মামার গাছে কাঞ্চন ফুল ফোটে, হরে মুদী এসে রোজ ফুল কুড়িয়ে নিয়ে যায়?

—না বাবা নিয়ে যায় না, তোমার জন্য অনেক ফুল ঘাট্-লার ওপর রেখে যায়, মালতী এসে রোজ সেই ফুলে মালা গেঁথে রাখে—বলিয়াই রামনিধি কহিলেন, দেশে যাবে বাবা?

বালক প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল · দেশে কি করে যাব? মাকে ফেলে আমার যাওয়া কোন মতেই হতে পারে না! আমি যাব না!

রামনিধি, নীলকণ্ঠ অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিল কিন্তু কোন সুফল হইল না। বালক কোন মতেই দেশে ফিরিয়া যাইতে চাহিল না!

দেশে ফিরিয়া রামনিধি গ্রামবাসীর কাছে এ কথা কর্ণ-গোচর করিতেই কেহ কেহ মুখ টিপিয়া হাসিল, কেহ বা মলিনমুখে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া গেলেন, কেহ বড় একটা সে কথায় কান দিলেন না!



জাতীয় মহাসমিতি

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কংগ্রেসের বয়স অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হইল। এই ৫০ বৎসরে কংগ্রেসের কার্য্যফল লক্ষ্য করিলে নবীনচন্দ্র সেনের উক্তি মনে পড়ে—

"ফলিয়াছে বহু আশা, ফলে নাই বহু আর।"

যে সব আশা ফলে নাই, সে সকল, বোধ হয়, আরও সাধনা সাপেক্ষ; আর যে সব পূর্ণ হইয়াছে, সে সকলও অবজ্ঞা করিবার মত নহে।

ভারতবর্ষে যখন খণ্ড ভারতকে মহা-ভারতে পরিণত করিবার—সকল প্রদেশের অধিবাসিগণকে মিলনসূত্রে বদ্ধ করিয়া জাতি গঠনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আত্মরক্ষার জন্য আধারের সন্ধান করিতেছিল, সেই সময় কংগ্রেসের উদ্ভব। এই আধার যে সে আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত—তাহা কংগ্রেসের অর্দ্ধ শতাব্দীকাল স্থিতিতেই বুঝিতে পারা যায়। কংগ্রেসের কার্য্য পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কংগ্রেস নানা বিপদের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে—যখন রাজনীতিক গগনে ঘনঘটা আসন্ন প্রলয় সূচনা করিয়াছে, তখন রাজরোষ বজ্রের আকারে কংগ্রেসের উপর পতিতও হইয়াছে; কিন্তু কংগ্রেসের বিলোপ সাধিত হয় নাই। আত্মকলহ হইতেও যে কংগ্রেস অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, তাহা নহে। মতভেদহেতু আত্মকলহে এক বার কংগ্রেসের অধিবেশন বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত প্রবল শক্তি তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল—নষ্ট হইতে দেয় নাই। সে শক্তি জাতীয়তার প্রাণ—ইংরাজীতে যাহাকে nationalism বলে তাহাই; 'বসুমতী' পত্রে সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি তাহার অনুবাদ করিয়াছিলেন—দেশাত্মবোধ।

ইহার প্রস্ফুরণের জন্য আমরা ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ। মুসলমান শাসনের শেষ দশায় দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার সময় বাঙ্গালার কতিপয় ক্ষমতাশালী লোক ইংরাজকে যে প্রাধান্য প্রদান করেন, তাহার মধ্যে ষড়যন্ত্রও যে ছিল না, এমন নহে। সেই প্রাধান্য ক্রমে রাজশক্তিতে পরিণতি লাভ করে এবং দেশে শৃঙ্খলা ও শান্তি স্থাপিত হয়। তদবধি দেশের শিল্প-বাণিজ্যের সর্ব্বনাশে দেশের যত ক্ষতিই কেন হইয়া থাকুক না, আর একদিকে দেশ লাভবান হইয়াছিল—সে লাভ ভাবের রাজ্যে—জ্ঞানের রাজ্যে এবং তাহার ফলেই দেশাত্ম-বোধবিকাশ। এ দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগেই কোন কোন ইংরাজ ইহার বিকাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া শাসক-সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ শাসন-কার্য্যে ভারতবাসীর সহযোগ লইতে হইবে—নহিলে দেখা যাইবে, বাহুবল কখন জাতির জাগ্রত দৃঢ় কামনাকে দলিত করিতে পারে না। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে —অর্থাৎ শত বৎসরেরও অধিককাল পূর্ব্বে রিকার্ডস নামক এক জন ইংরাজ লিখিয়াছিলেন :—

"The knowledge now diffused and diffusing, throughout India, will shortly constitute a power, which three hundred thousand British bayonets will be unable to control. * * * The ground-work of the future fabric should be co-operation with the natives in the government of themselves * * * Fleshly arms and the instruments of war, are but a fragile tenure, and 'soon to nothing brought' when opposed to the interests, and the will of an enlightened people."

কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা এই রাজ-নীতিকোচিত-সুপরামর্শ গৃহীত হয় নাই। আমেরিকা, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির দৃষ্টান্ত সম্মুখে থাকিতেও এ দেশে স্বৈরশাসন ত্যক্ত হয় নাই। ইহার ফলে দেশের লোকের আত্মসম্মান আহত হইয়া অসন্তোষের উদ্ভব করিয়াছে এবং তাহাতে দেশাত্মবোধ আরও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে সুদীর্ঘ কথা—দেশাত্মবোধের ক্রমবিকাশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার স্থান এ নহে। কংগ্রেস স্থাপনের অব্যবহিত পূর্ব্বের ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমরা নিরস্ত হইব। লর্ড রিপণের শাসনকালে এক আইন প্রণয়ন করিয়া ভারতবাসীর অপমানজনক বিচার-বৈষম্য বিলোপের চেষ্টা হয়। ভারতবাসী সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া হইলেও সর্ব্বত্র—সব বিষয়ে—য়ুরোপীয় অভিযুক্তের বিচারের অধিকার

তাহার ছিল না - কেন না, বিচারক বিজিত জাতির লোক, আর অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেতার জাতি। এই ব্যবস্থায় কেবল যে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য, তাহাই নহে ; পরন্তু বিচার-বিভ্রাট বা বিচার-ব্যাভিচারও ঘটিত। সে কথা ইংরাজ-পরিচালিত পত্র 'পাইওনীয়ার' হইতে আরম্ভ করিয়া ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী লর্ড রেডিং পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি এই অব্যবস্থার বিলোপসাধনচেষ্টায় এ দেশে য়ুরোপীয় সমাজ এত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, তাহারা বড়লাটকেও অপমান করে এবং তাহাদিগের অযথা অধিকার লোপ করাও সম্ভব হয় নাই। এই ব্যাপারে য়ুরোপীয় ও ভারতীয় উভয়পক্ষে শক্তি-পরীক্ষা হয় এবং তাহাতে ভারতবাসীর মনে হয়—সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কায না করিলে ভারতবাসীর পক্ষে সঙ্গত অধিকার লাভের পথও বিঘ্নশূন্য হইবে না। সে কথা হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"শেখ্ রে এখন, ভারত-সন্তান,
শ্বেতাঙ্গ নিকটে তৃণের সমান
সমগ্র ভারত জাতি কুল মান—
রাজস্তুতি গান সব(ই) বিফল।"

সুতরাং

"যে মন্ত্র সাধনে সুপটু উহারা
সেই বীর-ব্রত—একতার ধারা
সে সাহস উৎস—সে উৎসাহ-ধারা
হৃদয়-কন্দরে গাঁথিয়া রাখো।"

ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে আন্তর্জ্জাতিক প্রদর্শনী হয়, তাহার সুযোগ লইয়া নিখিল ভারত জাতীয় কন্‌ফারেন্স করা হয় এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে যখন কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন তখনও কলিকাতায় ঐ কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছিল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যে অভাব দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, সে অভাব তখন তীব্রভাবেই অনুভূত হইতেছিল। তখন রেলপথ, ডাক, তার—দেশে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে এবং ইংরাজী শিক্ষা সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে। বাঙ্গালায় যদি সর্ব্বপ্রথম দেশাত্মবোধের উদ্বোধন হইয়া থাকে, তবে তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালাই সর্ব্বাগ্রে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে। বাঙ্গালীই সর্ব্বপ্রথম সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইবার জন্য বিলাতে গমন করেন এবং কংগ্রেস স্থাপনের বহুপূর্ব্বে যখন বাঙ্গালায় হিন্দু মেলা প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এই বাঙ্গালী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরই গান রচনা করেন—

"মিলে সব ভারত-সন্তান
একতান মনঃপ্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শত খনি রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয় ;
জয় ভারতের জয়।
গাও ভারতের জয়
কি ভয়, কি ভয় ?
গাও ভারতের জয়।"

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেন—বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার সভাপতি।



উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
বোম্বাই—১৮৮৫ (প্রথম কংগ্রেস)
এলাহাবাদ—১৮৯২

এই সভাপতি নির্ব্বাচনেই রাজনীতিক আন্দোলনে বাঙ্গালার নেতৃত্ব স্বীকৃত হয়। সে অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রকৃত রাজনীতিক রূপ যেমন সপ্রকাশ হয় নাই, তেমনই তাহাকে

প্রকৃত প্রতিনিধি-প্রতিষ্ঠান বলিয়া অভিহিত করিবারও কারণ ছিল না। সে রূপ ফুটিয়া উঠে এবং সে কারণ দেখা যায়—কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে। সে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের কথা। সে অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন—"আমার বিক্ষিপ্ত স্বজাতীয়গণ একত্র হইবেন—আমরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবন যাপন না করিয়া একটি জাতিতে পরিণত হইব, ইহা আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন। এই কংগ্রেসে আমি সেই জাতীয় ঐক্যের আরম্ভ দেখিতেছি।"

এই রাজেন্দ্রলাল অতি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কেরাণীরূপে এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রবেশ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইয়াছিলেন। ইনি প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা করিয়া ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন এবং পণ্ডিত ইংরাজদিগের বিরুদ্ধ মত যুক্তির দ্বারা চূর্ণ করেন। আর ইনি যেমন জগতে ভারতবাসীর উচ্চস্থানলাভে সচেষ্ট ছিলেন, তেমনই ভারতবর্ষে বাঙ্গালীর নেতৃত্ব-প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী ছিলেন।

এই অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। আর বাঙ্গালী কবি হেমচন্দ্র সেই অধিবেশনে দেখিয়াছিলেন —ভারত মাতার যোগ নিদ্রা ভঙ্গ হইল—

"পূরব বাঙ্গালা মগধ বিহার
দেরা ইস্‌মাইল হিমাদ্রির ধার
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাটী গুজ্‌রাটী মহারাঠী ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।"

আর দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন :—

"জীবন সার্থক আজি রে আমার
এ রাখি-বন্ধন ভারত মাঝার
দেখিনু নয়নে—দেখিনু রে আজ
অভেদ ভারত চির-মনোরথ
পূরাবার তরে চলিল।"

এই অধিবেশনের পর হইতেই কংগ্রেস রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান-রূপে পরিচালিত হয় এবং সমগ্র ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ইহাতে সমবেত হইতে আরম্ভ করেন।

এই অধিবেশনে যাঁহারা প্রতিনিধি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে জীবিত বাঙ্গালী প্রিন্সিপাল হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, 'সঞ্জীবনী'-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুর, সত্যপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, রায় যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ বাহাদুর ও কামিনীকুমার চন্দ এই কয় জনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি।

কেবল মুসলমানরা প্রথমাবধি কংগ্রেসের প্রতি যেন কিছু বিরূপ ছিলেন। তাহার কারণ, তাঁহারা বহু বিলম্বে ইংরাজী শিক্ষায় আকৃষ্ট হওয়ার ফলে নানা ক্ষেত্রে হিন্দুদিগের তুলনায় পশ্চাতে ছিলেন এবং মনে করিয়াছিলেন, যে প্রতিষ্ঠানে সরকারের কাযের সমালোচনা হয়, তাহাতে যোগ না দিলে তাঁহারা সরকারের প্রীতিভাজন হইবেন। লোকের রাজনীতিক অধিকার বৃদ্ধিতে হিন্দুরাই অধিক প্রভাবসম্পন্ন হইবেন—এ সন্দেহও হয় ত তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মনে স্থান পাইয়াছিল। ইহা বিলাতের 'টাইমস' পত্র তৎকালেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেসের গুরুত্বহীনতা প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে ইহার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহার সম্বন্ধে বলা যায়—"adding another to many proofs that we must look to our Mahomedan subjects for the most sensible and moderate estimate of our policy." এত দিন পরেও আমরা মুসলমানদিগকে তুষ্ট করিয়া ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথ বিঘ্নাস্তৃত করিবার এই চেষ্টা বিলাতের কতকগুলি সংবাদপত্রে দেখিতে পাইতেছি। আবার তখনও যেমন, এখনও তেমনই মুসলমানদিগের মধ্যে সকলেই যে জাতীয়তার বিরোধী তাহা বলা যায় না। বিশেষ তখন সাম্প্রদায়িক ভাব মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের মত উগ্র হইয়া উঠে নাই।

লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসকে রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তিনি ইহাকে "আণুবীক্ষণিক" অর্থাৎ অতি অল্প-সংখ্যক লোকের অনুষ্ঠান ও "অজ্ঞাত রাজ্যে লম্ফ" বলিয়া বিদ্রূপ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। হয়ত তিনি পরে—ইহার পরিণতি ভাবিয়া শঙ্কিত হইয়াছিলেন।

লর্ড ডাফরিণের অপেক্ষাও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট সার অকল্যাণ্ড কলভিন কংগ্রেসের বিরোধিতা করেন। ভিঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহের নামে কংগ্রেসকে আক্রমণ করিয়া যে পুস্তিকা প্রচারিত হয় ('গণতন্ত্র ভারতের

উপযোগী নহে') তাহা সার অকল্যাণ্ডের রচনা বলিয়া জানা গিয়াছে। এই সময় এই বিষয়ে তাঁহার সহিত মিষ্টার হিউমের যে পত্রব্যবহার হয়, তাহাতে মিষ্টার হিউম স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, কংগ্রেস এ দেশে ইংরাজ শাসনের safety-valve হইবে। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের অধিবেশনের পর যখন প্রয়াগে অধিবেশন হয়, তখন সরকার প্রথমে খসরুবাগ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া সে অনুমতি প্রত্যাহার করেন এবং তাহার পর যে জমীর জন্য অগ্রিম ভাড়া পর্য্যন্ত গৃহীত হইয়াছিল ৪ মাস পরে সে জমী দিতেও অস্বীকার করেন। কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পণ্ডিত অযোধ্যানাথ "লাউদার কাসল" সংগ্রহ করিয়া তথায় অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন চতুষ্টয় যথাক্রমে—বোম্বাইয়ে, কলিকাতায়, নাগপুরে ও এলাহাবাদে। পূর্ব্ববার অধিবেশনের স্থান লইয়া বিশেষ অসুবিধা ঘটায় এ বার মহারাজা সার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ (দ্বারবঙ্গ) "লাউদার কাসল" ক্রয় করিয়া তাহা কংগ্রেসের অধিবেশন জন্য প্রদান করেন। যাঁহারা মহারাজার উপর উমেশচন্দ্রের প্রভাবের বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহারা ইহার কারণ অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন।



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনা—১৮৯৫
আমেদাবাদ—১৯০২

পর বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন লাহোরে। তাহার পর অধিবেশনক্ষেত্র যথাক্রমে—মাদ্রাজ, পুণা, কলিকাতা, অমরাবতী, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, কলিকাতা, আমেদাবাদ, মাদ্রাজ, বোম্বাই। এই ২০ বৎসরে বাঙ্গালী সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫ ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৫ ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দ), আনন্দমোহন বসু (১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ), লালমোহন ঘোষ (১৯০৩ খৃষ্টাব্দ)।



আনন্দমোহন বসু, মাদ্রাজ—১৮৯৮

ইহার পর কংগ্রেসে মতের সঙ্ঘর্ষ হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন হয়, তাহার প্রভাব কংগ্রেসে পতিত হওয়া যে অনিবার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য। বাঙ্গালা বৃটিশ পণ্য বর্জ্জন ঘোষণা করিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসে তাহার সমর্থন চাহিলে প্রথম সে সঙ্ঘর্ষ আত্মপ্রকাশ করে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর অধিবেশনের পরবৎসর অধিবেশন কলিকাতায়। ইহাতে মতভেদ প্রবল হয়। জাতীয় দল তখনই স্বায়ত্ত-শাসন ভারতবাসীর কাম্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—মডারেটরা কংগ্রেস পূর্ব্বপথেই রাখিতে চাহিতেছেন। জাতীয় দলের ইচ্ছা ছিল—বালগঙ্গাধর তিলককে সভাপতি করা হয়। মডারেটরা চেষ্টা করিয়া দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি করেন। সভাপতি তাঁহার অভিভাষণে—কংগ্রেসের দাবী প্রকাশ করেন—স্বরাজ বা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন নাগপুরে হইবার কথা ছিল; কিন্তু মডারেট নেতা সার ফিরোজশা মেটা সুরাটে মডারেট-প্রাধান্য বলিয়া অধিবেশন-স্থান তথায় পরিবর্ত্তন করেন। সে বার নির্ব্বাচিত সভাপতি—রাসবিহারী ঘোষ।

তিনি যে তাঁহার লিখিত অভিভাষণে জাতীয় দলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং



রমেশচন্দ্র দত্ত, লক্ষ্ণৌ—১৮৯৯

শুনা যায় মডারেটরা কলিকাতার অধিবেশনে গৃহীত স্বরাজ, বিলাতী পণ্য বর্জ্জন ও জাতীয় শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বর্জ্জন করিবেন। জাতীয় দল এই সংবাদে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং শেষে উভয় দলের সঙ্ঘর্ষে কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া যায়।



লালমোহন ঘোষ, মাদ্রাজ—১৯০৩

ইহার পর জাতীয় দলের অনেক নেতা রাজরোষে পতিত হয়েন এবং মডারেটরা নূতন নিয়ম করিয়া কংগ্রেস পরিচালন করিতে থাকেন।

এই সময় হইতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত—মাদ্রাজ, লাহোর, এলাহাবাদ, কলিকাতা, বাঁকিপুর, করাচী, মাদ্রাজ, বোম্বাই ও লক্ষ্ণৌ সহরে যে সব অধিবেশন হয়, সে সবই মডারেটদিগের অধীনে। এই কয় বৎসরে বাঙ্গালী সভাপতি—রাসবিহারী ঘোষ (১৯০৮ খৃষ্টাব্দ), ভূপেন্দ্রনাথ বসু (১৯১৪ খৃষ্টাব্দ), সার (পরে লর্ড) সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (১৯১৫ খৃষ্টাব্দ), অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৯১৬ খৃষ্টাব্দ)। পর পর ৩ বৎসর যে বাঙ্গালী সভাপতি নির্ব্বাচিত হয়েন, তাহাতেই কংগ্রেসে বাঙ্গালীর প্রভাব বুঝা যায়। সেই প্রভাবের ফলে লক্ষ্ণৌ সহরের অধিবেশনে আবার উভয় দলে মিলন হয়।



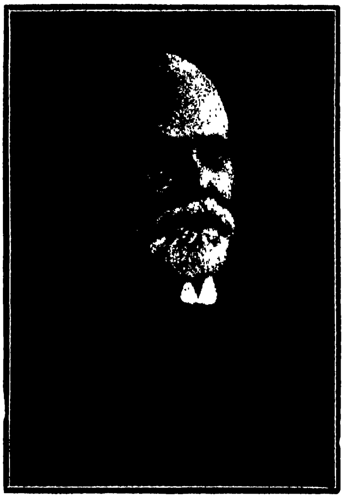
রাসবিহারী ঘোষ, সুরাট—১৯০৭
মাদ্রাজ—১৯০৮

এই অধিবেশনের আর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার—প্রধানতঃ মামুদাবাদের জমীদার রাজাসাহেবের চেষ্টায় মুসলমানদিগকে কংগ্রেসের সহিত একযোগে রাজনীতিক অধিকার লাভ চেষ্টা করাইবার আশায় চুক্তি হয়, কংগ্রেস যে শাসন-সংস্কার চাহিবেন তাহাতে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদিগের চারি-পঞ্চমাংশ নির্ব্বাচিত ও এক-পঞ্চমাংশ মনোনীত হইবেন এবং নির্ব্বাচিত ভারতীয় সভ্যের অনুপাতে মুসলমানের সংখ্যা এইরূপ হইবে :—

পঞ্জাব	শতকরা ৫০
যুক্তপ্রদেশ	„ ৩০
বাঙ্গালা	„ ৪০

বিহার	শতকরা ২৫
মধ্যপ্রদেশ	„ ১৫
মাদ্রাজ	„ ১৫
বোম্বাই	এক-তৃতীয়াংশ

মুসলমানগণ তাঁহাদিগের সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-কেন্দ্র হইতেই নির্ব্বাচিত হইবেন।



ভূপেন্দ্রনাথ বসু, মাদ্রাজ—১৯১৪

এই ব্যবস্থা মসলেম লীগ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং মুসলমানাতিরিক্ত প্রতিনিধিরা মনে করেন, মুসলমানরা এ বার কংগ্রেসে সাগ্রহে যোগ দিবেন। তখন তাঁহারা মনে করিতে পারেন নাই, জাতীয়তার স্থানে সাম্প্রদায়িকতার প্রতিষ্ঠায় বিশেষ কুফল ফলিবে এবং রক্তের আস্বাদ পাইলে শার্দ্দূল যেমন ভীষণ হইয়া উঠে—হিন্দুরা তাঁহাদিগের অযথা অধিকার লাভে সম্মত হওয়ায় মুসলমানরা তেমনই উগ্র হইয়া অযথা অধিকার-বৃদ্ধির চেষ্টাই করিবেন। যে সব ইংরাজ এ দেশে ভেদনীতির পক্ষপাতী ছিলেন, ইহাতে তাঁহাদিগেরও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সুযোগ ঘটে। পরে—শাসন-সংস্কারে, এই সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা দৃঢ় করা হইয়াছে এবং তাহাতে দেশের কিরূপ অপকার হইয়াছে, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। বিস্ময়ের বিষয় কংগ্রেসও পরে এই ব্যবস্থা বর্জ্জন করিবার সাহস দেখাইতে পারেন নাই।

ইহার পরবর্ত্তী অধিবেশন (১৯১৭ খৃষ্টাব্দ) কলিকাতায়। ইহাতে জাতীয় দলের চেষ্টায় বিনা বিচারে বন্দিদশা হইতে মুক্ত মিসেস বেসাণ্ট সভানেত্রী হয়েন।

৮ই জুলাই (১৯১৮ খৃষ্টাব্দ) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার বিবরণ প্রকাশিত হইলে তাহা বিচার জন্য বোম্বাইয়ে এক অতিরিক্ত অধিবেশন হয় এবং তাহাতে সংস্কার-



সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, বোম্বাই—১৯১৫

প্রস্তাবগুলি দেশের লোকের আকাঙ্ক্ষার উপযোগী নহে—এই মত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা অনুমান করিয়া মডারেটরা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

ইহার পর দিল্লীতে ও পরবৎসর অমৃতসরে অধিবেশন হয়। অমৃতসরের অধিবেশনের পূর্ব্বেই রৌলট আইন উপলক্ষ করিয়া আন্দোলন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। সে অধিবেশনেও মডারেটরা যোগ দেন নাই।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় লালা লজপত রায়ের সভাপতিত্বে যে অধিবেশন হয়, তাহাকে কংগ্রেসের তৃতীয় পর্ব্বারম্ভ বলা যায়। তাহাতে অসহযোগনীতি গৃহীত হয় এবং গান্ধীজী সে প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই সময় হইতে কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রভাবে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। কেবল গয়ার অধিবেশনে সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন প্রস্তাব প্রত্যাহার করাইবার চেষ্টায় বিফলকাম হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া স্বরাজ্য দল গঠন করেন এবং তাহার ফলে দিল্লীতে এক অতিরিক্ত অধিবেশনে স্থির হয়—ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশে যাঁহাদিগের বিবেকগত কোন আপত্তি নাই, তাঁহারা সে সভায় প্রবেশ করিতে পারেন। তখন গান্ধীজী কারাগারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের

অধিবেশনের পর আমেদাবাদে চিত্তরঞ্জনের সভাপতি হইবার কথা ছিল ; কিন্তু তাঁহার কারাদণ্ড হওয়ায় তিনি পরবর্ত্তী অধিবেশনে (গয়ায়) সভাপতিত্ব করেন।



অম্বিকাচরণ মজুমদার, লক্ষ্ণৌ—১৯১৬

গয়ার পরবর্ত্তী অধিবেশনসমূহের স্থান—কোকনদ (১৯২৩ খৃষ্টাব্দ), বেলগাঁও (১৯২৪ খৃষ্টাব্দ), কাণপুর (১৯২৫ খৃষ্টাব্দ), গৌহাটী (১৯২৬ খৃষ্টাব্দ), মাদ্রাজ ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ), কলিকাতা (১৯২৮ খৃষ্টাব্দ), লাহোর (১৯২৯ খৃষ্টাব্দ), করাচী (১৯৩১ খৃষ্টাব্দ)। লাহোরের



চিত্তরঞ্জন দাশ, গয়া—১৯২২

অধিবেশনে সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কংগ্রেসের পূর্ব্বাদর্শ ত্যাগ করিয়া নূতন আদর্শ গ্রহণ করার কথা বলেন। এতদিন কংগ্রেস "স্বরাজ" চাহিয়া আসিয়াছিলেন এবং স্বরাজ বলিলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন বুঝাইত। এই আদর্শে ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্য ত্যাগের কোন কথা উঠে নাই। পণ্ডিত জওহরলাল কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে স্বাধীনতা শব্দ ব্যবহার করেন। তিনি ইহার ব্যাখ্যা করেন—বৃটিশপ্রাধান্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি।

ইহার পর কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হয় এবং পরবর্ত্তী দুই বৎসর যথাক্রমে দিল্লীতে ও কলিকাতায় যে অধিবেশনের চেষ্টা হয়, তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়—অর্থাৎ সরকার অধিবেশন হইতে দেন নাই।

আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহৃত হয় এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই নগরে শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপতিত্বে পুনরায় কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে এক শতেরও অল্প সংখ্যক প্রতিনিধি লইয়া স্বল্প আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি-চেষ্টায় যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—আজ তাহা অর্দ্ধ-শতাব্দীর হইল। তাহার প্রভাব ও প্রতাপ কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে ভারতসচিব অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশনের নির্দ্ধারণের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহার পূর্ব্বে ভারত-সচিব লর্ড মর্লি কংগ্রেসের মডারেটদিগকে স্বপক্ষে আনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দেশব্যাপী বিক্ষোভের সময় বড়লাট লর্ড আরউইন কংগ্রেসের প্রতিনিধির সহিত পরামর্শ করিয়া মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নূতন প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার যেমনই কেন হউক না, ইহাতে কংগ্রেসের প্রভাব সুস্পষ্ট।

আশা ও নিরাশা, জয় ও পরাজয়, ত্যাগ ও সাধনা—এই সকলের মধ্য দিয়া কংগ্রেস অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল দেশের প্রকৃত ও একমাত্র রাজনীতিক প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্যতা ও গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। আজ সেই অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ব্বে মূর্ত্তিগ্রহণকারী ভাবের প্রতীক কংগ্রেসের জন্য উৎসব—ভারতে সর্ব্বত্র অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কংগ্রেস কখন সন্দেহে বিচলিত, কখন জয়ে উৎফুল্ল,

কখন বা বিভাগে দুর্ব্বল হইয়াছে। কিন্তু তাহার লক্ষ্য সে কখন ত্যাগ করে নাই। তাহার সেই লক্ষ্যে যে ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার—সে কথা বালগঙ্গাধর তিলক বলিয়াছিলেন। তাহার পর সে লক্ষ্য যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক সে কথা সম্রাটের বাণীতে উক্ত হইয়াছে। দেশবৎসল ভারতবাসীরা যে বহুদিন হইতে স্বরাজলাভের স্বপ্ন দেখিয়া আসিতেছেন, তাহা স্বীকার করিয়া সম্রাট তাহার সার্থকতা সাধন হইবে মনে করিয়া শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন করিলেন—বলিয়াছিলেন।

কংগ্রেস যত সবল হইবে সে স্বপ্ন ততই সাফল্য সম্ভাবনার নিকটবর্ত্তী হইবে। আজ তাহা স্মরণ করিয়া কংগ্রেসকে নূতন প্রযত্নে বরণ করিয়া দেশবাৎসল্যের গঙ্গোদকে ধৌত ত্যাগের রত্নবেদীর উপর স্থাপন করিতে হইবে—সাধনার নূতন পর্য্যায় আরম্ভ করিতে হইবে। যে বাঙ্গালী সর্ব্বপ্রথম এই প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিয়াছিল—যে বাঙ্গালী সর্ব্বাগ্রে মা'র রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াছিল, সেই বাঙ্গালী কি আবার এই সাধনায় অগ্রণী হইয়া সিদ্ধিলাভ করিবে না? তাহার কণ্ঠে কি আবার বাঙ্গালীর রচিত মাতৃমন্ত্র সর্ব্বোচ্চ স্বরে ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইবে না—

"বন্দেমাতরম্।"

চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ডাঃ শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এম, বি,

এ কথা আপনারা সকলেই জানেন যে আমাদের চক্ষু অত্যন্ত কোমল এবং যদিও শরীরের অন্যান্য স্থানের আঘাত অত্যন্ত সাংঘাতিক না হইলে তাহাদের কার্য্যকরী শক্তি একেবারে নষ্ট হয় না, কিন্তু চক্ষুর পীড়া কিংবা আঘাত সামান্য হইলেও তাহাতে ভবিষ্যতে রোগীর দৃষ্টিশক্তির অত্যন্ত ক্ষতি হইতে পারে। সুতরাং আমাদের চক্ষুর কোনও প্রকার পীড়া কিংবা আঘাত হইলে অত্যন্ত সাবধান হওয়া আবশ্যক।

ইহা ভিন্ন বহির্জগতের সহিত ভাবের আদানপ্রদানের জন্য চক্ষু সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়ও বটে। দৃষ্টিহীন ব্যক্তির পক্ষে জীবনধারণ বহুলাংশে বিড়ম্বনা মাত্র। জীবনের মাধুর্য্য উপভোগ দৃষ্টিশক্তি ভিন্ন সম্ভবপর নহে।

(ক) আমি প্রথম সাধারণ চক্ষুরোগ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। কোনও কোনও ক্ষেত্রে চক্ষুরোগের চিহ্নগুলি এতই সামান্য, যে রোগী কিংবা তাঁহার আত্মীয় স্বজনেরা হয়ত সে সকল গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। খুব সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে, যাকে ডাক্তারীতে বলা হয় Eye strain। চক্ষুকে যে কার্য্য করিতে হয়, তাহা চক্ষুর পক্ষে পীড়াদায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কতকগুলি চিহ্ন দ্বারা চক্ষু তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিতেছে। সাধারণতঃ এই সকল চিহ্ন উপস্থিত হইলেই আমাদের চক্ষুর দিকে নজর দেওয়া দরকার। যেমন কিয়ৎক্ষণ পড়িতে পড়িতে বা সেলাই করিতে করিতে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হইয়া যাওয়া, মাথা ধরা, চোখ দিয়া জল পড়া, প্রায়ই চোখ লাল হওয়া ইত্যাদি। অবশ্য এই সকল পীড়া গুরুতর হইলে, তাহার দিকে আপনিই মনোযোগ দিতে হয়; কিন্তু যখন এগুলি অতি সাধারণভাবে নিজেদের উপস্থিতি জানায়, তখনই যত গোলমাল বাধে। একথাটা বিশেষ করে মাথাধরা সম্বন্ধেই খাটে। মাথা ধরাটা যে সব সময়ে চোখের অসুখের জন্যই হয়, তাহা জোর করিয়া বলাও যায় না। তাহা ছাড়া মাথাধরা, রোগী ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। সেইজন্য অনেক সময়ে (বিশেষতঃ ছাত্রদের বেলায়) রোগীর আত্মীয় স্বজনরা মনে করেন যে, ওটা পড়াশুনা বন্ধের একটা অজুহাত মাত্র।

ছেলেদের বাপ ঠাকুর্দ্দারাও সম্ভবতঃ ছেলেবেলায়—চশমা ব্যবহার করেন নাই; সুতরাং ছেলেদের চশমা নেওয়ায় তাঁহাদের আপত্তি স্বাভাবিক।

সুতরাং এ ব্যাপারের কোনও প্রতীকার হয় না—এইরূপেই চলিতে থাকে। ছেলেটি ক্রমশঃ পড়ায় অমনোযোগী হইয়া পড়ে—কেননা কিছুক্ষণ পড়িলেই মাথার যন্ত্রণা আরম্ভ হয়। তাহার ফলে সে বাড়ীতে এবং স্কুলে দুই জায়গাতেই বকুনি খায়, পরীক্ষার ফলও খারাপ হয়। কিন্তু প্রথমেই চক্ষু পরীক্ষা হইলে তাহার এ সকল দুর্ভোগ সহ্য করিতে হইত না।

চক্ষুরোগে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা বলেন যে, যদি কোনও বিজ্ঞ ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করেন যে ছেলেটির চশমা লওয়া উচিত, তাহা হইলে ছেলেটির অল্প বয়স ইত্যাদি বাজে ওজর না করিয়া চশমা দেওয়া উচিত। কেন না, রোগের প্রথম অবস্থায় চশমা ব্যবহার করিলে খুব শীঘ্রই উপকার পাওয়া যায় এবং দেরীতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হইয়া গিয়া 'ট্যারা' হইয়া যাইতে পারে।

ছেলেটিকে বরাবর চশমা ব্যবহার করিতে হইবে কি না, সেটা মধ্যে

মধ্যে চক্ষু পরীক্ষা করিলেই জানা যাইবে। বৃদ্ধেরা হয়ত বলিবেন যে, "বাপু, এককালে আমরাও ছোট ছিলাম, কিন্তু কই, আমাদের ত চশমা দরকার হয় নি। চশমা নেওয়াটা আজকালের একটা ফ্যাশান মাত্র।" তাঁরা ছেলেবেলায় চশমা ব্যবহার করেন নি, এটা সত্য। আবার আজকাল অল্পবয়সে ছেলেমেয়েরা যে বেশী চশমা ব্যবহার করছে (এবং ব্যবহার করা দরকার হয়ে পড়েছে) এটাও সত্য। কাজেই শুধু ফ্যাশানের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকাটা ত ঠিক নয়। আমার মনে হয়, প্রধানতঃ এই কয়েকটি কারণে বিশেষ করে দৃষ্টিশক্তির অল্পতা হচ্ছে। যথা:

(১) অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে থাকা, মুক্ত আকাশ, আলো ও বাতাসের অভাব, পুষ্টিহীন আহার্য্য ইত্যাদি নানা কারণে সাধারণ স্বাস্থ্যের অবনতি। এখন বেশীর ভাগ লোকই নানা কারণে বাধ্য হইয়া সহরে থাকেন। এখানে পুষ্টিকর আহার্য্য কিংবা মুক্ত আকাশ, এ সবেরই অভাব। বাড়ীগুলি পরস্পর সংলগ্ন, আকাশ এবং বাতাস ধুলা ও ধোঁয়ায় ভরা। সাধারণ গৃহস্থের এই অবস্থা। বড়লোকেরা খোলা জায়গায় থাকিতে পারেন তবে গরীবের সে সুবিধা নাই।

(২) সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়ম অবহেলা করা—

(৩) অনুপযুক্ত আলোকে চক্ষুর ব্যবহার—যেমন অল্প আলোয় পাঠ, সেলাই ইত্যাদি। বায়োস্কোপের তীব্র আলোও চক্ষুর পক্ষে অপকারী।

(৪) অন্য রোগের ফল অথবা জন্মাবধি চক্ষু পীড়া—সবগুলির বিশদ বর্ণনা এখানে সম্ভব নহে। সেইজন্য সংক্ষেপে কেবল বর্ণনা করিলাম।

(খ) এইবারে আমি আরও একটু বেশী রকমের অসুখের কথা আলোচনা করিব। এখানে কেবল মাথাধরা বা চোখ দিয়া জলপড়া নয়, আরও বেশী রকমের চিহ্ন উপস্থিত। এস্থলে আর চক্ষুরোগ সম্ভব একথা বলিতে হয় না, কারণ রোগী এবং তাহার আত্মীয় স্বজন সকলের কাছেই অসুখ খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে।

কোনওরূপ আঘাতের জন্য অথবা সাধারণ পীড়া কিংবা চক্ষুপীড়ার জন্য চক্ষুরোগের উৎপত্তি।

(১) চোখে কোনও কিছু বাহিরের জিনিস—যেমন ধুলা, বালি, ছোট পাথরের টুকরা, ছোট পোকা ইত্যাদি পড়া। জিনিসটী চোখের পাতার ভিতরে আছে, কিন্তু চোখের আর কোনও ক্ষতি হয় নাই। এগুলি সাধারণতঃ পথে বেড়াইবার সময়েই ঘটে। চক্ষু লাল হইয়া উঠে এবং জল পড়িতে থাকে—যাহাতে ধুলা বালি ইত্যাদি জলে ধুইয়া বাহির হইয়া যায়। সুতরাং আমাদেরও উচিত চক্ষুকে তাহার কাজে সাহায্য করা। যাহা কিছুই পড়িয়া থাকুক না কেন, প্রথম কর্ত্তব্য, জলে চোখ ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলা। সাধারণে কিন্তু ভুল করিয়া এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই চোখ রগড়াইতে থাকে। তাহার ফলে সেই বালি বা অন্য কিছুর টুকরা চোখের মধ্যে বসিয়া যাইতে পারে এবং পরে চোখ নষ্ট হইয়া যায়। যদি জলে ধুইয়া বাহির না হয়, ত সাবধানে চোখের পাতা উল্টাইয়া পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে বাহির করা যাইতে পারে। কিন্তু, হাত পরিষ্কার থাকা চাই এবং চোখে যেন নখের আঁচড় না লাগে, তাহা না হইলে আরও বিপদের সম্ভাবনা আছে।

বাহির করার পর, চোখে দু চার ফোঁটা পরিষ্কার লিকুইড, প্যারাফিন (Liquid Paraffin) দিলে বিশেষ আরাম হয়। যদি চোখের মধ্যে কোনও আঘাত লাগিয়া থাকে অথবা সহজে বাহির করা না যায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। যদি সেই ধুলা বালির টুকরা চোখের মধ্যে কোথাও বিঁধিয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া দরকার। কেন না, তিনি সেটা উঠাইয়া ফেলিবার অথবা অন্য কোনও প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে পারেন; কিন্তু অজ্ঞ লোকে হয়ত চোখের আরও ক্ষতি করিয়া দিতে পারে।

ইহার পরে, যে সকল চক্ষুরোগে চিকিৎসকের উপদেশ অত্যাবশ্যক সেই সকল চক্ষুরোগের কিছু আলোচনা করিব।

(২) দুর্ঘটনা, আকস্মিক বিপদের জন্য চক্ষুরোগ।

এই সকল ক্ষেত্রে সাবধানতাই প্রকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই হয়ত সাবধান হওয়া সম্ভব হইয়া উঠে না।

যেমন কেহ বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন। পথে মজুরেরা কাজ করিতেছে। হঠাৎ এক টুকরা পাথর আসিয়া চোখে বিঁধিয়া গেল। বাজি পোড়ানোর সময়ের দুর্ঘটনার কথা সকলেই জানেন। যাহারা বাজি পোড়ায়, তাহাদের বিপদের আশঙ্কা ত আছেই, পথচারী পথিকের বিপদের ভয়ও কম নহে। কয়েক বৎসর আগেকার কথা। ৺কালীপূজার পরের দিন সকালে মেডিকেল কলেজ চক্ষু বিভাগে (Eye Infirmary) প্রায় বছর কুড়ি বাইশ বৎসরের একটি বাঙ্গালী যুবককে আনা হয়। তার আগের রাত্রে পথ দিয়া যাবার সময়ে কি রকম করে একটা বাজি ফেটে তাঁর চোখে টুকরা বিঁধে যায়। অবশ্য অন্য আঘাতও ছিল; কিন্তু চোখের কথাটাই বলছি। প্রথমে আমি চেষ্টা করিলাম, কিন্তু চোখ থেকে টুকরা বাহির হইল না। রেসিডেণ্ট সার্জ্জন আসিয়া দেখিলেন, তিনিও কিছু করিতে পারিলেন না—টুকরা গভীর ভাবে বিঁধিয়া রহিয়াছে। রোগীকে হাসপাতালে 'ইনডোরে' (Indoor) ভর্ত্তি করা হইল। ২।৩ দিন পরে সেই চোখটী উঠাইয়া ফেলিয়া দিতে হইল। তাই বলিতেছি, পথে চলিবার সময়েও সাবধানে চলিতে হয়।

অবশ্য ছোট ছেলেদের পক্ষেই এই রকম আঘাত পাওয়াটা বেশী সম্ভব। বড়রা অনেকটা সাবধানে চলিতে পারেন। তবে তাঁরা যখন ছেলেদের হাতে লাটু দেন কিংবা তাদের বাজি পোড়াতে অনুমতি দেন, তখন তাঁদের জেনে রাখা উচিত, তাতে কতটা বিপদ হতে পারে। আমি আবার মনে করিয়ে দিতে চাই, এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রথম হইতেই চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া উচিত।

(৩) সাধারণ অসুখের জন্য চক্ষুরোগ। চোখের বিশেষ কোনও অসুখ হয় নাই—কেবল চোখ লাল হওয়া, সকালে চোখ বন্ধ হয়ে



শিল্পী—শ্রীযুত [illegible]

যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গ আছে। হাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতিতে কিংবা ঠাণ্ডা লাগিয়া এ সকল হইতে পারে। এ সকল ক্ষেত্রে চোখের জন্য বিশেষ কিছু দরকার হয় না। সামান্য গরম করিয়া বোরিক লোসনে ২।৩ বার চোখ ধুইলে উপকার হয়।

(৪) চোখের বেশী রকমের অসুখ।

(অ) সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হইলে অথবা বেশী রকমের অসুখে—যেমন কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদিতে চোখে ঘা ইত্যাদি হওয়া। এক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ লওয়া বিশেষ আবশ্যক।

(আ) সাধারণ স্বাস্থ্য বিশেষ খারাপ না হইলেও চোখের অসুখ। চোখে কোনও আঘাত লাগিবার পরে চোখে ঘা হওয়া, অথবা চোখ ওঠা (Conjunctivitis), ছানি পড়া (Cataract), চোখের ভিতরের চাপ বৃদ্ধি হওয়া (increased intra ocular pressure glaucoma) ইত্যাদি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত। চোখের বেশী অসুখ করিলে সব ক্ষেত্রেই চোখ লাল হইয়া উঠে এবং চোখ দিয়া জল পড়া, রৌদ্রে তাকাইতে অক্ষমতা, চোখে ব্যথা—এ সমস্তই অল্প বিস্তর সব চোখের অসুখে পাওয়া যায়। সাধারণে সে জন্য এ সব অসুখই এক পর্যায়ে ফেলেন এবং চিকিৎসাও এক রকমই করেন। অনেক ক্ষেত্রে ভুল চিকিৎসায় সময় নষ্ট হয়।

অনেক ক্ষেত্রে দেখিয়াছি, চোখে ঘা হইয়া চোখ সাদা হইয়াছে। রোগীর আত্মীয় স্বজন জানে 'ছানি' পড়িতেছে। ছানি 'পাকিবার' জন্য অপেক্ষা করিয়া যখন রোগীকে হাসপাতালে লইয়া আসিয়াছে, তখন রোগী দৃষ্টিশক্তিহীন, অন্ধ,—মানুষের চিকিৎসার বাহিরে। এই রকম প্রত্যহই হইতেছে। তাই বলিতেছি, সময় থাকিতে সাবধান হউন। চোখের অনেক অসুখ আছে, অনেক চিকিৎসাও আছে। আমি কেবল এই কয়েকটি সামান্য কথা বলিলাম।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, যে কারণেই হউক্ না কেন, আজকাল অনেকেই চোখের অসুখে ভুগিতেছেন। চোখের অসুখ সামান্য হইলে সামান্য চিকিৎসাতেই ভাল হইয়া যাইবে, আবার হয়ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শও প্রয়োজন হইতে পারে। কাজেই চোখের অসুখ হইলে বিচক্ষণ চিকিৎসকের পরামর্শ যত শীঘ্র সম্ভব লওয়া উচিত। ঠিক সময়ে চিকিৎসা করিলে অসুখ বাড়িতে পারে না। চোখের ব্যাপারে অবহেলা করা অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

সাধারণ স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিবেন। শরীর ভাল থাকিলে চোখও সম্ভবতঃ ভাল থাকিবে। চোখকে যথোপযুক্ত বিশ্রাম দিবেন। অল্প আলোয় কিংবা অত্যধিক আলোয় পড়াশুনা ইত্যাদি করিবেন না। চশমা দরকার হয়, ব্যবহার করুন। ভাবিবেন না, যে এতগুলি লোকে কেবল 'ফ্যাশানের' জন্যই চশমা ব্যবহার করিতেছে। যদি সম্ভব হয়, মধ্যে মধ্যে বিচক্ষণ চিকিৎসকের দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করাইবেন। তাহা হইলে, কোনও নূতন উপসর্গের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা করা যাইবে।

সবশেষে এই কথাটি মনে রাখিবেন, আমাদের চোখ বড় কোমল এবং অল্পতেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

কবি জয়দেবের "বৈষ্ণবামৃত"

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন

কটকে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা আছে। শাখার অবস্থাও মূল পরিষদেরই মত। তবে ভরসার কথা কটকের কয়েকজন কৃতবিদ্য উদ্যমশীল বাঙ্গালী যুবক দুই-একজন খ্যাতনামা প্রবীণের সহায়তায় পরিষদের উন্নতির জন্য আ-প্রাণ পরিশ্রম করিতেছেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কটকে সুপরিচিত। তিনি সম্প্রতি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে স-শ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইয়া অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন জনসাধারণ এবং গভর্ণমেণ্ট উভয় পক্ষের সহযোগিতায় পরিষদের একটি স্থায়ী আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পরিষদের নিজস্ব কোন গৃহ নাই ইহা বাস্তবিকই অত্যন্ত দুঃখের কথা। পরিষদের কর্ম্মিগণ কটক টাউনহলে বৈষ্ণব-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে আমাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। বক্তৃতার পূর্ব্বদিন ইহাঁদেরই অনুগ্রহে কয়েকজন উড়িয়া সাহিত্য-সেবীর সঙ্গে কবি জয়দেব সম্বন্ধে আলোচনা হয়। উড়িষ্যার নবজাতীয়তা-বোধের আবেগের মুখে কোন কোন সাহিত্যিক কিছুদিন হইতে একটা প্রশ্ন তুলিয়াছেন "কবি জয়দেব কি উড়িয়া ছিলেন" ? বৈঠকে এই বিষয়েরই আলোচনা হইয়াছিল। অপর পক্ষের একটা প্রধান যুক্তি ছিল—কবি-প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না, পক্ষান্তরে উড়িষ্যায় জয়দেব প্রণীত

"বৈষ্ণবামৃত" নামক একখানি একাঙ্ক নাটিকা পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে এরূপ যুক্তির কোন সারবত্তা নাই। যেহেতু গৌড়-কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর "রামচরিতের" কোন পুঁথি বাঙ্গালায় পাওয়া যায় নাই, পুঁথি পাওয়া-গিয়াছে নেপালে; অতএব বলিব কি কবি নেপালী ছিলেন? গৌড়-কবি চতুর্ভুজের "হরিচরিত" কাব্যখানি বাঙ্গালায় খুঁজিয়া পাই না। পুঁথি রহিয়াছে নেপালের রাজকীয় গ্রন্থশালায়। অথচ এই কবি নিজেই বলিতেছেন যে "আমার পূর্ব্বপুরুষ স্বর্ণরেখ বাঙ্গালার পাল-নরপতি ধর্ম্মপালের নিকট করঞ্জ গ্রাম দানপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" কবি চতুর্ভুজ গৌড়েশ্বর হুসেনশাহের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। মাত্র সাড়ে চারিশত বৎসরের লেখা পুঁথিও বাঙ্গালায় পাওয়া যাইতেছে না, তা অন্যে পরে কা কথা! কিন্তু বাঙ্গালায় পাওয়া না পাওয়ার প্রশ্ন নয়, "বৈষ্ণবামৃত" সম্বন্ধে একটু বিশেষ কথা আছে। বৈষ্ণবামৃত যদি শ্রীগীতগোবিন্দ প্রণেতা কবি জয়দেবের প্রণীত হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালার প্রবাদের মূলে অনেকখানি সত্য রহিয়াছে। বৈষ্ণবামৃতের মধ্যে কোন উৎকলাধিপের নাম না থাকিলেও শ্রীজগন্নাথদেবের নাম আছে। নাটিকাখানি যে শ্রীজগন্নাথের সম্মুখে অভিনীত হইয়াছিল, গ্রন্থ মধ্যে তাহারও উল্লেখ পাইতেছি। সুতরাং ইহা জয়দেব প্রণীত হইলে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কবি জয়দেব শ্রীধাম পুরুষোত্তমে গিয়াছিলেন এবং তথায় কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে বাঙ্গালায় বিশেষ বীরভূমে এই প্রবাদই প্রচলিত আছে।

পুরী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত করুণাকর কর, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ এম, এ, মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের একটি প্রতিলিপি আছে। অধ্যক্ষ মহাশয় অপর কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটিকার সঙ্গে এই একাঙ্ক নাটিকখানি প্রাপ্ত হন। মূল প্রতিলিপি কত দিনের পুরাতন এবং সেখানি কোথায় আছে, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহা অবগত নহেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক নাটিকাখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া শুনাইলেন এবং কয়েকটি শ্লোক লিখিয়া লইতে ও প্রকাশ করিতে অনুমতি দিলেন। এই অনুগ্রহের জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। গ্রন্থখানি প্রকৃতই শ্রীগীতগোবিন্দ রচয়িতার রচিত কিনা, সুধীজনেরা তাহার বিচার করুন।

বৈষ্ণবামৃতের সূচনা হইয়াছে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট দর্শনে শ্রীমতী রাধার পূর্ব্বরাগে; রাধা-কৃষ্ণের মিলনে ইহার পরিসমাপ্তি। নাটিকা-কথিত রাধাসখীগণের নাম—বকুলমালিকা, নবমালিকা, প্রেমকলা প্রভৃতি। একজন কৃষ্ণভক্তের নাম রসালক। রায় রামানন্দের জগন্নাথবল্লভ নাটকেও ললিতা বিশাখাদি সখীগণের নাম নাই। আবার সম-সাময়িক শ্রীরূপগোস্বামীপাদের নাটকে আমরা ললিতাদির নাম প্রাপ্ত হই। আমরা এদিকে নবীন গবেষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। অনেকে ইদানীং এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে অমুক নাটকে কি কাব্যে যখন এই নামগুলি নাই, তখন তৎসমস্তই পরের যোজনা। কিন্তু এইরূপ দুই একখানি গ্রন্থ হইতে প্রতিপন্ন হয় না যে, জয়দেব অথবা রায় রামানন্দের সময় এই নামগুলি প্রচলিত ছিল না, পরবর্ত্তীকালে পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। নাট্যকার সখাসখীগণের নাম নির্ব্বাচনে স্বাধীন-কল্পনার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন, এইরূপ অনুমানই সঙ্গত। নাটিকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এইরূপ—

কিঞ্জল্কদ্যুতিপুঞ্জ পিঞ্জর দলৎ পঙ্কেরুহ শ্রীবহং
সম্পা সম্পতিতাংশু মানস শরৎ কাদম্বিনী ডম্বরং।
লাস্যোল্লাসিত চণ্ড তাণ্ডব কলাং লীলায়িতং সন্ততম্
চক্র প্রক্রম বৃত্ত নৃত্য হরয়ো নির্ব্যাজ মব্যাজ্জগৎ॥

অপিচ—

কম্পমান নবচম্পকাবলী চুম্বিতোৎপলসহোদরোদয়ম্
লাস্য লালস নবীন বল্লবী পল্লবীকৃত উপাস্মহে মহ॥

প্রথম শ্লোকটি শিবপক্ষ এবং কৃষ্ণপক্ষ দুইরূপেই ব্যাখ্যাত হইতে পারে। দুইটি শ্লোকই শ্রীগীতগোবিন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় শ্লোকটির শেষাংশের সঙ্গে কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের শ্লোকাংশের সাদৃশ্য রহিয়াছে।

নান্দ্যন্তে সূত্রধারের পর নিম্নোক্ত শ্লোকটি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মরুৎপম্পাকম্পাকুল লহরী সম্পাত শিশিরঃ
স্ফুরৎমল্লীবল্লী কুসুমপট হল্লিষক নট।
স্ফুরন্নালীকালী মধুর মধুপালী কবলয়ন্
অয়ং মন্দংমন্দং তরল তরুবৃন্দং প্রসরতি॥

গ্রন্থের সামাজিক সম্বোধন এইরূপ—

অহো ভগবতো ভাগবতজন শীতময়ূখস্য নীলাচলমৌলিমণ্ডনমণেঃ গরুড়ধ্বজস্য প্রাসাদে প্রমোদললিতাঃ সামাজিকাঃ—

চিত্রম্ চঞ্চলং চঞ্চলেব চতুরাচেতশ্চমৎকারিণী
পিযূষদ্যুতিমণ্ডলীব মধুরঃ স্বচ্ছ প্রবাহচ্ছটা।
দৃগ্ ভঙ্গীব কুরঙ্গ ভঙ্গুর দৃশাং আনন্দ সন্দায়িনী
গোষ্ঠী শ্রীজয়দেব পণ্ডিত মণেঃ সাবর্ত্ততে নর্ত্তিতুম্॥

শ্রীগীতগোবিন্দে কবি নিজেকে পণ্ডিত কবি বলিয়াছেন—

যদ্গন্ধর্ব্বকলাসুকৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গার বিবেক তত্ত্বমপি যৎকাব্যেষু লীলায়িতং।
তৎসর্ব্ব জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥
(১২ শঃ ২৭ শ্লোক)

কবি বলিতেছেন—

অশ্ম দ্রবীকর্ত্তুমিমৌ সমর্থৌ
চতুর্দ্দশানাং অপি পিষ্টপানাং।
অহং বচোভি র্জয়দেব নামা
করচ্ছটাভিশ্চ তুষারধামা॥

যে কবি বলিতে পারেন "চতুর্দ্দশ-ভুবনের মধ্যে পাষাণ গলাইতে পারি মাত্র আমরা দুইজন। এক—আমি জয়দেব পারি বাক্যচ্ছটায়, আর দ্বিতীয়—চন্দ্রদেব পারেন কিরণচ্ছটায়"! তিনি যদি শ্রীগীতগোবিন্দে "সন্দর্ভ শুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেব এব" বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। গোবর্দ্ধনাচার্য্য "আর্য্যাসপ্তশতী" গ্রন্থেও এইরূপ পূর্ণিমার সন্ধ্যার সঙ্গে সেন-নরপতির তুলনা করিয়াছেন। "সকলকলাঃ কল্পয়িতুং প্রভোঃ প্রবন্ধস্য কুমুদবন্ধোশ্চ। সেনকুলতিলকভূপতিরেকোরাকা প্রদোষশ্চ"। অর্থাৎ প্রবন্ধের (নৃত্য গীতাদি চতুঃষষ্টি কলা) এবং কুমুদবন্ধুর (ষোল কলা) সকল কলার সম্পূর্ণতা-সাধনে একমাত্র সেনকুলতিলক-ভূপতি বা পূর্ণিমার সন্ধ্যাই সমর্থ।

বৈষ্ণবামৃতের কৃষ্ণ-ভক্ত রসালক বলিতেছেন—

পরমব্রহ্ম নিরাকারং অবাঙ্মনসগোচরং।
বল্লবী তরলাপাঙ্গ পল্লবীকৃতমাশ্রয়॥

নিরাকার কথাটি সন্দেহজনক। কথাটি মূলে "নরাকার" ছিল কিনা অনুসন্ধানের বিষয়। কৃষ্ণকর্ণামৃতে একটি শ্লোক পাইতেছি—

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপিচ্ছ বিভূষণম্।
অঙ্গীকৃত নরাকারমাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ম্॥ (৯৩ শ্লোক)

কৃষ্ণকর্ণামৃতে ব্রহ্মেরও উল্লেখ আছে—

ধেনুপালদয়িতাস্তনস্থলীধন্যকুঙ্কুম সনাথ কান্তয়ে।
বেণুগীত গতি মূল বেধসে ব্রহ্মরাশি মহসে নমো নমঃ॥
(৭৭ শ্লোক)

বৈষ্ণবামৃতে মুরলীর তপস্যার প্রশংসা এইরূপ—

"জানে তবেব বঞ্চা মুরলী তপস্যা পরং রচিতা।
একাকিনী মুরারে চুম্বসি বিম্বাধরং যেন॥"

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক তুলনীয়—

গোপ্যঃ কিমচরদয়ং কুশলস্ম বেণু
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাং।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্ট রসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোগ্রে মুমুচুস্তরবো যথার্য্যাঃ॥ (১০ম,২১।৯)

"গোপিগণ! এই বেণু কি পুণ্য করিয়াছিল, যাহার ফলে গোপীভোগ্য শ্রীকৃষ্ণের অধর সুধা পান করিতেছে? আর্য্যগণ যেমন আপন পুণ্য-কর্ম্মা তনয়ের সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করেন, সেইরূপ এই বেণু যে নীরে পুষ্ট এবং যে বংশে সৃষ্ট, সেই হ্রদিনী ও তরুগণ ইহার সৌভাগ্য দর্শনে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে।"

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রণীত দানকেলী-কৌমুদীর একটি শ্লোক এইরূপ—

তপস্যামঃ ক্ষামোদরি বরয়িতুং বেণুষু জনু
র্বরেণ্যং মন্যেথাঃ সখি তদখিলানাং সুজন্মনাং।
তপস্তোমে নোচ্চৈর্যদিয় মুরলীকৃত্য মুরলী
মুরারাতের্বিম্বাধর মধুরিমানং রসয়তি॥

শ্রীরাধা ললিতাকে বলিতেছেন—"কৃশোদরি, জগতের ক্ষণজন্মাগণেরও বরণীয় বেণু-জাতিতে জন্ম-লাভের জন্য আমি তপস্যা করিব। দেখ, উৎকৃষ্ট তপস্যার ফলেই এই মুরলী মুরারীর বিম্বাধর-সুধা-মাধুর্য্যের আস্বাদ লাভ করিতেছে।

বৈষ্ণবামৃতের সমাপ্তি শ্লোক—

শুভমস্তু সর্ব্বজগতাং নিরন্তরং ন রিপোরপিস্ফুরতুবৈপদং পদং।
জগদীশ্বর কপটদারুবিগ্রহ করুণাকটাক্ষলহরী বিমুঞ্চতে॥
ইতি বৈষ্ণবামৃতং গোষ্ঠীরূপকং

বাঙ্গালায় অথবা উড়িষ্যায় কেহ উদ্যোগী হইয়া এই ক্ষুদ্র-পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিলে সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। পুরী সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় জয়দেব-রচিত আরও একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাইয়াছেন। আশাকরি এবার তিনি গ্রন্থের প্রাপ্তিস্থান, লিপিকাল ইত্যাদি বিষয়ে অবহিত হইবেন। কটকে গিয়া শুনিলাম, লোকে এখনও পুরাণো কবিদের নাম দিয়া পদ রচনা করিতেছে। বৈষ্ণবামৃতপ্রণেতার প্রকৃত পরিচয় এবং সময় নির্ণয়ের জন্য কটক শাখাপরিষদের কর্ম্মী—উৎসাহী যুবক-বৃন্দকে অনুরোধ জানাইতেছি।

ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুর স্মৃতিকথা

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু বি-এ



শেষ নিদ্রায় ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ প্যারাডাইজ্ ফটোগ্রাফার্সের সৌজন্যে

কলিকাতার বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু সহসা পরলোক গমন করিয়াছেন, এ দুঃসংবাদে দেশ-বিদেশের বহু পাঠক পাঠিকা মর্ম্মাহত হইবেন, কারণ তাঁহার কাছে কোন-না-কোন-সময়ে উপকৃত এমন লোক অসংখ্য।

সেই সৌম্য শান্ত মূর্ত্তির সংস্পর্শে একবার যিনি আসিয়াছেন, একবার যিনি তাঁর উদাত্ত গম্ভীর কণ্ঠধ্বনি শুনিয়াছেন, তিনি সে ছবি জীবনে ভুলিতে পারিবেন না।

চিকিৎসা করিলেন—স্যর নীলরতন—ডক্টরস্ বিধান রায়, নলিনী সেনগুপ্ত, ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়; পরামর্শ দিতে আসিলেন—স্যর উপেন্দ্র ব্রহ্মচারী, বামনদাস মুখোপাধ্যায় হইতে কলিকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসকমণ্ডলী। কিন্তু কোন ফলই হইল না, ব্লাড্‌প্রেসার ও ইউরিমিয়ায় তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। বাষট্টি বৎসর আগে একদিন বেলা ১০৷৷৹টায় তিনি মেদিনীপুরের এক বাঙ্‌লোয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, ২৯শে ডিসেম্বর বেলা ১০৷৷৹টায় শেষ নিঃশ্বাস তিনি কলিকাতার অট্টালিকায় পরিত্যাগ করিলেন।

স্যর নীলরতন চোখে রুমাল দিলেন, স্যর ব্রহ্মচারীকে থামানো গেল না, ডক্টরস্ সুশীল মুখোপাধ্যায়, বটকৃষ্ণ রায়, মদনমোহন দত্ত ছেলেমানুষের মত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। কারমাইকেল কলেজের এমার্জেন্সি বিভাগ বন্ধ হইয়া গেল, দলে দলে ছেলেরা ছুটিয়া আসিল। কলিকাতায় এমন বড়লোক কেহ নাই যিনি তাঁর সংস্পর্শে না আসিয়াছেন। এমন দরিদ্রও কম আছেন যিনি তাঁর স্নেহস্পর্শ পান নাই। শুধু চিকিৎসা বিভাগে নয়—সাহিত্য, শিল্প, ষ্টেজ্, সিনেমা, ফুটবল, স্পোর্টিং, সুইমিং, পুলিশ ও বিচারবিভাগ—এমন কোনো বিষয়ই নাই যেখানে তাঁহার বন্ধুসংখ্যা ছিল না, নিজের শরীরপাত করিয়া যাঁহাদের উপকার না তিনি করিয়াছিলেন। তাই ফুলের মালায় মূল্যবান শয্যা আচ্ছন্ন হইয়া গেল, তাই রোদনরত জনসঙ্ঘ তাঁহার শেষ কাজের ভার নিজেরাই হাতে তুলিয়া লইল।

পথে চলিতে চলিতে লোকে জিজ্ঞাসা করে—কে গেল? উত্তর শুনিয়া মর্ম্মাহত হয়। বাইক, মোটর, ট্রাম হইতে কৃতজ্ঞ লোকেরা নামিয়া পড়িয়া সঙ্গ লয়। বারান্দা হইতে

একটি মেয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া ওঠে—অ—মাসীমা, ডাক্তার নরেন বোস যে !

কারমাইকেল কলেজ—যা তাঁর হাতে-গড়া, প্রাণের চেয়েও প্রিয়, রোগশয্যায় প্রলাপের মধ্যে যার আউট-ডোরের কথা তিনি বারবার বলিয়াছেন, তার প্রবেশ-পথে দাঁড়াইয়া মিছিল স্তব্ধ হইয়া গেল ; সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর এই পথে তিনি মোটর করিয়া ঢুকিয়াছেন—অক্লান্ত এবং নিয়মিত। মেয়েদের বিভাগ, যা সম্পূর্ণ তাঁরই অধীন ছিল, পরিপূর্ণ ছিল উৎসুক নারীতে—যাঁরা আশা করিতেছিলেন তিনি সুস্থ হইয়া আসিয়া তাঁহাদের চিকিৎসা করিয়া নীরোগ করিয়া দিবেন ! তাঁহারা একযোগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

চিত্রার্পিতবৎ কলেজ ষ্টাফ্ দাঁড়াইয়া রহিল। দুঃসহ নীরবতা। প্রিন্সিপাল ও বিভিন্ন বিভাগ একে একে মালা দিয়া গেলেন। কিন্তু যখন নার্সরা আসিতে লাগিল, তখন অবস্থা হইল করুণতম। কন্যার মত যারা কাছে ছিল, সৌম্য প্রশান্ত নিদ্রিতের মত মুখচ্ছবির দিকে চাহিয়া স্থির তারা থাকিতে পারিল না। দ্বারবানেরা কাঁদিয়া উঠিল।

মাণিকতলা প্রসূতি-আগার—যা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি, সেখানেও সেই এক অবস্থা। নিমতলার ঘাটের সাব্-রেজিষ্ট্রারও উপকৃত, অশ্রুসজল সেও।

সহ্য করিলেন জননী, নব্বই বৎসরের বৃদ্ধা। তিনি দাঁড়াইয়া দেখিলেন—গুণবান পুত্রের শেষ সাজসজ্জা, গরদের কাপড়, চাদর, পাঞ্জাবি, চন্দন-চর্চ্চিত মুখে সোনার চশমা···হাসি তখনো লাগিয়া আছে। তিনি সুপুত্রের জননী, দিক্‌পাল পুত্র তৈয়ারী করিয়াছিলেন, বড় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু—চীফ্ এটর্ণী স্যাণ্ডার্সন এণ্ড মর্গ্যান্‌স্, মেজ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ, সেজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ—চীফ্ ইণ্টার-প্রীটার কলিকাতা হাইকোর্ট, ছোট ৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ—আলিপুরের বিখ্যাত উকীল ছিলেন। তিনি সহিতে পারিবেন না ত' পারিবে কে। পিতা ৺মহেশচন্দ্র স্বনামধন্য ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, কোলাঘাটে রূপনারায়ণ ব্রীজ তাঁরই হাতের। ত্রিবেণীর কাছে এক গণ্ডগ্রাম—সুলতানগাছা ছাড়িয়া তিনিই প্রথম কলিকাতায় আসেন, পাঁচ মেয়ে ও চারি পুত্রের বিধিব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা ও মধুপুরে বাড়ী করিয়া দিয়া তিনি পরলোকগমন করেন। জ্ঞান হারাইবার পূর্ব্বক্ষণে নরেন্দ্রনাথ ডাকিলেন 'বাবা', (এর আগে একদিনও বলেন নাই) হয়ত পিতা পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

প্রচুর উপায় করিয়াছেন—কারণ ধাত্রীবিদ্যায় ছিলেন অপরাজেয় ; তাঁহার স্থান পূরণ হওয়া কঠিন, দানও করিয়াছেন এত যে বলিয়া শেষ করা যায় না। ফী ছাড়িয়া দেওয়া যেন তাঁহার অভ্যাসের মত দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। দরিদ্র লোক ফী দিতে আসিলে বলিতেন—"সে হবে'খন। এখন অসুখে টাকার কত দরকার পড়বে, এখন থাক্ না!" "সে হবে'খন" বলিয়া তিনি ত চলিয়া আসিতেন, কিন্তু সে টাকা কখনো পাওয়া যাইত না। তাঁর সঙ্গে যে সমস্ত চিকিৎসক থাকিত—তাহারাও কিছু পাইত না তাঁহারই জন্য। তবু কেহ একদিনের জন্যও তাঁহাকে দোষ দেয় নাই, বরঞ্চ অননুকরণীয় উদারতা দেখিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়াছে।

সামান্য পতিতার যন্ত্রণাকাতর আহ্বানে তিনি ছুটিয়া যাইতেন এমন স্থানে, যেখানে যে কোন ভদ্রলোক প্রবেশ করিতে ইতস্ততঃ করিত। কেহ বলিলে বলিতেন—"মেডিকেল প্রোফেশন মিশনারি প্রোফেশন, জাতিধর্ম্মপেশা বিচারের স্থান এখানে চলে না।" এক কপর্দ্দক তিনি লন নাই, অথচ ঐ সব সমাজপরিত্যক্তা হতভাগিনীদের জন্য অনেক বড় "কল" নষ্ট করিয়াছেন।

আশ্চর্য্য সংযম ছিল তাঁর। ভোগের মাঝখানে থাকিয়াও কি করিয়া নিঃস্পৃহ থাকা যায়, প্রকৃত কর্ম্মীর মত তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। এইজন্য এই বালকের মত সরল লোকটির কাছে রোগ সম্বন্ধে গোপনীয়তম বিষয় প্রকাশ করিতে মেয়েদের কখনো লজ্জা হয় নাই। তিনি মায়ের মত এম্‌নি আপন করিয়া লইতে জানিতেন।

আচারে বিচারে একসময় তিনি পুরাদস্তর সাহেব ছিলেন, তাঁহার ছাত্ররা বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিয়াও পোষাকে, ব্যবহারে ও ইংরেজী চালচলনে তাঁহার কোন ত্রুটি ধরিতে পারে নাই। তিনি বিলাত যান নাই শুধু এইজন্য যে, বিলাত না গিয়াও এখানে বসিয়াই লোকে স্ব স্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারে, এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য। বিলাতের মোহ তাঁহার ছিল না। সে সত্য তিনি প্রমাণ করিয়াছিলেন স্পেশালিষ্ট্ হইয়া। ছাত্রহিসাবে তিনি তীক্ষ্ণধী ছিলেন, ব্যবসায়েও ছিলেন কৃতী। খ্যাতির

উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া তিনি বলিলেন—"আমার ডাক এসেছে।"

অথচ এই সাহেবটির অন্তরালে যে একটি খাঁটি হিন্দু আত্মগোপন করিয়া ছিল সে সংবাদ অনেকে রাখেন না। ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে গলায় ফুলের মালা ও ললাটে চন্দন তিলক লাগাইয়া নগ্নপদে তাঁহাকে দেখিয়া অনেকেই চিনিতে পারেন নাই। গোয়াবাগানের বিখ্যাত ৺চণ্ডীবাড়ীতে ৺চণ্ডীপাঠ ও পূজা করানো তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মত হইয়া উঠিয়াছিল। মাদুলী, হিপ্‌নটিজ্‌ম্‌, দেবদেবী—সমস্তই তিনি অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিতেন খাঁটি হিন্দুর মত।

বিলাস ছিল রাজোচিত। ঘরের আস্‌বাবপত্র ছিল বিচিত্র ও অতিরিক্ত মূল্যবান্‌। মোটর ছাড়া এক পা চলিতে পারিতেন না। দার্জ্জিলিং, সিম্‌লা, নৈনিতাল, গোপালপুর অন্‌সি—ছাড়া বেড়াইতে যাইতেন না। ট্রেণে সেকেণ্ড ক্লাসে যাইতেও তাঁর কষ্ট হইত, ফাষ্ট ক্লাসেই চড়িতেন। কিন্তু হঠাৎ একসময়ে যখন শতচ্ছিন্ন একটি গেঞ্জী ও ছিন্নপাদুকা পরিয়া বাহিরে আসিয়া বসিতেন, যেখানে নিত্য ধনী লোকের মেলা—কিম্বা বিবাহ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাইতেন ছেঁড়া একটি গরম কোট গায়ে ও চটি পায়ে—তখন লোকে অবাক্‌ হইত।

অত বড় ডাক্তার, কিন্তু মনে কোন অভিমান ছিল না। যে সব বন্ধুর শয়নের স্থান অবধি জুটিত না, তাহাদের বাহিরের ঘরে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। পরন্তু পর আসিয়া টেলিফোন এবং চা ও সিগারেটে—মাঝে মাঝে খাওয়া দাওয়ায়—তাঁহার বহু পয়সা নষ্ট করিয়াছে, নানা দিক হইতে তাঁহাকে ঠকাইয়াছে—কোনদিন তিনি রাগ করেন নাই, কাহারও নামে নিন্দা অবধি করেন নাই। নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ—যথা, পাশাখেলা, মাছধরা, ম্যাচ্‌ দেখা ইত্যাদি লইয়া দিন রাত এমনি যুবজনোচিত উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি লইয়া থাকিতেন, যে আমরা তা পারিতাম না। তাঁহারই জন্য অনেক গুণী জ্ঞানী মহাজনের চরণস্পর্শে আমাদের বাড়ী পবিত্র হইয়াছে এবং প্রসিদ্ধও হইয়াছে। তাঁহারই কল্যাণে সামাজিক জীবন কাহাকে বলে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একান্নবর্ত্তী পরিবারে ভ্রাতাদের সহিত যৌথ সংসারে থাকিতে তিনি আনন্দ বোধ করিতেন।

অনেক ছোট ছোট ঘটনা চারিধারে ছড়ানো রহিয়াছে তাঁহার অগণিত বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে, সেইগুলি হইতেই মানুষ হিসাবে তিনি যে কত বড় ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার একমাত্র কন্যার মনের অভিপ্রায়, সেই সব কাহিনী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবে—যশস্বী পিতার পুণ্যস্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য।

দেশের নারীদের অবর্ণনীয় রোগযন্ত্রণায় কথা অবিরত তাঁহাকে বিচলিত করিত। তিনি বলিতেন, দশ বারো বৎসর রোগ ভোগ করিয়া তবে তারা আমাদের কাছে আসে। বিশেষ করিয়া বাংলার কুললক্ষ্মীরা স্বামীদের কাছেও গোপন বেদনার কথা প্রকাশ করিতে চায় না। রুগ্ন শরীরে সন্তানসম্ভাবনা হইলে তিনি পতিদেবতাদের ডাকিয়া ভৎর্সনা করিতেন। পীড়িতা নারীর কাছে তিনি ছিলেন ধন্বন্তরির মত, তিনি নিরাময় করিতে পারেন নাই এমন রোগিণী কমই আছে। তাঁহার চিকিৎসাকুশলতার খ্যাতি দিগন্তবিশ্রুত, কিন্তু হৃদয়ের তাঁহার তুলনা নাই। আমি জানি, শোকমুখর এ কাহিনীর করুণ কোমলতায় দিকে দিকে অগণিত জনগণ অশ্রুমার্জ্জন করিবেন এবং আমাদের উত্তরপুরুষরা এই কুলপ্রদীপের দীপশিখার উজ্জ্বল রশ্মি সাশ্রুনেত্রে স্মরণ করিবে।

কাল ভ্রষ্ট

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

কদম্ব ফুল ফুট্‌ত যদি পৌষে মাঘে,
কবিরা তার গাইত না গান অনুরাগে।
গন্ধ তাহার পড়্‌ত চাপা হিমের চাপে,
অকাল বোধন পায় যে নিধন কালের শাপে।

সাময়িকী

বসন্তকুমার বসু—

গত ৬ই পৌষ প্রাতে তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে হাইকোর্টের প্রবীণতম উকীল বসন্তকুমার বসুর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৬ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ঢাকার মালখানগর গ্রামে বসন্ত বাবুর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকুমার বসু সেকালের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং পূর্ব্ববঙ্গে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষার প্রসার-সাধনে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের অন্যতম। ঢাকার পর বসন্তবাবু কলিকাতায় আসিয়া বিদ্যার্জ্জন করিতে থাকেন এবং ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে—একই বৎসরে—বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তদবধি তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে থাকেন। তাঁহার সহপাঠীদিগের মধ্যে সারদাচরণ মিত্র, সার বিপিনকৃষ্ণ বসু ও হাইকোর্টের জজ লালমোহন দাসের নাম উল্লেখযোগ্য। আইনে তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল এবং ব্যবহারাজীব-রূপে তিনি বিশেষ যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনিই হাইকোর্টে বার এসোসিয়েশনের প্রথম নির্ব্বাচিত সম্পাদক এবং ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি উহার সভাপতি ছিলেন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ওকালতীকাল ৫০ বৎসর পূর্ণ হয় এবং উহার দুই বৎসর পরে তিনি ব্যবসা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া সাহিত্য-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ইংরাজীতে যে সব পুস্তক রচনা করিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে (১) বাঙ্গালা বিজয়, (২) বাঙ্গালায় হিন্দুদিগের আচার, (৩) মুসলমান ধর্ম্ম, (৪) খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁহার শেষ চারিখানি পুস্তক যখন রচিত হয়, তখন তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই সকল পুস্তকেই তাঁহার গভীর জ্ঞানের ও অধ্যয়নের চিহ্ন সপ্রকাশ। বাস্তবিক মৃত্যুর বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহার মানসিক শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাঁহার সঙ্কল্পদৃঢ়তা কখন নষ্ট হয় নাই।

বসন্ত বাবুর ওকালতীতে সাফল্য কখনও তাঁহাকে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে মনোযোগ হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি কংগ্রেসের প্রথমাবধি এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে তিনি উপস্থিত ছিলেন না বটে, কিন্তু দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন। ১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বসন্ত বাবু বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার পর চিত্তরঞ্জন দাশ ঐ পদে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে বিরাট আন্দোলনে ভারতে নবজীবনের প্রকাশ তিনি তাহাতে ও স্বদেশী আন্দোলনে সোৎসাহে যোগ দিয়া-



বসন্তকুমার বসু

ছিলেন। এই সময় যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার সহিত বসন্ত বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। উহাই এক্ষণে যাদবপুর কলেজে পরিণত হইয়াছে। বসন্ত বাবু উহার ট্রাষ্টী, সহকারী সভাপতি ও রেক্টার ছিলেন। তিনি কিছুদিন কায়স্থ সভার সভাপতিও ছিলেন।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও রাজনীতিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে তাঁহার আগ্রহ সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। যখন 'বন্দে মাতরম্' পত্র প্রচারিত হয়, তখন তিনি তাহার পরিচালকদিগকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। তিনি সে সময়ের জাতীয় দলের

সহিতই অধিক সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ভারত সভার সহিতও তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠই ছিল।

বসন্ত বাবু যেমন সরল, তেমনই নিরহঙ্কার ছিলেন। তিনি বিলাসবর্জ্জিত জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারাই তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার আন্তরিকতা, অতিথিসৎকারে আগ্রহ, দেশবাৎসল্য ও উদারতায় তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই।

পরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আমরা তাঁহার স্বজনগণকে তাঁহার মৃত্যুতে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

দীননাথ সান্যাল—

গত ৪ঠা পৌষ শুক্রবার প্রাতঃকালে তাঁহার কৃষ্ণনগরস্থ ভবনে প্রবীণ সাহিত্যিক দীননাথ সান্যাল মহাশয় প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। বঙ্কিমমণ্ডলের অবসানের পর যে সাহিত্যিকসঙ্ঘ 'বঙ্গবাসী'পত্রকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত হইয়াছিল, দীননাথ তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকারের ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনায় ও প্রভাবে—দেবেন্দ্রবিজয় বসুরই মত—সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাঁহাদিগের প্ররোচনায় ও প্রভাবে তাঁহার সাহিত্যসেবার আরম্ভ ও পুষ্টি, তাঁহাদিগের দুই জনেরই মত তিনি জীবনের অপরাহ্নে মফঃস্বলে বাসস্থানে যাইয়া তথায় তরুণ সাহিত্যানুরাগীদিগকে লইয়া সাহিত্যিক সঙ্ঘ গঠিত করিয়াছিলেন। দীননাথের পিতৃগৃহ কৃষ্ণনগরে। তিনি শ্রীরামপুরে (হুগলী) মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বা মাতামহ কেহই সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না। মাতুলালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বালক দীননাথ পিতৃগৃহে আগমন করেন। সেই সময় তিনি তথায় কৃষ্ণ-নগরের প্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কালীবাবু প্রসিদ্ধ শিক্ষক রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের অনুজ। তাঁহার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র 'সুরধুনি কাব্যে' লিখিয়াছেন:—

"ছেলেদের কালীবাবু ছেলেরা কালীর;
উভয়েতে মিশে যায়—যেন নীর ক্ষীর।"

এই "ছেলেদের কালীবাবু"র যত্নে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দীননাথ পাটনায় অধ্যয়ন করিতে যায়েন এবং পরে কলিকাতায় আসিয়া বি, এ ও এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারের অধীনে ডাক্তারী চাকরী গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন হইয়া পরে সিভিল সার্জ্জনের পদ লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাবু দীননাথের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেন।

দীননাথ রসজ্ঞ ও সাহিত্যপ্রিয় ছিলেন। সে রসবৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যকে তাহার রূপ দিয়াছিল, তিনি সেই রসবৈশিষ্ট্যবোধের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সে বৈশিষ্ট্য অনুভব করিতে হয়, তাহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা না করিয়া লিখিয়াছিলেন:—

"এক দিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়া ছিলাম, প্রদোষকাল প্রস্ফুটিত চন্দ্রালোকে বিশাল বিস্তীর্ণ ভাগীরথী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনী—মৃদুপবনহিল্লোলে তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও নিবিতেছিল। যে বারেণ্ডায় বসিয়াছিলাম, তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি মৃদুরব করিয়া ছুটিতেছিল। আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি-সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গাহিতেছে:—

'সাধ আছে মা মনে
দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব জাহ্নবী-জীবনে।'

তখন প্রাণ জুড়াইল—মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবী-জীবনে দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল, এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই রসবৈশিষ্ট্য দীননাথকে আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং "ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী" সম্পাদনে তিনি এত সাহায্য করিয়াছিলেন যে, প্রকাশক

বলিয়াছেন; "তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই গ্রন্থাবলী প্রকাশ করাই দুরূহ হইত।" দীননাথ 'বঙ্গবাসীতে' স্বনামে ও নাম না দিয়া অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অমরকীর্ত্তি—বাঙ্গালা সাহিত্যে মূল্যবান দান—মধুসূদনের গ্রন্থের সমালোচনা ও ব্যাখ্যা। তিনি যখন ডাক্তারী করেন সেই সময় ইহার আরম্ভ—তখনই তিনি 'মেঘনাদবধের' ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। তাহার পর তাহার পরে পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাহার তুলনা নাই। এই পুস্তকে তাঁহার সাহিত্য রসিকতার ও অধ্যয়নের পরিচয় পত্রে পত্রে সপ্রকাশ। ডাউডেন ও হাডশন যেমন সেক্সপীয়রের সমালোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছেন, দীননাথ তেমনই মধুসূদনের সমালোচনায় যশস্বী হইয়াছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রথম ব্যাখ্যা রচনা করিয়াছিলেন—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাতে কিন্তু সমালোচনা ছিল না। এই রচনা শেষ করিয়া দীননাথ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের' ও 'চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর', 'ব্রজাঙ্গনার' ও 'বীরাঙ্গনার' সংস্করণ প্রকাশ করেন। আমরা 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে প্রথম ব্যাখ্যা-সংস্করণের কথা বলিয়াছি, তাহা ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং তাহাতে তিনি "নিবেদনে" লিখিয়াছিলেন :—

"সুকবির সুকাব্যমাত্রেরই ব্যাখ্যার প্রয়োজন। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' যে টীকা আছে, তাহা কেবল গোটাকতক দুরূহ শব্দের আভিধানিক অর্থ মাত্র; ব্যাখ্যাংশ উহাতে স্বল্প ও অকিঞ্চিৎকর এবং এই জন্যই বহুতর পাঠকই 'মেঘনাদবধ কাব্যের' রসাস্বাদনে ইচ্ছুক হইয়াও বঞ্চিত। প্রধানতঃ এইরূপ পাঠকগণের জন্যই আমি বঙ্গের এই সুকাব্যখানির (কেবল 'বঙ্গের'ই বা বলি কেন?)—পৃথিবীর উৎকৃষ্ট কাব্য সকলের মধ্যে যাহার স্থান, সুতরাং বঙ্গের অদ্বিতীয় গৌরবস্থানীয় এই সুন্দর কাব্যখানির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। সাধ্যমত যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করি নাই।"

দীননাথের যে সাহিত্য-রসজ্ঞতা মধুসূদনের নানা রচনার ব্যাখ্যায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা তাঁহার 'কুমারসম্ভব' সম্বন্ধীয় আলোচনাতেও সপ্রকাশ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ১৩১৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার 'মেঘনাদবধের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহার "বিষয়-সূচনা" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "উহা হইতে কাব্যের গল্পাংশ ও ঘটনা-পারম্পর্য্য অনায়াসেই বুঝা যাইবে।"

দশ বৎসর পরে তাঁহার "মেঘনাদবধ কাব্যের সীতা ও সরমা"—ব্যাখ্যা ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনাংশ পাবনা সাহিত্য-সভার প্রথম বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত ও 'নারায়ণ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকের উৎসর্গ এইরূপ :—

"কর্ষিত কাব্য-ভূমির অলৌকিক কঙ্কারত্ন, পবিত্রতার আদর্শ-স্বরূপিণী, রামৈকপ্রাণা সতীদেবীর নামে জয় উচ্চারণ করিয়া আমি মধুসূদনের সীতা ও সরমা চিত্রের এই ব্যাখ্যা ও সমালোচন বঙ্গের কুলনারীদিগের উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম।"

আর বৃদ্ধ-বয়সে বাল্মীকী রামায়ণের সংক্ষিপ্ত গদ্যানুবাদ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"রামগুণগান গাহিয়াই সাহিত্যসেবা শেষ করিলাম।"

তখন তিনি বুঝিয়াছিলেন—

"গীত শেষ, অপরাহ্ন; সন্ধ্যা আসিতেছে ধীরে,
বসি ধ্যানমগ্ন—এই জীবন-প্রভাসতীরে;
সম্মুখে অনন্ত সিন্ধু—ভাসে কৃষ্ণ-পদতরি,
এই তীরে সন্ধ্যা—ঊষা অন্য কূলে মুগ্ধকরী।"

তিনি বাঙ্গালীকে মধুসূদনের অমর কাব্যগুলির রস আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইবার সুযোগ দিয়া গিয়াছেন—তাঁহার সেই কার্য্যের জন্য যে তাঁহাকে—

"যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে
রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে"

তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।

আজ তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গবাণী এক জন একনিষ্ঠ সেবকে বঞ্চিতা হইলেন—বাঙ্গালা সাহিত্য এক জন সাহিত্যরসজ্ঞ সমালোচক ও লেখক হারাইল এবং বাঙ্গালী পাঠকগণ একজন পথি-প্রদর্শক হারাইলেন। আমরা তাঁহার শোকার্ত্ত পরিজনগণকে তাঁহাদিগের শোকে আমাদিগের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী—

সংপ্রতি ৮২ বৎসর বয়সে রায় সাহেব দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী বিদ্যাভূষণের মৃত্যু হইয়াছে। বাঙ্গালার বাহিরে যাইয়া যে সব বাঙ্গালী যশ অর্জ্জন করিয়াছেন, দুর্গাচরণ তাঁহাদিগের

অন্যতম। হুগলী জিলার বলাগড় থানার এলাকায় সোমড়া গ্রামে এক "ব্রাহ্মণ পণ্ডিত" পরিবারে দুর্গাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। শুনা যায়, ইঁহার প্রপিতামহ সুচিকিৎসক ছিলেন। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইয়া দুর্গাচরণ দরিদ্র পিতৃস্বসা কর্ত্তৃক পালিত হয়েন। বাল্যকাল হইতেই ইনি প্রবল বিদ্যার্জ্জন-স্পৃহার পরিচয় দেন। অর্থাভাবে অপরের নিকট হইতে পুস্তক লইয়া অপরের দীপালোকে ইঁহাকে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত। বিদ্যালয় গ্রাম হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত থাকায় বালককে অনেক দিন অনাহারেই তথায় যাইতে হইত। এইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াও



দুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী

ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরিক্ষার্থীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন এবং লব্ধ ছাত্রবৃত্তি (১৫ টাকা) সম্বল করিয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের এঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে পাঠারম্ভ করেন। তাঁহাকে ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য শিক্ষকের কায করিতে হইত এবং স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইতে হইত। এইরূপ পরিশ্রম করিয়াও ইঁনি ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ৫০ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তৎপরে ইঁনি বিহারে পূর্ত্ত বিভাগে চাকরী লাভ করেন এবং ক্রমে তথায় অসাধারণ যশার্জ্জন করেন। সেচের ব্যবস্থাকর নানা কার্য্যের ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত হয় এবং দামোদরের বন্যার প্রতীকার সম্বন্ধে উপায় নির্দ্ধারণ জন্য ইঁহাকে বর্দ্ধমানে আনা হয়। বর্দ্ধমানে আসিয়া দুর্গাচরণ ইডেন খালের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে বিশেষ সাহায্য করেন। এই খাল ক্ষুদ্র হইলেও খাস বাঙ্গালায় ইংরাজের আমলে ইহাই খাল সম্বন্ধে প্রথম কার্য্য। চাকরীর শেষভাগে দুর্গাচরণ একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ারের পদ লাভ করিয়াছিলেন।

সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া দুর্গাচরণ দর্শন শাস্ত্রের ও জ্যোতিষের চর্চ্চায় অবহিত হয়েন। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার দানেরও বৈশিষ্ট্য আছে। এঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধীয় জটিল বিষয় বিশদভাবে দেশের লোককে বুঝাইবার চেষ্টায় ইঁনি কয়খানি পুস্তক রচনা করেন—(১) স্থপতি-বিজ্ঞান (২ খণ্ড), (২) জরিপ শিক্ষা।

এইগুলি ব্যতীত তিনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন—গীতা ও তাহার যৌগিক ব্যাখ্যা, অলৌকিক রহস্য, ষষ্ঠেন্দ্রিয়, সপ্তমেন্দ্রিয়।

নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজ দুর্গাচরণকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

বাল্যকালে স্বয়ং শিক্ষালাভের জন্য দুর্গাচরণকে কিরূপ শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে। তাহা স্মরণ করিয়া ইঁনি নিজ গ্রামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়া স্বয়ং ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে তথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরেও তাহার জন্য অনেক অর্থ ব্যয় করেন। এই বিদ্যালয়ে এখন বহু ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে।

দুর্গাচরণের স্বভাব অতি মধুর ছিল। ইঁনি ধর্ম্মপরায়ণ ও উদারস্বভাব লোক ছিলেন। ইঁহার একমাত্র সন্তান কন্যার পুত্রদিগকে ইনি স্বয়ং বিশেষ যত্নে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহার অনুরাগ অসাধারণই ছিল। সে অনুরাগকে তিনি মূর্ত্তিদানও করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গাচরণের মত পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু, উদার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বাঙ্গালীর অভাব আমাদিগের সমাজে আজকাল পরিলক্ষিত হইতেছে। সেজন্যও তাঁহার আদর্শের আলোচনা ও অনুসরণ কর্ত্তব্য।

—

শ্যামাচরণ রায়—

গত ২২শে অগ্রহায়ণ ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব ও দেশসেবক রায় শ্যামাচরণ রায় বাহাদুর ৯১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ময়মনসিংহের বনগ্রাম নামক পল্লীগ্রামে দরিদ্র ধার্ম্মিক পরিবারে শ্যামাচরণের জন্ম হয়। প্রথমে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি জিলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও ঢাকা কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। ইংরাজীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার থাকিলেও গণিতে দৌর্ব্বল্যহেতু তিনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। কিন্তু তখনই তাঁহার ইংরাজীতে অধিকার অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। তিনি একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে হেডমাষ্টার ও তাহার পর পোগোজ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সহকারী হেডমাষ্টার নিযুক্ত হয়েন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ ওকালতী আরম্ভ করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পশার বিস্তার লাভ করে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শ্যামাচরণ প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিশনার হয়েন—লর্ড রিপণের আমলে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ হইলে তিনি ৪০ বৎসর নির্ব্বাচিত কমিশনার ও ১৮ বৎসর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। এই সময়ে সহরের অনেক উন্নতিসাধন হয়। জলের কল সম্বন্ধে তাঁহাকে বিভাগীয় কমিশনারের মত খণ্ডন করিয়া কায করিতে হইয়াছিল।

মিউনিসিপ্যালিটীর মত জিলা বোর্ডেও তিনি দীর্ঘকাল সদস্য ছিলেন এবং তথায় তাঁহার কৃত কার্য্যও উল্লেখযোগ্য।

উকীল হইয়াও শ্যামাচরণ শিক্ষাদানে উৎসাহ হারান নাই। উকীল হইবার অল্পদিন পরে তিনি এক বন্ধুর সহযোগে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া তাহার প্রথম শ্রেণীতে ইংরাজী শিক্ষা দিতেন। এই স্কুল পরে সিটী কলেজিয়েট স্কুলে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজ স্থাপনের উদ্যোগীদিগের মধ্যেও তিনি ছিলেন এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ইহার স্থাপনাবধি ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন।

প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে বনগ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি লিটন ডাক্তারী স্কুলের স্থাপন কমিটীর সভাপতিও ছিলেন।

রাজনীতি-চর্চ্চায় তাঁহার কার্য্য উল্লেখযোগ্য। তিনি মডারেট দলভুক্ত হইলেও সকল দলের কর্ম্মীরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। ময়মনসিংহে প্রাদেশিক সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে তিনি বলেন, দেশের রাজনীতিক কর্ম্মীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়াছেন এবং উভয় দলকে একযোগে স্বায়ত্ত-শাসন লাভ-চেষ্টা করিতে বলেন। তিনি বলেন, দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে, যাহাতে তাহাই পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়, সে চেষ্টা করা সঙ্গত।



রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ রায়

জনসাধারণের কার্য্যে তিনি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের সহিত বিরোধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি কতকগুলি কাপড়ের দোকানের অধিকারীদিগকে নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দোকান সরাইতে আদেশ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা স্বদেশী আন্দোলনের ফল মনে করিয়া তাঁহাকে মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যানের পদচ্যুত করিবেন, ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলে শ্যামাচরণ তাঁহার ব্যবহারে আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া বলেন, তাঁহাকে পদচ্যুত

করা ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাতিরিক্ত। শেষে ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অশিষ্ট পত্র প্রত্যাহার করেন।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে—যখন তাঁহার বয়স ৮৩ বৎসর তখনও, তিনি ঢাকা কলেজের পূর্ব্বতন ছাত্র-সম্মিলনে সভাপতিত্ব করিয়া বক্তৃতা করেন।

শ্যামাচরণের মৃত্যুতে কেবল ময়মনসিংহের নহে, পরন্তু সমগ্র বাঙ্গালার এক জন অসাধারণ ও শক্তিশালী কর্ম্মীর তিরোধান হইল। বাঙ্গালার মফঃস্বলে উপযুক্ত নেতার অভাব ঘটিলে সমগ্র প্রদেশে রাজনীতিক ও অন্যান্য জনগণ-প্রতিষ্ঠান দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। আমরা আশা করি, ময়মনসিংহের কর্ম্মীরা শ্যামাচরণের শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে প্রয়াসী হইবেন।

বিশপ লেডবিটার—

যে সকল সাধক ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সহিত পরিচয়ের পর প্রাচীন ঋষিদের আদর্শ অনুকরণে ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বিশপ সি, ডবলিউ, লেডবিটার তাঁহাদের অন্যতম। তিনি থিয়সফিকাল সোসাইটীর অন্যতম নেতা ম্যাডাম ব্লাভাস্কির সহিত ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ভারতে আসিয়া ত্রিশ বৎসর কাল মাদ্রাজের আদিয়ারে সোসাইটীর আশ্রমে বাস করিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন তিনি সোসাইটীর প্রথম সভাপতি কর্ণেল অলকটের সহিত সিংহলে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তথায় কয়েকটি বৌদ্ধ স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৪০ বৎসর ব্যাপী ঘনিষ্ঠতার ফলে তিনি ডাক্তার এনি বেসাণ্টের নিকট ভারতীয় সভ্যতা ও হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত ত্যাগ করিয়া বিশপ লেডবিটার সিডনীতে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন, তথায় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী ইংলণ্ডের অন্তর্গত নর্দাম্বারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন—কাজেই মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৭ বৎসর হইয়াছিল। অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত তিনি বিলাতেই পাদরীর কাজ করিয়াছিলেন।



বিশপ লেড্‌বিটার (শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি)

সম্প্রতি মাদ্রাজ আদিয়ারে তাঁহার

প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলিতেছে; মাদ্রাজস্থ গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বিশপ লেডবিটারের যে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার চিত্র আমরা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।

—

বিস্মৃত রাজনীতিক কর্ম্মী—

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি বদরুদ্দীন তায়াবজী কংগ্রেসের শোক-জ্ঞাপন প্রসঙ্গে গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের উল্লেখ করিয়া সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে বলেন—"তাঁহাকে আপনারা সকলেই জানিতেন এবং যাঁহারাই তাঁহাকে জানিতেন তাঁহারাই তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। গত বৎসর কলিকাতায় কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তিনি তাহার অন্যতম প্রধান কর্ম্মী ছিলেন।"

আজ প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে কংগ্রেসের বয়স অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হওয়ায় যে উৎসব হইতেছে, তাহার মধ্যে এই বিস্মৃত কর্ম্মীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ও ত্যাগের কথা স্মরণ করা বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় গিরিজাভূষণের জন্ম হয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ও এম, এ, উভয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইয়া হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি যদি এই ব্যবসায়ে একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত থাকিতেন, তবে যে বিপুল অর্থ ও যশ অর্জ্জন করিতে পারিতেন, ইহা মনে করা যায়। কিন্তু তিনি দেশসেবার আগ্রহে নিজ স্বার্থ অনায়াসে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন।

লর্ড লিটনের শাসনকালে দেশীয় ভাষায় পরিচালিত সংবাদপত্রের অধিকার-সঙ্কোচক আইন বিধিবদ্ধ হইলে তাহার প্রতিবাদকল্পে যখন 'সোম-প্রকাশ' প্রচার বন্ধ করা হয়, তখন গিরিজা বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগে 'নব-বিভাকর' প্রকাশ করেন। এই পত্র অল্প দিনের মধ্যেই প্রভাবসম্পন্ন ও প্রতাপশালী হয়।

কিন্তু কেবল সংবাদপত্রের সাহায্যে দেশে দেশাত্মবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন নাই। বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগের সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘ ৮ মাস কাল বাঙ্গালার নগরে নগরে ও বহু গ্রামে যাইয়া প্রচার কার্য্যের দ্বারা শিক্ষিত সমাজের আশা ও আকাজ্ঞা কংগ্রেস-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কারের অনুকূল করিবার চেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের বিপুল পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় এবং কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ৬ দিনের জ্বরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। সে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের কথা। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩৮ বৎসর।

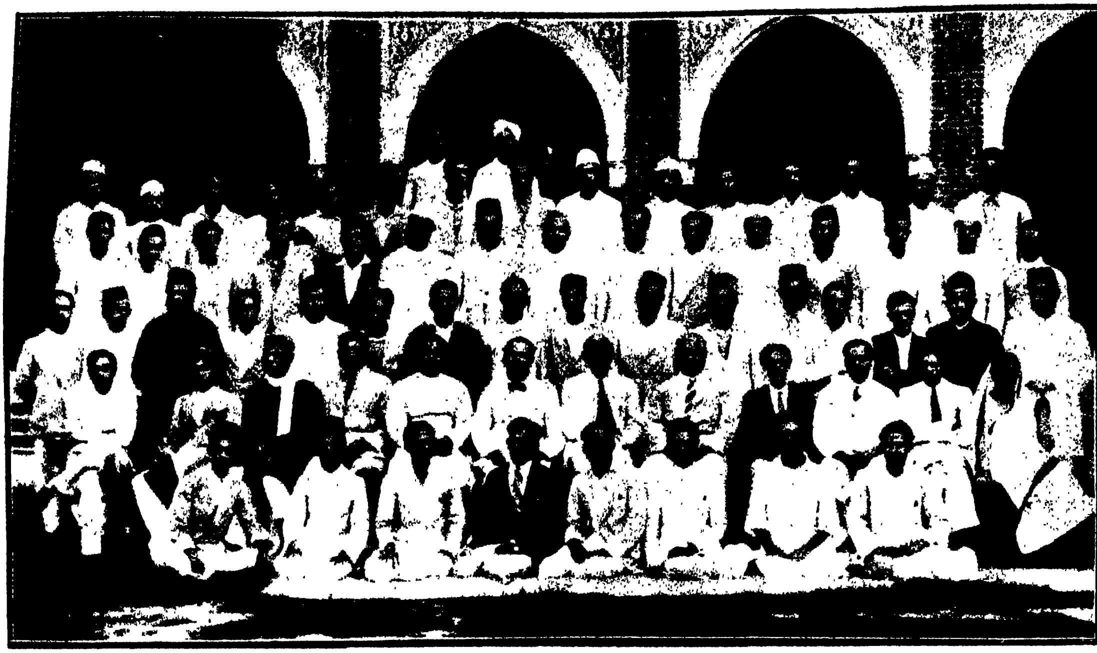
কিন্তু তাঁহার মৃত্যু কেবল তাঁহার বয়সের হিসাবেই অকাল মৃত্যু নহে, পরন্তু দেশের পক্ষেও তাহাই। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। সে অধিবেশনে বাঙ্গালা হইতে মাত্র ৩ জন প্রতিনিধি যোগ দিতে গিয়াছিলেন—সভাপতি, নরেন্দ্রনাথ সেন ও গিরিজাভূষণ।

তাঁহার অকাল মৃত্যুতে শোক প্রকাশ-প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রে লিখিয়াছেন, "গত বৎসর (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতায় কংগ্রেসের যে (দ্বিতীয়) অধিবেশন হইয়াছিল, তাহার জন্য গিরিজাভূষণ বাবু অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক কথায়, তাঁহার চেষ্টায় কংগ্রেসের অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল।"

বলা বাহুল্য, এই রাজনীতিক প্রচারকের কার্য্যে গিরিজা-ভূষণ বাবু ওকালতী প্রায় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের জন্য যাঁহারা ওকালতী ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রশংসা নানা দিকে ধ্বনিত হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার লাভজনক ব্যবসায়ে ফিরিয়াও গিয়াছেন। কিন্তু এই যে এক জন মনীষাসম্পন্ন বাঙ্গালী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালেই দেশ-মাতৃকার আহ্বানে দেশসেবার আগ্রহে ত্যাগের ব্রত আপনার জীবন দিয়া উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম আজ ইঁহার স্বপ্রদেশেও বিস্মৃত। আজ কংগ্রেসের বয়স যখন অর্দ্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হইল, তখন আমরা তাঁহার উদ্দেশে আমাদিগের শ্রদ্ধা অর্পণ করিতেছি।

—



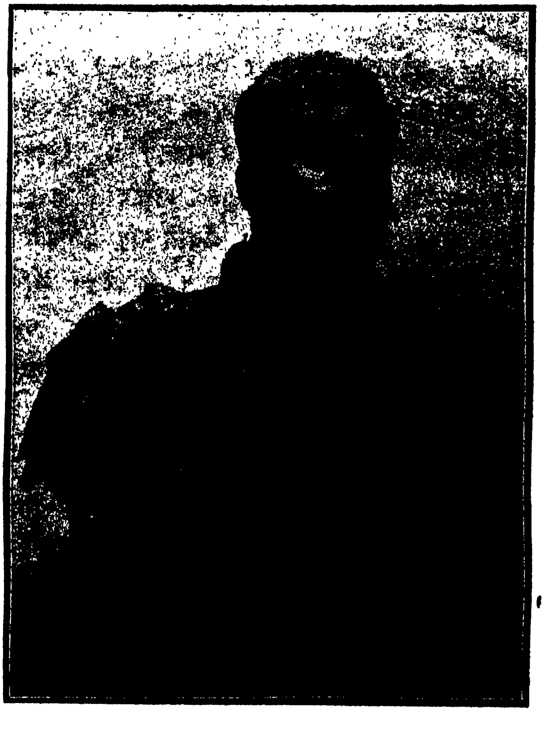
শ্রীগুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য (মধ্যস্থলে উপবিষ্ট)

বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালী—

শ্রীযুক্ত গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। তিনি ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার পরই বরোদা রাজ্যে মহারাজা গাইকোয়াড়ের নব-প্রতিষ্ঠিত সেকেণ্ডারী টিচার্স ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করিয়াছেন। তথায় ছাত্রগণ ও শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে যখন সম্বর্দ্ধনা করেন, সেই উপলক্ষে এই চিত্রখানি গৃহীত হইয়াছিল। চিত্রের মধ্যস্থলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বসিয়া আছেন। বাঙ্গালার বাহিরে একজন বাঙ্গালীর এই উচ্চ সম্মান লাভ বাঙ্গালী মাত্রেরই আনন্দের বিষয়।

লর্ড আর্স্কিন—

খ্যাতনামা বাঙ্গালী শিল্পী শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী বর্ত্তমানে মাদ্রাজের গভর্ণমেণ্ট স্কুল অফ্ আর্টস্ ও ক্রাফ্‌টসের প্রিন্সিপাল। সম্প্রতি তিনি মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আর্স্কিনের যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার চিত্র এই সঙ্গে প্রদত্ত হইল। ভাস্কর হিসাবে ইতঃপূর্ব্বেই দেবীবাবু খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতা চৌরঙ্গীর মোড়ে স্থাপিত পরলোকগত সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তি তাঁহারই নির্ম্মিত।



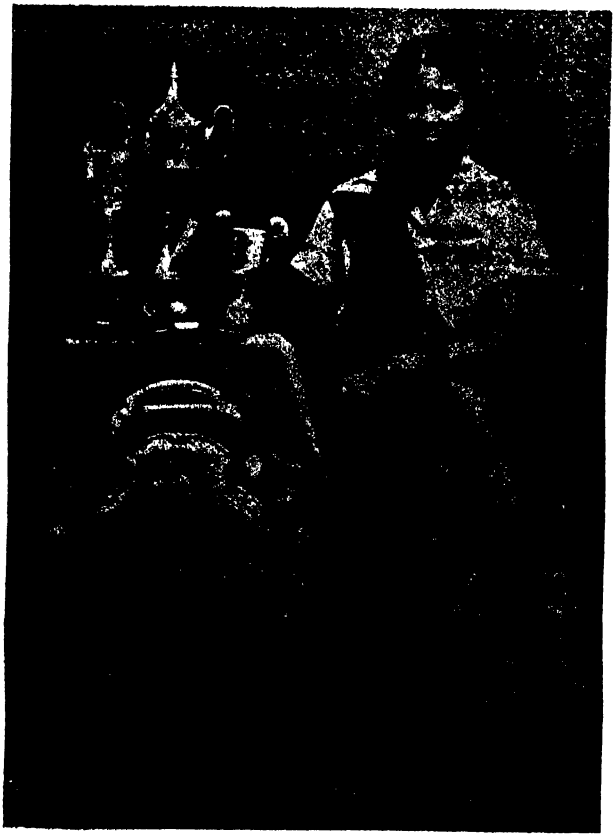
মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আর্সকিন

সন্তরণপটু বাঙ্গালী বালিকা—

এ বৎসর নিখিল ভারতীয় মহিলাগণের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বাঙ্গালী বালিকাটি "অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নসিপ্" লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কুমারী বাণী ঘোষ। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ছোরা ও লাঠি খেলা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে তিনি মহিলাদের সকল সন্তরণ প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন এবং ইংরাজ ও এংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা সন্তরণকারিণীদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিতেছেন। পুরুষ সন্তরণকারীদিগের সহিতও তিনি বহু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১৭জন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে তিনি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন। শুধু ক্রীড়া ক্ষেত্রে নহে, কুমারী বাণী বিদ্যালয়ের পরীক্ষা, সঙ্গীত, শিল্প, অভিনয় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই অপূর্ব্ব সাফল্য দেখাইয়া বহু পুরস্কারাদি লাভ করিয়াছেন। জার্ম্মাণীর বার্লিনে আগামী বিশ্ব অলিম্পিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যদি ভারতবর্ষ যোগদান করে, তবে কুমারী বাণীকেই ভারতের প্রতিনিধিরূপে তথায় গমন করিতে হইবে। তাঁহার পিতা খ্যাতনামা কংগ্রেস কর্ম্মী শ্রীযুত দেবেশচন্দ্র ঘোষ কলিকাতা আহিরীটোলার অধিকারী; তিনি নিজে তাঁহার কন্যাকে এই সকল ক্রীড়াদি শিক্ষা দান করিয়া থাকেন। আমরা আশা করি, এই বালিকার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—

নয়া দিল্লীতে এ বার প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ত্রয়োদশ অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ



কুমারী বাণী ঘোষ



শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ

ঘোষ বিদ্যাভূষণ ইঁহার প্রধান সভাপতি ছিলেন। তিনি এই ক্রমোন্নতিশীল প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, সকলেই তাহার অনুমোদন করিবেন :—

"আজ প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও মাতৃভূমির সাহিত্য-সেবকদের পরস্পর মিলনের ক্ষেত্র হইয়াছে এই প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন। আশা করি, এই মিলনের ফলে বাঙ্গালী মাত্রের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপিত হইবে এবং বাঙ্গালীর শক্তি সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি পাইবে। এই মিলনের অন্যতম উদ্দেশ্য—উপস্থিত প্রতিনিধিগণের সমবেত আলোচনায় বঙ্গ-সাহিত্যের, তথা বঙ্গভাষার, কার্য্য-সূচি ও কার্য্যপ্রণালী স্থির করিতে হইবে।"

তিনি বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান সমস্যাগুলির উল্লেখ করেন—(১) প্রাদেশিকতা—পূর্ব্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় প্রচলিত বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োগ; (২) সাধু (অর্থাৎ লেখ্য) ও কথিত ভাষায় দ্বন্দ্ব; (৩) হিন্দী ও ইংরাজী ভাষার চাপ; (৪) মুসলমানের দাবী।

আজকাল যে সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালাকে অবজ্ঞা করিবার চেষ্টায় হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সে সম্বন্ধে অমূল্য বাবু বলিয়াছেন :—

"এখন একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, ভারতের জন্য রাষ্ট্র-ভাষার প্রয়োজন, আর সেই রাষ্ট্রভাষা হইবার উপযোগিতা যখন একমাত্র হিন্দীরই রহিয়াছে, তখন তাহাই রাষ্ট্রভাষা হইবে না কেন? ইহা পক্ষপাতশূন্য বিচার নয়। ভারতে যদি কোন ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে বঙ্গভাষার সহিত হিন্দীর তুলনা করিতে হইবে। * * হিন্দীর সাহায্যে সারা ভারত অনায়াসে পর্য্যটন করা যায় না। বিশেষতঃ বর্ত্তমান তথাকথিত হিন্দীতে আরবী, ফার্সীর শব্দসম্ভার এত বেশী এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের কথ্য ভাষার ভঙ্গী এত বহুমুখী যে, উত্তর ভারতের ভাষার সহিত ইহার যোগসূত্রের অবকাশ বঙ্গভাষা অপেক্ষা বহু অংশে অল্প। দক্ষিণ ভারতে তামিল, তুলু, মলয়লম, তেলুগু, কন্নড় ও দক্ষিণী ভাষায় বাঙ্গালার বাক্‌ছন্দ, শব্দযোজন ভঙ্গী ও শব্দাবলী হিন্দী অপেক্ষা বহুগুণে উপযোগী। দক্ষিণ ভারতের লোকরা বাঙ্গালা বুঝিবে না; কিন্তু বুঝাইবার উপক্রম করিলে বাঙ্গালা যত সহজে বুঝিবে হিন্দী তত সহজে নহে।"

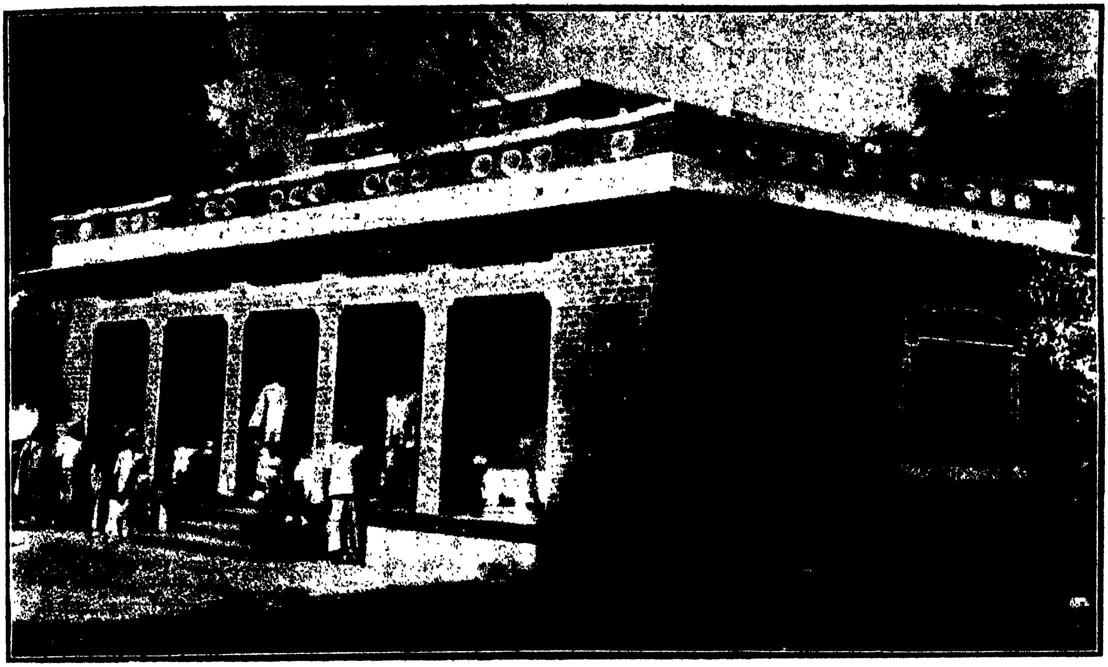
অভিভাষণের উপসংহারাংশে তিনি বলিয়াছেন :—

"আমরা চাই নূতন সংস্কৃতি। কিন্তু সেই সংস্কৃতির যোগ রাখিতে হইবে পুরাতন সনাতন ভারতের সংস্কৃতির সহিত। সংস্কৃতিই ছিল ভারতের অন্তরের বস্তু। অক্ষর-পরিচয়ে সাহিত্যজ্ঞান কোন দিন তাহার জ্ঞাপক ছিল না। এ দেশে বিদ্যা কোন দিন academic ব্যাপার বলিয়াও গৃহীত হয় নাই; দর্শনও কোন দিন বুদ্ধির পরিচয়-জ্ঞাপক মাত্র হয় নাই—ইহা ছিল ভারতবাসীদের প্রাণস্বরূপ। ধর্ম্ম ও দর্শন এ দেশে কোন কালে পৃথগ্ বস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। ভারতীয় ধর্ম্মের গোড়ার কথা হইয়াছে—সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে একটি অখণ্ড যোগ। সর্ব্ব বস্তু অখণ্ড পূর্ণের প্রকাশ মাত্র। সর্ব্ব বিদ্যাই ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। * * * ভারতের ধর্ম্ম বৈদিক ধারায় সুস্নাত হইয়া শত-পরীক্ষিত হইয়া আপনার ধারায় অদ্যাপি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। * * * ভারতের এই সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ কি তাহা আমাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। * * আমাদিগকে আত্মস্থ হইতে হইবে; নিজের ধাতু ও স্বরূপ চিনিতে হইবে; চিনিয়া বুঝিয়া কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বৃহত্তর বঙ্গের সহিত—বৃহত্তর ভারতের সহিত যোগ রাখিয়া, অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, আমাদের কায করিতে হইবে।"

স্থানাভাবে আমরা ভিন্ন ভিন্ন শাখার সভাপতিদিগের অভিভাষণের আলোচনা করিতে পারিলাম না।

কাশী সেবাশ্রমের নূতন গৃহ—

বাঁকুড়া জেলা নিবাসী শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থানুকুল্যে সম্প্রতি কাশীধামে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের যে "তিনকড়ি স্মৃতি লেবরেটরী" গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, গত ১২ই ডিসেম্বর তাহার দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। অখিল ভারত সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সভাপতি ও কাশী দেবীমঠের মোহান্ত স্বামী রামানন্দ গিরি মহোদয়ের আহ্বানে যুক্তপ্রদেশের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী সার জে, পি, শ্রীবাস্তব মহাশয় ঐ উৎসবে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন।



কাশী—রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, তিনকড়ি স্মৃতি লেবরেটারী

কাশীধামস্থ সেবাশ্রমটি সাধারণের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। বহু নিরাশ্রয় বাঙ্গালী পুরুষ ও নারী উক্ত সেবাশ্রমে আশ্রয় পাইয়া ধন্য হইয়া থাকেন। রাজেন্দ্রবাবুর এই দান চিরদিন লোক শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে; আরও আনন্দের বিষয় এই যে, রাজেন্দ্রবাবু নিজ ব্যয়ে সেবাশ্রমের মহিলা বিভাগের জন্য একটি স্বতন্ত্র পাক-গৃহও নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেছেন। আমরা দাতার সৌভাগ্যপূর্ণ দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

শিক্ষা-সংস্কার—

অল্প দিনের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানা সভায় ও সম্মিলন প্রভৃতিতে শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। দেখা গিয়াছে, অধিকাংশ বক্তাই বর্ত্তমান বেকার-সমস্যা সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং অনেকেই সেই সমস্যার সমাধানকল্পে কিরূপ সংস্কার প্রয়োজন সে সম্বন্ধে মত ব্যক্ত করিয়াছেন। পূর্ব্বে যেমন আমাদিগের দেশে ইংরাজ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত শিক্ষা চাকরীর ও ব্যবহারাজীবের ব্যবসা প্রভৃতি কতকগুলি ব্যবসাবলম্বনের সোপানরূপে কল্পিত হইয়াছিল, এখন সে শিক্ষাকে তেমনই বেকার-সমস্যার সমাধানোপায়রূপে কল্পনা করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত ও প্রধান উদ্দেশ্য কি—তাহা মনে না রাখিলে কোন সংস্কারই সফল হইবে না। বিশেষ এ দেশে বেকার-সমস্যা যে অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও বিস্তার ও প্রাবল্য লাভ করিয়াছে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। এ দেশে শিক্ষা এখনও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক না হওয়ায় দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষার আলোক পায় নাই—তাহাদিগের মধ্যেও যে বেকার-সমস্যা প্রবল হইয়াছে, তাহা কি বিশেষভাবে প্রতীকারযোগ্য নহে?

যাঁহারা বক্তৃতা করিয়াছেন -প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারাও কি প্রকৃত অবস্থা সম্যক উপলব্ধি করিয়া নিদানানুসারে বিধানের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত? এই বাঙ্গালায়ই শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী মন্ত্রী অল্প দিন পূর্ব্বে শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার জন্য যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, তিনি মনে করেন—তিনি যে সরকারের কর্ম্মচারী সে সরকারও, বোধ হয়, মনে করেন—মাসিক ১৫ টাকা বেতনেই উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। কিন্তু মন্ত্রীর বেতন —মাসিক প্রায় ৫ হাজার ৪ শত টাকা; অর্থাৎ শিক্ষক (হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় হিসাবে মন্ত্রীর সমকক্ষ হইয়াও)

তাঁহার বেতনের ৩ শত ৪০ অংশের একাংশ পাইয়া পরম সন্তোষ সহকারে শিক্ষা দানের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন ও করিবেন! পৃথিবীর আর কোন দেশে মন্ত্রীর বেতন এই দরিদ্র দেশের মন্ত্রীর বেতনের মত অধিক নহে। তাহার কারণ, এ দেশে যাঁহারা মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, তাঁহার দেশসেবার বা জনসেবার আগ্রহে তাহা করেন না—চাকরীতে অর্থার্জ্জনের জন্য করেন, বলা যায়। আর সেই জন্যই তাঁহারা বিজেতা শাসক-সম্প্রদায়ের চাকরীয়াদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট বেতনই অনায়াসে ও নির্লজ্জভাবে লইয়া থাকেন। বাস্তবিক যতদিন এ দেশে সরকারী চাকরীয়াদিগের বেতনের হার হ্রাস করা না হইবে, তত দিন—করভার বৃদ্ধি না করিয়া প্রাথমিক শিক্ষাও বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করা সম্ভব হইবে কি না, সন্দেহ।

তাহার পর বেকার-সমস্যার নানা কারণ বিবেচনা করিতে হয়। এ দেশের সেনাবলে, নৌসেনাবলে ও সেনাবলের বৈমানিক বিভাগে—যে বহু বিদেশী চাকরী পায় তাহাদিগের জন্য এ দেশের লোকের চাকরীর ক্ষেত্রের প্রসার সঙ্কুচিত হয়। কিন্তু বেকার-সমস্যা সমাধানের সর্ব্বপ্রধান উপায়—শিল্প সংস্থাপন। সে জন্য যে সব উপায় প্রয়োজন, সে সকলের মধ্যে মূলধন ও শিক্ষা-বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাযেই বেকার-সমস্যা সমাধান যত সহজসাধ্য মনে হয়, তাহা নহে। যে শিক্ষার দ্বারা এই কার্য্যে সাহায্য হইবে, তাহা বর্ত্তমান পদ্ধতির শিক্ষা নহে; আর সে জন্য কারীগরী ও ব্যবসায়িক শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সে জন্য যে অর্থের প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে।

য়ুরোপের নানা দেশ ও আমেরিকা বেকার-সমস্যার সমাধান কল্পে যে বিরাট আয়োজন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। আর এ দেশে সে সম্বন্ধে কিছুই হয় নাই। সংপ্রতি—বিলাতে পার্লামেণ্টে নূতন সদস্য নির্ব্বাচনকালে ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী মিষ্টার লয়েড জর্জ্জ দেখাইয়াছিলেন—জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসান হইতে এ পর্য্যন্ত বিলাতের সরকার বেকারদিগকে সাহায্য দানে ১,৫০,০০০ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন! আর এ দেশের সরকার? সুতরাং বেকার-সমস্যার সমাধান কেবল শিক্ষার পদ্ধতি-পরিবর্ত্তন দ্বারা হইতে পারে না। সে জন্য আরও অনেক উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। সে জন্য আবশ্যক অর্থ-ব্যয়ও করিতে হইবে। হয়ত সে জন্য শাসন-পদ্ধতিরও পরিবর্ত্তন করা অবশ্যম্ভাবী হইবে।

আমরা আজকাল এ দিকে বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির নানা ত্রুটির কথা শুনিতে পাই, তাহার পরিবর্ত্তন-প্রয়োজন আলোচিত হইতে দেখি—আর এক দিকে বেকার-সমস্যার জন্য আংশিকরূপে দায়ী সেই শিক্ষা-পদ্ধতিই বালকদিগের মত বালিকাদিগেরও মধ্যে প্রবর্ত্তিত করি! সেদিন মহীশূর রাজ্যে যুবরাজ এ সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও যে বেকার-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহার কারণ—পুরুষরা যেমন সরকারী চাকরী লাভের জন্য শিক্ষালাভ করে, স্ত্রীলোকরাও আজকাল তাহাই করিতেছে। যখন পুরুষরাই আর চাকরী পাইতেছে না, তখন স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে চাকরীলাভ কি আরও কষ্টসাধ্য নহে? তিনি বলিয়াছেন—গৃহই স্ত্রীলোকের কার্য্যের কেন্দ্র থাকিবে এবং এখন সংসারের কার্য্যে নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত ও স্বীকৃত হইয়াছে। খাদ্যদ্রব্যের গুণ, সন্তান পালনের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি এখন সংসারের কার্য্যের সহায়রূপে শিক্ষা করিতে হয়। সেই জন্য তিনি বলেন—বিদ্যালয়ে ছাত্রীদিগকে সাংসারিক নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করা প্রয়োজন।

যে মনোবৃত্তি লইয়া বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকরা সর্ব্ববিষয়ে পুরুষের তুল্যাধিকার লাভের আগ্রহে পুরুষের সঙ্গে একই শিক্ষায় শিক্ষিতা হইতে চাহিতেছেন, তাহার নিন্দা সেদিন বরোদার গাইকবাড় করিয়াছেন। স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা-প্রদানের পক্ষপাতী হইয়াও তিনি বলিয়াছেন, সে স্বাধীনতার স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। যে স্বাধীনতায় স্ত্রীলোকের বৈশিষ্ট্য নষ্ট বা লুপ্ত হয়, সে স্বাধীনতা কখনই সমাদরের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

শিক্ষা-সংস্কারের বিষয় আলোচনা করিতে হইলে, এই সব বিষয় অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করিলে চলিতে পারে না।

তাহার পর ধর্ম্মের কথা। ইংরাজ এ দেশে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাকে ধর্ম্মের সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়াই তাঁহারা সে জন্য গর্ব্বানুভব করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন—মনীষী ভলটেয়ার অভিজ্ঞতা-ফলে শেষে লিখিয়াছিলেন, যদি ঈশ্বর অসিদ্ধই হয়েন, তবে

সংসার শৃঙ্খলাসম্পন্ন রাখিতে হইলে স্বর্গ ও নরকের মত ঈশ্বরের কল্পনাকেও দৃঢ় করিতে হইবে; নহিলে বিশৃঙ্খলার বিকাশ অনিবার্য্য। সেদিন শ্রীযুক্ত চিরভূরী যজ্ঞেশ্বর চিন্তামণি মহীশূরে বক্তৃতায় বলিয়াছেন, পূর্ব্বে তিনি শিক্ষাকে ধর্ম্ম হইতে পৃথক রাখিবার পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতাফলে তিনি সে মত পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। কারণ, এখন আর গৃহে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান করা হয় না। সুতরাং, এখন বিদ্যালয়েই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকল ধর্ম্মের মূলগত ঐক্য বিবেচনা করিলে—ধর্ম্মমত যে নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা স্মরণ করিলে—ভারতবর্ষে নানা ধর্ম্মমত প্রচলিত বলিয়া বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা প্রদান অসম্ভব—ইহা আর বলা যায় না। বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে অভিভাবকদিগেরও বিশেষ কর্ত্তব্য আছে এবং তাঁহারা যদি সে কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন, তবে তাঁহাদিগের ত্রুটিতেই সমাজে বিশৃঙ্খলা বিশেষ প্রবল হইবে। যাঁহারা শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয় জন এ বিষয়ে মনোযোগ দেন?

আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যাইবে, এ দেশে শিক্ষা-সংস্কারের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শত বর্ষ ধরিয়া ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত যে শিক্ষা এ দেশে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার নানা ত্রুটি আজ লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিতেছে। তাহা যে প্রবর্ত্তনকালেও আমাদিগের সমাজের সহিত সামঞ্জস্যসম্পন্ন এবং দেশের অবস্থার উপযোগী ছিল না, তাহা যেমন বুঝিতে পারা গিয়াছে, তাহা যে পৃথিবীর মানবসমাজের পরিবর্ত্তনের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে আপনার পরিবর্ত্তন সাধন করে নাই, তাহাও তেমনই অনুভূত হইতেছে। শত বর্ষেও যে দেশে অজ্ঞতার অন্ধকার দূর হয় নাই, ইহা ও লজ্জার ও ক্ষোভের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু আজ চারিদিকে শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে যে কলরব উত্থিত হইয়াছে, তাহার উগ্রতায় ও ব্যগ্রতায় চঞ্চল ও ব্যস্ত হইয়া আমরা যেন প্রকৃত পথভ্রষ্ট না হই; আবার ভুল না করি। যে শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে জাতির আদর্শ-পরিবর্ত্তনে অনেক দুঃখের আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা আমাদিগের সংস্কৃতির ধাতুগত নহে—সেই পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত করিয়া আমরা যেন আবার আমাদিগের অনুপযোগী পদ্ধতির প্রবর্ত্তন না করি।

এ বিষয়ে একটি কথা আমাদিগকে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে—কোন্ শিক্ষা-পদ্ধতি দেশকালপাত্রোপযোগী হইবে, তাহা স্থির করা ব্যবহারাজীব মন্ত্রীর বা সিভিলিয়ান সেক্রেটারীর পক্ষে দুঃসাধ্য—সে জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন। দেশের অবস্থা, সমাজের প্রকৃতি, অর্থনীতির ও পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহের অভিজ্ঞতা—এই সকল উপকরণ লইয়া বিশেষজ্ঞগণকে কায করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাঁহাদিগের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

মানদান—

গত ৩রা পৌষ কলিকাতায় দর্শন সমিতির রজত-জয়ন্তী অনুষ্ঠানের সময় আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ত্রিসপ্ততিতম জন্মোৎসব উপলক্ষে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হইয়াছিল।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্য শীলকে অভিনন্দন করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটি প্রেরণ করিয়াছিলেন—

আচার্য্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্বরেষু—

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্দ্ধে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তব দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখর-শ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হোতে
সমুদ্র বাহিনী বার্ত্তা চলেছে প্রান্তর ভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি' যেথা মায়া কুহেলিকা
ভেদি' উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তাম্রাক্ষরে লিপি, যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্ত্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নি মণ্ডলের জপমালা, যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্তধরণীর দিগঞ্চলে
অনাবৃত করি দেন অমর্ত্ত্য রাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শোন বিশ্বজন,
শুভ্র অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ—
তমিস্রের পার হোতে তেজোময়, যেথায় মানুষ—
শুনে দেববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান,
দিক্ সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্ব মাঝারের তপোবনে
সত্য-দ্রষ্টা, যেথা যুগ যুগান্তরে ধ্যানের গগনে

গূঢ় হতে উদ্ধারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে—
নিত্য সুন্দরের আমন্ত্রণ ! সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্য রূপে তব সমুদার ললাটে বুলালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।
মোরে তুমি মানো বন্ধু বলি'
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্ব্বাদ, বিদায় কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

ভারতবর্ষের যে দার্শনিকের নামের খ্যাতি সমগ্র সভ্যজগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে তিনি তাঁহার জীবনের সায়াহ্নে—হয়ত তাঁহার পক্ষে সভায় শেষ উপস্থিতিতে—যাহা বলিয়াছেন, আশা করি, তাঁহার স্বদেশবাসী সকলেই তাহা শ্রদ্ধা সহকারে বিবেচনা করিয়া উপকৃত হইবেন। তিনি বলিয়াছেন—জীবনের সায়াহ্নে এক চিন্তা তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি পীড়িত করিতেছে - একই দেশ-মাতৃকার সন্তান হিসাবে যাঁহাদিগের মধ্যে সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দ্য বন্ধনে বদ্ধ হওয়াই কর্ত্তব্য, আজ দেশে তাঁহারাই দ্বন্দ্বে রত। আমাদিগের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান—যে ধর্ম্মমতাবলম্বীই কেন হউন না, দান প্রতিদানের মনোবৃত্তির দ্বারাই আপনাদিগের সমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডার হইতে অপরকে দান এবং সদিচ্ছা ও বন্ধুত্বের সহিত অপরের দান গ্রহণ করিয়াই নিজ নিজ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতম অনুশাসনের অনুসরণ করিতে পারেন। যাহা সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত তাহাই অক্ষত জাতীয়তাবোধের নিকট বিসর্জ্জন দিতে হইবে এবং দেশাত্মবোধ বিশ্ব-মানবের ভ্রাতৃত্ববোধে পরিপূর্ণতা লাভ করিবে।

ভারতবর্ষের এই পুণ্যভূমি আর্য্য, অনার্য্য, সেমিটিক ও ইরাণীয় সভ্যতার মিলনক্ষেত্র। এই দেশে আজ যে সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার স্থান অধিকারের দুরাশায় জাতির স্বার্থনাশে সমুদ্যত হইয়াছে, ইহা একান্তই পরিতাপের বিষয়। আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, যত দিন যাইতেছে, তত সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া যেন বৃদ্ধি পাইতেছে। সকলের—বিশেষ সকল সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত এই অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব হইবে না।

গুণনাথ সেন—

গত ১৯শে ডিসেম্বর কলিকাতায় প্রবীণ চিকিৎসক গুণনাথ সেন পরলোকগত হইয়াছেন। ঢাকা (বিক্রমপুর) সোণারংগ্রামে ৮১ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয়। চিকিৎসা বিদ্যা অর্জ্জন করিয়া ইতি নানা স্থানে এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জেনের কায করিয়া শেষে দ্বাদশবর্ষ উত্তরপাড়ায় হাসপাতালের



গুণনাথ সেন

প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। তথায় তিনি জনপ্রিয় হয়েন। তিনি শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেডিক্যাল অফিসারের কাযও ১০ বৎসর সম্পন্ন করিয়া কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মৃত্যুকালে ৭ পুত্র, ৬ কন্যা ও বহু পৌত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত পরের কথা, অধ্যাপকের পদও পূর্ব্বে বহু ভারতবাসীর পক্ষে অনধিগম্য ছিল। সুখের বিষয় এখন সেই অসঙ্গত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংপ্রতি এই কলেজের অধ্যক্ষ মিষ্টার বি, এম, সেন অসুস্থ হইয়া ছুটী লওয়ায় আমাদিগের পরম স্নেহভাজন শ্রীমান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ তাঁহার স্থানে কায



মিঃ বি, এম, সেন



মিঃ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

করিয়াছেন। প্রশান্তচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র বহুদিন এই কলেজে কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপকের কায করিয়া এখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রশান্তচন্দ্র কলিকাতায় আবহ গবেষণাগারের ভার লইয়া কিছু দিন সে কার্য্যও প্রশংসার সহিত সম্পন্ন করিয়াছেন।

লর্ড রেডিং—

ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড রেডিং'এর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। তিনি বিলাতে ব্যবহারাজীব ও রাজনীতিকরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ইহুদী প্রকৃতি তাঁহাকে অর্থার্জ্জনে কত আগ্রহশীল করিয়াছিল তাহা "মার্কোণী মামলায়" দেখা গিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোন ইহুদী বিলাতে মন্ত্রীর পদ লাভ করেন নাই। জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় তিনি আমেরিকায় যাইয়া বিলাতের বিশেষ সুবিধাজনক ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন।

ভারত-সচিব মিষ্টার মণ্টেগু স্বয়ং ইহুদী ছিলেন এবং বোধ হয়, সেই জন্য আশা করিয়াছিলেন, প্রাচীর ইহুদী জাতির লোককে ভারতের বড়লাট নিযুক্ত করিলে ভারতবাসী তাহাদিগের আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল শাসক লাভ করিবে। কিন্তু বিলাতে তিনি ন্যায়-বিচারের ভক্ত থাকিলেও লর্ড রেডিং'এদেশে, কর্ম্মকালে, আইনের স্থানে অর্ডিনান্স প্রবর্ত্তনে কিছুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ-বোধ করেন নাই। তিনি সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় অর্ডিনান্স জারি করেন, ব্যবস্থা পরিষদ কর্ত্তৃক ত্যক্ত রাজন্য-রক্ষা-আইন প্রভৃতি কয়খানি আইন বড়লাটের অতিরিক্ত ক্ষমতা-বলে বিধিবদ্ধ করেন এবং রাজনীতিকদিগের প্রতিবাদ দলিত করিবার জন্য সংশোধিত ফৌজদারী আইনের প্রয়োগে বিশেষ উৎসাহ দেখান। এদেশে আসিয়া তিনি বলিয়াছিলেন বটে, কালা-ধলা-ঘটিত মামলায় এদেশে বিচার-বিভ্রাট ঘটে—লোকের এই বিশ্বাসের বিষয় তিনি অবগত আছেন এবং তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিবেন; কিন্তু তাঁহারই শাসনকালে একাধিক মামলার বিচারফলে লোকের মনে সেই বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

বড়লাট হইয়া আসিয়া প্রথমে তিনি সংবাদপত্র বিষয়ক

আইন প্রভৃতি কয়েকখানি চণ্ডনীতি-দ্যোতক আইন বর্জ্জনে ব্যবস্থা-পরিষদের নির্দ্ধারণে আপত্তি করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কার্য্য সে মনোভাবের পরিচয় প্রদান করিতে পারে নাই। এদেশে দায়িত্বশীল শাসন প্রবর্ত্তনের যে প্রতিশ্রুতি বিলাতের সরকার ভারতে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি তাহার কার্য্য অগ্রসর করিবার কোন চেষ্টাই করেন নাই। যদিও তিনি কিছু দূর পর্য্যন্ত লর্ড মর্লির নীতি অনুসরণ করিয়া মডারেট-দিগের সহযোগ লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর হইতেও তিনি আপনার কার্য্য দ্বারা বুঝাইয়াছেন, তিনি স্বেচ্ছায় কায করিবেন—কাহারও পরামর্শে চালিত হইবেন না। বহু মডারেট নেতা যখন পরামর্শ দেন, বড়লাট গান্ধীজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজনীতিক বিক্ষোভের সমস্যা সমাধান করুন, তিনি তখন স্পষ্ট বুঝাইয়া দেন অসহযোগীরা আইন অমান্য বন্ধ না করিলে তিনি কিছুই করিবেন না। তাহার পর গান্ধীজীর প্রভাব সময়ের সঙ্গে ও মডারেট প্রভৃতির চেষ্টায় ক্ষুণ্ণ হইলেই তিনি—অবসর বুঝিয়া—গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের ও আদালতে বিচারের ব্যবস্থা করেন। গান্ধীজী কারাগারে আটক হওয়ার পর হইতে মডারেট বন্ধুদিগের প্রতি বড়লাট ব্যবহার-পরিবর্ত্তনের প্রমাণ দেন—এমন কি সার ম্যালকম হেলী যে হাস্যোদ্দীপক মত প্রকাশ করেন—ভারতের পক্ষে বিলাতের পার্লামেণ্ট-প্রতিশ্রুত দায়িত্বশীল শাসন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন নহে—তাহাও বড়লাটের সম্মতি-অনুসারে বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে।

গোলটেবিল বৈঠকে তিনি ভারতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং রাজওয়াড়া ভারতকে সঙ্ঘে স্থান দান করিয়া ভারতবাসীর প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার লাভে বিলম্ব ঘটাইবার ব্যবস্থাই তাঁহার মনোমত ছিল।

ভারতবাসীর রাজনীতিক অধিকার বৃদ্ধির দিক হইতে দেখিলে তাঁহার শাসনকালে উন্নতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই।

নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলন—

গত ১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই পৌষ কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট গৃহে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মিলনের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে এলবার্ট হলে যে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে প্রায় ৬ শত ছাত্রছাত্রী যোগ দিয়াছিলেন। সভায় সঙ্গীতানুরাগী দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও নাড়াজোলের কুমার বিজয়কৃষ্ণ খানের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয় এবং একাধিক বক্তা মত প্রকাশ করেন যে, সঙ্গীতকে সাধারণ শিক্ষার বিষয় করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহা শিক্ষার বিষয়-তালিকাভুক্ত করুন। বাঙ্গালার ও ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে আগত বহুগুণী সঙ্গীতালাপে কয়দিন লোককে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

উপাধি প্রাপ্তি—

এবার ইংরাজী নববর্ষে যাঁহারা নূতন উপাধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালায় সার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, নবাব সার কে, জি, এম্, ফরুকী, মহারাজা সার মন্মথনাথ রায় চৌধুরী ও সার জ্যোৎস্না ঘোষালের নাম যেমন উল্লেখযোগ্য—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীর মহামহোপাধ্যায় উপাধি লাভও তেমনই। সার নৃপেন্দ্রনাথ, নবাব সাহেব ও মহারাজা মন্মথনাথ পূর্ব্বেও উপাধিতে ভূষিত ছিলেন—সুতরাং তাঁহাদিগের উপাধিলাভ উচ্চতর সরকারী সম্মান লাভ। সার জ্যোৎস্না ঘোষাল বোম্বাই প্রদেশে সিভিলিয়ান ছিলেন, বর্ত্তমানে রাষ্ট্রীয় পরিষদের মনোনীত সদস্য ও সরকারের "হুইপ।" এবার সরকার সরকারী চাকরীয়াদিগকে যেরূপ উদারভাবে উপাধি দান করিয়াছেন, নানা বিভাগে বে সরকারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে তাহা করেন নাই।

লিলুয়ায় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা—

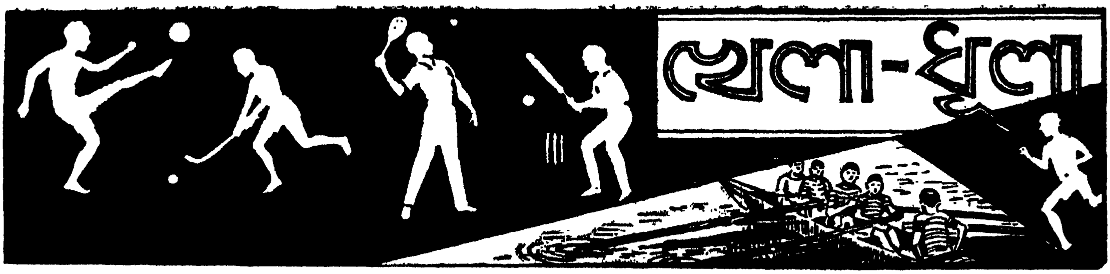
আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে হাওড়া লিলুয়ার ই, আই, রেল ইণ্ডিয়ান ইনিষ্টিউটের দ্বিতীয় বার্ষিক সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হইবে। কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগে ধ্রুপদ, খেয়াল ঠুংরী ও টপ্পা—উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত, ও কীর্ত্তন—যন্ত্র সঙ্গীত বিভাগে এস্রাজ, সেতার, সুরবাহার, বেহালা ও তবলা সঙ্গত প্রতিযোগিবৃন্দের বয়সানুপাতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতিযোগিতার আয়োজন ও ব্যবস্থা হইয়াছে। উক্ত ইনিষ্টিউটের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সেক্রেটারীর নিকট পাঁচ পয়সার টিকিট সহ আবেদন করিলে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে।

নরেন্দ্রনাথ বসু

কলিকাতার ও বাঙ্গালার বিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিদ্ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। স্থানান্তরে তাঁহার পরিচয়-প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। নরেন্দ্র বাবুর মত মধুর-স্বভাব, উদার-হৃদয় ও বন্ধুবৎসল লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। তিনি ডাক্তার হিসাবে সর্ব্বদাই লোককে সাহায্য দিতে আগ্রহসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা, বিধবা ও একমাত্র সন্তান—কন্যাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা আমাদিগের নাই—তাঁহাদিগের শোক ও সান্ত্বনার অতীত। নরেন্দ্রবাবুর মৃত্যুতে আমরা স্বজনবিয়োগবেদনা অনুভব করিতেছি।



ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসু



অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারত ঃ

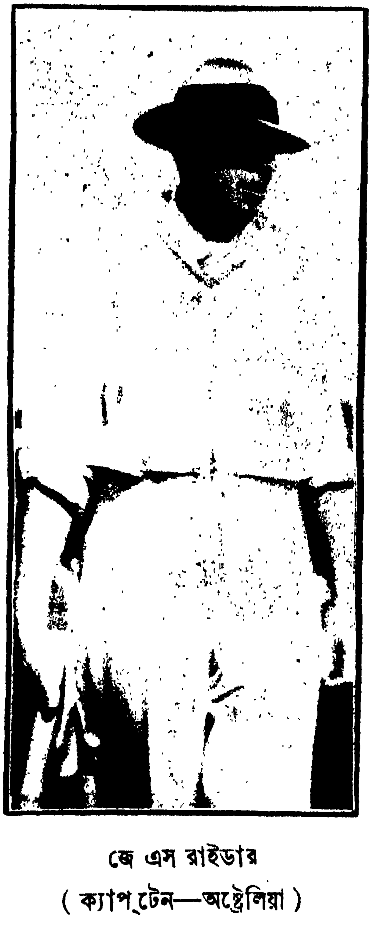
দ্বিতীয় টেষ্ট—

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের চারদিনের দ্বিতীয় (unofficial) টেষ্ট খেলা গত ৩১শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী তারিখে মাত্র দু'দিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। ৩০শে ডিসেম্বরে হঠাৎ বারিপাতের ফলে মাঠ খারাপ হয়। রাইডার টসে জিতে ভারতীয় দলকে ব্যাট করতে পাঠালেন। ভিজা বিশ্বাসঘাতক মাঠের সুবিধা পেয়ে ম্যাকার্টনে ও অক্সেনহামে মিলে ভারতীয়দের অবস্থা শোচনীয় করে তুললে। ম্যাকার্টনের চতুরতাপূর্ণ বলের অলস মন্থরগতি ভারতীয় ব্যাটস্‌ম্যানদের ভীতিপ্রদ হয়ে উঠলো। কেহ বা প্রলোভনে পড়ে এগিয়ে পিটতে গিয়ে ষ্টাম্পড হলেন, কেহ বা ক্যাচ তুলে কারু হাতে আটকালেন। লাঞ্চের আগেই মোট ৪৮ রানে সব ক'টা উইকেট পড়ে গেলো। ওয়াজির আলির ২০ রানই সর্ব্বোচ্চ হয়ে রইল, পাঁচজন শূন্য করেই গেলেন।

অষ্ট্রেলিয়ারাও ঐ ভিজা মাঠে বিশেষ রান তুলতে পারলে না। তাদের প্রথম ইনিংসও সেই দিনেই বেলা শেষ হবার আগেই মোট ৯৯ রানে শেষ হয়ে গেলো। ঐদিন বোলারদের দিন হ'লো। নিশার ও বাকাজিলানীর বলে অষ্ট্রেলিয়ার সুদক্ষ ব্যাটস্‌ম্যানরাও আউট হতে লাগলো। বাকার বলে রাইডার ক্যাচ তুললে সি কে নাইডু পড়ে গিয়েও এক হাতে ক্যাচ ধরলে, দর্শকরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়লো। আবার ৮৩ রানের মাথায় ম্যাকার্টনে বাকার বলে ক্যাচ তুললে সি এস নাইডু তাকে সুন্দর ভাবে লুফ্‌লে জনতার উল্লাস চরমে উঠ্‌লো। ওয়েণ্ডেল বিলের ২৯



এস ব্যানার্জ্জি



জে এস রাইডার
(ক্যাপ্‌টেন—অষ্ট্রেলিয়া)

ছবি—ভক্তকুমার



অমরনাথ

রানই সর্ব্বোচ্চ.; বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান 'গভর্ণর জেনারেল' ম্যাকার্টনেও ১১ রানের বেশী তুলতে পারলেন না।

পরের দিন মাঠের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল কিন্তু ভারতীয়দের খেলার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হলো না। ওয়াজির আলি দুই করে আউট হলেন। অমরনাথ ৩ করে লেদারের বলে আহত হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন। ক্যাপ্‌টেন নাইডু এসে অতি সতর্কতার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। রান মোটেই উঠলো না। নাইডু মাত্র ৫ করে এবারও আউট হয়ে গেলেন। পাতিয়ালার যুবরাজ এসে খেলার মোড় ফেরালেন। যুবরাজ ৫৮ মিনিটে ৩২ রান, তার মধ্যে ৫ বার বাউণ্ডারী করেছেন।

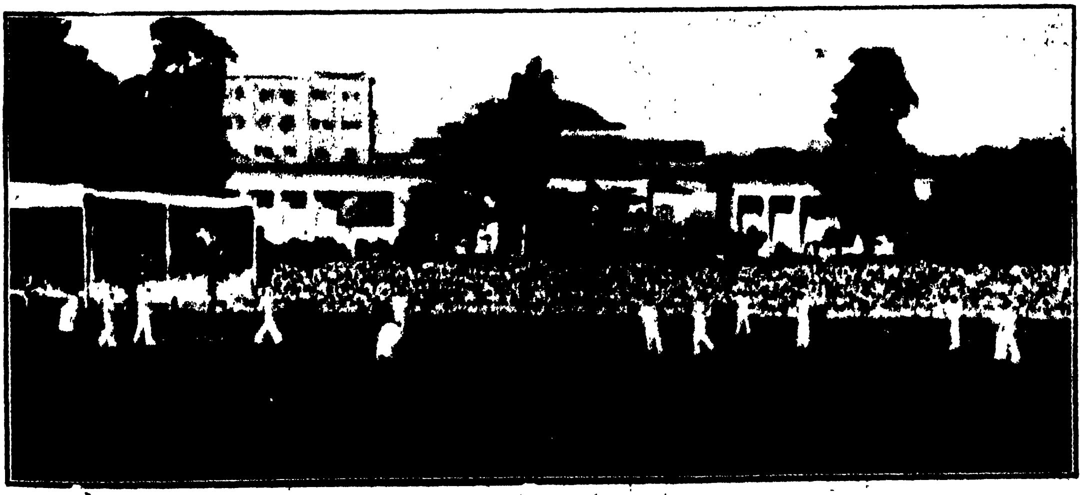
অমরনাথ হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে যুবরাজ পাতিয়ালার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সাহাবুদ্দিন এলেন। সাহাবুদ্দিনের উইকেট রাখতে অমরনাথকে প্রাণপণ করে খেলতে হচ্ছে।



সি কে নাইডু
(ক্যাপটেন—ভারতবর্ষ)
ছবি—ভক্তকুমার

অনেক রান ছেড়ে দিতেও হচ্ছে, আবার একটা রান করতে রান-আউটের বিপদ নিতে হচ্ছিল। দর্শকদের উত্তেজনার সীমা নেই, হার খেলায় প্রাণ এসেছে। অমরনাথের খেলা দেখে সকলে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। অমরনাথ কিছুতে ম্যাকার্টনের বলের মুখে সাহাবুদ্দিনকে যেতে দিচ্ছে না, নিজে ম্যাকার্টনের বল পেটাতে লাগলো। সর্ব্বোচ্চ ৩৯ রান করে ১২৭ রানের মাথায় লেদারের বলে দুর্ভাগ্যবশতঃ অমরনাথ বোলড হয়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের সকল আশা ফুরালো। নিসার এলো ও শূন্যতে গেলো।

অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো। মাত্র ৭৭ রান করলেই তারা জয়ী হবে। ওয়েণ্ডেলবিল ও ব্রায়ান্ট খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলা সুরু করলে, যাতে না একটাও উইকেট খোয়া যায়। কিন্তু ৪৬ রানে ব্রায়ান্ট ও ৫৫ রানে মরিসবীর উইকেট গেলো। রাইডার এসে



ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট খেলার মাঠের দৃশ্য। অষ্ট্রেলিয়ারা ব্যাট করছে ছবি—ভক্তকুমার

যোগ দিলেন। মোট রান হলো ৮০, দুই উইকেট গেছে। অষ্ট্রেলিয়ারা ৮ উইকেটে দ্বিতীয় টেষ্ট (বেসরকারী) খেলায় জয়ী হলো। চারদিনের খেলা দু'দিনেই সাঙ্গ হলো।

আজিজের উইকেট কিপিং একেবারে ভালো হয়নি। 'বাই' অনেক হয়েছে, কয়েকটি সহজ ষ্টাম্প সে ফস্‌কেছে। খেলোয়াড় নির্ব্বাচন ভালো হয়নি। মহম্মদ হোসেনের নির্ব্বাচন অনুমোদন করা যায় না। সাহাবুদ্দিন এলাহাবাদের খেলায় কয়েকটি উইকেট পেয়েছিলেন বলেই বোধ হয় স্থান পেয়েছেন, কিন্তু এখানে কিছুই



ওয়াজির আলি ও মুস্তাক আলি ব্যাট করতে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার

করতে পারেন নি। ব্যাটিংএ এম এম নাইডু অষ্ট্রেলিয়াদের বিপক্ষে শতাধিক রান করেছিলেন, তথাপি তাঁকে মনোনীত করা হয় নি। জয় অবশ্য মনোনীত হয়েছিলেন কিন্তু আসতে পারেন নি। ওয়াজির আলিকে এখন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলা থেকে বাদ দেওয়াই উচিত। সি কে নাইডুর সেদিন আর নেই। নির্ব্বাচনের দিকে উচিত দৃষ্টি না দিলে খেলার ফল উন্নত হবে না। এম সি সির বিরুদ্ধে ভারতীয়রা যেটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল, দু'বছর পরে উন্নতি করা দূরে থাক্‌, অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে তার চেয়ে তারা খারাপই ফল দেখাচ্ছে।



ওয়েণ্ডেল বিল ও ব্রায়ান্ট ব্যাট করতে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার

ভারতে চারটি টেষ্ট খেলার দু'টিতেই ভারতীয়রা অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে হারলে। বাকী দুটিতে ফল যাতে ভাল হয় সে জন্যে নির্ব্বাচনের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া নির্ব্বাচন কমিটির কর্ত্তব্য।

ভারতীয়দলের খেলার ষ্টাণ্ডার্ড যদি এই হয় তবে

এ বছরে তারা ইংলণ্ডে টেষ্ট খেলতে গেলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবতেও মনে ভয় হয়। বাঙ্গলা ও আসাম যেটুকু কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছিল সমগ্র ভারত তাও দেখাতে পারলে না। অষ্ট্রেলিয়াদের একজন ছাড়া বাঙ্গলার সঙ্গে যে খেলোয়াড়রা খেলেছিল তারাই ভারতীয়দের সঙ্গে খেলেছে।

লাহোরে যে তৃতীয় টেষ্ট খেলা হবে তার খেলোয়াড় মনোনয়ন হয়ে গেছে। তালিকা দেখে আমরা নিরাশই হয়েছি। লেফ্‌টেনেণ্ট ওয়াজির আলি ক্যাপ্‌টেন হয়েছেন। মেজর সি কে নাইডু খেলতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন। অষ্ট্রেলিয়ানদের বিপক্ষে কোন খেলাতেই উল্লেখযোগ্য রান করতে পারেন নি। অধিনায়ক হিসাবে তাঁর যোগ্যতা দেখবার জন্য আমরা উৎসুক রইলাম। মেহেরমজী জামনগরে দক্ষতার সঙ্গে উইকেট রক্ষা করেছিলেন। দেখা যাক, তিনি এবার ঐ বিষয়ে কি রকম পারদর্শিতা দেখান। নাইডুর স্থলে মহম্মদ সৈয়দকে খেলতে নির্ব্বাচন কমিটি জানিয়েছেন। ইনি অমৃতসরে অষ্ট্রেলিয়ানদের বিরুদ্ধে ৮০ রান করেছিলেন।

মুস্তাক আলি, সি এস নাইডু, হোসেন ও সাহাবুদ্দিন



সি কে নাইডু ভারতীয় দলসহ ফিল্ড করতে মাঠে নামছেন ছবি—ভক্তকুমার

অমর সিং অসুস্থতার অজুহাতে খেলছেন না। অতদূর থেকে কলিকাতায় এসে চিকিৎসকরা খেলবার উপযুক্ত বলে ঘোষণা করলেও তাঁর অসুস্থতা ঘুচলো না, বসে বসে দেখলেন কেমন করে ভারতীয়রা হারে। অমরনাথ সম্ভবতঃ আঘাতের জন্য খেলতে পারবেন না। ওয়াজির আলি ভাগ্যবান পুরুষ। দেখা যাক, তাঁর অধিনায়কত্বে ভারতীয় দল খেলায় অধিকতর উৎকর্ষতা দেখাতে পারেন কি না। এপর্য্যন্ত ওয়াজির আলি খেলোয়াড় হিসাবে আগামী খেলা থেকে বাদ গেলেন। আজ ১০ই তারিখ থেকে লাহোরে তৃতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হলো। তাতে নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা খেলবেন ;

ওয়াজির আলি (ক্যাপ্‌টেন), যুবরাজ পাতিয়ালা, নাজির আলি, এল অমরনাথ, নিসার, বাকাজিলানী, আমীর ইলাহী, এস ব্যানার্জ্জি, আর পি মেহেরমজী, জে এন ভায়া, মহম্মদ সৈয়দ। রিজার্ভ:—লাল সিং, মাসুদ সালাউদ্দীন, ডি আর পুরী ও রোসান লাল।



জে এস রাইডার ব্যাট করতে যাচ্ছেন

ছবি—ভক্তকুমার

সমগ্র ভারত ৪

প্রথম ইনিংস

ওয়াজির আলি	কট্ এলিস, বো ম্যাকার্টনে	২০
মুস্তাক আলি	ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	১৩
অমরনাথ	কট্ রাইডার, বো ম্যাকার্টনে	০
সি কে নাইডু	কট ম্যাকার্টনে, বো অক্সেনহ্যাম	৫
মহম্মদ হোসেন	ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	০
যুবরাজ পাতিয়ালা	কট্ মেয়ার, বো ম্যাকার্টনে	১
সি এস নাইডু	কট্ হেনড্রি, বো অক্সেনহ্যাম	০
বাকাজিলানী	কট্ রাইডার, বো অক্সেনহ্যাম	৩
এ আজিজ	নট্-আউট	০
মহম্মদ নিসার	কট্ ও বো অক্সেনহ্যাম	০
সাহাবুদ্দিন	কট্ রাইডার, বো অক্সেনহ্যাম	০
	অতিরিক্ত	৬
	মোট	৪৮

ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত খেলায় মধ্যভারত দলই কেবল অষ্ট্রেলিয়াকে হারাতে হারাতে সময়াভাবে খেলা 'ড্র' হয়েছে। মধ্যভারত প্রথম ইনিংসে ৩৮০ রান করে। জে ভায়া ক্রটীহীন ১০৬ রান করে রান-আউট হন। অষ্ট্রেলিয়ারা প্রথম ইনিংসে মাত্র ২২৩ রান করলে, তাঁদের ফলো-অন্ করতে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭২ রান হয়। মধ্যভারত দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৫৫ রান করলে সময় উত্তীর্ণ হওয়ায় খেলা 'ড্র' হয়।

এলাহাবাদে বৃষ্টির জন্য খেলা আরম্ভ হয় বেলা ১২॥০টায়। দু'দিনে উভয়পক্ষের এক এক ইনিংস সমাপ্ত হয়। ইউ পি—১৩৭ ও অষ্ট্রেলিয়া—৮৯। মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম সর্ব্বোচ্চ রান ৪০ করেছেন, তার মধ্যে ৬টা ছিল বাউণ্ডারী।



'গভর্ণর জেনারেল' ম্যাকার্টনে ব্যাট করতে নামছেন

ছবি—ভক্তকুমার



রাইডার তাঁর দলকে ফিল্ড করতে মাঠে নিয়ে যাচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

উইকেট পতন :—

৩০ রানে ১ম (ওয়াজির আলি), ৩৪ রানে ২য় (অমরনাথ), ৩৭ রানে ৩য় (মুস্তাক আলি), ৩৯ রানে ৪র্থ (সি কে নাইডু), ৩৯ রানে ৫ম (মহম্মদ হোসেন), ৪০ রানে ৬ষ্ঠ (সি এস নাইডু) ৪০ রানে ৭ম (যুবরাজ পাতিয়ালা), ৪৮ রানে ৮ম (বাকাজিলানী), ৪৮ রানে ৯ম (নিসার) এবং ৪৮ রানে ১০ম (সাহাবুদ্দিন)

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	৫	০	২	০
ন্যাগেল	৬	৩	৭	০
ম্যাকার্টনে	১২	৫	১১	৫
অক্সেনহ্যাম	৭·৫	৩	৭	৫

অষ্ট্রেলিয়ান ঃ

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল···বো নিসার	১৬
এফ ব্রায়াণ্ট···কট্ আজিজ, বো নিসার	২৯
আর মরিসবী · কট্ সি এস নাইডু, বো নিসার	০
জে রাইডার···কট্ সি কে নাইডু, বো বাকাজিলানী	৭
এইচ্ হেনড্রি···বো নিসার	৪
সি জি ম্যাকার্টনে···কট্ সি এস নাইডু,বো বাকাজিলানী	১১
এফ ন্যাগেল··· রান-আউট	০
আর অক্সেনহ্যাম···বো নিসার	২
জে এলিস ·· নট-আউট	৯
এফ মেয়ার···এল্ বি ডবলিউ, বো বাকাজিলানী	৬
টি লেদার···বো নিসার	০
অতিরিক্ত	১৫
মোট	৯৯

উইকেট পতন :—

২২ রানে ১ম (ওয়েণ্ডেল বিল), ২৮ রানে ২য় (মরিস্বী), ৬২ রানে ৩য় (রাইডার), ৬৮ রানে ৪র্থ (ব্রায়াণ্ট), ৭৩ রানে ৫ম (হেনড্রি), ৮০ রানে ৬ষ্ঠ (ন্যাগেল), ৮৩ রানে ৭ম (ম্যাকার্টনে), ৮৭ রানে ৮ম (অক্সেনহ্যাম), ৯৪ রানে ৯ম (এফ মেয়ার), ৯৯ রানে ১০ম (লেদার)।

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	১৭	৫	৩৫	৬
সাহাবুদ্দিন	৩	১	৪	০
সি কে নাইডু	৫	১	১০	০
বাকাজিলানী	১৬	৮	২৩	৩
সি এস নাইডু	৫	১	১২	০
অমরনাথ	২	২	০	০

সমগ্র ভারত ঃ

দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়াজির আলি ··কট্ ওয়েণ্ডেল বিল, বো লেদার		২
আব্দুল আজিজ···এল্ বি ডব্লিউ, বো ম্যাকার্টনে		১২
সি কে নাইডু···এল বি ডব্লিউ, বো অক্সেনহ্যাম		৫
মহম্মদ হোসেন···বো অক্সেনহ্যাম		১০
যুবরাজ পাতিয়ালা···কট্ মেয়ার, বো ম্যাকার্টনে		৩২
সি এস নাইডু···বো ম্যাকার্টনে		৮
মুস্তাক আলি···এল্ বি ডব্লিউ, বো লেদার		৪
বাকাজিলানী·· বো লেদার		০
এস সাহাবুদ্দিন···	নট-আউট	৪
অমরনাথ···বো লেদার		৩৯
এম নিসার···বো লেদার		০
	অতিরিক্ত	১১
	মোট	১২৭

উইকেট পতন :—

৪ রানে ১ম (ওয়াজির আলি), ২৪ রানে ২য় (সি কে নাইডু), ২৪ রানে ৩য় (আব্দুল আজিজ), ৪৮ রানে ৪র্থ (মহম্মদ হোসেন), ৭৩ রানে ৫ম (সি এস নাইডু), ৯০ রানে ৬ষ্ঠ (যুবরাজ পাতিয়ালা), ৯৪ রানে ৭ম (মুস্তাক আলি), ৯৪ রানে ৮ম (বাকাজিলানী), ১২৭ রানে ৯ম (অমরনাথ), ১২৭ রানে ১০ম (মহম্মদ নিসার)।

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৩·২	৫	২৯	৫
স্লাগেল	৮	২	১৫	০
ম্যাকার্টনে	১৭	৫	৪২	৩
অক্সেনহ্যাম	১২	৩	৩০	২

অষ্ট্রেলিয়ান ঃ

দ্বিতীয় ইনিংস্

ওয়েণ্ডেল বিল···	নট্ আউট	৪৫
এফ ব্রায়াণ্ট···কট্ নিসার, বো সি এস নাইডু		১২
আর মরিসবী···কট্ আজিজ, বো নিসার		১
জে এস রাইডার···	নট্-আউট	১০
	অতিরিক্ত	১২
	(২ উইকেট) মোট	৮০

উইকেট পতন :—

৪৬ রানে ১ম (ব্রায়াণ্ট), ৫৫ রানে ২য় (মরিসবী)।



উড্‌ল্যাণ্ডে ফ্রাঙ্ক টেরাণ্ট বাঙ্গলার লাট মহোদয়কে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছেন, পাশে মহারাজা কুচবিহার দাঁড়িয়ে ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

বোলিং :—

নিসার	৮·৩	১	২৫	১
বাকাজিলানী	৬	২	৯	•
সাহাবুদ্দিন	৩	১	৪	০
সি কে নাইডু	৬	১	১৮	০
সি এস নাইডু	৬	৪	১২	১

অষ্ট্রেলিয়ান বনাম বাঙ্গলা ও আসাম ৪

তিনদিন ব্যাপী খেলায় অষ্ট্রেলিয়ানরা ৯ উইকেটে বাঙ্গলা ও আসামকে পরাজিত করেছে। বাঙ্গলা ও আসাম —প্রথম ইনিংস ১৩৬, দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৪ ; অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৩০৮, দ্বিতীয় ইনিংস—১৩ (১ উইকেট)।

বেলা ১১টার সময় খেলা আরম্ভ হয়ে ৩·২০ মিনিটের মধ্যে বাঙ্গলা ও আসামের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র ১৩৬ রানে।

১৭ রানের মধ্যে বাঙ্গলার দু'জন ভাল ব্যাট পড়ে গেলো, ক্যাপ্‌টেন হোসী মাত্র ৯ রান করে গেলেন ২৮ রানের মাথায়। লংফিল্ড ৬, খাম্বাটা ৩, ভ্যাণ্ডারগাচ ১৯, গিলবার্ট ৩ রানে আউট হয়ে গেলেন যখন রান সংখ্যা মাত্র ৯৪। রানের শত সংখ্যা পূর্ণ হ'লো ১৬০ মিনিটে। সুশীল বোস বাউণ্ডারী করলে, এস ব্যানার্জ্জি আউট হবার পর থেকেই কমল ভট্টাচার্য্য ব্যাট করছেন। তিনি ও সুশীল বোসের খেলার জন্যই বাঙ্গলার রান সংখ্যা ১৩৬এ উঠেছিল। কমল ভট্টাচার্য্য ৪৮ রান করে অক্সেনহামের বলে এল্‌-বি হয়ে আউট হয়ে গেলেন। কমল খুব কৃতিত্বের সঙ্গে খেলে তার উইকেট রক্ষা করেছে যখন অন্যদিকের বড় বড় রথীদের উইকেট তাড়াতাড়ি পড়ে যাচ্ছিল।

৩·৫০ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ান পক্ষে ব্যাট করতে নামলে ওয়েণ্ডেল বিল ও ব্রায়াণ্ট। বেলা শেষে এক উইকেট খুইয়ে অষ্ট্রেলিয়াদের রান হলো সতোর।

দ্বিতীয় দিনে ম্যাকার্টনে ও মরিসবীর খেলা অতি চমৎকার হয়েছিল। ম্যাকার্টনের ষ্ট্রোকগুলি অতি উঁচুদরের, প্রত্যেকটি ষ্ট্রোকই ফিল্ডসম্যানের সতর্কতা এড়িয়ে চলে যাচ্ছিল। এক রকমেরই বল তিনি বিভিন্ন রকমে পেটাচ্ছিলেন। এ ধরণের খেলা কলিকাতায় একেবারেই নূতন। ২৮৫ মিনিট খেলার পরে ৩·৪৫ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলো মোট ৩০৬ রানে। এস ব্যানার্জ্জি গোড়ার দিকে বোলিংএ সুবিধা করতে পারেননি, কিন্তু লাঞ্চের পর থেকে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ৫জনকে আউট করেছেন।

১৭২ রান পশ্চাতে থেকে বাঙ্গলা ও আসাম দল দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে, এরাটুন ও কমল ভট্টাচার্য্যকে দিয়ে। কমল দু'টি চান্স দিয়ে ১২ রানে আউট হলো। শ'ও এল-বি হয়ে গেলো। হোসী এলো ও এরাটুনের সঙ্গে খেলে



জি এরাটুন ও এস ব্যানার্জ্জি বাঙ্গলা ও আসামের খেলায় প্রথম ব্যাট করতে নামছেন

ছবি—ভক্তকুমার

সে দিনটা কাটালে। রান উঠলো মাত্র ৩৬, কিন্তু দু' উইকেট গেছে।

এরাটুন এবার প্রশংসনীয় খেলা খেলেছে। লংফিল্ড, গিলবার্ট ও এস ব্যানার্জ্জির খেলাও ভালো হয়েছে। এস

ব্যানার্জ্জি অক্সেনহ্যামের বলে ওভার বাউণ্ডারী করে ইনিংস পরাজয় কাটালে। বাঙ্গলা ও আসাম মোট রান ১৮৪ করে সকলে আউট হলেন বেলা ৩টার সময়।

৩-১৫এ অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করতে নামলে, কিন্তু আবশ্যকীয় ১৩ রান করতে তাদের একটা উইকেট খোয়া গেল। ওয়েণ্ডেল বিল ৮ করে ভ্যাণ্ডারগাচের হাতে ধরা পড়লেন তখন মোট রান ১১ হয়েছে। ২ রান করতে অনেকক্ষণ লাগলো। মরিসবী ও ব্রায়াণ্ট অত্যন্ত সাবধান হয়ে খেলছেন, যেন তাঁরা পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্ত রান তুলছেন। স্থানীয় বোলাররাই প্রভুত্ব করছে,

এ এল্ হোসী··ষ্টাম্পড্ এলিস্, বো মেয়ার	৯
টি সি লংফিল্ড···কট্ মরিসবী, বো মেয়ার	৬
কে খাম্বাটা···এল্-বি ডবলিউ, বো মেয়ার	৩
পি ভ্যাণ্ডারগাচ···এল-বি, বো অক্সেনহ্যাম	১৯
এল্ গিলবার্ট··বো মেয়ার	৩
সুশীল বোস্···কট্ লেদার, বো মেয়ার	২৫
এ স'···ষ্টাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	০
জে এন ব্যানার্জ্জি··· নট-আউট	০
অতিরিক্ত	২১
মোট	১৩৬



অষ্ট্রেলিয়া ও কুচবিহার মহারাজার খেলোয়াড়গণ। মধ্যস্থলে বাঙ্গলার লাট মহোদয় ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

উপর্য্যুপরি তিনটি ওভার মেডেন পাওয়াই তার সাক্ষ্য। শেষে দুই 'বাই' পেয়ে খেলা শেষ হলো বেলা ৩।৹টায়। অষ্ট্রেলিয়ানরা ৯ উইকেটে জয়ী হলো।

বাঙ্গলা ও আসাম—প্রথম ইনিংস

এস ব্যানার্জ্জি · কট্ অক্সেনহ্যাম, বো লেদার	০
জি এরাটুন···কট্ এলিস, বো লেদার	২
কে ভট্টাচার্য্য···এল-বি ডবলিউ, বো অক্সেনহ্যাম	৪৮

বোলিং

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১০	৩	১৭	২
আলেকজাণ্ডার	৯	২	১২	০
মেয়ার	১৯	৫	৪৪	৫
অক্সেনহ্যাম	১৯	১৩	২২	২
ম্যাকার্টনে	৭·১	৩	২০	১

উইকেট পতন ঃ—

০ রানে ১ম (এস্ ব্যানার্জ্জি), ১৭ রানে ২য় (এরাটুন), ২৮ রানে ৩য় (হোসী), ৪২ রানে ৪র্থ (লংফিল্ড), ৪৮ রানে ৫ম (খাম্বাটা), ৮৪ রানে ৬ষ্ঠ (ভ্যাণ্ডারগাচ্), ৯৪ রানে ৭ম (গিলবার্ট), ১২২ রানে ৮ম (কে ভট্টাচার্য্য), ১৩৬ রানে ৯ম (সুনীল বোস), ১৩৬ রানে ১০ম (স')।

এইচ্ আলেকজণ্ডার···বো এস্ ব্যানার্জ্জি	১
অতিরিক্ত	১১
মোট	৩০৮

উইকেট পতন :—

৫৭ রানে ১ম (ওয়েণ্ডেল বিল), ১১৬ রানে ২য়, (ব্রায়াণ্ট) ১৬৭ রানে ৩য় (রাইডার), ১৭২ রানে ৪র্থ (হেনড্রি), ২৫২ রানে ৫ম (মরিসবী), ২৬৭ রানে ৬ষ্ঠ (অক্সেনহ্যাম), ২৯৮ রানে ৭ম (ম্যাকার্টনে), ৩০২ রানে ৮ম (মেয়ার), ৩০২ রানে ৯ম (লেদার), ৩০৮ রানে ১০ম (আলেকজাণ্ডার)।



এ এল হোসী বাঙ্গলা ও আসামদলকে নিয়ে ফিল্ড করতে মাঠে যাচ্ছেন　　ছবি—ভক্তকুমার

অষ্ট্রেলিয়ান—প্রথম ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল...কট্ হোসী, বো এল্ এইচ গিলবার্ট		৩৫
এফ ব্রায়াণ্ট···	রান আউট	৫০
আর ও মরিসবী···কট্ ও বো লংফিল্ড		৭৬
জে এস্ রাইডার···বো খাম্বাটা		২৫
এইচ এল্ হেনড্রি···বো গিলবার্ট		৪
সি জি ম্যাকার্টনে···কট্ গিলবার্ট, বো ব্যানার্জ্জি		৮৫
আর অক্সেনহ্যাম···বো এস ব্যানার্জ্জি		৫
জে ই এলিস···	নট্-আউট	১৪
এফ মেয়ার···বো এস্ ব্যানার্জ্জি		২
টি লেদার...বো এস ব্যানার্জ্জি		০

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
টি সি লং ফিল্ড	২৬	৩	৮২	১
এস ব্যানার্জ্জি	১৮·৩	৩	৫৩	৫
এল্ এইচ গিলবার্ট	১২	১	৯৪	২
জে এন ব্যানার্জ্জি	৯	০	২৬	০
কে খাম্বাটা	৬	০	২২	১
কে ভট্টাচার্য্য	৪	০	১০	০
জি এরাটুন	৩	০	১০	০

বাঙ্গলা ও আসাম—দ্বিতীয় ইনিংস

কে ভট্টাচার্য্য···বো লেদার		১২
জি এরাটুন···বো লেদার		৫৬
এ এ 'শ'···এল্ বি ডব্লিউ, বো অক্সেনহ্যাম		১
এ এল হোসী · কট্ এলিস, বো লেদার		৪
টি সি লংফিল্ড···কট্ এলিস, বো লেদার		৩৩
সুশীল বোস···বো মেয়ার		০
পি আই ভ্যাণ্ডারগাচ্···বো অক্সেনহ্যাম		১২
এস ব্যানার্জ্জি···বো অক্সেনহ্যাম		১৯
এল্ এইচ্ গিলবার্ট···কট্ মরিসবী, বো মেয়ার		২৫
কে খাম্বাটা···	নট্-আউট	৪
জে এন ব্যানার্জ্জি···বো অক্সেনহ্যাম		০
	অতিরিক্ত	১৮
	মোট	১৮৪

উইকেট পতন :—

২০ রানে ১ম (কে ভট্টাচার্য্য), ২৫ রানে ২য় (শ'), ৩৮ রানে ৩য় (হোসী), ১১৩ রানে ৪র্থ (এরাটুন), ১১৬ রানে ৫ম (সুশীল বোস), ১১৬ রানে ৬ষ্ঠ (লংফিল্ড), ১৩৬ রানে ৭ম (ভ্যাণ্ডারগাচ্), ১৬৮ রানে ৮ম, (গিলবার্ট), ১৮৪ রানে ৯ম (এস্ ব্যানার্জ্জি), ১৮৪ রানে ১০ম (জে এন ব্যানার্জ্জি)।

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৮	২	৩১	৪
আলেকজাণ্ডার	৭	০	১৬	
অক্সেনহ্যাম	২৭·২	১২	৪০	
মেয়ার	২২	৩	৭৯	



অষ্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়গণ ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

অষ্ট্রেলিয়ান—দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল···কট্ ভ্যাণ্ডারগাচ, বো জে এন ব্যানার্জ্জি···		৮
এফ ব্রায়ান্ট···	নট্-আউট	৩
আর মরিসবী	নট্-আউট	০
	অতিরিক্ত	২
	মোট (১ উইকেট)	১৩

বোলিং :—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
কে ভট্টাচার্য্য	৪	২	৫	০
জে এন ব্যানার্জ্জি	৩·১	১	৬	১

প্রীতি-সম্মিলন ঃ

অষ্ট্রেলিয়ান দল কলিকাতায় এসে প্রথম ম্যাচ খেলেন উড্‌ল্যাণ্ডসে কুচবিহার মহারাজার একাদশের সঙ্গে। পিচ্ খারাপ থাকায় ম্যাটিং পেতে খেলা হয়। অষ্ট্রেলিয়ানরা ৬ উইকেটে (ডিক্লেয়ার্ড) মোট ২১১ রান করেন। 'গভর্ণর জেনারেল' ম্যাকার্টনে ক্যাপ্‌টেন হয়েছিলেন। ম্যাক্ এসেই দত্তের বল দু'বার লেগ বাউণ্ডারীতে পাঠিয়ে, পরে পালিয়াকে সোজা পরদার পারে চালিয়ে প্রবীণ যাদুকরের যাদুবিদ্যার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়ে দর্শকদের আনন্দিত করলেন। খেলা আরম্ভের ৪০ মিনিটের মধ্যে ৭০ রানে চারটি উইকেট পড়ে যায়। তখন ম্যাকার্টনে মরিসবীর সঙ্গে এসে যোগ দিয়ে রান সংখ্যা তুললেন ১৭৫এর কোটায়। নিজের ৬১ রান হ'লে কুচবিহার মহারাজার বলে জগদ্দলের হাতে আটকে গেলেন।

মহারাজার দল ব্যাট করে দুই উইকেটে ১০১ রান হ'লে বেলা শেষ হওয়ায় খেলা ড্র হয়। এস ব্যানার্জ্জি ১৪, পালিয়া (নট্-আউট্) ৫৭ ও মহারাজা কুচবিহার (নট্-আউট্) ১৮ রান করেন।



কে ভট্টাচার্য্য (এরিয়ান)

অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের খেলা দু'দিনে শেষ হওয়ায় ভিজিয়ানাগ্রাম ও টেরাণ্ট একাদশের দু'দিনের প্রীতি-সম্মিলনের আয়োজন হয়। খেলা ড্র হয়েছে।



তৃতীয় টেষ্টের ভারতীয় খেলোয়াড়গণ ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ভিজিয়ানাগ্রাম প্রথমে ব্যাট করে ২৩৫ রান করেন, টেরাণ্টের দল ২১৮ করে।

দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে ভিজিয়ানাগ্রাম ৫০ মিনিট খেলে ৪ উইকেটে মাত্র ৬৩ করলে খেলা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ভিজিয়ানাগ্রাম দল—প্রথম ইনিংস—আব্দুল আজিজ ১৪, এস ব্যানার্জ্জি ৪৯, পালিয়া ৩৬, সি কে নাইডু ৩৯, ঘোসী ২, লাল সিং ৩, লংফিল্ড ৩২, সি এস নাইডু ৩৬, সুশীল বোস ২, বাকাজিলানী ১৩, সাহাবুদ্দিন ০।

দ্বিতীয় ইনিংস—সি কে নাইডু ১১, আজিজ ০, এস বোস ১৩, লাল সিং (নট-আউট) ৩০, সাহাবুদ্দিন ০, এস ব্যানার্জ্জি (নট-আউট) ৮।

টেরাণ্ট দল—ওয়েগুন বিল ৯১, ব্রায়াণ্ট ১৬, মরিসবী ১৯, গোপাল দাস ১০, হেনড্রি ১৪, ওয়ার্ণ ২, লাভ ০, টেরাণ্ট (নট-আউট) ৩৭, আমির ইলাহী ৭, ডেভিস ০, আলেকজাণ্ডার ১০।

তৃতীয় বেসরকারী টেষ্ট ঃ

লাহোরে তৃতীয় টেষ্টের প্রথম দিনের খেলায় সমগ্র ভারত প্রথম ইনিংসে মোট ১৪৯ রান করেছে। ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি প্রশংসনীয় ব্যাট করে ৭৬ রান করেছেন, মেহেরমজী ২৬, যুবরাজ পাতিয়ালা ১৪ রান করেছেন। নাজির আলি ও অমরনাথ খেলছেন না, সালাউদ্দীন ও ডি আর পুরী খেলছেন।

অষ্ট্রেলিয়ারা ৩ উইকেট খুইয়ে মোট ৭১ রান করেছেন। রাইডার ও ব্রায়াণ্ট নট-আউট আছেন।

অষ্ট্রেলিয়া বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ

অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার **প্রথম টেষ্ট** খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়ী হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা—২৪৮ ও ২৮২ (নোর্স ৯১),

অষ্ট্রেলিয়া—৪২৯ (ম্যাক্ক্যাব্ ১৪৯, চিপারফিল্ড ১০৯) ও ১০২ (এক উইকেট)

দ্বিতীয় টেষ্ট খেলা বৃষ্টির জন্য বন্ধ হওয়ায় 'ড্র' হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১৫৭ ও ৪৯১ (নোর্স ২৩১)

অষ্ট্রেলিয়া—২৫০ ও ২৭৪ (দুই উইকেট) (ম্যাক্ক্যাব্ ১৮৯)

তৃতীয় টেষ্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৭৮ রানে জয়ী হয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা—১০২ ও ১৮২।

অষ্ট্রেলিয়া—৩৬২ (ব্রাউন ১২১, ফিন্‌গেলটন ১১২)।

বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঃ

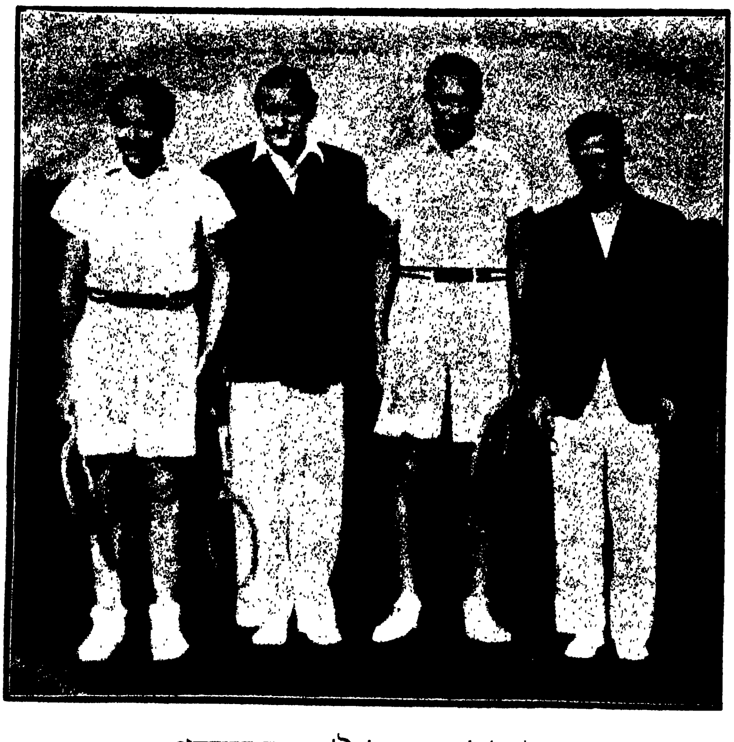
পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনাল—

ডি এ হজেস্ ৬-৪, ৮-১০, ১১-৯, ৬-৩ গেমে ডব্লিউ মিচেলমোরকে এ বৎসরও পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গল ফাইনাল—

মিস্ ওল্‌গা ওয়েব ৬-২, ৬-৩ গেমে মিসেস্ বোলাণ্ডকে পরাজিত করে বিজয়িনী হয়েছেন।

গত দশ বৎসরের মধ্যে এবার নিয়ে মিসেস্ বোলাণ্ড (মিস্ জেনি স্যাণ্ডিসন) টেনিস খেলায় মাত্র ৩বার পরাজিত হলেন।



পুরুষদের ডবল ফাইনালের খেলোয়াড়গণ।
বরোস্কি, মেঞ্জেল, মেটাক্সা ও হেক্‌ট ছবি—ভক্তকুমার

প্রথম ও দ্বিতীয়বার ইটালিয়ান খেলোয়াড় সিনর ভ্যালেরিওর নিকট কলিকাতায় ও এলাহাবাদে এবং এই তৃতীয়বার মিস্ ওল্গা ওয়েবের নিকট। মিস্ ওয়েব ব্যাকহ্যাণ্ড ড্রাইভে মিসেস্ বোলাণ্ডকে কাবু করেন। মিস্ ওয়েব আর জি ম্যাক্ইন্সের বাগ্দত্তা, শীঘ্রই পরিণীতা হবেন।

পুরুষদের ডবল ফাইনাল—

ডি এ হজেস্ ও আর জি ম্যাক্ইন্স্ ৬ ৪, ৯-৭, ৬-৪ গেমে ব্রুক এডওয়ার্ডস্ ও মিচেলমোরকে হারিয়েছেন। গত বৎসর বিজিতদের কাছে বিজয়ীরা হেরেছিলেন।

মিক্সড ডবল ফাইনাল—

ডি এ হজেস ও মিস্ হারভে জনষ্টন ৬-৪, ৬ ২ গেমে আর জি ম্যাক্ইন্স্ ও মিস্ ওল্গা ওয়েবকে পরাজিত করেছেন।

মেয়েদের ডবল ফাইনাল—

মিস্ ও ওয়েব এবং মিসেস্ গ্রাহাম ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪ গেমে মিসেস বোলাণ্ড ও মিসেস্ ম্যাক্কেনাবেকারকে হারিয়ে জয়ী হয়েছেন।



মিক্সড ডবল ফাইনালের খেলোয়াড়গণ ; বিজয়ী—কৃষ্ণস্বামী ও মিসেস্ বোলাণ্ড ; বিজিত—মিস্ ওয়েব ও ম্যাক্ইন্স ছবি—ভক্তকুমার

চ্যাম্পিয়নসিপ্ টেনিস ঃ

সাউথ ক্লাবের ক্যালকাটা চ্যাম্পিয়নসিপের নাম বদলে এবার থেকে নাম হ'লো ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপ্। এই প্রতিযোগিতার ফলাফল নিম্নরূপ

পুরুষদের সিঙ্গল ফাইনাল—

এল্ হেক্ট ৩ ৬, ২-৬, ৬-৩, ৬-১, ৭-৫ গেমে রড্রিক্ মেঞ্জলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মেয়েদের সিঙ্গল ফাইনাল—

মিসেস বোলাণ্ড ৬-১, ৩-৬, ৬-২ গেমে মিস্ ওল্গা ওয়েবকে পরাজিত করে বিজয়িনী হয়েছেন।

মিসেস বোলাণ্ড বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপের খেলায় মিস্ ওল্গা ওয়েবের নিকট এবার পরাজিত হয়েছিলেন।



সাউথ ক্লাবের সেণ্ট্রাল ইউরোপীয়ান খেলোয়াড়গণ
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

পুরুষদের ডবল ফাইনাল—

আর মেঞ্জেল ও এল হেক্ট্ ৮-৬, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৮, ৬-৪ গেমে জি ভন্ মেটাক্সা ও কাউণ্ট বয়োস্কিকে পরাজিত করে বিজয়ী হয়েছেন।

ভেটারন্স্ সিঙ্গল ফাইনাল—

এন এস আয়ার ৮-৬, ৬-৩ গেমে এস্ ডবলিউ বব্‌কে হারিয়েছেন।

হয়। তার ৩টি সিঙ্গল খেলাতে বিদেশীরা জয়ী হন। আর ১টি সিঙ্গল ও ২টি ডবল খেলায় ভারতবর্ষ জয়ী হওয়ায় সম্মান সমান হয়েছে।

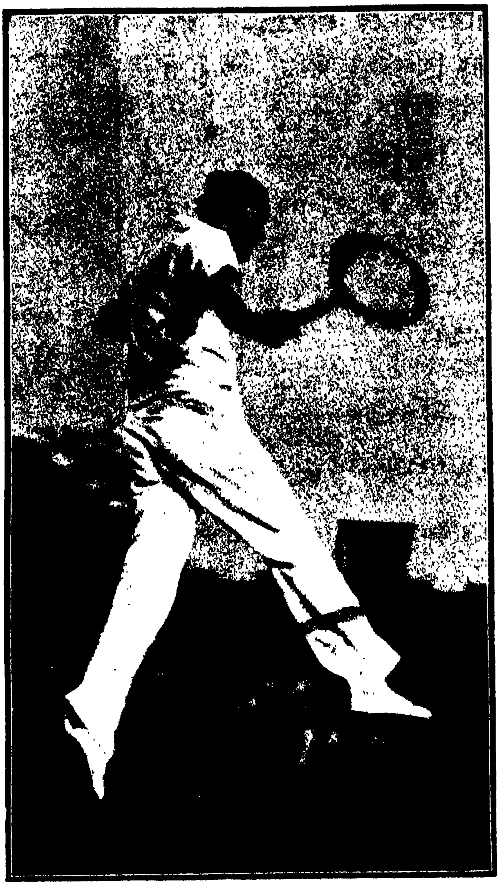
জি ভন্ মেটাক্সা (অষ্ট্রিয়া) ৬-৪, ৬-১ গেমে জে কে কাউলকে (ভারত) পরাজিত করেছেন।

ডি এন্ কাপুর (ভারত) ৪-৬, ৬-৪, ৬৩ গেমে কাউণ্ট বরোস্কিকে (অষ্ট্রিয়া) হারিয়েছেন।



ক্রীড়ারত জি ভন্ মেটাক্সা

ছবি—ভক্তকুমার



ক্রীড়ারত আর মেঞ্জেল

ছবি—ভক্তকুমার

মিক্সড ডবল ফাইনাল—

কৃষ্ণস্বামী ও মিসেস বোলাণ্ড ৬ ৪, ৭-৫ গেমে ম্যাক্ইন্‌স্ ও মিস ওল্গা ওয়েবকে হারিয়েছেন।

আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতা—

আগন্তুক ও ভারতের মধ্যে ৬টি আন্তর্জ্জাতিক খেলা

আর মেঞ্জেল (চেকোশ্লেভ) ১০-৮, ৬-৩ গেমে মদন-মোহন (ভারত) পরাজিত করেছেন।

এল হেক্ট (চেকোশ্লেভ) ৬-২, ৬-৩ গেমে শোহন লালকে (ভারত) হারিয়েছেন।



ক্রীড়ারত এল্ হেক্‌ট (ইষ্ট ইণ্ডিয়ান চ্যাম্পিয়ন)

ছবি—ভক্তকুমার

এইচ ডি সোনি ও ডবলিউ মিচেলমোর ১-৬, ৬-২, ৬-৩ গেমে জি ভন্ মেটাক্সা ও কাউণ্ট বরোস্কিকে পরাজিত করেছেন।

এন্ কৃষ্ণস্বামী ও এস এল আর সোহানে ৬-২, ৩-৬, ৬-২ গেমে আর মেণ্ডেল ও এল্ হেক্টকে হারিয়েছেন।



সাত মাইল দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীত্রয়ী। আগরপাড়া থেকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত দৌড় হয়। ১ম, ফণী চন্দ্র (১২); ২য়, কে কে নন্দী; ৩য়, এস বোস

ছবি—তারক দাস

বাংলার প্রাচীন শব্দ-সম্ভার

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী বি, এ

জাতির মধ্যে রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা সম্ভব হইলেও ভাষার মধ্যে ঐরূপ বিশুদ্ধতা রক্ষা করা নিতান্ত কঠিন। কোনও ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় করিতে হইলে কোন্ ভাষার ভিতর আদি ভাষা কতখানি প্রবেশ করিয়াছে তাহাই নির্ণয় করিতে হয়। আধুনিককালে আমরা দেখিতে পাই, ইংরাজগণ ভারতে আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত আমাদিগকে অনেক পাশ্চাত্য শব্দ দিয়াছে, আবার ইংরাজ প্রবল পরাক্রান্ত জাতি হইয়াও সে যে কেবল দিতেছে, কিছুই গ্রহণ করিতেছে না এরূপ মনে করাও ভুল। আমাদের Bazar, Bunglow, Ghee, Loot, Badmas, Golmal এবং Gunda ইংরাজী ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলমানদের সময়ও এইরূপ আদান প্রদান সমানভাবে চলিয়াছিল।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে নানা জাতির আগমন হইয়াছে এবং প্রত্যেক জাতিই ভাষার উপর কিছু না কিছু চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। আর্য্যগণ একদিন ভারতে বিদেশীয়ের মতই ছিলেন। অনার্য্যদিগকে আর্য্যেরা ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও তাহারা যে অনেকাংশে আর্য্য সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সুদূর অতীতে যে কত অনার্য্য শব্দ বেদ ও ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনার্য্য শব্দগুলিকে সংস্কৃত-ভাষী আর্য্যগণ বহুদিন যাবৎ ঘৃণার চক্ষে দেখিলেও অনেক শব্দ বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যেরূপ ইংরাজেরা তাহাদের নিজের উচ্চারণের অনুরূপ করিয়া আমাদের অনেক শব্দ গ্রহণ করিয়াছে সেইরূপ অনেক অনার্য্য শব্দ সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করিয়া আর্য্যগণ ব্যবহার করিতেন। অনেকগুলি সংস্কৃত

শব্দের প্রাকৃত আকার পুনর্ব্বার সংস্কৃত হইয়া এক নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার দেখাইয়াছেন, "দর্ভ" শব্দ প্রাকৃত "দুব্ব" বা "দুব্বো" হইয়াছিল, তাহা হইতে "দূর্ব্বা" নূতন সংস্কৃত শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এরূপ স্থলে অবশ্য দূর্ব্বা বেদে বা প্রাচীন সংস্কৃতে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা প্রমাণ করা আবশ্যক। ছান্দসের অনেক শব্দ দেশী শব্দরূপে ব্যবহৃত হইতেছে ইহাও উক্ত অধ্যাপক মহাশয় দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন, "কামার" শব্দটি ছান্দস্ "কর্ম্মার" শব্দের অপভ্রংশ, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ পরবর্ত্তীযুগে ইহাকে দেশী শব্দ মনে করিয়া কুম্ভকার ইত্যাদি শব্দের অনুকরণে "কর্ম্মকার" শব্দটি গঠন করিয়াছেন। এইরূপ ছান্দস্ শব্দগুলি যে অনার্য্যগণের নিকট হইতে গৃহীত হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? প্রকৃতও ঘটিয়াছে তাহাই। বিজয়বাবু দেখাইয়াছেন আমাদের দেশী শব্দ "আঁকুশী", আশা (দিক) ভেবড়ে, বাঁশ—(ছুতোরের অস্ত্র), 'কে বট হে' শব্দগুলি যথাক্রমে ছান্দস্ অঙ্কুশী, আশা, ভর্ভরা (ভাবের গণ্ডগোল), বাঁশী, বট্ (সত্য) ইত্যাদির সমতুল্য। ক্রমে সংস্কৃতের মধ্যে উক্ত প্রাকৃত রূপগুলির সংস্কৃত সংস্করণ প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অবশ্য এমনও হইতে পারে যে ছান্দস্ যে সময়ে কথিত ভাষা ছিল তখন অনার্য্যগণ ঐ শব্দগুলি গ্রহণ করিয়াছিল। তবে ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, আর্য্যগণই অনার্য্যদের কাছ হইতে ঐ শব্দ সকল গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও দেখাইয়াছেন আর্য্যগণের অনেক দেবতার নাম অনার্য্যদিগের ভাষা হইতে গৃহীত। তিনি ও অন্যান্য অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ্ অনুমান করেন, অনার্য্যদিগের এক রক্তবর্ণ দেবতা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক "রুদ্র" নামে অভিহিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী "শিব" ও "শম্ভু" নাম দুইটিও দ্রাবিড় ভাষার "সিবন্" (লাল) সেম্বু (তাম্র) শব্দ হইতে গৃহীত। দ্রাবিড়গণের এক দেবতা ছিল বানর, ইহাকে আর্য্যেরা "বৃষা কপি" বলিতেন; ইহার পরবর্ত্তী নাম হনুমান ও অনার্য্য শব্দ অন্+মান্দি (পুং বানর) শব্দদ্বয় হইতে গৃহীত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। বিষ্ণু নামটিও নাকি অনার্য্যদের—দ্রাবিড় ভাষায় বিন্ অর্থে আকাশ, বিষ্ণু কিনা আকাশের দেবতা।

দেবতাদের নাম ভিন্ন আরও অনেক অনার্য্য শব্দ বেদে ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণগুলিতে দেখা যায়। ঋগ্‌বেদের অনু, অরণি, কটুকা, কপি, কলা (অংশ), কাল, কিতব, কুট (কুটীর), কুনারু (ক্ষীনবাহু), কুণ্ড, গণ, নানা, নীল, নীহার, পুষ্কর (পদ্ম), পুষ্প, পূজন, ফল, চিল, বীজ, ময়ূর, রাত্রি, রূপ, সায়ং, বল্গু (সুন্দর) এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে—অটবী, অলর্ক, আড়ম্বর, কম্বল, কুলাল, খড়্গ, তণ্ডুল, তিল, মর্কট, বলক্ষ, বল্লী, ব্রীহি, শব ইত্যাদি শব্দ অনার্য্যদের নিকট হইতে আর্য্যগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

এত গেল বৈদিক শব্দের কথা। কথিত ভাষায় মিশ্রণ-কার্য্য যে কতদূর চলিয়াছিল, তাহার লিখিত প্রমাণ না পাইলেও সহজেই ধরা পড়ে। ভারতে আসিয়া অনার্য্যদের কাছ হইতে আর্য্যদের ঝাঁটা, কুলা, টোকা, বঁটি, খড়, দড়ি সবই লইতে হইয়াছিল; অনেক ফল-মূলেরও নাম তাহাদের কাছে শিখিতে হইয়াছিল। উচ্চ শ্রেণীর আর্য্যেরা ঐ শব্দগুলিকে অনুস্বার বিসর্গের ফোঁটা দিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। কিন্তু এই শব্দগুলি দেশী নামে অতি প্রাচীনকাল হইতেই অভিহিত হইয়া আসিতেছে। তৎভব ও দেশী শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় অনেক সময় দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। কোনও একটি শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশ, না তাহাই মার্জ্জিত হইয়া সংস্কৃতের আকার ধারণ করিয়াছে—তাহা বিচার করিতে হইলে বেদ ও সংস্কৃত প্রাচীন-সাহিত্যে বিশেষ অধিকার থাকা প্রয়োজন। মনে করুন "ঘাম" শব্দটির মূল নির্ণয় করিতে হইবে; আমার দৃষ্টিতে মনে হয়, ইহার মূল নির্ণয় করা অতি সহজ,—সংস্কৃত "ঘর্ম্ম" হইতে প্রাকৃত "ঘম্ম", তাহা হইতে ঘাম হইয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। "ঘর্ম্ম" হইতে "ঘম্ম" হয় নাই, বরং উল্টা "ঘম্ম" হইতে "ঘর্ম্ম" হইয়াছে। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম হইতে ধম্ম ও কম্ম হইয়াছে দেখিয়া উহাদের সাদৃশ্য-বশতঃ ঘর্ম্ম শব্দটি ঘম্ম হইতে সংস্কৃত করা হইয়াছে। "ঘম্ম" ঘর্ম্মের পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছিল। অধ্যাপক বিজয়বাবু বলেন—গ্রীষ্ম—গিমহ্—ঘম্ম; তাহা হইলেও দেখা যায় "ঘাম" শব্দটির মূল গ্রীষ্ম, ঘর্ম্ম নহে। কাজেই প্রাকৃত রূপ হইতে সংস্কৃত রূপটি গঠিত কিনা এ সন্দেহ অনেক সময়ই উঠিতে পারে। এ সন্দেহ দূর করিবার উপায় একমাত্র শব্দটির ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া রাখা।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "মধুচক্র"—১৲
শ্রীহেমমালা বসু প্রণীত উপন্যাস "ব্রতচারিণী"—২৲
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ প্রণীত ছেলেদের বই "সমুদ্রের রহস্য"—৷৵৹
হিমালয়, হৃষীকেশের স্বামী অমলানন্দ গিরি প্রণীত ধর্ম্মপুস্তক "জীবন জ্যোতিঃ"—১৲
শ্রীঅখিল নিয়োগী প্রণীত গল্পপুস্তক "ফুল ফোটে, ফুল ঝরে"—১৲
মন্মথ রায় এম, এ প্রণীত মেয়েদের অভিনয়ের জন্য নাটক "কাজল রেখা"—।৹
শ্রীরাধানাথ কাবাসী সঙ্কলিত ধর্ম্মপুস্তক "শ্রীশ্রীভক্তিরত্নহার"—৷৹
শ্রীমতী শান্তি ঘোষাল প্রণীত উপন্যাস "নীচের সমাজ"—১৷৹
শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সামাজিক নাটক "মুখচোরা"—১৲
শ্রীবিভূতিশেখর মজুমদার প্রণীত মহিলাদিগের কথা "জীবনী সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ"—১।৹
প্রভাময়ী মিত্র প্রণীত নাটক "দেউল"—১৲
লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় আই, এম্, এস (অবসর প্রাপ্ত) প্রণীত "মহাভারতের রহস্য" প্রথম ভাগ—৷৹
শ্রীমনুজচন্দ্র সর্ব্বাধিকারী প্রণীত "পুরুষ ও নারী"—৶৹
অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সরকার প্রণীত "পরাজিত জার্ম্মাণী"—৬৲
শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা প্রণীত "কেদার বদরী ভ্রমণ কাহিনী"—৸৹
শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত উপন্যাস "কো-এডুকেশন"—১।৹

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,



Bharatvarsha Halftone & Printing Works



ভারতবর্ষ

ফাল্গুন—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

মাটি, না, মা-টি ?

অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ

পাথর, মাটি, জল—এ সব "ভূত," জড় পদার্থ ! কিন্তু এ ভূত যে দশচক্রে ভগবান্ ভূত, আর এক জড় যে জড়ভরত—তা এতদিন ত' খেয়াল করি নাই। কথাটা খোলসা করিয়া বলার দরকার। যে গুলোকে আমরা অচেতন, নির্জীব, জড় ভাবি, তারা সত্য সত্যই কি তাই ? আমরা মানুষ, আমাদের জীবন ব্যবহার বা এক কথায়, কারবার চালাইবার জন্য এক একটা কারবারি জগৎ বা হাট ফাঁদিয়া বসিয়া আছি। তুমি, আমি মাঝারি মানুষ। তোমার, আমার কারবারি জগৎ সর্ব্বথা এক নয়। দুটো বৃত্ত যদি হয়, তবে সে বৃত্ত দুটো হুবহু মিলিয়া যায় না। কাটাকাটি করে। খানিকটায় মেলে, খানিকটায় মেলে না। কাণ খাড়া করিয়া থাকিলে একটার তোপ আমরা দুজনেই শুনি ; কুইনিন গালে দিলে দুজনারই তিত লাগে ; আগুনে দুজনারই হাত পোড়ে ; জল, মাটি এ সবের ভেতর প্রাণ ও চেতনার পরিচয় তুমিও পাও না, আমিও পাই না। ইত্যাদি। কিন্তু আমার শিরঃপীড়া আমারি, তোমার নয় ; আমার ভাবনা, চিন্তা, কল্পনা-জল্পনা এ সবও তাই। তোমায় আলাহিদা। তলাইয়া দেখিতে গেলে অনুভূতি (Experience) মাত্রই অনন্যসাধারণ (unique)—সূক্ষ্ম হিসাবে।

যেটাকে বাহ্যজগৎ বলিয়া কারবার করিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়াছি—খোদ আমরা নিজেরাই সলা পরামর্শ করিয়া এটাকে গড়িয়া পিটিয়া লইয়াছি এমনটা ঠিক নয় ; লক্ষ লক্ষ বৎসর আমাদের জীবনযাত্রার ফলে সেটা মোটামুটি একভাবে আমাদের পক্ষে গড়িয়া উঠিয়াছে—সেটাকেও তুমি বা আমি ঠিক একই ভাবে অনুভব করি না ; সেটার সম্পর্কে তোমার ও আমার কারবার ঠিক একই নয়। বাইরের রূপ, রং যে ঠিক একই ভাবে তুমি ও আমি দেখি এমন নয় ; শব্দ সম্বন্ধেও তাই ; স্পর্শ, গন্ধ, রস সম্বন্ধে আরও বেশী করিয়া তাই। তবে, তোমায় আমায় কারবার চালাইতে হইতেছে বলিয়া দুজনেই নিজের নিজের পুরো "সজীব" অনুভূতিকে ছাঁটিয়া মোটামুটি "সমান" করিয়া লইয়াছি, আর সমান ভাবিয়াই ব্যবহার চালাইতেছি। এ

সবে কারবারি মিলের চাইতে গরমিল যেখানে বেশী, সেখানে আমাদের কারবারে গোল বাধে। যে আকাশে একটা চাঁদের যায়গায় ছুটো তিনটে চাঁদ দেখে, সাদা সবুজ সব রংকেই হল্দে দেখে, তাকে আমরা কারবার হইতে ছুটি দিয়া আই ইন্ফারমারিতে পাঠাইয়া দিই। গোলটা মনের দিক্ হইতে হইলে, তাকে রাঁচি পাঠাইতেও হয়। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কারবারে কলে-ছাটা মাজা-ঘষা দেখা শুনা ইত্যাদির চাউলই কাটিতেছে; আ-ছাটা, অথবা নিজের নিজের "ঘরের ঢেঁকি" ছাটা চাউল কাটিতেছে না। কলে-ছাঁটা চাউল চলিতেছে বলিয়াই আমাদের এই ব্যাপক "ফুলো"-ব্যাধি—ভবরোগ। যে কলে ছাঁটাই হইতেছে ব্যক্তিগত (প্রাতিস্মিক) পুরো অনুভূতিগুলি, সে কলটা লাখ লাখ বৎসর ধরিয়া মানুষের ধরাপৃষ্ঠে জীবন সংগ্রামের ফলে গড়িয়া পিটিয়া উঠিযাছে। শুধু মানুষই বা বলি কেন—মানুষের গোড়া ধরিয়াও টান মারিতে হয়। সে কলটা বিচার-বিবেকের ততটা নয়, যতটা "অন্ধ" আচার আর সংস্কারের। আমাদের ধাতে সে কলটা বাহাল হইয়া রহিয়াছে। তাই প্রায় বিনা বিচারেই, আমরা—যারা মাঝারি মানুষ তারা, বাইরের জিনিষ আর ব্যাপারগুলোকে একই রকম ভাবে পাইতেছি মনে করিতেছি। সত্য সত্যই যে একই রকম ভাবে পাইতেছি এমন নয়।

যেটাকে আগে "কল" বলিলাম, সেটাকে "ছাঁচ" বলিলেও হয়। তোমার ছাঁচ ও আমার ছাঁচ মোটামুটি একরূপ, হুবহু একরূপ নয়। মানুষের ভেতরেও গরমিল কোথাও কোথাও, কোন কোন অবস্থায়, "অস্বাভাবিক" (abnormal) হইতে পারে। একজন জন্মান্ধ অথবা একজন মূকবধির যে ছাঁচে তার জগৎটা ঢালাই করিয়া লইতেছে, সে ছাঁচ তোমার আমার নয়। যাদের আমরা "পাগল" বলি, বাতিকগ্রস্থ বলি, তাদেরও ছাঁচ আলাহিদা। যাঁদের ভেতর কোনও রকম অসাধারণ আধ্যাত্মিক বিভূতি (Psychic Power) বিকশিত হইয়াছে— (যথা—যোগী, মিডিয়াম ইত্যাদি) তাঁদেরও ছাঁচ আলাহিদা। এমন কি, বৈজ্ঞানিক—যিনি যন্ত্রপাতি সাহায্যে তাঁর প্রত্যক্ষের জগৎটাকে অনেক বড় করিয়া লন এবং তাঁর হিসাবে (Theory) ও গণাগাথা দ্বারা সেটাকে "পরিকল্পিত" করিয়া লন—তাঁর ছাঁচটিও আলাহিদা। জন্মান্ধের জগৎকে আমরা মাঝারি মানুষ অসম্পূর্ণ জগৎ বলি; পাগলের জগৎকে জগাখিচুড়ি মনে করি; যোগীর জগৎ অতীন্দ্রিয়—হয়ত' ধ্যান (trance) এর ভেতরেই তার অস্তিত্ব; বৈজ্ঞানিক এ যুগে বড়ই জবরদস্ত; তবু তাঁর থিওরি আর ব্যাখ্যা এত ঘন ঘন তিনি পাল্টাইতেছেন এবং "তথ্য"গুলিও এত তাড়াতাড়ি ডিগবাজি মারিতেছে যে, তাঁর জগৎটাকেও বৈজ্ঞানিক ধুরন্ধরেরাই কেহ কেহ "মায়াপুরী" ভাবিতেছেন। অথচ, যোগীর দাবী তাঁর জগৎ "সত্যলোক," আর বৈজ্ঞানিকের বিশ্বাস তাঁর জগৎ "ধ্রুবলোক"। মাঝারি মানুষের মামলাটাও যে সহজ এমন মনে করিও না। মাঝারি মানুষ কে বা কাহারা?—এ প্রশ্নের জবাব এক তুড়ি মারিয়া দেওয়া যায় না। তোমার, আমার, তার—এ তিন জনের মাথার খুলির মাপ যদি ৮০, ৮৭, ৯০ হয়, তবে গড়ে আমাদের তিনজনের মাথার খুলির মাপ হইল ৮৫·৬। কিন্তু আমাদের কাহারও মাপ ৮৫·৬ নয়। ভারতবর্ষে লোকের গড়ে আয় বাৎসরিক ৩০৲ টাকা, আয়ুঃ ২৩ বৎসর ইত্যাদি। বহুলোকের দেখা-শুনা (Observation) গুলো পরস্পর তুলনা করিয়া লওয়ার প্রয়োজনীয়তা সকল অভিজ্ঞ পরীক্ষক ও বিচারকই অবগত আছেন। বিজ্ঞানের রিপোর্ট দাখিলায় অনেক সময় দেখি তাদের একটা গড় কষিয়া লইতেও হইয়াছে। সেই গড়-পড়তা লইয়াই বিজ্ঞানের অধীক্ষা—আধীক্ষিকী বিদ্যা। এ কথাটা এ ক্ষেত্রে ফলাও করিতে চেষ্টা করিব না। তবে দেখিতেছি যে, "মাঝারি মানুষ" যদি বিজ্ঞানের গড়পড়তা মানুষ হয়, তাহা হইলে, সে মানুষ একটা আদর্শ মাত্র; একটা গণিতের সংখ্যা; ভাব-লোকে সে মানুষ বিদ্যমান, নরলোকে তার সত্তা নাই।

আরও এক কথা মনে রাখা দরকার। বিজ্ঞানেই কেবল যে গড় কষার দরকার আছে এমন নয়। আমাদের আট-পৌরে "কারবারি হাটেও" গড়পড়তা চলিতেছে। বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম হিসাব—যেমন, বিজ্ঞানাগারে এক গ্রামের কোটি ভাগের এক ভাগ অথবা এক ইঞ্চির নিযুত ভাগের এক ভাগ পর্য্যন্ত হিসাব লওয়ার বন্দোবস্ত আছে। আমাদের হাটে কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বাটখারা ও মাপ-কাঠি অল্প বিস্তর আলাহিদা; তবু বাজার-চলন একটা সাধারণ ওজন ও মাপ হওয়ার ব্যবস্থাও রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়া কারবার চলে, লেন-দেন (ব্যবহার) চলে। হিসাব

এক্ষেত্রে মোটামুটি, জাবদা। সামান্য অডিটেই গরমিল, গোঁজামিল ধরা পড়ে। যাক্—এ সব কথাও আর একদিন পরিষ্কার করিতে যত্ন করিব।

এখন, তোমার-আমার ভিতরে যে "কল" বা "ছাঁচ" রহিয়াছে এবং সদাই জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির শিপ্‌টে চলিতেছে, তার কাজ হইতেছে—বাছাই, ছাঁটাই, ঢালাই। মানে—অনুভূতির "কাঁচামাল" মাত্রই এতে বাছাই হইতেছে, ছাঁটাই হইতেছে, ঢালাই হইতেছে। সব কিছু অপক্ষপাতে, সমগ্র, সম্পূর্ণভাবে আমরা নিই না; নেবার জন্য প্রস্তুত নই; নিলে কাজও চলে না। যে আকাশে ধ্রুবতারাটি দেখিতে চায়, তার আকাশের সব বাদ দিয়া একটু-খানিতেই অভিনিবেশ করিতে হয়। যে রাস্তায় বাড়ী-ভাড়ার নোটিশ খুঁজিতে বাহির হইয়াছে, তার স্থান বিশেষেই মনোযোগ দিতে হয়। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি, অপক্ষপাত হইলে চলে না। তাতে কাজের হাঙ্গামা ঢের বাড়িয়া যায়। হয়ত কাজটা ফাঁসিয়াই যায়। ভিতরে বাছাই, ছাঁটাই, ঢালাইএর যে যন্ত্রটি কাজ করিতেছে, সেটাকে অভিনিবেশ বলিতে পার। তার মূলে পক্ষপাত—রাগ-দ্বেষ। "রাগ" সংস্কৃত রাগ (= অনুরাগ), বাংলা রাগ নয়। ইংরাজিতে এক কথায়—Interest. এর সবটাই, এমন কি, বেশীটাই —জ্ঞাতসারে, "সজ্ঞানে" কাজ করে না। অল্প-স্বল্প করে। বেশীর ভাগ, সাগরে ডুবো বরফের চাঁই-এর মতন, আড়ালে আব্‌ডালে—অবচেতনা বা আধ-চেতনার ভেতরে থাকিয়া কাজ করে। কেন আমার বাছাই-ছাঁটাই-ঢালাইএর যন্ত্রটা (রাগ-দ্বেষগুলো, পক্ষপাতগুলো, Interestগুলো) এমন-ধারা হইল বা হইয়াছে, তার কৈফিয়ৎ উপস্থিত "বৈঠক" (Situation)এর বিচারে বা হিসাবনিকাশে খানিকটা বই সবটা পাওয়া যায় না। তার পিছনে রহিয়াছে আমার (সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠী, জাতি, মানবতা, এবং মানবেতর সত্তা সমূহের) লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী গোটা বিরাট্ ইতিহাস। এখনকার উপস্থিত "বৈঠক" সামান্য একটুখানি হদিশ দিতে পারে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু বৈঠক (situations) টানিয়া আনিয়া গাঁথিয়া যুড়িয়া লইতে হইবে। আমার সত্তার বর্ত্তমান "টুকরা" (section)টিতে চলিবে না, সত্তার অনাদি ধারায় ডুব মারিয়া খোঁজ করিতে হইবে। আমার যন্ত্রটার শক্তিকূট (diagram of components) যদি হয় —(ক, খ, গ, ঘ......), তোমারটার হইবে—(কঁ, খঁ, গঁ, ঘঁ ....); "বীজ" বা কম্পোনেণ্টগুলো শুধু যে একটু আধটু আলাদা-ধাঁজের এমন নয়; সম্ভবতঃ, দুই চারিটে মোটেই মেলে না। আমার হয়ত আধ্যাত্মিক, অলৌকিক, অতীন্দ্রিয়ের দিকে "ঝোঁক", বিশ্বাস ও বোধ বেশী বেশী; তোমার কম। তুমি ও দিকে ততটা ভিড়িতেই চাও না; ও-সব তেমন মানতে চাও না। বীজ বা কম্পোনেণ্টগুলো যে আলাদা তা ছোট-বড়, খুঁটিনাটি অনেক তাতেই ধরা পড়ে বা "বিশ্লেষণ" ক'রে দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এক আমারি যন্ত্র বদ্‌লাইতেছে। বাল্য, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্যে ঠিক ঠিক এক নয়। জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিতে ঠিক এক নয়। স্বপ্নে যন্ত্রের অনেক "ভেতর গোপ্পা বা চোরা প্যাঁচ" ধরা পড়ে। ফ্রয়েড্ প্রভৃতি তাই নিয়ে নতুন শাস্ত্র খাড়া করিয়াছেন। আমাদের দেশী শাস্ত্রও আছে। জাগরণে যিনি সাধু সর্ব্বত্যাগী, তিনি স্বপ্নে হয়ত' বা কাম-কাঞ্চন আস্বাদ করিতে লোলুপ। ওতে যন্ত্রের পরখ হয়, সু-আড়া, বে-আড়া যেখানে যা কিছু, তা ধরা পড়ে।

মানুষের নানান্ অবস্থায় তার যন্ত্রস্থ শক্তিকূট (ক, খ, গ, ঘ...ইত্যাদি) আলাহিদা। বন মানুষ, "বুনো" মানুষ, আধা-সভ্য ও সভ্য মানুষ—এদের মধ্যে বিস্তর ফারেগ। বুনো মানুষ (savage) মাটি, জল, বাতাস, মেঘ, ঝড় ইত্যাদি "আত্মীয়" করিয়া, কিনা, সজীব সচেতন ভাবে দেখে। তাদের ভেতরও ইচ্ছাশক্তি আছে; রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি আছে। এমন কি, আমাদের চাইতে বেশী বেশী আছে। তারা হয় দেবত-বিগ্রহ, নয়ত দানব-বিগ্রহ। এক কথায় তারা সেই পুরাতন অর্থে—"অসুর"। অথবা —"দেব"। যা খুসী। শুধু স্যাভেজ কেন, শিশুরাও তার চারধারের জগৎটাকে "নিজের মতন" ভাবে—সজীব, সচেতন। শিশু হোঁচট্ খাইয়া পড়িয়া কাঁদিল। যাতে হোঁচট্ খাইল, সেইটাকে তুমি মারো, শিশুর রাগ পড়িবে, খুসি হইবে। ঘর-দোর, মাটি-পাথর, গাছ-পালা কুকুর-বেড়াল তার "খেলু"দেরই সামিল। হয় অরি, নয় মিত্র। শিশুর "বোধোদয়" হয় নাই, বুনোর মাথার খুলি অপরিণত, তাই (অর্থাৎ, বিচার নাই বলিয়া) তারা এমন ভাবে, এমন করে। কিন্তু বেদের ঋষি, নয়ম-গাথার ঋষি ইত্যাদি ইত্যাদি বহু পুরাতন "যন্ত্র" মাটি, পাথর, জল, বাতাস,

আকাশ, বিদ্যুৎ এসব "দেব" "অসুর"রূপেই দেখিয়া গিয়াছেন যে! এখনও মহাত্মা, মহাপুরুষ যাঁদের আমরা বলি, তাঁরাও দেখি "খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" এসব "জড়" মানিতে নারাজ। সবই নারায়ণ— "নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভব্যম্"। এই সেদিনও পরমহংসদেব ঘর-দোর, কোশা-কুশী, ফুল-বেলপাত, নৈবেদ্য, গঙ্গাজল সবই চিন্ময় দেখিলেন! কি দিয়ে কেই বা কার পূজো করে? চিন্ময় মহাসাগরে নানান্ ঢেউ খেলে বেড়াচ্ছে। তার ভেতর কখনও মীনের মতন ডুব সাঁতার খেলে বেড়াচ্ছি; কখনও নুণের পুঁতুল যেমনধারা নুণের সাগরে গ'লে যায়, তেমনি ধারা বেমালুম গ'লে গিয়েছি! তল্লাস নেই, পাত্তা নেই! বৈষ্ণব বা আরও কেউ কেউ এই প্রাকৃত, "জড়ীয়" লোকটাকে তফাৎ করেন; কিন্তু কেন? অপ্রাকৃত, নিত্য, সত্য চিন্ময় ধামটিতে পৌছাইয়া দিবার জন্ম নয় কি? নৈলে - "সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ"। বিষ্ণু মানেই তাই। বিষ্ণু—বৈমুখ্য, ভেদ-দৃষ্টি, সংসারবুদ্ধি— এতে ক'রেই এই সাধারণ ব্যবহারের জগৎটাকে "প্রাকৃত", "নশ্বর", "জড়ীয়" ক'রেছে। সোজা, সিধে, সুমুখ, সরস হ'লে নিত্য, চিন্ময়, রসময়, লীলাময়, ব্রহ্ম বই আর কোথাও কিচ্ছু নেই। অর্থাৎ, তোমার বেয়াড়া যন্ত্রটি সোজা হ'লে। চিৎ, অচিৎ, ঈশ্বর—এসব তত্ত্বনির্দ্দেশও আচার্য্যদের এই কারবারি, চলতি, বেয়াড়া যন্ত্রটাকে শোধরাইয়া লইবার ফিকির। তুমি আমি কারবারে কতকগুলো বস্তুকে "জড়" বানাইয়াছি যে! শিবকে বাঁদর গড়িয়াছি! জড় হিসাবেই কারবার (সং সাজার, বাঁদর নাচের?) চলিতেছে যে! "কারবার বন্ধ কর" বলিলেই ত' বন্ধ করিতে পারি না! মুস্কিল! মায়াবাদী বেদান্তী অথবা শূন্যবাদী হয়ত' একদম বন্ধ করিতে বলেন। ততদূর না পারিলেও, কারবারের "ভোল" ফিরানও ত' সহজ নয়! তাই চিৎ, অচিৎ, ছোট, বড় ভেদটা নিয়েই সুরু কর। যন্ত্রটা আগে শোধ্রাও— পরে আপনিই বুঝ্বে—কে, কি, কেমন! এইটা হইল আচার্য্যদের পন্থা। যাক্—ফেরা যাক্- অনেক দূর "কোয়াসায়" এগিয়ে পড়া গেছে। হাঁ, আমাদের "বেয়াড়া" যন্ত্রে, কারবারি চশমায় ও সব কোয়াসা বই কি! "জ্যোতির্ম্মা গময়—"

কিন্তু যন্ত্রটা বেয়াড়া? আমাদের ফাঁদা এই কারবারের হিসাবে খাসা সু-আড়া। এইটেই সু-আড়া, সহ্সে আচ্ছা। যোগী ঋষি তাঁদের যন্ত্র নিয়ে এসে এ কারবারে "থৈ" পাইবেন না। বুনো ত' হারিয়া কোণঠেসা হইয়া রহিয়াছে। শিশুও চিরকাল শিশু থাকিলে তার সুবিধা নেই। "কাজের মানুষ" পাকা কারবারী প্রায় সকলকেই বনিতে হইতেছে। নহিলে উপায় নেই। অথচ, আসলে অনেকটাই ভূয়া কারবার এটা—ফলং—বধবন্ধনম্! ত্রিতাপ জ্বালা! পরিত্রাণ নেই। হয়—পারত'—কারবার একদম বন্ধ কর; নয়ত' একদম ভোল ফিরিয়ে দাও। শেষেরটাই সোজা, বহুৎ আচ্ছা। ভোগো যোগায়তে। প্রত্যেক রকম কারবারে তার নিজস্ব "হিসাব" (frame of reference) আছে। বাহালিটারও নিজস্ব একটা আছে। সেই মামুলিটার মোটামুটি নাম রাখিয়াছি—সভ্যভব্য জীবন-যাত্রা। ওপরকার, খোসার হিসাব এটা। তবু এই-ই সই। বুনোর জীবনযাত্রা, শিশুর জীবনযাত্রা, পাগলের জীবনযাত্রা, যোগীর জীবনযাত্রা (অর্থাৎ, abnormal ও subnormal দুই-ই)—এ সবের হিসাব, মূল frame of reference, আলাহিদা।

বৈজ্ঞানিকের "জগৎ" আর তার হিসাব, মান (ঐ frame of reference)ও আলাহিদা। আমাদের অ-দেখা সেখানে দেখা। আমাদের দেখা অনেক কিছু সেখানে বাতিল। শব্দের ঢেউ, আলোর ঢেউ—এসব আমাদের কারবারি জগতে নেই। কাজ চালানর জন্য দরকার নেই বলিয়াই নেই। বাতাসের ভেতর দানাগুলোর ছুটোছুটি, ধাক্কাধুক্কি; অণুর ভেতর, এটমের ভেতর, যূথ বাঁধিয়া অদ্ভুত কেরামতি নাচ;—এসব আমার কারবারি হিসাবের বাইরে। আকাশে জ্যোতিষ্কদের সঙ্গে আমার যতটুকু যেমন ধারা পরিচয়, বৈজ্ঞানিকের তেমন ধারা নয়। এই রকম অনেক ক্ষেত্রেই। আমার দেখা-শুনো ইত্যাদি কতকগুলি গণ্ডীর মধ্যে, সীমার ভেতরে। বিজ্ঞান সে গণ্ডী ভাঙ্গিয়া দেয়; সীমা এ-মুড়ো ও-মুড়ো দুমুড়ো ছাড়িয়ে যায়। আমার কারবারি জগতের তুলনায় বৈজ্ঞানিকের জগৎটা বেশী খাঁটি মনে করিতেছি। তবু সেটাও হয়ত' মায়াপুরী! বৈজ্ঞানিক খাঁটি বাস্তব লইয়া কারবার করেন না। অন্ততঃপক্ষে তাঁদের নিজেদেরও অনেকের সংশয়। তাঁর নিজস্ব কলে (থিওরি ও যন্ত্রপাতির) তিনিও দস্তুরমত ছাঁটাই বাছাই ঢালাই করেন। বুঝহ যে জান সন্ধান।

এই ত' ব্যাপার! নানান্ হিসাব, নানান্ মান (frame of reference) ; কাজেই, ঘাটে ঘাটে, ধাপে ধাপে, মোড়ে মোড়ে কারবারি জগৎ সব আলাহিদা। কোনটাই পুরা, "জলজীয়ন্ত", বাস্তবের "কাণ ঘেঁষিয়া" যায় না। এর ভেতর আমাদের মত সাধারণ জীবের জগৎ— যতই "কেজো" হোক্, যতই ভোটে ভারী—দমে ভারী হোক না কেন,—নিতান্তই সঙ্কীর্ণ ও বিকৃত জগৎ। আমরা মধু-কৈটভের এলাকায় বাস করি। জীব মাত্রই। একজন কৃপণ কিপ্‌টে টিপে টিপে টুকরো টুকরো করিয়াই দিতে জানে। আর একজন ঠকবাজ, সে টুকরোটুকুও ভেজাল বানিয়ে দেয়। ওপরে খাঁটির লেবেল! গোটার কারবার নেই, খাঁটিও চলে না। তাই বলিতেছিলাম—আমাদের "ছাঁচ"টা, যতই না "জীবনযাত্রার" পক্ষে কেজো হোক্, বেয়াড়া। তাকে বিশ্বাস নেই। শুধু তর্কের অপ্রতিষ্ঠাই নয়, চলতি বস্তুজ্ঞানেরও অপ্রতিষ্ঠা। অথচ এই বেয়াড়া বুদ্ধি নিয়েই বলি—মাটি পাথর এসব জড়, "ছোটলোক"! আসলে, মাটি পাথর - এসব যে চিন্ময়, চিদ্‌বিগ্রহ নয় তা কে বলিবে? কার তেমন বুকের পাটা? আমাদের কারবারি বেয়াড়া বুদ্ধির সে এক্তার নেই। তার জ্যাঠামিতে জটলাই বাড়ে। দর্শনের ভাষায় আমাদের সাধারণ ব্যবহারিক জগৎ আমাদের "অদৃষ্ট" ও কর্ম্ম দিয়ে গড়া। এ দুটোকে যদি বলি (ক, খ), তবে, সে জগৎ হইতেছে (ক, খ) এর ফাংশন্ (function)। যতক্ষণ (ক, খ) এভাবে আছে, ততক্ষণই জগৎটা এ-ভাবে আছে। অর্থাৎ, মাটি, পাথর এসব প্রাণহীন, চেতনাহীন জড় – এই কারবারি ভাবের মাল ততক্ষণ কাটিতেছে। ততক্ষণ তারা অচিৎ— তাদের ভেতর চিতের সাড়া নেই। সাড়া শোনবার দরকার নেই, শুনিতে প্রস্তুত নেই বলিয়াই নেই। জগৎটা (ক, খ)এর না হইয়া (গ, ঘ)এর function উৎপাদ্য (উৎপাদিত ফল) হইলে হয়ত' সাড়া পাইতাম। যাদের সেরূপ, তারা হয়ত' পায় ও। অন্য শ্রেণীর জীব (উচ্চাবচ) হয়ত' পাইতেছেন। বৈজ্ঞানিক এরির মধ্যে নতুন এক সাড়া পাইতেছেন। সাড়া = Response ; গাছ-পালা, ধাতু ইত্যাদির ভেতর বিষ ক্রিয়া, মাদক ক্রিয়ার খুব সূক্ষ্ম সাড়াও আচার্য্য জগদীশচন্দ্র আমাদের "শোনাইয়াছেন"। নানান্ ক্ষেত্রেই নূতন সাড়া পড়িয়াছে। যোগীদের ত কথাই নেই। যারা স্বাভাবিক অবস্থার (natural stateএর) খুব কাছাকাছি—যথা বর্ব্বর, শিশু—তারাও জড়ে "ভূতে" প্রাণের, চৈতন্যের সাড়া পায়। কবিরাও হয়ত' (যথা, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ) কেহ কেহ পান। কবির মিষ্টিসিজ্‌ম্, ঋষির ভিশন্—"সাক্ষাৎকার"—এ সবেরও অনুভূতি আলাহিদা। আমাদের "কেজো বৈঠকে" জগৎটা মরিয়া ভূত হইয়া গেছে। কেন না, ছুরি চালাইতে হইবে যে! এটা যে মগ! শুটকী মাছের হাট আমাদের ; তাজা, টাটকা গোটা বিকোয় না ; লোণা, বাসী, ভাগাই কাটিতেছে। অথচ, সোণার অনন্ত হাতে, নাকে ফাঁদি নথ, মেছুনী মাগীর দেমাক কত! দরে না বনিলে আঁশ জলের ছিটেও দেয়! মেছুনীটি আমাদের হেঁসেল ঘরেই বাসা নিয়াছে—নামটি তার "কেজো বুদ্ধি"— practical, commonsense। আসলে, তার অনেকটাই common nonsense। আমাদের চলতি "সভ্যতার" প্রতিষ্ঠা ইনি। স্বরূপে, স্বভাবে এ "সভ্যতা" অচল ; কৃত্রিমতায়, বিকারে সচল। এটা ঠিক "স্বাস্থ্য" নয়। কেউ কেউ "ব্যাধি"ই বলিয়াছেন ; তার নিদানও করিয়াছেন। ততদূর না হোক্—এর হিসাব, এর বিবৃতি সত্য বাস্তবপূর্ণ অনুভূতির পাকা খাতায় নির্ব্বিচারে উঠিবার যোগ্য নয়।

ঋষিরা বলেন—সবই খাঁটি খাঁটি ("খলু") ব্রহ্ম। নির্ব্বিশেষ, সবিশেষ ব্যাখ্যার গোল বাধাইও না। আসল মানে—সবই—এমন কি, একটা ধূলোও—সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ—পূর্ণ বিগ্রহ! "পূর্ণ মদঃ—" পূর্ণ ছাড়া কিছু নেই। তোমার শুটকী ভাগার কারবার, তাই ধূলোকে ছোটলোক দেখ ; ভাবো—"ও ত' ধূলো মাটি!" আসলে ব্রহ্মই। হালের এটম্‌ও দেখ্‌ছি একটা ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্ম নিখিল "সৃষ্টি" করিয়া তাতে "অনুপ্রবেশ" করিয়াছেন— এর মানেও তাই! ব্রহ্ম বা পুরুষ তাই "গুহাহিত" ; তাঁর শ্রীমন্দির তাই স্বল্প "দহর"। ব্যবহারে—তোমার আমার "কেজো হিসেবী চশমা"র চোখেই তাই। নৈলে, শুধু সর্ব্বত্র ভগবান এমন নয়, সবই ভগবান্। ভক্ত তুমি, রসিক সুজনের মতন দেখিয়া হাঁসিও ; ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিও না। কুতো ভয়, ভয় কিসের? মরা মোটেই নেই, সব রাম। ভূত নেই, সব শিব। ধারা সত্যি সত্যি নেই, রাধা আছেন। যাক্, ও-সব হেঁয়ালি গুহ্য কথা। ঈশ্বর

সব "সৃষ্টি" করিয়াছেন—মাটি, পাথর, জল, বাতাস, আকাশ—এসব তবে "সৃষ্ট" পদার্থ, "ভূত"! ও গো তাই নাকি? শুধু "সৃষ্টি" করেন নি, সব হইয়াছেন! সৃষ্টি মানেই তাই। থিজ্‌ম, প্যান্‌থিজ্‌মের ঝগড়া তুলো না। ফ্যায়দা নেই। শ্রুতি বলেন—"পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত প্রজাঃ সৃজেয়েতি। নারায়ণাৎ প্রাণো জায়তে মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ। খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী···"। বেশ, তার পর? "অথ নিত্যো নারায়ণঃ। ব্রহ্মা নারায়ণঃ। শিবশ্চ নারায়ণঃ। শক্রশ্চ নারায়ণঃ। কালশ্চ নারায়ণঃ। দিশশ্চ বিদিশশ্চ নারায়ণঃ। উর্দ্ধঞ্চ নারায়ণঃ। অধশ্চ নারায়ণঃ। অন্তর্বহিশ্চ নারায়ণঃ। নারায়ণ এবেদং সর্ব্বং যদ্‌ভূতং যচ্চ ভব্যম্‌। নিষ্কলঙ্কো নিরঞ্জনো নির্ব্বিকল্পো নিরাখ্যাতঃ শুদ্ধো দেব একো নারায়ণো ন দ্বিতীয়োঽস্তি কশ্চিৎ।" কেমন? বিশ্বরূপ, আবার বিশ্বাতিগরূপ, "অত্যতিষ্ঠদ্‌ দশাঙ্গুলম্‌", দুই-ই মিলিল ত'? ভগবান্‌ আমাদের দশচক্রে ভূত হইয়াছেন যে! জড় যে ঘোর সমাধিমগ্ন জড়ভরত! তার ঘাড়ে পাল্কি বয়াবে, বয়াও। কিন্তু হুঁসিয়ার! সে লাফিয়ে লাফিয়ে পা ফেলে। সত্যি। ইলেক্‌ট্রণের নাচের কথা মনে আছে ত?

মাটি, পাথর, এমন কি, একটা ধুলোর উপাসনা জড়ের উপাসনা নয়। জড়ই নেই, ছোটই আদপে নেই—তার আবার উপাসনা! মাথা নেই তার মাথা ব্যথা! তবে, হ্যাঁ, আমাদের কারবারি জড়ের বাতিক, ভূতের বাতিক, ছোটর বাতিক কাটিয়ে, কাটানর বন্দোবস্ত ক'রে, তবে উপাসনায় বস্‌তে হবে। সেই জন্যই নানান্‌ থানা তোড়-জোড়! ভূতশুদ্ধি, প্রাণপ্রতিষ্ঠা আরও কত কি। তাই না সম্প্রতি এক লেখায় বলিছি—মায়ের পানে পেছন ফিরে ভারি খেলায় মেতেছে। একটিবার খেলা ফেলে মায়ের পানে ফের দিকিন—সত্যি সত্যি মায়ের সাম্‌না-সাম্‌নি হ'লে দেখ্‌বে—মাটির মা আমার "মাটির" তনয়া—ও মাটি—মা-টি! তখন নতুন খেলা খেল, খুসি হয়ত'। নয়ত' মায়ের কোলে উঠে "ঠাণ্ডা" হও।

ধরার দান

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চাইনে আমি স্বর্গ ভগবান
যেথায় শুধু দেবতা করে বাস,
আলোর মাঝে চাইনে আমি স্থান,
আঁধার মাঝেই রইব বারমাস।
দেবতা থাকুন দেবত্ব তাঁর লয়ে
আমার বোঝা বেড়াই আমি বয়ে
মাটির ধরা আঁকড়ে আমায় ধরে
ওরই বুকে থাকতে আমি চাই,
ধরার প্রেমে বুকটা থাকুক ভরে,
ধরার মত কারেও দেখি নাই।

স্বর্গ থাকুক অনেক দূরে মম
জানি সেথায় আমার কেহ নাই,
ধরায় আছে আমার প্রিয়তম—
যাদের আমি বুকের মাঝে পাই।
কাঁদলে আমি ওরাই ছুটে আসে,
হাসলে আমি ওরাই সাথে হাসে,
আমার ব্যথা মুছিয়ে ওরাই দেয়
ওদের হাতে—আমায় বুকে টেনে,
আমায় ওরা ওদের করেই নেয়,
আমায় ওরা নিজের বলেই চেনে।

বদ্ধ কারাগার এ হউক—তবু,
থাকতে হে চাই এরই বুকের মাঝে,
আমায় হেথায় থাকতে দিয়ো প্রভু
জড়িয়ে থাকি এখানকারই কাজে।
আলো আমি চাইনে মালিক পেতে,
থাকব জেগে নিকষ আঁধার রেতে,
নরকই হোক—তাও এ আমার জানি
বন্ধু আমার হোক না সে সয়তান,
স্বর্গে পূজা পৌঁছাবে না মানি
বলব তবু শ্রেষ্ঠ ধরার দান।

অভিজ্ঞতার মূল্য

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বি-এল

উনিশ

মৌজা রহুয়া ও রোসনার মধ্য দিয়া নদীটি পশ্চিমদিক হইতে সোজা টানা পথ ধরিয়া আসিতে সেইখানে সহসা বাঁক লইয়া একেবারে দক্ষিণ দিকে ফিরিয়া গিয়াছে।

চৈত্রের শেষে ক্ষীণতোয়া এই স্বচ্ছ-সলিলার বাঁকের ধারে সন্ধ্যামুখে বেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল। এখান হইতে প্রায় এক রশি দূরে তাহাদের বাড়ী এবং এই সমস্ত চরটা তাহার পিতার জমিদারীভুক্ত! কিছুদিন হইতে প্রত্যহ এই সময় নিরালায় এইখানে ঘুরিয়া বেড়ান তাহার অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

একটা বড় পাথরের উপর বসিয়া পড়িয়া, বেলা নদীর দিকে চাহিয়া বায়ুভরে ছোটখাট তরঙ্গগুলির খেলা দেখিতে দেখিতে অতীত স্মৃতির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। পর্দ্দা আন্দোলনের কার্য্যে ব্রতী হইয়া যে দিন সে পিতার নিকট হইতে অতিকষ্টে অনুমতি পাইয়া উৎফুল্লচিত্তে যাত্রা করিয়াছিল সে দিন সে একবারও মনে করিতে পারে নাই যে এত সত্বর তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে এবং দারুণ গ্লানি ও মর্ম্মদাহ বহন করিয়া! মিসেস্ লালের সেই অহেতুক মন্তব্য ও তাহার চেয়েও কঠিন বাক্য আজও তাহার কানের মধ্যে যেন ধ্বনিত হইয়া তাহাকে উত্তেজিত করিয়া ফেলে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও তৃপ্তির সহিত অনুভূত হয় যে,সে দিনের সেই সংঘর্ষের আলোই চোখ ফুটাইয়া তাহার জীবনের গতিকে নিমেষে ভুল পথ হইতে এই নদীর বাঁকের মতই যেন ফিরাইয়া দিয়াছে!

একটা কোনও অবলম্বন চাই, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ নিরবচ্ছিন্ন নির্ভরতার সহিত জীবনতরী বাহিয়া যাইতে পারে। আশ্রম তাহাকে প্রথম হইতেই আনন্দ দিত সন্দেহ নাই এবং বাহিরের লোকের সংস্পর্শ ক্রমেই অকারণ লজ্জার জড়তা অপসারিত করিয়া অবাধ লঘু স্বচ্ছন্দতার আস্বাদ দান করিতেছিল। কিন্তু তখনও সে জানিতে পারে নাই, ইহার চেয়ে কত গভীর উপভোগ্য আনন্দ নারী-জীবনে প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে। সেই আনন্দের অনুভূতি সঞ্চারিত করিয়াছে তাহার বিকচোন্মুখ নারীহৃদয়ের শিরা উপশিরায় …কে ?…কাহার অস্ফুট আহ্বানের অব্যক্ত আকর্ষণী শক্তি লীলাবতীর অন্যায় রোষকে হেলায় দলিত করিয়া তাহাকে অবলীলাক্রমে ঈপ্সিতের সহিত মিলিনের পথে অগ্রসর করিয়া দিয়াছে ?

তাই বুঝি এতদিনে তাহার সন্ধানের আভাষ মিলিয়াছে, নারীর শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য, পরম সার্থকতা, নিহিত আছে— কোথায়!

নৌকার দাঁড়টা সন্তর্পণে এক পাশে তুলিয়া রাখিয়া জয়করণ নিঃশব্দে তীরে লাফাইয়া পড়িল। তাহার পর মৃদু পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া কিছুদূর আসিতেই বেলার সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইয়া গেল। দিগন্তে অস্তিম সূর্য্যের রক্তাভার মতই নিমেষে বেলার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

দুই হাতে তাহার লজ্জানত মুখটি তুলিয়া ধরিয়া জয়করণ বলিল—এখানে ব'সে কি ভাবছ বেলা ?

বেলা কিছুই বলিল না। বলিবার চেষ্টাও তাহার দেখা গেল না। তেমনি ভাবেই মাথা নামাইয়া মাটির দিকে তাকাইয়া যেন কিসের আবেগ দমন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহা লক্ষ্য করিয়া জয়করণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া এক হাত তাহার কাঁধের উপর রাখিয়া বলিল—আমার ওপর রাগ হয়েছে নাকি ?

এইবার বেলা সোজা হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া

বলিল—হাঁ রাগ ত করেছিই—কারণ থাকলেই রাগ হয়! তাড়াতাড়ি পাশেই বসিয়া পড়িয়া জয়করণ বলিতে লাগিল—এতদিন কেন যে আসতে পারিনি, কত কষ্টে—কি করে যে আজ পালিয়ে এসেছি তা যদি তুমি শুন্‌তে—

বেলা একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি শুনতে কিছুই চাই না। অন্ধকার হয়ে আসছে, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এবার আমি বাড়ী যাব।

জয়করণ তাহার দুটি হাত ধরিয়া ফেলিয়া মিনতির স্বরে বলিল—আর একটু ব'স বেলা, অনেক কথা আছে। আমার নৌকায় বাতি আছে, আমি তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসব।

সজোরে মাথা নাড়িয়া বেলা বলিয়া উঠিল—না, না, আর আমি এখানে থাক্‌তে পারবো না। আর কেনই বা থাক্‌বো? বেলাকে এক রকম জোর করিয়া বসাইয়া জয়করণ কাতর কণ্ঠে বলিল—আর দশটি দিন মাত্র সবুর ক'রো বেলা। তারপর আর আমাদের মধ্যে কোন ব্যবধান থাক্‌বে না, কোন সঙ্কোচের গ্লানি আমাদের অন্তরায় হতে পারবে না—এক সঙ্গে দেখলে কেউ কিছু বলতে সুযোগ পাবে না। তখন আমরা দুজনে মিলে, মনের আনন্দে প্রাণভরে—

বেলা বলিয়া উঠিল—তোমার বাবা রাজি হলে ত!

জয়করণ তখন বেলার আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া নিম্নস্বরে বলিতে লাগিল—রাজি তাঁকে হতেই হবে! না হয়ে আর অন্য উপায় নেই, এমন মজার চাল চেলেছি এক!

উৎসুককণ্ঠে বেলা বলিল—কি বল ত?

অশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে নিজের কাহিনীকে অলঙ্কার-ভূষিত করিয়া জয়করণ যতই বিবৃত করিতে লাগিল, প্রশংসার দীপ্তিতে বেলার চক্ষু ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। সুতরাং চতুর্দ্দিকে অন্ধকার যে ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিতেছিল বেলার আর সেদিকে খেয়ালই ছিল না। অজানিত পুলকে বিভোর হইয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন এক অপরূপ উন্মাদনায় কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপে কতক্ষণ যে কি ভাবে কাটিয়াছিল বেলা তাহা জানিতে পারে নাই। এমন সময় অদূরে পরিচিত কণ্ঠস্বরের আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিল—বেলা!

অপ্রতিভ হইয়া বেলা শিলাখণ্ডের উপর হইতে নামিয়া পড়িল—এ যে ললিতা! কখন এল?

জয়করণ ক্ষিপ্র হস্তে তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—চল আমরা নৌকায় পালিয়ে যাই, তাহলে আর—

তীব্র টর্চ্চের আলো তাহাদের উপর পড়িতেই জয়করণ বসিয়া পড়িয়া চকিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ক্ষণ পরেই ললিতা কাছে আসিয়া বলিল—এখানে, একলা, এই আঁধারে, কি কচ্ছিস ভাই?

তাহার মুখে বিদ্রূপের হাসি, চোখে কৌতুকের দৃষ্টি!

নদীর দিক হইতে ঝপাঝপ্ শব্দ আসিতে লাগিল।

ললিতা বিস্মিতভাবে বলিল—নৌকা নাকি ভাই?

বেলা এতক্ষণ নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া ছিল। এইবার সহসা ফিরিয়া স্বচ্ছন্দেই বলিল—হাঁ, তা আর বুঝতে পার্‌লি না? জয়করণ বাবু! তোকে দেখেই পালিয়ে গেলেন।

ললিতা তখন গলা ছাড়িয়া খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল—ডাক্‌ব নাকি? তাহার পিঠে গুম্ গুম্ করিয়া গোটা কতক কিল বসাইয়া দিয়া বেলা বলিল—তুই এলি কখন পোড়ারমুখী!

কুড়ি

ললিতার শ্বশুরালয় রহুয়ায় ও জয়করণের টোলাতেই। প্রায় এক বছর পরে আজ সে বাপের বাড়ী আসিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রিয় সখী বেলার সহিত দেখা করিতে আসিয়া শুনিল, সে নদীর ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, এখনও ফিরে নাই। সে আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিল।

দীর্ঘকালের পর দুই বন্ধুতে সাক্ষাতের ফলে কিল খাইয়া তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়া ললিতা বলিল—তোর কি পরিবর্ত্তনই না হয়েছে ভাই, এই অল্প সময়ের মধ্যে!

বেলা তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া আদর করিয়া বলিল—কিসে?

সেই শিলার উপর বসিয়া পড়িয়া ললিতা বলিতে লাগিল—এই নির্জ্জন অন্ধকারে, নদীর ধারে, তুই কখনও এ সময় একলা থাক্‌তে পারতিস্?

ললিতার গালে একটি মৃদু চাপড় দিয়া বেলা বলিল—এখনও একলা নই, এর আগেও ছিলাম না।

তবুও তোর খুব সাহস বেড়েছে—বলিয়া তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া ললিতা চাপাস্বরে কহিল—

জয়করণবাবুর সঙ্গে এত ভাব তোর কি রকম করে হোল রে?

পূর্ব্বাকাশে তখন কৃষ্ণ তৃতীয়ার চাঁদ হাসিয়া উঁকি মারিতেছেন দেখিয়া অন্ধকার গোপনে অন্তর্হিত হইতেছে। কখনও সেই নির্ম্মল উজ্জ্বল শশীর পানে চাহিয়া, কখনও উচ্ছ্বল খরস্রোতা নদীর দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, বেলা সেই শিলাখণ্ডের উপর ললিতার দেহে ভর দিয়া অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাহার প্রেমের অরুণ উন্মেষ ও অভিনব বিকাশের কাহিনী আবেগ-ভরা স্বরে একে একে সমস্তই কহিতে লাগিল। প্রিয়তমা সখীর নিকট এতদিনে মনের গোপন কথাগুলি নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া অব্যক্ত পরম তৃপ্তিতে অবশেষে বেলা তাহার দেহ এলাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে চোখ বুঝিল।

ললিতা নিবিষ্টচিত্তে প্রতি কথা প্রতি ভাব লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—ঈস্। তুই যে একেবারে ভাবের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিস দেখছি। এরই মধ্যে এত শিখ্‌লি কোথা থেকে?

বেলা রাগ করিল না। তাহার আয়ত চক্ষু ঈষৎ চাহিল, ঠোঁটের কোনে মিষ্ট হাসির একটি রেখা ফুটিল। তারপর ধীর স্বরে বলিল—সত্য ভাই, আমিই বলতে পারি নে, কেমন ভাবে কি করে আমি এত ভালবাস্‌তে জানলাম; কি মনে হয় জানিস? আমার মত প্রেমের এত গভীরতা বোধ হয় কেউ কখনও অনুভব করে নি।

বেলার দুই গণ্ডে অঙ্গুলীর মৃদু চাপ দিয়া ললিতা বলিয়া উঠিল—তুই চুপ কর তো! তোর বাড়াবাড়ি দেখে আর বাঁচি নে। আমরা যেন আর প্রেমের স্বাদ পাই নি! আসল ভালবাসা পাওয়া যে কি, তার সন্ধান পাওয়াও যে কত দুর্লভ, সে যে পেয়েছে সেই কেবল জানে।

ললিতার মুখ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বেলা সন্দিগ্ধ হইয়া কহিল—তোর এমন কথা বল্‌বার মানে?

ললিতা একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—মানে মতলব আর কি—জান্‌তে পারবি দিন কতক পরেই।

একটা সন্দেহের ছায়া যেন ঘনাইয়া আসিতেছিল, তাহাকে এক মুহূর্ত্তও সহ্য করা বেলার পক্ষে যে কি কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছে, তাহার কথাতেই তাহা প্রকাশ পাইল।

তোর পায়ে পড়ি ভাই, বলনা শীগ্‌গির কি হয়েছে?

ললিতা একবার দ্বিধা করিয়াই বলিয়া ফেলিল—তোর কি মনে হয় জয়করণ বাবু সত্যই তোকে খুব ভালবাসেন?

বেলা উঠিয়া বসিতেই এক ঝলক জোছনা তাহার দীপ্ত মুখের উপর পড়িয়া তমসামুক্ত অনাবিল প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া দিল।

নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দ স্বরে সে বলিল—এই-ই? আমার কি ভয়ই না হয়েছিল! তা ভাই তুই নিজের চোখে না দেখলে ত বুঝতে পারবি নে। তুই যদি চুপি চুপি আস্‌তিস্—আলো না ফেলে, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সবই শুনতে পারতিস—

ললিতা কিন্তু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল—না শুনেছি, সে জন্য দুঃখ নেই। তোমায় কিন্তু ভাই একটু সাবধান না করে থাক্‌তে পারছি না, কিছু মনে কোরো না। পুরুষ মানুষদের কথায় অত সহজে বিশ্বাস করতে নেই, তাতে হয়ত বিপদে পড়তে হয়।

বেলা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—উনি সে প্রকৃতির মানুষ নন্। তুই যদি একটিবার দেখ্‌তিস ওঁর সরলতা—আন্তরিকতা, তা হলে ওসব কথা তোর মনেই আস্‌তো না।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—পুরুষদের আকৃতি বা প্রকৃতির কথা কিছু না বলাই দুর্ব্বলা আমাদের পক্ষে হয় ত ভাল, হয় ত অনধিকার চর্চ্চা। আমাদের একবার বাইরে বেরোলেই দোষ, দুটো দূর আত্মীয় পুরুষের সঙ্গে হেসে কথা কইলেই অপরাধ। অথচ ওঁরা যদি—থাক্ সে সব কথা। কেন না ওঁদের বেলায় লীলা খেলা, আর পাপ লিখেছেন মোদের বেলা। কিছু দেখলেও প্রাণের ভয়ে চোখ বুজে থাক্‌তে হয়। কৌতূহলী হইয়া বেলা বলিল—কেন, কিছু দেখেছিস্ নাকি?

ললিতা সে কথার উত্তর না দিয়া বেলার চিবুক স্পর্শ করিয়া একটু নাড়া দিয়া বলিল—কিন্তু তুই ভাই সত্যই ভালবেসেছিস, গুণ আছে তোর প্রেমের—কি সুন্দর রূপ হয়েছে তোর এই কয় মাসে!

ললিতার হাত ধরিয়া বেলা বলিল—যাঃ বাজে কথা। তুই বুঝি কথা এড়িয়ে যাবি? এখন, কি দেখেছিস—বল্।

ললিতা একটু ভাবিয়া বলিল—দেখি নি ত কিছুই।

বেলা তাহাকে একটা ধাক্কা দিয়া বলিল—তবে রে মিথ্যেবাদী!

ললিতা বলিয়া ফেলিল—না দেখলেও—কানে কিছু কিছু কথা আসে বটে।

তবে বল্‌, কি শুনেছিস্‌।

ললিতা বলিতে লাগিল—জয়করণবাবু তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছে যে সব কথা বলেন, ইনিও তাঁদের কাছে সব শুনতে পান কিনা, তাই অনেক কথাই আমার শোনা হয়ে যায়। কেমন করে তোমাদের কত ভাব হোল, তারপর ছল করে লীলাবতীর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে আগে থাক্‌তে সব ব্যবস্থা করে, নিশাপ রাতের ট্রেনে কি ভাবে তোমায় নিয়ে এসেছিলেন—নিজের কামরাতে সযত্নে তোমার বিছানা করে দিয়েছিলেন—আর কেউ না কি ছিল না—আরও কত কি!

উত্তরোত্তর লজ্জিত হইয়া বেলা বলিল—ঐ ত ওঁর দোষ। এত সরল আর খোলা প্রাণ, কোনও কথা চাপতে বা লুকোতে জানেন না। অথচ এত ভালমানুষ যে, সে সব কথা বলে ফেলার পরিণাম কি হবে, তাও চিন্তা করে দেখেন না।

ললিতা আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল—কিন্তু পুরুষের অত অপরিণামদর্শী হওয়া যে আমাদের পক্ষে অনর্থের সূত্রপাত করে, সেটাও দয়া করে একবার ভেবে দেখা উচিত।

বেলা প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—এতে আর কি এমন অনর্থ হতে পারে ভাই?

এবার কতকটা বিদ্রূপের স্বরে ললিতা বলিল—না, এমন আর কি বল। তবে কাল আমি এতদূর পর্য্যন্ত শুনে এসেছি যে এমন অবস্থা তোমার নাকি হয়ে দাঁড়িয়েছে যে তোমার বাবাকে এখন বাধ্য হয়ে বিয়ে দিয়ে ফেলতে হবে—এবং সেই চার হাজার তিল্‌ক দিয়ে।

বেলা দৃপ্তস্বরে উত্তর করিল—হতেই পারে না—মিছে কথা। এই খানিক আগে আমায় বলে গেলেন যে এমন চাল এক চেলেছেন যে তাঁর বাবাকে রাজি হতেই হবে—বিয়ে দিতে, টাকা যা হয় দিলেই হবে।

আজ সকালের কি খবর জান? যা শুনে, কেবল তোমাকে বলবার জন্যই আজ আমি এখানে ছুটে এসেছি—বলিয়া ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইল। পরক্ষণেই আবার বলিল—না, এখানে সে কথা বলব না। আগে বাড়ী চল।

বেলাও উঠিয়া পড়িয়া ললিতার হাত চাপিয়া ধরিল—না, না, তোকে এখনই বল্‌তে হবে—মেরি কসম্‌।

ললিতা তখন কহিল—তবে আমায় বল্‌তেই হল, যেন দুঃখ পাস্‌নে ভাই। ধামনের জমিদার বাবু তেজনারায়ণ তেওয়ারীর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে জয়করণ বাবুর সম্বন্ধর কথাবার্ত্তা কিছুদিন ধরে চল্‌ছে। তিলক দেবেন নগদ পাঁচ হাজার, তাছাড়া বরাভরণ ইত্যাদিতে সবশুদ্ধ নাকি আরও চার পাঁচ হাজার খরচ কর্ব্বেন। তাঁরা আজ সকালে রহুয়ায় এসে পাকা কথা কয়ে সগুণ দিয়ে গেছেন। তখন জয়করণ বাবু সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই সংবাদ পেয়েই—ওকি তুই অমন হয়ে পড়লি কেন?

নিমেষের মধ্যে বেলার মুখ ছাইএর মত পাংশুবর্ণ হইয়া গেল এবং মুষ্টিবদ্ধ হাতে সে ধীরে ধীরে শিলার উপর বসিয়া ক্রমে শুইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বেলার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইয়া ললিতা বলিল—এই জন্যই ত এতক্ষণ বল্‌তে চাই নি। চোখ চাও বহিন্‌।

অনেক ডাকাডাকির পর বেলা চক্ষু চাহিল বটে, কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল যেন কোথাও আলোর চিহ্নমাত্র নাই। জলে স্থলে জমাট গাঢ় অন্ধকার ভরিয়া গিয়াছে।

একুশ

প্রায় একমাস পরে একদিন সকালে ডাক্তার লাহিড়ীর বাসায় গিয়া রামজনম ও মুরলীমনোহর ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বসিতে বলিয়া ভৃত্য জানাইল যে ডাক্তারসাহেব কলে বাহির হইয়াছেন, ফিরিতে বোধ হয় বিলম্ব নাই।

মুরলী বলিল—তখনই বলেছিলাম এখন দেখা পাওয়া যাবে না। পরে আসা যাবে, এখন চলুন—ভাল করে মুসাবিদা করে ফেলা যাক্‌।

রামজনম চিন্তিতভাবে বলিলেন—তা'র আগে এটাও দেখা দরকার যে—

—কি দেখবেন মোক্তার সাহেব? এই যে মনোহরও আছেন।—বলিয়া ডাক্তার প্রবেশ করিলেন।

মুরলী আরম্ভ করিল—আপনার সঙ্গে—

ডাক্তার কহিলেন—বসুন, বসুন—বড় বিমর্ষ দেখ্‌ছি যে মোক্তার সাহেব।

মুরলী বলিতে লাগিল - তাই ত পরামর্শের জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমার প্রথম প্রশ্ন হবে, কিশোরীলালকে আপনি শেষ কবে দেখ্‌তে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, শারীরিক বা স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য তাকে আপনি কোথাও বায়ু পরিবর্ত্তনে যাবার উপদেশ দিয়েছেন কি না এবং যদি দিয়ে থাকেন ত সে কোথায় ?

তাহার চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ডাক্তার উত্তর দিলেন—তার আগে আমার এই প্রশ্ন হচ্ছে যে, পুলিশের সি আই ডিতে তুমি নাম দিয়েছ কিনা এবং তাহা যদি হয়—ত সে কোন তারিখে।

রামজনম বলিয়া উঠিলেন—আমার বিপদের কথা বোধ হয় আপনার মালুম নেই ? চিড়িয়া উড়েছে !

ডাক্তার চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—না, কোন্ চিড়িয়া ভাই, ময়না—না তোতা ?

মুরলী বলিতে লাগিল—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ক্যাম্প রয়েছে আজ পাঁচদিন, চাম্‌পায়। মোক্তার সাহেব ও আমি সেখানে একটা কেসে ছিলাম চারদিন। আজ ভোরের ট্রেণে ফিরে এসে দেখা গেল মিসেস্ লাল অদৃশ্য হয়েছেন ! অনুসন্ধানে জানা গেল তিনি কিশোরীর সঙ্গে কার্সিয়ং গেছেন ! এই রকম একটা ঘটনার আশঙ্কা আমাদের অনেক দিন থেকেই ছিল। স্বামীর বিনানুমতিতে একজন পরপুরুষের সঙ্গে—যা'র সহিত পূর্ব্বঘনিষ্ঠতার অনেক প্রমাণ আছে—গোপনে পলায়ন—এ এক রকম অসহ্য !

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন—তাই ত ! বিশেষতঃ পুরুষ যখন স্বাস্থ্যলাভ করতে চলেছেন। এখন মোক্তার সাহেব কি করতে চান ?

রামজনম বলিলেন—দেওয়ানী করে কে একবছর বসে থাক্‌বে। আমি আজই ফৌজদারী করে এর একটা হেস্তনেস্ত করতে চাই। ওয়ারেণ্ট বার করা আমার পক্ষে কিছুই শক্ত নয়।

ডাক্তার বলিলেন—সেই সঙ্গে ষ্ট্রেচারের ব্যবস্থাও করবেন। তা আমাকে কি সাক্ষী মানতে চান না কি ?

মুরলী বলিয়া উঠিল—অন্ততঃ এখন জানতে চাই যে আপনার পরামর্শেই কিশোরী কার্সিয়ং গিয়েছে কি না।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—আর যদি মিসেস্ লালের পরামর্শেই গিয়ে থাকে ?

মুরলী বলিল—তা আমাদের কেস্ হবে না। বুঝতে পার্চ্ছেন না, বিবাহিতা স্ত্রী—abduction—আইন মানিয়ে ত চলতে হবে ! কিশোরীই যে মিসেস লালকে অনেক দিন থেকে প্রলোভন দেখিয়ে, শেষে ভুলিয়ে নিয়ে গেছেন—

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন—কি উদ্দেশ্যে ?

মুরলী বলিল—সে সব আমরা ঠিক করে নেব। কিশোরীর বর্ত্তমান শারীরিক অবস্থা কেমন এবং আপনি তাকে কার্সিয়ংএ বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিয়েছেন কিনা—উপস্থিত এই দুটি কথা জানা আমাদের দরকার।

ডাক্তার বলিলেন—প্রথমে আমার জানা দরকার যে লীলা যদি কিশোরীর সঙ্গে কার্সিয়ং গিয়ে থাকেন, তাতে মোক্তার সাহেবের ভয় পাবার কি আছে ?

মুরলী বলিল—ভয়ের কারণ নেই ? কি যে বলেন !

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—আমার মনে হয়, ভয়ের ভিত্তি ওঁর নিজেরই দুর্ব্বলতায়—হতে পারে স্নায়বিক। কারণ, সাহেবের ক্যাম্পে বড় মকর্দ্দমায় হয়ত কয়দিন অত্যধিক পরিশ্রম হয়ে থাকতে পারে, তা না হলে এ রকম ঘটনাকে বিপদের মধ্যে গণ্যই করা যেতে পারে না।...কি বলেন মোক্তার সাহেব ? মনে পড়ে সেই দিনের কথা, যে দিন কিশোরী ও আপনার সঙ্গে এই পর্দ্দা নিয়ে আমার প্রথম আলোচনা হয়েছিল ?

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মোক্তার বলিলেন—মনে পড়ে বই কি। এ রকম বিপদে পড়তে হবে তখন কি জানতাম ! আর প্রকৃতপক্ষে আমি কোনও কালে পর্দ্দার বিরুদ্ধে যেতে চাই নি—

ডাক্তার বলিলেন—কারণ মনের সে প্রসার গতি এখনও আপনার হয় নি।

রামজনম বলিয়া ফেলিলেন—নাই হোক। কিন্তু লীলাকে শাস্তি দেওয়া একবার দরকার হয়েছে। আপনার কাছে সে জন্য আমি করজোড়ে সাহায্য প্রার্থনা কচ্ছি।

ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করিয়া বলিলেন—আমিও করজোড়ে আপনাকে অনুনয় করছি, এ বিষয়ে সাহায্য করতে আমায় অনুরোধ কর্ব্বেন না।

মুরলী জিজ্ঞাসা করিল—কেন ?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিলেন—তোমরা ছেলেছোকরা মানুষ, এসব কথা ঠিক বুঝতে পারবে না।

তারপর রামজনমের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—শুনছেন মোক্তার সাহেব। লীলার সঙ্গে যদিও কয়েক বিষয়ে আমার মতের মিল না থাক্‌তে পারে, কিন্তু লীলার মত গুণবতী মেয়ে আমি কমই দেখেছি—বোধ হয় ঠিক অমনটি আর দেখি নি! কিছুদিন সংস্পর্শে এসে বুঝতে পেরেছি যে তার সহৃদয়তা, আন্তরিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার তুলনা পাওয়া শক্ত। আপনি যে তার উদারতাকে এখনও সন্দেহ করেন এতে আমি কেবল আশ্চর্য্য নয়, মর্ম্মাহত হয়েছি। তার কার্য্যে বা চরিত্রে সন্দিহান হওয়া আমি পাপ মনে করি। সুতরাং মাপ কর্ব্বেন, তাকে অপমান কর্ব্বার কোন চক্রান্তে আমার কাছে লেশমাত্র সাহায্য পাবেন না।

মুরলী উঠিয়া দাঁড়াইল—তা হলে চলুন। রামজনম ইতস্ততঃ করিতেছেন, দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন—একটি কথা জান্‌তে পারি কি? লীলাকে কি আপনি ত্যাগ কর্ব্বেন?

রামজনম বিস্মিত হইলেন—তার কি মানে আছে!

ডাক্তার কহিলেন—মানে আছে বই কি। এই সব মামলা হাঙ্গামার পর, আমার মনে হয়, লীলার মত আত্মসম্মানী মেয়ে—তার পিতার অবস্থাও মন্দ নয়—হয় ত আর আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইবে না।

মুরলী কিছু বলিতে উদ্যত হইলে ডাক্তার সঙ্কেতে তাহাকে নিবারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—এইটেই হচ্ছে কিছু করতে যাওয়ার আগে—আপনার প্রধান বিবেচনার বিষয়। ভেবে দেখবেন মোক্তার সাহেব—মকর্দ্দমার ফলাফলের উপর এটা মোটেই নির্ভর কর্‌ছে না। একবার যদি প্রকাশ্য আদালতে এই সব কথা বার করেন, তারপর হয়ত অভিমানিনী লীলাকে ফিরে পাওয়া আপনার অসম্ভব হবে। আর আপনার কেসের কি গতি হবে তাও অনুমান করা শক্ত নয়। পর্দ্দার বিরুদ্ধাচারী আপনি ও আপনার স্ত্রী এবং কিশোরীলালও,—তার বহুল প্রমাণ আছে। সেই সূত্রে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা হতে দেবার সহায়তা আপনি যথেষ্ট করেছেন। সুতরাং রুগ্ন দুর্ব্বল কিশোরীকে দোষী প্রমাণ করা আপনার পক্ষে কতদূর সম্ভব, আইনজ্ঞ আপনারা বিচার করে দেখবেন। আমার বিবেচনায় লীলাকে অযথা সাজা দিতে গিয়ে, তার দশগুণ শাস্তি আপনি নিজেই পাবেন।

মুরলী বলিল—অনেক দেরী হয়ে গেল—আমার অন্য কায আছে—এখন উঠুন।

রামজনম অব্যবস্থিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় ফাগুনি ছুটিয়া আসিয়া হাঁফাইয়া বলিল—মাইজি আ গেয়ে, আপকো বোলাতে হেঁ।

ডাক্তার আনন্দে প্রায় লাফাইয়া উঠিলেন—কেস্ আপনাদের ফেঁসে গেল না কি? যারে ফাগুনি, আমার গাড়ী নিয়ে জলদি তাঁকে এখানে নিয়ে আয়। না, না, দাঁড়া, আমি নিজেই গিয়ে দিদিকে আন্‌ছি।…চলুন না মোক্তার সাহেব, বাড়ীতে যেতেই হবে—আমার গাড়ীতেই চলুন—বিলম্বেন অলম্।

তারপর মুরলীর হাত ধরিয়া ডাক্তার বলিলেন—তুমিও এস, কিন্তু খুব সাবধান—এ সব কথা যেন ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না পায়।

গাড়ীতে উঠিবার সময় লাহিড়ী একবিন্দু আনন্দাশ্রু অলক্ষ্যে মুছিয়া ফেলিলেন!

বাইশ

কার্সিয়ংএ লীলাবতীর পিতার বাড়ী দুইখানি ছিল; একটিতে নিজে থাকিতেন, অপরটি ভাড়া দেওয়া হইত। ডাক্তার লাহিড়ীর পরামর্শে ও লীলাবতীর সাহায্যে সেই বাড়ীটি ঠিক করিয়া কিশোরীর পিতা সপরিবারে কয়েক মাস কার্সিয়ংএ থাকা স্থির করিয়াছিলেন।

অপরিচিত স্থানে দুর্ব্বল স্বামীকে লইয়া গিয়া কোনও অসুবিধা বা বিপদে না পড়িতে হয়, এইজন্য সাবিত্রী পত্রযোগে লীলাবতীকে সঙ্গে যাইবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। অনেককাল পরে পিতার সহিত সাক্ষাতের প্রলোভনবশে লীলা মনে মনে সম্মত ও কতকটা প্রস্তুত হইয়া ষ্টেশনে যান এবং সকলের সনির্ব্বন্ধ অনুনয়ের ফলে তাহাদের সহিত যাওয়া সংঘটন হয়। অবশ্য তাহার পূর্ব্বদিন রামজনম সফরে যাওয়ার জন্য এ সকল বিষয় জানিতে পারেন না। সেই কারণে স্বামীর বিরক্তির ভয়ে লীলা সকলপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যত সত্বর সম্ভব ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তথাপি ইতিমধ্যে যে কিছু একটা গোলযোগ হইয়াছে তাহা ফাগুনি পরিষ্কার করিয়া না বলিতে পারিলেও লীলার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

তাহার পর রামজনমের সঙ্গে ডাক্তার লাহিড়ী আসিয়া যে কয়েকটি প্রশ্নে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বিবাদের পথ বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহাও লীলা আন্দাজ করিয়াছিলেন। ইহার পর রামজনম কিছুই বলেন নাই এবং লীলারও সে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে স্পৃহা হয় নাই। কালের গতি সে ক্ষতের উপর প্রলেপ দিয়া যাইতেছিল বটে, কিন্তু তাহাকে একেবারে নিরাময় করিতে পারে নাই।

সেদিন বৈকালের দিকে লীলাবতী ভিতরের দালানে বসিয়া নিজ মনে চরকায় সূতা কাটিতেছিলেন, এমন সময় তাহার পশ্চাতে আসিয়া বেলা ডাকিল - লীলাদি!

হাতের কাষ বন্ধ করিয়া লীলা কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। বেলা তাঁহার কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিল—লীলাদি, আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন কি?

কিসের অপরাধ, বেলা?

আমি রাগের মাথায় কি সব আপনাকে বলে চলে গিয়াছিলাম—

—ওঃ, এই-ই? কিন্তু তার আগে আমিও তোমায় শক্ত কথা কম বলি নি! তখন যদি জানতাম জয়করণ বাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে—

—না হবে না—

—কেন এই যে শুনি তোমাদের এত ভালবাসা—

—না, ভুল শুনেছেন। ভালবাসতে বোধ হয় তিনি জানেন না। আপনি ঠিকই বলেছিলেন—আমারই অন্যায় হয়েছিল, অজ্ঞাত পুরুষের সঙ্গে সামান্য পরিচয়ে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে যাওয়া এবং সেই সুযোগ পেয়ে ছলনা করে তিনি যে আমার কি সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিলেন, সে কথা পরে একদিন বলবো। কিন্তু ভগবানের দয়ায় সে চাতুরী ধরা পড়ে যায় এবং তার পরও আমার সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করায় আমি ঘৃণাভরে তার লাঞ্ছনার বাকি রাখি নি। যাক্ সে সব কথা। এখনও আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন কিনা বলুন।

লীলা সস্নেহে বেলার হাত ধরিয়া বলিলেন—আমি তোমায় সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছি বোন। পরে বুঝেছিলাম, দোষ তোমার ছিল না। তাই তোমায় যে কটু বলেছিলাম সেই গ্লানিই এখনও আমায় কষ্ট দেয়।

বেলা সস্মিত মুখে বলিল—না দিদি, আপনি আর কিছু মনে রাখ্‌বেন না।

রামজনম সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন—বেলা, তোমার ভাই যে তাড়া লাগিয়েছেন, ট্যাক্সি আর দাঁড়াতে চায় না।

লীলা উত্তর করিলেন—না চায়, যেতে পারে। আমি অন্য গাড়ী বেলাকে আনিয়ে দেব। এত শীঘ্র ওর যাওয়া হবে না, বলে দাও।

রামজনম একটা খাম লীলার হাতে দিয়া বলিলেন—তোমার চিঠি। এটা সকালেই কাছারিতে পেয়েছি—দিতে ভুলেছিলাম।

লীলা চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

বেলা চরকা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া বলিল—একবার দাদামশায়ের কাছে যেতে হবে।

লীলা বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা লোক ত তুমি! এতবড় একটা সুখবর এতক্ষণ পকেটে চেপে রেখে দিয়েছিলে!

রামজনম জিজ্ঞাসিলেন—কি বল ত?

লীলা বলিলেন—এত সহজে তোমায় বল্‌ছি আর কি! তুমি এখন যাও, বেলার ভাইকে নিয়ে গল্প করগে। গাড়ী ছেড়ে দাও। এখানে চা খেয়ে আমরা দাদামশাইএর কাছে যাব। তাঁকে একটা খবর পাঠিয়ে দাও।

রামজনম ফিরিয়া যাইতেছিলেন, লীলা ডাকিয়া বলিলেন—ওগো, শুনছো? তোমাদের মত কথা চেপে রেখে আমরা হজম করতে পারি নে—শুনেই যাও। বেলার যে বিয়ে—এই শনিবারে।

মাথা নাড়িয়া রামজনম বিজ্ঞের মত কহিলেন—হাঁ, জয়করণের সঙ্গে ত!

লীলা হাসিয়া উত্তর করিলেন না, ছাপরার এক ডেপুটি, নতুন বোধ হয়। নামটি বড় চমৎকার, বল্ না ভাই বেলা। এখনই বলে নে, এর পরে আর উচ্চারণ করতে নেই, ইষ্টমন্ত্রেরও বাড়া! কি কড়া নিয়ম ভাই ওদের, আমাদের বেলা?

বেলা উত্তর দিবে কি, লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিতেছিল!

* * * *

লাহিড়ী তখন বাহিরের ঘরে নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া একটা মোটা কেতাব পড়িতেছিলেন।

পদশব্দে মুখ তুলিয়া চশমার ফাঁক দিয়া দেখিয়া বলিলেন—এস, এস, সব। আরে, এ যে বেলা! বিয়ের কনে এমন করে ঘুরে বেড়ায়!

সকলে আসন গ্রহণ করিলে লীলা বলিলেন—বেলা যে আপনাকে নেমতন্ন কর্ত্তে এসেছে!

ডাক্তার বিষণ্নমুখে বলিলেন—তার মানে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। সকালে চিঠি পেয়ে অবধি মন একদম খারাপ হয়ে গেছে। বইটই পড়ে কোন রকমে মন ভোলাচ্ছি। নাঃ, বড় আশা হয়েছিল যে জয়করণ যখন বিতাড়িত হয়েছে, তখন এবার আমার ভাগ্যই বুঝি সুপ্রসন্ন!

বেলা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল। লীলা বলিয়া উঠিলেন—এখনও চেষ্টা করে দেখুন না, হাতের কাছে ত পেয়েছেন!

ডাক্তার কহিলেন—ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র পাবার পর? না ভাই, শেষে নারীহরণ মামলায় পড়ে যাব!…বলিয়া রামজনমের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

রামজনম কথাটা চাপা দিয়া বলিলেন—এদিকে যে জয়করণ বলে বেড়ায়, তার বিয়ের সব ঠিক।

ডাক্তার বলিলেন—তাই ছিল, ধামনে বটে। কিন্তু আজকের খবর সেখানেও ফস্‌কে গেছে।

লীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—তাই নাকি? আপনি কোথায় শুনলেন?

ডাক্তার বলিলেন—আজ সকালেই যে আমি ধামন গিয়েছিলাম। সে অনেক কথা—থাক্। এখন বেলার বিষয় শোনা যাক্—কি বল?

বেলা সুযোগ পাইয়া বলিতে লাগিল—দাদামশাই, আপনার কাছে এসেছি—যদি আপনার মনে কোন কষ্ট দিয়ে থাকি—

দুই হাত তুলিয়া লাহিড়ী বলিলেন—আর কথায় কাজ কি! গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে কি লাভ?

তাহার পর উঠিয়া গিয়া বেলার মাথায় ডান হাতখানি রাখিয়া লাহিড়ী গদ্গদস্বরে বলিলেন—আশীর্ব্বাদ করি দিদি, সুখী হও!

পাচক আসিয়া সংবাদ দিল, সব প্রস্তুত।

লাহিড়ী হাসিয়া বলিলেন—আমার অভিজ্ঞতা ত কম হ'ল না!

রামজনম কহিলেন—কি রকম শুনি?

ডাক্তার বলিলেন—আগে আহারাদি হয়ে যাক। তার পর নিজের কথা সকলে একে একে বলা যাবে। মোক্তার সাহেবের কাহিনী বোধ হয় সবচেয়ে করুণ!

লীলা বলিলেন—আর আমার?

বেলা বলিয়া উঠিল—আমার কিন্তু বড়ই মর্ম্মান্তিক!

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন—আজ আমাদের মধ্যে একজন নেই, তার কথা যতদূর জানি, আমিই বলবো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা, কিশোরী যেন অচিরে পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করেন। যার কাহিনী যতই করুণ মর্ম্মন্তুদ হোক না কেন, এই কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা চাই যে বিনামূল্যে শিক্ষালাভ সহজে বড় একটা হয় না এবং যত কিছুই না দুঃখকষ্ট পেয়ে থাকি, জীবনে বৃথা কিছুই যাবে না।

সমাপ্ত

গান

শ্রীবীরেন্দ্রলাল রায়

নিভ্‌ল রে ওই দিনের আলো
উঠ্‌ল ফুটে রাতের হাসি।
তুই কি ভোলা বাঁধন-খোলা
শুনতে না পাস্ পাগল বাঁশী?

ঘুমের মাঝে বোনা স্বপন
ভাঙ্‌বে যবে জাগ্‌বে তপন
মিথ্যে মায়ার এ বীজ বপন
মন-ভোলান কথার রাশি-

তোর তো এ ঘর নয় রে আপন
তুই যে ভোলা পরবাসী॥

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

আজ যাঁর স্মৃতি তর্পণ করব, জগতের শিক্ষিত জনগণের কাছে তাঁর পরিচয় দেওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক। তিনি সর্ব্বজনপরিচিত ছিলেন, এবং এখনও অসংখ্য জনগণের পূজা গ্রহণ করছেন।—তিনি সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় যুগমানব—মহামানব (superman), ভারতের উজ্জ্বলরত্ন স্বামী বিবেকানন্দ।

বিবেকানন্দের কথা মনে হলেই আমার হিমালয়ের কথা মনে পড়ে। নগরাজ হিমালয়ের যেমন তুলনা নেই—মানবশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দও তেমনই তুলনার অতীত।

উনবিংশ শতাব্দের শেষার্দ্ধে যে কয়টি জ্যোতিষ্ক ভারত-গগন আলোকিত ও উদ্ভাসিত করেছিলেন—সুধু ভারতবর্ষ কেন—সমগ্র সভ্যজগত যাঁদের অবদানে উন্নতশীর্ষ হয়েছিল—স্বামী বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। নিতান্ত অযোগ্য ভক্ত হলেও আজ বহুদিন পরে তাঁর স্মৃতির তর্পণ করতে বসেছি এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যিনি নরলোকে আমাকে ভাই বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, আজ ত্রিদিবধামে অবস্থিত হলেও তাকে তিনি ভুলতে পারেন নি, তার শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য তিনি গ্রহণ করবেনই।

আমার বন্ধুগণের অনেকের ধারণা—নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) আমার সহপাঠী ছিলেন।—তা ঠিক নয়। আমি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৭৯ অব্দে এপ্রিল কি মে মাসে জেনারেল এ্যাসেম্‌ব্লিজ্‌ (অধুনা স্কটীশ চার্চ্চেস) কলেজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করি। আমার সহপাঠী ছিলেন—বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আর কে কে আমার সহপাঠী ছিলেন তাহা এখন আর মনে নাই। এতকাল পরে তাঁদের মধ্যে আর এক জনের নামই আমার মনে পড়ছে—তিনি বর্দ্ধমান রাজষ্টেটের সহযোগী ম্যানেজার ছিলেন—নাম হৃষীকেশ চট্টোপাধ্যায়। আমার সেই কলেজ সময়ের বন্ধু হৃষীকেশ আজ কয়েক মাস হল পরলোকগত হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৭৯ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৮০ অব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবেশলাভ করেন। কয়েক মাস অধ্যয়নের পরই শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ ত্যাগ করেন। সে বৎসরটি তাঁর বৃথা যায়। ১৮৮১ অব্দে তিনি জেনারেল এ্যাসেমব্লীজে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৮৮০ অব্দের শেষে এফ্, এ, পরীক্ষা দিয়ে আমি কলেজ থেকে বের হই। ১৮৮১ অব্দে আমি ঐ কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করি। সুতরাং নরেন্দ্রনাথ আমার সহপাঠী ছিলেন না। আমার কলেজ ত্যাগের পর-বৎসর তিনি কলেজে প্রবেশ করেন। স্যর ব্রজেন্দ্রনাথ তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র।

নরেন্দ্রনাথ যখন কলেজে পড়েন, তখন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, হবার সম্ভাবনাও ছিল না; তবে তাঁকে আমি অনেক দিন দেখেছি এবং তিনিই যে নরেন্দ্রনাথ দত্ত তাও জানতাম।

বাল্যকাল থেকেই আমি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতাম। আমাদের গ্রামে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের আমলে আমাদের গ্রামের ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের অন্তর্ভুক্ত হয়; তার পর যখন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমাদের ব্রাহ্মসমাজও "সাধারণ"-দল-ভুক্ত হয়। স্কুলে পাঠের সময় থেকে কলেজের পাঠ সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমি যথানিয়মে ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় যোগ দিতাম। কলেজ ত্যাগের পরও যখনই কলকাতায় আসতাম তখনই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের রবি-বাসরীয় উপাসনায় যোগদান করতাম এবং সে সময় যাঁহারা ব্রাহ্ম-সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই আমাদের গ্রামের সমাজের বার্ষিক উৎসবে যোগদান করতে যেতেন। সেই সূত্রে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার-পর কলিকাতাতেও তাঁরা আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন। ব্রাহ্ম-সমাজের এই রবি-বাসরীয় উপাসনা উপলক্ষে একটি

যুবক মধ্যে মধ্যে ব্রহ্ম-সঙ্গীত গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করতেন। আমার ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে তাঁর পরিচয় পেয়েছিলাম। তিনি নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি তখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নি, কিন্তু ঐ ধর্ম্মমতের প্রতি তাঁর আস্থা জন্মেছিল।

বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আমি তাঁর গান শুনেছিলাম—তাঁর পরিচয়ও পেয়েছিলাম—কিন্তু সে সময় তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার কথাও আমার মনে হয় নি এবং তিনি যে ভবিষ্যতে স্বামী বিবেকানন্দ হবেন, এ কথাও তাঁর হাবভাবে আমি বুঝতে পারি নি। কথাবার্ত্তা হলেও না হয়, হয় তো কিছু জানতে পারতাম, কিন্তু তাও তো হয় নি। আমার তখনকার স্মৃতি একটি সুন্দর-কায় আয়ত চক্ষু সু-গায়ক নবীন যুবকেই পর্য্যবসিত হয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একযুগ চলে গেল। সংসার-নাট্যমঞ্চে কত নাটকের কত ভূমিকাই গ্রহণ করলাম। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেল। কত আশা আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুমের মত আকাশেই বিলীন হয়ে গেল। কত ক্ষণস্থায়ী সুখ জীবনান্ত-স্থায়ী গভীর মর্ম্ম-বেদনায় পরিণত হয়ে রইল। কত আনন্দের সংসার গড়তে গেলাম। দেখতে দেখতে সে সকল শ্মশান-ভস্মে পরিণত হয়ে গেল। আমার জীবনের এই ১২ বৎসরের কাহিনী—কি হবে আর সে সকলের আলোচনা করে?

সংবাদপত্রাদিতে শ্রীশ্রীপরমহংস রামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে নানা কথা পড়তে লাগলাম। দক্ষিণেশ্বরের কালী-বাড়ীতে অনেক জ্ঞানী গুণী মনীষী যাতায়াত আরম্ভ করলেন। পরমহংসদেবের কৃপা অনেকে লাভ করে ধন্য হয়ে গেলেন। আমিও দু' একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। কত সাধু, কত ভক্তের সমাগম দেখেছিলাম। আমি দুয়োরের কাছ থেকে প্রণাম করেই বিদায় নিয়েছিলাম। কোন দিন তাঁর দৃষ্টি আমার ওপর পড়েছিল কি না সন্দেহ—কৃপা-দৃষ্টি তো মোটেই নয়।

সেই সময় শুনতে পেতাম—নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে খুব বেশী যাতায়াত করছেন। লোকের মুখে আর খবরের কাগজে এই সব সংবাদ পেতাম এবং নরেন্দ্রনাথ দত্ত যে পরমহংসদেবের পরম ভক্ত হয়েছেন এবং কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম ধারণ করেছেন, এ সংবাদও বন্ধুবান্ধবগণের মুখে অথবা সংবাদপত্রের মারফত পেয়েছিলাম। সাক্ষাৎ পরিচয় কিন্তু তখনও হয় নি, হবার কোন সম্ভাবনাও ছিল না।

তারপর এক অভাবনীয় ঘটনায় আমি স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের নহে) দর্শন লাভ করি। দর্শন-লাভ মাত্র; পরিচয় হয় নি, আর তখন পরিচয় হবার অবস্থাও তাঁর ছিল না।

এ কিন্তু প্রায় ১২ বৎসর পরের কথা। আমি তখন হিমালয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তখনো আমি বদরিকাশ্রমের দিকে যাই নি। যাবার কল্পনাও মনে হয় নি। কালীকান্ত সেন নামে বরিশাল জেলাবাসী—এক শিক্ষিত ভদ্রলোক ডেরাডুনে এক ইংরাজী স্কুল খুলেছিলেন। আমি ঘুরতে ঘুরতে হিমালয়ের মধ্যে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম ডেরাডুনে এই মাষ্টারজীর আশ্রয় লাভ করি।

মাষ্টারজী আমাকে পেয়ে বসলেন। তিনি বললেন—হিমালয়ে বেড়াতে হয় বেড়াবেন, যখন যেখানে ইচ্ছা যাবেন—একটা আড্ডার তো দরকার! যখন আমার এখানে এসেছেন, হিমালয়-ভ্রমণে ক্লান্ত হয়ে এইখানে এসেই বিশ্রাম করবেন এবং সেই বিশ্রামসময়ে আমার স্কুলে ছেলেদের পড়াবেন!

ওরে বাবা! সেই মাষ্টারী! এই যে দেশ ত্যাগ করে এলাম—তুমি কিনা বিনা-টিকিটে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে এই হিমালয়ের সানুদেশে ডেরাডুনেও উপস্থিত! কি করি,—ভদ্রলোক খেতে দেবেন, কাপড় ছিঁড়ে গেলে কাপড় কিনে দেবেন, শীতবস্ত্র দেবেন—তার পরিবর্ত্তে যখন ডেরাডুনে থাকব তখন তাঁর স্কুলের ছেলেদের অঙ্কশাস্ত্রে গাধা বানাব।

অবান্তর হলেও, সেই সময়ে ডেরাডুনের করণপুরে যে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল—সেই উপনিবেশের কয়েক জন বাঙ্গালীর নাম উল্লেখ করছি। পাঁচ সাত দিন এই উপনিবেশের বাঙ্গালীদের গৃহে যাতায়াত করে আমি একটা জিনিস দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। হিমালয়ের বক্ষে ডেরাডুনের ক্ষুদ্র এক পল্লীতে এতগুলি "কালী"র সমাবেশ আমার কাছে আশ্চর্য্য ঠেকেছিল।

সর্ব্বপ্রথম নাম করতে হয়—কালীমোহন ঘোষ মহাশয়ের। ইনি জি টি সার্ভে অফিসের প্রধান কম্পিউটার ছিলেন এবং আমি যতদূর জানি, গণিতে অত বড় বিশেষজ্ঞ সে

সময়ে বাঙ্গালীর মধ্যে কেহ ছিলেন না। পারি তো তাঁর কথা অন্য সময়ে বলব।

দ্বিতীয় "কালী"—কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ইনি কালীমোহন বাবুর সহকারী ছিলেন। আর এক "কালী"—কালীকান্ত কর। ইনি ফরেষ্ট আফিসের "বড়বাবু" ছিলেন। আর "কালী"—আমার মাষ্টারজী—কালীকান্ত সেন। পঞ্চম "কালী" ছিলেন কালীপদবাবু। ইনি খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

এই পাঁচ "কালী"তেই পর্য্যাপ্ত হয় নি—সেই সময়ে যিনি বৎসরে ছয় মাসের অধিক ডেরাডুনে থাকতেন—তিনি কলিকাতার প্রথিতনামা কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়।

এ ছাড়া আরও অনেকে ছিলেন, তাঁদের নাম করতে গেলে তালিকা বিস্তৃত হয়ে পড়ে। তার মধ্যে দুইটি নাম বিশেষভাবে আমার মনে পড়ছে—শশিভূষণ সোম মহাশয় ও রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব। সেই সময়ের এক জন মাত্র এখনও বেঁচে আছেন। তিনি আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ সোম। আমাদের সময়ের তিনিই এখন বেঁচে আছেন এবং তিনি সেখানকারই অধিবাসী হয়েছেন। এখন ডেরাডুনে যাঁরা বেড়াতে যান বন্ধুবর বিমলাচরণ তাঁদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সাহায্য করেন।

ও কথায় আর কাজ নেই। আমি মাষ্টারজীর স্কুলে পড়াই, খাই-দাই থাকি। প্রায় শনিবারেই অপরাহ্ণ দু'টার সময় স্কুল থেকে ফিরে এসে জুতা, পায়জামা, লম্বা কোট এবং প্রকাণ্ড পাগড়ী—আমাদের বিশ্বস্ত ভৃত্য দেবানন্দের জিম্মা করে দিয়ে একখানি কম্বল ও লাঠি নিয়ে মাষ্টারজীকে নমস্কার করে মহানন্দে বেরিয়ে পড়তাম। দুই তিন দিন বনে জঙ্গলে ঘুরে আবার ফিরে এসে পাগড়ী মাথায় দিয়ে ছেলেদের মাথার ভেতর সাইমাল্‌টেনিয়াস্ ইকোয়েশন্ ঢোকাতে আরম্ভ করতাম।

এই সময়ে এক শনিবারে বেলা একটা কি দুটোর সময় লাঠি আর কম্বল নিয়ে নগ্নপদে বেরিয়ে পড়ি। সে দিন আমার লক্ষ্যস্থান ছিল—হৃষীকেশ।

আমার আর কিছু যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক—সে সময়, এখনকার মত, যদি হাঁটার প্রতিযোগিতা থাকত—তাহলে আমি গর্ব্ব করে বলতে পারি যে, সব প্রতিযোগিতায় ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট হতাম। পথে নামলে আমার পা দুখানিতে কে যেন পাখা বেঁধে দিত।

আমি সেদিন এমন হেঁটেছিলাম যে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই হৃষীকেশে পৌঁছাই। অবশ্য তখন গ্রীষ্মকালের দিন—কাযেই খুব বড়।

হৃষীকেশে তখন সন্ন্যাসীদের আহার যোগাবার জন্য গুটি দুই তিন সদাব্রত ছিল। এখন কি হয়েছে জানি নে। সেই সদাব্রতের লোকরা হৃষীকেশের গঙ্গার চড়ায় ওপর ঘাস পাতা বাঁশ খড় দিয়ে ছোট ছোট কুটীর তৈরি করে রাখতো। সন্ন্যাসীরা এসে সেই সব কুটীরে বাস করতেন। কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করতে হ'ত না। প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে সন্ন্যাসীরা সদাব্রতের সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হতেন। সদাব্রতের লোকরা দুখানি মোটা রুটী, আর খোসা সুদ্ধ কলায়ের ডাল—আর কখন কখন বা তার সঙ্গে একটু নুণ আর লঙ্কাও দিতেন। সন্ন্যাসীরা তাই নিয়ে গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে আহার করতেন, তারপর অঞ্জলিপুরে জল পান করতেন। রুটি দুই খানিই বটে—কিন্তু সেই দুই খানিই তৈরী করতে আধ সের তিন পোয়া আটা লাগতো। সুতরাং সদাব্রতওয়ালাদের আর সন্ধ্যাবেলার আহার জোগাতে হ'ত না, আর তার প্রয়োজনও হ'ত না।

আমার যদিও তখন লম্বা চুল ও দাড়ী, কম্বল ও লাঠিমাত্র সম্বল, তা হলেও আমি কখনও হৃষীকেশের কোন কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করি নি। সন্ন্যাসীর আসন আমি অধিকার করব কেন?

আমি একটা সদাব্রতের বারান্দাতেই কি শীত কি গ্রীষ্ম পড়ে থাকতাম।

আমার তো আশ্রয়স্থানের ভাবনা ছিল না—কাযেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে হৃষীকেশে পৌঁছে আমি সন্ন্যাসীদের কুটীরগুলি দেখতে গেলাম। সেইখানে ঘুরতে ঘুরতে একটি কুটীরের সম্মুখে দেখি—জন তিন চার বাঙ্গালী সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁদের মুখে প্রবল উৎকণ্ঠা দেখে আমি হিন্দীতেই জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে। তাঁরা বল্লেন—স্বামী বিবেকানন্দ নামে এক জন সন্ন্যাসী মৃত্যুশয্যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ! হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে এই ক্ষুদ্র কুটীরে পরমহংসদেবের পরম স্নেহপাত্র স্বামী বিবেকানন্দ! আমি সন্ন্যাসীদের অনুমতি নিয়ে সেই কুটীরের মধ্যে প্রবেশ

করলাম। কুটীর-মধ্যস্থ ধূনীর অস্পষ্ট আলোকে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখলাম। তিনি তখন সংজ্ঞাশূন্য।

হিমালয়ের বনজঙ্গলের মধ্যে অনেক অসাধু সন্ন্যাসীও দেখেছি, আবার অনেক সাধু সন্ন্যাসীরও দর্শনলাভ হয়েছে। তাঁদের কারো কারো বিশেষ ক্ষমতাও দেখেছি। এমনও দেখেছি, কোন সন্ন্যাসী কোন একটা গাছের পাতা দিয়ে মুমূর্ষু রোগীর জীবন ফিরিয়ে এনেছেন। তাঁর কাছে সে পাতার সন্ধানও নিয়েছি। সে দিন স্বামী বিবেকানন্দকে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে এবং তাঁর চিকিৎসার কোন সুবিধাই নাই দেখে আমার সে গাছের কথা মনে হ'য়েছিল। আমি তখন তাড়াতাড়ি কুটীর থেকে বেরিয়ে এসে সেই প্রায়ান্ধকারে গঙ্গার বালুকাময় চড়ায় সেই গাছের অনুসন্ধান করে সৌভাগ্যক্রমে অনতিদূরেই সেই গাছ পাই। তারি ২।৩টি পাতা এনে হাতে রগড়ে রস বের করে স্বামীজীর মুখে দিলাম। দেখিই না কেন—সন্ন্যাসীর এ গাছ ফলপ্রদ হয় কি না। তারপর ঔষধের ফলাফল দেখবার জন্য কুটীরের বাইরে বালুকার আসনে বসে রইলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে স্বামীজী চৈতন্য লাভ করলেন। তাঁর সঙ্গীরা তখন কুটীরের ভিতরে ছিলেন। স্বামীজী ধীরে ধীরে বল্লেন—তোরা ভয় পাচ্ছিস কেন। আমি মরব না—আমার অনেক কায আছে। আমি দুয়ারের কাছ থেকে এই কথা শুনে, ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে আমার সদাব্রতে এসে উপস্থিত হলাম।

স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনলাভের, বোধ হয়, ১০।১৫ দিন পরে সংবাদ পেলাম, সানুচর বিবেকানন্দ স্বামী ডেরাডুনে এসে সেখানকার কালীবাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। সেই কথা শুনে আমি, শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ এবং তাঁর খুল্লতাত সার্ভে অফিসের এক জন প্রধান কর্ম্মচারী বন্ধুবর শশিভূষণ সোম—এই তিন জন কালীবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই রাত্রিতেই তাঁদের করণপুরে নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম, তাঁরা পরদিন প্রাতঃকালে আসতে স্বীকার করলেন।

শশিভূষণ সোম মহাশয়ের বাড়ী খুব বড় ও সুন্দর। সেইখানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা করলাম। শশীবাবুদের সকলেরই অফিস ছিল। কাযেই সন্ন্যাসীদের পরিচর্য্যার ভার—বাইরে আমি এবং ভিতরে শশীবাবুর বাড়ীর মেয়েরা গ্রহণ করলেন।

স্বামীজী এবং তাঁর সহচরবর্গকে আমরা কয়েকদিন আটকে রাখতে চেয়েছিলাম, কিন্তু স্বামীজী অস্বীকার করলেন। তিনি বল্লেন—দ্বিতীয় তিথি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে নেই—সেই জন্যই নাম "অতিথি"। তার পরদিন প্রত্যূষে তাঁরা চলে গেলেন। স্বামীজী বলে গেলেন, তিনি উত্তরাপথ ত্যাগ করে এই বার দক্ষিণাপথে যাবেন।

সেই যে এক দিন তাঁদের সঙ্গে কাটিয়েছিলাম, সে কথা আজও মনে আছে। গভীর ধর্ম্মচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা, তর্ক-বিতর্ক, সারা দিনরাতের মধ্যে তাঁর মুখে শুনতে পেলাম না। সুধু গান, সুধু আনন্দ, সুধু স্ফূর্ত্তি, সুধু রহস্যজনক গল্পগুজব। তিনি সেই দিনও রাতটা আমাদের একেবারে আনন্দের হিল্লোলে আপ্লুত করে রেখেছিলেন। এ স্মৃতি কি ভুলবার!

এই যে আমাদের সেদিনকার এত আনন্দ—এর মধ্যে কিন্তু ঘুণাক্ষরেও হৃষীকেশে আমার সেই অভাবনীয় বা অপ্রত্যাশিতভাবে স্বামীজীর দর্শনলাভের কথার উল্লেখ করি নি। স্বামিজী ত ন'নই, তাঁর সঙ্গীরাও ডেরাডুনে আমাকে চিনতে পারেন নি—পারবার কথাও নয়; তখন আমি নগ্নপদ কম্বল-সম্বল সন্ন্যাসী, আর ডেরাডুনে আমি ভদ্রবেশী, প্রকাণ্ড পাগড়ীধারী মাষ্টারজী। তা ছাড়া হৃষীকেশের গঙ্গাতীরে প্রায়ান্ধকারে মানুষ চেনাও শক্ত; সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বামীজীর পরলোকগমন উপলক্ষে একদিন মাত্র টাউনহলের শোক-সভায় হৃদয়ের আবেগ সংবরণ করতে না পেরে হৃষীকেশের ঘটনার সামান্য উল্লেখ মাত্র করেছিলাম। আজ তাঁর স্মৃতির তর্পণ-প্রসঙ্গে কথাটা এতদিন পরে উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলাম না।



অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(৬)

ভো-ভো-ভো করে' বিকট নিনাদে কলের বাঁশী গম্ভীরভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে বাজে। শ্রমিকদল অলস শয্যা ছেড়ে উঠে। নিমের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করে, হাত মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি সস্তা নিলামী জামা কাপড় পরে, পাগড়ী বাঁধে বা টুপী পরে, নিলামী জুতা পায় দেয়, মধ্যাহ্ন ভোজনের খাদ্য—লোহার বা পেতলের কৌটায় ভরে হাতে ঝুলায়, দল করে উর্দ্ধমুখে মিলে ছুটে যায়। ছুটছে, কেমন করে ছুটছে! ওদের চলার ভঙ্গিমাটাই আলাদা। দুপুর রোদে বা বৃষ্টিতে এরা যখন খাবার জন্য বাড়ী ফেরে তখন এদের দেখতে খুব আশ্চর্য্য বোধ হয়। কী ভীষণ ভিড়! রাস্তা ভরে যায়, পাশ কেটে বের হওয়া খুব কঠিন। শাঁ-শাঁ বেগে ধেয়ে চলে। ভারত মহাশ্মশানে যে এত বড় একটা সজীব জাতি জীবিত আছে তা চাক্ষুষ না দেখলে কল্পনা করা যায় না। এরা যখন মিলে কর্ম্মরত থাকে তখন এদের কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না, সজীব বলে বুঝা যায় না, কল-কব্জার একটা অঙ্গ বলে মনে হয়; বাইরে, বিশেষতঃ যখন এক ঘণ্টার ছুটীতে বাড়ী যায় তখন এদের দেখে মনে হয় এরা অন্য কিছু, মহা সজীব প্রাণী। এদের সঙ্গে অপর ভারতবাসীর মিল আছে শুধু দেহের কাঠামোতে। এদের গতি যেন দুর্ধর, অপ্রতিহত, অপরাজেয়। সুপ্ত কামানের গোলাগুলী যেমন উত্তাপ পেলে ভীষণভাবে দুর্দ্ধর্ষ রূপ নিয়ে ছুটে, ঠিক তেমনি। ঝড়ো ঝঞ্ঝা, উত্তপ্ত সূর্য্যভাতি, সান-ষ্ট্রোক, নির্জ্জীব শীতের ভয় নেই। গট্-গট্-গট্ করে রুদ্র ছন্দে চলে যায়। এদের সজীবতা দেখে নির্জ্জীব, জড়ের প্রাণেও বুঝি সজীব হ'বার স্পৃহা-কর্ম্মস্পৃহা প্রবলভাবে জেগে উঠে।...

শ্রমিকদল মিলের সরু গেটের পাশে এসে দাঁড়ায়; বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, রাস্তার ধারে বসে। সরু দ্বার লোহার পাত দিয়ে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, উদ্দেশ্য কুলি মজুররা যদি কোন জিনিষ লুকিয়ে নেয়—তবে লোহার পাতে লেগে বেজে উঠবে। দ্বারে তিন চার জন নেপালী বা ভুটিয়া দারোয়ান দুর্দ্ধর্ষ ভীষণাকৃতি চেহারা নিয়ে বসে থাকে। শ্রমিকদল এক এক জন করে হাতে বা কোমরে ঝুলানো তাম্রখণ্ডে মিলের ক্রমিক নম্বর দেখিয়ে ভেতরে ঢুকে। দিন-মজুররা রোজ কাজ পায় না, কিন্তু রোজ মিলে এসে হাজিরা দিতে হয়। রোজ হাজিরা না দিলে অন্য দিন কাজ পাবার আশা থাকে না। কে কবে কখন কাজ পাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই বহু দূর থেকেও রোজ দেখা দিয়ে যায়। যদিও জানে যে সে কাজ পাবে না, তবুও আসে যদি দুঃখ, অভাব জানিয়ে কাজ পায়। যারা কাজ পায় তারা ব্যস্তভাবে কাজে লেগে যায়, আর যারা কাজ পায় না গেটের বাইরে হল্লা করে, যাকে খুশী অভিসম্পাত করে, পেটের ক্ষুধায় ক্রোড়পতিদের মুণ্ডপাত করে; অপরকে গালাগাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটায়, তারপর অন্য পথে চলে। ফেরার পথে এদের আর সজীব জাতি বলে মনে হয় না, আলাদা একটা জাত বলে মনে হয় না—ভারতবাসী বলেই মনে হবে। এদের প্রাণে নেই আশা, নেই ভরসা, হাওয়ার কোলে নিজকে ছেড়ে দেয়, জানে না পরিণতি, জানে না কোথায় নিয়ে যাবে ঝড়ো-হাওয়া? শূন্যেই লয় পাবে—না অতল গর্ভে নিমজ্জিত হবে, না কোন উর্ব্বর ক্ষেত্রে শিকড় গাড়বে? দেহে যেন প্রাণ নেই, মনে বল নেই, বিবেকে বিচারবুদ্ধি জ্ঞান নেই, চরিত্রে দৃঢ়তা নেই; দারিদ্র্যের ভয়ঙ্কর ক্রূর মূর্ত্তিকে দেখে প্রাণ অব্যক্ত ভীতিতে, বেদনায় করে ডিব্-ডিব্, মন হয় অসাড়, জড়; শক্তি যায় হারিয়ে, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হয়ে পড়ে শিথিল। এবার চলার পথে জীবন্ত প্রতীক মূর্ত্তি ফুটে উঠে না, জুতার ঠক্ ঠক্ ঠক্ একতারায়, রাস্তার নির্জ্জীব লোকদের আর চেতনার সাড়া জাগিয়ে দেয় না; ওদের চলার ভঙ্গীতে শুধু ভেসে উঠে—ব্যর্থতার, অভাবের, অনাচারের মর্ম্মান্তিক চিত্র, চলার শিথিল শব্দে জানায় হাহাকারের করুণ বেদনা। এদের দেখে কে বলিবে যে এরাই খানিক আগে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে জানিয়ে গিয়েছিলো—ভারত মহাশ্মশান নয়,

আজো সব নিৰ্জ্জীব, জড় হয়ে পড়ে নি। শ্রমিক দল এখনো ভারতের বুক থেকে মুছে যায় নি, জেগে আছে, এখনো বুকের হিম-শীতল পাংশে রক্ত ঢেলে দিচ্ছে অত্যাচারীদের জন্য। বুকের রক্ত দিচ্ছে কি-না বুঝে না, বুঝলেও কেন দিচ্ছে তা বুঝে না—তাই যারা অজ্ঞানের রক্তশোষণ করে নে'য়—তারা অত্যাচারী, ভয়ঙ্কর। হিংস্র জন্তু হিংস্র প্রকৃতির জন্য ভয়ঙ্কর, কিন্তু যারা সাধুবেশে হিংস্র, নিজের সর্ব্বনাশ যাতে বুঝতে না পারে তা'র পথ বন্ধ করে রাখে, তারা যে কি—তার ভাষা, তার উপযুক্ত বিশেষণ আমার জানা নেই! যাক্ সে কথা—শ্রমিকদল—যারা কাজ পেলে না—তারা যদিও ঘরের কথা মনে করে মাথায় হাত দিয়ে বসে, তবু আশা রাখে রাত্তিরে হয়ত কাজ পাবে, তখন এমনি ভাবে চলবে না; আবার চলবে বেগে, আশা ভরসা, কল্পনার উজ্জ্বল ছবি মুখে এঁকে দপ্-দপ্ পা ফেলে। যাবে এ পথেই, তখন চলবে না টলতে টলতে। হয়ত দেহ মন লেপটিয়ে পড়বে না। এদের যাওয়া ও আসার মাঝে কত বড় সমস্যা, কত বড় উত্থান পতন। হয় ত আপনারা কেউ ভাবতে পারেন এমন কি বড় সমস্যা—বড় উত্থান পতন? নয় একদিন কাজ নাই বা পেলে, এক একটা কুলি মজুর কি কম টাকা রোজগার করে! আমি বলি—স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—যে, কোন জাতি বা শ্রেণীকে বিচার করতে হলে ওদের মন ও চোখ নিয়ে বিচার করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক কুলি মজুর মাসে চল্লিশ, পঞ্চাশ টাকা রোজগার করে, অবশ্য কেউ পনের টাকা, কেউ সত্তোর আশী টাকাও রোজগার করে। অবসর, বিশ্রাম, আমোদ, উৎসব—হীন, এককথায় বৈচিত্র্যহীন জীবনে মিলের অত্যধিক পরিশ্রমের পর যখন কুলি মজুর স্ত্রীপুরুষরা হপ্তা শেষে মাইনে পায়, তখন ক্ষণিক আমোদের লোভ সংবরণ করতে পারে না। অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষ মজুররা বোতলের পর বোতল মদ খায়, হল্লা করে। এর চেয়ে বড় উৎসব, স্ফুর্ত্তি এদের আর জানা নেই। অদৃশ্য দৈহিক দুর্ব্বলতা এমনিভাবে এদের সর্ব্বনাশ করে। তাই এদের রোজ কাজ পাওয়া চাই, নইলে ভুক্ত-অভুক্তের মস্ত বড় প্রশ্ন উঠে।…এরা যে প্রাণ দিতেই জন্মে, অন্যমনস্কের খেয়াল কতক্ষণ থাকতে পারে? তা হলে জাগরণের সাড়া জানাবে কে, মরণ মন্ত্র গেয়ে গেয়ে মাতাল হবে কে, ভারী ভারী লোকদের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা মেটাবে কে? এরা জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, এরাই শ্রোতা, এরাই গায়ক, এরাই জাগায়, এরাই চিরদিনের জন্য ঘুম পাড়ায়। এরা অপরকে বাঁচিয়ে রাখে, অপরকে জাগায়; নিজেরা কি বাঁচতে শিখবে না, নিজেদের কি জাগাবে না? শুধু কি দেবেই নিজেরা—নেবে না কিছু সম্পদ? অমৃত বিলায়ে কি শুধু বিষই পান করবে? ফটকের ভেতর—ধপ্-ধপ্-ধপ্, ঘ্যান্-ঘ্যান্-ঘ্যান্, কড়্-কড়্-কড়্, কত কি বহু স্বরে এন্‌জিন্ চলছে, ছোট, বড়—কত শত যন্ত্রপাতি চলছে। বিরাট ব্যাপার! অনভ্যস্ত চোখ উঠে টাটিয়ে, কাণ যায় বিকল হয়ে।

এক দিকে তুলা দিচ্ছে, অন্য দিক দিয়ে সূতা বের হয়ে আসছে। মোটা, সরু, মাঝারি, কত রকম! ঠাস্-ঠাস্-ঠাস্ করে মাকু চলছে; হাজার হাজার কাপড় তৈরি হয়ে বেরুচ্ছে। দরজা, জানালা দিয়ে বাতাস ঢুকে সূতা ছিঁড়ে দেবে বলে সব বন্ধ, বাতাসের চলাচল স্বাভাবিক নেই, লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসে, সজীব জীবের চলাচলে ঘরের বাতাস হয়ে যায় ভীষণ গরম, বিষাক্ত। শীতের সময় সূতা শক্ত হয়ে যায়—তাই ক্ষণে ক্ষণে Steam (উত্তপ্ত জলের ভাপ) ছাড়া হয়। মাঘ মাসেও শ্রমিকদের গা থেকে টপ্-টপ্ করে ঘাম পড়ে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না; পা টন্ টন্ করে, শরীর ঝিমিয়ে আসে, বিশ্রামের জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। তবু দাঁড়িয়ে থাকে, কাজ করে, বেশী করে কাজ করতে চায়; ঘরের ভাবনা যে হৃদয়ে অত্যাচার করে।…

চামড়ার কারখানা। গাড়ী ভরে ভরে কাঁচা চামড়া, শুক্‌নো দুর্গন্ধময় চামড়া আসে। চামড়াগুলি চুণের জলে পচানো হয়, পচানো চামড়া কাঠের ওপর ফেলে ছুরি দিয়ে ঘসে ঘসে লোম ও মাংস পরিষ্কার করে। যেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। সে চামড়া গাছের ছাল বা রসায়ন দ্রব্য দিয়ে ট্যান্ করা হয় (Vegetable and chrome tanned leather); সে চামড়া থেকে হয় বাক্স, জুতা, মনি ব্যাগ্, কত কি জিনিস। সে সব জিনিস বাক্সে বোঝাই করে দেশ বিদেশে চালান হয়। দু'কথায় ত চামড়ার কলের কথা শেষ করলাম; তাতে কুলি মজুরের দুর্দ্দশার কথা মোটেই বোঝা যায় না—বরঞ্চ গতর খেটে ভাল করে জীবন চালাতে পারে। কিন্তু হয় না। মিলের বর্ণনা

করা এখানে সুবিধে হবে না—তাই একটু বলে রাখি যে চামড়ার কলে কাপড়ের কলের মত অহরহ য়্যাক্‌সিডেণ্ট হয় এবং খুব বলিষ্ঠ লোক (কুলি মজুর) দশ ঘণ্টা কাজ করে দশ আনার বেশী রোজগার করতে পারে না।

লোহার কারখানা—এটা আরো ভয়ঙ্কর। এখানে টাকা উৎপন্ন হয় শ্রমিকদের তেজে। খনিজ লোহা (iron ore) গাড়ী গাড়ী বোঝাই হয়ে আসে, চুল্লীতে (furnace) গলানো হয়, গলিত লোহা নল বয়ে বেরিয়ে আসে। লোহা গুণ অনুসারে তিন প্রকার হয়, এক এক প্রকার লোহা দিয়ে হাজার হাজার রকম জিনিষ তৈরি হয়। লোহার গুণ বলে শেষ করা যায় না। একজনের স্মরণ শক্তিতে লোহার এতগুলো গুণ একসঙ্গে থাকতে পারে না। লোহা না থাকলে মানুষ ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকত কি-না সন্দেহ। লোহা যদি না থাকতো, হতো না কৃষিকার্য্য, হতো না এন্‌জিনিয়ার, হতো না কর্ম্মকার (লোহার), হতো না সুখশান্তির পথ, হতো না সভ্যতা ; অতি আদি কালের মত মানুষে মানুষ খেতো, ঝগড়াঝাটি বর্ব্বরতা দিয়েই জীবন চালাতো। লোহা যদি না থাকতো, তবে উর্ব্বর মস্তিষ্কের ঘি বৃথাই শুকিয়ে যেতো। এই লোহা—যার গুণ শত শত মুখে গেয়ে শেষ করা যায় না, যার প্রয়োজন নিত্য পদে পদে—অথচ এত শ্রেষ্ঠ অমূল্য লোহা দৈনিক কত সহস্র লোকের রক্ত চুষে নিচ্ছে যে, তা লিখে শেষ করা যায় না। যদি চিন্তা করা যায় তবে দেখা যায় কত মহা-উপকারী, অথচ কত সর্ব্বনাশী। লোহা নিজে লাখো লাখো কোটি কোটি লোকের রক্ত পান করে না। কিন্তু লোহার জন্যই শ্রমিকদলের রক্ত দিতে হয়। ক্ষমতাশালী লোক লোহার পূজায় কোটি কোটি শ্রমিকের জীবন ছল-চাতুরীতে বলিদান করে। ছেলেদের রূপকথায় শুনতে থাকে—ডাইনীরা ছদ্মবেশ ধরে লোক ভুলায়, রাত্রিরে তাদের রক্ত চুষে খায় নল লাগিয়ে। একদিনে মরে না, শুকাতে শুকাতে ধীরে ধীরে ঝরে পড়ে। এর নাম স্বাভাবিক মৃত্যু, হত্যা নয় কারণ ভগবান ভিন্ন অন্য কাউকে মৃত্যুর জন্য জবাবদিহি করা চলে না। লৌহ কারখানায়ও তাই, একেবারে মরে না, নরহত্যার দায় এড়াবার জন্য তিলে তিলে ধ্বংস করে। তার অনবরত জ্বলন্ত চুল্লীতে কাউকে তিলে তিলে ভাজে, কাউকে আংশিকভাবে, কাউকে সম্পূর্ণ ভেজে দেয়—আবার কাউকে সেদ্ধ করে দেয়। ব্যাপার গুরুতর নয়, দৈব-দুর্ঘটনা (য়্যাক্‌সিডেণ্ট)। য়্যাক্‌সিডেণ্ট কথাটা তুলে দিয়ে, স্বাভাবিক কথাটা ব্যবহার করলে অবস্থার সঙ্গে বেশ মিল খাবে।

খনি ও সমুদ্রের তল কি প্রকার জানি নে, নাম শুনলেই পিলে উঠে চমকে, সংক্ষিপ্ত আয়ু যায় আরো কমে। সাপের মাথার মণি নেবার মত। সাত রাজার ধন পাবে না, কিন্তু আনতে হবে সাত-রাজার,ধন, প্রতিদান—পাবে যৎসামান্য মজুরী, নয় প্রতিকারহীন সাপের বিষ। সমুদ্র মন্থন করে আনবে চুণি, পান্না, পাবে সামান্য মজুরী—দিতে হবে প্রাণ কুমীর হাঙ্গর কত কি ভয়ঙ্কর জলজন্তুর নিকট। নামতে হবে খনিতে, মরতে হবে বিষাক্ত গ্যাসে, জ্বলন্ত খনিজ আগুনে, কখন বা নিষ্পেষিত হবে ধসে-পড়া পাড়ের নীচে পড়ে। সর্ব্বত্রই দৈব-দুর্ঘটনা। ক্রোড়পতিরা টাকার জোরে সর্ব্বশক্তিমান, তাই তারা তিলে তিলে মারেন, হঠাৎ মারেন, কোন জবাবদিহি হতে হয় না। দিলেই কি সে প্রাণগুলি ফিরে আসবে—না যাদের মারবার জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের রক্ষা করা হবে। পায়ের নীচে পড়ে পোকা পিঁপড়ে কত মরে, কে তার খোঁজ রাখে, কি-ই বা তার প্রতিকার করা যেতে পারে, কোন জবাব দিতে হয় না কারো নিকট, মনের নিকটও নয়। এরা মানুষ, তাই দৈব-দুর্ঘটনা শব্দ তৈরি হয়েছে। প্রথম থেকে কি স্বাভাবিক, অবিসম্ভাবী কথাগুলি তৈরি হয় নি? এখনও আছে, চক্ষুলজ্জা আর কেন? সকলেই বুঝি মানেটা এবং চাইচিও—অতএব ব্যবহার করিলে কিছু সততার পরিচয়ই দেওয়া হবে। কুলিমজুররা অল্পই বুঝে! বুঝলেই বা কি, আসতে বাধ্য। প্রকৃতি তাদের এনে দেবে নিজস্ব-হীন করে দিয়ে।

শ্রমিক দল নয় মরলই, মরবার জন্য যখন সৃষ্ট হয়েছে, কিন্তু এরা ভোগ করতে পারবে না কেন? পূর্ব্বকালের দাসদের (slave) চেয়ে এরা কোন্ অংশে ভাল? পূর্ব্বকালে দাস নাম ছিলো, এখন তাদেরই নাম হয়েছে শ্রমিক। পার্থক্য কোথায়? এরাই তৈরি করে, উৎপন্ন করে এরাই হাতে তুলে দেয় কিন্তু ব্যবহার করে অপরে, ভোগ করে অপরে, টাকা নেয় ক্রোড়পতিরা। এরা থাকে

অর্দ্ধ-উলঙ্গ, উলঙ্গ অবস্থায়—অনশনে, অর্দ্ধাশনে—অথচ এদের হাতে গড়া জিনিষ ব্যবহার করে, অপব্যবহার করে অপর লোক; এদের শরীরের রক্ত কেড়ে নিয়ে বলীয়ান হয়ে—এদেরই তুচ্ছ করে, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে, জুতার নীচে ফেলে পদদলিত করে। কে রাজা? কে মানুষ? কে সভ্য? কে উচ্চ, মহৎ লোক? যদি ভেবে থাক, তবে এর উত্তর দাও, পরখ হোক তোমার ক্ষমতার, তোমার মনুষ্যত্বের, তোমার সভ্যতার, তোমার মহত্বের। কেউ নেই, কেউ নেই; যদি কেউ থাকে—সে বারি-বিন্দু মাত্র, শীতের হাড়িমুখো আকাশের ঝরে-পড়া মুক্তার মত শিশিরকণা, অরুণালোকে সহজেই শুকিয়ে যায়, কেউ বুঝতে পারে না, জানতে পারে না, জাতির উপকার হতে পারে না।

এদের জন্ম ত' অপমৃত্যু, দুঃখ, দুর্দ্দশা, যন্ত্রণা, অপঘাত ও অত্যাচারের সঙ্গে যুঝবার জন্য; এমনি সভ্য দুনিয়ার মজার লীলা যে এরা চায় বাঁচতে, তাই যুঝে প্রাণপণ মৃত্যুর দুয়ার আশ্রয় করে, অদৃশ্য শত্রুদের (ক্রোড়পতিরা) তৈরি পিছল পথে পা পিছলে মৃত্যুর দিকে যে এগিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতে পারে না, পারলেই বা প্রতিকার কি? গলায় ফাঁস লাগানো আছে, যে দিকে ঢাল সেদিকেই যেতে হয়। এরা জন্মেই ফাঁসি গ্রন্থিতে গলা বাড়িয়ে রাখে, জ্ঞানের সঙ্গে মৃত্যুর করালগ্রাসে ভয় পেয়ে পলাতে চায়, প্রতিকারের জন্যে যুঝে। যুঝাটা মনকে চোখ ঠারার মত।

আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই, চমকে ওঠবার মত কিছু নেই, ভয় পাবার মতও নয়, ভাবনা চিন্তারও নয়, সভ্য জগতের সমস্যাও নয়। প্রায়ই উঠে চেঁচিয়ে, পাশের লোক যায় ছুটে, ধরাধরি করে মূর্চ্ছিত বা মৃত বা জখমযুক্ত শ্রমিকদের বাইরে নিয়ে আসে। কখনো কখনো কুলিমজুর টুকরো টুকরো হয়ে যায়, কখনো হয় নিষ্পেষিত। কী পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ! কেউ কেউ আর্ত্তনাদ করবার অবসর পায় না, কেউ মরমে মরমে অনুভব করে প্রকাশ করবার শক্তি হারিয়ে ফেলে, কেউ কেউ গোঙায়—গোঁ গোঁ করে, কেউ মরণ আর্ত্তনাদ করে অচেতন হয়, কখনো ভাঙ্গে ঘুম—কখনো আর ভাঙ্গে না। কী ভয়াবহ ব্যাপার। শুনলে আঁতকে উঠে প্রাণ, সে দৃশ্য দেখা যে কি, বলা কঠিন; ভাষা হারিয়ে ফেলতে হয়। বেল্টে জড়িয়ে ঘুরতে লাগলো, বাড়ী খেতে খেতে টুকরো টুকরো হয়ে পড়লো, মানুষকে মানুষ বলে চেনা যায় না। পড়ে গিয়ে, মালের চাপায় পড়ে, হাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো—বিষাক্ত গ্যাসে দলকে দল মরে গেলো, খনির চাপে জীবন্ত সমাধি পেলে, আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো, সমুদ্রের তলে জনমের মত আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। বলা সহজ, লেখা সহজ, ধ্বংস করাও সহজ—কিন্তু তারা? যারা অহরহ যাচ্ছে, যাদের লোক যাচ্ছে—তাদের কথা কি সহজ? বড় কঠিন, বড় অভিশাপ!…এতে না আছে অনুতাপ, না আছে শোক, না পড়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস, না দেয় আন্তরিক সান্ত্বনা, না দেখায় সহানুভূতি; অবশ্য যমরাজ্যে এরূপ প্রত্যাশা করা অনুচিত। এদের লোক দেখানো 'আহাঃ!' 'উঃ!' করার মূল্য আছে? যারা ধ্বংস হলো তারা কি ফিরে আসবে ও তাদের অসহায়, দুর্দ্দশাগ্রস্ত পরিবারের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? এই ছলনাময় সহানুভূতি বা নরহত্যার মূল্য কি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ দানে হয়? আইনে অনেক কিছু লেখা থাকে—কিন্তু কটা পরিবার আদালত ঘুরে এসে নিয়মমত মূল্য পায়? যে লোকই য়্যাক্সিডেণ্টে মারা যায়, তারা নিজের দোষে মারা যায় বলে আদালতে প্রমাণ হয় কেন? কারণ এরা অসহায়, গরীব, সাক্ষীর দল চাকরীর মায়ায় সত্য কথা বলতে সাহস পায় না। কী ভয়ঙ্কর অবিচার! কি নির্ম্মম অত্যাচার! এই সহানুভূতি—প্রাণের মূল্য যে যৎসামান্য অর্থে দেওয়া হয়—এর চেয়ে ভণ্ডামী—খারাপ কাজ আর কি হতে পারে! লোভ দেখিয়ে বঁড়সীতে মাছ গাঁথা কি সভ্যতা? অর্থ লোভ না দেখাইলে চলে, এদের ভুলাতে যে অর্থ দিতে হয় তাতে অন্য আমোদ চলতে পারে, এদের টাকা দিলেই কি—না দিলেই কি—আসবে, আসতে বাধ্য। একজন মরে গিয়ে যে স্থান খালি করবে, সে স্থানে শত শত লোক এসে দাঁড়াবে। যাদের পেট খালি তারা মৃত্যুর কথা কমই ভাবে, ভাবলেই বা প্রতিকার কি! এঁরা যেন লজেঞ্জুস খান, কখনো চুষে চুষে; কখনো চিবিয়ে। আমরা সভ্য—তাই এর নাম গতর-খাটা, মৃত্যুর নতুন নাম দৈব-দুর্ঘটনা।…

কারখানায় ডাক্তার সাহেব আছেন, ডিস্পেন্সারি আছে। ডাক্তার সাহেব কাটা চেরা করেন, ক্ষতস্থান বাঁধেন, হাড় যোড়া লাগাতে চেষ্টা করেন, ওষুধ-পত্তর দেন।

রোগীরা বস্তি হাসপাতালে আশ্রয় পায়। ব্যাপার গুরুতর নয়, জখম হয় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা পড়ে, ওষুধ পড়ে, হাসপাতালে বিশ্রাম নেয়। দীর্ঘ কঠিন কাজের পর পরিবর্ত্তন—অবসর। ব্যাপার আজগুবি নয়, মারাত্মক নয়, আলোচনা করবার মত নয়, পত্রিকায় লিখবার মত দরকারী খবর নয়। নিত্যি হচ্ছে, আদিকাল থেকে হয়ে আসছে, হবেও! যতদিন থেকে একদল লোক সভ্য হয়েছে ততদিন যাবৎ চলে আসছে এবং যতদিন এমনি সভ্য, ক্ষমতাশালী থাকবে ততদিন এমনি চলবে। চিরন্তনী ব্যাপার।··· কারো গেলো হাত ভেঙ্গে, কারো গেলো পা ভেঙ্গে, কারো মাথা ফেটে চৌচির। ছোট খাটো জখম যে নিত্যি কত হচ্ছে তা কে খবর রাখতে পারে। অভিশপ্ত শ্রমিক দলও দু'দিন বাদে ভুলে যেতে বাধ্য হয়। অতীতকে মনে রেখে জ্বলবে—মরবে—না বর্ত্তমানকে সামলাবে? অফিসাররা সহানুভূতি দেখিয়ে বলেন 'জখম গুরুতর নয়। রক্ষে যে প্রাণটা যায় নি; ঈস্ সেদিন যখন টাটকা মানুষটা মরে গেলো।' ব্যাপার গুরুতর নয় তা ত' পূর্ব্বেই বলেচি। কি হয়েছে? প্রাণ ত যায় নি! মাত্র ত' গেলো—নয় এক পা, নয় হাত, নয় চক্ষু, নয় বা শক্তিহীন জড় পঙ্গু হয়ে পড়লো, মারা যায় নি তো! এই অভিশপ্তের বংশ যখন ধ্বংস হবে না, তখন ভয় কি? একজনের স্থানে শত শত লোক এসে দাঁড়াবে। হায় অভিশপ্তের দল! হায় মন্ত্রে বশীভূত, জড়, চেতনাহীন জাতি!

কুলি মজুরদের কিন্তু হাসপাতাল আছে! টালির ঘর, নোংরা ছোট ছোট কোঠা, তাতে নেই আলো, নেই স্বচ্ছ নির্ম্মল হাওয়া, বর্ষাতে পড়ে চূণ ধোয়া জল। রোগীদের শোবার মেলে ঠাঁই, বিনা খরচে ওষুধ পত্তরও মেলে। কুলি মজুরদের জন্য 'সেবা' কথা সৃষ্টি হয় নি, তাই এদের কোন অবস্থায় শুশ্রূষা করবার প্রয়োজন হয় না। ডাক্তার সাহেব খুশীমত চোখ বুলালেন—কম্পাউণ্ডার সুবিধে মত দেখাশোনা করে। রোগীর পথ্য হাসপাতাল থেকে দেওয়া হয় না, রোগীর অশিক্ষিত আত্মীয়স্বজন খেয়াল মত লুকিয়ে অপথ্য, কুপথ্য রোগীকে খাওয়ায়।

ছুটায় আবার কলের বাঁশী বাজে। কুলি মজুররা হুড়মুড় করে গুদামখানা থেকে বের হয়ে আসে। গেটে দারোয়ান থাকে, জামার পকেট, কাপড়ের প্যাঁচ অনুসন্ধান করে দেখে—কোন জিনিষ চুরি গেলো কি-না। এবার চলার গতিতে জোর নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, সজীবতা নেই, যুঝিবার শক্তি নেই, দৃঢ় বিজিগীষা নেই, জীবনেচ্ছুও যেন নয়। টলতে টলতে চলে, কথা বলবার মত শক্তি থাকে না। সর্ব্বাঙ্গে কালিধূলি, এটা সেটা কত কি! অসাড় দেহ, রুক্ষ শুকনো মলিন বদন, স্তিমিত নয়নযুগল। কেউ খুঁড়িয়ে চলে, কেউ জখম স্থান চেপে ধরে চলে।· চলে, এমনি করেই চলে, চলুক, কোনভাবে বস্তিতে পৌঁছতে পারলেই হলো। ভাবনা দু'দিকেরই। ঘরে ভাবে স্ত্রী ছেলেমেয়ে, আশায় আশায় আসার পথপানে চেয়ে থাকে; কৈ আসে না ত, অসহ্য হয়, তবু আশা রাখে। মিলে বসে ভাবে শ্রমিক, থামবার উপায় নেই, চালাতে হবে, অপ্রতিহত গতিতে চলতে হবে, মজুরী নিতে হবে··থেমে আসে গতি, ঝিমিয়ে আসে নয়ন—ঘরের কথা হঠাৎ এসে মনকে চাবুক মারে, তাই আবার পূর্ণ গতিতে চলে।··

কুলি মজুরদের গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সকল ঋতুই সমান। দুঃখ, কষ্ট চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। রোগ একটা না একটা লেগেই আছে, গ্রীষ্মে সানষ্ট্রোক্ (Sun or heat stroke), মেনইন্‌জাইটিজ (meningitis), কলেরা, প্লেগ; বর্ষাতে কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া, বহুরূপী জ্বর; শীত কালটা একটু ভাল যায়—তবে বসন্ত, রক্ত আমাশয় নিষ্কৃতি দেয় না, যক্ষ্মা রোগ ত ঘরে ঘরে আছে।

গ্রীষ্মকালে জল নেই, সব পুড়ে যেতে থাকে, ঝাঁ ঝাঁ করা আগুনের হলকা চারিদিকে হোলী খেলে। কোন কোন স্থানের রাস্তায় বেরোমিটারে ১২০ ডিগ্রি টেম্পারেচার ওঠে, পিচের রাস্তাগুলি যেন উনুন। এই রাস্তার ওপর মানুষই কাজ করে। একদল বদ্ধঘরে বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসে বাতাস খায়, জলে সিক্ত খস্‌খসের ভেতরে গরম হাওয়া ঢুকে বাবুদের গায় শীতল হাওয়া দেয়, অপর দল উনুন তুল্য রাস্তায় বোঝা বয়ে চলে। অবশ্য কুলি মজুরদের জন্য এরি জন্য, ওদের সব সয়ে যায়। কয়লা কাঠের জন্য ভস্মীভূত হ'বার জন্য, কাঠের ধীরে ধীরে পুড়ে যাওয়া সয়! কাঠের যদি ভাষা থাকত তবে বলতো এই সয়ে যাওয়াটা কি? কেন অসহনীয় বাস্তবে সহনীয় হয়!! বর্ষাকালটা আরো ভয়ঙ্কর। কুলি-মজুর পাড়ার চারিদিকে বন জঙ্গলে

অপরিষ্কার ডোবা। কাঁচা রাস্তায় হাঁটু পর্য্যন্ত জলকাদা জমে। বাড়ীর ঘর-দোরে আশে পাশে যাবতীয় আবর্জ্জনা জমে—পচে নরকতুল্য করে তোলে। আবাল বৃদ্ধ নর-নারীর পাইখানা নেই; সাঁজের আঁধারে পুরুষ রমণী খোলা মাঠে ঝোপের আড়ালে পাইখানার কাজ চালায়। এদের লজ্জা-সরম শুধু অবস্থা বিশেষে। দুর্গন্ধ, অতি দুর্গন্ধ, হাড়-পচা, চামড়া-পচা, জীবজন্তু-পচা—কত কি পচে ভয়াবহ করে রাখে! মুক্ত স্বাধীন বাতাস সঙ্কুচিত হয়ে যায়, জমে যায়, থেমে যায়; এখানে সেখানে মরণ বীজাণু, বাতাসের প্রতি স্তরে বিষাক্ত বিষ ছড়িয়ে বেড়ায় রোগ-বীজাণু! কুকুর, বেড়াল, গরু কত কি বস্তির ধারে, বস্তির বুকের ওপর মরে থাকে; শিয়াল গৃধিনী এসে আরো ভয়াবহ বিকট রূপ গড়ে তোলে। খোলার ঘর, মাটির দেয়াল, অবিরাম বর্ষার জল পড়ছে, নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না, কাপড়-চোপড় বালিস, কাঁথা, ছেলে-পিলেকে নিয়ে জড় হয়ে বসে থাকে; এক কোণ থেকে অন্য কোণে যায়। শীতে কাঁপে, করুণ নয়নে ঊর্দ্ধে তাকায়। শীতকালে শীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না, ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখবার খরচ কি করে যোগাবে! তবে মিলের কুলি বস্তিগুলি একটু ভাল, অত মারাত্মক নয়, যেমন শহরের বাইরের বস্তিগুলি।

(৭)

কানাই মিলের কাজ একেবারে ছেড়ে দিয়ে গঙ্গাবতীর বাড়ীতে এসে স্থান নিলে। কোথায়ও মজুরী খাটে না, গঙ্গাবতীর রোজগারের ওপর জীবন চালাতে আরম্ভ করলে। গতর খাটাবার প্রবৃত্তি আর নেই। জানে, ভাল করে বুঝেও যে গঙ্গাবতী নিজের জন্য না হোক অন্তত সন্তানের জন্য গতরে খেটে রোজগার করবে, অতএব তার বিনা পরিশ্রমে দু'বেলা আহার জুটবেই। এত অধঃপতনে গিয়েছে যে কারো উপদেশ মানবে না, শুনবে না, চটে উঠে পাঁচ কথা শুনিয়ে দেয়; স্ত্রী যদি কোন কথা বলে তবে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, এমনি ভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বকাবকি করে যে ভয় হয়—আর একটি কথার প্রতিবাদ করলেই মারধর আরম্ভ করবে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে গঙ্গাবতী চুপ করে থাকতে পারে না, স্বামীকে বোঝাতে চায়, চোখে আঙ্গুল দিয়ে অভাব অভিযোগ দেখিয়ে দেয়, বোঝাতে চেষ্টা করে—স্বামী বুঝতে চায় না, স্বামিত্বের দাবীতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, আস্ফালন করে। গঙ্গাবতী থামে না স্ত্রীর কর্ত্তব্য হতে, প্রাণপণে অতীত সুখের ইতিহাস নয়নের পাশে এনে স্তরে স্তরে সাজায়, হৃদয়ের দুর্ব্বল তন্ত্রীতে মৃদু ঘা দিয়ে মূর্চ্ছনা জাগাতে চায়, দেখিয়ে দিতে চায় অতীত ও বর্ত্তমানের ব্যবধান, পরিবর্ত্তন, ভবিষ্যতের বিভীষিকা—দৃষ্টিহীন নয়ন দেখতে পারে না, পাষাণে গড়া হৃদয়-দোর খুলে না।

এমনি ভাবে বেশীদিন চললো না। সংসার অচল, আর জোর জবরদস্তি করেও সংসারের খরচ চলে না। অনাহারে, অখাদ্যে ছেলেপিলে সব রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে, ক্রমাগত অসুখবিসুখে সব জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে; অসুখবিসুখ বাড়ীতে লেগেই আছে। ছেলেপিলেগুলি মরণ-পথে এগিয়ে চলেছে; কানাইর কোন চৈতন্য নেই। সে সংসারের কোন ধার ধারে না। আসে, যায়, দু'বেলা পেট ভরে খায়, আপন মনে ঘুমায়, ঝগড়াঝাটি করে, রাগের মাথায় সব্বাইকে মারধর করে, জোর করে গঙ্গাবতীর রোজগারের টাকা নিয়ে মদ খায়, কুপল্লীতে আমোদ করে। বেকার হয়ে স্ত্রীর কষ্টার্জ্জিত টাকায় জীবন চালিয়ে, জোর জবরদস্তি করে—টাকা ছিনিয়ে নিয়ে কুপল্লীতে কুৎসিত আমোদ আহ্লাদ করতে একটুকুও দ্বিধাবোধ করে না, লজ্জা-বোধ করে না। অভুক্ত ছেলেমেয়ের, স্ত্রীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে বলে একটু সঙ্কোচ বোধ করে না। চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে যে, স্ত্রী প্রাণপণ খেটে সংসার চালাচ্ছে, এত পরিশ্রম করছে শুধু সন্তানদের বাঁচাবার জন্য—আর সে পুরুষ হয়ে, পিতা হয়ে, স্বামী হয়ে, সক্ষম, বলিষ্ঠ যুবক হয়ে—সন্তানদের ওপর করছে অত্যাচার, স্ত্রীর ওপর করছে নির্ম্মম অত্যাচার অবিচার। এতে তার পুরুষত্বে ঘা পড়ে না; মনুষ্যত্বে বাজে না, বরঞ্চ আনন্দিত হয়। গঙ্গাবতী পারে না. নারী দেহ ও মন নিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারে না, দেহ গুরু-পরিশ্রমে এলে পড়ে, বুকে ব্যথা বাজে, পারে না সময় মত সন্তানদের মুখে খাবার দিতে, যাও দেয় তাতে সন্তানদের পেট ভরে না—তাই মাথা ঠুকে স্বামী-দেবতার চরণে—মিনতি করে চোখ ফাটা অশ্রুজলে। কানাই লাথি মেরে সরে যায়, এতেও প্রতিদান দেওয়া হয় না, একটি একটি করে ছিনিয়ে নেয় স্ত্রীর শরীরের যৎসামান্য অলঙ্কার।

একটি একটি করে তিনটি সন্তান মারা গেল—অনাহারে, দুর্ব্বলতায়। কঠিন রোগে মারা গেলে সান্ত্বনা থাকে, মনকে প্রবোধ দেওয়া যায়, অদৃশ্য দেবতার ওপর দোষারোপ করে মনের রুচি অনুসারে অভিযোগ, গালাগাল দিয়ে পাগলা মনকে শান্ত করা যায়। কিন্তু এমন অপমৃত্যুর সান্ত্বনা খুঁজবে কি করে, কোন যুক্তিতে, কোন স্পর্দ্ধায়? জননীর চোখের ওপর একটি নয়, দু'টি নয়, তিনটি সন্তান না খেতে পেয়ে মারা গেল—দড়ির মত শুকিয়ে শুকিয়ে। মাংস ছিল কি-না বুঝা যেতো না, মলিন চামড়ায় ঢাকা কতকগুলি হাড় শুধু ছিল। উঃ! কী ভীষণ সে দৃশ্য! বলেছিল 'ওগো! বাঁচাও আমি যাবো না, থাকবো এই সুন্দর ধরণীর কোলে, থাকবো আমি করুণাময় ভগবানের সাম্যের শ্রেষ্ঠ রাজ্যে। ভগবান এত সুন্দর, এত ঐশ্বর্য্য ভরে পৃথিবী তৈরি করেছেন, জগৎপিতা হয়ে সবাইকে প্রীতির চোখে দেখছেন, পালন করছেন, এদেশ ছেড়ে যাবো না'—তারপর চেঁচালে খাবারের জন্য। কে খাবার দিয়েছিল এই অভুক্ত, মৃত্যুমুখী সন্তানদের মুখে। জননী? জননী তখন জীবন উৎসর্গ করে গতর খাটাচ্ছে অর্থের জন্য। পিতা? পিতা তখন কু-পল্লীতে। কেউ দেয় নি, করুণাময় ভগবানও দেন নি, জগতের অসভ্য স্বার্থপর পাষণ্ডগুলিও দেয় নি। কিন্তু গঙ্গাবতী জননী হয়ে কি করে পারলে? জীর্ণ, শীর্ণ, রুগ্ন ছেলেকে আফিম্-গোলা বিষাক্ত দুধ পান করিয়ে এমনি ঘুম পাড়ালে যে, সে ঘুম আর ভাঙ্গলো না। কাজ থেকে সন্ধ্যায় মজুরী হতে ফিরে এলো, খাবার হাতে ছুটে গিয়ে জাগাতে চাইলে সন্তানের ঘুম, অভিমানী আর জাগলে না, আর খেলে না। অভিমানী চিরকালের ঘুম ঘুমিয়ে মার গতর খাটাবার সুবিধে করে দিলে! অপর দু'টি সন্তান দুর্ব্বল, রুগ্ন শরীরে রীতিমত খাদ্য খেতে না পেয়ে, আফিম্ সেবনে ধীরে ধীরে জীবনীশক্তি হারিয়ে ফেলে, তারপর একদিন করুণাময় ভগবানের মহত্ত্ব বুঝতে পেরে—তাঁর শ্রেষ্ঠ জগত থেকে বিদায় নিলে, শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতিকে অভিশাপ দিতে দিতে। আমি জানি—ওরা প্রাণপণ চেষ্টা করবে—মৃত্যুর পর যদি অন্য কোথাও আশ্রয় নিতে হয়, তবে ভগবানের অধীন রাজ্যের ত্রিসীমানার ধার দিয়েও যাবে না। আপনাদের যদি হৃদয় থাকে তবে আপনারা অন্তত দুঃখ করুন বা না করুন—ওদের উপদেশ দেবেন না যে ভগবানের রাজ্যে আশ্রয় নিতে—এ আমার বিশ্বাস আছে; বিশেষতঃ যেখানে ভগবানের অন্ধবিশ্বাস ভিন্ন অস্তিত্ব নেই এবং সভ্য ও অসভ্য, মানব ও মহামানবের বাস।...

হায় জননী! এর পরও কি তুমি বাঁচবে, হাসি কান্না নিয়ে সংসার করবে? তোমার হৃদয় কি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় নি? তোমার মাথা কি এখন ঠিক আছে, মাথার কল কি এত বড় আঘাতেও বিকল হয়ে যায় নি? তোমার বুকে যে অগ্নিগিরি সৃষ্টি হয়েছে—তারপরও বাঁচবে কি করে? আরও একটি মেয়ে আছে, শেষ সম্বলকেও কি মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে দেবার জন্য তৈরি কচ্ছো?

কানাইএর হলো মহাস্ফুর্ত্তি? একটি একটি করে সন্তান মরে—আর কানাইএর আনন্দ যায় আরো বেড়ে। সংসারের খরচ কমে যাবে, অতএব তার সেচ্ছাচারিতা করবার পক্ষে মহা-সুযোগ। যে আয়ে ছ'জনের খরচ চলতো সেখানে মাত্র বাকি আছে তিনজন, রোগীর পথ্যও যোগাতে হবে না, তারপর আর একটিও যাবার মুখে, এটি গেলেই সব শেষ। তখন স্বামী স্ত্রী। গঙ্গাবতী যা রোজগার করবে, তাতে বেশ দিন চলে যাবে। বাকি সন্তানটা গেলেই হয়, আপদ মরেও না! কানাই শেষ সন্তানটির শীঘ্র মরণ কামনা করে। এদিকে গঙ্গাবতী তিনটি সন্তান হারিয়ে বড় কঠিন হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে একটি কথার আদান প্রদান করে না, স্বামী আসে যায় কোন ভ্রূক্ষেপ করে না, নীরবে কাঁদে, অশ্রু দর্ দর্ বেগে ঝরে, মলিন আঁচলে অতি দুঃখের অশ্রুগুলি মুছে ফেলে। অশ্রু মুছে মুছে হায়রাণ হয়ে পড়ে, অশ্রুর ওপর হাত দেয় না, ছেড়ে দেয় আপন মনে বইতে। স্বামী আসে, খাবার চাইলে খেতে দেয়, যদি খাবার না থাকে তবে চুপ করে থাকে, স্বামীর নির্ম্মম গালাগালি ও অত্যাচারের কোন প্রতিবাদ করে না; এখন আর পূর্ব্বের মত পাড়াপড়শীর নিকট ধার করে আটা, ছাতু এনে স্বামীদেবতাকে ভোজন করিয়ে পুণ্য করে না। খাবার থাকলে খেতে দেয়, না থাকলে দেয় না; নির্জ্জীবের মত কোলের শিশুটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকে। দিন-মজুরের মত যে দিন ইচ্ছা কাজে যায়, মজুরী আনে; হাতে পয়সা থাকলে কাজে

যায় না, দিনরাত সন্তানকে কোলে নিয়ে ভাবে—ভাবতে ভাবতে কখনো কাঁদে, কখনো শিহরে উঠে, কখনো রোষবহ্নিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। দিন দিন যেন অশ্রু শুকিয়ে যাচ্ছে, ভাবনায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠে, নির্ম্মম জ্বালা প্রকাশ করতে পারে না, পুরুষের মত জ্বালা, হাহাকার বুকে চেপে গাম্ভীর্য্যের মুখোস পরে অস্থির হয়ে পড়ে, প্রাণভরে অভিশাপ দিতে পারে না, চেঁচিয়ে কাঁদতে পারে না, কান্না পায়, খুব বেশীই কান্না পায়, কিন্তু কাঁদতে পারে না। দিন কারো বসে থাকে না, কেউ বসেও থাকতে পারে না দিনের জন্য—একদিন, দু'দিন—কিছুদিন চলতে পারে, বেশী দিন চলে না। থেমে থাকা যায় না, চলতেই হয় চলতি জগতে। গঙ্গাবতীকে আবার উঠতে হল, আবার রীতিমত সংসারে নামতে হল, নিয়ম মত মিলে যেতে হল। টাকা রোজগার করতে হবে, ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রেখে সাবধানে চলতে হবে। একটি মাত্র অবশিষ্ট সন্তান—তাকে সুখী করতে হবে, বাঁচাতে হবে, ঝড়োঝঞ্ঝার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। গঙ্গাবতী নিজের দেহের প্রতি বেশী দিন অত্যাচার করতে পারলে না, নিজেকে জোর করে খাওয়াতে হচ্ছে—মুখে খাবার উঠতে চায় না, মুখের গ্রাস পড়ে যায়, হু হু করে অশ্রু আসে মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে, তবু সয়ে সয়ে খেতে হচ্ছে। কর্ম্মপ্রেরণা জাগাতে হচ্ছে জড় মনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করে।

সন্তানগুলির মৃত্যুতে কানাই মহা প্রফুল্ল হয়েছিল। কিন্তু গঙ্গাবতীর হিমালয় সদৃশ উদাসীনতায় রীতিমত ভড়কে গেল। তার আশা যে নির্ম্মূল হয়—গঙ্গাবতী পুত্রশোকে দিন কতক কান্না-কাটি করে আবার সকলের মত সংসার করুক, শেষ সন্তানকে নিয়ে আমোদ করুক, পাড়াপড়সীর সঙ্গে গল্প-গুজব করে বেড়াক; খুশী হোক বা না হোক, আমোদ আহ্লাদ করুক বা না করুক, কানাইর তাতে কিছু মাত্র আসে যায় না। কিন্তু গঙ্গাবতীর গতর খাটাতে না যাওয়া যে ভীষণ ব্যাপার। গঙ্গাবতী রোজগার না করলে যে তার মহা ক্ষতি; অনুনয়, বিনয় করে প্রেমের ভান করে টাকা না আদায় করতে পারুক, জোর করে ছলনা করে ত' টাকা নিতে পারতো! পূর্ব্বে যদিও স্ত্রীর অনুরোধে কাতর প্রার্থনায় চটে উঠে বলতো—টাকা নেই, আটা ছাতু কেনা যাচ্ছে না, আমি করবো কি? সাধ করে গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে জন্মিয়েছো, এখন পার তো খাওয়াও, না পারো গলা টিপে শেষ করে দাও। আপদ মরলেই তো বাঁচা যায়। সন্তান কে চায়? আটকানো যায় না—হয়ে পড়ে। রাক্ষসগুলি খেয়ে খেয়ে সব শেষ করে দিলে। তবু গঙ্গাবতীর রোজগারের টাকা ছল চাতুরী জোর করে নিতে পারতো; এখন যে ছেলে-পিলেগুলি মরে গিয়ে মহা সর্ব্বনাশ করে ফেলেছে, খরচ যদিও কমেছে কিন্তু টাকা যে আর আসে না। এদের শোকে গঙ্গাবতী মিলে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। মিলের লোকগুলি সাধারণত খুব খারাপ—কিন্তু গঙ্গাবতীকে চাকরী যাবার ভয় দেখিয়ে শাসালে না, মিলে যেতে আদেশ দিলে না। দরদ দেখে কানাইএর হাড় জ্বলে। কানাই গঙ্গাবতীর বিসদৃশ হাবভাবে বড় বিপন্ন হয়ে পড়লে—যদিও সে গঙ্গাবতীর জন্য একটুও দরদের, প্রেমের, অতীত দাম্পত্য জীবনের কিঞ্চিৎ আকর্ষণ অনুভব করে না—তবু এবার করতে হল। সত্যকার আকর্ষণ নয়, প্রাণের অনুভূতি নয়, গঙ্গাবতীর রূপ, যৌবন, নারী দেহের জন্যও নয়, ছলনা—বদমায়েসী। কানাইএর গঙ্গাবতীর দেহের ওপর লোভ নেই, যদি একটু থাকতো তবে অত অত্যাচার করতে পারতো না, স্বার্থের জন্য অন্ততঃ তোষামোদ করতো। চরিত্রহীন, মাতাল পুরুষ মানুষ অতি সুন্দরী স্ত্রীর আকর্ষণে ভুলে না, বিশেষতঃ যে স্ত্রী নিরীহ, সাধ্বী, সতী। তারা বুঝতে পারে, কার্য্যক্ষেত্রে দেখতে পায়, যে স্ত্রীর দেহ পেতে কোন বাধা আসে না, জোর অত্যাচার চলতে পারে, যে ভাবে ইচ্ছা চালানো যায়, ইচ্ছে করলেই পাওয়া যায়, অপেক্ষা করতে হয় না; কষ্ট করতে হয় না। অবলা নারী! পুরুষ যে ভাবে চালায় সেই ভাবে চলতেই বাধ্য। প্রগতি যুগের নারীরা আপত্তি করতে পারেন যে গঙ্গাবতীর মত স্বাবলম্বী তেজস্বী স্বাধীন নারীকে দুর্বৃত্ত হীন মাতাল কানাই কি করে শুধু নারী-দেহ নিয়ে ইন্দ্রিয়লালসা পূরণ করে। হয়, হচ্ছেও অনাদি কাল থেকে। শরৎ চ্যাটার্জ্জি যতদিন থেকে কলম ধরেছেন তারপর থেকে এ সব কথা আর না লিখলেও চলে। নারীর বন্ধু, হিতাকাঙ্ক্ষী, পথ-প্রদর্শক—তাঁর মত আর কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই। 'নারীর মূল্য' স্বার্থের খাতিরে এক শত ভাল পুস্তকের তালিকায় স্থান না পেতে পারে, কিন্তু নারীদের নিকট যে শ্রেষ্ঠ পুস্তক—তা কি অস্বীকার করা চলে?

কানাই স্বার্থের খাতিরে দরদী হল, কৃত অপরাধের জন্য পাপের জন্য অনুতপ্ত হল। কাঁদার ভাণ করে স্ত্রীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে। গঙ্গাবতী দুর্ব্বৃত্তের ছলনায় ভুলে গেল, অনুতপ্ত স্বামীকে ক্ষমা করে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে হৃদয়ের ভারী বোঝা নামালে।···গঙ্গাবতী বড় আশা করে আবার ভাঙ্গা ঘর যোড়া দিলে। যদিও সে যোড়া দিতে বাধ্য হতো, মাতৃত্ব তাকে সংসারে নামাতে বাধ্য করতো; কি করে যে সে পাকা সংসারী হয়ে যেতো তা বুঝতেও পারতো না; কিন্তু স্বামীকে লাভ করে নিজেই আবার সংসারে নামলে। চির-বিষাদ-করুণ মুখে যদিও হাসি আর ফুটে না, তবু যেন একটু আশার ছায়াপাতে বিষাদ-করুণ মুখখানাকে বেশ সুন্দর করে তুললে। ধীরে ধীরে মৃত সন্তানের পিছে দিয়ে দেওয়া জীবনীশক্তি, মনের সজীবতা, কার্য্য-ক্ষমতা, জিজীবিষা ফিরিয়ে আনতে লাগলে; জড়তা, ক্লীবত্ব দূর হতে লাগলো। রীতিমত সংসারী হল, দৈব ঘাতপ্রতিঘাতের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, ঠেকিয়ে রাখবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলো। তাকে বাঁচতে হবে, স্বামীকে আবার মানুষ করতে হবে, মেয়েকে রক্ষা করতে হবে, মাতা পিতার স্নেহে বড় করে ভাল ঘরে বিয়ে দিতে হবে, তবে না তার ছুটি, মুক্তি, বিদায় নেবার সময় হবে। দুনিয়াতে যে তার মস্ত বড় কাজ রয়ে গেছে। স্ত্রী সে, বিধবা নয়, কুমারী নয়, কন্যার জননী; স্বামী ফিরে এসেছে, মস্ত বড় বোঝা তার মাথায়! সে জননী! মাতৃত্ব ত' ছেলে-খেলা নয়, মেয়ে বড় হবে—আসন্ন যুবতী মেয়েকে কুলোকের হাত থেকে, কুনজর থেকে রক্ষা করতে হবে, ভাল করে বিয়ে দিতে হবে, একি সহজ কথা! যারা চলে গেছে—যে অবস্থায়ই যাক—বাস্তবপক্ষে যখন চলে গেছে, তাদের শোকে ত' যে আছে তাকে মারতে পারে না, যেমনি হোক বাঁচাতে হবেই! মন ত' মানে না—প্রাণ উঠে কেঁদে, শক্তি ফেলে হারিয়ে, হাতের কাজ যায় তলিয়ে। উঃ! একটি একটি করে তিনটি সন্তান গেল জনমের মত চলে; ফাঁকি দিয়ে নয়, লুকিয়ে নয়, জোর করে নয়, নিয়তির ডাকে নয়, কালের ক্রুর অভিশাপে নয়, স্রোতে ভেসে চলে গেল চোখের ওপর দিয়ে; তারা তো যেতে চায় নি, কাল প্রহরী ত' মৃত্যু দণ্ড নিয়ে হানা দেয় নি, তারা ত' স্পষ্ট ধরে রাখবার জন্য কেঁদে খুন হয়েছিলো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ধরে রাখবার পথ বলে দিয়ে-ছিল বারবার, সতত। সেই তো জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছে, মৃত্যু দূতকে অভিনন্দন দিয়ে ডেকে এনেছে। অনাহারে তিনটি সন্তান শুকিয়ে মরলো। এ 'ত' জমিদার বাবুর বাড়ী। সারা বাড়ীময় হাহাকার অভাব। একটি পুত্রমুখ দেখবার জন্য কত হাজার হাজার টাকা উৎসর্গ করছে—পায় নি, তারপর টাকা দিয়ে কিনে আনে পরের ছেলে! নিজের রক্তে গড়া সন্তান—আর পরের সন্তান! আকাশ পাতাল ব্যবধান! আর সে চারটি সন্তান পেয়ে তিনটিকে হত্যা করলে! যার সন্তান নেই সে কত তপস্যা করে সন্তানের জন্য, কত দুঃখে বলে অমুকের অতগুলি সন্তানকে খাওয়াতে পারে না; সন্তান আর চায় না; আর আমার একটি হয় না!' দীর্ঘনিঃশ্বাস কেবলি ক্ষণে ক্ষণে পড়ে।

কানাই ভাল মানুষ সেজে দু'দিনে হাঁপিয়ে উঠলো। মদ খেতে পাচ্ছে না; চরিত্রহীন মাতাল বন্ধুদের সঙ্গে বারবনিতা গৃহে গিয়ে আমোদ করতে পাচ্ছে না। বন্ধুরা রোজই ডাকতে আসে, সে অর্থের অভাবে তাদের দলে যেতে পারছে না। কানাই প্রথম প্রথম গঙ্গাবতীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য গতরে খেটে রোজগারের টাকা এনে দিতো; যখন দেখলে গঙ্গাবতী তার ছলনায় ভুলে গেছে, তাকে পূর্ব্বের মত আদর যত্ন করছে, ভালবাসছে, দাম্পত্য জীবনের মাঝে যে দুষ্টগ্রহের আবির্ভাব হয়েছিল তার স্মৃতি—তার হৃদয়-বিদারক গভীর ক্ষতচিহ্নগুলি ভুলে যেতে চেষ্টা করছে—এমনি সুযোগে কানাই আবার বেঁকে বসলে। কাজে যাবার ভাণ করে বন্ধুদের মজলিসে যায়, মদ খেয়ে মাতাল হয়, রাত্তিরে ঘরে ফিরে। রোজ একটা না একটা নতুন মিছে কথা তৈরি করে বলে। কোন দিন বলে কাজ পায় নি, কোন দিন বলে এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিল; কি এক ওজুহাতে মস্ত বড় খাওয়া দাওয়া ছিল - কিছুতেই ছাড়েনি। কোন দিন গম্ভীরভাবে বলে—বোঝা বইতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায়, বহুক্ষণ অচেতন ছিল। এমনি ভাবে গা মোচড় দিয়ে কাতর শব্দ করে যে, গঙ্গাবতী করুণ নয়ন তুলে খুঁটে খুঁটে সব কথা জিজ্ঞেস করে, কোমল হাতে গা টিপে দেয়।

এমনি ভাবে দিন চললো ওদের। গঙ্গাবতী যদিও কানাইএর চাতুরী ক্রমে ভাল করে বুঝতে পারলে—তবু কোন প্রতিকারের চেষ্টা করতে পারলে না। কানাই প্রতিকারের

স্বামীর কুপ্রস্তাবে গঙ্গাবতী শিউরে উঠে, ভয়ে জড় সড় হয়ে যায়। নারীত্বের উজ্জ্বল দীপ্তি মলিন হয়, চেতনা নির্জ্জীব হয়, অচেতন হয়, দাম্পত্য-ছবি ভয়াবহ হয়, নির্ম্মম অভিশাপ হয়, দেহ মন শিথিল হয়ে পড়ে। গঙ্গাবতী জড় মনে এই কথাটাই ভাবে—মানুষ পারে কি নিজের স্ত্রীকে লম্পটের কাম অনলে আহুতি দিতে? মানুষের কি এত শক্তি থাকতে পারে?

কানাই পাতালপুরীর মত ভয়ঙ্কর নীরবতায় জ্বলে উঠে, রুক্ষস্বরে বলে 'হ'য়েছে, রাখ্ বাবা! সতীপণা আমার নিকট মারতে হবে না। লোকে চলে পাতায় পাতায়, আমি চলি বাতাসে বাতাসে। কোন শালীকে আমি চিনি নে, বলুক ত' এসে আমার সামনে, দিন ক্ষণ শুদ্ধ বলে দিতে পারি।'

'সকলেই তোমাদের মত চরিত্রহীন নয়, আর হলেই যে আমাকে হতে হবে—' 'রাখ্-রাখ্, আর বক্তিমের কাজ নেই। আমি সব মাগীকে চিনি। বলবো—বলবো নাকি? তোমাকে পাড়ার কোন লোকটা বাকি রেখেছে—' 'চুপ্। নিজেকে দিয়ে সবাইকে বিচার করো না। তুমি চরিত্রহীন, মাতাল, নির্দ্দয়, কিন্তু স্বামী। স্বামী হয়ে অত বড় মিথ্যা কথা বলতে একটু দ্বিধা হয় না!' রাখ্ রাখ্ বাবা! বহু সতী দেখেচি! সতী নিয়েই আমাদের কারবার, এখন হাড়ে ঘুন ধরে গেছে। প্রকাশ্যে গেলে চক্ষুলজ্জা হয়, রাত্তিরে গেলেই হয়। যেমনি করে আমায় ফাঁকি দিয়ে রাতে মজা ক'রো। এ পাড়ার যত সব সতী দেখো—সব্বাই রাত্তিরে অভিসারে গিয়েছেন, এখন তোমার পালা। তুমি বর্ত্তমানে বন্ধ্যা কি-না—রূপ যৌবন উছলে পড়ছে শ্যামজী বলেন; তাই রোজগার খুব বেশী হবে। টাকাকড়ি, দাসদাসী, বাড়ী, অলঙ্কার কত কি? ঈস্—!

গঙ্গাবতীর গায় আগুন জ্বলে উঠে। উপায় নেই, প্রতিকার নেই। কথা কাটাকাটিতে শুধু জঞ্জাল বেড়েই চলে—নোংরা হয় বেশী, নারীত্ব বুকে চেপে ভয়ে ভয়ে সরে পড়ে, টল্‌তে টল্‌তে যায় বহু দূর। কানাই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে—বাবা! আমার চোখে ধুলো! চোখ দেখলে নাড়ী নক্ষত্র পর্য্যন্ত টের পাই। ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছে। শ্যামজী বাড়ী মেরামত করে দেয়, এটা সেটা পাঠায়, আমি অত বোকা নই যে সুন্দরীর মুখে না শুনে বিশ্বাস করবো। সব খবর রাখি, সবই বুঝি। মিছে কেন সাধুগিরি মারা হচ্ছে।'

গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা বহুদিন রটেছিল, দিন দিন আরো খারাপ রূপে প্রকাশ্যে ভাসতে লাগল। পূর্ব্বে অলক্ষ্যে নানা গুজব আলোচনা হতো, এখন প্রকাশ্যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বস্থানে আলোচনা হয়। এমনি ভাবে এরা কুৎসা আলোচনা করে যে—গঙ্গাবতী যেন বস্তির কলঙ্ক, বস্তির বুকে বসে ব্যভিচার করছে, তার ব্যভিচারে ঘরের মেয়ে-ছেলেরা নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব এর প্রতিকারের প্রয়োজন। এরা এমনি ভাবে গঙ্গাবতীকে কথা শোনায়—যেন এরা সকলি অতি সৎ চরিত্রবান—এ বস্তিতে একটিও অসতী মেয়ে নেই, যারা প্রলোভনে পড়ে পা বাড়িয়েছিল মাত্র বা পা বাড়াতে যাচ্ছিল, সমাজের মাতব্বর নরনারীদের কঠিন শাসনে অসতী হতে পারে নি; মাঝে মাঝে ভয় ত দেখায় যে শ্যামজীকে ওরা আর মানবে না, চুলের মুঠি ধরে গঙ্গাবতীকে বস্তি থেকে তাড়িয়ে দেবে, বস্তির মজ্জায় বাসা বেঁধে পাপ ব্যবসা করতে দেবে না।

গঙ্গাবতীর নামে কুৎসা এত অশ্লীল হতো না, বস্তির দুষ্টলোকদের ও অসতী নারীদের মনেপ্রাণে গঙ্গাবতী জীবন মরণ সমস্যার মত হয়ে উঠতো না। একে বস্তির অসতী নারীরা নিজের কলঙ্ক পুরাণো করবার জন্য অপরের কলঙ্ক খোঁজে, তার ওপর গঙ্গাবতীর ওপর শ্যামজীর মত টাকাওয়ালা লোকের নজর পড়াতে হিংসা হলো খুব বেশী; এতদিন আত্মদাহের মত জ্বালা গোপনে বলাবলি করতো—এখন কানাইএর সাহায্য পেয়ে বেশ সুযোগ ও জোর পেলে। এসবের একটা মজা—যে গুজব খুব ভাল করে রটে, লোকে এমনি ভাবে বলাবলি করে যেন বক্তা প্রত্যক্ষদর্শী, কিন্তু যখনি জিজ্ঞাসা করা হয়—সে নিজে দেখেছে কি-না বা শুনেছে কি-না—তখনি বল্‌বে যে সে দেখেনি বা শুনেনি—তবে ওমুকের নিকট শুনেছে। ওমুককে জিজ্ঞেস করলে সেও অপর একজনের নাম বলে, কেউ প্রত্যক্ষদর্শী হয় না, বিশেষতঃ যেখানে একটু ভয়ের কারণ থাকে। আরো একটু মজা যে চালাকচতুর লোকরা বোকা লোকদের মুখ দিয়ে এসব কুৎসা রটায়, এরাও তোষামোদে সন্দেহকে নিশ্চয় সত্য বলে লোকের নিকট বলে।

কানাই গম্ভীরভাবে লোকের নিকট বলে বেড়ায় যে, সে নিজে গঙ্গাবতীকে শ্যামজীর বাগান-বাড়ীতে দেখেছে। প্রায় রাত্তিরে শ্যামজীর মোটর আসে, গঙ্গাবতী লুকিয়ে পালিয়ে যায়, আবার শেষ রাত্তিরে বাড়ী ফেরে। যেদিন সে বাড়ী থাকে না, শেষ রাত্রের দিকে ঘরে ফিরে দেখেছে—তার শয্যায় শ্যামজী ও গঙ্গাবতী আমোদে নিশি কাটাচ্ছে, এই নিয়ে কত ঝগড়া। শ্যামজী এর জন্য তাকে টাকা দিয়েছিলেন। সে বাধা দেয় বলেই তার সঙ্গে গঙ্গাবতীর রাত্তির দিন ঝগড়া বিবাদ হয়। গঙ্গাবতী নাকি শিগ্‌গিরই শ্যামজীর কেনা নতুন বাড়ীতে চলে যাবে, একটা মোটর গাড়ী পাবে, টাকা পয়সার ত' কথাই নেই।…

কানাই দুর্ণাম করে—মাতাল হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে, পাষণ্ড চরিত্রহীন বলে নয় শুধু, তার একটা গূঢ় কূট অভিসন্ধি আছে। অসতী বলতে বলতে, সমস্ত লোকের নিকট থেকে নির্য্যাতন, অপমান পেতে পেতে একদিন আপনি বাধ্য হবে—মিথ্যাকে সত্যরূপে প্রকাশ করতে। পাগল করা জ্বালাতনে কতদিন সতী রইতে পারবে, ধিক্কারে স্বেচ্ছায় অসতীর পথ নেবে—আত্ম-সমর্পণ করতেই হবে। আত্ম-সমর্পণ করে যে প্রতিশোধ নিতেই হবে। মানুষ যখন শ্রেষ্ঠ, সৎ, ভাল জিনিষে আত্ম-উৎসর্গ করে পায় না বা ধরে রাখতে পারে না—অদৃশ্য শত্রুর অক্লান্ত আঘাতে—তখন ঠিক তার উল্টোটাকে আশ্রয় করে। কানাইও ঠিক বুঝেছে যে গঙ্গাবতীকে ক্ষিপ্তা করতে হবে, তার মনে ধিক্কার জন্মাতে হবে, তাহ'লেই তার অভিষ্ট সিদ্ধ হবে। গঙ্গাবতীর মত নারীকে যদি একবার আসরে নামাতে পারে—তবে সে মনের সুখে রাজার হালে গণিকা, মদ ও বন্ধু নিয়ে দিন কাটাতে পারবে।

গঙ্গাবতী অচল, অটল, মূক, বধির, চেতনাবিহীন। যেন সে হিমালয়—প্রাণও নেই, চেতনাও নেই। ঘরে ও বাইরে কোন দুষ্ট হাওয়া তাকে কাবু করতে পারে না, পারলে না। আপন মনে কাজে যায়, গম্ভীরভাবে কাজ করে, সন্ধ্যার সময় দ্রুত হেঁটে বাড়ী আসে। রাস্তায় কারো সঙ্গে বাক্যালাপও সহজে করে না। গেটের নিকট কানাই লুকিয়ে থাকে, হঠাৎ গঙ্গাবতীকে আক্রমণ করে, গঙ্গাবতীর মজুরী কেড়ে নিয়ে ছুটে পালায়। কাকুতি মিনতি শোনে না, কোলের শিশু ভয়ে চেঁচিয়ে উঠে, শিশুর জন্য ভিক্ষে চায় কিছু স্বার্জ্জিত পয়সা, কানাই দাঁত খিঁচিয়ে বকে, ছুটে যায় বন্ধুদের সঙ্গে কুপল্লীতে। এ সকল দুর্বৃত্তরা রাস্তায় হিসেব করে—কোন বন্ধু কত ছিনিয়ে আনতে পারলে। এপ্রকার নির্য্যাতিতা নারীরা ভয়ে মজুরীর পয়সা সঙ্গে আনে না, সঙ্গীদের নিকট রেখে দেয়। ওদের পাষণ্ড স্বামীরা যেদিন স্ত্রীর নিকট মজুরী পায় না, সেদিন নির্দ্দয়ভাবে মারধর করে, রাস্তার মাঝে বিবস্ত্রা করে পয়সা অনুসন্ধান করে। কুলি রমণীরা যত চতুর হয় দৈহিক অত্যাচার তত আরো বাড়ে। রাস্তার লোক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখে। পুলিস বা ভাল লোকের নজরে পড়লে এসব হতভাগা নারী রক্ষা পায়, অবশ্য এর সব নারীই আবার স্বামীকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচায়, অন্য কোনদিন এমন কাজ করবে না বলে নিজেরা জামীন হয়।

(ক্রমশঃ)



—ঠাকুরমা—

শ্রীসুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(Victor Hugo রচিত "The Grand-Mother"এর অনুসরণে)

হ্যাঁগো ঠাকুরমা ? আচ্ছা তোমার ঘুম ! সারা দুপুর ঘুরছি মোরা একলা হেথা।
ঘড়িতে যে বাজ্‌লো ক'টা—নেইক খেয়াল দেখিইনিকো মোরা ;
ওঠো, ওঠো, শুন্‌ছো ঠাকুরমা ! নেইক কেন মুখে কোন কথা !
ঠোঁট দু'খানি ঠাণ্ডা এমন কেন ? তোমার ঘুমে, তোমার মুখে
আমরা দেখি বিশ্বমায়ের স্বর্গ-রূপের ধারা ।
ঘুমও তোমার ঢের দেখেছি—ঠাকুর-ডাকা সেও দেখেছি—
কিন্তু তুমি এমন কেন হলে ?
যখন তুমি করতে তোমার পূজা-আরাধনা, শান্তিভরা বিশ্রামেরি ক্ষণে ;
তার মাঝেও শুভ্র আশীষবাণী, আমাদেরি মঙ্গলেরি তরে—শুনেছিগো
তোমার ঠোঁটের কোণে।
এ'ন তুমি এমন কেন হলে ?

*　　*　　*　　*　　*

চোখ দুটিতে পলক নাহি পড়ে, মাথাখানি ঢল্‌ছে নীচের দিকে, -
বুড়ো মানুষ ! হিমের পরশ অঙ্গে বাজে বড়, ঘরের কোণে আগুন
জ্বালা আছে—পড়ছে তা'তে ছাই ।
ঘরের প্রদীপ শীঘ্র যাবে নিবে—কি ঘুম তোমার আজকে এলো চোখে ?
রাগ করেছো ? হ্যাঁগো ঠাকুরমা ? মনে তোমার দিইছি কোন ব্যথা ?
সেই কথাটা বলেই ফেল তাই !
একি হলো ! এমন কেন হলে ! হাত দু'খানি ঠাণ্ডা তোমার কেন !
আচ্ছা এসো, আমরা মোদের তপ্তরাঙা জীবন-কণা দিয়ে—
তোমার দেহে জাগাই জীবন-জ্যোতি ।
তা'হলে তো গাইবে তুমি মোদের কাছে প্রাচীনকালের গীতি ?
বলবে তুমি তো ? পুরাকালের বীরপুরুষের মহৎজনের কথা ?
ভয়ঙ্করী রাক্ষসীদের কথা ? লুকিয়ে যারা থাকতো শুয়ে—
ধরতো মানুষ ঝড়ের মত এসে ?
বলবে কোন রাজকুমারীর কথা ? গাইবে তাহার প্রেমাস্পদের
ভালবাসার সহজ সুখের গাথা ?
শিখিয়ে দেবে যত্ন করে শুদ্ধ নীতি-কথা ? স্মরণ পথে পড়লে
পরে যাহা—মনের যত ময়লা যাবে চলে ;—
পড়লে পরে মনে—দূরে যাবে অশরীরী প্রেতাত্মাদের ভয়—ভুলবো
নাকো ভগবানের ব্যাথার-মালার কথা, বিশ্বজনে ত্রাণ করিবার কালে ।
কিম্বা তুমি পড়বে মোদের কাছে তোমার-চির-জীবন-আলো-করা
ধর্ম্ম পুঁথিখানি ?—

যাহার পাতায় পাতায়—সোণার মত শুদ্ধ আলোক-রেখায় লেখা
আছে সাধুর জীবন-কথা, ধর্ম্ম যা'দের মর্ম্ম-কথার মত।
সেই পুঁথিটি পড়তে তুমি যখন আনন্দেতে—যাহার শ্লোকের মাঝে
সুরটি মেলে—কেমন করে পতিতদের তরে চিন্তা করে দেবদূতেরা যত!
আচ্ছা ঠাকুরমা! এত কথা বলছি মোরা!—
তোমার মুখের ভাষা কোথায় গেলো!
কণ্ঠ নীরব কেন?
ওরে ও ভাই দেখরে তোরা সব! আলোয় যেন পড়ছে আবরণ—
লাগছে যেন সবই এলোমেলো—
ঘরের দেওয়াল মৌন দুঃখে যেন!

* * * * * *

জাগো, জাগো, ঘুমের থেকে ওঠো—দূর করে দাও দুষ্ট প্রেতের ছায়া—
তোমার ঘরের পবিত্রতা গ্রাসে;—
ঐ দেখা যায় শীর্ণ-হাতের কৃষ্ণ ঘন ছায়া—ওঠো, ওঠো, উঠে বসো,
ভয় যে বড় পাচ্ছে মোদের, শুন্‌ছো ঠাকুরমা!
ঘরের আলো কখন গ্যাছে নিবে—জ্বাল্‌লে পরে হয়—মনের মাঝে
এই বারেতে কি হারানোর ভয় যে ওঠে ভেসে।
আজকে মোদের পড়ছে মনে তোমার কথা—
বাবা ও মা মরণ-পরশ পেয়ে—
নিরালা ঐ গীর্জ্জা কোণের মাটির মায়ায় ঢাকা
হঠাৎ একি হলো? তোমার চোখের নাইক কোন গতি—
মুখে নাকে নাইকো শ্বাসের লেশ!
দেহ এত হিম ও কঠোর কেন? কোথাও কোন নাইকো বাঁচার সাড়া!
এই কি তবে শঙ্কাকারী মরণ?
কিম্বা তোমার বিশ্রামেরি ঘুম! কিম্বা তোমার আরাধনার ডাকা!

* * * * * *

ক্লান্ত-বিষাদ-চোখে রাত্রি সারা রইলো জেগে তা'রা—
ঠাকু'মার ঐ অসাড় দেহ ঘিরে;—
স্বর্গ হতে দেবদূতেদের স্নিগ্ধ আলোর রেখা—
মনে হলো পড়লো চারি পাশে।
সারা গ্রামে নামলো শোকের ছায়া—গীর্জ্জা-ঘড়ি বাজলো, উঠে ধীরে;—
শুদ্ধ-বেশে ধর্ম্ম-যাজক এলেন পুঁথি হাতে—হলেন নতজানু—
করযোড়ে জানিয়ে দিলেন একটি সসীম জীবন—
গেল অসীম দেশে।

ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী

শ্রীবিমলাচরণ লাহা, এম-এ, বি-এল, পিএইচ-ডি

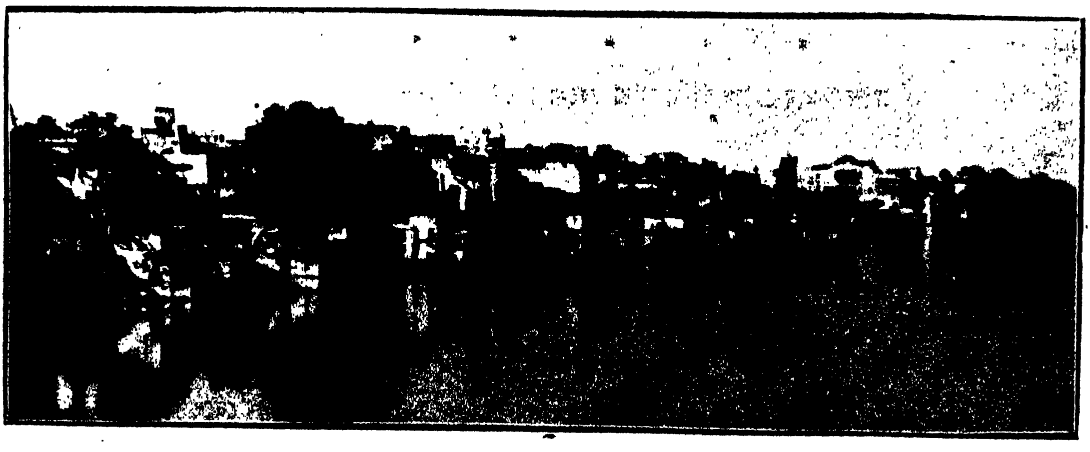
রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ হইতে ভারতবর্ষের পর্ব্বত ও নদী সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বত সুলেইমান হইতে আসাম ও আরাকান পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। হিমালয় অথবা হিমাদ্রি পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষ অবস্থিত। গঙ্গা, সিন্ধুনদ, কাবুল এবং সোয়াট্ নদী হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের মতে কৈলাশ পর্ব্বত হিমালয় পর্ব্বতের একটি অংশ। মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে ইহা একটি সম্পূর্ণ পৃথক পর্ব্বত। মেরু এবং নিসদ হিমালয় পর্ব্বতের অন্তর্গত। গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কুহু, গোমতী, ধুতপাপা, বাহুদা, দৃষদ্বতী, বিপাশা, দেবিকা, নিশ্চীরা, গণ্ডকী, কৌশিকী এবং রংকু—এই সমস্ত নদীগুলি হিমালয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে গঙ্গা নারায়ণের পাদদেশ হইতে উত্থিত হইয়া সুমেরু পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত। পরে গঙ্গা চারিটি ক্ষুদ্র শাখায় পরিণত হইয়া পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে প্রবাহিত হইত। ইহার দক্ষিণ নদ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত। মহাভারতে ও পুরাণে গঙ্গাকে "ত্রিপথগা" বলা হইয়াছে কারণ এই নদীটি তিনদিকে প্রবাহিত।

সরস্বতী নদীটি যমুনা এবং সাট্লেজের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এক সময়ে ইহা একটি খুব বিখ্যাত নদী ছিল, পরে ইহা "বিনসন" নামক মরুভূমিতে পরিণত হয়। ইহা



গঙ্গা (বারাণসী)



যমুনা

সিন্ধুনদের একটি শাখা এবং সিন্মুর পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত। বৈদিক-যুগে সরস্বতী একটি সুপ্রসিদ্ধ নদী ছিল। চালাউর গ্রামে বিলুপ্ত হইয়া ভবানীপুরে ইহা পুনঃ উত্থিত হয়। ঘরঘর সরস্বতী নদীর নিম্নভাগের নাম। চমসোভেদ, শিরোভেদ এবং নাগোভেদ এই তিনটি স্থানে সরস্বতী নদী পুনঃ উত্থিত হয়। সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু এবং বিমলোদকা এই সাতটি নদী সরস্বতী নামে পরিচিত ছিল।

সিন্ধুনদ বর্ত্তমানে ইন্দাস্ নামে পরিচিত। চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমস্থানের উপরিভাগকে সিন্ধুনদ বলা হইত। ডেরায়াসের বেহিস্তান শিলালিপিতে এই নদীটি হিন্দু নামে পরিচিত।

মার্কণ্ডেয়-পুরাণের মতে চন্দ্রভাগা নামে দুইটি নদী ছিল। পাঞ্জাবে চেনাব্ এবং চন্দ্রভাগা অভিন্ন। ঝেলাম্ এবং চেনাব্ নদীর সঙ্গম স্থানকেও চন্দ্রভাগা বলে।

বিয়াস্ নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থানকে "ঘগ্গর" বলা হয়। টলেমির জারাড্রস (Zaradros) এবং শতদ্রু অভিন্ন।

বিতস্তা এবং বর্ত্তমান ঝেলাম অভিন্ন। কাশ্মীরে এখনও



নর্ম্মদা নদী

পর্য্যন্ত এই নদটি বিতস্তা নামে পরিচিত এবং এই নদী ও 'হাইডাস্পেস্' অভিন্ন। বৈদিক আর্য্য এবং বৌদ্ধদিগের নিকট এই নদী বিতংসা নামে পরিচিত ছিল। ইরাবতী



কৃষ্ণা নদী

যমুনা নদী বর্ত্তমানে তাহার পুরাতন নামে পরিচিত। শতদ্রু নদী এবং বর্ত্তমান সাট্লেজ অভিন্ন। সাট্লেজ ও এবং রাবি অভিন্ন। কুহু নদী এবং বর্ত্তমান কাবুল নদী অভিন্ন। গোমতী নদী এবং বর্ত্তমান গোমল নদী সম্ভবতঃ

অভিন্ন। সিন্ধু নদের পশ্চিম শাখা গোমল নামে পরিচিত। আমাদের মনে হয় যে গোমতী নদী চম্বল নদীর একটি শাখা। কাহারও কাহারও মতে ধূতপাপা একটি প্রসিদ্ধ বর্ত্তমান রামগঙ্গা অভিন্ন। কনোজের নিকটে বামদিকে গঙ্গার সহিত বাহুদা নদী মিলিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে বাহুদা ও ধবলা (বর্ত্তমান ধুমেল কিংবা বুড়োরাপ্তি)



কাবেরী নদী

নদী এবং ইহার বর্ত্তমান নাম ধোপাপ। বারাণসীর নিকটস্থ গঙ্গার একটি শাখাবিশেষ ছিল। বাহুদা নদী এবং অভিন্ন। পার্জিটার সাহেব বলেন যে দক্ষিণাপথে বাহুদা নামে আর একটি নদী ছিল। মহাভারতের মতে এই বাহুদা নদীতে স্নান করিয়া "লিখিত" নামে একটি ঋষির খণ্ডিত বাহু জোড়া লাগিয়াছিল। শিবপুরাণের মতে গৌরী নদী বাহুদা নদীতে পরিণত হইয়াছিল।



ব্রহ্মপুত্র নদী

দৃষদ্বতী নদী ব্রহ্মবর্ত্তের দক্ষিণ এবং পূর্ব্ব সীমানা দিয়া প্রবাহিত হইত এবং পশ্চিম সীমানায় সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইত। মহাভারতের মতে এই নদীটি কুরুক্ষেত্রের একটি সীমানা বলিয়া পরিগণিত ছিল। দৃষদ্বতী নদী এবং চিত্রাঙ্ অভিন্ন। কাহারও কাহারও মতে 'ঘগর' নদী এবং দৃষদ্বতী অভিন্ন।

বিপাশা নদী বর্ত্তমান বিয়াস্ নদী

নামে পরিচিত। ঋষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে অভিভূত হইয়া নিজের হাত পা বাঁধিয়া প্রাণত্যাগ মানসে এই নদীতে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নদী তাঁহার প্রাণ বিনাশ করে নাই।

দেবিকা নদী হিমালয় হইতে উত্থিত হইয়াছে এবং দীগ্ নামে রাবী নদীর একটি শাখা এবং দেবিকা অভিন্ন। অগ্নিপুরাণের মতে সৌবীর দেশের মধ্য দিয়া এই নদী প্রবাহিত হইত এবং সিওয়ালিক পর্ব্বতমালার মৈনাক পর্ব্বত হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছিল। যুক্তপ্রদেশের দেবা দেবিকা অভিন্ন। সরযূ নদীর দক্ষিণভাগের অপর একটি নাম দেবা এবং উত্তরভাগের নাম কালী নদী। কালিকা-পুরাণের মতে ইহা গোমতী এবং সরযূর মধ্যভাগ দিয়া প্রবাহিত। মহাভারত এবং বরাহ-পুরাণের মতে গঙ্গা, সরযূ, গণ্ডক এবং দেবিকার সঙ্গমস্থলে কুমীর এবং হস্তীর কলহ হইয়াছিল।

নিশ্চীরা নদী নিশ্বীরা নামে বায়ুপুরাণে পরিচিত। নিশ্চীরা নদী এবং লীলাঞ্জন অভিন্ন। ইহার সঙ্গমস্থান ফল্গু নামে পরিচিত। ইহাই বৌদ্ধদিগের নেরঞ্জরা।

গণ্ডকী নদীর বর্ত্তমান নাম গণ্ডক এবং ইহার তীরে বিষ্ণু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ইহার পুরাতন নাম ছিল শালগ্রামী ও নারায়ণী। কৌশিকী নদীর বর্ত্তমান নাম কুশী। বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

ত্রিস্রোতার বর্ত্তমান নাম তিস্তা। ইহা ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে। বাঙ্‌লা-দেশের অন্তর্গত বগুড়া জেলার মধ্য দিয়া করতোয়া নদী প্রবাহিত। আপগা নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

ভারতবর্ষের সপ্ত-কুলাচলের মধ্যে কলিঙ্গ দেশের মহেন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাহার পর পাণ্ড্য দেশের মলয় পর্ব্বত, অপরান্তের সহ্য পর্ব্বত, ভল্লাট দেশের শুক্তিমৎ, মাহিষ্মতীর ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং মধ্যভারতের অন্ত পার্ব্বত্য দেশ এবং নিষাদদিগের কারিপাত্র। কাব্যমীমাংসার গ্রন্থকার রাজশেখর এই সাতটি কুল পর্ব্বতকে ভারতবর্ষের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ভারতবর্ষ কুমার-দ্বীপ নামে পরিচিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে মহেন্দ্র



চিনাব নদী

পর্ব্বত গঞ্জামের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বঘাটের অপর একটি নাম। কালিদাসের রঘুবংশে বহুবার মহেন্দ্র পর্ব্বতের উল্লেখ আছে এবং ইহা কলিঙ্গ দেশে অবস্থিত। রামায়ণের মতে মহেন্দ্র



ঝেলম নদী

পর্ব্বত গঞ্জাম হইতে পাণ্ড্যদেশের দক্ষিণ পর্য্যন্ত অবস্থিত। টিনেভেলি জেলায় মহেন্দ্রগিরি নামে একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বত আছে। হর্ষচরিত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে যে

মহেন্দ্র পর্ব্বত মাদুরার দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মহাভারতে এবং পুরাণে কতকগুলি ছোট ছোট পর্ব্বতের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা শ্রীপর্ব্বত এবং পুষ্পগিরি। অগ্নিপুরাণের মতে কাবেরী-সঙ্গমের নিকটে শ্রীপর্ব্বত অবস্থিত। ইহাকে শ্রীপর্ব্বত বলিত কারণ বিষ্ণু শ্রীর উদ্দেশে এই পর্ব্বতকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ভেন্কটাদ্রি, অরুণাচল এবং ঋষভ নামে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নামোল্লেখ



হিমালয় পর্ব্বত

পুরাণে আছে। মহেন্দ্র পর্ব্বতমালা হইতে যে সমস্ত নদী উত্থিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে পিতৃসোমা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গুলিনী এবং বংশকরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিসিমা, ঋষিকা এবং বংশধারিণী শুক্তিমান পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে। এই ছয়টি নদী ছাড়া মৎস্যপুরাণে আরও তিনটি নদীর নাম পাই—তাম্রপর্ণী, শরবা এবং বিমলা। ঋষিকুল্যা নদী বর্ত্তমানে পুরাতন নামেই পরিচিত এবং গঞ্জাম দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে ত্রিদিবা নদী উত্থিত হইয়াছে। লাঙ্গুলিনী নদী এবং বর্ত্তমান লাঙ্গুলীয় নদী অভিন্ন। এই লাঙ্গুলীয় নদীর তীরস্থ ভিজিয়ানাগ্রাম এবং কলিঙ্গপটমের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চিকাকোল নগর অবস্থিত। বংশকরা নদী এবং বর্ত্তমান বংশধরা নদী অভিন্ন। এই বংশধরা নদীটি কলিঙ্গপটমের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মলয় পর্ব্বতে অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছিল। মলয় পর্ব্বতের অপর একটি নাম মলয়কূট। ধোই প্রণীত পবন-দূতে শিখণ্ডাদ্রি নামে এই পর্ব্বত পরিচিত। নিম্নলিখিত নদীগুলি মলয় পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে; যথা, কৃতমালা, তাম্রপর্ণী, পুষ্পজা এবং উৎপলাবতী। কৃতমালা এবং বর্ত্তমান বৈগী অভিন্ন। এই নদী মাদুরার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। তাম্রপর্ণী নদী পাণ্ড্য-দেশ দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্ত্তমানে ইহা তাম্রবরী নামে পরিচিত। পুষ্পজা এবং উৎপলাবতী এই দুইটি নদী বর্ত্তমানে বৈপার এবং অমরাবতী নামে পরিচিত। বৈদূর্য্য পর্ব্বত পশ্চিমঘাটের উত্তরাংশে অবস্থিত ছিল। গোদাবরী, ভীমরথ, কৃষ্ণবেণ্বা, তুঙ্গ-ভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাহ্য এবং কাবেরী এই কয়টি নদী সহ্য পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে। ভীমরথা ও কৃষ্ণা নদীর ভীমা নামে একটি শাখা অভিন্ন। কৃষ্ণবেণ্বা কৃষ্ণা নামে পরিচিত। তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণা নদীর একটি শাখা। সুপ্রয়োগা কৃষ্ণা নদীর পশ্চিমদিকের একটি শাখা। বাহ্যা কিংবা বারদা কৃষ্ণা নদীর একটি শাখা। শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে নিম্নলিখিত নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে—যথা ঋষিকুল্যা, কুমারী, মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা এবং পলাশিনী। কাহারও কাহারও মতে হাজারিবাগ জেলার উত্তর দিকে শুক্তিমৎ পর্ব্বত অবস্থিত। কেহ কেহ বলেন ইহাই কাথিওয়ার পর্ব্বতমালা এবং কাহারও কাহারও মতে ইহাই সুলেইমান পর্ব্বতমালা। গঙ্গার কিউল নামে একটি শাখা ও ঋষিকুল্যা

অভিন্ন। মন্দগা এবং মন্দবাহিনীর অপর একটি নাম মন্দগামিনী এবং গন্ধমন্দগামিনী। জুনাগড় পর্ব্বতমালা হইতে পলাশিনী নদী উত্থিত হইয়াছে।

ঋক্ষবৎ এবং বিন্ধ্য এই দুইটি কুলাচল। বিন্ধ্য এবং পারিপাত্র বিন্ধ্য পর্ব্বতমালার অংশ বিশেষ। ঋক্ষ পর্ব্বত হইতে নর্ম্মদা, শোণ, মহানদ, মন্দাকিনী, দশার্ণা, তমসা, বিপাশা নদীগুলি উত্থিত হইয়াছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে শিপ্রা, পয়োষ্ণী, নির্ব্বিন্ধ্যা, বৈতরণী এই সকল নদী উত্থিত হইয়াছে। টলেমির মতে পুরাণের দশার্ণা এবং দোসরণ অভিন্ন। ঋক্ষপর্ব্বত হইতে দশার্ণা উত্থিত হইয়াছে। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগ হইতে নর্ম্মদা এবং তাপ্তী উত্থিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত নদীগুলি ঋক্ষ এবং বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে—(১) শোণ, (২) মহানদ, (৩) নর্ম্মদা, (৪) সুরথা, (৫) অদ্রিজা, (৬) মন্দাকিনী, (৭) দশার্ণা, (৮) চিত্রকূট, (৯) চিত্রোৎপলা, (১০) তমসা, (১১) করমদা, (১২) পিশাচিকা, (১৩) পিপ্পলিশ্রোণী, (১৪) বিপাশা, (১৫) বঞ্জুলা, (১৬) সুমেরুজা, (১৭) শুক্তি-মতী, (১৮) শকুলী, (১৯) ত্রিদিবা, (২০) বেগবাহিনী, (২১) শিপ্রা, (২২) পয়োষ্ণী, (২৩) নির্ব্বিন্ধ্যা, (২৪) তাপী, (২৫) নিষধাবতী, (২৬) বেম্বা, (২৭) বৈতরণী, (২৮) সিনীবালী, (২৯) কুমুদ্বতী, (৩০) করতোয়া, (৩১) মহাগৌরী, (৩২) দুর্গা এবং (৩৩) অন্তঃশিরা।

শোণ নদী নর্ম্মদার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উত্থিত হইয়া গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। ইহার পুরাতন নাম ছিল হিরণ্য-বাহ বা হিরণ্যবাহু।

মহানদ কিংবা মহানদী—ইহা বর্ত্তমান মহানদী নহে।

নর্ম্মদা—যে স্থান হইতে শোণ নদী উত্থিত হইয়াছে তাহার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে ইহা উত্থিত হইয়াছে। মৎস্য-পুরাণের মতে যে স্থানে নর্ম্মদা নদী উত্থিত হইয়াছে সেই স্থানটিকে জামদগ্নি তীর্থ বলে।

মন্দাকিনীও বর্ত্তমান মন্দাকিন অভিন্ন। ইহা পৈসুনী নদীতে পতিত হইয়াছে।

দশার্ণা নদী দশার্ণা দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

চিত্রকূট নদী চিত্রকূট পর্ব্বতের সহিত সংশ্লিষ্ট।

তমসা নদী ও তম নদী অভিন্ন। ইহা গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

করমদা—বায়ু এবং বরাহ-পুরাণের মতে ইহার নাম করতোয়া।

বিপাশা নদী এবং বর্ত্তমান বিয়াস্ বিভিন্ন।

শুক্তিমতী নদী শুক্তিমৎ পর্ব্বত হইতে উত্থিত হইয়াছে।

শকুলি এবং শক্রি নদী অভিন্ন। ইহা গঙ্গায় পতিত হইয়াছে।

শিপ্রা নদী পারিপাত্র পর্ব্বতমালা হইতে উত্থিত হইয়াছে।

পয়োষ্ণী এবং বর্ত্তমান পূর্ণ নদী অভিন্ন। পূর্ণ তাপ্তী নদীর একটি শাখা। চৈতন্যচরিতামৃতের মতে দক্ষিণ দিকে



বেভার পর্ব্বত

পয়োষ্ণী নামে একটি নদী ছিল এবং এই নদীটিও ত্রিবাঙ্কুরের অন্তর্গত পুর্ত্তি নদী অভিন্ন।

নির্ব্বিন্ধ্যা নদী এবং মালওয়ার অন্তর্গত কালীসিন্ধু নদী অভিন্ন।

তাপী বর্ত্তমানে তাপ্তী নামে পরিচিত।

বৈতরণী উৎকলদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে পারিপাত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাই আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ সীমা। যে সকল নদী পারিপাত্র হইতে উত্থিত হইয়াছে তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) বেদস্মৃতি, (২) বেদবতী, (৩) বৃত্রঘ্নি, (৪) সিন্ধু, (৫) বেণ্বা, (৬) আনন্দিনী, (৭) সদানীরা,

(৮) মহী, (৯) পারা, (১০) চর্ম্মণ্বতী, (১১) বিদিশা, (১২) বেত্রবতী, (১৩) শিপ্রা এবং (১৪) অবর্ণী।

সিন্ধুনদ এবং কালীসিন্ধু অভিন্ন। চম্বল এবং বেটওয়ার মধ্যস্থিত যমুনা নদীর ইহা একটি শাখা। ইহারই তীরে বিদর্ভরাজার কন্যা লোপামুদ্রার সহিত অগস্ত্যমুনির সাক্ষাৎ হইয়াছিল এবং পরে তাহাদের বিবাহ হইয়াছিল।

সদানীরা কোশল এবং বিদেহের সীমারূপে বর্ণিত আছে। কাহারও কাহারও মতে সদানীরা ও গণ্ডক অভিন্ন এবং কেহ কেহ বলেন সদানীরা ও রাপ্তী অভিন্ন।

মহী নদী মাল্‌ওয়া দেশ হইতে উত্থিত হইয়া ক্যাম্বে উপসাগরে পতিত হইয়াছে।

পারা ও পার্ব্বতী অভিন্ন। এই পার্ব্বতী নদী ভূপালে উত্থিত হইয়া চম্বলে পতিত হইয়াছে।

চর্ম্মণ্বতী যমুনার একটি শাখা।

বিদিশা বর্ত্তমান ভিল্‌সা।

বেত্রবতী বর্ত্তমান বেট্‌ওয়া, ইহা যমুনায় পতিত হইয়াছে।

অবর্ণী স্থলে বায়ুপুরাণে অবন্তীর উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতের নাম পাওয়া যায় এবং যাহাদের সহিত ঋক্ষ, বিন্ধ্য এবং পারিপাত্রের সম্বন্ধ আছে, তাহাদের মধ্যে উর্জ্জয়ন্ত, অমরকণ্টক, চিত্রকূট, কোলাহল এবং বৈভ্রাজ পর্ব্বতের নাম উল্লেখযোগ্য। উর্জ্জয়ন্ত এবং গির্‌ণার পর্ব্বত অভিন্ন।

অর্ব্বুধ বর্ত্তমানে আবু পর্ব্বত। অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে শোণ, মহানদী ও নর্ম্মদা উত্থিত হইয়াছে। চিত্রকূট পর্ব্বত প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। রাজগৃহের পাঁচটি পর্ব্বতের মধ্যে একটি পর্ব্বতের নাম ছিল বৈভার। বৈভ্রাজ এবং বৈভার অভিন্ন। দক্ষিণ বিহারের অন্তর্গত বাথান এবং বাতস্বন অভিন্ন।

অন্তর্যামী

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

অন্তর্যামী তুমি আজ মন বুদ্ধি চিত্ত লোক
আচ্ছন্ন করেছ একি মোহে,
আমার দর্শন-শক্তি কেন এত সীমাবদ্ধ,
কেন এত অন্ধ পরমাদ?
ক্রমশুষ্ক জীবনের নীরস রুক্ষতা মাঝে,
কোথা হ'তে আত্ম পরসাদ
বার বার জেগে উঠে অন্তঃসার শূন্য আড়ম্বরে
অর্থহীন সমারোহে।
আত্মারে বঞ্চনা করি উচ্ছৃঙ্খল মত্ততায়
মিথ্যার দংশন জ্বালা সহে
কোন মতে কাটে কাল আত্মম্ভরী প্রাণে চাপি,
ঘনীভূত নিত্য নিরাহ্লাদ;
ওরে মন তাই কিরে, শত কাব্যে, ছন্দে, গানে,
ব্যঙ্গময় ক্রূর দুঃখবাদ
লিখে যাস্ আনমনে? মৃত্যুহিম কালনদী
নিঃশব্দ কল্লোলে যায় বহে,
প্রিয়ার মধুর হাস্য, সুন্দরী নটীর লাস্য,
দাস্যময় এ নৈরাশ্য মাঝে
নাহি তোলে কোনো সুর, ব্যর্থতা মরুর বুকে
সকরুণ ছায়ানট বাজে।
হে চিত্রাক্ষী চিন্তাসখী অন্তর প্রকৃতি মোর
বহুবর্ণ-ছন্দ-গন্ধময়ী
চিদাকাশে মেঘকন্যা, মুক্তকেশে একি মায়া
সঞ্চারিলে ওগো সর্ব্বনাশী?
মোর সর্ব্ব প্রাণশক্তি ঢাকিয়াছ ইন্দ্রজালে,
আর কেন? মুক্ত কর অয়ি,
কাকরুষ্ণ কেশদামে গ্রন্থি দাও হে সুন্দরী,
আত্মজ্যোতি উঠুক উদ্ভাসি'॥



মাটির দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩২)

সংসারের মধ্যে ছোট বড় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে।

মা মারা গেছেন, সুনির্ম্মল মায়ের মৃত্যুর পর যতটা অসহায় হয়ে পড়বে ভেবেছিল ততটা হতে পারে নি, সে কেবল সুব্রতার জন্যই।

মা ইহলোক ত্যাগ করবার সময় এই আত্মভোলা ছেলেটির জন্যই বিশেষ করে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সকলেরই উপায় আছে, সকলেরই লক্ষ্য আছে, নাই কেবল এই ছেলেটির।

সুব্রতা স্বয়ং এ ভার গ্রহণ করেছে, মাকে নিশ্চিন্তভাবে পরলোকের পথে যাত্রা করতে দিয়েছে।

আগে সে তবু ভাসুরকে কতকটা এড়িয়ে চলতো—অনেক লেখাপড়া শিখলেও বাঙ্গালীর মেয়ের যা মজ্জাগত সংস্কার, তা সে ছাড়তে পারে নি।

কিন্তু সে সংস্কার আর রাখা চললো না—এ লোকটিকে সম্পূর্ণভাবে তাকে নিজের হাতে তুলে নিতেই হল।

সুবিমল সম্প্রতি বম্বে বেড়াতে চলে গেছে। সুব্রতা তার সঙ্গে যায় নি, ভাসুরকে দেখা শোনা করবার জন্য সে এখানেই থেকে গেছে।

মা মারা যাওয়ার পর বাড়ীর গিন্নির দায়িত্ব সবটা পড়েছে তারই মাথায়। এতদিন যদিও সংসারের সব কাজই সে করেছে, তবু সে আলগাভাবে,—এমন করে জড়িয়ে সে পড়েনি। ভয়ানক অসহ্য মনে হয়, তবু ত ছাড়বার যো নেই।

আত্মভোলা ভাসুর—তাঁকে সর্ব্বদা দেখাশোনা করা চাই। নিজের স্বামীর দিক তবু কতকটা আলগা দেওয়া যেতে পারে, লোকটি পরনির্ভরশীল নয়, কারও মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে পারে না। অনেক সময় নিজের সব কাজ নিজেই করে নেয়, স্ত্রী বা দাসদাসী কারও ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু এ মানুষটি ঠিক তার উল্টো; অসুখ হলে বলে দিতে হয়, জোর করে ওষুধ পথ্যের ব্যবস্থা করতে হয়। ভাল থাকলে তার কাপড় জামা জুতা অবিরত দেখতে হয়, ধমক দিয়ে শোওয়াতে হয়, খাওয়াতে হয়।

শিশুর মত প্রকৃতি, একেবারে সরল; সুব্রতার 'পরে নিজের ভার ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে মুখে খুসির হাসি ফুটিয়ে বলে—"সত্য বউমা, ভাগ্যে তুমি ছিলে মা, নইলে আমার উপায় যে কি হত আমি তাই ভেবে পাই নে।"

খানিক চুপ করে থেকে নিজে নিজেই বলে—"কি-ই বা আর হতো,—ভেসে যেতুম, স্থান পেতুম না। না থাকলে ও চলে হয় ত, আমি সেটা ধারণা করতে পারি নে এই মাত্র।"

এ রকম লোককে ফেলে যাওয়া বাস্তবিকই চলে না। সুবিমল ও দাদার দিকে চেয়ে বড় যেন উৎকণ্ঠিত হয় না, স্ত্রীকে এ দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলে, দাদার দিকে তাকিয়ে সে নিজে অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করে চলে।

অথচ দাদার সঙ্গে তার কথাবার্ত্তা চলে খুবই কম—দেখা হলে হঠাৎ সে এক চমৎকার দৃষ্টি তাঁর সারা দেহে বুলিয়ে নেয় মাত্র, দিন দিন সে দৃষ্টিতে উৎকণ্ঠাই বেড়ে ওঠে।

আড়ালে সুব্রতার কাছে তার অনুযোগের সীমা থাকে না—

সে নিশ্চয়ই দাদার দিকে দৃষ্টি দেয় না। আজ যদি মা থাকতেন, দাদাকে দেখার লোক থাকত। দাদা সত্যকার যত্ন পান না বলেই তাঁর এই চেহারা হচ্ছে।

সুব্রতা রাগ করতে যায় কিন্তু পারে না। মনে হয় সত্যই হয় তো তার সেবা যত্নের মধ্যে অনেকখানি ত্রুটি রয়ে গেছে, সে নির্ম্মলকে খুসি করতে পারছে না।

মাঝে মাঝে অতি মলিন মুখে সে নির্ম্মলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়—

তার মলিন মুখের পানে চেয়ে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করে, "কি মা, দরকার আছে কিছু?"

"না—"

বলে সুব্রতা ফেরে—

চলতে চলতে আবার সে চমকে দাঁড়ায়, দু-পা এগিয়ে এসে গভীর ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে—"আপনার শরীর কেন এত খারাপ হচ্ছে সত্য করে বলুন দেখি? আমি নিশ্চয়ই আপনাকে তেমন ভাবে যত্ন করতে পারি নে—"

নির্ম্মল বাধা দিয়ে বলে ওঠে—"ও কথা বলো না বউমা, তুমি যত্ন না করলে এতদিন আমার যে অস্তিত্বই থাকত না। কোথায় চলে যেতুম—হয়তো লোটা কম্বল নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতেই হতো—"

বলতে বলতে সে হো হো করে হেসে ওঠে—

সুব্রতা করুণ চোখের দৃষ্টি তার ওপর দিয়ে বুলিয়ে নেয়, এ ছাড়া তার আর কিছু করার উপায় নেই।

মেরুকে সংবাদ দেওয়ার কথা মনে হয়। সে এলে জোর করে দাদার যত্ন ঠিক মত করতে পারে, সুব্রতা সে রকম জোর করতে পারে না, পারবেও না।

এরই মধ্যে হঠাৎ সেদিন নির্ম্মল নিজেই প্রস্তাব করলে "দু মাসের জন্ম কোথাও গেলে বোধ হয় শরীরটা ভাল হতে পারে—কি বল বউমা? হয় তো কলিকাতায় থেকেই শরীরটা এত খারাপ লাগছে—কি বল?"

সুব্রতা ভারি খুসি হয়ে উঠল।

বললে—"তাই চলুন দিন কত। ওয়ালটেয়ারে চলুন, সমুদ্রের বাতাসে শরীরটা বেশ ভাল হয়ে উঠবে।"

ওয়ালটেয়ারে যাওয়ার ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেল। বম্বে হতে সুবিমল পত্র লিখলে সে দুই একদিনের মধ্যেই ওয়ালটেয়ারে যাচ্ছে সব ব্যবস্থা ঠিক করতে; কলকাতা হতে এদের রওনা হতে দিন দশেকের বেশী দেরী যেন না হয়।

আজকের বৃষ্টিটা সত্যই নির্ম্মলের বড় ভাল লেগেছিল। অনেক দিন এমনভাবে বৃষ্টি নামে নি, পৃথিবী তার অনন্ত পিপাসা আজ প্রাণভরে মিটিয়ে নিচ্ছিল। গাছের পাতাগুলোর ওপরে কতদিনকার ধুলো জমে সেগুলোর সত্যকার রূপ ঢেকেছিল, বৃষ্টি ধারা সে সব ধুয়ে নিয়ে তাদের সত্যকার সৌন্দর্য্য ফুটিয়ে দিয়েছিল।

টপ্, টপ্, টপ্—

গাছের পাতা হতে বৃষ্টি ঝরার শব্দটা শুনতে নির্ম্মলের ভারি ভাল লাগে, আরামে চোখ মুদে আসে—ইজি চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে সে অবিশ্রান্ত সেই শব্দটাই শুনছিল।

মনে হল—একটা মোটর দরজায় থামল। বৃষ্টির দিনে মোটর থামলে ও থামতে পারে, হয় তো পথে খুব খানিকটা জল জমেছে। পথিকরা হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে কোন-ক্রমে প্রাণের দায়ে পথ হাঁটলেও মোটর চলবে না।

নির্ম্মল আকাশের পানে চাইলে।

স্তরে স্তরে মেঘগুলা সেজে দাঁড়িয়েছিল চমৎকার, ওরই বুকে অতখানি জল যে সঞ্চয় করা আছে তা বোঝা যায় না।—অথচ ওই মেঘগুলা জলেরই সমষ্টি মাত্র। ভারি হয়ে নামতে নামতে গলে পড়ে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে যায়।

এই না আশ্চর্য্য ব্যাপার, বাষ্প উঠছে পৃথিবীর বুক হতেই, আবার জল হয়ে ঝরে পড়ছে পৃথিবীরই বুকে। আকাশ মহৎ—উদার, সে কারও দান নেয় না;—যে যাই পাঠাক, সে সবই আবার ফিরিয়ে দেয়।

খট্ খট্ করে একজোড়া ভারি জুতোর শব্দ শোনা গেল—অস্থির চঞ্চল।—মনে হল দরজার কাছে এসে থেমে গেল—

পরমুহূর্ত্তে আহ্বান শোনা গেল—"বড়দা—"

ত্রস্ত হয়ে নির্ম্মল উত্তর দিলে, "কে—ইন্দ্রনীল? এস—ঘরেই আছি।

পর্দ্দা সরিয়ে ইন্দ্রনীল প্রবেশ করলে।

নির্ম্মল বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এই বৃষ্টিতে এমনভাবে আসার মানেটা কি বুঝতে পারছিনে।"

ইন্দ্রনীল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল, পকেট হতে রুমাল বার করে মুখ মুছতে মুছতে বললে—"দরকার পড়লেই আসতে হয় বড়দা—বিশেষ দরকারে যে এসেছি, তা তো বুঝতেই পারছেন।"

নির্ম্মল আকাশ হতে পড়ল—"মানে? তোমার কথা আমি একটাও বুঝতে পারছিনে ইন্দ্রনীল।"

ইন্দ্রনীল মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে হঠাৎ বড়দার একখানা হাত চেপে ধরলে—

আর্দ্রকণ্ঠে বললে—"জীবনে মানুষ অনেক ভুলই করে থাকে বড়দা, সে ভুল সুধরাবার অবকাশ তাকে দিতে হয়। আমিও অনেক ভুল করেছি, আমায় এই বারটির মত মাপ করুন।"

হাতখানা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে নির্ম্মল বললে—"তোমার হেঁয়ালি-ভরা কথা কিছু বুঝতে পারছি নে ইন্দ্রনীল—এ রকম করে বলার চেয়ে সাদা-সিদে ভাবে বলাই ভাল বলে মনে করি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল বললে—"কথা খুবই সোজা ;—আপনি একবার সৈকতকে ডেকে দিন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আমি সত্যই তাকে আইনমতেই হোক—হিন্দুশাস্ত্রমতেই হোক বিয়ে করব।"

"সৈকত—এখানে—?"

নির্ম্মল বিস্ফারিতচোখে ইন্দ্রনীলের পানে চাইলে।

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে "হ্যাঁ, কাল রাত্রে বিয়ে নিয়েই আমাদের মনান্তর হয়েছে, রাত্রিশেষে সে এখানেই চলে এসেছে, আর কোথাও যায় নি। একটা সত্য কথা বলছি বড়দা—"

সে থেমে গেল দেখে নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে—"কি সত্য কথা—?

এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে ইন্দ্রনীল বললে—"আমি সৈকতকে যথাশাস্ত্র বিয়ে করতে পারি কি ?"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে, "কেন পারবে না ?"

মুখখানা নীচু করে ইন্দ্রনীল বললে, "কেন পারব না? পারব না এই জন্য যে আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছে।"

"তোমার স্ত্রী—"

নির্ম্মলের যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল।

সকল জড়তা কুণ্ঠা ত্যাগ করে ইন্দ্রনীল বললে, "হ্যাঁ, আমার স্ত্রী—বিলেতে যাওয়ার আগে যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল, সে আজও আছে।"

নির্ম্মল আড়ষ্টভাবে বসে রইল।

ইন্দ্রনীল বলতে লাগল, "একদিন শিকারে গিয়ে হঠাৎ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, আমি এতদিন পরেও তাকে দেখে চিনেছিলুম। শুধু সেই জন্যই সৈকতকে বিয়ে করতে পারি নি বড়দা—"

নির্ম্মল অকস্মাৎ গর্জ্জে উঠল—"পাপিষ্ঠ—"

ইন্দ্রনীল সে কথা মেনে নিলে—"হাজার বার—লক্ষবার, আমি স্বীকার করছি। কিন্তু আজ তাই বলে সেই অপরাধে আমায় দূরে রাখবেন না বড়দা, আমি প্রতিজ্ঞা করছি—আমি হিন্দুমতে ওকে বিয়ে করব, হিন্দুমতে আবার বিয়ে করতে পারা যায়।"

নির্ম্মল নিস্তব্ধ--

অত্যন্ত কাতরভাবে ইন্দ্রনীল বললে, "সত্য আমি তাকে সে অধিকার দেব, আইনসঙ্গতভাবে সে আমার 'পরে তার দাবী প্রতিপন্ন করবে, তার সন্তান আমার নামে পরিচিত হবে। তাকে একটিবার ডেকে দিন বড়দা, আমি তাকে বুঝিয়ে সব কথা বলি, সে নিশ্চয়ই বুঝবে—নিশ্চয়ই রাজি হবে।"

নির্ম্মল ধীরকণ্ঠে বললে, "কিন্তু গোড়াতেই যে মস্ত বড় ভুল করছ ইন্দ্রনীল, সৈকত এখানে নেই, সে এখানে আসে নি। আমার কথায় বিশ্বাস কর, সে আসে নি, আসার সাহস ও পায় নি।"

ইন্দ্রনীলের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে নির্ম্মলের হাতখানা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে।

জানালার বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল, তখনও তার ঝরঝরানি গানের সুর কানে ভেসে আসছিল।

ইন্দ্রনীল বাইরের পানে চেয়ে নিস্তব্ধে বসে রইল।

(৩৩)

নির্ম্মল অনেকক্ষণ কথা বলে নি, দারুণ বিতৃষ্ণায় তার সমস্ত অন্তরটা পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল—সে তাই ইন্দ্রনীলের পানে একবার ফিরেও চায় নি। ভেবেছিল—তার বিরাগভাব বুঝতে পেরে ইন্দ্রনীল আপনিই চলে যাবে।

অনেকক্ষণ বাইরের পানে চেয়ে চেয়ে তার চোখ জ্বালা করছিল, সে চোখ ফেরাতেই দৃষ্টি পড়ল ইন্দ্রনীলের ওপর।

সব হারালে মানুষের মুখের অবস্থা এমনই বিবর্ণ হয়ে যায়। নির্ম্মল খানিকক্ষণ তার পানে তাকিয়ে রইল—

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইন্দ্রনীল মুখ তুললে।

"কিন্তু আমি ঠিকই জেনেছিলুম বড়দা, সে এখানেই এসেছে, আর কোথাও যায় নি। তার মত অবস্থায় কোন মেয়ে অমন নিরাশ্রয়ভাবে পথে বার হতে পারে না। সত্যই আমার ওর জন্য ভারি ভাবনা হচ্ছে বড়দা—"

নির্ম্মল জিজ্ঞাসা করলে, "তার মত অবস্থা—মানে—?"

ইন্দ্রনীল স্থির-দৃষ্টি তার মুখের পরে রেখে শান্তকণ্ঠে বললে—"দুইটি মাস পরেই সে মা হবে বড়দা—"

উত্তেজিত নির্ম্মল হঠাৎ চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল—

"সে মা হবে—মা হবে—আমাদের সৈকত—"

কথা আর শেষ হল না, উত্তেজনায় তার কেবল কণ্ঠস্বরই নয়—সমস্ত দেহটাই থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, সৈকত মা হবে। আমি তার সন্তানের জন্যই তাকে এখন স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছি, কিন্তু—"

"থাক, থাক, যথেষ্ট হয়েছে। তাকে যা অপমান করেছ সেই তার যথেষ্ট অপমান হয়েছে, তার চেয়ে বেশী অপমান আর করতে যেয়ো না তাকে স্ত্রীরূপে এখন গ্রহণ করে।"

নির্ম্মলের কণ্ঠস্বর কাঁপছিল।

ইন্দ্রনীল একটা নিঃশ্বাস ফেললে—

"কিন্তু বড়দা, তার ভবিষ্যৎ, তার সন্তানের ভবিষ্যৎ—"

নির্ম্মল বললে—"সে জন্য তোমার আর ভাব্‌বার দরকার দেখছি নে। ভবিষ্যৎ কেউ কারও কোনদিন নির্দ্দেশ করতে পারে নি—পারবেও না। মানুষ পেছন ফিরে অতীতটাকেই দেখতে পায়, সুমুখ পানে চেয়ে ভবিষ্যৎকে দেখতে পায় না, তার দৃষ্টি সেই অন্ধকারের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বার বার ফিরে আসে; মানুষ ওখানে হয়ে যায় একেবারে ব্যর্থ। আমার মা বলতেন—যিনি জীব দিয়েছেন, তিনিই আহার দেবেন—জীবের সামনে পথ দেখাবেন, আমি এ কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি ইন্দ্রনীল, তাই তোমাকেও বলছি তুমি তাদের ভবিষ্যৎ গড়বার ভার হাতে নিতে চেয়ো না, সে হবে তোমার ভীষণ বোকামী।"

খানিক চুপ করে থেকে সে আবার বললে—"তার বুকে সে অপমানের আঘাত দারুণ হয়ে বেজেছে, সেই জন্যই সে তোমার আশ্রয় ত্যাগ করেছে। সে তেজস্বিনী হয়ে অতবড় অপমানটা মানিয়ে নিতে পারলে না, পারত—যদি সে সাধারণ একটি মেয়ে হতো। তবু—তবু তোমায় মিনতি করছি—তুমি আর ও আঘাত তাকে দিতে যেয়ো না এই বিয়ের প্রস্তাব করে।"

ইন্দ্রনীলের মুখে মলিন হাসির একটু রেখা জেগে উঠে তখনই মিলিয়ে গেল—

পকেট হতে একখানা পত্র বার করে সে নির্ম্মলের সামনে রাখলে—"পড়ে দেখুন—"

নির্ম্মল বললে, "কার পত্র—?"

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"সৈকত লিখে রেখে গেছে—"

সে কথাটা নির্ম্মল আগেই বুঝেছিল। পত্রখানা পড়বে না ভেবেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনের গতি বদলে গেল।

পত্রখানা খুলে ফেলতে দেখা গেল—নেহাৎ ছোট নয়, সৈকত অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে অনেকখানি লিখে গেছে।

সে লিখেছে—

অসীম দয়া তোমার, কিন্তু ধন্যবাদ তোমায়, তোমার দয়া আমি নিতে পারলুম না। ভেবেছিলে—যে অবস্থায় এসেছি তাতে তোমার দয়া নিতে আমি বাধ্য হব—কথাটা এক পক্ষে ঠিক, কিন্তু পারলুম না এ দয়াটুকু নিতে—বড় অসহ্য।

আজ আমার প্রথম হতে বর্ত্তমানকালের—প্রতি দিনটির কথা মনে পড়ছে।

আমার সুখের বাল্যকাল—

তখন জানতুম না ওরই স্মৃতি মনের মধ্যে এমনভাবে এঁকে বসবে। মানুষ কি তা ভাবে? দিন চলে যায়, ভবিষ্যৎ আশার আলোয় পথ দেখায়, কিন্তু ওই পথের শেষ এমন আচমকা হয়ে যায়, এমন আচমকা অন্ধকার আসে—মানুষের সারা জীবনটাই তখন ভরে যায় ব্যর্থতায়।

মানুষ জীবন ভোর পাওয়ার আশাই করে—ওইটাই হচ্ছে তার জীবন ভোর পরাজয়। অথচ তাকে কেবল দিয়েই আসতে হয়—বল, শক্তি, সাহস, সব, এমন কি দেহের রক্তকণা পর্য্যন্ত—তবু তার মনে আশা থাকে—সে পাবে, জীবনের যে কোন ক্ষণে—যে কোন লগ্নে সে তার প্রার্থিত বস্তু পাবে।

কিন্তু পায় কি?

চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গিয়ে সে যখন পেছন ফিরে চায়—দেখতে পায় ছাইয়ের ওপর দিয়ে সে হেঁটে এসেছে। পেছন দিকে তবু আলো পায়, কিন্তু সামনের দিক নিকষ কাল অন্ধকারে ঢাকা।

কিন্তু না, এ সব কি বলছি? রাতের কল্পনা মাত্র, কতকগুলা অসার চিন্তা মাথার মধ্যে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে, এক সঙ্গে মালার আকারে গাঁথব—আমার সাধ্য কি? কাজেই এ সব চিন্তা থাক, আমার নিজের কথাই বলি।

কি উদ্দাম জীবন—সুন্দর ছেলেবেলা—বাপের স্নেহ, ভাইয়ের ভালবাসা—ছোটবেলায় মা হারিয়েছি কি না—ওদের স্নেহ-যত্নের আর শেষ নেই। মেয়েদের সংস্পর্শে আসি নি, পুরুষদের সাহচর্য্যে আমি জানতুম না আমি মেয়ে—পুরুষ নই।

বোধ হল সেই দিন, যে দিন তোমায় আমি সামনে দেখতে পেলুম।

যৌবন কবে এসেছিল জানি নে, কেউ আমায় এ সম্বন্ধে সচেতন করতে চাইলেও আমার রাগ হতো। কিন্তু সেই দিনই বুঝতে পারলুম আমি মেয়ে, আমার যৌবন এসেছে।

মা গো, তখনও যদি পৌরুষত্ব ভাবটাকে জাগিয়ে রাখতে পারতুম—

কি করেছি, কোথা হতে কোথায় নেমেছি। আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমি নিজের হাতে কাল করে তুলেছি, আমার সরল সহজ পথে নিজের হাতে কাঁটা বিছিয়েছি, চলতে গেলে যা আমারই পায়ে বিঁধে।

আমি চলে যাব, হ্যাঁ, ঠিক চলে যাব। মরব না এ কথা আগেই বলেছি। তোমার মত একজন খেয়ালীর খেয়ালবশে নিজের অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেব না। আমি যা করেছি তার ফল আমিই ভোগ করব, শাস্তি আমি নিজেই বইব। আমার সন্তান—সে জানতে পারবে না তার বাপ কে, আমি তাকে সে পরিচয় দেব না। সে জানবে সে সমাজের বাইরে, দুনিয়ার মধ্যে থেকেও সে দুনিয়ার অপরিচিত।

কাল সকালে তুমি আমায় দেখতে পাবে না—এও আমার বড় শান্তি—মুক্তির বিরাট বিপুল আনন্দ। কোথায় যাব জানি নে, কে আমায় আশ্রয় দেবে তা জানি নে—তবু জানি যাব—তবু জানি আশ্রয় কোথাও মিলবে।

খোঁজ করো না—সন্ধান মিলবে না।

জানি—দুনিয়ায় এক বড়দা ছাড়া আর কেউ আমার খোঁজ করবে না, আর যদি কেউ করে—মেজ বউদি।

একদিন ফিরব ওদেরই কাছে—ওরা ছাড়া আর কেউ নেই।

বাবা আছেন, কিন্তু আমার কাছে তিনি মৃত। শুনেছি তিনি সব ছেড়ে দিয়ে হরিদ্বারে গেছেন, সৎগুরুর সন্ধান তাঁর জীবনে মিলেছে, ব্রহ্মকে চিনে তিনি আজ আদর্শ ব্রহ্মজ্ঞানী। আজ তাঁর কাছে গেলেও আমার আশ্রয় মিলবে না, কেন না আমারই দেওয়া আঘাত তাঁর বুক শতধা করে দিয়েছে।

তবু মনে ভাবছি—আজ নয়, একবছর পরে আমার অভাগা শিশু যদি বেঁচে থাকে, তাকে নিয়ে একবার তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে যাব। দোষ আমার—পাপ আমার, নির্দ্দোষ শিশু তো কোন অপরাধই করে নি—ওকে তিনি ক্ষমা করবেন, অভাগা শিশু দুনিয়ার ঘৃণা কুড়ালেও তাঁর কাছে ক্ষমা পাবে, এতটুকু ভালবাসা পাবে।

আর নয় থাক, মনের আবেগে কত কি মাথামুণ্ড যে লিখে যাচ্ছি তার ঠিক নেই। রাত বেড়ে উঠছে, আমায় এখনই বার হতে হবে।

তোমার যা কিছু সবই রেখে গেলুম। আমার পরণে যা আছে কাপড় জামা—তাই রইল।—

বিদায়।

আবার বলে যাই আমার খোঁজ নিয়ো না, আমি শূন্যে মিলাতে চললুম।—

সৈকত

(৩৪)

সকল রকম আমোদ প্রমোদের মাঝখান হতে ইন্দ্রনীলের মত লোকের অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধান হয়ে যাওয়া যেমন আশ্চর্য্য জনক তেমনই অসম্ভব।

আজ কয়টা বছর বিলেত হতে কলকাতায় ফিরে পর্য্যন্ত একটা দিন সে কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিরত হয় নি। যেখানে যা হয়েছে ইন্দ্রনীল সেখানে যোগ দিয়েছে, নিজের বাড়ীতে প্রায়ই আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান করেছে। এক কথায় তার মত সদানন্দ, সদালাপী লোক অতি বিরল। সেই জন্যই সে সহজে লোকের মনের মধ্যে স্থায়ী আসন গড়ে নিতে পেরেছিল।

তার অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে সকলেই তাই বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছিল।—

সকলেই বাড়ীতে এসেছিলেন এবং তাকে আবার যে কোন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে বার বার টানাটানি করেছিলেন।

এর মধ্যে বিশেষ অগ্রণী ছিল তমসা সিংহ।

আজকালকার মেয়েদের মধ্যে সে আরও খানিক এগিয়ে গেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।—বিলেতে ডান্সে সে খুব নাম করেছিল, অভিভাবকহীন অবস্থায় সেখানে দিনকত একটা থিয়েটারেও ঢুকে পড়েছিল—তবে বেশী-দিন তাকে সেখানে সেভাবে থাকতে হয় নি। একজন ভারতীয় ভদ্রলোক তাকে সেখান হতে উদ্ধার করেন এবং বিয়ে করে একেবারে ভারতে চলে আসেন।

এখানে আসার বছরখানেক পরে মিঃ সিংহ জন্মভূমি পঞ্জাবে মারা গেছেন।—

মিঃ সিংহ বিলেতে গেলেও তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণত্বের অহঙ্কার তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। তমসাকে বিয়ে করার আগে পর্য্যন্ত তার সম্বন্ধে তিনি বেশ উচু ধারণাই করেছিলেন, বিয়ের পর সংসার ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তিনি বেশ বুঝতে পারলেন—জীবনে তিনি কি মহাভুলই করেছেন।

স্বামী স্ত্রীতে সত্যকার মিলন হয় নি, তাই তমসা রইল কলকাতায়, আর মিঃ সিংহ রইলেন পঞ্জাবে।

মিঃ সিংহ মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তমসা পঞ্জাবে চলে গিয়েছিল তাঁর প্রচুর সম্পত্তি দখল করবার জন্য, কিন্তু গিয়ে শুনতে পেলে—মিঃ সিংহ তার সঙ্গে বড় কম প্রতারণা করেন নি, তাঁর উপযুক্ত দুই ছেলে, পুত্রবধূ এবং এক মেয়ে আছে।

ছেলেমেয়েরা বলেছিল—"আপনাকে আমাদের বাপ যখন ধর্ম্মসঙ্গতভাবে বিয়ে করেছেন তখন আপনাকে আমরা মা বলে মেনে নিতে বাধ্য। আপনি স্বচ্ছন্দে আমাদের এখানে বাস করুন, আপনাকে আলাদা বাড়ী, বাঙ্গালী দাসদাসী দিচ্ছি, কোন কষ্ট হবে না।"

কিন্তু তমসা এ আবেষ্টনীর মধ্যে থাকতে রাজি হয় নি। সে কোর্টের সহায়তায় স্বামীর সম্পত্তি দখল করতে চেয়েছিল, তার দাবী অগ্রাহ্য হল, মাসিক দুইশত টাকা পাওয়ার চুক্তিতে রাজি হয়ে তাকে কলকাতায় ফিরে আসতে হল।—

এখন সে স্বাধীনা।

আজকাল তার বাড়ীতেই যে কোন আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। বিধবা তমসাকে পত্নীরূপে পাওয়ার আশা অনেকেই করেন, কিন্তু তমসা এ পর্য্যন্ত কারও আশা পূর্ণ করে নি, অথচ হতাশও কাউকে করে না। তার সরল কথাবার্ত্তা, অকুণ্ঠিত মেলামেশা, অটুট স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য সকলকেই তার পানে আকৃষ্ট করে রেখেছে।

ইন্দ্রনীলও দু চার দিন মিসেস সিংহের বাড়ী গেছে, তার পরেই তমসাকে তার সম্বন্ধে কিছু বেশী রকম সচেতন হতে দেখা গেছে। যদিও সে কাউকে আভাসে জানায় নি সে ইন্দ্রনীলের সমস্ত খবরই জানতে চায়—ইন্দ্রনীল তার সান্ধ্য আনন্দোৎসবে যোগ না দিলে তার আনন্দ থাকে না—তবু অনেকেই ইন্দ্রনীলের তার বাড়ী যাতায়াত মোটেই পছন্দ করে নি।—

তমসার রূপের খ্যাতি, তার টেনিসখেলা, নাচ ও গানের প্রশংসা শুনেই ইন্দ্রনীল গিয়েছিল, ভারতীয় মেয়েদের সে যথেষ্ট পরিমাণে খেলালেও সে হয় তো এদের কোন কোন বিষয়ে এতটুকু শ্রদ্ধা করত—তমসাকে দেখে সে ভারতীয়ের আদর্শ এতটুকু তার মধ্যে দেখতে পায় নি।

সৌন্দর্য্য তার অসীম হতে পারে, নাচ গান খেলায় সে যথেষ্ট নাম নিতে পারে, কিন্তু তার অসীম পানাসক্তিই তারপরে ইন্দ্রনীলের ঘৃণা এনে ফেলেছিল।

এ দেশের মেয়েরা এমন নির্লজ্জভাবে মদ খেতে পারে, এমন নির্লজ্জভাবে ধূমপান করতে পারে, সেটা বুঝি সে আগে কোনদিন কল্পনাই করতে পারে নি। তমসার অতিরিক্ত বন্ধুত্ব সে তাই এড়িয়ে এল, আর তমসার দিকেও যায় নি।

এর আগে তমসা কোনদিনই ইন্দ্রনীলের বাড়ীতে আসে নি, তাই প্রথম সে যে দিন এল—সে দিন ইন্দ্রনীল বেশ একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল।—

সে বসতে না বললেও তমসা নিজেই তার পাশের চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসে পড়ল—

"বেশ মানুষ আপনি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, দু চার দিন গিয়ে আর ওদিকে যান না। কতদিন ডেকে পাঠিয়েছি—আপনার একটা উত্তর দেওয়ার পর্য্যন্ত অবকাশ হয় না।"

হাতের বইখানা টেবিলের পরে রেখে ইন্দ্রনীল অলসভাবে হাই তুলে আড়ামোড়া ছেড়ে বললে—"অবকাশ সত্যই মেলে না মিসেস সিংহ, অনেকদিনই এমনি মিথ্যে আমোদ প্রমোদ নিয়ে কাটিয়েছি, আজকাল—"

তরুণ হাসিতে ঠোঁট দুখানা রঞ্জিত করে তমসা বললে—

"এখন পারমার্থিক ধ্যানে মনোনিবেশ করছেন বুঝি? এ বইখানা নিশ্চয়ই আপনাকে পারমার্থিক উপদেশ দিচ্ছে—দেখতে পারি একটু?"

উত্তরের অপেক্ষা না করে বইখানা তুলে নিয়ে সে দেখলে—লেখা আছে—ধর্ম্মতত্ত্ব।

নিতান্ত অবহেলার সঙ্গেই সেখানা সশব্দে টেবলের পরে ফেলে সে বললে—"যত সব রাবিশ বই—আপনার মত লোকও এ বই পড়ে—সত্য এতে আমি ভারি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি। এই সব কঠোর বিষয়ের দিকে মন যায়, না এমনি দেখেই যান?"

ইন্দ্রনীলের মুখখানা হাসিতে ভরে উঠল, সে বললে—"তা যায় বই কি মিসেস সিংহ। মানুষের ওপর দিকটাই দেখে আসছেন, অন্তরের দিকটা আপনার এতখানি বয়সের মধ্যে আপনি দেখতে পান নি—অর্থাৎ দেখতে চান নি।—সাইকোলজি পড়তে হয় না, চোখের সামনে নেচারে ফুটে ওঠে। দেখেছেন শিশু এক রকম থাকে, সেই আবার যুবক অবস্থায় হয় অন্য রকম, আবার বার্দ্ধক্য যখন আসে তখন সেই লোকটিই যায় একেবারে বদলে—"

বাধা দিয়ে তমসা বললে, "আপনি তাহলে বুড়ো হয়েছেন বলতে চান?"

ইন্দ্রনীল গম্ভীর হয়ে বললে, "মানুষের মনটাই হয় তরুণ, শিশু, বুড়ো—দেহের বিকৃতি হয়তো না ঘটতেও পারে। নদীর স্রোতও বদলে যায় যখন পৃথিবীর বুকে ভূমিকম্প জাগে, অনেক নদ নদী এমন কি সাগর পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়, আবার নতুন করে জন্মও নেয়। মানুষেরও ঠিক তাই হয় মিসেস সিংহ। আজ যাকে দেখতে পাবেন উচ্ছৃঙ্খল, অত্যাচারী, বিলাসী, কাল হয় তো দেখবেন সে সর্ব্বত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, সন্ন্যাসী। এমন কোন একটা ধাক্কা এসেছে অতর্কিতে—যাতে সে একেবারে বদলে গেছে, তখন সে তার পূর্ব্বজীবনের স্মৃতিটাকে পর্য্যন্ত মুছে ফেলে দিতে পারলে বাঁচে—এমনই হয় অবস্থা। মানুষকে বুঝতে শিখুন মিসেস সিংহ, নিজেকে চিনতে পারবেন।"

তমসা আশ্চর্য্য হয়ে তার পানে চেয়েছিল—ইন্দ্রনীলকে সে যেন বুঝতে পারছিল না—লোকটি বড় জটিল মনে হয়।—

সে বললে, "কিন্তু সম্প্রতি যে আলোড়নটা হয়েছে তাতে আপনার মত লোকের মনের গতি এমনভাবে বদলে যাওয়া যেন অসম্ভব বলেই মনে হয়।"

ইন্দ্রনীল মুখ তুললে—

একটু হেসে বললে, "আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তাই তো বলছি মিসেস সিংহ, মানুষের শুধু বাইরেটাই দেখবেন না, ভেতরটা আগে দেখবেন। মাথার চুল সাদা, গায়ের চামড়া লোল হয়ে যাওয়া, একেই আপনারা বলেন বুড়ো, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। অনেক লোল চামড়া সাদা মাথা লোক আছে, তাদের মন অথচ চির নবীন—বসন্ত বার মাস তাদের মনের নিকুঞ্জে বাঁধা; আবার এমন লোকও দেখা যায় মিসেস সিংহ—যাদের যৌবনেই সব উচ্ছ্বাস ফুরিয়ে যায়, যাদের জীবন হয় একেবারে ব্যর্থ—যে কোন মুহূর্ত্তে তারা খসে পড়ার প্রতীক্ষা করে। সে রকম অবস্থায় তাদের জীবনে সান্ত্বনা দেয় এই রকম বই, এই রকম সঙ্গ, আর কিছুই তাদের কাছে প্রীতিপ্রদ হয় না।"

তমসা নীরবে বইখানা তুলে নিয়ে পাতা উল্টাতে লাগল।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখলে ইন্দ্রনীল তার পানেই চেয়ে রয়েছে।

তমসা শান্তকণ্ঠে বললে, "তবু আমি জোর করে বলি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, সৈকতের যাওয়াটা আপনাকে এমন কিছু আঘাত দিতে পারে না যাতে আপনার তরুণ মনটা বৃদ্ধ হয়ে পড়ে। সে এসেছিল, কিছুদিন ছিল, তার পর চলে গেছে—এতে আপনার মনে আঘাত পাওয়ার কারণ এমন কিছু নেই। ও সব পাগলামী ছেড়ে দিন—চলুন আমার সঙ্গে—"

আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ইন্দ্রনীল বললে—"কোথায়?"

তমসা উত্তর দিলে—"আমি একখানা এরোপ্লেন কিনছি, ইচ্ছা আছে এটায় উঠে আর একবার ইংল্যাণ্ড রওনা হব। জানেন বোধ হয় এরোপ্লেন উড়ানো আমি শিখেছি, এবার নিজেই উড়িয়ে যাব ইচ্ছা আছে। চলুন, সেটা দেখে দর-দাম ঠিক করে কিনে ফেলা যাক"

ইন্দ্রনীল হাসিমুখে বললে—"এ যাত্রায় আপনার সঙ্গী হচ্ছে কে, মিঃ চৌধুরী—না মিঃ পাল—?"

হেসে উঠে তমসা বললে—"ক্ষেপেছেন—ওঁদের সঙ্গী

করব? বাঙ্গালীর মধ্যে এমন কেউ নেই—কেবল আপনি ছাড়া—যে আমার সঙ্গী হতে পারে। না, মিছে কথা বলছিনে মিঃ চ্যাটার্জ্জি, এবার আমার ইংল্যাণ্ড যাত্রার সঙ্গী হবেন আপনিই—রাজি আছেন তো?"

ইন্দ্রনীল হাসলে মাত্র।

(৩৫)

একথা রাষ্ট্র হতে বড় বেশী দেরী হল না।

সুবিমল কিছুদিন আগে ফিরে এসেছে—নির্ম্মল তখনও ভিজাগাপটমে, সঙ্গে রয়েছে সুব্রতা।

নিজের জন্য সুবিমল স্ত্রীকে আটক করে নি, সে দেশে ফিরেই জোর করে সুব্রতাকে সঙ্গে দিয়ে নির্ম্মলকে দেশ-ভ্রমণে পাঠিয়েছে।

কয়েকটা দিন আগে সুব্রতা সুবিমলের পত্রে জেনেছিল—ইন্দ্রনীলের স্বভাব একেবারে বদলে গেছে, সে নাকি আজকাল খুব সাধুভাবে জীবন যাপন করছে।

তারই কয়দিন পরে আবার যে পত্রখানা সে পেলে তাতে জানতে পারলে—ইন্দ্রনীল মিসেস সিংহের সঙ্গী হয়ে ইউরোপ যাবে। প্রতিদিন সে এরোপ্লেনে উড়ছে, মিসেস সিংহ তাঁর বর্ত্তমান সঙ্গীকে এরোপ্লেন উড়ানো শিক্ষা দিচ্ছেন।

সুব্রতা হাসলে মাত্র।

মানুষের প্রবৃত্তি অনুযায়ী সে চলে থাকে, জীবনের ধারা বদলে নেওয়া তাই অসম্ভব বলেই মনে হয়। হাওয়া বিপরীত দিক হতেও বয়, মানুষ চলতে জানে না বলেই হাঁপিয়ে ওঠে, চোখে মুখে ধূলো গিয়ে বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়ে।

ব্যাপারটা সত্যই তাই—

ইন্দ্রনীল মাস তিন চার মাত্র সংযতভাবে থাকতে পেরেছিল, তমসার সংসর্গে পড়ে সে আবার ভেসে চলেছিল।

এবার হয়েছিল ঠিক সমান, বাধ্য-বাধকতার ভাব এর মধ্যে ছিল না। তমসার হাতে ইন্দ্রনীল নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছিল, ঠিক এই সময় এসে পড়লেন সস্ত্রীক ডাক্তার সোম।

সেই আত্মভোলা লোকটি, যিনি নিজের পানে তাকাতে চিরদিনই উদাসীন।

সাহা সোম নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে গেছেন সেই স্বামীরই কাছে, স্বামীর ভার সম্পূর্ণ নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আজ সত্যই তিনি স্ত্রী, গৃহিণী, একটি সন্তানের জননী।

"এ কি হচ্ছে মিঃ চ্যাটার্জ্জি, এমন করে নিজেকে ধ্বংসের পথে ভাসিয়ে দেওয়ার মানে তো কিছু বুঝছি নে।"

সাহার কথায় ইন্দ্রনীল কেবল হাসলে।

মিসেস সোম উৎকণ্ঠিতা হয়ে বললেন, "না, আমি বরাবরই এ রকম উচ্ছৃঙ্খলতা পছন্দ করি নে মিঃ চ্যাটার্জ্জি,—এ দেশের বৈশিষ্ট্য দূর করে পরের দেশের অনুকরণ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। কি করছেন বলুন দেখি?"

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে, "কি—?"

মিসেস সোম শান্তভাবে বললেন, "দেখুন, অনেক দেখেছি, অনেক শুনেছি, বুঝেছি—যাদের যা তাই ভাল, তার অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। মনে আছে দার্জ্জিলিংয়ে থাকতে একদিন এই সব বিষয় নিয়ে আপনার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হয়েছিল, আপনি সেদিন বিয়েটাকে কিছু নয় বলেই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন, আমি সেটা মানতে চাই নি। আপনি এই যে সৈকতকে দু বছর কাছে রাখলেন, সে চলে গেল—আবার তমসাকে গ্রহণ করেছেন, বলতে চান কি এইটাই সব চেয়ে ভাল? আজ মনে করুন—সৈকতের যে সন্তান এতদিন হয়েছে, যার বয়েস প্রায় এক বছর হয়ে এল—সে কি নামে নিজের পরিচয় দেবে? আদিম যুগটা নাকি সত্য ছিল, আপনারা আজ জোর করে সেই যুগটাকে মেনে নিতে চান—। সে যুগে শিক্ষা ছিল না, সভ্যতা ছিল না, বাপের বংশ ধরে পরিচয় দেবারও দরকার ছিল না। আজ আপনি বা আপনার মত আর দু-চার জন শিক্ষিত বর্ব্বর—মাপ করবেন, কথাগুলো বড় শক্ত হয়ে যাচ্ছে—সেই যুগটাকে ফিরে আনতে চাইলেও আপনাদের ঘিরে যে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে—সে তো তাকে মেনে নেবে না। কুমারীর সন্তানরূপে যিশুকে লোকে মেনেছিল—তাও দু হাজার বছর আগে, আজ তা বলে কেউ মানবে না মিঃ চ্যাটার্জ্জি। পূজা করা, উপদেশ শোনা দূরে থাক, পাশে বসাতে পর্য্যন্ত চাইবে না।"

ইন্দ্রনীল অন্যমনস্কভাবে জানালা দিয়ে বাইরের পানে তাকিয়ে রইল।

মিসেস সোম বলতে লাগলেন, "অসভ্য বর্ব্বর যারা তাদের সুন্দর সরল জীবন-যাত্রা প্রণালীকে আমরা অনেক সময় উপহাস করি, আবার অনেক সময় ওদেরই প্রশংসা করি। ধরতে পারি নে কি ভাল, বুঝতেও পারি নে। তবু এইটুকু বলে যেতে পারি—আমাদের দেশের যা, তাই ভাল—এই সুন্দর সরল অনাড়ম্বর জীবন—কি চমৎকার। বাংলার খাঁটি ছবি দেখতে পাবেন যদি পল্লীগ্রামে যান, বাংলার আদর্শ ছবি সেখানে দেখতে পাবেন। ওর সঙ্গে মিলান দেখি ইউরোপের ছবি, ওখানকার একটি মেয়ে আর এখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে তুলনা করুন—দেখতে পাবেন কোনটি সুন্দর। আমি নিজের ভুল বুঝেছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি—আমি পথ পেয়েছি—আলো পেয়েছি।—আশা করি আপনিও পথ পাবেন—আলো পাবেন, চিরদিন অন্ধকারে আপনাকে থাকতে হবে না।"

বাংলার পল্লী—

ইন্দ্রনীলের মুখখানা দৃপ্ত হয়ে উঠে তখনই অন্ধকার হয়ে গেল।

মিসেস সোম বললেন, "আপনার সামনে আজ যে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে, সে একটা ঝড়, সাইক্লোন, অমঙ্গল। দুনিয়ার যত যা কিছু আবর্জ্জনা অমঙ্গল—সব সে গায়ে জড়িয়ে বসে আছে, সে এই সব চারিদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সমাজে সে এনে ফেলেছে বিশৃঙ্খলা—ধ্বংস; সে যে পথে চলবে সে পথ পুড়িয়ে ছারখার করে যাবে। মিনতি করছি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আপনি সরে আসুন—আপনি সৈকতকে খুঁজে আনুন, তাকে বিয়ে করুন, তার ছেলেকে বাপের নামে পরিচয় দিতে দিন। আপনি যে মানুষ, আপনি বর্ব্বর নন, শিক্ষিত, সে পরিচয় দিন।"

ইন্দ্রনীল একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেললে—"আপনি ভুল বুঝছেন মিসেস সোম, তাকে পাওয়ার উপায় আর নেই, সে চিরদিনের মতই চলে গেছে। সে বার বার করে বলে গেছে—যেন তার খোঁজ করা না হয়—তার অশান্তি উৎপাদন করা আর না হয়। আমি বিশ্বাস করি মিসেস সোম, কোনদিন না কোনদিন তাকে আমি দেখতে পাব, সে দিন তার কাছে আমি ক্ষমা চাইব।"

মিসেস সোমের ছোট ছেলেটি মেঝেয় হামা দিয়ে বেড়াচ্ছিল, ইন্দ্রনীল তার পানে চেয়ে ভাবছিল সৈকতের সন্তানের কথা।

সে এতদিন আরও বড় হয়েছে, হয় তো হেঁটে বেড়ায়। নাম-হীন, গোত্র-হীন একটি শিশু—

আর যদি সে জন্মেই মারা গিয়ে থাকে—

তা হলে সৈকত বেঁচে গেছে।

গভীর রাত্রে বিছানায় ঘুম ভেঙ্গে ইন্দ্রনীল শুনতে পায় শিশুর কান্না—

মনে হয় সৈকত একটি শিশুকে বুকে করে নিয়ে সমস্ত ঘর পায়চারী করে বেড়াচ্ছে, গুন গুন করে গান গাইছে—"ঘুমো চাঁদ ঘুমো—"

সে স্বপ্ন দেখে খোকাটি নেই, সৈকত মরা ছেলের পাশে উপুড় হয়ে তার মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার চোখে জল যদি আসে সেও ভাল, কিন্তু সে চোখ একেবারে শুষ্ক। মুখে কি অবর্ণনীয় যন্ত্রণার চিহ্ন।

ডাকবে সে কাকে? জগতের সকলের স্নেহবঞ্চিতা সে, ভগবানের পরেও এতটুকু তার বিশ্বাস নেই।

সে বলেছে ভগবানকে ডাকে দুর্ব্বল লোকে। যতক্ষণ মানুষের নিজের শক্তি সামর্থ্য থাকে সে নিজেকেই বিশ্বাস করে, আর কারও শক্তি মানতে চায় না—সবই অগ্রাহ্য করে। মানুষের নিজের শক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, সে তখন বাঁচতে চায় আর কারও পরে নির্ভর করে—তখনই সে মানে ভগবানকে—ঘুস দেয় পূজা-নৈবেদ্যের।

সৈকতের যে মুখ স্বপ্নে ইন্দ্রনীল দেখতে পায় দৌর্ব্বল্যের লেসমাত্র তাতে নেই। সে বেদনা পেয়েছে, তবু সে বেদনা সইবার শক্তি তার আছে। সে ভাঙ্গবে, তবু নুইবে না—মরবে, তবু মর্য্যাদা হারাবে না।

জয় করবার আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না, সে ইন্দ্রনীলকে ভালবেসে নিজের সব তাকে দিয়েছিল।

আজও রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে ইন্দ্রনীল আর্ত্তকণ্ঠে এবার ডাকে—"সৈকত—"

কাল মেয়েটি, তার রূপ ছিল না, ছিল সাহস, ছিল দৃঢ়তা, ছিল প্রেম।

তমসার পাশে তার স্থান হয় তো হবে না, তবু ইন্দ্রনীলের সারা অন্তর মেনে নেয় সে তমসার অনেক ওপরে, তার নাগাল তমসা পেতে পারে না।

সারাদিন—রাত্রি বারটা পর্য্যন্ত তমসার সাহচর্য্যে কাটিয়ে শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে সে যখন বাড়ীতে ফেরে, তখন তার সারা অন্তর ভরে ওঠে আর্ত্ত-হাহাকারে—আজ যদি সৈকত থাকত।

তমসা এসেছে সৈকত থাকতে, ইন্দ্রনীল তার পানে চায় নি—তার মন ছিল ঘরের দিকে। আজ শূন্য-মনে সে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে, তীরের আকর্ষণে তবুও সে বিচলিত হয়ে সরে আসে।

ঘৃণায় সমস্ত হৃদয়টা ভরে ওঠে—অথচ সৈকত আসার আগে এ রকম ঘৃণার ভাব একটা দিন একটা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে জাগে নি। আগে যা ছিল তার কাছে আনন্দ আজ তাই হয়েছে দারুণ ঘৃণা।

কিন্তু তমসার কাছে না গিয়েও উপায় নেই, তাকে যেতে হবেই। তমসার আকর্ষণ দুর্ণিবার, সকাল হতে সে নিজেই মটর নিয়ে আসে, তাকে তুলে নিয়ে দমদমায় চলে যায় এরোপ্লেন চালাতে।

এ যেন একটা নেশা।

নেশা ছুটলে মাতাল মনে ভাবে আর মদ খাবে না, কিন্তু সময় উপস্থিত হলে থাকতে পারে না। ইন্দ্রনীল ভেসে চলেছে—দেখছে—ধ্বংসের মধ্যে আনন্দ পাওয়া যায় কি না।

সৈকতকে বিয়ে না করার মূলে ছিল জিদ, নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, তাতে পরাজয় ছিল না, ছিল জয়ের আনন্দ—

কিন্তু এতে আছে নিরানন্দ—পরাজয়ের দুঃসহ বেদনা, তবু একে এড়ানো যায় না ;—ইন্দ্রনীল তাই ভেসে চলেছে, শেষ পর্য্যন্ত দেখতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছে। (ক্রমশঃ)

ফুজি পর্ব্বতের উদ্দেশে

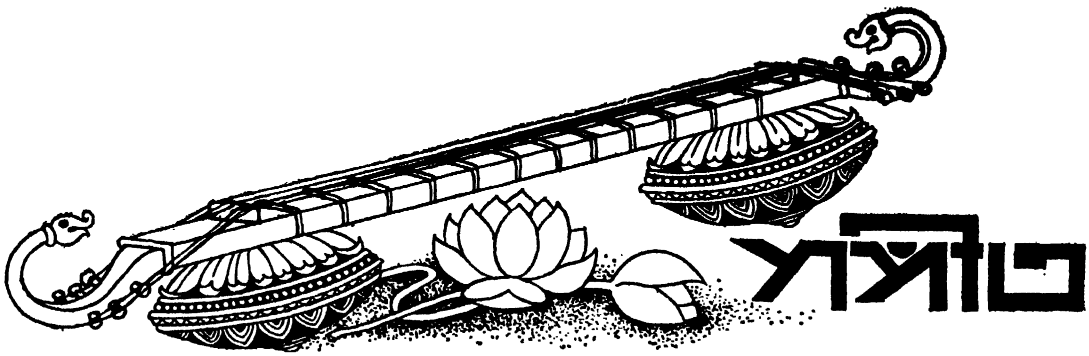
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

(নোগুচির 'From the Eastern Sea' হইতে)

তোমার নিঃশ্বাস বায়ু পেয়েছি যে, তাই মোরা বুঝি
মোদের অমর রূপ, হে হিমাদ্রি নগরাগ ফুজি !
নৈঃশব্দ সঙ্গীত তব, যে সঙ্গীতে পূর্ণ সুরলোক।
আছে জ্বালা, মৃত্যুভয় এ মরতে, তাই তুলি চোখ
সেই অমরার পানে, দৃষ্টি যেথা সান্দ্র সুখ ঘন।
স্রষ্টার গৌরবস্তম্ভ, হে ভূধর, প্রশস্তি কীর্ত্তন
করি মোরা জাপানের পুত্রকন্যা তোমার উদ্দেশে,
আমাদের ছায়াগুলি এঁকে দিই বক্ষে তব এসে,
সে উদার বক্ষঃস্থল চিরন্তন সৌরভ নিলয়,
হে অমলকুন্দ কান্তি, নিখিলের অপূর্ব্ব বিস্ময় !

তুমি প্রতিদ্বন্দ্বী-হীন অনুপম গাম্ভীর্য্যে শোভায়,
অগণন নদী ভালে চিত্র-লেখা সম দীপ্তি পায়
পূত ছায়াখানি তব। গিরিরাজি ঊর্দ্ধে তুলি শির
তোমার আদেশবাণী শুনিবারে করিয়াছে ভিড়।
চৌদিক ঘেরিয়া তব উথলয় নীল অম্বুরাশি ;
বুভুক্ষু শার্দ্দূল সম তীক্ষ্ণ দ্রংষ্ট্রাবলি পরকাশি'
গর্জ্জন-মুখর সিন্ধু সহসা হারায় আর্ত্তরব,
নেহারিয়া ছায়াঘন মূর্ত্তি তব মানে পরাভব,
সে জলদ মন্দ্র ধীরে লীন হয় নিদ্রালু মর্ম্মরে,
সুললিত শ্লোক স্বপ্নে শান্তি যেন পেল সে অন্তরে।

মোরা সাগরের তীরে ভুলে যাই মৃত্যুর বারতা।
মরণ মধুর বটে, তদপেক্ষা আছে মধুরতা
বেপথুল এ জীবনে। এ মরতে আমরা অমর,
হে অম্লান, হে শাশ্বত, আমরা তোমার অনুচর।



সঙ্গীত

আকৃতি

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

সুর ঃ—দ্বিজেন্দ্রলাল কথা ও স্বরলিপি ঃ----দিলীপকুমার

"নীল আকাশের অসীম ছেয়ে ছড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো"—দ্বিজেন্দ্রলাল।



শ্রীদিলীপকুমার রায়

আজ মা প্রাণের প্রতি কলি তোর তপনের চায় যে আলো :
আজ মনে হয় : তিমির-ক্ষুধাও শরণ-সুধাই বাসে ভালো।
যত দূরেই হোক্ তোর আকাশ,
আনে তো সে-ই মুক্তি-আভাষ,
বয় যত তোর মলয়-বাতাস
মরে মরণ, ঝরে কালো :
স্বপ্ন-প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো॥

প্রতিপদেই শুনি মা তোর মিলন-মণির নূপুর-ধ্বনি :
হারাই মুখর মেলায় তবু সঙ্গোপনীর আগমনী।
যতই মা তোর সিন্ধু পানে
ধায় হৃদি নদ অকূল-টানে,—
ততই স্ফটিক-ছন্দ বানে
যায় ভেসে হিম বাঁধ নিরালো :
স্বপ্ন প্রাণের মগ্ন কলি নীল করুণার চায় যে আলো॥

প'ড়ে মিছে মায়ার ফেরে কাণ পাতি মা ছায়ার ডাকে :
প্রেম-পুলিনে তাই তো বরণ-ফুল ফোটে না স্মরণ-শাখে।
আজ পিয়াসী জীবনটিরে
ঠাঁই দে মা তোর চরণ-তীরে,
আজ শ্রাবণের অশ্রু-নীরে
নিদাঘ ব্যথা দেখ্ মিলালো :
স্বপ্ন প্রাণের মগ্ন কলি তোর করুণার চায় যে আলো॥

০ ১ + ৩ ০

II সা সা সরগমপা | পা পা -া | ধপধা পগা পা | মা মা পমা | গা -া মগা |

আ জ মা প্রা ণে র প্র তি - ক লি - তো র ত

১ + ৩ ০ ১

রা সা -া | ন্সা রগমা গরা | গা রা গা | সা -া ন্সরা | রা রা -া |

প নে র চা য় যে আ লো - আ জ ম নে হ য়

+ ৩ ০ ১ +

গা রগা পা | মা মা পমা | গা রগা রগা | রা সা -া | সা ন্সা রগমা

তি মি র ক্ষু ধা ও শ র ণ সু ধা ই বা সে -

৩ ০ ১ + ৩

রগা রা গা | সা পা পা | পা পা -া | ধপা পধা পা | মা মা পমা

ভা লো - আ জ মা প্রা ণে র প্র তি - ক লি -

০ ১ + ৩ ০

গা -া রগা | রা সা -া | ন্সা রগমা গরা | গা রা গা | { মা পা না |

তো র ত প নে র চা য় যে আ লো - য ত -

য ত ই

নী ড় পি

১ + ৩ ০ ১

না না র্সা | র্সা -া র্সা | র্সনা র্রর্সা নর্সা | রর্সা র্রণা -া | ধা পা -া |

দূ রে ই হো ক তোর আ কা শ আ নে - তো সে ই

মা তো র সি ন্ ধু পা নে - ধা য় দ্ব দি ন দ

যা সী - জী ব ন টি রে - ঠাঁ ই দে মা তো র

+ ৩ [-া -া] ০ ১ +

পধা পধা র্সা | ণা র্সণা ধপাধ | } পণা -া ধণা | ধা পা ধা | পধা পগা পা |

মুক্ তি - আ ভা য ব য় য ত তো র ম ল য়

অ কূ ল টা নে - ত ত ই স্ফ টি ক ছন্ দ -

চ র ণ তী রে - আ জ শ্রা ব ণে র অ শ্রু -

৩ ০ ১ + ৩

মা গা -া | গা গা মা | পা না -া | র্সা নর্সা নর্সা | ধা পধা ণপা |

বা তা স ম রে - ম র ণ ঝ রে - কা লো -

বা নে - যা য় ভে সে হি ম বাঁ ধ নি রা লো -

নী রে - বি ষা দ ব্য থা - দেখ্ মি - লা লো -

০ ১ + ৩ ০

ধা -া র্সণা | ধা ধা -া | মা -া পধর্সণা | ধা পা ধা | পমা -া রগা |

স্ব প্ ন প্রা ণে র ম গ্ ন ক লি - নী ল ক

১ + ৩ ০ ১

রা সা -া | ন্সা রগমা গরা | গা রা গা | সরা গমপা পা | পা পা ধা |

রু ণা র চা য় যে আ লো - আ জ মা প্রা ণে র

+ ৩ ০ ১ +

পধা পগা পা | মা মা -া | গা -া রগা | রা সা -া | ন্সা রগমা গরা |

প্র তি - ক লি - তো র ত প নে র চা য় যে

৩ ০ ১ + ৩

গা রা গা | সা সা রা | রা রা -া | রগা মগা রা | রা রা -া |

আ লো - প্র তি - প দে ই শু নি - মা তো র

প ড়ি - মি ছে - মা য়া র ফে রে -

০ ১ + ৩ ০

রা গা মা | পা ধপা রা | রগা রগা পা | মা মা পমা | গা রগা রগা |

মি ল ন ম ণি র নূ পু র ধ্ব নি - প্র তি -

কা ন পা তি মা - ছা য়া র ডা কে - প ড়ে -

১ + ৩ ০

রা সা রা | রগা মগা রা | রা রা -া | রা গা মা | পা ধা রা |

প দে ই শু নি - মা তো র মি ল ন ম ণি র

মি ছে - মা য়া র ফে রে - কা ন পা তি মা -

+ ৩ ০ ১ +

রগা রগা পা | মা মা -া | মা গমা পা পা পা -া | পধা পধা র্সা |

নূ পু র ধ্ব নি - হা রা ই মু খ র মে লা য়

ছা য়া র ডা কে - প্রে ম পু লি নে - তাই তো -

৩ ০ ১ + ৩

ণা ণা -া | ধা পধা পা | মা গরা সা | সা রগা মপা | মা মা -া |

ত বু - সং - গো প নী র আ গ - ম নি -

ব র ণ ফুল্ - ফো টে না - স্ম র ণ শা খে -

এ গানটি দ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত "নীল আকাশের" গানটির ছন্দে ও সুরে রচিত। দ্বিজেন্দ্রলাল অভিনব সুরে কী ভাবে ক্ল্যাসিকাল স্বর বৈচিত্র্যের অবকাশ রাখতেন এ গানটি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এতে ছায়ানট খাম্বাজ দেশ প্রভৃতির ছোট তান কম্পন মূর্চ্ছনার অবসর প্রচুর। দ্বিজেন্দ্রগীতি-তে "নীল আকাশের" গানটির স্বরলিপির সঙ্গে এর স্বরলিপি তুলনা করলেই প্রতীয়মান হবে এ গানটির প্রতি চরণ কী ভাবে লীলায়িত করা হয়েছে মূল সুর রেখে। বস্তুত ক্ল্যাসিকাল গানের একটি প্রধান রস এইখানেই : অর্থাৎ প্রতি চরণকে নানাভাবে গাওয়া চলে হেলিয়ে দুলিয়ে তালফের ক'রে রাগফের ক'রে। শুধু তানই ক্ল্যাসিকাল ঢঙের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। প্রতি চরণের স্বরবিন্যাস গুণী নিজের প্রেরণা অনুসারে কম বেশি বদলাতে পারেন এখানেই তিনি স্রষ্টা হ'য়ে ওঠেন। এই সুরেই রচিত অনিলবরণের সুন্দর গান "তুই মা আমার হিয়ার হিয়া—তুই মা আমার আঁখির আলো" গানটি সাহানা দেবী সম্প্রতি গ্রামোফোনে দিয়েছেন, তাতে দ্বিজেন্দ্রলালের এই লীলায়িত ভঙ্গির মহিমা কিছু ফুটেছে, অল্প সময়ে যতদূর সম্ভব। ইতি। শ্রীদিলীপকুমার রায়

নৈনীতাল—দি লেক্-ল্যাণ্ড অফ্ ইণ্ডিয়া

শ্রীবিনয় ভট্টাচার্য্য

২৬শে সেপ্টেম্বর রাত্রি ১০-৩০। দেরাদুন এক্সপ্রেসে টান পড়লো। 'রিজার্ভ' করা কামরায় আমরা চলেছি ১৯ জন—১৬ জন ছাত্র, প্রফেসার অলোক সেন (ভারতবর্ষ-সম্পাদক জলধর বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র), জগদীন্দ্র বসু, আর Laboratory-in-charge দেবেন। ঘরের মায়া চিরদিনই পিছু ডাকে, তাই মনটা একবার দুলে উঠলো। এই যাবার জন্য দু'দিন ধরে কত সাজ-গোজ, কত আনাগোনা, যাকে ছাড়বার জন্য মনের প্রতি কণা হয়েছে উন্মুখ প্রতিমুহূর্ত্তে—সে আজ বিদায়-ক্ষণে পিছু ডাকে। মনে হলো, এই চলে যাবার পেছনে একটি অনন্ত বেদনার সুর রয়েছে, যে সুর—যাকে ছেড়ে চলে যাই—তাকে বড় করে তোলে, তোলে তাকে মহীয়ান করে।



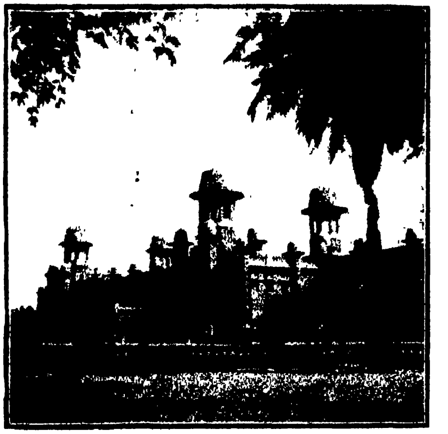
আমাদের দল— বাঁদিক থেকে উপবিষ্ট—প্রফেসার অলোক সেন, ডাক্তার বি, সি, ঘোষ ও জগদীন্দ্র বসু

[ফটো—খগেন দাস

আর আমাদের যাত্রাপথ করে তোলে সুখময়, সুন্দর। ঘরের প্রতি আমরা যতই বিমুখ হই, সে বিমুখতা কত ক্ষুদ্র, তা বুঝি আমরা যখন তাকে ছাড়ি। যেমন জীবন যে কত বড় বুঝি তখন, যখন মৃত্যুর অদৃশ্যপথ দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

অচল গাড়ী এতক্ষণে বেশ সচল হয়ে উঠেছে। লিলুয়া ষ্টেশনের আলো দেখ্‌তে দেখ্‌তে মিলিয়ে গেল। দেবেন এতক্ষণে আমাদের 'Luggage' গুলোর একটা সু-ব্যবস্থা করে হাঁপিয়ে উঠেছে। Luggageতো আর কম নয়—১৯ জনের সুটকেশ ১৯টি (আকারে ষ্টীল ট্রাঙ্কের দ্বিগুণ এবং ওজনের কথা বললে রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দেবার জন্য আপনারা দুর্নাম দিতে পারেন, এই ভয়ে সেটা উহ্য রেখে গেলুম), ১৯টি 'বেডিং,' Microscope গুটি পাঁচেক, বই গাদা খানেক। রান্নার জিনিষপত্র অলোকবাবুর ওষুধের বাক্স (হোমিওপ্যাথিক থেকে এলোপ্যাথিক), আর আমাদের ধনী বন্ধুদের প্রসাধনের দ্রব্যে ভরা আর একটি করে ছোট সুট্‌কেশ।

এর ভেতরে ১৯ জনের মধ্যে চারটে দল হয়ে গেছে: অলোকবাবুকে নিয়ে জন ছয়েক বসেছে তাস নিয়ে, বন্ধুবর শৈলেন গুপ্ত, রবি মুখার্জ্জী প্রভৃতি জন চারেক আরম্ভ



লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনের একাংশ [ফটো—শৈলেন ধর

করছেন বাঁশী এবং গান, ও কোণে চলেছে গভীর Politics আলোচনা…আবিসিনিয়া-মুসোলিনী, সমর—শৈলেন ধর প্রমুখ কয়েকজন করছেন শোবার জোগাড়। আশ্চর্য্য!—মাত্র ১৯ জন—যাদের লক্ষ্য এক, যারা একই উদ্দেশ্যে, একই কামরায় একই সঙ্গে চলেছেন—তাদের মাঝেই যদি চলার পথে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হয়। তবে এই ভারতবর্ষের মত দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতের সৃষ্টি না হওয়াই আশ্চর্য্য।

সীতাভোগ-মিহিদানার আওয়াজ মিলিয়ে গেল—গেল আসানসোল, কুলটীর লৌহ কোম্পানীর জলন্ত furnace দেখা যেতে লাগল—ওর সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই হয়তো

উদরের অগ্নি জ্বলতে আরম্ভ হয়েছে, হয়তো সমাপ্তি পর্য্যন্ত জ্বলতে থাকবে।

কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশী, রাত্রি তার সমস্ত রূপ, সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে ভরে উঠেছে আজ। রাত্রির এত ঐশ্বর্য্য এমনভাবে কোন দিন দেখবার সুযোগ হয় নি—এত ঐশ্বর্য্য যে সমস্ত পৃথিবীকে তাই দিয়ে মুড়ে ফেলেছে—তবু অজস্র আছে পুঞ্জীত হয়ে এখানে সেখানে। এ দিয়ে সে হয়তো আরো দু'তিনটে পৃথিবীকে মুড়ে ফেলতে পারে। ওর 'নীলাম্বরীর নীল-সায়রেতে' দু'চারটে নক্ষত্র জ্বলছে—যেন কাপড়ের ওপর বসানো হয়েছে জরির ফুল।

'ওরকম ভাবে মুখ বা'র করো না বিনয়, কয়লা পড়বে চোখে'—অলোকবাবুর স্বর শোনা গেল। কবিত্বে পড়ল বাধা শাসনের রূঢ় স্পর্শে, মুখ ভেতরে এনে অলোকবাবুর দলেই যোগ দিলুম—কারণ এ দলটাই এখন পর্য্যন্ত ভারী। খেলা বেশ চলেছে, কিন্তু মুস্কিল সুকেশকে নিয়ে। ওর দোষ হলেই বলে উঠবে : না স্যার, ওটা আপনাদেরই ভুল ; Culbertson এখানে বলেছেন···। অন্ন খোরাক ফুরিয়ে এলেও হাসির খোরাক যোগাচ্ছিল বেশ।

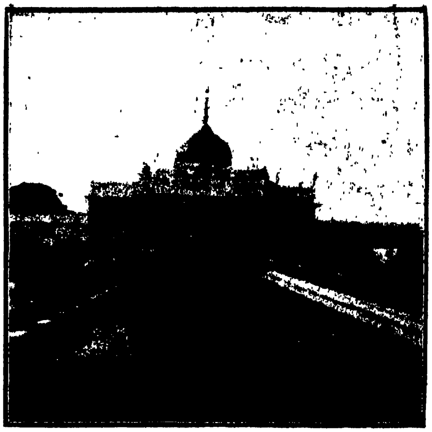
তন্দ্রা একটু এসেছিল, হয়তো বা ঘুম। কাণে সুড়সুড়ি লাগাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি অলোকবাবু হাসছেন।·· এদিকে অন্ধকার মুছে এসেছে, ভোরের আলো জেগে উঠেছে, জেগে উঠেছে আশপাশে পাহাড়ের ওপর পাখীর গান।

'নীলাম্বরীর নীলসায়রেতে রক্ত কমল দু'টি,
প্রথম ভোরের বাতাস পাইয়া করিতেছে ফুটি ফুটি'।

দেবেন রাশি-খানেক খাবার সাজিয়ে বসে বসে ঢুলছে, জন ছয়েক বাদে আর সবাই কুঁকড়ে-মুকড়ে ঘুমোচ্ছে—যেন বারোয়ারী মাঠের ভাঙ্গা যাত্রার আসর।·· চায়ের সঙ্গে হ'ল প্রচুর জলযোগ। সবাইকে আবার বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছে। দু'পাশে বনময় পাহাড়—তারই ওপর শাল মহুয়ার গাছ। দূরের পাহাড়শ্রেণীর পেছন থেকে সূর্য্যদেব উঁকি মারছেন।

'সুনীল গগন ঘনতর নীল অতিদূর গিরিমালা,
তারি পরপারে রবির উদয় কনক-কিরণ জ্বালা।

মোগলসরাইয়ে ভাত-মাংস খেয়ে আমাদের ১৪জন বন্ধু হতাশ হয়ে পড়লেন। আমাদের পাঁচ জনের হতাশ হতে হল না যেহেতু আমরা খেয়েছিলুম আঙ্গুর, আপেল, আর প্যাঁড়া সন্দেশ।···গঙ্গার ব্রিজের ওপর উঠেছি—এর ওপর থেকে কাশী কি সুন্দর দেখায়, যেন একখানা ছবি। মোটেই মনে হয় না এর ভেতর আছে বড়বাজারের মত ছোট ছোট গলি, আর তার দু' পাশে হাটখোলার গুদামঘরের মত



লক্ষ্ণৌ ইমামবাড়ী—ভেতরের অংশ

[ফটো—শৈলেন ধর

অন্ধকার বাড়ী। বিশ্বনাথের মন্দির দেখা গেল—নমস্কার করলুম।

ভোর থেকে চোখে পড়েছে দু-পাশে পাহাড় শ্রেণী—



ইউ-কালিপটস্ গার্ডেন, লক্ষ্ণৌ

[ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

এবার আবার সমতল ক্ষেত্র, দু-পাশে ধান ও জোয়ারের ক্ষেত। জোয়ার কি জিজ্ঞেস কর্ত্তে অলোকবাবু বললেন—কেন পড়েছ তো—

বেলা দ্বিপ্রহরে—
যে যাহার ঘরে—
সেঁকিছে জোয়ারী রুটী।

মাঝে মাঝে মরুভূমির মধ্যে ওয়েশিসের মত একখানি গ্রাম দেখা যায়—খেজুর, বাবলা, আর আম গাছে ঘেরা। ছেলে-মেয়েরা ছুটে আসে গাড়ীর শব্দ শুনে, মেয়েরা ঘরের পাশ থেকে ঘোমটা তুলে দেখে···

আর সময় কাটতে চায় না। দুপুর বেলা ট্রেণে কাটে ভয়ানক কষ্টে। কেউ বা ঝিমুচ্ছে, কেউ বা বসেছে তাস নিয়ে, বাঁশী নিয়ে, বই নিয়ে, সমর তো সব সময়ই ঘুমুচ্ছে; ওই জন্য অলোকবাবু ওর নাম দিয়েছেন sleeping boy। মাঝে মাঝে দু' একটা হাসির কথা ওঠে বটে, কিন্তু তাতে ভাল জমে না—সেটা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ভেঙ্গে যায়।



লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সি [ফটো—খগেন দাস

বাঁদরের প্রাচুর্য্য দেখে বোঝা গেল অযোধ্যায় এসেছি। যেমন ধুলা, তেমন বাঁদর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অনেক পুরাণ ভগ্নবাড়ী পড়ে রয়েছে—দূরে অনেকগুলি মন্দির। মন্দিরের স্বর্ণ-চূড়া জলছে সূর্য্যের আলোকে।

এই একদিনের Journeyতেই সবার মন হয়েছে স্তিমিত, নিরানন্দ, উৎসাহহীন। তাই ঠিক হল লক্ষ্ণৌতে একদিন Break Journey করা যাক্। কিন্তু লক্ষ্ণৌ যে আর আসে না। কে এর নাম দিয়েছিল দেরাদুন এক্সপ্রেস—এত গরুর গাড়ীর বেহদ্দ। অলোকবাবু ত বলে উঠলেন: আমাদের কি দয়া করকে লে যাতা হায়! (অলোকবাবু এখন প্রতি কথায় হিন্দী বলেন), ৩৭ মিনিট লেট ক'রে সন্ধ্যার ছায়ায় City of Gardenএ পৌঁছলুম। রাত্রিটা কাট্‌ল ধর্ম্মশালায়, দিনটা কাট্‌ল টাঙ্গার ওপরে।··· ইমামবাড়ী, রেসিডেন্সি, মিউজিয়াম, পশুশালা, বোটানিকেল গার্ডেন, ইউনিভারসিটি প্রভৃতির ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া হল মাত্র। লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনটি ভারি চমৎকার। যাক্ সে সব কথা এখন থাক্। সে সম্বন্ধে অনেকেই বলেছেন। কিন্তু একটা কথা না বলে পাচ্ছি না। দুপুর-বেলা ষ্টেশনে গিয়েছিলুম চিঠি 'পোষ্ট' কর্ত্তে, শৈলেন ধর এবং সমর চ্যাটার্জ্জী সহ। হঠাৎ একজন পুলিস এসে আমাদের ষ্টেশনের বাইরে যেতে বললে। জিজ্ঞেস করলুম: ব্যাপার কি? উত্তর এল: I won't hear, you must get out. তার ইংরেজীর স্রোতে ভেসে আমরা ষ্টেশনের বাইরে এলুম। জনকয়েক লালমুখ মোটরে করে চলে গেলেন। হঠাৎ দেখি সেই পুলিশটা এসে বলছে: বাবু, কুছ মনে নেহি কিজিয়ে, পুলিশকমিশনার ভী যাতা হো, উসি বাথ হাম আপকো—। জুতা মেরে গরু দান। তবে পুলিশের এই যা। সন্ধ্যায় আবার দেরাদুন এক্সপ্রেস ধরলুম, রাত্রি ১০-৪৮ মিনিটে এল বেরিলী। এখান থেকে আমাদের R. K. R.এর ছোট গাড়ীতে উঠ্‌তে হল। খাবার সময় ছিল না বলে খাওয়া হল না, রাত্রি ৪টার সময় ভাঙ্গল ঘুম। কিন্তু কি শীত—এ যে দারুণ! সোয়েটার র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে বস্‌তে বস্‌তেই এল কাঠ-গুদাম, আমাদের Railway Terminus. প্রথম ভোরের অস্পষ্ট আলো, রাত্রিশেষের নক্ষত্রখচিত আকাশ, পর্ব্বত-শ্রেণীর মাঝে মাঝে প্রজ্জ্বলিত দীপমালা, ষ্টেশনের পাশের গলা নদীর ঝিরঝিরে স্রোতের মাঝে এই অজানিত নূতন জায়গাটাকে ভারী ভাল লাগল।

'কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।'

এবার আমাদের ২২ মাইল পথ যেতে হবে বাসে। উঠ্‌তে হবে প্রায় ৫০০০ ফিটের কিছু ওপর। ষ্টেশনের গায়েই বাসষ্ট্যাণ্ড, পোষ্ট-অফিস এবং একটি ধর্ম্মশালা। যারা কৈলাস যান, তাঁদের এখান থেকে বাসে যেতে হয় আলমোড়া, তারপর অশ্বপৃষ্ঠে ও পদব্রজে।

দুখানা বাস বোঝাই হয়ে যাত্রা করলুম। রাস্তাটি পিচের, ভারী সুন্দর। দুখানি গাড়ী পাশাপাশি যেতে পারে। পাহাড়ের ওপরের মোটর রাস্তা হিসেবে এটা পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ। গাড়ী ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে শীর্ণকায়া ঝরণা প্রথম সোণার আলোয় চিক্‌মিক্ করছে, নীচে ঝাউ ও বাবলার ঘন জঙ্গল। সার বেঁধে সব খচ্চরের পিঠে করে আলু নিয়ে আসছে। ঝরণার পাশে কলা গাছের ঝোপে ঝোপে দু' একখানি কুঁড়ে ঘর চকিতের জন্য দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায়। পথের বাঁকে বাঁকে পাইন বনের ও চীর গাছের ফাঁকে শরতের সুনীল আকাশ চোখে পড়ে—মেঘমুক্ত, নির্ম্মল আকাশ। এ পথে চলতে বেশ লাগে। প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব বাঁকে নব নব সৌন্দর্য্য পথিকের মন ভুলিয়ে প্রলোভিত করে। অনাস্বাদিত সৌন্দর্য্য প্রতিমুহূর্ত্তে হয় আস্বাদিত, আবার আসে নব সৌন্দর্য্য। কত অনাগত গত হল, অদৃশ্য দৃশ্যমান হল, গাড়ী চলল ছুটে। বেলা ৯টা নাগাৎ পৌছলুম নৈনিতাল। এর জন্য দিতে হল মাথা পিছু ১৸৹ বাস ভাড়া, আর ১৲ টাকা টোল্ (Toll)। এপথে মোটরগাড়ীও ভাড়া পাওয়া যায়।

লেকের ধারে দাঁড়িয়ে একবার চারিদিকে তাকালুম। এই নৈনিতাল। একে দূর থেকে খুব সুন্দর ভেবে শান্তি পেয়েছি, ভেবেছি অমূল্য স্থান, কিন্তু আজ হাতে পেয়ে তার আর কোন মূল্যই রইল না, পাওয়া মানেই তার দর কমে যাওয়া।...শুধু পেয়েছি এই মাত্র! কিন্তু এর জন্য এত কৌতূহল, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-ব্যথা মূল্যহীন হয়ে গেল। এ যেন ভূমিকা হল মূল্যহীন আসলের চেয়ে। অথচ আসলের জন্যই ভূমিকা।

'মার্ভেলাস্', 'চার্মিং', চমৎকার! এরকম অনেকগুলো কথা বন্ধুদের কাছ থেকে শোনা গেল। সব কথাই সত্য, খুবই সুন্দর জায়গা। এ রকম 'হিল ষ্টেশন' ভারতবর্ষে আছে খুব কম, কিন্তু তা সত্ত্বেও একে খুব বড় করে দেখেছিলাম, এ দূরত্বের ব্যবধান ভরিয়ে তুলেছিলাম কল্পনার রঙীণ রেখায়।

হিন্দুস্থান হোটেলে উঠা গেল। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠান—বিশেষ তো অবাঙ্গালীর দেশে। এখানকার কুলীরা সৎ এবং বিনয়ী। অসম্ভব দরিদ্র বটে, কিন্তু আপনি যা দেবেন তাই হাসিমুখে নিয়ে যাবে। এরা পরিশ্রমী, সাহসী এবং নির্লোভ; অশিক্ষিত বটে, কিন্তু অসভ্য নয়। থাকবার জন্য সম্পূর্ণ সাধারণ বাড়ীর ভাড়া ৩০৲-৫০৲ পড়ে। তবে বাড়ীর কর্ত্তারা ঠকিয়ে নেবার জন্য ভয়ানক চেষ্টা করে। বাঙ্গালী তাদের একটি মস্ত বড় শিকার।



কাঠগুদাম ব্রিজ, ষ্টেশনের পাশে (নীচে গলা নদীর জল দেখা যাচ্ছে, পাশে পাহাড় শ্রেণী) [ফটো—শৈলেন ধর

হিন্দুস্থান হোটেলটি ঠিক লেকের উপরেই। তেতলায় আমাদের জন্য ৪খানা ঘর, ২টা বাথরুম, ১খানা রান্না-ঘর ঠিক হল—দৈনিক ৫৲ টাকা ভাড়া হিসেবে। দু' তিনজনের



চীনা পিক ও সহর [ফটো—খগেন দাস

থাকবার জন্য হোটেলে ১৲ টাকায় বেশ ভাল ঘর পাওয়া যায়। রান্নার জন্য ঠাকুর এবং একজন চাকর ঠিক হলঃ। রোজ তাদের আট আনা হিসেবে। নিজেদের

খাবার ব্যবস্থা নিজেরা কর্ত্তে পারলেই ভাল হয়। তাতে খরচও বাঁচে, আনন্দও হয়—আর ইচ্ছেমত খাওয়া চলে। জিনিষপত্র অবশ্য বিশেষ সস্তা নয়। চা'ল ১০৲ টাকা মণ, ডিম ছ' আনা কুড়ি, মাংসের সের ১৪ আনা, মাছটা পাওয়া যায় কম…দর খুব বেশী নয়। আমরা ৪৮০ আনায় সের পাঁচেক একটা রুই কিনেছিলুম। খুচরা পাওয়া মুস্কিল। তরি-তরকারী প্রায় সবই পাওয়া যায়, দর কোল্‌কাতার চেয়ে কিছু বেশী, বাঁধাকপি, বীট, মূলো, টমাটো বেশ সস্তা, আমদানীও প্রচুর। আলু হয় এখানে প্রচুর—অথচ তার দর কোলকাতারই মত। কারণ উৎপন্ন যা হয়, তা প্রায়ই চালান হয়ে যায়।…হোটেলে সাধারণ দু'টো Mealএর খরচ ১॥০ টাকা, ভাল খেতে হলে ৩॥০ টাকার কম হয় না। তারপর আছে 'টিফিন' খরচ। যাক্, যখনকার যা—

বাসের পেট্রলের গন্ধে ও ঝাঁকানিতে বেশ গা বমি বমি করছিল। বন্ধুবর শৈলেন ধর নেবুটেবু খাইয়ে আমায় আরোগ্য করিয়ে তবে রেহাই দিলেন।…লেকের সামনের ছোট ঘর দু'খানার একখানা নিলেন অলোকবাবু, বাকী খানা নিলুম আমরা চারটি বন্ধু—সমর, আমি, শৈলেন গুপ্ত, শৈলেন ধর। এ দু'খানা ঘরই সবচেয়ে ভাল। ঘরের মধ্যে দু'খানা খাট, একটা সোফা, একটা ড্রেসিং টেবিল, একটা আলনা।…দিনটা কাট্‌ল জিনিষপত্র গোছাতে আর বিশ্রাম নিতে। আমি তো সন্ধ্যে পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে কাটালুম।

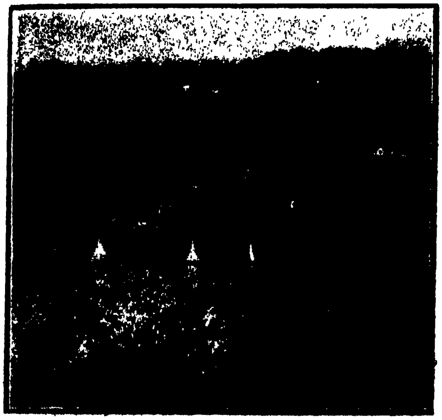
…চোখ খুলে দেখি দিনের কমলটি মুদে এসেছে, সূর্য্য গেছেন অস্তাচলে—কিন্তু লেকের জলে, পাহাড় শ্রেণীর ওপরে পাইন বনের শিখায় তার রক্তাভাষ রয়েছে এখনও। অনেকদিন দেখেছি দিবার বিদায়—দেখেছি মুক্ত মাঠের শেষে সুদূর দিকচক্রবালে, সমুদ্রের তীরে। কিন্তু কখনও ভাবি নি যে এর মধ্যে দেখার কিছু আছে। আজ ক্রম-বিলীয়মান রক্তিম রেখার মাঝে বিদায়মান দিবাকে দেখতে দেখ্‌তে একটা অনন্ত বেদনার সুর জেগে উঠল।…



লেকের উত্তর পশ্চিমের দৃশ্য—ডাণ্ডা-হিলের একাংশ

ভোরের আলো যে রক্তিমরাগে রঞ্জিত হয়ে বিপুল পৃথিবীকে নিজের ঐশ্বর্য্য দিয়ে ভরে দিয়েছিল, তখন কে ভেবেছিল এর সমাপ্তি আছে! সমস্ত পৃথিবী যাকে চেয়েছিল নিজের প্রয়োজনে, তাকে পাওয়া হয়ে গেছে, তার আর কোন মূল্য নেই, তার বিদায়ের ক্ষণে কারো মনে নেই এক ফোঁটা দুঃখ…কেউ ফেলছে না এক ফোঁটা অশ্রু। এমনই হয়তো হয়! মানুষ যখন যৌবনের শিখায় বসে থাকে তখন কার মনে হয় সে একদিন চলে যাবে। অথচ তাকে যেতে হয়; এই বিপুলা পৃথ্বী, নীলাকাশ, আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যখন তাকে যেতে হয়—তখন ক'জনই বা

তার কথা ভাবে, তার জন্য ফেলে চোখের জল। আমাকেও হয় তো একদিন যেতে হবে—ওই নীলাকাশ, পর্ব্বতমালা, পাইনবন, গিরিসানুদেশে সঞ্চরণশীল মেঘদল, পৃথিবীর এই অসীম ঐশ্বর্য্যসম্ভারকে ফেলে যেতে হবে



লোক ও "ডিওপাথ হিল"

[ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

মহাকালের সীমাহারা সমুদ্রে মিশে—তখন এই যে সমর-শৈলেন-হরদেব, আর যারা আজ আমায় এত ভালবাসে, তারা ক'জনই বা আমার কথা ভাব্‌বে, ফেলবে আমার জন্য একবিন্দু অশ্রু? এই সামান্য কটা কথায় চোখের উৎস খুলে গেল—আমি তাকে রোধ করতে পারলুম না…

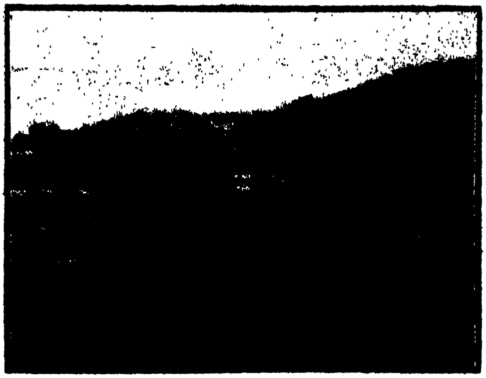
অলোকবাবু ডাকলেন চা খাবার জন্য। ওরা সবাই চা খেয়ে বিকেলেই বেরিয়েছে—আমার জন্য হলো আবার নূতন করে। বললেন: শরীরটা খারাপ লাগছে না তো আর? 'না স্যার, ঘুমিয়ে বেশ ভালই হয়েছে।'… খানিকক্ষণ গল্প হলো। বাইরে ভয়ানক বাতাস বইতে আরম্ভ হয়েছে·· ওপরের টিনগুলা যেন উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা সব একে একে ফিরছেন। বললুম: একটু বেড়িয়ে আসি, স্যার।

বেড়িয়ে আসবে! কেমন চমৎকার বেড়াবার সময়—চাঁদিনী রাত, বসন্তের মধুর হাওয়া—বস।

অলোকবাবুকে নিয়ে আর পারার যো নেই। পাছে কারুর শরীর খারাপ হয় এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত। কার মাথা ধরেছে তাকে দেবেন মাথা টিপে, কার মুখ ফেটেছে তাকে দেবেন 'গ্লিসারিণ' বার করে, অথচ এদিকে যে নিজের গা ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্যই নেই। বেরোন ভয়ানক কম, খালি Collected Plant, মাইক্রস্কোপ নিয়ে বসে আছেন, আর মাঝে মাঝে আমাদের নামে কবিতা লিখছেন। দু'একটি আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি:

সুকেশচন্দ্র সরকার,
পরণে 'সর্ট সার্ট' তার
ছোটখাট মানুষটি বেশ।
রাখিতে নামের মানে,
চিরুণীতে চুল টানে,
পরিপাটী রাখিয়াছে কেশ।

গাড়োয়ালী টুপি পরি—
পায়জামা পায়—
টগ্‌বগ্‌ ঘোড়া চড়ি
নবেন্দু যায়।
… … .. …
ঘোড়া চড়ি চীনাপিক
করিয়াছে জয়,
মোটর চড়িলে কিন্তু
বড় বমি হয়।



আয়ার পাথ হিল [ফটো—শৈলেন ধর

ওঁর অনুরোধে বসলুম বটে, কিন্তু বেশী দু'চারজন আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠে পড়লুম এক ফাঁকে।

নৈনীতালকে প্রাচীনত্বের মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

স্কন্দপুরাণে এই স্থানটি ত্রিঋষী সরোবর বা ত্রিশেশ্বর নামে অভিহিত আছে। ত্রিঋষী বা ত্রিশেশ্বর মানে—তিনটি ঋষির দ্বারা সৃষ্ট সরোবর। এক সময় মুনিবরত্রয় অত্রি, পুলস্ত্য ও পুলহ কৈলাস যাবার পথে এই স্থানে উপস্থিত হন। জলের কোন উৎস বা নদী না থাকাতে জলাভাবে তাঁদের অত্যন্ত কষ্ট অনুভূত হতে লাগল। সুতরাং তাঁরা এখানে একটি ক্ষুদ্র সরোবর খনন করেন এবং এটা তৎক্ষণাৎ জলের দ্বারা পূর্ণ হয়। সেই অতি ক্ষুদ্র সরোবর থেকেই এই লেকের উৎপত্তি। বর্তমান নামটি হয়েছে নৈনীদেবী ও লেকের সংযোগে। হিন্দীতে তাল মানে বড় সরোবর। নৈনী হয়েছে নয়ন থেকে।

সে সব ছেড়ে দিয়ে বৃটিশ রাজত্বে আসা যাক্। ১৮৩৯ খৃঃ অব্দে লেকটির প্রথম অস্তিত্ব জানা যায়। তখন এ স্থান বন্যজন্তুতে পূর্ণ গভীর জঙ্গলে আবৃত ছিল। শুধু তাই নয়—ভূত এবং পরীরাও নাকি এখানে বাস করত। তাই ভয়ে কেউ এদিকে আসত না। শুধু বসন্ত ও বর্ষায় রাখালেরা দল বেঁধে তাদের গৃহপালিত পশুর দলকে খাওয়াবার জন্য নিয়ে আসত, কারণ পশুর খাদ্য ছিল প্রচুর। কিন্তু দল বেঁধে এলেও তাদের দু'চারজনকে প্রায়ই পাওয়া যেত না, তাই তারা পূজার দ্বারা নৈনীদেবীকে



ডাণ্ডা হিলের ওপর থেকে লেকের দৃশ্য

[ফটো—খগেন দাস

করার চেষ্টা করত। তাদের এই পূজার এবং ভক্তির দ্বারা মন্দিরটি লুপ্ত না হয়ে সুরক্ষিত হয়ে আছে।

১৮৩৯ সালে Balten এবং Mr. P. Barren লেকটির অস্তিত্ব প্রথম সভ্যজগতে প্রচার করেন। তাঁরা আলমোড়ায় এসেছিলেন শিকার কর্তে। তাঁদের দেশীয় পথপ্রদর্শকেরাই এখানে তাঁদের নিয়ে আসে। জায়গাটিকে দেখে Barren এর কি মনে হয়েছিল, সেটা তিনি "Pilgrim" নামে



চীনামল বা খেলার মাঠ [ফটো—শৈলেন ধর

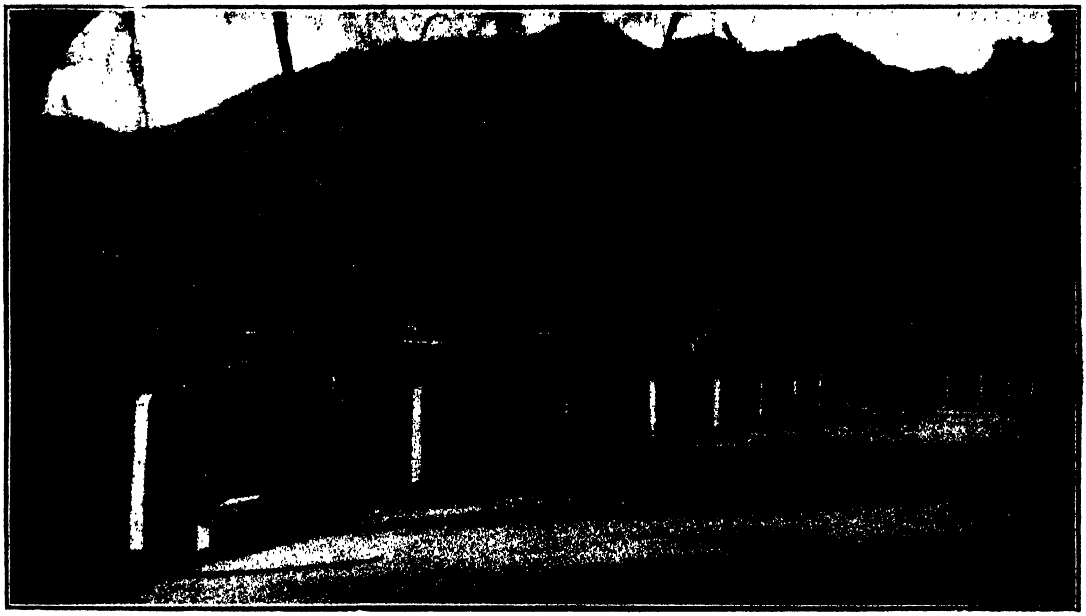
"Agra Akbar" পত্রিকায় যা লিখেছিলেন, তাই থেকে খানিকটা আমি আপনাদের উপহার দিচ্ছি :

"An undulating lawn with a great deal of level ground interspersed with occasional clumps of Oak, Cypress and other beautiful trees, continues from the margin of the lake for upwards of a mile up, to the base of a magnificient mountain standing at the further extreme of this vast amphitheatre, the sides of the lake are also bounded by splendid hills and peaks which are thickly wooded down to water's edge. On the undulating ground between the highest peak and the margin of the lake there are capabilities for a race-course, cricket ground etc. and building sites in every direction for a large town."

মধু লোভে অনেক ভ্রমরের হল আগমন, কাগজে কাগজে বেরুলো প্রচুর ছবি, তখনকার কমিশনার Mr. Lushingtonএর দৃষ্টি ফিরল এদিকে। ১৮৪২ খৃঃ অব্দে লালা মতিরাম সা Mr. Barren কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে কয়েকখানা বাংলো তৈরী করেন। ক্রমশ এল লোকজন, বাড়ল বাড়ী, হল বাজার দোকান, অল্প খাজনায় হল

'মৌরসী' ব্যবস্থা, অল্প দিনেই হয়ে উঠ্‌ল নগর। Sir Acmy Ramsay নৈনীতালকে তাঁর হেড কোয়ার্টার করলেন—'তারাইয়ে'র দস্যুদলকে দমনের জন্য। একটা ব্যারাক হল সৈন্যদের জন্য। তা ছাড়া অসমর্থ (convalescent) ব্রিটিশ সৈন্যরা এসে দখল করলেন খানিকটা স্থান, আর ক্যাণ্টনমেণ্ট যে হল এ কথা না বল্লেও চলে। তবে শেষের দু'টো সহরের ওপর নয়—কিছু নীচে। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে কাঠগুদাম পর্য্যন্ত রেলপথ হল। সোনায় সোহাগা! দুর্গম হল সুগম, সুদূর হল অতি নিকট, এর পর আর কি থাকতে পারে?…এর পরে হল ইউ, পি, গবর্ণরের গ্রীষ্মাবাস। একটা কথা বলতে

সকাল বেলায় যাত্রা করা হল Sher-Ka-Danda শিখর উদ্দেশে, প্রায় ৮০০০ ফিট উঁচু। রাস্তাটি ভারী সুন্দর! কত বনফুল ফুটে আছে দু'পাশে পাইন ও ঝাউ বনের ছায়ায়, বউ কথা কও পাখীর ডাক, পাহাড়ে পাহাড়ে তার প্রতিধ্বনি। মনটা একটা গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। পাহাড়ের ওপর অনেক বাড়ী-ঘর আছে—চাষও হচ্ছে বহু জায়গায়। এর ওপর থেকে snow range ভারী সুন্দর দেখায়—একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সাদা ধব্‌ধবে তুষারশ্রেণী। তুষারাবৃত শিখরগুলার নাম জেনেছিলাম 'চীনাপিক' থেকে। সেটা যথাসময়ে বলবো। ফেরবার পথে একজন লোককে দেখে ভয়ানক আকৃষ্ট



লেকের একাংশ ও পথ। দূরে চীনাপিক ও নগর দেখা যাচ্ছে

ভুলে গেছি। ১৮৮০ খৃঃ অব্দে landslip হয়। এর ফলে পুরাণ বাড়ী ঘরদোর অনেক নষ্ট হয়ে যায়, বহু লোকের (১৫১ জন) মৃত্যু ঘটে বটে, কিন্তু তাতে নূতন করে নগর তৈরী করবার সুবিধে হয়েছিল প্রচুর।

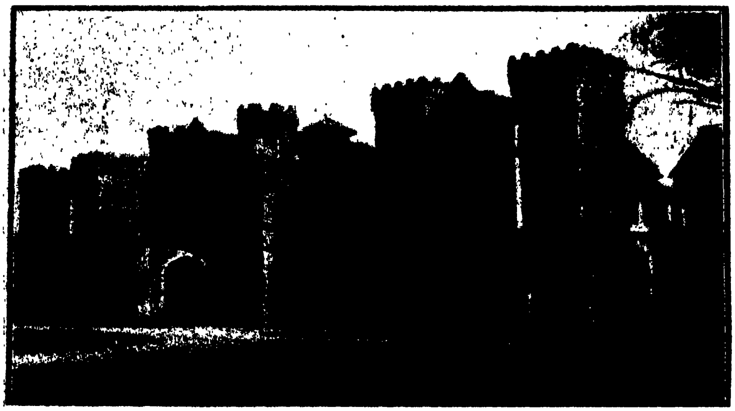
পথ চলতে চলতে দেখি রাস্তায় ইলেক্‌ট্রিক আলোগুলা সব নিভে আসছে। কি ব্যাপার! 'পাওয়ার' হাউস্ বন্ধ হয়ে গেল নাকি! আলোগুলা নিবু নিবু হয়ে আবার দিব্যি জ্বলে উঠল। হোটেলে এসে শুনলুম, এটা রাত্রি ৮টার চিহ্ন, যেমন কোল্‌কাতার বেলা ১টার চিহ্ন তোপধ্বনি।

হলুম। পাইন-ঘেরা ডালিয়া ফুলের অজস্র সমারোহের মধ্যে তাঁর বাংলোখানি। বসে বসে গীতা পড়ছেন, বছর পঞ্চান্ন তাঁর বয়েস। মুখখানি ভারী সুন্দর—কমনীয়তা, ঔজ্জ্বল্য এবং গাম্ভীর্য্যে ভরা। তাঁর উজ্জ্বল চোখদুটি আকর্ষণ করে, বিকর্ষণ করে না। বন্ধুদের ঠাট্টার ভয়ে আপাতত তাঁর কাছে যাবার ইচ্ছে স্থগিত রাখতে হল।

বিকেল ৪॥০টা নাগাৎ চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লুম সকাল-বেলাকার সেই ভদ্রলোকের উদ্দেশে। দুটি পাহাড়ীর সঙ্গে বসে গল্প করছেন, নমস্কার কর্ত্তে ঘাড় নাড়লেন। হেসে

বললেন: কি চান্? কি চান! ভদ্রলোক বাঙ্গালী তাহ'লে—বেশ একটু আশ্চর্য্য হলুম। কথায় কথায় নানা দেশের নানা কথা উঠল, কিন্তু তিনি নিজের সম্বন্ধে আমাকে সব সময়েই অজ্ঞাত রেখে চললেন। আচ্ছা মানুষ তো! মানুষের স্বভাবই তো নিজের কথা বলা, কিন্তু এ যে দেখছি সম্পূর্ণ উল্টো।

ভগবানের কথা উঠল শেষে—বল্লেন—ভগবান কি, সে সম্বন্ধে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নেই। আমার মনে হয়, বিশ্বের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে, তারায় তারায়, গ্রহে গ্রহে প্রকৃতির মাঝে যে সুন্দর রূপের, সৌন্দর্য্যের বীজ বুনে চলেছেন তাকে পাওয়াই মানব জীবনের চরম সার্থকতা।... তাকে পেতে হয় সুন্দরের সাধনা করে, প্রকৃতিকে ভালবেসে, প্রেমের মধ্য দিয়ে। এ জন্যই সেকালের মুনিরা



গবর্ণমেণ্ট হাউস

তাঁদের আশ্রম করতেন সৌন্দর্য্যময় প্রকৃতির কোলে, যাতে প্রকৃতির সেই খণ্ড সৌন্দর্য্যকে ভালবাসতে শিখে সেই বিরাট অখণ্ড সুন্দরকে ভালবাসতে পারেন।

প্রেম ছাড়া তাঁকে তো আর পাওয়া যায় না। এ জন্যই তো কবিরা বলেছেন:

"I know
That love makes all things equal :
I have heard
By mine own heart this joyous
truth averred :
The spirit of the worm beneath the sod
In love and Worship blends itself
with God."

প্রকৃতিই মানুষের ভালবাসার নির্ঝরিণী খুলে দেয়, তাকে সুন্দরের পথে এগিয়ে দেয়, এই সসীম রূপের মধ্য দিয়ে তাকে অসীমের পথে নিয়ে যায়। Wordsworth বলেছেন:

...Knowing that nature never did betray
The heart that loved her ; it is her
privilege
Through all the years of this our
life, to lead
From Joy to Joy : for she can so enform
The mind that is within us, so impress
With quietness and beauty and so feed
With lofty thoughts......

প্রকৃতির সম্পদ ও নির্জ্জনতার মাঝেই তো আমরা তাকে পাই।

In solitudes
Her voice came
to me, through the
whispering woods.
And from the
fountains, and the
odours deep
Of flower, which like
lips murmuring in
their sleep
Of the sweet kisses
which had lulled
them there.

রবীন্দ্রনাথও তো এই কথা বলেছেন:

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।

অনেক কথাই বলে গেলেন তিনি, একচিত্তে পান করছিলুম। স্থলের অধিবাসীদের কাছে যে সাগরের কথা চিরদিনেরই প্রিয়।

গিরিবনে সন্ধ্যা নেমে এসেছে, ঘরে ঘরে জ্বলে উঠেছে দীপ দু'একটি করে, আকাশ উঠেছে স্তব্ধতায় ভরে... দু' একজন করে প্রায় জন পাঁচেক পাহাড়ী তাঁর কাছে ওষুধ

নিয়ে গেল, একটি সাহেব এসেও কয়েক মিনিট তাঁর সঙ্গে কথা বলে গেলেন···একা একা এতটা পথ যেতে হবে ভেবে একটু ভয় করছিল, তিনি সেটা হয় তো লক্ষ্য করলেন, বললেন: ভয় করবে বুঝি একা যেতে—এই রুদ্র—বাবুকে লে যাও তো বাঁচমে···

আসবার আগের দিন আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। রুদ্রের ভাঙ্গা হিন্দী মারফত শুনলুম, ভদ্রলোক এখানে আছেন প্রায় ২১ বছর। গবর্ণমেণ্টের চাকরী করতেন, এখন 'পেন্‌সান' পান। বন্ধনের মধ্যে স্ত্রী ছিলেন, তিনি বছর সাতেক মারা গেছেন। দু'টি ছোট ভাই আছেন, তাঁরা কানপুরে ব্যবসা করেন। ভদ্রলোক নানারকম রোগের ওষুধপত্র জানেন এবং বিনামূল্যে পাহাড়ীদের দেন বলেই পাহাড়ীরা তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। দু'জন ইউরোপীয়ানের 'থাইসিস'ও নাকি তিনি সারিয়ে দিয়েছেন তাঁর ওই গাছগাছড়া দিয়ে।

ভয়ে ভয়ে হোটেলে ঢুকছি—কিন্তু ভয়ের পরিমাণ বেশী যেখানে, বিপদও সেখানে তত বেশী। পড়লুম একেবারে জগদীন্দ্রবাবুর সামনে। বললেন: এত রাত পর্য্যন্ত লে কে র ধারে! তুমিই আমাদের মজাবে দেখছি। অলোকবাবু ডাকলেন, চোখ কাণ বুজে একটা মিথ্যে উত্তর দিতে বলে উঠলেন: আজ যে Silver Fun সংগ্রহ করা হয়েছে, দেখেছ! ওগুলো সাধারণত···এই রে!—অলোকবাবু যদি এখন 'বোটানি' বোঝাতে আরম্ভ করেন···। তপেশচন্দ্র বাঁচালে আমায়। বলে উঠল: চেপে যান স্যার এখন, পড়াশুনা হবে কাল সকালে। অলোকবাবু সত্য সত্যই চেপে গেলেন।

ঘরে ঢুকে দেখি বন্ধুত্রয় কম্বলমুড়ি দিয়ে গল্প করছেন: যে গল্প সমবয়স্ক তরুণেরা—একত্র হলে করে থাকে। দলে যোগ দিলুম।

'আজ তো তুমি ছিলে না বিনয়, আজ যা দেখেছি ··'

আগেই বলেছি নৈনীতাল সহরটির ঐতিহাসিক মূল্য খুব বেশী নয়—তার যত মূল্য লেকটিকে নিয়ে। লেকের চারপাশে একটি সরু রাস্তা, রাস্তার পাশে 'উইপিং উইলো', পাইন প্রভৃতি গাছের সারি, মাঝে মাঝে গাছের তলায় বেঞ্চি পাতা। চার পাশে উঠে গেছে চারটি পাহাড়—লেকের উত্তরে—'চীনাপিক', পূবে Sher-ka-danda (এর সম্বন্ধে আগেই বলেছি), পশ্চিমে Deopatha আর দক্ষিণে হচ্ছে Ayarpatha.

লেকটি লম্বায় ১১৬৭ গজ (১ মাইলের কিছু কম), চওড়ার দিকে ৫০৩ গজ, আর গভীরতায় ৯৩ ফিট। লেকের বেষ্টনী দু' মাইলের কিছু ওপর। লেকের প্রধান Inlet বা জলের প্রবেশ পথ হচ্ছে Deopatha পর্ব্বতের একটি ঝরণা—অবশ্য ঝরণা তাকে ঠিক বলা যায় না, ইট দিয়ে তার দু'পাশ গেঁথে দিয়ে তাকে বৃহৎ নর্দ্দামা আকারে পরিণত করা হয়েছে। এই জলস্রোতের উৎপত্তি স্থান যে কোথায় - তা আমরা খুঁজে বার করতে পারি নি। শুনেছি, এটা অনেক বছর থেকে আসছে। এটা ছাড়া আরো দু'চারটে ক্ষুদ্র প্রবেশ পথ আছে বটে, কিন্তু সব সময় তা দিয়ে জল আসে না। লেকের জলের পরিমাণ সমান রাখার জন্য দক্ষিণ পারে, নৈনীতাল পোষ্ট অফিসের নীচ দিয়ে একটি জলনির্গম পথের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার ফলে হয়েছে একটি ছোটখাট জলপ্রপাতের সৃষ্টি। ভারী সুন্দর এ জায়গাটা—উৎক্ষিপ্ত ফেনময় জলকণার ওপর যখন সূর্য্যকিরণ এসে পড়ে তখন এমন চমৎকার দেখায় ··। এই জলের দ্বারা 'বালিয়া' নদীর সৃষ্টি এবং বালিয়া নদী গিয়ে



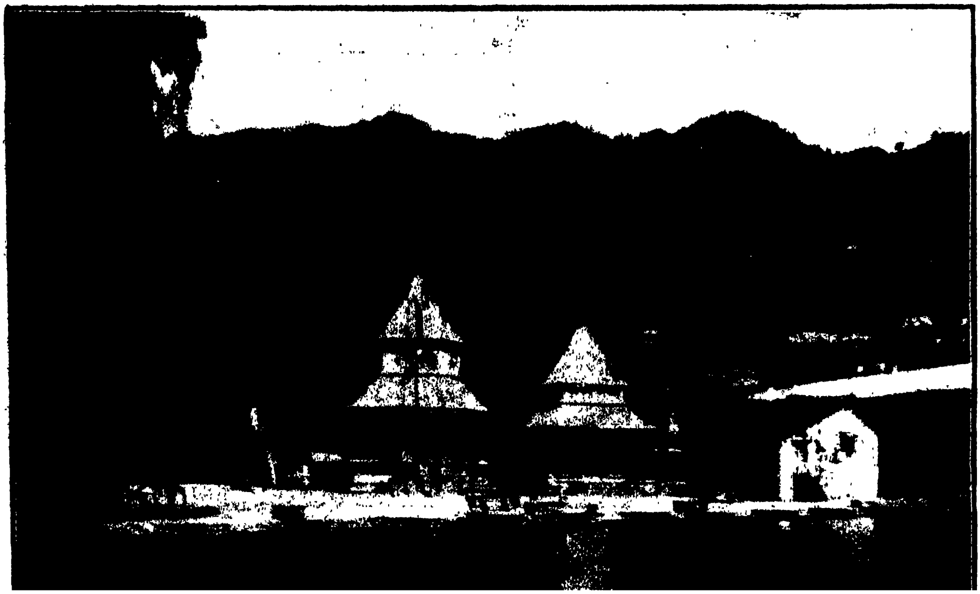
রামজে হাসপাতালের একাংশ

পড়েছে 'গলা' নদীতে। এই বালিয়া নদীর জল নিয়ে electric current তৈরী হচ্ছে। 'পাওয়ার হাউস'টি প্রায় ১০০০ ফিট নিচুতে—ছোট্ট 'হাউস'টি। লেকের দক্ষিণ পারে নৈনীতাল বাজারের কাছে একটি sulphur Spring আছে।

'চীনা পিকটি' হচ্ছে সব চেয়ে উঁচু, ৮৫৬৪ ফিট ; তার মানে ওর ওপর উঠতে হলে দু'হাজার ফিট উঠতে হয় লেকের পার থেকে। ওপরে ওঠার জন্য 'মিউনিসিপালটীর' রাস্তা আছে, ডাণ্ডী বা ঘোড়ার সাহায্যে যাওয়া যায়। হেঁটে যাওয়া খুব শক্ত—আর হেঁটে খুব কম লোকই যায়। যাঁরা যাবেন তাঁদের দল বেঁধে যাওয়া উচিত এবং হাতে

শিখরটি limestone ও slate পাথরের তৈরী। slate পাথরে বহু লোকের নাম লেখা রয়েছে দেখলুম, আমরাও দু' চারটে বাড়িয়ে দিলুম মাত্র।

এর ওপরে উঠা হয় Snow Range দেখার জন্য। খুব পরিষ্কার দেখায়, সামনে বনময় পাহাড়শ্রেণী, তার মাঝে মাঝে শীর্ণকায়া জলস্রোত গৃহত্যাগী বৈরাগীর মত কোন সুদূরে যাত্রা করেছে। এই পাহাড়শ্রেণীর পরপারে দাঁড়িয়ে আছে তুষারময় গিরিশ্রেণী অসীমতে একটা সীমারেখা টেনে। এদের সব চেয়ে উঁচু শিখরটি নন্দাদেবী (২৫৬৬০ ফিট), তারপর কামেট (Kamet ২৫৪৪৩) এবং ত্রিশূল (২°৪০৬)। এখান থেকে এদের দূরত্ব যথাক্রমে ৭৫,১০৫



নৈনীদেবীর মন্দির। প্রথমটি নৈনীদেবীর, পাশেরটি ভ্যারোর, একেবারে ছোটটি শিবের

লাঠি থাকাও দরকার। মাঝে মাঝে নাকি ভাল্লুক, নেকড়ে বা পাহাড়ী সাপের সাক্ষাৎ মেলে। আমরা ৯ জন গিয়েছিলুম, উঠতে প্রায় ২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট লেগেছিল। রাস্তা ৬ মাইলের কিছু ওপরে। জায়গায় জায়গায় খাড়াই ভয়ানক বেশী, এক জায়গায় ১০০ গজে ৩০০ ফিট উঁচু হয়েছে। শিখরের ওপর দু' চারটে ওক এবং রডোডেনড্রণ গাছ দেখা গেল। কে একজন বলে উঠল :

'শিখর-শাখায়'

'উদ্ধত যত শিখর-শাখায় রডোডেনড্রণগুচ্ছ।'

ও ৮৬ মাইল। কুয়াসায় ঢাকা না থাকলে Snow Range অত্যন্ত সুন্দর দেখায়—একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত স্ফটিকের মত শুভ্রতায় জ্বলছে। সূর্য্যের আলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো—হয়ে গিয়ে সাতরঙা রামধনুর মত দেখাচ্ছে······

সব দিন আবার তুষারশ্রেণী দেখা যায় না। প্রায়ই মেঘে ও কুয়াসায় ঢাকা থাকে। তখন শুধু শিখর তিনটে দেখে ফিরে আসতে হয়। পরেশ মজুমদার মশাই বলছিলেন—আমি তিন দিন গেছি, কিন্তু একদিনও

ভাল দেখতে পাই নি। আমাদের ভাগ্য সে হিসেবে ভাল বলতে হবে। যাদের এর ওপর উঠে দেখা অসুবিধে হবে, তাদের আমি Sher-ka-danda থেকে দেখতে অনুরোধ করি। তাতে বেশী কষ্ট হবে না।

Deopatha শিখর ৭৯৮৭ ফিট। এ পাহাড়টি অত্যন্ত ভগ্ন, অসমতল এবং গভীর বনে ঢাকা। বাঁশ ও অর্কিডের গাছ অনেক দেখা গেল। এর ওপর প্রায় জায়গাতেই লেখা রয়েছে 'Beware of falling stones ; পাহাড়ের চাঁইগুলি এমন আল্‌গা হয়ে রয়েছে, যে মনে হয় প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ে যাবে। পাহাড়টি ক্রমশ পশ্চিমে ঢালু হয়ে গিয়ে সমতলে মিশে গেছে। বাড়ী ঘর দোর খুব কম এর ওপরে।

Ayarpatha পাহাড়টি সব চেয়ে ছোট ও নিরাপদ, St. Joseph college, গবর্ণমেণ্ট হাউস এবং অন্যান্য অনেক বাড়ী রয়েছে এর ওপরে। St. Joseph কলেজটি এখানকার সব চেয়ে বড় কলেজ।

গবর্ণমেণ্ট হাউসটির কথা বেশী বলা বাহুল্য। ওখানে যতদূর ভাল করা সম্ভব তা হয়েছে। আগে এটি ছিল Danda Hillএ, কিন্তু সেটা নিরাপদ মনে না হওয়ায় ১৮৯৬ খৃঃ অব্দে এখানে বাড়ী আরম্ভ হয়, সেটা শেষ হয় ১৯০০ খৃঃ অব্দে।

Ayarpathaএর তলায় তালিতাল বাজার ও পোষ্ট আফিস। বাজারটি ছোট, জিনিষপত্রের দরও বেশী। নৈনীতাল বাজার এর চেয়ে অনেক ভাল—সব দিক থেকেই।

Ramsay Hospitalটি Danda Hillএর ওপর। চিকিৎসা যেমন ভাল, খরচপত্রও তেমনি কম। বাঙ্গালীর প্রবেশলাভ কষ্টকর। মাইলখানেক দূরে Manora Epidemic Hospital আছে ; সেখানে সংক্রামক রোগের চিকিৎসা করা হয়।

থাইসিসের রোগীকে নৈনীতালে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাদের চিকিৎসা হয় ভাওয়ালীতে—এখান থেকে মাইল ছয়েক দূরে। সেখানে কয়েকটি যক্ষ্মানিবাস আছে। তাতেও বাঙ্গালীর প্রবেশলাভ অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। সুখের কথা আমাদের একজন বাঙ্গালী ডাক্তার এখানে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপন করেছেন। নিবাসটি বেশ ভাল —চিকিৎসাও উন্নতধরণের। ঘূর্ণায়মান ঘরগুলার দ্বারা রোগীকে সব সময়ই সূর্য্যালোক উপভোগ করান যেতে পারে। এখনও অবশ্য খুব বড় করে তুলতে পারেন নি, তবে দেশবাসীর সাহায্য পেলে অচিরেই যে এটা বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আগেই বলেছি আসল সহরটি চীনাপিকের পাদদেশে। ঘরবাড়ী দোকান-বাজারে বোঝাই একেবারে। নৈনীতাল বাজারটি বেশ ভাল ; এখান থেকে বাজার করাই সাধারণের সুবিধে। এর কাছেই বিস্কুট ফ্যাক্টরী, Hydro electric water works প্রভৃতি। কলের জলটি বেশ সুস্বাদু, সব সময়েই পাওয়া যায়। পথে ঘাটে, পাহাড়ে-পাহাড়ে, খানিকটা অন্তরই কল বসান আছে।

নৈনীদেবীর মন্দিরটি হচ্ছে লেকের উত্তর প্রান্তে।



২০　চীনা পিক থেকে তুষার-শ্রেণী

পাশাপাশি তিনটি মন্দির : প্রধানটিতে নৈনীদেবীর মূর্ত্তি। দেবীর মূর্ত্তিটি ছোট, দেহ ঢাকা। চোখ তিনটি বেশ বড় বড় এবং সোণা দিয়ে বাঁধান। অন্য দু'টি মন্দিরের একটিতে আছেন শিব, অপরটিতে ভ্যারে (অনেকটা আমাদের হনুমানের মত)। বর্ত্তমান মন্দিরটি দেবতাসহ পুনরায় নির্ম্মিত হয়েছে—১৮৮২ খৃঃ অব্দে আসলের জায়গায়। কারণ আসল বা পুরাতন মন্দিরটি landslip (পাহাড়খণ্ড পতন)এর ফলে নষ্ট হয়ে যায়, দেবতা যান চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে। পুরাতন মন্দিরটি যে কত পূর্ব্বে স্থাপিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না—তবে এটা যে খুব পুরাতন সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ।

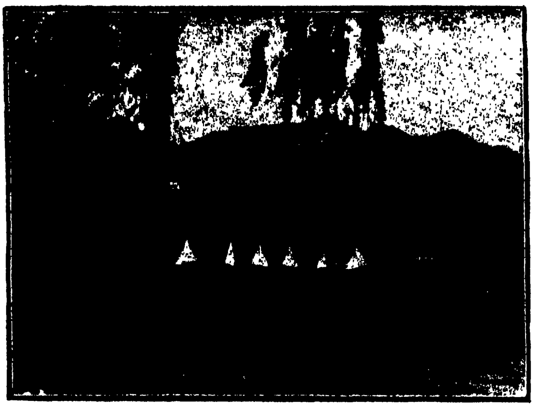
নৈনীমন্দিরের পেছনে China Mall বা খেলার মাঠ—

নৈনীতালের একমাত্র বৃহৎ সমতল ক্ষেত্র, বেষ্টনীটি প্রায় ¼ মাইল। এটা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, কিন্তু রক্ষার ভার মিউনিসিপ্যালিটীর ওপর। স্থানীয় ক্লাবেরা এটা মিউনিসিপ্যালটীর কাছ থেকে জমা নিয়ে থাকেন। এখানে ঘোড়ায়-চড়া থেকে, ক্রিকেট, ফুটবল, হকি প্রভৃতি সবই চলে।

পান্‌খান (Pankhan) দেবীর একটি মন্দির আছে Deopothaএর তলায়। দেবীর মুখখানি লালটকটকে—তার মধ্যে জিবখানিই সর্ব্বস্ব।

দুটি সিনেমা আছে এখানে—Capital ও Plaza। এদের মধ্যে Capital Cinemaই ভাল। টিকিট যথাক্রমে আট আনা ও ছ' আনা থেকে উর্দ্ধে।

দু'টি ব্যাঙ্ক—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও নৈনীতাল ব্যাঙ্ক, Lending Library, পাঁচ ছ'টি স্কুল। একটি Government Carpentary Schoolও চোখে পড়ল। এ স্কুলটির 'কোর্স' তিন বছরের—ছেলে আছে মোট ৪২টি।



লেকে ইয়ট (yacht) খেলা

[ফটো—খগেন দাস

হোটেলের মধ্যে Metropol, Empire, Royal, Y. M. C. A. এবং Hindusthan বিখ্যাত।

এইটুকু জায়গায় চার্চ্চের সংখ্যাধিক্য দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ভাবলুম, সংখ্যাধিক্য বেশী কার—ধার্ম্মিকের, না অধার্ম্মিকের?

শীত, বসন্ত ও বর্ষা- এই তিনটি মাত্র ঋতু এখানে। ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বরফ পড়ে—সিনেমা, হোটেল, দোকান, বাজার প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়, তিনভাগ লোক প্রায় নীচে নেমে যায়। স্বাস্থ্য এখানকার খুব ভাল।

লেকে নৌ-বিহার ও মাছ-ধরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, আর স্থলে উল্লেখযোগ্য ঘোড়ায় চড়া। লেকটিকে পারাপারের ভাড়া ৬ জনের ১২ আনা। ঘোড়া ঘণ্টায় ৬ আনা থেকে আট আনা। yacht (ইয়ট)গুলো কেবলমাত্র ওখানকার ক্লাবের সভ্যদের জন্য।

.. …কবি সত্যই বলেছেন : To me high mountains are a feeling। এক একদিন যখন লেকের ধারে বেঞ্চিতে একা একা বসে থাকি তখন এমন সব কথা মনে হয়…মনে হয় এই গিরিবনের শ্যামলিমার পেছনে, ওই সৌন্দর্য্যের অন্তরালে একজন দেবতা আছেন…যিনি পৃথিবীর এই সমস্ত সৌন্দর্য্যের আধার—তিনি আমাদের তাঁর কাছে ফিরে যাবার জন্য নিয়ত ডাকেন, পথ দেখিয়ে দেন।

এই মানবমণ্ডলী, ওই প্রাণীকুল, কীট-জগৎ একদিন হয় তো তাঁরই অংশ ছিল—মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রে ছিন্ন হয়ে জন্মের আরম্ভে সকলেই কীটাণুকীট হয়ে করেছিল জন্মগ্রহণ…তার পর তাঁরই দর্শিত পথে চলে…প্রেমের পথে সুন্দরের সাধনা করে ওদেরই এক দল কত জন্মজন্মান্তরের মধ্য দিয়ে - সেই ক্ষুদ্র কীটাণুকীট থেকে অভিব্যক্তির পথে সরীসৃপ পশুপক্ষী হয়ে মানবজন্ম লাভ করেছে…এখনও তাদের সাধনা শেষ হয় নি, যে দিন শেষ হবে সেদিন ওই বিরাট অসীমের সাথে গিয়ে লীন হয়ে যাবে…। তিনি তাদের সব ফিরে পেতে চান, কারণ তারা যে বিরাট তাঁরই অংশ—তাদের ছাড়া যে তিনি

আমি তাঁকে পেতে চাই না…আমি তাঁর সাথে মিশে লীন হয়ে যেতে চাই না…। যে লক্ষ কোটী বৎসর ধরে প্রেমের মধ্য দিয়ে সুন্দরের সাধনা করে আজ মানবজন্ম লাভ করেছি, তাকে আমি হারাতে চাই…আবার সেই কীটাণুকীট হয়ে চাই জন্মাতে। সুন্দরের সাধনা করে লক্ষ কোটী জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে আবার মানব হয়ে জন্মাবো…আবার ফিরে যাবো সেই কীটাণুকীটে…। আমি তাঁকে পেতে চাই না, আমি শুধু চাই তাঁকে পাবার আশায় আশায় থাকতে…কোটী কোটী বৎসর…অনন্ত কোটী বৎসর …সৃষ্টির সমাপ্তি পর্য্যন্ত…

আমার সামনে থেকে ওই নৈনীদেবীর মন্দির অদৃশ্য হয়ে যায় ধীরে ধীরে···ওই সন্ন্যাসীদের ভ্রান্ত, অলীক বলে মনে হয়...পরপারে বনময় পাহাড় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বনপথে গরুর পালকে নাম্‌তে দেখি···তাদের গলার ঘণ্টা বাজে, সে ধ্বনি একটি অনন্ত সুর হয়ে এসে কাণে বাজে···তার কাছে নৈনীদেবীর ঘণ্টাধ্বনি অস্পষ্ট হয়ে যায়···কাণে প্রবেশ করে না। আমার মন বলে ওঠে :

'মৃত্তিকা-ছানি' আমার দেবতা গড়ে নি কুম্ভকার,
ভাস্কর আসি হানে নাই তাঁরে ছেনি ও হাতুড়ি তার ;

এ জীবনে আর করিতে নারিব অন্যের আরাধন,
মরমে পেয়েছি পরশ-মাণিক ! সোনা হয়ে গেছে মন !

বাড়ী যাবে না বিনয় : সমর এসে কাঁধে হাত দিল। চল !

শৈলেন বললে : এক সের আপেল নিয়ে এলুম বিনয়···৬ আনা সের। তোমার ভাগে ছ'পয়সা পড়েছে।

ওরা আমায় ভালবাসে···খুব ভালবাসে, কিন্তু অনুগ্রহ করে না···এ জন্যই ওদের অত ভালবাসি।

বাঙ্গালী-বাসিন্দা এখানে খুব কম। Eastern Commandএর ইন্‌জিনিয়ার পরেশ মজুমদার, এখানকার S. D. O. এবং সবশুদ্ধ আরো গুটি চারেক ঘর আছেন। বেড়াতেও বাঙ্গালী খুব কম আসেন। পরেশ মজুমদার মহাশয় দিব্য লোক—যেমন আমুদে—তেমনি মিশুক। আমরা গেছি শুনে তিনি নিজে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন···আদর আপ্যায়িত করলেন খুব। তাঁর ভাইপো নীতীশ মজুমদার আমাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াতেন। সম্প্রতি আমাদের হোটেলে আরো দুজন বাঙ্গালী অতিথি এসেছেন—তার মধ্যে আমাদের কলেজের Vice-Principal Dr. B. C. Ghose ও Mrs. B. L. Chowdhury। Dr. Ghoseএর সঙ্গে আগে কখনো মিশবার সুযোগ হয় নি, এখন সুযোগ পেয়ে ধন্য হলুম। তাঁর মত লোক খুব কম দেখেছি। রোজ সন্ধ্যের পর আমাদের ঘরে এসে বসতেন···নানা দেশের গল্প হত···বিলেতে দশ বছর কাটিয়ে ছিলেন কি রকম ভাবে, আরো কত কি ? প্রায়ই আমাদের জন্য আপেল, আঙ্গুর, বিস্কুট, কেক প্রভৃতি পাঠিয়ে দিতেন··· আমাদের সুবিধে অসুবিধের প্রতি তীব্র দৃষ্টি দিতেন। এক একদিন মিসেস বি-এল-চৌধুরী নেমন্তন্ন করতেন—গাইয়ে



নৌ-বিহার [ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

বন্ধুদের গাইবার জন্য ; Dr. Ghoseএর ঘরে আসর বসত··· দল বেঁধে সব যেতুম···গানের পর হত প্রচুর জলখাওয়া···

রবি, বিজয়, হরদেব আমাদের ঘরে এসে বসে, গল্প করে, বলে : দুদিন বাদে ভুলে যাবে তো এ সব ? হরদেব তো বলেই বসল—

'···দুদিন পরে যাবে চলে।
ঝিনুকের দুটি খোলা।



তুষারপাতে নৈনিতাল

মাঝখানটুকু ভরা থাক্
একটি নিরেট "ভালবাসা" দিয়ে,—
দুর্লভ মূল্যহীন।'



মিউনিসিপাল গার্ডেন ও লেক
[ফটো—রবি চট্টোপাধ্যায়

বলে : না বন্ধু, এত সহজে কোন জিনিষ ভোলবার নয়। যেখানে তোমাদের স্মৃতিটুকু রেখে দিলুম,

'সে-সব জগতে কাল-ধারা নাই, পরিবর্ত্তন নাহি,
আজি এই দিন অনন্ত হয়ে চিরদিন রবে চাহি।'

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ওদের সব ভবিষ্যতের আশার কথা শুনছি। ওদের কেউ হবে ব্যারিষ্টার, কেউ বা এগ্রিকালচার পড়তে যাবে 'ডেনমার্ক', কেউ বা করবে coal সম্বন্ধে রিসার্চ্চ বিলেত গিয়ে, ··

আমি শুধু শুনেই যাচ্ছি···শুধু···

নিস্তব্ধ রাত্রি। অন্ধকার—বাইরে ভেতরে একটুও তফাৎ নেই—গাঢ় অন্ধকার। 'উইপিং উইলোর' কান্না এখান থেকে বেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি···বেশ স্পষ্ট···

বন্ধুদের আর ভাল লাগছে না নৈনীতাল, কালকেই আগ্রা রওনা হতে হবে। বিকেলে একবার দল বেঁধে বেড়াতে বেরুলুম। প্রকৃতি যেন মানুষের কাছে প্রিয়ার প্রথম চিঠি—যতবারই পড়া যাক্ না কেন, নূতন লাগবেই। যে রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি, সে রাস্তা দিয়ে চলতে আবার নূতন নূতন লাগছে। একটি ভদ্রলোক ও একটি ভদ্রমহিলা আসছিলেন একসঙ্গে। ভদ্রলোক 'সুট্' পরে, মহিলাটি ইউ, পি ধরণের কাপড় পরে। কেউ বল্‌ছে বাঙ্গালী, কেউ বা কচ্ছে 'প্রোটেষ্ট'। তাঁরা কাছে আসতেই তপেশবাবু বলে উঠলেন: এ্যাদ্দিন এসেছি, অথচ একজন বাঙ্গালীর মুখ দেখ্‌লুম না স্যার—আর এদেশে থাকা নয়—

ওঁরা দুজনে হেসে উঠলেন···তার পর হল নমস্কার বিনিময়—আলাপ পরিচয়। এমনিভাবে ওখানে যে কজন বাঙ্গালী আছেন বা গিয়েছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে আলাপ করেছি।

বিদায়ের ক্ষণে নাথুরাম, নীতীশবাবু এসে দাঁড়ালেন। আমাদের ঠাকুর নাথুরাম এবং ওখানকার বন্ধু নীতীশবাবু এ ক'দিনে আমাদেরই একজন হয়ে উঠেছিলেন, ওদের যে কখনো ছাড়তে হবে তাও ভাবিনি। আমরা হয় তো বহু বৎসর এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকব, কিন্তু কোনদিনই হয়তো দু'জনের মাঝে আর দেখা হবে না—আশ্চর্য্য!···ওদের বিদায় দিতে গিয়ে চোখটা আপনি জলে ভরে উঠল।

'হায় ওরে মানব হৃদয়—
বার বার—
কারো-পানে ফিরে চাহিবার—
নাই যে সময়,
নাই নাই।'



লেখক [ফটো—সমর চট্টোপাধ্যায়

৬-৩১ মিনিটে আগ্রা এক্সপ্রেস ছাড়ল। Au revoir. Good-by. এমনি দু' একটা কথা কাণে এল। কিন্তু

তার মূল্য কতটুকু ! তার মধ্যে বেদনা নেই, আবেগ নেই, সে শুধু কথার কথা।

'কত যে প্রাতের আশা ও রাতের গীতি,
কত যে সুখের স্মৃতি ও দুখের প্রীতি,
বিদায় বেলায় আজিও রহিল বাকি।'

তার খোঁজ ক'জন করলে ?

এর মধ্যে সবার চরিত্রের দুর্ব্বলতা ফুটে উঠেছে—ফুটে উঠেছে স্বার্থপরতা, প্রভুত্ব, অহঙ্কার। প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের অন্তরালে চরিত্রের ত্রুটির ওপর একটা মাধুর্য্য, সরলতা, অসামান্যতা ফুটে উঠেছিল পরস্পরের মধ্যে··· একটা সখ্যবন্ধন করেছিল বিকাশলাভ—নৈনীতাল ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সে বন্ধন গেল ছিঁড়ে, মাধুর্য্য গেল নষ্ট হয়ে, অসামান্য হল সামান্য...যারা ছিল আপন, তারা হল পর। নিজের মনেই বলে উঠ্‌লুম :

'হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়—
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয় !'

কাঠগুদাম ষ্টেশনের ডিস্‌ট্যান্ট্‌ সিগ্‌নালটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আঁধারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল ··

আগ্রা এক্সপ্রেস তখন পূর্ণগতিতে ছুটে চলেছে···

এখনই চলিয়া যাবে ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এখনই চলিয়া যাবে ? হে সুন্দরী, সন্ধ্যার অতিথি,
এখনও গগনপ্রান্তে দিবসের স্তিমিত আলোক
নিঃশেষে বিদায় নিতে পারেনি ক' ধরার মায়ায়,
সে মায়া মধুর এত—যেতে হবে তাও ফিরে ফিরে
পিছনে চাহিয়া দেখে, প্রিয়া তারে ডাকে কি না ডাকে।
স্বপ্নলোকে, মায়ালোকে, প্রিয়ারে কে দিয়া নির্ব্বাসন
কালের শাসন মানি ফিরে যেতে চায় গৃহ কোণে ?
ব্যথা বাজিবে না বুকে ? নিঃসঙ্গ ফেলিয়া যাবে মোরে ?
সম্মুখে আঁধার রাত্রি, একা আমি তুমি নাই পাশে
বিনিদ্র নয়ন দুটি তোমারে খুঁজিয়া হ'বে সারা
একা জাগি মায়ালোকে, একা জাগে দূরে সন্ধ্যাতারা।

সন্ধ্যায় এসেছ বলে, চলে যাবে রাত্রি না আসিতে ?
এখনও আসে নি রাত্রি !- এ কেবল সন্ধ্যার আঁধার
আমারে দেখায় ভয় ;—তুমি মোরে দেবে না অভয় ?
চেয়ে দেখ নদী পারে পল্লী বধূ এখনও ফেরে নি—
শেষ ঘট ভরি' ত্রস্ত পদে ; দিবসের শেষ রৌদ্রটুকু
নারিকেলশাখার আড়ালে ঝিলিমিলি করিছে এখনও।
রাত্রি হ'তে দেরী নাই,—তবু সন্ধ্যা এখনও রয়েছে,
ম্লান সন্ধ্যা তবু ত' রয়েছে। তোমারে পেয়েছি কাছে
এর বেশী আর কিছু নাহি চাই, থাক তুমি আরো কিছুক্ষণ,
স্মৃতির ফলকে রাখ চির-লেখা এ ক্ষণ ভুঞ্জন।

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মাধবীর আনন্দোজ্জ্বল মন গেল বিস্বাদ হ'য়ে তিক্ত হ'য়ে। শৈবাল যে এই কারণে তাকে এমনতর কঠিন আঘাত করবে এ কথা একটিবারও তার মনে হয় নি। বরঞ্চ সে ভেবেছিল বাড়ীতে এই রকম একজন মাননীয় অতিথি, শৈবাল নিজে থেকেই এ যাবার আয়োজন স্থগিত রাখতে চাইবে। শৈবালের মত যুবকের কাছ থেকে এই প্রত্যাশা করাই যে স্বাভাবিক। কারণ এমন ঘটনা আজ এই প্রথম নয়, এর আগে কতবার এমনি ভাবে অতিথি এসেছে, সে দিন হয়তো কোথাও যাবে ব'লে তারা ঠিক ক'রে রেখেছিল—সে যাওয়ার প্রয়োজন হয় তো এর চেয়েও বেশি ছিল, কিন্তু অতিথির আকস্মিক অভ্যাগমে তাদের যাওয়া হ'য়ে ওঠেনি এবং শৈবালই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তাদের যাওয়া স্থগিত রেখেছিল। আর আজ সেই একই কারণে সে এমনি অবিবেচকের মত এমনতর অপ্রীতিকর ব্যাপার সৃষ্টি করতে পারলে কি ক'রে? কি ক'রে সে পারলে হৃদয়হীন হ'য়ে তাকে অপমান ক'রতে—অতিথিকে ক'রতে শ্লেষ! এ যে একেবারে অপ্রত্যাশিত ও বিস্ময়কর।

কয়েক মিনিট এইভাবে বিবর্ণ নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকবার পর মাধবী নিরানন্দ মন নিয়ে উপরে উঠতে লাগল। হৃদয় লজ্জা ও আশঙ্কায় দুলছে। শৈবালের তীব্রকণ্ঠে তাদের কলহের আভায় কেউ পেয়েছে কিনা এই ভাবনা নিয়ে মাধবী ঘরে গিয়ে ঢুকল। সবিতা তারই জন্য অপেক্ষা করছিল। বললে: 'কি হ'ল? যাবি নাকি থিয়েটারে?'

'না কাকীমা, আজ আর যাব না।'

'সেই ভাল—বাড়ীতে কুটুম এসেচে তাকে ফেলে থিয়েটার যাওয়াটা ভাল দেখায় না' সবিতা মাধবীর আরক্ত মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'গেলি নে ব'লে শৈবাল রাগটাগ করলে না তো?'

'বেশ তো—রাগ কেন করবে?'

সবিতার হঠাৎ যেন চমক ভাঙল। ব্যস্ত হ'য়ে ব'লে উঠল: 'হাঁ রাণী, শৈবাল কি চ'লে গেল নাকি? তাকে যে সকালবেলা এখানে খাবার নেমন্তন্ন করবো। আমি জানি সে ওপরে আসবে। লক্ষ্মী মা আমার—তাকে এখুনি গিয়ে একবার ব'লে আয়।'

মাধবী পড়ল সঙ্কটে। ঈষৎ দ্বিধায় বললে: 'ক্ষিতি তো রয়েচে, তাকে ব'লে দাও না কাকীমা। আর শৈবালদার কি এ বেলা খাবার সময় হবে?'

'কেন হবে না। খুব হবে' সবিতা বললে: 'তার জন্য খাবার আয়োজন করেচি—সে না এলে চলবে কেন। যাতে আসে তার ব্যবস্থা আমিই করচি।'

সবিতা চলেই যাচ্ছিল—হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঘরের কোনে জড় করা ময়লা কাপড় জামাগুলার উপর। বিস্মিত কণ্ঠে বললে: 'এখনো এ সব ধোবার বাড়ী যায় নি। কতদিন থেকে বলচি ধোবাটাকে ডেকে পাঠিয়ে কাপড় জামা গুলা দিয়ে দে। তা তোর সে সময়ই হয় না। এসব ময়লা জিনিষ ঘরে রাখতে নেই, ব্যামো হ'তে পারে।'

মাধবী হেসে বললে: 'আচ্ছা আজ দেব কাকীমা—তুমি দেখো।'

'হাসি নয় এ সব শেখা তো দরকার' সবিতা যেতে যেতে বললে: 'একদিন সংসার ধর্ম্ম করতে যেতে হবে মনে থাকে যেন। চিরকাল এইভাবে কাটালে চলবে না।'

বিজন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে রসিকতা ক'রে বললে: 'সূক্ষ্মরুচি প্রকর্ষ চিত্ত হওয়ার বিপদ কি দেখচেন? অনবরত সংসারের তুচ্ছ স্থূল জিনিষের দিকেও জোর ক'রে দৃষ্টিতে সজাগ রাখতে হয়।'

'মেয়ে হ'য়ে জন্মালে' মাধবী হেসে বললে: 'তা রাখতেই তো হবে। কিন্তু সত্য বলচি এ আমার মোটে ভাল লাগে না। আমি একটুও আনন্দ পাই না।'

'কিসে আপনি আনন্দ পান?'

'কিসে আবার' মাধবীর মুখ ঈষৎ রক্তাভ হ'য়ে উঠল। কুণ্ঠিতকণ্ঠে বললে: 'এই—এই ছাত্রী হ'য়ে কলেজে যেতে—লেখাপড়া নিয়ে থাকতে—আর ছুটিতে আগের মতন দেশ-বিদেশে বেড়িয়ে আসতে। এক কথায় নিজের মনটাকে স্বাধীনভাবে ফেলে দিতে। এই আর কি।'

বিজন বললে : 'তাই করেন না কেন? করতে বাধা কি?'

'প্রধান বাধা হ'চ্ছে আমার কাকীমাটি'—মাধবী করুণ হেসে বললে : 'বি-এ পড়বার অনুমতি বাবার কাছ থেকে পেলাম, কিন্তু কাকীমার মত পেলাম না। তাঁকে কিছুতেই রাজি করান গেল না।'

'দিদির আপত্তির কারণ?'

'কারণ কাকীমা বলেন বেশি লেখাপড়া করলে মেয়েদের সংসার করবার অনেকখানি শক্তিক্ষয় হ'য়ে যায়, আর সেটা সংসারের পক্ষে অমঙ্গলজনক। এই মাত্তর শুনলেন না স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর মতামত'—মাধবী বললে : 'এখন কাকীমা প্রাণপণে চেষ্টা করচেন এই বয়সেই আমাকে একটি নিখুঁত পাকা গিন্নী তৈরী করতে। কিন্তু আমি সংসারের কাজে কিছুতেই মন বসাতে পারি না। এমনি বিশ্রী লাগে আমার। ওতো আছেই—তবে কেন এখন দুদিনকার মনের আনন্দকে এ ভাবে নষ্ট করি।'

'ওটা আর কিছুই নয়'—বিজন হেসে বললে : 'দিদি আপনাকে রিহার্সাল দিইয়ে নিচ্চে। দুদিন পরে যখন অভিনয় করতে যাবেন তখন যাতে আপনার অভিনয় নিখুঁত হয় তার জন্যই দিদির এই আপ্রাণ চেষ্টা।'

কথাটা রসিকতার মত বলা হ'লেও এ যে রসিকতা নয় তা মাধবী বুঝল। তার ছদ্ম-সহানুভূতির সুরে সুর মিলিয়ে বললে : 'এটা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের যুগ। এখন প্রত্যেকে নিজের আনন্দের পথ নিজেই নির্ব্বাচন ক'রে নেবে, একথা বড় বড় মনীষীরা জোর গলায় প্রচার করচেন। আমারও তো তাই মনে হয়। কোন মেয়ে যদি সংসারী হওয়ার চাইতে অন্য কোন নিষ্পাপ আনন্দের পথ নির্ব্বাচন ক'রে নেয়—তবে কেন সকলে তাকে আপ্রাণ চেষ্টা করবে বাধা দিতে?'

'এ যে আমাদের দেশের অন্ধ সংস্কার—যা প্রত্যেক নরনারীর অস্থিমজ্জায় মিশে এক হ'য়ে রয়েচে' বিজন বললে : 'গতানুগতিকভাবেই এরা এই পথটাকে নারীর জীবনের একমাত্র সার্থকতা ও মঙ্গলের পথ ব'লে মেনে নিয়েচে; সেখানে টুঁ শব্দটি করলে আর রক্ষে থাকবে না।' বিজন বললে : 'মাধবী দেবী যদি ডায়োসেসন থেকে বিএ পাশ ক'রে নিজের পড়াশুনা এবং দেশভ্রমণ নিয়েই পরম আনন্দে থাকেন তাহ'লে সবাই বলবে এ গর্হিত কাজ। ভাল হোক, মন্দ হোক, গতানুগতিকভাবে যা চিরকাল আমাদের সমাজের নারীরা মেনে এসেচে তাকে খণ্ডন করবার চেষ্টা করলেই প্রথমটা কলঙ্ক আর অপযশের বোঝায় মাথা ভারি হ'য়ে উঠবে।'

মাধবী আস্তে আস্তে বললে : 'সত্য।'

বিজন হেসে বলল : 'সত্য বলচি আপনাকে আমাদের সমাজে যে ভাবে মেয়েদের বিয়ে হয়—তা আমার কাছে তামাসা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না।" আমাদেয় বাঙলা দেশের কুমারী মেয়েরা যেন শো-কেশের পুতুল।

মাধবী কোন কথা বললে না। বিজনও নীরবে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। কয়েকটা মুহূর্ত্ত কাটল এমনি ভাবে। হঠাৎ বিজনের খেয়াল হ'ল—মাধবী তখন থেকে দাঁড়িয়েই রয়েছে একবার সে তাকে বসতেও অনুরোধ করে নি। লজ্জিত হ'য়ে সে বললে : 'বাঃ আপনি যে সেই থেকে দাঁড়িয়েই আছেন। বসুন।'

'এই তো বেশ আছি!'

'না তা শুনব না বসুন।'

'আচ্ছা বসচি।' মাধবী বিজনের সামনে মুখোমুখি হ'য়ে বসল।

'কোন কাজটাজ নেই তো? এখানে ব'সে গল্প করলে কাজের ক্ষতি হবে না?'

'আমার তো ভারি কাজ। আর গল্পের ভাল সঙ্গী পেলে আমার কাজের কথা ভাবতেই ইচ্ছে করে না।'

'আমাকে তাহ'লে গল্পের ভাল সঙ্গী ব'লে স্বীকার করচেন?'

'তা করচি।'

এ কথা সে কথার পর বিজন হঠাৎ এক সময় বললে : 'একটা কথা আপনাকে জিগ্‌গেস করব, কিছু মনে করবেন না?'

মাধবী একটুখানি অবাক হ'য়েই তার মুখের দিকে তাকাল। তার কণ্ঠস্বরে মুখের ভাবে মাধবী বুঝল বিজন সত্যিই তাকে কোন সীরিয়াস কথা জিগ্‌গেস করতে উদ্যত হ'য়েছে। কিন্তু মাধবী ভেবেই ঠিক করতে পারলে না কি এমন কথা জিগ্‌গেস করবার থাকতে পারে—যাতে ক'রে ঐ রহস্যালাপী মুখর যুবকটি তার চারপাশের নির্ম্মল

আনন্দ হাসি কলরোলকে নিমিষে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়ে দিল। কি সে কথা। মাধবী মনে মনে অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে শান্তকণ্ঠে বললে : 'না—বলুন।'

বিজন বললে : 'প্রথমে ভেবেছিলাম জিগ্‌গেস করব না, কিন্তু এখন ভেবে দেখচি সেটা না জিগ্‌গেস করাটাই অভদ্রতা হবে।' ব'লে বিজন সোজা তার মুখের দিকে চেয়ে বললে : 'শৈবালবাবুর সঙ্গে আপনার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেলেন না কেন জানতে পারি কি ?'

মাধবী ভয়ানক বিস্মিত হ'ল। কয়েক-মুহূর্ত্ত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে পরে বললে : 'হঠাৎ এ কথা জানতে চাইছেন কেন বলুন তো ?'

বিজনের ঠোঁটে একটুখানি মৃদু হাসি ফুটে উঠল। বললে : 'কারণ আছে নিশ্চয়। এটা না জানা পর্য্যন্ত নিজের কাছেই আমাকে অপরাধী থাকতে হবে।'

কথাটা মাধবীর কাছে দুর্ব্বোধ্য ঠেকল। বিস্মিত কণ্ঠে বললে : 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারচি না। কথাটা খুলেই বলুন !'

'আচ্ছা খুলেই বলচি' বিজন একটুখানি নড়েচড়ে ব'সে নিজেকে ঠিক ক'রে নিয়ে বললে : 'আজ মাসীমার বাড়ীতে আপনাদের নেমন্তন্ন। শৈবালবাবুর মুখ থেকে যা শুনলাম তাতে মনে হ'ল সেখানে সবাই অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে আপনাদের জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবেন। আর সেখানে যাবার জন্য আপনারাও সম্পূর্ণ প্রস্তুত হ'য়ে ছিলেন—তাই না ?'

মাধবী ঘাড় নেড়ে বললে : 'হাঁ।'

বিজন বললে : 'আপনাদের যাওয়ার ওপরই তাঁদের সব কিছু আনন্দ নির্ভর করচে এও সত্য। কিন্তু কি এমন ঘটল যাতে সেখানে না গিয়ে নিজেদের এবং আরো পাঁচজনের এমন আশার আনন্দকে নষ্ট ক'রে দিলেন ?'

কথাটা কৈফিয়তের মত মাধবীর কাণে গিয়ে বাজল। তার মোটে ভাল লাগল না। তার প্রশ্নের উত্তরে মাধবী শুধু বললে : 'না যাবার কারণ আছে।'

'সেইটাই তো আমি জানতে চাইছি' বিজন মাধবীর আনত মুখের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে বললে : 'আমার কেবলই মনে হ'চ্চে এর কারণ বোধ হয় আমি নিজে। হঠাৎ এমনভাবে এসে প'ড়ে সকলের আনন্দকে নষ্ট ক'রে দিলাম।'

মাধবী আনত দুটি চোখ তুলে বললে : 'বেশ ধরুন তাই। কিন্তু তাতে আপনার ক্ষতি হ'য়েচে কি ?'

'ক্ষতি ? আমার ?' বিজন বললে : 'আমার আবার ক্ষতি হবে কি ? বরঞ্চ ক্ষতি তো হ'ল আপনাদেরই। কিন্তু সত্য এর জন্য আমি ভয়ানক দুঃখিত হ'য়েচি ! আমার জন্য যে পাঁচজনের আনন্দের আয়োজন নষ্ট হ'ল এই চিন্তাটায় আমার এমনি অনুশোচনা হ'চ্চে। সত্য আপনার আজ না যাওয়া মোটেই ভাল হয় নি।'

মাধবী নিজের মনের বিরক্তি চেপে যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠে উত্তর দেবার চেষ্টা ক'রে বললে : 'কি ভাল হ'ত ? শৈবালবাবুর সঙ্গে সেখানে চ'লে যাওয়া ?'

'নিশ্চয়।'

'আপনি আজ আমাদের বাড়ীর অতিথি' মাধবী বললে : 'আপনাকে ফেলে আমাদের অন্য জায়গায় আনন্দ করতে যাওয়াই উচিত হ'ত—এই কি আপনি বলতে চান ?'

'তাইতো চাই। কেন আপনি আমার জন্য আর পাঁচজনের নিরানন্দের কারণ হ'তে গেলেন ? আপনি বোধ হয় ভেবেছিলেন আপনার অনুপস্থিতিতে অতিথি সৎকারের ত্রুটি হবে ?'

'না, তা ভাবি নি।'

'তবে ?'

মাধবীর বিরক্তি এইবার ক্রোধে রূপান্তরিত হ'ল। সে আশা করেছিল তাকে ফেলে তার এই না যাওয়াটার জন্য বিজন খুব খুশি হ'য়ে তাকে অনেক ধন্যবাদ দেবে। এইটা মনে মনে কল্পনা ক'রে শৈবালের দেওয়া রূঢ় আঘাতের জ্বালাটা কিছু পরিমাণে স্নিগ্ধ করেছিল। কিন্তু কল্পনার সূতা গেল টুকরো টুকরো হ'য়ে ছিঁড়ে। এ কি অপ্রত্যাশিত আচরণ। অন্যের দেওয়া জ্বালা যার সান্ত্বনার দ্বারা স্নিগ্ধ করতে চাই সেই দেয় জ্বালা বাড়িয়ে। মাধবী প্রথমটা অভিমান-ক্ষুব্ধ, পরে বিরক্ত, তারপর ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠল। এইবার সে আর প্রতিঘাত দেবার সুযোগ ছাড়লে না। বললে : 'বাড়ীতে একজন অতিথি, তাঁকে ফেলে অন্য জায়গায় আনন্দ করতে গেলে আর যাই হোক

শিষ্টাচারের পরিচয় দেওয়া হয় না। এই শিক্ষাই আমি চিরকাল পেয়ে এসেচি।'

কথাটা বিজনকে আঘাত করল। বললে: 'তাহ'লে আমি ছাড়া অন্য যে কেউ অতিথি হ'য়ে এলেও আপনি এই রকম করতেন?'

কথাটা নিতান্ত সামান্য। কিন্তু এই সামান্য কথাটা বিজনের সব কিছুকে নিমিষের মধ্যে মাধবীর চোখের সামনে স্পষ্ট উন্মোচিত ক'রে দিল। সে যে কি কথা তার মুখ থেকে শোনবার জন্য এত প্রকার কৌশল করচে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে করচে আঘাত—তার সূক্ষ্ম অর্থ মাধবীর কাছে আর গোপন থাকল না। আজ সে শৈবালের সঙ্গে নিমন্ত্রণ যায় নি ব'লে বিজন বিন্দুমাত্র দুঃখিত নয় বরঞ্চ পরম আনন্দিতই হ'য়েছে। তথাপি নিজের এই আনন্দকে গোপন ক'রে এই ভাব ব্যক্ত করার কারণ, বিজন মাধবীর মুখ থেকে শুনতে চায়, সে এমন ক'রে পাঁচজনের আনন্দকে নষ্ট ক'রল শুধু তারই জন্য। সে ছাড়া অন্য যে কোন অতিথি এলেও তার এ যাত্রাকে কোনমতেই রোধ করতে পারতো না। সে বিজনের সঙ্গ মনে প্রাণে কামনা করে এবং তার এই সাহচর্য্যের আনন্দ আজকের সেই সব আনন্দের চেয়ে মাধবীর কাছে অনেক বেশি উপভোগ্য ও লোভনীয় ব'লেই এমন অনায়াসে সেই সবকে অবহেলা করতে পারল। মাধবীর মুখ থেকে বিজন এটা স্পষ্ট শুনতে চায়। এ তার দুর্ব্বলতা। কিন্তু অপরের এই দুর্ব্বলতার পরিচয় পেয়ে অন্য জনের বুকের ভেতরটা এক অনির্ব্বচনীয় আবেগে এবং লজ্জায় দুলে উঠল। কিন্তু নিজের এই দুর্ব্বলতা বিন্দুমাত্র প্রকাশ হ'তে দিল না। তার কথার উত্তরে তেমনি শান্তকণ্ঠে বললে: 'হ্যাঁ আর যে কেউ হ'লেও ঠিক এই রকমই করতুম।'

এই অপ্রত্যাশিত কথায় বিজন খুশি হ'ল না, হ'তে পারেও না। মাধবীর কথার উত্তরে সে একটুখানি হাসল। সে হাসিতে আনন্দ না থাক কৃত্রিমতাও ছিল না। বললে: 'যাক্ বাঁচা গেল। ভেবেছিলাম আমার জন্যই এটা হ'ল। আমি আবির্ভূত হ'য়েই—'

মাধবী বাধা দিয়ে বললে: 'তা কেন হবে? আর আপনি এটাকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে দেখচেন কেন? ব্যাপক ভাবে দেখুন!'

'আমার তাহ'লে কোন অপরাধ নেই?'

'না' ব'লে মাধবী অনেকক্ষণ পরে একটুখানি হাসল। কৌতুক স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে: 'এবার দুর্ভাবনা গেল তো? এখন নিশ্চিন্ত হ'লেন?'

'হ'লাম বৈ কি' ব'লে বিজনও হাসল।

মাধবী মৃদু হেসে বললে: 'সত্য আপনার মতন সহৃদয়তা দুর্লভ। এমন ক'রে পরের জন্য ভাবতে বড় একটা কাকেও দেখা যায় না।'

মাধবীর মুখের হাসি সত্ত্বেও তার কথায় যে সূক্ষ্ম শ্লেষ ছিল তা বিজন টের পেল এবং সেও সৌজন্যের আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে শ্লেষের উত্তর দিতে দ্বিধা করলে না। বললে: 'তা বটে। কিন্তু সেটা সব জায়গায় নয়। স্থান কাল পাত্র বিশেষে আমার সহায়তার সীমা এমনি অতিক্রম ক'রে যায় বটে।'

এই কথার উত্তর দেবার জন্য উদ্যত হ'য়ে মাধবী চোখ তুলতেই দুজনের চোখে চোখ মিলল এবং পরক্ষণেই মাধবী আরক্ত-মুখে চোখ নত করল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাদের চোখোচোখি হ'য়েছে কিন্তু এমনতর লজ্জা সে পায় নি। কেন জানি না বিজনের সঙ্গে চোখ তুলে কথা কইতে তার বড় লজ্জা করছিল। তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। আর নীরবতার মধ্য দিয়ে কয়েকটা মুহূর্ত্ত গেল কেটে।

তারপর মাধবী বললে: 'এতখানি সময় বাজে কথায় গেল। এবার কিন্তু গল্প বলুন।'

'আমি কি গল্প বলব। বরঞ্চ আপনি বলুন।'

'বাঃ আমিই তো শুনব। আপনি বলুন।'

'না—আপনি বলুন।'

'বেশ যাহোক আমি কি গল্প জানি। আপনি বলুন।'

'আমি সত্য গল্প জানি না।'

'খুব জানেন' মাধবী সকৌতুকে বললে: 'গল্প ক'রে আপনি চমৎকার আসর জমাতে পারেন। আপনার অসামান্য গুণের মধ্যে এটি অন্যতম।'

'তাহ'লে' বিজনও হেসে বললে: 'শরৎচন্দ্রের ভাষায় ব'লতে হয় 'অনেক প্রকারের গুণগ্রামেই ইতিপূর্ব্বে মণ্ডিত হ'য়ে উঠেচি।'

মাধবী হাসতে হাসতে বললে: 'হ্যাঁ।'

দুজনে মুখোমুখি হ'য়ে ব'সে গল্প ক'রতে লাগল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে এই দুটি তরুণ তরুণীর আলাপ একেবারে নিবিড় হ'য়ে উঠল। বিজনের মুখে শিলঙের গল্প শুনতে শুনতে মাধবীর দুটি চোখ কৌতূহলে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। শিলঙ—শিলঙ তার মনকে এক অপরূপ স্বপ্নরাজ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় শিলঙের যে ছবি সে দেখেছে—তার রঙ জীবনে তার মন থেকে ম্লান হবে না। ভারি ইচ্ছে করে একবার তাজমহল দেখে আসি। সুন্দর ব'লে—বিস্ময়কর ব'লে—গতানুগতিক-ভাবে তাজকে মেনে নিতে চাই না। আমি চাই তাকে নিজের চোখে দেখতে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আলডুস হাক্সলি প্রভৃতি মনীষীগণ তাজকে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন—ভারি ইচ্ছে করে দেখতে কি ভাবে এবং কোথায় এঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে আমার দৃষ্টির পার্থক্য ঘটল। এই রকম আরো কত প্রসঙ্গ এল এবং গেল। বিজন সত্য-সত্য বিস্মিত না হ'য়ে পারল না। এতটা কল্পনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিস্ময় লাগে বৈ কি। একুশ বছর বয়সের মেয়ে কিন্তু কি তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল মার্জ্জিত মন, সূক্ষ্ম রুচি। কোন বিষয়ে কৌতূহলের অভাব নেই, গতানুগতিক ভাবে কোন জিনিষ মেনে নিতে রাজি নয়। সব কিছু নিজের নির্ভিক এবং রসিক মনের কাছে যাচাই ক'রে নিতে চায়। বিজনের বিস্ময় শ্রদ্ধায় রূপান্তরিত হ'ল এবং কিছুক্ষণ আগে মেয়েটির প্রতি যে অবিচার করেছিল সেই কথা স্মরণ ক'রে নিজেকে যেন ছোট মনে হ'তে লাগল।

অবশেষে উঠল সাহিত্যের প্রসঙ্গ। গল্‌সোয়ার্দ্দি বড় নাট্যকার না ঔপন্যাসিক, কিসে তাঁর শিল্প পরিপূর্ণরূপে আত্ম-প্রকাশ ক'রেছে। আচ্ছা—লোকের ধারণা কি ভুল নয় যখন তারা বলে Dolls house ইবসেনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটক। An enemy of the people কি ইবসেনের নাট্য-প্রতিভার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ নয়? এই নাটকখানি পড়ে কি তাঁকে পূজা করতে ইচ্ছে করে না। দেশের ভয়াবহ মিথ্যাচারের হাত থেকে সমাজের নরনারীকে রক্ষা করবার জন্য যেন Dr Stockman ধরল অস্ত্র। কিন্তু সেই সমাজেরই নরনারী ভুল বুঝে তাকে দেশশত্রু ব'লে অপমান করল—নির্দ্দয়ভাবে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত করল—অবশেষে দেশ থেকে শত্রু ব'লে তাড়িয়ে দিতে চাইল। অথচ সমস্ত নিন্দা গ্লানি কলঙ্ক অপমান মাথায় নিয়ে, কঠিন আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও একা দাঁড়িয়ে তাঁর সেই অবিরাম সংগ্রামের বিরাম নেই। কি গভীর সত্যোপলব্ধি। ষ্ট্রীণ্ড-বার্গের নারী-বিদ্বেষের মূলে তার ব্যক্তিগত জীবনের কোন ঘটনা ছিল কি না—তাঁর অবর্ণনীয় বীভৎস নাটক Fatherএর সেই captainএর শোচনীয় পরিণামের কথা মনে পড়লে কি গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে না—এমনতর বীভৎস রসসৃষ্টির মূল্য আর্টে কতখানি যার প্রভাব পড়ে মনের উপর নয়, স্নায়ুর উপর। ডষ্টয়েভস্কির বিখ্যাত উপন্যাসের সেই ছবিটা কি অপূর্ব্ব! প্রায়ান্ধকার স্বল্প-পরিসর একখানি ঘরের এক ধারে টেবলের উপর একটি প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা, তার মিটমিটে আলোয় ঘরখানি অদ্ভুত রহস্যময় ব'লে বোধ হচ্ছে। সেই স্বল্পালোকিত আবছায়া ঘরে ম্লান-বর্ত্তিকার আলোর ঠিক নীচে ব'সে ক্ষীণাঙ্গী sonia উদাত্তকণ্ঠে পড়ছে বাইবেল, আর অদূরে ব'সে হত্যাকারী Rascalnicoff স্থির নিশ্চল নিরুদ্ধ-শ্বাস হ'য়ে তাকিয়ে আছে soniaর গভীর তন্ময়তা-মাখান মুখের দিকে। তার আত্মা তখন পৃথিবীর ধূলা মালিন্য ক্লেদকে অতিক্রম ক'রে হয়তো কোন অনন্ত সৌন্দর্য্যের উদ্দেশে যাত্রা ক'রেছে। শিল্পীর নিরপেক্ষতা কি আপনি বিশ্বাস করেন? মানি—আর্টে কেমন ক'রে বলা হ'ল এইটাই সবচেয়ে বড় কথা—কিন্তু কি বলা হ'ল সেইটা কি অবহেলার?

এমনি ধরণের আলাপ আলোচনায় দুজনে এত তন্ময় হ'য়ে পড়েছিল যে তাদের এ খেয়াল নেই—এদিকে দেড়টা বেজে গিয়ে বাইরের মধ্যাহ্ন আকাশে রৌদ্র প্রখর হ'য়ে উঠেছে। বিজন যখন মাধবীকে উদ্দেশ ক'রে বলছে: 'দেখুন বর্ত্তমান যুগে পিওর আর্টের খুব বেশি কদর নেই যদি না তার মধ্যে কিছু পরিমাণে জার্ণালিসম থাকে। দৃষ্টান্ত হিসাবে নিতে পারেন বার্ণার্ড শ'কে। বার্ণার্ড শ'র রচনা যে সার্ব্বজনীন সমাদর পেয়েছে—বর্ত্তমান যুগের কোন খাঁটি শিল্পীর পরিপূর্ণ শিল্পসম্মত রচনা তার অর্দ্ধেক সমাদরও পায় নি, তার কারণ আমার কি মনে হয় জানেন—' ঠিক এমনি সময় চাকর এসে জানাল যে সবিতা খাবার জন্য অনেকক্ষণ ডাকাডাকি করছে তখন তাদের দুজনেরই চমক ভাঙল, বিজন লজ্জিত মাধবী

সরম-কুন্ঠিতা। চাকর চ'লে গেলে পর দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। এই অল্প সময়ের মধ্যে তারা যে দুজনের মনকে গভীরভাবে স্পর্শ করতে পেরেছে এবং একটি বিশুদ্ধ মমত্ববোধ জন্মেছে দুজনের মধ্যে—এই উপলব্ধি দুজনের অন্তরে সুধাবর্ষণ করতে লাগল। বিজনের মনে এমন একটি অনির্ব্বচনীয় রসের স্পর্শ লাগল, যার স্বাদ জীবনে কখনো পায় নি। এই স্পর্শ, এই রসের নির্ম্মল ইঙ্গিত তার মনের বৃন্তের কোরকগুলিকে একটি একটি ক'রে জাগিয়ে দিল। বাতাসে সেগুলি রজনীগন্ধার কোমল শাখার মত দুলে উঠে সমস্ত মনকে সৌরভে আকুল ক'রে তুলল। এই পথটুকু সশব্দ হাস্যকৌতুকে মুখর ক'রে নীচে এসেই অকস্মাৎ মাধবী থমকে দাঁড়িয়ে প'ড়ল। চকিতে তার মুখের হাসি গেল মিলিয়ে। নীচের দালানে খেতে বসবার আয়োজন করা হ'য়েছে। পাশাপাশি দুখানি আসন পাতা র'য়েছে একধারে। একখানি শূন্য, অন্যখানির উপর স্তব্ধ নতমুখে ব'সে শৈবাল, আর তারই সামনে পাখা হাতে ক'রে ব'সে সবিতা তাদেরই জন্য অপেক্ষা ক'রে রয়েছে। কালবিলম্ব না ক'রে বিজন আসনখানির শূন্যতা পূর্ণ করল। মুহূর্ত্তকালমাত্র পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে মাধবী এগিয়ে গেল।

সবিতা মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'এমনি গল্পে মেতেছিলি যে আমার এত হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি কাণেও যায় নি। বিজন আজ এসেচে ওর দোষ দিইনে, কিন্তু তোর তো এদিকে হুঁস থাকা উচিত ছিল। গল্প তো আর পালাচ্ছিল না, খাবারদাবার পর করলেই হ'ত। শৈবাল সেই কখন্ থেকে ব'সে আছে। এত বেলায় তোমার বড় কষ্ট হ'ল, না শৈবাল ?'

'না—কষ্ট আর কি।'

'দিদি অবিচার ক'র না' বিজন বললে: 'এতে এ অধীনও দায়ী। চোখের সামনে সব দেখে ওঁর ঘাড়ে চাপাতে দেব না।'

দুজনে পাশাপাশি আহার করছে। সবিতা পাখা দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস করতে করতে এটা ওটা সেটা আলাপ করছে। বিজন থেকে থেকে মাধবীকে নিয়ে করছে রসিকতা। শৈবাল শুদ্ধ নতমুখে আহার ক'রে যাচ্ছে—আর মাঝে মাঝে সবিতার কথার উত্তর দিচ্ছে খুব সংক্ষেপে। তার আশ পাশের হাস্যোজ্জ্বল মুখর আবহাওয়া থেকে নিজেকে সে কঠিনভাবে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। এমন কি সবিতা যে প্রশ্নগুলি তাকে মাঝে মাঝে করছে সেগুলি না করলেই যেন ভাল হয়। সমস্ত লক্ষ্য ক'রে মাধবী বিবর্ণমুখে বসে রইল। তার প্রতি শৈবালের এই অবজ্ঞা এত নিষ্ঠুর এবং স্পষ্ট যে মাধবীর আহত মন অভিমানে দুলে উঠল।

সবিতা বিজনকে বললে: 'হাঁ রে শৈবালের সঙ্গে জানা-শুনা হ'ল এখন কথাটথা বল্! দুজনে এমন ভাবে ব'সে খাচ্চিস যেন কেউ কাকেও চিনিস নে।'

বিজনের মুখ লজ্জায় অকস্মাৎ লাল হ'য়ে উঠল। শৈবালের মত যুবকের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় করবার জন্য সে সত্যিই খুব উৎসুক হয়েছিল, কিন্তু শৈবালের এখনকার আচরণ ও ভাবভঙ্গীতে এমন একটা কিছু তার নজরে প'ড়ল যাতে আলাপের প্রবল ঔৎসুক্য আর থাকল না। আজই সকালে তাদের দুজনের পরিচয় হ'য়েছে, তারপর সেই পরিচয়ের পর যখন আবার দুজনে মিলিত হ'ল তখন শৈবাল ভদ্রতার খাতিরে একটি কথাও তার সঙ্গে বললে না—এমন ভাবে খেতে লাগল যেন তাকে সে চেনে না। এই অপ্রত্যাশিত আচরণে বিজন ক্ষুব্ধ হ'ল, দুঃখিত হ'ল এবং বাধ্য হ'য়ে তাকেও এমন আচরণ ক'রতে হ'ল যেন শৈবালের সঙ্গে তার পরিচয়ই নেই। জিনিষটা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিজন প্রতিমুহূর্ত্তে তা অনুভব করছিল। এতক্ষণ নানা প্রসঙ্গ ও টুকরো হাসি তামাসা জিনিষটাকে একটা আবরণ দিয়ে সকলের কাছে গোপন রেখেছিল অকস্মাৎ সবিতা ঐ একটা কথা দিয়ে সেই আবরণকে উন্মোচিত ক'রে তার নির্লজ্জ রূপটা সকলের কাছে যেন প্রকাশ ক'রে দিল। বিজনের লজ্জার আর সীমা পরিসীমা রইল না। তার কেবলই মনে হ'তে লাগল ওপক্ষের আচরণে যত ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাক না কেন, নিছক ভদ্রতার খাতিরে তার কি উচিত ছিল না শৈবালের সঙ্গে একটা কথাও বলা? কিন্তু ক্ষণিকমাত্র, পরমুহূর্ত্তেই নিজের স্বভাবসুলভ রসিকতায় জিনিষটার গুরুত্ব একেবারে উড়িয়ে দেবার জন্য বললে: 'কি ক'রে কথা কইব দিদি? ওঁর সঙ্গে কথা কইবার কি আর মুখ রেখেচি!'

সবিতা ও মাধবী বিস্মিত হ'য়ে তাকাল এবং শৈবালও একটুখানি লজ্জিতভাবে উৎকর্ণ হ'য়ে রইল—তার কথা শোনবার জন্য।

যদিও বিজন মনে মনে বুঝল কৈফিয়ৎটা খুব সন্তোষজনক হবে না তবু বললে: 'আমার জন্যই তো ওঁকে মিছিমিছি এতক্ষণ কষ্ট ক'রে ব'সে থাকতে হ'ল। এই লজ্জায় ওঁর সঙ্গে কথা বলতে ভয়ানক বাধছিল।' শৈবালকে বললে 'সত্যি এর জন্য আমি ভয়ানক লজ্জিত।'

শৈবাল মৃদুকণ্ঠে বললে: 'এর জন্যে আপনার লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই।'

বিজন হেসে বললে: 'কারণ আছে বৈ কি। কিন্তু তাই ব'লে দোষ সম্পূর্ণ আমার একার নয়! ওঁর মত চমৎকার গল্পের সঙ্গিনী পেয়েছিলাম ব'লেই তো এটা হ'ল। কাজেই আমার দোষের অর্দ্ধেক ভাগ ওঁর।' মাধবীর দিকে চেয়ে বললে: 'এর অর্দ্ধেক দোষ আপনার ঘাড়ে নিতে রাজি? না, দস্যু রত্নাকরের পরিবারবর্গের মত নিঃসঙ্কোচে ব'লে বসবেন, তোমার দোষের এক কণা ভাগও আমি নিজের ঘাড়ে নেব না।'

শৈবালের সামনে নিজেকে খুব সংযত ক'রে মাধবী ক্ষুব্ধভাবে তাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল, কিন্তু আর নিজেকে সামলাতে পারলে না। বিজনের শেষের কথায় উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়বার উপক্রম করল। তাড়াতাড়ি নিজের এই অবাধ্য হাসিকে থামাবার জন্য মুখে আঁচল চাপা দিল, তবু অবরুদ্ধ হাস্যে দেহখানা দুলে দুলে উঠতে লাগল। একটু পরে হাসির বেগটা থামলে পর বললে: 'বাবা, কে আপনার সঙ্গে কথায় পারবে।'

সবিতা হাসতে হাসতে বললে: 'এত জানিস' শৈবালের দিকে চেয়ে হেসে বললে: 'ওর সঙ্গে কথায় কেউ পেরে ওঠে না। দেখচ তো কি রকম কথা বলতে পারে।'

বিজন শৈবালকে হেসে বললে: 'আমার একার এত বড় দোষ ক্ষমা ক'রতে হয় তো আপনার বাধত, কিন্তু এখন সেই দোষ দুজনের ভাগে পড়েচে। আশা করি এখন সহজেই ক্ষমা করতে পারবেন?'

কিন্তু আশ্চর্য্য—যাকে সম্বোধন ক'রে কথাগুলি বলা হ'ল তার দিক থেকে বিশেষ কোন উত্তরই এল না। মনে হ'ল এই আনন্দ এই উচ্ছ্বসিত হাসির প্রবাহ তাকে লেশমাত্র স্পর্শ করে নি। শৈবাল নীরবে নতমুখে আহার করতে লাগল বটে কিন্তু তার বুকের ভেতরটা তখন রোষে ক্ষোভে জ্বালায় পুড়ে যাচ্ছিল এবং যার রসিকতায় মাধবী হাসির আবেগে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল, যার কথায় ভগিনী সবিতা ভ্রাতৃগর্ব্বে গর্ব্বিতা হ'ল সেই যুবকটির প্রতি তার সমস্ত মন এমনি বিমুখ হ'য়ে উঠল যে ভাল ক'রে তার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দিতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। বিষাক্ত বিমুখ মন তার কেবলই এই আবহাওয়ার মধ্য থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্য জোরে তাগিদ দিতে লাগল। অসহ্য মাধবীর নির্লজ্জ হাসি—আর বিজনের রসিকতা। মুহূর্ত্তে শৈবালের মুখে সমস্ত আহার্য্য তিক্ত বিস্বাদ ঠেকল। আহার্য্য যতই সুস্বাদু হোক, এই বিশ্রী অসহ্য আবহাওয়ার মধ্যে তার মত শিক্ষিত উচ্চবংশীয় যুবকের গলা দিয়ে সে আহার্য্য নামবে কেমন ক'রে!

একটু পরে নিজেকে সংযত ক'রে শৈবাল বললে: 'যাক ও কথা আর মিছামিছি ব'লে কি হবে।'

বিজন বুঝল যে কোন কারণেই হোক, শৈবাল তার সঙ্গে নিজেকে ঘনিষ্ঠভাবে জড়াতে চায় না, তাই আর তার সঙ্গে কোন কথা বলবার চেষ্টা না ক'রে আহারে মন দিল। সে তো ভদ্রতা ক'রে কথা বলেছে—তার নিজের দিক থেকে ভদ্রতার সৌজন্যের তো কোন ত্রুটি হয়নি—তাহ'লেই হ'ল।

সবিতা শৈবালের দিকে চেয়ে এক সময়ে ব'লে উঠল: 'হাঁ শৈবাল, মাছের চপটা যে সরিয়ে রাখলে? কালিয়ার বাটিতে তো হাতই দিলে না! রান্না ভাল হয় নি বুঝি।'

'আর খেতে পারচি না কাকীমা।'

শৈবালের সমস্ত আচরণ ও ব্যবহারে আঘাত পেলেও মাধবী তার সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ খুঁজছিল। কারণ তাদের মধ্যে এ পর্য্যন্ত একটি কথার বিনিময়ও হয় নি, শৈবালের সঙ্গে তার এই আচরণ লক্ষ্য ক'রে পাছে তাদের কলহের কথা কেউ জানতে পারে এই আশঙ্কায় কণ্টকিত হ'য়ে মাধবী এক কৌশল করলে। শৈবালের কথা শেষ না হ'তেই খুব সহজভাবে হেসে বললে: 'না কাকীমা, শৈবালদার এ কথা একেবারে মিথ্যে। বিজনবাবুর সঙ্গে খেতে ব'সেচে ব'লে লজ্জা ক'রে খাচ্ছে, তুমি শৈবালদাকে আলাদা বসিয়ে খাওয়ালেই তো পারতে! লজ্জায় ওর হয়তো পেট ভরে খাওয়াই হ'ল না।'

কথাটা ভারি উপভোগ্য। তিনজনই একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু যাকে নিয়ে এ রসিকতা করা হ'ল, সে এর রস-গ্রহণ ক'রতে পারলে না। তেমনি স্তব্ধভাবে নতমুখে খেতে লাগল। মাধবী আড়চোখে তা কয়ে দেখলে শৈবালের মুখ পাষাণের মত কঠিন হ'য়ে উঠেছে এবং আনত দুটি চোখ দিয়ে অসহ্য ক্রোধে যেন আগুন ঠিকরে পড়ছে।

অনেক জিনিষই সংসারে সবিতার চোখ এড়িয়ে যায়, এটাও গেল। সে শৈবালের কথার সূত্র ধরে বললে: 'খেতে পারবে না কি। কি এমন খেয়েচ তুমি? নাও কালিয়ার বাটি থেকে অন্ততঃ মাছটা তুলে নাও। না-ও ব'সে রইলে যে! হাঁ, তোর যে পাতে সবই প'ড়ে রইল রে, কিছুই যে খেলি নে।' সজনে-ফুল ভাজা ভালবাসিস—বেশি ক'রে দিয়েছে তাও তো ছুঁলিনে।'

সজনে-ফুল ভাজা খেতে আমি ভালবাসি হা ভগবান এও শুনতে হ'ল। তোমাদের মত লোভী নারীদের জন্য ও বেচারা তো চিরকাল কাব্যে অপাঙক্তেয় হ'য়ে রইল। তোমাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সজনে ফুলও পরিত্রাণ পেলো না। রান্নাঘরে ঢুকিয়ে দিলে ওর জাত মেরে। সেই দুঃখে তো ছুঁই না।

'কি যে সব সময় রসিকতা করিস' ব'লে সবিতা শৈবালের দিকে চেয়ে বললে: 'ভাল কথা' আজ দুপুরে তুমি এস শৈবাল—চারজনে তাস খেলব। রাণী আর বিজন এরা দুটি হ'চ্চে পাকা খেলোয়াড়। আজ তোমাতে আমাতে বসব। দেখি ওদের হারাতে পারি কি না।'

শৈবাল মুখ না তুলেই বললে: 'আজ দুপুরে আমার আসা হ'য়ে উঠবে না।'

'কেন।'

'কলকাতায় যাব।'

'মাসীমার বাড়ীর মেয়েদের থিয়েটারে নিয়ে যেতে হবে বুঝি?'

'না, অন্য একটা কাজে যাব।'

'তবে দুপুরে নাই গেলে। বিকেলে যেয়ো।'

'না কাকীমা, আমাকে এখুনি বেরতেই হবে।'

'আজ কি না গেলেই নয়?'

'না।'

সবিতা নৈরাশ্যক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে: 'আজ তাহ'লে বেশ খেলা যেত। তা কাল দুপুরে এস, এই চারজনে খেলব!'

'কালও বোধ হয় আসা হ'য়ে উঠবে না। এ কদিন রোজই কলকাতায় যেতে হবে।'

সবিতার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হ'ল না।

বিজন বললে: 'ভালই হ'য়েচে দিদি খেললে তো হারতেই! তার চেয়ে না খেলে মনে মনে ভাবা ভাল, খেললে নিশ্চয় জিততে পারতাম। কি বলেন?'

বিজন মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলে। সে হাসিতে যোগ দেবার মত মনের অবস্থা মাধবীর ছিল না, সে নীরব হ'য়ে রইল। সবিতা তখন আশাভঙ্গে মুহ্যমান, মিনিট দুই তাই নিঃশব্দে কেটে গেল। এমনি সময় ভোলা চাকর এসে দাঁড়াল সেখানে।

সবিতা মুখ ফিরিয়ে বললে: 'বাবুদের আঁচাবার জল তোয়ালে সব ঠিকঠাক ক'রে রাখ্, আর তুই এখন এখান থেকে কোথাও যাসনে। বাবুদের খাওয়া হ'য়ে এল। ভাল কথা—হাঁ রাণী, দোতলার ঐ ঘরটা পরিষ্কার করিয়ে বিছানা পাতিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে রেখেচিস তো মা? বিজন ও ঘরটায় থাকবে।

মাধবী ভয়ানক চমকে উঠল। এ কথা তো তার একেবারেই স্মরণ নেই।

'ও কি চুপ ক'রে আছিস যে? সে কথাটা বুঝি একেবারে ভুলে গেছিস?' সবিতা মাধবীর নতমুখের দিকে চেয়ে বললে: 'তোর মন আজকাল কোথায় প'ড়ে থাকে রাণী? কাল তোকে পই পই ক'রে ব'লে দিলুম, আজ বিজন আসবে ঘরটা ভোলাকে দিয়ে ঠিকঠাক করিয়ে রাখিস—'

এবং সঙ্গে সঙ্গে মাধবীর পায়ের নীচেকার মাটি দুলে উঠল। আজ যে সকাল বেলা শৈবালের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কলহ ক'রে জোর ক'রে বলেছে—বিজন যে আজ আসবে তা সে জানত না—আর সেই শৈবালের সামনেই তার সমস্ত মিথ্যা এমনি নিষ্করুণভাবে প্রকাশ হ'য়ে প'ড়ল! সবিতার কথা শেষ হ'তেই শৈবাল মুখ তুলে স্থিরদৃষ্টিতে একটিবার মাত্র মাধবীর মুখের দিকে তাকাল। তার সেই

দৃষ্টির কল্পনাতীত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে মাধবী নিঃশব্দে বিবর্ণ-মুখে ব'সে রইল। দুঃখে ক্ষোভে লজ্জায় অপমানে তার চোখে জল এসে পড়েছিল।

অকস্মাৎ শৈবাল ব'লে উঠল : 'আজ একটা অভদ্রতা করছি কাকীমা, মাপ করবেন—একটা জরুরি কাজে আমাকে এখুনি উঠতেই হ'চ্চে।'

'সে কি শৈবাল? তোমার যে খাওয়াই হ'ল না! কি এমন কাজ—'

'দুটো পঁচিশ মিনিটের ট্রেণ এখুনি না উঠলে ধরতে পারব না' শৈবাল আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে : 'খাওয়ার জন্য ভাববেন না। এত বেশি খাওয়া কোন দিন খাই নি।'

মাধবী খানিকটা তফাতে তেমনি নতমুখে বসেছিল। আঁচিয়ে এসে শৈবাল তার পাশে দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ হাত মুছতে লাগল।

'শৈবালকে ঘর থেকে চাট্টি মসলা এনে দে রাণী।'

'দরকার নেই কাকীমা, মসলা আমার কাছেই আছে' ব'লে তোয়ালেটা টাঙানো তার লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ে—শৈবাল খুব নিম্নকণ্ঠে যেন স্বগত-উক্তি ক'রল : 'ওর মত মেয়ের ছোঁয়া খেতে আর আমার প্রবৃত্তি হয় না।' (ক্রমশঃ)

অমৃত চায় নর

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সংখ্যা ত নাই কতই যে কাজ তার,
বিরাট কর্ম্মক্ষেত্র এ সংসার।
সত্য একটা রাজ্য তাহার গৃহ,
সুন্দর এই ভুবন তাহার প্রিয়।
কত আশা আর কতই না শঙ্কা,
বক্ষে তাহার সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা।
সতত যে তার অতৃপ্ত অন্তর,
অমৃত চায়, অমৃত চায় নর।

২

জ্ঞান বিজ্ঞান স্থপতি শিল্পকলা,
সুধার লাগিয়া এ কোন্ পথ চলা।
যুগের যুগের মহা মানবেরা আসি,—
সুধার খপর দিয়ে যায় ভালবাসি।
ক্ষিতি অপ তেজ মরুতে ও ব্যোমে হয়ে
সন্ধানী নর সুধার গন্ধ পায়।
দেবতা তাহার অন্তরে দেছে ক্ষুধা—
নাহিক তৃপ্তি, মানব যে চায় সুধা।

৩

বিদ্যুৎ আজ তাহার আজ্ঞাবহ
জয় যাত্রার সংবাদ তার লহ।
আকাশ পাতালে স্থাপিয়াছে অধিকার,
করেছে সৃষ্টি সাহিত্য সম্ভার।
গ্রহে গ্রহে তার আবিষ্কারের ধুম
তবে দৃষ্টির চলিয়াছে মরসুম।
তবু অতৃপ্ত শান্তি তাহার নাই।
অমৃত চাই, অমৃত তার চাই।

৪

সে ত সব পারে কিছুতেই নহে কম
তাহার সৃষ্ট দ্রব্যও অনুপম।
প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না সে,
সুধার ভাণ্ড নাই যে তার পাশে।
তাই জীবনেতে এত সন্দেহ দোল—
এত সংগ্রাম, হিংসার হিল্লোল।
সদা ধুক্ ধুক্ করিতেছে অন্তর,
অমৃত চায়, অমৃত চায় নর।

ধনসঞ্চয়ে জীবন-বীমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

প্রয়োজন কি ?

জীবন-বীমার সার্থকতা কি ?—বিশেষ করিয়া আমাদের দেশে ইহার ব্যাপক প্রসারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইতেছে কেন—এ সকল কথা চিন্তা করিতে গেলে পারিবারিক প্রবন্ধের অমর-লেখক স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের "অর্থ-সঞ্চয়" নামক প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে।

ভূদেবচন্দ্র ছিলেন বাঙ্গালা দেশের পারিবারিক মঙ্গল-বিধানের পুরোহিত—তাঁহার লেখায়, আচার-আচরণে ও ব্যক্তিগত দৃষ্টান্তে তিনি তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া গিয়াছেন!—আজিও পর্য্যন্ত—এই অদৃষ্টপূর্ব্ব 'প্রগতি'র যুগেও তাঁহার সে আদর্শ হইতে বাঙ্গালী সমাজ যে সর্ব্বতোভাবে বিচ্যুত হয় নাই এ কথা জোর করিয়া বলা যায়।

সমাজের যে শক্তির উদ্বোধনকল্পে ভূদেবচন্দ্র সঞ্চয়ের কথা বারবার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাকেই আজকাল আমরা অর্থনৈতিক বা আর্থিক সঙ্গতি বা উন্নতি বলিয়া অভিহিত করিতেছি।

ভূদেবচন্দ্র বলিয়াছেন—"ভবিষ্যদ্দর্শন ও সঞ্চয়ের উপায়োদ্ভাবন দ্বারা আমাদের সমাজে শক্তিসঞ্চয়ের প্রয়োজন।" ভূদেবচন্দ্রের নিজের "ভবিষ্যদ্দর্শন" ছিল—তিনি তাই সমাজের গোড়াপত্তন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার ক্রমোন্নতি ও স্থিতির মূলে বাঙ্গালীর আর্থিক সঙ্গতি ও সংস্থানের একান্ত প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন। কোনও সমাজের কল্যাণ-সৌধ গঠনের ভিত্তিমূলে সঞ্চয়ের পাকা মাল-মশলা জোগান দিবার উপায়ই বা কি—তাহাও তিনি চিন্তা করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালী সংসারের দুর্গতি, তাহার পারিবারিক দুঃখ-দারিদ্র্য ও শোচনীয় উপায়হীনতা তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল—আজ তাই জীবনবীমার প্রয়োজন ও সার্থকতার বিষয় চিন্তা করিতে গিয়া—সম্মিলিত পারিবারিক জীবনে সর্ব্বদা আস্থাবান সেই চিন্তাশীল বাঙ্গালীর কথা শ্রদ্ধা-সহকারে স্মরণ করিতে হয়।

বাঙ্গালীর অমিতব্যয়িতাকে লক্ষ্য করিয়া সঞ্চয়-অভ্যাসের প্রতি তাহার অবজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক নিরপেক্ষতায় হতাশ হইয়া ভূদেবচন্দ্র বলিয়াছেন,—

> "এই জন্যই দেখিতে পাই, কেহ বহু বৎসর ধরিয়া মোটা বেতন পাইয়াও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার স্ত্রীপুত্রাদির ভরণ-পোষণের জন্য চাঁদার বহি বাহির হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, কোনও আয়বান ব্যক্তি একখানি প্রকাণ্ড বসত বাটীর কতকদূর প্রস্তুত করিয়া মৃত হইলে তাঁহার ছেলেদিগকে ঐ বাটীর ইট কাঠ বেচিয়া খাইতে হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই, খুব স্বচ্ছল পুরুষ যেই গেলেন, অমনি দেনার দায়ে তাঁহার ঘটি বাটি পর্য্যন্ত নিলামে উঠে! এই জন্যই প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই—"অমুকের অত আয়, কিন্তু সঞ্চয় এক কড়াও নাই" "অমুক স্বয়ং ঋণগ্রস্ত হইয়াও দান করিয়া ফেলেন, বলেন, ছেলেদের জন্য কিছু না রাখাই ভাল; ধনবানের পুত্রেরা প্রায়ই মন্দ এবং অকর্ম্মণ্য লোক হয়।"

জগত সম্পর্কে আধ্যাত্মিক মনোভাব বা ঔদাসিন্য অসংসারী বা সন্ন্যাসীর পক্ষে ভাল—কিন্তু যাঁহারা সংসারী, স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাঁহারা সংসার ধর্ম্ম পালন করিতে প্রতিশ্রুত, তাঁহাদের পক্ষে এই প্রকার "অমিতব্যয়িতার প্রশংসাবাদ সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর নহে; যাহা কিছু আয় হয়, সকলই ব্যয় করিয়া ফেলা গৃহস্থধর্ম্মের অনুকূলাচরণ নহে।"

সঞ্চয়ের মূলনীতি

জীবন-বীমার মূলনীতিও তাই;—পরিবারের জন্য সঞ্চয় করিয়া যাওয়া লোকতঃ ধর্ম্মতঃ আমাদের কর্ত্তব্য। সেই সঞ্চয়ের সহজ উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে জীবন-বীমায়।

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, পরিবার প্রতিপালন ও সংরক্ষণের দায়িত্ব প্রত্যেক মানুষের আছে। পুত্রকন্যার ভরণপোষণ ও শিক্ষার ভার, কন্যাকে সৎপাত্রে দান করিবার দায়িত্ব পিতামাতার, বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি-পালনের ভার যোগ্য সন্তানের—এইরূপ জীবনকালে এবং জীবনান্তে স্ত্রীর সর্ব্ববিধ ব্যয়ভার বহন করিবার কর্ত্তব্য

স্বামীর—ইহাই সংসার-জীবনে মনুষ্যত্বের দাবী এবং এই দাবী মিটাইবার সহজ উপায় জীবন-বীমা করিয়া নিয়মিত-ভাবে সঞ্চয় করা। যাহার যেমন প্রয়োজন, যাহার যেমন সঙ্গতি, সেই অনুসারে সঞ্চয় করিবার সুযোগ একমাত্র জীবন-বীমাতেই পাওয়া যায়।

গৃহস্থকে যে কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে হয় একথা সকল দেশের বিজ্ঞ লোকেই বলিয়া থাকেন। ইংরাজ দার্শনিক মহামতি বেকন বলিয়াছেন—"উপার্জ্জনের অর্দ্ধেক সঞ্চয় কর।" সঞ্চয় ব্যতিরেকে লক্ষ্মীমন্ত হইবার উপায় নাই; পারিবারিক শান্তিও অমিতব্যয়ীর পক্ষে লাভ করা সম্ভব নহে। যিনি "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করেন, সংসার-জীবনে সফলতা লাভ করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।—ইহা ত আমরা আমাদের ঘরে ঘরে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।

মনীষী ভূদেবচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুশাসন বিশেষভাবে অনুশীলন করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্র বলিতেছেন—

"ভবিষ্যৎকালের জন্য আয়ের সিকি জমা রাখিবে, অর্দ্ধেক নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ করিবে, আর সিকি ধার দিয়া সুদে বাড়াইবে।"

ভূদেবচন্দ্র যখন বাঙ্গালী গৃহস্থের সঞ্চয়ের কথা বলিয়াছেন, শাস্ত্রকার যখন হিন্দুর উপার্জ্জিত অর্থের ব্যয়ভাগ দেখাইয়াছেন, তখন জীবনবীমার তথ্যের কথাই তাঁহারা অজ্ঞাতে বলিয়া গিয়াছেন—কারণ প্রত্যেক উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির উপার্জ্জনের আংশিক সঞ্চয় সম্পর্কে জীবন-বীমার নীতিও এইপ্রকার। কেন না, জীবনবীমা একাধারে আমাদিগকে সঞ্চয় এবং লগ্নী ব্যাপারে সুবিধা ও লাভের ভাগী করিয়া থাকে। সম্পাদিত জীবন-বীমায় সঞ্চিত একটা নির্দ্দিষ্ট টাকা বাঁচিয়া থাকিলে আমি এককালীন পাইয়া ভোগ করিয়া যাইতে পারিব এবং মেয়াদী সময়ের আগে আমার যদি মৃত্যু হয়, আমার বীমার টাকা আমার স্ত্রীপুত্রপরিবার পাইবে;—সঞ্চয়ের এই সান্ত্বনা ও শান্তি লাভের সুযোগ দেয় জীবন-বীমা,—বীমা তহবিলের লগ্নী কারবারে আমার প্রদত্ত টাকার অংশতঃ সুদের ভাগীদারও আমি। নিজের আর্থিক সঙ্গতির এই শক্তি মানুষকে বড় করে—পরিবারকে, গোষ্ঠীকে আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন করিয়া তোলে—জাতিকে আর্থিক সম্পদের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর করিয়া দেয়। জীবনবীমার সূক্ষ্ম তত্ত্বই হইতেছে এই।

অবস্থা ভেদে ব্যবস্থা

কিন্তু সকল লোকের আর্থিক অবস্থা সমান নহে এবং সেই কারণেই সকলের পক্ষে সমপরিমাণ সঞ্চয় সম্ভব হইতে পারে না। তাই, ব্যক্তি ও অবস্থা বিশেষে সাধ্যানুযায়ী সঞ্চয়ের ব্যবস্থা দিয়া মানব-সংহিতা রচয়িতা ভগবান মনু বলিয়াছেন,—

"তিন বৎসর খরচের যোগ্য, অথবা এক বৎসরের যোগ্য, তিন দিনের যোগ্য, অন্ততঃ একদিনের যোগ্য ধান্য সঞ্চয় করিবে।"

অতএব দেখা যাইতেছে শাস্ত্রনির্দ্দেশ অনুসারে আমাদের সকলেরই কিছু না কিছু সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

"যে দিন আনে সে প্রতিদিন সঞ্চয় করিবে, যে মাসে আনে সে প্রতি মাসে সঞ্চয় করিবে, যে বর্ষে আনে সে প্রতি বর্ষে সঞ্চয় করিবে। কিন্তু কিছু সঞ্চয় সকলকেই করিতে হইবে। আর একটি নিয়ম এই যে, খরচের পূর্ব্বভাগে সঞ্চয় করিবে, খরচের শেষভাগে নয়।"

জীবনবীমার তথ্য নিরূপণ বা সঞ্চয়ের "উপায়োদ্ভাবন" সম্পর্কে যাঁহারা চিন্তা করিয়াছেন, চিন্তাকে কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রয়োগ করিবার জন্য ব্যাপৃত আছেন, সেই বীমাবিদ পণ্ডিতগণও মানুষের বিভিন্ন অবস্থার জন্য বিভিন্ন প্রকার বীমার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ৫০০৲ টাকা হইতে যেখানে ৫০ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিবার সুযোগ আছে, বয়স এবং মেয়াদ বা কাল অনুসারে চাঁদার তারতম্য রক্ষা করিয়া যেখানে সঞ্চয়ের সৌকর্য্য সাধন করা হইতেছে, সেখানে শাস্ত্র, বিজ্ঞান ও মানবধর্ম্মের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াই কর্ম্মিগণ আপনাদের কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

পারিবারিক দায়িত্ব

উপযুক্ত সঞ্চয়শীলতার অভাবে আজ বাঙ্গালী সমাজ নানাভাবে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। "অভাবে স্বভাব নষ্ট" এই প্রবচন বাঙ্গালীজীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সত্য হইয়া উঠিতেছে। আজ আমরা স্বাধিকারলাভের জন্য যে প্রাণপাত চেষ্টা করিতেছি—তাহার সাফল্যের জন্য বাঙ্গালী পরিবারকে আত্মস্বতন্ত্র করিয়া সুদৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করা চাই। দরিদ্র পরিবার সমাজকে রুগ্ন, আশা ভরসা ও উৎসাহহীন করিয়া জাতির স্কন্ধে দুর্ব্বহ ভার হইয়া পড়িতেছে, আর্থিক সংস্থানে



গ্রাম্য স্বর্ণকার

[illegible]

Bharatvarsha Halftone & Printing Works.

সমাজের পুনর্জ্জীবন দান করা ছাড়া জাতির অভ্যুত্থানের আর কোনও উপায় নাই।

মনের ধর্ম্মের দিক দিয়া, সমাজ ও পরিবারের সংহতি ও সংস্থিতি সাধনের দিক দিয়া—ভূদেবচন্দ্র বলিতেছেন—

"সঞ্চিত অর্থকে কদাপি নিজের মনে করিতে নাই। বাস্তবিক উহা সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব নহে। তুমি যাহা রোজগার করিতেছ তাহাতে তোমার পরিজনের অংশ আছে। তুমি যাহা সঞ্চয় করিতেছ, তাহাতেও তাদের অংশ আছে। তুমি সঞ্চয়ের ধন যদি পারিবারিক বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন খরচ করিয়া ফেল, তবে কিয়ৎ পরিমাণে পরস্বাপহারী হইবে।"

"পরস্বাপহারী" কথাটি এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। সমাজে অবিবেচক ও অবিমিশ্রকারী লোকের অভাব নাই। নিজের সুখ ও আরামের জন্য, পরিবারবর্গকে নিঃসম্বল করিয়া রাখিয়া যাইবার দৃষ্টান্ত ও আমাদের সমাজে অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবকদের মৃত্যুতে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে যে দারিদ্র্য দুঃখের হাহাকার উঠিতেছে তাহাত আমরা নিত্যই শুনিতেছি। ইহা হইতেই আমাদের পারিবারিক দায়িত্ব সূচিত হইতেছে। দায়িত্ব এড়াইয়া চলা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। পরিবার সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে পথে বসাইবার অধিকার আমার নাই। যাহারা পারিবারিক দায়িত্ব এড়াইয়া আত্মসর্ব্বস্ব জীবন যাপন করিয়া সুখী হইতে চায়—ধর্ম্ম ও সমাজের চোখে তাহারা নিন্দনীয়। সমাজকে দুর্ব্বল করিয়া তাহারা ক্রমশঃ জাতিকেও পঙ্গু ও বিপন্ন করিয়া তোলে। কল্যাণ কর্ম্মের সূচনা ও পরিণতির উপর জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত করিতে হইলে সঞ্চয় তথা জীবনবীমার প্রয়োজন ও সার্থকতা সম্বন্ধে আজ প্রত্যেক বাঙ্গালীকে অবহিত হইতে হইবে।

মনের অন্তরালে

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক এম-এ, বি-এল

শ্যামল এবার অনেক চেষ্টার পর তার বাবার কাছ থেকে মত পেল—তাদের গাঁ কুসুমপুর যাবার। সামনেই বড়দিনের ছুটি, কলেজ দশ বার দিন বন্ধ। তাই শ্যামল তার বাবাকে সিমলাতে লিখেছিল—এ'কটা দিন কলেজের ছুটিতে বাড়ী যেতে চাই। এখন শীতে ওখানে অসুখ বিসুখ নেই; তা ছাড়া সেখানে কদিনই বা থাকব'। একবার ভারী দেখতে ইচ্ছে করে নিজেদের গাঁ-টাকে। সেই কবে যে গিয়েছি দেশের বাড়ীতে তা ভাল করে মনেই পড়ে না। আশা করি এবার অমত হবে না আপনার।

শ্যামলের বাবা জগদীশবাবু থাকেন সিমলা। সরকারী ডাকবিভাগে মস্ত বড় চাকরে—মাইনে হাজারেরও ওপর। বছরের বেশীর ভাগ সিমলাতেই কাটে, দিল্লীতেও থাকতে হয় কিছুদিন করে। শ্যামল তার একই মাত্র ছেলে, আর মেয়ে সীতা। শ্যামল প্রেসিডেন্সিতে পড়ে বি-এ,—থাকে হিন্দু হোষ্টেলে। আর সীতা থাকে বাপ মার কাছে—কখনও দিল্লী, কখনও সিমলা। জগদীশবাবু তাঁর ছেলেকে "বইয়ের পোকা" করতে না চাইলেও তাঁর মনে একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা ছিল গোড়া থেকেই। তাই তিনি শ্যামলকে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখলেই সুখী হতেন বেশী। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের দুটো পরীক্ষাতেই শ্যামল খুব উঁচু স্থানই অধিকার করেছিল, তাই বি-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হবার সাথে সাথে জগদীশ বাবু শ্যামলকে লিখতে সুরু করেছেন—সময় নষ্ট কোর না একটুও। বি-এ তে ইকনমিক্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়া চাই। অবশ্য শ্যামলের পক্ষে প্রথম হওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়, কিন্তু তবুও পরীক্ষার দু-বছর আগে থেকেই তার বাবার অমনি ধরণের আদেশে মনটা দমে যায় অনেকখানি।

এবার সে ঠিক করেছে বাড়ী যাবেই। এতদিন তো তার বাবা যেতে দেন নি মোটে, পরীক্ষা আর পড়াশুনার জন্য। ক'লকাতা থেকে কতদূরই বা তাদের বাড়ী। মাত্র একটা বেলা আর একটা রাতের পথ। মনে পড়ে কবে সেই ছোট বেলায় সে মায়ের সাথে গিয়েছিল তাদের গাঁয়ে। তখন সে বাসায় পড়ে মাষ্টারের কাছে। গাঁয়ের ছবিখানি

স্বপ্নের মতই মনে পড়ে তার মাঝে মাঝে। ক'লকাতার এ কোলাহল থেকে কদিন দূরে সরে যেতে তার ইচ্ছে করে খুব। সিমলা আর দিল্লীতেও তার মোটেই ভাল লাগে না। সেখানে ও পথে ঘাটে, চাল-চলনে, কেমন একটা কৃত্রিমভাব—কেমন একটা মার্জ্জিত রুচির আবহাওয়া। এ সব তার কাছে লাগে অসহ্য। তাই এবার সে তার বাবা আর মাকে অনেক আগে থেকেই লিখছে—থার্ডইয়ারে কদিনের জন্য বাড়ী গেলে পড়াশুনার মোটেই ব্যাঘাত হবে না, বরং মনটা তার ভাল হবে অনেকখানি। কি জানি কেন জগদীশবাবুও এবার অমত করেন নি। তবে লিখেছেন—সাতদিনের বেশী থেক না ওখানে, অসুখ বিসুখ হতে পারে। ওখানকার জল-হাওয়া সহ্য নাও হতে পারে তোমার—সাবধানে থেক। শ্যামলের তাই এবার ভারী আনন্দ—নিজেদের গাঁয়ের বাড়ীতে যাবে।

শেষ রাতে ট্রেণ থেকে নেমে শ্যামল আলো-আঁধারে ঢাকা ষ্টীমার ঘাটে এসে বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। শীতের কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস পদ্মার বুক বেয়ে এসে তীরে লাগছে। সাদা স্বচ্ছ ধূঁয়ার মত কুয়াসায় ঢেকে আছে চারিদিক, আর তারই মাঝে এক একখানা ষ্টীমার বাতি নিবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যাত্রীর আশায়। ভোর হ'তে তখনও কিছুটা বাকী।

শ্যামল ষ্টীমারের দোতালায় একটু জায়গা করে নিল নিজের জন্য। যে সব যাত্রী আগ-রাতে বা মাঝ রাতে এসেছে তারা পাটাতনের ওপর বিছানা ক'রে দিব্য নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। রাতের আঁধারে চারিদিক আচ্ছন্ন। শেষ-রাতের আকাশে তখনও কয়েকটা তারা জ্বলছে মিট্‌মিট্‌ করে। পুবের আকাশটা বেশ লাল হ'য়ে উঠেছে। চারিদিকের কুয়াসা অনেকটা তরল হ'য়ে এল। বাইরে খুবই ঠাণ্ডা। ক্যান্‌ভাসের পুরু ঢাকনা ফেলে দেওয়া চারদিকে। শ্যামল একটা কোনে একটু খোলা জায়গায় গিয়ে রেলিঙ ধরে বাইরের পানে চেয়ে আছে। এ যেন প্রকৃতির শীতল স্নিগ্ধ আর একটা রূপ! মৌন জগতে প্রকৃতির এ অপূর্ব্ব লীলা দেখতে দেখতে শ্যামল তন্ময় হ'য়ে চেয়ে থাকে বাইরের পানে।

ভোর হবার সাথে সাথে চারদিক অনেকটা ফর্সা হ'ল। গাঢ় কুয়াসা অনেকটা তরল হয়ে ছড়িয়ে গেছে সবদিকে। নদীর জল প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত ক'রে সশব্দে ষ্টীমার তা যাত্রা সুরু করে দিল। শ্যামলদের গাঁয়ের ঘাটে ষ্টীমার এসে লাগবে বেলা ন'টায়।

কত গ্রাম পেরিয়ে নদীর ধার দিয়ে ষ্টীমার চলেছে বহু দূরের তাল সুপুরি খেজুর গাছে ঘেরা গ্রামটা ক্রমেই কাছে এসে পড়ে - আবার সেটা ছাড়িয়ে ষ্টীমার চলে দূরের পানে। কোথাও আবার নদীর পাড় দিয়ে দিগন্ত বিস্তীর্ণ মাঠ—ধান সব কাটা হয়ে গেছে, এখনও চিহ্ন তার স্পষ্ট। কোথাও নদীর পাড়েই চাষীর কুটীর—তাদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে শ্যামলের চোখে। ছেলে-মেয়েরা নগ্ন পায়ে মলিন বসনে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকে ষ্টীমারের যাত্রীদের দিকে। কোথাও আবার কৃষক বধূ ছেঁড়া-কাঁথা কম্বল বাইরে রোদে এনে মেলে দেয়। নদীতে জেলেরা ছোট ছোট ডিঙ্গিতে মাছ ধরছে। ষ্টীমারের জলের আলোড়নে তাদের ছোট ছোট ডিঙ্গি ভীষণভাবে দুলতে থাকে—তারা তাদের কাজ করে চলে আপন মনে, ভয় বা ভাবনার চিহ্নও নেই কোনখানে। মাঝে মাঝে দু-একখানা বড় বড় নৌকা পাল তুলে ধীর মন্থর গমনে চলেছে।

শ্যামল অবাকবিস্ময়ে মুগ্ধনয়নে এ সব দেখে। দেখে দেখেও তার দেখবার আশ মিটছে না মোটে। কখন যে তাদের গাঁয়ের ঘাটে ষ্টীমার এসে লেগেছে বুঝতেই পারে নি। যাত্রী জনকয়েক তাদের মোট নিয়ে ষ্টীমার থেকে ঘাট অবধি পেতে দেওয়া সরু তক্তার ওপর দিয়ে পাড়ে উঠছে। শ্যামলও নেমে প'ড়ে সুটকেশ মুটের মাথায় দিয়ে।

শ্যামল ঘাটে এসে দাঁড়াতেই বেশ বলিষ্ঠ সবল একটি ছেলে—মাজায় কাপড় বাঁধা, ঘাড়ের ওপর ছিটের একটা সার্ট, খালি পা, গায়ে ডোরাডুরি হাতকাটা ফতুয়া, শ্যামলের কাছে চট্‌ করে এসেই জিজ্ঞেস করে—শ্যামল, চিন্‌তে পারলি আমাকে? শ্যামল নিরুত্তর, ছেলেটির মুখের পানে তাকিয়ে থাকে অবাক হ'য়ে। কোন দিন একে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। ছেলেটি বলে—বাঃ রে, এরি মধ্যে ভুলে গেলি! আমি যে তোর কানুদা—তোর চেয়ে দুবছরের বড়। সেই যে কতদিন আগে ছোটবেলা একবার এসেছিলি, আমার তো বেশ মনে আছে তোর কথা।

শ্যামল এবার বুঝতে পেরে বলে—ওঃ তুমিই তা হলে

কানুদা! কিছু মনে কর না ভাই, সে তো অনেকদিনের কথা—চেহারাও বদলে গেছে তোমার খুব।

—তা, এবার চল নৌকায় উঠি। ঐ বিলটার মধ্য দিয়ে আধ মাইলটেক গেলেই বাড়ীর ঘাটে উঠব।

শ্যামলের কানুদা সুটকেশ নিজের ঘাড়ে ফেলে শ্যামলকে নিয়ে নৌকায় উঠল। তারপর নিজেও গিয়ে দাঁড় ধরে বসে বললে—চলরে, চরণ—চালিয়ে চল, দাঁড়ে আমিই বসছি। শ্যামলদের নৌকা কুসুমপুর গাঁয়ের দিকে চল্‌ল।

কুসুমপুর গাঁয়ে শ্যামলদের পৈতৃক বাড়ী। বাড়ীতে জ্যাঠামশাই থাকেন আর সবাইকে নিয়ে। তিনিই গাঁয়ের জোত-জমি সব দেখাশুনা করেন। শ্যামলের বাবা জগদীশ-চন্দ্র মেজ। ছেলে পড়িয়ে, স্কুলে মাষ্টারি ক'রে, তখনকার দিনে এম-এ পাশ করেন। আপন চেষ্টায় ডাকবিভাগে তাঁর একটা চাকরী হয়। তারপর ভাগ্যজোরে আপন কর্ম্মদক্ষতায় তিনি আজ ডাকবিভাগের এত বড় চাকরে। ছোট ভাই হৃষীকেশ—লেখাপড়া বিশেষ কিছু হয় নি। এ গাঁয়ের কাছেই পাটের আপিসে কি একটা চাকরী করত। বছর কয়েক হ'ল বিধবা পত্নী ও তিনটি ছেলে মেয়ে রেখে কলেরায় মারা যায়। এরা সব বাড়ীতে থাকে। তাছাড়া পিসিমা আছেন বাড়ীতে কর্ত্রী হয়ে বিশ বছরেরও ওপর। তিনি নিঃসন্তান বালবিধবা। জ্যাঠামশায়ের দুই ছেলে, চার মেয়ে। বড় ছেলে বলাই রেলে কি একটা চাকরী করে। ছোট ছেলে কানাই আজ বছর তিনেক চেষ্টা করেও ম্যাট্রিক পাশ করতে পারছে না। কানাই শ্যামলের চেয়ে বছর দুইয়ের বড়। বলাইয়ের বিয়ে হয়েছে কিছুদিন হল। জগদীশচন্দ্র বছর দশ বার বাড়ীতে আস্‌তে পারে না। সরকারী চাকুরী—ছুটি কম। তা ছাড়া আসতে হলেই সপরিবারে আসতে হয়। পত্নী অরুণাদেবীর গীতা হবার পর যে অসুখ হয়েছিল তা থেকে আজ পর্য্যন্ত সুস্থ হ'তে পারেন নি। তাই ছুটি পেলে তাঁকে নিয়ে বছর কয়েক হল স্বাস্থ্যকর স্থানেই যেতে হয় হাওয়াবদলের জন্য। জগদীশবাবু চাকুরীর প্রথম থেকে বাড়ীর খরচ দিয়ে আসছেন নিয়মিতভাবে। তা ছাড়া সংসারের নানা দায় দৈন্যে মোটা টাকা দিতে হয় তাঁকেই। তাই বাড়ী না এলেও বাড়ীর সংসারের সাথে তাঁর সম্বন্ধ আজও আছে অটুট।

কুসুমপুরের বিলের মধ্য দিয়ে শ্যামলদের নৌকা প্রায় বাড়ীর কাছে এল। বাড়ীর নিচেই ঘাট। বাড়ীর সবাই ও গাঁয়ের আর পাঁচজন দাঁড়িয়ে আছে ঘাটের পাড়ে। সেখানে বেশ একটা জটলা।

শ্যামল বলে—কানুদা, এমন একটা নদীকে তোমরা বিল বল কেন! এত বেশ একটা নদী।

কানাই ঠোঁট উল্টে বলে—দূর্‌, এ আবার একটা নদী! তবে হ্যাঁ, বর্ষাকালে এটা একটা নদী হয় বটে, যেমন স্রোত, তেমনি ডাক। বছর কয়েক হল এ বিলে কুমীরও আসছে।

নৌকা এসে ঘাটে লাগল। শ্যামলের জ্যাঠামশাই হুঁকা হাতে সবার আগে দাঁড়িয়ে আছেন—সাদা ধবধবে দাড়ি—বুক অবধি পড়েছে। শ্যামল দেখেই চিনতে পারে তাঁকে। এসে পায়ের ধূলা নিয়ে প্রণাম করে। জ্যাঠা-মশাই তার মাথায় হাত রেখে করেন—নীরব আশীর্ব্বাদ। পিসিমা এগিয়ে আসেন। সেই শ্যামল, মায়ের কোলের ছোট্ট ছেলেটি! আজ কত বড় হয়েছে! কেমন ফুটফুটে পরিষ্কার পাতলা চেহারা! কেমন মিষ্টি মুখখানা! শ্যামল পিসিমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলা মাথায় নেয়। পিসিমা ছোট ছেলের মত আদর করে—তার মাথায় চুমা খেয়ে—বলেন—বেঁচে থাক বাবা। তার পর এক এক ক'রে প্রণম্যদের প্রণাম করে শ্যামল সবার সাথে বাড়ীতে উঠে আসে।

শ্যামলের এতটা কাল বাপ মার কাছে, আর মেস হোষ্টেলেই কেটেছে। তাই এত আপন জনের মধ্যেও তার জড়সড় ভাবটা যায় না। আর বরাবরই সে একটু মুখ-চোরা। বেশী কথাবার্ত্তা, আলাপ আলোচনা করতে পারে না কোনদিন। তবুও বেশ ভালই লাগে এদের সবাইকে। আর ভাগ্যিস কানুদা ছিল, তাই রক্ষে। তা না হলে হয়ত সবার সাথে আলাপ-সালাপ করাও তার পক্ষে মুস্কিল হোত। পিসিমা তো কেবল বলেন—লজ্জা কর না শ্যামল, আমরা তো তোমার আপন জন, এত তোমাদেরই ঘর বাড়ী—কোন অসুবিধে হলে ব'ল। তোমরা সহরে থাক—কত অসুবিধে না জানি হবে।

—না পিসিমা, আমার মোটেই অসুবিধে হচ্ছে না—বরং খুবই ভাল লাগছে সব, সহরের চেয়ে অনেক ভাল, শ্যামল কোন রকমে কথা কটা বলে।

শ্যামল কানুদাকে কাছ ছাড়া করে না। কানুদাকে নিয়ে বসে গিয়ে বাইরের ঘরের উত্তর দিককার বারান্দায়। ঠিক নদীর পাড়েই ঘরখানা। পাড় থেকে অনেক উঁচু করে গেঁথে তোলা হয়েছে। ঠিক তারই নিচে হাতকয়েক দূরে নদী। কানুদা বলে—বর্ষাকালে নদীর জল বারান্দা অবধি আসে। এই বারান্দায় বসে ছিপ দিয়ে তারা সবাই মাছ ধরে। শ্যামল শুনে অবাক হয়ে যায়।

শ্যামল বারান্দায় বসে যতদূর চোখ যায় শুধু তাকিয়ে থাকে। দূরে ওপারে ঘন আম-কাঁটাল-দেবদারু গাছের বন দেখা যায়। মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়। সুপারি, তাল, আর খেজুর গাছ। তারই ফাঁকে দু' চারটে মেটে ঘরের চাল দেখা যায়।

শ্যামল বলে—এটা কি গাঁ কানুদা?

—ঐ যে ঘরগুলো একটু একটু দেখা যায়, ও গাঁয়ের নাম পলাশদিয়া—তার পাশেই রামপুর, তারপর গোঁসাইহাট, কানাই এমনি একটার পর একটা নাম করে যায়।

শীতের চক্‌চকে রোদ নদীর জলের ওপর পড়েছে। ঝিরঝিরে বাতাসে নদীর জল কেঁপে কেঁপে বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে দু একখানা জেলের নৌকা মাছ ধরে ফিরছে। শ্যামলের ভারী ভাল লাগে এ সব দেখতে। বলে—কানুদা, ভারী সুন্দর এ নদীটা।

কানাই এ কথা শুনে শুধু হাসে।

জ্যাঠামশাই সব সময় কেবল সবাইকে সাবধান করেন—দেখ, শ্যামলের যেন কোন অনিয়ম না হয়। সহরে থেকে অভ্যাস—এখানে অনিয়ম হলেই অসুখ হবে। শ্যামল নদীতে স্নান করতে চায় সবার সাথে। সবার তাতে ঘোর আপত্তি। জ্যাঠামশাই বলেন—চাকর জল এনে দিক, তুমি বাড়ীতেই স্নান কর। শ্যামল জেদ ধরে—নদীতেই স্নান করবে কানুদাদের সাথে। কিন্তু সাঁতারও জানে না, ভাল করে ডুব দিতেও পারে না। শ্যামলের খাবার জল ফুটিয়ে রাখা হয়েছে আলাদা করে। শ্যামল ভাবে, এ সব বাড়াবাড়ি—আর সবার যা সয় আমারই বা তা সইবে না কেন? কানাই তো রাগ করেই বলে—পিসিমা, ওকে আঁচলের কোনে বেঁধে রেখে দাও—আলো বাতাস লাগবে না, বেশ ভাল থাকবে। পিসিমাও চড়াসুরে বলেন—তোর মত তো গোয়ার গোবিন্দ না রে। তিন তিন বারেও একটা পরীক্ষায় পাশ দিতে পারলি না। তোর যা সয়, ওর কি তাই সইবে।

—বেশ, আমি গোঁয়ার আমিই আছি, তোমাদের তাতে কি? বলে রাগ করে কানাই চলে যায়।

দুপুরে গাঁয়ের এ-বাড়ী ও-বাড়ীর পিসিমা, মাসিমা, কাকীমা ও আর সবাই আসেন রায়বাড়ীর মেজ বৌয়ের ছেলে শ্যামলকে দেখতে। শ্যামলের ভারী লজ্জা করে এদের সামনে আসতে।

সন্ধ্যাবেলা শ্যামলদের বাইরের ঘরে বসে গাঁয়ের বুড়োদের বৈঠক। ঢালা ফরাসটায় সবাই এসে এক এক ক'রে জমা হয়। তারপর চা, পান আর তামাক চলতে থাকে রাত দশটা অবধি। এ নিয়ম অনেকদিন থেকে চলে আসছে। এখানেও শ্যামলের ডাক পড়ে। এদের অনেক কথারই উত্তর তাকে দিতে হয়।

বিকেলের দিকে কানুদার সাথে বেড়াতে বের হয় শ্যামল। বলে—আজ চল কানুদা, মাঠের দিকে যাই। চারিদিকে কেবল মাঠ আর ওপরে খোলা আকাশ—আমার বেশ ভাল লাগে তার মাঝে দাঁড়িয়ে থাকতে। কানাই বলে—তা হলে চল, অন্দুর না ঘুরে চৌধুরীবাড়ীর খিড়কির পেছন দিয়ে গিয়ে মাঠে উঠি। দুজনে চলতে থাকে।

বেত আর বাবলার ঝোপে ঢাকা সরু পায়ে-চলার পথ, দিনের বেলাই অন্ধকার। কানাই বেতের কাঁটা সরিয়ে পথ করে আগে আগে চলতে থাকে, শ্যামল চলে পেছনে পেছনে। কিছুদুর আসতেই মস্ত বড় একটা দীঘি। দীঘির জল আর দেখা যায় না—এত কচুরিপানা, সেওলা আর আগাছায় ভরা। দীঘির উঁচু পাড়গুলা ভেঙ্গে সমান হয়ে গেছে মাটির সাথে। পাড় দিয়ে আসতে একটা ধারে দেখে—একটি তের চোদ্দ বছরের মেয়ে দুটো থালা বাটি ধুচ্ছে দীঘির ঘাটে। তারই পাশ দিয়ে শ্যামলদের পথ। শ্যামল অবাক হ'য়ে যায় মেয়েটিকে দেখে। পাড়াগাঁয়ে কারও এমন গায়ের রং থাকতে পারে—লাল টক্‌টকে! আর কি সুন্দর মুখশ্রী! পরণে আধ-ময়লা তাঁতের কাল রংয়ের সাড়ি, কোমরে তার জড়ানো আঁচল। শ্যামল একটু পেছন ফিরে চেয়ে দেখে মেয়েটিকে। মেয়েটিও

তাতের কাজ ভুলে বিস্মিত বড় বড় চোখ দুটা তুলে শ্যামলের দিকে চায়। শ্যামল ভাবে, গাঁয়ে সে নতুন তাই ছেলে বুড়া সবাই তো তার দিকে এমনি করে চেয়ে থাকে। তারা তখন মাঠের ধারে এসে পড়েছে।

শ্যামল বলে—কানুদা, ও মেয়েটি কাদের? ঐ যে দীঘির ঘাটে বাসন মাজছিল।

—কে রে ঐ উষী, ও তো চৌধুরীদের মেয়ে।

—ওর নাম বুঝি উষী?

—নাম তো ওর অতসী, সবাই উষী বলেই ডাকে। ভারী ভাল মেয়ে, বাড়ীর সব কাজ ঐ অতটুকুন মেয়েই তো করে।

—পাড়াগাঁয়েও অমন গায়ের রং আর চেহারা থাকতে পারে কানুদা, আমি কিন্তু তা ভাবি নি কোন দিন।

—ও আর কি রে, ওর দিদি লতিকে যদি দেখতে—তবে বলতে হ্যাঁ, সুন্দরী বটে! যেমন রং তেমনি মাথার চুল! উষীর চেয়ে দেখতে অনেক সুন্দরী সে।

—তার বুঝি বিয়ে হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, আর বচ্ছর শ্রাবণ মাসে। ওরা খুব গরীব কিনা, তাই দোজ-বরে দিয়েছে বিয়ে। তা জামাইটি মন্দ হয় নি, বয়সও এমন বেশী নয়। আগপক্ষের একটি মাত্র দু-বছরের ছেলে আছে। জামাই মাষ্টারি করে, সংসারে আর কেউ নেই।

—আচ্ছা, তোমাদের ঐ কি বলে, উষীর বাবা কি করেন?

—কি আর করবেন। আগে কি একটা বিশ পঁচিশ টাকার চাকুরী করতেন বিদেশে, তা ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে এসে বছর কয়েক হল বাড়ীতেই আছেন। সামান্য জোত জমি আছে তাই দেখাশুনা করেন। আর গাঁয়ের পোষ্ট-মাষ্টারী করেন তাতে পান মাসে বার টাকা। তা দীনুখুড়ো লোক বড় ভাল। এমন সরল তা আলাপ করলে বুঝতে পারবি। এখন এই উষীর বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

—অতটুকুন মেয়ের বিয়ে! বল কি কানুদা!

—আরে খুঁজতে খুঁজতেই তো বছর দু-তিন যাবে। টাকা তো আর দিতে পারবেন না। মেয়ে দেখে যে দয়া করে নেবে।

—তা এত সুন্দরী মেয়ে, ওর জন্য ভাবনা কি?

—না রে ভাই—সুন্দরী হলে হয় না, টাকা চাই।

কানাই বিজ্ঞের মত কথাকটি বলে মাথা নাড়তে থাকে।

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আসে। সবুজ শ্যামল মটর কলাই আর শর্ষের ক্ষেত আবছা হয়ে আসে—চাষীদের শীতের সন্ধ্যার খড়-পোড়ানো ধুয়োয়। বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ নীরব আঁধার হ'য়ে পড়ে। কানাই বলে—চল শ্যামল, এবার ফিরি। শ্যামলের এ সন্ধ্যা নীরবতার মধ্যেও উষীর মুখখানা বার বার মনে পড়তে থাকে। আহা, ভারী মিষ্টি মুখখানা তার! কেমন সরল সুন্দর চোখদুটি! উষীদের বাড়ীর ধার দিয়ে ফিরতে রান্নাঘরে দেখে একটি মাটির প্রদীপ জ্বলছে টিপ্ টিপ্ করে, আর সারা বাড়ীটা অন্ধকার।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ীতে পিসিমা শ্যামলকে নিয়ে কত পুরাণ গল্প করে—সেই তাদের ছেলেবেলাকার কথা। সেই কবে তার বাবা জগদীশ তখন স্কুলে পড়ে—একদিন দুপুরবেলা ঐ দক্ষিণদিকের পিটুলি আমগাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল। পড়েছিল ছাইয়ের গাদায় তাই রক্ষে। তা না হলে সেদিন একটা কি যে কাণ্ড হত! ভারী দুষ্টু ছিল সে। একবার বর্ষাকালে ভরা নদীতে জগদীশ গিয়েছিল সাঁতার দিতে। তারপর মাঝ নদীতে গিয়ে আর আসতে পারে না। হাত পা অবশ হয়ে যায় আর কি! এমন সময় ভাগ্যি ও বাড়ীর নটুদা নৌকা করে আসছিল। সেই তুলে নেয় ওকে নৌকায়। তা না হ'লে সেদিন যে কি হত—ভাবলে এখনও গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। পিসিমা এমনি ধরণের কত কথাই যে বলে যান।

আবার পরদিন বিকেলে কানুদা বলে—চল, নদীর দিকে যাওয়া যাক আজ। শ্যামল রাজি হয় না, বলে—মাঠের দিকই আমার বেশ লাগে। এমন খোলা এত বড় মাঠ আর দেখি নি কানুদা।

—তবে চল্, ঐদিকেই যাই।

আবার সেই বেত বাবলার ঝোড় ঠেলে চৌধুরীদের দীঘির পাড় দিয়ে মাঠের দিকে চলল তারা। আজ আর উষীকে দেখা গেল না ঘাটের পাড়ে।

শ্যামল এদিক ওদিক তাকিয়ে কানুদার পেছনে পেছনে

চলল। মনটা তার দমে গেছে—আর বেড়ান'র উৎসাহটাও কমে গেছে অনেকখানি। মাঠের নীরব সৌন্দর্য্য আর তার কাছে ভাল লাগছে না। কানুদাকে উষীর কথা কিছু জিজ্ঞেস করতে লজ্জাও করছে খুব। যদি বুঝতে পারে তার আগ্রহটা। অন্য কিছু যদি মনে করে। মাঠের আল ধরে একটু দূর এগিয়েই শ্যামল বলে—চল কানুদা, না হয় আজ নদীর দিকেই যাই।

—ঐ না বললি, মাঠই তোর ভাল লাগে খুব।

—তা লাগে বৈকি, তা চল না আজ নদীর দিকেই যাওয়া যাক।

—তা হলে চল।

দুজনে চলতে থাকে। কানু বলে—চল, এবার ঝোপের মধ্যে দিয়ে না গিয়ে বাড়ীর ওপর দিয়ে যাই। চৌধুরীদের বাড়ী পেরিয়ে ভট্চাজ বাড়ীর পাশ দিয়ে গিয়ে নদীর ধারে উঠব।

চৌধুরী বাড়ীর কাছে আসতেই ভেতর থেকে কে যেন বললে—কে রে, কানু নাকি? এর মধ্যেই ফিরছিস যে।

—এই যে ন' কাকীমা, শ্যামলের খেয়াল আজ আবার নদীর দিকে যাবে। সহুরে ছেলে কিনা, নদী মাঠ দুইই ভাল লাগে ওর।

একটি মহিলা বাড়ীর ভেতর থেকে সদর দরজার কাছে এগিয়ে এলেন। আধ ময়লা সাড়ি পরণে—শান্ত স্নিগ্ধ মুখশ্রী।

শ্যামলের মার কথা মনে পড়ে। উনি বলেন—আয় না শ্যামলকে নিয়ে বাড়ীর ভেতর। ওকে সেই মার কোলে কতটুকুন দেখেছি। কদিন যেতেই পারি নি তোদের ওদিকে।

শ্যামলকে নিয়ে কানু এসে উঠানের মাঝে দাঁড়ায়। শ্যামল ন'কাকীমাকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধূলা মাথায় নেয়। ন'কাকীমা শ্যামলের মাথায় হাত রেখে বলেন—বেঁচে থাক বাবা দীর্ঘজীবী হ'য়ে, দেশের মুখোজ্জ্বল কর। উষি—ও উষি, একটা মাদুর পেতে দে না তোর দাদাদের বসতে—বলতে বলতে ন'কাকীমা নিজেই যান ঘরের ভেতর মাদুর আনতে। উষী এসে মেটে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর পেতে দিয়ে যায়। তারপর ন' কাকীমা কত কথাই বলে যান। নিজেদের সুখ দুঃখের কথা, শ্যামলের মার কথা—তার সাথে কত আলাপই ছিল সেই বৌ-কালে। আজ হয়ত তার মনে নেই কিছুই। ভারী দেখতে ইচ্ছে করে তাকে—কেমন হয়েছে এখন। একবার এলে বেশ দেখা-শুনা হোত। গীতাকে তো দেখেনই নাই। দেখতে কেমন হয়েছে সে? মার মত মুখ আর রং পেয়েছে না কি? কত বড় হয়েছে এখন? এমনি কত কথাই বলতে থাকেন তিনি। শ্যামলও দু-চারটে কথার উত্তর দেয়। উষী দরজার কাছে বসে সব শুনছে। দেখতে দেখতে রাত হ'য়ে গেল। ন' কাকীমা ঘরের তৈরী খাবার দিয়ে তাদের মিষ্টিমুখ করিয়ে বলেন—তা ও এসেছিলে বলে তোমার গরীব কাকীমার সাথে দেখাটা হল। যাওয়ার আগে আর একদিন এস।

সেদিন সন্ধ্যে হতেই কানাই তোড়জোড় সুরু করেছে। ঘোষবাড়ীতে ভাসান যাত্রা, শীঘ্র খাওয়া-দাওয়া সেরে যেতে হবে। দু-কাঠির নরহরি চক্কত্তির দল ও অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। শ্যামল বলে সেও যাবে। পিসিমা তো হেসেই খুন, বলেন—তুই যেয়ে কি করবি। ওকি তোর ভাল লাগবে। ক'লকাতায় কত ভাল থিয়েটার যাত্রা দেখেছিস। জ্যাঠামশাই বলেন—এ ঐ কেনেটার কাজ। ওকে মিছিমিছি রাত জাগিয়ে অসুখ করাবে, তবে ছাড়বে। না, শ্যামলের গিয়ে কাজ নেই ওখানে। কিন্তু শ্যামল জেদ ধরেছে সে যাবেই। শেষে ঠিক হয়—কিছুটা দেখে কানাই শ্যামলকে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে যাবে।

দুজনে বের হয় ঘোষ-বাড়ীর উদ্দেশে—যাত্রা দেখতে। উঠানে সামিয়ানা খাটান' হয়েছে। দুটা গ্যাস লাইট জ্বলছে দুধারে। ঘরের বারান্দায় গাঁয়ের মেয়েদের জায়গা করা হয়েছে? একধারে দুখানা বেঞ্চ পেতে দিল শ্যামলদের বসবার জন্য—ঘোষদের ছোট ছেলে পঞ্চু। সবাই শ্যামলকে দেখে কানাকানি সুরু করে দিল—রায়দের মেজ কর্ত্তার ছেলে, ক'লকাতা থেকে এসেছে, ভারী বিদ্বান, কেমন ছবির মত চেহারা। এদের দুএকটা কথা শ্যামলের কাণে আসছিল। শ্যামল এদের দৃষ্টির আড়ালে একদিকে জড়সড় হয়ে বসেছে। ওদিকের বারান্দার শ্যামল চাইতেই দেখে—ও কে, উষী না? ঠিক উষীই তো। থামে হেলান দিয়ে বসেছে ভাই বোনদের নিয়ে। আর তারই দিকে

যেন চেয়ে আছে। শ্যামল তাকাতেই চোখ ঘুরিয়ে নিল অন্যদিকে। আবার একবার শ্যামল দেখে—উষী ওরই সমবয়সী কোন বাড়ীর একটি মেয়েকে তারই দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে কি যেন বলছে। শ্যামল আরও কবার উষীর দিকে চেয়ে দেখল—উষী তারই দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে। যাত্রা হচ্ছে শ্যামলের আর সেদিকে খেয়ালই নেই। কানুরা কিন্তু মহানন্দে যাত্রা শুনছে আর হাসছে। শ্যামলের মন চলে গেছে অন্য রাজ্যে। উষী ওকে এত কি দেখছে? কেন অমন করে চেয়ে আছে শ্যামল ভেবেই পায় না? শ্যামলেরও যেন কেমন বেশ ভাল লাগে ওকে দেখতে। শেষ রাত্রে যাত্রা ভাঙ্গল। শ্যামলের খেয়াল হোল তখন, আহা! আরও কিছুক্ষণ যদি হত যাত্রাটা। উষীর কথা ভাবতে ভাবতেই শ্যামল বাড়ী ফিরে আসে। সে রাতে আর শ্যামলের ঘুম হয় না।

সেদিন শ্যামল কানুকে ধরল, আজ সাঁতার শিখবেই। কানু তো সব সময়ই প্রস্তুত। দুজন নদীর ঘাটে এসে দাঁড়াতেই দেখল, উষী নদীর ঘাটে তার ছোট ছোট ভাই বোনদের স্নান করিয়ে দিচ্ছে। নিজেও স্নান করবে বলে এসেছে। কানু উষীকে দেখেই জিজ্ঞেস করল—কি রে উষী, বীরুর কোন খবর এল? বীরু উষীর দাদা। একবছর হল ম্যাট্রিক পাস করে বেকার বসে আছে। আজ দশ বার দিন হল তার বোন সতীর শ্বশুরবাড়ী গিয়েছে। গিয়ে কোন চিঠিপত্র বা খবর দেয় নি। উষী বলে—কই কানুদা, আজ সকালের উজান ষ্টীমারেও তো দাদা এল না—চিঠিও দেয় নি কোন। মা তো ভেবে অস্থির।

উষীকে দেখেই শ্যামলের সাঁতার শেখার উৎসাহ দপ্ করে নিবে গেছে। কানু বলে—কি রে শ্যামল, কোমর জলে দাঁড়িয়েই কি সাঁতার শিখবি? এগিয়ে আয় না। শ্যামল কোনমতে বলে—না কানুদা, আজ থাক কাল শিখব। উষীর চোখ মুখে হাসির ঝলক। কানু বলে—তোর যত সব লজ্জা—লজ্জা করলে কি সাঁতার শেখা যায়। সে দিন কোমর জলেই কোনমতে ডুব দিয়ে শ্যামল বাড়ী ফিরল।

দেখতে দেখতে কি করে যে এগারটা দিন কেটে গেল শ্যামল তা বুঝতেই পারে না। সিমলা থেকে শ্যামলের বাবা চিঠি লিখেছেন—কলেজ খুললে একদিনও দেরী কর না। তবুও শ্যামল বলে—আর কটা দিন থেকে যাই পিসিমা। পিসিমার চোখ ছল্ ছল্ করে ওঠে, বলেন—আহা! বাড়ীর ছেলে বাড়ীতে থাকবি তার আবার কি? কিন্তু জ্যাঠামশাই কিছুতেই রাজী হন না, বলেন—জগদীশ রাগ করবে। ওকে তো জান' চিরটা কাল—কেমন একগুঁয়ে। ওর কথা না শুনলে আর কোনদিন হয়ত শ্যামলকে আসতেই দেবে না গাঁয়ের বাড়ীতে। কথাটা খুবই সত্য। তাই ঠিক হয় কাল বিকেলের ষ্টীমারে শ্যামল যাবে।

সেদিন সকালবেলা কানাই বলে—চল শ্যামল, ঘটক ঠাকুর্দ্দার সাথে একবার দেখা করে আসি। শুনলাম আজ কদিন ধরে জ্বরে বড্ড কষ্ট পাচ্ছেন। গাঁয়ের মানুষ তোরও তো একবার দেখা করা উচিত।

—ঘটক ঠাকুর্দ্দা আবার কে কানুদা?

—শিবদাস ভট্চাজের নাম শুনেছিস? তারই ছেলে হরিদাস ভট্চাজ। এদের তিন পুরুষ থেকে ঘটকালি করে আসছে। ঘটক ঠাকুর্দ্দার বাবার তো শুনেছি কত রাজা, মহারাজা, জমিদারদের ঘর থেকে ডাক আস্ত—আর ওর ঘটকালি করবার ক্ষমতাও ছিল খুব। ওর বাবা নাকি সবশুদ্ধ দশ হাজার একটা বিয়ের ঘটকালি করে মারা যান। সেকালে শিবদাস ভট্চাজকে চিনত না—এমন লোক এ অঞ্চলে খুব কমই ছিল।

—তারই ছেলে বুঝি তোমাদের এই ঘটক ঠাকুর্দ্দা?

—হ্যাঁ রে, তারই একমাত্র বংশধর।

—ইনি আজ পর্য্যন্ত কটা বিয়ের ঘটকালি করেছেন?

—জানিস না বুঝি, ঘটকালিতে ওদের অত নাম—কিন্তু তবু হরিদাস ভট্চায্যি ঘটকালি করে নি জীবনে। কেন জানিস্? শুনেছি সে এক ভারী দুঃখের কথা। শিবদাস ঘটক তখন বেঁচে ছিল। ছেলের বিয়ে ঠিক করল বেশ অবস্থাপন্ন লোকের ঘরে, খুবই সুন্দরী একটি মেয়ের সাথে। শিবদাসের অবস্থাও তখন গাঁয়ের মধ্যে ছিল সবচেয়ে ভাল, আর ছেলেও এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ত। গাঁ শুদ্ধ বরযাত্রী নিয়ে ছেলের বিয়ে দিতে গিয়ে শিবদাস শোনে যে সেদিন সকালবেলাই বিয়ের কনে হঠাৎ কুয়ার পাড়ে পা পিছলে পড়ে যেয়ে মাথায় যে আঘাত পেয়েছে তাতেই অজ্ঞান হয়ে আছে। বিয়ে বাড়ীতে তখন কান্নাকাটি

পড়ে গেছে। মেয়ের জ্ঞান আর হল না। বিয়ের রাতেই মেয়ে গেল মারা। বরযাত্রীরা বর নিয়ে আবার ফিরে এল। সেই থেকে ঘটক ঠাকুর্দ্দা প্রতিজ্ঞা করেছেন যে বিয়েও করবেন না, আর ঘটকালিতেও নেই।

কানু শ্যামলকে নিয়ে ঘটক ঠাকুর্দ্দার বাড়ীতে আসে। জীর্ণ একতালা বাড়ী। সংস্কার অভাবে বাইরের দিকটা নোনা ধরেছে, ফাটলে জায়গায় জায়গায় পাকুড় গাছ আর আগাছা গজিয়ে উঠেছে। বাড়ীর ভেতরে উইয়ের ঢিপি, মাকড়সার জাল, ঝুল আর কালীতে ভরা। একা মানুষ কোন দিকই বা দেখেন। তায় কদিন আবার অসুখে পড়ে আছেন! দুজনে ঘরের ভেতর গিয়ে দেখে—জীর্ণ তক্তপোষের ওপর মলিন বিছানা। তাতে বসে ঘটক ঠাকুর্দ্দা তামাক টানছেন চোখ বুজে। মুখখানা শুকনো, মাথায় সামান্য কগাছা রুক্ষ চুল, চোখের পাতা দুটো অস্বাভাবিক ফোলা। হাত পাগুলো সরু, কিন্তু পেটটা উঁচু। কানুদের দেখে বলেন—কি রে কানু, আজ কদিন অসুখে পড়ে আছি খোঁজও নিস না একবার বুড়ো ঠাকুর্দ্দার।

—ঠাকুর্দ্দা, কিছু মনে কর না, শ্যামল এসেছে, ওকে নিয়ে ভারী ব্যস্ত ছিলাম এ'কদিন।

শ্যামল ঠাকুর্দ্দাকে একটা প্রণাম করে। ঠাকুর্দ্দা আশীর্ব্বাদ করে বলেন—জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল কর। জগদীশের ছেলে তুই, তোর সব খবরই তো এ বুড়ো ঠাকুর্দ্দা রাখে। জগদীশ ছিল আমার খেলার সাথী। ভারী ভাব ছিল ওর সাথে। বিদেশেই কাটাল' জীবনটা, দেশে আর এলই না। তা তুই এসেছিস দেশ দেখতে, কেমন না? কেমন লাগছে তোর পাড়া গাঁ? ঘটক ঠাকুর্দ্দা কথা বলতে থাকেন। ভারী ভাল লাগে শ্যামলের শুনতে তার কথাগুলো। দেশ বিদেশের অনেক খবরই ঠাকুর্দ্দা রাখেন। সারাটা জীবন তো দেশ বিদেশেই ঘুরে কাটল'। এই সরল লোকটির সাথে জানা বিষয়ে তর্ক করতে শ্যামলের লজ্জা করে না একটুও। ঠাকুর্দ্দাও মুখ খুলেছেন। এক এক করে সমাজের অনেক প্রশ্নই তর্কের মধ্যে উঠতে থাকে। কথায় কথায় আজকালকার মেয়েদের কথা উঠল। ঠাকুর্দ্দা বলেন—পাড়াগাঁয়ের মেয়েও অনেক সুন্দরী ও বিদুষী আছে। তবে ভাই, কলেজে পড়া মেয়েদের মত মেয়ে এখানে পাবে না।

শ্যামল বলে—হ্যাঁ, ঠাকুর্দ্দা ঐ সেদিন দীঘির ঘাটে বেশ সুন্দরী একটি মেয়ে দেখলাম। পাড়াগাঁয়ে অমন মেয়ে থাকতে পারে তা কোন দিন ভাবি নি।

ঠাকুর্দ্দা কানুকে জিজ্ঞেসা করেন—কে রে কানু?

কানাই বলে—শ্যামল ঐ উষীর কথা বলছে।

—ও উষী, তা ভাই অমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবি নে। যেমন রূপ তেমনি গুণ, তবে লেখাপড়াটা পাড়াগাঁয়ে আর অত কি ক'রে শিখবে।

শ্যামল বলে ফেলে - কই ঠাকুর্দ্দা, ভাল করে তার চেহারাটা তো দেখি নি, দুএকদিন দেখেছি তাও দূর থেকে।

—দেখিস নি? আচ্ছা দাঁড়া।

বাইরে তিন চারটি ছোট ছোট ছেলে খেলা করছিল; ঠাকুর্দ্দা তাদের একজনকে ডেকে বলেন—যা তো রে টেপু, উষীদিদিকে গিয়ে বল যে ঠাকুর্দ্দা ডাকছে শীঘ্র এস। ঠাকুর্দ্দা যেন আপন মনেই বলতে থাকেন—উষীদির আমার এত রূপ আর এত গুণ যে রাজার ঘরে পড়লেও মানিয়ে যায়—কিন্তু বড় গরীব ওরা।

পেছন দরজা দিয়ে উষী এসে ঘরে ঢুকেই শ্যামলদের দেখে একটু লজ্জা পায়, বলে—ঠাকুর্দ্দা আমায় ডেকেছ?

—আয় না দিদি এগিয়ে, এদের দেখে লজ্জা কি তোর। উষী ঠাকুর্দ্দার কাছে যায়। ঠাকুর্দ্দা শ্যামলকে দেখিয়ে বলেন—ও কে চিনিস? শ্যামল ততক্ষণ উঠে দাঁড়িয়েছে। উষী অল্প একটু হেসে মাথা নাড়ে।

ঠাকুর্দ্দা বলেন—ওকে প্রণাম করিস নি বুঝি? যা লক্ষ্মী দিদি আমার, ওকে প্রণাম কর।

উষী কি বুঝল সেই জানে। ধীরে এগিয়ে গিয়ে ঝুপ্ করে একটা প্রণাম করে। শ্যামল লজ্জায় বলে—থাক্ থাক্। উষী উঠে দাঁড়াতেই ঠাকুর্দ্দা হাসতে হাসতে বলে ফেলেন—বাঃ কী সুন্দর মানিয়েছে তোদের! যেন শিব-পার্ব্বতী। উষীর মুখ জবাফুলের মত টক্‌টকে লাল হয়ে ওঠে একথা শুনে। এক ছুটে বেরিয়ে যায় পেছন দরজা দিয়ে। শ্যামল বলে—ঠাকুর্দ্দা, এটা কি করলে? ও হয় তো -কি না জানি মনে করছে?

ঠাকুর্দ্দা বলেন—উষী দিদিকে আমার বিয়ে করবি ভাই? আচ্ছা, আমিই লিখব জগদীশকে সব কথা গুছিয়ে। আমার কথা সে ফেলতে পারবে না।

ঠাকুর্দ্দার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্যামলরা বাসায় ফিরে আসে। বাসায় এসেই কানু চেঁচিয়ে পিসিমাকে ডেকে বলে—ও পিসিমা, ঘটক ঠাকুর্দ্দা তো শ্যামলের বিয়ে ঠিক করে ফেলল ওবাড়ীর উষীর সাথে। পিসিমা তো হেসেই অস্থির, বলেন—কানুটার কথার ছিরি দেখ! বিয়ে ঠিক কিনা উষীর সাথে! শ্যামলের পাশ করা বৌ ঘরে আসবে। ও যেমন বিদ্বান, তেমন বৌ না হলে কি বিয়ে! আর তা না—কোথাকার এক পাড়াগেঁয়ে গরীবের মেয়ে। হরিদাস ঘটকেরও আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই! বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে। বংশের ধারা যাবে কোথায়!

শ্যামল বলে—কেন পিসিমা, মেয়েটি তো বেশ!

বৌদিদি সকলকে শুনিয়ে বলেন—ওঃ ঠাকুরপো, তোমারই বুঝি মনে ধরেছে! উষীর ভাগ্য ভাল। তাই তো বলি, এত সাত তাড়াতাড়ি ঘটকের কাছে যাওয়া কেন?

শ্যামল লজ্জায় এর কোন উত্তর দিতে পারে না। সারাদিন বাড়ীতে এই কথারই আলোচনা চলল। শেষ পর্য্যন্ত জ্যাঠামশাই শুনলেন এ কথা। কোন কিছু বললেন না তিনি।

আজ শ্যামল কলকাতা যাবে। নদীর ঘাটে সবাই এসেছে নৌকায় উঠিয়ে দিতে। পিসিমার চোখে জল। বৌদি, জ্যেঠিমা, কাকীমা ও বোনদের চোখ ছল্ ছল্ করছে। পিসিমা বলেন—আবার আসিস পূজার ছুটিতে। শ্যামলেরও মনটা ভাল লাগছে না। কেমন যেন মায়া পড়ে গেছে সবার ওপর! আর উষীর কথা মনে পড়লেই প্রাণটা যেন কেমন করে ওঠে। ঘাটে উষীর মাও এসেছেন, কিন্তু উষী নেই। যাবার বেলা একবার দেখতে পেলে বেশ হত! কানু নৌকা ছেড়ে দিল। যতদূর দেখা যায় শ্যামল দেখতে লাগল' গ্রামখানাকে। নদীর পাড়ে গাছ-পালায় ঘেরা ছোট্ট একখানা গাঁ। ঘাটে তখনও সবাই দাঁড়িয়ে আছে।

ষ্টীমার ঘাটের কাছে নৌকা আসতেই শ্যামল কানুদাকে চুপি চুপি বলে—তুমি ভাই বাড়ীতে কাউকে বল না, আমি উষীকেই বিয়ে করব। বি, এ পাশ করে যে ভাবেই হোক মার কাছ থেকে মত নেব। মা অমত করবেন না। কানাই কি বুঝল' সেই জানে। কোন কথা না বলে শ্যামলের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল। শ্যামল বললে—চিঠি দিও ভাই, সবার খবর দিয়ে।

তারপর আবার সেই ক'লকাতা। শ্যামল এসে হোষ্টেল, কলেজ, আর পড়াশুনা নিয়ে পড়ল। কিন্তু কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে সব। উষীর মুখখানা সব সময়ই মনে পড়ে। কেন অমন করে সে চাইত তার পানে! কি দেখত চেয়ে চেয়ে—শ্যামল তা বুঝে উঠতেই পারে না! মনটা তার যেন গাঁয়ের আশে-পাশেই ঘুরছে। এমনি করে একটার পর একটা দিন যায়। মধ্যে কানুর দুখানা চিঠি পেয়েছে সে। উত্তরও দিয়েছে। কিন্তু কিছুদিন হল পড়াশুনার চাপে কানুদার চিঠির আর উত্তর দেওয়া হয় নি। কিন্তু উষীর কথা মনে পড়ে তার খুবই সব সময়।

দুটা বছর কেটে গেছে। শ্যামল আর কানুর কোন খোঁজখবর পায় না। আর এ'কটা মাস তার যে কি করে কেটেছে তা কেবল সেই জানে। দুনিয়ার কোনও খবরই সে রাখবার অবসর পায় নি পরীক্ষার চাপে। কেবল বই, আর পড়াশুনা। বি, এ পরীক্ষার ফল বের হল। ইক'নমিক্সে শ্যামল প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে পাশ করেছে। জগদীশবাবুর আনন্দ আর ধরে না। ছেলের চাইতে তিনিই যেন খুসী হয়েছেন বেশী। ছেলেকে কাছে ডেকে তিনি বলেন—শ্যামল, এবার আই, সি, এস, এর জন্য প্রস্তুত হও। এটা আমার অনেক দিনের ইচ্ছা। তুমি আই, সি, এস, এ সফল হলে সে ইচ্ছা আমার পূর্ণ হবে।

পিতৃ-আজ্ঞা। শ্যামল ক'লকাতা এসে ইক'নমিক্সে এম, এ ক্লাসে ভর্ত্তি হয়ে বাড়ীতে আই, সি, এস, এর জন্য প্রস্তুত হতে লাগল'। আসছে বছর আই, সি, এস দেবে। এবারও তাকে দুনিয়ার সব কথা ভুলে গিয়ে বইয়ের মধ্যে ডুব দিতে হল। বি, এ পরীক্ষার পর ভেবেছিল যা হোক এবার কিছুদিন ছুটি। তখন উষীর মুখখানাও উঁকি ঝুঁকি মারছিল তার মনের কোনে। কিন্তু সে সব মনের মধ্যেই চেপে তাকে আবার বইয়ের মধ্যেই আপনাকে মিশিয়ে দিতে হল।

শ্যামলের আই, সি, এস পরীক্ষা হয়ে গেল। ফলও বের হোল তার কিছুদিন বাদে। শ্যামল প্রতিযোগিতায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নির্ব্বাচিত হয়েছে। এবার বিলেতে যেতে হবে কিছুদিনের জন্য। জগদীশবাবু শ্যামলের সাফল্যের খবর পেয়ে সত্য সত্য এবার এত আনন্দিত হয়েছেন যে জীবনে এর চেয়ে বেশী আনন্দ তিনি কোনদিন আশা করেন নি।

শ্যামল তার বাবাকে বললে—আর তো কটা দিন বাদেই দেশ ছেড়ে যেতে হবে। এবার একবার দেশের বাড়ীতে গিয়ে সবার সাথে দেখা করে আসি। শ্যামলের বাবা সানন্দে সম্মতি দিলেন। ছেলেকে অদেয় এখন তাঁর কিছুই নেই। সে যা চাইবে এখন তাই দিতে পারেন তাকে। তাই শ্যামল আবার প্রায় চার বছর পরে তাদের কুসুমপুর গাঁয়ের বাড়ীতে চলল। আজ তারও প্রাণে আনন্দ—আবার উমীকে দেখবে। এবার তাকে জীবনের সাথী করে পেতে চাইলেও তার বাবা অমত করবেন না হয়ত। উমীর সরল সুন্দর মুখখানা বারবার শ্যামলের মনে পড়তে লাগল। এতদিন তো পৃথিবীর কোন জিনিসই ভাববার তার অবসর ছিল না।

আবার শ্যামল গাঁয়ের বাড়ীতে এসেছে। বাড়ীতে আর সবাই আছে কিন্তু তবুও তার কাছে সব খালি খালি লাগে—এক কানুদার জন্য। কানুদা আজ বছর দুই হল এক কাপড়ের মিলে কাজ শিখতে চলে গেছে। পূজার সময় কদিনের জন্য কেবল বাড়ী আসে। মাইনে বলতে পায় মোটে কুড়ি টাকা। কিন্তু জ্বরে ভুগে ভুগে অমন সবল চেহারা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেছে। পিসিমা কানুর কথা বলে কত দুঃখ করতে লাগলেন।

বিকেলের দিকে শ্যামল নদীর ধারে কিছুদূর হেঁটে বাড়ীতে ফিরে এল। গাঁয়ের সে সৌন্দর্য্য, সে সবুজ শোভা—আজ আর তার চোখে পড়ে না। উমীর কথা থেকে থেকে মনে হয়। কিন্তু কানুদা নেই—কাকেই বা জিজ্ঞেস করে তাদের কথা। একা একা কোথায়ই বা যাবে সে? তাই ফিরে আসতে হল সন্ধ্যে হবার আগেই।

চারিদিকে বেশ ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। পিসিমা মাদুর পেতে সবাইকে নিয়ে বসেছেন বারান্দায়। তিনি ঘর সংসারের কথা বলছেন, গাঁয়ের কথা বলছেন, আরও কত কি? শ্যামল বলে—পিসিমা ঘটক ঠাকুর্দ্দা এখানে আছেন তো এখন?

—ও মা তুই শুনিস নি বুঝি! আর বছর আষাঢ় মাসে দু তিন দিন জ্বরে ভুগেই তিনি মারা গেছেন। আহা, এমন কি-ই বা বয়েস হয়েছিল! একেবারে বিনে চিকিৎসায় মারা গেলেন। অসুখে কে বা দিত পথ্য, আর কে বা করত শুশ্রূষা। এতখানি বয়েস পর্য্যন্ত একটা বিয়েও করল না।

শ্যামলের খুবই দুঃখ হল ঘটক ঠাকুর্দ্দার জন্য। বেশ লোকটি ছিল। মনটা তার ছিল উঁচু। গাঁয়ের সবার জন্যই ভাবনা ছিল তার।

উমীদের কথা শুনতে শ্যামলের ভারী ইচ্ছে হয়, কিন্তু কিছুতেই সে কথা মুখ ফুটে বলতে পারে না। শেষে আমতা আমতা ক'রে কোন মতে জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা পিসিমা, ঐ সেই চৌধুরীদের বাড়ীর সবাই ভাল আছে তো?

—ও বাড়ীর উমী তো এসেছে আজ কদিন হল শ্বশুরবাড়ী থেকে। তুই বুঝি ওর বিয়ের কথা শুনিস নি? প্রায় তিন বছর হল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। একটি ছেলেও হয়েছে ও বছর কার্ত্তিক মাসে। জামাই কোথায় যেন চাকরী করে। দেখতে শুনতে মন্দ নয়। এ বিয়ের জন্য দীনু চৌধুরী ভিটে-বাড়ী, জমি-জমা, নরহরি সা'র কাছে বন্ধক রেখেছে। দীনু চৌধুরীর ছেলে বীরুকে দেখিস নি বুঝি? সে বিয়ের পর প্রতিজ্ঞা করে বাড়ী থেকে যায় যে, এ দেনা শোধ করতে না পারলে আর দেশে আসবে না। টাটানগরে এক কারখানায় চাকরী পেয়েছে সে। মাস মাস দশ পনর টাকা করে নরহরি সা'কে পাঠায় দেনার জন্য। সুদে আসলে অনেক টাকা শোধ করে ফেলেছে।

শ্যামলের মনটা ব্যথায় টন্ টন্ করে ওঠে। সেই ক'বছর আগে দেখা সুন্দর কচি মুখখানা তার মনে পড়ে। মনে পড়ে সেই একদিন বিকেলে প্রথম দেখা দীঘির ঘাটে—বাসন মাজছে কোমরে আঁচল জড়িয়ে। হাতের কাজ ফেলে কেমন বিস্মিত সলজ্জ নয়নে চেয়েছিল তার দিকে। ঘটক ঠাকুর্দ্দা তো উমীর সুমুখেই বলে ফেলেছিলেন তাদের বিয়ের কথা। এতে কি ওর মনে একটুও ছাপ পড়ে নি?

অনেক আশা করেই শ্যামল এবার চার বছর পরে দেশে এসেছে। ঊষীর সে চার বছর আগে দেখা মুখখানা আজও মনের মধ্যে আঁকা রয়েছে। এ ক বছর তার পড়া-শুনার মধ্য দিয়ে যে কি করে কেটেছে সে তা নিজেই জানে না। শুধু মনটা তার বদলায় নি একটুও।

শ্যামলের আর ভাল লাগে না পল্লীর সবুজ শোভা। সব মুছে গিয়ে এসেছে একটা বিরাট শূন্যতা। এখন যেন গাঁ ছেড়ে যেতে পারলে বাঁচে। তাই কাল সে যাবে।

আজ দুপুরে ঘুম থেকে উঠে ঘরের বাইরে আসতেই দেখে বারান্দায় পিসিমা বসে কার সাথে যেন আলাপ করছেন। শ্যামল সেদিকে না তাকিয়ে সরে যাচ্ছিল। এমন সময় কে যেন ডাকলে—শ্যামলদা।

শ্যামল দাঁড়াল। একটি মেয়ে, কোলে তার ফুটফুটে একটি ছেলে, পরণে চওড়া লাল পেড়ে সাড়ি, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর। মেয়েটি কোলের ছেলেকে বসিয়ে উঠে এল।

শ্যামল দেখলে এই সেই চার বছর আগের দেখা ঊষী! আরও বেশী সুন্দরী হয়েছে সে দেখতে। রং তার যেন ফেটে পড়ছে। ঠোঁট দুখানি পানের রংয়ে লাল। দেখলে সে ঊষী বলে চেনাই যায় না। চোখের সে সরল সলজ্জ চাউনি আর নেই—মুখখানি হয়েছে আরও বেশী সুন্দর, চোখ টি স্থির, অচপল। ঊষী এসে শ্যামলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে দাঁড়ায়, বলে—শ্যামলদা চিনতে পারলে?

শ্যামল বড় বড় চোখে চেয়ে থাকে, কোন কথা বলতে পারে না সে। ঊষী হেসে ওঠে বলে—বাঃ রে! এরি মধ্যে ভুলে গেলে। পিসিমা বলেন—ও যে ওবাড়ীর ঊষী রে, চিনতে পারলি না?

শ্যামল চিনতে পেরেছে অনেক আগে, কিন্তু বলতে পারছে না কিছু। তার মনে হয় ঊষীর তো কোন ব্যথা নেই প্রাণে, দিব্য হাসিখুসি! তা হলে বেশ সুখী হয়েছে সে। শ্যামল মনে একটু যেন শান্তি পায়, কিন্তু ব্যথাও লাগে কম না। কোন মতে সে পাস কাটিয়ে বাইরে চলে আসে।

তার পর দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেবার দিনটিতেও সবার সাথে পাড়াগাঁয়ের একটা জীর্ণ দীঘির ধারে দেখা পল্লীবালার সরল মধুর মুখখানি—আর স্নিগ্ধ সজল চোখ দুটি—মনের কোণে ভেসে ওঠে। সেই ঊষীর এ নতুন রূপ যেন সে মেনে নিতে পারে না নিজের মনের মধ্যে। কত তর্ক ওঠে তাকে নিয়ে—কত প্রশ্ন জাগে মনের ভেতর। সত্যই কি ঊষী সুখী হয়েছে? একটুও কি মনে হয় না তার কথা? এ কি শুধু চোখেরই দেখা, প্রাণে কি একটুও লাগেনি এর ছাপ। বার বার মনে পড়ে কেমন করে ঊষী চাইত তার দিকে! আজও শ্যামলের দেহ-মন পুলকিত হ'য়ে ওঠে পল্লীবালার সরল সলজ্জ চাউনি স্মরণ করে।

জাহাজ চলতে থাকে সাগরের বুকে আপন বেগে অধীর হ'য়ে।



ভারতীয় চিত্রকলার তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী

শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীঅতুল বসু প্রমুখ প্রসিদ্ধ শিল্পীগণের অধিনায়কত্বে কলিকাতা যাদুঘরে ভারতীয় চিত্রকলার তৃতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী এইবার অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, ইহা দেশের এবং শিল্পীগণের পক্ষে খুবই আশার কথা—ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ চিত্রকলা প্রদর্শনী আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নূতন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত হইলেও শিল্পাদর্শের অনুরূপ এই প্রদর্শনীগুলি এখনও অনেক নিম্নস্তরে থাকায় দেশের শিল্পীগণ এবং দেশবাসী বিশেষ দুইটি হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন।



বালির নদী — এম-ড্রেপার



ধোপার ঘাট —মিসেস এইচ্, এস্, এডমণ্ডসন্

প্রথমতঃ শিল্পীদের পক্ষে কিছু বলিবার পূর্ব্বে প্রাচীন ভারতে চিত্রকলা কিরূপ সমাদর পাইত সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ঐতিহাসিক প্রমাণ যতদুর পাওয়া যায় তাহাতে দেখিতে পাই ভারতবর্ষে চিত্রকলার সম্যক উপলব্ধি প্রথম ধর্ম্ম হইতেই উদ্ভূত হয়। ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অথবা ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চিত্রকলা বিচিত্র সম্ভারে নিত্য-নূতন ভাবে সৃষ্ট হইতে থাকিলেও শিল্পী এখানে নিজস্ব প্রতিভা স্ফুরণের সুযোগ তেমনভাবে পায় নাই। সে সময়ে শিল্পীর 'অর্ডার' কাজের মত রাজা-মহারাজার জন্য গতর খাটাইয়া অখ্যাত অজ্ঞাত অনাদৃত হইয়া নীরবে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইয়াছে। তাহাদের প্রতিভার স্ফুরণ দেশবাসীর দেখিবার সুযোগ কোন দিন আসে নাই বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত পটুয়ারা গ্রামে গ্রামে বাঁচিয়া রহিয়াছে, কিন্তু পাহাড়পুর, অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরম্, খজুরাহো ও কোণারকের শিল্পীদের নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজ একেবারে নিশ্চিহ্ন।

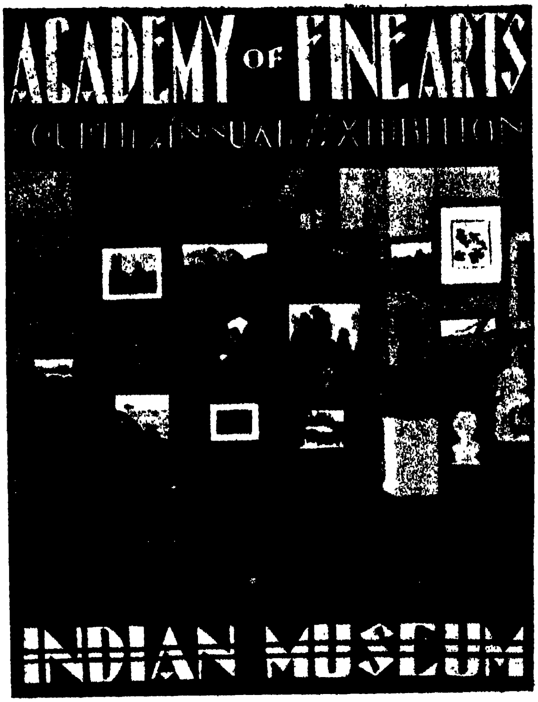
কিন্তু আজ দেশে শিল্পীরা যে উচ্চ-স্থান পাইতেছেন এবং জনসাধারণ

তাঁহাদের শিল্পকলাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন উহা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের অবদান—একেবারে অস্বীকার করিলে চলিবে না। এই মনোভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিবার জন্য উভয় পক্ষেরই যথেষ্টা চেষ্টা করা উচিত এবং এইরূপ চিত্রকলা-প্রদর্শনীই উহার একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর কক্ষে প্রবেশ করিলেই প্রথমে চোখে পড়িয়া থাকে চিত্র প্রসাধনের অভাব। দ্বিতীয়তঃ প্রদর্শনীগুলির প্রতি বিখ্যাত শিল্পীদের উদাসীনতা এবং অসহযোগিতা; তৃতীয়তঃ মনকে বিশেষভাবে পীড়া দেয় চিত্র-নির্ব্বাচন। এই সব কারণে জনসাধারণের চিত্রকলার সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হইবার আরও ব্যাঘাত ঘটিবে।

এতদিন প্রদর্শনীর অভাবের জন্যই হউক অথবা যে কারণেই হউক—প্রাচীনকালে যেমন জনসাধারণ অজন্তা প্রভৃতি শিল্পকলার সহিত সম্যকভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ না পাওয়ায় কেবলমাত্র লোকশিল্পের সহিত পরিচিত ছিল তেমনি আজ দেশবাসী উহার চেয়ে অতি নিকৃষ্ট চিত্রকলাকে লইয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছে—ইহা একটি জাতির পক্ষে কলঙ্কের কথা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যাহাতে মাসিক পত্রিকায় ছাপা ছবির মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা এবং সুযোগ জনসাধারণকে এই প্রদর্শনীগুলির মধ্য দিয়া শিল্পীদের দেওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক সময়েই প্রদর্শনীগুলি দেখিয়া মনে হয় যেন উহারই পুনরুল্লেখ হইতেছে মাত্র। ইহা শিল্পীদের এবং দেশবাসীর পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

ইহা ব্যতীত আর একটি গুরুতর সমস্যা ভারতীয় চিত্রকলায় দেখা দিয়াছে। ইহা শিল্পী শ্রীসুধাংশুকুমার রায়ের চোখে ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া আমরা খুবই সন্তোষলাভ করিয়াছি। তিনি লিখিয়াছেন, "ইউরোপের চিত্র-জগতে পুরাতন ও আধুনিক-পন্থীদের মধ্যে একটা বিরাট সংগ্রাম চলেছে। আধুনিক-পন্থীরা পুরাতন-পন্থীদের অনেক দোষ ধরেছেন—পক্ষান্তরে পুরাতন-পন্থীরা একটু এগিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন—আধুনিক-পন্থীদের ছবি 'ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে' ফেলে দাও।" সারা ইউরোপীয় চিত্রকলার রসাস্বাদন যাঁরা কর্ত্তে চান, বলা বাহুল্য তাঁরা এই দুটো



একখানি পোষ্টার—শিল্পী—জহর সেন



তৃষ্ণার্ত্ত—গোবর্দ্ধন

মতের কোনটাই না মেনে নূতন পুরাতন উভয়-পন্থীর ছবিকেই খতিয়ে দেখবেন।

ভারতবর্ষে কিন্তু সমস্যাটি একটু ঘোরাল। এখানে নূতন পুরাতনের দ্বন্দ্ব নেই; আছে পূর্ব্ব ও পশ্চিম-পন্থীর দ্বন্দ্ব। ইহা পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষার কোন্দল—প্রতিভার ক্রমবিকাশের দ্বন্দ্ব নয়।

আমাদের দেশের চিত্রকলায় আধুনিক-পন্থীর সঙ্গে পুরাতন-পন্থীর দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষ বলে কিছুই আশা কর্ত্তে পারি নে, কারণ 'আধুনিক' নামে কোন চিত্র-শিল্পের সৃষ্টিই আমাদের দেশে হয় নি। যাই হোক ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে ভারতীয় চিত্রকলার পরিচয় ঘটাবার মূলে বাধা সৃষ্টি করেছে—এই পদ্ধতিগত স্বাতন্ত্র্য বেধে। ভারতবর্ষে যেমন নিছক ভারতীয় ও নিছক ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকেন এমন দু'টি চিত্রকরের দল রয়েছে, তেমনি এই উভয় পন্থার মধ্যে ভাল মন্দ বিচারের ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য দুইটি পক্ষপাতমূলক সমালোচকমণ্ডলীরও সৃষ্টি হ'য়েছে। কেউ নিছক ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রকে দু'চক্ষের বালি মনে করেন। কেউ বা ভারতীয় চিত্রের পৃষ্ঠপোষক হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু এ দু'টোর কোনটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। আমাদের উচিত কোন প্রকারে পক্ষপাতদুষ্ট না হ'য়ে দু'রকম পদ্ধতির চিত্রেরই রসগ্রহণের চেষ্টা করা এবং উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদেরও উচিত জনসাধারণকে তাদের ছবির অপক্ষপাতমূলক আলোচনার সুযোগ দেওয়া।"



অবনীন্দ্রনাথের প্রোট্রেট —প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর

ইহা যে কত বড় সত্য কথা—আশা করি উহা আর বিশদভাবে বুঝাইয়া না বলিলেও চলিবে। তাহা হইলে বর্ত্তমানের এইরূপ বিভক্ত পদ্ধতিগত বৈষম্যে প্রতিষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির পরিবর্ত্তে জনসাধারণ বৈচিত্র্যময় নিত্য-নূতন রস সৃষ্টির অপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া সুচারু রুচির পরিচয় দিতে সমর্থ হইবেন। তখনই সার্থক লাভ করিবে ভারতীয় চিত্রকলার রূপ এবং শিল্পীদের অন্তরলোকের চির-চেতনাময় মানসমূর্ত্তি—সে তখন বদ্ধ জলাশয় হইতে মুক্ত হইয়া আপন বেগে বাধা-বিঘ্নের অতীত স্রোতস্বিনীর মত নিত্য-রসে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া ছুটিয়া চলিবে।

শিল্পীদের এই সার্থক প্রচেষ্টায় দেশবাসীর এতটুকু কার্পণ্য দেখাইলে চলিবে না। সম্পাদকগণের পত্রিকার জন্য চিত্র নির্ব্বাচনে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে যাহাতে দেশবাসী সহস্র সহস্র কাকের কলরব হইতে একটি কোকিলের শব্দ শুনিয়া মোহিত হইতে পারে এবং নিজেদের সুস্থ মনের ও জাতিগত ভাবের সুরুচির "ষ্টাণ্ডার্ড" উঁচু করিতে সমর্থ হয়। যেমন জাপানে প্রত্যেক স্কুলে প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের শিল্প সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রত্যেক ছেলে-মেয়েকে বুঝাইয়া দেওয়া হয় কি করিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে

অনুভব, উপভোগ, উপলব্ধি করা যাইতে পারে—ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের দেশের প্রত্যেক ছেলেমেদের বুঝাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্ম নয়।



ভারতীয় জীবনের একটি চিত্র —সারদা উকীল

সমগ্র জনসাধারণকে শিল্প-রসিক করিয়া তুলিবার জন্য দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চাই। ইউরোপে প্রত্যেক সহরে, এমন কি প্রত্যেক ছোট ছোট নগরীতে মিউনিসিপ্যাল আর্ট গ্যালারি আছে, যেখানে বড় বড় শিল্পীদের ভাল ভাল চিত্র সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হয়। এই সব আর্ট গ্যালারি প্রতিদিন খোলা থাকে, দর্শনী নাম-মাত্র—অধিকাংশই বিনা মূল্যে। এই সমস্ত শিল্পাগারের কল্যাণে প্রথমতঃ হইয়াছে শিল্পের সংরক্ষণ—যাহার ফলে আমাদের দেশের মত অকালে চারুশিল্প, লোকশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, দ্বিতীয়তঃ—দেশের মধ্যে শিল্প-বিকাশ ও শিল্পানুভূতির অনুকূলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তৃতীয়তঃ সাধারণ্যে শিল্পরস গ্রহিতার বিস্তার হইয়াছে। এই সমস্ত শিল্পাগার ব্যতীত অসংখ্য যাদুঘর, শত শত শিল্প-পরিষদ, শিল্পসভা ও শিল্পীদের ক্লাব আছে—যেখানে প্রতিনিয়ত শিল্পীদের সঙ্গে জনসাধারণের ভাবের আদানপ্রদান চলিতেছে। এইরূপ ভাবে আমাদের দেশেও শিল্পপ্রসারের দিকে অধিকতর মনোনিবেশ করিতে হইবে।

কলিকাতার 'একাডেমি অফ ফাইন আর্টস্' উহার তুলনায় ক্ষুদ্র হইলেও এই সুযোগের সৃষ্টি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

এইবার প্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্রের সমাবেশ হইয়াছে তাহাকে মোটামুটিভাবে ৪টি পর্য্যায়ে বিভক্ত করা যায়। (১) ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রাবলী (২) ভাস্কর্য্য (৩) ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রাবলী (৪) পুরাতন ইউরোপীয় চিত্রকরদের চিত্রাবলী।

প্রদর্শনীতে ভারতীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের সংগ্রহ দেখিলে মনে হয় 'দুধ ফেলিয়া জলের সংস্থান'। ইহার কারণ ভারতীয় পদ্ধতির শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ক্ষিতীন্দ্রকুমার, বীরেশ্বর সেন, অসিতকুমার, দেবীপ্রসাদ, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রভৃতি কেহই চিত্র প্রদর্শিত করেন নাই। অবশ্য যামিনী রায়ের নূতন পন্থায় অঙ্কিত ১৫খানি



কাঠ-কয়লায় অঙ্কিত একখানি চিত্র —অবনী সেন

এবং পুরাতন পন্থায় অঙ্কিত ১খানি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যামিনীবাবুকে 'মা ও মেয়ে' ছবিখানির জন্য প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'ভাইসরয় মেডেল' দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই 'মা ও মেয়ে' চিত্রখানির ভাব ও ব্যঞ্জনা যামিনীবাবুর পটুয়া শিল্পের পন্থায় অঙ্কিত অন্যতম 'মা ও সন্তান' চিত্রখানি হইতে অনেক দুর্ব্বলতর ; এই চিত্রখানির মধ্যে শিল্পীর সাধনার একাগ্রতা এবং চিত্রের ধর্ম্মের উপর অকপট শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়। 'মা ও সন্তান' বলিতে কোটি কোটি নরনারীর হৃদয় যে ভাবে আন্দোলিত হয় সেই চিন্তাশক্তির গভীরতায় এই চিত্রখানি অতুলনীয়।



সাঁওতাল নৃত্য —রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

চিত্রাঙ্কনে কোথাও দুর্ব্বল কল্পনার অথবা অর্থহীন অত্যুগ্র বর্ণবিন্যাসের স্থান নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যামিনী রায়ের তুলিকায় পল্লী-শিল্পের নিজস্ব ভঙ্গী ও প্রতিভায় অঙ্কিত বলিয়াই বোধ হয় এই চিত্রখানিকে প্রথম পুরস্কার দিতে কর্তৃপক্ষ সাহস করেন নাই।

শিল্পী শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'পদ্ম-চয়ন', 'সাঁওতাল নৃত্য', মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সারদা উকীল, প্রমোদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীর চিত্রাবলী দেখিলে দেশীয় কলা-বিজ্ঞানের অঙ্কন প্রণালীতে রসসৃষ্টির গভীরতা কিরূপ পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা বুঝা যায়।

তরুণ শিল্পীদের মধ্যে চিন্তামণি কর, আর্থার ঘোষ, কিরণময় ধর, এম, এল, দত্তগুপ্ত, তারক বসু, শীলা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। চিরাচরিত পথ ত্যাগ করিয়া বিষয়বস্তুর উপাদানকে ব্যাপকভাবে লইয়া বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনের নানা দৃশ্য ও ঘটনাকে ইঁহারা চিত্রকলায় যে রূপ দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন উহা আশা করি আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায় এক অনবদ্য রসের সন্ধান যোগাইতে সমর্থ হইবে। তাঁহাদের অঙ্কন প্রথায় দেবদেবীর বা যক্ষের যতটা স্থান আছে—তাহার চেয়ে বেশী চোখে পড়িয়া থাকে বাঙ্গালার মাঝি, ভিক্ষুক, গাড়োয়ান, আউলবাউল, ঝাড়ুদার, কুলীমজুর, মেছুনী, দোকানদার প্রভৃতি। সামান্যের ভিতর দিয়া বিরাটের এই যে উপলব্ধি—ইহা আধুনিক বঙ্গীয় চিত্রকলায় এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য্য বিভাগের সংগ্রহ মোটেই উৎকৃষ্ট হয় নাই। বিশেষভাবে আনন্দদান করিবার মত দুই তিনখানি ভাস্কর-মূর্ত্তি চখে পড়িয়া থাকে কি না সন্দেহ। শিল্পী সুধীররঞ্জন খাস্তগীরের পরিপুষ্ট মনের প্রকাশ ভঙ্গীতে উদ্ভাসিত কোন মূর্ত্তিই নাই। তবে তাঁহার নূতন কাজের কয়েকখানি মূর্ত্তি বেশ ভাল হইয়াছে। প্রদর্শনীতে আরও বেশী এবং উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য নিদর্শনের ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

ইহার পরেই ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত চিত্রের বিভাগ চোখে পড়িয়া থাকে। ইউরোপীয় পদ্ধতির চিত্র প্রায় বাঙ্গালী, বম্বেবাসী ও ভারতপ্রবাসী ইউরোপীয় অনেক শিল্পী দ্বারাই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে শিল্পী ললিত-মোহন সেন তাঁহার 'বর্ম্মী মেয়ে' চিত্রখানিতে সামঞ্জস্যময় খুব সাহসিক-বর্ণ প্রলেপের পরিচয় দিয়াছেন—তাঁহার এই ধরণে অঙ্কিত চিত্রগুলি প্রায়ই খুব জীবন্ত স্ফুর্ত্তি লাভ করিয়া

থাকে। মূক ও বধির শিল্পী শ্রীবিমানবিহারী চৌধুরী অঙ্কিত 'রঙিন সেকচ' ও ক্ষিতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইটালীয়ান-প্রথায় অঙ্কিত তৈলচিত্রগুলি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শিল্পী অতুল বসু তাঁহার অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলিতে যে বিশেষ হৃদয়াবেগ অনুভব করিয়া বর্ণের আলোকচ্ছায়ায় সামঞ্জস্যময় রূপ উদ্ভাসিত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার গভীর রসানুভূতির পরিচয় পাই। ইহাঁদের কম্পোজিসন বিদেশী হইলেও চিত্রের টেকনিক্ সম্পূর্ণ তাঁহাদের নিজস্ব। এই সংমিশ্রণের ফলেই তাঁহাদের এই চিত্রগুলির প্রত্যেকটি রেখা বিশেষ উদ্দেশ্য ও ভাব লইয়া আপন অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়াছে। অবনী সেনের চিত্রগুলিতে সতেজ ও ঝরঝরে ভাবের প্রকাশ আছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এবার 'পোষ্টার' চিত্র খুবই কম। আধুনিক যুগে 'পোষ্টার' শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধন হইয়াছে, কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পীরা এখনও ঠিক তেমন-ভাবে এই শিল্পটাকে গ্রহণ করেন নাই। এখন দেশে ইহার চাহিদা বেশ বাড়িয়া গিয়াছে, তরুণ শিল্পীদের এদিকেও অধিকতর মনোযোগ প্রদান করা সঙ্গত। প্রদর্শনীতে পোষ্টার চিত্রে জহর সেনকে পুরস্কার প্রদান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ সুবিবেচনার কাজ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অঙ্কিত আরও কয়েকখানি চলনসই চিত্র থাকিলেও বোম্বাই হইতে যে সব ছবি আসিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই—একেবারে সাধারণ চিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

অধিকাংশ পুরাতন ইউরোপীয় চিত্র মহারাজা প্রদ্যোৎ-কুমার ঠাকুর ও পাইকপাড়ার রাজষ্টেট্ দিয়াছেন। যদিও মহারাজা ঠাকুর প্রভৃতি তাঁহাদের সংগৃহীত ইউরোপীয় চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রের কয়েকটি নমুনা দেখিবার সুযোগ দিয়া ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, কিন্তু আমাদের মনে হয় বেশী এই সব চিত্র আর প্রদর্শিত না হওয়াই উচিত। ইউরোপীয় গ্যালারীর পৃথিবীবিখ্যাত চিত্রগুলি দেশবাসীর স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য না আসিলে উহা উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকায় দেখিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে নতুবা প্রদর্শনীতে টাঙ্গান পুরাতন ইউরোপীয় চিত্রগুলি হইতে আরও মূল উঁচুদরের এবং অতি আধুনিক পরীক্ষিত চিত্রের প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

ইংরাজী শিক্ষায় ধ্বনি-সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীকালিদাস ভট্টাচার্য্য বি-এ

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে মাতৃভাষায় গৃহীত হইবে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তদনুসারে যে সকল বিভিন্ন বিষয় এ পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষার ভিতর দিয়া শিক্ষা দেওয়া হইত, তাহা বাঙ্গলা এবং অন্যান্য মাতৃভাষায় (উর্দ্দু, অসমীয়া বা হিন্দী) তর্জ্জমা করিয়া ও প্রয়োজন মত পুস্তকাদি রচনা করিয়া কাজ আরম্ভের বিশেষ আয়োজনও চলিতেছে। স্বর্গীয় স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনব্যাপী যত্ন ও চেষ্টা তাঁহার পরবর্ত্তী কর্ম্মীদের অন্তরে জীবিত থাকিয়া আজ যে ফলে পরিণত হইতে চলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার বিশেষ সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভাষাই জাতির প্রাণ। মাতৃভাষা লোপ পাইলে, নিজস্ব জাতীয় জীবন বলিয়া আর কিছুই থাকে না। বিদেশী ভাষার প্রভাবে আমাদের মাতৃভাষা ক্রমশঃ প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছিল; এমন সময়ে এই লুপ্তপ্রায় ভাষার তথা জাতীয়শিক্ষাপদ্ধতির পুনরুদ্ধারের বিশিষ্ট চেষ্টা দেশের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ়ভাবে গড়িতে পারিবে বলিয়া বিশেষ আশা করা যায়। অন্যান্য বিদেশীয় জাতির মধ্যেও এইরূপ শিক্ষা প্রণালীই প্রচলিত আছে এবং তাহা জাতীয় সমৃদ্ধির যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। জাপানের এত দ্রুত উন্নতির একটি প্রধান কারণ—মাতৃভাষার উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন। জাপান বেশ বুঝিয়াছিল যে, বিদেশীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিয়া আধুনিক জগতের সমকক্ষ হইয়া চলা অসম্ভব এবং সেইজন্যই বিশিষ্ট নবীশদের দ্বারা বিভিন্ন বিষয়ের তর্জ্জমা ও পুস্তক রচনা করাইয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিল। বিশ্বভাষা (Lingua Franca) হিসাবে প্রয়োজনমত ইংরাজী গৌণভাবে স্কুল ও কলেজে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে মাত্র। অবশ্য এ ভাবের শিক্ষা দ্বারা জাতীয় উন্নতি স্বাধীন দেশে যতটা সহজসাধ্য ও সম্ভবপর, পরাধীন দেশে মোটেই ততটা নহে। তাহা হইলেও এই বর্ত্তমান সুযোগকে সর্ব্বান্তঃকরণে বরণ

করিয়া ভাষা ও জাতির ক্রমোন্নতির চেষ্টা আমাদের সকলকেই করিতে হইবে।

মাতৃভাষায় অন্যান্য সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কমিটী আরও স্থির করিয়াছেন যে, স্কুলগুলিতে ইংরাজী ভাষাও বিশিষ্ট শিক্ষক দ্বারা প্রকৃতভাবে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং প্রয়োজনমত শিক্ষকদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হইবে। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া কমিটী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সমীচীন ও প্রশংসনীয়। এ পর্য্যন্ত স্কুলগুলির উচ্চ চারিটি শ্রেণীতে সমস্ত বিষয় ইংরাজীতে শিক্ষা দেওয়া হইত; ফলে কেবল ইংরাজী শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও ভাষায় অল্প-বিস্তর দখল প্রত্যেকেরই হইত। তবে বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষা দেওয়ার দিকে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় উচ্চারণ ও অন্যান্য ব্যবহারিক ত্রুটি থাকিয়া যাইত। কিন্তু এখন সকল বিষয় মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার দরুণ এক দিকে যেমন মাতৃভাষার বিশেষ উন্নতি হইবে, অন্য দিকে তেমনি বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলে ইংরাজীর সুচারু শিক্ষা মোটেই সম্ভবপর হইবে না। যে কোন বিদেশী ভাষা শিখিতে হইলে সেই ভাষার ধ্বনি ও উচ্চারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষা হওয়াই প্রয়োজন, নচেৎ বিদেশী ভাষা শিক্ষার যে উদ্দেশ্য তাহা সর্ব্বতোভাবে সফল হইতে পারে না। ধ্বনি ও শব্দের উচ্চারণ বিশুদ্ধভাবে আয়ত্ত করিতে না পারিলে, কোন বিদেশীয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা মোটেই সম্ভব বা সহজ হয় না; অন্ততঃ যতদিন সেই বিদেশীয় অশুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত না হইয়া উঠেন। কোন নবাগত ইংরাজকে Fan (পাখা) কথাটি বলা হইলে তিনি স্বভাবতঃই Pan (পাত্র) বুঝিবেন, তাহার কারণ আমরা স্কুল কলেজে যেভাবে ইংরাজী শিক্ষা পাইয়া থাকি তাহাতে ইংরাজী ভাষার যে সকল ধ্বনি (Sounds of the letters) বাঙ্গালা বা সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার অন্তর্গত নয় তাহাদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। নবাগত ইংরাজটির বুঝিতে না পারার কারণ—ইংরাজী বর্ণমালার 'F'এর ধ্বনি বাঙ্গলায় নাই এবং তৎপরিবর্ত্তে আমরা 'ফ'এর ধ্বনি ব্যবহার করিয়া থাকি; আর এই 'ফ'এর ধ্বনি অনেকটা ইংরাজী 'P'এর ধ্বনির ন্যায়। পরে ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিব যে ইংরাজী বর্ণমালার কোন্ কোন্ ধ্বনি আমাদের আংশিক ও সম্পূর্ণভাবে অশুদ্ধ উচ্চারণ হইয়া থাকে।

এইরূপ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে হয়ত বিভিন্ন মত থাকিতে পারে। কেহ বা বলিতে পারেন বিদেশী ভাষা শুদ্ধভাবে শিখিবার জন্য আমরা এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন? বিভিন্ন জাতিগুলি কি ইংরাজী বিশ্বভাষা হওয়া সত্ত্বেও বিশেষভাবে শিক্ষা না করিয়া তাহাদের জাতীয় ভাষার দ্বারা কাজ চালাইতে সমর্থ হয় না? সেইরূপ আমরাও বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষা না করিয়া কেবলমাত্র বাঙ্গলা দ্বারা কেন সকল কাজ নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইব না? কথাগুলি কিয়ৎ পরিমাণে ঠিক হইলেও আমাদের ইংরাজী শিক্ষা অন্ততঃ এ সময়ে নিতান্ত প্রয়োজন। কেন না আধুনিক জগতের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের জন্য ইংরাজী পুস্তক ব্যতীত আমাদের আপাততঃ কোনই উপায় নাই; এ ছাড়া রাজভাষা হিসাবে ইহার কতক পরিমাণে প্রয়োজন আছে। সে জন্য যখন শিখিতেই হইবে তখন অন্ততঃ যদি সাধ্যাতীত না হয়, তাহা হইলে ভাষা যথার্থ ও শুদ্ধভাবে শিখি না কেন! বিশেষ শুদ্ধভাবে ইংরাজী শিখিতে হইলে উক্ত ভাষা ভাষীর দ্বারা শিক্ষা হওয়াই ইহার প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু এস্থলে শুধু যে সে ব্যবস্থা হওয়া সম্ভবপর নয় তাহা নহে, বিশেষ প্রয়োজনও নাই। কেবলমাত্র স্বদেশীয় যাঁহারা এবিষয়ে শিক্ষকতা করিবেন পূর্ব্বে তাঁহাদেরই ইংরাজী বর্ণমালার ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না পূর্ব্ব হইতে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিলে ইংরাজী উচ্চারণে এতটা অশুদ্ধতা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত কি না সন্দেহ।

অধিকাংশ জাতির মধ্যেই দেখা যায় যে, ভিন্ন ভাষার যে ধ্বনিসমূহ নিজ ভাষার বর্ণমালার মধ্যে নাই তাহা আয়ত্ত করিতে গিয়া প্রায়ই শুদ্ধভাবে উচ্চারিত হয় না। যেমন ইংরাজেরা "তুমিকে টুমি", ফরাসীরা "ব্যাড (bad)কে ব্যাদ", জার্ম্মাণীরা "ট্রি (tree)কে ত্রী", চীনারা "রুপী (rupee)কে লুপী", জাপানীরা "রিয়েলী (really)কে রিয়েরী, এবং আমরা Fanকে Pan বা water কে ওয়াটার ইত্যাদি বলিয়া থাকি। ধ্বনির এইরূপ অশুদ্ধতা কোন কোন জাতি স্বল্প চেষ্টায় শুদ্ধ করিয়া লইতে সমর্থ হয়, আর কোন কোন জাতির পক্ষে বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন হয়। এই যে একই ধ্বনির উচ্চারণ কোন জাতির পক্ষে সহজ ও অন্যের পক্ষে কঠিন অনুভব হয় তাহার অবশ্য যথেষ্ট কারণ আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা সামান্য প্রবন্ধে সম্ভব নয়; কেবল বিষয়োপযোগী কারণ দেখাইলেই এস্থলে যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

সাধারণতঃ কোন একটি জাতি কয়েকটি ভিন্ন ভাষার মধ্যে হয়ত একটি ভাষার ধ্বনি অতি সহজেই আয়ত্ত করিয়া প্রায় শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল; অন্য কয়টির হয়ত কিছু কষ্টে এবং অপরটির হয়ত কোন কোন ধ্বনি মোটেই উচ্চারিত হইল না। ইহার প্রধান কারণ, যে ভাষার ধ্বনি স্বল্প কষ্টে উচ্চারিত হইল তাহার বর্ণমালার ধ্বনিসমূহ নিজ ভাষার ধ্বনিসমূহের সঙ্গে সমধ্বনিত্বের দিক দিয়া প্রায় এক বা সামান্য পৃথক, এবং যে ভাষার ধ্বনি আয়ত্ত করা কিছু কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব মনে হইল সেই ভাষার বর্ণমালার কোন কোন ধ্বনি নিজ ভাষার বর্ণমালার মধ্যে ত না-ই—এতদ্ব্যতীত সেই সেই বর্ণের উচ্চারণ অদ্ভুত ধ্বনি বলিয়া মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যেমন আমরা উর্দ্দুর 'জলাসা' শব্দটি ইচ্ছা করিলেই শুদ্ধভাবে বলিতে পারি— কেন না 'স' ধ্বনি আমাদের বর্ণমালায় বর্ত্তমান এবং তাহার প্রকৃত উচ্চারণ আমরা জানি ও প্রয়োজন মত 'আস্তে, বাস্তবিক' প্রভৃতি শব্দে শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াও থাকি; কিন্তু উক্ত 'জলসা' শব্দে 'স'এর উচ্চারণ নিতান্ত তাচ্ছিল্যবশতঃ বর্ণের মৌলিক ধ্বনির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া উহার বিকৃত ধ্বনি 'শ' ব্যবহার হইয়া থাকে। যদিও বাঙ্গালার 'স'এর

এইরূপ বিকৃত উচ্চারণ আর কটু শুনায় না, কারণ ধ্বনি-বিজ্ঞান মতে উচ্চারণ-প্রাদেশিকত্বের (provinc alism in tongue) এবং সহজ উচ্চারণ (easiness in articulation)এর দিক দিয়া এইরূপ পরিবর্ত্তন কখন কখন অবশ্যম্ভাবী ও গ্রহনীয়। কিন্তু আবার উর্দ্দুর 'গুল' কথাটি বলিতে বিশেষ চেষ্টা ও অভ্যাসের প্রয়োজন—যেহেতু বাঙ্গালা বর্ণমালায় ঐ জাতীয় কোন ধ্বনি-নির্দ্দেশক বর্ণ নাই। সেজন্য সেই ভাবাভাবী অথবা ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ দ্বারা শিক্ষিত হইতে পারিলে ভিন্নভাষার সহজ ও কঠিন ধ্বনিগুলি আয়ত্ত করা মোটেই অসম্ভব হয় না।

ভাষার সমৃদ্ধি ধ্বনি সংখ্যার পরিমেয়ত্ব ও পরিপূর্ণতার উপর বিশেষ-ভাবে নির্ভর করে। সংস্কৃত ভাষা অপরাপর ভাষা হইতে এ কারণে বিশেষভাবে উন্নত এবং বাঙ্গালাভাষাও ঐ ধ্বনিসমূহের অধিকারী হওয়ায় প্রকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চেষ্টায় এত শীঘ্র বিশেষ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছে। অন্যদিকে ইংরাজীর বর্ণ-সংখ্যা অত্যন্ত অপরিমেয় বলিয়া—ভাষার ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি সংখ্যা বর্ণসমূহের সংখ্যা হইতে বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় মৌলিকবর্ণসমূহ ব্যতীতও wh, th (thin), th[s] (this), sh, ch s[3] (zh—Pleasure), ng এবং স্থানে স্থানে বর্ণমালার সমধ্বনি থাকা সত্ত্বেও n—Pn, Kn ; s—Ps, F—Ph প্রভৃতি ধ্বনির জন্য একবর্ণ বা যুক্তবর্ণের (diagraph) দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে। স্বরবর্ণের প্রায় প্রত্যেক ধ্বনিটিই বিভিন্ন শব্দে একাধিক ধ্বনি লইয়া বর্ত্তমান—'a' একটি মাত্র বর্ণ হইলেই—Cat (ক্যাট), Call (কল), Car (কার), Cane (কেন) প্রভৃতি বিভিন্ন ধ্বনি লইয়া প্রকাশ। ইংরাজীতে c, q ও x ক্রমান্বয়ে K ও S, K, এবং K+S ও G+Zএর সমধ্বনি হওয়ায় ছাব্বিশটি বর্ণের মধ্যে মাত্র তেইশটি বর্ণ থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনমত হয়ত ধ্বনি সংখ্যা বাড়িয়াই যাইবে, আর আমাদের বর্ণমালার ধ্বনি সংখ্যা নিজ ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার জন্য পরিমেয় হওয়া সত্ত্বেও তাহার ধ্বনি সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস করিয়া মাতৃভাষাকেও দুর্ব্বল করিতেছি, এতদ্ভিন্ন বিদেশীয় ভাষার ধ্বনি শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিবার পথও রুদ্ধ করিতেছি। "ই ও ঈ", "উ ও ঊ" বর্ণসমূহের আর পৃথক উচ্চারণ হয় না ; "অন্তস্থ য ও অন্তস্থ ব বর্ণ দুইটির মৌলিক ধ্বনি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছি এবং তাহার ফলে হইয়াছে কি Fill (ই) ও Feel (ঈ) এবং Book (উ) Food (ঊ) প্রভৃতির স্বরবর্ণগুলিকে মাত্রা পার্থক্য না রাখিয়া একই ভাবে উচ্চারণ করিতে হয় ; আর water—বটার এর পরিবর্ত্তে ওয়াটার ও yes—য়স এর পরিবর্ত্তে ঈয়েস বলিয়া সারিতে হয়। এ ছাড়া যে সকল ধ্বনি বাঙ্গালায় নাই অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যে সেই সকল ধ্বনিযুক্ত শব্দ নির্ব্বিবাদে স্থান পাইতেছে কিন্তু তাহাদের উচ্চারণ শুদ্ধতার দিকেও আমাদের কোনরূপ চেষ্টা বা যত্ন পরিলক্ষিত হয় না। Examination, Fit, Third, Bus প্রভৃতির Z, F, th, u ধ্বনি খুব কম লোকেরই শুদ্ধ উচ্চারণ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত উচ্চারণ বিকৃতির ত অভাবই নাই—Persist (পারসিষ্ট)কে পা-ছিষ্ট, actual (এ্যাকচুয়ল)কে একচুয়ল, Examination (এগজা (z) মিনেশন)কে এ্যাগজামিনেশন ইত্যাদি। যাহা হউক, এইরূপে বিভিন্ন কারণে বিদেশীয় ধ্বনি ও শব্দ যখন সকল—ভাষাতেই স্থান পায় এবং তাহার স্বাভাবিক গতি রোধ করিবার যখন কোনও উপায় নাই—তখন যে সকল নূতন ধ্বনি নিজ ভাষায় সুদৃঢ়ভাবে স্থান পাইতেছে, তাহা চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া লওয়া উচিৎ নয় কি ?

যে কোন ভিন্ন ভাষার কোন বিশিষ্ট ধ্বনি নিজভাষার একটি ধ্বনির সঙ্গে সমধ্বনিভাবে শ্রুত হইলেও অতি সূক্ষ্ম পার্থক্যও তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। অনেকক্ষেত্রে হয়ত কেবলমাত্র ধ্বনিটি শুনিয়া এই প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না—কিন্তু ভাষার ব্যবহারের বিশিষ্ট ধারায় ইহার প্রকাশ পায়। এই পার্থক্যের জন্মগত স্বাভাবিক কারণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম—জাতি, ব্যক্তি, রক্ত ও শ্বাসের গুণ-পরিমাণ ও গতি, বাক্য ও শ্রবণ যন্ত্রের গঠন, স্থান এবং আবহাওয়া প্রভৃতি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করিয়া নিয়ন্ত্রিত। কোন জাতির ধ্বনিতে অনুনাসিকের রেশ, কাহারও শ্বাসের উষ্ণতা, কাহারও বা ধ্বনি কণ্ঠ-স্বর-ময় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাব পরিলক্ষিত হয়।

নানা কৃত্রিম উপায়ে ভিন্ন ভাষা শিখিলেও এই পার্থক্যের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থাকিয়া যাইবেই। এতদ্ব্যতীত অনেকক্ষেত্রে ভিন্ন ভাষার ধ্বনির সমতার সামান্য অভাবকে অগ্রাহ্য করিয়াও শিক্ষা করা প্রয়োজন হয়, নচেৎ প্রায় সকল ধ্বনিরই আমূল পরিবর্ত্তন ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। সাধারণতঃ আমরা মনে করি—ইংরাজীর প্রায় সকল ধ্বনিই বাঙ্গালার বিভিন্ন ধ্বনির সমধ্বনি—কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মোটেই তাহা নয়। পার্থক্য প্রায় সকল ধ্বনিতেই আছে—এ ছাড়া ইংরাজীতে বাঙ্গালা হইতে কতকগুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনিও বর্ত্তমান।

ধ্বনিতত্ত্বের বিচারমতে বাঙ্গালার সহিত তুলনায় ইংরাজীর ধ্বনিগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।—প্রথম সূক্ষ্ম পার্থক্যযুক্ত, দ্বিতীয় সমতার সামান্য অভাবযুক্ত এবং তৃতীয় সম্পূর্ণ ভিন্ন ধ্বনি। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের সূক্ষ্ম পার্থক্য ও সমতার সামান্য অভাবকে অগ্রাহ্য করিয়া শিক্ষা করা ছাড়া বোধ হয় উপায় নাই—আর তৃতীয় ভাগের জন্য নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বনে চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা ধ্বনির শুদ্ধতা আয়ত্ত করা প্রয়োজন। প্রবন্ধে সংক্ষেপ ও সুবিধার জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের ধ্বনিসমূহের জন্য বিশেষভাবে ধ্বনিতত্ত্ব বিচার না করিয়া সামান্য আলোচনাই যথেষ্ট ; আর তৃতীয় ভাগের ধ্বনিগুলিকে সম্যক বুঝাইবার জন্য প্রয়োজন মত প্রতিকৃতি (diagram) তুলনামূলক ব্যাখ্যা দ্বারা ধ্বনিতত্ত্বের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ধ্বনির সমস্যা ও তাহার বিচার—সে জন্য একই ধ্বনির জন্য শব্দে বিভিন্ন বর্ণের ব্যবহার এবং উচ্চারণ ও উক্তের বিশিষ্টতা, মাত্রাভেদ (accent) প্রভৃতির দৃষ্টান্ত উল্লেখে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই। ইংরাজী পুস্তকের বর্ণ বিন্যাস অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক—সেই হেতু বর্ণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া ধ্বনির বিজ্ঞানসম্মত রচনা এস্থলে বর্ণিত হইবে।

প্রথমভাগ

স্বরধ্বনি :—a—অ (all,) a—আ (Path), e—ঈ (eve),—

o—উ (do), e—এ (end), o—ও (obey), a—এ্যা (mar) এবং যুগ্মধ্বনি (dipthong)—i—আঈ (isle)।

a in man এই "এ্যা" ধ্বনিটি বাঙ্গালা বর্ণমালার অন্তর্গত না হইলেও ইহাতে আমরা স্বাভাবিক ভাবেই উপার্জ্জন করিয়াছি। বাঙ্গালায় বহু শব্দে লিখিত চিহ্ন 'এ' থাকিলেও তাহার প্রকৃত ধ্বনি না দিয়া—এক, দেখ, বেলা প্রভৃতি শব্দে "এ্যা" ধ্বনি দেওয়া হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনি :—h, b, d, g, m, n, S (c), Sh, ng, l, r, ch, J (g)

ক্রমান্বয়ে হ, ব, ড, গ, ম, ন, স, শ, ঙ, ল, র, চ, জ এর সমধ্বনি।

মূলে ch ও J—t+sh ও d+zh ভাবের ব্যঞ্জন-যুগ্মধ্বনি (consonantal dipthongs) হইলেও ঐরূপ ব্যবহার আর হয় না। কোন কোন ধ্বনিতাত্ত্বিকের মতে ch, J, sh ধ্বনি তিনটি উচ্চারণ জন্য ওষ্ঠদ্বয় সামান্য গোলাকৃতি (slightly protruded) হওয়া উচিৎ, কিন্তু অন্যান্য ধ্বনিতাত্ত্বিক এইরূপ গঠনকে (fromation) বিকৃত (affected) বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "r"এর ধ্বনি ইংরাজীতে দুইভাবে সাধারণত ব্যবহৃত হয়। একরূপ বাঙ্গালা 'র'এর ন্যায় বা স্বল্পকম্পিত (slightly trilled), আর দ্বিতীয় রূপে 'r'এর কম্পিত ভাব থাকে না। এই অকম্পিত 'r'এর জন্য জিহ্বা গঠনস্থানে যায় মাত্র কিন্তু কোনরূপ কম্পন না দিয়া ফিরিয়া আসে এবং শব্দে 'r'এর পূর্ববর্ত্তী "আ" স্বরধ্বনিটি দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়—arm (আ—ম), Car (কা—র) প্রভৃতি। r এর ধ্বনিও কেহ কেহ বিকৃতভাবে ওষ্ঠদ্বয় গোলাকৃতি (protruded) করিয়া দিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় ভাগ

স্বরধ্বনি :—i—ই (sit) এবং u—উ (pull); যুগ্মধ্বনি (dipthongs) :—ou—আউ (thoü), এবং oi—অই (oil); ঈষৎ যুগ্মধ্বনি (semi-dipthongs or glide sound) :—

a-e—এই (age) এবং O—ও উ (old)

বাঙ্গালায় ই, ঈ এবং উ, ঊ ক্রমান্বয়ে ঈ এবং ঊ ধ্বনিতেই পরিণত—হইয়াছে, নচেৎ i এবং u এর ধ্বনির জন্য চিন্তা করিতে হইত না।

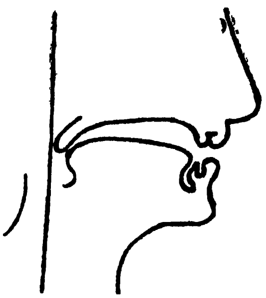


ঈ—e (eve)

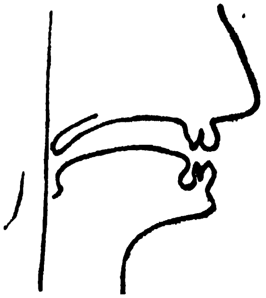


ই—i (sit)

e (eve)—ঈ উচ্চারণের জন্য গঠন হইতে জিহ্বা সামান্য নামাইয়া স্বর দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই i—ই (sit) এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। ওষ্ঠদ্বয়ের অবস্থা স্বাভাবিকভাবেই থাকিবে। গঠনের পার্থক্য উপরের প্রতিকৃতি হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।



উ—o (do)



উ—u (pull)

o (do)—'ঊ' উচ্চারণের গঠন হইতে জিহ্বার পশ্চাৎভাগ সামান্য নামাইয়া ও সেই সঙ্গে ওষ্ঠদ্বয়ের গোলাকৃতি ফাঁক সামান্য বড় করিয়া স্বর দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই u (pull)—উ এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। উপরের তুলনামূলক প্রতিকৃতি হইতে পার্থক্য সম্যক বুঝিতে পারা যাইবে।

ou—আউ এবং oi—অই যুগ্মধ্বনি দুইটির কোন আলোচনার প্রয়োজন নাই—কেন না ধ্বনি কয়টি ভিন্নভাবে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

এই—a-e (age) এবং ওউ—o (old) এই দুইটি ঈষৎযুগ্ম ধ্বনির জন্য ক্রমান্বয়ে এ এবং ও পূর্ণমাত্রায় ধ্বনি দিয়া ই এবং উ উচ্চারণ স্থানে জিহ্বা পৌছিবে মাত্র। এই কারণে ই এবং উ বর্ণদুটি এ এবং ও হইতে ছোট করিয়া লেখা হইয়াছে। এই ঈষৎযুগ্মধ্বনিদুটি আমরা মোটেই শুদ্ধভাবে দিই না এবং তাহার পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র এ এবং ও দিয়া থাকি।

ব্যঞ্জন ধ্বনি :—P, T, K (Q) এর জন্য আমরা ক্রমান্বয়ে প, ট ও ক ধ্বনি দিয়া থাকি। প, ট, ও ক হইতে উক্ত ধ্বনিগুলি অধিক শ্বাসযুক্ত। কোন কোন অভিধানে বা ধ্বনিতাত্ত্বিক দ্বারা বর্ণগুলির উপরে h চিহ্ন দিয়া Ph, Th, Kh এইভাবে শ্বাস নির্দ্দেশিত হইয়াছে। P, T, K, অনেকটা ফ, ঠ ও খ এর ন্যায়—পার্থক্য এই যে ফ, ঠ ও খ এর শ্বাস (breath) বর্ণগুলির ধ্বনির সহিত জড়িত অবস্থায় পশ্চাৎবর্ত্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হয়, কিন্তু P, T, ও K ধ্বনি কয়টির শ্বাস পশ্চাৎবর্ত্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে মিলিত হইবার পূর্ব্বেই সামান্যক্ষণ স্থায়ী হইয়া শ্রুত হয়। যেমন—

ফ্যান—ফ্যান (ভাতের মাড়);

Pan (Phan)—ফ—্যান (পাত্র)। (—শ্বাস চিহ্ন।)

Q এর মূলধ্বনি K র ন্যায়—antique, etiquette প্রভৃতি শব্দে K ধ্বনিই শ্রুত হয়। Q বর্ণ টি u ব্যতীত ব্যবহৃত হয় না এবং Q এর পরে u এর ধ্বনি ব্যঞ্জনান্ত বলিয়া Quit, quantity প্রভৃতি শব্দে K+W অথবা K+wh ধ্বনিভাবে উচ্চারিত হয়। (w এবং whএর ধ্বনি তৃতীয়ভাগে থাকিবে।)

X ব্যঞ্জনান্ত যুগ্মধ্বনি K+S ও G+Z দুইভাবে উচ্চারিত হয় (Z এর ধ্বনি তৃতীয় ভাগে থাকিবে)।

তৃতীয় ভাগ

স্বরধ্বনি :—U in but, O in hot, এবং E in her ধ্বনি তিনটি বাঙ্গালায় আদৌ নাই এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য এত সামান্য যে সেই সূক্ষ্ম পার্থক্য বজায় রাখিয়া বিদেশীয়ের পক্ষে আয়ত্ত করা সুকঠিন। এতদ্‌কারণে অন্ততঃ u in but এর ধ্বনি আয়ত্ত করিয়া ও তদনুযায়ী অন্য ধ্বনি দুইটি সমধ্বনিভাবে ব্যবহার করিলেও কিয়ৎ-পরিমাণে শুদ্ধতা বজায় থাকিবে এবং এমন কি কোন ইংরাজের পক্ষেও বুঝিতে কষ্টকর হইবে না।

U in but এই ধ্বনিটির জন্য 'আ' উচ্চারণের গঠন হইতে জিহ্বা সামান্য উপরে উঠাইয়া ও ওষ্ঠের ফাঁক সামান্য কমাইয়া স্বর দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই ইহার প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। বাঙ্গালায় কোন কোন চলতি কথায় এই ধ্বনিটির শুদ্ধ উচ্চারণ হইয়া থাকে—যেমন, 'বস্, তোমাকে আর যেতে হবে না।' এই 'বস্' শব্দটির 'ব' ধ্বনির সঙ্গে যে অ মিশ্রিত আছে সেই স্বর ধ্বনিটিই প্রায় U in but এর ধ্বনি। এই ধ্বনি-টির জন্য প্রতিকৃতি দিতে পারিলে ভাল হইত কিন্তু X—Ray Photo-graph ব্যতীত পরিষ্কারভাবে বোঝান কঠিন বলিয়া রেখা প্রতিকৃতি দেওয়া হইল না।

ব্যঞ্জনধ্বনি :—Y এবং W স্বর ও ব্যঞ্জন দুই ভাবেই ব্যবহৃত হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহারেও পূর্ণব্যঞ্জন (ure Consonantal) ধ্বনি না দিয়া অর্দ্ধস্বর ধ্বনি (Semi-Vowel) দেয়।

'ঈ' অথবা long 'e' ধ্বনির গঠন হইতে জিহ্বা আরও তালুর সন্নিকটে স্থাপন করিয়া স্বর দিলে ঘর্ষণযুক্ত যে ধ্বনি পাওয়া যায় তাহাই y এর প্রকৃত ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনি।

ঊ অথবা long 'oo' উচ্চারণজন্য গঠন হইতে জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ উপরে উঠাইয়া এবং সেই সঙ্গে ওষ্ঠদ্বয় অপেক্ষাকৃত কুঞ্চিত (narrow) করিয়া স্বর দিলে ঘর্ষণযুক্ত যে ধ্বনি পাওয়া যাইবে তাহাই w এর প্রকৃত ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনি।

Wh ধ্বনির জন্য w গঠনের কুঞ্চিত ওষ্ঠদ্বয়ের মধ্য দিয়া অ-স্বরান্ত (non-vocal) শ্বাস দিলে যে ধ্বনি পাওয়া যায় তাহাই ইহার প্রকৃত ধ্বনি। অনেক ধ্বনিতাত্ত্বিক এই ধ্বনিটিকে—hw (oo) ভাবেও প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং অনেক ক্ষেত্রে h এর ন্যায় ধ্বনিও দেয়। যেমন, whose—hooze, whole—hole প্রভৃতি।

Z in Zinc ধ্বনিটির গঠন সম্পূর্ণ S (স) এর গঠনের অনুরূপ, কেবলমাত্র Z এর জন্য শ্বাসকে স্বরান্ত (Vocalized) করিতে হইবে।

Z in azure অথবা S in measure প্রভৃতির ধ্বনি Z বা S স্বরান্ত (Vocalised) হইতে উষ্ণ বা শ্বাসযুক্ত—সেজন্য ধ্বনিটিকে 'Zh' যুক্ত বর্ণদ্বারা নির্দ্দেশ করা যায়। এই Zh এর ধ্বনি Sh (শ) ধ্বনিটিকে স্বরান্ত (Vocalized) করিলেই ইহার প্রকৃত ধ্বনি পাওয়া যাইবে।

F এবং V।

নিম্ন ওষ্ঠের উপরে উপরের দন্তসমূহ স্থাপন করিয়া শ্বাস দি



ঘর্ষণযুক্ত যে শ্বাস ধ্বনি শ্রুত হয় তা F এর প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি। Ph (Pha tom), gh (rough), U (lieu nant)—F ধ্বনির সম ধ্বনি ভা উচ্চারিত হয়।

V, F ধ্বনির স্বরান্ত (Vocalize রূপ।

Th ́ (think) এবং th (this

th ́ ধ্বনির গঠন প্রায় বাঙ্গালা ত বর্গের ধ্বনির গঠনের ন্যায়, পার্থ এই যে 'ত' এর জন্য জিহ্বা উপরের দাঁতের সঙ্গে সম্পূর্ণ আবদ্ধ থা আর th ́ ধ্বনি দিতে জিহ্বা ও দাঁত এর মধ্যে সামান্য পাতলা ফ থাকিবে এবং তাহা দ্বারা ঘর্ষণযুক্ত যে শ্বাস বাহির হইবে তাহাই th ́ প্রকৃত শুদ্ধ ধ্বনি।

th, th ́ এর স্বরান্ত (Vocalized) ধ্বনি।

ভিন্ন ধ্বনির জন্য লিখিত রূপ পৃথকভাবে না থাকিলে তাহার শুদ্ধ বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। নিজভাষার বর্ণমালা হইতে ভিন্ন ধ্বনি জন্য প্রতিবর্ণ নির্দ্দেশ করিলে ভিন্ন ধ্বনি শুদ্ধভাবে শিখিলেও ক্রম ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। এতদ্ব্যতীত নিয়মিতভাবে শিক্ষা করিয়া বাঙ্গালার নির্দ্দেশিত বর্ণের সাহায্যে শিক্ষা করিলে শুদ্ধ অশুদ্ধে বিচার মোটেই সম্ভব হয় না। ইহা ব্যতীতও নানা কারণের স্বাভাবি প্রভাবেও আসিবার সম্ভাবনা আছে। সেজন্য যতদূর সম্ভব বর্ণের প্রয়োজন মত পরিবর্ত্তন বা নূতন করিয়া লওয়াই উচিৎ।

প্রথম বিভাগের ধ্বনিসমূহের জন্য বাঙ্গালায় সমধ্বনি আছে। দ্বিত বিভাগের স্বরধ্বনি "i এবং u" এর জন্যও ই এবং উ বর্ত্তমান। P, K (Q) এবং X এর জন্য ক্রমান্বয়ে ফ, ঠ, খ এবং খ্‌স্ ব্যবহ করিতে পারিলে ধ্বনির শুদ্ধতা এবং লিখিত বর্ণের সঙ্গে কিয়ৎপরিমা সামঞ্জস্য থাকিত।

তৃতীয় বিভাগের ধ্বনি সমূহের জন্য সম্পূর্ণ নূতন বর্ণ প্রয়োজন এই সব ধ্বনির জন্য বাঙ্গালায় যে সকল নির্দ্দেশক বর্ণ ব্যবহৃত হ তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ নূতন চিহ্ন দিয়া বর্ণ তৈয়ারী হইতে পারে যাহাতে অন্য বর্ণের সহিত ব্যবহারে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে সেজ w ব্যতীত বাঙ্গালার নির্দ্দেশক বর্ণের নীচে একটি চিহ্ন ব্যবহার ক হইবে। যথা—u—অ, y—ঈ, w—ব, Z—জ, Zh—ঝ, F—ফ v—ভ, th ́—থ, th—দ।

ভাষা শিক্ষায় ধ্বনির শুদ্ধতা একান্ত প্রয়োজন। আমরা ইংরা শিখি এবং তাহাতে দখলও ভালই হয়। কিন্তু ধ্বনির শুদ্ধাশুদ্ধতা সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকায় শিক্ষায় যথেষ্ট ত্রুটি থাকিয়া যায়। এই শিক্ষায় সময় ব্যয়িত হয়, ইংরাজী ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে তাহা ধ্বনি শুদ্ধতা আয়ত্তের পক্ষে অত্যন্ত পরিমেয়। যাঁহারা শিক্ষকতা করিবে তাঁহাদের আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার একমা উপায়।

প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইংরাজী ধ্বনির শুদ্ধতা সম্বন্ধে নির্দ্দেশ করা মা সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত প্রয়াসের মধ্যে বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা অন্যান্য উচ্চার গত জটিলতার সমাধান কেহ যেন আশা না করেন।

যাহা কাব্য নহে

শ্রীমতিলাল দাস এম-এ, বি-এল্

(১)

পত্নীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে সুরেশ জাগিয়া আছে।—সারাদিনের হাড়-ভাঙা খাটুনি ক্লান্ত চোখ দুটিকে তন্দ্রাতুর করিয়া তোলে।

গত জীবনের ছবি মনে জাগে। তরুণী সপ্তদশী লীলা—আর সে এম-এ ক্লাশের পড়ুয়া। রূপ, যৌবন, কাব্য ও গান জটলা করিয়া আসে।

বিহগ কূজনের মত প্রেমের অশ্রান্ত গুঞ্জন। রাত্রির ভিতর অন্ততঃ দশবার জিজ্ঞাসা করে "তুমি আমায় ভালবাস?" লীলা কৌতুক করিয়া বলে "না"। মান অভিমানের পালা চলে।

চলচ্চিত্রের ছবির মত সেই ছবি জাগে। বার বার কাণে কাণে কত যে কথা—কত যে কৌতুক, কত যে ভুল, কত লুকোচুরি—এক কথায় সে ছিল কাব্য, আর—

সত্যকার জীবন—রসহীন নির্ম্মম অভিশাপ। এম-এ পাশ করিয়া আজ দশ বৎসর সুরেশ মাষ্টারি করে। তিন মাইল দূরে স্কুল—রোজ হাঁটিয়া যায়, হাঁটিয়া আসে। খাতায় লেখে পঞ্চাশ টাকা—পায় চল্লিশ। শেলি, ব্রাউনিং, টেনিসনের যুগ গেছে। দিনের পর দিন ছেলেদের শিখায় গণিত, ইতিহাস, ভূগোল। লীলা চার পাঁচ ছেলের মা হইয়া শেষ সন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যু-শয্যায় পড়িয়াছে।

কি যে রোগ কেহ জানে না। হরকুমার কম্পাউণ্ডারি শিখিতে গিয়াছিল—সেখান হইতে ফিরিয়া H. M. B. নাম দিয়া ডাক্তার সাজিয়াছে—সাতখানি গ্রামের সে-ই ধন্বন্তরী।

তাকে তাকে ঔষধের শিশি সাজানো—এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি দুই ঔষধেই চিকিৎসা চলে। সুরেশ নিরুপায়, দূর সম্পর্কের এক পিসি ছেলেগুলিকে আগলায়—সে পত্নীর সেবা শুশ্রূষা করে।

নিদ্রায় চোখ ভাঙিয়া আসে। তবু জাগিতে হয়, কিন্তু ভালবাসার যে শৌর্য্য—শরীরের আবেদনকে সে জয় করিতে পারে না। কাতর চোখ বুজিতে চায়।

না, সুরেশ আর পারে না; এমন করিয়া সেবায় সৌখীনতা তাহার সহে না। ইহার চেয়ে—

ভাবিতে ও বলিতে লজ্জা এবং সঙ্কোচ। কিন্তু তথাপি মন ভাবে।

এত যন্ত্রণা না দিয়া লীলা মরুক।

তাহার সকল ইন্দ্রিয় বিকল হয়। মনের প্রবুদ্ধ ও অপ্রবুদ্ধ চৈতন্যে দ্বন্দ্ব চলে, কিন্তু এই ইচ্ছাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারে না।

কখন যে চিন্তা স্রোতে শমতা হইয়া সে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িল, সুরেশ নিজেই তাহা জানে না।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া সে স্বপ্ন দেখে। দুঃসহ জীবনের দুর্নিবার ব্যথার কি বিপরীত ছবি।

সে গিয়াছে স্বর্গলোকে। কি সুন্দর ছবি—যেদিকে চায় সেদিকেই সুন্দরের ছড়াছড়ি। গন্ধ ও গান মনকে শীতল করে—আনন্দ অফুরন্ত, ভাণ্ডার অফুরন্ত।

সে পারিজাতের বিকচ ফুল পাড়ে, মালা করে, মালা করিয়া গলায় পরায়। কার? সে যেন লীলা—কিন্তু লীলাও নয়—চির-তরুণী চির-সুন্দরী সে—সে যেন নারীর চিরন্তন লীলা—।

লীলার আর্ত্তনাদ তাকে জাগায়। ক্ষীণ ও বেদনামথিত কণ্ঠ—"দেখ আমার বুকটা জ্বলে যাচ্ছে।"

অভ্যাসমত সে ঔষধের তাকের দিকে হাত বাড়ায়—

লীলা কাতরভাবে বলে—"ঔষধ না—আমি গেলে ওদের দেখো"—বলিয়াই ভাবের আতিশয্যে লীলা অচেতন হইয়া পড়ে।

মৃত্যুর অপরিচিত পদধ্বনি—

আকাশে তারা জাগে—লীলা বেলফুলের কেয়ারি করিয়াছিল তাহার গন্ধ আসে—। তবু শঙ্কায় মন ভরে।

সুরেশের ব্যাকুল বেদনায় জগতের কোনই ব্যথা নাই। সে পিসিকে ডাকে। ধীরে ধীরে জীবন মিলাইয়া যায়।

জীবন্ত খোকা-খুকুর হাহাকার—কিন্তু লীলার শবদেহ নীরব ও নিঃসাড়।

(২)

রমেশ বলে "তোমার কাছে এ আশা করতে পারি নে ভাই—বৌদি মরতে না মরতে—"

সসঙ্কোচ প্রশ্ন। বন্ধুর মুখের দিকে উদাস দৃষ্টি ফেলিয়া সুরেশ বলে—"তা সত্য, কিন্তু…"

"কিন্তু কি ?"

"আমার পাঁচ পাঁচটি ছেলেমেয়ে—এদের দেখে কে ? পিসি ত বাড়ী যাওয়ার নুটিস দিয়েছেন—এখন উপায় ?"

"উপায়ের কথা পরে ভাবব, কিন্তু তোমার কাছে—এটা কি প্রচণ্ড নির্ম্মমতা বলে মনে হচ্ছে না ?"

সুরেশ চুপ করিয়া থাকে। বন্ধুর আনন্দ-ভাস্বর মুখের দিকে তাকায়, পরু বলে—"আমিও তোমার মত ভাবতাম, কিন্তু জান কি, সমস্তই একটা প্রচণ্ড তামাসা—"

"কি তামাসা ?"

"সমস্তই—আমাদের কাব্য ও ধর্ম্ম, আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা—উদ্দেশ্যহীন সংগ্রামের মধ্যেই জীবনের চলা ফেরা—"

"তাহলে তুমি বিয়ে করছ ?"

"করছি বই কি, খেতে পাবে না অথচ কেউ আশ্রয় দেবে না—পয়সার দাসদাসী ওদের দেখবে না—"

"তাই বিনা পয়সার দাসী আনতে যাচ্ছ—যে তোমার পদসেবাকে পুণ্য মনে করবে—এই ত ?"

সুরেশ আস্তে আস্তে বলে—"রাগ করিস নে, জীবনকে তলিয়ে দেখলে তোর অনেক কাব্যই উল্টে যাবে। ফুল যে রূপ ও গন্ধ দেয়, সে মৌমাছিকে ভুলাবার জন্য—"

রমেশ বলে—"না, তুই পণ্ডিত, তোর সঙ্গে তর্কে পারব না—কিন্তু এ কাজ একান্ত পাশবিক বলে মনে হয়।"

সুরেশ বেদনা-বিহ্বল ধীরতায় উত্তর দেয়—"আমরা যে আদবেই পশু, সে কথা ভুললে চলবে কেন ?"

"না আমি শুনতে চাই নে—পরলোক থেকে সতীলক্ষ্মী তাকিয়ে দেখবে—তার ঐকান্তিক ভালবাসার এই শেষ পরিণাম ?"

"পরলোক, জানিস ভাই—ওটা মস্ত একটা ফাঁকি—!"

রমেশ লাফাইয়া ওঠে।

সুরেশ বলে—"আমি অনুভব করেছি। লীলার রোগ শয্যায় যখন সেবার শ্রান্তি আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলছিল—আমি ওর মৃত্যু কামনা করছি—তখন স্বর্গ দেখতে পেলাম—"

রমেশের ঔৎসুক্য প্রকট হইয়া ওঠে।

"সত্য—একটুও মিথ্যে নয়। দুনিয়ায় জ্বালার পরলোক একটা মিথ্যার প্রলাপ—"

"হয়েছে, আর নয়"—বলে রমেশ বিদায় লয়।

(৩)

বিবাহ হইয়াছে।

নববধূর নাম ক্ষমা। কিন্তু তার প্রকৃতি ঠিক উল্টা। পাঁচ পাঁচটির হাঙ্গামা মা-ই পোহাইতে পারে না—ক্ষমা না পারিলে দোষ দেওয়া যায় না।

মেয়েটি বড়, সেই ভাই বোনগুলিকে আগলায়।

সুরেশকে পুনরায় যৌবনের ভাণ করিতে হয়। অস্বচ্ছল সংসারেও প্রসাধন কিনিতে হয়।

কিন্তু কি উপায় ?

ক্ষমার সাধ-আহ্লাদ ত আর শেষ হয় নাই।

তাই খিটিমিটি লাগে।

ছোট মেয়েটির জ্বর। অঘোর অচৈতন্য—

ক্ষমার সেদিকে দৃষ্টি নাই। অতি-দূর সম্পর্কের নিমাই আসিয়াছিল—তাহাকে লইয়া সে ফষ্টি নষ্টি করে।

সুরেশ আসিয়া দেখে। কলহের পঙ্কিল আবর্ত্ত জাগে।

মেয়েটি বিনা চিকিৎসায় ও বিনা শুশ্রূষায় যায়।

সুরেশ পারে না। অভাব ও অনাটন—রোগ, শোক ও দারিদ্র্য সবাই যেন তাহার পিছনে লাগিয়াছে।

তার উপর রূপসী পত্নীর জন্য হিংসা ও সন্দেহের দাবানল।

ক্ষয় অলক্ষ্যে কবে আরম্ভ হইয়াছিল কেহ জানে না। তিলে তিলে প্রাণশক্তিকে ধ্বংস করিয়া সে যেদিন প্রকট হইল, সেদিন যাহা কিছু পুঁজি ছিল তাহা চিকিৎসায় নিঃশেষ হইল।

তারপর একদিন যাহা ঘটে তাহাই ঘটিল। সুরেশ অতি নাবালক দুইটি ছেলে ও দুইটি মেয়ে এবং ভোগ-সমুৎসুক পত্নীকে রাখিয়া সংসার খেলায় বিদায় নিল।

নিঃসম্বল নিরুপায় সুরেশ ভবিষ্যতের জন্ত কিছুই রাখিতে পারে নাই।

সুরেশের মৃত্যু তাই আকস্মিক না হইলেও অতি নিদারুণ দুর্দ্দৈবের মত দেখা দিল।

(৪)

সংসার যে কেবল নির্ম্মম তাহাই বা বলি কিরূপে। স্কুলের ছেলেরা শোক-সভা করিয়া নয় টাকা তের আনা চাঁদা তুলিয়া পাঠাইয়াছে। যে আনিয়াছিল সে চার আনা ভালমানুষি বলিয়া আদায় করিয়া নিয়া চলিল।

সংসারে সহানুভূতি আছে।

কিন্তু ক্ষমা—সে মনে করে এই জগৎ বিকট দৈত্যের বিকট অভিশাপ।

জীবনে আশা ও আনন্দের পুষ্প মুকুলিত হয় নাই।

বৃদ্ধের তরুণী ভার্য্যা সে। কিন্তু সেখানে অধিকারের চেয়ে সে পাইয়াছে অভাবের লাঞ্ছনা।

তাহার সমস্ত অন্তর বিদ্রোহী হইয়া ওঠে।

পড়শীরা বলে—শ্রাদ্ধ কর। ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধ না করিলে কি হয় কে জানে? সে দিন মাধু পিসী রাতে পথে ফিরিতে গা ছম ছম করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছিল। আবছায়া—কিন্তু মাধু পিসি দিব্য করিয়া বলিয়াছে—"সে সুরেশের আবছায়া।"

পড়শীদের উপদেশ—উপদেশ নয়। আদেশের মত তাহাকে মানিতে হয়। দরিদ্রের যাহা কিছু ছিল তাহা দিয়া পরলোকগত আত্মার সদ্গতি করিতে হয়।

ক্ষমা জগার ঠাকুমাকে বলিয়াছিল—"কিন্তু আমরা খাব কি?"

জগার ঠাকুমা জবাব দিয়াছিল—"জীব দিয়েছেন যিনি—আহার দিবেন তিনি, তাই বলে কি সুরেশ জলবিন্দু না পেয়ে তৃষ্ণায় কাঠ হয়ে গাছে গাছে ঘুরে বেড়াবে?"

অকাট্য যুক্তি। তিলোৎসর্গ ও বৃষোৎসর্গ যথানিয়মে হয়।

ক্ষমার চোখে মৃত্যুর পর পড়ে অন্ধকার যবনিকা। সেখানে সে কিছুই দেখে না। তাহার প্রেম জন্মে নাই, কাজেই প্রেমের মিথ্যা কল্পনা দিয়া সে সুরেশের তৃষিত বেদনা অনুভব করিতে পারে না।

তথাপি যুগ-যুগান্তরের সনাতন সংস্কার—ঋষিদের কল্পিত সংস্কার—তাহাকে সে বিড়ম্বনা বলিবে কোন্ দুঃসাহসে। শ্রাদ্ধ হইল, কিন্তু তাহাদেরও শ্রাদ্ধের বাকি রহিল না কিছু?

(৫)

যিনি জীব দিয়াছেন তিনি আহার দেন কই, ছোট দুটি ছেলেমেয়েকে রমেশ নিয়া গিয়াছে।

বড় মেয়েটি, বড় ছেলেটি—আর ক্ষমা। কচুশাক আর ভাত—তাহাও জোটান দায় হইয়া ওঠে।

পরণের কাপড় জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া যায়। কাপড় নাই—বাহির হইবার উপায় কোথায়।

উপায়—ভিক্ষা বা দাসীত্ব। কোনটাই সুলভ নহে। প্রলোভন আসে।

কামনার।—আদিম কামনার, যে কামনা সমস্ত বুদ্ধিকে ব্যাহত করিয়া অপ্রতিহত হইয়া চলে—সেই জীবনের আকর্ষণ—ক্ষমার মনে সংস্কারের বেদনা জাগে।

অভাবের নির্ম্মম তাড়না সে বোধকে ক্ষীণ করে। লাঞ্ছনা আর কামনা তাহাকে যুগপৎ বিহ্বল করিয়া তোলে।

প্রলোভনই জয়লাভ করে।

প্রলোভনের পথ মসৃণ। ক্ষমা ভাসিয়া যায়।

গ্লানি আছে অবশ্য, কিন্তু হয়ত একটি আদিম পাশবিক আনন্দ আছে।

কথা কাণে কাণে প্রচার হইয়া পড়ে।

ক্ষমা ভাবে—আর ভাবে।

কেহ গালি দেয়।

"সে কেন গলায় দড়ি দিয়া মরে না?"—যে কোনও দিন ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে নাই—গালি দিবার সময় তাহার কণ্ঠই শতমুখ হইয়া ওঠে।

ক্ষমা কথা কহে না।

কি হইবে, কি করিবে কিছুই বুঝিয়া পায় না।

কুৎসার আক্রমণ সূক্ষ্ম, কিন্তু বেদনা অতি গভীর। ক্ষমা তাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

বাড়ীতে একটি আমের গাছ ছিল। সেখানে সে গলায় দড়ি দিয়া মরিল।

ফাল্গুনের আম্রমুকুলের সৌরভ হয়ত তাহার জ্বালা জুড়াইল।

রাত্রে কেহ জানিল না।

ভোরের আলো জ্বলিল। দিকে দিকে জীবনের সাড়া জাগিল। ছেলে মেয়ে দুটি উঠিয়া ক্ষমাকে দেখিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—"মা! মা!"

অতলস্পর্শ সে কান্না।

কেহ সে কান্না শোনে না—না শোনে দুঃখীর ভগবান, না শোনে সমাজ, না শোনে রাষ্ট্র।

দিগন্ত মুখর করিয়া সে কান্না বহিয়া চলে।

নিষ্পাপ, শুচি ওই শিশু দুইটির কান্নার উত্তর কে দেয়? ভাগ্য? দুর্দ্দৈব? বিধাতা—না শয়তান?

জীবনের রথ বহিয়া চলে—আশা, আলো ও আনন্দ জাগে। কিন্তু উহাদের কান্না থামে না—; আশাহীন—অনির্ব্বাণ—নিরুন্তর বেদনা; তবু রথ থামে না—সে চলে; কে পিষ্ট হইল, কে আশ্রয় পাইল—রথ তাহা দেখে না।

জোনাকীর জন্মকথা

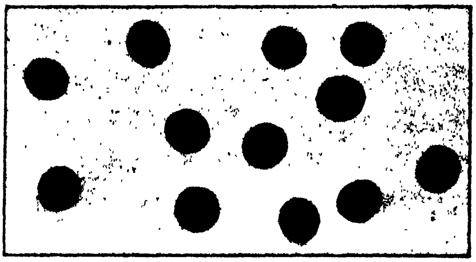
শ্রীনরেন্দ্র দেব

'জোনাক্ পোকা' না ব'লে 'জোনাকী' বললুম এই—জন্য যে 'পোকা' 'মাকড়' আখ্যাগুলোর মধ্যে কেমন যেন একটা হেয় এবং অশ্রদ্ধেয় ভাব উঁকি মারে। অথচ, আমাদের ভাষার এমনই মারপ্যাঁচ যে, ঐ 'পোকা' কথাটুকু বাদ দিলেই কেবলমাত্র 'জোনাকী' শব্দটি বেশ একটু মধুর, রহস্যময়, কৌতূহলোদ্দীপক এবং মর্য্যাদা-সম্পন্ন হয়ে ওঠে!

অবশ্য সংস্কৃতভাষায় জোনাকীর অসংখ্য ভাল ভাল নাম আছে—যেমন খদ্যোত, খদ্যোতিকা, দীপমক্ষিকা, জ্যোতিরিঙ্গণ, প্রভাকীট, কীটমণি ইত্যাদি। কিন্তু পাড়ার পরিচিত ছেলে পট্‌লার নাম প্রদ্যোতকুমার ব'ললে যেমন তাকে আমরা চিনতে পারি নি তেমনি সর্ব্বজানিত জোনাকীর কোন পোষাকী নাম এখানে ব্যবহার না করাই বোধ হয় ভাল।

আমাদের অতিপ্রাচীন মহাবৃদ্ধ প্রপিতামহদের আমলে নাকি বিষধর ভুজঙ্গ পর্য্যন্ত 'পোকা' ব'লেই গণ্য হ'ত। অর্থাৎ, যে কোন সরীসৃপজাতীয় প্রাণী মাটীতে মুখ থুবড়ে বুকে হেঁটে চ'লত—তারা যত বড় বা যত ছোটই হোক্ না, সাবেক কালের কর্ত্তারা তাদের ঘৃণাভরে 'কীট' ব'লেই উল্লেখ ক'রতেন। কাজেই, 'গুটিপোকা' 'শুঁয়ো-পোকা' থেকে সুরু ক'রে বৃশ্চিক ও সর্প পর্য্যন্ত সকল সরীসৃপই 'কৃমিকীটের' ন্যায় একটা হীনজাতির অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়েছিল।

'জোনাকী'কে তাচ্ছিল্যভরে আমরা 'পোকা' বলে উল্লেখ করি বটে, কিন্তু, প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন—'জোনাকী' কীট বা সরীসৃপ নয়। ওরা 'ফড়িং' বা 'পতঙ্গ' শ্রেণীভুক্ত! অবশ্য, একথা ঠিক যে স্ত্রী-জোনাকীর দল, যাদের আলোর দীপ্তিই সব চেয়ে বেশী, তাদের আকৃতি কিন্তু মোটেই পতঙ্গ-সদৃশ নয়! কারণ তাদের পৃষ্ঠদেশে পক্ষপুট তো নেইই—এমন কি পাখ্‌না ঢাকা এক জোড়া শক্ত খোলাও তাদের পিঠে নেই, সেটা সাধারণতঃ এই জাতীয় পতঙ্গদের একটা প্রধান বিশেষত্ব!



জোনাকীর ডিম—(চিত্রে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে আট গুণ বড় ক'রে দেখান হয়েছে। প্রত্যেক ডিমটি সৌরলোকের জ্যোতিষ্কের মতই জ্বল্ জ্বল্ করে)

চৈতালী সন্ধ্যায় গ্রাম্যপথে তরুকুঞ্জের পত্রপুঞ্জ ঘিরে লক্ষ লক্ষ দীপকণার সেই রহস্যময় সন্ধ্যারতি আমরা অনেকেই মুগ্ধনয়নে চেয়ে দেখেছি। হয়ত' কত কৌতূ-হলোচ্ছল তরুণী তাঁদের অঞ্চল ফাঁদে এই চঞ্চল-দ্যুতি

পতঙ্গদের বন্দী ক'রে আনন্দ পেয়েছেন, কত না অনুসন্ধিৎসা-ব্যাকুল বালক ঐ আলোক-কণার রহস্য উৎস সন্ধান ক'রে



শৈশবকোষে জোনাকী—(ডিম ফুটে জোনাকীর বাচ্ছা এই কৃমি সদৃশ আকারে বেরিয়ে আসে। ছবিতে স্বাভাবিক আকৃতির চার গুণ বড় করে দেখান হয়েছে)

ফিরেছে! কিন্তু একথা বোধ হয় জোর ক'রেই বলা যেতে পারে যে তাদের মধ্যে অতি অল্প জনেই জানে—স্ত্রী-জোনাক ও পুং জোনাকের পূর্ণ পরিচয়। অথচ এ পরিচয় পাওয়া এমন কিছু দুরূহ বা দুঃসাধ্য নয়। জোনাকীবহুল স্থানে যাঁরা বাস করেন তাঁরা যদি সন্ধ্যা রাত্রে বাতায়ন উন্মুক্ত রেখে গৃহকোণে একটি দীপ জ্বেলে দেন, ক্ষণকালের মধ্যেই তাঁদের কক্ষাভ্যন্তরে শ্রীযুক্ত জোনাক মহাশয় এসে প্রবেশ করবেন। কিছুক্ষণ তিনি দীপের চারিধারে উড়ে উড়ে নৃত্য ক'রে যখন ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রাম নেবেন, সেই সুযোগে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়া অত্যন্ত সহজ।

পরিণতদেহা স্ত্রী-জোনাকের আলোর দীপ্তিই যদিও সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়, তাহ'লেও আলোর অস্তিত্ব এই পতঙ্গের অঙ্গে সকল অবস্থাতেই বিদ্যমান থাকে। এমন কি ডিম্বাকারে সবে মাত্র যখন তারা ভূমিষ্ঠ হয়, তখনই সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ডিমগুলির ভিতর থেকেই মৃদু আলোক রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। শ্রাবণ আরম্ভেই জোনাকীরা ডিম পাড়তে সুরু করে; ভাদ্রের মাঝামাঝি ডিমগুলি ফুটে কৃমির মত ক্ষুদ্র বাচ্ছা হয়। এই বাচ্ছাগুলাও অল্প একটু আলো দেখিয়ে ঝিকমিক করে। পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বাবস্থা পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে এদের অবয়ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আলোর জ্যোতিও বাড়তে থাকে।

আমরা অনেকেই হয়ত জানি নি যে গেঁড়ি গুগ্‌লি শামুকের আজীবনের শত্রু হ'চ্ছে জোনাকী পোকা। এদের অস্থিহীন দেহের সুকোমল মাংসপিণ্ডই জোনাকীর জীবন-ধারণের একমাত্র সম্বল! এ ছাড়া অপর কিছু খাদ্য তাদের নেই! কিন্তু শামুকের মত অতিমাত্রায় স্পর্শ-সচেতন প্রাণীকে আয়ত্ত করা জোনাকীর পক্ষে যে কতদূর কঠিন কাজ এটা সহজেই অনুমেয়। একটা সরু সুতার ঈষৎ ছোঁয়া লাগলেই যে শামুক বিদ্যুৎবেগে তার খোলের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করে, তাকে ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জোনাকী ডিম ফুটে বেরুতে না বেরুতেই এই অসাধ্যসাধনে আত্মনিয়োগ করে। শামুকের পশ্চাদ্ধাবন ক'রে তারা প্রায় আধখানা খোলের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শামুক তখন নিজের খোলের মধ্যে বন্দী, বেরুবার উপায় নেই! জোনাকীর বাচ্ছারা তাকে কোনঠাসা ক'রে তাদের আহার-পর্ব্ব সুরু ক'রে এবং শামুকের খোলাটি নিঃশেষে চেঁচে খেয়ে—তবে ছেড়ে দেয়। অসংখ্য শূন্য শামুকের খোল যা আমরা ঘাটের ধারে পুকুর পাড়ে বেড়ার পাশে দেখতে পাই, তার প্রত্যেকটির এই শোচনীয় পরিণামের জন্য জোনাকীরাই সম্পূর্ণ দায়ী। যে সব শামুকের স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তাদের খোলটি নিঃশেষ করে পিপীলিকার দল।

জোনাকীর অঙ্গে আলো জ্বলে কেন? সে আলো সম্ভব হয় কেমন ক'রে? এ প্রশ্নের আজও কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নি। অনেকেই অনেক



কৈশোর কোষে জোনাকী—শৈশব কোষ বর্জ্জন ক'রে বেরিয়ে আসে জোনাকীর বাচ্ছা এই কৈশোর-কোষের আকারে। এটি পুং জোনাকের কোষ—কারণ কাঁধে ডানার কাঠাম রয়েছে)

রকম ব'লেছেন বটে, কিন্তু তার কোনটাই সঠিক ব'লে মেনে নেওয়া চলে না। প্রাণী ও উদ্ভিদ রাজ্যে যেখানেই মানুষ কোন কিছুর মধ্যে আলোক বা একটা দীপ্ত দ্যুতি বিকীর্ণ হ'তে দেখেছে সেখানেই তারা সেটাকে স্ফুরক-প্রভা (Phosphorescence) ব'লে ব্যাখ্যা ক'রতে চেষ্টা করেছে; কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান অধ্যুষিত যুগে ওটা নিশ্চয়রূপে গ্রাহ্য হয় নি। প্রাণী বা উদ্ভিদের এই দীপ্তি বা জ্যোতির যথার্থ কারণ নির্ণয়ের জন্য এখনও অনুসন্ধান চলেছে। এই আলোকের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কেউ কেউ অনুমান করেন যে পক্ষযুক্ত পুরুষ জোনাকীরা যাতে পক্ষহীন স্ত্রী জোনাকীদের সহজেই খুঁজে নিতে পারে, তারই জন্য এই আলোর ব্যবস্থা। হ'তে পারে হয়ত এ একটা কারণ, কিন্তু সেটাই যে মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হ'চ্ছে জোনাকীর ডিমের ভিতরেও আলো জ্বলে কেন? কৃমির মত ক্ষুদ্র বাচ্ছাগুলারও এ আলো বয়ে বেড়াবার সার্থকতা কি? তা'ছাড়া প্রাণী-তত্ত্ববিদেরা এটা বেশ নিশ্চিতরূপেই জানতে পেরেছেন যে এদের স্ত্রীপুরুষের মিলন ব্যাপারে আলোকের সাহায্য যতটা প্রয়োজন না হোক্ এদের পরস্পরের গায়ের গন্ধের আকর্ষণই এদিক দিয়ে বেশী কাজ করে। তাঁরা পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন যে একটা স্ত্রী জোনাককে টেবিলের উপর ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রাখলেও একাধিক পুরুষ জোনাকের কাছে তার অস্তিত্ব অগোচর থাকে না এবং তারা এসে ঠিক সেই জায়গায় ঘুরে বেড়ায়! সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে নারী জোনাকের অঙ্গসৌরভেই পুরুষ জোনাক আকৃষ্ট হয় বেশী!

স্ত্রী জোনাকের আকৃতি জোনাকের বাচ্ছাঅবস্থার সেই কৃমি-সদৃশ সৌষ্ঠবেরই হুবহু অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে তারা কেবল অপেক্ষাকৃত বড় দেখতে! জোনাক বাচ্ছার আকৃতি অবিকল শুঁয়া-পোকার মত। তফাতের মধ্যে কেবল যা একটু বেঁটে এবং গায়ে রোঁয়া নেই। নইলে, ঠিক সেই তাদের মতই পাকানো-পাকানো গোল গোল টুক্‌রো টুক্‌রো স্তরবিভক্ত শরীর, যেন কে টুকরোগুলো জোড়া লাগিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! কাজেই, এরা দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত ক'রতে পারে এবং যে দিকে ইচ্ছা অনায়াসে বেঁকাতে পারে। এই শরীরের উর্দ্ধাংশের দুপাশে এদের তিন জোড়া পা আছে। এই জাতীয় সমস্ত কীট পতঙ্গরাই প্রায় দেখা যায় ষট্‌পদ! শরীরের নিম্নাংশ থেকে বাচ্ছা জোনাকরা ইচ্ছা করলেই একগোছা সাদা লম্বা ছুঁচলো শুঁড় বার করতে পারে। এই শুঁড়ের গোছা ঝাড়ু বা ব্রাশের কাজ করে। জোনাকীর জীবনে এই শুঁড়ের গুচ্ছ দিয়ে তাদের যুগ্ম প্রয়োজন সাধিত হয়। প্রথমতঃ এদের দ্বারা আক্রান্ত গেঁড়ি শামুকরা যখন আত্মরক্ষার জন্য এদের গায়ে একরকম চট্‌চটে আঠা নিক্ষেপ ক'রে—তখন এরা ঐ শুঁড়ের গোছা বার ক'রে তার সাহায্যে সেই আঠা পরিষ্কার ক'রে ফেলে। আবার এই



পুং জোনাকী—(কৈশোর-কোষও বর্জ্জন ক'রে বেরিয়ে এসে পুং জোনাকী এই বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ ক'রে) উপরে মুণ্ড, (বাহির করা অবস্থা) বামে—কঠিন আবরণে আবৃত পক্ষ —পূর্ণাবয়ব জোনাক। দক্ষিণে—জোনাকের বুক পেট ও পশ্চাদ্দেশ এবং প্রান্তদীপ।)

শুঁড়ের গোছার সাহায্যেই জোনাকীর বাচ্ছারা গেঁড়ি ও শামুকের মসৃণ ও পিচ্ছিল খোলের উপর হামাগুড়ি দিয়ে

উঠতে পারে! খো'ল থেকে শামুক তার দেহটি যেই বার ক'রে – অমনি পৃষ্ঠারূঢ় জোনাকীর বাচ্চারা পিছন থেকে তাকে আক্রমণ করে! তিন জোড়া সূক্ষ্ম পা নিয়েও সে



স্ত্রী জোনাকী—(স্ত্রী-জোনাকের পক্ষ নেই এবং আকারেও তারা শৈশব কোষের মূর্ত্তি থেকে যে খুব বেশী রূপান্তরিত হয়, তা নয়। স্ত্রী-জোনাকের লাঙুল প্রান্তেও দীপ এবং পুং জোনাকী অপেক্ষা তার জ্যোতি উজ্জ্বলতর)



জোনাকীর আলো—(সন্ধ্যার অন্ধকারে অরণ্য প্রান্তে জ্বলে উঠেছে জোনাকীর রহস্যময় দীপ !)

শামুকের মসৃণ খোলের উপর চড়তে পারে না। এই শুঁড়ের গুচ্ছ না থাকলে তারা শামুকের একটুখানি গা ঝাড়াতেই খোলের উপর থেকে এক মুহূর্ত্তে পিছলে বা হড়কে নীচেয় পড়ে যেত। জোনাকীর বাচ্চাগুলোর মুণ্ডু দেখতে পাওয়া যায় কেবল খাবার সময়! নইলে অন্য সময় তারা মুখটা শরীরের প্রথম স্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে পড়ে থাকে। বাইরে থেকে দেখা যায় না।

বাচ্চা জোনাকী ক্রমে যখন বড় হয়, তাদের পূর্ণ পরিণতি লাভের ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বাবস্থায়—অর্থাৎ পক্ষোদ্ভেদের আগে তারা কিছুদিন একেবারে নিষ্ক্রিয় হ'য়ে পড়ে। শরীরটাকে যথাসম্ভব গুটিয়ে নিয়ে তারা পাশ ফিরে বা কাত হ'য়ে শুয়ে থাকে। সেই সময় তাদের সেই শিশুকোষের (Grub skin) চামড়া পাশ থেকে ফাট্‌তে সুরু হয় এবং ধীরে ধীরে তাদের সেই কৃমি আবরণ বা শিশুকোষ খসে গিয়ে তারা এক নূতনরূপ লাভ করে। অবশ্য এই রূপান্তরের জন্য তাদের রীতিমত পরিশ্রম করতে হয়। চামড়া ফাটতে সুরু হ'লেই তারা অনবরত সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে থাকে এবং সেই আক্ষেপের ফলে তাদের কৃমি খোলাটা খ'সে পড়ে ও তারা সেই শিশুকোষ থেকে নব কলেবরে বেরিয়ে আসে। কিন্তু সেটাও তাদের পূর্ণ অবয়ব নয়; সেটাকে তাদের কৈশোর-কোষ (chrysalis stage) বলা যেতে পারে। কারণ তখনও তাদের পাখনা এবং তার ঢাকনা দেখা যায় না। তা'ছাড়া পক্ষোদ্গমের পূর্ব্বে এদের স্ত্রী-পুরুষের কোন যৌন প্রভেদও চ'খে পড়ে না। পক্ষোদ্গমের পর তবেই এদের স্ত্রী ও পুং চিহ্ন লক্ষ্যগোচর হয়। তবে স্ত্রী জোনাকদের পাখা হয় না এবং পুরুষ জোনাকদের পাখা থাকে—এই একটা স্থূল পার্থক্য থাকায় পক্ষোদ্গমের

পূর্ব্বাবস্থাতেও অর্থাৎ কৈশোর-কোষেও এদের স্ত্রীপুরুষ ভেদ সহজেই ধরতে পারা যায়; কেন না, পাখনা না গজালেও তার একটা কাঠামো পুরুষ জোনাকদের কৈশোর কোষাবয়বে সংলগ্ন আছে দেখা যায়।

পাখনা সম্পূর্ণভাবে গজাতে মাত্র দিন পনের সময় লাগে এবং এই পনেরদিনের মধ্যে তাদের কৈশোর কোষাবয়বের অভ্যন্তরেও আর একটা বিরাট পরিবর্ত্তন চলতে থাকে। আর একবার তাদের এই দ্বিতীয় খোলসটাও অর্থাৎ কৈশোর-কোষ বিদীর্ণ হ'য়ে যায় এবং তার ভিতর থেকে এবার পূর্ণাবয়ব জোনাকী আবির্ভূত হয়।

পূর্ব্বেই বলেছি যে কৈশোর কোষস্থ পুরুষ জোনাকের সঙ্গে একজোড়া পক্ষপুটের কাঠাম থাকে। এদের যে পরিবর্ত্তন ঘটে তা যথার্থই বিচিত্র। এরা বেরিয়ে আসে একেবারে একজোড়া সূক্ষ্ম পেলব পক্ষপুট ও তার উপরের কঠিন আবরণে তাদের কোমল অঙ্গটি আবৃত ক'রে। অনেকে হয়ত মনে করবেন পাখনার উপর আবার একজোড়া এই ঢাক্‌নার প্রয়োজন কি ছিল? ওটা নেহাৎ বাহুল্য মাত্র! কিন্তু এদের সেই অতি সূক্ষ্ম পেলব পক্ষদ্বয় যাঁরা একটু মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করবেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে একে অক্ষতভাবে রক্ষা ক'রতে হ'লে একজোড়া পুরু শক্ত ঢাকনা একেবারে অত্যাবশ্যক, নচেৎ সামান্য আঘাতেই তা ছিন্ন হ'য়ে যেতে পারে। ভগবানের সৃষ্ট এই বিচিত্র জগতে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, মানুষ ও কীটপতঙ্গ কোন কিছুরই অনাবশ্যক বাহুল্য এতটুকু নেই। যার যা আছে তার সব কিছুরই এক একটা উদ্দেশ্য, প্রয়োজন ও নির্দ্দিষ্ট কার্য্য আছে। স্ত্রী-জোনাকের আকার বড় হওয়া ছাড়া তার গঠনের আর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায় না।

জোনাকীর অঙ্গে আলো থাকা সত্ত্বেও সে কেন আলোর দিকে ছুটে আসে? এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদয় হ'তে পারে। প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন এর কারণ আর অন্যকিছুই নয়, দীপ্ত আলো দেখে নির্ব্বোধ পুরুষ-জোনাকেরা তাকে কোন অসামান্যা রূপসী স্ত্রী জোনাকী মনে ক'রে তার সঙ্গলাভের জন্য ছুটে আসে এবং বহুক্ষণ তার চারপাশে নৃত্য ক'রে তার মন হরণের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। কিন্তু দীপের আলো সে প্রেম নিবেদনের কোনই প্রত্যুত্তর দেয় না। জোনাকী তখন ক্লান্ত হ'য়ে ভূমিতল আশ্রয় করে এবং হয়ত তাদের এই ভুলের জন্য মনে মনে অনুতাপও করে!

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কলিকাতা সহরে যে পরিবারটি গত শতাধিক বৎসর কাল বিদ্যা ও অর্থগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সমগ্র বাঙ্গালার—এমন কি সমগ্র ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে, যে বংশে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার পঙ্ক হইতে জাতিকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, যে বংশের তিলকস্বরূপ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে আজিও সমগ্র জগতের নিকট ভারতের স্থান অম্লান করিয়া রাখিয়াছেন, এবার আমরা প্রচ্ছদপটে সেই বংশের এক উজ্জ্বলরত্ন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিত্র প্রকাশ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ১৩৩১ সালের মাঘ মাসে 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং ১৩৩৯ সালের পৌষ মাসে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পঞ্চম পুত্র। মহর্ষির ৯ পুত্র ও ৪ কন্যা প্রায় সকলেই কোন না কোন ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলেও প্রসিদ্ধ দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। সে সময়ে ইঁহাদের বাড়ীতে একটি পাঠশালা ছিল; তথায় এক গুরুমহাশয়ের নিকটেই সকলকে বিদ্যারম্ভ করিতে হইত।

তাহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের নিকট ইংরাজি পড়া ারম্ভ হয় ; সে সময়ে তাঁহার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার ভিভাবক হন ; হেমেন্দ্রবাবু জ্যোতিবাবুকে মুগুর-ভাঁজা, ন-ফেলা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যায়াম অভ্যাস করাইতেন বং ক্রীড়াচ্ছলে তাঁহাকে সন্তরণ-বিদ্যাও শিখাইয়াছিলেন। াঙ্গালা ও ইংরাজীতে বাড়ীতে এইরূপে প্রাথমিক শিক্ষা াভ করিয়া তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন ; প্রথমে সেণ্ট পল্‌স ল, তাহার পর মণ্টেগুর একাডেমী ও তাহার পর হিন্দু ল। স্কুলের শিক্ষার প্রতি জ্যোতিবাবুর একটা বিতৃষ্ণা ন্মিয়াছিল ; স্কুলের পড়ায় তিনি একেবারেই মন দিতে ারিতেন না। তিনি যে সময়ে হিন্দু স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর াত্র, তখন তাঁহার উপনয়ন হয় ; সে সময়ে তিনি ক্লাসে সিয়া ছবি আঁকিতেন ; একবার তিনি মাষ্টার জয়গোপাল ঠের যে ছবি আঁকিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া সকলেই ৎকৃত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি অগ্রজ সত্যেন্দ্র-াথের সহিত লর্ড সিংহের পিতৃব্য প্রতাপনারায়ণ সিংহের িরামপুরস্থ বাড়ীতে যাইয়া প্রতাপবাবুর একখানা ছবি াকিয়াছিলেন ; সকলেই মুক্তকণ্ঠে বালক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঙ্কন-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিয়াছিল।

বাল্যকালে জ্যোতিবাবু একবার সত্যেন্দ্রনাথের সহিত ৃষ্ণনগরে সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে িয়া কিছুদিন তথায় বাস করিয়াছিলেন।

শৈশবাবস্থাতেই তিনি নিজেদের অভিনয়ের জন্য কখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন ; পুরাতন "সংবাদ ভাকর" হইতে কতকগুলি কবিতা জোড়াতাড়া দিয়া এই অদ্ভুত নাট্য" পুস্তক খাড়া করা হইয়াছিল। মনোমোহন াষ মহাশয় সে সময়ে তাঁহাদের বাড়ীতেই বাস করিতেন ; খনই রাষ্ট্রীয় উন্নতিসাধনের দিকে তাঁহার প্রবল ঝোঁক ল এবং সে উদ্দেশ্যে তিনি মহর্ষির অর্থসাহায্যে ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক একখানি ইংরাজি সংবাদপত্র কাশ করিয়াছিলেন।

হিন্দু স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন াশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'কলিকাতা কলেজ' নামক স্কুলে ভর্ত্তি ে ও সেখান হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। কলেজে বিহারীলাল গুপ্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। স্কুলে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডবলিউ, সি, ব্যানার্জ্জির পিতৃব্য ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত প্রভৃতি শিক্ষকদিগের নিকট তিনি শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কলেজে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির নিকট তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল। কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ শেষ করিবার পর তিনি ফি জমা না দিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে বোম্বায়ে পলাইয়া গিয়াছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ তখন সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়া আসিয়া বোম্বায়ে কার্য্য করিতেছিলেন। বোম্বাই অবস্থানকালে জ্যোতিবাবু সেতার বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়কে লইয়া একটি নাট্য-সমিতি গঠন করেন এবং মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটকে নিজে জননীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। পরে 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকে জ্যোতিবাবু সার্জ্জেন সাজিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাট্য-সমিতির অনুরোধে 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব'-রচয়িতা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় 'নবনাটক' রচনা করিয়া দিয়া ৫ শত টাকা পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ঐ নাটকখানি দর্শকগণকে এত মোহিত করিয়াছিল যে তাঁহাদের অনুরোধে একাধিক রজনী 'নবনাটক' অভিনীত হইয়াছিল।

যে সময়ে নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকুল্যে বঙ্গদেশে প্রথম হিন্দুমেলা নাম দিয়া জাতীয় শিল্পপ্রদর্শনী হয়, তখন জ্যোতিবাবু জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিয়া তথায় পাঠ করিয়াছিলেন।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ' নামক একখানি প্রহসন রচনা করিয়া জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ; ইহাই তাঁহার রচিত সর্ব্বপ্রথম গ্রন্থ। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইয়াছিল।

জ্যোতিবাবু স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন ; গঙ্গার ধারে কোন বাগানবাড়ীতে সস্ত্রীক অবস্থানকালে তিনি নিজের স্ত্রীকে নিজেই অশ্বারোহণ শিখাইয়াছিলেন ; তাহার পর দুইটি আরব ঘোড়ায় দুইজনে পাশাপাশি চড়িয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ী হইতে গড়ের মাঠ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বেড়াইতে যাইতেন ও ময়দানে যাইয়া দুইজনে সবেগে ঘোড়া ছুটাইতেন।

জমীদারী পরিদর্শন উপলক্ষে কটকে যাইয়া বাসকালে তিনি 'পুরুবিক্রম' নামক নাটক রচনা করেন; তাহা গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটার ও বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হইত। কটক হইতে কলিকাতা আসিয়া জ্যোতিবাবু 'সরোজিনী' রচনা করেন। কলিকাতার সাধারণ থিয়েটারে বইখানি অভিনীত হইলে নাট্যকার বলিয়া জ্যোতিবাবুর খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল।

তিনি 'মানভঙ্গ' নামক যে গীতিনাট্য রচনা করিয়াছিলেন 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' স্থাপনের পর পরিবর্ত্তিত করিয়া 'পুনর্বসন্ত' নামে তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল।

জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে 'কালমৃগয়া' অভিনয়কালে জ্যোতিবাবু দশরথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভা'য় তিনি কোন পাঠ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার উপর সঙ্গীত ও কনসার্টের ভার ছিল।

অন্যান্য ঝোঁক গিয়া কিছুদিন জ্যোতিবাবুর শিকারের ঝোঁকটাই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। প্রতি রবিবারে সদলবলে তিনি শিকারে বাহির হইতেন। শিকারের জায়গা ছিল ধাপার মাঠ। বাঙ্গালীদের মধ্যে সৎসাহস বর্দ্ধিত করিবার জন্য তিনি বন্দুক-ছোঁড়া ও শিকারের প্রবর্ত্তন করিতে গিয়াছিলেন।

জ্যোতিবাবুর উদ্যোগে কলিকাতায় 'সঞ্জীবনী-সভা' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয়। জাতীয় হিতকর ও উন্নতিকর সমস্ত কার্য্য করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল—বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসু সভার অধ্যক্ষ ছিলেন। সভা হইতে সার্ব্বজনিক একটি পোষাক চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। শিল্প বাণিজ্যের প্রসার উদ্দেশ্যে সভার উদ্যোগে সর্ব্বপ্রথম দেশালাইএর একটি কল প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক আয়াসে ও বহু অর্থব্যয়ে কয়েক বাক্স দেশলাই প্রস্তুত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে ক্রয়সাধ্য বা ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। সভায় এক নূতন কাপড়ের কল আনা হইয়াছিল। একখানি গামছা ছাড়া ঐ কলে আর কিছুই প্রস্তুত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'বালক' নামে একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন তখন জ্যোতিবাবু তাহাতে মুখ-সামুদ্রিক (Physiognomy) ও শির-সামুদ্রিক (Phrenology) সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

ইহার পর জ্যোতিবাবু আর একটি সভা স্থাপন করেন। দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধনের জন্য তাহা স্থাপিত হয় নাই—বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। সভার নাম হইল—"কলিকাতা সারস্বতসম্মিলনী"। সভার উদ্দেশ্য ছিল তিনটি—(১) বঙ্গভাষার অভাব মোচন (২) বঙ্গীয় গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিসাধন ও উৎসাহবর্দ্ধন (৩) বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগীদিগের মধ্যে পরস্পর সৌহার্দ্দ্য স্থাপন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় সভার প্রথম সভাপতি হইয়াছিলেন—কিছুদিন পরে সভা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

জ্যোতিবাবু মধ্যে মধ্যে পাবনা ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে জমীদারী দেখিতে যাইতেন ও শিলাইদহের কুঠীতে বাস করিতেন। সে সময়ে প্রায়ই তিনি পাখী শিকার করিয়া আত্ম-বিনোদন করিতেন।

এই সময়ে জ্যোতিবাবু হাটখোলায় এক পাটের আড়ত খুলিয়াছিলেন। অংশীদার ছিলেন—তাঁহার ভগিনীপতি জানকীনাথ ঘোষাল। দুইজনে প্রতিদিন সকালে হাটখোলায় গিয়া অফিস করিতেন, কিন্তু পাটের বাজার খারাপ হওয়ায় ঐ কাজ বন্ধ করিতে হয়। ব্যবসায়ে যে লাভ হইয়াছিল সেই টাকা লইয়া জ্যোতিবাবু শিলাইদহে নীলের চাষ আরম্ভ করেন। নীলেও বেশ লাভ হইয়াছিল; কিন্তু জার্ম্মাণী হইতে কৃত্রিম নীল আমদানী হওয়ায় এদেশে নীলের বাজার খারাপ হইয়া যায় ও জ্যোতিবাবু টাকা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন।

এই সময়ে কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত রেলপথ নির্ম্মিত হইয়াছে। জ্যোতিবাবু সরোজিনী, বঙ্গলক্ষ্মী, স্বদেশী, ভারত ও লর্ড রিপন নামক ৫খানি জাহাজ ক্রয় করিয়া খুলনা হইতে বরিশাল পর্য্যন্ত যাত্রী বহনের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সময় সময় জাহাজগুলি মাল লইয়া কলিকাতায় আসিত। ঐ সময়ে তিনি জাহাজেই বাস করিতেন। প্রথম প্রথম বরিশালবাসীরা স্বদেশী কোম্পানীর ষ্টীমারেই চড়িত। কিন্তু একটি বিদেশী কোম্পানীর জাহাজ যাইয়া তথায় প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিল—ফলে ভাড়া কমিয়া যাওয়ায় উভয় পক্ষেরই লোকসান হইতে লাগিল। সেই সময়ে জ্যোতিবাবুর একখানি মালপূর্ণ জাহাজ কলিকাতার গঙ্গায় ডুবিয়া যায়—তাহাতে তিনি হতাশ

হইয়া পড়েন ও রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ৪খানি জাহাজ ও কোম্পানীর সকল সরঞ্জাম বিদেশী কোম্পানীকে বিক্রয় করিয়া ফেলেন। ঐ সময়ে সার তারকনাথ পালিত মহাশয় জ্যোতিবাবুর সব পাওনাদারকে ডাকিয়া ঋণ মিটাইবার ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে ঋণমুক্ত করিয়া দিয়া প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা দেশে সঙ্গীতশিক্ষা, সঙ্গীতঅধ্যাপনা, তাহার প্রচার এবং বাঙ্গালার অভিজাত ও মধ্যবিত্ত লোকদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন উদ্দেশ্যে জ্যোতিবাবু কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া 'ভারতসঙ্গীতসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গীত সমাজের সহিত জ্যোতিবাবুর সম্বন্ধ যখন খুব ঘনিষ্ঠ, তখন দোয়ার্কিনদিগের ব্যয়ে 'বীণাবাদিনী' নামে তিনি সঙ্গীতবিষয়ক একখানি মাসিকপত্র সম্পাদন করেন—বৎসর দুই চলিয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। পরে ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অর্থসাহায্যে জ্যোতিবাবু 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' নামে সঙ্গীতবিষয়ক আর একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। মহারাজা বাহাদুরের মৃত্যুর পর ঐ কাগজও বন্ধ হইয়া যায়।

মধ্যে তিনি আবার কিছুদিন বোম্বায়ে সত্যেন্দ্রনাথের নিকটে যাইয়া বাস করিয়াছিলেন। তথায় তিনি মারাঠি ভাষা শিক্ষা করেন এবং 'ঝাঁসির রাণী' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তথায় তিনি 'হিতে-বিপরীত' নামক একখানি ক্ষুদ্র নাটকও রচনা করিয়াছিলেন।

সহজ ও সরল প্রণালীতে কিরূপে গানের স্বরলিপি লিখিত হইতে পারে সেইদিকে জ্যোতিবাবুর দৃষ্টিই প্রথম আকৃষ্ট হইয়াছিল। প্রথম প্রথম-'ভারতী'তে তিনি সংখ্যামাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি প্রকাশ করিতেন। পরে তাহা অপেক্ষা সহজ, সরল ও শিক্ষার্থীর বোধগম্য করিবার জন্য তিনি আকার-মাত্রিক স্বরলিপি আবিষ্কার করেন। সে গুলি ঐ সময়ে 'সাধনা'তে প্রকাশিত হইত। এই শেষোক্ত পদ্ধতিই এখন সর্ব্বসাধারণে গৃহীত ও প্রচলিত।

সঙ্গীত সমাজের সংস্রবে থাকিতে থাকিতেই তিনি সংস্কৃত নাটকগুলিকে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। ১৩০৬ হইতে ১৩১১ সালের মধ্যেই যথাক্রমে "অভিজ্ঞান-শকুন্তলা" (১৩০৬), 'উত্তর চরিত', 'মুদ্রা-রাক্ষস', 'রত্নাবলী' 'মালতী মাধব' (১৩০৭), 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়', 'বেণী সংহার', 'মহাবীর চরিত', 'মালবিকাগ্নিমিত্র', 'বিক্রমোর্ব্বশী', 'চণ্ড-কৌশিক' (১৩০৮), 'নাগানন্দ' (১৩০৯) 'বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা' 'ধনঞ্জয়-বিজয়' (১৩১০), 'কর্পূর-মঞ্জরী' ও 'মৃচ্ছকটিক' (১৩১১) অনুবাদিত ও প্রকাশিত হয়।

তাঁহার রচিত "মিলিতোনা", "বসন্তলীলা", "অশ্রুমতী", "অবতার", "মার্কাস ওরিলিয়াসের আত্মচিন্তা" প্রভৃতি নাটকও এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

জ্যোতিবাবু স্বাস্থ্যলাভের জন্য ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার রাঁচী গিয়াছিলেন; রাঁচী তাঁহার খুব ভাল লাগিয়াছিল। সে জন্য তিনি তথায় মোরাবাদী পাহাড়ের উপর 'শান্তিধাম' নির্ম্মাণ করিয়া শেষ জীবনে তথায় বাস করিয়াছিলেন।

১৩৩১ সালের ২০শে ফাল্গুন তারিখে রাঁচীতেই তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

স্থান ভ্রষ্ট

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

চাচর চিকুর রাজি নারীর মস্তকে
সহস্র নরের চিত্ত করে আকর্ষণ।

সহস্র নারীর কেশ শিরোভ্রষ্ট যবে
একটি মানব-প্রাণে না আনে স্পন্দন



বঙ্গপঞ্জিকা-সমন্বয় ও সূক্ষ্মলগ্ন নিরূপণ

শ্রীসুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী

রাজা-মন্ত্রী

দেশে রাজা বা রাজপ্রতিনিধি না থাকিলে যেমন অরাজকতা উপস্থিত হয় বর্ত্তমানে জ্যোতিষশাস্ত্রের কোন সর্ব্বজনমান্য নিয়ন্তা না থাকায় ইহার অবস্থাও হইয়াছে তদ্রূপ। কোন কোন পঞ্জিকাকারের মতে রবি রাজা বুধ মন্ত্রী, আবার কেহ বা বুধ রাজা শনি মন্ত্রী বলিয়া প্রচার করিতেছেন। এই বৈসাদৃশ্য হেতু কোন পঞ্জিকার উপরই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। যেহেতু একই সময়ে একই দেশে বিভিন্ন রাজা ও মন্ত্রী হইতে পারে না—ইহা ধ্রুব সত্য। ভাষাবিশেষে এক জলেরই বিভিন্ন নাম, যথা—সলিল, প্রাণ, বারি, অপ্‌, ওয়াটার ইত্যাদি হইয়া থাকে। সেইরূপ পঞ্জিকাকারগণও যদি একই রাজা ও মন্ত্রীকে ইঁহাদের লোক-প্রসিদ্ধ বিভিন্ন নামে নির্দ্দেশ করিতেন তবে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারিত না। কিন্তু তাহা না করিয়া বিভিন্ন গ্রহকেই একই বৎসরে একই চক্রবালে এক রাজা বা মন্ত্রী পদ দিয়া বহু রাজা ও বহু মন্ত্রীর অবতারণা করিয়া বহুরাজকতা বা অরাজকতার সৃষ্টি করিয়াছেন। এই জন্যই জ্যোতিষশাস্ত্র হইতে শিক্ষিত সমাজের আস্থা চলিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে এরূপ করিয়া যাহাতে প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের অবমাননা না হয় তৎপ্রতি পঞ্জিকাপ্রণেতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

প্রতীয়মান সূর্য্য

আমরা যে সূর্য্যের কিরণ পাই উহাকে প্রতীয়মান সূর্য্য বা স্পষ্ট সূর্য্য (Apparent Sun) বলে। প্রতীয়মান সূর্য্যের প্রাত্যহিক গতি দ্বারা যে সময় নির্ণয় করা হয়—অর্থাৎ সূর্য্যের পর্য্যবেক্ষণ লইয়া যে সময় নির্ণয় করা হয় তাহাকে প্রতীয়মান সৌরকাল (Apparent time) বলে। কাল্পনিক সূর্য্যের প্রাত্যহিক গতি দ্বারা যে সময় নির্ণয় করা হয় তাহাকে মধ্যম সাবন কাল (Mean time) বলে। প্রতীয়মান সৌরকাল হইতে মধ্যম সাবন কাল কখনও বেশী, কখনও বা কম হইয়া থাকে এবং ইহাদের অন্তরকে সমীকরণ বলে।

কাল্পনিক সূর্য্য

প্রতীয়মান সূর্য্য বিষুবরেখার (equator) লম্বভাবে না ঘুরিয়া ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) উপর দিয়া আবর্ত্তন করে এবং পৃথিবীর কক্ষের (Orbit) অসম-কেন্দ্রতা হেতু প্রতীয়মান সূর্য্যের গতি সমান নহে; সেইজন্য প্রতীয়মান সূর্য্যের উদয় হইতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে দিন (Apparent solar day) তাহার পরিমাণ সমান থাকে না অর্থাৎ সূর্য্য হইতে পৃথিবী সর্ব্বদা সমদূরবর্ত্তী না থাকায় প্রতীয়মান সৌর দিবসের পরিমাণ সমান থাকে না। ঘটিকা-যন্ত্র দ্বারা এরূপ অসমান ঘণ্টা প্রদর্শন করা অসুবিধা হয় বলিয়া একটি কাল্পনিক সূর্য্য (Mean Sun) বিষুবরেখার উপর দিয়া সমভাবে আবর্ত্তন করিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কাল্পনিক সূর্য্য ঘুরিতে ঘুরিতে কোনও দ্রাঘিমা ছাড়িয়া পুনরায় সেই দ্রাঘিমায় উপস্থিত হইতে যে সময় লাগে, তাহাকে মধ্যম সাবন দিন, মীন টাইম বা স্থানীয় সময় বলে। এই সময়ই জ্যোতিষ গণনা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; প্রতীয়মান সূর্য্যের উদয় ও কাল্পনিক সূর্য্যের উদয়ের সময়ের যে তারতম্য হইয়া থাকে তাহাকে সমীকরণ (equation of time) বলে। (The difference between the right ascension of the true sun and that of the mean sun is known as equation of time.)

আদি বিন্দু

সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির অবস্থান নিরূপণ করার জন্য বিষুবরেখা ও গ্রিণউইচের দ্রাঘিমার সমান্তর নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখা (celestial equatoror equinoctial) ও নভোমণ্ডলীয় দ্রাঘিমা (celestial meridian) নামক আরও দুইটি রেখা কল্পনা করিয়া লইতে হয়। প্রায় ৩৬৫ দিনে পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বৃত্তাভাস পথে ঘুরিয়া আসে, সূর্য্য এই বৃত্তাভাসের একটি মধ্য বিন্দু (Focus)। পৃথিবীর এই ভ্রমণ পথ উত্তর-পূর্ব্ব কোণ হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিস্তৃত, ইহা নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখার সহিত ২৩½ ডিগ্রী কোণে অবস্থিত। নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখা এবং পৃথিবী যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছেদ করে, তাহার উপরের বিন্দুকে মেষের আদি বিন্দু (First point of Aries) বলে। মেষের আদি বিন্দু হইতে সূর্য্য, গ্রহ ও নক্ষত্রাদির রাইট এসেন্‌শান (Right ascension) গণনা করা হয়।

রাইট এসেন্‌শান

মেষের আদি বিন্দু হইতে সূর্য্য বা কোনও গ্রহনক্ষত্র যতটুকু পূর্ব্ব দিকে সরিয়া থাকে অর্থাৎ মেষ রাশি দ্রাঘিমা পার হইয়া গেলে সূর্য্য বা কোনও নক্ষত্র যতক্ষণ পরে সেই দ্রাঘিমার উপর আসিয়া থাকে, সেই সময়টুকুকেই রাইট এসেন্‌সান বলে।

সৌরজগৎ

গ্রহ, উপগ্রহাদি সমস্তই বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সূর্য্য এই বৃত্তাভাসের একটি মধ্যবিন্দু। সূর্য্য, গ্রহ ও উপগ্রহাদি লইয়া যে জগৎ কল্পনা করা হয়, তাহাকেই সৌর জগৎ বলে।

দিবা, রাত্রি, এবং সূর্য্যনক্ষত্রাদির উদয়াস্তের কারণ

গ্রহ, উপগ্রহাদি এবং সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ পৃথিবী হইতে সমদূরবর্ত্তী নয় এবং একই তলের উপরেও স্থাপিত নয়। সমুদয়ই শূন্যের উপর

ঝুলিতেছে, কিন্তু অনেক দূরে থাকা নিবন্ধন এই শূন্যেই জড়ীয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বোধ হইতেছে যেন সমুদয়ই একটি গোলাকার পিলানের উপর স্থাপিত রহিয়াছে; এই পিলানটিকে আকাশ বলে। আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া যাইতেছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে; সূর্য্য ও নক্ষত্রসমূহ অচল। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিষুব রেখার লম্বভাবে পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে। আমরাও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে যখন কোনও নক্ষত্র বা সূর্য্যকে চক্রবালের উপরে দেখিতে পাই, তখন তাহার উদয় বলি এবং যখন পশ্চিম দিকে চক্রবালের নীচে যাইতে দেখি, তখন তাহার অস্ত বলি। এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে যতক্ষণ আমরা সূর্য্যকে দেখিতে পাই, ততক্ষণকে দিবা এবং যতক্ষণ সূর্য্যের কিরণ পাই না ততক্ষণকে রাত্রি বলি। পৃথিবীর সকল স্থানেই একই সময়ে দিবা বা রাত্রি হয় না এবং সকল নক্ষত্রই একই সময়ে উদয় হইয়া একই সময়ে অস্ত যায় না। দিবা রাত্রিতে ক্রমে উদয় হইতেছে, ক্রমে অস্ত যাইতেছে। দিবা ভাগে সূর্য্যের প্রখর কিরণের জন্য আমরা নক্ষত্রাদি দেখিতে পাই না।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত

প্রত্যহ পূর্ব্ব দিকের ঠিক এক জায়গা হইতে সূর্য্যোদয় হয় না। বর্ত্তমান ১৩৪২ বাং সনের ৭ই চৈত্র (২০শে মার্চ্চ) ও ৮ই আশ্বিন (২৫শে সেপ্টেম্বর) যে দুই দিন উষ্ণ মণ্ডলের (Torrid Zone) সর্ব্বত্র দিবা রাত্রি সমান হইবে সেই দুই দিন সূর্য্য ঠিক পূর্ব্ব দিক হইতে উদিত হইবে অর্থাৎ বিষুবরেখার উপর উদিত হইবে। অয়ন বা ক্রান্তিপাত (equinox) নভোমণ্ডলীয় বিষুবরেখাকে (celestial equator) ঠিক বিপরীতভাবে প্রায় ২৩°-২৮´ কোণ করিয়া যে দুই বিন্দুতে অবচ্ছেদ করে, তাহার এক বিন্দুকে বাসন্তী ক্রান্তিপাত (Vernal equinox) কহে। কারণ চৈত্রমাসে সেই বিন্দুতে সূর্য্যোদয় হয়। অপর বিন্দুকে শারদীয় ক্রান্তিপাত (Autumnal equinox) কহে, যেহেতু আশ্বিন মাসে ঐ বিন্দুতে সূর্য্যোদয় হয়। ২১শে মার্চ্চ হইতে সূর্য্য প্রত্যহ বিষুবরেখা হইতে একটু একটু উত্তরে উদিত হইতে থাকে; এইরূপ হইতে হইতে ২২শে জুন সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির (Tropic of cancer) উপর উদিত হয়, সেই দিন উত্তর গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিন—সুতরাং দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন। তাহার পর সূর্য্য আবার বিষুবরেখার দিকে আসিতে থাকে ও ২৫শে সেপ্টেম্বর শারদীয় ক্রান্তিপাতের উপর সূর্য্য উদিত হয় ও সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। ২৬শে সেপ্টেম্বর হইতে সূর্য্য প্রত্যহ বিষুবরেখা হইতে একটু একটু দক্ষিণে উদিত হইতে থাকে; এইরূপ হইতে হইতে ২৪শে ডিসেম্বর সূর্য্য বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী দক্ষিণে অর্থাৎ মকরক্রান্তির (Tropic of capricorn) উপর উদিত হয়। সেইদিন দক্ষিণ গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দিন ও উত্তর গোলার্দ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট দিন। তাহার পর সূর্য্য আবার বিষুবরেখার দিকে আসিতে থাকে ও ২০শে মার্চ্চ বাসন্তী ক্রান্তিপাতের উপর সূর্য্য উদিত হয় এবং সর্ব্বত্র দিবারাত্রি সমান হয়। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে বিষুবরেখা হইতে ২৩½ ডিগ্রী উত্তরে ও ২৩½ দক্ষিণে এই সীমানার মধ্যেই সূর্য্যোদয় হয়। কাজেই অক্ষাংশের তারতম্য অনুসারে সূর্য্যোদয়েরও তারতম্য হইয়া থাকে অর্থাৎ সকল দেশের অক্ষাংশ (Latitude) সমান নহে, এই হেতু সকল স্থানে একই সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না। সূর্য্যাস্তও এই নিয়মেই হইয়া থাকে। (The sun-rise and sun-set of different places vary directly as the latitude; of course this will have no effect on those places where the time is observed from a particular meridian within that area.)

লোকাল টাইম

যখন যে দ্রাঘিমার উপর দিয়া কাল্পনিক সূর্য্য অতিক্রম করে সেই সময় হইতেই সেই স্থানের লোকাল টাইম (স্থানীয় সময়) গণনা করা হয়। কাল্পনিক সূর্য্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দ্রাঘিমা অতিক্রম করা নিবন্ধন আমরা পৃথিবীতে অসংখ্য লোকাল টাইম পাইয়া থাকি বটে, কিন্তু যদি বাস্তবিক পক্ষে তাহা ব্যবহৃত হইত, তবে সময়েরও একটা বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হইত। যদি প্রত্যেক দেশের সহরে বা গ্রামে স্ব স্ব স্থানীয় সময় ব্যবহৃত হইত তবে আমাদিগকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে আমাদের ঘড়ীর সময় পরিবর্ত্তন করিতে হইত। বঙ্গদেশের কেহ ব্রহ্মদেশে যাইয়া তাঁহার ঘড়ীর সময় মিলাইয়া দেখিলেই ইহার সত্যতা অনুভব করিতে পারিবেন। এই সমস্ত কারণে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রীণ-উইচের দ্রাঘিমাকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড দ্রাঘিমা ও ° ডিগ্রী নির্দ্দেশ ক্রমে তাহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে ১৮০ ডিগ্রী ধরিয়া ৩৬০ ডিগ্রীর মিল করা হইয়াছে। গ্রীণ-উইচ হইতে যে সময় গণনা করা হয় তাহাকে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম, গ্রীণ-উইচ মীনটাইম বা ইংলণ্ডের লোকাল টাইম বলা হয় এবং সে সময় হইতেই অন্যান্য স্থানের লোকাল টাইম গণনা করা হয়। পৃথিবী যখন তাহার মেরুদণ্ডের উপর দিয়া সমভাবে ঘুরিতেছে এবং দ্রাঘিমাও যখন পৃথিবী বেষ্টন করিয়া গ্রীণ-উইচের দ্রাঘিমা হইতে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সমভাবে মাপ করা হইয়াছে, কাজে কাজেই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে গ্রীণ উইচ মীনটাইমও যে কোন স্থানের লোকাল টাইমের যে তারতম্য তাহা গ্রীণ-উইচের দ্রাঘিমা ও সেই স্থানের দ্রাঘিমার তারতম্যের সমান। (The difference between Greenwich mean time and the local time of any place is equal to the longitude of that place i, e, to say the local time of different places varies directly as the longitude.)

অনেক স্থান ব্যাপিয়া কোনও একটি দ্রাঘিমা নির্দ্দেশ ক্রমে সেই দ্রাঘিমা হইতেই ঐ সমস্ত স্থানের লোকাল টাইম গণনা করা হয় এবং তাহাকেই সেই স্থান বা দেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম বলা হয়। আধুনিক সহর কলিকাতা (দ্রাঘিমা ৮৮°-২০-২´ মিনিট পূর্ব্ব ও অক্ষাংশ ২২°-৩৫´ উত্তর) ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইমকে বঙ্গদেশের স্থানীয় সময় বলিয়া

নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। আবার সিংহলের (দ্রাঘিমা ৮২°.৩৫′ মিনিট পূর্ব্ব) স্থানীয় সময়কে ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। সেজন্য বঙ্গদেশের স্থানীয় সময় ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে ২৩′—২০°৮″ সেকেণ্ড বেশী। তার বিভাগের, পোষ্ট অফিসের ও রেলওয়ের ঘড়ীতে যে সময় দৃষ্ট হয় তাহা ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ও অন্যান্য ঘড়ীতে যে সময় দৃষ্ট হয় তাহা বঙ্গদেশের স্থানীয় সময়—কাজেই বঙ্গদেশে আমরা দুইটি সময় পাইয়া থাকি। বঙ্গদেশের লোকাল টাইম ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে কেহ বা ২৩′-২৪″ কেহ বা ২৪′ বেশী ধরিয়া গণনা করিয়া থাকেন। ইহা ভুল ; উল্লিখিত কারণে নিঃসন্দেহ চিত্তে ২৩′-২১″ সেকেণ্ড ধরিয়া গণনা করাই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

ব্রহ্মদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম দ্রাঘিমা ৯৭°-৩০′ পূর্ব্ব ও অক্ষাংশ ২০° ডিগ্রী উত্তর ধরিয়া একটি কাল্পনিক স্থানের জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই সেই সময় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ভারতবর্ষের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম হইতে ১ ঘণ্টা বেশী—কারণ এই দুই স্থানের দূরত্ব ১৫° ডিগ্রী। (The standard time of Calcu tı which is the local time of Bengal is reckoned from the meridian E 88°-20-2′ and the Standard time of India from the meridian E 82°-30′. Hence the Calcutta l cal time is 23′-20-8″ seconds in advance of the standard time in India. Similarly the standard time in Burma is reckoned from the meridian E 97°-30′. Hence the standard time in Burma is one hour in advance of the s:andard time in India.) জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনা কার্য্যে কোন কোন পঞ্জিকাকারক নবদ্বীপের দ্রাঘিমাকেই স্বদেশীয় মধ্যরেখা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া কলিকাতার দ্রাঘিমাকেই স্বদেশীয় মধ্যরেখা ধরিয়া গণনা করাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়, যেহেতু বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কলিকাতার স্থানীয় সময় ব্যবহৃত হয়।

দিবামান ও রাত্রিমান

সকল পঞ্জিকাতেই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের যে সময় ধরিয়া দিবামান ও রাত্রিমান গণনা করা হইয়াছে তাহাও অনুসন্ধেয়।

সূক্ষ্ম-লগ্ন নিরূপণ

লগ্ন নিরূপণ করার নিয়ম সকলেই বিদিত আছেন বটে, কিন্তু পুনরালোচনা করার কারণ নিম্নে প্রকাশ করা হইতেছে। লগ্ন নিরূপণ করা সম্পূর্ণ—সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের উপর নির্ভর করে। ঘটিকাযন্ত্রে সূক্ষ্ম সময় পাওয়া যায়। যদি বিশুদ্ধভাবে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নিরূপণ করা না হয় তবে লগ্নমান যে ভুল হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মৎদেশীয় অনেক আচার্য্যের সঙ্গে আলোচনাক্রমে দেখা যায় যে, কোন কোন আচার্য্য সকল স্থানের জন্যই—পঞ্জিকার লিখিত সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত ধরিয়া লন, আবার কেহ বা কলিকাতার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে কলিকাতার পূর্ব্বদিকের স্থানগুলির জন্য পঞ্জিকায় দেশভেদে অক্ষাংশ ও সময়নির্ণয়ের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কলিকাতায় ১২টার সময় যে স্থানে যত সময় বেশী দেখান হইয়াছে তাহা কলিকাতার সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে যোগ করিয়া সেই—স্থানের সূর্য্যোদয় নির্ণয় করিয়া থাকেন। এই উভয় প্রণালীই ভুল। যেস্থানের সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত নির্ণয় করিতে হইবে উক্ত তালিকায় ১২টার সময় সে স্থানে যত সময় দেখান হইয়াছে তাহা ১২টা হইতে যত সময় বেশী তাহা কলিকাতার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত হইতে বাদ দিয়া, আবার যে স্থানে ১২টা হইতে যত সময় কম দেখান হইয়াছে তাহা কলিকাতার সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে যোগ দিয়া গ্রাম বিশেষের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নির্ণয় করিলেই বিশুদ্ধভাবে নিরূপিত হইবে। কারণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই কলিকাতার স্থানীয় সময় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। কাজেই বিভিন্ন অক্ষাংশের জন্য সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের যে তারতম্য হইয়া থাকে তাহা ধর্ত্তব্য নহে। ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, কলিকাতার পূর্ব্বদিকের স্থানসমূহের পূর্ব্বে ও কলিকাতার পশ্চিমদিকের স্থানসমূহে পরে সূর্য্যোদয় হয় বলিয়া কলিকাতায় যখন ১২টা—তখন কলিকাতার পূর্ব্বদিকের স্থানসমূহের ১২টা হইতে বেশী সময় ও পশ্চিমদিকের স্থানসমূহে ১২টা হইতে কম সময় দৃষ্ট হয়। এই বেশী কম কলিকাতা হইতে দ্রাঘিমার দূরত্বানুযায়ী প্রতি ডিগ্রীতে ৪′ মিনিট হিসাবে হইয়া থাকে ; ব্রহ্মদেশের জন্য উক্ত নিয়ম ব্যবহৃত হইবে না। যেহেতু ব্রহ্মদেশের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মদেশের ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মদেশবাসী বাঙ্গালীদের সুবিধার্থ ব্রহ্মদেশের (দ্রাঘিমা পূর্ব্ব ৯৭°-৩০′ ও অক্ষাংশ উত্তর ২০° ডিগ্রী) দৈনিক সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত যাহাতে পঞ্জিকায় সন্নিবেশিত করা হয় তৎপ্রতি পঞ্জিকাপ্রণেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ একান্ত বাঞ্ছনীয়। ব্রহ্মদেশের যে স্থান হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরা হয় সে স্থান হইতে রেঙ্গুন ৫′-২০″ ও আকিয়াব ১৮′-২৪″ দূরে অবস্থিত ; কাজেই ব্রহ্মদেশের যে স্থান হইতে ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম ধরা হয় সে স্থানের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সঙ্গে উক্ত সময় যোগ দিলে যথাক্রমে রেঙ্গুন ও আকিয়াবের সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত নির্ণীত হইবে।

লগ্নমান

কোন পঞ্জিকাতেই আকিয়াবের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান দেওয়া হয় নাই। কেবলমাত্র রেঙ্গুনের লগ্নমান দেওয়া হইয়াছে। উক্ত লগ্নমান আকিয়াবের জন্যও কেহ কেহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহা সম্পূর্ণ ভুল। যেহেতু রেঙ্গুনের অক্ষাংশ ১৬°-৪৬′ উত্তর। আকিয়াবের অক্ষাংশ ২০° ৮′ উত্তর বিধায় প্রায়ই পুরীর অক্ষাংশের নিকটবর্ত্তী, কাজেই স্থূলভাবে পুরীর লগ্নমান ধরিয়া গণনা করা যাইতে পারে। অক্ষাংশভেদে সূর্য্যোদয়ের ন্যায় লগ্নমানেরও তারতম্য হইয়া থাকে। কাজেই নিম্নে আকিয়াবের লগ্নমান দেওয়া গেল।

মেষ	৪।১১।৫৪	সিংহ	৫।২৩।১০	ধনু	৫।১৮।৪৭
বৃষ	৪।৫৪।৪৫	কন্যা	৫।১৯। ৯	মকর	৪।৩৪।৪৮
মিথুন	৫।৩১।৪৫	তুলা	৫।২৯।৪৫	কুম্ভ	৩।৫৯।১৩
কর্কট	৫।৩৬।৫৬	বৃশ্চিক	৫।৩৮।৩৭	মীন	৩।৫০,৪১

লগ্নের উদয় অস্ত

পঞ্জিকায় কলিকাতার লগ্নমান ধরিয়া দৈনিক লগ্নের উদয় অস্ত লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কাজেই সকল স্থানের লগ্নমানের জন্য সেই উদয় অস্ত ধরিয়া গণনা করা ও যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশুদ্ধ লগ্নমান গণনা করিতে হইলে যে দিন যে স্থানের লগ্নমান ধরিয়া গণনা করিবে, সেই দিন সেই স্থানের লগ্নমান ধরিয়া উদয় অস্ত নির্ণয় করিয়া লওয়াই শাস্ত্রসঙ্গত।

উল্লিখিত বিষয়গুলি প্রচার-উপোযোগী মনে করিয়াই প্রচার করা হইতেছে। ইহাতে যদি একজন লোকও উপকৃত হন, তবেই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও জাতিভেদ

রায় শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ বাহাদুর

"It is fatal to fly straight at him with ready-made analogies. We must see him in his own atmosphere.

Gilbert Murray.

মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য (শ্রীচৈতন্য) একাধারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবের আরাধ্য দেবতা এবং ভক্তিসাধনের ক্ষেত্রে প্রধান আদর্শ। অবৈষ্ণব বাঙ্গালীরা তাঁহাকে আদর্শ ভক্তরূপে গভীর শ্রদ্ধা করেন। শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে এক নব যুগের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। এই যুগের স্রষ্টার কীর্ত্তির সম্যক পরিচয় প্রদান করা বাঙ্গালার ইতিহাসলেখকের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। বাঙ্গালায় যে সকল ধর্ম্মসংস্কারক আবির্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শ্রীচৈতন্য যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী সুতরাং সর্ব্ব প্রধান, এই বিষয়ে মতদ্বৈধের অবসর নাই। অনেক ঐতিহাসিক তাঁহাকে সমাজসংস্কারকরূপেও প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। জাতিভেদের উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা সমাজসংস্কার ক্ষেত্রে তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন কি না ইহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে বর্ত্তমানে যে বাদানুবাদ উপস্থিত হইয়াছে "ভারতবর্ষে"র পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। এই বাদানুবাদে সাক্ষাৎসম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করিয়া আমি এই প্রস্তাবে বিষয়টি আলোচনা করিব। ঐতিহাসিক হিসাবে শ্রীচৈতন্য একজন বিরাট আদর্শ (representative) বাঙ্গালী। সুতরাং মানুষ শ্রীচৈতন্যকে চিনিতে না পারিলে বাঙ্গালী আপনাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিবে না।

বৃন্দাবনদাস "চৈতন্য ভাগবতে" লিখিয়াছেন—

ভক্তিবিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর।
ভক্তি-রসময় শ্রীচৈতন্য অবতার॥

(অন্ত্য ৯।১৫৫)

ধর্ম্মের তিন মার্গ—কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তি। কর্ম্মমার্গে বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানমার্গের দুই শাখা, বৈদিক এবং অবৈদিক। বৈদিক জ্ঞানমার্গে ব্রহ্মজ্ঞানসাধন বিহিত হইয়াছে। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্ম অবৈদিক জ্ঞানমার্গের অন্তর্গত। বৈদিক কর্ম্মমার্গে এবং জ্ঞানমার্গে জাতিভেদানুসারে অধিকারী ভেদ করা হইয়াছে। স্ত্রী এবং শূদ্র যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং উপনিষদোক্ত ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলনের অধিকারী নহে, স্মৃতিশাস্ত্রে যাহাদিগকে অনুলোমজ এবং প্রতিলোমজ শঙ্কর জাতি বলা হইয়াছে তাহারা ত নহেই। কিন্তু ভক্তিমার্গে জাতিভেদানুসারে অধিকারী ভেদ নাই এবং ভক্ত যে জাতীয়ই হউক না কেন সকল জাতির পূজ্য। "হরিভক্তিপরায়ণ চণ্ডাল দ্বিজশ্রেষ্ঠরূপে গণনীয়" (চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ) এই প্রবচনে জাতিভেদ সম্বন্ধে ভক্তিমার্গীর অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য, নীচ জাতির লোকও ভক্তি-সাধনের অধিকারী এবং সে ভক্তি লাভ করিতে পারিলে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের তুল্য পূজনীয়। জাতিভেদ সম্বন্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিধি-ব্যবস্থা জানিতে হইলে গোপালভট্টের "হরিভক্তিবিলাস" দেখিতে হইবে। শ্রীচৈতন্য স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া যায়েন নাই। তিনি গ্রন্থ রচনার ভার দিয়াছিলেন রূপ, সনাতন, গোপাল ভট্ট আদি গোস্বামীগণের উপর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অনুসরণীয় স্মৃতিনিবন্ধ "হরিভক্তিবিলাস" সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন গোপালভট্ট এবং স্বয়ং সনাতন গোস্বামী তাহার টীকা লিখিয়াছেন। গোপালভট্ট "হরিভক্তিবিলাসের" প্রথম বিলাসে অধিকারী নির্ণয়ে প্রথমতঃ এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

তান্ত্রিকেষু চ মন্ত্রেষু দীক্ষায়াং যোষিতামপি।
সাধ্বীনামধিকারোঽস্তি শূদ্রাদীনাঞ্চ সদ্ধিয়াং॥

তান্ত্রিক মন্ত্রে ও দীক্ষায় সাধ্বী স্ত্রী ও সদ্বুদ্ধি শূদ্রাদির অধিকার আছে।

শূদ্রাদি শব্দের দ্বারা এখানে শূদ্র এবং দ্বিজ ভিন্ন আর সকল জাতিই বুঝাইয়াছে। গোপালভট্টধৃত শ্রীরামের মন্ত্ররাজের উদ্দেশে উক্ত অগস্ত্যসংহিতার বচনে এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—

শুচিব্রততমাঃ শূদ্রা ধার্ম্মিকা দ্বিজসেবকাঃ।
স্ত্রিয়ঃ পতিব্রতাশ্চান্যে প্রতিলোমানুলোমজাঃ॥
লোকাশ্চণ্ডালপর্য্যন্তাঃ সর্ব্বেঽপ্যত্রাধিকারিণঃ॥

পবিত্রব্রতবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, গুরুসেবাপরায়ণ শূদ্রগণ, পতিপরায়ণা স্ত্রীগণ এবং অন্যান্য প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ চণ্ডাল পর্য্যন্ত সকলেই ইহাতে অধিকারী হইতে পারেন।*

শূদ্রের "দ্বিজসেবক" বিশেষণ হইতে দেখা যায়, এই বচনে সাধন-ভজন সম্বন্ধে সকল জাতির সমান অধিকার বিহিত হইলেও অন্যান্য বিষয়ে জাতিভেদের ভিত্তি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনুসরণের বিধি সূচিত হইয়াছে। পারলৌকিক মঙ্গল বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া লৌকিক ব্যাপারে তাহার অনুসরণ এ কালের ঐহিকসর্ব্বস্ব (secularist) লোকের নিকট বিস্ময়কর মনে হইতে পারে। কিন্তু সে কালের ধর্ম্ম-সংস্কারকগণ ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন; তাঁহারা পারত্রিক ব্যাপারে জাতিভেদ অস্বীকার করিলেও ঐহিক ব্যাপার সম্বন্ধে জাতিভেদের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই।

"হরিভক্তিবিলাসে" বৈষ্ণব শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে। এই শ্রাদ্ধের প্রধান কার্য্য, যে অন্ন বিষ্ণুকে নিবেদন করা হইয়াছে বিষ্ণুর সেই প্রসাদ পিতৃগণকে নিবেদন করা। বৈদিক শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজনের ন্যায় বৈষ্ণব শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবভোজনের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এখানেও ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের প্রতি পক্ষপাত দেখা যায়। যথা—

ব্রহ্মপুরাণে শ্রীব্রহ্মবচন—

শঙ্খাঙ্কিততনুর্বিপ্রো ভুঙ্‌ক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ॥

ব্রহ্মপুরাণে ব্রহ্মা বলিতেছেন, যে ব্রাহ্মণের শরীর শঙ্খের চিহ্ন ভূষিত সেই ব্রাহ্মণ যে গৃহে ভোজন করেন, পিতৃগণের সহিত স্বয়ং বিষ্ণু (সেই গৃহে) অন্ন ভোজন করেন।

গোপালভট্ট প্রধানতঃ পুরাণের বচন অনুসারে বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে কি আচার প্রচলিত ছিল এবং তিনি স্বয়ং কিরূপ আচরণ করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার প্রামাণিক জীবনচরিত বৃন্দাবনদাসের "চৈতন্যভাগবতে" এবং কৃষ্ণদাসকবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃতে"। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিবার পূর্ব্বাবধিই যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা হরিভক্তের জাতি বিচার করিতেন না, ঠাকুর হরিদাসের জীবনী তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। "চৈতন্য ভাগবতের" আদিখণ্ডের ষোড়শ অধ্যায়ে হরিদাসের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তিনি জাতিতে যবন বা মোসলমান ছিলেন। যবন শব্দে আদৌ যবন (Ionian) গ্রীকদিগকে বুঝাইত। তারপর পশ্চিম দিক হইতে আগত অনেক আক্রমণকারীকে যবন নামে অভিহিত করা হইয়াছে। হরিদাস ঠাকুরের মোসলমান নাম কি ছিল আমরা জানি না এবং তিনি কি উপায়ে যে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাহাও জানা যায় না। তিনি যশোহর জেলার অন্তর্গত বুড়ন গ্রামে* জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর ফুলিয়া-শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। সেইখানে তাঁহার শান্তিপুরনিবাসী অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত মিলন হইয়াছিল। তারপর মোসলমান মুলুকের পতি (ফৌজদার?) স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য হরিদাসকে কি কঠোর সাজা দিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। বৃন্দাবনদাস হরিদাসের প্রতি মুলুকপতির যে উক্তি লিখিয়াছেন তাহার কয়েকটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে—

আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত॥
জাতি-ধর্ম্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার।
পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার?
না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার।
সে পাপ ঘুচাহ করি কল্‌মা উচ্চার॥

* 'শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস," শ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত, কলিকাতা, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ, ৩৮ পৃঃ।

* গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত", ৩৩৯ পৃঃ, টীকা।

নিমাই পণ্ডিত গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সঙ্কীর্ত্তন এবং নামপ্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত হরিদাস ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। নিমাই পণ্ডিত কাটোয়াতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করতঃ তিন দিন অনাহারে রাঢ় দেশে ভ্রমণ করিয়া গঙ্গা পার হইয়া নিত্যানন্দের সহিত শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের ঘরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্বৈত শ্রীচৈতন্যের এবং তাঁহার ভক্তগণের আহারের প্রচুর আয়োজন করিলেন এবং পূজা ও আরতি সমাপ্ত করিয়া অভ্যাগতগণকে আহার করিবার জন্য ডাকিলেন।

দুই ভাই আইলা তবে করিতে ভোজন।
গৃহের ভিতরে প্রভু করেন গমন॥

দুই ভাই এখানে শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দ। অদ্বৈত মুকুন্দ এবং হরিদাসকেও শ্রীচৈতন্যের সহিত আহার করিতে ডাকিলেন।

মুকুন্দ, হরিদাস, দুই প্রভু বোলাইল।
যোড়হাতে দুই জন কহিতে লাগিল॥
মুকুন্দ বলে, মোর কিছু কৃত্য নাহি সরে।
পাছে মুঞি প্রসাদ পামু, তুমি যাহ ঘরে॥
হরিদাস বলে, মুঞি পাপিষ্ঠ অধম।
বাহিরে এক মুষ্টি পাছে করিমু ভোজন॥

শ্রীচৈতন্যের আহার শেষ হইলে অদ্বৈত তাঁহার পদসেবা করিতে চাহিলেন। তখন—

সঙ্কুচিত হঞা প্রভু বলেন বচন॥
বহুত নাচাইলে তুমি, ছাড় নাচন।
মুকুন্দ হরিদাস লইয়া করহ ভোজন॥
তবে ত আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুই জনে।
করিল ভোজন, ইচ্ছা যে আছিল মনে॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

হরিদাস ঠাকুরের দৈন্য বিফল হইল। তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের এবং মুকুন্দের সঙ্গে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সাধারণ মোসলমানের সঙ্গে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের এইরূপ পংক্তি ভোজনের কোন প্রমাণ নাই।

চৈতন্য যখন নীলাচলে (পুরী) গেলেন, গৌড়ীয় ভক্তগণের সঙ্গে হরিদাস ঠাকুর তথায় উপস্থিত হইলেন। পুরীতে পৌছিয়া ভক্তগণ জগন্নাথ দর্শন না করিয়াই শ্রীচৈতন্যের বাসার দিকে চলিলেন এবং সেইখানে (কাশী মিশ্রের ভবনে) একে একে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মুরারিগুপ্ত বাহিরে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য অনুসন্ধান করিলে বহু ভক্ত গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিল।

মুরারি দেখিয়া প্রভু আইলা মিলিতে।
পাছে ভাগে মুরারি লাগিল কহিতে॥
মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, মুঞি ত পামর।
তোমার স্পর্শযোগ্য নহে এই কলেবর॥
প্রভু কহে, মুরারি, কর দৈন্য সম্বরণ।
তোমার দৈন্য দেখি মোর বিদীর্ণ হয় মন॥
এত বলি প্রভু তারে কৈল আলিঙ্গন।

তারপর আরও কয়েকজন ভক্তের সহিত সাক্ষাতের পর শ্রীচৈতন্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁহা হরিদাস।" হরিদাস তখন রাজপথপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ ধাইয়া গিয়া হরিদাসকে বলিলেন, "প্রভু তোমায় মিলিতে চাহে, চলহ ত্বরিত।" তখন—

হরিদাস কহে, আমি নীচ জাতি ছার।
মন্দির নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার॥
নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ, একলে কাল গোঙাঙ॥
জগন্নাথ সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়।
তাহাঁ পড়ি রহোঁ, মোর এই বাঞ্ছা হয়॥

শ্রীচৈতন্য এই সংবাদ পাইয়া হরিদাসের নিকট গেলেন এবং দণ্ডবৎ পতিত হরিদাসকে আলিঙ্গন করিয়া উঠাইলেন।

হরিদাস কহে, প্রভু না ছুঁইও মোরে।
মুঞি নীচ অস্পৃশ্য পরম পামরে॥

শ্রীচৈতন্য কহিলেন, আমিও তোমার তুল্য পবিত্র নহি,

দ্বিজ-ন্যাসী হইতে তুমি পরম পাবন।

এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটি (৩।৩৩।৮) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্লোকের প্রথম দুই চরণ—

অহো বড় শ্বপচোঽতো গরীয়ান
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।

হে ভগবন, যাঁহার মুখে তোমার নাম উচ্চারিত হয় সে শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ।

শ্রীচৈতন্য হরিদাসঠাকুরকে এক বাগানে লইয়া গিয়া বলিলেন,

এই স্থানে রহি কর নাম সংকীর্ত্তন।
প্রতি দিন আসি আমি করিব মিলন॥
মন্দিরের চক্র দেখি করিহ প্রণাম।
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, একাদশ পরিচ্ছেদ)

হরিদাস ঠাকুরের যেমন অদ্বৈতের মত গৃহস্থ বৈষ্ণবের সহিত পংক্তি ভোজনে বাধা ছিল না, তেমন জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশেরও বাধা ছিল না। কিন্তু তিনি দৈন্যতা-বশতঃ নিজেকে জগন্নাথসেবকেরও অস্পৃশ্য জ্ঞান করিলেন, এবং মন্দির হইতে দূরে রহিলেন। দীন ভক্ত হরিদাস মন্দির চূড়ার চক্র দেখিয়াই কৃতার্থ হইতেন। বৈষ্ণব সুলভ দৈন্যতা বশতঃ কেবল অস্পৃশ্য জাতির বৈষ্ণব অস্পৃশ্য থাকিতে চাহিতেন না, ব্রাহ্মণ এবং করণ জাতীয় বৈষ্ণবও আপনাদিগকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। উড়িষ্যার করণ জাতি ব্রাহ্মণের অস্পৃশ্য নহে। শ্রীচৈতন্য যখন করণ রামানন্দ রায়ের পিতা ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিলেন, তখন—

ভবানন্দ রায় বলিলেন—

আমি শূদ্র, বিষয়ী অধম।
মোরে তুমি স্পর্শ, এই ঈশ্বর লক্ষণ॥

(চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ১০।৫৪)

বৈষ্ণবোচিত দৈন্যের চরম উদাহরণ সনাতন গোস্বামী। রূপ-সনাতনের পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামীর "লঘুতোষিণী" গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" এই বিবরণ উদ্ধৃত এবং বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন। রূপ-সনাতনের পূর্ব্বপুরুষ কর্ণাটদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। সনাতন (সাকর মল্লিক) এবং রূপ (দেবীর খাস) গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহর পাত্র ছিলেন। গৌড়ের নিকটবর্ত্তী রামকেলি গ্রামে শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলনের পর দুই ভাই রাজকার্য্য এবং বিষয় ত্যাগ করিয়া মথুরা চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য যখন নীলাচলে বাস করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহিত মিলনের জন্য ঝারিখণ্ড-বনপথে সনাতন পুরী আসিয়াছিলেন।

ঝারিখণ্ড বনপথে আইলা একেলা চলিয়া।
কভু উপবাস, কভু চর্ব্বণ করিয়া॥
ঝারিখণ্ডের জলের দোষে উপবাস হৈতে।
গাত্রে কণ্ডু হৈল, রসা পড়ে খাজুয়াইতে॥

পুরী পৌছিয়া সনাতন হরিদাস ঠাকুরের বাসায় গেলেন। শ্রীচৈতন্য হরিদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সেইখানে গিয়া সনাতনকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। পাছে হটিয়া সনাতন বলিলেন—

মোরে না ছুঁইহ, প্রভু, পড়োঁ তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডুরসা গায়॥

শ্রীচৈতন্য সনাতনের নিষেধ না মানিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সনাতন হরিদাসের সঙ্গে রহিলেন এবং মন্দিরে না গিয়া মন্দিরের চক্র প্রণাম করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীচৈতন্য সনাতনকে নিজের বাসস্থানে মধ্যাহ্ন ভোজন করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। হরিদাসের আশ্রম হইতে শ্রীচৈতন্যের বাসস্থানে পৌছিতে হইলে জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের নিকট দিয়া যাইতে হইত। সনাতন সেইপথে না গিয়া সমুদ্রের পার দিয়া ঘুরিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নের সূর্য্যকিরণে তপ্ত বালুকার উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে সনাতনের দুই পায়ে ফোস্কা পড়িল।

প্রভু কহে, "তপ্ত বালুকাতে কেমনে আইলা?
সিংহদ্বারের পথ শীতল, কেনে না আইলা?"

সনাতন উত্তর করিলেন—

সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার।
বিশেষ ঠাকুরের তাঁহা সেবকের প্রচার॥
সেবক গতাগতি করে, নাহি অবসর।
তার স্পর্শ হৈলে সর্ব্বনাশ হবে মোর॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, এইকথা শুনিয়া শ্রীচৈতন্য সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন—

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন।
তোমা স্পর্শে পবিত্র হয় দেবমুনিগণ॥
তথাপি ভক্তস্বভাব মর্য্যাদা রক্ষণ।
মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥

মর্য্যাদা-লঙ্ঘনে লোক করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥
মর্য্যাদা রাখিলে তুষ্ট হয় মোর মন।
তুমি ঐছে না করিলে করে কোন জন?
(চৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

কি নিমিত্ত যে সনাতন নিজেকে নীচজাতি এবং অস্পৃশ্য-জ্ঞান করিতেন নরহরি চক্রবর্ত্তী "ভক্তিরত্নাকরে" তাহা আলোচনা করিয়াছেন। সনাতন সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন -

পিতা-পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গে নিরন্তর রয়॥
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয়॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর॥
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে॥
শ্রীচৈতন্য কৃপা যাঁরে তাঁর ঐছে রীত।
আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ॥
সদা একরস আপনাকে নীচ মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্বজানে॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য॥
তার ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায়॥" *

যাঁহারা দৈন্যরসে নিমগ্ন হইয়া আপনাদিগকে নীচজাতি এবং অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আনন্দ অনুভব করেন তাঁহাদিগকে ঠিক জাতিভেদের বিরোধী বলা যায় না। "চৈতন্য-চরিতামৃতে"র যে পরিচ্ছেদে (অন্ত্য, ৪) সনাতনের দৈন্য বর্ণিত হইয়াছে সেই পরিচ্ছেদে জাতিভেদ ও দীনতা সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য সনাতনকে বলিতেছেন—

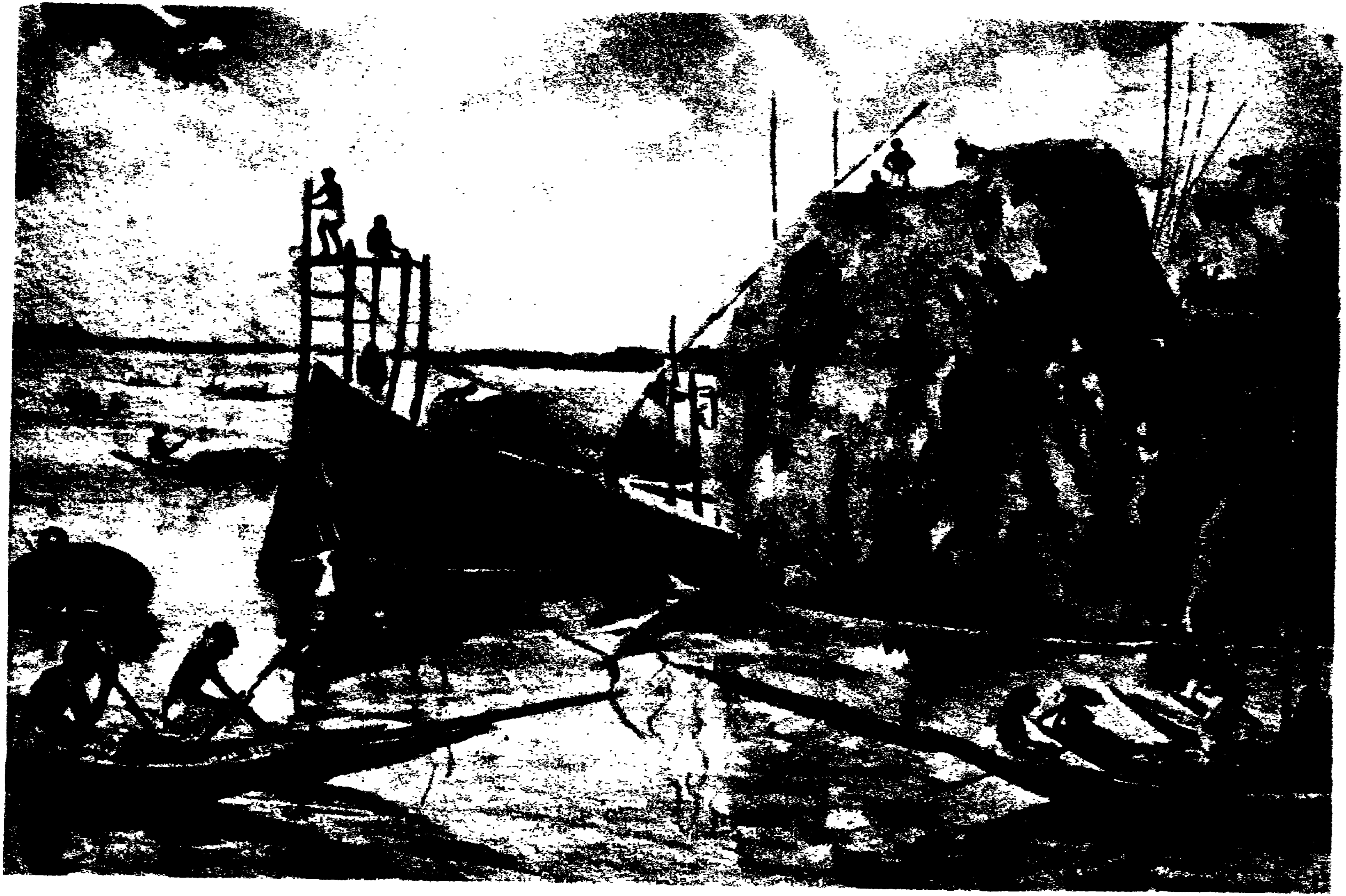
নীচজাতি নহে কৃষ্ণ ভজনের অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণ ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন-পণ্ডিত-ধনীর বড় অভিমান॥

কৃষ্ণভজন সম্বন্ধে সকল জাতির সমান অধিকার স্বীকৃত হইলেও দীনভাব সেই সাম্য প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরের ভিত্তির উপর। সুতরাং বৈষ্ণবের দীনতা পরোক্ষভাবে অস্পৃশ্যতার পৃষ্ঠপোষণ করিয়াছে। জাতিভেদ সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্যের "বজ্রসূচি"র প্রথম নির্ণয় বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবগণ যেমন কৃষ্ণভজনে সকল জাতির সমান অধিকার প্রচার করিয়াছেন, মৃত্যুঞ্জয়াচার্য্য প্রকারান্তরে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনায় চতুর্বর্ণের সমান অধিকার প্রচার করিয়াছেন। তিনি "বজ্রসূচি"র প্রথম নির্ণয়ের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে জানিলে ব্রাহ্মণ হয়। সেই জ্ঞানের ন্যূনাধিক্য দ্বারা ক্ষত্রিয় বৈশ্য—আর তাহার অভাব দ্বারা শূদ্র এই সিদ্ধান্ত।" (রামমোহন রায়ের অনুবাদ)।

ইহার তাৎপর্য্য, চতুর্বর্ণের লোকই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী, এবং জ্ঞানের তারতম্যানুসারে বর্ণভেদ হওয়া উচিত। জাতিভেদ বা সামাজিক বৈষম্য ভাঙ্গিয়া সামাজিক সাম্য এবং ঐক্যস্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে। জাতিভেদজনিত অনৈক্য যে হিন্দুদিগের অধঃপতনের একটি কারণ এ দেশীয় লোকের মধ্যে এই তথ্য বোধহয় প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। প্রশ্নচ্ছলে হিন্দুর তাবৎ শাস্ত্রের দোস দেখাইয়া লিখিত একব্যক্তির একখানি পত্র ১৮২১ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের "সমাচারদর্পণে" মুদ্রিত হইয়াছিল। রামমোহন রায় শিবপ্রসাদ শর্ম্মা এই ছদ্মনামে এই পত্রের উত্তর "সমাচারদর্পণে"র সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া-

* "ভক্তিরত্নাকর" দ্বিতীয় সংস্করণ, মুর্শিদাবাদ, চৈতন্যাব্দ ৪২৩, ৪৪ পৃঃ।



ছিলেন। ১৮২১ সালের ১লা সেপ্টেম্বরের "সমাচারদর্পণে" লিখিত হইয়াছে, "অনেক অভিজ্ঞাসিতাভিধান আছে বলিয়া এই উত্তর 'সমাচারদর্পণে' প্রকাশিত হয় নাই।" * রামমোহন রায় এই উত্তর ১৮২১ সালেই "ব্রাহ্মণ সেবধি। ব্রাহ্মণমিসনরি সম্বাদ" নামে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণসেবধি"র সূচনায় রামমোহন রায় অন্যধর্ম্মের প্রচারকগণ হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা করিয়া হিন্দুদিগের যে মনঃপীড়া উৎপাদন করেন তাহার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"এই তিরস্কারের ভাগী আমরা প্রায় নয় শত বৎসর অবধি হইয়াছি ও তাহার কারণ আমাদের অতিশয় শিষ্টতা ও হিংসা, ত্যাগকে ধর্ম্ম জানা ও আমাদের জাতিভেদ—যাহা সর্ব্বপ্রকার অনৈক্যতার মূল হয়।" †

* ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "সংবাদপত্রে সেকালের কথা," প্রথম খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ।

† "রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী" এলাহাবাদ পাণিনি কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত; কলিকাতা, ১৩১১, ৪৫৬ পৃঃ।

বখ্শীষ্

মনোজ গুপ্ত

লোক কথায় বলে লাখ কথা না হলে বিয়ে হয় না—এ লাখ কথা কোথায় সুরু হয়—আর কোথায় শেষ হয় তার—ধরা-বাঁধা কোন সীমা নির্দ্দেশ করা নেই, তাই এর বিপক্ষে কিছু বলাও চলে না। অবনীর বিয়ের ঠিক হল—লাখ কথার আগে কি পরে তা ঠিক জানা নেই, তবে ঠিক হল। আজকালকার হিসেবে একটু কম বয়েসেই বলতে হবে—এই তো সবে বি-এ পাশ করেছে! মেয়েরাই তো আর বি-এ পাশ করবার আগে বিয়ে করতে চায় না। অবনীর বন্ধুদের মধ্যে খুব কম ছেলেরই বিয়ে হয়েছিল। কেউ কেউ বলতেও ছাড়লে না—অবনীর বাবার আর একটি মেয়ে ছিল, তাই তাড়াতাড়ি পার করলেন।

আমাদের গল্পটা ঠিক অবনীর বিয়ে নিয়ে নয়—তার বিয়ের রাত্রির একটা ঘটনা নিয়ে। কিন্তু সব কিছুর মত এরও একটা আরম্ভ আছে, সেটা না বললে চলে না।

অবনীদের "মোটর" নেই। "ট্যাক্সি" করে বর নিয়ে যাওয়াটাও নেহাৎ ভাল দেখায় না—তাই একটা গাড়ীর সন্ধান করতে হল। যার একখানা গাড়ী থাকে—সে Ford হলেও—তার পক্ষে গাড়ী পাওয়া সম্ভব—কিন্তু অবনীর বাবার গাড়ী ছিল না তা বলাই হয়েছে! গাড়ী পাওয়া কষ্টকর দেখে অবনীর বাবা বললেন, "কিছু দরকার নেই লোকের খোসামোদ করবার। গাড়ী যখন নেই, তখন 'ট্যাক্সি' করেই যাওয়া ভাল।" এ কথায় কিন্তু সকলে সন্তুষ্ট হতে পারল না—তাই গাড়ীর চেষ্টা চলতে লাগল। শেষে একখানা গাড়ী যোগাড় হ'ল—কোন এক রায় বাহাদুরের গাড়ী। সন্ধ্যের পর তাঁর আর গাড়ীর দরকার থাকে না—সে সময় গাড়ী পাওয়া যাবে।

৭টার সময় বর নিয়ে বেরুতে হবে—৭টা বাজতে মাত্র দশ মিনিট বাকি আছে—তখনও গাড়ী এসে পৌছয় নি। অবনীর বাবার বয়েস পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে, কাজেই একটু ব্যস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। সাড়ে ছ'টা থেকে তিনি জিজ্ঞেস করতে সুরু করেছেন—গাড়ী এসেছে কি না। গাড়ী তো আসে নি দেখাই যাচ্ছে কিন্তু করা যায় কি? যে বেচারা গাড়ীর ঠিক করেছিল তার প্রাণ যায়; প্রতি মুহূর্ত্তে কৈফিয়ৎ দিতে হয় গাড়ী আসছে না কেন। আচ্ছা, সেই বা কি বলতে পারে? এক বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল গাড়ী না-পাওয়া নিয়ে। কে একজন ভদ্রলোক বন্ধুটির বাড়ীতে এসেছিলেন; তিনি নিজে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—কোথায় বিয়ে, কবে বিয়ে, সন্ধ্যের পর গাড়ী হলে চলবে কি না; শেষে বললেন, "তোমাদের ঠিকানাটা দাও, বিয়ের দিন ঠিক সময়ে আমার গাড়ী তোমাদের বাড়ী যাবে।"

অবনীর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কখন আসতে হবে ঠিক করে বলে দিয়েছিলি তো?"

"বাঃ, তা আর দিই নি!"

"বাড়ীর নম্বর ভুল করিস নি?"

"আপনি কি যে বলেন? বাড়ীর নম্বর ভুল করব?"

"কি জানি? তোরা সব পারিস! ভদ্রলোকের ঠিকানা জানিস তো?"

"না, ঠিকানাটা তো জেনে নিই নি!"

"বেশ কাজই করেছ! একটা নিমন্ত্রণের চিঠিও তো দাও নি?"

"কৈ না!"

"কি বুদ্ধিই তোদের হচ্ছে! একটা ভদ্রলোক নিজে থেকে গাড়ী দিতে চাইলেন, তাঁকে নিমন্ত্রণ করাটাও দরকার মনে করিস না। ঠিকানাটাই জেনে নিস নি। তোরা কি যে লেখা-পড়া শিখিস! কোন কাজটা তোরা নিজের বুদ্ধি খরচ করতে পারিস বল ত ···" কোথায় গিয়ে যে থামত বলা যায় না, যদি না ঠিক সেই সময় পেছনে এসে একটা মোটার "হর্ণ" দিত। হাঁ, সেই মোটারই তো! অবনীর বাবা তাড়াতাড়ি Chauffeurকে জিজ্ঞেস করলেন, "এত দেরী করলে কেন হে?"

"ইস্ টাইমকো আনে বোলা রহা"—তাকে আর কোন কথা না বলে ভদ্রলোক বাড়ীর ভেতর তাড়া দিতে গেলেন। দেরী হবেই; কোন কাজ যদি মেয়েরা ঠিক সময়ে করবে! দেরী হয়ে যাচ্ছে বোঝে না।

গাড়ী আসবারও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বর বেরুল। তার মধ্যে অবনীর বাবা কতবার যে চটে উঠেছেন—তা বলা যায় না। অবনীর বড় ভাই একবার বললেন, "আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন বাবা? এখনও সময় ঢের আছে। বিয়ে তো কোন রাতে—"

"আচ্ছা, থাক্! তোরা তো বুঝিস সব! ঠিক লগ্নর সময় সময় গেলে চলে?" বেচারা অতি ভাল-মানুষ, খুব সাহস করে কথাগুলো বলে ফেলেছিলেন, আর কিছু বলবার মত তাঁর সাহস ছিল না।

কোন কিছু না বলে Chauffeur গাড়ী ছেড়ে দিলে। সোজা গাড়ী চলল Cornwallis Street দিয়ে, তার পর College Street, তার পর Wellington দিয়ে—কেউ কিছু বলে দিচ্ছে না। Dhurmatallahর মোড়ে অসম্ভব ভিড়। Chauffeur গাড়ী ত চালাচ্ছিল বেজায় জোরে। অবনীর বাবার ভয় হওয়াই স্বাভাবিক। সাবধানে চালাতে বললেন কিন্তু সে শুনেছে বলে মনে হল না। রাসবিহারী এভিন্যু থেকে বাঁ দিকে একটা রাস্তায় যেতে হয়; রাত্রের অন্ধকারে সেটা ঠিক করতে চেষ্টা করছিলেন অবনীর বাবা। এক জায়গায় বললেন, "এই, এই বাঁ দিকে।" গাড়ীটা আসতে করে নিতেই বললেন, "না না, এটা তো নয়!" Chauffeur বললে, "রাস্তাকা নাম বাৎলাইয়ে, হাম্ ঠিক লে জায়েগা।" বটে তো, ভুল হয়ে গিয়েছিল! ও যখন গাড়ী চালায় তখন রাস্তা তো ওর জানা থাকারই কথা।

বিয়ে বাড়ীতে সানাই বাজছিল। অবনীর বাবা ভেবেছিলেন ঠিক গাড়ী থামবে; তাই আগে থেকে সাবধান করে দেন নি। গাড়ী কিন্তু না থেমে এগিয়ে চলল। ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "কি বিপদ! ছাতুর কি এটুকুও বুদ্ধি নেই—এই রোখো, রোখো।" একটুও ব্যস্ত না হয়ে Chauffeur বললে, "ম্যাঁয় লেতা।"

গাড়ী থেকে নেমে অবনীর বাবা আর কোন দিকে তাকাবার অবসর পেলেন না। কন্যা-কর্ত্তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেই যে বাড়ীতে ঢুকলেন, তারপর বিয়ের হাঙ্গামে আর বাইরে আসবার সময় পেলেন না। বিয়ের পর বাইরে কেউ অভুক্ত আছে কিনা দেখবার জন্য আসছিলেন, দেখলেন গাড়ী ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। তাড়াতাড়ি Chauffeurএর কাছে এসে বললেন, "এখনও দাঁড়িয়ে যে?"

"কাল সুবে ক' বাজে আনে হোগা?"

ভদ্রলোক মহা বিপদে পড়লেন। তিনি শুনেছিলেন সকালের দিকে গাড়ী পাওয়া যাবে না, অথচ এ জিজ্ঞেস করছে। গাড়ী দরকার নেই এ কথা বলতেও ইচ্ছে হল না; বললেন, "আচ্ছা, সে কাল সকালে বলে পাঠাব।" এর পর সে নিশ্চয় চলে যাবে জেনে অবনীর বাবা ভেতরে চলে গেলেন। Chauffeur যে কাল ক'টার সময় আসবে সে কথা জানবার জন্য এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তা জেনে তাঁর লোকটার ওপর বিরক্তি অনেক কমে গিয়েছিল। একবার মনে হ'ল, কৈ লোকটাকে তো কিছু দেওয়া হল না! যাক্ গে, পরে তখন দিলেই হবে।

* * * *

কে একজন বাইরে এসেছিল কি কাজে। গাড়ীটা

তখনও দাঁড়িয়েছিল। Chauffeur তাকে ডেকে পরিষ্কার বাঙ্গালায় বললে "কনের দাদাকে একবার ডেকে দেবেন?"

"এখন তাঁকে পাওয়া শক্ত—খুব ব্যস্ত আছেন। কি দরকার জানাতে আপত্তি আছে?"

"আজ্ঞে, আমার তাঁর সঙ্গেই দরকার—দয়া করে যদি একবার ডেকে দেন, বিশেষ দরকার। বলবেন, যে গাড়ীতে বর এসেছে তার Chauffeur."

এ কথা না বললে ডেকে দিত কি না বলা যায় না। কত গাড়ীই তো এসেছে—কোন একটা গাড়ীর Chauffeur বাড়ীর কর্ত্তাকে এত জোর 'তলব' দিতে দেখলে আশ্চর্য্যবোধ তো হয়ই, একটু বিরক্তিও। কিন্তু উপায় কি? বরের বাড়ীর কা'র গাড়ী—কাজেই ডেকে দিতে হবে।

কনের দাদাও শুনে এমন বিশ্বাসই করতে পারেন নি যে গাড়ীর Chauffeur তাঁকে ডাকতে পারে। জিজ্ঞেস করলেন, "তাকে খাবার দেওয়া হয়েছে তো—তাতেই বা আমায় ডাকবে কেন?"

গাড়ীর কাছে এসে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই Chauffeurকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমায় কি দরকার?"

"হামারা তো বখ্‌শীষ্‌ মিলা নেই।"

কি বিপদ। বর নিয়ে এল তাও বখ্‌শীষ দিতে হবে কন্যাপক্ষকে। কেন ওঁরা দিয়ে গেলেই তো পারতেন। দিতে গেলে গোটা দু'য়েক টাকার কম তো দেওয়া যায় না। এই রকম বাজে খরচ করেই তো খরচ বেড়ে যায়! উপায়ই বা কি? দু'টো টাকা নিয়ে Chauffeurএর হাতে দিতে সে বললে, "দো রুপেয়া, ব্যস্‌! এতা ভারি কামকে খালি দো রুপেয়া বখ্‌শীষ!"

ভদ্রলোক এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না—এর চেয়ে বেশী যে সে আশা করতে পারে—তা তিনি ধারণাও করেন নি। বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তা কত দিতে হবে?"

"আপ্‌কে মর্‌জি!"

"এই তো দিয়েছিলাম—এখন তোমার কি চাই বল?"

"পাঁচ রুপেয়া সে কম্‌তি নেহি লেগা।"

নেহি লেগা তো মাথা কিনেগা! পাঁচ পাঁচটা টাকা দিতে হবে! না হলে নেবে না! নতুন জামাইএর বাড়ী; যদি কিছু না দিয়েই বিদেয় করা হয় তাতে বদ্‌নাম রটবে। আচ্ছা, ওঁদের ডাকলে কি হয়! না, তা হলে মনে করবে টাকা দেবার ভয়ে ডেকেছে—সে ঠিক হবে না। একবার বললেন, "তা আর এক টাকা নাও—তাহলেই তো হবে!"

"পাঁচ রুপেয়া সে কম্‌তি নেহি লেগা"—কাজেই একটা পাঁচ টাকার নোট দিতে হল। পেছন ফিরতেই Chauffeur ফের ডেকে বললে, "হুজুর কুছ মিঠাই তো মিলনা চাই!"

"হাঁ, হাঁ, মিলবে বৈ কি! তা তুমি খাবে চল না?"

"নেহি হুজুর! হুঁয়া বৈঠ্‌কে খানে নেহি সেকেগা। কেত্‌না আদমি খাতা হ্যায়—কৈ ঠিকানা তো নেহি!"

ওঃ একেবারে ব্রহ্মচারী রে! লোকের সঙ্গে বসে খাবে না! হাজার রাগ হলেও উপায় নেই—তাকে খাবার দেবার ব্যবস্থা করে দিতে হল। ভদ্রলোক ভাবলেন, বিয়ের হাঙ্গাম শেষ হয়ে যাক্‌, একদিন সব বলবেন। কি রকম লোকের গাড়ী! Chauffeurকে কি মাইনে দেয় না নাকি? না এই থেকেই মাইনে তুলে নেয়?

সকালে যখন বর কনে নিয়ে যাবার সময় হয়েছে—তখন খেয়াল হল গাড়ীর কথা বলে দেওয়া হয় নি। কি অন্যায় হয়ে গিয়েছে! একবার বলে দিলেই গাড়ীটা পাওয়া যেত, তা আর হয়ে উঠল না। শুধু শুধু এই বালিগঞ্জ থেকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতে হবে। ট্যাক্সি ভাড়া কিন্তু সত্যই দিতে হল না—গাড়ী ঠিক সময়েই এসে হাজির হল। অবনীর বাপ তাড়াতাড়ি Chauffeurকে বললেন, "কৈ তোমায় তো সময় বলে দিই নি? ঠিক সময়ে এলে কি করে?"

"বাবুজী ভেজ দিয়া।"

"কা'র গাড়ী হে! বেশ ভদ্রলোক তো! না বলতে নিজে থেকে সময় বুঝে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওহে দেখ, কাল তোমার বখ্‌শীষ্‌টা দিতে বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল—"

"নেহি হুজুর বখ্‌শীষ হাম্‌ লেনে সেকেগা নেহি!"

"সে কি? কেন?"

"মনীবকা হুকুম নেহি—" কনের ভাই এতক্ষণ সব শুনছিলেন। আর চুপ করে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব; বললেন, "কার গাড়ী মশাই? এ রকম শয়তান driver

কেউ রাখে ? বখশীষ লেনেকা হুকুম নেহি ? কাল রাতকো তুম হাম্‌সে পাঁচ রুপেয়া লিয়া নেহি ?"

"আপ্‌সে রুপেয়া লেগা কেঁও ?"

"এঁ্যা ! বেটাকে কাল নিজে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়েছি, আর—"

"গাল মাত্‌ দেও ! আউর কৈ কো দিয়া হোগা !"

সবাই অবাক হয়ে চেয়েছিল। অবনীর বাবার দিকে ফিরে কনের ভাই বললেন, "মশাই, কাল ডেকে পাঠিয়ে টাকা নিয়েছে। দু'টাকা দিতে গেলাম, নিলে না—জোর করে পাঁচ টাকা আদায় করলে। ভেবেছিলাম সব হাঙ্গাম শেষ হয়ে গেলে তবে বলব। অম্লানবদনে বলে কি না 'আউর কৈ কো দিয়া হোগা !' আচ্ছা করে প্রহার দিলে তবে হয়।"

"প্রহার আমাকে না দিয়ে তোকে দেওয়ার বেশী দরকার" গলার কম্ফাটারটা খুলতে খুলতে Chauffeur বললে। অবনীর বাবা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এত সুন্দর একটা লোককে তিনি ছাতুখোর বলে ভুল করেছিলেন মাত্র তার গোটাকতক হিন্দি কথা, আর কম্ফাটার থাকার জন্য !

"কি লোক তুই ! বোনের বিয়েতে Chauffeurকে পাঁচ টাকা বখশীষও দিবি না। আমাদের তো জানালও নি। এত টাকা জমিয়ে করবি কি ?"

"তোর পাত্তা পাই কি করে বল ! কত দিন তোকে দেখি নি, তাই মনে পড়ে না।"

"তা পড়বে কি করে ! নিজের নিয়েই ব্যস্ত ! আমি কিন্তু তোর বোনের নাম শুনেই সন্দেহ করেছিলাম—বিশেষ যখন ঠিকানাটা জানলাম। তাই নিজেই Chauffeur সেজে গেলাম।"

"সত্য কাল তোকে কত কষ্ট দিয়েছি বল ত ?"

"যথেষ্ট হয়েছে—এখন তো আগে বর-কনে পৌছে দিয়ে আসি।"

অবনীর বাবা একটু আপত্তি করতে ভদ্রলোকটি বললেন, "কাল গিয়েছিলাম Chauffeur হিসেবে—আর আজ যাচ্ছি কনের ভাই হয়ে। এবার কিন্তু বখশীষ দিতে হবে আপনাদের।"

* * *

প্রীতি ভোজে Chauffeur-এর নিমন্ত্রণের ত্রুটি হয় নি।

"আজকে আমার প্রভাত হ'ল—"

শ্রীরামেন্দু দত্ত

(গান)

আজকে আমার প্রভাত হ'ল
শালের বনের শ্যামল মাথায়,
অরুণ আলোর বার্ত্তা এল
চিকণ সবুজ পাতায় পাতায় !
নীল পাহাড়ে সূর্য্য উঠি'
ছুড়্‌লো সোণা মুঠি মুঠি,
এই প্রভাতের শীতল হাওয়া
ঘুচায় সকল বিষণ্ণতায় !
আনন্দে আজ রঙীণ হ'ল
শিশির কণা পাতায় পাতায় !

গাছের শাখে ঐ যে ডাকে
নাম-না-জানা নতুন পাখী !
বনের কুসুম মনের মাঝে
যায় সুরভির পরশ রাখি' !
লতায় লতায় ফুলে ফুলে
ভোরের আলো উঠ্‌লো দুলে,
বন-দুলালী নয়ন তুলে
আনন-কুসুম রাঙ্‌লো রে তায় !
কানন-কুসুম ব্যাকুল হ'ল
রঙীণ আলোর চঞ্চলতায় !

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যু অতর্কিত না হইলেও অপ্রত্যাশিত। কারণ আট মাস পূর্ব্বে যখন বিশাল বৃটিশ সাম্রাজ্যে তাঁহার রাজত্বকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উৎসবানুষ্ঠান হইয়াছিল, তখনও কেহ জানিতেন না মৃত্যুর ছায়া তাঁহার উপর পতিত হইয়াছিল। উৎসবের শেষ দিন ৬ই মে (১৯৩৫ খৃষ্টাব্দ) তিনি যে বেতার-বিবৃতিতে তাঁহার প্রজাদিগকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলেন—

"আর যে কয় বৎসর আমি জীবিত থাকিব, সে কয় বৎসরের জন্য আমি আপনাকে তোমাদিগের কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম।"

তাঁহার এই উক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রতীচীর নিয়মতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত নৃপতির ও প্রাচীর "রাজা প্রকৃতিরঞ্জনাৎ"—আদর্শের অনুরূপ, সন্দেহ নাই। তিনি যে বিশেষভাবে এই আদর্শের অনুসরণ করিতে প্রয়াসী ছিলেন, তাহার পরিচয় তাঁহার জীবনে পাওয়া গিয়াছে।

তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান ঘটনাগুলি এইরূপ :—

জন্ম—৩রা জুন, ১৮৬৫ খৃঃ

বিবাহ—৬ই জুলাই, ১৮৯৩ খৃঃ

প্রিন্স অব ওয়েলস উপাধি লাভ—নভেম্বর, ১৯০১ খৃঃ

প্রথম ভারতে আগমন—১৯০৫ খৃঃ

সিংহাসন লাভ—৯ই মে, ১৯১০ খৃঃ

অভিষেকোৎসব—২২শে জুন, ১৯১১ খৃঃ

দিল্লীতে দরবার—১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১ খৃঃ

সিলভার জুবিলী উৎসব—৬ই মে, ১৯৩৫ খৃঃ

ভারত শাসন আইনে স্বাক্ষর দান—১৯৩৫ খৃঃ

মৃত্যু—২০শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ খৃঃ

তাঁহার রাজত্বকালের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা—জার্ম্মাণ যুদ্ধ।

বিলাতে মারলবরা হাউসে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুবরাজের দ্বিতীয় পুত্র; সুতরাং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অগ্রজের জন্মে যে উৎসবানন্দ লক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্মে তাহা হয় নাই। সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবন-চরিতে কেবল দেখা যায়—৩রা জুন যুবরাজ ও যুবরাজ-পত্নীর আর একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে ও ৭ই জুলাই রাণীর উপস্থিতিতে উইণ্ডসর চ্যাপেলে তাহাকে "ব্যাপ্টাইজ" করা হয়। রাণী তাহার নামকরণ করেন—জর্জ্জ ফ্রেডরিড আর্ণেষ্ট এলবার্ট।



মহারাণী ভিক্টোরিয়া

৬ বৎসর বয়সে জর্জ্জের শিক্ষাভার জন নাল ড্যালটনের উপর অর্পিত হয় এবং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উভয় ভ্রাতাকে

নৌবহরে শিক্ষানবিশ করা হয়। নৌ-সেনাবিভাগে কায করাই তখন জর্জ্জের অভিপ্রেত ছিল। সে সময় ইংলণ্ডের উপনিবেশসমূহ বিস্তার লাভ করিতেছিল। যুবরাজ স্থির করেন, পুত্রদ্বয়ের পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্য দর্শনে উপকার হইবে। তদনুসারে তাঁহারা সাম্রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। বিলাত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর আবশ্যক শিক্ষালাভ করিতে থাকেন ও



সপ্তম এডওয়ার্ড

জর্জ্জ নৌবহরে কায করিতে থাকেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ পীড়িত হইয়া পড়েন এবং তিনি যখন রোগশয্যায় তখন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া মেরীর সহিত অগ্রজের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়। ইহার পরই দুরন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জায় অগ্রজের মৃত্যুতে জর্জ্জ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েন এবং ভিক্টোরিয়া মেরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই বিবাহের সন্তান—

(১) প্রিন্স এলবার্ট এডওয়ার্ড (বর্ত্তমান সম্রাট)—২৩শে জুন, ১৮৯৪ ; (২) প্রিন্স জর্জ্জ (বর্ত্তমান ডিউক অব ইয়র্ক) —১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫ ; (৩) প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া—২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৭ ; (৪) প্রিন্স হেনরী উইলিয়ম এলবার্ট (বর্ত্তমান ডিউক অব গ্লষ্টার)—৩১শে মার্চ্চ, ১৯০০ ; (৫) প্রিন্স জর্জ্জ এডমণ্ড (বর্ত্তমান ডিউক অব কেণ্ট)—২০শে ডিসেম্বর, ১৯০২ ; (৬) প্রিন্স জন—(জন্ম—১২ই জুলাই, ১৯০৫, মৃত্যু—১৮ই জানুয়ারী, ১৯১৯)।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড নামে সিংহাসন লাভ করেন। দিল্লী দরবারের (১৯০২ খৃঃ) পরই বড়লাট লর্ড কার্জ্জন যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীকে ভারত-ভ্রমণে আসিতে বলেন বটে, কিন্তু সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড লিখেন, দরবার উপলক্ষে রাজন্যগণকে বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে—সুতরাং তাহার অব্যবহিত পরেই সস্ত্রীক যুবরাজের অভ্যর্থনায় তাঁহাদিগের পক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করা সঙ্গত হইবে না। সেই জন্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যুবরাজ জর্জ্জের ভারতে আগমন ঘটে নাই।

১৯১০ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে স্বল্পকালস্থায়ী ব্যাধিতে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যু হয় এবং ৯ই তারিখে জর্জ্জ রাজা ঘোষিত হয়েন।

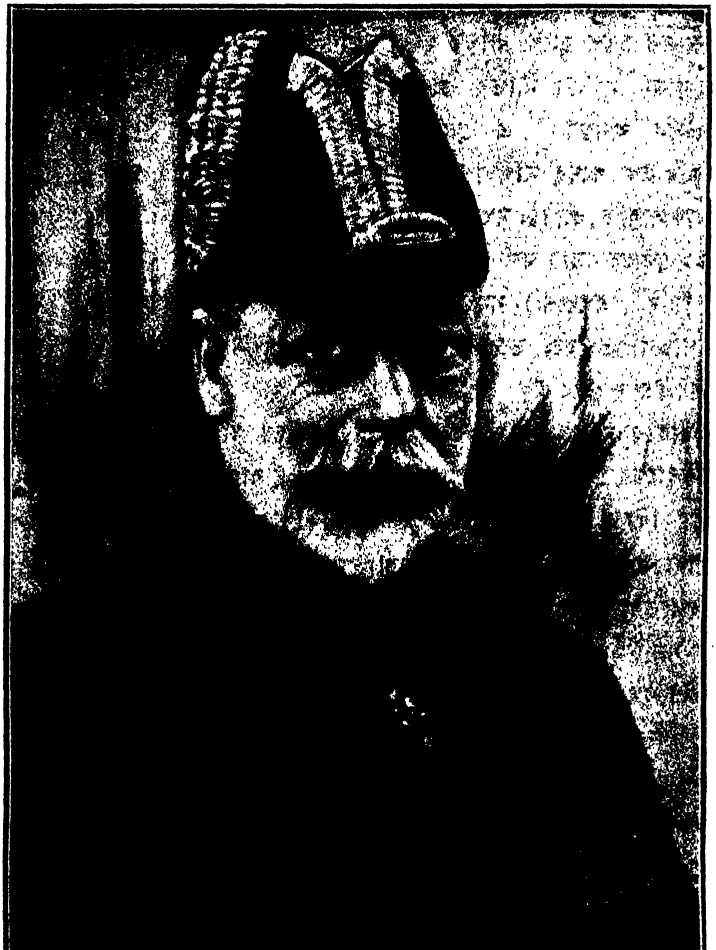
ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রথমবার ভারত-ভ্রমণ হইতে স্বদেশে ফিরিয়া তিনি রয়াল একাডেমীতে ভারতবর্ষের কথায় বলেন—ইহা বিস্ময়কর দেশ। ইহার বৈচিত্র্য, ইহার সৌন্দর্য্য ও ইহার স্থপতিকীর্ত্তি অসাধারণ।

এই বার তিনি তাঁহার স্বাভাবিক দয়ার যে পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখযোগ্য। তিনি যখন মহীশূরের রাজার আতিথ্য স্বীকার করেন, তখন রাজা যে সময় তাঁহাকে বনমধ্যে হস্তী ধৃত করা দেখাইতে লইয়া যাইতে-

ছিলেন, তখন পথিমধ্যে অগ্রগামী সিপাহীদিগের এক জন বাইক হইতে পড়িয়া আহত হয়। তথায় লোক দেখিয়া যুবরাজ স্বীয় যান হইতে অবতরণ করেন এবং তাহার জন্য জল আনাইয়া—তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া তবে সে স্থান ত্যাগ করেন।

বিলাতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরই তিনি ভারতে তাঁহার বাণী প্রেরণ করেন—সহানুভূতি। প্রজার সহিত এই সহানুভূতি তিনি নানা ক্ষেত্রেই দেখাইয়াছেন। জার্ম্মাণ যুদ্ধকালে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে আন্দোলন হয়—মদ্যপান বন্ধ না করিলে সমর-সরঞ্জাম উৎপাদনে বাধা ঘটিতেছে এবং জাহাজনির্ম্মাণকারীরা মদ্যপান নিষিদ্ধ করিতে বলিলে সম্রাট স্বয়ং মদ্যপান ত্যাগ করেন ও রাজপ্রাসাদে মদ্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়। ফ্রান্সে অশ্ব-পতনে তিনি আহত হইলে যখন চিকিৎসকদিগের উপদেশে কয় দিন পুনরায় মদ্যপান করেন, তখন চিকিৎসকদ্বয় বিবৃতি প্রকাশ করেন—সুস্থ হইলেই তিনি পুনরায় মদ্য বর্জ্জন করিবেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষা-বিস্তার তাঁহার বিশেষ অভিপ্রেত ছিল। সম্রাটরূপে ভারতে আসিয়া দিল্লীতে দরবারে তিনি যে ঘোষণা করেন, তাহাতেও এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছিল। দিল্লী দরবারের পর কলিকাতায় আসিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনন্দনের উত্তরে বলিয়াছিলেন, দিল্লীতে তাঁহার আদেশে ঘোষণা করা হইয়াছিল যে, সপার্ষদ বড়লাট শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার সাধনকল্পে অধিক অর্থ ব্যয় করিবেন। "আমার ইচ্ছা এই যে দেশের সর্ব্বত্র বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সেই সকলে যাহারা শিক্ষালাভ করিবে, তাহারা শিল্প, কৃষি প্রভৃতি সকল কার্য্যে আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিবে। ইহাও আমার অভিপ্রেত যে, জ্ঞান-বিস্তারের ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য ও চিন্তা সম্বন্ধে উচ্চতর ধারণার ফলে আমার ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের গৃহ সমুজ্জ্বল ও পরিশ্রম লঘু হইবে। শিক্ষার দ্বারাই আমার এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে এবং ভারতে শিক্ষা বিষয়ে আমি সর্ব্বদাই অবহিত থাকিব।"



পঞ্চম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই উক্তি মর্ম্মরফলকে ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছেন। এই উক্তি পাঠ করিলে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রচারিত জাপানের সম্রাটের ঘোষণা মনে পড়ে :—

"আমার উদ্দেশ্য এই যে, অতঃপর শিক্ষা এরূপ বিস্তার লাভ করিবে যে, কোন গ্রামে কোন অজ্ঞ পরিবার থাকিবে না—কোন পরিবারেই কোন লোক অজ্ঞ থাকিবে না।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্রবণ হইতে উদ্গত বিদ্যার পাবনী ধারা শত পথে প্রবাহিত হইয়া দেশের উন্নতিসাধন করিবে, ইহাই সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিপ্রেত ছিল।

শিক্ষার মত সমবায় নীতি সম্বন্ধেও তিনি আগ্রহশীল ছিলেন। নানা দরিদ্র দেশে এই নীতি যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধন করিয়াছে, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। আয়ার্লণ্ডে সার হোরেস প্লাংকেট প্রমুখ কর্ম্মীরা যখন দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের দুর্দ্দশা-দুঃখে ব্যথিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা স্থির বুঝেন সমবায় নীতির প্রবর্ত্তন ব্যতীত সে অবস্থার পরিবর্ত্তন অসম্ভব। এ দেশে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম কৃষকদিগকে ঋণের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টায় সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে সম্রাট জর্জ্জ বলেন :—

"যদি (এ দেশে) সমবায় নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রবর্ত্তিত ও পরিচালিত হয়, তবে এ দেশে কৃষকদিগের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হইবে।"

প্রজার মনোরঞ্জনে তাঁহার আগ্রহের পরিচয় আমরা বঙ্গবিভাগের পরিবর্ত্তনে পাইয়াছি। বঙ্গবিভাগ বাঙ্গালীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে করা হইয়াছিল বলিয়া বাঙ্গালী তাহাতে আপনাকে অপমানিত মনে করিয়াছিল এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। যুবরাজ-রূপে সম্রাট জর্জ্জ এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালায় আন্দোলনের প্রাবল্য লক্ষ্য করিয়া গিয়াছিলেন এবং সম্রাট হইয়া তিনি পূর্ব্বব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া বঙ্গ-ভাষাভাষীদিগকে এক-প্রদেশযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ না করিবার কোন কারণ আছে—ইহা তিনি মনে করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে আয়ার্লণ্ডে প্রজার অধিকার-বিস্তারে তাঁহার কৃত কার্য্য স্মরণীয়। যখন রাজপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত চণ্ড-নীতির অসাফল্য পদে পদে প্রতিপন্ন হইল, তখন তিনি স্বয়ং তথায় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতেই নূতন নীতি প্রবর্ত্তিত হয় :—

"I appeal to all Irishmen to stretch out the hand of forbearance and conciliation, to forgive and forget, and to join in making for the land which they love, a new era of peace and contentment and goodwill."

সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের রাজত্বকালে এ দেশে যে রাজনৈতিক অধিকার-বিস্তার ঘটিয়াছে, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। সেই সম্পর্কে প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে উল্লেখ করা গেল—

(১) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তন ও পরে নূতন ভারত-শাসন আইন বিধিবদ্ধ করণ ;

(২) ভারতবর্ষকে অর্থনীতি সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান ;

(৩) ভারতে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের আয়োজন ;

(৪) ভারতবাসীকে বিলাতের অভিজাত সম্প্রদায়ে গ্রহণ ;

(৫) ভারতবাসীকে সহকারী সচিবপদ প্রদান ;

(৬) সমর ও শান্তি পরিষদে ভারতবাসীর স্থান নির্দ্দেশ ;

(৭) ভারতবাসীকে গভর্ণর নিয়োগ ;

(৮) স্বরাজে ভারতবাসীর অধিকার স্বীকার।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার-ব্যবস্থায় ও তাহার পরবর্ত্তী ভারত-শাসন আইনে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে, এমন বলা যায় না। কারণ, যে দক্ষিণ আফ্রিকা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল এবং নানা স্থানে ইংরাজকে বিপন্নও করিয়াছিল, সেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে যে ভাবে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করা হইয়াছিল, ভারতবর্ষকে সে ভাবে তাহা প্রদান করা হইতেছে না। কিন্তু এই বিষয়ে দুইটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন—প্রথম, এ দেশে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠাই যে ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে ; দ্বিতীয়, এই সব বিধি-ব্যবস্থা করা রাজার ক্ষমতাতিরিক্ত—পার্লামেণ্টের অধিকারভুক্ত। নিয়মতন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত রাজা স্বীয় প্রভাবে মন্ত্রিমণ্ডলের নির্দ্ধারণ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন মাত্র।

ভারতবর্ষকে অর্থনীতি সম্বন্ধে যে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে, তাহার ফলে এ দেশে বয়নশিল্পের উন্নতির পথ সুগম হইয়াছে। পূর্ব্বে বিলাতের বয়নশিল্পের সুবিধার জন্য এ দেশের বয়নশিল্পেও কর সংস্থাপিত ছিল এবং সে ব্যবস্থা অসঙ্গত ও অন্যায় হইলেও তাহা বর্জ্জিত হয় নাই। প্রথম যখন এ দেশের এই শিল্পজ পণ্যের উপর কর বিদেশ হইতে আমদানী পণ্যের উপর কর অপেক্ষা কম হয়, তখন বিলাতে কাপড়ের কলওয়ালাদিগের আপত্তির উত্তরে ভারত-সচিব

(মিষ্টার চেম্বারলেন) বলেন, জার্ম্মাণ যুদ্ধে ভারতবর্ষ কেবল লোক দিয়াই বিলাতকে সাহায্য করিতেছে না ; পরন্ত অর্থ সাহায্যও করিতে চাহে এবং সেই জন্য আর্থিক প্রয়োজনে



সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড

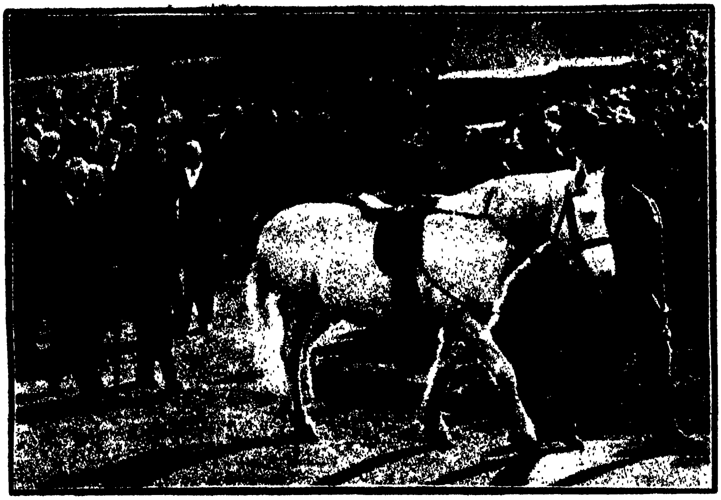
আমদানী পণ্যের উপর কর-বৃদ্ধি করা হইতেছে। কিন্তু তাহার পর বার, যখন ভারতীয় পণ্যের আরও সুবিধা করা হয়, তখন ভারত-সচিব (মিষ্টার মণ্টেগু) নিঃসঙ্কোচে বলেন—বিদেশী পণ্যের উপর শুল্ক প্রতিষ্ঠা ভারতে শিল্পের সংরক্ষণকল্পে প্রবর্ত্তিত হইতেছে এবং সেরূপ ব্যবস্থা করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবর্ষকে নূতন শাসন-ব্যবস্থায় প্রদান করা হইয়াছে। তাহার পর—ফিশক্যাল কমিশনের নির্দ্ধারণে—যে টারিফ বোর্ডের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নির্দ্ধারণ অনুসারে এ দেশে নানা শিল্পের জন্য সংরক্ষণ শুল্ক ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথমে শিল্প কমিশনের নির্দ্ধারণ ও সামরিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত মিউনিশন বোর্ডের অভিজ্ঞতা বিশেষভাবেই প্রতিপন্ন করিয়াছে, ভারতবর্ষে নানা শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে এবং কিছুদিনের জন্য সংরক্ষণ-



ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের শবাধার ; শবাধারের উপর সম্রাটের মুকুট স্থাপিত

শুল্কের সুবিধা পাইলে পরে সে সব শিল্প অনায়াসে বিদেশী শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে।

সমগ্র সভ্যজগতে আজ যে বেকার-সমস্যা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, কিসে তাহার প্রতীকার করা যায়, সে বিষয়ে পঞ্চম জর্জ্জের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জুন তারিখে বিলাতে এই সমস্যার আলোচনার জন্য ৬৬টি জাতির প্রতিনিধিদিগের যে সম্মিলন হয়, তাহাতে তিনি



সম্রাটের শবের শোভাযাত্রা। চিত্রের শ্বেত-অশ্ব 'জ্যাক' সম্রাটের বিশেষ প্রিয় ছিল—তাহাকে শোভাযাত্রার সম্মুখে লওয়া হইয়াছে

সে সম্বন্ধে তাঁহার উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর মৃত্যুর কয়মাস পূর্ব্বে যখন তাঁহার শাসনকাল ২৫ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় উৎসব উপলক্ষে তিনি তাঁহার বাণী ব্যক্ত করেন, তখনও তিনি বেকারদিগের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে সাহায্য করিতে বলিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষেই তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি আর যতদিন জীবিত থাকিবেন ততদিনের জন্য আপনাকে প্রজাপুঞ্জের কার্য্যে উৎসর্গ করিলেন।

সম্রাটরূপে ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি কলিকাতায় বলেন—"ছয় বৎসর পূর্ব্বে



নূতন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড তাঁহার তিন সহোদরের সহিত শব-শোভাযাত্রার সঙ্গে যাইতেছেন। সম্রাট এডওয়ার্ডের পার্শ্বে লর্ড হেয়ারউড

বিলাত হইতে আমি ভারতবর্ষকে সহানুভূতির বাণী প্রদান করিয়াছিলাম; আজ ভারতে আমি ভারতবর্ষকে বলিতেছি —আশাকে মূলমন্ত্র করিতে হইবে। (I give to India the watchword of hope) আমি চারিদিকে নূতন জীবনের চিহ্ন ও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিতেছি। শিক্ষা তোমাদিগকে আশা দিয়াছে—উন্নত শিক্ষার দ্বারা তোমরা উচ্চতর ও উন্নততর আশা গঠিত করিতে পারিবে।"

তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অষ্টম এডওয়ার্ড নাম গ্রহণ করিয়া পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন।

নূতন সম্রাট ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। পিতা এ দেশে আসিয়া বাঙ্গালায় যে আন্দোলন দেখিয়া গিয়াছিলেন, পুত্র সমগ্র ভারতে তদপেক্ষাও প্রবল আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আগমনকালে গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল। যুবরাজ যে দিন বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন, সে দিন হরতাল ঘোষিত হইয়াছিল এবং গান্ধীজী স্বয়ং সে দিন তথায় উপস্থিত ছিলেন। সে দিন যে জনতাকে অহিংসায় অবিচলিত রাখা সম্ভব হয় নাই, তাহাতে গান্ধীজী যত দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়াছিলেন, তত—হয়ত—আর কেহ হয়েন নাই। বাঙ্গালার আন্দোলনে কোথাও এরূপ বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয় নাই। কেবল বোম্বাইয়ে নহে, আরও নানা স্থানে তাঁহার আগমন দিবসে "হরতাল" হইয়াছিল। পিতা যে প্রজাদিগের রাজনীতিক অধিকার-বিস্তার-চেষ্টা-সমুদ্ভূত অনাচারকেও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন, তাহা নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে তাঁহার ঘোষণায় বুঝা যায়। তখন মাণিকতলার বোমার বাগানে ধৃত ব্যক্তিরাও দণ্ডভোগ করিতেছিলেন। তিনি বড়লাটকে উপদেশ দেন, দেশের শান্তি বিপন্ন না হইলে তিনি যেন সর্ব্ববিধ রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান করেন—কেন না তাঁহারা রাজনীতিক উন্নতিলাভের আগ্রহাতিশয্যে আইন ভঙ্গ করিয়াছেন—"Let those who in their eagerness for political progress broke the law in the past, respect it in the future."

অদূর ভবিষ্যতে ভারতে নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইবে। তাহাতে ভারতে সাম্রাজ্যান্তর্গত সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন প্রদত্ত হইবে না বটে, কিন্তু গণতন্ত্রনীতির মর্য্যাদা বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক রক্ষিত হইবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাজ্যের আদর্শানুগামী হইবে—এমন আশারও অবকাশ আছে।

মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ রাজনীতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদিগের প্রতি যে দয়া দেখাইয়াছিলেন, তাহার কারণোল্লেখে তিনি বলিয়াছিলেন—তাঁহার ইচ্ছা এই যে, সে সময় ভারতের প্রজা ও তাহাদিগের শাসকদিগের মধ্যে বিরোধভাবের অবসান হয়। তাহাই যে নূতন সম্রাটের অভিপ্রায়—ইহা আমরা অনুমান করিতে পারি। তিনি রাজা হইয়াই ঘোষণা করিয়াছেন, তিনি তাঁহার পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিবেন। তাই আমরা আশা করিতেছি, বিনা বিচারে যাহারা বন্দী হইয়া আছে, তাহাদিগের প্রতি সম্রাটের সদয় দৃষ্টি পতিত হইবে; তিনি যে ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতে পূর্ব্বে যাহারা আইনের বিধান ভঙ্গ করিয়াছে, ভবিষ্যতে

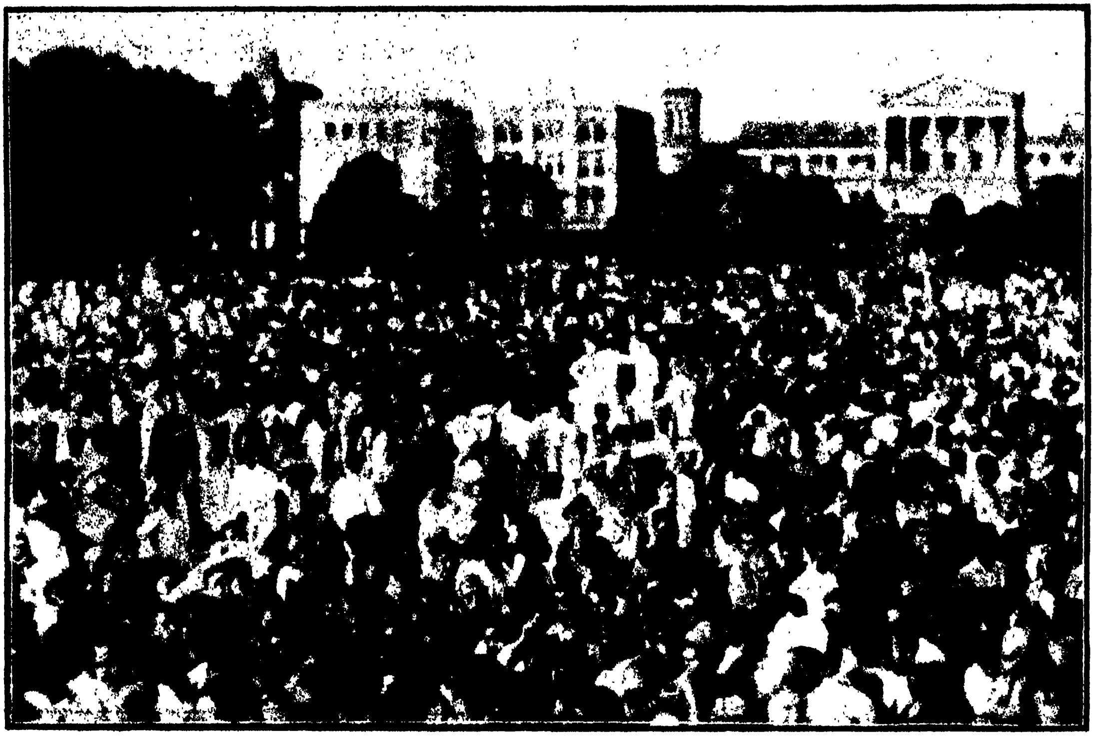


কলিকাতায় ময়দানে সম্রাটের শোকসভায় সমবেত জনতা—চিত্রে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, সার হরিশঙ্কর পাল প্রভৃতি ফটো—তারক দাস

তাহারা তাহা মানিয়া চলিবে—দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা দেশের লোকের সন্তোষের উপর প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ় হইবে।

নবপ্রবর্ত্তিত শাসন-সংস্কারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভার উদ্বোধন জন্য পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার পিতৃব্য ডিউক অব কনটকে এ দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি প্রজার প্রতিনিধি-রূপে বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীর বর্ত্তমান রাজনীতিক অবস্থার সহিত স্বৈর শাসনের সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে না—কাযেই ভারত-শাসনে স্বৈর-শাসন নীতি বর্জ্জন ভারতের ইতিহাসে নানা কারণে স্মরণীয়। ইহার মধ্যে ভারতবাসীর রাজনীতিক আকাঙ্ক্ষার যে পরিচয় প্রকট হইয়াছে, তাহা পঞ্চম জর্জ্জের মত তাঁহার পুত্র—বর্ত্তমান সম্রাটও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন এবং তাহাতে সহানুভূতি প্রদানেও কার্পণ্য করেন নাই।

যে ভাবে দক্ষিণ আফ্রিকা স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার পাইয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে, সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে ভারতবর্ষ সেই ভাবে স্বায়ত্ত-



সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের মৃত্যুতে কলিকাতার রাজপথে সঙ্কীর্ত্তনের দল ফটো—তারক দাস

করিতে হইবে। ভারতবাসীও ইহাই চাহিয়া আসিতেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের স্বায়ত্ত-শাসনশীল অংশসমূহের অধিবাসীরা যে সব রাজনীতিক অধিকার সম্ভোগ করে, ভারতবাসী সেই সব অধিকারই চাহিতেছে এবং পঞ্চম জর্জ্জ বলিয়াছিলেন, শাসন-সংস্কারে ভারতে সেই স্বাধীনতার আরম্ভ হইল। তাহার পর পঞ্চদশ বর্ষ গত হইয়াছে। এই সময় শাসনাধিকার প্রাপ্ত হইয়া সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করিবে—ইহাই আজ ভারতবাসীর কামনা। পিতা যে মন্দিরের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, পুত্র তাহার উপর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে ভারতবাসীর পূজাধিকার প্রদান করিবেন, এই কামনাই আজ তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার সময়—ভারতবাসীর হৃদয়ে সপ্রকাশ হইতেছে।

সাময়িকী

সার জন উডরফ—

য়ুরোপে কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারক ও তন্ত্রের নূতন ব্যাখ্যাকার সার জন উডরফের মৃত্যু হইয়াছে। সার জনের পিতাও কলিকাতা হাইকোর্টে এক জন অতি বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ছিলেন। যে সময় সার চার্লস গ্রিগরী পল, সার গ্রিফিথ ইভান্স, মিষ্টার হিল প্রভৃতি য়ুরোপীয় এবং উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সার তারকনাথ পালিত, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালী ব্যারিষ্টারদিগের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, সেই সময় সার জন উডরফের পিতা সার টি, উডরফ সেই সব উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের অন্যতম ছিলেন। ব্যারিষ্টার হইয়া পুত্র সার জন পিতার যশ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং অধ্যয়নের জন্য অধিক অবসর লাভ করিবার আশায় তিনি যখন জজের পদ গ্রহণ করেন, তখনও বিচারকরূপে তাঁহার খ্যাতি অল্পদিনেই বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

কিন্তু বড় ব্যারিষ্টার বা বিখ্যাত জজ হিসাবে পরবর্ত্তী কালের লোক সার জন উডরফকে স্মরণ করিবে না। অন্য কারণে তিনি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা ও সভ্য জগতের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। তিনি ভারতের পুরাতন সংস্কৃতির গৌরব উপলব্ধি করিয়া তাহার অনুরাগী হইয়াছিলেন এবং ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি—তন্ত্রের ব্যাখ্যা।

তাঁহার পূর্ব্বে অধিকাংশ বিদেশীই, অজ্ঞতা হেতু তন্ত্রের মূল তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে মানবের হীনবৃত্তির পরিপুষ্টিসাধক বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিতেন। আর আমরাও সেই সব বিদেশীর মতই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতাম। এমন কি ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজ লেখক তান্ত্রিক মতকে আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গের ম্যালেরিয়া-পীড়িত অধিবাসীদিগের বিকৃত মনোভাবের ফল বলিয়া মত প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।—

"It is in the most malarious regions of Eastern Bengal and Assam that we have the religion of necromancy, of charms and spells of Tantric rites which remind the scholar so vividly of the practices which characterised the decay of the Roman Empire."



সার জন উডরফ

ইংরাজ লেখকরা বলিতেন, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বীভৎসতা একরূপ মানসিক বিকারের ফল এবং সে বিকার হয়ত পুনঃ পুনঃ জ্বরে জীর্ণ হওয়ার দৌর্ব্বল্য হইতে উদ্ভূত।

আজ যে এই মত হাস্যোদ্দীপক অজ্ঞতার পরিচায়ক বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সত্যসন্ধিৎসার লোক কুণ্ডলিনীর রহস্য-ভেদে ও যন্ত্রমন্ত্রের স্বরূপ নির্ণয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, সার জন উডরফের কার্য্য তাহার প্রধান কারণ।

লর্ড জেটলাণ্ড বলিয়াছিলেন, য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই তন্ত্র সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান বিশেষজ্ঞ। কেবল তাহাই নহে—সার উইলিয়ম জোন্স যেমন অবজ্ঞাত সংস্কৃত সাহিত্যের স্বরূপ দেখাইয়া তাহাকে সমগ্র সভ্য জগতে সম্পূজিত করিয়াছিলেন, সার জন উডরফ তেমনই ঘৃণিত তান্ত্রিক ধর্ম্মের উচ্চাঙ্গের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝাইয়া তাহাতে নিহিত ভারতীয় প্রতিভা-স্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন।

কিরূপে তিনি প্রথম তন্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু আকৃষ্ট হইয়াই তিনি অসাধারণ উৎসাহ, আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহকারে তাহাতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। সে কার্য্যে তাঁহার গুরু হইয়াছিলেন শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব; আর সহকর্ম্মী—অটলবিহারী ঘোষ। শিবচন্দ্রের মত তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত সচরাচর—বঙ্গদেশেও দেখা যায় না। উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া গুরু যে বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। অটল বাবু কলিকাতা স্মল কজেস্ কোর্টের উকীল ছিলেন। তাঁহার সহিত সার জনের বন্ধুত্ব এত ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল যে মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ যেন অটল বাবুকে তার করা হয়। তারে সেই দুঃসংবাদ যখন অটল বাবুর উদ্দেশে পাঠান হয়, তাহার চারিদিন পূর্ব্বে তিনিও মহাযাত্রা করিয়া—বন্ধুর পূর্ব্বগামী হইয়াছেন।


উপরে ভারতীয়ের বেশে সার জন উডরফ ও তাঁহার সম্মুখে অটলবিহারী ঘোষ উপবিষ্ট

১৮৬৫ খৃঃ অঃ সার জনের জন্ম হয়। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন ও ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৯০ খৃঃ অঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের কায আরম্ভ করেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হইয়া ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে জজ নিযুক্ত হয়েন। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিবার পর তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আইনের অধ্যাপক হইয়া ছিলেন।

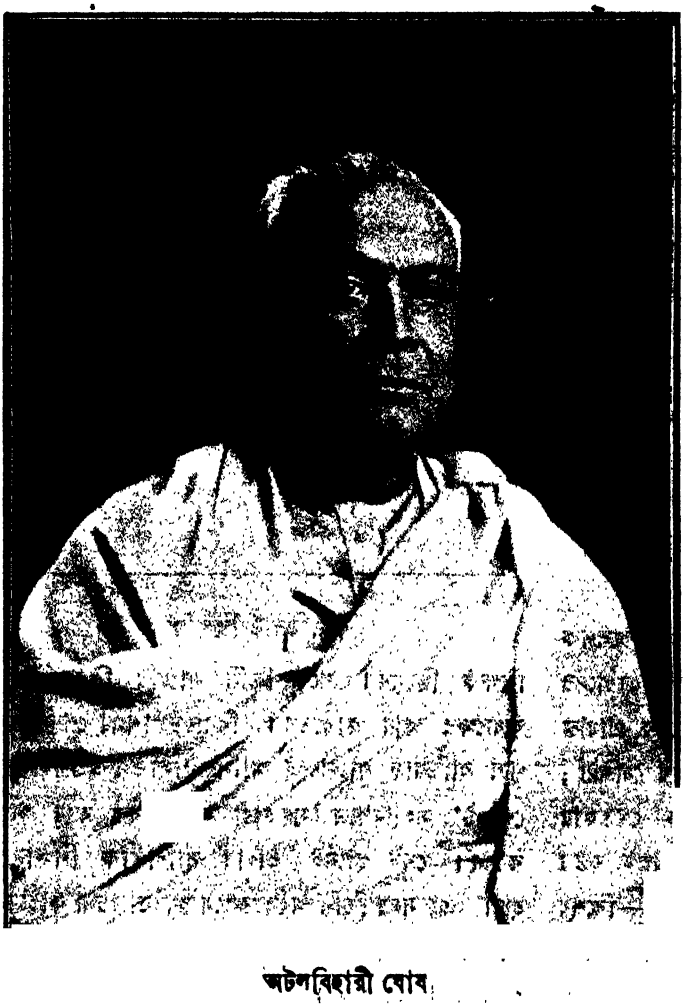
মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

এ দেশের সভ্যতার প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল এবং এ দেশে পুরুষদিগের ও স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষা যে জাতীয়তার ভিত্তিভ্রষ্ট হইলে ব্যর্থ হইবে, ইহাই তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মহাকালী পাঠশালায় ছাত্রীদিগকে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তিনি তাহার সমর্থক ছিলেন। আজ

যখন এ দেশে শিক্ষা-সংস্কারের কথা আলোচিত হইতেছে, তখন আমরা সকলকে স্যাডলার কমিশনের জন্য লিখিত সার জনের বিবৃতি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। এ দেশের পুরাতন শিল্পের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কত প্রবল ছিল, তাহা বেঙ্গল হোম ইণ্ডাষ্ট্রিজ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠাকালে তাঁহার উদ্দেশ্য বিবৃতিতে দেখা যায়। যে বিবৃতি সার জনের লিখিত।

"আর্থার এভেলন" ছদ্মনামে তিনি—অটল বাবুর সহযোগে ও একাধিক পণ্ডিতের সাহায্যে বহু তন্ত্র গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন. এবং স্বয়ং নানা পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া তন্ত্রের তত্ত্ব ও ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন।

যে নীলাচলে জগন্নাথের মন্দিরে সাধনা শেষ করিয়া চৈতন্যদেব নীলাম্বুবিস্তারমধ্যে নীলমণিময় দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া—নীলাম্বুকল্লোলে তাঁহার বংশীধ্বনি শুনিয়া সাগরের নীলজলে মধ্যে বিলীন হইয়াছিলেন—সেই জগন্নাথ-ক্ষেত্রের নীলাম্বুবেলায় সার জনকে নগ্নপদে ভ্রমণ করিতে করিতে চিন্তাযুক্ত অবস্থায় অনেকে দেখিয়াছেন। তিনি কি তখন হিন্দুসভ্যতার ও হিন্দুধর্ম্ম-তত্ত্বের রহস্যভেদ চেষ্টাই করিতেন? জাম্ববতী-তনয় শাম্ব অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য পিতৃকর্ত্তৃক অভিসম্পাতপ্রাপ্ত হইয়া যে অর্কক্ষেত্রে আসিয়া দ্বাদশবর্ষকাল শান্ত, দান্ত, নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় হইয়া সাধনার ফলে সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরের আশীর্ব্বাদে পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন, সেই কণার্ক মন্দিরে তিনি বাঙ্গালীর বেশে যখন নবগ্রহাদি শিল্পকীর্ত্তি তন্ময় হইয়া দেখিতেন, তখন কি তিনি ধ্যানমগ্নই হইতেন? স্মরণাতীত কাল হইতে যে ভুবনেশ্বর লক্ষ লক্ষ ভক্তের পূজাপূত—সেই ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাহিরে বাঙ্গালীর বেশে - নগ্নপদে—উত্তরীয়াচ্ছাদিত দেহে তিনি যখন উপবিষ্ট থাকিতেন, তখন কি তিনি মন্দিরের দেবতাকে নিবেদন জানাইতেন—ভিন্ন জাতির মধ্যে ও ভিন্ন ধর্ম্মের অঙ্কে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে মন্দিরে প্রবেশের অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছেন, জন্মান্তরে যেন তাহাতে প্রবেশের অধিকার লাভ করেন? কে বলিতে পারে?



অটলবিহারী ঘোষ

আজ এই বিদেশী ভারত-বন্ধুর জন্য ভারতবর্ষ—বিশেষ তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র ও সাধনার স্থান বাঙ্গালা—বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছে। তাঁহার কৃত কার্য্য যেমন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে, তেমনই স্বভাবতঃ কৃতজ্ঞ ভা র ত বা সী—বিশেষ বাঙ্গালী কখন শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহাকে স্মরণ করিতে বিরত হইবে না।

অটলবিহারী ঘোষ—

গত ২৭শে পৌষ ৭২ বৎসর বয়সে অটলবিহারী ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। অটল বাবু একই বৎসরে বি, এ, ও এম, এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উকীল হইয়া কলিকাতা ছোট আদালতে ব্যবহারাজীবের কায আরম্ভ করেন। তিনি জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর

কাল ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সার জন উডরফের সহিত একযোগে তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার ও ব্যাখ্যার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। উকীল অবস্থায় সার জনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। উভয়ে একযোগে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করিতে থাকেন। পরে পাতিয়ালার রাজন্য মহারাজার ও মহারাজা সার রমেশ্বর সিংহের (দ্বারবঙ্গ) বদান্যতায় "আগমানুসন্ধান সমিতি" প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয়ে তান্ত্রিক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন। অটলবাবুর ও সার জন উডরফের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ ১৯ খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই সব গ্রন্থে দেবনাগর অক্ষরে মূল ও ইংরাজীতে টীকা ও ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজী অনুবাদও অবজ্ঞাত হয় নাই। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, গত ২৫ বৎসর কাল যে কায করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয় নাই; কেন না লোক এখন তন্ত্রের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা বর্জ্জন করিয়া তাহার স্বরূপ জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে। মৃত্যুকালে তিনি কালিদাসের অপ্রকাশিত কবিতা 'চিদ্‌গগন-চন্দ্রিকা' প্রকাশে ব্যাপৃত ছিলেন।

অটলবাবু নিরহঙ্কার ছিলেন এবং তাঁহার মত সংস্কৃত পণ্ডিত বিরল হইলেও তাঁহার ব্যবহারফলে ও আত্মগুণ-গোপন-স্পৃহার জন্য—অনেকে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয় অবগতও ছিলেন না। "আর্থার এভেলন" ছদ্মনামে সার জন ও অটল বাবু পুস্তক প্রকাশ করিতেন।

অটলবাবুর মৃত্যুতে আমরা একজন পরম পণ্ডিত হারাইলাম।

রাডিয়ার্ড কিপলিং—

বিলাতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—কবি ও গল্পলেখক রাডিয়ার্ড কিপলিংএর মৃত্যু হইয়াছে। তিনি সাম্রাজ্যবাদের কবি ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; ইংরাজের প্রাধান্য—ইংরাজের গৌরব কীর্ত্তন করাই তাঁহার রচনার বৈশিষ্ট্য; আর শ্বেত জাতির গর্ব্বও তিনি সমর্থন করিতেন—শ্বেতকায় জাতিরা যেন অন্যান্য জাতির কল্যাণ সাধনের জন্যই সৃষ্ট। সুতরাং তাঁহার রচনা যে শ্বেতকায়দিগের নিকট—বিশেষ ইংরাজের বিশেষ আদৃত তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না। কোন কোন কবিতার জন্য তিনি প্রতি শব্দে প্রায় ২ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইয়াছেন।

কিপলিং যে নানা শ্রেণীর জীবের ও মানুষের বিষয় সরস রচনায় বিবৃত করিতে পারিতেন, তাহার কারণ সন্ধান করিয়া কোন প্রসিদ্ধ সমালোচক বলিয়াছেন, যে ভারতবর্ষে জন্মান্তরবাদ আদৃত সেই ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করায় তিনি নিশ্চয়ই এই দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

বোম্বাই সহরে কিপলিং জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁহার পিতা—শিল্পী লকউড কিপলিং—তথায় শিল্প বিদ্যালয়ে



রাডিয়ার্ড কিপলিং

শিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি লাহোর শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যক্ষের কায করিতেন। বিলাতে শিক্ষা শেষ করিয়া পুত্র রাডিয়ার্ড লাহোরেই আসিয়া 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট' সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদকের কায আরম্ভ করেন। সেই স্থানেই তাঁহার সাহিত্যিক শিক্ষানবিশী হয়। এই সময় তিনি অবসরকালে কবিতা রচনা করিতেন। লাহোরের উদ্যানে যে ব্যাণ্ড বাজিত তাহারই সুরে তিনি গান রচনা করিতেন। সেগুলি 'সিভিল এণ্ড মিলিটারী

গেজেটে' প্রকাশিত হইত। তিনি লিখিয়াছেন, ছাপাখানার ফোরম্যান রুকন-দীন সে গুলির খুব আদর করিত; বলিত —"আপনার কবিতা খুব ভাল –আজ ঠিক যতটুকু জায়গা খালি ছিল, তাহার মত হইয়াছে।" সে সেগুলি "পাদ-পূরণে" ব্যবহার করিত। আর কম্পোজিটর মামুদ আসিয়া কবিতা চাহিত—"এক আউর চীজ।"

ক্রমে এই সব কবিতা আদৃত হয় এবং তিনি সেগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশের আয়োজন করেন। কাগজের এক পৃষ্ঠায় ছাপা ও "বালীর" কাগজে বাঁধা পুস্তকের মূল্য ১ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া তিনি সকল বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের নিকট উহা—পত্র লিখিয়া—পাঠাইয়া দেন। গ্রন্থকার ও প্রকাশক দুই-ই এক। ইহাই তাঁহার প্রথম পুস্তকের জন্মের ইতিহাস।

লাহোরের দুরন্ত গ্রীষ্মে ছাপাখানায় কম্পোজ ঘর অপেক্ষাকৃত শীতল বলিয়া তিনি তথায় বসিয়া রাত্রিতে রচনা করিতেন। তখন তিনি ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, কিপলিং চঞ্চল ছিলেন এবং কলমভরা কালী এমনভাবে ছড়াইতেন যে দিনশেষে তিনি যখন গৃহে ফিরিতেন তখন তাঁহার সাদা কোট প্যাণ্টালুন কালীর ছাপে চিত্রিত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষে বাসকালে যুবক রাডিয়ার্ড অত্যন্ত আমোদ-প্রিয় ছিলেন। সাত বৎসর ভারতবর্ষে নানা স্থান ও নানা রূপ লোক লক্ষ্য করিয়া তিনি রচনার বিচিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যে ইংরাজ সে কথা তিনি ইংরাজের স্বাভাবিক গর্ব্বসহকারে সর্ব্বদাই স্মরণ করিতেন। ইংরাজ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন:—

করে বটে বাস তা'রা দেশ দেশান্তর,
হৃদয় তা'দের কিন্তু রহে এক স্থানে;
জননীর মুখে শুনি' শিশুর অন্তর—
সুদূর ইংলণ্ড তা'র দেশ বলি' জানে।

তাঁহার মতে সাগরে ইংরাজের প্রাধান্য বিশেষ গর্ব্বের বিষয়। তিনি গর্ব্বভরে লিখিয়াছেন—

"সিন্ধুর আহার মোরা জোগায়েছি সহস্র বৎসর।"

সাময়িক নানা বিষয়ে তিনি কবিতা রচনা করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে রচিত ক্ষুদ্র কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সেই কবিতায় প্রথম পাঠকরা বুঝিতে পারেন, সাম্রাজ্যবাদের কবি রাডিয়ার্ড সময় সময় গম্ভীরভাবে মানবের অন্তর্নিহিত ভাবের অভিব্যক্তি অনুভব করিয়া থাকেন। সেই কবিতায় তিনি দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিয়া বলেন, ইংরাজ যেন সম্পদের ও সমৃদ্ধির গর্ব্বে তাঁহাকে বিস্মৃত না হয়; কেন না—সম্পদ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। বোধ হয়, ভারতের শিক্ষা ও প্রভাব তাঁহার ইংরাজ-প্রকৃতিগত ঔদ্ধত্য ও গর্ব্ব সংযত করিয়াছিল। সে প্রভাব সময় সময় তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করিত।

তাঁহার বহু ক্ষুদ্র গল্পে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি কয়খানি উপন্যাস রচনাও করিয়াছিলেন।

বলা বাহুল্য, ইংরাজী সাহিত্যে ঔপন্যাসিক থ্যাকারের সহিত তাঁহার তুলনা হইতে পারে না। কিন্তু এ কথা অনায়াসে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যে সব ইংরাজ সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে থ্যাকারের পর রাডিয়ার্ড কিপলিংএর মত যশ অর্জ্জন করা আর কাহারও ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। অবশ্য থ্যাকারে মানব-প্রকৃতি নখদর্পণে দেখিতেন এবং তিনি মানব-প্রকৃতির চিত্রকর; আর রাডিয়ার্ড কিপলিং ইংরাজের সাম্রাজ্যবাদের কবি। এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সাংবাদিক তাঁহাকে Banjo-bard of the Empire নামেও অভিহিত করিয়াছেন।

রাডিয়ার্ড কিপলিং ভারতীয় প্রভাবের পরিচয় তাঁহার বহু রচনায় রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার অনেক রচনার উপকরণ তিনি ভারতবর্ষ হইতেই সংগ্রহ করিয়া ইচ্ছানুসারে সে সকলের ব্যবহার করিয়াছিলেন।

মূক ও বধির শিল্পী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চৌধুরী—

মানুষের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম তাহার অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে উন্নতির পথে কতদূর লইয়া যাইতে পারে, তাহা মূক ও বধির শিল্পী বিপিনবিহারী চৌধুরী মহাশয়ের পরিচয় হইতে জানিতে পারা যায়। বিপিনবিহারীর বয়স বর্ত্তমানে মাত্র ২৬ বৎসর; তিনি প্রথমে কলিকাতায় মূক বধির বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন; তথায় তিনি কথা বলিতে

সমর্থ হন এবং বৎসর বৎসর সকল পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার লাভ করিতে থাকেন। বিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলিয়া তাঁহাকে এক সময়ে তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রোনাল্ডসের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছিল। তাহার



মিঃ লয়ার্ডজর্জ্জ (পেন্সিলে অঙ্কিত)

পর গভর্ণমেণ্টপ্রদত্ত বৃত্তি লাভ করিয়া তিনি ছয় বৎসর কলিকাতা আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন—সেখানেও



নৃত্যকারী দল

তিনি সহপাঠী সকল ছাত্রকে পরাজিত করিয়া বহু পুরস্কার ও মেডেল লাভ করিয়াছিলেন। শেষ পরীক্ষায় তিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। কিছুকাল বোম্বাই আর্ট স্কুলে শিক্ষা লাভের পর ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে তিনি লণ্ডনে গমন করেন। তিনি অর্থহীন অবস্থায় লণ্ডনে পৌছিয়া নিজ



বিপিনচন্দ্র চৌধুরী ও অন্যান্য দেশবাসী মূক-বধিরগণ

চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ের দ্বারা রয়াল আর্ট কলেজে প্রবেশ করেন। প্রথম পরীক্ষার সময়েই পরীক্ষকগণ তাঁহার



শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী এ-আর-সি-এ (লণ্ডন)
মূক বধির আর্টিষ্ট

অসামান্য প্রতিভা দর্শনে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন; তাঁহাদের অনুগ্রহে এবং হাই-কমিশনার সার ভূপেন্দ্র নাথ মিত্র ও

ব্যবসায়ী সার আলেকজাণ্ডার মারে'র অর্থ সাহায্যে তিনি তিন বৎসর তথায় শিক্ষা লাভ করেন।

তিনি ভারতের কমার্শিয়াল আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান আহরণ করেন এবং রয়াল কলেজ হইতে পেন্টিং-এর ডিগ্রী লাভ করেন। উক্ত কলেজের প্রিন্সিপাল সার রথেনষ্টিন বিপিনবিহারী সম্বন্ধে জানাইয়াছেন—"ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে তিনি দেশের উপকার করিতে সমর্থ হইবেন।" বিলাতের 'ডেলি মেল' 'ডেলি মিরার' প্রভৃতি পত্রে তাঁহার নৈপুণ্যের প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে কলিকাতার 'ষ্টেটসম্যান' এবং বোম্বায়ের 'টাইমস্ অফ ইণ্ডিয়া' তাঁহার প্রশংসা ও পরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিপিনবিহারীর অঙ্কিত যে দুইখানি চিত্র সর্ব্বত্র সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে, আমরা তাহা এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম। একখানি "পেন্সিলে অঙ্কিত মিঃ লয়াড জর্জ্জের প্রতিকৃতি"। এই ছবিখানি দেখিয়া বিলাতের শ্রমিকদলের নেতা খ্যাতনামা রাজনীতিক মিঃ ল্যান্সবারী ইহার নৈপুণ্যে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। অপর চিত্রখানিতে 'একদল নর্ত্তকী' প্রদর্শিত হইয়াছে। মহামান্য আগা খাঁ দ্বিতীয় চিত্রখানির অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। বিলাতস্থ ভারতীয় হাই কমিশনার তত্রস্থ "ইণ্ডিয়া হাউস" সাজাইবার জন্য চিত্র দুইখানি রাখিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতায় "শিক্ষা সপ্তাহ"—

সোৎসাহে কলিকাতায় "শিক্ষা-সপ্তাহ" অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার গভর্ণর, বাঙ্গালার শিক্ষা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী প্রভৃতি বক্তৃতা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে যে কি ফল ফলিবে—কি জন্য যে এই অর্থব্যয়—তাহা বুঝা যায় না। যে স্থানে বাঙ্গালার নানা স্কুল ও কলেজের প্রায় ১৭ শত প্রতিনিধি সমবেত হইয়াছিলেন—সে স্থানে যে বক্তৃতা ও সভাশোভন ব্যতীত শিক্ষা-বিষয় প্রকৃত আলোচনা হইতে পারে, তাহা মনে হয় না। ইংরাজীতে যাহাকে demonstrative বলে—এই অনুষ্ঠান তাহা হইতে পারে, শোভার্থ মাত্র হয়; কিন্তু যাহাকে deliberative বলা হয়, তাহার আশা করা যায় না। নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বাহ্নে এই নূতন অনুষ্ঠানে মন্ত্রীর উদ্যম প্রকাশ পাইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—ইহাতে "কি লভিনু?" তবে কোন সন্তোষজনক ও উৎসাহপ্রদ উত্তর পাওয়া যায় কি?

বলা বাহুল্য মন্ত্রী তাঁহার উদ্বোধন-বক্তৃতায় অনেক বড় কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এখন শিক্ষার শক্তি আর বিদ্যালয়েরই বদ্ধ নহে; পরন্তু পাঠাগার, যাদুঘর, রঙ্গালয়, ব্যায়াম-সম্মিলন, সভা, ক্ষেত্র, কলকারখানা, সংবাদপত্র প্রভৃতির সাহায্যেও তাহা ব্যাপ্তিলাভ করিতেছে। আর এখন সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ আরম্ভ হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার প্রচারিত—নানা ত্রুটিপূর্ণ—বিবৃতির উল্লেখ করেন ও বলেন, শিক্ষাবিস্তার ও শিক্ষার উন্নতি সাধনই সে বিবৃতির মূল কারণ।

"It is in this spirit of critical analysis that in tackling the problems of education, we intend to initiate in this Eduation Week, a programme of work which attempts a new orientation, through a variety of channels, in order that its extension and projection may permeate every school in Bengal."

শিক্ষার নূতন ব্যবস্থার কোন পদ্ধতি-পরিচয় কিন্তু আমরা কাহারও বক্তৃতায় পাইলাম না। পরন্তু আমাদিগের মনে হয়, যে সরকার আজও বাঙ্গালায় প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে পারিলেন না, সে সরকারের পক্ষে এবং যে মন্ত্রী নির্ব্বিকারভাবে ঘোষণা করিতে পারেন, মাসিক ১৫ টাকা হইতে ২০ টাকা বেতনে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় সে মন্ত্রীর পক্ষে—শিক্ষা-পদ্ধতির প্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধনের কথা না বলিলেই শোভন হয়।

যে দিন মন্ত্রীর এই বক্তৃতা হয়, তাহার পরদিনই ভারত সরকারের শিক্ষা কমিশনার সার জর্জ্জ এণ্ডার্শন বলেন—যে সকল কারণে শিক্ষার গতি প্রহত হইতেছে, সে সকলেরই উচ্ছেদ-সাধন শিক্ষাবিভাগের সাধ্যাতীত। তিনি সে সকল কারণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দারিদ্র্যের উল্লেখ করেন—

নানারূপ দারিদ্র্য এই পথে বিঘ্ন বিস্তার করিতেছে। সরকারের ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির অর্থাভাব। আবার দেশের জনগণের দারিদ্র্য এমন মর্ম্মন্তুদ যে, তাহারা দেহে প্রাণরক্ষা করাই দুষ্কর বলিয়া অনুভব করে; সুতরাং

সন্তানদিগকে শিক্ষার্থ নিযুক্ত না করিয়া অন্নার্জ্জনের কার্য্যে নিযুক্ত করিতে বাধ্য হয়। ইহা ভিন্ন ব্যাধির বিস্তার শিক্ষাবিস্তার পথ বিঘ্নাস্থত করিতেছে এবং যাতায়াতের অসুবিধাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সর্ব্বাগ্রে আমরা সরকারের অর্থাভাবের আলোচনা করিব। লর্ড মেষ্টন এ দেশে প্রাদেশিক ছোট লাট ও ভারত সরকারের অর্থ-সচিব ছিলেন। প্রদেশসমূহের সহিত ভারত সরকারের যে আর্থিক ব্যবস্থায় বাঙ্গালা তাহার আয়ে ব্যয়সঙ্কুলান করিতে পারিতেছে না—সে ব্যবস্থার জন্ম তিনি দায়ী। সে দিন কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনের স্বার্থরক্ষার্থ এ দেশে আসিয়া তিনি মত প্রকাশ করিয়াছেন—সর্ব্ববিধ ব্যয়বাহুল্যের উপর কর ধার্য্য করিয়া সরকার আয়-বৃদ্ধি করিলে ভাল হয়। যদি এই নীতি অবলম্বনীয় হয় তবে কি সর্ব্বাগ্রে সরকারকেই কর দিতে হয় না? তিনি বিবাহের ব্যয়ের উপরও কর স্থাপন করিতে বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি যে সিভিল সার্ভিসে চাকরীর ফলে প্রভূত অর্থ অর্জ্জন করিয়া এ দেশ হইতে গিয়াছেন, সেই সার্ভিসের লোকের বেতন-বাহুল্যের বিষয় মনেও করেন নাই। অথচ পৃথিবীর আর কোন দেশে সিভিল সার্ভিসে এত অধিক বেতনের ব্যবস্থা নাই। কেবল তাহাই নহে—প্রচলিত শাসন-পদ্ধতিতে যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন, তাঁহারাও সেই সার্ভিসে বিদেশী চাকরীয়াদিগের অত্যধিক বেতনের তুল্য বেতন সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন। সে বেতন যে দরিদ্র দেশের লোকের আয়ের তুলনায় অত্যন্ত অধিক তাহা মনেও করেন নাই। ইহাতে যে সরকারের অর্থাভাব অনিবার্য্য তাহা বলা বাহুল্য। "শিক্ষা-সপ্তাহের" অনুষ্ঠান করিয়া বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে শিক্ষকদিগকে আনিয়া সভাশোভন করিলে যে শিক্ষা-প্রণালীতে প্রকৃত উন্নতি প্রবর্ত্তনের কোন উপায় হইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

শিক্ষাবিভাগের মন্ত্রী তাঁহার বিবৃতিতে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের আভাস দিয়াছেন, তাহার দ্বারা যে প্রকৃত উপকার হইবে—বর্ত্তমান শিক্ষার ত্রুটি দূর হইবে, এমন মনে করিবার কোনই কারণ নাই। শিক্ষার ত্রুটির বিষয় এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধনকালে বাঙ্গালার গভর্ণরও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সে সব ত্রুটি সংশোধনের জন্ম সরকার কি করিতেছেন? আজ যে শিক্ষার ত্রুটির দিকে সরকারের দৃষ্টি পতিত হইয়াছে, বেকার-সমস্যার উগ্রতাই কি তাহার কারণ নহে? অথচ যে শিক্ষায় ছাত্রদিগের মধ্যে বেকার-সমস্যাই বিস্তারলাভ করিতেছে, ছাত্রীদিগকেও সেই শিক্ষা প্রদান করা হইতেছে! যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান দৌর্ব্বল্য কোথায়, তাহা কি লক্ষ্য করা হইতেছে? এই শিক্ষার সহিত এ দেশের অবস্থা ব্যবস্থার, সমাজের সংস্কৃতির কোন সম্বন্ধ নাই এবং প্রধানতঃ সেই জন্মই ইহার ফলে সমাজের ভিত্তি শিথিল হইয়া যাইতেছে। যে শিক্ষার সহিত জাতির বৈশিষ্ট্যের সম্পর্ক নাই, সে শিক্ষা বিদ্যাকে কেবল অর্থকরী মনে করায় প্রকৃত ফলপ্রদ হইতে পারে না। এ দেশে ইংরাজ যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহা দেশীয় দীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—সর্ব্বতোভাবে বিদেশী। গত শত বৎসরে ইহার প্রভাব সমাজে অনিষ্ট-সাধনই করিয়াছে—ইহা যদি শত শত লোকের অন্নার্জ্জনের উপায় করিয়া দিয়া থাকে, তবে সহস্র সহস্র লোককে বৃত্তিচ্যুত করিয়াছে, সমাজে যে স্তর-বিভাগ ছিল তাহা নষ্ট করিয়া কাঞ্চন-কৌলিন্যের প্রবর্ত্তন করিয়াছে, সমাজ হইতে সন্তোষের নির্ব্বাসন সাধন করিয়াছে এবং যত দিন যাইতেছে ততই দেখা যাইতেছে—ইহা মনীষার স্ফুরণেও সহায় হইতে পারিতেছে না।

স্যাডলার কমিশনের মত বিশেষজ্ঞ-সঙ্ঘ যখন শিক্ষায় আবশ্যক পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তনের প্রকৃত উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই, তখন যে কয়দিনের শোভাসভারূপে "শিক্ষা-সপ্তাহের" অনুষ্ঠান করিয়া শিক্ষাদানকার্য্যে শিক্ষানবিশ মন্ত্রী তাহা করিতে পারিবেন, এমন আশা কখনই করা যায় না। ইহা বিজ্ঞাপনের উপায় ও নির্ব্বাচনের সোপান হইতে পারে; কিন্তু ইহার দ্বারা শিক্ষার আবশ্যক সংস্কারোপায় নির্দ্ধারণের উপায় স্থির করা হইতে পারে না এবং সেই জন্ম ইহার জন্ম ব্যয়িত অর্থ অপব্যয়ের পর্য্যায়ভুক্ত না বলিয়া পারা যায় না। আমরা সরকারকে এই অনুষ্ঠানের পরিবর্ত্তে বিশেষজ্ঞদিগের সাহায্যে এ দেশে দেশকালপাত্রোপযোগী শিক্ষার প্রবর্ত্তনোপায় স্থির করিবার চেষ্টায় রত দেখিলে সুখী হইব এবং সে বিষয়ে যে দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা সরকারকে সাহায্য করিবেন, এ আশাও আমরা করি।

—

আর্ট স্কুলের সরস্বতী মূর্ত্তি—

গত শ্রীপঞ্চমীতে কলিকাতা বহুবাজারস্থ ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ স্বহস্তে নির্ম্মিত যে সরস্বতী মূর্ত্তির পূজা করিয়াছিলেন, তাহার চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল।



শ্রীশ্রীসরস্বতী
ইণ্ডিয়ান আর্ট-স্কুলের উত্তীর্ণ ছাত্র গোষ্ঠ দ্বারা গঠিত
ফটো—শচীন সেন

আধুনিক মূর্ত্তি গঠনেও শিল্পের ধারা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা এই চিত্রটি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

সঙ্গীতজ্ঞ অবিনাশচন্দ্র—

গত ২০শে পৌষ কলিকাতায় বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক অবিনাশচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হইয়াছে। "বিলম্বিত" ধ্রুপদ গায়কদিগের মধ্যে তিনি যেরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ অল্প সংখ্যক গায়কই লাভ করিতে পারিয়াছেন। ইনি বিশেষ যত্ন ও নিষ্ঠা সহকারে সঙ্গীতাচার্য্য সেখ মুরাদ আলি খাঁর নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং কেশবচন্দ্র মিত্র, অনন্তরাম মুখোপাধ্যায়, বসন্তলাল হাজরা, ভেইয়ালাল, উপেন্দ্র বসাক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী "সঙ্গত" করিয়া তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। অবিনাশবাবু সঙ্গীত সম্বন্ধে যে বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ। যৌবনে তিনি শারীরচর্চ্চায় কৃতিত্ব লাভ



সঙ্গীতজ্ঞ অবিনাশচন্দ্র ঘোষ

করিয়াছিলেন এবং নানা ক্ষেত্রে সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বাসপল্লীতে এক পরিবারে দুরন্ত বসন্ত রোগে কয় জনের মৃত্যুর পর যখন একটি বালিকার মৃত্যু হয়, তখন সৎকার করিবার লোকের অভাব ঘটিয়াছে জানিয়া তিনি একাকী সেই বসন্ত রোগে মৃত বালিকার শব বহন করিয়া শ্মশানে সৎকারার্থ লইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গীত-চর্চ্চাব্যপদেশে তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং নানা ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি যখন যে বিষয়ের আলোচনা

করিতেন, তখন তাহাতেই বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিতেন। কয় মাস রোগ ভোগ করিয়া তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। ১২৭৪ বঙ্গাব্দে ৩১শে শ্রাবণ তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। কেবল ধ্রুপদ গানে নহে, তিনি তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র স্বহস্তে প্রস্তুত করিতেও বিশেষ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে এক জন "গুণী" হারাইয়াছি।

উপাধিলাভ—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবার কয়েকজন মনীষীকে সম্মানিত উপাধি প্রদান করিবেন শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। যে কয়েকজন এই উপাধি লাভ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর সকলেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট উপাধিধারী। যিনি এতদিন কোন উপাধি লাভ করেন নাই, তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকৃত গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন—আমাদের শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডি-লিট্ উপাধি লাভ করিবেন। বাঙ্গালা কথা-সাহিত্য ক্ষেত্রে শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র যে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত, ডি-লিট্ উপাধি সে আসনের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি না করিলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সঙ্কল্পকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছি। শ্রীভগবান শ্রীমান্ শরৎচন্দ্রকে দীর্ঘজীবী করুন; তিনি বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে আরও অধিক প্রশংসা অর্জ্জন করুন।



শ্রীমান্ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

পরলোকে অধ্যাপক বিপিনবিহারী—

আমাদের পরমহিতৈষী বন্ধু, 'ভারতবর্ষে'র কৃতী লেখক অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত মহাশয়ের পরলোক গমন সংবাদে আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। বিগত ১৯শে মাঘ রবিবার রাত্রি দশটার সময় তিনি তাঁহার রামকৃষ্ণপুরের (হাওড়া) ভবনে ৬১ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বিপিনবাবু আমাদের পরম সুহৃদ ছিলেন; 'ভারতবর্ষে'র সূচনা হইতে বহু বৎসর পর্য্যন্ত তিনি 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন; তাঁহার 'বিবিধ-প্রসঙ্গ' 'পুরাতন-প্রসঙ্গ' প্রভৃতি পুস্তকের অধিকাংশ প্রবন্ধই



অধ্যাপক বিপিনবিহারী গুপ্ত

'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। আমাদের 'সাময়িকী'র তিনিই প্রবর্ত্তক। কয়েক বৎসর যথানিয়মে তিনি সাময়িকী লিখিয়াছেন। বিগত কয়েক বৎসর শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য তিনি লেখাপড়া একেবারে ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকে তিনি জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন; তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকুরী গ্রহণ করেন নাই। কলিকাতার সাহিত্যিকগণের, বিশেষতঃ তাঁহার পরম বন্ধু আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের সাহচর্য্য লাভের জন্য তিনি শ্রীহট্টের মুরারীচাঁদ কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা রিপণ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হইয়া আসেন এবং সেই কার্য্যেই জীবন শেষ করেন। বিপিনবাবুর পরলোক গমনে আমরা পরমাত্মীয়ের বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি।

কামিনীকুমার চন্দ—

পরিণত বয়সে শিলচরের প্রসিদ্ধ উকীল ও কংগ্রেসের কর্ম্মী কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। কামিনীবাবু বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি শ্রীহট্টাগত বাঙ্গালী যুবকদিগের মতই সোৎসাহে দেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন জানিয়া তাঁহার পিতৃব্য তাঁহাকে শিলচরে যাইয়া ওকালতী করিতে আদেশ করেন এবং তিনি সেই উপদেশ শিরোধার্য্য করেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান উকীল বলিয়া বিবেচিত হয়েন এবং চা-কররাও তাঁহাদিগের মামলায় কামিনীবাবুকে উকীল নিযুক্ত করিতেন। উকীল হইবার কয়বৎসর পরেই তিনি বালাধুন হত্যা মামলায় হাইকোর্টে আপীল করিয়া দণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে নিরপরাধ প্রতিপন্ন করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সেই মামলা পরিচালনকালে তিনি যেরূপ শ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা সে সময় তাঁহাকে দেখেন নাই, তাঁহারা অনুমান করিতেও পারিবেন না। এক এক দিন মামলার নথীপত্র দেখিতে দেখিতে তিনি আহার করিতেও ভুলিয়া যাইতেন। তিনি যখন বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দেন, তখন কোন ইংরাজ-চালিত পত্র বলিয়াছিলেন—আসামের চা-কররাই কামিনী বাবুকে বড় করিয়াছেন; তাঁহারা তাঁহাকে টাকা দিতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধি ত দিতে পারেন না।

পুরাতন কংগ্রেসের তিনি একজন একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় তিনি নানা বিষয়ে দেশের অনিষ্টকর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যখন ভারত সরকার আইন করিয়া পাঞ্জাবের অনাচারে সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে মামলা হইতে অব্যাহতিদানের ব্যবস্থা করেন, তখন তিনি ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিয়াছিলেন—তদন্ত কমিটীর বিবরণ প্রকাশের পূর্ব্বে এইরূপ আইন করা সঙ্গত নহে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান অপূর্ব্বকুমার বাঙ্গালায় প্রথম 'বাঙ্গালী' ডিরেক্টার অব পাব্লিক ইন্স্ট্রাকশান্।

আমরা তাঁহার মৃত্যুতে একজন শ্রদ্ধেয় সুহৃদ হারাইয়াছি। আজ তাঁহার বিধবাকে ও শ্রীমান অপূর্ব্বকুমার প্রমুখ তাঁহার সন্তানদিগকে আমরা আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস—

গত ৩০শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণ ভাইস-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদকে সম্মুখে লইয়া চলিয়াছেন ফটো—তারক দাস

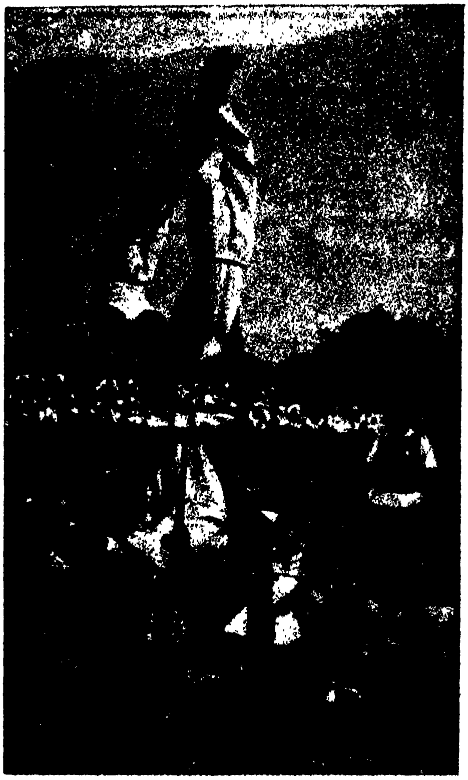


বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে বেথুন কলেজের
ছাত্রীদিগের শোভাযাত্রা

ফটো—তারক দাস



বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে গড়ের মাঠে সমবেত





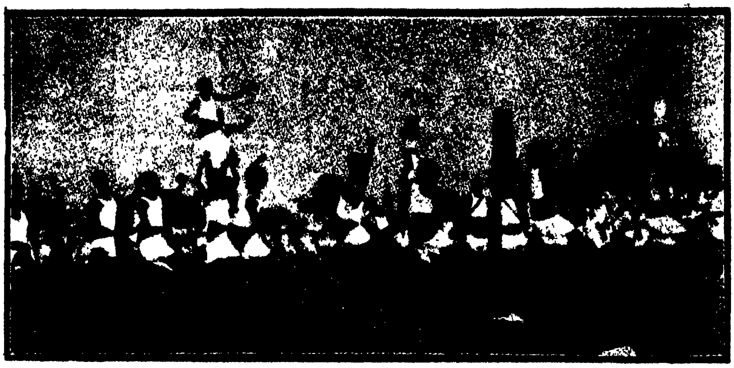
ছাত্রগণের ক্রীড়া প্রদর্শন (বিশ্ববিদ্যালয়-উৎসবে অনুষ্ঠিত)
ফটো—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ছাত্রগণের অপর একটি ক্রীড়া



বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের মিছিল ফটো—তারক দাস

উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব সম্পাদিত হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে সেদিন সকালে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রগণ শোভাযাত্রা করিয়া গড়ের মাঠে গিয়া সমবেত হইয়াছিল। তথায় চ্যান্সেলার (গভর্ণর) ও ভাইস-চ্যান্সেলারের বক্তৃতার পর ছাত্রগণ তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া মিছিল করিয়া যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা অভিবাদন করিয়াছিল। অপরাহ্নে মাঠেই সকল কলেজের ছাত্রগণ নানাপ্রকার ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছিল। আমরা উক্ত উৎসবের কয়খানি চিত্র এই সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।



বিশ্ববিদ্যালয় উৎসব উপলক্ষে অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত ব্রতচারী নৃত্য

ফটো—তারক দাস

রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায়—

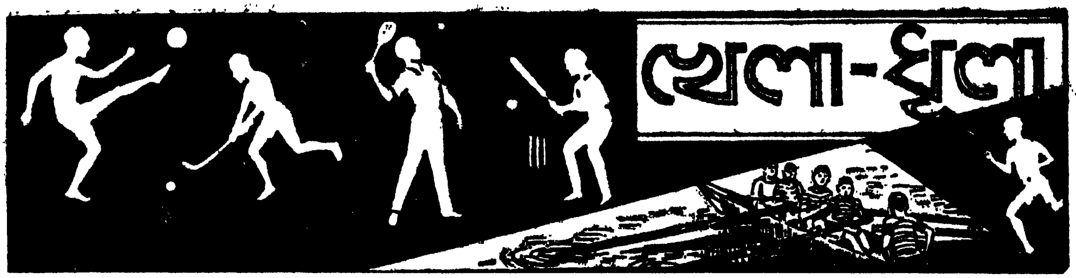
জয়পুর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায় মহাশয় গত ২৮শে নভেম্বর তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১২৭১ সালে বহরমপুরের সুবিখ্যাত সেন বাড়ীতে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। বহরমপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনিষ্টিটিউটে শিক্ষালাভ করেন। বি, এ পাশ করিয়া বহরমপুরস্থ কৃষ্ণনাথ কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকরূপে তাঁহার কর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়। কিছুকাল পরে জয়পুর কলেজের ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে তিনি জয়পুরে গমন করেন। মধ্যে কিছুকাল তিনি মীরাট কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে তাঁহাকে জয়পুর রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের পরিচালক ও কলেজের প্রিন্সিপালরূপে জয়পুরেই ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না—তিনটি কন্যাকেই তিনি সুশিক্ষিতা করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যম কন্যা গায়ত্রী বি এ, বি-টি পাশ করিয়া কিছুকাল জয়পুরস্থ মহিলা কলেজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে নবকৃষ্ণবাবুর বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।



রায় সাহেব নবকৃষ্ণ রায়

ভ্রম সংশোধন—

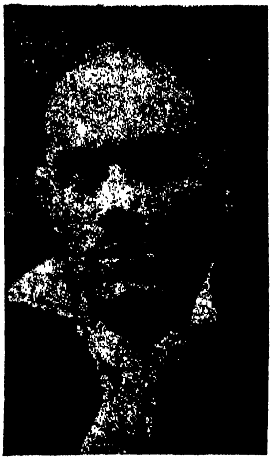
এ মাসের প্রচ্ছদপটে পরলোকগত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিকৃতি এবং পরিচয়ে পরলোকগত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবন কথা প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি ও দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবন কথা সন্নিবেশিত করিব।



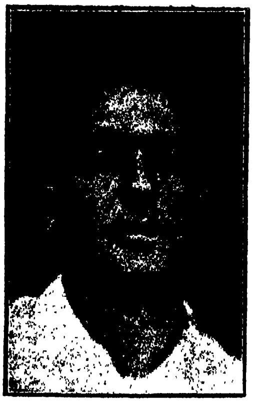
তৃতীয় টেষ্টে ভারত বিজয়ী ঃ

লাহোরে ১৯৩৬ সালের ১০ই থেকে ১৩ই জানুয়ারী অষ্ট্রেলিয়ান ও সমগ্র ভারতের তৃতীয় টেষ্ট খেলায় সমগ্র ভারত ৬৮ রানে জয়লাভ করেছে। বোম্বাই ও কলিকাতায় প্রথম ও দ্বিতীয় টেষ্টে নয় উইকেটে ও আট উইকেটে পরাজয়ের গ্লানির কতকটা মুচেছে। এবারকার টেষ্টের খেলোয়াড় মনোনয়নে সকলেই হতাশ হয়েছিলেন। বড় বড় ধুরন্ধর খেলোয়াড়, যেমন, সি কে নাইডু, অমরসিং, অমরনাথ, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলি ও নাজির আলি খেলেন নি বা মনোনীত হন নি।

প্রশংসনীয় ব্যাটিং করেছেন, ক্যাপ্‌-টেন ওয়াজির আলি এবং তার পরেই

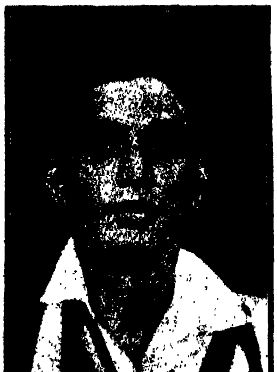


ওয়াজির আলি
(ক্যাপ্‌টেন—ভারত)



আমীর ইলাহী

বাঙ্গলার এস্‌ ব্যানার্জ্জি। ওয়াজির আলি প্রথম ইনিংসে ১৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৯২ করেছেন। এস্‌ ব্যানার্জ্জি প্রথম ইনিংসে মাত্র ৫ করেন, কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে, যদিও কয়েকটি চান্স দিয়েছিলেন, ৭০ রান করে সমগ্র ভারতকে জয়ের দিকে অনেকটা এগিয়ে দেন। ব্যানার্জ্জি অক্সেনহ্যাম ও লেদারের দু'টি সুন্দর ক্যাচ নিয়ে অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ করে দেন। অক্সেনহ্যামের ক্যাচটি খুব শক্ত ছিল। বোলিংএ বাকা ও নিসার অত্যা-শ্চর্য্য ফল দেখিয়েছে, বাকার ১৬ রানে চারটি শ্রেষ্ঠ উইকেট নেওয়া সত্যই অদ্ভুত। ফিল্ডিং এ ভারতীয়রা বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ারা খুব খারাপ ফিল্ডিং করেছে, বিশেষতঃ 'ক্যাচে'। অক্সেনহ্যাম অশক্ত হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়াদলের বোলিংও খারাপ হয়েছে। মেহেরমজীর উইকেট-রক্ষা



মেহেরমজী



বাকাজিলানী

উৎকৃষ্ট হয়েছে। মাত্র একবার তার ভুল হয়েছে।

প্রথম বিখ্যাত ব্যাটস্‌ম্যান ম্যাকার্টনে

লাহোরে তাঁর খেলায় বিশেষত্ব দেখাতে পারেন নি। ক্যাপ্টেন রাইডারই কেবল সর্ব্বোচ্চ রান ৭৩ করতে পেরেছেন।

এই খেলাটির সম্বন্ধে রাইডার মতামত প্রকাশ করে বলেছেন, ভারতীয় খেলোয়াড়গণ সকলে একজোটে এমন খেলেছেন যেন একটি মানুষ খেলছেন, ক্রিকেট খেলায় এটাই সকলের চেয়ে অত্যাবশ্যক। ওয়াজির আলি দু' ইনিংসেই অতি সুন্দর খেলেছেন। নিসার, বাকাজিলানী ও আমীর ইলাহী বোলিংএ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, ভারতীয়দের ফিল্ডিং অতীব সুন্দর বিশেষতঃ জায়ার। The Indian Whippet (তিনি জায়াকে ঐ নামে অভিহিত করেন) যে দলে যাবেন সেই দলই শক্তিশালী হবে। মেহেরমজীর উইকেট কিপিং প্রথম শ্রেণীর।

মাদ্রাজে সুন্দর আবহাওয়া ও নির্ম্মল আকাশতলে তৃতীয় টেষ্ট খেলা আরম্ভ হলো বেলা ১১-১৫ মিনিটে।

ওয়াজির আলি টসে জিতে মেহেরমজী ও এস্ ব্যানার্জ্জিকে ব্যাট করতে পাঠালেন। জনসমাগম তেমন হয় নি। অমরনাথ, মেজর নাইডু খেলছেন না, খেলোয়াড় নির্ব্বাচনও আশানুরূপ হয় নি। ১৫ মিনিট খেলার পরেই প্রথম উইকেট গেলো ১৭ রানের মাথায়। সমগ্র ভারতের শত রান উঠলো ৯২০ মিনিট খেলার পর বাকাজিলানীর মারে। হ্যাগেলের বলে ১০০ রানের মাথায় ষষ্ঠ ও সপ্তম উইকেট খোয়া গেল, বাকাজিলানী ও আমীর ইলাহীর। ওয়াজির আলি নিজস্ব ৫০ রান করলেন ১০২ মিনিটে, ১২৪ রানে ৮ম ও ৯ম উইকেট পড়লো। নিসার এসে ওয়াজির আলির সঙ্গে যোগ দিলে, যখন ওয়াজিরের স্কোর ৭৮। ওয়াজির পিটিয়ে খেলতে সুরু করলেন। পর পর দু'বার হ্যাগেলকে কভার বাউণ্ডারীতে পাঠালেন। নিসার ওয়াজিরের কাছে এগিয়ে গিয়ে জানালে যে সে তার উইকেট বাঁচিয়ে রাখবে, ওয়াজির যেন পিটাতে গিয়ে তার উইকেট নষ্ট না করে। সত্যই নিসার শেষ উইকেটের স্থিতিতে ওয়াজিরের চেয়ে বেশী সুখ্যাতি পাবার যোগ্য। ওয়াজির কভার বাউণ্ডারীতে পাঠাতে গিয়ে স্লিপে ডেন্ট্রিক্সির হাতে আটকে গেলো বেলা ২-৫৫ মিনিটে, মোট স্কোর তখন ১৪৯। ওয়াজির আলি নির্দ্দোষ খেলে ৭৬ করেছে ১৩৭ মিনিটে, তার মধ্যে ১২টা ৪ ছিল।

৩-১০ মিনিটে ওয়েণ্ডেলবিল ও ব্রায়াণ্ট এসে অষ্ট্রেলিয়াদের ইনিংস আরম্ভ করলে। নিসার ও পুরী বল দিতে লাগলো। পুরী ৩০ গজ দূর থেকে ছুটে এসে বল করছে। তার বল নিসারের চেয়ে দ্রুত বলে মনে হয় কিন্তু বলের গতি ও দীর্ঘতা নিসারের মত সঠিক ছিল না। অষ্ট্রেলিয়াদের ৫০ রান উঠ্‌লো ৭৫ মিনিটে। অত্যন্ত মন্দ গতিতে রান হচ্ছে, একটা উইকেট গেছে। আমীর ইলাহীর বলে মেহেরমজী মরিসবীকে চমৎকার ক্যাচ নিলে। মরিসবী বলটা 'ব্লক' করে নিজের সুমুখে বাঁ দিকে যেমন তুলেছে, মেহেরমজী দৌড়ে এসে মাটি থেকে মাত্র এক ইঞ্চি উঁচুতে বলটি অত্যাশ্চর্য্যরূপে লুফ্‌লে। বেলা শেষে যখন খেলা শেষ হলো অষ্ট্রেলিয়াদের মোট স্কোর ৭১ কিন্তু ৩ উইকেট গেছে। মেহেরমজীর উইকেট রক্ষা এত সুন্দর হয়েছে যে একটিও 'বাই' হয় নি। জায়ার ফিল্ডিং অত্যাশ্চর্য্য।

দ্বিতীয় দিনের খেলায় জনতা লাহোরের পক্ষে বেশীই বলতে হবে। গভর্ণর দিনটি সাধারণ ছুটীর বলে ঘোষণা করেছেন। পুরী তাঁর নিজের বলেই ব্রায়াণ্টকে ক্যাচ করলে। ক্যাচটি অতি সুন্দর হয়েছিল। ম্যাকার্টনে এসে রাইডারের সঙ্গে জুটি হলেন। রাইডার নিসারের বল আটকাতে ক্যাচ তুললে মহম্মদ সৈয়দ পাশে লাফিয়ে ক্যাচ ধরলেন। ৪ রানের মধ্যে দু'টি উইকেট গেলো। ফিল্ডিং ও বোলিং খুব ভাল হ'চ্ছে। ম্যাক্ ও লাভে মিলে রান তুললে ৯০। ৯২ রানে লাভ গেলো, অক্সেনহ্যাম গেলো পুরীর হাতে ১০০ রানে। হ্যাগেল এলো ও ১০২ রানে আউট হলো। মেয়ার এসে ম্যাকের সঙ্গে যোগ দিলে। খেলার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হলো, রান সংখ্যা উঠ্‌লো ১২৯। ম্যাকার্টনে এল্ বি ডবলিউ হলেন ৩৪ রান করে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট খেলবার পর। মেয়ার ও লেদারে মিলে ৩৭ রান তুললে, লেদার বোল্ড হলো ২৭ করে। অষ্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হলো ১২-২০ মিনিটে।

বেলা ২-৫ মিনিটে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ হলো মেহেরমজী ও ব্যানার্জ্জিকে দিয়ে। মেহেরমজী ১২ করে রান আউট হলেন। বাকা জিলানী এলেন ও কিছু না করেই গেলেন। ক্যাপ্টেন ওয়াজির আলি নামলেন। ব্যানার্জ্জি ইতিমধ্যেই দু'টি 'চান্স' দিয়েছেন। ৮০ মিনিট খেলার পর সাত রান হ'লো। চা পানের সময় ব্যানার্জ্জির ৬৩ আর ওয়াজির আলির ৫৪

হয়েছে। এই জুটি ১২৮ রান করবার পর ব্যানার্জ্জি লেদারের বল তুললে আলেকজাণ্ডার লুফ্‌লেন। ব্যানার্জ্জি ১৩৫ মিনিট খেলে ৭০ রান করেছেন তার মধ্যে ৭টা ৪ ছিল। তিনি অনেকগুলি 'চান্স' দিয়েছেন। যুবরাজ এলেন ও বেলা শেষ পর্য্যন্ত খেলে রান সংখ্যা ৩ উইকেটে ১৭৭ হ'লো।

তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ হলে, যুবরাজ মাত্র ১৬ করে গেলেন। ওয়াজির আলি ৯২ করে লাভের হাতে আটকালেন, তিনি ১২টা বাউণ্ডারী করেছেন। সৈয়দের সঙ্গে তায়া যোগ দিলেন। সৈয়দ ২৬ করে ষ্টাম্পড হলেন। আমীর ইলাহী এলে খেলার স্কোর দ্রুত উঠতে লাগলো। তায়া দ্রুত রান তুলতে গিয়ে ২৭ করে রান আউট হলেন। সালাউদ্দীন এলেন, আমীর ২৬ রান করে আউট হলেন, ডি আর পুরী এলেন ও বোল্‌ড হলেন। নিসার এসে মাত্র ৩ রান করে লাভের হাতে আটকালে ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ৩০১ রানে শেষ হ'লো।

অষ্ট্রেলিয়ারা ২৮৫ রান পিছিয়ে আছে কিন্তু তাদের হাতে দেড় দিনের বেশী সময় আছে। লাঞ্চের পর ২৬ রানে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাদের ২ উইকেট গেলো। সালাউদ্দীনের শেষের বলে ওয়েণ্ডেলবিল এল্‌-বি হলেন। নিসারের বলে লাভ মেহেরমজীর হাতে আটকালেন। মরিসবী ও রাইডারের জুটি ভাঙ্গতে ওয়াজির আলি ঘন ঘন বোলার বদল করতে লাগলেন, তবুও রান সংখ্যা ৮০ হলো। নিসার পুনরায় এসে বাম্পিং বল করতে লাগলেন, মরিসবী আউট হলেন। ব্রায়াণ্ট এসে ২৩ মিনিট খেলার পর প্রথম রান করলেন। বাকাজিলানী পর পর মেডেন পেলেন। ১১৩ মিনিটে শত রান উঠ্‌লো। ১০১ রানের মাথায় ব্রায়াণ্ট মেহেরমজীর হাতে ক্যাচ হলো। ম্যাক্ এলো। রাইডার ৮০ মিনিট খেলে নিজস্ব ৫০ রান করলেন, ৬টি বাউণ্ডারী ছিল। চায়ের পর, ম্যাক্ ১৬ রান করে বাকাজিলানীর বলে এল্‌-বি আউট হলেন। হেনড্রি এলেন, কিন্তু রাইডার আমীর ইলাহীর বলে ক্যাচ তুললে, ওয়াজির আলি 'মিড্ অফ্' থেকে ছুটে এসে বোলারের ঠিক পিছনে সুন্দর লুফলেন। ১৪৮ রানে দু'টি ধুরন্ধর উইকেট গেলো। স্মাগেল এলেন ও গেলেন, অক্সেনহ্যাম যোগ দিলেন ও বেলা কাটিয়ে দিলেন। অষ্ট্রেলিয়াদলের ৭ উইকেটে মাত্র ১৫৭ রান হলো।

চতুর্থ দিনে খেলা আরম্ভ হলো। অষ্ট্রেলিয়াদের ১২৭ রান বাকী। অক্সেনহাম ও হেনড্রি খুব সতর্কতার সঙ্গে খেলছেন, রান খুব ধীরে ধীরে উঠ্‌ছে। আমীরের বলে হেনড্রি ৪০ মিনিট খেলবার পরে আউট হলেন মাত্র ৬ করে। মেয়ার এলেন, দু'জনে মিলে রান সংখ্যা ওঠালে ৩০০এ। নিসারের বলে মেয়ার একটি ক্যাচ দিয়েছিলেন ব্যানার্জ্জি তা লুফ্‌লেন কিন্তু 'নো বল' থাকায় মেয়ার আউট হলো না।

নূতন বল নিয়ে নিসার অক্সেনহামকে আউট করলেন, ব্যানার্জ্জি তাঁর খুব জোর মারের ক্যাচটি ধরলেন। শেষ খেলোয়াড় লেদার এসে ১১ রান করবার পরে বাকাজিলানীর বলে ব্যানার্জ্জির হাতে আটকে যেতে অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ২১৮ রানে শেষ হলো। ভারতীয়দল আন্তর্জ্জাতিক ক্রিকেট খেলায় এই সর্ব্বপ্রথম ৬৮ রানে জয়লাভ করতে সক্ষম হলো।

ভারতীয় দল—প্রথম ইনিংস

এস ব্যানার্জ্জী···কট লাভ, বো স্মাগেল		৫
আর পি মেহেরমজী···কট লাভ, বো স্মাগেল		২৬
মহম্মদ সৈয়দ ··কট হেনড্রি, বো লেদার		০
ওয়াজির আলি কট হেনড্রি, বো লেদার		১৬
যুবরাজ পাতিয়ালা···বো অক্সেনহাম		১৪
তায়া···বো মেয়ার		৭
বাকাজিলানী···বো স্মাগেল		৪
আমীর ইলাহী···বো স্মাগেল		০
মাসুদ সালাউদ্দিন···বো লেদার		১২
ডি আর পুরী ··বো লেদার		০
নিসার···	নট-আউট	০
	অতিরিক্ত	৫
	মোট	১৪৯

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৫	২	৩৮	৩
স্মাগেল	১৫	২	৭২	৪
অক্সেনহাম	৭	৪	১২	১
ম্যাকার্টনে	৪	১	১৪	০
মেয়ার	৩·১	০	৮	২

অষ্ট্রেলিয়ান দল—প্রথম ইনিংস

ওয়েণ্ডেলবিল···এল বি ডবলিউ, বো বাকাজিলানী	১৭
ব্রায়াণ্ট···কট ও বো পুরী	১০
মরিসবী···কট মেহেরমজী, বো আমীর ইলাহী	২৩
রাইডার···কট সৈয়দ, বো নিসার	২১
হেনড্রি···বো আমীর ইলাহী	৩
লাভ···বো বাকাজিলানী	৩
ম্যাকার্টনে ··এল বি ডবলিউ, বো নিসার	৩৪
অক্সেনহাম···কট পুরী, বো নিসার	৪
হ্যাগেল···এল বি ডবলিউ, বো নিসার	১
মেয়ার নট-আউট	১৭
লেদার···বো আমীর ইলাহী	২৭
অতিরিক্ত	৬
মোট	১৬৬

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	২০	৩	৭২	৪
ডি পুরী	৯	০	২৪	১
এস ব্যানার্জ্জি	২	০	৪	০
বাকাজিলানী	১৫	২	৪৫	২
আমীর ইলাহী	৬	০	১৫	৩

ভারতীয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস

আর পি মেহেরমজী··· রান-আউট	১২
এস ব্যানার্জ্জি···কট ও বো লেদার	৭০
বাকাজিলানী···কট রাইডার, বো হ্যাগেল	০
ওয়াজির আলি···কট লাভ, বো লেদার	৯২
যুবরাজ পাতিয়ালা···কট ও বো হ্যাগেল	১৬
মহম্মদ সৈয়দ···ষ্ট্যাম্পড লাভ, বো মেয়ার	২৬
আমির ইলাহী···কট হ্যাগল, বো লেদার	২৬
জে এন ভায়া··· রান-আউট	২৭
মাসুদ সালাউদ্দীন··· নট-আউট	২৩
ডি আর পুরী···বো লেদার	০
এস এম নিসার···কট লাভ, বো লেদার	৩
অতিরিক্ত	৩
মোট	৩০২

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	২৭·১	২	১০২	৫
হ্যাগেল	১৭	২	৫০	২
মেয়ার	১২	০	৯১	১
ম্যাকার্টনে	২০	৮	৪৮	০
হেনড্রি	২	০	৬	০

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

ওয়েণ্ডেল বিল···এল বি ডবলিউ, বো সালাউদ্দিন	৫
এইচ এস লাভ···কট মেহেরমজী, বো নিসার	১০
আর মরিসবী···বো নিসার	৩৫
জে এস রাইডার···কট ওয়াজির, বো আমীর ইলাহী	১০
এফ ব্রায়াণ্ট···কট মেহেরমজী, বো বাকাজিলানী	৬
সি জি ম্যাকার্টনে···এল-বি, বো বাকাজিলানী	১৬
এইচ এল হেনড্রি···বো নিসার	৬
এল হ্যাগেল···বো বাকাজিলানী	০
আর অক্সেনহাম···কট ব্যানার্জ্জি, বো নিসার	৩০
মেয়ার··· নট-আউট	১৪
লেদার···কট ব্যানার্জ্জি, বো বাকাজিলানী	১১
অতিরিক্ত	১৩
মোট	২১৬

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	২৪	৩	৮০	৪
সালাউদ্দিন	৫	১	১৮	১
বাকাজিলানি	১২	৫	১৬	৪
এস ব্যানার্জ্জি	২	০	৮	০
পুরী	৭	০	২৬	০
আমীর ইলাহী	১৭	২	৫৫	১

মৈনুদ্দৌলাদলের অপূর্ব্ব সাফল্য ঃ

মৈনুদ্দৌলাদল প্রথমে সারা দিন ৫ উইকেটে ৪১৩ রান করে। অমরনাথ ত্রুটীহীন ১৪৪ রান করে অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোচ্চ রান করার কৃতিত্ব অর্জ্জন করলেন। এস এম হোসেন ৭৩, পালিয়া (নট্-আউট্) ৬১, এস্ এম হাডি (নট্-আউট্) ৩৮, এস ব্যানার্জ্জি ৩০, অমরসিং ১৭, হিন্দেলকার ১৭, ওয়াজির আলি ৭ করে আহত হয়ে চলে যান।



অমরসিং

দ্বিতীয় দিনে মহারাজকুমার ভিজিয়ানাগ্রাম ইনিংস ডিক্লেয়ার্ড করলে অষ্ট্রেলিয়ানরা প্রথম ইনিংস আরম্ভ করে ২-৪০ মিনিটের মধ্যে ১৪৪ রানে সকলে আউট হওয়ায় তাঁদের 'ফলো-অন্' করতে হ'লো। নিসার ও অমরসিং ৫৬ ও ৫১ রানে প্রত্যেকে ৪টি উইকেট এবং এস্ ব্যানার্জ্জি ৩৪ রানে ২টি উইকেট নেন।



ডি ডি হিন্দেলকার

দ্বিতীয় ইনিংসেও অষ্ট্রেলিয়াদল বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। বেলা শেষে তাঁদের ৮ উইকেট গেলো আর রান হলো মোটে ১৪৬। স্থাগেল, লেদার ও আলেকজাণ্ডার খেলতে বাকী। অষ্ট্রেলিয়াদের ইনিংস পরাজয় বাঁচাতে তখনও ১২৩ রান করতে হবে, যদিও তা করা অসম্ভব। লেদার ও আলেকজাণ্ডার আউট হয়ে গেলো তৃতীয় দিনের খেলা আরম্ভ হবার পনেরো মিনিটেরও কম সময়ে, মোট রান হ'লো ১৫৪। অমরসিং একা ৩৬ রানে ৬টি উইকেট নিয়েছেন। মৈনুদ্দৌলাদল এক ইনিংস ও ১১৫ রানে জয়ী হয়ে রেকর্ড স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।

ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে এই বিজয় চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহারাজকুমার যে একজন সুদক্ষ ও চতুর ক্যাপ্টেন তা' প্রমাণিত হ'লো। ১৯৩৩ সালে জার্ডিনের এম সি সি দলকে বেনারসে তাঁর অধিনায়কতায় ভারতীয় দল ১৪ রানে হারাতে সক্ষম হয়েছিল। 'গোল্ডেন কাপ্' এবং জুবিলী টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী দলের ক্যাপ্-টেনও ছিলেন তিনি।



পি ই পালিয়া

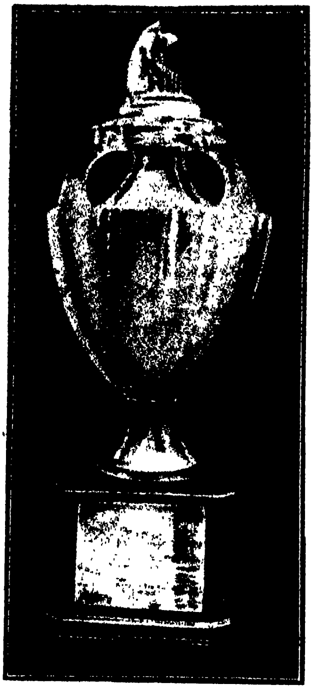
অমরনাথের চমৎকার ব্যাটিং, অমরসিংএর মারাত্মক বোলিং ও হিন্দেলকারের নির্দোষ উইকেট রক্ষা এবং মহারাজকুমারের কুশলী অধিনায়কত্বের জন্যই মৈনুদ্দৌলাদল এরূপ অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করতে পেরেছে।

আন্তঃ প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

ভারতের ক্রিকেট খেলার উন্নতির উদ্দেশ্যে মহারাজা পাতিয়ালা "রঞ্জি" নামক ট্রপী আন্তঃ প্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার জন্য প্রদান করেন। গতবৎসর বোম্বাই প্রেসিডেন্সী ক্রিকেট এসোসিয়েশন এই ট্রপী বিজয়ী হন। এই প্রতিযোগিতার ইষ্টার্ণ জোনের খেলায় বাঙ্গলা ও আসাম প্রদেশ ৫ উইকেটে মধ্যপ্রদেশ ও বেরারকে হারিয়ে জয়ী হয়। মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ব্যাট করে প্রথম ইনিংসে মোট রান ১৪৯ করে। হীরালাল ৪৪, রহমন পাশা ৩১, ডি আর রতনাম ২৩, এস জে নাইডু ২০, ভি আর পাটকি (নট্ আউট্) ৫, পি এন লাঘেট ৪, জর্জ্জ লোখাণ্ডে ৪, ল্যান্স কর্পোরাল ক্রেজার ১, ডি সি মোবিল ১, লতিফ ০, জহুর আমেদ ০।

গিলবার্ট ৫৪ রানে ৩, কে ভট্টাচার্য্য ৩৯ রানে

৩, বাপী বোস ১৮ রানে ১, জি এরাটুন ১ রানে ১, স্কিনার ৫ রানে ১ ও খাম্বাটা ১৬ রানে ০ উইকেট নেন।



মহারাজা পাতিয়ালা প্রদত্ত
রঞ্জি ট্রপী

বাঙলা ও আসাম—প্রথম ইনিংস—১৯৬ রান এ এল হোসী ৮২, জি বোস ৪৬, সুশীল বোস ২৬, কে খাম্বাটা ৭, গিলবার্ট ৫, এরাটুন ৪, কিং ৪, ওয়ারেন ৩, কে ভট্টাচার্য্য ৩, স্কিনার ৩, বাপী বোস (নট-আউট্) ২।

জহুর আমেদ ৫৪ রানে ৩, লোথাণ্ডে ৩৩ রানে ২, মোরিল ৩৫ রানে ২, লাঘেট ২৫ রানে ১, রহমন পাশা ৩৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংসে, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার ৭ উইকেটে ২৪৬ রান করে ডিক্লেয়ার্ড করলে, নিজেদের দু' ইনিংসের মোট স্কোরের কমে বাঙলা ও আসামের সবাইকে আউট করে দেবার চেষ্টায়। কারণ সময়াভাবে খেলা শেষ হলেও নিয়মানুযায়ী প্রথম ইনিংসের স্কোর হিসাবে তাদের পরাজয় ঘটবে।

মধ্যপ্রদেশ ও বেরার—দ্বিতীয় ইনিংস—জে আমেদ ৭৭, ফ্রেজার ৬০, হীরালাল (নট-আউট) ৪৫, রহমন পাশা ৩৬, রতনাম (নট্ আউট) ১৬, এস জে নাইডু ১১, লাঘেট ৬, লতিফ ২, লোথাণ্ডে ০।

গিলবার্ট ১০০ রানে ৫ উইকেট, এরাটুন ১৮ রানে ১, কে ভট্টাচার্য্য ৭৫ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন।

২১৭ রান করলে তবে জয় হবে। বাঙলা ও আসাম দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে ১২-২৫ মিনিটে। ১০২ মিনিট খেলে ১০০ রান উঠ্‌লো। চায়ের সময় রান সংখ্যা ১৬৩ (৪ উইকেট), ভট্টাচার্য্য ও গণেশ বোস ব্যাট করছে। বাঙলার জয়ী হবার আশা প্রায় নিশ্চিত—হাতে তখনও ছ'টা উইকেট ও এক ঘণ্টা সময় আছে, রান বাকী মাত্র ৫৫। ৪-৩৮ মিনিটে সুশীল বোস দু'য়ের বাড়ী মেরে ২১৮ করলে, বাঙলা ও আসাম ৫ উইকেটে জয়ী হলো। ওয়ারেন ৬৬, ভট্টাচার্য্য (নট্ আউট) ৫৪, হোসী ৪১, গণেশ বোস ৩৬, স্কিনার ৭, এরাটুন ৪, সুশীল বোস (নট্-আউট) ৪।

লোথাণ্ডে ৪৬ রানে ২, মোরিল ৩৮ রানে ২, জে আমেদ ১৮ রানে ১ উইকেট পেয়েছে।

বাঙলা বনাম মধ্যভারত ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় বাঙলা ও আসাম মধ্যভারতকে প্রথম ইনিংসের স্কোরে হারিয়েছে। মধ্যভারত দলে কয়েকজন ভারত-বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, যেমন,—সি কে নাইডু, সি এস নাইডু, মুস্তাক আলি, ভায়া ও জগদেল। এই দলকে হারিয়ে বাঙলা প্রমাণ করেছে যে দরকার হলে এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও ক্রিকেটে ভালো ফল দেখাতে পারে। ক্রিকেট-জগত বাঙলাকে চিরকালই অগ্রাহ্য করে এসেছে। আজ সেই বাঙলাও দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়গণ পরিবৃত মধ্যভারত দলকেও হারিয়ে দিলে। বাঙলা এবার সাদার্ণ জোনের বিজয়ী মাদ্রাজদলের সঙ্গে মাদ্রাজে খেলবে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী থেকে ভাণ্ডারগাচ লংফিল্ড ও কমল ভট্টাচার্য্য যেতে পারবেন না—এজন্য বাঙলাদল বিশেষ শক্তিহীন হ'লো।

এই খেলায় ভাণ্ডারগাচ দুই ইনিংসেই চমৎকার খেলেছেন। ৬ষ্ঠ উইকেট সহযোগিতায় ভাণ্ডারগাচ ও কে ভট্টাচার্য্য মিলে ১৯০ রান তুলেছেন। সি কে নাইডু তাঁদের জুটি ভাঙ্গবার জন্য তাঁর দলের সকল বোলারকেই বল দিতে দিয়েছিলেন। বাঙলার ক্যাপ্‌টেন হোসী দ্বিতীয় ইনিংসে চমৎকার খেলে ৫৩ রান করেন ৫৫ মিনিটে, আটবার চার করেছেন। বোলিংএ প্রথম ইনিংসে সি কে নাইডু ৭ উইকেট, দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেট নিয়েছেন ও ভায়া ১ উইকেট। বাঙলার নামকরা ব্যাটস্‌ম্যান কে বোস কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এস



আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা—বাঙ্গলা ও আসাম বনাম মধ্যভারত—সি কে নাইডু (ক্যাপ্‌টেন) মধ্যভারত দলকে ফিল্ড করতে নিয়ে যাচ্ছেন ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

ব্যানার্জ্জি ব্যাটিং বা বোলিংএ বিশেষ কিছুই করেন নি, তিনি মাত্র ১টি উইকেট নিয়েছেন। বেরেণ্ড, লংফিল্ড ও কে ভট্টাচার্য্য বোলিংএ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। লংফিল্ড ব্যাটিংএ একেবারে অকৃতকার্য্য হয়েছেন।

ফিল্ডিংএ ভায়া সত্যই দারুণ। তিনি যে দলে যোগ দেবেন সেই দলই যে লাভবান হবেন ইহা ধ্রুব সত্য। তিনি অনেক নিশ্চিত রান বাঁচিয়েছেন। তিনি না থাকলে বাঙ্গলার রান সংখ্যা আরো অনেক বেশী উঠ্‌তো। বল মারবার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে বল ধরেছেন। তাঁর কাছাকাছি বল গেলে ব্যাটসম্যানরা আর রান নিতে সাহস করছিলেন না। তাঁর বল ধরা ও নিক্ষেপের তৎপরতা অনুকরণীয়। তুলনায় বাঙ্গলার ফিল্ডিং অতি নিকৃষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে। বাঙ্গলা কয়েকটি ক্যাচ ফেলেছেন ও খারাপ ফিল্ডিংএর জন্য রানও অধিক হয়েছে।

মধ্যভারতের পক্ষে দুই ইনিংসে সি এস নাইডু ও জগদেল ভালো খেলেছেন। সি কে নাইডু দ্বিতীয় ইনিংসে ভালো খেলেছেন, কিন্তু ভায়া ব্যাটিংএ কিছুই করতে পারেন নি। ভায়ার নিজের বোলিংএ বাপীবোসের মারের বলটা ধরা সত্যই সুন্দর ও অদ্ভুত।

৩৪৩ রান ১৫০ মিনিটে করলে তবে মধ্যভারত জিততে পারবে। ২-১৫ মিনিটে জগদেল ও মুস্তাক আলি খেলতে এসে পিটাতে সুরু করলে। ৪০ মিনিটে ৫০ রান হলো। মুস্তাক আলি এল-বি হলো ২৯ করে ৬৭ রানের মাথায়। ৬৮ রানে জগদেল বোল্ড হলো ৩৮ করে। বেরেণ্ড এক ওভারে দু'টি উইকেট নিলে। নাইডু ভ্রাতাদ্বয় খেলতে এলো। ১০০ রান ৮৫ মিনিটে উঠ্‌লো। বেলা শেষে ৫ উইকেটে মোট ১৯৫ রান হ'লো। প্রথম ইনিংসের অধিক রান সংখ্যার জন্য বাঙ্গলা ও আসাম জয়ী ঘোষিত হলো।

বাংলা ও আসাম :—প্রথম ইনিংস, মোট স্কোর—২৮৩ ; কে বোস ০, বেরেণ্ড ৩৮, এস্ ব্যানার্জ্জি ১০, হোসী ২৭, লংফিল্ড ০, ভাণ্ডারগাচ ৯৩, কে ভট্টাচার্য্য ৪১, জি বোস ২০, এস বোস ২, বাপী বোস ২৭, জে এন্ ব্যানার্জ্জি (নট্‌-আউট্‌) ৫।

সি কে নাইডু ৬৩ রানে ৭ উইকেট, সি এস নাইডু ১১১ রানে ১, হাজারী ৩৮ রানে ১, মুস্তাক আলি ২৮ রানে ১ উইকেট নিয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংসে—মোট স্কোর ২৫৯ ;—কে বোস ১৬, বেরেণ্ড ৯, এস ব্যানার্জ্জি ০, লংফিল্ড ০, হোসী ৫৩, ভাণ্ডারগাচ ৭১, কে ভট্টাচার্য্য ৯, জি বোস ৮, বি বোস ১৫, এস বোস (নট্‌-আউট্‌) ৩১, জে এন ব্যানার্জ্জি ১৫।

সি কে নাইডু ৫৩ রানে ৪, সি এস নাইডু ১১১ রানে ৪, জগদেল ১০ রানে ১, ভায়া ১২ রানে ১ উইকেট পেয়েছেন।

মধ্য ভারত :—প্রথম ইনিংস, মোট স্কোর—২০০, ইস্তিক আলি ১৮, ভাণ্ডারকার ৯, জগদেল ৪৬, সি কে



বাঙলার প্রথম ব্যাটসম্যানদ্বয়—এস্ ডব্লিউ বেরাও ও কে বোস খেলতে নামছেন

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

নাইডু ৮, মুস্তাক আলি ২০, সি এস নাইডু ৬৮, ভায়া ৮, হাজারি ২, মহম্মদ বসির ০, টাটারাও (নট্ আউট) ৭।

বেরেও ২৯ রানে ৩, লংফিল্ড ৬৩ রানে ৩, কে ভট্টাচার্য্য ২০ রানে ২, এস ব্যানার্জ্জি ৩০ রানে ১, জে এন ব্যানার্জ্জি ১২ রানে ০, এস বোস ৩৪ রানে ০ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় ইনিংস—মোট রান ১৯৫ (৫ উইকেট) ;—মুস্তাক আলি ২৯, জগদেল ৩৮, সি কে নাইডু ৪৭, সি এস নাইডু ৫১, ভায়া ৫, ভাণ্ডারকার (নট্ আউট) ১৬, হাজারী (নট্ আউট) ৭।

লংফিল্ড ৩১ রানে ০, এস, ব্যানার্জ্জি ৩৭ রানে ০, বেরেও ২৬ রানে ২, কে ভট্টাচার্য্য ৬০ রানে ১, জে এন ব্যানার্জ্জি ১৪ রানে ১, জি বোস ৯ রানে ১, এস বোস ১৬ রানে ০ উইকেট পেয়েছেন।

মাদ্রাজ ও অষ্ট্রেলিয়া ঃ

মাদ্রাজ দলের সঙ্গে খেলায় অষ্ট্রেলিয়াদল এক উইকেটে জিতেছে। অষ্ট্রেলিয়ারা ভারতে এসে অনেক যুদ্ধেই সহজে জয়ী হয়েছে কিন্তু এরূপ কষ্টার্জ্জিত জয় তাদের এই প্রথম। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৪৭ রানে সকলে আউট হয়ে যায়; দ্বিতীয় ইনিংসে ২৬১ রান করতে পারলে জয়ী হবে যা' কল্পনাতীত ছিল। পরাণকুসম ক্যাচ ফেলায় মাদ্রাজের জিত বাজী হারে পরিণত হ'লো। শেষ উইকেট ৫০ মিনিট দাঁড়িয়ে গেল, লেদার ও অক্সেনহ্যাম দু'জন বোলারে মিলে ৮০ রান করে, নিশ্চিত হার থেকে দলকে নিয়ে গেলো জয়ের পথে। মাদ্রাজদলের ফিল্ডিং ও নিক্ষেপ খুব ভালো হয়েছে, তার প্রমাণ রাইডার ও ম্যাকার্টনের রান-আউট হওয়া। গোপালন্ প্রথম ইনিংসে ২৩ রানে ৬ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৬২ রানে ৫ উইকেট মোট ১১ উইকেট এই খেলাতে নিয়ে বোলিংএ অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এ পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়াদের বিরুদ্ধে খেলায় কোন বোলারই এরূপ ফল দেখাতে পারেন নি। কলিকাতায় সমগ্র ভারত ৪৮ রানে আউট হয়। মাদ্রাজে অষ্ট্রেলিয়াদের ৪৭ রানে নামিয়ে দিয়েও নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ মাদ্রাজ হেরে গেলো। মাদ্রাজ :—১৪২ ও ১৬৫ ; অষ্ট্রেলিয়া :—৪৭ ও ২৬২ (৯ উইকেট)।



এম্ জি গোপালন্

মাদ্রাজ পক্ষে রামাস্বামী অতি চমৎকার খেলেছেন:

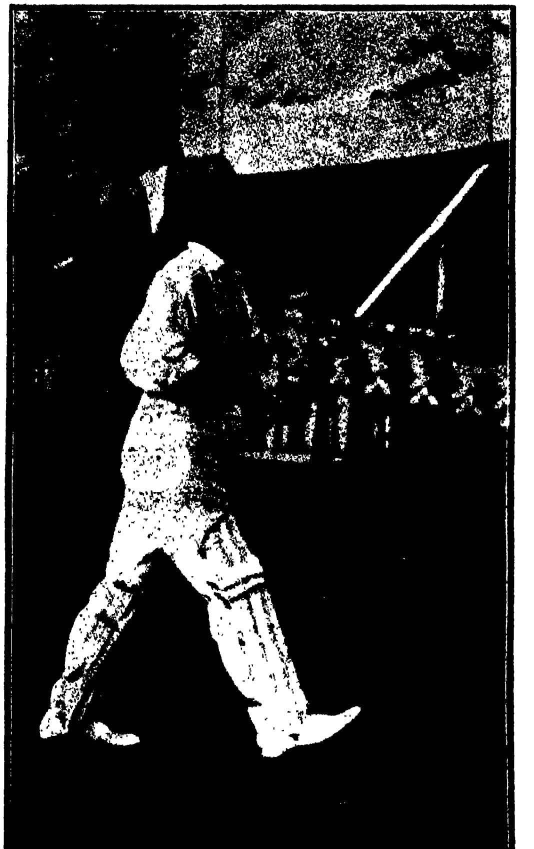
প্রথম ইনিংসে ৪৮ (নট্-আউট্), দ্বিতীয় ইনিংসে ৮২, ৩৪ ও ৫৪ রান কেবল বাউণ্ডারীতে করেছেন। তাঁর ভাই বালিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৪৪ করেছেন। অষ্ট্রেলিয়া পক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে, হেনড্রি ৪৯, লেদার (নট্-আউট্) ৪৬, ম্যাকার্টনে ৩৯।

চতুর্থ ও শেষ টেষ্ট ঃ

মাদ্রাজে চতুর্থ ও শেষ টেষ্ট খেলা ৬ই ফেব্রুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে ৮ই তারিখে তিনদিনেই শেষ হয়ে গেছে। সমগ্র ভারত ৩৩ রানে জয়ী হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতের টেষ্ট খেলায় (যদিও বেসরকারী !) ফল সমান সমান হ'লো। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম দু'টি খেলায় জয়ী হয়েছিল। ভারত তৃতীয় ও চতুর্থ খেলায় জয়ী হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে অ্যাগাল ও অক্সেনহ্যাম অসুস্থতা ও আঘাতের জন্ত খেলতে পারেন নি। নির্ব্বাচিত মহম্মদ হোসেন খেলেন নি, তাঁর ভ্রাতা এস এম হাদি খেলেছেন। তিনি দুই ইনিংসেই নট্-আউট্ ছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর ১৯, ভারতের সর্ব্বোচ্চ স্কোর। তিনি বেশ কৃতিত্বের সঙ্গে খেলেছেন, তাঁর খেলার কৌশল সুন্দর ও প্রশংসনীয়।



জে এস রাইডার

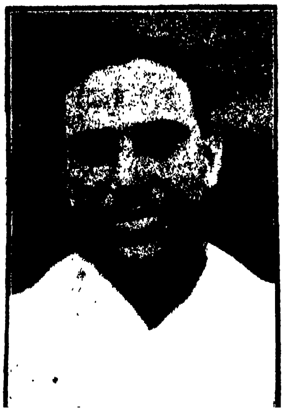


ম্যাকার্টনে

আকাশ পরিষ্কার, উইকেট ভালো, প্রায় দশ হাজার দর্শক সমবেত। ভারত টসে জিতলে। ওয়াজির আলি কে বোস ও মুস্তাক আলিকে ব্যাট করতে পাঠালেন। মুস্তাক বেশ ভালই খেলছেন, কে বোস ৪ করেই গেলেন। বিপুল আনন্দ ধ্বনির সঙ্গে অমরনাথ নামলেন। অমরনাথ সতর্কতার সঙ্গে খেলছেন, মুস্তাক আলি পিটাচ্ছেন। নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ মুস্তাক আলি ৮২ মিনিট খেলে ৪৩ করে রান-আউট হলেন। অমরসিং এসে পিটিয়ে খেললেন। লাঞ্চের পর থেকেই ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয় সুরু হলো, এবং চা পানের সময় ৩-৫৫ মিনিটে মাত্র ১৮৯

রানে ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হলো। এলিস ষ্ট্যাম্পড করেছেন তিন জনকে আর একজন কট্।

অষ্ট্রেলিয়াদের ইনিংস আরম্ভ হয়ে প্রথম ওভারেই স্লিপে হেনড্রি কট্ হলো, তখন তাদের এক রানও হয় নি।



এম ডি হোসেন

ব্রায়াণ্টের ক্যাচ ফস্‌কেছে। ভারতের ফিল্ডিং অত্যন্ত খারাপ হচ্ছে। অমরসিং তার চতুর্থ ওভারের শেষ বলে মরিসবীকে বোল্ড করলে। বেলা শেষে অষ্ট্রেলিয়া ৪ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৬১ রান করেছেন। অমরসিং ও নিসার প্রত্যেকে দু'টি করে উইকেট পেয়েছেন।

দ্বিতীয় দিনের সকালে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ জলপূর্ণ হয়। শুকনো চট ভিজিয়ে মাঠ থেকে জল শুষে নেওয়া হ'লে, বেলা বারটায় খেলা আরম্ভ হলো। দর্শক সংখ্যা প্রায় হাজার বারো। লাভ ও এলিস খেলতে নামলেন। এলিসের ক্যাচ ওয়াজির ফস্‌কালেন, পুনরায় ক্যাচ উঠ্‌লে কার্ত্তিক ধরে ফেললেন। বাকী ৬টা উইকেট ১০১ রানে পড়ে গেলো বেলা ২-৩৫ মিনিটে, মোট স্কোর ১৬২তে। মাঠের অবস্থা বুঝে অষ্ট্রেলিয়ারা যেন শীঘ্র শীঘ্র আউট হয়ে যেতেই চাইলে, যাতে ভারতের দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠের ঐ অবস্থার সুযোগ তারা পায়।

আবহাওয়ায় বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। ভারতীয় দল ২-৪৭ মিনিটে দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। এক রান করে কার্ত্তিক গেলেন, মুস্তাক ৭ করে ২৭-এর মাথায়। অমরসিং গেলো ১০ করে, ওয়াজির এলেন। অমরনাথ ১৮ করে গেলেন। চা পানের সময় রান হলো মাত্র ৫৩।



মুস্তাক আলি

ওয়াজির আউট হলেন। দর্শকরা বিদ্রূপ করলে। ১২৮ মিনিটে শত রান উঠ্‌লো, বেলা শেষে ৯ উইকেট গিয়ে ১০৩ রান হয়েছে।

তৃতীয় দিনে আকাশের অবস্থা ভালো। দিনটি ছুটির বলে ঘোষিত হওয়ায় দর্শক সংখ্যা বেশী হয়েছে। হাদি ও ভেঙ্কটাচারী খেলতে নামলেন। হাদির ৯ রান হ'লো। এলিস দক্ষতার সহিত ভেঙ্কটাচারীকে ষ্ট্যাম্পড করলে ১৭ মিনিট খেলার পর। ভারতীয়দের দ্বিতীয় ইনিংস মোট ১১৩ রানে ১৪৫ মিনিট খেলে শেষ হলো।



নিসার

বেলা ১১-৩৬ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়ারা দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করলে। ১৪১ রান করলে তাঁরা জয়ী হবেন। ১৫ রানের মধ্যে লাভ ও মরিসবী গেলেন। ব্রায়াণ্ট একঘণ্টা খেলে ১১ রান করে এল্‌-বি, হলেন, মোট রান মাত্র ৩৬। রাইডারের সঙ্গে হেনড্রি যোগ দিলেন ও ৯ রান করে গেলেন। ভারতীয়দের ফিল্ডিং ও ক্যাচ খুব ভালো হচ্ছে। রাইডার পিটিয়ে খেলছেন। লাঞ্চের পর রাইডার ও ম্যাকার্টনের জুটিতে রান সংখ্যা ৮৫তে উঠ্‌লো। *নিসার ওভারে একটা বল সঠিক করছে বাকী ৫টা এমন দিচ্ছে যাতে মোটে রান না হয়। অমর সিং উইকেট লক্ষ্যে মারাত্মক বল দিচ্ছে। নিসার, অমরনাথ ও সালাউদ্দীন তিনজনে মিলে ম্যাকার্টনের ক্যাচ ধরতে গিয়ে কেহই পারলেন না। ৮৬ রানে ম্যাক্ বোল্ড হলেন। এলিস এল। রাইডার ৪১ রান ৮০ মিনিটে করে মোট ৯১ রানের মাথায় অমরসিংয়ের চমৎকার বলে বোল্ড আউট হলে অষ্ট্রেলিয়াদের জয়াশা শেষ হলো। মেয়ার এলেন, এলিস দুর্ভাগ্যবশতঃ নিসারের বলে ৯৯র গাঁঠে এল-বি হলো। এই বিচারে তিনি সন্তুষ্ট হন নি। ৭ উইকেট গেছে, এখনও পরাজয় থেকে

নিস্তার পেতে ৪০ রান বাকী। লেদার এসে ৩ রান করে নিসারের বলে গেল ডেভিস এলো ও নিসারের বলে গেলো আলেকজাণ্ডার এলো। সেই ওভারে আলেকজাণ্ডারকে আউট করতে পারলে নিসারের হ্যাট-ট্রিক্ হ'তো। পরের ওভারে নিসারের বলেই ২ রান করে বোল্ড হলে ২-৩৫ মিনিটে অষ্ট্রেলিয়াদের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১০৭ রানে ১৩৯ মিনিটে শেষ হলো ভারত ৩৩ রানে চতুর্থ টেষ্টেও জয়লাভ করলে।

বোলিংয়ে প্রথম ইনিংসে নিসার ও অমরনাথ ৬১ ও ৫৪ রানে ৫টি করে উইকেট নিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে নিসার।

ভারতীয় দল—

প্রথম ইনিংস

কার্ত্তিক বসু···কট রাইডার, বো লেদার	৪
মুস্তাক আলি · রান আউট	৪৩
অমরনাথ···কট লাভ, বো লেদার	৩২
অমর সিং···কট লেদার, বো রাইডার	৪৫
এম এম নাইডু···কট এলিস, বো হেনড্রি	৭
ওয়াজির আলি···কট লাভ, বো ম্যাকার্টনে	১৮
রাম সিং···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো মেয়ার	৫
হাদি··· নট-আউট	১৯
সালাউদ্দিন···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	৫
নিসার···বো মেয়ার	০
ভিরুভেঙ্কটাচারী···ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	৫
অতিরিক্ত	৬
মোট	১৮৯



খেলাঘরের বার্ষিক স্পোর্টস "টাগ্ অফ্ ওয়ার"
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



রেঞ্জার্স ক্লাবের বার্ষিক স্পোর্টস্ (পাগ্লা জিমখানা) ছবি—কাঞ্চন



মোহনবাগান স্পোর্টসে 'আমাদের ছয়জন'—আর সেন, জি সি দাস, এম ঘোষ, এল দেব, বি কে মুখার্জ্জি ও এন কে শীল—ডি এন গুঁইয়ের ছয় জনকে টাগ্ অফ্ ওয়ারে পরাভূত করছে ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৮	৩	২৯	২
হেনড্রি	১১	৪	৯	১
আলেকজাণ্ডার	৬	১	১৮	০
ম্যাকার্টনে	২০·৫	৫	৫২	৩
মেয়ার	১১	০	৬৪	২
রাইডার	৬	১	১১	১

ভারতীয় দল—দ্বিতীয় ইনিংস

কে বসু…বো লেদার	১
মুস্তাক আলি…কট লাভ, বো লেদার	৭
অমরনাথ…কট লেদার, বো ম্যাকার্টনে	১৮
অমর সিং…এল বি ডবলিউ, বো হেনড্রি	১০
ওয়াজির আলি…বো ম্যাকার্টনে	১৬
এম এম নাইডু…ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	৭
রাম সিং…বো ম্যাকার্টনে	০
হাদি নট-আউট	১৯
সালাদ্দিন…কট ও বো লেদার	১২
নিসার…ষ্ট্যাম্পড এলিস, বো ম্যাকার্টনে	১৭
তিরুভেঙ্কাটাচারী…ষ্ট্যাম্পড এলিস বো ম্যাকার্টনে	১
অতিরিক্ত	৫
মোট	১১৩

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
লেদার	১৬	৪	৩২	৩
হেনড্রি	১৩	৪	৩৫	১
ম্যাকার্টনে	১৮·৪	৭	৪১	৬

অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

হেনড্রি…কট অমরনাথ, বো নিসার	০
এফ ব্রায়াণ্ট…কট মুস্তাক আলি, বো নিসার	২৬
আর মরিসবী…বো অমর সিং	১২
রাইডার…এল বি ডবলিউ, বো অমর সিং	২০
এইচ এল লাভ…কট ভেঙ্কটাচারী, বো নিসার	১৯
এলিস…কট বসু, বো অমর সিং	২
ম্যাকার্টনে…কট রাম সিং, বো অমর সিং	৩
মেয়ার…বো অমর সিং	৪৮
লেদার…বো নিসার	১৩
জে ডেভিস… নট-আউট	৪
আলোকজেণ্ডার…বো নিসার	১
অতিরিক্ত	১৪
মোট	১৬২

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
অমর সিং	১৭	৩	৫৪	৫
নিসার	১৬	২	৬১	৫
সালাউদ্দিন	১	০	১১	০
অমরনাথ	১	০	৬	০
রাম সিং		১	৮	
মুস্তাক আলি		১	৮	

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস

এফ ব্রায়াণ্ট…কট অমর সিং, বো নিসার	১১
লাভ · কট অমর সিং, বো নিসার	২
মরিসবি…বো সালাদ্দিন	
রাইডার · বো অমর সিং	৪১
হেনড্রি·· কট সালাদ্দিন, বো অমরনাথ	৯
ম্যাকার্টিনে…বো অমর সিং	১৪
এলিস…এল বি ডবলিউ, বো নিসার	১২
মেয়ার নট আউট	৩
ডেভিস…বো নিসার	০
আলেকজাণ্ডার…বো নিসার	২
অতিরিক্ত	৭
মোট	১০৭

বোলিং—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
নিসার	১৬·৪	৪	৩৬	৬
অমর সিং	২১	৬	৫৪	২
অমরনাথ	১	০	৩	১
সালাউদ্দিন	৪	৩	৭	১



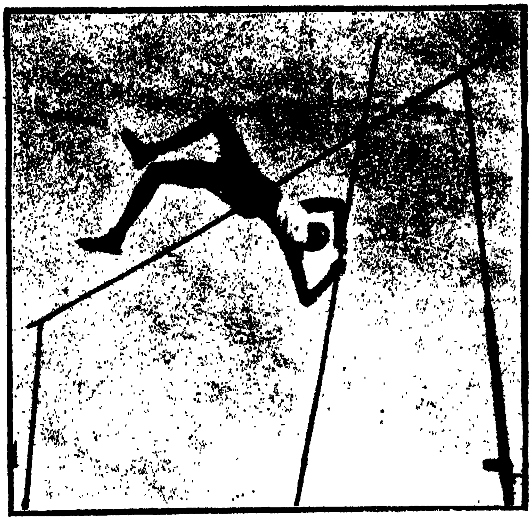
বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টসের একশত মিটার দৌড়ে—
প্রথম জেড্ এইচ খাঁন ছবি—কাঞ্চন



বেঙ্গল অলিম্পিক স্পোর্টস্—মেয়েদের ৫০ মিটার
দৌড়—প্রথম, মিস্ এম্ স্মিথ ছবি—কাঞ্চন



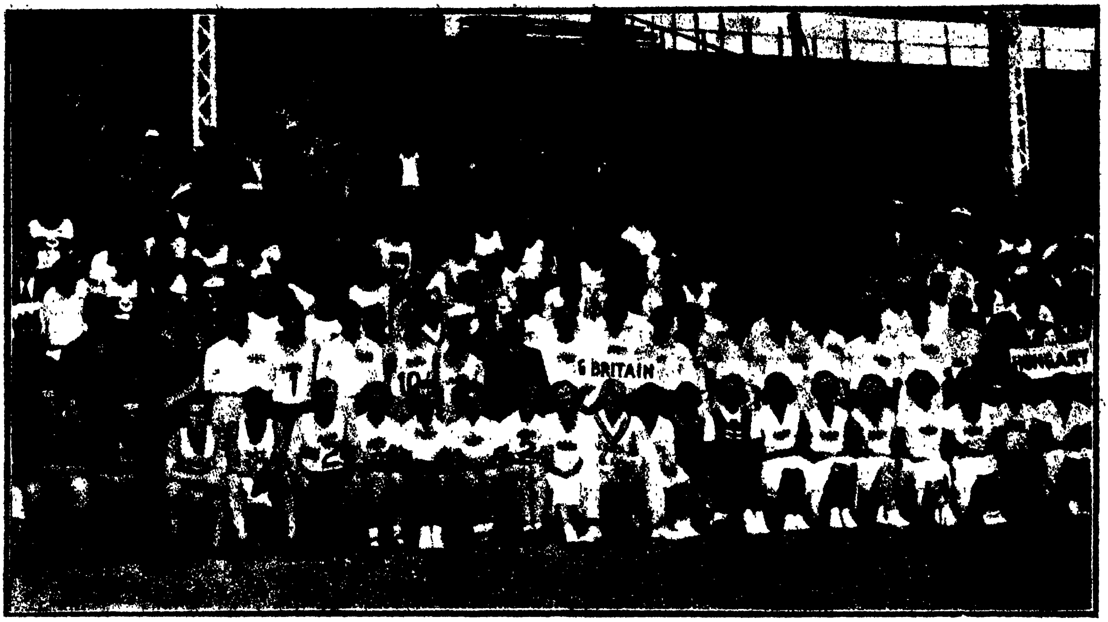
মোহনবাগান এথ্‌লেটিক্ স্পোর্টসের ইণ্টার ক্লাব তিন-পায়া
রেসে বি উকিল ও এস উকিল ৯½ সেকেণ্ডে
জয়ী হচ্ছেন ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ



মোহনবাগান স্পোর্টস্—বিজয়ী এইচ কে মুখোপাধ্যায়
(আই এ ক্যাম্প) পোল ভল্টে ১০ ফুট ৭
ইঞ্চি লাফিয়ে অল্ বেঙ্গল রেকর্ড
স্থাপন করেছেন
ছবি—ভক্তকুমার ঘোষ

লণ্ডনে মূক বধিরগণের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৩৫ সালের ১৯শে আগষ্ট থেকে মূক-বধিরগণের চতুর্থ আন্তর্জ্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হয়। সে এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ইতঃপূর্ব্বে এরূপ আনন্দকর প্রতিযোগিতা লণ্ডনে হয় নি। গ্রেটবৃটেন মূক-বধিরগণের প্রতিযোগিতায় এই প্রথম সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে সক্ষম হলেন। সপ্তাহকাল প্রতি অপরাহ্নে হর্ব্বর্ণ ষ্টেডিয়াম ক্লাবে যে মূকবধিরগণ সমবেত হয়েছিলেন, তাদের সংখ্যা পনেরো শত। পূর্ব্বে লণ্ডনে মূকসমাজে এতাদৃশ আনন্দ ও উল্লাস পরিলক্ষিত হয় নি। ভারতীয় শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী এ-আর-সি-এ (লণ্ডন) ইহাতে যোগদান করেন এবং Walter sportsman হয়ে কার্য্য করেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়ায় এবং তাঁর রয়েল কলেজ অফ্ আর্টের পরীক্ষায় উপাধিলাভ করায় জন্য বহু মূক-বধির আনন্দ প্রকাশ করেন। অনেকে তাঁর ফটো ও 'অটোগ্রাফ' নেন।



সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকারী গ্রেট বৃটেন দল বন্ধুবর্গ সহ

প্রতিযোগিতার ফলাফল ঃ

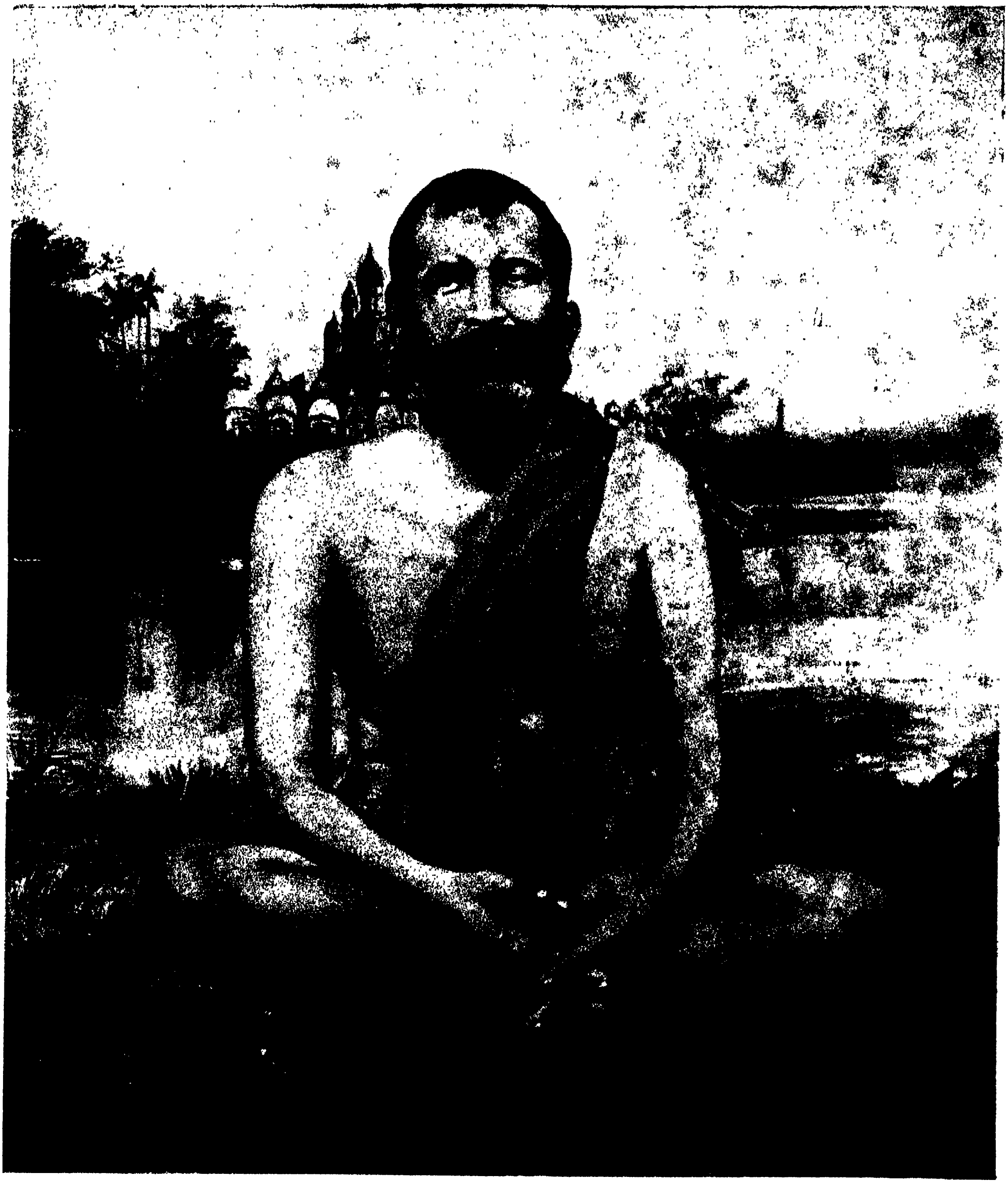
		এথ্‌লেটিক্‌স্‌	সাঁতার	ফুটবল	টেনিস্‌	সাইকেল দৌড়	পয়েণ্ট
১।	গ্রেটবৃটেন	৮৪	৪৭	১০	৪৯	১৬	২০৬
২।	জার্ম্মানী	৮১	৭৮	—	১০½	—	১৬৯½
৩।	ফ্রান্স	১০৫	১১	৪	২০	৯	১৪৯
৪।	সুইডেন্‌	১২১	—	—	—	—	১২১
৫।	ফিন্‌ল্যাণ্ড	১১২	—	—	—	—	১১২
৬।	নরওয়ে	১৮	৩০	—	—	—	৪৮
৭।	বেলজিয়াম	—	—	৬	৩৫½	—	৪১½
৮।	ডেনমার্ক	২৬	১১	—	—	—	৩৭
৯।	হল্যাণ্ড	—	৩৬	—	—	—	৩৬
১০।	হাঙ্গেরী	—	৩০	—	—	—	৩০
১১।	ইউ এস এ	২৯	—	—	—	—	২৯
১২।	অষ্ট্রিয়া	১১	১২	—	—	—	২৩

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ক্তার শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "রবীন মাষ্টার"— ২৲
হমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত উপন্যাস "সান্ত্বনা"— ১।০
শ্রীপ্রমথনাথ মল্লিক বাহাদুর প্রণীত "কলিকাতার কথা" (মধ্যকাণ্ড ইতিহাস)— ৩৲
ভো ঠাকুর প্রণীত কাব্য "স্বপ্ন শেষ"— ।৶০
তীশচন্দ্র ভক্তিরত্ন প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কীর্ত্তন"— ১০
রুচন্দ্র রায় প্রণীত উপন্যাস "কাল-নিদ্রা"— ১।০
শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত গল্প "বিদেশী ফুল"— ১।০
শ্রীজগৎ মিত্র প্রণীত উপন্যাস "এরা শুধু মানুষ"— ১।০
শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "পতিতার জাহ্নবী"— ২৲
শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত প্রণীত কবিতা "রূপায়তন"— ১৲
গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত নারী জীবনী "জীবনী সংগ্রহ" দ্বিতীয় ভাগ— ১।০

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta.



শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



চৈত্র—১৩৪২

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

চলিত ভাষার সংস্কার

শ্রীরাধারাণী দেবী ও শ্রীনরেন্দ্র দেব

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা চলিত ভাষার বানান নিরূপণে সচেষ্ট হয়েছেন। আনন্দের কথা। প্রগতি-শীলা চলিত ভাষার যথেচ্ছাচারকে সুনিয়ন্ত্রিত করে একটা বিধি-নির্দ্দিষ্ট সংযত পথে তাকে পরিচালনের ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু, কেবলমাত্র বানান সমস্যার সমাধান চেষ্টাতেই এ সম্বন্ধে সকল কর্ত্তব্য সমাপ্ত হবে না।

এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ধারা দেখে মনে আগেই এই সংশয় জাগে যে, তাঁরা এদিকে ঠিক দৃঢ়পদে অগ্রসর হবার সংকল্প করেন নি। পদক্ষেপ যেন একটু দ্বিধাজড়িত ও সকুণ্ঠ! তাঁরা 'সাধুভাষা' ও 'চলিত ভাষা' দু' নৌকাতেই পা দিয়ে অগ্রসর হ'তে চান, কিন্তু এরূপ যাত্রা যে চিরদিনই সঙ্কটময় এবং তার ফল যে কোনো দিনই শুভ হ'তে পারে না একথা বলাই বাহুল্য!

তাঁরা চান একটা মাঝা-মাঝি রফা ক'রে চ'লতে! কিন্তু, এতে কোনোটিরই কল্যাণ হবে ব'লে মনে হয় না। এই উভয়-সঙ্কট অবস্থায় যে কোনো একটাকে ত্যাগ ক'রে একটাকে ধরে থাকাই ভালো। হয় সাধু ভাষাই তাঁরা শিরোধার্য্য ক'রে নিন; নয় চলিত ভাষার হাতেই আত্ম-সমর্পণ করুন।

এ বিষয়ে রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের উদ্যমও ঠিক এই একই কারণে আশানুরূপ ফলবান হ'তে পারছে না। তিনি মৌখিক ও লৈখিক ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের পক্ষপাতী। এতদুদ্দেশ্যে কিছু কিছু অক্ষর সংক্ষেপও ক'রতে চান্। কিন্তু তিনি সংস্কৃতের মোহ আজও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভীষিকা তাঁকে প্রতিপদে ভ্রূকুটি ক'রে অক্ষর পরিত্যাগে বাধা দিচ্ছে! তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার ভার কিছু কমাতে ইচ্ছুক অপরদিকে তেমনি আবার এর স্কন্ধে কতকগুলি চিহ্নের বোঝা চাপাতেও চান! এই 'চাপান' কিন্তু বর্ত্তমান ব্যস্ততার যুগে কোনো কিছুর উপরই সইবে না!

এখন দিন এসেছে সকল প্রকার বাহুল্য বর্জ্জনের।

বর্ত্তমান শতাব্দীকে প্রকৃতপক্ষে যান্ত্রিক যুগ বলা চলে। এ যুগে মানুষের সকল প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা হ'চ্ছে কল-কব্জার সাহায্যে। যা কিছু চিঠি-পত্র দলিল দস্তাবেজ আদালতের আর্জ্জি ও রায়, মায়—বড় বড় বই লেখা পর্য্যন্ত টাইপ-রাইটারে নিষ্পন্ন হ'চ্ছে। দ্রুত লিখনের জন্ত short-hand বা 'ত্বরা-লেখা' এবং cable বা তারে সংবাদ প্রেরণের সুবিধার জন্ত code-words বা সাঙ্কেতিক শব্দের প্রচলন হয়েছে। মুদ্রাযন্ত্রের কাজ সত্বর, সহজ এবং সুন্দর করবার জন্ত 'লাইনোটাইপ' 'মনোটাইপ' ও 'রোটারি মেশিন' ব'সেছে। কিন্তু সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তৃষ্ণার্ত্তের যেমন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলা ভিন্ন গত্যন্তর নেই, তেমনি এসব দেখে আমরা শুধু ম্লান অধোমুখে চেয়ে থাকি মাত্র। কারণ 'বাংলাভাষা' এ সকল সুযোগ গ্রহণের মোটেই উপযোগী নয়। আনন্দবাজার পত্রিকাকে বাংলা লাইনোটাইপ যন্ত্র সংগ্রহ করতে রীতিমত কৃচ্ছ্র সাধনা করতে হ'য়েছে। তাঁরা বরলাভ করেছেন বটে, কিন্তু সেটা তাঁদের সম্পূর্ণ মনঃপূত হয়নি। এই যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে ধরণীর ক্ষিপ্র গতির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে চ'লতে না পারলে জগতে আজ আমাদের যে কেবল পেছিয়েই পড়তে হবে তাই নয়, জগন্নাথের বিরাট রথচক্র তলে নিষ্পেষিত হ'য়ে মরতে হবে। পৃথিবীর সকল জাতিই বর্ত্তমান সময়ানুকূল ও উত্তর যুগোপযোগী নিজেদের যা কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক তা যথাকালে সংস্কার করে নিয়ে এগিয়ে চলেছে! কেবল আমরাই কি পড়ে থাকবো পুরাতনের মোহ নিয়ে?

এই আকাশ-যানের যুগে বৈদিক আমলের গরুর গাড়ীর মায়া কাটাতে হবে। পরিবর্ত্তনই গতি; পরিবর্ত্তনই প্রাণ! নদীর স্রোতোবেগ আছে বলেই তার জল থাকে চির-নির্ম্মল! যুগে যুগে নব নব সংস্কারের পথ বেয়েই জাতি বলিষ্ঠ ও দীর্ঘায়ু হ'য়ে ওঠে।

চীন তার বর্ণমালার ৪৯০০০ অক্ষরকে কমিয়ে ২৪টিতে দাঁড় করাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কেবলমাত্র টিকি ছেঁটেই নিশ্চিন্ত হয় নি। তুর্কী তার খিলাফৎ ও ফেজটুপি ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তার এবং লিখন ও মুদ্রণের সুবিধার জন্ত 'রোমান-লিপি' গ্রহণ করেছে। বন্ধুবর ডাক্তার সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় অনেকদিন থেকেই আমাদের রোমান-লিপি গ্রহণ করবার জন্ত উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু আমরা জন্মগত সনাতনী। মন আমাদের পুরাতন-পন্থী। সে তার মজ্জাগত জরার জড়তা এবং সঙ্কীর্ণতা ঝেড়ে ফেলে এ সকল অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারও গ্রহণ ক'রতে পারছে না।

আজকের কথা নয়, পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার একটা সুনির্দ্দিষ্ট রূপ গড়ে তোলবার জন্ত 'সাধনা' পত্রিকার পৃষ্ঠায় সকলকে আহ্বান ক'রে-ছিলেন। তাঁর মতে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হয় বিদেশীর ফরমাসে এবং তার সূত্রধার ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিতেরা। বাংলা ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর ভাদ্র-বৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখন মুখ দর্শন করেন নি। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হয়েছিল; সে জন্ত একে তাঁরা আমল দেন নি। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটে নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করলেন যার কেবল বিধিই আছে, কিন্তু গতি নেই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়ে যজ্ঞ-কর্ত্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়লেন। (সবুজ পত্র ১৩২৩) কিন্তু সোনার সীতাকে নিয়ে রামচন্দ্রের সংসার চলেনি। নিকষ এবং তোলদণ্ডের যোগে সে সীতার মূল্য পাকা ক'রে বেঁধে দেওয়া সহজ, কিন্তু সজীব সীতার মূল্য সজীব রামচন্দ্রই বুঝতেন, তাঁর রাজসভার প্রধান স্বর্ণকার বুঝতেন না, কোষাধ্যক্ষও নয়। আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য সে সজীব প্রাণের মূল্য * * (বিচিত্রা ১৩৩৯) চলিত বাংলার প্রতিষ্ঠার পক্ষে—অদ্যাবধি রবীন্দ্রনাথের চেষ্টার বিরাম নেই। তিনিই প্রথম একথা জোর ক'রে ব'লতে সাহসী হয়েছিলেন যে "তিনটে 'শ', দুটো 'ন' ও দুটো 'জ' শিশু-দিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে। * * * এ ছাড়া দুটো 'ব'য়ের মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ, ৯, ঙ, ঞ, এগুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। * * সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় "হ্রস্ব দীর্ঘস্বর।" কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে আমরাও আজ সেই কথাই বলি। চলিত ভাষার সংস্কার তথা বানান নিরূপণে নিযুক্ত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বাংলা বর্ণমালা সংক্ষেপ করা! কারণ, বানানের ভিত্তি বর্ণমালার উপরই নির্ভর করে। এই বর্ণ-মালা আগে নির্দ্দিষ্ট না হ'লে 'বানান' এই শব্দটিরই বান'ন

নিয়ে গোল বেধে যেতে পারে! বর্ণমালার বর্ণনা থেকে যদি বানান শব্দ এসে থাকে তাহ'লে সংস্কৃতপন্থীদের মতে বানানের বানান করতে মাঝের 'ন'টি মূর্দ্ধণ্য ণ লেখা উচিত! কিন্তু এতাবৎ আমাদের দন্ত্য নয়েই কাজ চলেছে, এ জন্ত 'মহাভারত' অশুদ্ধ হয়নি।

চলিত বাংলায় হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের বালাই নেই; রাজশেখরবাবু বলেন—মূল সংস্কৃত শব্দের আদিতে বা মধ্যে যদি 'ঈ' থাকে তবেই বাংলা শব্দে দীর্ঘ ঈ হয়, যথা শীর্ষ=শীষ, দীর্ঘিকা=দীঘি, কুম্ভীর=কুমীর। কিন্তু, এর ব্যতিক্রমও তিনি দেখিয়েছেন। আর, দীর্ঘ ঈ হয়—অবশ্য পণ্ডিতি প্রথায়—দুই সমান স্বর সন্নিহিত হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি করলে—যেমন গিরি-ইন্দ্র=গিরীন্দ্র, মহী-ইন্দ্র= মহীন্দ্র। অথচ দীর্ঘ উর্‌বেলা মূল সংস্কৃতে দীর্ঘ ঊ থাকলেও শব্দের বাংলা রূপে হ্রস্ব উ হয়, যেমন—ঊনবিংশ=উনিশ, কূপ=কুয়া, তূল=তুলা ইত্যাদি। সন্ধির ক্ষেত্রে অবশ্য দীর্ঘ ঊ বজায় থাকে।

বিশেষণে ও স্ত্রীলিঙ্গে—দীর্ঘ ঈ ব্যবহার বাংলায় নিয়মিত হয়েছে বলা চলে না—কেন না তারও যথেষ্ট ব্যতিক্রম পাওয়া যায়। যেমন—বেশি, দিদি। অতএব আমাদের মনে হয় বাংলা ভাষায় ১৪টি স্বরবর্ণের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র অ আ ই উ এ ও এই ৬টি থাকলেই যথেষ্ট! চলিত বাংলা ঌ, ৡ,কে বর্জ্জন করেই চলে। আর—ঋ, ঐ'কার, ঔ'কার প্রভৃতি যখন স্বাধীনবর্ণ নয়, দু'টি বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে উচ্চারিত হচ্ছে, তখন সেই সন্ধিকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিলেই অনায়াসে উচ্চারণ ক'রতে পারা যাবে। যথা—র্‌-ই=ঋ বা রি, অ-ই বা ও-ই=ঐ, এবং অ-উ বা ও-উ=ঔ! যেমন:—ঐ লোকটি=ওই লোকটি। 'ঐশ্বর্য্য' শব্দটিকে যদি 'অইশর্য' এই বানানে চালানো হয়, কেন না আমরা বাংলায় শ্ব'র ব'ফলা উচ্চারণ করি না, তাতে বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য্য কিছুমাত্র কমবে বলে মনে হয় না! 'খই', 'দই', ঐ'কারের পরিবর্ত্তে ই দিয়ে লিখলে কলারের কোনো অসুবিধা হবে কি? 'ঔষধ'কে চলিত বাংলায় 'ওষুধ' বানান করলেও আশা করি তা' সেবনে রোগ সারবে। 'কৌশল'কে যদি 'কউশল' লেখেন তাতে কারুর কৌশল ব্যর্থ হবে না।

ব্যঞ্জন-বর্ণ থেকে ঙ, জ, ঞ, ণ, ব, শ, স, ঢ়, ঃ এবং ৎ সহজেই বর্জ্জন ক'রে চলিত ভাষা মাত্র ৩০টি ব্যঞ্জন অক্ষরে তার সকল ব্যঞ্জনা শেষ করতে পারে। বিভিন্ন সংস্কৃত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণের দিকে লক্ষ্য রেখে, এমন কি ইংরাজীর V. W. Z. ও আরবি ফার্সির খে, কাফ্, গাইন প্রভৃতিরও সঠিক উচ্চারণ কেমন ক'রে বাংলায় লেখা যায় সে সম্বন্ধে আকাশ পাতাল ভেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা যদি বাংলা ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা আরও বাড়িয়ে তুলে "পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী মা আমার" করে তোলেন, তাহ'লে তাঁরা হয়ত ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক বিধি বজায় রাখতে পারবেন, কিন্তু, ভাষা হ'য়ে উঠবে দুর্ভাগ্য!

উচ্চারণ প্রথা বাংলা দেশের সকল জেলায় সমান নয়। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে বলা যায় কলকাতার লাখপতিরা লক্ষ টাকাকে বলবে—'লোখ্য টাকা' এবং ঢাকার ধনী মহাজনেরা তাঁদের প্রাদেশিক ধ্বনি বজায় রেখে পড়বেন 'লৈক্ষ্য টাহা!' কিন্তু, সে জন্য লাখটাকার একটি পয়সাও কম পড়বে কি? সুতরাং ও চেষ্টা না ক'রে, যাতে ছেলেমেয়েদের ভাষা শেখার উপায়টি সুগম হয়, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ, টাইপ-রাইটার প্রভৃতি মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা ও ছাপাখানার সৌকর্য্যের সুযোগ ঘটে সেইদিকে দৃষ্টি রেখে যথাসম্ভব বর্ণমালার বাহুল্য বর্জ্জন করাটাই হবে সমীচীন।

এখন দেখা যাক্ আমাদের প্রস্তাবানুযায়ী বর্ণমালার অক্ষর সংখ্যা হ্রাস করলে বাংলা ভাষা—বিশেষ চলিত ভাষা অচল হ'য়ে পড়বে কি না?—

আমাদের মনে হয় 'ঙ'র আসনে যদি ং কে বসানো যায় তাহ'লে ঙ কে আমরা অনায়াসে নির্ব্বাসনে দিতে পারি। বর্গের পঞ্চম বর্ণ ঙ ঞ ণ ন ম স্থানে যদি সমবর্গীয় বর্ণ পরে থাকে তবে ং ব্যবহার করা বিধি আছে এবং তা চলছেও। অহংকার, সংকীর্ণ, সংখ্যা, সংঘ ইত্যাদি এর প্রমাণ। কাঙালী বাঙালী লিখতে চলিত বাংলা এখনও 'ঙ'র শরণাপন্ন হয়, কিন্তু 'ঙ'য় আকার চিহ্ন দেওয়ার পরিবর্ত্তে 'ঙ'টাকে বাদ দিয়ে যদি পুরো 'আ'কারটাই ব্যবহার করা যায়, তাহ'লে 'বাংআলী'—বাঙালীই থাকবে, ওড়িয়া বনে যাবার ভয় নেই।

বর্গীয় 'জ'এর কাষ আমরা অন্তঃস্থ 'য' দিয়ে সারবো, কারণ বাংলার জিহ্বায় দুই 'জ'ই সমান। দুটো 'য'এর

মধ্যে অন্তঃস্থ 'য'টা বেছে নেওয়ার কারণ—ওর তলায় ফুটকি দিলেই আমরা 'য়' অক্ষরটা পাবো, তাতে 'লাইনো' ও টাইপ রাইটারের পক্ষে এবং ছাপাখানার দিক থেকেও সুবিধে।

'ঞ' আমাদের খুব কমই প্রয়োজনে লাগে। সে আছে কেবল যুক্তাক্ষরের সংখ্যা বাড়াবার জন্য। যথা—চঞ্চল, বাঞ্ছা, কুঞ্জ, ঝঞ্ঝা ইত্যাদি। প্রত্যেকটি শব্দে এক একটি নূতন নূতন যুক্তাক্ষর—অথচ প্রত্যেকটি শব্দ আমরা উচ্চারণ করি সুস্পষ্ট দন্ত্য 'ন' দিয়ে—যেমন—চন্‌চল, বান্‌ছা, কুন্‌জ, ঝন্‌ঝা! সুতরাং 'ঞ'র উৎপাত এখানে সহ্য করা নির্ব্ব্‌দ্ধিতা! জ্ঞানীদের 'যজ্ঞ' পণ্ড করবার জন্য কোনো বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন হ'লে 'য' ফলা ও ঁ চন্দ্রবিন্দুর শরণাপন্ন হলেই চলবে। অবশ্য হসন্ত চিহ্নটা থাকা চাই। কারণ, এই হসন্তের হাতিয়ার ঘুরিয়েই আমরা সমস্ত যুক্তাক্ষরকে নিঃক্ষত্রিয় করতে চাই। চলিতভাষা যদি এভাবে যুক্তাক্ষর বর্জ্জন ক'রে চলে তাহ'লে গ্যাঁন, বিগ্যাঁতা, অভিগ্যাঁতা অগ্যাঁ লোকেরও অবিদিত থাকবে না। যগ্যাঁ শিশুরাও সম্পাদন করতে পারবে। মূর্দ্ধণ্য 'ণ'কে ছেড়ে দিয়ে কেবলমাত্র দন্ত্য ন কে ধরে থাকলেই চলিত বাংলা—ভাষার সাগরে ভেসে বেড়াতে সমর্থ হবে। কেন না, মৌখিক ভাষা 'ষ'ত্ব 'ণ'ত্বর ধার ধারে না। অন্তঃস্থ 'ব'টি বাংলা ভাষায় একেবারেই নিষ্কর্ম্মা!

তিনটি 'শ'য়ের মধ্যে মূর্দ্ধণ্য 'ষ'কে রাখার আমরা পক্ষপাতী, কারণ অন্তঃস্থ 'য'এর পেট কাটলেই তাকে পাওয়া যাবে। ছেলেদের শেখার পক্ষেও সুবিধার, কলকব্জার পক্ষেও সুবিধার। ছাপাখানার ত কথাই নেই!

ঃ বিসর্গ আপনিই ক্রমশঃ স্বর্গলাভ করছে। বাংলা ভাষায় ওর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। 'দুঃসময়ের' জন্য 'দুঃখ' ক'রতে হ'লে এখন পর পর য্‌'য়ে হসন্ত ও ক্‌'য়ে হসন্ত বসালেই আর বিসর্গের অভাবে কারুর 'নিষ্‌সহায়' বোধ হবে না।

'আষাঢ়'কে যখন আষাড় বলি, 'রাঢ়' দেশকে উচ্চারণ করি 'রাড়' সুতরাং আমাদের বিশ্বাস কেবলমাত্র 'ড়' থাকলেই 'মূড়্‌হ'জনেরাও তার 'গূড়্‌হ' অর্থটা 'গাড়্‌হ'ভাবেই বুঝবে।

বেঁচে থাক্‌ 'ত'য়ে হসন্ত—ৎ আবার কেন? ওকে নাকে 'খৎ' দিয়ে বিদায় করা হোক্‌।

এইভাবে অনাবশ্যক হরফগুলিকে সংক্ষেপ করতে পারলে ছাপাখানাওয়ালারা দু'হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করবে এবং আমাদের ভবিষ্যদ্বংশধরেরাও 'বর্ণ পরিচয়' চটপট্‌ শেষ করতে পারবে। পূর্ব্বেই বলেছি চলিত বাংলা ভাষায় যুক্তাক্ষর রাখবার প্রয়োজন নেই। 'ক্ত' নিয়ে এত রক্তপাত না করে ক'য়ে হসন্ত দিয়ে 'বক্‌তব্য' শেষ করাই ভালো। ক'য়ে ষ'য়ে 'ক্ষ'টা ভিক্ষাতেই শোভা পায়। ওটা বাদ দিয়ে ক'য়ে হসন্ত ও খ রাখলে ছেলেরা রক্‌খা (রক্ষা) পাবে। ক'য়ে স'য়ে যুক্ত করবার প্রয়োজন ত দেখি কেবল কক্সবাজারে বা বক্সারে 'বাক্স' কিনতে গেলে হ'তে পারে। সুতরাং ওটাও ক' য়ে হসন্ত দিয়েই সারা উচিত। গ'য়ে ধ'য়ে যুক্ত না ক'রে, যদি কিছু দ গ্‌ধ করা হয় তাহ'লে কি আপনারা মুগ্‌ধ হবেন না?

'লঙ্কা' যদি ঙ'য়ায় ক'য়ে না লিখে ল'য়ে ং+কা=লংকা লিখি তাহ'লে লংকার ঝাল একটুও কমবে না, সোনার লংকাও ছারখার হবে না। এমনি করে ষ'য়ে ং অনুস্বর দিয়েই যদি ষংখ লিখি তাহ'লে সে ষংখও সকল শুভ কাজে বাজবে। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা সম্বন্ধে ঙয়ায় গ'য়ের অনাবশ্যকতা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

চয়ে চয়ে, চয়ে ছয়ে, জয়ে ঝয়ে, টয়ে টয়ে, নয়ে ঠয়ে, নয়ে ডয়ে, তয়ে তয়ে, পয়ে তয়ে, নয়ে দয়ে, নয়ে ধয়ে, বয়ে জয়ে, ময়ে ফয়ে, সয়ে তয়ে, প্রভৃতি সমস্ত যুক্তাক্ষর এইভাবে হসন্তের সাহায্যে লিখে সুচারু ভাবে কাজ চালানো যায় 'উ-চ্‌-ছ-ন্ন' এইভাবে 'উচ্ছন্ন' বানান লিখলে ছেলেরা কেউ উচ্ছন্ন যাবে না। 'উচ্‌ছন্‌ন' এখানে ন'য়ে হসন্ত ও ন লিখলেও চলে কিন্তু একটি হরফ্‌ বেড়ে যায়। 'য' ফলা দিলে সেটা সংখেপ করা যায়।

এতগুলি দ্বৈগুণী যুক্তাক্ষর ছাড়া কয়েকটি আবার ত্রৈগুণী যুক্তাক্ষরও আমরা ছেলেদের কাঁধে চাপাই যেমন—লক্ষ্মণ, উজ্জ্বল, মহত্ত্ব, মন্ত্র, ঊর্দ্ধ, বস্ত্র ইত্যাদি। এগুলিকে বাচ্ছাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে না নিলে তারা ঘাড় সিধে ক'রে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছে না। এখন থেকে ওরা লিখুক লখ্যন, উজ্জ্যল, মহত্য, মন্ত্র, উদ্‌ধার, বস্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু, এই 'র' ফলা প্রভৃতি চিহ্ন সম্বন্ধেও একটু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে হয়। ই, কার উ'কার প্রভৃতি চিহ্ন ও য'ফলা র' ফলা ম'ফলা ব'ফলা, ন 'ফলা প্র-

ফলা আমাদের ঢেলে সাজতে হবে। স্বরবর্ণ থেকে দীর্ঘ ঈ দীর্ঘ ঊ যখন বাদ দিচ্ছি, তখন 'ি' চিহ্নটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে টেনে আনাই সুবিধা যথা—তীনী। ডাইনের হ্রস্বইকার না থাকায় এখানে দীর্ঘঈকার ব্যবহার করতে হ'ল। কারণ, আগে ব্যঞ্জন—তারপর স্বর যোগ! 'ু' চিহ্নটি যোগেশবাবু ও রাজশেখরবাবুর প্রস্তাব অনুসারেই চালানো ভাল। সর্ব্বদা নিচের দিকে এক পাশে থাকবে। কোনো হরফের সঙ্গে আর যুক্ত হ'তে দেওয়া নয়। তাহ'লে শুঁড়পাকানো 'গু' 'শু' প্রভৃতি পৃথক হরফ আবশ্যক হবে না। 'ঋ'কে আমরা ত্যাগ করেছি র+ই র সাহায্যে। কাযেই 'ঋষি' এখন থেকে 'রীষী' লিখলেই চলবে, কিন্তু 'কৃষি' কাযের বেলা ক'য়ের সঙ্গে র+ই র চিহ্নরূপে সেই পুরাতন কাতকরা 'ৃ'ফলাকেই বাহাল রাখতে চাই—এবং 'ূ' ফলার বেলা তাকেই উপর দিকে তুলে নিয়ে ব্যবহার করতে বলি।

ৃফলা তলার দিকে থাকলে হবে র+ই=রি। উপর দিকে থাকলে হবে 'র' ফলা। তাই সম্বল ক'রেই ত্র্যম্বক বৃষারূঢ় হয়ে ত্রৈলক্য ঘুরে আসতে পারবে। এটা কউতুক নয়। "ে" চিহ্নকে অক্ষত রেখে 'ও'কারের বেলা সেই পুরাতন 'ঔ'কার চিহ্নটার শেষাংশ টেনে নিয়ে এসে ব্যবহার করলেই চলবে। যেমন 'শোক' না লিখে 'শৌক' লিখলেই হবে। 'ঐ' কার ও 'ঔ'কারের কোনো চিহ্নই রাখার আবশ্যক নেই; কারণ ওগুলো 'ই' 'উ' দিয়ে চলবে। 'ক্র' হরফেরও প্রয়োজন গেল, এখন 'ক'য়ের মাথার পাশে 'র' ফলা অর্থে প্রযুক্ত 'র্' ফলা দিলেই হবে যথা—বর্ক, কুর। 'ব' ফলা রাখাও অনাবশ্যক। কারণ অধিকাংশ শব্দেই তিনি অনুচ্চারিত থাকেন যেমন—স্বাধীন, শ্বেত, স্বজন, দ্বীপ, স্বর্ণ, স্বর, ইত্যাদি। যেখানে উচ্চারিত হয় সেখানে উদ্যানের মত 'য' ফলাতেই কাজ চলবে—যেমন 'বিদ্বেষ', 'অধ্য' 'বিদ্যান' ইত্যাদি। 'ন' ফলারও প্রয়োজন নেই কারণ 'বিষন্য' 'অন্ত' ইত্যাদি 'য' ফলাতেই চলবে। দণ্ড্য ন'য়ে হসন্ত ও 'ন' দিলেও চলে কিন্তু তাতে হরফ বাড়ে। 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্‌ন' লিখলে আশা করি, 'বৈষ্‌নবেরা উষ্‌ন বা 'অসহিষ্নু' হবেন না। মধ্যাহ্ন র 'হ্ন' চলিত ভাষায় হ্ত হ'য়ে উচ্চারিত হয় মধ্যান্‌ন!

'ম' ফলা নিয়েও মাথা ঘামাবার প্রয়োজন নেই। কারণ বাংলা ভাষায় ওটার উচ্চারণ নাসিকাতেই আবদ্ধ থাকে। যথা—'ভস্ঁয' (ভস্ম) পদ্দ্য (পদ্ম) রেফ্‌টা ´ আমরা চাই। কারণ, ওটা অনেক 'দ্বিত্ব' রূপঃহরফি দৈত্যেরহাত থেকে বাংলা ভাষাকে বাঁচাবে। যেমন—ধর্ম, কর্ম, মর্ম, গর্দভ ইত্যাদি।

সুতরাং, আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী এখন বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ মিলে একখানি মাত্র সরল 'বর্ণ বোধে' দাঁড়াচ্ছে—যার অক্ষর বিন্যাস ৫৪টি স্থলে—হবে ৩৫টি। স্বর-ব্যঞ্জন চিহ্ন ২১টির পরিবর্ত্তে মাত্র ১০টি—যুক্তাক্ষর ৩০টি একেবারেই বাদ যথা—ক্ক, ক্ত, ক্ষ, ক্স, গ্ধ, ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, চ্চ, চ্ছ, ঝ্ব, জ্ঞ, ঞ্জ, ট্ট, ঠ্ঠ, ণ্ড, ন্ত, ন্দ, ন্ধ, ন্ত, ক্ষ, স্ত, স্প, জ্জ্ব, ত্ব, ন্ত্র, ন্ন, র্জ্জ, র্দ্ধ, স্ত্র। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই—স্বরবর্ণ=অ, আ, ই, উ, এ, ও=৬, ব্যঞ্জনবর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, চ, ছ, ঝ, ট, ঠ, ড, ঢ, ত, প, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ষ, হ, ং, ঁ, ড়, য়।=৩০, স্বর-চিহ্ন—া, ী, ু, ে, ৌ=৫, ব্যঞ্জন ফলা=্য, ৃ, ্ব, ্, ´=৫। ব্যস্, এই পেলেই চলিত বাংলা চমৎকার চলবে—কি পাঠশালে, কি টাইপ-রাইটারে, কি ছাপাখানার লাইনোটাইপ, মনোটাইপ রোটারি মেশিনে—সবেতেই এবং সুনীতিবাবু বোধ হয় স্বীকার করবেন 'রোমান লিপি' চালাবার পক্ষে এটাই হচ্ছে প্রথম ধাপ!

শব্দের উচ্চারণ সঙ্কট ও অর্থ-বিভ্রাট ঘটতে পারে এই আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে অনেকেই সঠিক উচ্চারণের অনুকূল অতিরিক্ত কতকগুলি চিহ্ন বানানের সঙ্গে ব্যবহার ক'রতে উৎসুক হয়েছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বাদ যাননি। 'লেখা' এবং 'দেখা' শব্দে এ' কারের সোজা ও বাঁকা দুরকম বিভিন্ন উচ্চারণের ইঙ্গিত দেবার জন্য বাঁকা 'এ' কারের একটু পার্থক্য রাখবার চেষ্টা হচ্ছে। ইংরাজীনবীশ পণ্ডিতেরা আবার 'জ' ও Z এর উচ্চারণ পার্থক্য প্রকাশের যোগ্য চিহ্ন খুঁজছেন। কিন্তু, ছেলেরা যখন Bat, আবার Ball নিয়ে খেলা করতে পারে; Sit বলে Kite শেখে, Top জেনেও Toll টোল পড়ে—Put বলেই Cut বলে, তখন একারের এই ঈষৎ করুণা তাদের উপর না বর্ষণ করলেও চলে। 'এ'কারের কোথায় বাঁকা উচ্চারণ হবে এবং 'য' কোথায় 'Z'এর মত উচ্চারিত হবে সেটা নির্ণয়ের ভার পাঠকদের উপর ছেড়ে দিলেই সুবিবেচনার কাজ হবে। "কেশব কেরাণীগিরি করে না কেশিয়ারী করে।" এর মধ্যে কেবল মাত্র একই 'ে'কার চিহ্ন থাকলেও যথাস্থানে বাঁকা উচ্চারণ কেউ পড়তে ভুল করবে না। অবশ্য "ইষ্টা-মপকা-

গজবি-ক্রয় হয়" যাঁরা পড়েন তাঁদের কথা আলাদা। 'এবং' কথাটায় মস্ত বড় 'এ' থাকলেও কোনো কোনো জেলার লোকেরা—পড়েন 'এ্যাবং'। 'কেবল' তাদের কাছে 'ক্যাবল' —আর যতই বাঁকা 'ে' একার থাক না এমন কি যে শব্দে 'যা'ও আছে, সেখানেও তাঁরা বেরিষ্টার (ব্যারিষ্টার) ডেকে এনে 'বেঘাত' (ব্যাঘাত) উৎপাদন করবেন এবং 'বেকারণের' (ব্যাকরণ) 'বেখ্যা' (ব্যাখ্যা) শোনবার জন্য 'বেকুল' (ব্যাকুল) হবেন। সুতরাং বাঁকা 'এ'কারের বঁড়শী দিয়ে তাঁদের জিহ্বাকে সংযত করবার চেষ্টা নিষ্ফল।

তবে তাঁরা নিজেরা এর একটা চমৎকার উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন বটে, সেটা আপনারা গ্রহণ করতে রাজি আছেন কি না ভেবে দেখুন! তাঁরা 'চেন' শব্দটাকে লেখেন 'চেইন্'—পাছে 'চ্যান' পড়ে ফেলেন কেউ! 'ল্যান' না বলেন কেউ, এই ভেবে 'লেন'কে লেখেন 'লেইন'! কিন্তু, যাক্ সেকথা। সুনীতিবাবু 'স্‌টেশন' লিখলেও যখন তাঁরা পড়েন 'ষ্ট্যাশন' এবং আমরা পড়ি 'ষ্টেশান' তখন 'স্‌টেশনে' কোনো পক্ষেরই আপত্তি থাকতে পারে না। পাঠক-সমাজকে একেবারে নীরেট মূর্খ ধরে নেওয়াটা কিন্তু পণ্ডিত-বর্গের পক্ষে না বিদ্যাবত্তার—না বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক! কোথায় 'য' Zএর মত উচ্চারিত হবে এ তারা জানে। একারণ য'য়ের পিঠে Zএর আঁচড় দেবার প্রয়োজন করে না। তারা বাবুও সাজে, আবার তামাকও সাজে, হাজার কাজের মধ্যেও বাজার যেতে বেজার হয় না!

এই তো গেলো উচ্চারণ সঙ্কটের কথা। এখন অর্থ-বিভ্রাট সম্বন্ধেও আলোচনা করা যাক। ঈ, ঊ জ, ণ, শ, স, ইত্যাদি তুলে দিলে অনেক ভিন্নঅর্থ-বাচক শব্দের একই রকম বানান হবে, ও তা' নিয়ে গোল বাধবে। তাছাড়া, লিঙ্গ-বিপর্য্যয় ঘটবার সম্ভাবনা ত আছেই, একথাও অনেকে বলবেন। কারণ, বাংলায় সাধারণতঃ ই ও ঈ এবং নি ও নী প্রত্যয় যোগেই স্ত্রীলিঙ্গ পদ নিষ্পন্ন হয়! কিন্তু এসকল আপত্তিও একেবারেই টেঁকে না! কারণ বাংলা ভাষায় এমন অসংখ্য শব্দ রয়েছে যার বানান এক, কিন্তু অর্থ বহু! "minute" কোথায় সময়জ্ঞাপক এবং কোথায় সভাসমিতির সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরিণী—আবার কোথায় বা তা 'মাইনিউট' সেটা পুঙ্খানুপঙ্খরূপে ছেলেরা যদি শেখে—Please take it এবং It will please you! এই উভয় pleaseএর অর্থ পার্থক্য যদি ছেলেদের রপ্ত হ'তে পারে, তাহলে 'ভাষা' কোথায় language, আর কোথায় 'ভাষা' মানে to float, 'দিপ' অর্থে কোথায় 'প্রদীপ' আর কোথায়ই বা জলবেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূভাগ—তা' সহজেই তারা আয়ত্ত করে নেবে। 'পাট'=শব্দটির বানান পা+ট কিন্তু অর্থ অনেকগুলি।—১। কোষ্ঠী বা শণপাট, ২। নালিতা, ৩। রেশম, ৪। কৌশেয়, ৫। পাটশাড়ি, ৬। ভাঁজ, ৭। স্তর, ৮। তক্তা (ধোবার), ৯। কপাটের পাট, ১০। খড়ম বা চটির (জুতোর) পাটি, ১১। সিংহাসন (রাজপাট), ১১। শ্রেষ্ঠ (পাটরাণী), ১২। বৈষ্ণবপীঠ (শ্রীপাট), ১৩। অস্ত (সূর্য্যপাটে), ১৪। নিত্যকর্ম্ম (ঘরের পাট), ১৫। ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি (বংশের পাট), ১৬। কুয়ার পাট, পেটো ইত্যাদি। আর একটা দেখুন— 'তারা' শব্দটি, একই বানান 'তা-রা'—কিন্তু, অর্থ এর প্রায় এক ডজন! যথা—তারা=নক্ষত্র, তারা=আঁখিতারকা, তারা=দশমহাবিদ্যার একটি, তারা=বালিরাজার পত্নী, তারা=বৌদ্ধ দেবী, তারা=সুরগ্রামের উচ্চসপ্তক (উদারা মুদারা তারা!), তারা=তাহারা, তারা=পার হওয়া উত্তীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। সুতরাং দীর্ঘ ঈ, দীর্ঘ ঊ, ণ, জ, শ, স প্রভৃতি বাদ দেওয়ার ফলে একই বানানের বিভিন্ন অর্থ-বাচক শব্দ ছেলেদের বেশী কিছু জব্দ ক'রতে পারবে কি?—

আমাদের প্রস্তাবিত ভাষা সংস্কারের ফলে ঈহা ও ইহা এক হবে বটে, কিন্তু চলিত বাংলায় 'ঈহা' ব্যবহার হয় কি? সংস্কৃত কীল=বাংলায় 'খিল্' হয়ে গেছে সুতরাং আটকাবে না। কাষি—অর্থ তখন অভিধানে লেখা হবে ১। কাষিধাম্ বারানষি হিন্দুর তিরথ্ ষ্থান ২। ষর্দি কাষি, কাষরোগ ইত্যাদি। মতিলালের মতিগতি ভাল নয় লোকে যখন বুঝতে পারে তখন গংগায় 'বান' ডাকলে কেউ গংগা ময়রার 'বান' বলে ভুল করবে না এ বিষ্ষায় আমাদের আছে।

তারপর লিঙ্গ-বিপর্য্যয়ের আশঙ্কা! এটা এতই অমূলক যে তা নিয়ে পুঁথি বাড়াতে চাইনে। শুধু এইটুক ব'ললেই যথেষ্ট হবে যে 'ই' ও 'নি' প্রত্যয়ান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দগুলি এ উৎপাতেও অক্ষতই থাকবে, কারণ আমরা 'ই' বর্জ্জন করিনি। আর 'ঈ' কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ যদি অতঃপর 'ই' দিয়ে লেখা হয়—তাতে আশা করি কোনো

হানি হবে না। স্ত্রীকে যদি এখন থেকে হ্রস্ব 'ই' দিয়ে বানান করি, তাঁর আধিপত্য তাতে কিছুমাত্র হ্রস্ব হবে বলে ত' বোধ হয় না—হ্রস্ব 'ই' কার দিয়ে লিখলেও 'পেত্নি' চিরদিন পেত্নীই থাকবে। 'অভাগির'ও কোনকালে ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটবে না! সুতরাং মাভৈঃ!

চলিত ভাষায় সংস্কৃত শব্দ যথাসম্ভব কম ব্যবহারের আমরা পক্ষপাতী। সাধুভাষায় 'আর্দ্রবস্ত্র' চলিতভাষায় 'ভিজে কাপড়' মাত্র! এতে 'সিক্তবসনের' তাৎপর্য্য ও রসের এতটুকুও ঘাটতি হবে বলে মনে করি না। "চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি" যদি সাহিত্যের অমরাবতীতে পৌছুতে পেরে থাকে, তবে মিছে কেন সংস্কৃতের প্রাচীন শিলাখণ্ড ঘাড়ে চাপিয়ে বাংলাভাষাকে গতিহীন করা? এ দুর্ব্বুদ্ধি ঘটলে 'চণ্ডীদাস' সেদিন মাঠে মারা যেতেন! মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' হয়ত রচিতই হ'ত না—যদি তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের দাসত্ব করতেন। এমন কি পূর্ব্বতন ধারার বিদ্রোহী না হ'লে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও আমরা পেতেম কিনা সন্দেহ!

অনেকে ব'লছেন 'পরিভাষা'র সন্ধান ক'রতে সংস্কৃতের কুবের ভাণ্ডারে আমাদের হাত পাতা ছাড়া উপায় নেই, কারণ চলিতভাষার শব্দসম্পদ এত অল্প ও অসম্পূর্ণ যে সংস্কৃতের দাক্ষিণ্য ভিন্ন তার সংসার অচল হ'য়ে পড়বে। কিন্তু, সত্যই কি তাই? পণ্ডিতেরা অনেক ভেবে Bycycleএর পরিভাষা ক'রে দিয়েছিলেন "দ্বিচক্রযান" কিন্তু তা'কি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হ'তে পেরেছে? তার চেয়ে চলিতভাষার 'পা-গাড়ী' অনেক সোজা কথা! আজকাল ত' দেখি 'বাইক' শব্দটাই সবারমুখে চলছে, এমন কি কেতাবেও! "ঘটিকাযন্ত্র" অপেক্ষা 'ঘড়ি' যেমন সোজা কথা—তেমনি ক'রেই চলিতভাষায় নূতন শব্দ লোকের মুখে আপনি গড়ে উঠবে ও উঠ্‌ছে! চাই শুধু পণ্ডিতী পাহারাওয়ালাদের রুলের ভয় না ক'রে সমস্ত প্রয়োজনীয় নূতন বিদেশী শব্দগুলিকে আমাদের বেমালুম আত্মসাৎ করা! যেমন করে আমরা একাধিক সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, পোর্ত্তুগীজ ও ইংরাজী শব্দকে নিজের ক'রে নিয়েছি! খণ্ড = খাঁড়া, দণ্ড = ডান্‌ডা, চন্দ্র = চাঁদ, কর্ণ = কান, স্বর্ণ = সোনা হয়ে উঠেছে বাংলায়!! খুব, খোষমেজাজ, মশ্‌গুল, গোলাপ, রোজগার, গুনাগার, বেমালুম, বাংলা হয়ে গেছে। গেলাস, বাক্‌স, টিপায়, চেয়ার টেবিল সবই আজ বাংলার ঘরের জিনিষ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। কলেজ ও আপিষের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম! চপ্‌-কাটলেটের পরিভাষা খুঁজতে হয়নি কোনো দিন; কেন না, পণ্ডিতের দল টিকি পৈতের অনুশাসন মেনে দীর্ঘকাল ওগুলোর আস্বাদ গ্রহণে বিরত ছিলেন, ওরা সেই সুযোগে একেবারে আমাদের রান্নামহলের হেঁসেলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে! 'যবক্ষারজান' বুঝতে আমাদের জান বেরিয়ে যায়, কিন্তু নাইট্রোজেন সহজে বুঝি। পাড়ার যে কোনো নিরক্ষর স্যাকরা 'নাইট্রিক এসিড্‌' পদার্থটা কি ভাল ক'রেই জানে, কিন্তু "নেত্রিকাম্ল" জিনিষটা তাদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত!

বিশ্ববিদ্যালয় বরং প্রচলিত ও প্রাচীন পরিভাষাগুলিকে একত্র সংগ্রহ ক'রে তাদের নির্দ্দিষ্ট পরিচয় স্থির ক'রে দিন। যে সকল 'শব্দ' আমাদের ভাষায় নেই তার কতকগুলির যথাসম্ভব সহজ ও সরল পরিভাষা প্রণয়ন করুন। বাকী শব্দ আত্মসাৎ করুন। প্রচুর পোর্ত্তুগীজ শব্দ আজ বাংলা হয়ে গেছে—যেমন আচার, আয়া, সায়া, সেমিজ, কামিজ, কেদারা, আলপিন, আনারস ইত্যাদি। বিদ্যুৎ, বিজলী, তড়িৎ প্রভৃতি বুঝি কিন্তু কোনটা Electricityর জন্য ব্যবহার হবে, কোনটা lightningএর জন্য ব্যবহার হবে এইটে তাঁরা বিধিবদ্ধ ক'রে দিন।

এইবার ব্যাকরণ সম্বন্ধে দু'এক কথা বলে বক্তব্য শেষ করবো। প্রথম প্রশ্ন হ'চ্ছে—"পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র?" অর্থাৎ ব্যাকরণ আগে, ভাষা পরে—না, ভাষা আগে, ব্যাকরণ পরে?

ব্যাকরণের উৎপত্তি অনুসন্ধান করলে তো দেখা যায়—ভাষার কোলেই সে ভুমিষ্ঠ হয়েছে। ভাষাই তার জননী! যে বর্ণ, বর্গ, যুক্তাক্ষর, সন্ধি, সমাস, ষত্ব, ণত্ব, লিঙ্গ, প্রত্যয়, বিভক্তি, কারক, বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম, ক্রিয়াপদ, শব্দরূপ, অব্যয় এবং ধাতুপ্রকরণাদি নিয়ে এত লাঠালাঠি চলেছে—তারা সকলেই ভাষার স্বাধীন শাসন পরিষদের নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্য মাত্র! ব্যাকরণের অধীনতা মানাটা ভাষারই শাসন সুনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনে, ব্যাকরণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নয়। তার পরিবর্ত্তন ও নবনির্ব্বাচন বরাবরই চলবে। এবং সেইটাই বিহিত ব্যবস্থা। আমাদের ভাষায় এত যুক্তাক্ষর ও সমাস সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান ক'রে ত দেখা যায়, সেকালে ছাপাখানা

ছিল না, কাগজের জন্ম হয় নি! লেখকদের হাতে লিখে তালপত্রে গ্রন্থ রচনা ক'রতে হ'ত। যত সহজে শীঘ্র ও অল্পের মধ্যে অনেক লেখা যায় এবং সেই পুঁথির আরও পাঁচখানা নকল চট্ ক'রে করে নেবার সুবিধা হয় এইদিকে লক্ষ্য রেখেই পুরাকালে ভাষার গঠন এই গাঢ়রূপ ধারণ করেছিল। আজকের যান্ত্রিক যুগে তার সে গাঢ়তার প্রয়োজন লোপ পেয়েছে! এখন কলের দিকে লক্ষ্য রেখেই ভাষার আমূল সংস্কার অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে!

বাংলাভাষায় একখানিও বিশুদ্ধ বাংলা ব্যাকরণ আজও রচিত হয় নি। সেই ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ থেকে সুরু ক'রে রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা ব্যাকরণ, বীমস্ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ, লোহারামের বাংলা ব্যাকরণ, রায় যোগেশ বাবুর বাংলা ব্যাকরণ পর্য্যন্ত পানিনি বোপদেবের প্রাচীন সূত্রের উদ্গার মাত্র! সুতরাং এই সময় আগে বাংলা ভাষার আমূল সংস্কার ক'রে নিয়ে তারপর একখানি খাঁটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করা ভাল নয় কি? কি ভাবে এই ব্যাকরণ রচিত হ'তে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর "শব্দকোষে" সে সম্বন্ধে অতি সুন্দরভাবে পথনির্দ্দেশ করে দিয়েছেন এবং মাল মস্লাও যথেষ্ট সংগ্রহ করে দিয়েছেন। এখন যে কোনোও একজন অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান বৈয়াকরণ সহজেই এ কাজ সম্পাদনে সমর্থ হবেন।

চলিত বাংলা ভাষার প্রত্যেক শব্দের 'ধাতু' উদ্ধারের জন্য অনেকেই আজ বিশাল সংস্কৃত শব্দক্ষেত্রে গভীর খাদ খননে প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের এ অকারণ শ্রমের কোনো প্রয়োজন আছে কি? বহুযুগের অপব্যবহারের ফলে যে শব্দ তার মান্ধাতার আমলের পৈতৃক ধাতু থেকে আজ সম্পূর্ণ স্খলিত হ'য়ে পড়েছে, তার বর্ত্তমান রূপ ও পরিচয়টাকেই গ্রাহ্য ক'রে নেওয়া উচিত এবং তদনুসারে এখন আবার তাদের নূতন ধাতুরূপ গড়াই কর্ত্তব্য। জাত হারিয়ে যারা পুরুষানুক্রমে বৈষ্ণব হ'য়ে পড়েছে তাদের আজ শুদ্ধি সম্পাদন করে আবার স্ব স্ব পরিত্যক্ত জাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টায়, তাদের প্রাক্‌বৈষ্ণবীয় আদি-জাতি নির্ণয়ের আদম-সুমারি বসাতে যাওয়া বিড়ম্বনা নয় কি? তা'ছাড়া, যে সংস্কৃতের দোহাই পেড়ে সংস্কৃতপন্থীরা এইভাবে বাংলা ভাষার সংস্কার ক'রতে চান, তাঁরা কি জানেন না যে খোদ সংস্কৃতই নিজের অনেক ধাতু হারিয়ে বসে আছে বহুদিন থেকে? 'বৃধ্' 'ঋধ্' ও 'এধ্' এই তিনটি ধাতু পরস্পর ভিন্ন বলে সংস্কৃত ব্যাকরণে গৃহীত হ'য়েছে; কিন্তু পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"বস্তুতঃ একই 'বৃধ্' ধাতুই 'ঋধ্' ও 'এধ্' এই দুই আকার ধারণ করেছে। 'বৃণোতি' ও 'উর্ণোতি' একই 'বৃ' ধাতুর রূপ। 'বৃষভ' শব্দেরই রূপান্তর 'ঋষভ'।

'দৃশ্' ধাতুর বর্ত্তমানকালে প্রথম পুরুষের একবচনে বৈয়াকরণেরা বলেন 'পশ্যতি', কিন্তু 'দৃশ্' ধাতুর 'দ' কার স্থানে 'প' কার কেন হ'ল? শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"সহস্র নৈরুক্ত সমবেত হলেও এর উত্তর দিতে পারবে না! 'পশ্যতি' বস্তুতপক্ষে 'দৃশ্' ধাতুর রূপ নয়। ওটা 'দর্শন' অর্থে প্রযুক্ত 'স্পশ্' ধাতুর রূপ!"

বাংলা ভাষায় 'চাঁদ' শব্দটির ধাতু সন্ধানে যদি চন্দ্রলোকে অভিযান করা যায় তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে মূল 'শ্চন্দ্র' হ'তে আমাদের 'চন্দ্র' বা চাঁদ হয়েছে। বৈদিক ভাষার 'পুরশ্চন্দ্র' 'সুশ্চন্দ্র' 'বিশ্বশ্চন্দ্র' ইত্যাদি শব্দ পাওয়া যায়। এইরূপ 'হরিশ্চন্দ্র' শব্দ ও বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আছে। এ সমস্ত পদই মূল 'শ্চন্দ্' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। 'শ্চন্দ্' হ'তেই পরে শ'কার লোপে 'চন্দ্' হ'য়েছে। কিন্তু বৈয়াকরণেরা বলেন 'হরি-চন্দ্র' এই উভয় শব্দের মধ্যে শ'কারের আগমে 'হরিশ্চন্দ্র' হয়েছে। শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "এটা তাঁদের কষ্টকল্পনা!"—

সংস্কৃত 'চন্দ্রমাঃ' বা 'চন্দ্রমস্' ও 'চন্দ্র', পর্য্যায় শব্দ বলে ব্যাকরণে প্রসিদ্ধ, কিন্তু বস্তুত এদের অর্থে কিছু ভেদ আছে। 'চন্দ্র' শব্দের যৌগিক বা আক্ষরিক অর্থ 'উজ্জ্বল' 'দীপ্তিমান' কারণ, 'শ্চন্দ্' বা 'চন্দ্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। ওর একটা গৌণ অর্থ হ'চ্ছে 'আহ্লাদিত করা'। 'মাঃ' বা 'মস' শব্দের অর্থ 'চন্দ্র' 'চাঁদ'। পূর্ব্বে চন্দ্রের প্রত্যক্ষ উদয়াস্ত দেখে কাল্ মাপা হত ব'লে ওর নাম হ'য়েছিল—মাঃ বা 'মস্'। 'মস'—'মস্' অথবা 'মা' ধাতু হ'তে নিষ্পন্ন। সুতরাং 'চন্দ্রমাঃ' শব্দের পুরাকালে অর্থ ছিল; চন্দ্র = উজ্জ্বল; মা = চাঁদ অর্থাৎ "উজ্জ্বল চন্দ্র"! পরে বিশেষণ বাচক শব্দের অর্থটি লুপ্ত হওয়ায় এখন কেবল 'চাঁদ' ব'লতে 'চন্দ্রমা' শব্দের প্রয়োগ হ'চ্ছে। 'মাঃ' অর্থাৎ চন্দ্রের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় চৈত্রাদি মাসকে 'মাস' বলা হয়।

এখানে 'খাস' কথাটিরও পূর্ব্ব পুরুষের সন্ধান পাওয়া গেল ! কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের এই অতি চিত্তাকর্ষক ও মহা মূল্যবান প্রবন্ধ "শব্দ প্রসঙ্গ" (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪১) থেকে জানা যায়—এমন আরও অসংখ্য সংস্কৃত শব্দ বেনামীতে চলে আসছে, যারা তাদের ধাতু, রূপ ও অর্থ পর্য্যন্ত বহুকাল হ'ল হারিয়ে বসে আছে ! পাণিনির মত পাঁড় বৈয়াকরণেও তাঁদের ছদ্মবেশ ধ'রতে না পেরে ব্যাকরণে গোঁজা মিল দিয়ে গেছেন ! সুতরাং, অন্যে পরে কা কথা ?—

আমরা চলিত বাংলায় এমন অসংখ্য শব্দ ব্যবহার করি, যা লেখা পণ্ডিতদের মতে একটা অতি লজ্জাকর গর্হিত আচরণ ! তার গোটা কয়েক নমুনা এখানে উল্লেখ করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন—ব্যাপারটা কিন্তু ততটা মারাত্মক অপরাধ নয়। যথা—আমরা যদি লিখি—'অনাথিনী' ওঁরা চোখ রাঙিয়ে বলেন কথাটা 'অনাথা' হবে। তোমরা 'থিনী' লাগিয়ে আর 'অনাথার' অতিরিক্ত সর্ব্বনাশ কোরো না ! আমরা 'গোবর' লিখলে ওঁরা সেখানে 'গোময়' লেপে দেন ! আমরা 'অন্তর্ধান' হয়েছেন লিখলে ওরা সেখান থেকে 'অন্তর্হিত' হ'ন। আমরা 'আশ্চর্য্য' হয়েছেন লিখলে ওঁরা 'আশ্চর্য্যান্বিত' হ'য়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন ! আমরা 'নির্দ্দোষী' লিখলে ওঁরা কিন্তু সেটা মোটেই 'নির্দ্দোষ' মনে করেন না। আমাদের 'নির্ধনী' তাঁদের কাছে 'নির্ধন' ! আমাদের "নৈরাশ" লিখতে দেখলে তাঁরা একেবারেই 'নিরাশ' হন। আমরা 'বিধর্ম্মী' লিখলে তাঁরা আমাদের 'বিধর্ম্মা' মনে করেন ! 'বিশেষ ভাবে' কিছু বলতে গেলে তাঁরা 'বিশিষ্টভাবে' সেটা বোঝেন না ! আমাদের 'মহদুপকার'কে তাঁরা 'মহোপকার' বলে স্বীকার করেন না। আমরা 'সশঙ্কিত' লিখিলে তাঁরা 'সশঙ্ক' বা বা 'শঙ্কিত' হ'য়ে ওঠেন ! আমাদের 'সৌজন্যতা'কে তাঁরা মোটেই 'সৌজন্য' বা 'সুজনতা' বলে মানেন না ! সুতরাং ওসব ব্যাকরণের সাংস্কৃতিক বিধান নিয়ে গোড়া থেকেই গোল না বাধিয়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি :—বাংলা ভাষাকে বাংলা ভাষা বলে স্বীকার করে তার স্বভাব-সঙ্গত নিয়মগুলি উদ্ভাবন করা হোক।

মনীষী রাজশেখরবাবু যথার্থ কথাই বলেছেন যে—"কোনো ব্যক্তি বা বিদ্বৎ সঙ্ঘের করবাণে ভাষার সৃষ্টি স্থিতি লয় হ'তে পারে না। শক্তিশালী লেখকদের প্রভাবেও সাধারণের রুচি অনুসারে ভাষার পরিবর্ত্তন কালক্রমে ধীরে ধীরে ঘটে।"

বানানের ব্যাপারে তিনি বলেছেন—"বিভিন্ন টাইপের ভারে আমাদের ছাপাখানা নিপীড়িত, তার উপর যদি 'ও'কারের বাহুল্য আর নূতন নূতন চিহ্ন আসে তবে লেখা ও ছাপার শ্রম বাড়বে মাত্র !" (প্রবাসী শ্রাবণ ১৩৪০)

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"প্রাচীন প্রাকৃতে বানানের যে রীতি আছে আমার মতে তাহাই শুদ্ধরীতি। ছদ্মবেশে মর্য্যাদা ভিক্ষা অশ্রদ্ধেয়।" (শব্দকোষ)

পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন—"সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত মধুরতর। অনুভবই ইহার পরম প্রমাণ। রাজশেখর (কবি) বলিয়াছেন সংস্কৃতবন্ধ কঠোর, প্রাকৃতবন্ধ সুকুমার। পুরুষ ও মহিলার মধ্যে যে ভেদ, সংস্কৃত ও প্রাকৃতের মধ্যেও সেই ভেদ। বাক্‌পতি বলিয়াছেন—নব নব অর্থের দর্শন আর সন্নিবেশ শিশিরবন্ধন-সম্পদ এইসব সৃষ্টিকাল হইতে নিবিড়ভাবে প্রাকৃতেই পাওয়া যায়।" (শব্দ-প্রসঙ্গ) আমরাও বলি সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার মধ্যে অবিকল এইরূপ তারতম্যই বিদ্যমান ! সুতরাং প্রাকৃত বাংলা বা চলিত ভাষাই একমাত্র এই যান্ত্রিক যুগের পুঁথির ভাষারূপে প্রচলিত হবার যোগ্য, অবশ্য যদি তার মর্য্যাদা অক্ষুন্ন রেখে তার জন্য কোন সর্ব্বজনগ্রাহ্য শাসনবিধি প্রণয়ন করতে পারা যায়।

অতএব আমাদের অভিমত এই যে—বিশ্ববিদ্যালয় আগে বর্ণ সংক্ষেপ করে নিয়ে, যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জ্জন করে চলিত ভাষার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করুন, কেন না ভাষা একটি সুনির্দ্দিষ্ট রূপ না নেওয়া পর্য্যন্ত তার সঠিক ব্যাকরণ গড়া সম্ভব হতে পারে না এবং তার বানান নিরূপণও সহজসাধ্য নয়। এদেশে একজন ষ্টালীন্ বা কামালপাশার উদ্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত সুনীতিবাবুকে তাঁর রোম্যান লিপি চালাবার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে। রায় বাহাদুর যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয়েরও 'ধর্ম' 'কর্ম' প্রভৃতি ততদিন পঙ্গু হওয়া ছাড়া গত্যন্তর কি ?

মাটির দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(৩৬)

রাত্রি বারটার পর ইন্দ্রনীলের মোটর এসে থামল।

গেটকিপার গেট খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল, মোটর নির্দ্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে ইন্দ্রনীল নেমে পড়ল।

আজ ঝোঁকের বশে সে বেশ বেশীরকমই মদ খেয়েছিল, —বেশীক্ষণ স্থির হ'য়ে দাঁড়ানর ক্ষমতা তার ছিল না। কাল বাদে পরশু দিন তমসা আর সে এরোপ্লেনে ইংল্যাণ্ড যাবে, আজ আনন্দ সম্মিলন ছিল তমসার বাড়ীতে।

মোটর থামতেই দু-তিনজন চাকর ছুটে এসেছিল। তারা ইদানিং তাদের মনিবের প্রকৃতি বেশ জেনেছিল— গাড়ীর শব্দ পেয়েই তাদের প্রস্তুত হতে হয়।

কোনক্রমে সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরের দরজার সামনে গিয়েই ইন্দ্রনীল শুম্ভিত হয়ে দাঁড়াল।

ঘরে আলো জ্বলছে, দরজা খোলা; সেই খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি মেয়ে।

প্রধান চাকর রামটহল ফিস ফিস করে বললে—"মা এসেছেন—"

ইন্দ্রনীল হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে রইল।

সেই মেয়েটি—যাকে সে সেই গ্রামের প্রান্তে দেখেছিল।

স্বপ্ন যে কোনদিন সত্য হতে পারে তা ইন্দ্রনীল জানত না।

বিস্ময়ে সে শুধু বিস্ফারিতচোখে তার পানে চেয়ে রইল, তার নেশা কোথায় উড়ে গেল।

মেয়েটি এগিয়ে এল, শান্ত কণ্ঠে বললে—"এখানে এমনভাবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঘরে এস—"

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে ইন্দ্রনীল ডাকলে—"গায়ত্রী—"

মেয়েটি উত্তর দিলে—"হ্যাঁ, আমিই, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই, আমিই এসেছি। তোমার ডাকের প্রত্যাশায় ছিলুম, দেখলুম ডাকলে না—বাধ্য হয়ে নিজেকেই আসতে হল। দেখছি অনেক দেরীতে এসেছি, আরও আগে এলেই ভাল হত। কিন্তু এ সব কথা এখন থাক, তুমি এস।"

নিজেই এগিয়ে এসে সে ইন্দ্রনীলের হাত ধরলে—চাকরদের দিকে তাকিয়ে মিষ্টকণ্ঠে বললে—"যাও, তোমরা শোও গিয়ে। আমি যখন এসেছি, আর তোমাদের এ সব দিক দেখতে হবে না।"

ইন্দ্রনীলকে ঘরে নিয়ে গিয়ে সে বিছানায় বসিয়ে দিলে— জিজ্ঞাসা করলে—"খাওয়া হয়েছে?"

তার প্রশ্নের উত্তর দিতে ইন্দ্রনীল ভুলে গেল, উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে বললে—"কিন্তু সত্যই আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে তুমি নিজেই এসেছ গায়ত্রী—এ যেন স্বপ্নেরও অগোচর।"

গায়ত্রীর মুখ বড় মলিন, তবু সে জোর করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললে—"স্বপ্নও নাকি অনেক সময় সত্য হয়, এও তাই। কিন্তু আজ এ সব কথা থাক, তুমি বড় পরিশ্রান্ত। বিছানায় শুয়ে ঘুমাও, আমি পাশের ঘরে থাকছি—দরকার পড়লে ডেক—"

সে যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালে—

ব্যগ্রভাবে ইন্দ্রনীল বললে—"একটু দাঁড়াও, তারপরে যেয়ো।"

গায়ত্রী ফিরে দাঁড়াল, বললে—"বল, কি বলবে?"

ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে—"এতকাল পরে আজ হঠাৎ আসবার মানেটা কি বুঝতে পারছিনে ত।"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"বোঝাটা এমন কিছু শক্ত নয়। অনেক কথাই কানে গিয়েছিল, সব সয়েছিলুম, কিন্তু যখন শুনলুম অধঃপতনের শেষ সীমায় নেমেছ, তখন আর থাকতে পারলুম না।"

ইন্দ্রনীল বললে—"পাতিব্রত্য ধর্ম্মের কাযটা তখন মনে পড়ল বুঝি?"

গায়ত্রী মুখ উঁচু করলে, বললে—"নিশ্চয়ই, এ কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। এর আগে সৈকতের সম্বন্ধে সব কথাই আমি জানি। রাগে নয়, অভিমানে নয়, কেবল সৈকতর জন্তই আমি আসি নি, পাছে তার কষ্ট হয়। তারপর এও শুনলুম সে চলে গেছে, তুমি আবার একটি মেয়েকে নিয়ে পড়েছ—তার সঙ্গে এরোপ্লেনে বিলেত যাচ্ছ। সইতে পারলুম না, স্ত্রীর কর্ত্তব্য মনে পড়ল—চলে এলুম।"

ইন্দ্রনীল বললে—"কিন্তু আবার যাবে ত—?"

ধীরে ধীরে গায়ত্রী বললে—"সেটা ভেবে দেখব।"

ইন্দ্রনীল বললে—"এই নাস্তিকের কাছে, এই অনাচারের মাঝখানে তুমি থাকতে পারবে কি?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"মনের একাগ্রতায় নাকি সব কিছুই সম্ভব হয়। আমার যদি সেই একাগ্রতা থাকে—অনেক অসাধ্যকেও সুসাধ্য করে তুলব আশা করি।"

সামান্ত পল্লীগ্রামের মেয়ে, লেখাপড়া বেশী জানে না, অথচ মনে হয় যেন এ সবই জানে। এর দৃপ্ত উজ্জল মুখখানার পানে তাকাতে ভয় হয় পাছে এ তাকায়, এর চোখে চোখ মিলে যায়। সে যেন একটা বিরাট লজ্জা, সে লজ্জা রাখার মত জায়গা তুনিয়ায় নেই।

বিছানায় পড়ে ইন্দ্রনীল ভাবছিল তার পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনের কথা।

বিলেত যাওয়ার আগে বাপের জিদে তাকে বিয়ে করতে হয়েছিল এই গায়ত্রীকে। সামান্ত গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, তার বাপ ছিলেন একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, তাঁর নিজের একটা টোল ছিল, সেখানে অনেক ছেলে পড়াশুনা করত।

এই টোলে সেই সব ছেলেদের সঙ্গে গায়ত্রীও পড়ছিল—ইংরাজী নয়, দেশীয় ভাষা সংস্কৃত।

মেয়েটি ছিল সুন্দরী এবং ছোটবেলা হতে খুব বুদ্ধিমতী; ইন্দ্রনীলের বাপ তাই একেই পছন্দ করলেন। ইন্দ্রনীলের মৃদু আপত্তি টেঁকে নি। বিয়ে না করলে সে বিলেত যেতে পাবে না, সম্পত্তি পাবে না—এসব ভেবে সে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল।

গায়ত্রী তখন সবে বার তের বৎসরের।

সেইটুকু মেয়ের মধ্যে ইন্দ্রনীল যে প্রখর বুদ্ধির বিকাশ হতে দেখেছিল তাতে সে চমৎকৃত হয়ে গিয়েছিল।

দীর্ঘ এগার বার বৎসর তারপর অতীত হয়ে গেছে, ইন্দ্রনীল দেশে ফিরেছে, পিতা গত হওয়ায় তাঁর বিপুল সম্পত্তি পেয়েছে, গায়ত্রী কোথায় পড়ে রইল কে জানে? ইন্দ্রনীলের চলার পথে সে একদিনও এসে দাঁড়ায় নি, একটিবার সাড়া দেয় নি সে আছে।

তবু ইন্দ্রনীলের মনের অতি গোপন স্তরে সে ছিল, হয় ত একেবারে মিলিয়ে যায় নি, তাই বহুকাল পরে গ্রামের পথে তাকে একবার মাত্র দেখতে পেয়েই সে চমকে উঠেছিল; তার নামটা মনে পড়ে গিয়েছিল, সে থমকে দাঁড়িয়েছিল।

তারপর হতে সময় অসময়ে এই মেয়েটির কথা মনে জাগে, ইন্দ্রনীল অন্যমনস্ক হয়ে যায়।

বিলাসে বিতৃষ্ণা এসেছিল, কোলাহলময় নাগরিক জীবন আর ভাল লাগছিল না। মনে হচ্ছিল—সে সেই ত্যাগের—নিবৃত্তির মাঝখানে যদি ফিরে যেতে পারে।

স্বপ্নেও সে ভাবে নি—গায়ত্রী আসবে—তার স্বামী বলে দাবি করবে, তাকেই তুলে নিতে চাইবে।

আজ আরও একটা দিক তার মনে পড়ে গেল।

নিজের দিক নয়—গায়ত্রীর দিক।

নিষ্ঠাবান হিন্দু ঘরের মেয়ে সে, বৈদেশিক শিক্ষা সভ্যতার ধার সে ধারে না, এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মাঝখানে সে এসে দাঁড়িয়েছে, ইন্দ্রনীল তাকে মানিয়ে নিতে পারবে না।

পদে পদে তার বাধবে, সেই জন্তই তাকে বাধ্য হয়ে ফিরে যেতে হবে।

যাক, সেইটাই হবে ইন্দ্রনীলের পরম মুক্তি। সে গায়ত্রীকে সইতে পারবে না, গায়ত্রী তার পক্ষে অসহ্য। গায়ত্রীর মুখের পানে সে চাইতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না। মাঝখানে এত বড় একটা ব্যবধান তুলে ইন্দ্রনীল বাস করতে পারবে না, সে রকম থাকার চেয়ে গায়ত্রীর স্বস্থানে ফিরে যাওয়া ভাল।

মনে ত হয় না সে ফিরবে। সে সব জেনে শুনেই এসেছে—সে হয় ত যাবে না। কিন্তু পরশু মিসেস সিংহের সঙ্গে এরোপ্লেনে বিলেত যাওয়া—

চুলোয় যাক বিলেত যাওয়া—

মিসেস সিংহ ও গায়ত্রী তুজনের কথাই মনে জাগে।

পাশ্চাত্যের শিক্ষাভিমানিনী উদ্ধতা তমসা—মুক্ত

স্বাধীন মন তার, চলা-ফেরা পান ভোজনে তার অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা। একদিন ইন্দ্রনীল ঠিক এমনই একটি মেয়েকে তার সঙ্গিনীরূপে পেতে চেয়েছিল—ঠিক তারই মনের মত, তারই মূর্ত্ত কল্পনা। কিন্তু আজ সে চায় না—তার মন অকস্মাৎ তার মানসীর আদর্শ বিচ্যুত হয়েছে।

মনে হয় ওর মধ্যে নিজস্ব কিছু নেই—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি ওর নেই, ও যেন কলের পুতুল, যে যেদিকে টানবে সেইদিকেই হবে ওর গতি।

না, দূর হক—ওর সঙ্গী হয়ে এরোপ্লেনে বিলাত যাওয়ার কল্পনা—ইন্দ্রনীল এবার ঘরে ফিরল। সে এবার হতে শান্ত সমাহিত জীবন ভোগ করবে, নিজেকে আর স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেবে না।

ঘড়িতে টং টং করে তিনটা বাজল।

ইন্দ্রনীল পাশ ফিরে শুলে।

এবার একটু ঘুমান দরকার। কাল তমসা যখন আসবে তখন গায়ত্রীকে দেখতে পাবে, তার পর যখন তার পরিচয় পাবে—

তমসার তখনকার মুখখানা কল্পনা করে ইন্দ্রনীল সেই গভীর রাত্রে অন্ধকারে হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

(৩৭)

শান্তভাবে ইন্দ্রনীল জিজ্ঞাসা করলে—"এখানে থাকতে পারবে ত গায়ত্রী ?"

গায়ত্রী তার বড় বড় চোখ দুটির শান্ত স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার মুখের ওপর রেখে উত্তর দিলে—"পারব। আমি হিন্দুর মেয়ে, ছোটবেলা জ্ঞান ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পেয়েছি স্বামীই দেবতা, তিনি যেখানেই থাকুন—সে জায়গা যত কদর্য্যই হ'ক, স্ত্রীর কাছে তাই স্বর্গ। যত কষ্ট যত দুঃখই হ'ক, যত অত্যাচার যত নির্য্যাতনই হ'ক, স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সবই সয়ে যেতে পারে? তোমার কাছে কেবল এইটুকু বলতে চাই—আমাকে এখান হতে জোর করে সরাবে না। আর তুমি আজ জোর করে সরাতে চাইলেও আমি যে সম্ভব তা ভেব না।"

অত্যন্ত দৃঢ় তার কণ্ঠস্বর—

সে জোর করে নিজের স্থান দখল করেছে—কি জানি কেন—ইন্দ্রনীল তার এই দৃঢ়তা দেখে ভারী খুসী হয়ে উঠল।

এই রকম দৃঢ়মনা একটি মেয়েকেই সে কামনা করেছিল, যে তাকে টেনে ধরে রাখতে পারবে। এই রকম শক্ত মেয়ে ছিল সৈকত, তাকে এতটুকু আলগা হতে দেয় নি, শক্তভাবে টেনে রেখেছিল।

আজ সেই সৈকতের কথাই মনে পড়ে।

সমস্ত অন্তরটা জুড়ে জেগে ওঠে বেদনা—মনে হয় যদি সে থাকত—।

গায়ত্রী খানিক চুপ করে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—"সৈকতের খোঁজ নিয়েছিলে কি ?"

ইন্দ্রনীল ঠিক এই কথাই ভাবছিল—

হঠাৎ চমকে উঠল, বললে—"না—"

খুব সংক্ষেপে গায়ত্রী বললে—"কিন্তু নেওয়া উচিত ছিল।"

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"ছিল তা আমিও জানি, কিন্তু তারই কথা রেখেছি। সে আমায় বার বার বলেছে আমি যেন তার খোঁজ না করি।"

গায়ত্রী ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বললে—"তার খোঁজ না নিতে পার, কিন্তু তার সন্তানের—? সে ত শুধু মায়েরই নয়, তার বাপেরও বটে।"

ইন্দ্রনীল নীরবে দুই হাতে নিজের মাথার পুরু চুলগুলা টানছিল।

গায়ত্রী বললে—"তার সন্তানের খোঁজ নাও, নিজের কর্ত্তব্যের কথা মনে কর, তাকে আমার কাছে এনে দাও।"

"তোমার কাছে—"

ইন্দ্রনীল যেন আকাশ হতে পড়ল।

গায়ত্রী ধীরকণ্ঠে বললে—"হ্যাঁ, আমার কাছে। আমি তাকে মানুষ করব, তাকে শিক্ষা দেব, তোমার ছেলে বলে জগতে প্রচার করব।"

বড় মলিন এক টুকরা হাসি ইন্দ্রনীলের মুখের ওপর ভেসে উঠল—

"পারবে গায়ত্রী ? সে আমার বিবাহিতা স্ত্রীর ছেলে নয়, সৈকত তার মা—তাকে মেনে নিতে—কোলে টেনে নিতে তুমি পারবে? তোমার মনে এতটুকু বাধবে না—তোমার আচারে—নিষ্ঠায়—"

গায়ত্রী হেসে উঠল—"তুমি আজও তোমার দেশের

মেয়েদের চেন নি, বিলিতি আবহাওয়া তোমায় ওদের দেশের ধাঁজেই গড়ে তুলেছে। দেখ, এ দেশ তোমার নয়। তুমি পুরাতন যুগ হতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত দেখে এস—এ দেশের ছেলেমেয়ের মধ্যে ত্যাগের দৃষ্টান্ত ঢের দেখতে পাবে। ভোগে সাময়িক তৃপ্তি পাওয়া যায় বটে, তার পরে আসে জ্বালা—তীব্র দাহন। এ দেশের মুনি ঋষিরা নিবৃত্তি শ্রেষ্ঠধর্ম্ম—এই মহাবাণী প্রচার করে গেছেন। যুগ যুগ ধরে এ দেশে ত্যাগের দৃষ্টান্ত চলেছে, এখনও—এই পাশ্চাত্যের আবহাওয়ার মধ্যেও তার দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। এখনও এমন মেয়ে এ দেশে আছে যারা অনেক অনাত্মীয়কে আত্মীয় করে একসঙ্গে বাস করে। সৈকত যদি আজ আসে আমি তাকে তার আসন ছেড়ে দিয়ে তার ছেলেটিকে মানুষ করবার ভার নিয়ে থাকব।"

ইন্দ্রনীল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে "পারবে গায়ত্রী, সৈকতকে তার জায়গা ছেড়ে দিতে পারবে?"

গায়ত্রী কাছে এগিয়ে এল—ইন্দ্রনীলের পাশে দাঁড়িয়ে তার অবিন্যস্ত চুলগুলো ঠিক করে দিতে দিতে বললে— "কেন পারব না? অত ছোট মন আমার নয়, আমি সৈকতকে চিনেছি তোমায় চেনার মধ্য দিয়ে। সত্য আমি তাকে না দেখেই ভালবেসেছি, নিজের ছোট বোন বলে জেনেছি। আজ যদি সে ফিরে আসে আমি তাকে তার জায়গা ছেড়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হব না।"

মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থেকে সে বললে—"তোমার উচিত তাকে খুঁজে বার করা। সে তোমায় বারণ করলেই তুমি বিরত থাকবে সেটা নিশ্চয়ই উচিত নয়, তোমারই কর্ত্তব্য আছে সেটা মনে করতে হয়?"

এই কথাটাই ঘুরে ফিরে ইন্দ্রনীলের মনে হয়।

সৈকত চলে গেছে, তার চিহ্ন আজও সব কিছুর মধ্যেই পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে, সে চিহ্ন কেউই মুছতে পারলে না—না তমসা, না গায়ত্রী।

সত্যকার ভালবাসতে পেরেছিল সে সৈকতকে—সেই কাল মেয়েটিকে। তার রূপ ছিল না, তার পরুষ প্রকৃতির জন্য কেউই তাকে পছন্দ করতে পারে নি, একা ইন্দ্রনীলই তাকে পছন্দ করেছিল, তাকে জীবনের সহচারিণী বলে গ্রহণ করেছিল।

সে রাত্রিটা ইন্দ্রনীল মোটেই ঘুমাতে পারে নি।

জানালার ধারে বসে সে তাকিয়েছিল দূরের পানে—কৃষ্ণা সপ্তমীর চাঁদ অনেক রাত্রে আকাশে ভেসে উঠেছিল, আকাশে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে ফুটেছিল দুটি চারটি তারা, অতি ম্লানভাবে তাদের কিরণ ফুটেছিল।

সারা দিনের পর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসটা লাগছিল বেশ সুন্দর।

তমসা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তার যাওয়ার অপেক্ষা করেছিল, তারপর পত্র লিখে লোক পাঠিয়েছিল, ইন্দ্রনীল সে পত্রের উত্তরও দেয় নি।

ও ঘরে এক ঘুমের পর গায়ত্রী জেগে উঠেছিল—

আস্তে ভেজান দরজাটা খুলতে সে খোলা জানালার সামনে ইন্দ্রনীলকে দেখতে পেলে।

খুব আস্তে পা টিপে সে এসে তার পাশে দাঁড়ালে—তার কাঁধের ওপর হাতখানা রাখতেই ইন্দ্রনীল চমকে উঠল—

গায়ত্রী স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে—"রাত অনেক হয়ে গেছে, এখনও বসে রয়েছ যে। এ রকম করে রাত জেগে একটা অসুখ বাধিয়ে বসবে দেখছি।"

ইন্দ্রনীল মাথা নাড়লে, একটু হেসে বললে—"না, অসুখ হবে না। বিছানায় শুয়েছিলুম, ঘুম এল না, সেই জন্যই বসে আছি।"

গায়ত্রী বললে—"তুমি শোও, তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দেই, ঘুম আসবে এখন।"

ইন্দ্রনীল বললে—"অতটা সুখ আমার সহ্য হবে না গায়ত্রী, পা টিপবার দরকার হবে না। তুমি যাও, আমি এইবার ঘুমাব।"

সে যে একা থাকতে চায়—তা গায়ত্রী বুঝেছিল, বললে—"আমি যাচ্ছি, তোমায় শুতে দেখে তারপর যাব।"

ইন্দ্রনীল উঠে দাঁড়াল, একটা আড়ামোড়া ছেড়ে বললে—"তুমি যাও, আমার জন্যে অনর্থক রাত জেগ না। আমার এমন রাত জাগা ঢের অভ্যাস আছে—"

গায়ত্রী যেমন ধীরে এসেছিল তেমনই চলে গেল, তার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সকালে ইন্দ্রনীলের যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন বেলা আটটা বেজে গেছে।

আলস্য সে ছাড়তে পারছিল না, বিছানায় চুপ করে পড়ে রইল।

পাশের ঘর হতে গায়ত্রীর মন্ত্রোচ্চারণ শব্দ ভেসে আসছিল। ভোর বেলায় তার স্নান হয়ে গেছে—স্নানান্তে সে নিজের ঘরে ফিরে এসে পূজা করতে বসেছে।

স্বপ্নের মত মনে পড়ে মায়ের কথা—

তখন ইন্দ্রনীলের কতই বা বয়স, বোধ হয় পাঁচ ছয় বৎসর হবে। মায়ের চেহারাটা স্পষ্ট মনে পড়ে না—সবই যেন ঝাপসা মনে হয়। তবু মনে হয়—এমনই লালপাড় শাড়ীটি তাঁর সর্ব্বাঙ্গ ঘিরে থাকত, সিঁথিতে এমনই সিঁদুর জ্বলত, কপালের মাঝখানে লাল টিপটা দপ দপ করত। মুখখানার কথা মনে না থাকলেও তাঁকে ঘিরে যে একটি শান্ত শ্রী বিরাজ করত সেটার কথা মনে হয়।

ইন্দ্রনীল দুই হাত কপালে ঠেকালে—

কোন সেই ছোটবেলায় দেখা—আজ স্বপ্নের মত মনে ভেসে ওঠা মাতৃমূর্ত্তিকে স্মরণ করে সে মনে মনে বলছিল—"আশীর্ব্বাদ কর দেবী, যেন পথ না হারাই, তোমায় যেন ভুলে না যাই। জানিনে কোন পথ ভাল—এতদিন যে পথে চলেছিলুম সেই পথ, কিম্বা বর্ত্তমানে যে পথ সামনে জেগে উঠেছে সেই পথ। যে পথে চলেই হোক—আমি যেন এক লক্ষ্যে পৌছাতে পারি, আমি যেন শান্তি পাই।"

গায়ত্রী ঘরে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়াল।

শান্ত শ্রী—মায়েরই প্রতিচ্ছবি।

গায়ত্রী এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললে—"তোমার ঘুম বোধ হয় ভাঙ্গিয়ে দিয়েছি। আজ বাড়ী ঘরগুলা দেখে শুনে ঠিক করে নেব এখন, নিরিবিলি একটা ঘর বেছে নেব পূজার জন্ম। কাল নতুন এসে কিছু ঠিক করতে পারি নি, লাভে হতে তোমার বিঘ্ন জন্মিয়েছি।"

ইন্দ্রনীল উত্তর দিলে—"না, বিঘ্ন কিছুই হয় নি গায়ত্রী, আমার ঘুম অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। অনেককাল পরে তোমার মুখে স্তোত্র শুনতে শুনতে আমার মনে অনেক কালের হারান স্মৃতি জেগে উঠল।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—"আমার মা যখন মারা যান তখন আমি মাত্র ছয় সাত বছরের, ভাল মনে পড়ে না—তবু আবছা ছায়া মনে জাগে। মনে পড়ে তোমারই মত আমার মা ছিলেন—তাঁর ধর্ম্মনিষ্ঠাই আমার উচ্ছৃঙ্খল বাপকে সৎ করে তুলতে পেরেছিল।"

গায়ত্রী বললে—"আমি সব জানি—সব শুনেছি। ও সব কথা থাক, গুরুজনের কথা না তোলাই ভাল।

উঠে বসে ইন্দ্রনীল বললে—"কিন্তু মায়ের কথা আজ আমার মনে পড়েছে গায়ত্রী, সেই জন্যই আমার বাপের কথা মনে জাগছে। আমার বাপ কি ছিলেন আজও সে গল্প শুনতে পাই—আমার মা তাঁকে ফেরাতে পেরেছিলেন। সেই উচ্ছৃঙ্খল নাস্তিক লোকটিকে আমি দেখতে পেয়েছিলুম আস্তিক ত্যাগী মহাপুরুষ রূপে।"

গায়ত্রী বললে—"আশীর্ব্বাদ কর, আমিও যেন সেই রকম হতে পারি, আমার স্বামীকে সৎপথে ফেরাতে পারি, আস্তিক করে তুলতে পারি।"

সে নত হয়ে ইন্দ্রনীলের পায়ের ধূলা নিয়ে মাথায় দিলে।

গাঢ়স্বরে ইন্দ্রনীল বললে—"আশীর্ব্বাদের জোর যদি আমার থাকে গায়ত্রী, আমি আশীর্ব্বাদ করছি তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।"

(৩৮)

মোটর হতে নেমেই তমসা হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল।

রাগে তার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। আজ সে অনেক কথাই শুনিয়ে দেবে ইন্দ্রনীলকে, সহজে ছাড়বে না। আজই ইংলণ্ডে রওনা হওয়ার দিন, কাল সে সারাদিন একটি বারের জন্ম তমসার বাড়ী যায় নি।

সামনেই পড়ল একটি মেয়ে,—

তমসা থতমত খেয়ে দাঁড়াল।

অনুপম সুন্দরী মেয়ে, বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। এমন সৌন্দর্য্য তমসা খুব কমই দেখেছে, তবু সে সহজে মেনে নিতে পারলে না। এর সিঁথির সিন্দুর, কপালের মস্ত বড় সিঁদুরের ফোঁটা, হাতের শাঁখা—এমন কি লোহাটাও তার চোখ এড়াল না।

গায়ত্রী অতি সহজেই মেয়েটিকে গ্রহণ করলে, অসঙ্কোচে বললে—"আসুন—"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে দাম্ভিকা মেয়েটি কয়েক মুহূর্ত্ত এই মেয়েটির পানে তাকিয়ে রইল, তারপর এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল, একটি কথাও বললে না।

গায়ত্রী তার ভাবটা সহজেই বুঝতে পারলে, তবুও সে বললে—"এ ঘরে বসবার কিছু নেই, ও ঘরে বসবেন চলুন।"

তমসা তার পাশ কাটিয়ে আগেই বার হয়ে পড়ল।

মেয়েটির প্রকৃতি অতি অদ্ভুত—গায়ত্রীর বেশ একটু মজা বোধ হচ্ছিল। সেও সঙ্গে সঙ্গে বসবার ঘরে প্রবেশ করলে।

তমসা একখানা চেয়ারে বসে পড়েছে। টেবিলের ওপর অত্যন্ত পরুষভাবে পা দু-খানা তুলে দিয়ে একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে একখানা বই তুলে নিচ্ছে।

গায়ত্রী চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, মেয়েটিকে সে কিছুতেই অন্তরে গ্রহণ করতে পারছিল না।

তমসা মুখ তুললে—অত্যন্ত কঠিন মুখেই জিজ্ঞাসা করলে—"মিঃ চ্যাটার্জ্জি বাড়ী নেই—?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"না—"

তমসার মুখখানা কাল হয়ে গেল—

জিজ্ঞাসা করলে—"কতক্ষণ বার হয়েছেন, কখন ফিরবেন, কিছু বলেছেন—?"

গায়ত্রী বললে—"এখনই ফিরবেন বলে গেছেন।"

তমসা খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে তার পানে চেয়ে রইল, তারপর জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি মিঃ চ্যাটার্জ্জির কে হও?"

গায়ত্রী একটু হাসলে—বললে—"তাঁর দেশের লোক।"

"ওঃ"—বলে তমসা আবার বইতে মন দিলে।

রামটহল দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলে—"মা—ভাঁড়ারের চাবিটা—"

আঁচল হতে প্রকাণ্ড বড় চাবির গোছাটা খুলে একটা বড় চাবি দেখিয়ে দিয়ে বললে—"এই চাবিটা দিয়ে তালা খুলে সব বার করে নাও গিয়ে রামটহল, যা যা লাগবে সব নিয়ো। সাহেবের জন্ম মাংস আনিয়ে নিয়ো—তাঁর খাওয়ার যেন ত্রুটি না হয়। তোমরা যদি মাছ খাও—আনিয়ে নিয়ো।"

রামটহল চাবিটা নিয়ে ইতস্ততঃ করে বললে—"আর আপনার—"

একটু হেসে গায়ত্রী বললে—"না বাবা, আমার জন্ম কিছু ভাবতে হবে না, কাল আমার যেমন হয়েছে আজও তেমনি হবে।"

একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রামটহল বললে—"রোজ অমনি করে হবিষ্যি করবেন মা, ওতে শরীর ভাল থাকবে?"

গায়ত্রী বললে—"খুব থাকবে বাবা, চিরটা কাল এমনি করেই কাটছে ত। আমার জন্ম তোমাদের এতটুকু ভাবতে হবে না রামটহল, আমার বাকি দিনটাও এমনি করে কেটে যাবে।"

খুব ক্ষুণ্ণভাবেই রামটহল চলে গেল।

কাল তারা মায়ের খাওয়ার জন্ম বিস্তৃত আয়োজন করে ফেলেছিল। বাজারের সেরা তরকারী মাছ সব এনে ফেলেছিল, কিন্তু গায়ত্রী সে সব কিছুই নেয় নি। সে শুধু ভাতে ভাত নিজেই রেঁধে নিয়ে পরম পরিতোষের সঙ্গে আহার করেছিল।

তমসা বই পড়তে পড়তে আড়চোখে গায়ত্রীর পানে চেয়ে দেখছিল।

তার কাছে এ বাড়ীতে এই মেয়েটির অবস্থিতি একেবারে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছিল। এ বাড়ীতে কিছুতেই মেলে না—না—একে মানায় খাঁটি হিন্দু গৃহস্থের বাড়ীতে।

তমসা জিজ্ঞাসা করলে—"তুমি এখানে নতুন এসেছ বুঝি?"

গায়ত্রী উত্তর দিলে—"হ্যাঁ—"

একখানা মোটর থামবার শব্দ হল—গায়ত্রী বললে—"তিনি এসেছেন—গাড়ী এল।"

সে সরে গিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল।

কথাটা যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই, কারণ একটু পরেই ভারী বুটের শব্দ শোনা গেল—

দরজার পর্দ্দাটা সরে যেতে সেখানে ইন্দ্রনীলের সুদীর্ঘ অবয়ব দেখা গেল।

"বেশ বেশ, ভারী খুসী হয়েছি গায়ত্রী, তুমি অভ্যাগতার সম্মান রাখতে জান। মাপ করবেন মিসেস সিংহ, আমায় বিশেষ দরকারে একবার ভবানীপুরে যেতে হয়েছিল, আপনাকে বোধ হয় অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছে—"

ইন্দ্রনীল একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তমসার সামনে টেবিলটার ওধারে বসে পড়ল।

তমসা অভিমানে মুখখানা গম্ভীর করে রাখলে।

গায়ত্রী এগিয়ে এসে বললে—"হ্যাঁ, এসেছেন প্রায় আধ

ঘণ্টা—তুমি এখনই আসছি আসছি করে যেতে পারেন নি। আচ্ছা, তুমি বস, আমি ওদিকে চললুম—কাজ আছে।"

ইন্দ্রনীল তার গমনে বাধা দিলে, বললে—"থাক কাজ, তোমায় এখনই যেতে দেব না গায়ত্রী। এতদিন তুমি না থাকতেও এসব কাজ যেমন করে হয়েছে তেমনই করে আজও হবে। মিসেস সিংহ এসেছেন, ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় হোক, কথাবার্ত্তা হোক—"

গায়ত্রীর ঠোঁটের ওপর মৃদু হাসির রেখা জেগে উঠে তখনই মুছে গেল —

সে বললে—"তোমরা ততক্ষণ কথাবার্ত্তা বল, আমি পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই ঘুরে আসছি, বেশীক্ষণ দেরী হবে না।"

সে বেশ বুঝছিল সে থাকতে তমসার কথাবার্ত্তা বড় বেশী সহজভাবে চলতে পারবে না; সেই জন্যই সে একটা কাজের অছিলা করে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

তমসা হাতের সিগারেটের অবশিষ্টাংশ দূরে ছুঁড়ে ফেলে বললে—"আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথাবার্ত্তা হবে, মিঃ চ্যাটার্জ্জি—।"

ইন্দ্রনীল শান্তভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বললে—"আপনার মতলব কি তাই শুধু জানতে চাই। কোথায় আজ ইউরোপে আমাদের রওনা হওয়ার কথা, সকল লোকে একথা শুনেছে, আর আপনি কি না—"

রাগে দুঃখে তার মুখে আর কথা ফুটল না।

সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে প্রচুর ধোঁয়া ছেড়ে দিতে দিতে ইন্দ্রনীল বললে—"যাওয়া হল না, মিসেস সিংহ। কথাটা জানাতে আপনার ওখানে এখনি যাব ঠিক করেছিলুম, সেই জন্যই বাড়ীতে এসেছি গায়ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য। নইলে শেষে বলবেন—আমি সত্যই ফাঁকি দিয়েছি।"

তমসা জিজ্ঞাসা করলে—"ওর সঙ্গে আপনার এমন কি সম্বন্ধ যে ওকে না নিয়ে আপনি যেতে পারেন না?"

ইন্দ্রনীল মুখখানা গম্ভীর করে বললে—"সম্বন্ধ গভীরতর, মিসেস সিংহ, উনি আমার স্ত্রী—মিসেস চ্যাটার্জ্জি বা গায়ত্রী চ্যাটার্জ্জি—"

মিসেস চ্যাটার্জ্জি—

তমসার চোখের সামনে বিশ্ব নামে কিছু যেন নেই—পায়ের তলা হতে পৃথিবী পিছলে চলে যায়।

কতক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

তারপর বলে উঠল—"আপনি আমায় পরিহাস করছেন, মিঃ চ্যাটার্জ্জি—"

ইন্দ্রনীল মাথা তুলিয়ে বললে—"সত্যই পরিহাস নয়, গায়ত্রী আমার বিবাহিতা স্ত্রী। এ বিয়ে কবে হয়েছিল জানেন—আমি বিলেতে যাওয়ার অনেক আগে। আমি ওকে গ্রহণ করি নি; ও নিজের পিত্রালয়ে বড় কষ্টে দিন কাটিয়েছে—অথচ আমার একরাত্রির আনন্দে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এতদিন অস্বীকার করে এসেছি, আজকেও অস্বীকার করতে পারব না, মিসেস সিংহ—কারণ সত্যই আমি বড় শ্রান্ত হয়ে পড়েছি—সংসারে এ রকমভাবে একা আমি আর চলতে পারছি নে, তাই কারও পরে ভর দিতে চাই।"

সে তমসার মুখের পানে চাইলে, তমসা তখন অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে চেয়ে রয়েছে।

ইন্দ্রনীল বলে চ'লল—"যে পথ বেয়ে চলছিলুম—ক্রমেই তার স্বরূপ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছিল, আমি নিজেই শিউরে উঠছিলুম। আপাত-দৃষ্টিতে দেখে যা হীরা বলে জেনেছিলুম—শেষে দেখলুম সে একটা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো, বাজারে তার দাম এক কানাকড়িও নয়। মাপ করবেন মিসেস সিংহ, হয় তো অনেক কিছু রূঢ় কথাই আমার মুখ দিয়ে বার হবে। সতীত্ব জিনিসটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি কোনদিন জানতে না চাইলেও আমি কোনদিন এ রকম মেয়েদের এতটুকু শ্রদ্ধা করতে পারি নি। এদের মূল্য তাই আমার কাছে—শুধু আমার কাছেই বা বলি কেন—কারও কাছেই নেই। আজ আমি বুঝতে পেরেছি—পথের ধারে বসে যে ভিখারিণী হাতে দুটি লাল সুতা বেঁধে ভিক্ষা চায়, তার মূল্য যা আছে—মোটর হাঁকিয়ে যে সব বিলাসিনীরা চলে যায়, তাদের মূল্য তার শতাংশের একটু নয়। সতীত্ব মেয়েদের মর্য্যাদার তুলাদণ্ড মাপকাঠি,—কেবল আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সকল দেশে সকল জাতির মধ্যে সতীর আসন তাই স্বতন্ত্র, সতী মেয়ে অসাধ্য সাধনও করতে পারে—কথা আছে।"

নিদারুণ অথচ গোপন আঘাতে তমসা বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল।

ইন্দ্রনীল নূতন করে আর একটা সিগারেট ধরাতে

ধরাতে বললে—"জানেন, মিসেস সিংহ—মানুষ কিসে শান্তি পায়? এই যে এতখানি পথ বেয়ে এসেছি, নিত্য নূতন কামনা আমায় পুড়িয়েছে, সবই পেয়েছি অথচ শান্তি পাই নি, তৃপ্তিও আমার জীবনে মেলেনি। সত্যকার মানুষ যে পাই নি তা নয়, পেয়েছি—পেয়েছি বলেই পেছন ফিরে এক আধবার চেয়েছি, জেনেছি সকলেই উচ্ছৃঙ্খল নয়। বলতে পারেন মিসেস সিংহ, আপনি যে পথে চলেছেন এতে কি পেয়েছেন? নিত্য নূতন জয়ের কল্পনামাত্র, ওতে জ্বালা ছাড়া আর কিছু নেই। সুমিত্রার কথা মনে পড়ে। কাপড় জীর্ণ হয়ে গেলে মানুষ যেমন সেটা ফেলে দিয়ে নূতন কাপড় পরে, সেও তেমনি পত্যন্তর গ্রহণ করেই চলেছিল, তারপর ভুলটা বুঝলে—কিন্তু অনেক পরে। তবু তার সৌভাগ্য—সে থমকে দাঁড়িয়েছিল—নতুন পথ সে আজ বেছে নিয়েছে। মানুষের জীবনে এমন ক্ষণও আসে মিসেস সিংহ, দানব দেবতা হতে চায়—অন্ততঃ আশাও করে—"

তমসা হাঁপিয়ে উঠে বললে—"আপনি কি সব বকে যাচ্ছেন মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।"

আঙ্গুলে টোকা মেরে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে ইন্দ্রনীল বললে—"খুব সোজা কথা মিসেস সিংহ, এমন কিছু শক্ত নয় যা আপনার পক্ষে বোঝা কঠিন হবে। একটা গল্প আছে—একটা শিয়ালের নাকি লেজ কাটা ছিল সে তাই প্রস্তাব করেছিল সকলেরই লেজ কাটা হোক, আমার অবস্থাও ঠিক সেই গোছের। আমার কথা ধরবেন না, পাগলের মত আবোল তাবোল বকে চলেছি, মাথা নেই—মুণ্ড নেই।"

গায়ত্রী এসে দাঁড়াল—

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে—"চা এনে দেবে কি?"

অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে তমসা উঠে দাঁড়াল—"না, না, আমি চা খেয়ে এসেছি, আর কিছু দরকার নেই। আচ্ছা, আজ আসি মিঃ চ্যাটার্জ্জি, আর একদিন দেখা হবে আশা করি।"

ইন্দ্রনীল উঠে দাঁড়াল, একটু হেসে বললে—"নিশ্চয়ই—তাতে কোন সন্দেহ নেই; আপনি যে দিনই বলবেন—চাই কি আমি নিজেই যাব।"

তমসা বললে—"আমি আপনাকে জানাব, আচ্ছা নমস্কার—"

তাড়াতাড়ি সে বার হয়ে চলল—ইন্দ্রনীলও সঙ্গে সঙ্গে গেল।

গায়ত্রী যে সেখানে উপস্থিত রয়েছে—তমসা যেন সেটা ভুলে গিয়েছিল।

(৩৯)

নির্ম্মল একা চুপ করে বিছানায় শুয়ে পড়েছিল।

উপস্থিত সে বেশ ভাল হয়েই উঠেছে, কোর্টে আবার কাজও করছে।

সম্প্রতি শোনা গেছে ইন্দ্রনীলের স্ত্রী আছে, সে উপস্থিত তার বাড়ীতে এসেছে। সমস্ত লোকের মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠেছে, কেউ কেউ এসে নির্ম্মলকে এ সংবাদটা দিয়ে গেছে।

নির্ম্মলকে এ সংবাদ দেওয়ার কারণ কি, তা নির্ম্মল বেশই জানে—

জেনে শুনেও সে চুপ করে থাকে। কাউকে একটি কথাও বলে নি।

সুবিমল কোথা হতে কথাটা শুনে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে বাড়ীতে ফিরেছিল—

"শুনেছ দাদা, রাস্কেলটার কথা? ওর নাকি স্ত্রী আছে, বিলেতে যাওয়ার আগে বিয়ে করে গিয়েছিল। আজ সেই স্ত্রী ফিরে এসেছে তার ঘরে। উঃ, কি বলব—সৈকত আজ উপস্থিত নেই। সে যদি থাকত—ঠিক আমি গিয়ে রাস্কেলটাকে জুতা মারতুম।"

কথাটা সত্য—কেবল সৈকত নেই বলেই ইন্দ্রনীল বেঁচে গেল।

এরই মধ্যে হঠাৎ একখানা পত্র নির্ম্মলের কাছে যেদিন এসে পড়ল, সেদিন সে উত্তেজিত হয়ে উঠল বড় কম নয়—

"বউমা—বউমা—"

তার ব্যগ্র ডাক শুনে সুব্রতা ছুটে এল!

হাতের পত্রখানা তার হাতে দিয়ে নির্ম্মল বললে—"পড়ে দেখ বউমা, সৈকত আসছে।"

সৈকত—

সুব্রতা অবাক হয়ে গেল।

নির্ম্মল আনন্দ চাপতে পারছিল না—"হ্যাঁ, সৈকত। সে তার বাপের কাছে রয়েছে লিখেছে, তিনিও আসছেন যে।"

সুব্রতা পত্রখানা পড়ে আস্তে আস্তে সেখানা রেখে বার হয়ে গেল।

খুসী হওয়ার চেষ্টা করা সত্বেও সে খুসী হতে পারলে না। তার বার বার মনে হচ্ছিল—সৈকত না এলেই ভাল হ'ত। সে এলেই সকলে ইন্দ্রনীলের সম্বন্ধে কত কথা তাকে বলবে, সে সব শোনার চেয়ে তার না আসাই উচিত।

কেউ ত তার মুখ চেয়ে কথা বলবে না। মানুষ চায় নিজের খুসীর খেয়ালে চলতে, সেই জন্য অনেক সময় নিষ্ঠুর আঘাত দিয়েও তারা আনন্দ পায়। কার মনে ব্যথা লাগল, না লাগল—কেই বা দেখে, কেই বা তা অন্তর দিয়ে অনুভব করে?

সুব্রতা তাই মনে মনে কামনা করতে লাগল সৈকত যেন না আসে। সময় থাকলে সে একখানা টেলি করে দিত, কিন্তু সময় যে নেই।

সৈকত সত্যই এসে পড়ল।

কেউ তাকে প্রথমটায় চিনতেই পারে না।

মাথার চুলগুলা পুরুষদের মত ছোট ছোট করে ছাঁটা, —এই ছোট চুলগুলাতে তার মুখের শ্রী একেবারে বদলে দিয়েছে। তার হাত একেবারে খালি—যেমন আগে ছিল। পরণে অত্যন্ত সাদা-সিদা একখানা চুলপাড় ধুতি।

তাকে যেন নিজেদের মধ্যে আর মানিয়ে নেওয়া চলে না, তার চেহারাটাই হয়ে উঠল প্রধান অন্তরায়।

যে হাসিটা তার মুখে জেগে উঠেছিল—সেটাও যেন অত্যন্ত করুণ—বেদনাপূর্ণ বলেই সকলের চোখে ঠেকল। সে বড়দা, মেজদা, বউদি সকলেরই পায়ের ধুলা নিয়ে মাথায় দিলে, ওরা কেউ একটা আশীর্বাদ পর্য্যন্ত করতে পারলে না।

এক মুহূর্ত্তে সবারই চোখের সামনে ভেসে উঠল কয়টা বছর আগেকার সৈকতের ছবিখানা।

বড়দার চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে সৈকত তাঁর মাথার ছোট চুলগুলার মধ্যে আঙ্গুল চালাতে লাগল—ঠিক চার বছর আগেকার মত।

কেউ জিজ্ঞাসাও করতে পারলে না—সে একা কেন? সকলেই জানত সৈকত আসবে—তার সঙ্গে আসবে ছোট একটি শিশু। সে স্বর্গের দূত, আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি। ধার্ম্মিক লোকরা হয়ত তাকে মেনে নেবে না—সমাজ তাকে টানবে না, তবু সে থাকবে, সে পৃথিবীর বুকে একটি মানুষ হয়ে বর্ত্তমান থাকবে। হয় ত সে আবর্জ্জনা—তবু এও সত্য—জগতে আবর্জ্জনারও আবশ্যকতা থাকে। সে শেষ অবস্থাতে মাটিতে পর্য্যবেশিত হবে এবং সেই মাটিই পৃথিবীর যেদিন ওজন হবে, সে দিন তাকে গুরুত্ব দেবে।

অন্য সময় এ সন্তানের দরকার না থাক্ লোক গণনার সময় দরকার, একটি মানুষ বাড়বে। ও যদি না থাকে, একটি কমবে—তাতে গণনার সংখ্যা কম হবে।

কিন্তু কেন সে এল না?

কেউই মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না। সত্যই কি সে এসেছিল—এখনও বর্ত্তমান আছে কি? থাকলে সে এখন কোথায়—কার কাছে?

সবারই মনে এই একটি কথাই জাগে, অথচ মুখে কথা ফোটে না।

বড়দার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সৈকত হেসে উঠল —"ওমা, বড়দার মাথার সব চুল যে সাদা হয়ে উঠল—দেখ মেজদা—দেখ বউদি। আর দুদিন বাদে দেখব—সব কদম ফুল হয়ে গেছে। জান বউদি, যেখানে আমরা থাকি সেই ঘরটার পাশে একটা কদম ফুলের গাছ আছে। ফুলগুলা যখন ফোটে, গন্ধটা ভেসে এলেই ঘর ছেড়ে বার হই, —ঠিক যেন বড়দার মাথা। সত্য—সব সাদা দেখায়, বড় চমৎকার।"

চোখ মুদে সে ফোটা কদমের রূপটা মনে এঁকে তোলে।

নির্ম্মল হেসে বললে—"আর অত বর্ণনায় কাজ নেই সৈকত। বয়স হল—চুল কি এখনও কাল হয়ে থাকবে, সাদা আর হবে না? হিসেব করে দেখ দেখি—কত বয়স হল—?"

সৈকত মহা কোলাহল তুললে—"বাঃ, কতই বা আর বয়েস হয়েছে যে তাতে তোমার মাথার চুল কদমফুল হয়ে যাবে? নিজেকে বুড়া ভেবে ভেবে সত্য তুমি বুড়া হয়ে গেলে বড়দা, এর নাম অকালবার্দ্ধক্য। আজ পিসীমা থাকলে সত্য মাথা ভেঙ্গে মরতেন—তোমার এ রকম অবস্থা দেখে।"

নির্ম্মল বললে—"সত্য—কপাল ভাল যে তিনি নেই।"

সৈকত সুব্রতার দিকে চাইলে—"বাবা, কারও মুখে একটি কথা নেই—সংয়ের মত কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে রয়েছে দেখ। বউদি না হয় পরের মেয়ে, কথা না বললেও

বলতে পারে, কিন্তু তুমি মেজদা, নিজের ভাই হয়ে তুমিও মুখ বুজে থাকবে ?"

সুবিমল হেসে উঠে বললে—"কি বলব তাই যে মনে হচ্ছে না।"

সৈকত বলে উঠল—"চমৎকার, সেটাও তা হলে শিখিয়ে দিতে হবে।"

সুবিমল নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

সুব্রতা বললে—"উত্তর আমিই দিতুম, কিন্তু দেব না ; কারণ আগেই তুমি জবাব দিয়ে গেছ—বউদি পরের মেয়ে, ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

সৈকত বলিয়া উঠিল—"অমন কথা আমি বলিনি বউদি, বলুক বড়দা, বলুক মেজদা, আমি সে কথা বলেছি কি না। সত্য মনের এমন অধোগতি হয় নি—যে এই মাত্র একটা কথা বলে তক্ষুণি ভুলে যাব, আমি যা বলেছি সব আমার মনে আছে।"

বড়দা মেজদা হাসছিল—

সুব্রতাও হাসিতে যোগ দিয়েছিল, কিন্তু সে হাসিতে প্রাণ ছিল না। নেহাৎ হাসতে হয় তাই হাসছিল—

সৈকত যেন সেই সৈকতই আছে। মাঝখানে প্রায় সাড়ে চার বছর গেছে, এর প্রতিদিন কি রকম ভাবে এসেছে এবং গেছে—তা কারও অবিদিত নেই। আজ মনে হয় মাঝখানে সে দিনগুলা আসেই নি, বছরগুলা মাঝখানে বাদ চলে গেছে। মনে হয় সৈকত কোথাও যায় নি, সে বরাবর এখানেই রয়েছে ; তার মধ্যে কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নি, সে যেমন তেমনই রয়েছে।

সমস্ত দিনটা তুমুল গোলমালের মধ্যে কেটে গেল। সৈকতের ছুটাছুটি হাসি গল্পের একমুহূর্ত্ত বিরাম নেই—বাড়ীর সকলকে সমস্ত দিনটা সে তন্ময় করে রেখে দিলে।

রাত্রে সকলের খাওয়া মিটে গেল—

নির্ম্মল সৈকতকে লক্ষ্য করে বললে—"আর না, রাত এগারটা বাজল, এবার শুয়ে পড় গিয়ে সৈকত। কাল বিকেলে ত চলে যাবি বলছিস, রাত জাগিস নে আর।"

সৈকত চলে গেল।—

সুব্রতাও শুতে যাওয়ার সময় সৈকতের ঘরে উঁকি দিয়ে দেখলে সে ঘরে নেই। সমস্ত ঘরগুলা খুঁজে তাকে যখন দেখতে পাওয়া গেল না তখন সুব্রতা ছাদে গেল।

অন্ধকার ছাদের একটি পাশে চুপ করে বসে আছে সৈকত।

সুব্রতা আস্তে আস্তে তার পাশে এসে দাঁড়াল।

একটি ছায়ামূর্ত্তির মত বসেছিল সৈকত। একটি অঙ্গও তার নড়ছিল না—বাতাসে তার কাপড়ও নড়াতে পারে নি।

সারাদিন ছলনার মধ্য দিয়ে কেটেছে—এবার শ্রান্তি এসেছে—সৈকত শান্ত প্রকৃতির কোলে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে—এই তার আসল মূর্ত্তি।—

"সৈকত—"

সুব্রতার ডাকে সে চমকে উঠে ফিরল—

হঠাৎ হেসে উঠে বললে—"বাপ রে, তোমার জ্বালায় কোথাও নিরিবিলি একটু বসবার উপায় নেই বউদি, অমনি এসে ধরেছ।"

তার পাশে বসে পড়ে সুব্রতা গম্ভীরভাবে বললে—"হ্যাঁ, ধরেছি। কিন্তু জোর করে এ হাসি আনবার দরকার নেই সৈকত, কত কষ্টে যে এ হাসিটুকু ফুটাচ্ছ তা তোমার দাদারা বুঝতে না পারুক, আমি বুঝেছি। সৈকত, এর চেয়ে তুমি কাঁদ—তোমার চোখ দিয়ে জল বার হোক—কান্নার চেয়ে ভয়ানক এই হাসিটাকে আমি মোটে সহ্য করতে পারছি নে।"

সৈকত যেন অবাক হয়ে গেল—"কি বলছ বউদি—?"

সুব্রতা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে—"মেয়েরা যত শিগ্গীর মেয়েদের বুঝতে পারে সৈকত, এতটা পুরুষে পারে না। তুমি যে সারাদিন হাসি গল্প খেলা নিয়ে রয়েছ, এতে ভাইয়েরা ভুলে যেতে পারে, আমি ভুলতে পারি নে। তুমি বুঝেছ—আমি জেনেছি এটা তোমার বাইরের আবরণ ; তোমার ওই হাসির তলায় যে কান্নার স্রোতটা গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াচ্ছে, উথলে প্রকাশ হয়ে পড়তে চাচ্ছে, সেটা আমার চোখে ধরা পড়ে গেছে সৈকত—"

"বউদি—"

সৈকত সত্যই নিজেকে আর সামলাতে পারলে না, সে সামনে নুয়ে পড়তেই সুব্রতা তাকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

তার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে সুব্রতা বলতে লাগল—"কতখানি শক্তি থাকলে মানুষ এমন করে বুকের আগুন

চেপে রাখতে পারে, আমি তাই ভাবি ভাই। আজ সারাদিন তাই তোর পানে চাচ্ছি—আর আমার চোখের জল উপচে পড়তে চাচ্ছে। কত কষ্টে যে সামলে রেখেছি তা আমি তোমায় কি করে জানাব, সৈকত। কতবার মনে হয়েছে বলি—এর চেয়ে কাঁদ, সেটা বরং সয়ে নিতে পারব, কিন্তু হাসি একেবারে অসহ্য, তোমার মত অবস্থায় কেউ হাসতে পারে না।"

রুদ্ধকণ্ঠে সৈকত বললে—"সত্য পারে না—সত্য নয়। বউদি, আমি—"

বলতে বলতে সে সুব্রতার বুকের মধ্যে মুখখানা গুঁজে রেখে উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে উঠল। সুব্রতা নীরবে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল, সান্ত্বনার কথা একটি বললে না।—

(৪০)

ইন্দ্রনীল একখানা সংবাদপত্র পড়ছিল।

সামনে অর্দ্ধভুক্ত চায়ের কাপটা পড়ে আছে, সংবাদপত্র পড়তে সে তন্ময় হয়ে গেছে।

দরজার উপরে এসে দাঁড়াল সৈকত—

অকস্মাৎ তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই ইন্দ্রনীল একেবারে নিস্পন্দ হয়ে গেল।—

একটু হাসির রেখা সৈকতের মুখে ফুটে উঠল;

ধীর পদে এগিয়ে এসে সে টেবিলের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়াল—

"আমায় চিনতে পারছ না—আমি সৈকত।"

ইন্দ্রনীলের সহজ জ্ঞান অল্পে অল্পে ফিরে এল, একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে বললে—"চিনেছি, তুমি সৈকত, কিন্তু—"

সৈকত বললে—"কেন এসেছি তাই বুঝতে পারছ না, কেমন? কেন এসেছি এ কথা তোমায় বলবার দরকারও আমার নেই, দরকার তোমার স্ত্রীর কাছে। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শুনেছি, অনেক প্রশংসার কথা এর মধ্যে আমার কানে গেছে, তাঁকে একবার দেখতে পাব কি?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ইন্দ্রনীল বললে—"তার কাছে দরকার—আমার কাছে নয়? আমার অপরাধ কি এতই বেশী যে আমায় আজও ক্ষমা করতে পারলে না? একদিন কঠিনহৃদয় বিচারকের মত আমার বিচার করলে, তারপর আমায় একলা ফেলে গভীর রাত্রে—"

সৈকত বাধা দিলে—"থাক থাক, ও সব কথা তুলবার আর দরকার নেই। যা হয়ে গেছে সে সব আর না তোলাই ভাল।"

ইন্দ্রনীল একটা নিঃশ্বাস ফেললে—।

এবার সে ভাল করে সৈকতের পানে চাইলে।

কেবল তার দৈহিক পরিবর্ত্তনই নয়, মনেরও পরিবর্ত্তন যথেষ্ট ঘটেছে, আর তারই ছাপটা ফুটে উঠেছে তার মুখের ওপর।

ইন্দ্রনীল বললে—"আমার কাছে তোমার কথা হতে পারে না, সৈকত?"

অত্যন্ত গম্ভীরভাবে সৈকত বললে—"না—"

ইন্দ্রনীল গায়ত্রীকে ডেকে পাঠালে—

সৈকত যে মেয়েটিকে পেছনদিককার দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতে দেখলে, তার মুখের পানে তাকিয়ে গভীর শ্রদ্ধায় তার মাথা অবনত হয়ে পড়ল।

ইন্দ্রনীল স্ত্রীকে তার পরিচয় দিয়ে দিলে—"এই সৈকত—আর সৈকত, ইনিই আমার স্ত্রী গায়ত্রী দেবী।"

বিস্ময়ে সৈকত গায়ত্রীর পানে চেয়ে রইল।

এমনও মূর্খ কেউ থাকে যে সুগন্ধ ফুল পেয়ে পদদলিত করে নির্গন্ধ শিমূল ফুলের লোভে ছোটে। শীতল জল ফেলে গরম দুর্গন্ধ জলের আশায় ছোটে? এই পবিত্র মূর্ত্তি সুন্দরী স্ত্রী যার, সে কিসের আশায় পথে ঘুরেছে?

কাল রাত্রে সুব্রতার মুখে সৈকত সবই শুনেছে।

গায়ত্রীও নিস্পন্দে কতক্ষণ সৈকতের পানে চেয়েছিল; অনেকক্ষণ পরে শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—"তুমিই সৈকত?"

"হ্যাঁ, আমিই সৈকত—দিদিমণি—"

সে নীচু হয়ে প্রণাম করতে যেতেই গায়ত্রী তাকে দুই বাহুতে জড়িয়ে বুকের মধ্যে টেনে নিলে—

"থাক, প্রণামটা আজ না হয় নাই হল, আর একদিন ওটাকে আদায় করে নেওয়া যাবে। থাকবে ত দিদিমণির কাছে? এসেছ যখন আর সহজে যেতে দিচ্ছি নে মনে রেখ। তোমার যা কিছু সব নাও দেখি, আমায় ছুটি দাও; বাপরে এই সংসারের ফেঁসাদে মানুষ নাকি ইচ্ছে করে

জড়ায়—এই মাস দুইয়েকের জন্যই আমার অসহ্য হয়ে উঠেছে বাপু।"

"আমার সংসার—"

সৈকত হেসে উঠল—"কি যে বলেন দিদিমণি, তার ঠিক নেই। না, না, ও সব মতলব ছেড়ে দিন, আমি এসেছি একটা মতলব নিয়ে, সে দরকার আপনারই কাছে। বলুন—আমার একটা কথা রাখবেন?"

আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে গায়ত্রী বললে—"আমার কাছে দরকার? কি দরকার বল দেখি?"

সৈকত বললে—"আমি আজ বম্বে মেলে বিলেত রওনা হচ্ছি। আমার দাদা আমায় নিয়ে যাচ্ছেন বাঙ্গালী হলেও বাঙ্গালী সমাজে আমার জায়গা হল না। আপনি তো সবই শুনেছেন দিদিমণি, এত বড় একটা কলঙ্কের সৃষ্টি হয়ে গেছে, তার পরে আর এখানে থাকা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। আমার দাদা আমার জন্যই চিরকালের জন্য দেশত্যাগী হচ্ছেন, আমরা দু ভাই বোনে আর ভারতে ফিরব না—"

আর্ত্তকণ্ঠে ইন্দ্রনীল ডাকলে—"সৈকত—"

একবার তার পানে তাকিয়ে গায়ত্রী সৈকতের পানে ফিরলে—

দৃঢ়কণ্ঠে বললে—"কিন্তু তোমার ত যাওয়া হতে পারে না সৈকত। আমি তোমায় যেতে দেব না।"

নির্ব্বাক জিজ্ঞাসুনেত্রে সৈকত তার পানে চাইলে।

গায়ত্রী বললে—"আমি তোমার সকল কলঙ্ক মুছে দেব, আমার স্বামীর ঘরের লক্ষ্মীরূপে তোমায় আমি নিজে বরণ করে নেব।"

সৈকতের চোখে জল আসছিল, কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে হাসলে, বললে—"তা কি হয় দিদিমণি, তাতে কি আমার কলঙ্ক ঢাকা পড়বে?"

গায়ত্রীর চোখ দুটি দৃপ্ত হয়ে উঠল—

"কেন পড়বে না? আমি মেনে নেব সৈকত, আমি দশজনকে ডেকে দেখাব—সৈকত আমার স্বামীর স্ত্রী, আমি নিজে ওকে বরণ করে নিয়েছি।"

কি মহান উদার হৃদয়—

সৈকত বললে—"আমি তা করব কেমন করে দিদিমণি? লোকে যে বলবে চিরদিন বিয়ের বিপক্ষে দাঁড়িয়ে আজ কেবল ওদেরই ভয়ে বিয়েটাকে মেনে নিলুম, তা হতে পারবে না। জনমতকে চিরদিন উপেক্ষা করে এসে আজ নিজের স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ বলে মানতে পারব না, ওতে আমার অন্তরের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব হয়ে যাবে।"

গায়ত্রী নীরব হয়ে গেল।

সৈকত বললে—"হ্যাঁ, আমি একটা কথা বলতে এসেছি, আমার কথা আপনারা ভুলে যান। আমি আজ চলে যাব—জীবনে আর কোনদিন ফিরব না এ কথা ঠিক। আপনাকে একটি জিনিস আমি চিরকালের মত দিয়ে যেতে চাই—"

গায়ত্রী জিজ্ঞাসা করলে—"কি—?"

সৈকত উত্তর দিলে—"আমার ছেলে—"

দরজার কাছে সরে গিয়ে সে ডাকলে—"লখিয়া, খোকাকে আন—।"

আয়ার কোলে একটি শিশুকে দেখা গেল।

বড় সুন্দর ছেলে—সে যেন ইন্দ্রনীলের দ্বিতীয় প্রতিকৃতি। এক বৎসর মাত্র বয়স হবে—।

সৈকত তাকে দেখিয়ে বললে—"আমায় রাখার চেয়ে এই হতভাগা শিশুকে রাখার সার্থকতা বেশী। একে নামাবার জাগয়া কোথাও পেলুম না দিদিমণি, বাবা নেই যে তাঁর কাছে দিয়ে যাব। তখন মনে হল তোমার কথা। আমার গর্ভে জন্মালেও এ তোমার স্বামীর ছেলে—একে তুমি নাও, এর জীবন সার্থকতায় ভরে তোল। আমি জন্মের মত ওকে তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। ও মা চেনে নি—নিজের কাছে ওকে রাখি নি শুধু এই উদ্দেশ্যে, যদি ওকে কোথাও দিতে পারি।—"

গায়ত্রী শিশুটিকে আয়ার কোল হতে টেনে নিলে, তার বুকের ওপর মাথা দিয়ে সে চুপ করে পড়ে রইল।

গায়ত্রী তার মুখে চুমো দিয়ে ইন্দ্রনীলের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে—"নাও, খোকাকে ধর।"

ইন্দ্রনীল হাত বাড়াতেই শিশু তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, দুই হাতে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে তার মুখের ওপর মুখ দিলে।

হতভাগ্য পিতা—

চোখ দুটি তার সজল হয়ে উঠল।—

সৈকত অপলকদৃষ্টিতে চেয়েছিল—

গায়ত্রী তার হাতখানা চেপে ধরে অনুনয়পূর্ণকণ্ঠে বললে—"তুমিও থাক সৈকত—এই ছেলে ফেলে তুমি সেখানে থাকতে পারবে না।"

সৈকত কি ভাবছিল, চমকে উঠে গায়ত্রীর পানে তাকাল—

একটু হেসে বললে—"খুব থাকতে পারব দিদিমণি, বরং শান্তিতে থাকতে পারব। খোকন তার নিজের জায়গা পেয়েছে, সে তার বাপের স্নেহ পেয়েছে, তুমি তাকে ঘৃণা না করে বুকে নিয়েছ। ওর ভবিষ্যতের পানে চেয়েই ওকে ছেড়ে চললুম, আমার বড় দুঃখে সান্ত্বনা হবে এইটাই। তোমরা ওকে দেখ—ওকে মানুষ কর—। কালে সকলেই ভুলে যাবে আমি ওর মা ছিলুম, ও নিজেও জানতে পারবে না। আমার তাতে এতটুকু দুঃখ হবে না দিদিমণি, আমি বহুদূর হতে ভাবব—খোকন তার বাপের নামে পরিচিত হতে পেয়েছে।"

তার চোখ দিয়ে হঠাৎ ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল।—

আত্মহারা ইন্দ্রনীল ডাকলে—"সৈকত--"

"না, আর ডেক না, আমার সময় হয়েছে। বাইরে দাদা গাড়ী নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, ট্রেনের আর দেরী নেই। চললুম দিদিমণি, খোকনকে দেখ—কেউ যেন না বলে আমি ওর মা ছিলুম।—"

একটিবার ছেলের মুখের পানে অপলকদৃষ্টিতে তাকিয়ে সৈকত বার হয়ে পড়ল।

কেউ যদি তখন মুখ বার করে দেখত—দেখতে পেত অসহ্য শোকাবেগে সে চলতে পারছে না, তার পা দু'খানা ভেঙ্গে পড়ছে।

সমাপ্ত

মুন্সেফ-আবিষ্কার

৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

১

একদিন সন্ধ্যাকালে আসিয়া নিয়তি,
করিলেন প্রশ্ন এক বিধাতার কাছে,
দেখিয়া যা লাগে তাক্ বলো মহামতি
তোমার সৃষ্টির মধ্যে এমন কী আছে?
মানুষেরা হাসে গায়,
সকলেই খায় দায়,
একইভাবে বন্ধুসনে গল্প করে সবে;
এর মধ্যে আছে বলো আশ্চর্য্য কি তবে?

বিধাতা শুনি সে প্রশ্ন হলেন নির্ব্বাক্,
ভাবিলেন গুম্ফ দুটি বুলাইয়া ধীরে,
"তাই ত, কিছুই দেখে লাগে নাকো তাক্,
দেখি সবই সাধারণ এ বিশ্বমন্দিরে;
সকলেই খায় দায়,
সকলেই হাসে গায়,
সকলেই করে গল্প বন্ধুসনে মিশে,
তাইত! এ সত্য কথা—আশ্চর্য্যটা কিসে?"

৩

বিধাতার গুম্ফ ঝুলে গেল ভেবে ভেবে,
দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি চিন্তাকুলমনে
পরিশেষে ডাকিলেন বিশ্বকর্ম্মাদেবে;
প্রণমেন বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার চরণে;
কহিলেন "মহাশয়!
আমারে কি আজ্ঞা হয়?
করিতে হইবে পূর্ণ কোন্ মনস্কাম?"
করিলেন বিশ্বকর্ম্মা আবার প্রণাম।

কহেন বিধাতা, "বৎস! সমস্যা কঠিন!
ভাবিয়া দেখেছি আজ শুন দিয়া মন,
তোমার এ বিশ্বসৃষ্টি বিশেষত্বহীন,
তোমার ত বিশ্বতলে সবই সাধারণ;
মানুষ ত আছে যারা,
খায় ও ঘুমায় তারা,
হাসে আর গল্প করে সেই নরগণ;
নেহাইৎ সামান্য যে সে! অতি সাধারণ।

৫

"করেছিলে সৃষ্টি বটে তিলোত্তমা নারী
অত্যদ্ভুত। কিন্তু সে ত বহুদিন গত;
সৃষ্টি করো সবিশেষ কোনও গুণধারী
নররূপী জীব দেখি কিছু তার মত,
যারা আছে বসুধায়,
সকলেই খায় দায়
সকলেই হাসে গায়—এই বার্ত্তা শুনি'
সৃষ্টি করো ধরা মাঝে অন্যরূপ গুণী।"

৬

"তাইত!" বলিয়া দেব বিশ্বকর্ম্মা ক্রমে
রহিলেন মুহূর্ত্তেক স্তিমিত নয়নে;
"হয়েছে"—বলিয়া দেব পুন সসম্ভ্রমে
প্রণমেন দণ্ডবৎ বিধাতৃ চরণে;
"হয়েছে, একটি নয়;
শুন তবে মহাশয়
দেখ তবে যাহা কেহ কখনও দেখে নি;
সৃজিব নূতনরূপ জীব এক শ্রেণী

৭

"এই বঙ্গদেশ জুড়ি জেলায় জেলায়,
মহকুমা মহকুমা ব্যাপ্ত করি আজ
করিব নূতন সৃষ্টি এক সম্প্রদায়,
নররূপধারী জীব দেখ বিশ্বরাজ!
যারা নাহি খায় দায়,
যারা নাহি হাসে গায়,
যারা নাহি গল্প করে কারো সঙ্গে কভু
করি এ সৃজন নব দেখ তবে প্রভু।

৮

"যে শ্রেণী সৃজিব তারা পুস্তক ঘাঁটিয়া
পাশ করি কোনোরূপে বি, এল্-টি ক্রমে
ফিরিবে বিচারগৃহে শামলা আঁটিয়া
এদিকে ওদিকে নিত্য ব্যর্থ পরিশ্রমে;
নাহি আয় নাহি জমা,
(নাহি কোন মকদ্দমা)
তিনটি বৎসর পরে হইয়া বাহির,
উঠিবে বিচারাসনে সেই সব বীর।

৯

"শামলা ছাড়িয়া তারা শিরে পরি টুপি,
চাপকান পরিবর্ত্তে কোটে গাত্র ঢাকা,
উকীল হইবে ক্রমে বিচারক রূপী—
কীট হবে প্রজাপতি—বাহিরিবে পাখা;
সময়ে কাগজ'পরে
ষ্টীল পেন লয়ে করে
নথির সহিত যুদ্ধ করি' দিবারাত,
করিবে অশ্রান্ত তারা মসীরক্তপাত।

১০

"এই শ্রেণী হাসিবে না কাঁদিবে না কেহ
মিশিবে না কারো সঙ্গে। ফিরে নিজঘরে
নিশীথে প্রহর পরে কর্ম্মক্লান্ত দেহ
শুইয়া পড়িবে ভাত ভরিয়া উদরে;
(তার সঙ্গে ডাল থাকে
তা হ'লে কে পায় তাকে ?)
যাহা পাবে মাঝে মাঝে করিবে না ব্যয়
যাহা পাবে জমাইবে শুন মহাশয়।

১১

"এই শ্রেণী দেখা হলে ফিরাইবে মুখ;
করিবে না অভ্যর্থনা; কহিবে না কথা;
সদাই ভাবনা, আর সদাই বিমুখ
হুজুরের তুষ্টিলাভে হইলে অন্যথা;
সদাই ভাবনা ভবে
কবে সবজজ হবে
কটা মেয়ে পার হল কটা আছে বাকী—
ভাবিবে একথা নিত্য বসিয়া একাকী।

১২

"ইঁহারা হবেন হিঁদু; গীতা লয়ে হাতে
ভাবিবেন বসে তার ব্যাখ্যা আধ্যাত্মিকী,
কারণ খরচ কম ডাল আর ভাতে
কারণ ঘাড়ের পরে নিজে বাড়ে টিকী
ভক্তি সেবা পূজা যত
সাহেবের পদানত
বিশুদ্ধ প্রণাম দেবদেবীর সময়
—কিনা, বিনা পয়সায় যতদূর হয়।

১৩

"এঁদের দিয়াছি আয়—দিই নাই ব্যয় ;
এঁদের দিয়াছি দন্ত—হাসি নাহি তায় ;
এঁদের দিয়াছি কণ্ঠ কথা নাহি কয় ;
দিয়াছি উদর, পেট ভরে নাহি খায় ;
কেবল অঙ্গুলি তার,
করে মাত্র ব্যবহার,
গলদেশে মালা তার দুপয়সা হারে,
শিরোদেশে টিকী তার আপনিই বাড়ে।"

১৪

এই বলি' হাতকাটা কুর্ত্তি দিয়া গায়,
পরাইয়া ধুতি হস্ত দেড়েক বহরে,
সৃজিলেন বিশ্বকর্ম্মা নব-সম্প্রদায়,
রাখিলেন খোড়ে, চালে, গ্রামে ও সহরে ;
বলিলেন, "মম আজ
দেখ সৃষ্টি বিশ্বরাজ,
এঁরাই মুন্সেফ, খোঁজো মর্ত্ত ও ত্রিদিব,
বা'র করো দেখি হেন অত্যাশ্চর্য্য জীব।"

১৫

বিশ্বকর্ম্মা নবসৃষ্টি একত্রিত করি
রাখিলেন বিধাতার চরণের তলে,
দেখিয়া বিধাতা আর নিয়তি সুন্দরী
উঠিলেন যুগপৎ "কেয়াবাৎ!" ব'লে ;
"এরা নাহি খায় দায়,
এরা নাহি হাসে গায়,
নরের মতই জীব নরনামধারী ;
কেয়াবাৎ বিশ্বকর্ম্মা! যাই বলিহারী!"

কবিবরের অপ্রকাশিত রচনা, পুরাতন কাগজ পত্রের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

আমাদের রেশিও সমস্যা

অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চৌধুরী এম-এ

ভারতের মুদ্রানীতির সহিত যাঁহাদের পরিচয় আছে তাঁহারা জানেন যে ১৯২৭ সালে হিল্টন-ইয়ং কমিশনের প্রস্তাবমত রৌপ্য মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি নির্দ্ধারণ করা হয়। ১ শিলিং ৬ পেনির স্বর্ণমূল্য প্রায় ৮·৪৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণ। এই হারে ভারত গভর্ণমেণ্ট টাকার পরিবর্ত্তে স্বর্ণথান এবং স্বর্ণথানের পরিবর্ত্তে টাকা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু ১৯৩১ সালে এই মুদ্রা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে। সেই বৎসরের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করে। এই জন্য ইংলণ্ডের পাউণ্ড নোট অথবা ষ্টার্লিংয়ের এখন কোন নির্দ্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য নাই। সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারও রৌপ্য মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণথান ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেন। কিন্তু বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনিই আছে এবং এর কোন পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। এই হারে গভর্ণমেণ্ট এবং ১৯৩৪ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—টাকা বা ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করে। ফল কথা এই যে—আমাদের রৌপ্য মুদ্রাও স্বর্ণ হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়া ষ্টার্লিংয়ের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং টাকার সহিত ষ্টার্লিংয়ের একটা নির্দ্দিষ্ট বাট্টার হার আছে বলিয়া এই মুদ্রা-ব্যবস্থা "ষ্টার্লিং একস্‌চেঞ্জ ষ্টাণ্ডার্ড" নামে অভিহিত হয়।

কিন্তু ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হয় নাই। হিল্টন-ইয়ং কমিশনের সদস্য হিসাবে স্যার পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওর তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পারস্পরিক মূল্য বিবেচনা করিলে রৌপ্য মুদ্রার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৪ পেনির বেশী হওয়া উচিত নহে এবং ১৯৩১ সালে ভারতের মুদ্রা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও যখন বাট্টার হার স্থির রাখা হয় তখন দেশব্যাপী এই রেশিও সমস্যা নিয়া তুমুল তর্কবিতর্ক ও আন্দোলন আরম্ভ হয়। অনেকে বলেন যে এই বাট্টার হার 'অধিক' এবং ভারতের পক্ষে "অহিতকর"। তাঁহারা "রৌপ্য মুদ্রার

মূল্য ১ শিলিং ৬ পেনি হইতে, বেশী কম না হইলেও অন্ততঃ ১ শিলিং ৪ পেনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্ত" দরবার ও আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই প্রবন্ধে ১ শিলিং ৬ পেনি বাট্টার হার 'অধিক' এবং 'অহিতকর' কি না এই কথাটা সংক্ষেপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

প্রারম্ভে একটা মোটা কথা মনে রাখা উচিত। কোন রেশিও বা বাট্টার হার কোন দেশের কৃষি, ব্যবসা বা বাণিজ্যের পক্ষে চিরদিনের জন্ত সুবিধাজনক বা অনিষ্টকর হইতে পারে না। বাট্টার হারের সহিত পণ্যের মূল্য, শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিক ইত্যাদির সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইলে কাহারও লাভ-ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু সামঞ্জস্ত স্থাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত বাট্টার হার ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে হিত বা অহিতকর হইতে পারে।

খুব সোজাভাবে এই কথাটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। বাট্টার হার যদি ১ শিলিং ৬ পেনি হইতে ক্রমশঃ নামিতে থাকে তাহা হইলে আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইতে পারে। ধরা যাক—বাট্টার হার ১ শিলিং ৬ পেনি হইতে ১ শিলিং ৪ পেনিতে নামিয়াছে। এই অবস্থায় যদি কোন ইংরেজ বণিক ভারত হইতে ১২০,০০০ টাকার জিনিষ ক্রয় করে তবে তাহাকে দিতে হইবে ৮,০০০ পাউণ্ড। কিন্তু পূর্ব্বের বাট্টার হার অনুসারে তাহাকে দিতে হইত ৯,০০০ পাউণ্ড। ভারতীয় বণিক তাহার পণ্যের জন্ত ১২০,০০০ টাকাই পাইল। কিন্তু ইংরেজ বণিককে এখন ১,০০০ পাউণ্ড কম দিতে হইতেছে। কথাটা অন্তভাবেও বলা চলে। ভারতের বণিক ইংলণ্ডে মাল রপ্তানী করিয়া রৌপ্য মুদ্রার হিসাবে বেশী পাইবে—যদিও পাউণ্ডের হিসাবে তাহার পণ্যের মূল্য পূর্ব্ববৎই রহিল। ফলে বিদেশী বাজারে তাহার প্রতিযোগিতা করিবার ক্ষমতা দৃঢ়তর হইবে, ভারতীয় মাল বিদেশে সস্তায় বিকাইবে এবং আমাদের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে।

পক্ষান্তরে আমাদের আমদানী হ্রাস পাইতে পারে। ৩০০ পাউণ্ডের জিনিষ ক্রয় করিলে ভারতের বণিককে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও অনুসারে দিতে হইত ৪,০০০ টাকা। ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও অনুসারে তাহাকে দিতে হইবে ৪,৫০০ টাকা। ইংলণ্ডের বণিক পূর্ব্বের ন্তায় ৩০০ পাউণ্ডই পাইবে। কিন্তু ভারতীয় দেনাদারকে ৫০০ টাকা বেশী দিতে হইবে। ফলে ইংলণ্ড হইতে আমাদের পণ্যের আমদানী হ্রাস পাইতে পারে।

ভারতীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না পাইলে রপ্তানীকারী কিয়ৎ-পরিমাণে লাভবান হইবে। কারণ সে বেশী রৌপ্য মুদ্রা পাইবে এবং তদ্দ্বারা অধিক পরিমাণে দেশীয় পণ্য ক্রয় করিতে পারিবে। অন্তদিকে আমদানীকারী কিয়ৎপরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ভারতে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি না পাওয়াতে সে বেশী রৌপ্য মুদ্রা দিয়া জিনিষ ক্রয় করা সত্ত্বেও উচ্চদরে বিক্রয় করিতে পারিবে না।

কিন্তু এইভাবে বাট্টার হার চিরদিন রপ্তানীকে সহায়তা এবং আমদানীকে খর্ব্ব করিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে ভারতে পণ্যের মূল্য, মজুরদের মজুরী ইত্যাদি বৃদ্ধি পাইবে। এইভাবে যখন পণ্যের মূল্য, লোকের আয় ইত্যাদি এক ভাবে উঠা-নামা করিবে, তখন আর নূতন বাট্টার হার কাহারও পক্ষে লাভজনক বা ক্ষতিকর হইবে না। পণ্য-প্রস্তুতকারী যেমন বিদেশে তাহার পণ্য বিক্রয় করিয়া বেশী রৌপ্য মুদ্রা পাইবে তেমন তাহাকেও অধিক মজুরী দিতে হইবে এবং অধিক মূল্যে জিনিষ ক্রয় করিতে হইবে। আমদানীকারীও যেমন বেশী রৌপ্য মুদ্রা দিয়া বিদেশ হইতে পণ্য ক্রয় করিবে, তদ্রূপ সে উচ্চদরে ভারতে পণ্য বিক্রয় করিতে পারিবে। সামঞ্জস্ত স্থাপিত হইলে ব্যবসাবাণিজ্য আবার পূর্ব্বের ন্তায় নিরুপদ্রবে চলিতে থাকিবে।

এক্ষণে মূল বিষয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা যাউক। ১ শিলিং ৬ পেনির বিরুদ্ধে দুইটি কথা শুনা যায়। প্রথম কথা এই যে—১৯২৭ সালে টাকার ১ শিলিং ৬ পেনি স্বর্ণ মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় কথা এই যে—এক্ষণে টাকার ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিং মূল্যও অধিক।

প্রথম মতটির স্বপক্ষে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। ইংলণ্ডের ও ভারতের পণ্যের মূল্য তালিকা হইতে ষ্টার্লিংয়ের ও টাকার ক্রয়শক্তির পার্থক্য দেখাইয়া অনেকে বলেন যে রৌপ্য-মুদ্রার স্বর্ণমূল্য নির্দ্ধারণ ঠিক হয় নাই। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কতদূর মূল্যবান সেই সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। কারণ এই দুই দেশের পণ্য-তালিকা নির্ম্মাণ প্রণালী এক নহে। কাজেই কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হইলেই যে রেশিওকে দায়ী করিতে হইবে—এমন কথা বলা চলে না। আবার কেহ কেহ বলেন যে এই

রেশিও গভর্ণমেণ্ট নানা প্রকার মুদ্রার মার-প্যাঁচ দ্বারা স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু কেমন করিয়া এই রেশিও স্থাপন করা হইয়াছে, গভর্ণমেণ্ট যদি অন্যভাবে মুদ্রানীতি পরিচালন করিতেন, তাহা হইলে ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও স্থাপিত হইত—এই জাতীয় প্রশ্নগুলি এখন উত্থাপন করার কোন সার্থকতা আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রথম এবং শেষ প্রশ্ন হইতেছে এই যে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওর সহিত পণ্য-মূল্য, আয়, মজুরী ইত্যাদির সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়াছে কি ?

অর্থনীতির পণ্ডিতদের মতে এই সামঞ্জস্য দুইটি বিষয়ের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। (১) বাট্টার হার কতকাল যাবৎ কার্য্যকরী অবস্থায় আছে ? (২) শ্রমজীবীদের মজুরী ইত্যাদির স্থিতি-স্থাপকতা কি প্রকার ? (elasticity of the factors of production, especially of the wage rate).

অনেকে জানেন যে বিগত যুদ্ধের সময় ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। ১৯১৯ সালে টাকার স্বর্ণ-মূল্য গড়ে ১ শিলিং ৭ ১/১৬ পেনি পর্য্যন্ত উঠে। ১৯২০ সালে আবার ১ শিলিং ৫ ৩১/৬৪ পেনিতে নামে। ১৯২১ সালে বাট্টার হার ১ শিলিং ৫ ১/১৬ পেনিতে নামে। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে টাকার স্বর্ণমূল্য ১ শিলিং ৪ পেনিতে দাঁড়ায়। কিন্তু এই বাট্টার হার বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে রেশিও ১ শিলিং ৫ ১/৮ পেনি হয় এবং সেই বৎসরের জুন মাসে টাকার স্বর্ণ মূল্য ১ শিলিং ৬ ৩/৩২ পেনিতে দাঁড়ায়।

১৯১৭ সালের মধ্যভাগ হইতেই ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও লোপ পায় এবং এই বাট্টার হার ১৯২৪ সালে মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য স্থায়ী হয়। সেই তুলনায় ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও ১৯২৭ সালের পূর্ব্বে প্রায় দুই বৎসর কার্য্যকরী অবস্থায় ছিল। এই বিবরণ হইতে বোধ করি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পণ্য-মূল্য, আয় ও মজুরীর ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওর সহিত সামঞ্জস্য স্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।*

দ্বিতীয়তঃ এই কথাটা সকলেরই জানা আছে যে ভারতে Trade union (শ্রমিক-সঙ্ঘ) এখনও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয় নাই এবং ইংলণ্ডের শ্রমিকসঙ্ঘগুলির শক্তি ও ক্ষমতার সহিত আমাদের দেশের Trade union গুলির তুলনাই হইতে পারে না। তাই বাট্টার হার বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকদের মজুরী কমান বোধ করি এদেশে ইংলণ্ড হইতে সহজ। অর্থাৎ এ দেশে বাট্টার হারের এবং শ্রমিকদের বেতনের মধ্যে অনেক পরিমাণে স্বল্প আয়াসে ও সময়ে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে।

এক কথায় আমরা বলিতে চাই যে ১৯২৭ সালে টাকার স্বর্ণ মূল্য অধিক নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। যদি তর্কের খাতিরে স্বীকারও করা যায় যে ১৯২৭ সালে রৌপ্যমুদ্রার স্বর্ণ-মূল্য কিঞ্চিৎ অধিক ধরা হইয়াছিল তাহা হইলেও এ কথা বলা চলে যে উপরোক্ত কারণ দুইটির জন্য বর্ত্তমান অর্থ-সঙ্কট আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান বাট্টার হার—টাকার ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিং মূল্য—কোন ক্রমেই বেশী হইতে পারে না। কারণ ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিংয়ের স্বর্ণমূল্য হ্রাস পাইয়াছে। টাকার স্বর্ণমূল্য এখন ১ শিলিং ৪ পেনি হইতেও কম।

প্রতিপক্ষের আর একটি যুক্তি-বিচার করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। গত কয়েক বৎসরের হিসাব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অন্যান্য দেনাদার দেশসমূহের (Debtor countries) তুলনায় ভারতের রপ্তানী অধিক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং অনেকে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিওকে ভারতের বহির্বাণিজ্যের দুর্গতির জন্য দায়ী করেন। কিন্তু এই অনুমান আমাদের অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের একটা বিশেষত্ব সুবিদিত। আমাদের দেশ হইতে যে সব জিনিষ রপ্তানী হয় তাহার মধ্যে কৃষি-জাত পণ্য ও যে সব জিনিষ আমদানী হয় তাহার মধ্যে শিল্পজাত পণ্যই প্রধান। বর্ত্তমান অর্থসঙ্কটে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য শিল্পজাত পণ্যের মূল্য অপেক্ষা অধিক পরিমাণ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। পাট রপ্তানী-বাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্য। ইহার অস্বাভাবিক মূল্যহ্রাসের কথা মনে করিলেই বিষয়টা বুঝা যায়।

ইহা ছাড়া আরও দুইটি কথা মনে রাখা উচিত। ইদানীং ভারতের নানা প্রদেশে চিনির কারখানা স্থাপিত

---

* এই সংখ্যাগুলি শ্রদ্ধেয় ডাঃ যোগীশচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের রেশিও সম্বন্ধে একটি বিবৃতি হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার বিবৃতি আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছে।

হইতেছে। কাপড়ের মিলের সংখ্যাও বাড়িতেছে। এর জন্য বিদেশ হইতে বহু লক্ষ টাকার যন্ত্রপাতি ক্রমাগত আমদানী হইতেছে। আবার অন্য দেশের তুলনায় আমদানী খর্ব্ব করিবার জন্য ভারতের শুল্ক-প্রাচীর অধিকতর উচ্চ করা হয় নাই। সুতরাং ১ শিলিং ৬ পেনি ষ্টার্লিং রেশিওকে আমাদের রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাসের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না।

এই আলোচনা হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চাই যে ১ শিলিং ৬ পেনি রেশিও ভারতের পক্ষে অধিক এবং অহিতকর নহে। তাই বাট্টার হার কমাইবার জন্য এত আন্দোলন ও দরবার দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিও অনেকদিন যাবৎ কার্য্যকরী অবস্থায় নাই। তথাপি ইহাই যথার্থ বাট্টার হার—এই কথাটা আমাদের নিকট হেঁয়ালীর মত ঠেকে। আমাদের মনে হয় যে ১ শিলিং ৪ পেনি রেশিওর স্বপক্ষে এত উত্তেজনা ও উৎসাহের মূলে রহিয়াছে অর্থ প্রসারণের (currency inflation) আকাঙ্ক্ষা। এই জন্যই বোধ হয় রেশিও প্রশ্ন এখনও সজীব আছে। কিন্তু অর্থ প্রসারণের ফলে মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইয়া আর্থিক জীবন কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(৮)

গঙ্গাবতীর ঘরের উৎপাত কম্‌'ল, কিন্তু বাহিরের উৎপাত চল্‌'ল আরও ভয়াবহভাবে বেড়ে। স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মজুরী সঙ্গে আনা ছেড়ে দিয়েছে, সঙ্গীদের নিকট রেখে দেয়, গোপনে বাজার সদা করে—আটা, ছাতু, ডাল, তরকারি নিয়ে বাড়ী আসে, স্বামীর ভয়ে একটি পয়সা বাড়ীতে রাখতে চায় না। কানাই অত্যাচারের মাত্রা দিল বাড়িয়ে; সকল ব্যাপারেরই একটা সীমা থাকে—গঙ্গাবতী এতদিন নীরবে সব সয়েছে, স্বামীর সুমতির জন্য নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জন করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেছে। পাষাণ দেবতা শুনলে না, তাই নিরুপায় হয়ে দাঁড়াতে হ'ল মাথা তুলে। দৈহিক অত্যাচার কত সইতে পারে! সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়, হাত পা শিথিল হয়ে পড়ে, কাজ করবার শক্তি, ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলে। কাজ করতে পারে না; মাথা ঘুরে, শরীর ঝিমিয়ে আসে। তাই সেও মাথা তুলে দাঁড়া'ল। কানাই যখন আসে মারধর করতে—সেও রুখে দাঁড়ায়। চরিত্রহীন, লম্পট, দুর্বৃত্ত কানাইএর সে শক্তি নেই, গঙ্গাবতীর মত শক্তিশালিনী রমণীর সঙ্গে মুহূর্ত্তের জন্য শক্তিতে টিঁকে থাকতে পারে না, ভয়ে পালিয়ে যায়। কখন কখন দূর থেকে ঢিল ছুঁড়ে পালায়। স্ত্রীর নিকট টাকা পায় না তাই আরম্ভ কর'ল চুরি, একদিন ধরা পড়ে—গে'ল জেলে। ঘরের শত্রু নিষ্কৃতি দিল।

কানাই জেলে যাবার পর থেকে পাড়া-পড়সী ও শ্যামজীর উৎপাত আরও বেড়ে গে'ল। যাদের টাকা আছে তারা দেখায় টাকার লোভ; যাদের যৌবন আছে তারা দেখায় প্রেমের ছলনা; বয়সে ছোট এমন যুবকও বহু ভক্ত জুটে গেছে; এদের প্রেম আরও মারাত্মক; যাদের টাকাকড়িও নেই, রূপযৌবনও নেই—তারা খাটাতে চায় শক্তি। তাই নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে না, এরা মাঝে মাঝে রাত্রিবে হানা দেয়, তখন গঙ্গাবতীকে লাঠি ধরতে হয়, দুর্বৃত্তদের শাসন করতে হয়। এরা পুরুষ, আস্ফালন করে বিশ্ব-বিজয়ীর মত, নিজেদের জটলার মাঝে গঙ্গাবতীকে খেলার পুতুলের মত করে নাচায়, কিন্তু গঙ্গাবতীর শৌর্য্যে বীর্য্যে মাথা তুলতে পারে না। গঙ্গাবতীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ দৃষ্টির নিকট দাঁড়াতে পারে না, গায়ের জোরে কুলিয়ে উঠবার মত শক্তি অল্প লোকের আছে।

পাড়াপড়সীদের গঙ্গাবতী বেশি ভয় পায় না। সে বেশ বুঝতে পারে যতদিন তার দৃঢ়তা শক্তি সামর্থ্য থাকবে ততদিন এরা নিকটেও ঘেঁসতে সাহস পারবে না। যত ভয়

শ্যামজীকে। আগে ধরতে করতে পাওয়া যেত না অথচ গলার কাঁটার মত জড়িয়ে থাকতে চাইত, এখন প্রকাশ্যে আরম্ভ করেছেন। মিলের কাজ-কর্ম্ম ত' ছেড়েই দিয়েছেন, কেবল কুলি-মজুর ঠেঙ্গান। আফিস ঘরে যাওয়া এক রূপ ছেড়ে দিয়েছেন, সর্ব্বদা কুলি-মজুরের নিকট দাঁড়িয়ে থাকা—বিশেষতঃ যেখানে গঙ্গাবতী কাজ করে। গঙ্গাবতী যখন ছেলেকে দুধ খাওয়াতে যায় তখন শ্যামজী নির্জ্জনে পেলে কুপ্রস্তাব করেন। ফাঁক বুঝে কখনও হাত চেপে ধরেন। দশ বিশ টাকা হাতে গুঁজে দেন। গঙ্গাবতী নোট ছুঁড়ে ফেলে দেয়, চেঁচাবে বলে ভয় দেখায়। শ্যামজী গঙ্গাবতীকে দেখলেই মুচকি হাসেন, চোখে ঈসারা করেন। চক্ষুলজ্জাও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

মিলের কর্ত্তৃপক্ষ মিলের শিশু-রক্ষাগার উঠিয়ে দিল। কাজ বেড়েছে, জিনিষ পত্তর রাখবার অসুবিধে। কুলিমেয়েরা প্রতিবাদ করলে, কর্ত্তৃপক্ষ কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কুলিরমণীদের অসুবিধে কেউ গ্রাহ্য করলেন না। অনেক কুলিরমণী কাজ ছেড়ে দিল, অন্য সকল কুলি ও কুলিরমণীরা ধর্ম্মঘট করলে। মিল কয়েকদিন বন্ধ রইল। মিলের চারিদিকে পুলিস এল পাহারা দিতে, বিদ্রোহী কুলিদের দমন করতে। গরীব কুলিরা পেটের দায়ে প্রথম সর্ত্ত অনুযায়ী আপোষ করতে রাজি হল, কর্ত্তৃপক্ষ এদের আবেদনে কর্ণপাত করলেন না। কুলি মজুররা নিরুপায় হয়ে আবার ধীরে ধীরে শান্ত শিষ্ট হয়ে মিলে ঢুকল। ধর্ম্মঘট ভাঙ্গল, কোন লাভ সুবিধে ত' হলই না; নির্য্যাতন আরও বেড়ে গেল। ধর্ম্মঘট করার দরুণ সর্দ্দাররা জেলে গেল, অনেকে চাকরি হারাল।

ধর্ম্মঘট করে সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল গঙ্গাবতীর। মেয়ের অসুখ, টাকা পয়সা নেই, মিলের ডাক্তার রোগী দেখবেন না; ওষুধ পত্তর বন্ধ। কেউ এক পয়সা সাহায্য করবে না; নিরুপায় হয়ে গঙ্গাবতী রোজই কাজ করতে যেতে চাইত, পাড়াপড়সীরা জোর করে ধরে রাখে, শ্যামজীর উল্লেখ করে অশ্লীল শ্লেষ বিদ্রূপ করে। যে দিন ধর্ম্মঘট ভাঙ্গল সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। রুগ্ন মেয়েকে আফিম্ গোলা দুধ খাইয়ে মিলে গেল কাজ করতে। গিয়ে শুনল তার চাকরি গিয়েছে—কারণ সে নাকি এ ধর্ম্মঘটের নেতা ছিল। উপায় নেই, দু'তিন দিন যাবৎ সে দু'বেলা খেতে পায় নি, ছেলেকে রীতিমত ওষুধ পথ্য দিতে পারে নি। অপমান সয়েও ছেলেকে বাঁচাতে হবে তাই উন্মাদের মত শ্যামজীর শরণাপন্ন হল—না হ'লে অন্য কেউ চাকরি দিতে পারবেন না। যদিও সে বুঝেছিল যে এ একটা ফাঁদ, শ্যামজীর চাল চাতুরী, তবু ফাঁদে পা দিতে হল। যেমন করে হোক সন্তানকে বাঁচাতে হ'বে।

গঙ্গাবতীর বশ্যতায় শ্যামজীর সাহস গেল বেড়ে, অচল মুখ হল সচল, কাম হল প্রেম, সঙ্গে এল যুক্তিতর্ক। গঙ্গাবতী যখন দোষীর মত নতমস্তকে চাকরির জন্য দীনকণ্ঠে প্রার্থনা করলে, তিনি করলেন অভিনয়। প্রথম শাসালেন, তারপর বল্লেন—যার রূপ যৌবন আছে সে কোন দুঃখে, কোন যুক্তিতে অমন কষ্ট করে গতরে খাটে। সে মুখের কথাটি খসালে যে অমন বহু দাস দাসী রাখতে পারে—তিনটি সন্তানকে না খাইয়ে মেরেছে, যা একটি এখনও আছে তাকেও শেষ করবার যোগাড় করেছে, নিজেও মরতে চলছে, কেন? এতগুলি নরহত্যায় কি পাপ হয় না, এর চেয়ে বড় পাপ কি দুনিয়ায় আর আছে। যে সৌভাগ্যকে পদদলিত করে নিজেও ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যায় অপরকেও ধ্বংস করে, সে কি নরকেও স্থান পাবে? কানাই চরিত্রহীন, মাতাল, চোর, ডাকাত, নরকের কীটের মত ভয়ঙ্কর—তার আশাও বৃথা—অতএব আর কেন গোঁড়ামীর দোষে মহাসর্ব্বনাশ, মহাপাপ বৃদ্ধি করা? এখনও সময় আছে, যদি সুমতি হয়, একতিল বুদ্ধি থাকে তবে চলে এস, চিরজীবন রাজরাণীর হালে মাথায় তুলে রাখব। তোমায় আমি বড় ভালবাসি, বিশ্বাস ক'র, এ ভালবাসায় ছলনা নেই। যদি কেবল তোমার রূপ দেহ চাইতুম তবে ভালবেসে তোমায় জয় করবার জন্য তপস্যা করতুম না, অন্যান্য যুবতীদের মত জোর জবরদস্তী করতুম।

গঙ্গাবতী কোন উত্তর দেয় নি, ভ্রমরীমিত্রতার রূপ সে চেনে, বুঝে। ভ্রমরীমিত্রতা চিনুক, বুঝতে পারুক, সে যে সত্যকার প্রেমও চায় না। স্বামীকে ভালবেসেছিল, ভালবাসা পেয়েছিল, দুরদৃষ্টবশতঃ তা যখন হারিয়েছে তখন সেই স্মৃতি নিয়েই তাকে বাঁচতে হবে। সতীত্বের নিকট প্রেম, সুখ, সমৃদ্ধি, অসীম প্রতিপত্তি, রাজার ঐশ্বর্য্য যে অতি তুচ্ছ। স্বামীকেই যখন প্রকৃত পক্ষে

হারিয়েছে তখন তার মৃত্যুও যে হ'য়ে গেছে। যদি কোলের শিশুটি না থাকত তবে সে পাপ কথা শুনবার পূর্ব্বে মরণ বরণ করতে পারত। আজও তার দেহে এমন শক্তি আছে, মনে এমন বল আছে—যাতে শ্যামজীর মত নরাধমকে এক ঘুসিতে ধরাশায়ী করতে পারে। কিন্তু উপায় নেই, তাই কোন প্রতিবাদ করলে না, অদম্য ইচ্ছা সত্ত্বেও এক ঘুসি নাকের ডগায় বসিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিলে না যে সে নারী—তার সতীত্ব, নারীত্ব খেলার জিনিষ নয়। উপায় নেই, পথ নেই, মুক্তি নেই—অভিশপ্ত শিশুটি যে এখনও কণ্ঠে জড়িয়ে আছে। টাকা চাই, পয়সা চাই। নীরবে, অতি নীরবে হেঁটমুখে সে কাজে চলে যায়; এমন ভাবে চলে গিয়েছিল যেন সে এত বড় সৌভাগ্যের প্রস্তাবে স্বীকৃত—অথচ সম্মতির কোন লক্ষণ এতটুকুও বোঝা যায় নি।

শ্যামজীর কুপ্রস্তাবে গঙ্গাবতী এখন আর রেগে উঠে না, চেঁচাবে বলে ভয় দেখায় না, চোটপাট করে গায়ের জোর খাটাতে চায় না, কড়া কড়া কথা শোনায় না। মিলের ভেতরে একা কোথাও চলাফেরা করে না, কাজও করে না, কোথাও একা যেতে হলে একা যায় না, একজন সঙ্গী সাথে নিয়ে যায়। শ্যামজীকে প্রাণপণ চায় এড়াতে। মিলে ঢুকতেই গা করে ছম্ ছম্, পা থাকে কাঁপতে; শ্যামজীর সাড়াশব্দ পেলেই গা শিউরে উঠে, সান্নিধ্যে পড়লে মুখ যায় ছাইবর্ণ হয়ে, বুকের রক্ত হয় শীতল—এমন শীতল ও ভারী হয় যেন মস্ত বড় বরফ চাপা দিয়েছে কেউ জোর করে। মনে মনে ভগবানকে ডাকে অতি দীন করুণ ভাষায়।

শ্যামজীর চক্ষুলজ্জার মুখোস পড়ে গেছে, গঙ্গাবতীর ভীতার্ত্ত, শান্ত মুখের ভাবে সাহস সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এমনি ব্যাপার আরম্ভ করেছেন যেন সে রাস্তার পানওয়ালী, পতিতা নারী, বাবুদের মিষ্টি হাসি পাবার জন্য আসর জমিয়ে বসে আছে! হোক না সে দুর্দ্দশাগ্রস্তা, নির্য্যাতিতা গরীব নারী, হোক না সে স্বার্থপর হীন সমাজের পরিত্যক্তা হীনচরিত্র, পাষণ্ড, মাতাল, চোর, জোচ্চোরের স্ত্রী—তবু ত' সে নারী। তার নারীত্ব ত' হীন নয়, তুচ্ছ অবজ্ঞার নয়। সে মূর্খ, অশিক্ষিত নারী বলে কি রোজ শুনতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে সতীত্ব গরিব ও আভিজাত্যহীন নারীদের জন্য নয়। সতীত্বজ্ঞান কুসংস্কার, সমাজের চালাকি ফাঁকি। হোক কুসংস্কার, হোক চালাকি, হোক ফাঁকি—সে পারবে না, অসম্ভব—এর পূর্ব্বে মৃত্যু স্বেচ্ছায় না আসে তবে যেন জোর করে সে মৃত্যুকে আনতে পারে। সতীত্ব হারাতে হলে যদি শ্যামজীর কথামত জ্ঞানী, অভিজাত হওয়া যায়, রাজরাণীর মত ঐশ্বর্য্যশালিনী হওয়া যায়, অসীম ক্ষমতাশালিনী হওয়া যায় তবে সে চায় না, চায় না কিছু সে দুনিয়ার। সে যেন চিরজীবন জন্ম জন্ম ধরে এমনি দুঃখ কষ্টই পায়।

ভাবতে ভাবতে অসীম শক্তি বল জেগে উঠে, অপমান-সূচক কথায় শরীরে আগুন জ্বলে উঠে, হাত দৃঢ়মুষ্টি হয়ে বজ্রের মত ভয়ঙ্কর হয়, শেষটায় পারে না—শিশু-সন্তানের মরণোন্মুখ ছবি নয়নপথে ভেসে উঠে, সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে; উপঢৌকন, কুপ্রস্তাবে গর্জ্জে উঠে না—পদাঘাত করতে উদ্যত হয়েও থেমে যায়, কাঁপতে কাঁপতে দূরে পালিয়ে যায়। প্রতিশোধ নেবার যে উপায় নেই।

(৯)

মিলের ছুটির সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। প্রথম উড়ল ধূলিবালি, চোখ মেলা যায় না, চোখে মুখে সর্ব্বাঙ্গে গাদা গাদা রাস্তার হালকা আবর্জ্জনা এসে জড়াচ্ছে। দরজা জানালার কবাট দুম্ দাম্ করে বন্ধ হচ্ছে আর খুলছে, গাছের ডাল পালা, কুঁড়ে ঘর-বাড়ী ধপ্ ধপ্ করে ভেঙ্গে পড়ছে। কেউ রাস্তায় বেরোতে সাহস পেল না। তুফানের বেগও একটু কমল—অমনি ঝপ্ ঝপ্ নামল বাদল। বিশাল সমুদ্র উঠল ক্ষেপে। ক্ষেপা সমুদ্রের মাঝবুক থেকে ধেই-ধেই করে নেচে আসছে পাহাড়ের বিশাল জলের ঝাপটা, ঝপ্ ঝপ্ করে পড়ছে জল। এমনি ভাবে জল পড়ছে যেন শিগ্‌গীর বন্যা হবে।

গঙ্গাবতী গেটের এক কোণে দাঁড়িয়ে ভীতচকিত নয়নে আকাশ পানে তাকিয়ে ভাবছে। বহু কুলি ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে পালিয়েছে, যারা সে অবকাশ পায় নি, ঝড়ে যেতে সাহস পাচ্ছে না—তারা চিন্তিতমুখে আকাশ পানে ব্যস্তভাবে তাকিয়ে রয়েছে। জল আর ধরছে না, শিগ্‌গীর ধরবে বলে কোন লক্ষণও বোঝা যাচ্ছে না। এত বৃষ্টিতে যেতেও সাহস পাচ্ছে না, অথচ বৃষ্টি ধরার প্রতীক্ষায় কতক্ষণ বা উদ্বিগ্ন মনে অপেক্ষা করবে। যুবকরা উসখুস্ করছে। অসহ্য হয়ে উঠলে দশ বার জন দল বেঁধে হল্লা

করতে করতে বাড়ী চলে ; এদের দেখাদেখি অন্য দল বের হয়।...

গঙ্গাবতীর বাড়ী যাবার তাড়া সব চেয়ে বেশি। রাত্রি হতে চলল, মেয়েটা হয়ত' জেগে উঠে মাকে খুঁজছে, আর ভয়ে ক্ষুধায় মাকে না পেয়ে চীৎকার করে কাঁদছে। মেয়ের কথা মনে পড়তেই গঙ্গাবতী চমকে উঠল, মনে বিভীষিকা জেগে উঠল, ভয়ে অমঙ্গল আশঙ্কায় গা থর্ থর্ করে কেঁপে উঠল। কি বিষম স্বার্থপর সে ! নিজের কষ্ট হবে বলে আরাম করে দাঁড়িয়ে আছে, জলের ছিটে যাতে গায়ে না পড়ে তারই অপেক্ষা করছে। সে কেন প্রতীক্ষা করছে তার প্রকৃত কারণ মনে করে সান্ত্বনা নিলে না, চেষ্টাও করলে না, অভিযোগের ওজর দিলে না, মেয়েকে কষ্ট দিয়ে নিজে সামান্য জলের ভয়ে ছাদের নীচে দাঁড়িয়ে আছে সে জন্য নিজেকে ধীক্কার দিতে লাগল। সে যে এতক্ষণ মেয়ের ভবিষ্যতের চিন্তায় যায় নি তা মনে করলে না ; ভিজে বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়বার মত একটা বস্ত্র নেই, যদি অসুখ-বিসুখ হয় তবে যে দুজনকেই অনাহারে মরতে হবে। স্বপক্ষে বলবার তার কিছুই নেই, এ-ত পরের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসাব-নিকাশ নয়। তারই বুকের রক্তে গড়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন একটি মাত্র মেয়ে। সে সন্তানের জন্য সব কিছু হাসিমুখে ত্যাগ করতে পারে, ভগবানকেও অস্বীকার করতে একটু ইতস্তত করবে না ; একটু কুণ্ঠিত হবে না। সন্তানের নিকট নিজের অস্তিত্ব ভুলে যায়, তাই ছুটল উন্মাদের মত, কোনদিকে খেয়াল না করে। ঝড়-তুফান অনুভূতির বাইরে, বাধা-বিপত্তি ভাববার সময় নেই, দিশেহারার মত ছুটল, কেবলই ছুটছে।

ঝড়ের হাওয়া থেমে গেছে, টিপ্ টিপ্ করে ছাতুর মত গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টির কণা পড়ছে। আকাশের স্তরে স্তরে মেঘরাশি জমাট বাঁধে নি, সমস্ত আকাশব্যাপী ছড়িয়ে আছে। আকাশ নিকষ কাল, ধরণী আঁধারে আত্মগোপন করেছে, গুঁড়া গুঁড়া বৃষ্টির কণার সমষ্টিতে ধরণীর অনন্ত আভরণকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে তুলেছে, তবে দৃষ্টির পথ রুদ্ধ নয়, আশু ভবিষ্যতের ভয়ঙ্কর বিপর্য্যয়ের চিহ্ন নেই। একবারে মুক্ত নয়, সরল নয়—কুটিলও নয়, ভীতিপ্রদও নয়।

গঙ্গাবতী চলেছে। রাস্তার মিটমিটে আলোকে দেখা যাচ্ছে তার শিথিলতা, ক্লান্ততা। অক্ষম দৈহিক শক্তির ওপর মানসিক বলের অত্যাচারের পরিণতি। গঙ্গাবতীর সর্ব্বাঙ্গ থেকে জল ঝরছে, মোটা এলো খোঁপা থেকে অঝরে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টির জল পড়ছে। পাতলা সাড়ীখানা গায়ে মিশে গেছে, শালুকা (অর্দ্ধ পাঞ্জাবীর মত জামা) ভিজে বুকে জড়িয়ে গেছে। ভেজা শরীরে শীতল বায়ু এসে একটু কাঁপিয়ে দিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

আঁধার রজনীর মেঠো আলোকে গঙ্গাবতীকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মত রক্তাভ গৌরবর্ণ—দুঃখ-দুর্দ্দশায় এখনও মলিন হয় নি, বিষাদে দারিদ্র্যের পীড়নে যেন আরও রমণীয় আকর্ষণীয় অতুলনীয় সুন্দরী করে তুলেছে শুভ্র গোলাকার মুখখানা। গভীর কাল টানাটানা ভাসাভাসা চোখ দু'টি কি করুণ, কি মিষ্টি, কত সুন্দর—কত যুগের অনন্ত ভাবপ্রবণ ভাষার আধার! হাসি ভুলে গেছে, হাসতে চায় পারে না বিষাদ মুখ আরও বিষাদ-করুণ হয়ে উঠে। সে এত করুণ, এত বিষাদ বলেই বুঝি এত আকর্ষণীয়, এত সুন্দরী। কুলির মেয়ে, কুলির জায়া কি এত সুন্দরী হ'তে পারে? চার সন্তানের জননী এত রূপসী হয় কি করে? শারীরিক মানসিক এত বিপত্তির পর কি গুণে এত সুন্দরী থাকতে পারে—যার জন্য রাস্তার লোক থমকে যায়, পথিক পথ ভুলে যায়, চিত্রকর তুলিতে রঙ পরায়, বিদেশী আশ্রয় খুঁজে, যাযাবর আস্তানা গাড়ে, ক্রোড়পতিরা মাথা নত করে ধর্ণা দিয়ে পড়ে, লোভ দেখায় মুরজার মত ঐশ্বর্য্যশালিনী করে দিতে, ভদ্রমহিলারা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে, দুটি কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়, সুন্দরীরা ঈর্ষায় জ্বলে মরে, পদস্থ ভদ্রলোকরা অকারণে কারণ ঘটিয়ে আলাপ করতে চায়।...কি করে এত সুন্দর চিরযৌবন অটুট রূপরস নিয়ে সে দুঃখ কষ্ট নির্য্যাতনের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে তার উত্তর এখানে নয়। যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন এর রহস্য। হয়ত' সে আকস্মিক, অঘটন, সৃষ্টিকর্ত্তার খামখেয়ালী ভুল ; কিন্তু কল্পিতা নয়, অবাস্তব নয়। যাক্ সে কথা—

গঙ্গাবতী বাড়ী যাচ্ছে, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে। এক হাঁটু জল শাঁ শাঁ করে চলছে, পদক্ষেপে ছপ্ ছপ্ করে শব্দ হচ্ছে। কর্দ্দমাক্ত জল বৈদ্যুতিক আলোকে যেন টুকরো টুকরো শুভ্র কাঁচের মত চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গঙ্গাবতীর কাপড়-চোপড় কাদা জলে

কাল হয়ে গেছে। এলোমেলো জলহাওয়া বড় শীতল, বিশাল সমুদ্রের যেন গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। সিক্ত অঙ্গে এক একটা ফুরফুরে হাওয়া দোল দিয়ে যায়—আর শীতে গা থরথরিয়ে কেঁপে উঠে। গঙ্গাবতীর কোন দিকে লক্ষ্য নেই, শীতে হাত পা কাঁপছে, দাঁত ঠক্ ঠক্ করে বাজছে, সে শুধু মেয়ের কথা ধ্যান করে এগুচ্ছে। হঠাৎ একখানা বলিষ্ঠ হাত তার কম্পিত হাত চেপে ধরলে। ভয়ে থমকে দাঁড়াল, ভীতাশ্চর্য্যনয়নে সুমুখে দেখল শ্যামজী উত্তপ্ত মরুর পিপাসা নিয়ে নির্ণিমেষ নয়নে তার দিকে চেয়ে আছেন—উঃ! কি ভয়ঙ্কর চাউনি, গঙ্গাবতীর গা শিউরে উঠল। মুহূর্ত্তে নিজকে দৃঢ় করে নিয়ে রুক্ষ কর্কশ স্বরে বললে—"ছিঃ! হাত ছাড়ুন। ছাড়ুন বলছি!"

হাত ছুটাতে পারলে না, মুক্ত করেও দিল না; বাঁধন দৃঢ় অথচ মৃদু।

শ্যামজী প্রাণের আবেগ ঢেলে বল্লেন—"তুমি কি পাষাণী!"

"আঃ! রাস্তার মাঝে কি মাতলামী করছেন, ছাড়ুন হাত।"

"হুঁ! আজ তোমার একটা উত্তর চাই! তুমি কিসের জন্য নিজেও ধ্বংস হচ্ছ, আমায়ও পুড়িয়ে মারছ? সতীত্বের ভয়? কিসের সতীত্ব! তুমি মূর্খ, লেখাপড়া শেখনি তাই সব ফাঁকি জুচ্চুরি ধরতে পার নি। কে তোমার স্বামী, তার কি পরিচয় বা তুমি দিতে পার?"

"ছাড়ুন বলচি—ভালয় ভালয়। আমার মেয়ের বড্ড অসুখ, বাড়ীতে কেউ নেই—"

"তোমার কি এক তিল বুদ্ধি নেই? নিজে নয় সুখ-স্বচ্ছন্দতা বিসর্জ্জন দিলে—কিন্তু সন্তান। এদের হত্যা করবার কি অধিকার আছে তোমার। আজ আর কোন মানা শুনব না। আমার স্ত্রী নেই, আমি তোমাকে আমার স্ত্রীর আসনে বসাব; তোমার মেয়ের জন্য ভয় কর না, বৈপিত্রেয় মেয়েকে আমি নিজের সন্তানের মত দেখব শুধু একবার বল তুমি আমার।"

শ্যামজীর কথা শুনে ও হাব-ভাবে গঙ্গাবতী চঞ্চল হয়ে পড়ল। পাষণ্ডের সঙ্গে তর্ক করে পারবে না—কিন্তু রাহু-গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়াও কঠিন। এরা কুলি-মজুর, অশিক্ষিত, সংস্কারবদ্ধ, কবিতার ধার ধারে না, বুঝালেও বুঝে না, তাই ঔপন্যাসিক প্রেম যুক্তি-তর্ক শুনে ভড়কে যায়। এরা খোলাখুলি কথা বোঝে, জানে, উত্তরও দেয়—এদিক, কি ওদিক। যে ধরা দেবার সে ধরা দেয় লোভে বা মোহে পড়ে; কেউ বা অবস্থায় পড়ে ধরা দিতে বাধ্য হয়, কেউ আবার লোভ, মোহ, বাধ্যতামূলক অবস্থায় পড়েও ধরা দেয় না, ধরা দেবার পূর্ব্বে জীবন বিসর্জ্জন দেয় বা অপরকে খুন করে নিজের গরিমা রক্ষাও করে।...গঙ্গাবতী কোন উত্তর দিলে না, কিই বা উত্তর দিবে। একটি মাত্র উত্তর আছে কিন্তু তা যে কার্য্যত অসম্ভব। সে গরিব দুঃখিনী, নিঃসহায়—কিই বা করতে পারে। সে যা চায়, বলতে চায়—তার পরিণাম যে ভয়ঙ্কর। তার যে কেউ নেই, কেউ যদি জোর করে ধরে নিয়ে যায় তবে কে তাকে বাঁচাবে, রক্ষা করবে? এ পর্য্যন্ত যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যায় নি এই তার ভাগ্য, পূর্ব্বজন্মের পুণ্যের জোর। শ্যামজী যদি জোর করে ধরিয়ে দেন তবে সে কি করতে পারে, কে তাকে দুর্বৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার করবে? জীনার স্বামী ছিল, ভাই বোন সবাই ছিল—কিন্তু কেউ কি তাকে রক্ষা করতে পারলে? না দুর্বৃত্তের বিলাসকুঞ্জ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারলে? কেউ পারে নি, কুমার সাহেবের অর্থ ও প্রতিপত্তির নিকট আদালতের সূক্ষ্ম বিচার পর্য্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে। জীনা রূপ যৌবন হারাল, কুমার সাহেব গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলেন। জীনা স্বামী পরিত্যক্তা, সমাজ ত্যক্তা, রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে কোনভাবে জীবন চালাচ্ছে। কোন প্রতিকার কি হল?

সে ছোটলোকের মেয়ে, খেটে খায়। দৈহিক ও মানসিক অসীম শক্তি সে রাখে। ইচ্ছে করলে শ্যামজীকে দু'তিন ঘুসিতে-কাত করে দিতে পারে—হয়ত ডাক্তার ডাকবারও প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু তার পর? সে কোথায় যাবে? কে তাকে স্থান দেবে? এ বিশ্ব জুড়ে কোথায়ও যে তার স্থান নেই, কাউকে যে সে বিশ্বাস করতে পারে না, বিশ্বাস করবার যে আর কোন উপায়ও নেই। পোড়া রূপ যৌবন যতদিন পর্য্যন্ত আছে ততদিন যে তার নিষ্কৃতি নেই। একগণ্ডা সন্তানের জননী হল, মিলে গতর খাটাচ্ছে প্রায় সাত বছর যাবৎ—তবু না যায় রূপ, না যায় যৌবন। কিন্তু এমন ভাবে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে বা কতকাল। যে হয় রক্ষক সেই সাজে সংহার-কর্ত্তা, যার পায় ক্ষুধা সেই চায় ক্ষুধা মেটাতে।

হঠাৎ কেঁপে উঠল যেন ধরণী, থমকে গেল পশু পক্ষী, ভয়ে চমকে উঠল মানব, বীভৎস রাগিণীতে মথিত হয়ে উঠল আকাশ বাতাস। জনক মৃত ছেলেকে ফিরিয়ে আনবার জন্তে আর্ত্ত-স্বরে চেঁচাচ্ছে 'বাবা! বা-বা!' বলে, জননী মৃতদেহ সাপটিয়ে ধরে করছে পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ। নীরোগ ছেলে সকাল বেলাও হেসেছিল, খেলনা নিয়ে খেলেছিল, মূক ভাষায় জনকজননীর সঙ্গে সোহাগ আবদার করেছিল। আফিম খাইয়ে শিশুকে ঘুম পাড়িয়ে মিলে চলে যায়, ফিরে এসে আর পেল না। জন্মের ঘুম ঘুমিয়েছে, আর জাগাতে পারছে না। জনক জননী! ঘুম চেয়েছিলে! এবার আর চিন্তা নেই, যুগ যুগান্তর ধরে ঘুমাবে। হায় রে! অভিশপ্ত কুলিমজুর! এমন করেই কি মরতে হয়!

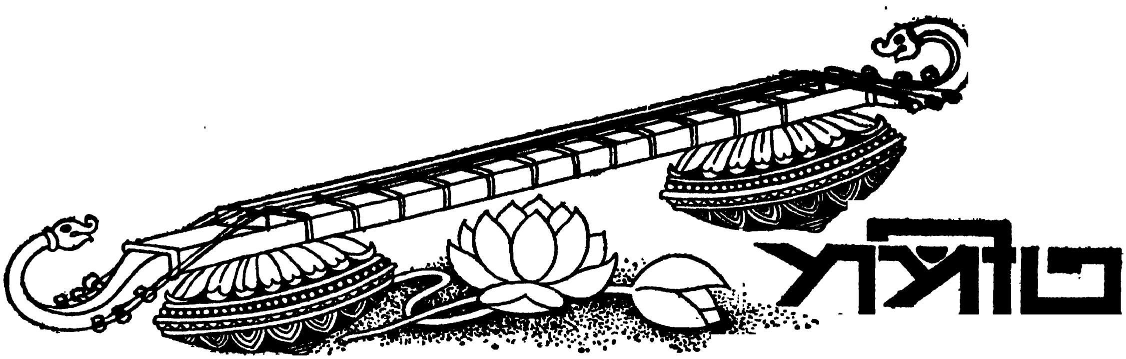
'আমার মেয়ে! আমার সোনার মাণিক!' গঙ্গাবতী উন্মাদিনীর মত ছুটল। শ্যামজী নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হয়ে গঙ্গাবতীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে গেছে, একচুল নড়বার শক্তি নেই। মাতৃত্বের দীপ্তির নিকট চোখ ঝলসে গেল, শক্তি সামর্থ্য কামের অগ্নিদাহ জড় নিষ্প্রভ নিস্তেজ হয়ে গেল।

উন্মাদিনী ছুটেছে, ছুটেছে, কোন হুঁস নেই; শুধু বিভীষিকা—ভয়ঙ্কর অতীব ভয়ঙ্কর—মৃত্যুরাজ বহু পূর্ব্বে এসেছেন, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন, সে যেতে চায় না, প্রাণপণে মাকে ডাকছে, পারছে না চেঁচাতে, ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সে বাড়ী পৌঁছতে পৌঁছতে মৃত্যুরাজ চলে গেল, শুধু একটি কথা, শুধু একবারের জন্ম দেখতে দিলে না, চলে গেল।···গঙ্গাবতী দৌড়চ্ছে, হাঁপাচ্ছে, পা যেন চলে না, ভীষণ ভারী, দস্তার মত ভারী। পিছল রাস্তায় কতবার পড়ে গেল, কতবার পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। এক ধাক্কায় দোর ঠেলে উন্মত্তের মত ভীত রোরুদ্যমান শিশুকে বক্ষে চেপে ধরে নিজেই অসহায়ের মত কান্না জুড়ে দিল। নিষ্ঠুরা জননী কি করেই বা প্রবোধ দেবে! এত বড় নির্দ্দয়তার কি কোন ওজুহাত আছে! তিন চার বছরের মেয়ে আজও হাঁটতে পারে না, ভাল করে বসতে পারে না, কথা পর্য্যন্ত বলতে পারে না, রোগে ভুগে ভুগে দড়ির মত শুকিয়ে যাচ্ছে। এত রোগা, এত দুর্ব্বল—তার ওপর সারাদিন খায় নি ভাল করে, কখন দুপুরে একটু বুকের দুধ চুষেছিল—সাত আট ঘণ্টার ক্ষুধায় নির্জ্জীব হয়ে গেছে। পেট মেরুদণ্ডের সঙ্গে মিশে গেছে, মুখখানা মুমূর্ষুর মত শুষ্ক পাংশু হয়ে গেছে, বুক শুকিয়ে কাঠ হয়েছে, আঁধার নির্জ্জন ঘরে ঝড় তুফানের ভয়ে প্রাণের স্পন্দন অনুভূতিটুকু যেন হারিয়ে ফেলেছে—জড় নিস্পন্দ মূক বধির—মরণ কান্নায় গলা ভেঙ্গে গেছে, গোঁ গোঁ করে গোঙানর ক্ষমতাও নেই আর। নির্দ্দয় জননীর কোলখানি পেয়ে কি করে জানাবে তার প্রাণের ভাষা। অবসর বা কৈ? মাতৃস্তন হ'তে রক্ত চোষকের মত প্রাণপণে মাতার মধু চুষে নিচ্ছে। সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার জ্বালায়, ভয়ে আশ মিটিয়ে চোঁ-চোঁ করে দুধ টানতে পারছে না, যেন মরুভূমিতে বিন্দু বিন্দু বারিধারা পড়ছে টপ্-ট-প্ করে। মাতার ভাষা নেই, সান্ত্বনা নেই—আছে রোদন, বিলাপ—আছে কল্পনাতীত আবেশ। শিশু মূক, বধির, চেতনাবিহীন—আছে শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস, যেন দম আটকে যাচ্ছে। ক্রমশঃ

সর্ব্ব-হারা

শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ

অবসাদ আসে মোর সর্ব্ব অঙ্গ ছেয়ে।
জগতের রূপ মোরে মুখ-ভঙ্গী করি'
ব্যঙ্গ করে যেন; ঘ্রাণে মোর আসে ধেয়ে
জগতের সুরভি যা' পূতিগন্ধে ভরি'।
যে অমৃত জগতের মজ্জায় মজ্জায়
রুচি নাহি তাহে আর। অঙ্গের চপলা
উন্মদ আবেগে ক্ষুণ্ণ লজ্জায় লজ্জায়
ফিরে যায় অনাহূত পরশ-বিফলা।
রঙের তুলিকা করে যে সুন্দর আঁকে
তৃণ-পুষ্প-বল্লরী-চারু-মঞ্জী-মঞ্জিমা
প্রাণের প্রাঙ্গণে, গগনের সারা ফাঁকে
লেপি দেয় নির্ণিমেষ নিবিড় নীলিমা,
তুলি গেছে খসি তার; বিপন্ন তন্দ্রিকা
রচিতেছে চারিধারে ধূসর ধূমিকা।



ভীমপলশ্রী মিশ্র—দাদ্‌রা

আজ যদি গো নীরব রহি।
গানের সুরে ডাক্‌তে যদি
আঁখি-ধারা যায় গো বহি॥
ভুল বুঝো না, ওগো প্রিয়,
অঙ্গনে মোর চরণ দিও,
নীরবতার গভীর ভাষায়
শেষ কথা মোর যাব কহি'॥
আমার ঘরের প্রদীপখানি না হয় যদি জ্বালা,
অন্ধকারের অতল তলে গাঁথবো তোমার মালা
তোমার আসার সে-লগনে,
যদি আমি রই স্বপনে,
মালাখানি নিও তুমি—
তার ব্যথা আর কত সহি?

কথা ঃ—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য, এম্‌-এ

সুর ও স্বরলিপি ঃ—শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত

II পগা -া মা | গমা -পণা পা I মজ্ঞা -া মজ্ঞা | -া রা সা I
আ জ্ য দি॰ ॰॰ গো নী ॰ র ॰ ব ম্

I ররা -ন্া -সা | -া -া -া I সজ্ঞা জ্ঞা -া | রা সা -া I
হি॰ ॰ ॰ ॰ ॰ ॰ গা নে র্ সু রে ॰

I সা পা পা | পক্ষা পা -া I পণা ণা ধা | ণা -া -া I
ডা ক্ তে য দি ॰ আঁ খি ধা রা ॰ ॰

I পণা -র্সর্া র্সা | ণধা -পদা পা II
যা॰ ॰য়্ গো ব॰ ॰॰ হি

II {পা -া পা | মধপা মজ্ঞা মা I পা ণা -পা | -পনা র্সা র্সা I
ভু ল্ বু ঝ•• না • ও গো • •• প্রি য়্

I র্সা ণর্সা -র্জ্ঞা | র্রা জর্সা -া I ণা র্সা ণা | -র্সা -া -া I
অং গ• •• নে মো র্ চ র ণ • • •

[পা পা -দা | দর্রা র্সা -া]
I ণর্সা -ণা -ধা | পা -া -া } I {পা পা -ধা | ণা র্সা -া I
দি• • • ও • • নী র • ব তা য়্

I ণা ধা -ণা | ণপা ণা ণদা I পা -া -া | -া -া -া } I
গ ভী • র • ভা ষা • • • • য়্

I পা -া মধপা | মা মগা -া I গা সগা -মপা | মা পা -া II
শে ষ্ ক•• থা মো র্ না ব• •• ক হি •

II সা সা দা | দা দা -া I পা পা -া | পঋা -গা -ঋা I
আ মা র্ ঘ রে র্ প্র দী প্ খা• • •

I গা -া -া | -া -া -া I ঋা গা -া | ঋগা -ঋঋা -গঋগা I
নি • • • • • না হ য়্ য• •• ••দি

I গঋা -া -া | সা -া -া I সা -া সা | সন্া ধ্া -ন্া I
জ্বা • • লা • • অ ন্ ধ কা রে র্

I সা সমা -া | মা মা -া I মা -া মা | মা মা -া I
অ ত• ল্ ত লে • গাঁ থ্ বো তো মা য়্

I মগা -া মা | সা সমা মা I গা -া মা | গমা -পণা পা I
মা• • • লা আ মি গাঁ থ্ বো তো• •• মায়্

I মজ্ঞা মজ্ঞা -া | রা -সা -া I
মা • • লা • •

I {পা পা -া | মধপা মজ্ঞা -মা I পা -ণা -পা | মা র্সা র্সা I
তো মা য়্ আ•• সা য়্ সে • • ল গ নে

I র্সা ণর্সা -র্জ্ঞা | র্রা জ্ঞর্সা -া I ণা -র্সা -ণা | -র্সা -া -া I
য দি॰ ॰॰ আ মি ॰ র ॰ ॰ ই ॰ ॰

[পা পা -দা দর্রা র্সা -া]
I ণর্সা ণা -ধা | পা -া -া } I { পা পা -ধা ¦ ণা র্সা -া I
স্ব॰ প ॰ নে ॰ ॰ মা লা ॰ খা নি ॰

I ণা -ধা -ণা | ণপা ণা ণদা I পা -া -া | -া -া া- } I
নি ॰ ॰ ও ॰ তু মি ॰ ॰ ॰ ॰ ॰

I পা -া মধপা | মা মগা -া I গা সগা -মপা | মা পা -া II II
তা র্ ব্য॰॰ থা আ র্ ক ত॰ ॰॰ স হি ॰

নোবেল পুরস্কার

কমলেশ রায়

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে পদার্থ-বিজ্ঞানে (Physics) ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জে, স্যাড্‌উইক্ (Dr. J. Chadwick) এবং রসায়নে (Chemistry) ইরেণে কুরী ও তাঁহার স্বামী অধ্যাপক জোলিও (Irene Curie, Prof F. Joliot ফরাসী) নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উন্নতি অত্যন্ত ধারাবাহিক, এই কারণে স্যাড্‌উইক্ ও জোলিও-দম্পতির আবিষ্কারের কথা প্রথমেই বল্‌তে যাওয়ায় অসুবিধা ঘট্‌তে পারে। এঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'লে পূর্ব্বে কতকগুলি বিষয় বলা প্রয়োজন।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কণাদ এবং কোন কোনও গ্রীক দার্শনিক পদার্থের আণবিক গঠন সম্বন্ধে ধারণা ক'রেছিলেন। তবে সে মতবাদ বিজ্ঞানসম্মত বিচার দ্বারা কখনও পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় নাই। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে ডাল্টন (John Dalton) স্বীয় আণবিক মতবাদ বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি ও পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ডাল্টন এবং পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণের মতানুসারে প্রত্যেক বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণুর সমষ্টি, প্রত্যেকটি অণু আবার এক বা ততোধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন মৌলিক উপাদানের (যথা— হাইড্রোজেন, অঙ্গার, পারদ, লৌহ ইত্যাদি) পরমাণুর আকৃতি, প্রকৃতি, ভার ইত্যাদি বিভিন্ন ; পরমাণুগুলি অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়।

আজ অবধি ৯২টি মৌলিক পদার্থ (Chemical Elements) আবিষ্কার হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমেও সকলের মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে পরমাণুই জড়পদার্থের চরম অবিভাজ্য অংশ।

কেম্ব্রীজের ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাদারফোর্ড (Rutherford) দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে পরমাণুই বস্তুর চরম অবিভাজ্য অংশ নয়—প্রত্যেকটি পরমাণু ঋণাত্মক (negative) ও ধনাত্মক (positive) বিদ্যুৎ রেণুর সমষ্টি। ঋণাত্মকগুলি ইলেকট্রণ, ধনাত্মকগুলি প্রোটন। ইলেকট্রণ অপেক্ষা প্রোটন প্রায় ১৮৫০ গুণ ভারী, কিন্তু উভয়ের বিদ্যুৎ-পরিমাণ সমান, অবশ্য একটি ঋণাত্মক ও অপরটি ধনাত্মক।

রাদারফোর্ড ও বোরের চিত্র (Rutherford-Bohr model) অনুসারে এক একটি পরমাণুকে প্রোটন ও ইলেকট্রণের সৌরজগতের মত কল্পনা করা যেতে পারে। এক বা ততোধিক প্রোটনকে কেন্দ্র ক'রে কতকগুলি ইলেকট্রণ প্রচণ্ডবেগে ঘুরে। এক একটি পরমাণুর আয়তন অনুপাতে তা'র কেন্দ্রীয় প্রোটন-সমষ্টি অত্যন্ত ছোট। এইরূপ ক্ষুদ্র স্থানে সমজাতীয় (ধনাত্মক) প্রোটন থাকায় তা'রা বিকর্ষণ বলে (force of repulsion) ছেড়ে যেতে চায়। কিন্তু কেন্দ্রীণের (nucleus) চারি পাশে একপ্রকার বৈদ্যুতিক বেষ্টনী (potential barrier) থাকায় তা'রা সেটা অতিক্রম ক'রে সহজে নিষ্ক্রান্ত হ'তে পারে না।

কেন্দ্রীণের মধ্যে অধিকাংশ প্রোটন থাকলেও কতকগুলি ঋণাত্মক ইলেকট্রণও থাকে এবং উদ্বৃত্ত ধনাত্মক প্রোটনীয় বিদ্যুৎই কোনও পরমাণু কেন্দ্রীণের বিশেষত্ব ; এর উপরেই পরমাণুর তথা মৌলিক পদার্থের ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ভর করে। যদি কোনও মৌলিক পরমাণুর কেন্দ্রীণের ইলেকট্রণ বা প্রোটনের সংখ্যা কোনও উপায়ে পরিবর্ত্তন করা যায় তবে সে অন্য মৌলিক পদার্থে পরিবর্ত্তিত হ'বে। এ যেন পুরাণ রসায়নবিদের (alchemist) কথার মত হ'ল। তাঁ'রা চেষ্টা ক'রতেন কি উপায়ে লোহা, তামা ইত্যাদিকে সোনায় পরিণত করা যায় (অবশ্য রাসায়নিক উপায়ে, পরশ পাথরের ছোঁয়ায় নয়)। ডাল্টনের আণবিক মতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সে আশা লুপ্ত হ'ল ; কারণ তাঁদের মতবাদ অনুসারে পরমাণু অবিভাজ্য ও অপরিবর্ত্তনীয়। কিন্তু রাদারফোর্ডের আবিষ্কার ও কেন্দ্রীণ মতবাদের ফলে দেখা যায় সে আশা পূর্ণ করা দুঃসাধ্য হ'লেও একেবারে অসাধ্য নয়। পারদ পরমাণুর কেন্দ্রীণ থেকে একটি প্রোটন দূর ক'রে দিতে পারলে বা তামার কেন্দ্রীণে ৫০টি অথবা লোহার কেন্দ্রীণে ৫৩টি প্রোটন বাড়িয়ে দিতে পারলে তা'রা সোনায় পরিণত হ'বে। তবে কেন্দ্রীয় ইলেকট্রণ বা প্রোটন পরিবর্ত্তন করা মোটেই সহজ কাজ নয়।

হেন্‌রী বেকেরেল ইউরেণীয়াম ধাতু থেকে তিন প্রকার রশ্মি স্বতঃই নির্গত হ'তে লক্ষ্য করেন। নির্গত রশ্মির একাংশ প্রচণ্ডবেগে ধাবমান হিলিয়াম কেন্দ্রীণ (অর্থাৎ ৪টি প্রোটন+২টি ইলেকট্রণের সংবদ্ধ কণা), এর নাম আল্‌ফা রশ্মি (A-rays)। হিলিয়াম একপ্রকার গ্যাস। বেকেরেল আবিষ্কৃত রশ্মির আর এক অংশ অনুরূপ ধাবমান ইলেকট্রণ—বিটা রশ্মি (B-rays) ; এবং অপরাংশ রঞ্জন রশ্মি জাতীয় ক্ষুদ্রতরঙ্গ আলোক বিশেষ। আল্‌ফা ও বিটা 'কণিকা' বিশেষ, এ জন্য তা'দের "রশ্মি" বলা যুক্তি-বিরুদ্ধ, তবে শব্দটি সুপ্রচলিত হ'য়ে গিয়েছে। চুম্বকের প্রভাবে রশ্মিত্রয়কে পৃথক করা যায়। মিশ্র রশ্মি পথে চুম্বক শক্তি প্রয়োগ ক'রলে আল্‌ফা ও বিটা কণিকা পরস্পর বিপরীত দিকে ভ্রষ্ট (deflected) হয়, কারণ আল্‌ফা কণিকাগুলি হিলিয়াম কেন্দ্রীয় (ধনাত্মক) ও বিটা রশ্মি ঋণাত্মক ইলেকট্রণ সমষ্টি। কিন্তু গামা রশ্মি আলোকতরঙ্গ বিশেষ, ধন বা ঋণ বিদ্যুৎকণা নয়, অতএব সে সরলপথেই ধাবিত হয়, চুম্বক প্রভাবে পথ-ভ্রষ্ট হয় না।

ইউরেণীয়াম ভিন্ন থোরিয়াম, একটিনীয়াম বা রেডিয়ামে এইরূপ স্বতঃ বিচ্ছুরণশীলতা তীব্রভাবে দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিকীরণ ধাতুটির কেন্দ্রীণ চূর্ণ হওয়ার ফল। বিচ্ছুরণশীল কেন্দ্রীণ হ'তে এইভাবে অবিশ্রান্ত ইলেকট্রণ ও হিলিয়াম কেন্দ্রীণ নির্গত হওয়ার ফলে সে ক্রমশঃ নিম্ন শ্রেণীর ধাতুতে রূপান্তরিত হয়। ইউরেণীয়াম ধাতু অতি ধীরে ধীরে সীসকে পরিণত হয়।

বর্ত্তমান সময়ে সকলেই পরমাণুর কেন্দ্রীণের স্বরূপ জানবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। নানা উপায়ে বিধ্বস্ত করে তা'কে পরীক্ষা করবার উপায় উদ্ভাবন হ'চ্ছে। রেডিয়াম জাতীয় ধাতু নিসৃত আল্‌ফা কণিকাগুলি অপেক্ষাকৃত ভারী এবং প্রচণ্ড গতিশক্তিশালী। কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীণকে চূর্ণ ক'রবার একটি প্রধান অস্ত্র এই আল্‌ফা রশ্মি। তবে আল্‌ফা কণিকাগুলি ধনবিদ্যুৎযুক্ত হওয়ায় কেন্দ্রীণের বিদ্যুৎ-বেষ্টনীতে (Potential barrier) যথেষ্ট বাধা পায়।

জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক বোদে (Bothe) এবং গাইগের (Geiger) বেরিলীয়াম ধাতুকে আল্‌ফা রশ্মি দ্বারা চূর্ণ (bombard) করতে গিয়ে একপ্রকার অত্যন্ত গভীর ভেদক রশ্মি (highly penetrating rays) আল্‌ফা কণিকা আঘাতপ্রাপ্ত বেরিলীয়াম গাত্র থেকে নির্গত হ'তে লক্ষ্য করেন। বোদে, বেকের, কুরী ও জোলিও ঐ রশ্মি

পরীক্ষা ক'রলেন। তাঁরা সকলেই তা'কে অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ রশ্মি বলে ভুল ক'রলেন।

রাদারফোর্ডের ছাত্র ও সহকর্ম্মী ডাঃ স্যাড্উইক্ দেখালেন এই রশ্মি 'কণিকা' বিশেষ এবং এই কণিকা ধন বা ঋণ বিদ্যুৎকণা নয়—একেবারে বিদ্যুৎশূন্য! এর নাম নিউট্রণ। এর গুরুত্ব প্রোটনের অনুরূপ, উপরন্তু কোনও প্রকার তড়িৎ সংশ্লিষ্ট না থাকায় কোনও কেন্দ্রীণের বিদ্যুৎ-বেষ্টনী তা'কে বাধা দিতে পারে না। এইজন্য নিউট্রণ সহজেই যে কোনও কেন্দ্রীণের মধ্যে বেগে প্রবেশ ক'রে তা'কে বিধ্বস্ত ক'রতে পারে। স্যাড্উইকের এই নিউট্রণ আবিষ্কার ভবিষ্যতে পরমাণু-বিজ্ঞানের কত যে জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত ক'রবে সে কথা এখন হয় তো কেউ কল্পনাই ক'রতে পারে না!

রসায়ন শাস্ত্রে ফরাসী অধ্যাপক এফ্ জোলিও ও তাঁ'র পত্নী ইরেণে কুরী-জোলিও "নোবেল পুরস্কার" পেয়েছেন। ইরেণে কুরী মাদাম কুরীর কন্যা। মাদাম কুরী ও তাঁর স্বামী পেরী কুরি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন রেডিয়াম আবিষ্কার ক'রে।

জোলিও দম্পতি কৃত্রিম উপায়ে সাধারণ ধাতুতে রেডিয়ামের অনুরূপ বিচ্ছুরণশীলতা (Radio-activity) প্রণোদিত ক'রতে সমর্থ হ'য়েছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তাঁ'রা রাদারফোর্ডের পরীক্ষা অনুযায়ী আল্ফা রশ্মি আঘাতে বোরণ, ম্যাগ্নেসীয়াম ও এলুমিনিয়ামের কেন্দ্রীণ বিধ্বস্ত ক'রবার চেষ্টা ক'রছিলেন;—ফলে আঘাত-প্রাপ্ত ধাতু থেকে প্রোটন, নিউট্রণ, গামা রশ্মি ইত্যাদি বহির্গত হ'চ্ছিল। অকস্মাৎ তাঁ'দের মনে হয়—দেখা যাক্ আল্ফা রশ্মি সরিয়ে নেওয়ার পরেও ধাতুগাত্র থেকে বিচ্ছুরণ পাওয়া যায় কি না। কি আশ্চর্য্য! সত্যই কিছু-কাল পর্য্যন্ত তা'রা বিকীরণশীল থাকে! এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে প্রণোদিত বিচ্ছুরণশীলতায় রেডিয়াম ইত্যাদির প্রাকৃতিক বিচ্ছুরতার নিয়মসূত্রাদি বর্ত্তমান থাকে। বোরণ ধাতুতে প্রণোদিত বিকীরণশীলতার পরিমাণ অর্দ্ধেকে হ্রাস হ'তে ১৪ মিনিট, ম্যাগ্নেসীয়ামের ২·৫ মিনিট এবং এলুমিনিয়ামের ৩·২৫ মিনিট লাগে। প্রাকৃতিক বিচ্ছুরণ-শীল কতগুলি ধাতু অবশ্য এর তুলনায় অনেক বেশী স্থায়ী। রেডিয়ামের অর্দ্ধ হ্রাস কাল (half-value period) ১৬০০ বছর।

জোলিও দম্পতি আল্ফা রশ্মি আঘাতে কতকগুলি ধাতুতে বিচ্ছুরণশীলতা প্রণোদিত ক'রতে সর্ব্বপ্রথম সমর্থ হয়েছেন। পরে ফের্ম্মি (Fermi) ও তাঁ'র সহকর্ম্মীগণ নিউট্রণের আঘাতে সকল মৌলিক পদার্থেই সহজে বিচ্ছুরণশীলতা প্রণোদিত ক'রে তাদের গুণাগুণ পরীক্ষা ক'রেছেন। পূর্ব্বে স্যাড্উইক্ প্রসঙ্গে নিউট্রণের আবিষ্কারের কথা ব'লেছি;—নিউট্রণে কোনও প্রকার বিদ্যুৎ না থাকায় সেগুলি অনায়াসে যে কোনও পরমাণুর কেন্দ্রীণের বিদ্যুৎ-বেষ্টনী ভেদ ক'রে ভিতরে প্রবেশ ক'রতে পারে।

চিত্রগুপ্ত ও তাহার বৈজ্ঞানিক তথ্য

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

চিত্রগুপ্তের নাম হিন্দুমাত্রেরই চিরপরিচিত। অতি পুরাকাল হইতে এই নাম হিন্দুর শ্রবণ-পথ দিয়া প্রবিষ্ট হইয়া তাহার হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয় এবং সেই প্রতিধ্বনির ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা অজানা কাল্পনিক অনৈসর্গিক ভীতিব্যঞ্জক ভাবের উদ্রেক করিয়া দেয়। হিন্দুসভ্যতার কোন স্মরণাতীত যুগে ইহার জন্ম, তাহা সঠিক নির্ণয় করা দুর্ঘট; তবে ইহা স্থির যে এই চিত্রগুপ্তের ভীতিব্যঞ্জক কাল্পনিকতার মধ্য দিয়া ন্যূনাধিক সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হিন্দুজাতির যে জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা চিন্তা করিতে আজিও যেন বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে—হৃদয় একটা অননুভূতপূর্ব্ব অতীত গরিমায় পরিপূর্ণ হইয়া যায়, আর ঘূর্ণ্যমান কাল-চক্রনেমির নিষ্ঠুর বিবর্ত্তনের বিষম চিন্তা করিতে করিতে মনে হয় হিন্দুজাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান-মণ্ডিত গৌরব-গরিমামাখা স্বতঃবিকশিত সেই জ্যোতির্ম্ময় অতীত, বর্ত্তমানের স্বপ্ন;—আর পরপদ-বিমর্দ্দিত পরমুখাপেক্ষী রুদ্ধ অন্ধকারে স্তব্ধ বর্ত্তমান, সেই অতীতের স্বপ্ন। হিন্দু-জাতি যখন যশাদ্রির অভ্রভেদী তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়া সমস্ত জগতকে তাহার জ্ঞান-জ্যোতির অমোঘ আলোকে উদ্ভাসিত করে,

তখন প্রতীচ্যের উলঙ্গ আমমাংসভোজী যে অসভ্য বন্যজাতি, তদানীং বন্যপশু অপেক্ষা কোনও উচ্চ স্তরের জীব নামে পরিগণিত হইবার যোগ্য ছিল না—হতভাগ্য হিন্দুজাতির দুর্ভাগ্যের ফলে, কালচক্রের নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে আজ সেই বন্যজাতির বংশধরগণ স্ফীতবক্ষে এই হিন্দুজাতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, আকাশ-পাতাল বিদীর্ণ করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বিশ্বজগতে প্রচার করিতেছে যে হিন্দুজাতি মূর্খ—অজ্ঞান—তিমিরান্ধ—অসভ্য !—আর হতভাগ্য আমরা সেই বন্যজাতির মুখাপেক্ষী হইয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষীণ আলোকের আশায়, তাহারই চরণপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছি! নিষ্ঠুর নিয়তির নিষ্পেষণে এই হতভাগ্য হিন্দুজাতির অতীতের গুণ-গরিমা যেরূপভাবে নিষ্পেষিত হইয়াছে, বোধ হয় এই সুবিশাল বিশ্ব-সংসারে অসংখ্য জাতির মধ্যে কোনও জাতির দুর্ভাগ্য তাহাকে অচিন্ত্যপূর্ব্ব অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে নিপাতিত করিয়া এমন নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত করিতে পারে নাই।

প্রথমে আমি চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ও প্রচলিত আখ্যানগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, পরে ইহার বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত আলোচনান্তর আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রলয়কালে দিবা অথবা রাত্রি, আকাশ অথবা পৃথিবী কিছুরই অস্তিত্ব মাত্র ছিল না ; তখন অন্ধকার বা আলোক অথবা অন্য কোনও পদার্থই সৃষ্ট হয় নাই ; সমস্তই চিন্তাতীত কল্পনাতীত অনন্ত শূন্য—অনন্ত নাস্তিত্ব, যাহা আজকাল আমরা বিজাতীয় ভাষায় inconceivable nothingness বলিয়া থাকি। বিষ্ণুপুরাণে আমরা এই সত্যই পাই—

"নাহো ন রাত্রির্ননভো ন ভূমি
নাসীৎ তমো জ্যোতিরভূন্ন চান্যৎ।"

তখন কি ছিল ?—"প্রধানিকং ব্রহ্ম পুমাংস্তদাসীৎ।"
অর্থাৎ ছিল একমাত্র প্রধানিক ব্রহ্ম বা পরমব্রহ্ম।

পদ্মপুরাণেও ঐ কথা—

"সৃষ্টের্প্রলয়াদর্দ্ধং নাসীৎ কিঞ্চিৎ দ্বিজোত্তমাঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞমভূদেকং জ্যোতিষ্মৈ সর্ব্বকারকম্॥
নিত্যং নিরঞ্জনং শান্তং নির্গুণং নিত্যনির্ম্মলম্।
আনন্দস্য পুরং স্বচ্ছং যং কাঙ্ক্ষন্তি মুমুক্ষবঃ॥"

* * * *

"সর্গকালে তু সংপ্রাপ্তে জ্ঞাত্বা তং জ্ঞানরূপকম্।
আত্মলীনং বিকারঞ্চ তৎ স্রষ্টুমুপচক্রমে॥"

সৃষ্টিপূর্ব্বে মহাপ্রলয়কালে কোনও পদার্থই বিদ্যমান ছিল না। অনন্তর সর্ব্বসৃষ্টিকারক জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সমুদ্ভূত হইলেন ; তিনি নিত্য, নিরঞ্জন, শান্ত, নির্গুণ, নিত্যনির্ম্মল, আনন্দনিকেতন, স্বচ্ছ ; মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা সেই ব্রহ্মের ধ্যানে নিরত থাকেন। সৃষ্টিকাল সমুপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্ম আপনাকে জ্ঞানস্বরূপ ও বিকারগর্ভ জানিয়া সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মুণ্ডকোপনিষদে প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রহ্মই ব্রহ্মারূপে সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন—

"ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।"
অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা ভুবনপ্রতিপালক ব্রহ্মা দেবতাগণের প্রথমেই প্রাদুর্ভূত হন।

সৃষ্টি-প্রকরণ আমাদিগের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নহে, সুতরাং উহার নিগূঢ় তথ্যের সন্ধান বর্ত্তমান ক্ষেত্রে পরিত্যাগ করিয়া, আমাদিগের আলোচ্য চিত্রগুপ্তের সন্ধানে সৃষ্টিতত্ত্বের যতটুকু মাত্র প্রয়োজন, ততটুকুর মধ্যেই আমাদিগের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত আছে যে পিতামহ ব্রহ্মা সমস্ত জগত সৃষ্টিকরণান্তর ধ্যান-নিমগ্ন হইলে, তাঁহার কায় হইতে বিচিত্রবর্ণ বিচিত্রগঠন এক মহাপুরুষ মস্যাধার ও লেখনী হস্তে নিঃসৃত হন। তদনন্তর ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গান্তে, তিনি সম্মুখস্থ সেই বিচিত্রগঠন মহাপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, ঐ অপূর্ব্বদর্শন মহাপুরুষ সবিনয়ে করপুটে কহিলেন "প্রভো, আমি কি নামে বিশ্বসংসারে পরিচিত হইব কৃপা করিয়া তাহা বলিয়া দিন ; আর আমাকে কোনও উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আমার জন্ম সার্থক করুন।" ব্রহ্মা স্বকায়-সম্ভূত পুরুষের মধুর বচনে পরিতৃপ্ত হইলেন এবং সানন্দচিত্তে বলিলেন—"তুমি আমার কায় হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছ, এই হেতু তুমি 'কায়স্থ' বলিয়া খ্যাত হইবে, আর তোমার নামকরণ হইল 'চিত্রগুপ্ত'। মনুষ্যদিগের পাপপুণ্যের বিচারার্থ তুমি যমপুরে গিয়া বাস কর।" এই বাক্যের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা অনন্তশূন্যে অন্তর্হিত হইলেন। তদবধি ঐ বিচিত্র মহাপুরুষ 'চিত্রগুপ্ত' নামে বিখ্যাত হইয়া যমরাজের লেখক ও প্রধান কর্ম্মচারী-রূপে নিযুক্ত রহিলেন। জীবের জীবনব্যাপী পাপ-পুণ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখাই ইঁহার প্রধান কার্য্য। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে লিখিত আছে যে তিনি মনুষ্যের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল প্রদান করেন। ইহা অবশ্য স্বাভাবিক ; যিনি কর্ম্মের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব নিকাশ রাখিয়া থাকেন তিনি যে কর্ম্মফলানুসারে ভাবী শুভাশুভের ব্যবস্থা করিবেন, ইহা আদৌ বিচিত্র নহে। গরুড়পুরাণে প্রেতকল্পে লিখিত আছে যে যমলোকের সন্নিকটে চিত্রগুপ্তপুর নামে একটি স্বতন্ত্র লোক আছে। তথায় পুণ্যাত্মা কায়স্থগণ তাঁহার কার্য্যে সাহায্য করিয়া থাকেন। অনেকের মতে চিত্রগুপ্ত কায়স্থকুলের আদিপুরুষ ; এই নিমিত্ত কোনও কোনও স্থানে কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কায়স্থগণের মধ্যে চিত্রগুপ্তের পূজার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। গোমন্তের অর্থাৎ বর্ত্তমান গোয়ার শঙ্খাবলী নাম্নী নদীর সন্নিকটে চিত্রগুপ্তের একটি অতি প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও পরিদৃষ্ট হয়।

কথিত আছে পুরাকালে সৌদাস নামে এক অতি দুরাচার নৃপতি ছিলেন। তিনি কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা সুসম্পন্ন করিয়া অনন্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। মহাবাহু ভীষ্ম চিত্রগুপ্তের আরাধনা ও পূজায় ব্রতী হইয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হ'ন ও তাঁহার নিকট হইতে বর লাভ করেন এবং চিত্রগুপ্তের প্রসাদেই তিনি ইচ্ছামৃত্যুরূপ অপার্থিব শক্তি লাভ করেন। মহাভারতে অবশ্য আমরা দেবব্রতের ইচ্ছামৃত্যুর অন্য ইতিহাস প্রাপ্ত হইয়া থাকি ;—পিতৃভক্ত মহানুভব জিতেন্দ্রিয় শান্তনুনন্দন পিতৃ-সন্তোষবিধানার্থ

যে অমানুষিক স্বার্থত্যাগ ও চিরকৌমারব্রত গ্রহণ করেন, তাহারই বিনিময়ে তিনি পিতৃ-আশীর্ব্বাদে ইচ্ছামৃত্যু শক্তি লাভ করেন।

বিশ্বকোষে ভবিষ্যোত্তর পুরাণ হইতে একটি শ্লোকাংশ উদ্ধৃত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইতে চিত্রগুপ্তের জন্ম-ইতিহাস সম্বন্ধে অন্যরূপ ইঙ্গিত প্রাপ্ত হওয়া যায়,—

"শ্রিয়া সহ সমুৎপন্ন সমুদ্র মথনোদ্ভব।"

বিশ্বকোষ সঙ্কলক বলেন যে এই শ্লোক দ্বারা বোধ হয় চিত্রগুপ্ত সমুদ্র হইতে লক্ষ্মীসহ উত্থিত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এরূপ প্রবাদও কোনও কালে প্রচলিত ছিল;—তবে অন্য কোনও প্রাচীন গ্রন্থে আমরা এরূপ কোনও আখ্যান প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমাদিগের স্মরণ হয় না। এরূপও সম্ভব যে উহা কোনও প্রক্ষিপ্ত শ্লোকাংশ।

চিত্রগুপ্তের সহিত আলোক-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ; সেইজন্য চিত্রগুপ্তকে বুঝিবার নিমিত্ত আলোক-বিজ্ঞানের যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। এই আলোক-বিজ্ঞানের চর্চ্চা প্রতীচ্য জগতে প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে আরম্ভ হয় নাই। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হল্যাণ্ডনিবাসী বৈজ্ঞানিক স্নেল্ (Snell) আলোক সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করেন এবং আলোকের পরাবৃত্তি, উহার গতি-বিবর্ত্তন ও পূর্ণ প্রতিফলন কি ভাবে সংসাধিত হয়, তৎসম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর আবিষ্কার করেন। তৎকালীন বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা ছিল, যে স্বতঃই হউক বা পরতঃই হউক জ্যোতিষ্মান্ পদার্থ মাত্রই এক প্রকার দৃষ্টির অগোচর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণিকারাশি চতুর্দ্দিকে তীব্র বেগে বিকীর্ণ করে এবং ঐ কণিকা চক্ষুষ্মান্ জীবগণের চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ অক্ষিপটে প্রতিহত হইয়া, অক্ষিপটস্থ স্নায়ুকোষগুলিকে উত্তেজিত করিয়া দৃষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত করে। স্নেল এই আলোক-কণিকা-মতাবলম্বীই ছিলেন এবং তাঁহার আবিষ্কার তাঁহার মৃত্যুর পর প্রচার-লাভ করে। বিশ্ববিখ্যাত নিউটন্ যদিও আলোক সম্বন্ধীয় একাধিক ব্যাপার অথবা ঘটনা আলোকের কণিকা-মতের সাহায্যে ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ হ'ন নাই, তথাপি তিনি তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত ঐ কণিকা মতেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি জীবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় মতাবলম্বীগণ আলোকের এই কণিকা-মত অতি বিশদভাবে প্রচারিত করেন; ফলে শতাধিক বৎসর কাল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতে এই ভ্রান্তিমূলক কণিকা মতই অচলভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নিউটনের নামোল্লেখের সঙ্গে এই স্থলে উল্লেখ করা কর্ত্তব্য যে পাশ্চাত্য আলোক-বিজ্ঞানের একটি অতীব মূল্যবান আবিষ্কার—শুভ্রোজ্জ্বল সৌরকিরণরশ্মি সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোকের একযোগে সমুৎপন্ন। নিউটন্ কলমের ত্রিকোণ কাচখণ্ডের সাহায্যে সপ্রমাণ করেন যে বেগুনী, নীল, আশমান, হরিৎ, পীত, অরুণ ও রক্ত এই সপ্তবর্ণের বর্ত্তমান হেতু সূর্য্যকিরণ শুভ্রোজ্জ্বল পরিদৃষ্ট হয়। এই আবিষ্কার পাশ্চাত্য জগতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে (খৃঃ ১৬৭২) সম্পাদিত হয়। অতি সামান্যরূপ পর্য্যালোচনা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুজাতি অতিমাত্র কবিতা ও কাব্যালঙ্কার প্রিয়—বেদ পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া, চিকিৎসা-শাস্ত্রে, এমন কি গণিত-শাস্ত্রে পর্য্যন্ত অজস্র কবিতা ও কাব্যরসের লহরীলীলা দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দুশাস্ত্রে সূর্য্যের অন্যতম নাম সপ্তসপ্তি ও সপ্তাশ্ব। সপ্তি শব্দের অর্থ ঘোটক। পুরাণকার বলেন—'যে রথে আরোহণ পূর্ব্বক সূর্য্যদেব বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিভ্রমণ করেন, তাহা সপ্ত অশ্ব দ্বারা পরিচালিত' অর্থাৎ একযোগে সপ্ত অশ্বের গতি দ্বারাই সূর্য্যালোকের গতিক্রিয়া সংসাধিত হয়;—যেখানেই সূর্য্যালোক সেই-খানেই তাহার বাহন সপ্তবর্ণ, যেখানে সূর্য্যরশ্মি সেইখানেই সপ্তবর্ণের সমাবেশ।—ইহাই আমাদিগের পৌরাণিক ঋষিবর্গের বৈজ্ঞানিক সত্যের কাব্যালঙ্কার সুশোভন ভাষা। প্রতীচ্যের এ ভাষা বুঝিবার অথবা উপলব্ধি করিবার শক্তিও নাই আর বাসনাও নাই, কারণ তাহা হইলে তাহাদিগের আবিষ্কারের মৌলিকত্ব নষ্ট হইয়া যায়—তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বীকার পাইতে হইবে যে বৈজ্ঞানিক তথ্য সম্বন্ধীয় জ্ঞান তাহারা মাত্র সার্দ্ধ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই জ্ঞান পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই হিন্দুজাতির অপরিজ্ঞাত ছিল না।

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও পাশ্চাত্য জগতে ভ্রান্তিমূলক কণিকা-মত সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে গ্রিমাল্‌ডি (Grimaldi), হুক্ (Hooke) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ আলোকের কম্পনগতি ও ঊর্ম্মিমত সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করেন। অবশ্য আলোকের বেগ নির্ণয়কল্পে বহু গবেষণা এবং তন্নিরাকরণার্থ বিবিধ উপায় উদ্ভাবন সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হয়। গ্যালিলিও (Galileo) এই কার্য্যে প্রথম পথপ্রদর্শক। রোমার অর্দ্ধবৎসর ব্যবধানে বৃহস্পতির উপগ্রহের গ্রহণ-কাল লক্ষ্য করিয়া আলোকের বেগ নির্দ্ধারণ করেন, পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুকো (Foucault), ফিজো (Fizeau), ইয়ং (Young) প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ নানাবিধ উন্নত উপায় ও কৌশল অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগ নির্ণয় করেন। স্থিরীকৃত হয় যে আলোকের বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল—মোটামুটি হিসাবে প্রায় ১ লক্ষ ক্রোশ। নিউটনের কণিকা মতানুসারে নিবিড় পদার্থে প্রবেশকালে আলোক কণিকার ঝোঁক্ বাড়িয়া যায় এবং ফলে নিবিড় পদার্থের মধ্যে আলোকের বেগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ফুকো প্রত্যক্ষ প্রমাণে প্রমাণিত করেন যে জলের মধ্যে আলোকের বেগ আদৌ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু বেগ হ্রাস পাইয়া থাকে। ফুকোর এই প্রত্যক্ষ প্রমাণের আঘাতে কণিকামতের ভিত্তিমূল একেবারে শিথিল হইয়া পড়ে। Edwin Edser স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন "The fact that light is transmitted more slowly in a highly refracting medium, such as water, than in air or in vacuum, gives us decisive evidence against the corpuscular theory of light. Our only alternative is to seek an explanation of the phenomena of light in terms of wave."

যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে গ্রিমাল্‌ডি এবং হুক্ আলোকের তরঙ্গমতের ইঙ্গিত অল্পাধিক প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি পাশ্চাত্য

জগতে ফরাসী বৈজ্ঞানিক হাইগেন্‌ই প্রকৃতপক্ষে তরঙ্গমতের আবিষ্কারক। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পূর্ব্বোক্ত ইয়ং নামক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক এবং ফ্রেনেল্ নামক ফরাসী বৈজ্ঞানিক আলোকের এই তরঙ্গ তত্ত্বের পুনরালোচনা আরম্ভ করেন। অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে কোনও জলাশয়ে লোষ্ট্র নিক্ষেপ অথবা অন্য কোনও কারণে যদি দুই সারি তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে অনেক সময়ে ঐ দুই সারি তরঙ্গের মিলন-ক্ষেত্র নিস্তরঙ্গ হয়। একটি তরঙ্গের ঊর্দ্ধাংশ বা ঊর্ম্মিশির অপর তরঙ্গের নিম্নাংশ বা ঊর্ম্মিক্রোড়ের সহিত সম্মিলিত হইলে এইরূপ ফল যে অবশ্যম্ভাবী তাহা সহজেই বোধগম্য। কম্পন-সংঘাতে বায়ুমণ্ডলে তরঙ্গের উদ্ভব হইতেই শব্দ-সৃষ্টি; শব্দে শব্দে সম্মিলনে এই ভাবেই নিঃশব্দতার উৎপত্তি হয়। সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই এ সত্য বিশেষ ভাবে অবগত আছেন যে কোন বাদ্যযন্ত্রের দুইটি তার এক সুরে বাঁধা না থাকিলে, অর্থাৎ উভয় তারের 'কম্পন-সংখ্যা' ঠিক সমান না হইলে শব্দের বা সুরের স্পষ্ট উত্থান ও পতন পরিলক্ষিত হয়। বায়ুমণ্ডলে দুইটি তার বা দুইটি শব্দকেন্দ্র হইতে উত্থিত শব্দের তরঙ্গগুলির যখন শিরে শিরে অথবা ক্রোড়ে ক্রোড়ে মিলন হয়, তখন তরঙ্গের প্রবলতা ঘটে, ফলে শব্দের উত্থান বা শক্তিবৃদ্ধি অনুভূত হয়; আর যখন একের শির অন্যের ক্রোড়ের সহিত সম্মিলিত হয়, তখন প্রবলতার পরিবর্ত্তে দুর্ব্বলতা বা নিঃশব্দতা সংঘটিত হয়। ইয়ং এবং ফ্রেনেল উনবিংশ শতাব্দীতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা দেখাইলেন যে শব্দে শব্দে নিঃশব্দতা যেরূপ প্রত্যক্ষ ঘটনা, আলোকে আলোকে অন্ধকারও ঠিক সেইরূপই প্রত্যক্ষ ঘটনা—উভয়ই তরঙ্গসংঘাতগত ব্যাপার।

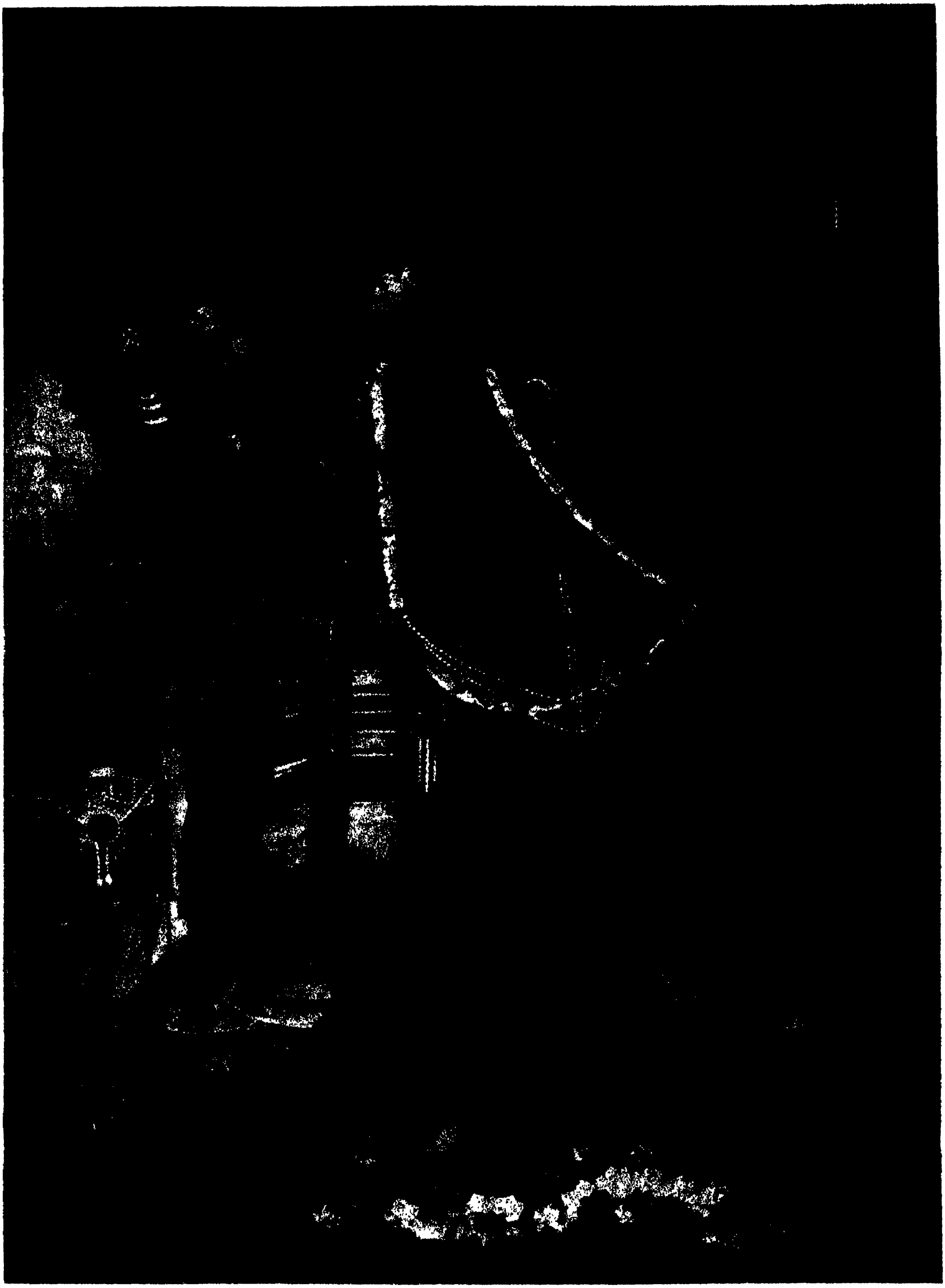
আপনারা সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে দূরে কোনও শব্দ উত্থিত হইলে, ঐ শব্দ আমাদিগের নিকটে পৌঁছিতে অল্পাধিক সময় লাগে। প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা ও গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বায়ুমণ্ডলে শব্দতরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯০ ফিট্§ অর্থাৎ সহজ হিসাবে প্রায় ১১০০ ফিট্। প্রত্যক্ষ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে আলোকতরঙ্গের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল—এ কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। একটি শব্দকেন্দ্র হইতে কোনও ব্যক্তি ১১০০ ফিট্ দূরে অবস্থান করিলে, ঐ কেন্দ্রোত্থিত শব্দতরঙ্গ শব্দোত্থানের মুহূর্ত্ত হইতে ১ সেকেণ্ড পরে তাহার শ্রবণেন্দ্রিয়ে উপস্থিত হয় অর্থাৎ ১ সেকেণ্ড পরে ঐ শব্দ শ্রুত হয়; দূরত্বের পরিমাণ যদি উহার দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ বা ততোধিক হয়, তাহা হইলে দূরত্বের অনুপাতে ঐ শব্দ যথাক্রমে দুই, তিন, চারি সেকেণ্ড, অথবা ততোধিক কাল পরে শ্রুত হয়; অতএব ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, শব্দের অস্তিত্ব বায়ুমণ্ডলে বর্ত্তমান থাকে, কেবলমাত্র তাহার অনুভূতি হয় দূরত্বের অনুপাতে। আলোকের ব্যাপারও ঠিক ঐরূপ—পার্থক্যের মধ্যে শব্দ তরঙ্গ বায়ু আশ্রয় করিয়া প্রধাবিত হয়, আর আলোক তরঙ্গ প্রধাবিত হয় ব্যোমপথে;—এ পার্থক্য সাধারণের প্রাণিধানীয় বিষয় নহে, ইহা বৈজ্ঞানিকের গবেষণার বিষয় মাত্র। দর্শনীয় পদার্থ হইতে আলোক-তরঙ্গ সমুত্থিত অথবা প্রতিফলিত হইয়া যখন আমাদিগের দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে, তখন অক্ষিপটে দর্শনীয় পদার্থের চিত্র বা প্রতিচ্ছবি পড়ে এবং ফলে ঐ পদার্থ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয়। যদি কোনও চক্ষুষ্মান্ জীব দর্শনীয় পদার্থ হইতে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার মাইল দূরে অবস্থান করে, তাহা হইলে ঐ দর্শনীয় বস্তু আবির্ভাব হইবার ১ সেকেণ্ড পরে উহার চিত্র ব্যোমপথে তাহার অক্ষিপটে পৌঁছিবে। যদি দূরত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তদনুপাতে কালের পরিমাণও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আপনারা অনেকেই জানেন আলোক সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে পৌঁছিতে ৮ মিনিট ৮ সেকেণ্ড সময় লাগে।

এক্ষণে বোধ হয় সহজেই বোধগম্য হইবে যে হিন্দুজাতির চিত্রগুপ্তটি কি। আমরা জীবনের প্রারম্ভকাল হইতে জীবলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সৎ বা অসৎ, বাঞ্ছনীয় বা অবাঞ্ছনীয়, প্রশংসার্হ বা নিন্দার্হ—যে কোনও রূপ কর্ম্ম নিষ্পাদন করি, আলোক তরঙ্গের সাহায্যে ব্যোমপথে অনন্তশূন্যে তাহার স্বরূপ চিত্র গুপ্তভাবে রহিয়া যায়। যদি এই ভূলোক-নিবাসীর কর্ম্মাকর্ম্মের চিত্র অবলোকন করিবার নিমিত্ত লোকান্তরে কেহ থাকেন—যদি অনন্তশূন্যে অনন্তকাল কোনও চক্ষুষ্মান্ তাঁহার চিরজাগরিত নেত্রের নির্ণিমেষ দৃষ্টি পাপপুণ্যের লীলাক্ষেত্র এই ভূলোকের প্রতি নিবদ্ধ রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সকল কর্ম্মাকর্ম্মের— সকল পাপ-পুণ্যের স্বরূপ চিত্র আলোক-তরঙ্গ ব্যোমপথে অনন্তশূন্যে সেই অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন চক্ষুষ্মানের চক্ষে পৌঁছাইয়া দিবে। যদি আমাদিগের জীবনের পর—যদি মৃত্যুর পরপারে জীবাত্মার অস্তিত্ব থাকে, যদি ব্যোমপথে অনন্তশূন্যে জীবাত্মার গতি অপ্রতিহত থাকে—যদি এই নশ্বর দেহের চক্ষু দুইটি চিরমুদ্রিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অবিনশ্বর আত্মার দৃষ্টিশক্তি চিরলুপ্ত না হয়, তাহা হইলে আমরাই অনন্তশূন্যে ব্যোমপথে দেখিব ইহজগতে আমাদিগের কর্ম্মজীবনের গুপ্ত চিত্র কত হীন—কত ঘৃণিত—কত ভয়ঙ্কর। যদি আত্মার অনুভূতি থাকে, তাহা হইলে হয় তো এই আত্মা অনন্তকাল অনন্তশূন্যে অনন্ত অনুতাপের নীরব হাহাকারে দিগন্ত প্লাবিত করিবে। এক্ষণে সহজেই অনুমেয় যে ইহজগতের কর্ম্মাকর্ম্মের অনন্ত-শূন্যস্থিত গুপ্তচিত্রই হিন্দুদিগের চিত্রগুপ্ত।

কাহারও কাহারও মনে হয় তো স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে যদি আলোকের সাহায্যেই কর্ম্মাকর্ম্মের স্বরূপ চিত্র আকাশপথে অনন্তশূন্যে রহিয়া যায়, তাহা হইলে নিশীথ অন্ধকারের আবরণে শত অপকর্ম্ম করিয়াও চিত্রগুপ্তের অমোঘ চিত্রাঙ্কনবিদ্যার কঠোরহস্ত হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ লাভ করা যাইতে পারে। প্রশ্নটি আপাত-সুন্দর ও মনোরম হইলেও অতি সামান্য চিন্তার সাহায্যেই ইহার সহজ নিরাকরণ সুসিদ্ধ হইতে পারে। তরঙ্গমত ও কম্পনবাদ দ্বারা ইহার সুচারু সমন্বয় হয়, কিন্তু সে জটিল তত্ত্বের অবতারণা করিয়া এ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই; যে হেতু অতি সহজ ও সুবোধ্য

---

§ ফার্ণহিট্ ৩২° ডিগ্রি উষ্ণতায় শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে শব্দগতি প্রতি সেকেণ্ডে ১০৯৩ ফিট।



ভ্রষ্ট-লগ্ন

শিল্পী— শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মজুমদার

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

যুক্তির সাহায্যে এ প্রশ্নের সমাধান করিতে পারা যায়। এই পৃথিবীতে সকল বিষয়েই পূর্ণত্বের অভাব। এখানে পূর্ণ অন্ধকার অথবা পূর্ণ আলোক বলিয়া কিছু নাই। জীবজগতে দৃষ্টিশক্তির প্রাবল্যানুসারে আলোক এবং অন্ধকারের নামকরণ হইয়া থাকে। বৃদ্ধ যাহাকে অন্ধকার আখ্যায় আখ্যায়িত করেন একটি সুস্থ সবল বালকের দৃষ্টিতে তাহা আলোক সঙ্কুল; আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যের চক্ষে যাহা ঘোর অন্ধকার, মার্জ্জার মুষিকাদির দৃষ্টিতে তাহা আলোকময়;—মনুষ্যের আকর্ণবিস্তৃত সুবিশাল নেত্রদ্বয় তথায় কার্য্যকরী না হইলেও, মুষিকের ক্ষুদ্র চক্ষু সেই অন্ধকারে ক্ষুদ্রতম খাদ্যকণাটি পর্য্যন্ত স্পষ্ট দেখিতে পায়। ইহা হইতে সহজেই বোধগম্য হয় যে আমরা যাহাকে অন্ধকার আখ্যায় আখ্যায়িত করি, প্রকৃতপক্ষে তাহা আলোকশূন্য নহে; সুতরাং অন্ধকারের অন্তরালে আমরা যে কার্য্য করি, তাহারও স্বরূপ চিত্র চিত্রগুপ্তের অনন্ত আকাশরূপ বিশাল চিত্রশালায় স্থানলাভ করে। বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বরাজ্য বড় কঠিন স্থান, এ রাজ্যে ফাঁকি চালাইবার উপায় নাই।

আর একটি মাত্র প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া আমি আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। ইতিপূর্ব্বে আমরা পুরাণ হইতে দেখিয়াছি যে চিত্রগুপ্ত যমের প্রধান কর্ম্মচারী। যম শব্দের অর্থ সংযম। এ পৃথিবীতে সংযম হইতেই সৎকর্ম্মের উৎপত্তি, আর অসংযম হইতেই অসৎকর্ম্মের প্রাদুর্ভাব। যিনি অনন্ত সংযমী তিনিই যম; সেই হেতু হিন্দুশাস্ত্রে চিত্রগুপ্ত যমের প্রধান কর্ম্মচারী। এক্ষণে স্থির-চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, জড়বাদী গর্ব্বিত পাশ্চাত্যজগতে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কার মাত্র বিগত দুই-তিন শত বৎসরের মধ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, ন্যূনাধিক পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে তত্ত্ব হিন্দু ঋষিগণের যে অপরিজ্ঞাত ছিল না, চিত্রগুপ্ত তাহার অন্যতম নিদর্শন। পাশ্চাত্য জগত জড়বাদী—জড়ই তাহাদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রাণ;—আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—প্রকৃত জ্ঞান তাহাদের সুদূরপরাহত। বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিকাশ, আত্মজ্ঞানের অপরূপ অভিব্যক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানের অচিন্তনীয় অপূর্ব্ব সমন্বয়—এই পরমুখাপেক্ষী অধঃপতিত হিন্দুজাতির অতীত ইতিহাসের প্রতি ছত্রে বর্ণে বর্ণে যেরূপ সমুজ্জ্বল-সুবর্ণভাতিতে প্রতিভাত, তাহার কণামাত্র ভাতি এ সুবিশাল জগত তলে কোনও দেশে কোনও জাতির ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুজাতির জড়বাদের সহিত অধ্যাত্মবাদের অচিন্তনীয় সমন্বয়ে যে উচ্চতম জ্ঞান-বিজ্ঞান-বুদ্ধির পূর্ণ প্রভাব ছিল, তাহার কণামাত্র লাভ এই তামস-মলিন গর্ব্বিতবুদ্ধি স্থূল জড়বাদী জাতির পক্ষে পঞ্চ সহস্র বৎসর পরেও সুদূর পরাহত। ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ভ্রান্ত আর্য্য সন্তান! তোমার সকলই ছিল - সকলই আছে, তবে কেবল ভস্মস্তূপে আবৃত!

ভস্মাবৃত বহ্নি যথা পাংশু-আবরণে
লুকাইয়া রাখে
আপন দাহিকা শক্তি অতি সংগোপনে,
সেই মত আছে
মোহ-আবরণে ঢাকা ভারতের প্রোজ্জ্বল মহিমা।

একবার আলস্য-মোহ-ভ্রান্তি দূরে বিক্ষিপ্ত করিয়া সমবেত চেষ্টায় ঐ ভস্মাচ্ছাদন বিদূরিত কর—সমবেত ফুৎকারে তোমার জ্ঞান বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব বহ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত করিয়া দাও—দেখিবে তাহার লেলিহান শত শিখা তোমার শূন্য আকাশ পূর্ণ করিয়া সমুজ্জ্বল প্রভায় দিগন্ত প্রভান্বিত করিতেছে; সে জ্ঞানগরিমার অমোঘ ছটায় তুমি ধন্য হইবে—সমস্ত জগতবাসীকে ধন্য করিবে—আর বিশ্বনিয়ন্তার অজস্র আশীর্ব্বাদ শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় তোমার শিরে বর্ষিত হইবে।

রূপদক্ষ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ভাবকে এরা ফুটায় রঙে ভাষায়,
কালকে রাখে কালির রেখায় ধরি।
অনন্তকে অসীম ভালবাসায়,
প্রকাশ করে ধ্যানের ছবি গড়ি।

২

অকূলকে হায় আনতে কূলের কাছে
যুগযুগান্ত চেষ্টা করে তা'রা
অপরূপকে ধরতে রূপের মাঝে
বসে থাকে তন্দ্রা অলস হারা।

৩

চঞ্চল ভাই রাখতে চাওয়া ধরে
বিজ্ঞান জ্ঞান শিল্প-কলার মূল,
এ কাজ সুধার কারবারীরাই করে
অরসিকে পায় না ইহার কূল।

৪

সাগর মথি এরাই সুধা তোলে
বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্ম যে লয় কাড়ি,
অপ্সরাগে স্বরগ দুয়ার খোলে,
এরাই জমায় রূপ সাগরে পাড়ি।

ভাস্কর্য্যে বাঙ্গালার তরুণ শিল্পীর অবদান

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম-এ, পি-আর-এস্

নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশ পলিমাটি দিয়ে গড়া। অতি প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের ভাস্কর ও স্থপতি পাথরের অভাব যথেষ্ট অনুভব করে এসেছে। উড়িষ্যার মন্দিরের মত বিরাট অভ্রভেদী পাষাণ দেউল বাঙ্গালা দেশে বিরল। যে কয়েকটি ছোট ছোট নিদর্শন এখনও দেখতে পাওয়া যায়, তা সবই পশ্চিম রাঢ়ভূমির পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত। অবশ্য অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাল ও সেনরাজাদের আমলে বিখ্যাত শিল্পী ধীমান্ ও বিতপালের নেতৃত্বে বাঙ্গালী ভাস্কর অসংখ্য দেবদেবীর অপরূপ পাষাণ মূর্ত্তিতে তাদের অক্ষয়-কীর্ত্তি রেখে গেছে। কিন্তু সে সব কাল পাথরের ফলকগুলি রাজমহল পাহাড়ের খনি থেকে আহরণ করা। বাঙ্গালী শিল্পী চিরকালই এই পাথরের অভাব পূরণ করতে চেয়েছে দেশের মাটি দিয়ে। প্রাচীন বাঙ্গালী কলাবিদ্ মৃন্ময়শিল্পে যে চরম উৎকর্ষ সাধন করেছিল আজও তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—অতীত যুগের পাহাড়পুর ও মহাস্থানের অতুলনীয় মন্দিরে, গৌড়পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মস্‌জিদে ও মথুরাপুর বিষ্ণুপুর প্রভৃতি সারা বাঙ্গালাব্যাপী অসংখ্য ভগ্নদেউলে। দেবমানবের বিচিত্র লীলায়, পশুপক্ষীর অপরূপ সমাবেশে ও পুষ্পলতার সুচারু সজ্জায় সেকালের প্রত্যেক মৃত্তিকাফলকটি অভিনবরূপে সজ্জিত।

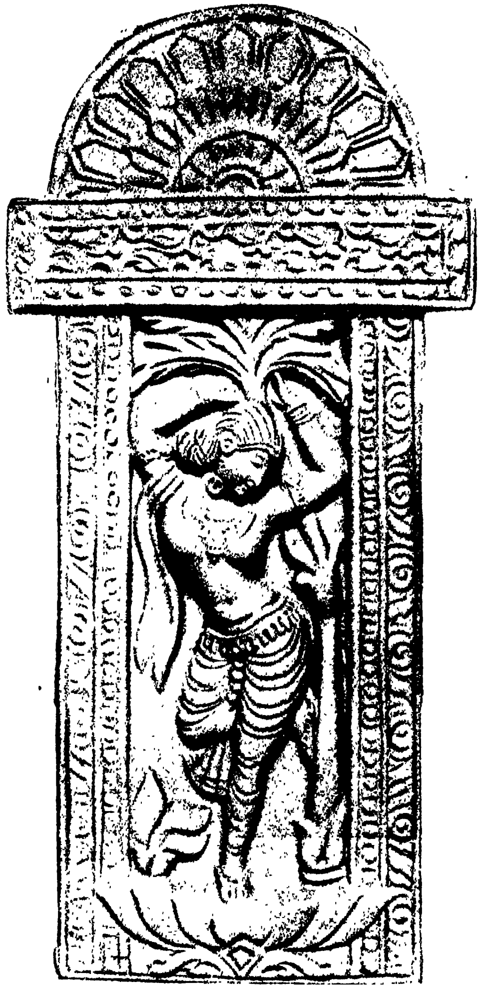


ধ্যানী-বুদ্ধ —মনোরঞ্জন



বুদ্ধদেব ও সুজাতা — মনোরঞ্জন

জাতীয় আত্মবিস্মৃতির গভীর তমসাচ্ছন্ন যুগের পর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজনৈতিক জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে হাভেল ও অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নূতন বাঙ্গালায় নূতন কলাশিল্প গড়ে উঠ্‌ল—প্রাচীন ভারতের অজন্তা ও ইলোরা, মুঘল ও রাজপুতানার অমর শিল্পের আদর্শে। আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রথিতনামা ছাত্র দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর দৃষ্টি ভাস্কর্য্যের দিকে আকৃষ্ট হল প্রথম। ভাস্কর্য্যে তাঁর



নর্ত্তকী —মনোরঞ্জন

নৈপুণ্য এখন সর্ব্বজনবিদিত। কুমারটুলীর প্রসিদ্ধ নিতাই পালের পুরাণ ঢঙ্গে গড়া মৃন্ময়মূর্ত্তি আজকাল শিক্ষিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। বৈদেশিক প্রভাবান্বিত গ্রীসীয় পদ্ধতি অনুসারে গড়া নগ্ন ও অর্দ্ধনগ্ন নরনারী মূর্ত্তির নিকৃষ্ট অনুকরণগুলির বিষম মোহ থেকে যে ক'জন নবীন বাঙ্গালী শিল্পী আমাদের শিক্ষিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের রুচি ধীরে ধীরে ফেরাতে চেষ্টা করছেন, তাঁদের মধ্যে কুমিল্লাবাসী শ্রীমান্ মনোরঞ্জন ভৌমিক অন্যতম। ইনি কোনও শিল্পাচার্য্য বা শিল্পায়তনের সাহায্যে নিজের রসানুভূতি পরিপুষ্ট করবার সুযোগ পান নি। স্বাধীন ত্রিপুরান্তর্গত উদয়পুরের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সংস্পর্শে এসেই সর্বপ্রথম ইনি ভারতের অতীত আদর্শে অনুপ্রাণিত বাঙ্গালার নিজস্ব চিরপুরাতন মৃৎশিল্পের সাধনায় মনোনিবেশ করেন।



মন্দির পথে —মনোরঞ্জন

তিনি এই ক্ষেত্রে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন তাঁর তৈয়ারী কতকগুলি মূর্ত্তিফলক দেখলেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে। সবগুলিই অর্দ্ধচিত্র বা relief work এবং মাটি বা প্ল্যাষ্টারের সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে তৈয়ারী। এর মধ্যে "বসন্ত-উৎসব" নামে চিত্রটিই সবচেয়ে প্রশংসনীয়। নব বসন্ত সমাগমে

পুষ্পিত তরুতলে নৃত্যমুখর আনন্দ-উচ্ছল রসবিভোর মূর্ত্তিগুলির সমাবেশ বাস্তবিকই সুন্দর। প্রথমেই মাঝখানের দেবমূর্ত্তির পরিপাটি বলিষ্ঠ দেহকান্তি, সুললিত সুঠাম দেহ-যষ্টি আমাদের চোখে পড়ে। শিল্পী তাঁহার দিব্যশ্রী, সুষমা ও লালিত্যটুকু সুন্দর করে মনোহারী করে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই সুস্থদেহ, বলিষ্ঠ-কান্তি, গৌরবপুর্ণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের উজ্জল পুরুষমূর্ত্তির রূপ-কল্পনায় বেশ একটু দেবোচিত শান্ত অথচ মধুর ভাব আছে। প্রতিমূর্ত্তিটির দুটি হাতের সুললিত গতিভঙ্গী ছন্দবদ্ধতা আর সমস্ত শরীরে সচঞ্চল গতির লীলা বড়ই রমণীয়। তাকে ঘিরে আনন্দ-উন্মাদনা প্রকাশিত হয়েছে নানা বক্র ও নমনীয় রেখার প্রাচুর্য্যে, রস উদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে। কিন্তু নৃত্যরত মূর্ত্তিগুলির উদ্দামতাহীন মধুর সংযত ভাব বিশেষ লক্ষণীয়। এই ধরণের সাবলীল ছন্দ ও লীলায়িত রেখাবলী, আলোছায়ার অপূর্ব্ব সম্পাত ও নারীরূপের রমণীয় পরি-কল্পনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন অমরাবতীর মর্ম্মরপটে উৎকীর্ণ বিচিত্র-রূপসম্ভার। যদিও আলোচ্য চিত্রটি বৃহৎ নয় তবুও বিষয় সংস্থাপন ও গঠনের গুণে এতে বিশালত্বের স্পর্শ আছে।

"পূজারিণী" চিত্রে দেখতে পাই অতি সন্তর্পণে চলেছে



বসন্ত-উৎসব —মনোরঞ্জন

সুকৌশলে সংস্থাপিত পরিপূর্ণ-যৌবনা তরুণীদলের লীলাভঙ্গী ও ছন্দমাধুরীও যথার্থ উপভোগ্য। তাদের দেহের সুগঠিত সুগোল সৌন্দর্য্যে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ঋজুসঞ্চালনের ভঙ্গীতে, সুচারু বর্ত্তুলরেখার সুললিত গতিলীলায়, নৃত্যের আবর্ত্তনে, মধুর ঝঙ্কারে ও ঐক্যতানের স্পর্শে একটা মোহিনী শক্তি আছে। চিত্রটি আরও মনোহারী হয়ে উঠেছে পুষ্পিত তরুশাখার আন্দোলন ও সজীব মূর্ত্তিসমূহের প্রত্যেক অবয়ব পরস্পর পরস্পরের প্রতিধ্বনি করেছে বলে। নৃত্যের নবযৌবনশ্রীর স্নিগ্ধ দীপ্তি নিয়ে একটি তন্বী তরুণী। একটি: হাতের লীলাভঙ্গীতে কম্পিত দীপশিখা, অপরটি শঙ্খ আশ্রয় করে নিয়ে প্রসারিত। সমস্ত মূর্ত্তিটি একটু সলজ্জ, মধুর ও সঙ্কোচের ভাবে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। শিল্পী বড় কৌশলে ফুটিয়ে তুলেছেন ভক্তিনম্র পূজারিণীর সংযত ভঙ্গী, স্তম্ভিত গতি ও সুমধুর ভাবটি। তার সুকুমার সুগলিত উন্নত গঠন ও কল্পনার রূপরসটি বেশ স্নিগ্ধ সংযমের লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তরুণীর দেহলতার মসৃণ

সরস সুগোল অঙ্গলীলা প্রকাশিত হয়েছে অপূর্ব্ব সূক্ষ্মরেখার সুষমায়, শিল্পীহস্তের দরদী পরশে। তার অভিনব রূপকল্পনা ও ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা পরিস্ফুট হয়েছে সাবলীল গ্রীবাভঙ্গে, নয়নের অভিষিক্ত ভাবে, মনোরম বেশবিন্যাসে ও হস্তপদের স্নিগ্ধ সঞ্চালনে। সমস্ত চিত্রে একটি নারীসুলভ কমনীয়তা ও কোমলতার ছায়া কল্পনাটিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অলঙ্কারহীন সরল ঐশ্বর্য্যে মূর্ত্তিটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধের ধ্যানমূর্ত্তি ও শিবনটরাজের নৃত্যমূর্ত্তি—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পবুদ্ধি ও রসানুভূতির শ্রেষ্ঠ দান।—বুদ্ধের জীবনকে আশ্রয় করে শ্রীমান মনোরঞ্জন যে কয়েকটি প্রচেষ্টা করেছেন তা শিল্পসৃষ্টির দিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক। বুদ্ধের বেশবিন্যাসে আধুনিকতার ছাপ স্পষ্ট বিদ্যমান। এইরূপ বিশেষ বেশসজ্জারীতি ও পিছনে বটবৃক্ষের কারুকার্য্য আমাদের চৈনিক আদর্শের কথা মনে করিয়ে দেয়। জানি না শিল্পীর এই বিশেষ অনুভূতি জ্ঞানত বা অজ্ঞানত। "নিবেদন" চিত্রে বজ্রাসনে উপবিষ্ট বুদ্ধের দীর্ঘ সরল আকৃতি বটমূলগুলির লম্বিত সমান্তরাল রেখাবলীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটা স্থির নিশ্চল নীরবতা সৃষ্টি করেছে। এই পরিপূর্ণ গাম্ভীর্য্যকে মধুর করে তুলেছে পদপ্রান্তে ধূলি-লুন্ঠিতা অজন্তা-অনুপ্রাণিত নিবেদিতার কুসুমপেলব দেহের কোমল লীলায়িত রেখাবলী ও ভক্তিরসাপ্লুত করুণ রূপমাধুর্য্য। অন্য চিত্রে এই ভাব ব্যক্ত হয়েছে অপর একটি নতজানু ভক্তিমতী লাবণ্যময়ীর ঊর্দ্ধমুখী নিবেদনের আকুল প্রার্থনায়। শিল্পী দিতে চেষ্টা করেছেন তথাগতের স্মিত বদনে অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি। এই দিব্যভাবকে দেবত্বের স্পর্শ যখন দিতে পারবেন, তখনই হবে শিল্পের সার্থকতা।

এই তরুণ শিল্পীর শিল্প সম্বন্ধে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি—যা তাঁর মূর্ত্তিগুলিকে আরও বেশী শোভন ও সুরুচিপূর্ণ করে তুলেছে। ফ্রেমের পরিকল্পনায় তোরণ অথবা চৈত্যগবাক্ষ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যের অলঙ্কারগুলির ব্যবহারে যে কৌশল ও চাতুর্য্য দেখিয়েছেন সেটা তাঁর বিশেষত্ব। এ কথা বলা যেতে পারে যে মৌলিক রচনাপ্রসূত নয়নাভিরাম ফ্রেমগুলি রূপ-সৃষ্টির কোঠায় গিয়ে পৌছেচে। কারুশিল্পকে চারুশিল্পে পরিণত করবার স্পর্দ্ধা রাখা কম সাহসের কথা নয়।



শ্রীমনোরঞ্জন ভৌমিক

প্রাচীন ভারতের রূপতত্ত্বকে কিরূপে অনায়াসে আধুনিক রুচিমার্জ্জিত সমাজের উপযোগী করতে পারা যায় আমাদের নবীন ভাস্কর তার নানারূপ পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁর অভিনব কলার উত্তরোত্তর সাফল্য ও পরিণতি কামনা করি।

গল্প

বোহিমিয়ান

শ্রীঅমিয়কুমার ঘোষ

বাবা ছিলেন কেরাণী, আমিও তাই। ··

কাজেই আমাদের জীবন চলিয়াছে ঠিক একই ধারায়। ঠিক একই ভাবে প্রতিটি দিনের সুরু হয়। আর একই ভাবেই হয় তার শেষ। বৈচিত্র্যের মধ্যে আসে মাঝে মাঝে ছেলেপুলেগুলির অসুখ-বিসুখ, মাসের শেষে টানাটানি—আর নয় তো জামাতা বাবাজির শুভাগমন।

কিন্তু কোন রকমে দিন কাটাইয়া দিতেছি।···যে বাড়ীতে থাকি সেখানে আমারই মত আর পাঁচ ছয়টি পরিবার পাশাপাশি থাকিয়া এমনই ভাবে দিন কাটাইয়া দেয়। পাশাপাশি ঘরগুলির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছি মাত্র কয়েকটি চটের পর্দ্দা টানাইয়া—তা ছাড়া এই পুরাতন আবদ্ধ বাড়ীটির এত বন্ধনের মাঝেও আমরা পরস্পরের নিকট উন্মুক্ত!···

মাঝে মাঝে কল ও জল লইয়া আমাদের মধ্যে যে বচসা হইয়া গিয়াছে, তাহা অতি সামান্যই! আমাদের মধ্যে সহজ সম্প্রীতিকে বিচ্ছিন্ন করিবার পক্ষে তাহা যথেষ্ট নহে। সামনের ঘরের সান্ন্যাল-গিন্নির সহিত আমার গিন্নির বড়ই ভাব—কাজেই সান্ন্যাল মহাশয় হইয়াছেন আমার পরম বন্ধু!

*　　*　　*　　*

এ বাড়ীর মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা যাইতেছে! এতদিন যে ভাবে কাটিয়াছে আজ যেন তার মধ্যে কেমন ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সবাইয়ের দৃষ্টি একদিকেই ধাবিত হইতেছে!···

নীচের ঘরের নবাগত ভাড়াটিয়াদের লইয়া গিন্নির সহিত সান্ন্যাল-গিন্নির কানাকানি চলে দিবারাত্র। তারই দু' একটা কথা কানে আসিয়া পৌছায়।

—যাই বল ভাই, আমার কিন্তু ও রকম হাসি ভাল লাগে না। চেনা নেই, শোনা নেই, আমার সঙ্গে আলাপ করবি তা অত হাসি কেন? কি জানি বাপু, আমার যেন কেমন লাগে—

—কিন্তু অত হাসলে কি হবে? কি ব্যাপার ওদের জান না? শোন কথা তবে।—আমি বেশ নজর করে দেখেছি, সেবার তিন দিন ওদের আর হাঁড়ি চ'ড়ল না। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যাবেলা ছেলেটা কোথা থেকে ফিরে এসে বউটাকে ইসারা করে কি বল্‌ত, আর বউটা আস্তে আস্তে উঠে এগিয়ে তাকে এক গ্লাশ জল দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলত। জল খেয়ে ছেলেটা হাত পা মেলে বিছানায় শুয়ে পড়ত।·· শেষে তিন দিনের দিন বিকাল বেলা ছেলেটা কোথা থেকে দুটা রুমালে করে বাঁধা কি সমস্ত এনে হাজির! পকেট থেকে ঝন্‌ঝন্ করে কতকগুলি টাকা বার করে বউটার হাতে দেয়। বউটাও আনন্দে দিশেহারা! তখুনি উনুনে আঁচ দিয়ে রান্না চাপিয়ে ফেললে। তার পর রাত দুটা পর্য্যন্ত দু'জনে কি গল্প!···ওদের ছোট্ট মেয়েটাকেও ঘুমুতে দেয় নি একটুও।···

আবার শোন—সে দিন সন্ধ্যাবেলা তিনি কোথায় সেজেগুজে বেরুলেন, শুনলুম নাকি কোথায় 'মিটিঙে' না কিসে যাওয়া হচ্ছে। মাগো—যাদের পেটে ভাত নেই—তাদের আবার এত সখ কিসের?

হঠাৎ সিঁড়িতে সান্ন্যাল-মশায়ের চটির শব্দ হয়। কাজেই উঁহাদের কথোপকথন মাঝে আধপথে যবনিকা টানিয়া দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।—

*　　*　　*　　*

ব্যাপারটা অবশ্য খুবই সামান্য!···

কিন্তু তবুও আমাদের মধ্যে কেমন একটা ঔৎসুক্যের

সৃষ্টি হইয়াছিল। ওদের ছোট্ট মেয়েটি ঘরের ভিতর খেলিয়া বেড়ায়। ছুটিয়া যায়, বল লইয়া লোফালুফী করে। খেলিতে খেলিতে বলটি আসিয়া আমাদের দালানে পড়ে।

সান্যাল মশায়ের ছোট ছেলে টুনি আসিয়া সেটি ধরে। ধরিয়া বলে—আর দেব না! আমায় একবার খেলতে দেবে বল, তবে দেব!

ছোট মেয়েটি অবাক হইয়া যায়। ভয়ে সে তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া মুখটি মলিন করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সান্যাল গিন্নি আসিয়া বলটি আপনার ছেলের হাত হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার গালে একটি থাপ্পড় দিয়া বলেন—হতভাগা ছেলে, ফের পরের জিনিসে হাত দিবি? দেখিস না দেমাকে ফেটে পড়েন, ওদের সঙ্গে আবার মেশে?

ব্যাপার দেখিয়া মেয়েটি ভয়ে ছুটিয়া পলাইল। বলটি কোথায় পড়িয়া রহিল কে জানে!

* * * *

সকালবেলা ছেলেটির সহিত মুখোমুখি!

দেখিয়াই হাসিয়া ফেলে। নমস্কার করিতে করিতে আর কিছু বলিবার কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলি—আলাপ করবার সুবিধে হয় নি, ভাল আছেন?

ছেলেটি বলে—এই এক রকম কেটে যাচ্ছে!

বললুম—করা হয় কি আপনার জানতে—

ছেলেটি বলে—নিশ্চয় জানতে পারেন। এই একটা ছোট কম্পানীর 'সেলিং এজেন্ট'। সামান্য কাজ। আচ্ছা নমস্কার!

তাহার পর ছেলেটি চলিয়া যায়। আমিও উঠিয়া পড়ি।

সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিবার সময় একবার উহাদের ঘরের দিকে চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসি। দেখি বউটি তখন একটি ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁটাইতে বসিয়াছে। ঈষৎ টানা ঘোমটাটি হাওয়ায় উড়িয়া গিয়াছে। মুখখানিতে একটু ক্লান্ত অবসাদ। কিন্তু আশ্চর্য্য—ঘরের জিনিষ পত্রগুলি কেমন শ্রীমণ্ডিত, সুচারুরূপে গুছান। বুঝিলাম দারিদ্র্যকে যদিও উহারা আমরণ জীবনের সম্বল বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে, তাহা হইলেও তাহার নিকট একান্তভাবে তাহারা আত্মসমর্পণ করে নাই। নিত্য দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে থাকিয়াও কোন রকমে আপনাদের লক্ষ্মীছাড়া করিয়া তুলিতে উহাদের বাধে।···

আফিস যাইবার পূর্ব্বে খাইতে বসিয়াছি, গিন্নি আসিয়া বলিলেন—হ্যাঁ গা 'কুইন্' মানে কি?

আমি বলিলাম—কুইন্? ওঃ 'কুইন্' মানে রাণী। কিন্তু কি হয়েছে তাতে?

গিন্নি ততক্ষণে উধাও হইয়াছেন। বারান্দা হইতে একবার উঁকি দিয়া সান্যালগিন্নিকে বলিতে থাকেন—জানলে দিদি, 'কুইন' মানে রাণী!

তাহার পর সান্যালগিন্নি ঠেস দিয়া বলিতে থাকেন—কিন্তু রাণী মা কি উপোস দেয় ভাই? শুনি নি কখনও—

দু'পক্ষই হাসিয়া ওঠে।

বেশ বুঝিতে পারি উহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে। উহাদের ছোট্ট ঐ মেয়েটি 'কুইন!' কি ভালবাসে উহারা ওকে! দারিদ্র্যের একটিও উত্তাপরশ্মি গায়ে লাগিতে দেয় না। নিজেরা কিছু খাক না খাক-মেয়েটাকে খাওয়াইবার কামাই ছিল না কোন দিন।

* * * * *

দেখিয়া মনে হইল গিন্নি আমার উপর সে দিন ভয়ানক চটিয়া গিয়াছেন। ঝড়ের মত আসিয়া তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—আচ্ছা তোমার কি মতিচ্ছন্ন ধরেছে বল তো—চাকরী বাকৃরি ছেড়ে দিয়ে কি এই বাড়ীতে বসে থাকবে?···

আমি বলিলাম—বা রে! আজ যে মুসলমানদের পরব, আজ ছুটি, জান না?

গিন্নি বলেন—মুচুরমানদের পরপ! সে তো মহরম কবে হয়ে গেছে। আমি বুঝি বুঝতে পারি না? আমার সঙ্গে চালাকি? আচ্ছা বেশ, তাই যদি হয়—এই নাও জামা, বেরিয়ে পড় সুধীর খোকা হয়েছে, 'নৈটী' থেকে দেখে এস কেমন আছে। তা বলে বাড়ীতে বসে থাকতে দেব না। মাগো! মেয়েটার যা চালচলন। আমার ওসব ফিরিঙ্গিপনা ভাল লাগে না বাপু। ওরা যদি না উঠে যায়, আমরা উঠে যাব।···বাড়ীতে পুরুষ মানুষ আছে একটু লজ্জা নেই!··· আর তোমারই বা দিন দিন কি আক্কেল হচ্ছে বাপু, ছেলে-পুলে আছে—তোমার কেবল দিনরাত্তির হাঁ করে চেয়ে বাড়ীতে বসে থাকা।···

গিন্নির সহিত পারিয়া উঠি না—তাই জামা গায়ে দিয়া নৈহাটী চলিলাম।—

* * * * *

রবিবার গুলায় কিন্তু বাড়ীতে থাকিতে হয়।

দেখি ন'টা দশটার সময় খাওয়া-দাওয়া করিয়া ছেলেটি বাহির হইয়া যাইবার পর বউটি ঘুমন্ত মেয়েটাকে পিঠে করিয়া কোথায় বাহির হইয়া যায় এবং ঘণ্টা দুয়েক পরে এক পোঁটলা রেশমী কাপড় সুতা ছিট্ প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসে। সমস্ত দিন ধরিয়া সেইগুলি দিয়া ছোট ছোট বাহারি জামা তৈয়ারী করে। সন্ধ্যায় ছেলেটি আসিয়া আবার সেই তৈয়ারী জিনিসগুলি লইয়া বাহির হইয়া যায় — একটু রাত্রি করিয়া ফিরিয়া আসে।

আর একদিন সান্ন্যালগিন্নির বক্তৃতা সুরু হয়। দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করেন—জানলে বউ, আমার কথাটা এমন কি খারাপ হয়েছিল বল না? আমি কি বলেছিলুম জান? বলেছিলুম—হ্যাঁ গা, তোমার ঐ ঘুমন্ত মেয়েটাকে অমন কাঁধে করে নিয়ে যাও কেন? রেখে গেলেই তো পার? আমরা রয়েচি, একবার একবার কি আর দেখতে পারব না?

বললে—না আপনাদের কষ্ট হবে—। তখন আমি বললুম—আমাদেরও তো ছেলেপুলে রয়েছে বাছা? তখন হতচ্ছাড়া মেয়েটা কি বললে জান? বললে--না আপনাকে দেখে ও কেঁদে উঠবে? আপনি যা মোটা!···

শুনলে দেমাকের কথাটা একবার? মনে হ'ল ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দিই। এ সমস্ত কিন্তু ভাল লক্ষণ মনে হয় না বাপু! আমি বলি কি—

অনুচ্চারণীয় শ্লেষ বাক্যটি অনুচ্চারিত থাকিয়া যায়। মেয়েটি বাহির হইতে বেড়াইয়া আসে। বেশ বুঝিতে পারি কথাগুলি সে শুনিতে পাইয়াছে। কিন্তু উহা শুনিবার কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই ও যেন কেমন কৃশ বিবর্ণ হইয়া পড়ে। দেখিতে পাই ওর চাহনির পশ্চাতে যেন এক অন্তর-জোড়া অশ্রুর সাগর দুলিতেছে!

* * * * *

শীতকালের সকাল।

উঠিতে একটু বিলম্ব হয়। কে দরজার শিকল নাড়া দিয়া ডাকিতে থাকে। বলি—কে সান্ন্যাল মশাই?

হ্যাঁ—একটু তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন।···

হুড়কা খুলিয়া বাহির হইয়া আসি। সান্ন্যাল মশাই ডাকিয়া লইয়া যান—আরে আসুন দেখুন কাণ্ডখানা একবার!

একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া দেখি—নূতন ভাড়াটিয়াদের ঘর একদম শূন্য! তাহারা নাই!

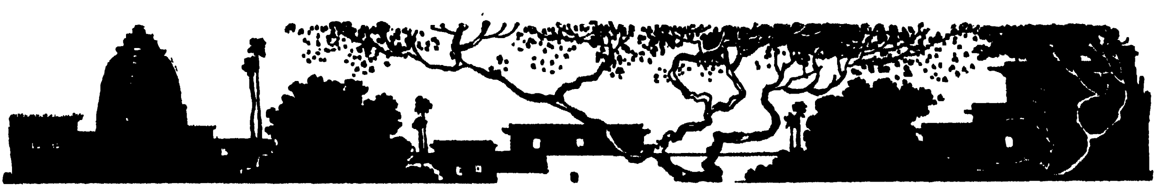
সান্ন্যাল মশাই বলিতে লাগিলেন—দেখলেন ব্যাপারটা ভাড়া মেরে দিয়ে পালিয়েছে!

বিতৃষ্ণায় অন্তর ভরিয়া গেল। বলিলাম—ওরা কি তাহলে এমনই লোক নাকি?

সান্ন্যাল মশাই অবজ্ঞার সুরে বলিতে লাগিলেন—তা না তো আবার কি? হালচাল দেখেই আমি তো আগেই বলেছিলুম। কিন্তু এখন আমাদের না ফ্যাসাদে ফেলে। বাড়ীওলা এসে না আমাদের ধরে—না বলে আমাদের সঙ্গে সড় করে করেছে।···

যথাসময়ে বাড়ীওয়ালা সামন্ত মহাশয় আসিয়া পৌঁছাইলেন। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন—আমিও চালাক ছেলে মশায়—নতুন লোক দেখে এক মাসের ভাড়া আগে নিয়ে রেখেছিলুম। যাক ভালই হোল, এবার নতুন ভাড়া বসাব।

সান্ন্যাল মশাই বলিতে আরম্ভ করিলেন—আপনি তো তা হলে চালাক ছেলে মশাই! কিন্তু আমাদের ঘটি বাটিটাও তো আছে। সে গুলা আর নিয়ে ভাগ্‌তে কতক্ষণ। দেখি একবার গিন্নিকে জিগ্‌গেস করি—সমস্ত ঠিক আছে কিনা!



জীবনানন্দ

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মরি নাই আমি মরি নাই
আজি যে আবার পৃথিবীর প্রেম
গগনের নীল আলো চাই।
আজি যে প্রাণের বাজাইয়া বাঁশি
মরণেরে যত যাব উপহাসি',
জাগাবো ঘুমের বালা ;

শেফালির বনে শরত-উষায়,
ফাগুনে বসিয়া বকুলের ছায়
রসিয়া রসিয়া চরম নেশায়
গাঁথিয়া পরিব মালা।

নয়নের তারা ঘিরিয়া ঘিরিয়া
স্বপনের স্রোত আসিবে ভিড়িয়া,
আকাশের নীল চিরিয়া চিরিয়া
ফুটাবো সোনার ছবি,

বেহাগে দীপকে ললিতে বাহারে
ঠোঁটের হাসিতে নয়ন-আসারে
সাজায়ে ফিরিব প্রাণ-বঁধুয়ারে
জীবনের মহাকবি।

মরি নাই আমি মরি নাই
ওগো ও তরুণ ওগো ও তরুণী
হাতে মোর হাত রাখ ভাই।
আজি ধমনীর শোণিতে জোয়ার
দিকে দিকে যত ভাঙে শিলাভার,
এক হ'য়ে যায় যত ঘর বার
একটি চরম হাঁকে।

ওই যে সুমুখে স্বপনের রাণী
আঁচল দোলায়ে চলে সুর টানি'
ডেকে ডেকে যায় দিয়া হাতছানি
জীবনের প্রতি বাঁকে।

তারি সাথে সাথে কণ্ঠের গান
উচ্ছ্বসি' ওঠে আকুলিয়া প্রাণ,
রূপের সায়রে করি' সুখ-স্নান
স্বর্ণ-গরিমা রথে

ষোড়শ বাজির বল্গা বাগায়ে
প্রেম হাসি শোক অশ্রু জাগায়ে
চলিব কনক কিরীট লাগায়ে
জীবনের মহাপথে।

ওগো তরুণ তরুণী ভাই
তোমাদের সাথে সাথী আছি আমি
জীবনের জয় সদা গাই।
ধমনীতে যত শোণিতের দোল
ধরণীর বুকে তোলে হিল্লোল,
মানবের যত খল কলরোল
বক্ষে পড়িবে আসি',

পৃথিবী জুড়িয়া ভবনে ভবনে
প্রাণের শঙ্খ লগনে লগনে
সন্ধ্যা উষায় শয়নে স্বপনে
বাজাবে পথের বাঁশি।

সেই বাঁশরির সুরের নেশায়
ধূলি-তলে-তলে অঙ্কুর গা'য়
শিহরণ লাগি' পল্লব-কায়
জাগিবে অবিরাম,

গগনে যখন গোধূলি-বেলায়
আধ জাগরণ আধ ঘুমে ছায়
ধরণীর হিয়া গভীর মায়ায়
ছাবে এ-হৃদয় মম।

ওগো তরুণ তরুণীদল
তোমাদের সাথে সাথী আছি আমি
নেচে যায় হেসে খলখল

সিন্ধুর বুকে সমীর-দোলায়
উর্ম্মিবালারা যেথায় খেলায়
সেইখানে আমি চড়িব ভেলায়
বাজায়ে প্রাণের বাঁশি,

তুফানের সাথে করি' কাড়াকাড়ি
ঝঞ্ঝার রোলে দিব জয়-পাড়ি
বজ্রের বোলে যত নভচারী
হাসির অট্টহাসি।

আবার যখন জোছনা-জোয়ার
ছেয়ে যাবে দিক এপার ওপার,
ক্ষেপণীর তালে মৃদু ঝঙ্কার
তরুণী-কণ্ঠ সম

ফুটিবে, লুটাবে নীল কুন্তল
উর্ম্মিবালারা গাহি ছল ছল্,
পদতলে পড়ি' সিন্ধু অতল
রহিবে অধীনতম।

ওগো তরুণ তরুণী ভাই
এসো আজি এসো হাতে রাখি হাত
অজানার পানে চ'লে যাই।
সন্ধ্যার কোলে একটি তারায়
যে-সুর বাজিয়া আকাশে হারায়
সেই সুর তুলি' প্রাণের ধারায়
চলিব নিরুদ্দেশে,

সমীরণ সাথে যার কানাকানি
নয়নের পাতে তারি মায়া টানি'
প্রাণ-যমুনায় নব স্রোত আনি'
পঁহুছিব সেই দেশে;

নব পুলকের আলোর জোয়ার
ছেয়ে দেবে যত ঘর আর বার
পরিহাস যত হবে জিত হার
শেষ এক পরিহাসে,

ঝড়ের মাতনে, জোছনা-ধারায়,
মেঘের প্রলয়ে, শারদ-মায়ায়
দেখিব গভীর মরম ছায়ায়
বসি' কে যে এক হাসে।

মরি নাই আমি মরি নাই
আজি যে আবার পৃথিবীর প্রেম
গগনের নীল আলো চাই।
আজি মোর প্রাণ বাজাইয়া বাঁশি
মরণেরে যত চলে উপহাসি',
দিকে দিকে ছায় রূপকথা রাশি
জাগায়ে ঘুমের বালা,

শেফালির বনে শরত-উষায়
ফাগুনে বসিয়া বকুলের ছায়
রসিয়া রসিয়া চরম নেশায়
গাঁথিয়া পরিছে মালা;

নয়নের তারা ঘিরিয়া ঘিরিয়া
স্বপনের স্রোত আসিছে ভিড়িয়া
আকাশের নীল চিরিয়া চিরিয়া
ফুটিছে সোনার ছবি,

বেহাগে দীপকে ললিতে বাহারে
ঠোঁটের হাসিতে নয়ন-আসারে
সাজায়ে ফিরিছে প্রাণ-বঁধুয়ারে
জীবনের মহাকবি!



স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যাঁহার স্মৃতি-তর্পণ করব, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী নহেন ;—উচ্চ উপাধি দূরে থাকুক—ইংরাজী বর্ণমালার সহিতও কোনদিন তাঁহার পরিচয় হয় নি। কিন্তু তিনি বিশ্বের মহাবিদ্যালয়ে—বিশ্বনাথের কাছে উচ্চ—বহু উচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি আমার গ্রামবাসী, আজীবন সুহৃদ ও সখা, আমরণ বন্ধু ; এই জন্যই যে এত কথা বললাম তা নয়—সত্যসত্যই তিনি বাংলাদেশের একজন স্মরণীয় ও বরণীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অনন্য-সাধারণ বাগ্‌বিভূতিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি সিদ্ধ-সাধক ছিলেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে বাংলাদেশে তন্ত্রশাস্ত্রের বিখ্যাত ব্যাখ্যাতা ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার অধ্যাপনামাত্রই করেন নাই, তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গে সিদ্ধিলাভও করেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীশ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যার্ণব।

পূর্ব্বেই বলেছি, শিবচন্দ্র আমার গ্রামবাসী ছিলেন। গ্রামের এক প্রান্তে আমার বাড়ী ও অপর প্রান্তে শিবচন্দ্রের বাড়ী ছিল না। তিনি আমার নিকট প্রতিবেশী ছিলেন—তাঁদের বাড়ী ও আমার বাড়ীর মাঝখানে একখানি মাত্র বাড়ী ; সুতরাং বলতে গেলে আমরা এক বাড়ীরই ছেলে ছিলাম।

বাংলাদেশের দুইজন খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং নিতান্ত অখ্যাত-নামা আমি, এই তিনজন একই বৎসরে জন্মগ্রহণ করি। আমি জন্মগ্রহণ করি ১৮৬০ অব্দের ১লা চৈত্র, শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দের—২রা জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। আর তৃতীয় জন বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ প্রথিতযশা ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—জন্মগ্রহণ করেন ঐ ১৮৬০ অব্দেই—আমার অন্নপ্রাশনের দিন।

তা হলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে শিবচন্দ্র আমার ঠিক দু' মাসের ছোট, অক্ষয় আমার ছ' মাসের ছোট ছিলেন। তাই আমি শিবচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের দাদা ছিলাম।

এখন যেমন সকলে আমাকে সুধু "দাদা" বলে ডাকেন—শিব-অক্ষয় আমাকে তা বলে ডাকতেন না। তাঁরা ডাকতেন 'জল-দা' বলে।

শিবচন্দ্রের পিতৃদেব চন্দ্রকুমার তর্কবাগীশ মহাশয় আমাদের অঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। আমরা তাঁকে কাকা বলে ডাকতাম। তিনি গল্প করতেন যে, নবদ্বীপে তিনি আঠার বৎসর সুধু কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেছিলেন—আর কিছু পড়েন নি। কিন্তু এই কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন উপলক্ষে তাঁর অধ্যাপকেরা তাঁকে সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিশারদ করে দিয়েছিলেন। কি সুন্দর ছিল তখনকার শিক্ষা-পদ্ধতি! আর অধ্যাপকগণের ছিল কি অপূর্ব্ব মনীষা!

শিবচন্দ্র আর আমি, একসঙ্গেই খেলাধূলা করতাম—আমাদের বাড়ী যে পাশাপাশি। অক্ষয়কুমারকে আমরা একআধ-মাসের জন্য বছরে সঙ্গী পেতাম। তাঁর পিতৃদেব পূজনীয় মথুরানাথ মৈত্রেয় মহাশয় রাজসাহীতে চাকুরি করতেন, অক্ষয়কে সেইখানেই থাকতে হোত।

সেকালের পদ্ধতি অনুসারে নানা অনুষ্ঠান করে পুরোহিত মহাশয় আমাদের হাতে-খড়ি দেন নি। আমারও নয়—শিবচন্দ্রেরও নয়। শুনেছি অনুষ্ঠান সবই হয়েছিল, পুরোহিত মহাশয়ও পূজা-অর্চনা করেছিলেন, কিন্তু আমাদের হাতে-খড়ি দিয়েছিলেন আমাদের পরম পূজনীয় পরমারাধ্য কাঙাল হরিনাথ। তিনিই দুই মাস আগে-পিছে আমাদের দুই জনের বিদ্যারম্ভ করিয়েছিলেন। আর সেই সাধক-প্রবরের শুভ সূচনার ফলে একজন হলেন সিদ্ধ সাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, আর একজন হলেন—অ-সিদ্ধ অ-পক্ক আমি ;—এক ঝাড়ের বাঁশেই দেবপূজার পুষ্পপাত্রও হোল এবং বাড়ীর ঝাঁটাও হোল।

কোন্ বছরে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে আমরা কুমারখালি বঙ্গ-বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশলাভ করেছিলাম তা আমার মনে নেই। মনে থাকবারও কথা নয়।

পাড়াগাঁয়ের গরীবের ছেলে, দুবেলা যার অন্ন জোটেনি তার সম্বন্ধে এ-সব কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্ত কারও মাথা-ব্যথা হতে পারে না। শুনেছি, আমাদের যখন চার পাঁচ বছর বয়স, তখন শিবচন্দ্র ও আমি বাংলা স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের দুজনের কেউই গুরুমশায়ের পাঠশালায় প্রথম শিক্ষা লাভ করি নি—একেবারে সোজা 'বর্ণপরিচয়' হাতে করে বাংলা স্কুলের ছাত্র হয়েছিলাম। কাঙাল হরিনাথের কাছে শুনেছিলাম—আমিই আগে স্কুলে যাই, তার মাস দুই তিন পরে শিবচন্দ্র স্কুলে ভর্ত্তি হন।

দুই বছর কি আড়াই বছর আমরা একসঙ্গেই পড়েছিলাম। তার পরে এক আশ্চর্য্য ঘটনায় শিবচন্দ্রকে বাংলা স্কুল ত্যাগ করতে হয়েছিল। শিবচন্দ্রের পিতা—আমাদের চন্দ্রকাকা অত্যন্ত তেজস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবচন্দ্র তখন চরিতাবলী পড়েন। সেই সময় একদিন চন্দ্রকাকা শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কি পড়ছিস রে শিব?

শিবচন্দ্র বললেন, "ডুবালের গল্প।"

"ডুবালের গল্প। সে আবার কি রে? দেখি।" এই বলে তিনি বইখানি হাতে নিয়ে চার পাঁচ লাইন পড়ে বইখানি দূরে নিক্ষেপ করে বল্লেন—"এই সব বুঝি পড়া হয়? দেশে আর মানুষই নেই, মহাপুরুষও নেই, পড়িস কি না ডুবালের গল্প। যাঃ, কাল থেকে তোকে আর স্কুলে যেতে হবে না. এই ডুবালেই দেখছি দেশ ডুবালে।"

তেজস্বী ব্রাহ্মণের যে কথা সেই কায। পরদিন থেকেই শিবচন্দ্র আর বাংলা স্কুলে গেলেন না। পরবর্ত্তী জীবনে অনেক স্থানে অনেক বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শিবচন্দ্র তাঁর পিতার সেই কথা কয়টি ভোলেন নি। যখন তখনই বলতেন—এই ডুবালেই দেশটা ডুবালে।

দেশ ডুবেছে কি না বলতে পারি নে, কিন্তু এই ঘটনা থেকেই আমরা ভবিষ্যতের অসাধারণ বাগ্মী, প্রগাঢ় পণ্ডিত তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্রকে পেয়েছিলাম। তা না হলে হয়ত আর দশজনের মত শিবচন্দ্রও হয় আমাদের মত দু-কুড়ি সাতের মানুষ হতেন, নয় তো কিঞ্চিৎ স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনা করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হয়ে বসতেন, আর শ্রাদ্ধ-সভায় গিয়ে অপরের দুর্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক মাথা নেড়ে আবৃত্তি করে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জাহির করতেন।

স্কুলের পড়া ছেড়ে দিয়ে শিবচন্দ্র বাড়ীতে পিতামহ কৃষ্ণসুন্দর ভট্টাচার্য্যের কাছে ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করলেন। কিন্তু বাপ বা পিতামহের কাছে পড়া তাঁর হয়ে উঠল না। এই যে ভট্চায্যি বংশ—এর একটা সুখ্যাতি আছে। এ বংশের লোক যেমন তেজস্বী তেমনি দুর্দ্দমনীয়। শিবচন্দ্রের পিতা এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। শিবচন্দ্রও ছেলেবেলা থেকে পিতার এই গুণ লাভ করেছিলেন। বাল্যকালে তিনি যেমন দুর্দ্দান্ত তেমনি একগুঁয়ে ছিলেন। কোন কার্য্যে একবার 'না' বললে এই ভট্চায-নন্দনকে কেউ 'হাঁ' বলাতে পারতেন না,—এমন কি স্বয়ং কাঙাল হরিনাথও না। এমন দুর্দ্দমনীয় একগুঁয়ে ছেলের পাঠ পিতার কাছে বেশী দিন চলল না।

চন্দ্রকাকা তাকে নবদ্বীপে কৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে পাঠিয়ে দিলেন। অপূর্ব্ব মেধাবী শিবচন্দ্র অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাকরণ, স্মৃতি ও দর্শনে বিশেষ অধিকার লাভ করলেন। কিশোর শিবচন্দ্রের এই অনন্য-সাধারণ প্রতিভা দেখে তাঁর অধ্যাপকেরা ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি হবেন, এ ভবিষ্যদ্বাণীও করেছিলেন। শিবচন্দ্রের কাছেই শুনেছি—তিনি যখন নবদ্বীপের টোলে অধ্যয়ন করতেন, তখন তাঁর সতীর্থগণের মধ্যে কেউই তাঁকে তর্কে পরাস্ত করতে পারত না। সেই সময়েই তিনি সংস্কৃতে ও সুললিত সাধু বাংলায় অনর্গল বক্তৃতা করতে শিক্ষা করেন।

নবদ্বীপের পাঠ শেষ করে শিবচন্দ্র কাশীতে বেদান্ত পড়তে যান, কিন্তু সেখানে আর তাঁর বেদান্ত পড়া হোল না। যে তন্ত্রশাস্ত্র পুরুষানুক্রমে তাঁদের বংশে অল্পবিস্তর অধীত হয়ে আসছিল, সেই তন্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের সুপ্ত স্পৃহা শিবচন্দ্রের হৃদয়ে জাগরূক হোল। চন্দ্রকাকার মুখেও শুনেছি তাঁদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ কেহ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন, অতিপ্রাকৃত শক্তিসম্পন্ন হয়েছিলেন। যুবক শিবচন্দ্রের হৃদয়ে তন্ত্রালোচনার বাসনা বলবতী হোল। পূর্ব্বপুরুষগণের সাধন-মার্গ অনুসরণ করবার জন্ত তিনি কৃতসঙ্কল্প হলেন। কাশীতে সে সময়ে তন্ত্র-শাস্ত্রের যাঁরা অধ্যাপক ছিলেন, যাঁরা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান করতেন, শিবচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে মিশে গেলেন। অপূর্ব্ব প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই কাশীতে তাঁর সুনাম প্রচারিত হোল, সু-বক্তা বলে

তাঁর প্রতিষ্ঠা হোল। তার পরই কাশী ত্যাগ করে তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র ঘরে ফিরে এলেন এবং পরম উৎসাহে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রচার আরম্ভ করলেন, তন্ত্র-তত্ত্বের ব্যাখ্যা লিখতে আরম্ভ করলেন। দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব নিতে আরম্ভ করল। তিনি সেই শিষ্যদের নিয়ে পঞ্চমকার সাধন আরম্ভ করলেন।

শিবচন্দ্রের সঙ্গে এই সময়ে আমার ধর্ম্মমতের পার্থক্য উপস্থিত হোল। কিন্তু আমাদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণই রয়ে গেল। আমি তন্ত্র-শাস্ত্র পড়ি নি, এখনও তার কিছুই জানি নে; কিন্তু তা হলেও আমি বলতে দ্বিধাবোধ করছিনে যে আমি তন্ত্র-শাস্ত্রের বিরোধী ছিলাম এবং এখনও আছি। আমি তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকারের সাধন কি, তা জানিনে। কিন্তু ঐ পাঁচটি ম-আদি নাম শুনে তখনও শিউরে উঠতাম— এখনও উঠি। রক্তবস্ত্র-পরিহিত সিন্দূর চর্চ্চিত-ললাট হাতে-গলায় একরাশ মালা—এ মানুষ দেখলেই আমি দশ হাত দূরে সরে দাঁড়াতাম, এখনও দাঁড়াই। ও মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার তো করেই না, ত্রাসের সঞ্চার করে। আমি চোখ বুঁজে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কাপালিকের কথা স্মরণ করে কেঁপে উঠি।

শিবচন্দ্র তন্ত্রের কথা আমাকে বোঝাবার জন্য কত চেষ্টা করেছেন। তাঁর লেখা আমাকে কত পড়তে দিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সেই তন্ত্র-মন্ত্র আমার মাথার ভিতর ঢোকাতে পারেন নি।

শিবচন্দ্র, অক্ষয়কুমার ও আমি—এই তিনজন এক সঙ্গেই কাঙালের চরণপ্রান্তে বসে শিক্ষালাভ করেছিলাম। শিবচন্দ্র তন্ত্র-শাস্ত্রের ক্রিয়া-কলাপে সিদ্ধিলাভ করলেন। অক্ষয়কুমার তন্ত্র-শাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করলেন, কিন্তু তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের পাশ দিয়েও গেলেন না। আর আমি যা হলাম তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। বড় দুঃখেই এক সময় কাঙাল হরিনাথ বলেছিলেন—এই তিনটিকে মনের মত করে গড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তার তো কিছু দেখছিনে। তিনটি তিন রকম হোল। একজন হোল ফিকির, আর একজন হোল ফকির, আর একজন হোল মুসাফির। তাঁর কথার তাৎপর্য্য এই যে— অক্ষয়কুমার উকিল হয়ে ফিকিরবাজ হলেন, তান্ত্রিক শিবচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন—ফকির হলেন; আর আমি মুসাফির হয়ে হিমালয়ে চলে গেলাম। কিন্তু কাঙাল হরিনাথের চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নি। অক্ষয়কুমার ও শিবচন্দ্র তাঁর শিষ্যত্বের গৌরব ষোল আনা রক্ষা করে অমর-ধামে চলে গিয়েছেন।

পূর্ব্বেই বলেছি—আমার সঙ্গে ধর্ম্মমতের ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কলাপের যথেষ্ট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও শিবচন্দ্রের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নিগূঢ়তর হয়ে পড়েছিল। তাঁর সেই রক্তবস্ত্র ভেদ করে এক পবিত্র মন্দাকিনীর প্রবাহ আমার হৃদয়ে সঞ্চারিত হোত। তখন আমি ভুলে যেতাম যে শিবচন্দ্র তান্ত্রিক, আর আমি কিছুই না। শিবচন্দ্র যখন তাঁর গৃহে মাতা সর্ব্বমঙ্গলার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন, আমি তখন তার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলাম, কায়মনোবাক্যে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলাম। এই যে পরস্পরে মতান্তর—এতে কখন মনান্তর হয় নি।

কলিকাতা হাইকোর্টের সেই সময়ের প্রসিদ্ধ বিচারপতি সার জন উডরফ শিবচন্দ্রের কাছেই তন্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি শিবচন্দ্রের তন্ত্র-ব্যাখ্যা শুনে এবং অপূর্ব্ব প্রতিভা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের শিষ্যত্ব স্বীকার করেছিলেন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। যতদিন তিনি এ-দেশে ছিলেন নানা ভাবে শিবচন্দ্রকে সাহায্য করেছেন। শিবচন্দ্রের তন্ত্র-তত্ত্বের দ্বিতীয় ভাগ সার জন উডরফ ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন। তিনি এ-দেশে থাকতেই শিবচন্দ্র সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করেন। এই সংবাদ শুনে মহামতি উডরফ তাঁর সংস্কৃতের অধ্যাপক অধুনা পরলোকগত হরিদেব শাস্ত্রী মহাশয়কে শিবচন্দ্রের বিধবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য কুমারখালিতে পাঠিয়ে দেন। অবসর গ্রহণ করে বিলাতে গিয়েও তান্ত্রিক-শ্রেষ্ঠ মহামতি উডরফ শিবচন্দ্রের স্ত্রী-পুত্রের কথা বিস্মৃত হন-নি। সর্ব্বদাই তাঁদের সংবাদ নিতেন এবং সাময়িক সাহায্যও করতেন।

শিবচন্দ্র যে অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সাধু ভাষায় এমন ওজস্বিনী বক্তৃতা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখবার শক্তি সত্য সত্যই শিবচন্দ্রের ছিল। সে সময়ে আরও একজনের সে শক্তি ছিল; তিনি পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। উভয়ের বক্তৃতার একটি পার্থক্য এই ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন চলতি

ভাষায় বক্তৃতা করতেন, আর শিবচন্দ্র সাধু ভাষায় বলতেন। বাংলা ভাষা যে কতদূর শক্তিসম্পন্ন, বাংলা ভাষার মাধুর্য্য যে কতদূর মনোমদ, যাঁরা বাগ্মীপ্রবর শিবচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন তাঁরা সে কথা অকুন্ঠিতচিত্তে স্বীকার করবেন। সে সময়ে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন, শিবচন্দ্র ও পণ্ডিত শশধর তর্ক-চূড়ামণি বাংলাদেশে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের বান ডাকিয়ে এনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্ব (culture) সেই সময়েই আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর গীতা ও কৃষ্ণচরিত্র সেই সময়েই প্রকাশিত হয়। সে যুগ যেন বাংলা ভাষার একটা প্লাবনের যুগ—সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের একটা প্রবল প্রচেষ্টা।

শিবচন্দ্র অনেক বক্তৃতা করেছেন, অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন—সে সকলই পরম উপাদেয়; কিন্তু তাঁর তন্ত্র-তত্ত্বই তাঁকে অমর করে রেখেছে। তিনি যে কত গান লিখেছেন তার সংখ্যা করা যায় না। সেগুলি সাধকের অমূল্য রত্ন। এখনও আমাদের দেশের বহু লোক কাঙাল হরিনাথের বাউল সঙ্গীত ও শিবচন্দ্রের মাতৃমহিমা গান করে থাকেন। এখনও শিবচন্দ্রের গৃহে মা সর্ব্বমঙ্গলার পূজা হয়। এখনও বাড়ী গেলে শিবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মাতা সর্ব্বমঙ্গলাকে দর্শন করে আসি। মন্দিরের পার্শ্বে যে বিল্বমূলে শিবচন্দ্রের শেষ নিশ্বাস বহির্গত হয়েছিল, সেইখানে বসে তাঁর কথা স্মরণ করে একবিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করি।

এইবার শেষ কথা।—শিবচন্দ্রের দেহাবসানের কথা বলেই আমার এই স্মৃতি-তর্পণ শেষ করি। মাতা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দিরের পাশেই ছোট একখানি বাগান ছিল, এখনও আছে। সেই বাগানের বেড়া বাঁধবার জন্য একদিন মজুরেরা কতকগুলি বাঁশ কেটে ফেলে রেখেছিল। শিবচন্দ্র সেইখান দিয়ে যেতে তাঁর পায়ে একটা বাঁশের তীক্ষ্ণাগ্রভাগ বিঁধে যায়। পরদিনই পা ফুলে ওঠে ও অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয়। ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বলেন ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়েছে। তাঁরা তিন চার দিন ঔষধ ও প্রলেপের দ্বারা ঐ বিষের গতিরোধ করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না।

ডাক্তারেরা তখন তাঁহার পায়ের কিয়দংশ কেটে বাদ দেবার প্রস্তাব করেন—শিবচন্দ্র তাতে সম্মত হন নি, তাঁর চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আনবার প্রস্তাবও তিনি অস্বীকার করেন; বলেন—মায়ের মন্দির ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। মন্দির পার্শ্বের সেই বিল্বমূলে যেন তাঁর দেহাবসান হয়।

আমি তখন কলকাতায় ছিলাম। এই সংবাদ পেয়ে আমি তাঁর শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হই। দশদিন পর্য্যন্ত গ্রামের নরনারী সকলে মিলে শিবচন্দ্রের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বৃথা হ'ল। ১৩২০ সালের ১১ই চৈত্র কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি ১১টা ৩০ মিনিটে মন্দির-পার্শ্বস্থ বিল্বমূলের আসনে শিবচন্দ্রের দেহাবসান হইল। তাঁর আজীবন সঙ্গী আমি তাঁর শেষ নিশ্বাস বের হতে দেখলাম।

রাত্রি কেটে গেল। প্রত্যুষে গ্রামের সকলে শিব-চন্দ্রের নশ্বর দেহ গৌরী নদীর তীরে চিরদিনের জন্য চিতাভস্মে পরিণত করে ফিরে এলাম। আজ ২৩ বৎসর পরে আমার চির-সুহৃদ সিদ্ধ সাধক আবাল্য-বন্ধু শিবচন্দ্রের স্মৃতি-তর্পণ করলাম। শিবচন্দ্রের প্রতিকৃতি এই মাসের প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হইল।



বড়দা

শ্রীসুরেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

গল্পও নয়, কথিকাও নয়, আমাদের দুর্ভাগ্য কেরাণী-জীবনের আনন্দোজ্জ্বল একটা অধ্যায়, আমাদের হাওড়া-শিয়াখালা লাইনের ন'টা চুয়াল্লর বড়দার কথা।

বড়দার আসল নাম নবগোপাল বাড়ুয্যে, শিয়াখালার এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান। পড়াশুনায় মাথা আছে দেখে তাঁকে তাঁর বাবা লোকের কথা উপেক্ষা ক'রে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু বড়দা ওখানে এক কায়স্থ ডাক্তারের মেয়েকে বিয়ে ক'রে ফেলেন। গাঁয়ের প্রবীণরা ওঁর বাবাকে "গুরুবাক্য না শুনে কানে, প্রাণ যাবে তোমার হ্যাঁচকা টানে" এমন ধারা শোনাতে আরম্ভ ক'রলেন যে তিনি হ্যাঁচকা টানের ঠেলায় কাশীতে এক শিষ্যের বাড়ীতে গিয়ে বাঁচেন।

বড়দার কিন্তু রোখ হ'ল গাঁয়ে বাস ক'রতে হবে, যে ক'রেই হ'ক। শ্বশুরের বারণ সত্ত্বেও সস্ত্রীক গাঁয়ে এলেন। গাঁয়ের লোকরা ক্ষেপে উঠ্‌ল, একঘরে ক'রলে—ধোপা নাপিত বন্ধ ক'রলে। বড়দা দু-পয়সার যায়গায় চার পয়সা খরচ করে নেপথ্যে কাপড়ও কাচালেন, চুলও কাটলেন। বৌদি অন্নপূর্ণা দেবীও সাধারণের সঙ্গে পুকুরঘাটে একসঙ্গে যাতায়াত ক'রতেন এবং যাবতীয় কটাক্ষবাণ হাসি মুখে শুনে আস্‌তেন।

বড়লোকের মেয়ের এমন ধারা জেদ কেন, এ নিয়ে অনেক আলোচনা হ'য়েছিল। প্রবীণরা বল্‌তেন এ নাকি গাঁয়ের মাথা খাবার জেদ, আচারনিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ-পল্লীর মধ্যে অনাচার ঢুকিয়ে দেবার জেদ।

গাঁয়ের লোকরা বিপদে পড়্‌ল, এরা কোন কথা নিয়ে মাথা ঘামান না—তর্ক করেন না। সব কথাই হেসে উড়িয়ে দিতেন।

(২)

দিন কেটে চল্‌ল। গাঁয়ের দুঃখ বাড়্‌ল, দারিদ্র্য বাড়্‌ল এবং প্রবীণরাও একে একে গত হ'লেন। বড়দা এবং বৌদির বাবা বৌদিকে চিকিৎসাশাস্ত্রের সহজ এবং অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ভাল ক'রেই শিখিয়েছিলেন, কাযেই গাঁয়ের ঘরে ঘরে বৌদির ডাক পড়্‌তে দেরী হ'ল না এবং দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর স্লেচ্ছের অখ্যাতিটা চাপা পড়ে গেল। চাষা-ভূষার ঘরে বড়মা ব'লে তিনি মস্ত একটা সম্মানের পদ লাভ করলেন। গরীবের ঘরে শোকে দুঃখে বড়মাই সব থেকে বড় আত্মীয়া হ'য়ে উঠ্‌লেন। বড়দাও কালের গতিতে তাল রেখে ন'টা চুয়াল্লর ডেলি-প্যাসেঞ্জার হ'য়ে শ' তিনেক ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট ডেলিপ্যাসেঞ্জারের মঙ্গলামঙ্গলের ভার নিলেন।

প্রথম দিন দেখি ন'টা চুয়াল্ল এসে দাঁড়াতেই বছর চল্লিশ বয়সের মোটা-সোটা ফর্সা এক ভদ্রলোক ট্রেণ থেকে কাঁচা-পাকা-দাড়ি সমেত চশমা আঁটা মুখ বের ক'রে—বিচিত্র নামের লিষ্টির একটা ছড়া কেটে হাঁকলেন। অমনই চারদিক থেকে রব উঠ্‌ল "এই যে বড়দা সব আছি।" আমি তখন ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের ওঠবার ব্যাপার দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে আছি। বড়দা আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন "ও গোপাল! দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে কেন বাপ্? এদিকে আয়"—ব'লেই হাত বাড়িয়ে জানালা গলিয়ে আমায় টেনে তুল্‌লেন। দেখ্‌লাম বুড়া হলেও হাতের কব্জীটা আমার পায়ের গোছের মত। আমায় বল্‌লেন "বাপধন! ডেলিপ্যাসেঞ্জারদের কাছে প্রবেশের পথ হিসেবে যে জানালা দরজায় কোন ভেদাভেদ নেই—তা আজ থেকে জেনে রাখ।" কথাটা খুব সত্য।

গাড়ীতে উঠে দেখি নিষ্ক্রিয় হ'য়ে ব'সে থাকা কারও কুষ্টিতে লেখে নি। তাস, পাশা, দাবা, যাত্রার হাক আখড়াই চলেছে এমন ভাবে—যে গাড়ী দাঁড়িয়েছে বারোয়ারী বৈঠকখানায়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ছিল বরিশাটির কৈলাস দত্তের খবরের কাগজ মারফত মজার মজার খবর শোনান। শোনাবার আগ্রহের আতিশয্যে পড়ার রকম ও ভুলপ্রমাদগুলি আরও মজাদার হ'য়ে

উঠ্‌ত। মনে আছে কৈলাস একদিন চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—"বড়দা বড়দা মজার খবর অশনি নিপাত।"

বড়দা চশ্‌মা কপালে তুলে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমনভাবে ব'লে উঠলেন "অশনি নিপাত? বলিস্ কি কৈলেস? মানে বজ্রপাত বন্ধ তা'হলে?"—যে কৈলাস পর্য্যন্ত না হেসে থাকতে পারে নি। কৈলাস ভুল সংশোধন ক'রে পড়্‌ল "অশনি নিপাত নয়, অশনি পাত।"

বড়দা—"ও পাত নিপাত একই, তারপর?"

কৈলাস পড়্‌তে লাগ্‌ল "গতকল্য অশনি পাতের প্রচণ্ড নিনাদে রামপুরহাটের জনৈক গোয়ালার এগারটি দুগ্ধবতী গাভী দড়ি ছিঁড়িয়া উধাও। অদ্যাবধি কোন সংবাদ-পত্র পাওয়া যায় নাই।"

বড়দা—"সংবাদ-পত্র না পাওয়া যাক্ চিঠিপত্র অন্ততঃ একখানাও পাওয়া গেছে কি?"

আমরা হেসে অস্থির, কৈলাস বল্‌লে "ও! সংবাদ-পত্র নয়, সংবাদ।"

বড়দা—"ও একই; সংবাদ-পত্র না হ'লে সংবাদ পাবে কি ক'রে লোকে।"

চণ্ডীতলার পণ্ডিত মশায় বল্‌লেন "কাগজওয়ালাদেরও খেয়ে-দেয়ে কায নেই। গরু পালাল—খবর, তাও কাগজে লিখ্‌তে হবে?"

বড়দা গম্ভীর হ'য়ে বল্‌লেন "হবে না কেন শুনি? এগারটি দুগ্ধবতী গাভীর যায়গায় একটি পুত্রবতী বধূর নিরুদ্দেশ সংবাদ শুনলে দেশশুদ্ধ লোক মিলে হৈ-হৈ করতে ত? আরে বামুন পণ্ডিত! তুমি গোয়ালার দুঃখ কি বুঝ্‌বে? ঐ যে তোমাদের শাস্ত্রে আছে—দেশে দেশে কলত্রানি, দেশে দেশে চ বান্ধবা, তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র দুগ্ধবতী গাভী—"

আমরা বড়দার নজিরের বাকীটা হাসির রোলে আর শেষ হ'তে দিই নি। পণ্ডিতমশায়ের মত ব্যক্তিও গাম্ভীর্য্য রাখ্‌তে পারেন নি। গাম্ভীর্য্য রাখার জো এখানে একেবারে ছিল না। বড়দার চোখের চাউনি, ব্যাখ্যা, বিচার—বৈজ্ঞানিক laughing gasএর থেকেও ভয়ানক ছিল।

বড়দার মিনিটে মিনিটে ডাক্ পড়্‌ত সালিশি করতে—কোন অর্ব্বাচীন কোন প্রাচীনকে তাস খেলতে ব'সে চোখে ধুলা দেবার চেষ্টা করছে, কে বেহাগে ভৈরবীতে খিচুড়ি পাকাচ্ছে। নিতাই একদিন আমার পরম পূজনীয় জেঠামশায়কে তাসে হাজারের খেলা দেখাতে চাওয়ায় জেঠামশায় বয়সোচিত গাম্ভীর্য্য ভুলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন "বাঁড়ুয্যে, তোমার নিতের সাহস দেখ? আমায় হাজারের খেলা দেখাতে চায়?" বড়দা বল্‌লেন "সাহস হবে না কেন ব্রজ, ওই নিতের পিতে ওর বে'তে ওর শ্বশুরকে দু-হাজার এক এর খেলা দেখিয়েছেন—তাতেই ভদ্রলোক সেই থেকে ফেরার।" এমন কাজির বিচারে কেউ না হেসে থাকতে পারে নি। আর একটা অভিযোগ মেটানর নমুনা দিই। বলুহাটির সঞ্জীববাবুর গলাটা ছিল একটু চড়া রকমের। বাকি সামান্ত পথটুকুতে তাঁর "রুচে-বার" "হ্যা হ্যা হ্যা হ্যাকা" প্রভৃতির হুঙ্কারে পথের গরুবাছুরগুলি পর্য্যন্ত চম্‌কে ওঠার যোগাড়। তাঁর প্রসঙ্গে পণ্ডিতমশায় একদিন বড়দাকে বল্‌লেন "বাঁড়ুয্যে, তুমি এক সময় ওকে ওরকম চেঁচাতে বারণ ক'র। হাজার হ'ক কোম্পানীর গাড়ী। অমন ষাঁড়ের মত গলা।" মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বড়দা বল্‌লেন "ওটা হ'ল ওর প্রাক্তন, পূর্ব্ব জন্মের জিনিষ। আরে, আর জন্মে ঐ ত তোমাদের হিতোপদেশের সঞ্জীবক ছিল—যার নাদ শুনে সিংহেরও—তোমার কি বলে—পিলে চম্‌কে উঠেছিল। ওর রাসনামে উঠ্‌ল 'স', বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞাসা কর।"

হাসির রোল উঠ্‌তে সঞ্জীববাবু বল্‌লেন "আমি কি একটু বেশী চেঁচাই বড়দা?"

পণ্ডিতমশায় বল্‌লেন "বাবা! তোমার বিনতি দেখে প্রণতি জানাচ্ছি—ওর নাম কি একটু বেশী?"

বড়দা হেসে বল্‌লেন "শোন তবে গলার কথা বলি। আমি বছর কতক আগে একবার কাশী গিয়েছিলাম—"

কৈলাস জিজ্ঞাসা করলে "কোথায় ছিলেন? হাতী-ফটকায় নিশ্চয়?"

বড়দা—"না ষাঁড়্‌ফট্‌কা—"

সবাই বল্‌লে "সে আবার কি বড়দা—?"

বড়দা—"যায়গাটার নাম বাইরে বাঙালীটোলা, কাশীতে ষাঁড়ফটকা। অর্থাৎ ওখানে গিয়ে ষাঁড়ফটকা না হ'য়েছেন এমন পুণ্যাত্মা ব্যক্তি বিরল। তার পর শোন। একদিন রাত্রে খাওয়া দাওয়া ক'রে শুয়েছি, সাড়ে ন'টা হবে। তন্দ্রাও এসেছে—এমন সময় মনে হ'ল পৌনে তিন ডজন সজীব

বাজখাঁই গলায় একসঙ্গে তারস্বরে চীৎকার ক'রছে। কদিন আগে ডাকাতি হ'য়ে গেছে; ধড়মড়িয়ে বিছানায় উঠে বস্‌লাম। এমন সময় সাম্‌নের ঘর থেকে বাড়ীওয়ালা ভদ্রলোক ভাবে গদগদ হ'য়ে বল্‌লেন "জেগে আছেন নাকি?" বল্‌লাম "জেগে উঠেছি।" বল্‌লেন "শুন্‌ছেন একবার তালখানা? লালাবাবুর মত গলা মশায় বাঙ্গালা মুলুকে মেলবার নয়।" আমি বল্‌লাম "রামচন্দ্র! ও তাল ঐ পিলেরুগীর দেশে জান-মারা ব'লে অস্ত্র আইনে আট্‌কে যাবে যে।" কে বা শোনে কার কথা, ভদ্রলোক উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ব'লে যেতে লাগ্‌লেন "এই শিবের স্তব, আহা! উনি এমন তন্ময় হ'য়ে গান, যে বাঙ্গালীটোলার প্রত্যেক বাড়ী থেকে স্পষ্ট শোনা যায়।" আমি বল্‌লাম বাঙ্গালীটোলা ত ছার ও তাল কৈলাসে স্বয়ং মহাদেবের কান পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রে নিশ্চিত। আসার সময় তাঁকে জিজ্ঞেসা ক'রেছিলাম "আচ্ছা লালাবাবু, এ গান নিজেই শিখেছেন—না ওরও গুরু কেউ ছিলেন?" ভদ্রলোক মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বল্‌লেন "ছিলেন বৈ কি; গুরু নইলে কি সাধনা হয়? উনিও ঐ বাড়ীতেই ছিলেন। তিনি একজন অবতার বিশেষ ছিলেন; তাঁরই একটা কি সুরে ত ওবাড়ীর থিলেনটা চিড় খেয়ে র'য়েছে। আহা গেল বছর তিনি দেহ রক্ষা ক'রেছেন মশায়, একটা ইন্দ্রপাত হ'য়ে গেছে মশায় এ দেশের" ব'লে চোখ মুছ্‌লেন—আমিও দেখাদেখি মুখ মুছলাম; গুরুদেবের চিড় খাওয়ান সুরের কথা শুনে ঘেমে ওঠার যোগাড় আর কি। ভাবলাম দেহরক্ষা ক'রে বাড়ীওয়ালা আর বাসিন্দা উভয়কেই রক্ষা ক'রেছেন। বলাই বাহুল্য পণ্ডিত মশায়ের অভিযোগের সমাধান হ'য়ে গেল।

(৩)

এ সব মজ্‌লিশি ব্যাপার ছাড়া বড়দা'র আরও কায ছিল। বিয়ে পৈতের দিন দেখা, বিপদে আপদে সাহায্য করা, সামাজিক ব্যাপারে পরামর্শ দেওয়া, পথের যাত্রীদের কে আসে নি, তার অসুখের খবর নেওয়া—ওষুধ পাঠিয়ে দেওয়া আদি ক'রে কত আর ব'লব। এ সব ওই "দেখ্‌ছেন ত?" "শুনছ ত?" "এদিকে মুখ বাড়াবেন ত" র সুরসঙ্গে চল্‌ত। ওষুধ দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর খুব হাতযশ হ'য়েছিল। এমন কি ওঁর আফিসের এক বুড়া সাহেবের হাতে পর্য্যন্ত অর্শের আংটি স্থান পেয়েছিল এবং তাঁরই কল্যাণে বহু মায়ে-খেদান বাপে তাড়ান স্কুল-পালান ছেলের এবং অনেক গোবরগণেশের অন্নসংস্থান হ'য়েছিল।

আফিস ফেরতা মজ্‌লিশ আরও জমে উঠ্‌ত, বিশেষ ক'রে কৈলাসের দৌলতে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় বৃষ্টিতে কথাবার্ত্তা জম্‌ছিল না, কৈলাস বলে উঠ্‌ল "বড়দা, এবার হোমরুল হবে।" বড়দা ঘোর নৈরাশ্যের ভাব দেখিয়ে দাড়িতে আঙ্গুল চালাতে চালাতে বল্‌লেন "আ পোড়া কপাল! এবার খালি হোমরুল? বৃষ্টি বাদ্‌লা দেখে আশা হ'য়েছিল বুঝি ভাল জামরুল হবে, তা শেষে কিনা হোমরুল? কপাল আর কাকে বলে!" বলাই বাহুল্য আমাদের নুয়ে পড়া মন আবার হাসির ফোয়ারায় সতেজ হ'য়ে উঠ্‌ল।

আফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ক্লান্তি কোথা দিয়ে ভুলে গেলাম।

(৪)

বড়দার গাঁয়ের বারোয়ারী হ'ত ওঁরই বাড়ীর সাম্‌নে; ওখানকার লোককে বল্‌তে শুন্‌তাম "এ আমাদের বারোয়ারী নয়, বড়বাবু বড়মার কায। সত্যই তাই। বড়দা বৌদির অক্লান্ত চেষ্টায় কোন কাযেই বারোয়ারীর অসংযত ব্যাপার বিন্দুমাত্র দেখা যেত না—মনে হ'ত তাঁদেরই ঘরের কাজ। গাঁয়ের লোক গরীব বটে, কিন্তু এইসব উৎসবে চাল ডাল তরিতরকারী ইত্যাদি ক'রে জিনিসপত্র তারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে দিয়ে যেত। উৎসবের নাচ গান প্রভৃতি—যে গুলিতে বেশী পয়সার খেলা—সে গুলি বাদ্ পড়লেও খাওয়া দাওয়ার ভেতরে আনন্দ কারুর কম হ'ত না। বারোয়ারীর কথা বাদ দিলেও দেখেছি যে যা পেরেছে, নতুন গাই বিয়ালে দুধ, নতুন গুড়ের সন্দেশ, তরিতরকারি মাছ আদি ক'রে নানা জিনিস নানা অছিলায় ওঁদের দিয়ে গেছে। ছুটিছাটার দিনে আমরা প্রায়ই ওঁর বাড়ীতে যেতাম। অন্নপূর্ণার অন্নসত্রের প্রসাদ এবং বড়দার রসেভরা কথা শুনে কৃতার্থ হ'য়ে আসতাম। বড়দা আর বৌদির মতন মানুষ দেখে আমি ভাবতে পারতাম না এঁরা কি দিয়ে তৈরী। কেমন ক'রে এতখানি আত্মবিস্তার ক'রেছেন। অবস্থা ওঁদের এমন কিছু নয়; বড়দা সামান্ত মাইনের

কেরাণী। কিন্তু মাটির বাড়ীখানি কি সুন্দর সাজান; ফল ফুলের গাছে বড়দার মস্ত নেশা ছিল; নিজে হাতে যে বাগান ক'রেছিলেন তা দেখবার মত। দান খয়রাতের ত অন্ত ছিল না। এমনই ক'রে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্য্যন্ত বড়দা নটা চুয়ান্নর দাবার চাল, তাসের হাজার, কৈলাসের হোমরুল, আশু মোক্তারের সুরের খিচুড়ির সালিশি ক'রে রোগের দাওয়াই, সময়ের নির্ঘণ্ট এবং বেকার সমস্যার সমাধান ক'রে, আমাদের দুর্ভাগ্য ডেলিপ্যাসেঞ্জারকুলের গ্লানি মুছে দিয়ে এসেছেন। গাঁয়ের লোকের উৎসবে অভাবে অভিযোগে বুক দিয়ে খেটেছেন এবং গাঁয়ের সর্ব্ববিধ মঙ্গলাচরণে, রোগের সেবায়, কৌলিক আচারে, অন্নপূর্ণাদেবীও বড়দার অনুকূল কায ক'রে জীবন কাটিয়ে আস্‌ছিলেন।

(৫)

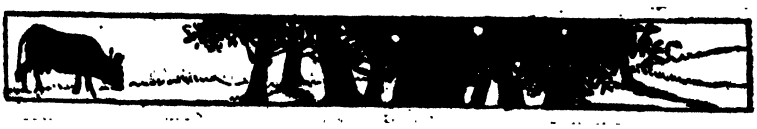
তারপর দুর্দ্দিনের ঝড় এসে আমাদের এই ছায়া-ফলদাতা, আমাদের ক্লান্তিহরা বিরাট মহীরুহকে একদিন এমন প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে গেল, যে সে বেগ সহ্য না ক'রতে পেরে এতদিনের পুরাণ বৃক্ষ ধরাশায়ী হ'ল। বৌদি অন্নপূর্ণার অন্নসত্রের হাট ভেঙ্গে একদিন চলে গেলেন। সে আঘাতের পর বড়দা একটা মাস বেঁচেছিলেন, আমাদের সঙ্গে হেসে কথা ক'য়েছিলেন—কিন্তু সে হাসির উৎসস্থল যে শুকিয়ে এসেছে তা আমরা বুঝতে পারতাম। থেকে থেকে তিনি বিমনা হ'য়ে পড়তেন, কিন্তু কখনও রুদ্ধ ঘরে ব'সে হাহাকার করেন নি। তখনও কোন চাষা আলুর ক্ষেতে জল বাঁধ্‌ছে না, কার কপির ক্ষেতে পোকা লাগ্‌ছে, কার অসুখ, কার বিসুখ—সব খবরই রাখ্‌তেন। ছুটির দিনে আমরা আরও সকাল সকাল যেতাম। বড়দা বলতেন "তোমাদের বৌদি তোমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাও ক'রে রেখে গেছেন। ঐখানে চিঁড়ে আছে, ঐখানে গুড় আছে, ঐটাতে কলা আছে, এবার নিজে হাতে নিয়ে খেতে হবে এই যা।" তারপর বল্‌লেন "যাবার সময় বললে, যা রেখে গেলাম তাতেই সংসার চলে যাবে।"

বৌদির শেষ কথাটার ইঙ্গিত সেদিন বুঝলাম—যখন ঠিক এক মাস পরে রেখে যাওয়া জিনিষপত্তর শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বড়দা ভোরবেলা আহ্নিক ক'রতে ক'রতে দেবলোকে চলে গেলেন। সকালে হারাণ বোষাল ডাক্‌তে এসে দেখ্‌লে বড়দা কথা কইছেন না, চোখ বুঁজে ব'সে আছেন। তখনই হৈ চৈ ক'রে লোক জড় ক'রলে। বড়দা মানুষের ডাককে কখনও পূজার নীচে স্থান দেন নি। ডাক যখনই কানে গেছে তখনই সাড়া দিয়েছেন। তা পূজাই কি আর অন্য কাযই কি? কাযেই হারাণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

আমি খবর পেয়ে আফিস কামাই ক'রে এসে দেখি, অর্দ্ধেকেরও বেশী ডেলিপ্যাসেঞ্জার জীবন মরণ চাকরি উপেক্ষা ক'রে এসে হাহাকার ক'রছে। সঞ্জীববাবুর উচ্চরোলের কান্নায় আজ আর পণ্ডিতমশায়ের রাগ নেই, তিনিও কাঁদছেন। পাঁচ সাতখানা গাঁয়ের লোক দেখি ভেঙ্গে প'ড়েছে, ইতর ভদ্র মেয়ে পুরুষ কেউ বাদ নেই। ফিরে দেখি নটা চুয়ান্নর বুড়ো মুসলমান ড্রাইভার হাউ হাউ ক'রে কাঁদছে। তারও মুখে বড়দার গুণপনার কথা—কবে তার ছেলে যেতে যেতে বড়দার ওষুধে বেঁচেছে, কবে তিরিশ-টাকার জন্য জেলে যাবার দাখিল হ'তে বড়দা সে টাকা দিয়ে বাঁচিয়েছেন তাকে।

আশে পাশে কেবল বড়দার গুণের কথা, বৌদির কথা। মেয়ে মহলে কে যেন সুর ক'রে ক'রে কাঁদছিল "আহা মাটির মানুষ ছিল গো বড়বাবু—"

মনে হ'ল খুব খাঁটি কথা; বড়দা বড়মানুষ ছিলেন না, মহাত্মাও ছিলেন না, ছিলেন মাটির মানুষ। মৃত্তিকাজাত মহীরুহের মতই শ্যামল পত্রপল্লবের ছায়ায় এত লোককে প্রাণপণে সকল গ্লানির সকল দুঃখের হাত থেকে ছায়া ক'রে রেখেছিলেন। তাঁর সরসতা সত্যই মাটির সরসতার মত প্রাণদায়িনী ছিল। হে ভগবান্! তোমার মাটির পৃথিবীতে এমনই ধারা ক'জনা মাটির মানুষ সৃষ্টি ক'রে তাপক্লিষ্ট মানুষের দুঃখ দূর কর।



পম্পেয়াই ও ভিসুভিয়স

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

রাস্তার ধারে একটি বাড়ীতে আমরা ঢুকলাম। বাড়ীর সবই আছে শুধু অনেকাংশের ছাদ নাই। পম্পেয়াইএর বাড়ীগুলির গঠনভঙ্গী প্রায় একরকম, অবশ্য ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী অল্প-স্বল্প ইতর-বিশেষ আছে। সদর দরজার পর প্রথমেই একটি উঠান, উঠানের চারধারে ছোট ছোট জানালাবিহীন ঘর। ঘরগুলি থেকে পরচালা নেমে এসে উঠানের চারদিকে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে কিন্তু মাঝখানটি খোলা। এই দিক দিয়ে বৃষ্টির জল এসে উঠানের মাঝে মর্ম্মর চৌবাচ্চায় জমা হ'ত। পরিষ্কার পানীয় জলের এখানে অভাব ছিল, তাই এই ব্যবস্থায় জল সংগৃহীত



ভেত্তির বাড়ীর অলিন্দ ও বাগানের একাংশ

হ'ত। প্রথম চত্বরে সাধারণতঃ টাকা-কড়ি নেওয়া দেওয়া ও বৈষয়িক কাজকর্ম্ম চ'লত। এর পরের চত্বরে শোবার ঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি। তার পরে বেশ সুবিন্যস্ত বাগান। এই বাড়ীটির অনেকগুলি ঘরের দেওয়ালের রং ও মেঝের মোজায়েক চিত্রগুলি এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। ভোজনের মর্ম্মর টেবিল ও অন্যান্য পাথরের আসবাবের কিছু কিছু এখনও ইতস্তত পড়ে আছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই গৃহ দেবতার জন্য একটি পৃথক ঘর ছিল। দেবতার বেদীর নীচে অনেক বাড়ীতে সাপ আঁকা আছে। অধিকাংশ বাড়ীতেই ক্রীতদাসদের যাওয়া আসার জন্য বাড়ীর পাস দিয়ে একটি পৃথক গলি পথ ছিল। সদর দরজা দিয়ে ঢুকবার অধিকার তাদের ছিল না।

একটি বাড়ীতে এক লৌহ ফটকের কাছে একটি সমগ্র ক্রীতদাস পরিবারের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। যে দিন ভিসুভিয়াস রুদ্রদেবের ক্রুদ্ধ ইঙ্গিতে খণ্ড প্রলয়ের উদ্দেশ্যে মেতে উঠেছিল, সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে ধনীরা যখন প্রাণ নিয়ে সহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল, সেদিনও তারা নিজের প্রাণের মূল্য দিয়ে ক্রীতদাসদের প্রাণের বেদনা বোঝে নি। অনেক পরিবার সদর দরজায়

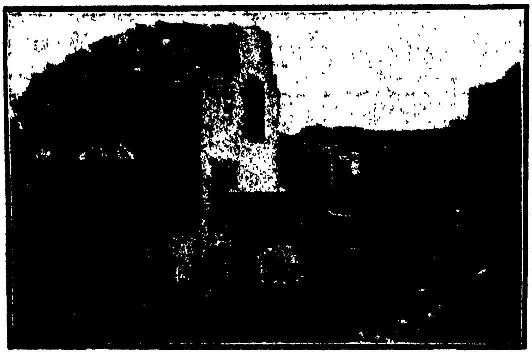


বিয়োগান্ত কবির গৃহ

চাবি দিয়ে ক্রীতদাস পরিবারকে বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে পালিয়েছিল। সেই সব হতভাগ্য পরিবারদের অনেকে একত্র পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে তিলে তিলে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রাণ দিয়েছে। তাদের অস্থি-চর্ম্ম বহুদিন ভস্মস্তূপের মাঝে লীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের ওপরের ছাই ওপরেই চাপে ও জলে জমাট বেঁধে গিয়েছিল (ভূমিকম্প ও ভস্মবৃষ্টির অব্যবহিত পরেই বৃষ্টি হয়)। পরে বৈজ্ঞানিকেরা কৌশলে জমাট বাঁধা ছাইএর মধ্যে প্যারিস প্লাষ্টার (কাদা-মাটি) ঢেলে দিয়ে ভেতরের মূর্ত্তিগুলি যে ভঙ্গীতে মারা গিয়েছে তাদের

অবিকল ছাঁচ তুলেছে। এই ছাঁচগুলির কয়েকটি এমন নিখুঁত রূপ নিয়েছে যে তাদের দেহের প্রতি রেখায়, প্রতি ভঙ্গিমায় মরণোন্মুখ জীবগুলির মৃত্যু-যন্ত্রণা পরিপূর্ণ রূপ নিয়েছে। একটি পরিবার, একটি একক পুরুষ ও একটি কুকুর, তাকে বোধহয় তাড়াতাড়ির মধ্যে মনিব খুলে দিতে ভুলে গিয়েছিল, এমনই ছাঁচের মূর্ত্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

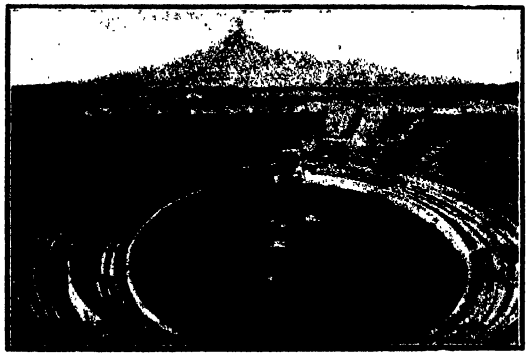
এর পর "হাউস অব ভেতি" (House of Vetti), হাউস অব ফাউন (House of Foun), হাউস অব ল্যাবিরিন্থ (House of Labyrinth), হাউস অব গোল্ডেন কিউপিড (House of Golden Cupid), হাউস অব সিলভার ওয়েডিং (House of silver ওয়েডিং) "হাউস অব পান্সা" (House of Pansa) প্রভৃতি কয়েকটি ছোট বড় বাড়ী দেখলাম। সবগুলির বিশেষ বিবরণ আজ তিন বছর পরে সঠিক মনে নাই। সবগুলিতেই অল্প-বিস্তর রং, চিত্র শিল্প ও মর্ম্মরের কাজ দেখেছিলাম এইটুকুই মনে আছে। তবে এদের মধ্যে আজও বিশেষ ভাবে মনে আছে 'হাউস অব ভেতি'। এটিকে বর্ত্তমানে গাছপালা দিয়ে ও পুনর্নির্ম্মাণ করে পূর্ব্বে যেমন ছিল কতকটা তেমনি করা হয়েছে। বাড়ীটি দোতালা। দু-হাজার বছর আগেকার হলেও বাড়ীটি আজকের বিংশ শতাব্দীর যে কোনও লোক বাস করবার জন্য পছন্দ করবে—শুধু নীচের ঘরে কয়েকটা জানালা ফুটিয়ে নিলেই হবে। এই বাড়ীটির প্রধান দরজার পাশে একটি কুলঙ্গীর মধ্যে একটি অশ্লীল চিত্র আছে—সেটি বর্ত্তমানে একটি কাঠের ছোট দরজা দিয়ে বন্ধ রাখা হয়।



পাথরের জাঁতা ও রুটি সেঁকবার উনুন

এমনই অশ্লীল চিত্র পম্পেয়াইএর অনেক বাড়ীতে আছে; বিশেষ করে ব্যক্তিগত স্নানাগারগুলিতে এদের বাহুল্য চোখে পড়ে। এ বাড়ীর স্নানাগারেও অনেকগুলি অশ্লীল চিত্র আছে। বাড়ীর রক্ষককে কিছু বকশিস্ দিলে সে সব ঘরগুলি যত্ন করে দেখায়, সাধারণতঃ এই চিত্রগুলি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই নিয়ম।

'হাউস অব ভেতির' ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড উদ্যান ও ফোয়ারা; একটি ঘরের সমস্ত দেওয়ালে আগাগোড়া বিভিন্ন রংএর ছবি আঁকা আছে। এটি নাকি ভোজনশালা ছিল। এই বাড়ীটিকে এখন এক বিরাট শ্মশানের মধ্যে ছোট্ট সজীব রঙ্গীন গোলাপ মনে হয়। চতুর্দ্দিকে শুধু ধ্বংসাবশেষ বুকে নিয়ে এক বিরাট শ্মশান—তার মাঝে এই বাড়ীটি প্রাণের স্পন্দন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

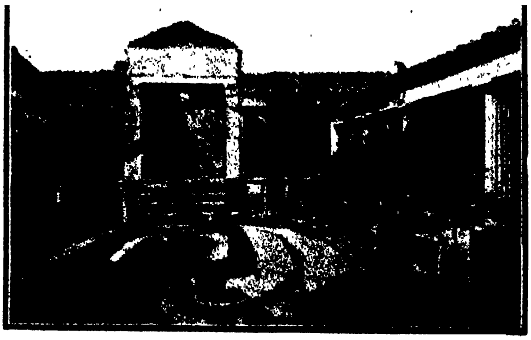


এম্পি-থিয়েটার

এই বাড়ীটি থেকে আবার প্রধান রাস্তায় (via di nola) এসে একটু পশ্চিমে যেতেই বাঁয়ে পড়ে সাধারণ স্নানাগার ও তার পাশে ভাগ্যদেবীর মন্দির। মন্দিরটির মধ্যে এখন দ্রষ্টব্য কিছু নাই তবে স্নানাগারটি এখনকার প্রধান দ্রষ্টব্যের অন্যতম। স্নানাগারটির তিনটি অংশ। একটিতে খুব গরম জল (Caldarium), অপরটিতে মৃদু গরম জল (tepidarium), তৃতীয়টিতে ঠাণ্ডা জলের (Frigidarium) চৌবাচ্চা ছিল। এ ছাড়া একটি প্রকাণ্ড বাগানওয়ালা উঠান আছে সেখানে স্নানের পূর্ব্বে নাগরিকরা ব্যায়াম ক'রত। এখানে এখনও একটি পাথরের বড় গোলা (সাধারণ ফুটবলের আকারের) পড়ে আছে। [illegible] ক'রলে নড়িয়ে নিজের শক্তি পরীক্ষা করা যায়। মনে হ'ল আগেকার লোকরা সত্যই ঢের বেশী শক্তিসম্পন্ন

ছিল, নইলে অত ভারী পাথরের বল নিয়ে খেলা করা সহজসাধ্য নয়।

এখানকার দেওয়ালের কয়েকটি চিত্র এখনও বেশ চমৎকার আছে। ছাদের খিলানের নীচে এ্যাপোলো, কিউপিড প্রভৃতির কয়েকটি চিত্র শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এর গরম জলের ঘরটির দেওয়াল বরাবর ফাঁপা। কয়েক জায়গা ভেঙ্গে যাওয়ায় এর গঠনভঙ্গী দেখা যায়। এই ঘরের পাশেই আগুন জালাবার ঘর। সেখান থেকে গরম হাওয়া এই ঘরের দেওয়াল ও মেঝের তলা দিয়ে চালান হ'ত এবং গরম জল চৌবাচ্চায় পাঠান হ'ত। পরে সেই হাওয়া ও জল ক্রমশঃ অল্প ঠাণ্ডা হলে মৃদু-গরম জলের ঘরে পাঠান হ'ত। মেয়েদের ঘরের দেওয়ালে



একটি আংশিক পুনর্গঠিত বাড়ী (House of gilded loves)

কাপড়-জামা রাখবার হুকগুলি পুরুষদের চেয়ে যে খাটো এ তারই প্রমাণ।

স্নানাগার থেকে বেরিয়ে চোখে প'ড়ে একটি মস্ত তোরণ। এই তোরণটি পার হ'য়ে সামনেই পড়ে 'ফোরাম'। 'ফোরামে' বাজার হাট ব'সত—লোকরা অবসর সময়ে জটলা করত, পাশেই ছিল বিদ্যালয়, কাজেই ছুটির সময় নিশ্চয়ই ছেলেরা এখানে হুড়োহুড়ি বাধাত। রোমার যে সব রাজাদেশ প্রচারিত হ'ত তার প্রতিলিপি এখানের দেওয়ালে ও থামে লেখা হ'ত। এমন প্রতিলিপি খননের ফলে পাওয়া গিয়াছে। এর পাশে কোন ব্যক্তিগত বাড়ী নাই; চারদিকেই মন্দির, বিচারালয়, বাজার ইত্যাদি। এর আয়তন ৪৬৭ × ১২৬ ফিট। এই প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণটির চারদিকে পাথরের থাম ছিল, তার ওপর দোতলা বাড়ী ছিল। ওপরের তলায় কোন চিহ্ন এখন নাই; শুধু তিনটি সিঁড়ি ও কয়েকটি খিলানের দাগ থেকে দোতলার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। প্রাঙ্গণের মধ্যে অনেকগুলি পাথরের ছোট ছোট থাম



সমগ্র ব্যাসিলিকা

পড়ে আছে—এগুলির ওপর আগে বিখ্যাত লোকদের ও প্রজানুরঞ্জক রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি থাকত। পরে সে গুলি স্থানান্তরিত করা হ'য়েছে। এটির প্রবেশ পথের দু-পাশের দুটি স্তম্ভ দেখিয়ে গাইড বোল্লে পূর্ব্বে এখানে সামনা-সামনি দুটি দেব-দেবীর মূর্ত্তি থাকত; তাদের ভেতরে দুটি নল



ভেতির বাড়ীর উদ্যান

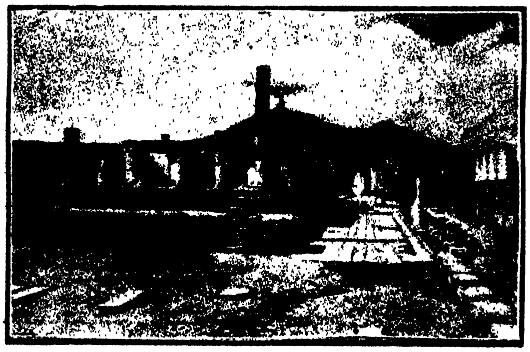
মুখ পর্য্যন্ত ছিল, নলের অপরদিক লুকান থাকত পুরোহিতের ঘরে। পুরোহিতেরা দূর থেকে সেই নলের মধ্য দিয়ে নানা জটিল বিষয়ের উত্তর দিয়ে ও গুরুতর সমস্যার সমাধান করে লোক ঠকিয়ে বেশ দু-পয়সা রোজগার ক'রত। ফোরামের উত্তর দিকটা প্রায়

জুড়ে আছে একটি বিরাট মন্দিরের উঁচু পাদপীঠ। মন্দিরটি এখন নেই, কিন্তু তার ধ্বংসাবশেষ থেকে মন্দিরটির পূর্ব্বাকার অনুমান করা শক্ত নয়। এটি জুপিটারের মন্দির বলে খ্যাত। এর উঁচু বেদীমূল থেকে নাগরিক-



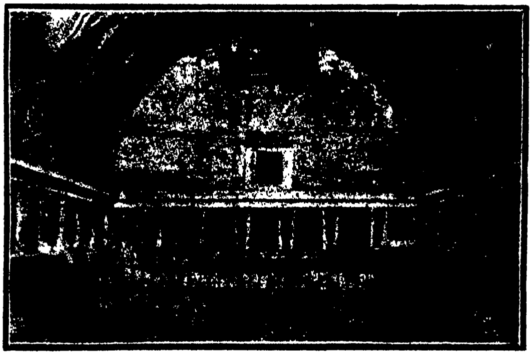
সমুদ্র তোরণ—এর কাছেই যাদুঘর

শ্রেষ্ঠরা বক্তৃতা দিতেন। ফোরামের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে সাধারণে তা শুনত। মন্দিরে তিনটি বেদী আছে—একটি জুপিটারের, দ্বিতীয়টি জুনোর এবং তৃতীয়টি মিনার্ভাদেবীর। এর পাশেই সহরের ধনাগার ছিল। ফোরামের পাশেই বাজার। (এ জায়গাটি এখন শিক দিয়ে ঘেরা আছে।) বাজারের খিলানওয়ালা ঘরগুলি



ফোরামের একাংশ—জুপিটারের মন্দির, ডানদিকে বাজারের একাংশ।

এখনও আছে। দোকানগুলির প্রায় সবই উত্তর-মুখো—বোধ হয় তরিতরকারী এবং মাছ মাংস যাতে রৌদ্রে নষ্ট না হয় এই জন্যই এ ব্যবস্থা। বাজারের পাশেই ভেসপেসিয়ানের (Vespasian) মন্দির দ্রষ্টব্য। এখানে একটি বেদী বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মর্ম্মরের বেদীটি এমন অক্ষত ও সুন্দর—যে দেখে মনে হয় এইমাত্র বুঝি কোন শিল্পী সেটিকে তৈরী করেছে। এর একদিকে পুরোহিত, ছেত্তা, ভৃত্য, বাদক প্রভৃতি বলির সমসাময়িক সকলের প্রতিমূর্ত্তি খোদিত, অপরদিকে বলির পাত্র কলসী ইত্যাদি ও বলির সময়ের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি খোদিত আছে। অপর দু-দিকে একটি ওকের (oak) মালা আছে। ফোরামের দক্ষিণে তিনটি অপেক্ষাকৃত ছোট বাড়ী আছে। একটি 'কমিটিয়াম' (Comitium), এখানে সহরের নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব চ'লত—কারণ রোম সাম্রাজ্যের অধীনে পম্পেয়াই একটি স্বয়ংশাসিত সহর ছিল। অপরটি নাকি কাপড়ের বাজার ছিল। এখানে যে সব লিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় Eumachia নামে এক ধনী



ফোরাম স্নানাগারের মৃদুগরম জলের ঘর

পুরোহিতপত্নী এটি নির্ম্মাণ করান। এই বাড়ীগুলি এখন ইটের কঙ্কাল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তবে এর আশে পাশের প্রচুর মার্ব্বেল দেখে মনে হয়, পূর্ব্বে এগুলি মার্ব্বেলমোড়া ছিল।

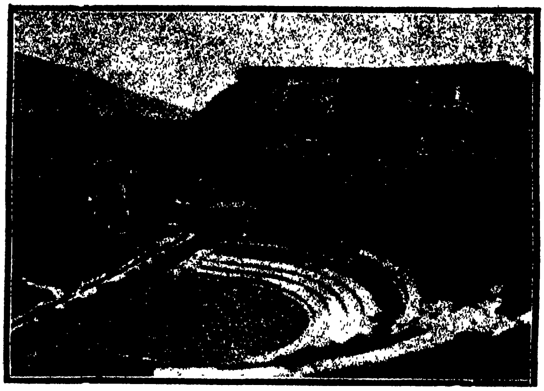
এই বাড়ীগুলির পাশে, ফোরামের কাছেই একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা চোখে পড়ে। লম্বা চারকোণা একটি প্রকাণ্ড হলঘর; চারধারে বড় বড় থামের ওপর ছাদ ছিল। এর নাম ব্যাসিলিকা (Basilica)। নামটি গ্রীক, গঠন-পদ্ধতিও গ্রীসীয় (Helenistic)। পূর্ব্বে এখানে কেনা-বেচার কারবার (Exchange) চ'লত, পরে কিন্তু এটি বিচারগৃহে রূপান্তরিত হয়। এর একদিকে উঁচু একটি বেদী আছে, যেখানে বিচারকরা বসিতেন। এর নীচে একটি ছোট ঘরে বিচারকদের আসন ও আসবাবপত্র

রাখা হ'ত। সেকালের কুঁড়ের বাদশারা ফোরাম আর ব্যাসিলিকায় সময় কাটাত। ব্যাসিলিকার দেওয়ালে দুহাজার বছর আগেকার মানুষ অনেক কিছু মনের কথা লিখে গেছে—যে অভ্যাস আজও মানুষের মনের অন্তরতম কোণে লুকান আছে। একটি এমনি লেখার বাংলা তর্জ্জমা—"আমি আশ্চর্য্য হই হে দেওয়াল; এই সব আজগুবি লেখা বুকে নিয়ে আজও তুমি দাঁড়িয়ে আছ; ধ্বংসস্তূপে পরিণত হও নি।" এমনি একটি লেখার নীচে ৭৮ খৃঃ পূর্ব্ব তারিখ দেওয়া আছে (প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা ব্যাসিলিকা খৃঃ পূর্ব্ব দুই শতাব্দীতে নির্ম্মিত)। ব্যাসিলিকা আর ফোরামের মাঝে ছ'টি প্রকাণ্ড থাম, এদের মধ্যের লোহার ফটকগুলি রাত্রে বন্ধ করা হ'ত। আটাশটি



'হাউস অফ্ ফাউন'—পিছনে ধূমায়মান ভিসুভিয়স

স্তম্ভের ওপর এর ছাদটি ছিল, স্তম্ভগুলির শুধু মূলদেশ এখন আছে। কোন কোনটির ওপরের অংশ পাওয়া গেছে। ব্যাসিলিকার মাঝের অংশে ছাদ ছিল না, চারধারে চালার মত আচ্ছাদন ছিল। পম্পেয়াইএর মধ্যে সম্ভবতঃ ব্যাসিলিকাই সবচেয়ে বড় অট্টালিকা ছিল। ব্যাসিলিকার উত্তরে "ষ্ট্রাডা মেরিণা" (Strada Marina), রাস্তার অপর পাশেই 'অ্যাপোলোর' (Apollo) মন্দির। এটিও একটি প্রকাণ্ড অঙ্গনের একদিকে—এর বেদী, সিঁড়ি ও সামনের দুটি স্তম্ভ প্রায় অক্ষত। বেদীটি মার্ব্বেলমোড়া; দেওয়ালগুলিও যে মার্ব্বেলমোড়া ছিল, তার চারপাশে ছড়ান প্রচুর মার্ব্বেল ফলক থেকে বোঝা যায়। ফোরাম ও অ্যাপোলোর মন্দিরের মাঝে শুধু কয়েকটি মাত্র থামের ব্যবধান। এখান থেকে আর একটু পশ্চিমে গেলেই এখানকার ছোট্ট যাদুঘর। এখানে পম্পেয়াইএ প্রাপ্ত তৈজসপত্র, নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষ ও আসবাব এবং কয়েকটি মৃতের মৃণ্ময় প্রতিমূর্ত্তি আছে। পম্পেয়াই এর বড় এবং ভাল শিল্পগুলি নাপোলীর ন্যাশান্যাল যাদুঘরে আছে।



রঙ্গালয় (বড়)

এখানকার যাদুঘরের সামনে দিয়ে যে রাস্তাটি সোজা ব্যাসিলিকা ও ফোরামের মাঝ দিয়ে গোটা সহরের বুক চিরে চলছে তার নাম "ষ্ট্রীট অব এবানডান্জ" (Street of Abbondanzh)। বলা বাহুল্য পম্পেয়াইএর বাড়ীঘর

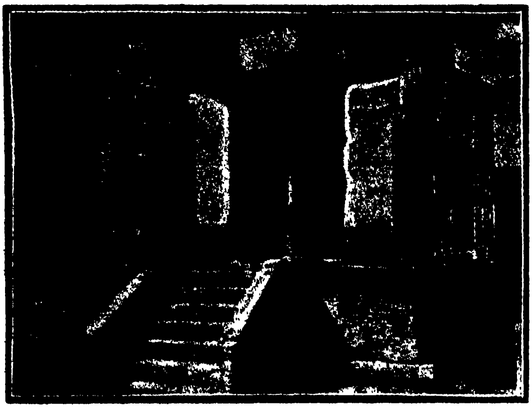


অ্যাপোলোর মন্দির

ও অন্যান্য রাস্তার নামের মত এ নামটিও এর পূর্ব্ব নাম নয়—আবিষ্কারকদের মনগড়া নাম মাত্র।

এই রাস্তাটি ধরে পূর্ব্বমুখে অনেকটা এলে বাঁ দিকে রাস্তার ধারে একটি ঝর্ণা পড়ে; সেখানে খোদিত একটি নারীমূর্ত্তি থেকেই রাস্তাটির বর্ত্তমান নামকরণ। এই রাস্তার

ধারেই 'ষ্ট্যাবিয়ান স্নানাগার" (Stabion Bath)। ফোরামের স্নানাগারের মত এখানেও ঠাণ্ডা, মৃদু গরম ও খুব গরম জলের ব্যবস্থা ছিল, তবে বাড়ীটির গঠন ভঙ্গী (plan) কিছু পৃথক। এখানে স্ত্রীলোক ও পুরুষদের পৃথক



আইসিস মন্দির

প্রবেশ পথ ও পোষাক ছাড়বার ঘর আছে—কিন্তু স্নানের চৌবাচ্চা এক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে যা চলছে তখনও তাই ছিল। এটির সামনেই একটি বাড়ীতে একটি মর্ম্মর টেবিল উল্লেখযোগ্য। ষ্টাবিয়ান স্নানাগারের পাশের রাস্তাটির নামকরণ হয়েছে ষ্টাবিয়ান রাস্তা (Via di Stabia)।



ডোমিটিয়ান রোড ও হারকিউলেনিয়াম তোরণ

এর পরে থেকে "নূতন খননকার্য্য বিভাগ" (New Excavations) পড়ল—এখানে ফটো নেওয়া নিষিদ্ধ। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে এখান থেকে বেশ বৃষ্টিও সঙ্গ ধরলে। মাথার ফেল্টের হ্যাটের কার্ণিস বেয়ে বেশ জলধারা গড়াতে লাগল; ওভারকোটটা তখনকার মত ওয়াটারপ্রুফের কাজ চালালে। আমরা রীতিমত তাড়াতাড়ি পা চালালাম। এদিকে এ্যাবাণ্ডান্স ষ্ট্রীট অনুসরণ করে খননকার্য্য চলেছে। কয়েকটি দোকান ছাড়া এদিকে বেশী কিছু আবিস্কৃত হয় নাই। কয়েকটি বাড়ীতে ক্রীতদাসদের বন্ধনের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি লোহার জিনিষ পাওয়া গেছে, তা থেকে অনুমিত হয়েছে সেগুলি ক্রীতদাসদের বাড়ী ছিল। এইগুলির কাছেই রঙ্গালয়, যেখানে ক্রীতদাসদের প্রাণের বিনিময়ে পম্পেয়াইএর নাগরিকরা আনন্দ উপভোগ ক'রত। সহরের দক্ষিণদিকের দুটি রঙ্গালয় এবং অপেক্ষাকৃত দূরে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে এ্যাম্পিথিয়েটার উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্বের রঙ্গালয় দুটি একবারে

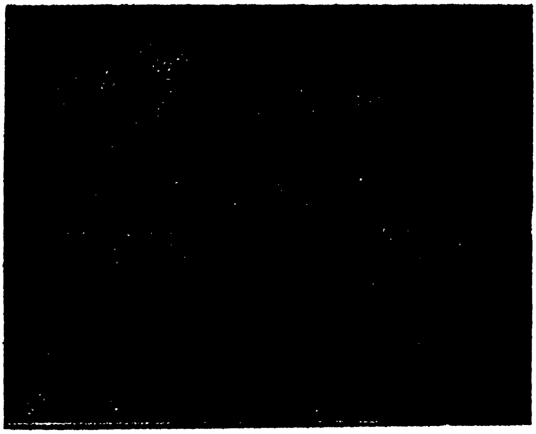


House of Rufus—একটি বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ

পাশাপাশি—একটিতে পাঁচহাজার দর্শকের আসন ছিল, অপরটিতে মাত্র পনরশ' দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। প্রথমটি সাধারণ দর্শকদের মনোরঞ্জন ক'রত, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্মকলাজ্ঞানসম্পন্ন সুধীদের চিত্তবিনোদনের জন্য ছিল। বৃহত্তর রঙ্গালয়টির কোন ছাদ ছিল না। অর্দ্ধবৃত্তাকারে তিনটি চত্বরে অনেকগুলি বসবার আসনের শ্রেণী তিনদিক ঘিরে ছিল; একদিকে রঙ্গমঞ্চ। মঞ্চের সামনের পর্দ্দা ওপর থেকে প'ড়ত না, নীচে থেকে উঠত। মঞ্চের মেঝে কাঠের ছিল। ছোট রঙ্গালয়টি আগাগোড়া ঢাকা ছিল, এ থেকে অনুমিত হয় এখানে সূক্ষ্ম যন্ত্রসঙ্গীতের আলাপ চ'লত। দুটি রঙ্গালয়েরই বসবার আসন মর্ম্মরমণ্ডিত ছিল। রঙ্গালয় দুটির আশে পাশে আর

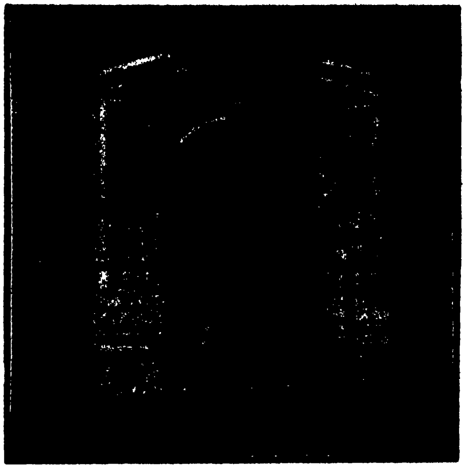
কয়েকটি ছোটখাট দ্রষ্টব্য ছিল, কিন্তু বরুণদেব বাদ সাধায় এবং প্রায় দু'তিনঘণ্টা ঘুরে ক্লান্ত হওয়ায় আমরা ফিরলাম। এ্যাম্পি-থিয়েটার দেখা হ'ল না। রোমার এ্যাম্পি-থিয়েটারের (কলোসিয়াম) চেয়ে এটি ছোট, এখানে বিশ হাজার দর্শকের আসন ছিল। তবে এটি নাকি এই ধরণের রঙ্গালয়ের প্রাচীনতম ; এর আয়তন ৪৬০ × ৩৪৫ ফিট।

বৃষ্টি বেশ জোর আসায় ফিরবার পথে আমরা একটি বাড়ীর বারান্দাওয়ালা রোয়াকে আশ্রয় নিলাম। বাড়ীটি দেখে মনে হ'ল যেন কেউ বাস করে। গাইডকে জিজ্ঞাসা করায় সে আর একটি লোককে ডেকে বাড়ীটির তালা খুলে দেখাতে অনুরোধ ক'রলে। বাড়ীটি খুলে দেখা গেল



একটি বাড়ীর মোজায়েক করা মেঝে

সেটি পূর্ব্বে বেশ্যালয় ছিল। চার কি পাঁচটি অতি ছোট ছোট কুঠরী—প্রত্যেকটিতে একটি পাথরের বেদী, বোধ হয় তার ওপর শয্যা পাতা থাকত। প্রত্যেক ঘরের দরজার ওপর বিভিন্ন ভঙ্গীর কামশয্যা চিত্রিত ; যার যেমন অভিরুচি সেই মত কুঠরী সে দখল ক'রত। বাড়ীতে ঢুকেই একটি দরদালান, দরদালানের দুধারে এই কুঠরীগুলি—আর ঠিক সামনেই একটি পাথরের বেদী, এখানে ব'সত বাড়ীওয়ালী মাসী তার সুধার পশরা সাজিয়ে। ঠিক এর পাশেই ছিল একটি গুপ্তদ্বার—পুরোহিত, বিচারক, নগরপাল প্রভৃতি পদস্থ ও গণ্যমান্যের জন্য—যারা সমাজের দণ্ডবিধাতা অথচ যাদের অন্তরে অতি সাধারণ মানবের হৃদয়বৃত্তি অহরহ খেলা করে। দুহাজার বছর আগের চেয়ে বাড়ীটির চেহারা বিশেষ পরিবর্ত্তিত হয় নি। বাড়ীটির ছাদ, বারান্দা, মেঝে প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে অথবা মেরামত করা হ'য়েছে—কিন্তু নাই তার অধিবাসীরা, যারা শুধু উদরান্নের জন্য নিজেদের দেহ ও যৌবনকে শতশত লোলুপ দৃষ্টির সামনে মেলে ধ'রত, যারা কত আকাঙ্খিত জনের কাছে হয়ত শুধু পেয়েছে একটা ঘৃণ্য জ্বালাময়ী দৃষ্টি, হয়ত বা আন্তরিক অনিচ্ছায় নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে আকাঙ্খিতের মত্ত খেয়ালের পায়ে। যারা এখানে থাকত পরের তৃপ্তির জন্য, সারাজীবন ধরে নিজেদের অন্তরে অতৃপ্তির বোঝা ব'য়ে—আজ তারা সেখানে নাই, তবু মনে হ'ল তাদের রুদ্ধ-ক্রন্দন মথিত কাষ্ঠহাসির চাপা আওয়াজ



এ্যাপোলোর মন্দির

আজও সেখানে বুঝি বাজছে ; এখনি বুঝি পুরোহিতশ্রেষ্ঠ গুপ্তদ্বার দিয়ে ছোটবড়র এই মহামিলন ক্ষেত্রে এসে হাজির হবেন।

বৃষ্টি একটু ক'মলে আমরা ষ্টেশন মুখে রওনা হ'লাম। ব'লে রাখা ভাল বৃষ্টির জন্য এখানকার একটি দ্রষ্টব্য 'ষ্ট্রীট অব টুম্বস' (Street of Tombs) অর্থাৎ 'কবরের রাস্তা' দেখা হয় নি। এখানে অনেকগুলি সমাধি ও স্মৃতিফলক আবিষ্কৃত হ'য়েছে শুনলাম।

ষ্টেশনের ভোজনশালায় মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। ফিরবার ট্রেণের কিছু দেরী ছিল—ফিরবার মুখে ভিসুভিয়াস দেখে যাব ঠিক ছিল।

আমি যখন গিয়েছিলাম (১৯৩৬ ফেব্রুয়ারী) তখন

সুপ্ত ভিসুভিয়স হঠাৎ আবার জেগে উঠেছিল। ভিসুভিয়স প্রথম ক্ষ্যাপে ৭৯ খৃঃ অব্দে, যখন পম্পেয়াই সমাধিস্থ হয়। তার আগেও ৬৩ খৃঃ অব্দে পম্পেয়াই একবার ভীষণভাবে বিপর্য্যস্ত হয় ভূমিকম্পে, কিন্তু সেবার বাইরে ভিসুভিয়স রুদ্রমূর্ত্তি ধরে নাই। ৬৩ খৃঃ অব্দে পম্পেয়াইএর বহু বাড়ী ধ্বংস হয়; সেগুলি পুনর্নির্ম্মাণের সময় আবার ভিসুভিয়াস ক্ষেপে উঠে তাকে শ্মশানে পরিণত



বাজারের দোকান ঘর



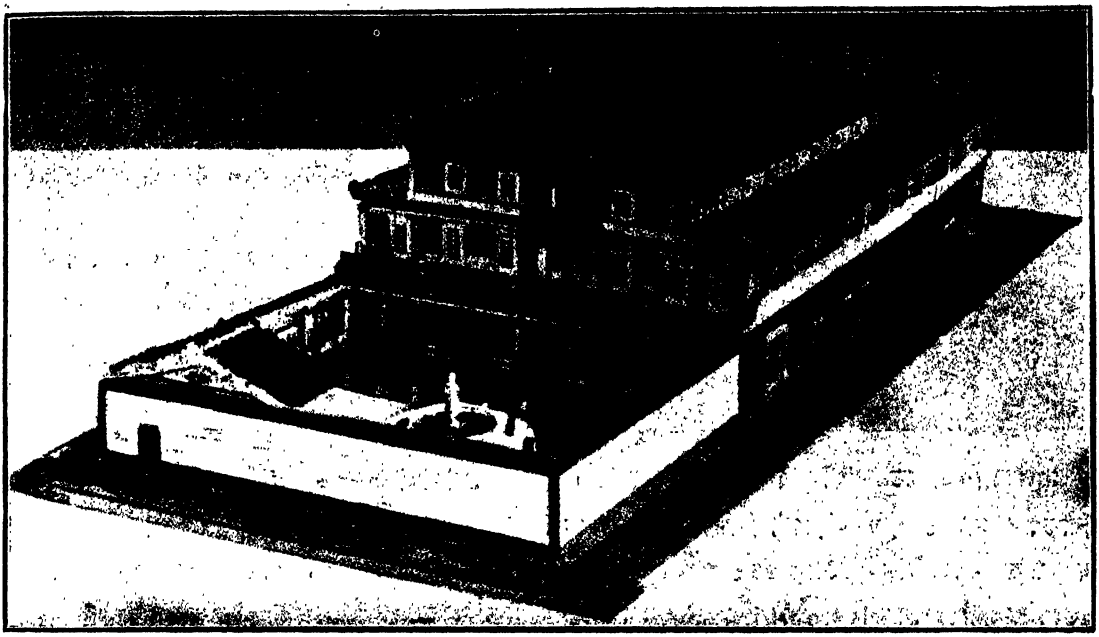
ফোরামের পথে তোরণ

করে; কাজেই পম্পেয়াইএর অনেক বাড়ীই ৬৩ খৃঃ অব্দের খুব আগের নয়, যে গুলি ৬৩ খৃঃ অব্দের ভূমিকম্পের পরও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ছিল শুধু সেই গুলি থেকে আমরা খৃঃ পূর্ব্ব আমলের স্থপতিশিল্পের পরিচয় পাই। পম্পেয়াই ধ্বংসের আগেও ভিসুভিয়সের ধূম্রবপুর শীর্ষদেশ থেকে অবিরাম গতিতে ধূমশিখা উঠত এবং ধ্বংসের পরও সে ধূমরেখা বন্ধ হয় নি। নীল আকাশের কোলে ভিসুভিয়াসের চূড়ার গহ্বর থেকে অনন্ত শূন্যে শুভ্র ধূমশিখা অবিরাম গতিতে এঁকে বেঁকে উঠ্‌ছে—যেন বিরাট বিশ্বদেবতার মন্দিরে অনির্ব্বাণ ধূপদানী। ১৯০৬ সালে আবার একবার ঘুমন্ত ভিসুভিয়াস জেগে ওঠে এবং তার গায়ে যে সব গ্রাম ছিল তার কয়েকটি নিশ্চিহ্ন করে। তবু আশ্চর্য্য এই যে আজও বহু ছোট ছোট গ্রাম এই সর্ব্বনেশে রাক্ষসের বিরাট বপুর ওপর গ'ড়ে উঠেছে। বেদের ছেলে যেমন সাপ দেখলে ভয় করে না—ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে ভয়ঙ্করের ভীষণতা যায় কমে—এখানকার লোকগুলিও তেমনি ধূমায়মান ভিসুভিয়াসকে ভয় করে না; তার সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে তার গায়েই বাসা বেঁধেছে। ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে আবার সুপ্ত সিংহ গর্জ্জে উঠেছিল—তবে এবারের গর্জ্জনেও বর্ষণে বিশেষ বিশেষত্ব সম সাময়িক সমস্ত কাগজে সে সময় ইউরোপে বিশেষ আলোচনা ও গবেষণা চলেছিল। এবারের আওয়াজ ছিল অভিনব, ভাষায় অবর্ণনীয়; অগ্ন্যুৎপাতের সময় আকাশে মুহুর্মুহু বিচিত্রবর্ণের অগ্নিশিখার অভূতপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটেছিল। এত বর্ণবৈচিত্র্য এর আগে নাকি ভিসুভিয়সে কখনও দেখা যায় নি। বৈজ্ঞানিকেরা পাগলা ভোলার এই অভিনব খেলায় একবারে হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। বহু বৈজ্ঞানিক নানা যন্ত্রসাহায্যে আগ্নেয়গিরির একবারে মুখে গিয়ে কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সন্তোষজনক কোন কৈফিয়ৎ কাগজে প্রকাশিত হয় নি। যতবারই অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে—নূতন নূতন মুখ সৃষ্টি হয়েছে। এবারের মুখটি প্রথমে দু' ফিট পরিধির ছিল, পরে তার ব্যাস দশ ফিট হয় (দু' তিন দিনের মধ্যে)। এ সম্বন্ধে প্যারীর "ডেলী মেল" পত্রিকায় যে সংবাদ ও চিত্র বেরিয়েছিল পাঠকদিগকে তার কিয়দংশ উপহার দিলাম।

Naples, Sunday
(5. 2. 33)

Vesuvius, the great Italian volcano, which after two years of absolute repose, is again presenting a wonderful sight is puzzling scientists and delighting thousands of spectators....The coloured lights are a new phenomenon of the volcano...The flaming gases from the various minerals in combustion, were shooting hundreds of feet up from the active core. This incandescent light, he said, changed from vivid green to soft purple and then suddenly there would be a sudden rush of gas and vapour and scarlet glow would illuminate the sky for miles around....

ভীষণ ভিসুভিয়াসের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে পম্পিয়াই-এর ওপর তাকালাম। রিমি ঝিমি বৃষ্টির আবরণের অবগুণ্ঠনে আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে যেন পুরাতন পম্পেয়াই জেগে উঠল। তার বর্ত্তমান রূপ গেল দূরে, তার চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যপট ছায়াছবির মত বৃষ্টির পর্দ্দার আড়ালের মাঝে পড়ল ঢাকা। ইতিহাসের পাতা থেকে অতীত হ'য়ে এল বর্ত্তমান। সহরটি এখনও এত সম্পূর্ণ ও অতীতের পরিচয় বর্ত্তমানের মাঝেও এত সুস্পষ্ট যে



বৈজ্ঞানিকের বাড়ীর (House of Scientist) একটি চমৎকার মোজায়েক করা ফোয়ারা

অতীতকে কল্পনার চোখে দেখতে কষ্ট হয় না। লম্বা সাদা 'টোগা' (Toga) পরা পুরুষের দল অলস মন্থর গতিতে



পম্পেয়াই এ প্রাপ্ত পাথরের জাঁত

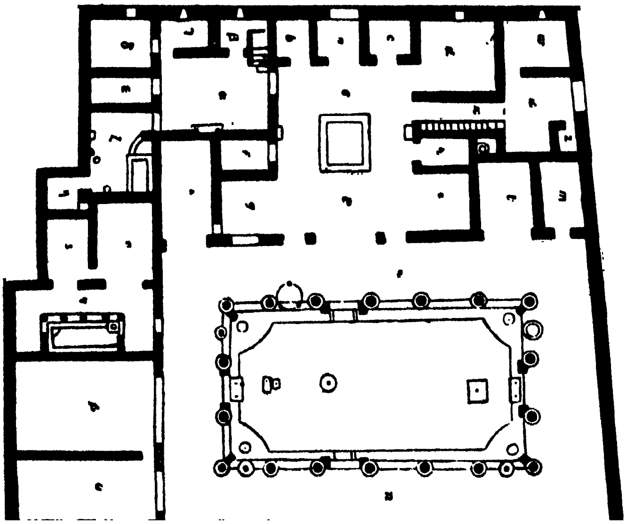
রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে চলেছে, দোকানে জিনিষ কিনছে, চা খাচ্ছে, ফোয়ারে পরস্পর গল্পগুজব করছে, নয়ত

জুপিটারের মন্দির চত্বর থেকে সহরের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের প্রদত্ত বক্তৃতা শুনছে। মেয়েরা তাদের বিচিত্রবর্ণের 'পাল্লা' (Palla) প'রে শুভ্র পোষাক পরিহিত পুরুষদের মধ্যে



গোল্ডেন কিউপিডের বাড়ীর একাংশ (পুনর্নির্ম্মিত)

লীলা-চঞ্চল গতিতে ঘুরে বেড়িয়ে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করছে। সদর রাস্তা কয়েকটিতে অশ্বযান প্রচণ্ড শব্দে ছুটছে, বাকী রাস্তাগুলিতে ক্রীতদাস-বাহিত পাল্কী (এখানকার মত ঢাকা



'হাউস অফ ভেত্তি'র প্ল্যান

নয়) সুন্দরী ধনীতনয়াকে নিয়ে চলেছে। শুভ্র মর্ম্মরের মন্দির, ফোরাম ও ব্যাসিলিকার মাঝে বহু ধনীর বিচিত্র প্রাসাদ ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যে টলমল ক'রছে—মেঘমুক্ত নীলাকাশ থেকে অবারিত সূর্য্যালোক এসে তাদের ওপর দ্বিগুণ ঔজ্জ্বল্যে ঠিকরে পড়ছে। তখন মেয়েরা ছিল সাধারণতঃ দুশ্চরিত্র, কারণ জীবন সংগ্রাম ছিল সহজতর, অলস মনগুলিকে নিযুক্ত করবার মত অন্য কাজ যথেষ্ট ছিল না, তাই তাদের মন ছিল বিপথগামী। তখনকার দিনে 'নৃত্য' সন্দেহের চোখে লোকে দেখত, যারা নাচত সাধারণে তা'দিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত না। বিবাহ-বন্ধন এ সময়ে ছিল শিথিল ; পাঁচ বৎসরে আটটি স্বামীর গলায় বরমালা দিয়েছে এমন নারীর কথাও ইতিহাসে পাওয়া যায়।

এ্যাম্পি-থিয়েটারে হতভাগ্য ক্রীতদাসদের প্রাণের বিনিময়ে উন্মত্ত জনতা আনন্দ উপভোগ ক'রত। এই পাশবিক উত্তেজনার প্রভাব নারী ও পুরুষদের সমাজ-জীবনেও পড়েছিল—তাদের কোমল হৃদয়বৃত্তিগুলি ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল।

স্নানাগারগুলিতে যথেষ্ট ভিড় জ'মত। সারাদিন কাজকর্ম্মের পর লোকগুলি প্রথমে গরম ঘরে ঢুকে, খুব খানিকটা ঘেমে নিত, তার পর গরম জলে স্নান ক'রে, পরে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায় মনের আনন্দে সাঁতার দিত।

রঙ্গালয় দুটিতে প্রত্যহ সাধারণ ও সুধী দর্শকদের ভিড় জ'মত। বড়টিতে সাধারণতঃ বিয়োগান্ত নাটক অভিনীত হ'ত, ছোটটিতে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির আলাপ চ'লত। তখনকার দিনে অভিনয়ে পুরুষেরাই নারীর অংশ গ্রহণ ক'রত। নটের জীবন সম্মানার্হ ছিল না।

পম্পেয়াই ধ্বংসের পর দীর্ঘ উনবিংশ শতাব্দী ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে, বহু শক্তিমান সম্রাট ও সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় ও পতন হ'য়েছে, মানুষ সভ্যতার লক্ষ্যে অনেকগুলি ধাপ এগিয়ে গিয়েছে—কিন্তু তবু সেই বাদল দিনে মুক্ত মাঠের মাঝে ষ্টেশনের চালায় ব'সে মনে হ'ল এই দীর্ঘ উনিশ শতটি বছরে মানুষ শান্তির পথে কতদূর এগিয়েছে ! সভ্যতার লক্ষ্য শান্তি ও আনন্দ, কিন্তু পম্পেয়াইএর লোকগুলির চেয়ে আজ আমরা কতটুকু বেশী সভ্য, অর্থাৎ বেশী শান্তি ও আনন্দের অধিকারী। স্বীকার করি তখন ক্রীতদাসের প্রতি অমানুষিক

নিষ্ঠুরতা ছিল, পারিবারিক জীবন হয়ত এখনকার চেয়ে সুখ ছিল, হয়ত পুরুষ ও নারীরা অধিকতর চরিত্রহীন ছিল, সূক্ষ্ম কলাশিল্প বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক পেছিয়েছিল কিন্তু তবুও শান্তি কি কম ছিল? আজ সভ্য মানুষকে সারা দিন রাত তার জীবিকার্জ্জনের জন্য যে অপরিসীম পরিশ্রম ক'রতে হয়, যে দুশ্চিন্তা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হয় তার চেয়ে তখনকার জীবন ঢের বেশী সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। সভ্যতার ফলে আজ একটা জাত অপর একটি জাতিকে যেমন নির্ম্মমভাবে হত্যা



গৃহদেবতার বেদী

ক'রতে শিখেছে, তখনকার দিনে মানবহত্যা এমন ব্যাপকভাবে করা সম্ভব ছিল না। যানবাহনে ও জীবনযাত্রার উপকরণে হয়ত বর্ত্তমানে মানবজাতি এই উনিশ শ' বছরে অনেকখানি এগিয়েছে কিন্তু যতটুকু সে এগিয়েছে তার কাছ থেকে শান্তি ও আনন্দ ঠিক ততখানি দূরে সরে গেছে।

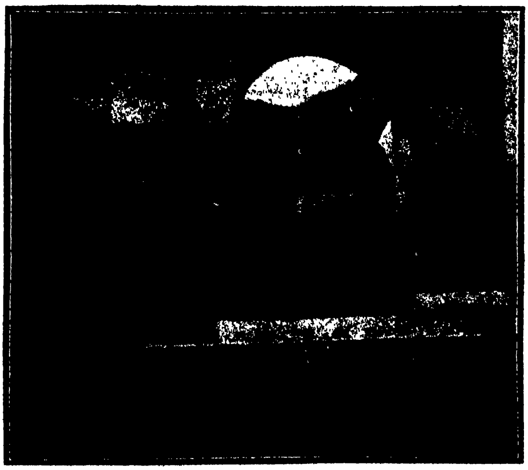
ষ্টেশনে একটি ছোট্ট দোকান আছে; সেখানে পম্পেয়াইএ প্রাপ্ত অনেক জিনিষের নকল প্রতিমূর্ত্তি বিক্রয় হয়। আমি ২৫ লিয়ার দিয়ে এখান থেকে একটি "নৃত্য-পরায়ন ফাউনের" (Dancing Faun) ধাতুমূর্ত্তি কিনলাম।

ট্রেণ এসে প'ড়ল। আমরা ভিসুভিয়াসের ষ্টেশনে নামলাম। এখান থেকে আর একটি বৈদ্যুতিক ট্রেণে ভিসুভিয়াসের গা বেয়ে উঠতে আরম্ভ করলাম। এ



ষ্ট্যাবিয়ান স্নানাগারের পূর্ব্বাংশ (সামনে পাথরের গোলা)

ট্রেণটি উঠবার সময় এমন মাথা উঁচু করে ওঠে যে নীচে না তাকিয়েও বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ট্রেণটা উঁচুতে



ষ্টাবিয়ান স্নানাগারের ভিতরের দেওয়াল

উঠছে। মাঝখানে একটা ষ্টেশন থেকে আর একটা এঞ্জিন পেছনে ঠেলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে ট্রেণটি এক জায়গায় দাঁড়াল; এখানে একটি অবজারভেটারী ও

ভাল রেস্তোঁরা আছে, ট্রেণটি অনেকক্ষণ দাঁড়ায়; কাজেই এখানে চা খেয়ে নিলাম। এখানে ছোট কাঁচের শিশিতে ভিসুভিয়াসের প্রত্যেকবারের অগ্ন্যুৎপাতের ছাই পর পর সাজিয়ে বিক্রয় হয়। তিন লিয়ার দিয়ে স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে একটা শিশি কিনলাম। এর পর লাইন একবারে তির্য্যক-



রঙ্গালয়ের আসন। সামনে কয়েকটি ব্রঞ্জ অক্ষরের লেখা এখনও আছে

ভাবে ভিসুভিয়াসের গা দিয়ে উঠেছে। পূর্ব্বে লাইনের 'গ্রেড' (grade) ছিল ৪ ফিটে এক ফিট অর্থাৎ প্রতি চার ফিট দূরত্বে লাইন এক ফিট উঁচু হয়েছে; এবার গ্রেড হ'ল দু ফিটে এক ফিটেরও বেশী (শতকরা ৫৫)।



গৃহস্থের তৈজসপত্র

এতক্ষণ পর্য্যন্ত ভিসুভিয়াসের গায়ে গ্রাম ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র দেখা যাচ্ছিল, এবার শুধু লাল ও কাল পোড়া মাটি দুদিকে ছড়ান; সজীবতার কোন চিহ্ন চোখে প'ড়ল না। একটি ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় নি। এইখান থেকে "ফানিকুলার" (funicular) রেলে উঠতে হয়; এর লাইন ভিসুভিয়াসের একটি পুরাণ মুখ পর্য্যন্ত উঠেছে। এ লাইনটি এমন খাড়াই যে এখানকার যানের আসনগুলিও ধাপে ধাপে সাজান (গ্যালারীর মত)। এখানকার যান একটি প্রকাণ্ড লিফ্‌টের (lift) মত; একটি ওঠে ও একটি নামে। এই লিফ্‌টটিতে উঠবার সময় বেশ শীত করে ও নীচের দিকে তাকালে অল্প স্বল্প ভয় করে। গায়ে দেবার জন্য কম্বল বা ওভারকোট এখানে এক লিয়ার দিলে ভাড়া পাওয়া যায়। সব ব্যবস্থাই কুক কোম্পানীর। কিছুদূর উঠে ভিসুভিয়াসের ধোঁয়ায় ও তীব্র গন্ধকের গন্ধে শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হতে লাগল; মাঝে মাঝে কাসি হতে লাগল। পম্পেয়াইএ একটি নারীর ও কুকুরের (যার গলায় লোহার বগলশটি এখনও আছে) প্রতিমূর্ত্তিতে শ্বাসবন্ধ হয়ে মৃত্যুর যে করুণ ও ভীষণ ছবি দেখেছিলাম—এখন সে যন্ত্রণার কতকটা অনুভব করলাম।

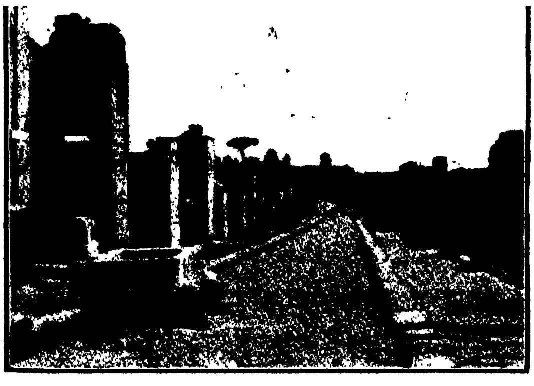
চতুঃপার্শ্বের রিক্ততা ও ভীষণতা শ্মশানের চেয়েও ভয়ঙ্কর; রুদ্রদেবের চিহ্ন এখনও মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। ভিসুভিয়াসের মাথায় উঠে লাভা, পোড়া পাথর ও গিরি রঙের পোড়া মাটির ওপর দিয়ে খানিকটা দূরে পুরাণ মুখটির কাছে এলাম, প্রকাণ্ড গহ্বর (দুই কিলোমিটার লম্বা চওড়া) একটি ছোট খাট পুষ্করিণীর মত। অদূরে নূতন মুখ দিয়ে তখনও অগ্নি বর্ষণ চলছে। বৃষ্টি ছেড়ে গিয়েছিল কিন্তু মাঝে মাঝে মেঘের পর্দ্দায় দৃষ্টি আড়াল ক'রছিল। দু'চার মিনিট অন্তর সহসা একটা প্রচণ্ড আওয়াজের সঙ্গে প্রস্তর বৃষ্টির আওয়াজ কানে আসছিল; কখনও সাদা হাল্কা মেঘের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছিল আকাশের গায়ে কে যেন মুঠো মুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছেন, কখনও গোলাপী রঙে হোলি খেলা চলছিল। সে আওয়াজ কাল-বোশেখীর ঝড়ের সময় বন্ধ ঘরের মধ্যে থেকে রুদ্ধ দ্বারে ক্রুদ্ধ প্রকৃতির প্রচণ্ড করাঘাত ও রুদ্ধশ্বাস যেমন শোনায় কতকটা তেমনি। সমস্ত পাহাড়টি সে সময় যেন ভয়ে কেঁপে উঠছিল। বহু ঊর্দ্ধে জ্বলন্ত পাথরের টুকরো

উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছিল। পুরাণ মুখটিতে (১৯০৬ সালের) নামা যায়; এর জন্য পৃথক সম্মতি দরকার হয়; ভিসুভিয়াসের মাথাতেই এখানে নামবার জন্য পৃথক গাইড পাওয়া যায়।



ফোরামের সাধারণ দৃশ্য—পেছনে ধূমায়মান ভিসুভিয়াস। সহরের সরল রাস্তা ও সহর সাজাবার নিখুঁত ভঙ্গী কতকটা বোঝা যাবে।

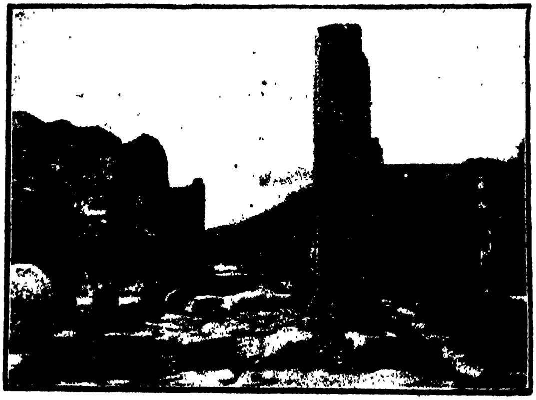
ভিসুভিয়াস থেকে সমুদ্র বড় সুন্দর দেখায়। সমুদ্রের ধারে দুটি গ্রাম চোখে পড়ে, একটি প্রবালের জন্য ও অপরটি 'মাকারোণী'র (এক রকম খাদ্য) জন্য বিখ্যাত।



ষ্ট্রীট অব এ্যাবাণ্ডান্স—রাস্তার ধারের জলের কল ও ফুটপাথ লক্ষ্য করুন

এক দিকে অসীম শান্ত বারিধির নীলম্বুরাশি, অন্য দিকে দুরন্ত ভিসুভিয়াসের ভয়াবহ অগ্নিপ্রবাহের মাঝে মন স্বতঃই প্রকৃতিদেবীর অপরূপ লীলা মহিমায় ডুব দেয়। সব চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে অগ্নিগর্ভ পাষাণের বুক থেকে ইতালীর সুবিখ্যাত দ্রাক্ষাগুচ্ছ কেমন ক'রে রস সঞ্চয় করে তাই ভেবে। বেশীক্ষণ এই ক্রুদ্ধ প্রলয়ঙ্করীর বুকে দাঁড়াতে ভরসা হ'ল না, তাই নেমে এলাম।

পম্পেয়াইএর ভয়াবহ পরিণতি ও ভিসুভিয়াসের



ষ্টাবিয়ান রোড, রাস্তার ওপরে পারাপারের জন্য পাথরগুলি লক্ষ্য করবার

রুদ্রমূর্ত্তির স্মৃতি এমনভাবে মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছিল, যে পরে নাপোলীর হোটেলে থাকতে, নীচে রাস্তায় ভারী লরীর গুরুগম্ভীর আওয়াজ এবং তার গতির ফলে হোটেলের কাঠামোয় যে কাঁপুনি জাগত, তাতে মাঝে মাঝে ভয়ে



ষ্ট্রীট অব ফরচুন—এই রাস্তাটি দেখে বোঝা যাবে সমগ্র সহরটি কি অক্ষতভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, রাস্তার ওপর চাকার দাগ সুস্পষ্ট

চ'মকে উঠতাম, মনে হ'ত ভিসুভিয়াস বুঝি আবার সর্ব্বগ্রাসী হ'য়ে তার তাণ্ডব সুরু ক'রলে।

পম্পেয়াইও ধ্বংস হবার আগে কয়েকবার ভূমিকম্পে

কেঁপে ওঠে, এক অভূতপূর্ব্ব শব্দ শোনা যায়—তারপর আরম্ভ হয় ছাইবৃষ্টি ও জ্বলন্ত পাথর বর্ষণ। উৎসারিত লাভা (lava) অগ্নমুখে প্রবাহিত হ'য়ে হারকিউলেনিয়ামকে ধ্বংস করে; পম্পেয়াই ছাই চাপা পড়ে। তিনদিন অবিরাম ভস্মবৃষ্টির পর সূর্য্যের আলো প্রকাশ পায়—এই তিন দিন গাঢ় অন্ধকারে আকাশ ছেয়েছিল—কিন্তু ভস্মবৃষ্টি থামলেও ভূমিকম্প থামে নাই। যারা এই ভীষণ খণ্ডপ্রলয়ের পরও পরমায়ু নিয়ে বেঁচেছিল, তাদের অনেকে আবার এসে তাদের ধনরত্ন নিয়ে গিয়েছিল, তবে এখানে বাস করা আর সম্ভব হয় নাই। তাই শরীর গতিবেগে সৃষ্ট কম্পনকে বারবার ভূমিকম্প ও তার আওয়াজকে ভিসুভিয়াসের গম্ভীর গর্জ্জন ব'লে ভুল হ'ত—নাপোলী না ছাড়া পর্য্যন্ত ভিসুভিয়াসের ভীষণ আতঙ্ক মন থেকে মোছে নাই।

বিরহ-মিলন কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শৈবালের মৃদু অথচ মর্ম্মান্তিক কথাটি সবিতা ও বিজনের কান এড়িয়ে গেলেও যার উদ্দেশে এই কথাগুলি বলা হ'ল তার কান এড়িয়ে যায় নি। শৈবাল চ'লে যাবার পরও মাধবী নিঃশব্দে নতমুখে ব'সে রইল। শৈবালের নিষ্ঠুর আঘাত, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ এবং তার মিথ্যা কথার নির্লজ্জ প্রকাশ—সমস্ত তার বুকের মাঝখানে গভীর ক্ষতের মত র'য়ে-র'য়ে জ্বলতে থাকল। তার সামনে যদি আর কেউ না থাকত তা হ'লে তার দুচোখ ছাপিয়ে জলধারা কপোল সিক্ত ক'রে নেমে আসত। এইভাবে সমস্ত অপমান আঘাতের তীব্র জ্বালা নিঃশব্দে সহ্য ক'রতে ক'রতে তার ইচ্ছা হ'ল এখনি সে ছুটে পালিয়ে সেই নির্জ্জন পরিত্যক্ত ঘরটায় ঢুকে বালিশে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকে।

বিজনের খাওয়া শেষ হ'লে সবিতা বললে—'খাওয়া দাওয়ার পর ভোলা ও-ঘরটা ঠিক ক'রে রাখবে—তুই ততক্ষণ রাণীর ঘরে বিশ্রাম ক'রগে যা। হাঁ রাণী, আজ কি আর খাওয়া দাওয়া ক'রতে হবে না মা। ও-ঘর থেকে বিজনের পানটা এনে দিয়ে খাবে এস।'

সবিতা রান্নাঘরে চ'লে গেল। মাধবী পানের ডিবে নিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল। বিজন তার হাত থেকে সেটা নিয়ে দুটো পান মুখে দিয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে চুপিচুপি বললে—'খাওয়া দাওয়া সেরেই আমার কাছে যাবেন কিন্তু। দেরী যেন না হয়, কেমন?'

মাধবী তখন পর্য্যন্ত মুখ তুলে বিজনের দিকে তাকাতে পারে নি; এই কথার পরও পারলে না, কেবল ঘাড় ঈষৎ হেলিয়ে সম্মতি জানাল। বিজন তার টকটকে রাঙা মুখের মাধুর্য্যটুকু উপভোগ ক'রতে ক'রতে উপরে উঠে গেল।

আহারে মাধবীর রুচি ছিল না তবু প্রত্যহের মত সবিতার সামনে কোনরকমে দুটি খেয়ে সে উপরে গেল। তার চোখের সামনে দিন রাত্তির যে ছবিটা রঙে বিচিত্রতর হ'য়ে তার সূক্ষ্ম রসানুভূতিকে জাগিয়ে রেখেছিল শৈবালের নিষ্ঠুর আঘাতে তা নষ্ট হ'য়ে গেল। মাধবী খানিকক্ষণ এঘর ওঘর ক'রলে, আলমারি থেকে একটা অসমাপ্ত ব্লাউজ বার ক'রে বসল সেটা শেষ ক'রতে, কিন্তু একটুখানি ক'রেই বিরক্ত হ'য়ে রেখে দিল। বইএর আলমারি খুলে লাল ফিতের পেজ মার্ক দেওয়া পল মোঁরার Open all night খানা বের ক'রে দাঁড়িয়েই তার কয়েকখানা পাতা উলটে পালটে রেখে দিলে। এমন বই এখন চাই, যা নিয়ে ওর দগ্ধ মন ভুলে থাকতে পারে—খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ওর চোখ প'ড়ল প্রবোধকুমার সান্যালের 'মহাপ্রস্থানের পথে'র উপর। তাড়াতাড়ি বইখানা বার ক'রে আলমারিটা দিল বন্ধ ক'রে। বইখানি নিয়ে মাধবী জানলার ধারটিতে চেয়ার টেনে এনে ব'সল। বইখানি খুলে তার উপর দুটি চোখ রাখলে কিন্তু পড়তে আর পারছে না। মন যে তার কোথায় প'ড়ে র'য়েছে তা তো সে স্পষ্ট অনুভব ক'রতে পারছে। তার শোবার

ঘরে খাটের উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে একজন তারই প্রতীক্ষায় নিঃশব্দে মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিচ্ছে—এ জেনেও সে তার কাছে যেতে পারছে না, অথচ সে জন প্রতি মুহূর্ত্তেই তাকে প্রবলভাবে টানছে—জোয়ারের নদী যে রকম দুর্ব্বার আবেগে বাঁধা-খেয়া-নৌকাকে টানে। মাধবীর মন ছল ছল ক'রতে লাগল।

এমনি ক'রে মিনিট কুড়ি নিঃশব্দে কেটে গেল। এই সময়টা যে কি ক'রে কেটেছে তা সেই জানে। প্রত্যেক নগণ্য মুহূর্ত্তটি যাবার সময় তাকে ঠেলা দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছে—বন্ধু আসি। হঠাৎ পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখলে তার ছোট ভাই ক্ষিতি খুব ব্যস্তভাবে নীচে নামছে। দুজনে চোখোচোখি হ'তেই ক্ষিতি বলে উঠল—'বাঃ তুমি এখানে ব'সে আছ দিদি, আমি ওদিকে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি!'

মাধবী ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বললে—'চোখ বুজে খুঁজলে আর কি ক'রে দেখতে পাবি। কি দরকার শুনি?'

'শৈবালদা তোমাকে একবার ডাকছে দিদি! চল এখ্‌খুনি।'

মুহূর্ত্তে মাধবীর বুক দুলে উঠল। অপরিসীম বিস্ময় যেন তাকে নির্ব্বাক ক'রে দিল। শৈবাল যে তাকে আজ কোন কারণে ডাকতে পারে একথা কল্পনা করাও যে তার পক্ষে অসম্ভব হয়েছিল। আজ শৈবাল নিজে থেকেই যে সব কলহের সৃষ্টি ক'রে গেছে যে রকম নির্ম্মমভাবে তাকে ক'রেছে আঘাত—তা সহজে ভোলবার নয় এবং মাধবী আশা ক'রেছিল সহজে এর মীমাংসা হবে না—হওয়া সম্ভবও নয়। সেই শৈবাল ডেকে পাঠিয়েছে এ কথা বিশ্বাস হয় কি ক'রে? মাধবী তার বিস্ময় ও কৌতূহল এতটুকু প্রকাশ হ'তে দিল না। তার মুখের দিকে চেয়ে শান্তকণ্ঠে জিগ্‌গেস ক'রলে—'ডাকছে কেন জানিস?'

'তা জানি না' ক্ষিতি গড়গড় ক'রে বললে—'আমি আর সুনীল কেরম খেলছি শৈবালদা বসে বললে—ক্ষিতি তোমার দিদি কি ক'রছে জান? আমি বললুম দিদি বিভাস মামার সঙ্গে গল্প ক'রছে—'

মাধবী বাধা দিয়ে রাগতভাবে বললে—'কেন তুই না জেনে ওকথা বলতে গেলি? আমি তো একা এই ঘরে ব'সে পড়ছি।' বলেই কথাটা নিজের কানে খট্ করে বাজল। ক্ষিতি যদি ওকথা শৈবালকে বলেই থাকে তাতে কি হয়েছে! মাধবী তো কোন অন্যায় করে নি।

'বাঃ তা আমি কি ক'রে জানব' ক্ষিতি বললে—'তোমাদের দুজনকে তখন নীচে দেখতে পেলুম না যে। তাই—'

মাধবী তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'তারপর শৈবালদা কি বললে?'

'আমার কথা শুনে শৈবালদা তখ্‌খুনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই আবার ঘরে এসে বললে—রাণীকে একবার এখ্‌খুনি আমার নাম ক'রে ডেকে নিয়ে এস'।

মাধবী একটুখানি কি যেন ভাবলে। তারপর বললে—'শৈবালদা তোর কথা শুনে অমন ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কেন?'

ক্ষিতি অধীর হ'য়ে বললে—'তা আমি কি ক'রে জানব। তুমি আমার সঙ্গে এখন চল না।'

'শৈবালদাকে ব'লগে যা দিদি একটু পরে আসছে।'

'একটু পরে গেলে হবে না যে। এখন চল।'

'তুই বল গে যা না, একটা কাজ সেরে দিদি একটু পরে আসছে।'

ক্ষিতির ধৈর্য্যচ্যুতি অনেক পূর্ব্বেই ঘটেছিল। এখন মাধবীর এই ঔদাসিন্যে তা ক্রোধে পরিণত হ'ল। কোপ দৃষ্টিতে তাকে ভস্ম করে বললে—'কি তোমার কাজ যে যেতে পার না?'

মাধবীর মনটাও ভাল ছিল না। তার উপর ছোট ভাইয়ের এই স্পর্দ্ধায় সে একেবারে জ্বলে উঠল। ধমক দিয়ে বললে—'তোর সে খোঁজে দরকার কি? বড় যে স্পর্দ্ধা হ'য়েছে তোর দেখছি!'

অকস্মাৎ এই ভৎর্সনায় ক্ষিতি থতমত খেয়ে গেল। মাধবীও একটু বিস্মিত হ'ল ক্ষিতির এই কর্ত্তব্যপরায়ণতায়। ভাইকে সে জানে, পরের জন্য এতটা উদ্বেগ, পরের কাজের জন্য এতটা মাথা-ব্যথা তার কুষ্ঠীতে লেখে নি। তাই তার এই আকস্মিক আচরণে বিস্মিত হ'য়ে ভাবলে—এই ভাইটির মধ্যে এমন মহৎ উদার টনটনে কর্ত্তব্যবোধ জাগিয়ে তুললে কে। কিন্তু ক্ষিতির এই গভীর কর্ত্তব্য-

পরায়ণতার মূলে যে জিনিষটা অহরহ অনুপ্রেরণা দিচ্ছে সেটা হ'চ্ছে এই—আজ দুপুরে প্রতিদিনের মত ক্ষিতি আর সুনীল চ্যাম্পিয়ন খেলছিল কেরমে। ঠিক যখন খেলাটা পুরোদমে জমে উঠেছে এমন সময় গম্ভীরানন শৈবাল ঘরে বসে তাকে করলেন এই অলঙ্ঘনীয় আদেশ। মনে মনে শৈবালের মুণ্ডপাত ক'রতে ক'রতে বাধ্য ছেলেটির মত ক্ষিতি আদেশ পালনে তৎপর হ'ল। কিন্তু মাধবীর মুখ থেকে এই জবাব পেয়ে তার ক্রোধ প্রচণ্ড হ'য়ে উঠল এবং সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল মাধবীর উপর।

ক্ষিতি অকস্মাৎ করুণ হ'য়ে বললে—'তুমি যাবে না তো?'

'না—না--না—না' প্রত্যেকটা দন্ত্যনএ আকার ক্ষিতির বুকে শেলের মত হানিয়ে মাধবী বললে—'জিগ্‌গেস করি, আমার যাওয়া না যাওয়া নিয়ে তোর কি যায় আসে?'

চোখ রাঙিয়ে কার্য্যোদ্ধার সুবিধে হবে না দেখে সুবোধ ছেলেটির মত ক্ষিতি সত্য কথা স্বীকার ক'রে ফেলল। কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বললে—'শৈবালদা যে আমাদের খেলবার ঘরে ব'সে আছে। তুমি না গেলে ওখান থেকে উঠবে না। হয়তো রাগ ক'রে ব'লে বসবে—খেলা তুলে আঁকের খাতা নিয়ে বস।'

এতক্ষণে তার ব্যগ্রতার হেতু মাধবী বুঝলে। যদিও তার মনের অবস্থা ভাল নয় তথাপি সে সমস্ত বিস্মৃত হ'য়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বললে—'কেমন জব্দ, আরও আমাকে চোখ রাঙাও!'

'আচ্ছা আর কখ্‌খনো ক'রব না। তুমি চল।'

'তুই যা, আমি বিজনবাবুকে একটা কথা বলেই যাচ্ছি। দাঁড়িয়ে রইলি কেন? শৈবালদা কিচ্ছু বলবে না, কোন ভয় নেই।'

ক্ষিতি আস্তে আস্তে বললে—'শৈবালদাকে গিয়ে তবে বলি, দিদি তোমাকে ওপরের ঘরে গিয়ে ব'সতে বললে। সে এখ্‌খুনি আসছে।'

মাধবী পুনরায় হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বললে—'তাই বলিস।'

দিদির অভয়বাণী পেয়ে আর ক্ষিতি এক মিনিট দাঁড়ায় নি। মাধবীর কথা শেষ হ'তেই ছাড়া পাওয়া ঘোড়ার মত একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে চকিতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এই কয়েক মিনিটের মধ্যে ক্ষিতি যেন তার মনকে বিস্ময়ের অতলে ডুবিয়ে দিয়ে গেল। শৈবাল তাকে ডেকেছে—বিশেষ প্রয়োজনে ডেকেছে—মাধবীর মনে এই কথাটা তোলপাড় ক'রতে লাগল। কি প্রয়োজন, শৈবালের কি প্রয়োজন তার সঙ্গে থাকতে পারে—যাতে এইসব ঘটনার পরও তাকে এমন ক'রে ডেকে পাঠাতে হয়! এই চিন্তায় তার মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত কেটে যেতে লাগল। কত কথা—কত কল্পনা—কত চিন্তা জল বুদ্‌বুদের মত তার মনের সায়রে ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, কত সন্দেহ কত সংশয় বুকের রক্তে দোলা দিয়ে গেল তবু এ আহ্বানের যথার্থ কারণ নির্ণয় হ'ল না। কেন এই অপ্রত্যাশিত আহ্বান—কিসের জন্য? বাইরের দিকে চেয়ে মাধবী ভাবতে লাগল—সম্ভবতঃ কি কারণে শৈবাল এমন ক'রে ডাকতে পারে। আচ্ছা এও তো হ'তে পারে শৈবাল আবার তাকে অন্য কোন ছুতা ক'রে আঘাত করবার জন্য অপমান করবার জন্য ডেকেছে। এখন তার মনের অবস্থা যে কি তার তো তা অজানা নেই। এই তো এখন তার সম্বন্ধে ভাবা যায়। এ ছাড়া আর কি হ'তে পারে। আজকের এই ঘটনার অন্য কোন সূত্র ধরে শৈবাল পুনরায় তাকে আঘাত ক'রতে উদ্যত হ'য়েছে এই সম্ভাবনা মনে উদয় হ'তেই রোষে ক্ষোভে উত্তেজনায় তার বুকটা দ্রুতগতিতে ওঠা নাবা ক'রতে লাগল।

তবু মাধবী ভাবতে লাগল এর অন্য কারণ কি! সব দিক দিয়ে এর কারণ ভেবে দেখতে দেখতে হঠাৎ আর একটা সম্ভাবনায় তার সমস্ত অন্তর মেঘমুক্ত দিনের মত উজ্জল হ'য়ে উঠল। ঠিক হ'য়েছে—এর কারণ অনুমান করা তো খুব সহজ—এতক্ষণ এই কথাটা সে বুঝতে পারছিল না। আজ শৈবাল সামান্য কারণে যে অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্রপাত ক'রে গেছে, নির্ম্মমভাবে তাকে আঘাত ক'রেছে বিনা কারণে--ক'রেছে কটূক্তি—এখন সেই সবের জন্য তার অনুশোচনা হ'য়েচে। এখন তীব্রভাবে সে অনুভব ক'রছে কি ভুল, কি অবিচার সে তার উপর ক'রেছে সাময়িক উত্তেজনায় দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হ'য়ে। তাই যখন সে নিজের দোষ বুঝলে তখন কালবিলম্ব না ক'রে তাকে আহ্বান ক'রলে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইবার জন্য। শৈবাল শিক্ষিত হৃদয়বান যুবক, তার পক্ষে এই

পরিবর্ত্তনই তো স্বাভাবিক। আর তা ছাড়া শৈবাল সম্বন্ধে একথা ভাববারও কারণ আছে। বছরখানেক আগেকার একটি দিনের কথা মাধবীর স্মরণ হ'ল। সে দিন চায়ের টেবিলে ব'সে চা খেতে খেতে দুজনের মধ্যে কি একটা কথা নিয়ে হয় বচসা। শৈবাল চা এবং খাবারের প্লেট ফেলে উঠে চ'লে গিয়েছিল। দোষ অবশ্য হ'য়েছিল শৈবালের এবং নিজের এই দোষ বুঝতে পেরে সেইদিনই সে এসে মিটমাট করেছিল। সেই তো শৈবাল—সুতরাং আজ তার এমনতর আচরণে তো বিস্মিত হবার কোন কারণ নেই, বরঞ্চ এই তো স্বাভাবিক। এমনতর অনেক চিন্তা অনেক কল্পনা অনেক দ্বিধার পর মাধবীর সংশয়-ক্ষুব্ধ মনে অবশেষে এই ধারণা বদ্ধমূল হ'ল, তাকে আঘাত অপমান ক'রতে নয়, তার কাছে দোষ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইতে, প্রীতি স্থাপন ক'রতে শৈবাল তাকে এমন ক'রে আহ্বান ক'রেছে। মাধবী তো মনে প্রাণে এই কামনা করে। এই কথাটা আবিষ্কার করবার পর একটা তীব্র আনন্দের অনুভূতি মাধবীর মধ্যে উঠল প্রবল হ'য়ে। মাধবী নিশ্চিন্ত হ'ল—সুখী হ'ল। তার চোখের সামনে দিয়ে রাত্রির ছবিখানা আবার রঙে রসে বৈচিত্র্যে উজ্জ্বল মধুর হ'য়ে উঠল। এমনই হয়, ঘাত প্রতিঘাতের পর মানুষের বিদগ্ধ মনে যখন আনন্দের বার্ত্তা এসে পৌঁছায় তখন সেই আনন্দ মনকে এমনই আত্মহারা করে।

মাধবী বইখানা আলমারিতে যেমন-তেমন ক'রে রেখে ক্ষিপ্রপদে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বিজন তারই জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা ক'রে র'য়েছে তার সঙ্গে দেখা করে কিছুক্ষণের অনুপস্থিতির অনুমতি নিয়ে শৈবালের সঙ্গে দেখা ক'রতে যাবে। কিন্তু এই মনোমালিন্যের পর চোখোচোখি হওয়ার কল্পনায় সে কুণ্ঠিত হ'য়ে উঠল। শৈবাল নিজের ব্যবহারের জন্য যখন অনুতপ্ত হ'য়ে দুঃখ প্রকাশ ক'রবে তখন মাধবী যে কোন প্রকারে হ'ক এই লজ্জাকর প্রসঙ্গটা উড়িয়ে দিতে সক্ষম হবে, কিন্তু এ ব্যাপারে ওপক্ষই তো কেবল দোষী নয়, তার নিজেরও যে গলদ র'য়েছে। শৈবাল যদি কথায় কথায় তার সেই নিষ্করুণভাবে প্রকাশিত মিথ্যাচারের কথা উল্লেখ করে, তখন সেই অপরিসীম লজ্জার হাত থেকে সে নিজেকে বাঁচাবে কি ক'রে! কিন্তু তা কি সে ক'রতে পারে? না: এ শৈবাল কোনমতেই ক'রতে পারে না। এই রকম নানা সন্দেহ নিয়ে মাধবী দ্বিধায় ঘরে ঢুকল। দেখলে বিজন একা খাটের উপর চুপ ক'রে ব'সে উদাস দৃষ্টিতে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। দৃশ্যটা তার চোখে খুবই খারাপ ঠেকল। বিজন আজ তার বাড়ীর সম্মানিত অতিথি। সে এই রকম একা ঘরে ব'সে মিনিটের পর মিনিট কাটিয়ে দিচ্ছে। বাড়ীর একটি প্রাণীও তার কাছে নেই। ছি ছি সে কি ভাবছে! মাধবী লজ্জায় রাঙা হ'য়ে উঠল।

মাধবীকে দেখেই বিজন নিরসকণ্ঠে বললে—'এই যে আসুন'। মাধবী লজ্জিত হ'য়ে তার সামনে এলে পর বিজন বললে—'আপনি তো পরমানন্দে হাসিতে গল্পে সময় কাটাচ্ছিলেন, এদিকে একা ঘরে ব'সে আমার কি অবস্থা হ'চ্ছিল তা কি ভেবেছেন?' মাধবীর নিঃশব্দ নতমুখের দিকে চেয়ে বিজন তারপর বললে—'এখন আমার সঙ্গে ব'সে সময় নষ্ট ক'রতে যদি নাই পারবেন তো এটা তখন এসে ব'লে গেলেই হ'ত। আমি নিশ্চয় আপনাকে জোর ক'রে ধরে রাখতাম না।'

তার মুখের হাসি সত্বেও এর অন্তরালের নিহিত অভিযোগ মাধবীকে আঘাত ক'রলে। তার এই অভিযোগ তো মিথ্যা নয়, মাধবী দেখলে তার এই অনুপস্থিতি তাকে ক্ষুব্ধ করেনি, বিজন ক্ষুব্ধ আহত হ'য়েছে এই কথা ভেবে—এই অনুপস্থিতির মধ্য দিয়ে মাধবী তাকে অবজ্ঞা ক'রেছে। মাধবী সমস্তই বুঝলে। অপরাধীর মত মাথা নত ক'রে আস্তে আস্তে বললে—'আমি ভেবেছিলুম আপনি ঘুমিয়ে প'ড়েছেন তাই আসি নি।'

মাধবীর কথায় সত্যের অপলাপ ছিল কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে ও মুখের ভাবে এমন একটা কিছু তার নজরে প'ড়ল যাতে মাধবীর কথা তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস ক'রতে তার বাধল না। মাধবীর হয় তো কোন দোষ নেই। হয় তো সে সত্যই তাই ভেবেছিল। বিনা কারণে ঐ নতমুখী সুন্দরী মেয়েটিকে শ্লেষ ক'রে বিজনের আর অনুশোচনার অবধি রইল না। কেন সে তাকে ব্যঙ্গ ক'রলে? তার কথা শেষ হ'লে একটু পরে বিজন বললে—'ভেবেছিলেন ঘুমিয়ে প'ড়েছি? কিন্তু সে রকম তো কথা ছিল না।'

মাধবী নিরুত্তরে নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

বিজন বললে—'আপনার ইনট্যুইশন তাহ'লে ঠিক হয় নি একথা আশা করি অকপটে স্বীকার ক'রছেন ?'

বিজন তাহ'লে পরিহাস ক'রছে নাকি ! মাধবী আনত দুটি চোখ ভয়ে ভয়ে তুলতেই দেখলে বিজন সহাস্যমুখে স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে। মাধবী সেই মুহূর্ত্তে চোখ নামিয়ে নিয়ে সলজ্জে বললে—'করছি।'

'এই ভুলের শাস্তিও নিতে রাজী আছেন ?'

'তাও আছি।'

'বেশ আমার সামনে এসে বসুন।'

'বসছি।'

'এই শাস্তি বুঝলেন !'

'এ কি রকম ?'

'এখন ঘণ্টা দুই কোথাও যেতে পারবেন না'—বিজন হেসে বললে—'এ ছাড়া সুন্দরী মেয়েকে আর কি শাস্তি দিতে পারি।'

মাধবী বিপদে প'ড়ল। এ কি ক'রে হবে ? এখনি যে তাকে যেতেই হবে শৈবালের কাছে। কিন্তু মুখ ফুটে একথা কি ক'রে ব'লবে—আমাকে মিনিট কুড়ির জন্য বাইরে যাবার অনুমতি দাও, ফিরে এসে তোমার সঙ্গে প্রাণভরে গল্প ক'রব। তুমি হয় তো জান না আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় তোমার কথা শোনবার জন্য উন্মুখ হ'য়ে থাকে।

'এ শাস্তি কি খুব গুরুতর মনে হ'চ্ছে ?'

মাধবী একবার মুখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল।

'চুপ ক'রে আছেন যে, কথা বলুন !'

মাধবী আবার সেইরকম ক'রলে। সে যে কি একটা কথা বলবার জন্য উসখুস ক'রছে অথচ পারছে না—তা বিজনের তীব্রদৃষ্টিতে ধরা প'ড়ল। সে পুনরায় বললে—'কি আশ্চর্য্য, কি ব'লতে চান বলুন ! বাবারে বাবা, আপনার মান ভাঙাতে আর পারি নে।'

মাধবী জোর ক'রে হেসে বললে—'অভয় দিচ্ছেন তো ?'

'হাঁ।'

'তা হ'লে বলি ?'

'বলুন।'

'নাঃ, আর বলা হ'ল না।'

'সে কি ! ব'লবেন না কেন ?'

'বাবাঃ আপনি যে রকম গম্ভীর হ'য়ে আছেন। না হাসলে ভরসা পাচ্ছি না।'

'আমি ভাল ক'রে না হাসলে ব'লবেন না ?'

'উঁহু।'

বিজন তার এই ছোট্ট খুকির মত আবদার দেখে গভীর আমোদ পেয়ে হেসে উঠল। বললে—'এই তো হাসলাম, এবার বলুন !'

মাধবী দ্বিধাজড়িতকণ্ঠে বললে—'একবার আধঘণ্টার জন্য আমাকে ছুটি দেবেন ?'

'কেন ?'

'একটা বিশেষ দরকার আছে তাই।'

'বেশ তো যান্। তার জন্য এত কুণ্ঠা কেন !'

'একটা বিশেষ দরকার প'ড়ল ব'লেই—নইলে—'

'তা জানি। যান্।'

'আপনি কি একা ব'সে থাকবেন ?'

'কি ক'রব ?'

'তবে থাক্, আমি যাব না।'

'কেন যাবেন না ? আপনার যে দরকার আছে।'

'তা থাক। আপনাকে এমনভাবে ফেলে যেতে পারব না।'

'না, তা হবে না' বিজন জেদ ক'রে বললে—'আপনাকে দরকার সেরে আসতেই হবে।'

বিজন মাধবীর মুখের দিকে নির্নিমেষে কয়েক মুহূর্ত্ত চেয়ে থেকে বললে—'তাতে কিছু এসে যাবে না। একথা কেন মিথ্যে ভাবছেন—আমাকে এখানে বসিয়ে রেখে কাজে গেলে আমি ভাবব—আপনি আমাকে অবহেলা ক'রলেন !' তার কণ্ঠস্বর সহসা একটুখানি কেঁপে উঠল, বললে—'একদিনের পরিচয় হ'লেও আমি আপনাকে চিনি। এতখানি নির্ম্মম তো আপনি আমার ওপর হ'তে পারেন না !'

মাধবীর সমস্ত মুখ অকস্মাৎ টকটকে রাঙা হ'য়ে উঠল এবং পরক্ষণেই অসীম লজ্জায় তার দৃষ্টি আনত হ'ল। বিজনের আবেগকম্পিত শেষের কথাটি তার অন্তরের কোমল স্থানে গিয়ে আশ্চর্য্যভাবে স্পর্শ ক'রলে এবং সেই নিমিষেই কি এক অনির্ব্বচনীয় উপলব্ধিতে তার সারা অন্তর কূলে পরিপূর্ণ হ'য়ে দুলে দুলে উঠল। মনের কুঞ্জে লাগাল

রঙের মায়াময় ছোঁয়াচ। বাইরের লজ্জা এবং ভিতরের নিবিড় অচিন্ত্যপূর্ব্ব উপলব্ধি তাকে স্তব্ধ ক'রে রাখলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নীরবেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দুজনের এই স্তব্ধতার মধ্যে যে অর্থ নিহিত ছিল তা দুজনের কার'র কাছেই গোপন থাকল না।

ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই কিন্তু সিঁড়ির মুখে সে থমকে দাঁড়াল। নীচের সিঁড়িতে মৃদু পদশব্দ, কারা যেন কথা কইতে কইতে উপরে উঠছে। অপরিসীম কৌতূহল ও চাঞ্চল্যে তার বুকের ভেতরটা অকস্মাৎ আলোড়িত হ'য়ে উঠল। ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ নেমে মুখ বাড়িয়ে দেখলে সবিতা এবং শৈবালের মা মায়ারাণী উপরে আসছে। মাধবী বুঝল তাসখেলার জন্ম সবিতা নিয়ে এসেছে মায়ারাণীকে। তার ইচ্ছা হ'ল এই নিমেষেই ছুটে ওদিককার সিঁড়ি দিয়ে নীচে পালিয়ে যায়। কারণ সে বিলক্ষণ জানে—সবিতার সঙ্গে দেখা হ'লে এক মিনিটের জন্যও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না—এই মুহূর্ত্তেই তাস খেলতে ব'সতে হবে। অথচ সবিতার কাছ থেকে জোর ক'রে যে যাবে তারও উপায় নেই, সঙ্গে মায়ারাণী র'য়েছে। কিন্তু নিমেষের এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার পূর্ব্বেই তাদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হ'য়ে গেল। সবিতা ভালভাবে তাস খেলা হবার সম্ভাবনার আশায় হর্ষপ্রকাশ ক'রল, মাধবী নৈরাশ্যে অচঞ্চল হ'য়ে থাকবার প্রয়াস ক'রলে। শৈবালের কাছে যাবার এখন কোন উপায় নেই, মাধবী নাছোড়বন্দা—সবিতার হাতে নিরুপায়ের মত আত্মসমর্পণ ক'রে তাদের সঙ্গে ঘরে ঢুকল। তারপর বিজনের সঙ্গে মায়ারাণীর পরিচয় প্রণাম আশীর্ব্বাদ—দুজনের মধ্যে সুস্নিগ্ধ আলাপ আলোচনা ইত্যাদির পর ঘরের মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে চারজনে বসল তাস খেলতে। তাস হাতে ক'রে মাধবী ভাবছিল, তার এখন না যাওয়ার কারণ যদি এই দেখান যায়—তবে শৈবালের তা মনঃপূত হবে কি না। এদিকে দেখতে দেখতে তাদের খেলা খুব জমাটি হ'য়ে উঠল।

মিনিট পনের কুড়ি কেটেছে, খেলা চ'লছে পুরোদমে, কার'র মুখে একটি কথাও নেই, সকলের দৃষ্টি হাতের তাসের উপর, তাদের সকলকে ঘিরে একটি স্তব্ধতা স্থির হ'য়ে র'য়েছে। এমন সময় একটি দশ বার বছরের সুশ্রী ছেলে সলজ্জে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল।

মায়ারাণী বললেন—'কি রে খোকা?'

মায়ারাণীর কথায় সকলেই সেইদিকে তাকাল। মাধবী দেখলে—শৈবালের ভাই সুনীল এসেছে।

সুনীল সলজ্জে বললে—'রাণুদিকে একটা কথা ব'লব।'

সবিতা জিগ্গেস ক'রলে—'কি কথা সুনীল?'

'জ্যাঠাইমা এবার আপনি তাস দিন না'—মাধবী তাঁজ-করা তাসগুলা তাঁর দিকে ঠেলে দিয়ে সহসা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'আমি এখখুনি আসছি।'

'বেশী দেরী করিস নে যেন।'

সুনীলের হাত ধরে মাধবী পাশের ঘরে নিয়ে গেল। তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—'কি বলবে বল?'

সুনীল বললে—'তোমাকে দাদা ডাকছে রাণুদি, আমার সঙ্গে চল।'

'কেন ডাকছে জান?'

'তা তো বলে নি দাদা, ক্ষিতিকে আবার আসতে বলেছিল—ও বললে, দিদি আমার কথা শুনবে না—তাই আমাকে পাঠালে।'

'তোমাকে কি বললে?'

'বললে যে' সুনীল ঈষৎ দ্বিধায় বললে—'তোর রাণীদিকে একবার সঙ্গে ক'রে ডেকে নিয়ে আয়—যদি এখন না আসে বলিস আর আসবার দরকার নেই। তুমি এখনি একবার আমার সঙ্গে চল না রাণুদি।'

মাধবী চুপি চুপি বললে—'একটা কথা ব'লতে পার সুনীল?'

'কি বল?'

'তোমার—তোমার শৈবালদা আজ ভয়ানক রেগে আছে, না?'

কথাটা যে কতখানি সত্য তা সুনীলের চেয়ে বেশী আর কে জানে! কিন্তু পাছে তার মুখের এই সত্য কথা মাধবীর যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটায় বা অন্য কোন বিপদ উপস্থিত করে, এই জন্য সুনীল বেমালুম সব বুদ্ধি খরচ ক'রে বললে—'রেগে থাকবে কেন রাণুদি? কি হ'য়েছে?'

'রেগে নেই?'

'কই না তো। তুমি চল না রাণুদি।'

মাধবী নিশ্চিন্ত হ'ল। তার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ

রইল না ক্ষিতি হতভাগাটা তাকে তাড়াতাড়ি ওখানে নিয়ে যাবার জন্য মিথ্যে ক'রে শৈবালের রাগের কথা ব'লেছিল। সে যাক, কিন্তু যে আবার বিশেষ প্রয়োজনে সুনীলকে দিয়ে ডেকে পাঠালে তার কি হবে! বিশেষ প্রয়োজনটা যে কি—তা তো মাধবীর অজ্ঞাত নেই। মাধবী ভাবলে এই মুহূর্ত্তেই সুনীলের সঙ্গে শৈবালের কাছে চ'লে যায়, কিন্তু একটু পরেই তার মনের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটল। আচ্ছা—মাধবী সকৌতুকে মনে মনে ভাবলে, সে যদি এখন নাই যায়—তো কেমন হয়! সে নিশ্চয় জানে শৈবাল তার অনুতপ্ত হৃদয়ের ভার লাঘব করবার জন্য চঞ্চল হ'য়ে তাকে বার বার ডেকে পাঠাচ্ছে। এখন যদি সে না যায় তাহ'লে শৈবাল ভাববে যে মাধবী তার নির্ম্মম ব্যবহারে এত মর্ম্মাহত হয়েছে যে তার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখতে সে রাজী নয়। এই অবস্থায় যদি শৈবাল এই কথা ভাবে তাহ'লে সে কি চুপ ক'রে থাকতে পারবে? কখনো না, তাকে এইখানে ছুটে আসতেই হবে। মাধবী যদি তাই করে তাহ'লে সবটা মিলে কেমন অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি হয়!

মাধবী আস্তে আস্তে বললে—'আমি তো এখন যেতে পারব না সুনীল!'

'কেন রাণুদি, এখ্খুনি তো চ'লে আসবে! একবার চল না।'

'কি ক'রে যাব ভাই তাস খেলছি যে, আর শরীর আমার ভয়ানক খারাপ—এখুনি হয়তো জ্বর আসবে, আজ আমি কিচ্ছু খাই নি। নেহাৎ ওরা ছাড়ছে না তাই খেলছি।'

'যেতে পারবে না?'

'না ভাই।'

'তা হ'লে গিয়ে দাদাকে বলি—রাণুদি কিচ্ছু খায় নি, শরীর বড্ড খারাপ হ'য়েছে এখুনি জ্বর আসবে—তাই আসতে পারলে না!'

'হাঁ।'

সুনীল প্রস্থান ক'রলে পর মাধবী সকৌতুকে ভাবলে মোক্ষম চাল চালা হ'ল। এর পর কি শৈবাল না এসে পারে। এই জিনিষকে আশ্রয় ক'রে মাধবীর কল্পনা স্রোতের নৌকার মত তর্ তর্ ক'রে এগোতে লাগল। এখনি শৈবাল এসে প'ড়বে। মিটে যাবে সব কলহ বিবাদ মনোমালিন্য, সব আঘাতের জ্বালা ভুলে গিয়ে তাদের মধ্যে ফিরে আসবে সেই প্রীতি মমতা স্নেহ শ্রদ্ধা।

কিছুদিন আগে কোন এক গানের সভায় হরেন চাটুয্যের মুখে 'প্রিয় তোমার কাছে যে হার মানি, সেই তো আমার জয়' গানখানি তাকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ক'রেছিল, আজ তারই অপূর্ব্ব সুর তার মনে স্বতঃ উৎসারিত হ'চ্ছে পিয়ানো বাজিয়ে তারা কোটা উষ্ণ সন্ধ্যায় আজ সেই গানখানি গাইবে। কত গল্প হবে তাদের তিনজনের মধ্যে। আনন্দ গুঞ্জনে কলরবে কত অফুরন্ত কথার ফাঁকে কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যাবে তা তাদের খেয়ালই থাকবে না, এই আনন্দের অনুভূতি নিয়ে মাধবী ঘরে এসে তাস খেলায় যোগদান ক'রলে। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হ'য়ে রইল একজনের পদধ্বনির আশায়। সে আসে—আসে—আসে।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা বেজে যাবার পর তাদের তাস খেলা ভাঙল। মায়ারাণী চ'লে যাবার আগে বিজন ও মাধবীকে পরের দিন দুপুরে তাঁর বাড়ীতে খাবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেলেন। সবিতা বিজনের বৈকালিক জলখাবার আয়োজন করতে নীচে গেল।

বৈকাল শেষ হ'য়ে এল। পশ্চিম আকাশে অজস্র রঙের খেলার মধ্য দিয়ে দিনান্তকালের সূর্য্য যাচ্ছে অস্তাচলে, অদূরে নারকেল বনের ফাঁক দিয়ে পশ্চিম দিগন্তের গায়ে আগুনের একটানা স্রোত দেখা যাচ্ছে। নারকেল গাছের ঘন সবুজ ঝালরগুলি সোণা মেখে মৃদু মৃদু কাঁপছে। আর সূর্য্যাস্তের রাঙা আলো এসে মাধবীর সুকুমার মুখে, মাথার চেরা সিঁথিতে, ঘন সুগন্ধ কেশে প'ড়ে অপরূপ সুষমাময় করে তুলেছে। বিজন মুগ্ধ হ'ল। কিন্তু তার মুখের অপরূপ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকার পরিবর্ত্তে তার সূর্য্য-রক্তিম সিঁথিতে এয়োতির চিহ্ন কল্পনা ক'রে অকস্মাৎ তার বুকের ভেতরটা শির্ শির্ ক'রে উঠল।

বিজন বললে—'বিকালটা কি ক'রবেন? চলুন দুজনে খানিকটা ভাল ক'রে বেড়িয়ে আসি।'

মাধবী লজ্জিত হ'য়ে বললে—'মোটর ত নেই। বাবা কলকাতায় নিয়ে গেছেন।'

'মোটর কি হবে? এমনি পায়ে হেঁটে খানিকটা মাঠের ধারে বেড়িয়ে আসব।'

'বেশ, তাই যাবেন আপনি।'

'বাঃ আমি একা যাব নাকি? আপনিও সঙ্গে যাবেন, দুজনে না হ'লে বেড়িয়ে আনন্দ আছে। নিন—নিন—ঠিক হ'য়ে নিন। বিকালে বাড়ী ব'সে থাকতে আমার অসহ্য লাগে।'

'বেড়াতে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নেবেন?'

'হাঁ।'

'শাস্ত্রের উপদেশ কিন্তু আপনার অমান্য করা হয়—পথিনারীবিবর্জ্জিতা।'

'তা হ'ক—আপনাকে পেলে আমি অনেক উপদেশ অমান্য ক'রতে পারি।'

একটু পরেই বৈকালিক জলযোগ ক'রতে সবিতার আহ্বানে বিজন নীচে নেমে এল। একধারে একখানা আসন পাতা রয়েছে, তার সামনে দুধের মত শাদা পাথরের থালায় খোসা ছাড়ান নানারকমের উৎকৃষ্ট ফল ও মিষ্টান্ন এবং কাঁচের গেলাসে সুগন্ধি বরফসংযুক্ত জমাট তরমুজের সরবৎ।

সবিতা এদিক ওদিক চেয়ে বললে—'রাণী গেল কোথা? জলখাবারটা এসে খেয়ে যাক্ না বাপু।

তরমুজের সরবতের গেলাসে মৃদু চুমুক দিয়ে সেটা ঘুরিয়ে নাড়তে নাড়তে বিজন জবাব দিল—'বেড়াতে যাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে।'

'কোথায় বেড়াতে—এই যে একেবারে সাজসজ্জা ক'রেই এসেছিস! চল, খাবার খাবি চল।'

'আমার এখন খেতে একটুও ইচ্ছে ক'রছে না কাকীমা'—মাধবী রূপের তরঙ্গ তুলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললে—'সন্ধ্যাবেলা এসে খাব।'

'তরমুজের সরবৎ ক'রেছি, তাই একটু খেয়ে যা না!'

'আচ্ছা দা-ও।'

বিজন বললে—'দেরী না ক'রে খেয়ে আসুন। এদিকে যে সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে তা লক্ষ্য ক'রেছেন।'

সবিতা চ'লেই যাচ্ছিল, বিজনের কথা কানে যেতেই ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—'ওকি রাণীর সঙ্গে আবার 'আপনি' 'আজ্ঞে' ক'রে কথা কি। ও তোর চেয়ে অনেক ছোট তা জানিস? না—না—ও সব কেতাবি চাল এখানে চ'লবে না। রাণীকে 'তুমি' ব'লেই কথা কইতে হবে।'

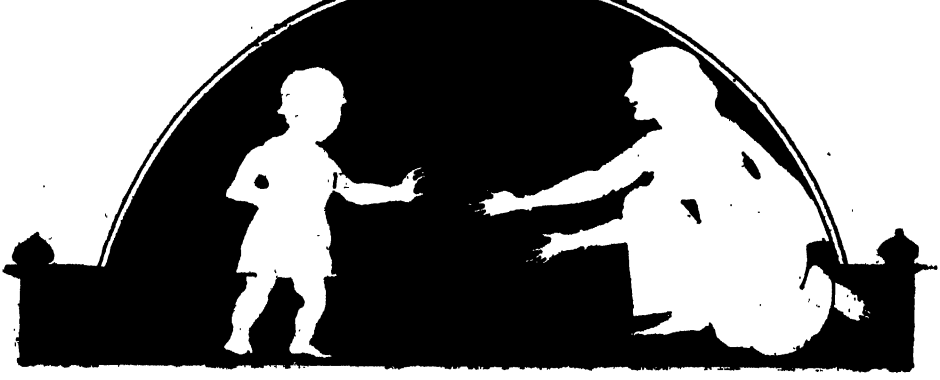
বিজন এই জন্যই অপেক্ষা ক'রছিল। মনে মনে প্রীত হ'য়ে কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললে—'তুমি বললে তো হবে না দিদি, আর একজনের যে অনুমতি চাই।'

সবিতা মাধবীর মুখের দিকে চাইলে। মাধবী সলজ্জ কৌতুকে বললে—'তার জন্য আটকাবে না। আমি 'পাওয়ার অফ্ এটর্ণি' দিলাম।

সবিতা স্নেহ-স্নিগ্ধ হাসিটি হেসে বললে—'তা হ'লে আমার সামনে নাম ধরে 'তুমি' ব'লে ডাক্।'

বিজন তেমনি গম্ভীর হ'য়ে মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে—'আর মিছিমিছি দেরী ক'রছ কেন! তাড়াতাড়ি খেয়ে এস না, রাণী।'

(ক্রমশঃ)



ভারতীয় ধর্ম্ম-বৈচিত্র্য

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত বি-এস্-সি,

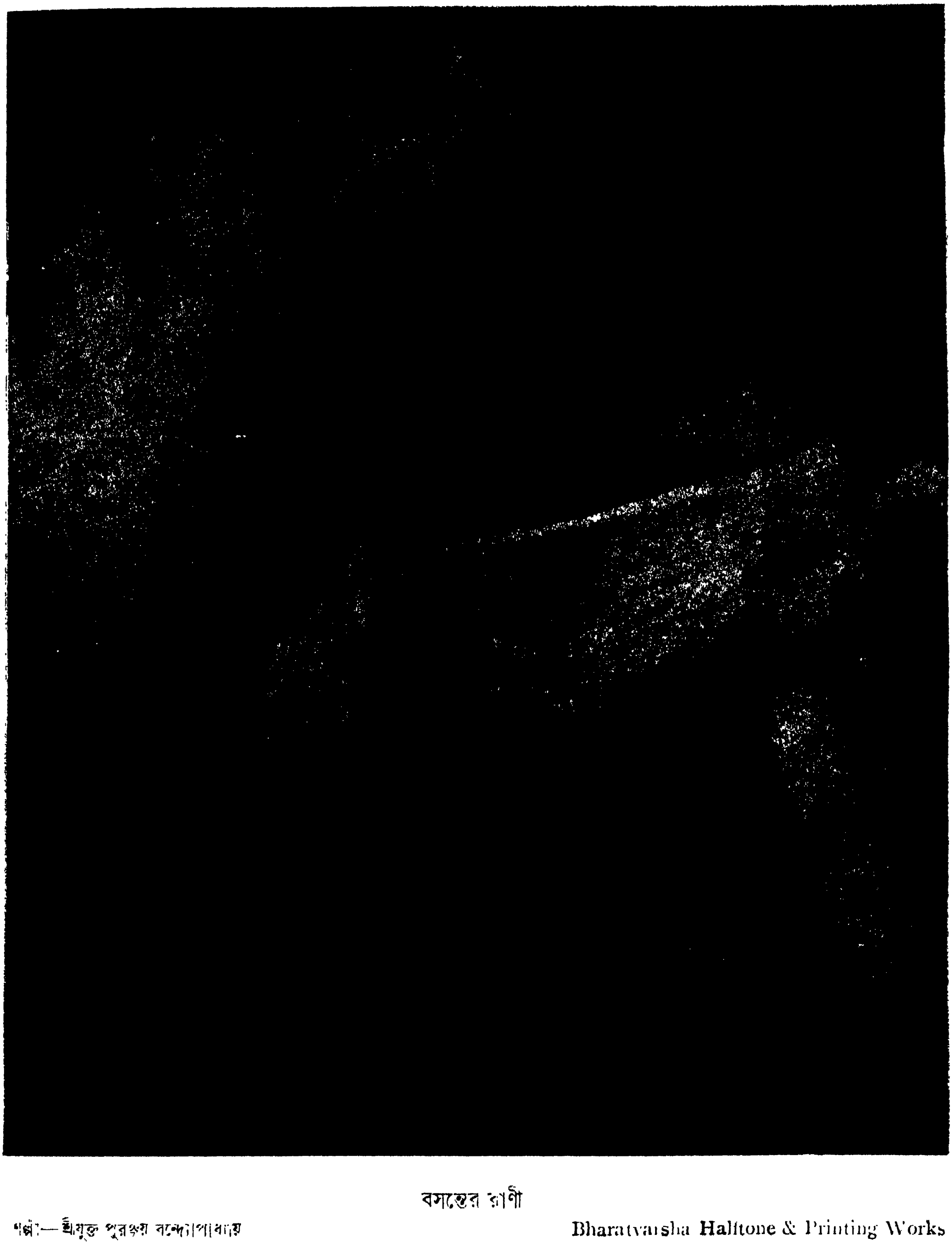
ভারতবর্ষে বর্ণ-ধর্ম্মের বহুলতা ভারতীয় সমাজকে জটিল হইতে জটিলতর করিয়া তুলিয়াছে। ভারতীয় সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে বিভিন্ন ধর্ম্মমতের উপর ভিত্তি করিয়া। ভারতীয়ের সমাজ-স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক আচার-রীতি-নীতি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া গিয়াছে এমন কথা যদিও বলা চলে না, তথাপি বলিলে অত্যুক্তি হইবে না বা সত্যের অপলাপ করা হয় না যে ভারতের বিভিন্ন সমাজের আচার-নীতির উপর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে এবং সামাজিক রীতি-নীতি আচার-নিষ্ঠা যেন ধর্ম্মকেই কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদে আমরা আমাদের ধর্ম্মের আদর্শকেই অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হই। বিবাহের বয়স, পুনর্ব্বিবাহ, পর্দ্দা-নীতি, নারীর কর্ম্ম-জীবন, পুরুষের কর্ত্তব্য, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, বৈধব্য জীবনের নিষ্ঠা, কুমারীর শুচিতা প্রভৃতি এতদ্দেশে নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্নভাবে বর্ণানুসারে এবং ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। যে সকল ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতবর্ষের সমাজগুলি গঠিত হইয়াছে, অথবা এক কথায় বলিতে গেলে যে সকল ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস এতদ্দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে, সেইগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার এবং চূড়ান্ত আলোচনা করা সুকঠিন—সুকঠিন কেন প্রায় অসম্ভব; ইহা অতিশয়োক্তি নহে, কারণ প্রচলিত ধর্ম্মমত-সমূহ বিভিন্ন এবং এত বিস্তৃত যে সকলগুলির সন্ধান করিয়া উঠাই শক্ত। একে তো বহু বিস্তৃত, তদুপরি আবার অনেক সময়ে দেখা যায় নিজের ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেকের বিশেষ কোন স্পষ্ট ধারণা নাই। তবে এ সকল আলোচনায় আদমসুমারীতে স্বীকৃত ও উক্ত ধর্ম্মমতগুলির অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া অগ্রসর হওয়াই সুবিধাজনক এবং তাহাতেই তবু যাহা কিছু তথ্য সংগৃহীত ও সন্নিবেশিত হইয়া থাকে।

গত আদমসুমারীতে (১৯৩১ খৃঃ) ভারতীয় ধর্ম্মমত-গুলিকে প্রধানতঃ হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, জোরোয়াষ্ট্রিয়ান্, জু, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ট্রাইবাল নামে অপর একটি বিভাগ করা হইয়াছে। নাগা প্রভৃতি পার্ব্বত্য বা অসভ্য এবং আদিম অধিবাসীগণ এই ট্রাইবাল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইতঃপূর্ব্বে ইহাদিগকে অন্যান্য আদমসুমারীতে "এ্যানিমিষ্ট" (animist) বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (১) মোটামুটিভাবে উক্ত নয়টি মতের উল্লেখ ও আলোচনাই প্রধানতঃ আদম-সুমারীর বিবরণীতে দেখিতে পাওয়া যায়; আলোচনা প্রসঙ্গে অবশ্য অন্যান্য আরও দুই-চারিটি বিভিন্ন মতে বিশ্বাসী দলের সন্ধানও পাওয়া যায়। কিন্তু তাহাদের স্থূল পার্থক্য তেমন কিছু নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না; এইরূপ ক্ষেত্রে যেগুলি সুনির্দ্দিষ্টভাবে কোন মতের গণ্ডিতে পড়ে না সেইগুলিকে একটি ভিন্ন দলভুক্ত করিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীর বিবরণীগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহাদিগকে পৃথক পৃথক ভাবে বিবেচনা না করিয়া 'অন্যান্য' বলিয়া একই শীর্ষান্তর্গতরূপে বিবেচনা করা হইয়াছে। উক্তরূপ বিভাগে যদিও বিভিন্ন ধর্ম্মমতগুলি বিভক্ত করিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে তথাপি সীমা নিরূপণ নিঃসন্দেহ এবং নিখুঁত কোন ক্রমেই বলা যায় না এবং ডাঃ হাটনও এইরূপ অতৃপ্তি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে 'ঐগুলিতে সম্পূর্ণ তৃপ্ত হইতে পারা যায় না এবং চূড়ান্ত বা নির্ভুল নহে' (২)। হিন্দুদের মধ্যে অনেকে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধগণকে হিন্দু বলিয়া দাবী করে; তাহারা তাহাদের দাবীর স্বপক্ষে যুক্তি দেখায় যে এই সকল ধর্ম্মমতের গোড়া-পত্তন হইল হিন্দুধর্ম্ম হইতে। হিন্দুরা তো দাবী করে শিখ, জৈন ও বৌদ্ধগণ হিন্দু; কিন্তু দেখিতে হইবে তাহারা আবার সেই দাবী স্বীকার করে কি না।

---

(১) *Census of India*, 1931, Vol. V (Bengal), part I, page 403

(২) "This is the most practical division available but is admittedly not satisfactory since difficulty arises in the case of many of these terms, particularly so in that of the term Hindu, which is not entirely exclusive of some other terms used."—*Census of India*, 1931, Vol. I (All India), part I, p. 379.



বসন্তের রাণী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পুরঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

প্রথমতঃ শিখ। শিখগণ কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিতে মোটেই প্রস্তুত নহে; হিন্দুগণের দাবী তাহারা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। অতএব শিখগণকে হিন্দু হইতে পৃথক বলিয়া বিবেচনা করা সঙ্গত। অথচ শিখদের মধ্যে কিন্তু একদলকে দেখা যায় তাহারা যেন শিখ ও হিন্দুর মাঝামাঝি। ইহারা শাহেজধারী শিখ নামে পরিচিত। ইহারা নবম গুরুর আরাধনা করে, অথচ দশম গুরুকে স্বীকার করে না। অন্যান্য শিখদের ন্যায় ইহারা বেণী বাঁধে না, চুল ছোট করিয়া কাটিয়া ফেলে।

দ্বিতীয়তঃ জৈন। জৈনদের বেলা সমস্যা কিঞ্চিৎ জটিল হইয়া পড়ে। ইহাদের অনেকে নিজেদের হিন্দু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই অবিসম্বাদে নিজেকে হিন্দু বলিয়া স্বীকার করে না। ইহার যথার্থতা আমরা আদমসুমারীর সংখ্যা তালিকা আলোচনা করিয়াই প্রমাণ করিতে পারি। সমগ্র ভারতবর্ষে জৈন মতাবলম্বী ১,২৫২,৬৩১ জনের মধ্যে মাত্র ১২,৩২৬জন হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে; অর্থাৎ জৈন জনসংখ্যার হাজার করা ৯৮জন মাত্র হিন্দুরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। আর ১২,৭৮৬,৮৩১ জন বৌদ্ধের কেবল ৭০জন, অর্থাৎ হাজার করা ০·০০৫জন নিজেদের হিন্দু বলিতে রাজী আছে। যুক্তপ্রদেশের সেন্সস্ সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট তাঁহার বিবৃতিতে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে জৈনগণও ক্রমেই হিন্দুগণ হইতে আরও পৃথক হইয়া পড়িতেছে। (৩)। পূর্ব্বে তবু যতটুকু সামাজিক মিলামিশা ছিল তাহাও এখন কমিয়া আসিতেছে; অবশ্য বর্ত্তমানেও তাহারা হিন্দু কন্যাকে ঘরের বৌ করিয়া নিতে তত আপত্তি করে না, কিন্তু জৈন কন্যাকে হিন্দু পরিবারে বিবাহ দিতে যথেষ্ট আপত্তি উত্থাপিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আরও দুই-একটি এমন অদ্ভুত রকম মত-বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার তেমন কোন কারণ বা যুক্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কবীরপন্থী ও সৎনামীগণ আপনাদিগকে হিন্দু হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু তাহার পর হইতে দেখা যায় ক্রমে তাহারা হিন্দুগণের সহিত মিশিয়া যাইতেছে এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে তাহাদের বিবৃতি অনুসারে তাহাদিগকে হিন্দুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া গণনা করা হইয়াছে; কেবল বোম্বাই প্রদেশে কতিপয় কবীরপন্থী 'হিন্দু' পরিচয় দিতে অস্বীকৃত থাকায় তাহাদিগকে "অন্যান্য" শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশের দাদুপন্থীগণও হিন্দু হইতে পৃথক বলিয়া পরিচয় দিয়াছে; তাহাদিগকেও সেই হেতু "অন্যান্যের" অন্তর্গত বিবেচনা করা হইয়াছে। অনন্তর অন্যান্য সকল ধর্ম্মমতকে কোন না কোন হিসাবে পরস্পর হইতে স্পষ্টতঃ পৃথক বলিয়া অনুমান করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্ম ও ট্রাইবাল ধর্ম্মগুলির পার্থক্য অনেকস্থলে স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেকগুলি মধ্যবর্ত্তী দল আবার দেখিতে পাওয়া যায় যেগুলিকে হিন্দু কি ইস্‌লাম বা হিন্দু কি খৃষ্টান বলিয়া নিঃসংশয়ে কোনটিরই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নির্দ্ধারণ করা যায় না, মূলতঃ উভয় দিকেই ইহাদের অনেকাংশে মিল দেখিতে পাওয়া যায়।

তৎপর এতদ্দেশীয় জু-দের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলেও আবার কিঞ্চিৎ সমস্যা আসিয়া পড়ে। টিন্নেভেলিতে একদল জু আছে যাহারা জু এবং খৃষ্টান উভয়তঃই আত্ম-পরিচয় দিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অবশ্য জু-গণের স্বতন্ত্র সত্তাই স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। জু-গণের উপর কিন্তু হিন্দুর প্রভাব অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। কেবল বেণী ইজরাইল দলের মধ্যে দেখা যায় হিব্রু নাম ব্যতীত হিন্দু বা হিন্দু ধরণের একটি দ্বিতীয় নাম তাহারা প্রথাগতভাবে গ্রহণ করে।

দক্ষিণ ভারতীয় খৃষ্টানগণের সামাজিক জীবন ও ধর্ম্ম-বিশ্বাস আলোচনা কালে আবার জটিলতা কিঞ্চিৎ অধিক পরিদৃষ্ট হয়। তথাকার ক্যাথলিকগণ প্রায়ই বর্ণ-বিভাগ স্বীকার করে; কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট্‌রা আবার সকলে বর্ণবিভেদ মানিয়া চলে না। অপর দিকে প্রোটেষ্টাণ্ট্‌রা কিন্তু পংক্তি-ভোজন সমর্থন করে, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেণীর একই টেবিলে আহারাদি করিতে তাহাদের আপত্তি আছে। ক্যাথলিকগণ পোষাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে প্রতিবেশীর আচার-নীতির প্রতি তো দৃষ্টি রাখেই, তা' ছাড়া বিবাহ

(৩) ১৯৩১ খৃঃ আদমসুমারীর যুক্তপ্রদেশের বিবরণীতে "ধর্ম্ম" অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্যাপারেও অঙ্গুরীয়ের পরিবর্ত্তে "টালী"* ব্যবহার করিয়া থাকে এবং তদ্দেশে প্রচলিত বিবাহ সংক্রান্ত অন্যান্য আচারগুলিও তাহারা মানিয়া চলে, যেমন সন্তানের জন্ম হেতু অপবিত্র মানুষ বা জাতাশৌচের সংস্পর্শ বিবাহাদি পবিত্র কর্ম্মাচরণে নিষেধ আছে। অবশ্য এইরূপ নিষেধের সমর্থনে তাহারা স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দোহাই দেয়।

লিঙ্গায়েৎগণের আচার-নীতির অনেকাংশে খৃষ্টমতাবলম্বীগণের সহিত সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে (কুমারী মেরীর) অপাপস্পৃষ্ট গর্ভ-প্রবাস (immaculate conception)† বিশ্বাস করে এবং শবদেহের সমাধি প্রথায়ও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের সহিত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। উত্তর কানাড়ায় এক শ্রেণীর বনচর মানুষ দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের কুল পরিচয় দেখা যায় খৃষ্টধর্ম্ম সমুদ্ভূত; কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে।

ভারতের অস্পৃশ্যদের মধ্যে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের গোলযোগ অতিমাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের মধ্যে এমন অবস্থা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যথার্থ পক্ষে ইহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের রূপ ও ক্রম নির্দ্ধারণ এক প্রকার দুরূহ ব্যাপার। লালবেগিগণের ধর্ম্মমত গড়িয়া উঠিয়াছে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্ম্মের সূত্র অবলম্বন করিয়া। পঞ্জাবের ছেতরামী দলের বেলায় অবস্থা দেখা যায় আরও বিচিত্র। ইহারা খৃষ্ট-হিন্দু-মুসলিম সকল বিশ্বাসের এক অদ্ভুত সমন্বয় করিয়া লইয়াছে। ইহারা ত্রিশক্তির আরাধনা করে এবং ত্রিশক্তির রূপ ও শক্তি এইরূপ :—'আল্লাহ'—বিধাতা (সৃষ্টিকর্ত্তা), পরমেশ্বর—রক্ষক এবং খুদা - সংহারক। এইরূপ আরও এমন কতকগুলি দল সমগ্র ভারতময় দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের কোন্‌টি হিন্দু বা কোন্‌টি মুসলমান তাহা নিরূপণ এক বিরাট সমস্যা। গুজরাট, কচ্ছ ও খানদেশের সৎপন্থী বা পীরপন্থীগণের মধ্যে আবার বৈচিত্র্য আরও অদ্ভুত। মাথিয়া কুম্বী একটি বর্ণ বিশেষ। এই মাথিয়া কুম্বীগণ এবং লাবা কুম্বীদের একটি শাখা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়াছে বলিয়া গত আদমসুমারী অনুসারে দেখা যায় (৪)। ইহারা অথর্ব্ব বেদের অনুসরণ করে বলিয়া জানা যায়। ইহারা পীরানা এবং অন্যান্য স্থানের মুসলিম সাধু বা পীরগণের সমাধি-মন্দিরে বসিয়া দৈনিক প্রার্থনা এবং অন্যান্য ব্যাপার উপলক্ষে আরাধনা করে। সেই জন্যই বোধ করি পীরপন্থী ইহাদের অন্যতম সাম্প্রদায়িক নাম। ইহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ ইমাম শাহ পীরানার পীরের উপদেশাবলীর সংগ্রহ মাত্র (৫)। ইহারা রমজান উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে এবং কলমা পাঠ করে; অথচ শব রক্ষাকালে মুসলিম প্রার্থনা ও হিন্দু স্তোত্রাদি পাঠ উভয়ই ইহাদের অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা হোলী এবং দেওয়ালী প্রভৃতি হিন্দু আনুষ্ঠানিক আচরণের অনুসরণ করিয়া থাকে; বিবাহাদিতে পৌরোহিত্য করে ব্রাহ্মণগণ। ইহাদের সামাজিক আচার-নীতি স্পষ্টত: প্রায়ই হিন্দুগণের অনুরূপ, আর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ধারণা জন্মে ইহারা মুসলমান। শঙ্কেশ্বর ও করবির মঠের ধর্ম্মগুরু শঙ্করাচার্য্য ইহাদিগকে হিন্দুত্বের গণ্ডীর মধ্যে স্বীকার করেন না, অপর পক্ষে হিন্দু মহাসভা ইহাদিগকে হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দু মহাসভা সর্ব্বদাই হিন্দুত্বের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সমুৎসুক এবং হিন্দুর স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই মহাসভা গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সভা বলিলেন—হিন্দু। অন্য দিকে শঙ্করাচার্য্য হিন্দুগুরু এবং হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত দিতে সম্পূর্ণ অধিকারী –

---

* হাঁহুলি জাতীয় এক প্রকার অলঙ্কার। নীলগিরির টোডাদের সম্বন্ধে আলোচনা কালে আরনেষ্ট ক্রলি (Ernest Crawley) টালীর উল্লেখ করিয়াছেন—*The Mystic Rose*, 4th. ed. 1932, p. 402.

† In the Roman Catholic Church, the doctrine that the Virgin Mary was born without the strain of original sin. This doctrine came into favour in the 12th century; it afterwards became a subject of vehement controversy between the Scotists, who supported, and the Thomists, who opposed it. In 1708 Clement XI appointed a festival to be celebrated throughout the Church in honour of the immaculate conception, but the doctrine was not an article of faith until the year 1854."—The Compact Encyclopedia (The Gresham Publishing Co. Ltd.), Vol. II, page 160.

(৪) *Census of India*. 1931, vol. 1 (All India), Part I, p. 380.

(৫) "They observe as their sacred book a collection of the precepts of Imam Shah, the Pir of Pirana."—*loc. cit.*

তিনি বলিলেন সেই দলকে অহিন্দু। এখন এই জটিলতার সমাধান করিবে কে ? অপর এক হিন্দু প্রতিষ্ঠান নাকি ইদানীং মাথিয়াগণকে মুসলিম সাধু বা পীরের আরাধনায় বিরত হইতে বাধ্য করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্ম-বিশ্বাসের নিদর্শন কি ? সাধু লোকের সমাধিস্থানকে পবিত্র জ্ঞানে আরাধনা—মন্দিররূপে ব্যবহার করা হইতেই কি স্থির করা চলে—কে কোন ধর্ম্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী ? সাধু ও সংব্যক্তি সকলের অন্তরেই সমভাবে পবিত্র স্মৃতির উন্মেষ করিতে পারে—যে—যে ধর্ম্মকেই গ্রহণ ও স্বীকার করুক না কেন সাধু যেমন মুসলমানের কাছে সাধু, তেমনই হিন্দুও সাধুর আদর্শজীবনকে অস্বীকার করিতে পারে না। বস্তুতপক্ষে দেখাও যায় একই পবিত্র স্থানকে বিভিন্ন ধর্ম্মের সকলেই পবিত্র ও শুদ্ধ বলিয়া মস্তক অবনত করে। চট্টগ্রামের এক মুসলিম পীরের পবিত্র সমাধির প্রতি আরাকানের এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া সেই পীরের সমাধিকে বুদ্ধ মকান (অর্থাৎ বুদ্ধ বা ভগবানের আবাস) বলিয়া অভিহিত করেন।

মাথিয়া কুম্বীদের ন্যায় জটিলতা মালওয়ার ন্যায়িতাদের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্ম্মই সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। ইহারা একাধারে গণেশের পূজা করে এবং আল্লাহর আরাধনা করে ; হিন্দু নাম রাখে, হিন্দুর ন্যায় বেশভূষা করে, হিন্দু উৎসবগুলিতে যোগ দেয় এবং নিজেরাও হিন্দু উৎসবাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এই প্রকার মিশ্র আচরণ সিন্ধুদেশের কুবচণ্ড এবং হোসেনী ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও প্রচলিত রহিয়াছে। মাথিয়াদের ন্যায় ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহারা ইসলাম, অথচ সামাজিক আচার-নীতিতে ব্রাহ্মণ্য আচারের প্রভাব যথেষ্ট বিস্তার লাভ করিয়াছে। মুসলমানদের কেবল একটি দলের (Sayyids) সহিত একত্র ভোজনাদিতে ইহাদের আপত্তি নাই ; এই সৈয়দী মুসলমান ভিন্ন অপর কাহাকেও খাওয়া-দাওয়া ব্যাপারে গ্রহণ করে না। যুক্তপ্রদেশের মালকানগণ এবং জাঠ ও বেনিয়া হইতে উদ্ভূত অনুরূপ অপর একটি রাজপুত দলের মধ্যেও এই প্রকার দ্বৈত আচরণ লক্ষিত হয় ; ইহারাও মাথিয়াদের মত হিন্দু ও মুসলমান উভয়বিধ ক্রিয়া-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করে। শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবে মালকানদের অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের অনেকে আবার গত ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদম-সুমারীতে মুসলমানরূপে আত্ম-পরিচয় দিয়াছে। কিন্তু ইহাদের বেশীর ভাগই হিন্দু ও ইসলাম এই দুই ধর্ম্মের মাঝামাঝি এক অপরূপ মত লইয়া রহিয়া গিয়াছে। মালকানদের এইরূপ বিভিন্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবার মূলে এক আশ্চর্য্যরকমের ইতিহাস রহিয়াছে। ডাঃ হাটন তাঁহার বিবৃতিতে এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"In 1926 when the *shuddhi* and *tanzim* movements were at their height these Malkans started taking money for conversion and it is said that many made considerable sums by conversion and reconversion to and from Hinduism, Islam and Christianity..." (৬)। উক্ত বিবরণী হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে অর্থের লোভে ইহারা আজ এ ধর্ম্ম কাল সে ধর্ম্ম—এমনই করিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং এই আবর্ত্তন-বিবর্ত্তনের ফলে ইহাদের কেহ কেহ হইয়া পড়িয়াছে উৎকট হিন্দু, কেহ রহিয়া গিয়াছে মুসলমান, আর এক দল কোন কিনারা করিতে না পারিয়া এ'র কিছু তা'র কিছু করিয়া মাঝামাঝি স্থলেই পড়িয়া রহিয়াছে।

বঙ্গ প্রদেশেও এই প্রকার দ্বৈধভাব অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাগ-বেনিয়া বা সত্যধর্ম্ম দলের উৎপত্তি মনে হয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্য হইতে। যে ধর্ম্ম হইতেই যে আসিয়া এই দলে যোগ দিয়া থাকুক না কেন, যখন একই দল গড়িয়া উঠিল তখন আর সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্য থাকা বাঞ্ছনীয় নহে এবং না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সত্যধর্ম্ম বা ভাগ-বেনিয়াদের নিজেদের সমাজে পরস্পরের মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য রহিয়া গিয়াছে। ইহাদের নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবাধ বিবাহাদি চলিতে পারে না (৭)। বাঙ্গালা দেশে বাখরগঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানে আরও কয়েকটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচার-নীতির মধ্যে

(৬) *Census of India*, 1931, vol. I (All India), Part I, p. 381.

(৭) *Census of India*, 1931,—loc. cit.

যুগপৎ হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই প্রভাব আংশিকভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। বাখরগঞ্জের নাগার্চ্চি, পাবনা ও ময়মনসিংহ জেলার কীর্ত্তনিয়া এবং পশ্চিম বঙ্গের পটুয়া বা চিত্রকর প্রভৃতি সম্প্রদায় উক্তপ্রকার বিভিন্ন দল গঠন করিয়া বাস করিতেছে। ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয় এই বিভাগগুলি কেবল বর্ণগত, কেন না ধর্ম্ম-বিশ্বাস ইহাদের সকলেরই মাথিয়া কুম্ভীগণের ন্যায় হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই সমন্বয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে মহীশূর অঞ্চলে এক ব্যক্তি চন্নবাসবেশ্বরের অবতার বলিয়া নিজের পরিচয় দান করে এবং হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে সখ্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় এক নবতর আন্দোলন আরম্ভ করে। যদিও কয়েকজন দলভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এ আন্দোলন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই বলিতে হইবে। পরন্তু এই আন্দোলনের ফলে মহীশূরের বীরশৈবদের মধ্যে একটা অন্তর্বিরোধের সূত্রপাত হয় এবং বিবাদের ফলে উক্ত অবতারের সকল প্রচেষ্টা লয় পাইয়া যায়। পঞ্জাব প্রদেশের চুহ্‌রাদের ‡ মধ্যেও বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন আচার-ব্যবহার প্রচলিত রহিয়াছে। পঞ্জাবের পূর্ব্বাঞ্চলের চুহ্‌রাগণ সাধারণতঃ হিন্দু আচার-নিষ্ঠার অনুসরণ করে এবং ইহাদের মধ্যে হিন্দু নাম গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে; অথচ পঞ্জাবেরই অপরাংশের চুহ্‌রাগণ মুসলমান নাম গ্রহণ করে এবং অনেক স্থলে মোল্লাদের পৌরহিত্য স্বীকার করে। চুহ্‌রাগণ অবশ্য সকলেই পঞ্জাবে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিগণিত। কিন্তু দুই শ্রেণীর চুহ্‌রাদের মধ্যে স্পষ্টতঃ এমন আর কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না—যাহা হইতে তেমন কোন ধর্ম্ম-বৈষম্য নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অথচ চুহ্‌রাগণ কেহ কেহ নিজেকে হিন্দু বলে, আবার অনেকে নিজেদের ইসলাম বলিয়া প্রচার করে। ইহাই কেবল দ্রষ্টব্য নহে। চুহ্‌রাদের মধ্যে অপর একদল আছে যাহারা নিজেদের বলে—তাহারা আদ-ধর্ম্ম বা আদি-ধর্ম্ম বিশ্বাসী। ইহা দ্বারা প্রতীত হয় যে এই দলের বিশ্বাস ইহারা হিন্দু, কেবল অপরাপর বর্ণ-হিন্দু এবং নিজেদের মধ্যে একটা ব্যবধান নির্দ্দেশ করিবার জন্য নিজেদের আদ বা আদি নামে পরিচিত করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন আদ-ধর্ম্মের দ্বারা কোন মূল ধর্ম্মের দাবী করে এমন অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না, কারণ ইসলাম বা খৃষ্টান হইতে পৃথক বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা ইহাদের বেশ অনুধাবন করিতে পারা যায়। যে সকল চুহ্‌রা আপনাদের ধর্ম্ম কেবল 'চুহ্‌রা' নামে অভিহিত করিয়াছে, গত আদমসুমারীতে দেখা যায় তাহাদিগকে হিন্দু দলভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। পূর্ব্ব আলোচনা হইতে এইরূপ ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সহজেই প্রমাণিত হইতে পারে। পঞ্জাবের চুহ্‌রাগণকে গুজরাটের অসভ্য জাতি ছোঞ হইতে উৎসারিত এক পতিত শাখা বলিয়া উক্ত আদমসুমারীর বিবরণীতে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে; অবশ্য ইহার সত্যাসত্য প্রমাণসাপেক্ষ।

"সাধারণ কথায় বলিতে গেলে এমন কোন অনতিক্রম্য হেতু দৃষ্টিগোচর হয় না যাহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে হিন্দু ও মুসলমানগণের পক্ষে সখ্য বন্ধনে পাশাপাশি বাস করা সম্ভবপর নহে"—এই প্রকার অভিমত ডাঃ হাটন তাঁহার বিবৃতিতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতের যথার্থতা তিনি বহুলাংশে প্রমাণ করিতে সমর্থও হইয়াছেন (৮)। মাদুরা ও তাঞ্জোরে বহু হিন্দু দেবমন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার বংশানুক্রমে মুসলমানের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গাঞ্চলে, বিশেষতঃ বিক্রমপুরে, মুসলমানগণ অনেক সময়ই শীতলা (হিন্দু দেবতা) পূজা করে দেখা যায়; কালীর নিকট বলির মানতও কখনও কখনও করিতে দেখা যায়। আবার হিন্দুও পীরের দরগায় সিন্নি দিবার সঙ্কল্প করে এরূপ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। কাজেই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পার্থক্য দুই ধর্ম্মাবলম্বীর ঐক্য বন্ধনের পক্ষে যে তেমন কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে এমন মনে হয় না। অতুল চক্রবর্ত্তীও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন; তাঁহার অভিমত জয়াকর, মুঞ্জে প্রভৃতি নেতাগণও সমর্থন করেন

‡ লুধিয়ানা কলেজের অন্যতম অধ্যাপক মিঃ দৌলা (অধুনা ডাঃ) যখন তাঁহার প্রবন্ধ প্রস্তুত উপলক্ষে ডাঃ বিরজাশঙ্কর গুহের তত্ত্বাবধানে আমাদের সহযোগিতা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট হইতে এই চুহ্‌রাদের সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলাম; কিন্তু পরিসর সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহার চূড়ান্ত আলোচনা এস্থলে করা গেল না। অধ্যাপক দৌলার এই সহায়তার নিমিত্ত আমি কৃতজ্ঞ।

(৮) *Census of India*, 1931.—*loc. cit.*

(৯)। প্রকৃত বৈষম্য সম্ভবতঃ গড়িয়া উঠিয়াছে অতীতের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গঠনাবলীর গর্ব্ব লইয়া। মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছিল রাজ্য বিস্তার করিতে এবং হিন্দুর উপরে প্রাধান্য করাই ছিল তখন তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। তারপর অবশ্য কাল-পরিবর্ত্তনে এবং অবস্থার বিবর্ত্তনে পরস্পরের মধ্যে পারস্পরিকতা ও সৌহার্দ্দ্য ক্রমেই গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহাদের সভ্যতার আদর্শ ও কৃষ্টি ছিল ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। সভ্যতা-স্বাতন্ত্র্যের পার্থক্য বর্ত্তমানেও কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাই ডাঃ হাটনের মত সমর্থন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে একটা ভিত্তিহীন সংঘর্ষ অস্পষ্টভাবে মূর্ত্তি পাইয়া উঠিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মের রেশারেশি অপেক্ষা প্রবলতর হইল মুসলমানগণের অমূলক সন্দেহ, প্রাধান্য করিবার তীব্র বাসনা এবং বিস্মৃতপ্রায় কৃষ্টির পুনরুদ্ধারের তথা স্বাতন্ত্র্যরক্ষণের প্রচেষ্টা। অতুল বাবু যে বলিয়াছেন বর্ত্তমান হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের হেতু বেশীই মানসিক, ধর্ম্ম-বৈষম্য নহে—এ কথা অংশতঃ সত্য (১০)। *

(৯) A. C. Chakraverty—*Cultural Fellowship in India*, (Thacker Spink), 1934.

(১০) A. C. Chakraverty—*op. cit.*

* বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচিত তথ্যসমূহ প্রধানতঃ আদমসুমারীর বিবরণী হইতে সংগৃহীত এবং ডাঃ হাটনের (সেন্সস কমিশনার) অনুমতি অনুসারে তাঁহার বিবৃতির অনেকাংশ সোজাসুজি অনুবাদ করা হইয়াছে।

অষ্ট-প্রহর

শ্রীগৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

(১)

কলিকাতায় শীতের সকাল। সাতটা বাজিতে বেশী দেরী নাই। ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে শ্যামবাজার—পথটুকু ত আর কম নয়, বেলা দশটার মধ্যে 'টিউশনি'টা সারিয়া একমুঠা ভাত খাইয়া নিত্যকার মত কাজের সন্ধানে আফিসে আফিসে ঘুরিতে হইবে, তাই একটু দ্রুতপদক্ষেপে চলিতে আরম্ভ করিলাম।

অন্যমনস্কভাবে চলিতেছিলাম। গোলদীঘির কাছে আসিয়া দেখিলাম—এত সকালেও একটা লোক—বিচিত্র-বেশে মাথায় একটা ত্রিকোণ টুপি পরিয়া একটা ভাঙ্গা হারমোনিয়ম লইয়া গান গাহিতে গাহিতে লোক জমাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ডেড্-লেটার আফিস ফেরৎ চিঠির মত তাহার পোষাক কি একটা ওষুধের নাম ও গুণ-গাথায় পূর্ণ। ওই ওষুধটির অব্যর্থতা বিষয়ক কথা লইয়া গানটিও রচিত হইয়াছে। লোকটিকে অতি পরিচিত বলিয়া মনে হইল—কিন্তু কোথায় তাহাকে দেখিয়াছি তাহা মনে পড়িল না। তখন স্মৃতি-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া লোকটিকে কোথায় দেখিয়াছি তাহা সন্ধান করিবার সময় ছিল না—তাই সে চিন্তা দূরে সরাইয়া নিজ গমন পথের দিকে অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইতেই মনে পড়িয়া গেল—শৈশবে যখন মামার বাড়ী যাইতাম তখন লোকটিকে দেখিয়াছি। লোকটির নাম শ্রীনাথ বৈরাগী—গান বাজনায় সে যে বেশ সুদক্ষ ছিল এবং শৈশবে যে সে আমাকে খুব ভালবাসিত একথাও মনে আসিল। গ্রামের জমীদারবাবু বেতন দিয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন শুধু তাহার গান শুনিবার জন্য। শুধু শ্রীনাথ কেন ও অঞ্চলের বহু গায়ক, কীর্ত্তনীয়া, কবি-ওয়ালা ও কথকের তিনি পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। শ্রীনাথ কিসের মায়ায় সে সুখের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া মহানগরীর কদর্য্য জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িল তাহা জানিবার ইচ্ছা হইল। ইতিমধ্যে ছাত্রটির বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়া শ্রীনাথের চিন্তা কিছুক্ষণের জন্য মন হইতে অপসারিত করিলাম। যথারীতি নিজের কার্য্যশেষে ফিরিবার পথে দেখিলাম—শ্রীনাথ তখনও ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। এবার বোধ হয় সে আমাকে চিনিতে পারিল। মনে মনে

একটু বিব্রত বোধ করিলাম, পনের টাকার একটা 'টিউশনি'ই সম্বল হইলে কি হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট আমি, পথে এত লোকের মাঝখানে বহুরূপী-বেশধারী সামান্য একটা ক্যানভাসারের সাথে আলাপ করিতে কেমন যেন সঙ্কোচবোধ হইল। ভাবিলাম জনতার মধ্যে আত্মগোপন করি, কিন্তু তাহা পারিলাম না। বাল্যে তাহার বহু গান শুনিয়াছি—আমাকে সে যে বেশ ভালবাসিত তাহাও মনে পড়িল, তা ছাড়া প্রবাসে পরিচিত লোককে পাশ কাটাইয়া যাওয়াটা অত্যন্ত অশোভন বলিয়া মনে করিলাম। তাই তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি শ্রীনাথ, আমাকে চিনতে পার?" শ্রীনাথ কলিকাতায় একটি চেনা-মুখ দেখিয়া যে অত্যন্ত খুসী হইয়াছে তাহা তাহার মুখের ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলাম। সে হাসিয়া কহিল "দাদাবাবু, ভাল আছেন ত? চিনতে পেরেছেন আমাকে? আপনি যে এখানে আছেন তা ত' আমি জানতাম না—ওঃ কত ছোট যে আপনাকে দেখেছি, আপনি এত বড় হয়েছেন।" কথা শেষ করিয়াই সে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল—কেহ আমাদের আলাপ লক্ষ্য করিতেছে কিনা। তাহার মনের ভাব আমি বুঝিলাম, সে যে এখন হীনাবস্থার লোক, আমার মত একজন ভদ্রযুবকের সহিত তাহার আলাপে আমার যে মানের ক্ষতি হইতে পারে—এ সম্বন্ধে সে যেন বেশ সচেতন বলিয়া মনে হইল। "এখন থাক্ দাদাবাবু, আপনার সাথে আমি পরে আলাপ করব, আপনার ঠিকানাটা আমায় বলুন"—শ্রীনাথের এই কথা শুনিয়া তাহাকে আমার ঠিকানাটা দিয়া তিনটার সময় আমার মেসে দেখা করিতে বলিয়া স্থান ত্যাগ করিলাম। তখন আমার অপেক্ষা করিবার সময় ছিল না। পথে যাইতে যাইতে শুনিলাম—শ্রীনাথ পুনরায় তাহার গান আরম্ভ করিয়াছে।

(২)

তিনটার সময় আফিসে আফিসে কাজের চেষ্টায় ঘুরিয়া মেসে ফিরিয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি—এমন সময় শ্রীনাথ আসিল।

এখন আর তাহার সে বেশ নাই—একটা হাত কাটা সার্টও একটা আধ ময়লা কাপড় পরিয়া খালি পায়েই সে আসিয়াছে। শ্রীনাথ প্রণাম করিয়া মেঝের উপরেই বসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কখন কল্‌কাতায় এলে শ্রীনাথ, তোমার বাবু বেঁচে আছেন ত?'

শ্রীনাথের চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল, সে বলিল—"বাবু আজ একবছর হ'ল স্বর্গে গেছেন দাদাবাবু, তিনি বেঁচে থাকলে কি আজ আমার এমনি ক'রে খেতে হয়? তিনি মারা গেলেন, ক'মাস যেতে না যেতেই তাঁর ছেলেরা বল্লেন—'তোমার আর এখানে থাক্‌বার দরকার নাই শ্রীনাথ, বাজে খরচ আর আমরা কর্‌ব না'।"

শ্রীনাথের জন্য আমারও বড় দুঃখ হইল, বলিলাম—"তুমি ত আর বসে খেতে না শ্রীনাথ, তুমি গান গেয়ে খেতে, নতুন বাবুরা গান ভালবাসেন না বুঝি?"

সমবেদনার আভাস পাইয়া শ্রীনাথ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে বলিতে লাগিল—"আমাদের গান আর কে শুনবে দাদাবাবু, আমাদের গান কি আর তাঁদের পছন্দ হয়! বাবু মারা যেতেই তাঁরা বাড়ীতে কলের গান আনালেন, বেতারের যন্ত্র আনালেন—তাই সব শোনেন। এখন আর পূজায় যাত্রা হয় না, কীর্ত্তনের দল এসে ফিরে যায়, সারা বছর ধরে চণ্ডীমণ্ডপখানা খাঁ-খাঁ করে। বাড়ী-ঘর ত কোন দিন ছিল না, আমার তাই তাঁরা জবাব দিতেই অকূলে পড়্‌লাম। সবাই বল্লে—তুমি গুণী লোক, কল্‌কেতায় চলে যাও তোমার কাজ হবে। হাতে যা টাকা পয়সা ছিল খরচ করে এখানে এলাম। কারও সঙ্গে জানাশুনা নেই, কত ঘুরি কোথাও আর কাজ হয় না। শেষে গান গাইতে পারি জেনে এই ওষুধের দোকানের বাবুরা আমাকে পাঁচ টাকা মাইনেয় এই কাজটা দিলে। দুবেলা আধ-পেটা হোটেলে খাই, আর একটা গুদাম ঘরে শুয়ে থাকি—মাসে আট আনা ভাড়া লাগে। অমনি করে গান গেয়ে ওষুধ বিক্রী করে আমাকে যে খেতে হবে এ কোন দিন আমি ভাবি নি। গুরুর কাছে যত্ন করে গান শুনেছিলাম—সেটা যে এই কাজে লাগবে তা কে জানত দাদাবাবু। কত যে লজ্জা পাই মনে তা আর কি করে বল্‌ব। তাও কল্‌কেতায় দেশের একজন লোক দেখে মনটা ঠাণ্ডা হল।" তাহার কথার শেষের দিকটা কান্নার মত শোনাইল। তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিলাম—"দুঃখ কর না শ্রীনাথ, আমি তোমাকে একটা ভাল

কাজ করে দেব।" এ আশ্বাস যে কত মূল্যহীন অন্তর্য্যামী ছাড়া বোধ করি কেহ বুঝিলেন না। শ্রীনাথ কিছুক্ষণ বসিয়া উঠিতে চাহিল। 'মধ্যে মধ্যে এস শ্রীনাথ' বলিয়া তাহাকে বিদায় দিলাম। তখন সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব নাই, আমিও সার্টটা গায়ে দিয়া সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইলাম।

(৩)

রাত্রি ন'টার সময় মেসে ফিরিয়া দেখি—আমার ঘর খোলা, অথচ ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি 'রুম-মেট্' হীরেনবাবু বা'লিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া আছেন। কোন এক বড় মার্চেণ্ট আফিসে তিনি চাকরী করেন। সকালবেলা দিব্য হাসতে হাসিতে আফিস গেলেন—ইতিমধ্যেই এমন একটা কি বিপর্য্যয় আসিয়া তাঁহার সেই প্রফুল্লতা নষ্ট করিয়া দিল যাহার জন্ম তিনি ঘরে আলো পর্য্যন্ত জ্বালেন নাই—তাহা জানিতে বড় ইচ্ছা হইল। আলোটা জ্বালিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি দাদা, শুয়ে যে, শরীর খারাপ আছে নাকি?" তিনি সংক্ষিপ্ত উত্তরে জানাইলেন—"না।" সহসা একটু রসিকতা করিবার ইচ্ছা জন্মিল—বলিলাম—"তবে আর অমন করে শুয়ে আছেন কেন? বৌদির চিঠি পান নি বুঝি কয়েকদিন।" হীরেনবাবু ছিলা—ছেঁড়া ধনুকের মত লাফাইয়া উঠিয়া আমায় গালি দিতে আরম্ভ করিলেন—"এঁচোড়পাকা ছোঁড়া কোথাকার, ইয়ারকির আর জায়গা পাও নি?" ইত্যাদি। সামান্ত রসিকতার ফলে যে তাঁহার এরূপ ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে তাহা কল্পনা করিতে পারি নাই। বৎসরাধিক হইল একঘরে বাস করিতেছি কখনও তিনি আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করেন নাই—ঠিক ভায়ের মত স্নেহই তাঁহার নিকট পাইয়া থাকি। এই রূপান্তরে বিস্মিত হইয়া অপরাধীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, হীরেনবাবু আবার শুইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে উঠাইতে সাহস না পাইয়া কিছুক্ষণ পরে নীচে খাইতে গেলাম। খাওয়া শেষ করিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই হীরেনবাবু বিছানা হইতে উঠিলেন, তারপর আমার দিকে করুণভাবে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"কিছু মনে ক'র না ভাই, আজ মনটা বড় খারাপ আছে। আফিস থেকে আমাদের ১০।১২ জনকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। মেসিনের কথা ত তোমায় আগেই বলেছি, এক্সপেরিমেণ্টে দেখা গিয়েছে মেসিনেই ওদের কাজের সুবিধা হবে—তাই ওই দিয়েই, লোক কমিয়ে, ওরা কাজ চালাবে ঠিক করেছে।" আমি চমকাইয়া উঠিলাম—এই বয়সে তাঁহার চাকরী যাওয়া—আর অনশনে দিনযাপন একই কথা। মেসিনের প্রবর্ত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে তাঁহাদের চাকরী যাওয়ার আশঙ্কা আছে—একথা তাঁহার মুখে পূর্ব্বে শুনিয়াছি—কিন্তু সে আশঙ্কা যে এত দ্রুত সত্যে পরিণত হইবে ইহা আশা করি নাই। কোন এক সাহেব কোম্পানী কতকগুলি হিসাবের মেসিন আবিষ্কার করিয়াছে। যে হিসাবের জন্ম দশ জন লোকের দরকার মেসিনের সাহায্যে সেই কাজ দুই জন লোকের দ্বারা করা চলে। হীরেনবাবুদের কোম্পানী এতদিন 'এক্সপেরিমেণ্ট' করিতেছিলেন যে যথার্থ-ই কাজের সুবিধা হইবে কিনা। 'এক্সপেরিমেণ্টে' কোম্পানী ভাল ফল পাইয়াছেন—তাই দুর্ভাগ্য কেরাণীদের কর্ম্মচ্যুতির আয়োজন করা হইয়াছে। হীরেনবাবু নীচে খাইতে চলিয়া গেলেন। শ্রীনাথের কাহিনী শুনিয়া মনটা ভাল ছিল না, হীরেনবাবুর কর্ম্মচ্যুতির কথা শুনিয়া আরও বিষণ্ণ হইয়া পড়িলাম। অবসন্নচিত্তে বিছানায় শুইয়া পড়িলাম।

(৪)

কিছুক্ষণ পরেই আমার মনে হইল যেন সকাল হইয়াছে, শ্যামবাজারে ছাত্রটিকে ডাকিয়া পড়াইতে বসাইতেছি এমন সময় ছাত্রটি বলিল—"মাষ্টার মশায়, বাবা বলে দিয়েছেন—আপনাকে কাল থেকে আসতে হবে না। তিনি একটা যন্ত্র কিনেছেন, একটা কাগজে যে কোন প্রশ্ন—তা হারুডার ফ্যাক্টরই বলুন—আর ইণ্টারেষ্ট কিম্বা জিওম্যাটি্ রিডিডাক্সনই বলুন—লিখে তার মধ্যে ঢুকিয়ে একটা হাতল ঘুরিয়ে দিলেই সেটা থেকে প্রশ্নগুলো চমৎকারভাবে বোঝান একটা কাগজ বেরিয়ে আস্‌বে। এতে খরচও কম হবে, আর সময়ও বাঁচবে।" অপরিসীম বেদনায় ও হতাশায় মন ভরিয়া গেল। আজ এক বৎসর একটা মাত্র 'টিউশনি'র উপর নির্ভর করিয়া দারিদ্র্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া কলিকাতায় আছি সেটাও বুঝি বিধাতার সহ্য হইল না!

বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। পথে নামিতেই শুনিলাম কি একটা শব্দ! চোখ মেলিয়া দেখি—বিছানায় ঘুমাইতেছি, নীচে হইতে কলের জলপড়ার শব্দ হইতেছে। অদূর ভবিষ্যতে আমার স্বপ্ন সত্য হইবার সম্ভাবনা হয়ত আছে—কিন্তু আপাততঃ ত' কাজটা হাতে আছে। আঃ—বাঁচিলাম।

মাংসাশী উদ্ভিদ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

জীবজগতে এমন বিভিন্ন প্রাণী বহু আছে যারা অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রাণীদের হত্যা ক'রে খায়। তাদের মধ্যে অধিকাংশকেই আমরা জানি। কারণ, আমরা তাদেরই স্বজাতি। কিন্তু উদ্ভিদ্ জগতে এমন কোন তরু তৃণের পরিচয় আমরা আজও পর্য্যন্ত পাই নি যারা অন্য কোন উদ্ভিদ্‌কে ভক্ষ্যরূপে ব্যবহার করে! অথচ, জীবহিংসার দ্বারা জীবন ধারণ করে—জগতে এমন একাধিক উদ্ভিদের সন্ধান মিলেছে!

জঙ্গমলোকের জীবনধারণের প্রধান অবলম্বন হ'চ্ছে আলো-বাতাস ও জল। গাছের পাতা, সূর্য্যকিরণ হ'তে আলোকরশ্মি টেনে নিতে পারে; বাতাস থেকে কার্ব্বণিক এসিড গ্যাস অর্থাৎ অঙ্গারাম্ল বাষ্প—যা মানুষের পক্ষে দূষিত ও একান্ত অনিষ্টকর বলেই গণ্য, তা সর্ব্বদাই আকর্ষণ ক'রে নেয়! প্রতি পল্লবের প্রাণধারণের প্রচেষ্টায় সেই আহৃত আলোকরশ্মি ব্যয়িত হয় বিবিধ অর্গ্যানিক বস্তু বা জৈব উপাদান প্রসবে। কার্ব্বণ রূপান্তরিত হয় চিনি, ষ্টার্চ্চ্ (খাদ্যের শ্বেতসার) ও অনুরূপ পুষ্টিকর উপাদানে—যা' প্রধানতঃ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও পরিপোষণে সহায়তা করে।

এইভাবে জড়বস্তুকে প্রাণবন্ত ক'রে, নির্জ্জীব পদার্থে জীবনীশক্তি সঞ্চার ক'রে—উদ্ভিদ্ প্রতিদিন কার্ব্বণিক-এসিড-গ্যাস ও জল বা মৃত্তিকার রস শোষণান্তে তা থেকে নিজের প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্য নিজেই তৈরি করে নেয়। কিন্তু, ঠিক কি ভাবে যে এই রূপান্তর ঘটে সে তথ্য আজও বৈজ্ঞানিকদের কাছে এক বিস্ময়কর রহস্য হ'য়ে আছে। ব্যাপারটা তাঁরা বেশ স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও একটা বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হ'য়েছেন এই যে—সবুজ পাতার সবুজ রংটা ফুটে ওঠে, প্রত্যেক পাতাটি যে অসংখ্য সবুজ রংয়ের কণিকা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা (granules) সমাকীর্ণ থাকার ফলে—সেই সবুজ কণিকাগুলিই এই রূপান্তর ঘটান ব্যাপারে নিঃসন্দেহ একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করে!

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে—জলবাতাস আর আলো পেলেই উদ্ভিদ্ তার সাহায্যে তেজ-বীর্য্যদায়ক ও পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করে নিতে পারে। প্রাণীজগতের সঙ্গে উদ্ভিদ্‌জগতের এইখানেই মস্ত প্রভেদ। এমন কোন জীব নেই যে উদ্ভিদের মত আশ্চর্য্য উপায়ে আপন খাদ্য আপনি সৃষ্টি করে নিতে পারে! প্রত্যেক জীবের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, তার গতির প্রতি ভঙ্গীটি বরং সম্পূর্ণ নির্ভর করে এই উদ্ভিদের উচ্ছিষ্ট জৈব পদার্থের উপরই। এদের পাতায়, এদের ডালপালায়, এদের ফুলেফলে যে প্রাণদায়ক ও শক্তিসঞ্চারক উপাদান সংগৃহীত থাকে তারই জোরে শুধু যে তারা প্রাণে বেঁচে থাকে ও পুষ্টিলাভ করে তাই নয়—উঠে হেঁটে ছুটে বেড়াতে পারে এবং—শিং নেড়ে ও লেজ তুলে নাচতে পারে!

মোটের উপর এটুকু বেশ সুস্পষ্ট জানা গেছে যে উদ্ভিদই প্রাণধারণের উপযোগী আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করে, যার সাহায্যে সে নিজে অথবা প্রাণীজগতের জীবেরা বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু এর মধ্যে মস্ত একটা শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে—উদ্ভিদ তার নিজের প্রাণ না দিয়ে প্রাণীজগতের প্রাণ রক্ষা ক'রতে পারে না! জীবলোক তা'কে ধ্বংস ক'রে তবেই আত্মসাৎ করতে পারে।

উদ্ভিদ যদিও নিজের খাদ্য নিজে প্রস্তুত ক'রে নেবার শক্তি রাখে, কিন্তু অনেক সময় এমন অবস্থাতেও তাকে পড়তে হয়, যখন প্রচুর আলো বাতাস ও জল পাওয়া সত্বেও সে সুস্থ ও সজীব থাকতে পারে না! কারণ, সেখানকার জলের মধ্যে হয়ত যথেষ্ট পরিমাণ নাইট্রেট্ বা তাম্র-দ্রাবক এবং লবণ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ও অজৈব উপাদানের অভাব, যার জন্য সে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য প্রস্তুত ক'রে নিতে বাধা পায়। এ অবস্থায় যে উদ্ভিদকে বাড়তে হয় ও বেঁচে থাকতে হয়, তার সঙ্গে আমাদের অভাবগ্রস্ত সংসারের কর্ত্রীদের তুলনা করা যেতে পারে। যাঁরা অন্নাভাবে দিনের পর দিন মুড়ি খেয়ে বা অন্য কিছু পুষ্টিহীন খাদ্য গ্রহণ ক'রে বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেন। তাঁদের শরীর যেমন ক্রমশঃ ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হ'য়ে আসে, উদ্ভিদের অবস্থায়ও দাঁড়ায় অবিকল তাই! সে তার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য পূর্ণমাত্রায় সংগ্রহ ক'রতে না পারায় ফলে ক্রমেই তার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য

সৌন্দর্য্য ও তেজ হারিয়ে ফেলতে থাকে এবং হয়ত শেষ পর্য্যন্ত সেই দরিদ্র গৃহিণীদের মতই শুকিয়ে পাকিয়ে অকালে মারা যায়। সুতরাং এটাও বেশ বোঝা যাচ্ছে যে কেবলমাত্র জল, হাওয়া ও আলো পেলেই হবে না, সেগুলি সগুণও হওয়া চাই!

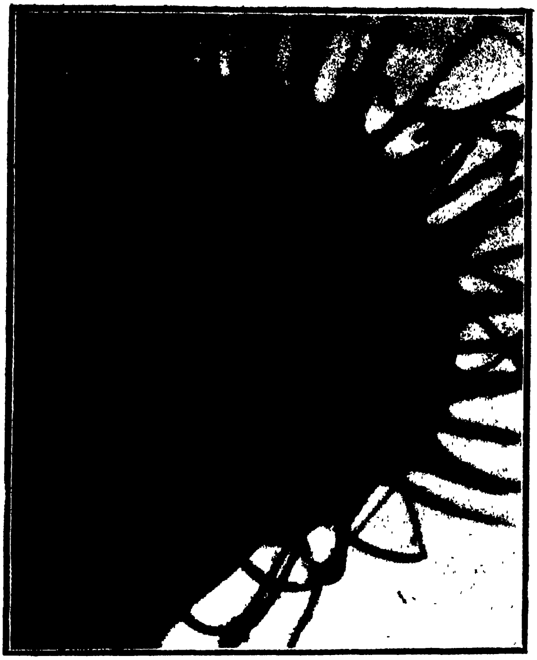
বিশেষজ্ঞেরা বলেন—দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নাভাবে ক্ষুধার্ত্ত মানুষও যেমন প্রাণে বাঁচবার জন্য নির্ব্বিচারে অখাদ্যও উদরস্থ ক'রতে দ্বিধা বোধ করে না, তেমনি উদ্ভিদও যেখানে জল হাওয়ার মধ্যে—বেঁচে থাকবার পক্ষে প্রয়োজনীয় উপাদানের একান্ত অভাব বোধ করে, সেখানে সে



নীহার-ভানুর শীষ (Sun-dew)। (মাছি ধরেছে। মাছিটির একেবারে নড়ন-চড়ন রহিত)

আমিষাশী হ'য়ে ওঠে! তার স্বাভাবিক খাদ্যের পরিবর্ত্তে অস্বাভাবিক উপায়েই আহার্য্য প্রস্তুত ক'রে নিতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রেই অনন্যোপায় হ'য়ে তারা কীটপতঙ্গ ধ'রে খায়! সেখানে নির্গুণ মৃত্তিকার বক্ষ-ধারায় যে পুষ্টিকর ও প্রাণধারণোপযোগী ভোজ্যরসের অভাব ঘটে, সেটা তারা পূরণ ক'রে নেয় ঐ কীটপতঙ্গের অঙ্গ হ'তে প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করে!

জজম লোকের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁরা হয়ত' —গাছপালারা পোকামাকড় ধ'রে খাচ্ছে—এরূপ ঘটনা সত্য বলে বিশ্বাস করা দূরে থাক্, কল্পনাই করতে পারবেন না! কিন্তু ব্যাপারটা যে কতখানি সত্য তা' অনায়াসেই তাঁরা বুঝতে পারবেন, যদি কোন খানা-খন্দল, মেঠো জলা বা পচা ডোবার ধারে গিয়ে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন। কারণ এই সব হাজামজা অঞ্চলেই প্রাণীভুক্ উদ্ভিদের বসবাস খুব বেশী চ'খে পড়ে। দিবারাত্র পাঁকের নোংরা জলে সেখানকার জমি ভিজে স্যাঁৎসেঁতে থাকায় ফলে কোন প্রাণী তো সেখানে বাস করতে পারেই না, কোন ভাল গাছপালাও জন্মায় না। ঘন শ্যাওলায়



নীহার-ভানুর শিকার—(অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায় কি ভাবে নীহার-ভানুর পত্রস্থ দীর্ঘ রোঁয়াগুলি একটি পিপীলিকা আসবামাত্র বেঁকে তার উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আঁকড়ে ধরে বিষাক্ত লালা বর্ষণ করছে!)

সেখানটা ঢাকা থাকে বলে অক্সিজেন্ বা অম্লজান বাষ্প সেখানে প্রবেশ ক'রতে পারে না। নানারকম দুষ্পাচ্য অম্ল (antiseptic acids) জমে ওঠে! বিশেষতঃ নাইট্রোজেন্ বা যবক্ষারজান এবং উদ্ভিদের পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন খনিজ পদার্থের অস্তিত্বও থাকে না।

অথচ এ অবস্থাতেও দেখা যায় যে কোন কোন গাছ সেখানে বেশ সতেজেই বেড়ে উঠছে, যেন তার পারিপার্শ্বিক বিরুদ্ধ অবস্থাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রেই! এর কারণ অনুসন্ধান ক'রলেই দেখতে পাওয়া যাবে যে ঐ সব গাছের ডাল ও পাতা রসকোষযুক্ত চুলের মত সরু সরু সূক্ষ্ম কাঁটা বা রোঁয়ায় পরিপূর্ণ। ঐ সরু কাঁটার মত চুলের মুখে হঠাৎ আঘাত লাগলেই আঠা নিঃসৃত হয়! যদি কোন কীট পতঙ্গ ঐ গাছের ডালে বা পাতায় গিয়ে বসে, তাহ'লে তাদের শরীরের সামান্য আঘাতেই সেই সূক্ষ্ম চুলের মত রোঁয়া বা কাঁটাগুলির রসকোষ থেকে তৎক্ষণাৎ আঠার ন্যায় লালা নিঃসৃত হ'য়ে উক্ত কীট বা পতঙ্গকে লেপ্‌টে ধরে। তারা সেখানেই জব্দ হ'য়ে আট্‌কে থাকে



নীহার-ভানুর আকৃতি—(একটি 'নীহার-ভানু' লতার সম্পূর্ণ আকৃতি। এর কবলে একটি মস্ত ফড়িং এসে পড়েছে)

ও অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায়। তাদের গলিত মৃতদেহ থেকে সেই লোমশ তরু-তৃণ তখন নিজ নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করে নেয়। সেখানকার অসুস্থ মৃত্তিকার রসে তারা যা ভোজ্যবস্তুর সন্ধান পায় না, এই সব মৃত জীবের গলিত শরীর থেকে তারা সেই সকল খাদ্যসার সংগ্রহ ক'রে সতেজে বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হয়। এই-ভাবে জীবনধারণে দীর্ঘকাল ধ'রে অভ্যস্থ হওয়ার ফলে ক্রমে সেইটাই তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ও তদনুসারে তাদের আকৃতিরও অনুরূপ জীবন-যাপনের উপযোগী ও অনুকূল পরিবর্ত্তন, বহু জন্মান্তরের ক্রমবিবর্ত্তনে সংঘটিত হয়েছে।

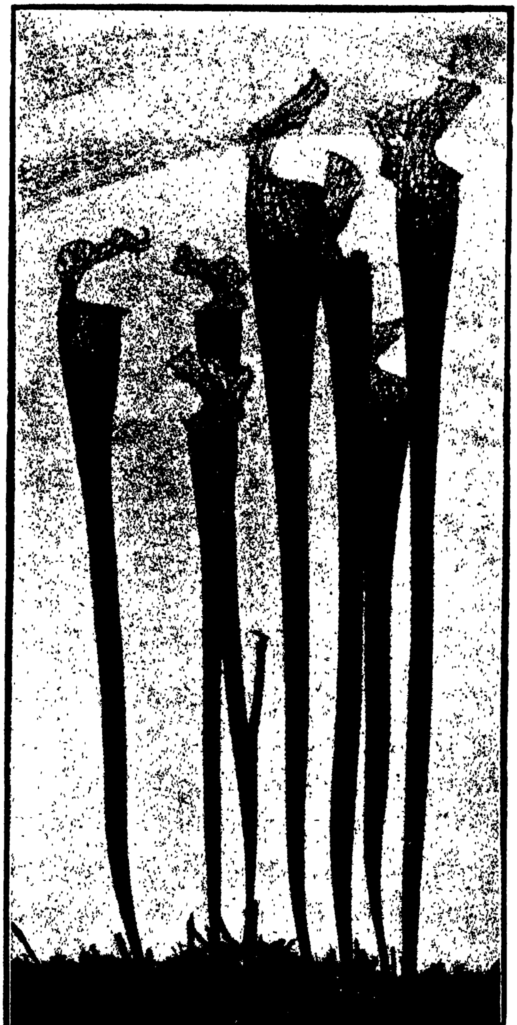
প্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত চার্লস্ ডারউইন্ এই সকল প্রাণীভূক্ উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান ক'রে অতি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার সব আবিষ্কার ক'রে গেছেন। তিনি বলেন—উদ্ভিদের মধ্যেও রীতিমত রক্তপিপাসু মাংসলোভী হিংস্র গাছপালা আছে। লোল জিহ্বার মত তারা তাদের



তূর্য্যলতা (Trumpets)—(আমেরিকায় এই জাতীয় উদ্ভিদ্ জন্মায়। পাতার শেষের দিকটি ঠোঙার মত মোড়া, তার মধ্যে মৃত কীটপতঙ্গ স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে)

দীর্ঘ সূক্ষ্ম শুঁড় বিস্তার ক'রে প্রাণী শিকারের জন্য হ'য়ে থাকে। কেউ রঙীণ সুন্দর ফুলের লোভ দেখিয়ে—কেউ বাহারী পাতার নয়নাভিরাম রূপ দেখিয়ে—কেউ বা মায়া মরীচিকার মত মিথ্যা-মধুর চার দিয়ে নানা নির্ব্বোধ জীবকে নিজেদের খর্পরের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে হত্যা করে। তাদের লেলিহান রসনার বিষাক্ত লালায় কীট-পতঙ্গেরা আবদ্ধ হ'য়ে প্রাণ দেয়। ডারউইনের মতে জীবের সংস্পর্শ ঘটবামাত্র ঐ সকল উদ্ভিদের ডালপালা ও পাতা নুয়ে

পড়ে ও গুটিয়ে আসে। এমন কি অনেক সময় দেখা যায়, প্রত্যেক পাতাটি যেন একেবারে সর্ব্বাঙ্গ মুম্‌ড়ে একটি ঠোঙা বা আঁজ্‌লা হ'য়ে উঠেছে! সূক্ষ্ম শুঁড়গুলি নিম্নাভিমুখী হ'য়ে তাদের শীর্ষদেশস্থ রসকোষ হ'তে আবদ্ধ-জীবের অঙ্গে



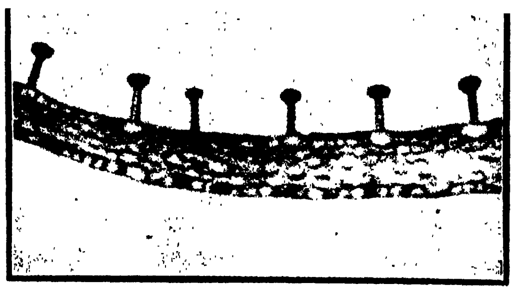
কলস লতা বা ভৃঙ্গার লতা (Pitcher plant)—(এর এই সরু লম্বা চোঙের গর্ভে অসংখ্য প্রাণী তাদের অন্তিম-শয্যা গ্রহণ করে)

তরল আঠা বা লালা বর্ষণ করতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেনে একেবারে সেই পাতার ঠোঙার গর্ভে এনে ফেলে! সেখান থেকে আর সে হতভাগ্য জীবের পরিত্রাণ পাবার কোন উপায়ই থাকে না! কারণ সে পালাবার জন্য যতই



মাখন লতা (Butterwort)—(শিকার এসে পড়লে এদের পাতার অসংখ্য রস-কোষ হ'তে বিষাক্ত লালা নির্গত হ'তে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পাতার কিনারা গুটিয়ে আসতে থাকে)

ছট্‌ফট্‌ করে ততই তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্ষেপের ফলে আঘাত লেগে গাছের পাতার সমস্ত লোমগুলি বা ফুলের সমস্ত



মাখন লতার অজস্র রস-কোষ—(মাখন লতার পুরু মোটা পাতার একটুকরা চিল্‌তে কেটে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখলে লক্ষ্য হয়—কত অসংখ্য রস-কোষে প্রত্যেক পাতাটি আচ্ছন্ন!)

শুঁড়গুলি অধিকতর উত্তেজিত হ'য়ে উঠে, দ্বিগুণ বেগে লালা বর্ষণ করতে সুরু করে।

ডার্‌উইন্ বলেন—শুঁড়গুলি নিম্নাভিমুখী হ'য়ে যখন লালা বর্ষণ ক'রে তখন তা' এমন একটা অম্ল আরকে রূপান্তরিত হ'য়ে নিঃসৃত হয়, যা আমাদের পাকস্থলী নিঃসৃত রসধারার ন্যায় পাচকগুণসম্পন্ন। সুতরাং তিনি এ সম্বন্ধে একেবারে কৃতনিশ্চয় হয়েছিলেন যে উক্ত পাচকগুণসম্পন্ন অম্ল আরক জাতীয় রস সংযোগে প্রাণীভুক্ উদ্ভিদেরা তাদের খাদ্য রীতিমত পরিপাক করে নিয়ে তার সার আকর্ষণে প্রাণধারণ করে। অসার পদার্থ বাইরে পড়ে থাকে! ডার্‌উইনের এই আবিষ্কার উদ্ভিদ্ জগতে এক নূতন আলোকপাত করেছিল। উদ্ভিদও যে হিংস্র ও মাংসাশী



রতি-ফাঁদ (Venus Fly-trap)—(এর প্রত্যেক পাতাটি দু'খানি ডালার মত দু'ভাগ করা। শিকার এসে ফাঁদে পড়লেই ঝপ্ করে ডালা দুটি বন্ধ হ'য়ে প্রাণীটিকে অবরুদ্ধ ক'রে ফেলে!)

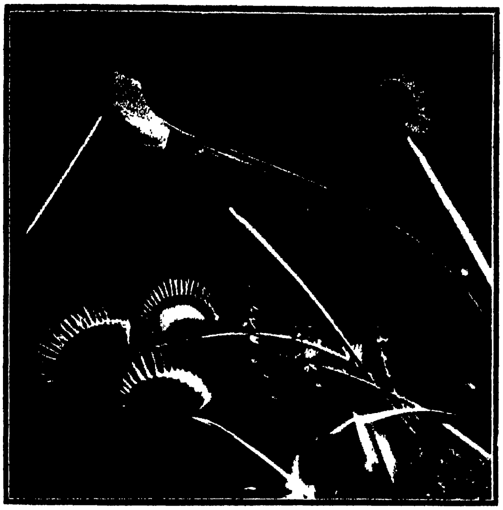
হ'তে পারে এ তথ্য আগে কারও জানা ছিল না এবং তারা যে সকল পোকামাকড় খায়, তা' যে আবার জীবজন্তুদের মতই যথানিয়মে তারা হজম ক'রে নিয়ে তার সারাংশে নিজের পুষ্টি ও শক্তিবৃদ্ধি করে—এ সংবাদও তখন পর্য্যন্ত য়ুরোপে অবিদিত ছিল।

বিলাতে অর্থাৎ ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানা স্থানে হাজা-পচা জলা জমীতে 'নীহার-ভানু' নামে (Sun-Dews) এক রকম জংলী চারা জন্মায়। সাধারণতঃ এর পাতা গোলাকার, তবে আরও দু' একরকম—যেমন বাদামী লম্বাটে পাতা—আর এক খুব বড় বড় পাতাওয়ালা 'সান্-ডিউ' গাছও দেখতে পাওয়া গেছে। এর সবুজ পাতা ও ডাঁটার গায়ে অসংখ্য চুলের মত সরু সরু রক্তবর্ণের দীর্ঘ কাঁটা বা লোম আছে, প্রত্যেক কাঁটা বা লোমের মুখে ক্ষুদ্রতম জলকণার মত এক একটি রসে টস্‌টসে আঠা বা লালা ভরা কোষ আছে। সূর্য্যকিরণে এই কোষগুলি নীহার কণার মত ঝিক্‌মিক্ করে, তাই কবিরা এর নাম রেখেছেন 'Sun-Dew' অর্থাৎ 'নীহার-ভানু'!

উত্তর আমেরিকায় একপ্রকার প্রাণীভুক্ উদ্ভিদ্ দেখতে পাওয়া যায়, তার পাতাগুলি সুতার মত সরু সরু এবং এক ফুট দেড় ফুট লম্বা! এই সূত্রাকার সুদীর্ঘ পত্রপুঞ্জ এত অজস্র জন্মায় যে সেগুলি পরস্পর জোটপাকিয়ে মাটিতে লুটোয়, কারণ গাছগুলি লম্বায় বাড়ে না। এরাও ঠিক 'নীহার-ভানু'র মতই নিষ্ঠুরভাবে প্রাণীহত্যা ক'রে তবেই জীবনধারণে সমর্থ হয়।

পাহাড়ের উপর যে সব জলা জমী আছে সেখানে এক রকম প্রাণীভুক্ উদ্ভিদ্ জন্মায় তাদের চেহারা এক একটা বড় বড় কাঁঠালিচাঁপা ফুলের মত! এর নাম 'Butterwort' অর্থাৎ 'মাখনলতা'! মাখনলতার পাতার উপরদিকটি দু'রকম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার মত কোষে আচ্ছন্ন থাকে, অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ভিন্ন সাদা চোখে তা' দেখা যায় না। একরকম কোষ যারা সংখ্যায় বেশী তারা পাতার গায়ে মিশিয়ে থাকে এবং আর একরকম কোষ যারা সংখ্যায় অল্প তারা পাতার উপর ঘাড় তুলে মাথা উঁচু ক'রে খাড়া হ'য়ে থাকে! এই দু'রকম কোষ থেকেই বিষাক্ত লালা নির্গত হয় এবং ঠিক 'নীহার-ভানু'র আঠার মতই নাইট্রোজেন বা যবক্ষারজান সংযুক্ত কোন পদার্থের সংস্পর্শ ঘটলে অম্ল-আরকে রূপান্তরিত হয়। কারণ এখানেও ধৃত কীটপতঙ্গের অঙ্গজাত খাদ্য মাখনলতা উক্ত অম্ল-আরকের সাহায্যেই পরিপাক ক'রে নিতে সমর্থ হয়। মাখনলতার পাতার কাণা বা ধারি একটু ভিতরদিকে গুটিয়ে থাকে। ধৃত কীটপতঙ্গ এই প্রাচীর অতিক্রম করে

পালাতে পারে না, কারণ এদিকে এলেই অসংখ্য কোষ তার আগমনে উত্তেজিত হ'য়ে উঠে যে লালাস্রাব বর্ষণ করে তার বেগে সে জড়িয়ে গড়িয়ে পাতার গর্ভে গিয়ে পড়ে!



রতি-ফাঁদে আলপিন—(এই ফাঁদের শক্তিপরীক্ষার জন্য যুগ্ম ডালার মধ্যে একটি আলপিন ছুঁইয়ে দেখা গেছে আলপিনটিকে তারা চেপে কামড়ে ধরে!)



কাফ্রি নীহার-ভানু—(আফ্রিকায় এই ধরণের 'সান্-ডিউ' দেখতে পাওয়া গেছে)

'মাখনলতা' শুধু মাংসাশী নন, ডারুউইন সাহেব পরীক্ষা ক'রে দেখে ব'লেছেন এঁদের নিরামিষ পথ্যেও রুচি বেশ! এঁরা কচি পাতার কুচি, ফুলের কেশর, বীজের দানা প্রভৃতি বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই ভোজন করেন! সুতরাং এই উদ্ভিদ্-ভোজী উদ্ভিদকে বলা যেতে পারে—উদ্ভিদ্ জগতের রাক্ষস!

অন্যান্য দেশের জলাভূমিতে আরও অদ্ভুত রকমের সব প্রাণীভুক্ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে! উত্তর আমেরিকার উষ্ণ প্রধান অঞ্চলে 'Venus Fly trap' বা রতি দেবীর মক্ষীফাঁদ নামে একপ্রকার প্রাণীভুক্ উদ্ভিদ্ জন্মায়। এরা রীতিমত ফাঁদ পেতে পোকামাকড় ধরে। 'নীহার-ভানু' বা 'মাখনলতা'র মত এদের হাতে কোন বিষাক্ত লালা বা আঠা-রসের অস্ত্র নেই! এদের প্রাণীশিকার রীতি অতি ভীষণ ও নৃশংস।

লম্বা লম্বা ডাঁটার মুখে অদ্ভুত একজোড়া ক'রে পাতা! উভয় পাতার চারদিকেই অসংখ্য কাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাঁত! পাতা জোড়াটি বইয়ের মলাটের মত আধ খোলা অবস্থায় উঁচু হয়ে থাকে, তার উপর পিঠ কাল, ভিতর পিঠটা সাদা!—দেখে মনে হয় যেন কোনো বহুদন্তী হিংস্র জানোয়ারের মুখ!—কিছু খাবার জন্য সে হাঁ ক'রে রয়েছে! কোন কীটপতঙ্গ যদি এর ডাঁটার উপর দিয়ে চলে বেড়ায় বা জোড়া পাতার পিছনদিকে গিয়ে বসে—তাহ'লে কোন ভয় নেই, এমন কি দাঁতের উপরে গিয়ে বসলেও কিছু হয় না, কিন্তু যদি সে হতভাগ্য কীট কোন ক্রমে একবার ঐ যুগ্ম পাতার ভিতর দিকে যে তিনটি ক'রে অতিমাত্রায় স্পর্শ-সচেতন পর্দ্দা আছে তা ঈষৎ স্পর্শ ক'রে ফেলে, তৎক্ষণাৎ স্প্রিংয়ের ডালার মত সেই আধখোলা পাতা জোড়াটি নিমেষের মধ্যে ঝপ্ করে বন্ধ হ'য়ে যাবে! বেচারী পোকাটি তখন সেই উভয় পাতার চাপে 'স্যাণ্ডউইচের' মত অবস্থায় গতায়ু হবে! তবে পোকাটি যদি নেহাৎ ক্ষীণ ও ক্ষুদ্র হয়, তাহ'লে পাতার ফাঁদে ধরা পড়লেও তারা চট্ ক'রে মরে না। ভিতরেই ঘুরে ফিরে বেড়ায়। এমন কি ফাঁক পেলে গ'লে পালাতেও পারে!

আর এক রকম কীটভোজী উদ্ভিদ্ দেখা গেছে—তাদের বলে 'Side-Saddle', বা 'বগ্‌লি-জিন্'! এদের পাতা রঙীণ ফুলদানীর আকারে লম্বা চোঙার মত! এরা জলের জালে শিকার ডুবিয়ে মারে! সেই রঙীণ ফুলদানীর মত পাতার চোঙার মুখপাতে থাকে মধুনিঃসারি গণ্ডমালা। মধুলোভে কীটপতঙ্গ আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সেই চোঙের মুখে

ঢুকলে আর তাকে ফিরতে হয় না! মধুর স্বাদ পেয়ে ধীরে ধীরে সে আরও লোভাতুর হয়ে ভিতরে যেতে সুরু করে এবং এ যাত্রা তাদের শেষ-যাত্রায় পরিণত হয়! কারণ সে যত ভিতরে যেতে থাকে—তার পিছু পিছু পাতার গায়ের রোঁয়াগুলি উত্তেজিত ও বিস্তৃত হ'য়ে তার ফেরবার পথ রুদ্ধ ক'রতে থাকে। পোকাটি ফেরবার পথ খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত হ'য়ে শেষে সেই ফুলদানীর তলায় পড়ে যায়! সেখানে থাকে জলভরা! সেই জলের অথৈ তলে সে তলিয়ে ডুবে মরে যায়!

কালিফোর্ণিয়ার—"Darlingtonia" বা 'প্রিয়াকণ্ঠি' এবং 'Pitcher Plant' বা 'ভৃঙ্গার লতা'ও ঠিক এইভাবে কীটপতঙ্গ আকর্ষণ ক'রে এনে তাদের ডুবিয়ে মারে এবং তাদের মৃতদেহ জলে পচে' গ'লে উঠলে তবে তাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিলাভের সুবিধা হয়।

কবি কীট্‌স্‌

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ

অনেকেই জন্ কীট্‌সকে কেবল সৌন্দর্য্যের উপাসকরূপেই জানেন। রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্য্যেই মত্ত থাকিয়া তিনি কেবল তাহারই জয়গান করিয়া গিয়াছেন - এই ভ্রান্তধারণা অনেকেই কীট্‌সের সম্বন্ধে পোষণ করেন। বস্তুতঃ কীট্‌সের কবিজীবনে যে ক্রমবিকাশ দেখা যায় তাহা কেবল শ্রেষ্ঠ কবিদের ইতিহাসে বর্ত্তমান। মৃত্যুকালে তিনি ২৫ বৎসরের যুবক মাত্র। এই তরুণ বয়সেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য-জগতে অনন্যসাধারণ। কবি বলিয়াছিলেন—"আমি আশা করি মৃত্যুর পর ইংরাজ কবিদের মধ্যে গণ্য হইব।" কবির উপরোক্ত কথার উল্লেখ করিয়া ম্যাথু আরণল্ড বলিয়াছেন— কীট্‌সের আসন সেক্ষপীয়রের সহিত।"

শ্বেতভুজা বীণাপাণির মন্দিরে অস্পৃশ্যতা নাই। ১৭৯৫ খৃঃ লণ্ডনের অন্তর্গত ফিন্সবারিতে এক অশ্বরক্ষকের গৃহে এই বিশ্ববিশ্রুত কবির জন্ম হয়। ইউরোপের সাহিত্য-জগতে তখন এক পরম যুগ। ১৭৯৮ খৃঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও কোল্‌রিজের 'লিরিক্যাল্ ব্যালাডস্' প্রকাশিত হয়। ইহাই রোমাণ্টিক যুগের স্পষ্ট বিকাশ। বহুপূর্ব্ব হইতেই কাব্যজগতে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় ভাবধারা প্রবেশ করিতেছিল—তাহাই আজ মূর্ত্ত হইয়া অতি স্পষ্টভাবে নিজেকে ব্যক্ত করিল। রোমাণ্টিক কবিদের অব্যবহিত পূর্ব্বের কবি কুপার, ক্রাব বা বার্ণসের মধ্যে এই নবভাবের সূচনা যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তর্ক ও ন্যায়ের জটিলতা হইতে চিন্তাধারাকে মুক্ত করিয়া যাঁহারা কল্পনালোকের সম্মোহন আবেষ্টনীতে ইহাকে আনিয়াছিলেন এবং মানব ও প্রকৃতিকে নূতন ভাবে ও নূতন আলোকে দেখাইয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রথমে রোমাণ্টিক যুগের সূচনা করেন। অতীতের প্রতি একটি তীব্র আকাঙ্খা এই কল্পনার সহায়ক। মানব যখন বর্ত্তমানে বীতশ্রদ্ধ হয়, তখন সে অতীতের সৌন্দর্য্য ও গৌরবময় কাহিনীতে আশার রঙ্গীণ ছবি দেখে। যখন বর্ত্তমানে ধরিবার মত কিছু পাওয়া যায় তখন মানব বর্ত্তমানের সেই ক্ষুদ্রতম আশ্রয়টুকু অবলম্বন করিয়াও অনেক কিছু গড়িতে পারে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ এমন কি বায়রণ, শেলী ও স্কট্ তাহাই করিয়াছিলেন। ফরাসী বিদ্রোহের প্রবল বন্যা যখন ইউরোপে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ঊর্ম্মি আনিয়াছিল, তখন তরুণ কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ আনন্দে আত্মহারা হইয়া বর্ত্তমানকে ধরিয়াই নিজেদের নব প্রীতি কবিতায় প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই ফরাসী বিদ্রোহের বর্ব্বরতা তাঁহাদের সে রঙ্গীণ কল্পনায় নিষ্ঠুর আঘাত করিয়াছিল। ইহাতে এই দুই কবির মানসিক ও কাব্যিক যে অধঃপতন ঘটিয়াছিল তাহা বাস্তবিক শোচনীয়। আদর্শের অতর্কিত এই বিকৃতিতে তাঁহারা নিজেদের একমাত্র সম্বল যেন হারাইয়া ফেলিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন এবং ক্রমে চিন্তাধারার এক অভিনব বিপর্য্যয় ঘটাইয়া বসিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিজের ও ভগিনীর চেষ্টায় প্রকৃতির ও গূঢ় অধ্যাত্মবাদের মধ্যে থাকিয়া টিকিয়া গেলেন কিন্তু কোলরিজের জীবন এক বিয়োগান্ত নাটকেই পরিণত হইল। শেলীও এই বিদ্রোহকে আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি ইহার মন্দ দিকটা ছাড়িয়া দিয়া ভালটুকুর সাহায্যে ও কল্পনার প্রভাবে এক আদর্শ সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতালোকের ছবি তাঁহার 'প্রোমীথিয়সের মুক্তি' নামক কাব্যে অঙ্কিত করিয়াছেন। বায়রণ ও স্কটের মধ্যে 'বর্ত্তমানের' এই প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু কবি কীটস্ রোমাণ্টিক্ যুগের এক অপূর্ব্ব অধ্যায়। তিনি নিজেই সেই অধ্যায়ের আরম্ভ—নিজেই তাহার অবসান। 'বর্ত্তমানের' হীন আদর্শ তাঁহাকে কবিতার কোন উপকরণ যোগাইতে পারে নাই। যখন কীট্‌স্ লিখিতে আরম্ভ করেন, ওয়াটারলু যুদ্ধের পর ইংলণ্ড তখন জড়বাদ ও পার্থিব ভোগে মত্ত। ১৭৮৯ অব্দ হইতে কবিরা যে মহৎ ভাবধারাকে আশ্রয় করিয়াছিল তখন তাহা মৃত ও বিকৃত। বিদ্রোহ শান্তির সহিত কল্পনা বিষাদে ও অবসন্নতায় পর্য্যবেশিত হইয়াছিল। কবি কীট্‌স্ ইংলণ্ডে থাকিয়া সে সমস্তই অনুভব করিলেন। তিনি বুঝিলেন যে বর্ত্তমান তাঁহার কবি-মনের

কোন খোরাকই যোগাইতে পারিবে না। বর্ত্তমানের চিন্তা, আশা ও আকাঙ্খা প্রত্যাখ্যান করিয়া কীট্স্ তখন অতীতের দ্বারে ভাবের প্রার্থী হইলেন। প্রাচীন গ্রীসের গৌরবময় কাহিনী, সেখানকার অনাড়ম্বর জীবন, সরল পৌত্তলিকতা, শুচিশুভ্র প্রকৃতি ও আদিম অনুরাগ কীটস্‌কে মুগ্ধ করিল। অনেকেরই মনে হইতে পারে যে কীট্স কিরূপে কেবল অনুবাদ পড়িয়া ও ইংলণ্ডের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া গ্রীসের এই ভাবটুকু আয়ত্ত করিয়াছিলেন। ইহার উত্তর শেলী দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কীট্স্ আজন্ম গ্রীক্। বস্তুতঃ প্রাচীন যুনানীভাব কীট্সের মজ্জাগত। শিক্ষার অভাব বা লণ্ডনের সঙ্কীর্ণ পরিসর ইহাতে কোনও বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। প্রাচীন গ্রীকদের ভাবিবার ও দেখিবার রীতি কীটসের কবিতার একটি বৈশিষ্ট্য (Hellenism)। বৈদিকযুগের প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের প্রকৃতি পূজার রীতি অনেকাংশে গ্রীক রীতির অনুরূপ। বৈদিক ঋকে দেখা যায় প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ দেবতারূপে কল্পিত হইয়া স্তুত হইয়াছে। উষাকালে অরুণ-সারথি সূর্য্যদেব তাঁহার রথে দৈনন্দিন কার্য্যে বাহির হইয়াছেন, জল-দেবতা বরুণ শস্যসম্ভার লইয়া মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন—এই ভাবে প্রকৃতির আরাধনা যেমন বৈদিক হিন্দুর বৈশিষ্ট্য ছিল, তেমনি ভাবে প্রাচীন গ্রীকেরা আদিম মনের সাহায্যে প্রকৃতিতে প্রাণ সঞ্চার করিয়া দেখিত। বর্ত্তমানের সভ্যতা বা বিদ্যার আড়ম্বর তখন মানুষকে ভারাক্রান্ত করে নাই—তাই তখন সে একটি গোলাপকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উদ্ভিদ্-জ্ঞান-পিপাসা মিটাইত না, পরন্তু ভগবানের এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি বলিয়া ইহার সৌন্দর্য্যেই মগ্ন থাকিত। এই আদিম সৌন্দর্য্য প্রীতি—অর্দ্ধ-পূজা ও অর্দ্ধ-আনন্দের—এই ভাবই গ্রীক প্রকৃতির মূল কথা।

কিন্তু কীট্স্ গ্রীক রীতিতে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করিয়া চিরকালই কেবল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দরকে বরণ করিয়া যান নাই; তিনি যে ক্রমে এক অতীন্দ্রিয় পদার্থের সন্ধান পাইতেছিলেন তাহা তাঁহার কবিতাতেই সুস্পষ্ট। কবিতাই কবির আত্মজীবনী। এণ্ডিমিয়ন্ ওড্‌স্ কয়টি, লামিয়া ও হাইপেরিয়ন্—এই কয়টি কবিতাতেই কীট্সের ক্রমবিকাশ ও বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এণ্ডিমিয়ন তাঁহার প্রথম প্রচেষ্টা, অপরিণত বয়সের অনেক চিহ্ন ইহাতে আছে। জ্যোৎস্না দেবীর সিন্‌থিয়ার রাখাল বালক এণ্ডিমিয়নের সহিত প্রণয়কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার হস্তে ইহা এক রূপকে পরিণত হইয়াছে। সিন্‌থিয়ার জন্য এণ্ডিমিয়নের প্রেম পরম সুন্দরের জন্য কবির হৃদয়ের আবেগই সূচনা করিতেছে। এণ্ডিমিয়নের প্রথম ছত্রটি প্রসিদ্ধ। "চির আনন্দে নন্দিত যাহা সুন্দর"—যদিও ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দরের আরাধনা, তথাপি কবির হৃদয়ের পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। একটি প্রাচীন গ্রীসীয় পাত্রের চতুর্দ্দিকে কারুকার্য্যখচিত চিত্রসকল দেখিয়া তিনি যে গীতিটি লিখিয়াছিলেন তাহাও সুন্দরেরই পূজা। 'সুন্দরই সত্য, সত্যই সুন্দর'—ইহা যদিও বাহ্যতঃ ভাস্কর শিল্পের মহিমা-কীর্ত্তন, তথাপি ইহার মধ্যে এক নিগূঢ় সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কারুকার্য্যখচিত ও বিচিত্রচিত্রশোভিত পাত্রটি প্রাচীন গ্রীসের যেন একটি অধ্যায়কে অমর করিয়া রাখিয়াছে। কোথায় গিয়াছে গ্রীসের সেই লোকোত্তর গৌরব, কোথায় তাহার সেই সরল সৌন্দর্য্য—কিন্তু বর্ত্তমানের এই কুৎসিৎ আবেষ্টনের মধ্যে সেই মুহূর্ত্তগুলিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে এই সুন্দর শিল্পকলাযুক্ত পাত্রটি। কারণ সত্য কখনও মরে না—সে সেই অমর, অব্যর্থ সত্যেরই সন্ধান দিতেছে বলিয়াই সে আজ এত সুন্দর। 'লামিয়া' কবিতাটি কবির এক বিশিষ্ট দান। সুন্দরী রমণীর আকৃতি ধারণ করিয়া এক সর্পিণী 'লিসিয়াস' নামক এক পুরুষকে মুগ্ধ করে ও তাহাকে বিবাহ করে। বিবাহোৎসবের মধ্যে দার্শনিক এপোলোনিয়সের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কুহেলিকা ভেদ করে। কবি যে আর কেবল রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়েই চিত্ত নিবিষ্ট রাখিতে পারিতেছেন না, তাঁহার হৃদয়ে যে অতীন্দ্রিয় এক পরম রূপের জন্য দ্বন্দ্ব চলিতেছে তাহা 'লামিয়া' পড়িলে বুঝা যায়। এই দ্বন্দ্ব আরও স্পষ্টভাবে অনুভূত হয় কবির 'হাইপেরিয়ন' নামক কবিতাংশটি পড়িয়া। মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' নামক মহাকাব্যের সমতুল্য এক কাব্য সৃষ্টির আশাতেই তিনি "হাইপেরিয়ান্" আরম্ভ করেন। কিন্তু দুটি সম্পূর্ণ ও একটি অসম্পূর্ণ কাণ্ড লিখিয়াই তিনি এ চেষ্টা ছাড়িয়া দেন। তিনি মহাকাব্য লিখিবার অনুপযুক্ত অথবা ইহাতে মিলটনের মুদ্রাঙ্ক পড়িতেছিল বলিয়াই তিনি এ প্রচেষ্টা ছাড়িয়া দিলেন তাহা বোধ হয় না। ইহার মূলে রহিয়াছে তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত দ্বন্দ্ব। লেখার ও হৃদয়ের ভাবের সহিত তিনি সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছিলেন না বলিয়াই ইহা অর্দ্ধপথে ছাড়িয়া দিলেন বলিয়া মনে হয়। অলিম্পিয়ানগণ কর্ত্তৃক টাইটনদের পরাজয় এই কাব্যের বিষয়। সেটারন্ তাঁহার পুত্র জুপিটার কর্ত্তৃক স্বর্গরাজ্যচ্যুত হইয়া বিলাপ করিতেছেন। একমাত্র টাইটন্—সূর্য্যদেবতা হাইপেরিয়ন্ তখনও পরাজিত হইবার শঙ্কায় শঙ্কান্বিত। এধারে আপেলো ক্রমে নিজের মধ্যে এক পরিবর্ত্তন ও আনুষঙ্গিক দ্বন্দ্ব ও ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। এইখানে কবিতাটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কবি ওসিয়েনাস নামক এক টাইটনের মুখে বলিতেছেন যে অলিম্পিয়ানরা জিতিবে—কারণ তাহারা অধিকতর সৌন্দর্য্যের অধিকারী। 'যে যত অধিক সুন্দর সেই তত বলবান' ইহাই কবিতাংশটির মূল কথা। এ যে আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য—অবিনশ্বর, পরম, অমৃত ও অখণ্ড সৌন্দর্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি নিজের পরিবর্ত্তন আপেলোর মধ্যে সূচিত করিয়াছেন কিন্তু এই সৌন্দর্য্য যে অপার্থিব ও ভূমা—তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই বোধ হয় 'হাইপেরিয়ন্' অর্দ্ধ পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন।

যে কীটস্ সুরাপানের পূর্ব্বে লঙ্কার উগ্রতা আস্বাদ করিতেন, ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি প্রখরতর করিবার জন্য তিনিই আবার ভূমানন্দ লাভের জন্য ব্যাকুল; কিছুকাল পূর্ব্বে যিনি ফ্যানীব্রণ নাম্নী রমণীর প্রেমে আত্মহারা হইয়াছিলেন তিনিই আবার নিজের মধ্যে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন বোধ করিয়াছিলেন—এক মহত্তর রূপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। ইহাই বোধ হয়, কীট্সের জীবনের বড় কথা।

সামাজিক হিতসাধনে জীবন-বীমা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় বি-এ

ধন-সঞ্চয়ের উপর যে জাতীয়তার ভিত্তি সংস্থাপিত একথা আমরা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু কোনও ব্যক্তিবিশেষের ধনসঞ্চয়ের উপর জাতির কল্যাণ নির্ভর করিয়া থাকিতে পারে না। কোনও বিশেষ একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির উপরও জাতির শ্রীবৃদ্ধি নির্ভরশীল নহে; সে প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা যতই ব্যাপক হউক না কেন, তাহার উন্নতিতে মুষ্টিমেয় ধনিক অথবা বহুসংখ্যক অংশীদারের স্বার্থরক্ষা হয় বটে—বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক বা কেরাণীর দল কায়ক্লেশে দুইবেলা অন্ন সংস্থানেরও সুযোগ পায়, কিন্তু তাহাতে সমগ্রভাবে জাতির আর্থিক দুর্গতি দূর হয় না, অর্থনৈতিক সমস্যারও কোনও সমাধান হয় না; সমগ্র জাতি যে দেশের আর্থিক অবস্থার উৎকর্ষ-সাধনের জন্য সমবেতভাবে সচেষ্ট, ইহাও তাহার দ্বারা বুঝা যায় না।

জাতির সমবেত চেষ্টার কথা বলিতে গেলেই পারিবারিক ও সামাজিক একপ্রাণতা ও ঐক্যসাধনের কথা আসে। বাঙ্গালীকে সামাজিক সংহতি সাধনের দিকে মন দিতে হইবে। সমাজের সকল স্তরেই যখন জাতিগত আত্মবোধ অধিকারভেদে পরিস্ফুট হইয়া উঠে তখনই যথার্থ জাতীয় জাগরণ সূচিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর যে সমাজ আজ দারিদ্র্য-দোষে গুণহীন—অভাবের তাড়নায় পঙ্গু হইয়া আছে—আশা-হীন, উৎসাহ-হীন, আত্মনির্ভরতা-বিহীন—সে বাঙ্গালী সমাজের সংহতি সাধন দূরের কথা—ওতপ্রোত-ভাবে প্রকৃত জাতীয় কল্যাণ সাধনের জন্য জাতি এখনও জাগ্রত হয় নাই।

কিন্তু তাহাতে নিরুৎসাহ হইলে চলিবে না—অর্থ-সম্পদে সম্পদশালী করিয়া জাতিকে প্রকৃত কল্যাণের পথে অগ্রসর করিয়া দিবার চিন্তা—বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সে চিন্তার ফল—জগতের অন্যান্য দেশ বিশেষভাবে উপভোগ করিতেছে। ভারতবর্ষই বা কেন পশ্চাৎপদ থাকিবে? দরিদ্র সমাজকে—দৈনন্দিন অভাব হইতে, ভবিষ্যতের নিদারুণ দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিবার পথে অন্যান্য দেশ কি ভাবে অগ্রসর হইতেছে দেখা যাক্—,

জীবন-বীমার মাথা পিছু (Per Capita) পরিমাণ—

আমেরিকা	...	...	৩,০৭৬৲
গ্রেট ব্রিটেন	...	...	৯৭০৲
নেদারল্যাণ্ডস্	...	...	৪৪৮৲
ভারতবর্ষ	...	...	৫৲

এ সম্পর্কে একজন প্রসিদ্ধ বীমাবিদ্ বলিয়াছেন—

There was only one way in which a poor man without capital could protect his family from the vicissitudes of fortune and make proper security against the day that must come to us all and that was through life insurance.

—Charles E. Hughs.

—অর্থাৎ একজন গরীব লোক, যাহার কোনও মূলধন নাই, তাহার পক্ষে ভবিষ্যতের দুর্দ্দশা হইতে পরিবারবর্গকে রক্ষা করা এবং যে দুর্দ্দিন একদিন সকলেরই আসিবে—সেদিনের জন্য উপযুক্ত সঞ্চয় করার একমাত্র উপায় জীবন-বীমা করা।

কিন্তু শুধু দরিদ্র লইয়াই ত আমাদের সমাজ নহে—ধনীর পক্ষে কি ইহা কম উপযোগী? "ধনী দরিদ্র সকলের পক্ষেই জীবন বীমার সার্থকতা আছে। শুধু ধনীর সম্পদ লইয়া—জাতীয় সম্পদ নহে; ধনীর অবস্থা-সচ্ছলতা দরিদ্রের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যে বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে বর্ত্তমান ব্যাপক অর্থনৈতিক মন্দার দিনে কাহাকেও সে প্রমাণ দিবার প্রয়োজন নাই।

কাজেই ধনী বা স্বচ্ছল অবস্থার লোকের জীবনবীমা করিবার প্রয়োজন নাই এমন তর্ক চলিতে পারে না। নিজের পরিবারস্থ লোকের এবং প্রিয়জনের ভবিষ্যৎ সংস্থানের ব্যবস্থা কল্পে জীবনবীমাই যে প্রকৃষ্টতর উপায় এ সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। 'ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্ অফ

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট মিঃ কালভিন্ কুলিজ (Mr. Calvin Coolidge) বলিয়াছেন—

"There is no argument against the taking of life insurance. It is established that the protection of one's family or those near to one is the one thing most to be desired and there is no medium of protection that is better than Life Insurance."

জীবন বীমার মধ্যে একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে—ইহার "পুরুষানুক্রমিক প্রভাবের কথা।" জীবন-বীমার সুখ সুবিধা ও কল্যাণ শুধু এক পুরুষের জন্ম নহে, —পুরুষানুক্রমেই তাহা উপলব্ধ হইয়া থাকে। অভিভাবকের অভাবেও জীবনবীমার দ্বারা সঞ্চিত অর্থের সাহায্যে সন্তানগণ শিক্ষা লাভ করিয়া মানুষ হয় এবং "অভাবে স্বভাব নষ্ট" হয় নাই বলিয়া তাহার সৎশিক্ষা ও আচার ব্যবহারের সুফল আমরা পুরুষানুক্রমে বর্ত্তাইতে দেখি। বীমা-সঞ্চিত অর্থের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি বংশের ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে আমরা ভবিষ্যৎ বংশধরগণের চরিত্রে প্রতিফলিত হইতে দেখি।

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের বংশের মর্য্যাদা ও সম্মান, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারাকে অব্যাহত দেখিতে পাইলে আমাদের মত তৃপ্তিবোধ অন্য কোনও জাতি করে কি না জানি না। এই প্রকার তৃপ্তিবোধের মধ্যে আমাদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। অভাবে ও দুর্দ্দশায় বিক্ষিপ্ত বাঙ্গালী পরিবার তথা বাঙ্গালী সমাজের অন্তর বিপ্লবের ফলেই আজ আমরা সে বৈশিষ্ট্য হারাইতে বসিয়াছি। জাতির সে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে না পারিলে আসন্ন সর্ব্বনাশের স্রোতে বাঙ্গালী তৃণের মত ভাসিয়া যাইবে। দারিদ্র্য—সংক্রামিত অথর্ব্ব সমাজ লইয়া জাতীয় কল্যাণ সাধনের আশা সুদূরপরাহত।

সম্প্রতি করাচীতে "রোটারি ক্লাব"এ মিঃ ডি, বি, অভারি জীবনবীমা সম্বন্ধে যে সুচিন্তিত ও তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা দিয়াছেন তাহা হইতে বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়—জীবনবীমা মানুষের সামাজিক জীবনের কল্যাণসাধনে কতখানি উপযোগী।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যবসায়ের দিক অর্থাৎ অর্থনৈতিক সমস্যা-সমাধানের উপায়ের কথা ছাড়াও জীবন-বীমার প্রসারের মধ্যে সমাজ-কল্যাণ সাধনের যে উচ্চ আদর্শ আছে তাহা জনসাধারণকে আকৃষ্ট না করিয়া পারে না। অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানের বড় কথা সাধারণ-বুদ্ধিতে আমরা না হয় নাই বুঝিলাম; কিন্তু সমাজের আর্থিক অভাব ও তজ্জনিত দুঃখ দুর্দ্দশা ত আমরা প্রতি-নিয়ত স্বচক্ষেই দেখিতেছি। উপার্জ্জনক্ষম অভিভাবকের মৃত্যুতে অসহায় পরিবারের উপায়হীন অবস্থা দেখিয়া হা-হুতাশ করিতেছি। এই সব অনর্থপাত হইতে সমাজকে জীবনবীমা কি ভাবে রক্ষা করিতে সমর্থ, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস এখানে দিতেছি।

বিভিন্ন দেশের বীমা কোম্পানীগুলির হিসাব হইতে দেখা যায় বীমার দাবী মিটাইবার পক্ষে তাহাদের বাৎসরিক ব্যয়ের পরিমাণ এইরূপ :—

আজীবন বীমার দাবী— (Claims on Whole-life Policies)	৫০ কোটি টাকা
মেয়াদী বীমার দাবী— (Claims on Endowment Policies)	১১৪ কোটি "
বার্ষিক ভাতা (Annuity) অক্ষম লোকদের ভরণপোষণের চুক্তিমূলক বীমা—	৩·৮ কোটি "
পারিবারিক অন্নবস্ত্র ও আশ্রয় সংস্থানের জন্ম—	৫০ কোটি "
ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ব্যয় নির্ব্বাহ—	৪ কোটি "
বৃদ্ধ ও অক্ষম লোকদের ভরণ-পোষণ বাবদ—	১১·২ কোটি "

অর্থাৎ উপরোক্ত হিসাবের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে সভ্যজগতের সমগ্র বীমা কোম্পানীগুলির সামাজিক হিতসাধনকল্পে বার্ষিক ব্যয়————

২৩২·১০ কোটি টাকা

জীবনবীমা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মানব সমাজের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনের জন্ম এই প্রকার বিরাট কাজের কথা ভাবিলে সত্যই বীমা-কর্ম্মীদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে হয়।

ব্যক্তিগতভাবে দান করিয়া, ভিক্ষা দিয়া, ধনীলোকের চাঁদায় সদাব্রত বা আতুর আশ্রম খুলিয়াও সমাজ সেবা

কার্য্যের একপ্রকার পদ্ধতি আছে এবং প্রত্যেক সভ্যদেশেই সে ব্যবস্থা কিছু না কিছু আছে। কিন্তু

"দান সে ত দানই
দাতারে দরিদ্র করে
দরিদ্রেরে করে না মহৎ"—

—তাহার মধ্যে সমগ্রভাবে মানুষের সম্মান, পুরুষের পৌরুষ ও নারীর আত্মমর্য্যাদা কোনও না কোনও-ভাবে আহত না হইয়াই পারে না। অথচ যে কোনও প্রকারের ব্যবস্থায় আমরা জীবনবীমা গ্রহণ করি না কেন—তাহাতে যে টাকা আমাদের প্রাপ্য হয় তাহা আমাদের নিজের টাকা, প্রতিদিনের মিতব্যয়িতার ফলে সঞ্চিত; মেয়াদ পূর্ণ হইলে বা বীমাকারীর জীবনান্তে কোম্পানীর নিকট দাবী উপস্থিত করিয়া আমরা যে টাকা আদায় করি তাহা কাহারও অনুগ্রহদত্ত দান বা ভিক্ষা নহে—তাহা আমাদের ন্যায্য পাওনা, আমাদের একান্ত দাবীর টাকা; মানুষের পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে। স্বকীয় অধিকার মানুষকে বড় করে—অভাবজনিত নৈতিক অবনতি হইতে রক্ষা করিয়া চলে বলিয়াই সমাজিক হিত-সাধনে জীবন-বীমার সার্থকতা আজ সভ্যসমাজে সসম্মানে স্বীকৃত হইতেছে।

ডাক্তারের আত্মকাহিনী

শ্রীদুলালচন্দ্র মিত্র

(১)

আমি একজন ডাক্তার—রোগ ও রোগীর ডাক্তার, অর্থাৎ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় যাকে বলে চিকিৎসক। আমি সেই সে কালের ডাক্তার—কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের 'এল্-এম্-এস্' পাশ। 'এল্-এম্-এস্' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়েই আমি যা হ'ক কিছু রোজগার করছিলাম, নিজের সংসারখরচ নিজেই চালাতাম; বছরখানেক পরে এই কলিকাতা সহরেতেই গাড়ী-ঘোড়া চ'ড়ে ডাক্তারী ক'রে বেড়াতাম। সে গাড়ী-ঘোড়ার বহর দেখে কিন্তু সকলেই মুচ্‌কে হাসত; আজকালের (খোকা বা) 'বেবী'-মোটার্ গাড়ী দেখে, কৈ কেউ তো বিদ্রূপের হাসি হাসে না! বরং বলে "বেশ্ ছোট্ট-খাট্ট গাড়ীটি!" অবশ্য আমার সেই 'বেবী'—অশ্বযান বেশ ঝক্‌ঝকে, আর খোকা-অশ্বিনী-নন্দনটি শ্রীযুক্ত ছিল—তবুও বিদ্রূপের হাসি আমি এড়াতে পারি নি।—বিদেশী পণ্যদ্রব্যের মোহে আমরা এমনি জর্জ্জরিত! কিন্তু যাক্ ও সব কথা; আমার দিনগুলি বছর কতক একরকম বেশই কেটে গেল।

তার পর আমার মেয়ের বিয়ে দেবার সময় হ'ল; এই কন্যাটি আমার প্রথম সন্তান। সে সময় বিশ-পঁচিস্ বয়সের অবিবাহিতা বালিকা দেখা যেত না। পরাধীন জাতির যত কিছু দুঃখ ও দীনতা আমাদের মধ্যে যতই পুঞ্জীভূত হচ্ছে, আমরা ততই বিলাতী ধারার নব নব রূপের অনুকরণ করছি—আর তারই সঙ্গে সঙ্গে অবিবাহিত পুত্র কন্যার বয়সও বেড়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্ত্তনকে মুখে আমরা যতই ভাল বলি, অন্তরে সে ভাবে গ্রহণ করতে পারছি না—সুতরাং দেখতে পাই যে, সার্দ্দা-আইন অনুসরণ না ক'রে সকলে তার দোহাই দিয়ে থাকেন। সে সময় এমনটি ছিল না—তাই বয়সে-বালিকা কন্যার বিয়ে দিয়ে গৌরীদানের পুণ্য অর্জ্জন করতে হ'ল। যৎসামান্য যা কিছু উপার্জ্জন করতাম, মধ্যবিত্তভাবে সংসার চালাতে তা প্রায় সমস্তই খরচ হ'য়ে যেত—আর রোগ যে ডাক্তারের সংসারে হয় না, তা তো নয়; এজন্য সঞ্চয় কিছু করতে পারি নি বললেই হয়—কন্যার বিবাহে দেনা হ'ল।

দেনা হ'ল বটে, কিন্তু উপার্জ্জন তো কিছু বাড়ল না—সুতরাং সুদে-আসলে দেনার বোঝাটা অল্পদিনেই একটু ভারী বোধ হ'তে লাগল। এই সময়ে ইউরোপে জার্ম্মাণ-যুদ্ধ বেঁধে গেল এবং অচিরেই মহাযুদ্ধে পরিণত হ'ল। মহাদাবাগ্নির সময় হরিণের পাশ দিয়ে বাঘ ছোটে

পালাবার জন্য—এ কথাটা কতদূর সত্য তা জানতাম না; কিন্তু উক্ত মহাযুদ্ধের সময় বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে, কথাটা খুবই সত্য। ইংরাজবাহাদুর অবাধে দেশী ডাক্তারদিগকে 'আই-এম্-এস্' পদে ভর্ত্তি করেছিলেন, যুদ্ধের ডাক্তার করবার জন্য। আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের পরামর্শ মত এই লত্তুয়ে 'আই-এম্-এস্'এর পদ আমিও একটা জোগাড় করলাম এবং নামের পূর্ব্বে 'ক্যাপ্‌টেন্' আখ্যা লাভ ক'রে যুদ্ধযাত্রা করলাম—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের ডাক্তার হ'য়ে যাত্রা করলাম যুদ্ধক্ষেত্রে, ফিরে এসে পাওনাদারকে পরাজয় করবার আশায়। "পরাজয়" কথাটা শুনে হাসবেন না—তখন সত্যসত্যই পাওনাদার ও দেনাদারের মধ্যে একটা যুদ্ধ-অভিনয় হ'ত; পাশ্চাত্য আইনের ফাঁকিটা সহজ ও ব্যাপক করতে তখন কেহই রাজনীতিক্ষেত্রে উদিত হন নি।

(২)

আমার 'ক্যাপ্‌টেন্' জীবনের কথা কিছু বলব না; তবে এইটুকু বলতে চাই যে, 'ক্যাপ্‌টেন্' কথাটা বাঙ্গালা ভাষায় আমদানী "কাপ্তেনী" কথার জননী হ'লেও, আমি আমার 'ক্যাপ্‌টেন্'-জীবনে কাপ্তেনী করি নি—সুতরাং কিছু সঞ্চয় ক'রে দেনার বোঝাটা নামাতে পেরেছিলাম।

যুদ্ধের বিরাম হ'ল এবং সেই সঙ্গে আমার 'ক্যাপ্‌টেন' জীবনও শেষ হ'ল। আমার মতন অনেকেই পুনর্মূষিক হ'লেন তো বটেই—রাজনীতিক্ষেত্রেও মহাশয়দিগের কত-না সাধের আশা একেবারে ভেঙ্গে চুর হ'য়ে গেল; বর্ব্বরের ধন-ক্ষয় আর স্বপনবিলাসীর আশা-ভঙ্গ চিরকালই হ'য়ে থাকে।

আবার কলিকাতায় ফিরে এসে ডাক্তারী পেশা আরম্ভ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম যে, এই অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের দেশের, অন্ততঃ এই কলিকাতা সহরের চালচলনে বেশ একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'য়ে গেছে। 'খোকা'-ঘোড়া, আর 'বেবী'-গাড়ী শুধু বিদ্রূপের বস্তু নয়—একেবারেই অচল; পূর্ব্বে যা কিছু উপার্জ্জন করতাম সেই সামান্য উপার্জ্জনও এক্ষণে আমার ভাগ্যে জুটল না—যদিও আমি এখন একজন "অবসরপ্রাপ্ত 'আই-এম্-এস্'।" আবার বুঝি একটা নূতন কারণে দেনার একটা নূতন বোঝা মাথায় নিতে হয়—এই ভয়ে সদাই শঙ্কিত। এ হেন সময় আমার এক নিকট আত্মীয় এলেন আমার নিকটে আশার বাণী ও বার্ত্তা নিয়ে।

আমার এই আত্মীয়টিকে দে মশাই ব'লে এখানে পরিচিত করব। তিনি একজন ব্যবসাজীবী; যে যুদ্ধের কৃপায় আমি আজ একজন "অবসরপ্রাপ্ত 'আই-এম্-এস্'", সেই যুদ্ধের কৃপাতেই তিনি তাঁহার ব্যবসাসূত্রে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন ক'রে আজ একজন ধনী। তিনি এসে আমাকে জানালেন যে, তাঁর গ্রামে তিনি একটি দাতব্য ডাক্তারখানা খোলবার বন্দোবস্ত করেছেন; আমি যদি সেই ডাক্তার-খানার ভার লই, তা হ'লে তিনি বিশেষ উপকৃত হবেন। মাসিক পঞ্চাশ টাকা হিসাবে মাহিনা—দে মশাই বিনয় দেখিয়ে 'মাহিনা' কথার পরিবর্ত্তে 'পারিশ্রমিক' কথাটা বলেছিলেন এবং বাসস্থান ও সিধার বন্দোবস্তও করবেন; দশজনের উপকারার্থ সেই প্রতিষ্ঠান—সুতরাং আমাকে একটু স্বার্থত্যাগ ক'রে এই সর্ত্তে কাযটি গ্রহণ ক'রতে হবে। তখন আমার যেরূপ অবস্থা, উক্ত সর্ত্তে দাতব্য ডাক্তারখানাটির ভার লওয়া আমার পক্ষে স্বার্থত্যাগ নহে, স্বার্থের পূজা; দে মশাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে চাকুরীটি গ্রহণ করলাম।

(৩)

'রেল্‌ষ্টেশন' হ'তে ক্রোশখানেক মেঠো পথ গোরুর গাড়ীতে অথবা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করবার পর গ্রামটি পাওয়া যায়; পথটি 'রেল্‌ ষ্টেশন' থেকে পূর্ব্ব মুখে এসে গ্রামের মধ্য দিয়ে বক্রগতিতে গ্রামের পূর্ব্বপ্রান্তে এক প্রান্তরে গিয়ে পড়েছে। এই পথটি হ'ল সেই গ্রামের প্রধান পথ এবং এই পথটির দু'ধারে ভিন্ন ভিন্ন গলি, লোকের কানাচের পাশ দিয়ে, ঝোপঝাপের মধ্য দিয়ে, পুকুর-ডোবার পাড় দিয়ে গ্রামের অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। এক-একটি গলি গিয়ে এক-একটি পাড়ায় পৌঁছান যায়; যথা—বামুনপাড়া, কায়েৎপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া—এমন কি ডোমপাড়া, চাঁড়ালপাড়াও আছে। শুনেছি মাত্র তিরিশ-চল্লিশ বছর পূর্ব্বে এই গ্রামে মুসলমানপাড়া ছিল না—পাঁচ-সাত ঘর মুসলমান যা'রা ছিল তারা গাঁয়ের বাইরে বাস করত; ইংরাজবাহাদুরের নির্ম্মম ভেদনীতি এবং রাষ্ট্রিক ধুরন্ধরদের আত্মঘাতী পরাজয়ভীতি, আর তারই সঙ্গে গোঁড়া সনাতনীদের উৎকট গোঁড়ামি—এই ত্র্যহস্পর্শের

স্পর্শে ডোমপাড়া-চাঁড়ালপাড়ার পাশেই একটা বড় মুসলমান-পাড়া ক্রমশঃ গজিয়ে উঠেছে।

গ্রামটির অবস্থা এখন যাই হোক-না কেন, এক সময়ে যে ইহা একটি সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রাম ছিল তার চিহ্নের অভাব নেই। ভগ্ন ও ভগ্নপ্রায় কোঠাবাড়ী চারিদিকেই রয়েছে—কোনটাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে, আবার কোনটাতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না। নিম্নস্তরের লোকরা এখনও আছে বটে, কিন্তু বোধহয় থাকে না; অনশন ও রোগে তারা জর্জ্জরিত—প্রতি বৎসর তাদের মধ্যে কত জন যে বিনা চিকিৎসায় ও বিনা পথ্যে জীবন দান ক'রে নিজেদের ও স্বদেশের পাপ নীরবে স্খালন করছে, তা'র খোঁজ কে-ই বা করে, আর কে-ই বা দেয়! স্বাধীন জগতের অবোধ্য এই গ্রামটি আমার নূতন চাকুরীর স্থল।

দাতব্য ডাক্তারখানায় আমি পাঁচ মাসের ওপর ডাক্তারী করেছিলাম। আমি কলিকাতা মেডিক্যাল্ কলেজের পাশকরা ডাক্তার—সুতরাং যে ঘরে আমি রোগী দেখতাম এবং ওষুধ বিতরণ করতাম, সে ঘরটাকে 'ডাক্তারখানা' বলতেই হ'বে—তা না হ'লে সে ঘরে ডাক্তারখানার আর কোন লক্ষণ বড় একটা ছিল না। যখন সেখানে প্রথম যাই, তখন ডাক্তারখানার প্রতিষ্ঠাতা দে মশাই 'কুইনিন্' 'সোডি-বাইকার্ব্ব' প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ পরিচিত ওষুধ অল্প পরিমাণে আমার সঙ্গে দিয়েছিলেন—প্রথম সপ্তাহেই তা শেষ হ'য়ে যায়; কিন্তু তার পর থেকে দে মশাইয়ের কলিকাতার ঠিকানায় চিঠির ওপর চিঠি লিখেও ওষুধ আনাতে বেগ পেতে হ'ত—উত্তর আসত "চিরেতার জল দিয়া কার্য্য চালাইতে থাকুন, ওষুধ যথা শীঘ্র পাঠান হইতেছে।"

হায় রে হতভাগ্য দেশ—এক ছটাক চিরেতাজলের জন্য কত না লোক আসত, কতদূর থেকে আশেপাশের গ্রাম থেকে! আর হায় রে হতভাগ্য আমি, দু মুঠি অন্নের জন্য এইভাবে ডাক্তারী করতাম! চাকুরীর প্রারম্ভে যে পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলাম, তাহা বাদে হাতখরচ বা মাহিনাবাবদ প্রাপ্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার পঞ্চাশ পয়সাও কখন পাই নি, যা থেকে দু-চারটে কম দামের চলতি ওষুধ নিজের খরচে আনিয়ে রাখতে পারি। দে মশাইয়ের পূর্ব্বপুরুষের অতি জীর্ণ কোঠা ভদ্রাসনের দুখানা ঘরে বাস করতাম এবং আর একখানা ঘরে ডাক্তারী করতাম; আর সিধার বন্দোবস্ত নিজেকেই ক'রে নিতে হ'ত—দে মশাইয়ের জঙ্গলময় বাগান থেকে ও গ্রামের ঝোপঝাপের ভেতর থেকে—আর সেই সিধা পূর্ণ করতাম দে মশাইয়ের মোড়ল রায়তদের নিকট হ'তে ভিক্ষালব্ধ অন্নের দ্বারা—লাউ, কুমড়া, শসা, যা কিছু সিধা সত্যসত্যই পেতাম, তা এই চিরেতাজলপিপাসী হতভাগ্যদের নিকট হ'তে!

(৪)

এই অভাগার জীবনের দিনগুলি যখন এইভাবে হতভাগ্যদের মাঝে কেটে যাচ্ছিল, তখন জামাতা বাবাজী এক দিন হঠাৎ এসে হাজির হ'ল কলিকাতা থেকে। তার মুখে শুনলাম যে, কলিকাতার সংবাদপত্রসমূহ দে মশাইয়ের দাতব্য ডাক্তারখানাটির গুণকীর্ত্তনে চতুর্ম্মুখ! সংবাদপত্রে আরও প্রকাশ যে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দে মশাইয়ের দয়াদাক্ষিণ্যের কথা বিশেষভাবে গভর্ণমেণ্টের নজরে এনেছেন এবং জেলাবোর্ড্ দে মশাইয়ের হাতে পাঁচশত টাকা দিয়েছেন ডাক্তারখানাটির উন্নতিকল্পে। বাবাজী পরম্পরায় শুনেছে যে শীঘ্রই দে মশাই এক হাতুড়ে ডাক্তারের ওপর বার্ষিক তিন শত টাকা কড়ারে ডাক্তারখানাটির ভার অর্পণ করবেন এবং জেলাবোর্ডের দেওয়া পাঁচশত টাকার বক্রী দুই শত টাকার ওপর আরও দুই-এক শত টাকা নিজে খরচ ক'রে ভদ্রাসনের কতকগুলি ঘর বাসোপযোগী ক'রে নেবেন; অবশ্য সমস্তটা ডাক্তারখানা-বাবদ খরচ দেখান হবে। জানি না দে মশাইয়ের মতন আরও কত মহাশয় লোক আপনি ফুটে আপনি ঝরে পড়ছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে!

মনে মনে ভয় হ'ল—অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থাটা তো হ'য়েই রয়েছে, পত্রদ্বারা প্রেরিত হ'লেই হয়; তা ছাড়া উচ্চ বাক্য উচ্চারণ করবার উপায় নেই—কারণ "ধনী সে, দরিদ্র আমি; সে আলো, এ অন্ধকার"। ভয় তো হ'লই—সঙ্গে সঙ্গে মনে একটা ধিক্কারও এল; সেই দিনই জামাতার সঙ্গে কলিকাতায় রওনা হওয়া গেল। জামাতার পরামর্শে ও সাহায্যে নিজ গ্রামে এসে একটা ডাক্তারখানা খুললাম—আর সেই থেকে এই ক' বছর—এ বুড়ো বয়সেও ডাক্তারী করছি। আমি গরীব—বিনা মূল্যে কিছু করবার ক্ষমতা নেই; ওষুধের মূল্য বাবদ কিছু নিয়ে থাকি, আর 'ভিজিট্' (পারিশ্রমিক) হিসাবে যে যা যখন দেয়—কিন্তু তা শুধু চিরেতাজলের পরিবর্ত্তে নয়।

উড়িষ্যায় চণ্ডীদাস ভণিতার কয়েকটি নূতন পদ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্য-রত্ন

প্রায় চারি বৎসর পূর্ব্বে পাটনার অধ্যাপক সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত রণ্ডীন হালদার এম-এ মহাশয় সংবাদ দেন যে কটকের অধ্যাপক রায় সাহেব আর্ত্তবল্লভ মহান্তী এম-এ মহাশয়ের নিকট চণ্ডীদাসের কতকগুলি নূতন পদ আছে। সংবাদ পাইয়া কটকে গিয়া মহান্তী মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, কিন্তু ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। পদগুলি তাঁহার পল্লীগ্রামের বাটীতে থাকায় এবং তিনি নিজে না গেলে সেগুলি অপর কেহ খুঁজিয়া পাইবে না জানিতে পারায়—ফিরিয়া আসা ভিন্ন আমার উপায় ছিল না।

এ বৎসর পূজার পর কটকে গিয়া কটকের উদীয়মান সাহিত্যিক শ্রীমান্ প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ মহাশয়ের নিকট শুনিলাম রায়সাহেব তাঁহার পল্লী-ভবন হইতে পদগুলি আনিয়াছেন এবং সেগুলির প্রতিলিপি প্রদানে সম্মত আছেন। পদগুলি উড়িয়া অক্ষরে লেখা। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও উপর্য্যুপরি তিনদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া বিশেষ পরিশ্রম সহকারে রায়সাহেব পদগুলির পাঠোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তিনি এইরূপ অনুগ্রহ না করিলে পদ সংগ্রহ এবং পাঠোদ্ধার—আমার পক্ষে কোনটাই সম্ভবপর হইত না। আমি এজন্য রায়সাহেবের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। তাঁহার আপ্যায়ন আমার বহুদিন স্মরণ থাকিবে।

মহাপ্রভু তাঁহার সন্ন্যাসজীবনের প্রায় অষ্টাদশ বৎসরকাল নীলাচলে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। গম্ভীরায় গুপ্তকক্ষে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরকে লইয়া তিনি কয়েকখানি গ্রন্থের সঙ্গে চণ্ডীদাসের পদাবলীও আস্বাদন করিতেন। স্বরূপের সুধাকণ্ঠে চণ্ডীদাসের গান শুনিয়া তিনি আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইতেন। সুতরাং পুরীধামে যে সে সময় চণ্ডীদাসের পদাবলী বহুলরূপে প্রচারিত হইয়াছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আমরা কিছুদিন হইতে বিশেষ ব্যগ্রতা সহকারে উড়িয়া-প্রবাসী বাঙ্গালী সাহিত্যিকগণের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছি যে, তাঁহারা উড়িয়া-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের কোন পদ বা তাঁহার কোন প্রসঙ্গ পাইলে যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক তত্তৎ-বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়ে লিখিয়া পাঠাইতে বিস্মৃত না হন। কিন্তু আমাদের আবেদনে কোন ফল হয় নাই। একথা অবিসম্বাদী সত্য যে উড়িয়া-সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন বাঙ্গালার সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে। মহাপ্রভুর জীবন-কথা সংকলন করিতে হইলে উড়িয়া-সাহিত্যের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা যে কত, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। ভরসা করি—কটক বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ-শাখার সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ মহোদয় তাঁহার তরুণ সহকর্ম্মিগণকে লইয়া এ বিষয়ে অবহিত হইবেন।

আমাদের সংগৃহীত পদগুলির কয়েকটি "দ্বিজ চণ্ডীদাস" ভণিতাযুক্ত, বাকী সমস্ত পদেই "চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে। ভণিতার দিক্ দিয়া পদগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাসেরই রচিত বলিতে হয়। কিন্তু রায়সাহেব মহান্তী মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে উড়িষ্যায় কেহ কেহ আজিও চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি প্রভৃতি কবিগণের ভণিতা দিয়া পদ রচনা করে। এ কথা সত্য হইলে অবস্থা ভীষণ বলিতে হইবে। এই পদ কয়েকটির প্রাপ্তিস্থান কোথায়, মূলগ্রন্থ কত দিনের পুরাতন, গ্রন্থের অধিকারীর বংশ-পরিচয় (অর্থাৎ শাক্ত বা বৈষ্ণব) এবং প্রকৃতি কিরূপ, রায়সাহেব কি সূত্রে এই পদগুলির সংবাদ প্রথম জানিতে পারেন, ইত্যাদি ইত্যাদি তিনি পরে আমাকে বিস্তারিতভাবে জানাইবেন বলিয়াছেন। সে কথা পুনরায় সবিনয়ে তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। সংগৃহীত পদগুলির মাঝে মাঝে উড়িয়া শব্দ এবং প্রয়োগ-পদ্ধতি রহিয়াছে। উড়িয়া-ভাষাবিদ্ পদাবলীপ্রিয় সাহিত্যিক কেহ এ বিষয়ে আলোচনায় অগ্রসর হইলে উপকৃত হইব। পদগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

(১)

সায়ংকাল গেল প্রদোষ হইল
ভোজন সারিল কাহ্নু। (কান)
তাম্বুল যোগান করিয়া বহন
কৈল পালঙ্কে শয়ান ॥
রাধা গুণ গান সদা মনে ধ্যান
অনুক্ষণে বলে রাধা।
ছন চন মন আকুল পরাণ
নয়ানে না আসে নিদ্রা ॥
সঙ্কেতের কথা হেজি (ভাবি) কালা কাহ্নু
চিত্তে নাই আর সুখ।
অট্টালিকা পরে জাগিছিল রাই
তেঁহ মনে বড় দুখ ॥
কর কমলকে জোড়ি করি রাই
নয়ানে সম্পাদি জল।
সে কথা সুমরি নাগর শ্রীহরি
কামে তনু ক্ষীণ কৈল ॥
নিশি বারদণ্ড বুঝিয়া নাগর
বোলে এ সঙ্কেত বেলা।
চণ্ডীদাস বোলে চল এহি কালে
বানায়্যা সুবেশ মালা ॥

(২)

নির্জ্জন দেখিয়া কালা বানাইল বেশ।
নানা বেশে বাঙ্কে চূড়া মনেতে হরেষ ॥
আগে পাছে ডোলে ঝুম্পা ভুমিতে লোটায়।
বহি পিচ্ছ বর চূড়া বামেতে ডোলায় ॥
তারপরে শোভে মাল সেমতি পাখুড়ি (সেউঁতি পাপড়ি)
যুবতী কে বর্ত্তি যাব দেখি ত্যা মাধুরী ॥
(অঙ্গুলী অঙ্গতে কাল পুরিয়াছে পায় ?)
একেত রঙ্গিয়া নাগর যুবতী ভুলায় ॥
অগুরু চন্দন আর গায়েতে লেপিল।
মৃগ মদ * * লঞা ললাটে লিখিল ॥
কর্ণেতে কুণ্ডল ঝালি দুকরে কঙ্কণ।
পয়রে (পায়েতে) নুপুর খঞ্জি চলে রুনু ঝুনু ॥
পীত দুকুলের ঝটা কি কহিতে পারি।
নবীন ঘনেতে কিবা জড়িত বিজুরী ॥
শ্রীবিম্ব অধরে করে তাম্বুল চর্ব্বণ।
চণ্ডীদাস বলে নাগর চলহে গহন ॥

(৩)

বাহিরিল শ্যাম নাগর রাধা নাম স্মরি।
স-ধীরে গমন করে বামেতে বাঁশরী ॥
ইতি উতি চাহে শ্যাম কোই নাহি আর।
বৃন্দা বিপিনেতে চলে সে নাগর বর ॥
যাইতে যাইতে পথে চিন্তে নীলমণি।
কুথানে ভেটিব আমার রাই বিনোদিনী ॥
আমাকে চাহিঞা বসিথিবে রসময়ী।
অতেক ভাবিয়া নাগর সত্বরে চলই ॥
মদনের কুঞ্জে তবে সঙ্কেতের স্থান।
তথা প্রবেশিল গিঞা মুরলী বদন ॥
দেখিল নাগর রায় ধনী নাই আর।
বিরসিত মন হঞা বসে পালঙ্কের ॥
বিচারয়ে অথনে আসিবে গুণমণি।
চণ্ডীদাস বলে নাগর না কর ভাবনি ॥

(৪)

পালঙ্কে বসিঞা চাহিঞা চাহিঞা
ধনী না আইলে কেনে।
খনে উঠে খনে ইতি উতি চাহি
রাই নাচে দুনয়নে ॥
বহু বেলা হৈল রাধে না আইল
কাতরে বসেন শ্যাম।
ভাবে পুন অবে অথনি আসিবে
সঙ্গে লঞা সখীগণ ॥
কুসুম পালঙ্ক পরে শ্যাম বন্ধু
বসিঞা গাঁথয়ে মালা।
অত যতনেরে মালা গান্থা করে
পইরাইব ধনী গলা ॥
সুবাস চন্দন রাইর ভুষণ
আভরণ যত আর।
রাইরে পরাব সুখে কাল নিব
এমনি ভাবি নাগর ॥
রাই না দেখিঞা আকুলিত হঞা
কাম জ্বলে অতিশয়।
চণ্ডীদাস বলে অবে কি করব
না আইল ধনী রাই ॥

(৫)

কুসুম পালঙ্ক তেজিয়া শ্যাম।
রাই প্রেম হেজি (ভাবি) করে গমন ॥
আহা রসময়, প্রেমের তরী।
কি লাগি না আসে নবীনা গোরী ॥
পথ নিবারই নবীন ভান (?)
একা রাধা বিনা অধরে প্রাণ।

কোন দিগু ধনী আসে কি চাহে।
ছন ছন চিত্ত সে শ্যাম রায়ে ॥
চণ্ডীদাস বলে মদনে ভুর।
একা রাই বিনা মন আকুল ॥

(৬)

বিরহ অনল তাপেতে মাধব
এদিকে সেদিকে চাহে।
যত তরুগণ লতাদি কানন
রাধা রূপ দিশে তাহে ॥
ঝিকারির (ঝিল্লী ?) স্বন শুনিতে দ্বিগুণ
জ্বলয়ে তাহার গায়।
বোলে কিবা বিধু বদনী সে ধনী
তরাবার * * লা'য় ॥
যেদিকে নয়ন ফিরাইল কান
সেদিকে রাইর রূপ।
চিত্র প্রতিমার প্রায় দৃষ্ট হয়
রসময়ীর স্বরূপ ॥
ক্ষণেকে নাগর হইয়া সুস্থির
মিলিল মাধবীতলা।
ভ্রমরর ধ্বনি শুনি নীলমণি
বলে অবে রাই আইলা ॥
চাহে চৌদিকে কোই নাহি আগে
আর তে খোঁজে মোহন।
রাই পদচিহ্ন দেখিয়া দুপানি
নিহারয়ে বসি পুন ॥
চিহ্ন পদধুলি অঙ্গে লয়ে বুলি
লাগিল কিবা শীতল।
ধনী রসময়। ধনী প্রাণ বন্ধু
তুমি আমার কণ্ঠমাল ॥
বিরহ অনল তাপেন্তে মাধব
খোঁজে বিপিনহি তথা।
চণ্ডীদাস বোলে অবে কি করব
সে ধনী পারব কোথা ॥

(৭)

রাইরূপ মনসিরা বুলে বন বন।
কিবা কোথা লুচি (কি) রাছে মোর প্রাণধন ॥
কামে থরহর নাগর চলিতে না পারে।
রাধাকুণ্ড তীরে থাকি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোথানে আছ গো ধনি দিও আমারে দেখা।
অনুক্ষণে ডাকে শ্যাম রাধিকা রাধিকা ॥
দুনয়ানে বহে বারি রাইরূপ চিন্তি।
রাই না দেখিয়া শ্যাম ধৈর্য্য না ধরন্তি ॥
ধৈর্য্য না ধরে শ্যাম বলে হাই হাই।
চণ্ডীদাস বলে কিবা বিহিল এ ঠিহি ॥

(৮)

নিরবধি ঝুরে সে শ্যাম নাগরে
রাধারে করে বিলাপ।
জিহ্বা অগ্রে নাম নেত্র অগ্রে ধাম
ভজিল সকলি আপ ॥
সো ধনীর কীর্ত্তি শুনাই শ্রবণে
ঘুচাবে কে ব্যথা মোর।
মন ধ্যানে তন্ময় লাগিঞা রহল
কে আনি দিবে তৎপর ॥
বিধু জিতাননী মুকুল রদনী
আমার হিত প্রাণ-মিত।
আরে বিম্বাধরী সুকনক গোরী ॥
গলি মোএ বিসরিত ॥
পশু মৃগগণ তরু লতাবন
গউর বরণ দিশে।
মনমথ বাণ তাপে নীলমণি
সচকিত হঞা বসে ॥
ভাবিতে ভাবিতে সে নাগর রায়
ভুমে অচেত পড়ল।
চণ্ডীদাস বোলে ধনী না আইলে
কিবা সে প্রমাদ ভেল ॥

শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ দশা বর্ণনা করিয়া কবি অতঃপর শ্রীরাধার কথা বলিতেছেন।

(৯)

জাবট মন্দিরে ধনী ললিতারে কহে বাণী
শুন গো পরাণ সহচরি।
কৃষ্ণ আমার পরাণ তারে করি সদা ধ্যান
অবে আমি কেমনে কি করি ॥
আজ আমি তার মুখ হেজি পাইলই দুখ
শাশু যবে করয়ে ভৎর্সনা।
অপবাদ দিঞা মোরে নানা কুভৎর্সনা করে
সদা হেরি নন্দপোয়ে কাহ্না ॥
যে বলে সে বলু মোরে না ছাড়িব সে নাগরে
সে কালা মো পরাণের মিত।
জাতিকুল যাব পিছে থিবি (থাকিব) তার কাছে কাছে
আর মোরে সবহি অচিন্ত ॥

চল সহচরি অবে কৃথা আছে সে মাধবে
সঙ্কেত লই আবাহন।
দ্বিজ চণ্ডীদাস কহে কোথা আছে শ্যামরায়ে
হেরি আস মদনমোহন॥

(১০)

শুনি দূতী বোলে শুন শুন ওগো ধনি।
তোমাকে নিশ্চয় কৃষ্ণ মিলাইব আনি॥
রাইকে প্রবোধি সহচরী চলি গেলা।
কোথা আছে শ্যামরায়ে খুঁজিতে লাগিলা॥
প্রতি কুঞ্জে হেরি হেরি না পাইল শ্যাম।
তথাপি চলিল দূতী শ্যামকুণ্ড ধাম॥
সেখানে না দেখি দূতী রাধাকুণ্ডে চলে।
দেখিল শ্যাম নাগর শুতে ভূমিতলে॥
কৃষ্ণকে দেখিল দূতী বিরহ হৈয়াছে।
শয্যা ত্যজি নটবর ভূমিতে পড়িছে॥
কৃষ্ণ দশা দেখি দূতী আকুল হৈল।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ কর্ণে ফুকারিল॥
রাই নাম শুনি শ্যাম নয়ানে চাহিল।
চণ্ডীদাস বোলে শ্যাম চেতনা পাইল॥

(১১)

দূতী রূপ হেরি চিনিতে না পারি
রাই বলি কোলে কৈল।
বিরহ অনল তাপরে পুড়িছে
পরাণ রাধ কেবল॥
শুন অগো ধনি আমার যে বাণী
তোমার লাগিঞা এথা।
তোমা না দেখিঞা জ্বলই অন্তর
পাইনু এমনি ব্যথা॥
কি কারণে সই অত দশা (দুঃখ) দিল
দশ দিগ দিশে শূন্য।
তোমারে না পেঞা অতি দুখী হঞা
পিণ্ডে (দেহে) না রহে পরাণ॥
অত বলি শ্যাম রাই বলি করে
বসন বিস্তরণ কৈল।
অলকা টুটিল কবরী খসিল
অধরে অধর দিল॥
সহচরী বলি চিনিতে মাধব
লজ্জিত হইঞা রহল।
সঙ্কুচিত হঞা প্রিয় সহচরী
শ্যাম বাস পহিরল॥

প্রেমর বিভলে বদন পালট
দুঁহা না পারল বারি (চিনিতে)
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে সহচরী
শুনহে মুরলী ধারি॥
বুঝিঞা সঙ্কেত কহিঞা ত্বরিত
সে নব রসিক রাজে।
শুনি শ্যাম তুমি আন গুণমণি
এহি মনোহর কুঞ্জে॥
শুনিঞা ভারতী শীঘ্র যায় দূতী
মিলিল কিশোরী পাশ।
বেণী (দুই) কর জুড়ি কহে পাদে পড়ি
বোলে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥

শ্রীরাধিকার দূতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া শৈব্যা ও পদ্মা গিয়া চন্দ্রাবলীর নিকট উপস্থিত হইল এবং চন্দ্রাবলীকে আনিয়া কৃষ্ণ-চন্দ্রাবলীর মিলন ঘটাইয়া দিল।

(১২)

একালে সঙ্কেত পুছিয়া ত্বরিত
প্রাণ সহচরী গিল।
লতাতলে লুচি (লুকাইয়া) চন্দ্রাবলী সখী
শৈব্যা পদ্মা শুনিঠিল॥ (শুনিয়াছিল)
সেহি থরতরে যাইঞা সত্বরে
মিলি চন্দ্রাবলী পাশে।
এসব বিধান কহিঞা বহন
অনাইল কুঞ্জ দেশে॥
গণ্ড দেশ শুনি নূপুরের ধ্বনি
শ্রুতি মুখে শ্যামরাজে।
বিচারই চিত্তে জানি আমার দুখ
রসনিধি (রাধা) কৈলো বিজে॥ (বিজয়, আগমন)
অতক ভাবিঞা কুঞ্জ ত্যজি হরি
সত্বর পাছুটী গেল।
ঘোর আন্ধারেতে বারি না পারিতে
ধাঞি কোলাগ্রত কৈল॥
বোলে চন্দ্রাবলী শুন বনমালী
কি কারণে ফির বনে।
নীলমণি ভাষে তোমারি উদ্দেশে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণে॥

(১৩)

অত শুনি চন্দ্রাবলী আনন্দিত হৈঞা।
শ্যাম কর ধরি চলে সখীগণ লঞা॥

আপনার কুঞ্জান্তরে প্রবেশ হইল।
কুসুম পালঙ্কে দুঁহা আনন্দে বসিল ॥
জানি সখী শৈব্যা পদ্মা অন্তর হৈতে।
যার যেই কুঞ্জে গিয়া রহিল জাগ্রতে ॥
একে হাস পরিহাস কৌতুক বচন।
প্রেমোন্মদে মত্ত প্রিয়া প্রিয় আলিঙ্গন ॥
দুইজনে লীলা করে আনন্দিত মনে।
চণ্ডীদাস বোলে কালা পড়িল বিষমে ॥

দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী-মিলনের পদের সঙ্গে ইহার ঐক্য নাই। দীন চণ্ডীদাসের চন্দ্রাবলী "এই পথে নিতি কর গতাগতি নূপুরের ধ্বনি শুনি" এই বলিয়া কৃষ্ণকে আবদ্ধ করিলে, তিনি শ্রীদাম ডাকিতেছে এইরূপ ছল করিয়া পলাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু পলাইতে না পারিয়া চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে নিশি-যাপন করিতে বাধ্য হন এবং প্রভাতে উঠিয়া শ্রীমতীর কুঞ্জে দর্শন দিলে তিনি অভিমান-ভরে শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করেন। আমাদের আলোচ্য কবিতাগুলির শেষাংশ না থাকায় শ্রীরাধার মানপ্রকরণ জানিতে পারি নাই।

আলোচ্য পদের ন্যায় দূতীর সহিত কৃষ্ণের মিলন দীন-চণ্ডীদাসের পদে পাওয়া যায় না। শ্রীচৈতন্য পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিগণ পদ রচনায় উজ্জ্বলনীলমণির অনুসরণ করিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণিতে দূতীর লক্ষণ কথিত হইয়াছে—

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্য্যাৎ প্রাণাত্যয়েষ্বপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতীস্যাদ্গোপ সুভ্রুবাং ॥

যে অতিশয় স্নেহশীলা, বাক্যপ্রয়োগনিপুণা এবং প্রাণান্তেও বিশ্বাসভঙ্গ করে না, ব্রজবধূগণের দৌত্যকার্য্যে সেই একমাত্র যোগ্যা। পদাবলী-সাহিত্যে এইরূপ দূতীই দেখিতে পাই। অবশ্য সখীগণকে অভিসার করাইয়া শ্রীরাধা আনন্দ লাভ করেন বটে, কিন্তু আমাদের আলোচ্য-পদে তাহার আভাস পর্য্যন্ত নাই। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলিয়াছেন—(মধ্য, অষ্টম পরি)

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণ সহ নিজ লীলায় সখীর নাহি মন ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ সুখ হৈতে তাহে অধিক সুখ পায় ॥
রাধার স্বরূপ কৃষ্ণ প্রেম কল্পলতা।
সখীগণ হয় তার পুষ্প পল্লব পাতা ॥
কৃষ্ণ লীলামৃতে যদি লতাকে সিঞ্চয়।
নিজ সুখ হৈতে পল্লবাদ্যের কোটী সুখ হয় ॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণসঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করায় সঙ্গম ॥
নানা ছলে কৃষ্ণে প্রেরি সঙ্গম করায়।
আত্মসুখ সঙ্গ হৈতে কোটী সুখ পায় ॥
অন্যোন্যে বিশুদ্ধ প্রেম করে রস পুষ্ট।
তা সবার প্রেম দেখি কৃষ্ণ হয় তুষ্ট ॥
সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কাম ক্রীড়া সাম্যে তার কহি কাম নাম ॥

দূতী এবং সখীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য আছে। আমরা পদাবলী হইতে কবিরাজ গোবিন্দদাসের একটি প্রসিদ্ধ পদ তুলিয়া দিলাম।

ঋতু-পতি রাতি বিরহ জ্বরে জাগরি দোতি উপেখলি রামা।
প্রিয় সহচরি বলি মোহে পাঠায়লি অতয়ে আয়লুঁ তুয়া ঠামা ॥
শুন মাধব কর জোড়ি কহল মো তোয়।
মনমথ রঙ্গ তরঙ্গিত লোচনে নিমিখে না হেরবি মোয় ॥
দূর কর আলস আনহি লালস চাতুরী বচন বিভঙ্গ
বরু জীবন হাম তোহে নিরমঞ্ছব তবহুঁ না সোঁপব অঙ্গ।
যাহে শির সোঁপি কোরপর শুতিয়ে সো যদি করু বিপরীতে।
পিরিতি করীত ঐছে তব মীটব গোবিন্দদাস চিত ভীতে ॥

পদটি উজ্জ্বলনীলমণির নিম্নোক্ত শ্লোকের ভাবানুবাদ—

দূত্যে নাস্য সুহৃজ্জনস্য রহসি প্রাপ্তাস্মি তে সন্নিধিং
কিং কন্দর্প ধনুর্ভয়ঙ্কর মমুং ভ্রূগুচ্ছমুদ্যচ্ছসি।
প্রাণানর্পয়িতাস্মি সম্প্রতি বরং বৃন্দাটবীচন্দ্র তে
নত্বেতামসমাপিত প্রিয় সখী কৃত্যানুবন্ধাং তনুম্ ॥
(সখীপ্রকরণ, ৩৯ শ্লোক)

উজ্জ্বলনীলমণি বলিতেছেন—

দূত্যং তু কুর্ব্বতী সখ্যাঃ সখী রহসি সঙ্গতা।
কৃষ্ণেন প্রার্থ্যমানাপি স্যাৎ কদাপি ন সম্মতা ॥
(সখী প্রকরণ)

সখী যদি দৌত্যকার্য্যে আসিয়া নির্জ্জন প্রদেশে মিলিতা হন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট সুরত প্রার্থনাও করেন, তথাপি তিনি কদাপি তাহাতে সম্মতা হন না।

আমাদের আলোচ্য পদে দূতী গিয়া অতঃপর শ্রীরাধার নিকট উপস্থিত হইলেন।

(১৪)

চিনি সহচরী বলো গো কিশোরি
তোমা বিনে শ্যামরায়।
বিরহ দুখেতে কানন ফিরিতে
তোমার আগমন ধ্যায় ॥
মদন রাজন করিছে কর্দ্দন
শ্রীঅঙ্গে আভাষ নাই।
একালে তোমার সঙ্কেত লইয়া
মিলিলাম আমি যাই ॥
আমার বদনে তোমার দশা শুনি
দ্বিগুণ বিচেষ্ট হৈল।
হৃদে কর মারি আহা বন্ধু বলি
বিধি এহা শুনাইল ॥
ধরিয়া মো কর বোইল নাগর
মো যাইতে শকি (শক্তি) নাই।
নিবেদন মোর এহি মনোহর
কুঞ্জে আন রসমই ॥
এমনি সঙ্কেত কহি প্রাণনাথ
বসি নিরখয়ে পথ।
কাম মনোহর বেশে তার পাশে
চল লঞা সখীযুথ ॥
রতি সুখ এই সংসারের সার
বিলম্ব না কর ইথে।
চণ্ডীদাস বোলে শুনি কহে ধনী
দূতীরূপ হেরি নেত্রে ॥

(১৫)

রাই বলে শুন এগো প্রাণ সহচরি।
আজ একু অপরূপ রীতি গো তোমারি ॥
খরতর নিঃশ্বাসত বহিছে সত্বরে।
সত্য কহ কপট না রাখিয়া অন্তরে ॥
দূতী কহে শুন রাধে আসিবার তরে।
সেহি লাগি নিঃশ্বাস বহিছে খরতরে ॥
অধরত শুখিয়াছে শুন গো দূতিকে।
দন্তে তৃণ লইয়া জাত বিনয়ি কহিতে ॥
কেমনেতে ভ্রষ্ট হৈছে তোমার অলকা।
তোমার লাগি কৃষ্ণপদে পড়িল রাধিকা ॥
বেশ কেমনে মলিন হয়ে সহচরি।
ঝটিতি আসিবা তরে সব গেল ফিরি ॥
কৃষ্ণের পিন্ধিবা বাস কেমনে পিন্ধিল।
দূতী বলে তোমার খানে সঙ্কেত আনিল ॥
সঙ্কেত দেখিয়া ধনী আনন্দ হৈল।
চণ্ডীদাস বলে বহু সুখ সে পাইল ॥

(১৬)

শ্যামের সন্দেশ পাঞা মনে আনন্দিত হঞা
সুবেশ হইলা ধনী রাধে।
চিরণী ধরিঞা করে কেশ বিরলিঞা ধীরে
কুন্তল কবরী বামে বাঁধে ॥
কনক মুকুর ধরি কপালে চন্দন চারি
সিন্দুরের বিন্দু তার মাঝে।
নয়নে কজ্জল দিল নাসারে মুকুতা ফল
কনক তাটঙ্ক গণ্ডে সাজে ॥
হস্তে নানা রত্ন চুড়ি তাহে বাজুবন্ধ জড়ি
অঙ্গুলরে মুদ্রিকা বিরাজে।
নানা রতনের ঝিলি দিশই কি শোভা বলি
নথ পংক্তি আদরশ গঞ্জে ॥
কণ্ঠে কণ্ঠ মালভরি আর লম্বে উরসরি (?)
রূপে নাহি আর তুলিবারে।
কনক কুচ উপরে নীল কাঞ্চলি পহিরে
তাহে দিল মুকুতার হারে ॥
নীলধটী শোভে কটী তাহে বান্ধে সোনাকণ্ঠী
পায় দিল কনক নুপুর।
ললিতা ভাঙ্গি তাম্বুল শ্রীমুখেতে জোগাইল
কুঞ্জে যাইতে উদ্বেগ মনর ॥
সব আভরণভরি দাণ্ডাইল সুন্দরী
যেনি (?) লীলা কমল মঞ্জরী।
বৃন্দাবন যাপাইল (?) মনোহর কুঞ্জে গেল
চণ্ডীদাস যাও বলিহারি ॥

(১৭)

মনোহর কুঞ্জে রাই যাইঞা প্রবেশিল।
সব সখী লইঞা ধনী পালঙ্কে বসিল ॥
কুঞ্জেতে রহিল রাই শ্যামের আবেশে।
মাণিকের দীপাবলী জ্বলে চৌপাশে ॥
কান্তে মিলিবারে ধনী হইল উল্লাসে।
নানা পুষ্পমালা তবে শয্যাতে বিলাসে ॥
নানা বেশভুষা রাই সখীর সহিতে।
কান্ত আগমন ভাবি রহিল সুচিতে ॥
এ ঠারু এথানে অভিসারিকা হইলাক শেষ।
এ অন্তে বাসক সজ্জা কহে চণ্ডীদাস ॥

(১৮)

কৃষ্ণের সঙ্কেতে রাই কুঞ্জেতে রহিল।
বহু রাত্র হৈল তবে শ্যাম না আইল ॥

শুন প্রাণ দূতী অবে কি কহব ভলে।
সঙ্কেত করিয়া নাগর কোন্‌খানে গলে॥
নক্তকাল হৈল কৃষ্ণ কেন না আইল।
কুন্ নাগরী ফান্দে নাগর ভুলিঞা রহিল॥
অত কহি রাই মনে আকুলিত হুএ॥
চণ্ডীদাস বোলে রাই বহু দুঃখ পাএ॥

(১৯)

শুনগো পরাণ দূতি অবে কি করব।
কালা যদি না আইল নিশ্চয় মরব॥
এ বেশ ভূষণ আমি না রাখিব গাএ।
যদি না পাই অব শ্যাম হত্যা দিব তাএ॥
তাহার মিলিবা আশে সেজাইলুঁ শেজ।
অবে কেন না আইল সে নাগর রাজ॥
জানিলুঁ জানিলুঁ সখি সে শঠ পিরীতি।
আমাকে কহিঞা গিল কোন্ নাগরী কতি॥ (কাছে ?)
সে কালিয়া চান্দ সঙ্গে যে পিরীতি কএ।
চণ্ডীদাস বোলে সখি অত দশা দিএ॥

(২০)

কুন রসবতী প্রেমরসে মাতি
ভুলাই নিল শ্যামরে।
আমি না জানিল কুন হরি নিল
বিধি বাম হৈল মোরে॥
সে রসিয়া নারী রসের চাতুরী
রসিল মোহন মনে।
রসে পরিচার রসে নিশাণর (?)
অসর নাহি কখনে॥
বিবিধ বিনোদে নিশি পোহাইব
প্রেমরসে মাতি মনে।
বাহু আলিঙ্গিয়া অধর চুম্বিঞা
লগালগি দুইজনে॥
অতি যতনরে কুসুম পালঙ্কে
হংস তুলি বিছাইঞা।
জাতি যুথী মালি বকুল মালরি
নিকুঞ্জ থিব মণ্ডিঞা॥ (?)
কমলে ভ্রমর চুম্বিঞা মধুর
হএ সখি যেন সুখী।
চণ্ডীদাস বোলে কালার পিরীতি
যে করে সে হএ দুখী॥

(২১)

নব ঘনশ্যাম বিলম্ব দেখিঞা
বিলাপ করই রাধা।
দূতী মুখ হেরি নেত্র বহে বারি
কহে লভি কামবাধা॥
কুথা গিল নাথ করিঞা অনাথ
আমি অবে কি করব।
এ চাঁদ নিশীথে বন্ধু রৈলা পথে
কেনে পরাণ ধরব॥
দেখ ফুলবনে মাতি মধুপানে
মধুকর করে কেলি।
মাতোয়াল হঞা ঝঙ্কার করএ
বিরহী বধিব বলি॥
নন্দসুত বাণী বজ্রাঘাত জানি
কানে পশি প্রাণ হরে।
মলয় পবন বহে ঘনেঘন
বিরহী বধিবা তরে।
একালে একান্ত হয়ে আমি কান্ত
মুখপদ্ম না দেখিল।
মনোহর কুঞ্জে নানা পুষ্প পুঞ্জে
শেজ সেজাইয়া ছিল॥
মল্লিকা কুসুমে অতি মনোরমে
সেজাইল সুপতি শেজ।
তথিপরি পীত পতনি পকাই
সিঞ্চিল কস্তুরী রজ॥

ইহার পর দুই ছত্রের পাঠোদ্ধার হয় নাই এবং এইখান হইতেই পুঁথিখানি খণ্ডিত। যে দুই একজন ব্যক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দোহাই দিয়া পদাবলীর আলোচনায় নাম কিনিবার চেষ্টায় আছেন, বাহিরের খোসামাত্র লইয়াই তাঁহাদের কারবার। পদাবলী সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র বোধ নাই, তথাপি কথা কহিবারও চেষ্টার ত্রুটি নাই। পদের ভণিতা মাত্র যাহাদের আলোচনার সম্বল, তাহাদিগকে বুঝাইতে যাওয়া বৃথা। তথাপি সাধারণের অবগতির জন্য বলিয়া রাখা ভাল যে এই পদগুলি দীন চণ্ডীদাসের নহে। এগুলি দ্বিজ চণ্ডীদাসেরও রচিত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। রচনা তৃতীয় শ্রেণীর, মিলের দুর্গতি দেখিয়া দুঃখ হয়। মিলের দোষ, ছন্দপতন, ভাষার অস্পষ্টতা—এ সমস্ত লিপিকর প্রমাদ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। আমাদের

মনে হয় চণ্ডীদাসের নাম লইয়া ইহা কোন উড়িষ্যানিবাসী বাঙ্গালী কবির কিম্বা বাঙ্গালা জানা উড়িয়া কবির রচনা। উড়িষ্যার যে দশা, বাঙ্গালারও সেই দশা। এদেশেও যে কত ভেজাল চলিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক কবির পদ আর এক কবির নামে চলিতেছে, অনেক পদের ভণিতা লোপ পাইয়াছে। আবার নানা সময়ে নানা জনে চণ্ডীদাসের নামে নানা রকমের পদ লিখিয়া চালাইয়া দিয়াছে। যাঁহারা পদাবলী সাহিত্যের আলোচনা করেন, তাঁহারা উদ্ধৃত পদগুলির সঙ্গে আমাদের বক্তব্য বিষয় বিচার করিলে অনুগৃহীত হইব।

চণ্ডীদাস ভণিতার আরও একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সেবার কটকে মহান্তী মহাশয়ের নিকট পদ সংগ্রহে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ভুবনেশ্বরে যাই। তথায় কোন মন্দিরে কয়েকজন কীর্ত্তনীয়া গান করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এই পদটি সংগ্রহ করি। কীর্ত্তনীয়া দুইজনের নাম লিখিয়া লইয়াছিলাম—শ্রীনাথ সুবুদ্ধি ও ভীম মহাপাত্র, নিবাস ভুবনেশ্বরের নিকটবর্ত্তী নোয়াগাঁ। এই পদটি হইতেও বুঝা যাইবে যে ভুবনেশ্বরে বা কটকে বা পুরীতে—এককথায় উড়িষ্যায় চণ্ডীদাসের নামে কিরূপ পদ প্রচলিত রহিয়াছে।

মদনমোহন পীতবসন বঙ্কিম বনচারী।
কেশীমথন মদনমোহন আর্ত্তত্রাণ দৈত্যারি॥
নবীন কপালে নবীন চাঁদ নবীন নবীন সাজে।
নবীন অধরে নবীন বাঁশরী নবীন নবীন বাজে॥
নবীন গলায় নবীন মালা নবীন নবীন দুলে।
কোন্ বিনোদিনী এ মালা গেঁথেছে নবীন নবীন ফুলে॥
নবীন কটীতে নবীন ধটী নবীন নবীন সাজে।
নবীন পএর নবীন নুপূর নবীন নবীন বাজে॥
কহে চণ্ডীদাস নবীন নাগর নবীন কদম্ব মূলে।
এরূপ হেরিয়া কোন বিনোদিনী পরাণ ধরিতে পারে॥

বরোদা ও গায়কবাড়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

বরোদা রাজ্যের বর্ত্তমান মহারাজার শাসনকাল ৬০ বৎসর পূর্ণ হইল। এই ঘটনা উপলক্ষে বরোদা রাজ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং মহারাজা কেবল উৎসবেই এই স্মরণীয় ব্যাপার শেষ হইতে দেন নাই, পরন্তু দরিদ্র ও অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ভুক্ত প্রজার কল্যাণকর কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার জন্য ১ কোটি টাকা ন্যাসরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

আজ হইতে ৬০ বৎসর পূর্ব্বে—মহারাণী লক্ষ্মীবাঈ কর্ত্তৃক দত্তক গৃহীত এই গায়কবাড়ের বিবরণ এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ চিত্রকর লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই চিত্রকরের নাম—ভ্যাল প্রিন্সেপ। প্রিন্সেপ পরিবারের সহিত ভারতবর্ষের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও বহুদিনের। তাঁহার প্রপিতামহ যখন এ দেশে আইসেন তখন তাঁহার পিতা—খৃষ্টধর্ম্ম যাজককে তাঁহার কোন বন্ধু এ দেশ হইতে লিখিয়াছিলেন—তিনি যেন পুত্রকে ভারতবর্ষে প্রেরণ না করেন—কারণ, "ক্লাইব স্বয়ং শয়তান"। কিন্তু পুত্র এ দেশে আসিয়া লাভবান হয়েন। তাঁহার পর একই সময়ে ঐ পরিবারের ৭জন ভারতবর্ষে নানা কার্য্যে রত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে এক জনের স্মৃতি কলিকাতায় প্রিন্সেপ ঘাটে রক্ষিত হইতেছে। ইনিই অশোকের শিক্ষালিপির পাঠোদ্ধার করেন এবং এ দেশের প্রত্নতত্ত্বে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

রাণী ভিক্টোরিয়া যখন ভারতের সাম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করেন তখন দিল্লীতে যে দরবার হয়, সাম্রাজ্ঞীর জন্য তাহার চিত্র অঙ্কিত করিতে ভ্যাল প্রিন্সেপ ভারত সরকার কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া জন্মভূমি ভারতবর্ষে আগমন করেন। ঐ চিত্রে রাজন্যগণের প্রতিকৃতি প্রদানার্থ তিনি রাজন্যগণের চিত্র অঙ্কিত করেন এবং তাহাতে রাজন্যগণের নিকট হইতেও তাঁহার "প্রাপ্তি" অল্প হয় নাই। নৌশারীতে যাইয়া তিনি যে কেবল তরুণ গায়কবাড়ের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা নহে—সঙ্গে সঙ্গে মহারাণী যমুনা বাঈয়ের ও তাঁহার দুহিতার চিত্রও অঙ্কিত করেন। এই শিল্পী এ দেশে অবস্থান-

কালে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা চিত্রে অলঙ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হয়। বরোদার গায়কবাড়ের ও বরোদার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক—চিত্রেরই মন মনোজ্ঞ। সেই বিবরণের আরম্ভে তিনি লিখেন :—

"আমি এই স্থানে (নৌসারীতে) উপস্থিত হইবার পর প্রাতে ৮টার সময় গায়কবাড় তাঁহার চিত্রাঙ্কন জন্ম আসিলেন। ইনি ভবিষ্যতে বার্ষিক ১ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা আয়ের অধিকারী। দুই বৎসর পূর্ব্বে ইনি এক জন অতি সাধারণ পল্লীবালক মাত্র ছিলেন। গায়কবাড় কুণ্ডী রাওয়ের বিধবা যমুনা বাঈ দত্তক গ্রহণ করিবেন বলিয়া যে



মহারাণী যমুনা বাঈএর কন্যা তারাবাঈ

৩টি বালককে আনা হয়, সেই বালকত্রয়ের মধ্যে তিনি ইঁহাকেই গ্রহণ করেন।"

ইহার পর তিনি এই দত্তক গ্রহণের কারণ বিবৃত করেন। তিনি লিখিয়াছেন—যমুনা বাঈ সম্ভ্রান্ত পরিবারের দুহিতা এবং অসাধারণ সুন্দরী বলিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তিনি কুণ্ডী রাওয়ের সহিত বিবাহিতা হয়েন। স্বামী ইঁহাকে যেমন আদর করিতেন, তেমনই প্রহারও যে করিতেন না, এমন নহে। অপুত্রক স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্নী যে গর্ভবতী তাহার সন্ধান না লইয়াই বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে রেসিডেণ্ট কুণ্ডী রাওয়ের ভ্রাতা মলহর রাওকে গায়কবাড় ঘোষণা করেন। এই ব্যক্তি অতি ভীষণ প্রকৃতির লোক ছিল এবং অগ্রজকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করায় কারাগারে রুদ্ধ হয়। মলহর রাও ৯ বৎসর কারাগারে বন্দী থাকিবার পর রেসিডেণ্টের কথায় তাহাকে মুক্তি দিয়া সন্ন্যাসীর দলে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা



মহারাণী যমুনা বাঈ

হয়। এই সময় তিনি যখন রেসিডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন, তখন উলঙ্গ অবস্থায় আসিয়া যানে বস্ত্র পরিধান করিতেন এবং সাক্ষাৎ শেষ হইলেই আবার বস্ত্র ত্যাগ করিতেন। কয় বৎসর সন্ন্যাসীর সঙ্গেও তাঁহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি গায়কবাড় হইয়া যখন শুনিলেন, যমুনা বাঈ সন্তান-সম্ভবা এবং তিনি যদি পুত্র প্রসব করেন তবে সে-ই রাজ্য লাভ করিবে, তখন তাঁহার মনোভাব সহজেই অনুমেয়। বিপদের সম্ভাবনা হেতু যমুনা বাঈকে প্রাসাদ হইতে সরাইয়া অন্য গৃহে এক জন ইংরাজ

মহিলার অভিভাবকত্বে রাখা হয়। যাহাতে ভয়ে মহারাণীর সন্তান নষ্ট হয়, সেই আশায় মলহর রাও তাঁহার গৃহের সম্মুখে সেনাদিগের কুচকাওয়াজের ও বড় বড় তোপ দাগিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি যমুনা বাঈকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার চেষ্টাও করেন। স্বামীর মৃত্যুর ৮ মাস পরে যমুনা বাঈ এক কন্যা-সন্তান প্রসব করিলে যখন প্রকাশ করা হয়, তিনি বালক প্রসব করিয়াছেন, তখন মলহর রাও নিরাশ হইয়া পড়েন। শেষে সত্য প্রকাশ পাইলে তিনি আনন্দে তাঁহার পাগড়ী লুফিতে লুফিতে নাচিতে আরম্ভ



মহারাজা গাইকবাড় (তরুণ বয়সের চিত্র)

করেন। তিনি মাতা ও পুত্রীকে হত্যার চেষ্টা করিলে যমুনা বাঈ রাজ্য ত্যাগ করিয়া পুণায় গমন করেন এবং তথায় বৃটিশ সরকার প্রদত্ত মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিতে নির্ভর করিয়া বাস করিতে থাকেন।

প্রিন্সেপ তাঁহার দুহিতা ৪।৫ বৎসর বয়স্কা তারাবাঈএরও চিত্র অঙ্কিত করেন। সে-ও যে গায়কবাড় নহে তাহা সে বিশ্বাস করিত না; সেই জন্য পুরুষের মত বেশ পরিধান করিত ও গায়কবাড় যখন অশ্বারোহণে আসিতেন তখন সেও পুরুষের মতই অশ্বারোহণে আসিত।

মলহর রাও রেসিডেণ্টকে পানীয়ের সহিত হীরকচূর্ণ দিয়া হত্যার চেষ্টা করিয়া রাজ্যচ্যুত হয়েন। তাহার পূর্ব্বে তিনি কোন নিম্নবর্ণের লোকের স্ত্রী লক্ষ্মীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া রেসিডেণ্টের বিরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন। তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে যখন দত্তক গ্রহণের প্রয়োজন হইল, তখন মাসিক ৩০ টাকা বৃত্তিভোগী মহারাণী যমুনা বাঈকে পুণা হইতে বরোদায় আনিতে হইল এবং তিনিই বর্ত্তমান গায়কবাড়কে দত্তক গ্রহণ করেন। তিনি প্রাসাদে সর্ব্ববিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন এবং যখনই কোথাও গমন করেন, তখন ভৃত্যবর্গ উচ্চস্বরে বলে—"মহারাণী সাহেবার সুখ ও সম্পদ হউক"—"ভগবান মহারাণীর কল্যাণ করুন।"

ভ্যাল প্রিন্সেপ মহারাণী যমুনা বাঈএর যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

"পৌঁছিবার দিন অপরাহ্নে আমি মহারাণীর নিকট নীত হইলাম। আমরা যে বৃহদায়তন কক্ষে নীত হইলাম তথায় তিনি ছিলেন। তিনি দীর্ঘকায়, তন্বী ও এখনও অসাধারণ সুন্দরী। তাঁহার চক্ষু বিশালায়ত ও সুগঠিত, নাসিকা সরল, মুখমণ্ডল সুগঠিত। তাম্বুল চর্ব্বণে তাঁহার দন্ত রঞ্জিত হইয়াছে এবং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎকালে ও বাক্যালাপ করিবার সময়েও তাঁহার গণ্ডে তাম্বুল রক্ষা হেতু উচ্চতা লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহার পরিধানে যে গাঢ় নীলবর্ণের সূক্ষ্ম শাড়ী ছিল, তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার ত্বকের বর্ণ লক্ষিত হয়। কটির উপর তাঁহার বক্ষের আচ্ছাদন—সোণার জরীর কায করা রক্তবর্ণের কঞ্চুলী। তাঁহার কর ও চরণ অত্যন্ত সুন্দর—যে স্থানে নখ মাংস হইতে বাহির হইয়াছে তথায় হেনার বর্ণে অর্দ্ধবৃত্ত অঙ্কিত। তাঁহার চরণে অঙ্গুষ্ঠে দুইটি ও অন্য অঙ্গুলীতে একটি করিয়া অঙ্গুরী। কিন্তু তিনি রঞ্জনের দ্বারা শোভাবর্দ্ধনচেষ্টা করেন না। তাঁহার নয়নে কজ্জল বা নাসিকায় নাকছাবি নাই। কেবল তাঁহার কপালে, কপোলে ও থুতনীতে একটি করিয়া ফিকা নীলবর্ণের উলকী বিন্দু। তাঁহার অলঙ্কার সুনির্ব্বাচিত—তাহাতে বাহুল্য নাই।"

তিনি যে সুশিক্ষিতা নহেন, তাহার পরিচয় গায়কবাড়ের

চিত্র-সমালোচনায় পাওয়া যায়। মুখের এক পার্শ্বের চিত্র দেখিয়া তিনি বলেন—"একটিমাত্র চক্ষু ও পাগড়ী হইতে বিলম্বিত মুক্তাহারের ২টি মাত্র শ্রেণী দেখান হইয়াছে কেন?" এরূপ চিত্রে তাহাই অঙ্কিত করিতে হয় বলায় মহারাণী বলেন—"সে বিষয় আপনারাই ভাল জানেন।" কিন্তু সে চিত্র যেন তাঁহার মনোমত হয় নাই।

বালক গায়কবাড়ের বর্ণনায় প্রিন্সেপ লিখেন—তাঁহার বয়স ১৫ বৎসর এবং তিনি মাংসল। প্রথমে তাঁহাকে স্বল্পবুদ্ধি মনে হইলেও তিনি বুদ্ধিমান। তাঁহার যথেষ্ট সঙ্কল্প-দৃঢ়তা ও উদ্যম আছে। তিনি এখনই বেশ ইংরাজী পড়িতে ও ইংরাজীতে কথা বলিতে পারেন। তাঁহার আদর্শ শাসক হইবার সম্ভাবনা।



বরোদার গাইকবাড় (বর্ত্তমান ছবি)

তরুণ গায়কবাড় খেলাতেও উৎসাহশীল ছিলেন। শিল্পী তাঁহাকে কুস্তী করিতে দেখিতে গিয়াছিলেন। গায়কবাড়রা কুস্তীর বিশেষ আদর করিতেন এবং মলহর রাও ইহার জন্য প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রিন্সেপ যখন গায়কবাড়ের চিত্র অঙ্কিত করেন, তখন সার তাঞ্জোর মাধব রাও বরোদার "রিজেন্ট"। তিনি অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিলেন এবং তাঁহার ব্যবস্থায় পালোয়ানদিগের জন্য অর্থব্যয় হ্রাস করা হয়। বিরক্ত হইয়া প্রধান পালোয়ান তখন চাকরী ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পালোয়ান তরুণ গায়কবাড়কে কুস্তী শিখাইতেছে। সে যেভাবে গায়কবাড়ের সঙ্গে কুস্তী করিত—যেন গায়কবাড়ের সঙ্গে বল পরীক্ষায় পারিয়া উঠিতেছে না—এমনই ভাব দেখাইত, বালকের দ্বারা পাতিত হইত—তাহা হাস্যোদ্দীপক।

প্রিন্সেপ যে অনুমান করিয়াছিলেন, বালক গায়কবাড় আদর্শ শাসক হইবেন, তাহা সার্থক হইয়াছে। বালকের যমুনা বাঈএর আনুগত্য দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল, অহল্যা বাঈএর মত বুদ্ধি ও শিক্ষা থাকিলে তিনি হয়ত শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন এবং তিনি হয়ত গায়কবাড় প্রবর্ত্তিত উন্নতির অন্তরায় হইবেন। সে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। হয়ত যমুনা বাঈএর প্রভাব নানারূপ উন্নতিকর কার্য্যে তাঁহার পুত্রকে উৎসাহিতই করিয়াছিল। কারণ এই মহিলা মলহর রাওয়ের মত পিশাচপ্রকৃতির লোকের অত্যাচার লক্ষ্য ও অনুভব করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং প্রতিকূল অবস্থায় যে



বরোদার বর্ত্তমান মহারাণী

শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভুলিবার নহে। যদি তাঁহার শাসকোচিত গুণ না থাকিয়া থাকে, তথাপি একথা বলা যায় যে, উন্নতির রথচক্রের গতিরোধ করিবার প্রবৃত্তিও তাঁহার ছিল না। মাধব রাও গায়কবাড়ের নাবালক অবস্থায় রাজ্যে নানা সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়া উন্নতির পথ সুগম ও প্রশস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। গায়কবাড় সেই পথে জয়যাত্রা করিয়া আদর্শ শাসকের কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারিয়াছেন।

গায়কবাড়ের রাজত্বকাল ৬০ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তাঁহার প্রজাদিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হইয়াছে, তাহাতে সত্যই বলা হইয়াছে :—

"আপনি অগ্রণী হইয়া রাজ্যে বহুদূর-প্রসারী ফলপ্রদ শিক্ষা ও সমাজ সম্বন্ধীয় সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সে সকলের মধ্যে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা, জনগণের জন্য বিনাব্যয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের উপায়, মাতৃভাষার উন্নতিসাধন, প্রাচ্য বিদ্যাচর্চ্চায় উৎসাহ দান, বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের সংস্কার, ধর্ম্ম ও লোকহিতকর কার্য্যের জন্য প্রদত্ত সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিধি, অনাবশ্যক ও ব্যয়বহুল ব্যবস্থা বর্জ্জন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকলে কেবল যে আপনার প্রজারাই মুগ্ধ হইয়াছে, তাহা নহে; পরন্তু অন্যান্য স্থানেও বরোদার ব্যবস্থা অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে।"

গায়কবাড় নানা প্রদেশ হইতে উপযুক্ত লোককে তাঁহার রাজ্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালী রমেশচন্দ্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

উৎসব উপলক্ষে গায়কবাড় যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে প্রজার জন্য তাঁহার স্নেহের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—তিনি প্রজার—বিশেষ দরিদ্র ও অবজ্ঞাত সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতিসাধন জন্য ১ কোটি টাকা ন্যাসরূপে রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সাধারণতঃ এই সব কার্য্যে তাঁহার সরকার যে অর্থপ্রযুক্ত করিবেন, ইহা হইতে তাহাতে আরও অর্থ যুক্ত হইয়া তাহার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কার্য্যসম্পাদনে সাহায্য করিবে।

তিনি বলিয়াছেন :—

"আপনারা অবগত আছেন, গত ৫৫ বৎসরকাল আমি পল্লীগ্রামের উন্নতিসাধন জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি। আর কোন কাযই আমার এত মনোযোগ আকৃষ্ট করে নাই। গ্রাম্য জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই আমার উদ্দেশ্য। আমার প্রজারা জীবনযাত্রাপদ্ধতির উন্নতিসাধন করিবে—উন্নত পদ্ধতিতে জীবনযাপনের সঙ্কল্প করিবে—স্বাবলম্বনের অনুশীলন করিবে—ইহাই আমার অভিপ্রেত। যাহাতে গ্রাম্যজীবন আকর্ষক হয়—কৃষিকার্য্য লাভজনক হইয়া সকলের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে—তাহাই আমি দেখিতে চাহি।"

অর্ঘ্য

শ্রীনীরদবরণ—শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম

কবে বল্‌ব শুধু তোমার কথা
গাইব তোমার গান?
তোমার প্রেমের সুধাধারায়
সিক্ত হবে প্রাণ!
তোমার মৃদুল পরশ লাগি'
চিত্ত আমার রইবে জাগি'
সকল রাত্রিদিন,
তোমার অমল অরুণ হাসি
আমার দুঃখ-আঁধার নাশি'
করবে বাধাহীন
শুক্ল রাতের স্নিগ্ধ আলোয়
পুঞ্জ মেঘের কালোয় কালোয়
ভুল্‌বে তোমার রূপ,
একলা মনের বিজন কোণে
গাঁথ্‌ব মালা-সঙ্গোপনে
জ্বাল্‌ব প্রেমের ধূপ;

জীবন-বীণায় তন্ত্র 'পরে
ঝঙ্কবে তান তোমার করে
নিত্য সুমধুর,
সকল ক্ষণে, সকল কাজে,
অবসরের শান্তি মাঝে
বাজবে তোমার সুর;
কবে তোমায় ভালোবেসে
তোমার পথে চলব হেসে,
করব না আর ভয়;
আমার তনুর প্রতি অণু
হবে তোমার বর্ণ-ধনু—
তোমার স্বপ্নময়;
মাগো, পঙ্ক-মলিন মর্ম্ম-নীরে
সূর্য্য-শতদলে
মুক্ত করি' অর্ঘ্য করো
তোমার চরণ তলে।



চড়ক

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দ

[ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে (১৮৩৬ খৃঃ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি) হুগলী জেলার সুদূর পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়।

অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বড় ভাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লেখাপড়া শিক্ষা কিছুই হইল না। ব্রাহ্মণের ছেলে সামান্য পূজা-অর্চনা মাত্র শিক্ষা করিলেন এবং জানবাজারের রাণী রাসমণির অনুগ্রহে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পূজকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর তিনি প্রধান পূজকও হন। সেই সময়েই তিনি সাধন-পথে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সময় সময় তিনি এমনই তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে মায়ের পূজার্চনার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিল ঠাকুর পাগল হইয়াছেন। সত্যই তিনি মায়ের দর্শনলাভের জন্য পাগল হইয়াছিলেন এবং সেই পাগলই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এই ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় তিনি অবতীর্ণ হন। আজ সমগ্র সভ্যদেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন। আমরাও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে প্রণাম করিতেছি।

তাঁহার জীবন-কথা, তাঁহার সাধনার কথা বলিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, যে শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই। আমরা কতকগুলি শুষ্ক কথার দ্বারা কোন রকমে একটা মালা গাঁথিতে পারি। কিন্তু এই পবিত্র দিনে—সে মালা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের চরণে অর্পণ করা কিছুতেই শোভন হইবে না। তাই—যিনি তাঁহার কথা বলিবার প্রকৃত অধিকারী, যিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন, যিনি জগৎময় তাঁহারই মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন—সেই যুগমানব সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমরা এই শতাব্দী-জয়ন্তীতে পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।]

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের অনুসন্ধান করিতাম। আমি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাবসানে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম—"এই যে সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তরে বলিতেন—"এ সকল আমার মত ও বিশ্বাস।" অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। আমার এখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত একটি শ্লোক মনে পড়িতেছে—

> বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
> বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি ও শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন; আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় কথা কহিতেছিলেন; আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্ম্মাচার্য্য কিরূপে হইতে পারে? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সারা জীবন ধরিয়া অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"হাঁ"। "মহাশয়, আপনি কি

তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?" "হাঁ"। "কি প্রমাণ?" "আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতেছি।" আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি—ধর্ম্ম সত্য, উহা অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। এ একটা তামাসার কথা নয় অথবা ইহা মানুষের করা একটা গড়াপেটা জিনিষ নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট আসিতে লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি—ধর্ম্ম যে দেওয়া যাইতে পারে তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে, একটা সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বার বার হইতে দেখিয়াছি। আমি বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম; তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। আমি এখন দেখিলাম, ইহা সত্য; যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্ম দান সম্ভব, আর মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন—"জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া নেওয়া যায়, ধর্ম্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া নেওয়া যাইতে পারে।" অতএব আগে ধার্ম্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জ্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহা দাও গিয়া। ধর্ম্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম—আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। উহা লইয়া সমাজ গঠন কিরূপে হইবে? কোন ধর্ম্ম কি কখন কোন সমিতি বা সংঘ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ সমাজ করিলে ধর্ম্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয়—আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম্মের লোপ। এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম্মের প্রাচীন জন্মভূমি। উহাদের মধ্যে এমন একটি ধর্ম্মের নাম কর, যাহা প্রণালীবদ্ধ সংঘের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটিরও তুমি নাম করিতে পারিবে না। ইউরোপই এই উপায়ে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল—আর সেই জন্যই উহা এশিয়ার মত কখনই সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা ছুটাইতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্ম্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্ম্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ্চ নির্ম্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে বা বচনে বা বক্তৃতায় বা সংঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের মোট কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলে প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, আমরা যতক্ষণ না নিজেরা সত্যকে জানিতেছি, ততক্ষণ কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, আমরা যতই শুনি না কেন, কেবল একটি জিনিষেই আমাদের সন্তোষ হইতে পারে—তাহা এই—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি—আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষানুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর পার, ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—দুই কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না। "তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানকে এক সঙ্গে সেবা করিতে পার না।"

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগকে সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব—সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে

যাইতেছ তাহা ঠিক নহে, একথা বলা ভুল। এইটি করিতেই হইবে—এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবে—সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে বহুত্বে একত্ব বুঝায়, ব্যবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ, কিন্তু এই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত, অপরিণামী, নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—সমষ্টির ক্ষুদ্রাকারে পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—আর ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটি আজকালকার দিনে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের লোক, যেখানে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্ত নাই—সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা সৌভাগ্যবশতঃই হউক, যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়—আমি এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সহিত পরিচিত। এমন কি, মর্ম্মনেরা (Mormons) * পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে। সেই ত ধর্ম্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশাপেক্ষা সেখানেই ধর্ম্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার কর, উহা যতই কিম্ভূতকিমাকার ধরণের হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে, আর তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাক্ষাৎ ভগবানরূপে পূজিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ, ইহাতে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে ভারতে আমরা এই এক বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে উহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি তাহারা সকলেই বলিবে উহারা এক ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

"যেমন বিভিন্ন নদীসমূহ বিভিন্ন পর্ব্বতসমূহে উৎপন্ন হইয়া ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদয়ই সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।" ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্য্যে স্বীকার করিতে হইবে—তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া অপর ধর্ম্মে কিছু সত্য আছে বলেন, সেরূপ ভাবে নহে—'হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে।'. (আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু "আমাদের ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে")। একজন বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন না উহা সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম; আবার অপর একজন তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়াও সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মুক্তি দিবার শক্তি সমান আছে। মন্দিরে বা চার্চ্চে উহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন—আর তুমি, আমি বা অপর কতকগুলি লোক একজন অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মার রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যও দায়ী নহে, সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী।

* ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ইঁহারা বাইবেলের মধ্যে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ এক পত্নী সত্ত্বেও বহুবিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী।

আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে আপনা-দিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র লোকসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাঁহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষকস্বরূপ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার, তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার, তবে মানুষ যেখানে অবস্থিত আছে তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য, যিনি অনায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে। তদীয় মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি তিনি কাহারও সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মনও কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্ম্মলাভের এক মাত্র গুহ্য উপায়। বেদ বলেন—

"ন ধনেন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"

"—ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়।" যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন—"তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।"

সব বড় বড় আচার্য্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না, সকল ধর্ম্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে, আর যতই ত্যাগের ভাব কমিয়া যায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় ততই ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে, আর ধর্ম্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই ব্যক্তি ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয়, আর মদীয় আচার্য্যদেব এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না; তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্য্যন্ত এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, এমন কি, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহটা যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল যাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদানে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এই সব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণ জয়ের তিনি এক জীবন্ত উদাহরণ। এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর কিছুমাত্র ছিল না—আর এই শতাব্দীর জন্য এইরূপ লোকসকলের অতিশয় প্রয়োজন। এখনকার কালে লোকে যাহাকে আপনাদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, তাহা ব্যতীত এক মাসও বাঁচিতে পারিবে না মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্তরূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—আজকালকার দিনে এই ত্যাগের প্রয়োজন। এইরূপ কালে এমন একজন লোকের প্রয়োজন—যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন লোক আছে যে সংসারের সমুদয় ধনরত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহে। বাস্তবিকই এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত—আর তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০

ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন। আর এরূপ ঘটনা যে দুই একদিনের জন্য ঘটিত তাহা নহে; মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে তাঁহার গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও কথা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম, তাঁহার কষ্ট যাহাতে না হয় এই কারণে লোক-জনের সঙ্গে তিনি যাহাতে দেখা না করেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত—"এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?"—তিনি হাসিয়া এই মাত্র উত্তর দিতেন—"কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে ত ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, তাহার জন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।" একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—"মহাশয়, আপনি ত একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।" প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন—"তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দেখিতেছি অপর সংসারী লোকদের মত কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদ-পদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?"

এইরূপে তিনি লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, ইঁহার শীঘ্র দেহ যাইবে—তাই পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে কিরূপে লোক আসিয়া তাঁহাদের চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশায়ই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। অপরের ভিতর এইরূপ আধ্যাত্মিকতার আদর হইতেই লোকের ভিতর আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, যত বড় বক্তৃতাই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বচনে হইবে না, নিজে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে। যখন লোকে শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল—আর মদীয় আচার্য্যদেব নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর দূর হইতে আসিত, আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—"যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব"—আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে—সেই দিন দেহত্যাগ করিবেন—ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আমরা তাঁহার দেহ দগ্ধ করিলাম। (মদীয় আচার্য্যদেব)



'শব্দরত্নাবলী' ও মূসা খাঁ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

পরলোকগত হরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন-কালে যে সকল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের 'শব্দরত্নাবলী' অন্যতম (১)। পরলোকগত হেন্‌রী টমাস্ কোলব্রুক্ সাহেবও তাঁহার 'অমরকোষ'-এর সংস্করণ সঙ্কলনকালে এই 'শব্দরত্নাবলী'র সাহায্য লইয়াছিলেন (২)। এই অভিধান সম্বন্ধে উইলসন্ সাহেবের অভিমত এই যে, পর্য্যায়শব্দগুলির মধ্যে নানা বিভিন্ন পাঠ প্রবেশনের জন্যই ইহা প্রধানতঃ প্রয়োজনীয়, নচেৎ ইহাতে নূতনত্ব কমই আছে। কোলব্রুক্ বলেন, ইহা অমরকোষের অনুক্রমে লিখিত, সেই হেতু ইহাকে অমরকোষের টীকা-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পরে পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় এখানি সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আধুনিক যতগুলি শব্দ-কোষ তিনি দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (৩)।

আধুনিক কোষগ্রন্থের মধ্যে 'শব্দরত্নাবলী'ই শ্রেষ্ঠ কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অমরকোষের তুলনায় ইহাতে অনেক বেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা, অমর স্বর্গবর্গে বুদ্ধের যতগুলি সংজ্ঞা বা সমার্থ দিয়াছেন, মথুরেশ তদ্ব্যতীত আরও ২৭টি বেশী সংজ্ঞা দিয়াছেন; তন্মধ্যে 'ধর্ম্মচক্র, গুণাকর, অসম, খসম, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বজ্রী, বাগীশ, মহাসুখ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, পঞ্চজ্ঞান, মহাবোধি, ত্রিমূর্ত্তি ও শক' এইগুলি উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবের 'ত্রিকাণ্ডশেষে'র অনেকগুলি সংজ্ঞা 'শব্দরত্নাবলী'তে নাই, যথা 'মহাশ্রমণ, কুলিশসন, গোপেশ' ইত্যাদি। অমরকোষ অপেক্ষা 'শব্দরত্নাবলী'তে বিষ্ণুর ৬৪টি বেশী প্রতিশব্দ আছে, তন্মধ্যে 'ইরেশ, জিতামিত্র, ঊর্দ্ধদেব, হরিগৃধ্র' প্রভৃতি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। দুর্গার আছে প্রায় ৪৭টি বেশী, তন্মধ্যেও কতকগুলি পুরাণ বা তন্ত্র (আগম) শাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় না। এইরূপ সমগ্র গ্রন্থেই কিছু কিছু বেশী শব্দ আছে।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, নদীয়া রাজবংশের রাজা রাঘব রায়ের সভায় যে স্মার্ত্ত-পণ্ডিত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ছিলেন, তাঁহার পিতা মথুরেশ তর্কপঞ্চানন ও মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার একই ব্যক্তি নহেন। ঐ মথুরেশের নিবাস ছিল রাণাঘাটের অন্তর্গত উলায় (৪)। মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার 'শব্দরত্নাবলী' ব্যতীত 'সারসুন্দরী' নামে অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় ইনি নপাধীয় বন্দ্যঘটীয় কুলোদ্ভব। ইহার প্রারম্ভ ও পুষ্পিকা হইতে আরও জানা যায় যে, ইনি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র ছিলেন এবং ইঁহার মাতার নাম ছিল পার্ব্বতী (৫)।

'শব্দরত্নাবলী' ও 'সারসুন্দরী' ব্যতীত মথুরেশ প্রণীত আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়—'নানার্থশব্দ'। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

> "নত্বা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম মূর্চ্ছা খাঁন নৃপাজ্ঞয়া
> নানার্থশব্দ লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ।" (৬)

কিন্তু এই 'নানার্থ শব্দ' স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, ইহা 'শব্দরত্নাবলী'রই অন্তর্গত নানার্থ-বর্গ। অথচ একই গ্রন্থের অন্তর্গত মাত্র একটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে এইরূপ গৌরচন্দ্রিকা কেন, ইহা বোঝা দুষ্কর।

'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথি সুলভ নয়। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র

(১) Works of H. H. Wilson, Vol. V., London, 1865, p. 233.

(২) Miscellaneous Essays, Cowell's ed., Vol. II, London, 1873, pp. 51-52.

(৩) A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language, Analytical, Historical and Lexicographical, Vol. III, Part I, Calcutta and London, 1884, Introduction, p. 36.

(৪) Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS., under the care of the Asiatic Society of Bengal, by MM. H. P. Sâstrî, Vol. III, (Smriti) Cal., 1925, Intro, pp. XXX.

(৫) R. L. Mitra's Notices of Sanskrit MSS., Vol. VII., pp. 221 and 222.

(৬) Ibid, Vol. I. No. 354.

লাল মিত্র মহাশয় উহার যে পুঁথিখানির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"বন্দে সদানন্দময়ং সমস্তাজ্জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম ভবাদিসেব্যম্
ধ্যানেকগম্যং জগদেকরম্যং যদিচ্ছয়া কারণকার্য্যভাবঃ।
আসীৎ ক্ষ্মাতলমণ্ডলে নৃপকুলৈঃ সংসেবিত শ্রীযুতৈ-
র্ভূপালঃ শিতমানখান ইতি যঃ কীর্ত্তিপ্রতাপোজ্জ্বলঃ।
যদ্দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপচণ্ডদহনৈঃ কল্পান্তসূর্য্যপ্রভৈঃ
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালকা রণভুবি ক্ষোভাকুলাঃ শেরতে।
তস্যৈব জগদেকবীরতনুজঃ খ্যাতো জগন্মণ্ডলে
মূর্চ্ছা খাঁন মহীপতিঃ স্থিরমতির্বঙ্গেকরজ্জোৎসবঃ।
দীপ্তৈর্দ্বাদশ ভূমিপৈশ্চিরতরং তীক্ষ্মাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ
শ্রীধাতৃ প্রতিদেশপালনবিধৌ সংসেব্যমানোঽভবৎ।

* * * * * * * *

ধীর শ্রীমথুরেশ এষ তনুতে শ্রীশব্দরত্নাবলীং
সন্তঃ সন্ত বিনোদিনো নৃপসমং সন্তোষসন্তোঽনয়া।" (৭)

'সারসুন্দরী'তে মূর্চ্ছা খাঁর নাম নাই। মথুরেশের পৃষ্ঠপোষক 'বঙ্গে'র নৃপ, 'দ্বাদশ-ভূমিপে'র (বার ভুঁইয়ার) তীক্ষ্মাংশু চণ্ডপ্রভায় দীপ্ত এই মূর্চ্ছা খাঁন যে পূর্ব্ববঙ্গের 'বাইশ পরগণা'র অধীশ্বর মসনদ্-ই-আলি ইশা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান মূসা খাঁ—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবুল ফজলের 'আইন্-ই-আক্‌বরি' ও 'আকবর-নামা', ইনায়েৎ-উল্লার 'তক্‌মিল্‌ল-ই-আকবর-নামা' (Elliot's History of India, vol. VI.), ইংরেজ র‍্যাল্‌ফ্ ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (Horton Ryley, 1899), ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত 'রাজমালা', ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের জঙ্গলবাড়ীতে ইশা খাঁর বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ, জনপ্রবাদ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রচলিত গ্রাম্য-গীতি প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিবরণ দ্বারা গঠিত বীরবাহু ইশার কাহিনী নানা সাময়িক-পত্রে ও গ্রন্থে আলোচিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। অধুনা ইহা অতি-পরিজ্ঞাত কথা যে, ইশার পিতা কালিদাস গজদানী (যদিও 'আকবর-নামা'য় ইশার পিতার নামোল্লেখ নাই) মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুলেমান খাঁ যে 'শব্দরত্নাবলী' বর্ণিত 'সিতমান খান' ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কিন্তু 'শব্দরত্নাবলী' অনুসারে সিতমান খান ইশা খাঁর পিতা নহেন, মূর্চ্ছা খানের পিতা। ভুলটা অবশ্যই মথুরেশের এবং কোনও রাজার বা রাজস্থানীয় ব্যক্তির সভাপণ্ডিতের পক্ষে তাঁহার প্রভুর পিতার নাম সম্বন্ধে এরূপ ভুল বা অজ্ঞতা আশ্চর্য্যের কথা।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁর প্রকৃত অভ্যুদয় এবং ১৫৯৮ অথবা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে (ইনায়েতুল্লার মতে ১০০৭ হিজরী ও 'আকবর-নামা'র মতে ১০০৮ হিজরী) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র, দেওয়ান মূসা খাঁ ও দেওয়ান মহম্মদ খাঁ এবং এই দুইয়েরই সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু মূসার পুত্র মশূম খাঁর জীবনের ১৬৩২ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা মুসলমানী ইতিহাসে পাওয়া যায় (৮)। আর পাদ্রী জন্ ক্যাব্রাল্ (Fr. John Cabral S. J.) কর্ত্তৃক ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি চিঠি হইতে জানা যায় যে—"Minimican, Son of Massacan, who had been Emperor of Bengal before the Moors conquered it." অর্থাৎ এই চিঠি লিখিত হইবার পূর্ব্বেই Massacan-এর প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই Massacan মূসা খাঁ (৯)।

কিন্তু কোলব্রুক্ 'শব্দরত্নাবলী'র যে পুঁথি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ (১০)।

উইলসনের পুঁথিতেও ঐ একই তারিখ ছিল এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে 'শব্দরত্নাবলী' ১৫৮৮ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল (১১)।

রাজা রাজেন্দ্রলাল 'শব্দরত্নাবলী'র যে পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন উহা খণ্ডিত, উহার শেষাংশ নাই। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে মথুরেশের একখানি 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথিতে পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আছে (১২),

"শাকাব্দে রস দোষ বাধব (সৈন্ধব) ধরামানে ধরা নির্জ্জর
কোঽপ্যেতামলিখচ্ চ কোবিদং (ক্র) তাং শ্রীশব্দরত্নাবলীম্।"

(৭) Ibid, Vol. III, No. 1105, p. 65.

(৮) J. A. S. B., Vol. XLIII, 1874, James Wise, p. 210.

(৯) Ibid, 1913, p. 445.

(১০) Colebrooke, op. cit., p. 52 footnote.

(১১) Wilson, op. cit., p. 233.

(১২) Eggeling's Catalogue, No. 1512.

কিন্তু ইহা হইতে তারিখটা জানা যায় না, কারণ ইহার কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রলাল 'সারসুন্দরী'র যে পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দুইটি তারিখ দেওয়া আছে, একটি গ্রন্থ-রচনার, অপরটি পুঁথি-নকলের। নকলের তারিখটি—'পক্ষাভ্ররসচন্দ্রাব্দ' অর্থাৎ ১৬০২ শক বা ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ। রচনার তারিখ, 'গজাষ্টতিথিযুক্শাকে' অর্থাৎ ১৫৮৮ শকাব্দে বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশ 'শব্দরত্নাবলী' ও 'সার সুন্দরী' এই উভয়ই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 'মূসা খান' আসেন কোথা হইতে?

ইতিহাস অনুসারে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূসা-খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'শব্দরত্নাবলী' রচিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু কোলব্রুকের পুঁথিতেও '১৫৮৮' শকাব্দ-এর সহিত 'মূর্চ্ছা খান'এর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, উইলসনের পুঁথিতেও তাই এবং 'সারসুন্দরী'তে 'মূর্চ্ছা খান' না থাকিলেও ১৫৮৮ শকাব্দটা ঠিকই আছে। এই তারিখ ও মূর্চ্ছা খানের সহিত ইতিহাসের মূসা খাঁ'র কি করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে কি এই সকল বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পুঁথির তারিখটা প্রক্ষিপ্ত? ভরসা করি, কোনও পণ্ডিত এ রহস্য ভেদ করিয়া দিবেন। ইতিহাসে পাই, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, মূসা-খাঁর পৌত্র ও মশূম-খাঁর পুত্র জমিদার মুনব্বর-খাঁ চট্টগ্রাম অবরোধকারী সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ১,০০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করা হইয়াছিল (১৩)। কিন্তু ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মশূম-খাঁ জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ তারিখে সায়েস্তা-খাঁ কর্ত্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত একখানা সনদ ঐ বংশের উত্তরাধিকারিদের নিকট রক্ষিত আছে (১৪)।

১৩১০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার (দশম ভাগ) তৃতীয়-চতুর্থ (অতিরিক্ত) সংখ্যায় মুবারিজ খাঁর পুত্র কবি মহম্মদ খাঁ রচিত 'মুক্তাল-হোছন'-এর একখানি পুঁথির বিবরণ (পৃঃ ১৫৭-১৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা গেল, ইশা খাঁ ও মূসা খাঁর উল্লেখ আছে। পুঁথিখানি জীর্ণ, কাজেই মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধার হইতে পারে নাই এবং গ্রন্থের ভাষাও সুখবোধ্য নয়। ইশা খাঁ সম্বন্ধে এইটুকুই পাইতেছি,

"বার বাঙ্গালার পতি ইচ্ছা খান বির
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধির॥" (পৃঃ ১৫৯)

ইহার খানিকটা পরে পাইতেছি,

"কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিন খান রূপে অনুপাম॥
তান পুত্র গুণবান * * *
জার কৃতি গৌর (ড়) দেশ ভরি॥
* * * * *
গাভুর খনি গুণনিধি থিরপির রসদধি
তাহানে প্রণমি বহুতর॥
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ
নিলাএ পাঠানগণ জিনি॥
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহুবলে লভি জয়
বাপ হস্তে কৈল রাজধানী॥
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র কথা অনুক্ষণ
রঙ্গ ঢঙ্গ কওক অপার॥
হাম খান মুছানন্দ হাস্য বাণী মকরন্দ
তাহানে প্রণমি বারে বার॥ (পৃঃ ১৬০)।

যাহা পাইতেছি তাহাতে মনে হইতেছে, কবি মহম্মদ খাঁর মতে মুছানন্দ খান বা মূসা খাঁ 'মিন খান'-এর পুত্র। এই 'মিন খান'কে মশূম খাঁ ধরিয়া লইলে 'শব্দরত্নাবলী'র বিবরণের এইভাবে একটা মীমাংসা করা যায় যে, ঐ বংশে দুইজন 'মূর্চ্ছা খান' ছিলেন। কিন্তু ঐ বংশের উল্লিখিত সনদ ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে মশূম খাঁকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কাজেই তৎপূর্ব্বে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশের পক্ষে মূর্চ্ছা খানকে 'মহীপতিঃ' 'দীপ্তেদ্ধাদশভূমিপেশ্চিরতরং তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। তা ছাড়া, দ্বিতীয় মূসা খাঁর কথা ইতিহাসে কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

অতএব মিন খাঁর পুত্র মুছানন্দ, কবি মহম্মদ খাঁর এই উক্তি অসত্য। কিন্তু দ্রষ্টব্য—মুছানন্দ "লইয়া পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রকথা অনুক্ষণ, রঙ্গ ঢঙ্গ কওক অপার।" এই পণ্ডিত-

(১৩) James Wise, op. cit., p. 211.
(১৪) Ibid.

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী

স্বামী বিবেকানন্দ

[ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ফাল্গুন মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে (১৮৩৬ খৃঃ, ১৭ই ফেব্রুয়ারি) হুগলী জেলার সুদূর পল্লীগ্রাম কামারপুকুরে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়।

অল্পবয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার বড় ভাই তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য কলিকাতায় লইয়া আসেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের লেখাপড়া শিক্ষা কিছুই হইল না। ব্রাহ্মণের ছেলে সামান্য পূজা-অর্চনা মাত্র শিক্ষা করিলেন এবং জানবাজারের রাণী রাসমণির অনুগ্রহে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে পূজকের সহকারী নিযুক্ত হইলেন। তাহার পর তিনি প্রধান পূজকও হন। সেই সময়েই তিনি সাধন-পথে প্রবেশের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। সময় সময় তিনি এমনই তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে মায়ের পুজার্চনার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। সকলে বলিতে লাগিল ঠাকুর পাগল হইয়াছেন। সত্যই তিনি মায়ের দর্শনলাভের জন্য পাগল হইয়াছিলেন এবং সেই পাগলই যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

শতবর্ষ পূর্ব্বে এই ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ায় তিনি অবতীর্ণ হন। আজ সমগ্র সভ্যদেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন। আমরাও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে প্রণাম করিতেছি।

তাঁহার জীবন-কথা, তাঁহার সাধনার কথা বলিতে গেলে যে সাধনার প্রয়োজন, যে শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন, তাহা আমাদের নাই। আমরা কতকগুলি শুষ্ক কথার দ্বারা কোন রকমে একটা মালা গাঁথিতে পারি। কিন্তু এই পবিত্র দিনে—সে মালা শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের চরণে অর্পণ করা কিছুতেই শোভন হইবে না। তাই—যিনি তাঁহার কথা বলিবার প্রকৃত অধিকারী, যিনি তাঁহার প্রধান শিষ্য ছিলেন, যিনি জগৎময় তাঁহারই মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন —সেই যুগমানব সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ—স্বামী বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই আমরা এই শতাব্দী-জয়ন্তীতে পরমহংসদেবের প্রতি আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিলাম।]

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের অনুসন্ধান করিতাম। আমি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাবসানে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতাম—"এই যে সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তরে বলিতেন—"এ সকল আমার মত ও বিশ্বাস।" অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। আমার এখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকৃত একটি শ্লোক মনে পড়িতেছে—

বাগ্‌বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি ও শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্যভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না।

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন; আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় কথা কহিতেছিলেন; আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্ম্মাচার্য্য কিরূপে হইতে পারে? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সারা জীবন ধরিয়া অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"হাঁ"। "মহাশয়, আপনি কি

তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?" "হাঁ"। "কি প্রমাণ?" "আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতেছি।" আমি একেবারে মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি—ধর্ম্ম সত্য, উহা অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। এ একটা তামাসার কথা নয় অথবা ইহা মানুষের করা একটা গড়াপেটা জিনিষ নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট আসিতে লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি—ধর্ম্ম যে দেওয়া যাইতে পারে তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে, একটা সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বার বার হইতে দেখিয়াছি। আমি বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম; তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। আমি এখন দেখিলাম, ইহা সত্য; যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্ম দান সম্ভব, আর মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন—"জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া নেওয়া যায়, ধর্ম্ম তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া নেওয়া যাইতে পারে।" অতএব আগে ধার্ম্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জ্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহা দাও গিয়া। ধর্ম্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে, অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম—আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। উহা লইয়া সমাজ গঠন কিরূপে হইবে? কোন ধর্ম্ম কি কখন কোন সমিতি বা সংঘ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ সমাজ করিলে ধর্ম্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয়—আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম্মের লোপ। এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম্মের প্রাচীন জন্মভূমি। উহাদের মধ্যে এমন একটি ধর্ম্মের নাম কর, যাহা প্রণালীবদ্ধ সংঘের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটিরও তুমি নাম করিতে পারিবে না। ইউরোপই এই উপায়ে ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল—আর সেই জন্যই উহা এশিয়ার মত কখনই সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা ছুটাইতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্ম্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্ম্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ্চ নির্ম্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে বা বচনে বা বক্তৃতায় বা সংঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের মোট কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলে প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, আমরা যতক্ষণ না নিজেরা সত্যকে জানিতেছি, ততক্ষণ কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, আমরা যতই শুনি না কেন, কেবল একটি জিনিষেই আমাদের সন্তোষ হইতে পারে—তাহা এই—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি—আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষানুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর পার, ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ—দুই কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না। "তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানকে এক সঙ্গে সেবা করিতে পার না।"

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট আমি আর একটি বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব আমাদিগকে সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব—সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয় তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। তুমি যে পথে

যাইতেছ তাহা ঠিক নহে, একথা বলা ভুল। এইটি করিতেই হইবে—এই মূল রহস্যটি শিখিতে হইবে—সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, এইটি বুঝিলে অবশ্যই আমরা পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে বহুত্বে একত্ব বুঝায়, ব্যবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ, কিন্তু এই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে অনন্ত, অপরিণামী, নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—সমষ্টির ক্ষুদ্রাকারে পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—আর ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটি আজকালকার দিনে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের লোক, যেখানে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের অন্ত নাই—সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা সৌভাগ্যবশতঃই হউক, যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়—আমি এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সহিত পরিচিত। এমন কি, মর্ম্মনেরা (Mormons) * পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে। সেই ত ধর্ম্মপ্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশাপেক্ষা সেখানেই ধর্ম্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না; কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার কর, উহা যতই কিম্ভূতকিমাকার ধরণের হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে, আর তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাক্ষাৎ ভগবান্‌রূপে পূজিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ, ইহাতে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে ভারতে আমরা এই এক বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার তাহাদের মধ্যে কতকগুলি আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে উহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি তাহারা সকলেই বলিবে উহারা এক ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব ॥"

"যেমন বিভিন্ন নদীসমূহ বিভিন্ন পর্ব্বতসমূহে উৎপন্ন হইয়া ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদয়ই সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।" ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্য্যে স্বীকার করিতে হইবে—তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া অপর ধর্ম্মে কিছু সত্য আছে বলেন, সেরূপ ভাবে নহে—'হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে।' (আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু "আমাদের ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে")। একজন বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন না উহা সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম; আবার অপর একজন তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়াও সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মুক্তি দিবার শক্তি সমান আছে। মন্দিরে বা চার্চ্চে উহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন—আর তুমি, আমি বা অপর কতকগুলি লোক একজন অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মার রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যও দায়ী নহে, সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই সকলের জন্য দায়ী।

---

* ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ইঁহারা বাইবেলের মধ্যে একটি নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইঁহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ এক পত্নী সত্ত্বেও বহুবিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী।

আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে আপনাদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটি ক্ষুদ্র লোকসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন, আর তাঁহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষকস্বরূপ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার, তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার, তবে মানুষ যেখানে অবস্থিত আছে তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য, যিনি অনায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে। তদীয় মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি তিনি কাহারও সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মনও কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহাপবিত্রতা, মহাত্যাগই ধর্ম্মলাভের এক মাত্র গুহ্য উপায়। বেদ বলেন—

"ন ধনেন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"

"—ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়।" যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন—"তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।"

সব বড় বড় আচার্য্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না, সকল ধর্ম্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে, আর যতই ত্যাগের ভাব কমিয়া যায় ইন্দ্রিয়ের বিষয় ততই ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে, আর ধর্ম্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই ব্যক্তি ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয়, আর মদীয় আচার্য্যদেব এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না; তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্য্যন্ত এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, এমন কি, নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহটা যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল যাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদানে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এই সব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণ জয়ের তিনি এক জীবন্ত উদাহরণ। এই দুই ভাব তাঁহার ভিতর কিছুমাত্র ছিল না—আর এই শতাব্দীর জন্য এইরূপ লোকসকলের অতিশয় প্রয়োজন। এখনকার কালে লোকে যাহাকে আপনাদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, তাহা ব্যতীত এক মাসও বাঁচিতে পারিবে না মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্তরূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—আজকালকার দিনে এই ত্যাগের প্রয়োজন। এইরূপ কালে এমন একজন লোকের প্রয়োজন—যিনি জগতের অবিশ্বাসীদের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন লোক আছে যে সংসারের সমুদয় ধনরত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহে। বাস্তবিকই এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও শেষাংশ উহার বিতরণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপদেশ শুনিতে আসিত—আর তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০

ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন। আর এরূপ ঘটনা যে দুই একদিনের জন্য ঘটিত তাহা নহে; মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে তাঁহার গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও কথা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম, তাঁহার কষ্ট যাহাতে না হয় এই কারণে লোক-জনের সঙ্গে তিনি যাহাতে দেখা না করেন তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত—"এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?"—তিনি হাসিয়া এই মাত্র উত্তর দিতেন—"কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে ত ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, তাহার জন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।" একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল—"মহাশয়, আপনি ত একজন মস্ত যোগী—আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।" প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না। অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন—"তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দেখিতেছি অপর সংসারী লোকদের মত কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদ-পদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব?"

এইরূপে তিনি লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, ইঁহার শীঘ্র দেহ যাইবে—তাই পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে কিরূপে লোক আসিয়া তাঁহাদের চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশায়ই তাঁহাদিগকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। অপরের ভিতর এইরূপ আধ্যাত্মিকতার আদর হইতেই লোকের ভিতর আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে, তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও, যত বড় বক্তৃতাই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না; কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বচনে হইবে না, নিজে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে। যখন লোকে শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাঁহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল—আর মদীয় আচার্য্যদেব নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর দূর হইতে আসিত, আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন—"যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব"—আর তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে—সেই দিন দেহত্যাগ করিবেন—ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'ওঁ' উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। পরদিন আমরা তাঁহার দেহ দগ্ধ করিলাম। (মদীয় আচার্য্যদেব)



‘শব্দরত্নাবলী’ ও মূসা খাঁ

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম-এ

পরলোকগত হরেস্ হেম্যান্ উইলসন্ সাহেব তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন-কালে যে সকল সংস্কৃত অভিধানের সাহায্য লইয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাঙ্গালী মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের ‘শব্দরত্নাবলী’ অন্যতম (১)। পরলোকগত হেন্‌রী টমাস্ কোলব্রুক্ সাহেবও তাঁহার ‘অমরকোষ’-এর সংস্করণ সঙ্কলনকালে এই ‘শব্দরত্নাবলী’র সাহায্য লইয়াছিলেন (২)। এই অভিধান সম্বন্ধে উইলসন্ সাহেবের অভিমত এই যে, পর্য্যায়শব্দগুলির মধ্যে নানা বিভিন্ন পাঠ প্রবেশনের জন্যই ইহা প্রধানতঃ প্রয়োজনীয়, নচেৎ ইহাতে নূতনত্ব কমই আছে। কোলব্রুক্ বলেন, ইহা অমরকোষের অনুক্রমে লিখিত, সেই হেতু ইহাকে অমরকোষের টীকা-রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু পরে পণ্ডিত আনন্দরাম বড়ুয়া মহাশয় এখানি সম্বন্ধে এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আধুনিক যতগুলি শব্দ-কোষ তিনি দেখিয়াছেন, তাহার মধ্যে এইখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট (৩)।

আধুনিক কোষগ্রন্থের মধ্যে ‘শব্দরত্নাবলী’ই শ্রেষ্ঠ কি না জানি না, কিন্তু ইহা যে একখানি উৎকৃষ্ট অভিধান তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অমরকোষের তুলনায় ইহাতে অনেক বেশী শব্দ সন্নিবিষ্ট আছে। যথা, অমর স্বর্গবর্গে বুদ্ধের যতগুলি সংজ্ঞা বা সমার্থ দিয়াছেন, মথুরেশ তদ্ব্যতীত আরও ২৭টি বেশী সংজ্ঞা দিয়াছেন; তন্মধ্যে ‘ধর্ম্মচক্র, গুণাকর, অসম, খসম, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বজ্রী, বাগীশ, মহাসুখ, শ্বেতকেতু, ধর্ম্মকেতু, পঞ্চজ্ঞান, মহাবোধি, ত্রিমূর্ত্তি ও শক’ এইগুলি উল্লেখযোগ্য। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবের ‘ত্রিকাণ্ডশেষে’র অনেকগুলি সংজ্ঞা ‘শব্দরত্নাবলী’তে নাই, যথা ‘মহাশ্রমণ, কুলিশসন, গোপেশ’ ইত্যাদি। অমরকোষ অপেক্ষা ‘শব্দরত্নাবলী’তে বিষ্ণুর ৬৪টি বেশী প্রতিশব্দ আছে, তন্মধ্যে ‘ইরেশ, জিতামিত্র, উর্দ্ধদেব, হরিগৃধ্র’ প্রভৃতি কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। দুর্গার আছে প্রায় ৪৭টি বেশী, তন্মধ্যেও কতকগুলি পুরাণ বা তন্ত্র (আগম) শাস্ত্রে সচরাচর দেখা যায় না। এইরূপ সমগ্র গ্রন্থেই কিছু কিছু বেশী শব্দ আছে।

স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, নদীয়া রাজবংশের রাজা রাঘব রায়ের সভায় যে স্মার্ত্ত-পণ্ডিত রঘুনাথ সার্ব্বভৌম ছিলেন, তাঁহার পিতা মথুরেশ তর্কপঞ্চানন ও মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার একই ব্যক্তি নহেন। ঐ মথুরেশের নিবাস ছিল রাণাঘাটের অন্তর্গত উলায় (৪)। মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার ‘শব্দরত্নাবলী’ ব্যতীত ‘সারসুন্দরী’ নামে অমরকোষের একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায় ইনি নপাধীয় বন্দ্যঘটীয় কুলোদ্ভব। ইহার প্রারম্ভ ও পুষ্পিকা হইতে আরও জানা যায় যে, ইনি শিবরাম চক্রবর্ত্তীর পুত্র ছিলেন এবং ইঁহার মাতার নাম ছিল পার্ব্বতী (৫)।

‘শব্দরত্নাবলী’ ও ‘সারসুন্দরী’ ব্যতীত মথুরেশ প্রণীত আর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়—‘নানার্থশব্দ’। ইহার প্রারম্ভ এইরূপ :—

> “নত্বা জ্যোতিঃ পরং ব্রহ্ম মূর্চ্ছা খাঁন নৃপাজ্ঞয়া
> নানার্থশব্দ লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ।” (৬)

কিন্তু এই ‘নানার্থ শব্দ’ স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, ইহা ‘শব্দরত্নাবলী’রই অন্তর্গত নানার্থ-বর্গ। অথচ একই গ্রন্থের অন্তর্গত মাত্র একটি অধ্যায়ের প্রারম্ভে এইরূপ গৌরচন্দ্রিকা কেন, ইহা বোঝা দুষ্কর।

‘শব্দরত্নাবলী’র পুঁথি সুলভ নয়। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্র

(১) Works of H. H. Wilson, Vol. V., London, 1865, p. 233.

(২) Miscellaneous Essays, Cowell's ed., Vol. II, London, 1873, pp. 51-52.

(৩) A Comprehensive Grammar of the Sanskrit Language, Analytical, Historical and Lexicographical, Vol. III, Part I, Calcutta and London, 1884, Introduction, p. 36.

(৪) Descriptive Catalogue of Sanskrit MSS., under the care of the Asiatic Society of Bengal, by MM. H. P. Sâstrî, Vol. III, (Smriti) Cal., 1925, Intro, pp. XXX.

(৫) R. L. Mitra's Notices of Sanskrit MSS., Vol. VII., pp. 221 and 222.

(৬) Ibid, Vol. I. No. 354.

লাল মিত্র মহাশয় উহার যে পুঁথিখানির বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার আরম্ভ এইরূপ :—

"বন্দে সদানন্দময়ং সমস্তাজ্‌জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম ভবাদিসেব্যম্
ধ্যানেকগম্যং জগদেকরম্যং যদিচ্ছয়া কারণকার্য্যভাবঃ।
আসীৎ ক্ষ্মাতলমণ্ডলে নৃপকুলৈঃ সংসেবিত শ্রীযুতৈ-
র্ভূপালঃ শিতমানখান ইতি যঃ কীর্ত্তিপ্রতাপোজ্জ্বলঃ।
যদ্দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপচণ্ডদহনৈঃ কল্লান্তসূর্য্যপ্রভৈঃ
প্রত্যর্থিক্ষিতিপালকা রণভুবি ক্ষোভাকুলাঃ শেরতে।
তস্যৈব জগদেকবীরতনুজঃ খ্যাতো জগন্মণ্ডলে
মূর্চ্ছা খাঁন মহীপতিঃ স্থিরমতির্বঙ্গৈকরঙ্গোৎসবঃ।
দীপ্তৈর্দ্বাদশ ভূমিপৈশ্চিরতরং তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ
শ্রীধাতৃ প্রতিদেশপালনবিধৌ সংসেব্যমানোঽভবৎ।

* * * * * * * * * * *

ধীর শ্রীমথুরেশ এষ তনুতে শ্রীশব্দরত্নাবলীং
সন্তঃ সন্ত বিনোদিনো নৃপসমং সন্তোষযন্তোঽনয়া।" (৭)

'সারসুন্দরী'তে মূর্চ্ছা খাঁর নাম নাই। মথুরেশের পৃষ্ঠপোষক 'বঙ্গে'র নৃপ, 'দ্বাদশ-ভূমিপে'র (বার ভুঁইয়ার) তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভায় দীপ্ত এই মূর্চ্ছা খাঁন যে পূর্ব্ববঙ্গের 'বাইশ পরগণা'র অধীশ্বর মসনদ্‌-ই-আলি ইশা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেওয়ান মুসা খাঁ—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আবুল ফজলের 'আইন্‌-ই-আকবরি' ও 'আকবর-নামা', ইনায়েৎ-উল্লার 'তক্‌মিল্‌ল-ই-আকবর-নামা' (Elliot's History of India, vol. VI.), ইংরেজ র‍্যাল্‌ফ্‌ ফিচের ভ্রমণ বৃত্তান্ত (Horton Ryley, 1899), ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত 'রাজমালা', ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জ সব্‌ডিভিসনের জঙ্গলবাড়ীতে ইশা খাঁর বংশধরদিগের নিকট প্রাপ্ত বিবরণ, জনপ্রবাদ, পূর্ব্ববঙ্গ প্রচলিত গ্রাম্য-গীতি প্রভৃতি হইতে লব্ধ বিবরণ দ্বারা গঠিত বীরবাহু ইশার কাহিনী নানা সাময়িক-পত্রে ও গ্রন্থে আলোচিত ও উদ্ধৃত হইয়াছে। অধুনা ইহা অতি-পরিজ্ঞাত কথা যে, ইশার পিতা কালিদাস গজদানী (যদিও 'আকবর-নামা'য় ইশার পিতার নামোল্লেখ নাই) মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সুলেমান খাঁ যে 'শব্দরত্নাবলী' বর্ণিত 'সিতমান খান' ইহা স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে, কিন্তু 'শব্দরত্নাবলী' অনুসারে সিতমান খান ইশা খাঁর পিতা নহেন, মূর্চ্ছা খানের পিতা। ভুলটা অবশ্যই মথুরেশের এবং কোনও রাজার বা রাজস্থানীয় ব্যক্তির সভাপণ্ডিতের পক্ষে তাঁহার প্রভুর পিতার নাম সম্বন্ধে এরূপ ভুল বা অজ্ঞতা আশ্চর্য্যের কথা।

১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে ইশা খাঁর প্রকৃত অভ্যুদয় এবং ১৫৯৮ অথবা ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে (ইনায়েতুল্লার মতে ১০০৭ হিজরী ও 'আকবর-নামা'র মতে ১০০৮ হিজরী) তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র, দেওয়ান মুসা খাঁ ও দেওয়ান মহম্মদ খাঁ এবং এই দুইয়েরই সম্বন্ধে ইতিহাস নীরব। কিন্তু মুসার পুত্র মশুম খাঁর জীবনের ১৬৩২ হইতে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অনেকগুলি প্রসিদ্ধ ঘটনা মুসলমানী ইতিহাসে পাওয়া যায় (৮)। আর পাদ্‌রী জন্‌ ক্যাব্রাল্‌ (Fr. John Cabral S. J.) কর্ত্তৃক ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত একখানি চিঠি হইতে জানা যায় যে—"Minimican, Son of Massacan, who had been Emperor of Bengal before the Moors conquered it." অর্থাৎ এই চিঠি লিখিত হইবার পূর্ব্বেই Massacan-এর প্রভুত্ব লোপ পাইয়াছিল। স্বর্গীয় রায় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী বাহাদুর প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই Massacan মুসা খাঁ (৯)।

কিন্তু কোলব্রুক্‌ 'শব্দরত্নাবলী'র যে পুঁথি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার তারিখ ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দ (১০)।

উইলসনের পুঁথিতেও ঐ একই তারিখ ছিল এবং তিনি স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে 'শব্দরত্নাবলী' ১৫৮৮ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল (১১)।

রাজা রাজেন্দ্রলাল 'শব্দরত্নাবলী'র যে পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন উহা খণ্ডিত, উহার শেষাংশ নাই। বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে মথুরেশের একখানি 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথিতে পুষ্পিকায় এইরূপ লিখিত আছে (১২),

"শাকাব্দে রস দোষ বাধব (সৈন্ধব) ধরামানে ধরা নির্জ্জর
কোঽপ্যেতামলিখচ্‌ চ কোবিদং (ক্র) তাং শ্রীশব্দরত্নাবলীম্‌।"

---

(৭) Ibid, Vol. III, No. 1105, p. 65.

(৮) J. A. S. B., Vol. XLIII, 1874, James Wise, p. 210.

(৯) Ibid, 1913, p. 445.

(১০) Colebrooke, op. cit., p. 52 footnote.

(১১) Wilson, op. cit., p. 233.

(১২) Eggeling's Catalogue, No. 1512.

কিন্তু ইহা হইতে তারিখটা জানা যায় না, কারণ ইহার কোনও মানেই হয় না।

কিন্তু রাজা রাজেন্দ্রলাল 'সারসুন্দরী'র যে পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে দুইটি তারিখ দেওয়া আছে, একটি গ্রন্থ-রচনার, অপরটি পুঁথি-নকলের। নকলের তারিখটি—'পক্ষাভ্রয়সচন্দ্রাব্দ' অর্থাৎ ১৬০২ শক বা ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ। রচনার তারিখ, 'গজাষ্টতিথিযুক্‌শাকে' অর্থাৎ ১৫৮৮ শকাব্দে বা ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশ 'শব্দরত্নাবলী' ও 'সার সুন্দরী' এই উভয়ই লিখিয়াছিলেন। কিন্তু ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে 'মুসা খান' আসেন কোথা হইতে?

ইতিহাস অনুসারে ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসা-খাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় 'শব্দরত্নাবলী' রচিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু কোলব্রুকের পুঁথিতেও '১৫৮৮' শকাব্দ-এর সহিত 'মূর্চ্ছা খান'এর নামোল্লেখ পাওয়া যায়, উইলসনের পুঁথিতেও তাই এবং 'সারসুন্দরী'তে 'মূর্চ্ছা খান' না থাকিলেও ১৫৮৮ শকাব্দটা ঠিকই আছে। এই তারিখ ও মূর্চ্ছা খানের সহিত ইতিহাসের মুসা খাঁ'র কি করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায়, তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তবে কি এই সকল বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন পুঁথির তারিখটা প্রক্ষিপ্ত? ভরসা করি, কোনও পণ্ডিত এ রহস্য ভেদ করিয়া দিবেন। ইতিহাসে পাই, ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে, মুসা-খাঁর পৌত্র ও মশুম-খাঁর পুত্র জমিদার মুনব্বর-খাঁ চট্টগ্রাম অবরোধকারী সৈন্যদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ১,০০০ পদাতিক ও ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করা হইয়াছিল (১৩)। কিন্তু ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মশুম-খাঁ জীবিত ছিলেন, কারণ ঐ তারিখে সায়েস্তা-খাঁ কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত একখানা সনদ ঐ বংশের উত্তরাধিকারিদের নিকট রক্ষিত আছে (১৪)।

১৩১০ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার (দশম ভাগ) তৃতীয়-চতুর্থ (অতিরিক্ত) সংখ্যায় মুবারিজ খাঁর পুত্র কবি মহম্মদ খাঁ রচিত 'মুক্তাল-হোছন'-এর একখানি পুঁথির বিবরণ (পৃঃ ১৫৭-১৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা গেল, ইশা খাঁ ও মুসা খাঁর উল্লেখ আছে। পুঁথিখানি জীর্ণ, কাজেই মাঝে মাঝে পাঠোদ্ধার হইতে পারে নাই এবং গ্রন্থের ভাষাও সুখবোধ্য নয়। ইশা খাঁ সম্বন্ধে এইটুকুই পাইতেছি,

"বার বাঙ্গালার পতি ইচ্ছা খান বির
দক্ষিণ কুলের রাজা আদম সুধির॥" (পৃঃ ১৫৯)

ইহার খানিকটা পরে পাইতেছি,

"কামিনী মোহন বর অভিনব পঞ্চশর
মিন খান রূপে অনুপাম॥
তান পুত্র গুণবান * * *
জার কৃতি গৌর (ড়) দেশ ভরি॥
* * * * *
গাভুর খনি গুণনিধি থিরপির রসদধি
তাহানে প্রণমি বহুতর॥
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ
নিলাএ পাঠানগণ জিনি॥
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহুবলে লভি জয়
বাপ হস্তে কৈল রাজধানী॥
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্র কথা অনুক্ষণ
রঙ্গ ঢঙ্গ কওক অপার॥
হাম খান মুছানন্দ হাস্য বাণী মকরন্দ
তাহানে প্রণমি বারে বার॥ (পৃঃ ১৬০)।

যাহা পাইতেছি তাহাতে মনে হইতেছে, কবি মহম্মদ খাঁর মতে মুছানন্দ খান বা মুসা খাঁ 'মিন খান'-এর পুত্র। এই 'মিন খান'কে মশুম খাঁ ধরিয়া লইলে 'শব্দরত্নাবলী'র বিবরণের এইভাবে একটা মীমাংসা করা যায় যে, ঐ বংশে দুইজন 'মূর্চ্ছা খান' ছিলেন। কিন্তু ঐ বংশের উল্লিখিত সনদ ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে মশুম খাঁকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কাজেই তৎপূর্ব্বে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে মথুরেশের পক্ষে মূর্চ্ছা খানকে 'মহীপতিঃ' 'দীপ্যদ্দর্পদশভুমিপৈশ্চিরতরং তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না। তা ছাড়া, দ্বিতীয় মুসা খাঁর কথা ইতিহাসে কুত্রাপি পাওয়া যায় না।

অতএব মিন খাঁর পুত্র মুছানন্দ, কবি মহম্মদ খাঁর এই উক্তি অসত্য। কিন্তু দ্রষ্টব্য—মুছানন্দ "লইয়া পণ্ডিতগণ, শাস্ত্রকথা অনুক্ষণ, রঙ্গ ঢঙ্গ কওক অপার।" এই পণ্ডিত-

(১৩) James Wise, op. cit., p. 211.
(১৪) Ibid.

গণের অন্যতম বিদ্যালঙ্কার মথুরেশ 'শব্দরত্নাবলী' অভিধান ও 'সারসুন্দরী' টীকা লিখিয়াছিলেন।

'শব্দরত্নাবলী' যে মথুরেশের লিখিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সকল পুথিতেই একথা লেখা আছে; ইণ্ডিয়া আফিসের পুঁথিতেও আছে—"ধীর শ্রীমথুরেশ এষ তন্মুনে (তে) শ্রীশব্দরত্নাবলীম্।" কিন্তু আমার পুঁথিখানা অদ্ভুত। পুঁথিখানা লেখা হইয়াছিল—"শাকে যুগ্মনভোহঙ্গ-চন্দ্রগণিতেন" অর্থাৎ ১৬০২ শকাব্দে বা ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে। উপরে যে 'সারসুন্দরী'র পুঁথির কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেখানাও এই একই ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। আমার পুঁথির প্রথম পত্র খানি নাই, কাজেই উহাতে কি ছিল জানা গেল না। কিন্তু পুঁথির শেষ পত্রে (২১৫ক) সর্ব্বশেষ পুষ্পিকায় লেখা আছে—"ইতি শ্রীমহারাজ শ্রীযুত মুছাখান মশনন্দ এল্বি বিরচিতায়াং শব্দরত্না (ব) ল্যাং স্ত্রীলিঙ্গ সংগ্রহবর্গপ্রকাশঃ"। স্বর্গবর্গের শেষেও আছে (পৃঃ ২৪ক)—"ইতি মহারাজ শ্রীযুত মুশাখান মশনন্দ এল্লি বিরচিতায়াং স্বর্গবর্গ প্রকাশঃ"। এইরূপ আগাগোড়া সকল বর্গেরই শেষে, কেবল কোথাও 'মুশা খান' 'কোথাও বা 'মুছা খান', আর (মসনদ-ই-) 'আলি'র স্থলে কোথাও 'এল্বি', কোথাও বা 'এল্লি'। অনুগৃহীত কবির রচনা সময়ে সময়ে কেমন করিয়া পৃষ্টপোষক প্রভুর নামে চলিয়া যায়, ইহা তাহার আর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বাণের লেখা কাব্য হর্ষের নামে চলে—শ্রীনিবাস ভট্টের লেখা 'দানসাগর' বল্লালসেনের নামে চলে—ইত্যাদি। তেমনই মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারের অভিধান মুশা খাঁর নামে চলিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা এই পুঁথির সাহায্যে ধরা পড়িয়াছে। অনুমান হয়, মুশা বা মুসা খাঁ সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, নতুবা এরূপ চেষ্টা চলিতে পারিত না। কিন্তু এত করিয়াও লিপিকর পুঁথিতে 'নানার্থশব্দ' হইতে মথুরেশের নামটা বাদ দিতে পারেন নাই, সেটা ঠিকই আছে—"নত্বা জ্যোতিঃ পরংব্রহ্ম মুছা খান নৃপাজ্ঞয়া। নানার্থশব্দ লিখ্যন্তে মথুরেশেন যত্নতঃ॥" (পৃঃ ১১৫ক)

মুসা খাঁর পিতা ইশা খাঁ সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ময়মনসিংহ জেলার ব্রহ্মপুত্র ও বানারের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এগার-সিন্দুর দুর্গ বানারের অপর পার হইতে আক্রমণ করিলে ইশা খাঁ মানসিংহকে একটু বিব্রত করিয়া তুলিলেন এবং অবশেষে শক্তি পরীক্ষার জন্য মানসিংহকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। মানসিংহ নিজে না গিয়া তাঁহার জামাতাকে প্রেরণ করিলেন এবং জামাতা যুদ্ধে হত হইলেন। মানসিংহের এতাদৃশ কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহারে ইশা খাঁ বিরক্ত হইয়া মানসিংহকে তিরস্কার করিয়া নিজের দুর্গে চলিয়া যান। এবারে মানসিংহ নিজে যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। প্রথম যুদ্ধেই ইশা মানসিংহের তরবারি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন (অথবা মানসিংহের হস্ত হইতে তরবারি পড়িয়া গেল)। মহাবীর ইশা তখন মানসিংহকে হত্যা না করিয়া তাঁহাকে নিজের তরবারিখানি দিতে চাহিলেন। ইশার এই উদার ব্যবহারে স্তম্ভিত মানসিংহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার বন্ধুত্ব ভিক্ষা চাহিলেন। উভয়ের মধ্যে তখন বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। অনন্তর ইশা মানসিংহের সহিত আগ্রায় (অথবা দিল্লীতে) গেলেন। সেখানে আকবর তাঁহাকে বন্দী করিলেন, কিন্তু এগারসিন্দুর যুদ্ধে ইশার মহত্বের কথা শুনিয়া তাঁহাকে মুক্ত ত করিয়া দিলেনই, উপরন্তু 'দেওয়ান মসনদ-ই-আলি' উপাধি-খেলাৎ ও তৎসহ বহু পরগণার জমিদারী উপঢৌকন দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিলেন (১৫)।

আমার 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথির দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মুসা খাঁরও 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি ছিল এবং বাঙ্গালার 'বার-ভুঁইয়ার' ইতিহাসে ইহা একটি গুরুতর তথ্য। ইশা খাঁর 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি আকবর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়া থাকিলে মুসা খাঁর উপাধিও মোগল দরবার কর্ত্তৃকই প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা 'Bengal: Past and Present' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় 'Bengal Chief's Struggle' নামক সুচিন্তিত প্রবন্ধে (১৬) প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, আগ্রায় গিয়া ইশা খাঁর 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি প্রাপ্তির কথা

(১৫) সাহিত্য, ১৩১১, শ্রাবণ, পৃঃ ২৩০-২৩১; ঐতিহাসিক চিত্র, ১৩১৭, অগ্রহায়ণ, পৃঃ ৩৪২-৩৪৯; ইত্যাদি।

(১৬) ১৩৩৬ আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' (পৃঃ ৫৯৯-৬০২) এই প্রবন্ধের একটি বাঙ্গালা অনুবাদ-জাতীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

মিথ্যা (পৃঃ ২২-২৩)। 'আকবর-নামা'য় যখন স্পষ্ট লিখিত আছে যে ঈশা কখনও মোগল-দরবারে যান নাই, তখন আকবর কর্ত্তৃক তাঁহাকে ঐ উপাধি দানের কথা অবশ্যই অলীক। কিন্তু ঢাকা মিউজিয়ামের কামানের খোদিত-লিপির প্রমাণে, ঈশার 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি অবশ্য স্বীকার্য্য। ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'য় আছে যে ঐ উপাধি ত্রিপুরাধিপতি অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক ঈশাকে প্রদত্ত হইয়াছিল (ঐ, পৃঃ ৪৩ এবং পাদটীকা ১৩)। ইহার আর এক বিকল্প এই যে, ঈশা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উক্ত উপাধি নিজে নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ উহা কাহারও দান নয়। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের 'Dacca Review' পত্রিকায় (পৃঃ ২২২) খাঁ বাহাদুর আওলাদ হাসান সাহেব এই অনুমান করিয়াছিলেন (ঐ পাদটীকা ১২)। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের মতে 'রাজমালা'-র উক্তিই ঠিক, তিনি বলেন ঈশা খাঁর 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, যখন 'রাজমালা'-য় স্পষ্টই কথিত হইয়াছে যে ঐ উপাধি অমরমাণিক্য কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তখন এই উক্তি অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু দেখি না। একথা কেহই যথার্থভাবে অস্বীকার করিতে পারেন না যে, অমরমাণিক্যের ন্যায় একজন প্রতাপশালী ও স্বাধীন রাজার তাঁহার আশ্রিত একজন আফগানকে (কারণ আফগান জাতীয় অন্য কোনও কোনও জমীদার ঐ সময়টায় এই জাতীয় উপাধি ধারণ করিতেন) এইরূপ উপাধি প্রদানের অধিকার বা ক্ষমতা ছিল না।" (ঐ, পৃঃ ৪৩ ; ভারতবর্ষ, ১৩৩৬, আশ্বিন, পৃঃ ৬০২)।

কিন্তু 'রাজমালা'-য় যে গল্পই থাকুক, ঈশা খাঁ অমরমাণিক্যের অধীনস্থ ভূস্বামী ছিলেন, একথা ভট্টশালী মহাশয় ('রাজমালা'র উক্তি বাদে) প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই। মোগল-সৈন্যের আক্রমণে ঈশার সরাইল হইতে পলাইয়া অমরমাণিক্যের নিকট গিয়া 'যোড়হস্তে' তাঁহাকে রক্ষা করিবার অনুরোধ, অমরমাণিক্যের রাণীর "স্তনধৌত জল ইছা খাঁ খাইল" ইত্যাদি কতকগুলি নূতন কথা 'রাজমালা'য় আছে বটে, কিন্তু নূতন কথা মাত্রই সত্য না-ও হইতে পারে। পক্ষান্তরে 'আকবর-নামা'য় স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে—"Out of foresight and cautiousness, he (Isa) refrained from waiting upon the rulers of Bengal." (Akbar-nama, III, p. 647.) অর্থাৎ ঈশা তাঁহার দূরদৃষ্টি ও সতর্কতার প্রভাবে বাঙ্গালার নৃপতিদিগের নিকট অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে বিরত ছিলেন। ইলিয়ট্ সাহেবের তর্জ্জমায় পাই—"he took care not to see them" অর্থাৎ বাঙ্গালার নৃপতিদের সন্নিধানে গিয়া দেখা না করিতে ঈশা সাবধান ছিলেন (Elliot and Dowson, Vol. VI., p. 73.) বস্তুতঃ ঈশার ইতিহাস আলোচনা করিলে মনে হয় না, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিত্বশালী পুরুষ ভারত-সম্রাট ব্যতীত অপর কোনও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রাজার প্রদত্ত উপাধি সগৌরবে (এবং বংশানুক্রমে) বহন বা ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশার মোগল-দরবারে যাওয়ার প্রবাদটা যখন ভিত্তিহীন, তখন এই একমাত্র অনুমানই বা সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে, ঈশা স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া (নামে বা কাজে) নিজেই 'মসনদ-ই-আলি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, 'শব্দরত্নাবলী'র পুঁথিতে মুসা খাঁরও এই উপাধি ধারণ—এই অনুমান বা সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেব ও জাতিভেদ

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

আশ্বিনের ভারতবর্ষে আমি 'শ্রীচৈতন্য ও জাতিভেদ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম মাঘের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ফাল্গুনের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রথমে বন্ধুবর রমেশ বাবুর প্রবন্ধটি আলোচনা করা যাক।

রমেশবাবু যে সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার নিজের কোনও সন্দেহ নাই যে শ্রীচৈতন্যদেব "জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানিতেন না।" আমাদেরও এ বিষয়ে সকল সন্দেহ মিটিয়া যাইত—যদি রমেশবাবু নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতেন।

(১) শ্রীচৈতন্যদেব যদি জাতিভেদ না মানিতেন তাহা হইলে যখন তাঁহার জ্বর হইয়াছিল, তখন কেন বলিয়াছিলেন—"ব্রাহ্মণের পাদোদক আন, উহা পান করিলে আমার জ্বর ছাড়িয়া যাইবে ?"

(২) চৈতন্যভাগবতে শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন দেব ও দ্বিজে ভক্তিমান বলা হইয়াছে ?

(৩) তিনি কেন শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না, কেবল ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করিতেন ?

(৪) শ্রীসনাতন যখন বলিয়াছিলেন যে জগন্নাথদেবের মন্দিরের 'সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার" তখন শ্রীচৈতন্যদেব কেন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—

মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ।
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

আশ্বিনের ভারতবর্ষে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহাতে এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। কিন্তু রমেশবাবু এ সকল প্রশ্নের কোনও উত্তর দেন নাই। এ জন্য মনে হয় যে এই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিতে তিনি অসমর্থ।

রমেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে প্রথমেই বলিয়াছেন যে শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন—ইহা স্যর গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এবং শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ও বলিয়াছেন। ইঁহাদের নজির দেখাইয়া রমেশবাবু নিজের ভ্রম লঘু বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের অধিকাংশ জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় লেখা হইয়াছে। স্যর রামকৃষ্ণ বাঙ্গালা জানিতেন না। তাঁহার ভ্রম মার্জনীয়। কিন্তু বাঙ্গালী ঐতিহাসিক রমেশবাবু কেন এ ভ্রম করিলেন ?

রমেশবাবু দীনেশবাবুর নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"চৈতন্য-ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—জাতিভেদের অসারতা দেখাইবার জন্য তিনি (চৈতন্য) হীন শূদ্র রামানন্দ রায়কে দিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।" কিন্তু চৈতন্যভাগবতে একথা বলা হয় নাই। অধিকন্তু শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভেই রামানন্দ রায় বলিয়াছেন যে বর্ণাশ্রমের আচার পালন করাই ধর্মজীবনের প্রথম সোপান।

প্রভু কহে পর শ্লোক শাস্ত্রের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্মাচরণে বিষ্ণু ভক্তি হয়॥
তথাহি বিষ্ণুপুরাণে—
বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থাঃ নান্যত্তত্তোষকারণম্॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্যলীলা ৮ম পরিচ্ছেদ সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ, —"বর্ণাশ্রমবিহিত আচারবান্ পুরুষের দ্বারা পরমপুরুষ বিষ্ণু আরাধিত হন—তাঁহার সন্তোষের অপর কোনও কারণ নাই।"

সুতরাং দীনেশবাবু ও রমেশবাবু যে বলিয়াছেন—রামানন্দ রায় দ্বারা শাস্ত্রব্যাখ্যা করাইয়া শ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদের অসারতা দেখাইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ কি ?

জাতিভেদ বা বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম অনুসারে শূদ্রের বেদ পাঠ নিষেধ, অতএব বেদ ব্যাখ্যাও নিষেধ। কিন্তু পুরাণ পাঠ এবং ব্যাখ্যা করিতে সকলের সম্পূর্ণ অধিকার আছে—শূদ্রেরও আছে। রামানন্দ রায়ের নিকট চৈতন্যদেব যদি বেদের ব্যাখ্যা শুনিতেন তাহা হইলে রমেশবাবুও দীনেশবাবু বলিতে পারিতেন যে চৈতন্যদেব বর্ণাশ্রমধর্মের নিয়ম মানেন নাই। কিন্তু রামানন্দ রায় বেদের ব্যাখ্যা করেন নাই, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র-প্রতিপাদিত ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সুতরাং রামানন্দ রায়ের শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া চৈতন্যদেব জাতিভেদের নিয়ম লঙ্ঘন করেন নাই।

নিম্নবর্ণের নিকট ব্রাহ্মণগণ পুরাণাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছেন ইহা হিন্দুধর্মশাস্ত্রে বহুস্থানে উল্লেখ আছে। নৈমিষারণ্যে প্রতিলোমজ সূতের নিকট ব্রাহ্মণগণ ভাগবত শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং সূতবংশোদ্ভব সৌতির নিকট মহাভারত শ্রবণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে ধর্মব্যাধের উপাখ্যানে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্মব্যাধ ব্যাধ হইয়াও ব্রাহ্মণকে ধর্ম বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন যে জাতিভেদ মানিলে নিম্নবর্ণের লোকের নিকট ধর্মোপদেশ শ্রবণ করা যায় না, তাঁহারা জাতিভেদের স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞ, তাঁহারা জাতিভেদের যে নিন্দা করেন তাহা অজ্ঞতাপ্রসূত বলিতে হইবে।

রমেশবাবু অপর যে সকল যুক্তি দিয়াছেন নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হইতেছে। প্রথম যুক্তি শ্রীচৈতন্যদেব গোবিন্দ নামক শূদ্রকে ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে রমেশবাবু যে কিরূপে সিদ্ধান্ত করিলেন—চৈতন্যদেব

জাতিভেদ মানিতেন না—তাহা রমেশবাবুই বলিতে পারেন। জাতিভেদ সংক্রান্ত একথা কোথাও বলা হয় নাই যে ব্রাহ্মণ প্রভু শূদ্র ভৃত্য রাখিবে না? আমি পূর্ব প্রবন্ধে ইহা কোথাও বলি নাই যে চৈতন্যদেব কখনও শূদ্র ভৃত্য রাখেন নাই। রমেশবাবু এই প্রসঙ্গে চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহার অর্থ এই যে ঈশ্বরের কৃপা কেবল উচ্চবর্ণের ব্যক্তির উপর বর্ষিত হয় না, নিম্নবর্ণের ব্যক্তিও ঈশ্বরের কৃপা পাইতে পারে। অতি সত্য কথা এবং ইহা দ্বারা মোটেই প্রতিপন্ন হয় না যে চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন না।

এই প্রসঙ্গে এবং অন্য স্থলেও রমেশবাবু চৈতন্য-চরিতামৃত হইতে এবং শাস্ত্র হইতে কতকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে—নিম্ন জাতির লোক যদি ঈশ্বরভক্ত হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের কৃপালাভ করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারে; পরন্তু ব্রাহ্মণ যদি ঈশ্বর-ভক্ত না হয় তাহা হইলে সে ঈশ্বরের কৃপালাভে সমর্থ হয় না, তাহার জীবন ব্যর্থ হয়। সুতরাং ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জাতি অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। রমেশবাবু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জাতিভেদ অসার, কিন্তু রমেশবাবুর এই সিদ্ধান্ত ভুল। কেহ যদি বলেন রমেশবাবু অপেক্ষা রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ছিলেন, তাহা হইলে কি ঐতিহাসিক হিসাবে রমেশ বাবুর অসারতা প্রতিপাদন করা হয়? কখনই নহে। সেইরূপ কেহ যদি জাতি অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেন—তাহা হইতে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। শ্রীচৈতন্যদেব শূদ্র গোবিন্দকে এবং শূদ্র ভবানন্দ রায়কে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন বলিয়াও ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় না যে—"জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করাই"—চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য ছিল। যদি জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করা চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে তিনি কখনও ব্রাহ্মণের পাদোদক পাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন না এবং অব্রাহ্মণের অন্ন খাইতে আপত্তি করিতেন না। শ্রীচৈতন্যের জীবনীর যে ঘটনাগুলি রমেশ বাবুর মত সমর্থন করিতে পারে, রমেশবাবু কেবল সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। রমেশ বাবুর মতের বিরোধী কয়েকটি ঘটনা আমি পূর্ব প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলাম। রমেশবাবু সেগুলি চাপিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ওকালতী হিসাবে রমেশ বাবুর আচরণ প্রশংসার্হ হইলেও ইহা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের উপযুক্ত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সকল উক্তি এবং আচরণগুলি আলোচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কর্তব্য। এই ভাবে সিদ্ধান্ত করিলে দেখা যায় যে চৈতন্যদেব জাতিভেদ মানিতেন, কিন্তু কোনও কোনও বিষয়ে জাতি অপেক্ষা ভক্তিকে উচ্চ স্থান দিতেন এবং সেজন্য নিম্নজাতির ভক্তকে আলিঙ্গন করিতেন।

দ্বিতীয় যুক্তি—চৈতন্যদেব আহার করিতে বসিয়া রূপ, সনাতন ও হরিদাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন সুতরাং—"নীচজাতীয় লোকের সহিত আহার করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না।"

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে পরম ভক্তদিগকে চৈতন্যদেব অতিশয় পবিত্র বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি আহারের সময় রূপ, সনাতন ও হরিদাসকে আহ্বান করিয়াছিলেন। যাহারা ভক্ত নহে এরূপ শূদ্রকে একত্র আহারের জন্য আহ্বান করেন নাই। যদি জাতিভেদের অসারতা প্রতিপাদন করা তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবিচারে সকল জাতির লোকের সহিত একত্র ভোজন করিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই।

তৃতীয় যুক্তি—তিনি যবন হরিদাস এবং আরও কয়েকটি মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন।

জাতিভেদের মধ্যে এমন কোনও নিয়ম নাই যে মুসলমানকে শিষ্য করা যায় না। মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন, অতএব জাতিভেদ তুলিয়া দিয়াছিলেন এই যুক্তি অতুলনীয়।

এই প্রসঙ্গে রমেশবাবু একটি বড় রকম ভুল করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে মুসলমান ভক্তগণ মন্দিরে প্রবেশ করিবে ইহাতে চৈতন্যদেবের কোনও আপত্তি ছিল না এবং দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে চৈতন্যদেব হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। চৈতন্যদেব কখনও হরিদাসকে মন্দিরের মধ্যে আসিতে আহ্বান করেন নাই। রমেশবাবু যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার একাদশ পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

রমেশবাবু একটু ধীরভাবে ইহা পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন যে কাশী মিশ্রের গৃহে বসিয়া চৈতন্যদেব হরিদাসকে ডাকিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। হরিদাসও সে সময়ে মন্দির মধ্যে যাইবার কথা বলেন নাই, মন্দিরের নিকটে যাইবার কথাই বলিয়াছেন।

অতএব রমেশবাবু যে এই প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন—চৈতন্যদেবের মতে অস্পৃশ্যদের মন্দির প্রবেশ দূষণীয় নহে—তাহা শূন্যে নির্মিত সৌধমালার ন্যায় অলীক। বস্তুতঃ চৈতন্যদেবের মতে অস্পৃশ্যদের পক্ষে মন্দির প্রবেশ দূষণীয় ছিল। তাই সনাতন যখন বলিয়াছিলেন "সিংহদ্বারে যাইতে মোর নাহি অধিকার" তখন চৈতন্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন—

"মর্য্যাদা পালন হয় সাধুর ভূষণ॥
মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥"

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তির মন্দির প্রবেশ শাস্ত্রনিষিদ্ধ সে যদি মন্দির মধ্যে প্রবেশ করে তাহা হইলে তাহার দ্বারা মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা হয় এবং সে ইহলোক ও পরলোকে দুঃখ ভোগ করে।

আমি পূর্বে বলিয়াছি যে রমেশবাবু আমার কয়েকটি যুক্তির কোনও উত্তর দেন নাই। কিন্তু রমেশবাবু আমার একটি যুক্তির উত্তর দিয়াছেন ইহা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য। আমার যুক্তি ছিল—শ্রীচৈতন্য বেদ ও পুরাণ মানিতেন, বেদ ও পুরাণে জাতিভেদ আছে, সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব

জাতিভেদ মানিতেন। ইহার উত্তরে রমেশবাবু বলিয়াছেন—"প্রাচীন হিন্দুধর্মসংস্কারকগণ মুখে কখনও বেদ ও পুরাণের অপ্রামাণিকতা স্বীকার করিতেন না, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের মত ও প্রদর্শিত পথ অনেক স্থলেই সনাতন ধর্ম ও আচার হইতে ভিন্ন।"

অর্থাৎ তাঁহাদের মনে একরূপ এবং কার্য্যে অন্যরূপ; সহজ কথায় তাঁহারা কপটাচারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপর এবং যাবতীয় সাধু পুরুষদের উপর—কি সুগভীর ভক্তি! শ্রীচৈতন্য যে বেদকে অভ্রান্ত মনে করিতেন না তাহার প্রমাণস্বরূপ রমেশবাবু বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ করিয়াছেন।" ভক্তির নিকট বেদজ্ঞানকে তুচ্ছ মনে করিলে বেদকে ভুল বলিয়া স্বীকার করা হয়, ইহা রমেশ বাবুর আর এক অদ্ভুত যুক্তি। কেহ যদি বলেন ধর্ম-জীবনের তুলনায় ধর্মপুস্তকের জ্ঞান তুচ্ছ, তাহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ধর্মপুস্তকগুলি মিথ্যা?

ভক্তির তুলনায় বেদের জ্ঞান তুচ্ছ—ইহা বলিয়া যে শ্রীচৈতন্য বেদের বিরোধিতা করেন নাই তাহার আর একটি কারণ এই যে—বেদেই এই কথা আছে। মুণ্ডকোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়—

নায় মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যম্ এব এষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
তস্য এষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাং॥

এখানে বলা হইল যে বেদে এবং অন্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিলেই ব্রহ্মলাভ হয় না। ব্রহ্ম যাঁহাকে কৃপা করেন তাঁহারই ব্রহ্মলাভ হয়। অবশ্য যাঁহার ভক্তি আছে তাঁহাকেই ব্রহ্ম কৃপা করেন। সুতরাং বেদেই আছে যে ভক্তির নিকট বেদের জ্ঞান তুচ্ছ।

গীতাতেও ভগবান এই কথা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন।

নাহং বেদৈর্নতপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবান্ অসি মাং যথা॥১১।৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যোঽহম্ এবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥১১।৫৪

"হে অর্জ্জুন, তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, বেদ, তপস্যা, দান বা যজ্ঞ দ্বারা আমার সে রূপ দেখা যায় না। কেবল আমার প্রতি অনন্য ভক্তি থাকিলে আমাকে এই ভাবে জানা যায়, দেখা যায় এবং আমাতে প্রবেশ করা যায়।"

সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের এই মত হিন্দুর বেদ-পুরাণ-ইতিহাস সকল ধর্মশাস্ত্রেই আছে। এই মত প্রচার করিয়া শ্রীচৈতন্য হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের বিরোধিতা করেন নাই। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্য তাঁহার সকল মত এবং আচরণ বেদ-পুরাণ দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি যে ভগবদ্ভক্ত শূদ্র এবং পতিতদিগকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, ইহাও পুরাণবাক্য দ্বারা সমর্থন করিয়াছিলেন। তথাপি রমেশবাবু কিরূপে এই গূঢ় রহস্য জানিতে পারিলেন যে বেদ ও পুরাণের প্রতি শ্রীচৈতন্যের আন্তরিক আস্থা ছিল না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।

রমেশবাবু আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বলিয়াছেন:

চৈতন্যদেব যাহা যাহা করিয়াছিলেন আমি এবং আমার দলভুক্ত শাস্ত্রীয় আচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ তাহা করিতে প্রস্তুত আছি কি? আমি শূদ্র ও মুসলমানকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষা দিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত আছি কি? তাঁহাদিগকে লইয়া একসঙ্গে ভোজনে ও মন্দির প্রবেশ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে কোনও আপত্তি আছে কি? ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ—ইহা কি আমি বিশ্বাস করি?

আমাদের মীমাংসার বিষয়—শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মমত। এই প্রসঙ্গে আমার দলভুক্ত ব্যক্তিগণের (?) আচরণ নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক। রমেশ বাবুর এই প্রশ্নগুলির মধ্যে যে যুক্তি নিহিত আছে তাহা এইরূপ:—

শ্রীচৈতন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন. বসন্তবাবু সে সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত নহেন; বসন্তবাবু জাতিভেদ মানেন অতএব শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না।

সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে অথবা পাশ্চাত্য Logicএ এবম্বিধ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। বোধ করি রমেশবাবু গবেষণা বলে সুমাত্রা বা জাভা দ্বীপ হইতে এই অপূর্ব যুক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন।

রমেশবাবুর এই নবাবিষ্কৃত যুক্তি অনুসরণ করিয়া (এবং মহর্ষি গৌতমের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া) আমরা বলিতে পারি,—

শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না, রমেশবাবু জাতিভেদ মানেন না, সুতরাং শ্রীচৈতন্য যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, রমেশবাবুর সেই সকল কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণের পাদোদক খাইয়াছিলেন, রমেশবাবু খাইতে প্রস্তুত আছেন ত?

অবশ্য শ্রীচৈতন্য যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা করিতে আমি প্রস্তুত নহি, ইহা রমেশবাবুর অনুমান মাত্র। হরিদাস, রূপ ও সনাতন সকলেরই পূর্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ ছিলেন—কোনও কারণে ইঁহাদের পাতিত্য জন্মিয়াছিল। ইঁহাদের আচার ব্যবহার পরম পবিত্র, ইঁহাদের ভক্তি ও সাধনা অতুলনীয়। এরূপ মহাপুরুষগণের পার্শ্বে বসিয়া আহার করিতে অথবা ইঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতে আমার কোনই আপত্তি থাকিতে পারে না—অথবা আপত্তি এই যে আমি তাঁহাদের আলিঙ্গনের যোগ্য নহি। শ্রীচৈতন্য যে ইঁহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করেন নাই তাহা আমি পূর্বেই দেখাইয়াছি। ভক্তিশূন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডাল যে সম্মানার্হ তাহাও আমি পূর্বেই বলিয়াছি।

কোনও কোনও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিতের হরিদাস প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিতে আপত্তি থাকিতে পারে ইহা সত্য। কিন্তু যত লোক জাতিভেদ বিশ্বাস করে সকলের আচরণ একরূপ হইবে, এই মতটি যুক্তিসিদ্ধও নহে, পর্য্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়কও নহে। রমেশবাবুর ইহা বোঝা উচিত যে জাতিভেদে আস্থা থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। শাস্ত্রে জাতিভেদের বিধান আছে, আবার ইহাও লিখিত আছে যে কোনও ব্যক্তি যদি

অস্পৃশ্য জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরে ভক্তিমান হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে পবিত্র বলিয়া মনে করা উচিত। শ্রীচৈতন্যদেব এই বিধান অক্ষরে অক্ষরে (literally) পালন করিতেন। কিন্তু এই বিধানের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে ভক্তির প্রশংসা করিবার জন্যই শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিয়াছেন, নিম্নজাতীয় ভক্তের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিলেই শাস্ত্রের এই বিধানটি পালন করা হইবে, তাঁহাদিগের সহিত একত্র ভোজন করিবার প্রয়োজন নাই, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিবারও প্রয়োজন নাই; কোন্ ব্যক্তি প্রকৃত ভক্ত, কোন্ ব্যক্তি নহে—তাহা সকল ক্ষেত্রে নিশ্চয় করাও সম্ভবপর নহে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিষয়ে এইপ্রকার মতভেদ থাকিলেও জাতিভেদের প্রধান নিয়মগুলি সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই—সকলেই স্বীকার করেন যে প্রতিলোম অসবর্ণ বিবাহ পাপকার্য্য, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের ভোজন করা উচিত নহে, চণ্ডাল নিজেকে অস্পৃশ্য বিবেচনা করিবে, মন্দিরে প্রবেশ করিবে না। এই সকল বিষয়ে সকল নিষ্ঠাবান হিন্দুর সহিত শ্রীচৈতন্যদেবের যখন কোনও মতভেদ নাই—তখন ভক্ত চণ্ডালকে আলিঙ্গন করা উচিত কি না, এই প্রকার ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভেদ আছে বলিয়া, কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এক সম্প্রদায় জাতিভেদ মানেন এবং এক সম্প্রদায় মানেন না। অথচ রমেশবাবু ঠিক এই অপসিদ্ধান্তই করিয়াছেন।

অতঃপর রমাপ্রসাদবাবুর প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা প্রয়োজন। সুখের বিষয় যে রমাপ্রসাদবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—শ্রীচৈতন্যের সম্প্রদায়কে "জাতিভেদের বিরোধী বলা যায় না।" কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকটি ভুল কথাও আছে। তিনি বলিয়াছেন—"ভক্তিমার্গে জাতিভেদ অনুসারে অধিকারী ভেদ নাই।" তাহা হইলে শ্রীচৈতন্যদেব কেন সনাতনকে বলিলেন—"তুমি মন্দিরের নিকট না গিয়া ভাল কাজ করিয়াছ, সকল ব্যক্তিরই মর্য্যাদা পালন করা উচিত।" রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন বৈষ্ণবধর্মে— পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করিয়া লৌকিক ব্যাপারে তাহার অনুসরণ" করা হইয়াছে। কিন্তু পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করা হয় নাই। কারণ শ্রীচৈতন্যদেব বলিয়াছেন,—

মর্য্যাদা লঙ্ঘনে লোকে করে উপহাস।
ইহলোক পরলোক দুই হয় নাশ॥

চৈতন্য-চরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ।

এই "মর্য্যাদা" হইতেছে জাতিভেদ অনুসারে অধিকারভেদ। শ্রীচৈতন্যের মতে ইহা লঙ্ঘন করিলে পরলোকে সর্বনাশ হয়। সুতরাং ইহা বলা যায় না যে পারলৌকিক ব্যাপারে জাতিভেদ উপেক্ষা করা হইয়াছে। রমাপ্রসাদবাবু তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য একটি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—যাহার অর্থ "হরিভক্ত চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ দ্বিজরূপে গণনীয়।" কিন্তু এই বাক্য হরিভক্তির প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যেই বলা হইয়াছে। সত্য সত্যই এইরূপ ভক্ত চণ্ডালের জাতি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দেশ করা এই বাক্যের উদ্দেশ্য নহে। ভক্ত চণ্ডালকে কোনও বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কন্যা-সম্প্রদান করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের প্রধান ভক্ত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভৃতির বংশ জন্মগত ব্রাহ্মণবংশের সহিতই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন—ব্রাহ্মণেতর ভক্তবংশের সহিত করেন নাই। রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন যে কোনও একটি মন্ত্র সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে —সকল জাতির এই মন্ত্রে অধিকার আছে। এই মন্ত্রটিতে সকল জাতির অধিকার থাকিতে পারে। কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় না যে অন্য কোনও বিষয়ে জাতি অনুসারে অধিকারভেদ নাই। বৈষ্ণবদের মন্দিরে ব্রাহ্মণগণই বিগ্রহের সেবা করিয়া থাকে, অন্য জাতির ভক্তদের স্বহস্তে সেবা করিবার অধিকার নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ভক্তিমার্গেও জাতি অনুসারে অধিকার ভেদ আছে। বস্তুতঃ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি যে মার্গই গ্রহণ করা হউক, যদি বেদের প্রতি আস্থা থাকে, তাহা হইলে জাতিভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ জাতিভেদ বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্প্রতি যে বর্ণাশ্রম-স্বরাজ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে রামানুজ, বল্লভাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য প্রভৃতি ভক্তিমার্গের অনেক সম্প্রদায় যোগদান করিয়াছেন। ভক্তিমার্গে যে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই ইহা ভুল।

রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন যে হরিদাস ঠাকুরের—"জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশের বাধা ছিল না।" কিন্তু ইহা শ্রীচৈতন্যের মত নহে। কারণ তিনি বলিয়াছেন—শাস্ত্রে যে জাতির লোককে মন্দির প্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই তিনি মন্দির প্রবেশ করিলে মর্য্যাদা লঙ্ঘন" হয় এবং তাহাতে "ইহলোক পরলোক" নষ্ট হয়। রমাপ্রসাদবাবু ভক্তিরত্নাকর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে শ্রীসনাতন ব্রাহ্মণ ছিলেন কিন্তু নীচ জাতির সহিত ব্যবহার করিতেন বলিয়া নিজদিগকে নীচ জাতি বলিয়া পরিচয় দিতেন। আমি এ বিষয়ে শ্রাবণ ১৩৪১এর ভারতবর্ষে এবং পৌষ ১৩৪২এর বঙ্গশ্রীতে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ থাকিলেও তাঁহার পিতা শ্রীকুমার কোনও কারণে জাতিচ্যুত হইয়াছিলেন।

প্রবন্ধের উপসংহারে রমাপ্রসাদবাবু বলিয়াছেন—"জাতিভেদজনিত অনৈক্য যে হিন্দুদিগের অধঃপতনের একটি কারণ এই তথ্য বোধ হয় প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়।" ইহার কারণ এই যে রাজা রামমোহন রায় খৃষ্টধর্মকে সকল ধর্মের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। Digby সাহেবকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি একথা প্রকাশ করিয়াছেন। হিন্দুধর্ম এবং সমাজকে খৃষ্টানধর্ম এবং সমাজের অনুকরণে গঠিত করিবার জন্য তিনি প্রতিমা পূজা এবং জাতিভেদের নিন্দা করিয়াছিলেন। খৃষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগবশতঃ রাজা রামমোহন বুঝিতে পারেন নাই যে হিন্দুধর্মের জাতিভেদ ঐক্যের কারণ, অনৈক্যের নহে। জাতিভেদের মূলশ্রুতি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি জাতিকে বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ বলা হইয়াছে। বিভিন্ন অঙ্গের কর্ম বিভিন্ন হইলেও সকল অঙ্গই এক উদ্দেশ্যের সহায়ক, এ জন্য সকলের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সেইরূপ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন কর্ম নির্দ্দিষ্ট হইলেও, সকলেরই উদ্দেশ্য সমাজদেহের কল্যাণ সাধন—এ জন্য সকলের মধ্যে ঐক্য বিরাজমান। সকল ব্যক্তির সকল

কাজে সমান অধিকার থাকিলে প্রবল প্রতিযোগিতা অবশ্যম্ভাবী। প্রবল প্রতিযোগিতা হইতে দ্বন্দ্ব এবং অনৈক্যের উদ্ভব হয়। হিন্দু-সমাজে জন্ম অনুসারে অধিকার নির্দেশ করিয়া প্রতিযোগিতাকে মৃদুতর করা হইয়াছে। তাহাতে অনৈক্যের সম্ভাবনাও কম হয়। প্রত্যেক হিন্দু জানে যে অপর সকল জাতির সাহায্য ব্যতীত তাহার পক্ষে জীবনযাত্রা করা দুরূহ, এ জন্য সকল জাতির মধ্যে ঐক্যের বন্ধন থাকে। যাঁহারা প্রাচীন পল্লী-সমাজ দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ সদ্ভাব এবং ঐক্য থাকে। পাশ্চাত্য সমাজে জাতিভেদ নাই, কিন্তু ধনিকে এবং শ্রমিকে যেরূপ চিরন্তন বিবাদ বর্ত্তমান, হিন্দুসমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সেরূপ বিবাদ কখনও ছিল না। হিন্দুসমাজ হইতে জন্মগত জাতিভেদ তুলিয়া দিলে পাশ্চাত্য সমাজের ন্যায় হিন্দুসমাজেও ধন অনুসারে শ্রেণীবিভাগ হইবে এবং ধনের আধিপত্য উগ্রভাবে প্রকাশিত হইবে। জন্ম এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা (heredity and environment) অনুসারে কর্মভেদ স্বাভাবিক। অপর উপায়ে কর্মভেদ করিলে সমাজে সুব্যবস্থা থাকিতে পারে না। পাশ্চাত্য সমাজে এইরূপ সুব্যবস্থা নাই বলিয়া বেকার সমস্যা প্রবল হইয়াছে এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে যথেষ্ট বিদ্বেষ দেখা যায়।

জাতিভেদ যদি হিন্দুর জাতীয় অধঃপতনের কারণ হইত তাহা হইলে সুদূর অতীত কাল হইতে জাতিভেদ থাকা সত্ত্বেও ভারত সর্ব্বাগ্রে ধর্ম, দর্শন, কাব্য, শিল্প—সকল বিষয়ে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিত না। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময় হিন্দুর বিভিন্ন জাতি কলহ করিয়াছিল এরূপ দেখা যায় নাই। কলহ হইয়াছিল স্বজাতির মধ্যেই এবং তাহাই হিন্দুর পতনের অন্যতম কারণ। বৌদ্ধধর্মে প্রচারিত হইল যে সকল অবস্থায় অহিংসা পরম ধর্ম—দেশ রক্ষার জন্য শত্রু হিংসাও যে ধর্ম—ইহা বৌদ্ধধর্মে বলা হইল না। এই অতি অহিংসাবাদের প্রভাবও পতনের অন্যতম কারণ। বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত—সকল ধর্মগ্রন্থেই জাতিভেদকে সমাজের কল্যাণের জন্য ঈশ্বর প্রণীত ব্যবস্থা বলা হইয়াছে। ব্যাস, বাল্মীকি, শঙ্কর, রামানুজ, মাধবাচার্য্য, শ্রীচৈতন্য সকলেই ইহার সমর্থন করিয়াছেন। ইঁহাদের সর্ববাদিসম্মত মতের বিরুদ্ধে খৃষ্টানধর্মভক্ত রাজা রামমোহনের মত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

[অতঃপর এ সম্বন্ধে আর কোন প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইবে না।—ভারতবর্ষ-সম্পাদক।]

গীতা মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কি না ?

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

দেশের ও বিদেশের অনেক মনস্বীই বলিয়া থাকেন যে ভগবদ্গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা একান্ত উচিত মনে করিয়া বাদী ও প্রতিবাদীর উক্তি-প্রত্যুক্তিচ্ছলে তাহা এস্থানে লিপিবদ্ধ করা হইল।

প্রক্ষিপ্তবাদী—মহাশয়! ভগবদ্গীতাটা যে ভীষ্মপর্বে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা জানেন?

প্রতিবাদী—কি করিয়া জানিব; কাহাকেও প্রক্ষিপ্ত করিতে দেখি নাই, শুনা কথারও কোন মূল্য নাই, প্রক্ষেপের যুক্তিও খুঁজিয়া পাই না।

প্রক্ষিপ্তবাদী—কেন প্রক্ষেপের যুক্তি খুঁজিয়া পাইবেন না; ভীষ্মপর্বের যে স্থানে গীতা সন্নিবেশিত আছে, সে স্থানে গীতা উঠিবার কোন প্রসঙ্গই নাই।

প্রতিবাদী—প্রসঙ্গ নাই একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ কুরুপাণ্ডব উভয়পক্ষ যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং ভীষ্ম কুরুপক্ষের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন—ইত্যাদি সমস্ত ঘটনাই ধৃতরাষ্ট্র জানেন এবং যুদ্ধের সমগ্র বৃত্তান্ত জানিয়া আসিয়া তাহা বলিবার জন্য সঞ্জয়ের উপরে আদেশও করিয়াছেন। এই অবস্থায় দশম দিনের যুদ্ধে ভীষ্ম নিপতিত হইলে সঞ্জয় আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বলিলেন—"মহারাজ! ভীষ্ম আজ শিখণ্ডীর হস্তে যুদ্ধে নিপতিত হইয়াছে"—ইহা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বহুতর বিলাপ করিয়া যুদ্ধের আদ্যন্ত বৃত্তান্ত শুনিবার ইচ্ছায় সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার পুত্রেরা ও পাণ্ডবেরা যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া প্রথমে কি করিলেন?" ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রশ্নই ত গীতা উঠিবার প্রসঙ্গ; এইরূপ প্রসঙ্গ লইয়াই ত মহাভারতের এবং অন্যান্য উপাখ্যানময় গ্রন্থের উপাখ্যানগুলি উঠিয়াছে।

প্রক্ষিপ্তবাদী—সে যাহা হউক। উভয়পক্ষের যোদ্ধারাই অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আপন আপন সেনাপতির

আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন, সে আদেশ হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়—এমন সময়ে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থানে থাকিয়া পাণ্ডবপক্ষের প্রধান সহায় কৃষ্ণ গীতা বলিতে আরম্ভ করিলেন—আর প্রধান যোদ্ধা অর্জ্জুন তাহা শুনিতে থাকিলেন। 'ধান ভাণতে মহীপালের গীত আরম্ভ হইয়া গেল'—মহাযুদ্ধারম্ভে অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকিল! এমন ঘটনা কি কখনও সম্ভব হইতে পারে? বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই নিরুদ্বেগ না হইলে, গীতার মত বিষয়ের আলোচনা হইতেই পারে না।

প্রতিবাদী—মহাশয়! এই ভীষ্মপর্ব্বেরই প্রথম অধ্যায় পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় আপনি এরূপ অসামঞ্জস্যের অবতারণা করিতেন না। উভয়পক্ষ মিলিত হইয়া যুদ্ধের প্রা.ম্ভে যে সকল নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা ভীষ্মপর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে; তাহার মধ্যে এই কথাটুকুও আছে যে—"সমাভাষ্য প্রহর্ত্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে" অর্থাৎ 'আমরা বলিয়া কহিয়া বিপক্ষের উপরে প্রহার করিব এবং কোন পক্ষ বিশ্বস্ত বা বিহ্বল থাকিলে তাহার উপরে প্রহার করিব না'। সুতরাং কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাসই ছিল যে, আমাদিগকে না জানাইয়া কেহই প্রহার করিবে না। অতএব কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই তখনও নিরুদ্বেগ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের অধ্যাত্মবিষয়ের আলোচনাও সম্ভবপর হইয়াছিল।

প্রক্ষিপ্তবাদী—মহাশয়! আসামিপক্ষের অনেক উকীলেরই মনে মনে এমন প্রতিজ্ঞা থাকে যে—'আমার মক্কেল দোষীই হউন আর নির্দোষই হউন, আমি তাঁহাকে নির্দোষ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিব'—আপনারও যদি সেইরূপই প্রতিজ্ঞা থাকে যে, আমি গীতাকে মূলগ্রন্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিব, তাহা হইলে আমার আর আলোচনার প্রয়োজন নাই।

প্রতিবাদী—'গ্রন্থকার জীবিত নাই বা উপস্থিত নাই, গ্রন্থ নিজেও অচেতন পদার্থ বলিয়া কোন প্রতিবাদ করিতে পারিবে না। সুতরাং এই সুযোগে গবেষক নাম বাহির করিয়া লই'—এইরূপ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া আপনারাও যদি মূলগ্রন্থ গীতাকে প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান, তাহা হইলে আমারও বিবাদে প্রয়োজন নাই। তবে সর্ব্বপ্রযত্নে গীতাকে মূলগ্রন্থ বলিয়াই প্রতিপন্ন করিতে হইবে এরূপ কোন প্রতিজ্ঞা আমার নাই বা সেরূপ ইচ্ছাও নাই।

প্রক্ষিপ্তবাদী—তাহা হইলে বলুন দেখি, যে দুর্য্যোধন বাল্যকাল হইতেই বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া বিষপ্রয়োগ, জলে নিক্ষেপ এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছে, সেই দুর্য্যোধন প্রভৃতিরই "সমাভাষ্য প্রহর্ত্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে" এই কথাটুকুর উপরে বিশ্বাস করিয়া ঐরূপ সময়ে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মত লোকচরিত্রাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ লোকদের অন্যমনস্ক হওয়া কি সম্ভবপর হয়?

প্রতিবাদী—অবশ্যই হয়। কেন না, সে সময়ে অসাধারণ ধার্ম্মিক ভীষ্ম কৌরবপক্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং তিনিও সেই নিয়মপ্রবর্ত্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। সুতরাং তাঁহার আদেশ ব্যতীত কৌরবপক্ষের কাহারও কিছু করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাহার পর কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন কচি খোকা ছিলেন না। উভয়েই অতিরথ ও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন—একথা সকলেই জানিত। অতএব দৌড়াইয়া যাইয়া তাঁহাদিগকে সংহার করিবার সাহস বা তীর ছুটাইয়া মারিয়া ফেলিবার ভরসা কাহারও হয় নাই, কিংবা তাঁহারাও সেরূপ আশঙ্কা করেন নাই। তাই তাঁহাদের গীতার আলোচনায় অন্যমনস্ক হওয়া অসম্ভব হয় নাই।

প্রক্ষিপ্তবাদী—আচ্ছা যাউক। পুরাণরচয়িতা বেদব্যাস চিরকালই সাপের গল্প ও ব্যাঙের গল্প প্রভৃতিই লিখিয়া আসিয়াছেন, এ অবস্থায় তিনি যে গীতার মত সমস্ত সম্প্রদায়ের উপযোগী মূল্যবান্ গ্রন্থ রচনা করিতে পারিয়াছিলেন, ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করিতে পারি?

প্রতিবাদী—এইবার আধুনিক রুচির অনুরূপ কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন।

প্রক্ষিপ্তবাদী—আপনার সেকেলে ধরণের কথা শুনিব বলিয়া।

প্রতিবাদী—মহাশয়! সে কাল যে হিন্দুর সুবর্ণযুগ ছিল তাহা জানেন? সে যাহা হউক, বেদব্যাস কেবল পুরাণই রচনা করিয়া যান নাই, তিনি অধ্যাত্মবিষয়ের চরমগ্রন্থ বেদান্তদর্শন এবং পাতঞ্জলভাষ্য প্রভৃতিও লিখিয়া গিয়াছেন।

প্রক্ষিপ্তবাদী—তবে কি আপনি মনে করেন যে বেদব্যাস একজনই ছিলেন?

প্রতিবাদী—বেদব্যাস একজন বা অনেকজন ছিলেন

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; এই মাত্র বলিতে পারি যে, এই মহাভারতেরই উদ্‌যোগপর্ব্বে 'সানৎসুজাত-' নামে যে অধ্যাত্মশাস্ত্র দেখিতে পাই তাহা যদি বেদব্যাস রচনা করিতে পারিয়া থাকেন, তবে এই গীতাও যে তিনি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; বেদব্যাসের মত জ্ঞানী লেখক ভারতবর্ষে কেহ জন্মিয়াছিলেন বলিয়াও মনে হয় না!

প্রক্ষিপ্তবাদী—সে যাহা হউক। শুনিতে পাই—জাভাদ্বীপের মহাভারতে নাকি ভগবদ্‌গীতা নাই। সুতরাং ভগবদ্‌গীতা যদি মহাভারতের মৌলিক অংশই হইত, তবে জাভাদ্বীপের মহাভারতেও তাহা অবশ্য থাকিত।

প্রতিবাদী—অবশ্যই থাকিত একথা বলিতে পারেন না। কারণ জাভাদ্বীপবাসীরা প্রথমে হিন্দু ছিল, মধ্যে বৌদ্ধ হইয়াছিল, পরে মুসলমান হইয়াছে। এ অবস্থায় তাহারা যখন হিন্দু ছিল, তখন তাহাদের মহাভারতে ভগবদ্‌গীতা ছিল বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে; তাহার পর তাহারা যখন বৌদ্ধ এবং মুসলমান হইয়াছিল সম্ভবতঃ তখন তাহাদের মহাভারত হইতে গীতা এবং ঐরূপ ঈশ্বরের মূর্ত্তিবোধক অংশগুলি নিষ্কাশিত হইয়াছিল। কেন না, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি নাই; অথচ ভগবদ্‌গীতার বক্তা কৃষ্ণ আপনাকে বহু স্থানে ঈশ্বর বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাইয়া তাহা প্রমাণিতও করিয়াছেন—আবার পার্থসারথিমূর্ত্তিতে সকলের দৃষ্টিগোচরও হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের ঐ গীতা যে বিরক্তিকর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আর এক কথা, জাভাদ্বীপের ভাষায় সে দেশের মহাভারতের যখন অনুবাদ হইয়াছিল, তদবধি তাহাদের মহাভারতে বহু উপাখ্যান নূতন প্রবেশ করিয়াছে, অনেক বিষয় নিষ্কাশিত হইয়াছে এবং বহু স্থান অত্যন্ত বিকৃত হইয়াছে। এ অবস্থায় সে দেশের মহাভারতে গীতা না থাকিলেও তাহা গীতার অমৌলিকতা প্রমাণিত করিতে পারে না।

প্রক্ষিপ্তবাদী—ভাল; গীতার মৌলিকতাসম্বন্ধে আপনি নির্দোষ যুক্তি দেখাইতে পারেন কি?

প্রতিবাদী—অবশ্যই পারি।

মহাভারতের পূর্ব্বাপর স্থানগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, অন্যান্য স্থানে যেরূপ ভাষা, যে ভাব, যে প্রকার ছন্দ এবং যে জাতীয় অপাণিনীয় (আর্ষ) প্রয়োগ আছে, গীতাতেও সেইরূপই সে সমস্ত আছে।

প্রক্ষিপ্তবাদী—এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদও আছে

প্রতিবাদী—থাক; শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধরস্বামী ও মধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি যোগী মহাপুরুষগণ নিঃশঙ্কচিত্তেই ৫ গীতার ভাষ্য ও টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন; ইহাতে গীতার মৌলিকতাই প্রমাণিত হয়।

প্রক্ষিপ্তবাদী—গীতা প্রক্ষিপ্ত বা মৌলিকগ্রন্থ এ বি শঙ্কর প্রভৃতি কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন বলিয়া ম হয় না। কারণ, তাহা করিয়া থাকিলে শ্রীধরস্বামী যে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমে তাহার মহাপুরাণত্ব স্থাপনের চে করিয়া গিয়াছেন, সেইরূপ গীতার প্রারম্ভেও শঙ্কর প্রভৃতি —অন্ততঃ শ্রীধরস্বামীর কিছু লেখা থাকিত। সুতরাং উঁহাদের ভাষ্য ও টীকা থাকায় এইমাত্র প্রমাণিত হয় যে, উঁহাদের সময়ে মহাভারতে গীতা ছিল।

প্রতিবাদী—তাহার পর গীতায় যে সকল আধ্যাত্মিক শ্লোক আছে, তাহার প্রায় শ্লোকই মহাভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উল্লিখিত রহিয়াছে।

প্রক্ষিপ্তবাদী—ভাল, তাহা হইলে অবশ্যই একথা বলা যায় যে, মহাভারত রচনার পরে কোন বিশিষ্ট বিদ্বান্ লোক মহাভারতের সেই সকল স্থান হইতে আধ্যাত্মিক শ্লোক-গুলিকে একত্র করিয়া, মধ্যে মধ্যে নিজেও কিছু কিছু লিখিয়া 'ভগবদ্‌গীতা' নাম দিয়া ভীষ্মপর্ব্বে সন্নিবেশিত করিয়া গিয়াছেন।

প্রতিবাদী—তাহাও হইতে পারে না। কারণ, মহাভারতের আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায়টির নাম—'পর্ব্বসংগ্রহ অধ্যায়'। তাহাতে—কোন্ পর্ব্বে কতগুলি অধ্যায়, কতগুলি শ্লোক, কতগুলি উপপর্ব্ব এবং কি কি বৃত্তান্ত আছে, তাহা মহর্ষি বেদব্যাস নিজেই সূচিপত্রের ভাবে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন; তাহাতে দেখিতে পাই—"পর্ব্বোক্তং ভগবদ্‌গীতা পর্ব্ব ভীষ্মবধস্ততঃ"—ইহার পরে আবার লেখা আছে—"কশ্মলং যত্র পার্থস্য বাসুদেবো মহামতিঃ। মোহজং নাশয়ামাস হেতুভির্মোক্ষদর্শিভিঃ॥"

তার পর আবার আশ্বমেধিকপর্ব্বে অনুগীতাপ্রকরণে স্বয়ং কৃষ্ণই অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—"পূর্ব্বমপ্যেত

দেবোক্তং যুদ্ধকাল উপস্থিতে। ময়া তব মহাবাহো! তস্মাদত্র মনঃ কুরু॥" (বঙ্গবাসীর পুস্তকে ও কুম্ভঘোণমের পুস্তকে আশ্বমেধিকপর্ব্বে অনুগীতাপ্রকরণে ৫১ অধ্যায়ে ৪৯ শ্লোক)। অতএব বেদব্যাস আদিপর্ব্বে ভগবদ্গীতাকে একটি উপপর্ব্ব বলিয়াছেন এবং তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন; আবার কৃষ্ণ আশ্বমেধিকপর্ব্বে অনুগীতাপ্রকরণে অর্জ্জুনকে সেই ভগবদ্গীতার বিষয়ই স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; এ অবস্থায় কোনরূপেই ভগবদ্গীতাকে সংগ্রহ-গ্রন্থ কিংবা প্রক্ষিপ্ত বলা যায় না।

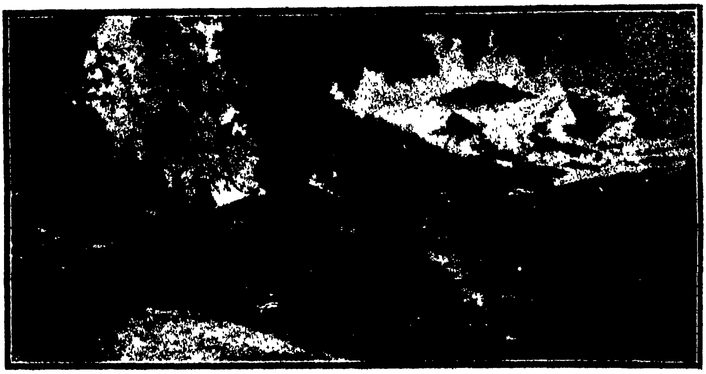
প্রক্ষিপ্তবাদী—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) যদি সেই অংশগুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলি?

প্রতিবাদী—তাহা হইলে, সম্পূর্ণ মহাভারতটাকেই কিংবা নিজেকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া আমাকে নিষ্কৃতি দিয়া যান।

সুইজারল্যাণ্ডের আবহাওয়া

ডাঃ সুরেশচন্দ্র সান্যাল এল্-এম্-এফ

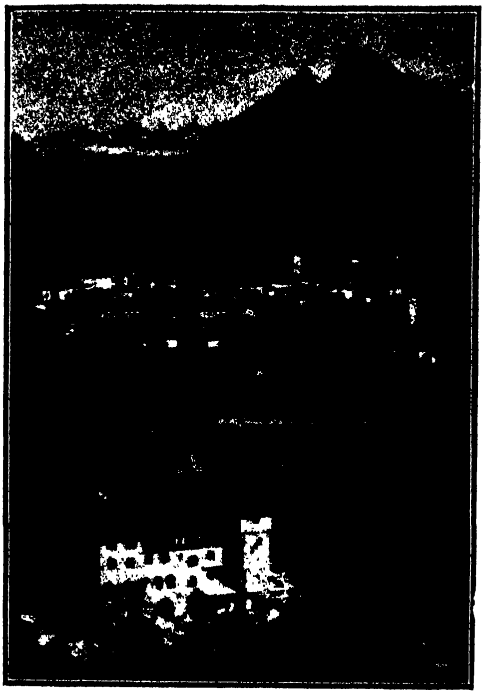
দিবারাত্র কাজকর্ম্মের পেষণে শরীর ক্লান্ত ও শুষ্ক হইয়া পড়িলে স্বাভাবিক রক্তশূন্যতা, গ্রন্থিবেদনা, পেটের পীড়া, বাতরোগ, যক্ষ্মা, শিরঃপীড়া, পেশীবেদনা প্রভৃতি উৎকট রোগ সকল চতুর্দ্দিক হইতে আমাদিগকে বিব্রত করিয়া ফেলে। তীর্থকামী যাত্রীর মত ধনীরা পর্ব্বতময় স্বাস্থ্যকর স্থানের দিকের ধাবিত হয়, সামর্থ্য থাকিলে কেহ কেহ বা সুইজারল্যাণ্ডের অপূর্ব্ব দৃশ্যপূর্ণ স্থানসমূহে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করে। কেহ বা গ্রীষ্মকালের আল্পাইন্ পর্ব্বতশ্রেণীর স্নিগ্ধ বায়ু সেবন না করিলে জীবন সার্থক মনে করে না। শীতের দিনে বরফাচ্ছন্ন পর্ব্বত রেখার অপূর্ব্ব দৃশ্য, স্কি-খেলার অফুরন্ত আমোদ, পাহাড়ের ধাতব জলপূর্ণ ঝরণাসমূহে স্নান, বৃক্ষশ্রেণীর নগ্নাবস্থা, প্রকৃতির উপমাহীন শোভা, রুগ্ন লোকের প্রাণেও আশার সঞ্চার করে; হতাশ লোকের প্রাণে দ্বিগুণ সাহস ও শক্তি আনিয়া দেয়। বিশুদ্ধ বায়ু, তীক্ষ্ণ সূর্য্যকিরণ, স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া প্রভৃতি রোগীদিগকে সুইজারল্যাণ্ডের দিকে ধাবিত করে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পর্ব্বতশিখরের রৌদ্র শিখার মূল্য অধিকতর, কারণ নিম্নস্থান সমূহে রৌদ্র কিরণ পৌঁছাইতে হইলে ধূলিকণা ও বাষ্পস্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ইহা ক্রমশঃ নিস্তেজ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, উচ্চ স্থানের আবহাওয়া বিশুদ্ধ ও বীজাণুশূন্য বলিয়া অসংখ্য ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।



বার্ণিজ ওবারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড

সুইজারল্যাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে নানারকম ধাতুমিশ্রিত জলপূর্ণ ঝরণা, জলপ্রপাত এবং সুন্দর সুন্দর হ্রদ বর্ত্তমান থাকায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে জল-চিকিৎসার জন্য বৎসরের সকল সময়েই নানা জাতীয় নরনারীর সমাগম হয়। আদিমকাল হইতে মানবের কোন না কোন রোগাক্রান্ত হওয়া স্বভাবগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাস্থ্যলাভের জন্য এই জল-চিকিৎসার পন্থা বহু পুরাতন হইলেও সেই আদিমকাল হইতে অধুনা সভ্যযুগ পর্য্যন্ত উহার অবাধ ব্যবহার হইতেছে, কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। শত শত বৎসরের অভিজ্ঞতা ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে, এরূপ ঝরণায় সাধারণতঃ ৩০।৪০টি স্নানের পর বহু রোগী সম্পূর্ণ

নিরাময় হইয়াছে। যে কোন প্রকার বাতরোগে, সায়েটিকায়, গ্রন্থি-বেদনায়, শিরঃপীড়ায় এবং পেশীবেদনায় ইহাতে আশাতীত ফল দর্শে।



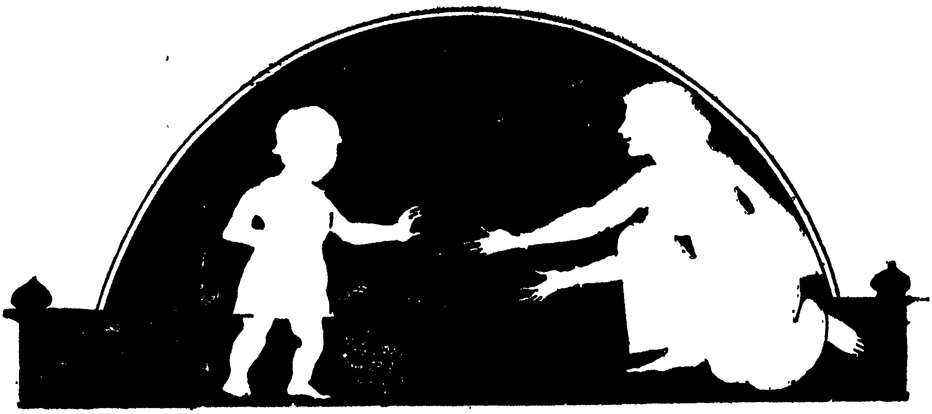
রাগাজ

সুইজারল্যাণ্ডের নিম্নলিখিত ঝরণাগুলি বাতরোগের চিকিৎসার জন্য বিখ্যাত—যথা—এগেল্ (Aigle), আল্‌ভানিউ (Alvanue), আন্দির (Andeer), বেক্স (Bex), গিউরনিগেল্ (Gurnigle), হেনিজ (Henniez), রাগাজ (Ragaz), ভিজবাদ্ (Weissbad) ইত্যাদি। স্নায়বিক বেদনার জন্য অনেকে আকোয়া রোজা (Aqua Rossa), আন্দির ("Andeer), লাভি (Lavey), বাইনজ লেক্ (Loeche Les Bains) প্রভৃতি স্থানে চিকিৎসার জন্য গমন করিয়া থাকেন।



রচি ইনিষ্টিটিউট

কিন্তু সাধারণের পক্ষে সুদূর সুইজারল্যাণ্ডে চিকিৎসার্থ যাওয়া অত্যধিক ব্যয়সাধ্য বিধায় একপ্রকার অসম্ভব। বিশ্বশ্রুত "সারিডন্" "সিরোলীন রচি" প্রভৃতি সর্ব্বত্র-ব্যবহৃত ঔষধের বিশাল কারখানা এই সুইজারল্যাণ্ডের বাজেল নামক সহরে অবস্থিত। ডাঃ বারেলের অপরিসীম ধৈর্য্য ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে রচি কোম্পানীর শাখাপ্রশাখা বিস্তার লাভ করিয়াছে। বহু বৎসর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে "সারিডন" সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ বেদনা-নাশক ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। রচির বিশাল ল্যাবরেটরী বাজেল সহরের একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থল।



সাময়িকী

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট—

গল্প আছে, কোন বাত-ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর দিয়াছিল :—

"কোন দিনই বা ভাল ;
একাদশী গেল, আবার পৌর্ণমাসী এল।"

বাঙ্গালা সরকারের বাজেট পরীক্ষা করিয়া ও অর্থ-সচিব সার জন উডহেডের বক্তৃতা পাঠ করিয়া আমাদিগের সেই গল্প মনে পড়িল। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনাবধি বাঙ্গালার আর্থিক দুর্গতি তাহার পথের সাথী হইয়া আছে। প্রথম বৎসরেই আয়ের তুলনায় ব্যয়ের আধিক্য—২ কোটি ১৫ লক্ষ ৪৬ হাজার টাকা। তাহার পর ৪ বৎসর ব্যয় অপেক্ষা আয় সামান্য কিছু অধিক হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে আমোদ-কর ও ঘোড়-দৌড়ে বাজি রাখার উপর নূতন কর সংস্থাপনের এবং সাধারণ ও কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্পের মূল্য বৃদ্ধি করায়। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে নূতন করদ্বয়ের আয় যথাক্রমে—৫ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ও ১৪ লক্ষ ৪৪ হাজার টাকা হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে ব্যয়ের আধিক্য ৪০ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা হয় ও ১৯৩১-৩৪ খৃষ্টাব্দের বাজেটে তাহা ২ কোটি ১০ লক্ষ ১০ হাজারে পরিণত হয়।

এ বার অর্থ-সচিব বলিয়াছেন—অবস্থা মন্দের ভাল। বর্ত্তমান বৎসরে ব্যয়াধিক্য ৬৫ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা হইবে—অনুমিত হইয়াছিল ; আগামী বর্ষে উহা ৫১ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ উন্নতি যৎসামান্য এবং তাহাতে সুবিধাও হইবে না। অর্থ-সচিব স্বীকার করিয়াছেন যে যৎসামান্য উন্নতি লক্ষিত হইতেছে, তাহা ভারত সরকার কর্ত্তৃক পাটের রপ্তানী শুল্কের অর্দ্ধাংশ প্রদানের ফল। সুতরাং বলা যাইতে পারে, যদি ঐ শুল্কের সম্পূর্ণ অংশ বাঙ্গালাকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলেও বাঙ্গালার যশোদার দড়ীর দুই মুখ মিলিবে না। অথচ শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য—এই সকলের জন্য অর্থব্যয় ব্যতীত বাঙ্গালার লোকের কর দানের ক্ষমতাবৃদ্ধি হইতে পারে না।

অর্থ-সচিব সব মামুলী কারণেরই উল্লেখ করিয়াছেন—মেষ্টনী ব্যবস্থা, ব্যবসা মন্দা, সন্ত্রাসবাদের জন্য ব্যয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যয়সঙ্কোচের জন্য প্রশংসালাভের চেষ্টাও করিয়াছেন। এই স্থানে তাঁহার সহিত আমাদিগের মতভেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কারণ, আমরা মনে করি, শাসনের ব্যয় সঙ্কোচ না করিলে উপায় নাই এবং ব্যয়সঙ্কোচ করাও অসম্ভব নহে। এ বিষয়ে প্রথম কথা—এ দেশে সিভিলিয়ান সম্প্রদায়ের বেতনের হার অকারণ অত্যধিক এবং তাহা এ দেশের—এই দরিদ্র দেশের পক্ষে দুর্ব্বহ ভার মাত্র। আর কোন দেশে সিভিল সার্ভিসে এত অধিক বেতন নাই। কেবল তাহাই নহে—অন্য অনেক চাকরীতে বেতন সিভিল সার্ভিসের চাকরীয়াদিগের বেতনের আদর্শে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দরিদ্র দেশে বাঙ্গালী মন্ত্রীরাও অনায়াসে শাসন পরিষদের সদস্যদিগের সমান বেতন লইতেছেন—তাহাতে লজ্জানুভব করা ত পরের কথা। বোধ হয়, এ কথা বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, বিলাতে লর্ড অক্সফোর্ড, লর্ড বার্কেনহেড, সার জন সাইমন প্রভৃতি মন্ত্রিত্ব স্বীকার করিয়া আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিয়াছেন—ত্যাগ করিয়াছেন ; আর এ দেশে মন্ত্রীরা লাভ করিয়াছেন ও করিতেছেন। বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিত্রয় মন্ত্রী হইবার পূর্ব্বে কে কত টাকা আয়-কর দিতেন, তাহার হিসাব দেখিলেই আমাদিগের কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্ণর ব্যবস্থাপক সভায় ব্যয়সঙ্কোচ কমিটীর নির্দ্ধারণের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—

"I have no doubt that under normal conditions we can carry on the work fairly comfortably with a Government of six members and if there were no question of preserving a communal balance the number

mighteven be reduced to five as recommended by the Committee."

অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় ৬ জনে কায চলে এবং সাম্প্রদায়িকতার আবদার না থাকিলে ৫ জনই কায চালাইতে পারেন। তখন গভর্ণর বলিয়াছিলেন—শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কায বাড়িয়াছে। এখন ত তাহা আর নাই, তথাপি যে ৭ জনই বহাল রহিয়াছেন তাহার কারণ কি? মন্ত্রীদিগের বেতন হ্রাসের কোন চেষ্টাও হয় নাই। কারণ—"লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।"

ইহার উপর আবার বাঙ্গালার বর্ত্তমান গভর্ণরের শাসনকালে সিভিলিয়ানদিগের জন্ম নিম্নলিখিত অতিরিক্ত পদের সৃষ্টি হইয়াছে—(১) গভর্ণরের অতিরিক্ত প্রাইভেট সেক্রেটারী—১জন; (২) ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার—১জন; (৩) অতিরিক্ত সেক্রেটারী—১জন; (৪) অতিরিক্ত সেক্রেটারীর জন্ম ডেপুটি সেক্রেটারী ১জন; (৫) সমবায় বিভাগের ডেপুটী সেক্রেটারী—১ জন; (৬) সমবায় বিভাগে অতিরিক্ত রেজিষ্ট্রার—১জন।

দপ্তরখানায় রাজনীতিক বিভাগে চীফ সেক্রেটারীর অধীনে ১জন ডেপুটি সেক্রেটারী ও ১জন সহকারী সেক্রেটারী থাকিলেও সরকারের বার্ষিক কার্য্য-বিবরণ রচনার জন্ম কয় মাস ১জন অতিরিক্ত ইংরাজ সিভিলিয়ান আমদানী করা হয়। তিনি ক্লার্কই হউন, আর হিজলী বন্দিবাসের কমাডাণ্ট বেকারই হউন, আর হিউজই হউন—তাঁহাদিগের কার্য্যের পরিচয়—গত বৎসরের রিপোর্টে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সম্বন্ধে যে উক্তি সরকারকে প্রত্যাহার করিতে হইয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করাতেই বুঝিতে পারা যায়।

যে ইংরাজ সিভিলিয়ান এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কমিশনার থাকা পর্য্যন্ত শৈলাবাসে না যাইয়াও কায করিতে পারেন, তাঁহারই শাসন পরিষদের সদস্য বা সেক্রেটারী হইলে—গ্রীষ্মকালে শৈলশিরে শৈত্য সম্ভোগ না করিলে চলে না। আবার এই সব ইংরাজের মত বাঙ্গালী সদস্য ও মন্ত্রীরাও শৈলশিরে কয় মাস যাপন করেন। ইহাতেও যে সরকারের ব্যয়বৃদ্ধি হয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

আমরা পূর্ব্বে যে ৬টি নূতন পদের উল্লেখ করিয়াছি, সে সব পদে অধিষ্ঠিত কর্ম্মচারীদিগের প্রত্যেকেরই কেরাণী হইতে চাপরাশীর ব্যয় অতিরিক্ত হয়।

বাঙ্গালা হইতে যে পাট রপ্তানী হয়, তাহার জন্ম লব্ধ শুল্ক যে বাঙ্গালার প্রাপ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেই কি বাঙ্গালার দুঃখ ঘুচিবে? গত বৎসর বাঙ্গালা সরকার ৫খানি আইন বিধিবদ্ধ করিয়া—ষ্ট্যাম্প ও কোর্ট ফীর মূল্যবৃদ্ধি, বিদ্যুতের ও তামাকের উপর কর সংস্থাপন এবং আমোদ করের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছেন। এই সকলে মোট প্রায় ২৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয় বৃদ্ধি হইবে।

কিন্তু যতক্ষণ সরকারের ব্যয়সঙ্কোচ-কার্য্য সম্পন্ন না হইবে ততক্ষণ যে বাঙ্গালায় কৃষির ও সেচের, শিক্ষার ও শিল্পের, স্বাস্থ্যের ও পথের উন্নত ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অথচ সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই—সেই জন্ম বাঙ্গালা সরকারের বাজেটেও তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

এ দিকে আমলাতন্ত্র সরকারের চেষ্টা না থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের বা বেদনার কারণ থাকিতে পারে না; কিন্তু এ দিকে দেশবাসীর ও যাঁহারা দেশবাসীর প্রতিনিধি বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করেন, তাঁহাদিগের দৃষ্টির অভাব কি একান্তই পরিতাপের বিষয় নহে?

নারী-নির্য্যাতনে বেত্রাঘাত—

বাঙ্গালার নানা স্থানে নারী-নির্য্যাতন যে সমাজের পক্ষে বিপদের ও লোকের পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে জানা যায়, সরকারের হিসাবে এইরূপ লজ্জাজনক ঘটনার সংখ্যা—১৯২৮ হইতে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দ এই কয় বৎসরে যথাক্রমে—৮ শত ৩৮, ৯ শত ২৮, ১ হাজার, ১ হাজার ৬৪, ৯ শত ১০ ও ৯ শত ৩৩—মোট ৫ হাজার ৬ শত ৭৩। বলা বাহুল্য, এরূপ অনেক ঘটনা লোক—বিশেষ হিন্দুরা—লোকলজ্জাভয়ে বা সংস্কার হেতু বা দুর্ব্বৃত্তদিগের ভয়ে—পুলিসের গোচর করে না। আর ইহা হিন্দুদিগের সম্বন্ধেই সমধিক প্রযোজ্য। যাহাদিগের বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"ইহারা কুকুর মারে, কিন্তু হাঁড়ী ফেলে না"—তাহারা হিন্দু সম্প্রদায়ে ঘৃণ্য বলিয়া বিবেচিত। যে

সব সম্প্রদায়ে বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন, সে সব সম্প্রদায়ের লোকই সহজে এরূপ ব্যাপারে পুলিসের সাহায্য লইতে অগ্রসর হয়। সুতরাং বুঝা যায়, প্রকৃত ঘটনার সংখ্যা ৫ হাজার ৮ শত ৭৩ হইতে অনেক অধিক। যে প্রদেশে এরূপ ঘটনা এত অধিক ঘটে, সে প্রদেশে এই পাপের প্রশমনকল্পে কঠোর ব্যবস্থার প্রয়োজন কে অস্বীকার করিতে পারে? এই অপরাধে অপরাধীর অন্য দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা সরকার যে এত দিন করেন নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এত দিনে সরকার এই ত্রুটি সংশোধনে উদ্যোগী হইয়াছেন। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ব্যবস্থা-সচিব সার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র এই বিষয়ে যে আইন মঞ্জুরীর জন্য উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনাকালে কয় জন মুসলমান সদস্যের ব্যবহারে অনেকে স্তম্ভিত হইয়াছেন। সার ব্রজেন্দ্রলালের বিশ্বাস ছিল, এই ব্যবস্থায় মতভেদ হইবে না। বোধ হয়, সেই জন্যই তিনি ইহার সমর্থনে বক্তৃতা করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কিন্তু মেদিনীপুরের মুসলমান মিষ্টার সহিদ সুরাবর্দ্দী এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করেন! ইনি বোধ হয়, পাঠকদিগের নিকট অপরিচিত নহেন। কারণ, কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়—মীণা পেশাওয়ারীর ব্যাপারে ইঁহার নাম সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

সরকারী হিসাবে দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বোক্ত ৬ বৎসরে ধর্ষিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা—৩ হাজার ৫ শত ২৫। অথচ প্রস্তাবিত আইনের প্রতিবাদ করিয়া মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলেন:—

(১) নারী ধর্ষণের অপরাধ অপেক্ষা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা অধিক দোষাবহ।

(২) এই সব ব্যাপারে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে। নিরপরাধ মুসলমানদিগকে এই অপরাধে অভিযুক্ত করিবার জন্য নানা (হিন্দু) প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(৩) হিন্দু জুরাররা প্রমাণ না থাকিলেও মুসলমান অভিযুক্তদিগকে দণ্ড দেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বিচারকদিগের সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, সভাপতির নির্দ্দেশে তাহা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হয়েন। সভাপতি যে হিন্দু জুরারদিগের সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিতে আপত্তি করেন নাই, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আরও যে সব আপত্তিজনক উক্তি হিন্দুদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে সকলের আলোচনা আমরা করিতে চাহি না। ব্যবস্থাপক সভায় উক্ত হইয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার প্রলাপোক্তির উল্লেখমাত্র করিলাম। কিন্তু—ইহা যদি প্রলাপোক্তি হয়, তবে আমরা অবশ্যই বলিব—"Though this be madness, yet there's method in it." আমাদিগের সময় সময় আশঙ্কা হয়, এ দেশে সাম্প্রদায়িকতার তীব্রতা যেরূপ বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহাতে হয়ত পরে সাম্প্রদায়িকতার প্রচারকদিগের জন্যও বেত্রাঘাত দণ্ডের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। যাহারা অতি ঘৃণ্য অপরাধে অপরাধীর দণ্ডবিধান সম্বন্ধেও সাম্প্রদায়িকতার অবতারণা করিতে পারে, তাহারা কিরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন তাহ সহজেই অনুমেয়।

টুণ্ডলা ষ্টেসনে কয়টা ফিরিঙ্গী রেলের চাকরীয়া যখন নারীধর্ষণের মামলায় অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হয়, তখন ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের পক্ষে ডাক্তার গিডনী নির্লজ্জভাবে আবেদন করিয়াছিলেন—তাহাদিগকে যদি বেত্রাঘাত করা হয়, তবে যেন ভারতীয়ের দ্বারা দণ্ডাদেশ তামিল করান না হয়। সুখের বিষয়, বাঙ্গালার বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা যেমনই কেন হউক না—সে সভাতেও মিষ্টার সুরাবর্দ্দী তাঁহার আপত্তি গ্রাহ্য করাইতে পারেন নাই।

মানুষ যে ধর্ম্মাবলম্বীই কেন হউক না, সমাজের পবিত্রতা রক্ষা করা তাহার ধর্ম্মমতানুমোদিত। হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ—সকল ধর্ম্মেই নারীর প্রতি অত্যাচার নিন্দিত। সেই জন্য কেহ যদি মনে করেন, মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ধর্ম্মের দিকে দৃষ্টি না দিয়া কেবল হিন্দুবিদ্বেষবশে এই বিধানের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তবে তাঁহাকে ভ্রান্ত বলা যায় কি না সন্দেহ। আর যে মুসলমান সমাজের ৩ হাজার ৫ শত ২৫ জন নারী ৬ বৎসরে ধর্ষিতা হইয়াছে, সেই মুসলমান সমাজ যদি মিষ্টার সুরাবর্দ্দীর কার্য্যের সমর্থন করেন, তবে বলিতে হইবে—এইরূপ নেতার নেতৃত্বে কি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের উন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে? মুসলমান-শাসিত দেশে এইরূপ হীন অপরাধে অপরাধী-

দিগের কিরূপ দণ্ডের ব্যবস্থা আছে? এরূপ অপরাধে বেত্রাঘাত-দণ্ডের উপযোগিতা বিলাতেও স্বীকৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালা সরকার যে এখন বেত্রাঘাত-দণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন, ইহাও হয়ত পশুপ্রকৃতি ব্যক্তিদিগকে নিবৃত্ত করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইবে না। যদি না হয়, তবে আমরা নবীন জার্ম্মানীর বিধাতা হিট্‌লারের ব্যবস্থার অনুমোদন করিব। তিনি এরূপ ক্ষেত্রে অপরাধীকে নিৰ্ব্বীৰ্য্য করিবার জন্য অস্ত্রোপচারের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখনও সে ব্যবস্থার ফল পরীক্ষাধীন। পরীক্ষা সফল হইলে deterrent দণ্ড হিসাবে উহার প্রবর্ত্তন প্রয়োজন হইতে পারে। কারণ হিসাবে দেখা যায়, বাঙ্গালায় এই ঘৃণ্য অপরাধের বৃদ্ধিই পরিলক্ষিত হইতেছে এবং সমাজের কল্যাণকল্পে ইহার দমন প্রয়োজন।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে এইরূপ অপরাধে অপরাধীকেও যথাসম্ভব কঠোর দণ্ড দিতে অনিচ্ছুক তাহারা হিন্দুই হউক—আর মুসলমানই হউক, তাহাদিগের বুদ্ধি-বিকার ঘটিয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে মন্দ হয় না।

হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান নির্ব্বিশেষে এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিমাত্রেরই কঠোরতম দণ্ডের ব্যবস্থা ব্যতীত সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। সেইরূপ দণ্ড-ব্যবস্থায় যিনি বিরোধী হইবেন, তিনিই যে সমাজের কল্যাণ সম্বন্ধে অনবহিত, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ডাক বিভাগের আয়-ব্যয়—

১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দে সরকারের ডাক বিভাগের আয়-ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায়, ডাক ও তার বিভাগে আয় ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। সরকারের বিবরণে বলা হইয়াছে—কেবল ব্যবসা মন্দা দূর হওয়াতেই এই পরিবর্ত্তন হয় নাই; পরন্তু পত্রের, বিমান ডাকের, তারের ও টেলিফোনের মাশুল হ্রাসও পরিবর্ত্তনের কারণ। আলোচ্য বর্ষে মোট আয় ৪৭ লক্ষ টাকা বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে পত্রের জন্য মাশুলের হার প্রথম আড়াই তোলায় ৫ পয়সা ছিল—পরে স্থির করা হয়, অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের পত্র ১ আনা মাশুলে যাইবে। বিমান ডাকে মাশুলও ঐ ভাবে কিছু হ্রাস করা হয়। তারের সম্বন্ধে ব্যবস্থা হয়—প্রথম ১২ কথার জন্য যে ১৩ আনা দিতে হইত, তাহার স্থানে প্রথম ৮ কথার জন্য ৯ আনা দিতে হইবে। টেলিফোনের জন্য বার্ষিক ২ শত ৫০ টাকার স্থানে ১ শত ৯২ টাকা দেয় স্থির করা হয়। কিন্তু পুস্তকাদির মাশুল বাড়ান হয়। এই শেষোক্ত ব্যবস্থার ও ভি, পি মাশুলের ফলে পুস্তকের ব্যবসার সর্ব্বনাশ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যে লোকের জ্ঞানার্জ্জনের পথ বিঘ্নাস্তৃত করা হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই।

যখন দেখা যাইতেছে, পত্রের মাশুলে বা তারের মাশুলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনরূপ হ্রাস ব্যবস্থা না করিলেও যথাক্রমে ওজনের ও কথার পরিমাণ অনুসারে সামান্য মাশুল হ্রাসেও আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তখন এ কথাও অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, বুকপ্যাকেটের ও ভি, পি'র মাশুল হ্রাস করিলে সেইরূপ ফললাভই হইবে। কেন যে সে দিকে ডাক-বিভাগের কর্ম্মচারীদিগের ও অর্থ-সচিবের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই, তাহাই বিস্ময়ের বিষয়। অথচ এ বিষয়ে পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন দেশের লোক বিশেষভাবেই অনুভব করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে আমরা ডাকবিভাগের একটি বিস্ময়কর ব্যবস্থার প্রতি সরকারের মনোযোগ আকৃষ্ট করিব। কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ও টেলিফোন কর্পোরেশন প্রতি মাসে গ্রাহকদিগের নিকট যে "বিল" ডাকে পাঠান, তাহা "বুক পোষ্ট" হিসাবে গৃহীত হয়। অথচ সংবাদপত্রের বা মাসিকপত্রের মূল্যের জন্য গ্রাহকদিগকে যে পত্র লিখিত হয়, তাহাতে পত্র হিসাবে অধিক মাশুল দিতে হয়! এই ব্যবস্থা-বৈষম্যের কারণ কি? "বিল"-গুলি প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র এবং তাহাতে দেয় টাকার পরিমাণও নির্দ্দেশ করা হয়।

সরকারের টেলিফোনের জন্য মাশুল বার্ষিক ২ শত ৫০ টাকার স্থলে ১ শত ৯২ টাকা করিয়াও লাভ হইতেছে। বার্ষিক ১ শত ৯২ টাকা দিলে সরকারী টেলিফোনে গ্রাহক যত বার ইচ্ছা লোকের সহিত কথা বলিতে পারেন। অথচ কলিকাতায় টেলিফোন কর্পোরেশনে গ্রাহককে অনেক অধিক টাকা দিতে হয়! টেলিফোন যদি "পাবলিক ইউটিলিটি সার্ভিস" অর্থাৎ লোকের সুবিধার জন্য স্বীকার করিতে হয়, তবে বলা যাইতে পারে, যে স্থানে একচেটিয়া

ব্যবসায়ের সুযোগে কোন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান টেলিফোনে অকারণ অতিরিক্ত লাভ করেন, সে স্থানে সরকার উহা লইয়া পরিচালিত করিলেই ভাল হয়। সরকারের হিসাবে দেখা গিয়াছে, টেলিফোনের মাশুল বার্ষিক ২ শত ৫০ টাকা হইতে ১ শত ৯২ টাকা করা সম্ভব। তবে কলিকাতায় টেলিফোন কোম্পানী কি জন্য তাঁহাদিগের মাশুল হ্রাস করিতে বাধ্য হইবেন না? সংপ্রতি কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্পোরেশনের মূল্য সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে দেখা গিয়াছে, সে কোম্পানী বিদ্যুতের মূল্য যে হারে আদায় করিতেছেন, তাহা কেবল অসঙ্গতই নহে—অন্যায়ও বটে।

ডাকবিভাগে ব্যয়সঙ্কোচের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাও সংশোধিত হইতে পারে; কারণ তাহাতে নিম্নদিকে যত মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, উচ্চদিকে তত দেওয়া হয় নাই।

ভারত সরকারের বাজেট—

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে দিল্লীতে ভারত সরকারের বাজেট ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ব্যয় অপেক্ষা আয় মাত্র ২ কোটি ৫ লক্ষ টাকা অধিক দেখান হইয়াছে। ইহাতে যাঁহারা মনে করিতেছেন, ভারতবর্ষের আর্থিক দুর্গতি সম্বন্ধে "গেল কুদিন সুদিন ভেল" আমরা তাঁহাদিগের সহিত একমত হইতে পারি না। কারণ এই বাজেট পরীক্ষা করিয়া আমাদিগের সেই প্রচলিত কথা মনে পড়িল—"উপরে চিকণ—ভিতরে খড়।" তাহার কারণ, ২ কোটি টাকা ভারতের রাজস্বের তুলনায় নগণ্য। যত দিন বর্ত্তমান আয়-ব্যয়-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন সাধিত না হইবে, ততদিন প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হইবে না। আগামী বৎসরের আনুমানিক আয়—৮৭ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা; আর আনুমানিক ব্যয়—৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। এই যে ৮৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা—ইহার মধ্যে ৪৫ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা সামরিক ব্যয় বাবদে বরাদ্দ হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকার মধ্যে বড়লাটের বেতন হইতে আরম্ভ করিয়া শাসন বিভাগের সব ব্যয় বাদ দিলে প্রজার কল্যাণকর কার্য্যের জন্য কত টাকা অবশিষ্ট থাকে?

আমেরিকা তাহার বেকারদিগের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করিয়াছে এবং ইংলণ্ড বেকারদিগের সাহায্যকল্পে এ পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাহা মনে করিলে কি বেকার-সমস্যার সমাধানকল্পে যে বাজেটে কিছুই বরাদ্দ করা হয় নাই, সে বাজেট উপহাস—নিষ্ঠুর উপহাস বলিয়াই মনে হয় না? যতদিন সমর বিভাগের ও শাসন বিভাগের অত্যধিক ব্যয় সঙ্কুচিত করা না হইবে, ততদিন আশার অবকাশ কোথায়? গত কয় বৎসরে প্রজার কর-ভার যেরূপ বর্দ্ধিত করা হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাগ্রে তাহার সেই দুর্ব্বহ ভার লঘু করাই সঙ্গত ছিল। কিন্তু তাহার কোন চিহ্ন বাজেটে নাই। কেবল:—

(১) বার্ষিক ২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়ে আয়-কর দিতে হইবে না।

(২) আয় করের ও সুপার ট্যাক্সের অতিরিক্ত ভার কিছু লঘু করা হইবে।

বার্ষিক ২ হাজার টাকা আয় এই দরিদ্র দেশে কয় জনের আছে? সুতরাং এই ব্যবস্থায় তেলা মাথায় তেল ঢালা না হইলেও প্রজাসাধারণের যে কোন উপকার হইবে না, তাহা বলা বাহুল্য।

লবণের শুল্ক সমান রহিল—অর্থাৎ সমভাবে দরিদ্রকে পীড়িত করিতে থাকিল।

ডাকের মাশুলে যে ব্যবস্থা হইল, তাহাতে দরিদ্রের ব্যবহার্য্য পোষ্টকার্ডের মূল্য পূর্ব্ববৎ রহিল।

বড়লাটের সফর ও কর্ম্মচারীদিগের শৈলবিহার সম্বন্ধে আর অরণ্যে রোদন করিব না। যখন লবণের শুল্কই হ্রাস করা হইল না, তখন এ সব বিলাস-ব্যয় যে হ্রাস করা হইবে, এমন আশা আমরা করি না—করিতে পারি না।

সিন্ধু ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইবে। সেই জন্য প্রদেশদ্বয়কে যথাক্রমে ১ কোটি ৮ লক্ষ ও ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হইবে।

কৃষি গবেষণা, উটজ শিল্পের উন্নতি ও বেতারের প্রসার—এই সব বাবদে টাকা প্রদত্ত হইবে। কিন্তু যে স্থানে উটজ শিল্পের উন্নতি সাধনকল্পে মাত্র ৫ লক্ষ টাকা প্রদত্ত হইবে, সে স্থানে বেতারের প্রসার-বৃদ্ধির জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই! অথচ কোনটির প্রয়োজন অধিক তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহার নাই, ইহা কখনই মনে করা যাইতে পারে না।

মোট কথা—বাজেটের ব্যবস্থায় সম্পত্তি-সম্পন্নদিগের কিছু উপকার হইলেও দরিদ্র ও পিষ্ট প্রজাসাধারণের প্রয়োজন একেবারে অবজ্ঞাত ও উপেক্ষিত হইয়াছে। আমরা ইহাকে কোন মতে সমৃদ্ধির বাজেট বলিতে প্রস্তুত নহি।

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার—

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় সম্প্রতি কলিকাতা যাদুঘরের প্রত্নতত্ত্বশাখার ও ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হইয়াছেন জানিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। ননীগোপালবাবু ১৯২০ হইতে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন



শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার

ভারতীয় ইতিহাস বিষয়ের অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন এবং মৌলিক গবেষণার জন্য প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৬ পর্য্যন্ত রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কিউরেটারের কাজ করার পর তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৯৩১ সাল পর্য্যন্ত তিনি সিন্ধুদেশস্থ মহেঞ্জোদাড়ো ও অন্যান্য স্থানে খনন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার খনন বিবরণ সম্প্রতি "Exploration in Sind" নামে গ্রন্থাকারে ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। গত জানুয়ারী মাস হইতে মজুমদার মহাশয় উত্তর বিহারে চাম্পারণ জেলায় লৌড়িয়া নন্দনগড়ে খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্প্রতি তাঁহাকে অবৈতনিক অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিয়া গুণের সমাদর করিয়াছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত—

ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত গত বৎসর স্ত্রী ও শিশু-রোগ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন।



ডাক্তার মহেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

তিনি ডাবলিনের রোটাণ্ডা হাসপাতাল হইতে ধাত্রী বিদ্যা ও স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা বিষয়ে পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স সমাপ্ত করিয়া এল, এম উপাধি লাভ করিয়াছেন। সুরমা উপত্যকায় তিনিই সর্ব্বপ্রথম এই উপাধি লাভ করিলেন। তিনি লণ্ডন মেডিকেল ও পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট এসোসিয়েশনের সদস্য। ডাক্তার দত্ত সিভিলিয়ান শ্রীযুত গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের ভাগিনেয়।

শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন—

শ্রীযুত বিনয়কুমার সেন সম্প্রতি লণ্ডনের চার্টার্ড একাউণ্টেন্সী এবং ইনকরপোরেটেড একাউণ্টেন্সীর শেষ পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। মাত্র দুই সপ্তাহের ব্যবধানে পর পর দুইটি কঠিন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত সাফল্য লাভ করা বিশেষ প্রশংসনীয়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এস সি পরীক্ষা পাশ করিয়া মাঞ্চেষ্টারের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, কম



শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সেন

পরীক্ষায় পাশ হইয়াছেন। ইনি বর্দ্ধমান-কালনার সুপ্রসিদ্ধ সেন পরিবারের স্বর্গীয়. গোপালচন্দ্র সেনের পুত্র এবং কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার কবিরাজ শ্রীযুত সত্যব্রত সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।

খাল খনন—

বাঙ্গালা সরকার ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় কুতুলিয়া খাল খননের যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেশের লোকের স্বাবলম্বন পরিচয়ে সকলেই প্রীত হইবেন। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই খাল ব্রাহ্মণবেড়িয়া সহরের উত্তর-পশ্চিমে নদীর দুইটি শাখা সংযোগ করিত। এই খাল মজিয়া যাওয়ায় ৩০ বর্গমাইল স্থানব্যাপী বিলে বার বার বন্যার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাতে লোকের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে। কয় বৎসর হইতে জেলাবোর্ড ও সরাইল জমীদারীর পক্ষ হইতে খালটির সংস্কার-চেষ্টা হইয়াছে বটে, কিন্তু চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয় নাই।

তাহার পর যাহাদিগের কায সেই স্থানীয় লোকরা—পদমর্য্যাদানির্ব্বিশেষে—এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণবেড়িয়া সমবায় গ্রাম-সংস্কার সমিতির উদ্যোগে জরীপের কায শেষ হইলে ৩ মাইল দীর্ঘ, ৬৫ ফিট প্রস্থ ও ১০ ফিট গভীর খাল খননের সঙ্কল্প করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয় খালের উত্তর কূলে ৩০ ফিট চওড়া রাস্তা করা হইবে। হিসাব করিয়া দেখা হয়, যদি ১০ হাজার লোক প্রতিদিন কায করে, তবে ৩ মাসে এই কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। সমগ্র স্থানটি ২৫ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং স্বেচ্ছাসেবকরা কায পর্য্যবেক্ষণ করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে। মার্চ্চ মাসের শেষেই যাহাতে খনন কার্য্য শেষ হয় তাহারই ব্যবস্থা হইয়াছে। কারণ বর্ষার পূর্ব্বেই কায শেষ করিতে হইবে। চারিদিকের লোককে এই কার্য্যে যোগ দিতে আহ্বান করা হইয়াছে। এই আহ্বান ব্যর্থ হওয়া ত পরের কথা ইহাতে অপ্রত্যাশিত আগ্রহ উদ্ভূত হইয়াছে। ১লা জানুয়ারী তারিখে যখন কায আরম্ভ হয়, তখনই ১০ হাজারের অধিক লোক কাযে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে যাঁহারা কায করিতেছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে স্থানীয় রাজকর্ম্মচারী, উকীল, ব্যবসায়ী প্রভৃতি হইতে কৃষক ও শ্রমিক আছেন। কেহ কেহ দিনের পর দিন আসিয়া কায করিতেছেন। কোন দিন লোকের সংখ্যা ১০ হাজারের কম হয় নাই এবং কোন কোন দিন ২০ হাজার লোক কোদালী লইয়া মাটী কাটিয়া ঝুড়ী পূর্ণ করিয়া মাথায় বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন। রাত্রিতে দীপালোকেও কায চলে। ২০ হইতে ২৫ মাইল দূরবর্ত্তী স্থান হইতেও লোক কায করিতে আসিতেছেন। কায যেরূপ অগ্রসর হইতেছে তাহাতে মনে হয়, নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই খাল খনন ও রাস্তা গঠন শেষ হইবে।

এই খাল সম্পূর্ণ হইলে ব্রাহ্মণবেড়িয়া হইতে ভৈরবে গতায়াতের অনেক সুবিধা হইবে। বর্ত্তমানে নৌকায়

ভৈরবে উপনীত হইতে ৬ দিন অতিবাহিত হয়। খালের পথে নৌকা ১ দিনে ভৈরবে আসিতে পারিবে। বিল হইতে জলনিকাশের এই ব্যবস্থায় বন্যায় শস্যহানি নিবারিত হইবে এবং তাহা আবার শস্যক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

এখন ব্রাহ্মণবেড়িয়ার লোক বুঝিতে পারিয়াছে, তাহারা ইচ্ছা করিলে আপনাদিগের কল্যাণকর কার্য্য আপনারা সম্পন্ন করিতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে অপরের দ্বারস্থ হইতে হয় না। অর্থাৎ সরকারের কাছে—

"আবেদন আর নিবেদনের থালা
বহে বহে নতশির"

হইয়াও যখন তাহারা আবশ্যক সাহায্য লাভ করে নাই, তখন তাহারা আপনাদিগের কায আপনারা করিবার সঙ্কল্প করিয়া স্বাবলম্বী হইয়াছে এবং স্বাবলম্বনের ঐন্দ্রজালিক শক্তি অনুভব করিয়াছে। এ দেশের জনগণ-প্রতিষ্ঠানসমূহ নূতন শাসনের ফলে বিনষ্ট হইবার পূর্ব্বে জনগণের সমবেত চেষ্টায় এইরূপ বহু কল্যাণকর কার্য্য সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন হইত। যদি আবার সেই সঙ্ঘ-শক্তির সাধনায় আমরা সিদ্ধি লাভ করিতে পারি, তবে যে আমাদিগের অনেক দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীর প্রয়োজন—

পাবনা জিলার জামতৈল নামক স্থানে "রায়ত ও খাতক সম্মিলনে"—নবাব সার কে, জি, এম, ফারুকী সাহেব বাঙ্গালার কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া যে সব কথা বলিয়াছেন, সে সব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালী যে জীবন-সংগ্রামে অন্যান্য প্রদেশের লোকের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া দারিদ্র্য-দুর্দ্দশার পঙ্কে পতিত হইতেছে, তাহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এ কথার বিশেষ আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। নবাব সাহেবের কথার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উচ্চ বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করেন নাই, সহানুভূতিসিক্ত কথায় লোককে কর্ত্তব্য কি—সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার প্রথম কথা, বাঙ্গালার কৃষক বুদ্ধিমান হইলেও অলস। বাঙ্গালার "৫ কোটি লোকের মধ্যে কেবলমাত্র ১ কোটি ৩৭ লক্ষ লোক উপার্জ্জন করে" —অবশিষ্ট তাহাদিগের উপার্জ্জনের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। বাঙ্গালার পাটের কলে মজুর প্রায় সবই বাঙ্গালার বাহিরের—কলিকাতার শ্রমিক অধিকাংশই অবাঙ্গালী।

বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হওয়ায় হয়ত তাহার শ্রমবিমুখতা বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯:১ খৃষ্টাব্দের আদম-শুমারের বিবরণে লিখিত হইয়াছিল:—

"A leading cause of poverty and of many other disagreeables in a great part of Bengal is the prevalence of Malaria. For a physical explanation of the Bengali's lack of energy, Malaria would count high."

সেই জন্য নবাব সাহেবের অভিভাষণে বলা হইয়াছে —"আপনাদিগকে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিতে হইবে। আপনি যদি প্রত্যহ একটু সময়ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিবেশ করেন, তাহা হইলে আপনি কেবল আপনার নয়—আপনার পরিবারের প্রত্যেককে সুস্থ রাখিতে সমর্থ হইবেন। আপনার বাড়ীর চারিদিকে যে আগাছা ও জঙ্গল জন্মায়, তাহা কাটিয়া ফেলা আপনারই কর্ত্তব্য। আপনার ডোবায় যে মশা হয়, তাহা ধ্বংস করিবেন—আপনি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকা এবং অপরিষ্কার খাদ্য খাওয়া এবং স্বাস্থ্যরক্ষার সামান্য সামান্য নিয়ম পালন না করা আপনার পাপ।"

প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে লর্ড ডাফরিণ এ দেশের লোকের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, যাহারা যে পুষ্করিণীতে স্নান করে, সেই পুষ্করিণীর জলই পান করে—তাহাদিগের মধ্যে সংস্কারের প্রয়োজন যত অধিক, তত আর কোথাও নহে। বলা বাহুল্য, অনেক ক্ষেত্রে পুষ্করিণীর অভাবই ইহার কারণ। কিন্তু সে অভাব—গ্রামের সকল লোকের অভাব এবং গ্রামের লোকের সমবেত চেষ্টা ও সঙ্কল্পই সে অভাব দূর করিতে পারে।

দারিদ্র্য যেমন মানুষের শক্তি হরণ করে, শক্তির অভাবে তেমনই দারিদ্র্য বর্দ্ধিত হয়। সেই জন্য মানুষ সুস্থ ও সবল হইয়া আলস্য বর্জ্জন করিলে দারিদ্র্যের দংশন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। গ্রামে থাকিয়া কিরূপে লোক আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে পারে—কিরূপে নিজ চেষ্টায় সে কায করিতে পারে, তাহারও আলোচনা এই অভিভাষণে দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি।

"ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, আমরা আমাদের

প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাউলও উৎপন্ন করি না।" এইরূপে ডাউল সরিষা প্রভৃতির জন্য আমরা অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করি। এই সব জিনিষ যে বাঙ্গালায় উৎপন্ন করা যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ আমরা অপরের মুখাপেক্ষী।"

যদি দেশের অজ্ঞ জনগণকে এই সব কথা সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়া—বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতীকারোপায় নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়, তবে যে সুফল ফলে তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কাশীধামে রামকৃষ্ণ মন্দির—

বহু ধর্ম্মের মিলনভূমি মন্দিররাজি পরিশোভিত কাশীধামে আর একটি নূতন মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য অধুনা সমাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরটি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নামে উৎসৃষ্ট। কারুকার্য্য ও বিস্তৃতি হিসাবে এইরূপ দেবালয় কাশীধামে বিরল। বিন্ধ্যাচল হইতে আনীত প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রস্তরগাত্রে দশাবতার, দশমহাবিদ্যা ও অন্যান্য দেবদেবী এবং পরমহংসদেব, তাঁহার পত্নী ও স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসিগণের প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত হইয়াছে। ইহার উচ্চতা ৫৫´ ফুট এবং গর্ভ-মন্দিরের আয়তন ১৯৬´ বর্গ ফুট্। মন্দিরের অন্তর্ভাগ দুইভাগে বিভক্ত। মন্দিরের নিম্নে ভূগর্ভে চারিদিকে যে "তয়খানা" নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতে এক অংশে পূজা ও ভোগরাগের উপযুক্ত দ্রব্যাদি সজ্জিত থাকিবে এবং অপর তিন অংশে সাধু ও ভক্তেরা ভগবানের ধ্যান-ধারণাদি করিতে পারিবেন। কাশীর মত হিন্দুর পবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে ঠাকুর রামকৃষ্ণের জন্য মন্দিরের পরিকল্পনা যাঁহারা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা উহার জন্য গত পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া অর্থাদি সংগ্রহ ও কর্ম্ম-পরিচালনাদি করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত-আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নির্ভরানন্দ। কঠিন রোগে চলচ্ছক্তিহীন হইয়াও ইনি যে ভাবে এই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী এই কার্য্যে অকাতরে অর্থ সাহায্য এবং বহু ইঞ্জিনিয়ার অক্লান্তভাবে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শতবার্ষিকী জন্ম-মহোৎসব উপলক্ষে গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী কাশীর সাধু ভক্ত ও বিদ্বজ্জন সমক্ষে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।



কাশী রামকৃষ্ণ মন্দির

মহিলা কবির সম্মান—

আমরা অতীব আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলা কবি শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী ও শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসুকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিগত সমাবর্ত্তন অনুষ্ঠান উপলক্ষে পদক দানে সম্মানিত করিয়াছেন। কবি ও উপন্যাসলেখিকা

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী 'জগত্তারিণী পদক' ও কবি শ্রীযুক্তা মানকুমারী বসু 'ভুবন-তারিণী পদক' লাভ করিয়াছেন।

রামকৃষ্ণ জন্ম-শত-বার্ষিকী—

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের জন্মশত-বার্ষিকী উৎসব সহকারে অনুষ্ঠিত হইতেছে। কলিকাতার উপকণ্ঠে জাহ্নবীর কূলে যে ভক্ত ব্রাহ্মণ সন্তান কিতাবতী শিক্ষার অনুশীলন না করিয়া সত্যের সন্ধানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন—যাঁহার ভাবোন্মাদ কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রতীচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত সত্যান্বেষীদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং বিবেকানন্দ স্বামীর মত প্রতিভাবান যুবককে তাঁহার দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল—যাঁহার সর্ব্বধর্ম্মের মূলগতঐক্য-বোধ আজ সমগ্র সভ্য জগতের মনীষীদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে—যাঁহার শিষ্যদিগের দ্বারা একদিকে যেমন বিদেশে বেদান্ত-বাণী প্রচারিত হইতেছে, অপরদিকে তেমনই সেবা-ধর্ম্মে দেশের লোক শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতেছে, তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা জনগণের পক্ষে স্বাভাবিক। যে ধর্ম্মের বক্ষে তাঁহার জন্ম ও যে ধর্ম্ম তাঁহার সংস্কার সৃষ্টি করিয়াছিল, সেই ধর্ম্মের উদারতা তাঁহার উপদেশে স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। আজ যে হিন্দুধর্ম্মের স্বরূপ হিন্দুস্থানের বাহিরে—ইহকালসর্ব্বস্ব য়ুরোপে ও আমেরিকায়—এই যান্ত্রিক যুগে—প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যে বহু পরিমাণে রামকৃষ্ণ শিষ্যদিগের চেষ্টায়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার ফলে হিন্দুধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার অবসান হইয়াছে।



গত ১লা মার্চ্চ বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসবে দুই সহস্র মহিলা একত্র প্রসাদ গ্রহণ করিতেছেন

ফটো—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়



রামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বেলুড় মঠে প্রসাদ গ্রহণের স্থানের প্রবেশপথে সমবেত জনতা

ফটো—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য—

মাত্র এই একজন বাঙ্গালী এবার আই, পি, এস চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছেন।



শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি ভট্টাচার্য্য

শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—

কালীকৃষ্ণবাবুর বয়স মাত্র ১৯ বৎসর—ইনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের মিলিটারী হিসাব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত অনাদিচরণ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি বিলাতের 'টেম্‌স নটিক্যাল ট্রেণিং কলেজ' হইতে নৌ-বিদ্যার পরীক্ষা পাশ করিয়া প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া বি, আই, এস, এন কোম্পানীতে শিক্ষানবীশ নিযুক্ত হইয়াছেন!



শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

কুমারী সুকৃষ্ণা বসু—

আসাম ডিব্রুগড়ের ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা কুমারী সুকৃষ্ণা বসু গত বঙ্গীয় সঙ্গীত সম্মিলনীতে যোগদান ফলে সেতারে চতুর্থ এবং এসরাজে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ-খচিত পদক প্রাপ্ত' হইয়াছেন। তিনি গত বৎসর এলাহাবাদে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মিলনীতেও এসরাজে প্রথম পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতার প্রসিদ্ধ মৃদঙ্গাচার্য্য শ্রীযুত দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে এক বৈঠকে সুকৃষ্ণা তাঁহার ধ্রুপদ গানে উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ডিব্রুগড়নিবাসী প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীযুত হরিদাস সান্ন্যাল মহাশয়ের নিকট সুকৃষ্ণা গীতবাদ্য শিক্ষা করিয়াছেন।



কুমারী সুকৃষ্ণা বসু

রেল বাজেট—

এদেশে রেলপথের বিস্তার কত অধিক এবং তাহাতে কত টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা মনে করিলে স্বতঃই আশা করা যায়, ইহাতে সরকারের প্রভূত লাভ হইবার কথা। ইহাতে মূলধন হিসাবে প্রায় ৮শত ৮৫ কোটি টাকা প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন বহুদিন রেলে লাভ হয় নাই—গত কয় বৎসর হইতে আবার তেমনই লোকসান হইতেছে। ভারতে রেলপথের বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য দেশে যেমন অন্তর্বাণিজ্যের জন্যই রেলপথ রক্ষিত হয়, এদেশে তেমনই বহির্বাণিজ্যের জন্য অর্থাৎ বিদেশের সহিত বাণিজ্যে অধিক মনোযোগ প্রদান করা হয়। সেচের খালের উপযোগিতা যত অধিকই কেন হউক না এবং তাহাতে যত লাভই কেন হউক না—সরকার রেলের দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়া আসিয়াছেন। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন, যখন রেল ব্যবসা—তখন ঋণ করিয়া মূলধন দ্বারা রেলপথ রচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা না করিয়া ভারত সরকার যে রাজস্বের উদ্বৃত্ত টাকাও রেলে ব্যয় করেন তাহার কারণ—

"I know there is the standing pressure of the European Mercantile Community, to expend every available rupee on Railways and these men are powerful both in this country and in England."

মধ্যে কয় বৎসর লাভের পর ভারতে রেলে আবার ক্ষতি আরম্ভ হইয়াছে। গত বৎসর বাজেটে যে লোকসান হইবে মনে হইয়াছিল, তদপেক্ষা লোকসানের পরিমাণ ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা অধিক হইয়াছে। অথচ লোকসান কম হইবে, এই অনুমানে নির্ভর করিয়া কর্ম্মচারীদিগের বেতনহ্রাস-ব্যবস্থা বাতিল করা হইয়াছিল!

এবার আনুমানিক ঘাটতী—সাড়ে ৩ কোটি টাকা। এই লোকসানের কারণ-নির্দ্দেশকল্পে রেলওয়ে সচিব সার মহম্মদ জাফর উল্লা খাঁ বলিয়াছেন, কারণ ত্রিবিধ :—

(১) পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা মন্দা—পণ্যের অসাধারণ মূল্য-হ্রাস।

(২) পৃথিবীর সকল দেশে (ভারতবর্ষেও) স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টা এবং পণ্যের ও অন্তর্বাণিজ্যের পুষ্টি।

(৩) মোটরের প্রতিযোগিতা এবং অল্প পরিমাণে—জলযানের প্রতিযোগিতা।

আমরা এই কারণ-নির্দ্দেশ সমর্থন করিতে পারি না। পৃথিবীর সকল দেশেই ব্যবসা মন্দা হইয়াছে ও পণ্যের মূল্য কমিয়াছে। কিন্তু আর সব দেশ কিরূপে লোকসান হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে?

পৃথিবীর সব দেশের স্বাবলম্বী হইবার চেষ্টার সঙ্গে ভারতে রেলপথের আয়ের সম্বন্ধ কতটুকু। অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধিতে যে রেলের আয় বৃদ্ধিই অনিবার্য্য তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। তবে বহির্বাণিজ্যের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া যে ক্রমাগত রেলপথ রচনা করা হইয়াছে, তাহারই ফলে যে আজ এই দুরবস্থা তীব্র হইয়াছে, তাহা আমরা স্বীকার করি।

মোটরের ও জলযানের প্রতিযোগিতা প্রহত করিবার একমাত্র উপায়—রেলে ভাড়া হ্রাস করা। সে বিষয়ে যে আবশ্যক চেষ্টা হইয়াছে ইহা মনে হয় না।

কেবল ইহাই নহে—যখন এই কারণত্রয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি স্থায়ী হইবে, তখন পূর্ব্বকৃত ভ্রমের সংশোধন ও ব্যয়সঙ্কোচ ব্যতীত উপায় কি? রেলওয়ে বোর্ডের প্রয়োজন আছে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। বার বার ব্যবস্থা পরিষদে দেখান হইয়াছে, যে পদ্ধতিতে কয়লা ক্রয় করা হয় তাহার পরিবর্ত্তন করিলে অনেক টাকা ব্যয়-হ্রাস হয়। সরকারের অন্যান্য বিভাগের মত এই বিভাগেও চাকরীয়াদিগের বেতন অনেক ক্ষেত্রে অকারণ অধিক।

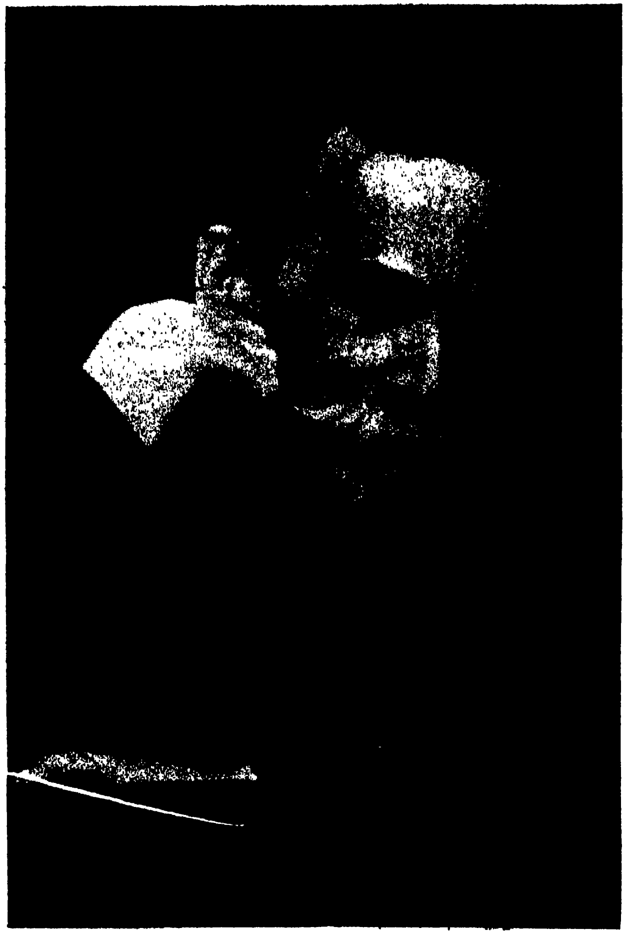
এই সব ত্রুটি সংশোধিত হইলে যে ব্যয়-সঙ্কোচ ও তাহার ফলে লোকসান হ্রাস হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই।



শোক-সংবাদ

ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ারোধহেতু ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু হইয়াছে। কলিকাতা যোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যতম পুত্র হেমেন্দ্রনাথের তিন পুত্রের মধ্যে ঋতেন্দ্রনাথ অন্যতম। তাঁহার সহোদরদ্বয়ের নাম—ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও হিতেন্দ্রনাথ। পরিবারের সাহিত্যানুরাগ ও জ্ঞানার্জ্জন-স্পৃহা ইনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছিলেন। ঋত্যেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা করিতেন এবং সে সকলের উদ্ভব-কারণ ও উপযোগিতা, অনুসন্ধানফলে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি নানা মাসিকপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার 'জয়ন্তী' নামক পুস্তক পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। তবে তিনি যে সব রচনা করিতেন, সে সব সাধারণ পাঠকের অধিকার সীমা বহির্ভূত ছিল। ক্ষিতীন্দ্রনাথ, হিতেন্দ্রনাথ ও ঋতেন্দ্রনাথ—ভ্রাতৃত্রয়ই অধ্যয়নশীল ও বঙ্গ-ভারতীর সেবকরূপে পরিচিত। জ্ঞানানুশীলনাদি সম্বন্ধে ঠাকুর-পরিবারের সেকালের অনেক বৈশিষ্ট্য ঋতেন্দ্রনাথের ছিল। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির যত্নে যে সাহিত্য সভা গঠিত হইয়াছিল ঋতেন্দ্রনাথ তাহার অন্যতম উৎসাহী সদস্য ছিলেন। স্বভাবতঃ নির্ব্বিরোধী, মিষ্টভাষী ও সাহিত্যানুশীলনানুরাগী ঋতেন্দ্রনাথ পরিচিত মাত্রেরই প্রীতি অর্জ্জন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার বহু পরিচিত লোক দুঃখানুভব করিবেন, সন্দেহ নাই।



ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কমলা নেহরু—

জেনিভায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পত্নী কমলা নেহরু—রোগজীর্ণ দেহ রক্ষা করিয়াছেন। ইনি দিল্লীর জৌহরমল কৌলের কন্যা। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলালের পুত্র জওহরলালের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তখন পণ্ডিত মতিলাল যুক্তপ্রদেশে ব্যবহারাজীবদিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী—সার সুন্দরলাল, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও পণ্ডিত মতিলাল এই তিনজন এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্রাধান্য



কমলা নেহেরু

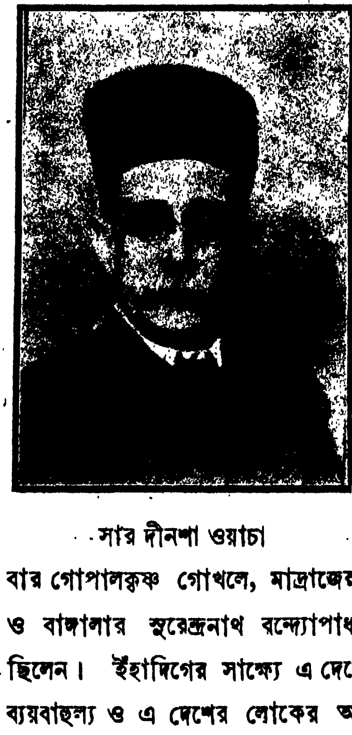
করিতেছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরলাল রাজনীতি চর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ হইতে কমলাও রাজনীতি-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েন ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অসুস্থতাহেতু মুক্তিলাভ করেন। সেই সময় তাঁহার যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় তাহাতেই ক্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া যায় ও তিনি চিকিৎসার্থ য়ুরোপে গমন করিলে তাঁহার অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় তাঁহার নিকট যাইতে পারিবেন বলিয়া কারারুদ্ধ জওহরলালকেও মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁহার অকালমৃত্যু বিশেষ দুঃখের বিষয়।

সার দীনশা ওয়াচা—

পরিণত বয়সে সার দীনশা ইদালজী ওয়াচার মৃত্যু হইয়াছে। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। বোম্বাই এলফিনষ্টোন কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ব্যবসায়ে প্রবেশ করেন। দীর্ঘকাল তিনি ত্রিবিধ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—(১) রাজনীতি, (২) ব্যবসা—বিশেষ কাপড়ের কল ইত্যাদি, (৩) সংবাদপত্র-সেবা।

যদি সম্মান ও প্রসিদ্ধি সাফল্যের পরিমাপ হয়, তবে সার দীনশার সাফল্য সম্বন্ধে কেহই কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পারেন না। কেন না, তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ও পরে রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন; তিনি ৩১ বৎসর কাল বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির ও ৩৫ বৎসর কাল বোম্বাই কলওয়ালা সমিতির কাযে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তাহার স্থাপন হইতে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বোম্বাই ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ট্রাষ্টীও ছিলেন। আরও নানা প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবধি বহুদিন কংগ্রেসে তাঁহার স্থান নেতৃগণের মধ্যে ছিল এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের যে অধিবেশন কলিকাতায় হয়, তিনি তাহাতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজনীতিক ব্যাপারে সার ফিরোজশা মেটার অনুসরণ করিতেন এবং কলিকাতার অধিবেশনের পর মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ সাংবাদিক —জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার লিখিয়াছিলেন—কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাকে যথেচ্ছা আকার দান করে, ফিরোজশা তেমনই সভাপতি দীনশা ওয়াচার মতকে যথেচ্ছা আকার দিয়াছিলেন। সুতরাং সার দীনশা যে পরে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মডারেটদিগের প্রতিষ্ঠান—ন্যাশান্যাল লিবারল ফেডারেশনে যোগ দিয়াছিলেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

সার দীনশা যৌবনে 'ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার' পত্রের প্রধান লেখক ছিলেন। বহুদিন তিনি কলিকাতার 'বেঙ্গলী' ও মাদ্রাজের কোন পত্রের নিয়মিত সংবাদদাতা ছিলেন এবং বোম্বাইয়ের কোন কোন পত্রেও লিখিতেন। তিনি নানা বিষয়ে কয়খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে বোম্বাইয়ে মিউনিসিপ্যাল ব্যবস্থার আরম্ভ ও ক্রমবিকাশ, জামশেদজী টাটার জীবনচরিত, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের জীবনচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



সার দীনশা ওয়াচা

বিলাতে ভারত সরকারের ব্যয় সম্বন্ধে যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল (১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে) তিনি তাহাতে সাক্ষ্য দিতে বিলাতে গিয়াছিলেন। সে বার গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মাদ্রাজের জি, সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও বাঙ্গালার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার সহগামী ছিলেন। ইঁহাদিগের সাক্ষ্যে এ দেশে বিদেশী সরকারের ব্যয়বাহুল্য ও এ দেশের লোকের আয়ের তুলনায় তাহার আধিক্য প্রতিপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু শাসনের ব্যয় হ্রাস হওয়া ত পরের কথা—বর্দ্ধিতই হইয়াছে। তাহার পর শাসন-সংস্কারে প্রদেশের সংখ্যা বাড়িয়াছে—প্রত্যেক প্রদেশে ব্যাণ্ড, বডিগার্ড ও শৈলাবাসসম্বলিত গভর্ণরের সৃষ্টি হইয়াছে; যে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যা এক জন ছোটলাটের দ্বারা শাসিত হইত, তাহার মধ্যে কেবল বাঙ্গালাই এখন একজন গভর্ণর—৭জন মেম্বার ও মন্ত্রিসহ - শাসন করিতেছেন। ইহাই যদি স্বায়ত্তশাসনের স্বরূপ হয়, তবে এ কথা অস্বীকার করিবার

উপায় থাকে না যে, এই স্বায়ত্ত-শাসন দেশবাসীর আয়ত্তাধীন নহে বলিয়াই এমন হয়।

কাপড়ের কলের সম্বন্ধে সার দীনশার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। স্বদেশী আন্দোলনের সময় যখন বাঙ্গালায় বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তিনি তাহার পরামর্শদাতৃ-রূপে বার্ষিক নির্দ্দিষ্ট পারিশ্রমিক লাভ করিতেন।

শেষ বয়সে দৈহিক দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে অভিভূত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তবুও তিনি নানা কাযে সময় অতিবাহিত করিতেন। সমস্ত জীবন কাযের সাধনা করিয়া তাহা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়াছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সার দীনশা ইদালজী ওয়াচা দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের জনগণানুষ্ঠানে যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা সাধারণ নহে।

নবীনচন্দ্র বরদলই—

গত ৩রা ফাল্গুন আসামের অন্যতম নেতা নবীনচন্দ্র বরদলই লোকান্তরিত হইয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে মোটর দুর্ঘটনায় তিনি যে আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহারই ফলে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নবীনচন্দ্র তাঁহার পিতা রায় বাহাদুর মাধবচন্দ্র বরদলই মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি কলিকাতায় অধ্যয়নান্তে ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমে গৌহাটিতে ব্যবহারাজীবের কার্য্য আরম্ভ করিয়া পরে কলিকাতা হাইকোর্টে কার্য্যারম্ভ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ডিবরুগড়ে আসাম এসোসিয়েশনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, তখন তিনি মধ্যপন্থী ছিলেন এবং অভিভাষণে ইংরাজের নানারূপ প্রশংসা করিয়া মতপ্রকাশ করেন—যে সময় মগরা আসামে অত্যাচার করিতেছিল, সেই সময় ইংরাজের তথায় গমন বিধাতার বিধান। ঘনশ্যাম বড়ুয়া আসামের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলে নবীনচন্দ্র তাঁহার স্থানে আসাম এসোসিয়েশনের সম্পাদক নির্ব্বাচিত হয়েন। তখন আসামের সকল উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানেই তিনি যোগ দিতেন। মণ্টেগু-চেমস-ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে কমিশনার সার নিকোলাস বিটশন-বেল অনুন্নত বলিয়া আসামকে শাসন-সংস্কারের পরিধির বাহিরে রাখিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতায় মিষ্টার মণ্টেগুর সহিত আলোচনা করিবার জন্য নবীনচন্দ্র প্রমুখ যে সব আসামী কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আসামে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিতে বলেন এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে যাঁহারা বিলাতে জয়েণ্ট কমিটীতে আসামে শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, নবীনচন্দ্র তাঁহাদিগের অন্যতম। বিলাতে তিনি এ বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের পরামর্শে কায করিতেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শিবসাগরে নবীনচন্দ্র আসাম ছাত্র-সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন এবং জোড়হাটে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে আসাম রায়ত সম্মিলনে প্রজার অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া তাঁহাকেই সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল।

কারাগারে অবস্থানকালে তিনি আসামী ভাষায় কয়-খানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

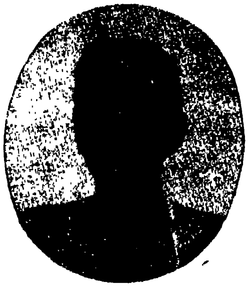
রাজনীতিই তাঁহার প্রধান সাধনার বিষয় ছিল। তিনি আসামের অন্যতম নেতা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার মতাবলম্বী ছিলেন না, তাঁহারাও তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ও মতে নিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

বরদলই মহাশয়ের মৃত্যুতে কেবল আসাম নহে, পরন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ এক জন দেশাত্মবোধের সাধক ও প্রচারক হারাইয়াছে। তাঁহার দেশপ্রেম যে অনাবিল ছিল, তাহার জন্যই তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন।

মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রবীণ এটর্ণী মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। মোহিনী বাবুর খ্যাতি—প্রসিদ্ধ এটর্ণী বলিয়া নহে; পরন্তু পণ্ডিত বলিয়া। পঠদ্দশা হইতেই মোহিনীমোহন মনীষার পরিচয় দেন এবং দর্শন ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে চর্চ্চায় মনোযোগ দেন। এই সময় তিনি থিয়জফিষ্ট সম্প্রদায়ে আকৃষ্ট হইয়া ঐ সম্প্রদায়ের কোন সভায় যোগ দিতে বাঙ্গালার বাহিরে গমন করেন ও তথা হইতে আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি গীতার যে ইংরাজী অনুবাদ করেন, তাহা বোদ্ধাদিগের নিকট আদরলাভ করে। রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি প্রথম কালের কংগ্রেসে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা অনেকেরই

প্রশংসা লাভ করিত। সাধারণ কথোপকথনে তিনি হিন্দুর নানা সংস্কারের উৎপত্তি ও পরিবর্ত্তন এবং দার্শনিক বিষয় অত্যন্ত সরলভাবে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। আমাদিগের মনে আছে, নাটোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনের অধিবেশন-কালে যখন ভূমিকম্পে নাটোর সহর প্রায় বিধ্বস্ত হয়, তখন তিনি তাঁহার আলোচনার দ্বারা শঙ্কাকুল প্রতিনিধি-দিগের মনের চাঞ্চল্য প্রশমনে সহায় হইয়াছিলেন। মোহিনী বাবু পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং তাঁহার মত নিষ্ঠা-সহকারে প্রচার করিতেন।



মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়

মোহিনী বাবু ও তাঁহার অনুজ রমণীমোহন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। রমণী বাবু ত্রিপুরা রাজ্যে দাওয়ানের ও কলিকাতা কর্পোরেশনে নানা পদে কায করিয়া যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। মোহিনী বাবু অন্য বিভাগে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

পরলোকে রামেশ্বরপ্রসাদ—

আমরা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইলাম যে, সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী আমাদের পরমস্নেহভাজন রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা সেদিন অকালে হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পরলোকগত হইয়াছেন। রামেশ্বরপ্রসাদ প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিশারদ, চিত্র-শিল্পী, কলিকাতা আর্ট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক পণ্ডিতঈশ্বরীপ্রসাদের পুত্র ছিলেন। আর্টস্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরই রামেশ্বর বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; মহারাজ তাঁহাকে বর্দ্ধমানের রাজ-শিল্পী পদে নিযুক্ত করেন। কয়েক বৎসর পরে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর নিজ ব্যয়ে রামেশ্বরকে উচ্চ চিত্রকলা শিক্ষার জন্য বিলাতে প্রেরণ করেন এবং সেখানকার প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের নিকট শিক্ষা-গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রায় চারি বৎসর শিক্ষালাভের পর কয়েক মাস পূর্ব্বে রামেশ্বর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের উৎসাহে চৌরঙ্গী অঞ্চলে একটি চিত্রাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বিলাত গমনের পূর্ব্বে তাঁহার অঙ্কিত অনেক চিত্র 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল। রামেশ্বর যখন বিলাতে ছিলেন সেই সময়ই তাঁহার স্ত্রী-বিয়োগ হয়; এখন একমাত্র কন্যার ভার অশীতিপরবৃদ্ধ পিতার উপর সমর্পণ করিয়া রামেশ্বর অকালে চলিয়া গেলেন; আমরা একজন অকৃত্রিম বন্ধু, প্রতিভাশালী চিত্র-শিল্পী হারাইলাম।

মনোহর মুখোপাধ্যায়—

উত্তরপাড়ার জমীদার-পরিবারের মনোহর মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স প্রায় ৯৬ বৎসর হইয়াছিল। ইঁহার সমসাময়িকরা সকলেই ইতঃপূর্ব্বে লোকান্তরিত হইয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"তারপরে গুড়ি গুড়ি এস বুড়ো শিব,
গঙ্গার ওপারে বাড়ী অদ্ভূত নসিব।"

মনোহর জয়কৃষ্ণের ভ্রাতা রাজকৃষ্ণের চারি পুত্রের অন্যতম। জয়কৃষ্ণের পুত্র রাজা প্যারীমোহন নানারূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণের পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে হরিহর ও ও মনোহরই জমীদাররূপে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি স্বগৃহে বিজ্ঞানানুশীলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ও গোপালনের পক্ষপাতী ছিলেন।



কোণার্ক

অধ্যাপক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম-এ

১৯৩৪—ডিসেম্বর মাসে স্বাস্থ্যান্বেষণে ও বিশ্রামার্থে ৺পুরীধামে গমন করি। শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভু এবং তীর্থরাজ সমুদ্রের কৃপায় অল্পদিনেই অভীষ্টলাভের পরে মনে বাসনা জাগিয়া উঠে, অবকাশের বাকী দিন কয়টা আশে পাশের দ্রষ্টব্য স্থানাদি দর্শন করিয়া কাটান যাইবে। অবস্থান করিতেছিলাম সমুদ্রতীরে বারিধিশোভা (sea-view) নামক হোটেলের দ্বিতলের একটি ঘরে, একাকী। হোটেলে নানারূপ লোকের সমাগম হইয়া থাকে, সকলের সহিত আলাপ করার বিশেষ প্রবৃত্তি ও অবসর আমার ছিল না, অথচ দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দর্শন করিবার জন্য একাকী যাইতেও মন সরে না, সঙ্গীর প্রয়োজন অনুভূত হইতে লাগিল। একদিন বৈঠকখানায় গিয়া কথাপ্রসঙ্গে কোণার্কের উল্লেখ করিলাম; কথায় কথায় ২।৪ জন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যে, তাঁহারাও যাইতে পারেন, যদি যাতায়াতের খরচ তেমন বেশী না হয়। হোটেলের একটি ভৃত্যের বাড়ী কোণার্কের নিকটে, সে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবে। যান স্থির হইল ভারতের 'আদি ও অকৃত্রিম' গো-যান। নামটা গো-যানই বলিতে হইবে বটে, যানের আকৃতি সাধারণ গো-যানের ন্যায়ই বটে, কিন্তু চক্রগুলি অতি বৃহৎ—আর বসিবার স্থান সেই অনুপাতে অপ্রশস্ত; আর বলীবর্দ্দগুলি দেখিলে 'গোজাতি' না বলিয়া ঈষৎ বৃহৎ ছাগ বলিতে ইচ্ছা হয়; শীর্ণ শরীরে পঞ্জরাস্থি ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, না চলিলে মনিব প্রহার করিবে এই ভয়েই তাহারা চলে, নিজের স্ফূর্ত্তিতে চলে না।

বৈকালে গো-যান-চালক গো এবং যানের নমুনা দেখাইয়া গেল; পরদিন বৈকালে 'যাত্রা' হইবে, ভাড়া যান প্রতি ৫॥০ (সাড়ে পাঁচ টাকা) স্থির হইল; আমার যানের বায়না বাবদ কিছু পয়সাও চালককে দিলাম। তিন জন যাইবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, প্রত্যেক যানে ২ জন করিয়া যাওয়া হইবে; ২৪ মাইল পথ, সঙ্কীর্ণ গাড়ীতে শয়ন করিয়া যাইতে হইবে; অতএব স্থির হইল যে weightage (আজকাল কথায় কথায় weightage—ভারসমতা) ঠিক রাখিবার জন্য আমার সঙ্গে handicap (প্রতিবন্ধক) অর্থাৎ একটি বালক বা বালিকা থাকিবে; "তথাস্তু" বলিয়া সকলকে 'অভয়'দান করিয়া নিজের ঘরে যাইবার সময় পাচককে বলিয়া গেলাম, পরদিন বৈকালে যেন ভাল রকমের জলযোগের ব্যবস্থা থাকে।

যাত্রার সবই স্থির, কিন্তু মনটা বেশ প্রসন্ন হইল না। অতখানি পথ, সারারাত যাইতে হইবে, অল্পপরিসর যান, নিজের দীর্ঘায়ত কলেবর, দ্বিতীয় প্রাণী handicap বালক বা বালিকা যেই হউক পার্শ্বে থাকিবে—এই প্রাণীটির স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা অবশ্যই আমাকে করিতে হইবে, অতএব আমায় খাড়া বসিয়া জাগিয়া দীর্ঘপথ অতিবাহন করিতে হইবে—মনটা বেশ প্রসন্ন হইল না। বায়না দিয়াছি, যাইতেই হইবে।

পরদিন প্রাতঃকালে যাত্রীদিগের সহিত দেখা হইলে কেহ বড় একটা কথা কহিলেন না; ব্যাপার কি? বুঝিলাম, দুইদল পিছাইয়াছেন। একটু বিরক্ত হইয়া স্থির করিলাম, একাকীই যাইব। এমন সময়ে গো-যান-চালক আসিয়া 'দরশন' দিলেন; অন্য ২ খানি গাড়ীর বায়না বাবদ কিছু অর্থ লইয়া তিনি গাড়ীর বন্দোবস্ত করিবেন এবং বৈকালে যথাসময়ে ৩ খানি গাড়ী লইয়া হোটেলের সম্মুখে উপস্থিত হইবেন। যাত্রীদের ভাবগতি দেখিয়া বেচারির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে! তাহাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিলাম—"কেহ না যায়, আমি একাকীই যাইব'; তখন বেচারির মুখে উৎসাহের পরিবর্ত্তে 'কাঁচু-মাচু' চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে, সে বলিল—"একাকী যাওয়াটা কি বাবু, বড় ভাল হইবে?" [পরে কোণার্কে শুনিয়াছি, পথে ছইতলা নামক স্থানে একটু ভয়ের কারণ নাকি আছে।] সারথির কথায় যাত্রা বন্ধ করিতে হইল; বায়নার পয়সা ফেরত দিবার কথা বলিতে পারিলাম না। মনটা 'বিষাদ-যোগ' প্রাপ্ত হইল। ইতি উদ্যোগপর্ব্বের উপপর্ব্বাধ্যায়।

অথ উদ্যোগপর্ব্ব। বড়দিনের ছুটি নিকটবর্ত্তী হইলে হোটেলে যাত্রীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। কে আসে, কে

যায়, সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করি না। আমারই প্রকোষ্ঠের পার্শ্বের প্রকোষ্ঠে কে বা কাহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে হঠাৎ সকলেই বেশী রকম সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন, এইটুকু লক্ষ্য করিলাম। বৃদ্ধ হইতে যুবা সকল হোটেলবাসীই ইঁহাদের সম্বন্ধে অত্যধিক সজাগ হইয়াছেন। একদিন নীচে নামিয়া যাইতেছি—বৈঠকখানা ঘরে নবাগতদের সম্বন্ধে নানা জল্পনা চলিতেছে শুনিতে পাইলাম। জল্পনার নমুনা—"ইহুদি?" "হ'তেও পারে"; "না, ও বৌ নয়"; "আরে, বৌ নয় ত অমন ক'রে কি বেড়াতে পারে?"—"মাথায় সিঁদুর কই?" "চোখে কাজল * দেখছেন না?" ইত্যাদি…

দুইদিন পূর্ব্বে এক যুবক তাঁহার পত্নীসহ হোটেলে আসিয়াছেন; বুঝিলাম, ইঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই জল্পনা। জল্পনার হেতু—ইঁহাদের অতি-আধুনিকত্ব (ultra-modernism)। কিশোরী দেখিতে সুন্দরী, মস্তকে রাশীকৃত, হ্রস্ব, কুঞ্চিত, অবেণীসম্বদ্ধ কেশ, পরিধানে অত্যাধুনিকীর বেশ ['আধুনিকা' লিখিতে পারিলাম না, যদিও মস্ত বড় একজন সাহিত্যিক তাহা লিখিতেছেন] মস্তক সম্পূর্ণ অনাবৃত, সুকুমার করে সুকুমারতর যষ্টি দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত; যুবক সাধারণ বেশধারী, যেন বেশ-পরিপাট্যে উদাসীন; কিশোরী যুবকটির সহিত যখন-তখন লীলায়িত গতিতে হোটেল হইতে বাহির হইতেছেন, ঢুকিতেছেন, সমুদ্রতটে বিচরণ করিতেছেন। হোটেলবাসীরা ইঁহাদের আচরণে একটু বিব্রত হইয়াছেন; তদুপরি ইঁহাদের অপরাধ, ইঁহারা কাহারও সঙ্গে মেশেন না; এই হইল ব্যাপার! আমাকে বৃদ্ধগোছের দেখিয়া বৈঠকখানায় সমবেত সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মহাশয়, একটু খোঁজ খবর রাখুন না, আপনারই ত পাশের ঘরে ওঁরা আছেন।" হাসিয়া বলিলাম—"দেখা যাবে।"

২৫শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার রাত্রি ৮।৩০। উকীল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে প্রভুপাদ প্রাণগোপাল কৃত শ্রীশ্রীগোপীগীতের প্রাণ-মাতান ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রায় অন্যমনা হইয়া হোটেলে ফিরিলাম। তখন 'কালরাত্রি' (পঞ্জিকামতে ৭।১ হইতে ৮।৫১ কালরাত্রি)। অন্যমনা হইয়াই নিজ প্রকোষ্ঠের দিকে চলিয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম—সম্মুখেই জুজু! অর্থাৎ প্রকোষ্ঠের সম্মুখস্থ খোলা বারান্দায় চেয়ারে উপবিষ্ট যুবক ও কিশোরী। পূর্ব্বক্ষণেই শুনিয়া আসিয়াছি, গোপীরা দয়িতের সন্ধানে ঘুরিতেছেন, কাতর প্রার্থনা করিতেছেন, চিরকালের 'চেনা'র কাছে কত আকূতি নিবেদন করিতেছেন। আজ এই রাত্রিতে, চিরকালের 'অচেনা' আমার কাছে ইঁহারা কিছু চান নাকি! গোপীদের 'নিষ্ঠুর' দয়িতের ন্যায়ই ইঁহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া নিজ প্রকোষ্ঠে ঢুকিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছি, একটি সসঙ্কোচ ধ্বনি কাণে প্রবেশ করিল—'একটা কথা বলিতে চাহি'? শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাহিরে গেলাম এবং যেখানে শব্দ উত্থিত হইল সেখানে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—"কি, বলুন।"

যুবক। শুনিলাম, আপনি কোণারকে যাইতে চাহেন; আপনি কি আমাদের সঙ্গে যাইবেন? আমরা ছেলেমানুষ, বিদেশে কখনও বাহির হই নাই, আপনি বিজ্ঞ (অর্থাৎ কোমল ভাষায়, বুড়ো), আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে আমাদের কোনও ভয় থাকে না; যাইবেন? আমাদের "মোটর" ঠিক হইয়াছে।

আমি। আমি কোণার্ক যাইতে চাহি বটে; যদি আপনারা আমার নিকট মোটর-ভাড়ার অংশ গ্রহণ করেন, তবেই আমি যাইতে পারি।

যুবক। সে তখন দেখা যাইবে, তার জন্য কি? চলুন ত!…আচ্ছা, আজ ঘুমাইতে যাই, কাল সকালে যাত্রা করা যাইবে, কেমন?…

বেচারির উৎসাহ বাড়িয়া গিয়াছে।

আমি। আরও একটা কথা। আমি আপনাদের নিকটে সম্পূর্ণ অপরিচিত; আমি কিরূপ লোক তাহা আপনারা জানেন না, আমাকে সঙ্গে লওয়া কি আপনাদের পক্ষে উচিত হইবে? আর, আমিও আপনাদের কোনই পরিচয় জানি না, আমিই বা আপনাদের সঙ্গে যাইব কেন?

যুবক। আপনাকে আমরা আনন্দের সহিত সঙ্গে লইব,

---

* সুলক্ষণা রমণীর চোখের পাতা খুব ঘন, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়—যেন কাজল পরিয়াছে। বিশ্বনাথ কবিরাজ 'ভাবিক' অলঙ্কারের দৃষ্টান্তরূপে দেখাইয়াছেন—"আসীদঞ্জনমত্রেতি পশ্যামি তব লোচনে"—হে নারী! তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে কাজল ছিল (অতীত হইলেও)—দেখিতেছি। সাহিত্য-দর্পণ ১০।১৩

আপনার পরিচয় আমরা জানি। তবে আমাদের পরিচয় না পাইলে যদি আপনার যাইতে আপত্তি থাকে, সে স্বতন্ত্র কথা।

আমি। আমার আপত্তি না থাকাই কি অস্বাভাবিক নহে?

যুবক তখন নিজের পরিচয় দিলেন; নিজের নাম, পিতার নাম, গ্রামের নাম, জেলার নাম বলিলেন; কি কর্ম্মাদি করেন তাহা বলিলেন; তাঁহার পিশামহাশয়কে আমি হয় ত জানিতে পারি—ইহাও বলিলেন। ইঁহার পিশামহাশয় সত্যই আমার বিশেষ পরিচিত, সোদরপ্রতিম। এই সময় কিশোরী আসিয়া আমাদের নিকটে দাঁড়াইলেন। তখন নব-অনুরাগ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কিশোরীর দিকে চাহিয়া যুবক বলিলেন—আপনি অমুক স্থানের ডাক্তার অমুককে জানেন ত? ইনি তাঁহার "পঞ্চমী কন্যা"; ৭ মাস হইল ইঁহাকে আমি বিবাহ করিয়াছি। কিশোরী ঈষৎ লাজ-বিনম্র হইলেন। যুবক হাসিয়া বলিলেন—"এখন ত সব জানিলেন, এখন ত আপনার আমাদের সঙ্গে যাওয়ায় আপত্তি হইবে না?" হাসিয়া সম্মতি দিলাম। তখন কত ঘরোয়া কথা হইল। পরের দিন কি কি পাথেয় সঙ্গে লইতে হইবে সে সবের হিসাব হইল, কখন যাত্রা করিতে হইবে, তৎপূর্ব্বে হোটেলের 'খাদ্য' পাওয়া যাইবে কি না, সমস্তই আলোচিত হইল।

পরদিন সকালে আহারান্তে যাত্রা করিতে হইবে। 'শ্রীমান্'—বলিলেন, সমুদ্র স্নানটা ত সারিয়া যাইতে হইবে। 'শ্রীমতী' বলিলেন যে সমুদ্রে নামিতে তাঁহার বড় ভয় হয়। আমি বলিলাম—"তুমি (আমার কন্যার অপেক্ষা বয়সে ছোট কিশোরীকে 'তুমি'ই বলিয়া ফেলিলাম, 'আধুনিক'গণ ক্ষমা করিবেন) মা, আমার সঙ্গে যাইও, ভয় পাইবে না। বেচারিরা হোটেলে কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে না পারায়, বোধ হয় হাঁফাইয়া উঠিয়াছিল; আমাকে আত্মীয়ের মতই গ্রহণ করিল।

অথ যাত্রার পূর্ব্বে সমুদ্র স্নান। সকালে উঠিয়াই তাগাদা দিলাম—"কৈ গো মা, যাত্রার আয়োজন প্রস্তুত ত? স্নানে যাবে না?" মা আমার স্নানের নীল-পোষাকের* (bathing costume) উপর সাড়ী পরিধান করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত, আর সঙ্গে শ্রীমান্ একটা এলুমিনিয়াম নির্ম্মিত 'মগ'-হস্তে প্রস্তুততর! জিজ্ঞাসা করিলাম, সমুদ্রটা কি কলিকাতার চৌবাচ্ছা, মগে করিয়া জল তুলিয়া স্নান হইবে? উভয়েই হাসিলেন, কিন্তু মগ-মহাশয় সঙ্গেই চলিলেন। তারপর সমুদ্র-স্নানের সে কি (দীর্ঘ ঈকার দিতে ইচ্ছা হয়) দৃশ্য! আমি গভীর জলে চলিয়া গিয়াছি, তরঙ্গের সঙ্গে আমার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; হঠাৎ তীরের দিকে ফিরিয়া দেখি যে, শ্রীমতী ভিজা বালুকায় দাঁড়াইয়া আছেন, ক্ষুদ্র তরঙ্গের শেষ ফেনিল প্রান্তটুকু তাঁহার পদপ্রান্তে আছড়াইয়া আত্মনিবেদন করিতেছে এবং তাহারই একটুখানি ফেনিল ও বালুকামিশ্রিত জল 'মগে' তুলিয়া লইয়া শ্রীমান্ শ্রীমতীর গায়ে ঢালিতেছেন! তখন জলে আমি একাকী, একাকী কত হাসিব! চীৎকার করিলাম—"এগিয়ে এসো, ভয় নেই, ও কি হ'চ্ছে?" কে শোনে সে কথা! বালুকার উপরে দাঁড়াইয়া 'মগে' সমুদ্র জল লইয়া তাহাতে স্নান—এ এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, কখনও কল্পনায় আনা যায় না। হাতের কাছে 'ক্যামেরা' থাকিলে এই দৃশ্যের 'ফটো' তুলিয়া কাগজে পাঠাইলে কিছু অর্থ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত! যাক, যথাসম্ভব শীঘ্র স্নান সমাপ্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে হোটেলে ফিরিয়া বলিলাম—'মা তোমার এই স্নানপর্ব্বটির বিবরণ আমি লোকের সমক্ষে প্রচার করিব।' শ্রীমতী হাসিমুখে অনুমতি দিয়া বলিলেন—"আমার নামটা দিবেন না ত?" সকলেই খুব হাসিলাম।

বেলা ৯।১৫ মিনিট, মোটরে যাত্রা করা গেল। পাথেয় আমার সঙ্গে থাকিল কিছু রসগোল্লা ও ৪টি ডাব। শ্রীমানেরা কেট্‌লি, কাগজের পুট্‌লি, থার্ম্মো-বোতল ইত্যাদিতে কি—কি—সব লইলেন। মোটরের মাইল-মিটারের অঙ্কটা লিখিয়া রাখিলাম—৪২৮৭৫। চালক বলিলেন, রাস্তায় নদী আছে তাহাতে পুল নাই, অতএব ঘুরিয়া যাইতে হইবে, তাহাতে ৫০।৫২ মাইলের স্থানে ৭২ মাইল হইবে। তাহাই স্বীকার। গো-যানে পথের পরিমাণ অল্প, দেশী 'আদি ও অকৃত্রিম' যানে ব্যয়ও অল্প, কিন্তু তাহাতে অনেক সময় লাগে, আজকালকার মানুষের নাকি অবসর বড় অল্প; আর গো-যানে গতির বা চলার একটা উৎকট ঝাঁঝালো আনন্দ নাই, মোটরের দ্রুতগতিতে সেটা পাওয়া

* পুরী যাত্রীর নাকি ওটা (bathing costume) সঙ্গে রাখিতেই হয়, নতুবা ফ্যাসান মারা যায়! তা স্নানটা যে ভাবেই হয়, হউক!

যায়। ব্যয়ও হয় ৩০।৩৫ টাকা! ৭২ মাইল! আচ্ছা তাহাই স্বীকার!

মোটর দ্রুতবেগে প্রায় উত্তরমুখী কটক-রোড দিয়া ছুটিল। পুরীর বাহিরের দৃশ্য বাঙ্গালা দেশের পল্লীগ্রামের দৃশ্য হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। তবে এ অঞ্চলে জগন্নাথদেবের বিশেষ প্রাধান্য থাকায় পথের ধারে মাঝে মাঝে দেখা গেল "চন্দন-সরোবর"; সরোবরের মাঝখানে ক্ষুদ্র মন্দির; গ্রামবাসীরা সেখানে দেবমূর্ত্তি লইয়া গিয়া পুরীর চন্দনযাত্রার অনুকরণে উৎসবাদি করেন। মাঝে মাঝে বস্তি, মাঝে মাঝে মাঠ। পথ অতি প্রশস্ত, দুই পার্শ্বে নানাবিধ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষের শ্রেণী পথের উপর ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। পথে উল্লেখ-যোগ্য বিশেষ ঘটনা ঘটে নাই। কেবল শ্রীমান্ একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—হোটেলে তাঁহাদের সম্বন্ধে কি কোনও জল্পনা চলিতেছে। শ্রীমতী প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন। ব্যাপারটা যতদূর বলা চলে, ততদূর বলিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধের অভিজ্ঞতার দোহাই দিয়া বুঝাইলাম যে, সংসারে চলিতে হইলে সমাজের নিয়ম-কানুন কিছু মানিয়া চলা ভাল, তাহাতে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। শ্রীমান্ বলিলেন—"ও ত (অর্থাৎ শ্রীমতী) মাথায় কাপড় দিতেই চায়, আমার ওটা ভাল লাগে না বলিয়া জোর করিয়া মাথার কাপড় খসাইয়া দিই। আর, আমার বন্ধু মিঃ অমুক আই, সি, এস (I. C. S.) তাঁহার পত্নীকে লইয়া এই ভাবেই ত বেড়াইয়া থাকেন, আমাদের বেলায় তাহাতে দোষ হইবে কেন?" হাসিয়া উত্তর দিলাম—"আই, সি, এসরা প্রকাণ্ড ব্যক্তি, যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারেন; অন্যের কি তাহা করা শোভন? তাঁহাদের সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের কথা খাটে—'তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা'—অতি তেজস্বীর পক্ষে অনেক কার্য্য দোষাবহ না হইতেও পারে। আর দেখুন, অন্যরূপ আই, সি, এসও আছেন। আমার একজন অধ্যাপকের পুত্র যুবক আই, সি, এস কাছারীর বাহিরে এমন গৃহস্থ চা'লে থাকেন যে, কেহ না বলিয়া দিলে বুঝিতেই পারা যায় না যে তিনি প্রকাণ্ড হাকিম।" এইরূপে যথাসম্ভব কোমল করিয়া, শ্রীমানদের আচরণ কিছু পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দিলাম। হোটেলের লোকজনেরা আমাকে বলিয়াছিলেন—"দেখিবেন মহাশয়, একটু সামলাইয়া দিবেন।" ইঁহারা ভালভাবেই সকল কথা গ্রহণ করিলেন, তাহা ইঁহাদের পরবর্ত্তী আচরণ দ্বারাই সপ্রমাণ হইয়াছিল।

আমরা প্রায় ২৫।২৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছি, এমন সময়ে মোটর-চালক বলিলেন—'ঘোরা-পথে না গিয়া দেখিব নাকি—এ পথে যাওয়া যায় কি না।' সকলেই য়্যাড্‌ভেঞ্চারের (সঙ্কট)—গন্ধে সমস্বরে বলিয়া উঠিলাম—"নিশ্চয়ই।" তখন গাড়ী পাকা রাস্তা ছাড়িয়া ডানদিকে এক অপ্রশস্ত কাঁচা পথ ধরিয়া চলিল এবং অল্পক্ষণ পরে এক নদীর সম্মুখে আসিয়া থামিয়া গেল। নদীর উপরে সেতু নাই, অথচ নদী পার হইতে হইবে! চালক, শ্রীমান্ ও আমি নামিয়া পড়িলাম। আমার যষ্টি হাতে লইয়া ও জুতা খুলিয়া শ্রীমান্ পল্লীর বালকের ন্যায় হাসিতে হাসিতে জলে নামিলেন—"এক বাম্ মিলে" কি না দেখিবার জন্য। চালকও নামিলেন। জল ১॥ হাতের বেশী গভীর নহে, জলের নীচে বালুকা। তখন মোটরের হাতল ঢুকাইবার গর্ত্তে খানিকটা ছিন্ন বস্ত্র গুঁজিয়া দেওয়া হইল, নতুবা ইঞ্জিন-যন্ত্রে জল ঢুকিতে পারে। শ্রীমতী পাছে ভয় পান এজন্য গাড়ীতে আমায় থাকিতে হইল। শ্রীমান্ হাসিতে হাসিতে নদী পার হইয়া গেলেন; তদ্দর্শিত পথে আমাদের মোটর নামিয়া ক্ষুদ্র নদীতে ক্ষুদ্র তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত করিয়া জলের নীচেকার বালুকার উপর দিয়া নদী পার হইয়া গেল। মাইল-মিটারে উঠিয়াছে ৪২৯০২ অর্থাৎ আমরা পুরী হইতে ২৭ মাইল আসিয়াছি। ২।৪ জন গ্রামবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইঁহারা মুসলমান। গ্রামের নাম জানিয়া লইলাম—'হরিপুর শাসন'; উত্তীর্ণ নদীটির নাম—'ভার্গবী'।

মোটর আবার যাত্রা আরম্ভ করিল; এবার সোজাসুজি গন্তব্যস্থানে পৌছান যাইবে। দুই পার্শ্বে মাঠ, মধ্যে উঁচু পথ, কাঁচা পথ হইলেও পথ ভাল। হু হু শব্দে মোটর ছুটিতেছে, হঠাৎ মোটর থামিয়া গেল, মাঠের মাঝে পথ নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইয়াছে। আবার নামা হইল; এবার নদী নহে, জলা; বর্ষায় পথ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মাইল-মিটার জানাইল, হরিপুর শাসন হইতে মাত্র ৮ মাইল আসিয়াছি। আবার জলে নামিয়া জল মাপা হইল, আবার হাতলের গর্ত্তে বস্ত্রখণ্ড গুঁজিয়া দেওয়া হইল, আবার মোটর

জলে নামিল; এবার জলের নীচে বালুকার পরিবর্ত্তে কর্দ্দম; চালক কৌশল করিয়া মোটর চালাইয়া জলা পার হইলেন; সকলেই নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম। মোটর চলিতে লাগিল। 'গোপ' থানা ও 'গোপ' গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমরা পৌঁছিলাম "মৈত্রেয়-অরণ্যে"; তখন বেলা ১২।৪৫ মিনিট। এক ক্ষুদ্র পুন্নাগ-ঝোপের মাঝে মোটর বিশ্রাম লইল। মাইল মিটারে উঠিয়াছে ৪২৯২৭ অর্থাৎ ৫২ মাইল অতিক্রম করা হইয়াছে। অরণ্যের চিহ্ন বড় একটা নাই, আছে সুদূর বিস্তৃত প্রান্তর—আর সম্মুখে প্রসারিত বালুময় দীর্ঘ পথ। "দীর্ঘ পথ হেরি ক্লান্ত" হইলে চলিবে না; মোটর হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যাত্রা সুরু করা গেল। একটি স্থানীয় লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাকে ডাব চারিটি বহনের ভার দেওয়া গেল। আরও ডাব সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু তাল গাছে আছে, সংগ্রহ করিতে সময়ক্ষেপ হইবে; আমাদের সময় সংকীর্ণ, ডাবের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। যাত্রা চলিতে থাকুক, মৈত্রেয় অরণ্যের কথা কহিয়া রাখি।

শাম্বপুরাণ নামক একখানি উপপুরাণ আছে। তাহাতে শাম্বের অভিশাপ-প্রাপ্তির এক বিবরণ দেখা যায়। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র জাম্ববতী-নন্দন শাম্ব দেহ-সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এজন্য তাঁহার মনে সৌন্দর্য্য-গর্ব্ব ছিল। এই গর্ব্ব নাশ করা আবশ্যক হওয়ায় এক কূট চক্রের আয়োজন হইল। নারদ একদিন কৌশল করিয়া শাম্বকে এক জলাশয়ের তীরে লইয়া গিয়া তত্রস্থ উদ্যানের শোভা দেখাইতেছিলেন। ঐ জলাশয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ জলক্রীড়া করিতেছিলেন, শাম্ব তাহা জানিতেন না। শাম্বকে উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণে ব্যাপৃত রাখিয়া নারদ ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দিলেন যে, শাম্ব নিজের রূপ-গৌরবে এতই মত্ত হইয়াছেন যে, নিজ রূপ দেখাইবার জন্য জলক্রীড়ারত মহিষীগণের সম্মুখে নির্লজ্জের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেখানে আসিলেন এবং অভিশাপ দিলেন—শাম্বের রূপ নষ্ট হইবে এবং তাঁহার শরীর কদর্য্য হইয়া যাইবে। শাম্ব পিতার শ্রীচরণে পতিত হইয়া নিজের নির্দ্দোষত্ব নিবেদন করিয়া শাপ-মোচনের প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ শাম্বের নির্দ্দোষত্বের প্রমাণ পাইয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন—"মৈত্রেয় অরণ্যে গমন করিয়া সূর্য্যের প্রসন্নতা অর্জ্জনের জন্য দ্বাদশ বৎসর তপস্যা কর।" শাম্বের কুষ্ঠব্যাধি দেখা দিল, নবনীত-কোমল অপূর্ব্ব সুন্দর দেহ কুৎসিত আকার ধারণ করিল। লজ্জায় শাম্ব দ্বারকা ত্যাগ করিলেন এবং লোকালয়ে আর মুখ দেখাইবেন না প্রতিজ্ঞা করিয়া পিতার উপদেশ অনুসারে মৈত্রেয় অরণ্যের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েক মাস পরে তিনি মৈত্রেয় অরণ্যে উপস্থিত হইলেন; ইহা পূর্ব্বসমুদ্রের তীরে অবস্থিত।*

শাম্ব কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। নিত্য প্রাতঃ-স্নান, নিত্য সূর্য্যপূজা, রোগক্লিষ্ট নগ্নগাত্রে সূর্য্য কর-আলিঙ্গন ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। এক রাত্রিতে সূর্য্য স্বপ্নে শাম্বের নিকটে আবির্ভূত হইয়া উপদেশ দিলেন—তুমি আমাকে যে নিত্য পূজাদি করিতেছ ইহাতে তোমার অত্যধিক ক্লেশ হইতেছে; দীর্ঘ স্তবপাঠে তোমার রুগ্ন কৃশ ধমনিসন্তপ্ত শরীর অতিমাত্রায় ব্যথিত হইতেছে; কল্য হইতে তুমি এই স্তব পাঠ করিবে, ইহাই আমার স্তবরাজ।

---

* সূর্য্যের প্রসন্নতা অর্জ্জন করিবার জন্য ভারতবর্ষের পশ্চিম-কূলে অবস্থিত দ্বারকা হইতে পূর্ব্বকূলে অবস্থিত মৈত্রেয়ারণ্যে শাম্বের আগমনের ভিতর উন্মুক্ত সমুদ্রতীরে পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইয়া সূর্য্যের রোগ-অপনয়ন-ক্ষম ultra-violet-rays সেবনের ইঙ্গিতাদি আছে কিনা তাহা বিশেষজ্ঞগণ ভাবিয়া দেখিবেন।

শাম্বের কুষ্ঠরোগপ্রাপ্তি ও আরোগ্য সম্বন্ধে অন্যবিধ উল্লেখও পুরাণে দেখা যায়, যথা—

(১) পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ড—১৩, শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করেন এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্ত হন।

(২) স্কন্দপুরাণ—নাগরখণ্ড—২১৩, শাম্ব পরম রূপবান্ ছিলেন। তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য পুরনারীগণের মোহের কারণ হইয়াছিল। একবার শাম্বের এক বিমাতা-নন্দিনী শাম্বের রূপে মুগ্ধ হইয়া শাম্বের অজ্ঞাতসারে তাঁহার শয্যাভাগিনী হন (৩০ শ্লোক)। এই অজ্ঞাত পাপের জন্য শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। তৎপরে তিনি হাটকেশ্বর তীর্থে কুহরদেবের (সূর্য্যের) আরাধনা করিয়া রোগমুক্ত হন। (নাম্না কুহরবাসাখ্যা সংজ্ঞা মম ভবিষ্যতি—১১ শ্লোক)।

(৩) বরাহপুরাণ—১৭৭—একদিন শ্রীকৃষ্ণ মহিষী ও গোপিকাগণ পরিবৃত হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন। তখন শাম্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। শাম্বকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রণয়িনীদের মনোবিকার উপস্থিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে শাম্বের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া 'বিকৃতাকার হও' বলিয়া অভিশাপ দেন। শাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হন। পরে নারদের পরামর্শে সূর্য্যের উপাসনা করিয়া শাম্ব রোগমুক্ত হন। (পূর্ব্বাচলে তু পূর্ব্বাহ্নে উদ্যন্তং তু বিভাবসুম্। নমস্কুরু যথান্যায়ম্ ···· ৩৩।৩৪ শ্লোক)।

বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমাল্লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ।
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ।
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেবনমস্কৃতঃ॥
······ইত্যাদি

শাম্ব এই স্তবরাজের দ্বারা সূর্য্যকে সন্তুষ্ট করিয়া পবিত্র-দেহ, নীরোগ ও সৌন্দর্য্যবান্ হইলেন।

কপিলসংহিতায় (উপপুরাণ) আছে—তপস্যান্তে শাম্ব চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিলেন এবং স্নানান্তে উঠিবামাত্র পদ্মের উপরে আসীন সূর্য্যের একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া শাম্ব তাহাতে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং এই মূর্ত্তি পূজা করিতে করিতে সহসা রোগ-মুক্ত হইয়া দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন।

গৃহীত্বা প্রতিমাং তাঞ্চ যযৌ শাম্বো মহামতিঃ।
প্রাসাদং কারয়িত্বা চ স্থাপয়ামাস সত্বরঃ॥
তাং পূজয়িত্বা বিধিবদ্ ভক্ত্যা নত্বা পুনঃ পুনঃ।
বিমুক্তরোগঃ সহসা যযৌ দ্বারবতীং পুরীম্॥*

শাম্বকর্ত্তৃক স্থাপিত বিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির অবশ্যই এখন নাই; তাহার পরিবর্ত্তে কোণার্কের বিখ্যাত মন্দির এক্ষণে আকাশ ভেদিয়া দণ্ডায়মান।** দূর হইতে এই মন্দির দেখিয়া আমি যখন সূর্য্যস্তবরাজ পাঠ করিতেছিলাম, তখন আমার সঙ্গিনী অত্যাধুনিকা শ্রীমতী ও শ্রীমান্ আমার সহিত স্তবপাঠে যোগ দিলেন, ভক্তিসহকারে মন্দিরের উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। ভাবিলাম, একমাত্র পোষাক ছাড়া আর কিছুতে আমাদের মেয়েরা এখনও অতি আধুনিক হইতে পারেন নাই; আধুনিক পোষাকের দ্বারা আচ্ছাদিত বাঙ্গালী নারীর হৃদয় এখনও দেব-দ্বিজে ভক্তি-পরায়ণই আছে।

ব্রহ্মপুরাণমতে এই স্থান "লবণস্তোদধেস্তীরে"—লবণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত। কিন্তু আজকাল এই স্থান হইতে সমুদ্র ২ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে; এককালে যে এইস্থানে সমুদ্র ছিল তাহা বালুময় প্রান্তর দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। চন্দ্রভাগা নদী এখন ১½ মাইল দূরে বালুময় হইয়া পড়িয়া আছেন। এই চন্দ্রভাগার তীরে একদিন এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। কপিলসংহিতায় এই স্থানের নাম মৈত্রেয়-অরণ্য; শিবপুরাণে স্কন্দের তীর্থযাত্রা প্রকরণে এই স্থানকে বলা হইয়াছে সূর্য্যক্ষেত্র; ব্রহ্মপুরাণে এই স্থানের নাম কোণাদিত্য (কোণাদিত্য ইতি খ্যাতস্তস্মিন্ দেশে ব্যবস্থিতঃ। যং দৃষ্ট্বা ভাস্করং মর্ত্ত্যঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥ ব্রহ্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়); অর্কক্ষেত্র এবং পদ্মক্ষেত্রও ইহার নাম। চক্রক্ষেত্র (আজকালকার পুরীধাম) হইতে ঈশান কোণে ব্যবস্থিত বলিয়া এই ক্ষেত্রের নাম হইয়াছে কোণ-ক্ষেত্র এবং এই ক্ষেত্রের সূর্য্যের নাম কোণাদিত্য বা কোণ-অর্ক=কোণার্ক; চলিতভাষায় স্থানের নাম হইয়াছে কোণারক।

যে স্থানে আমরা মোটর ত্যাগ করিয়াছি, সে স্থান হইতে কোণার্কের মন্দির ১½ মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বিপ্রহরের রৌদ্র; শীতের রৌদ্র হইলেও প্রখর; ১½ মাইল বালুময় পথ; আমরা সকলেই ছত্রহীন—মোটরে চড়িয়া মন্দিরের দ্বারে নামিব ভাবিয়া কেহই ছত্র সঙ্গে আনি নাই; এই পথ অতিক্রম করিতে কাহারও কাহারও ক্লেশ যে না হইল এমন নহে, তবে পুরাণ-কথা আলোচনায় ব্যাপৃত থাকায় অনুভূত ক্লেশ কেহই বড় গ্রাহ্য করিলাম না।

কপিল-সংহিতা অনুসারে মৈত্রেয়-অরণ্য, সূর্য্যমন্দির, শ্রীমঙ্গল ও শ্রীশাল্মলীভাণ্ড পুষ্করিণী, সূর্য্যগঙ্গা, চন্দ্রভাগা, সমুদ্র, সমুদ্রতীরে রামেশ্বর-মন্দির এবং কল্পবট—এই পবিত্র স্থানগুলি কোণার্কের সন্নিকটে অবস্থিত। আমাদের সময়-সঙ্ক্ষেপ, সকল স্থান দর্শন করিবার প্রবৃত্তি হইল না। এখানে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে। দু'চার খানি গো-যান একসঙ্গে আসিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে গো-যানেই আসা ভাল; গো-যান সকালে পৌছে। সারাদিন কোণার্কে থাকিয়া দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বিশেষ করিয়া দেখিয়া সন্ধ্যায় রওনা হইলে পরদিন সকালে পুরীতে পৌছান যায়। রেলে মোটরে তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, তাড়াতাড়িই ফিরিতে হয়; তীর্থযাত্রীর মন অত ত্বরান্বিত না হওয়াই ভাল। সকল কাজ ফেলিয়া আসিয়াছি, সকাল সকাল না ফিরিলেই কাজ নষ্ট হইবে, আহারের অসুবিধা হইবে, নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে—এই সকল চিন্তা লইয়া তীর্থে (কোণার্ক শিল্পীর তীর্থ, ঐতিহাসিকের তীর্থ, ভ্রমণকারীর তীর্থ) গেলে তীর্থের ফল পাওয়া যায় না। আমরা মোটরে গিয়াছিলাম, মোটরেই ফিরিয়াছি, কিন্তু আমার অভিমত এই যে, যাঁহারা কোণার্কে যাইবেন তাঁহারা যেন পুরা একটি দিন হাতে লইয়া যান; এক কোণার্কেই এত দ্রষ্টব্য জিনিষ আছে যে, পুরা দিন দেখিলেও তন্ন তন্ন করিয়া দেখা শেষ হয় না।*

বেলা ১।১৫ মিনিটের সময় আমরা সূর্য্যমন্দিরের হাতায় (compound) উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড হাতা, দৈর্ঘ্যে ৮৫৭ ফুট, প্রস্থে ৫৪০ ফুট, চারিদিকে ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি চওড়া

* পদ্মপুরাণ—সৃষ্টিখণ্ড—১৩ অধ্যায় মতে শাম্ব সৌরশাস্ত্রপ্রণেতা এবং মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ কার্য্যে অতিশয় কুশলী ছিলেন।

** মন্দিরের উচ্চতা ২২৮ ফুট; জগন্নাথের মন্দির ২১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি।

* এস্থানে বিশ্রাম করিবার জন্য ডাক-বাঙ্গালা আছে। মন্দির হইতে বেশী দূর নয়। মালীকে কিছু বখ্শিস দিলে আহার্য্যাদির ব্যবস্থাও হইতে পারে। মন্দিরের নিকটেই নিরঞ্জন-মঠ আছে, সেখানে বসিয়াও বিশ্রাম লওয়া যাইতে পারে। আহার্য্যের অপক্ক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া গেলে মঠে রন্ধনাদি করিয়া আহার চলিতে পারে।

প্রাচীর ; এই প্রাচীর একদিন ১৪ ফুট উচ্চ ছিল, এক্ষণে ৩।৪ ফুট হইবে। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থমতে প্রাচীর ১৯ হাত চওড়া, ১৫০ হাত উচ্চ ছিল!! হাতার পশ্চিমদিকে ঝাউগাছের ছায়ায় সকলেই বসিলাম। সকলেই অল্পবিস্তর ক্লান্ত। ডাবের ছোবড়া কাটিয়াই আনা হইয়াছিল, এক্ষণে ছুরি দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া ডাবের মুখ খোলা আরম্ভ হইল। প্রথমটি 'মা-ঠাকরুণ'কে দিলাম ; তিনি 'না' 'না' 'আপনি খান' ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। বেচারির মুখ রৌদ্রে লাল হইয়া গিয়াছে। এতক্ষণে আমাদের আত্মীয়তা একটু গাঢ় হইয়াছে ; বলিয়া ফেলিলাম—'বেটি, আগে নিজেকে ঠাণ্ডা কর, তারপর আমাদের কথা ভাবিও।' বেচারি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া ডাবের জল পান করিলেন। পরে ধীরে ধীরে অন্য তিনটি ডাবের সদ্ব্যবহার করা হইল। এর মধ্যে ছুরি ফস্‌কাইয়া নিজের অঙ্গুলি কাটিয়া ফেলিয়াছি, কাহাকেও জানিতে দিই নাই। পরে অঙ্গুলিতে রুমাল বাঁধা দেখিয়া শ্রীমতী বহু আর্ত্তি-কাতরতা প্রকাশ করিলেন। ভাবিলাম—বাঙ্গালীর মেয়ে ত! যাঁহারা কোণার্ক যাইবেন, তাঁহারা অনেকগুলি ডাব ও কাটারি সঙ্গে না রাখিলে তৃষ্ণায় বড় কষ্ট পাইবেন।

হাতার পশ্চিম প্রান্ত হইতে মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড ভগ্ন-প্রস্তর-স্তূপ বলিয়া মনে হয়। ইহারই এত প্রসিদ্ধি! দেশ-দেশান্তর হইতে মানুষ আসে এই মন্দির দেখিতে! দূর হইতে এইরূপই মনে হয় ; নিকটে গিয়া মন্দিরের কারুশিল্প দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া ভাবিতে হয়—"হায়! এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া



মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য—শ্রীযুক্ত সুনীল লাহিড়ীর সৌজন্যে

শিখিতে হয়।...কুমারসম্ভব ছাড়িয়া সুইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, উড়িষ্যার প্রস্তর-শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের চীনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে, বলিতে পারি না।"...পাথর "এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু?...তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক...এ সকল হিন্দুর কীর্ত্তি। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মসার্থক করিয়াছি।" (বঙ্কিমচন্দ্র, সীতারাম ১ খ,—১৩ পরিচ্ছেদ)

মনে শ্রদ্ধাবিমিশ্রিত বিস্ময় লইয়া আমরা বসিলাম মন্দিরের নিকটে। মন্দিরের ৩ অংশ, বিমান অর্থাৎ দেববিগ্রহের মন্দির, জগমোহন অর্থাৎ আমাদের সাধারণ চলিত ভাষায় সম্মুখস্থ নাটমন্দির এবং ভোগমণ্ডপ। মন্দির পূর্ব্বমুখী, প্রকাণ্ড একখানি রথরূপে পরিকল্পিত, যেন রথ পূর্ব্বমুখে চলিয়াছে। পৃথিবীর আবর্ত্তন পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, ইহারই কি প্রতীক পূর্ব্বমুখী রথ? কোণার্কের মন্দির-নির্ম্মাতারা সূক্ষ্মরূপে পূর্ব্ব-দিঙ্‌-নিরূপণ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের দিঙ্‌-নিরূপণ বিষয়ে সূর্য্যসিদ্ধান্ত উপায়-নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, যথা—

শিলাতলেঽম্বুসংশুদ্ধে বজ্রলেপেঽপি বা সমে।
তত্র শঙ্ক্বঙ্গুলৈরিষ্টৈঃ সমং মণ্ডলমালিখেৎ॥
তন্মধ্যে স্থাপয়েচ্ছঙ্কুং কল্পনাদ্দ্বাদশাঙ্গুলম্‌।
তচ্ছায়াগ্রং স্পৃশেদ্‌ যত্র বৃত্তে পূর্ব্ব পরার্দ্ধয়োঃ॥
তত্র বিন্দু বিধায়োভৌ বৃত্তে পূর্ব্বপরাভিধৌ।
তন্মধ্যে তিমিনা রেখা কর্ত্তব্যা দক্ষিণোত্তরা॥
যাম্যোত্তরদিশোর্মধ্যে তিমিনা পূর্ব্বপশ্চিমা।
দিঙ্‌মধ্যমৎস্যৈঃ সংসাধ্যা বিদিশস্তদ্বদেব হি॥

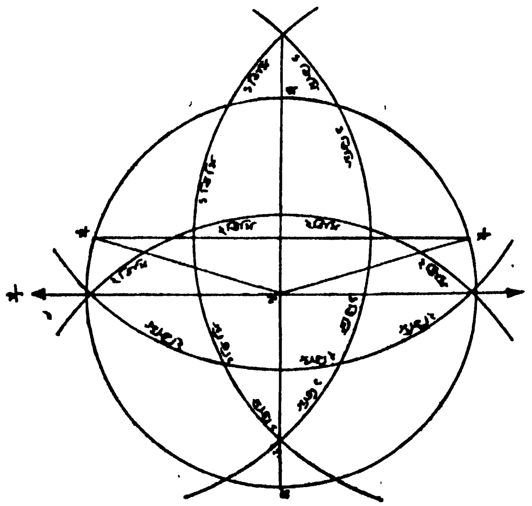
তৃতীয় অধ্যায় ১-৪

শিলাতলকে জলের দ্বারা (পরীক্ষা করিয়া) সমতল অর্থাৎ লেভেল (level) করিয়া লইয়া তাহার উপর, অথবা সমান পাকা চূণের মেঝের উপর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধের একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিবে। ইহার কেন্দ্রে দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ একটি শঙ্কু (gnomon) লম্বভাবে (vertically) স্থাপন করিবে এবং পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে ঐ শঙ্কুর ছায়ার অগ্রভাগ পূর্ব্বাঙ্কিত বৃত্তকে যে যে স্থানে স্পর্শ করিবে তথায় পশ্চিম ও পূর্ব্ব বিন্দু নামে দুইটি বিন্দু চিহ্নিত করিয়া লইবে। পরে ঐ দুই বিন্দুর মধ্য দিয়া যে তিমি (দুই বৃত্তের ছেদে উৎপন্ন মৎস্যাকার ক্ষেত্রের নাম তিমি) হইবে, সেই তিমির মধ্য দিয়া রেখা টানিলেই তাহা যাম্যোত্তর রেখা বা দ্রাঘিমা বা meridian হইবে। এক্ষণে যাম্যোত্তর বিন্দুর মধ্যস্থিত তিমির ভিতর দিয়া রেখা অঙ্কিত করিলেই তাহা পূর্ব্ব-পশ্চিমা (east-west line) হইবে ; এইরূপে নির্ণীত বিন্দুর মধ্যস্থ তিমি দ্বারা অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী ঈশানাদি দিক্‌ নির্ণয় করিবে।

সঙ্গের চিত্র হইতে প্রক্রিয়া বুঝার সুবিধা হইবে—

ক = শঙ্কু
খ = পশ্চিমবিন্দু
গ = পূর্ব্ববিন্দু

ক খ = পূর্ব্বাহ্নে ছায়া
ক গ = অপরাহ্নে ছায়া
ঙ ঘ = যাম্যোত্তর
পূ = পূর্ব্ব
প = পশ্চিম
পূপ = পূর্ব্ব পশ্চিমা রেখা



এই প্রণালীতে যে পূর্ব্ব দিক্ নির্ণীত হইত তাহা আজকালকার Prismatic Compass এবং Theodolite যন্ত্রদ্বারা নির্ণীত পূর্ব্বদিক হইতে তফাৎ হইত না। হাওড়ার ভূতপূর্ব্ব ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় Prismatic Compass এবং Theodolite দ্বারা একাধিকবার মন্দিরের দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে মন্দিরের পূর্ব্বদ্বার ৩৬০° এবং দক্ষিণদ্বার ২৭০°। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের অভাবেও উড়িষ্যার শিল্পীদের এরূপ যথাযথ দিঙ্-নিরূপণপূর্ব্বক মন্দির নির্ম্মাণ বড় অল্প কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। (মনোমোহনবাবুর Orissa & Her Remains দ্রষ্টব্য)

পশ্চিমপ্রান্তে বিমান অবস্থিত। জগমোহনে প্রবেশ করিয়া জগমোহন পার হইয়া বিমানে প্রবেশ করিতে হইত। এক্ষণে জগমোহনের দ্বার প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিমান ভগ্নদশায় অবস্থিত। পশ্চিমদিকে সিঁড়ি বাহিয়া কিছু উপরে উঠিয়া আবার নামিয়া বিমানের দেববিগ্রহস্থানে যাওয়া যায়। আমরা সকলেই এইরূপে বিমানের অভ্যন্তরে বা গর্ভগৃহে প্রবেশ করিলাম। অভ্যন্তর সমচতুষ্কোণ, আয়তন ৩২′—১০″ × ৩২′—১০″। জগমোহন হইতে বিমানে প্রবেশের দ্বারও প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দ্বারের কারুকার্য্যখচিত ঠাট (frame) দাঁড়াইয়া আছে, উচ্চতার মাপ ৯′—১০½″। এই দ্বার বিমানের মেঝে হইতে কিছু উচ্চে অবস্থিত, সম্ভবতঃ দ্বারের সম্মুখে সিঁড়ি ছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এক্ষণে কোনও সূর্য্যবিগ্রহ নাই, সিংহাসন বা পাদপীঠ খালি আছে। কেহ কেহ বলেন যে, পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের হাতায় সূর্য্যমন্দিরে যে মূর্ত্তি আছে তাহাই নাকি কোণার্ক হইতে তথায় নীত হইয়াছিল। সিংহাসন বা পাদপীঠ কাল মুগুনি প্রস্তরে (chlorite stone) নির্ম্মিত, ৪′—৮″ উচ্চ। পাদপীঠের গাত্রে প্রস্তরে উৎকীর্ণ সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তীর শ্রেণী। তদুপরি অনেকগুলি কুলুঙ্গীর ন্যায় স্থানে (niches) পূজার্থী ও পূজার্থিনীর ভক্তিবিনম্র মূর্ত্তির শ্রেণী। প্রত্যেকের মুখে এমন একটি ভাব প্রকটিত যাহা দেখিয়া অনুমান হয় যে, শিল্পীরা নিজেদের প্রাণের রসে যেন ইহাদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল। বিমানের অভ্যন্তরে এই সিংহাসন ছাড়া দ্রষ্টব্য এখন আর কিছুই নাই। বিমানের উপরে ছাদ নাই। কেমন করিয়া বিমানের ধ্বংস হইল, এ সম্বন্ধে কতকগুলি মত আছে, যথা—

(১) M. H. Arnott, Superintending Engineer এর মত—মন্দির যখন নির্ম্মাণ করা হয় তখন যেমন যেমন গাঁথা হইতেছিল তেমনই বালুকা দ্বারা ভিতর পূর্ণ করা হইতেছিল; মন্দির-গাঁথা শেষ হইবার পরে যখন ভিতরের বালুকা সরান হয় তখন ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়। এই মত ঠিক হইতে পারে না, কেন না (ক) মন্দিরে যে বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহার নিদর্শন রহিয়াছে সিংহাসন, এবং (খ) এরূপ হইলে পাথরগুলি হুড়মুড় করিয়া কতক ভিতরে কতক উপরে চাপিয়া পড়িত; পাথরগুলিকে সেরূপ দেখায় না।

(২) ভিত্তি বসিয়া যাওয়ায় মন্দিরের ধ্বংস; ইহাও হইতে পারে না, কেন না ভিত্তি কোথায়ও বসিয়া যায় নাই; এরূপ হইলে মেঝেতে horizontal ফাটল ও মন্দিরে vertical (প্রলম্ব) ফাটল দেখা যাইত; তাহা দেখা যায় না।

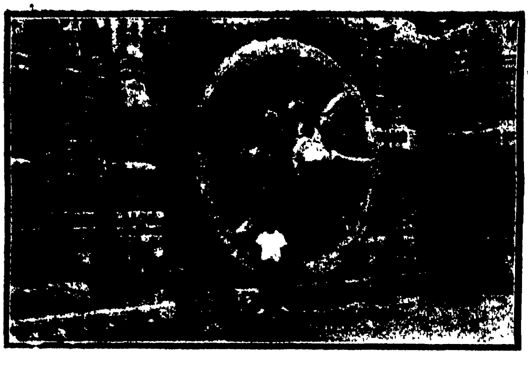
(৩) A. Sterling, Asiatic Researches, xv. 329—বিমানের উপর একটি প্রকাণ্ড কুম্ভপাথর (loadstone) ছিল; তাহা সমুদ্রগামী জাহাজকে আকর্ষণ করিত; একদল মুসলমান নাবিক দূরে জাহাজ হইতে নামিয়া চুপি চুপি মন্দির আক্রমণ করিয়া কুম্ভপাথর চুরি করিয়া লইয়া যায়। পুরোহিতগণ মন্দির অপবিত্র জানিয়া বিগ্রহকে পুরীতে লইয়া যান এবং মন্দির ত্যাগ করেন। পরে প্রকৃতি তাঁহার ধ্বংসলীলা আরম্ভ করেন।

(৪) ভূমিকম্পের ফল। তাহাও হইতে পারে না; কেন না বিমানের ঠিক সম্মুখেই বিমানসংলগ্ন জগমোহন এখনও ঠিক খাড়া আছে; ভূমিকম্প জগমোহনকে পরিত্যাগ করিত না।

(৫) পুরীর records মতে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে কালাপাহাড়ের আক্রমণ।

কারণ যাহাই হউক, বিমানের ধ্বংস শিল্পের জগতে একটা বিরাট শোচনীয় ব্যাপার, সন্দেহ নাই।

বিমানের উত্তর এবং দক্ষিণ গাত্রে ৮′—২½″ উচ্চ একটি করিয়া প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তি এবং পশ্চিমগাত্রে ৯′—৬″ উচ্চ একটি সূর্য্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটিই শান্ত স্নিগ্ধ মূর্ত্তি। বিমান হইতে অবতরণ করিয়া আমরা জগমোহনের দিকে অগ্রসর হইলাম। বিমান-জগমোহন প্রকাণ্ড রথরূপে পরিকল্পিত, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। ইহাদের গাত্রে উত্তরদিকে ১২খানি এবং দক্ষিণদিকে ১২খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রথচক্র তোলা-করিয়া (relief) ক্ষোদিত দৃষ্টিগোচর হইল। এই রথচক্র শিল্পজগতে বিখ্যাত। পাথরের উপর পাথর বসাইয়া মন্দির গাঁথা হইয়াছে অথচ তাহারই ভিতর হইতে বিরাট চক্র কেমন সুন্দর উৎকীর্ণ হইয়াছে! সমস্ত ব্যাপারটাই একটা অতি-বিরাট-সুন্দর কল্পনা হইতে প্রসূত। চক্রগুলির সম্মুখে গিয়া আমরা কিছুক্ষণ বিস্ময়স্তিমিতগতি



রথ-চক্র—শ্রীযুক্ত সুনীল লাহিড়ীর সৌজন্যে

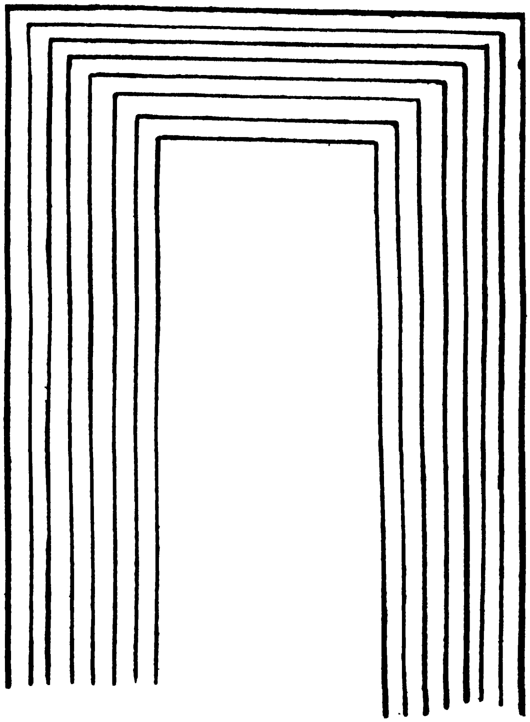
হইয়া অনিমেষলোচনে শিল্পীর নৈপুণ্য দর্শন করিতে লাগিলাম। প্রত্যেকখানি চক্রই অতিসুন্দর, বিরাট; পাথরে তোলা-করিয়া উৎকীর্ণ; অর, অক্ষ, নেমি সবই আছে, আর চক্রের প্রতি অঙ্গে নিপুণ হস্তের নির্ম্মিত সুন্দর মূর্ত্তি বা পদ্ম বা অন্য বস্তু উৎকীর্ণ রহিয়াছে। চক্রের ব্যাসের মাপ ৯′—৮″; প্রত্যেক চক্রে প্রধান অর (spoke) আটটি, আর অবান্তর অর আটটি; প্রত্যেক অরই কারুকার্য্যবিশিষ্ট; অক্ষ হইতে নেমি পর্য্যন্ত অরের দৈর্ঘ্য ৩′—৩″। পূর্ব্বে রথে নাকি ৭টি প্রস্তর নির্ম্মিত অশ্ব যোজিত ছিল, এখন সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই রথ-চক্র দেখিবার জন্য দেশ-বিদেশের শিল্পানুরাগী ব্যক্তিগণপ্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া কোণার্কে গমন করেন। দেখিবার, শুধু দেখিবার নহে, ভাবিবার মত জিনিষ বটে!

উত্তরদিকের গাত্রে চক্রগুলি দেখিতে দেখিতে আমরা পূর্ব্বমুখে গিয়া জগমোহনের পূর্ব্বদ্বারে উপস্থিত হইলাম। দ্বার প্রস্তর দ্বারা গাঁথিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই প্রস্তরের উপরে লেখা আছে—

Interior of Jagamohan was filled in by order of the Hon'ble G. A. Bourdilon, Lt. Governor, Bengal, 1903.

[বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা (লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর) মাননীয় জে, এ, বুর্দ্দীলন বাহাদুরের আজ্ঞানুসারে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে জগমোহনের অভ্যন্তর (বালুকা প্রভৃতির দ্বারা) পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া হইল।]

দ্বারের প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাট (frame) শিল্পীর নৈপুণ্যের নিদর্শন লইয়া আজও দাঁড়াইয়া আছে। কাল মুগুলি (chlorite) প্রস্তরে ক্ষোদিত অতি সুন্দর মূর্ত্তি সকল এবং বৃক্ষলতা ও জীবজন্তুর প্রতিকৃতি রুচি ও বিন্যাস-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। মূর্ত্তিগুলি এখনও এত সুন্দর রহিয়াছে যে, মনে হয় এইমাত্র বুঝি তক্ষণ শিল্পী তাহার যন্ত্রাদি রাখিয়া বিশ্রাম করিতে গিয়াছে। Sterling (Asiatic Researches. xv. 332) বলেন, Which would stand a Comparison with some of our best specimens of Gothic architectural ornaments—পাশ্চাত্যের গথিক শিল্পের সহিত ইহাদের উপমা চলে।



দ্বারের প্রস্তর নির্ম্মিত ঠাট

এই দ্বারের কারুকার্য্য প্রায় অক্ষত অবস্থায় আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বারের ঠাটের দুই পার্শ্বের প্রস্তর দণ্ড ও মস্তকের প্রস্তরে ৭টি নক্সা শ্রেণী বর্ত্তমান।

(১) লতা-পাতার নক্সা।

(২) ঊর্দ্ধে মানব-মানবী, অধোভাগে সর্পের ল্যাজের ন্যায়—এইরূপ যুগলমূর্ত্তি পরস্পরকে জড়াইয়া সমস্ত দ্বার বেড়িয়া আছে।

(৩) দুই পার্শ্বের ডাণ্ডায় মিথুনমূর্ত্তি, দ্বারের উপরে উপবিষ্টা নর্ত্তকী।

(৪) আঁকা-বাঁকা লতার মাঝে নৃত্যের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান মানুষের মূর্ত্তি—ডাণ্ডায়; উপরের প্রস্তরে পরী উড়িয়া যাইতেছে।

(৫) নগ্না, নৃত্য ও বাদনরতা নারী।

(৬) মিথুনমূর্ত্তি এবং নৃত্যবাদনরতা নারী।

(৭) পুষ্পের মালা।

জগমোহনের ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে। আমরা সকলেই উপরে উঠিলাম; বিভিন্ন 'ভূমি' (storey) অতিক্রম করিয়া আমরা সর্ব্বোচ্চ ভূমিতে আরোহণ করিলাম। এই স্থানে ৬।৭ ফুট দীর্ঘ মানুষ বেশ স্বচ্ছন্দে নীচের আলিসার উপর দিয়া ও উপরের আলিসার তলা দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারে। প্রত্যেক আলিসাতেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি. কেহ বাদ্যবাদনরত, কেহ বংশীবাদনরত ইত্যাদি। চতুর্ম্মুখ-মূর্ত্তি, মৃদঙ্গ-বাদনরতা অপ্সরার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন আমরা জগমোহনের উপর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে সমুদ্র দেখিতে পাইলাম তখন "উৎকট আনন্দে" আমাদের হৃদয় ভরিয়া উঠিল; সকলেই প্রায় সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—কি মহীয়ান্ দৃশ্য! শ্রীমতী ত একেবারে বালিকার ন্যায় হাস্যসমুজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন; শ্রীমানের ভয় হইতেছিল, বুঝি বা শ্রীমতী "দেই লাফ" বলিয়া লাফ দেন! সকলেই স্তম্ভিত হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলাম; পরে সকলেই সেই উচ্চ আলিসায় দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলাম—কোণার্ক না দেখিয়া ফিরিলে উড়িষ্যায় আগমনই বৃথা হইত!

জগমোহন হইতে অবতরণ করিয়া আমরা অন্যান্য দ্রষ্টব্য পদার্থ ও ভোগমণ্ডপ দেখিলাম। ভোগমণ্ডপ দেখিয়া মনে হয় ইহা সম্পূর্ণ-গাঁথা হয় নাই। যে সকল মূর্ত্তি ভোগমণ্ডপে ছিল—তাহা সরাইয়া নবনির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র যাদুঘরে রাখা হইয়াছে। আমরা যাদুঘরে প্রবেশ করিলাম। এস্থানে পাণ্ডাজাতীয় একটি লোক আমাদিগকে ফুলের মালা দিতে আসিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা শ্রীমতীর প্রাপ্য স্থির করা গেল। 'পাণ্ডা' শ্রীমতীকে মালা পরাইয়া দিলেন, কিছু পয়সা দক্ষিণা পাইলেন। যাদুঘরে পাণ্ডা! যাক্। যাদুঘরে কাল প্রস্তরে উৎকীর্ণ বহু সুন্দর মূর্ত্তি দেখা গেল। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

গঙ্গা, ছাগবাহন অগ্নি, মহিষমর্দ্দিনী, জগন্নাথ, শিবলিঙ্গ, তিন অংশে সীতা বিবাহ [১ সম্প্রদান, ২ নৃত্যগীত, ৩ বিবাহ মিছিল], বিষ্ণু, ঝুলন-যাত্রা, সূর্য্য। এই সূর্য্যমূর্ত্তি অতি সুন্দর। মূর্ত্তির সর্ব্বনিম্নে অরুণ সপ্ত অশ্ব পরিচালনা করিতেছেন; অরুণের ঠিক পশ্চাতে দ্বিভুজ সূর্য্যনারায়ণ দাঁড়াইয়া আছেন; পায়ে স্যাণ্ডালের ন্যায় জুতা, কটিতে কটিবন্ধ, গলায় মালা, স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত, মস্তকে মুকুট। উপরে তোরণের মধ্যস্থলে রাহুর মুখ। সূর্য্যদেবের পাদদেশের দুই পার্শ্বে দুটি ছোট মূর্ত্তি, একটি শঙ্খ বা ঐরূপ কিছু বাজাইতেছে, অপরটি বোধ হয় পূজার্থ দ্রব্য-হস্তে দণ্ডায়মান; ইহাদের পার্শ্বে ঢাল ও তরবারি হস্তে দণ্ড ও পিঙ্গল নামক দুইজন দ্বারপাল; ইহাদের উপরে ছোট মন্দিরের চূড়ায় উপরে দুইটি নারীর মূর্ত্তি, ইঁহারা বোধ হয় নিক্ষুভা ও দ্যৌ—সূর্য্যের দুই পত্নী (স্কন্দপুরাণ, প্রভাস, ১১ অধ্যায়)। ইঁহাদের উপরে দুইটি প্রস্ফুটিত পদ্মফুল। উপরের দুই কোণে অপ্‌সরার পৃষ্ঠে কি যেন উড়িয়া আসিতেছে। সমগ্র মূর্ত্তিটি শিল্প-সৌন্দর্য্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। যাদুঘরের একখানি দীর্ঘ প্রস্তরফলকে নবগ্রহের মূর্ত্তি ক্ষোদিত; এই প্রস্তরফলকখানি নাকি পূর্ব্বে জগমোহনের দ্বারের উপর ছিল। এইরূপ প্রস্তরফলকে ক্ষোদিত নবগ্রহমূর্ত্তি পুরীতে গুণ্ডিচাবাড়ীর দ্বারের উপরে দেখা যায়। যাদুঘরের ভিতরে লৌহনির্ম্মিত কয়েকটি ক'ড়ি (Beam) আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। ইহাদের মধ্যে তিনটির দৈর্ঘ্য ৩৫'-৯"। ইহারা মন্দিরের কোনও স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এখন এখানে থাকিয়া তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।



সূর্য্য—শ্রীযুক্ত সুনীল লাহিড়ীর সৌজন্যে

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে কাল প্রস্তরে নির্ম্মিত (chlorite) উচ্চ অরুণ-স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কোণার্ক হইতেই তথায় নীত হইয়াছে।

কোণার্ক মন্দিরের হাতায় উত্তরদ্বারে দুইটি হস্তীর মূর্ত্তি।

প্রত্যেক হস্তীই এক একখানি প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ, প্রত্যেকের শুণ্ডে একটি করিয়া মানুষ ঝুলিতেছে। দক্ষিণ দ্বারে দুইটি অশ্ব; ইহারাও এক একখানি প্রস্তর হইতে উৎকীর্ণ। বিখ্যাত শিল্পবিজ্ঞানবিৎ হাভেল সাহেব বলেন (Indian sculpture and Painting p. 146-47)—Had it by chance been labelled Roman or Greek, this magnificent work of Art would now be the pride of some great metropolitan museum in Europe and America.—যদি ইহার গায়ে, রোমান বা গ্রীক ভাস্কর্য্যের নিদর্শন বলিয়া বিজ্ঞাপন আঁটিয়া দেওয়া হইত, তাহা হইলে ইউরোপ বা আমেরিকার যে কোনও প্রধান সহরের যাদুঘরে ইহা সাদরে রক্ষিত হইয়া যাদুঘরের গৌরব বাড়াইত।

বিমানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে মায়াদেবীর মন্দির; বাহিরের কারুশিল্প সুন্দর, কিন্তু তাহার বিশেষ করিয়া দেখিবার মত অবসর আমাদের ছিল না। কোণার্কে দ্রষ্টব্য অনেক জিনিষ আছে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু আমরা সে সকল না দেখিয়া এক্ষণে ঘড়ির দিকে দৃষ্টি রাখিতে লাগিলাম। মন হইল উচাটন, অথচ সব যে দেখা হইল না এরূপ ভাবও মনে জাগিতে লাগিল! ফিরিতেই হইবে, মন্দিরের নিকট দিয়াই ফিরিতে লাগিলাম; এতদিনের ঝড়-বৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও মন্দিরের কারুকার্য্যের সূক্ষ্মতা প্রতি পদক্ষেপেই আমাদিগকে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেছিল; যেন বলিতেছিল, থাকিয়া যাও, দেখিয়া যাও, আদর করিয়া যাও। এমন একখানি প্রস্তর নাই, যেখানিতে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই। প্রত্যেক পাথর-খানিতে শিল্পীর আদরের সুস্পষ্ট চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। পাথর দেখিতে দেখিতে ভুল হইয়া যায়, মনে হয় ইহা যেন কোমল লঘু মৃত্তিকা বা মোম ছিল, শিল্পী সযত্নে হাতে করিয়া তুলিয়া বুকের নিকটে রাখিয়া সমস্ত স্নেহরস নিঙ্‌ড়াইয়া দিয়া ইহাকে অভিষিক্ত করিয়া মনের মতন করিয়া গড়িয়া রাখিয়া দিয়াছে, পরে কোনও দয়াল দেবতা শিল্পীকে অমর করিবার জন্য কোমল মৃত্তিকা বা মোমখণ্ডে সযত্নে অঙ্কিত শিল্পকে কঠিন প্রস্তরের আকার দিয়া আজ পর্য্যন্ত মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবার উপযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিলাম। ফিরিবার পথে কেবলই মনে হইতে লাগিল—"পাথর এমন করিয়া যে পালিশ করিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? এমন করিয়া বিনা বন্ধনে যে গাঁথিয়াছিল, সে কি আমাদের মত হিন্দু? আর এই প্রস্তর মূর্ত্তিসকল যে ক্ষোদিয়াছিল, এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধসৌন্দর্য্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্ত্তিমান্ সম্মিলন-স্বরূপ পুরুষ মূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু? এই কোপপ্রেমগর্ব্বসৌভাগ্যস্ফুরিতাধরা চীনাম্বরা তরলিতরত্নহারা পীবরযৌবনভারাবনতদেহা এই সকল স্ত্রীমূর্ত্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?" (বঙ্কিমচন্দ্র)

ফিরিতেই হইল। আবার সেই বালুময় দীর্ঘ পথ, পা যেন আর চলিতে চায় না, কি যেন ফেলিয়া চলিয়াছি! যেখানে মোটর-যানকে রাখিয়া গিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে পুনঃ সেই স্থানে আসিলাম। সামান্য জলযোগান্তে যাত্রা করা হইল, তখন বেলা ৩।১৫ মিনিট। ১॥ ঘণ্টার মধ্যে সব দেখা হইল! এ যেন আমেরিকার সখের ভবঘুরের ২১ দিনে ভারত দর্শন! তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোণার্কে যাওয়ার পক্ষে সনাতন গো-যানই প্রশস্ত; সময়ের তাড়া থাকে না, যত খুশী কোণার্ক দর্শন করুন, সারাদিন পরে আহারান্তে গোযানে শয়ন করিয়া প্রত্যাগমন করুন। সময়ের তাড়া নাই, আরামের তাগাদা নাই, সভ্যতার বালাই নাই।

এইবার একটু ইতিহাসের কথা। মন্দির নির্ম্মাণের ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে (১) মাদলা পাঁজি (২) গঙ্গাবংশীয় রাজগণের তাম্রশাসন এবং (৩) আইন-ই-আকবরী দেখিতে হইবে।

(১) মাদলা পাঁজিতে আছে (Dr. Rajendralal Mitra, Orissa II)

সপুচ্ছনরসিংহেন শ্লেশ্বরেণাংশুমালিনঃ।
প্রাসাদঃ কারিতো রাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে॥

রাজা নরসিংহদেবের দ্বারা দ্বাদশ শকশতাব্দীতে অংশুমালী সূর্য্যের মন্দির নির্ম্মাণিত হইয়াছিল।

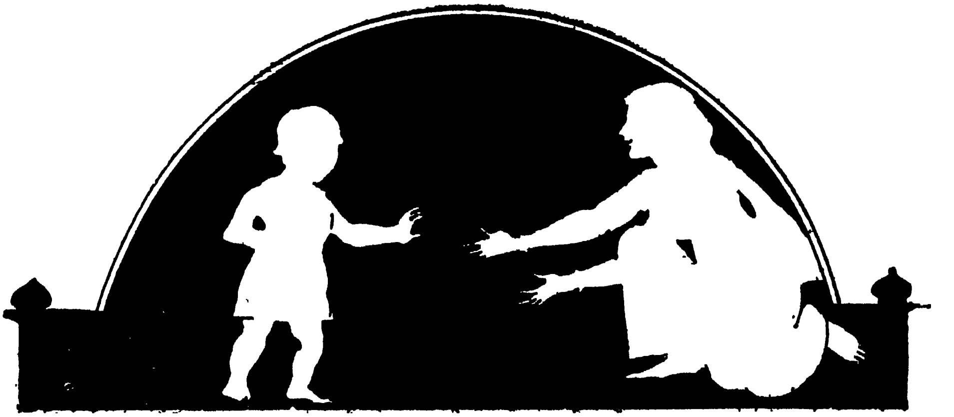
(২) তাম্রলিপিতে দেখা যায়—কোণার্কের মন্দির নরসিংহদেবের রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে নির্ম্মিত হয়। নরসিংহদেব ১১৬০ শক হইতে ১১৮৬ শক পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন (মনোমোহন চক্রবর্ত্তী); তাহা হইলে ১১৭৮ শকে (১২৫৬

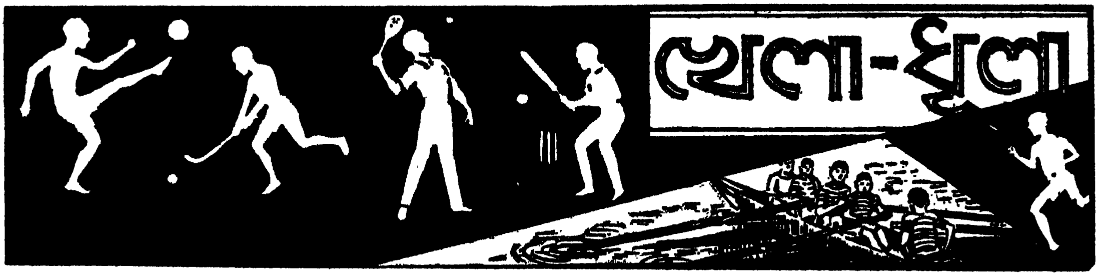
খৃষ্টাব্দে) মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিতে হয়। স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে নরসিংহদেব ১২৩৮ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন (History of Orissa, vol I. p. 262)। এই হিসাব মাদ্‌লা পাঁজির হিসাবের সহিত মিলে। চোড়গঙ্গবংশের রাজাদের রাজত্বের সময়ের হিসাবও ইহাই নির্দ্দেশ করে।

(৩) আইন-ই-আকবরী। প্রথম ভাগ—সুবে বাঙ্গালা পৃঃ ৩০৯ (Francis Gladwinএর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের অনুবাদ) Near to Jaganaut is the temple of the Sun, in the erecting of which was expended the whole revenue of Orissa for 12 years... This is said to be a work of seven hundred and thirty years antiquity. Raja Nurshing Deo finished this building, thereby erecting for himself a lasting monument of fame...... জগন্নাথের মন্দিরের অনতিদূরে সূর্য্যের মন্দির অবস্থিত ; এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে উড়িষ্যার ১২ বৎসরের আয় ব্যয়িত হইয়াছিল।...৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির নির্ম্মিত হয় ; রাজা নরসিংহদেব ইহা সম্পূর্ণ করিয়া স্বীয় যশের চিরস্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ..

আবুল ফজলের এই উক্তি কতটুকু প্রামাণ্য তাহা বিচার-সাপেক্ষ। মন্দির যে নরসিংহদেবের রাজত্ব সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, মাত্র এইটুকু আমরা উক্ত উক্তি হইতে গ্রহণ করিতে পারি ; পূর্ব্বে লিখিত দুই প্রমাণের সহিত তাহা মিলে। কিন্তু মন্দির নির্ম্মাণের সময়—আবুল ফজলের মতে, ১৫৫৬ (আকবরের রাজ্যপ্রাপ্তি) + ৪৭ (আবুল ফজলের মৃত্যু)—৭৩০=৮৭৩ খৃষ্টাব্দের পরে হইতে পারে না। সম্রাট আকবর রাজত্ব করিয়াছিলেন ৪৯ বৎসর। আকবরের রাজত্বের মাঝামাঝি সময়ে উড়িষ্যায় এই বিবরণ লিখিত হইয়াছিল মনে করিলে (অর্থাৎ ১৫৮০ হইতে ৭৩০ বাদ দিলে) মন্দির নির্ম্মাণের সময় দাঁড়ায় ৮৫০ খৃষ্টাব্দ। ইহা পূর্ব্বে উক্ত প্রমাণের সহিত মিলে না। জগন্নাথের মন্দিরও তখন নির্ম্মিত হয় নাই। অন্য কারণেও আবুল ফজলের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না ; কোণার্কের মন্দিরে জগন্নাথের মূর্ত্তি দেখা যায়—ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; অতএব জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের পরে কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে বলিতে হয়। জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণের সময়—একাদশ শতাব্দীর পরে হইতে পারে না, কেন না একাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরের খ্যাতি বাহিরে বিস্তৃত হইয়াছিল (R. D. Banerjee—History of Orissa, vol II. p. 370)। আরও এক কথা, কোণার্ক শব্দের অর্থই হইতেছে, চক্রক্ষেত্র বা পুরী হইতে ঈশান কোণে অবস্থিত সূর্য্যমন্দির ; পুরীর মন্দিরের পূর্ব্বে পুরী হইতে ঈশান কোণের মন্দির কেমন করিয়া হইবে !

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোণার্কের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল—এইরূপই বলিতে হইবে। কালের প্রভাবকে প্রায় উপেক্ষা করিয়া এই মন্দির সকলের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য প্রায় ৭০০ বৎসর দাঁড়াইয়া আছে। শিল্পী কালের গর্ভে বিলীন হইয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু শিল্পী ও তাহার শিল্পকে অমর করিয়া রাখিয়াছে কোণার্ক।





নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতা ঃ

লাহোরে নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাবের খেলোয়াড়রা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। পাঞ্জাব ৯১ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম, বাঙ্গলা ২৩ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয় এবং বোম্বাই ১৯ পয়েণ্ট পেয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। বাঙ্গলার পুরুষ প্রতিযোগিগণের মধ্যে কেবলমাত্র এফ্ গাণ্ট্জার ৪০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হতে পেরেছেন। মহিলাদের প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার মিস্ স্মিথ ৫০ ও ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম এবং মিস্ পিচার্ড ৮০ মিটার বেড়া দৌড়ে ও হাইজাম্পে প্রথম ও ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে বাঙ্গলার মুখ রক্ষা করেছেন। পোল-ভল্টে বি পি রায় চৌধুরী (বাঙ্গলা) দ্বিতীয় হয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়ারা পঞ্চম টেষ্টে জয়ী হয়েছে এক ইনিংস ও ৬ রানে।



নিখিল ভারত অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ১০০ মিটার দৌড়ে, প্রথম—মিস্ এম্ স্মিথ (বাঙ্গলা), দ্বিতীয়—মিস্ ডি প্রিচার্ড (বাঙ্গলা), তৃতীয়—মিস ডি ফয়েষ্ট (পাঞ্জাব)

গ্রিমেট ৭৩ রানে ৬ উইকেট, ও'রেলি ৪৭ রানে ৪ উইকেট নিয়েছে।

এইবারের অভিযানে অষ্ট্রেলিয়ারা একটা খেলাতেও হারে নি, বারোটা খেলায় জিতেছে, আর তিনটায় ড্র করেছে।

ক্রিকেট রেকর্ড ঃ

জগৎ বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন্ ব্র্যাডম্যান তাস্ম্যানিয়ার বিরুদ্ধে খেলে ৩৬৯ রান করেছেন। তিনি তৃতীয় শত রান মাত্র ৪০ মিনিটে করেছেন। তৃতীয় উইকেট সহযোগিতায় ৩১৬ রান হয়েছে, তার শেষ এক শত রান মাত্র ৩২ মিনিটে হয়।

ইংলণ্ডগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

আগামী ৪ঠা এপ্রিল ভারতীয়গণ ক্রিকেট খেলতে ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করবেন। সেখানে তাঁরা তিনটি টেষ্ট ম্যাচ ও আটাশটি ম্যাচ বিভিন্নদলের সঙ্গে খেলবেন। ২রা মে তারিখে উষ্টার্সেয়র সঙ্গে তাঁদের সেখানে

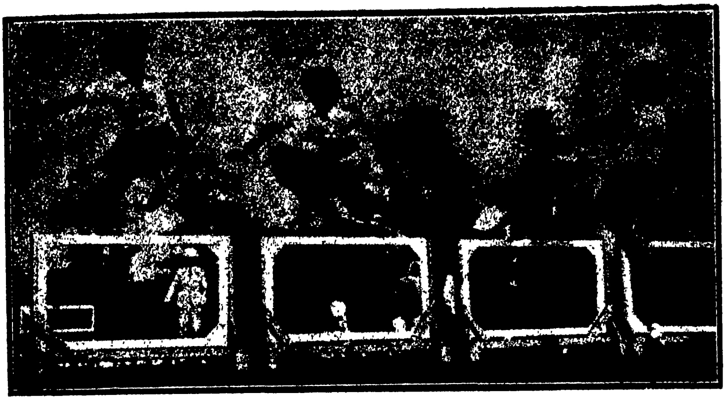
প্রথম খেলা হবে এবং ১৪ই সেপ্টেম্বর ইণ্ডিয়ান জিমখানার সঙ্গে শেষ খেলা হবে।

নিম্নলিখিত সতেরো জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

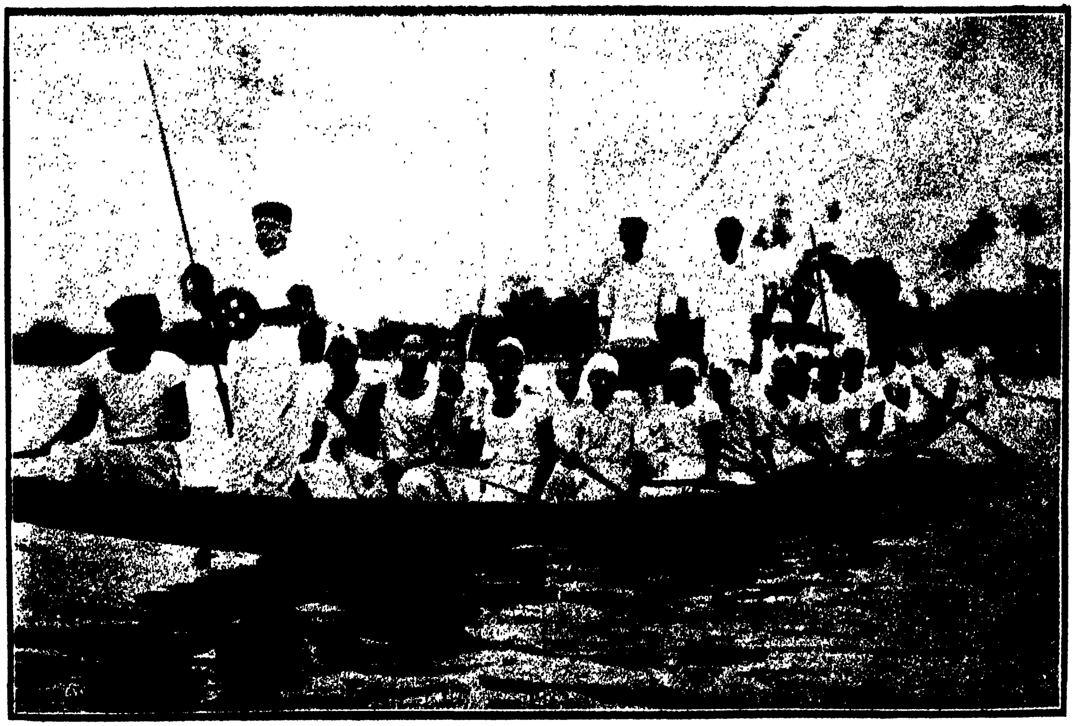
মহারাজ কুমার ভিজিয়ানাগ্রাম (ক্যাপ্‌টেন), মেজর সি কে নাইডু, ওয়াজির আলি, মহম্মদ নিসার, এল অমরনাথ, বিজয় মার্চ্চেন্ট, বাকা জিলানী, আমির ইলাহী, মুস্তাক আলি, মেহেরমজি, এল পি জয়, এস্ ব্যানার্জ্জি, এম জে গোপালন্, পি ই পালিয়া, হিন্দেলকার, এল এম হোসেন, রামস্বামী।

পাতিয়ালার যুবরাজও নির্ব্বাচিত হন, কিন্তু তিনি যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছেন। টেষ্ট-খেলা এবং বিশেষ বিশেষ খেলাতে অমর সিং, দিলওয়ার হোসেন ও জাহাঙ্গীর খাঁর সাহায্য পাওয়া যাবে। মেজর ব্রিটেন জোন্স দলের ম্যানেজার নির্ব্বাচিত হয়েছেন।

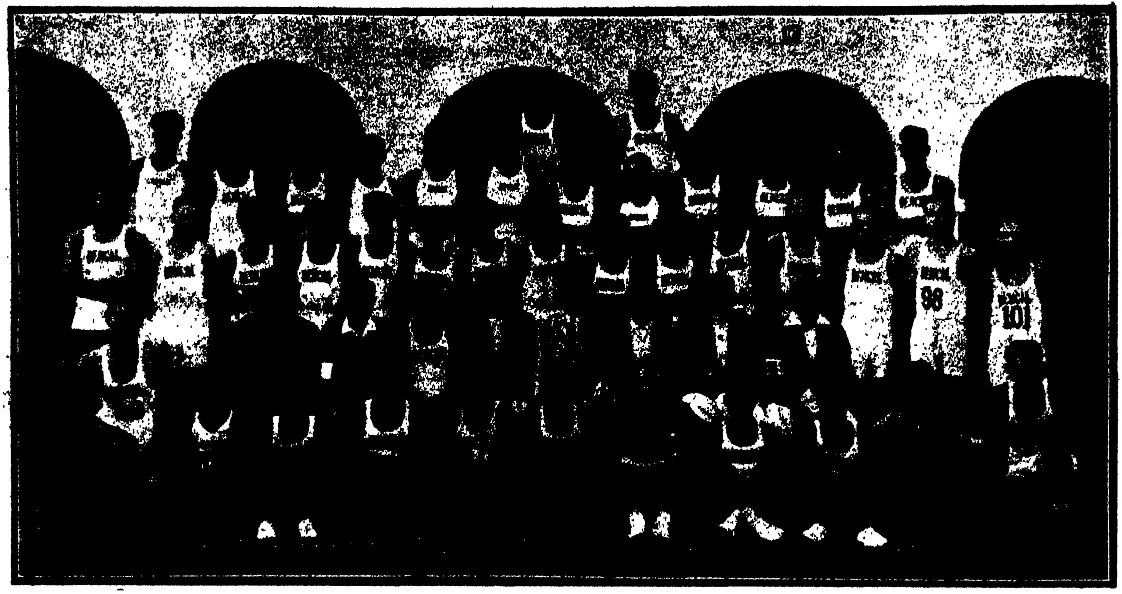
সি এস নাইডু ও ভায়া (Indian Whippet) নির্ব্বাচিত না হওয়ায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। সি এস নাইডু একজন সুদক্ষ সর্ব্বদিক-পারদর্শী খেলোয়াড়—বোলিং, ব্যাটিং ও ফিল্ডিং সকল বিষয়ে তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। আর ভায়া তো acquisition to any



কালীঘাট স্পোর্ট্‌সের ৮৬ গজ বেড়া দৌড়ে
মিস্ এম্ স্মিথ প্রথম হয়েছেন
ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



বেঙ্গল এডুকেশন সপ্তাহে—লেকে ছাত্রদের নৌবিহার ও গীত-বাদ্য　ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



বেঙ্গল অলিম্পিক দল—লাহোরে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন



জলপাইগুড়ি যোগেশচন্দ্র স্মৃতি স্পোর্টসে (দক্ষিণে) ফজলর রহমান সাধারণ প্রতিযোগিতায় ও শান্তি বোস স্কুলের প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন —ভক্তকুমার ঘোষ



নিখিল ভারত অলিম্পিকে জেরাল্ড ডি মনি (মাদ্রাজ) ৫ ফুট ১০.৫ ইঞ্চি লাফিয়ে হাই জাম্পে প্রথম হয়েছেন

side,—ফিল্ডিংএ তাঁর জোড়া নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট খেলা, বাঙ্গলা ও আসাম বনাম মাদ্রাজ, মাদ্রাজে হয়েছে। মাদ্রাজ ৯১ রানে জয়ী হয়ে ফাইনালে গেলো। বৃষ্টির জন্য খেলোয়াড়দের খুবই অসুবিধা হয়েছিল। দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথমে বাঙ্গলার আরম্ভ বেশ ভাল হয়েছিল, কিন্তু শেষের দিকে সি পি জনষ্টনের বোলিংএ ব্যাটস্‌ম্যান্‌রা সুবিধা করতে পারে নি। জনষ্টন ২৮ রানে ৬ উইকেট নিয়েছেন। মোট স্কোর : মাদ্রাজ—১৯৫ ও ১৫৮ ; বাঙ্গলা ও আসাম—১৪৪ ও ১১৮। বাঙ্গলার কমল ভট্টাচার্য্য, ভাণ্ডারগাচ ও লংফিল্ড যেতে না পারায় হীনবল বাঙ্গলা হেরে গেলো, নতুবা কি হতো বলা যায় না।

যুক্তপ্রদেশ দক্ষিণ পাঞ্জাবকে প্রথম ইনিংসের স্কোরে হারিয়েছে। যুক্তপ্রদেশ—২৩০ ও ১৯৫ (৬ উইকেট) ; দক্ষিণ পাঞ্জাব—১৬৯ ও ২৮০ (৫ উইকেট, ডিক্লেয়ার্ড)।

উত্তর ভারত যুক্তপ্রদেশকে এক ইনিংস ও ৩১ রানে হারিয়ে বোম্বাইএর সঙ্গে ফাইনাল খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে। উত্তর ভারত—প্রথম ইনিংস—৪৫২। যুক্তপ্রদেশ—২০৮ (৯ উইকেট) ও ২১৩।

জিতেন্দ্রনারায়ণ ক্রিকেট শীল্ড ঃ

মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্রিকেট শীল্ড খেলার সেমিফাইনালে মোহনবাগান মাণিকতলা ইউনাইটেডকে পাঁচ উইকেটে পরাজিত করেছে। মহমেডান স্পোর্টিংও ই বি আর্ ম্যান্‌সন্ ইন্‌ষ্টিটিউটকে তিন উইকেটে হারিয়ে ফাইনালে যায়।



ইণ্টার স্কুল গার্লস্ স্পোর্টসের ১০০ মিটার দৌড়ে—প্রথম—রমা লুড্ডি, দ্বিতীয়—হিরণ্ময়ী বসু —কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



কালীঘাট স্পোর্টসের এক মাইল দৌড়ের আরম্ভ—ইণ্ডিয়ান স্পোর্টিংএর লক্ষ্মীনারায়ণ (বাম থেকে তৃতীয়) প্রথম হয়েছেন

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়



ইণ্টার স্কুল মেয়েদের স্পোর্টসের "হাই জাম্পে" সিলভিয়া আইজাক প্রথম হয়েছেন

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



ইণ্টার স্কুল মেয়েদের স্পোর্ট্সে ৭৫ মিটার দৌড়ে—রুবি আরণ প্রথম ও হিরণ্ময়ী বসু দ্বিতীয় হয়েছেন

ছবি—কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়

ফাইনালে মহামেডান স্পোর্টিং এক ইনিংস ও ৫৮ রানে মোহনবাগানকে হারিয়েছে।

বিলিয়ার্ড ঃ

ই মঙ্ক (রেঙ্গুন) ৪৯ পয়েণ্টে রাজাকে (কলিকাতা) হারিয়ে প্রফেশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। খেলা অত্যন্ত সাধারণ ধরণের হয়েছে, স্কোর উঠ্ছিলো অত্যন্ত ধীরে। রাজা ছয় সাতটা অল্ রাউণ্ড 'ক্যানন্' করে। 'টপ্‌টেবল' খেলা তেমন হয়নি। উভয় খেলোয়াড়ই অত্যন্ত সোজা 'সট্'ও 'মিস্' করেছে।

স্কোর: প্রথম সেসন্—ই মঙ্ক—৪৫৬; রাজা—৩৮৬;

দ্বিতীয় সেসন্—ই মঙ্ক—৯৪৫; রাজা—৮৯৬।

ব্রেক্‌স্: ই মঙ্কের—৪২, ৩০, ২৬, ২০, ২৪, ৪২, ৪৬, ২৬, ৪১, ৬৩, ২২, ৩১, ৬১, ৪৮।

রাজার—৪৪, ২৩, ২৪, ৩২, ৫২, ৩৮, ২২, ৩০, ৩৩, ২১।

ইণ্টার-ভার্সিটি হকি ঃ

পাঞ্জাব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চতুর্থ বার্ষিক আন্তঃর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা অমীমাংসিত হয়ে শেষ হয়েছে, কোন পক্ষ গোল দিতে পারে নি। ১৯৩৩ সালে প্রথম এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়, সেবার কলিকাতা ৩-২ গোলে জয়ী হয়েছিল। বিগত দুই বৎসর ১৯৩৪-৩৫ সালে কলিকাতা পাঞ্জাবের নিকট ৪-০ গোলে পরাজিত হয়।

পাঞ্জাবের খেলা উন্নত ধরণের হয়েছে, তাদের খেলোয়াড়দের খেলার কৌশল কলিকাতার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ভবিষ্যতে জয়লাভ করতে হ'লে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড়দের খেলায় অধিকতর উন্নতি করতে হবে।

মেয়েদের হকি ঃ

গ্রাসহপার্স এক গোলে ওয়াণ্ডারার্সকে হারিয়ে মেয়েদের সিনিয়র হকি নক্-আউট্ টুর্ণামেণ্ট বিজয়িনী হয়েছে।

জামালপুর দল ২-১ গোলে জুনিয়র গার্লসদের হারিয়ে মেয়েদের জুনিয়র নক্-আউট্ টুর্ণামেণ্ট বিজয়িনী হয়েছে।

ওয়াণ্ডারার্সরা ৩-১ গোলে গ্রাসহপার্সদের পরাজিত করে লেডী টেগার্ড কাপ্ বিজয়িনী হয়েছে।



লেডী টেগার্ট কাপ্ বিজয়িনী ওয়াণ্ডারার্স —দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়



সিনিয়র নক্-আউট টুর্ণামেণ্ট বিজয়িনী গ্রাসহপার্স দল —তারকদাস

আন্তঃ প্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলায় বাঙ্গলা ৭-০ গোলে বিহার ও উড়িষ্যাকে হারিয়েছে। বিহার ও উড়িষ্যা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল দল। গোলরক্ষক বলদেশ্বরী অনেক অবধারিত গোল বাঁচিয়েছে। বাঙ্গলার পক্ষে ডেভিডসন ৩, সুলতান খাঁ ২, সি ট্যাপ্সেল ১ ও গ্যালিবর্ডি ১ গোল দিয়েছেন। ইঁহাদের খেলা বেশ ভালো হয়েছিল। সেণ্টার ফরওয়ার্ড এমেটের খেলা ভালো হয়নি।

ভূপাল ও পাঞ্জাব প্রথম দিনে গোল শূন্য 'ড্র' করে দ্বিতীয় দিনে ভূপাল এক গোলে পাঞ্জাবকে হারিয়েছে। ভূপালের অনমনীয়, কৃতসঙ্কল্প বাধাদান পাঞ্জাবকে জয়ী হতে দিলে না। বানি খাঁর জন্ম পাঞ্জাবের ফরওয়ার্ডরা কৃতকার্য্য হতে পারলে না। ব্যাক ফারুকের বল ধরা ও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মারা অতি সুন্দর। পাঞ্জাবের লেফ্ট-ইন ব্যারেট খেলার আরম্ভেই দুটি গোলের সুযোগ নষ্ট করায় তাঁর দলের হার হলো। এই প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব গত বৎসরে বিজয়ী ছিল।

বোম্বাই ৩-২ গোলে ইউ পিকে হারিয়েছে। বোম্বাই ভালো খেলেছে। ইউ পির ক্যাপটেন বিখ্যাত রূপসিং একা যে গোলটি করেন তাতে তাঁকে সত্যই যাদুকর বলা যেতে পারে। বোম্বাই পক্ষে সেণ্টার হাফ নির্ম্মলের খেলা সুন্দর হয়েছিল। জেমিসন, টাইরেল, পিণ্টো ও আসলাম এবং

বিজিত পক্ষে রূপসিং,ওয়েলস ও লিমোণ্ডাইন ভালো খেলেছেন। টাইরেল ও জেমিসনের দু'টি গোলই বিশেষ সুন্দর ও চতুরতাপূর্ণ ছিল।

মাদ্রাজ ২-১ গোলে মধ্যভারতকে হারিয়েছে।

৩-০ গোলে সম্মিলিত রেলওয়ে দলকে পরাজিত করে বাঙলা সর্ব্বপ্রথমে সেমি ফাইনালে উঠেছে। রেলওয়ে দল ভালো খেলতে পারে নি। বাঙলা যতো আক্রমণ করেছে তাতে আরো বেশী গোলে তাদের জেতা উচিৎ ছিল। রেলওয়ে পক্ষে টেলিস, জনার্দ্দন, পেনিগার, প্রিতম সিংএর খেলা খুব ভালো হয়েছিল। বাঙ্গলার গ্যালিবর্ডি



নিখিল ভারত অলিম্পিক খেলায় মল্ল দ্বন্দ্বে রত
জি ঘোষ (বাঙলা) ও রামদুলারা (ইউ পি)
জি ঘোষ বিজয়ী হয়েছেন

৬ষ্ঠ ফরওয়ার্ড ও ৩য় ব্যাক হিসাবে সর্ব্বোৎকৃষ্ট খেলেছেন এবং প্রথম গোলটি দিয়েছেন। সি ট্যাপসেল ও হজেস ব্যাকদ্বয় অপরাজেয়। দু'জন আউটের মধ্যে এ দেবই বেশী খেটে খেলেছেন, তাঁর জন্যেই এল ডেভিডসন তৃতীয় গোলটি করতে করেন। সুলতান খাঁ ম্যাকআরথট, নয়নাকান্নু ও গ্রস্ট্রেটকে কাটিয়ে এবং মিকিকে গোল থেকে বের করে নিয়ে দ্বিতীয় গোলটি দেন। বাঙলার একটি গোল আম্পায়ার জগন্নাথ বাতিল করেন। কিন্তু বহু দর্শকের অভিমত যে বলটি গোল লাইন অতিক্রম করে পরে পোষ্টে ঠেকে ফিরে আসে।

মানাভাদার ষ্টেট ২-১ গোলে সিন্ধুপ্রদেশকে হারিয়েছে। সিন্ধুর হারের জন্য তাদের গোলকিপারই দায়ী। বিজয়ীদের সেণ্টার হাফ মামুদ উৎকৃষ্ট খেলা খেলেছে। রাইটব্যাক সত্তারের কৌশলপূর্ণ খেলার জন্যই সিন্ধু গোল করতে পারে নি। ফরওয়ার্ডে নাইডু ও জব্বরের আদান-প্রদান চমৎকার, তারা দু'জনে দু'টি গোল দেয়। রাইট্ আউট সাহাবুদ্দিনের গতি খুব দ্রুত, সে কয়েকটি নিখুঁত সেণ্টার করেছে।

ভূপাল ও বোম্বাই-এর খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। খেলাটি খুব প্রতিযোগিতামূলক হয়েছিল। উভয় দলেই বিশিষ্ট নামকরা খেলোয়াড় ছিল। ভূপাল দল কেবল ভারতীয় খেলোয়াড়ে গঠিত, কিন্তু বোম্বাই দলে নানা জাতি ছিল। উভয়পক্ষের দু'টি গোলই শেষ সময়ের পাঁচ মিনিটের মধ্যে হয়। খেলাটি এত উত্তেজনাপূর্ণ হয়েছিল



কালীঘাট স্পোর্টস্ বিজয়িনী ওয়াণ্ডারার্স এথেলেটিক ক্যাম্পের খেলোয়াড়গণ। বাম থেকে দক্ষিণে :—
মিস্ এম, ক্রেমিস, পেগি ম্যাক্‌ইণ্টায়ার,
এল ক্যারান ও মারজোরি স্মিথ (৫৮)

ছবি—দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়

যে এক মুহূর্ত্তও বিরক্তিকর মনে হয় নি। দ্বিতীয় দিনে, বোম্বাই ২-১ গোলে ভূপালকে হারিয়েছে। খেলাটি খুব উচুদরের হয়েছিল। ভূপালের রাইট হাফ্ ও ক্যাপ্টেন আসান আহত হওয়ায় দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম থেকেই খেলতে অপারক হন। ভূপালের সাকুর প্রথম গোল দেয়। বোম্বাইদল লং পাস করে খেলতে আরম্ভ করে ভূপালদলকে বিপর্য্যস্ত করে তোলে। টাইরেল দু'টি গোলই দিয়েছে। জে পিণ্টোর বিপক্ষকে কাটিয়ে বেরুনো ও সহকর্ম্মিদের

সুন্দর সুযোগ করে দেওয়া খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক এবং বিপক্ষের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছে। সুইনির স্থলে বোকারা খেলেছেন, তাঁর বলের উপর আয়ত্ত অতি চমৎকার, দুজন ব্যাকই বেশ নির্ভরযোগ্য; সেণ্টার হাফ্ নির্ম্মল খুব খাটিয়ে এবং তাঁর ফরওয়ার্ডদের বল জোগান নিখুঁত ও সুবিচারসম্মত। বর্ত্তমান দলসমূহে নির্ম্মলের ন্যায় সেণ্টার হাফ্ নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। অলিম্পিকে স্থান পাবার তিনি সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মাদ্রাজ ও দিল্লীর খেলা প্রথম দিনে ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। দিল্লীর রাইট ব্যাক রাজেন্দ্র সিং, লেফ্‌ট হাফ্ ব্যাক জাফর, এক্সট্রস ও রঞ্জৎ সিং খেলায় বিশেষত্ব দেখিয়েছে। মাদ্রাজ পক্ষে কুলেন, দোরাবজি, মার্ফি, ব্রাঙ্কলে ও মাসিলামনি ভালো খেলেছে।

দিল্লী দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাদ্রাজকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। খুব উত্তেজনার মধ্যে ও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খেলাটি হয়েছিল। বল চক্ষের পলকে মাঠের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ঘুরছিল, সময়ে সময়ে লক্ষ্য রাখা দুরূহ হচ্ছিল। দিল্লী তাদের ফরওয়ার্ডদের ভাল ফিনিস্ ও তৎপরতার জন্য এবং দুর্ভেদ্য রক্ষণভাগের বলে অতিরিক্ত সময় খেলে জিততে পেরেছে। দিল্লীর এক্সট্রস, রঞ্জৎ সিং ও আবদুল হাই এই তিন জনে মিলে চারটি গোলই দিয়েছে। এদের খেলা খুব উচ্চ ধরণের। দিল্লীর গোল-রক্ষক মুলা সিং বিশেষ শক্ত সটগুলি অবলীলাক্রমে রক্ষা করে তাঁর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করেছেন। মাদ্রাজের পক্ষে ইন্‌সাইড রাইট ব্রাঙ্কির খেলার যোগ্যতা ও নিপুণতা অসাধারণ, তাঁর সহকর্ম্মিদের মধ্যে পাশ নিখুঁত ও সুবিচারপূর্ণ ছিল। ব্রাঙ্কি দু'টি অতি সুন্দর গোল করেছে এবং তাঁর একটি গোল দুর্ভাগ্যবশতঃ 'ষ্টিকের' জন্য বাতিল হয়েছে।

বাঙ্গলা ৩-০ গোলে দিল্লীকে হারিয়ে সর্ব্বপ্রথম ফাইনালে উঠ্‌লো। বাঙ্গলা দলে একজন 'সার্প সুটার' সেণ্টার ফরওয়ার্ডের বিশেষ অভাব ছিল, অলিম্পিকের খেলোয়াড় আর কার যোগ দেওয়ায় সে অভাব পূর্ণ হয়েছে। আর কার দু'টি গোল করেন এবং এ দেব একটি। দিল্লী তাদের পূর্ব্ব খেলার তুলনায় খারাপ খেলেছে। ফরওয়ার্ডে এক্সট্রস্ ও হাই ব্যতীত কেউ ভালো খেলতে পারে নি। রক্ষণভাগে মূলা সিং ও সৈতুল হক উৎকৃষ্ট খেলেছে। বাঙ্গলার পক্ষে এলেন, সি ট্যাপ্‌সেল, মি হজেস, গ্যালিবর্ডি, চ্যাটার্জ্জি, এ দেব, আর কার, সুলতান খাঁ ও নাজির সুন্দর খেলেছেন। এল ট্যাপ্‌সেল ও এল ডেভিডসনের খেলা ততো উচুদরের হয় নি। এ দেব ও আর কার দ্বিতীয় গোলটি বিশেষ দুরূহ অবস্থা থেকে করেন।

বোম্বাই ও মানাভাদারের সেমি ফাইনাল খেলাটি গোলশূন্য ড্র হওয়ায় ফাইনাল খেলা পিছাইয়া গেলো, শনিবারে খেলা হবে। বোম্বাই তাদের পূর্ব্ব খেলার তুলনায় নিকৃষ্ট খেলেছে। বোম্বাইএর নির্ম্মল, ফিলিপ্‌স আসলাম, এল পিণ্টো ও বোকারা এবং মানাভাদারের মহম্মদ হোসেন, মামুদ, সাহাবুদ্দিন, নাইডু ও বোষ্টন খাঁ ভালো খেলেছে। আজ (১১-৩-৩৬) পুনরায় ইহাদের খেলা হবে।

হকি লীগ খেলা ঃ

হকি লীগ খেলা চলছে। গত বৎসরের লীগ বিজয়ী মোহনবাগান এ পর্য্যন্ত গত বারের সুনাম রাখতে পারেন নি। তাঁরা ছ'টি খেলা খেলে মাত্র ৯ পয়েণ্ট লাভ করেছেন। সেণ্ট জোসেফ ১১ পয়েণ্ট ও ভবানীপুর ১০ পয়েণ্ট করেছে। রেঞ্জার্স ৪টি খেলে ৭ এবং কাষ্টমস্ ২টি খেলে ৪ করেছে। মোহনবাগানের বিশিষ্ট খেলোয়াড় এ দেব ও এইচ মিত্র নবাগত বি জি প্রেস দলে যোগ দেওয়ায় মোহনবাগান শক্তিহীন হয়েছে। কিন্তু সুলতান খাঁ তাদের দলভুক্ত হওয়ায় অনেকটা ক্ষতি পূরণ হয়েছে। ক্যালকাটা ও পুলিসের সঙ্গে ড্র করায় তাদের মূল্যবান দুটি পয়েণ্ট নষ্ট হয়েছে। খুব সম্ভব এবার রেঞ্জার্স ও কাষ্টমসের মধ্যে লীগ চ্যাম্পিয়নসিপ্ নিয়ে প্রতিযোগিতা হবে।

নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ঃ

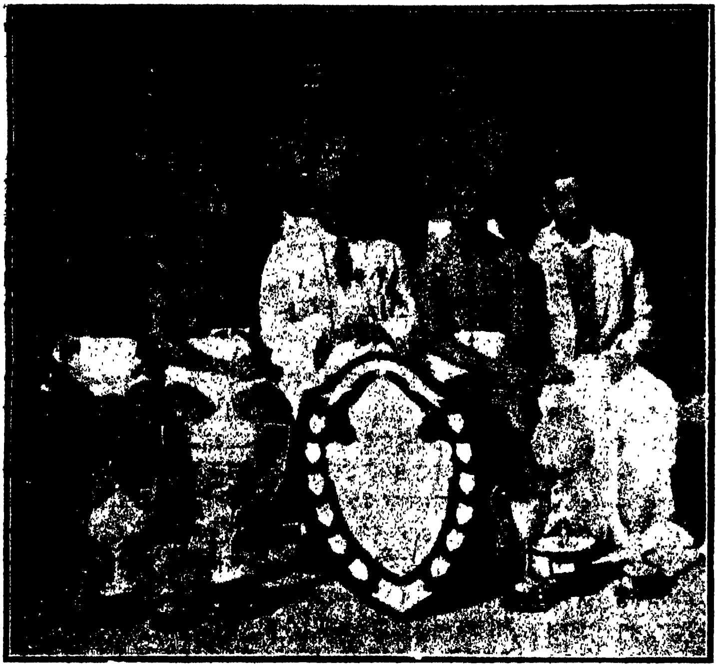
দ্বাদশ বার্ষিক নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা



নিখিল ভারত ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার প্রতিযোগীগণ, উদ্যোক্তাগণ,

শেষ হয়েছে। মিষ্টার জো উইক্ (বর্ম্মা) মোট ৬৯০ পাউণ্ড ভারোত্তোলন করে তাঁর নিজস্ব পূর্ব্ব রেকর্ড ভঙ্গ করেছেন। তিনি ১২ ষ্টোন ও তদুর্দ্ধ বিভাগে প্রথম হয়ে গোপীনাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ্ ও স্যার রাজেন্দ্রনাথ চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়েছেন এবং সিনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।

মিষ্টার এম্ পি কৃষণ (মাদ্রাজ) মোট ৫৪৫ পাউণ্ড উত্তোলন করে ১০ ও ১১ ষ্টোন বিভাগে প্রথম হয়েছেন ও ডি এন বসু মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড ও রাধারাণী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়ে জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন।



ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতার বিজয়ীগণ—(বাম থেকে দাঁড়িয়ে)—১১ ষ্টোন বিজয়ী এম পি কৃষ্ণাণ (মাদ্রাজ), ১২ ষ্টোন বিজয়ী জো উইক (বর্ম্মা), পি গোপালম্ (ক্যানানোর); (উপবিষ্ট)—এম ভারাথন (ক্যানানোর), টুন্‌মিন্ (বর্ম্মা),এন এন ঘোষ (সভাপতি), সান্‌থিন (বর্ম্মা) ও হরেন্দ্র কাবাসী (সম্পাদক)

ছবি—তারকদাস

মিষ্টার সান্‌থিন (বর্ম্মা), (পকেট হার্‌কিউলিস্ নামে অভিহিত) তাঁর নিজের ওজন অপেক্ষা অধিক ভার উত্তোলন করে রাসবিহারী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ ট্রফি পেয়েছেন এবং ৮ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাগবাজার জিম্‌ন্যাসিজম্ চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়েছেন।

মিষ্টার টুন্‌মিন্ ৯ ষ্টোন বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গোবিন্দ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ কাপ্ পেয়েছেন। মিষ্টার টি নাহাপিট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর স্বাস্থ্যের জন্য সুবর্ণ পদক লাভ করেছেন। বাঙ্গলার কেউ উচ্চ স্থান অধিকারী হন নাই।

সন্তরণে নূতন রেকর্ড ঃ

আমষ্টার্ডমের সংবাদে প্রকাশ, উইলি ডি নওডেন ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল ১ মিনিট ৪-১৬ সেকেণ্ডে সাঁতারে নিজের রেকর্ড ভঙ্গ করে নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

ম্যাষ্টেনব্রক ১০০ মিটার ব্যাক-ষ্ট্রোক ১ মিনিট ১৫-১৮ সেকেণ্ডে সাঁতরে মিসেস হোম জারেটের ১ মিনিট ১৬-১৮ সেকেণ্ডের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "তীর্থযাত্রী"—২৲

ভাগবতাচার্য্য শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা"—দ্বিতীয় খণ্ড (৭-১৮ অধ্যায়)—১৲

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী প্রণীত উপন্যাস "দীপের আলো"—১৷৹

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড—২৲

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত উপন্যাস "অনাথ আশ্রম"—২৲

অধ্যাপক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত সমালোচনা "শরৎচন্দ্র"—১৷৹

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার "কুহকিনীর ফাঁদ"—৷৹

শ্রীরমেশচন্দ্র দাস প্রণীত কিশোর উপন্যাস "লাইট্ হাউস্ রহস্য"—১৲

শ্রীদিলীপকুমার রায় প্রণীত উপন্যাস "দোলা" দ্বিতীয় ভাগ—৩৲

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় সম্পাদিত রহস্য-লহরী উপন্যাস মালার "ডাকাতীর সোনা"—৷৹

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন প্রণীত আলোচনা "গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য"—২৲

শ্রীনীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুলালচন্দ্র পাত্র প্রণীত ছোটদের অভিনয় উপযোগী নাটক "চালিয়াৎ-ছেলে"—।৵৹

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য প্রণীত উপন্যাস "হাওয়া-বদল"—১৷৹

শ্রীবিমলানন্দ রায় বি-এ প্রণীত ভ্রমণ কাহিনী "দক্ষিণ ভারত"—১৲

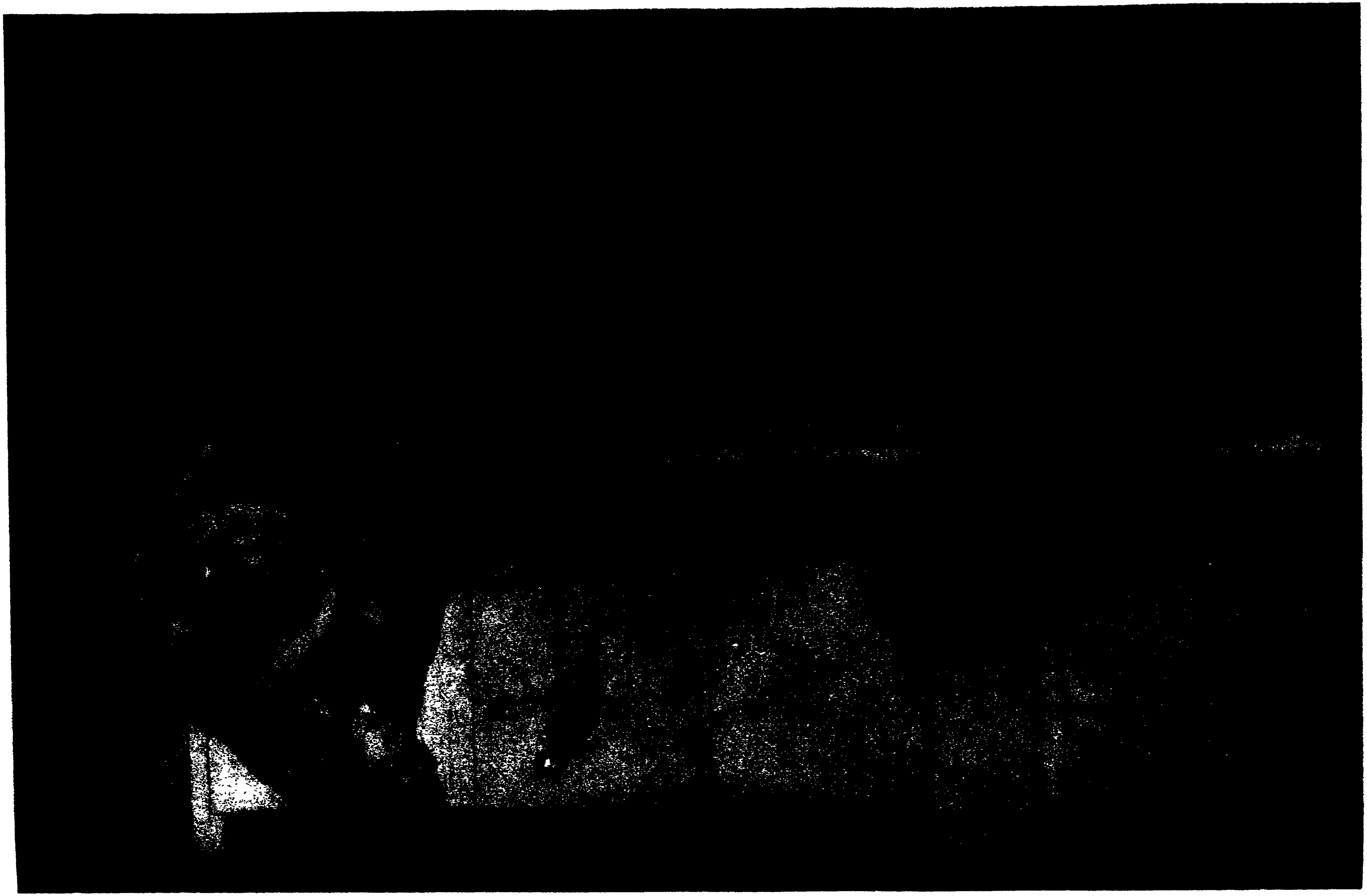
শ্রীরমাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত গোয়েন্দা গ্রন্থমালার "দস্যুকন্যা"—৷৵৹

শ্রীপ্রমথনাথ পাল বি-এ প্রণীত সমালোচনা পুস্তক "দত্তা পরিচয়"—৷৹

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত বিচিত্র রহস্য সিরিজের 'নাগিনী"—৷৹

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons,
at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

عتاقي





ভারতবর্ষ

বৈশাখ—১৩৪৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

চলিত বাঙ্গালা ও তাহার বানান

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ

সংস্কৃতের সঙ্গে তুলনা করিতে গিয়া পণ্ডিতেরা বরাবরই প্রাকৃতের উপমা দেন গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে। নগরের সাজ-সজ্জা প্রসাধন অলঙ্করণ তাহার অজ্ঞাত—হয় ত বা অবজ্ঞাতও বটে। প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত সে, বন্ধন-শাসন মানিতে চাহে না। তাহার প্রসাধন ভিন্ন ধরণের, বেশবাস ইচ্ছাধীন। তাহার আচার বাঁধারীতির বশ নহে। সংস্কৃত জনপদ-পালিতা নাগরী; আভিজাত্যের চিহ্ন তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া আছে। তাহাকে নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। অনিয়মের উদ্দামতা তাহার মধ্যে নাই, আছে সুনিয়ত পরিমাণবোধ। প্রাকৃত লঘুগতি, মুক্তবেণী, চঞ্চল হরিণীর মত স্বাধীন তাহার সঞ্চরণ।

এখন এই উক্তির মধ্যে সত্যাসত্য কতটুকু আছে দেখা যাউক। প্রাকৃতের কোন নিয়ম নাই ইহাই যদি এই উপমার অর্থ হয়—তাহা হইলে তাহা আদৌ নির্ভুল হইবে না। চলিত ভাষা একাধিক এবং প্রত্যেকেরই ব্যবহারে ভিন্নতা আছে। প্রতি চলিত ভাষারই একটা পৃথক নিয়ম আছে। অবশ্য সে নিয়মের শৈথিল্য থাকা অসম্ভব নহে। প্রাকৃত মাত্রেরই ঐরূপ এক একটা নিয়ম আছে। তথাপি তাহার যে একটা স্বাধীনতা আছে সেটা তাহার স্বাচ্ছন্দ্যে। স্বেচ্ছাচারের সহিত স্বাধীনতার যোগ নাই। অ-রাজের অর্থ স্বরাজ নহে।

বাঙ্গালা ভাষার ক্ষেত্রে এখন অরাজকতা উপস্থিত। রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইলে দেশ যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে, অথচ কোন রাজ্যেই প্রকৃত রাজা থাকে না—আমাদের ভাষার ক্ষেত্রে আজ তেমনই দুর্য্যোগের আবির্ভাব। লেখকদের মধ্যে যাঁহাদের কিছু কিছু শক্তি আছে তাঁহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ধরণে লিখিতেছেন, অল্পবল বা হীনবল লেখকরা উঁহাদের মধ্যে এক একজনকে আদর্শ করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা বাদুড়বৃত্তিই অবলম্বন করিয়া বসিতেছেন। ভিন্ন ধরণ বলিতে আমি ভঙ্গী ধরিতেছি না। ভঙ্গী লেখকমাত্রের ভিন্ন হইবেই। আমি বলিতেছি—শব্দ ও বাক্য গঠনের প্রাথমিক নিয়ম-

গুলির কথা। আমার বক্তব্য কি তাহা ক্রমশঃ এক একটি উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

বানানের কথাই প্রথম ধরি—

বাঙ্গালা শব্দ এখন বহুরূপী। একই শব্দের বানান নানা রকমের। চলিত ভাষায় এই অত্যাচারটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক বাঙ্গালা শব্দেরই তিন রূপ ;—বাঙ্‌লা, বাঙ্গ্‌লা ও বাংলা। ঙয়ে হসন্ত না দিলে রূপ আরও বাড়ে। একমাত্র-ছি প্রত্যয়যোগে "কর্" ধাতু যে কত রকম রূপ ধারণ করে তাহা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রই জানেন। ছি যুক্ত হইলে কর্ ধাতু কত রকম রূপ পাইতে পারে নিম্নে তাহার একটা তালিকা দিলাম।—

১। করছি	২। কোরছি	৩। ক'রছি
৪। কর্‌ছি	৫। কোর্‌ছি	৬। ক'র্‌ছি
৭। কচ্ছি	৮। কোচ্ছি	৯। ক'চ্ছি
১০। কর্চ্ছি	১১। কোর্চ্ছি	১২। ক'র্চ্ছি

এইত গেল বারটি। আবার 'ছ'এর স্থলে 'চ' লিখিলে আরও বারটি। তাহা হইলে 'কর্' ও 'ছি' র যোগে সর্ব্বশুদ্ধ চব্বিশটি শব্দের সৃষ্টি হইতে পারে। বস্তুত চব্বিশটি না হউক, প্রদর্শিত শব্দগুলির অন্তত পনের ষোলটি ছাপার অক্ষরে দেখিয়াছি। অথচ ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে এ চব্বিশটি শব্দের মধ্যে ২৩টি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। এই তেইশটি শব্দ যে কত দিক দিয়া কত অসুবিধা সৃষ্টি করে, ভুক্তভোগীমাত্রই তাহা জানেন। লেখকের অসুবিধা, প্রতিলিপিকারের অসুবিধা, কম্পোজিটরের অসুবিধা, অসুবিধা সকলেরই। প্রথম ভাষা-শিক্ষার্থীর প্রতি যে অকারণ অত্যাচার করা হয় তাহার কথা ছাড়িয়াই দিলাম। 'doing' কথাটা লিখিতে হইলে কাহাকেও ভাবিতে হয় না, 'i' লিখিব, কি 'e' লিখিব। এমন কি 'i'র উপর বিন্দুটা দিতে ভুলিয়া গেলেও বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। ইংরাজি যিনি কিছুমাত্র জানেন তিনিও ইহা বুঝিয়া লইবেন। কিন্তু 'করছি' র চতুর্ব্বিংশতি রূপের কোনটি লিখিব ইহা ভাবিতে এক মুহূর্ত্তও সময় দিতেই হয়। অথচ ভাবনার সমাধান হইয়া উঠে না। কলমের আগায় যাহা আসে তাহাই বসাইয়া দেওয়া হয়। বানান নির্দ্দিষ্ট না হইলে ইহা ছাড়া আর কিই বা উপায় আছে? তাহা ছাড়া 'doing' কথাটা যতই অস্পষ্ট রকমে লিখিত হউক না কেন, কথাটা কি একবার অনুমান করিয়া লইতে পারিলে—কি প্রতিলিপিকার, কি কম্পোজিটর—বানানের জন্য কাহাকেও ভাবিতে হইবে না। তাহার কারণ 'doing'এর বানান দুই রকম হইবার উপায় নাই। কিন্তু 'করছি'র বেলায় প্রত্যেকটি অক্ষর পড়িতে পারা চাই, তাহা না পারিলেই বিপদের সম্ভাবনা। পৃথিবীর মধ্যে প্রধান ভাষা যতগুলি, তাহাদের সব কয়টিরই বানান নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। সময় হয় নাই বলিয়া আমরা আর কতদিন বসিয়া থাকিব। যতই বিলম্ব হইবে ততই জটিলতা বাড়িবে। সুতরাং অগৌণে বানান নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয় যে কালভেদে এবং কৃৎপ্রত্যয়-যোগে একটা ধাতুই প্রায় হাজার রূপ গ্রহণ করে। নিদর্শনস্বরূপ কর্ ধাতুর রূপ-তালিকাটি এতৎসহ সন্নিবেশিত হইল। (৬৬৫—৬৬৬ পৃষ্ঠা)

বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে আলোচনা একেবারেই হয় নাই এমন নহে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহার ফল কিছু ফলে নাই। আট বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিশ প্রমুখ কয়েকজনের উদ্যোগে একটি খসড়া বানান পদ্ধতি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধারণভাবে ঐ পদ্ধতিটি অনুমোদন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে বিশ্বভারতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের বইগুলিতে ঐ বানান পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়াছিল। পরে অবশ্য আবার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে। ঐ পদ্ধতিটির সম্বন্ধে প্রশান্তবাবু বলিয়াছেন—"কাজ চালান যায় এমন একটা পদ্ধতি খাড়া করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই নিয়ম ও সঙ্গতির দিক থেকে একেবারে সম্পূর্ণ নিখুঁত একটি পদ্ধতি তৈরী করবার চেষ্টা আমরা করি নি। অভ্যস্ত সংস্কারে যাতে বেশী আঘাত না লাগে সে দিকে দৃষ্টি রেখে জায়গায় জায়গায় অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রচলিত বানান গ্রহণ ক'রতে হ'য়েছে।" অভ্যস্ত সংস্কারকে যতদূর সম্ভব অনাহত রাখিয়াও এই যে বানান পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছিল ইহাতে এমন কিছু ছিল না যাহা লেখক সম্প্রদায়ের ভীতি উদ্রেক করিতে পারে। নূতন অপরিচিত এবং অনভ্যস্ত বিষয়ে হাত দিতে হইলেই লোকে প্রথমত ভয় পাইবে ইহা স্বাভাবিক এবং সেরূপ বিষয় গ্রহণ বা স্বীকার করিতেও

কুণ্ঠা বোধ করা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে সে রকম কিছু ছিল না। ইচ্ছা করিলে সকলেই সেটা গ্রহণ করিতে পারিতেন। আর অনিচ্ছার কারণ থাকিলে তাহাও আলোচিত হইতে পারিত। কিন্তু এই পদ্ধতি স্বীকৃতও হয় নাই, ইহার গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনাও উঠে নাই। হয়ত বা বাঙ্গালীজাতির প্রকৃতিগত শিথিলতাই এইরূপ নিস্তব্ধতা এবং নিশ্চেষ্টতার কারণ। যে কারণেই হউক—আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষার লেখকগণ একই শব্দের বানান লিখেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। এমন কি একই লেখকের হাতে একই শব্দের একাধিক বানানও দেখা যায়। আধুনিক বাঙ্গালা লেখকগণের পুস্তকাদিতে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না। আমি কিছুকাল ধরিয়া এইরূপ দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিতেছি। এ পর্য্যন্ত যত শব্দ সংগ্রহ করা হইয়াছে সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করিয়া বানান সম্বন্ধে কোন্ কোন্ স্থানে পার্থক্য ঘটে তাহা বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এস্থানে সেই বিবরণটুকুই লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই সমস্যাটি বঙ্গভাষার কর্ণধারগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে চাই। যে ভাবেই হউক একটা নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন। ভাষার ব্যাকরণ প্রণয়নের সময় আসে নাই বলিয়া যথেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দেওয়া আর চলে না। এইবার ভাষার গতিপথ নির্দ্দিষ্ট করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যতদিন না ঠিক হয় 'করছি' র চতুর্ব্বিংশতি রূপের মধ্যে একটিমাত্র রক্ষণীয়—অপরগুলি বর্জ্জনীয়—ততদিন প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান।

কথা উঠিবে চতুর্ব্বিংশতি রূপের মধ্যে শুদ্ধ কোন্‌টি? কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিবার এখন অবসর নাই। শুদ্ধি অশুদ্ধির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিবার সময় এ নয়। হয়ত সব কয়টিই শুদ্ধ হইতে পারে। আমরা বলি, পণ্ডিতগণ এই চব্বিশটি শব্দের মধ্যে ভাষায় গৃহীত হইবার পক্ষে যেটির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্যতা আছে তাহাকেই গ্রহণ করিবেন। বিচারকালে লিখন-সৌকর্য্য, ব্যাকরণশুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত গুণগুলিই আলোচনার মধ্যে আসিবে। বিশেষজ্ঞের হাতে সে ভার অর্পণ করিতে হইবে। এইভাবে যখন নিয়মের দ্বারা তেইশটি অনাবশ্যক শব্দকে নির্ব্বাসন দেওয়া হইবে, তখন ভাষালক্ষ্মীও অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্যলাভ করিবেন।

প্রশ্ন উঠিবে নিয়ম করিবে কে এবং একজন তাহা করিলে সকলে স্বীকার করিবে কেন?

সাহিত্যের সব শাখায় সকলের সমান অধিকার নাই, থাকা স্বাভাবিকও নয়। এক বিষয়ে সকলেই বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন না। বাঙ্গালা ভাষার ভূত ভবিষ্যৎ বিচার করিতে পারিবেন, তাহার হিতাহিতের ভার লইতে পারিবেন—এ আশা আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালা লেখকের কাছে করিতে পারি না। আর লেখক বা সাহিত্যিক-মাত্রই যে এ দাবি করিবেন ইহাও মনে করি না। আচ্ছা মনে করা যাউক, রবীন্দ্রনাথকে পুরোবর্ত্তী করিয়া শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ একটি সভায় মিলিত হইয়া সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি লইয়া একটি ব্যাকরণের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে যে নিয়ম প্রণয়ন করা হইল তাহা সাহিত্যিকবর্গ বা লেখকসমাজ মানিতে অসম্মত হইবেন এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন সঙ্গত কারণ আছে কি? অবশ্য ইহাও দেখিতে হইবে যে লেখকদিগকে যেন উপেক্ষা করা না হয়। ভাষার নিয়ম গঠন সম্পর্কে তাঁহাদের মতামতও আহ্বান করিতে হইবে এবং বিচারকালে তাঁহাদের মতামতের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ যদি এই কাজে অগ্রণী হন তাহা হইলে বাঙ্গালা ভাষার একটা মহৎ কল্যাণ সাধিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গালার উন্নতিকল্পে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ বিশেষভাবে আকর্ষণ করি। বিধান রচিত হইলেই হয় না, তাহার প্রয়োগ শক্তিসাপেক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে সেই শক্তি আছে।

বাঙ্গালার বানান পদ্ধতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ ইতিপূর্ব্বে যে সকল তর্কবিতর্ক করিয়াছেন দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের দৃষ্টি সে দিকে গুরুতররূপে আকৃষ্ট হয় নাই। বানান সম্বন্ধে কথা উঠিলেই ভাষার কথা উঠে এবং বানান সমস্যার গুরুত্ব ভাষা সমস্যার নীচে চাপা পড়িয়া যায়। কথা উঠিয়াছে বাঙ্গালায় সাধু এবং চলিত নামে যে দুইটি লৈখিক ভাষা প্রচলিত আছে, এ দুইটিরই থাকার কোন

আবশ্যকতা আছে কি না ? 'চলন্তিকা'-কার বলেন, একটির দ্বারাই যদি কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে আর একটি শিখিবার জন্য যে শ্রম করা হইবে তাহা ত হইবে পণ্ডশ্রম। তাঁহার মতে লৈখিক ভাষা একটাই থাকা উচিত, সে সাধুই হউক—আর চলিতই হউক। পরে কয়েকটি যুক্তি অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন—"চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিক হবার যোগ্য, যদি তাতে নিয়মের বন্ধন পড়ে এবং সাধু ভাষার সঙ্গে রফা করা হয়।" এ সম্বন্ধে অনেকেই আপন আপন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন—"আমাদের প্রাকৃত বাংলার যে মূল্য—সে সজীব প্রাণের মূল্য, তার মর্ম্মগত তত্ত্বগুলি বাঁধা নিয়ম আকারে ভালো করে আজো ধরা দেয় নি বলেই তাকে দুয়ো রাণীর মতো প্রাসাদ ছেড়ে গোয়াল ঘরে পাঠাতে হবে, আর তার ছেলেগুলোকে পুঁতে ফেলতে হবে মাটির তলায়, এমন দণ্ড প্রবর্ত্তন করার শক্তি কারো নেই। অবশ্য যথেচ্ছাচার না ঘটে, সেটা চিন্তা করবার সময় এসেছে স্বীকার করি।" চলিত ভাষার প্রতিই কবির আন্তরিক টান তাহা শুধু এই উক্তি হইতেই বুঝা যায় এমন নহে, তাহার অন্যান্য নিদর্শনও আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি সাধুভাষা একরূপ লিখেন নাই। ৺ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার—সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা—শীর্ষক পুস্তিকায় সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে মীমাংসা করিতে গিয়া "আধা ডিগ্রী এবং আধা ডিসমিস" দিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকেই আদর্শ ধরিয়াছেন। তিনি বলেন—"বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষা এবং চলিত ভাষার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব রচনারীতি প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী।" কিন্তু বঙ্কিমের ভাষাকে আমরা সাধু ভাষার পর্য্যায়েই ধরিয়া থাকি। সে যাহাই হউক এ প্রসঙ্গ এখানেই বন্ধ করা ভাল। কারণ এইরূপ বাদানুবাদের মধ্যে বানান-সমস্যা ভাষাসমস্যার নিম্নে চাপা পড়িয়া যায়। এখন কিন্তু আর আমাদের দেরি করিবার অবসর নাই। যে সমস্যাই হাতে আসে অবিলম্বে তাহারই মীমাংসা করিয়া ফেলা প্রয়োজন। চলিত বাঙ্গালার বানান সম্বন্ধে যখন বিচার করিতে বসিব তখন অন্য কোনদিকে মন দিবার আবশ্যকতা নাই। চলিত ভাষাই একমাত্র লৈখিক ভাষা হউক বা না হউক, তাহার বানান নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়োজনের হ্রাস হয় না।

১। অ—ও

(ক) বাঙ্গালা শব্দের শেষ অক্ষরে যদি অ স্বর থাকে এবং সেই অ যদি গ্রস্ত না হয়—তাহার উচ্চারণ হয় 'ও'য়ের মত। যেমন—মত—মতো, গত—গতো, ভাল—ভালো, গেল—গেলো ইত্যাদি। এ নিয়মের বিপর্য্যয় কখনও ঘটে না। এ ক্ষেত্রে ঐরূপ স্থলে ওকার যোগ করিবার আবশ্যকতা আছে কি ? যদি উচ্চারণের অনুরূপ বানান করিতে হয় তাহা হইলে ত 'বন' (অরণ্যার্থক)কে বোন লিখিতে হয়, কিন্তু তাহা কি সঙ্গত হইবে ? 'গোলক' এবং 'গো-লোক' এই দুই শব্দের উচ্চারণ প্রায় সমান, কিন্তু তাই বলিয়া গোলক শব্দের 'ল'য়ে ওকার দেওয়া কেহ সমর্থন করিবেন কি ? অবশ্য অনেকে বলিতে পারেন, তৎসম শব্দের বানান পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকের লেখায় তৎসম শব্দের সংখ্যা কি কম ? তাহার উচ্চারণে যদি অসুবিধা না ঘটে, তাহা হইলে 'ভাল' 'মত' প্রভৃতির স্কন্ধে অকারণ বোঝা চাপান কেন ?

'এমনতর' এবং 'অধিকতর' উভয় শব্দেরই 'র'এর উচ্চারণ হয় 'রো'য়ের মত। ইহাদের কোনটির শেষে ও দেওয়া বিধেয় কি না ? সংস্কৃত অর্থাৎ তৎসম শব্দ অবিকৃত থাকিবে এইরূপ নিয়মই যদি স্থির হয়, তাহা হইলে 'অধিকতর'তে 'ও' যোগ করা চলে না। কিন্তু 'এমনতর'কে 'এমনতরো' লিখিলে বোধ হয় ক্ষতি হয় না। বরং কিছু লাভই হয়। ইহাতে কোনটি ফাঃ তরহ্—আর কোনটি সংস্কৃত তর তাহা সহজেই চেনা যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখায় 'এমনতরো' বানান সর্ব্বদাই দেখা যায়।

প্রেরণার্থক ধাতুর সামান্যরূপে (infinitive) বাঙ্গালায় 'ন' লাগান হইয়া থাকে। যথা—'খাওয়ান' 'বসান' 'শোওয়ান' ইত্যাদি। অনেকে এই 'ন'কে 'নো' করেন। ক্রিয়াপদের অতীতকালের রূপেও এই সমস্যা। গেল, না—গেলো ? গিয়েছিল, না—গিয়েছিলো ? যেত, না—যেতো ? অনুজ্ঞাতেও তাই। কর, না—করো ? ক'র, না—ক'রো (করিও) ? এস, না—এসো ? বল, না—বলো ?

(খ) পরে ই বা ঈ স্বর থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকারের উচ্চারণ হয় ওকারের মত। তথাপি কেহ কেহ লিখেন 'রোইল'। ই স্বর লোপ পাইলেও পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ' 'ও' হয়। যেমন—'কেমন করে এলে ?' কিন্তু—'সে এখন কি করে ?'

'নামের গুণে তরে গেল'। কিন্তু—'কার তরে তুই কাঁদিস্?' এই সকল শব্দ লিখিতে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই ইলেক্ বা ওকারের সাহায্য গ্রহণ করেন না। সত্যই ঐ সব শব্দে ওকারের চিহ্ন কিছু না থাকিলেও ওকারের অস্তিত্ব বুঝিবার পক্ষে কোন অসুবিধা হয় না। বাক্যের অন্বয় দ্বারা সহজেই বুঝা যাইবে—শব্দটি 'করে' (করিয়া) না 'করে' (করিয়া থাকে), 'মরে' (মরিয়া) না 'মরে' (প্রাণত্যাগ করে)। অনুজ্ঞাতে একটু অসুবিধা হইতে পারে। 'কর' (এখনই কর) এবং 'কর' 'করিও' এই দুই রকম রূপের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা সহসা ধরা না পড়িতে পারে। কিন্তু অভ্যাসের দ্বারা এ সকলও সহিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়। ইংরাজিরও একই বানানের শব্দে স্থল বিশেষে বিভিন্ন উচ্চারণের অভাব নাই, অথচ আমরাই মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহা মুখস্থ করিয়া ফেলি। 'read' 'wind' প্রভৃতি শব্দ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

একটা কথা এখানেই বলিয়া রাখা আবশ্যক যে উচ্চারণ অনুসারে বানানের রীতি অবলম্বন করিতে গেলে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় একটা প্রলয় আনয়ন করিবে। ধরা গেল, এক স্থানের ভাষাকেই আদর্শ করিলাম—যদিও তাহাতে অনেক বিপদের আশঙ্কা আছে—কিন্তু এক প্রদেশেই কোন 'অ' 'ও' রূপে উচ্চারিত হয়, আবার কোন 'অ' অবিকৃত থাকে। পণ, রণ, ক্ষণ—কিন্তু মন বন ধন। অথচ ইহাদের প্রায় সবগুলিই খাঁটি সংস্কৃত শব্দ।

শুধু তাহাই নহে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যুৎপন্ন এবং বানানেও ভেদ আছে এমন অনেক শব্দ একইরূপে উচ্চারিত হয়। বানানে ভেদ থাকিলেও উচ্চারণে কোন অসুবিধা হয় না। এখানে বানান এক করিয়া ফেলিলে অর্থগ্রহের পক্ষেই অসুবিধা জন্মিবে। উদাহরণ স্বরূপ 'লক্ষ'—'লক্ষ্য', 'কটী' —'কোটী' প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ করা যায়।

(গ) পরে উ-স্বর থাকিলেও পূর্ব্ববর্ত্তী 'অ' 'ও' হয়। যথা, 'পড়ুয়া'—'পোড়ুয়া' (পোড়ো, পড়ো, প'ড়ো); প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের লেখায় 'প'ড়ো' বানান দেখিয়াছি। ঐরূপ মরুক—ম'রুক, মোরুক, মহুয়া—মোহুয়া, ইত্যাদি। উ-কার পরে আছে বলিয়া অনেকে 'গোরু'কে 'গরু' লিখেন। সুনীতি বাবু 'গোরু' লিখিবার পক্ষপাতী। তিনি বলেন মূল শব্দে ও বা উ থাকিলে অপভ্রষ্ট শব্দে তাহার চিহ্নস্বরূপ ওকার রাখা উচিত। এই কারণে তিনি 'মতি' না লিখিয়া 'মোতি' লিখেন, কারণ 'গোরু' যেমন 'গোরূপ' হইতে ব্যুৎপন্ন—'মোতি'ও তেমনি 'মৌক্তিক' হইতে আগত।

(ঘ) পূর্ব্বে ই বা উ স্বর থাকিলে পরবর্ত্তী অ-কারাদির প্রভাবে তাহা যথাক্রমে একার বা ওকার হইতে চায়। যেমন 'ভিতর'—'ভেতর', 'উপর'—'ওপর', 'পিছন'—'পেছন', 'উঠে'—'ওঠে' ইত্যাদি। 'বাংলার বানান সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে রবীন্দ্রনাথের মতটি এই প্রসঙ্গে তুলিয়া দিতেছি। "আজকাল অনেকেই লেখেন—'ভেতর' 'ওপর' .. আমি লিখি নে। কিন্তু কার বিধান মতে চলতে হবে?"

(ঙ) ঘুমান, চিবান, এগান, বিলান প্রভৃতি নিজন্ত ধাতুর দ্বিতীয় অক্ষরের 'আ'কার উচ্চারণে 'ও' হয়। ফলে বানান হয় 'ঘুমোন' 'চিবোন' ইত্যাদি। কখনও কখনও ও-কার বা আ-কার কিছুই দেওয়া হয় না, শুধু অ-যুক্ত ব্যঞ্জনটি রাখিয়া দেওয়া হয়। যেমন, 'চিবতে', 'ঘুমতে' ইত্যাদি। "গাড়ী 'টিকতে টিকতে' ছদিনের দিন পৌছল।" —প্রমথ চৌধুরী, নীললোহিত। অকার বা ওকারের স্থানে উ-কারের প্রয়োগও দেখা যায়। যেমন—'ঘুমুতে' 'চিবুতে' ইত্যাদি। তিন রকমের ব্যবহারই প্রচলিত। কি রাখিতে হইবে, আর কি ত্যাগ করিতে হইবে?

জোর দেওয়ার জন্য অনেক শব্দে একটা 'ও' যুক্ত করা হয়। যেমন, 'কখনও' 'তখনও' ইত্যাদি। কিন্তু এই শব্দগুলিকে সময়ে সময়ে 'কখনো' 'তখনো' এই রকম বানান করা হইয়া থাকে। 'কখনো' 'তখনো' 'কোনো' রাখিতে হইলে সামঞ্জস্যের অনুরোধে 'একজনো' (একজনও র পরিবর্ত্তে) 'রামো' (রামও র পরিবর্ত্তে) এইরূপ বানানের প্রস্তাব উঠিতে পারে।

২। ই—ঈ

(ক) বাঙ্গালায় 'ই' ও 'ঈ'র উচ্চারণে কোন ভেদ নাই বলিলে অনেকে মনে করেন উভয় ই স্বরের উচ্চারণ একই রকম। বস্তুত তাহা নয়। 'তিন', 'রীত', 'হিম' প্রভৃতি শব্দের ই-স্বর* এবং 'তিলেক' 'রিপু' 'ভীষণ' প্রভৃতি শব্দের ই-স্বর একরূপ নহে। প্রথমোক্ত উদাহরণের ই-স্বর গুরু এবং

* ই-স্বর বলিলে সাধারণতঃ ই এবং ঈ এই উভয় স্বরকেই ধরিতে হইবে।

শেষোক্ত দৃষ্টান্তের ই-স্বর লঘু। § কিন্তু উচ্চারণ গুরু হইলে স্বর দীর্ঘ বা উচ্চারণ লঘু হইলে স্বর হ্রস্ব হইবে এমন কোন মানে নাই। আমরা সাধারণত বানান অনুসারে উচ্চারণ বা উচ্চারণ অনুসারে বানান করি না। 'শিব' শব্দের 'ই'কে দীর্ঘ করি, 'মলিন' শব্দের 'ই'কেও দীর্ঘ করি। অথচ 'অধীরতা'র 'ঈ'র হ্রস্ব উচ্চারণ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বাঙ্গালায় ই-স্বরের (এবং অন্য স্বরের) উচ্চারণ ও বানান কেহ কাহারও অধীন নহে। তথাপি অনেকে 'ঈ'র দ্বারা গুরু উচ্চারণ সূচিত করিবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্থলবিশেষে 'ক'য়ে 'ঈ' দিয়া 'কী' লিখেন। এই নিয়ম কিন্তু সর্ব্বত্র প্রয়োগ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। প্রয়োজন হইলে 'তুমি'কে 'তুমি', 'তুমী' বা 'তুমী' এইভাবে লিখিবার স্বাধীনতা কাহারও আছে কি? অন্তত থাকা উচিত কি না তাহা ভাবিবার বিষয়। 'ছায়া সীতা' নামক একখানি উপন্যাসে 'ত্রুক্খীত' বানানও দেখিতে হইয়াছে।

(খ) মাসী মাসী পিসী প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে 'ই' এবং 'ঈ' এই উভয় স্বরেরই ব্যবহার লক্ষিত হয়। কিন্তু 'ঈ'র ব্যবহারই বেশি। 'ঈ' যদি সর্ব্বজনগ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে 'দিদি'র কি বানান হইবে ?

(গ) পাখী—পাখি দুই বানানই দেখা যায়। দীর্ঘ ঈ বোধ হয় পক্ষীর নজিরে। বেশী—বেশি, দেরী—দেরি, খুসী—খুসি, তৈরী—তৈরি প্রভৃতিতেও দুই 'ই'। '—টি' প্রত্যয়েও দুই ইকারের ব্যবহার। যেমন 'একটি'—'একটী'। কোন্‌টি থাকিবে ?

(ঘ) ইন্ ভাগান্ত সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালায় দীর্ঘ ঈকারান্ত হয়। যেমন পক্ষী, অধিকারী, দুঃখী, সুখী ইত্যাদি। অন্য শব্দের সঙ্গে যখন এই সকল শব্দের সমাস হয় তখন দীর্ঘ ঈ কোথাও পরিবর্ত্তিত হইয়া হ্রস্ব ই হয় এবং কোথাও বা অপরিবর্ত্তিত থাকে। যাঁহারা হ্রস্ব করেন তাঁহারা সংস্কৃতের নিয়ম মানিয়া চলেন। আর যাঁহারা 'পক্ষীগণ' লিখিতে চান, তাঁহারা 'পক্ষী'কে বাঙ্গালা শব্দ ধরিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে কাজ করেন। উভয়ের পক্ষেই যুক্তি আছে। এখন কর্ত্তব্য কি ?

§ স্বর্গীয় কবি সত্যেন্ দত্তের রচিত "যক্ষের নিবেদন" শীর্ষক মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত কবিতায় হ্রস্ব স্বরের গুরু উচ্চারণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

(ঙ) বিদেশী শব্দে ই ধ্বনি থাকিলে বাঙ্গালায় তাহা উভয় স্বরের দ্বারাই বানান করা হইয়া থাকে। যথা, খ্রিষ্ট—খ্রীষ্ট, ষ্টিমার—ষ্টীমার, ষ্টিল—ষ্টীল, ঈৎসিঙ্—ঈ-চিঙ্ (চিনা শব্দ)। বিদেশী শব্দের বেলায় কেবল একটি-মাত্র ই রাখাই সঙ্গত নয় কি ?

(চ) পক্ষী, দুঃখী প্রভৃতির দেখাদেখি 'দরদী' 'মরমী' প্রভৃতি শব্দেও 'ঈ'র ব্যবহার লক্ষ্য করিবার বিষয়। কিন্তু হ্রস্ব ই ও মধ্যে মধ্যে দেখা যায় না এমন নহে। জাতীয় বা দেশীয় বুঝাইতেও উভয় স্বরের ব্যবহার দেখা যায়। যথা, হিন্দুস্থানী—নি, ইংরাজী—জি, ফরাসী—সি, বাঙালী—লি ইত্যাদি।

৩। উ—ঊ

উকারের গোলমাল তত বেশী নয়। 'ত্রুক্খীতভাবে' লিখেন যে গ্রন্থকার—তাঁহার বইখানি ঘাঁটিয়াও কেবল তৎসম শব্দ ব্যতীত অন্যত্র 'ঊ' চোখে পড়িল না। পক্ষীর নজিরে যাঁহারা পাখী লিখেন তাঁহারাও সূত্রের নজিরে কদাচিৎ সূতা লিখেন। আর 'মুহূর্ত্ত' 'কৌতুক' 'কৌতূহল' 'শ্বশ্রূ' প্রভৃতি শব্দে 'উ' 'ঊ'র যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে সেগুলি কেহ স্বেচ্ছায় করেন না বলিয়াই মনে হয় অর্থাৎ সেগুলি সাধারণ প্রমাদের পর্য্যায়ে পড়ে।

৪। ঋ—ঌ

(ক) ঋ তৎসম শব্দে আছে থাকুক, তদ্ভবতে যদি থাকা সম্ভব হয় তাহাতেও আপত্তি নাই। সম্ভব হয় এইজন্য বলিলাম যে সংস্কৃতের 'ঋ' তদ্ভবতে প্রায়ই অন্যস্বর হইয়া যায়। যেমন, কৃষ্ণ—কাল, ঘৃত—ঘি, অমৃত—অমিয়। কিন্তু যে শব্দ দেশজ বা বিদেশী সে সকল শব্দে 'ঋ' রাখার প্রয়োজন কি ? 'খৃষ্ট' 'খ্রিষ্ট' ও 'খ্রীষ্ট' একই শব্দের যখন এই রকম তিনটি বানান—তখন 'ঋ'র ব্যবহার বাদ দিলে অন্তত একটা ত কমে। এই প্রসঙ্গে 'বৃটেন' 'কৃষ্টান' প্রভৃতি শব্দ তুলনীয়।

(খ) ঌ বর্ণমালায় আছে মাত্র, কিন্তু ভাষায় ইহার ব্যবহার নাই। সুতরাং ইহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৫। এ

(ক) 'এ'র উচ্চারণ দ্বিবিধ। সাধারণ উচ্চারণ ইংরাজি bed শব্দের এ ধ্বনির অনুরূপ। এতদ্ব্যতীত ইহার একটি বক্র উচ্চারণও আছে। যেমন, 'কেন' 'ক্ষেপা' 'কেমন' ইত্যাদি। সাধারণ উচ্চারণ যথা, 'ফেল' 'তেল'

মেশা' 'কেনা' ইত্যাদি। সাধারণ উচ্চারণে কোন গোল নাই। হাঙ্গামা ঐ বাঁকা উচ্চারণ লইয়া। কোন কোন লেখক 'এ্যাড' বা 'য়্যাড' লিখেন। আবার কেহ কেহ বক্র 'এ' বুঝাইবার জন্য 'অ্যা' ব্যবহার প্রস্তাব করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ ব্যঞ্জনে যুক্ত বক্র 'এ' বুঝাইতে 'ে' এইরূপ রেখা-যুক্ত এ চিহ্ন ব্যবহার করেন। যথা, 'কেনা'—কিন্তু 'বেচা', 'খেলি' কিন্তু 'খেলা' ইত্যাদি। কিন্তু শুধু 'এ'র বেলায় উচ্চারণের বিভিন্নতা বুঝাইবার কোন উপায় তাঁহার কোন পুস্তকে দেখা যায় না। 'এমন' এবং 'এম্‌নি' এক এ দিয়াই বানান করা হয়। কয়েকটি আধুনিক উপন্যাস ও গল্পের বই ঘাঁটিয়া 'এ্যাক' 'এ্যাতো' 'ফ্যালা' 'এ্যাকলা' 'ক্যাগোন' প্রভৃতি শব্দ পাইয়াছি। 'এ'র বাঁকা উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য পৃথক কোন বানানের প্রয়োজন আছে কি না? যদি থাকে কোন্ বানান গ্রহণীয়?

(খ) কলিকাতার অশিক্ষিত সম্প্রদায় এবং স্ত্রীলোক-গণের মধ্যে কোথাও কোথাও 'আ' 'য়্যা' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, 'কাঁথা'—'ক্যাঁথা', 'বাঁকা'—'ব্যাঁকা'। এইরূপ আকারের য়্যা-উচ্চারণ শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মুখেও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাই। তাহারই ফলে সাহিত্যেও ইহা ধীরে ধীরে স্থান পাইতেছে। এই 'য়্যা' আবার 'ই' স্বরের পূর্ব্বে বসিয়া 'এ' হইয়া যায়। যেমন, বাঁকা—ব্যাঁকা—বেঁকিয়ে, ঝাঁটা—ঝ্যাঁটা—ঝেঁটিয়ে। আর 'য়্যা' বা 'এ'-রূপ ভাষায় স্থান পাইবে কি?

৬। ঐ—ওই—অই

'ঐ' ধ্বনির বানান নির্দ্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। কেহ লিখেন 'ঐ', কেহ লিখেন 'ওই'—আবার কেহ বা লিখেন 'অই'। কৈ—কই, বৈ—বই (ব্যতীত), দৈ—দই প্রভৃতি শব্দের কোন্ বানান চলিবে?

৭। ঔ—ওউ—অউ

'উ' সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। 'উ' 'ওউ' 'অউ' এ তিনেরই উচ্চারণ এক। যথা, বৌ—বোউ—বউ, মৌ—মোউ—মউ ইত্যাদি।

৮। মহাপ্রাণ বর্ণ

মহাপ্রাণ বর্ণগুলির সম্বন্ধেও একটা নিয়ম করা আশু প্রয়োজন। বাঙ্গালায় মহাপ্রাণ বর্ণের মহাপ্রাণতা শব্দের আদি ব্যতীত অন্যত্র প্রায়ই অক্ষুণ্ণ থাকে না। সেইজন্য 'করেছে' হয় 'করেচে', 'অর্দ্ধেক' হয় 'আদ্দেক', 'বাচ্ছা' হয় 'বাচ্চা', 'শাঁখ' হয় 'শাঁক', 'পৌছেছি' হয় 'পৌচেছি'—ইত্যাদি। ঐরূপ 'বাঁঝা'—'বাঁজা', 'সাঁঝ'—'সাঁজ', 'মাঝা'—'মাজা', 'দেখ্ দিখিনি'—'দেক্ দিকিনি' 'সিন্ধুক'—'সিন্দুক' ইত্যাদি।

৯। জ—য

কোথায় 'জ' এবং কোথায় 'য' হইবে ইহা একটি সমস্যার বিষয়। কেহ কেহ সংস্কৃত বানানের অনুসরণ করিয়া 'কায' লিখেন। আবার কেহ কেহ ভাষার গতি অনুসরণ করিয়া প্রাকৃত কজ্জর নজিরে 'কাজ' লিখেন। ঐরূপ 'যাঁতি', 'যাঁতা', 'যোড়া' প্রভৃতি শব্দ দুই 'জ'য়ের দ্বারাই বানান করা হয়। দেশজ বা বিদেশী শব্দে একটি মাত্র 'জ' রাখাই বিধেয় নয় কি? 'জায়গা' এবং 'যায়গা' দুইটি বানানই প্রচলিত, কিন্তু একটি রাখাই কি সঙ্গত নয়?

১০। র—ড়

পূর্ব্ববঙ্গীয় লেখকদের হাতে পড়িয়া 'ড়' যেখানে সেখানে 'র' হইয়া যাইতেছে। সুতরাং 'র'এর স্থানেও মধ্যে মধ্যে 'ড়' বসিতেছে। কিন্তু এগুলিকে সম্ভবত ভুলের গণ্ডীতে ফেলা যায়। পূর্ব্ববঙ্গীয় লেখকগণ 'ঝড়'কে যতই 'ঝর' লিখুন না কেন, সাহিত্যে তাহা কোন দিন স্বীকৃত হইবে বলিয়া আশঙ্কা করি না।

১১। ন—ণ

ন ও ণর সমস্যাও বড় জটিল হইয়া পড়িয়াছে। এই 'বানান' শব্দটিরই একাধিক বানান আছে। কেহ লিখেন 'বানান', কেহ লিখেন 'বাণান' এইরূপ; আগুন—আগুণ, সোনা—সোণা, কান—কাণ, চুন—চুণ, কোন—কোণ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করি—"পণ্ডিতেরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষার ছাঁচে ঢালাই করলেন—সেটা হলো অত্যন্ত আড়ষ্ট। বিশুদ্ধভাবে সমস্ত তার বাঁধাবাধি—সেই বাঁধন তার নিজের নিয়মসঙ্গত নয়—তার ষত্ব ণত্ব সমস্তই সংস্কৃত ভাষার ফরমাসে। সে হঠাৎ বাবুর মত প্রাণপণে চেষ্টা করে নিজেকে বনেদী বংশের বলে প্রমাণ করতে চায়। যারা এই কাজ করে তারা অনেক সময়েই প্রহসন অভিনয় করতে বাধ্য হয়। কর্ণেলে গবর্ণরে পণ্ডিতি করে মূর্দ্ধন্য ণ লাগায়, সোনা পান চুনে ত কথাই নেই।" এখন পণ্ডিতরা বিচার করুন—কোথায় মূর্দ্ধন্য ণ এবং কোথায় দন্ত্য ন লাগান আবশ্যক।

১২। রেফ্ (র্)

সংস্কৃতে দেখি রেফ্‌যুক্ত বর্ণের বিকল্পে দ্বিত্ব হয়। সর্ব্ব—সর্ব, মর্ম্ম—মর্ম, কার্য্য—কার্য ইত্যাদি। দ্বিত্ব না করিয়া লিখার দিকেই বরং ঝোঁকটা বেশি। বাঙ্গালায় কিন্তু রেফ্‌যুক্ত বর্ণের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দ্বিত্ব করা হয়।

ইদানীং কেহ কেহ বর্ধন, মর্ম, এইরূপ লিখিতেছেন। দ্বিত্ব না করিলে যখন সংস্কৃতে অশুদ্ধ হয় না তখন বাঙ্গালায় তৎসম শব্দ বানান করিতে বৃথা দ্বিত্ব করার আবশ্যক কি? তৎসম দূরের কথা—আমরা 'কর্ম্ম' 'চর্ব্বি'—কার্ব্বন পর্দ্দা প্রভৃতিতেও দ্বিত্ব করিয়া থাকি।

১৩। বিসর্জ্জনীয় (ঃ)

ক্রমশঃ অন্ততঃ বস্তুতঃ প্রভৃতি শব্দে বিসর্গকে অনেক লেখকই বিসর্জ্জন করিতেছেন। আবার রক্ষাও করিতেছেন অনেকে। কি করা কর্ত্তব্য?

মনস্ শিরস্ প্রভৃতির স্ লোপ ঘটায় মন শির প্রভৃতি শব্দকে খাঁটি বাঙ্গালা বলি। তথাপি সমাসের সময় পূর্ব্বতন সংস্কৃতরূপের শরণাপন্ন হইয়া 'শিরোমণি' লিখিতে হয়। কেহ কেহ 'মনযোগ' 'শিরমণি' লিখেন। এইরূপ প্রয়োগকে বাঙ্গালা ব্যাকরণের নিয়মে শুদ্ধ বলিয়া ধরিব কি না?

১৪। ম—ব

'ম' চলিত বাঙ্গালায় কোন কোন লেখকের হাতে স্থান বিশেষে 'ব' হইয়া যায়। শুদ্ধি অশুদ্ধির কথা বলিতেছি না। আম্রের পক্ষে আঁব হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে 'আম' ও 'আঁব' এই দুই শব্দই চলিবে? না, একটি রাখিয়া একটি ত্যাগ করিতে হইবে? এইরূপ 'নেমে'র (নামিয়া) রূপান্তর 'নেবে', 'তামার' রূপান্তর 'তাঁবা'—প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত আছে।

১৫। উর্দ্ধকমা বা ইলেক (')

সংস্কৃতে দেখি সন্ধির সূত্রে দুই শব্দে যোগ হইয়া কোন 'অ' যদি লুপ্ত হয় তাহা হইলে লুপ্ত অকার দ্বারা তাহার সন্ধিপূর্ব্ব অস্তিত্ব দেখান হয়। যথা, মমোঽন্তর। বাঙ্গালার ইলেক অনেকটা এই ধরণের চিহ্ন। কোন বর্ণের লোপ হইলেই ইহা সাধারণত বসিয়া থাকে।

(ক) করে'—ক'রে, ধরে'—ধ'রে, পড়ে'—প'ড়ে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের ব্যবহার দুই স্থানে দেখা যায়। ইলেকের ব্যবহার আদৌ থাকিবে কি না তাহা অবশ্য পূর্ব্বেই স্থির করিয়া ফেলা প্রয়োজন। যদি ইলেকের ব্যবহার চলে তাহা হইলে কোন্ কোন্ স্থলে তাহা করা প্রয়োজন তাহাই এক্ষণে আলোচনা করা যাউক। অসমাপিকা ক্রিয়ায় ইলেকের ব্যবহার যদি রাখা হয় তাহা হইলে অন্ত্য অক্ষরে দেওয়া উচিত—অথবা উপান্তে?

(খ) দেখান, শোনান, বোনান, করান, পালান, ভাঁড়ান প্রভৃতি ধাতুর সামান্যরূপে (infinitive) ন'য়ের তিনরূপ দেখা যায়। কখনও ন শুধুই থাকে, কখনও ও যোগ করা হয়, আবার কখনও বা ইলেক দেওয়া হয়। এস্থলে ইলেক থাকা বাঞ্ছনীয় কি না?

(গ) অনুজ্ঞায় ইলেকের ব্যবহার হইয়া থাকে। বল' (বলহ)—ব'লো (বলিহ), কর'—ক'রো—এ সকল স্থলে ইলেক দিতে হইলে কোনখানে দেওয়া উচিত?

(ঘ) আপাতত অন্তত বস্তুত প্রভৃতি শব্দের বিসর্গ লোপ হওয়ায় কেহ কেহ ইলেক দিয়া উহাদের স্বরান্ত বুঝাইবার চেষ্টা করেন। আদৌ তাহার প্রয়োজন আছে কি? ত অব্যয়ে ইলেক দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? ত তো (১। জিজ্ঞাসাও এই প্রসঙ্গে আলোচ্য) এবং ত' এই তিন রূপই দেখিতে পাই।

(ঙ) তা'র (তাহার) যা'র (যাহার) কা'র (কাহার) প্রভৃতি শব্দে লুপ্ত 'হা'র স্থানে ইলেক কেহ কেহ ব্যবহার করেন। ইহা কি আবশ্যক?

(চ) 'উপর' শব্দের 'উ' উহ্য রাখিয়া উহার স্থলে ইলেক দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ' পরে লিখেন।

১৬। হাইফেন (-) ও ফাঁক

(ক) সমাস হইলে দুইটি শব্দের মধ্যে হাইফেন কখনও বসে, কখনও বসে না। যথা, হাজার-বার-শ হাত-পা, কূল-কিনারা ইত্যাদি। ঠিক এই ধরণের শব্দই বিনা হাইফেনেও লিখিত হয়। একই প্রবন্ধের মধ্যে 'সেবা-প্রতিষ্ঠান' ও 'সেবা প্রতিষ্ঠান' দেখা যায়।

(খ) সমস্ত পদদ্বয়ের মধ্যে বিকল্পে ফাঁকও দৃষ্টিগোচর হয়। 'ইহা দ্বারা' 'জাহাজ কোম্পানি' 'এই জন্য' 'তা ছাড়া' 'ফল দ্বারা' ইত্যাদি।

(গ) 'এ' 'যে' প্রভৃতি সর্ব্বনামের পরবর্ত্তী শব্দ হাইফেন দ্বারা যুক্ত হইতে দেখা যায়। যথা, এ-কথা, যে-লোক, সে-দিন, ইত্যাদি।

১৭। ং, ঙ্, ঙ্গ্; ঙ, ঙ্গ।

(ক) অনুস্বর, ঙ্, এবং ঙ্গ্ নির্ব্বিচারে একই স্থলে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাংলা—বাঙ্লা—বাঙ্গ্লা—বাঙলা—বাঙ্গলা, রং—রঙ্—রঙ্গ্, ঢং—ঢঙ্—ঢঙ্গ্, আংটি—আঙ্টি—আঙ্গ্টি ইত্যাদি। হসন্ত উচ্চারণে ঙ্গ-এর ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অল্প।

(খ) স্বরান্ত উচ্চারণে অনুস্বরের ব্যবহার হয় না, কাজেই 'ঙ' এবং 'ঙ্গ' ব্যবহৃত হয়। যথা, বাঙালী—বাঙ্গালী, ব্যাঙাচি—ব্যাঙ্গাচি, ভাঙানি—ভাঙ্গানি, আঙুল আঙ্গুল ইত্যাদি।

* * * *

প্রত্যেক প্রশ্নের সহিত উদাহরণ আরও অধিক পরিমাণে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারিত, কিন্তু বাহুল্যবোধে করি নাই। দুই চারিটি উদাহরণই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করি। এই সকল শব্দও কিছু নূতন নহে। বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকা-মাত্রই প্রতিদিন এই ধরণের অসংখ্য শব্দ দেখিতেছেন।

কর্ ধাতুর রূপ

		প্রথম — সামান্য	প্রথম ও মধ্যম — গুরু	মধ্যম — সামান্য	মধ্যম — তুচ্ছ	উত্তম	
বর্তমান	১। নিত্য	করে	করেন	কর · রো	করিস কোরিস্ — স্ কোরিস	করি কো-	৫ এর স্থলে ১০
	২। ঘটমান	করছে ক'রছে কোরছে ক'র্‌ছে কর্‌ছে কোর্‌ছে ক'চ্ছে´ কচ্ছে´ কোচ্ছে´ ক'চ্ছে কচ্ছে কোচ্ছে [ছ স্থলে চ লিখিলে আরও ১২টি রূপ]	করছেন ক'রছেন কোরছেন [প্রথম সামান্যের মতই ২৪টি রূপ]	করছ ক'রছ কোরছ [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ, কিন্তু শেষ অক্ষরের ও উচ্চারণ থাকায় ও যোগ হইতে পারে। তাহা হইলে ২৪টি রূপ]	করছিস [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ। হসন্ত-যোগে ৪৮]	করছি [প্রথম সামান্যের মত ২৪টি রূপ]	৫ এর স্থলে ১৬৮
	৩। অনুজ্ঞা	করুক ক'রুক কোরুক [হসন্ত যোগে আরও ৩]	করুন ক'রুক কোরুন [হসন্ত যোগে আরও ৩]	কর করো	কর্ [বিনা হসন্তে আর ১]	×	৪ এর স্থলে ১৩
অতীত	৪। অচির	করলা (ক) ওকার ও ইলেক যোগে ৩ (খ) র'র হসন্ত দিলে ৩ (গ) র স্থানে রেফ্ দিলে ৩ (ঘ) র বা রেফ্ তুলিয়া ল'র দ্বিত্ব ৩ (ঙ) ল র ওকার দিলে ১২ করলে উপরের মত ২৪ মোট ৪৮	করলেন [৪। (ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে ১২, ন'র হসন্ত দিলে আরও ১২, মোট ২৪]	করলে [মোট ১২]	করলি [মোট ১২]	করলাম ১২ করলেম ১২ করলুম ১২ ৩৬ ময়হস দলে আরও ৩৬ মোট ৭২	৫ এর স্থলে ১৬৮
	৫। সংঘটিত	করেছে (ক) ইলেক এবং ও যোগে ৩ (খ) ছ স্থলে চ দিলে ৩ ৬	করেছেন (ক) (খ) অনুসারে ৬ রূপ	করেছ (ক) (খ) অনুসারে ৬ ছয়ে ওকার দিলে ৬ ১২	করেছিস (ক) (খ) অনুসারে ৬ সয় হসন্ত যোগে ৬ ১২	করেছি (ক) (খ) অনুসারে ৬	৫ এর স্থলে ৪২

কর্ ধাতুর রূপ

		প্রথম — সামান্য		প্রথম ও মধ্যম — গুরু		মধ্যম — সামান্য		মধ্যম — তুচ্ছ		উত্তম				
অতীত	৬। নিত্য	করত		করতেন		করতে		করতিস		করতাম		৫	এর স্থলে	১০৮
		(ক) ইলেক এবং ও যোগে	৩	(ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে	১২	(ক) (খ) (গ) (ঘ) অনুসারে	১২	(ক)—(ঘ) অনুসারে	১২	(ক)—(খ) অনুসারে	১২			
		(খ) র র হসন্ত দিলে	৩					স'র হসন্ত দিলে	১২	করতেম	১২			
		(গ) র এর স্থানে রেফ্ দিলে	৩						২৪	করতুম	১২			
		(ঘ) র এর স্থানে ঁ দিলে	৩								৩৬			
		(ঙ) ত'র ওকার দিলে	১২											
			২৪											
	৭। ঘটমান	করছিল		করছিলেন		করছিলে		করছি		করছিলাম	২৪	৫	এর স্থলে	১৬৮
		পূর্ব্বোক্ত নিয়ম সকল অনুসারে	৪৮	মোট	২৪	মোট	২৪	মোট	২৪	করছিলেম	২৪			
										করছিলুম	২৪			
											৭২			
	৮। পুরাঘটিত	করেছিল		করেছিলেন		করেছিলে		করেছিলি		করেছিলাম	৬	৫	এর স্থলে	৪৮
		মোট	১২	মোট	৬	মোট	২৪	মোট	৬	করেছিলেম	৬			
										করেছিলুম	৬			
											১৮			
ভবিষ্যৎ	৯। নিত্য	করবে		করবেন		করবে		করবি		করব		৫	এর স্থলে	৩৬
		মোট	৬	মোট	৬	মোট	৬	মোট	৬	মোট	১২			
	১০। অনুজ্ঞা	করবে		করবেন		করো		করিস		×		৪	এর স্থলে	২১
		মোট	৬	মোট	৬	মোট	৩	মোট	৬			মোট ৪৮	এর স্থলে	৭৮৫

কৃৎপ্রত্যয়—যোগে কর্ধাতু

১। — তে		২। — এ		৩। — লে		৪ — বার		৫ — আ				
করতে		করে		করলে		করবার		করা		৫	এর স্থলে	৬৩
মোট	১২	মোট	৬	মোট	১২	মোট	২	মোট	১			

সর্ব্বসাকল্যে ৫৩ স্থলে ৮১৮ কালভেদে এবং কৃৎ-যোগে কর্ ধাতুর ৮১৮ রূপান্তর,

গল্প

বনের হরিণ

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

দিল্লী এক্সপ্রেশে চড়িয়া দীনেশ ফিরিতেছিল এলাহাবাদে।

সে এলাহাবাদে থাকে। এম-এ পাশ করিয়া সেখানে কোন কলেজে প্রফেশরি করে। বাপ এলাহাবাদের উকিল। দীনেশ আসিয়াছিল কলিকাতায় বিবাহের জন্য পাত্রী দেখিতে। পাত্রী নির্ম্মলার বাবা তার বাবার বন্ধু ক্ষিতীশ চৌধুরী —কলিকাতা হাইকোর্টের মস্ত এটর্ণি। মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করিয়া আই-এ পড়িতেছে। গান জানে, বাজনা জানে, নাচিতে শিখিয়াছে। সেবারে বন্যা-রিলিফে ম্যাডান থিয়েটার্সে নাচিয়া খবরের কাগজের কটা লাইন-জুড়িয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছে; তার উপর মেডেল মানপত্র যা পাইয়াছে—দেশটা সনাতনীভাবে ভরিয়া না থাকিলে, কি জানি হয় তো বা, সেই মেডেল আর মানপত্রের জোরে···

কিন্তু সে কথা থাক্। যে হেতু আমরা পাত্রী নির্ম্মলার কথা বলিতে বসি নাই; আমরা বলিতেছি পাত্র দীনেশের কথা।

দীনেশ ভালো ছেলে। পাত্রী সম্বন্ধে একালের ছেলেদের মত মনে-মনে একটা আদর্শ জাগে বলিয়া পাত্রী দেখিতে যায় নাই; গিয়াছিল মা—বাপের কথায়। বাবার প্রাকটিশ ছাড়িয়া নড়িবার জো নাই। ক্ষিতীশ চৌধুরীর প্রস্তাবে এমনি 'বেশ' বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু দীনেশের মা বলিলেন—ও কি গো! এ জিনিষ কেনা নয়—যে মন্দ হয় ফেলে দেবে। ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ আনচো! দেখে শুনে আনো! দেখতে কেমন—খোঁড়া, না বোঁচা—এগুলো দেখবে না! বন্ধুর মেয়ে—মেয়ে একেলে-ধরণে পাশ করেছে, গাইতে বাজাতে জানে—এই কথা শুনেই অমনি 'তথাস্তু' করচো! সে কি কথা হলো!

তখন দুজনে পরামর্শ করিয়া দীনেশকে বলিলেন—তুই যা বাবা—ক্ষিতীশ পর নয়—ছেলে বেলাকার বন্ধু—তুই দেখে পছন্দ করে আয়···ক্ষিতীশ অনেক পয়সা করেচে—লিখেচে মেয়ের বিয়েতে পনেরো হাজার টাকা যৌতুক দেবে···

হাসিয়া দীনেশ জবাব দিল—আমার দাম পনেরো হাজার তোমরা সাব্যস্ত করলে, মা···! তুমি যে বলতে মাণিক ছেলে! মাণিকের দাম পনেরো হাজার টাকার চেয়ে ঢের বেশী!

মনে কি বাসনা—আমাদের তা জানিবার উপায় নাই। মা বাপের কথায় মুখে দ্বিরুক্তি না করিয়া দীনেশ কলিকাতায় আসিয়াছিল পাত্রী নির্ম্মলাকে দেখিতে।

দেখিয়া আজ এই দিল্লী এক্সপ্রেশে ফিরিতেছে।

বেলা সাড়ে চারিটায় দিল্লী এক্সপ্রেশ হাওড়া ষ্টেশন ছাড়িল। ইণ্টার কামরায় বেঞ্চের কোণ অধিকার করিয়া দীনেশ প্লাটফর্ম্মে-কেনা একটা বিলাতী নভেল খুলিয়া তাহার পৃষ্ঠায় মনঃসংযোগ করিল।

গাড়ীতে খুব বেশী ভিড় নাই। দেওয়ালে পিঠ ঠাশিয়া দীনেশ বেঞ্চে বসিয়া পা দুটা ছড়াইয়া দিল, পা ছড়াইয়া বসিবার জায়গা ছিল। বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত বহু যাত্রী নামা-ওঠা করিল—তারা কলরব ছাড়ে নাই—সে কলরবে দীনেশের পড়ার কোনো ব্যাঘাত ঘটিল না।

অবশেষে বর্দ্ধমান! কার্ত্তিক মাস। সন্ধ্যা হয় হয়।

প্রচণ্ড কোলাহল তুলিয়া পিল্ পিল্ করিয়া রাজ্যের লোক আসিয়া ইণ্টার কামরা ভরিয়া দিল। সঙ্গে বিপুল মোটঘাট। বাক্স বিছানা হইতে সুরু করিয়া হাঁড়ি-কুঁজা, সীতাভোগ মিহিদানার চাঙারি পর্য্যন্ত। দীনেশকে পা গুটাইয়া বসিতে হইল। তার বেঞ্চে যে দলটি আসিয়া অধিকার করিল—সে দলে বৈচিত্র্য আছে।

কর্ত্তা, গৃহিণী, আট ও দশ বৎসর বয়সের দুটি ছেলেমেয়ে এবং একটি কিশোরী। কর্ত্তা নামেই কর্ত্তা—গৃহিণীর

হাঁকডাক হুঙ্কারের তলায় কোন মতে আত্মরক্ষা করিতেছেন। মোটঘাট যা আসিল, তার সংখ্যা নাই! কতকগুলা গেল বেঞ্চের তলায়, কতকগুলা বাঙ্কে—কতকগুলা মেঝের আঙিনায় বাঁধিয়া পড়িয়া রহিল, কতক উঠিল বেঞ্চের উপর।

গৃহিণী হাঁকিলেন—নন্দ

সে আহ্বানে কিশোরী গৃহিণীর পানে চাহিল। গৃহিণী কহিলেন—সং হয়ে দাঁড়িয়ে রইলি যে। ফর্দ্দখানা নে—জিনিষ পত্তর মিলিয়ে ভাখ্—শেষে একটা পড়ে থাকবে'খন প্ল্যাটফর্ম্মে—যেতে যাবে আমারি।

কিশোরী আঁচলের খুঁট হইতে একটা ভাঁজ করা কাগজ লইয়া ভাঁজ খুলিয়া সেটির সহিত মিলাইয়া মোট ঘাটগুলার উপর চোক বুলাইতে লাগিল। গৃহিণী ততক্ষণে বেঞ্চের উপরে মোট ঘাটগুলা নাড়িয়া সরাইয়া ছেলে দুটির পানে চাহিয়া বলিলেন—বোস না তোরা—শেষে ট্রেণ চলতে আরম্ভ করবে—আর পড়ো উল্টে—পড়ে হাত পা কাটো। নে, তুই বোস এখানে বুঝলি শম্ভু—আর বঙ্কু তুই বোস্ ওখানে।

বঙ্কু বসিল দীনেশের পাশে। দীনেশ পড়া ভুলিয়া গৃহিণীর পানে অবিচল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে।

কর্ত্তা দাঁড়াইয়া আছেন—বসেন নাই—বোধ হয় আদেশ পান নাই বলিয়া। গৃহিণী বলিলেন—দাঁড়িয়ে রইলে যে। বসো

কর্ত্তা কহিলেন—ধারটায় তুমি বসবে তো?

গৃহিণী বলিলেন—হাঁা। না হলে এ মোট ঘাটের মধ্যে বসলে আমার সর্দ্দি গর্ম্মি হবে। আমার জায়গা রেখে তুমি বসো। আমি এখন দেখি, গুণের ধুচুনি মেয়ের ফর্দ্দ মিললো কি না। কিগো জমিদারের বৌ হলো দেখা?

দীনেশ বুঝিল। কিশোরীর সম্বন্ধে গৃহিণীর যা ভাব—ওটি কখনই কন্যা নয—কন্যা হইলে সপত্নী-কন্যা! নয় তো একান্ত আশ্রিতা

নন্দ বলিল—সব মিলেচে, খুড়িমা। তোমার পানের বাক্স?

—ফেলে এসেচো। না—হাড় শত্তুর সকলে! যেটি নিজে না দেখবো

শম্ভু বলিল—বাঃ—ঐ যে পানের বাক্স—বাঙ্কের ওপর।

গৃহিণী বাঙ্কের দিকে চাহিলেন—হাঁ, আছে। পানের বাক্স আছে—হারাবার নাই।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। গৃহিণী বসিলেন। বসিয়া ছেলেদের পানে চাহিলেন, কহিলেন—আরামে বসেছিস। কোনো কষ্ট হচ্ছে না?

—না।

গৃহিণী যেন এতক্ষণে আরাম পাইলেন।

দীনেশের মনে হইল—জার্ম্মান যুদ্ধ এতক্ষণে শেষ হইয়াছে—শান্তি দেখা দিয়াছে! কিন্তু ঐ মেয়েটি? দ্বারের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণী ছেলেদের আরাম হইতেছে কিনা—প্রশ্ন করিয়া জানিলেন। কিন্তু মেয়েটি যে বসিল না—কে জানে, কতদূর চলিয়াছেন, বেঞ্চের উপর হইতে খুচরা পোটলাপুটুলিগুলা সরাইয়া রাখিলে মেয়েটির মত চারটি মেয়ের বসিবার জায়গা হয়।

তার কেমন অসহ্য বোধ হইল। সে কর্ত্তার পানে চাহিল, বলিল—শুনচেন?

কর্ত্তা কহিলেন—আমায় বলচেন?

—আজ্ঞে হাঁ।

—বলুন।

—কতদূর যাবেন?

—কাণপুর।

—এ জিনিষগুলো সরালে ঢের জায়গা মিলবে। মেয়েটি বসতে পাচ্ছে না—সারা রাত দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে যেতে পারবে না তো!

কর্ত্তা সভয়ে গৃহিণীর পানে চাহিলেন—গৃহিণী তখন পিঠ ঠাশিয়া বসিয়া চক্ষু মুদিয়াছেন।

সুতরাং কর্ত্তা কোনো জবাব দিলেন না—নিরুত্তর রহিলেন।

দীনেশ তখন চাহিল শম্ভু ও বঙ্কুর পানে; কহিল—তোমরা এদিকে একটু সরে বসো তো · উনি তাহলে ঢের বসবার জায়গা পাবেন। জায়গা যখন রয়েছে

শম্ভু ও বঙ্কু এমন চোখে দীনেশের পানে চাহিল—সে দৃষ্টি দেখিলে মনে হয়, তারা যেন দীনেশকে ভীষণ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে দেখিয়া আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে। পরক্ষণে তাহারা চাহিল মায়ের পানে। মা তখনো তেমনি চক্ষু মুদিয়া আছেন।

শম্ভু বঙ্কু একটু নড়িয়া বসিল। দীনেশ বলিল—ওঁকে ডাকো—বসতে বলো

শম্ভু ডাকিল—নন্দদি···

নন্দ খোলা জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের পানে চাহিয়াছিল···অন্ধকার—ও অন্ধকারে এক মনে কি দেখিতেছে···ভাবিয়া দীনেশ একটু আশ্চর্য্য হইল। প্রাণে একটু ব্যথাও বোধ করিল। হয়তো এই বয়সেই বেচারীর জীবনে অমনি সব ঘোর আঁধার নামিয়াছে। শম্ভুর আহ্বানে নন্দ ফিরিয়া চাহিল। শম্ভু কহিল—এখানে জায়গা আছে—বসবে এসো।

নন্দ কহিল—থাক্—আমি বেশ আছি।···

কি সঙ্কোচ সে কণ্ঠস্বরে!··

দীনেশ কি করিবে? সে বই খুলিয়া তার পৃষ্ঠায় আবার মনঃসংযোগ করিল।

ওদিকে গৃহিণীর ধ্যান ভাঙ্গিল। তিনি কথারম্ভ করিলেন। সে কথার কি শৃঙ্খলা আছে, না শেষ আছে! কোন্ লেখক কবে যেন লিখিয়াছিলেন—বেশ বলিষ্ঠ দৃপ্ত কণ্ঠস্বর!···গৃহিণীর স্বর শুনিয়া দীনেশের সেই লেখকের লেখা ছত্রটা মনে পড়িল। গৃহিণী যে সব কথা বলিতেছিলেন, তার সবগুলাই তাঁকে কেন্দ্র করিয়া! কথাগুলা হইতে দীনেশ বুঝিল, কর্ত্তা রেলে চাকরি করেন; বদলি হইয়া কাণপুরে চলিতেছেন। বর্দ্ধমানের নারী-সমাজ তাঁকে পাইয়া কতখানি বর্ত্তাইয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁকে হারাইয়া তাদের দুর্দ্দশা যে কতখানি পুঞ্জিত হইয়া উঠিবে—কথায় বার্ত্তায় পরামর্শে তাঁর মত আর তারা কোথাও কাহাকে দেখে নাই। তার উপর তাঁর লেখার কি আদর সকলে করে। কোন্ মাসিকপত্রখানা পড়িয়া রহিল মুন্সেফের স্ত্রীর কাছে—নন্দকে কত করিয়া বলিয়াছিলেন, গিয়া লইয়া আয়! তা হতভাগা মেয়ের যদি কোন হুঁশ থাকে! বিজয়াদশমীর পরের দিন বাণীসভায় তাঁকে যে সভানেত্রী করিয়া লইয়া গিয়াছিল, সে ঐ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট কমলাকান্তবাবুর স্ত্রীর পরামর্শে! তিনিই বাণীসভার সেক্রেটারি কিনা! বর্দ্ধমানে ঐ একটি মেয়ে আছে—যে তাঁর দাম বোঝে। অপরেও বোঝে—তবে কমলাকান্তবাবুর স্ত্রীর বোঝার সঙ্গে অপরের বোঝার অনেক তফাৎ! ভালো কথা—'বোধন', 'বাসন্তী', 'বজ্রপুট', 'গন্ধমাদন' এসব কাগজের আফিসে চিঠি দেওয়া হইয়াছে তো—যে তিনি চলিয়াছেন বর্দ্ধমান ছাড়িয়া কাণপুরে!· কথাগুলো যে দীনেশ একান্ত মনোযোগে ইচ্ছা করিয়া শুনিতেছিল, তা নয়। সে বই খুলিয়া পড়িতেছিল—কথাগুলা হাতুড়ি পেটার শব্দে আসাতে তার মনকে বইয়ের পৃষ্ঠা হইতে ক্রমাগত সরাইয়া দিতেছিল। এ কি মুখের কথা! যেন লাউড-স্পীকার, না, মেশিনগ্যান্ চলিতেছে!

লেখেন! লেখিকা!

নাম জানিবার জন্য দীনেশের মনে প্রচণ্ড কৌতূহল হইল। কিন্তু কি বলিয়াই বা কাহাকে জিজ্ঞাসা করেন!

তার পড়া হইল না। বইয়ের পাতায় চোখ রাখিয়া লেখিকার কথার কামানধ্বনি শুনিতে লাগিলেন। ট্রেণ আসিয়া থামিল আসানশোলে।

গৃহিণী ডাকিলেন—নন্দ···

মেয়েটি তখনো দ্বারের সামনে ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। গৃহিণীর কথায় নন্দ ফিরিল।

গৃহিণী কহিলেন—জানালাগুলো বন্ধ করে দে···রাতের হাওয়ায় না হলে আমার গলা ভারী হয়ে উঠবে!···কর্ত্তার দিকে ফিরিলেন, ফিরিয়া কহিলেন—বিনোদ ডাক্তার তোমায় কত করে বললে, আমার গলার জন্তে ওষুধটা আনিয়ে দিতে—তার আর তোমার সময় হোলো না!··· দামটা না হয় আমিই দিতুম।

সপ্রতিভভাবে কর্ত্তা কহিলেন—বর্দ্ধমানে খুঁজতে বাকী রাখি নি—কোনো ডাক্তারখানায় পাওয়া গেল না।

—না হয় কলকাতা থেকে আনাতে! লোকজন যাচ্ছে চব্বিশ ঘণ্টা—ট্রেণের গার্ডদের জানালে মিলতো না?··· হুঁঃ—বলে, সে যত্নাদি থাকলে—ওরে শম্ভু—গলায় বোতাম দে···নন্দ—ওদের কম্ফার্টার দুটো গেল কোথায়? পই পই করে কদিন বলছি, কম্ফার্টার দুটো বার করে রাখিস। আজ বলি নি···কি না···

সসঙ্কোচে নন্দ উত্তর দিল—বাইরেই রেখেছি, খুড়িমা। তোমার পাশে ঐ পুঁটুলি···

—তবু ভালো। তা পুঁটুলিতে রাখলেই দুঃখ ঘুচবে! ···দাও বার করে ওদের দু'ভাইয়ের গলায় জড়িয়ে।···

শম্ভু কহিল—না মা,···গরম হবে। এই তো জানলা বন্ধ করেচো।

মা হাঁকিলেন—তা হোক্। যা বলচি, শোনো···। নন্দ···

নন্দ পোঁটলা খুলিয়া সযত্নে কম্ফার্টার বাহির করিয়া আবার পোঁটলা বাঁধিল।

গৃহিণী কহিলেন—জানালা বন্ধ করতে বললুম যে···

—দিচ্ছি···

গোটা তিনেক জানালা বন্ধ হইল। নন্দ বন্ধ করিল। দীনেশের শীটের সংলগ্ন জানালা খোলা ছিল। নন্দ আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

দীনেশ বলিল—এটা আমার জানালা। খোলা থাকবে। না হলে আমার কষ্ট হবে।

কথাটা বলিয়া দীনেশ গৃহিণীর পানে চাহিল। ইচ্ছা করিয়াই সে এ কথা বলিল। গৃহিণীর ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া শুনিয়া তার মনে যেন আগুন জ্বলিতেছিল—বিরোধের শিখা। সে শিখা দেখাইবার প্রচণ্ড লোভ···

গৃহিণীও তার পানে চাহিলেন। দুজনের দৃষ্টি মিলিল। গৃহিণীর চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। গৃহিণী কহিলেন—একজনের আরাম দেখলে তো চলে না। সকলের যাতে আরাম হয় তাই করতে হবে। রেলের তাই নিয়ম।

হাসিয়া দীনেশ কহিল—আপনি স্ত্রীলোক—আপনার সঙ্গে তর্ক করবো না।···তবে কথার ভাবে বুঝচি, উনি রেলে চাকরি করেন। রেলের নিয়ম ওঁর তো জানা আছে। উনি বলুন—কোন্ আইনের কোন্ ধারায় এ কাজ···

গৃহিণী বুঝিলেন—লোকটা বর্ব্বর! তিনি চুপ করিলেন।

দীনেশ নন্দর পানে চাহিল। সে যেন মস্ত অপরাধী—তার দু'চোখে এমনি কুণ্ঠা। দীনেশ কহিল—সবটা নয়—বেশ খানিকটা আমি বন্ধ করচি···

নন্দ যেন বাঁচিল!···

গৃহিণী আবার কথা সুরু করিলেন—বর্দ্ধমানে নিজের প্রতিপত্তি—বাঙালার সাহিত্যসমাজে তাঁর গৌরব, কীর্ত্তি—তাহারি কাহিনী।···

সহসা তার মধ্যে বলিলেন—তুই ঢুলচিস যে বঙ্কু!···নন্দ···

নন্দ আবার চাহিল।

গৃহিণী কহিলেন—ওটা ঘুমোবার জোগাড় করচে।···খাবারগুলো যে এনেচো—সে কি পুঁটুলিতে পচাবার জন্যে?

নন্দ বাক্স হইতে একটা চ্যাঙড়া নামাইল। চ্যাঙড়ায় লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা—খানকয়েক কলাপাতাও···

নন্দ বেঞ্চের উপর কলাপাতা সাজাইয়া তাহাতে দিল—লুচি, আলু ভাজা, বেগুন ভাজা—

গৃহিণী কহিলেন—খাইয়ে দে—ওরা যেন তেল ঘীয়ে হাত জবজবে না করে···তারপর কর্ত্তার পানে চাহিলেন, বলিলেন—তুমিও খেয়ে নাও···বুঝলে।

কর্ত্তা বসিয়া আছেন, যেন ব্যোম্ ভোলানাথ! এবারে ঠোঁট নড়িল। বলিলেন—হোক ওদের। তারপর আমরা দুজনে···

কর্ত্তা বলিলেন দুজনের কথা—অথচ···নন্দ তো খাইতেছে না!

শম্ভু বঙ্কু বেশ করিয়া পেট ঠাশিতে লাগিল। গৃহিণী ঝঙ্কার তুলিলেন—নন্দ—

নন্দ তাঁর পানে চাহিল। গৃহিণী কহিলেন—গাঙ্গুলিরা যে একরাশ সন্দেশ রসগোল্লা দিয়েছিল—সেগুলো এসেচে?

নন্দ বলিল—এসেচে। ঐ···

গৃহিণী কহিলেন—শিকেয় তুলে রাখো···তারপর···ভালো জ্বালা! এতবড় ধাড়ি মেয়ে—কোনো বুদ্ধি যদি ঘটে থাকে!

নন্দ বলিল—তুমি তো বলোনি, খুড়িমা···

—এ আবার বলবো কি! জানো না···বয়সে বুড়ো মাগী—থেকে থেকে ন্যাকা সাজচ—

কথাগুলার ভঙ্গীতে দীনেশের আপাদ মস্তক জ্বালা করিতেছিল। উনি আবার লেখিকা—পরিচয় দিলেন! বাঙ্‌লা সাহিত্য এখনো বাঁচিয়া আছে।

নন্দ সন্দেশ রসগোল্লার হাঁড়ি নামাইল। গৃহিণী কহিলেন—ঐ হাতেই! নাও—ম্লেচ্ছপনা আর গেল না! গেল হাঁড়িটা নষ্ট হয়ে। ওতে কম্‌সেকম্ পাঁচসের মিষ্টি আছে। সেগুলোর কি হবে! যে দেশে যাচ্ছি, সে দেশে এ সব খাবার পাবার নয়। ভেবেছিলুম···

নন্দ কহিল—তাহলে···

গৃহিণী কহিলেন—তাহলে কি হাঁড়িটা ফেলে দেবে! খাবার জিনিষ···ধরলে দোষ নেই তত···হাতটা ধুয়ে ফেল, মুছে—দাও—যা খেতে চায়!

শম্ভু কহিল—আমি খাবো না।

বঙ্কু কহিল—আমি শুধু একটা রসগোল্লা খাবো।

তাহাই হইল। শম্ভু বন্ধুর আহার চুকিল; তারপর কর্ত্তা ও গৃহিণী···

গৃহিণী কহিলেন—তুই এখন খাবি—আসবার আগে ওবেলার ভাতগুলো খেয়েচিস—

নন্দ কহিল—না খুড়িমা। আমার খিদে পায় নি।

গৃহিণী কহিলেন—তার উপর যে মেয়ে···ঘী যদি পেটে পড়লো, অমনি অম্বল।···তোমায় যে কি খেতে দেবো—বললুম তখন এক ঠোঙা মুড়ি নে সঙ্গে···শোনা হলো না—এখন থাকো উপোস করে।···

দীনেশের দুই চোখ কপালে উঠিবার জো···! বুঝিল, দুঃখ অনেক! নহিলে ঘী পেটে পড়িলে অম্বল হইত না এবং সে অম্বলের জন্য স্নেহময়ী খুড়িমার এমন সতর্কতা!···আসিবার সময় ওবেলার ভাত খাইয়েছে!

কে জানে, সে বেলায় হয়তো জোটে নাই। কিম্বা হাঁড়ীর ভাত কয়টা পাছে নষ্ট হয়—ন দেবায়, ন ধর্ম্মায়···! তাই দে খাইতে বেচারী আশ্রিতাকে!

মা বাপ নাই—নিশ্চয়! থাকিলে যত দুঃখ কষ্টই সহুক, মেয়েকে এমন লোকের হাতে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব!

কর্ত্তা গৃহিণীর আহার চুকিলে নন্দর উপর আদেশ হইল—শম্ভু বন্ধুকে শোয়াইয়া দিবার জন্য—যেন ঘাড়ে না ব্যথা হয়···মাথায় দুটা বালিশ!

কর্ত্তার জন্যও ব্যবস্থা হইল—ট্রাঙ্ক টানিয়া নন্দ বেঞ্চের সামনের ফাঁকটুকু বুজাইয়া দিল। তারপর গৃহিণী বলিলেন—সেই আরকটা আন্ নন্দ···পায়ের তলায় মালিশ···তলাটা এমন জলচে যেন কে বাটা লঙ্কা ঘষে দেছে।

দীনেশ বই রাখিয়া দিল। এমন নির্ম্মমতা দেখিয়া বই পড়া যায় না—কিছু করা যায় না···শুধু···

দীনেশ ভাবিল—মানুষের মাথায় যে খুন চাপে—কথাটা সত্য—খুব সত্য এবং সে খুন চাপে এসব দৃশ্য চোখে দেখিলে···

নন্দ গৃহিণীর পায়ে শিশির আরক লেপিয়া ঘষিতে লাগিল—মেঝেয় বসিয়া একখানি করিয়া শ্রীচরণ প্রায় বুকে তুলিয়া···

কর্ত্তা বহুপূর্ব্বে চক্ষু মুদিয়াছেন! তাঁর চক্ষু তো এমনিতেই মুদিয়া থাকে···গৃহিণীর ক্রমেই নাসার গর্জ্জন ফুটিল।

সে গর্জ্জনধ্বনি শুনিয়া দীনেশ ভাবিল, ভদ্রলোকের ভাগ্য···কণ্ঠ ও নাসা সমানে গর্জ্জন তোলে!

ট্রেণ দাঁড়াইল—মুখ বাড়াইয়া দীনেশ দেখে, কোদর্ম্মা। ছোট্ট ষ্টেশন। গৃহিণীর পরিবারটি নিদ্রায় অচেতন, কামরায় অপর নরনারীরও সেই দশা। এ বেঞ্চে এত বড় ট্রাজেডির অভিনয় চলিয়াছে—সেটুকু কাহারও চোখে পড়ে নাই। চোখ চাহিয়াও মানুষ কত কি যেন দেখিয়া পথ চলে···

নন্দ বেঞ্চের নীচে তেমনি বসিয়া আছে—ঘুমে কখনো ঢুলিয়া পড়িতেছে, পরক্ষণেই ঘুম ভাঙ্গিতেছে—অমনি ধড়মড় করিয়া পা তুলিয়া দুই হাতে পূজনীয়া খুড়িমার পায়ে হাত ঘষিতেছে!

দীনেশের খুব ক্ষুধা পাইয়াছিল—সেদিকে হুঁশ ছিল না—এখন হুঁশ হইল। সঙ্গে খাবার আছে—

তার মনে জাগিল—দুঃসাহসের অভিসন্ধি!···

বড় থার্ম্মোফ্লাস্কে ছিল চা—পেয়ালায় চা ঢালিয়া পেয়ালা হাতে সে সন্তর্পণে আসিয়া নন্দর মাথায় হাত দিল। নন্দ ঢুলিতেছিল—স্পর্শে চোখ মেলিয়া চাহিল। চাহিয়া···

দীনেশ লক্ষ্য করিল, সে চাহনিতে কত ব্যথা, কত মিনতি, কতখানি···

মৃদুস্বরে দীনেশ কহিল—খেয়ে ফ্যালো···

নন্দ যেন কাঠ—চোখে পলক নাই—অচঞ্চল দৃষ্টি!

দীনেশ কহিল—আমার কাছে খাবার আছে। খিদে পেয়েছে। তুমি না খেলে আমি পার্বো না···খাও···খেতে হয়। না খেলে আমার অপমান হবে।

নন্দ যে কি করিবে···সভয়ে খুড়িমার পানে চাহিল। দীনেশ কহিল—কুম্ভকর্ণর ঘুম। ও ঘুম ছ'মাসের আগে ভাঙবে না। ভয় নেই।

পেয়ালা আগাইয়া সে পেয়ালা ধরিল নন্দর মুখে। কহিল—খাও—তুমি খেলে তবে আমি খাবো।

বেচারী নন্দ! কি করে! তার জন্য উনি খাইবেন না! বুঝিল—দয়া! এ দয়া তো তাকে কোনো দিন কেহ করে নাই!

সে পেয়ালা লইয়া মুখে দিল।

দীনেশ খুশী হইল। বলিল—সবটুকু খেয়ো না—বিস্কুট আছে—ঐ সঙ্গে খাও···কিন্তু তোমার আরকের হাত···আমি মুখে ধরচি।···না, না, লজ্জা নয়···খিদের সময় লজ্জা করতে নেই!

বিমূঢ় নন্দ! এ অবস্থায় কি করিবে, কি করতে হয়—সে জানে না। জ্ঞান হইয়া অবধি গালাগালি শুনিতেছে··· মিষ্ট কথা কাহাকে বলে শোনে নাই। আজ এ কথা শুনিয়া সে যেন আর তাহাতে নাই!

নিঃশব্দে সে চা-বিস্কুট খাইল।

দীনেশ কহিল—উনি তোমার কাকাবাবু?

—হ্যাঁ।

—তোমার খুড়িমা বই লেখেন?

—হ্যাঁ।

—কি নাম ওঁর?

—শ্রীমতী চমৎকারিণী দেবী।

দীনেশ কহিল—ও—তাই স্বভাবটিও এমন চমৎকার! বটে!

নন্দ কোনো জবাব দিল না। লজ্জায় মাথা নামাইল।

দীনেশ কহিল—এ মোটঘাট তুমিই বেঁধেচো? না, রেলের কুলি ডাকিয়েচ?

নতশিরে নম্র শান্ত স্বরে নন্দ কহিল—আমি বেঁধেচি।

দীনেশ বলিল—কেন! ষ্টেশনে কুলির তো অভাব নেই। তাদের দিয়ে বাঁধা ছাঁদা করালে পয়সা লাগতো না···

নন্দ কহিল—বাইরের লোকে জিনিষ ছোঁবে—খুড়িমা চায় না!

—ও! শুধু চমৎকারিণী নন্—তাহলে আবার শুদ্ধাচারিণী!

নন্দ মুখ নামাইল।

দীনেশ ক্ষণেক চুপ করিয়া রহিল। চমৎকারিণীর নাসা-গর্জ্জন সহসা থামিল। দীনেশ সন্তর্পণে নিজের জায়গায় গিয়া বসিল। গৃহিণী ডাকিলেন—নন্দ···

নন্দ কহিল—খুড়িমা···

—এক গেলাশ জল দে···

কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া চমৎকারিণীর হাতে নন্দ গ্লাশ দিল। জলপানান্তে খুড়িমা কহিলেন—সেই মশারির পুঁটুলিটা দে তো···মাথা কেমন গড়িয়ে পড়চে। নন্দ ঘাড়ের নীচে মশারির পুঁটুলি গুঁজিয়া দিল—সানভাবে মাথা দুলাইয়া অবশেষে একসময়ে তিনি বলিলেন—এবারে ঠিক হয়েচে।···হ্যাঁ···তুই যেন ঘুমোস নে···এই সব জিনিষ পত্তর ছত্রাকার হয়ে রইলো···একটা যদি যায়···। ঘুম যদি পায় চোখে জল দিস্···বুঝলি?

নন্দ কহিল—দেবো।

—ছেলেরা বেশ ঘুমোচ্ছে তো? ওঠে নি?

—না।

খুড়িমা নিশ্চিন্ত হইলেন।

দু' মিনিটের মধ্যে নাসার আবার নহবৎ সুরু হইল।

নন্দ একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে চাহিল দীনেশের পানে; দীনেশ তার পানেই চাহিয়াছিল। বুঝি ক্ষিতীশ চৌধুরীর ম্যাট্রিক পাশকরা মেয়ের সঙ্গে নন্দর তুলনা করিতেছিল! কিম্বা আর কিছু ভাবিতেছিল···

নন্দর দৃষ্টিতে তার দৃষ্টি মিলিলে দীনেশ হাসিল—নন্দও হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না।

দীনেশ বলিল—তোমার কাকাবাবুর নাম কি?

—তিনকড়ি ঘোষাল।

দীনেশ ভাবিল—বেচারা! হয়তো তিনকড়ি ছিলেন! চমৎকারিণীর দাপটে তিনকড়ি আজ কাণাকড়িতে পরিণত হইয়াছেন!

—তোমার বাবা ওঁর সহোদর ভাই ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—মা বাবা কেউ নেই?

—না।

আহা! বুকের মধ্য হইতে একটা নিশ্বাস ঠেলিয়া উঠিল—দীনেশ সে নিশ্বাস চাপিতে পারিল না।···

ট্রেণ চলিয়াছে···চলিয়াছে···

দীনেশ কহিল—ঠায় দাঁড়িয়ে আছো! তুমি আমার জায়গায় বসো—বসে একটু ঘুমোবার চেষ্টা করো···

নন্দ মাথা নীচু করিয়া নখ খুঁটিতে লাগিল। দীনেশ কহিল—ভয় নেই। আমি জিনিষ চৌকি দেবো'খন!

নন্দ আবার আড়ষ্ট যেন কাঠ!

দীনেশ উঠিয়া দাঁড়াইল—কহিল—এসো। বিকেল থেকে বসে বসে সত্যি আমার কোমর ধরে গেছে!···এসো··· লক্ষ্মী মেয়ে তুমি···কথা শোনো···।

কি করে! বেচারী ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত কুণ্ঠাভরে দীনেশের পানে চাহিল। দীনেশ বুঝিল। কহিল—যদি উনি ওঠেন—আমি বলবো—বেঞ্চের নীচে ঢুলছিল দেখে আমি জোর

করে' ঘুমোতে পাঠিয়েছি—পাঠিয়ে আমি তোষাখানায় পাহারা দিচ্ছি।

দীনেশ মিনতি করিল। নন্দর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে গিয়া বেঞ্চে বসিল।

কিন্তু ঘুম কি আসে!·· প্রাণে এমন আতঙ্ক···

দীনেশ কহিল—ছেলে দুটি কেমন? মায়ের মতন?

নন্দ কহিল—ভালো। আমায় ভালোবাসে।

দীনেশ কহিল—ভালো—না ছাই! ও-হাওয়ায় ভালো থাকতে পারে না।কেউ।···আচ্ছা—তোমার খুড়িমা যে কি বই লিখেচেন? ছাপা হয়েছে?

মাথা নাড়িয়া নন্দ জানাইল—হাঁ।

—তোমার কাকাবাবু পয়সা দেছেন—বই ছাপতে।

—পাব্লিশাররা বই ছাপায়। খুড়িমাকে টাকা দেয়।

—খুড়িমা বসে বসে শুধু বই লেখে—কাজকর্ম্ম করো তুমি।

নন্দ কোনো জবাব দিল না। তার চোখ দেখিয়া দীনেশ বুঝিল, তাই। কহিল—আমি ওঁর লেখা কোনো বই পড়িনি। বাঙলা নভেল খুব কম পড়েচি।···

ওঁর কি কি বই আছে? নভেল?

নন্দ কহিল—নভেল আছে—পদ্যর বই আছে—অন্য বইও আছে।

দীনেশের তাক্ লাগিয়া গেল! হুঁ! এত বিদ্যা!

কহিল—কি নাম—বইয়ের?

নন্দ বলিল—"চন্দ্রমুখী"; "পদ্মাবতী"; "বিলাসবতী"; "সংসারারণ্য"; "প্রাণের টান"; "পক্কবিম্ব"—এগুলো নভেল। "আদর্শ গৃহিণী" বলে' একখানি বই আছে—সেখানার খুব বিক্রী।

দীনেশ কহিল—বটে! তাতে ওঁর গৃহিণীপনার এই আদর্শটি বুঝি লিখেচেন!

কর্ত্তা একটু নড়িলেন। শম্ভু-বঙ্কু দুজনে গুঁতোগুঁতি করিয়া একবার উঠিয়া বসিল—নন্দ তাদের ধরিয়া ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিল।

দীনেশ কহিল—আর কথা কইবো না—তুমি ঘুমোও। ···তার আগে আমার ঐ বইখানা দাও তো···

নন্দ বই দিল; দিয়া কোনো মতে কহিল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়বেন? বসবেন না?

দীনেশ তার পানে চাহিল। হাসি মুখ। নন্দর খুব লজ্জা হইল। এতগুলো কথা সে কহিয়া ফেলিয়াছে! নাম জানে না—ধাম জানে না! ট্রেণে সহসা দেখা···

তা হোক—যে করুণা করিয়াছেন! চায়ের পেয়ালা মুখের সামনে ধরা···এ কামরায় তো আরো লোক ছিল···

তার প্রাণ একেবারে কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গিয়াছিল।

দীনেশ কহিল—তোমাদের ঐ বিছানার গাঁটরিটা রয়েছে কম্বল জড়ানো—ওর উপরে বসবো···

নন্দ বিস্ফারিতনেত্রে তার পানে চাহিয়া রহিল। দীনেশ কহিল—ভয় হচ্ছে, তোমার খুড়িমা বকবেন?···বকুন না একবার—ওঁর সব মোট-ঘাট তাহলে হিঁচড়ে নামিয়ে দেবো ঐ বাঙ্ক থেকে।

কথার শেষে দীনেশ আবার হাসিল।···হাসিয়া কহিল —তুমি ঘুমোও···এর পরে আবার না হয় কথা হবে'খন! রাত দুটো বেজে গেছে!···

দীনেশ বইয়ের পাতায় দৃষ্টি স্থাপন করিল।···

পড়া অগ্রসর হইল না। এই দুর্ভাগিনী বালিকাটিকে কেন্দ্র করিয়া চিন্তার তরঙ্গ উঠিয়া মনটাকে দোলা দিতে লাগিল।···নন্দর পানে চাহিয়া দেখিল—নন্দ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সারাদিন যত ধকল বহিয়াছে···এইটুকুতেই যে পরিচয় মিলিল···

বেচারী···!···

এমনি চিন্তার মধ্যে কখন্ যে সেই গাঁটরির উপর শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে···

ঘুম ভাঙ্গিল, ভোরের আকাশে আলোর আভাস—ট্রেণ চলিয়াছে এবং ট্রেণের কামরায় শ্রীমতী চমৎকারিণী জাগিয়া বসিয়া আছেন—ছেলেদুটি জাগিয়াছে—নন্দ তাদের সামনে বসিয়া রসগোল্লার সেই হাঁড়ি ধরিয়া! কর্ত্তা বুঝি বাথরুমে।···

নন্দ তার পানে চাহিল—চোখের দৃষ্টিতে অনেকখানি আতঙ্ক!

দীনেশ বুঝিল···গৃহিণীর পানে তাকাইল। সে মুখ বাঁকিয়া আছে! এমনিতেই তো ওমুখ যতটুকু দেখিয়াছে, বাঁকা দেখিয়াছে! তবু···

এই যে ঠাঁই বদল···হয়তো সে জন্য নন্দর উপর এক পশলা বর্ষণ হইয়া গিয়াছে।

কর্ত্তা ফিরিলেন।

দীনেশ কহিল—মশায়ের সঙ্গে আলাপ হলো না।

কর্ত্তা কহিলেন—আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

দীনেশ কহিল—এলাহাবাদ। সেইখানেই থাকি।

—ও!

কথা হয়তো আরো চলিতে পারিত। চলিল না—কারণ অচিরে ট্রেণ আসিয়া ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইল।

এলাহাবাদ।

কুলি ডাকিয়া তার মাথায় দু'চারিটা যা মোট ছিল, চাপাইয়া দীনেশ বিদায় লইল—নামিবার সময় কর্ত্তাকে নমস্কার জানাইল। নন্দর পানে চাহিল—নন্দ তখন শম্বু-বৎসের মুখে জলের গ্রাশ ধরিয়াছে!···

মায়ের সঙ্গে পাত্রী লইয়া অনেক কথা হইল।···দীনেশ কহিল—কলিকাতার পাত্রী পছন্দ নয়—অত আপটু-ডেট্—নাচে মেডেল পাইয়াছে! শেষে বৌ আসিয়া নৃত্যকালী-বেশে যদি সংসারে নৃত্য জুড়িয়া দেয়, তো তার পক্ষে খোদ শিবের মত নৃত্যশীলা পত্নীর চরণতলে শুইয়া কাঠ হইয়া থাকা ছাড়া যে আর কোনো উপায় থাকিবে না! তার চেয়ে কাছেই এই কাণপুরে···রেলে কাজ করেন শ্রীযুত তিনকড়ি ঘোষাল—অর্থাৎ বিশ্ববিখ্যাতা লেখিকা শ্রীমতী চমৎকারিণী দেবীর স্বামী শ্রীযুত তিনকড়ি ঘোষালের একটি ভাইঝী আছে···

মা বলিলেন—বলিস্ কি দীনু···বড় বড় ঘর ফেলে কোথাকার কার ঘর থেকে···

দীনেশ বলিল—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি! তা ছাড়া মা, ট্রেণে আসতে যেটুকু দেখা—মা নেই, বাপ নেই···বেচারী কুলির অধম নির্য্যাতন সইচে! বাঙালীর মেয়ে—ব্রাহ্মণের মেয়ে মা···তোমরা যদি এসব মেয়ের মুখের পানে না দেখবে, মা—ভগবান তোমাদের পয়সাকড়ি দেছেন···তাহলে এ মেয়েগুলোর পরিণাম যে কেরোসিনের আগুনে পুড়ে ছাই হবে!···

মা কহিলেন—দেখি, ওঁকে বলি···

উঁহাকে বলার ফলে মুহুরি ত্রিদিবলাল গিয়া একদিন কাণপুরে শ্রীমতী চমৎকারিণী দেবীর স্বামীর সঙ্গে দেখা করিলেন···

এবং বিনামূল্যে এ দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের এমন উপায়—শ্রীমতী চমৎকারিণী নভেল লিখিলেও বিষয়-বুদ্ধিও চমৎকার। কাজেই শ্রীশ্রীপ্রজাপতির নির্বন্ধ ঘটিতে বাধা রহিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে নন্দ লজ্জায় মুখ আর তুলিতে পারে না! দীনেশ তাকে বক্ষলগ্ন করিয়া বলিল—সেদিন তোমার ঐ অবহেলা চোখে দেখে সেই ট্রেণেই আমার প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছিল—তোমায় বুকে নেবার জন্যে···

নন্দ কহিল—তুমি আমায় খুব বেহায়া ভেবেছিলে—না ?

—খুব।···মোদ্দা জায়গা বদল দেখে তোমার পূজনীয়া খুড়িমা কিচ্ছু বলেন নি ?

—তোমারো পূজনীয়া খুড়িমা···

—নিশ্চয়। তস্মিন্ তুষ্টে···কিনা!···তা, কিচ্ছু বলেন নি ?

—খুব রাগ! বললে—হুঁ—ওখানে গেলি কি করে! আমি বললুম, ভদ্দর লোকটি বললেন—তুমি এখানে এসে ঘুমোও···আমি জেগে বসে পড়বো···তাতে খুড়িমা বললে—এক কথায় বিশ্বাস করে বসলি, যদি ও জিনিষপত্তর নিয়ে কোনো ষ্টেশনে ভেগে যেতো!···

—তুমি কি বললে ?

—আমি চুপ করে ছিলুম। কোনো জবাব দিই নি।

দীনেশ বলিল—ঠিক কথা বলেছিলেন—নভেল লেখেন কি না—মানবচরিত্র বোঝেন···তবে একটু ভুল বুঝেছিলেন। কিছু নিয়ে ভেগে পড়ার মতলব আমার গোড়া থেকেই ছিল—তবে তুচ্ছ গাঁঠরি নিয়ে ভাগা নয়—তেমন বোকা আমি নই···ভাগবার বাসনা ছিল তাঁর এই ভাগ্যবতী কিশোরী দেওরঝীটিকে নিয়ে···

হাসিয়া নন্দ বলিল—ঠাট্টা করচো কি! ভাগ্যবতীই তো···না হলে—

কথা শেষ হইল না। দীনেশের অধর তার অধরে আসিয়া যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল মত্ত আবেগে!

ভারতীয় গণিতে ‘পাই’

শ্রীফণিভূষণ দত্ত

প্রাচীনকালে যে সকল জাতি সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অন্যান্য বিদ্যার সহিত গণিতবিদ্যারও বিকাশ প্রস্ফুট হইয়াছিল। গণিত-জ্ঞানের বিকাশের সহিত বিবিধ আকার-বিশিষ্ট ভূমির ক্ষেত্রফল নিরূপণের আবশ্যক হইয়াছিল। বৃত্ত ও গোল সম্বন্ধীয় যাবতীয় ক্ষেত্রের বর্গ বা ঘনফল নির্ণয়ের জন্য অতি প্রাচীন কালেই ‘পাই’এর পরিমাণ নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছিল। আধুনিক গাণিতিকগণ—বৃত্তের পরিধির সহিত ব্যাসের যে আনুপাতিক সম্বন্ধ তাহাই—সাঙ্কেতিক চিহ্ন II (‘পাই’) দ্বারা প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এই সম্বন্ধের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য বহুদিন হইতেই চেষ্টা চলিয়াছিল। তাহার ফলে—ঈজিপ্ট, ব্যাবিলোন, গ্রীস ও ভারতবর্ষ ‘পাই’এর বিভিন্ন মান নিরূপণ করিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

ব্যাবিলোনবাসী ও হিব্রুগণ ‘পাই’এর পরিমাণ ৩ স্থির করিয়াছিলেন। ঈজিপ্টের পণ্ডিতগণ—বৃত্ত-ব্যাসের $\frac{১}{৯}$ অংশ ব্যাস হইতে বিয়োগ পূর্ব্বক অবশিষ্টের বর্গ নিরূপণের দ্বারা বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করিতেন। এই স্থলে ‘পাই’এর পরিমাণ $(\frac{১৬}{৯})^{২}$ = ৩·১৬০৪···পাওয়া যায় (১)। উপরের দুইটি ফল কিরূপে সিদ্ধ হইয়াছিল তাহা জানা যায় না; এগুলি পরীক্ষালব্ধ (emperical) ফল বলিয়াই মনে হয়। গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আর্কিমিদিজ (খৃঃ পূঃ ২১২) গণিত যুক্তিদ্বারা ‘পাই’এর পরিমাণ স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বৃত্তের মধ্যে যাহার ভূমি পরিধিকে স্পর্শ করে এবং শীর্ষটি কেন্দ্রে সংলগ্ন থাকে এমন একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কিত করিয়া এবং কেন্দ্রস্থ কোণটিকে ক্রমান্বয়ে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া অনুপাত দ্বারা দেখাইয়াছেন যে ‘পাই’ ৩$\frac{১}{৭}$ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন। অতঃপর তিনি বৃত্তের মধ্যে ৬, ১২, ২৪, ৪৮, ৯৬ সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সমবাহু বহুভুজ ক্ষেত্র অঙ্কনপূর্ব্বক দেখাইয়াছিলেন যে, বৃত্তের পরিধি তাহার ব্যাসের তিন গুণ হইতে কিঞ্চিৎ অধিক; সেই আধিক্য $\frac{১}{৭}$ হইতে কিছু কম এবং $\frac{১০}{৭১}$ হইতে কিছু বেশী। এই আসন্ন মান ব্যবহারক্ষেত্রে বেশ চলিতে পারে। (২)

ভারতবর্ষেও বহু প্রাচীন কালেই বৃত্ত পরিধির সহিত ব্যাসের অনুপাত নিরূপণের চেষ্টা হইয়াছিল। ব্যাবিলোনীয়গণের ন্যায় ভারতীয় পণ্ডিতগণও ‘পাই’এর মান ৩ ব্যবহার করিতেন। এই অনুপাত যে অতীব স্থূল তাহা বলাই বাহুল্য। কূর্ম ও বায়ুপুরাণে দেখিতে পাই—

“নবযোজন সাহস্রো বিষ্কম্ভঃ সবিতুঃ স্মৃতঃ।
ত্রিগুণস্য বিস্তারো মণ্ডলস্য প্রমাণতঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ, ৫।৪০।১৩

“নবযোজন সাহস্রো বিস্তারো ভাস্করস্যতু।
বিস্তারাস্ত্রিগুণশ্চাস্য পরিণাহোঽথ মণ্ডলম্॥”

বায়ুপুরাণ, ১৫।৬২

উক্ত শ্লোকের দ্বারা সূর্য্যের পরিধি তাহার ব্যাসের কতগুণ তাহাই স্থূলভাবে নির্ণীত হইয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে পুরাণগুলি তেমন প্রাচীন নহে। কিন্তু বেদানুযায়ী শুল্বসূত্রগুলি যে খৃষ্ট জন্মিবার অন্যূন ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, সে বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন। যজ্ঞার্থ বেদিনির্ম্মাণের জন্য শুল্বসূত্রের উৎপত্তি হইয়াছিল এবং এই সূত্রগুলি শ্রৌতসূত্রের অন্তর্গত থাকায় আমরা বুঝিতে পারি যে, এগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতেই লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। পরে প্রয়োজনানুরোধে বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বেই আপস্তম্ব, বৌধায়ন, লাটায়ন, কাত্যায়ন প্রভৃতি ঋষিগণ দ্বারা শুল্বসূত্রগুলি গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। শুল্বসূত্রে জ্যামিতির মূলসূত্রগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যজ্ঞার্থ শ্যেন, রথচক্র, চতুরস্র, কঙ্ক প্রভৃতি চিতি ব্যবহৃত হইত। যেরূপ চিতিই ব্যবহৃত হউক তাহাদের ক্ষেত্রফল ৭$\frac{১}{২}$ বর্গ পুরুষ পরিমিত হইত। আকারের বৈষম্য ঘটিলেও তাহাদের ক্ষেত্রফলে

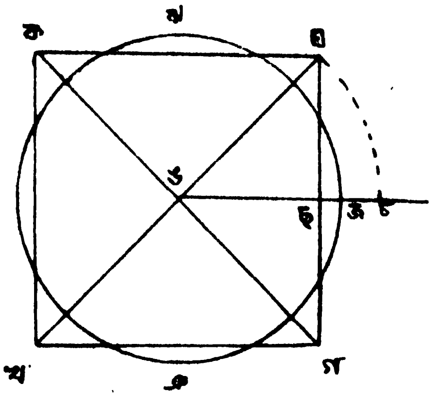
(১) F. Cajori—A History of mathematics—p. 11

(২) Ibid—pp. 41, 42.

পার্থক্য না হওয়ায় ঐ সকল বেদি প্রস্তুতে জ্যামিতিজ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বৃত্তক্ষেত্রের তুল্যফল-বিশিষ্ট সমচতুর্ভুজ ও সমচতুর্ভুজের তুল্যফল-বিশিষ্ট বৃত্ত কল্পনা করিবার কতকগুলি সূত্র শুল্বসূত্রে দেওয়া হইয়াছে।

সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রকে বৃত্তক্ষেত্রে পরিণত করিবার জন্য বৌধায়ন নিম্নলিখিত সূত্র করিয়াছেন। (৩) "সমচতুর্ভুজ ক্ষেত্রকে বৃত্তক্ষেত্রে পরিণত করিবার ইচ্ছা করিলে, সমচতুর্ভুজের কেন্দ্র হইতে তাহার কর্ণার্দ্ধের সমান একটি রজ্জু ঠিক পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত কর এবং ঐ রজ্জুর যে অংশ চতুর্ভুজের মধ্যে পড়িয়াছে তাহার সহিত বহিঃস্থিত অংশের এক তৃতীয়াংশ যোগ করিয়া একটি বৃত্ত অঙ্কিত কর। এই বৃত্তই সমচতুর্ভুজের সমান ফলবিশিষ্ট হইবে।" আপস্তম্বও এইরূপ সূত্রই করিয়াছেন, অধিকন্তু তিনি বলিয়াছেন যে সমচতুরস্রের যে অংশ বৃত্তের বাহিরে পড়িবে, সমচতুরস্রের বহির্দেশস্থ বৃত্তাংশ দ্বারা তাহা পূরণ হইয়া যাইবে।

এই সূত্রটি চিত্র দর্শনের দ্বারা বিবৃত্ত করা যায়। ক খ গ ঘ একটি সমচতুর্ভুজ। ইহার তুল্যক্ষেত্র একটি বৃত্ত অঙ্কিত করিতে হইবে। ঘ ঙ সমচতুর্ভুজের কর্ণার্দ্ধের সমান। ঙ



চিত্র

উহার কেন্দ্র। ঘ ঙ-র সমান ঙ চ রেখা পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত করা হইয়াছে (অর্থাৎ ঙ চ রেখা গ ঘ রেখার সহিত লম্ব করিয়া অঙ্কিত হইয়াছে)। ছজ $=\frac{১}{৩}$ ছচ। ঙজ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া জ ঝ ঞ বৃত্তটি অঙ্কিত হইল। এই বৃত্তের ক্ষেত্রফল নির্দ্দিষ্ট সমচতুর্ভুজ কখগঘ-র ক্ষেত্রফলের সমান।

সূক্ষ্ম গণনা দ্বারা দেখা যায় যে এই প্রক্রিয়ায় আনীত উভয়ক্ষেত্রের ফল আসন্নভাবে সমান। ইহাদের ফল হইতে গণনা করিলে 'পাই' এর পরিমাণ ৩·০৮৮৩ পাওয়া যায়।

বৌধায়ন বৃত্তক্ষেত্রের সমান সমচতুর্ভুজ অঙ্কনের একটি সূত্র দিয়াছেন। সেই সূত্র এই (৪)—"বৃত্তকে সমচতুর্ভুজে পরিণত করিতে হইলে, ব্যাসকে আট ভাগে বিভক্ত কর, তাহাদের একটিকে পুনরায় ২৯ ভাগ কর, এই ২৯ ভাগ হইতে ২৮ ভাগ বিয়োগ কর, (এই ২৯ ভাগের যে অংশটি অবশিষ্ট রহিল) তাহার অষ্টম-ভাগোন-ষষ্ঠাংশ বিয়োগ কর।" সূত্রটি গণিত দ্বারা প্রকাশ করিলে এইরূপ দাঁড়াইবে—বৃত্তব্যাসের পরিমাণ ১ হইলে, অভীষ্ট সমচতুর্ভুজের বাহুর পরিমাণ বৃত্তব্যাসের $\left\{ \frac{৭}{৮} + \frac{১}{৮\times২৯} - \left(\frac{১}{৮\cdot২৯\times৬} - \frac{১}{৮\times২৯\times৬\times৮} \right) \right\}$ অংশ হইবে। এই ভগ্নাংশ সরল করিয়া 'পাই'এর পরিমাণ ৩·০৮৮৩···পাওয়া যায়।

এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মটি কোন উপায়ে আনীত হইয়াছিল, তাহার কোন বিবরণ শুল্বসূত্রে দেওয়া হয় নাই। তৎকালে গ্রন্থবিস্তৃতি-ভয়ে এই সকল নিয়মের যুক্তি-প্রদর্শনের কোন রীতি প্রচলিত ছিল না। সেই জন্য শিক্ষার্থিগণ গুরুমুখ হইতে স্বীয় বুদ্ধি-প্রাখর্য্যে এই সকলের যুক্তি বা উপপত্তি অবগত হইতেন। নিয়মটির প্রকৃতি দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে ব্যবহারিক যুক্তি দ্বারা নিয়মটি পাওয়া গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে সমচতুর্ভুজের সমান বৃত্তক্ষেত্র অঙ্কিত করিবার উপায় দেওয়া হইয়াছে। ঐ নিয়মে বৃত্ত আঁকিয়া, তাহার ব্যাস নির্দ্দিষ্ট সমচতুর্ভুজের বাহুর কত গুণ তাহাই ব্যবহারিক উপায়ে মাপিয়া স্থির করা হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উপায়টি এইরূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে—একটি রজ্জু দ্বারা বৃত্ত-ব্যাস মাপিয়া দেখা গেল যে উহার $\frac{৭}{৮}$ অংশ নির্দ্দিষ্ট সমচতুর্ভুজের বাহু অপেক্ষা কিছু কম। ইহার সহিত ব্যাসের অবশিষ্ট $\frac{১}{৮}$এর ২৯ ভাগ যোগ করিলে বাহু-পরিমাণ কিছু বেশী হইয়া পড়ে। এই আধিক্য যে অংশটুকু যোগ করা হইল তাহার ৬ ভাগ হইতেও কম এবং যেটুকু কম হইল

(৩) চতুরস্রং মণ্ডলং চিকীর্ষন্নক্ষয়ার্ধং মধ্যাৎ প্রাচীমভ্যাপাতয়েদ্ যদতিশিষ্যতে তস্য সহ তৃতীয়েন মণ্ডলং পরিলিখেৎ।—বৌধায়ন শ্রৌত-সূত্রম্, ৩০।২, published by the Asiatic society of Bengal, p, 392

(৪) মণ্ডলং চতুরস্রং চিকীর্ষন্বিষ্কম্ভমষ্টৌ ভাগান্ কৃত্বা ভাগমেকোন-ত্রিংশধা বিভজ্যাষ্টাবিংশতি ভাগানুদ্ধরেদ্ভাগস্য চ ষষ্ঠমষ্টমভাগোনমপি। Ibid p, 395

তাহার পরিমাণ হইতেছে বিযুক্ত-অংশের ৮ ভাগের এক ভাগ। এইরূপ ব্যবহারিক উপায়ে গণিত-ফল যতদূর সূক্ষ্ম করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা শুল্বসূত্রে পুনঃপুনঃ দেখা যায়।

বৃত্তক্ষেত্রকে চতুর্ভুজে পরিণত করিবার জন্য শুল্বসূত্রে আরও একটি সূত্র আছে। বৌধায়ন লিখিয়াছেন (৫)—"ব্যাসের ১৫ ভাগ হইতে ২ ভাগ হরণ করিলে যে ১৩ ভাগ অবশিষ্ট থাকিবে তাহাই সমচতুরস্রের বাহুর পরিমাণ।" এই সূত্র হইতে 'পাই'এর পরিমাণ ৩·০০৪ পাওয়া যায়। শুল্বসূত্র হইতে 'পাই'এর দুইটি পরিমাণ পাওয়া গেল, তাহার মধ্যে প্রথম ফলটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম। দ্বিতীয় ফলটি যে গণিত-লাঘবের জন্য স্থূলভাবে বিবৃত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহাই হউক—এই সূত্রগুলি কোন গণিতযুক্তিবলে নির্ণীত হইয়াছিল অনুমান ব্যতীত তাহা জানিবার অন্য উপায় নাই। তবে এগুলি যে আর্য্য ঋষিগণের গণিত-প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ উদ্ভূত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

শুল্বসূত্রের পর বহুদিন যাবৎ গণিত সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের পর ভারতবর্ষে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম বহুল-পরিমাণে শ্লথ হইয়াছিল। সেই জন্য ঐ সময়ে যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ-প্রণালীর কোন উন্নতি দেখা যায় না। আর্য্যভট ৪২১ শকে তাঁহার গ্রন্থ প্রচার করেন। সেই গ্রন্থে গণিত-প্রক্রিয়া যেরূপ পূর্ণাবয়বে প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে শুল্বসূত্রের পর ১৫০০ বৎসরের মধ্যে গণিতের যে কোন উন্নতি হয় নাই—তাহা মনে হয় না। ভারতীয় জ্যোতিষ-শাস্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ দৈব, আর্ষ ও মানব এই তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দৈবগ্রন্থ—পৈতামহ-সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতি—বহু প্রাচীন বলিয়া কথিত হইয়াছে। ডাঃ থিবো সাহেব পৈতামহসিদ্ধান্তকে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের ন্যায় প্রাচীন বলিয়া মনে করেন। বাশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, পোলিশ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি আর্ষ গ্রন্থগুলি দৈবগ্রন্থের পরে প্রচারিত হইয়াছিল। উভয়বিধ গ্রন্থের মধ্যে দৈবগ্রন্থসমূহ খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে এবং আর্ষ-গ্রন্থগুলি খৃষ্ট জন্মিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে রচিত হইয়াছিল—এইরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান আছে। সুতরাং শুল্বসূত্রের পরে খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে ভারতীয় গণিতে 'পাই'এর পরিমাণ কত স্থির হইয়াছিল দেখা যাউক। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর পুরাণান্তর্গত পিতামহসিদ্ধান্তে লিখিত হইয়াছে—"দশগুণিত কর্ণবর্গের মূল গ্রহণ করিলে গ্রহের কক্ষা-পরিমাণ পাওয়া যায়। এইরূপেই অন্য সকল বৃত্তের ব্যাস হইতে পরিধি আনয়ন করা যায়। (গ্রহগতি-সাধনাধ্যায়)। ইহা হইতে 'পাই'এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ পাওয়া যায়। লঘুবশিষ্ঠে ত্রিজ্যা-পরিমাণ ৩৪১৫ লিখিত হইয়াছে (৪২)। ত্রিজ্যার এই পরিমাণ হইতে গণনা করিলে 'পাই'এর মান ৩·১৬২৫ পাওয়া যায়। বৃদ্ধবশিষ্ঠসিদ্ধান্তে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে—"১৬০০ যোজন পৃথিবীর ব্যাস, তাহার বর্গকে ১০ গুণ করিয়া মূলগ্রহণ করিলে ৫০৬০ যোজন পৃথিবীর নিরক্ষদেশের পরিধি।"(৫২) ইহা হইতে 'পাই'এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ পাওয়া যায়। কিন্তু উহা পৃথিবীর পরিধি ও ব্যাসের পরিমাণ ধরিয়া গণনা করিলে—বৃদ্ধবাশিষ্ঠ হইতে প্রাপ্ত 'পাই'এর মান ৩·১৬২৫ পাওয়া যায়। সোমসিদ্ধান্তের প্রথম অধ্যায়ের ৫০ শ্লোক হইতে 'পাই'এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ পাওয়া যায়। পুনরায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে জ্যাগণিত হইতে ইহার মান $\frac{৩১৪১৬}{১০০০০}$ = ৩·১৪১৬ পাওয়া যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে 'পাই'-এর পরিমাণ কত দেওয়া হইয়াছে দেখা যাউক। পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধির বর্ণনা-প্রসঙ্গে সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত হইয়াছে,

"যোজনানি শতান্যষ্টৌ ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ॥" ১।৫৯

ইহাতেও 'পাই'-এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ পাওয়া যায়।

এখন দেখিতে পাইতেছি যে দৈব ও আর্ষ গ্রন্থসমূহে 'পাই'এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ লিখিত হইয়াছে। ভারতবাসি-গণের পূর্ব্বে অন্য কেহ এই পরিমাণের উল্লেখ করেন নাই। এই পরিমাণ কি প্রকারে পাওয়া গেল সে সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থসমূহে কোন যুক্তি প্রদর্শিত হয় নাই। এই পরিমাণ স্থূল। সূর্য্যসিদ্ধান্তের টীকাকারগণ ও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ এই পরিমাণ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়াছেন। রঙ্গনাথ (১৫২৫ শক) গূঢ়ার্থপ্রকাশিকা নামক সূর্য্য-সিদ্ধান্তের টীকায় লিখিয়াছেন—"ভগবান্ সূর্য্য গণিত লাঘবের জন্য এই স্থূল পরিমাণ গ্রহণ করিয়াছেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তেই

(৫) পঞ্চদশভাগান্ কৃত্বা দ্বাবুদ্ধরেৎ সৈষা নিত্যা চতুরস্রকরণী। Ibid p, 392.

এতদপেক্ষা সূক্ষ্ম অনুপাত দেখা যায়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ত্রিজ্যা-পরিমাণ ৩৪৩৮ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং বৃত্ত-পরিধি ২১৬০০ হইলে ব্যাস-পরিমাণ ৬৮৭৬ হইবে। ইহা হইতে 'পাই'এর বর্গ ষষ্ঠিতমিক (Sexagesimal) প্রক্রিয়াক্রমে ৯।৫২।১২ পাওয়া যায়। এই পরিমাণ ১০ হইতে অল্প পৃথক্ বলিয়া ভগবান্ সূর্য্য গণন সুবিধার জন্য 'পাই'-পরিমাণ $\sqrt{১০}$ই গ্রহণ করিয়াছেন।" অধুনাতনকালে সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় সূর্য্যসিদ্ধান্তের স্বকৃত টীকায় উক্ত শ্লোকের সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"তদ্বর্গতোঽ দশগুণাৎ ভূব্যাসস্য বর্গাদদশেতি" (৬) ভূব্যাসবর্গকে অ-দশ (কিঞ্চিন্ন্যূন দশ) দ্বারা গুণ করিয়া তাহার মূল গ্রহণ করিলে ভূপরিধি পাওয়া যায়।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে 'পাই'এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ গ্রহণ করিলে সূর্য্যসিদ্ধান্তে ২১৬০০ চক্রকলা পরিধিতে ত্রিজ্যার পরিমাণ কি প্রকারে ৩৪৩৮ হইতে পারে? দ্বিবেদী মহাশয়ের ব্যাখ্যা হইতে 'পাই'এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ হইতে কিঞ্চিৎ ন্যূন পাওয়া গেল। দশ-শব্দের পূর্ব্বে লুপ্ত-অকারের আগম করিয়া তিনি যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা অতীব সমীচীন এবং প্রশংসার্হ বটে, কিন্তু সূর্য্যসিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য যে-সকল গ্রন্থে 'পাই' এর পরিমাণ $\sqrt{১০}$ লিখিত রহিয়াছে সেই সকল গ্রন্থে ঐরূপ ব্যাখ্যার কোন সুবিধা নাই।

লৌকিক গ্রন্থসকলে 'পাই'এর পরিমাণ কিরূপ লিখিত হইয়াছে এখন দেখা যাউক। বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই গ্রন্থগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ আর্য্যভটীয়ে (৪২১ শক) লিখিত হইয়াছে—

"চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্ঠিস্তথা সহস্রাণাম্।
অযুতদ্বয়বিকম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ ॥১০

(গীতিকাপাদঃ)

এই শ্লোক হইতে 'পাই'-পরিমাণ $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$ = ৩.১৪১৬ পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে কেহই এই পরিমাণের উল্লেখ করেন নাই। গ্রীক্ পণ্ডিত আর্কিমিডিজের লিখিত $\frac{২২}{৭}$ বা আর্ষ ও দৈব গ্রন্থের $\sqrt{১০}$ হইতে আর্য্যভটের দত্ত ফল যে সূক্ষ্ম তাহা বলা বাহুল্য। আর্য্যভট স্বীয় ফল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে ইহা আসন্ন (approximate) মান। তাঁহার টীকাকার পরমেশ্বরাচার্য্য এই শ্লোকের টীকায় সিদ্ধান্তদীপিকা-নামক ভাস্করাচার্য্যের কোন টীকার উল্লেখ করিয়া জ্যাগণিত (trigonometry) সাহায্যে এই ফলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধান-যোগ্য। আর্য্যভটের শিষ্য লল্লাচার্য্য (প্রায় ৫০০ শক)'শিষ্যধীবৃদ্ধিদে' 'পাই'এর পরিমাণ [illegible] = ৩.১৪২৪৫ লিখিয়াছেন। আর্য্যভটের ফল ইহা হইতে সূক্ষ্ম হইলেও লল্লাচার্য্য তাহা গ্রহণ করেন নাই—অনেক স্থলেই তিনি স্বীয় আচার্য্যের মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় শ্রীধরাচার্য্য (৯১৩ শক) ত্রিশতিকাখ্য পাটীগণিতে 'পাই'এর পরিমাণ সূর্য্যসিদ্ধান্তের অনুরূপ $\sqrt{১০}$ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রাহ্মস্ফুট- সিদ্ধান্তে (৫৫০ শক) 'পাই'এর সূক্ষ্মমান সূর্য্যসিদ্ধান্তানুযায়ী $\sqrt{১০}$ এবং স্থূল পরিমাণ পুরাণোল্লিখিত ৩ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু তাহার জ্যাগণিত হইতে গণনা করিলে 'পাই' ৩.৩০২৭ পাওয়া যায়। এই তিনটি পরিমাণের একটিকেও সূক্ষ্ম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয় আর্য্যভটের রচিত মহাসিদ্ধান্তে (৯ম শতাব্দী শক) গ্রন্থে 'পাই'এর তিনটি পরিমাণ পাওয়া যায় $\sqrt{১০}$, $\frac{২২}{৭}$ এবং $\frac{২১৬০০}{৬৮৭৬}$ = ৩.১৪১৩৬...। অতঃপর গণিত-গগনের ভাস্কর-স্বরূপ ভাস্করাচার্য্য (১০৭২ শক) 'পাই'এর পরিমাণ যাহা লিখিয়াছেন তাহার আলোচনা করিয়া এই প্রস্তাবের সমাপ্তি করা যাইতেছে। ভাস্করাচার্য্য লীলাবতী নামক পাটীগণিত-গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"ব্যাসে ভনন্দাগ্নি ৩৯২৭ হতে বিভক্তে
খবাণ সূর্য্যৈঃ ১২৫০ পরিধিস্তু সূক্ষ্মঃ।
দ্বাবিংশতিঘ্নে বিহৃতেঽথশৈলৈঃ
স্থূলোঽথবা স্যাদ্ ব্যবহারযোগ্যঃ ॥৩১"

ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 'পাই'এর সূক্ষ্মমান $\frac{৩৯২৭}{১২৫০}$ = ৩.১৪১৬ এবং স্থূল পরিমাণ $\frac{২২}{৭}$। প্রথমটি আর্য্যভটের ফল হইতে অভিন্ন এবং দ্বিতীয়টি আর্কিমিদিজের ফলের তুল্য। ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্তশিরোমণির গোলাধ্যায় ও গণিতাধ্যায়ের মধ্যেও 'পাই'এর পরিমাণ-ফলের উল্লেখ করিয়াছেন এবং পূর্ব্বগ্রন্থকারগণের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছেন। তিনি গোলাধ্যায়ের ভুবনকোষের ৫২ শ্লোকের স্বকৃত বাসনাভাষ্যে লিখিয়াছেন—"মহদযুতাদি

(৬) সুধাকর দ্বিবেদি—সম্পাদিত এসিয়াটিক সোসাইটী-প্রকাশিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত—পৃঃ ৩৬।

বৃহৎ ব্যাসার্দ্ধ গ্রহণপূর্ব্বক বৃত্ত কল্পনা করিয়া জ্যোৎপত্তি (trigonometry)—বিধি দ্বারা পরিধির শতাংশ হইতেও সূক্ষ্ম জ্যা রচনা করিলে জ্যা-সংখ্যাগুলির পরিমাণফল পরিধির সমান হইবে। কারণ শতাংশ হইতে সূক্ষ্ম বৃত্তাংশ তাহার জ্যার সমান।" তিনি আরও বলিয়াছেন—"শ্রীধরাচার্য্য ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি 'পাই'এর পরিমাণ যে $\sqrt{১০}$ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা স্থূল হইলেও সুখার্থ অঙ্গীকৃত হইয়াছে; তাহারা যে সূক্ষ্ম পরিমাণ জানিতেন না তাহা নহে।" লীলাবতীর এক টীকাকার 'পাই'-পরিমাণের উপপত্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বৃত্তের মধ্যে সমবাহু ষড়্‌ভুজ অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত জ্যাগণিতের নির্দ্দিষ্ট-নিয়ম (formula) কখ $= \sqrt{২ - \sqrt{৪ - কগ^২}}$ সাহায্যে ক্রমান্বয়ে দ্বিগুণ বাহু-বিশিষ্ট বহুভুজ ক্ষেত্র উক্ত বৃত্তমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। এই নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কগ প্রথম বহুভুজের বাহু এবং কখ তাহার দ্বিগুণ বাহুবিশিষ্ট বহুভুজের বাহু। এই নিয়মে বৃত্তমধ্যে ৬×২^{১২} বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ ক্ষেত্র হইতে 'পাই' পরিমাণ $\frac{১৫৭০৭৯৬৩}{৫০০০০০০০} = ৩^\circ১৪১৫৯২৬$ পাওয়া যায়। পুনরায় আসন্ন-মান সাধনের নিয়ম দ্বারা 'পাই'এর ৩, $\frac{২২}{৭}$, $\frac{৩৩৩}{১০৬}$, $\frac{৩৫৫}{১১৩}$ প্রভৃতি আসন্নমানগুলি পাওয়া যাইবে। (রাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ সম্পাদিত লীলাবতী, পৃঃ ২৮৫) উপর্য্যুক্ত ফল সাত দশমিক স্থান পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম। অধুনাতনকালে 'পাই'এর অতি সূক্ষ্ম ফল নির্ণীত হইলেও ব্যবহার-ক্ষেত্রে আর্য্যভট অপেক্ষা সূক্ষ্ম ফলের ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। দুঃখের বিষয়, ভাস্করাচার্য্যের যুক্তি দর্শনের পর কমলাকর ভট্ট স্বীয় গ্রন্থে সূর্য্যসিদ্ধান্তের ফলকে 'সুসূক্ষ্ম' বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার যুক্তি সর্ব্বৈব আধারশূন্য।

ভারতবর্ষীয় গণিত ফল পৃথিবীর অন্যত্র নীত হইয়াছিল। ৮৩৩ খৃষ্টাব্দে আরবদেশীয় গাণিতিক মহম্মদ-বিন্-অল্-হাভারেজ্‌মি 'পাই'এর তিনটি মান দিয়াছেন—$৩\frac{১}{৭}$, $\sqrt{১০}$ এবং $\frac{৬২৮৩২}{২০০০০}$। শেষের দুইটি পরিমাণ ভারতীয় এবং আশ্চর্য্যের বিষয় যে তিনি আর্য্যভটের মান ভুলিয়া গিয়া অপেক্ষাকৃত স্থূল পরিমাণ ব্যবহার করিয়াছেন। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্যদেশে গণিত-যুক্তি দ্বারা 'পাই'এর গণনার চেষ্টা দেখা যায়। তাহার ফলে Ludolph von Ceulen ৩৫ দশমিক স্থান পর্য্যন্ত 'পাই' পরিমাণ গণনা করেন। তাহার পর M de Lagry ইহাকে ১২৭ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। পাশ্চাত্য দেশের এই ফলনির্ণয় বহু শ্রমসাধ্য হইলেও ভারতের আর্য্যভট এই গণিত প্রচেষ্টার অগ্রদূতরূপে সকলের পূজার্হ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যখন পাশ্চাত্য জগতে গণিতশাস্ত্র মুকুলিত হইতেছে মাত্র, তখন ভারতের ভাস্করাচার্য্যের সুচিন্তিত বিশুদ্ধ গণিত-পদ্ধতি দর্শন করিলে চমকিত হইতে হয়।

পদ্মা

সমুদ্রগুপ্ত

কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, কিন্তু মেঘভারাবনত 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' নবযৌবনের যে প্রস্ফুট সঙ্গীত নদীর সারা গায়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাহার মধুর রেশটুকু আজও মিলাইয়া যায় নাই। পাশ্চাত্যদেশে যৌবনের শেষ-সীমারেখায় উপনীতা নারী যেমন প্রসাধনের সাহায্য নেয়, আমাদের চির-পরিচিতা পদ্মাও তেমনই বারবার নিজের বিগতপ্রায় সাবলীল মুখরতা ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথের মত আমারও পদ্মা বহুদিনের প্রিয়সাথী। আমাদের গ্রামের বাড়ীটি পদ্মার তীরে নয়, কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে যে আমার শৈশবের স্বপ্ন-কণ্টকিত রাত্রিগুলি পদ্মার রোমান্সে ভরিয়া যাইত। সে দিনের প্রতি ফিরিয়া তাকাইলে পদ্মার যে মূর্ত্তি আমার মনে পড়ে তাহা ধ্বংসের রক্তরেখায় দীপ্ত।

কলিকাতার হিসাবে যখন সন্ধ্যা এবং পল্লীগ্রামের হিসাবে যখন রাত্রি—সেই পরমরহস্যময় সময়টিতে আহারাদি সমাপন করিয়া আমরা ভাইবোন কয়টি মিলিয়া শুইয়া

আছি। ছোট একখানা টিনের ঘর, খাটের অভাবে মেঝেতে ঢালা বিছানা করা হইয়াছে। রেড়ির তৈলের বাতির পরিবর্ত্তে নিউইয়র্কের তৈয়ারী হেরিকেন্ লণ্ঠন জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহার মৃতপ্রায় শিখাটি অন্ধকার দূর না করিয়া তাহা আরও গাঢ় করিয়াছে কিনা বলা যায় না। মা রান্নাঘরের কাজ শেষ করিয়া তখনও বড় ঘরে আসিতে পারেন নাই। ঠাকুরমা মালা জপ করিবার ফাঁকে ফাঁকে আমাদের ক্রম-বর্দ্ধমান কলহের মীমাংসা করিতেছেন। বাহিরে ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে এবং তাহার বিচিত্র ধ্বনি টিনের চালে এবং বাঁশের ঝাড়ে প্রতিহত হইয়া আমাদের নিতান্ত সঙ্কীর্ণ পৃথিবীর ক্ষুদ্র কোলাহল ডুবাইয়া দিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতেছে।

এমনই সময়ে আমাদের সেই অতি ক্ষুদ্র রঙ্গমঞ্চে বর্ণচ্ছটাহীন দৃশ্যপটে পরিবেষ্টিত হইয়া উন্মাদিনী পদ্মার প্রবেশ। আমরা অধিকাংশ সময়েই চোখ বুজিয়া থাকিতাম, কিন্তু তাহাতে দৃষ্টির ব্যাঘাত হইত না। গদাহস্তে ভীমের মত পদ্মার ভৈরব মূর্ত্তি আমাদের চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং তাহার প্রতি পদক্ষেপে ও হুঙ্কারে আমার ভয়াতুর দেহটি বারবার কাঁপিয়া উঠিত। বৃষ্টির সুরের সাথে পদ্মার কল্লোলের মিলন হইত……যেন দৈত্যনিধনরত দেবরাজের সাথে অনন্তযৌবনা উর্ব্বশীর নিবিড় আলিঙ্গন!

একদিন কথক ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছিলাম, শত্রুরূপে ভগবানের সাধনা করিয়া রাবণ নাকি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব্বজন্মের অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ঠাকুরমার ধরণ অনেকটা সেইরকম ছিল। পদ্মার চেয়ে বড় শত্রুর কল্পনা করা বোধ হয় তাঁহার অসাধ্য ছিল—কেন না বহুকাল পূর্ব্বে একদা পদ্মার দুর্নিবার আকর্ষণে তাঁহার শ্বশুরের চৌদ্দ পুরুষের ভিটা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। সেই মুহূর্ত্তে পদ্মার বিরুদ্ধে এমন একটা অসহায় হিংস্রতায় তাঁহার মন ভরিয়া গিয়াছিল যে দিনের মধ্যে সহস্রবার তিনি নানাছলে সেই প্রসঙ্গটি উত্থাপন না করিয়া পারিতেন না।

সেই নিরলঙ্কার ধ্বংসের কাহিনীটি ঠাকুরমার মুখে কতবার যে শুনিয়াছি তাহার সংখ্যা করা কঠিন; কিন্তু তবু এখনও আমার মনে হয় যেন তাহার অনেকখানিই অকথিত রহিয়া গিয়াছে।

শ্রাবণ মাস। পদ্মার দুরন্ত গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক মুখরিত হইতেছে। একদিন সকালে পূজার ফুল তুলিবার সময় দেখা গেল, আমাদের নবাবী আমলের জীর্ণ দালানটি ঘিরিয়া মাটিতে ফাটল-রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরমার পুষ্পচয়ন এবং দাদামহাশয়ের তাম্রকূটসেবন বন্ধ হইয়া গেল এবং সমবেত প্রতিবাসীদের সহানুভূতিমূলক উচ্ছ্বাসের মধ্যে মজ্জমান ভদ্রাসনের ধ্বংসাবশেষ রক্ষার প্রয়াস চলিতে লাগিল। বেলা বাড়িতে লাগিল এবং সূর্য্যের প্রখরতার সঙ্গে সঙ্গে পদ্মার ক্ষুধাও তীব্রতর হইয়া উঠিল। পুরোহিত-বাড়ীর দক্ষিণে বিরাট মাঠ তখন বর্ষার প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে। সেই জলরাশির আলিঙ্গনের মধ্যে কম্পমান ধান্যশীর্ষে দিবসের শেষ রক্ত-রশ্মি যখন মিলাইয়া গেল তখন নবাবী আমলের ইট কয়খানার চিহ্নমাত্রও আর পাওয়া গেল না।

জিনিষপত্র সব নৌকায় বোঝাই করিয়া স্বামী-স্ত্রী চৌদ্দ-পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া চলিয়াছেন। সেদিন খড়ের রান্না-ঘরটি এবং গোময়লিপ্ত তুলসীতলার পানে চাহিয়া ঠাকুরমার দুইটি চোখে যে অশ্রু জমিয়া উঠিয়াছিল—অর্দ্ধ শতাব্দীর ব্যবধানেও তাহা লুপ্ত হয় নাই।

সেই রাক্ষসী পদ্মার বুকের উপর দিয়া হেমন্তের সন্ধ্যায় দিগ্বিজয়ী ইংরাজের জাহাজ ছুটিয়া চলিয়াছে। তিথিটা কি তাহা মনে পড়িতেছে না, কিন্তু জ্যোৎস্নার রূপালি ছটা সত্যই এত তীব্র যে বাঙ্গালার পদ্মার চেয়ে উত্তর-ভারতের যমুনার বুকেই যেন তাহা বেশী মানায়। দক্ষিণে ও বামে দুই দিকেই ঘনতরুরাজিসমাচ্ছন্ন গ্রামের সারি। আমি যদি কবি হইতাম তবে পদ্মাকে দুগ্ধফেননিভ মস্‌লিন-শাড়ীর সাথে তুলনা করিতাম এবং বলিতাম যে জরির কাজ করা প্রশস্ত দুইটি পাড় অপূর্ব্ব বর্ণচ্ছটায় রঞ্জিত হইয়া সেই অমলিন শুভ্রতাকে আরও বেশী মনোরম করিয়াছে।

পরীক্ষার পালা শেষ করিয়া সম্প্রতি বেকার-জীবনের নিয়মিত নৈরাশ্য উপভোগ করিতেছিলাম, কাজেই কাব্যলোক অপেক্ষা কর্ম্মজগতের প্রতি বেশী দৃষ্টিনিক্ষেপ করাই আমার পক্ষে স্বাভাবিক। পূজার ছুটির মাঝখানে কলিকাতা হইতে ফিরিতেছি—জাহাজে বেশী ভিড় নাই—অর্থাৎ সতর্কভাবে চেষ্টা করিলে বসিবার জায়গা মিলিতে পারে। জাহাজের দোতালায় একটা কোণে একখানা সতরঞ্চির

উপরে আধময়লা চাদরখানা বিছাইয়া লইয়াছি এবং আমার দখলীস্বত্বটুকু যাহাতে সহজে অর্থাৎ একপশলা ঝগড়া ছাড়া অপরের আক্রমণে ক্ষীণতর না হয় সেজন্য এই সযত্ন-রচিত শয্যাটির দুইপাশে সুটকেশ দুইটি স্থাপন করিয়া দুর্ভেদ্য প্রাচীরের গোড়াপত্তন করিয়াছি। বিছানার অপর দুইটি দিক বেশ সুরক্ষিত—একদিকে জাহাজের রেলিং এবং আর একদিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের দেওয়াল। অতএব আপাততঃ স্থানচ্যুতির ভয় নাই জানিয়া পরম নিশ্চিন্তভাবে নিকটস্থ ষ্টল্ হইতে এক পাত্র 'হিন্দু চা' আনাইয়া লইলাম।

কি জানি কেন—জাহাজে উঠিয়া বসিলেই আমার মন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। দুরন্ত জলরাশির কম্পমান বুকের উপর দিয়া নিতান্ত নৃশংস উল্লাসে জাহাজ চলিতে থাকে, আর সেই গতিস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত আলস্যে আমি ঝিমাইতে আরম্ভ করি। ষ্টেসনের পর ষ্টেসন চলিয়া যায়, যাত্রীদের বিচিত্র কলরোল আকাশ মুখর করিয়া তোলে।

হঠাৎ একবার চোখ মেলিয়া দেখিতে পাইলাম, একটি ভদ্রলোক নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন —আর তাঁহার সঙ্গিনী জাহাজের রেলিং-এ ঠেস দিয়া হয়তো বা পদ্মার সাথে সখিত্ব করিবার চেষ্টা করিতেছেন। দৃশ্যটা অসাধারণ নয়, তাই সেদিকে মনোযোগ না দিয়া আমি আবার তন্দ্রাভিভূত হইবার উদ্যোগ করিতেছি—এমন সময় সেই ভদ্রলোকটি আমাকে লক্ষ্য করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ?

নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে গন্তব্য স্থানের নামটি বলিয়া ফেলিলাম। ভদ্রলোক একটু হাসিমুখে আবার বলিলেন, আমরাও তো সেদিকেই যাচ্ছি। আপনার একটা ষ্টেসন আগে আমরা নাম্‌ব।

আমি বলিলাম, বেশ। ভদ্রলোক হয়তো আশা করিয়াছিলেন যে আমি তাঁহার (অথবা তাঁহাদের) সঙ্গলাভের আশায় পরম উৎফুল্ল হইয়া উঠিব এবং তাঁহাকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাশে বসাইব। কিন্তু আই. জি. এন্. ও আর. এস্. এন্. কোম্পানীর জাহাজে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমি—সহৃদয়তা দেখাইয়া খাল কাটিয়া কুমীর আনা যে মোটেই সঙ্গত নয় তাহা আমার বুঝিতে বাকী নাই।

ভদ্রলোক হয়তো বন্ধুত্ব করিবার জন্য আর একটু চেষ্টা করিতেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার সঙ্গিনী আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে যাইতে ইঙ্গিত করিল।

যদি বলি যে অকস্মাৎ আমি মুগ্ধ হইলাম, যদি বলি যে আমার প্রতি স্নায়ুতে পদ্মার জোয়ার দাপাদাপি করিতে লাগিল, তবে আপনারা সেকথা বিশ্বাস করিবেন না। আপনারা মনে করিবেন যে আমি কবি—নতুবা গুণ্ডা। কিন্তু একথা সত্য যে আমি কবিও নই এবং গুণ্ডাও নই— নিতান্তই অসহায় বেকার মাত্র।

মেয়েটি রূপসী নয়। তাহার কটিতট ক্ষীণ নয়, তাহার চোখ ত্রস্ত হরিণনেত্রের মত নয়, তাহার নাসা তিলফুল পরাজিত করিতে পারে না। বাঙ্গালীর বিচারে যাহা সৌন্দর্য্যের প্রধানতম মাপকাঠি—গায়ের রঙ্—তাহাও উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছাড়া আর কিছু নয়।

মেয়েটি দীপ্তিমতী। তাহার মুখের দিকে তাকাইলে আপনাদের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যাইত। তাহার সর্ব্বাঙ্গে যেন আগুনের ফুল্‌কি ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এ আগুন রূপের নয়। এ আগুন কিসের তা জানি না, তবে এ আগুনে যে আমার মত আপনারাও পুড়িয়া যাইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরস্ত্রীর রূপবর্ণনা করিতেছি বলিয়া দোষ লইবেন না। মেয়েটি মেয়ে—স্ত্রী নয়। ওর সিঁথিতে রক্তরেখা নাই। যদি থাকিত তবে হয়তো ওর দেহের তাপ আরও কমিয়া যাইত।

কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, হে কানু—তুমি শৈশব ও যৌবনের তফাৎ বুঝিতে পার না। বৈষ্ণব মহাজনগণের মত তীক্ষ্ণ রসদৃষ্টি আমাদের নাই, কিন্তু আমার এই অপরিচিতা অতিথির বয়ঃসন্ধির লক্ষণ বিশ্লেষণ করা সত্যই কঠিন। চঞ্চল দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত কটাক্ষে পরিণত হইতেছে সন্দেহ নাই, অবাধ্য অঞ্চল আন্দোলিতা লতার মত জাহাজের কঠিন রেলিং জড়াইয়া ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে, বাহিরের ঝাপ্‌টা বাতাস মনের কোণে কোণে থরথর করিতেছে—তবু যেন এই মেয়েটি আপনার মুকুলিত-প্রায় যৌবনের স্পন্দন মোটেই অনুভব করিতে পারিতেছে না।

আপনারা মনে করিবেন না যে আমি নির্লজ্জভাবে মেয়েটির দিকে তাকাইয়াছিলাম। ওর দিকে একবার

মাত্র দৃষ্টিপাত করিলেই ওকে বুঝিতে পারা যায়। মেয়েটি পদ্মার মত স্বচ্ছ ও গভীর। মেয়েটি পদ্মার মতই দর্শককে ক্রমাগত আকর্ষণ করে।

ভদ্রলোকটি মেয়েটির সঙ্গে যে-সব কথাবার্ত্তা বলিতে-ছিলেন তাহার কিছু কিছু আমার কানে পৌছিতেছিল। নিতান্তই সাধারণ কথাবার্ত্তা।

একটু পরে আমার দিকে ফিরিয়া ভদ্রলোকটি বলিলেন, দেখুন আপনাকে একটু বিরক্ত করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নেই। যদি কিছু মনে না করেন--

নির্ভয়ে বলুন—

আমার কথার ভঙ্গীতে মেয়েটি হাসিয়া ফেলিল। পদ্মার সাদা ঢেউগুলি যেমন জাহাজের চাকার আঘাতে ফাটিয়া থান্ থান্ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ঠিক তেমনিভাবে সেই দীপ্তিমতী মেয়েটির স্বচ্ছ শুভ্র হাসির টুকরাগুলি জাহাজের ডেকে এবং পদ্মার বুকে এবং নীল আকাশে বিচ্ছুরিত হইল।

ভদ্রলোকটি যাহা বলিলেন তাহার সার মর্ম্ম এই যে তাঁহারা পশ্চিম-বঙ্গের লোক, এদিকে আর কখনও আসেন নাই, অতএব আমার সাহায্য পাইলে তাঁহাদের খুব সুবিধা হইবে। তাঁহার নিজের নাম সত্যবাবু, মেয়েটি তাঁহার শ্যালিকা—নাম উষা—গোখেল স্কুলে পড়ে।

অতএব হিন্দুধর্ম্ম অনুসারে আশ্রিতরক্ষণ করিতে হইল।

সন্ধ্যার আর বাকী নাই। চলন্ত জাহাজের সর্ব্বাঙ্গে আলোর মালা ঝল্‌সিয়া উঠিতেছে, আর দুরন্ত নদীর বুক চিরিয়া সেই আলোর রশ্মি ইতস্ততঃ দুলিতেছে। রাত্রির ছায়ায় দেহ যেমন অবসন্ন হইয়া পড়ে, জাহাজের গতিও যেন তেমনই ক্রমশঃ মন্থর হইতেছে।

ইতিমধ্যে সত্যবাবুর সহিত আমার আলাপ বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। সত্যবাবু সেই শ্রেণীর মানুষ—যাহারা অপরিচিত ব্যক্তির সম্মুখে যাইতে সঙ্কুচিত হয় অথচ পরিচয়ের সূচনাতেই পরম আত্মীয়ের মত নিবিড় বন্ধনে জড়াইয়া পড়ে। এমন লোক আমার বড় ভাল লাগে। ইহাদের কথার গতি মেঘাচ্ছন্ন দিনের সূর্য্যালোকের মত—প্রথম প্রকাশে বিলম্ব ঘটে, কিন্তু পরে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া যায়।

উষা বাবার কাছে যাইতেছে। বাবা সরকারী চাকরির পঞ্চম অঙ্কে উপনীত হইয়া সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের কোন একটা ছোট সহরে প্রেরিত হইয়াছেন। উষা ছুটিতে তাঁহার কাছে যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে উষার দিদিও বাবার কাছে আছেন।

সত্যবাবুর কথার ফাঁকে ফাঁকে উষার দিদি আমার মনের দরজায় হাজিরা দিতেছেন। আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি একটি সন্তানভারাবনতা নবীনা গৃহিণী। বয়স তাঁর কত হইয়াছে জানি না, কিন্তু মন সংসারনাট্যশালার রঙ্গমঞ্চে নিতান্ত সহজভাবেই চলাফেরা করিতেছে। আমাদের এই নিতান্ত নিরীহ সত্যবাবুর জলখাবার তৈয়ার করিতে তাঁর কখনও ভুল হয় না। সিঁথিতে রক্তরেখা টানিয়া দিতে তাঁর আলস্য নাই, কিন্তু বেণীটি রচনা করিয়া সন্ধ্যার বিপুল সমারোহে আত্মসমর্পণ করিবার সময় তাঁর কোথায়?

আমাদের কথার মাঝখানে মূর্ত্তিমান্ বিঘ্নের মত ছুটিয়া আসিয়া উষা কহিল—জামাইবাবু, দেখুন বৃষ্টি হচ্ছে।

বছরের এই সময়টাতে বৃষ্টি হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়, তবু যেন বৃষ্টির সিক্তধারার জন্য আমার মনটি মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সত্যবাবুর কথা শুনিতে শুনিতে আমি মনে মনে যে জগতের ছবি আঁকিতেছিলাম তাহার সমস্ত মহিমা একটি নারীকে কেন্দ্রীভূত করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল —কিন্তু সেই সুস্নিগ্ধ শিল্পলোকে ভিজা হাওয়ার স্থান কোথায়? তাই হঠাৎ চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম, সত্যই বৃষ্টি হইতেছে এবং বৃষ্টির গা ঘেঁষিয়া সঞ্চারিণী বিদ্যুৎরেখার মত উষা দাঁড়াইয়া আছে।

সত্যবাবু তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন এবং বৃষ্টিপাত সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন—তাই তো, এখন কি হবে?

হাসিয়া জবাব দিলাম—ভয় নেই সত্যবাবু। পদ্মা রাক্ষসী বটে, কিন্তু সে সুন্দরী। আপনার মত সজ্জনের বিপদ ঘটাবার ইচ্ছা তার নেই।

কবিতা বিলাসের সামগ্রী, প্রয়োজনের বাজারে তার দাম নাই। জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর ডেস্‌প্যাচ-ক্লার্ক সত্যবাবু পদ্মার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু একটি সামান্য ইঙ্গিতে পদ্মা যে তাঁহাকে উষার দিদির নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারে—এই কথাটি তাঁহার মনে

বোধ হয় সদা জাগ্রত ছিল। ভদ্রলোক অকস্মাৎ এত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন যে উষা বলিল—আপনি করেন কি বলুন তো? জাহাজটা কি সত্যি ডুবে যাচ্ছে নাকি? এত লোক তো রয়েছে, তারা তো আপনার মত life-belt পরবার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে না।

শ্যালিকার তাড়া খাইয়া সত্যবাবু দমিয়া গেলেন। বলিলেন—না, life-belt পরতে যাব কেন, তবে কি না—

আমি বলিলাম—এর মধ্যে 'তবে' নেই সত্যবাবু। আপনার প্রাণের ভয় কিছুমাত্র নেই। আপনি অনায়াসে নিশ্চিন্তভাবে গল্প করতে পারেন। যদি বলেন তো এক বাটি চা এনে দিতে পারি।

উষা আমার দিকে তাকাইয়া একটু তীক্ষ্ণভাবে কহিল—বেশ তো, তাই দিন না।

মনে করুন যেন সেই জ্যোৎস্নাস্নাতা সুন্দরী রজনী ক্রমে ক্রমে মেঘের সমুদ্রে ডুবিয়া গেল, যেন ধীরে ধীরে চঞ্চল বায়ু দুর্দ্দান্ত ঝটিকায় পরিণত হইল, যেন অতি ক্ষীণ চন্দ্রালোকে বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসলীলার মাঝখানে একটি যুবক ও একটি কিশোরী পদ্মার অশান্ত বুকে ভাসিয়া চলিল।

—কিন্তু যাহা মনে করা যায় তাহা কি কখনও ঘটে?

জাহাজ চলিতেছে। রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইয়া উঠিয়াছে। যাত্রীদের কোলাহল মন্দীভূত হইয়াছে। বৃষ্টি থামিয়া গিয়া সমস্ত আকাশ তারায় ভরিয়া গিয়াছে। যেদিকে চাহিবে কেবল তারা। আকাশের নীলিমাকে টুকরা টুকরা করিয়া তারার মালা ফুটিয়াছে, তরুর যৌবন মথিত করিয়া যেমন ফুল ফোটে।

সত্যবাবুর প্রাণের ভয় ঘুচিবামাত্রই তাঁর শ্রান্ত চোখে ঘুমের আবেশ লাগিয়াছে। ট্রেণে ও জাহাজে যে তৃতীয়-শ্রেণীর যাত্রী ঘুমাইতে চায় তার নানারকম ওস্তাদী থাকা চাই—সাময়িক প্রতিবাসীর সহিত তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইবে এবং স্বল্পপরিসর স্থানে দেহটিকে কিভাবে প্রসারিত করা যায় সেই কৌশল জানিতে হইবে। এই সকল গুণের কোনটিই সত্যবাবুর ছিল না, তবু তিনি যে নিতান্ত নিশ্চিন্ত-ভাবে ঘুমাইতে পারিলেন তাহা কেবল আমার দক্ষতায়।

উষার চোখে ঘুম ছিল না। এই রহস্যময় নূতন জগতের সহিত নিবিড় পরিচয় লাভ করিবার উৎসাহে তাহার বিনিদ্র দেহটি নাচিয়া উঠিতেছিল। কথার পর কথা বলিয়া যাইতেছে, তার সুরের ঢেউ কাঁপিয়া কাঁপিয়া বিনিদ্রা পদ্মার তরঙ্গে আঘাত করিতেছে, তার প্রস্ফুট দেহের জ্যোতিঃ আকাশের তারার সাথে মিশিতেছে। সে যেন পদ্মার মতই আমার চির-পরিচিতা।

—আচ্ছা, নগেনবাবু—আপনার নাম তো নগেনবাবু, না?

—প্রতিবাদ করিয়া জানাইলাম যে আমার নাম অমিয়।

—তা' বেশ, না হয় অমিয়বাবুই হল। জানেন, আমি আগে যে ইস্কুলে পড়তাম সেখানে নগেনবাবু নামে এক পণ্ডিতমশাই ছিলেন, শব্দরূপ লিখতে একটা ভুল হলে তাঁর কাছে ভয়ানক বকুনি খেতে হত।

—ভুল হত কেন?

—বাঃ রে, ভুল হবে না মোটে? অত অনুস্বার-বিসর্গ—কে মনে রাখতে পারে? পারেন আপনি? বলুন দেখি, সুধী শব্দের চতুর্থীর দ্বিবচনে কি হবে?

গম্ভীরভাবে বলিলাম, ও তো ভয়ানক সোজা; আমার মামাত ভাই নরু পর্য্যন্ত বলতে পারে—যে নরু তিন বারের চেষ্টায় এবার ফোর্থ ক্লাস থেকে থার্ড ক্লাসে উঠেছে। বলিয়া যেন নিতান্ত অবজ্ঞাভরেই হাসিয়া উঠিলাম। জ্যোৎস্না-প্লাবিতা পদ্মার বুকে ফুটন্ত কিশোরীর সাথে এমন প্রেমালাপ আপনারা কেহ করিয়াছেন কি?

নরুর কীর্ত্তিকাহিনী শুনিয়া উষা যেন একটু দমিয়া গেল, তবু কহিল—তা' যেন হল, কিন্তু ধাতুরূপ লেখা যে শক্ত—

বাধা দিয়া কহিলাম—ছেলেবেলায় আমার ধাতুকোষ বইখানাই একেবারে মুখস্থ ছিল যে।

এবার উষা সত্যই দমিয়া গেল; যেন একটু অভিমানের ভাণ করিয়া কহিল—আপনারা সবাই বড় বড় বিদ্বান্ লোক, সব আপনাদের মুখস্থ থাকে। আচ্ছা, পদ্মা নদী কত মাইল লম্বা জানেন?

স্বীকার করিলাম—জানি না।

উষা বলিয়া উঠিল, দেখুন তো, আপনাদের বাড়ীর পাশে এত বড় নদী—অথচ ওর সম্বন্ধে আপনারা কিছুই জানেন না।

সত্যই তো, যে আমার পাশে থাকে তার সম্বন্ধে আমি

কি-ই বা জানি! এই যে ঝরণার মত মেয়েটি ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে তার মনের খোঁজ আমি কতটুকু রাখি?

গল্পটি এই পর্য্যন্ত লিখিয়া কি ভাবে উপসংহার করিব ভাবিতেছি এমন সময় কক্ষমধ্যে গৃহিণীর আবির্ভাব হইল। আমার সাহিত্যচর্চ্চার প্রতি গৃহিণীর অসীম অনুরাগ, যদিও আমার কৃতিত্বের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা নিতান্তই কম। কাগজখানা টানিয়া লইয়া একবার তিনি কি দেখিলেন, তারপর ভ্রুকুটিকুটিল ভঙ্গীতে বলিলেন, প্লট্ যদি তৈয়ার করতে না জান—তবে গল্প লিখ্‌তে যাও কেন?

নিরুপায়ভাবে বলিলাম—কেন, প্লট্‌টা মন্দ কি?

—প্লট্ না ছাই। আমি আবার পদ্মার মত রূপসী ছিলাম কবে?

সাহস পাইয়া হাসিয়া বলিলাম, যেদিন সত্যবাবুর সাথে আমার দেখা হল।

সুন্দরী পদ্মার যৌবন-চঞ্চল তরঙ্গ আমার বুকে আছড়াইয়া পড়িল।

অকাল—বৈশাখী

শ্রীরামেন্দু দত্ত

অকালে নেমেছে ধরণীর বুকে
করাল—বৈশাখী!
ফুলবনে আজ ফাল্গুন রাতে
সভয়ে রই জাগি'!
এই ত আকাশে উঠেছিল চাঁদ,
জ্যোস্নার জালে পেতে রূপ-ফাঁদ,
সে গেল লুকায়ে,—উদ্বাহু বন
তাই কি বৈরাগী?

কোকিলের কুহু যায় নি মিলায়ে
এখনো ফুল-বাগে,
ঝঞ্ঝায় উড়ে গুলের পাপ্‌ড়ি
এখনো গায় লাগে!
নেশায় এখনো ঝিমায় নয়ন—
নীলাকাশ তলে পাতিনু শয়ন,

ঘুম ভেঙে দেখি আঁধার ভুবনে
সবাই রাত-জাগে!

মেঘ উড়িতেছে উন্মাদ সম
ধূসর অম্বরে!
বিজলী ঝলসে, বজ্র উলসে
কাঁপায়ে অন্তরে!
পাখীরা কোথায় গিয়াছে পলায়ে,
লতিকা লুটায় বৃক্ষের পায়ে,
ফুল পাতা যত, ঝড়ের হাওয়ায়
সবেগে সন্তরে!

মধুঋতু আজো লয়নি বিদায়
নেমেছে বৈশাখী!
কখন কি হয় ভবনে, ভুবনে,
সভয়ে রই জাগি'।
অশ্রু ঝরিছে ফোঁটায়, ফোঁটায়,
ত্রস্ত ধরণী চরণে লোটায়!
হাসে খল্ খল্ পিঙ্গল-জট
কোপন বৈরাগী!
আসে উচ্ছল প্রলয়েশ নট
করাল বৈশাখী!

পাশ্চাত্যমতে বেদের আলোচনা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ

আমাদের দেশের ইংরাজিশিক্ষিত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ বেদ সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থ হইতে। কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তমত পোষণ করেন। কারণ বেদ বড় দুরূহ গ্রন্থ এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ হিন্দুদের সাধনা এবং রীতিনীতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বহু পরিমাণে অজ্ঞ। দুঃখের বিষয় এই যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রমগুলি ইংরাজিশিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে বিস্তার লাভ করিতেছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদ সম্বন্ধে কিরূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচার করেন তাহাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডাক্তার উইণ্টারনিজ্ (Dr Winternitz) এর কয়েকটি মত আলোচনা করিব। এই সকল মত যে কেবলমাত্র ডাক্তার উইণ্টারনিজই পোষণ করেন তাহা নহে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতই এতদনুরূপ মত প্রচার করিয়াছেন। যে সকল পাশ্চাত্যপ্রথায় শিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিত বেদ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাও সাধারণতঃ এই সকল মত গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ডাক্তার উইণ্টারনিজের মতগুলি আলোচনা করিবার কারণ এই যে, অধুনা সংস্কৃত বিদ্যায় পণ্ডিত পাশ্চাত্য মনীষিগণের মধ্যে ডাক্তার উইণ্টারনিজ একজন অগ্রণী। তাঁহার প্রণীত জার্মাণ ভাষায় লিখিত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (History of Sanskrit Literature) বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে এবং পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বেদের ধর্ম্মকে polytheism বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন * অর্থাৎ তাঁহার মতে বেদের ধর্মে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা নাই। কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ ভুল। সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা বেদে বহু স্থানে আছে। এই কথা একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন।

* History of Sanskrit Literature ৭৬ পৃষ্ঠা

প্রথমতঃ বিচার করা প্রয়োজন, বেদ কাহাকে বলে? মহর্ষি আপস্তম্ব তাঁহার যজ্ঞসূত্রপরিভাষা নামক গ্রন্থে বেদের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই সর্ববাদিসম্মত। সে সংজ্ঞা এই—মন্ত্র ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ং অর্থাৎ মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের নাম বেদ। বিখ্যাত দশ উপনিষদের মধ্যে অধিকাংশ উপনিষদই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। একটি উপনিষদ্ (ঈশোপনিষদ্) মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং দশটি উপনিষদ্ই যে বেদের অন্তর্গত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সকল উপনিষদ এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথায় পরিপূর্ণ। ডাক্তার উইণ্টারনিজও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে উপনিষদ বাদ দিয়া বেদের অবশিষ্ট অংশে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা নাই। কিন্তু ইহাও ভুল। উপনিষদ ব্যতীত ও বেদের বহুস্থলে সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কথা আছে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ঋগ্বেদকেই বেদের প্রাচীনতম অংশ বলিয়া মনে করেন। আমরা ঋগ্বেদ হইতে কয়েকটি মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠক দেখিবেন ইহাতে একেশ্বরবাদতত্ত্ব কিরূপ পরিস্ফুট।

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি

ইন্দ্রং যমং মাতরিশ্বানম্ আহুঃ—ঋগ্বেদ সংহিতা ২।৩।৩২

"ব্রাহ্মণগণ সেই এক তত্ত্বকে বহুপ্রকার নাম দিয়াছেন; ইন্দ্র, যম, মাতরিশ্বা (বায়ু) এই সকল নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন।"

হিরণ্যগর্ভসূক্ত (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০-১২১) হইতে নিম্ন-লিখিত পংক্তিগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ

"দেবগণ যে ঈশ্বরের আদেশ পালন করেন।"

মহিত্বা এক ইদ্ রাজা জগতো বভুব

"তিনি নিজ মহিমায় জগতের রাজা হইলেন।"

যো দেবেষু অধি এক দেব আসীৎ

"যিনি সকল দেবতার উপরে এক দেবতা ছিলেন।"

পুরুষসূক্তে (ঋগ্বেদ সংহিতা ১০-৯০) উক্ত হইয়াছে—

পুরুষ এব ইদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যৎ চ ভব্যং

"যাহা কিছু হইয়াছে যাহা কিছু হইবে, এই সবই পুরুষ (ঈশ্বর)"

ঋগ্বেদের আরও অনেকস্থলে ঈশ্বরের কথা আছে। যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদেও সে কথা বহু স্থলে আছে। সুতরাং উপনিষদ বাদ দিয়াও বেদের অপর অংশে ঈশ্বরের কথা নাই, ইহা সম্পূর্ণ ভুল।

অতএব ডাক্তার উইণ্টারনিজের এই যে মত—বেদে ঈশ্বরের কথা নাই—ইহা সমর্থন করিতে হইলে কেবলমাত্র উপনিষদগুলি বাদ দিলে চলিবে না, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের সর্বত্র যেখানে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আছে (বহুসংখ্যক স্থানেই ইহা আছে) সে সকল অংশই বাদ দিতে হইবে। ইহা কেমন বিচার পদ্ধতি? যেমন একজন বলিলেন—"সকল গাভীর বর্ণই শ্বেত" এবং তাঁহার মত সমর্থন করিবার জন্য লাল ও কাল বর্ণের যত গাভী আছে, সেগুলি সব বাদ দিতে বলিলেন।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ (এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের অনুসরণকারী ইংরাজীশিক্ষিত ভারতীয় পণ্ডিতগণ) বেদকে যে ঈশ্বরবাদহীন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহার কারণ এই যে বেদে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি অনেক দেবের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোনও রাজ্যে যদি কতকগুলি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ থাকেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত করা যায় না—সে দেশে রাজা নাই। বেদে ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার উল্লেখ আছে সত্য; ইহাও উল্লেখ আছে যে এই সকল দেবতার পূজা করিলে নানাবিধ অভীষ্ট লাভ হয়। কিন্তু তাহা হইতে ইহা কিরূপে সিদ্ধান্ত করা যায় যে এই সকল দেবতার অধীশ্বর এক সর্বশক্তিমান পুরুষ নাই? বিশেষতঃ বেদে যখন বহুস্থানেই এরূপ সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কথা আছে। এই সকল পণ্ডিত স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরিয়া লইয়াছেন যে কেহ যদি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বিশ্বাস করে তাহা হইলে সে বিবিধ দেবতায় বিশ্বাস করিতে পারে না। বোধ হয় খৃষ্টানধর্মে এই সকল দেবতার কথা নাই বলিয়াই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরূপ মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত।

শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি সকল আচার্য্য বলিয়াছেন যে অলৌকিক বিষয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ অলৌকিক বিষয়ে প্রয়োগ করা যায় না। পরমেশ্বর এবং দেবদেবী, এই সকল অলৌকিক তত্ত্ব। সুতরাং এ সকল বিষয়ে হিন্দুর পক্ষে বেদই প্রমাণ। বেদে বলা হইয়াছে যে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী ইন্দ্রাদি দেবগণ আছেন। এজন্যই হিন্দুগণ ইহা বিশ্বাস করে। এই তত্ত্বের মধ্যে কিছুই অযৌক্তিক নাই। বাইবেলে পরমেশ্বরের কথা আছে, কিন্তু পরমেশ্বরের অধীন অপর দেবগণের কথা নাই (যদিও দেবদূতের কথা আছে) এজন্য খৃষ্টান-ধর্মমতের সহিত মিলাইয়া যে আমাদের ধর্মমত গঠন করিতে হইবে এরূপ কোনও কথা নাই। অনেক বিষয়ে (যথা পুনর্জন্ম এবং কর্মফল) খৃষ্টানধর্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম যে অনেক বেশী উন্নত ইহা সর্ববাদিসম্মত। দেবতত্ত্ব বিষয়েও হিন্দুধর্ম খৃষ্টানধর্ম অপেক্ষা উন্নততর।

এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অধীন অনেকগুলি দেবতা থাকিলে তাহাকে polytheism বলা যায় না। যে ধর্মমতে এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বর নাই, কতকগুলি স্বতন্ত্র দেবতা আছেন তাহাকেই polytheism বলা হয়। অধ্যাপক হেনরি ষ্টীফেন বলিয়াছেন যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র দেবতার উপর একজন ঈশ্বর রাজত্ব করিলে তাহা একপ্রকার একেশ্বরবাদ (monotheism) ("Problems of Metaphysics" ২৬৪ এবং ২৬৫ পৃষ্ঠা)। বেদের ধর্মমত এই যে ঈশ্বর কেবলমাত্র অপর দেবগণের অধিপতি নহেন, তিনি অপর দেবগণকে নিজ দেহ হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অপর দেবগণের অন্তর্য্যামী হইয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন। সুতরাং বেদের ধর্মমতকে অবশ্যই একেশ্বরবাদ বলিতে হইবে।

ডাক্তার উইণ্টারনিজের ধারণা এইরূপ যে—নির্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত কেহ বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস করিতে পারে না। এই ধারণা হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যাঁহারা এক পরমেশ্বরের কথা বলিয়াছেন তাঁহারা এরূপ নির্বোধ হইতে পারেন না যে বহু দেবদেবী বিশ্বাস করিবেন—অথবা মনে করিবেন যে বৈদিক যজ্ঞ করিয়া কেহ স্বর্গে যাইতে পারে। এজন্যই তিনি লিখিয়াছেন—ঋগ্বেদের কোনও কোনও মন্ত্রে দেবদেবীর অস্তিত্বে এবং যজ্ঞের কার্য্যকারিতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে এবং এই সকল অবিশ্বাসী

ব্যক্তির চিন্তা হইতে অবশেষে উপনিষদের উৎপত্তি হইয়াছিল। * এই প্রসঙ্গে ডাক্তার উইণ্টারনিজ্ যে বেদমন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন (ঋগ্বেদ ২।১২ এবং ৮।১০০) তাহাতে ইহা বলা হইয়াছে যে কেহ কেহ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতায় বিশ্বাস করে না; কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হইয়াছে যে এই ব্যক্তিরা ভ্রান্ত। এই সকল অবিশ্বাসী ব্যক্তি যে বেদের কোনও অংশ রচনা করিয়াছিলেন অথবা উপনিষদের রচনার সহিত সংস্পৃষ্ট ছিলেন একথা বেদে কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। অবিশ্বাসী ব্যক্তির কেবলমাত্র উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা কিছুতেই সিদ্ধান্ত করা যায় না যে এই সকল অবিশ্বাসী ব্যক্তি বেদের মন্ত্র এবং উপনিষদ রচনা করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে। বেদের যে সকল স্থলে সর্বশক্তিমান অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের কথা আছে সে সকল স্থানে অন্য দেবগণের কথা এবং যজ্ঞের কথা আছে, ঐ সকল মন্ত্রের রচয়িতা যে দেবতত্ত্বে এবং যজ্ঞের সার্থকতায় বিশ্বাস করিতেন তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। পূর্বে আমরা হিরণ্যগর্ভসূক্ত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে—দেবগণ সেই পরমেশ্বরের আদেশ পালন করেন (উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ)। সুতরাং হিরণ্যগর্ভসূক্তের রচয়িতা যে দেবগণের অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ঐ সূক্তেই ইহাও বলা হইয়াছে যে সেই পরমেশ্বর দেবগণের উপর অধিপতি হইয়া থাকেন (যো দেবেষ্ অধি একদেব আসীৎ)। পুরুষসূক্তেও পরমেশ্বরের কথা আছে এবং দেবগণের উৎপত্তির কথা আছে, যজ্ঞের কথাও আছে। উপনিষদেও দেবগণের কথা এবং যজ্ঞের কথা আছে। 'কেন'—উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে দেবাসুরের সংগ্রামে দেবগণ বিজয়লাভ করিবার পর ব্রহ্ম দেবগণের সমীপে জ্যোতির্ময়রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং দেবগণ প্রথমে অগ্নিকে পরে বায়ু ও ইন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন—এই জ্যোতির্ময় বস্তু কি তাহা জানিবার জন্য। কঠ উপনিষদে নচিকেতা যমের নিকট গিয়াছিলেন—যম নচিকেতাকে অগ্নিবিদ্যার উপদেশ দিলেন, যে অগ্নি উপাসনা করিয়া স্বর্গলাভ করা যায়। সুতরাং এখানেও দেবগণের অস্তিত্বে এবং যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও অবসর নাই। অন্যান্য উপনিষদগুলি আলোচনা করিলেও দেখা যাইবে যে বহু স্থলেই দেবগণের কথা এবং যজ্ঞের কথা আছে। ফলতঃ যে সকল বেদমন্ত্রে পরমেশ্বরতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে সে সকল মন্ত্রের রচয়িতা এবং উপনিষদের ঋষিগণ যে দেবগণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ হয় ইহাও বিশ্বাস করিতেন—এ বিষয়ে সন্দেহের কিছুমাত্র অবসর নাই। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে এ বিষয়ে ডাক্তার উইণ্টারনীজের বিপরীত কল্পনা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বৈদিক যজ্ঞের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ তিনি এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

উপনিষদের বাণী এইরূপ; দেবগণ আছেন ইহা সত্য; বেদবিহিত যজ্ঞের দ্বারা দেবগণের আরাধনা করিলে স্বর্গলাভ হয়, ইহাও সত্য; কিন্তু সে স্বর্গবাস যত দীর্ঘকালের জন্যই হউক না কেন, একদিন স্বর্গবাস শেষ হইবে—তখন আবার মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া দুঃখ ভোগ করিতে হইবে; অতএব যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের আরাধনা করা জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য হইতে পারে না; কিন্তু মোক্ষলাভ করিলে আর পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মোক্ষলাভ করা যায়; অতএব ব্রহ্মকে জানিয়া মোক্ষলাভের জন্য চেষ্টা করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

তদ্ যথা ইহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে
এবম্ এব অমুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে।

"যেমন কর্মদ্বারা ইহলোকে যাহা কিছু লাভ করা যায় একদিন তাহার ক্ষয় হয়, সেইরূপ যজ্ঞাদি পুণ্য দ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি যাহা লাভ করা যায় একদিন তাহারও ক্ষয় হয়।"

শ্বেতাশ্বর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে—

তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হয়নায়।

* "...In some of the hymns of the Rigveda doubts and scruples arose concerning the popular belief in Gods and the priestly cult. These sceptics and thinkers, these first philosophers of ancient India certainly did not remain isolated" (History of Sanskrit Literature, pages 226 and 227)

"When the Brahmanas were pursuing their barren sacrificial science, other circles were engaged upon those highest questions which were at last treated so admirably in t e Upanishads" (ঐ পুস্তকের ২৩১ পৃষ্ঠা)

"কেবল তাঁহাকে জানিলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; মোক্ষলাভের অপর কোনও উপায় নাই।"

গীতায় সকল উপনিষদের সার ভাগ লিখিত হইয়াছে। গীতাতেও এই তত্ত্ব সুস্পষ্টভাবে লিখিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিতেছেন—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপা পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যম্ আসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং
অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥

"বেদবিদ্গণ সোম পান করিয়া পাপমুক্ত হন এবং যজ্ঞদ্বারা আমারই আরাধনা করিয়া স্বর্গলাভ প্রার্থনা করেন। তাঁহারা পুণ্যময় ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া দেবোচিত সুখভোগ করেন।"

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মম্ অনুপ্রপন্নাঃ
গতাগতং কামকামাঃ লভন্তে॥

"তাঁহারা বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া যখন পুণ্য ক্ষীণ হইয়া যায় তখন মর্ত্ত্যলোক প্রবেশ করেন। যাঁহারা বেদের কর্মকাণ্ড অনুসরণ করেন তাঁহারা সকামচিত্তে এইভাবে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে যাতায়াত করেন।"

অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

মাম্ উপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতং।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

"মহাত্মাগণ পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হয় এবং দুঃখের আলয় ও অনিত্য পুনর্জন্ম আর প্রাপ্ত হয় না।"

হিন্দুধর্মের এই সার উপদেশ বেদ উপনিষদ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল ধর্মগ্রন্থে লিখিত আছে। ধর্মশাস্ত্রের সহিত যে সকল হিন্দুর সামান্য পরিচয় আছে তাঁহারাও এই তত্ত্বের সহিত সুপরিচিত। এই জ্ঞান অর্জন করিবার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচয় হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইংরাজি-শিক্ষিত পণ্ডিতগুলি হিন্দু হইয়াও এই সহজ তত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞ থাকিয়া যান এবং গ্রন্থ লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া ইহার বিপরীত মতই প্রচার করেন।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ মনে করেন যে হিরণ্যগর্ভসূক্তে, দেবগণের অস্তিত্বে এবং যজ্ঞের কার্য্যকারিতায় অবিশ্বাস প্রকাশ করা হইয়াছে। হিরণ্যগর্ভসূক্তে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ সকল দেবতার অধিপতি, দেবগণ তাঁহার আদেশ পালন করেন, সুতরাং এই সূক্তে দেবগণের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে ইহা কিছুতেই বলা যায় না। এই সূক্তের প্রত্যেক শ্লোকের শেষে আছে—"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"। ডাক্তার উইণ্টারনিজ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন—"কোন্ দেবতাকে ঘৃত দ্বারা পূজা করিব" এবং বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ এই যে অন্য দেবতাকে পূজা করিয়া কোনও ফল নাই। কিন্তু সায়ণাচার্য্য বলিয়াছেন যে এখানে "ক" শব্দের অর্থ প্রজাপতি বা হিরণ্যগর্ভ এবং এই পংক্তির অর্থ এই যে "প্রজাপতিকে আমরা হবিঃ দ্বারা পূজা করিব।" হিরণ্যগর্ভসূক্তে বলা হইয়াছে যে হিরণ্যগর্ভ সকল ভূতের অধিপতি, সকল দেব তাঁহার আজ্ঞাপালন করেন ইত্যাদি। সুতরাং এই সূক্তে ইহা বলাই যুক্তিযুক্ত হয় যে আমরা হিরণ্যগর্ভের পূজা করিব। একজন রাজা আছেন—অতএব আমরা রাজপুরুষকে সম্মান করিব না—ইহা বলাও যেমন যুক্তিযুক্ত—পরমেশ্বর আছেন অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণের পূজা করিব না—একথা বলাও সেইরূপ যুক্তিযুক্ত। অতএব ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তদপেক্ষা সায়ণাচার্য্যের অর্থই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। ইন্দ্রাদি দেবগণ নাই অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা নিষ্ফল—ইহা হিরণ্যগর্ভসূক্তের অর্থ কখনও হইতে পারে না। এ বিষয়েও ডাক্তার উইণ্টারনিজের মত ভ্রান্ত।

বৈদিক যজ্ঞের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ডাক্তার উইণ্টারনিজ আর একটা ভ্রান্ত উক্তি করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের ২৬০ পৃষ্ঠায় তিনি লিখিয়াছেন যে ব্রহ্মলাভ করিতে হইলে সৎ ও অসৎ সকল কর্ম ত্যাগ করিতে হয় ("In order to attain the highest object—Brahman—it is necessary to give up all work good as well as bad")। সন্ন্যাস আশ্রমে সকল কর্ম ত্যাগ করিবার কথা আছে বটে কিন্তু সাধারণতঃ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের পর সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করা হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও গার্হস্থ্য আশ্রমে ঐ আশ্রমদ্বয়ের বিহিত কর্ম-সকল অনুষ্ঠান করিতে হয়। গার্হস্থ্য আশ্রমে যজ্ঞ করা প্রয়োজন। ঈশোপনিষদে উক্ত হইয়াছে।

কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ—"বিহিত কর্ম

সকল অনুষ্ঠান করিয়াই এক শত বৎসর বাঁচিবার ইচ্ছা করিবে।" কঠোপনিষদে দেখিতে পাইবে—যম নচিকেতাকে প্রথমে যজ্ঞ করিতে শিখাইয়াছিলেন, পরে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলেও কর্মানুষ্ঠান প্রয়োজন—কারণ কর্মানুষ্ঠান না করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না, চিত্ত শুদ্ধ না হইলে সহস্র উপদেশলাভ করিলেও জ্ঞানের উদয় হয় না। উপনিষদের যে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত তাহা মহর্ষি বেদব্যাস "সর্বাপেক্ষা হি যজ্ঞাদিশ্রুতেঃ অশ্ববদ্" (ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।২৬) এই সূত্রে স্থাপিত করিয়াছেন। গীতাতেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন,

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যম্ এব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥১৮।৫

"যজ্ঞ, দান এবং তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে—অনুষ্ঠান করা উচিত। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যা মনীষিগণের চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করে।"

যাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে তিনি কর্ম ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু সেরূপ লোক একান্ত বিরল। সাধারণ লোক শাস্ত্রীয় কর্ম পরিত্যাগ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয় না—সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদে পুনর্জন্মের কথা নাই (তাঁহার গ্রন্থের ৭৮ ও ৭৯ পৃষ্ঠায় ইহা উক্ত হইয়াছে)। ইহাও যথার্থ নহে। 'অয়ং পন্থা অনুবিত্তঃ পুরাণঃ' এবং 'অবর্ত্ত্যা শুণ অন্ত্রাণি পেচে' (ঋগ্বেদসংহিতা ৩-৫) এই দুইটি মন্ত্রে পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে। এখানে ঋষি ব্যাসদেব তাঁহার পূর্বজন্মের কথা বলিয়াছেন—যখন দুর্ভিক্ষের সময় তিনি কুকুরের অন্ত্র পাক করিয়াছিলেন। ডাক্তার উইণ্টারনিজ তাঁহার গ্রন্থের ৯৭ পৃষ্ঠায় ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের অনুবাদ দিয়াছেন (১০, ১৬, ১—৬)। যেখানে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে "যাও, তোমার কর্ম অনুসারে স্বর্গ, পৃথিবী, জল বা উদ্ভিদের মধ্যে যাও"। এখানেও পুনর্জন্মের উল্লেখ আছে।

তাঁহার গ্রন্থের ৬৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়াছেন যে ঋগ্বেদের সময় জাতিভেদের উৎপত্তি হয় নাই। অথচ তিনি লিখিয়াছেন যে ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি ইহা উল্লেখ করেন নাই কিন্তু ঋগ্বেদে কয়েকস্থলেই ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে (যথা ৫-৭-৪, ১-১০-২, ৮-৭৮-৩, ৮-৩-২৬, ৮ ২৫-৩)। অধিকন্তু অথর্ববেদের বহুস্থানে চারিবর্ণের স্পষ্ট উল্লেখ আছে এবং ডাক্তার উইণ্টারনিজ নিজেই বলিয়াছেন যে অথর্ব বেদের ভাষা ও ছন্দ ঋগ্বেদের ভাষা ও ছন্দ হইতে বিভিন্ন নহে অর্থাৎ অথর্ববেদ ঋগ্বেদের ন্যায়ই প্রাচীন। সুতরাং বৈদিকযুগে জাতিভেদ ছিল না ইহা সত্য নহে।

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নীতির উপদেশ নাই বলিয়া ডাক্তার উইণ্টারনিজ খুব নিন্দা করিয়াছেন। অনেকগুলি উপনিষদ ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত, তাহাতে বহু নীতি উপদেশ আছে; মন্ত্রভাগেও নীতি উপদেশ আছে। বেদের মর্ম জানিতে হইলে মন্ত্র, উপনিষদ প্রভৃতি সকল অংশের আলোচনা করা প্রয়োজন। মন্ত্র ও উপনিষদ অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে নীতি উপদেশ নাই বলিয়া নিন্দা করা তাঁহার সমীচীন হয় নাই। বিশেষতঃ তিনিই বলিয়াছেন যে এই ব্রাহ্মণ ভাগে যজ্ঞ করিবার বিস্তারিত বিবরণই দেওয়া হইয়াছে—কিরূপে বেদি প্রস্তুত করিতে হয়, যজ্ঞপাত্রগুলি কিরূপ হইবে, কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া আহুতি দিতে হয় ইত্যাদি। বেদের এই অংশে নীতি উপদেশ না থাকা দোষাবহ হয় না। পদার্থবিজ্ঞান (Physics) সম্বন্ধে একটি বই পাঠ করিয়া কেহ যদি নিন্দা করেন—"ইহাতে একটিও নীতি কথা নাই"—তাহা হইলে তাঁহার উক্তি যেরূপ সঙ্গতি-বিহীন হয়—এ বিষয়ে ডাক্তার উইণ্টারনিজের উক্তিও সেইরূপ হইয়াছে।

তাঁহার গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠায় বেদের সৃষ্টি সম্বন্ধে কয়েকটি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে এই বিবরণগুলির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য নাই। একটি বিবরণে বলা হইয়াছে যে প্রজাপতি অগ্নি সৃষ্টি করেন—তাহার পরে উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করেন, তাহার পর সূর্য্য, তাহার পর বায়ু। আর এক বিবরণে উক্ত হইয়াছে যে তিনি পক্ষী, সর্প ও স্তন্যপায়ী জন্তু সৃষ্টি করেন। তৃতীয় বিবরণে বলা হইয়াছে যে তিনি তাঁহার মন হইতে মানব, চক্ষু হইতে অশ্ব, প্রাণবায়ু হইতে গাভী, কর্ণ হইতে মেষ এবং স্বর হইতে ছাগ সৃষ্টি করেন। আবার অপর সকল বিবরণে উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি নিজেই সৃষ্ট হইয়াছিলেন অথবা সৃষ্টি জল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল অথবা শূন্য হইতে অথবা ব্রহ্ম হইতে। ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই সকল বিবরণকে পরস্পরবিরোধী মনে

করেন। কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে বিরোধ নাই। সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ এই সকল বিভিন্ন স্থলে উক্ত হইয়াছে। বিভিন্ন অংশগুলি সংগ্রহ করিয়া সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া এইরূপ দাঁড়াইবে ; প্রলয়ের সময় কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, আর কিছুই ছিল না (শূন্য ছিল) ; তাহার পর জল সৃষ্টি হয় ; তাহার পর প্রজাপতি; প্রজাপতি অগ্নি (দেবতা), উদ্ভিদ, সূর্য্য, বায়ু (দেবতা), পক্ষী, সর্প, স্তন্যপায়ী জীব (যথা মানব, অশ্ব, গাভী, মেষ, ছাগ)— এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ডাক্তার উইণ্টারনিজের উল্লিখিত বিভিন্ন বিবরণগুলি এইভাবে একটি সম্পূর্ণ বিবরণের বিভিন্ন অংশ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনও পরস্পর-বিরোধ থাকিবে না।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন যে সমগ্র উপনিষদের মধ্যে একটি দর্শনশাস্ত্র আছে ইহা বলা যায় না অর্থাৎ উপনিষদের বিভিন্ন অংশে পরস্পরবিরোধী মত পাওয়া যায়। ইহাও তাঁহার ভ্রম। সমগ্র উপনিষদে একটিই দর্শনশাস্ত্র আছে—তাহা বেদান্তদর্শন নামে পরিচিত। ইহাই হিন্দুধর্মের ভিত্তি। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থে এই বেদান্তদর্শন সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। উপনিষদের যে সকল বিভিন্ন অংশে আপাততঃ বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, মহর্ষি তাহাদের মধ্যে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন। ডাক্তার উইণ্টারনিজ উপনিষদের কোন্ অংশগুলি পরস্পর-বিরোধী মনে করেন তাহা উল্লেখ করেন নাই।

উপনিষদের 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যের ডাক্তার উইণ্টারনিজ যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া বোধ হয় যে তিনি উপনিষদের মর্ম কিছুমাত্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই বাক্যে 'তৎ' শব্দের অর্থ ব্রহ্ম ; 'ত্বম্' শব্দের অর্থ জীব। আচার্য্য শঙ্করের মতে এই বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য নিরূপিত হইয়াছে ; আচার্য্য রামানুজ বলেন— এই বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে ব্রহ্ম জীবের আত্মস্বরূপ। যে মতই গ্রহণ করা যাউক এই বাক্যে যে জীব ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়াছে ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই বাক্যের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন —"জগতের যতটুকু সম্বন্ধে তুমি সচেতন ততটুকুরই অস্তিত্ব আছে"। তৎ ত্বম্ অসি—এই বাক্য হইতে এই অর্থ পাওয়া যায় না। উপরন্তু অর্থটি একপ্রকার যুক্তিহীন প্রলাপ। জগতের যে অংশ সম্বন্ধে আমি সচেতন অপর এক ব্যক্তি তাহা সম্বন্ধে সচেতন নহে ; আমি ১০ বৎসর পূর্বে যাহা সম্বন্ধে সচেতন ছিলাম এখন তাহা সম্বন্ধে সচেতন নহি। সুতরাং এই অর্থ গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে আমাদের জ্ঞান অনুসারে জগৎ পরিবর্ত্তন হইতেছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন জগৎ বিদ্যমান আছে। এই সিদ্ধান্তগুলি যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা সহজ বুদ্ধি হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ উপনিষদের সারতত্ত্ব এইভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—"জগৎই ব্রহ্ম—ব্রহ্মই আত্মা"। ইহাও ভুল। উপনিষদে বহু স্থানে বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর। কিন্তু জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর। সুতরাং জগৎকে কিরূপে ব্রহ্ম বলা যায়? অধিকন্তু জগৎ নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, কিন্তু ব্রহ্ম পরিবর্ত্তনহীন নির্বিকার। বস্তুতঃ জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন নহে। জগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে অন্তর্নিহিত আছেন। উপনিষদের যে বাক্য পড়িয়া ডাক্তার উইণ্টারনিজ এই ভ্রমে পড়িয়াছেন সে বাক্যটি এই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্ম, কারণ ইহা ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ব্রহ্মেই অবস্থান করে এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়। এ বাক্যের অর্থ এরূপ নহে যে জগৎ ও ব্রহ্ম অভিন্ন। উপনিষদে ইহা বলা হইয়াছে যে ব্রহ্ম জগৎকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান থাকেন—

পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি
ত্রিপাদ্ অস্য অমৃতং দিবি

"বিশ্বের সমুদয় ভূত তাঁহার এক অংশ, তাঁহার অপর তিন অংশ অমৃত—তাহা দ্যুলোকে অবস্থান করে।"

এষ সর্বেষু ভূতেষু গূঢ়োত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়াবুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

"ইনি সর্বভূতের মধ্যে নিগূঢ় হইয়া অবস্থান করেন, প্রকাশ পান না। সূক্ষ্মদর্শিগণের সূক্ষ্ম বুদ্ধিতে ইনি প্রকাশিত হন।"

ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে নিহিত আছেন, আবার তাহার বাহিরেই অবস্থান করিতেছেন। সুতরাং জগতের দৃশ্যমান পদার্থগুলিকে ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করিলে ভুল হইবে। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" সমগ্র বাক্যটিতে যথার্থ তত্ত্ব প্রকাশিত হইতেছে। বাক্যটির "তজ্জলান্" এই

অংশ বাদ দিয়া কেবলমাত্র "সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম" এই অংশটিতে অর্দ্ধ সত্য মাত্র প্রকাশিত হইতেছে। অর্দ্ধ সত্য প্রায়ই ভুল হয়।

এইভাবে উপনিষদের সর্বজনবিদিত কথাগুলি পর্য্যন্ত ডাক্তার উইণ্টারনিজ বুঝিতে পারেন নাই। অথচ অতিশয় বিজ্ঞভাবে বেদ ও উপনিষদের নানা প্রকার দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। শোপেনহয়ার, ডয়সেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উচ্ছ্বসিত ভাষায় উপনিষদের যে সকল প্রশংসা করিয়াছেন, ডাক্তার উইণ্টারনিজ তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বেদের কোনও কোনও অংশ "নির্বোধ এবং অর্থহীন" (foolish and nonsensical—page 149). এমন কথাও বলিয়াছেন যে বেদের কোনও কোনও অংশ উন্মাদের রচনা বলিয়া বোধ হয় (১৮২ পৃষ্ঠা)। তিনি বেদের যে অংশ বুঝিতে পারেন নাই, সেই অংশগুলি দম্ভ এবং অহঙ্কার হেতু এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

মনুসংহিতার দোষ দিয়া তিনি বলিয়াছেন—যদিও বেদে দেখা যায় যে স্বামী ও স্ত্রী একত্র যজ্ঞ করিতেছে তথাপি মনু বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকের যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। এখানেও তিনি মনুর নিষেধের মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। মনুর উদ্দেশ্য এই যে স্ত্রীলোক পুরোহিতের কার্য্য করিবে না। কারণ বেদে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে যজ্ঞ করিবার সময় ভুল হইতে পারে এবং ভুল হইলে অনিষ্ট হইবে। বেদে যেখানে বলা হইয়াছে যে স্বামী স্ত্রী মিলিত হইয়া কোনও যজ্ঞ করিবে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধিকার সঙ্কোচ করা মনুর উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মনু ত গোড়াতেই বলিয়াছেন যে যেখানে তাঁহার বিধান বেদ-বিরোধী মনে হইবে সেখানে বেদের বিধানই পালন করিতে হইবে—মনুর বিধান নহে। "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"। অতএব ডাক্তার উইণ্টারনিজ মনুর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া মনুকে বেদবিরোধী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ডাক্তার উইণ্টারনিজ বলিয়াছেন—ঋগ্বেদের মন্ত্র পড়িয়া দেখা যায় যে সে সময় রমণীগণ উৎসবের সময় প্রকাশ্যে বাহির হইতেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে বৈদিক যুগের পরে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে। রামায়ণেও রমণীগণের সম্বন্ধে এইরূপ নিয়মই লিপিবদ্ধ আছে ;—

ব্যসনেষু ন কৃচ্ছ্রেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দূষ্যতে স্ত্রিয়ঃ॥

(যুদ্ধকাণ্ড ১১৪ অধ্যায়)

"বিপদের সময়, অভাবে, যুদ্ধে, স্বয়ম্বরে, যজ্ঞে এবং বিবাহে স্ত্রীলোককে দেখা গেলে তাহা দোষের বিষয় হয় না।"

ভারতে হিন্দুসমাজেও এই প্রথাই বর্ত্তমান।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যাইতেছে। সুতরাং এইখানেই উপসংহার করা হইবে। পরিশেষে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন এই গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন, তখন গ্রন্থ হইতে এই সকল ভুল যাহাতে সংশোধিত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নচেৎ ছাত্রগণের মধ্যে বেদ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচারিত হইবার আশঙ্কা আছে। গ্রন্থটি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। গ্রন্থকারকে তাঁহার ভ্রমগুলি দেখাইয়া দেওয়া কবিবরেরও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়।



হুড্রু ও রাজরপ্পা

শ্রীজনরঞ্জন রায়

এবার সাওতালদের দেশের উপর সভ্য বাঙ্গালী স্বাস্থ্য-কামীদের সুনজর পড়িয়াছিল। তাঁহাদেরই দলে মিশিয়া আমরা কয়জন হাজারিবাগে গিয়া পড়িয়াছিলাম। সমতটের বাঙ্গালী এখানে আসিয়া নয়নেন্দ্রিয়ের ভূরিভোজনে বিমোহিত হইয়া গিয়াছিলাম। বিদেশে এত আনন্দ বুঝি আর কখনও পাই নাই। পুষ্পপল্লবে এত রঙ্গের খেলা, প্রকৃতির প্রাঙ্গণে এরূপ হরিৎশোভা, উঁচু নিচু ক্ষেত্রে আলোছায়ার এরূপ রেখাপাত, দিকবালে গিরিমালার কিরীট শোভা—তার সঙ্গে মধুরস্পর্শ সীকরবাহী পশ্চিমের বাতাস—আমাদের মনে প্রাণে যেন পুলকমাতন আনিয়া দিয়াছিল। হাজারিবাগের নৈসর্গিক শোভা-সম্পদ অপূর্ব্ব। প্রায় এক সপ্তাহ কাল সহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর দৃশ্যের জন্য আগ্রহ জন্মিল। শুধু হাজারিবাগ সহরেই যাহা আছে তাহা ভাল করিয়া দেখিবার পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধতর শোভাময় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিবার ব্যাকুলতা আসিল। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতপরিবেষ্টিত মালভূমি এই হাজারিবাগ। শ্বাপদ-শার্দ্দূলসঙ্কুল এই স্থানে "হাজারি" নামক একটি গণ্ডগ্রাম ছিল, তাহা হইতে এরূপ নামকরণ হইয়াছে—ইহাই হাণ্টার সাহেবের মত। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৬২ খৃঃ ইহা বৃহদায়তন সহর হয় এবং রাজগোপাল রায় নামক একজন বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার একাংশ শাল বন কাটাইয়া মানুষের বাসোপযোগী করেন, সেই বসতির নাম হয় বোডাম বাজার। তখনকার স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার বোডাম সাহেবের নাম হইতে এই বাজারের নাম হয়। এক্ষণে এই স্থানটিকে ঘিরিয়া সহরটি প্রসারিত হইয়াছে। এখানে এতদিন গণ্যমান্য সকলেই বাঙ্গালী ছিলেন। রাজগোপালবাবু কর্ত্তৃক আনীত তাঁহার পিতৃভূমি রায়-প্রদেশ নাদনঘাটের নিকট-বর্ত্তী স্থানের বৈদ্যগণ এখানকার প্রধান-তম সমৃদ্ধ অধিবাসী। রাজগোপালবাবু আসিয়া হাজারিবাগের সিপাইদের ক্যান্টনমেণ্টে দুইজন বাঙ্গালী ষ্টোর-কিপারকে দেখিতে পান। একজন বৈদ্য, অন্যটি কায়স্থ। তাঁহাদের উভয়ের বংশই এক্ষণে হাজারিবাগবাসী। এক্ষণে ৩০,০০০ হাজার লোকের বাস, তন্মধ্যে বোধ হয় ৩০০০ হাজার বাঙ্গালী আছেন। ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতা এই দেশবাসীদের আচ্ছন্ন করিতেছে এবং বাঙ্গালী-বিদ্বেষ প্রবল হইতেছে। হিন্দু মুসলমানে সদ্ভাবও অতিসম্প্রতি বিশেষ-রূপে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এখানকার দর্জ্জি ও ফেরিওয়ালা অধিকাংশই মুসলমান। দেশীয় উকিল ও মোক্তারদের মধ্যে অনেকেই লালা কায়েত। হাণ্টার, সিফটন্ ও লিষ্টারের রিপোর্টে বহু প্রাচীন তথ্য জানা যায়। কিন্তু ইতিহাস লইয়া মাথা ঘামাইতে আমাদের কাহারও আগ্রহ দেখা গেল না। যদিও প্রচুর উপাদান সুলভ। কোনও এলবাম বা গাইড-বহি পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা লোকান্তরিত হইলে পুরাকাহিনী লুপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু হাজারিবাগ হইতে ১০৮ মাইল পূর্ব্বদিকে ভ্রমণের সুযোগটি



দামোদর ও ভেড়া নদীর সঙ্গম—রাজরপ্পা। ফটো—বিনয়কৃষ্ণ রায়

সর্ব্বপ্রথমে আসিয়া পড়িল। হাজারিবাগ হইতে রাঁচীর প্রান্তভাগ পর্য্যন্ত যাতায়াত করা গেল এক বেলায় এবং সুবর্ণরেখার জলপ্রপাত (হুড্রু ফল্স্) এবং ভেড়া নদী ও ভীষণাকার দামোদরের সঙ্গমক্ষেত্রে (রাজরুপ্পায়) প্রস্তর মন্দিরে ছিন্নমস্তার পাষাণমূর্ত্তির দর্শন ঘটিল। হাজারিবাগ জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃশ্য এই দুইটি।

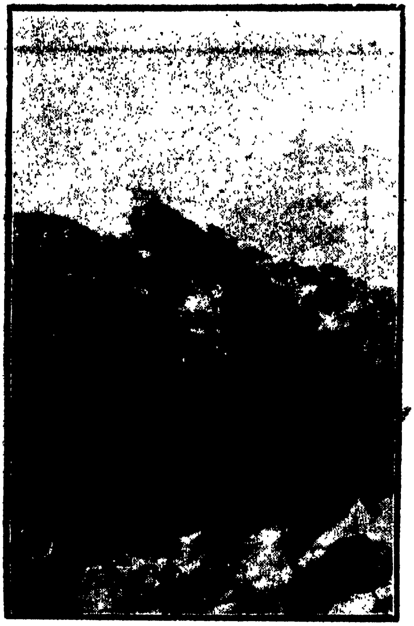
৮ই অক্টোবর ১৯৩৫—বাঙ্গালা ২১শে আশ্বিন ১৩৪২ মঙ্গলবার প্রাতে ৬৷৷০টায় ট্যাক্সিতে চড়িয়া ছয়জন মিলিয়া অপূর্ব্ব আনন্দের সন্ধানে যাত্রা করা গেল। সঙ্গী হইলেন কলিকাতাবাসী তিনজন—সেণ্টপল্ কলেজের অধ্যাপক শ্রীকালীচরণ সান্যাল এম-এ ; কপিলেশ্বর তৈলের কারখানার অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযমুনাবিহারী সাধুখাঁ ও আশুতোষ কলেজের ছাত্র শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং বাকী দুইজন নবদ্বীপবাসী। একটি আমার কনিষ্ঠ শ্রীসুধীররঞ্জন রায় বি-এল এবং অন্যটি শ্রীঅমিয়কুমার বাক্চী বি-এ। হুডরুর পথে পীচ-ঢালা হাজারীবাগের চমৎকার রাস্তার উপরে ট্যাক্সি যখন তীরবেগে ছুটিতে লাগিল—তখন গুঞ্জরিয়া উঠিয়াছিল সকলেরই প্রাণ! রাস্তার দুধারে সারিবদ্ধ গাছগুলি যেন কোন রাজ-অতিথিকে বিদায় অভিনন্দন (গার্ড-অফ্-অনার) দিতেছিল। ১৫ হইতে ২০, ২০ হইতে ২৫ এবং বাড়িতে বাড়িতে কোথাও ঘণ্টায় ৫০ মাইল পর্য্যন্ত মোটরের গতিবেগ হইতেছিল। আঁকা বাঁকা রাস্তায় 'চরকা-পটলকা' ঘাট। উচ্চ পর্ব্বত হইতে নামিবার কালে উৎরাইয়ের রাস্তা এইরূপ হয়। এই সব স্থানকে ঘাট বলে। ১০০ ফিট আন্দাজ নীচে আমাদের বামে জঙ্গলের মাথায় সূর্য্য উঠিতেছিল। আলো ছায়ার কি অপূর্ব্ব লীলা। গাড়ীর বেগ মন্দ করিতে হইয়াছিল। গভীর হইতে গভীরতম শালবন। সম্মুখে রিজার্ভ ফরেষ্ট। রয়াল-বেঙ্গল বাঘ, ভালুক, শম্বর, নীলগাই এবং হরিণ—এমন কি সাদা বাঘ এখানে নির্ব্বিবাদে অবস্থান করিতেছিল, কোনও ভাগ্যবানের হাতে প্রাণ দিয়া ধন্য হইবার জন্য। অনেক পথিকেরই কোন একটির দর্শন ঘটে। আমরা একটিরও চেহারা দেখিলাম না। আশা ও ভয় লইয়া চলিতেছিলাম—সোফারের মুখে শুনিতে শুনিতে। আগে নাকি বাঘ আসিয়া দিনের বেলায় ঝাঁপাইয়া পড়িত মোটারের উপর। রাত্রে মোটারের আলো চক্ষে পড়িলে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যাইত—বাঘ,হরিণ,শম্বর ও নীলগাইগুলি। এখন তাহারা গুলির শব্দের মর্ম্ম বুঝিয়াছে ; মোটারের শব্দে লুকাইয়া যায়। হাজারিবাগ হইতে ১৭ মাইল উত্তরে 'মাণ্ডু' নামক গণ্ডগ্রাম পাওয়া গেল। মাণ্ডুয়ার চাষ থাকায় যদি এই গ্রামের নাম মাণ্ডু হইয়া থাকে তবে ঠিক নামকরণ হইয়াছে। মাণ্ডুয়াভুকদের নাম অপভ্রংশে মেড়ো।



রাজরুপ্পা মন্দির ফটো—বিনয়কৃষ্ণ রায়

কিন্তু এখানকার বাঙ্গালীরা সাঁওতালপরগণার লোকদের মেড়ো বলিতে দেন না। বলেন—এদের বলিতে হইবে 'ছাতু' অর্থাৎ ছাতুখোর। মেড়ো বলিলে নাকি এদের সম্মান করা হইবে। এখানে একখানি ইন্সপেক্সন্ বাংলা আছে। প্রশস্ত হরিৎক্ষেত্র দুদিকে। এতক্ষণ চায়ের গরম থাকায় কেহই ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য আবরণের প্রতি চাহেন নাই। এখন কেহ বা একটু কাশিতেছিলেন, কেহ মফ্লারটার বেষ্টনে আরামের অভিব্যক্তি প্রকাশ করিতেছিলেন ইত্যাদি। যখন ১৭ লেখা পোষ্টমাইল পাওয়া গেল তখন আসিল 'জুজরু' নামক ক্ষুদ্র গ্রাম। একখানি দীর্ঘ লম্বা খোলার চালায়—কয় ঘর বসতি। এরূপ গায়ে গায়ে লাগানো

কেন যে এদের ঘরগুলি—তাহা ভাবিতে লাগিলাম। যেন চোর, ডাকাত, শ্বাপদ প্রভৃতির ভয়ে জোট বাঁধিয়া রহিয়াছে। ২৯ মাইলে "ঘড়ক" ষ্টেশন। রাস্তায় চাহিয়া দেখি বি, এন, রেলওয়ে লাইন। আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। ইহা বেমো-হেসনা রেলওয়ে লাইন। লাইন পার হইয়া গেলাম। কিছু আগে 'আরগট ষ্টেসন' (?)। ঐ নামের কোলিয়ারি এখান হইতে ৪॥ মাইল পশ্চিমে। তার পরেই পার হইলাম নাতিদীর্ঘ লৌহ সেতু দামোদরের উপরে। ইহার ১৮ মাইল পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র জলপ্রপাত হইতে দামোদর নদের উৎপত্তি। ব্রিজ পার হইয়াই রামগড়। ইহা একটি



রাজরপ্পা জলপ্রপাত। ফটো—কুমারী মায়া গুপ্ত

বৃহৎ গ্রাম। তিনটি রাস্তা মিশিয়াছে।. রামগড়ের রাজাই এখন এ প্রদেশের শ্রেষ্ঠ ধনী। এখন রামগড়ে থাকেন না। আরও দূরে পদমা নামক গ্রামে থাকেন। এই রামগড় বিহারের পলাসী। এখানে রামগড়রাজ মুকুন্দসিংহ ক্যাপটেন ক্যামাকের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইলে বিহার প্রদেশে ইংরাজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধে রাজা মুকুন্দসিংহের ভ্রাতা ও সেনাপতি তেজসিংহ বাঙ্গালাদেশের মীরকাশিমের অংশ অভিনয় করেন। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে এখানকার রাজা রাম নারায়ণসিং মৃত্যুকালেও একজন সামান্য জমিদার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার নাবালক পুত্র লছমীনারায়ণের এষ্টেট কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের হাতে যায়। সে সময় জার্ম্মাণ যুদ্ধের জন্য কয়লার বাজার আগুন হইয়া উঠে। রামগড় ষ্টেটের অধীনে অজস্র কয়লার খনি বাহির হইতে থাকে। ফলে এখন রামগড়রাজের প্রায় ২২ লক্ষ টাকা আয় দাঁড়াইয়াছে। রামনারায়ণ সিংহের পুত্র সাবালক হইবামাত্র দৈবাক্রমে মারা যান। তিনি একটি প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়বংশের শিক্ষিতা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং দুইটি পুত্র রাখিয়া যান। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত কামাখ্যানারায়ণ আর দুই বৎসর পরে সাবালক হইবেন। রামগড়ের দক্ষিণ দিয়া হাজারিবাগ-রাঁচী রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। রামগড়ের চটিতে রামজীর ছোট চায়ের দোকানটি যাত্রীদিগের প্রিয় বিশ্রাম স্থান। এই লোকটি পুণ্যশ্লোক চিত্তরঞ্জনের প্রিয় ভৃত্য ছিল। সে মাসে ৩৫৲ টাকা করিয়া বেতন পাইত। সে আবেগভরে বলিল—"ঐসে আমীর আর কোহি নেহি হোগা বাবু!" তাহার ঘরে কিন্তু সি-আর-দাশ মহাশয়ের কোনও ছবি দেখিলাম না; তাঁর দেওয়া কোনও চিহ্ন বা বকশীষ-করা জিনিষও উহার কাছে নাই জানিলাম। অবিশ্বাস হইল, লোকটা দাশ মহাশয়ের নাম ভাঙ্গাইয়া খায় না তো! কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব প্রভুভক্তি আমাদের মুগ্ধ করিল। ভাবিলাম আমাদেরও অনেক ভৃত্য সদ্ভাবের সঙ্গে বিদায় লইয়াছে, তাহারা কি মনিবের কথা এতটা প্রীতি-ভক্তির সঙ্গে ভাবে? রামজীকে বলিলাম, তুমি দেব-সেবা করিয়া ধন্য হয়েছ, আমি তোমার মনিবের ছবি পাঠাইয়া দিব। লোকটি স্বকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাইল। তথায় বিশ্রামের পর আবার ট্যাক্সিতে উঠিলাম। কিছু দূরে যাওয়ার পরেই রাস্তার ডানদিকে অর্থাৎ দক্ষিণে 'বিজুলিয়া' রেল ষ্টেশন। একটু অগ্রসর হইতেই রাস্তার বামে সুন্দর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা গেল। শুনিলাম ঐদিকে বহু দূরে দাহুয়া-ভাহুয়া নামক স্থান; তাহার সৌন্দর্য্যকে সাহেবেরা আল্পস্ পর্ব্বতের ন্যায় মুগ্ধকর বলিয়া থাকেন। দাহুয়া অর্থে দৈত্য ও ভাহুয়া অর্থে ভল্লুক। দৈত্য ও ভল্লুকের দেশ। ডানদিকে আবার একবার রেললাইনটি দেখা গেল। সিঙ্গেল লাইন। রাঁচীর রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া এখন গোলার রাস্তার দিকে চলিতেছিলাম।

ইহা অপেক্ষাকৃত খারাপ রাস্তা, পূর্ব্বের রাস্তার মত পিচ ঢালা নহে। এই রাস্তায় প্রথম গ্রাম পাইলাম চিতরপুর। চিত্রপুর নামের সার্থকতা না হইলেও স্থানটির দৃশ্য মনোরম। ইহা হাজারিবাগ হইতে ৪০ মাইল। ৪৪ মাইলে ভেড়া নদী। মোটারযোগেই নদী পার হওয়া সম্ভব হইল। শুনিলাম ৪দিন হইল জল কমিয়াছে। তাহার পরেই বৃহৎ গ্রাম 'গোলা'। গোলার পূর্ব্বদিকে গোমতী নদী। মোটরে চড়িয়াই পার হওয়া গেল। এদিক দিয়া না আসিয়া বড় রাস্তা দিয়া আসাই ভাল ছিল। কারণ বস্তির রাস্তা সঙ্কীর্ণ। মোটার যাওয়ার পক্ষে অসুবিধাকর। ফিরিবার কালে আমরা বড় রাস্তা দিয়া আসিয়াছিলাম। রেল লাইন পার হইলাম। নিকটেই 'কামতা' ষ্টেশন। এবার যে রাস্তা দিয়া গিয়াছিলাম তাহা অত্যন্ত খারাপ। বে-মেরামত তো বটেই—উপরন্তু রাস্তার মধ্যে ঘাস বাহির হইয়াছে। এ রাস্তায় লোক চলাচল অত্যন্ত কম বুঝা গেল। কাঁকর-মাটির দৌলতে এদেশে রাস্তা তৈয়ারী করা ভারি সুবিধা। নতুবা বাঙ্গালাদেশ হইলে ইহা একটি গ্রাম্য রাস্তা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাহাতে মোটার চলাচল সম্ভব হইত না। অদূরে দুইদিকেই পাহাড়শ্রেণী—একটির পার্শ্বে অন্য একটি শ্রেণী। দক্ষিণে মনে হইল তিনটি শ্রেণী রহিয়াছে। ইহারই বহু পশ্চিমে রাঁচী। সম্মুখের পথ রোধ করিল একটি ছোট পাহাড়। নিম্নের বসতি দুইটির নাম—'বরিয়াতু' ও 'টোনাগাঁথু'। খাড়া উচ্চ পাহাড়। পাঁচ মাইল দীর্ঘ এই পাহাড় অতিক্রম করিলে সুবর্ণরেখার জলপ্রপাত। একখানি ডুলি যোগাড় করিতে হইয়াছিল। এই পাহাড়ের উপর অনেক ওঁরাও ও মুণ্ডাদের বাস। এদের অপূর্ব্ব নাচ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। ফুল ইহাদের অতি প্রিয় বস্তু। পাহাড়ের উপরে টালির চালা ঘর রহিয়াছে। ইহাকে দিগওয়ারী বাংলা বলে। ইহাই পূর্ব্বে পাহাড়-পথচারী কর্ম্মচারীদের থানাস্বরূপ ছিল। এখানে যাহারা রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য ও পথপরিদর্শকরূপে থাকিত তাহাদের দিগওয়ারী বলা হইত। রেল মোটারের প্রচলনে এবং পুলিশ নিয়োগ দ্বারা ইহাদের অনেকেরই অন্ন উঠিয়াছে। হাজারিবাগ হইতে ৫১ মাইল দূরে আসিয়াছি জানিলাম। পাহাড়ে উঠিতেছি—নামিতেছি—প্রায় ৩৫ মিনিট কাল। পর্ব্বতশিখরে একটি সমতলক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। পাহাড়ীয়াগণ এই স্থানটিকে খামারের ন্যায় ব্যবহার করে দেখিলাম। নিকটে বসতি আছে, নাম 'জারাবান্দা'। বেলা প্রায় ১১টার সময়ে—এই অধিত্যকায় দাঁড়াইয়া দূরে ঠিক সমুদ্রের মত গর্জ্জন শুনিতে পাইলাম। বুঝিলাম ইহাই সুবর্ণরেখার জলপ্রপাতের শব্দ। পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। হুডরু হইতে স্রোতধারা চলিয়াছে পাহাড়ের বক্ষ ভেদ করিয়া। রেখা সুবর্ণ নহে—শ্যামল বনানীর বক্ষে যেন রজতরেখায় আঁকাবাঁকা আলিম্পন। দুইদিকে পাহাড় উত্তুঙ্গ,



সুবর্ণরেখার জলপ্রপাত—(হুড্রু ফল্‌স্)

ফটো—কুঞ্জবিহারী ঘোষ

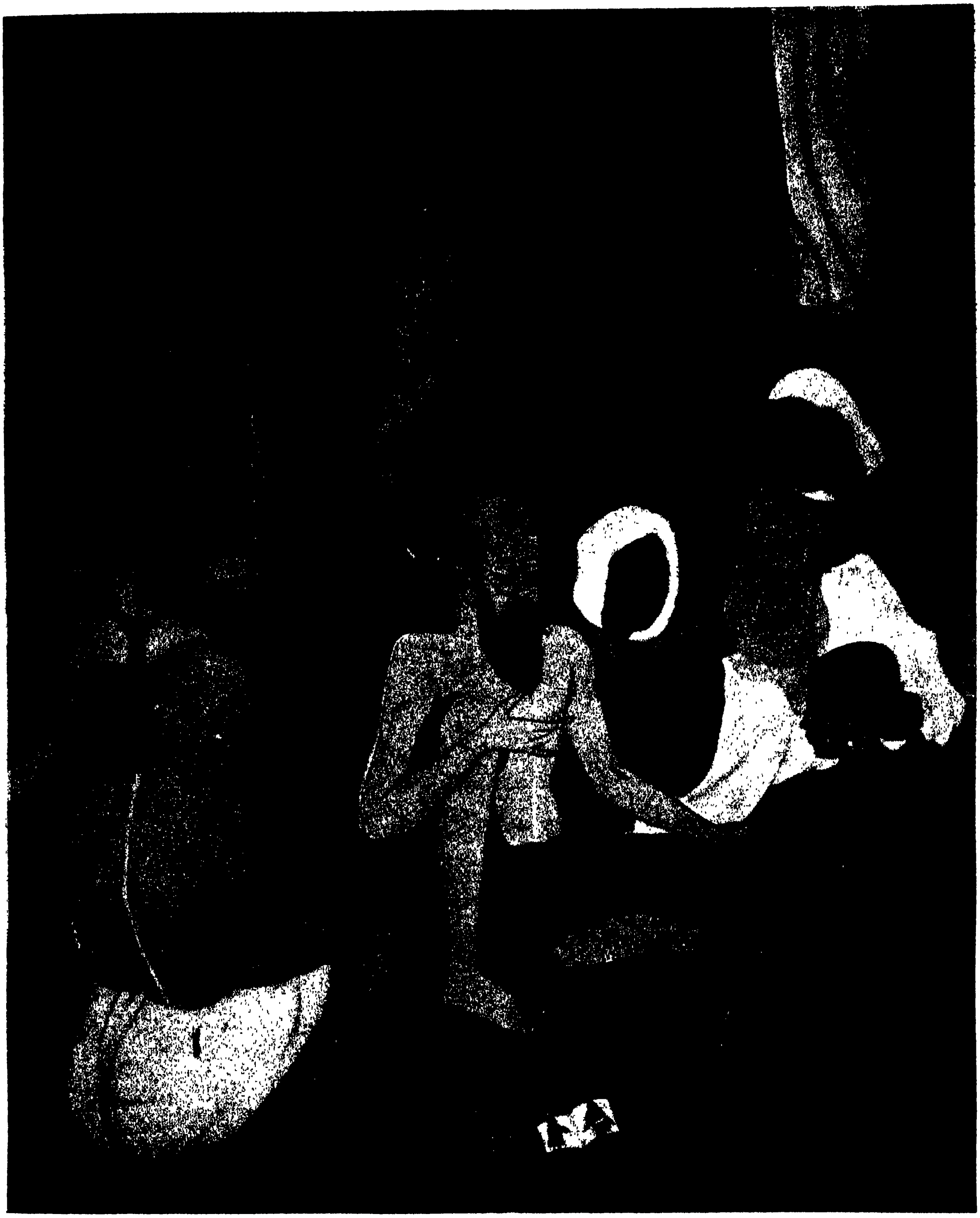
মাঝে নদী। সহযাত্রীদের মানা না শুনিয়া সেখানে বসিয়া পড়িলাম।

৬০০ ফুট নীচে নামিলাম। হুড়হুড় শব্দে তরঙ্গহীন নির্ম্মল জলরাশি চলিয়াছে। এই সুবর্ণরেখা নদী ছোট-নাগপুরের পাহাড় হইতে উৎপন্ন। মেদিনীপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগ দিয়া বালেশ্বরের ভিতর হইয়া বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! নয়ন মন স্বার্থক হইয়া যায়। দূরে শ্যামল বনানী—তাহার ভিতর দিয়া পাহাড়ের বুক চিরিয়া এ কি এক অমৃতের স্রোত। ঝরণা

একটি নয়, দুইটি নয়—বহু। কতরূপে কতভাবে অবিরাম জলধারা পড়িতেছে। পাথরের ছোট চাপগুলি একটির উপর অপরটি সেই স্রোতের এদিকে, ওদিকে, মধ্যে—নিকটে, দূরে—কে যেন অপূর্ব্ব বিন্যাশকৌশলে থরে থরে সাজাইয়া দিয়া গিয়াছে। বহু বৎসর পূর্ব্বেও যাঁহারা দেখিয়াছেন—এই-রূপই দেখিয়া গিয়াছেন। অবিরত স্রোতধারায় এ সবাকার কি ক্ষয় বৃদ্ধি নাই! নদী বাহিয়া—খালি পায়ে চলিতেছি প্রধান ঝরণার দিকে উত্তরমুখে। ওপারে গেলাম। উল্লাস-মুখর—এক ভিন্ন রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। অপরিচিত মুখ বহুযাত্রীদল। সাহেব, হিন্দু, বাঙ্গালী, পশ্চিমা, মুসলমান, মাড়োয়ারী—মেয়ে পুরুষ এঁরা সকলেই এপার দিয়া রাঁচী হইতে আসিয়াছেন। ম্যাডান থিয়েটার্স হইতে একদল লোক ক্যামেরা লইয়া রিল্ প্লেটে স্যুটীং লইতেছিল। তাহাদের একটি লোক বনমানুষ সাজিয়া সম্মুখে ছুটাছুটি করিতেছিল। এক সাহেবযুগল, একটি হিন্দু বাঙ্গালী-যুগল—অনেক খাদ্য লইয়া সেবানন্দে মগ্ন। এক হিন্দুস্থানী-যুগল রন্ধনরত; প্রায় সের পনের ছানা আটার তাল এনেছিল। প্রপাতের শব্দ যেখানে অত্যন্ত বেশী—সেই স্থানটিতে চলিলাম, এক একখানা প্রকাণ্ড পাথর, তার উপর আর একখানা। কোথাও বাহিয়া—কোথাও বা লাফাইয়া উঠিতে হইয়াছিল। কেড্ জুতা ও লাঠি থাকিলে অনেকটা নিরাপদ—নতুবা হাত পা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা আছে বুঝিলাম। নিকটে গিয়া দেখিলাম এক বিস্ময়কর দৃশ্য। প্রায় ৩০০ ফিট উচ্চ পাহাড় হইতে নিচে পাথর বক্ষে অজস্র ধারায় জল পড়িতেছে। যেন পাঁচ ছয়টি সিঁড়ি বাহিয়া কাহার প্রশস্ত প্রস্তরবক্ষে এই জলরাশি পড়িতেছে। বোধ হয় সেটি তৃতীয় ধাপ হইবে, উপর হইতে আন্দাজ ২০০ ফিট। সেখানে আকাশব্যাপী রেণুকণা—সূর্য্যালোকে সপ্তবর্ণের বৈচিত্র্য! তাহা ভেদ করিয়া এপার হইতে পারাবতশ্রেণী ওপারে উড়িয়া যাইতেছে। শেষ পাদে জলরাশি যেন হাজার হাজার মন পেঁজা তুলার ন্যায় আকার ধারণ করিয়াছে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়মধ্যে এই দৃশ্যটির চিত্র আঁকিয়া লইলাম। দেখিয়া তৃপ্তি আর মিটে না। তৎপরে অপেক্ষাকৃত বেশী জলে সকলে মিলিয়া স্নান করা গেল। কেহ কেহ আহ্নিক সারিয়া ভক্তিভরে পিতৃতর্পণাদি করিলেন। স্রোতে দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। চোরা বালিতে পা পুঁতিয়া যাইতে লাগিল। জলের মধ্যে পাথরের অত্যন্ত ধার। এইরূপ একটি পাথরে পা কাটিয়া গেল। একখণ্ড পাথরের উপরে আসিয়া বসিলাম। সহ-যাত্রীরা দারুণ ব্যগ্রভাবে মৃৎপাত্রে স্থিত জলখাবারের ভার লাঘব দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিলেন।

এইবার ফিরিতে হইবে। প্রকৃতিসুন্দরীর অব্যক্ত লীলা-নিক্বণ অন্তরের কন্দরে যে উৎসবানন্দ তুলিয়াছে তাহা যেন অফুরন্ত হয়। শ্রদ্ধানত হইয়া এই প্রার্থনা জানাইলাম বিশ্ব-স্রষ্টার চরণে। রাজরপ্পায় যাইবার প্রলোভন লইয়া ফিরিতে-ছিলাম। রূপাতীতের-রূপ কেহ যদি কল্পনা করিতে চাহে, তবে তাহার পক্ষে এইসব অপরূপ-রূপ অবশ্য দর্শনীয়। ৪৮ মিনিট মধ্যেই অন্য সহযাত্রীরা পায়ে হাঁটিয়া পাহাড় হইতে অবতরণ করিলেন। আমাদের ডুলি পৌছিল প্রায় সওয়া ঘণ্টায়—অপরাহ্ণ তিনটায়। তদ্দেশে আজ 'পেঠিয়া' (হাট) বসিয়াছে। আমাদের পথপ্রদর্শক ও ডুলিবাহকদের প্রত্যেককে ॥৶০ আনা হিসাবে বকশিস দেওয়া হইল। হাটে আমাদের সকলকে বলিল—"ড্যাম্ চি" বাবু (অর্থাৎ ড্যাম-চিপ্ =অতি সস্তা)। কলিকাতার লোক এখানে আসিলে সব জিনিষের দামই সস্তা মনে করিয়া ড্যাম-চিপ্ বলেন, এজন্য পাহাড়ীয়ারা তাঁহাদের নাম দিয়াছে ড্যাম-চি! তৎপরে গোলা হইয়া রাজরপ্পা দর্শনে গেলাম।

গোলা একটি ছোটখাটো সহর। হাসপাতাল, থানা, মাইনর স্কুল, রাধাকৃষ্ণের একটি সুদৃশ্য মন্দির প্রভৃতি সেখানে আছে। ২।৪ ঘর মুসলমানও বসবাস করে। গোলা হইতে ৮ মাইল উত্তরে ভেড়া নদী ও দামোদরের সঙ্গমস্থল। সেই স্থানেই একটি পাথরের মন্দির। মন্দিরের দশটি ধাপ। মন্দিরের মাথায় ত্রিশূল। তাহার প্রশস্ত চত্বরে দুইটি ভাঙ্গা মিনার লুপ্তবিভবের সাক্ষ্য দিতেছে। স্থানটির নির্জ্জনতা ভীতিপ্রদ। বৌদ্ধতান্ত্রিক বা কাপালিকদের স্থাপিত। তীরে গভীর বনানী। দক্ষিণ দিক হইতে ভেড়া এবং পশ্চিম দিক হইতে দামোদর আসিয়া একত্র মিলিত হইয়াছে। পরে এই যুক্ত স্রোত পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। পাহাড় কাটিয়া চলিতেছে এই স্রোত। যেন পাহাড়ের পঞ্জরমালা চিরিয়া দামোদরের গন্তব্য পথ বাহির হইয়াছে। অতি শুষ্ক, কঠোর ও বন্ধুর সেই পথ। সরস মাধুর্য্য কিছুমাত্র নাই। পাহাড় ভেদ করিয়া নদী বাহির হইয়াছে।



জ্যোতিষী

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

পাহাড়ের এই পথটি ভঙ্গপ্রবণ, চক্‌চকে, করাতের মত ধারালো স্তরমালায় সজ্জিত বলিয়া মনে হয়। তাহার তলদেশে রক্তশূন্য গভীর সাদা বুকে একটি ক্ষীণ ধারা প্রবাহমান। এই কি সেই বরষার যৌবনস্ফীত বহুধ্বংসী দামোদর? যেন শীতবৃদ্ধ প্রাণমাত্রসম্বল সে আজ। সারাটি অন্তর উদাসপ্রায় হইয়া যাইতেছিল। তাহার উপরে প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ঐ ছিন্নমস্তা যেন সত্যই ধ্বংসলীলার দ্যোতকস্বরূপা। অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য হইয়াছে—স্থানের সহিত অধিষ্ঠাত্রীদেবীর। যে সাধক এই দেবীমূর্ত্তি স্থাপনের জন্য স্থান নির্ব্বাচন করিয়াছেন সেই শিল্পী এবং সাধক ভাগ্যবান ব্যক্তি। এমন সমাবেশ না হইলে বোধ হয় মন্ত্রস্ফূর্ত্তি সম্ভবপর হয় না। মন্দিরের নিম্নে দুইটি যূপকাষ্ঠ। একটি ছাগ বলির জন্য। পুরোহিত বলিলেন—গত নবমীতে সেখানে শতাধিক "বপড়া" বলি হইয়াছে। অন্য হাঁড়িকাঠটিতে একটি মহিষ বলি হইয়াছে। বলি প্রায় নিত্য হয়। দেখিলাম—রক্তাক্ত যূপকাষ্ঠ। মূর্ত্তির বামহস্তে মুণ্ড ও দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, দুইদিকে দুই যোগিনী মূর্ত্তি। সমস্ত মূর্ত্তিই একখণ্ড প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ। রামগড়ের রাজার এলাকা-মধ্যে এই মন্দির। বর্ষায় দামোদর প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে। তখন ওপারে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। এখনও দিনে একবার মাত্র পূজা করা হয়। পূজারিগণ ঘোষাল উপাধিকারী, নিজেদের বাঙ্গালী ও কালীঘাটের পাণ্ডা-বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। রামগড়ের রাজা তাঁহাদের 'হেসাপুরা' গ্রামখানি নিষ্কর প্রদান করিয়াছেন। তাঁহারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কালীঘাট হইতে এখানে আগমন করেন বলিলেন। দেখিলাম একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে এবং দুইটি গবাক্ষ পাথরের নুড়িতে পরিপূর্ণ। এরূপ প্রস্তরখণ্ড মানস সিদ্ধ হওয়ার পর এদেশের লোকরা মন্দির গবাক্ষে রাখিয়া যায় শুনিলাম। নিকটেই একটি অতিথিশালা নির্ম্মিত হইতেছে দেখিলাম। সন্ধ্যা আগতপ্রায় হওয়ায় আমরা ফিরিয়া চলিলাম। যে সব দর্শক রাঁচী হইতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা তৎপূর্ব্বেই ফিরিয়া গিয়াছেন। সহযাত্রীগণ অনেকেই রং বেরঙের নুড়ি-পাথর সংগ্রহের চেষ্টা করিলেন। আবার ট্যাক্সিতে আরোহণ করা গেল। রাজরপ্পা হইতে এই ৮ মাইল ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা সংস্কার-বিহীন। সন্ধ্যার পর গোলায় আসিয়া ডাক্তারখানায় পায়ের ক্ষতটা ড্রেস করিয়া লইবার জন্য মোটর থামাইলাম। সেখানকার বাঙ্গালী ডাক্তারবাবু তখন নিকটেই রেলষ্টেশনে তাঁহার বন্ধুর বাসায় নিমন্ত্রণ রক্ষায় বাহির হইতেছিলেন। তিনি আমাদের সাদরে 'চা' পান করাইলেন। রামগড়ে তাহার রেস্তোরাঁর বাহিরে 'রামজী' অপেক্ষা করিতেছিল। সেদিন ফিরিবার সময়ে কি মনোরম জ্যোৎস্না। যেন গলিত রজতধারায় দিগন্ত পরিস্নাত হইতেছিল। পুরাদমে গাড়ী দৌড়াইতেছিল। অমিয় ও সুধীর মাঝে মাঝে দু'একটি কথা কহিতেছিল, বাকী সকলেই স্তব্ধপ্রায় ছিলেন। আমার চিত্ত তখন দুইটি ভিন্ন স্থানের বিভিন্ন রূপ—স্থায়ী আলেখ্য অঙ্কনরত। বাড়ীর কাছে আসিয়া মোটারের ডাকে যে। স্বপ্ন হইতে জাগ্রত হইয়াছিলাম।



অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

(১০)

মেঘ করেছে ঘটা করে, আঁধার সমস্ত পৃথিবীটাকে গ্রাস করে রাত্রির মত করে ফেলেছে। নেই শশী, নেই তারকা-রাশি, নেই সূর্য্য, নেই রাস্তার বৈদ্যুতিক আলোক, নেই বস্তিতে কোন স্তিমিত প্রদীপ শিখা। আছে মেঘের গম্ভীর চাপা নিঃশ্বাস, বাতাসের শোকতপ্ত দীর্ঘশ্বাস। নেই রাত্রির নির্জ্জনতা, নিঝুমতা, নেই দিনের কোলাহল। না আছে স্বচ্ছ উজ্জ্বল আলোক, না আছে নিকষ আঁধার। হচ্ছে না বর্ষণ, হচ্ছে না তুফান, খাচ্ছে না মেঘে মেঘে ধাক্কা, করছে মেঘে মেঘে কোলাকুলি, মেঘের ওপর মেঘ জমে প'ড়ছে ঢ'লে।

গঙ্গাবতী মেয়ের অসুখের জন্য চার পাঁচ দিন যাবৎ কাজে যেতে পারে নি। হাতে জমানো টাকাকড়ি বিশেষ কিছু ছিল না, যৎসামান্য বহু কষ্টে শিষ্টে যা জমিয়েছিল তা মেয়ের পথ্য যোগাতেই খরচ হয়ে গেছে; নিজে কোন দিন দু'বেলা খেতে পায় নি, একবেলা উদর পূর্ণ করে খাবারের সংস্থান ছিল না, ধার করে কোন ভাবে এ কয়েকদিন চালিয়েছে। শারীরিক মানসিক কি যে দুর্দ্দশা দুরবস্থা গিয়েছে এ কয়েকদিন—তা বর্ণনা করা যায় না।

হাতে এক পয়সা নেই, ধারও মিললো না। মেয়েকে একটু ভাল দেখে গঙ্গাবতী কাজে যেতে মনস্থ করল; কাজে যাওয়া ভিন্ন উপায় নেই। মেয়েকে একটু আফিম্ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে মিলে গেল। ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে, দুশ্চিন্তায়, শারীরিক পরিশ্রমে শরীর বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে, তাঁতের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, শরীর কেবলই ঢলে পড়ছে। দেহ মন চায় দীর্ঘ বিশ্রাম, ভাল পর্য্যাপ্ত-পরিমাণ খাদ্য, সুকোমল শয্যা। উদর ইচ্ছামত সুস্বাদু খাদ্যের লোভ ছাড়লেও দেহ মন কিছুতেই বিশ্রাম, নিদ্রার লোভ ছাড়তে পারছে না। সে ভাগ্য তার নেই, অভিশপ্তদেরও নেই সে ভাগ্য। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, গতর খাটার মূল্য নিতে হবে, তারপর ক্ষণিকের বিশ্রাম—সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কিঞ্চিৎ প্রতিকার। তাঁতের পাশে দাঁড়িয়ে কেবলই ঝিমোচ্ছে। মাকুর ঠাস্-ঠাস্ শব্দে এন্‌জিনের ঘস্-ঘস্ শব্দে চমকে ওঠে, অনবরত শব্দ ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যায়। ধীরে ধীরে অনুভূতির বাইরে চলে যায়, কখনো পড়ে ঢলে, জীবন্ত হয় চমকে, ব্যথা পেয়ে। কেউ কেউ ওপরওয়ালার চাঁটা খেয়ে, গুঁতো খেয়ে—'উঃ' করে ভীষণভাবে আঁৎকে উঠে।...

গঙ্গাবতী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলো—মেয়ের জ্বর হঠাৎ বেড়ে গেছে, যন্ত্রণায় ঘুম ভেঙ্গে গেল, আকুলি-বিকুলি করে মাকে খুঁজছে, পেলে না—প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল। গঙ্গাবতী 'এই ত আমি' বলে সাঁ সাঁ করে ছুটে গিয়ে সন্তানকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে তাঁতের সঙ্গে ধাক্কা খেল। ধাক্কা লেগে তন্দ্রা ভেঙ্গে গেল, চেয়ে দেখে সূতা ছিঁড়ে গেছে, মাকু সূতায় জড়িয়ে আছে। একটা বড় নিঃশ্বাস অতি কষ্টে ছেড়ে যন্ত্র বন্ধ করে মাকু ঠিক করে দিলে, সূতা ঠিক করে দিয়ে আবার যন্ত্র চালিয়ে দিলে। নিঃশ্বাসটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ, কিন্তু যন্ত্র চললো ঠিক মত।

মিল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাবতীর ওপর থেকে তলব পড়ল। তলব শুনে গঙ্গাবতী ভীষণ দমে গেল। এ কয়েকদিন সে কাজে আসতে পারে নি, সে জন্য হয় তো কর্ত্তৃপক্ষ ক্রুদ্ধ হয়েছেন, চাকরির জবাব দিয়ে দিতে পারেন। যদি চাকরির জবাব হয়ে যায় তা হলে উপায়?

শ্যামজী গঙ্গাবতীকে অনুপস্থিতির জন্য খুব শাসালেন, চাকরি যাবার ভয় দেখালেন। অবশ্য পুরুষদেরও শারীরিক বা পারিবারিক অসুখ-বিসুখের জন্য অনুপস্থিত থাকলে চাকরি যায়, নির্য্যাতন সহ্য করতে হয়। গঙ্গাবতী শ্যামজীর বক্তৃতা শুনে অধৈর্য্য হয়ে পড়ল। রীতিমত রাত্রি হয়ে গেছে, কখন মেঘ আরম্ভ হয়েছে ঠিক নেই, ঘরে মরণ শয্যায় রুগ্ন শিশু, এতক্ষণে ক্ষুধায় জেগে উঠেছে। আঁধার ঘরে

জননীকে খুঁজছে, কেবল খুঁজছে—পেলে না, ভয়ে ক্ষুধার জ্বালায় চেঁচাচ্ছে, জননীর কোন সাড়া পেল না। দুর্ব্বল শরীরে আর চেঁচাতে পারছে না—গলার স্বর বন্ধ হয়ে গেল; উঃ! কি করুণভাবে গোঙাচ্ছে। তবু জননী নেই, স্নেহনির্ভর, সর্ব্বসান্ত্বনাময় বাহুডোর নেই, মধুস্রোতা স্তনযুগল নেই, একজন পাড়াপড়সী পর্য্যন্ত নেই। একা, অতি একা—নির্জ্জন আঁধার ঘরে। ঐ ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগলো! কি প্রচণ্ড দাপট? কি গুরু হুঙ্কার! কি নিকষ-আঁধার। শিশু যে আর গোঙাতে পারছে না! বুঝি অচেতন হয়ে পড়ল। কেউ নেই, হায় কেউ নেই! গঙ্গাবতী হঠাৎ উঠলো চমকে! বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলছে, ঘরখানি স্বচ্ছ তীব্র আলোকে উজ্জ্বল। কত আকাশ-পাতাল প্রভেদ সেই কুঁড়েঘরে আর এখানে। গঙ্গাবতী প্রভুকর্ত্তার পানে তাকিয়ে দেখলে তিনি হাঁ করে তাকিয়ে আছেন, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন চুষে নিচ্ছেন। গঙ্গাবতী তাড়াতাড়ি বের হয়ে এল বাইরে।

রাত্রি সাতটা। গঙ্গাবতী দ্রুত হেঁটে চললে, ঝড় এলো বলে, ঝড়ের আগে তাকে জিনিষপত্র কিনতে হবে, তারপর বাড়ী যেতে হবে। প্রবাদ আছে—'রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে!' গঙ্গাবতীরও হল তাই। শ্যামজী যতদিন পর্য্যন্ত তার প্রতি আসক্ত থাকবেন ততদিন তার চাকরি যাবে না, আর যতদিন যৌবনকুসুম সৌরভ ছড়াবে ততদিন চারিদিক বিপত্তিতে ঘিরেই থাকবে। তাই বুঝি গেট থেকে বের হতে না হতেই নামলো বাদল মুষলধারে।

রাত্রি কেবল বেড়ে যাচ্ছে, ঝড়ো বাদল থামছে না! রাস্তায় লোক চলাচল এক রূপ বন্ধ হয়ে গেছে, মাঝে মাঝে দু'একটা মোটর গাড়ী ভঁস্-ভঁস্ করে বায়ুবেগে চলে যাচ্ছে, কচিৎ পদাতিকের ভীত চঞ্চল পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে! গঙ্গাবতী কি করবে? জিনিষপত্তর না কিনতে হলে একদৌড়ে বাড়ী চলে যেতে পারতো? কিন্তু রোগীর পথ্য নিজের খাদ্য যে কিনতেই হবে! এমন দুর্য্যোগে কোথায় পাবে বার্লি সাগু, কোথায় পাবে আটা ছাতু? সব দোকান যে বন্ধ হয়ে গেছে! উপায় নেই! সহসা মেয়ের মুখখানা চোখের ওপর ভেসে উঠলো। চমকে উঠে, দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে, বুকের ভেতর হাতুড়ীর ঘা পড়ে ধপ্ ধপ্ করে! সময়ও যাচ্ছে দ্রুতগতিতে ছোটে! ভাবলে বাড়ীই ফিরে যাবে। বুক ছিঁড়ে, স্তন নিঙড়ে সন্তানকে খাওয়াবে, নিজে উপোষ করবে, তবু যেতে হবে। কিন্তু তার পর দিন? সৌভাগ্য ত' আকাশ থেকে ঠিকরে পড়বে না! মিলে আসবার পূর্ব্বে ত' বাজার করে নিজে খেয়ে ও মেয়েকে খাইয়ে আসবার সময় পাবে না! তবে উপায়? উপায়, উপায়, উপায়—কি করা যায়, কি করি, গঙ্গাবতী উত্তেজিত হয়ে পড়লো, শরীর শিথিল হলো, ইন্দ্রিয় সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। কোন কিছুই ঠিক করতে পারলে না। ঢং-করে সাড়ে আটটা বাজলো। সর্ব্বনাশ! গঙ্গাবতীর ভয় হলো মেয়েটা হয়তো এতক্ষণে মরে গেছে! মুহূর্ত্তে সকল বিপত্তি চলে গেল, কঠিন সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। একটু এদিক ওদিক না তাকিয়ে, একবার বর্ষাঝরা আকাশ পানে না চেয়েই মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ীমুখে চল্‌লো।

গেটের পাশে একখানা সীডেন বডীর গাড়ী। মোটর-চালক গাড়ীর পাশে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে, আর অনুসন্ধিৎসু নয়নে মিলের ভেতর পানে তাকিয়ে আছে। গঙ্গাবতী কোন কিছুর খেয়াল না করে মোটরচালকের পাশ ঘেঁসে চল্‌লো, মোটরচালক পথ আটকিয়ে জিজ্ঞাসিল—অত দেরীতে যে? খুব খাটুনি গেচে বুঝি?'

গঙ্গাবতী একটু নৈরাশ্যভাবে বল্‌লে—খাটুনি বেশী হয় নি, ছোটবাবু একটু দেরী করিয়ে দিলেন, তারপর পোড়া ঝড়োবাদল যে আরম্ভ হয়েছে, কিছুতেই থামছে না, কখন ক্ষান্ত হবে কে জানে!'

'এই ঝড়ো ঝঞ্ঝায় যাবে নাকি? আর একটু দেখে যাও!'

'না দাদা! মেয়েটার বড্ড অসুখ। গরিব মানুষ তাই মেয়েটাকে মরণ শয্যায় রেখে চলে এসেচি। এত রাত হ'য়ে গেল, তার ওপর মুষলধারে জল পড়ছে, বেচারীর যে কি হচ্ছে!' একটা বক্ষফাটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল। কত ব্যাকুলতা, কত ব্যস্ততা, কত অসহায়ের বেদনার নিঃশ্বাস কে বুঝতে পারে?

'বাচ্চার এত বড় অসুখে মা হয়ে একা ফেলে চলে আসতে পারলে? তোমরা কি সাংঘাতিক নারী বাছা! বাচ্চা হয় তো এতক্ষণে মরে ভূত হ'য়ে গেছে। সেদিন এমনই একটি ছেলে—'

গঙ্গাবতী বাতাসের মত কেঁপে উঠলো, বিভীষিকায় অভিভূত করে ফেল্লে। কোন কথা না বলে হন্ হন্ করে ঊর্দ্ধমুখে বাড়ী যাবার জন্য পা বাড়ালে।

মোটরচালক বাধা দিয়ে বল্লে—'আমি যে তোমাদের বাড়ীর পাশ দিয়ে এসুম, মেয়েটা কাঁদতে পারছে না, কেবল গোঙাচ্চে, দৌড়ে চলে যাও।'

'অদৃষ্ট—দাদা! অদৃষ্ট! আচ্ছা যাই।'

'এতদূর একা একা নির্জ্জন বিশ্রী রাত্রিতে যাবে? তুমি যদি যেতে চাও পৌছে দিয়ে আসতে পারি।'

'বলো কি দাদা? বাবু জানলে শেষটায় তোমার চাকরি যাবে! যাক্ ভাই! আশীর্ব্বাদ ক'রো!'

'না-না তোমার অত ভয় করতে হবে না। বাবু হ'লো মাতাল—অত হুঁশ কি থাকে। আমি এমনই বসে আছি, তোমার এ বিপদে একটু সাহায্য করতে পারবো না! আমার বড় মেয়ে যে তোমারই বয়সী!'

গঙ্গাবতী আর কোন দ্বিরুক্তি করলে না, পিতার বয়সী লোকের সঙ্গে যাব, তার মেয়ে যে তাকে খুব ভালবাসতো, এখনো শ্বশুরবাড়ী থেকে এলে রোজ ডেকে নিয়ে যায়। গঙ্গাবতী চট করে গাড়ীতে উঠে বসলো, তার প্রাণ বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলছে বাড়ীমুখে, মন চলে গেছে সন্তানের পাশে, প্রবল ইচ্ছে হচ্ছে দেহটাকে একলাফে সন্তানের পাশে নিয়ে যায়, পলকে সন্তানকে বক্ষে চেপে ধরে চুম্বনে প্রাণে অনন্ত, ক্ষিপ্ত, উন্মাদ ক্ষুধা ঢেলে দেয়। গাড়ী চলছে ভস্ ভস্ করে। একটু দ্বিধা নেই, একটু সঙ্কোচ নেই—এতই লোভ, এতই প্রবল আকর্ষণ। কোথায় চলছে, কোন পথ দিয়েই বা চলছে তার কোন লক্ষ্য নেই, সে শুধু জড়ের মত বসে আছে গাড়ীর এক কোণে—খোলা জানালা দিয়ে চেয়ে আছে বাইরের দিকে, দৃষ্টি উদাস, বাহ্যিক দৃষ্টি নেই, শুধু চেয়েই আছে—দেখছে না কিছু, ভাবছে পোড়া অদৃষ্টের কথা, কৃতজ্ঞতায় ধন্যবাদ জানাচ্ছে মনে মনে মোটরচালককে। ভাবছে—শুধু ভাবছেই, এরই মধ্যে যে কোথা দিয়ে কোথা চলে এলো এতটুকু টের পায় নি। এতক্ষণে যে হেঁটে বাড়ী যেতে পারতো। যখন বাহ্যজ্ঞান হলো তখন সে মহা-সর্ব্বনাশের আড়ম্বরপূর্ণ দোরে বন্দিনী। গাড়ীবারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে আছে। একটি বৈদ্যুতিক বাতি মিট্ মিট্ করে জলছে। আকাশে ইতস্ততঃ মেঘপুঞ্জ ছড়িয়ে আছে, মাঝে মাঝে কয়েকটা তারকা হীরকটুকরার মত ধক্ ধক্ করে জলছে। ধরণীর মহাশূন্য আবরণ জমাট আঁধার নয়, শুভ্রালোকে উদ্ভাসিতও নয়। আবছায়া আলোছায়া ছড়িয়ে রয়েছে। বাড়ীর পাশে বড় বড় বৃক্ষশ্রেণী, মানুষের তৈরি ছোট ছোট পাহাড়, ঝর্ণা, ফোয়ারা, পুষ্পে শোভিত লতায় পাতায় কুঞ্জ, রুচিমার্জ্জিত পুষ্প-উদ্যান, পল্লব-শাখায় কারিকুরি! হাসনাহানার মদির মাতাল বায়ে চারিদিক আমোদিত করে তুলছে। রজনীগন্ধা বিধবার শুভ্র হাসি নিয়ে স্বচ্ছ পবিত্র বাস ছাড়ছে।

গঙ্গাবতী সভয়ে দেখলে সে বাগান-বাড়ীতে বন্দিনী হয়েছে। মোটরচালক গাড়ীতে নেই, গাড়ীর পাশে শ্যামজী দাঁড়িয়ে আছেন। তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে খান খান হয়ে গেল, ভয়ে সমস্ত শরীর থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগল। আজ আর কোন নিষ্কৃতি নেই। সে যতই শক্তিশালিনী, স্বাবলম্বিনী, ক্ষমতাশালিনী, স্বাধীনা নারী হোক না কেন আজ আর কোন উপায় নেই, পরিত্রাণ নেই। সে যত বড় নারীই হোক, তবু সে নারী মাত্র। এমনই অবস্থায় পুরুষের পশুপ্রবৃত্তির নিকট যে কোন নারীই যে রক্তমাংসের একটা নারী-দেহ-তুল্য হয়! এমনই অবস্থায় শ্যামজীর পশুশক্তির নিকট জয়লাভ করা দৈবঅনুগ্রহ ভিন্ন উপায় নেই। কাকুতি-মিনতি, চোখের তপ্ত ফুটন্ত অশ্রুজল, সতীর তীব্র অভিশাপ, শারীরিক শক্তি—সব ব্যর্থ নিস্ফল। নির্জ্জন, নিঝুম রাত্রিতে, এ নরকতুল্য পাষাণ কারাগারে সে কি করে ত্রাণ পাবে? এ নরকপ্রাসাদ বহু সতীর সতীত্ব পূজা পেয়ে বড় হিংস্র হয়ে পড়েছে। ছলনা, কল-কৌশল সবই কি ব্যর্থ হবে? একবার যদি দৌড়ে বাইরে যেতে পারে তবে কি উপায় হবে না? এখনও ত' রাস্তায় লোক চলাচল করছে, হয়ত পরিত্রাণ পেলেও পেতে পারে!

শ্যামজীর মুখ থেকে বিলিতী মদের গন্ধ বেরুচ্ছে, চোখ দুটি ফোটা রক্তজবার মত লাল, অঙ্গ শিথিল, টলতে টলতে এগিয়ে এসে বললেন—'সুন্দরী! আমি তোমায় ভা-লো-বা-সি। ঐ'—কথা আটকে গেলো, লোলুপনয়নে চেয়ে রইলেন। কি ভীষণ চাউনি।

গঙ্গাবতী যেন কোন ভয় পায় নি, স্বেচ্ছায় এ পাপময় সুখ-সাগরে এগিয়ে এসেছে—এমনি ভাব দেখিয়ে বললে—

'আমার মেয়ের বড্ড অসুখ, খুব জ্বর বেড়েছে, বিষম কাঁদছে একা একা।'

'কিছু হয় নি, ও মিছে কথা; তুমি স্বচ্ছন্দে এসো সখি! কোন চিন্তা নেই, তাকে আজ রাত্রিতেই এখানে এনে দেবো।'

গঙ্গাবতী একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বল্লে—'আঃ বাঁচলুম। দেখো; মেয়েকে কিন্তু আজ রাত্রির মধ্যে চাই, নইলে আমি থাকবো না।' 'এক্ষুনি আনিয়ে দিচ্ছি,'—শ্যামজী শিথিলহস্তে দ্বার খুলতে খুলতে বল্লেন—'এসো পিয়ারী।'

গঙ্গাবতী শ্যামজীর হাত ধরে মোটর থেকে নামলো। শ্যামজী ধৈর্য্য আর রাখতে পারলেন না, দু'হাত বাড়ালেন জড়িয়ে ধরবার জন্য। গঙ্গাবতী গাঁ করে বজ্রের মত প্রকাণ্ড এক ঘুসি মারলে, শ্যামজী মাটির ওপর ঘুরে পড়ে গেলেন ধপ্ করে, নাক থেকে দর্‌দর্ করে রক্ত পড়তে লাগলো। মোটর-চালক ও ভৃত্য চুরি করে মদ এনে খুব আমোদ করে মদ খাচ্ছিলো, হঠাৎ চীৎকার শুনে 'কি হলো' বলে হোঁচট খেতে খেতে বাবুর নিকট ছুটে এলো। গঙ্গাবতী ততক্ষণে এক গলির মধ্যে আত্মগোপন করে ফেলেছে।

* * * *

গঙ্গাবতী মেয়েকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে কাল কোথায় পালাবে সেই মস্ত বড় কঠিন সমস্যা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছে, ঘুম এখনো ভাল করে পায় নি, একটু তন্দ্রা এসেছে মাত্র, হঠাৎ দরজা ভাঙ্গার শব্দে জেগে উঠলো—বজ্র-গম্ভীর ভীষণকণ্ঠে বল্লে—'কে? কি চাই?'

'দরজা খোলো।' গঙ্গাবতী শ্যামজীর কণ্ঠস্বর শুনে চিনতে পারলে, রুক্ষ স্বরে বল্লে—'ভালয় ভালয় ফিরে যান, নইলে আজ খুন করবো।'

'পিয়ারী! যত টাকা চাইবে ততই দেবো. যা চাও তাই দেবো।'

'তবে রে লম্পট বদ্‌মাইস! এক ঘুসিতে বুঝি শিক্ষা হয়নি!'

'ভালমানুষটির মত দরজা খুলে দাও, কেউ দেখবে না, কেউ টেরও পাবে না—তোমায় সোনাদানা, টাকাকড়ি দিয়ে ঢেকে রাখবো পিয়ারী।'

'দাঁড়া বদমাইস! ঠেঙ্গিয়ে সোনাদানা বের করাচ্ছি।'

'স্বেচ্ছায় রাজি হও ত' মঙ্গল—নইলে জোর করে নেবো, এবার আর ফাঁকি চালচাতুরী খাটবে না, কারও বাপের সাধ্য নয় এবার রক্ষা করে তোমায়।'

'খুন করে যদি ফাঁসি যেতে হয় তবে ফাঁসিই যাব; বড়লোক বলে আজ আর ডরাব না, এখনো পালাও—নইলে চেঁচিয়ে লোক জড় করবো।'

শ্যামজী দুমদাম করে দরজায় ঘা মারতে লাগলেন। গঙ্গাবতী একখানা ইঁট নিয়ে দরজার ওপরের ফাঁক দিয়ে শ্যামজীর মাথায় ছুড়ে মারলে। 'মা গো' বলে শ্যামজী মাটির ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

কারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, নিঝুম রাত্রি।

(১১)

গঙ্গাবতী শ্রীরাম মিলের কাজ ছেড়ে দিয়ে তার পরদিনই শহরের অপর প্রান্তে চলে আসে। শ্যামজীর ভয়ে এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে নি। শ্যামজীর দ্বারা কোন কিছু বিশ্বাস নেই, হয়ত ব্যর্থ হয়ে অপমানে মরিয়া হয়ে নতুন জাল বিস্তার করে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে নিয়ে যাবে, বলীর কাছ থেকে মুক্তি পাবার আর কোন উপায় থাকবে না। কি হবে? কোথায় যাবে? কোথায় পাবে আশ্রয় মাথা গুঁজবার? কোথায় পাবে একমুষ্টি খাবার? জানে না, তবু পোঁটলা-পুঁটলী নিয়ে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অজানা পথে চললো। সে জানে, ভাল করেই বুঝতে পারে যে তার স্থান নেই, যেখানে যাবে সেখানেই ক্ষীণজীবী পতঙ্গ অগ্নিশিখায় ঝাঁপিয়ে পড়বেই। নির্দ্দিষ্ট পতঙ্গের আক্রমণ ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু রূপ-পিপাসী পতঙ্গের আক্রমণ চলবেই। চব্বিশটি ঘণ্টার আয়ু নিয়ে পোকা জন্মায়, ওরা কি আগুনের শিখা দেখে দূরে থাকতে পারে? ঝাঁপিয়ে পড়ে, রূপের মোহে অকালে প্রাণ হারায়। গঙ্গাবতী জানে যে যতক্ষণ দীপ্তি আছে ততক্ষণ আলোক ছড়াবেই, সঙ্গে সঙ্গে রূপ-পাগলার অত্যাচার হবেই—তবু চল্‌লো অচীন পথে। জমিদারের লোক যখন আদালতের সাহায্যে বাড়ী-ঘর নিলাম করতে আসে তখন উপস্থিত বিপত্তিকে এড়াবার জন্য লোকে বেশি সুদে টাকা ধার করে। উপস্থিত বিপত্তিকে বাধা দেবার জন্য লোকে ভবিষ্যতের বড় বিপত্তি তৈরি করে বর্ত্তমান বিপত্তি এড়ায়। তেমনই গঙ্গাবতীও ভবিষ্যৎকে ভবিষ্যৎ রেখে রাস্তায় নামলো।

উদ্‌ভ্রান্তের মত সারা রাস্তায় ঘুরছিল, কোথায় যাবে ঠিক্‌, যেতে হবে সুনিশ্চিত—কিন্তু কোথায়, কিসের ভরসায় তা ঠিক করতে পারে নি। যাওয়া যে কত কঠিন, মানুষের পশুপ্রবৃত্তি থেকে নিজের পরিপূর্ণ যৌবনের অপূর্ব্ব সুন্দর দেহটা রক্ষা করে জীবন চালানো যে কত কঠিন, কত বাধাবিঘ্নময়—তা সে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে, তাই বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, উদ্‌ভ্রান্ত। মেয়েটা তার জীবনের মস্ত বড় কাঁটা। যদি সে একা হতো, কোন বাধা না থাকতো, তবে সে, সে রাত্রিতে শ্যামজীকে উচিত শিক্ষা দিয়ে হাসিমুখে মরণকে বরণ করতে পারতো। মরণ তার পক্ষে অসম্ভব, তাকে বাঁচতে হবে, ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে সংসারের নির্ম্মম অত্যাচারের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে চলতে হবে, পাষণ্ড দুর্ব্বৃত্ত পুরুষগুলির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে।

এমনি মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে গঙ্গাবতী পাগলিনীর মত ইতস্তত ঘুরছিল—হঠাৎ কিশোরীবাঈর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কিশোরীবাঈ এখন আর রূপসী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতী নয়। এ কয়েক বছরে জীর্ণা শীর্ণার মত প্রায় হয়ে গেছে। এখন মিলে বা রাস্তাঘাটে গতর খাটায় না; কুলিমজুর পাড়ায় ছোট একটা মুদী-দোকান করে ব্যবসা করে। দোকানের সামান্য আয়ে তার একার খাওয়া-পরা বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তার কোন ছেলেমেয়ে হয় নি, কোন আত্মীয়স্বজনও নেই, ছিলও না কোনকালে। সংসারের বৈচিত্র্যলীলায় যখন নেমে আসে তখন ছিল শুধু রূপকথার মায়াপুরী, সেই মায়াপুরীতে নীড় বেঁধে ছিল সে আর তার স্বামী। তারা মদিরার নেশায় ভরপুর হয়ে চলছিল, অদৃষ্ট এত বড় সৌভাগ্য সইতে পারলে না। স্বামী মিলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করত, কখনও ক্লান্তিবোধ করত, উদ্দীপনায়, ঘরের মধুমিলনের কল্পনায় সব কিছু উপেক্ষা করত। টাকা-রোজগারের মানুষমারা পরিশ্রমকে হাসিমুখে বরণ করত—কারণ কষ্টার্জ্জিত অর্থ সে স্ত্রীর হাতে গুঁজে দিতো। কিশোরী প্রাণপণে স্বামীর সেবা করত, নিজের সত্তা উপেক্ষা করে স্বামীর ক্লান্তি শ্রান্তি দূর করত। দু'জন দুজনকে এতো ভালোবাসত যে সাংসারিক দুঃখকষ্ট, বাধাবিপত্তি, অশান্তি কাকে বলে উপলব্ধি করতে পারতো না, ভাববার অবকাশ পেতো না। কিশোরীবাঈ অতি প্রত্যুষে উঠে ঘরদোর পরিষ্কার করে ঠিক সময়মত স্বামীকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিত, স্বামী হাতমুখ ধুয়ে ভেজা চানা বা পাকড়ী খেয়ে মিলে ছুটে যেত; কিশোরী এটা ওটা যোগাড় করে বড় সাধে রান্না করে বারটার পূর্ব্বেই রোদ, বৃষ্টি অবহেলা করে খাবার নিয়ে মিলে যেত। নানা কথা বলে স্বামীকে খুব বেশি করে খাওয়াতো, কোনদিন হয়তো তার খাবার কম পড়তো। কিশোরী যেদিন খাবার নিয়ে যেতে পারতো না—সেদিন তার স্বামীর খাওয়া মোটেই হ'ত না, কিশোরীরও কোন কিছু ভাল লাগতো না। কিশোরীর স্বামী মিল থেকে ফিরে কোথাও বের হ'ত না, ঘরের কোণে বসে কেবল প্রেমালাপ করত, পাড়া-পড়সীর ঠাট্টা বিদ্রূপকে ওরা কখনো গ্রাহ্য করত না। এমনই সুখের মধ্যে, তৃপ্তির মধ্যে প্রেমে আত্মভোলা হয়ে দু'জনের জীবন চলছিল, কোনদিন একটুর জন্য একটু মন্দা পড়ে নি, হঠাৎ সুখের নীড়ে হল বজ্রাঘাত। সেই যে সর্ব্বনেশে দুরদৃষ্টের সূত্রপাত হল—চরমে না পৌঁছে থামলো না। তারা শ্যামজীর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে শ্রীরাম মিল ছেড়ে রাধাকিষণ মিলে চলে আসে। সুন্দরী যুবতীর সর্ব্বত্র বিপদ। প্রথম দর্শনেই কিশোরী বড়বাবুর কুপুত্রের লালসাময় মারাত্মক নজরে পড়ে যায়।

লোভে প্রলোভনে কিশোরীবাঈ রাজি হয় নি, অতি তুচ্ছভাবে টাকাকড়ি জিনিষপত্তর প্রত্যাখ্যান করেছিল, মুখের ওপর যা-তা বকে তাড়িয়ে দিয়েছিলো, এমন কি ভয় দেখান সত্ত্বেও পাপপথে, লোভের পথে যেতে রাজি হয় নি, দর্পভরে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিল। সামান্য একটা কুলি রমণীর দর্প, উপেক্ষা, অপমান বড়বাবুর ছেলে সইতে পারলেন না, পরিষদবর্গের পরামর্শে মরিয়া হয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। মান সম্মান ভুলে গুণ্ডা পাঠালেন কিশোরীকে ধরে আনতে। গুণ্ডারা স্বামীর বুক থেকে কিশোরীকে ছিনিয়ে নিতে পারে নি। পাঁচটি বলিষ্ঠ গুণ্ডা জখম হয়ে কোনভাবে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গিয়ে রক্ষা পেয়েছিল। তারপর একদিন নিঝুম নির্জ্জন নিকষ-আঁধার রজনীতে কিশোরীর স্বামীর বক্ষে নির্ম্মম, দুর্জ্জয় অস্ত্রাঘাতে প্রাণ বায়ু কেড়ে নিয়ে যায়। স্বামীর মরণ

আর্ত্তনাদে কিশোরী জেগে দেখে সব শেষ, গুপ্তঘাতক নেই, অস্ত্র নেই, সাড়া শব্দ নেই, শুধু একটি মৃতদেহ, টগ্‌বগ্‌ করে উথলিয়ে রক্তের ফোয়ারা বের হচ্ছে, ধীরে ধীরে সব থেমে যায়। নিশাচর পাখীও ডাকে না, কাদের যেন চাপা কান্না শতশত সহস্রসহস্র স্পন্দনে গুমরিয়ে গুমরিয়ে বের হয়।

পুলিস নরঘাতকের কোন সন্ধানই করতে পারে নি, গরিব কুলিমজুরদের রহস্যময় হত্যার কোন কুলকিনারা করতে পারে নি, বিশেষ চেষ্টাও করে নি। বিনা অর্থে ভূতের বেগার খাটা কে করতে চায়? অর্থের প্রভাব ভিন্ন আবশ্যক হতে পারে না, অমানুষের এত বড় মারাত্মক বোকামী নেই।

সকলে ভুলে যাক্, পুলিস প্রয়োজন মনে না করুক, কিশোরী ভুলে নি, ভুলতে পারে না। তার চোখে মেয়েলী অবলা অশ্রু সরে নি, সে দুর্ব্বল জড় শিথিল হয়ে ধূলায় লুটায়নি, বিষাদের ছবি অবয়বে ধারণ করে মুশড়িয়ে পড়ে নি; গুলিবারুদ-ভরা কামানের মত চুপ করে থেকেছিল; অভিসারের ছদ্মবেশ পরে স্বেচ্ছায় হাসিমুখে বিলাসকুঞ্জে ঢুকেছিল। তারপর মহাসুযোগে চরিত্রহীন, মাতাল, পাষণ্ড নরঘাতক কুপুত্রের বক্ষখানা ছুরিকা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নেয়। মাতাল যখন উত্তেজিত হয়ে কিশোরীকে জড়িয়ে ধরেছিল কিশোরী যৌবনোত্তেজনায় ক্ষিপ্ত হয় নি, স্বামীকে হারিয়ে বিলাসকুঞ্জের মাতাল নেশায় ভুলে নি, সাঁ করে ছুরিকা বক্ষে বিদ্ধ করে দিয়েছিল। একটুকুও টলেনি, একটুকুও দ্বিধাবোধ করে নি, একটুকুও দুর্ব্বল হয়নি—পলকে ছুরিকার আঘাত করেছিল; মৃত্যুমুখে মাতাল এক ফোঁটা জল চেয়েছিল—কিশোরী ছুরিকা বিদ্ধ করে চাহিদা পূরণ করেছিল।

সেদিনের পর কিশোরীকে আর কেউ আহম্মদাবাদ শহরে দেখেনি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে বম্বে চলে আসে। ভাবে—অবশিষ্ট জীবন এই প্রার্থনা করবে যাতে পরজন্মে স্বামীকে কখনও না হারাতে হয়।

কিশোরীবাঈ গঙ্গাবতীর দুরবস্থা, দুর্দ্দশা, অত্যাচারের কাহিনী শুনে সাদরে নিজ গৃহে এনে আশ্রয় দেয়। দু'জন একই ধারার নারী বলে, মনের বিবেকের সাদৃশ্য হেতু কয়েক দিনের মধ্যে একজন অপরের আপনার লোক হ'য়ে উঠলো। দু'জনেই নারীত্ব উঁচু করে চলে, প্রাণান্তেও নিচু করতে চায় না, সতীত্বে অপমানে দুর্দ্ধর্ষ হয়—তাই দু'জনের এত মিল, এত ভালবাসা। কিশোরী গঙ্গাবতীকে সহোদরা ছোট বোনের মত ভালবাসে, গঙ্গাবতীও কিশোরীকে দিদির ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করে, বন্ধুর মত ভালবাসে। কিশোরী চারিদিকে খোঁজখবর নিয়ে গঙ্গাবতীকে একটি ভাল বাড়ীতে আয়ার কাজে ঢুকিয়ে দিলে, নিজে বাড়ীর ওপর ছোট দোকানখানা দেখাশোনা করে, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম্ম করে গঙ্গাবতীর মেয়েকে লালন পালন করে। এদের নতুন সংসারটা চলতে লাগল বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে। এদের যেন নেই অতীত, আছে শুধু ভবিষ্যৎ। দু'জনে গতর খাটায়, মিলিত রোজগারে সংসার চালায়, দু'জনে মিলে কল্পনা আঁটে যে ক্রমে দোকানখানা বড় করবে, গঙ্গাবতী তখন আর বাইরে কাজ করতে যাবে না, টাকা জমাবে—হিসাব মত খরচ করে যাতে মেয়েকে খুব ভাল ঘরে বিয়ে দিতে পারে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই আনবে, জামাই দোকান চালাবে, দু' শাশুড়ী মিলে সংসার চালাবে, নাতী-নাতনী নিয়ে সুখে দিনযাপন করবে।… এদের ভালবাসার সন্ধিস্থলে মাত্র একটি শিশু, তাই মেয়েকে নিয়ে হয় প্রীতির ভাগাভাগি, শিশুর সুন্দর দেহ বক্ষে জড়াবার জন্য হয় কাড়াকাড়ি। একটিমাত্র কুঁড়ি দু'টি কোমল পাতার মাঝে আছে আত্মগোপন করে। দূর থেকে বোঝা যায় না। কার সঙ্গে বেশী জড়িত হয়ে আছে—কুঁড়িখানা নিজেও বুঝতে পারে না সে কোনদিকে একটু হেলে আছে, কোনদিকে তার মন চায় হেলে পড়তে! পাতার সঙ্গে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে, এমন সম্পর্কে বাঁধা পড়েছে যে একটি পাতা বাতাসে সরে গেলে কীট এসে অকালে ধ্বংস করবে। এমনভাবে সুখে, স্বচ্ছন্দে, শান্তিতে চার পাঁচ মাস কাটলো, ভুলে এল অতীতের বিভীষিকা, নয়নের দৃষ্টিতে ভাসছে মাত্র রঙিণ আলোর মধুরিমা—এমনই সময় হঠাৎ ধেয়ে এলো জোয়ারের মত অশান্তি, জ্বালা, দুর্দ্দশা। নদীতে জোয়ার আসাই যে স্বাভাবিক।

কানাই জেলখানায় বড় কষ্টে ছিল, জেলখানা থেকে বেরিয়ে দেখে গঙ্গাবতী নেই, বন্ধুদের বাড়ীতে আশ্রয় চাইলে—কেউ আশ্রয় দিলে না। সারাদিন সারা রাত্রি

পথে ঘাটে অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে গঙ্গাবতীর খোঁজ পেলে। গঙ্গাবতীর অবস্থা দেখে জিব দিয়ে জল পড়তে লাগলো, টাকার স্বচ্ছলতা দেখে মাথায় দুষ্টুমী বুদ্ধি ভাল করেই খেললো! তোলা ভাতে সর্দ্দারী করবার জন্য দুষ্টুমী বুদ্ধির পথ খোলা করবার জন্য ভালমানুষ সেজে কিশোরীবাঈর দোরে ধর্ণা দিয়ে পড়লো। কিশোরীবাঈ কানাইর চেহারা দেখেই বুঝতে পারলে যে সে, যে সে মানুষ নয়; তাই খাল কেটে কুমীর আনতে চাইলে না। গঙ্গাবতী আবার ভুল বুঝলে, কানাইর মিষ্টি কথায় ভুলে গিয়ে স্বামীর স্থান ভিক্ষা চেয়ে আদায় করলে—সে যে সতী!

কানাই গতরে খেটে রোজগার করে, মজুরীর সব টাকা-পয়সা কিশোরীর হাতে দেয়। মাঝে মাঝে কিশোরীকে দোকানের বিষয় উপদেশ দেয়, নিতান্ত ভালমানুষের মত বলে যে গঙ্গাবতীর পোয়াতী অবস্থায় এখন আর কাজকর্ম্ম করা উচিত নয়। কিশোরী কানাইর কথাবার্ত্তায়, চাল-চলনে ধীরে ধীরে কানাইকে বিশ্বাস করতে লাগলো এবং মাসখানেক পরীক্ষা করে কানাইর হাতে দোকানের ভার দিলে। কানাই যদি গঙ্গাবতীর স্বামী না হত তবে কিশোরী কিছুতেই দোকানের ভার তার হাতে দিত না। যাক্ কিশোরীর সতর্কদৃষ্টিতে বসে চালাকচতুর কানাই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে দোকানের অবস্থা খুব ভাল করে দিলে। কিশোরী দোকানের এত ভাল উন্নতি দেখে গঙ্গাবতীকে কাজ থেকে নিয়ে এল এবং কানাইর ওপর দোকানের সকল ভার দিয়ে দিল। মাত্র দু'টি মাস গিয়েছে এর মধ্যে দোকান দেউলে হয়ে পড়লো, চারদিক থেকে ধার শোধ করবার কড়া তাগিদ এল। কিশোরীবাঈ এত বড় নিমকহারামী হটকারিতা সহ্য করতে পারলে না, ঝাঁটা মেরে মাতাল কানাইকে দূর করে দিলে।

কানাই গঙ্গাবতীর মস্ত বড় দুষ্টগ্রহ। কানাই অপমানিত হয়ে নিঃস্ব হয়ে হাড়ে হাড়ে চটে গেল, কিন্তু নিরুপায়—তাই চারদিকে অকথ্য দুর্নাম রটাতে লাগল কিশোরী ও গঙ্গাবতীর নামে। কানাই কিশোরীকে খুব ভয় পায়—তাই ওৎ পেতে থাকে, গঙ্গাবতীকে একা পেলেই জোর জবরদস্তি করে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়ে যায়। চিরদিন অত্যাচার করা যায় না, গঙ্গাবতী দৃঢ় হয়ে দাঁড়ালে, কিশোরীবাঈ সতর্ক দৃষ্টিতে পাহারা দিতে লাগল। কানাই বজ্জাতের চূড়ান্ত, অতি ধূর্ত্ত; যখন দেখলে জোর ছলনা করে সুবিধে করতে পারছে না তখন অন্য পথ ধরলে।

কিশোরী মেয়েকে কোলে নিয়ে একটা জিনিষ কিনবার জন্যে বের হয়ে গেছে, গঙ্গাবতী দোকানে বসে পাড়ার মেয়েদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ করছে—এমন সময় কানাই এসে পাণ্ডুর মুখখানা তুলে বললে—'কাল থেকে খাই নি!'

স্বামীর ক্লিষ্ট করুণ মুখ থেকে ভিক্ষা চাওয়ার কথাগুলি যেন গঙ্গাবতীর প্রাণে হুল ফুটালে। গঙ্গাবতীর করুণ, প্রেমময় চোখের কোণ দিয়ে দু'তিনটে বিষাদ অশ্রুফোঁটা অজ্ঞাতে ঝরে পড়ল। গঙ্গাবতী কিশোরীর নিষেধ সত্ত্বেও চুপি চুপি খাবার দিলে খেতে, চুপি চুপি পালিয়ে যেতে উপদেশ দিয়ে অনুরোধ করে দোকানে এসে বসলো। কানাই পেট ভরে খেয়ে, বেশ তাজা হয়ে গঙ্গাবতীর নিকট গম্ভীরভাবে এসে আদেশের স্বরে টাকা চাইলে। গঙ্গাবতী টাকার কথায় কোন ভ্রূক্ষেপ না করে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা কইতে লাগলো।

কানাই চটে উঠে রুক্ষ স্বরে বললে—'বড় যে গ্রাহ্য হচ্ছে না!'

'ভালয় ভালয় সরে পড়, এক্ষুণি দিদি আসবে!'

'দিদি ফিদি বাবা বহু দেখেছি, এখন টাকা দাও বের করে—নইলে এক থাপ্পড়ে'—

'যাবে কি-না বলো! লজ্জা করে না টাকা চাইতে, মরণ ভাল—।'

গঙ্গাবতী নিজের কথায় নিজেই চমকে উঠলো।

'মরণ! মরলেই ত' ভাল করে রোজগারের সুবিধে হয়! টাকা দিবি কি-না বল্ নইলে সব্বাইর নিকট দু'জনের কীর্ত্তি কলাপ বলে দেব।'

'বের হও বাড়ী থেকে, বের হ' বলচি!'

'বের হব না, কি করবি? বদগায়েসী আমার সঙ্গে! আমি ছ'সাত মাস যাবত জেলে ছিলুম, তুই কি করে পোয়াতী হ'লি? আমি তোর জন্য জেলে গিয়ে পচলুম—আর তুই ইত্যবসরে গেলি শ্যামজীর নিকট। শ্যামজী বড়লোক—তাই গরিব স্বামীকে মনে ধরল না। সব জানি! যেই পোয়াতী হলি, শ্যামজীর আর একজন জুটলো—অমনি গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিলে। জানিনে আমি! সে শালী বেশ্যাগিরি করে টাকা জমিয়ে এখন

দোকান দিয়েছে, আর তোকে রাত্রিতে ভাড়া খাটায়। ও শালীর মত সতী সবাই হয়, বাজারে এমন বহু সতী আছে।'

'খবর্দ্দার!' গঙ্গাবতীর মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হলো না; রাগে দুঃখে অপমানে, মিথ্যে দুর্নামে শরীর কাঁপতে লাগলো, চোখ দু'টি থেকে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বের হতে লাগলো। পাড়াপড়সীরা কোন বাধা দিলে না, কোন কথা বললে না, চোখ ঠারাঠারি করে খুব আমোদ উপভোগ করতে লাগলে। এরা চায়—ভাল করে অশ্লীল কথার বর্ণনা শুনতে, মারাত্মক ঝগড়াঝাটি দেখতে।

কানাই বল্‌লে—'এতদিন যে রোজগার করেচিস্‌, শিগ্‌গির ভাগ দে।'

'বের হ'—বের হ'! হারামজাদা, নচ্ছার ব্যাটা! ঝাঁটা মেরে দাঁত ভেঙ্গে দেবো!'

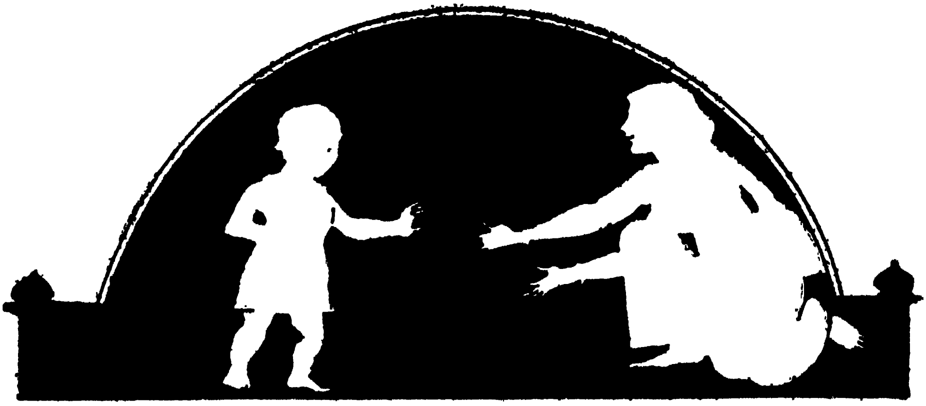
কিশোরী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকলো। কানাই বেগতিক দেখে চট করে সরে পড়লো।

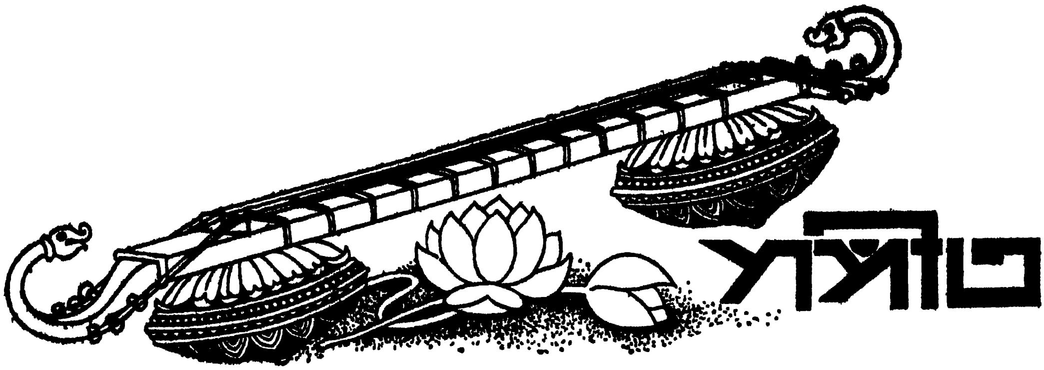
কানাই পালাল, পাড়ার মেয়েছেলেরা মুচকি হেসে জটলা করে কুৎসা রটাবার জন্য একে একে সরে পড়লো। কিন্তু গঙ্গাবতীর মনের ঝড়োদোলা ক্ষান্ত হল না, একটু মৃদু হল না। কিশোরী কানাইর কথায় কোন ভ্রূক্ষেপই করলে না, পাগলের মাতালের কথা বলে একটু পরেই ভুলে গেল। কিন্তু গঙ্গাবতী প্রলাপ বলে, স্বপনের ঘোরে বলে, সহজে ভুলে যেতে পারলে না। সে জানে, বুঝে, কিশোরীর মতই সে যুক্তিতর্কে মানে যে মিথ্যা কথার গভীরতা নেই, চিরদিন তার হুলফোটা ক্ষতচিহ্ন থাকে না। তবু সে মিথ্যাকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতে পারলে না, সে যে জননী, তার গর্ভে যে সন্তান!

কিশোরী যত বুঝায়, যত প্রবোধ দেয়, কানাইর কথা মূল্যহীন বলে উড়িয়ে দেয়—গঙ্গাবতী ততই আরও অধীর হয়, মন তার বলে আত্মহত্যা করে নিষ্কৃতি নিতে। কত দুঃখে বলে—'না—না—দিদি আর বাধা দিয়ো না। তুমি আমার অবস্থা বেশ বুঝতে পারচো, তোমার মনও চায় আমার মৃত্যু—তবে কেন মনকে ফাঁকি দেবে? তুমি বেশ বুঝতে পারো যে আমার মৃত্যু ছাড়া অন্য গতি নেই। এতদিন মেয়ের জন্য মরতে পারি নি, এখন তোমার কোলে দিয়ে নিশ্চিন্ত—আর কেন বেঁচে থাকা!' কিশোরী শাসন করে বলে—'পোড়ারমুখী এখন আমায় জ্বালাবার যোগাড় করছো! ফের যদি অমন সর্ব্বনেশে কথা বলবি ত পালাবো; আর আমার মুখও দেখতে পাবি নে। রইবে পড়ে তোর মেয়ে।'

'না-না! তুমি যেয়ো না! তবে যে আমার মরা হবে না, মরেও শান্তি পাবো না। আমায় মরতে দাও, নইলে প্রায়শ্চিত্ত হবে কি করে? প্রায়শ্চিত্ততে মেয়ের মঙ্গল হবে।'

গঙ্গাবতীর চোখের কোণ বেয়ে বড় বড় অশ্রু ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে। কিশোরী আর বোঝাতে পারে না, সান্ত্বনা দেবার ভাষা হারিয়ে ফেলে। রোগা মেয়ের দেহে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। (ক্রমশঃ)





মালকোষ—তেওরা

আর দুঃখ মোরে দিও না জননী।
সংসার জ্বালায় জ্বলে' জ্বলে' মরি
শান্তি দাও মোরে শান্তি প্রদায়িনী ॥

কেন মা কাঁদাও অবোধ সন্তানে,
তনয়ের দোষ ক্ষম নিজগুণে,
মোর জ্বালা দেখে সব ভুলে গিয়ে—
নে মা কোলে তুলে ত্রিতাপনাশিনী ॥

কথা—শ্রীবিভূতিভূষণ রায়

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীব্রজগোপাল গোস্বামী
(শ্রীপাট বোধখানা)

+ ২ ৩ + ২ ৩
II সা -জ্ঞা জ্ঞা | সা -া | দ্া ণ্া I সা সা ণ্া | সা -মা | মা মা I
আ র্ দুঃ খ ০ মো রে দি ও না জ ০ ন নী

+ ২ ৩ + ২ ৩
I মা মা মা | মা -া | মা -জ্ঞা I জ্ঞা মা দা | ণা -র্সা | র্সা র্সা I
সং সা র জ্বা ০ লা য্ জ্ব লে জ্ব লে ০ ম রি

I ণা -র্সা ণা | দা -া | মা মা I ণা ণা মা | জ্ঞা -মা | সা সা II
শা ন্ তি দা ও মো রে শা স্তি প্র দা ০ যি নী

II {মা মা মা | দা -া | দা -ণা I ণা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা I
কে ন মা কাঁ ০ দা ও অ বো ধ স ন্ তা নে

I ণা র্সা ণা | র্সা -া | র্মা র্মা I র্জ্ঞা র্মা র্জ্ঞা | র্সা -া | র্সা র্সা} I
ত ন য়ে র ০ দো ষ ক্ষ ম নি জ ০ গু ণে

I র্সা -া র্সা | র্সা -া | র্সা র্সা I ণা র্সা ণা | দা -া | মা মা I
মো র্ জ্বা লা ০ দে খে স ব ভু লে ০ গি য়ে

I জ্ঞা মা দা | ণা -র্সা | র্সা র্সা I ণা দা মা | জ্ঞা -মা | সা সা II II
নে মা কো লে ০ তু লে ত্রি তা প না ০ শি নী

ডাম্পিং অর্থাৎ স্বদেশ হইতে সস্তায় বিদেশে মাল রপ্তানী

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র মিত্র

অনেকেই সন্ধান করেন Dumping ব্যাপারটা কি এবং কিরূপে উহা সম্ভব হয়। উহার ফলাফল কি—সে বিষয়েও একটা প্রশ্ন উঠে। বিষয়টি নানা কারণে বিশেষ আলোচনার যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, কারণ ভারতে ডাম্পিং চলিতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায়ও অবলম্বিত হইতেছে। ডাম্পিং শব্দটি ইংরাজী, এক কথায় ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ আমি জানি না, এজন্য এই আলোচনায় আমি ডাম্পিং কথাটিই ব্যবহার করিব—বিশেষ যখন এই ইংরেজী কথাটি বাঙ্গালা ভাষার কথাবার্ত্তায় বেশ প্রচলিত হইয়া গিয়াছে।

ডাম্পিং কাহাকে বলে? ডাম্পিং-এর ফলাফল বুঝিতে হইলে ইহাতে সাধারণত কি বুঝায় এবং কি অর্থেই বা সর্ব্বসাধারণ কথাটিকে ব্যবহার করেন তাহা জানা আবশ্যক। অনেকেরই ধারণা এবং এই ধারণা মোটের উপর ভ্রান্ত নহে—যে কোন দেশের উৎপন্ন পণ্য, ঐ উৎপন্নের খরচ এবং সঙ্গত লাভ হইতেও অল্পমূল্যে অপর দেশের বাজারে বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়াকে ডাম্পিং বলে। ইংলণ্ডে ১৯২১ খৃঃএ যে শিল্পরক্ষা আইন পাশ হইয়াছে, তাহাতে ডাম্পিং কথাটির ঐরূপ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থ পরিষ্কার হইলেও যথার্থ প্রয়োগস্থলে এই সংজ্ঞা লইয়া বিলক্ষণ গোলযোগ ঘটে, কারণ সব দেশেই একই পণ্যের উৎপাদনের খরচের বিভিন্ন উৎপাদনকারীর মধ্যে পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত তাঁহাদের কারখানা কোনরূপে চলতি রাখার জন্য উৎপাদন খরচ হইতে কমমূল্যে তাঁহাদের উৎপাদিত পণ্য বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিতে পারেন, কিন্তু আবার কাহারও বা উৎপাদনের খরচ নানা কারণে কম থাকায় সমান মূল্যে বিক্রয় করিলেও তাহা উৎপাদনের মূল্যের কম হয় না অর্থাৎ একদল উৎপাদনকারী তাঁহাদের পণ্য লোকসানে বিক্রয় করিলেও অপর দল ঐ পণ্যই লাভে বিক্রয় করিতে পারেন। সুতরাং দ্বিতীয় স্থলে বিদেশে ঐরূপ বিক্রয়ের ব্যবস্থা ডাম্পিং বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এরূপ স্থলে উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুযায়ী যথার্থ ডাম্পিং ঘটিতেছে কি না তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

রপ্তানীকারক কোন দেশে কোন পণ্য উৎপাদনের এইরূপ কোন বাঁধা খরচের হার নির্দ্দেশ করিতে পারেন না বলিয়া ডাম্পিং কথাটির অপর একটি সংজ্ঞা এখন অনেকে গ্রহণ করিতেছেন। ১৯০৭ খৃঃএর কানাডার টারিফ আইনে একটি ডাম্পিং ধারা আছে—উহাতে ডাম্পিং কথাটির এই ব্যাখ্যাটি দেওয়া হইয়াছে। ঐ ধারাটি এইরূপ :—

In the case of articles exported to Canada of a class or kind made in Canada, if the export or actual selling-price to an importer in Canada be less than the fair market-value of the same article when sold for home consumption in the usual and ordinary course in the country whence exported to Canada at the time of its exportation to Canada, there shall, in addition to the duties otherwise established, be levied, collected and paid on such articles on its importation into Canada a special duty (or dumping duty) equal to the difference between the said selling-price of the article for export and the said fair market-value thereof for home consumption.

ইহার ভাবার্থ এই যে কানাডাতে যে সকল পণ্য উৎপন্ন হয়—বিদেশ হইতে সেই প্রকারের পণ্য আমদানীর বেলায় যদি দেখা যায় যে বিদেশাগত দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য যে দেশ হইতে উহা আমদানী হইতেছে তথাকার বিক্রয়-মূল্য অপেক্ষা কম, তাহা হইলে ঐ বিক্রয়-মূল্য এবং তথা হইতে যে মূল্যে উহা রপ্তানী হইতেছে তাহার পার্থক্যের সমান একটি বিশেষ-ডাম্পিং-শুল্ক কানাডার গভর্ণমেণ্ট অপরাপর শুল্কের উপর ধার্য্য করিতে পারিবেন।

এই ব্যবস্থায় কোন দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ঐ দেশে যে মূল্যে

বিক্রয় হইতেছে তদপেক্ষা কম মূল্যে বিদেশে রপ্তানী করাকেই ডাম্পিং নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই সংজ্ঞার সুবিধা এই যে ইহাতে "উৎপাদন খরচ"এর পরিবর্তে "বিক্রয় মূল্য"কে নির্দ্দেশক মান করা হইয়াছে অর্থাৎ উৎপাদনের বিভিন্ন প্রকারের খরচের জন্য উপরে উল্লিখিত যে গোলমালের সৃষ্টি হয় তাহা মোটামুটি দূর করা হইয়াছে।

১৯৩২ খৃঃএ অটোয়াতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যে এগ্রিমেণ্ট হইয়াছে তাহাতে ডাম্পিং কথাটির উপরে-লিখিত দুইটি অর্থ হইতে আর একটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থ করা হইয়াছে। রুসিয়া সম্পর্কেও বিশেষভাবে ঐ এগ্রিমেণ্টে একটি ব্যবস্থা হইয়াছে, কারণ ঐ দেশে বাধ্যতামূলক শ্রমপ্রথা প্রচলিত থাকায় উৎপন্নের খরচ অতিশয় কম, সুতরাং ঐ এগ্রিমেণ্ট অনুযায়ী সাম্রাজ্যসুবিধামূলক ব্যবস্থা (Imperial Preference) তাহাতে ব্যাহত হইবে বলিয়া ক্যানাডার প্রতিনিধিগণ এ বিষয়ে বিশেষ ব্যবস্থার দাবী করেন। ফলস্বরূপ নিম্নলিখিত একটি ধারা ইংলণ্ডের সহিত কানাডার ঐ এগ্রিমেণ্টে সন্নিবেশিত হয়।

This agreement is made on the express condition that if either Government is satisfied that any preference hereby granted in respect of any particular class of commodities are likely to be frustrated in whole or in part by reason of the creation or maintenance directly or indirectly of prices for such class of commodities through State action on the part of any foreign country, that Government hereby declares that it will exercise the powers which it now has or will hereafter take to prohibit the entry from such foreign country directly or indirectly of such commodities into its country for such time as may be necessary to make effective and to maintain the preference hereby granted by it.

ইহার ভাবার্থ এই যে উভয় গভর্ণমেণ্টের মধ্যে কোন গভর্ণমেণ্ট যদি সাব্যস্ত করেন যে অপর দেশের কোন গভর্ণমেণ্টের কার্য্যের জন্য ঐ দেশের কোন বিশেষ পণ্যের মূল্য এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে তাহাতে এই এগ্রিমেণ্টের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইতে পারে, তাহা হইলে এগ্রিমেণ্টের অপর পক্ষ যাহাতে ঐ পণ্য আবশ্যকীয় সময়ের জন্য ঐদেশে আমদানী না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিবেন।

ফলস্বরূপ ইংলণ্ডকে এই সর্ত্ত অনুসারে রুসিয়ার সহিত যে বাণিজ্য চুক্তি ছিল তাহা রদ করিবার জন্য নোটিস দিতে হয় এবং ইংলণ্ডের তদানিন্তন ডমিনিয়ন সেক্রেটারী মিঃ টমাস কৈফিয়ত দেন যে রুসিয়ার "সোয়েটেড্" পণ্য ইংলণ্ডে ডাম্পিং হওয়ার জন্যই রুসিয়ার সহিত বাণিজ্য চুক্তি রদ করা আবশ্যক হইয়াছে। ইহাতে ডাম্পিং কথাটির অপর একটি অর্থের এখানে সূচনা হইয়াছে—কারণ "সোয়েটেড্" পণ্যের আমদানীকেও এখানে ডাম্পিংএর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এইরূপ পণ্যের মূল্য উৎপাদক-দেশের উৎপাদনের খরচ কিম্বা ঐ দেশের সাধারণ মূল্য হইতে বিদেশে কম না হইতে পারে এবং ফলস্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি ইহাতে প্রযুক্ত হয় না।

"সোয়েটিং" কথাটার অর্থ এখানে পরিষ্কারভাবে ধারণা করা দরকার। সাধারণত অস্বাভাবিকরূপ কম মজুরীতে কিম্বা অতিশয় অধিক সময়ের জন্য মজুরদিগকে কাজ করাইয়া উৎপাদিত পণ্যকে "সোয়েটিং" শ্রম শিল্পের উৎপন্ন পণ্য বলিয়া কথিত হয়। এই প্রকারের পণ্য কোন দেশে আমদানী হইলে সাধারণতঃ ঐ দেশের উৎপন্ন পণ্য তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। ইহাকেও ডাম্পিং বলে। কিন্তু এই সম্পর্কে আর একটা কথা উঠে। অনেক দেশে জীবন-যাত্রার প্রণালী (Standard of living) অতিশয় নিম্নস্তরে অবস্থিত এবং অনেক সুসভ্য দেশে উহাদের মুদ্রামূল্য অতিশয় হ্রাস করিয়া দিয়াছেন। ফলস্বরূপ ঐ সকল দেশ হইতে অতিশয় সস্তায় অন্যান্য দেশে পণ্য আমদানী হইতে পারিতেছে। উপরোক্ত অবস্থায় এইরূপ আমদানীকেও ডাম্পিং বলা অসঙ্গত হইবে না। যুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর মুদ্রাধিক্যের (inflation) কথা অনেকেই জানেন। মার্কের মূল্য তখন ভয়ানক কমিয়া যায় এবং অনেক দেশই তখন জার্ম্মাণীর পণ্য আমদানীকে ডাম্পিং আখ্যা দিয়া উহাতে আপত্তি করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডাম্পিং কথাটি অধিকাংশ স্থলেই অন্যায় প্রতিযোগিতামূলক রপ্তানী অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই অন্যায় প্রতিযোগিতার সীমা কোথায় অর্থাৎ কোন অবস্থায় উপরোক্ত কারণগুলিকে অন্যায় প্রতিযোগিতা

বলা যায় তাহা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। ইংলণ্ড স্বর্ণমান ত্যাগ করার পর হইতে তথাকার রপ্তানীকে অবশ্য ডাম্পিং বলা চলে না। কাজেই দেখা যাইতেছে ডাম্পিং অন্যায় প্রতিযোগিতার প্রকার এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এ অবস্থায় উপরোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া ডাম্পিং কথাটার অর্থ বুঝিলেই সব দিক হইতে সুবিধা। পরন্তু কানাডার এগ্রিমেন্টের সংজ্ঞাটি বিশেষ-ভাবে সুনির্দ্দিষ্ট হওয়ায় উহাতে গোলমালের সম্ভাবনা খুব কম।

এখন জানা আবশ্যক—এই ডাম্পিংএর কারণ কি অর্থাৎ সাধারণতঃ এক দেশ অন্য দেশে কি জন্য তাহার পণ্য ডাম্প করিতে চায়। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত কারণগুলি এজন্য নির্দ্দেশিত হইতে পারে :—

(১) অনেক দেশের পক্ষে অনেক সময় বিদেশ হইতে ব্যবহারোপযোগী পণ্য কিম্বা শিল্পের জন্য দরকারী কল-কারখানার যন্ত্রাদি আমদানী অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। যদি ঐ সকলের মূল্য দিবার একমাত্র উপায় ঐ দেশের উৎপন্ন পণ্য ভিন্ন আর কিছু না থাকে, তবে ঐ পণ্য অনেক সময় প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিবার জন্য নিজ দেশের মূল্য কিম্বা উৎপাদনের খরচ হইতে কম মূল্যে ঐ অপর দেশে বিক্রয় করিতে হয়। রুসিয়াকে উপরোক্ত কারণে ঠিক এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইয়াছে অর্থাৎ আবশ্যকীয় পণ্য ও যন্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য সোভিয়েট রুসিয়ার পণ্য অন্য দেশে ডাম্পিং হইতেছে।

(২) কোন কোন দেশের বাণিজ্যনীতি এরূপভাবে অনুসৃত হইয়া থাকে যাহাতে সস্তায় পণ্য রপ্তানী করিয়া আমদানীকারক দেশের ঐ পণ্যের মূল্য এরূপ ভাবে কমাইয়া দেয় যাহাতে ঐ শেষোক্ত দেশে আর ঐ পণ্য উৎপাদিত হইতে পারে না। এইরূপে যখন ঐ শ্রমশিল্প ঐ দেশে একেবারে নষ্ট করিয়া রপ্তানিকারক দেশ আমদানী-কারক দেশের ঐ সকল দ্রব্যের বাজার সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া বসে, তখন প্রথমোক্ত দেশে ঐ সকল পণ্যের মূল্য বাড়াইয়া দেয় এবং তখন যথেষ্ট লাভ করিয়া ডাম্পিংএর সময়ের লোকসান পোষাইয়া লয়। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স ও মধ্য-ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভারতবর্ষে বিট, ও চিনি ডাম্প করিয়া ঠিক এইরূপ করিয়াছিল।

(৩) কোন কোন দেশ অতি বিস্তৃতভাবে কাজ করিয়া অনেক অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপাদন করতঃ অর্থ-নৈতিক সুবিধা পাইয়া এইরূপ ডাম্পিং চালাইতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ জার্ম্মাণীতে কোন কোন পণ্য উৎপাদনের সমস্ত খরচ কেবল জার্ম্মাণীর ব্যবহারের পরিমিত পণ্যের উপর ধরা হয় এবং বাণিজ্যে রক্ষানীতির অনুসরণ করিয়া লাভজনক মূল্যে উহা দেশে চালান হয়। বিদেশে রপ্তানীর জন্য এই সকল বৃহৎ কারখানায় অতিরিক্ত যাহা উৎপন্ন হয় তাহাতে কেবল কাঁচা মাল এবং পারিশ্রমিকের খরচা ভিন্ন আর কিছু থাকে না। সুতরাং ঐ সকল পণ্য ইংলণ্ড কিম্বা অপরাপর দেশে তথায় উৎপাদিত ঐ প্রকারের পণ্য অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করিতে পারা যায়।

আরও কোন কোন কারণে ডাম্পিং ঘটিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণতঃ উপরোক্ত তিনটি কারণই প্রধান।

একদল অর্থ-নৈতিক স্বাধীন-বাণিজ্যের নীতির দোহাই দিয়া ডাম্পিং নিবারণ করা অন্যায় বলিয়া মনে করেন এবং বলেন যে ইহাতে পণ্য-মূল্য সস্তা হওয়ায় সাধারণে উহা অল্পদামে পাইয়া উপকৃত হইয়া থাকে ও দেশে অধিক পরিমাণে পণ্যের ব্যবহার হওয়ায় অধিবাসীদের জীবন-যাপন নীতি (standard of living) উচ্চতর হইয়া থাকে। কিন্তু এই যুক্তির একটি বিশেষ বিবেচনার উপযুক্ত অপরদিক আছে। কোন দ্রব্য কোন দেশে ডাম্পিং হইলেই ঐ দেশের ঐ পণ্যের উৎপাদন কমিয়া যায় কিম্বা একবারে নষ্ট হইয়া যায়। ফলস্বরূপ তথায় বৃত্তি-হীনতা (unemployment) বাড়িয়া যায়। সুতরাং সস্তার সুবিধা, আয় কমিয়া যাওয়ায় অসুবিধার জন্য নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই ডাম্পিং নিবারণ করা অনেক গভর্ণমেণ্টই ন্যায়সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা ভাষার রূপ-সমস্যা

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক "কেন্দ্রীয় পরিভাষা সমিতি" গঠিত করেন। সেই সমিতির কার্য্য —বাঙ্গালা বানানের নিয়ম সঙ্কলন চেষ্টা। এই কার্য্যের বিবরণে সমিতির পক্ষে সম্পাদক লিখিয়াছেন !—

"আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভাষায় দুই রীতি চলিতেছে—'সাধু' ও 'চলিত'। বহুকাল বহুপ্রচারের ফলে সাধু-ভাষায় প্রযুক্ত শব্দসমূহের বানান প্রায় সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু চলিত ভাষায় তাহা হয় নাই. বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রীতিতে বানান করেন। বিদ্যালয়ের পাঠ্য-পুস্তকে চলিত ভাষা স্থান পাইয়াছে পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের উত্তর চলিত-ভাষায় লিখিতে পারে এমন অনুমতিও কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন। বাঙলা শব্দের, বিশেষতঃ চলিত-ভাষায় প্রযুক্ত শব্দের বানান-পদ্ধতি নিরূপণ করা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, নতুবা পাঠ্যপুস্তক-রচয়িতা, শিক্ষক ও ছাত্র সকলকেই পদে পদে সংশয়ে পড়িতে হইবে। বানানের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম গৃহীত হইলে লেখকমাত্রেই সুবিধা বোধ করিবেন।"

ইহাতে স্বীকৃত হইয়াছে, "চলিত" ভাষায় যে সব শব্দের বানান নানা লেখক নানারূপ করেন, সেগুলির বানান একরূপ করিবার চেষ্টা করাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধু, সন্দেহ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (রাজনীতিক কারণে সৃষ্ট নাবালক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা আমরা আলোচনা করিব না) অতি অল্প দিনই বাঙ্গালাকে পংক্তিতে স্থান দান করিয়াছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়-ভবনে রক্ষিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মূর্ত্তির পাদপীঠে সেই কার্য্য তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবজনক কায বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এত অল্পদিনের মধ্যেই যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার "সংস্কারে" উদ্যোগী হইতেন, তবে তাহা হাস্যোদ্দীপক বলিয়াই বিবেচিত হইত। বিশেষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অবদানে আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুস্তক ও পুঁথি সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য নহে এবং বিশ্ববিদ্যালয় যে বাঙ্গালা সাহিত্যে সুপরিচিত সাহিত্যিকদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষাদানের কার্য্যভার দিয়াছেন, এমনও নহে। বিশ্ববিদ্যালয় যে সে কার্য্যে উদ্যোগী না হইয়া কেবল কতকগুলি শব্দের বানান নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য মত সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা সুবুদ্ধির কাযই হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদিগের কেবল বলিবার বিষয় এই যে, মত-সংগ্রহের পদ্ধতিও ত্রুটিশূন্য হয় নাই—যাঁহারা দীর্ঘকাল সাহিত্য-সেবায় রত আছেন, এমন বহু লোককে বিশ্ববিদ্যালয় উপেক্ষা বা অবজ্ঞাও করিয়াছেন। এই ব্যবহার যদি দম্ভদ্যোতক হয়, তবে ইহা কেবল যে দুঃখের বিষয় তাহাই নহে, পরন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ বিঘ্নাস্তৃতই করিবে।

বলিবার আর একটি কথা—পত্রের যে অংশ উপরে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমিতি বা তাহার সম্পাদক মতামত গ্রহণের পূর্ব্বেই—মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়াই একটা পদ্ধতি গঠন বা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারই বা কারণ কি ?

এই পত্রেই আমরা দেখিতে পাই—"পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্রের উত্তর চলিত ভাষায় লিখিতে পারে এমন অনুমতিও কলিকাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিয়াছেন।" কিন্তু এই "চলিত ভাষা" বলিলে আমরা কি বুঝিব ? চলিত ভাষা কোন্ স্থানের ভাষা ? প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যিক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সাহিত্য পঞ্জীতে" লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালা ভাষার নানা রূপ :—

"এক সহরের (অর্থাৎ কলিকাতার) মধ্যেই ইহার আঠারো রকমের আকার। ভবানীপুর, খিদিরপুর অঞ্চলে এক রকমের আকার; শোভাবাজার বাগবাজার অঞ্চলে আর এক রকমের। এক চিৎপুর রোডেই হয়ত চৌদ্দ রকমের। যোড়াসাঁকোর মোড়ের মাথায় এক মূর্ত্তি, গলির ভিতর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন রকমের রূপ। পাথুরেঘাটায় আবার পৃথক আকার; বিডন ষ্ট্রীটে ও বটতলায় বিভিন্ন বিভিন্ন রূপ। তার পর কলুটোলা কপালীটোলা অঞ্চলে অন্য কত রকম ঢঙ্। কর্ণওয়ালিসে, কলেজ ষ্ট্রীটে আবার (বটতলারই মত) রকম বিরকমের ঢপ ও ঢঙ্ বাইয়া চালোয়া মিশিয়াছে।"

এইত গেল এক কলিকাতার কথা। তাহার পর !—

"কোথাও সৌধপুরে প্রকাণ্ড পান্সী—পান্সীর পরে মাহংগিরা রঙ্গের মিহি গান। কোথাও মহাজনী নৌকা—রসিক মেয়ে—সামাবলীর হাল্।

* * কোথাও পুরাণ কাঠামে নবীন ঠাট। কোথাও জাপানী বার্ণিশে শিমুল কাঠ”—ইত্যাদি।

বিশ্ববিদ্যালয় “চলিত ভাষা” বলিলে কোন্ বা কোন্ কোন্ স্থানের ভাষা বুঝিবেন? তাহা স্থির না হইবার পূর্ব্বে যে ভাষা সর্ব্বত্র প্রচলিত, তাহার ব্যবহার-ব্যবস্থা কি সঙ্গত ও সুবিধাজনক ছিল না? বিশ্ববিদ্যালয় যখনই “চলিত ভাষা” গ্রাহ্য করিয়াছেন, তখনই তাহার সকল রূপ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কেন? আজকাল রাজনীতি-ক্ষেত্রে “প্যাক্ট” বা চুক্তির বড় আদর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তালি যেমন এক হাতে বাজে না, “প্যাক্ট” তেমনই এক পক্ষে হয় না—সকল দলের সম্মতি ব্যতীত তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এক্ষেত্রে কিন্তু যাঁহারা সংস্কৃতপন্থী বা সনাতনী তাঁহাদিগের চিরাগত সাধনা ও সেই সাধনায় অর্জ্জিত অধিকার অবজ্ঞা করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছেন, এমন মনে করিতে পারি না। ছাত্রদিগকে “চলিত ভাষায়” প্রশ্নের উত্তর দিবার অধিকার প্রদানের পূর্ব্বে কি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির সমর্থক ও সেবকদিগকে সম্মিলিত করিয়া ব্যবস্থা-নির্দ্ধারণই এই গণতান্ত্রিক যুগের উপযোগী হইত না? তাহা না করিয়া “ফতোয়া” জারি করা যে স্বৈর-ব্যবস্থা তাহা বোধ হয়, আর বলিয়া দিতে হইবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় কতকগুলি শব্দের বানানের নিয়ম নির্দ্দিষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই চেষ্টার সার্থকতা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু এই চেষ্টা উপলক্ষ করিয়া ভাষার “সংস্কার” জন্য যে আগ্রহ কোন কোন দিকে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, তাহার সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের কল্যাণকামীদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য আছে। যে বাঙ্গালা ভাষা মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিকদিগের সর্ব্ববিধভাবপ্রকাশে ব্যবহৃত হইয়াছে; যে ভাষা আজ হর্ষে বিকশিত, বিপদে বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচলিত, রোষে বিকম্পিত, শঙ্কায় বিমর্ষ, গর্ব্বে স্ফীত—সহসা সেই ভাষার “সংস্কারের” কি প্রয়োজন অনুভূত হইল তাহা বিবেচ্য, সন্দেহ নাই। সংস্কার যখন বাহির হইতে প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হয়, তখন তাহা হয় ব্যর্থ হয়, নহে ত সংহারের অগ্রদূত হয়। যে সংস্কার অন্তর হইতে উদ্গত ও প্রবর্দ্ধিত না হয়, তাহা সার্থক হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এই কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

আজ হইতে ষাট বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, এক জন ইংরাজ বাঙ্গালা-ভাষার সংস্কার সাধনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। জন বীমস্ সিভিল সার্ভিসে চাকরীয়া ছিলেন। তিনি কয় বৎসরের চেষ্টায় হিন্দী, পঞ্জাবী, শিন্ধী, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া ও বাঙ্গালা—এই কয়টি বর্ত্তমান যুগের আর্য্য ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। তিন খণ্ডে সমাপ্ত এই পুস্তক তাঁহার পাণ্ডিত্য-পরিচায়ক। তিনি য়ুরোপের কয়টি দেশে ভাষার অভিব্যক্তির আলোচনা করিয়া প্রস্তাব করেন, বাঙ্গালায় “ফ্রেঞ্চ একাডেমীর” মত একটি সভা গঠিত করিয়া বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা হউক। তিনি “বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ” গঠনের জন্য এক দীর্ঘ অনুষ্ঠানপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। আমরা বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-কামীদিগকে তাহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সেই দীর্ঘ প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদিগের নাই। বহুদিন পরে তাঁহার প্রস্তাবানুসরণে ‘বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ’ প্রতিষ্ঠিত হয়।

মিষ্টার বীমস্-প্রচারিত অনুষ্ঠানপত্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

“তাঁহার কৃত এই প্রস্তাব যে পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ আদৃত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। তাঁহার কৃত প্রস্তাবের উপর অনুমোদন বাক্য আবশ্যক নাই এবং বলিবার কথাও তিনি কিছু বাকি রাখেন নাই। আমরা ভরসা করি, যে সকল বঙ্গ পণ্ডিতেরা দেশের চূড়া, তাঁহারা ইহার প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন।”

বীমস্ তখন লিখিয়াছিলেন :—

“ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশ অপেক্ষা বিদ্যানুশীলন ও সভ্যতা বর্দ্ধনে বাঙ্গালা প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অগ্রগামী হওয়াতে ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশের সাহিত্যাপেক্ষা বঙ্গীয় সাহিত্য উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপীয় সাহিত্য সদৃশ হইতেছে। * * * বাঙ্গালীরা এক্ষণে পদ্যকাব্য, নাটক, দেশপর্য্যটন বৃত্তান্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, গদ্যকাব্য, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিতেছে। অতএব বঙ্গভাষাকে প্রণালীবদ্ধ করিয়া তাহার একতা সম্পাদন করিবার ও সাহিত্যে প্রয়োগযোগ্য ভাষা নির্ণয় করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

‘এক্ষণে বাঙ্গালায় দুই দল দেখা যায়। এক দল পাণ্ডিত্যাভিমানে অপর্য্যাপ্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করিতে প্রযত্নশীল। সাধারণ সমাজে তাঁহাদের ব্যবহৃত কঠিন শব্দ সকল বুঝে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত না

করিয়া, বাঙ্গালাকে তাঁহারা সংস্কৃত করিতে চাহেন। অপর দল ইতর ও স্থানীয় ভাষা ব্যবহারকরত সুশিক্ষিত সংস্কারের প্রতিযোগী হইয়া উঠিতেছেন।"

তিনি লিখেন :—

"ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে, সংস্কারবিশিষ্টা পাঁচটি প্রধান ; ইংরাজি, ফ্রেঞ্চ, জারমান, ইটালীয় এবং স্পানীয়। তত্তদ্দেশীয় সুশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পাঠযোগ্য পুস্তকাদির জন্ত এক একটি পৃথক্ ও সুনির্ণীত ভাষা অবধারিত আছে। সুশিক্ষিত ইংরাজেরা ইংলণ্ডের যে প্রদেশ বা বিভাগ হইতেই লিখুন, এক ভাষাতেই লিখিবেন। বলটিক হইতে আল্প পর্য্যন্ত সকল জারমান জাতি, সাবয় হইতে পালামো পর্য্যন্ত সমস্ত ইটালীয়েরা, লিলে হইতে ম্যরবুসেল পর্য্যন্ত সকল ফরাসিরা এবং কাটালান গালিসিয়ান আণ্ডালুসিয়ান, কাষ্টিলিয়ান প্রভৃতি সমস্ত স্পানীয়েরা, এক এক সুনির্ণীত সাধুভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং সেই সেই ভাষাতে ব্যাকরণভেদ অথবা নির্ণীত শব্দ সকলের বিভিন্নতা কুত্রাপি দেখা যায় না।"

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোল্লিখিত পাঁচটি য়ুরোপীয় ভাষার কোনটিতে ঐক্য ছিল না—স্থানভেদে একই দেশে ভাষার নানারূপ ছিল। কিরূপে ঐ সকল ভাষার বৈষম্য দূর হয়, তাহা দেখাইয়া মিষ্টার বীমস্ প্রস্তাব করেন :—

"বাঙ্গালা ভাষা প্রণালীবদ্ধ করা যে আবশুক, তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। বাঙ্গালাকে একেবারে সংস্কৃত ভাষা করিয়া তোলা এবং সংস্কৃত আভিধানিক শব্দসমূহ প্রয়োগপূর্ব্বক ভাষাকে সাধারণের বোধাতীত করা কখন উচিত নহে। অথচ রূঢ়, স্থানীয়, কর্কশ এবং অশ্লীল বাক্যসকল সাধুভাষা হইতে বর্জ্জিত করা আঁবশুক।

"কথিত হইয়াছে যে, ইংরাজি ভাষা ক্রমে স্বতন্ত্র উপায়ের দ্বারা কোন কোন অসাধারণ ব্যক্তির পরিশ্রম এবং ক্ষমতাতে প্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। আর ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান এবং স্পানীয় ভাষা একত্রিত উৎসাহবিশিষ্ট সভার প্রযত্নে সুপ্রণালীবদ্ধ হইয়াছে। এই দুই প্রকার গতির মধ্যে সভার দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার হিতসাধনই উপযুক্ত ও সম্ভব বোধ হয়। বাঙ্গালায় এমত কোন সর্ব্বজনপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি নাই যে তাঁহার প্রচারিত নিয়ম, দেশীয় সকল লোকের নিকট মান্ত হইবেক এবং পাঠ্যপুস্তকেরও এমন আধিক্য ও উত্তমতা হয় নাই যে তাহা হইতে জন্‌সন সদৃশ কোন ব্যক্তি সঙ্কলন পূর্ব্বক সাধুভাষা অবধারিত করিতে সক্ষম হইতে পারেন।

"অতএব বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষার স্থিরতা বিধান জন্য সকল বাঙ্গালী মিলিত হইয়া সভাস্থাপন করত তদ্বারা ভাষার উন্নতি সাধন করা আবশুক।"

বাঙ্গালা ভাষাকে পদ্ধতিবদ্ধ করিবার জন্ত এই যে চেষ্টা ইহাতে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালার পদ্ধতির অভাব ছিল না। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির রচনা পাঠ করিলে তাহা বুঝিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না এবং ভারতচন্দ্রের রচনায় তাহা যেরূপ সপ্রকাশ সেরূপ আর কোথাও নহে। বাঙ্গালা পুরাতন ভাষা। এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে যে, কপিলাবস্তুর প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠেও ইহা ব্যবহৃত হইত। এই ভাষা শব্দশিল্পী ভারতচন্দ্রের হস্তে যে অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহা বিবেচনা করিয়া কেহ কেহ ভারতচন্দ্রের রচনাকে বাঙ্গালা কথার তাজমহল বলিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের রচনা !—

"শুন রাজা সাবধানে পূর্ব্বে ছিল এই স্থানে
বীরসিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হবে ইহার॥"

এই রচনা পাঠ করিলে মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, বাঙ্গালা ভাষা পদ্ধতিবদ্ধ ছিল। কেবল তাহাই নহে, ভারতচন্দ্রের রচনায় দেখা যায়, বাঙ্গালা সজীব ও সরল ভাষা বলিয়াই অনায়াসে অন্য ভাষার বহু শব্দ আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারিয়াছিল। একই পুস্তকে একদিকে—

"প্রাণধন বিদ্যালাভ ব্যাপারের তরে।
খোয়াব তনুর তরি প্রবাস সাগরে॥
যদি কালী কূল দেন কূলে আগমন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন॥"

আবার তাহাতেই অন্য স্থানে আমরা দেখিতে পাই !—

"ছত্র দণ্ড আড়ানী চামর মোরছল।
গোলামগর্দ্দিনে খাড়া গোলাম সকল॥"

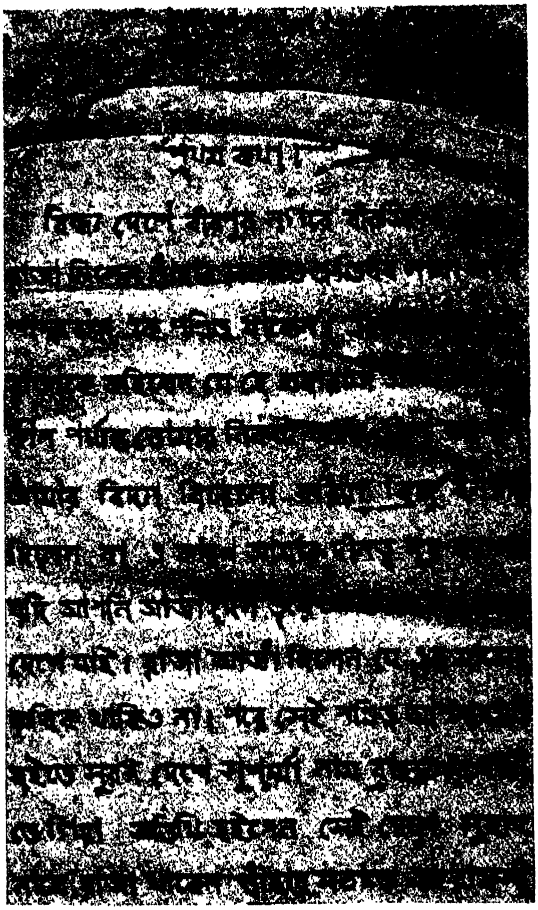
সেই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন :—

"যে মুসলমানেরা পাঁচশত পঞ্চাশৎ বৎসর এই বঙ্গে একাধিপত্য করিয়াছেন ; ধর্ম্মে মাণিকপীর, সত্যপীর, ওলাবিবি, বনবিবি চালাইয়াছেন ; ধর্ম্ম সংস্কারে দশ সংস্কারের উপর সমাধিসংস্কার চালাইয়াছেন ; কুবিশ্বাসে মামদো ভূতকে প্রত্যেক কবরস্থানে বসাইয়া রাখিয়াছেন ; যে যবন সাধারণ বাঙ্গালীর নয়নপথে পরীকে জিনীকে আকাশমার্গে উড়াইতেছিলেন ; যে যবন বাঙ্গালীদেহের উপরার্দ্ধের পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন, আহার-পদ্ধতির উন্নতি শিক্ষা দিয়াছেন, সমগ্র ভূভাগের বন্দোবস্ত নিজমতে করিয়াছেন, আয়ব্যয় নিরূপণ-পদ্ধতি নিজ মতে প্রচার

করিয়াছেন, সেই যবন যে বাঙ্গালা ভাষার রীতির কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করেন নাই, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে ?"

বিশ্বাস করিবার উপায় নাই।

কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যবনের রীতি ও শব্দ গ্রহণ করিয়াও আপনার বৈশিষ্ট্য হারায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত এই যে, বাঙ্গালা জয় করিয়া মুসলমান বহুদিন বাঙ্গালা ভাষার কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারে নাই।



১৮১২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত

"কিন্তু বঙ্গভাষা যখন চৈতন্যদেবের ভক্তিপ্রবাহিনীতে নিজ তরণী সাজাইয়া এক দিকে স্রোতোমুখে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছিল, সেই সময়েই পারসী ভাষা আসিয়া সেই তরণীতে আপনার কতকগুলি কায়দা, কতকগুলি রীতি, শত শত শব্দ আনিয়া তুলিয়া দিল। ভাষা সেই বৈদেশিক গুরুভারে আস্তে আস্তে চলিতে লাগিল। নৌকা যত চলিতে লাগিল, পারসী ভাষা ক্রমেই বোঝাই চাপাইতে লাগিল। এইরূপ ক্রমাগত দেড় শত কি দুই শত বৎসর ধায়। পারসীর বোঝাই বাড়িতে থাকে, নৌকা আস্তে আস্তে চলিতে থাকে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতে এই নৌকায়, যাবনিক দ্রব্য অব্যবহার্য্য ও পরিহার্য্য বোধে, দেশীয়বস্তুজাতের সওদা করিতেন; সাধারণ্যে নিত্যকর্ম্মে, ব্যবসায়ে, শিল্প বিপণিতে, হিসাবপত্রে জমীদারী সেরেস্তায় এই যাবনিক সওদারই কেনাবেচা অধিক পরিমাণে হইত।"

ক্রমে যে এ ভাবও কাটিয়া গিয়াছিল, সংস্কৃতজ্ঞ ভারতচন্দ্রের রচনায় তাহা বুঝা যায়।

কিন্তু বাঙ্গালার যে নূতন পদ্ধতি পুরাতনের ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, তাহা কবিতায় যেমন দেখা গিয়াছিল, গদ্যে তেমন দেখা যায় নাই। কি জন্য বাঙ্গালা গদ্য পদ্যের মত সমৃদ্ধ হয় নাই, তাহার কারণ একাধিক; সর্ব্বপ্রধান কারণ, যখন মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন হয় নাই, তখন যে সব রচনা সহজে স্মৃতিতে রক্ষা করা যায়, তাহাদিগেরই স্থায়িত্বলাভসম্ভাবনা অধিক ছিল। কবিতা কণ্ঠস্থ করা যায়—গদ্য রচনায় তাহা সম্ভব নহে। লেখক সকলেই আপনার রচনার স্থায়িত্ব কামনা করেন—সুতরাং পদ্যেরই অনুশীলন স্বাভাবিক। সেই জন্যই আমরা বাঙ্গালা গদ্যে রচিত পুস্তকের সন্ধান পাইতেছি না। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' গ্রন্থ শেষ হয়; ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর বিপর্য্যয়। ইহার পর দেশের যে অবস্থা—তাহাকে সাহিত্য-চর্চ্চার পক্ষে অনুকূল বলা যায় না। "জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সকল বিরাজ করিয়াছেন; কিন্তু ভাষা মুখবদ্ধ জলাশয়ের ন্যায় স্থিরভাবে ছিল।" উপপ্লবকর্ত্তা রামমোহন রায় সে আবরণ খুলিয়া দিলেন।

বিস্ময়ের বিষয় এই যে রামমোহনের ব্যবহৃত গদ্যে যে পদ্ধতি দেখা যায়, তাহা যে নিন্দনীয় নহে তাহা অনেকে—বিশেষ বর্ত্তমানকালে যাঁহারা ভাষার সংস্কারজন্য বদ্ধপরিকর তাঁহারা—বিবেচনা করিয়া দেখেন না। রামমোহন যখন গদ্য রচনা আরম্ভ করেন, তখন বাঙ্গালায় ইংরাজীর অনুকরণে ছেদচিহ্ন প্রবর্ত্তিত হয় নাই; কিন্তু ছেদচিহ্ন সন্নিবিষ্ট করিলে সে ভাষা দুর্ব্বোধ্য হয় না। নিম্নে রামমোহনের রচনা হইতে একাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"এ অতি আহ্লাদের বিষয় যে এখন তুমি এ বিষয়ের বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত হইলে পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয় তাহার অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক এবং এরূপ স্ত্রীবধ জন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না।"

ছেদ-চিহ্ন দিলে ইহা এইরূপ হয় !—

"এ (ইহা) অতি আহ্লাদের বিষয় যে, এখন তুমি এ বিষয়ের

বিবেচনা করিতে প্রবর্ত্ত (প্রবৃত্ত) হইলে। পক্ষপাত পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্র বিবেচনা করিলে যাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হয়, তাহার (সম্বন্ধে) অবশ্য নিশ্চয় হইতে পারিবেক (পারিবে) এবং এরূপ স্ত্রীবধ জন্য (জনিত) পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার (নিন্দা) আর হইবেক (হইবে) না।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, শতবর্ষাধিককাল পূর্ব্বে রামমোহন যে গদ্য স্বীয় বক্তব্য প্রকাশার্থ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহার সহিত বর্ত্তমানকালের গদ্য রচনা তুলনা করিলে যে প্রভেদ লক্ষিত হয় তাহা উপেক্ষণীয় এবং বুঝা যায় শতবর্ষাধিককালে ভাষার বা রচনা-পদ্ধতির এমন কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই যে, ভাষার স্বরূপ নির্ণয় করা দুষ্কর হইতে পারে। রামমোহনের রচনায় একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা প্রয়োজন—ইহাতে সংস্কৃতমূলক শব্দেরই প্রাধান্য; কিন্তু তাহাতে ভাব-প্রকাশে কোনরূপ বাধা ঘটে না।

এই সময়ে ও ইহার পর বাঙ্গালায় আর যে সব পুস্তক প্রকাশিত হইতে থাকে, সে সকলের ভাষা সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

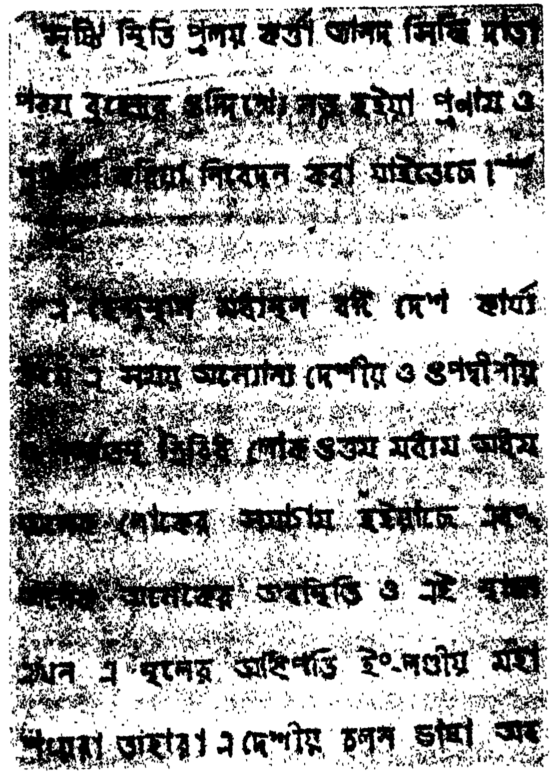
১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে পাদরী ইয়েটস কৃত যে বঙ্গভাষার প্রবেশিকা (Introduction to the Bengali Language) পুস্তক প্রকাশিত হয় তাহাতে বিবিধ বাঙ্গালা পুস্তকহইতে রচনাংশ উদ্ধৃত। ইহার সম্পাদক ওয়েঙ্গার সংগ্রহের প্রথম পুস্তক 'তোতা ইতিহাস' সম্বন্ধে টীকায় লিখেন:—এই সকল গল্প পারসী ও উর্দ্দু হইতে অনুদিত। ইহাদিগের রচনা-রীতি (style) কোনরূপেই বিশুদ্ধ বলা যায় না but deserving of attention as a very fair specimen of the colloquial language and its almost unbounded negligence.

তবেই দেখা যায়, তৎকালে চলিত ভাষায় রচিত পুস্তক বিশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইত না। কিন্তু চলিত ভাষা ভাবপ্রকাশক্ষম ছিল। আমরা নিম্নে একটি গল্পের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:—

XV—Tale of the Serpent presered এক প্রধান লোকের পুত্র তিনি আপন জামার আস্তিনের মধ্যে সর্পকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহার কথা।

এক প্রধান লোকের পুত্র এক দিবস মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন, অকস্মাৎ এক সর্প ধাইয়া সেই বড় মনুষ্যের সন্তানের অগ্রে যাইয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, ও বড় মনুষ্যের পুত্র, আমার এক শত্রু যষ্টি হস্তে লইয়া আমাকে নষ্ট করিতে আমার পশ্চাৎ২ আসিতেছে, অতএব তুমি আশ্রয় দিয়া আমাকে রক্ষা কর। ইহা শুনিয়া আমিরপুত্র সেই নাগকে অনুকূল হইয়া আপন জামার আস্তিনেতে স্থান দিলেন, সর্পও সেই আস্তিনমধ্যে গোপন হইল। এক দণ্ড পরে এক ব্যক্তি লাঠি লইয়া, সেইখানে পঁহুছিয়া সেই উত্তম লোকের পুত্রকে জিজ্ঞাসিল, এক কৃষ্ণবর্ণ সর্প আমার অগ্রে পলাইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে দেখিয়াছ কি না।

এই রচনাকে পুস্তক-সম্পাদক চলিত ভাষায় রচিত বলিলেও দেখা যায় ইহাতে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃতমূলক এবং রচনায় "যষ্টি" ও "লাঠি" "উপস্থিত হইয়া" ও


সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা আনন্দ সিদ্ধি দাতা
পরম ব্রহ্মের [illegible] হইয়া প্রণাম এ
[illegible] করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।
[illegible] মহাশয় বঙ্গ দেশ কার্য্য
[illegible] এ সময় অন্যোন্য দেশীয় ও উপদ্বীপীয়
[illegible] বিবিধ লোক ওত্তম মধ্যম অধম
[illegible] লোকের আগমন হইয়াছে এবং
[illegible] অনেকের অবস্থিতি ও এই [illegible]
এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহা
শয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অব

লিপিমালা—১৮০২ খৃষ্টাব্দে লিখিত

"পঁহুছিয়া" উভয় প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হইলেও সংস্কৃতমূলক শব্দেরই প্রাধান্য আছে এবং চলিত শব্দ যেন সংস্কৃত শব্দের সহিত কুণ্ঠিতভাবে একাসনে উপবেশন করিতেছে।

ইহার পর আমরা রামরাম বসু রচিত 'লিপিমালা'র উল্লেখ করিব। এই পুস্তক ১৮০২ খৃষ্টাব্দে "শ্রীরামপুরে ছাপা" হয়। ইহাতে স্পষ্টই লিখিত হইয়াছে, ইংরাজরা এ দেশের চলিত ভাষা অবগত হইয়া রাজকার্য্যক্ষম হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে তাঁহাদিগের জন্য এই পুস্তক রচিত হয়। ইহার আরম্ভ এইরূপ:—

সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কর্ত্তা জ্ঞানদ সিদ্ধিদাতা পরম ব্রহ্মের উদ্দিশ্যে (উদ্দেশ্যে) নত হইয়া প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়া নিবেদন করা যাইতেছে।

এ হিন্দুস্থান মধ্যস্থল বঙ্গ দেশ কার্য্যক্রমে এ সময় অন্যোন্য (অন্যান্য) দেশীয় ও উপদ্বীপীয় ও পর্ব্বতস্থ ত্রিবিধ লোক উত্তম মধ্যম অধম অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে এবং অনেক অনেকের অবস্থিতিও এই স্থানে এখন এ স্থলের অধিপতি ইংলণ্ডীয় মহাশয়েরা তাহারা এ দেশীয় চলন ভাষা অবগত নহিলে রাজক্রিয়াক্ষম হইতে পারেণ না ইহাতে তাহারদিগের আকিঞ্চন এখানকার চলন ভাষা ও লেখাপড়ার ধারা অভ্যাস করিয়া সর্ব্ববিধ কার্য্য ক্ষমতাপন্ন হয়েন।

ভূমিকার শেষভাগ এইরূপ !—

এই পুস্তকের মধ্যে কদাচিত ক্রমে কশ্চিত দোষ হইয়া থাকে তাহা অনুগ্রহ পুর্ব্বক দৃষ্টিমাত্রে নিন্দামদে মত্ত না হয়েন একারণ কোন লোক দোষ ভিন্ন হইতে পারে না।

মানব সৃজন বিধি করিল যখন।
সেই কালে ষড়রিপু কৈল নিয়োজন।

বড়ই কাতর দেখি হইল মমতা
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা।
আপন ইচ্ছায় ফল খাও যত আইসে মনে
শুনিয়া হরিষ হৈল যত বানরগণে।
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর
লাফে২ পড়ে গিয়া গাছের ওপর।

রামায়ণ—১৮০২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত

অতএব ভুল ভ্রান্তি আছে সব্বজনে
মানব লক্ষণ বসু রামরাম ভনে।
শতাদিত্য বসু বর্ষ পঞ্চ শ্রেষ্ঠ মাস।
পরম আনন্দে রাম করিল প্রকাশ।

রামরাম যে উদ্দেশ্যে তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজদিগকে রাজকার্য্যক্ষম করিবার জন্য তিনি তাঁহাদিগকে এ দেশের "চলন ভাষা" শিক্ষা দিবার জন্য যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে সংস্কৃতের প্রভাব কত অধিক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সুতরাং মনে করা যাইতে পারে, এখন যেমন—পূর্ব্বেও তেমনই চলিত ভাষা সংস্কৃতমূলক ছিল। যে সংস্কৃতমূলক ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা সৃষ্টি করেন নাই—নিজ নিজ প্রয়োজনানুসারে প্রযুক্ত করিয়াছেন।

'ইতিহাস-মালা' শ্রীরামপুরে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহার রচয়িতা উইলিয়ম কেরী। ইহার "প্রথম কথার" প্রথমাংশ এইরূপ—

বিন্ধ্য দেশে বীরপুর নগরে বীরসিংহ নামে রাজা ছিলেন তাঁহার সভাতে শ্রুতিধর নামা সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন। এক দিবস তিনি রাজকে কহিলেন যে হে মহারাজ আমি অনেক কাল পর্য্যন্ত তোমার নিকটে আছি কিন্তু আপনি আমার বিদ্যাবিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না এ কারণ আমার দীনত্ব দূর হয় না যদি আপনি আজ্ঞা দেন তবে আমি একবার অন্য দেশে যাই। রাজা আজ্ঞা দিলেন যে এক মাসের অধিক থাকিও না। পরে সেই পণ্ডিত আপন বাটী হইতে সুরঙ্গ দেশে সুশর্ম্মা নাম ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইলেন সেই দেশে সুবাহু নামে রাজা থাকেন তাঁহার সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা দেয়।

এই রচনার ভাষা সরল ও কার্য্যোপযোগী; কিন্তু ইহাতেও সংস্কৃতের প্রভাব সুস্পষ্টরূপ লক্ষিত হয়।

এই সকল রচনার আলোচনা করিলে মনে হয়, বাঙ্গালা ভাষা যে পদ্ধতিবদ্ধ ছিল না, তাহা নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে সময় রামমোহন গদ্য রচনা প্রবর্ত্তিত করেন তাহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালা পদ্য রচনা পাঠ করিলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না—বাঙ্গালা ভাষা পদ্ধতিবদ্ধ ছিল। এই সকল পূর্ব্ববর্ত্তী পদ্য রচনা—অনেক স্থানে—এখনও রচনার আদর্শরূপে পঠিত হইতেছে।

যে বৎসর রামরাম বসুর 'লিপিমালা' মুদ্রিত হয়, সেই বৎসরে শ্রীরামপুর হইতে, তাহার বহুপূর্ব্বে রচিত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৫ খণ্ডে মুদ্রিত হয়। তাহার ভাষা স্বচ্ছ, সরল ও সবল—

বড়ই কাতর দেখি হইল মমতা
কন্যা বলে ফল খাও দিলাম সর্ব্বথা।
আপন ইচ্ছায় ফল খাও যত আইসে মনে
শুনিয়া হরিষ হৈল যত বানরগণে।
একে চায় আর আজ্ঞা পাইল বানর
লাফে লাফে পড়ে গিয়া গাছের উপর।

বলা বাহুল্য ভারতচন্দ্রের রচনায় ভাষা আরও মার্জ্জিত, ছন্দ আরও মধুর ও লীলায়িত—

ওহে বিনোদ রায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে॥
নবজলধর তনু　　শিখিপুচ্ছ শক্রধনু
পীতধড়া বিজুলিতে ময়ূরে নাচাও হে।

নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর
মুখসুধাকরহাসি-সুধায় বাঁচাও হে ॥

মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধে'র তুলনায় 'অন্নদামঙ্গল' ভাষা, ছন্দ, রচনা,কোন বিষয়ে নিম্নস্তরের—এ কথা যাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহাদিগের সাহিত্য-রসজ্ঞতার প্রশংসা করিতে পারি না।

ভারতচন্দ্রের সময়ও বাঙ্গালা ভাষা কেবল যে প্রণালীবদ্ধ ছিল, তাহা নহে; পরন্তু শক্তিশালী বাঙ্গালী সাহিত্যিকরা ভাবপ্রকাশের জন্য—বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিবার জন্য অনায়াসে বিদেশী শব্দও সংস্কৃত শব্দের সহিত মাল্যে গ্রথিত করিয়াছেন। ইহা ভাষার অসাধারণ ক্ষমতারই পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

রামপ্রসাদের গানেও ইহা দেখা যায়!—

আমায় দাও মা তসিলদারী।
আমি নেমকহারাম নই শঙ্করি ॥
পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরারি ॥
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি।
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি ॥

দেশীয় ভাষার পার্শ্বে বিদেশী ভাষা স্বচ্ছন্দে স্থান পাইয়াছে—কাহারও কোনরূপ কুণ্ঠা ভাব নাই।

বৈষ্ণব সাহিত্যেও ভাষার পদ্ধতি-বদ্ধতার ও ভাবপ্রকাশ-ক্ষমতার পরিচয় সর্ব্বত্র সপ্রকাশ।

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রায় ভারতচন্দ্র যে অসাধারণ কৃতিত্ব-পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিয়াও কি বলা যায়, বাঙ্গালা ভাষা গৌরবের বিষয় ছিল না?—

পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
সকলের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তার কপালে আগুন ॥

তন্ত্রমত প্রচার ও ভাগবতমত প্রচার—উভয়ই বাঙ্গালায় বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে হইয়াছে। পণ্ডিতদিগের মধ্যে তর্ক ও জনসাধারণের নিকট মতপ্রচার উভয়ই যে বাঙ্গালায় হইত, তাহা সহজেই অনুমেয়। কথকতায়ও আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। বাঙ্গালা ভাষাকে পদ্ধতি-বদ্ধ করিবার কোন প্রয়োজন তখনও অনুভূত হয় নাই—যখন যে ভাবপ্রকাশ প্রয়োজন হইয়াছে ভাষা তাহারই উপযোগী দেখা গিয়াছে।

ইহার পর ইংরাজের শাসনে কি হইয়াছে, অতঃপর তাহাই বিবেচনা করিয়া আমরা প্রয়োজনবোধে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

মায়ের শেষ চিঠি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

[আমার অসুখের কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী এই চিঠিখানি লেখেন—২৭শে অগ্রহায়ণ শুক্রবারে পাই, ৮ই পৌষ তিনি স্বর্গারোহণ করেন]

চিঠিখানি মায়ের হাতের লেখা
শুক্রবারে পেয়েছিলাম কবে,
গভীর স্নেহ অমৃতের সে রেখা
ভাবি নাই ত শেষ চিঠি যে হবে।

২

বুড়া খোকার তৃষিত এই মুখে,
মায়ের বুকের শেষ দুধের এ ধার—
শেষের কাজল জলভরা এই চোখে
এ জনমে মিল্‌বে না ত আর।

৩

পরের কাছে মূল্য ইহার নাই—
অমূল্য এ আমিই শুধু জানি,
বাৎসল্যেরি সাম্রাজ্যের এ ভাই
মায়ের দেওয়া দান-পত্রখানি।

৪

দুধ সাগরের মানচিত্র এ গোটা
শেষ আশীষের দূর্ব্বা এবং ধান
ললাটে শেষ দই হলুদের ফোঁটা
মায়ের লেখা শেষ চিঠি এইখান

শ্রীগৌরাঙ্গ ও লীলাকীর্ত্তন

রায় শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর এম-এ

শ্রীগৌরাঙ্গ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে এক ফাল্গুনের সন্ধ্যায়। পূর্ণিমার রজনী। সেদিন আবার চন্দ্রগ্রহণ। সহস্র সহস্র লোক গ্রহণ-স্নান করিবার জন্য নবদ্বীপের ঘাটে ঘাটে আসিতেছে। সকলেই হরিবোল হরিবোল বলিতেছে। ভক্তগণ হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে স্নানে আসিতেছেন।

"হরিবোল হরিবোল সবে এই শুনি।
সকল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিধ্বনি॥"

আর একদিন যখন কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেদিনও আমরা প্রকৃতির সঙ্গে এইরূপ এক বিশেষ সামঞ্জস্য দেখি। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী। কারাগৃহ অন্ধকার। কিন্তু সহসা দিঙ্মণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল, ঋক্ষ গ্রহ নক্ষত্র প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, নদীসকল নির্ম্মল জলে পূর্ণ হইল, সরোবরে পদ্মফুল ফুটিল, বনরাজি কুসুমচয়ে শ্রীসমন্বিত হইল, পক্ষিকুল কলধ্বনি করিতে লাগিল। সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাণোন্মুখ বহ্নি দীপ্ত হইয়া জ্বলিল, সমুদ্রের জলকল্লোলের সঙ্গে সুর মিলাইয়া জলধরগণ গুরু গুরু ডাকিতে লাগিল। এমনি এক ঘোর অন্ধকার নিশীথে ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। কৃষ্ণের আবির্ভাবের প্রয়োজন পৃথিবীর ভার-হরণ। পাপের ভারই দুর্ব্বহ। পৃথিবীতে যখন পাপের মাত্রা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, তখন ভগবান আবির্ভূত হয়েন, ইহাই সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণের তাৎপর্য্য। কৃষ্ণ অবতারের প্রয়োজন পাপের উচ্ছেদ-সাধন—শত্রু-সংহারের দ্বারা, যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা। শ্রীগৌরাঙ্গের অবতারও পাপের উচ্ছেদ-সাধন নিমিত্ত—কিন্তু সংহারের দ্বারা নহে, ভক্তির দ্বারা, নাম-প্রেমের দ্বারা। তিনি হরিনাম প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কাজেই হরিধ্বনির মধ্যে তাঁহার জন্ম। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অবতার-প্রয়োজনীয়তার অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য।

চন্দ্রগ্রহণের সময় সজ্জন দুর্জ্জন সকলেই হরিবোল বলিয়া গঙ্গায় ডুব দিতেছে বটে। কিন্তু ইহার দ্বারা সে সময়কার অবস্থা প্রতীয়মান হয় না। লোকের মধ্যে ভক্তির অভাব ছিল, দেশে তখন মুসলমানদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের আস্থা কমিয়া গিয়াছে। বাসুলী বিষহরি যোগীপাল ভোগীপাল প্রভৃতি দেবতার পূজা অর্চ্চনা হইতেছে। পূজায় তান্ত্রিক আচারেরই প্রাচুর্য্য। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রভাব সমাজের বিভিন্ন স্তরে সংক্রামিত হইয়া নানা বীভৎস আচার অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের সৃষ্টি করিয়াছে। পাষণ্ডী ভণ্ড ও নাস্তিকের অত্যাচারে ভক্তগণ সন্ত্রাসিত। পূজা অর্চ্চনায় লোকে ধন-পুত্রই কামনা করে, কীর্ত্তন শুনিলে উপহাস করে। ভগবৎ-নামের কোনই প্রসঙ্গ নাই। এমনই কলিতিমিরাকুল যুগে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইলেন।

নিরুপায়ের উপায় ভগবান সর্ব্বকালেই। কিন্তু এবারে এক নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইল, যাহা কোনও অবতারে কখনও হয় নাই। সে নূতন উপায় হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবের উদ্ধার। প্রত্যেক অবতারেই ভগবান যুগধর্ম্ম স্থাপন করেন।

'কলি যুগের যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন।
এতদর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন॥'

মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন যে চৈতন্যাবতারের মুখ্য প্রয়োজন কীর্ত্তন প্রচার।

'কীর্ত্তনং কারয়ামাস স্বয়ং চক্রে মুদান্বিতঃ।'

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে ফিরিয়া এই নাম-কীর্ত্তনের পদ্ধতি দেখাইলেন।

হরিকীর্ত্তনমাদিশৎ স্মরণ্
পুরুষার্থায় হরেরতিপ্রিয়ম্।
স গয়াসু পিতৃক্রিয়াং চরণ্
হরিপাদাঙ্কিত ভূমিষু স্বয়ম্॥

—মুরারিগুপ্তের করচা ১ম প্র, ১ম সর্গ।

নিমাই পণ্ডিত আর অধ্যাপনা করিতে পারিলেন না।

"গয়া হৈতে যাবত আসিয়াছেন ঘরে,
তদবধি কৃষ্ণ ব্যাখ্যা আন নাহি স্ফুরে।

যে প্রভু আছিল ভোলা মহাবিদ্যারসে।
এবে কৃষ্ণ বিনা আর কিছু নাহি বাসে॥
সর্ব্বদা বলেন কৃষ্ণ পুলকিত অঙ্গ।
ক্ষণে হাস হুঙ্কার ক্ষণেক বহু রঙ্গ॥"
"শিষ্য বলে পণ্ডিত উচিত ব্যাখ্যা কর।
প্রভু বলে সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মর॥"

তখন প্রভু বলিলেন—

"তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার।
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥"

যেখানে তোমাদের ইচ্ছা হয় গিয়া পড়িতে পার, আমার দ্বারা আর হইবে না।

"কৃষ্ণ বিনা আর বাক্য না স্ফুরে আমার।"

পড়িতে বসিলেই আমি দেখি,

'কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায়।'

শিষ্যেরাও অধ্যাপকের উপযুক্ত; তাঁহারা বলিলেন আমরা আর পড়িব না। এত বলি,

"পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর।"

তখন গৌরচন্দ্র তাঁহাদিগকে বলিলেন তবে কৃষ্ণ নাম কর।

'কৃষ্ণ নামে পূর্ণ হউক সবার বদন।'

পড়ুয়ারা বলিলেন আমরা ত সংকীর্ত্তন করিতে জানি না, আমাদিগকে শিখাইয়া দিন। তখন প্রভু করতালি দিয়া দিশা দেখাইয়া দিলেন।

'হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"

ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলিয়া এই নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। ক্রমে কোলাহল হইয়া উঠিল; তখন নবদ্বীপের সব লোক ধাইয়া আসিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল—

'এবে সংকীর্ত্তন হৈল নদীয়া নগরে।'

ইহাতে এইরূপ বুঝা যায় যে পূর্ব্বে এমনটি ছিল না।

ইহার পর হইতে রীতিমত কীর্ত্তন চলিল। কিন্তু সে কীর্ত্তনে কি গীত হইত, কি প্রণালীতে গান করা হইত, তাহা ত আমরা জানিবার সুযোগ পাই না। চৈতন্য-ভাগবত হইতে এইমাত্র জানিতে পারি যে এই সংকীর্ত্তন হইতে—

'নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।'

এখন হইতে তাঁহার চেষ্টা হইল যাহাতে

"ঘরে ঘরে নগরে নগরে অনুক্ষণ,
সর্ব্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্ত্তন।"

ইহার পরে নিত্যানন্দচন্দ্র নবদ্বীপে আসিয়া উদিত হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন

"নদীয়ায় শুনি বড় হরি সংকীর্ত্তন।
কেহ বলে এথায় জন্মিলা নারায়ণ।"

ইহার পর হইতে

'মহামত্ত দুই প্রভু কীর্ত্তনে বিহরে।'

নিরন্তর ভক্তগণ মধ্যে এই কীর্ত্তনানন্দ হইত।

শ্রীবাসবিপ্রাদিগণৈঃ কচিন্নবং
গায়ন্ত্যলং নৃত্যতি ভাবপূর্ণঃ।

মুরারির করচা—১ম ১৬শ

রাত্রিকালে শ্রীবাসের গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তন হইত। সে কীর্ত্তনের আসরে সকলের প্রবেশাধিকার থাকিত না।

এই মত প্রতি নিশা করয়ে কীর্ত্তন।
দেখিবার শক্তি নাহি ধরে অন্যজন॥

এই কীর্ত্তনে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেন। বৃন্দাবনদাস যখনই এই কীর্ত্তনপ্রসঙ্গ তুলিয়াছেন, তখনই তিনি এই নৃত্যের কথাই কহিয়াছেন।

মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন যে নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্র সংকীর্ত্তনের একমাত্র জন্মদাতা। 'সংকীর্ত্তনৈক পিতরৌ।' কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে গ্রহণের সময় শত সহস্র লোক সংকীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে আগমন করিতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গৌরচন্দ্রের পূর্ব্বেও একরূপ সংকীর্ত্তন হইত। তাহা হইলে কীর্ত্তনের ইতিহাসে শ্রীগৌরাঙ্গের স্থান কোথায়? শুধু যে বৃন্দাবনদাস ইঁহাকে (এবং নিত্যানন্দকে) সংকীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিতেছেন, তাহা নহে। কৃষ্ণদাসকবিরাজও বলিয়াছেন,

'চৈতন্যের সৃষ্টি এই নাম সংকীর্ত্তন।'

প্রতাপরুদ্র রাজা মহাপ্রভুর কীর্ত্তন দেখিয়া যখন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন

'কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন।'

তখন সার্ব্বভৌম বলিলেন, মহারাজ! ঠিকই বলিয়াছেন। এই সংকীর্ত্তন চৈতন্যের সৃষ্টি। এই কীর্ত্তনে প্রভু তাণ্ডব নৃত্য করিতেন। সে সময়ে তাঁহার অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদয় হইত। কবিরাজ-গোস্বামী ইহাকেই চৈতন্যের কীর্ত্তন-বিলাস বলিয়াছেন।

'মহাপ্রেম মহানৃত্য মহাসংকীর্ত্তন।'

এইরূপ উক্তি হইতেও বুঝা যায় যে চৈতন্যের এই কীর্ত্তন এক পরম অদ্ভুত ব্যাপার ছিল।

লোচনদাস এই সংকীর্ত্তনকে সর্ব্বধর্ম্মসার বলিয়াছেন। এই হরিসংকীর্ত্তন পঞ্চম বেদ এবং ইহার প্রবর্ত্তক গৌরচন্দ্র।

'জয় জয় সংকীর্ত্তন দাতা গৌর হরি।'
'অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি আমারে আনিয়া।
সংকীর্ত্তন যজ্ঞস্থানে সুদৃষ্টি হইয়া।"

অতএব দেখা যাইতেছে যে সকলেই একবাক্যে মহাপ্রভুকে সংকীর্ত্তনের জনক বলিতেছেন। তাঁহার অবতারের প্রয়োজনও বঙ্গীয় গোস্বামীদিগের মতে 'সংকীর্ত্তন-প্রকাশ।'

শ্রীবাসাদির গৃহে দ্বার রুদ্ধ করিয়া এই সংকীর্ত্তন হইত। অবশ্য ইহার উদ্দেশ্য এই যে অভক্ত কেহ এই নৃত্যবিলাসে উপস্থিত না থাকেন। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে এই নূতন ব্যাপার সকলে প্রীতির চোখে দেখিবে কিনা এই সন্দেহও সম্ভবতঃ মনে ছিল বলিয়া দ্বার রোধ করা হইত।

কবিরাজ গোস্বামী ইহা কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য চন্দ্রোদয়' নাটক হইতে অনুবাদ করিয়াছেন ঃ—

রাজা। ঈদৃশং কীর্ত্তনকৌশলং কাপি ন দৃষ্টম্।
সার্ব্বভৌম। ইয়মিয়ং ভগবচ্চৈতন্যস্য সৃষ্টিঃ।

বৃন্দাবনদাস একদিনকার এক ঘটনায় ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নবদ্বীপের এক পরম সাধুপ্রকৃতির ব্রহ্মচারীর বড় সাধ হইল মহাপ্রভুর কীর্ত্তন দেখিবার জন্য। শ্রীবাসকে ধরিয়া পড়িলেন। কিন্তু শ্রীবাস বলিলেন যে তাঁহার আজ্ঞা না হইলে ত তোমাকে প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। প্রভু যদি রাগ করেন! শেষে সেই বিপ্রের আগ্রহাতিশয্যে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধ্যাকালে নিজের বাড়ীতে লুকাইয়া রাখিলেন। প্রভুর কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনি মুকুন্দমুরারি বনমালী প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু আনন্দ হইল না। তখন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে একজন গৃহকোণে লুক্কায়িত রহিয়াছেন। তৎক্ষণাৎ সে ব্রহ্মচারীকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইল। সে ব্রাহ্মণ যার পর নাই লজ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন, যাহা হউক ভাগ্যে ত কিছু দর্শন ঘটিল, ইহাই পরম লাভ।

'অদ্ভুত দেখিনু নৃত্য অদ্ভুত ক্রন্দন।
অপরাধ অনুরূপ পাইনু-তর্জ্জন।'

তিরস্কৃত হইয়াও যে ব্রহ্মচারী মনে মনে অভিমান করিলেন না, ইহা বুঝিয়া প্রেমের ঠাকুর তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৃপা করিলেন। এই কীর্ত্তনের বর্ণনায় চৈতন্যভাগবত বলিতেছেন—

'হরিবোল হরিবোল হরি বল ভাই।
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই।"

সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে শ্রীবাসঅঙ্গনে নামকীর্ত্তনই অনুষ্ঠিত হইত। এই কীর্ত্তন-মঙ্গলের কথা ক্রমেই সুপ্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন নাগরিকগণ দধি ঘৃত কদলী মাল্য প্রভৃতি লইয়া মহাপ্রভুকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন 'কৃষ্ণভক্তি হউক সবার' এবং বলিয়া দিলেন 'হরেকৃষ্ণ' নাম জপ করিলে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে। এই নাম করিতে কোনও বিধির প্রয়োজন নাই। সর্ব্বক্ষণ এই নাম লওয়া যাইতে পারে।

'দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া॥"
হরি 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ নাম করিতেন বলিয়া সদানন্দ নামে একজন উড়িয়া কবি তাঁহাকে 'হরিনাম মূর্ত্তি' আখ্যা দিয়াছিলেন।

পদাবলী যে সে সময়ে সুপরিচিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। জয়দেবের কোমল-কান্ত পদাবলীর ত কথাই নাই, বাঙ্গালা পদাবলী ও আস্বাদ্য ছিল। মহাপ্রভুর সমসাময়িক মুরারি গুপ্ত বলিতেছেন

ভাবানুরূপ শ্লোকেন রাসসংকীর্ত্তনাদিনা-
শ্রীরাধাকৃষ্ণয়ো লীলারসবিজ্ঞা-নিদর্শনম্।

এই ভাবানুরূপ শ্লোক ও রাসসংকীর্ত্তন বাঙ্গালা পদাবলীও হইতে পারে। সে সময়ে যে বাঙ্গালা পদাবলীর মাধুর্য্য বৈষ্ণবসমাজে স্বীকৃত হইত তাহা শ্রীসনাতনগোস্বামীর কথা হইতেও বুঝা যায়। তিনি তাঁহার বৃহৎ বৈষ্ণবতোষিণী নামক ভাগবতের টীকায় বলিতেছেন :—শ্রীচণ্ডীদাসাদি-দর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড প্রকারাশ্চ।

কাটোয়া হইতে শ্রীগৌরাঙ্গ যখন সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিত্যানন্দের 'প্রেমপূর্ণ কৌশলে' অদ্বৈতভবনে উপনীত হইলেন, তখন অদ্বৈতাচার্য্য বিদ্যাপতির একটি পদ গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন :

কি কহবরে সখি আজুক আনন্দ ওর।
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

অনেকদিন পরে মাধব আমার গৃহে ফিরিয়াছেন, সখি! আজ আমার আনন্দের সীমা নাই। এই বলিয়া তিনি নৃত্য, গর্জ্জন, হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া ও পদটি শুনিয়া শ্রীগোবিন্দ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্তরে কৃষ্ণপ্রেম-ব্যথা জাগিয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মুকুন্দ 'ভাবের সদৃশ পদ লাগিল গায়িতে।' মুকুন্দ অতি সুমিষ্ট গান করিতেন। পদাবলীও তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। মুকুন্দের গীতে মহাপ্রভুর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল। মহাপ্রভু তিনদিন উপবাসী ছিলেন; তাহা হইলেও আচার্য্যপ্রভু তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলেন নৃত্য করিবার জন্য। মুকুন্দ তখন গান ধরিলেন:

হা হা প্রাণ প্রিয়সখি কিনা হৈল মোরে।
কানুপ্রেম বিষে মোর তনু মন জরে॥
দিবানিশি পোড়ে মন সোয়াথ না পাও।
যথা গেলে কানু পাও তথা উড়ি যাও॥

এই পদটি যে চণ্ডীদাসের সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার ভনিতা নাই। পদকল্পতরুতেও পদটি উদ্ধৃত হয় নাই। যাহা হউক, এই পদটি শুনিয়া মহাপ্রভু প্রথমে সংজ্ঞা হারাইলেন। পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন। অদ্বৈত হরিদাস প্রভৃতি সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর কোনোদিন শ্রীবাসের গৃহে, কোনোদিন বিদ্যানিধির গৃহে, কোনোদিন মুরারির, কোনদিন বা আচার্য্যরত্নের গৃহে কীর্ত্তন করিতেন। (চৈঃ চন্দ্রোদয় নাটক)। এইরূপে নবদ্বীপে ক্রমে কীর্ত্তনের প্রসার বাড়িতে লাগিল। খোল করতাল লইয়া নাগরিকগণ কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে কাজি সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কাজির হুকুমে তখনই খোল ভাঙ্গিয়া দিল এবং লোকের গৃহদ্বারে অনাচার করিল।

'ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।'

এইরূপ অত্যাচার যখন চলিতে লাগিল তখন মহাপ্রভু নগরকীর্ত্তন বাহির করিলেন। অনেকে মহাত্মা গান্ধীকে Civil Disobedienceএর প্রবর্ত্তক মনে করেন, কিন্তু ইহার প্রথম প্রবর্ত্তন হয় নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা। তিনি কাজির হুকুম অমান্য করিয়া কীর্ত্তন বাহির করিলেন। নবদ্বীপের প্রতিগৃহ পূর্ণকুম্ভ রম্ভা আম্রপল্লবে শোভিত হইল, ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিল, নগরের যত লোক সকলেই কীর্ত্তনের মিছিলে যোগদান করিল। প্রত্যেক লোকের হাতে প্রদীপ। খোল করতাল শঙ্খ লইয়া কীর্ত্তন বাহির হইল। কাজি তাহার প্রতিষেধ করিতে না পারিয়া রফা করিলেন। এই নগরকীর্ত্তনের একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে আপামর সাধারণ ইহাতে যোগদান করিয়াছিল। দ্বিতীয়, লোকের মনে ইহা অদ্ভুত সাহসের সঞ্চার করিল। এই সাহস গণতান্ত্রিকতার একটি ফল—অর্থাৎ বহু লোকের সহযোগিতা এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব শক্তির সন্ধান দিল। তৃতীয়ত আমরা দেখিতে পাই যে এই কীর্ত্তনে মহাপ্রভু একটি পদ গাহিয়া নৃত্য করিতেছেন সে গানটি এই—

তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে।
সার্ঙ্গধর তুয়া চরণে মন লাগহুঁ রে॥

সম্ভবতঃ এই কলিটি কোনও প্রচলিত গানের ধুয়া। এরূপ-ভাবে পদাবলী গান করিয়া সম্ভবতঃ ইহার পূর্ব্বে কীর্ত্তন করা হইত না। সেইজন্যই বলা হইয়াছে

চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি সংকীর্ত্তন।

এই কীর্ত্তনের নাম বেড়া-কীর্ত্তন। এক এক দল স্বতন্ত্র হইয়া কীর্ত্তন করেন, এইরূপ বহুদলে বিভক্ত হইয়া একসঙ্গে কীর্ত্তনের নাম বেড়া-কীর্ত্তন। প্রথম বারের এই বেড়া-কীর্ত্তনে আর একটি পদ গান করা হইয়াছিল।

বিজয় হইলা হরি নন্দ ঘোষের বালা।
হাতে মোহন বাঁশী গলে দোলে বনমালা॥

—চৈতন্য-ভাগবত, মধ্য

এইরূপ কীর্ত্তন কেহ কখনও দেখে নাই। ইহাতে শাস্ত্রের বচনের সহিতও অপূর্ব্ব মিল হইল—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদৈঃ
সংকীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজ্ঞৈ যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

চৈতন্য অবতারের অস্ত্র সাঙ্গোপাঙ্গ এবং যজ্ঞ সংকীর্ত্তন। ভাগবতের ২য় অধ্যায়েও কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে

* ৺সতীশচন্দ্র রায় এই ঘটনাকে মধ্যলীলার শেষ সময়ে লইয়া ফেলিয়াছেন। "এই মধ্যলীলার শেষ সময়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীবৃন্দাবনের পথ ভুলিয়া রাঢ়দেশে উপনীত হইলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর প্রেমপূর্ণ কৌশলে তিনি শান্তিপুরে শ্রীমৎ অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে সমানীত হইয়াছিলেন"—শ্রীপদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড ভূমিকা ৯৭।

তাহারই অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি গৌরাঙ্গের লীলায় দেখিতে পাই।

নবদ্বীপ হইতে যখন গৌরাঙ্গ নীলাচলে গেলেন, তখনও তিনি কীর্ত্তন করিতেন। গম্ভীরায় বসিয়া রাত্রিদিন চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামানন্দরায়ের জগন্নাথবল্লভনাটক, জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গান করিতেন এবং শুনিতেন। এগুলি কি ভাবে গীত হইত তাহা আমরা জানিতে পারি না। মহাপ্রভু এগুলির আস্বাদন করিতেন এইমাত্র জানি। মহাপ্রভুর ভাবোল্লাসের গতি বুঝিয়া এই সমস্ত গ্রন্থ হইতে মুকুন্দ এবং স্বরূপদামোদর শ্লোক ও কবিতা আবৃত্তি করিতেন বা গান করিতেন। ইহাই বুঝা যায়। গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে এই সকল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে রীতিমত কীর্ত্তন হইত তাহা বলা যায় না। এই পাঁচখানি গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি সংস্কৃত, একখানি বাঙলা, অপর একখানি মৈথিল, ব্রজবুলি বা বাঙ্গালা তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। সেকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতের চলনই বেশী ছিল। সেইজন্য আমরা অনেক সময়ে দেখিতে পাই যে মহাপ্রভু সংস্কৃত শ্লোক পড়িয়া কীর্ত্তন করিতেছেন। কখনও কখনও উড়িয়া পদেও পরম আবেশে নৃত্য করিতেছেন।

"জগমোহন পরিমুক্ত যাউ।
মন মাতিলারে চকা চন্দ্রকু চাউ॥"
উড়িয়া পদ মহাপ্রভুর মনে স্মৃতি হইল।
স্বরূপেরে সেই পদ গায়িতে আজ্ঞা দিল॥

হে জগন্নাথ তোমার পদে মস্তক নত করি। আমার মন-চকোর তোমার মুখচন্দ্র দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছে। এই গীতে প্রভু তিন প্রহর নৃত্য করিয়াছিলেন।

পুরীতে জগন্নাথমন্দিরে বেড়া-কীর্ত্তন হইয়াছিল। গৌড়ীয় ভক্তগণ সেখানে সম্মিলিত হইয়াছেন। জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যাধূপ আরতি দেখিয়া ভক্তগণ সঙ্কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

"চারিদিকে চারি সম্প্রদায় করে সঙ্কীর্ত্তন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন।"
"আট মৃদঙ্গ বাজে বত্রিশ করতাল।"
"চারিদিকে চারি সম্প্রদায় উচ্চস্বরে গায়।
মধ্যে তাণ্ডব নৃত্য করে গৌররায়॥"

যতদিন গৌড়ীয় ভক্তেরা পুরীতে ছিলেন ততদিন প্রত্যহ তিনি এইমত কীর্ত্তন করিতেন। স্বরূপদামোদর উচ্চকণ্ঠে গান করিতে পারিতেন। মহাপ্রভু তাহাতে মাচিয়া আনন্দ পাইতেন। এইরূপ গুণ্ডিচা মন্দিরে এবং রথযাত্রায় গৌড়ীয় ভক্তগণ লইয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তন করিতেন।

রথযাত্রায় গৌড়ীয় কীর্ত্তনীয়াগণকে চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হইয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে দুইজন খুলি বাদ্য করিতেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে এক একজন নৃত্য করিবেন স্থির হইল।

নিত্যানন্দ অদ্বৈত হরিদাস বক্রেশ্বরে।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে॥

ইহা ব্যতীত কুলীনগ্রামের এক কীর্ত্তনের দল, অদ্বৈত-আচার্য্যের এক কীর্ত্তনের দল, শ্রীখণ্ডের এক কীর্ত্তনের দল লইয়া সর্ব্বসমেত ৭টি সম্প্রদায় হইল এবং চৌদ্দ মাদল বাজিতে লাগিল। জগন্নাথের রথের আগে ৪ দল, দুই পার্শ্বে দুই দল এবং পশ্চাতে একদল গান করিতে করিতে চলিলেন। পরে মহাপ্রভুর যখন নাচিতে মন হইল, তখন সাত সম্প্রদায়কে মিলিত করিলেন। স্বরূপদামোদরাদি দশজন প্রভুর সঙ্গে গায়িতে লাগিলেন। অন্য দল সব দূরে থাকিয়া যোগ দিলেন। প্রভু এইবার উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং প্রথমে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহার উদ্বোধন করিলেন। কতক্ষণ এইভাবে নৃত্য করিয়া প্রভু ভাববিশেষে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাণ্ডব নৃত্য পরিত্যাগ করিলেন। স্বরূপ ভাবের গতি বুঝিয়া—

সেই ত পরাণ নাথে পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেলুঁ॥

এ পদটি কাহার তাহা আমরা জানি না। 'হা হা প্রাণপ্রিয় সখি' পদটিরও কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। শেষোক্ত পদটির অবশিষ্ট কলি একজন বন্ধু পুরাতন কাগজের মধ্যে চণ্ডীদাসের নামে পাইয়াছেন। কিন্তু 'সেই ত পরাণ নাথে পাইলুঁ' কোনও পুরাতন পাতড়ায় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। স্বরূপগোস্বামী এই ধুয়ামাত্র গায়িয়াছিলেন। তাহাতেই আমাদের উৎকণ্ঠা বাড়াইয়া দিয়াছেন। জানিতে ইচ্ছা হয় পদটির শেষে কি ছিল। 'সেই ত পরাণনাথে পাইলুঁ'—'ত' দেওয়াতে রহস্য আরও জটিল হইয়াছে।

একি 'রেবা রোধসি বেতসীতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে' এই শ্লোকের অনুবাদ। অজ্ঞাতনামা কবির এই মধুর পদটি কাব্যপ্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে; এই পদ্যের ভাব লইয়া শ্রীরূপগোস্বামী লিখিলেন—'সেই আমার প্রাণ রমণকে কুরুক্ষেত্রে দেখিলাম বটে; কিন্তু মনো মে কালিন্দী পুলিনায় স্পৃহয়তি'। আমার সাধ হইতেছে সেই কালিন্দীপুলিনের নীপবন ছায়ায় মিলনের জন্য, যেখানে শ্যামের মোহনবাঁশী বাজিয়া যমুনাকে উজান বহাইত। আমার বোধ হয় স্বরূপ-গোস্বামী নিজেই এই কবিতার ভাব লইয়া ঐ বাঙ্গালা পদটি লিখিয়াছিলেন। স্বরূপদামোদর অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন এবং তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা পদাবলীর সঙ্গেও সুপরিচিত ছিলেন। স্বরূপগোস্বামীর ধুয়া শুনিয়াই প্রভু আনন্দে মধুর কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখন জগন্নাথের রথ চলিতে লাগিল। আগে আগে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া চলিলেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে মহাপ্রভুর সময়ে পদাবলীর প্রচার থাকিলেও কীর্ত্তন বলিতে ইঁহাদের নৃত্য ও ভাবাবেশ বুঝাইত। কবিকর্ণপূর বলিয়াছেন :—

সান্দ্রানন্দময়ী ভবন্নহুদিনং দেবো নরীনৃত্যতে।

—চৈতন্যচন্দ্রোদয়—২য় অঙ্ক।

আমরা কীর্ত্তন বলিতে যাহা বুঝি গরাণহাটী মনোহরসাহী প্রভৃতির সুর—ইহা অবশ্য পরবর্ত্তীকালের সৃষ্টি। মহাপ্রভুর সময়ে কীর্ত্তনে কিরূপ সুর ছিল তাহা আমরা জানি না। তবে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে এখনকার মত পালাবদ্ধভাবে সাজাইয়া কীর্ত্তন করিবার প্রণালীর দৃষ্টান্ত আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। প্রধানতঃ নামকীর্ত্তনই কীর্ত্তন নামে অভিহিত হইত। লীলাকীর্ত্তন যাহা ছিল, তাহা ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভু নবদ্বীপে ও নীলাচলে আস্বাদন করিতেন। কিন্তু তাহার কোনও বিস্তৃত বিবরণ আমরা পাই নাই। গৌরনিত্যানন্দকে সঙ্কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলা হয়। আমার মনে হয় যে ইহার কারণ এই—মহাপ্রভু যে প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিলেন কীর্ত্তনকে তাহার বাহন করিলেন। ধর্ম্মের সাধক (এবং প্রধান সাধক) যে কীর্ত্তন—ইহা মহাপ্রভুর পূর্ব্বে স্বীকৃত হয় নাই। তিনি এবং নিতাইচাঁদ নিজের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইলেন যে সংকীর্ত্তনের দ্বারা নরনারীর মন যত সহজে আকর্ষণ করা যায় এমন আর কিছুতে নহে। ধর্ম্ম জনকতক ভক্তের মধ্যে, ঋষিযোগী বা সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকিলেই হইল না। সকলকে পারের খেয়ায় তুলিতে না পারিলে শুধু দুই একজন পার হইলেই কি, আর না হইলেই কি? আয়াসসাধ্য ভজন-সাধনারাধনার পরিবর্ত্তে এই কীর্ত্তনযজ্ঞ বা নামযজ্ঞ মহাপ্রভু সকলের চক্ষুর সমক্ষে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসহ ধারণ করিলেন। ইহাই চৈতন্যচন্দ্রের অবদান কীর্ত্তনের ইতিহাসে।

দক্ষিণাপথে আর একজন ভাবুক এইরূপভাবে কীর্ত্তন-মহিমা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম তুকারাম।

তুকারামের অভঙ্গ বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় প্রসিদ্ধ। তুকারাম একজন মারাঠী বৈষ্ণব সাধু ছিলেন। তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল 'রাম কৃষ্ণ হরি'। এই মন্ত্র তিনি স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর সহিত তুকারামের অনেক বিষয় আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। তুকারাম নামের প্রভাবে মাতোয়ারা ছিলেন। নাম অতি মধুর। নাম যে কত মধুর তাহা বর্ণনা করা যায় না। নামের মাধুর্য্য ক্রমেই বাড়ে। একবার এই নামের মাধুর্য্য যে আস্বাদন করিয়াছে, তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না। ভগবান নিজে তাঁহার নাম যে কত মধুর তাহা জানেন না। পদ্মফুল কি জানে যে তার সৌরভ কত মিষ্টি? শুক্তি কি তার মুক্তার মূল্য জানে? নাম করার যে মহিমা, সেই মহিমা কীর্ত্তনের। ভগবানকে পাইতে হইলে কীর্ত্তনের মত এমন আর কোনো উপায় নাই। যেখানে কীর্ত্তন হয়, সেখানে ভগবান আপনি সমাগত হয়েন। কীর্ত্তন শুনিয়া যার কর্ণ পরিতৃপ্ত হয় না, তার কান মূষিকের গর্ত্তের ন্যায়। তুলনা করুন, মহাপ্রভুর উক্তি—

কৃষ্ণের মধুর বাণী অমৃতের তরঙ্গিনী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে।
কাণাকড়ি ছিদ্র সম জানিহ সেই শ্রবণ
জন্ম তার হৈল অকারণে।

কীর্ত্তন করিতে হইলে শরীরের সামর্থ্য থাকা চাই। সেইজন্য তুকারাম প্রার্থনা করেন, হে ভগবান আমার শরীর যেন কখনও অসমর্থ না হয়। জীবন একদিন যাইবেই, তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু যতদিন বাঁচিয়া থাকি, ততদিন যেন কীর্ত্তন গাহিতে পারি। কীর্ত্তনকে তুকারাম নদীর সহিত তুলনা করিয়াছেন—এই নদী ভগবানের দিকে ঊর্দ্ধমুখে

প্রবাহিত হয়। কখনও তিনি কীর্ত্তনকে বলিয়াছেন ভজনের ত্রিবেণী—ভক্ত, ভগবান ও নাম এই ত্রিধারা সম্মিলিত হইয়া কীর্ত্তন হইয়াছে। কীর্ত্তনে যে অমৃতের ধারা বহে, তাহাতে জগৎসংসার পবিত্র হইয়া যায়। যিনি কীর্ত্তন করিবেন, তিনি অর্থ লইবেন না, অনাহারে থাকিবেন, গন্ধমাল্যাদি ধারণ করিবেন না। এইরূপভাবে কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া দাক্ষিণাপথে তুকারাম এক অত্যুজ্জ্বল আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ এই যে ভগবান নিজে আসিয়া তাঁহাকে আপনার রথে তুলিয়া লইয়া যান।

সে যাহাই হউক শ্রীচৈতন্য কীর্ত্তনকে যে ভাবে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন, তুকারাম তাহা পারেন নাই। চৈতন্যের প্রভাব এইরূপ যে এক্ষণে কোনও বৈষ্ণব মহাপ্রভুর নাম আগে না করিয়া কীর্ত্তন করিতে সম্মত হইবেন না। এই যে কীর্ত্তনের পূর্ব্বে মহাপ্রভুর নাম করা হয় ইহাকে গৌরচন্দ্রিকা বা সংক্ষেপে গৌরচন্দ্র বলে। কীর্ত্তনের আসরে তাঁহাকে আবাহন করাই গৌরচন্দ্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিবার পূর্ব্বে মহাপ্রভুর তদ্‌ভাবোচিত পদ গান করিবার রীতি আছে। যথা শ্রীকৃষ্ণের রূপগান করিবার পূর্ব্বে গৌরাঙ্গের রূপ, বিরহ গায়িবার পূর্ব্বে গোরাচাঁদের সংসারত্যাগ, হোলি গানের পূর্ব্বে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক রাধাকৃষ্ণের হোলিলীলা স্মরণ, ইত্যাদি। এই যে গৌরচন্দ্রিকা গান করিবার প্রথা, ইহা কত দিনের? অবশ্য মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে নিশ্চয়ই এইরূপ হইত না। এমন কি শ্রীনিবাস প্রভৃতি যখন চৈতন্যকে ঈশ্বর বলিয়া আখ্যাত করিয়া তাঁহার জয়গান করিতে লাগিলেন, তখন প্রভু অত্যন্ত লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন।

"অহে অহে শ্রীনিবাস পণ্ডিত উদার।
আজ তুমি সব কি করিলা অবতার॥
ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
কি গাইলে আমারে তা বুঝাও এখন॥"

কিন্তু কে শুনে কাহার কথা? লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুর জয়গান করিতে লাগিল। শ্রীনিবাস বলিলেন, আমাদের না হয় দণ্ড দিতে পার, কিন্তু—

অব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হইল তোমার কীর্ত্তনে।
কত জনে দণ্ড তুমি করিবা কেমনে।"

এই হইতে গৌরাঙ্গ-গীতি বিশেষভাবে প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও গৌরচন্দ্রিকার উল্লেখ আমরা কোথাও পাই না।

আমার বোধ হয় গৌরচন্দ্রিকার সূত্রপাত নরোত্তম-ঠাকুর হইতে। নরোত্তম শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুত্র হইয়াও অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শ্রীবৃন্দাবনধামে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নিজ জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং গ্রামের প্রান্তে ভজন-খুলি নির্ম্মাণ করিয়া সাধনভজন করিতে থাকেন। নরোত্তম-দাসের উদ্যোগে খেতরীতে যে মহোৎসব হইয়াছিল, সে অতি অপূর্ব্ব ব্যাপার। বর্ণনা পড়িয়া যাহা মনে হয়, তাহাতে এরূপ বিচিত্র উৎসব উহার পূর্ব্বে বা পরে অনুষ্ঠিত হয় নাই। গৌরনিত্যানন্দ, অদ্বৈত এবং তাঁহাদের পার্শ্বদেরা তখন নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবাদেবী ছিলেন এই উৎসবের হোত্রী; শ্রীনিবাস প্রধান পুরোহিত, নরোত্তম উদ্‌গাথা এবং রাজা সন্তোষ দত্ত যজমান। খেতুরীতে ছয় বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে এই মহোৎসব হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ-বল্লবীকান্ত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজমোহন।
শ্রীরাধারমণ রাধে রাধাকান্ত নমোঽস্তুতে॥

এই ছয় বিগ্রহের প্রথমেই আমরা শ্রীগৌরাঙ্গকে স্থাপিত দেখিতে পাই। নরোত্তম শ্রীখণ্ডে গিয়া প্রথম শ্রীগৌরাঙ্গের যুগলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আসেন। শ্রীখণ্ডের ঋষিকল্প নরহরি সরকার ঠাকুর এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়া দিবানিশি তাঁহার সম্মুখে ভজনসাধন করিতেন। খেতরীতে যে সকল বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইল তাহার মধ্যে গৌরাঙ্গ-বিগ্রহই সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী। ইহা হইতেই তখনকার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই উৎসবে অপূর্ব্ব সঙ্কীর্ত্তনস্থল প্রস্তুত হইয়াছিল। সেই সংকীর্ত্তনস্থলে শ্রীনিবাসাদি আচার্য্যগণ এবং বহু প্রসিদ্ধ গায়ক ও বাদক সমবেত হইয়াছিলেন। বঙ্গের এমন কোনও বিখ্যাত গায়ক বাদক ভক্ত মহাজন ছিলেন না যিনি খেতরীর মহোৎসবে যোগদান করেন নাই। শ্রীজাহ্নবা দেবী সকলের অলক্ষ্যে বসিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র অচ্যুতানন্দ নরোত্তমকে গান করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুর নরোত্তমকে মাল্য-চন্দন দিলেন। নরোত্তম ভূমিতে মস্তক ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন এবং দেবীদাস অমৃতের ন্যায় ধ্বনি করিয়া মর্দ্দলে

শব্দ করিলেন। চণ্ডীদাস গৌরাঙ্গদাস প্রভৃতি সেই সঙ্গে মৃদঙ্গ করতাল প্রভৃতি বাজাইতে লাগিলেন। ভক্তিরত্নাকরে এই কীর্ত্তনের বিশদ বর্ণনা আছে। গ্রন্থকার খেতরীর উৎসবের অনেক পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রাচীনদের মুখে শুনিয়া তিনি এই উৎসবের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। নরহরি বা ঘনশ্যাম অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেই সম্ভবতঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন ইহা জানা যায়। খেতরীর মহামহোৎসবের একশত বৎসর পরেও যে ইহার স্মৃতি উজ্জ্বলভাবেই বৈষ্ণবসমাজে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নরোত্তমদাস ঠাকুরের পরিবারভুক্ত নরহরি চক্রবর্ত্তী যে নরোত্তমের লীলা সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা বিশ্বাস করা যায়। ভক্তিরত্নাকরে ও নরোত্তমবিলাসে তিনি এই কীর্ত্তনানন্দের যেরূপ বর্ণনা দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় না যে তিনি শুধু কল্পনার মালা গাঁথিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পারি যে কীর্ত্তন দুই প্রকার ছিল—নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ। অনিবদ্ধ কীর্ত্তন গোকুল-দাস গান করিলেন। সুর তান রাগিণী মূর্চ্ছনা প্রভৃতি বিস্তার করিয়া তিনি এই গান করিয়াছিলেন। আর নরোত্তম নিজে গাহিয়াছিলেন নিবদ্ধ কীর্ত্তন। আমার বোধ হয় পালাক্রমে যাহা গান করা হইত তাহার নাম ছিল নিবদ্ধ কীর্ত্তন। নরোত্তম নিজে গরাণহাটি সুরের স্রষ্টা, তিনি অসামান্য পদকর্ত্তা। নরোত্তমের প্রার্থনার পদের ন্যায় কবিতা কোনও ভাষায় নাই। নরোত্তম পালা সাজাইয়া গান করিয়াছিলেন এবং তৎপূর্ব্বে গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়াছিলেন।

শ্রীরাধিকাভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥
আকর্ষণ মন্ত্র কি উপমা তার দিতে।
হইল বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে॥
তদুপরি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন মনে এই কৈল অভিলাষ॥ ভক্তিরত্নাকর ১০ম

ইহাই গৌরচন্দ্রিকার আরম্ভ। ঠাকুর মহাশয় যে দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী গায়ক ও পদকর্ত্তৃগণ অনুসরণ করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে প্রতি অধ্যায়ের সূচনায় গৌরচন্দ্রের নাম করিবার রীতি দেখা যায়। সে সময়ে বৈষ্ণবদের মধ্যে গৌরচন্দ্রকে প্রণাম না করিয়া কোন গ্রন্থ বা নূতন কোন অধ্যায় আরম্ভ করিবার প্রথা ছিল না। কিন্তু কীর্ত্তনের গৌরচন্দ্রিকা শুধু গৌরচন্দ্রকে প্রণাম মাত্র নহে। এক্ষণে গৌরচন্দ্র বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহা এই যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণের কোন লীলা গান করিতে হইলে সেই লীলার ভাবোচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক গান করিতে হয়। এই প্রণালীর সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাই—খেতরীর উৎসবের বর্ণনায়। তখনও পালাক্রমে গান করিবার পদ্ধতি সুপ্রচলিত হয় নাই বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঐ খেতরীর মহোৎসবে দেখিতে পাই

কেহ হোলিযাত্রা পদ্য পড়য়ে উচ্ছায়।
কেহ নবদ্বীপ বৃন্দাবন লীলা কেহ গায়॥—নরোত্তমবিলাস

ইহা হইতে বুঝা যায় যে গান করিবার প্রণালী তখনও সুনিয়মিত হয় নাই। সে দিন ফাল্গুনী পূর্ণিমা। যে দিন মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয় নবদ্বীপে, সেদিনও ফাল্গুনী পূর্ণিমা। খেতরীতে মহাপ্রভুর জন্মোৎসব গান করা হইয়াছিল। আর হোলির দিন বলিয়া কেহ কেহ উৎসাহসহকারে ('উচ্ছায়') হোলি সম্বন্ধে পদ আবৃত্তি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, খেতরীর উৎসবে শ্রীঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক যে প্রথার উদ্ভব হইল, তাহাই পরবর্ত্তীকালে নানা গায়ক মহাজন কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া—বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌছিয়াছে। পূর্ব্বে অনেক মহাজন গৌরলীলা সম্বন্ধে পদ লিখিয়াছিলেন। সেইগুলি যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া পালা সাজানো হইতে লাগিল। খেতরীতেই নরোত্তমদাস আরতির পরে বাসুঘোষের পদ গায়িয়া গৌরচন্দ্রিকা করিয়াছিলেন, ইহা নরোত্তমবিলাসে জানা যায়।

সখি হে, ওই দেখ গোরা কলেবরে।

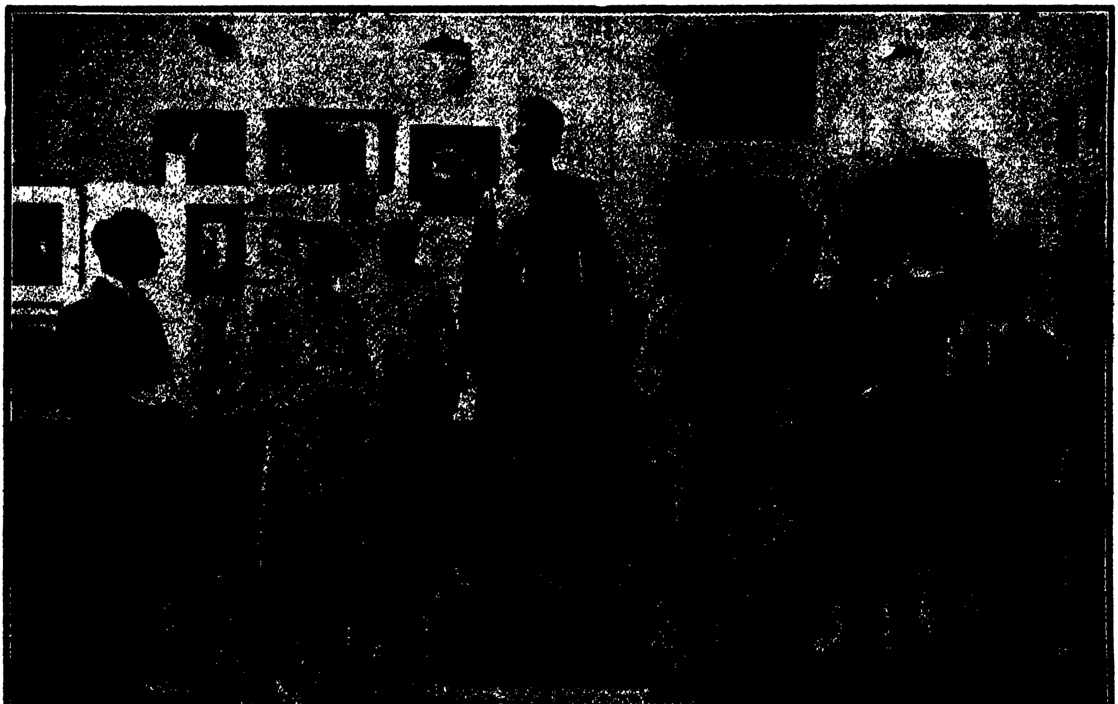
এই অনুরাগের পদটি ঠাকুর মহাশয় গান করিয়াছিলেন। খেতরীতে যাহা হইল, সমস্ত বৈষ্ণব জগৎ তাহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। প্রচারের দিক দিয়া খেতরীর মহোৎসব এক অতি প্রয়োজনীয় ঘটনা। মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্ম, মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তন খেতরীর উৎসব হইতেই দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। নবদ্বীপে যে ধর্ম্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল, বৃন্দাবনের গোস্বামীপাদগণ যে ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, খেতরীর মহোৎসবে তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল।

মাদ্রাজে শিল্পকলা প্রদর্শনী

গত ১৮ই জানুয়ারী হইতে কয়েকদিন মাদ্রাজে গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল গৃহে ছাত্র ও শিক্ষকগণের অনুষ্ঠিত বার্ষিক শিল্পকলাপ্রদর্শনী হইয়া গিয়াছে। প্রদর্শনী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে প্রথমেই শিল্পীদিগের নির্ম্মিত ভাস্কর্য্য সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল। শ্রীযুত সি, গোপালমের নির্ম্মিত "চ্যালেঞ্জ" নামক কুস্তীগীরের মূর্ত্তিটি অতীব মনোহর হইয়াছিল। শ্রীযুত ডি, পি, পাঠকের নির্ম্মিত দুইটি মূর্ত্তিকেও কেহ না দেখিয়া চলিয়া যাইতে পারেন নাই। জনাব আবদুল হাকিম মাদ্রাজের সেরিফ ছিলেন এবং তাঁহার বদান্যতা ঐ অঞ্চলে সর্ব্বজনবিদিত। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল—বাঙ্গালার গৌরবস্বরূপ—শ্রীযুত দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী মহাশয় হাকিমসাহেবের যে পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শনীক্ষেত্রের মধ্যস্থলে স্থাপন করিয়া সকলকে দেখিতে দেওয়া হইয়াছিল। প্রদর্শনীর দক্ষিণ দিকে মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড আরস্‌কিনের আবক্ষ মূর্ত্তিটিও



নিউ জুয়েল (চিত্র) —শিল্পী সৈয়দ আমেদ



স্কুলের প্রদর্শনীতে গভর্ণর

রঞ্জিত ছিল। ইহাও দেবীপ্রসাদের ভাস্কর্য্য-নিপুণতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

শ্রীযুত এস, মুখোপাধ্যায়ের অঙ্কিত "গঙ্গা" চিত্র বাঙ্গালী চিত্রশিল্পীদের সুনাম মান্দ্রাজে এবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। নদীর এরূপ দৃশ্য বাঙ্গালী শিল্পী ভিন্ন অপর কাহারও দ্বারা চিত্রণ সম্ভব হইত না। ভারতীয় মহিলাগণের অঙ্কিত বহু



একটি দৃশ্য (চিত্র)—শিল্পী বি, সি, নাগ



জনাব আবদুল হাকিমের মূর্ত্তি



প্রভাত (চিত্র)—শিল্পী থানিকাচালম্

চিত্র এবার প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল। তাঁহাদের অঙ্কনের আদর্শও দিন দিন উন্নত হইতেছে দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

দেবীপ্রসাদ কলিকাতায় দুর্গাপূজার মিছিলের যে তৈলচিত্রখানি অঙ্কন করিতেছেন, তাহা তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। সেই অসম্পূর্ণ ছবিখানিও দর্শকগণকে উপভোগের উপাদান

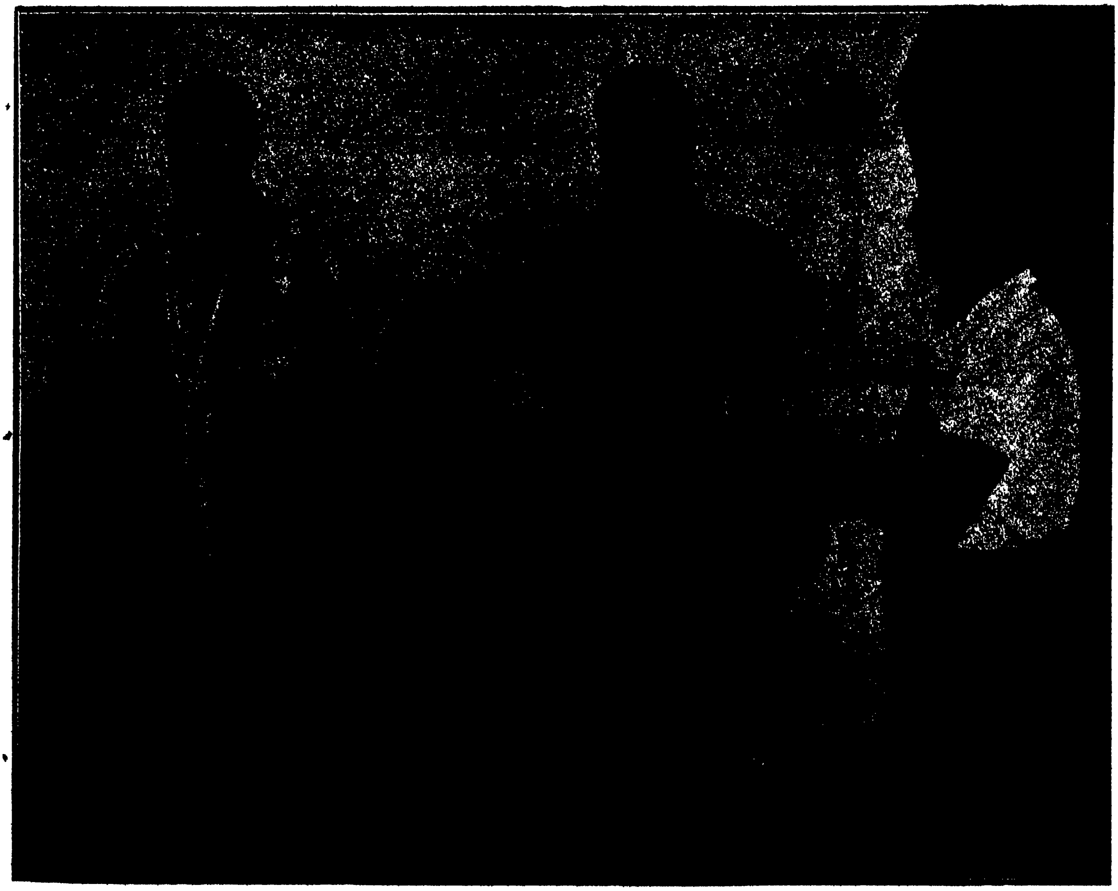
যোগাইয়াছিল। কে, ঘোষদস্তিদারের অঙ্কিত "গায়ক," গোপালকৃষ্ণ সেন অঙ্কিত "লর্ড বুদ্ধ" এবং বারিন নাগের অঙ্কিত "বন্যফুল" প্রদর্শিত চিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল।

মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে শুধু চিত্রাঙ্কন শিক্ষা দেওয়া হয় না। তথায় উটজ-শিল্প শিক্ষাদানের বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কুটির শিল্প বিভাগের প্রদর্শিত কাঠের কাজ, সীসার কাজ, এনামেলের কাজ, চামড়া ও কাপড়ের উপর সেলাইয়ের জাক সত্যই উপভোগের বিষয় ছিল।

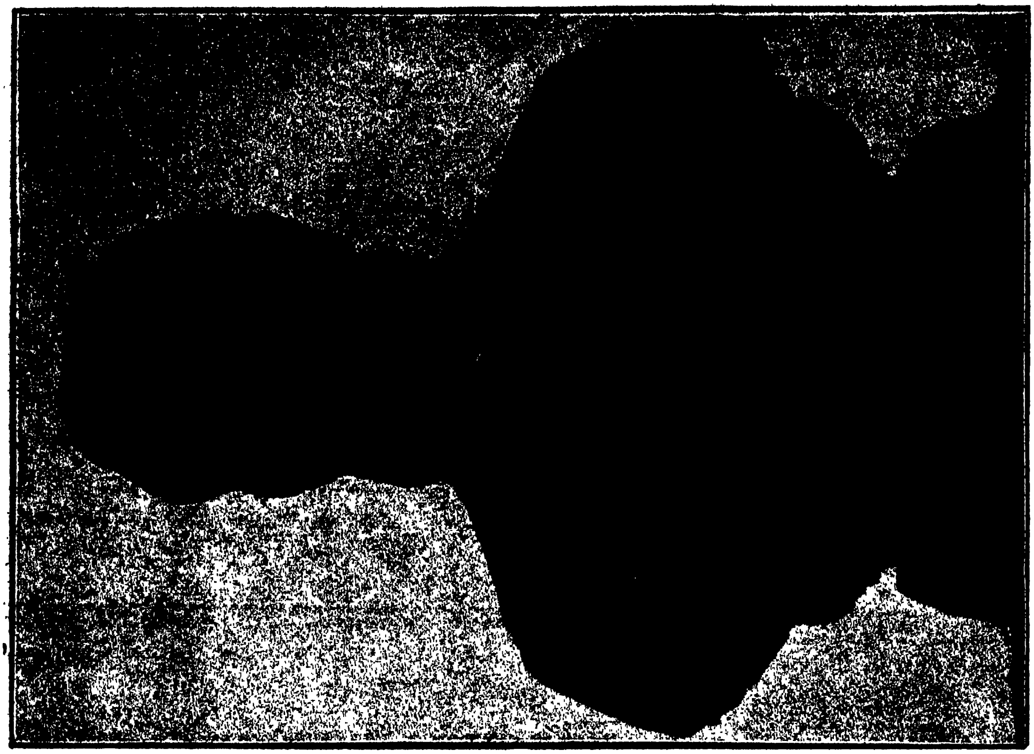
১৮ই জানুয়ারী সকালে মাদ্রাজের গভর্ণর ও তাঁহার পত্নী প্রদর্শনী দেখিতে



চেয়ার টেবিল প্রভৃতি—ফটো—ভি, আর, চিত্র



মাদ্রাজ গভর্ণরের আবক্ষ মূর্ত্তি—একপার্শ্বে শিল্পী দেবীপ্রসাদ ও অপর পার্শ্বে গভর্ণর লর্ড আরসকিন দণ্ডায়মান



বিশপ লেডবিটারের আবক্ষ মূর্তি—শিল্পী দেবীপ্রসাদ নির্মিত



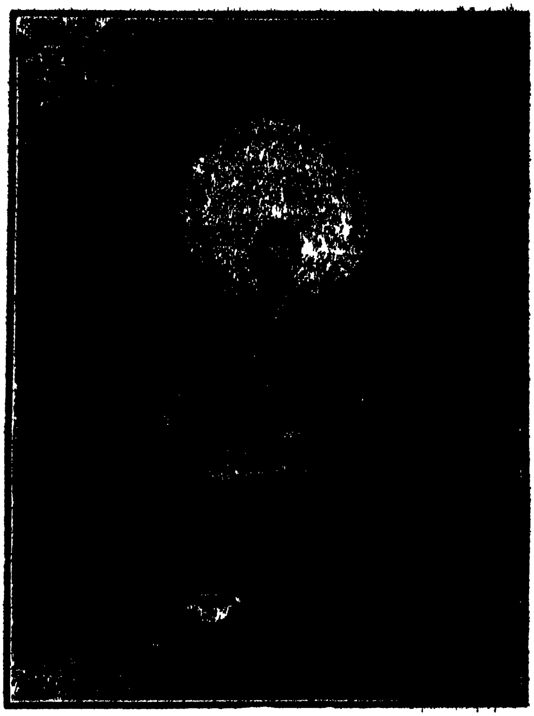
চ্যাপেল—শিল্পী গোপালন্

গিয়াছিলেন। গভর্ণর-পত্নী প্রদর্শনী হইতে কয়েকখানি চিত্র, চামড়ার একটি লিখিবার প্যাড ও কোটের ব্যবহারের জন্য এক সেট বোতাম কিনিয়াছিলেন।

মাদ্রাজের আর্ট স্কুলটি ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার আলেকজাণ্ডার হাণ্টার নামক সামরিক বিভাগের এক চিকিৎসকের চেষ্টায় ও অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পরে উহার পরিচালন ভার মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং তদবধি মাদ্রাজের সরকারী শিল্প বিভাগের ডিরেক্টার কর্ত্তৃকই উহা পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমানে দেবীপ্রসাদবাবু উক্ত স্কুলের প্রিন্সিপাল এবং শ্রীযুত ভি, আর, চিত্র কারুশিল্পবিভাগে তাঁহার সহকারীর কার্য্য করেন। ঐ বিভাগের নির্ম্মিত চেয়ার টেবিলগুলি সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে।

দেবীপ্রসাদবাবু উক্ত স্কুলের প্রিন্সিপালপদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে স্কুলের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার চেষ্টায় স্কুলের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে স্কুল আরও উন্নত হইবে বলিয়া সকলেই আশা করেন।

আমরা এই সঙ্গে উক্ত প্রদর্শনীতে প্রদত্ত মাত্র কয়েকখানি চিত্র প্রকাশ করিলাম।



লর্ড বুদ্ধ (চিত্র)
—শিল্পী গোপালকৃষ্ণ

বিরহ-মিলন-কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(৪)

সান্ধ্য ভ্রমণ ক'রে তারা বাড়ী ফিরে আসতে দেরী ক'রবে না—সবিতার কাছে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যখন বিজন আর মাধবী লন ছাড়িয়ে গেটের বাইরে এসে দাঁড়ালো—তখন পশ্চিমের রক্তচিতায় দগ্ধদিবসের অবসান হ'য়ে এসেচে। আজ সারাদিনের পর এইমাত্র মুক্তি পেয়ে বিজনের মন বিচিত্র আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো। এই শহরের এক প্রান্তের সবুজ মাঠ দিগন্তের কোলে ঝাপসা—বনরাজিনীল এবং তার উপর চুম্বন-আনন্দ রঞ্জিত আকাশ তাদের নিবিড় সৌন্দর্য্য নিয়ে তাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকচে।

উজ্জ্বল দুটি চোখের পরিপূর্ণ দৃষ্টি বিজনের মুখের উপর রেখে মাধবী বললে : 'কোন দিকে যাবেন?'

বিজন হঠাৎ এর জবাব দিতে পারলে না। তার দ্বিধাগ্রস্ত মনে তখন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হ'লো। মাধবীকে সম্বোধন করা যায় কি ব'লে। যদিও তাকে তুমি ব'লে সম্বোধন করবার অধিকার মাধবী তাকে সানন্দেই দিয়েচে এবং তাদের পরিচয়ও এমন অন্তরঙ্গতায় পরিণত হ'য়েচে যে ঐভাবে সম্বোধন করা একটুও বেমানান হবে না, তবুও তাকে এভাবে সম্বোধন ক'রতে তার ভয়ানক বাধছিল।

কিন্তু তার দ্বিধাগ্রস্ত মনের এই বাধাকে যেমন ক'রে হোক কাটিয়ে উঠে ঐভাবে তাকে সম্বোধন ক'রতে হবে, নইলে তাদের দুজনের মধ্যে এখনও যে সূক্ষ্ম ব্যবধান রয়েচে তাকে না দূর ক'রলে তাদের মধ্যে নিবিড়তম অন্তরঙ্গতা হবে কি ক'রে। কিন্তু এই সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তাকে তুমি ব'লে সম্বোধন ক'রতে পারলে না।

বিজন মুহূর্ত্তমাত্র এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজেকে ঠিক ক'রে নিয়ে বললে : 'চলুন না, মাঠের দিকে যাওয়া যাক। বেড়াবার পক্ষে এখন মাঠই তো সুন্দর। মাঠ তো এখান থেকে খুব বেশি দূর নয় ?'

'না, এই কাছেই তো'—মাধবী মৃদুকণ্ঠে বললে : 'তাই চলুন।'

বাড়ীর ঠিক সামনে দিয়ে যে পথটা মাঠের দিকে প্রসারিত হ'য়েচে তার দুধারে সারি সারি নিবিড় গাছগুলি একটি সবুজের ইঙ্গিত দিয়ে বহুদূরে চ'লে গিয়েছে। তারই দীর্ঘতর ছায়ায় পথখানি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন। বাতাসের উচ্ছ্বসিত আবেশ তার নিবিড় পল্লবে পল্লবে ব্যাকুল কলরব তুলে আশপাশের স্তব্ধতার ধ্যানভঙ্গ ক'রচে। পাখীরা নীড়ে তখনো ফেরেনি, কোথাও গাছের শাখায় অজস্র কাঠ-মল্লিকা ফুটে র'য়েচে, তারই সৌরভে চারিদিক আমোদিত। দিবা অবসানে এই মর্ম্মরিত ছায়াময় পথখানির উপর দিয়ে দুটি তরুণ তরুণী পথ চ'লতে লাগলো। তাদের কথার আর বিরাম নেই। দুজনের অন্তরে এসেচে ভরা জোয়ারের আবেগ। মুখে চোখে উৎসাহের ও কৌতূহলের বিদ্যুৎ-দীপ্তি ক্ষণে ক্ষণে আলোক সম্পাত ক'রচে। কথালাপের মধ্য দিয়ে তাদের কাণে ধ্বনিত হ'চ্চে—পরস্পরের পরিপূর্ণ হৃদয়-সরোবরের তরঙ্গধ্বনি।

একথা সেকথার পর বিজন এক সময় বললে : 'একটা কথা ব'লবো কিছু মনে ক'রবেন না বলুন ?'

মাধবী হেসে বললে : 'তা কি ক'রে বলবো। আগে কথাটা শুনি।'

বিজন মাধবীর প্রসাধনের দিকে তাকিয়ে বললে : 'খদ্দর ছেড়ে এই কাপড়ে আপনাকে কি চমৎকার মানিয়েচে।'

মাধবী চকিতে পরণের দামী সাড়ীটার দিকে চোখ বুলিয়ে নিলে। তার বরাবর মনে একটা গর্ব্ব আছে—খদ্দরেই তাকে চমৎকার মানায় এবং একথা তাকে তার বন্ধুরাও অনেক বার ব'লেচে। তাকে এই কাপড়েই চমৎকার মানায় ব'লে খদ্দর ছাড়া অন্য কাপড় বড় একটা পরে না। বাইরের লোকরা যারা নিশ্চিন্তে এবং নির্ব্বিঘ্নে দুঃখী দেশমাতৃকার ব্যথা অনুভব করে তারা শ্রদ্ধান্বিত হ'য়ে বলে : স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের প্রতি অপূর্ব্ব মমতা ও সহানুভূতি তাকে খদ্দর পরায় ; আর যারা বিশেষ অন্তরঙ্গ তারা পিছনে বলে : এ তার নিছক ফ্যাসন। কারণ যাই হোক, মোট কথা সবাই স্বীকার করে খদ্দরে মাধবীকে বড় সুন্দর মানায়। তাই বিজনের কথায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হ'য়ে হাসবার চেষ্টা ক'রে বললে : 'খদ্দর ছেড়ে ? কেন, খদ্দরে বুঝি আমাকে মানায় না ?'

বিজন হাসতে হাসতে বললে : 'খদ্দরে আপনাকে মানায় একথা বললে আপনার সঙ্গে ভয়ানক রসিকতা করা হবে। সে জন্য নয়—আপনার পরণে খদ্দর দেখে আমি আপনার সম্বন্ধে মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা পোষণ ক'রেছিলাম।'

'কি ?' উজ্জ্বলমুখে খুব নরম মিষ্টি গলায় মাধবী বললে : 'ভেবেছিলেন বুঝি এ মেয়ে ভয়ানক স্বদেশী ?'

'হায় রে হায়, সে ধারণাও যে ছিল ভাল ! এ যে তার চেয়ে ঢের বেশি মারাত্মক।'

'কি বলুন না ?

'তবে বলেই ফেলি। দেখুন আপনার পরণে খদ্দর দেখে আমার নিশ্চিত ধারণা জন্মেছিল, আপনি সাহিত্য, আর্ট, সঙ্গীত ও অন্যান্য সুকুমার ললিত-কলার একান্ত বিরোধী।'

'খদ্দর দেখে—তার মানে ?'

'তার মানে আমার বরাবর এই স্থির ধারণা—খদ্দর যারা পরে তারা সব রকম সূক্ষ্ম ললিতকলার বিরোধী হ'তে বাধ্য।'

'কেন ?'

'তার কারণ সত্যিকারের যারা আর্টিষ্ট বা আর্টের উপাসক তাদের মন এতো পেলব এতো মার্জ্জিত যে খদ্দরের মত অমনতর ভয়াবহ স্থূল জিনিষ তারা প্রাণ থাকতে কোন মতে সহ্য ক'রতে পারে না'—বিজন গম্ভীর হ'য়ে বললে : 'খদ্দরের মত ভয়াবহ জিনিষ তারাই কেবল পরমানন্দে সহ্য ক'রতে পারে যাদের মনটাও ওরকম স্থূল।'

তার এই সরস রসিকতা ও কটাক্ষ ভারী উপভোগ্য

—মাধবী খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। হাসি নয় এ যেন ভরা জোয়ারের উচ্ছ্বসিত কলধ্বনি। বললে: 'আপনি তো খুব ঠাট্টা ক'রতে পারেন!'

'আপনার ঠাট্টা বোঝবার শক্তি তো অসাধারণ' —বিজন কৃত্রিম বিস্ময়ে বললে: 'এ ঠাট্টা বা রসিকতা মোটেই নয়। এ হ'চ্চে শুদ্ধ ভাষায় যাকে বলে 'আমার হৃদয়ের গভীরতম উপলব্ধি'। কি ভাগ্যি আজ আপনি খদ্দর পরে আসেন নি তাহ'লে এমন মাঠে বেড়ানোর আনন্দ মাঠে মারা যেতো। উঃ আপনার পরণে খদ্দর দেখে আমার এমনি অস্বোয়াস্তি হ'চ্ছিল। কি ক'রে ও জিনিষ সহ্য করেন আপনি?'

'কেন এর জবাব তো আপনি নিজেই দিয়েচেন' মাধবী না হেসে বললে: 'আমার মনটাও যে অমনতরো স্থূল।'

বিজন হো হো ক'রে হেসে উঠলো। বললে: 'আপনাকে আর যে অপবাদই দি—ও অপবাদ দিতে পারি না। কোন সূক্ষ্মমনা মেয়ে যে এ জিনিষ সহ্য করতে পারে তার একমাত্র প্রমাণ তো আপনিই দিয়েচেন।'

মাধবী কোন কথা বললে না। এর পর খানিকটা পথ তারা নীরবে অতিক্রম ক'রলে। বিজনের মনে তখন রঙ্ ধরেচে, বললে: 'বড় চমৎকার লাগচে না?'

মাধবী কেমন যেন উন্মনা হ'য়ে পড়েছিলো, চকিত হ'য়ে বললে: 'কি চমৎকার লাগচে?'

'এই পাশাপাশি এমনি ভাবে গল্প ক'রতে ক'রতে বেড়াতে'—বিজন বললে: 'আমার যে কি ভাল লাগচে। ইচ্ছে ক'রচে একে রেখে ঢেকে উপভোগ করি।'

'তাই করুন না। কেউ তো আর বাধা দিচ্চে না।'

'বাধা দিচ্চে বৈ কি। একা একা তো কোন জিনিষ উপভোগ করা যায় না।'

'ওমা কে বাধা দিচ্চে?'

'যে প্রশ্ন ক'রচে সে।'

'আমি?'

'হাঁ, বেড়াতে এসেচেন অথচ মন আপনার কোথায় প'ড়ে র'য়েচে। মুখে সেই মিষ্টি হাসিটি নেই—কি এতো ভাবচেন বলুন তো?'

'বা রে কি আবার ভাববো। বলুন কি বলবেন!'

'বলছিলাম কি—আজ কি তিথি জানেন?'

'পূর্ণিমা, কেন বলুন তো?'

'পূর্ণিমা—বাঁচা গেলো' বিজন অত্যন্ত খুশী হ'য়ে বললে: 'এমন আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত ক'রে অন্ধকারের ভয়ে তাড়াতাড়ি আর বাড়ী ফিরতে হবে না। দুজনে মাঠের ধারে খুব বেড়ানো যাবে, গল্প করা যাবে। আজ পরীক্ষা ক'রবো—আপনার গল্পের ভাণ্ডার কি রকম ঐশ্বর্য্যশালী।'

ব'লে বিজন একান্ত পুলকে মাধবীর মুখের দিকে তাকালে। কিন্তু এক পক্ষের এই অপরিসীম উল্লাসে অন্যপক্ষ বিন্দুমাত্র সাড়া দিল না। বরঞ্চ মনে হলো তার মুখে দুর্ভাবনার চিহ্ন প্রকট হ'য়ে উঠেচে। মাধবী তার মুখের দিকে চেয়ে জিগ্‌গেস ক'রলে: 'আপনি কি আজ অনেক রাত্তির করে বাড়ী ফিরতে চান নাকি?'

বিজন হাসিমুখে বললে: 'আপনার বোধ হয় এই রকম ভাবে বেড়াতে আর ভাল লাগচে না?'

'না তা নয়—'

'তবে?'

'আজ আজ' মাধবী দ্বিধা কাটিয়ে অবশেষে বলে ফেললে: 'তাড়াতাড়ি বাড়ী ফেরা দরকার কিনা তাই।'

'থাক দরকার' বিজন ব'লে উঠলো: 'বাড়ীর সামান্য দরকারের চেয়ে আমাদের এই আনন্দের দাম অনেক বেশি। জীবনে হয়তো এমন দিন আর আসবে না, এমন আনন্দ আহরণের সুযোগও দুজনে একসঙ্গে পাব না। তাই সামান্য দরকারের জন্য দয়া ক'রে এমন দুর্লভ দিনটা নষ্ট ক'রে দেবেন না। জীবনে যখন এই রকম বৈচিত্র্য আসে তাকে নিবিড়ভাবে উপভোগ ক'রে সার্থক ক'রে তোলাই মানুষের ধর্ম্ম।'

বিজনের শেষের কটি কথাতে এমনি একটা সকরুণ মিনতি প্রকাশ পেল যে মুহূর্ত্তে মাধবীর চোখে জল আসবার উপক্রম হ'লো। তার কি সাধ যাচ্চে না বিজনের পার্শ্ব-সহচরী হ'য়ে এমন দুর্লভ দিনটাকে রেখে ঢেকে উপভোগ করে; কিন্তু শৈবালের কথা ভেবে তার সে আনন্দ করবার উৎসাহ থাকলো কই? শৈবালের সঙ্গে তার সজ্ঘাতের কথা বিজন বা বাড়ীর আর কেউ না জানলেও সে তো জানে—শান্ত নিস্তরঙ্গ নদীর তলাকার শাণিত ক্ষুরধার আবর্ত্তের মত তা কি ভয়ানক। এখন যদিও সে আবর্ত্ত আর নেই, কিন্তু যদি মাধবী বিজনের সঙ্গে এইভাবে

অনেক রাত্রি অবধি মাঠের ধারে থাকে তবে আবার সৃষ্টি হবে আবর্ত্ত—আকাশে ঘনাবে মেঘ—নদী উঠবে উত্তরোল হ'য়ে। দুপুরের সেই ঘটনার পরে তার একান্ত প্রতীক্ষা সত্ত্বেও শৈবাল যখন এলো না তখন মাধবী আর স্থির থাকতে না পেরে বেড়াতে যাবার একটু আগেই চুপি চুপি গিয়েছিল শৈবালের কাছে এবং দেখা না পেয়ে তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এসেচে। স্থির ক'রেচে আজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরেই যাবে তার কাছে। এ ছাড়া আর একটা জিনিষ তাকে অত্যন্ত বিস্মিত ও লজ্জিত ক'রেচে—তা হ'চ্চে বিজনের সঙ্গে শৈবালের ব্যবহার। মাধবীর স্মরণ হ'লো, দুপুরে খাবার সময় যখন বিজন তার সঙ্গে উৎসুক হ'য়ে আলাপ ক'রতে গেল তখন শৈবাল আলাপ করা দূরে থাক এমন আচরণ ক'রলে—যাতে ছিলো স্পষ্ট অবজ্ঞা ও অপমান এবং তার এই আচরণ আগুনের মত তার অন্তরকে দগ্ধ ক'রছিল। বিজন তার এই আচরণে ক্ষুব্ধ হ'য়ে আর তার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হ'লো না। মাধবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এসব কিছুই এড়ায়নি। সে ভাবছিল শৈবাল বিজনের সঙ্গে এমনতর ব্যবহার ক'রলে কেন?

মাধবী কোন কথা বলবার আগেই বিজন পুনরায় বললে: 'বাড়ীর কথা এখন একেবারে ভুলে যান—সে যখন হোক ফিরলেই চ'লবে। আজকের এই দিনটিকে এমন-ভাবে সার্থক ক'রে তুলি আসুন—যাতে এ দিনটার কথা আমাদের মনে অনেকদিন জ্বল জ্বল করে। এর কথা ভেবে অনেকদিন পরেও যেন আমরা আনন্দ পাই। ওসব প্রয়োজন অপ্রয়োজন আজ থাক'—ব'লে বিজন বাড়ী ফেরার এই নীরস চিন্তা থেকে মুহূর্ত্তে নিজেকে মুক্ত ক'রে নব উদ্যমে বললে: 'হাঁ আপনি তখন প্রভাত মুখুজ্যের সম্বন্ধে ব'লছিলেন তাঁর মত আর্টিষ্ট বাঙলা দেশে খুব কমই জন্মেচে। তার ছোট গল্পের আর্ট—'

মাধবী আর থাকতে পারলে না। জোর ক'রে নিজের সমস্ত লজ্জা বাধাকে জয় ক'রে ব'লে উঠলো: 'প্রভাত মুখুজ্যের সম্বন্ধে আলোচনা করবার ঢের সময় পাওয়া যাবে কিন্তু আজ সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ী না ফিরলেই যে চ'লবে না!'

তার কণ্ঠের দৃঢ়তায় বিজনের সমস্ত উৎসাহের উৎস এক পলকেই রুদ্ধ হ'য়ে গেল। মাধবীর মুখের দিকে গভীর বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলে—সে মুখ বিবর্ণ, তাতে আনন্দের লেশমাত্র চিহ্ন নেই, বললে: 'কেন বলুন তো?'

তার কণ্ঠস্বরে মুখেরভাবে চোখের চাউনিতে যে বিস্ময় এবং বিরক্তি ফুটে উঠেছিল মুহূর্ত্তে মাধবী তা টের পেলে। আবহাওয়াটা যাতে পাতলা হয় সেই উদ্দেশ্যে জোর ক'রে হেসে বললে: 'বাঃ কাকীমার কথা এরই মধ্যে ভুলে ব'সে আছেন। বাবা যে আপনার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকবেন।'

বিজন অধৈর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠলো: 'আমি তো এখন পালাচ্চি না, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবার ঢের সময় পাবো। আর আমরা বেড়িয়ে যদি বেশি রাত্তিরে ফিরি তো তিনি কিচ্ছু মনে করবেন না। এ আমার দায়িত্ব আমি ভাল বুঝি। কিন্তু দোহাই আপনার—বারে বারে বাড়ী ফেরবার তাগাদা দিয়ে এমন দুর্লভ দিনটিকে মাটি ক'রে দেবেন না।'

মাধবী ভয়ানক বিপদে পড়লো। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বললে: 'খালি বাবা নন, আরো দু' একজন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'আরো দু'একজন?'

'হাঁ।'

'কে তাঁরা?'

'এই—এই—শৈবালদাকে চেনেন তো? তিনি।'

'শৈবালবাবু?'

'হাঁ তিনি' মাধবীর বুক তখন কি এক অজানা আশঙ্কায় ঢিপ ঢিপ ক'রছিল, তবু জোর ক'রে ঠোঁটে হাসি ফোটাবার চেষ্টা ক'রে বললে: 'কি, আশ্চর্য্য হ'য়ে যাচ্ছেন যে?'

বিজন গভীর বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে: 'আশ্চর্য্য হবো বৈ কি। তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ নেই—পরিচয় নেই—তিনি আমার জন্যে এইরকম-ভাবে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন কেন? এতে তাঁর কি স্বার্থ। আপনি তামাসা ক'রচেন—নয় আমাকে তাড়াতাড়ি বাড়ী নিয়ে যাবার জন্য এ এক কৌশল ক'রচেন।'

'কৌশল করলাম? আপনি তো লোকের নামে খুব বদনাম দিতে পারেন' মাধবী মুখ টিপে হেসে বললে: 'আপনি লোকটি বড় কম নন।'

'আপনিও মেয়েটি বড় সহজ নন' বিজনও হেসে বললে: 'আমাকে ভুলিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ী নিয়ে যেতে চান।'

'না না সত্যি ঠাট্টা নয়। শৈবালদা আমাদের জন্ত ব'সে থাকবেন—আজ সন্ধ্যাবেলা না ফিরলেই নয়'—মাধবী এইবার মুখ গম্ভীর ক'রে আস্তে আস্তে বললে: 'আপনি এখন অস্বীকার ক'রলে কি হবে—আপনাদের ছু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পরিচয় র'য়েচে—তবে খুব বেশি আলাপ হবার সুযোগ হয় নি এই যা। কিন্তু কেন তিনি পরিচয় হওয়া সত্বেও আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ ক'রতে পারেন নি তা জানেন?'

বিজন সংক্ষেপে বললে: 'না।'

মাধবী হেসে বললে: 'ভয়ানক লাজুক। তাঁর লজ্জা মেয়েদেরও হার মানায়। কারও সঙ্গে আলাপ হ'লে লজ্জায় তার সঙ্গে বেশি কথা কিছুতেই ব'লতে পারেন না। পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে তিনি দশ মুখে কথা বলবেন—কিন্তু একজন অজানা লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রতে হ'লে বোধ হয় শৈবালদার প্যাল্‌পিটেশন সুরু হবে। তাঁর নিন্দে করার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু তাঁর এমনতর লজ্জা আমার ভাল লাগে না। আপনি জানেন না—তাঁর এই লজ্জাকে অহঙ্কার মনে ক'রে কত লোকে অবিচার ক'রেচে। এইবার ডাইনে বেঁকতে হবে।'

বরাবর যে পথটা সোজা প্রসারিত হয়ে এসেচে এইবার তা ডান দিকে টার্ন নিলে। দেখা গেল এখন সে পথ আরও সঙ্কীর্ণতর হ'য়ে অদূরের পরিদৃশ্যমান মাঠের ঠিক পাশ দিয়ে ঐ দূরের সারি সারি ঘন তাল নারকেল গাছের কাছে গিয়ে কোনদিকে যে ঘুরে গেছে এইখান থেকে দৃষ্টি দিয়ে তা বোঝবার উপায় নেই। দুজনে সেইদিকে মোড় ফিরলে। বিজন এতক্ষণ নীরব হ'য়েছিল—এইবার তার মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'তবে কেন তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন লজ্জা দিতে?'

মাধবী মুখ টিপে হেসে বললে: 'ইস্‌ আমি নিয়ে যাচ্চি বৈকি। তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্ত খুব উৎসুক হ'য়ে আছেন, তাই।'

'আমার সঙ্গে—কেন?'

'কাকীমা আর বাবার কাছে তিনি আপনার সম্বন্ধে সমস্ত শুনেচেন' মাধবী ব'লতে লাগলো: 'আপনি তো জানেন আজ আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর তিনি বেশি কথা ব'লতে পারেন নি আপনার সঙ্গে, তাই আমাকে ডেকে চুপি চুপি তখন বললেন: 'বিজনবাবুর সঙ্গে তো বিশেষ আলাপ ক'রতে পারলুম না, তিনি হয়তো কি ভাবচেন; যদি দয়া ক'রে আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার সঙ্গে আমার বাড়ী আসেন তো খুব সুখী হবো। আমি আপনাকে নিয়ে যাবো কথা দিলুম।'

বিজন আর কি ব'লবে—নীরবে পথ চলতে লাগলো।

মাধবী বলতে লাগলো: 'চমৎকার লোক—পড়াশুনাও খুব বেশী ক'রেচেন, শুধু সাহিত্য নয় অন্তসব বিষয়েও ওঁর যে কত পড়াশুনা আছে দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আজ ওর সঙ্গে আলাপ ক'রে আপনি সত্যই খুব সুখী হবেন। আর কি চমৎকার লোক—ওঁর কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে এমন একটি মাধুর্য্য আছে—যা সচরাচর দেখা যায় না।'

এমনি ক'রে মাধবী শৈবাল সম্বন্ধে আরও কত কথা ব'লে গেলো। বিজন আড়চোখে চেয়ে দেখলে শৈবাল সম্বন্ধে কথা ব'লতে ব'লতে মাধবীর মুখ চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে, কণ্ঠে এসেচে আন্তরিকতার সুর এবং সে এমনি তন্ময় হ'য়ে প'ড়েচে যে অন্যপক্ষের নির্ব্বিকার ঔদাসিন্তের প্রতি মনসংযোগ করবারও সুযোগ পাচ্চে না। তার এই মৃদুকণ্ঠের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা বিজন ঠিকভাবে গ্রহণ ক'রতে পারছিল না। বুকের কোন এক নিভৃত স্থানে যে ঈর্ষা কুশাঙ্কুরের মত একটুখানি মাত্র স্থান দখল ক'রেছিল—অকস্মাৎ দেখতে দেখতে সেটা বিরাট বনস্পতির মত বুকের সমস্ত স্থানটা জুড়ে মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো। একজন অপরিচিত লোক—যার সম্বন্ধে তার বিন্দুমাত্র কৌতূহল বা উৎসাহ নেই—কেন মাধবী তার কাছে সেই লোকটার এমনতর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রচে? কি প্রয়োজন তাকে সেই লোকটার গুণকাহিনী শোনাবার? সে যাই হোক না কেন, বিজনের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? তার সঙ্গে আলাপ ক'রতে তার এতটুকু উৎসাহ নেই। বিজনের মনে হ'লো, এই নিছক স্তুতিটা কোনরকমে থামাতে পারলে সে বাঁচে। এ অসহ্য।

হঠাৎ এক সময় মাধবী বললে: 'চুপ ক'রে আছেন যে? তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে ব'লে বুঝি মন খারাপ হ'য়ে গেল?'

'তা হ'লো বৈ কি।'

তার কণ্ঠের অস্বাভাবিক শুষ্কতা মাধবীর অভ্যাযোগ

আকর্ষণ ক'রলে না, বরঞ্চ একে রহস্ত কল্পনা ক'রে মাধবী হেসে বললে : 'মন খারাপ করবার কোন দরকার নেই। এখানে বেড়িয়ে যত আনন্দ পাবেন, তার চেয়ে ঢের বেশি আনন্দ পাবেন শৈবালদার সঙ্গে আলাপ ক'রে। একথা আমি নিশ্চয় বলচি। শৈবালদার সাহচর্য্য মস্ত লাভ—জানেন!'

বিজনের চোখের সামনে যে ছবিটা রঙে উজ্জ্বল—রসে অনির্ব্বচনীয় হ'য়ে উঠেছিল, অকস্মাৎ তার উপর একটা কাল যবনিকা নেবে এলো। তার সমস্ত বুকটা জুড়ে একটা ঈর্ষা রি-রি ক'রে জ্বলছিল। একটা প্রচণ্ড অভিমান ও ক্ষোভে মনটা দুলে দুলে উঠতে লাগল। এ কি অসন্তোষ! তার মনে হ'তে লাগল—যে অনুপ্রেরণায় আজ নিজের হৃদয় পেয়ালা রসে পরিপূর্ণ ক'রতে নিরালায় এই মেয়েটির সঙ্গে বেরিয়েছিল—একান্ত শক্রতা সাধন ক'রে এই মেয়েটি সেই আনন্দের স্বপ্ন একটা কাচের পেয়ালার মত চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিল। বিজন বার বার ভাবতে লাগল, আজ না এলে খুব ভাল হ'তো। তাতে আনন্দ আহরণ করা হ'তো না বটে, কিন্তু সমস্ত মনটা এমনি অশান্তির আগুনে দগ্ধ হ'তো না—সমস্ত বুকটা স্ফীত হ'য়ে উঠতো না এমনতর অভিমানে ও ক্ষোভে।

বিজন নিজেকে সামলে নিলে। মনে যাই থাক, কথাবার্ত্তায় এই মেয়েটির সামনে নিজের এই দুর্ব্বলতা কোনমতেই প্রকাশ হ'তে দেওয়া চলবে না, তাই খুব সহজভাবে বলবার চেষ্টা করলে : 'আপনি যখন ব'লচেন তখন তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরব বটে—কিন্তু শৈবালবাবুর কাছে যাব না।'

'যাবেন না? সে কি?'—মাধবী বিস্মিত হয়ে বললে।

'কি জন্য যাব বলুন?' বিজন আস্তে আস্তে বললে : 'আপনার কাছে তাঁর কাল্চারের কথা যা শুনলাম, তারপর তাঁর কাছে যাওয়া আমার ঠিক শোভন হবে না। আপনার বাবা এবং কাকীমা আমাকে খুব স্নেহ করেন—সেই স্নেহে অন্ধ হ'য়েই তাঁরা আমার সম্বন্ধে বড় বড় কথা শৈবালবাবুকে ব'লেচেন এবং সেইজন্যই তিনি উৎসুক হ'য়ে উঠেচেন আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে। কিন্তু আপনি তো খুব ভাল ক'রেই জানেন তাঁর তুলনায় আমার কালচার কত সামান্য। এসব জেনেও তাঁর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া কি সঙ্গত হবে। সেখানে তাঁর মত কাল্চার্ড লোকের সঙ্গে ভাল আলাপ ক'রতে না পেরে অপদস্থ হব—সেটা কি ভাল হবে?'

'বেশ, এইরকম একটা ছল-ছুতো ক'রে যদি তাঁকে এড়িয়ে চলতে চান তো আমি কিছুই ব'লতে চাই না' মাধবী নতমুখে ধীরে ধীরে বললে : 'তিনি আমাকে এ অনুরোধ জানাতে ব'লেছিলেন—আমি সরলভাবে জানিয়ে দিলাম।'

'ছল-ছুতো আমি মোটেই করি নি' বিজন বললে : 'আমার দিক থেকে একথাটা জানানো দরকার ব'লেই আমি জানিয়ে দিলাম।'

'কোন কথাটা?' মাধবী বিজনের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে : 'যে আপনার তাঁর তুলনায় কাল্চার কিছুই নেই—এই তো? কিন্তু আপনি নিজে জানেন, এর মত মিথ্যে আর কিছুই নেই।'

'মিথ্যে?'

'তাছাড়া আর কি' মাধবী তেমনিভাবেই বললে : 'শৈবালদাকে আমি প্রশংসা ক'রেচি, তাঁর মত শিক্ষিত এবং ভদ্র আমাদের জানাশুনার মধ্যে অতি অল্পই আছে, একথাও সত্য—কিন্তু তাই ব'লে এ ইঙ্গিত আমি আপনাকে করি নি যে আপনার কাল্চার তাঁর তুলনায় কিছুই নয়। আপনি যে তাঁর চেয়ে কালচার্ড, একথা আমি জানি এবং আরও সকলেই জানে।'

'একথা কি আপনি সত্য বিশ্বাস করেন?'

'করি। সেই জন্যই তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য আমি এতখানি উৎসুক। কিন্তু আপনি যখন যাবেন না, তখন ওকথা থাক।'

এইবার বিজনের পরিবর্ত্তন ঘটলো। তীব্র জলোচ্ছ্বাসের মত একটা বিপুল হৃদয়াবেগ তার অভিমান বিক্ষোভ ঈর্ষাকে মুহূর্ত্তে হৃদয়ের তটরেখা থেকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়ে গেল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাদের মধ্যে এমনতর সুযোগ এসেচে কিন্তু কখন এই মেয়েটি তার সম্বন্ধে নিজের মনোভাব এমন ক'রে ব্যক্ত করে নি, তাই অকস্মাৎ তার মুখের এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তিতে বিজন বিস্মিত হ'লো, গর্ব্বিত হ'লো, পুলকিত হ'লো। কে জানতো যে একদিনের পরিচয়ে এক সুন্দরী নারীর কুসুমের মত হৃদয়ের কোমল স্থান শ্রদ্ধায়

পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠবে। যদিও নারীর সঙ্গে তার ভাসুর ভাদ্দরবউ সম্পর্ক—তবুও এ জ্ঞান তার আছে যে মেয়েদের এই বয়সটা বা জীবনের এই সময়টা ভয়ানক সমস্যামূলক। একেবারে সহজভাবে কাউকে তারা মনের হীরেমুক্তামাণিক্য-খচিত সিংহাসনে চট্‌ ক'রে স্থান দিতে পারে না, তখন একে একে দেখা দেয় কত সংশয়—কত সন্দেহ—কত দ্বিধাদ্বন্দ্ব—যাচাই-বাছাইএরও অন্ত থাকে না তখন। তাই মাধবীর—

বিজন আস্তে আস্তে বললে: 'বেশ তাই যদি মনে করেন তবে আমি নিশ্চয় যাব, তার জন্য আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ ক'রতে হবে না।'

'আপনার দয়া।'

'এইবার রাগ পড়লো তো?'

'হাঁ পড়লো। এদিকে মাঠেও এসে পড়লাম।'

বিজন তার মুখের দিকে চেয়ে বললে: 'আঃ বাঁচা গেল। রাগ ক'রে মুখ কি বিমর্ষই হ'য়েছিল। এমন মুখে এইরকম মিষ্টি হাসি না হ'লে মানায়!'

দুজনে মাঠের ধারে এসে দাঁড়াল। সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত বিশাল মাঠের শেষে দিবা অবসানে সূর্য্যাস্ত হ'চ্চে। দিবা অবসানে মাঠের পরপারে এই সূর্য্যাস্ত যে কি মহান কি অনির্ব্বচনীয় তা কথা বলে বর্ণনা করা দূরে থাক, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করাও বোধ হয় সম্ভব নয়। দুজনে চেয়ে দেখলে—মাঠের শেষ প্রান্তের সমস্ত আকাশ টকটকে রাঙা হ'য়ে উঠেচে আর সেই রক্তপদ্মের পাপড়ির মত অস্তমান সূর্য্য থেকে রাঙা আলোর বন্যা ঝলকে ঝলকে নেমে এসে দিগন্তের কোলে তরঙ্গায়িত নীল বনশ্রেণী, সারি সারি দীর্ঘায়ত তাল নারকেল গাছগুলির মসৃণ পল্লব—সুবর্ণ রঞ্জিত ক'রে তুলেচে। চারিদিক নিবিড় মৌনতায় পরিপূর্ণ। মনে হয় দিবা অবসানের এই নিবিড় নম্র সৌন্দর্য্যে সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতি মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে নীরবে নতনেত্রে কি এক অচল শান্তি স্থাপন ক'রেচে। কোথাও উদ্বেগ নেই, আশঙ্কা নেই, চাঞ্চল্য নেই। সমস্ত মিলিয়ে এক অখণ্ড সৌন্দর্য্য স্থির হ'য়ে র'য়েচে। বর্ষার অবিশ্রান্ত ধারা শেষ বৈশাখের নিদারুণ শুষ্ক-শুষ্ক মাঠকে সরস ক'রে দিয়েচে, আর গাছগুলি মাটির সেই রসকে টেনে সতেজ সবুজ হ'য়ে উঠেচে, তাদের প্রতি পল্লবে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠেচে নবজীবনের পরিপূর্ণ আবেগ। সমস্ত মাঠে মানুষ-প্রমাণ লম্বা সতেজ সরস ঘাসগুলি বাতাসে ধীরে ধীরে কাঁপচে। সেইদিকে চাইলে দুটি চোখের দৃষ্টি সবুজের গভীরতায় একেবারে ডুবে যায়। এই ঘাসগুলির ঠিক মাঝ দিয়ে একটা পদচিহ্নময় পথ দূরে উত্তরপাড়ার ষ্টেশনের কাছ বরাবর গিয়েছে। এই পথটা দিয়ে লোকজন সচরাচর যাতায়াত করে না, তবে সৌন্দর্য্য-পিয়াসীরা জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে বৈচিত্র্যের লোভে এই পথ দিয়ে যাতায়াত ক'রে থাকে। চারিদিক তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত দুজনে স্থির নির্ব্বাক হ'য়ে এই অসীম সৌন্দর্য্যকে তাদের মৌন প্রণতি জানালে এবং একই সঙ্গে দুজনের মনে হ'লো দিবা অবসানে মাঠের ধারে এমনতর সূর্য্যাস্ত-সমারোহ শুধু সুন্দর নয়, আশ্চর্য্য। একে ব্যক্ত করবার মত উপযুক্ত প্রতিশব্দ আজ অবধি আবিষ্কৃত হয়নি।

চমৎকার বটে। এ ছাড়া এই অসামান্য সৌন্দর্য্যে অভিভূত বিজনের মুখ দিয়ে এই সামান্য উচ্ছ্বাস ছাড়া আর কি ব্যক্ত হ'তে পারে! বিশ্বশিল্পীর শিল্প সাধনা যেখানে চরম উৎকর্ষ লাভ ক'রেচে তার যথার্থ রূপ-ব্যঞ্জনা মানুষ ভাষায় ব্যক্ত ক'রে ফোটাতে পারে কতটুকু। এই সৌন্দর্য্য কয়েক মুহূর্ত্ত মাধবীকেও মুগ্ধ ক'রে রেখেছিল—এখন বিজনের এই অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে তার সে ভাবটা কেটে সহজ অবস্থা ফিরে এলো। মুখ ফিরিয়ে সকৌতুকে বললে: 'চমৎকার বটে, কিন্তু শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের তুলনায় এ কিই বা। এ দৃশ্যে এরকমভাবে মুগ্ধ হওয়া আপনার কিন্তু সাজে না!'

কথাটা নিতান্ত সামান্য এবং মাধবীও একথা তাকে রহস্যচ্ছলেই ব'লেচে—কিন্তু এই সামান্য কথাটা বিজনের কাছে তার নিজের জীবন সম্বন্ধে এক বিচিত্র ইঙ্গিত দিয়ে গেল। তার দৃষ্টি গেল খুলে এবং এই দিবা অবসানে মাঠের ধারে একটি সুন্দরী মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বিজন তার অতীত জীবনটাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলে। কৈ এমন ক'রে নিজের জীবনকে সে তো পূর্ব্বে কখনও দেখতে পায় নি!

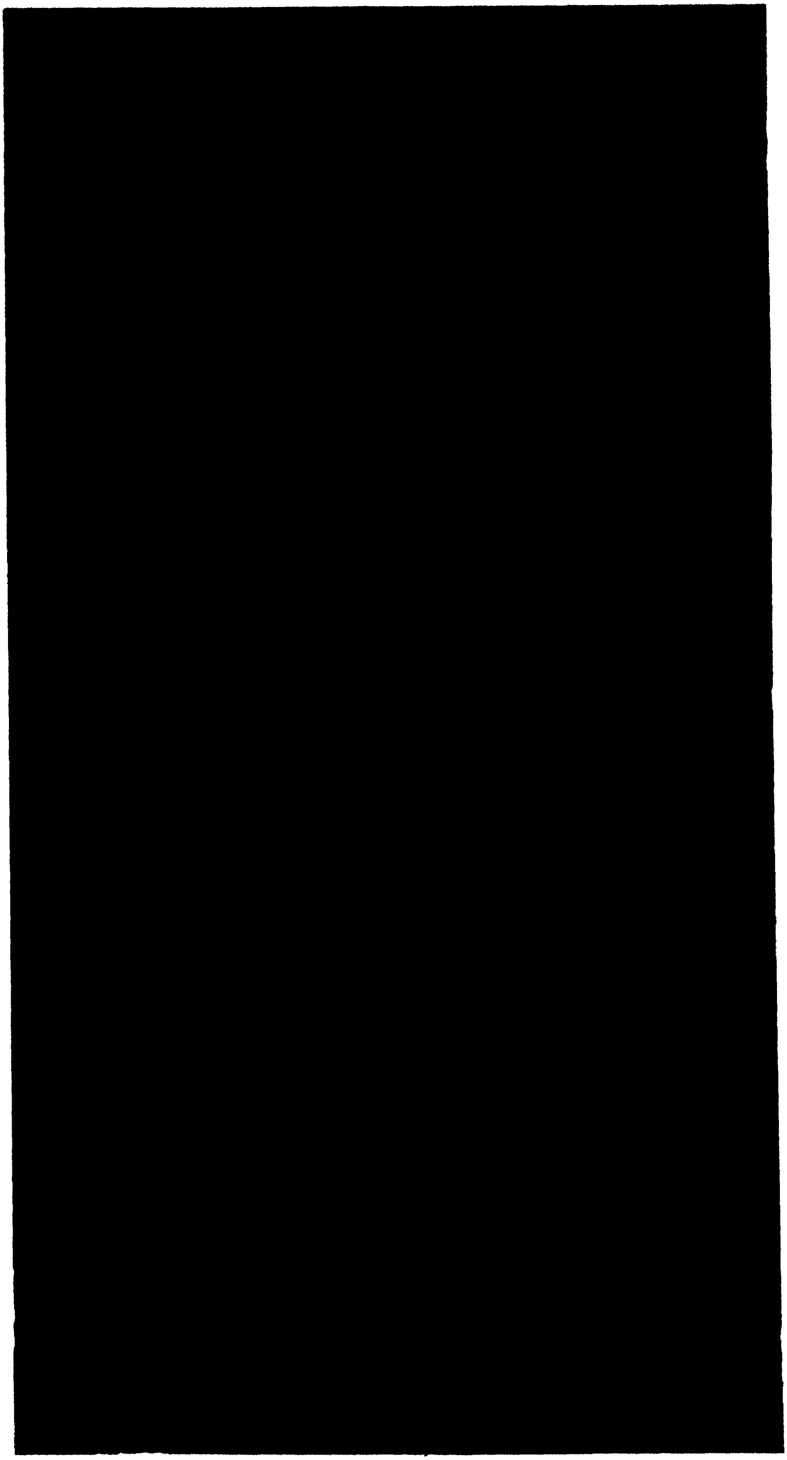
মাধবী ঠিকই ব'লেচে, শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য যে দু চোখ ভরে দেখে হৃদয় পেয়ালা পরিপূর্ণ ক'রেচে—এ দৃশ্য তার কাছে কিই বা—যাতে সে এমনতর মুগ্ধ হ'তে পারে। কিন্তু বিজন মুগ্ধ হ'য়েচে—অভিভূত হ'য়েচে। শিলঙ তার কর্ম্মভূমি, জীবনের কয়েকটা শ্রেষ্ঠ বছর তার

ঐখানেই কেটেছে এবং আরও হয়তো অনেকদিন কাটবে। শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়—সেখানকার দৃশ্য এখনও তার চোখের সামনে ভাসচে। সে তো দেখেচে বিশাল তুষারশুভ্র পর্ব্বতের উপর থেকে যখন জলধারা দুর্ব্বারবেগে পাথরের গা বেয়ে কত বিচিত্র বর্ণের সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ক'রে আশপাশ কলধ্বনিতে মুখর ক'রে নীচে নেমে আসে—তখন বিশ্বশিল্পীর শিল্প সাধনার সেই চরমতম উৎকর্ষের সামনে কতদিন সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে সেই অতুলনীয় দৃশ্য দেখেচে। নববর্ষার প্রবল বারিপাতে গিরি নির্ঝরিণীগুলি যখন কলঝঙ্কার তুলে জীবনের দুর্ব্বার আবেগে পর্ব্বতগাত্র বিদীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসে, সমস্ত পাইন-বন যখন শ্যামলতর হ'য়ে মর্ম্মর গুঞ্জনে ঊর্দ্ধের বিস্তারিত নীলাকাশকে বন্দনা করে, বসন্তে যখন বনরাজি বিচিত্র বর্ণের ফুলভারে অবনত হ'য়ে পড়ে, যখন তাদের প্রতি পল্লব নবজীবনের আবেগে রোমাঞ্চিত হয়, সৌন্দর্য্যের অমরাপুরী শিলঙের সেই সব অতুলনীয় দৃশ্য সে যে হৃদয়ের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে উপভোগ ক'রেচে। শিলঙের বিশাল পর্ব্বতের মাথায় রৌদ্রঝলমল তুষারে, প্রপাতের বেগবান শাণিত বিচিত্রবর্ণের জলধারায়, গন্ধঘন পাইন-বনের শ্যাম প্রসারে, ঊর্দ্ধের অসীম নীলাকাশে, পদচিহ্নময় পথের দুপাশের অযত্ন-বর্দ্ধিত ছোট ছোট গাছ-গুলিতে, এমন কি প্রতিটি তৃণমঞ্জরীতে সৌন্দর্য্যের যে বিচিত্র ইঙ্গিত র'য়েচে কোথাও তার তুলনা হয় না। এসব তো সে প্রতিদিন উপভোগ ক'রেচে। কিন্তু আজ একটি মেয়ের সঙ্গে এই মাঠের ধারের সূর্য্যাস্ত তার মনে এক আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করলে। সৌন্দর্য্যের অমরাপুরী শিলঙের তুলনায় এ সামান্য, কিন্তু আজ এই সামান্য দৃশ্য তার চোখে অসামান্য হ'য়ে দেখা দিল। মনে হ'লো কখনও কোন সৌন্দর্য্যকে সে তো এমন ক'রে উপভোগ ক'রতে পারেনি, এমনতর নিবিড় বিচিত্র অনুভূতির স্বাদও জীবনে আর কখনও সে পায়নি। তার বার বার মনে হ'তে লাগল এতদিন সৌন্দর্য্য সে শুধু হৃদয় দিয়ে উপভোগ ক'রেচে—জলের উপরকার বর্ণচ্ছটার মত সে সৌন্দর্য্য। কিন্তু জীবন দিয়ে উপভোগ যাকে বলে, তা এই প্রথম করলে। কার মায়াময় হাতের একটুখানি ছোঁয়া তার সৌন্দর্য্যের রুদ্ধ উৎসকে খুলে দিয়ে গেল, তাই তো সে এমন নিবিড়ভাবে উপভোগ ক'রতে পারছে শুধু রূপকে নয়, রূপাতীতকে—সৌন্দর্য্যকে নয়, সৌন্দর্য্যাতীতকে এবং এর মূলে যে কি র'য়েচে তা অকস্মাৎ বিজনের চোখে সূর্য্যাস্তের রক্তবর্ণ আকাশের মতই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো।

মাধবীর এই রহস্তের বিজন কোন উত্তর দেবার প্রয়াস ক'রলে না, শুধু বললে : 'চলুন মাঠের ওদিকটায় খানিকটা যাওয়া যাক।'

মানুষ প্রমাণ লম্বা লম্বা ঘাসের ঠিক মাঝ দিয়ে যে পদ-চিহ্নময় পথটা বরাবর ষ্টেশনের কাছে গিয়েছে সেই পথ দিয়ে দুজনে পাশাপাশি চ'লতে লাগলো। বিজনের পদক্ষেপ মন্থর, তার গতিতে এল শৈথিল্য। যে বিচিত্র আনন্দের তীব্র অনুভূতি তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছিল সে সমস্ত নিঃশেষ হ'য়ে কোথায় যেন অন্তর্হিত হ'য়ে গেল এবং দেখতে দেখতে তার মনে আশ্চর্য্যভাবে এক পরিবর্ত্তন ঘটলো। তার চোখে সামনের ঐ দিগন্ত-প্রসারী মাঠের পরপারে ঐ সূর্য্যাস্ত—ঐ ঝাপ্সা তরঙ্গায়িত নীল বনশ্রেণী—ঐ ছবির মত কুটীর—তাল নারকেলের ঘন সারির ওধারে ছোট গ্রামখানি—ঊর্দ্ধের গোধূলির আকাশ—সমস্তটা তার চোখে গভীর বিষাদময় ব'লে বোধ হ'লো। এসব এত সুন্দর অথচ এর অন্তরালে এত বিষাদ—এত করুণা আত্ম-গোপন ক'রে র'য়েচে। নিজের জীবনের আসল চেহারাটা এমনিভাবে তার চোখে ধরা প'ড়ে গেল। জীবনে তার সবই র'য়েচে—কেবল কি যেন একটা নেই—যার অভাবের জন্য তার জীবন সার্থক নয়—রসে রূপে ফলবান নয়—অথচ সেই জিনিষের জন্য তার হৃদয় ছিল তৃষিত উন্মুখ—কিন্তু সেই ভয়ানক তৃষ্ণার কথা, ভয়াবহ অভাবের কথা সে জানতে পারে নি। আজ সেই তৃষ্ণা হ'য়ে উঠল আকণ্ঠ—সেই অভাবের তীব্র জ্বালায় তার বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠল। মাধবীর পাশ দিয়ে চ'লতে চ'লতে বিজনের মনে হ'লো তার জীবনের এই ভার যেন আর সে বইতে পারছে না। এ জীবন তার বড় ক্লান্ত, বড় অবসন্ন। এ জীবনের পরিবর্ত্তন দরকার—একটা আমূল পরিবর্ত্তন দরকার। এই কথাটা তার সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন ক'রে আশ্চর্য্য সুরে বাজতে লাগল।

একটুখানি নীরবতার পর বিজন আস্তে আস্তে বললে : 'আপনি প্রায়ই শিলঙের কথা বলেন, শিলঙ বুঝি আপনার খুব ভাল লাগে?'



বিদায় সন্ধ্যা

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৌরেন সেন

Bharatvarsha H. P. Works

'হাঁ' মাধবী হেসে বললে : 'ও জায়গাটার নাম শুনলে আমার যে কি আনন্দ হয়। ছেলেদের কাছে যেমন রূপকথার রাজপুত্রের দেশ, আমার কাছে তেমনি শিলঙ। রবীন্দ্রনাথ যে সব লেখায় শিলঙের একটুখানিও বর্ণনা ক'রেচেন, তা পড়ে শিলঙের সমস্ত রূপটা যেন আমি দেখতে পাই।'

'শিলঙ সম্বন্ধে যদি এতখানি কৌতূহল—তবে যান নি কেন এতদিন ?'

'এখন আপনার সঙ্গে আলাপ হ'য়েচে—এইবার যাব। থাকবার জায়গা দেবেন তো ?'

'দেব' বিজনের বুকের রক্ত সহসা উদ্দাম হ'য়ে উঠল। বললে : 'কবে যাবেন, দয়া ক'রে বলুন।'

'যাব একদিন, তার আগে অবশ্য জানতে পারবেন।'

'সে দিন কবে আসবে ?'

'আসবে একদিন। এত তাড়া কেন ?'

'আছে কারণ। কিন্তু দয়া ক'রে দেরী ক'রবেন না এই মিনতি রইল' বিজনের কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ অপরিসীম ব্যাকুলতা ধ্বনিত হ'য়ে উঠলো, বললে : 'আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই দিনটির প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। আমার আশাকে ব্যর্থ ক'রবেন না।'

'আচ্ছা' মাধবীর বুকটা তখন ভয়ে লজ্জায় টিপ টিপ ক'রছিল, মনের ভাবটা কোনরকমে গোপন ক'রে যেন বিজন তাকে রহস্য ক'রেই বলচে এবং সেও একে রহস্য ব'লে গ্রহণ ক'রচে এই ভাব দেখিয়ে হেসে বললে : 'আপনার আবেদন মঞ্জুর করা গেল। দু'একদিন আপনার বাড়ী গিয়ে অতিথি হ'য়ে থেকে আসব।'

'দু'একদিনের জন্য গিয়ে হয়তো সারাজীবন ঐখানেই কাটাতে হবে' বিজন মৃদু হাসতে হাসতে বললে : 'কার বাঁধন যে কোথায় ঠিক হ'য়ে র'য়েচে, তা কে ব'লতে পারে ?'

বিজন পরিপূর্ণদৃষ্টিতে মাধবীর মুখের দিকে তাকালে। তার এই কথার নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম ক'রে মাধবীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত শিউরে উঠলো, বুকের রক্ত হ'ল উদ্দাম এবং পরক্ষণেই তার মুখখানি এমনি ছাইয়ের মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হ'য়ে উঠলো—যে এই সময় অস্ত-সূর্য্যের রাঙা আলো যদি না তার মুখে থাকতো তবে বিজন তার সেই অস্বাভাবিক বিবর্ণ পাণ্ডুর [illegible] দিকে চেয়ে চমকে উঠতো, কিন্তু মুহূর্ত্তকালমাত্র [illegible]

মাধবী আশপাশ সচকিত ক'রে হেসে উঠলো, বললে : 'বে-শ! আমি কি আপনার মত চাকরি ক'রতে যাচ্চি যে সেখান থেকে আর আসা হবে না!'

ব'লে ঠিক সামনের দিকে তাকিয়েই তার মুখের হাসি যেন মার খেয়ে বন্ধ হ'য়ে গেল। তাদের ঠিক সামনেই শৈবাল। ষ্টেশন থেকে এই রাস্তা দিয়েই দ্রুতপদে এদিকে এগিয়ে আসচে। তার দৃষ্টি মাটির দিকে থাকা সত্ত্বেও মাধবী দেখলে শৈবালের মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর, আর মুহূর্ত্তকাল পরেই তাদের চোখাচোখি হবে—তখন যে কি ঘটবে তা ঠিক কল্পনা ক'রতে না পেরে মাধবীর বুকের ভেতরটা সমুদ্রের মত আন্দোলিত হ'য়ে উঠলো। এই পদচিহ্নময় পথটা যথেষ্ট প্রসারিত নয়—দুজনে কোন রকমে পাশাপাশি চলতে পারে, আর মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই শৈবাল একেবারে এসে প'ড়লো সামনে এবং বাধা পেয়ে মুখ তুলে মাধবী আর বিজনকে দেখে ভয়ানক চমকে উঠলো। তার পর এক মুহূর্ত্ত মাধবীর মুখের দিকে পরিপূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে পরক্ষণেই তার উদ্যত আনন্দোজ্জ্বল মুখের আহ্বানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে দ্রুতপদে তাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল এবং দেখতে দেখতে তার দ্রুত পদক্ষেপ ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে অবশেষে দূরে মিলিয়ে গেল। এ কি হ'ল! অপরিসীম বিস্ময়ে মাধবী নির্ব্বাক অভিভূত হ'য়ে প'ড়লো। শৈবাল যে এই অবস্থায় তাকে এমন কঠিনভাবে অগ্রাহ্য ক'রে অপমান ক'রে যাবে—একথা মনেও স্থান দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি; বরঞ্চ এই অকস্মাৎ দেখা হ'য়ে তাদের পরস্পরের মিলন হওয়ার কল্পনায় তার সমস্ত বুকটা এক লজ্জামিশ্রিত অপূর্ব্ব উল্লাসের আবেগে দুলে উঠেছিল। কিন্তু এ কি হ'লো! অকস্মাৎ বিদ্যুতের মত একটা কথা তার মনে তীব্রভাবে আঘাত ক'রলে। শৈবাল তখন তাকে যে ডেকে পাঠিয়েছিল—তা বোধ হয় অনুতপ্ত হ'য়ে সমস্ত মিটমাট ক'রে প্রীতিস্থাপনের জন্য নয়, হয়তো সেই আহ্বানের অন্য কারণ ছিল। মাধবীর সমস্ত অনুমান ভুল মিথ্যা হ'য়ে তার সমস্ত আশাকে—স্বপ্নকে—আয়োজনকে নিষ্ঠুরভাবে দলিত বিধ্বস্ত ক'রে দিয়ে গেল এবং এই অনুমান মিথ্যা হওয়ার ফল যে কি তা কল্পনা ক'রে মাধবীর বার বার মনে হ'তে লাগলো—এই মুহূর্ত্তে তার [illegible]য়ের [illegible] মাটি যদি দ্বিধা হয়—তবে তার মধ্যে আত্মগোপন

ক'রে সে বাঁচে; প্রতি পদের এই আঘাত অপমান জালা—মিথ্যাচারের এই লজ্জা আর তার সহ্য হয় না।

কিন্তু এই ঘটনাটা পর্য্যবেক্ষণ ক'রে বিজন ভয়ানক বিস্মিত হ'ল। মাধবীর দিকে চেয়ে বললে: এই শৈবাল-বাবু না?'

'হাঁ।'

তার পর ক্ষণিকের নীরবতা।

'একটা কথা বলবো?'

'বলুন।'

'আমার যেন বোধ হ'চ্চে আপনাদের দুজনের মধ্যে একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটেচে। এ কি সত্য?'

মুহূর্ত্তে মাধবীর বুকটা জ্বলে উঠলো। তার ইচ্ছা হ'ল এই মুহূর্ত্তেই ঐ লোকটার সব কথা বিজনের কাছে অকপটে ব্যক্ত করে দেয়। কিসের সঙ্কোচ, কিসের লজ্জা? বিজন জানুক ঐ লোকটার মনের আসল চেহারা। যার সুনাম মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সে এতখানি মিথ্যাচারের আশ্রয় নিলে—সেই শৈবালই আজ এইরকমভাবে প্রতি পদে তাকে লাঞ্ছনা ক'রচে। কিন্তু মাধবী জোর ক'রে এই ভয়ানক স্বীকারোক্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা ক'রলে। বিজনের মুখের দিকে জোর ক'রে চেয়ে অসাধারণ সংযমের সঙ্গে আস্তে আস্তে বললে: 'এ ধারণা আপনার কোথা থেকে হ'ল যে শৈবালবাবুর সঙ্গে আমার কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেচে?'

তার বিবর্ণ মুখের ভাবে কণ্ঠের দৃঢ়তায় বিজন এতটুকু হ'য়ে গেল। অপ্রতিভ হ'য়ে বললে: 'এ আমার অনুমান মাত্র, ভুলও হ'তে পারে।'

'ভুলই হ'য়েচে, কিন্তু এতে তো আপনার কোন দোষ নেই' মাধবী বললে: 'উনি কথা না ব'লে এমনিভাবে চলে গেলেন এই দেখেই তো আপনি অনুমান ক'রেচেন—কিন্তু এই অবস্থায় যে উনি এই রকম ক'রবেন তা আমি জানতাম। ওঁর স্বভাব যে কি, তা আপনাকে আমি আগেই ব'লেচি!'

'তাই হবে' ব'লে বিজন চুপ ক'রে গেল। কিন্তু মাধবীর এই জবাবদিহিটাকে কিছুতেই সরলভাবে গ্রহণ ক'রতে পারলে না। নেপথ্যে তাকে কেন্দ্র ক'রে কি যেন একটা ঘটেচে এবং এই মেয়েটি তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এই নিয়ে আর আলোচনা ক'রতে তার প্রবৃত্তি হ'ল না। যে উষ্ণ ঘন একটি আবহাওয়া মাধবীকে কেন্দ্র ক'রে তৈরী হ'য়েছিল তা শৈবাল এমন ক'রে নষ্ট ক'রে দিয়ে গেল ব'লে বিজনের অনুশোচনার আর অবধি রইল না।

তার পর বিজন অনেক চেষ্টা ক'রেও সে আবহাওয়ার সৃষ্টি ক'রতে পারলে না। অবশেষে নিরাশ হ'য়ে চুপ ক'রলে।

একটু পরে মাধবী বললে: 'অন্ধকার হ'য়ে আসচে, চলুন।'

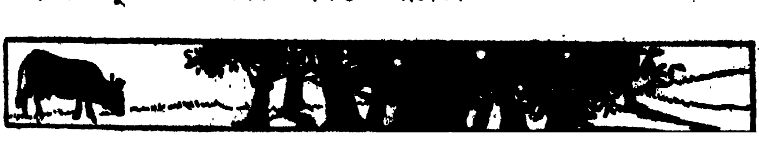
'চলুন!'

আবার সেই পদচিহ্নময় পথটা অতিক্রম ক'রে যখন তারা রাস্তায় এসে পড়লো তখন সূর্য্য অস্তাচলের অতলে ডুবে গেছে। গোধূলি আসন্ন হ'ল—আর একটু পরে মাঠে নদীতে অরণ্যে চারদিকে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোর ঐশ্বর্য্য ছড়িয়ে উঠবে চাঁদ—তারই প্রস্তাবনায় দিগন্তের আকাশ অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় হ'য়ে উঠেচে। দুজনে নীরবে পথ চলতে লাগলো। সে আবেগ সে অনুপ্রেরণা যেন তাদের নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। চন্দ্রোদয়ের প্রস্তাবনায় আভাময় আকাশের দিকে চেয়ে বিজন ভাবতে লাগলো—তার নিজের জীবনের অমা-অন্ধকার কেটে এমনি ক'রে চাঁদ উঠবে—দিন যাবে। আর তারই পাশে চ'লতে চ'লতে মাধবী তখন ভাবছিল—দুজনেই চিন্তিত অথচ দুজনের চিন্তাধারা কি বিভিন্ন! এই রকম ক'রে দুজনে যখন বাড়ীর কাছে এসে পড়ল তখন সহসা মাধবী বললে: 'শৈবালবাবুর কাছে গিয়ে আর কাজ নেই।'

'কেন?'

'ভেবে দেখলাম আপনার কথাই ঠিক। এর পর আপনার সঙ্গে মুখোমুখি হ'লে তিনি হয়তো ভয়ানক লজ্জা পাবেন।'

(ক্রমশঃ)



পুরাণ-পরিচয়

শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী বি-এ

(১)

—অতীতকে বাদ দিয়া নবীনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। জগতে সভ্য ও উন্নত এমন কোনও জাতি দেখা যায় না, যাহার পশ্চাতে অতীত-অবদান কাহিনী নাই। জাতির কৃষ্টির ইতিহাসে এ অবদান অতি অমূল্য। গ্রীক ও রোম্যান জাতির কৃষ্টির ইতিহাসে অতীত পৌরাণিক-কাহিনীর স্থান কত উচ্চে তাহা ঐতিহাসিকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন; আবার গ্রীক রোম্যান—পৌরাণিক সম্পদ-খনি হইতে মণি আহরণ করিয়া ইংরাজী সাহিত্য ও সভ্যতা কতখানি উৎকর্ষলাভ করিয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

পৌরাণিক যুগ হিন্দু-সভ্যতার ইতিহাসে একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে। উপনিষদের যুগ হইতে সহসা একদিন দুঃস্বপ্নের মত পৌরাণিক-যুগে আসিয়া উপস্থিত হই নাই, মধ্যে ক্রম বিকাশের পারম্পর্য্য ও স্বতঃস্ফূরিত একটি ধারা আছে। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে পৌরাণিক-যুগের দ্বৈতলীলাবাদ ঈশ্বরানুভূতির আর একটি বিকাশ। বিচার করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের সঙ্গে ইহার কোনও বিরোধ নাই। প্রতি যুগ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সংস্কৃতি ও সাধনার ফল; সুতরাং পৌরাণিক যুগও পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের সঙ্গে কার্য্যকারণ সম্বন্ধে অচ্ছেদ্যবন্ধনে গ্রথিত। উপনিষদ যুগের প্রচারিত অদ্বৈতবাদ ও জ্ঞান-ধর্ম্ম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান সন্দেহ নাই, কিন্তু উপনিষদকার কেবল কঠোর জ্ঞানতত্ত্ব আলোচনা করিয়া শুষ্ক ইক্ষুদণ্ড চর্ব্বন করেন নাই, অনুভূতির চরমস্তরে উঠিয়া আবার কহিতেছেন—

'রসঃ বৈ স'

পৌরাণিক যুগে যে ভক্তি বা রসের ধর্ম্ম তাহার বীজ এই ঋষিবাক্যের মধ্যে নিহিত দেখিতে পাই। উপনিষদের নির্গুণতত্ত্বই আদি বা শেষ কথা নহে। যিনি অসীম ও অনন্ত—সৃষ্টি-রস প্রকটের ও লীলা-বিলাসের জন্য তাঁহার যে দ্বৈতভাব পোষণ, তাহা সৃষ্টিতত্ত্বের দিক দিয়াও মিথ্যা নহে। বহুত্বের মধ্যে একের যে আনন্দের বিকাশ, সেই প্রেমের প্রাচুর্য্য ও আনন্দের বৈচিত্র্য ভাল করিয়া আস্বাদ করাইবার জন্যই পুরাণের সৃষ্টি। আমার মধ্যে অনন্তের যে খণ্ড-বিকাশ তাহারই মাধুর্য্য উপলব্ধিই তো আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, কাজ কি জগৎ সংসার কারণের তত্ত্ববিচারে? কবি তাই গাহিয়াছেন—

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর,
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এতো মধুর।"

পাশ্চাত্য-সভ্যতার প্রথম প্লাবনে যখন আমরা লক্ষ্মীভ্রষ্ট ও কুলভ্রষ্ট হইয়া—বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, নবীন আলোক-প্রাপ্ত নয়নে যখন পাশ্চাত্য-জ্ঞানের রঙ্গীণ চশমা অাঁটিয়া আমাদের মহাপুরুষ-গীত পুরাণ-গুলিকে কল্পনার দিবাসপ্ন বলিয়া উপহাস করিয়া ম্যাক্সমুলারের কথিত বেদান্ত হইতে বড় বড় বচন উচ্চারণ করিয়া—"ব্রহ্মজ্ঞানী" হইয়া পড়িতে-ছিলাম, সেই যুগসন্ধিক্ষণে প্রবল ভাঙ্গনের যুগে মহা-মহীরুহের মত দণ্ডায়মান হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে পুরাণের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া আমাদের নয়ন সমক্ষে আর একটি নবীন আলোকশিখা উদ্ভাসিত করিয়া ধরিলেন···"পুরাণেই ভক্তির চরমাদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্তিবীজ পূর্ব্বাবধিই বর্ত্তমান, সংহিতাতেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়; কিঞ্চিদধিক বিকাশ উপনিষদে কিন্তু উহার বিস্তারিত আলোচনা পুরাণে। পুরাণের প্রামাণিকত্ব লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু উহা ছাড়িয়া দিলেও একটি জিনিষ আমরা নিশ্চিত দেখিতে পাই, তাহা এই ভক্তিবাদ। সৌন্দর্য্যের মহান আদর্শের—ভক্তির আদর্শের দৃষ্টান্তসমূহ বিবৃত করাই যেন পুরাণগুলির কার্য্য বলিয়া মনে হয়। পুরাণগুলির বৈজ্ঞানিক সত্যতায় বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাঁহার জীবনে প্রহ্লাদ, ধ্রুব বা ঐ সকল প্রসিদ্ধ মহাত্মাগণের উপাখ্যান-প্রভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় না।"

স্বামীজীর এই সূক্ষ্মদৃষ্টি নিয়া বিচার করিলে সহজেই অনুমিত হয় যে জাতি-গঠনে পুরাণের উপযোগিতা কত বেশী; পুরাণের সার্ব্বজনীনত্ব ও আদর্শবাদই ইহার হেতু। আদর্শ চরিত্র অঙ্কন করিয়া জীবনের মহত্ত্ব বিকাশ করিতে একমাত্র পুরাণই অদ্বিতীয়। আমাদের এমন একদিন ছিল, যে 'জাহ্নবীযমুনা বিগলিতকরুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী' রামায়ণ-মহাভারত-কথা আমাদের জাতীয় জীবনকে মহান ও দ্রবীভূত করিয়া পৃথিবীর মত সর্ব্বংসহ, অগ্নি-সূর্য্যের মত দীপ্তিমান, সাগরের মত গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ ও গাঙ্গেয় বারির মত উদার ও পবিত্র করিত গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বণিতা—পুণ্যময়। রামায়ণ-মহাভারত-কথা নিত্য শ্রবণ করিয়া আদর্শ জীবনযাপনের মহৎ প্রেরণা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন।

আবার কি সে দিন আসিবে? আবার কি আমরা বিশ্বাসগদগদ-কণ্ঠে বলিতে পারিব—

"তুলসী কাননং যত্র, যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণ পঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরি।"

আবার—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে তথা,
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ।"

পুরাণ তো তাঁহারই লীলা কীর্ত্তন। পবিত্র পুরাণ পাঠের সময় শ্রীভগবানের

শুভ আগমন ভক্ত তুলসীদাসের জীবনে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পুরাণ প্রসঙ্গ আলোচনায় জগৎপ্রীতি বিরতি হইয়া পরমা রতি ও আসিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ কি? পুরাণ হিতকারী বন্ধুর মত বলিয়া দিতেছেন—

"— রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং, ন রাবণাদিবৎ।"

ইহাই পুরাণের উপদেশ। সাগরকে লক্ষ্য করিয়া যেমন সমস্ত নদীপ্রবাহ ছুটিয়াছে, তেমনি দশরথের সত্যসন্ধত্ব, কৌশল্যার পুত্রস্নেহমুগ্ধতা কুব্জা ও কৈকেয়ীর ক্রূরতা, ভরত লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, সুগ্রীবের মৈত্র্য, হনুমানের ভক্তি-বীরত্ব, জাম্ববানের বুদ্ধিকৌশল, সিদ্ধশবরী ও গুহকের ভক্তি, সর্ব্বোপরি সীতার পাতিব্রত্য রামকে লক্ষ্য করিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; তাই রামায়ণের ভক্তি ব্যাখ্যাতা রামানুজ কহিতেছেন—

'বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রামাম্ভোনিধিসঙ্গতা
শ্রীমদ্রামায়ণী গঙ্গা পুণাতি ভুবনত্রয়ম।'

বাল্মীকি হিমালয়নির্গতা রামসিন্ধুসঙ্গতা রামায়ণী গঙ্গা ভুবনকে পবিত্র করিতেছে—কথা অতীব সত্য। ধর্ম্মের জন্য জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা যুধিষ্ঠিরাদির মত অন্য কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না; তাই তাঁহার নাম "ধর্ম্মরাজ পুণ্যশ্লোক।" পুরাণের এই সব চরিত্র কত উপকারী তাহা বর্ণনার অতীত, তাই বলিতেছেন—রাম যুধিষ্ঠিরাদির মত চলিও রাবণ দুর্য্যোধনাদির মত চলিও না।" পাপের কি ভীষণ পরিণাম—

"লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ
যৎকৃত রামদূতেন স রামঃ কিং করিষ্যতি। (বাল্মীকি রামায়ণ)

পাপী যত বড়ই হউক, তাহার চিত্ত ভয়শূন্য হইতে পারে না, তাই রাবণ হনুমানকর্ত্তৃক লঙ্কা দাহান্তে মন্ত্রণাসভায় এই কথা বলিতেছেন। যুদ্ধের পর হতবান্ধব হতপুত্র-পৌত্র রাবণ বলিতেছেন—

"এক লক্ষ পুত্র মোর সোয়া লক্ষ নাতি।
কেহ না রহিল মোর বংশে দিতে বাতি।"

পাপীর ধ্বংস এই রূপেই হইয়া থাকে। উর্ব্বীতলকে নির্ব্বীর করিয়া ১৮ দিনের মধ্যেই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। "একাদশচমূভর্ত্তা" 'ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম' মহামানী দুর্য্যোধন "হতসবলবাহন ভগ্নউরু" হইয়া ধূলিশয্যায় রক্ত বমন করিতেছেন! তাই বিচিত্র সংসার রহস্য দ্রষ্টা ঋষি-কবি বলিতেছেন—

'পশ্য কালস্য পর্য্যয়ম্' (মহাভারত)

—অসার-সংসার-গর্ব্বিত মানব কালের ক্রীড়া দর্শন কর। ঋষি আবার কহিতেছেন—ঐ দৃশ্য দেখিয়া তুমি দুঃখিত হইও না।—কারণ "প্রাণিনাং গতিরীদৃশী"। প্রাণীগণের ঐরূপ গতি। তোমারও পরিণাম ঐরূপ—যে পর্য্যন্ত না তুমি সেই অমৃত-বিষ্ণুপদ-বিলীন হইবে, যে পর্য্যন্ত না তুমি তোমার স্বরূপ উপলব্ধি করিবে। তাইতো কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গণে অর্জ্জুনকে স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য গীতার অবতারণা। ঋষিতপঃপূত পবিত্র ভারতের সনাতন বেদব্যাখ্যামূর্ত্তি পুরাণশাস্ত্র ভিন্ন অন্তস্তলদর্শী—সত্যের উলঙ্গমূর্ত্তি এমন করিয়া জগতে আর কেহই দেখাইতে পারে নাই, সতত জীবন-সংগ্রাম-বিপর্য্যস্ত ভগবানের অবোধ সন্তান অশান্ত মানবকে এমন করিয়া করুণার কথা আর কেহ শুনাইতে পারে নাই।

সপ্তরথিপরিবেষ্টিত স্ফুটনোন্মুখ-যৌবন অভিমন্যুর পতন হইয়াছে, পাণ্ডব শিবিরে শোকের সিন্ধু উথলিয়া উঠিয়াছে, পঞ্চপাণ্ডব শোকে ম্রিয়মাণ, অপার স্নেহময়ী জননী সুভদ্রা ও পতিগতপ্রাণা উত্তরার দশা বর্ণনার অতীত, এই অবস্থায় ঋষি কহিতেছেন

"মাতুলো মাধব যস্য পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যু রণে শেতে নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।"

নিয়তির নিয়ম ধ্যান করিলে সংসারচক্রবধির অশান্ত মানবজীবনের অনেক কোলাহলই নিবৃত্ত হয়, তাই আবার বলিতেছি—পুরাণ ভিন্ন এমন সান্ত্বনার কথা অন্যত্র দুর্লভ। পুরাণ-কথা শুনিয়া যে বৈরাগ্যের উদয় হয় তাহা স্থায়ী হইলে জীবের পরমাগতি লাভ হইতে পারে। তাই বেদ রামায়ণের ব্যাখ্যাতা পরমভক্ত রামানুজ যথার্থ-ই কহিয়াছেন—

"বাল্মীকে র্মুনিসিংহস্য কবিতা বনচারিণঃ
শৃণ্বন্ রামকথানাদং কো ন যাতি পরাং গতিম্।"

কবিতা কাননচারী বাল্মীকি মুনিসিংহের রামনাদ শ্রবণে কার না পরমা-গতি লাভ হয়?

(২)

—বর্ত্তমান সভ্যতার চাকচিক্যে আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, আমরা পুরাণকে অশ্রদ্ধা করিয়া কোণঠাসা করিয়া রাখিয়াছি, সভা-সমিতিতে গলাবাজী করিয়া বলিতেছি—'সনাতন বেদ থাকিতে আবার পুরাণ কেন? উদার বেদশাস্ত্রে সার্ব্বজনীন সভ্যতার মূলভিত্তির পত্তন হইয়াছিল, বিশ্বমানবতার বিজয়-সঙ্গীত বেদশঙ্খনাদেই প্রথম জগতের রুদ্ধদ্বারে উদ্ঘোষিত হইয়াছিল, জাতির সে সুবর্ণ যুগ চলিয়া গিয়াছে। উত্তরকালে পুরাণশাস্ত্র রচনাকালে বেদবর্ণিত সার্ব্বজনীন সভ্যতাকে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে"—ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু আমরা বেদকেও বা প্রকৃত সম্মান দিতেছি কই? মূলবেদ কয়জনে পাঠ করিয়া তাঁহাদের অভিমত প্রকাশ করিতেছেন—? কেবল পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সমালোচনা পাঠ করিয়া পরের মুখেই ঝাল খাইয়া আমরা অভিমান করিয়া বেদের সঙ্কীর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি। ইহা হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?—বেদ শ্লেষার্থ-ব্যঞ্জক গ্রন্থ নহে, উহার অর্থমাত্র একটি, দুই বা ততোধিক অর্থ বেদের হইবে না। বেদার্থ তাৎপর্য্যবিৎ পরমর্ষিগণের ইহা সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত, বেদের একটি বর্ণ বা শব্দ নিরর্থক হইবে না, ইহাও সেই আর্য্যঘোষণা। সুতরাং সংযম ও ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হইয়া দেশীয় বিদ্যাসম্পদে দরিদ্র হইয়া বেদবিষয়ে মন্তব্য প্রচার করার মত ধৃষ্টতা আর নাই। সায়ণ-শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে দেখাই করিব না, বেদ ধারণোপযোগী শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিব না—অথচ ম্যাক্সমুলারের মুখে বেদ-উপনিষদের বাণী শুনিব—ইহা অপেক্ষা জাতীয় দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে? কালে যে আমাদের এইরূপ দুর্দ্দশা হইবে, তাহা সর্ব্বজ্ঞভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ঋষির অবিদিত ছিল না, সেই জন্য পরহিতপরায়ণ পরমকারুণিক পুরাণর্ষি করুণার্দ্রকণ্ঠে কহিতেছেন—

"রামায়ণং বেদসমং শ্রাদ্ধেষু শ্রাবয়েদ্ বুধঃ.
সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্য যঃ পঠেৎ ॥"

(বাল্মীকিরামায়ণ উত্তরকাণ্ড—)

(৩)

—বেদে আছে—শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।—

"আত্মা দ্রষ্টব্যোঃ শ্রোতব্য নিদিধ্যাসিতব্যঃ।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ. মৈত্রেয়ীযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ)

পূর্ব্বোক্ত বেদবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে গুরুমুখে বা শাস্ত্রমুখে প্রথমতঃ পরমাত্মার স্বরূপ কি তাহা ভাল করিয়া শ্রবণ করিতে হইবে, সেই ভাবেই তাহাকে যুক্তি প্রমাণ সাহায্যে মনন অর্থাৎ চিন্তা বা শেষকথা ধ্যান করিতে হইবে, ঐ চিন্তা বা ধ্যানের পরিপক্ক অবস্থা বিশেষের নামই নিদিধ্যাসন, এই নিদিধ্যাসনের পরই পরমাত্মা-সাক্ষাৎকার বা ভগবদ্দর্শন হয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেদোক্ত সাধনার প্রথম ভূমিকা "শ্রবণ", দ্বিতীয় 'মনন", তৃতীয় "নিদিধ্যাসন," চতুর্থ ভূমিকায় তাঁহার দর্শনলাভ হয়। তাঁহার নাম রূপ স্বরূপ প্রভৃতি শ্রবণ করিলেই তাঁহার উপর প্রেমোদয় হইবেই, এই প্রেমোদয় হইলেই সেই হৃদয়স্থিত প্রেমাস্পদের চিন্তা না করিয়া থাকা যায় না, বেদশাস্ত্র ইহাকেই মনন বা ধ্যান বলিয়াছেন, ঐ চিন্তা বা ধ্যান পরিপক্ক হইলেই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানধারা আসিবেই। ইহাকে কবির ভাষায়—'শয়নে স্বপনে হৃদয়-রতনে তিলে তিলে প্রাণে জাগে—" ইহাকে যোগশাস্ত্রের ভাষায় "ধ্যেয়াকারাকারিতচিত্তবৃত্তি" বলা যাইতে পারে—'আত্মতত্ত্ববিবেক', ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা ভগবদ্ভক্ত দার্শনিক উদয়নের ভাষায় এই মনোবৃত্তিকে ''ধ্যানাভাসরস" বলা যাইতে পারে। ঐরূপ অবস্থা হইলে সর্ব্বেন্দ্রিয়-রসায়ন ভগবান আর থাকিতে পারেন না। শিবরূপী রসসিন্ধু জীবরূপী বিন্দুতে মিলিত হয়েন, অখণ্ড চৈতন্য খণ্ডচৈতন্যে মিশিয়া যান, ইহারই নাম উত্তমযোগ বা আত্মসাক্ষাৎকার অথবা ভগবদ্দর্শন—। ইহাকেই বেদ বলিয়াছেন—

১। "আত্মা বাহরে দ্রষ্টব্যঃ"

ইহাকেই গীতা বলিয়াছেন—

২। "যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমাস্মৃতা।"

৩। "আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।"

এই অবস্থাকেই কবি ভাল করিয়া বুঝাইয়াছেন—

৪। 'ক্রিয়ালোপ আত্মা সুশীতল,
নিবৃত্তি জাহ্নবীধারা বহে কলকল,
এক, নাহি দুই আর,
আদরিণী থেমেছে এবার ॥"

বেদবর্ণিত এই অবস্থা সাধনগম্য ; অন্তর্মুখী বৃত্তি লইয়া নীরবে ভজন না করিলে ইহার গভীর রহস্য ধারণা করা একান্তই অসম্ভব। ইহা লিপিকৌশল দ্বারা প্রকাশের বস্তু নহে। পূর্ব্ববর্ণিত বেদোক্ত সাধনত্রয় (শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন) এবং তাহার ফল ভগবদ্দর্শন জীবের চরম সার্থকতা. সর্ব্বভূতসমদর্শিঋষিগণ ইহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়াছেন—

'অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্" (যাজ্ঞবল্ক্যঃ)

যিনি সাধনোপযোগী মানবদেহ ধারণ করিয়াও উক্ত ধর্ম্মলাভ চেষ্টায় বিরত, তিনি প্রকারান্তরে আত্মহত্যাই করেন। পুরাণর্ষিগণ এই সব সাধন স্তর সহজ সাবলীল ভাষায় পূত চরিতাখ্যানের ভিতর দিয়া আমাদের বুঝাইয়া গিয়াছেন, এইজন্যই বাল্মীকির "রামায়ণং বেদসমম্"—রামায়ণ বেদের সমান। রামায়ণাদি পুরাণ-বর্ণিত চরিতাবলী কাব্য-কল্পনা-কল্পিত চরিত্রাখ্যান নহে, উহা সনাতন বেদবর্ণিত সাধনার বিশদব্যাখ্যা বিশেষ, উহা হিন্দু জাতির অক্ষয় রক্ষাকবচ। আজ আমরা সভ্য হইয়াছি—সভ্যতার দোহাই দিয়া আমাদের রক্ষাকবচ হেলায় হারাইয়া সংসার কুরুক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় পরতাপে ছটফট করিতেছি অমৃতের পুত্র হইয়া মৃতের মত অবস্থান করিতেছি। তাই বলিতেছি এস, পুণ্য ভারতের হিন্দু জাতি—আমরা আমাদের সনাতন বেদমহিম-মণ্ডিত পৌরাণিক পূত চরিতকাহিনী ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি।



জীবন-বীমা কোম্পানীর দাদন প্রথা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমরা গত মাঘ সংখ্যার ভারতবর্ষে গভর্ণমেণ্ট ব্লুবুকের (Government Blue Book) আলোচনায় ভারতীয় ও অ-ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির বীমার কাজের পরিমাণ সম্পর্কে বীমা-ব্যবসায়ীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের একচুয়ারীর রিপোর্ট হইতে আমাদের দেশের বীমা-কোম্পানীগুলি কি ভাবে তাহাদের লগ্নী (Investment) ব্যাপার নিয়ন্ত্রিত করিতেছে তাহারই আলোচনা করিব।

ভারতীয় বীমা-কোম্পানীগুলির মোট সংস্থান হইতেছে ৩১¾ কোটি টাকা। এই টাকার প্রায় ৬৯% অর্থাৎ ২১¾ কোটি টাকা কোম্পানীর কাগজ বা ঐরূপ সরকারী বন্ধকী প্রথায় খাটিতেছে। বন্ধকী-কারবার, পলিসি বন্ধকে টাকা ধার, ষ্টক এবং শেয়ারের ব্যাপারে লগ্নী করা হইয়াছে ৪¾ কোটি টাকা। বাড়ীঘর বন্ধকী সম্পত্তির মূল্য অবধারণ করা হইয়াছে ১¾ কোটি। সুতরাং দেখা যাইতেছে অধিকাংশ টাকাই প্রায় কোম্পানী-কাগজে খাটিতেছে।

রাজসরকারের অভিভাবকত্বের দোহাই দিয়া আমরা বলিয়া থাকি বীমা-কোম্পানীর টাকার নিরাপত্তাবিধানের পক্ষে কোম্পানীর কাগজে টাকা লগ্নী করাই উৎকৃষ্ট উপায়। আমরা আরও বলি যে সাধারণ লোক এক গভর্ণমেণ্টকেই বুঝে—তাহাদের উপর লোকের বিশ্বাসও অগাধ—কাজেই এই পন্থা অবলম্বনীয় অর্থাৎ আমরা চিরাচরিত পথে চলিতে চাই—রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতিই আমাদের আকর্ষণ বেশী—নূতনভাবে চিন্তা করিবার, নূতন উপায়ে টাকা খাটাইয়া লাভবান হইবার সাহস আমাদের নাই।

কোম্পানী কাগজের ঘাট্‌তি

শুধু কোম্পানীর কাগজে ভারতীয় বীমা-কোম্পানীর টাকার ৬০% উপর খাটিতেছে। কিন্তু হিসাবে দেখা যায় যে ১৯৩২ সালের ৫·৮৮ সুদ অর্জ্জন—চলতি বৎসরের প্রথম ভাগে নামিয়াছিল ৩·৯১—পরে আরও কমিয়া বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়াছে ৩·৫। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয় যে হারাহারিভাবে কোম্পানীর কাগজের সুদ ৩·৫ দাঁড়াইবে। দেখা যাইতেছে কোম্পানীর কাগজেরও "ঘাট্‌তি" (Depreciation) আছে।

১৯১৩—২৯ পর্য্যন্ত কোম্পানীর কাগজের 'ঘাটতি'র দরুণ আমাদের কোম্পানীগুলির ২¾ কোটি টাকা ক্ষতি হইয়াছে। ১৯২৯ সালের পর এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়িয়াছে। আমরা জানি কোনও কোম্পানীকে ১৯৩১ সালে এই ঘাটতির দরুণ হিসাবনিকাশে ১২ লক্ষ টাকা সংস্থান হইতে সরাইয়া দিতে হইয়াছে।

অভিজ্ঞের কথা

এই সম্পর্কে সুবিখ্যাত একচুয়ারী ও বীমাবিদ মিঃ টি, ই, ইয়ংএর কথা মনে পড়ে। তিনি বলিতেছেন—

"In former days of assurance business, when the relation of the realised rate of interest to the valuation rate was not so distinctly recognised in its bearing upon profits and in consequence also of restricted notions of Insurance Finance, this form of investment in Government Securities was universally popular with companies and the preference again was no doubt partially due to the prestige and public confidence which were supposed to be bestowed upon a Corporation by an extensive holding of finest Government Security. Looking to the decline of the rate obtainable from 'consol's and especially in fluctuations of value in recent years, this mode of investment has justly, in the interest of Policy-holders, ceased to retain the supreme favour of assurance administrators which it formerly possessed."

অর্থাৎ—পূর্ব্বে জীবন-বীমা ব্যবসায়ে একচুয়ারী নির্দ্ধারিত "ভ্যালুয়েশন" মূলে সুদের এবং প্রকৃত অর্জ্জিত সুদের হারের মধ্যেকার পার্থক্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইত

না। তাহার ফলে কোম্পানীর লাভের হিসাবে অর্জ্জিত সুদের আধিক্যের প্রভাব তাদৃশ পরিলক্ষিত হইত না। পরন্তু কোম্পানীর কাগজের প্রতি সাধারণ লোকের আস্থা অধিক থাকায় এবং ঐরূপ দাদনের উপর কোম্পানীর সারবত্তা নির্ভর করে এই ধারণা বদ্ধমূল থাকায় অনেকাংশে কোম্পানীর কাগজেই জীবন-বীমা কোম্পানীর টাকা লগ্নী করা হইত। ক্রমে এইরূপ দাদনে অর্জ্জিত সুদের হার কমিতে থাকায় এবং ইহার মূলধনেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় জীবন-বীমা কোম্পানীগুলির পক্ষে বীমাকারীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য উপায়ে দাদন করা একান্ত সঙ্গত ও প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং ফলে—ক্রমশঃ কোম্পানীর কাগজের প্রতি বীমা কোম্পানীর পরিচালকবর্গের নির্ভর-শীলতা কমিতে থাকে।

এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিলে, এই দাদন-নীতি পরিবর্ত্তন ন্যায়সঙ্গত ও লাভজনক হইয়াছে।"

বিদেশী কোম্পানীর দাদন-নীতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতি

বিদেশী বীমাকোম্পানীগুলির লগ্নী প্রথার আলোচনা করিলে বন্ধকী দাদনের উদাহরণ অনেক পাওয়া যায়। একদিন ছিল যখন ব্রিটিশ কোম্পানীগুলির প্রভূত পরিমাণ টাকা কোম্পানীর কাগজে থাকিত। প্রারম্ভিক অবস্থায় রাজসরকারের সহিত লগ্নী ব্যাপারের এই যোগাযোগ অবশ্যই ফলপ্রদ। কিন্তু এমন সময়ও আসে যখন কোম্পানীর পক্ষে এই প্রথা ক্ষতিজনক হইয়া দাঁড়ায়। ব্রিটিশ বীমা কোম্পানীর হিসাব-তালিকা দেখিলে বুঝা যায় যে দাদন-নীতি এবং তাহার প্রয়োগ ব্যাপারে সেখানে সম্প্রতি যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। এখন ব্রিটিশ কোম্পানী বিস্তৃতভাবে লগ্নী কারবার চালাইতেছে। যদি ১৮৭০ সালে তাহারা কোম্পানীর কাগজে ৭·৫% লগ্নী করিয়া থাকে—১৮৯০ সালে সেই হার দাঁড়াইয়াছে ২·৯%। ১৯০৭ সালেই কোম্পানীর কাগজকে 'প্লেগ' আখ্যা দিতে দেখা যায় [British Consols—they are avoided as plague—W.m Smith Nicol]। যুদ্ধের প্রারম্ভে তাহার সুদ দাঁড়াইয়াছিল ০৯৪% এবং যুদ্ধের বাজারে স্বদেশপ্রেমের খাতিরেই কোম্পানীর কাগজে বহু টাকা দাদন করা হইয়াছিল। কিন্তু সম্প্রতি খুব কম পরিমাণই কোম্পানী-কাগজে লগ্নী করা হইতেছে। ইহার কারণ প্রত্যক্ষ। ১৮৯৬ সালের যাহার দাম ছিল ১১৪, ১৯২১ সালে তাহা নামিল ৪৩এ। ব্যবসায়ী লোকের এ সম্পর্কে সাবধান হওয়াই ত স্বাভাবিক।

এখন গতানুগতিক পন্থা ছাড়িয়া তাহারা নানাবিধ লাভজনক ব্যাপারে টাকা লগ্নী করিতেছে। তাহারা আজকাল মনে করে যে বীমা কোম্পানী পরিচালকগণের লক্ষ্য হওয়া উচিত—"by constant watchfulness of financial affairs to discover sound and suitable openings for loans and purchases which are not so adapted to private investors as to Corporations. Undoubtedly special knowledge and caution are requisite but the superior rate of interest to be secured justifies the expenditure of particular and continued supervision."—

অর্থাৎ—সর্ব্বদা আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কি করিয়া যথাযথভাবে ও নিরাপদে ঋণদান ও ক্রয় বিক্রয়ের পন্থা নির্দ্ধারণ করা যায়, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে পন্থা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে নহে, শুধু সমবায়-প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই অবলম্বনযোগ্য সেই পন্থাতেই জীবন-বীমার টাকাকড়ি খাটাইতে হইবে। একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে এ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান ও সতর্কতার প্রয়োজন; কিন্তু যদি বেশী হারে সুদ অর্জ্জিত হয়, তাহা হইলে এই প্রকার তত্ত্বাবধানের ব্যয় পোষাইয়া যায়।

বিদেশী কোম্পানীর সদ্দৃষ্টান্ত

একটি ব্রিটিশ কোম্পানী তাহার মোট সংস্থান ৬½ মিলিয়ন পাউণ্ডের মধ্যে বন্ধকী দাদনে ৩½ মিলিয়ন পাউণ্ড খাটাইতেছে। স্বাধীন দেশের স্বাধীন মত। কি উপায়ে অধিক মাত্রায় লাভ করা যায় তাহার জন্য গবেষণা চলিতেছে; চিন্তা ও অনুশীলন দ্বারা ষ্টক ও শেয়ারের বাজারে লগ্নী-কারবারের পরখ চলিতেছে।

কানাডা দাদন-ব্যাপারে পূর্ব্বাপর বিশেষ সৎসাহসের পরিচয় দিয়া আসিতেছে। আজ যে কানাডা শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতির দ্বারা সমগ্র পৃথিবীর মহাজন (Credit Country) হইয়া বসিয়াছে—তাহার প্রধান কারণ বীমা-কোম্পানীর সহায়তা। বীমা-তহবিলের ৫০% শিল্পবাণিজ্য, রেলওয়ে বণ্ড, বিদ্যুৎ বা জলসরবরাহ,

রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাবিধ পাব্লিক ইউটিলিটি সার্ভিসের শেয়ারে খাটিতেছে।

যুক্ত-সাম্রাজ্যের কোম্পানীগুলি শিল্পবাণিজ্যে তহবিলের অধিকাংশ লগ্নী করিয়া থাকে। কেবল বন্ধকী দাদনে তাহারা খাটায়—২০%। ছোট ছোট কৃষি-প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যাপারের অধিকাংশ টাকা বীমা কোম্পানীগুলি সরবরাহ করিয়া থাকে।

জারমানীতে সামাজিক বীমা-প্রতিষ্ঠান (Social Insurance Institution) ছাড়াও বীমা কোম্পানীগুলি ব্যাপকভাবে বন্ধকী দাদন কার্য্যে সহায়তা করিতেছে। Reichএর বীমা-পরিদর্শন-সংঘের বিবরণী পাঠে দেখা যায় যে ১৯৩৩ সালে বীমা কোম্পানীগুলির বন্ধকী দাদনের সংখ্যা ছিল ৬৭,৭০০০। আজকাল ছোট ছোট কৃষি প্রতিষ্ঠানে দাদনী কাজের সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। কৃষিঋণ তুলিয়া দিয়া বীমা কোম্পানী হইতে কৃষিঋণের ব্যবস্থা মূলে ইয়োরোপিয়া জমি বন্ধকী সমিতির সভ্য ভন্ হেক্‌টএর (Von Hecht) নাম স্মরণীয় হইয়া আছে। এই কৃষিঋণের ব্যবস্থা অতি সুন্দর।

(Sinking Fund) হইতে ঋণমুক্তির উপায় ছাড়াও —ঋণের টাকার পরিমাণে একটি বীমা করিতে হয়। ঋণের পরিমাণ উক্ত ফণ্ডের টাকা হইতে পরিশোধিত হইয়া যেমন কমিতে থাকে তেমনই বীমার টাকার পরিমাণও কমিয়া যাওয়ায় ক্রমশঃ প্রিমিয়মও কম লাগে। সম্পূর্ণ টাকা শোধ না হওয়া পর্য্যন্ত এই পদ্ধতিতেই কাজ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে যদি বীমাকারীর মৃত্যু ঘটে—বীমার টাকায় ঋণ পরিশোধ হইয়া বন্দকী খালাশ হইয়া থাকে। ইষ্ট প্রুশিয়ার Land Schaft নামক প্রতিষ্ঠান দ্বারাও বীমা-ব্যবস্থায় কৃষিঋণ শোধ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

আশা করি নূতন পথে দাদন-নীতি পরিচালিত করিবার পক্ষে—এই উদাহরণগুলি ভারতীয় কোম্পানীকে অনুপ্রাণিত করিবে। পরীক্ষা করিতে গিয়া হয়ত কোনও কোনও স্থলে ভুলচুক হইবে, আশানুরূপ ফললাভ হয়ত সম্ভব হইবে না কিন্তু গতানুগতিক পথ সংস্কারবদ্ধ প্রণালীতে চলার মধ্যে কোনও যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না। কাজেই একান্ত নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা সহকারে অধিকতর লাভের দিকে লগ্নী কারবার চালাইবার চেষ্টা করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতীয় বীমা কোম্পানীর সমস্ত টাকা কোম্পানীর কাগজে আটকাইয়া রাখিলে—ভারতবাসীর নিকট হইতে ভারতীয় কোম্পানী যে সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেছে —তাহার প্রতি ন্যায্য মর্য্যাদা প্রদর্শন করা হয় না। যদি ভারতবাসীর প্রদত্ত অর্থ ভারতবর্ষের অভাব পূরণ ও সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত হয়, তবেই বলিব দেশীয় কোম্পানীগুলি অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করিতেছেন। অন্যথায় চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করিয়া পরিচালকবর্গ তাঁহাদের দায়িত্ব পালনে যথোচিত যত্ন লইতে পরাঙ্মুখ—একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না—

"The administrator who persues this course has failed to master the rudiments of responsibility with which he has been entrusted and the resourceful and competent execution of which demands in the place of supineness vigilant yet cautious enterprise in the place of inactive ease."

অর্থাৎ—পরিচালকবর্গ যদি এই পথই অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা তাঁহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না; যথাযোগ্যভাবে বিভিন্ন উপায়ে সে দায়িত্ব পালন করিতে হইলে চাই—ঔদাসিন্য ও নিশ্চেষ্ট আরামের স্থলে জাগ্রত অথচ সতর্ক কর্ম্মপ্রচেষ্টা।

কোন পথে ?

ভারতীয় বীমা কোম্পানী তাহা হইলে কোন লগ্নী-ব্যাপারে কোন্ উপায় অবলম্বন করিবে? ইহার আভাস আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ভারতীয় বীমার অবস্থা অনুযায়ী যেমন বীমা কোম্পানীগুলির দাদন-ব্যবস্থা করিতে হইবে, তেমনি—আমাদের দেশের অর্থ-নৈতিক অবস্থার বিষয়ও এই ব্যাপারে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। আজ আমাদের দেশ শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় জগতে কোথায় পড়িয়া রহিয়াছে—বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের কথা দূরে থাকুক—ছোটখাটো অর্থকরী শিল্প ব্যবসায়ের কারখানা—বা ঐ প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায়ও আজ অর্থাভাবে পরিকল্পনাতেই থাকিয়া যাইতেছে; কার্য্যক্ষেত্রে ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষা—শিল্প সাধনার রূপ পরিগ্রহ করিতে

পারিতেছে না। দেশে অর্থের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অপ্রতুলতা নাই; কিন্তু সে অর্থ স্থানবিশেষ বা ব্যক্তি-বিশেষের আয়ত্তে থাকিলে চলিবে না। এই প্রকার মত-বাদকে প্রশংসা করিয়া জনৈক বীমাতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন—

If the Insurance Companies pick and choose, use caution and circumspection, they could find sound engineering works, public utility enterprises, electrification projects etc. to finance. Small industrial concerns are the the units of national industrial life. It is for them to patronise these industrial ventures, give them financial support and herald an era of developed industry. This wave of industrial regeneration will react favourably upon the companies themselves. For with greater income and a higher standard of life of the people that comes in the wake of industrial expansion there will be a larger demand for Insurance."

—অর্থাৎ যদি বীমাকোম্পানীগুলি বাছাই করিয়া কোথায় টাকা দাদন করিবেন তাহা স্থির করেন, চারিদিক দেখিয়া শুনিয়া সতর্কতা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে টাকা লগ্নী করিবার উপযোগী ভাল ভাল ইন্‌জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও স্বাস্থ্যোন্নতি বিধান প্রভৃতি জনসাধারণের (Public utility services) উদ্দেশ্যে সঙ্কল্পিত প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাইবেন। ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান লইয়াই জাতীয় শিল্প জীবনের প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থানুকুল্যে এই সকল শিল্প প্রচেষ্টার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া উন্নত শিল্পের যুগান্তর আনয়ন করা বীমা কোম্পানীরই কর্ত্তব্য। শিল্পের পুনরুত্থান বীমা-কোম্পানীর পক্ষে সুফলপ্রসূ হইবে; কারণ, অধিকতর উপার্জ্জন এবং উন্নততর জীবনের আদর্শ লইয়া যাঁহারা এই নবজাগ্রত শিল্প প্রসারের মধ্যে আসিয়া পড়িবেন, তাঁহাদের অধিকতর বীমার প্রয়োজন হইবে।

কেহ কেহ বাড়ী বন্ধকী কাজে টাকা খাটাইবার পক্ষপাতী। আমাদের দেশে বাড়ীঘরদুয়ারের অবস্থা এখনও আদর্শস্থানীয় হয় নাই। কাজেই তহবিলের কিছু অংশ এই ব্যাপারে লগ্নী করা যাইতে পারে।

পল্লী ভারতের দাবী

কিন্তু পল্লী-ভারতের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়াছে অথচ প্রকৃত ভারতবাসী বলিতে আমাদের দেশের পল্লীবাসিগণকেই বুঝায়। কৃষি ও ভূমি-স্বার্থে সংশ্লিষ্ট যে দেশের প্রতি ৪জনে একজন কৃষিজীবী সে দেশের পল্লী-বাসীদের লইয়াই আমাদের জাতীয় অর্থনীতি।—কৃষিস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বীমা কোম্পানীর করণীয় বিষয়ের মধ্যে কৃষি-বীমা সম্পর্কে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আমাদের বক্তব্য এই যে পল্লী-প্রধান ভারতবর্ষে পল্লীশিল্প ও কৃষির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে—বীমা কোম্পানীকে নূতন পথের সন্ধান দিতে হইবে। তাহাদের পুঞ্জীভূত অর্থ ভাণ্ডারের ন্যায্য অংশ যদি পল্লী-কৃষকের অবস্থা পরিবর্ত্তনে ও কৃষি-উন্নয়নে ব্যয়িত হয় তবে ভারতবর্ষে জীবন-বীমা করিবার লোকের অভাব হইবে না। বীমাজগতে ভারতবর্ষ পিছাইয়া আছে—যেখানে আমেরিকায় গড়পড়তা মাথা পিছু জীবন-বীমার পরিমাণ—২,১৭৩৲ টাকা, কানাডায়—১,৮১৫৲ টাকা, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডে ৭০২৲ টাকা—সেখানে ভারতবর্ষে মাত্র ৫৲ টাকা—ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

কৃষকদিগের ঋণভার আমাদের জাতীয় অর্থনৈতিক জীবনের কলঙ্ক হইয়া আছে। ক্রুকের (Crook) হিসাব অনুসারে আমাদের কৃষিঋণের পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকা এবং আমাদের দেশের শতকরা ৮০জন কৃষক এই ঋণভার বহন করিতেছে। আমাদের দেশের স্বার্থপর মহাজন ও "শাইলক"-মতি উত্তমর্ণগণের হাত হইতে এই ধ্বংসোন্মুখ পল্লীবাসী কৃষকগণকে উদ্ধার করিতে না পারিলে আমাদের দেশে কোনও "National Economy" বা জাতীয় অর্থনীতি গড়িয়া উঠিতে পারে না। এদিকে দেশের বীমা কোম্পানীগুলি কি অবহিত হইবার চেষ্টা করিবেন?

জার্ম্মাণ দেশের জমী-বন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land mortgage Banks) স্থাপন করিয়া দীর্ঘমেয়াদী বন্ধকী ব্যবস্থা, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টও গ্রহণ করিয়াছেন। টাউনশেণ্ড কমিটি (Townshend Committee on Co-operation), লিন্‌লিথগো কৃষি কমিশন (Linlithgo Commission on Agriculture), কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনুসন্ধান সমিতি (Central Banking Enquiry Committee) প্রভৃতির সুপারিশে ভারতবর্ষে জমি-বন্ধকী-ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে। দীর্ঘ-মেয়াদী আমানত পাওয়া সহজ নহে এবং যেহেতু ডিবেঞ্চারই (Debenture) জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্কের প্রধান অবলম্বন—অতএব এইদিক দিয়া বীমা কোম্পানীর কর্ত্তব্য সুস্পষ্ট। একদিকে দীর্ঘমেয়াদী দাদনের ব্যবস্থায় বীমা কোম্পানী যেমন লাভবান হইবেন—সেই সঙ্গে বীমার অন্যতম আদর্শ যে জনহিতসাধন, ভারতীয় কৃষক সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতিসাধন করিয়া তাহাদিগের মনুষ্যত্ব ও সাংসারিক সুখসাচ্ছন্দ্য বিধান—ভারতীয় বীমা কোম্পানী-গুলি সেই উচ্চ আদর্শ পালনের সার্থকতা লাভ করিবেন।

'অষ্টপাদ' বা অষ্টভুজ

শ্রীনরেন্দ্র দেব

সাগরতলের কত যে অধিবাসী রূপের ঐশ্বর্য্যে ও বর্ণের ছটায় বরুণলোক উদ্ভাসিত ক'রে রেখেছে তার সংখ্যা হয় না। আবার, সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, যারা যত বেশী সুন্দর—তারাই তত বেশী প্রয়োজনীয় জীব! রূপ ও রংয়ের সম্পদে গর্ব্বিত হ'যে তারা কেউই অপদার্থের দলে গিয়ে পড়ে নি। সৌখীন বা বিলাসীও হ'য়ে উঠে নি! জগতের কল্যাণে যথাসাধ্য কাজ করে চলেছে তারা। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, বিরক্তি নেই!

সমুদ্রগর্ভে যেমন সৌন্দর্য্যের প্রাচুর্য্য, তেমনি আবার এত বেশী কদর্য্য ও কুরূপেরও অস্তিত্ব আছে সেখানে, যে সমস্ত পৃথিবী খুঁজলেও সে রকম বীভৎসমূর্ত্তির জীব একটিও



অষ্টপাদ বা অষ্টভুজ (সমুদ্রতলে শুয়ে বিশ্রাম ক'রছে)

খুঁজে পাওয়া যাবে না! যে অষ্টপাদের সম্বন্ধে আজ আলোচনা ক'রতে বসেছি, তাদের মধ্যে যত রকমের বিভিন্ন জাত আছে, সবাই অত্যন্ত কুৎসিত! এরা সরীসৃপ জাতীয় বা খোলাহীন শম্বুক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত!

'অষ্টপাদ' নামটি থেকেই নিশ্চয় এটুকু বোঝা যায় যে এই সামুদ্রিক জীবের অন্ততঃ আটখানি পা' আছেই। ইতর প্রাণীদের হস্ত পদ উভয়ই সমান কার্য্যক্ষম ব'লে এই অদ্ভুত সামুদ্রিক জীবটিকে অনেক ক্ষেত্রে 'অষ্টভুজ'ও বলা হয়। যারা 'পুরী' বেড়িয়ে এসেছেন তাঁরা নিশ্চয় সমুদ্রতীরে এই 'অষ্টপাদে'র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করে এসেছেন, তবে সেগুলি আকারে ক্ষুদ্র।

'অষ্টপাদ' বা 'অষ্টবাহু' জীব আরও নানা জাতীয় আছে এবং তাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে এই আলোচ্য অষ্টপাদের পার্থক্য এই যে. এদেরও আটটি পা' আছে বটে, কিন্তু অন্যান্য অষ্টবাহুর তুল্য এদের মস্তক সংলগ্ন প্রকাণ্ড দু'টি শুঁড় নেই! আকৃতিগত প্রভেদও যথেষ্ট। এই সুদীর্ঘ দুই শুঁড় বাড়িয়ে তারা স্পর্শের দ্বারা অনেক কিছু জানতে ও অনুভব ক'রতে পারে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য অষ্টপাদের এই স্পর্শানুভূতি-সূচক যুগল ইন্দ্রিয়ের একেবারেই অভাব!

আরও নানা দিক দিয়ে এই সাধারণ অষ্টপাদের সঙ্গে অন্যান্য অষ্টপাদের প্রভূত গরমিল আছে। এদের শরীরের আকৃতি বা গঠন প্রায় গোলাকার পিণ্ডবৎ। আবার শরীরের তুলনায় এদের হাত-পায়ের পরিমাপ একেবারেই বিপরীত! যে রকম প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা বড় বড় এদের আটখানি পা, দেহ কিন্তু সে তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র!

'টোপা' জাতীয় সামুদ্রিক অষ্টপাদ-গুলির (squid) দেহের আকৃতি কতকটা বেলনের ন্যায় এবং তাদের দেহের উভয় পার্শ্বে মাছের লেজের মত দুটি পাখ্‌না আছে। এরা যখন সাঁতার কেটে খুব দ্রুত পিছু হ'টে জলের ভিতর চলে তখন দাঁড় টানার মত এই পাখ্‌না ব্যবহার করে। এই সময় তাদের গ্রীবাসংলগ্ন একটা নলের মুখ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে জলধারা নির্গত হয়। কিন্তু সাধারণ 'অষ্টপাদ'গুলির দেহে একমাত্র জল উৎসারণের নল ছাড়া আর কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বাহুল্য নেই। কারণ, তাদের জীবনযাত্রার যে ধারা তার পক্ষে এ সকল বাহুল্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনও

আবশ্যক নেই। এরা স্বল্পজলের অধিবাসী। দিনে থাকে সমুদ্রতীরের কাছাকাছি জলমগ্ন পার্ব্বত্য শিলাখণ্ড আঁকড়ে এবং রাত্রে সেই দীর্ঘ চরণাষ্টকের সাহায্যে ঘুরে বেড়ায় তারা জলের মধ্যে আহারের সন্ধানে। শিকার ধরেই তারা একেবারে মুখের মধ্যে পুরে দেয়। মুখখানি এদের অনেকটা কাকাতুয়ার ঠোঁটের মত কঠিন ও তীক্ষ্ণ। সর্ব্বদাই হাঁ করে আছে! শরীর ব'লে বিশেষ কোনও কিছু গঠন না থাকায় মুখখানি এদের সেই পিণ্ডবৎ শরীরের ঠিক মাঝখানে স্থপিত হয়েছে। এই মুখখানিকে কেন্দ্র করেই অষ্টপাদের সেই সুদীর্ঘ আটখানি পা বা অষ্টবাহু চারিপার্শ্বে বিস্তৃত।

জীবজগতে এই অষ্টপাদের ন্যায় অদ্ভুত আকৃতির আর কোনও প্রাণী সচরাচর দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলেছি এদের শরীরের তুলনায় এদের পা গুলি বেহিসাবী রকমের বড়। তবে এটা ঠিক যে তার মধ্যেও একটা অনুপাত আছে। কারণ, যাদের শরীর ক্ষুদ্রতর তাদের চরণাষ্টক যত বড় ও যতটা লম্বা, তার চেয়েও ঢের বেশী বড় ও লম্বা আটখানি চরণ দেখা যায় যাদের শরীর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। পা'গুলির উদ্ভব হয়েছে ঠিক এই অদ্ভুত জীবের মাথার মাঝখান থেকে। একটি চক্রের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে চারিদিকে লম্বা দাঁড়ি টানলে যেমন দেখতে হয়, অষ্টপাদের আটখানি পা অনেকটা সেই রকমই তার চারিদিকে চক্রাকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এই পদোৎপত্তি স্থানকে অর্থাৎ চরণমণ্ডলের মধ্যস্থলকে যদি মাথা বলে ধরা হয়, তাহলে ঠিক তার বিপরীতদিকেই অর্থাৎ পদচক্রতলের কেন্দ্র স্থলে এই জীবের তীক্ষ্ণ কঠিন চঞ্চুবৎ মুখ! এদের শরীর যতটা স্থূল, প্রত্যেক চরণ ঠিক তার এক চতুর্থাংশ পরিমাণ মোটা। অবশ্য, পদাবলীর উরুদেশ বা উদ্ভবকাণ্ড অর্থাৎ মাত্র তাদের চরণ মূলের পরিমাপ এই; কিন্তু চরণাগ্র তাদের ক্রমশ সরু হয়ে শেষে একেবারে চাবুকের ডগার মত বা সাপের লেজের মত লিক্‌লিকে হয়ে দাঁড়িয়েছে। পায়ের উপর-পিঠটা তাদের সমান, কিন্তু ভিতর পিঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোষক-চাক্তি সংযুক্ত আছে। এই চাক্তি-গুলির প্রত্যেকটি বাতাস পাম্প্ করবার যন্ত্রের মত কাজ করে এবং যা কিছু এরা ছোঁয় তাইতেই একেবারে বজ্রের ন্যায় এঁটে কামড়ে বা লেপ্‌টে ধরে! টেনে ছাড়াবার উপায় নেই।

অষ্টপাদ যখন কোনও কিছু ধ'রবো বলে লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে এসে ছোঁয় তখন কেবলমাত্র যে সেই শোষক-চাকৃতির গুণেই তার লক্ষ্য-ভূত বস্তুটিকে সে ঝাপ্‌টে ধ'রে



অষ্টপাদ (মাথার উপর দিক থেকে)

তাই নয়, তার অষ্টপদ বা অষ্টবাহুর বিক্রমও অসাধারণ! সেই সুদীর্ঘ ভীমকায় বলিষ্ঠ অষ্টভুজের দুর্জ্জয় শক্তির পরিচয়



অষ্টপাদ (উল্টা দিক অর্থাৎ পেটের তলা)

মাঝে মাঝে অসাবধানী সমুদ্র-স্নানার্থীরা কেউ কেউ পায়। রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভ্য শ্রীযুক্ত এফ্ টি বুলেন্ সাহেব একবার নিউজিল্যাণ্ডের দক্ষিণে সমুদ্রকূলে অল্প জলের মধ্যে নেমে চাঁদামাছ ধরবার জন্য টহল দিচ্ছিলেন। নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাওরী জুলুরা যেমন ক'রে বিনা ছিপে বা বিনা জালে মাছ ধরে, বুলেন্ সাহেবেরও ঠিক তেমনি ক'রে মাছ ধরবার সখ হয়েছিল। বড় বড় চাঁদামাছ দেখতে পেয়ে মাওরীরা ঠিক তাক ক'রে পায়ের তলায় চেপে ধরে, তারপর হেঁট হ'য়ে গিয়ে একেবারে তাঁর চক্ষুস্থির! দেখেন প্রকাণ্ড এক অষ্টপাদ এসে তাঁর দুই পা জড়িয়ে ধ'রে ক্রমে কটির উপর উঠবার চেষ্টা ক'রছে! এ দৃশ্য দেখে তাঁর সমস্ত শরীর ঝিন্-ঝিন্ ক'রে উঠলো! তিনি প্রাণপণ শক্তিতে অষ্টপাদের পা' ধ'রে টেনে ছাড়িয়ে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু আটহাতের সঙ্গে দু'হাতে কি লড়া যায়! তিনি যেই অতিকষ্টে অষ্টপাদের একজোড়া বাহু-বন্ধন টেনে ছাড়ান, সঙ্গে সঙ্গে তার আর একজোড়া হাত এসে তাঁকে জড়িয়ে



কর্কট ও অষ্টপাদ (অষ্টপাদের কবলে এক কাঁকড়ার দুর্দ্দশা)

দু'হাতে মাছটাকে বাগিয়ে তুলে আনে। বুলেন্ সাহেবও তাদের দেখাদেখি ঠিক তেমনি ক'রে মাছ ধরছিলেন সে দিন।

পাছে জলে ভিজে যায় ব'লে তাঁর পরণে ছিল একটি ছোট জাঙিয়ামাত্র! খালিপায়ে ও খালিগায়ে তিনি জলে নেমেছিলেন। সবে যেই হাঁটু পর্য্যন্ত জলে তিনি এগিয়ে গেছেন হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল দুই পায়ে যেন অসংখ্য ছুঁচ্ ফুটছে! চমকে উঠে ব্যাপারটা কি হেঁট হ'য়ে দেখতে ধরতে থাকে! তিনি ক্লান্ত হ'য়ে উঠলেন। সেই জলের ভিতর দাঁড়িয়েও তার সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেল! অষ্টপাদের অষ্টবাহুর নাগপাশে বুঝিবা প্রাণ দিতে হয়!

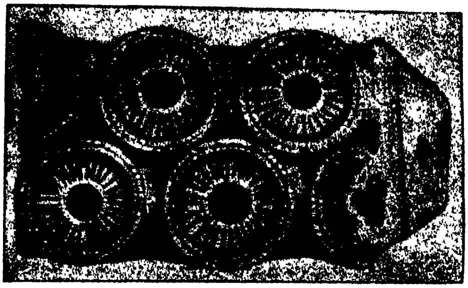
হঠাৎ তাঁর খেয়াল হ'লো কোমরের বেল্টে বাঁধা বড় ছুরী আছে একখানা! বিদ্যুৎবেগে তিনি খাপ থেকে ছুরীখানা টেনে বার ক'রে ফেললেন। অষ্টপাদের যে বাহুযুগল তাঁর পা জড়িয়ে ধ'রেছিল এবার ছুরিকাঘাতে তা কেটে ফেলবার জন্য উদ্যত হ'য়ে অকস্মাৎ তাঁর মনে হ'ল এটা অত্যন্ত নির্ব্বুদ্ধিতার

কাজ হবে। আহত অষ্টপাদ নিশ্চয় ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠে তার অবশিষ্ট ছ'পায়ে তাঁকে একেবারে পিশে জড়িয়ে ধরে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারবে! প্রত্যুৎপন্নমতি-বশত তিনি তৎক্ষণাৎ স্থির ক'রে ফেললেন একে হত্যা করা ছাড়া প্রাণ বাঁচাবার আর উপায় নেই? তখন সেই অষ্টচরণ মণ্ডলের অন্তরালে কোথায় এ বীভৎস জীবের ক্ষুদ্র দেহ সংগুপ্ত আছে তারই সন্ধানে ছুরিখানি বাগিয়ে ধ'রে তিনি সাবধানে আর একবার জলের মধ্যে হেঁট হ'লেন।

ক্ষুদ্র দেহপিণ্ড—মুষ্টি পরিমাণ মাংস খণ্ডের মত! কিন্তু, কি হিংস্র তার দুই চোখের দীপ্ত দৃষ্টি! যেন হত্যার জন্য সে বদ্ধপরিকর! অগত্যা বুলেন্ সাহেব আত্মরক্ষার জন্য দিলেন সেই ছুরিখানি আমূল বিদ্ধ ক'রে তার দেহে! তারপর একে একে কেটে ফেললেন সেই কঠিন নাগপাশের প্রত্যেকটি পা! এইভাবে মুক্ত হয়ে তিনি তীরে উঠে এলেন প্রাণ বাঁচিয়ে। জমীর উপর উঠে এসে খুব খানিকটা বমি করে ফেলে তবে যেন তিনি কতকটা সুস্থ ও নিরাপদ বোধ করলেন।

সৌভাগ্য বশতঃ সেদিন হাঁটু জলের বেশী অগ্রসর হন নি এবং সঙ্গে ছুরি থাকায় বুলেন্ সাহেব অষ্টপাদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন, কিন্তু এই বিপদ যদি তাঁর গভীর জলে ঘটতো এবং অষ্টপাদ জীবটি যদি আর একটু বৃহদাকার হ'তেন তাহ'লে সে দিন বুলেন্ সাহেবের চাঁদামাছ ধরার সখ জন্মের শোধ ঘুচে যেত!

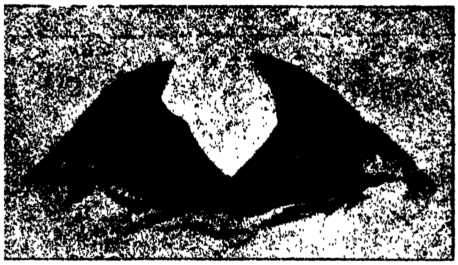
একটা মস্ত বড় সুবিধা এই যে খুব বৃহদাকার অষ্টপাদের সংখ্যা প্রায় বিরল! এ পর্য্যন্ত সবচেয়ে বড় যে অষ্টপাদটিকে ধরা হয়েছে তার দেহের পরিমাপ এক বর্গফুট মাত্র চওড়া এবং প্রত্যেক পা'খানি ছ'ফুটের বেশী লম্বা নয়। এই সব বৃহদাকার সমুদ্র-দৈত্যেরাই একান্ত ভয়াবহ! মানুষ মারবার শক্তি এদের অষ্টবাহুতে যথেষ্ট আছে। বেশ একটু দুষ্ট-বুদ্ধিও ধ'রে এরা। এটা কবি-কল্পনা বা 'গঞ্জিকাধূম' নয়। যে কোনও অষ্টপাদের চোখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেই এ সত্য স্বতঃই উপলব্ধি হবে। দুই চোখে যেন বুদ্ধির দীপ্তি প্রখর হ'য়ে ফুটে আছে! একটা হিংস্র প্রবৃত্তির উগ্র ছায়াও যেন সে চোখের মধ্যে স্পষ্ট উদ্ভাসিত! একমাত্র মানুষ ছাড়া জগতের আর কোনও জীবের চোখে এমন বুদ্ধিদীপ্ত হিংসার দৃষ্টি ফুটে উঠতে দেখা যায় না! গোল গোল দুই কাল চোখ। চোখের কোনও পল্লব নেই! পাখীর চোখের উপর যেমন একটা পাতলা ছালের পর্দ্দা লেপ্‌টে থাকে দেখা যায়, এদের তাও নেই! এদের সম্বন্ধে যা কিছু অবিশ্বাস্য ও অসম্ভব কাহিনী এবং বাড়াবাড়ি ব্যাপার প্রাচীন পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে দেখা যায় তার জন্য প্রধানতঃ দায়ী কতকটা এদের এই সব অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য



শোষক চাকৃতি (অষ্টপাদের অষ্ট চরণসংলগ্ন এইরূপ অসংখ্য শোষক চাকৃতি আছে)

এবং কতকটা এদের এই ভাঁটার মত ড্যাব্‌ডেবে গোল গোল কাল চোখের দীপ্ত তুষ্‌মণি চাহনি!

ভিক্টর হিউগো তাঁর "Toilers of the Sea" নামক গ্রন্থে এদের সম্বন্ধে লক্ষ লক্ষ পাঠকের মনে অত্যন্ত ভুল একটা ধারণা করিয়ে দিয়েছিলেন। এক ফুট চওড়া শরীর

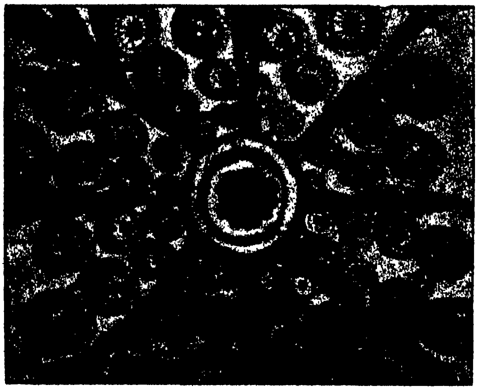


অষ্টপাদের কঠিন তীক্ষ্ণ চঞ্চুবৎ ঠোঁট (কাকাতুয়ার ঠোঁটের মত)

এবং ছ'ফুট লম্বা এক একটি পা যে অষ্টপাদের—তারা বড় বড় জোয়ান মানুষকে এক কোমর জলে পেলেও অনায়াসে পিশে মেরে ফেলতে পারে! এদের সম্বন্ধে বহু অনুসন্ধান ক'রে জানা গেছে যে এর চেয়ে বড় আকারের অষ্টপাদ আর হ'তে পারে না! কিন্তু হিউগো তাঁর বইয়ে Channel Islandsএর যে অতিকায় অষ্টপাদের বর্ণনা ক'রে গেছেন

তারা মানুষ ত' কোন ছার—বড় বড় হাতীকেও ছারপোকার মত টিপে মেরে ফেলতে পারে! 'ষ্যুল্‌সভার্ণ্‌' নামে আর একজন বিখ্যাত ফরাসী লেখকও তাঁর "Twenty Thousand Leagues under the Sea" নামক চমৎকার কাহিনীর মধ্যে অষ্টপাদের ঝাঁকের সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রীদের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তার ভিতর সত্যের পরিবর্ত্তে লেখকের কল্পনা এত বেশী এদের অতিরঞ্জিত ক'রে তুলেছে যে এরা আজও অনেকের কাছে এক ভয়াবহ রহস্যময় ও বিস্ময়কর জীব হ'য়ে রয়েছে!

অষ্টপাদের সুদীর্ঘ অষ্টবাহু অবিশ্রান্ত চঞ্চল হ'য়ে চতুর্দ্দিকে খাদ্যের সন্ধানে সমুদ্র আলোড়ন ক'রে ফেরে! এদের খাদ্য সরবরাহের আর বিরাম নেই! সবার লক্ষ্য সেই চরণ-মণ্ডল তলের মুখগহ্বরের দিকে। সবার গতি সবার শক্তি



অষ্টপাদের মুখাভ্যন্তর (অষ্টবাহুর চক্রজালের মধ্যেও অসংখ্য শোষক চাকৃতি আছে)

নিয়োজিত সেই গুহাভ্যন্তর খাদ্যের দ্বারা পরিপূরণে। যা কিছু শিকার সমস্তই ধ'রে এনে তারা পৌছে দিচ্ছে সেই তীক্ষ্ণ কঠোর শুক-চঞ্চুবৎ শৃঙ্গাধরের কঠিন পেষণের মধ্যে! এদের এই ওষ্ঠদ্বয়ে পাথরের যাঁতার মত জোর! সমুদ্রের বড় বড় চিংড়ি, কাঁকড়া, ঝিনুক, গেঁড়ি প্রভৃতি কড়্‌কড়্‌ শব্দে চিবিয়ে দাঁড়া খোলা-সমেত গুঁড়িয়ে খেয়ে ফেলে! অষ্টপাদের প্রধান খাদ্য বা জীবনধারণের প্রধান অবলম্বনই হ'চ্ছে এই চিংড়ি, কাঁকড়া, গেঁড়িজাতীয় সামুদ্রিক প্রাণী।

অষ্টপাদেরা যে শ্রেণীর সামুদ্রিক জীবের অন্তর্ভুক্ত তাদের সকলেরই এইরূপ শৃঙ্গবৎ কঠিন ওষ্ঠপুট আছে দেখা যায়! জীবতত্ত্ববিদেরা বলেন এরা নাকি খোলাহীন শম্বুক জাতীয় জলচর শ্রেণীর অন্তর্গত! এই খোলাহীন শম্বুক জাতীয় জলচরেরা নানা বিচিত্র আকারে সমুদ্রের মধ্যে জন্মলাভ করে। এদের যেমন একদিকে সর্ব্বভুক্‌ জীব বলা চলে, তেমনি এরা আবার অন্যদিকে যাবতীয় সামুদ্রিক মৎস্যের একান্ত প্রিয় খাদ্য! তিমি মাছেরা অষ্টপাদ দেখবামাত্র টপাটপ্‌ খেয়ে ফেলে! তিমি শিকারী জেলেদের ধরা এমন অনেক তিমিমাছের পেটে এই অষ্টপাদের কঠিন



অষ্টপাদের বিভিন্ন রূপ (সম্মুখের চিত্রে অষ্টপাদের পিণ্ডাকার দেহ, গোলাকার চক্ষু এবং যে নলের মুখ দিয়ে সে বারিধারা উৎসারিত ক'রে দ্রুত পশ্চাদ্দিকে সাঁতার কেটে চলে সেই নলটি দেখা যাচ্ছে। উপরে ডানদিকের কোণে অষ্টপাদের পশ্চাতে সাঁত্‌রে যাওয়ার চিত্র। মধ্যের চিত্রে অষ্টপাদের মাথা দেখা যাচ্ছে)

ওষ্ঠযুগল অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে! তিমির অন্ত-নিঃসৃত সর্ব্বজারক রসেও (ambergris) তা' জীর্ণ হয় না —এমনিই কঠোর সে ঠোঁট!

অষ্টপাদেরা অণ্ডজ জীব। এদের জন্মের হার এত দ্রুত

বৃদ্ধি পায় যে সমস্ত সমুদ্রবাসী প্রাণীর খাদ্য হিসাবে নিত্য ধ্বংস হ'য়েও এরা আজও লুপ্ত হয় নি। এরা যদি খাদ্য-হিসাবে ব্যবহৃত না হ'ত তাহ'লে ধরণীর সপ্ত মহাসাগর আজ অষ্টপাদে পূর্ণ হ'য়ে যেত! অষ্টপাদের অস্থিহীন কোমল ও সরস মাংস যাবতীয় সামুদ্রিক জীবের অতি লোভনীয় খাদ্য হওয়া সত্ত্বেও এরা যে এখনও টিকে আছে তার প্রধান কারণ একটু বড় হ'য়ে পড়লেই আর কেউ এদের ধ'রতে সাহস করে না। এরা তখন এমন ভয়ঙ্কর দুর্দ্দান্ত ও হিংস্র হ'য়ে ওঠে যে এদের আক্রমণ ক'রতে গিয়ে আক্রমণকারীর নিজেরই প্রাণ সংশয় হয়ে ওঠে! কেবল একমাত্র সুবৃহৎ সামুদ্রিক বাণ মাছ (Conger-eel) এদের আক্রমণ করতে ভয় পায় না! কারণ এদের সাপের মত লম্বা সরু পিচ্ছল শরীর অষ্টপাদেরা ঠিক বাগিয়ে ধরতে পারে না এবং বাণমাছ তার করাতের মত তীক্ষ্ণ দাঁত দিয়ে অষ্টপাদের আটখানি পা' কেটে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে খেয়ে ফেলে!

অষ্টপাদের আর একটা আত্মরক্ষার মস্ত উপায় হ'চ্ছে সে ইচ্ছামত তার দেহ হ'তে প্রচুর পরিমাণে গাঢ় কপিল-বর্ণের লালা নিঃস্রাবের দ্বারা আশেপাশের জল এমন ঘোলাটে ক'রে তুলতে পারে যে সেই অস্বচ্ছতার আবরণের অন্তরালে সে অনায়াসে আত্মগোপন করে থাকে। তখন অপর কোনও মাছ আর তাকে দেখতে পায় না, কিন্তু অষ্টপাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে ঘোলাটে জল ভেদ ক'রেও শত্রুর আগমন লক্ষ্য ক'রতে পারে এবং শিকার সন্ধানেও তাদের কোনও বাধা হয় না।

অষ্টপাদের অঙ্গ থেকে যে গাঢ় কপিশবর্ণের লালা নির্গত হয় তাই দিয়ে মূল্যবান 'সেপিয়া' রং তৈরি হয়। এই 'সেপিয়া' রংয়ের লোভে ব্যবসায়ী মহলে অষ্টপাদের চাহিদা আছে, সুতরাং মানুষও এদের এক মস্ত শত্রু। জেলেরা এদের দেখতে পেলেই ধ'রে নিয়ে আসে।

অষ্টপাদের আর একটা বিশেষত্ব হ'চ্ছে, সে ক্ষণে ক্ষণে বহুরূপীর মত তার দেহের বর্ণ পরিবর্ত্তন ক'রতে পারে। শত্রুর ভয়ে ছদ্মবেশ ধারণের জন্য সে তো বহুবারই তার দেহের রং বদলায়, তাছাড়া রেগে উঠলে বা বিরক্ত হ'লেও তার শরীরের বর্ণ স্বতঃই পরিবর্ত্তিত হ'য়ে থাকে।

মহাসমুদ্রের বহু প্রাচীন অধিবাসী এই পরাক্রান্ত অষ্টপাদ বা অষ্টভুজকে প্রকৃতপক্ষে এক বর্ণ-বিলাসী সৌখীন জীব বলা চলে।

তুমি কি আসিয়াছিলে ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি কি আসিয়াছিলে, নব মেঘে প্রথম আষাঢ়ে
নিরন্ধ্র আঁধার রাত্রি, অবিশ্রান্ত ধারা বরিষণ
বিদ্যুৎ চমকি ফিরে প্রতিহত মেঘের পাহাড়ে
ঘন-মেঘ-অন্তরালে অন্তর্গূঢ় ব্যথার ক্রন্দন।

মেঘ-ভার-অবনত—গগন-সীমান্ত পথ ব্যাপি'
বলাকার মালা গাঁথা, তোরণ দুয়ারে সুশোভন,
ঊর্দ্ধবাহু ঝাউবীথি বায়ুবেগে উঠিতেছে কাঁপি'
তুমি কি আসিয়াছিলে—সে দুর্য্যোগে নয়ন-লোভন?

পার হয়ে এলে নদী মরুপথ বিজন কান্তার
নিতান্ত একেলা এলে, দীপ্ত দীপ চেলাঞ্চলে ঢাকা,
অপরিচয়ের পথে, জন্মজন্মান্তরে যে আমার
মর্ম্মের গেহিনী ছিলে, তব পদচিহ্ন সেথা আঁকা।

তুমি কি আসিয়াছিলে, কদম্বকেশর-শিহরণে
যূথিকা-সভার মাঝে খুলেছিলে লাজাবগুণ্ঠন
বিস্ময়ে চাহিয়া আছি, চেনা-মুখ পড়িছে স্মরণে,
রজনীগন্ধার গন্ধ আর্দ্র বায়ু করিছে লুণ্ঠন।

অভিসারে এসেছিলে? মন-দেওয়া-নেওয়া কতবার
করিয়াছি তোমা সনে, হে বান্ধবী লীলা-সহচরী,
দুর্য্যোগ-সন্ধ্যায় দেখা, অতীতে সে সব কল্পনার,
নবরূপে এলে তুমি, অবগাঢ় প্রেমে চিত্ত ভরি।

তুমি কি আসিয়াছিলে? নব মেঘে আসিবে আবার?
দিনান্তে পথের প্রান্তে ক্লান্ত করি' দীর্ঘ প্রতীক্ষার?

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

এবার যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করবার প্রয়াসী হয়েছি, তিনি কোন ধনী বা জমিদারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন নাই—নদীয়া জেলার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি ছিলেন। তিনি কোন দিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছায়াও স্পর্শ করেন নাই—বিশ্ববিদ্যালয় দূরে থাকুক, কোন বিদ্যালয়েও তিনি প্রবেশ লাভ করেন নাই। আর সেকালে এখনকার মত গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয়ও ছিল না। যে গ্রামে দুচার ঘর অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন গৃহস্থের বাস ছিল, সেই গ্রামের কোন গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে একটা পাঠশালা বস্‌ত, গ্রামের ও নিকটবর্ত্তী স্থানের ছেলেরা সেই চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়ে গুরুমশাইয়ের কাছে তৎকাল-প্রচলিত শিক্ষালাভ করতেন; সে শিক্ষার সঙ্গে ছাপা-বই পড়ার বড় একটা সংস্রব ছিল না। ছাত্রেরা বর্ণ ও বানান শিক্ষা করত। শুভঙ্করী, বাজার হিসাব, জমিদারী ও মহাজনী সেরেস্তার কাগজপত্র, দলিল দস্তাবেজ ও জমা-ওয়াশীল-বাকী পাঠশালার শিক্ষণীয় বিষয় ছিল। আর গুরুমশাই ও ছাত্রদের অভিভাবকগণের প্রধান দৃষ্টি ছিল হাতের লেখা সুন্দর হওয়ার দিকে। এই বিদ্যা শিক্ষা করেই সেকালের লোকে জীবিকার্জ্জন করতেন এবং এই বিদ্যার জোরেই সে সময় অনেকে তালুক মুলুক, বিষয়-বিভব করে গিয়েছেন। আমি যাঁর স্মৃতি-তর্পণের প্রয়াসী হয়েছি, তিনি এই রকম একটা পাঠশালায় কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

যাঁরা বিগত ৭০।৮০ বৎসরের বাঙ্গালা-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, অন্ততঃ যাঁরা দুচারখানি বাঙ্গালা ছাপা বইও নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই সেই সকল বইয়ের অনেক গুলিরই প্রচ্ছদপটে দুইটি নাম ছাপা দেখেছেন—একটি শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, আর একটি বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী। আজ আমি আমার সেই শুভাকাঙ্খী পূজনীয় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করব।

আমি পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলাম, পাড়াগাঁয়েই আমার শিক্ষা দীক্ষা। তা হ'লেও সে সময় কল্‌কাতার দু-চারটে খবর আমরা পেতাম। আমার বেশ মনে পড়ে, সে সময় আমরা কলিকাতার তিনটে বড় পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশকের নাম শুন্‌তে পেতাম—এক যোগেশবাবুর ক্যানিং লাইব্রেরী, আর গুরুদাসবাবুর বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী, তৃতীয় চিনেবাজারের পদ্মচন্দ্র নাথের বইয়ের দোকান। এই তিনটি ছাড়া বটতলায় অনেক পুঁথির দোকান ছিল; তাদের নাম বড়-একটা জানতাম না।

স্কুলের পাঠ শেষ ক'রে যখন কলিকাতার কলেজে পড়তে এলাম, তখন দুই-চার বার গুরুদাসবাবুর দোকানে বই কিন্‌তে গিয়েছি। আমরা পাড়াগাঁয়ের ছেলে, আমাদের আদব-কায়দা শিক্ষা অন্য রকম ছিল। আমি দোকানে উপবিষ্ট গৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুভ্র উপবীতধারী, সৌম্যমূর্ত্তি মানুষটি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম, তিনিই দোকানের কর্ত্তা গুরুদাসবাবু। তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করে বইয়ের কথা বল্‌তাম। তিনি অদূরে উপবিষ্ট কর্ম্মচারীকে বল্‌তেন "অনন্ত, দেখ ত ছেলেটি কি বই চান।" এই অনন্তবাবুই তাঁর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং আজীবন গুরুদাসবাবুর সেবাতেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনন্তবাবু আমাকে বই দিতেন, তাঁরই হাতে মূল্য দিতাম এবং আস্‌বার সময় পুনরায় গুরুদাসবাবুকে প্রণাম করে চ'লে আসতাম। এই আমার প্রথম গুরুদাসবাবুর দর্শন লাভ—পরিচয় লাভ নয়। প্রতিদিন আমার মত কত ছেলে তাঁর দোকানে বই কিন্‌তে আস্‌ত; তাদের সকলকে চিনে রাখা কি সম্ভব? গুরুদাস-বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় এ সময়ের অনেক পরে হয়েছিল। সে কথা পরে বল্‌ছি।

আমি পূজনীয় গুরুদাসবাবুর পবিত্র জীবন-কথা লিখতে বসি নাই, সে স্পর্দ্ধাও আমার নাই—আমি স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি। তা হোলেও, আমার স্মৃতি-চর্চ্চা করবার পূর্ব্বে গুরুদাসবাবুর মহানুভবতা, তাঁর ঔদার্য্য, তাঁর কর্ম্ম-নিষ্ঠা, সর্ব্বোপরি তাঁর কর্ত্তব্যপরায়ণতা সম্বন্ধে দুই চারটি কথা বলতে চাই এবং সে কথাও অন্যের বিবৃত কথা—আমার কথা নয়।

কিছুদিন পূর্ব্বে একখানি বাঙ্গালা পুস্তক পড়েছিলাম,

সেই পুস্তকের কোন কোন প্রস্তাব 'ভারতবর্ষে'ও প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকখানির নাম 'দাদার কথা'। লেখক সুরেশচন্দ্র ঘোষ। এ 'দাদা' আর কেহই নহেন, ভারত-বিখ্যাত অদ্বিতীয় ব্যবহারাজীব দানবীর পরলোকগত সার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়; সুরেশবাবু তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। সার রাসবিহারী পঠদ্দশায় কলিকাতায় হিন্দু হোষ্টেলে থাকতেন। সেই সময়ের কথা-প্রসঙ্গে একদিন তিনি সুরেশবাবুকে যাহা বলেছিলেন, সেই কথা কয়টিই নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি।

"হোষ্টেলের আর একটি লোকের কথা বলি শোন—এখন তাঁর অনেক পয়সা হয়েছে, কল্‌কাতায় বাড়ীঘর করেছেন, তাঁর বইএর দোকান আছে, নাম গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। বোধ হয় নাম শুনেছ? এমন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, কর্ত্তব্যপরায়ণ লোক বাঙ্গালীর মধ্যে দেখেছি বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ তাঁর তখনকার অবস্থার মত লোকের মধ্যে। তিনি আমাদের হোষ্টেলের বাজার-সরকার ছিলেন। সামান্যই বেতন পেতেন। বোধ হয় সংসারে অনেক লোকজন প্রতিপালন করতে হতো, খুবই তাঁর টানাটানি ছিল বুঝতাম। এদিকে হোষ্টেলে বাজার-সরকারের কাজে তিনি অনেক পয়সা ঘাঁটাঘাঁটি করতেন। ইচ্ছা করলে যথেষ্ট সরাতে পারতেন! কিন্তু তাঁর পরম শত্রুও কখন বল্‌তে পারে নাই—'গুরুদাসবাবু একটা পয়সা চুরি করেছেন!' আমার দৃঢ় বিশ্বাস—বাজার-সরকারের এ সুখ্যাতি পৃথিবীতে কেউ করতে সাহস পাবে না!"

"তিনি মেডিক্যাল কলেজের ছেলেদের জন্য দু'টা আলমারিতে সামান্য ডাক্তারি বইও রাখ্‌তেন। ছেলেরা বই কিন্‌বার সময় বইএর দাম জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলতেন—'এটা এত টাকা, ওটা অত টাকা কেনা পড়েছে।' ছেলেরা কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন—'যা হোক্ দাও।' 'যা হোক্ দাও।' আমি একদিন তাঁকে বল্‌লাম—'গুরুদাসবাবু, বেশ ব্যবসা করছেন? বইটার কেনা দামের উপর যদি বলেন—'যা হোক্ দাও, যা হোক্ দাও! তবে ছেলেরা কে আর আপনাকে টাকাটা, সিকাটা দিতে চাবে? দুচার পয়সা দিয়ে সেরে দেবে।' তাতে তিনি হেসে বল্‌তেন—'তাই ঢের, তাই ঢের। তোমাদের কাছে আবার কি নেব?' অথচ দেখ, তাঁর তখন কত টানাটানি ছিল! একটা কথা আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'; কিন্তু গুরুদাসবাবুর সম্বন্ধে এটা কখনও খাটে নাই। অভাব তাঁর স্বভাব নষ্ট করতে পারে নাই।"

"পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বহুবাজার কি ঐ দিকে কোথা একটা বইএর দোকান করবেন স্থির করেন। হোষ্টেলের অনেকে তাঁকে নিষেধ করে বল্‌লেন—'আপনার মূলধন বেশী নাই, আপনি এমন কাজ করবেন না; দোকান চলবে না, ঠক্‌বেন!' আমি কিন্তু জোর করে বলেছিলাম—'উনি নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হবেন! ওঁর অমন Honesty মূলধন আছে; কেবল ওতেই উনি সফলতা লাভ করবেন!' হ'লও তো তাই! এখন তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু দেখ্‌চ তো? আমার খাবার সময় নাই, যাই কখন। আবার অনেক সময় ওটা মনেও থাকে না। অনেকে বলে বাঙ্গালী ব্যবসা করতে জানে না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যাঁরা ব্যবসা করতে যান, তাঁদের অধিকাংশেরই Honestyটা কম। তাই ফেল মারেন।"

"বি-এ পাশ করবার পরই দাদার একবার খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি গোপনে গোপনে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত এ বিষয়ে পরামর্শ হইত। এ সম্বন্ধে দাদা বলিয়াছিলেন—"খ্রীষ্টান হবার দিন গোপনে হোষ্টেল হইতে বেরিয়ে গেলাম। গীর্জ্জার কাছাকাছি গেছি, তখন এমন একটা বিঘ্ন ঘট্‌লো যে, আমার আর খ্রীষ্টান হওয়া হ'ল না।"

"বিঘ্নটি এই—আমি গীর্জ্জায় ঢুক্‌ছি, এমন সময় বাবা গিয়ে আমার হাত চেপে ধর্‌লেন। সে সময়ে সহসা সেখানে বাবাকে সে অবস্থায় আমার হাত ধ'রে ফেল্‌তে দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেলাম। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, কেমন করে বাবা আমার খ্রীষ্টান হবার কথা জান্‌তে পেরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।"

"বাবাকে বল্‌লাম—'থাক্, আপনি যখন এসে পড়েছেন, তখন আর আমি খ্রীষ্টান হ'ব না।' তারপর বাবার সঙ্গে হোষ্টেলে ফিরে এলাম।"

"এই গুরুদাসবাবুই—আমি খ্রীষ্টান হব সন্দেহ ক'রে, বাবাকে টেলিগ্রাম করেন। বাবা সেই টেলিগ্রাম পেয়েই হোষ্টেলে আসেন। আমি তখন খৃষ্টান হবার জন্য হোষ্টেল্

থেকে বেরিয়ে গেছি। বাবা হোষ্টেলে সংবাদ নিয়ে গীর্জ্জায় গিয়ে আমায় ধরেন। গুরুদাসবাবু সংবাদ দিয়ে বাবাকে এনে আমার খৃষ্টান হওয়ার বাধা দিয়েছেন, এ আমি জানতে পেরেছি শুনে গুরুদাসবাবু ভয় পেয়েছিলেন। সে জন্য তিনি আমার সঙ্গে সেদিন আর দেখা করেন নাই।"

"পরের দিন সকালে আমি ঝড়ের মত ছুটে গুরুদাসবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁহার হাতটা ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে সেকহ্যাণ্ড করে বল্‌লাম—'বেশ করেছেন!' এই বলেই সেখান থেকে চলে গেলাম।"

পূজনীয় গুরুদাসবাবুর জীবন-চরিত সার রাসবিহারীর এই কয়টি কথাতেই সম্পূর্ণ পরিস্ফুট হয়েছে। সত্য-সত্যই গুরুদাসবাবু যথার্থ সম্পদের, অতুলনীয় অগাধ মূলধনের অধিকারী ছিলেন; সে মূলধন, সার রাসবিহারীর কথায় তাঁহার Honesty। এই মূলধনই সংসার-সংগ্রামে তাঁকে জয়যুক্ত করেছিল, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেছিলেন, অতুল যশের অধিকারী হয়েছিলেন; এই Honesty মূলধনই তাঁকে সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় করেছিল, পুস্তক-ব্যবসায়ী-সমাজে তাঁকে বরেণ্য করেছিল। তাঁকে পুস্তক-ব্যবসায়ী-সমাজের সভাপতি পদে বরণ করে তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তিনি সত্য-সত্যই বাঙ্গালা সাহিত্যের পরম উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁর সাহায্য না পেলে কত দুস্থ সাহিত্যিকের সাহিত্য-জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হোতো। কিন্তু সে কথা বলতে আমি বসি নাই, আমার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি এই মহৎ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করবেন, আমি স্মৃতি-তর্পণই করব।

এই স্থানে আর একটি কথা বলবার প্রলোভন আমি কিছুতেই সংবরণ করতে পারছিনে। সে প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। গুরুদাসবাবু প্রথম বইয়ের দোকান করেন ৯৭নং কলেজ ষ্ট্রীটের একটি ছোট ঘরে এবং সেই ঘরের পাশ দিয়ে যে ছোট একটা গলি ছিল, সেই গলিতে ছোট একটি বাড়ীতে তিনি সপরিবারে বাস করতেন। সে বাড়ী ও সে গলি এখন মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দোকানের প্রসার যখন বৃদ্ধি হোল এবং কিছু অর্থও সঞ্চিত হোল, তখন ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ২০১ নম্বর কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের তেতালা বাড়ী কিনে সেখানেই নিচের তলায় দোকান করেন এবং দোতালা তেতালায় পরিবারসহ বাস করেন। কিছুদিন পরে ঐ বাড়ীর সম্পূর্ণ অংশেই দোকান বিস্তৃত করেন।

তিনি যখন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের ২০১ নম্বরের বাড়ীতে বাস করতে আসেন, তখন সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার পরলোকগত মনোমোহন বসু মহাশয় ২০২ নম্বর বাড়ীতে বাস করছেন। গুরুদাস বাবুকে নিকট প্রতিবেশী পেয়ে উৎফুল্ল হৃদয়ে তিনি যে গানটি রচনা করেন, 'মনোমোহন গীতাবলী' হতে সেই গানটি উদ্ধৃত করে দিলাম—

"চাঁদের হাট পেতেছেন্ পাড়ায় গুরুদাস্।
সোনার ছেলে মেয়ে আপনি গিন্নী, তেমি শ্বশুর
তেমনি শ্বাস্।
কিবা শান্ত ছেলে হরি, মরি মরি কি মাধুরী,
ও তায় দেখলে সাধ যায় কোলে করি,
কথা শুনলে হয় উল্লাস।১।
নন্দিনী তাঁর নন্দরাণী, ফুল্ল কমল বদনখানি,
যেন আনন্দময়ী ঠাকুরাণী এসেছেন ছেড়ে কৈলাস।২।
সুবালা মেয়েটি হায়, যেন কলের পুতুল নেচে বেড়ায়,
ও তার ফুটফুটে রং পুটপুটে ঢং, বিধুমুখে মধুর হাস।৩।"

গুরুদাস বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুধাংশুশেখর তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

এইবার গুরুদাস বাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের কথা বলি। আমি তখন মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলের রাজস্কুলে মাষ্টারী করি। সে সময় 'ভারতী' ও 'সাহিত্য' পত্রে আমার কতকগুলি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে। তখন 'সাহিত্য'-সম্পাদক পরলোকগত সুরেশচন্দ্র ও যতীশচন্দ্র সমাজপতি ভ্রাতৃদ্বয়ের আগ্রহে আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার ব্যবস্থা হয়। সোদরপ্রতিম সুরেশচন্দ্র তখন বৃন্দাবন মল্লিকের লেনে একটা বাড়ীতে বাস করতেন। সেই বাড়ীর নিম্নতলে তাঁর একটি ছাপাখানাও ছিল। সেই ছাপাখানাতেই 'প্রবাস-চিত্র' প্রথম ছাপার ব্যবস্থা হয়। সেই সময় সুরেশচন্দ্র আমাকে লিখলেন যে, 'প্রবাস-চিত্র' প্রকাশের ব্যবস্থা করবার জন্য আমার একবার কলিকাতায় আসা প্রয়োজন। তাঁর পত্র পেয়েই আমি কলিকাতায় এলাম এবং তাঁরই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলাম। তিনি বল্লেন যে, গুরুদাস বাবুকে 'প্রবাস-চিত্রে'র প্রকাশক করা

তাঁরা স্থির করেছেন এবং সেই দিনই অপরাহ্ণকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করে সমস্ত স্থির করতে হবে, সে সময় আমার উপস্থিত থাকা দরকার ; অন্য কারণে না হোক, গুরুদাস বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হওয়া প্রয়োজন।

সেই দিনই গুরুদাসবাবুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া গেল। সেই সময় পরমস্নেহভাজন শ্রীমান্ হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও আমাদের সঙ্গী হওয়ার জন্য সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

আমরা তিনজনে যখন গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ের সম্মুখে গেলাম, তখন দেখ্‌লাম তিনি ফুটপাথের পার্শ্বে একখানি বেঞ্চের উপর বসে আছেন এবং তাঁর পাশে বসে আছেন 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়। গুরুদাসবাবুকে ঐ স্থানে ঐ ভাবে বসে থাকতে অনেকদিন দেখেছি কিন্তু কোনদিন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার দুঃসাহস আমার হয় নাই।

আমরা গুরুদাসবাবুর সম্মুখে উপস্থিত হ'লে গুরুদাসবাবু সহাস্যমুখে বল্‌লেন 'কি হে সুরেশচন্দ্র, হেমেন্দ্র বাবাজী, কি মনে করে?"

সুরেশচন্দ্র বল্‌লেন "আমাদের জলধরদাদার সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিতে এসেছি।"

আমি তখন অগ্রসর হয়ে গুরুদাসবাবুকে যথারীতি প্রণাম করতেই তিনি বলে উঠ্‌লেন "আহা, থাক থাক।" সুরেশকে বল্‌লেন "ওঁর লেখার ত খুব প্রশংসা শুন্‌তে পাই। বেশ, বেশ।"

সুরেশচন্দ্র তখন বল্‌লেন যে, তিনি আমার কয়েকটি ভ্রমণ-কথা 'প্রবাস-চিত্র' নাম দিয়ে ছাপতে আরম্ভ করেছেন। ছাপার খরচা তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু দেবেন। গুরুদাস-বাবুকে ঐ বইয়ের প্রকাশক হ'তে হবে।

গুরুদাসবাবু বল্‌লেন, "বেশ, তাতে আর আমার আপত্তি কি। আমিই সব খরচ দিতাম। তা তোমরা যখন সে ব্যবস্থা করেছ, ভালই করেছ। এর পর জলধরবাবুর যে বই ছাপা হবে, আমি তার সব ভার নেব।"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বল্‌লেন 'এই বইখানি কেমন চলে, তাই দেখে পরে এঁর হিমালয়-ভ্রমণও ছাপবার ইচ্ছা আছে।'

গুরুদাসবাবু বল্‌লেন "আমিই সে ভার নেব।" তখন সুরেশবাবু আমার অনেক পরিচয় দিলেন। গুরুদাসবাবু বল্‌লেন "যখনই কলিকাতায় আসবেন, আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।"

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে তাঁকে প্রণাম করে সুরেশ ও হেমেন্দ্রের সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করলাম। গুরুদাসবাবুর সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়।

ইহার তিন চার মাস পরে মহিষাদলের মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে কলিকাতায় চলে আসি। যেদিন কলিকাতায় আসি সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুরুদাসবাবুর সঙ্গে দেখা করতে যাই। তাঁকে যখন বল্‌লাম, আমি মাষ্টারী ছেড়ে দিয়ে এলাম, তখন তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বল্‌লেন "ছেড়ে ত এলেন। তার পর কি করবেন?"

আমি বল্‌লাম "আপনার আশীর্ব্বাদে কিছু করবার পথও হয়েছে। পাঁচকড়িবাবু ও সুরেশবাবু 'বঙ্গবাসীর' অধিনায়ক যোগেন্দ্রবাবুকে বলে আমার জন্য 'বঙ্গবাসী' আফিসে একটা চাকুরী স্থির করেছেন। আজ সন্ধ্যার পর যোগেন্দ্রবাবুর বাড়ী গেলে কথা পাকা হবে।"

গুরুদাসবাবু যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেল্‌লেন, বল্‌লেন, "তবুও ভাল। আমি ভাবলাম এ কি করলেন, কাচ্চাবাচ্চা-পোষা মানুষ—কিসে চল্‌বে। তা কি জানেন, খবরের কাগজের কাজ ত কখন করেন নি। যোগেন্দ্রবাবু প্রথম শিক্ষানবীশকে কি আর বেশী মাইনে দেবেন, তাই ভাবছি। যাক্, তবুও ত একটা কিছু হোল। যোগেন্দ্রবাবু কি বলেন, সে কথা কা'ল আমাকে বলে যাবেন, বুঝলেন।"

বুঝলাম অনেক কথা। আমার মত একদিনের পরিচিত লোকের উপর যে মানুষের এত স্নেহ আগ্রহ হয়, এ ত জানতাম না, সে দিন তা বুঝলাম। আর বুঝলাম কোন্ গুণে গুরুদাসবাবু এমন সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় হয়েছেন, মা লক্ষ্মী তাঁর উপর কেন এমন সদয় হয়েছেন।

পরদিন বঙ্গবাসী আফিসে যাবার সময় গুরুদাসবাবুর দোকানে গিয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে বল্‌লাম "আজই কাজে যাচ্ছি। যোগেন্দ্রবাবু আপাততঃ মাসে ত্রিশটাকা দেবেন, কাজকর্ম্ম শিখলে বাড়িয়ে দেবেন।"

গুরুদাসবাবু বল্‌লেন "আমিও তাই ভেবেছিলাম। তা হোক ত্রিশ টাকা, কোন ভাবনা করবেন না, যখন যা অভাব হয় আমাকে জানাতে লজ্জা করবেন না।" কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে সেই সংবাদপত্রসেবার প্রথম

যাত্রাকালে যা দেখেছিলাম, আজ বহুকাল পরে এই বৃদ্ধ বয়সেও তা আমার মনে আছে ; আর তারই জন্য এই সুদীর্ঘ কাল পরে সেই দয়ার সাগর মহাত্মার স্মৃতি-তর্পণ করতে বসেছি।

এর পরের তের চৌদ্দ বৎসরের ঘটনা আমার জীবনের এক *সুদীর্ঘ স্মরণীয় ইতিহাস*। কত *বিপদআপদ*, কত ঝড়ঝঞ্ঝা, কত শোকতাপ যে এই চৌদ্দ বৎসর আমার মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, তা আমি জানি, আর জান্‌তেন গুরুদাসবাবু। আমি এই কয় বৎসর প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশ নিয়েছি, তিনি যা আদেশ করেছেন তাই করেছি, তাঁরই উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেছি। অবশেষে আজ পূর্ণ তেইশ বৎসর হোল, নিতান্ত অযোগ্য হ'লেও তাঁরই আদেশে 'ভারতবর্ষে'র ভার গ্রহণ করে নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় লাভ করেছি। কিন্তু 'ভারতবর্ষে'র বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হতে না হতেই ১৩২৫ সালের এই বৈশাখ মাসের ১২ই তারিখে আমার সেই আশ্রয়দাতা, আমার অভিভাবক গুরুদাসবাবু উপযুক্ত পুত্রদ্বয়ের হস্তে আমার অভিভাবকত্ব-ভার নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করে সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন—আমি এখনও সে ভার বহন করছি —আর কতদিন করব তা তিনিই জানেন।

পূজনীয় গুরুদাসবাবুর স্মৃতি-তর্পণ এখানেই শেষ করতে পারছিনে ; আমার প্রতি তাঁর যে কত স্নেহ, কত ভালবাসা ছিল, সে সম্বন্ধে দুই চারটি ঘটনার উল্লেখ না করলে এ স্মৃতি-তর্পণ যে অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

পরলোকগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব থেকে গুরুদাসবাবুর দৃষ্টিশক্তি লোপ হয়েছিল, তিনি আর দোকানে আসতে পারতেন না ; তাঁর দুই পুত্রই সমস্ত কাজকর্ম্ম করতেন। তিনি সে সময় পুত্রদের এই উপদেশই দিতেন, কারও একটি পয়সা পাওনা হ'লেই চাইবামাত্র দিতে হবে। কোন পাওনাদার কখনও এ কথা বলতে পারেন নি এবং এখনও পারেন না যে, গুরুদাসবাবুর দোকানে প্রাপ্য টাকা আনতে গিয়ে কেউ কখন ফিরে এসেছেন। ইহাই গুরুদাসবাবুর মূল মন্ত্র ছিল এবং ইহারই জন্য গুরুদাস লাইব্রেরীর এমন প্রতিষ্ঠা। আমি প্রায়ই তাঁকে প্রণাম করবার জন্য তাঁর বাড়ীতে যেতাম। সে সময় শ্রীযুক্ত হরিদাসবাবু কি সুধাংশুবাবু যদি উপস্থিত থাকতেন, তা হ'লে আমার সম্মুখেই তাঁদের বলতেন "দেখ, জলধরবাবু যখন যা চাইবেন তাই দিও, হিসাব দেখো না। নিতান্ত দরকার না হ'লে উনি কখন কিছু চান না।"

অনেকদিন আগের একটা ঘটনার কথা বলি। তখন গুরুদাসবাবুর পুত্রেরা দোকানের ভার গ্রহণ করেন নাই। পূজার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি একদিন বেড়াতে বেড়াতে দোকানে গিয়েছি। গুরুদাসবাবু আমাকে দেখে বললেন "কৈ জলধরবাবু, পূজার হিসাবের টাকা নিলেন না।"

আমি বললাম "ভারি তিন টাকা তের আনা পাব, তা আবার এত আগে নিতে আসব। ছুটীর আগের দিন এসে নিয়ে যাব।"

গুরুদাসবাবু হেসে বললেন "বেশ তাই আসবেন।"

গুরুদাসবাবু আগে থাকতেই অনন্তবাবুকে শিখিয়ে রেখেছিলেন। ছুটীর দুই-এক দিন পূর্ব্বে আমি যখন দোকানে গেলাম, তিনি অনন্তবাবুকে ডেকে বললেন "অনন্ত, জলধরবাবুর হিসাবের পাওনা তিন টাকা তের আনা দাও।" অনন্তবাবু আমাকে তিন টাকা তের আনা দিলে গুরুদাসবাবু বললেন "হিসাবে আরও কিছু পাওনা হয়েছে, নিয়ে যান।"

আমি বললাম—"পাওনাটা দেনায় দাঁড়াতে দশদিনও লাগে না। আমার এখন দরকার নেই।" গুরুদাসবাবু হাসতে লাগলেন।

একটু পরেই আমি যখন বিদায় নেবার জন্য উঠে পড়লাম, তখন গুরুদাসবাবু বললেন—"একটু দাঁড়ান জলধরবাবু।" এই ব'লে অনন্তবাবুর দিকে হাত বাড়ালেন। অনন্তবাবু সবুজ কাগজে মোড়া কি একটা গুরুদাসবাবুর হাতে দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে সেই মোড়কটা আমার হাতে দিয়ে বললেন "আপনি ত কিছু করবেন না, টাকা পেলেই একে ওকে দিয়ে বসবেন। তাই বৌমার জন্য এই হারটা গড়িয়ে রেখেছিলাম। বাড়ী গিয়ে তাঁকে দেবেন।"

আমি ত অবাক্! মোড়ক খুলে দেখি একটা সোনার হার। আমি বললাম "এ কি করেছেন ?"

গুরুদাসবাবু হেসে বললেন "আপনার পাওনা তিন টাকা তের আনা ত বুঝে পেয়েছেন, এখন বাড়ী যান। এটা

আপনার বই বিক্রীর টাকা থেকেই আমি গড়িয়েছি।" এই আমার পূজনীয় অভিভাবক গুরুদাসবাবু!

আর একবার রাণাঘাটের ষ্টেসনের কাছে একটা বাগানওয়ালা পাকাবাড়ী খুব সস্তায় বিক্রী হচ্চে সংবাদ পেয়ে গুরুদাসবাবুর কাছে গিয়ে সেইটে কিনবার কথা বল্‌তে তিনি চেঁচিয়ে বল্‌লেন—"সে কিছুতেই হবে না। রাণাঘাটে বাড়ী কিনবেন? বিনা পয়সায় দিলেও আমি আপনাকে সেখানে যেতে দেব না; সেখানে যে ম্যালেরিয়া। তার থেকে এক কাজ করুন। দেশে গিয়ে গ্রামের বাইরে নদীর ধারে একটু জমি কিনে ছোটখাটো একটা বাড়ী করুন। যে টাকা লাগে আমি দেব। বই বিক্রীর টাকা থেকে শোধ না হ'লেও আমি বাকী টাকা চাইব না।" এই থেকেই আমি আমার গ্রামের বাইরে নদীর তীরে ছোট একটা বাড়ী করবার প্রেরণা পাই এবং গুরুদাসবাবুর জীবদ্দশাতেই সেই বাড়ীর অনেকটা তৈরী হ'য়েছিল। এ সংবাদ শুনে তাঁর যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা কেমন করে বর্ণনা করব।

এমন কত ঘটনার কথা এই বৃদ্ধের হৃদয়ে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। সে সব কথা আর বলা হোল না। আজ এতকাল পরে সেই দয়ালু, মহানুভব, পরদুঃখকাতর ব্রাহ্মণ-প্রবরের সামান্য স্মৃতি-তর্পণ করে কৃতার্থ হলাম, ধন্য হলাম, পবিত্র হলাম।

নিবারণের মৃত্যু

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

রেল লাইন থেকেই দেখা যায় কতকগুলি ছোট-বড় গাছের আড়ালে একখানি ভাঙা বাড়ী, সামনে ছোট্ট একটি ডোবা। বাড়ীর চারিদিকে ঘেঁটু, আশ-শ্যাওড়া আরও কত কিসের ঝোপ, ঝাড়, জঙ্গল। বাড়ীর ইট বেরিয়ে পড়েছে। নোনা-ধরা দেওয়াল স্থানে স্থানে এত ক্ষয়ে গেছে যে, কি ক'রে অমন বাড়ীতে মানুষ থাকে ভাবতে বিস্ময় লাগে। বাড়ীর চারিদিকের পাঁচীল মাঝে মাঝে ভেঙে গেছে। তার ফাঁক দিয়ে অন্দরের উঠোন পর্য্যন্ত দেখা যায়; খোয়া-ওঠা উঠোন; তার এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত যে তার ঝোলানো তাতে কয়েকখানা ছেঁড়া কাঁথা ভিজে কাপড় ঝুলছে। ওইতেই অন্দরের মর্য্যাদা রক্ষিত হচ্ছে।

ডোবার বাঁধাঘাটের অবস্থাও সমান শোচনীয়। অন্ধকারে পা না ভেঙে নামা অসম্ভব। কিন্তু ওদের এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে একটা ছোট ছেলেও চোখ বুজে নামতে পারে। এই ঘাটটিই এ পাড়ার খিড়কি। ছোট ছোট পানায় তার জল এমন নীল হয়ে গেছে যে ছুঁতেও ঘৃণা হয়।

সকাল বেলা। সবে সূর্য্য উঠেছে। একটি বৃদ্ধা বিধবা ঘাটের পৈঠায় বসে তামাকের গুল দিয়ে যে ক'টি দাঁত এখনও অবশিষ্ট আছে সেই ক'টি সযত্নে মার্জ্জিত করছিল। আর একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক মাথায় আধ-ঘোমটা টেনে ঘাটের অপর প্রান্তে ঘাড় হেঁট ক'রে নিঃশব্দে বাসন মাজছিল। চারিদিকে গাছের ঝিমিয়ে-আসা পাতায় কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। তারই বিষণ্ণ ছায়া পড়েছে ডোবার নিস্তরঙ্গ নীল জলে।

একটি বউ ভাঙা বাড়ী থেকে মন্থরপদে বেরিয়ে এসে ঘাটের মাথায় মুখ ঢেকে থমকে দাঁড়াল। কতই বা তার বয়স হবে? কুড়ি-একুশ, কি তারও কম। ছিপছিপে শরীর, কিন্তু তারও বাঁধন যেন আলগা হয়ে পড়েছে। গাছ থেকে লতার বাঁধন আলগা হয়ে গেলে লতার যে অবস্থা হয় তেমনি। যেন এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে। বউটি মুখ ঢেকে দাঁড়াল। ঘাটের এই দুটি মেয়ের কাছে মুখ দেখাতে তার ইচ্ছে করছে না। তার কচি ঘাসের মতো রঙের লাবণ্য যেন কোথায় উবে গেছে! কোমল ত্বকে কর্কশতা এসেছে। মুখে কলঙ্ক রেখা দেখা দিয়েছে। চোখে জল নেই বটে, কিন্তু লাল—রক্তের মতো লাল। আর তার ঘন পল্লবে বিশ্বের শ্রান্তির ছায়া এসেছে ঘনিয়ে। তারই ওপর মাথার রুক্ষ চুলগুলি বারে বারে উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। চোখের কোণে রাত্রি-জাগরণের কালিমা।

তরুবালা ঘাটের মাথায় থমকে দাঁড়াল। পরিচিত মানুষের সামনে তার পা যেন চলতে চাইছে না। কিন্তু তবু থমকে দাঁড়ালে তার চলবে না। দিনের সব কাজই তার বাকি। বুড়ী শাশুড়ীর কাল থেকে কোমর যেন ভেঙে গেছে। আর উঠতে পারছেন না। স্তিমিত দৃষ্টি চোখের জলে অন্ধ হবার উপক্রম। তবু কান্নার এখনই হয়েছে কি? বলতে গেলে এখনও তো সুরুই হয় নি! এখনও মানুষটির শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে, চোখ মেলে চাইছে, অতি কষ্টে দুয়েকটি কথাও বলছে এখনও। কিন্তু আর বোধ হয় বেশীক্ষণ নয়। হয় তো আজ দুপুরেই নিশ্বাস থেমে যাবে, চোখ মেলে চাওয়াও হবে শেষ। ডাক্তার মুখে কিছু বলেন নি বটে, কিন্তু তাঁর মুখ চোখ দেখে বুঝতে আর কারও বাকি নেই। হয়তো দুপুরেই, কিম্বা বড় জোর সন্ধ্যেয়। তার বেশী নয়। কান্নার সুরু হবে তখন। তখন থেকে সমস্ত জীবন-ভোর। সমস্ত জীবন-ভোর সমস্ত জীবন ভোর সমস্ত জীবন-ভোর

এর বেশী তরুবালা আর ভাবতে পারে না। একটি জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তারই সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বাকি জীবনগুলি সমানে চলতে থাকবে—এ যেন বিশ্বাস করার মতো কথা নয়। যাকে প্রত্যক্ষ দেখছি, যার অস্তিত্ব প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করছি, অকস্মাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তের পরে তাকে আর কোথাও দেখা যাবে না—একথা ভাবতে গেলেও মন হু হু করে, মাথা ঝিম ঝিম ক'রে ওঠে, অকস্মাৎ পৃথিবীর সঙ্গে যোগসূত্র ছিঁড়ে গিয়ে সমস্ত মন বিষাদ ঔদাসিন্যে পরিপূর্ণ হয়। জীবনের যেন আর কোনো মানেই থাকে না।

যে বৃদ্ধা পিছন ফিরে দন্তধাবন করছিল তরুবালাকে সে লক্ষ্য করে নি। তরুবালা তখন ঘাটের শেষ পৈঠায় পৌঁচেছে। যে মেয়েটি বাসন মাজছিল সে যেন তরুবালাকে দেখে সমীহ ক'রে একটু স'রে বসল। বৃদ্ধার দৃষ্টিও তার ওপর পড়তে সেও অপ্রয়োজনে একটু স'রে গেল। সবাই জানে আর কয়েক ঘণ্টা পরেই এই বধূটির দুঃখে বনের পাখীও কেঁদে উঠবে। আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র। এই অল্প সময়টুকু কেউ তাকে কোনো দুঃখ দিতে চায় না। এই ঘাটেই বাসন মাজা নিয়ে কত জনের সঙ্গে কত কলহই না হয়ে গেছে। ছোট ঘাট। তিন জন নামলেই চতুর্থ জনের আর পা ফেলবার জায়গা থাকে না। তাকে বাসনের গোছা হাতে ক'রে ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। কোথায় কে পৈঠার ওপর চিবোনো ডাঁটা ফেলে গেছে, কার পাতের ভাত ঘাটের কোণে জড় হয়ে আছে, ফেলে দিতে মনে নেই; কার এঁটো বাসনে কারও পা ঠেকেছে, এই অবেলায় নেয়ে মরতে হবে; কলহের কারণের কি অভাব আছে? কিন্তু সে সব আজ নয়, বিশেষ ক'রে এই বধূটির সঙ্গে কিছুতে নয়। ওর সিঁথির সিন্দুর এখনও জ্বল জ্বল করছে বটে, কিন্তু সে সিন্দুর চিহ্নের দিকে চাওয়া যায় না। সে যেন ওর সিঁথিকেই বিদ্রূপ করছে—মর্ম্মান্তিক বিদ্রূপ। যে সীমন্তিনীর সকল গৌরব আর কিছু পরেই পথের ধুলোয় মিলিয়ে যাবে তাকে প্রতিবেশিনীরা সকল গৌরব নিঃশেষ ক'রে আজকেই মিটিয়ে দিতে চায়। যাকে ক'দিন আগে তারা গ্রাহ্যই করেনি, আজ তাকেই দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে।

বউটি সসঙ্কোচে ঘাটে নামল।

—নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

বৃদ্ধা একবার গলাটা ঝেড়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে।

এ প্রশ্নের উত্তর দেবার কিছু নেই। নিবারণের অবস্থা কাল রাত থেকেই খুব খারাপ। ভালো লক্ষণ যা ছিল একটি একটি ক'রে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আশা করার মতো কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। বৌমা উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে মাথাটা নেড়ে ডান হাত দিয়ে ললাটের চুলগুলি সরিয়ে ফেললে। এই ক'দিনের রোগী-সেবায় আর দুর্ভাবনায় তার শরীর আধখানা হয়ে গেছে। শীর্ণ করপ্রকোষ্ঠে চুড়ি দু'গাছি ঢল ঢল করছে। ওই দু'গাছি সরু চুড়িই আজ তার সম্বল। চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহের পর তার গায়ের গহনা অবশেষে ওই দু'গাছিতেই এসে ঠেকেছে।

প্রতিবেশিনীরা সহানুভূতিসূচক দীর্ঘশ্বাস ফেললে। কাজ তাদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে চলে গেল।

ফাল্গুনের শেষ। জলে এখনও শীত রয়েছে বেশ।

এই ডোবার মাঝলে চারিদিকের উঁচু পাড় বাইরের পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে রাখে। অকস্মাৎ পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তরুবালা যেন বেঁচে গেল। মুমূর্ষু রোগীর অস্ফুট আর্ত্তনাদ, পাণ্ডুর চোখের কাতর দৃষ্টি, শিশুপুত্রের

কখনও দাপাদাপি কখনও চীৎকার, বৃদ্ধা শাশুড়ীর ভাষা-হীন বিহ্বল দৃষ্টি—জরা-মৃত্যু ব্যাধিগ্রস্ত বিপুল পৃথ্বী তার সমস্ত কুশ্রীতা নিয়ে এই গোষ্পদের সুগভীর নির্জ্জনতায় তলিয়ে গেল।

তরুবালা মুখ ধোবার জন্যে ঘাটে এসেছিল। তার এখনও অনেক কাজ। সমস্ত রাত ছট্‌ফট ক'রে এখন একটু নিস্তেজ হযে স্বামী তার ঝিমুচ্ছে। এখনই উঠবে বোধ হয। কাছে কেউ নেই। সমস্ত রাত্রি জেগে শাশুড়ী ওধবে এলিযে পড়েছে। ছেলেটা সকালে উঠে পূজোর রঙীন পাঞ্জাবীটা গাযে দেবার জন্যে বেজায় ঝোঁক ধরেছিল। সেটা বের ক'রে দিতেই সে ছুটতে ছুটতে পাড়ায় বেরিযে গেছে। স্বামীর কাছে কেউই নেই। রোগীর ঘুম, হয়তো এখনই উঠে পড়বে। তাকে ওষুধ দিতে হবে। একটুখানি বেদানার রস ক'রে খাওয়াতে হবে। গাযের ঢাকাটা খুলে গিযে থাকলে আবার ভালো ক'রে গাযে দিযে দিতে হবে। কত কাজ। ছেলেটা একটু পরেই ফিরবে। গয়লা দুধ দিযে গেছে, সেটুকু গরম ক'রে রাখতে হবে। নইলে ক্ষুধায় ছেলেটা কাঁদবে। কাল শাশুড়ীর একাদশী গেছে। তাঁর দ্বাদশীর ব্যবস্থা করতে হবে। আর নিজের জন্যে না হ'লেও ওদের দুজনের জন্যেও তো দুটো ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিতে হবে। মাত্র একটি মানুষেরই জীবনের তেল ফুরিযে এসেছে। পৃথিবীর গতি তো আর বন্ধ হয নি! যে যাবে সে যাবে, যারা থাকবে তাদের খেতেও হবে, খাটতেও হবে, সবই করতে হবে।

তরুবালার অনেক কাজ।

কিন্তু ডোবার ঠাণ্ডা জল তাকে লোভ দেখাচ্ছে। সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করছে। উনিশ-কুড়ি বছরের তরুবালা আর পারে না। সে আকণ্ঠ জলে ডুবিয়ে এই সুশীতল একাকিত্বে যেন মজে গেল। বাইরের পৃথিবীর কিছুই আর খেয়াল রইল না।

খেয়াল রইল না রুগ্ন স্বামীর মুখ, শাশুড়ীর একাদশী-পর্ব্ব, ক্ষুধার্ত্ত শিশুর কাতরতা, ঘর-কন্নার আরও সহস্রবিধ খুঁটিনাটি।

খেয়াল রইল না নিজের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী অসংখ্য দুঃখ-দারিদ্র্য ও জীবন সংগ্রামের দুর্ভাবনা: বুড়ী শাশুড়ী মরি-মরি ক'রেও আরও কতকাল বাঁচবেন কে জানে, কে জানে সে নিজেই কতকালের পরমায়ু নিয়ে এসেছে; ছোট ছেলে একদিন বড় হবে, তাকে মানুষ করতে হবে—কিন্তু সে পরের কথা পরে, আপাততঃ এই তিনটি প্রাণীর দৈনন্দিন দুবেলা দুটি গ্রাসের অন্ন কে জোগাবে সেই তো সমস্যা।

কিন্তু তরুবালা আর ভাবতে পারে না। গত পনেরো দিন ধ'রে সে কেবলই ভাবছে, কেবলই ভাবছে। ভেবে ভেবে তার দেহ-মন ভেঙে গেছে, মস্তিষ্কের ভাববার শক্তি লোপ পেয়েছে। একটু সে বিশ্রাম চায়। একটু বিস্মৃতি।

ডোবার নীল জল কন্‌কনে ঠাণ্ডা। উঁচু পাড়ের আড়ালে পৃথিবীতে চলেছে ভাঙা-গড়ার খেলা—অবিশ্রান্ত। ঝোপে ঝোপে ক'টি পাখী তুলেছে নিরবচ্ছিন্ন কূজন। তরুবালার সব ভুল হয়ে গেল।

তরুবালা ডোবার জলে গলা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে মুখ দিযে জল ছিটিযে ছিটিযে আপন মনে খেলা করতে লাগল।

নিবারণ মস্ত বড় লোক নয়। সে মারা গেলে তার নিজের নিভৃত কোণটি ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা যাবে না। না বেরুবে খবরের কাগজে ছবি, না লেখা হবে ইনিয়ে-বিনিয়ে সত্যি-মিথ্যে নানা রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি। এক যদি কোনো বড়লোকের মোটর চাপা প'ড়ে মরতে পারত, কিম্বা পুলিশের গুলিতে, তাহ'লেও হ'ত। কিন্তু সে মরছে নিতান্ত মামুলি ধরণে—দীর্ঘকাল ধ'রে রোগে ভুগে অস্থিচর্ম্মসার হযে—আরও কোটি কোটি লোক প্রত্যহ যেমনভাবে মরছে। এমন মৃত্যুর কেই বা খবর রাখার উৎসাহ বোধ করে! আর কি উৎসাহই বা বোধ করবে? কেউ কি তাকে চেনে? মানব-সভ্যতায় তার দান কি?

নিবারণ ক্যানভাসার। হাওড়া থেকে ব্যাণ্ডেল লাইনে-সে ট্রেণে ফেরী ক'রে বেড়ায়—জি, সি, দত্তের বিখ্যাত মিমের মাজনের, জয়পুরের মানসিং গুলির, নারকেল তেলের মসলার, সুগন্ধী ধূপকাঠির, আর মাথাধরা, মাথা ঘোরা, মাথা ঝন্‌ঝন্ কিম্বা কন্‌কন্ করার অব্যর্থ ও একমাত্র ঔষধ মাথালিনের।

নিবারণের বয়স পঁচিশ, ছাব্বিশ, সাতাশ, কি বড় জোর

আটাশ অর্থাৎ তাকে দেখে তার বয়স বলা শক্ত। নিবারণ সাধারণ বাঙালীর চেয়ে অন্তত চার ইঞ্চি বেঁটে, রোগা। দেহ তুলনায় গোঁফজোড়া যথেষ্ট বড়। আর জুলফি নামতে নামতে গালপাট্টায় এসে দাঁড়িয়েছে। গাল মাংসহীন। চোয়াল চওড়া, আর সামনের দিকে ঝুঁকে এসেছে। নাকের গোড়াটা চ্যাপ্‌টা, কিন্তু ডগাটা বর্তুলাকার। হাঁ-মুখ অসম্ভব রকম বড়, আর পুরু পুরু ঠোঁট। আর কণ্ঠ? নিবারণ পাশের গাড়ীতে কথা বললেও এ গাড়ী থেকে শোনা যায়।

লোকটি ওরই মধ্যে একটু সৌখীন। গায়ে থাকে একটি সিল্ক, নয়তো লংক্লথের পাঞ্জাবী। পরণের কাপড় ধোপ-দুরস্ত। হাতে রিষ্ট-ওয়াচ। মাথায় চুলে পরিপাটি টেরী। এর সঙ্গে মিলত না তার জুতো। সময়াভাবে জুতোয় কালিও দিতে পারত না, মেরামতও করাতে পারত না। আর সময়ের অভাব ঘটত ক্ষৌরকর্মে। ক্যানভাসারের রবিবারও নেই, দোল দুর্গোৎসবও নেই। সেই কারণে মুখমণ্ডল প্রায়ই শ্মশ্রুকণ্টকিত হয়ে থাকত।

ন'টায় সময় যা-হোক-দু'টি নাকে-মুখে দিয়ে তাকে বেরুতে হয়। এই যা-হোক-দু'টির ব্যবস্থা করতেই তরুবালাকে উঠতে হ'ত ভোর পাঁচটায়। নিবারণ একটু নিদ্রাবিলাসী। উঠতে তার সাড়ে সাতটা বেজে যেত। তাও কি সহজে? তরুবালা চা নিয়ে এসে কত সাধ্যসাধনা ক'রে তবে ওঠাত। চোখ বুজে বুজেই নিবারণ চাটুকু খেয়ে নিত। তারপরে একটু অবসাদ কাটলে উঠে তেল মেখে একেবারে দাঁতন করতে করতে নাইতে যেত—কি শীত, কি গ্রীষ্ম। স্নান ক'রে এসেই খেতে বসা, তারপরে ন'টা সাতের ট্রেণ ধরতে ষ্টেশনে দৌড়ান। যাওয়ার সময় তরুবালা হাসিমুখে দুটি পান দিত—প্রত্যহ, এর আর ব্যতিক্রম ছিল না। খোকা নিজের হাতে বাপের মুখে পান দুটি তুলে দিত। কোনো দিন প্রসাদ পেত, কোনো দিন পেত না।

তারপরে?

—জি, সি, বসুর বিখ্যাত নিমের মাজন চাই? মাজন? আপনারা অনেক দামী দিশী ও বিলাতী মাজন ব্যবহার করে দেখেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের নিমের মাজনও একবার ব্যবহার ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। মহাশয়গণ, এ মাজনে কোনো অদ্ভুত জিনিষ নেই। এ আমাদের দিশী গাছ-গাছড়ার তৈরী। এতে আছে আমলা, হরিতকী, বহেড়া···দাঁত নড়া, দাঁতে রক্তপড়া, দাঁতের গোড়া কন্‌কন্‌ করা, দাঁতের পোকা প্রভৃতি যাবতীয় দন্তরোগ একদিনেই আরোগ্য হবে। এ আমার বাজে কথা নয় মহাশয়গণ। যাঁদের দাঁত হল্‌হল্‌ ক'রে নড়ছে, কিম্বা মুখে এমন দুর্গন্ধ হয় যে কারও সামনে কথা বলতে সঙ্কোচ হয়, এমন যদি এখানে কেউ থাকেন, তাঁকে একবার আমাদের এই মাজন পরীক্ষা ক'রে দেখতে অনুরোধ করি। এক মাসের ব্যবহারযোগ্য এক কৌটার দাম মাত্র দু'পয়সা। এক সঙ্গে তিন কৌটা নিলে মাত্র পাঁচ পয়সায় পাবেন। মুখের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়ে চমৎকার সুগন্ধ হবে। যাঁর দরকার হবে চেয়ে নেবেন।···

মুখের দুর্গন্ধ এত লোকের মধ্যে স্বীকার করতে কেউ রাজি নয়। যাদের দাঁত হল্‌হল্‌ ক'রে নড়ে তারাও এই ট্রেণে, মুখ ধোবার জল নেই কিছু নেই, এমন মহৌষধ ব্যবহার ক'রে দেখতে সম্মত হয় না। তবু প্রয়োজন মতো কেউ কেনে, কেউ কেনে না।

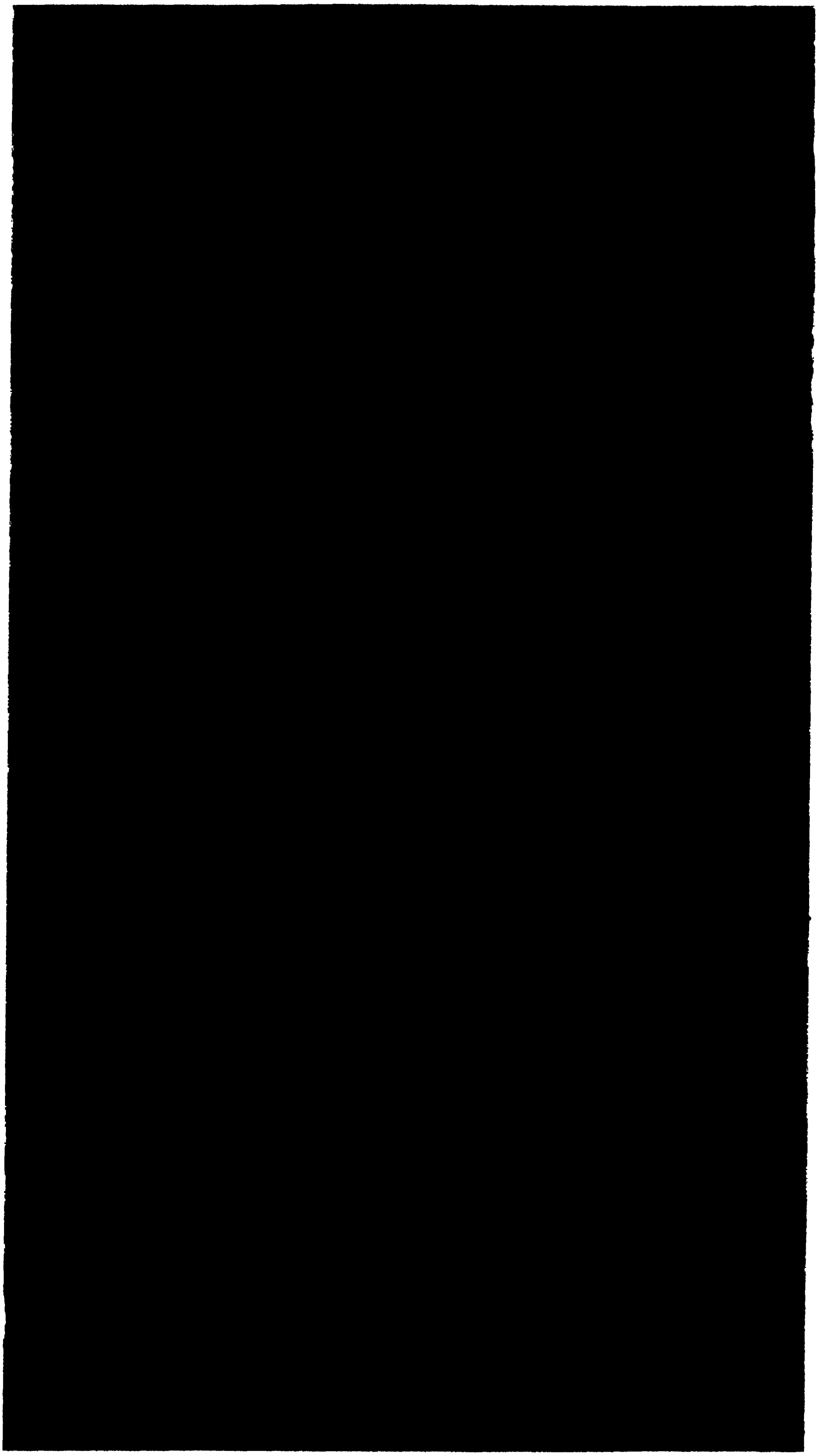
নিবারণ বিখ্যাত মাজন ব্যাগে পুরে আবার একটা নতুন জিনিস তুলে চীৎকার আরম্ভ করে;

—জয়পুরের মানসিং গুলি। চাই কারও? মহাশয়গণ, আমাদের নতুন আবিষ্কার সম্বন্ধে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি, একটু দয়া ক'রে শুনবেন।

হয়.তা কোনো ভদ্রলোক একটু ঝিমুচ্ছিলেন। চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বলেন, দয়া না ক'রেও শুনতে পাচ্ছি মশাই, একটু আস্তে বলবেন।

নিবারণ অপ্রস্তুত হয় না, হাসে। গলা একটুও না নামিয়ে ব'লে চলে—মুখস্থ বলার মতো:

—মহারাজা মানসিংহ এই গুলি ব্যবহার করতেন। হাসবেন না মহাশয়গণ, আপনাদের দেশে সব ছিল। কালের প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যাতে বিলিতি ওষুধের দোকানের ছাপমারা নেই, এখন আপনারা তার নাম শুনলেও হেসে উঠবেন। আমার মুখের কথায় আপনাদের বিশ্বাস হবে না মহাশয়গণ। কিন্তু পরীক্ষা ক'রে দেখতে দোষ কি? এতে স্মৃতিশক্তি বাড়ে, দেহের বল বাড়ে, কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, গলা-ধরা, ঢোক গিলতে কষ্ট হওয়া, টন্সিলের ব্যথা সমস্ত আরোগ্য হয়। মূল্য একশো গুলির শিশি মাত্র চার



মগ্না

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সূর্য্য রায়　　Bharatvarsha H. P. Works

আনা। আমার কাছে নমুনার ছোট শিশিও আছে। মূল্য চার পয়সা মাত্র। যাঁর আবশ্যক হবে চেয়ে নেবেন।

তারপরে নারকেল তেলের মসলা। তারপরে মাথলিন।

সবই পরের পর নিবারণ তোতাপাখীর মতো গড় গড় ক'রে বলে। যাদের ওষুধ, কি বলতে হবে তারা তা লিখে দিয়েছে। নিবারণ মুখস্থ ব'লে যায়। তার নিজের 'অবদান' মাঝে মাঝে 'মহাশয়গণ' কথা বসিয়ে দেওয়ায়।

ওর সাহিত্যিক কৃতিত্ব হচ্ছে সুগন্ধী ধূপের বেলায়। সেইজন্যে এইটে সে সব শেষে বলে :

—ধূপ চাই? মহীশূরের ধূপ? বাসর-মজান, রতিবিলাস ধূপ আছে।

সকলের দিকে চেয়ে আবার বলে :

—রতিবিলাসও বটে, আরতিবিলাসও বটে। যার যেমন প্রয়োজন হবে চেয়ে নেবেন।

'বাসর-মজান', 'রতিবিলাস'—আর তার সঙ্গে 'আরতি-বিলাস' এই তিনটে কথা তার নিজের আবিষ্কার এবং এই 'সাহিত্যিক প্রচেষ্টায়' সে বেশ গর্ব্ব অনুভব করে। আরও কয়েকজন ধূপ বিক্রি করে, কিন্তু তারা শুধু বলে মহীশূরের সুগন্ধী ধূপ। নিবারণের 'ট্রেড-মার্কা' যেন কেউ ব্যবহার না করে সেজন্যে তাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছে।

নিবারণ তার 'ট্রেড-মার্কের' ফল শ্রোতৃবৃন্দের ওপর কি রকম হ'ল—চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর বলে :

—যাঁরা অনেকদিন পরে বাড়ী যাচ্ছেন তাঁরা অন্তত এক প্যাকেট কিনে নিয়ে যান। দেখবেন সুগন্ধে ঘর মৌ মৌ করবে, 'মানুষের' মুখে হাসি ফুটবে, সুখে নিশি প্রভাত হবে, আর আমার ধূপের জয়জয়কার হবে। বাসর-মজান ধূপ। সুগন্ধে বাসররাত্রির কথা মনে পড়বে। নিয়ে যান। রতিবিলাস ধূপ, আরতি বিলাসও বটে—যাঁর যেমন দরকার। এক প্যাকেট মাত্র দু'পয়সা, পাঁচ পয়সায় তিন প্যাকেট। এক রাত্রেই দামের চতুর্গুণ উশুল হবে।

নিবারণ আত্মতৃপ্তির হাসি হাসে। তার সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলেই হোক, আর যে কারণেই হোক ধূপটা বিক্রি হয় বেশ, মানে অন্য জিনিষের চেয়ে বেশী।

প্রায়ই কামরায় দু'একজন পরিচিত লোক থাকেন। দু'বছর ধ'রে এই লাইনে সে ঘুরছে। মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে রসিকতা হয় :

—এই যে বাবুদাদা, এবার অনেকদিন পরে যে! ক'লকাতায় বাসা করেছেন? বেশ, বেশ। তা হোক, বাসর-মজান ধূপ দু' প্যাকেট নিয়ে যান। এত সস্তায় এ জিনিস আর কোথাও পেতে হয় না!

বাবুদাদার 'না' বলবার উপায় থাকে না। ততক্ষণে নিবারণ তাকে দু' প্যাকেট ধূপ গছিয়ে দিয়েছে।

বাবুদাদা কেবল একবার বলেন, দু'প্যাকেট নয়, এক প্যাকেট দিন।

কিন্তু কে কার কথা শোনে! নিবারণ হাসতে হাসতে বলে, এক প্যাকেটে কি হয়? ক'লকাতায় বাসা করেছেন, আবার কবে দেখা হবে···কি রকম! বড়বাবু নাকি? এই নিন আপনার সুবাসিত নারকেল তেলের মসলা। আজ শনিবার। জানি কি না, আপনি আজ আসবেনই। আমি এই দু'বছরের মধ্যে আপনাকে একটা শনিবারও বাদ দিতে দেখলাম না।

নিবারণ নিজের রসিকতায় নিজেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

—ক'প্যাকেট দোব? দু'টো? চারটে?

বড়বাবু তাড়াতাড়ি বললেন, না, না। আজ আর দরকার হবে না। সেদিন দুটো নিয়ে গেছি, তাই এখনও ফুরোয়নি।

নিবারণ বড়বাবুর হাতে দুটো প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে, এ সে প্যাকেট নয় বড়বাবু, আপনার জন্যে স্পেশাল তৈরী ক'রে রেখেছিলাম। বাড়ী নিয়ে যান, যিনি সমঝ্‌দার তিনি বুঝবেন।

নিবারণ হো হো ক'রে হাসলে।

প্রতি কামরাতেই এমনি দু'একন আছেই। কেউ দাদা, কেউ ভাই, কেউ বাবু। কিন্তু কারও নাম সে জানে না। তারও নাম কেউ জানে না। শুধু চেনার পরিচয়। নাম পাতিয়ে নিয়েছে নতুন ক'রে। তাতে উভয় পক্ষেরই কাজ চলে যায় নির্ব্বিঘ্নে। প্রতি দিনের লেন-দেনে কোনো অসুবিধা হয় না। সেই কারণে এর চেয়ে ভালো ক'রে চেনবার জন্যে কোনো পক্ষেরই কৌতূহল এর চেয়ে বেশী এগোয় নি।

নিবারণের পৃথিবী বলতে এই। ঘরে মা, স্ত্রী, একটা শিশুপুত্র—আর বাইরে এরা। তার নামের কারবার নেই। মা, মা। মায়ের নাম থাকে না। স্ত্রী, ওগো। আর শিশুপুত্রের নাম এখনও স্থির হয় নি। যে যা খুশী তাই ব'লে ডাকে। তাতেই শিশু সাড়া দেয়। আর বাইরে একদল নামহীন, অপরিচিত বন্ধু। এই নামের পৃথিবীতে তার কারবার একটু অদ্ভুত ধরণের। যত নামহীন লোক নিয়ে।

তার অসুখের খবর কেউ পেলে, কেউ পেলে না। কেউ জানলে, কেউ জানলেই না। কিন্তু সবাই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মনে মনে একবার বোধ হয় অনুভব করলে।

তরুবালা ঘাটে গলা ডুবিয়ে রয়েছে তো রয়েইছে।

ওর যেন জ্ঞান লোপ পেয়ে গেছে। কিছুরই আর খেয়াল নেই। ছোট মেয়ের মতো আপন মনে জল নিয়ে খেলাই করছে, খেলাই করছে। সময়ের হিসাব নেই।

ঘোষালগিন্নি ঘাটে এসে সশব্দে বাসন নামালেন। তরুবালার কানে এ শব্দ পৌছুলই না। তাকে অমন নিশ্চিন্তভাবে জলে গা ডুবিয়ে বসে থাকতে দেখে ঘোষালগিন্নি ভাবলেন, নিবারণ বোধ হয় ভালোই আছে।

জিজ্ঞাসা করলেন, নিবারণ কেমন আছে বৌমা?

নিবারণ? নিবারণ কে? তরুবালা অকস্মাৎ মানুষের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল। কিছুই যেন সে বুঝতে পারে নি এমনি ক'রে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

তার পরে বিস্মৃতির তিমির বিদীর্ণ ক'রে ধীরে ধীরে জেগে উঠল বাস্তব পৃথিবীর রূপ—যেখানে মায়ের চোখের সুমুখে মরে ছেলে, স্ত্রীর চোখের সুমুখে মরে স্বামী, ভায়ের চোখের সুমুখে মরে ভাই।

নিষ্ঠুর, কদর্য্য পৃথিবী।

তরুবালার চোখের পল্লবে আবার ঘনিয়ে এল বিষণ্ণ ছায়া, ঠোঁটে জাগল নিরতিশয় অসহায়তা, আর দুই চোখে ভ'রে উঠল অসীম শূন্যতা।

তরুবালা মাথায় ভালো ক'রে ঘোমটা দিয়ে ক্লান্তকণ্ঠে বললে, ভালো নেই খুড়ীমা।

সামনের মরা আমড়া গাছের শুকনো ডালে একটা কাক এমন ক'রে ডেকে উঠল যে, দু'জনেই ভয়ে ভাবনায় শিউরে উঠল।

সেদিন আর নয়, কিন্তু তার পরের দিন দুপুরের মধ্যে সব শেষ হয়ে গেল। সকালেই নাভিশ্বাস উঠেছিল। ঘোষালগিন্নি চটপটে মেয়ে। ব্যাপার বুঝে সকালেই নিবারণের ছেলেকে দুটো ভাতে-ভাত নিজের বাড়ীতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর জেদাজেদিতে তরুবালাকেও অমন অবস্থায় স্বামীকে ফেলে রেখে একবার থালার সামনে বসতে হয়েছিল, এক টুকরো মাছও মুখে দিতে হয়েছিল। এ নাকি প্রথা। প্রতিবেশীরা তাকে জোর ক'রে স্বামীর কাছ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে ঘোষাল বাড়ীর রান্নাঘরে বসিয়ে দিয়েছিল। কে একজন একটুকরো মাছও তার মুখে গুঁজে দেয়।

তখনই তরুবালা স্বামীর শিয়রে ফিরে আসে। কিন্তু নিবারণের কথা সকাল থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। এখন শুধু চোখের দেখা। চোখ মেলে স্বামীর শেষ যন্ত্রণা দেখা।

সেও অল্পক্ষণের জন্যে। দুপুরের মধ্যেই নিবারণ গেল। সন্ধ্যার মধ্যেই তার পার্থিব দেহের বিন্দুমাত্রও অবশিষ্ট রইল না।

নিবারণের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আর পাঁচজনের মতোই অতি সামান্য। ট্রেণের জনৈক সহযাত্রীর মুখে এই ঘটনা শুনেছিলাম। ঘটনাও আজকের নয়, অনেকদিন আগের। কিন্তু আমাদের ট্রেণ সেই পানাপুকুরের ধার দিয়ে চলবার সময় হঠাৎ মনে পড়ল নিবারণকে, অনেক দিন পরে।

এই গতির জগতে মানুষের বিশ্রামের অবসর নেই। নিবারণের মৃত্যুর পর এই পথ দিয়ে হাজার হাজার ট্রেণ এসেছে, গেছে। হাজার হাজার যাত্রী। এইখানে পানাপুকুরের সামনে এসে ক্বচিৎ কারও হয়তো তাকে মনে পড়েছে একটি মুহূর্ত্তের জন্যে। তেমনি ক'রে আমারও তাকে মনে পড়ল অনেক কাল পরে। ওই পানাপুকুরের অনেক পরিবর্ত্তনই নিশ্চয় তার পরে হয়েছে। কিন্তু দেখেদেখে তা আর চোখে পড়ে না। ওরই মধ্যে নিবারণের স্মৃতি একটুখানি কোথাও যেন বেঁচে আছে। ওদিকে চাইতেই এক মুহূর্ত্তের জন্যে তাকে একবার মনে পড়ল।

একবার মাত্র। তাও নিবারণের জন্যে নয়, বিশেষ কোনো একজন লোকের জন্যেও নয়। একবার শুধু মনে হ'ল, *যাদের চিনতাম তাদের মধ্যে কত মানুষই নেই।* চকিতে সমস্ত মন কেমন উদাস হ'য়ে গেল।

ট্রেণ চলেছে ঝড়ের বেগে।

শ্রীরামপুর···শ্রীরামপুর···

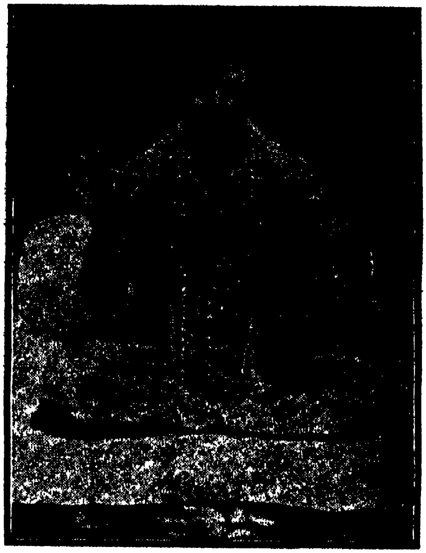
নতুন ষ্টেশন। সে পানাপুকুরের চিহ্নমাত্র নেই। আবার নতুন জগৎ, নতুন আবেষ্টনী। পাঁচ মিনিট আগের মন পাঁচ মিনিট পিছিয়ে পড়ল। তারও হ'ল মৃত্যু। আর তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কাশীধামে রামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী

গত শিবরাত্রি হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ একপক্ষকাল মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, শোভাযাত্রা, সর্ব্বধর্ম্মসম্মেলনাদি হইয়া কাশীধামে শ্রীরামকৃষ্ণ শতাব্দী জয়ন্তী সুসম্পন্ন হইল। মহা-রাষ্ট্রীয় বৈদিক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক রুদ্রযাগ, বিষ্ণুযাগ ও সপ্তশতী হোম যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া, বাস্তুযাগের পর চতুর্থ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিতে শ্রীরামকৃষ্ণমঠের ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী কর্ত্তৃক নবনির্ম্মিত



শ্রীমৎ স্বামী নরসিংহ গিরিজী মণ্ডলেশ্বর



শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরিজী মণ্ডলেশ্বর



শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরিজী মণ্ডলেশ্বর



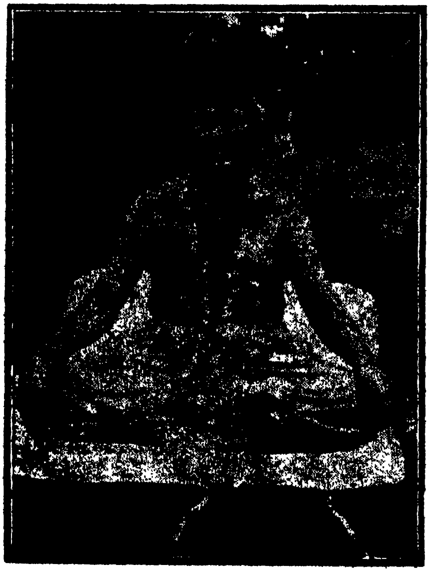
শ্রীমৎ স্বামী ভাগবতানন্দ গিরিজী মণ্ডলেশ্বর

সুদৃশ্য প্রস্তর মন্দিরের দ্বার উন্মোচিত হয়। মর্ম্মর বেদীর উপরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একটি মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়া



শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী মণ্ডলেশ্বর

অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা অধিকতর সমারোহে জন্মতিথিকৃত্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। ইহার পরদিবসে মহামহোপাধ্যায়

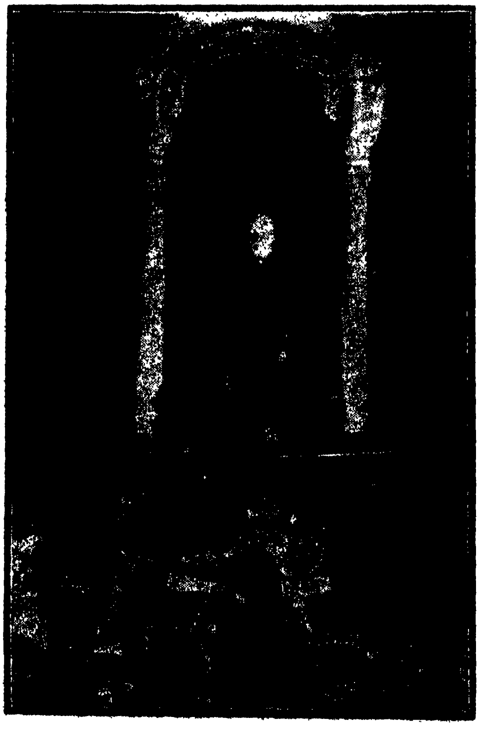


শ্রীমৎ স্বামী জয়েন্দ্র পুরীজী মণ্ডলেশ্বর

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় সমাগত বহু নরনারীর সমক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া-



সাধু ভোজন (সমষ্টি-ভাণ্ডারা)



কাশী রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রমে নবনির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্ত্তি

ছিলেন। ষষ্ঠ দিনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি বৃহৎ প্রতিকৃতি সুসজ্জিত হস্তীর উপর স্থাপন করিয়া এক বিরাট্ শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল; তাহাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মুকুটমণি মণ্ডলেশ্বরগণ এবং পরমহংস ও নাগা সন্ন্যাসীরা যোগ দিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শোভাযাত্রা সচরাচর দেখা যায় না। সপ্তম দিনে প্রায় দুই সহস্র সাধু, পাঁচ শত ব্রাহ্মণ ও চারি শত দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইয়াছিল। সেবা-ধর্ম্মের মাহাত্ম্যে চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন আখড়ার নাগা-সন্ন্যাসীরা এক স্থানে আহারাদি করিয়াছিলেন।

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিনের সভা কাশীনরেশ-শিবালয়ে হয় এবং মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দগিরিজী সভাপতিত্ব করেন। বাকি পাঁচ দিন শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সভার অধিবেশন হইয়াছিল এবং হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্সিপল্ শ্রীযুক্ত ধ্রুব, মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী জয়েন্দ্র পুরীজী, মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী নরসিংহগিরিজী, মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী ভাগবতানন্দগিরিজী ও মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দগিরিজী যথাক্রমে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ভক্তগণের মধ্যে গীতা প্রচারক স্বামী বিদ্যানন্দজী, স্বামী সর্ব্বানন্দজী, মহা-



কাশীতে রামকৃষ্ণ শতবার্ষিক উৎসবের মিছিল

তৎপরে অষ্টম দিবস অর্থাৎ ২৮শে ফেব্রুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ এক সপ্তাহকাল ধর্ম্ম-সম্মেলন চলিয়াছিল এবং তাহাতে মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রতিনিধিগণ যোগ দিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যাখ্যা করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উদার মতবাদ এবং শিবজ্ঞানে জীব-সেবার প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্রথম দিনে সভা টাউন-হলে হয় এবং মণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী

মহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্রের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দগিরিজী বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শঙ্করাচার্য্যের তুল্য অবতারপুরুষ বলা যায়। শ্রীমৎ স্বামী জয়েন্দ্রপুরীজী বলেন যে শঙ্করাচার্য্যের পর এরূপ ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন শক্তিমান মহাপুরুষ এদেশে আর আসেন

নাই। শ্রীমৎ স্বামী ভাগবতানন্দজী ও স্বামী কৃষ্ণানন্দজী উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যুগাবতার বলিয়া বর্ণনা করতঃ বেদাদি শাস্ত্রের সাহায্যে তৎপ্রচারিত সমন্বয়-ধর্ম্মের মহিমা বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করেন। স্বামী ভাগবতানন্দজী আরও বলেন—"যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই রামকৃষ্ণ; সুতরাং 'রামকৃষ্ণ' শব্দটি 'রাম' ও 'কৃষ্ণ' এই দুই শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস নিষ্পন্ন নহে—উহা ঐ দুই শব্দের অভেদে কর্ম্মধারয় সমাসে নিষ্পন্ন।" স্বামী কৃষ্ণানন্দজী আরও বলেন যে পরমহংসদেব উচ্চকোটির পরমহংস ছিলেন, সেইজন্য হংস যেরূপ ক্ষীর ও নীরের বিবেক করে, সেইরূপ তিনিও সত্য ও মিথ্যার বিবেক করিয়া জগতের কল্যাণে 'বিবেকানন্দের' সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

মহামহোপাধ্যায় তর্কভূষণ মহাশয় বলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের লোকস্থিতিকর আদর্শ জীবন এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-মাধুর্য্যের যুগপৎ মিলন ঘটিয়াছে। অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্র বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয় কেবল বিভিন্ন ধর্ম্মের সারমর্ম্ম একত্র গ্রথিত করিয়া বুদ্ধীকৃত সমন্বয় নহে; পরন্তু বিভিন্ন ধর্ম্মের প্রত্যেক অঙ্গ যথারীতি অনুষ্ঠান করিয়া একই সত্যোপলব্ধি। স্বামী সর্ব্বানন্দজী—সনাতন ধর্ম্ম তথা শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও উপলব্ধি যে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—তাহাই ব্যাখ্যা করিয়া প্রতিপন্ন করেন। প্রায় সকল বক্তাই শ্রীরামকৃষ্ণপ্রচারিত সমন্বয় ও সেবাধর্ম্মের যুগোপযোগিতা কীর্ত্তন করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী দুই দিবসে 'নিমাই-সন্ন্যাস' কীর্ত্তন ও কালীকীর্ত্তন হইয়া ঐ উৎসব সম্পূর্ণ হইয়াছে।

বাঙ্গালার শাসন-বিবরণ

বাঙ্গালা সরকারের ১৯৩৪-৩৫ খৃষ্টাব্দের বার্ষিক কার্য্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি বৎসরই এইরূপ কার্য্য-বিবরণ প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং এক বৎসরে প্রদেশের অবস্থাব্যবস্থা ও সরকার প্রজার মঙ্গলের জন্য যে সকল কার্য্য করিয়া থাকেন তাহার বিস্তারিত বিবরণ এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়। আমরা সরকারের এই কার্য্যবিবরণ হইতে কতকগুলি বিভাগের কার্য্যের হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, যে সরকার আলোচ্য বর্ষে প্রজাসাধারণের জন্য যে কার্য্য করিয়াছেন প্রজাদিগের অভাবের তুলনায় তাহা সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য তুল্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের পর হইতে বাঙ্গালার শাসন পরিষদে জনগণের নির্ব্বাচিত তিনজন ব্যক্তিকে মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু তাঁহারাও সাধারণে যাঁহাদের মন্ত্রিত্ব কামনা করেন সে দলের লোক নহেন। কিন্তু মন্ত্রীদিগকে যে "ষ্টিলফ্রেমে"র মধ্য দিয়া কাজ করিতে হয়, তাহাতে তাঁহাদিগের পক্ষে প্রজাহিতকর কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা সহজসাধ্য হয় না। কারণ কাজের জন্য ব্যয় বরাদ্দ করা তাঁহাদিগের ক্ষমতাতীত।

আলোচ্য বর্ষে বাঙ্গলা সরকার বাঙ্গালায় পথ নির্ম্মাণ ও পথ সংস্কার বাবদে মোট ২৪ লক্ষ ২০ হাজার ৬ শত ৩১ টাকা ব্যয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভারত সরকার ঐ কার্য্যের জন্য বাঙ্গালা সরকারকে ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১৭ টাকা দান করিয়াছিলেন। ঐ অর্থব্যয়ের ফলে পূর্ব্ব বৎসরে বাঙ্গালায় যে ৩ হাজার ৬ শত ১২ মাইল পাকা রাস্তা ছিল, তাহার স্থানে এ বৎসর ৩ হাজার ৬ শত ৪২ মাইল পাকা রাস্তা হইয়াছে। কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ও বর্দ্ধিত হইয়া ৪৮ হাজার ৮ শত ৮ মাইলের স্থানে ৫৩ হাজার ৯ শত ৩০ মাইল হইয়াছে। উহার মধ্যে ২ হাজার ৬ শত ৪৮ মাইল পাকা রাস্তা ও ৫৩ হাজার ২ শত ৩৫ মাইল কাঁচা রাস্তা জিলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের দ্বারা প্রস্তুত বা মেরামত করা হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে বর্ত্তমানে ১০৭টি মিউনিসিপালিটী আছে; তাহারা কত মাইল পাকা বা কাঁচা রাস্তা প্রস্তুত, মেরামত বা রক্ষা করে, তাহার কোন হিসাব এই বিবরণে পাওয়া যায় না। উপরের হিসাব হইতে দেখা যায়, জিলা বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের কাজ বাদ দিলে বাঙ্গালা-সরকার বাঙ্গালা দেশে নূতন পথ নির্ম্মাণ বা পুরাতন পথ মেরামতের জন্য প্রায় কিছুই করেন না। কেবল হিসাব প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থার কোন ত্রুটি নাই। অথচ এই পথ নির্ম্মাণের জন্য পেট্রলের মূল্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

তাহার পর সেচের কথা। বাঙ্গালা দেশ যে এককালে স্বর্ণপ্রসূ ছিল, তাহার প্রধানতম কারণ, বাঙ্গালায় যেরূপ সুন্দর সেচের ব্যবস্থা ছিল, সেরূপ আর কোথাও ছিল না বলিলেও বলা যায়। কিন্তু গত শতাধিক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালায় সেচের ব্যবস্থা দিন দিন নষ্ট হইয়া যাইতেছে এবং তাহার ফলে একদিকে যেমন কৃষিজাতদ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যাইতেছে, অন্যদিকে তেমনই দেশে নানারূপ রোগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছে। সার উইলিয়ম উইলকক্স ভারতে জন্মগ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করেন। সেচ বিভাগে তাঁহার অদ্ভুত দক্ষতা দর্শনে তাঁহাকে মিশর সরকার মিশর দেশে সেচের ব্যবস্থার উন্নতিসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে মিশরের মরুভূমিও স্বর্ণপ্রসূ হইয়া উঠিয়াছে। সার উইলিয়ম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে সেচ ব্যবস্থা সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতায় বাঙ্গালায় সেচের বিষয়ে যে সকল

মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সরকার যে সকল কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক তাহাতে কর্ণপাত পর্য্যন্ত করেন নাই। সকলেই জানেন, নদীয়া, যশোহর ও মুর্শিদাবাদের বহুতা নদীগুলি একে একে মজিয়া যাওয়ায় উক্ত জিলাত্রয় ক্রমে জনহীন হইয়া পড়িয়াছে। ঐ জিলাত্রয়ের হাজা-মজা নদীগুলির সংস্কারের জন্য রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার প্রমুখ একদল কর্ম্মী সরকারের নিকট বহু আবেদন নিবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। ইহাই সরকারের সেচ বিভাগের প্রকৃত অবস্থা। যাহা হউক, সেচবিভাগ আলোচ্য বর্ষে জনসাধারণের জন্য যে সামান্য পরিমাণ কাজও করিয়াছেন, আমরা নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম:—১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে দামোদরের যে সেচের খাল নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল তাহার দ্বারা বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলায় প্রায় ৬ লক্ষ বিঘা অনুর্ব্বর জমীতে ফসল উৎপন্ন হইবে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ঐ খাল হইতে প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার বিঘা জমীতে জল সরবরাহ করা হইয়াছে, তাহার ফলে ঐ অঞ্চলে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। যে জমী খালের জল লইয়াছে, তাহার প্রতি বিঘাতে ১৬।১৭ মণ ধান হইয়াছে—আর যে জমী খালের জল লয় নাই সে সকলের কোনটির এক বিঘাতেই ৫ মণের অধিক ধান উৎপন্ন হয় নাই। বাঁকুড়া জিলায় বক্রেশ্বরের যে সেচের খাল ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহার দ্বারাও প্রায় ৩০ হাজার বিঘা জমীতে জল প্রদান করা চলিবে।

উপরোক্ত দুইটি খালের দ্বারা যে বহু লোক উপকৃত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই; কিন্তু আমাদিগের প্রয়োজনের তুলনায় এ বিষয়ে কৃত কার্য্য কিছুতেই পর্য্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যশোহর, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদের হাজা-মজা নদীগুলির সংস্কারে যদি সরকার মনোযোগী হয়েন, তাহা হইলে কেবল যে দেশের লোক উপকৃত হয় তাহা নহে, সরকারের রাজস্ব এবং অন্য নানাবিভাগের আয়ও বর্দ্ধিত হইতে পারে।

সরকার বাঙ্গালায় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, তাহাও কখনই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয় না। এই শিক্ষা বিভাগে সরকার যে অর্থ ব্যয় করেন, তাহার অধিকাংশ প্রকৃত শিক্ষার জন্য ব্যয়িত না হইয়া বিভাগের কর্ম্মকর্ত্তা প্রকৃতির বেতন দিতে ব্যয়িত হইয়া থাকে। এ দেশের শাসন ব্যবস্থার উহাই প্রধান দোষ—উপরের দিকে মোটা মোটা বেতনে যেভাবে কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়, তাহার ফলে নিম্নদিকে ব্যয়ের জন্য অর্থের অভাব হয়। একটি উদাহরণের দ্বারা আমরা বিষয়টি বুঝাইয়া দিব। বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষা বিভাগ পরিচালনার জন্য এক জন ডিরেক্টার আছেন; পূর্ব্বে এক জন সহকারী ডিরেক্টারের দ্বারাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত—বর্ত্তমানে একাধিক সহকারী ডিরেক্টার নিযুক্ত করা হইয়াছে এবং তাহার উপর প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনার জন্য একজন "বিশেষ কর্ম্মচারী" নিযুক্ত করা হইয়াছে—এই বিশেষ কর্ম্মচারীর বেতন মাসিক হাজার টাকার কম নহে—অথচ ইনি যে কি কার্য্য করেন, তাহা সাধারণে জানিতে পারে না। ফলে দরিদ্র শিক্ষকগণের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা হয়, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করার জন্য গভর্ণমেণ্ট যখন গুরু ট্রেনিং পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করেন, তখন স্থির হয় যে, উক্ত ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণ স্কুলের প্রদত্ত বেতন ব্যতীত সরকারের নিকট হইতে মাসিক ৬ টাকা করিয়া বৃত্তি লাভ করিবেন। মফঃস্বলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ স্কুল হইতে মাসিক ২, ৩ বা ৪ টাকার অধিক বেতন পায়েন না। তাঁহাদিগকে ঐরূপ বৃত্তি দানের ব্যবস্থা হইলে তাঁহারা অনন্যকর্ম্মা হইয়া স্কুলের কাজে মন দিতে পারিতেন। কিন্তু কয় বৎসর গুরু ট্রেনিং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষকগণকে মাসিক ৬ টাকা বৃত্তি দানের পর সরকার এখন তাহা কমাইয়া মাসিক ২ টাকায় পরিণত করিয়াছেন। যে শিক্ষাবিভাগে উচ্চপদে কর্ম্মচারী নিয়োগের সময় গভর্ণমেণ্টের অর্থাভাব হয় না সেই বিভাগেই দরিদ্র শিক্ষকগণের বৃত্তির জন্য অর্থাভাব দেখা যাইতেছে।

যাহা হউক, গভর্ণমেণ্ট আলোচ্য বৎসরে (১৯৩৪-৩৫) শিক্ষা বিভাগের কার্য্যের নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। বাঙ্গালা দেশে হাই স্কুলের সংখ্যা ২৪টি কমিয়া যাইলেও হাইস্কুলগামী ছাত্রের সংখ্যা ১৭,৯০৬টি বাড়িয়াছিল। হাই স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রের জন্য সরকার বার্ষিক ৩৩ টাকা এবং প্রত্যেক হাই স্কুলের জন্য বার্ষিক ৪,৯৭২ টাকা ব্যয় করিয়াছেন; ১৯৩৫ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে বাঙ্গালা দেশে দেশীয় ছাত্রদের জন্য ৪৫,৫৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল এবং ঐ বিদ্যালয়সমূহে মোট ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার ৯ শত ৭৭ জন (ইহার মধ্যে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬ শত ৩৭ জন বালিকা) ছাত্র ছিল। তদ্ভিন্ন হাইস্কুলসমূহের প্রাথমিক বিভাগেও ২ লক্ষ ১২ হাজার ১ শত ২ জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে যে নূতন প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবার জন্য সরকার মৈমনসিংহ, চট্টগ্রাম, পাবনা, দিনাজপুর, নোয়াখালি, বগুড়া, বীরভূম, ঢাকা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ জিলায় "জেলা স্কুল বোর্ড" গঠন করিয়াছেন এবং যাহাতে দেশে অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় সে জন্য বোর্ডের সদস্যগণকে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে বলা হইয়াছে।

দেশে যে বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে তাহার প্রতীকারের জন্য শিক্ষা বিভাগ প্রকৃতপক্ষে কিছুই করেন নাই। সরকার কোনরূপে কয়টি এঞ্জিনিয়ারিং, কমার্সিয়াল ও আর্ট স্কুল চালাইয়া থাকেন। দেশের বেকার যুবকদিগকে অন্নসংস্থানের উপায় শিক্ষা দিবার পক্ষে সেগুলি আদৌ পর্য্যাপ্ত নহে। যে দেশের শতকরা ৭০ জন অধিবাসী পল্লীগ্রামে বাস করিয়া কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবনধারণ করে, সে দেশে কৃষি শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই—ইহা অপেক্ষা আমাদের দুর্ভাগ্যের পরিচয় আর কি হইতে পারে? সরকারের শিল্প বিভাগ যে গত কয় বৎসর যাবৎ কিছু কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন—যে কার্য্যের পরিমাণ যত অল্পই হউক না কেন—তাহা প্রশংসার বিষয়। আলোচ্য বর্ষে ও তৎপূর্ব্ববর্ষে ২৮ দল শিক্ষক বাঙ্গালা দেশের নানা গ্রামে ঘুরিয়া বেকার লোকদিগকে কুটীর শিল্পে শিক্ষা দান করিয়াছেন। ফলে বহু মধ্যবিত্ত

পরিবারের যুবক পিতল ও কাঁসার বাসন, মাটির পুতুল, খেলনা প্রভৃতি, ছাতা ছুরি ও কাঁচি প্রস্তুত, সাবান ও জুতার কাজ, পাট ও পশমের দ্রব্য-প্রস্তুত প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া তদ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেছে। দেশে যে সকল কুটীর শিল্প মৃতপ্রায় অবস্থায় আছে, সেগুলির বিবরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করিবার ব্যবস্থা স্থির করিতে সরকার দুইজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন নোয়াখালি জিলার বিবরণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং অপর এক জন নদীয়া জিলার বিবরণ সংগ্রহ করিতেছেন। বাঙ্গালার রেশম শিল্প যাহাতে লোপ না পায়, সে জন্যও সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। তবে জাপানী রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় শেষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার রেশমের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন।

বাঙ্গালা দেশে নারিকেল গাছের অভাব নাই, কিন্তু বাঙ্গালায় এত নারিকেল হওয়া সত্ত্বেও বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল দড়ি এদেশে আমদানী হইয়া থাকে। বাঙ্গালার নারিকেলের ছোবড়া হইতে যাহাতে এদেশে দড়ি ও গদি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হয়, সে জন্য গভর্ণমেণ্ট কয়েকদল যুবককে শিক্ষা দান করিয়াছেন।

এক বৎসরে কত টাকার দ্রব্য বাঙ্গালা প্রদেশে আমদানী বা রপ্তানী হয়, তাহার একটি হিসাব হইতে বুঝিতে পারা যাইবে, আমরা কতকগুলি বিষয়ে কিরূপ পরমুখাপেক্ষী। নিম্নে মাত্র কয়টি জিনিসের বার্ষিক আমদানীর হিসাব প্রদত্ত হইল—

কাপড় প্রভৃতি কার্পাসপণ্য—	৬ কোটি ১৪ লক্ষ ৩৭ হাজার ২ শত ১৯ টাকা
লোহালক্কড়—	৯২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭ শত ৮৪ টাকা
মোটর গাড়ী—	৭৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮ শত ৬৯ টাকা
পশমের বস্ত্রাদি—	৭৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩ শত ৭৩ টাকা
ঔষধ—	৬১ লক্ষ ৫ হাজার ৭ শত ২৬ টাকা
কাচের দ্রব্য—	৩৭ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭ শত ২ টাকা
লবণ—	৩৫ লক্ষ ৫০ হাজার ৯ শত ১ টাকা
চিনি—	২৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৬ শত ১৪ টাকা
সাবান—	১২ লক্ষ ৬ হাজার ৪ শত ০৪ টাকা

ইহার মধ্যে কতকগুলি জিনিষ আমরা সামান্য চেষ্টা করিলেই বাঙ্গালায় উৎপাদন করিতে পারি। যে দেশে প্রচুর খেজুর ও আখের গুড় উৎপন্ন হয় সে দেশে বিদেশ ও অন্যপ্রদেশ হইতে কেন যে অনেক টাকার চিনি আমদানী করিতে হয়, তাহা বুঝা কঠিন। বাঙ্গালা দেশে ঔষধের উপকরণেরও অভাব নাই—তথাপি আমাদিগকে বিলাতের ঔষধের প্রতি অহৈতুক মোহের জন্যই কি এত অধিক টাকার বিলাতী ঔষধ আমদানী করিতে হইয়া থাকে?

সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কথা বলা হয় নাই। এই বিভাগের জন্যও সরকার প্রতি বৎসর অর্থব্যয় করিয়া থাকেন। দেশে শিক্ষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম, মৃত্যু ও বিভিন্ন রোগ প্রভৃতির সম্বন্ধে কতকটা সঠিক হিসাব প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু যে সকল ব্যাধি সরকারের চেষ্টার ফলে বন্ধ হইতে পারিত, সেগুলি এখনও বন্ধ হয় নাই। আমরা সেচের কথা আলোচনার সময় বাঙ্গালা দেশে স্বাস্থ্যহানির (ম্যালেরিয়ার প্রকোপের) কথা বলিয়াছি। এক ম্যালেরিয়ার জন্যই যে বাঙ্গালার অধিকাংশ গ্রামই আজ হতশ্রী হইয়া বাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়াছে, তাহা না বলাই শ্রেয়। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়াতেই গত ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালায় ৪,১৩,৯২২ জন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৩,৮৭,১৯১ জন লোক মারা গিয়াছে। পানামায় ও মিশরে স্বাস্থ্য বিভাগের চেষ্টায় ম্যালেরিয়া একেবারে দূরীভূত করা হইয়াছে—কিন্তু বাঙ্গালার সরকার কেবল কুইনাইন বিতরণ ছাড়া ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাইবার জন্য অপর কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কুইনাইন বিতরণও প্রয়োজনানুরূপ নহে।

কলেরায় ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৯,২৪২ জন ও ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৫০,৭৪২ জনের মৃত্যু হইয়াছে। কলেরা নিবারণের জন্য সরকার এখন টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন—গত দুই বৎসরে যথাক্রমে ১০,৩৬,৬৪৩ এবং ২১,৬২৬৯ জনকে কলেরা-নিবারক টীকা দেওয়া হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা ১,৮৪,৮৮৪টি কূপ, ৫০,৭৮৪টি পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা তাহার জল "ব্যবহারের যোগ্য" করিয়া দিয়াছিলেন। বসন্ত রোগেও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৫,৪২৬ জন এবং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮,২৯৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার কোথাও বসন্তের প্রকোপ দেখা যায় নাই—সেই জন্য মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইয়াছে। বসন্তের জন্য এখন সর্ব্বত্র টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

স্বাস্থ্য বিভাগ বাঙ্গালার সহরগুলিতে পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য এবং ময়লা জল নিকাশের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। আলোচ্য বর্ষে (১৯৩৪-৩৫) আসানসোল, নবদ্বীপ, হুগলী-চুঁচড়া, বরাহনগর ও হালিসহরে জল সরবরাহ ব্যবস্থার খসড়া প্রস্তুত হইয়াছে। নারায়ণগঞ্জ, শ্রীরামপুর ও বর্দ্ধমানে জল সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নততর করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন বহু ছোট ছোট সহরের ময়লা জল নিকাশ সমস্যা এখন এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে যে সরকারকে বাধ্য হইয়া সেই সকল স্থানের অধিবাসী-দিগকে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ হইতে বাঁচাইবার জন্য কোন না কোন ব্যবস্থা করিতেই হইবে। বহু মিউনিসিপালিটীর জল-নিকাশ-ব্যবস্থা এখন সরকারের বিচারাধীন। উপযুক্ত পানীয় জল প্রদান এবং ময়লা জল নিকাশ করিতে পারিলে রোগের প্রকোপ অবশ্যই কমিয়া যাইবে।

সরকারের বার্ষিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করিলে একদিকে যেমন তাঁহাদিগের কার্য্যের তালিকা পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই দেশের লোকের অভাবঅভিযোগ ও দুঃখদুর্দ্দশার পরিমাণ বুঝিতে পারিয়া দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গল বিষয়ে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। নূতন শাসন-সংস্কারের ফলে বহু কার্য্যের ভার জনগণের প্রতিনিধি মন্ত্রীদিগের করতলগত হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে কি না, তাহাই এখন চিন্তার বিষয়।

মৌর্য্য শিল্পকলা

শ্রীঅচ্যুতকুমার মিত্র

হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষসমূহে যে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে ভারতীয় চারুশিল্পের ইতিহাসে নূতন আলোক পাওয়া গেল। এই সভ্যতা শুধু পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল অথবা গঙ্গাযমুনার উপত্যকা পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা কেবল প্রাচীন ধ্বংসাবশেষগুলির অনুসন্ধান এবং খননেই প্রমাণ হইতে পারিবে। তবে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য তাম্রের ব্যবহার যে উক্ত প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা হইতে মধ্যদেশে সঞ্চারিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। গঙ্গাযমুনার সমীপবর্ত্তী প্রদেশ ভাগে যে সকল তাম্রাস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে তরবারি এবং বর্ষাফলকের মত অস্ত্রগুলি পাঞ্জাব এবং সিন্ধুপ্রদেশে পাওয়া যায় নাই। ইহাতে মনে হয় হারাপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সহিত মধ্যদেশের সভ্যতার অন্তত কতক কতক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। মির্জ্জাপুরের গিরিগাত্রে যে সকল হস্তী, অশ্ব এবং গণ্ডার শিকারের চিত্র অঙ্কিত আছে তাহাও প্রাগৈতিহাসিক। সে দিন পাটনার ডাঃ ব্যানার্জ্জীশাস্ত্রীর বক্সার খননের ফলে যে সকল মৃণ্ময় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলিও সম্ভবতঃ খুবই প্রাচীন। দুঃখের বিষয় উক্ত খননের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণের অভাবে বক্সারের আবিষ্কার সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

ধারাবাহিক ইতিহাস

গত দশ বৎসর ধরিয়া যে সকল নব নব আবিষ্কার ঘটিয়াছে, তৎসত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত ভারতীয় ললিতকলার ইতিহাস আজিও গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। মৌর্য্য শিল্পকলার যে কয়টি নিদর্শন আজিও ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান আছে এবং যে গুলি ভগ্নাবস্থায় তক্ষশীলা, সারনাথ, সাঁচী এবং পাটলিপুত্রে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতেই ভারতীয় চারুশিল্পের ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত।

মৌর্য্যশিল্পের বৈশিষ্ট্য

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মৌর্য্যশিল্পে রূপাভিব্যক্তির স্তরবিন্যাস থাকিলেও প্রথম হইতেই তাহা সুপরিণত। যে দিন শিল্পীর হস্ত তাহাকে প্রথম প্রস্তরে রূপ দিল, তখনই তাহা "যৌবনে গঠিত, পূর্ণ-প্রস্ফুটিত।" শুধু তাহাই নহে; খোদন-পদ্ধতি, পরিকল্পনা এবং রেখাসমাবেশে কোন কোন মৌর্য্য শিল্পকীর্ত্তি ভারতীয় ললিতকলার ইতিহাসে চিরদিন অতুলনীয় রহিয়া গিয়াছে।



হকমেনিদীয় স্তম্ভের পীঠিকা, সুসা লুভার চিত্রমালা

বিদেশীয় প্রভাব

এই অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যের এরূপ আকস্মিকভাবে কোথা হইতে সমুদ্ভব হইল তাহা যথার্থই ভাবিবার বিষয়। জেম্স্ ফার্গুসন, স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম, স্যর জন্ মার্শাল, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ স্থির করিয়াছেন যে মৌর্য্যশিল্পের এই আকস্মিক আবির্ভাবের

মূলে বহির্ভারতের অনুপ্রেরণা আছে। মৌর্য্য রাজশক্তির অভ্যুত্থানের মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার মিশর, পশ্চিম এসিয়া এবং পারস্থে হকমেনিদীয় (Achaemenid) সাম্রাজ্য ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রত্যন্তভাগে জয়ধ্বজা রোপণ করেন। আলেকজাণ্ডার এশিয়ায় আসিয়াছিলেন গ্রীসের প্রতিনিধিরূপে। হকমেনিদীয় সাম্রাজ্য তাঁহার পদানত হইল, কিন্তু এশিয়ার সভ্যতার কাছে তিনি বিজিত হইলেন। পারস্থের বিলাসসৌষ্ঠব এবং ভারতবর্ষীয়



মৌর্য্য স্তম্ভচূড়া—রাম-পূর্ব্বা—কলিকাতা যাদুঘর

দার্শনিকগণের চিন্তা তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। বহির্জগতের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁহার হৃদয় হইতে গ্রীক সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত হইল। একমনঃপ্রাণ লইয়া একই সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গ্রীক এবং ইরাণী জীবন যাপন করিবে এইরূপ কল্পনা লইয়া আলেকজাণ্ডার তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর অনতিকাল পরে তাঁহার সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল, কিন্তু তাঁহার উদার আদর্শ বিলুপ্ত হইল না। মিশর এবং পশ্চিম এশিয়ার যে নূতন গ্রীকরাজ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহাদের প্রাচ্যদেশীয় আবেষ্টন ও সভ্যতা এবং ব্যবসায়মূলক ও রাজনৈতিক আদান-প্রদানের ফলে এশিয়া এবং গ্রীসের ইতিহাসে এক নবপর্য্যায় আরম্ভ হইল। নবপ্রতিষ্ঠিত মৌর্য্য সাম্রাজ্যও এই সভ্যতার আদান-প্রদান এবং ভাববিনিময় হইতে দূরে রহিল না। ইহারই ফলে কিয়ৎপরিমাণে গ্রীক-শিল্প-নৈপুণ্য এবং ইরাণী চারুশিল্প এবং স্থাপত্যের একটি ধারা ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ করে। ভারতীয় রসগ্রাহীরা কিন্তু এই বিদেশীয় শিল্পধারার অবিকল অনুকরণ করিলেন না। মৌর্য্য সম্রাটগণের প্রেরণা এবং উৎসাহে এই সকল বিদেশীয় শিল্পধারা ভারতবর্ষের মৃত্তিকায় অল্পবিস্তর রূপান্তরিত হইয়া একলব্য শিল্পরীতি প্রবর্ত্তিত করে। ইহাই মৌর্য্যশিল্পের ইতিহাস।

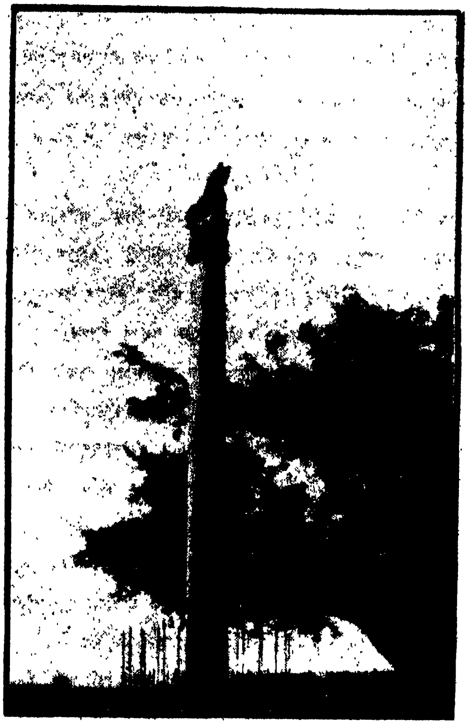
মৌর্য্য-শিলা-স্তম্ভ

সাঁচী, সাঙ্কাশ্যা, সারনাথ, রামপূর্ব্বা এবং নন্দনগড় প্রভৃতি স্থানে যে সকল মৌর্য্য যুগের শিলাস্তম্ভ বা তাহার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে, তাহা মৌর্য্য-শিল্পকলার স্বতন্ত্র উদ্ভাবনার পরিচায়ক। এগুলির মান (proportions) এবং পরিকল্পনা গ্রীক স্থাপত্যের অনুমোদিত নহে। তথাপি ইহাদের চূড়ার উপরে বিরাজমান পশুমূর্ত্তিগুলির স্বভাবানুগ খোদনরীতিতে গ্রীক নৈপুণ্যের পরিচয় আছে। সুসা এবং পার্সিপোলিসের হকমেনিদীয় প্রাসাদাদির স্তম্ভমূলে কোন না কোনরূপ পীঠিকার (base) প্রয়োগ লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু মৌর্য্যস্তম্ভের মূলদেশে কোনই পীঠিকা দেখা যায় না। হকমেনিদীয় স্তম্ভের সূচিগুলি (shaft) একাধিক খণ্ডের প্রস্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে। মৌর্য্যস্তম্ভের সূচিগুলি কিন্তু একখানিমাত্র সুদীর্ঘ প্রস্তরে খোদিত এবং তাহারই কিয়দংশ ভূগর্ভে প্রোথিত থাকে। শেষোক্ত স্তম্ভের চূড়ার সহিত হকমেনিদীয় স্তম্ভচূড়ার রূপগত সাদৃশ্য নাই। কিন্তু হকমেনিদীয় স্তম্ভের পীঠিকার (চিত্র ১) সহিত মৌর্য্যস্তম্ভ চূড়ার (চিত্র ২) নিম্নভাগের সাদৃশ্য অতি নিকট। স্বীকার করিতেই হইবে যে মৌর্য্যশিল্পীরা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন যে উন্মুক্ত আকাশের তলে সুবৃহৎ স্তম্ভগুলির নীচে হকমেনিদীয় পদ্ধতির পীঠিকা অশোভন দেখাইবে। তৎ-

পরিবর্ত্তে উক্ত নক্সাটিকে স্তম্ভসূচির অগ্রভাগে অপেক্ষাকৃত বঙ্কিম রেখায় মণ্ডিত করিয়া সন্নিবিষ্ট করিলে তাহা যথার্থই স্তম্ভের শোভাবর্দ্ধন করিবে। নন্দনগড়ের স্তম্ভটিকে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই এরূপ যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম হয়। নানারূপ নক্সা এবং গঠনে (mouldings) অলঙ্কৃত পীঠিকা, পলতোলা (fluted) সূচি এবং বিচিত্র চূড়ার সমাবেশে হকমেনিদীয় স্তম্ভগুলি সুসঙ্গতিক্রমে পরিকল্পিত সুগোল এবং মসৃণ মৌর্য্যস্তম্ভ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন অনুভূতির সঞ্চার করে। মৌর্য্যস্তম্ভ এবং অন্যান্য শিল্প-নিদর্শনসমূহে যে উজ্জ্বল বার্ণিশ দেখা যায় তাহা হকমেনিদীয় শিল্প হইতেই সংগৃহীত।

মৌর্য্য-শিল্প প্রতিভা

উত্তরকালে ভারতীয় ললিতকলায় বিদেশীয় শিল্পের প্রভাব বারবার অনুভূত হইয়াছে, কিন্তু সংযত এবং সুচিন্তিত পরিকল্পনায় মৌর্য্য শিলাস্তম্ভগুলি অনুপমেয়। ভারতবর্ষের চিরন্তন শিল্পনৈপুণ্যই যে ইহার অন্যতম কারণ তাহা মনে করা যায় না। ইহার মূলে আছে মৌর্য্য-সম্রাটগণের প্রতিভা এবং রসগ্রাহিতা। গ্রীক চিন্তা এবং জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া দীর্ঘকালাবধি বহির্জ্জগতের সংস্রবে মৌর্য্য সম্রাটগণ চিন্তা এবং রসকল্পনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের মনীষা তাঁহাদের মধ্যে অভিনবরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল। মৌর্য্য-শিল্পের নিদর্শনমাত্রে তাহার পরিচয় প্রকট হইয়া আছে।



মৌর্য্য শিলাস্তম্ভ (নন্দনগড়)

বিহারের ভাউলী প্রথা ও বাঙ্গালার জমিদারী সমস্যা

শ্রীগোপালচন্দ্র বসু

দক্ষিণ বিহারের অধিকাংশ কৃষি জমির উৎপন্ন সেচ ব্যবস্থার উপর প্রধানতঃ নির্ভর করে বলিয়া—বাঙ্গালা দেশের ন্যায় এদেশে নগদী-জমা খুব কম। মোট কৃষি জমির প্রায় ১০ ভাগই "ভাউলী"। নগদ টাকার পরিবর্ত্তে উৎপন্ন শস্যের হিস্যা দ্বারা মালগুজারী (খাজনা) পরিশোধ করাকে এ দেশে ভাউলী জমা বলে।

বাঙ্গালাদেশের ন্যায় এদেশে অত নদী, নালা বা পুকুর নাই; বৃষ্টির পরিমাণ ও কম—এ জন্য কৃষি-জমির মাঝে মাঝে নিচুস্থানে চারিধারে আল (Pind) দিয়া বর্ষার জল বা নদীর জল আনিয়া সময়মত সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়। ঐ প্রকার জলভাণ্ডারকে "আহারা" বলে। কখনও কখনও এই "আহারা" দৈর্ঘ্যে দুই বা আড়াই মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে এবং ইহা যখন জলপূর্ণ অবস্থায় থাকে তখন একটি প্রকাণ্ড দীঘির ন্যায় দেখায়। বর্ষায় যে জল ক্ষেত হইতে বহিয়া আহারাতে আপনা হইতে আসিয়া পড়ে তাহাকে 'ঠাটা" পানী বলে (Surface water)। তবে নদী হইতে সাধারণতঃ "পাইন" (খাল) কাটিয়া সময়মত "আহারাগুলি" ভর্ত্তি করা হয় এবং তথা হইতে প্রয়োজনমত আবার ছোট ছোট নালা (ভোকলা) কাটিয়া ক্ষেতে ক্ষেতে জল লইয়া যাওয়া হয়। যেখানে আহারা প্রস্তুত করিবার অসুবিধা থাকে সেখানে নদীতে সাময়িক বাঁধ বাঁধিয়া বহুলোকের জমির মধ্যদিয়া লম্বা পাইন কাটিয়া জল লওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ পাইন হইতে আবার ছোট ছোট পাইন কাটিয়া বহু মৌজা পালাবন্দী অনুসারে পটান (জলসিক্ত) হয়।

কেহ কেহ বা মাত্র ঐ পাইনের জল "লাটা কুড়ি" (জল তুলিবার একপ্রকার লোহার পাত্র) দ্বারা নিজ নিজ জমি পটাইবার হক পাইয়া থাকে। প্রতি জমিতে যে প্রকারে জল লইতে হইবে তাহার একটি পাকা ব্যবস্থা থাকে তাহাকে "কার্দ্দা-আগাসী" বলে। উহা অনেকটা সেটেল্‌মেণ্টের পরচার (Khatian) অংশ বিশেষ এবং ইহা জরিপের সঙ্গে সঙ্গেই গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয়। উপরোক্তরূপে সেচ্ কাজ ব্যতীত অনেক উচু জমিতে ইন্দারা কাটিয়া তাহা হইতে জল লওয়া হয়। কারণ তথায় জল লইবার অন্য কোন বন্দোবস্ত করা কোনমতে সম্ভবপর হয় না।

দক্ষিণ বিহারের মধ্যে গয়াজেলার নদীগুলির গতিবেগ সকলই উত্তরাভিমুখী—কারণ এখানকার জমি উত্তর হইতে দক্ষিণদিকে ক্রমাগত উচু হইয়া গিয়াছে; প্রতি মাইলে দক্ষিণ হইতে উত্তরের লেবেল প্রায় চার ফুট নিচু। বর্ষাকালে যখন এই সকল পার্ব্বত্য নদীগুলিতে "বাড়" (বাণ) আইসে তখন তাহাদের গতিবেগ বড়ই ভীষণ হয়, উভয় তীর প্লাবিত করিয়া বহুঘরবাড়ী, গবাদি গৃহপালিত পশু এবং গাছপালা যাহা সম্মুখে পড়ে তাহা ভাসাইয়া লইয়া যায়। এইপ্রকার বাড়ে প্রতিবৎসর নদীতীরস্থ বহুলোকের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। সময় সময় অনেককে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

যে বৎসর বৃষ্টির পরিমাণ যেরূপ হয়, ফসলের অবস্থাও প্রায় তাদৃশ হয়, কারণ সময়মত প্রচুর বর্ষা না হইলে পার্ব্বত্য নদীগুলিতে জল পাওয়া যায় না, আহারাকে ও জলপূর্ণ করা যায় না এবং জলাভাবে কৃষিকার্য্য অনেকস্থলে অচল হইয়া পড়ে। এখানকার কৃষকেরা বড়ই পরিশ্রমী, দিন রাত্রই তাহারা স্ত্রী পুরুষে ক্ষেত খামারের কাজে ব্যস্ত থাকে। চারি পয়সার ছাতু হইলে একজনের দিন কাটিয়া যায়। খাঁটী স্বদেশী "মুটীয়া" কাপড়েই তাহারা সন্তুষ্ট। প্রায় সকল বিহারীকেই এইদেশী মুটীয়া পরিধান করিতে, মুটীয়ার কোর্ত্তা ও একটি দোহার (চাদর) ব্যবহার করিতে দেখা যায়। সকলেই দেশী স্বল্পমূল্যের জুতা ব্যবহার করিয়া থাকে। খালি পায় চলা ইহারা ততটা পছন্দ করে না। উপরোক্ত দেশী জুতার মূল্য অধিকাংশ স্থলে এক আনা হইতে দুই আনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এত সস্তায় জুতা অন্য কোন দেশে মিলে কি না জানা যায় না। গয়া জেলার ভীষণ নাম-করা মশাতেও তাহারা তাহাদের পরমপ্রিয় সর্ব্বদার সঙ্গী দোহার মুড়ি দিয়া কি শীতে কি দারুণ গ্রীষ্মে পরমসুখে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়। কি বড় লোক কি গরীব কাহাকেও মশারী ব্যবহার করিতে বড় দেখা যায় না।

মশারীর মধ্যে থাকিলে তাহাদের প্রাণ নাকি হাঁপাইয়া উঠে। আজকাল শিক্ষিতদের মধ্যে ২।১ জনে মশারী ব্যবহারের প্রচলন আরম্ভ করিয়াছেন—তবে তাহা বড় একটি বিলাসের জিনিস বলিয়া পরিগণিত হয়।

উপরোক্তভাবে জমিতে জলের ব্যবস্থার পর 'আহারা", "পিণ", পাইন ইত্যাদি গুলির মেরামত করা এবং আবশ্যকমত জমিতে মাটি তুলিবার কার্য্য ও কৃষিকার্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ। ঐ সকল কার্য্যকে "গোলন্দাজী" বলে। এই কলের ব্যবস্থা এবং গোলন্দাজী কাজ করিতে প্রতি বৎসর বহু অর্থ ব্যয় হয়, বিশেষতঃ সেচ্ কার্য্যের ব্যবস্থা করিতে বহুলোকের স্বার্থ—সম্মতি ও লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করে বলিয়া আসামীয়ানদের (প্রজাদের) পক্ষে অনেকস্থলে তাহা মোটেই সম্ভব হয় না। এমত অবস্থায় জমিদার যদি নিজেই ঐ সকল ব্যবস্থা না করেন তবে তাঁহার জমিদারীর অধিকাংশ জমিই পতিত থাকিয়া যাইবে। মনে হয় দক্ষিণ বিহারে ভাউলীজমি প্রচলনের প্রাবল্যের ইহাই একটি প্রধান কারণ। কারণ ভাউলী জমিতে সেচও গোলন্দাজী কার্য্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব জমিদারের উপর—প্রজাদিগের ঐ বিষয়ে বিশেষ কোন দায় ভার থাকে না। জমিদার ঐ কার্য্যে যত অধিক মনোযোগ ও অর্থ ব্যয় করিতে পারিবেন তাঁহার জমিদারীর আয় ও তত বৃদ্ধি পাইবে। এমন কি অধিকাংশ সময় ঐ সকল খরচের উপর প্রায় শতকরা চল্লিশটাকা লাভ পাইতে দেখা যায়। মোটকথা গোলন্দাজীকে এদেশের কৃষি-কার্য্যের প্রধান জীবনস্বরূপ বলা যাইতে পারে কারণ ইহা সেচ ব্যবস্থার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত; ভাল সেচ ও গোলন্দাজীর ব্যবস্থা থাকিলে সাধারণ অবস্থার ২।৩ গুণ ফসল উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

এইবার ভাউলী-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিহারে উৎপন্ন শস্যের মধ্যে ধান, গম, ছোলা, তিসি, মুশুরী ও খেসারীই প্রধান। ইহা ব্যতিত আলু, কফি এবং আখের চাষও হইয়া থাকে। আখকে এ দেশে "কেতারী" বা "উক্" বলে। অধুনা নানাস্থানে কল বসাতে কেতারী চাষের আধিক্য বাড়িয়া যাইতেছে।

প্রথমতঃ জমিতে বিহন (বীজ) বোনার পর জমিদারের গমস্তাকে মোট কতজমি আবাদ হইয়াছে ও কোন্ কোন্ জমিতে কি কি ফসল বপন করা হইয়াছে তাহার একটি মোটামুটী ফিরিস্তী কাছারীতে ভারপ্রাপ্ত উপরিস্থ কর্ম্মচারীর নিকট পাঠাইতে হয়, তাহা হইতে সেই বৎসর কত জমিতে আবাদ হইল তাহা জানিতে পারা যায়; এই ফিরিস্তীকে "হরিঅরী" বলে। পরে যখন শস্য পাকিয়া আসে তখন গমস্তাকে আর একটি রিপোর্ট কাছারীতে পাঠাইতে হয়, তাহাতে তাহার এলেকায় প্রতি প্লট জমিতে যে ফসল বোনা হইয়াছে তাহা প্রতি বিঘায় কি পরিমাণ উৎপন্ন হইতে পারে তাহার একটি আন্দাজ মত বিবরণ থাকে। তাহাকে 'সুদগার" বলে। অনেকে শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য হইবেন যে এ দেশীয় লোকের এই প্রকার আন্দাজে বিঘা প্রতি ফসলের উৎপাদন নির্ণয় করিবার শক্তি অতীব তীক্ষ্ণ; অধিকাংশ স্থলেই তাহারা ঐ প্রকারে কেবলমাত্র ফসল দেখিয়া আন্দাজে যে রেট ঠিক করে তাহা ঠিকই হইয়া থাকে। উপরোক্ত সুদগার ব্যাপারে আসামীয়ানদের এবং গমস্তার উভয়ের স্বার্থ থাকায় গমস্তাগণ প্রায়ই ইচ্ছাপূর্ব্বক উৎপন্ন রেট্ কম দেখাইতে চেষ্টা করে, সেইজন্য অভিজ্ঞ ও চতুর জমিদার বা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীগণ গমস্তা-প্রদত্ত "সুদগারের" রিপোর্ট পরীক্ষা করিতে মাঝে মাঝে অন্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। এই পরীক্ষা কার্য্যকে "পরতাল" করা বলে।

ভাউলীতেও আবার দুই প্রকার প্রথা আছে—এক বাটাই", অপরকে দানাবন্দী" বলে।

বাটাই প্রথামতে জমিদারের কর্ম্মচারীরা ফসল পাকিলে তাহা ক্ষেত্রেই পাহারা দিতে লোক নিযুক্ত করেন, পাছে আসামীয়ানরা বা অন্য লোকে লইয়া না যাইতে পারে। পরে দিন ঠিক করিয়া তাঁহাদের খবরদারীতে একে একে ক্ষেত হইতে আসামীয়ানরা নিজে অথবা "বনিহার" (লোক) দিয়া ফসল কাটিতে আরম্ভ করে। দৈনিক কত বোঝা ফসল কাটা হইল তাহার একটি ফর্দ্দ প্রত্যহ গমস্তার দস্তখতযুক্তে জমিদারের কাছারীতে পাঠান হয়। ফসল পাহারা দেওয়া এবং প্রত্যহ ঐরূপ হিসাব কাছারীতে পাঠানর কার্য্য যে করে তাহাকে "বরাহীল" বলা হয়। বরাহীলদিগকে কার্য্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জমিদার কর্ত্তৃক দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি লোক নিযুক্ত থাকে তাহাদিগকে "গোড়াইত" বলে। এইজন্য তাহাদের জায়গীরের ব্যবস্থাও জমিদারকর্ত্তৃক করা আছে। প্রত্যেক গমস্তা আদায় তহশীল কার্য্যে হিসাবাদি রাখার জন্য একজন সহকারী মালিক হইতে পাইয়া থাকে, তাহাদিগকে "পাটোয়ারী" বলে। কয়েকটি মৌজা লইয়া এক একটি "পাটোয়ারীর" এলেকা ঠিক করা হয়; তাহাকে তাহার এলেকার মৌজা-সমূহের প্রজাদের প্রত্যেকের জমির ও জমার হিসাবাদি রাখিতে হয়। পাটোয়ারীরা তাহাদের কার্য্যের জন্য কোন কোন স্থলে বেতন এবং কোন কোন স্থলে উৎপন্ন শস্যের কিছু হিস্তা পারিশ্রমিক স্বরূপ পাইয়া থাকে। প্রতিদিনের ফসল যাহা কাটা হয় তাহা একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে মাড়াই করিবার জন্য জমা করিয়া রাখা হয়। ঐ স্থানের নাম "খরিয়ান।" প্রত্যেক আসামী তাহার ফসল নিজ চিহ্নিত স্থানে পৃথক করিয়া রাখে। রাত্রে ঐ সকল ফসল কেহ লইয়া যাইতে না পারে তাহার জন্য জমিদারের পেয়াদা ও উপরোক্ত বরাহীল এবং গোড়াইত খরিয়ানে চালা (মাড়ুই) বাঁধিয়া সারারাত্রি তাহাতে অবস্থান করিয়া পাহারা দেয়; আসামীয়ানরা ও নিজ নিজ ফসল পাহারাদিগের জন্যে স্বীয় বোঝার সন্নিকটেই রাত্রযাপন করে।

ফসল মাড়াই হইবার পূর্ব্বে তাহা হইতে সেই মৌজার "বাঢ়ী" (ছুতার), "লোহার" (কামার), "হাজাম" (নাপিত), চামার, ধোবা এবং ভাট (ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি সকলকে সেই খরিয়ানের প্রথামত কিছু কিছু শস্য বিতরণ করিয়া দিতে হয়। ইহা ছাড়া ভিক্ষুকও ২।৪ জন উপস্থিত হয়, তাহাদিগকেও কিছু কিছু দিতে হয়। খরিয়ানে বাটাই হইবার সময় যখন উপরোক্ত লোকেরা তাহাদের হিস্তা লইতে আসে, তখন তথায় বড় মজার ব্যাপার দৃষ্ট হয়। জমিদারের উপস্থিত আমলা-কর্ম্মচারীবর্গের তখন ভারী খাতির, তাহাদিগকে খুসী করিতে তখন সকলেই ব্যস্ত। নাপিত আসিয়া পা টিপিতে আরম্ভ করে ভাটেরা কোথাও গান করিতে আরম্ভ করে, এমন কি সময় সময় "পানারীরা" (বারৈ) আসিয়া অযাচিতভাবে পান বিলাইতে আরম্ভ করে। কখনও কখনও বাইজীরা পর্য্যন্ত তথায় আসিয়া নৃত্যগীতাদিতে আমলা-দিগকে তুষ্ট করিয়া কিছু ফসল প্রার্থনা করে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার, নিজের চোখে না দেখিলে সম্যক উপভোগ করা যায় না। সেইদিন উহাদের ঐ প্রকারে কাতরভাবে সামান্য ২।৪ মুঠা ফসল পাইবার প্রার্থনা দেখিলে ইহাদের অবস্থা যে কতটা শোচনীয়, ইহারা যে কত দরিদ্র এবং কত অল্পে সন্তুষ্ট—তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মালিকের হিস্তা হইতে তুল্যাংশে যাইবে বলিয়া আসামীয়ানরা ঐ প্রকার বিতরণে কিছুমাত্র আপত্য করে না, বরং উপরোক্ত লোকদিগকে সময়-মত সংবাদ দিয়া আনায়।

এইরূপ বিতরণের পর অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা মাড়াই করিয়া তাহা হইতে প্রতি মণে আবার নিম্নলিখিতব্যক্তিগণকে হিস্তা দেওয়া হয়। যথা:—

পাটোয়ারী—চার ছটাক
গোড়াইত—দুই ছটাক
বরাহীল—দুই ছটাক
কুম্ভকার—এক ছটাক
টহলুবাচাকর—এক ছটাক

অবশ্য এই রেটে সব মৌজায় দেওয়া হয় না মৌজা ও জমিদার বিশেষে ইহার তারতম্য আছে—তবে ইহাই একটি মোটামুটী হিসাব। গ্রামে জমিদারের কর্ম্মচারী আসিলে তাহাদের পরিচর্য্যা উক্ত গ্রামের বা তন্নিকটস্থ মৌজার কাহারদিগকে করিতে হয়, এই কাহারদিগকে এদেশে "টহলু" বলে। ইহাদের অবস্থা অনেকটা ক্রীতদাসের মত। পরিচর্য্যা করিবার ক্ষমতা ইহাদের অদ্ভুত। দেহাতে (মফঃস্বলে) টহলু না থাকিলে অনেক সময় বহু কষ্টে পড়িতে হয়; প্রত্যেক টহলুর জমিদার হইতে জায়গীরের ব্যবস্থা আছে।

এই সকল দিবার পর মোট "গল্লা" (ফসল) হইতে আবার 'বনিহার'দিগকে প্রতি মণে দেড় হইতে আড়াই সের মজুরীর খরচা বাবদ উভয়কে দিতে হয়। তদ্বাদে যাহা থাকে তাহা সমান দুই ভাগে মাপিয়া বিভাগ করা হয়। যাহারা এই সময়ে মাপিয়া বিভাগ করে তাহাদিগকে "হাটুইয়া" বলে। হাটুইয়ারা ও তাহাদের পরিশ্রমের জন্য দুই তরফ হইতে কিছু শস্য পাইয়া থাকে।

উক্তরূপে বিভাগ হইবার পর পাটোয়ারী দুই খণ্ড কাগজে একটিতে "মালিক" অপরটিতে 'আসামী" লিখিয়া জনৈক নিরক্ষর লোকের হাতে দেয়, সে উহা আপন ইচ্ছামত ফসলের "ঢেরীতে" (গাদায়) রাখে। তখন সেই কাগজের লেখা অনুসারে জমিদার ও প্রজার অংশ নির্ণয় করা হয়। এইরূপ লটারী প্রথা থাকায় আর কেহ কোন আপত্য করিতে পারে না। পরে প্রজার অংশ হইতে জমিদার সেস্ বাবদ মণকরা দেড় হইতে আড়াই সের গ্রহণ করেন। তাহাকে "নেগ" কহে। এই প্রকারে সকলকে কিছু কিছু দিয়াও আসামী ও জমিদারের মন্দ লাভ থাকে না।

মোটামুটী হিসাবে দেখা যায় যে ফসল তৈয়ার করিতে মজুরী খরচা মোট উৎপন্ন শস্যের ৮৮ হইতে ৭৯ ভাগ পড়ে। পরে যাহা বাকী থাকে তাহা হইতে উপরোক্তমতে আমলা কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে শতকরা

২'৫ ভাগ দিয়াও প্রজারা শতকরা ৪৮ হইতে ৪৯'১৬ ভাগ এবং জমিদাররা শতকরা ৪৯'৬৬ ভাগ পাইয়া থাকেন অর্থাৎ জমিদার ও প্রজার অংশ প্রায় সমান সমান হয়। ইহা ছাড়া গবাদি পশুদিগের খাদ্যের জন্য আসামীয়ানরা সমুদয় "পোয়া" (পল) ও ভুষা পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয় "দানাবন্দী" প্রথায় জমিদারকে অপেক্ষাকৃত অনেক কম ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হয়, সরঞ্জামী খরচাও কিঞ্চিৎ কম পড়ে। কিন্তু এই প্রথা "বাটাই" হইতে সহজসাধ্য হইলেও ইহাতে মালগুজারী বাকী পড়িবার ভয় থাকে এবং কার্য্যতঃ অনেক সময় নালিশ না করিলে মালগুজারী আদায় হয় না। কিন্তু বাটাইতে মালগুজারী সঙ্গে সঙ্গেই আদায় হওয়াতে মামলা মোকর্দ্দমায় পয়সা নষ্ট করিতে হয় না। ক্ষেতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয় জমিদার ও প্রজা তাহা আপনাদের ভিতর বাটিয়া লয়েন। ইহা পরস্পরের একটা মস্ত লাভ।

যাহা হউক, দানাবন্দী রীতিতে ফসল যখন পাকে তখন গমস্তা, পাটোয়ারী, আমিন এবং কয়েকজন "মধ্যস্থ" করিবার লোকসহ প্রত্যেক ক্ষেতে উপস্থিত হইয়া সেই সেই ক্ষেতের আসামীর মুকাবেলা সকলে মিলিয়া প্রতি বিঘায় কত মণ ফসল উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আন্দাজে ঠিক করিয়া একটি হিসাব প্রস্তুত করে। যে স্থলে প্রজার সহিত জমিদারের লোকের মতের অমিল হয় তথায় সেই জমির সব থেকে ভাল ও মন্দ দুই স্থানের সমপরিমাণ জায়গা হইতে সমুদয় ফসল কাটিয়া "মধ্যস্থ" ব্যক্তিগণের সম্মুখে মাড়াই করিয়া একটা গড়পড়তা রেট্ লওয়া হয়—তাহাকে crop-cutting বলে। ইহাতে আর কাহারও আপত্যের কারণ থাকে না।

এইরূপে সমস্ত প্লটের ফসলের একটি রেট্ প্রস্তুত করিয়া দুইটি ফর্দ্দ তৈয়ার করা হয়; তাহাতে নিজ নিজ ক্ষেতের আসামীর এবং জমিদারের তরফ হইতে গমস্তার দস্তখতযুক্তে এক ফর্দ্দ কাছারীতে পাঠান হয়, অন্য ফর্দ্দ প্রজাকে দেওয়া হয়। জমিদারের কর্ম্মচারীবর্গ যদি অসৎ হয় তবে তাহারা এই 'দানাবন্দীর" সময় আসামীয়ানদের সহযোগে বেশ কিছু কামাইয়া লইতে পারে। তাই অনেক সময় জমিদার বা তাঁহার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী অন্য বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা দানাবন্দী আবার "পর তাল" (চেক্) করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, দানাবন্দী হইয়া যাইবার পর প্রজারা আপন ইচ্ছায় ও খরচে ফসল কাটিয়া ঘরে লইয়া যায়; পরে জমিদার দানাবন্দীর "চিঠা" (হিসাব) হইতে আপন হিস্যা ঠিক করিয়া হিসাব মত তাহাতে কত মণ গল্লা হইবে ঠিক করেন এবং তখনকার বাজার দরে তাহার মূল্য নিরূপণ করিয়া দিয়া গমস্তা দ্বারা তহশীল করাইয়া লন।

"কর্দ্দারেওয়াজ" নামে এদেশে একটি সুন্দর জিনিস আছে; তাহাতে প্রত্যেক মৌজার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সেচ, কার্য্যের ব্যবস্থা এবং তাহা রক্ষা করিতে কাহাকে কিরূপ খরচ দিতে হয়, জমিগুলির শ্রেণী বিভাগ, কোন জমিতে কি বপন করিতে হইবে—এবং ভাউলী হইলে বাটাই বা দানাবন্দী কি প্রণালীতে হইবে, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করা থাকে। ঐ সকল বিষয় পরিষ্কার লেখা থাকায় অনেক মামলা মোকর্দ্দমা বাঁচিয়া যায়। এই "ফর্দ্দা-রেওয়াজ"ও পূর্ব্বোক্ত "ফর্দ্দা-আপাশীর" ন্যায় জরিপের সময় একই সঙ্গে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রস্তুত হয় এবং উভয়ই বেশ মূল্যবান দলিল বলিয়া পরিগণিত।

বাঙ্গালাদেশের যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলায় যেখানে অধিকাংশ নদী মজিয়া যাওয়ায় জলাভাবে কৃষিকার্য্যের অবস্থা অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং যেখানে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত কৃষকদের বৃষ্টির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয় তাহারা যদি এ দেশীয়দের ন্যায় মালিকের সহযোগে ক্ষেতের মধ্যে কূয়া কাটিয়া এবং সময় মত ক্ষেতের মধ্যে নিচু জমিতে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করিয়া পরে আবশ্যক মত ব্যবহার করিতে অভ্যাস করে তবে অনেক স্থলেই মনে হয় আশার অন্ততঃ অর্দ্ধেকের বেশী ফসল পায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহারা তাহা না করিয়া নিজেদের গরজ মত বৃষ্টির আশায় চাতক পাখীর ন্যায় উপরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকে, না পাইলে কেবল অদৃষ্টের দোষ দেয় এবং সারা বৎসর দুঃখে কাল কাটায়। অথচ এদেশে দারুণ শীতেও দেখা যায় যে সারারাত্র ধরিয়া স্ত্রী পুরুষে ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া ক্ষেত পটাইতেছে। ফলে তাহাদের ক্ষেতে কিছু না কিছু ফসল হইয়াই থাকে। একেবারেই অজন্মা হয় না। এইরূপ জল সেচন দ্বারা তাহারা অনেক উচু জমিতে আক, আলু ও কফির চাষ করিয়া থাকে। বাঙ্গালার কৃষকদের এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে। গতানুগতিকরূপে চলিলে তাহাদের শোচনীয় অবস্থা অদূর ভবিষ্যতে আর ও শোচনীয়তর হইয়া দাঁড়াইবে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান অর্থকৃচ্ছতার দিনে ফসলের দাম কমিয়া যাওয়ায় এবং প্রতি বৎসর স্থানে স্থানে অজন্মা হওয়ায় বাঙ্গালার বহু জমিদারই সময়মত রাজস্ব দিতে না পারায় তাঁহাদের জমিদারী নিলামে উঠিতেছে, বহু পুরাতন জমিদারীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কেহ কেহ বা অনন্তোপায় হইয়া কোর্ট-অব ওয়ার্ডসের শরণাপন্ন হইয়া নিজদিগকে বাঁচাইতে যাইয়া দরিদ্র প্রজাদের ও মধ্যস্বত্বভোগীদিগের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিতেছেন। ঋণও অনেকের যথেষ্ট, অথচ কোন ব্যাঙ্কে বা গভর্ণমেণ্টের নিকট জমিদারী বন্ধক রাখিয়াও ধার পাইতেছেন না; সুতরাং এক কথায় বাঙ্গালার জমিদারদিগের অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহাতে এইরূপভাবে আর কিছুদিন চলিলে জমিদারশ্রেণীর অস্তিত্ব থাকিবে কিনা সন্দেহ।

জমিদার আদৌ থাকা বাঞ্ছনীয় কিনা সে সম্বন্ধে আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সুতরাং জমিদারী রাখিতে হইলে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শরণাপন্ন না হইয়া নিজেরা যদি প্রজাদের সহিত মিলেমিশে ব্যবস্থা করেন তবে প্রজা ও জমিদার উভয়ের রক্ষার কোন সুমীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু একাজে জমিদারদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

উদাহরণ-স্বরূপ মনে হয় যে বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গালায় যদি বিহারের ন্যায় ভাউলী প্রথার প্রচলন করা যায় তাহা হইলে জমিদার এবং প্রজা উভয়ের সমস্বার্থ হওয়ায় উভয়ের সমবেত বুদ্ধি উৎসাহে এবং পরিশ্রমে জমির উর্ব্বরাশক্তি ও অপেক্ষাকৃত বাড়ান যাইতে পারে; যাহা উৎপন্ন হইবে তাহা তাহারা নিজ নিজ অংশমত ভাগ করিয়া লইলে যাহা হউক

কিছু মালগুজারী আদায় হইতে পারে। অন্যথা কাগজে বৎসর বৎসর বাকি বাঁধিয়া সুদে ও আসলে মোটা অঙ্কে পরিণত করাইয়া কোনই লাভ হয় না। ঋণের মাত্রা বাড়িয়া গেলে প্রজার আর শোধ করিবার উপায় থাকে না, তখন অগত্যা নিজ হইতে কোর্ট ফি দিয়া নালিশ করিয়া অবশেষে জমিদারকেই ক্ষেত নিলাম করাইয়া লইতে হয়। জমির মূল্য কম হইয়া যাওয়াতে আশানুরূপ খাজনায় অন্যের নিকট বন্দোবস্ত করাও সুকঠিন। বাকী করের নালীশের মধ্যে মনে হয় শতকরা ৮০টি কেসে ডিক্রীদার পক্ষে নিলাম খরিদ করিতে হয়, এই ত অবস্থা।

দক্ষিণবিহারের শতকরা ৮০ ভাগ জমি ভাউলী জমায় বন্দোবস্ত থাকায় অধুনা এই প্রকার অর্থকৃচ্ছতার দিনেও বিহারের জমিদারদিগের অবস্থা বাঙ্গালার জমিদারদিগের তুলনায় অনেক ভাল। প্রজারাও তাহাদের মালিককে দেবতার মত দেখে। সাধ্যানুসারে তাহারা মালগুজারী পরিশোধ করিতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ জমিদার তাহাদের আসামীয়ানদিগের প্রতি বেশ সহানুভূতিসম্পন্ন। কেহ কেহ সত্যকার অন্তরের দরদ দিয়া প্রজাদিগের সুখদুঃখের দিকে নজর দিয়া থাকেন। এই সকল বিষয় হইতে ধারণা করা যায় যে জমিদারশ্রেণী সৃষ্টি করিবার সার্থকতা এদেশের জমিদারদিগের মধ্যে কিছু কিছু আছে।

নগদী জমা হঠাৎ ভাউলী জমাতে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে 'অধিকার রেকর্ড' সম্বন্ধে অনেক অসুবিধা হইতে পারে ; কিন্তু যদি মালিক ও প্রজা উভয়ের মত থাকে এবং জমিদার যদি উপস্থিত কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে রাজী হন তবে—ভাউলী প্রথা মতে তাঁহাদিগের অংশের প্রাপ্য ফসলের মূল্য নগদী জমার মালগুজারীতে সেহা করিয়া বাকী টাকা উপস্থিত মাপ দিয়া রেকর্ড ঠিক রাখিতে পারেন ; পরে সুদিন আসিলে আবার সাবেক ব্যবস্থায় খাজনা আদায় করা কষ্টকর হইবে বলিয়া মনে হয় না।

অসম্ভবরূপে সেস্ বৃদ্ধি বাঙ্গালার জমিদারী বিপন্ন হইবার অন্যতম প্রধান কারণও বটে। কোন কোন জেলায় উহা প্রায় শতকরা ১১০৲ টাকা পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে ; তাহার দরুণ ইহাতে পরোক্ষভাবে রাজস্ব আদায়ের বিঘ্ন ঘটিতেছে। জমিদারবর্গের এবং প্রত্যেক প্রজার প্রবল আন্দোলন করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণকরত যশোহর জেলার ন্যায় পুনরায় মূল্য নির্ণয় করান আশু প্রয়োজন এবং জেলাবোর্ড যাহাতে এই কার্য্যে বাধা প্রদান না করেন সঙ্গে সঙ্গে সে ব্যবস্থাও করা দরকার।

সম্প্রতি কলিকাতার বিখ্যাত চিন্তাশীল জমিদার শ্রীযুক্ত অমূল্যধন আঢ্য "অমৃতবাজার পত্রিকা"তে বাঙ্গালার জমিদারদিগের অসহায় অবস্থা বর্ণনা করিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আকুলভাবে গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। জানি না সরকার তাঁহার প্রস্তাবানুযায়ী জমিদারদিগকে কতটা সাহায্য করিতে পারিবেন এবং যদি সত্যই ঐরূপ সাহায্য করেন তাহা হইলে উহা কতটা কার্য্যকারী হইবে।

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের "১৯৩৩-৩৪ সালের শাসন বিবরণীতে" প্রকাশ যে, "খাজনা দিতে কৃষকদিগের অনিচ্ছাই খাজনা বাকী পড়িবার কারণ" এবং উদাহরণস্বরূপ তাঁহারা সেস্ এ্যাক্টের ৯৯ ধারা প্রয়োগে খাসমহলের এবং ওয়ার্ডষ্টেটের অধিকাংশ বাকী-খাজনা পরিমাণে হ্রাস করাইয়াছে এবং এতদ্বারা তাঁহারা জমিদারদিগের জমিদারী বন্দোবস্ত কার্য্যে অক্ষমতার ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যাঁহারা জানেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে সার্টিফিকেট জারিতে এবং জারির জয়ে প্রজা ও মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা কি প্রকারে টাকা আদায় করিতেছেন। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে সার্টিফিকেট কেসে বাকী কর আদায়ের জন্য একযোগে দস্তক ও অস্থাবর ক্রোকী পরওয়ানা লইয়া কোর্টের পিয়ন দায়িকের বাড়ীতে ক্রোক করিবার কিছুই না পাইয়া প্রজাকে দস্তক বলে ধরিয়া আনিয়াছে এবং তাহার অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা দিতেছে —যাহা শুনিয়া এবং হতভাগ্য প্রজার শতছিন্ন মলিন বস্ত্র এবং অনাহার বা স্বল্পাহারজনিত শীর্ণ দেহ দেখিয়া উপস্থিত কেহই অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। বাস তার অতি জীর্ণ কুটীরে, অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আছে কয়েকটি মাটির পাত্র এবং শীত নিবারণের জন্য "ছালা" বা শত তালিযুক্ত ময়লা কাঁথা। কাহারও বা তাহাও জুটে না। দ্বিতীয় বস্ত্র পর্য্যন্ত কাহারও নাই। এই ত প্রকৃত অবস্থা। সুতরাং খাজনা পরিশোধ করিবার প্রকৃত শক্তি তাহাদের কতখানি আছে বা থাকিতে পারে তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।



ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

অসীম বিদ্যানুরাগ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেম এবং সাধু চরিত্রের দ্বারা যাঁহারা বঙ্গের গৌরব-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ডাক্তার ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র অন্যতম। এবারে 'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপটে বাঙ্গালার এই মনস্বী সন্তানের প্রতিকৃতি প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা হইতে নয় মাইল মাত্র দূরে—হুগলী জিলার অন্তর্গত কোন্নগর নামক প্রাচীন ও সুপরিচিত গ্রামে ১২৫১ বঙ্গাব্দে ২১শে বৈশাখ (ইং ২রা মে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) দিবসে এক পর্ণকুটীরে ত্রৈলোক্যনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জয়গোপাল মিত্র কোনও সওদাগরী আফিসে সামান্য কেরাণীর কার্য্য করিতেন এবং কোনও প্রকারে তাঁহার ক্ষুদ্র আয়ে তাঁহার বৃহৎ পরিবারের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। দারিদ্র্যের ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বাল্যকাল হইতেই ত্রৈলোক্যনাথ পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু ও আত্মনির্ভরপরায়ণ হইয়াছিলেন।

শ্রীরামপুরের এক গ্রাম্য পাঠশালায় বর্ণপরিচয়াদি পাঠ-করণানন্তর ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ১১ই মে তিনি উত্তরপাড়া স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পঠদ্দশায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। পর বৎসর তিনি এল্-এ পরীক্ষা দিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি সকল বিষয়েই পারদর্শী ছিলেন এবং কথিত আছে যে বি-এ উপাধি লাভের পর কলেজের অধ্যক্ষ সাটক্লিফ সাহেব তিনি কোন্ বিষয়ে এম্-এ পড়িবেন জিজ্ঞাসা করিলে ত্রৈলোক্যনাথ বলিয়াছিলেন তিনি কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে যে কোনও বিষয় তিনি লইতে প্রস্তুত আছেন। সাটক্লিফ সাহেব গণিতের অধ্যাপনা করিতেন এবং ত্রৈলোক্যনাথকে গণিতে এম্-এ পড়িতে পরামর্শ দেন। ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার অভিও গণিতে এম্-এ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে একমাত্র তিনিই অনার্স-ইন-ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় তাঁহার পূর্ব্বে আর কেহ উত্তীর্ণ হন নাই এবং পরেও কয়েক বৎসর কেহ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার স্যর রাসবিহারী ঘোষ এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তাহার পরে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মানলাভ করেন। ইঁহাদের পরে আরও কয়েকজন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ ও স্যর গুরুদাস এই দুইজন সর্ব্বপ্রথম ডি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র ত্রৈলোক্যনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হুগলী কলেজে ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দর্শনাধ্যাপক মিষ্টার (পরে স্যর) অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট্ অবসর গ্রহণ করিলে তৎপদে দর্শনাধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি গণিতে এম্-এ হইয়াও এককালে দর্শন ও ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ইহা হইতেই প্রতীত হয় তিনি কত বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় এক বৎসর কাল এই দুই বিষয়ে অধ্যাপনা করিয়া দর্শনাধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করত হুগলীতে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। এই ব্যবসায়ের সঙ্গে অবশ্য ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপনাও তিনি যথানিয়মে সম্পাদিত করিতেন। কথিত আছে যে শিক্ষা বিভাগের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মিষ্টার অ্যাটকিন্সন তাঁহাকে শিক্ষা বিভাগে উচ্চ স্থায়ী পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ স্বাধীন-ভাবে ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিতে স্থিরসঙ্কল্প

হইয়াছিলেন এবং অ্যাটকিন্সনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ ভালই করিয়াছিলেন, কারণ ব্যবহারাজীবরূপে তিনি যে অপূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিলে তাহা লাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ হুগলীতে উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা এবং ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞানের জন্য অত্যল্পকাল মধ্যে ব্যবহারাজীবগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। আট বৎসর কাল হুগলীতে ওকালতী করিবার পর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করিতে আসেন। কথিত আছে—যে যখন হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি মার্কবি হুগলীর বিচারালয়সমূহ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, তখন ত্রৈলোক্যনাথের প্রগাঢ় আইনজ্ঞান ও বাগ্মিতা সন্দর্শনে মুগ্ধ হন এবং তাঁহাকে হাইকোর্টের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা বিনিযুক্ত করিতে পরামর্শ দেন। ত্রৈলোক্যনাথ এই পরামর্শানুসারে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। স্বল্পকালের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন এবং আইনের কূট তর্কযুদ্ধে এডভোকেট, জেনারেল স্যর চার্লস পল, উড্রফ, স্যর গ্রিফিথ ইভ্যান্স প্রভৃতি ত্রৈলোক্যনাথে একজন সমকক্ষ প্রতিযোদ্ধা পাইয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁহার বন্ধু ডাক্তার (পরে স্যর) রাসবিহারী ঘোষ এবং ডাক্তার (পরে স্যর) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ঠাকুর আইন-অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার সময় তিনি 'হিন্দু বিধবা সংক্রান্ত আইন' সম্বন্ধে যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন তাহা ঐ বিষয়ে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকে।

ত্রৈলোক্যনাথ বহু বৎসর শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং এই সময়ে স্বাস্থ্যবিভাগের অধ্যক্ষের সহিত তিনি যে সকল স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন এবং মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা 'টাইম্‌স্' কর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। তিনি জাতীয় মহাসভার একজন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে বাঙ্গালার অন্যতম প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিয়াছিলেন।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ পদত্যাগ করিলে ত্রৈলোক্যনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাশাস্ত্রবিভাগের সভাপতি (Dean of the Faculty of Law) নির্ব্বাচিত হন। তিনি সিণ্ডিকেটেরও সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর তিনি ইংলণ্ডীয় রয়েল এসিয়াটিক সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদপ্রার্থী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নির্ব্বাচিত হইবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিল ; কিন্তু অকস্মাৎ জ্বররোগে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ই এপ্রিল তারিখে তিনি তাঁহার ভবানীপুরস্থ ভবনে কালকবলে পতিত হন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশব্যাপী হাহাকার পড়িয়াছিল। হাইকোর্টে তদানীন্তন এডভোকেট-জেনারেল স্যর গ্রিফিথ ইভ্যান্স, সিনিয়র গবর্ণমেণ্ট উকীল কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান বিচারপতি স্যর ফ্রান্সিস ম্যাক্লীন, বিচারপতি ম্যাকফার্সন, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর হেনরি প্রিন্সেপ, মিষ্টার নরিস, মিঃ পিগট এবং সারদাচরণ মিত্র তাঁহার বিবিধ গুণগ্রামের উচ্চ প্রশংসা করিয়া আন্তরিক শোক প্রকাশ করেন। হাইকোর্ট ও শ্রীরামপুরের উকীল সভা, শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও শোকসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়। এস্থলে তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা সম্ভব নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার একটি সুন্দর তৈল-চিত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ত্রৈলোক্যনাথ সাধু ও সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় "তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপূর্ব্ব কর্ম্মনিপুণতা, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অহঙ্কারশূন্য স্বাধীন প্রকৃতি এবং মধুর সৌজন্য তাঁহাকে সকলের শ্রদ্ধাভাজন করিয়াছিল। তাঁহার অকাল বিয়োগে যে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইয়াছে, বহুকাল তাহা অনুভূত হইবে।"

উপন্যাস

লক্ষ্মীর বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

প্রথম পরিচ্ছেদ—কোষ্ঠীর চক্রান্ত

হুগলী জেলার ত্রিশবিঘা গ্রাম সুপ্রসিদ্ধ। এককালে ইহা সপ্তগ্রামের এক গ্রাম ছিল। তখন পূর্ণযৌবনা সরস্বতীর মত এই গ্রামেরও শ্রী উথলিয়া উঠিত। সে সরস্বতী নাই—সে সপ্তগ্রামও নাই। ত্রিশবিঘা অতীত গৌরবের কঙ্কালের মত আছে। অবিরল তিন্তিড়ি বেণুবনের অবগুণ্ঠনে অট্টালিকাসমূহের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অতি বিরল বসতি। যে কয়েকঘর অধিবাসী আছে, তাহাদের গ্রামের প্রতি যে বিশেষ আকর্ষণ আছে তাহা নহে, শুধু অন্যত্র গিয়া নূতন বাসা বাঁধিবার মত অর্থ ও প্রাণশক্তি নাই বলিয়াই ইহারা পড়িয়া আছে।

ভরা সৌভাগ্যের দিনে এই গ্রামের রায় ও বসু পরিবারের ভিতর ঐশ্বর্য্য ও সমারোহের উৎকট স্পর্দ্ধা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। দুই পরিবারেরই অর্থ ছিল অপরিমিত; সম্পত্তি ও প্রতিষ্ঠারও সীমা ছিল না। সকল কাজেই—ইহাদের একের অন্যকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার নেশার অন্ত ছিল না। শুনা যায় এই নেশারই বশবর্ত্তী হইয়া একবার রায় পরিবারের একজন বারটি ও বসু পরিবারের একজন ষোলটি দারপরিগ্রহও করিয়াছিলেন। নবাব বাদশাদের ভোগৈশ্বর্য্যের তুলনায় বার কি ষোল দার-সংখ্যা অগ্রাহ্যই বটে, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসে ইহার মত অপরিমিতের দৃষ্টান্ত আর নাই। থাকিলেও তাহা সুবিদিত নহে।

যখন মর্য্যাদা ও কীর্ত্তিতে এই দুই বংশ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছিল, ঠিক তখনই কিন্তু সেই সঙ্গেই ইহাদের অর্থভাণ্ডার ক্রমশ হ্রস্ব হইতে হ্রস্বতর হইতেছিল। তবু লক্ষ্মী ছাড়া যায়, চাল ছাড়া যায় না। দান, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অতিথিশালা নির্ম্মাণ—পূজা-পার্ব্বণের ঘটায় প্রতিযোগিতা যখন অর্থাভাবে অসম্ভব হইল, তখন সামান্য ব্যক্তিগত ব্যাপার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিছুকাল চলিল; ইহাও ক্রমশ সদ্‌গুণের দ্বন্দ্ব হইতে অসদ্‌গুণের আত্মম্ভরিতাতে পরিণত হইবার মত হইল। কিন্তু এই সময়ে রায়বংশীয় ও বসু-বংশীয় সমস্ত আগাছা ও পরগাছা হঠাৎ একদিন অন্নচেষ্টার প্রবল বাত্যাতে কোথায় উড়িয়া গিয়া ছত্রভঙ্গ হইল। আসল বংশধর দুইজন তখন মোহমুক্ত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন নিজেদের অবস্থা। অবস্থা আর তখন নাই, দুরবস্থাই। দুইটি বংশের কীর্ত্তি ম্লান হইয়াছে—কলঙ্কিতও একেবারে হয় নাই তাহাও নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্ত নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল। উভয়তই এই কীর্ত্তিপূর্ণ বংশদ্বয়কে বাঁচাইবার চেষ্টার লক্ষণ দেখা গেল।

রায় বংশের রাধাবল্লভ বসু বংশের হরিনারায়ণকে বলিলেন, "হরিনারায়ণ, এখন আবার লক্ষ্মীর পুনরাহ্বান করা চাই। এতকাল তোমার আমার ও আমাদের উভয়ের পিতৃপুরুষের মিলিত চেষ্টা লক্ষ্মীকে বিদায় করিয়াছে—এইবার আমাদের ও আমাদের পরপুরুষদের পুনরায় লক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চাই। যতদিন তৈল ছিল—শত দীপ জ্বালান হইয়াছে; এখন তৈলাভাব। এর প্রতীকার কি?"

হরিনারায়ণ বয়সে রাধাবল্লভেরই সমান ছিলেন। বলিলেন "তা অনেককাল ভেবেছি, রাধাবল্লভ। কিন্তু সে হুগ্‌লী নেই, সে চুঁচড়া নেই—ব্যবসা চলে গেছে কলকাতাতে, হাতের বাইরে। লক্ষ্মীকে আর পাওয়া যায় কি করে? কোনও উপায়ই আর দেখি না। তা ছাড়া পূর্ব্বপুরুষদের মত সে ভাগ্যই বা কোথায়?"

রাধাবল্লভ বলিলেন, "তা বলে ত বসে থাকা চল্‌বে না। বংশ দুটোকে একেবারে লোপ পেতে দেওয়া চল্‌বে না। আর আমাদের একা কারও চেষ্টাতে কিছুই হবে না।

দুজনের যা কিছু আছে একত্র করা যাক্ এস। তারপর বিবেচ্য।"

হরিনারায়ণও বুঝিতেন—কিছু না করিলে অদূর ভবিষ্যতে বিষম অন্নাভাবে মরিতে হইবে। তাই ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা কিছু বাকী ছিল—ভাঙ্গা বসত-বাড়ী ব্যতীত সমস্তই বাঁধা দিয়া বিক্রয় করিয়া নগদ টাকাতে পরিণত করিলেন। রাধাবল্লভও তাহাই করিলেন। দুই জনের টাকা একত্রিত হইয়া হাজার দুই হইল, তখন রাধাবল্লভ ও হরিনারায়ণ গ্রামের নটবর মিত্রকে সেই টাকা দিয়া একখানি হ্যাণ্ডনোট লিখাইয়া ও বিশেষ সর্ত্ত না করিয়াই কলিকাতায় পাঠাইলেন ব্যবসা করিতে। নটবর তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও তৎকালে ২৫।২৬ বৎসরের উৎসাহপূর্ণ যুবক।

রাধাবল্লভ ইতিপূর্ব্বেই বিপত্নীক হইয়াছিলেন। সংসারে থাকিবার মধ্যে ছিল একটি এক বৎসরের শিশুকন্যা! রাধাবল্লভ অনেক আশা করিয়া কন্যার নাম দিয়াছিলেন লক্ষ্মী। হরিনারায়ণের স্ত্রীও ছিল, এক ৫।৭ বৎসরের পুত্রও ছিল। পুত্রের নাম ছিল শঙ্কর। নটবর মিত্রকে ব্যবসা করিতে পাঠাইয়া দুইজনে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, নটবর ব্যবসা কতদূর কি করিল তাহার আশাতে। কিন্তু রাধাবল্লভ দুই তিন বৎসরের অধিক অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে হরিনারায়ণকে ডাকিয়া কহিলেন, "হরিনারায়ণ, আমি চল্লুম। লক্ষ্মীকে তোমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি। পার ত শঙ্করের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ো। আর নটবর কি করে দেখ।"

হরিনারায়ণ কোনও কিছু অঙ্গীকার না করিয়া লক্ষ্মীকে গ্রহণ করিলেন। তারপর উদ্বিগ্নচিত্তে নটবরের পথ চাহিয়া রহিলেন। একদিন নটবরও দেখা দিল—গ্রামে তাহার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি ছিল তাহাদের লইতে। হরিনারায়ণের হাতে দুই হাজার টাকাই প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "হ'ল না, ব্যবসা করা অসম্ভব। সাহেব, মাড়োয়ারি, ভাটিয়া, মুসলমান—সবাই ব্যবসা খেয়ে ফেলেছে। দু এক হাজারের কর্ম্ম নয়। শুধু শুধু টাকাটা কেন জলে দিয়ে দায়িত্ব ঘাড়ে নিই।"

হরিনারায়ণ নটবরের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন। কেন না আসল টাকাটা সম্বন্ধেই তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল।

ইহার পর নটবর আপনার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লইয়া কলিকাতাতে কি এক চাকরি করিতে গেল। আরও দশ বৎসর কাটিয়া গেল। হরিনারায়ণ সেই দুই হাজার টাকা ঘরে বসিয়া খাইলেন। শেষে তাঁহারও স্ত্রীবিয়োগ ঘটিল। অর্থাভাবে, বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীকে হারাইয়া ম্যালেরিয়াতে হরিনারায়ণের অন্তকাল নিকটবর্ত্তী হইল। ভাবিলেন, 'এইবার সবই গেল। এত বড় দুইটি বংশ যাইবে।' তিনি ক্রমে এই দুশ্চিন্তাতে এত কাতর হইলেন যে তাঁহাকে শয্যা লইতে হইল। কিন্তু তবুও ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল না! তখন লক্ষ্মীর বয়স প্রায় ষোল-সতের, শঙ্করের প্রায় বাইশ তেইশ।

পাড়ার মুখুয্যে মশায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া হরিনারায়ণ শেষে নটবরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন—যদি মৃত্যুকালে শঙ্কর ও লক্ষ্মীর ব্যবস্থা করিয়া যাইতে পারেন। গ্রামের মধ্যে এমন কেহই ছিল না—যে এই দুইটি প্রাণীর ভার বা দায়িত্ব লইতে পারে। গ্রাম তখন একেবারে দরিদ্র নিঃসম্বল প্রাণীদের একটা আত্ম-গোপনের স্থানমাত্রে পরিণত হইয়াছে। যাহাদের কিছুমাত্র প্রাণ বা উৎসাহ ছিল—তাহারা ইতিপূর্ব্বেই বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—এমন ছড়াইয়া পড়িয়াছে যে তাহাদের সকলের ঠিকানা মিলাও দায়। কেবল নটবরই এখন ধনী; কলিকাতার মধ্যে প্রতিষ্ঠাশালী ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছে। নটবরের উপর হরিনারায়ণের বিশ্বাসও ছিল—সে উপকৃত ও স্বগ্রামবাসী। নটবরও কি ভাবিয়া হরিনারায়ণের শেষ অনুরোধ রক্ষা করিতে গ্রামে আসিলেন।

হরিনারায়ণ তাঁহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইলেন। বলিলেন, "নটবর, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে।" নটবর আত্ম-প্রত্যয়ী, বুদ্ধিজীবী ব্যক্তি—কোনওরূপ উৎসাহ না দেখাইয়া শান্তভাবে বলিলেন, "বটে!"—তারপর সন্দেহের দৃষ্টিতে সমুপস্থিত বৃদ্ধ মুখুয্যে মশায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

হরিনারায়ণ বলিলেন, "আমার সময় এসেছে, সেজন্য দুঃখ নেই, যেতে হবে বলেই এসেছি। কিন্তু আমাদের ও রাধাবল্লভের বংশের কথা ভেবে আকুল হ'চ্ছি। এ দুটো বংশকে লোপ হ'তে দেওয়া মহাপাতক হবে।"

নটবর উদাসভাবে ঘরের ভিতর দিকের ছাদে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "হুঁ।"

হরিনারায়ণ কহিলেন, "এ দুই বংশকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় রাধাবল্লভ বলে গিয়েছিল—সেটা লক্ষ্মীর সঙ্গে শঙ্করের বিবাহ দেওয়া। নানা কারণে কিন্তু আমি আজও তা ঘটিয়ে উঠ্‌তে পারি নি। প্রথমতঃ, অর্থাভাব। শুধু দুইটি বংশের মর্য্যাদার ভারই উহাদের স্কন্ধে চাপিয়ে ছেড়ে দেওয়া সুবিবেচনা নয়। দ্বিতীয়তঃ, শঙ্করের স্বাস্থ্যও ভাল নয়—আর সেজন্য আজও ও কিছু শিখ্‌তে পারে নি, স্কুলে নামমাত্র গিয়েছিল—আর ওর বুদ্ধিটাও একটু মোটা গোছের। ওর উপর কোনও এমন ভরসা নেই যে ভবিষ্যতে ও কোনরূপে জীবিকার্জ্জন কর্‌তে পার্‌বে। আর তৃতীয়তঃ—শঙ্করের কোষ্ঠী-গণনাতে আছে যে ওর সংসার-বৈরাগ্য বড় বেশী। কাশীর ভৃগুসংহিতা কার্য্যালয় থেকেও গণনা করিয়ে দেখেছি—যে সে কথা সত্য। এমন কি তারা এও বলেছে যে যদি ওর অমতে বিয়ে দেওয়া হয়, তবে ও তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ কর্‌বে। মিথ্যা ওর নাম শঙ্কর রাখি নি। এই সব অবস্থাতে কি করে লক্ষ্মীকে শঙ্করের হাতে দিই? দেওয়া সঙ্গত মনে করি নি।"

নটবর মিত্র শুনিয়া পরম বিস্মিত হইলেন। কিন্তু সম্ভব তৎক্ষণাৎ তাঁর স্মরণ হইল অতটা বিস্ময় দেখান তাঁর মত কৃতী পুরুষের পক্ষে অশোভন, তাই তখনই তাহা গোপন করিলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ, বসন্তের দাগে কলঙ্কিত মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু দৃষ্টি তাঁহার কড়িকাঠেই নিবদ্ধ রহিল।

হরিনারায়ণ কহিলেন—একটু চুপ করার পর—"তাই আমি তোমাকে ডেকেছি। আমার দুইটি অনুরোধ আছে। প্রথম, তুমি কৃতী পুরুষ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছ—শঙ্করকে জীবিকার্জ্জনের একটা পথ দেখিয়ে দেবে। ও বোকা, নির্বুদ্ধি বটে—তবে খুব সরল ও বিশ্বাসী। দ্বিতীয় অনুরোধ এই যে—ভবিষ্যতে ও যদি বিবাহ করিতে চায় তবে লক্ষ্মীর সঙ্গেই ওর বিয়ে দেবে। এইজন্যই এতদিন লক্ষ্মীর বিয়ে দিই নি কোথাও। অবশ্য রাধাবল্লভের কাছে আমার কোনও প্রতিশ্রুতি নাই—তবু তাহার বংশের মান রাখা চাই বই কি। এ ত শুধু কাঞ্চন-কৌলিন্য নয়। এ দুইটি অনুরোধ রাখবে?"

নটবর মনে মনে এইরূপই একটা আশঙ্কা করিতেছিলেন। সব কথা শুনিয়া লইয়া প্রথমে বলিলেন "হুঁ!" তারপর মুখুয্যেমশায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বড় ভুল ক'রেছেন ও কোষ্ঠী-টোষ্ঠী বাজে ধাপ্পা। এতদিন ওদের বিয়ে দিলেই হ'ত; লক্ষ্মী কি? না মায়া। মায়া কি? না স্ত্রীলোক। মায়া বড়, না সন্ন্যাস বড়? মায়া বড়। অনেক সন্ন্যাসী তলিয়ে গেছে—আছে মায়া। খুব প্রবলভাবেই আছে, না?"

মুখুয্যেমশায় এইরূপ প্রশ্নোত্তরের মধ্যে হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, "তা বটে।" নটবর উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "এখন মায়া-রজ্জুতে সন্ন্যাসীকে বাঁধা তাহলে কিছুই মুস্কিল নয়—কেমন? শঙ্কর সম্ভব এখনও প্রাণায়াম কুম্ভক রেচক প্রভৃতি করে নি? সম্ভব সে এখনও হিমালয়ের গুহাতে গিয়ে বোধিসত্ত্ব বনে নি? তখন সে আর কি? নগণ্য। আপনি ভুল বুঝেছেন। আজই গোধূলি-লগ্নে ওদের বিয়ে দিন। আপনাকে কিছু ক'রতে হবে না—স্রেফ শুয়ে শুয়ে দেখুন—কেমন আমি লক্ষ্মীরূপ মায়া রজ্জুতে শঙ্কররূপ সন্ন্যাসকে বাঁধিয়ে দিই।"

মুখুয্যেমশায় ও হরিনারায়ণ উভয়েই নটবরের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে বিমুগ্ধ হইলেন, মুখুয্যেমশায় কিছু বলিলেন না। হরিনারায়ণ একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সে কথাটা একবার যে ভাবি নি, তা নয়, নটবর। কিন্তু তাতে উল্টো ফলও ফল্‌তে পারে ত! লক্ষ্মী যে এতদিন এ সংসারে আছে—কোনও দিন শঙ্কর তাকে চেয়েও দেখে নি। এ সংসার বৈরাগ্যের লক্ষণ হে। যুবক যুবতীর মধ্যে এ রকম কখনও দেখেছ? আমার গৃহিণী একথা বুঝ্‌তেন, তাঁর কাছেই আমি সব শুনেছি। তাতেই আশঙ্কা হয় বিপরীত ফল হ'তে পারে!"

নটবর একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "হাঁ! পাড়াগাঁ তবে বল্‌বে কেন? শহরে গিয়ে থাকলে এ রকম বাজে কথাতে ভয় খেতেন না, সেখানে এরকম প্রেজুডিশ্‌ (prejudice) নাই—তা জানেন? আর সব ক্ষেত্রে কি মেয়েদের কথা মানা চলে? 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী!' স্ত্রী-বুদ্ধিতেই প্রলয়। প্রলয় কি—না স্ত্রীবুদ্ধি। কেমন মুখুয্যেমশায়? এই ত শাস্ত্র?"

মুখুয্যেমশায়ের শীর্ণ মুখমণ্ডল একটু কুঞ্চিত হইল; তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "তা শাস্ত্রে ঐ রকমই বলে বটে—তবু সংসারের কথা আলাদা নটবর!"

নটবর উঠিয়া গিয়া মুখুয্যেমশায়ের পদধূলি লইয়া মাথায় রাখিলেন, তার পর স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া বসিয়া বলিলেন, "যথার্থ! তাই-ই আমি বল্‌ছিলুম, মুখুয্যেমশায়! প্রলয় কি—না স্ত্রীবুদ্ধি। এখন শঙ্করের সন্ন্যাসে ও কোষ্ঠীতে যদি প্রলয় ঘটাতে চান—তাকে একেবারে ধ্বংস ক'রতে চান, তবে তার সন্ন্যাসের পিছনে স্ত্রীবুদ্ধির প্রলয় লাগিয়ে দিন। ফর্সা হয়ে যাবে।"

হরিনারায়ণ চুপ করিয়া সমস্তই শুনিতেছিলেন। এখন কহিলেন, "শঙ্করকে না হয় একবার জিজ্ঞাসা করাই যাক্—ওর কি মত। তাহলে নিশ্চিন্তভাবে এ কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য তোমার কথাতেই সাহস ক'র্‌ছি।"

নটবর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন, "শঙ্করকে? এ সব কলকাতার ফ্যাসান! পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম—পুত্র—আবার কি? এ শিক্ষাই শাস্ত্র। নয় কি মুখুয্যেমশায়? পিতাই পুত্রের গোড়া—মূল নয় কি?"

মুখুয্যেমশায় নটবরের শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তির পরিসর দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

নটবর কহিলেন, "আপনি যা বল্‌ছেন, শঙ্করের তাই করা উচিত। অন্তত আমার পুত্রদের এই শিক্ষাই আমি বরাবর দিয়েছি। সুতরাং শঙ্কর বিবাহ ক'র্‌তে বাধ্য। আর বিবাহে কি হয়—না—পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা! তখন আপনার ও স্বর্গীয় রাধাবল্লভের বংশরক্ষার আর কোনও সন্দেহ থাকৃতে পারে না।"

হরিনারায়ণও ক্রমে শাস্ত্রের ভার সহ্য করিতে পারিলেন না; বলিলেন, "কিন্তু এ সব ভার নেবে কে নটবর, এখন? আমি ত আর বেশীক্ষণ নই!"

নটবর উঠিয়া দাঁড়াইয়া উত্তর দিলেন, "সে ভার আমাকেই দাও। তুমি সুস্থির হয়ে শুয়ে থাক কেবল। আর পুত্রের বিয়েটা দেখেই যাও।"

নটবর আর অপেক্ষা না করিয়া মুখুয্যেমশায়কে লইয়া পুরোহিত ও নাপিতের ব্যবস্থা করিতে গেলেন।

হরিনারায়ণ শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ নটবরের পরামর্শ তাঁহার কাছে অতি সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। এতদিন যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন নাই তাই ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন।

কিন্তু হরিনারায়ণের সম্মতি ও নটবরের উৎসাহ বিফল হইল। নটবর যখন নাপিত ও পুরোহিতের ব্যবস্থা করিয়া, আকস্মিক বিবাহের সংবাদে গ্রামে একটা বিস্মিত কৌতূহল সৃষ্টি করিয়া, কিছু প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের আশাতে হরিনারায়ণের গৃহে দুই ঘণ্টা পরে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন দেখিলেন হরিনারায়ণের অবস্থা মন্দ। শঙ্কর ও লক্ষ্মী উভয়েই মুমূর্ষুর সেবাতে ব্যস্ত। নটবর তাহাতেও দমিলেন না; কিন্তু যখন শঙ্করকে অন্তরালে ডাকিয়া কিছু অর্থ চাহিয়া শুনিলেন বাড়ীতে কপর্দ্দকও সঞ্চিত নাই, তখন আর অগ্রসর হওয়া সুবিবেচনা মনে করিলেন না, নিতান্ত হতাশভাবে শুধু বলিলেন, "তাই ত হে, তবে চিকিৎসার কি হবে? আমি উপস্থিত থেকে ত দেখ্‌তে পার্‌ব না যে বোসজা বিনা চিকিৎসাতে মর্‌বে!"

শঙ্কর নিরুপায়ভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

নটবর তাহার মুখ হইতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে তাকাইয়া কিছুকাল নিবিষ্ট মনে দেখিলেন। লক্ষ্মীকে ইতিপূর্ব্বে তিনি একবার দেখিয়াছিলেন—কিন্তু সে স্মরণই হয় না। হঠাৎ তার পর কহিলেন, "তবে আমি চল্‌লুম শঙ্কর, এই গাড়ীতেই কলকাতাতে; ফিরতি ট্রেণে ডাক্তার ও ওষুধ দুই-ই নিয়ে আস্‌ছি। এমন বিনা চিকিৎসাতে মানুষ মর্‌বে—তা দেখতে পার্‌ব না। তোমরা ততক্ষণে একটু সাবধানে থেক। আমি ফিরতি ট্রেণেই আস্‌ছি। তোমার বাবাকে বাঁচান চাই।"

নটবর আর একবার লক্ষ্মীর দিকে তাকাইয়া ট্রেণ ধরিতে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেলেন। পরদিন প্রভাতে যখন হরিনারায়ণের মৃত্যু ঘটিল নটবরের ফিরতি ট্রেণ তখনও আসে নাই; সমস্ত দিনের পরে সৎকারাদির শেষে শঙ্কর ও লক্ষ্মী যখন অন্ধকারপূর্ণ জীর্ণ অট্টালিকাতে বসিয়া অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যত ভাবিতেছিল, তখনও নটবরের ট্রেণ ত্রিশবিঘাতে পৌঁছায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—লক্ষ্মীর রাগ

হরিনারায়ণের মৃত্যুর দুই দিন পরে নটবরের খামে এক পত্র আসিল শঙ্করের নামে। শঙ্কর পত্র খুলিয়া পড়িল;—

"প্রবল স্নেহাস্পদেষু—

পরে শঙ্কর বাবাজীবন, সেদিন আসিবার কালে ত্রিশবিঘা

ষ্টেশনে চলন্ত গাড়িতে উঠিতে চেষ্টা করিয়া পদস্খলন ঘটে ও তাহাতে পড়িয়া গিয়া বিস্তর চোট লাগে। দুই চার জন কোনও মতে গাড়িতে উঠাইয়া দেয়। কোনওরূপে কলিকাতাতে পৌছিয়াই ভীষণ জ্বর ও যন্ত্রণাতে শয্যাশায়ী হই। বিধাতার ইচ্ছা সবই। উপস্থিত তোমাদের সংবাদ অতি সত্বর দিয়া সুখী করিবে। কারণ আমার মনের উদ্বেগের অন্ত নাই, যদিও শরীর অত্যন্ত কাতর। তোমাদের কারণ আমার দুশ্চিন্তা প্রবল হইয়াছে। আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

শ্রীনটবর মিত্র।"

পত্র পাঠ করিয়া শঙ্কর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। তাহার নিরুপায় অবস্থাতে নটবরের এই সহানুভূতি তাহাকে বিচলিত করিল। এই দুই দিন সে অত্যন্ত হতাশ ও নিরুপায় হইয়াই কাটাইয়াছে। ইহার উপর আবার গ্রামের দুইচারিজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া ও লক্ষ্মীর কোনও একটা ব্যবস্থা সত্বর করিতে পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সে কি ব্যবস্থা করিবে ভাবিয়া পায় নাই। তাহার বাইশ তেইশ বৎসর বয়স হইয়াছে বটে—কিন্তু সে কিছুই শিক্ষা করে নাই। বৎসরের মধ্যে প্রায় নয় মাস সে ম্যালেরিয়াতে ভুগিত—সে অবস্থাতে পড়াশুনা করা অসম্ভব ছিল। তাহার দীর্ঘ ক্ষীণ দেহ কৃশতা হেতু দীর্ঘতর মনে হইত, রং তাহার এক সময়ে গৌর ছিল বটে—কিন্তু ভুগিয়া তাহা ম্লান হইয়াছে। দেহে প্রাণও ক্ষীণ, সর্ব্বপ্রকারে রিক্ত সে; পিতার মৃত্যুর পর কি যে সে করিবে তাহা ভাবিবার শক্তিও তাহার ছিল না! নটবরের পত্র পাইয়া সে তাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস। পত্রখানি হাতে লইয়া সে লক্ষ্মীকে ডাকিল, "লক্ষ্মী, শোন!"

লক্ষ্মী তখন কি এক গৃহকর্ম্মে রত ছিল, বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নটবরের পত্রখানি তাহার হাতে দিয়া শঙ্কর বলিল, "পড়!"

পত্র পড়িয়া লক্ষ্মী ভ্রূ ও ওষ্ঠ দুই একসঙ্গে কুঞ্চিত করিল। শঙ্কর সাগ্রহে কহিল, "আমি ভাব্‌ছি একবার আজই কলকাতাতে যাই—নটবরকাকার সঙ্গে পরামর্শ করিগে, কি করা যায়। আবার রাত্রের ট্রেণেই ফিরবো।"

লক্ষ্মী চিঠিখানি ফিরাইয়া দিয়া সংক্ষেপে বলিল, "বেশ!"

শঙ্কর আরও একটু ভাবিয়া কহিল, "তাই ভাল। ফিরে এসে তখন যা' হয় করা যাবে।" সে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিহীন চক্ষুতে চাহিয়া কিন্তু যেন তখনই ভাবিতে লাগিল। শঙ্করের এই আকস্মিক দায়িত্বজ্ঞান দেখিয়া লক্ষ্মী একটু হাস্য করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইয়া বলিল, "যাবে ত যাও না, দেরী করে লাভ কি? কিন্তু কিছু যে বিশেষ ফল হবে বলে মনে হয় না। ও লোকটিকে আমার বিশেষ ভাল বলে মনে হয় না।"

শঙ্করের যেন চমক ভাঙ্গিল, "না, না! নটবরকাকা তেমন লোক নয়, যেমন ভাবছ তেমন নয়। আচ্ছা, দেখাই যাক্!" সে উঠিল। লক্ষ্মী আর কোনও কথা না কহিয়া স্বকর্ম্মে প্রস্থান করিল। শঙ্করের সহিত পরামর্শ বৃথা তাহা সে জানিত।

শঙ্কর আপন অবস্থা বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু লক্ষ্মী তাহার সহজ স্ত্রী-বুদ্ধিতে সমস্তই বুঝিয়াছিল। যতদিন হরিনারায়ণ ছিলেন, এ গৃহে বাস করা লক্ষ্মীর তত অসুবিধাজনক হয় নাই, কিন্তু এইবার বাস করা কিরূপে চলিবে সে বুঝিতে পারিতেছিল না। শঙ্করের সহিত তাহার বিবাহ যে হইবার একটা প্রস্তাব ছিল তাহা সে জানিত; তবে কেন তাহার ষোড়শবর্ষেও সে বিবাহ ঘটে নাই তাহা সে স্পষ্টরূপে জানিত না। ইহার পরেও ঘটিবে কি না তাহাও তাহার কল্পনাতীত ছিল। শঙ্করের ব্যবহার হইতে সে কিছুই বুঝিত না। শঙ্করের কাছে সে একটি সচল, সজীব প্রাণীও নহে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুবিশেষ। শঙ্কর সত্যই তাহার দিকে কখনও কোনও রকম অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখে নাই, হরিনারায়ণ মিথ্যা বলেন নাই। অথচ লক্ষ্মীর উজ্জ্বল শ্যাম দেহলতা, অপরূপ মুখসৌষ্ঠব কোনদিনই কোন যুবক অগ্রাহ্য করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না। তবে শঙ্করের ব্যবহারে সে কোনদিনই আঘাত পায় নাই, অভিমান করে নাই। শুধু মাঝে মাঝে এই লোকটির সম্বন্ধে তাহার একটা কৌতূহল হইত।

শঙ্কর কলিকাতায় গেল, নটবরের সাক্ষাত ও পরামর্শ করিয়া সন্ধ্যার পরই প্রত্যাগত হইল। রাত্রে আহারাদির পর বিশ্রাম করিতে করিতে লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, "কি হ'ল? কি কাণ্ড করে এলে?"

শঙ্কর নিরুৎসাহভাবে উত্তর দিল, "বড় বিষম কথা,

লক্ষ্মী! নটবরকাকা বলেন 'তোমাকে বিবাহ করে এই গ্রামেই বাস করতে!"

লক্ষ্মী একটু হাসিয়া কহিল, "এর জন্য কলকাতাতে না গেলেও হ'ত! তা কথাটা বিষম কিসে?"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া হ্যারিকেনের আলোতে লক্ষ্মীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বিষম না? একশ বার বিষম! ও বিয়ে থা আমার দ্বারা পোষাবে না। তুমি সে কথা মনেও ঠাঁই দিও না। মরি আর কি?"

লক্ষ্মী বলিল, "আচ্ছা, সে যেন হ'ল। অন্য কি কথা হল শুনি?"

শঙ্কর বলিল, "বিশেষ আর কি? তবে আমাকে বলেছেন কলকাতাতে গিয়ে তাঁর কাছে ব্যবসা শিখ্‌তে, সেও আমার দ্বারা হবে না।"

লক্ষ্মী প্রশ্ন করিল, "তবে তোমার দ্বারা কি হবে?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "কিছু না।"

লক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হইল। একটু চিন্তা করিয়া সে বলিল, "বেশ! তোমার কিছু না কর্লেও চল্‌বে, আমার তা বলে চল্‌বে না। আমাকে রাঙ্গা-মাসীর কাছে চাত্‌রাতে পাঠিয়ে দাও। দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কিছু না কর।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে কি কর্‌বে?"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে বলিল, "অনেক কাজ আছে কর্‌বার।"

শঙ্কর আরও একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "নটবর-কাকা আরও বলেছেন যে যদি আমি বিয়ে না করি—আমি তখনই বলে দিলুম যে বিয়ে করতে আমি পারব না—তা হলে তোমাকে তাঁর কাছে রেখে আস্‌তে। তিনি তোমাকে স্কুলে পড়াবেন—বিয়ের ব্যবস্থাও কর্‌বেন। হাজার হোক্ তোমারও পিতৃবন্ধু কি না! সে ব্যবস্থা মন্দ হবে না। চাত্‌রাতে কে আছে—তার কাছে কখনও যাও নি, দেখ নি কাকেও—তার চেয়ে এ জানাশোনা লোক —আর অত্যন্ত বড় লোকও—"

লক্ষ্মী অত্যন্ত নির্ব্বাক হইয়া শুনিতেছে দেখিয়া শঙ্করের কথার স্রোত হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সে উদাসভাবে কহিল, "তা যেমন তোমার ইচ্ছা হবে, ক'র্‌বে—লক্ষ্মী, আমার কি? আমার দ্বারা কিছু হবে না।"

এইবার লক্ষ্মী একটু বিরক্ত হইয়া বলিল, "কেন হবে না শুনি! তুমি কি মানুষ নও? হাত পা নেই? বল্‌তে লজ্জা করে না?"

কিন্তু কে কাহাকে তিরস্কার করে? শঙ্কর উদাস দৃষ্টিতে শূন্যের দিকে তাকাইয়া বলিল, "আমার দ্বারা কি হবে? কিছু না। নটবরকাকাও তা বুঝেছেন।"

লক্ষ্মীর বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। সে বলিল, "বলুক! কিন্তু কিছু কর্‌তেই হবে তোমাকে। না কর —ত কালই আমি চাত্‌রাতে রাঙ্গামাসীর কাছে যাব চলে, তা বলে দিচ্ছি।"

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া উত্তর করিল, "চাত্‌রাতে? সে কোথায়?"

লক্ষ্মী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "চুলোয়!" শঙ্কর কিছু বুঝিতে পারিল না—ঠিক চুলোর কোন স্থানে চাত্‌রা ও রাঙ্গামাসী। সে শুধু বুঝিল—লক্ষ্মী ক্রুদ্ধ হইয়াছে, তাই সভয়ে কহিল, "আচ্ছা, আচ্ছা, বাপু, যাবে ত অত রাগ কেন?" ও আর অপেক্ষা করা সুযুক্তি না মনে করাতে তৎক্ষণাৎ নিজের ঘরে শয়ন করিতে গেল। লক্ষ্মীকে সে বস্তুবিশেষ—যন্ত্রবিশেষ ভাবিলেও ভয় করিত।

লক্ষ্মী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মুখুয্যে মশায় তাঁহার অনুগত একটি নীচজাতীয়া স্ত্রীলোককে রাত্রে লক্ষ্মীর কাছে শুইতে পাঠাইতেন। সে আসিলে লক্ষ্মী শুইতে গেল, কিন্তু সারারাত্রি তাহার দুর্ভাবনাতে ঘুম হইল না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া শঙ্কর ডাকিল, "লক্ষ্মী!"

লক্ষ্মী বিরক্তই ছিল, উত্তর করিল না।

শঙ্কর বুঝিল; একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "আজ ত্রিবেণীতে যাচ্ছি গঙ্গাস্নানে, দু একটা টাকা দেবে?"

লক্ষ্মী তাহা গ্রাহ্য না করিয়া আপনার গৃহকর্ম্ম করিতে গেল। শঙ্কর এইবার রুষ্ট হইল, সে লক্ষ্মীর পিছনে পিছনে গিয়া বলিল, "টাকা দেবে না?"

লক্ষ্মী সংক্ষেপে কহিল, "না। টাকা সস্তা নেই আমার! পুণ্যি করতে হয় পায়ে হেঁটে যাও!"

শঙ্কর একটু দাঁড়াইয়া ভাবিয়া বলিল, "টাকা তোমার?"

লক্ষ্মী উত্তর দিল, "হাঁ।" শঙ্কর সজোরে মাথা নাড়িয়া উত্তেজিত হইয়া বলিল, "না, টাকা আমার বাবার! তোমার টাকা কিসের? আমি জানি না বুঝি? দাও, শীগ্‌গির!"

লক্ষ্মী তাহাতে কর্ণপাত করিল না। সে যেমন নিজের কাজ করিতেছিল, তেমনই করিয়া চলিল। শঙ্কর ক্রুদ্ধ হইয়া সজোরে পদক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মীর কক্ষে গিয়া তাহার ছোট হাতবাক্সটি লইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল তাহাতে চাবি দেওয়া। সে তাহা কুক্ষিগত করিয়া লক্ষ্মীর কাছে পুনরায় গিয়া বলিল, "এই বাক্স আমি নিয়ে পূর্ণকামারের কাছে চল্‌লুম; টাকা নিয়ে আমি আজই কলকাতা যাব। এখানে আর কিছুতেই থাক্‌ব না। তোমার ভাঙ্গা বাড়ী নিয়ে থাক তুমি!" বলিয়াই সে বীরপদে সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মী চীৎকার করিয়া বলিল, "খবরদার বল্‌ছি; বাক্স রেখে দাও গে! না হ'লে ভাল হবে না।" কিন্তু শঙ্কর তাহা শুনিল না, সে তাহা লইয়া বাড়ী ত্যাগ করিল। লক্ষ্মী যখন তাহার পিছনে সদর দ্বার পর্য্যন্ত ছুটিয়া গেল, তখন দেখিল শঙ্কর বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। সেও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "যাক্ গে চুলোতে সব!"

শঙ্কর কিছু পথ গিয়াই—লক্ষ্মীর কথা ভাবিয়া ভীত হইল, কিন্তু সে বাড়ী ফিরিল না। মুখুয্যে মশায়ের বাড়ীতে গিয়া মুখুয্যে-গৃহিণীকে বলিল, "জ্যেঠি মা, এই বাক্সটা রেখে দাও ত, লক্ষ্মী এলে দিয়ো। আর আমাকে একটা কি দুটো টাকা দিতে পার?"

মুখুয্যে-গৃহিণী বলিলেন, "টাকা কোথায় পাব মণি! তা এ বাক্সে কি আছে? এ তুই কোথা থেকে নিয়ে এলি?"

শঙ্কর উত্তর করিল, "বাক্সে টাকা আছে জানি আমি। লক্ষ্মীর কাছে টাকা চাইলুম, দিলে না, তাই নিয়ে এসেছি উঠিয়ে। টাকা ত বাবার, লক্ষ্মীর নয়। তা নিক্‌গে, লক্ষ্মী। আমি কল্‌কাতায় গিয়ে অনেক টাকা রোজকার ক'র্‌ব পরে! এখন আমি গঙ্গাস্নানে ত্রিবেণী চল্‌লুম। হেঁটেই যাই, আর কি হবে? বাড়ীতে যাচ্ছি না। লক্ষ্মী থাক্‌তে আর না।"

সে হন্ হন্ করিয়া বাহির হইয়া গেল। মুখুয্যে-গৃহিণী বাক্সটি তুলিয়া লইয়া কি ভাবিলেন, তারপর বসুদের বাড়ীতে গিয়া লক্ষ্মীকে সমস্ত কথা জানাইয়া বাক্স দিয়া আসিলেন।

লক্ষ্মী সেদিন সারাদিন অপেক্ষা করিল, শঙ্কর আসিল না। রাত্রে সে বাক্স ও অন্য দুই একটা অপেক্ষাকৃত মূল্যবান্ জিনিস লইয়া মুখুয্যে বাড়ীতেই গিয়া রহিল। পরদিনও শঙ্করের দেখা নাই, লক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইল, কিন্তু তাহার রাগও হইল অত্যন্ত। সত্যই ত শঙ্কর আর শিশুটি নহে। বয়স ত হইয়াছে যথেষ্ট। এতটুকু আক্কেলবুদ্ধি যে পুরুষের নাই—তাহার উপর ভবিষ্যতের ভরসাই বা কি করিয়া করা যায়? লক্ষ্মী শেষে ভাবিল, এইবেলা অন্যত্র আশ্রয় লওয়াই ভাল। এইরূপে শঙ্করের গলগ্রহ হইয়া থাকা উচিত কার্য্য হইবে না। সে যদিও চাত্‌রার মাসীকে কখনও দেখে নাই, তবু সে একবার সেই আশ্রয়ই চেষ্টা করিতে মনস্থ করিল।

সে রাত্রে মুখুয্যে-বাড়ীতে শুইতে গিয়া সে মুখুয্যে মশায়ের সহিত পরামর্শ করিল এ বিষয়ে। মুখুয্যে মশায় লক্ষ্মীর প্রস্তাব সমীচীন মনে করিলেন, পাগ্‌লা শঙ্করের উপর ভরসা নাই। মেয়েটার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকারময়—ভাবিয়া তিনিও দুঃখিত হইলেন।

পরদিন লক্ষ্মী যাওয়াই স্থির করিল একেবারে। মুখুয্যে মশায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইয়াছিল শ্রীরামপুরে। তাহাকেও দেখিয়া আসা হইবে এই সূত্রে, এই ভাবিয়া তিনি লক্ষ্মীকে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

লক্ষ্মী তাহার প্রয়োজনীয় দুই চারিখানা বস্ত্র লইয়া পুঁটলি বাঁধিল। বাক্স খুলিয়া দেখিল তাহাতে মোট দুইকুড়ি পোনর টাকা আছে। সে অত টাকা লইতে সাহস করিল না। মুখুয্যে মশায়কেও দিল না। বাড়ীরই মধ্যে এক স্থানে মাটির নীচে গোপন করিল—কেবল নিজের ব্যবহারের জন্য দশটি টাকা লইল ও শঙ্করের ব্যবহারের জন্য পাঁচ টাকা মুখুয্যে গৃহিণীর কাছে জমা রাখিয়া দিয়া বলিল, "জ্যেঠিমা, এই টাকা তোমার ছেলেকে দিয়ো। দিয়ে পার ত কল্‌কাতাতে পাঠিয়ো।" মুখুয্যে মশায় বলিলেন, "তাই হবে!"

লক্ষ্মী রাগের মাথাতেই ত্রিশবিঘা ছাড়িয়া যাইতে দ্বিধা করিল না—যাইবার সময় তাহার মনে কোনরকম ক্লেশও হইল না।

পরদিন অবেলাতে শঙ্কর গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিল। বাড়ীর সদর দ্বারে তালা দেখিয়া সে একটু আশ্চর্য্য হইল। মুখুয্যেবাড়ীতে গিয়া শুনিল যে লক্ষ্মী চাত্‌রাতে গিয়াছে। শুনিয়া সে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। সত্যই যে লক্ষ্মী চাত্‌রাতে যাইবে তাহা সে ভাবেও নাই।

মুখুয্যে-গৃহিণী বলিলেন, "তা তোরই দোষ, শঙ্কর। সত্য ত সে এমনি থাক্‌তে পারে না। বিয়ে কোরতিস্ তোরা, সে এক কথা। তা যখন তুই কর্‌বি না, তখন কি করে সে থাকে তোর ঘরে ?"

শঙ্কর শুনিয়াও শুনিল না। সে তখন ভাবিতেছিল যে লক্ষ্মী এতটা রাগ করিয়াছে ও করিবে জানিলে, সে কখনও কোনও রকম দুষ্কৃতি করিত না।

মুখুয্যে-গৃহিণী বলিলেন, "তোর জন্য পাঁচ টাকা রেখে গেছে—নিবি ?"

তিনি গৃহের চাবিও পাঁচ টাকা আনিয়া শঙ্করের সম্মুখে রাখিলেন। শঙ্কর বসিয়া বসিয়া কিছুক্ষণ আরও ভাবিল। তারপর চাবি মুখুয্যে-গৃহিণীকে ফেরত দিয়া টাকা পাঁচটি লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বাড়ীর চাবি রইল, জ্যেঠি মা। তোমরা দেখাশোনা কর। আমি আর ও বাড়ীতে ঢুক্‌ছি না। কলকাতায় চল্‌লুম।"

তাহার শুষ্ক মুখ দেখিয়া মুখুয্যে-গৃহিণী ব্যথিত হইয়া কহিলেন, "সে কি রে ? বাড়ীঘর ছেড়ে যাবি কি ? তুই কি এখনই সন্ন্যাস নিবি নাকি ? বাপপিতামহের ভিটেতে শেষে সন্ধ্যে পড়্‌বে না ?"

শঙ্কর উত্তর করিল, "নেই পড়ুক গে। আমি আর কি করবো ? আমার ভরসাতে তো ভিটে রেখে বাবা যান নি। লক্ষ্মীর ভরসাতে রেখেছিলেন। আমার দ্বারা কিছু হবে না—তাত সবাই জানে।"

মুখুয্যে-গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "খেয়েছিস্ কিছু ? খাবি ?"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জানাইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। মনে মনে লক্ষ্মীর প্রতি তাহার অভিমানের অন্ত রহিল না।

কতকটা আনমনেই সে গ্রাম্য রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া ষ্টেশনের দিকে চলিল। কেন যে লক্ষ্মীর গৃহে থাকা অসম্ভব হইল তাহা সে বুঝিয়াও পাইল না। গৃহে ত ছিল সে এতদিন ; আজ এতকাল পরে আর একদিন থাকিতে পারিল না—ইহার একমাত্র কারণ এই বুঝিল যে সে টাকার বাক্স লইয়াছিল। কিন্তু সত্যই ত সে বাক্স খাইয়া ফেলে নাই, টাকাও নষ্ট করে নাই। তবে লক্ষ্মীর এত ক্রোধের কারণ কি ?

শেষে বিরক্তভাবেই আপন মনে সে বলিল, "যাক্ গে। বাঁচা গেল। থাক্‌লেই বিয়ে কর্‌তে হোত—সে বিষম দায় ! আমাকে ত আর এখন বিয়ে কর্‌বার জন্য কেউ বল্‌বে না আর। বড় উৎপাত করেছিল—দিনকতক বেশ আরামে কল্‌কাতা দেখা যাবে।"

কল্‌কাতা দেখার কৌতূহল তাহার ক্রমশ প্রবল হইল। সে যখন ষ্টেশনে গাড়ি চড়িয়া বসিল তখন সে বাড়ীর কথা, লক্ষ্মীর কথা সবই ভুলিয়া গিয়াছিল। অত বড় রায় ও বসু-পরিবারের জীর্ণ ভগ্ন অট্টালিকাটি তাহাদের সদর-অন্দর অতিথিশালা দুর্গাবাড়ী চণ্ডীমণ্ডপ লইয়া পরিত্যক্ত জনহীন অবস্থাতে রহিয়া গেল মাত্র। রাধাবল্লভের বাড়ী ত বহুদিনই এইরূপ হইয়াছিল—তাহাতে গমনাগমনের পথও জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছিল। হরিনারায়ণের বাড়ীরও অবস্থা তাহাই হইতে চলিল এইবার।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—নটবর মিত্র

নটবর মিত্র কলিকাতাতে কাঁটাপুকুরে এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেন। তাঁর সদর দ্বারের উপর এক সাদা কাষ্ঠখণ্ডের উপর কাল অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা ছিল—N. Mitter. Esq., Jute Share-Broker. নটবর কি উপায়ে এত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা কেহ জানিত না, কিন্তু সকলে জানিত যে তাঁহার প্রচুর অর্থ। সম্ভব পাটের ও শেয়ারের দালালিতেই উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

তাঁহার সংসারে নটবরের ব্যবসা-বুদ্ধিরও ব্যবহার সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইত। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ক্ষান্তমণি। ক্ষান্তমণি গ্রাম্য বালিকা ছিলেন—দেখিতেও কুশ্রী ছিলেন। বয়সে আরও কুৎসিত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাঁর মনটা ছিল সরল ও নির্ব্বোধ। নটবর তাঁহাকে দু-চক্ষুতে দেখিতে পারিতেন না। দুইটি পুত্র ও দুইটি কন্যা নটবরের ছিল। পুত্র দুইটির নাম মোহন ও মদন—তাহারা স্বয়ংসিদ্ধ মহাপুরুষ। বড়টির বয়স ২০।২১, ছোটটির ১৯ হইবে। কিছুই করিত না তাহারা। কন্যা দুটির বয়স ১৪ ও ১১। বড় কন্যাটির নাম সুকৃতি, তবে দেখিতে রুগ্ন ও কৃশ হইলেও মন্দ ছিল না। ছোটটির নাম প্রকৃতি।

পুত্র কন্যা স্ত্রী কাহাকেও নটবর দেখিতে পারিতেন না।

গার্হস্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ছিলেন বলিলেও ঠিক বলা হয় না; নটবর ইদানীং গার্হস্থ্যকে নিজের পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতি মনে করিয়া মনে মনে ইহার উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, রীতিমত ইহাকে ঘৃণা করিতেন। তাই কন্যারা বড় হইলেও বিবাহের কথা কখনও ভাবেন নাই—যেন তাহারা তাঁর কন্যাই নহে। পুত্রেরা স্কুলের নিম্ন ক্লাস হইতেই বিদ্যা বর্জ্জন করিল—তিনি একবারও তাহাদের একটাও অভিযোগ বা তিরস্কারের কথাও কহিলেন না। ক্ষান্তমণি যদি কখনও কোনও কথা বলিতে যাইতেন—তবে নটবর তাঁহাকে নিজের কক্ষে প্রবেশ ত করিতেই দিতেন না, উল্টাইয়া দ্বারদেশে দেখিলেই আদেশ করিতেন, "যাও, get away." বাড়ীর সকলের প্রতি তিনি যেমন বিতৃষ্ণ ছিলেন, তাহারাও তাঁহাকে তেমনি বিতৃষ্ণা করিত।

হরিনারায়ণের মৃত্যুকালে ত্রিশবিঘাতে গিয়া ফিরিয়া আসা অবধি কিন্তু নটবরের মনে একটা দুশ্চিন্তা হইয়াছিল—তাহা ক্রমশই বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সত্যই তাঁহার একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাকে যথাসময়ে পুনরায় ত্রিশবিঘাতে পৌছিতে দেয় নাই। গাড়ী হইতে না হইলেও, ষ্টেশনের ভিতরই পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহা না হইলে হয় ত যাইতেন। কিন্তু সে যাওয়া হরিনারায়ণকে বাঁচাইতে নহে—হরিনারায়ণ যে বাঁচিবেন না তাহা তিনি জানিতেন—যাইতেন লক্ষ্মীর জন্য। পূর্ণযৌবনা লক্ষ্মীকে দেখিয়া নটবর প্রথমটা চিনিতেই পারেন নাই, শুধু অভিভূতই হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই তাঁহার মন চঞ্চল হইয়াছে। এতকাল অর্থসংগ্রহের পিছনে বা ধনরক্ষণের চেষ্টাতেই বিব্রত ছিলেন—একাকীই এক রকম ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এইবার মনে হইতে লাগিল যে লক্ষ্মীকে বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গী হিসাবে লাভ করিতে পারিলে মন্দ হয় না। লক্ষ্মীর ভিতর একটা কমনীয় আকর্ষণ ছিল, তাহাতে নটবরের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল। নিজে যে হঠকারিতা করিয়া না জানিয়া শঙ্করের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ ঘটাইয়া বসেন নাই তাহাতে আনন্দিত হইলেন। শঙ্করেরও বিবাহবৈরাগ্য ও কোষ্ঠী গণনা যে তাঁহার পক্ষে অনুকূল, তাহা চিন্তা করিয়া নটবর শঙ্করের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেন। শঙ্কর পিতার মৃত্যুর পর যখন দেখা করিতে আসিয়াছিল, তখন বিবাহের কথাটা পাড়িয়া শঙ্করের সে বৈরাগ্য দেখিয়াই শঙ্করকে কলিকাতায় আসিয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন—লক্ষ্মীকেও আনিতে বলিয়াছিলেন এবং শঙ্করের প্রত্যাগমনের আশাপথ চাহিয়া রহিলেন। লক্ষ্মীর কথা চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশ তাঁহার মনে হইল, লক্ষ্মী ব্যতীত তাঁহার সকলই বৃথা হইবে—লক্ষ্মীকে যে উপায়েই হোক চাই-ই। তিনি ত আর প্রাণায়াম রেচক কুম্ভক করিয়া সাধক হন নাই যে পূর্ণ-যৌবনা নারীকে উপেক্ষা করিবেন।

তিন চার দিনের পর যখন শঙ্কর সন্ধ্যার সময় আবার তাঁহার বাড়ীতে দর্শন দিল তখন শঙ্করকে একাকী দেখিয়াই নটবর প্রজ্বলিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "লক্ষ্মী কোথায়? এনেছ তাকে?"

শঙ্কর জানাইল, লক্ষ্মী চাত্‌রাতে তাহার এক মাসীর নিকট গিয়াছে।

নটবর মহাবিরক্তভাবে বলিলেন, "মাসী? মাসী কোথা থেকে এলো? কি রকম? এতকাল ও মাসী ছিল কোথায়?"

শঙ্কর উত্তর দিল—সে কিছুই জানে না।

নটবর মুখ বিকৃত করিলেন। শঙ্কর যে পুরাদস্তর নির্ব্বোধ, একেবারে কঠিন প্রস্তর কাষ্ঠের সহিত তুলনীয়—তাহা জানিতেন। মনোভাব বাক্যে প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "যাক্—সে ব্যবস্থা হবে'খন। তুমি যাও—আহারাদি করগে ভিতর বাড়ীতে গিয়ে। নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। তারপর আবার এস—কি করা যাবে ভেবে দেখি।"

তিনি কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য সময় লইলেন। উর্ব্বর মস্তিষ্কের পক্ষে উপায় উদ্ভাবন সহজ।

শঙ্কর ক্ষান্তমণিকে চিনিত—বাল্যকালে বহুবার দেখিয়াছিল। সে ভিতরে যাইতেই ক্ষান্তমণি কহিলেন, "শঙ্কর এসেছিস্? তা বেশ করেছিস্!"

মনে মনে তিনি কিন্তু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন যে নটবর মিত্র হঠাৎ শঙ্করের উপর এত সদয় কেন?

শঙ্কর বলিল, "কাকীমা, খিদে পেয়েছে।"

ক্ষান্তমণি তখনই উঠিয়া কহিলেন, "তা বলতে হয় রে। কি আশ্চর্য্য! একটু বোস বাবা, এখনই ব্যবস্থা

করে দিচ্ছি।" তারপর কন্তা সুকৃতির দিকে চাহিয়া কহিলেন, "যা ত চট্ করে উনানে আগুন দে ত! আমি ততক্ষণ ময়দা মাখি!"

সুকৃতি এতক্ষণ শঙ্করকে দেখিতেছিল, এখন ভ্রূ ও ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া মহা বিরক্তির সহিত রান্নাঘরের দিকে গেল। ক্ষান্তমণি ভাঁড়ার ঘর হইতে ময়দা বাহির করিয়া তাহা লইয়া সুকৃতির অনুগমন করিলেন, শঙ্করকে ততক্ষণ হাত মুখ ধুইতে উপদেশ দিয়া গেলেন।

শঙ্কর হাত পা ধুইয়া আসিয়া সেই কক্ষের দ্বারের নিকট বসিল। সে ক্লান্ত হইয়াছিল, কিন্তু মনটা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। অল্পক্ষণ পরে নটবরের এক পুত্র আসিল, তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু কিছু বলিল না। সোজা রন্ধনগৃহের দিকে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে ক্ষান্তমণি ও সেই পুত্রটি ফিরিল। ক্ষান্তমণি তাহাকে বলিলেন, "টাকা নেই, দিতে পারব না!" ছেলে উত্তর দিল, "না দেবে—বাক্স ভাঙ্‌বো।"

ক্ষান্তমণি কহিলেন, "তোর বাবার কাছে নিতে পারিস না?" ছেলে বলিল, "বাবা মানুষ, যে নেব? সে রকম বাপের মত বাপ হ'লে তবে কথা কইতে ইচ্ছে করে। ও মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না।" ক্ষান্তমণি অস্পষ্টভাবে কি কতকগুলি কথা বলিলেন ও গৃহাভ্যন্তর হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন। পুত্র তৎক্ষণাৎ আবার অন্তর্হিত হইল। ক্ষান্তমণি আবার রন্ধনশালায় গেলেন। শঙ্কর অবাক হইয়া সব শুনিল ও দেখিল। নটবরের পুত্রকে দেখিয়া তাহার বড়ই বিস্ময় হইল। সে ইহার কথাই ভাবিতেছে—এমন সময় সুকৃতি আসিয়া খাবারের থালা তাহার সাম্‌নে দিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "জল চাই?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "হাঁ।" সুকৃতি উত্তর দিল, "কল-তলাতে খেয়ো।" শঙ্কর ঠিক বুঝিল না, জল খাওয়ার রীতি কলিকাতাতে এই রকম কি না। সে চুপ করিয়া রহিল। সুকৃতি আবার প্রশ্ন করিল, "খাইয়ে দিতে হবে?"

শঙ্কর বিপন্নভাবে উত্তর দিল, "না, না। আমি নিজেই খেতে পারি।" ও তাহা দেখাইবার জন্ত তৎক্ষণাৎ আহার সুরু করিল। সুকৃতি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, তাহাতে শঙ্করের উদ্বেগ আরও বাড়িতে লাগিল। কোনও মতে গলাধঃকরণ করিতে পারিলে যেন সে বাঁচে।

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সুকৃতিকে বলিল, কর্ত্তামশায় ডাক্‌ছেন। সুকৃতি জিভ্‌ বাহির করিয়া তাহাকে ভ্যাঙ্‌চাইয়া বলিল, "আচ্ছা!" তারপর সে নটবরের কাছে গেল।

শঙ্কর হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে সুকৃতি ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "এখানে থাক্‌বে, না যাবে? থাক্‌তে হয় বৈঠকখানার পাশের ঘর আছে। আর খাওয়া হ'লে কর্ত্তার কাছে যেও!" শঙ্কর জবাব দিল না। সুকৃতি জিজ্ঞাসা করিল, "কালা নাকি? শুন্‌তে পাও না?" শঙ্কর জানাইল সে বেশ শুনিতে পায়। তবু সুকৃতি যেন বিশ্বাসই করিল না। আহারাদি যথাসম্ভব শেষ করিয়া শঙ্কর নটবরের কক্ষের সম্মুখে গেল—কক্ষের ভিতর যাওয়া সকলের নিষেধ ছিল।

নটবর কহিলেন, "তোমার কথা ভেবে দেখেছি। তুমি এখানেই থাক আপাতত—বাড়ী যাওয়ায় লাভ কি? তবে কর্ব্বে কি এখানে?—একটা কিছু করা চাই ত!"

শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল। সে কি করিবে সে সম্বন্ধে তাহার ধারণা ছিল না। নটবর বলিলেন, "তারপর দু চারদিন বাদে চাত্‌রা গিয়ে লক্ষ্মীকে আন্‌বে। যদি সে আপত্তি করে বল্‌বে যে তুমি বিয়ে করবে তাকে—তা হলেই সে আস্‌বে। সে তোমাকে বিয়ে করতে চায় কি?"

শঙ্কর ইহার উত্তর দিতে পারিল না। লক্ষ্মী তাহাকে বিবাহ করিতে চায় কিনা তাহা ত' সে কোনদিনই প্রশ্ন করে নাই। অন্য সকলে চাহিয়াছে তাহা সে জানিত। আর পাছে অন্য সকলে এই বিবাহ ঘটাইয়া ফেলে সেই ভয়েই সে অস্থির হইয়াছিল। লক্ষ্মীও সম্ভব সেই ভয়েই অস্থির হইয়াছিল। তাই সে সংক্ষেপে বলিল, "কিন্তু আমি ত বিয়ে করবো না।"

নটবর এই কথায় অপলক দৃষ্টিতে শঙ্করের পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "সে কথা হাজারবার শুনেছি। কিন্তু তবু তাকে আনবার জন্য তোমাকে মিথ্যে করে বল্‌তে হবে। পারবে না?" নটবরের স্বর ক্রোধে বিকম্পিত হইল। শঙ্কর মিথ্যা বলিতে পারিত না। কিন্তু সে খবর সে নটবরকে দিতে সাহস করিল না। নটবর কক্ষের ভিতর অশান্তভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। শেষে দাঁড়াইয়া

বলিলেন, "তোমার থাকার ব্যবস্থা ক'র্‌তে সুকৃতিকে বলে দিয়েছি। থাক গে আজ। কাল তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। পড়াশোনা আগে কিছু কর, হিসাবপত্র লিখ্‌তে শেখ—তারপর আবার দেখা যাবে। এখন যাও।" শঙ্কর নীরবে সম্মতি জানাইয়া নীচে ফিরিল। নটবর যেন তাহার কাছে আজ এক নূতন ব্যক্তি বলিয়া মনে হইল। কিন্তু কান্তমণির কাছে যাইতে সাহস হইল না—পাছে সুকৃতির সম্মুখে পড়িয়া যায়। সে বহির্বাটিতে বৈঠকখানার কাছে গিয়া বসিল।

সন্ধ্যা হইল ক্রমে। শঙ্করের নিদ্রাকর্ষণ হইল। সে যেস্থানে বসিয়াছিল সেইখানেই শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুমাইবার পূর্ব্বেই কে তাহাকে ডাকিল, "শুনছো, না নেশা করেছ?" শঙ্কর শশব্যস্তে উঠিয়া চাহিয়া দেখিল, সুকৃতি। সুকৃতি—বৈঠকখানার পার্শ্বে একটি ছোট কুঠ্‌রি দেখাইয়া বলিল, "এই ঘর তোমার। যত পার নেশা কর এইখানে ভিতরে বসে! ঢেঁকি!"

শঙ্কর ভীতভাবে বলিল, "নেশা ত' করি না।"

সুকৃতি তাহার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু শঙ্কর অন্ধকারে বিশেষ কিছু দেখিতে পাইল না। তারপর বলিল—"ঢেঁকি!"

শঙ্কর বিস্মিত হইল। শহরের বাড়ীতে ঢেঁকি ত সে দেখে নাই। তাই সে প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

সুকৃতি আবার বলিল, "ঢেঁকি!" তারপর সে চলিয়া গেল। শঙ্কর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল সুকৃতি কি বলিতে চাহে। বুঝিতে না পারিয়া সে নিজের নির্দ্দিষ্ট কুঠ্‌রীতে গিয়া মেঝের উপরই শুইয়া পড়িল।

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; দেখিল তাহার পিঠের উপর একখানা মাদুর, একটা সতরঞ্চি ও একটা বালিস চাপাইয়া দিয়া লণ্ঠনহস্তে সুকৃতি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে ভীত হইল। উঠিয়া বসিল। সুকৃতি বলিল, "নেশা করেছ? সন্ধ্যে রাত্রে এত ঘুম?"

শঙ্কর লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল। সুকৃতি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া আবার বলিল, "ঢেঁকি!" তারপর কক্ষত্যাগ করিল।

শঙ্কর অন্ধকারে বসিয়া রহিল, তাহার ঘুমও ছুটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—ভট্‌চাজ্‌

পরদিন নটবর তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাহির হইলেন। চিৎপুর পার হইয়া কুমারটুলিতে এক অপ্রশস্ত গলির ভিতর একখানি জীর্ণ একতলা বাড়ীর বন্ধ দ্বারে গিয়া ডাকিলেন, "ভশ্চাজ্‌! ভশ্চাজ্‌!"

উপর্য্যুপরি কয়েকবার ডাকার পর এক নগ্নকায়, স্থূল, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তি বাহিরে আসিয়া মুখব্যাদান করিয়া হাই তুলিয়া লইল। তারপর বলিল, "আজ্ঞে—মিত্তিরজী!" শঙ্কর দেখিল, ভট্‌যাজের মুখগহ্বর দন্তহীন, তাহার কেশ নাই বলিলেই চলে; কপাল প্রশস্ত হইয়া আপন সীমা লঙ্ঘন করিয়া মস্তকের মধ্যস্থলে পৌছিয়াছে। তাহার উপর স্বর একটু অনুনাসিক।

নটবর বলিলেন, "চল ভিতরে চল, কথা আছে।" ভট্টাচার্য্য তৎক্ষণাৎ ফিরিল; শঙ্কর ও নটবর তাহার অনুসরণ করিয়া এক অন্ধকার চলনপথ পার হইয়া একটি ছোট উঠানের মধ্যে পড়িল; সেখানে আলো আছে। উঠানের এক পার্শ্বে একটা উচ্চ দরদালানের মত, তাহারই উপর একখানি ঘরের দ্বার খোলা। দালানে একখানা মাদুর—ছিন্ন ও তৈলাক্ত পড়িয়াছিল। সম্ভব তাহাই ভট্টাচার্য্যের শয্যা। ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া ও একখানি জলচৌকি বাহির করিয়া দালানে পাতিয়া দিয়া ভট্‌চায দাঁড়াইয়া আপন মাথাতে হাত বুলাইতে লাগিল।

নটবর ডাকিলেন, "কাছে এস, ভশ্চাজ্‌!" ভট্‌চায কাছে আসিলে নটবর বলিলেন, "এই ছোকরাকে বাঙ্‌লা আর হিসাব শেখাতে হবে। পারবে?"

ভট্‌চাজ মাথা নাড়িয়া কহিল, "খুব। বাঙ্‌লা ত? হাঁ সেই যা হেমচন্দ্র লিখেছে—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীরচূড়ামণি—
চলি যবে গেল—"

নটবর বাধা দিয়া কহিলেন, "হয়েছে। পারবে। তোমার ত কাজ নেই—সকালে ও সন্ধ্যেবেলা একে একঘণ্টা করে পড়াবে। বুঝেছ?"

ভট্‌চাজ জানাইল, সে বুঝিয়াছে।

নটবর বলিলেন, "সকালে বাঙ্‌লা পড়াবে, বিকেলে হিসাব অঙ্ক এই সব।"

ভট্চাজ শঙ্করের মুখের দিকে আশ্চর্য্যে তাকাইয়া বলিল, "আচ্ছা! বাঙ্‌লা আর হিসাব—এই ত? বাঙ্‌লা আমি ছাত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত পড়েছি—ছাত্রবৃত্তিতে জলপাণি পেয়েছিলুম —সে কথা কি ভুলি, মিত্তিরজী?"

নটবর আবার বাধা দিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা সে ত ভুলে যাও নি জানি, সব কথাই মনে রাখা ভাল—ভট্চাজ! তা এই ঠিক্ রইল—কেমন?" ভীতভাবে ভট্চাজ সম্মতিসূচক শির-আন্দোলন করিল।

নটবর উঠিয়া বলিলেন, "তবে চল, শঙ্কর। কাল সকালেই এসে সব বইটা জেনে নিয়ে যেও। ভট্চাজ পণ্ডিত—পড়াবে সব ভাল করেই!"

তুইজনে আবার সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। চিৎপুরে পড়িয়া নটবর বলিলেন, "আমার দরকার আছে অন্যত্র যাবার—তুমি চিনে বাড়ী যেতে পার্‌বে ত শঙ্কর?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "পার্‌বো।" নটবর একখানি গাড়ি করিয়া চলিয়া গেলেন।

শঙ্কর কাঁটাপুকুরে যাইবার পথ ধরিল। কিছুদূর যাইবার পর—তাহার পশ্চাতে একজন কে মোটা গলাতে বলিল, "বাবা, অন্ধ খঞ্জকে দয়া কর!" সেই লোকটির গলার শব্দে শঙ্কর চমকিয়া উঠিয়া পিছনে চাহিল। দেখিল একটি বৃদ্ধ একখানি লাঠি লইয়া ঐরূপ চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে। শঙ্করের জামার পকেটে পয়সা ছিল, সে অন্ধের হাতে একটি পয়সা দিয়া আবার ফিরিতেছে, লোকটি বলিল, "বেঁচে থাক বাবা, ধনপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক্!"

শঙ্কর বিস্মিত হইল, লক্ষ্মীর নাম লোকটির মুখে শুনিয়া। সে আরও একটু নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মীকে চেন? কি করে চিন্‌লে?"

লোকটি হাসিবার একটা বীভৎস চেষ্টা করিয়া বলিল, "চিনি বৈ কি বাবা, তা যাবে তার কাছে? এই কাছেই তার বাড়ী। কত বড় বড় লোক যায়!"

শঙ্কর এইবার বুঝিল তাহার ভুল হইয়াছে। এ অন্ধ অন্য লক্ষ্মীর কথা বলিতেছে। সে আবার নিজের পথে অগ্রসর হইল। কিন্তু কিছু পথ যাইবার পর তাহার মনে হইল যেন তাহার জামার পকেট খালি। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, অন্ত দিকে হাত বাহির হইয়া পড়িল, কোথাও আট্‌কাইল না। পাঁচ টাকার মধ্যে প্রায় চার টাকা সাড়ে সাত আনা পয়সা ছিল—কিছুই নাই। সে ছুটিয়া সেই অন্ধ ভিক্ষুককে দেখিতে গেল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। কি করিয়া কে তাহার পকেট কাটিয়া টাকা লইল, বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সে নটবরের বাড়ী ফিরিল। কিন্তু এই লোকসানের কথা কাহাকে বলিতে পারিল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—চাত্‌রার মাসী

শ্রীরামপুরে নামিয়া লক্ষ্মীর ক্রোধ সমস্ত অন্তর্হিত হইল, ত্রিশবিঘাতে ফিরিবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু তখন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে—মুখে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিল না।

মুখুয্যেমশায় পুরাতন লোক—মাসীর নাম মাত্র জানা থাকিলেও—তিনি খুঁজিয়া পাতিয়া চাত্‌রাতে মাসীকে আবিষ্কার করিলেন। সম্পর্কের মাসী মাত্র। একটিমাত্র পুত্র তাঁহার—পুত্রটির নাম দিগ্বিজয়। দিগ্বিজয় কলিকাতায় কোন আফিসে কাজ করে, ১০৷৮০ টাকা মাহিনা পায়। সংসারে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। মাসী বিধবা।

মুখুয্যেমশায় লক্ষ্মীকে লইয়া তাঁহার গৃহে পৌছিয়া খবর দিতেই, মাসী মাথায় কাপড় দিয়া বহির্বাটিতে আসিয়া একবার তুইজনকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন।

মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "এ লক্ষ্মী—ত্রিশবিঘার রাধাবল্লভের কন্যা!"

মাসী অত সহজে ভুলিবার পাত্রী নহেন। অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "বটে? ত্রিশবিঘার রাধাবল্লভ! তা আমার কাছে কেন?" তারপর প্রতিবাসীর যে পুত্রের সাহায্যে মুখুয্যেমশায় আসিয়া পৌছিয়াছিলেন তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গোপাল, কোথা থেকে এদের নিয়ে এলি? কেন আন্‌লি? আচ্ছা বোকা ত তুই?"

গোপাল অপ্রতিভ হইল। উত্তর দিতে পারিল না।

মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "উহার দোষ নেই, মা। আমরাই ওকে সঙ্গে এনেছি। লক্ষ্মী আপনার কাছে এসেছে আশ্রয়ের জন্য। এককালে ওর পূর্ব্বপুরুষরা শত শত লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, আজ সেই বংশের মেয়ে হয়ে ওকেই আশ্রয় ভিক্ষা কর্‌তে বেরুতে হয়েছে। এর নাম ভবিতব্যতা আর কি?" তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

মাসী মনে করিলেন—লক্ষ্মীরই অপর নাম সম্ভব ভবিতব্যতা, তাই তিনি লক্ষ্মীকে আপাদ মস্তক পুনরায় নিরীক্ষণ করিলেন। তারপর বলিলেন, "ঠিক বুঝতে পারছি না। এই রকম আত্মীয় বলে এসে এ পাড়াতে অনেকে চুরি করে নিয়ে গেছে—তা কাপড়খানাই হোক্, আর ঘটিবাটিটা হোক্। চট্ করে ভরসা করতে পারছি না।" তার পর লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার মার নাম কি—বল ত মেয়ে?"

লক্ষ্মীর এতক্ষণ মনে হইতেছিল, পলাইতে পারিলে সে বাঁচে। মাসীর আশ্রয়লাভের চেয়ে সে বরং তাহার পৈতৃক ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতের সহিত বাস করিবে। মাসীর প্রশ্নের উত্তরে সে চুপ করিয়া রহিল। উত্তর দেওয়াও যেন তাহার পক্ষে লজ্জাজনক বলিয়া মনে হইল।

মাসীর সন্দেহ ঘনীভূত হইল। তিনি আরও একটু সাম্‌নে আসিয়া প্রতিবাসীপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপাল, তোর কাকা বাড়ী আছে রে?" গোপাল মাথা নাড়িয়া জানাইল, আছে। মাসী বলিলেন, "তবে ছুটে গিয়ে আমার নাম করে ডেকে আন একবার!" গোপাল অন্তর্হিত হইল।

মাসী মুখুয্যেমশায়কে বলিলেন, "আমার ছেলে কলকাতায় গেছে চাকরিতে. সে সেই সন্ধ্যেবেলায় ৬টার গাড়ীতে ফিরবে। সে না ফেরা পর্য্যন্ত আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারছি না, কি করবো। আপনারা ততক্ষণ চণ্ডীমণ্ডপে বিশ্রাম করুন। যখন এসেছেন, তখন একেবারে তাড়াতে ত পারি না।"

মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "আমি এসেছি আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে দেখ্‌তে, তার বিবাহ নিকটেই দিয়েছি। বরং লক্ষ্মীকে এইখানে রেখে যাই। আমি না হয় সন্ধ্যাবেলা এসে আপনাদের মতামত জেনে যাব।"

মাসী মুখুয্যেমশায়কে ভাল করিয়া দেখিলেন—এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ঠগ্ প্রতারক চোর বলিয়া হঠাৎ বুঝা যায় না। তাহার উপর ব্রাহ্মণ এখনই যাইতে চাহে—চুরির অবসরও খুঁজে না। মাসীর মনে হইল তবে আত্মীয়তার কথাটা হয়ত একেবারে ছলনা নাও হইতে পারে। তাই তিনি মুখুয্যে-মশায়ের প্রস্তাবের উত্তরে বলিলেন, "বেশ, তাই হবে। যা আপনার ইচ্ছে—করুন।"

মুখুয্যেমশায় প্রস্থানোদ্যত হইলেন। লক্ষ্মী স্থিরভাবে কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; তাহার একবার মনে হইল সেও মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে যায়, কিন্তু আত্মসংযম করিল। মুখুয্যেমশায় একলাই কন্যার আলয়ে গেলেন।

গোপালের কাকা আসিয়া তাহাকে আর রক্ষক হিসাবে প্রয়োজন নাই শুনিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া চলিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল যে হয় ত চোর ধরার বীরত্বের একটা সুযোগ পাইবে —কিন্তু তাহা নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া হতাশ হইল।

মাসী লক্ষ্মীকে ভিতরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া লক্ষ্মীর হাতের পুঁটুলি ও ছোট একটি বাক্স একটি ঘরের মধ্যে রাখিতে বলিয়া তাহাকে বসাইলেন। লক্ষ্মী বসিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি লক্ষ্মী, কনকের মেয়ে?"

লক্ষ্মীর মাতার নাম কনকলতা ছিল।

লক্ষ্মী মাথা নাড়িয়া জানাইল—সে কনকের মেয়ে।

মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ত' বয়স হয়েছে —১৭।১৮ হবে, এতদিন বিয়ে হয় নি? কি আশ্চর্য্য!"

লক্ষ্মী হাসিল মাত্র, উত্তর দিল না। মাসী তখন লক্ষ্মীকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন— রাধাবল্লভের মৃত্যু, হরিনারায়ণের গৃহে প্রতিপালন, শঙ্করের সহিত বিবাহের প্রস্তাব ও হরিনারায়ণের মৃত্যুতে তাহার বিফলতা, সমস্তই একে একে তিনি সংগ্রহ করিয়া মুখ ভার করিলেন। লক্ষ্মী মনে মনে হাসিল।

মাসী বলিলেন, "তা এসেছ মাসী বলে এতকাল পরে, দু'দিন থাক, আপত্তি নেই। কিন্তু বুঝ্‌তে পার ত, সেয়ানা মেয়ে তুমি, এরকম আইবুড় অবস্থাতে ঘরে রাখ্‌তে পারি না। আমার ছেলেও সোমত্ত। যদি তোমাদের মধ্যে বিয়ের কোনও উপায় থাকতো, না হয় বিয়েই দিয়ে রাখ্‌তুম। কিন্তু তারও সম্ভাবনা দেখি না।"

লক্ষ্মী বলিল, "তবে? আবার ফিরে যাব?"

মাসী উত্তর দিলেন, "তাছাড়া আর কি কোরবে বুঝে পাই না। যাক্, সে হবে'খন। দু চার দিন ত থাক।" লক্ষ্মী মনে মনে স্থির করিল মুখুয্যেমশায়ের সহিত ত্রিশ-বিঘাতেই ফিরিবে। মাসীর আদর সহ্য করা যাইবে না।

সন্ধ্যার সময় মাসীর পুত্র দিগ্বিজয় কলিকাতা হইতে আফিস করিয়া ফিরিল ও জলযোগের সময় মার মুখে সমস্ত শুনিল। দিগ্বিজয়ের বিবাহের বয়স প্রায় অতিক্রান্ত

হইয়াছে—সাধারণ যুবকদের মত সে বিবাহের বিরুদ্ধেই ছিল —কিন্তু মনটা তাহার স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যথেষ্ট কৌতূহলী ছিল। লক্ষ্মী কিরূপ তাহা দেখিবার জন্য তাহার একটু ঔৎসুক্য হইল। সে দুই একবার বৃথা চেষ্টা করিয়াও লক্ষ্মীকে না দেখিতে পাইয়া পাড়ার তাসের আড্ডাতে যাইতে উদ্যত হইয়াছে, এমন সময় মুখুয্যেমশায় পুনরায় আসিলেন। দিগ্বিজয় তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইল।

ইতস্তত কথা-প্রসঙ্গে মুখুয্যেমশায় প্রশ্ন করিলেন, "কি করলে, বাবা? লক্ষ্মী সম্বন্ধে চিন্তা করেছ?"

দিগ্বিজয়ের মুখে একটা দুর্ভাবনার ছায়া পড়িল; সে মাথাতে হাত বুলাইয়া বলিল, "যাই সব। আমি—তা লক্ষ্মী থাক্‌বে!"

মুখুয্যেমশায় একটু আশ্বস্ত হইলেন; দিগ্বিজয়ের মার কাছে যে অভ্যর্থনা পাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁর কিছুমাত্র আশা ছিল না। দিগ্বিজয় মাকে মুখুয্যে মশায়ের আগমনের সংবাদ দিয়া, রান্নাঘরে একটু উঁকি মারিয়া তাসের আড্ডাতে চলিয়া গেল।

দিগ্বিজয়ের মা আসিয়া বলিলেন, "তা লক্ষ্মী যখন এসেই পড়েছে—তখন না হয় দু একদিন থাক্!" মুখুয্যে-মশায় হতাশভাবে কহিলেন, "কিন্তু আমি কালই ফিরব।" মাসী বলিলেন, "বেশ, তবে কালই এসে নিয়ে যাবেন, আজ তবে থাক্।"

মুখুয্যেমশায় আর কিছু বলিলেন না। কেবল লক্ষ্মীর সহিত একবার সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইলেন। লক্ষ্মী আসিয়াই বলিল, "জ্যেঠামশায়, আজই বাড়ী ফিরে চলুন।" মুখুয্যেমশায় উত্তরে কহিলেন, "ব্যস্ত হোস্ নি, মা। এসে এরকম করে চলে যাওয়াটাও ঠিক হবে না। ধৈর্য্য ধরে আজকের দিনটা কাটা, কাল বিকেলের গাড়িতেই ফির্‌বো।" তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রীর গৃহে ফিরিলেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লক্ষ্মীকে সে রাত্রে মাসীর আদর সহ্য করিতে হইল। দিগ্বিজয় পরদিন প্রভাতে কোনও মতে লক্ষ্মীকে একবার দেখিয়া লইল। দেখিয়া তাহার মনে হইল, লক্ষ্মী থাকিলেই বা ক্ষতি কি! তাই আফিস যাইবার সময় মাকে বলিল, "তা ঐ মেয়েটি কি থাক্‌বে—না কি?" মা শুষ্ককণ্ঠে উত্তর করিলেন, "না।" দিগ্বিজয় ইতস্তত করিয়া বলিল, "এসেছে, দুদিন থাক্ না!" মাতা তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কহিলেন, "ওসব মেয়েদের ছলাকলা বুঝি না, বাবু! না থাকাই ভাল। যাবে বলে ত এখন থেকেই তৈয়ের হচ্ছে। ধরে রাখ্‌বি নাকি?"

দিগ্বিজয় আশ্চর্য্যান্বিত হইল, গতরাত্রে সে শুনিয়াছে লক্ষ্মী নিরাশ্রয়, আজ সে এইরূপে কোথায় যাইতে প্রস্তুত হইল! তবু মার এইরূপ বাক্যচ্ছটা তাহার প্রীতিকর হইল না। কিন্তু কিছুই বলিতে সাহস করিল না। সে ক্ষুণ্ণমনে আফিস চলিয়া গেল।

পুত্রের এই অকারণ ঔৎসুক্যে মাসী আরও লক্ষ্মীর উপর বিদ্বিষ্টা হইলেন। তাই মুখুয্যেমশায়ের সহিত সে যখন প্রস্থান করিল, তিনি আশ্বস্ত হইলেন। এইরূপ চালচুলাহীন বয়স্কা কন্যাকে ঘরে রাখিয়া তিনি ত মজিতে পারেন না। লক্ষ্মীও পরম উৎসাহে ও আনন্দে স্বগ্রামে ফিরিল—কিন্তু গ্রামে গিয়া মুখুয্যে-গৃহিণীর কাছে শঙ্করের কার্য্যের বৃত্তান্ত শুনিয়া লক্ষ্মী ও মুখুয্যেমশায় দুই জনেই বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন হইল। তবে কি এতদিনে কোষ্ঠী ফলিল? কলিকাতায় না গিয়া সে অন্য কোথাও, কাশী হরিদ্বার চিত্রকূটে গিয়া এতক্ষণ সন্ন্যাসই লইল কি না কে বলিতে পারে? এই বয়স্কা কন্যাকে লইয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারই বা কি করিবেন? আর বিনা রক্ষকে লক্ষ্মী কিছু শঙ্করের বাড়ীতে গিয়া থাকিতেও পারিবে না। মুখুয্যেমশায়ের বাড়ীতে লক্ষ্মী রহিল বটে কিন্তু সকলেই বিশেষ একটা অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)



পাণ্ডুনগর

শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী এম্‌-এ

বাঙ্গালার পাঠান স্থলতানগণের রাজধানী গৌড় এবং পাণ্ডুয়া দর্শন করিবার সৌভাগ্য অনেকেরই হইয়াছে। বাঙ্গালার পুরাতত্ত্ববিষয়ক নানা গ্রন্থাদিতেই গৌড়-পাণ্ডুয়ার বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়-পাণ্ডুয়া যাত্রী অনেক সুধী-জনই নানা সাময়িক পত্রের মারফতে তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনী এবং গৌড়-পাণ্ডুয়ার নানাবিধ কীর্ত্তিগুলির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন; এই সমস্ত বিবরণাদি পাঠে গৌড় এবং পাণ্ডুয়া দেখিবার আকাজ্ক্ষা বহুদিন হইতেই ছিল।

ভাগ্যক্রমে সুযোগ যা জুটে গেল, একেবারে সুবর্ণ সুযোগ। গত ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙ্গালার তদানীন্তন শিক্ষাধ্যক্ষ ষ্টেপল্‌টন সাহেব (Mr. H. E. Stapleton, M. A., F. A. S. B.) মালদহ এবং দিনাজপুর জেলায় একটা archæological tour দিবার ব্যবস্থা করেন। কি সৌভাগ্যে জানি না, এ যাত্রায় তাঁর সঙ্গী হইবার জন্য আমার নিকট আহ্বান আসিল। ভ্রমণ-পঞ্জীতে গৌড়, পাণ্ডুয়া এবং আরও নানা প্রাচীন স্থানের নাম দেখিয়া বাহির হইয়া পড়াই স্থির করিলাম। ভাবিলাম, এই সমস্ত প্রাচীন স্থানাদি দর্শনের সুবিধা ভবিষ্যতে হইলেও এরূপ সৎসঙ্গে ভ্রমণের সৌভাগ্য আর কখনও ঘটিবে না।

এ যাত্রায় এবং তারপরে ষ্টেপল্‌টন সাহেবের উৎসাহে আরও কয়েকটি যাত্রায়, উত্তরবঙ্গের বা প্রাচীন বরেন্দ্রীর অনেক পুরাকীর্ত্তি এবং প্রাচীন স্থান দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে, বাঙ্গালার অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদই এ সমস্ত স্থানের অধিকাংশেরই কোন খবর রাখেন না। প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ, পুরাতন শিল্পকলার নিদর্শন প্রভৃতিতে এই সকল দুর্গম এবং পরিত্যক্তপ্রায় পল্লীগুলি এখনও বিশেষ সমৃদ্ধ। পুরাতত্ত্ববিদ এবং শিল্পরসিকের এক একটি অতুলনীয় সম্পদ যেখানে সেখানে অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। স্থানীয় অধিবাসিগণ তৈল এবং সিন্দুর লেপিয়া এবং বৎসরে দু'একদিন ফুল জল ফেলিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করে, এগুলি যাহাতে রক্ষিত হইতে পারে সেদিকে তাহাদের কোন দৃষ্টিই নাই। রৌদ্রে পুড়িয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া, মাটি চাপা পড়িয়া, গাছে জড়াইয়া এই রকম কত সম্পদই না নষ্ট হইয়া যাইতেছে! বাঙ্গালার পুরাকীর্ত্তির এই সমস্ত অমূল্য নিদর্শন রক্ষা করিবার চেষ্টা প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে। নতুবা অচিরেই এগুলির ধ্বংস অনিবার্য্য।

এই সমস্ত প্রাচীন স্থানের এবং পুরাতন কীর্ত্তির বিবরণ চিত্রাদি সহ বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে পাণ্ডুয়ার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আমি এই প্রবন্ধে করিব।

মালদহের প্রায় ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাঙ্গালার পাঠান সুলতানগণের রাজধানী 'হজরত পাণ্ডুয়া' এককালে বিশেষ সমৃদ্ধ নগর ছিল। সে সমৃদ্ধির অনেক নিদর্শনই পেঁড়ো বা পাণ্ডুয়ার ব্যাঘ্র-সংকুলিত অরণ্যের ভিতর হইতে উঁকি মারিতেছে। চারিধারে পরিখা-সমন্বিত প্রাচীরবেষ্টিত সহর। সেই প্রাচীরের দৈর্ঘ্যই অন্যূন কুড়ি মাইল। বাইশ-হাজারীর বড় দরগা এবং সেলামী দরওয়াজা, ছয় হাজারীর ছোট দরগা, কুতবশাহী বা সোনা মসজিদ, একলক্ষী সমাধি মন্দির, সুবৃহৎ আদিনা মসজিদ এবং আদিনার ১ মাইল পূর্ব্বে সাতাইশঘড়ায় রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ—এখন পাণ্ডুয়ায় মুসলমান সমৃদ্ধির নিদর্শন। গৌড়-পাণ্ডুয়া যাত্রী অনেক সুধীজনই এগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সে বিস্তৃত বিবরণ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

পূর্ব্বতন লেখকগণ সকলেই মুসলমান নগরী পাণ্ডুয়ার গৌরব কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে পাণ্ডুয়া যে সমৃদ্ধ হিন্দুনগর ছিল সে পরিচয় দিবার চেষ্টাই আমি করিব। কালের কঠোর প্রভাবে যে সব প্রাচীন কীর্ত্তি এখন লুপ্ত, সে সমৃদ্ধির অধিকাংশ নিদর্শনই এখন নষ্ট। বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে কিছু কিছু নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। তাহার সাহায্যে হিন্দু নগরী পাণ্ডুয়ার যে চিত্র কল্পনার নেত্রে ফুটিয়া উঠে, তাহা যেমনই উজ্জ্বল তেমনই গৌরবময়।

'গৌড়ের ইতিহাস'কার প্রমুখ কোন কোন লেখক পাণ্ডুয়া এবং ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন। এ মতবাদের বিশেষ কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুধু নামসাদৃশ্য হইতেই এরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বিশেষ এ স্থলে দুইটি নামের সাদৃশ্যও খুব বেশী যুক্তিসহ নয়। সুপ্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর অবস্থান বগুড়া জেলায় করতোয়াতটবর্ত্তী মহাস্থানে (১)। এ সম্বন্ধে যাহা কিছু সন্দেহ ছিল ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে মহাস্থান হইতে মৌর্য্যযুগের ভগ্ন শিলালিপির আবিষ্কারে (২) তাহা দূর হইয়াছে।

পাণ্ডুয়ার হিন্দু নাম ছিল 'পাণ্ডুনগর'। 'পাণ্ডুনগর' নামটি রাজা গণেশের এবং তাঁহার পুত্র মহেন্দ্রের মুদ্রা হইতে জানিতে পারা যায়। 'পাণ্ডুনগর' হইতেই নগরের নাম পাণ্ডুয়া হইয়াছে, এ অনুমান মোটেই অযৌক্তিক নয়। প্রায় ১২০ বৎসর পূর্ব্বে বুকানন হ্যামিণ্টন (Buchanan Hamilton) পাণ্ডুয়ার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি প্রবাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সে প্রবাদ অনুসারে পাণ্ডব-বংশীয় কোন রাজা বাঙ্গালায় আসিয়া পাণ্ডুয়াতে নগর স্থাপন করেন। পাণ্ডুয়ার কয়েকটি ভগ্নাবশেষও প্রবাদ মতে পাণ্ডবদের সহিত জড়িত। সাতাইশঘড়ার দিঘী তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই দিঘীর পূর্ব্বপারে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও 'পাণ্ডব রাজা দালান' নামে খ্যাত। এই সমস্ত প্রবাদ বা জনশ্রুতির কোন ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন। আধ্যাত্মিক ভাবের বিহ্বলতায় ভারতবাসিগণ আত্মবিস্মৃতির চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তাহাদের ইতিহাস-বিমুখ মন যাহা কিছু প্রাচীন, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু কীর্ত্তিময়—সে সমস্তই কোন দেবতা কিম্বা রামায়ণ অথবা মহাভারতের কোন প্রসিদ্ধ নায়কের সহিত জড়িত করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিত। সুন্দর সুন্দর প্রাচীন মন্দিরগুলি মানুষে সৃষ্টি করিতে পারে না, সমস্তই দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা রচিত, এরকম জনশ্রুতি ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানেই প্রচলিত। একমাত্র উত্তরবঙ্গেই চার পাঁচটি প্রাচীন স্থান মহাভারতের বিরাটরাজের রাজধানীর সহিত সংযুক্ত। কৈবর্ত্তরাজ ভীম রামপালদেবের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বরেন্দ্রীর প্রান্তভাগে যে সকল মৃৎপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন, সেই 'ভীমের ডাইঙ্গ' বা ভীমের জাঙ্গাল কল্পনালোলুপ জনসাধারণের নিকট মধ্যম পাণ্ডবের কীর্ত্তি-চিহ্ন বলিয়া খ্যাত। এইরকম অনেক দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত প্রবাদ এবং জনশ্রুতির সহিত জড়িত হইয়া যে কোন প্রাচীন স্থানই অধ্যাত্মবাদী হিন্দুর মনে একটা অজ্ঞেয় পবিত্রতার ভাব আনে। তাহার নীচে ঐতিহাসিক সত্য চাপা পড়িয়াছে সত্য; সে তথ্য অজ্ঞাত রহিলেও এইরূপ প্রবাদ সংবলিত স্থানগুলি যে প্রাচীন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই।

পুষ্করিণী-খনন এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা হিন্দুর নিকট অতি পবিত্র কার্য্য। রাজাধিরাজ হইতে সম্পন্ন গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই পূর্ব্বকালে পুষ্করিণী-খনন এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠা করিয়া ইহলোকে অতুলকীর্ত্তি এবং পরলোকে স্বর্গবাসের পুণ্য সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার বিখ্যাত পাল-রাজবংশ পুষ্করিণী আদি খননের জন্য প্রসিদ্ধ। মহা-রাজাধিরাজ রাজ্যপালদেব অতলগর্ভ পুষ্করিণী-খনন এবং উত্তুঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া 'বিখ্যাত-কীর্ত্তি' হইয়াছিলেন, একথা প্রথম মহীপালদেবের বানগড়ে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে পাওয়া যায়—

"তোয়াশয়ৈর্জ্জলধি মূল গভীর গর্ভৈঃ
দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধর তুল্য কক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তিরভবৎ তনয়স্য তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোকপালঃ॥ (১)

মুর্শিদাবাদ জেলার সুবিস্তীর্ণ সাগরদিঘী পালবংশের কোন রাজা কর্ত্তৃক খাত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধ ("পালবংশকৃতং খাতং")। দিনাজপুর জেলার সুবৃহৎ মহীপাল-দিঘী পালসম্রাট মহীপালদেবের নামের সহিত জড়িত। মন্দির স্থাপন বিষয়েও পালসম্রাটগণ কিম্বা তাঁহাদের পরবর্ত্তী সেনরাজগণ উদাসীন ছিলেন না। নূতন মন্দির এবং বিহারাদি প্রতিষ্ঠা, পুরাতনের জীর্ণসংস্কার, নূতন নূতন নগর স্থাপন করিয়া তাঁহারা প্রাক্‌মুসলমানযুগে বাঙ্গালা

১। P. C. Sen, Mahasthan and its Environs, V. R. S. monographs, No. 2.

২। J. P. A. S. B, Vol, XXVIII. 1932, Pt. I.

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

দেশে একটা অভিনব শিল্প এবং সভ্যতার ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন।

শুধু রাজা মহারাজাই নন, যে কোন সম্পন্ন গৃহস্থই সেকালে সাধ্যানুসারে পুষ্করিণী-খনন এবং মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। সেকালের নগরসমূহ এইরূপেই বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকা এবং উত্তুঙ্গ মন্দিরসমূহে শোভিত হইয়া উঠিয়াছিল, এ অনুমান নিরর্থক নয়। 'রামচরিতে'র কবি সন্ধ্যাকরনন্দী প্রস্ফুটিত পদ্মপূর্ণ অসংখ্য দীর্ঘিকা-বেষ্টিত এবং শিল্পসুষমামণ্ডিত মন্দিরাদিশোভিত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শোণিতপুর নগরীর যে মনোরম চিত্র আঁকিয়াছেন, সে চিত্র সমস্ত প্রাচীন নগরের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই কারণেই নষ্টপ্রায় পুষ্করিণী এবং মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ যে কোন স্থানের পুরাতন হিন্দু-সমৃদ্ধির পরিচায়ক। পাণ্ডুয়ার ভিতরে এবং আশে পাশে অসংখ্য পুরাতন পুষ্করিণী দেখা যায়। অধিকাংশই উত্তর দক্ষিণে লম্বা এবং এই কারণেই হিন্দুযুগে খনিত হইয়াছিল—এ অনুমান নিঃসন্দেহ। 'হোমদিঘী' প্রভৃতি নামও হিন্দুযুগেরই পরিচায়ক। পাণ্ডুয়াতে প্রচুর হিন্দু মন্দির যে ছিল, তাহার একাধিক প্রমাণ আছে। ইষ্টকপরিপূর্ণ ছোটবড় নানা আকারের ভগ্নস্তূপের সংখ্যা পাণ্ডুয়াতে কম নয়। যথারীতি খনন করিলে মন্দির বা স্তূপের ভগ্নাবশেষ বাহির হইবে বলিয়াই ধারণা। সে খননে নগরীর পূর্ব্ব-ইতিহাসের কিছু উপাদান আবিষ্কৃত হওয়াও বিচিত্র নয়। হিন্দু স্থাপত্যের এবং ভাস্কর্য্যের বহু নিদর্শনই পাণ্ডুয়ার ভিতরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। বিধর্ম্মী বিজেতাগণ কর্ত্তৃক মন্দিরাদি ধ্বংস হওয়াতেই যে এগুলি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে এ অনুমান স্বাভাবিক। এরকম অনেক নিদর্শনই পাণ্ডুয়ার নানা মুসলমান কীর্ত্তিতে ব্যবহৃত হইয়াছে। পাণ্ডুয়া এবং আদিনার মাঝখানে পুরাতন সেতুটিও হিন্দু দেবমূর্ত্তি এবং অন্যান্য পাথর দিয়া গঠিত। বড় দরগার প্রাঙ্গণে দুইটি সুন্দর কারুকার্য্যখোদিত প্রস্তরস্তম্ভ অতীতযুগের শিল্পসুষমার অতুলনীয় নিদর্শন। একটি সুন্দর জালিকাটা পাথর দেওয়ালে জানালার কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে; সেটি যে হিন্দু স্থাপত্যের 'সারিকুহর'—সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। চিল্লাখানার প্রাঙ্গণে দুই একটি দেবমূর্ত্তি উল্টাভাবে বসান রহিয়াছে। ছোট দরগাটি একটি নাতিউচ্চ সমতল স্তূপের উপর অবস্থিত। সামনে এবং পিছনে হিন্দুযুগের অনেক প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষদেশ দেখা যায়। মুসলমান কীর্ত্তিগুলিতে ব্যবহৃত স্তম্ভ এবং চৌকাট অধিকাংশই হিন্দুযুগের অট্টালিকা হইতে গৃহীত। সুবৃহৎ আদিনা মসজিদের অধিকাংশ প্রস্তরই যে মন্দির হইতে গৃহীত, সে কথা এখন আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অনেক পাথরই দেওয়ালে উল্টাভাবে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। দেব বা দেবী মূর্ত্তির চিত্রগুলি যেখানে ঢাকিয়া ফেলিবার কোন সুবিধা হয় নাই সেখানে সেগুলি চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে হিন্দুশিল্পের মণ্ডনরীতি বা তক্ষণ-কৌশল নষ্ট করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। সে সব এখনও স্পষ্ট বিদ্যমান। স্তম্ভগুলির গঠনভঙ্গী দেখিলেই সেগুলি যে এককালে কোন মন্দিরের শোভাবর্দ্ধন করিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। মসজিদের অধিকাংশ খিলানই ত্রিপত্রাকৃতি (trefoil)। এই ত্রিপত্রাকৃতি খিলান বাঙ্গালা দেশের প্রাক্-মুসলমান যুগের নিজস্ব জিনিষ। এই ত্রিপত্রাকৃতি খিলান হইতে মুসলমানযুগের বহু পত্রাকৃতি (lobed) খিলানের ক্রমবিকাশ আদিনা মসজিদের নানা ধরণের খিলানে সুন্দর-ভাবে বুঝিতে পারা যায়। মসজিদের চারিধারে বহু খোদিত পাথর এখনও ছড়ান রহিয়াছে। সেগুলিতেও হিন্দুর শিল্প-কৌশল পরিস্ফুট। মসজিদে ব্যবহৃত একখানি পাথরে নবম শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত একটি সংস্কৃত নাম ('ইন্দ্রনাথঃ') এখনও দেখা যায়।

শুধু তাই নয়! আদিনা মসজিদটি যে একটি অসমাপ্ত হিন্দু মন্দিরের উপরেই তৈয়ার হইয়াছে তাহারও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। মসজিদের ভিত্তিগাত্রের সহিত হিন্দু মন্দিরের ভিত্তিগাত্রের ('জঙ্ঘা') সুন্দর সাদৃশ্য দেখা যায়। সিকান্দারের কক্ষের এবং তাহার উত্তরে মসজিদের ভিত্তি-গাত্রের গঠনরীতির সহিত হিন্দু মন্দিরের জঙ্ঘার গঠনরীতির এই অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য কেমন করিয়া সম্ভব হইল? মনে হয় মুসলমান আক্রমণের সময়ে এখানে একটি মন্দির তৈয়ারী হইতেছিল। সেজন্য নানা স্থান হইতে বহুল পরিমাণে প্রস্তর সংগৃহীত হইয়াছিল এবং মন্দিরে যথাযোগ্য স্থানে সন্নিবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে সুনিপুণ শিল্পী কর্ত্তৃক নানা কারুকার্য্য শোভিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পাথরের *অপূর্ব্ব শিল্পকৌশল এবং

সূক্ষ্ম কারুকার্য্য দেখিয়া মনে হয়—সমাপ্ত হইলে মন্দিরটি বাঙ্গালার হিন্দু স্থাপত্যের একটি মনোরম নিদর্শন হইতে পারিত। দুর্ভাগ্যক্রমে মুসলমান বিজেতার আগমনে মন্দিরটি সমাপ্ত হইতে পারে নাই এবং সুলতান সিকান্দার শাহ সেই সমস্ত মালমশলা দিয়া এবং অন্যান্য মন্দির হইতে প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া অসমাপ্ত মন্দিরের উপরেই আরও বড় করিয়া মসজিদ প্রস্তুত করিলেন। আদি মন্দির হইতে মসজিদটি বৃহত্তর হওয়াতে মসজিদের ভিত্তি দক্ষিণ দিকে আরও বাড়াইতে হইয়াছে। পাঠান সুলতানের শিল্পিগণের হিন্দুস্থাপত্যে অনভিজ্ঞতাবশতঃ উত্তর দিকের ভিত্তির গঠন-রীতি দক্ষিণে ঠিকমত অনুকরণ করিয়া উঠিতে পারে নাই। সেজন্যই সেদিকে সামান্য সামান্য অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়।

প্রাচীন মুসলমান উপনিবেশ সমস্তই প্রাচীনতর হিন্দুনগরে বা তাহার আশে পাশে গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রাচীনতর কীর্ত্তিগুলি ধ্বংস করিয়া সেই উপকরণ দিয়াই মুসলমান কীর্ত্তিগুলি রচিত। মুসলমান অধিকারের প্রথম যুগে সুপ্রাচীন দেবীকোট নগরী ভাঙ্গিয়াই মুসলমান ঐতিহাসিক-গণের দিবকোট সহর তৈয়ারী হয়। প্রাচীন ভারতের কৌশাম্বী, মথুরা, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী প্রভৃতি অশেষ সমৃদ্ধ নগরীর সমান পর্য্যায়ভুক্ত দেবীকোট বা কোটীবর্ষ নগরীর পুরাতন সমৃদ্ধির কতটুকুই বা অবশিষ্ট আছে? গৌড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি অনেক নগরেরই পরিণাম তদ্রূপ। পাণ্ডুনগর বা পাণ্ডুয়া সম্বন্ধেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। শত শত বৎসরের মুসলমান অধিকারের পরও এই হিন্দু নগরীর যে সামান্য নিদর্শন এখনও আমরা পাই, তাহার সাহায্যেই তাহার প্রাচীন কীর্ত্তি ও সমৃদ্ধির, তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের একটা উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

শোক-সংবাদ

চণ্ডীচরণ লাহা—

গত ২৫শে ফাল্গুন তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে চণ্ডীচরণ লাহা মহাশয় ৮০ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে হুগলী চুঁচুড়ায় পৈত্রিক বাড়ীতে চণ্ডীচরণের জন্ম হইয়াছিল। প্রাণকৃষ্ণ লাহা যে ব্যবসার প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার ৩ পুত্র—মহারাজা দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ তাহার অসাধারণ বিস্তার সাধন করেন। চণ্ডীবাবু শ্যামাচরণের একমাত্র পুত্র। এই শ্যামাচরণই বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিলাতে যাইয়া তথায় ব্যবসায়ীদিগের সহিত ব্যবসা-সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাঁহার অর্থ-সাহায্যে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে বহু চিকিৎসালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা হিন্দু স্কুলে ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নের পর ২০ বৎসর বয়সে চণ্ডীচরণ পৈত্রিক ব্যবসায় যোগ দেন এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুতে তাহার এক জন অংশীদার হয়েন। তদ্ভিন্ন তিনি আরও একাধিক ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্রব রাখিয়াছিলেন। কলিকাতায় বহু ভূসম্পত্তির এবং ২৪ পরগণা, হাওড়া, খুলনা, নোয়াখালী ও ত্রিপুরা জিলা কয়টিতে জমীদারীর তিনি অধিকারী ছিলেন



চণ্ডীচরণ লাহা

নানা স্থানে প্রজাদিগের শিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য তিনি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি চুঁচুড়ার গৃহে একটি কবিরাজী ও একটি এলোপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন ও দরিদ্র ছাত্রদিগকে আহার্য্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন এবং কলিকাতা ১০৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে তিনি পরলোকগতা কন্যার স্মৃতিরক্ষার্থ যে "ললিতকুমারী দাতব্য চিকিৎসালয়" প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে প্রতিদিন দুই শতাধিক রোগী বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হয়।

তিনি নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পুত্র তারিণীচরণ, ভবানীচরণ ও সতীশচন্দ্রের মধ্যে ভবানী বাবু প্রসিদ্ধ চিত্রকররূপে 'ভারতবর্ষের' পাঠকদিগের নিকট পরিচিত।

মোহিনীনাথ বসু—

কলিকাতা হাইকোর্টের জনপ্রিয় ব্যবহারাজীব রায় সাহেব মোহিনীনাথ বসু ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগত



মোহিনীনাথ বসু

হইয়াছেন। কলিকাতা মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশন হইতে প্রবেশিকা, প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এফ-এ, বিহার ন্যাশনাল কলেজ হইতে বি-এ ও প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ওকালতী পরীক্ষা শেষ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা অবলম্বন করেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-প্রমুখ জজরা তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হয়েন এবং হাইকোর্টে ষ্ট্যাম্প রিপোর্টারের পদ সৃষ্ট হইলে ঐ পদে এক জন প্রতিষ্ঠাবান ব্যবহারাজীবের নিয়োগ প্রয়োজন বুঝিয়া সার আশুতোষ তাঁহাকে ঐ পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আশুতোষের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে তিনি ঐ পদ গ্রহণ করেন। গত বৎসর কোর্টফিশ আইন সংশোধনের প্রয়োজন অনুভব করিয়া সরকার উহার সংশোধনভার মোহিনীনাথের উপর অর্পণ করেন এবং ঐ সংশোধিত বিধি যখন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদন জন্য উপস্থাপিত করা হয়, তখন বিশেষজ্ঞ বলিয়া মোহিনীনাথকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত করা হয়।

মোহিনীনাথ কোর্টফিশ ও ষ্ট্যাম্প আইন সম্বন্ধে যে দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন, সে দুইখানি ঐ দুই বিষয়ে ভারতের সর্ব্বত্র প্রামাণ্যপুস্তকরূপে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায়—

গত ৩রা চৈত্র কলিকাতা রিপণ কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক নৃত্যলাল মুখোপাধ্যায় ৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনফ্লুয়েঞ্জার পর ফুসফুসের প্রদাহ তাঁহার এই অতর্কিত মৃত্যুর কারণ। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের চাকরী লাভ করেন। কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুরাগ ও অকুণ্ঠ স্বাধীনচেতার ভাব তাঁহার পক্ষে এই চাকরীতে স্থিতির অন্তরায় ঘটায় তিনি অল্পদিনের মধ্যেই ঐ চাকরী ত্যাগ করিয়া শিক্ষকের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ, রংপুর কার্ম্মাইকেল কলেজ ও বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ—এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানত্রয়ে অধ্যাপকের কায করিয়া রিপণ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর কাল তিনি শিক্ষকের কার্য্যে যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। নৃত্যলাল অকৃতদার ছিলেন। ছাত্ররা তাঁহার অধ্যাপনায় আকৃষ্ট ও উপকৃত হইত। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার অপ্রত্যাশিত মৃত্যু দুঃখের কারণ, সন্দেহ নাই।

গ্রীক-জননায়ক ভেনিজেলস—

৭০ বৎসর বয়সে প্যারিসে গ্রীক-জননায়ক ও য়ুরোপের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজনীতিক ইলিউথেরিয়স ভেনিজেলসের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার বৈচিত্র্যবহুল জীবনের ঘটনাপুঞ্জ স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। এথেন্সে শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি ক্রীটে ব্যবহারাজীবের ব্যবসা আরম্ভ করেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহকালে তিনি ক্রীট ত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হয়েন; কিন্তু শান্তিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিপ্লবের অন্যতম নেতৃরূপে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের কথা। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি ক্রীটের শাসক সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া পরিগণিত হয়েন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হাই-কমিশনার প্রিন্স জর্জ্জের সহিত তাঁহার মতান্তর ঘটে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স জর্জ্জ ক্রীট ত্যাগ করিলে ভেনিজেলসই তথায় সরকারে কখন প্রধানমন্ত্রী, কখন প্রতিপক্ষের নেতা ছিলেন এবং ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম বলকান যুদ্ধের ফলে ক্রীট যে গ্রীসের অঙ্গীভূত হয়, সে প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায়।

ঐ ১৯০৯ খৃষ্টাব্দেই গ্রীসে রাজনীতিক অনাচারের ও রাজসভায় পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষিত হয়—সৈনিকদিগের আহ্বানে তিনি সেই-বিদ্রোহে নেতৃত্ব করিবার জন্য এথেন্সে গমন করেন এবং তাঁহার মতানুসারে গ্রীসে জাতীয় সমিতির দ্বারা শাসন-পদ্ধতির সংস্কার সাধিত হয়। বলা বাহুল্য, এই সময় তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তিনি পরবৎসর নির্ব্বাচনে প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে রাজার সহিত মতভেদ হেতু তিনি পদত্যাগ করেন। সেই বৎসরেই তাঁহাকে পুনরায় প্রধান মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

কিন্তু গ্রীস যে জার্ম্মাণ যুদ্ধে যোগদান :করিল—তাঁহার এই উক্তির জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা হয়।

ইহার পর গ্রীসের রঙ্গমঞ্চে "খুলিল দ্বিতীয় অঙ্কে দৃশ্য অভিনব"। রাজা কনষ্টাণ্টাইন ব্যবস্থাপরিষদ বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনচ্যুত হইলে আবার ভেনিজেলসকে সরকারের পরিচালনভার গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু গ্রীসের জনগণের মনে নিরপেক্ষতার প্রাবল্যহেতু তাঁহার প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। জার্ম্মাণ যুদ্ধের বিরতি-কালে ও তাহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে তাঁহার নানা কার্য্যে তিনি য়ুরোপের রাজনীতিক রঙ্গমঞ্চে প্রধান অভিনেতা-দিগের অন্যতম বলিয়া পরিচিত হয়েন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসের একটি রেল ষ্টেশনে তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয় এবং গ্রীসে নির্ব্বাচনে তিনি পরাভূত হয়েন।

ভাগ্যচক্রের এই আবর্ত্তনের পর আবার লজানের সন্ধির সময় তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে আবার গ্রীসে প্রধান মন্ত্রী হয়েন। কিন্তু স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু নির্ব্বাচনের কয়মাস পরেই তিনি পদত্যাগ করেন।



ভেনিজেলস

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আবার রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। তাঁহার চেষ্টায় গ্রীসে তৎকালীন সরকারের পরাভব ঘটে এবং তিনি স্বীয় মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত করেন। তিনি রাজনীতিক কার্য্যে রোমে, লণ্ডনে ও বেলগ্রেডে গিয়াছিলেন এবং ইটালীতে মুসোলিনীর সহিত তাঁহার আলোচনাফলে গ্রীসের সহিত ইটালীর বন্ধুত্ব স্থাপিত ও সন্ধিসর্ত্তে সন্নিবিষ্ট হয়।

শেষে ভেনিজেলস নিয়মানুগ রাজা হিসাবে দ্বিতীয় জর্জ্জের গ্রীসের সিংহাসন গ্রহণে আনন্দ প্রকাশ করেন।

জীবনে এইরূপ বৈচিত্র্য কেবল স্বাধীন দেশেই রাজ-নীতিকের ভাগ্যে সম্ভব হয়।

মহারাণী প্রফুল্লকুমারী—

বিলাতে ২৬ বৎসর বয়সে বাস্তার রাজ্যের মহারাণী প্রফুল্লকুমারীর মৃত্যুতে বর্ত্তমানে দেশীয় রাজ্যসমূহের একমাত্র মহিলা-শাসিকার তিরোধান হইয়াছে। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ওয়ারাংগালের রাজবংশের এক সন্তান মধ্য-প্রদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রান্তে অরণ্যবহুল বাস্তার রাজ্য স্থাপন করেন। ইহার পরিমাণ ১৩ হাজার ৬২ বর্গ মাইল।

মহারাণী প্রফুল্লকুমারী তাঁহার পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুর পর মহারাজা পুনরায় বিবাহ করেন; কিন্তু সে বিবাহে তাঁহার সন্তান হয় নাই। তিনি দত্তক গ্রহণের আয়োজন করিলে দুই মহারাণীর পিতৃগৃহ



মহারাণী প্রফুল্লকুমারী

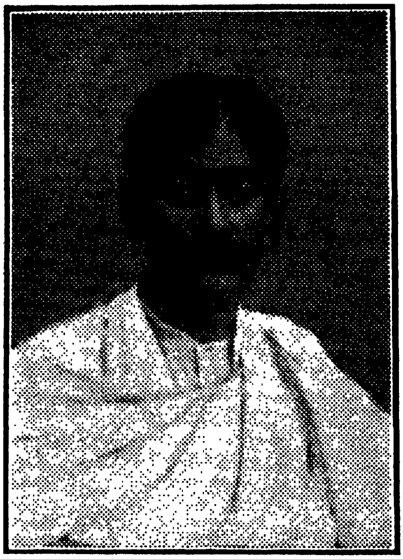
হইতেই দুইটি বালককে দত্তক দিবার চেষ্টা হয়। এই অবস্থায় এবং ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ আশঙ্কা করিয়া মহারাজা দত্তক গ্রহণ স্থগিদ রাখেন। এই সময় তাঁহার মৃত্যু হয়।

ময়ূরভঞ্জ, বাস্তার, নীলগিরি প্রভৃতি রাজ্যের ব্যবস্থা, রাজার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসিয়া অনুমতি প্রদান না করা পর্য্যন্ত মৃত শাসকের শব দাহ করা হয় না। মহারাজার মৃত্যুতে বাস্তারে এই অনুমতি-সমস্যার বিস্ময়করভাবে সমাধান হয়। বাস্তারে পার্ব্বত্য জাতিসমূহের প্রধান বা মণ্ডলরা অভিষেককালে নূতন শাসকের মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দেয়। তাহারা আসিয়া রোরুদ্যমানা দ্বাদশ-বর্ষীয়া বালিকার মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দেয় (১০ই ফেব্রারী, ১৯২০)। পরে বড়লাট লর্ড রেডিং তাহাদিগের কৃত কার্য্যই সমর্থন করেন।

ইহার পর প্রফুল্লকুমারীর বিবাহের প্রস্তাব হয় এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও তাঁহার পিতৃব্যপুত্র কুমার প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত মহারাণীর বিবাহের প্রস্তাব করেন। তাহা লইয়া নানারূপ আন্দোলন হইলে লর্ড রেডিং স্থির করেন, মহারাণীর বয়স ১৬ বৎসর হইলে তাঁহার অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহ হইবে এবং তদনুসারে তাঁহার অভিপ্রায়ে পরে কুমার প্রফুল্লচন্দ্রের সহিত মহারাণীর বিবাহ হয়। মাতার মৃত্যুতে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও বাস্তারের মহারাজা হইলেন।

সুরেন্দ্রনাথ লাহা—

রাজা হৃষীকেশ লাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা গত ১৮ই চৈত্র ৫৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন। অল্পবয়সে মাতৃহীন সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথ পিতার স্নেহে লালিত পালিত হয়েন।



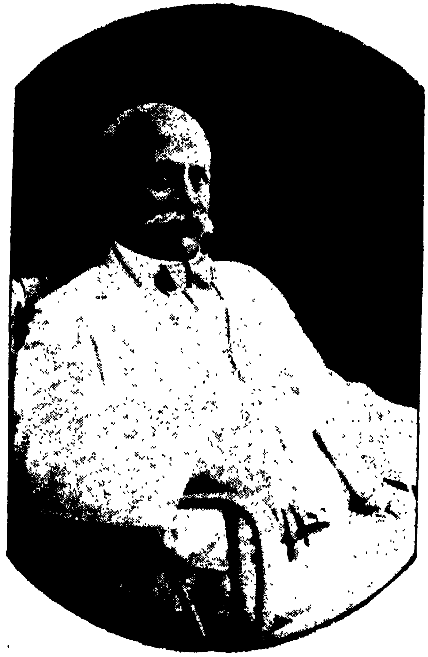
কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা

ডাভটন কলেজে কিছুদিন পাঠের পর সুরেন্দ্রনাথ পিতার নির্দ্দেশে নিজ পরিবারের ব্যবসায়ে যোগ দেন এবং তাহাতেই

তাঁহার বংশগত ব্যবসা-বুদ্ধি অনুশীলনে তীক্ষ্ণ হয়। তিনি বহুদিন কৃষ্ণদাস লাহা কোম্পানীর "সিনিয়ার পার্টনার" ছিলেন এবং ভ্রাতা নরেন্দ্রনাথের সহিত বঙ্গেশ্বরী কাপড়ের কলের আবশ্যক অর্থ যোগাইবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতি, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাষ্টি ও ধনরক্ষক, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সহকারী সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য, কলিকাতার অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট, বাসন্তী কটন মিলের ও কলিকাতা টেলিফোন কর্পোরেশনের ডিরেক্টার, সুবর্ণবণিক সমাজের সভাপতি, যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ কলেজের ট্রাষ্টী প্রভৃতি ছিলেন। তিনি কয় বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জিলার রাস্তা নির্ম্মাণের জন্য যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি পিতার মত দানশীল ও কার্য্যতৎপর ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং ভাগবতপাঠে তাঁহার সন্ধ্যা অতিবাহিত হইত। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালায় একজন সাধু ব্যবসায়ীর, নানা জনহিতকর কার্য্যে উৎসাহী সামাজিক লোকের তিরোভাব হইল। আমরা তাঁহার বিধবাকে, ভ্রাতা সুধী নরেন্দ্রনাথ লাহাকে, রাধাচরণ ও তুলসীচরণ পুত্রদ্বয়কে ও কন্যা দুইজনকে তাঁহাদিগের শোকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—

পরিণত বয়সে কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ চিকিৎসক উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। উমাদাস বাবু বিলাত হইতে চিকিৎসকের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়া দীর্ঘকাল চিকিৎসকের কায করিয়া গিয়াছেন। ডাক্তার উমাদাস ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; নদীয়া জিলার দেবগ্রাম পানিঘাটায় ও কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি ৩ বৎসরকাল কলিকাতা মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করেন; পরে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন। তিনি পরলোকগত সার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জীবনের সায়াহ্নে কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতা হইতে যাইয়া আপনার পল্লীভবনে অতিবাহিত করিবার সঙ্কল্প মনে পোষণ করিয়া তিনি দেব গ্রামে বাস-ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং শেষে তথায় যাইয়া বাস করেন। তথায় তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বাসগ্রামের প্রতি এইরূপ অনুরাগ আজকাল সচরাচর



ডাক্তার উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষিত হয় না। এ বিষয়ে তাঁহার আদর্শ অনুসৃত হইলে বাঙ্গালার অনেক পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধিত হইতে পারে।

বিমলকান্তি ঘোষ—

আমরা জানিয়া দুঃখিত হইলাম, 'অমৃতবাজার পত্রিকার' সম্পাদক পরলোকগত গোলাপলাল ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিমলকান্তি ঘোষ অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি এম-এ ও বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতী আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহা তাঁহার প্রীতিপ্রদ না হওয়ায়—পারিবারিক ব্যবসায় যোগ দিয়া—'অমৃতবাজারের' সম্পাদকীয় বিভাগে কায করিয়াছিলেন।

ডাক্তার কেদারনাথ দাস

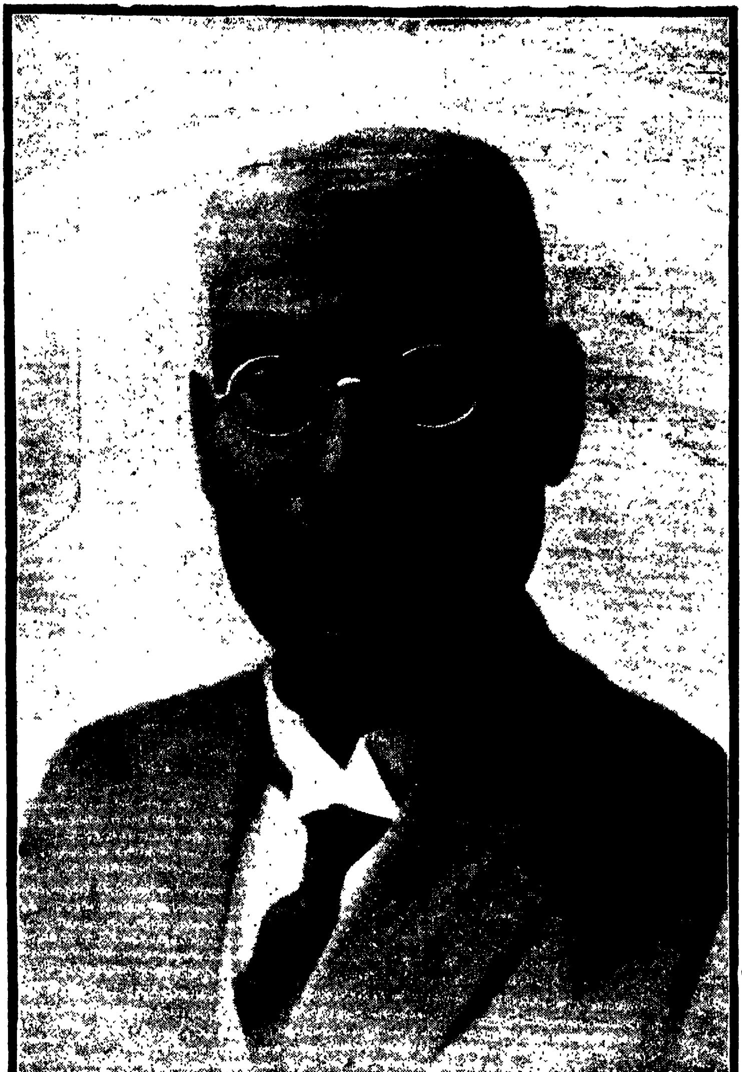
শ্রীপ্রভাত ঘোষ

ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার সার কেদারনাথ দাস গত ১৩ই মার্চ্চ তাঁহার কলিকাতাস্থ ভবনে পরলোকগত হইয়াছেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার জন্ম হয়। বর্দ্ধমান জিলার শ্রীপুর গ্রামে তাঁহার পৈত্রিক বাসভূমি। তাঁহার পিতা যাদবকুমার দাস তৎকালীন শিক্ষকদিগের মধ্যে সমাদৃত ছিলেন। কেদারনাথ তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। কলিকাতা হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও জেনারল এসেমব্লিজ ইনষ্টিটিউশন হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি স্বয়ং চিকিৎসাবিদ্যা লাভের জন্য কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি অল্পদিন মেডিক্যাল কলেজে চাকরী করিবার পর ক্যাম্পবেল স্কুলে ও তাহার সংলগ্ন হাসপাতালে চাকরী গ্রহণ করেন। তথায় তিনি দীর্ঘ ২৩ বৎসরকাল সুখ্যাতির সহিত কায করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি বাঙ্গালায় ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধে প্রধান চিকিৎসক বলিয়া পরিগণিত হয়েন এবং নানা স্থান হইতে স্ত্রীরোগের চিকিৎসার্থ রোগিণীরা তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর প্রমুখ ব্যক্তিদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কার্ম্মাইকেল কলেজে অধ্যাপনা করেন ও তথায় অধ্যক্ষের পদে মনোনীত হয়েন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি এই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

রোগ মনুষ্যের নিত্যসাথী—শরীর ব্যাধি-মন্দির; সেইজন্য যাঁহারা রোগীকে নিরাময় করেন তাঁহাদের মৃত্যুতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। ডাক্তার কেদারনাথের মৃত্যুতে সেইজন্যই আমরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি।



ডাক্তার কেদারনাথ দাস

তিনি রোগের আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং সেইজন্য তাঁহার আবির্ভা

রোগীর ও রোগীর স্বজনদিগের মনে শঙ্কার স্থানে সাহসের আবির্ভাব হইত।

যিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অনেককে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, আজ তিনিই বীরের মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। সব চিকিৎসা ব্যর্থ করিয়া তিনি যাইবার পূর্ব্বক্ষণে শিয়রে দণ্ডায়মান সার নীলরতন সরকারের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন—"দরজা জানালা সব খুলে দাও। Let there be more sweet light."

তিনি কলিকাতার বহু হাসপাতালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কার্মাইকেল কলেজকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে, মৃত্যুর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বেও ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসুর সহিত তাহার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই কলেজকে তিনি তাঁহার বিরাট সঞ্চয় পুস্তকগুলি দান করিয়া গিয়াছেন।

বাল্যকাল হইতেই তিনি রোগীর সেবায় উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কোন স্থানে ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্দ্র বলিয়াছিলেন, ডাক্তারী শিক্ষা করিলে কালে বালক প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। তাঁহার কথা সফল হইয়াছিল। তিনি যখন ডাক্তারী শিক্ষা আরম্ভ করেন, তখন কলিকাতায় ধাত্রীবিদ্যাবিশারদের সংখ্যা অধিক ছিল না। তাই তিনি সেই অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দেশবিদেশ হইতে ধাত্রীবিদ্যা সম্বন্ধীয় শত শত পুস্তক আনাইয়া তিনি অনেক সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সে সব পাঠ করিতেন। সেই অসাধারণ অধ্যয়নের ফলে তাঁহার "Obstretrix Forceps" আজ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমাদৃত।

তিনি প্রকৃতির প্রসন্ন শোভা বড় ভালবাসিতেন এবং সেইজন্য মধ্যে মধ্যে এই জনবহুল কর্ম্মকেন্দ্র কলিকাতা হইতে জামতাড়ায় চলিয়া যাইতেন। তথায় তিনি প্রকৃতির নির্ম্মল অবিকৃত রূপ যেন ধ্যান করিতেন।

আজ তিনি নাই; কিন্তু তাঁহার কীর্ত্তি তাঁহাকে চিরদিন স্মরণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিবে।

আমরা অল্পদিন পূর্ব্বে ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ বসুকে হারাইয়াছি; তাঁহার শোক প্রশমিত হইবার পূর্ব্বেই আমাদিগকে কেদারনাথের শোক ভোগ করিতে হইল।

প্রায় দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে সার কেদারনাথের স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল। তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা রাখিয়া পরলোকগত হইয়াছেন।

সিলিকণের আত্ম-কথা

অধ্যাপক শ্রীসুবর্ণকমল রায় এম-এ

ভারতবাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় কম, যদিও আমি আছি উহাদের পদরেণু হইয়া। যে দেশ একদিন মহত্ত্বে ও গুণে পৃথিবীর শীর্ষস্থান অধিকার করিত সে দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যদি আমাকে না চেনে তাহাতে আমারই বরং সৌরভময় জীবনে কালিমা লিপ্ত হয়। যে সিলিকণের (Silicon) রাজত্ব বিশ্বসংসার জুড়িয়া, তাহাকে আবার আত্মকাহিনী লিখিয়া পরিচয় ভিক্ষা করিতে হয়; ইহা ভারতবাসীর পক্ষে কলঙ্কের, আমার পক্ষেও কম অনুতাপের বিষয় নয়। দিনকালের যেরূপ প্রখর পরিবর্ত্তন, এইরূপ হাওয়ায় চুপ করিয়া থাকা বড়ই মূর্খতার পরিচায়ক।

'আমাকে যেন না করি প্রচার
আমার আপন কাজে'

এ যেন এ যুগের খাপছাড়া কথা। আমি তাই আত্মকথাধর্ম্মের পূজারী।

এই যে বিশাল স্থলভূমি বিশ্বের ¼ অংশ জুড়িয়া আছে তাহার গঠনবিধি কি কেহ অবগত আছেন? এই যে বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ আছে, উহাদের দ্বারা যদি ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয়, তবে মৌলিকত্বের দিক দিয়া মাটিরই বা উপাদান কি? গগনচুম্বী পর্ব্বতমালা—উহাদের সাথে মাটির কোন রাসায়নিক যোগাযোগ আছে কিনা এ সমস্ত

প্রশ্নের মীমাংসা ভারতবাসী কি করিবেন না? মানুষের নিকট এ বিশালদেহ পৃথিবী স্বতঃই কৌতূহল উদ্রেক করে। এ অপরূপ শরীর কি ভাবে গড়িয়া উঠিল? উহার বক্ষভেদ করিয়া কেন ঐ বিরাট পর্ব্বত মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়? এগুলি গড়িয়া তুলিতে বিধি এত উপকরণ কোথায় পাইলেন? উহাদের মূল উপকরণই বা কি? পুরাকালে ভারতবাসী অনেক সময় এ সমস্ত জল্পনা কল্পনায় ডুবিয়া থাকিতেন, কিন্তু উহাদের রাসায়নিক মূলতত্ত্ব অবগত ছিলেন কিনা আজ তাহার কোন নিদর্শন নাই।

এ রাসায়নিক যুগে দুই একটি ছাড়া সমস্ত মৌলিক পদার্থই (Element) বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা পড়িয়াছে। রাসায়নিক-বিশ্লেষণে পৃথিবীবক্ষ আজ উদ্বেলিত। কোথায় কোন্ ধাতু (Metal) বা উপধাতু (Non-metal) আছে সে সংবাদ বর্ত্তমানে রসায়নের অগোচর নয়। প্রায় ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে আমিও উহাদের আমলে আসিয়াছি। মৌলিকত্বের গর্ব্ব আমার আছে এবং অঙ্গার (Carbon) শ্রেণীর উপধাতু বলিয়া আমি পরিচিত। অঙ্গারকে যেমন নানারূপে পৃথিবীর বুকে পাওয়া যায়, আমাকে সেরূপ মুক্ত পাওয়া যায় না। এ জন্যই সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষ আমার যৌগিক পদার্থ (Chemical Compound) নিয়া এত নাড়াচাড়া করিয়াও আমার সম্বন্ধে যে তিমিরে সেই তিমিরে। অঙ্গারভায়া ইচ্ছা করিলে একা একা দিন কর্ত্তন করিতে পারে, আবার ভাবের ঘোরে (In Chemical Combination) মজিয়া থাকিতেও দেখা যায়, আমার কিন্তু মানসিক দুর্ব্বলতাজনিতই হউক বা অভ্যাসবশতঃই হউক—একা থাকা পোষায় না। এজন্য ধরাপৃষ্ঠে আমাকে পাওয়া যায় বিশেষভাবে ঐ অক্সিজেনের (Oxygen) সাথে প্রেমবন্ধনে (Chemical Combination)। আবার কতকগুলি ধাতুপদার্থও কখনও কখনও আমাদের মিলন-ক্ষেত্রে আসিয়া যোগ দেয়। সডিয়াম (Sodium), পটাসিয়াম (Potasium), এলুমিনিয়াম (Aluminium), ম্যাগ্‌নেসিয়াম (Magnesium) প্রভৃতি ধাতুই বিশেষ করিয়া সহানুভূতি দেখাইয়া থাকে। এই যে মিলনবাসর, এখানে আমিই প্রধান কেন্দ্র। আমারই চারিদিকে নানা ভঙ্গিতে অপর পদার্থগুলি স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠান হয়। এ বন্ধন ছেদন করা অত্যন্ত কঠিন। কাজেই আমার দ্বারা যে সমস্ত যৌগিক পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে তাহাদের স্বভাবকাঠিন্য জগৎবিখ্যাত। সিলিকেট (Silicate) নামে উহারা রসায়ন জগতে প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে হইতে বহু যোজন নিম্ন পর্য্যন্ত এবং পাহাড় পর্ব্বতের প্রধান উপাদানই এই সিলিকেট। পৃথিবীর ন্যায় যে আরও গ্রহ উপগ্রহ আছে, তাহাদেরও অধিকাংশের স্থলাংশ এই সিলিকেটের। আমাদের অতি নিকট বন্ধু যে চন্দ্রমা, তাহার দেহে ইহার অস্তিত্বের নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এরূপ সুদূর পল্লীতে থাকিয়াও আমার মত নিরীহ সিলিকণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া আছি, পৃথিবীর পরিমাণ করা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু আমার সমষ্টিগত পরিমাণ করা কল্পনাতীত। বিজ্ঞানচক্ষুর অন্তরালেও আমি বহুদূর, বহু বিরাট শরীরে বর্ত্তমান; সেখানে যোগীর ধ্যানদৃষ্টি প্রবেশ করে কিনা জানি না। যদি বিশ্বনিয়ন্তা সনাতন পুরুষ থাকেন, তবে তিনিই কেবল তাঁহার তুলাদণ্ডে ইহার ইয়ত্তা করিবেন। জানি না এত অচলভাবে আমাকে ছড়াইয়া রাখিয়া তাঁহার কি অভিষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে।

অক্সিজেন (Oxygen) ঘটিত যোগফল আমার একটি মাত্র আছে, তাহার নাম সিলিকা (Silica)। ইহার একটি অণুতে আমার একটি ও অক্সিজেনের দুইটি পরমাণু আছে। সিলিকা আমাদের চলিত ভাষায় অনেক কিছু নামে পরিচিত—যথা বালুকণা (Sand), অগ্নিপ্রস্তর (Flint), বিমল (Rock crystal), সোলেমানী পাথর (Agate), স্ফটিক (Quartz), পুলক (Opal) ইত্যাদি।

সমুদ্রতীরের দিগদিগন্তব্যাপী বালুকণা সিলিকারই অতি ক্ষুদ্র পরিণতি। একদিন যাহা উচ্চশিরে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বদরবারে নিজের প্রতিপত্তি ঘোষণা করিতেছিল, তাহাই এখন জল বায়ুর উৎপীড়নে পড়িয়া এত ক্ষুদ্রাকারে দুনিয়ার পদসেবা করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। প্রকৃতির ইহা অলঙ্ঘনীয় রীতি—কঠিন পর্ব্বতচূড়া ফাটিয়া চৌচির। আজ যিনি গর্ব্বিত মহারাজ—কা'ল তিনি ভিক্ষাঝুলিসহ বিশ্বদ্বারে উপস্থিত।

বেলেপাথর (Sandstone) নামে একপ্রকার পাথর আছে, প্রাসাদতুল্য দালান বালাখানায় ব্যবহৃত হয়, তাহা

সিলিকারই একটা জমাট সংস্করণ। ইহা পাহাড়ের গোড়াদেশে, সমুদ্রের কিনারায় ও উগ্র নদীবক্ষে বিস্তর পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের বেলেপাথর জগৎবিখ্যাত। উক্ত ভূখণ্ড জুড়িয়া উহার আবির্ভাব বড়ই রহস্যজনক। ধন্য সে নিপুণ কারিকর, যিনি বিশ্বকারখানায় মানুষের জন্য পাথরের স্তুপ পর্য্যন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছেন। যেমন তিনি, তেমন তাঁহার সীমাহীন কাজ। বেলেপাথরই কি ভাবে স্ফটিকে পরিণত হয় তাহা একটি অদ্ভুত কাহিনী। প্রকৃতির বিপর্য্যয়ে পড়িয়া সাধারণ পাথর সময় সময় পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ প্রচণ্ড উত্তাপক্ষেত্রে আসিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়, তৎপর আবার ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং পূর্ব্বের কাঠিন্য প্রাপ্ত হয়। ইহাই স্ফটিক (Quartz)। এখন সেই ভূতুড়ে-পাথর স্বচ্ছ, সুন্দর, দানাদার (Crystalline) রূপে পরিণত দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হয়। অনেক সময় এরূপ রূপযৌবনের মোহে পড়িয়া স্বর্ণ উহার সাথে জড়িত হইয়া পড়ে। এজন্য স্ফটিক বক্ষে সময় সময় স্বর্ণ মিলিয়া থাকে।

আবার সিলিকার কত প্রতিপত্তি; মানুষ নানা দিক দিয়া উহার নিকট কৃতজ্ঞ। অগ্নিপ্রস্তর (flint) নামক উহার এক সংস্করণ দ্বারা মানুষ এক সময় অস্ত্র তৈয়ার করিত। অতি আদিকালে যখন লৌহের সাথে লোকের ভাব ছিল না তখন এই অগ্নিপ্রস্তরই একমাত্র যন্ত্র, যাহার সাহায্যে উহারা হিংস্র জন্তু হইতে আত্মরক্ষা করিত। পুলক-পাথর নামে সিলিকার আর একটি নমুনা আছে; তাহার গর্ব্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। বহুমূল্য পাথর হিসাবে ইহার সমাদর সর্ব্বত্র। উহার অভ্যন্তরে, প্রকৃতির কোন খেয়ালে কতকটা জল আবদ্ধ আছে। সেই জলের উপর আলো-সম্পাতে চিত্র বিচিত্র বর্ণ আসিয়া পাথরের সৌন্দর্য্য উদ্ভাসিত করে। শুনা যায় অষ্ট্রিয়ার রাজপরিবারে একটি অতি সুন্দর ওপেল আছে, উহাতে সবুজ ও লাল আলো সর্ব্বদা খেলা করে। এমন কি সেরূপ মনোমুগ্ধকর ওপেল-খণ্ড অনেক সময় হিরকখণ্ডের সৌন্দর্য্যকে ম্লান করিয়াছে।

পুলক ছাড়াও সিলিকার আরও বহুবিধ মূল্যবান আকৃতি আছে। ইহাদের মধ্যে বিমল পাথর (Rock crystal) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোলাপী, লাল, হলুদ, কাল ইত্যাদি বহুবিধ রংবাহারে ইহা সুন্দরীদের মন আকৃষ্ট করে। আল্পস্ (Alps) পর্ব্বতের স্ফটিকের মধ্যে একপ্রকার বর্ণচোরা বিমল পাওয়া যায়, ইহা আইরিশ (Irish) হিরক নামে পরিচিত।

স্ফটিক পাথরের যদিও অলঙ্কারহিসাবে তত আদর নাই, কিন্তু ইহার অন্যান্য বিশেষ বিশেষ ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। চশমার পাথর রূপে, পদার্থবিদ্যার যন্ত্রপাতিতে ও আধুনিককালে টেষ্ট্ টিউব (Test tube) তৈয়ার করিতে ইহার সার্থকতা দেখা যায়। এরূপ টেষ্টটিউব উত্তাপের তারতম্যে ভাঙ্গে না, অথচ কাচের ন্যায় স্বচ্ছ।

সৌন্দর্য্যের ভরা নিয়া সিলিকা কিভাবে লোকের মনোরঞ্জন করে তাহার একটা আভাস দেওয়া গেল, এখন ইহার আর কি পরিণতি দৃষ্ট হয় তাহার আলোচনা দরকার।

সাধারণতঃ সিলিকা জলে দ্রবণীয় নহে। কিন্তু ভূগর্ভে যে ফুটন্ত জল ভীষণচাপে টগ্‌বগ্ করে, সেখানে ইহার অব্যাহতি নাই, অতি কঠিন সিলিকা সরসর করিয়া ইহাতে স্বরূপ আহুতি দেয়। ফলে জল ও সিলিকা মিলিয়া এক অভিনব রাসায়নিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এখানে হাইড্রজেন (Hydrogen) ও অক্সিজেন আমাকে কেন্দ্র করিয়া অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে সিলিসিক এসিড্ (Silicic acid) নামে অভিহিত করা যায়। এই সিলিসিক এসিড্ অনেক সময়ই উষ্ণ প্রস্রবণের সাথে ধরাপৃষ্ঠে উপস্থিত হয় এবং প্রস্রবণের চতুর্দ্দিকে সুন্দর ধবল স্তূপ হইয়া দাঁড়ায়। নিউজিলণ্ড (New-Zealand) নামক স্থানে ঐরূপ অসংখ্য প্রাকৃতিক ফোয়ারা দৃষ্ট হয়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! নানা ভাবে নানা ভঙ্গিতে উত্থিত হইয়া রাশি রাশি জল ধরাপৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িতেছে, কত কলতান, কত সঙ্গীত লহরী—উহাদের কণ্ঠ জুড়িয়া আছে। "গাওরে তাহারি নাম, রচিত যার বিশ্বধাম"—ইহাই যেন উহাদের মূলমন্ত্র।

উৎস বাহিয়া যে সিলিসিক এসিড্ আসে তাহার উজ্জ্বল ধবলত্বে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত। শুভ্র পাহাড়ের চূড়া হইতে কলতানের সাথে সাথে শ্বেতপাথরের সিঁড়ি নামিয়া আসিয়াছে। কে এক অজানা পুরুষ রঙ্গীণ নেশায় ওখানে আনাগোনা করে; ইহা তাহারই আয়োজন।

সিলিসিক এসিড্ অনেক সময় জেলীর (Jelly) মত আকার ধারণ করিতে পারে। উক্ত রূপ নিয়া অনেক সময় ইহা সামুদ্রিক জন্তু ও বৃক্ষাদির শরীরে স্থান লয়। ঘাস,

খড়, বাঁশ গাছ প্রভৃতি ঘাস জাতীয় উদ্ভিদে ইহার অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায় একমাত্র সিলিসিক এসিডের দরুণই উহারা উন্নত মস্তকে দাঁড়াইতে পারে, হেলিয়া দুলিয়াও ভাঙ্গিয়া পড়ে না। ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী ভাসমান কাদামাটি গিলিয়া উক্ত এসিড প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে উহা উহাদের শরীরের কঙ্কালে পরিণত হয়। কিসেলগার (Kiesilguhr) ইহাদেরই এক পরিণতি।

আমার বন্ধুবর অঙ্গার—রসায়নজগতে যেরূপ লব্ধপ্রতিষ্ঠ, সেরূপ অপর কেহ নহে। প্রায় অর্দ্ধেকটা রসায়ন আজ উহারই লীলাক্ষেত্র বলিলে ভুল হয় না। বহু বৈজ্ঞানিক আজ অঙ্গার-ঘটিত (organic) পদার্থ ঘাঁটিয়া জীবনপাত করিতেছেন। এরূপ কাজের পরিধি দিন দিনই অসীমের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

পৃথিবীতে আমার স্থান কোথায় তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। যদিও প্রকৃতপক্ষে আমিই স্থলভাগের মেরুদণ্ড, তথাপি আমি এখনও অখ্যাত ও অনেকটা অজ্ঞাত। আমাকে কেন্দ্র করিয়া এমন জটিল সব সিলিকেটের সৃষ্টি হইয়াছে যে রাসায়নিক এখন পর্য্যন্ত সে সমস্ত নাড়াচাড়া করিয়া আনন্দ পায় না। অনেকগুলি ধাতু সেখানে গভীরভাবে জড়িত—কিন্তু উহাদের কি পরিস্থিতি, তাহা বিশ্লেষণ দ্বারাও সম্পূর্ণ নির্দ্দেশ করা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে আমার রাজত্ব এখনও অর্গলবদ্ধ, একদিন কোন ভাগ্যবান সে দ্বার উন্মোচন করিবেন—তখন বিরাট রাসায়নিক প্রস্রবণ রসরাজ্যকে ভাসাইয়া দিবে।

পাথর, মাটি—এগুলি এত নীরস যে রাসায়নিক পদার্থহিসাবে কদাচিৎ লোকের কৌতূহল উদ্রেক করে। আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই আমি কোন রসিক রাসায়নিকের রস যোগাইতে পারি না। কিন্তু একথা সত্য, যেদিন এই পাথর মাটি ভাঙ্গিয়া উহাদের প্রকৃত আভ্যন্তরীণ গঠন প্রণালী জানা যাইবে এবং যে দিন তত্রস্থ পরমাণুগুলির রঙ্গরস সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে সেদিন এ শাস্ত্রের এক অপূর্ব্ব জয়ন্তী।

প্রকৃতির খেয়ালে যে সিলিকেটের ভাঙ্গাগড়া চলিয়াছে তাহার খোঁজ না নিলেও রসপণ্ডিতগণ আজ তাঁহাদের গবেষণাগারেই ইহা তৈয়ার করিতেছেন। কাচও এক প্রকার সিলিকেট। সিলিকার সাথে সোডা ও চক মিশ্রিত করিয়া উত্তাপ সংযোগে ইহা তৈয়ার করা হয়। নূতনত্বের দিক দিয়া এ কাচের কাহিনীতে কিছুই নাই। ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বেও লোকে ইহা অবগত ছিল। খৃষ্টের জন্মের ১৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বের কাচপাত্র এখনও আমরা দেখিতে পাই। মিশর, বেবিলোনিয়া, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি স্থানে অতীত গৌরবের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। প্রাচ্য দেশ যে এক সময়ে সমগ্র ধরণীর শীর্ষস্থান অধিকার করিত, এ সমস্ত সংস্কৃতির চিহ্ন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। মৃত্তিকা-নির্ম্মিত পাত্র ও ইষ্টকনির্ম্মিত সৌধ লোকে অবহেলে গড়িয়া তুলিত।

আজকাল কাচের ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মার্কিণ দেশে একমাত্র কাচের বোতলই বৎসরে ১৬-১৭ কোটি তৈয়ার হয়, ইহা ছাড়া জানালার কাচ প্রভৃতি কত কি সামগ্রী আছে। এই যন্ত্রদানবের দিনে একটা কাচের কারখানায় প্রবেশ করিলে হতভম্ব হইয়া থাকিতে হয়—বিশাল চুল্লীতে তরল কাচের হ্রদ, সে এক ভয়াবহ দৃশ্য—তাহা হইতে মুহূর্ত্তে হাজার হাজার বোতল ও অন্যান্য জিনিস তৈয়ার হইতেছে।

এদিকে বাসনপত্র ইত্যাদির জন্য সিলিকেটের যেরূপ বিপুল প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে তাহাতে আমি একটু আশ্বস্ত আছি। পরসিলেন (Porcelain) ও চীনাবাসনরূপে দেখা দিয়া আজকাল সভ্য জগতের আমি মান ইজ্জত রাখিয়াছি। সস্তায় আনন্দ বিলাইতে এরূপ বাহাদুরী আর কাহারও আছে কিনা সন্দেহ। আবার অক্সিজেন ও ধাতুপদার্থের মিলনক্ষেত্রে যে কত রকম সিলিকেট হয় তাহার একটা আভাষ নিম্নে দেওয়া গেল।

মাটি	···	এলুমিনিয়াম সিলিকেট্।
আভ্	···	এলুমিনিয়াম পটাসিয়াম সিলিকেট্।
ট্যালক্	···	ম্যাগ্নেসিয়াম সিলিকেট।
এসকোটান্	···	ক্যালসিয়াম ম্যাগনেসিয়াম্ সিলিকেট্।

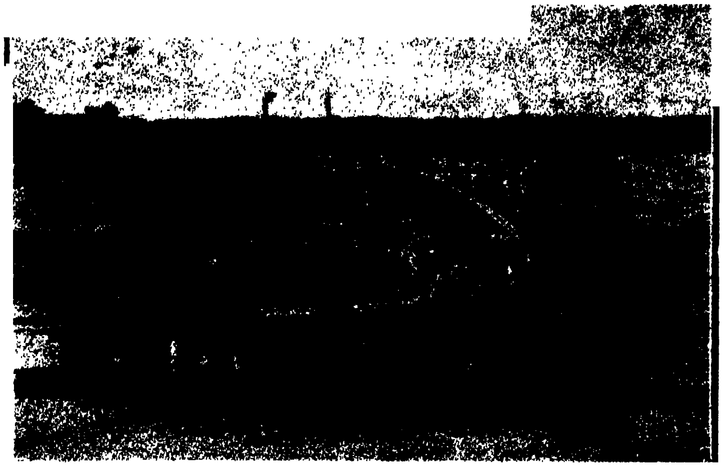
আমার বক্তব্য এখানেই শেষ হইল। প্রার্থনা করি, মা-টিই খাঁটি হউক।

সাময়িকী

হাওড়া-সেতু

কলিকাতার নিম্নে কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে যে সেতু গঙ্গার উপর বিদ্যমান তাহা যে আর কার্য্যোপযোগী নাই, সে কথা অনেকদিন হইতেই স্বীকৃত হইতেছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ছোটলাট কর্ত্তৃক সেতু নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবার জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। স্থির হয়, তিনি আর্ম্মাণী ঘাটের কাছে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া সরকারের ব্যয়ে সেতু নির্ম্মাণ করাইবেন এবং কলিকাতা বন্দরের কমিশনার-দিগকে কার্য্য-ভার দিবেন। ভাসমান সেতু নির্ম্মাণ করা স্থির হইলে প্রসিদ্ধ এঞ্জিনিয়ার সার ব্রাডফোর্ড লেস্লীর সহিত চুক্তি করা হয়—১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগের মধ্যেই অনধিক ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা (বর্ত্তমান হিসাবে) ব্যয়ে সেতু নির্ম্মিত হইবে। নির্দ্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতে কায আরম্ভ হয় ও সেতুর অংশ এদেশে আনিয়া যুক্ত করা হইতে থাকে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে সেতু নির্ম্মাণ শেষ হয় বটে, কিন্তু একটি অতর্কিত দুর্ঘটনায় কাযে বিঘ্ন ঘটে। একখানি জাহাজ নোঙ্গরের শিকল ছিঁড়িয়া সেতুতে আঘাত করে। ফলে সেতুর যে ক্ষতি হয় তাহা সংস্কার করিতে ৮০ হাজার টাকা খরচ পড়ে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ এই দুর্ঘটনা না ঘটিলে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই কায শেষ হইত। কিন্তু এই বাধার জন্য ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবরের পূর্ব্বে সেতুর উপর দিয়া লোক ও যান গতায়াতের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। মোট ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকার উপর হয়। কর আদায় করিয়া এই ব্যয়ের টাকা পূরণ করা হয়।

তাহার পর কলিকাতায় লোক ও যান গতায়াত কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। সেতুও জীর্ণ হইয়াছে। গত ১০ বৎসরেরও অধিক কাল হইতে সময় সময় শুনা যাইতেছে, ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু like threatened men living long ইহা আজও কায দিতেছে। এদিকে নূতন সেতু নির্ম্মাণের বিষয়ও আলোচিত হইয়া আসিতেছে। প্রথমাবধি পোর্ট কমিশনাররা কেন্টিলিভার সেতু নির্ম্মাণের পক্ষপাতী হইলেও কলিকাতা কর্পোরেশন ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা ব্যয়বাহুল্যের জন্য সে প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। কেন্টিলিভার সেতুই যে বাঞ্ছনীয়, তাহা সকলেই স্বীকার করিলেও ব্যয়ের জন্য বহুদিন ব্যবস্থা স্থির হয় নাই। শেষে



বর্ত্তমান হাওড়ার পুল

কালের সঙ্গে সঙ্গে আপত্তির তীব্রতা হ্রাস হইলে স্থির হইয়াছে, ঐরূপ সেতুই নির্ম্মিত হইবে।

তদনুসারে পোর্ট ট্রাষ্ট সেতুর যে নক্সা করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া নির্ম্মাণের ঠিকা লইবার জন্য যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়, তাহার ফলে যে সব কোম্পানী আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও প্রদত্ত ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(১) বার্ণ, ব্রেথওয়েট ও জেসপ (ভারতীয় সঙ্ঘ) —প্রায় ২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা

(২) এরলস—প্রায় ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা

(৩) ক্লিভল্যাণ্ড কোম্পানী—প্রায় ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা

(৪) ক্রুপস—প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ টাকা

এই হিসাবে ২টি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার—

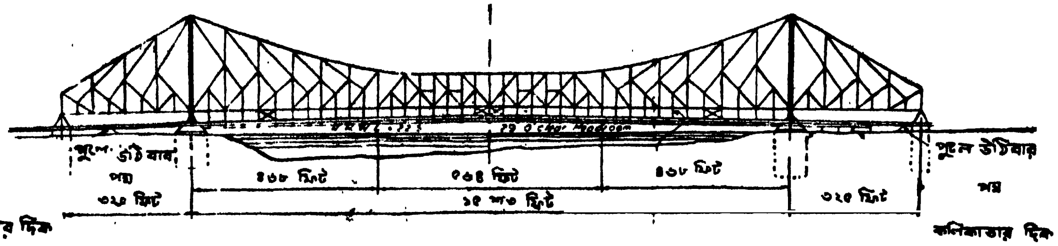
(১) ভারতবর্ষে কোন একটি কোম্পানী সেতু নির্ম্মাণের ভারগ্রহণ করিতে পারেন না এবং সেইজন্য ৩টি কোম্পানী একযোগে ঠিকা লইতে অগ্রসর হইয়াছেন।

(২) জার্ম্মাণ কোম্পানীর ঠিকা সর্ব্বনিম্ন।

এইস্থলে ইহাও বলা প্রয়োজন যে, ভারতীয় কোম্পানী ৩টির মধ্যে বার্ণ কোম্পানীতে ভারতীয়ের মূলধন আছে—আর ২টিতে নাই।

বর্ত্তমান রাজনীতিক সঙ্কটকালে জার্ম্মাণ কোম্পানী যথাযথভাবে সেতু নির্ম্মাণের চুক্তি পালন করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ বলিয়া সেতু নির্ম্মাণ সমিতি ব্যয় অল্প ৫২ হাজার ৮ শত ৫৩ টাকা—আর ভারতীয় সঙ্ঘ চাহিয়াছেন—৮৮ লক্ষ ৭৭ হাজার ৫ শত ৪৯ টাকা। এই স্থানে প্রভেদ ২৫ লক্ষ টাকারও অধিক। পোর্ট ট্রাষ্টের এঞ্জিনিয়াররা বলেন, তাঁহারা ৭২ লক্ষ টাকায় নিম্নাংশ নির্ম্মাণের ভার লইতে পারেন। সেইজন্য প্রতিবাদকারীরা বলেন, ভারতীয় সঙ্ঘ যদি ঐ টাকায় নিম্নাংশ নির্ম্মাণের ভার লইতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তাঁহাদিগকেই সেতু নির্ম্মাণভার প্রদান করা হউক। কারণ, তাহা হইলে ভারতীয় সঙ্ঘ ক্লিভল্যাণ্ডের ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার স্থানে প্রায় ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকায় সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন।

কিন্তু ভারতীয় সঙ্ঘ ৮৮ লক্ষ টাকার স্থানে কিরূপে ৭২ লক্ষ টাকায় কায করিয়া দিতে সম্মত হইবেন এবং যদি তাহাতে সম্মত হয়েন তবে তাঁহারা কি হিসাবে প্রথমে ৮৮ লক্ষ টাকা হাঁকিয়াছিলেন? তাঁহারা যদি



হাওড়ার নূতন পুলের পরিকল্পনা

হইবে বলিয়া ক্লিভল্যাণ্ড কোম্পানীর ঠিকা গ্রহণ করিতে চাহিয়াছেন।

তিনজন ভারতীয় কমিশনার কিন্তু ভারতীয় সঙ্ঘকে ঠিকা দিবার পক্ষে মতপ্রকাশ করিয়াছেন।

ঠিকা ২ ভাগে বিভক্ত—নিম্নাংশ ও ঊর্দ্ধাংশ।

ভারতীয় সঙ্ঘ উপরাংশের ব্যয় বাবদে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩ শত ৬৯ টাকা চাহিয়াছেন! আর এই অংশের জন্য ক্লিভল্যাণ্ড কোম্পানী চাহিয়াছেন—১ কোটি ৫১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৯০ টাকা। সুতরাং এই অংশের জন্য ভারতীয় সঙ্ঘের দাবি কয় লক্ষ টাকা কম। সুতরাং ঠিকা যদি ২ ভাগে বিভক্ত করা হয়, তবে ঊর্দ্ধাংশের ঠিকা ভারতীয় সঙ্ঘকে দেওয়া যায়। কিন্তু প্রতিবাদকারীরা কায ২ ভাগে বিভক্ত করিতে সম্মত নহেন। অথচ নিম্নাংশের জন্য ক্লিভল্যাণ্ড কোম্পানী চাহিয়াছেন—৬২ লক্ষ দাঁও মারিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তবে তাহা যে প্রশংসনীয় নহে, তাহা বলা বাহুল্য।

আবার টেণ্ডার গ্রহণের পর যদি তাহা পূর্ব্বোক্তভাবে পরিবর্ত্তিত করা হয়, তবে টেণ্ডার গ্রহণের সার্থকতাও ক্ষুণ্ণ হয়—বলিয়া কেহ কেহ ভারতীয় সঙ্ঘের বিরোধী হইতেছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সঙ্ঘের ৩টি কোম্পানীর ২টিতে ভারতবাসীর মূলধন নাই। তথাপি যে ভারতে সেতুর সরঞ্জাম প্রস্তুত হইলে অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক ভারতবাসী কায পাইবে তাহা বলা বাহুল্য এবং সেইজন্য মূল্যের তারতম্য অল্প হইলে ভারতীয় সঙ্ঘকে ঠিকা প্রদানে ভারতবাসীর আগ্রহ স্বাভাবিক। তদ্ভিন্ন আর একটি কথা এই যে, বড় বড় কায না পাইলে এদেশে বড় বড় এঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী স্থাপিত ও চালিত হইবে না—হইতে পারেও না। সে হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানে

কিছু ক্ষতি স্বীকার করা অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যতদিন হইতে এদেশে রেলের মাল বিদেশ হইতে আমদানী হইতেছে, ততদিন যে কোটি কোটি টাকা লাভ হিসাবে বিদেশীরা পাইয়াছে, তাহাতেই এদেশে সে সব সরঞ্জাম উৎপন্ন করিবার মত কলকারখানা স্থাপিত হইতে পারিত। বর্ত্তমানে এদেশে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সরকার যে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সাহস পাইয়াই টাটা কোম্পানী এই সেতুর জন্য লৌহ সরবরাহ করিতে পাইবেন—এই আশায় আপনাদিগের কারখানায় ব্যবস্থা-বিস্তার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের এই কার্য্য যেমনই কেন হউক না, তাঁহাদিগের আশার যে অবকাশ ছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। পোর্ট ট্রাষ্টে কলিকাতার ইংরাজ-বণিক-সভার প্রতিনিধিও বলেন, যাহাতে উপকরণ প্রস্তুত কার্য্য যথাসম্ভব এদেশে হয়, তাহার ব্যবস্থা করা সঙ্গত।

যাঁহারা ভারতীয় সঙ্ঘের পক্ষপাতী তাঁহারা বলেন, মোট ব্যয় বিদেশী কোম্পানীর নির্দ্দিষ্ট ব্যয় তুলনায় শতকরা ৫ টাকা পর্য্যন্ত অধিক হইলেও কাযের ভার ভারতীয়-সঙ্ঘকে প্রদান করা সঙ্গত। সরকার শেষ মীমাংসা কি করেন, তাহা জানিবার জন্য লোকের কৌতূহল স্বাভাবিক সন্দেহ নাই।

ভবিষ্যতের আশা—

লর্ড লিনলিথগো ভারতবর্ষের বড়লাট হইয়া আসিতেছেন। গত ২৪শে মার্চ্চ বিলাতে এক নিমন্ত্রণে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করা হয়। তাহাতে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন, লর্ড কার্জ্জন যখন ভারতে বড়লাটের পদ গ্রহণ করেন, তখন তিনি বিনয়, নম্রতা ও শ্রদ্ধা সহকারে সে কায করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা শিক্ষালাভ করিয়া উপাধিলাভ করে, ভারতের বড়লাটের কাযে শিক্ষা-লাভ হয়—উপাধিলাভের অবকাশ নাই। সেই মনোভাব লইয়া লর্ড লিনলিথগো এই পদ গ্রহণ করিতেছেন। গত ২৫ বৎসরে ভারতে যত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তত আর কোথাও হয় নাই; কেবল এক বিষয়ে ভারতবর্ষে কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—ভারতবাসীদিগের রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ভারতবর্ষ তাহার অধিবাসীদিগের মনীষা ও পূর্ব্বেতিহাসের সৃষ্ট অবস্থার মধ্য দিয়া বিলাতের সহিত নূতন সম্বন্ধের দিকে অগ্রসর হইতেছে। সেই কার্য্যে ভারতবাসীকে পথিপ্রদর্শনের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য লর্ড লিনলিথগোকে করিতে হইবে। ইহার গুরুত্ব ও দায়িত্ব সাধারণ নহে। লর্ড জেটল্যাণ্ড এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, লর্ড লিনলিথগো তাঁহার নূতন কায সুসম্পন্ন করিতে পারিবেন।

ভারতে যে পরিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা যে বিলাতের রাজনীতিকদিগের মনোভাবও পরিবর্ত্তিত করিতেছে, তাহা



লর্ড লিনলিথগো

সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যে লর্ড কার্জ্জন মর্লিমিণ্টো শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনকালে ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তন অসম্ভব বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনিই মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের পূর্ব্বগামী ঘোষণায় বলিয়াছিলেন—ভারতবর্ষে দায়িত্বশালী শাসন প্রতিষ্ঠাই ইংরাজ শাসনের উদ্দেশ্য। আবার বাঙ্গালার গভর্ণর হইয়া আসিয়া যিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের সময় সমাগত হয় নাই, আজ তিনিই সে শাসন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন স্বীকার করিতেছেন। বিলাতের রাজনীতিকরা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন—স্বায়ত্ত-শাসনে কোন দেশের অধিবাসীদিগের

জন্মগত অধিকার অস্বীকার করা যায় না। লর্ড জেটল্যাণ্ড এ-ক্ষেত্রে বলিয়াছেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলি দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। আমরা বলি, দুঃখের বিষয় এই যে ব্যবস্থা পরিষদ ও ব্যবস্থাপক সভা—এ সকলের বহু মত অনেক স্থলে সরকার কর্ত্তৃক যথোচিত আদৃত হয় না।

লর্ড লিনলিথগো বলেন, নূতন শাসন-পদ্ধতি দেশের লোকের উপর অধিক দায়িত্ব অর্পণ করিবে এবং তাঁহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা—ভারতবাসীরা সেই দায়িত্ব বিবেচনা করিয়া সেই পদ্ধতির সীমামধ্যে স্বদেশের সেবা করিবার যথেষ্ট সুযোগ লাভ করিবেন।

বর্ত্তমানে সমগ্র জগতে যে আর্থিক দুর্দ্দশা ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া লর্ড লিনলিথগো বলেন—আজ সমগ্র পৃথিবীর উপর শঙ্কা ও সন্দেহের ঘন মেঘ দেখা যাইতেছে; কিন্তু সকল দেশেই শান্তি ও কল্যাণকামী নরনারীর সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সকলেই বুঝিতেছেন, শঙ্কা ও সন্দেহ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলে সকল দেশের পক্ষেই নূতন ও উন্নত অবস্থার অরুণালোকপাত হইবে। ভারতবর্ষে যে নবযুগের প্রবর্ত্তন হইতেছে, তাহার গুরুত্ব কেবল রাজনীতিক বিষয়েই সীমাবদ্ধ নহে—পরন্তু ইহার সুযোগে প্রাচী ও প্রতীচীর জনগণের মধ্যে বর্ত্তমান অবস্থার স্থানে নূতন—ন্যায়সঙ্গত ও আত্মসম্মানের উপর প্রতিষ্ঠিত—সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে।

যদি ইংলণ্ড সত্য সত্যই স্বীয় দ্বৈপায়ন সঙ্কীর্ণতা ও প্রকৃতিগত দম্ভ বর্জ্জন করিয়া ভারতবর্ষকে সাম্রাজ্যের—অন্যান্য ও শ্বেতকায়দিগের দ্বারা অধ্যুসিত অংশের—সকল অধিকার দিতে—ভারতবাসীর জন্মগত অধিকার স্বীকার করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন—তবেই লর্ড লিনলিথগোর স্বপ্ন সফল হইবে—নহিলে নহে।

বিনাব্যয়ে রেলে ভ্রমণ—

সম্প্রতি দিল্লীতে এক আলোচনা সভায় দেখা গিয়াছে, যাহারা টিকিট না লইয়া রেলে গতায়াত করে, এদেশে তাহাদিগের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক এবং নানারূপ উপায় অবলম্বন করিয়াও রেল কোম্পানীগুলি তাহাদিগের অনাচার হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেছেন না। গত ১০ বৎসরে কত লোক এইরূপে বিনা টিকিটে গতায়াত করিয়াছে, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল!—

খৃষ্টাব্দ	বিনা-টিকিটের যাত্রীর সংখ্যা
১৯২৫	১,৭৩৪,৩৫৪
১৯২৬	১,৭৭১,৩৮৪
১৯২৭	২,৩১৮,৪৭৪
১৯২৮	২,৪২৯,৪০৫
১৯২৯	২,৬৮৩,২০৫
১৯৩০	২,৭৭৮,৪৮৮
১৯৩১	২,৩৬৭,৬৬৫
১৯৩২	২,৩৭৬,৬২৭
১৯৩৩	২,৯৯১,৬৮৭
১৯৩৪	২,৬৯৪,১৬৪

বলা বাহুল্য, সকল অপরাধী ধরা পড়ে না—সুতরাং এই সব সংখ্যায় অনাচারের সম্পূর্ণ পরিমাণ পরিমাপ করাও যায় না। যে সব সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে, তাহার ফলে মোট কত টাকা লোকশান হইয়াছে, তাহাও জানা যায় নাই; কেবল অনুমান করা যাইতে পারে—ক্ষতির পরিমাণ অত্যন্ত অধিক।

বলা হইয়াছে, গত ১০ বৎসরে এই অনাচার নিবারণ-কল্পে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা নিবারিত না হইয়া উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। যে সব উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য!—

(১) অধিক সংখ্যক ষ্টেশনে প্লাটফর্ম্ম টিকিত ব্যতীত লোককে প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত করা।

(২) কয়টি রেল লাইনে পরীক্ষার কঠোর ব্যবস্থা করা।

(৩) অল্পদূরের যাত্রীরা সত্য সত্যই যে ষ্টেশনে নামিবার টিকিট লয়, সেই ষ্টেশনে নামে কি না, তাহা লক্ষ্য করা।

(৪) রেল ষ্টেশন হইতে ভিক্ষুক প্রভৃতি বিতাড়িত করা।

(৫) যাহাতে বিনা-টিকিটের যাত্রীরা সরিয়া যাইতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে প্ল্যাটফর্ম্মের বিপরীত দিকে ও শেষভাগে প্রহরী রাখা।

(৬) ষ্টেশনে অতিরিক্ত বেড়া স্থাপন।

কিন্তু এই সব উপায় যে ব্যর্থ হইয়াছে, অনাচারীদিগের সংখ্যাবৃদ্ধিতে তাহা প্রতিপন্ন হয়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই অনাচার দূর করিবার জন্য অতিরিক্ত আইন প্রণয়নের প্রস্তাব হইয়াছে। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাব সরকার অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এইরূপ অপরাধে স্বল্পকালের জন্য কারাদণ্ড যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। বোধ হয়, পঞ্জাবে এই অভিমত অনুসারে কাযও হইয়াছে। আইন করা সহজ, কিন্তু সেই আইনে ঈপ্সিত ফললাভ করা তত সহজ বলিয়া মনে করা যায় না।

দ্বাদশ বৎসরের চেষ্টায় যে এই অনাচার প্রশমিতও হয় নাই, ইহা অবশ্যই রেলের কর্ত্তাদিগের অসাধারণ কার্য্যদক্ষতার পরিচায়ক নহে। এক দিকে রেলে বৎসরের পর বৎসর প্রভূত টাকা লোকশান হইতেছে—আর একদিকে এইরূপে রেলের ন্যায্য আয় হ্রাস পাইতেছে—এ অবস্থা সন্তোষজনক নহে। যদি অতিরিক্ত আইনের দ্বারা ইহার উচ্ছেদ সাধনই প্রয়োজন হয়, তবে দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষকাল—"ক্রু" প্রভৃতি ব্যবস্থায় বহু অর্থ ব্যয় ও বহু অর্থ লোকশান না করিয়া প্রথমেই আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা হয় নাই কেন?

নবদ্বীপে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ—

ভারতচন্দ্র নবদ্বীপের বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"ভারতীর রাজধানী, ক্ষিতির প্রদীপ।" বাস্তবিক বিদ্যাগৌরবে নবদ্বীপ বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে মিথিলায় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যাপীঠ ছিল এবং তথা হইতে উপাধি বিতরিত হইত। ন্যায়ের অধ্যাপনা তৎপূর্ব্বে নবদ্বীপে হইত না। বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রথম মিথিলায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ন্যায়শাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া ফিরেন ও নবদ্বীপে ন্যায়ের অধ্যাপনা প্রবর্ত্তন করেন। তিনিই চৈতন্যদেবের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ নবদ্বীপে পাঠ শেষ করিয়া মিথিলায় সার্ব্বভৌমের অধ্যাপক গদাধর মিশ্রের নিকট যাইয়া অধ্যয়ন ও "শিরোমণি" উপাধি লাভ করেন। তদবধি আর কেহ শিক্ষার্থী হইয়া মিথিলায় গমন করেন নাই এবং রঘুনাথ ও তাঁহার সমসাময়িক পণ্ডিতরা উপাধি প্রদান করিতে থাকেন। সার্ব্বভৌমের রচিত কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না; রঘুনাথের রচিত চিন্তামণি নামক গ্রন্থের টীকা প্রসিদ্ধ। তাহার বহুদিন পরে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত ("বুনো রামনাথ") ন্যায়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য-পরিচয় প্রদান করেন। রঘুনন্দন তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী। রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তর্কে পরাভূত করিবার জন্য কলিকাতায় আহূত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে



প্রস্তাবিত নবদ্বীপ বিদ্যাপীঠ—বুনোরামনাথের টোল　　ফটো—কে, মৌলিক

কৃষ্ণনগরের মহারাজাই পণ্ডিতদিগকে প্রধান পদ প্রদান করিতেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার ভুবনমোহন বিদ্যারত্নকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপে কোন সভা বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা উপাধি প্রদান করা হইত না। ভুবনমোহন বিদ্যারত্নের সময় নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী "পোড়ামা'র" নামানুসারে "বিদগ্ধজননী সভা" স্থাপিত হয়। পাইকপাড়ার কুমার ইন্দ্রচন্দ্র সিংহের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত এই সভার নাম পরে "বঙ্গবিবুধজননী সভায়" পরিবর্ত্তিত হয়। এ পর্য্যন্ত এই সভাই ছাত্র ও সুধীদিগকে উপাধি দিয়া আসিতেছেন। সভার বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা "রত্ন" উপাধি লাভ করেন। সরকারের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীরা "তীর্থ" উপাধি লাভ করেন।

"বিবুধজননী সভা" বহুদিন হইতে নবদ্বীপে একটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। "বুনো রামনাথের" পরে তাঁহার টোলটি ক্রমে প্রসন্নকুমার তর্করত্ন কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। সেই সময় বাবুলাল আগরওয়ালার গুরুপুত্র নবদ্বীপে তর্করত্নের টোলে শিক্ষার্থী হইয়া আসিলে আগরওয়ালা মহাশয় টোলটিকে ছাত্রাবাসযুক্ত অট্টালিকায় পরিণত করিয়াছেন। সেইজন্য এই টোলটি "পাকাটোল" নামে পরিচিত। (ই, বি, কাওয়েলের বিবরণ দ্রষ্টব্য)। নবদ্বীপে ও ত্রিহুতে দুইটি সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব বহু আলোচনার পর ত্যক্ত হইলে সরকারের সাহায্যে বারাণসীতে একটি বৃহৎ বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

"বিবুধজননী সভা" রামনাথের ভিটা ও "পাকা টোলের" গৃহ ক্রয় করিয়া তথায় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন।

এই সাধু উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি হইয়া বহু পণ্ডিতের সহযোগে দেশবাসীর নিকট অর্থ সাহায্য পাইবার জন্য আবেদনপত্র প্রচার করিয়াছেন। নবদ্বীপের "বঙ্গবিবুধজননী সভার" পক্ষ হইতে এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা হইতেছে।

এক্ষণে সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদি সংস্কৃত বিদ্যাকেন্দ্র নবদ্বীপে কথিত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাহা যে বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

পাঠ্য-নির্দ্ধারণ—

বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষাবিভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তাবের প্রয়োজনানুরূপ পাঠ্য-পুস্তকাদির বিষয় ও ঐ সব প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় শিক্ষা প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান জন্য এক সমিতি গঠিত করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক এই সমিতির সভাপতি। আর নিম্নলিখিত ১৫ জন পুরুষ ও নারী ইহার সদস্য।— শান্তিনিকেতনের ডাক্তার ধীরেন্দ্রনাথ সেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষাবিভাগের শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কয়লা ব্যবসায়ী), শ্রীনিকেতনের ডাক্তার প্রেমচাঁদ লাল, বিষ্ণুপুর শিক্ষাসঙ্ঘের পাদ্রী এস, কে, চট্টোপাধ্যায়, মৌলানা মহম্মদ আক্রাম খাঁ, মুসলমান-শিক্ষার ভূতপূর্ব্ব সহকারী ডিরেক্টার খাঁ বাহাদুর আলফাজুদ্দীন আহম্মদ, সহকারী ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাক্‌শান মিষ্টার জে, এম, সেন, কুমারী এস, বি, গুপ্ত (ইনস্‌পেকট্রেশ অব স্কুলস), মুসলমান-শিক্ষার বর্ত্তমান সহকারী ডিরেক্টার অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশান খাঁ বাহাদুর মৌলা বক্স, মিষ্টার আবুল হোসেন, মিসেস এম, এ, মোমেন (ইনি পূর্ব্বে ইনস্‌পেকট্রেস অব স্কুলস ছিলেন এবং মুসলমান ছিলেন না), খাঁ বাহাদুর তসাদ্দক আমেদ, ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় ও মৌলবী আবুল কোয়াশেম। রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলানা আক্রাম খাঁ, মৌলবী আবুল কোয়াশেম ও তারক বাবু কি জন্য সমিতির সভ্য হইলেন বুঝিতে পারা যায় না। যখন ধর্ম্মবিষয়ক শিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, তখন হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান একসঙ্গে কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন? আর যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মক্তাব এক নহে, তখন এরূপ পাঁচমিশালী সমিতির সার্থকতা কি?

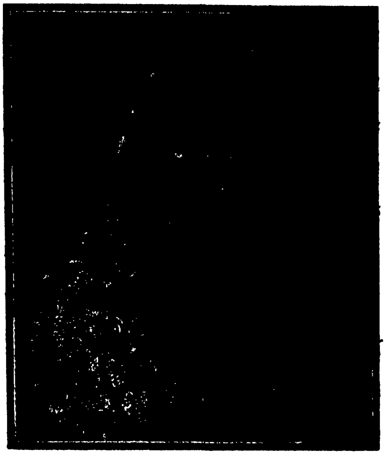
স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ও প্রাথমিক শিক্ষা—

গত ১৮ই চৈত্র দিল্লীতে নিখিল-ভারত স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন সম্মিলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার শিক্ষা বিভাগের সভার আমাদিগের স্নেহভাজন—কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে'র সম্পাদক শ্রীমান অমলচন্দ্র হোম

সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা-বিস্তারে কলিকাতা কর্পোরেশনের কার্য্যের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছিলেন। কিরূপে কলিকাতা কর্পোরেশন এ বিষয়ে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য-পালন-প্রচেষ্টা করিতেছেন তাহার বিবরণ দিয়া বক্তা দেখাইয়াছেন, কর্পোরেশন প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দ এ-বিষয়ে অবহিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে কর্পোরেশন-পরিচালিত বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-দিগের মধ্যে ১৩ হাজার হিন্দু ও ৫ হাজার মাত্র মুসলমান এবং ছাত্রীদিগের মধ্যে ১২ হাজার ৫ শত হিন্দু ও মাত্র ২ হাজার মুসলমান।

মহিলা কাউন্সিলার—

চাকরীর হিস্যা লইয়া বিবাদ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের মুসলমান কাউন্সিলাররা পদত্যাগ করিয়া-ছিলেন—পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করায় এক জনকে প্রস্তুত হইতে হইয়াছিল এবং নূতন নির্ব্বাচনে অনেকক্ষেত্রে

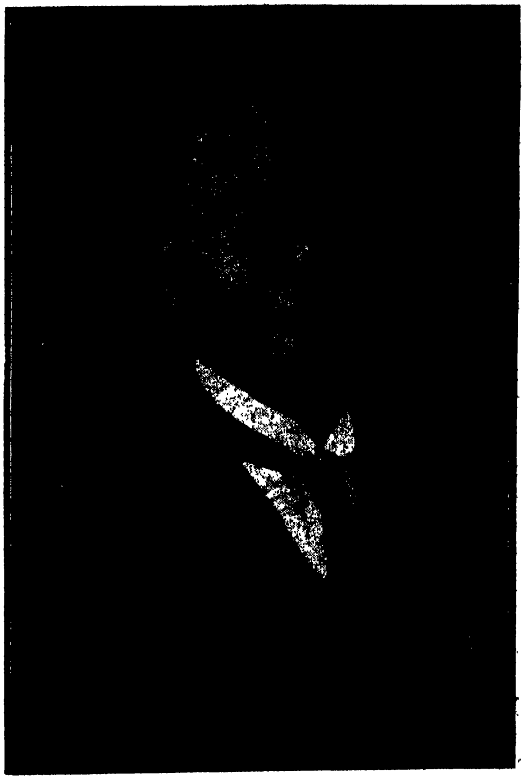


বেগম সাকিনা M-A, B-L

মুসলমানরা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হয়েন নাই। এমন কি মুসলমান ভোটারদিগকে ভোট দিতে বাধা দেওয়াও হইয়াছিল। মুসলমান কাউন্সিলারদিগের শূন্য স্থানে, আইনের বিধানানুসারে, সরকার যে কয়জন মুসলমান কাউন্সিলার মনোনীত করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন মহিলা। শ্রীমতী সাকিনা ফারুক সুলতান মইয়দজোদা কলিকাতা হাইকোর্টে উকীল হইয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে ইনিই প্রথম মুসলমান মহিলা-কাউন্সিলার।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু—

ডাক্তার সার কেদারনাথ দাসের মৃত্যুতে কার্মাইকেল মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ পদ শূন্য হইয়াছিল। ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু তাঁহার স্থানে অধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মধ্যমাগ্রজ পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি বিলাত হইতে চক্ষু



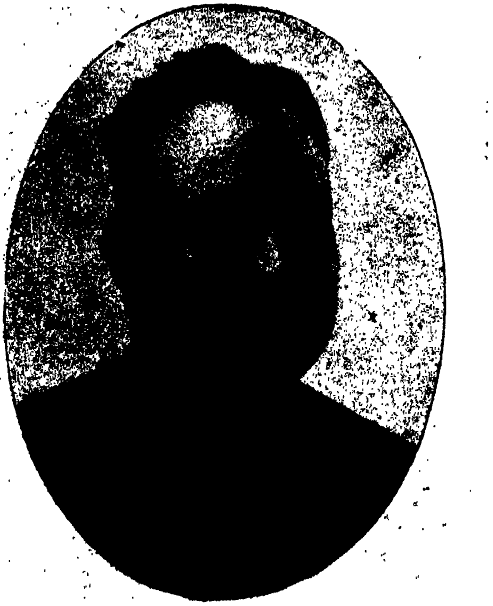
ডাক্তার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু

চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং চিকিৎসকরূপে যশ অর্জ্জন করেন। ইনি দীর্ঘকাল কার্মাইকেল কলেজের সহিত সম্পর্কিত থাকিয়া কলেজের কার্য্যে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। ইনি মিষ্টভাষী, সদালাপী ও কর্ম্মঠ। ইঁহার নিয়োগে আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি।

মন্ত্রীদের কথা—

যে শাসন-পদ্ধতিতে বর্ত্তমান মন্ত্রীরা কার্য করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তনকাল আসন্ন। তাই এবার বাজেটের আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙ্গালা সরকারের মন্ত্রীরা নিজ নিজ কৃত কার্য্যের বিবরণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রদান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য আপনার কথা আপনি বলিতে হইলে একটু অতিরঞ্জনের প্রলোভন সম্বরণ করা অনেকের পক্ষেই দুঃসাধ্য হয়।

শিক্ষাবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক মন্ত্রিত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদিন মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত



মন্ত্রী খাঁ বাহাদুর আজিজুল হক

থাকিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার বিবৃতিতে নূতন কথা অধিক নাই। তিনি প্রথমেই বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের অর্থ-সাহায্যের আলোচনা করিয়া সে সাহায্যের পরিমাণ সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পর উল্লেখযোগ্য কথা—ভবিষ্যতে কলেজগুলিতে বাহিরের লোকের—অন্যান্য কলেজের অধ্যাপক, বিখ্যাত শিক্ষাভিজ্ঞ, অর্থ-নীতিক, সাংবাদিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির—অতিরিক্ত বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হইবে। অন্যান্য দেশে ইহা Extension Lectures নামে পরিচিত। তাহার পর তিনি বলেন, বাঙ্গালার মুসলমানরা শিক্ষা বিষয়ে অগ্রসর হইতেছে বটে, কিন্তু ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারিং, বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাহাদিগের সংখ্যা আশানুরূপ নহে। তাহাদিগকে এই সব বিষয়ে শিক্ষালাভে অধিক সাহায্য করিবার বিষয় এখন সরকারের বিবেচনাধীন। বালিকাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, আমরা তাহাতে প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন, সরকারের উদ্দেশ্য—প্রত্যেক জিলায় বালিকাদিগের জন্য সদরে একটি সুপরিচালিত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও প্রত্যেক মহকুমা-সহরে একটি ভাল মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন। যে শিক্ষা বর্ত্তমানে বালকদিগেরও উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না, বালিকাদিগকে সেই শিক্ষাদানে যে সুফল ফলিবে, এমন মনে হয় না। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে যে বিবৃতি গত বৎসর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা আমরা তৎকালেই করিয়াছি; সুতরাং সে সম্বন্ধে আজ আর কোন কথা বলিব না।

ইহার পর স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের মন্ত্রীর কথা। ইনি যে দীর্ঘকাল মন্ত্রিত্ব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাঙ্গালার স্বাস্থ্যোন্নতির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। তাঁহার বাসগ্রাম যে জিলায় অবস্থিত, সেই জিলায় গ্রাম-বিশেষে নূতন কুইনাইন ব্যবহারের যে পরীক্ষা হইয়াছে, তাহার ফল সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা যায় না। স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগে এই সময়ে সর্ব্বপ্রধান উল্লেখযোগ্য কার্য্য—কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করা। এই ক্ষমতা কতটা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার পরিচয়—সেদিনও কর্পোরেশনের মুখপত্রের "কংগ্রেস সংখ্যা" প্রকাশে বাধায়—পাওয়া গিয়াছে। ভারত সরকার তাঁহাদিগের নীতিবিবৃতিতে বলিয়াছিলেন—

"Except in cases of really grave mismanagement, local bodies should be permitted to make mistakes and learn by them, rather than be subjected to interference either from within or from outside."

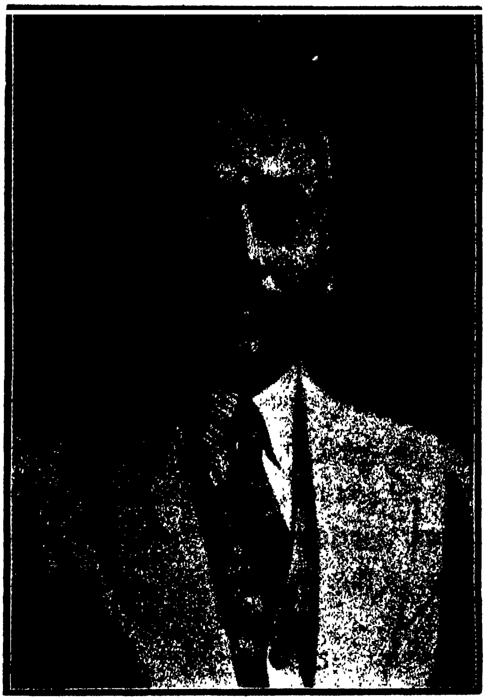
কিন্তু নূতন ব্যবস্থায় বাহির হইতে সরকারের হস্তক্ষেপের ক্ষমতা এত প্রবল করা হইয়াছে যে, স্বায়ত্ত-শাসনের মূল-নীতির বিকৃতি ঘটিয়াছে।

শেষ—কৃষি ও শিল্প এবং সমবায় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নবাব সার মহীউদ্দীন ফারুকী। ইহার কার্য্যকালও

যেমন দীর্ঘ, কৃত কার্য্যের তালিকাও তেমনই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষিকার্য্যে উন্নতি ব্যতীত এ দেশে সাধারণ লোকের উন্নতির যেমন উপায় নাই, তেমনই আবার বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার মূলধনও লাভ করা দুঃসাধ্য। আমেরিকার দৃষ্টান্তে ইহা বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই কৃষিপ্রাণ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের প্রভূত উন্নতিসাধন যে সময়সাধ্য ও ব্যয়সাধ্য, তাহা বলা বাহুল্য। সরকারের বর্ত্তমান ব্যবস্থায় বড় চাকরীয়াদিগের বেতনে, পুলিসের ব্যয়ে ও ঐরূপ নানা বাবদে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়, তাহাতে কৃষি ও শিল্প বিভাগের জন্য আবশ্যক টাকা অবশিষ্ট থাকে না। তবে গত বৎসর হইতে ভারত-সরকার পল্লীর পুনর্গঠন জন্য যে টাকা দিতেছেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইয়াছে ও হইতেছে।

পাটের দাম অত্যন্ত কমিয়া যাওয়ায় বাঙ্গালার প্রজার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সরকার পাটচাষ সঙ্কোচ করিয়া পাটের মূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন এবং ইহাতে যে জমী পতিত থাকিবে তাহাতে অন্য কোন কোন ফশলের চাষ হইতে পারে সে সম্বন্ধে লোককে উপদেশ দিতেছেন। মন্ত্রী যে স্বয়ং এই প্রচারকার্য্য ব্যপদেশে জিলায় জিলায় যাইয়া লোককে বুঝাইয়া চাষ-সঙ্কোচের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, এজন্য আমরা অবশ্যই তাঁহার প্রশংসা করিব। যতদিন মন্ত্রীরা আপনাদিগকে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি মনে না করিবেন, ততদিন তাঁহারা লোকের বিশ্বাসভাজন হইতে পারিবেন না। অথচ আমরা দেখিতে পাই, কোন কোন মন্ত্রী বন্যায় বা অন্য কারণে দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্থানে যাইয়াও ব্যয়সাধ্য অভিনন্দনলাভের প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন না। ইহা যে দুঃখের বিষয়, তাহা বলা বাহুল্য।

কৃষিবিভাগ হইতে অধিক ফলনের ধান্যের ও পাটের বীজ বিতরিত হইতেছে এবং তামাকের ও ইক্ষুর চাষে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হইতেছে। রংপুর অঞ্চলে প্রজারা তামাকের চাষে বিশেষ লাভবান হইতেছে। উন্নত শ্রেণীর ইক্ষুর চাষেও প্রজাদিগকে উৎসাহিত করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে যে ভাবে বাঙ্গালায় চিনির কারখানা বাড়িতেছে, তাহাতে মনে হয় অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালার লোককে আর বাঙ্গালার বাহির হইতে চিনি আমদানী করিতে হইবে না। ইতঃপূর্ব্বে প্রজার উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়ের কোন ব্যবস্থা সরকার করেন নাই; এখন যে সে কাযে অবহিত হইয়াছেন ইহা আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই। ইহার ফল কিরূপ হয়, তাহা দেখিবার জন্য আমরা আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করিব। বাঙ্গালার গবাদি পশুর অবস্থা শোচনীয়। বাঙ্গালা প্রতি বৎসর অন্য প্রদেশ হইতে অনেক টাকার বলদ ও দুগ্ধবতী গবী আমদানী করে। যাহাতে এই অবস্থার প্রতিকার হয়, কৃষিবিভাগ সে চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রংপুর পশুক্ষেত্রের উচ্ছেদসাধনের প্রতিবাদ



মন্ত্রী নবাব সার মহীউদ্দীন ফারুকী

করিয়া এইরূপ পশুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মন্ত্রীমহাশয়কে অনুরোধ করিতেছি।

ফলের চাষে সরকারের মনোযোগদানও এই স্থানে উল্লেখযোগ্য।

স্থানাভাবে আমরা কৃষিবিভাগের কার্য্যের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিতে পারিলাম না।

শিল্পবিভাগের কথায় নবাব সাহেব বলিয়াছেন, এই বিভাগের কায নিম্নলিখিত কয়ভাগে বিভক্ত করা যায়:—

(১) শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে সংবাদসংগ্রহ ও প্রচার।

(২) পরীক্ষা ও গবেষণা পরিচালন।

(৩) প্রচারকার্য্য ও প্রদর্শন।

(৪) কারীগরী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

(৫) অর্থাভাবে বিব্রত শিল্পীদিগকে আবশ্যক অর্থদানের ব্যবস্থা।

মন্ত্রী মহাশয়ের কথা, শিল্পবিভাগ এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া কায করিতেছেন। আটক-আসামীদিগকে শিল্পশিক্ষা প্রদানের ভার যে রাজনীতিক বিভাগের উপর না দিয়া শিল্প-বিভাগের উপর অর্পিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়—সরকারের এই বিভাগ অন্যান্য বিভাগের তুলনায় লোকের অধিক আস্থা অর্জ্জন করিতে পারিয়াছে।

সমবায় বিভাগ বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতির জন্য বিশেষ বিব্রত হইয়াছে বটে, কিন্তু যখন মনে করা যায় এই সমবায় নীতি অবলম্বন ব্যতীত দেশের উন্নতিসাধন দুঃসাধ্য তখন স্বতঃই এই বিভাগের কার্য্যে মনোযোগ দিতে হয়। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ যখন এদেশে আসিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন :—

"If the system of Co-operation can be introduced and utilized to the full, I foresee a great and glorious future for the agricultural interests of this country."

কলিকাতা কর্পোরেশন—

কলিকাতা কর্পোরেশনের নূতন সদস্য নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে। পুরাতন কাউন্সিলাররা তাঁহাদিগের শেষ সভায় গত বৎসরের কাযের আলোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কলিকাতার করদাতারা যে সর্ব্বতোভাবে সন্তোষলাভ করিতে পারে নাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। গত দ্বাদশ মাসে কর্পোরেশনের মোট ৮৭টি সভাধিবেশন হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যেই কলিকাতার পানীয় জল দূষিত বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সহরবাসীকে ক্লোরিণযোগে বিস্বাদ জল পান করিতে হইয়াছিল। এই বিষয় লইয়া যে আন্দোলন হয়, তাহার ফলে দেখা যায়—স্থানে স্থানে জলবাহী নলে ছিদ্র হওয়ায় আবর্জ্জনাপূর্ণ জল পানীয় জলের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তাহার জন্য বিসূচিকা ও রক্তামাশয় সংক্রামক ব্যাধিরূপে ব্যাপ্তি লাভ করে। এই অবস্থার প্রতীকার করা প্রয়োজন। আপাততঃ নলে যদি সর্ব্বদা জলপূর্ণ রাখা যায়, তবে বিপদ সম্ভাবনা হ্রাস পাইতে পারে। কিন্তু সে ব্যবস্থা হয় নাই। এ সম্বন্ধে এক সমিতি গঠিত হয়। সমিতির নির্দ্ধারণ এখনও জানা যায় নাই। সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরাট কীর্ত্তি নূতন কর্পোরেশন প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে অবহিত হইয়াছেন। গত মার্চ্চ মাসে কর্পোরেশন পরিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা—২ শত ২৭ ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মোট ৩৩ হাজার ছিল। বর্ত্তমানে এই বাবদে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়; আরও ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সহরে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার আয়োজন হইতেছে। কর্পোরেশনের এই কার্য্য অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগে নিযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীদিগের সম্বন্ধে অনেক সময় অনেক অপ্রিয় কথা শুনা যায়।

কর আদায় সম্বন্ধে শৈথিল্য কর্পোরেশনের পক্ষে প্রশংসার কথা নহে। একদিকে কর আদায়ে শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে; আর এক দিকে এই সময়েও কর্পোরেশন—ইংরাজ সরকারের অনুকরণে—উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া বেতনের পরিমাণ অকারণ অধিক করিয়াছেন।

গত বৎসর চাকরীর "হিস্যা" লইয়া মুসলমান কাউন্সিলাররা অনেকেই কর্পোরেশন ত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহা যে সাম্প্রদায়িকতার সম্প্রসারণ-পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কলিকাতা কর্পোরেশন বহুদিন হইতে সহরের মধ্যে অবস্থিত আবর্জ্জনা-বাহী রেলে আবর্জ্জনা ভরিবার ব্যবস্থা-লোপের প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিতেছেন। আজও সে প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত করা হয় নাই।

সহরের উপকণ্ঠে গবাদিপশু রক্ষার ও গোচরের ব্যবস্থা আজও হয় নাই।

সহরে ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয় বন্ধ হয় নাই।

কলিকাতার পথগুলির অবস্থা উন্নত না হইয়া অবনতই হইয়াছে।

গত কাউন্সিলার-নির্ব্বাচনকালে যে কোন প্রসিদ্ধ জননায়ক চীফ একজিকিউটিভ অফিসারকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন—কর্পোরেশনের কয়জন কর্ম্মচারী নির্ব্বাচনে মোড়লী করিতেছেন, তাহাতে মনে হয়—কর্ম্মচারীদিগকে উপযুক্ত শাসনে রক্ষা করা হয় না। অথচ অপরাধী কর্ম্মচারীদিগকে কোনরূপ দণ্ডপ্রদান করা হয় নাই। নির্ব্বাচন কেন্দ্রেও কোন কোন কর্ম্মচারীর অনাচার ও অজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়াছে।

স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায় কর্পোরেশন আইন যেরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে যে কর্পোরেশনে স্বায়ত্ত শাসননীতির স্বরূপ বিকৃত হইয়াছে, তাহা অনেক কার্য্যেই প্রকাশ পাইয়াছে।

সুভাষচন্দ্র বসু—

শ্রীমান সুভাষচন্দ্র বসু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিতেছেন জানিতে পারিয়া ভারতসরকার তাঁহাকে জানাইয়া দিয়াছেন, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাঁহার স্বাধীনতা আর



সুভাষচন্দ্র বসু

অক্ষুণ্ণ থাকিবে না। ব্যবস্থাপরিষদে এই ব্যবস্থার নিন্দাজ্ঞাপক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু সরকার এই ব্যবস্থাপরিষদকে পার্লামেণ্ট বলিলেও ইহার সিদ্ধান্ত স্বৈরক্ষমতাবলে পদদলিত করিতে পারেন। তাঁহারা বলেন, সুভাষচন্দ্র বিপ্লবতন্ত্রীদিগের দলের সহিত সংশ্লিষ্ট; অথচ তাঁহারা কেন যে আদালতের বিচারে তাঁহাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করিবার সরল পথ ত্যাগ করিয়া বিনাবিচারে তাঁহার নির্ব্বাসন-ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সরকার পক্ষের কথা—সুভাষচন্দ্রের মনীষা ও লোককে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার ক্ষমতা যেরূপ অধিক, তাহাতে তাঁহার মত মনোভাবসম্পন্ন লোককে মুক্ত অবস্থায় রাখা সরকারের পক্ষে সুবুদ্ধির কায হইবে না। অনেকে মনে করিবেন, এই স্বীকারোক্তি শক্তিসম্পন্ন বৃটিশ-সরকারের পক্ষে দৌর্ব্বল্যপরিচায়ক। ইংরাজ স্বয়ং স্বদেশকে কত ভালবাসেন তাহা সকলেই জানেন। বিদেশে মৃত বন্ধুর শব যে ইংলণ্ডে আনিয়া সমাধিস্থ করা হইবে—এই চিন্তাতেও ইংরাজ কবি টেনিশন সান্ত্বনানুভব করিয়াছিলেন!—

"'Tis well; 'tis something! we may stand
Where he in English earth is laid,
And from his ashes may be made
The violet of his native land."

আর সেই ইংরাজই এদেশে সুভাষচন্দ্রকে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দিতে অসম্মত!

বেকার-সমস্যা—

বিলাতে যে গত মাসে বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৭ শত ১ জন কমিয়াছে, ইহাতে বিলাতের সরকার যেন স্বস্তির শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে বেকারের সংখ্যা ছিল—২০ লক্ষ ২৫ হাজার ২১। পূর্ব্বের তুলনায় দেখা গিয়াছে, বিলাতে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ইহার কারণ বিলাতে বেকারদিগের হিসাব রাখা হয়, তাহাদিগকে—যাহাতে তাহারা অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয় সেজন্য—সাহায্য প্রদান করা হয় এবং যাহাতে তাহারা কায পাইয়া সরকারের ভার হইয়া না থাকে, সে ব্যবস্থাও করা হয়। এ দেশে সেরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। এমন কি অনাহারে লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইলে বা আত্মহত্যা করিলেও সরকার সে জন্য তিরস্কৃত হয়েন না। এ দেশে বেকার-সমস্যা কিরূপ প্রবল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। কোন কোন প্রদেশ এই বিপদের স্বরূপনির্ণয় ও

প্রতীকারোপায় নির্দ্ধারণ জন্য সমিতি নিযুক্তও করিয়াছেন। সেই সকলের মধ্যে যুক্তপ্রদেশের সাপরু কমিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আজও সেই সমিতির নির্দ্ধারণানুসারে কোন কায হইল না! দেশে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্ত্তন যেমন প্রয়োজন, শিল্পপ্রতিষ্ঠা তেমনই প্রয়োজন—নহিলে এই বিষম সমস্যার সমাধান হইবে না। কিন্তু সে বিষয়ে সরকার উল্লেখযোগ্য কোন কাযই করেন নাই ও করিতেছেন না। বিশেষ যতদিন সরকারের সামরিক ও শাসনব্যয় হ্রাস না হইবে, ততদিন শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্যে আবশ্যক অর্থের অভাবও ঘুচিবে না।

ডিলিমিটেশন কমিটি—

বিলাতের মন্ত্রীর রচিত সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের পর যে সমিতি সেই নির্দ্ধারণের মধ্যে ব্যবস্থাপকসভাসমূহে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র স্থির করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল, সেই কমিটির নির্দ্ধারণে বাঙ্গালার প্রতি বিশেষ অবিচার হইয়াছে। বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভায় ১৪ জন বিদেশী ব্যবসায়ী-প্রতিনিধি, আর ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের মাত্র ৫ জন প্রতিনিধির স্থান হইবে। বাঙ্গালার পরামর্শ-সমিতি ও বাঙ্গালা-সরকার স্থির করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় যে সব ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আছে, সে সকলের মধ্যে বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ ২ জন, বঙ্গীয় মহাজন সভা ১ জন, মাড়বারী এসোসিয়েশন ১ জন ও নবগঠিত মসলেম চেম্বার অব কমার্শ ১ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবেন। মাড়বারী এসোসিয়েশনের স্বরূপ ইহার নামেই প্রকাশ। মসলেম চেম্বার সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ প্রকাশের পর স্থাপিত এবং তাহার সভ্যরা প্রায়ই অন্যান্য প্রদেশ হইতে আগত। বাঙ্গালা-সরকার পরামর্শ-সমিতির সহিত একমত হইয়া বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের বণিকদিগের নিয়ন্ত্রণাধীন ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্শের প্রতিনিধি প্রেরণাধিকার অসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় এই যে ডিলিমিটেশন কমিটি তাঁহাদিগের অধিকারই স্বীকার করিয়া মহাজন-সভার অধিকার হরণ করিয়াছেন। অথচ মহাজন-সভাই বাঙ্গালার অন্তর্বাণিজ্যে রত বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদিগের একমাত্র ও প্রতিষ্ঠাপন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বর্ত্তমানে এই সভা ব্যবস্থা-পরিষদে সদস্য নির্ব্বাচনের অধিকার বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্শ ও মাড়বারী এসোসিয়েশনের সহিত তুল্যরূপে সম্ভোগ করিয়া আসিতেছেন! বাঙ্গালায় যে ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধিদিগের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যাই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় অধিক হইবে, ইহা একান্ত অসঙ্গত।

সিন্ধু ও উড়িষ্যা—

গত ১৯শে চৈত্র হইতে সিন্ধু ও উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইয়াছে। এই দুই প্রদেশের অধিকাংশ অধিবাসী যাহা চাহিয়াছেন, তাঁহারা তাহা লাভ করিলেন। সুতরাং এ বিষয়ে আমরা আর কোনরূপ মত প্রকাশ বাহুল্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু কিরূপে যে এই প্রদেশদ্বয়ের ব্যয়সঙ্কুলান হইবে, তাহাই বিবেচনার বিষয়। যখন সিন্ধুর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য এক সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তখন দেখা গিয়াছিল—সিন্ধুর আয়ে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না—হইতে পারে না। কিন্তু তথাপি সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছে। সিন্ধু মুসলমানপ্রধান প্রদেশ হইল—সে জন্য মুসলমানরা ইহার গঠনে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এখন আফগানিস্থানের সীমায় যে ধ্বনি ধ্বনিত হইবে, তাহা সিন্ধুতে পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে পারিবে। উড়িষ্যা প্রথমে বিহারের মতই বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত হইয়া—বিহারের সহিত এক প্রদেশে পরিণত হইয়াছিল। এখন উড়িষ্যা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইল। ইহার রাজধানী কোথায় হইবে, তাহা এখনও স্থির হয় নাই এবং তাহা লইয়া উড়িষ্যাবাসীদিগের মধ্যে মনোমালিন্যের চিহ্নও আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ঘোড়া যখন হইয়াছে, তখন চাবুকও হইবে। উড়িষ্যার দারিদ্র্য শোচনীয়। এই দরিদ্র প্রদেশে স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থায় করবৃদ্ধি অনিবার্য্য হইবে। কিরূপে সে ব্যবস্থা হইবে, তাহা এখনও জানা যায় নাই। তবে আমাদিগের বলা এই যে—সিন্ধু ও উড়িষ্যাকে দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত করিয়া তাহাদিগের জন্য যদি কেন্দ্রী-সরকারের তহবিল হইতে টাকা যোগাইতে হয়, তবে সে ব্যবস্থায় অন্যান্য প্রদেশের আপত্তি অনিবার্য্য।

হেমচন্দ্র স্মৃতি উৎসব—

গত ২১শে চৈত্র হুগলী জিলার রাজবলহাটে হেমচন্দ্র স্মৃতিপূজা, হুগলী জিলা পাঠাগার সম্মিলন ও হেমচন্দ্র স্মৃতি-পাঠাগারের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে।

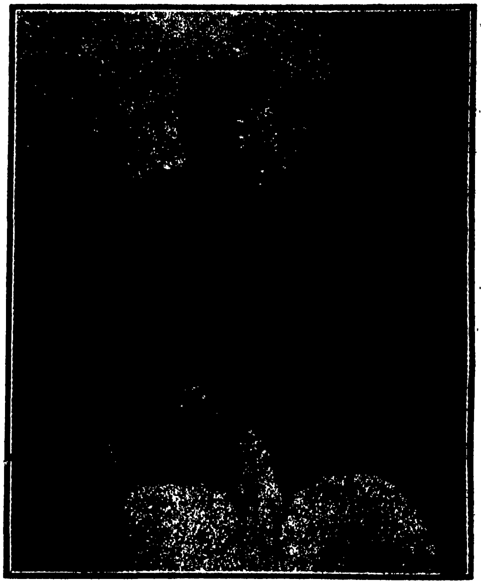
প্রথমে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন।

পাঠাগার-সম্মেলনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সভাপতিত্ব ও শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিত্ব করেন এবং শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় পাঠাগার সম্মিলনের কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু শিশু-পাঠাগার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্নের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষ হেমচন্দ্র-স্মৃতি-উৎসবে সভাপতি ছিলেন। তিনি বলেন, এই রাজবলহাটে কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪৫ বঙ্গাব্দের ৬ই বৈশাখ মাতামহগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

হেমচন্দ্র-স্মৃতি-পাঠাগারের বার্ষিক উৎসবে শ্রীযুক্ত মুণীন্দ্রদেব রায় মহাশয় সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

সহর হইতে দূরে এইরূপ অনুষ্ঠানের বিশেষ উপযোগিতা আছে। এই অধিবেশনের উদ্যোগীরা বাঙ্গালার সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদিগের ধন্যবাদ-ভাজন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীযুক্ত ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উদ্যম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নব-বরষে

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য

অতীতে ও বর্ত্তমানে ব্যবধান একটি নিমেষ,
পুরাণো নিমেষ যায়, নবীনের হয় আগমন।
বর্ষ পরে বর্ষ আসে, মাস তিথি হয় না নিঃশেষ,
নব নামে নব সাজে মহাকাল করেন নর্ত্তন॥



শিক্ষা

শ্রীদেবহরি দে

চলিত কথায় শিক্ষা শব্দের অর্থ যাহা কিছু শেখা যায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ সাহিত্য, কেহ বিজ্ঞান, কেহ রাজনীতি, কেহ অর্থনীতি প্রভৃতি নানাবিধ বিষয় শিখিলেই আমরা মনে করি তাহার শিক্ষা সমাপন হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষা শব্দে মাত্র অতটুকু বুঝিলে চলিবে না; বিদ্যাভ্যাস, জ্ঞানাভ্যাস এগুলি ত আছেই, শিক্ষা শব্দে আরও গভীর মহান ভাব বুঝায়। সেটি মনুষ্যত্ব-লাভ; এগুলি তাহার সহায়তা করে মাত্র। এই মনুষ্যত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে কোন অধীত বিদ্যাই কার্য্যকরী হয় না। মানুষের যে সকল বৃত্তি বর্জ্জনীয় সেগুলি ত্যাগ, যে গুলি আদরণীয় সে গুলির অনুশীলন করিয়া পরের এবং নিজের কল্যাণলাভ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। যাহাতে বিচার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়, বিবেক সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, ন্যায় ও সত্যের প্রতি নিষ্ঠা হয় এবং সমাজের কল্যাণের জন্য নিজের জীবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় ইহাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

প্রাচীনকালে দেখা যায় এইটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শিক্ষাদান করা হইত। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে যে সকল প্রাচীন মনীষী ও জ্ঞানীর নাম পাওয়া যায় তাঁহারা সকলেই উন্নত-চরিত্র, সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, এবং সমাজের কল্যাণে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে সকল ছাত্রদের বিবরণ পাওয়া যায় তাহারা দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া এইরূপ একটি গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিতেন। গুরুগৃহে বাস তখন শিক্ষার আর একটি প্রধান অঙ্গ ছিল। যতদিন না শিক্ষা সমাপ্ত হয়, ততদিন শিক্ষার্থীকে গুরুগৃহে বাস করিতে হইত। শিক্ষার্থীরা গুরু এবং গুরুপত্নীকে পিতামাতা জ্ঞানে প্রাণপণে সেবাযত্ন করিয়া তাঁহাদের প্রসন্নতা লাভ করিবার চেষ্টা করিত। গুরু ও যে শিষ্যটি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতেছে দেখিতেন তাহাকেই প্রাণ ঢালিয়া তাঁহার সমস্ত বিদ্যা অর্পণ করিতেন। এইভাবে তখনকার দিনে শিক্ষাদান এবং শিক্ষালাভ চলিত।

বর্ত্তমানে গুরুগৃহ উঠিয়া গিয়া বিদ্যালয় এবং বিদ্যায়তনের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্ব হইতেই একটি শিক্ষা তালিকা প্রস্তুত হয়। প্রথম যে দিন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙ্গাইয়া ভিতরে প্রবেশ করে, সেইদিন জ্ঞানের পুটুলী তাহার উপর চাপান হইতে থাকে এবং শেষদিন পর্য্যন্ত সবগুলি পুটুলিই চাপান হইয়া গেলে শিক্ষক মহাশয় নিশ্চিন্ত হন এবং তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইয়াছে মনে করেন—ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহাকে প্রকৃত জ্ঞান দান বলা চলে না,—ইহার নাম চর্ব্বিত চর্ব্বণ। মানব-মস্তিষ্ক মাত্র এই চর্ব্বিত চর্ব্বণের জন্য সৃষ্ট হয় নাই—ইহার সীমা অনন্ত। কোন জ্ঞানই আমরাবাহির হইতে শিখাইয়া দিতে পারি না। জ্ঞান বাহিরের জিনিষ নয়, ইহ কাহারও লাভ করিতে হয় না। ইহা ভিতরেই আছে, মাত্র সেইটিকে ভিতর হইতে বাহিরে আনা হয়। আমরা বলি, বৃক্ষ হইতে ফল পতন দেখিয়া নিউটন মাধ্যাকর্ষণের সূত্র আবিষ্কার করিলেন। ইহা ভুল; মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম তাঁহার ভিতরেই ছিল। ফলটির পতন সেই জ্ঞানকে বাহিরে আনিবার কারণ। ঠিক সর্ব্বত্র এইরূপই চলিতেছে। বাহিরের বাধাগুলি সরান আমাদের কায। এইভাবে তাহার অন্তর্নিহিত প্রতিভার স্ফুরণের সাহায্য করিতে হইবে। প্রতিভা একবার স্ফুরিত হইলে, আর কোন সাহায্য করিবার দরকার নাই। তখন সেইটিকে আপনা আপনি জ্বলিতে দেওয়াই আমাদের কাজ। ইহাই হইল শিক্ষাদানের বৈজ্ঞানিক নীতি। কিন্তু আমরা ঠিক ইহার বিপরীত নীতি অনুসরণ করি। প্রতিভার সম্যক বিকাশের চেষ্টা না করিয়া ভুলক্রমে তাহাকে আরও ক্ষীণ করি। কেন না যখনই আমরা মনে করি, কাহাকে কিছু শিখাইয়া দিতেছি, তখনই তাহার মস্তিষ্ককে খর্ব্ব করি, তাহার অন্তর্নিহিত শক্তিকে বেগদান না করিয়া তাহার বেগরোধ করি।

শিক্ষকতা একটি অত্যন্ত গুরুভারপূর্ণ কার্য্য। দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন, সূক্ষ্মবিচারশীল ব্যক্তিরই এই কাজ লওয়া উচিত। কখন কোনটিকে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির সম্মুখে আনিলে কিভাবে সে গ্রহণ করিবে, প্রয়োগের এই কৌশলটুকু জ্ঞাত হওয়া

চাই। কোনটাকে গ্রহণ করিতে গিয়া তাহার মস্তিষ্ক কি পরিমাণ শ্রান্ত হইতেছে অথবা কি পরিমাণ উৎসাহিত হইতেছে, সেইগুলি পূর্ণভাবে লক্ষ্যাধীন রাখা চাই। এক কথায় শিক্ষার্থী অপেক্ষা শিক্ষককে বেশী পরিশ্রম করিতে হইবে। বর্ত্তমান অনুসৃত পদ্ধতিতে ঐ প্রকার শিক্ষাদান সম্ভব নয়। একই মাষ্টারকে ক্লাশের সমস্ত ছাত্র পড়াইতে হয়। কাজেই অতি সহজেই তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। ফলে কৌশল অপেক্ষা তাড়নার আশ্রয় লইতে হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহার উন্মুখতার পথটি রুদ্ধ হইয়া যায়। যদি কেহ ধীরভাবে লক্ষ্য করিয়া—বুঝিবার এবং শিখিবার পক্ষে কোনটি বাধা হইতেছে দেখিয়া—সেই বাধাটিকে দূর করিতে পারেন, তবেই তাহাতে সুফল হয়। এই সমস্যা সকল স্বাধীন জাতির মধ্যেই দেখা দিয়াছে। ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই শিক্ষা-প্রণালী লইয়া কত পরীক্ষা চলিতেছে। বহু অধ্যবসায় ও গবেষণার পর কিণ্ডারগার্ডেন, মণ্টেসারী প্রভৃতি নীতি গড়িয়া উঠিতেছে।

আমাদের দেশে কয়জন শিক্ষার জন্য ভাবেন বা তাহার দায়িত্ব বুঝেন। কয়টি পিতামাতা তাহার সন্তানের শিক্ষার জন্য চিন্তা করেন। কোনরূপে কয়েকটা টাকা বিদ্যালয়ের বেতন যোগাইয়া, সন্তানকে বিদ্যালয় পর্য্যন্ত পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। কি যে তাঁহার শিক্ষা হইতেছে, সে সম্বন্ধে আর মাথা ঘামান না। সন্তান জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করাও যে কর্ত্তব্য, এ শিক্ষা তাঁহাদের নাই।

শিক্ষকের কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, ইহা একটি বৃত্তি মাত্র নয়, ইহা একটি ব্রত। একটি জীবনের ভার তাঁহার উপর। তিনি যে আকারে যে ছাঁদ দিবেন, সেই আকার সেই ছাঁদ ভবিষ্যতে চিরকালের জন্য স্থায়ী হইবে। একটি বিশাল রাজ্যের শাসনভার অপেক্ষা একটি বালকের ভবিষ্যত জীবন গঠনের দায়িত্ব অনেক পরিমাণে বেশী।

শিক্ষাদানের দায়িত্ব শুধু যে পিতামাতা এবং শিক্ষকেরই মাত্র তাহা নহে। যাঁহারা বালকদিগের সংস্পর্শে আসেন, তাহাদের সহিত একত্র থাকিবেন—সকলেরই এ সম্বন্ধে দায়িত্ব সমান। বাহিরের জিনিষ হইতে মনের উপর ছায়া পড়ে; বালকদের সহিত ব্যবহারে মন যেন বিকৃত আকার না পাইয়া স্বাভাবিক সহজ আকার পাইতে পারে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্ত্তব্য।

কোন একটি ব্যক্তির জীবন লক্ষ্য করিলে দেখি—তাহার কার্য্যকলাপ চালচলন আচারব্যবহারগুলির মধ্যে একটা সঙ্গতি ও সুনিবদ্ধ ভাব আছে—তাহারা সেই জাতীয় কারণ হইতে উদ্ভূত। তাহাকে আমরা স্বভাব বা প্রকৃতি বলি। মানুষের মধ্যে যেমন বাহিরের আকারের বিভিন্নতা থাকে, সেইরূপ স্বভাবের পার্থক্যও প্রতি মানুষে আছে। একই পিতামাতার সন্তান—একই শিক্ষা-দীক্ষার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিলেও তাহাদের স্বভাব বিভিন্ন হইবে। পঞ্চ পাণ্ডব আজন্ম একত্র লালিতপালিত হইয়া একত্র অবস্থান, একত্র বিহার এবং একত্র গ্রথিত থাকিলেও স্বভাবের অত্যন্ত বিভিন্নতা তাহাদের মধ্যে ছিল। একই জাতীয় বৃক্ষ একই দেশের মাটিতে পাশাপাশি জন্মিয়া একই জলবায়ুর গুণে বর্দ্ধিত হইয়া কত বিভিন্নতা ধারণ করে—আবার একটি বৃক্ষের ফলগুলি প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি হইতে বিভিন্ন। আরও গভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখি, এমন কি একই বৃক্ষের কোন দুইটি পত্রও এক নয়। প্রকৃতির মধ্যে এই বিভিন্নতা সর্ব্বত্র। ইহাই প্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম।

শিক্ষাক্ষেত্রে প্রকৃতির এই সত্যটির মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা-প্রণালী ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার প্রথম সূত্র হইল—শিক্ষা দ্বারা স্বভাব গঠিত বা পরিবর্ত্তিত হয় না। স্বভাব আপন হইতে গঠিত হইয়াই আছে। শিশুকালে তাহার আভাষ এত ক্ষীণ থাকে যে কোন প্রকারে তাহা চক্ষে পড়ে না। কৈশোরে তাহা ক্রমে ক্রমে সুস্পষ্ট হয় এবং যৌবনে তাহা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবের গতি লক্ষ্য করা সব সময় অভিজ্ঞদিগের সাধ্য হয় না। স্বভাবটি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেই এমন একটি সময় আসে এবং তাহা এত দ্রুত পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ অবস্থায় উপনীত হয় যে পূর্ব্বাপর লক্ষণগুলির মধ্যে মিল খুঁজিয়া বাহির করা সাধারণের ত কথাই নাই অভিজ্ঞদিগের পক্ষেও দুঃসাধ্য। যে কোন ব্যক্তির জীবনধারা লক্ষ্য করিলে এটি সহজেই আমাদের চক্ষে পড়িবে।

তখন স্বভাবের সহিত শিক্ষার সংযোগ কি? ইহার উত্তর, শিক্ষার দ্বারা স্বভাব গঠিত হয় না। স্বভাবই শিক্ষার দ্বারা পুষ্ট হয়। কেন এবং কেমন করিয়া হয় তাহা

বলিতেছি। দুইটি গাছ একই মাটিতে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া একই জল বায়ু রৌদ্রের সাহায্যে এবং মাটি হইতে একই প্রকার খাদ্য আহরণ করিয়া দুইটি বিভিন্ন রকমের ফল-ফুল প্রসব করিতেছে। তাহা হইলে দেখি উপাদানগুলি উদ্ভিদদ্বয়ের প্রকৃতিরই সহায়তা করিতেছে মাত্র। সেইরূপ একই প্রকার খাদ্য ভোজন করিয়া নারীদেহ ও পুরুষ-দেহ গঠিত হইতেছে; ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে একই দ্রব্য বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিভিন্ন ক্রিয়ার সৃষ্টি করে। শিক্ষাক্ষেত্রেও সেইরূপ আমরা বিভিন্ন বিষয়গুলি হইতে প্রকৃতি অনুযায়ী কতকগুলি বাছিয়া লই। অথবা বৈজ্ঞানিক ভাবে বলিলে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি বিভিন্ন প্রকৃতিতে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত হয়। ইহাই হইল শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ।

শিশু প্রকৃতিতে বুদ্ধি-বৃত্তি অপেক্ষা মেধাশক্তিই সমধিক প্রস্ফুটিত! সে সহজেই কোন জিনিষ শুনিয়া শুনিয়া মুখস্থ করিয়া ফেলে এবং তাহাতে বেশ আনন্দ বোধ করে। কিন্তু একটা জিনিষ বুঝিবার জন্য মোটেই ব্যস্ত নহে, পারত পক্ষে সেদিকেও সে যাইবে না। তাহার কারণ বহিঃপ্রকৃতির ছাপ অতি অল্পই তাহার চিত্তে পড়িয়াছে—কাজেই স্মৃতির দ্বারা তাহাকে জাগরিত করা তখনও সহজ থাকে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে মেধা কমিতে থাকে! দেখা যায় ইহার কারণ এত নানাবিধ দ্রব্যের ছাপ পড়িয়া গিয়াছে যে, স্মৃতি-বলে পুরাতন কোন একটা উদ্ধার করা একটু শক্ত হয়। আমার এই যুক্তির পক্ষে একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কোন একটি দোকানের মুটেরা সকাল হইতে রাত্র পর্য্যন্ত জিনিষ ওজন করে এবং ডাক দিয়া তাহার ওজন লিখাইয়া দেয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত শতাধিকবার ওজন চাপাইলেও তাহারা বলিয়া দিতে পারে—কখন কোন ব্যক্তির মাল কত ওজন হইয়াছে। সেই ব্যক্তিকেই যদি বলা যায় মাল লইয়া অমুক ঠিকানায় যাও তবে সে সমস্ত পথ সেই ঠিকানাটি আওড়াইতে আওড়াইতে যায়। এরা শেষ পর্য্যন্ত হয়তঃ ঠিকানা ভুলিয়া গিয়া ফিরিয়া আসে। এই দুইটি বিষয়ে পার্থক্য বড় চমৎকার। একটিকে মনে করিয়া রাখার জন্য কোন তাগিদ দেওয়া হয় নাই—অথচ সেটিকে স্মরণ করিয়া রাখা তাহার পক্ষে অতি সহজসাধ্য হইল—কিন্তু যেটিকে মনে রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে সেইটিই সে ভুলিয়া যায়। তা হ'লেই দেখা যায় বাহিরের কোন তাগিদ বার বার অভ্যাস করার দরুণ স্মৃতিশক্তি সেটা গ্রহণ করিতে বিমুখ হয় এবং যেটি সহজ স্বাভাবিকভাবে আসে সেটিকেই সে গ্রহণ করিয়া লয়।

বালক-চিত্ত বাহিরের তাগিদে কিছু গ্রহণ করিতে চায় না। জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দিলেও তাহা ভুলিয়া গিয়া বোঝা হাল্কা করিতে তাহার দেরী হয় না। সে চায় যাহা কিছু শিখিবে তাহা আনন্দের ভিতর দিয়া লইতে। তাহার স্বাভাবিক আনন্দময়তার বিরুদ্ধে কিছু আসিলে সে বাঁকিয়া বসে। আনন্দের সহিত মিশিয়া তাহার মনের সহিত খাপ খাওয়াইয়া যাহা আসে সেইটিকে ধরিয়া রাখিতে চায়। তাই দেখি, উপকথার গল্প—রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীগুলি সে একবার শুনিয়াই মনে রাখিতে পারে—কিন্তু পড়ার একটি ছত্রও তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। সত্যই সে তুলনায় একটি বালক অন্যান্য পাঁচটি বিষয় লেখা পড়ায় তাহার অতি ক্ষুদ্র অংশও গ্রহণ করিতে পারে না। বাপমায়ের সহিত কোন দেশ বা স্থানে বেড়াইতে যাইয়া কোথায় কি দেখিয়া আসিল, কোন স্থান কিসের জন্য প্রসিদ্ধ, পথের নানা স্থানের নাম ও বিবরণ সে বেশ গুছাইয়া বলিতে পারিবে, কিন্তু ইতিহাস বা ভূগোলের কয়টা নাম ও বিবরণ সে মনে রাখিতে পারে? ইহার কারণ, ভ্রমণের সময় সেই বিবিধ দৃশ্য যে আনন্দ দিয়াছে, যে পরিমাণ তাহার দেখা শুনা এবং জানার আগ্রহ বাড়াইয়া দিয়াছে, তাহার কোনটিই পুস্তকের মারফতে দেওয়া যাইতেছে না। এই অবস্থায় শিখিবার জন্য ব্যস্ত করিলে সেগুলি পীড়াদায়ক হইয়া উঠে এবং পরে মন একেবারেই তাহাদের প্রতি বিমুখ হয়। ঠিক যেমন আমরা ফুলা বা বেদনার উপর কোন আঘাতই আসিতে দেই না, সর্ব্বদাই সভয়ে তাহা ঢাকিয়া রাখি—সেইরূপ আনন্দহীন চেষ্টার ফলে তাহার মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিলে সে কিছুতেই গ্রহণ করিতে চায় না।

এখন দেখা যাইতেছে শিক্ষা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই প্রাথমিক শিক্ষা বিধানের সংস্কার হওয়া আবশ্যক। পাঠ্য-পুস্তকের আবশ্যকীয়তা কোথায় কতটুকু এবং কি ভাবে হইবে তাহা বুঝিয়া লইয়া কাহাকে কোন

বয়স হইতে পাঠ্যপুস্তক ধরান হইবে, তাহার বালকগত সক্ষমতা অক্ষমতার বিচার করিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা না করিয়া সকলকেই এক বয়স হইতে পাঠ্যপুস্তক ধরাইতে যাওয়া ভুল হইবে। ছেলের বয়স হইয়াছে বলিয়াই যে তাহার উপর পাঠ্যপুস্তকের ভার চাপাইতে হইবে সে প্রণালী মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নহে।

শিক্ষাক্ষেত্রে চিন্তাশীলতার অভাব বেশী। শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য মানুষকে চিন্তাশীল করিয়া তোলা। যে কোন বিষয় বা যে কোন ভাবকে লক্ষ্য করিয়া যদি চিন্তা করা যায় তাহাতেই কায হয় বেশী। এই ভাবে একটি বিষয় লইয়া অভ্যাস করিলে আরও পাঁচটি বিষয় সরল হইয়া যায়। মনোযোগের সহিত পুস্তকের একটি অধ্যায় পড়িলে সমগ্র পুস্তকের মর্ম্ম বুঝা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া পড়ে। কোন একটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার লইয়া যদি ধীরভাবে তাহার প্রত্যেকটি অংশ খুঁটিয়া বিচার করা যায়, আবিষ্কারকের চিন্তাসূত্রটি ধরিতে পারা যায়, তবেই সে সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ণ হয়—দ্বিতীয় একটি নূতন আবিষ্কারের প্রেরণা আপন মস্তিষ্কে জাগ্রত হয়। সাহিত্য জগতেও তাহাই; কিভাবে সাহিত্যিক তাহার আপন ভাবকে প্রকাশ করিতেছে, কোন জিনিষ অবলম্বন করিয়া কিরূপ ভাবধারা প্রবাহিত হইতেছে সেগুলি চিন্তাশীলের অতি সহজেই লক্ষ্যে পড়ে। জগতে যাঁহারা বড় হইয়াছেন, যাঁহাদের কথা দশজনে মানিয়া লইয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে এই ক্ষমতা যেন স্বাভাবিক দৃষ্ট হয়। কোন একটি বিষয়ের সামান্য ফলের পরিচয়ের মধ্যে তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ সুস্পষ্ট জ্ঞান তাহাদের জন্মে। কিন্তু সাধারণ লোকের একটি বিষয় বার বার দেখিলেও তাহার বাহিরের দিকটাই লক্ষ্যে আসে, আবার তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই বাহিরের জিনিষের ও সবটুকু দেখিতে পায় না।

জগতে শতকরা ৯৯.৯ লোকই গড্ডালিকার স্রোতে গা ভাসাইয়া চলে। চোখ বুঁজিয়া চলাতেই তাহারা আরাম পায়, তাই চোখ খুলিয়া নূতন পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে নিজের বুদ্ধি খাটাইতে তাহারা ভয় পায়। যেমন ব্যক্তিগত-জীবনে, তেমনি সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম সর্ব্বত্র হুজুগের পিছনে ছুটাছুটি। আজিকার যে ফ্যাসান—দ্রুতগতিতে কাল তাহা বদলাইয়া যাইবে। বক্তৃতায় শুনিলাম ধনীর অত্যাচারে দরিদ্র ধ্বংস পাইতেছে, আভিজাত্যই জগতকে রসাতলে লইয়া যাইতেছে—তখনই আমরা উচ্চকণ্ঠে কম্যুনিজমের জয়-গান গাহিয়া উঠি। আবার কেহ হয়ত বলিল, জগৎ শক্তিমানের ইঙ্গিতে চলিয়াছে চলিতেছে ও চলিবে, তখনই আমরা ফ্যাসিজম ও হিটলারিজমের পক্ষপাতী হইয়া উঠি। কোথাও শুনিলাম, অমুক একজন খ্যাতনামা লোক বলিতেছেন—ধর্ম্মই মানব জাতিকে আফিমের গুলি খাওয়াইয়াছে। তখনই আমরা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে খড়্গাহস্ত হই, দেবদেবীর উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিলে যেন নিশ্চিন্ত হই। আবার কেহ হয়ত বলিলেন—না হে হিন্দুর ঐ ন্যাস ধ্যান আর কিছুই নয়—এইগুলি বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত মাংসপেশীসঞ্চালন ক্রিয়া, অমনি আমরা তাহাই বিশ্বাস করিয়া লই। এই যে মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তন, বিশ্বাস এবং যুক্তির দৃঢ় ভিত্তির অভাব, ইহার কারণ চিন্তাশীলতার অভাব।

শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সেই পরিমাণে সফল হইবে যে পরিমাণ আমরা তাহাকে চিন্তাশীল করিয়া তুলিতে পারিব, দ্রব্যের ভেতরটা দেখিবার জন্য গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপের সহায়ক হইব।

এইবার ভারতীয় শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলিব। পুত্র কৈশোরে পদার্পণ করিলে পিতামাতা তাহাকে গুরুগৃহে প্রেরণ করিতেন। শিক্ষা সমাপন পর্য্যন্ত ছাত্রকে সেইখানে বাস করিতে হইত। গুরুগৃহে অন্যান্য সহপাঠীরা থাকিত এবং গুরু ও গুরুপত্নীকে সকলে পিতা মাতা জ্ঞান করিত।

গুরুগৃহে গৃহচর্য্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কার্য্যই করিতে হইত। কেহ কাঠ আনিত, কেহ জল তুলিত, কেহ গরু চরাইত—এইরূপ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে বর্ত্তমান কালে যেমন কায়িক পরিশ্রমকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করা হয় না, তখন সেইরূপ ছিল না। পরিশ্রমকে কোন প্রকার হীন মনে করা হইত না, বরং ইহাই ছিল স্বাভাবিক যে কেহ কিছু না কিছু পরিশ্রম করিবে—কেননা শরীর রক্ষার্থ পরিশ্রম অপরিহার্য্য।

ছাত্রদের বেশভূষার কোন আড়ম্বরই তখন ছিল না বা বেশভূষার সৌখীনতার প্রতি কোন মনোযোগ তাহাদের ছিল না। অতি সামান্য পরিচ্ছদ ব্যবহার করিয়া তাহারা

আনন্দের সহিত দিন কাটাইত। বেশভূষার ন্যায় আহার্য্যও অতি সামান্য ছিল। কোন প্রকার চর্ব্বচোষ্য আহারের ব্যবস্থা ছিল না। শুধু সংস্থানের অভাব বশতঃ নহে, ঐরূপ আহার ব্যবহার করাই নিষেধ ছিল।

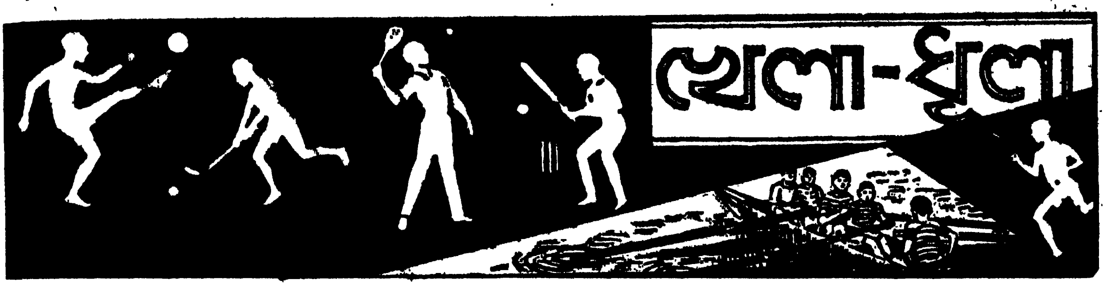
এই কয়বৎসর তাহারা অতি গভীর সেবার ভাব লইয়া সকল কর্ম্ম করিতে শিখিত। গুরুর প্রতি অনুরাগ এবং তাঁহার প্রীতির জন্য সকল কর্ম্ম করিতেছি—এই বোধ ধারণ করিয়া সযত্নে তাহা বাড়াইবার চেষ্টা করিত, এই বোধ এবং এই সেবার ভাব তাহাদের চরিত্রে এত গভীরভাবে অঙ্কিত হইত যে গুরুর একটি সামান্য আজ্ঞার জন্য তাহারা প্রাণ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। গুরুকে তাহারা দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত, তাহাদের নিকট গুরু অপেক্ষা অন্য কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। ইহাই মনুষ্যত্বের পরিচয়। যাঁহার নিকট সারা জীবনের জন্য দায়ী থাকিতে হইবে, প্রাণপণে তাঁহার সেবা ভক্তি করা ছাড়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের আর কি উপায় আছে? কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ দেখাই যায় না বলিলে হয়।

বেশভূষা ও আহারবিহারের সংযম—এইগুলি ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্গত। এই আশ্রমে তাহারা কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিত। ব্রহ্মচর্য্য চরিত্র গঠনের ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য্য না থাকিলে কোন উপদেশ ধারণ করা—পালন করা যায় না বা পালন করিবার ক্ষমতা থাকে না। ব্রহ্মচর্য্যের অভাবে স্বাস্থ্য স্মৃতি মেধা প্রতিভা সকলই নষ্ট হয়। উচ্চ চিন্তা করিবার ক্ষমতা লুপ্ত হয়, উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ বিষয় সম্বন্ধে কোন ধারণা হয় না। যে সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ শিক্ষার উদ্দেশ্য, ইহার অভাবে সে বিষয়ে কখন অধিকারী হওয়া যায় না।

সেদিনে দেখা যায়—অন্যান্য উপায় অপেক্ষা গুরুর সাহচর্য্যে ও সঙ্গে শিক্ষা হইত বেশী। গুরু তাঁহার বিদ্যার সবটুকু দান করিয়া শিক্ষা সমাপন করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়া যদি তদতিরিক্ত কিছু জানিবার আগ্রহ থাকিত, তখন শিক্ষার্থী অন্য গুরুর নিকট যাইত।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের পর গৃহস্থাশ্রম গ্রহণই ছিল সাধারণ প্রথা। কিন্তু যদি কোন ব্রহ্মচারীর মনে ঐ বয়সেই তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা লাগিত, তাহা হইলে সে একেবারেই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিত।





আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

বোম্বাই ও মানাভাদার সেমি ফাইনালে ০-০ ও ১-১ গোলে ড্র ক'রবার পরে মানাভাদার তৃতীয় দিনে ৪-১ গোলে বোম্বাইকে হারিয়ে ফাইনালে উঠে। বার্লিনগামী ভারতীয় দলের মনোনয়ন হয়ে যাওয়াতে খেলোয়াড় ও দর্শকের আগ্রহ কমে যাওয়ায় খেলা ভালো জমেনি। বিজিত দলের নামকরা খেলোয়াড়রাও ভাল খেলতে পারে নি। তাদের ফরওয়ার্ডরা গোল করার সুযোগ কদাচিত নষ্ট করে থাকে, কিন্তু তারাও অসংখ্য সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারে নি, খেলায় যেন তাদের আগ্রহ ছিল না। মানাভাদারের গোলরক্ষক বোস্টন খাঁ অত্যাশ্চর্য্য খেলেছে। সে অনেকগুলি অবধারিত গোল রক্ষা করেছে। তার তুলনায় বোম্বাইএর গোলরক্ষক পিন্টোর খেলা অনেক নিকৃষ্ট হয়েছিল। দু'টি গোল রক্ষা করা তার উচিত ছিল। মানাভাদারের পক্ষে আমেদ দু'টি ও সুলতান খাঁ দু'টি গোল দিয়েছে, বোম্বাইএর হ'য়ে পিন্টো একটি গোল দেয়।

বাঙ্গলা বিজয়ী ঃ

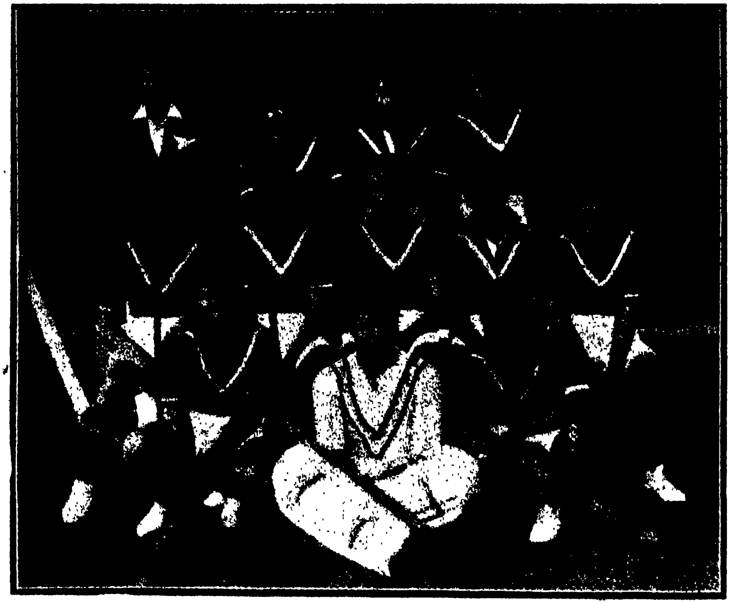
আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় বাঙ্গলা এক গোলে মানাভাদারকে হারিয়ে প্রথমবার এই প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো। ১৯২৮ সালে এই প্রতি-যোগিতা আরম্ভ হয়। সেবার যুক্তপ্রদেশ জয়ী হয়েছিল। দ্বিতীয় বার ১৯৩২ সালে ফাইনালে বাঙ্গলাকে



আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতা-বিজয়ী বাঙ্গলা দল

পরাজিত করে পাঞ্জাব বিজয়ী হয়। ১৯৩৬ সালে বাঙ্গলা জয় লাভ করলে। ফাইনাল খেলাটি তেমন প্রতিযোগিতা মূলক হয় নি। প্রথমার্দ্ধে মানাভাদার দল ভালো খেলেছিল এবং বাঙ্গলাকে উদ্‌ব্যস্ত করে তুলেছিল। বাঙ্গলার রক্ষণভাগের উৎকৃষ্ট খেলার জন্য বিপক্ষরা গোল করতে সক্ষম হয় নি।

বাঙ্গলার ফরওয়ার্ডরা যোগাযোগ করে খেলতে না পারায় তাদের আক্রমণ ভালো হচ্ছিল না। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বাঙ্গলা খেলার উৎকর্ষতা দেখিয়েছিল এবং পুরো বিশ মিনিট কাল মানাভাদার দলকে তাদের গোল সীমানার মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছিল। কিন্তু গোল করতে সক্ষম হয় নি, কতকটা বিপক্ষের রক্ষণভাগের মরণ-পণ খেলার জন্য এবং কতকটা তাদের ফরওয়ার্ডদের তৎপরতার সামান্য অভাবের জন্য। বাঙ্গলার পক্ষে সি ট্যাপ্‌সেল পাহাড়ের মতো দুর্ভেদ্য, তার বিপক্ষের আক্রমণ রক্ষা করা ও নিজের ফরওয়ার্ডের প্রতি আক্রমণে সাহায্য করা সত্যই সুন্দর। হাফ্ তিনজন সকলেই সুন্দর খেলেছে। ক্ষুদে গ্যালিবর্ডি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সে কঠোর পরিশ্রম করে খেলেছে। এলেন, ডেভিডসন, আর কার, এস চ্যাটার্জ্জি ও হজেস প্রভৃতি সকলেই ভাল খেলেছে। বিজিত দলের বোস্তন খাঁ, মহম্মদ হোসেন, মাসুদ, সা মুর, সাহাবুদ্দিন, সুলতান ও আমেদ ভালো খেলেছে। খেলার শেষ এক মিনিটে আর কারের সুন্দর চাতুর্য্যপূর্ণ ব্যাক পাস্ থেকে ডেভিডসন একমাত্র গোলটি দেয়।



আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতা-বিজিত মানাভাদার দল

বাঙ্গলা :—এলেন ; সি ট্যাপ্‌সেল ও হজেস : এস চ্যাটার্জ্জি, এল ট্যাপসেল ও গ্যালিবর্ডি ; এ দেব, এল ডেভিডসন, আর কার, সুলতান খাঁ ও নাজির।

মানাভাদার :—বোস্তন খাঁ ; সত্তার ও মহম্মদ হোসেন ; সৈয়দ, মাসুদ ও সামুর ; সাহাবুদ্দিন, সুলতান, আমেদ, জব্বার ও রবার্টস্।

বাঙ্গলা ৭-০ গোলে বিহার ও উড়িষ্যাকে, ৩-০ গোলে রেলওয়েকে, ৩-০ গোলে দিল্লীকে, ১-০ গোলে মানাভাদারকে, হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হ'লো। বিপক্ষে একটি গোলও হয়নি।

মানাভাদার ২-১ গোলে সিন্ধু প্রদেশকে, ০-০, ১-১, ৪-১ গোলে বোম্বাইকে হারিয়ে বাঙ্গলার কাছে ১-০ গোলে ফাইনালে হেরে গেছে।

অলিম্পিক হকি খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত ঃ

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ অলিম্পিকে হকি খেলবার জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছেন :—

গোল :—এলেন (বাঙ্গলা)

ব্যাক :—সি ট্যাপ্‌সেল (বাঙ্গলা), গুরুচরণ (পাঞ্জাব), ফিলিপ্‌স (বোম্বাই), মহম্মদ হোসেন (মানাভাদার)

হাফ্ :—আসান খাঁ (ভূপাল), মাসুদ (মানাভাদার), গ্যালিবর্ডি (বাঙ্গলা), নির্ম্মল (বোম্বাই), কুলেন (মাদ্রাজ)

ফরওয়ার্ড :—সাহাবুদ্দিন (মানাভাদার), আর কার (বাঙ্গলা), ধ্যানচাঁদ (আর্ম্মি), রূপসিং (ইউ পি), জাফার (পাঞ্জাব), এমেট (বাঙ্গলা), পি পি ফারনান্‌ডেজ (সিন্ধু)

মনোনীতদের মধ্যে যদি কেহ যেতে অপারক হন, সেই কারণে নিম্নলিখিতদের প্রস্তুত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।—মিকি (রেলওয়ে), হজেস (বাঙ্গলা), আর ক্রয়িন (বোম্বাই) ও দারা (আর্ম্মি)।

নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দল ভারত ত্যাগ করবার পূর্ব্বে ভারতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে পাঁচ ছয়টি খেলা খেলবেন। অলিম্পিকের খেলায় যোগ দেবার আগে জার্ম্মাণীর সঙ্গে চারটি ও হল্যাণ্ডের সঙ্গে দু'টি খেলা ইউরোপে হবে। ভারতীয় দল ২৫শে জুন যাত্রা করে ১৫ই জুলাই জার্ম্মাণীতে পৌছুবে। অলিম্পিক প্রতিযোগিতা শেষ হবার পর একমাস কাল মহাদেশে ভ্রমণ করে তাঁরা ১৯শে সেপ্টেম্বর ভারতাভিমুখে যাত্রা করবেন ও ৫ই অক্টোবর বোম্বাইকে এসে পৌছুবেন।

আন্তঃপ্রাদেশিক খেলার মোট লাভ ৩০০০৲ টাকা ছাড়া বিদেশে এই ভারতীয়দলটিকে পাঠাতে আরো ২৫০০০৲ হাজার টাকার প্রয়োজন। বাকী অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় ফুটবল চ্যারিটি খেলার আয়োজন করতে আই এফ একে অনুরোধ করা হয়েছে।

মানাভাদার ৩০০০৲, বাঙ্গলা ২০০০৲, পাঞ্জাব ১০০০৲ যুক্তপ্রদেশ ১০০০৲ ও দিল্লী ৫০০৲ টাকা দিয়া ফেডারেশনকে সাহায্য করতে স্বীকৃত হয়েছেন।

ইণ্টার-কলেজ বাচ্-খেলা ঃ

ঢাকুরিয়া লেকে বিভিন্ন কলেজের মধ্যে বাচ-খেলার প্রতিযোগিতার প্রথম সেমিফাইনাল খেলায় সেণ্টজেভিয়ার্স এক লেংথে ল' কলেজকে পরাজিত করেছে। সময়—৩ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ড। ল'কলেজ বিদ্যাসাগরকে ৩½ লেংথে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিল।

দ্বিতীয় সেমিফাইনাল খেলায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট চার লেংথে প্রেসিডেন্সী কলেজকে হারিয়েছে। সময়—৩ মিনিট ৪০ সেকেণ্ড। প্রেসিডেন্সী কলেজ আশুতোষ কলেজকে হারিয়ে ছিল। উভয় দলই প্রায় এক সঙ্গে পৌছায়, কিন্তু বিচারকগণ বহুক্ষণ আলোচনার পর প্রেসিডেন্সীকেই জয়ী বলে ঘোষিত করেন।

ফাইনাল খেলায় পোষ্ট গ্রাজুয়েট সেণ্টজেভিয়ারকে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছে। সময়—৩ মিনিট ৪৪⅘ সেকেণ্ড।



ইণ্টার-কলেজিয়েট বাচ্ খেলা বিজয়ী পোষ্ট গ্রাজুয়েট



বিজিত সেণ্টজেভিয়ার্স দল

ইণ্টার ভার্সিটি এথ্‌লেটিক স্পোর্টস্ ঃ

লাহোরে ইণ্টার-ভার্সিটি এথ্‌লেটিক্ স্পোর্টসে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১২-৩ পয়েণ্টে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। গত বৎসরও কলিকাতার ইডেন গার্ডেনে পাঞ্জাব কলিকাতাকে পরাজিত করেছিল। বার বার এইরূপ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। বড়ই দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন না, যাতে পরবৎসরে আর এরূপ শোচনীয় হার না হয়।

নিম্নলিখিত তিনটি প্রতিযোগিতায় কলিকাতা জয়ী হয়েছে ঃ—২২০ গজ দৌড়ে—লিসেনবার্গ। দীর্ঘ লম্ফনে—লিসেনবার্গ। উচ্চ লম্ফনে—কে মুখার্জ্জি।

ইণ্টার-কলেজ

মহিলা স্পোর্টস ঃ

ইতিপূর্ব্বে স্কুলের ছোট ছোট বালিকাদেরই বার্ষিক স্পোর্টস প্রতিযোগিতা হয়েছে। এবার কলেজের মেয়েদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়েছে। ছোট ও বড়, পুরুষ ও মহিলা সকলের শরীর গঠনের ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ব্যায়াম অতি প্রয়োজনীয়। কলেজে পড়লে আর শরীরের উৎকর্ষ বিধানের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে না ইহা সমীচীন নহে। মানসিক ব্যায়ামের সঙ্গে শারীরিক ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ আবশ্যক। ঘরে বসে সারাদিন কেবল বইয়ের পড়া মুখস্থ করলে শরীর আরো বেশী খারাপ হবে, যদি না তার সঙ্গে উপযুক্ত শারীরিক ব্যায়াম করা হয়। ছাত্রী জীবনেই যদি মেয়েদের স্বাস্থ্যহীনা হতে হয় তবে পরে সংসার ক্ষেত্রে প্রবেশ করে স্বাস্থ্যহীনা জননীরা ভবিষ্যৎ জাতিকে হীনবীর্য্য করে তুলতে বাধ্য হন। প্রাচীনকাল আর নেই, সাধারণের কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা অনেক কমে গেছে। এইরূপ প্রতিযোগিতা আরম্ভ হলে আরো কমে যাবে।

ইউরোপীয় মেয়েদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য দেখে নয়ন ও মন তৃপ্ত হয়। তাদের মেয়েরা বাঙ্গালী অনেক যুবকদের অপেক্ষা শক্তিমান বলে প্রতীয়মান হয়। ছেলেবেলা থেকেই তারা দৌড়-ঝাঁপ প্রভৃতি নানা প্রকার ক্রীড়ায় অভ্যস্ত। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রতিযোগিতায় যোগদান করে স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন করে। স্বাস্থ্য ও শক্তি না থাকলে সৌন্দর্য্য রক্ষা করা যায় না।



মেয়েদের ইণ্টার-কলেজিয়েট স্পোর্টসের ৮০ গজ দৌড়ের আরম্ভ



ইণ্টার কলেজিয়েট স্পোর্টসে হপষ্টেপ ও জাম্পের প্রতিযোগিনীগণ :—
প্রথম—সারা এজরা (৩৯) দ্বিতীয়—মনীষা বোস (৭),
তৃতীয়—অসিতা গুপ্ত (২৩)



অবজারভেসন রেস—ইণ্টার কলেজ গার্লস স্পোর্টস



বালীগঞ্জ ফিজিক্যাল ট্রেনিং প্রদর্শনীর শিক্ষয়িত্রী মণ্ডলী

এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে কিছু কিছু দোষ ত্রুটী লক্ষিত হয়েছে। বোধ হয় প্রথম বার বলেই সকল মহিলা কলেজ থেকে ছাত্রীগণ যোগদান করে উঠ্‌তে পারেন নি এবং কতকগুলি অত্যাবশ্যক বিষয়ও তালিকাভুক্ত হয় নি। আশা করি, ভবিষ্যতে সকল ত্রুটী সংশোধিত হবে এবং সকল কলেজের ছাত্রীগণই ইহাতে যোগদান করবেন।

ফলাফল :—

৮০ গজ দৌড়—প্রথম—সারা এজরা (স্কটিশ চার্চ্চ), দ্বিতীয়—অমলা নন্দী (আশুতোষ কলেজ), তৃতীয়—স্নেহ মিত্র (বেথুন কলেজ)—সময়, ৮$\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড।

হপ ষ্টেপ জাম্প—প্রথম—সারা এজরা (স্কটিশ চার্চ্চ), দ্বিতীয়—মনীষা বসু (ভিক্টোরিয়া), তৃতীয়—অমিতা গুপ্ত (বেথুন কলেজ)—দূরত্ব, ১৯ ফিট ৮ ইঞ্চি।

পর্য্যবেক্ষণ দৌড়—প্রথম—বসন্ত পুরী (আশুতোষ), দ্বিতীয়—অমলা নন্দী (আশুতোষ কলেজ), তৃতীয়—কানন মুখার্জ্জি (ভিক্টোরিয়া)।

৪৪০ গজ ভ্রমণ—প্রথম—নীলিমা মিত্র (বেথুন কলেজ), দ্বিতীয়—সুলেখা চক্রবর্ত্তী (আশুতোষ কলেজ), তৃতীয়—কৃষ্ণা সেন (ভিক্টোরিয়া)।

অন্ধের হাঁড়ি ভাঙ্গা—অপর্ণা রায় (ভিক্টোরিয়া)।

রিলে রেস—বিজয়ী স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ (ইভলিন লোরা, রেবা দত্ত, ডলি সামুয়েল ও সারা এজরা) সময়—১ মিনিট ৫৮$\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড।

কলেজ চ্যাম্পিয়নসিপ—প্রথম—আশুতোষ কলেজ, দ্বিতীয়—ভিক্টোরিয়া ইন্‌ষ্টিটিউশন।



ভারতী বিদ্যালয়ের বার্ষিক স্পোর্টসের বালিকাদের ৫০ গজ 'এ' ব্যালান্স রেসের, প্রথম—হেমলতা ঘোষ (১৯৪), দ্বিতীয়—নির্ম্মলা ঘোষ (১৯৫), তৃতীয়—প্রভা চক্রবর্ত্তী (১৫৮);

ছবি—তারক দাস



বালীগঞ্জ ব্যায়াম ট্রেনিং প্রদর্শনীতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
বালিকাগণের একত্রে ক্রীড়া প্রদর্শন



পঞ্চম বার্ষিক আনন্দ মেলা স্পোর্টসের ৮৩ মিটার নীচু বেড়া দৌড়, প্রথম—হিরণ্ময়ী বোস (১৭) আর কে মিশন গার্লস্কুল, দ্বিতীয়—দীপ্তি সেন (১২) সরিষা কমলা গার্লস স্কুল, তৃতীয়—গীতা ব্যানার্জি (১৩) সরিষা কমলা গার্লস্ স্কুল

ছবি—তারক দাস



ইণ্টার-স্কুল স্পোর্টসের ৭৫ মিটার ব্যালান্স রেস ছবি—তারকদাস



কালীঘাট স্পোর্টসের পোলভল্টে—প্রথম, আর এস এম এ ড্রুমণ্ড (ব্লাকওয়াচ) —কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়



ক্রাউন স্পোর্টসের ১৫০ গজ দৌড়ে—প্রথম—মিস্ এন্ বিডল —কাঞ্চন



খ্যাতনামা জার্ম্মাণ কুস্তীগীর—ক্রেমার একজন ভারতীয় কুস্তীগীরকে কুস্তী শিক্ষা দিচ্ছেন। ক্রেমার শুধু ইউরোপে নয়, মিশর, পারস্য, ইরাক প্রভৃতি দেশের কুস্তীগীরগণকে মল্ল যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। পাঞ্জাবের বিখ্যাত মল্লবীর গোঙ্গাকে লাহোরে মাত্র দু'মিনিটের মধ্যে পরাজিত করেছেন



দমদমে অনুষ্ঠিত গার্ল গাইডস্ (বালিকা সেবা-ব্রতী দল) ক্যাম্প। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের নানাস্থানের বহু বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী নানা-প্রকার আঘাতে ব্যাণ্ডেজ শিক্ষার জন্য এই ক্যাম্পে সমবেত হয়েছিলেন

রঞ্জি ট্রফী ঃ

আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় বোম্বাই ১৯০ রানে মাদ্রাজকে হারিয়ে এবারও চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই খেলায় সময় নির্দিষ্ট ছিল না—যতদিন প্রত্যেক দলের দুই ইনিংস করে খেলা শেষ না হয়, ততদিন খেলতে হবে। ছ'দিনে খেলা শেষ হয়েছে। তার মধ্যে একদিন বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ ছিল। বোম্বাই দলের অধিনায়কত্ব করেছেন ভাবিজদার, মাদ্রাজ দলের এম বালিয়া। নয়া দিল্লী ফিরোজসা মাঠে ২৭শে মার্চ্চ খেলা আরম্ভ হয়ে ১লা এপ্রিল শেষ হয়েছে।

বোম্বাই প্রথমে ব্যাট করে প্রথম দিনে ২৭৭ রান ৭ উইকেটে করে। দ্বিতীয় দিনে ওয়াদকার ও বাপোরিয়ার চমৎকার ব্যাটিং এর জন্য মোট ৩৮৪ রানে বোম্বাইএর প্রথম ইনিংস শেষ হয়।

মাদ্রাজের আরম্ভ ভালো হয় নি। দু' উইকেট খুইয়ে ৯৯ রান হলে সেদিনের খেলা শেষ হয়। কৃষ্ণস্বামী ও গোপালনে মিলে স্কোর করে ৮৫।

তৃতীয় দিনে মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে মাদ্রাজের গোপালন্ ও কৃষ্ণস্বামী খেলা আরম্ভ করলে এবং মাত্র ৪ রান হতেই গোপালন্ আউট হলো। মাদ্রাজের প্রথম ইনিংস বেলা ৩টার পরেই শেষ হলো ২৬৮ রানে। বোম্বাই ১১৬ রানে এগিয়ে রইল।

বোম্বাই দ্বিতীয় ইনিংস আরম্ভ করে ৩ উইকেট খুইয়ে মাত্র ৪৩ রান তুললে সেদিনের খেলা শেষ হলো।

চতুর্থ দিন বৃষ্টির জন্য খেলা স্থগিত ছিল। পঞ্চম দিনে ভিজা মাঠে বোম্বাইএর দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা চললো। মার্চেন্ট ও ভাবিজদারের পঞ্চম উইকেট সহযোগিতায় স্কোর উঠ্‌লো ৪৭ থেকে ১৫৭এ। মোট ১৯৯ রানে বোম্বাইএর দ্বিতীয় ইনিংস সমাপ্ত হয়।

মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংস অত্যন্ত নৈরাশ্য জনক ভাবে আরম্ভ হলো। মাত্র ৫০ রানে ৫ উইকেট গেলো। বোম্বাইএর জয় অনিবার্য্য। মাদ্রাজ বাকী ৫ উইকেটে ২৬৫ রান তুলতে পারলে তবে জয়ী হবে, যা একেবারেই অসম্ভব।



ভাবিজদার

ষষ্ঠ দিনে রামস্বামী ও গোপালন্‌, ইংলণ্ডগামী ভারতীয় দলের মনোনীত খেলোয়াড়দ্বয়, তাঁদের যোগ্যতানুযায়ী ষষ্ঠ উইকেটে উভয়ে মিলে ৬৮ রান করলে। মাদ্রাজের দ্বিতীয় ইনিংস খেলা স'বারোটার পরেই শেষ হ'লো মোট ১২৫ রানে। বোম্বাই দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হলো।



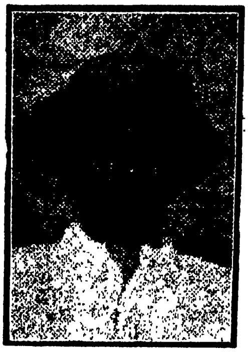
মার্চেন্ট

বোম্বাই:—প্রথম ইনিংস—মোট ৩৮৪। হিন্দেলকার ৫৪, কাদ্রি ৮৩, মার্চেন্ট ২৩, মেটা ১, বাপোরিয়া ৯০, প্যাটেল ৬, ভাবিজদার ৮, খোটে ৬, ওয়াদকার ৬৪, কালাপেসী ১৩, জামসেদজি (নট্‌ আউট) ৫; অতিরিক্ত ৩১।

উত্তাপ্পা ৭০ রানে ৪, গোপালন্‌ ৭০ রানে ২, রামানাথম্‌ ১৯ রানে ২ উইকেট নিয়েছে।

দ্বিতীয় ইনিংস—মোট ১৯৯। হিন্দেকার ৬, কাদ্রি ২, মার্চেন্ট ৭৯, মেটা ০, বাপোরিয়া ১৬, ভাবিজদার ৪৮, ওয়াদকার ১২, প্যাটেল (নট্‌ আউট) ২৪, খোটে ২, কালাপেসী ০, জামসেদজি ৩; অতিরিক্ত ৭।

রামসিং ৯২ রানে ৫, গোপালন্‌ ৩৭ রানে ২, রামচন্দ্র ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে।

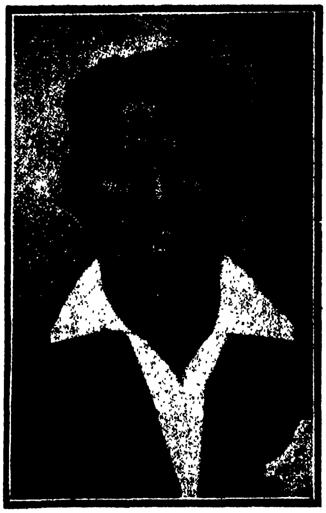


হিন্দেলকার

মাদ্রাজ:—প্রথম ইনিংস—মোট ২৬৮। কৃষ্ণস্বামী ৭৭, থেইগারজন ০, এম্‌ গোপালন্‌ ৩৩, রামসিং ৩২, বালিয়া ২৯, এস্‌ গোপালন্‌ ১৮, উত্তাপ্পা ১৩, ভেঙ্কটাচারী (নট আউট) ২০, রামচন্দ্র ১; অতিরিক্ত ১৪।

কালাপেসী ৯২ রানে ৫, খোটে ৫ রানে ১, ভাবিজদার ২১ রানে ১, মার্চেন্ট ২৭ রানে ১, ওয়াদকার ১৮ রানে ০, জামসেদজি ৫৬ রানে ১, মেটা ২২ রানে ১ উইকেট পেয়েছে।

দ্বিতীয়ইনিংস—মোট ১২৫। কৃষ্ণস্বামী ২, থেইগারজন্‌ ০, গোপালন্‌ ০, উত্তাপ্পা ১৪, রামসিং ৩, রামাস্বামী ৪০, গোপালন্‌ ২৮, বালিয়া ১৭, রামানাথম্‌ ৩, ভেঙ্কাটাচারী (নট আউট) ০, রামচন্দ্র ৯; অতিরিক্ত ৯।



গোপালন্‌

কালাপেসী ৩৫ রানে ৩, মার্চেন্ট ২৫ রানে ৩, জামসেদজি ১৮ রানে ৩, ভাবিজদার ২৪ রানে ১ উইকেট নিয়েছে।

সাহিত্য-সংবাদ

নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ওঁকারেশ্বরানন্দ প্রণীত জীবনী "প্রেমানন্দ" প্রথম ভাগ—৸৹
মিঃ ওয়াহেদ হোসেন প্রণীত ইংরাজী গ্রন্থ "Conception of divinity in Islam and Upanishads"—১৷৹
শ্রীচারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত পালি গ্রন্থ ও অনুবাদ "ধম্মপদ" ৪র্থ সং—১৸৹
শ্রীনিরঞ্জন নিয়োগী প্রণীত জীবনী "ঋষি প্রতাপচন্দ্র"—৸৹
শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত প্রণীত ছেলেমেয়েদের জন্য কবিতাচয়ন "কিশোর কবিতা"—৸৹
শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "ঘরের ঠিকানা"—২৲
শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল প্রণীত উপন্যাস "বন্ধ্যাসঙ্গিনী"—২৲
শ্রীশিশিরকুমার বসু প্রণীত জীবনী 'শ্রীশ্রীনিগমানন্দ স্মৃতি'—১৷৹
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "পরিত্যক্তা"—৷৵৹
শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত ছেলেমেয়েদের উপযোগী "মহাভারতের গল্পগুচ্ছ" দ্বিতীয় ভাগ—৷৹
শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু প্রণীত উপন্যাস "অপলাষিকা"—১৷৹
শ্রীবিমলকান্তি সিংহ প্রণীত কৃষি পুস্তক "বাংলার চাষী"—১৲
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত জীবনী "স্বামী সারদানন্দ"—১৷৹
ডাক্তার অভয়কুমার সরকার প্রণীত 'নারীত্বের প্রতিষ্ঠা"—৸৹
ডাক্তার অভয়কুমার সরকার প্রণীত "প্রসূতি পরিচর্য্যা" দ্বিতীয় সং—২৲
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত শতবর্ষের রাজনীতিক ইতিহাস "কংগ্রেস ও বাঙ্গালা"—১৷৹

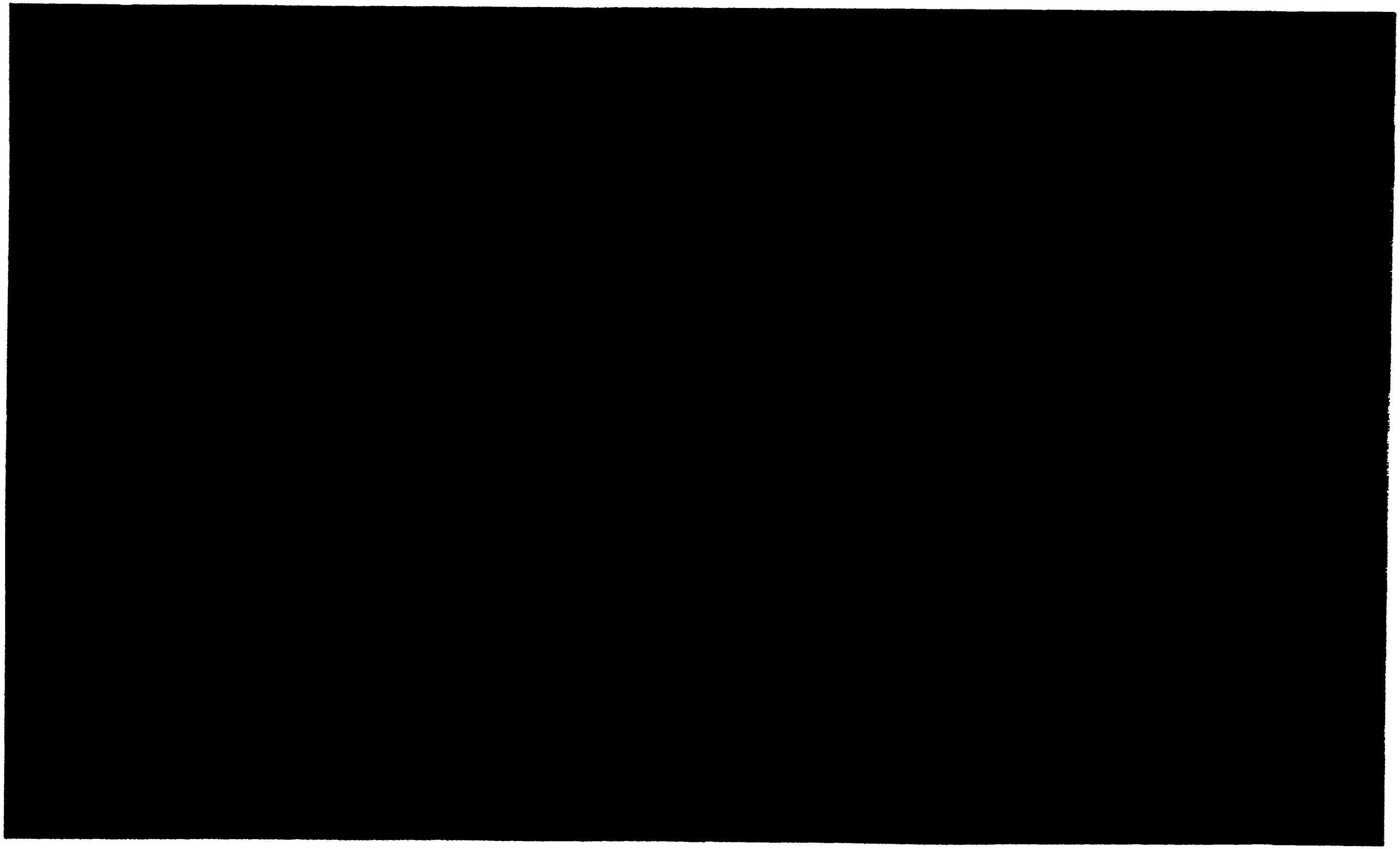
নিবেদন

আগামী আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষে'র চতুর্বিংশ বর্ষ আরম্ভ হইবে

সুদীর্ঘ ত্রয়োবিংশ বর্ষকাল যে 'ভারতবর্ষ' গ্রাহক, পাঠক ও অনুগ্রাহকগণের পরিচিত, তাহার পরিচয় আর নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে কি? এই ত্রয়োবিংশ বর্ষকাল 'ভারতবর্ষ' যে ভাবে বাঙ্গালা-সাহিত্যের সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই সুদীর্ঘ কাল 'ভারতবর্ষ' প্রতি বৎসরে ২০০০ পৃষ্ঠা পঠিতব্য বিষয়, ৬০খানি ত্রিবর্ণ চিত্র ও অন্যাধিক ১৫০০ এক বর্ণ চিত্র উপহার দিয়াছে; প্রতিমাসে প্রচ্ছদপটে বঙ্গের খ্যাতনামা পরলোকগত মনীষীবৃন্দের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা দিয়াছে; এতদ্ভিন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিশেষজ্ঞগণের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধরাজি 'ভারতবর্ষ'কে সমৃদ্ধ করিয়াছে; আগামী বৎসরের জন্য তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর রচনা-সম্ভারে 'ভারতবর্ষ'কে অধিকতর সমৃদ্ধিসম্পন্ন করিবার আয়োজন করা হইয়াছে; এক কথায়, 'ভারতবর্ষ' এই ত্রয়োবিংশ বর্ষকাল যে উচ্চতম আসন অধিকার করিয়া আছে, তাহাকে আরও মনোরম করিবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ভারতবর্ষের মূল্য মণিঅর্ডারে বার্ষিক ৬৷৵০, ভি, পিতে ৬৸৵০, ষাণ্মাসিক ৩৵০ আনা, ভি, পিতে ৩৷০। এই জন্য ভি, পিতে ভারতবর্ষ লওয়া অপেক্ষা **মণিঅর্ডারে মূল্য প্রেরণ করাই সুবিধাজনক।** ভি, পির টাকা বিলম্বে পাওয়া যায়; সুতরাং পরবর্ত্তী সংখ্যার কাগজ পাইতে বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। **২০শে জ্যৈষ্ঠের মধ্যে টাকা না পাওয়া গেলে আষাঢ় সংখ্যা ভি, পি, করা হইবে।** পুরাতন ও নূতন গ্রাহকগণ কুপনে কাগজ পাঠাইবার পূর্ণ নাম ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ কুপনে **নম্বর** দিবেন। নূতন গ্রাহকগণ **নূতন** বলিয়া উল্লেখ করিবেন; নতুবা টাকা জমা করিবার বিশেষ অসুবিধা হয়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Printing Works, 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta



পল্লীর হাট

শিল্পী—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার রায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works



ভারতবর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৪৩

দ্বিতীয় খণ্ড | ত্রয়োবিংশ বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

প্রজ্ঞানের প্রগতি

অধ্যাপক শ্রীক্ষেত্রমোহন বসু ডি-এস্‌সি

বিবর্ত্তবাদের প্রচারে ধীমান্ ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে কোন বিশিষ্ট যুগের চিন্তাধারা—বৈজ্ঞানিক অথবা দার্শনিক মতবাদ—একেবারে নিছক্ অনন্যসাপেক্ষ বা স্বতঃধৃত হইতে পারে না; প্রতি যুগের চিন্তার বৈশিষ্ট্য পূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন যুগের চিন্তাধারায় অল্প-বিস্তর অনুপ্রাণিত হইবে। সভ্যতার যুগ সকল দেশে একই সময়ে নিশ্চয় আরম্ভ হয় নাই। ঈজিপ্ট, ব্যাবিরুষ, আসিরিয়া, পারস্য, ভারত, গ্রীস্ প্রভৃতির কৃষ্টি ও সভ্যতা-সম্পদ্ বিষয়ে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করা যেমন ঐতিহ্যের একটা মামুলীতত্ত্ব, সেইরূপ ভূ-পৃষ্ঠে মানবজাতির চিন্তার ধারা ও প্রজ্ঞানের প্রগতি কিরূপ ভাবে অগ্রসর ও বিবর্ত্তিত হইয়া আধুনিক যুগের চিন্তা ও প্রজ্ঞানের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে তাহাও ঐতিহ্যের একটা বিশেষ দিক্, সে সম্বন্ধে উপস্থিত সন্দর্ভে কিছু আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

অসভ্যতার একটা যুগ সকল দেশে সকল মানব জাতির মধ্যেই ছিল, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না এবং সেই যুগে মানুষের চিন্তার বিষয় কি থাকিতে পারে কিছু কিছু ধারণা করা যায়। মানুষের জ্ঞেয় (object) ও রহস্যের বস্তু ছিল একমাত্র নেচারকে লইয়াই। আদিম যুগে মানুষ প্রকৃতিতত্ত্ব লইয়া যতটা বুঝিবার, নাড়াচাড়া করিবার ও কৌতূহলী হইবার অবসর পাইত, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ অপ্রাকৃত বস্তু তাহার অভাব-পূরণ ও সুবিধা-অসুবিধার যন্ত্র-স্বরূপ দাঁড়াইয়া গিয়াছে—কল-কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সভ্যতার দৌলৎ লইয়া দুনিয়া বুঝিতেছে ও নাড়াচাড়া করিতেছে, তাহার যাবতীয় কৌতূহল ও সুখ-সুবিধার আধার অপ্রাকৃত বস্তুতে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহাতে প্রকৃতিরহস্য একরূপ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আবার আদিম যুগে মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতিকে যতটা জটিল, দুর্জ্ঞেয় ও প্রহেলিকাচ্ছন্ন ভাবিত, আধুনিক সভ্যতার রশ্মিপাতে প্রকৃতির জটিলতা জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে সরল হইয়া গিয়াছে অনেক পরিমাণে, কিন্তু মানুষকে দিন দিন নিত্য-নূতন রহস্যের মধ্যেই লইয়া যাইতেছে;

সুবিধা এই যে, এই অভিনব রহস্যের ভিতর নিগূঢ়তা প্রচুর থাকিলেও তাহাতে আঁধারের চেয়ে আলোকের অনুপাতই বেশী। কিন্তু

—মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ—

প্রকৃতিকে সম্যক্ আয়ত্ত করিতে যাওয়া—আর মরীচিকার পিছনে ছুটা একই কথা। সসীমজ্ঞানে অসীমকে বুঝা মানবের সাধ্যাতীত; তবুও অসীমকে আঁকড়াইয়া ধরিবার প্রচেষ্টা তাহাকে করিতেই হইবে। এই প্রলুব্ধ বাসনা আছে বলিয়াই সে মানুষ, সে জ্ঞানপিপাসু, সে মায়াময়ী প্রকৃতির দাস।

প্রকৃতি বা নেচার

এক্ষণে 'প্রকৃতি' শব্দের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন। যদি বলা যায় ইহার অর্থ মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-গোচর বিশ্বের অংশ বিশেষ, তবে প্রকৃতিকে ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ করা হইল; কিন্তু মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-গম্য অংশ হইতে একটি বিরাট অংশও 'প্রকৃতি' শব্দ দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আর যদি বলি, প্রকৃতি মন হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বিষয়সমূহ, তাহা হইলে মনকে—প্রকৃতিরাজ্যের বহির্গত কোন সত্ত্বা—এই ধারণা করিতে হয়। তাহাও সঙ্গত নয়, কেন না মনুষ্য প্রকৃতির অন্তর্গত! কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যবর্ত্তী জগৎই প্রকৃতি। ইহাও সন্তোষজনক নহে, কেন না—জীবাত্মার বাসভূমি মানবদেহকে প্রকৃতির বাইরে—এরূপ কল্পনা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে; যদি তাই হয় তবে জীবাত্মা প্রকৃতিরাজ্যের নানা-ভোজ্যে পরিপুষ্ট, সংস্কারাবদ্ধ হইতে পারে না। সাধারণতঃ, প্রকৃতিকে মনোধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন বহির্জ্জগৎ—এই অভিধান দেওয়া হয়; প্রকৃতি হইল নেচার—একটি যন্ত্রস্বরূপ। এখানে প্রকৃতি জড় জীব-জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। তবে জড় জগৎ হইতে মনবুদ্ধিঅহঙ্কারযুক্ত জীব-জগৎ উদ্ভূত হয়—এ কি রকম কথা? এ জন্য অভিব্যক্তিবাদ—কি বার্গসনের creative evolution, কি মর্গ্যানের emergent evolution দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িতেছে। তাহা হইলে 'প্রকৃতি' একটি যান্ত্রিক রচনা—mechanism ইহা মনুষ্যের কল্পনাপ্রসূত, মনগড়া কথা; সংজ্ঞাহীন বহির্জ্জগৎ বলিয়া কোন পদার্থের অস্তিত্বই নাই। এই দ্বৈতভাবটিই প্রথমে জন্মিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। জড়প্রকৃতিকে আলাদা করিয়া দেখিয়া মানুষের যত কিছু বোঝাপড়া চলিয়াছিল মনের নিভৃত কন্দরে; জ্ঞানার্জ্জন করিয়াছিল মন, বাহ্যপ্রকৃতির ক্রিয়াকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া।

প্রকৃতির "খাম্‌খেয়ালী"

প্রকৃতি জ্ঞানের ভাণ্ডার। আদিমযুগে পৃথিবীপৃষ্ঠে মানবের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পরেই মানুষের মনে কিরূপ জ্ঞানের রস প্রকৃতি যোগাইতে লাগিল, কিরূপ অভিজ্ঞতার (experience) ছাপ পড়িতে লাগিল ও কিভাবে মন অভিজ্ঞতাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে শিখিল এবং শিখিয়াও "এরূপ হয় কেন?" এই প্রশ্নের সবসময় উত্তর পাইল না অথবা কোন ঘটনার (phenomenon) কারণ খুঁজিয়া পাইল না, পরন্তু একটা কৌতূহল, একটা অনুসন্ধিৎসা তাহার মনকে সজাগ করিয়া দিয়া কারণতত্ত্বের দিকে ছুটাইয়া দিল—এ সমুদয়ের একটু আভাস পাওয়া যাইতে পারে। সাধারণ যে-সব নৈসর্গিক ঘটনা—সে গুলা আবহমান ঘটিবেই ঘটিবে। যেমন কোন জিনিস অবলম্বনহীন হইলেই পড়িয়া যায়, লোষ্ট্র বা পাথর পুকুরে নিক্ষেপ করিলেই ডুবিয়া যায়—কিন্তু কাঠের টুক্‌রা ভাসে। একটু জটিলতার কথা বলি। এক জোড়া তালগাছ—আয়তনে ও উচ্চতায় সমান সমান ও পাশাপাশি—মধ্যে তিন হাত ব্যবধান; তাহার একটি বজ্রাঘাতে নষ্ট হওয়ায় অপরটি অটুট রহিয়া গেল। অথবা কোন এক অমাবস্যার দিনে আবহাওয়া বেশ সুন্দর, কিন্তু পরবর্ত্তী অমাবস্যায় ভীষণ দুর্যোগ। আদিম মানবের কাছে এইরূপ অভিজ্ঞতার মূলে কোন কারণই যোগাইল না। প্রকৃতির এই "খাম্‌খেয়ালী" প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকায় মানুষ ভাবিল যে প্রাকৃতিক দুর্ব্বোধ্য ঘটনার জন্য দায়ী কোন মিত্র-বরুণ-অগ্নিপ্রমুখাৎ দেবতা-সম্প্রদায় বা শনি-রাহু-কেতু প্রভৃতি অপদেবতার দল।

বিজ্ঞান ও কারণতত্ত্ব

অনেক চিন্তা, ভূয়োদর্শন ও গবেষণার ফলে তবে কারণ-তত্ত্বের জন্ম হইয়াছে। হিন্দুদের উপনিষদাদি এই কারণ-তত্ত্বের দিকে ধাবিত হইয়া বহুদূরে পৌঁছিয়াছিল; কিন্তু সে কারণতত্ত্বের একদিক্—সর্ব্বকারণের মূলকারণ যে একটি

অখণ্ড সত্য, শিবং সুন্দরং অদ্বৈতং, সেইটার উপলব্ধি যুক্তি ও আপ্তবাক্যের সাহায্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তৎপরেই ষড়্দর্শনের উৎপত্তি ও প্রজ্ঞাবাদের পরাকাষ্ঠা বৌদ্ধদর্শন। অপরপক্ষে কারণ-তত্ত্বের যে বিভিন্ন টুক্‌রা টুক্‌রা আইন-কানুন—সেগুলার সাহায্যে যদি প্রকৃতির ওই আপাতঃ খামখেয়ালীর মীমাংসা হইয়া যায়—সেগুলাকে অগ্রাহ্য করা চলে না। কেন না অগ্রাহ্য করিলে পদে পদে বিপদ্‌পাতের বা প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা আছে। এ সব খণ্ড-সত্য অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। হইতে পারে এই সব খণ্ড-সত্য কোন বিরাট অখণ্ড সত্যেরই বিভিন্ন কলা বা রূপ। কার্য্যকারণের যেটা বিশ্লেষণের দিক্, সেইটাই বিজ্ঞানের দিক্; বিজ্ঞানের পথ কার্য্য হইতে কারণ—a poste riori—এজন্য বিজ্ঞান-লব্ধ জ্ঞানকে empirical বলা হয়, যাহা পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রদীপের শিখায় হস্ত পুড়িয়া যায়, বস্ত্র কাগজ প্রভৃতি ধ্বংস হয়; কিন্তু লৌহ গলিয়া যায় না, ঈষৎ তপ্ত হয় মাত্র। অগ্নির দাহিকাশক্তি আছে—ইহা এক টুক্‌রা জ্ঞান; কিন্তু উত্তাপের পরিমাণের (temperature) উপর স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, মোম প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যের দ্রুত হওয়া নির্ভর করে—সেইটাই হইল বিজ্ঞান।

পুরাণ (mythology)

কারণতত্ত্বের অনুসন্ধানে মানুষ ছুটিল; কালে আইন-কানুনের এরূপ একটি বিচিত্র রূপ গড়িয়া উঠিল যে তাহাতে নিখিল জড় জগত যেন বাঁধা পড়িয়া গেল। আদিমানব প্রথমে ভাবিতে শিখিল—তাহার আশপাশের নৈসর্গিক ঘটনার মূলীভূত কারণকে লইয়াই; জগৎটার সে একটা animistic view লইতে লাগিল এবং সর্ব্ববিষয়েই দেবত্ব আরোপ করিতে লাগিল। যেমন সূর্য্য হইল সূর্য্য-দেবতার রথ; রামধনু হইল ইন্দ্র দেবতার ধনু অথবা স্ক্যাণ্ডিনেভীয়ার উপকথায়—ভ্যালহালায় (স্বর্গ) পৌছিবার সেতু; বজ্র বোত্‌ বা মিত্র-দেবতার ক্রোধের অভিব্যক্তি। এই সময় হইতেই পুরাণ বা উপকথার (mythology) সৃষ্টি। ঈজিপ্ট, গ্রীস্, ভারত প্রভৃতি সব দেশেই সভ্যতা সূচনা হইবার প্রাক্কালে mythologyর একটি যুগ গিয়াছে। ঈজিপ্টের পবনদেব হইলেন শূ (Shu), ধরিত্রীদেবী হইলেন সেব্ (Seb), আশ্‌মান্-দেবী (goddess of the firmament) হইলেন নুট্ (Nut); এইরূপ রা (Ra), অসিরিস (Osiris), আইসিস্ (Isis) প্রভৃতি অনেক দেবদেবীর উপকথা আছে। গ্রীসীয় উপকথার নেমেসীস্ (Nemesis) দেবতা নৈসর্গিক যাবতীয় মত্ততার জন্য দায়ী এবং অজ-দেবতা পান্ (Pan) যত সব আপাতঃ বে-আইনীকর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। ভারতের কথা যদি ধরা যায়, তবে মরুদ্‌গণ ও তাঁহাদের পিতা রুদ্রকে আমরা প্রমত্ত নেমেসীস্ বলিতে পারি, পৃথ্বীকে সেব্, ইন্দ্র বা বায়ুকে আকাশ দেব, সূর্য্যকে রা ইত্যাদি পৌরাণিক কল্পনায় অনেক ঐক্য দেখা যায়।

দেবদেবীবাদ বনাম একেশ্বরবাদ

পৌরাণিক যুগের অব্যবহিত পরেই হইল মনে হয় বৈদিক যুগ। এই যুগের একমাত্র চিন্তা হইল দৈবীগুণসম্পন্ন প্রকৃতির শক্তিপুঞ্জকে—deified forces of nature—কিরূপে সন্তুষ্ট করা যাইতে পারে। এজন্য বিভিন্ন প্রদেশে যাগ্-যজ্ঞ-বলি প্রভৃতি বিধিবদ্ধ হইল। মানুষের ধর্ম্মজীবনের গোড়াপত্তন হইল এই animism দিয়া। আবার এই animism হইতে যে polytheism—বিভিন্নদেবদেবীবাদ্—সৃষ্ট হইয়াছিল ইহা ত খুবই স্বাভাবিক। এ সম্পর্কে হিন্দুদের ধারণা একটু স্বতন্ত্র, সেই কথাই বলিতেছি।

ঋগ্বেদীয় ধর্ম্ম হইল মূলে প্রকৃতি-উপাসনা। এই বেদে অসংখ্য দেবতার কথা আছে বটে, অসংখ্য পূজা-পদ্ধতি আছে বটে, কিন্তু সে-সমুদয় পূজামন্ত্র একের প্রতিই প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই একই—প্রকৃতি দেবী প্রকৃতি-পরিচালক আত্মা সর্ব্বেশ্বর পরমেশ্বর; তিনিই মিত্র, তিনিই ইন্দ্র, তিনিই অগ্নি, তিনিই বরুণ, তিনিই সুপর্ণ, তিনিই সূর্য্য, তিনিই যম, তিনিই মাতরিশ্বা।*

* The *sky* which bends over all, the beautiful and the blushing *dawn* which like a busy housewife wakes men from slumber and sends them to their work, the gorgeous tropical *sun* which vivifies the earth, the *air* which pervades the world, the *fire* which cheers and enlightens us and the violent *storms* which in India usher in those copious rains which fill the land with plenty—these were the *gods* whom the early Hindus loved to extol and to worship.

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গুরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি সূর্য্যং যমং মাতরিশ্বানমাহু॥ ঋক্

বলাবাহুল্য যে দেবদেবীবাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য না থাকায় জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ একেশ্বরবাদী হইয়া পড়িল। নৈতিক জ্ঞান moral consciousness—ও যুক্তিবিচারে দেবদেবীবাদ্ টিকিতে পারে না, ইহা সহজেই অনুমেয়। এই নৈতিক জ্ঞানের প্রেরণা চায়—ধর্ম্মজীবনের একটা বিধির—law of righteousness—প্রাধান্য উপস্থিত করিতে; যুক্তি-বিচারের উদ্দেশ্য যখন একটা সঙ্গতির দাবী, তখন সে সঙ্গতির দাবী দেবদেবীবাদকে খণ্ডন করিবে তাহা আর বিচিত্র কি? বৈদিক যুগে শুধু যে monotheism স্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহা নয়, pantheism-ও বটে। গ্রীস্ ও হিব্রু সভ্যতার ইতিহাসেও polytheism হইতে একেশ্বরবাদের উৎপত্তি হইয়াছিল এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়। এই মতবাদ সর্ব্বদেশে কিছু একদিনেই গড়িয়া উঠে নাই, এরূপ জ্ঞানসঞ্চয় হইতে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া থাকিবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদি-স্তর

একদিকে যেমন ধর্ম্মজীবনের পত্তন হইয়াছিল animism দিয়া, অন্যদিকে তেমনি জ্ঞানচর্চ্চার অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল উহাকে ছাটিয়া ফেলিয়া। এইটিই হইল জ্ঞানবিজ্ঞানের যুগ—rationalistic age—এ যুগে যুক্তি বিনা কোন মতবাদ—কোন thesis—গ্রাহ্য নয়। এই সময় হইতে সর্ব্ব সভ্যদেশে দর্শনের যুগ আরম্ভ হইল। উপনিষদ্ ও বেদের ব্যাখ্যা নানাদিক্ হইতে সুরু হইল—যেমন ষড়দর্শনের মধ্য দিয়া, তাহাতে আস্তিক্য-নাস্তিক্য দুই মতবাদই গড়িয়া উঠিল, নাস্তিক্যের পরাকাষ্ঠা বৌদ্ধদর্শনে। গ্রীসীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠা হইল য়ুরোপীয় কোন ভূ-খণ্ডে নয়, এশিয়ামাইনরের পশ্চিম উপকূলে ক্ষুদ্র আয়োনিয়া প্রদেশে—যাহা গ্রীসের অধিকার-ভুক্ত হইয়াছিল। সর্ব্বপ্রথম গ্রীসীয় দার্শনিকগণ নৈসর্গিক জটিল ঘটনাগুলাকে বুঝিতে চেষ্টা করেন—বস্তুর অল্প-কয়েকটি সাধারণগুণের সাহায্যে। তাহাতে দেবতা বা অপদেবতার কোন ছায়াপাত দেখা যায় না। কিন্তু mythology তাঁহাদের চিন্তাধারার উপর একেবারে কোন প্রভাব যে বিস্তার করে নাই, একথাও জোর করিয়া বলা যায় না। কেন না দার্শনিক থেলিস্ (Thales) যখন বলিলেন যে যাবতীয় বস্তুর উপাদান একমাত্র "অপ্", তখন ঈজিপ্টের দেবতা Osirisএর কথা স্মরণ হয়; দার্শনিক হিরাক্লিটাস্ (Heraclitus) যখন বলিলেন যে বস্তুর মূল উপাদান "তেজঃ", তখন ঈজিপ্টের সূর্য্যদেবতা Raএর কথাই স্মরণ হয়। এইরূপ প্রতি সভ্য-দেশে mythology হইতে বিজ্ঞান ও দর্শন গড়িবার অনেক সুবিধা হইয়া পড়িল।

সৃষ্টিতত্ত্বযুগ

প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন উত্তরে সিরিয়া, আসিরিয়া ও ব্যাবিরুষ খণ্ডে নানা রাজত্বের ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছিল ও দক্ষিণে ঈজিপ্ট বিংশতিতমপুরোহিত-বংশসম্ভূত রাজগণের শাসনে সভ্যতার নিম্ন সোপানে অধিরোহণ করিতেছিল তখন হিব্রু উপাধিধারী একটি সেমেটিক জাতি (Semitic people) জুডিয়া রাজ্যে বসতি করে—তাহার রাজধানী ছিল জেরুজেলাম। ঐ হিব্রু জাতি পূর্ব্বে ব্যাবিরুষে অবস্থিতিকালে কিছু সভ্যতা অর্জ্জন করে এবং খৃঃ পূঃ পঞ্চশতাব্দীর মধ্যে সাহিত্যে অনেক অভিনব সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছে—যেমন, পৃথিবীর ইতিবৃত্ত, আইন-সংগ্রহ, ঐতিহ্য (chronicles), ধর্ম্ম-গীতি (psalms), জ্ঞানরত্নাবলী (books of wisdom), কাব্য, উপাখ্যান ও রাষ্ট্রনীতি—যে সমুদয় হইতে একটি পুরা-বাইবেল (old Testament) গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই ইহুদীজাতির ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে "তিনি লোকচক্ষুর অগোচর, বহুদূরে কোথাও অবস্থিত আছেন, যেন কোন পবিত্র মন্দিরে—যাহা মানুষের স্পৃষ্ট মোটেই নয়; আর তিনি ন্যায়ের কর্ত্তা (Lord Righteousness)"। কালক্রমে উহাদের মধ্যে একদল পুরোহিতজাতীয় লোকের (prophets) অভ্যুদয় হয়, তাঁহারা যাহাতে লোক ও ন্যায়াবতার পরমেশ্বরের মধ্যে একটা সহজ নৈতিক সম্বন্ধ উদ্বুদ্ধ হয় তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। ঠিক সেই

And often when an ancient *Rishi* sang the praises of any of the gods with devotion and fervour, he forgot that there was any other god besides and his sublime hymn has the character and the sublimity of a prayer to the *one God of the universe.—Early Hindu civilisation, R. C. Dutt.*

সময়ে গ্রীসীয় দার্শনিকগণ মানুষকে জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিবার নবপদ্ধতি শিক্ষা দিয়া প্রাণবন্ত করিতেছিল। মানবচিন্তার ইতিহাসে নানাপ্রশ্নের মধ্যে একটি খুব মৌলিক প্রশ্ন হইল—"জগতের যাবতীয় বস্তু সৃষ্টির মূলে কি উপাদান আছে এবং প্রলয়-শেষে কি বস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে।" সেটি পরিবর্ত্তনহীন, রূপহীন বা বিকারহীন এমন কোন বস্তু—যাহাকে "নিত্য"-বস্তু এই আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। মানুষের মনে এই চিন্তাই জাগরিত হয় যে জগতের বহুত্ব কোনও একটি চরম একত্ব বা সত্য-বস্তুরই প্রতিভাস এবং সেই নিত্যবস্তু প্রকৃতিগর্ভে ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত ও প্রকৃতির আধার (snbstratum)—এইটিই হইল গ্রীসীয় দর্শনের "সৃষ্টিতত্ত্বযুগের" (cosmological period) প্রধান অনুসন্ধিৎসা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের মেরুদণ্ডস্বরূপ।

আয়োনিক-দর্শন

প্রতীচ্যের আদি-দর্শন গ্রীসীয় দর্শনকে আমরা তিনটি পর্য্যায়ে ফেলিতে পারি। প্রথম, সৃষ্টিতত্ত্বযুগ। এ সম্পর্কে আমরা আয়োনিকদর্শন, পীথাগোরাসীয় মত, ইলীয় দর্শন, হিরাক্লিটাস সম্প্রদায়ের মত ও প্রাচ্যপাশ্চাত্য পরমাণু-বাদীর মত উল্লেখ করিব। দ্বিতীয়, নৃতত্ত্বযুগ—anthropological period. এ সম্পর্কে সোফিষ্ট-সম্প্রদায়, ওসেলাস্ ও সক্রেটিসের মত উল্লেখযোগ্য। তৃতীয়তঃ, যুক্তিমূলক যুগ—Systematic period. এ বিষয়ে সক্রেটিস্, প্লেটো ও আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মনীষীর দর্শনবাদ বিচার্য্য। পরমাণুবাদীগণের মধ্যে লিউপ্পাস্ ও দেমোক্রীটাস্ এবং আর্য্য-ঋষি কণাদের বৈশেষিকদর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি তুলনামূলক চিন্তা অপরিহার্য্য হওয়ায় সে-সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৬৪০ হইতে খৃঃ পূঃ ৫৫০ হইল—দার্শনিক থেলিসের-কাল। তাঁহার মতে জলই সংসারের সার বস্তু; কিন্তু আনাক্সিমেনিস্ (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৫৯০-৫২৫) বলেন, বায়ুই সর্ব্বমূলাধার। আনাক্সিমান্দর (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৬১০-৫৪৫) ইঁহাদের অপেক্ষা একটু গভীরভাবেই আলোচনা করিয়া-ছিলেন; তিনি বলিলেন—"জগতের মূলপদার্থ যে কি তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না—indeterminable; কিন্তু তাহা নিত্য ও অসীম। কোনও এক অদৃশ্যশক্তির প্রেরণায় অগ্নি, বায়ু, জল, মৃত্তিকা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে ও পৃথগবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে—separated এবং তজ্জনিত জাগতিক বিভিন্ন বস্তু, বিভিন্ন ধর্ম্ম ও বিভিন্ন রূপপরিগ্রহ করিয়াছে —differentiated." আনাক্সিমেনিস্ বলিলেন—সঙ্কোচন (condensation) ও সম্প্রসারণ (rarefaction) পদ্ধতিতে বায়ু হইতে বস্তুর সৃষ্টি ও লয় সাধিত হইয়া থাকে।

থেলিস্, আনাক্সিমেনিস্ ও আনাক্সিমান্দর এই তিন-জনের সৃষ্টিতত্ত্ব আয়োনিকদর্শনের যেন তিনটি ধারা, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী, সর্ব্বপ্রথম প্রতীচ্যভূখণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া বস্তুবিচাররূপ জনপদমধ্য দিয়া প্রকৃতি রূপ রহস্য-সাগরের অভিমুখে প্রধাবিত হইয়াছিল। এখানে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে যদিও ইঁহারা প্রত্যেকেই জড়বস্তু ও জড়পদ্ধতিকে (material process) আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি-সুলভ নানাত্ব ধর্ম্মের ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তবু তাঁহাদের 'জড়বাদী'—materialists—এই আখ্যা দেওয়া চলে না। কারণ সে-যুগে আত্মা ("mind") ও জড় ("matter") এই দুইয়ের প্রভেদ কোথায়—সে চিন্তা তাঁহাদের মনে একেবারে উদিত হয় নাই। গ্রীসীয়-দার্শনিকমাত্রেরই ধারণা ছিল জড়-বস্তু প্রাণময়—matter is something living. এক্ষণে আমরা যে-অর্থে বস্তুমাত্রকেই জড় ভাবি, তাঁহারা মোটেই সেরূপ জড়বাদী ছিলেন না—বস্তুমাত্রেই জৈবশক্তিসম্পন্ন। এজন্য তাঁহারা ছিলেন hylozoists—বস্তু অচেতন জড়পদার্থে নির্ম্মিত নয়, জীবন্ত কণা দিয়া গড়া। তাঁহারা ছিলেন জৈবজড়বাদী।

পীথাগোরাস সম্প্রদায়

বস্তুর মূলাধার সম্বন্ধে আরও একটু নিগূঢ় ধারণা উপস্থিত হয় পীথাগোরাস্ (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৫৭০—৫০০) সম্প্রদায় হইতে। তাঁহারা "ঝোঁক্" দেন বস্তুর রূপের (form) উপর, বস্তুর বস্তুত্বের (matter) উপর নয়। থেলিস্ হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত জ্যামিতিশাস্ত্রের আলোচনা হইয়া আসিতেছিল এবং এই সময়েও সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। আজকাল আমাদের দেশে প্রায় প্রতি ঘরেই সঙ্গীতচর্চ্চা হইয়া থাকে অনেকটা ব্যব-হারিকভাবেই—যেমন অর্গ্যানে কোন গৎ বাজান বা কোন কবিতার সরগম্ হারমোনিয়ম যন্ত্রে তুলিয়া সুরে গান

প্রতীচ্য পরমাণুবাদ

প্রতীচ্যে পরমাণুর পরিকল্পনা লিউসিপ্পাস্ (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৫০০-৪৩০) সর্ব্বপ্রথম করিলেও দেমোক্রীটাসই (আনুঃ খৃঃ পূঃ ৪৬০-৩৭০) পরমাণুবাদের জন্মদাতা—এইরূপ বিশ্ববিশ্রুতি আছে। লিউসিপ্পাসের মত এই যে, বিশ্ব অনন্ত, ইহার কোনও অংশ শূন্যময় (vacuum) এবং কোনও অংশ পরমাণু দ্বারা পরিপূর্ণ (plenum); পরমাণু সমুদয় শূন্যস্থানে বিক্ষিপ্ত হইলে পরস্পর প্রতিহত হয় (impact) এবং তাহাদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া তাহারা বিভিন্ন বক্রগতি লাভ করে (variety of curvilinear motions)—ফলে এক জাতীয় পরমাণু পরস্পর মিলিত হইয়া এক এক প্রকার আকৃতি গঠিত হইয়া যায়। এই ব্যাপার আপনা-আপনি সংঘটিত হইতেছে, অনেকটা নিয়তি বা প্রকৃতির বশীভূত হইয়া, ইহার সহিত দৈবীশক্তির কোন যোগাযোগ নাই।

দেমোক্রীটাসের সৃষ্টি বিষয়ে উক্তি এই যে, পরমাণু ও দেশ (space) এই দুইটি জগতে নিত্যবস্তু; পরমাণু (atoms) ও তাহার গতি (motion)—এই যুগল তত্ত্বের উপর সৃষ্টিতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। কোন স্বতন্ত্র উচ্চশক্তি (transcendental power) ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া পরমাণুপুঞ্জকে সংজ্ঞবদ্ধ করিতেছে তাহা নহে, নৈসর্গিক নিয়মে গতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া উহারা সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হয়—এইরূপে সৃষ্টি-ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। পরমাণু-সংঘটিত বিভিন্ন যৌগিক বস্তু নানারূপী হয়—তাহার কারণ তিনটি :—(১) বস্তুর উপাদানীভূত পরমাণু সমুদয়ের "আকার ও গঠন" ভিন্ন ভিন্ন; (২) বিভিন্ন বস্তুর অন্তর্নিহিত পরমাণুপুঞ্জের "অবস্থান" (position) স্বতন্ত্র; (৩) উক্ত পরমাণুগুলির "সন্নিবেশ" (arrangement) স্বতন্ত্র। পরমাণুগুলি যেন প্রকৃতির বর্ণমালা (alphabets); এই বর্ণমালার সাহায্যে বস্তুর বিভিন্নতা হয় কেন, ইহার কতকটা মীমাংসা করা যাইতে পারে; (১) 'অ' ও 'স'এর গঠন আকার স্বতন্ত্র, ইহাদের দ্বারা দুইটি বিভিন্ন শব্দ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, যেমন 'অসীম' ও 'সসীম'। (২) 'ব' ও 'চ', বা 'M' ও 'W' ইহাদের বিভিন্নতা অবস্থানের উপর নির্ভর করে, দুইটি শব্দ 'বল' ও 'চল' বা 'Me' ও 'We' বিভিন্ন সংজ্ঞাজ্ঞাপক; একটি শব্দ উল্টাইয়া অপরটি হইয়াছে এরূপ লিপিকর প্রমাদ প্রুফ্ দেখিবার সময় নজরে পড়ে। (৩) সন্নিবেশভেদে—যেমন 'ON' এবং 'NO', অথবা 'দম' (আত্মজয়) এবং 'মদ' (অহঙ্কার) বিভিন্ন অর্থ সূচিত করিয়া দেয়।

দেমোক্রীটাসের মতে পরমাণু একেবারে 'জড়' নয়, ইহা গতিধর্ম্ম বিশিষ্ট। বিশ্বের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা—mechanical explanation—এই পরমাণুবাদে পাওয়া যায়, matter এবং motion এই দুইটির সাহায্যে। কিন্তু এই যান্ত্রিক ব্যাখ্যা হইতে বস্তুর গৌণধর্ম্ম (secondary qualities) যথা শব্দ স্পর্শ-রূপ-রস গন্ধ, যেগুলিকে বলা হয় "Objective reality," সে সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না। দেমোক্রীটাস্ এই বিষয়ে কতকটা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধের (axioms) মতই ধরিয়া লইয়াছেন যে মিষ্টতা ও তিক্ততা, উষ্ণতা ও শৈত্য, লোহিত-পীতাদি বর্ণ বস্তুবিশেষের হইবেই হইবে!

প্রাচ্য পরমাণুবাদ

বৈশেষিক দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ঋষি কণাদের কালনির্ণয় সম্বন্ধে সঠিক কেহই কিছু বলিতে পারেন না। এই দর্শনকে যদি সাংখ্যের পরবর্ত্তী বলা যায় এবং সাংখ্যদর্শনকে যদি গৌতমবুদ্ধের কালের অব্যবহিত পূর্ব্বেরই ধরা যায়, তবে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে কণাদের কাল বলিলে তাঁহাকে দেমোক্রীটাসের সমসাময়িক হিসাবে ধরা যাইতে পারে। কণাদ বলেন যে সমুদয় জাগতিক তত্ত্ব বুঝিতে হইলে সাতটি ভাববিশেষ বা ধারণার (categories) সাহায্য লইতে হইবে। সেই সাতটি ভাব এই—দ্রব্য (substance), গুণ (quality), ক্রিয়া (action), সামান্যভাব (generality বা community), বিশেষভাব (particularity বা individuality), সঙ্গতি (coherence বা inherence) এবং অনিত্যতা (non-existence).

দ্রব্য নয় প্রকার, যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম (আকাশ), কাল, দেশ, মন ও আত্মা (self). ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটির তাম্মাত্রিক সৃষ্টি পরমাণু লইয়া, এজন্য উহারা নিত্য (eternal), কিন্তু সমবায়রূপে (in aggregates) উহারা ভঙ্গুর এবং অনিত্য (transient

and perishable). আকাশ হইল শব্দ-তন্মাত্র (sound potential), ইহার কোন পরমাণু নাই এজন্য ইহা অনন্ত, নিত্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ (infinite, one and eternal)। কালের কোন গুণ নাই—ইহা আদি-অন্তহীন। মন অন্তরিন্দ্রিয় ; আত্মা স্বয়ংসিদ্ধ।

গুণ চতুর্ব্বিংশতি প্রকার। রূপ (colour), রস (taste), গন্ধ (odour), স্পর্শ (touch), সংখ্যা (number), দেশভাগ (dimension), স্বাতন্ত্র্য (separateness), সংযোগ (conjunction), বিয়োগ (disjunction), দূরত্ব (distance), নৈকট্য (proximity), বুদ্ধি (intellect), সুখ (pleasure), দুঃখ (pain), কাম (desire), ঘৃণা (aversion), প্রযত্ন (effort), মাধ্যাকর্ষণ (gravity), তারল্য (fluidity), আটালতা (viscidity), বৃত্তি (faculty), যুগল অদৃশ্যশক্তি (twofold invisible force) এবং শব্দ (sound).

ক্রিয়া পঞ্চবিধ—উৎক্ষেপণ (upward movement), অবক্ষেপণ (downward movement), সঙ্কোচন (contraction), প্রসারণ (dilatation) এবং গমন (going বা general motion).

চতুর্থ ভাব 'সামান্য' দ্বিবিধ। সমষ্টির (genus) ধারণার মূলে হইল সামান্যভাব ; ইহা নানা পদার্থের ভিতর একটি সাধারণ ধর্ম্ম প্রকাশ করে এবং ব্যষ্টির (species) সম্বন্ধেও ধারণা জন্মায়। কণাদের মতে সমষ্টি ও ব্যষ্টির একটা প্রকৃতই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। পঞ্চম ভাব হইল 'বিশেষ'। ইহা সামান্যীকৃত হইতে পারে না এরূপ কতকগুলি স্বয়ংসিদ্ধ একক বস্তু—যথা আত্মা, মন, কাল, দেশ, ব্যোম।

ষষ্ঠভাব সঙ্গতি ("সমবায়") বস্তুনিবহের মধ্যে একটা নৈকট্য সম্বন্ধ বুঝাইয়া দেয়, যেমন 'বস্ত্র' ও 'বস্ত্রের সূত্রগুলি'। ইহাতে আধার-আধেয় এইরূপ একটি ভাব প্রকট।

সপ্তম ভাব 'অনিত্যতা' একটি অস্তিত্বের অভাব (negation) সূচিত করে, যাহা সম্বন্ধ-বিহীন (universal) ও সম্বন্ধযুক্ত (mutual) উভয় ধারণা-সাপেক্ষ।

ঋষির মতে উক্ত সপ্তমভাবের প্রকৃত জ্ঞান হইল পরম সুখলাভের উপায়স্বরূপ। যেরূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি প্রকৃতিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রতীচ্য পরমাণুবাদীগণ হইতে অনেক উপরকার তত্ত্ব। কেহ কেহ বলেন—কণাদ প্রাকৃত বিজ্ঞানেরই (physics) একটা গোড়াপত্তন করিয়াছেন, ঠিক দর্শনের নয়। কিন্তু প্রাকৃত-বিজ্ঞান আবার natural philosopyও বটে, এজন্য এক হিসাবে দর্শনও বিজ্ঞানেরই জিনিস, নিছক্ দর্শন বা নিছক্ বিজ্ঞান নয়। 'দর্শন' সংজ্ঞাটির অর্থ Schellings এইরূপ করিয়াছেন :—

"Philosophy is the attempt to determine what the world must be in order that it may be understood by the mind and what the mind must be in order that it may understand the world."

এখানে স্থূলতঃ বলা হইতেছে যে মনোজগৎ ও বহির্জগৎ এই উভয়ের সূক্ষ্মসত্বা (essence) কি এবং উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধই বা কি। আর যদি বেবের[১], কোমৎ[২] ও পল্‌সেন[৩] প্রভৃতির অর্থ ধরা যায় তবে কণাদ দর্শনেরই ব্যাখ্যাতা সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

---

১. Philosophy is the search for a comprehensive view of nature, an attempt at a universal explanation of things"—*Weber*

২ "Philosophy is the science of sciences, i, e, it is the attempt to coordinate the results of the sciences"—*Comte*

৩ "Philosophy is the sum-total of all scientific knowledge"—*Paulsen*



উপন্যাস

লক্ষ্মীর বিবাহ

অধ্যাপক শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—শঙ্করের শিক্ষা

ক্রমে শঙ্করকে কলিকাতা মহানগরীর রস জীর্ণ করিতে লাগিল—প্রথাটা একটু বিলম্ব হইলেও, তাহাতে ব্যতিক্রম হইল না। শঙ্করের কাছে কলিকাতার সমস্তই নূতন।

নটবরের আপন বাড়ীতেই নূতনত্বের অভাব ছিল না, তার দুই পুত্র মোহন ও মদন—অলঙ্কার বিশেষ। বাড়ীতে তাহারা শুধু খাইতে ও শুইতে আসিত; অধিকাংশ সময় যে কোথায় কাটাইত—তাহা শঙ্কর ভাবিয়াও কল্পনা করিতে পারিত না। শঙ্করকে উহারা গ্রাম্য চাষা বলিয়াই কৃপার চোখে দেখিত। শঙ্কর তাহাদের সহিত কথা কহিতেও সাহস করিত না। শুধু দূর হইতে লুকাইয়া তাহাদের বিচিত্র বেশ ও ব্যবহার লক্ষ্য করিত। ইহাদের উপর আবার সুকৃতি। সুকৃতির ভয়ে সে সমস্তক্ষণ কণ্টকিত হইয়াই থাকিত। তাহাকে সম্মুখে পাইলেই সুকৃতি—চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিয়া দেখিয়া বলিত, "ঢেঁকি।" এমনভাবে কখনও বা প্রশ্ন করিত যে শঙ্কর একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময় ও আকর্ষণ ছিল তা'র ভট্‌চাজের সেই পুরাতন জীর্ণ বাড়ী।

প্রথম দিন সে পড়িতে গিয়া দেখিল দ্বার খোলা। দুই একবার "ভট্‌চাজ মশায়" বলিয়া ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া সে ভিতরে সাহস করিয়া প্রবেশ করিল ও সেই উঠানে উপস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া ডাকিতেই দালানের উপরকার ঘর হইতে একটি ২৫।২৬ বৎসরের স্ত্রীলোক বাহির হইয়া তাহাকে বলিল, "এই যে, এস।" শঙ্কর সাশ্চর্য্যে তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ভট্‌চাজ মশায় কোথায়?"

স্ত্রীলোকটি বলিল, "গঙ্গাস্নানে। আস্‌বেন সময় হলেই। তুমি বস।"

বিব্রত হইয়া কহিল, "না। বাইরেই দাঁড়াইগে, এলে তখন আস্‌ব।"

স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া তাহাকে দেখিল, তারপর বলিল, "বসলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে নাকি? মরি! মরি! কি কথারই শ্রী! এখন বসবে কেন? যখন টাকা ছিল, তখন খোসামোদ করতে—এখন ত কলা দেখাবেই।"

শঙ্কর নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ মেয়েটি বলে কি?

স্ত্রীলোকটি আরও বলিল, "আর পারি না। সাধ্য কেন বাপু? তবে এত লোক থাকতে মিত্তিরের আর ভট্‌চাজের হাতে পড়লে কেন? তোমার এতটুকু বুদ্ধিও নাই—ছি!"

শঙ্করের মনে হইল সে বিষম কিছু অপরাধ করিয়া ফেলিয়াছে। সে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন? তারা কি ক'রেছে?"

মেয়েটি ঘরের ভিতর হইতে একটি মোড়া আনিয়া তাহাতে বসিয়া বলিল, "আর আমি পারি না, বাপু। হাড়মাস জ্বালালে আমার তুমি। এই তোমার শেষে মনে ছিল।" তারপর স্ত্রীলোকটি অধোবদনে বসিয়া রহিল।

শঙ্করের কাছে ইহা পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় আশ্চর্য্য হইয়া উঠিল। সে একদৃষ্টিতে স্ত্রীলোকটিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ স্ত্রীলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মিত্তির কে হয়? জান মিত্তিরকে—কলকাতার মিত্তিরকে? তাও বলতে পার না—এত লজ্জা তোমার? কিন্তু কে হয় একবার বল। একবার শুনি। তখন বুঝব, কি ব্যাপার!"

কথা কহিতে কহিতে স্ত্রীলোকটির চক্ষুদ্বয় কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাহার শীর্ণ মুখ রক্তাভ হইল, তাহার ওষ্ঠ কুঞ্চিত হইতে লাগিল।

শঙ্করের অতিশয় ভয় হইল। সে স্খলিতস্বরে উত্তর দিল, "ও কেউ হয় না!"

স্ত্রীলোকটি মনোযোগ দিয়া শুনিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "তাই ঠিক। তাই ঠিক।" ও দালান হইতে নামিয়া পার্শ্বের এক সরু গলিতে অন্তর্হিত হইল।

শঙ্কর পালাইবে কি না ভাবিতেছে—এমন সময় নিঃশব্দে ভট্চাজ তাহার সম্মুখেই প্রায় আবির্ভূত হইল। শঙ্কর চমকিত হইল।

ভট্চাজ হাসিয়া বলিল, "এসেছ। আচ্ছা তোমাকে বাঙ্গালা শেখাব—মিত্তিরজা যখন বলে গেছে শেখাতেই হবে। বাঙ্গালা কি জান? না—বোধোদয়, চারু পাঠ, আর হেমচন্দ্রের মেঘনাদবধ। মেঘনাদবধ পড়েছ?"

ভট্চায দালানে মোড়ার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "অতি চমৎকার কাব্য। ছাত্রবৃত্তিতে পড়েছি। শুন্‌বে একটু—

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীর চূড়ামণি,
চলি যবে গেল যমপুরে—কোন বীরবরে—"

শঙ্কর ভট্চাজের আবৃত্তি ও অভিনয় দেখিয়া পরম পুলকিত ও বিস্মিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, 'এই বাঙ্গালা? তা' ত শুনি নি।"

ভট্চাজ হাসিয়া বলিল, "শুন্‌বে, শুন্‌বে। রোজ তোমাকে শোনাব—তবে ত শিখ্‌বে। খাসা কাব্য লিখেছে—মেঘনাদবধ। এর নামই বাঙ্গালা। এ তুমি শিখ্‌বেই।"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "আর হিসাব? অঙ্ক?"

ভট্চাজ উত্তর দিল, "হিসাব? হিসাব ত শুভঙ্করী। মুখে মুখে কষা যায়—" তারপর শঙ্করের কাছে উঠিয়া আসিয়া তাহার কানের অতি নিকটে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, "সাহেবরাও জানে না।"

শঙ্কর ঠিক বুঝিল না, সাহেবরা কি জানে না। ভট্চাজের মুখের দিকে সে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়াই রহিল।

ভট্চাজ আবার মোড়ার উপর গিয়া বসিয়া বলিল, "হোয়েছে?"

শঙ্কর প্রশ্ন করিল, "কি?"

ভট্চাজ শঙ্করকে বিস্মিতনেত্রে দেখিয়া—হঠাৎ উঠিয়া বলিল, "ওবেলা এস শুভঙ্করী নিয়ে—এখন আমার সময় কম। কাষ্টম-হাউসে যাব—প্রেস হাউসে যাব—অনেক কাজ। না হলে আবার মিত্তিরজা চটে যাবে।" সঙ্গে সঙ্গে সেও সেই সরু পথে অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হইল।

শঙ্কর দাঁড়াইয়া দেখিল। তারপর পাঁচ মিনিট, সাত মিনিট করিয়া আধঘণ্টা একঘণ্টা অতিবাহিত হইল। তাহার একবার প্রবৃত্তি হইল ঐ সরু পথে গিয়া সে দেখে যে ভট্চাজ ও সেই স্ত্রীলোকটি কোথায় গেল। কিন্তু সাহস হইল না। তবু সে পা পা করিয়া সে গলির মাথা পর্য্যন্ত গেল। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া সে ভাবিতে লাগিল, স্ত্রীলোকটি কে? ভট্চাজের স্ত্রী নাকি? তাহাই হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে কিছুতেই ইহা সম্ভব মনে করিতে পারিল না যে ভট্চাজের স্ত্রী থাকিতে পারে। ভট্চাজকে কেহ কি বিবাহ করিতে পারে? তা' ছাড়া ভট্চাজ ও তা'র স্ত্রী দু'জনকেই শঙ্করের একেবারে অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। সে কখনও এরূপ মানুষের কল্পনাও করিতে পারে নাই। ইহা একেবারে নূতন। সে এই ভাবিয়া ফিরিতে যাইতেছে এমন সময় ভট্চাজ আবার দেখা দিল। বলিল, "ওবেলা এস। শুভঙ্করী শিখাতে হবে—মিত্তিরজা বলে গেছে। শ্লেট্ এনো। না আন্‌লেও চলে, মুখে মুখেও হ'তে পারে। আচ্ছা, বল দেখি, এক মণ লোহার দাম এখন বাজারে সাড়ে তিন টাকা, সাড়ে সতের ছটাকের দাম কত?"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, "জানি না।"

ভট্চাজ হাসিয়া বলিল, "জান্‌বে, জান্‌বে। এখন যাও।"

বাধ্য হইয়া শঙ্কর ফিরিল, কিন্তু মনটা তাহার পড়িয়া রহিল, ভট্চাজের বাড়ীতেই। সে আবার বাড়ীর পথে পিছনে শুনিল, "অন্ধ আতুরকে দয়া কর, বাবা।"

শঙ্কর পিছন ফিরিয়া সেই বৃদ্ধকে দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটস্থ হইল। বৃদ্ধ ভিক্ষুক তাহাকে নিকটে দেখিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "ওঃ। তুমি? তা বলতে হয় যে কর্ত্তাবাবুর বাড়ীর লোক। আরে ছ্যাঃ! দিনটাই আমার মাটি ক'রলে। এই নাও তোমার টাকা।" সে ট্যাঁক হইতে টাকা বাহির করিয়া শঙ্করকে দিতে গেল।

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, চাই না. আর। কিন্তু তুমি সত্যি অন্ধ নও?"

বৃদ্ধ টাকা পয়সা পুনরায় ট্যাঁকে গুঁজিয়া বলিল, "অন্ধ বৈ কি বাবা—তা না হ'লে তোমাকে চিন্‌তে পার্‌লুম কেমন করে? একেবারে অন্ধ!" তারপর তাহার লাঠি বাড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল ও চীৎকার করিতে লাগিল, "অন্ধ-আতুরকে দয়া কর বাবা!"

শঙ্কর মুগ্ধদৃষ্টিতে কিছুকাল তাহাকে দেখিয়া আবার বাসার পথ ধরিল।

সমস্ত দিন উৎকণ্ঠিতভাবে কাটাইয়া বিকালে শঙ্কর পুনরায় ভট্‌চাজের বাড়ী গেল। সে ভিতরে গিয়া ডাকিতেই সেই স্ত্রীলোকটি মোড়া হাতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "এই যে, এস!" শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল, "ভট্‌চাজ মশায় কোথায়?"

স্ত্রীলোকটি উত্তর করিল, "গঙ্গাস্নানে। আস্‌বেন, সময় হলেই। তুমি বস!"

শঙ্কর চুপ করিয়া দেখিতে লাগিল। স্ত্রীলোকটিও অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া তাহাকে দেখিয়া বলিল, "বসলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে নাকি? মুরি, মরি! কি কথারই শ্রী? এখন বস্‌বে কেন? যখন টাকা ছিল, তখন খোসামোদ কর্‌তে! এখন ত কলা দেখাবেই!"

শঙ্কর নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। স্ত্রীলোকটি আবার বলিল, "আর পারি না, সাধা কেন বাপু? তবে এত লোক থাকতে মিত্তির আর ভট্‌চাজের হাতে পড়্‌লে কেন? তোমার এতটুকু বুদ্ধিও নেই—ছিঃ!"

ইহার পর একটু চুপ করিয়া মেয়েটি কহিল, "আর আমি পারি না বাপু; হাড়মাস জ্বালালে। এই তোমার শেষে মনে ছিল!" তার পর সে অধোবদনে বসিল। এমন সময় আকস্মিকভাবেই ভট্‌চাজের আবির্ভাব ঘটিল। শঙ্কর চমকিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকটি একটু হাসিয়া পাশের সরু গলিতে অদৃশ্য হইতে উদ্যত হইল।

শঙ্কর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "তুমি কে?" তা'রপর ভট্‌চাজকে প্রশ্ন করিল, "ও কে ভট্‌চাজ মশায়?"

ভট্‌চাজ ও স্ত্রীলোকটি দুজনেই চমকিয়া উঠল। দুইজনেই বিস্মিতভাবে শঙ্করের দিকে কিছুকাল নির্নিমেষে দেখিয়া নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

অভিভূতের মত সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে ভাবিতে চেষ্টা করিল, কোথায় ইহারা এই গলিপথে অদৃশ্য হইল। তার পরে সে দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিয়া সেই পথে চলিল, কিন্তু প্রায় অন্ধকার পথে সে অনেক দূর গিয়াও—সে স্ত্রীলোকটির বা অন্য কাহারও কোনরূপ চিহ্ন দেখিতে পাইল না। ক্রমে তাহার ভীতি বর্দ্ধিত হইল, সে ত্রাস্তপদে পুনরায় সেই অপরিসর উঠানে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ভট্‌চাজ হাসিমুখে দাঁড়াইয়া। কিরূপে যে ভট্‌চাজ আসিল তাহা সে নির্ণয় করিতে পারিল না।

ভট্‌চাজ হাসিয়াই প্রশ্ন করিল, "কি হে, তুমি ওদিকে কেন? কি দেখেছ? অ্যাঁ?" হাসির তাৎপর্য্য কিছুমাত্র উপলব্ধি না করিয়া শঙ্কর অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল। কোনও উত্তর করিতে পারিল না। বিনোদ কহিল, "তা বেশ ক'রেছ। এখন পড়াশোনার কি হবে? শুভঙ্করী এনেছ? শ্লেট? বাঙ্গালা পড়্‌বে? হেমচন্দ্রের—" বাধা দিয়া ব্যস্তভাবে শঙ্কর সংক্ষেপে উত্তর দিল, "আমার দরকার নেই?"

ভট্‌চাজ অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, "দরকার নেই কি হে? মিত্তিরজা এত করে বলে গেলেন—তোমার উপর তাঁর বিশেষ প্রীতির ভাব, এমন অবহেলা কর্‌লে চল্‌বে কেন? কি হল? আচ্ছা বল, মুখে মুখেই বল, এক হন্দর লোহার দাম যদি ১৩ টাকা পৌনে পাঁচ আনা হয়, তবে এক ছটাক স্ক্রুর দাম কত? বলে ফেল? এর নামই শুভঙ্করী। শুভঙ্করী কি গাছ থেকে পড়ে? তা নয়।"

শঙ্কর মাথা নীচু করিয়াই রহিল। যেন শুভঙ্করীর পড়া সম্বন্ধে তাহার কোনও ঔৎসুক্য নাই।

ভট্‌চাজ কহিল, "এটা একটু কঠিন প্রশ্ন হল। আচ্ছা, সোজা একটা ধর—সাড়ে সতের আনাতে ৩টা ইলিশ মাছ, ওজন পৌনে আটাশ ছটাক, তা হলে সওয়া মনের দাম কত, আর কটা ইলিশ উঠ্‌বে? এটা ত সহজ, বলে ফেল দেখি। তা হলেই ছুটি।"

শঙ্কর কিছুই বলিল না, মাথা নীচু করিয়াই রহিল। ভট্‌চাজ একটু নীরবে অপেক্ষা করিয়া বলিল, "না, শুভঙ্করী কাল আনা চাই-ই, বুঝেছ? না হলে বাপু, পড়ান হবে না। মিত্তিরজাকে বল্‌তে হবে তা হলে। তুমি ত বাবু কচি খোকা নও, দুগ্ধপোষ্যও নও, বেশ টন্‌টনে হয়েছ

—স্ত্রীলোকের পিছুতে অন্ধকারে ছুটে পড়, আর পড়াশোনাতে এত অবহেলা কেন? এতে নিজেরই আখেরে ভাল হবে!"

শঙ্কর এইবার ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "কাল নিশ্চয়ই আস্‌ব।"

ভট্‌চাজ হাসিয়া কহিল, "এই ত! কালে মিত্তিরজা যে তোমাকে জামাতা কর্‌বেন না, তাই বা তুমি বুঝ্‌লে কি করে? আর তা হলে ত কথাই নেই। ছেলে দুটো ত অপদার্থ! কোনদিন দেখ্‌বে মিত্তিরজা তাদের ত্যাজ্য পুত্র করেছে। তখন তোমারই সব হে। তাই বলি বুঝে চল। বনেদী ঘরের ছেলে, আবার বনেদী হবে।"

শঙ্করের কানে সব কথা পৌছিল না। সে "আজ তবে আসি" বলিয়া বিদায় লইয়া কোন মতে পলাইল। সে যে ভট্টাচার্য্যের কাছে ধরা পড়িয়াছে—ইহাতে তাহার দেহের সমস্ত রক্ত যেন উষ্ণ হইয়া শিরায় শিরায় ছুটাছুটি করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া তাহার মনে হইল যেন গ্যাসবাতি গুলি সহস্র সহস্র চক্ষু দিয়া সমস্ত কলিকাতা সহরে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে। সে দ্রুতপদে নটবরের গৃহে ফিরিয়া ক্ষান্তমণির কাছে একেবারে উপস্থিত হইল।

ক্ষান্তমণি তাহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে শঙ্কর, কি হয়েছে?"

শঙ্কর আত্মস্থ হইয়া উত্তর দিল, "কিছু না কাকীমা।"

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "পড়াশোনা আরম্ভ হ'ল? কি পড়্‌লি?"

শঙ্কর সেখানে প্রকৃতি ও সুকৃতিকে উপস্থিত দেখিয়া লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়াই রহিল। সুকৃতি মুখ ফিরাইল, প্রকৃতি বলিল, "বর্ণপরিচয় সুরু হয়েছে সম্ভব!"

ক্ষান্তমণি তর্জ্জন করিলেন, "যা, যা? তোকে কেউ জবাব দিতে বলে নি।"

প্রকৃতি বলিল, "উনি যে দিতে পার্‌ছেন না!"

শঙ্কর শান্তভাবে কহিল, "কাল বই কিন্‌বো—তারপর সুরু হবে। কিন্তু কাকীমা, আমার পড়াশোনার কি দরকার? আমি ত চাকরি কোর্‌ব না, কিছু না। শুধু শুধু আমাকে পড়ান কেন?"

ক্ষান্তমণি কহিলেন, "তবুও বেটা-ছেলের পড়াশুনা চাই বৈ কি? আমরা মেয়েছেলে—মূর্খ হলেও ক্ষতি নেই। আর আজকাল মেয়েরাও সবাই পড়্‌ছে, পাশ কর্‌ছে! আমার ছেলেরাই মূর্খ হোয়ে রৈল কেবল—যেমন কপাল!"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "পাশ কর্‌ছে? সে কি?"

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "তা' কি জানি ছাই? আমিও যে মূর্খ রে তোরই মত। এই পাশের বাড়ীতে একটি মেয়ে আছে দেখিস্‌, সে নাকি দুটো পাশ করেছে। আমার কপালেই কেউ পাশ হতে পারে না।"

শঙ্কর কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু প্রকৃতি ও সুকৃতির দিকে চাহিয়া তাহা শেষ করিতে পারিল না। তবে তাহার মনে পড়িল যে সে রাস্তাতে জুতা-মোজা-পরিহিতা অনেক স্ত্রীলোককে দেখিয়াছে—তাহাদের অনেকের হাতে বই। সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না, এই স্ত্রীলোকেরা কি পড়ে ও কেন পড়ে। সখ করিয়া কেহ যে সংসারে পড়াশুনা করে এ তাহার ধারণাতীত ছিল।

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "সুকৃতি ও প্রকৃতিকেও ত পড়াতে চেয়েছিলুম, দুদিন ত ওরা স্কুলেই গিছ্‌ল—কিন্তু ওদের কপালে নেই। বাড়ীর কাজ কে করে? আর ছেলেরাই যখন সব মূর্খ হল—মানুষ হল না—তখন—সবই আমার বরাত। আরও কত লাঞ্ছনা আছে বরাতে তা কে জানে!"

এই সখেদ উক্তি—শঙ্করকে পীড়া দিল। সে আপনার ছোট কুটুরিতে পলাইয়া গেল। ভাবিল, কলিকাতা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার!

একটু পরে সুকৃতি আসিয়া বলিল, "নেশা হ'য়েছে? ঘোর কেটেছে? ঢেঁকি! এখন খেয়ে চরিতার্থ কর।"

এমনি ভাবেই সুকৃতি কথা কহিত—কেন তাহা শঙ্কর জানিত না, ভাবিয়া পাইত না। সে উঠিয়া আহারে গেল। এইরূপে শঙ্করের শিক্ষা সুরু হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—দিগ্বিজয়ের আশ্চর্য্য

দিগ্বিজয় সেদিন আফিসে আসিয়া কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারিল না! তাহার মায়ের কথাগুলি কেবলই থাকিয়া থাকিয়া মনে পড়িতে লাগিল; সেই সঙ্গে লক্ষ্মীকে যে মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য দেখিয়াছিল তাহাই স্মরণ হইতে লাগিল। এতকাল সে বিবাহের কথা ভাবে নাই; সামান্য আয় বলিয়া মাতার বিস্তর পীড়াপীড়িতেও সে সম্মত হয়

নাই। এমন করিয়াই তাহার বয়স ২৭।২৮ হইয়াছে। আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, বিবাহ করিলে মন্দ হইত না। ৭৫৲ টাকার উপর ভরসা করিয়া অনেকেই ত সংসার করে —তাহাদের চলিতেছে না? বিশেষ লক্ষ্মীর মত স্ত্রী লাভ করিলে চলিতে পারে। আফিসের ছুটির পর সে দ্বিধাগ্রস্ত-ভাবে বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়াই সে কিছু জিজ্ঞাসা মাত্র না করিয়াই বুঝিল, লক্ষ্মী চলিয়া গিয়াছে। তাহার চলিয়া যাওয়ার এত তাড়া কিসের সে ভাবিয়া পাইল না, সম্ভব তাহার মা কিছু বলিয়া থাকিবেন। যে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছিল সে এরূপ বিমুখ হইতে পারে না; যাহার কাছে আশ্রয়ের জন্য আসিয়াছিল সেই বিমুখ হইতে পারে, কেন না তাহার হাতে কিছু প্রভুত্ব আছে। কিন্তু মা-কে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে বা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না। হাত মুখ ধুইয়া জল খাইয়া সে তাসের আড্ডাতে হাজিরা দিতে যাইতে উদ্যত হইয়াছে এমন সময় তাহার মা তার হাতে একখানি পত্র দিল।

দিগ্বিজয় পত্রখানি উল্টাইয়া দেখিল, কিছু বুঝিতে পারিল না, তাহা খামে বন্ধ। তারপর তাহার নাম দেখিয়া সে তাহা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িল; ইংরাজিতেই পত্র—তাহার বাঙ্গালা মর্ম্ম এই:

তারিখ ২৭শে জুন, ১৩৩২

মহাশয়,

ত্রিশবিঘার ৺রাধাবল্লভ রায়ের কন্যা লক্ষ্মী সম্প্রতি আপনার আশ্রয়ে আছে। কিন্তু তার পিতার বিশেষ অনুরোধ ও উইলের বলে আমিই তাহার অভিভাবক। ৺হরিনারায়ণের পুত্র শঙ্করেরও আমিই অভিভাবক। অতএব মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক লক্ষ্মীকে আমার গৃহে পৌছাইয়া দিবেন, নচেৎ আইনের সাহায্যে আমি তাহাকে অত্র আনাইব। অন্যায়পূর্ব্বক তাহাকে আটক রাখিলে বিচারে দণ্ডনীয় হইবেন। ইতি

শ্রীনটবর মিত্র।

২৪ কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা।

পত্র পড়িয়া দিগ্বিজয়ের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তাহার মা তাহাকে দুই তিনবার প্রশ্ন করিলেন, কাহার পত্র? কোথা হইতে আসিয়াছে? কিন্তু দিগ্বিজয় শুনিতে পাইল না। যখন শুনিল তখন সংক্ষেপে উত্তর দিল যে তাহার কোনও বন্ধুরই পত্র। তারপর চিঠিখানি পকেটে ফেলিয়া সে আড্ডাতে গেল।

আড্ডা হইতে রাত্রে ফিরিয়া আহারাদির পর সে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল সে কি করিবে! লক্ষ্মী অবশ্য চলিয়া গিয়াছে, তাহার কোনও রূপ আইনের দণ্ডের ভয় নাই। কিন্তু এইরূপ পত্রের কারণ কি? লক্ষ্মী কি পলাইয়া আসিয়াছিল? এই নটবর মিত্রের কাছে সে থাকিতে ইচ্ছুক নহে? কেন? ভাবিতে ভাবিতে এই নটবরকে দেখিতে দিগ্বিজয়ের প্রবল একটা কৌতূহল হইল। লক্ষ্মীর গন্তব্য কোথায় তাহা সে জানিত না। লক্ষ্মী পলাইয়া কি স্বগ্রামে ফিরিয়াছে? দিগ্বিজয়ের এইরূপ নানা চিন্তাতে রাত্রে সুনিদ্রা হইল না। কেবল থাকিয়া থাকিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিল ও লক্ষ্মীর কথা মনে পড়িল। পরদিন প্রভাতে আফিসে যাইবার সময় মাকে বলিয়া গেল, "মা, আমি আজ দেরীতে আস্‌ব, দশটার গাড়ীতে। আমার এক বন্ধুকে দেখ্‌তে যাব, তার বড় অসুখ।"

মাতা গত দিনের চিঠির কথা ভাবিয়া তাহাই স্বীকার করিয়া লইলেন। অস্বস্তিতে সমস্ত দিন অফিসে কাটাইয়া দিগ্বিজয় ৫টার বহু পূর্ব্বেই কাঁটাপুকুরের ঠিকানাতে গেল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া ২৪নং বাড়ী বাহির করিয়া দেখিল যে দ্বারের বাহিরে কাষ্ঠফলকে লেখা, N. Mitter. Esq., Share-Broker. দিগ্বিজয় নির্ণয় করিল, এই বাড়ী। সে বাহিরে দাঁড়াইয়া ডাকিল, "বেহারা!"

ভিতর হইতে একজন বেহারা বাহির হইয়া আসিতেই সে প্রশ্ন করিল, "নটবরবাবু বাড়ী আছেন নাকি? এইটাই সম্ভব তাঁরই বাড়ী?"

বেহারা কাহাকেও এ পর্য্যন্ত নটবরবাবুর সন্ধানে আসিতে দেখে নাই। সে বলিল, "আছেন।"

দিগ্বিজয় তাহাকে বলিল, "আচ্ছা, বলগে চাতরা থেকে এক ভদ্রলোক দেখা ক'র্‌তে এসেছে! বিশেষ দরকার!"

ভৃত্য গিয়া সংবাদ দিতেই নটবর তৎপর হইয়া বৈঠকখানাতে দিগ্বিজয়কে ডাকাইয়া বসাইলেন। তারপর দিগ্বিজয়কে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "আপনিই দিগ্বিজয়বাবু?"

দিগ্বিজয়ও নটবরকে দেখিতেছিল; সে উত্তর দিল, "হাঁ, তাই।" তারপর পকেট হইতে পত্রখানি বাহির

করিয়া বলিল, "এই পত্রের অর্থ ত বুঝ্‌তে পারলুম না, নটবরবাবু! লক্ষ্মী একদিন আমাদের বাড়ী এসেছিল বটে—কিন্তু পরদিনেই চলে গেছে। আমার মা তাকে স্থান দিতে সম্মত হন নাই। সে সংবাদ দেওয়া উচিত মনে করেই এসেছি।" কিন্তু তাহার কথাতে অবিশ্বাস করিয়া নটবর ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "হুঁ!"

দিগ্বিজয়ের প্রবল কৌতূহল হইল এই 'হুঁ'র অর্থ কি জানিতে। নটবরকে তাহার মন্দ লাগিতেছিল না।

নটবর একটু চুপ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "কথাটা কি সত্য? না, আমাকে প্রতারিত করার চেষ্টা এ?"

দিগ্বিজয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "সত্য বৈ কি!"

নটবর পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, "তবে লক্ষ্মী কোথায়?"

দিগ্বিজয় উত্তর করিল, "তা আমি জানি না। জানা সম্ভবও নয়, কেন না সে আমাকে তার ঠিকানা দিয়ে যায় নি।"

তাহার উত্তরে একটু ব্যঙ্গের আভাষ ছিল। নটবর ভিতরে ভিতরে কুপিত হইলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন, "আচ্ছা, তাহলে আপনি যেতে পারেন।"

দিগ্বিজয় কিন্তু এত শীঘ্র যাইবে বলিয়া আসে নাই। লক্ষ্মীর স্মৃতি তখন তাহার মনকে পূর্ণ করিয়াই ছিল। সে বলিল, "তবে সে কোথায় তা আমি না হয় সন্ধান করতে পারি।"

নটবর উদাসকণ্ঠে কহিলেন, "বটে?" দিগ্বিজয় বলিল, "হাঁ। কিন্তু একটা সর্ত্ত—যদি লক্ষ্মীকে পাওয়া যায়, তবে তার সঙ্গে আমার বিবাহ দিতে হবে।"

নটবরের ওষ্ঠাধরে একটা হাসির বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "সেটা পরে বিবেচ্য। প্রথম কথা, লক্ষ্মীকে পাওয়া।"

দিগ্বিজয় উত্তর দিল, "তা নিশ্চয়ই। সে জন্য আমি আপনাকে সাহায্য ক'রতে পারবো বলে মনে হয়। অবশ্য আফিসের চাকরি আমার—তবুও।"

নটবর এই সব যুবকদের তরলমতির কথা সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন ও মনে মনে পৃথিবীর সমস্ত যুবককে ঘৃণা করিতেন। শঙ্করের প্রতিও তাঁহার অবজ্ঞায় কোনও রকম কমতি ছিল না। শুধু তাহাকে চোখে চোখে রাখিবার অভিপ্রায়েই নিজের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। যতদিন না লক্ষ্মীকে হাতে পাওয়া যায় ততদিন শঙ্করকে দরকার। দিগ্বিজয়ের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ দেখিয়া বলিলেন, "বেশ্।"

দিগ্বিজয় ইহাতে একটু নিরুৎসাহ হইল। বলিল, "চাকরি আমি ইচ্ছা করেই করি। তা না হলে বসে খাবার মত সংস্থান আমাদের আছে।"

নটবর বিশেষ কৌতুক অনুভব করিলেন। মুখে যথাসাধ্য গাম্ভীর্য্য আনয়ন করিয়া বলিলেন, "বেশ্। আমি ত লক্ষ্মীর অভিভাবক। সে ফিরে এলে এ বিষয়ে চিন্তা ক'রবো ও কথাবার্ত্তা কইব। তুমি মধ্যে মধ্যে এস। কিন্তু সে যদি তোমাদের ওখানে না গিয়ে থাকে তবে গেল কোথায়? কা'র সঙ্গে গিছ্‌ল?"

দিগ্বিজয় উত্তর দিল, "এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে—মুখুয্যেমশায় তাঁর নাম।"

নটবর চিন্তা করিয়া একটু বলিলেন, "মুখুয্যে? বুঝেছি। সে বড় সোজা লোক নয়। একেবারে পাকা ঘুনো। মাথায় অনেক রকম বুদ্ধি খেলে। মেয়েটাকে শেষে না নষ্ট করে এই ভয়। বড় হ'য়েছে মেয়ে—আর দেখ্‌তেও চমৎকার। তাই ত বড়ই দুর্ভাবনার সংবাদ দিলে হে।"

দিগ্বিজয়েরও বড় দুর্ভাবনা হইল। মুখুয্যে লোকটি ত সর্ব্বনেশে তাহা হইলে। তাহার সহিত লক্ষ্মী গেল কেন? লক্ষ্মী নষ্ট হইলে ত দিগ্বিজয়ের সমস্ত আশা একেবারে যাইবে। সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "তবে ত এর বিধান শীগ্‌গিরই করা চাই, মশায়। ওরকম বদ্‌লোকের সঙ্গ থেকে মুক্ত করাই চাই! সে আপনার এখান থেকে পালাল কেন?"

নটবর উত্তর করিলেন, "বড় মেয়ে—শেয়ানা হ'য়েছে—কি জানি তার মনে কি আছে। যতদূর সন্দেহ হয় ভিতরে ভিতরে নিশ্চয়ই কেউ তাকে উস্‌কেছে—লোভ দেখিয়েছে। না হলে তার বাপ ও হরিনারায়ণ দুজনে আমার হাতে তার ভার দিয়ে গেছে জানে—আমিও যত্নের আদরের ত্রুটি রাখি নি—তবু সে গেল কেন ভেবে পাই না। ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শিখিয়ে যোগ্যপাত্রে দিয়ে দেব। এ অবস্থাতে পালিয়ে আপনাদের কাছে যাওয়াটা এমন করে তার কি উচিত হ'য়েছিল? অবশ্য আমি ভেবেছিলুম আপনারা তাকে স্থান দেবেন না, বে-আইনী

কাজ কেন করবেন?—তবু কত বড় দায়িত্ব আমার ভাবুন। সেই জন্যই চিঠিখানা ভুলের ঝোঁকে লিখেছিলুম, কিছু মনে করবেন না। কি লিখেছি নিজেরই মনে নেই। দেখি—আছে সে চিঠি?"

দিগ্বিজয় পকেট হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া দিল। নটবর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া চিঠিখানি ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্, ও অনিষ্টের মূল, বিবাদের মূল যাওয়াই ভাল।"

দিগ্বিজয় বসিয়া বসিয়া নটবর মিত্তিরের প্রশংসা মনে মনে করিতে লাগিল।

নটবর বুঝিয়া বলিলেন, "আপনি মাঝে মাঝে এলে আনন্দিতই হব। লক্ষ্মীর সন্ধান আমিও করছি—আপনিও করুন। পেলে জানাবেন। আপনার মত সুপাত্র পেলে ত তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাই!"

দিগ্বিজয় বিনীতভাবে জ্ঞাপন করিল—সে সন্ধান করিবে ও অচিরেই নটবরকে সংবাদ জানাইবে। তারপর সে হৃষ্টচিত্তে বিদায় লইয়া গেল।

নটবর কতকটা নিঃসন্দেহ হইলেন যে শ্রীরামপুরে লক্ষ্মী নাই। কিন্তু সে কোথায় গিয়াছে বুঝিতে পারিলেন না। ত্রিশবিঘাতে ফিরিতে পারে, কিন্তু সেখানে ত তাহার আশ্রয় নাই। অত বড় কন্যাকে কেহই ঘরে লইবে না—তাহার দায়িত্ব লওয়া বড় সহজ নহে। তাহাই যদি হয়, তবে লক্ষ্মী গেল কোথায়? মুখুয্যে কি তাহাকে জামাতার বাড়ীতেই গোপন করিল? নটবর ভাবিয়া ঠিক পাইলেন না। অথচ বিষম উদ্বিগ্ন হইলেন।

ওদিকে দিগ্বিজয় বাড়ী ফিরিবার পথে নটবরের মধুর ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনে মনে স্থির করিল, একবার ত্রিশ-বিঘাতে গিয়া লক্ষ্মীর সন্ধান করিবে। কিন্তু মাতাকে এ সব বিষয় গোপন করিয়া করিবে কিম্বা তাঁহাকে সব জানাইয়া এই কার্য্যে অগ্রসর হইবে তাহা বিচার করিয়া উঠিতে পারিল না। এতদিন তাহার জীবন ধারাবাহিক রকমে চলিয়াছিল, সে বাড়ীতে আহার করিত, শয়ন করিত, আড্ডাতে তাস খেলিত, আর আফিস করিত। কিন্তু হঠাৎ একটা নূতনত্ব তাহার অভ্যস্ত জীবনে আসিয়া তাহাকে ব্যস্ত বিব্রত করিল।

সে-রাত্রে আহারের সময় সে মাকে বলিল, "লক্ষ্মীর কোনও খবর আর কি পেয়েছ, মা?"

মা মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, "কি দরকার খবরের? ওসব মেয়েছেলের চরিত্র ভাল না কি? এখানে এসেছিলেন ঢং করতে। আর ঐ মুখুয্যেকে দেখলেই মনে হয় চোর।"

দিগ্বিজয় লক্ষ্মীর প্রতি মার মনোভাব দেখিয়া একটু হতাশ্বাস হইল। তবু জিজ্ঞাসা করিল, "ওর—ঐ মেয়েটির মা কি সত্যই তোমার ভগ্নী ছিলেন না কি?"

দিগ্বিজয়ের মা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "ভগ্নী না হাতী। কে জানে? কোনও কালে ত শুনি নি! তবে তার খবরে আর তোর দরকার কি?" দিগ্বিজয় মনের অস্বস্তি গোপন করিয়া বলিল, "না, কিছু না।"

মাতা কিন্তু সন্দিগ্ধা হইলেন। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তা বাবু, তুই-ই একটা বিয়ে করে ঘরে লক্ষ্মী নিয়ে আয় না। তোকে ত কতবার বলে বলে হায়রাণ হ'য়ে গিছি। মেয়ের ত অভাব নেই—পাওনাও কিছু হবে!"

দিগ্বিজয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না! ও বিয়েথার দিকে যেও না। মেয়ের ত অভাব নেই, কিন্তু মেয়ের মত মেয়ে পাওয়া দায়। সে পাবেও না, আমার বিয়েরও দরকার নেই।"

মা কিন্তু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "না, মেয়ে ঐ একটি জন্মেছে—লক্ষ্মী! কি যে বেহায়াগিরি করিস্ তা বলা যায় না। আমি বাবু আর শুন্‌ছি না তোর কথা—বিয়ে দেবই এইবার! দেখি তুই কি করিস?" তিনি ক্রোধবশতঃ অস্থির হইয়া উঠিয়া অন্যত্র গেলেন।

দিগ্বিজয়ের কাছে মায়ের এই ক্রোধ বড় অশোভন বলিয়া বোধ হইল। তা ছাড়া লক্ষ্মী সম্বন্ধে এইরূপ অবজ্ঞা দেখিয়া তাহার মনে অত্যন্ত ব্যথা লাগিল। সে তখনও নটবরকে তুষ্ট করিয়া কিরূপে লক্ষ্মীকে লাভ করা যায় তাহাই চিন্তা করিতেছিল। অবশ্য এরকমভাবে যে প্রেমে পড়ার মত নভেলি কাণ্ড কিছু সে করিতে ভালবাসিত তাহা নহে—সে কখনও ভাবে নাই সে প্রেমে পড়িবে—কিন্তু মাতার জিদ্ দেখিয়া তাহারও মনে জিদ্ হইল, হয় লক্ষ্মী—না হয় চিরকৌমার্য্য সে গ্রহণ করিবে—পৃথিবীতে কেহই তাহার এই সঙ্কল্প বিচলিত করিতে পারিবে না। কিন্তু কাহাকেও সে তাহার এই ভীষণ সঙ্কল্পের কথা জানাইল না। যথারীতি সে তাসের আড্ডাতে গিয়া হাজিরা দিল।

পরদিন অফিস হইতে সে ফিরিলে তাহার মাতা আবার তাহার হাতে একখানি খামে মোড়া চিঠি দিলেন। সে অস্থির হইয়া তাহা তখনই খুলিয়া পড়িল, নটবর ইংরাজিতে লিখিয়াছে—

"লক্ষ্মীর সংবাদ পাইয়াছি। সে মুখুয্যে মশায়ের সহিত সম্ভব বাঙ্গালা দেশ ছাড়িয়া গিয়াছে। তাহার উপর আর আমার হাত নাই। সুতরাং তোমাকে আর কি লিখিব। আমার নিকট আসার আর তোমার দরকার নাই! তবে যদি পার, মুখুয্যের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বাড়ীতে একবার সন্ধান লইও। আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে ত আমাকে পত্র দ্বারা জানাইও।"

দিগ্বিজয়ের মুখ ভার হইল। সে তখনই আড্ডায় যাইবার নাম করিয়া বাহির হইল। মুখুয্যেমশায়ের মুখেই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর গৃহের সন্ধান সে প্রথম দিনেই পাইয়াছিল। সেখানে গিয়া সন্ধান করিতেই জানিল যে মুখুয্যেমশায় বাঙ্গালার বাহিরে কোথাও যান নাই, স্বগ্রামেই ফিরিয়াছেন। শুনিয়া নটবরের পত্র তাহার মনে যুগপৎ অস্বস্তি ও বিস্ময় উৎপাদন করিল। নটবর চাহে কি? তাহাকে কি ঝাড়িয়া ফেলিতে চাহে? কিন্তু দিগ্বিজয় সে পাত্রই নহে।

মনে মনে যথেষ্ট বিস্মিত হইলেও দিগ্বিজয় লক্ষ্মীর সন্ধান করিবেই ও তাহাকে জয় করিবে—সে বিষয়ে আরও স্থির-সঙ্কল্প হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—ক্ষান্তমণির দুশ্চিন্তা

লক্ষ্মীর সম্বন্ধে শঙ্করের কোনও রকম খেয়াল আর ছিল না। সে লক্ষ্মীকে একেবারে না ভুলিলেও, তাহার কথা ভাবিবার অবসর পাইত না। লক্ষ্মী ছিল ত্রিশবিঘার অবিচ্ছিন্ন অবকাশ ও শান্তির সহিত জড়িত; শহরের নানা অসম্পূর্ণ ও দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মধ্যে তাহার স্থান ছিল না।

শঙ্কর পড়াশোনা করিয়া উঠিতে পারিল না বটে, কিন্তু সে শুভঙ্করী শ্লেট প্রভৃতি লইয়া প্রত্যহ দুই বেলা বিনোদ ভট্টাচার্য্যের বাড়ী যাইত। এক ঘণ্টা হইতে ক্রমশঃ সারা সকালটা ও সন্ধ্যাটা তাহার সেই ভট্টাচার্য্যের গৃহে অতিবাহিত হইত। ভট্চাজ বাড়ীতে কোনদিনই মজুত থাকিত না। কোন বেলাতেই নহে। শঙ্কর সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখিত; স্ত্রীলোকটিই দুই বেলা তাহাকে মোড়া বাহির করিয়া দিয়া প্রত্যহই দুইবেলা একই প্রশ্ন করিত ও তারপর কোথায় কোন্ গহ্বরে অদৃশ্য হইত। ইহাই শঙ্করের কাছে পরম বিস্ময়ের বস্তু ছিল। তারপর ভট্চাজ তাহার দীর্ঘ-নগ্ন বপু লইয়াই যেন ভূগর্ভ হইতে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইত, নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য হিসাবের প্রশ্ন করিত, জবাবের জন্য অপেক্ষা করিত না, কিছুই শিখাইত না ও শেষে বলিত—তাহার বিশেষ কার্য্য আছে সে বাহিরে যাইবে, আগামী কল্য নিশ্চয়ই পড়া সুরু হইবে।

শঙ্করের বয়স হইলেও তাহার মন ছিল শিশুসুলভ। সে জীবনের বাইশ তেইশ বৎসর কাটাইয়াছিল একরূপ চক্ষু মুদিয়াই। তার উপর পল্লীগ্রামের ভিতর প্রকৃতির উন্মুক্ত জগত, সেখানে মানুষের সৃষ্টি কোনও কিছুই অপ্রাকৃত হইতে পারে না। গ্রামের জীবনে সুখদুঃখ, চেষ্টা উদ্দেশ্য অত্যন্ত সরল ও গ্রাম্য, তাহার ভিতর বৈচিত্র্য নাই। গভীরত্ব তাহাতে থাকিতে পারে, অনুভূতির গভীরত্ব—কিন্তু তাহার ভিতর দুর্বোধ্যতা নাই। শহর মানুষের হাতের সৃষ্টি; ইহার ভিতর মানুষের মন সর্পিল লীলাতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার মধ্যে মানুষের মনের দুর্জ্ঞেয়ত্ব কোথায় কেমন ভাবে এক এক এমন অপূর্ব্ব রূপ লইয়াছে যে তাহার অর্থ নির্ণয় করাই দুরূহ। পল্লী-গ্রামবাসী তাই সহরকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে দেখে, আর যখন ইহার উদ্দেশ্য কোনরূপে নির্ণয় করিতে না পারে তখন বিমূঢ় হয়। শঙ্করের হইয়াছিল তাহাই। তদুপরি তাহার শিশুসুলভ মন তখনও সমস্ত বিষয়ের ভিতর নূতনত্ব ও অপূর্ব্বত্বের স্বাদ পাইয়া বিস্ময়ে, আনন্দে ও কৌতূহলে পূর্ণ হইত। রূপকথা তাহার কাছে ছিল সত্য, প্রত্যক্ষ সংসার তাহার কাছে ছিল রূপকথারই মত।

যখন শঙ্করের মন এইরূপে মহানগরীরই বৈচিত্র্য অনুভবে অভিভূত হইতেছিল, তখন সে একদিন মুখুয্যে মশায়ের এক চিঠি পাইল। চিঠিখানি দৈবক্রমেই তাহার হাতে পড়িয়াছিল। সাধারণতঃ যখন চিঠিপত্র আসিত, তখন পিয়ন নটবরের বৈঠকখানার জানালা দিয়া ভিতরে নিক্ষেপ করিত। কিন্তু সেদিন শঙ্কর পিয়নের সম্মুখে পড়াতে পিয়ন তাহাকে শঙ্কর ভাবিয়া চিঠিখানি দিয়াছিল। সামান্য একখানা পোষ্টকার্ড; শঙ্কর অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তাহা পড়িয়া তাহার মর্ম্মোদ্ধার করিল। লক্ষ্মী ত্রিশবিঘাতে

ফিরিয়াছে তাহা জানিয়া সে আনন্দিত হইল, কিন্তু মুখুয্যে-মশায় তাহাকে অত শীঘ্র কেন গ্রামে ফিরিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। তবুও লক্ষ্মী ফিরিয়াছে শুনিয়া মনটাতে যেন একটা অকারণ তৃপ্তি পাইল। কিন্তু ত্রিশবিঘাতে সে যাইবে কি উপায়ে? তাহার ত যাইবার মত অর্থও নাই। নটবরের নিকট চাহিতেও তাহার ভরসা হইল না। কে জানে কেন তাহার নটবরের প্রতি একটা বিদ্বেষ ও ভয় হইয়া গিয়াছিল। সে পত্রের কথা একেবারে গোপন করিবেই ভাবিল।

কিন্তু গোপন রহিল না। সুকৃতি কোন অবসরে চিঠিখানি লইয়া গিয়া পড়িল ও তার পর ক্ষান্তমণিকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, লক্ষ্মী কে?"

ক্ষান্তমণি তাহার মুখে লক্ষ্মীর নাম শুনিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন, "লক্ষ্মী? কোন্ লক্ষ্মী?"

সুকৃতি প্রশ্ন করিল, "কোন্ লক্ষ্মী? ত্রিশ্‌বিঘার লক্ষ্মী কে?"

ক্ষান্তমণি শঙ্কর ও লক্ষ্মীর কথা কতক জানিতেন; তিনি বলিলেন, "ও শঙ্করের সঙ্গে যার বিয়ে হবার কথা ছিল সেই—রাধাবল্লভ রায়ের মেয়ে! কেন রে?"

সুকৃতি উত্তর দিল, "যেতে লিখেছে!"

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "কাকে? শঙ্করকে?" সুকৃতি মাথা নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

ক্ষান্তমণি প্রথম সুযোগেই শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওরে, তোকে নাকি লক্ষ্মী চিঠি দিয়েছে যাবার জন্য?"

শঙ্কর একটু বিস্মিত হইয়া উত্তর দিল, "না। মুখুয্যে-মশায় লিখেছেন। তা যদি একটা কি দুটো টাকা দাও কাকীমা, তবে যাই। আবার ফিরে আস্‌ব।"

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "এই ত এসেছিস্? এর মধ্যে যাই যাই কেন? বেটাছেলের অত পিছটান কেন? আর বিয়ে যখন কোর্‌বি না তাকে, তখন আর দেখ্‌তে যাওয়াই বা কেন? সেও ত আচ্ছা নাছোড়বান্দা মেয়ে দেখি।"

শঙ্কর ইহার জবাব খুঁজিয়া পাইল না। কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "তা চিঠির কথা কাকাবাবুকে বলে দিয়ো না, কাকীমা। কাকাবাবু রাগ করতে পারেন।"

ক্ষান্তমণি তখন অন্য কথাই ভাবিতেছিলেন, শুনিতে পাইলেন না। শঙ্কর এ দিক ও দিক চাহিয়া দেখিল সেখানে অন্য কেহ নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি দেখেছ তুমি কাকীমা? কে দেখালে?"

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "না বাবু, তবে শুন্‌তে পাচ্ছি। তা এ লুকোবার ছাপাবার কি দরকার? চিঠি লেখালেখি চল্‌ছে—তা জানতুম না।" তাঁর মুখ অতিশয় ভার হইল।

শঙ্কর দেখিয়া শুনিয়া—বিব্রত হইল। বলিল, "ও কিছু না। বিয়ে ত আমি ক'র্‌ব না। আমার মত লোকের বিয়ে করা চলে না, আমি বেশ বুঝেছি।"

ক্ষান্তমণি কহিলেন, "তবে তাই খুলে মুখুয্যেমশায়কে লিখে দে। কাল তোকে পোষ্টকার্ড আনিয়ে দেব—লিখে দিস্ যেন লক্ষ্মীর অন্য বিয়ের ব্যবস্থা মুখুয্যে করে। যে বিয়ে করবে না—তাকে ধরে টানাটানি কেন রে বাপু?"

শঙ্কর মনে মনে আজ ক্ষান্তমণির উপর একটু অসন্তুষ্ট হইল। সে বিয়ে করুক বা না করুক অপরের তাহাতে কথা বলিতে আসা কেন? এ বিষয়ে কাহারও কোনও কথা সে সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে পুনরায় বলিল; "সে লিখে দেব'খন। কিন্তু কাকাবাবুকে যেন এ কথা বলো না।"

ক্ষান্তমণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? বল্‌লে কি হবে?"

শঙ্কর উত্তর দিল, "না, এমন কিছু হবে না। তবে কি দরকার? বলো না তুমি।"

ক্ষান্তমণি এমনিতে কখনও স্বামীকে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না। নটবর ও কদাপি ভুলেও স্ত্রীকে কিছু বলিতেন না। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তা দুইজনেরই সুকৃতির মধ্যস্থতাতে ঘটিত। কাজেই তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, "আচ্ছা!" আসল কথা শঙ্কর সম্বন্ধে ক্ষান্তমণি একেবারে নিঃস্বার্থ হইতে পারেন নাই। প্রথম স্নেহটা স্বাভাবিক ও নিরপেক্ষ ছিল বটে, কিন্তু শঙ্কর দুই একদিন থাকিতেই ক্ষান্তমণির মনে একটা অভিপ্রায় জাগ্রত হইল। তিনি ভাবিলেন যে শঙ্কর যদি লেখাপড়া শিখিয়া কাজ কর্ম্ম শিখে, তবে তাহার সহিত সুকৃতির বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাবটা মন্দ হইবে না। বড় ঘরের ছেলে, তাতে কর্ত্তার কাছে অর্থোপার্জ্জনের বিদ্যা লাভ করিলে, শঙ্করও বিবাহ-যোগ্য সুপাত্রই হইবে—সুকৃতির সহিত মানাইবেও। অবশ্য এ সমস্ত ইচ্ছা অপ্রকাশিত ছিল; এমন কি নটবরকেও তিনি তাহা জ্ঞাপন এখনও পর্য্যন্ত করেন নাই; কিন্তু ইহা তাঁহার

মনে ছিল। প্রকাশ করিতে তিনি ভয়ও একটু পাইতেন, কেন না শঙ্করের বিবাহ বিষয়ে একটা ভীতি ছিল। এই বিবাহ-ভীতিকে জয় করিবার জন্য তাঁহার মাথাতে—মাতৃসুলভ কয়েকটি ফন্দীও আসিয়াছিল, তবে তাহার কোনটিকেও এখনও কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই, ইচ্ছার কথাটা প্রচারিত হইয়া যাইবার ভয়ে।

কিন্তু মুখুয্যের চিঠির কথা শুনিবার পর তাঁর মনে হইল যে—হয় ত শঙ্কর আপনার মন জানে না, কিম্বা হয় ত মুখুয্যে নিজেই আসিয়া শঙ্করকে ধরিয়া লইয়া গিয়া বিবাহ দিবে লক্ষ্মীর সহিত এবং এই চিন্তাতে একটু বিচলিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি নটবরের সহিত এ কথাটার মীমাংসা করিয়া লইতে ইচ্ছা করিলেন। শঙ্করের কাছে তিনি চিঠির কথাটা গোপন রাখিবেন প্রতিশ্রুতি দিয়াও সেই দিনই অবসর খুঁজিয়া স্বামীর কাছে গেলেন। ইহা দুঃসাহস হইলেও তিনি গেলেন। নটবর বাড়ীর ভিতরে বড় কখনও যাইতেন না। বাহিরে দ্বিতলে আপনার কক্ষে, না হয় বৈঠকখানাতেই থাকিতেন। সমস্ত দিন যে কি করিতেন তাহাও কেহ বড় জানিত না। তবে তাঁহার ঘরে একটা টেবিলের উপর বিস্তর কাগজপত্র ছড়ান থাকিত, তাহাতে অন্য কাহারও হাত দেওয়া একেবারে নিষেধ ছিল। সারা দিন তিনি সেই সমস্তই ঘাঁটিতেন। কখনও কখনও ডাকে আরও এইরূপ কাগজপত্র আসিত। তবে কখনও কোন লোক তাঁহার কাছে আসিত না, আর তিনিও কাহারও কাছে যাইতেন কচিৎ কদাচিত। সে কক্ষে অন্য কাহারও প্রবেশের অধিকারও ছিল না। বাড়ীর কেহ কোনও প্রয়োজনে আসিলে বাহির হইতেই প্রয়োজন জ্ঞাপন করিতে হইত। ক্ষান্তমণি তাই কক্ষদ্বারে দাঁড়াইলেন ও জানাইলেন—তাঁর প্রযোজন আছে। নটবর তখন বিছানাতে শুইয়া তামাকু সেবন করিতেছিলেন। পত্নীর দিকে চাহিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার আবার কি প্রয়োজন? সময় নেই, যাও। get away।"

ক্ষান্তমণি উত্তরে বলিলেন, "যাই। কিন্তু একটা কথা ছিল যে!"

নটবর বলিলেন, "ভাল জ্বালা! কিছু কথা নেই। যাও, get away!"

ক্ষান্তমণি মনে মনে ব্যথিত হইলেন। ম্লানভাবে বলিলেন, "আমি ভাব্‌ছি সুকৃতির সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দেওয়ার কথাটা কেমন হয়? মেয়ের বিয়ে ত দিতে হবে। পোনর ষোল ত এ দিকে বয়স হ'ল!"

নটবর তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "একেবারে get away" তারপর আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ক্ষান্তমণির চোখে জল আসিল। তাহা অঞ্চলে মুছিয়া ত্রস্তপদে নিজের অংশে ফিরিলেন। স্বামীর এই ব্যবহার তিনি সারাজীবনই মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছেন; কিন্তু নটবর ধনী হইবার পর হইতে ব্যবহারটা একেবারে অবোধ্য রকমের কর্কশ হইয়াছে। তিনি কুৎসিত, তাই না হয় এই ব্যবহার স্বাভাবিক। কিন্তু ছেলেমেয়েদের প্রতিও এই রকম ঘৃণা ও বিদ্বেষ—তাঁহার কাছে অস্বাভাবিক মনে হইত। ইহার পরিণাম যে শুভ হইতে পারে না, তাহা তিনি বুঝিতেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন?

নটবরের সহিত এই প্রকারের পরামর্শ হইবার পর ক্ষান্তমণির স্বাভাবিক অবস্থাতে ফিরিতে একটু সময় লাগিল। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা তাঁহাকে সহজে অব্যাহতি দিল না। তিনি সুকৃতিকে বলিলেন, "তোর সঙ্গে শঙ্করের বিয়ে দেব।"

সুকৃতি কেবলমাত্র অদ্ভুত রকমে মার দিকে চাহিল। কোনও রকম উত্তর দিল না।

ক্ষান্তমণি বলিলেন, "যাদের বাপ্ দেখ্‌বার নেই—থেকেও নেই—তাদের নিজেদেরই সব করে নিতে হয়! আমি কি করতে পারি? একে ছেলেদের জ্বালাতেই হাড় মাস ভাজা ভাজা হল, আবার মেয়েদের ভাব্‌না! মরণ হ'লে বাঁচি!"

সুকৃতি আপন মনে কাজ করিতে লাগিল। ক্ষান্তমণি পুনরায় বলিলেন, "মরণ হ'লেই বাঁচি!" সুকৃতি ইহার পিঠেও কোন কথা বলিল না।

নবম পরিচ্ছেদ—শঙ্করের শিক্ষার উন্নতি

বিকালে সেদিন শঙ্কর ভট্চাজের গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় তাহার ঘরের দরজা ঠেলিয়া সুকৃতি প্রবেশ করিল দেখিয়া সে ত্রস্ত হইল।

সুকৃতি দরজা ভেজাইয়া দরজাতে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া

এক দৃষ্টিতে শঙ্করকে দেখিতে লাগিল। শঙ্কর অস্বস্তিতে বলিয়া ফেলিল, "কি চাই?"

সুকৃতি জিজ্ঞাসা করিল, "লক্ষ্মী কে?"

শঙ্কর লক্ষ্মীর কথা শুনিতে শুনিতে ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া গিয়াছিল, বলিল "লক্ষ্মী কে? লক্ষ্মী-লক্ষ্মী।"

সুকৃতি জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে ক'র্‌বে?"

শঙ্কর মাথা নাড়িয়া সজোরে কহিল, "করি ত ক'র্‌বো, না করি ত না ক'র্‌বো। তাতে কার কি? থাক্‌বো না আর এ বাড়ীতে!"

সুকৃতির মুখ বিকৃত হইল। সে বলিল, "যাবে কোথায়? ঢেঁকি!"

শঙ্কর জ্বলিয়া উঠিয়া কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু থামিয়া গেল।

সুকৃতি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আরও কিছুকাল দেখিয়া বলিল, "আমি সব জানি। পালিয়ে মজা দেখ্‌বে? দেখ্‌বে?" সে দুই এক পদ শঙ্করের দিকে অগ্রসর হইতেই শঙ্কর সঙ্কুচিত হইয়া কোণের দিকে সরিয়া গেল। সুকৃতি তখন দাঁড়াইয়া বলিল, "ঢেঁকি!" ও তারপর প্রস্থান করিল—যাইবার সময় দরজা বন্ধও করিল না। নিতান্তই হতবুদ্ধি ও বিপন্ন হইয়া সময়ের পূর্ব্বেই শঙ্কর ভট্‌চাজের গৃহাভিমুখে গেল।

সেখানে সেই স্ত্রীলোক মোড়া বাহির করিয়া তাহাকে অভ্যস্ত প্রশ্নাদি করার পর শঙ্কর সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটা কথা বল্‌তে পার? আজ হঠাৎ অমন ক'রে চলে যেও না যেন। শুন্‌ছ?"

স্ত্রীলোকটি বিস্ময়বিহ্বল হইয়া মোড়ার উপর বসিয়া পড়িল।

শঙ্কর আপন মনের আবেগে লক্ষ্মী ঘটিত সমস্ত ব্যাপার বর্ণনা করিয়া বলিল, "এখন বল ত আমি কি করি? বাড়ী যাব? কেন রোজ রোজ আমাকে ঢেঁকি বল্‌বে?"

স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া তাহার কথা সমস্ত শুনিল। তার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া সেই গলির পথে অদৃশ্য হইতে গেল। শঙ্কর পিছন হইতে ছুটিয়া গিয়া তাহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, "শোন—বলে যাও! আমার যে বড় ভয় কর্‌ছে এইবার!"

স্ত্রীলোক আবার ফিরিল; বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শঙ্করকে দেখিয়া দেখিয়া শেষে কেবলমাত্র এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। তাহার চক্ষুর দৃষ্টি যেন বহুদূরে চলিয়া গেল—মুখ উদাস বিমর্ষ হইল। শঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া সভয়ে বলিল, "না, না, তুমি যাও। আমি কিছু বলি নি।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই ভট্‌চাজ আবির্ভূত হইল। স্ত্রীলোকটি তাহাকে দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ অপসৃত হইল।

ভট্‌চাজ বলিল, "এই যে এসেছ ত? বাঙ্গালা শিখ্‌লে? বাঙ্গালা কাকে বলে শুন্‌বে

—সম্মুখ সমরে পড়ি বীরবাহু বীরচূড়ামণি—
অকালে গেল যবে যমপুরে—কোন বীরবরে
বরি—রক্ষ সেনাপতি পদে—"

শুন্‌লে ত? ওর নাম বাঙ্গালা। বাঙ্গালা মানে বোধোদয়, চারুপাঠ তৃতীয় ভাগ, আর হেমচন্দ্রের মেঘনাদবধ। ছাত্র-বৃত্তিতে পড়েছি।" ভট্‌চাজ মোড়ার উপর বসিল।

শঙ্কর আজ বিরক্ত হইয়া বলিল, "রোজই এক কথা ভাল লাগে না। পড়্‌বো না আমি বাঙ্গালা।"

ভট্‌চাজ বিস্মিত হইয়া কহিল, "পড়বে না? আচ্ছা শুভঙ্করী কষতে পার? মুখে মুখে কর দেখি:—

জাভাতে চিনি—১০৩ টাকা সওয়া পাঁচ আনা মণ, মাশুল টন পিছু ৫ টাকা সাড়ে তিন আনা, ট্যাকসো ১৭৷৷০ টাকা শত করা—বাজার পড়তা কত হবে? চট্‌ করে বল দেখি।"

শঙ্কর উত্তেজিতভাবে বলিল, "ভট্‌চাজ মশায়, আমার একটা কথা আছে।"

ভট্‌চাজ চুপ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল। শঙ্কর যে তাহার সম্মুখে কথা আছে বলিতে পারে তাহা ভট্‌চাজের যেন কল্পনাতীত।

শঙ্কর বলিল, "আমি বড় ভাবনাতে পড়েছি—তাই আমার কিছু আর ভাল লাগ্‌ছে না—আমি পালাবো।"

ভট্‌চাজ বিস্মিত হইয়া রহিল।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "আপনারা সবাই পাগল নাকি? এত মহা বিপদ দেখ্‌ছি। বুঝ্‌তে পারেন না কথা?"

ভট্‌চাজের মুখে হঠাৎ ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন পরিস্ফুট হইল; তাহার চক্ষু অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া গেল। সে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। শঙ্কর তাহা লক্ষ্য করিয়া মনে মনে ভট্‌চাজের উপর কৃপা অনুভব করিয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাব। না

হয় অন্য কোথায়ও যাব। আমাকে কিছু টাকা দিতে পারেন ? এ পড়াশোনা আমার দ্বারা হবে না।"

বিনোদ ভট্টাচার্য্য উঠিয়া দাঁড়াইল ও আবার মোড়ার উপর বসিল। শঙ্কর বলিল, "আপনাকে ছেড়ে অবশ্য যেতে চাই না। আমার মন্দ লাগে না আপনাকে। কিন্তু এখানে কাকাবাবুর বাড়ীতে বড় উৎপাত হ'য়েছে। সত্যি কি কাকাবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে নাকি ? আমি বিয়ে কি করে করবো ? তার চেয়ে পালাব। আমাকে কিছু টাকা দেবেন ?"

ভট্‌চাজ উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে চক্ষু ঠারিয়া শঙ্করকে বলিলেন, "মিত্তিরজার অনেক টাকা! অনেক অনেক! চেপে থাক পাবে! সব পাবে। ভয় কিসের ? বিয়ে দেবে তাই ? দিলেই বা। আমি ত কত বিয়ে করেছি—একটাও কি বেঁচেছে ভাব্‌ছো ? একটাও না!" সঙ্গে সঙ্গে সে যেন বিগত সমস্ত পত্নীর শোকে অভিভূত হইয়া মাথা নীচু করিল।

শঙ্কর ভট্‌চাজের পত্নীবিয়োগের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "একটাও নেই ? তবে ঐ যে মেয়েটি আছে—ও কে ?"

কিন্তু ভট্‌চাজ তখন পত্নীশোকে এত কাতর যে তাহার কাণে শঙ্করের প্রশ্ন প্রবেশই করিতে পারিল না। সে মাথা নীচু করিয়া বসিয়াই রহিল।

শঙ্কর পুনরায় প্রশ্ন করিল। ভট্‌চাজ মাথা নীচু করিয়াই নিরাশ-কণ্ঠে বলিল, "না, একটাও নেই!"

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, "তবে ও স্ত্রীলোকটি কে ?"

ভট্টাচার্য্য মাথা তুলিয়া বলিল, "ও কে তা আমি কি করে জানবো, বাপু ? সেকথা মিত্তিরজাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। মিত্তিরজা জান্‌তে পারে। আমি ওকে চিনিও না। তুমি বল্‌লেও আমি চিন্‌তে পার্‌বো না।"

শঙ্কর ইহাতেও নিরস্ত হইল না—জিজ্ঞাসা করিল, "এ বাড়ী কার ? এখানে ও কেন আছে ?"

ভট্‌চাজ মাথা নাড়িয়া হতাশভাবে উত্তর দিল, "নাঃ। আমি জানি না কিছু। মিত্তিরজা জানে। সে সব জানে, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো।"

শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে কি প্রশ্ন আর করিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভট্টাচার্য্য অন্যমনা হইয়া বসিয়া বসিয়া শেষে বলিল, "একটাও বাঁচল না, একটাও না। বুঝেছ ? একটাও না। কেউ বাঁচে না, বাঁচে কি ? যদি বাঁচবে তবে মরলো কেন ?"

শঙ্কর উত্তর দিতে পারিল না। ভট্টাচার্য্যকে সে চিরকালই বুঝিতে পারে নাই, এখনও অবোধ্যতা বাড়িয়াই গেল। তাহার মনে হইল ইহাদের এই বাড়ীর কেহই সাধারণ জীবিত মনুষ্য নহে। ইহারা অন্য জগতের প্রাণী। সে কিছুকাল আবার নীরবে অপেক্ষা করিল, যদি ভট্‌চাজ কিছু বলে। কিন্তু ভট্‌চাজ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পত্নীশোক কিছুতেই প্রশমিত হইল না।

শেষে শঙ্করের সেই নীরবতা অসহ্য হইল। সে বলিল, "আমি তবে চল্‌লুম আজ! মিথ্যে দাঁড়িয়ে থাকা!

ভট্‌চাজ মাথা তুলিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "হ্যাঁ, কাল শুভঙ্করী আর শ্লেট এনো—এক মাসেই তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। কিন্তু ঐ যে বল্‌লুম, মিত্তিরজাকে জিজ্ঞাসা করে দেখো, বুঝ্‌লে ? মিত্তিরজা সব জানে আর তার অনেক টাকা—অনেক। তুমি হিসেব ত শিখ্‌বেই—বাঙ্গালাও শিখ্‌বে—এই মাসখানেকের মধ্যেই - তখন সব তোমার হবে।"

শঙ্কর প্রস্থানোদ্যত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত টাকা কোথায় পেলে ?"

বিনোদ আশ্চর্য্যান্বিতের মত উত্তর দিল, "কোথায় পেলে ? জোগাড় করেছে। জোগাড় না করলে টাকা পায় কেউ ? আসলে জোগাড় থাকা চাই। মিত্তিরজার জোগাড় আছে। তোমারও নেই, আমারও নেই। তাই বলি, জোগাড় করে নিতে শিখ্‌তে হবে তোমাকে। চাই কি মিত্তিরজার টাকা তুমিই পাবে শেষে।"

শঙ্কর এই দুর্বোধ্য ভাষার অর্থ বিচার করিতে অক্ষম হইয়া বাড়ী ফিরিল। তাহার এইবার কলিকাতার প্রতি কেমন একটা ভয়ের ভাব হইল। পারিলে হয় ত সে সেই রাত্রেই পলাইত, কিন্তু তাহার নিকট ট্রেণ ভাড়াও ছিল না। সে তাই নটবরের বাড়ীতেই ফিরিল। পরদিন সে ক্ষান্তমণির নিকট হইতে পয়সা লইয়া মুখুয্যেমশায়কে পোষ্টকার্ড লিখিল যে তাহার টাকা নাই, টাকা থাকিলে সে গ্রামে ফিরিতে পারিত। লেখাপড়া সে শিখিতে পারিবে না।

দশম পরিচ্ছেদ—নটবরের ধূর্ত্ততা

দিগ্বিজয় যে সপ্তাহে নটবরের সহিত সাক্ষাত করিয়া আপ্যায়িত হইয়া ফিরিয়াছিল, তারপর সপ্তাহান্তে রবিবার সে মাকে লুকাইয়াই ত্রিশবিবা গেল। সেখানে সংবাদ লইল যে লক্ষ্মী মুখুয্যেমশায়ের গৃহেই আছে। সে মুখুয্যে মশায়ের সহিত সাক্ষাত করিল।

মুখুয্যেমশায় তাহাকে দেখিয়া একটু সন্দিগ্ধ হইলেন। তবু ব্যাপার কি জানিতে কৌতূহল হওয়াতে তিনি দিগ্বিজয়কে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সংবাদ?"

দিগ্বিজয় একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "লক্ষ্মী কি এখানে?"

মুখুয্যেমশায় উত্তর করিলেন, "তা ছাড়া আর কোথায় যাবে? হাজার হোক্, রায় বংশের মেয়েকে আমি ত পথের মধ্যে বার করে দিতে পারি না।"

দিগ্বিজয় আরও একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "কিন্তু শুনেছি নটবর মিত্র নাকি লক্ষ্মীর অছি। তাঁর বাড়ী থেকে লক্ষ্মী পালিয়ে এসেছিল! আপনার কি তাকে গৃহে রাখা উচিত হ'য়েছে?"

মুখুয্যেমশায় অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিলেন না। তিনি প্রবীণ ব্যক্তি—বুঝিলেন ইহার ভিতর একটা চক্রান্ত কোথায় আছে।

উত্তর না পাইয়া দিগ্বিজয় বলিল, "নটবরবাবু আমাকে ভয় দেখিয়ে পত্র দেন—তিনিই আইনসঙ্গত অভিভাবক। আমি দায়মুক্ত হ'তে চাই, তাই জান্‌তে এসেছি লক্ষ্মী এখানে কি না!"

মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "তা বেশ করেছ। লক্ষ্মী এখানেই আছে। নটবর মিত্র যদি প্রয়োজন মনে করে একে নিয়ে যাবে। তাকে ত আমি চিনি।"

দিগ্বিজয় একটু চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; তারপর বলিল, "দেখুন মুখুয্যেমশায়, লক্ষ্মী যে চলে এসেছিল আমাদের বাড়ী থেকে, তা আমি জান্‌তে পারি নি। আমার মা হাজার হোক গৃহকর্ত্রী। আমার এতে কোনও রকম মতামত ছিল না, থাকৃতে পারে না মা বর্ত্তমানে। আমাকে আপনারা দোষী ভাববেন না—এই আমার প্রার্থনা। আমার অধিকার থাকলে আমি লক্ষ্মীকে কখনও আশ্রয় দিতে আদর কোরতে বিমুখ হতুম না। লক্ষ্মীকে একথা বল্‌বেন।"

মুখুয্যেমশায় তাহা বুঝিতে পারেন নাই তাহা নহে; তাই সংক্ষেপে বলিলেন, "তা ত বটেই!"

দিগ্বিজয় বলিল, "তবে যান্, লক্ষ্মীকে বলে আসুন।"

মুখুয্যেমশায় ভাবিলেন, এ ছোক্‌রা পাগল। মুখে বলিলেন, "বল্‌বো—সময়ে বল্‌বো। ব্যস্ততা কিসের?"

দিগ্বিজয় কহিল, "না হোক্, চট্ কোরে বলেই আসুন না। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম, এই ত দুমিনিটও লাগ্‌বে না।"

মুখুয্যেমশায় বিব্রত হইয়া ভিতরে গিয়া লক্ষ্মীকে বলিলেন, "ভাল বিপদ্, লক্ষ্মী! তোর মাসীর ছেলে এসে কি বক্‌ছে যা তা!" লক্ষ্মী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল, "কি বলে?" মুখুয্যে উত্তর দিলেন, "তা কি ছাই বুঝি! এসব ছেলে ছোকরাদের হাবভাব বুঝা দায়!" তিনি ভিতরে একটু বিলম্ব করিয়া আবার বাহিরে গেলেন।

দিগ্বিজয় জিজ্ঞাসা করিল, "বলেছেন?" মুখুয্যে মাথা নাড়িয়া জানাইলেন, "হাঁ।" তখন দিগ্বিজয় আবার বলিল, "আমি যদি কোনও সাহায্য করতে পারি-ত করতে রাজী আছি। একথাও বলে আসুন। যান্, চট্ করে বলে আসুন, আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। দু'মিনিটই লাগ্‌বে বৈ ত না।"

মুখুয্যেমশায় কহিলেন, "তা আগে থেকে বলেছি, বাবাজি! বল্‌তে কিছুই বাকী রাখি নি। বলেছি, তুমি তার জন্য বড় ব্যস্ত হ'য়েছ, তোমার ইচ্ছা লক্ষ্মী তোমাদের বাড়ী গিয়ে থাক্, তুমি ওর জন্য প্রাণ দিতে—রেলগাড়ীতেও কাটা পড়তে পার, পুকুরে ঝাঁপ দিতে পার, গলাতে দড়ি দিতে পার, সব পার। কিছু বাকী রাখি নি।" শুনিয়া দিগ্বিজয় হৃষ্ট হইল। যাইবার সময় কহিয়া গেল, সে আবার আসিবে। মুখুয্যেমশায় বলিলেন, "তার দরকার হবে না, লক্ষ্মী সব বুঝে নিয়েছে—তোমার কথা বুঝ্‌তে কি কারও দেরী লাগে।"

দিগ্বিজয় তখন আবার চাত্‌রাতে ফিরিল। পরদিন সে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নটবরের বাড়ীতে গেল। নটবর প্রথমে দেখা করিতে চাহিলেন না, কিন্তু দিগ্বিজয় বলিয়া পাঠাইল, "খুব দরকার!" নটবর ভাবিলেন লক্ষ্মী

সম্বন্ধে নূতন সংবাদ হয় ত কিছু আছে। তাই নীচে নামিলেন।

দিগ্বিজয় নটবরের নিকট লক্ষ্মীর সন্ধান দিয়া বলিল, "বস্! এইবার ত সন্ধান পেয়েছেন—তবে ব্যবস্থা ক'রে বিয়েটা দিয়ে ফেলুন। আমি তৈরি!"

নটবর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "খবরটা দিয়ে ভালই করলে। আসলে তোমার সঙ্গে বিয়ে দিতে আমার কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু লক্ষ্মীর বিয়ে দেবার কথা হ'য়ে আছে—হরিনারায়ণের ছেলে শঙ্করের সঙ্গে। সে ছেলেও আমার এখানেই আছে। শুধু ছেলেটি অজ্ঞ মূর্খ, গেঁয়ো আর নির্ব্বোধ বলেই এতদিন বিয়ে দিতে দ্বিধা করেছি।"

শুনিয়া দিগ্বিজয়ের মুখ শুষ্ক হইল।

নটবর বলিলেন, "লক্ষ্মীর বাপ ও শঙ্করের বাপ এ বিয়ে দিতে বলে গেছে। না দিলে আমার অন্যায় হবে।"

দিগ্বিজয় মাথা নাড়িয়া বলিল, "কিছু অন্যায় হবে না।"

নটবর বলিলেন, "শঙ্করই সম্ভব লক্ষ্মীকে ভয় দেখিয়েছে, তাই সে পালিয়েছে। সেও সম্ভব শঙ্করকে বিয়ে কোরতে চায় না।"

দিগ্বিজয় উৎসাহিতভাবে বলিল, "কেন চাইবে? তাই পালিয়েছিল, বটে? এইবার সব ঠিক বুঝতে পারছি। তা সেই শঙ্করার সঙ্গে বিয়ে দেবেন না কি?"

নটবর কহিলেন, "ক্ষেপেছ? আমি তা করবো না কিছুতেই। হাত পা বেঁধে তার চেয়ে মেয়েটাকে জলে ফেলা ভাল।" তারপর একটু ভাবিয়া বলিলেন, "হয়ত তোমার হাতেই শেষে দেব। যে রকম তোমার টান্ দেখ্ছি—" দিগ্বিজয় কৃতার্থ হইল। লজ্জিতভাবে বলিল, "আপনার কাছে সব বলাই ভাল। বিবাহ আমি কোরব না কখনও ভেবেছিলাম। তবে সত্যি কথা বলতে কি—লক্ষ্মীকে দেখে পর্য্যন্ত আমার মনে কেমন একটা আকর্ষণ হ'য়েছে—" সে আর যেন বলিতে পারিল না। মনে মনে অনেক কিছুই কল্পনা ও চিন্তা করিয়া নটবর হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, সে বিবেচনা করে দেখা যাবে। তুমি মাঝে মাঝে দেখা করো। শুধু ঐ ছোঁড়াটার জন্য ভাবনা। ওটাকে নিয়ে জ্বালা হ'য়েছে, ও থাকতে লক্ষ্মীকে আনাও বিপদ—আবার কি হবে?"

দিগ্বিজয় শঙ্করের উপর জাতক্রোধ হইল। কিন্তু সে ক্রোধ উপলব্ধির কোনও রকম উপায় হাতে না থাকাতে, সে তাহা সত্ত্বেও আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল। সেই দিন সে মাকে বলিল, "মা, লক্ষ্মীর সঙ্গে যদি বিয়ে দাও ত বিয়ে ক'রবো।"

দিগ্বিজয়ের মা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিলেন, "অত বড় মেয়ে? ঐ মেয়ে? কেন সংসারে কি মেয়ে নেই আর?"

দিগ্বিজয় বলিল, "মেয়ে আবার নেই। কিন্তু বিয়ে ওকেই ক'রবো, না হলে নয়।"

মা কহিলেন, "তবে তোর বিয়ে করা আর হবে না।"

দিগ্বিজয় ইহাতে অসন্তুষ্ট হইল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিল, লক্ষ্মীকেই সে বিবাহ করিবে—নচেৎ নহে। মাকে বলিল, "তবে কুছ্ পরোয়া নেই। দেখা যাবে।"

ওদিকে নটবর কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলা যায় কি না ভাবিতেছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—কলিকাতা যাত্রা

দিগ্বিজয়ের মুখে নটবরের কথা শুনিয়া মুখুয্যেমশায় চিন্তিত হইলেন। ইহার ভিতর যে কি চাল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

ইহারই অনতিপরে তিনি নটবরের এক পত্র পাইলেন। তাহাতে নটবর লিখিয়াছে যে লক্ষ্মীর সহিত শঙ্করের বিবাহে তিনি শঙ্করকে রাজী করাইয়াছেন বহু কষ্টে—পত্র পাঠ মুখুয্যেমশায় যেন লক্ষ্মীকে লইয়া কলিকাতাতে পৌঁছান। বিলম্বে শঙ্করের মনের পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

পত্র পাইয়া মুখুয্যে মশায়ের দুর্ভাবনা বাড়িল বৈ কমিল না। গ্রামের দুই একজন অন্য লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলেন সকলেই তাঁহাকে কলিকাতাতেই যাইতে উপদেশ দিল। তিনি তবুও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। লক্ষ্মীকে ও গৃহিণীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন শেষে।

গৃহিণী কহিলেন, "যাও না, যদি মেয়েটার গতি হয়। তোমাদের মত দু দুটো আস্ত মানুষকে গিলে খাবে না।"

লক্ষ্মী কিছুই স্থির মীমাংসা করিতে পারিল না। তাহার একবার মনে হইল ইহা নটবরের চাল—আবার পরক্ষণেই

মনে হইল, ইহা প্রকৃত ও সরল হইলেও হইতে পারে। নটবর হয় ত সদুদ্দেশ্যেই লক্ষ্মী ও শঙ্করের বিবাহের খরচ নির্ব্বাহ করিতে রাজী হইয়াছেন।

মুখুয্যেও এই কথাই ভাবিলেন। কিন্তু যাত্রার সমস্ত বন্দোবস্ত করার পর শঙ্করের চিঠিও আসিয়া পড়িল। মুখুয্যেমশায় আবার দ্বিমনা হইলেন। গৃহিণী বলিলেন, "এ সন্দেহ বৃথা। অন্তত সে ছেলেটাকেও দেখা হবে—তাকে সঙ্গে করে আন্‌তে পার্‌বে। তারও ত অনিষ্ট হ'তে পারে।"

মুখুয্যেমশায়ও ভাবিলেন, শঙ্করের অনিষ্ট করা সহজ। শঙ্কর নির্বোধ—শিশুর মত সরল। হয় ত নটবর ফাঁকী দিয়া বসতবাড়ী পর্য্যন্তও লিখাইয়া লইতে পারে। এই বিবাহে তাহার এত আগ্রহের হেতু হয় ত তাহাই। কিন্তু তিনি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কোনও গতিকে আহারের সংস্থান হয়, তিনি ধনী নটবরের কি করিবেন? শঙ্করকেই বা কিরূপে রক্ষা করিবেন?

লক্ষ্মী বলিল, "লিখিয়া দিন বিবাহ যদি হয়, তবে এইখানেই হইবে।"

মুখুয্যেমশায় সে যুক্তি গ্রাহ্য করিলেন ও নটবরকে তাহাই উত্তরে লিখিলেন। শঙ্করের চিঠির কোনও উত্তর আপাতত দিলেন না।

তিন দিন পরে নটবরের এক চিঠি আসিল পুনরায়। তাহাতে নটবর লিখিয়াছে, শঙ্কর গ্রামে যাইতে প্রস্তুত নহে, আর তাহার যাওয়াও ঠিক নহে। কলিকাতাতে সে পড়াশুনা করিতেছে। তাহা শেষ হইলেই নটবর তাহার জীবিকার্জ্জনের একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। এ অবস্থাতে মুখুয্যের কি করা উচিত তাহার উল্লেখ করাই বাহুল্য।

লক্ষ্মী ইহাতে বিরক্ত হইল। সোজা বলিল, "এ মিথ্যে কথা!"

মুখুয্যেরও যে সন্দেহ হয় নাই তাহা নহে। কিন্তু অন্য দিকে সম্ভাবনাও প্রচুর। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। গৃহিণী কিন্তু পরামর্শ দিলেন, "যাও! মেয়েটির যদি গতি হয়, অবহেলা করে তা নষ্ট করা উচিত নয়।"

শেষ লক্ষ্মী বলিল, "তবে জ্যেঠামশায় আগে যান, দেখে আসুন কি অবস্থা, তারপর যা করা দরকার করা হবে।"

মুখুয্যেমশায় তাহাও যে না ভাবিয়াছিলেন তাহা নহে। কিন্তু যদি নটবরের পত্র ও উদ্যোগ সত্য হয় তবে তাঁহাকে অত্যন্ত লজ্জাতে পড়িতে হইবে। তিনি নটবরকে কি জবাবদিহি করিবেন?

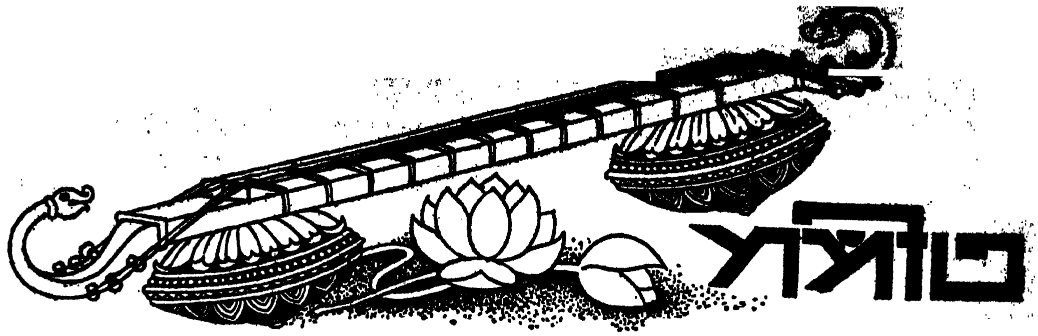
শেষে অনেক বিচার বিতর্কের পর স্থির হইল যে লক্ষ্মীও যাইবে। মুখুয্যেমশায় সঙ্গে থাকিতে ভয় নাই। যদি বিবাহ না ঘটে—তবে মুখুয্যেমশায় লক্ষ্মী ও শঙ্করকে লইয়া গ্রামে ফিরিবেন।

লক্ষ্মী শঙ্করদের বাড়ীতে গিয়া লুকানো টাকা উঠাইয়া আনিল; কেন না দরিদ্র মুখুয্যেমশায়ের ট্রেণ ভাড়ারও সঙ্গতি ছিল না, আর তা ছাড়া বিদেশে-বিভুঁয়ে হাতে কিছু টাকা থাকা ভাল।

তারপর শুভদিন দেখিয়া শুভক্ষণ বাছিয়া 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলিয়া লক্ষ্মীকে লইয়া যাত্রা করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে বিশ্বাসদের মধুকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন যেন সে আসিয়া বন্ধুর বাড়ীর ও মুখুয্যে বাড়ীর উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখে। মুখুয্যে গৃহিণী বার বার বলিয়া দিলেন—যেন কলিকাতাতে পৌছিয়াই পত্র দেওয়া হয়।

সারা রাস্তাতে—কিন্তু লক্ষ্মী ও মুখুয্যেমশায় ইহার আলোচনা হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। নটবর একবার তাহার ও শঙ্করের বিবাহের উদ্যোগী হইয়াছিলেন, মুখুয্যে তাহা জানিতেন, তাই তিনি নটবরের পক্ষে যুক্তি দিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীর কেবল এক অজ্ঞাত আশঙ্কা ব্যতীত কোনও যুক্তি ছিল না, সে তাহা লইয়াই মুখুয্যেমশায়কে যতটা সম্ভব নিরুৎসাহিত করিতে লাগিল। শেষে মুখুয্যে হতাশভাবে বলিলেন, "সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা লক্ষ্মী! তুই ত সরলমতি বালিকা; আর আমিও জন্মে কারও অনিষ্ট চিন্তা করি নি। শঙ্করও করে নি। তবে আমাদের ভগবান রক্ষা করবেন না কেন?"

লক্ষ্মীও ভাবিল, ভগবানের রক্ষা না করিতে আমার কোনও যুক্তি ও কারণ নেই।



কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম

স্বরলিপি জগৎ ঘটক

ভজন

ডাক্‌তে তোমায় পারি যদি
আড়াল থাকতে পারবে না।
এখন আমি ডাকি তোমায়
তখন তুমিই ছাড়বে না॥
যদি দেখা না পাই কভু
সে দোষ তোমার নহে, প্রভু,
সে-সাধনায় আমারই হার,—
স্বামী, তুমি হারবে না॥
বহু লোকের চিন্তাতে মোর—
বহুদিকে মন যে ধায়,
জানি জানি অভিমানী—
পাই নি আজও তাই তোমায়।
বিশ্ব-ভুবন ভুলে যে-দিন
তোমার ধ্যানে হব বিলীন,
সে-দিন আমার বক্ষ হ'তে
চরণ তোমার কাড়বে না॥ *

[র্সা -না ধণা]

II { ধা -া পধর্সণা | ধা পা -া I রগা মা -পা | রা সা -া I
ডা ক্ তে০০০ তো মা য়্ পা রি ০ য দি ০

I স্না সরা -া | রা -া গা I মা ণা ধা | পা -মগা -রা } I
আ ড়া ল্ থা ক্ তে পা র্ বে না ০০ ০

---

* গানখানি শ্রীমান্ নিতাই ঘটক কর্তৃক "টুইনে" রেকর্ড করা হইয়াছে।

I সা ^সরা -া | রপা পা -া I পা পধা -ণধপা | মা মগা -রা I
এ থ ন্ আ ০ মি ০ ডা কি০ ০০০ তো মা০ য়্

I রা রা -গা | মা মপা -া I পা -া পা | ধা -না -সর্রা II [ ]
ত থ ন্ তু মি০ ই ছা ড়্ বে না ০ ০০

II { পা পা -া | পা পনা -ধা I না র্সা -া | র্সা র্সা -নধা I
য দি ০ দে খা০ ০ না পা ই ক ভু ০০

I ধা ^নধা -না | র্সা ^নর্সা -র্রা I না র্সনা -ধা | ধা ণধা -পা } I
সে দো ষ্ তো মা র্ ন হে০ ০ প্র ভু০ ০

I সা র্মা র্গা | র্রা র্সা -া I না র্সনা -ধণা | ধা পা -া I
সে ০ সা ধ না য়্ আ মা০ ০০ রি হা র্

I রা গরা -গা | মা পা -া I পা -া পা | পা -না সর্রা II [ ]
স্বা মী০ ০ তু মি ০ হা র্ বে না ০ ০০

II { ^সন্া সন্সা -ধ্ণ্া | ধ্া প্া -া I প্া রা রা | রা রা -া I
ব হু০০ ০০ লো কে র্ চি ন্ তা তে মো র্

I রা রা -গা | মা পা -া I মা ণা ধপা | মা -গমগা রা I
ব হু ০ দি কে ০ ম ন্ যে০ ধা ০০০ য়্

I রা রা -গা | মা পা -া I ^মগা মগমা -রজ্ঞা | রা সা -া I
জা নি ০ জা নি ০ অ ভি০০ ০০ মা নী ০

I সা র্সা ণা | ধা পা -া I রা ণা ধা | পা -া -া } I
পা ই নি আ জ ও তা ই তো মা ০ য়্

I { পা -া পা | পা ^পনা -ধা I না র্সা -া | র্সা র্সা -নধা I
বি ০ শ্ব ভু ব ন্ ভু লে ০ যে দি ০ন্

I ধা ^নধা -না | র্সা নর্সা -র্রা I না র্সনা -ধা | ধা ণধা -পা } I
তো মা র্ ধ্যা নে ০ হ ব০ ০ বি লী০ ন্

I র্সা র্সর্মা -র্গর্মা | র্রা র্সা -া I না -র্সা ধণা | ধা পা -া I
সে দি০ ০ন্ আ মা র্ ব ০ ক্ষ০ হ' তে ০

I রা গরা -গা | মা পা -া I পা -া পা | ধা -না -সর্রা II II [ ]
চ র০ ণ্ তো মা য় কা ড়্ বে না ০ ০০

বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গ-সংস্কার

শ্রীঅনিলবরণ রায় এম-এ

উচ্চারণ অনুযায়ী বানান (phonetic spelling) প্রবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালা ভাষাকে বৈজ্ঞানিক ও আধুনিক যুগোপযোগী করিবার প্রস্তাব উঠিয়াছে। বাঙ্গালা বর্ণমালা হইতে অনেক বর্ণ ও হরফ বাদ দিলে বাঙ্গালা ভাষা অচল হইয়া পড়ে না, অথচ ছেলে-মেয়েদের ভাষা শিখিবার উপায়টি সুগম হয়, লাইনোটাইপ, মনোটাইপ, টাইপ-রাইটার প্রভৃতি মুদ্রাযন্ত্রের সুবিধা ও ছাপাখানার সৌকর্য্যের সুযোগ ঘটে। তাই প্রস্তাব হইতেছে, ১৪টি স্বরবর্ণের পরিবর্ত্তে কেবলমাত্র অ, আ, ই, উ, এ, ও এই ৬টি থাকিলেই যথেষ্ট এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হইতে ঙ, ঞ, ঞ, ণ, ব, শ, স, ঢ়, ঃ এবং ৎ সহজেই বর্জ্জন করা চলিতে পারে। এই সঙ্গে যদি "হসন্তের হাতিয়ারে ঘুরাইয়া আমরা সমস্ত যুক্তাক্ষরকে নিঃক্ষত্রিয়" করিয়া দিই, তাহা হইলেই বাঙ্গালা ভাষার সংস্কার সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। তখন বাঙ্গালা কথাসকলের কি রকম রূপ হইবে তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্—গ্যান, বিগ্গাঁতা, অস্ত, ভয্য়ঁ, কউষল, অইর্ষ, বইষ্নব, উচ্ছন্ন, ঝুঁখি, বক্তব্য, ভিক্খা, বিদ্বেষ, বিষন্ন, বাংআলী, কউতুক, বৃষারূঢ়্হ ইত্যাদি। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, জননী বঙ্গভাষার এই ভবিষ্য রূপ কল্পনার চক্ষুতে দেখিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে, তখন বুঝিতে হইবে যে তিনি পুরাতন পন্থী—তাঁহার মজ্জাগত জরার জড়তা এবং সঙ্কীর্ণতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া তিনি যদি এই সকল অতি প্রয়োজনীয় সংস্কারও গ্রহণ করিতে না পারেন—তাহা হইলে "আমাদের যে কেবল পেছিয়েই পড়তে হবে তা নয়, জগন্নাথের বিরাট রথচক্রতলে নিষ্পেষিত হ'য়ে মরতে হবে।"

এখন দেখা যাউক এই "অতি প্রয়োজনের" দাবী বাস্তবিকই যুক্তিসহ কি না। প্রথমেই একটা কথা মনে উঠে যে, বর্ণমালার হরফ সংখ্যা হ্রাস করিলেই যদি এই অচল ভাষা এবং অচলায়তন সমাজ সচল হইয়া উঠে, তাহা হইলে আরও একটু বেশী দূর অগ্রসর হইয়া ইহার logical conclusion পর্য্যন্ত যাইতে আপত্তি কি? তামিল ভাষার বর্গের প্রথম বর্ণের দ্বারাই দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের কার্য্য সমাধা হয়। সেখানে "গদাধর" লিখিতে হইলে "কতাতর" লিখিতে হয়—কারণ গ, দ, ধ এ-সব বর্ণের বালাই নাই। "কবি" লিখিতে হইলে লিখিতে হইবে "কপি," "ছবি" হইবে "চপি", "ঠান্‌দিদি" হইবে "টান্‌তিতি"। ইহাতেই তাহারা অভ্যস্ত। "কান্তী" লেখা দেখিলেই তাহারা বুঝিতে পারে ইনি জগতের সেই শ্রেষ্ঠমানব "গান্ধী", তাহাদের কোনই অসুবিধা হয় না! তাহা হইলে বৈদিক আমলের গরুর গাড়ীর মারা কাটানোর ন্যায়, বাঙ্গালা ভাষা হইতেও বর্গের অনাবশ্যক দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণগুলি ছাঁটিয়া ফেলা হউক না কেন? কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, logic বা যুক্তি মানিয়া ভাষা চলে না, ভাষার আছে জীবন্ত গতি, অনেক স্থলে সে নানারূপ খেয়ালের আনন্দ উপভোগ করে, অনেক সময় এমন সব গভীর প্রয়োজন তাহাকে মিটাইতে হয়—মানুষের স্থূল বুদ্ধি তাহার কোনও হিসাবই করিতে পারে না। তাহাকে জোর করিয়া বৈজ্ঞানিক, যৌক্তিক বা যান্ত্রিক করিবার চেষ্টা করিলে তাহার জীবন নিষ্পেষিত হইবারই সম্ভাবনা এবং কোনও জীবন্ত ভাষা এইরূপ অত্যাচার বরদাস্ত করিবে বলিয়া মনে হয় না।

ইংরাজী ভাষাকে এইভাবে সংস্কৃত করিবার আন্দোলন অনেকই হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও ফল হয় নাই। সম্প্রতি Times পত্রিকায় আবার এই প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে, ইংরাজীতে phonetic spelling—উচ্চারণ অনুযায়ী বানান নির্দ্ধারণের প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে বিলাতের অন্যতম বিখ্যাত সাপ্তাহিক New Statesman পত্রিকায় একজন চিন্তাশীল ব্যক্তি যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, পাঠকগণকে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—

"I confess I disliked it at first sight. It seemed to me like a horrible work-house costume being foisted on a noble language. It was an interference with the fine capriciousness, the gay illogicality of nature. It was the thin end of the wedge of science threatening literature."

বর্ত্তমান ইংরাজী বানান শিক্ষা করিতে ছাত্রগণকে যে বেগ পাইতে হয় তাহাতে তাহাদের শিক্ষা ব্যাহত হয়, উচ্চারণ অনুযায়ী বানান প্রবর্ত্তন করিলে ছাত্রগণ প্রায় এক বৎসর সময় বাঁচাইতে পারিবে—এই যুক্তির বিরুদ্ধে উক্ত মনীষী বলিয়াছেন যে যাঁহারা এরূপ যুক্তি উত্থাপন করেন—তাঁহারা স্মৃতিশক্তির অনুশীলনে বর্ত্তমান ইংরাজী বানানের কিরূপ উপযোগিতা—তাহা উপলব্ধি করেন না। যিনি যাহাই বলুন, অল্পবয়সেই স্মৃতিশক্তির অনুশীলন করিতে হয়; আর "niece," "receive," "fuchsia," "phthisis," "apophthegm" প্রভৃতি কথার বানান আয়ত্ত করার দ্বারা যেমন স্মৃতিশক্তির অনুশীলন আরম্ভ হয় এমনটি আর কিসের দ্বারা হইতে পারে? এইরূপ বানান শিক্ষার দ্বারা শুধুই যে স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয় তাহা নহে, নৈতিক চরিত্রগঠনেও সহায়তা হয়। তিনি বলিয়াছেন, "Many a child, having learnt at last to spell "fuchsia," has felt a wave of triumphant self-confidence passing through his being, the ripples from which endure for years. I have known a boy to wear a manlier look as a result of being sure of the spelling of "accommodate." The soul is conscious of a new decisiveness when the mind is made up as to the number of "l's" in "quarrelled."*

প্রচলিত ইংরাজী বানানের বিরুদ্ধে তাঁহার একমাত্র অভিযোগ এই যে, এমন কতকগুলি কথা আছে যাহাদের দুই রকম বানানই চলে। তিনি বলেন, কেবল এই সব স্থানেই বানানের সংস্কার যুক্তিযুক্ত। উচ্চারণ অনুযায়ী বানানের বিরুদ্ধে তাঁহার আর এক আপত্তি এই যে, দেশের সব স্থানে উচ্চারণ এক নহে। "As things are at present the Yorkshireman and the Cockney pronounce a word differently, but spell it the same way." বিভিন্ন স্থানের লোক যদি আপন আপন উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লিখিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে ভাষার জটিলতা বাড়িবে বই কমিবে না। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী বানান প্রবর্ত্তন করিতে চান তাঁহারা এই ইংরাজ মনীষীর আপত্তিগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কি?

বাঙ্গালা ভাষায় হরফ সংখ্যা অধিক বলিয়াই যে ছাপা ইত্যাদির অসুবিধা হয় তাহা ঠিক নহে। কারণ "ইংরাজীতে" ঐ সকল কাজ সুচারুভাবেই চলিতেছে, আর "ইংরাজী" অপেক্ষা এ-বিষয়ে বাঙ্গালার জটিলতা খুব বেশী নহে। বাঙ্গালায় যেমন অনেকগুলি যুক্তাক্ষর আছে, তেমনই ইংরাজীর ন্যায় Capital অক্ষরের বালাই নাই। আবার ইংরাজী ছাপা পুস্তকে যেখানে সেখানে Italics ব্যবহার হয়, তাহাতেও Capital এবং সাধারণ অক্ষরের প্রভেদ আছে। অতএব রোমান-লিপি ও Italics, Capital ও সাধারণ অক্ষর—এই সব ধরিলে ইংরাজী বর্ণমালার সংখ্যাও নিতান্ত কম হইবে না।

যুক্ত অক্ষর বাঙ্গালা ভাষার মজ্জাগত হইয়া পড়িয়াছে, যুক্ত অক্ষর বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের স্বরূপই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। সে কালে ছাপাখানা ছিল না, কাগজের জন্ম হয় নাই, স্থান ও সময় সংক্ষেপ করিবার জন্যই যুক্তাক্ষর সৃষ্টি হইয়াছিল, এ কথা ঠিক নহে। কারণ তামিল ভাষাতে যুক্তাক্ষর নাই, রোমান লিপিতেও যুক্তাক্ষর নাই, কিন্তু এইগুলি ছাপাখানা ও কাগজের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্বেই সৃষ্ট হইয়াছিল। প্রকৃত কথা এই যে, প্রকৃতির এক মূল প্রেরণা হইতেছে অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করা, সেই প্রেরণাতেই দেশে দেশে যুগে যুগে বহু বিচিত্র ভাষার উদ্ভব হইয়াছে, সে-সবকে এক ছাঁচে ঢালিবার প্রয়াস কখনই সুফলপ্রসূ হইবে না। যুক্তাক্ষর ব্যবহার করিলে অল্পপরিসরের মধ্যে, অল্প সময়ে যে অনেক লেখা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সন্‌দেহ" লিখিতে যত স্থান, শ্রম ও সময় লাগে, "সন্দেহ" লিখিতে তাহা অপেক্ষা কম লাগে; বাঙ্গালা ভাষার এই সুবিধাটুকু আমরা কিসের জন্য পরিত্যাগ করিব? যুক্ত অক্ষরকে ধরিয়া বাঙ্গালা সাধারণ ছন্দের মাত্রার যেরূপ হিসাব পাওয়া যায়, এমন আর কিছুতেই সম্ভব নহে। কাশীদাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মেঘনাদবধ কাব্য, রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক কবিদের বহু কবিতা আগাগোড়া চোদ্দ অক্ষরের ছত্রে লেখা। যুক্ত অক্ষরকে ভাঙ্গিয়া দিলে ছত্রে অক্ষরের সংখ্যার সাতিশয় তারতম্য হইবে। এ সম্বন্ধে এখানে বেশী আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। যুক্ত অক্ষর বর্জ্জন করিলে বাঙ্গালা ছন্দের গতি ও রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে, ভাষাও ভিন্ন পথ ধরিবে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে এখনই তাহার জন্য এইরূপ গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করিতে হইবে?

---

* ইহার অনুবাদ করিতে গেলে কৌতুকটির রসভঙ্গ হইবে, অতএব সে চেষ্টা করিলাম না লেখক।

"জ্বলেনি আলো অন্ধকারে"

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্-এ

এলাহাবাদ আসিয়াছিলাম সরকারের চাকুরী নিয়া। চাকুরী টি`কিবে না, টি`কিবে না করিয়া শেষ অবধি টি`কিয়া গেল এবং আজ প্রায় দশ বৎসরে বেশ কায়েমি হইয়া বসিয়া গিয়াছি। বেতন দুইশত টাকা ছাড়াইবে ছাড়াইবে করিতেছে—আমার মত নিঃসঙ্গ একটা লোকের পক্ষে প্রয়োজন এবং যথেষ্টরও বেশী। গাড়োয়ালী চাকরটা রান্নাবান্না হইতে জুতাব্রুশ অবধি সমস্ত কাজ নিঃশব্দে করিয়া যায়—কয় বৎসরে সে আমায় যত্ন করিতে শিখিয়াছে বেশ এবং ইদানীং বিশেষ কোনও অসুবিধা আমার কোনও দিন হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না।

যেখানটায় বাসা লইয়াছি সে জায়গাটার নাম দেখি সহরের বহু আদিম অধিবাসীও জানে না। কিন্তু স্থানটি মন্দ নয়। সামনে খানিকটা ঘেরা জায়গা, মিউনিসি-প্যালিটি পার্ক করিবে বলিয়া মালী লাগাইয়াছে। একপাশে দু'খানা বাড়ীর পরই কর্দ্দমহীন পরিচ্ছন্ন Zero রোড্ সোজা চলিয়াছে। আপিসের ডিপার্টমেণ্ট্যাল্ পরীক্ষা দিতে যাইবার সময়ও ঐ রাস্তার নামটা এক একবার চোখে পড়িয়া হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুততর করিয়া তুলিয়াছে। রাতে—সে কথা ভাবিয়া আজও কোনও কোনও দিন আমোদ পাই।···বাড়ীখানি বেশ। নীচের ঘর দু'খানা ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না বলিলেই চলে, উহারই এক-খানায় বাইসিক্ল্টা শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকে। ওপরের দুখানি ঘর আমি ব্যবহার করি। ঘর দু'খানি কতকটা আধুনিক ধরণেই সজ্জিত। যেটিকে খাবার ঘর করিয়াছি সেটির মধ্যস্থলে ইংরাজি অনুকরণে শুভ্র বস্ত্রাবৃত ডাইনিং টেব্ল্, তাহার উপর ফুলসহ দুইটি ফুলদানি। খাইবার অনতিপূর্ব্বে একখানি শূন্য ডিশে রজতশুভ্র কাঁটা চামচ রাখিয়া দেওয়া হয়। কাচের গেলাস ভিন্ন জল খাই না।···এই ঘরখানিরই একপাশে ছোট্ট খাট্ট ড্রইংরুম বানাইয়াছি। টেব্লের ওপর একটি ছোট্ট সুদৃশ্য ক্যালেণ্ডার, রবীন্দ্রনাথের একখানি ছোট ছবি, গোটা চারেক দামী ঝরণা-কলম, একখানা অক্স্‌ফোর্ড্ কন্সাইজ্ অভিধান, দু'খানা নামহারা মাসের মাসিকপত্র—এই আস্‌বাব। শুইবার ঘরটি বেশ বড়। এক পার্শ্বে নেয়ারের অনতিপ্রশস্ত পালঙ্ক, অপর দিকে বনাতমোড়া টেব্ল্—চারিদিকে চেয়ার, দু'খানা গদি-আঁটা আরামকেদারা, একখানা ডেক্ চেয়ার। ড্রইংরুমের কাজ প্রায় এঘরেও চলে। টেব্লের ওপর ক্ষুদ্র এক টাইমপীস্, খানকয়েক 'সায়েন্‌টিফিক্ য়্যামেরিকন্' ও 'পাঞ্চ্' এলোমেলো ছড়ানো।

সকাল নটা বাজিতেই বাইকে চড়িয়া আপিসের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়ি, বর্ষার দিনে বর্ষাতিটা হাতলের ওপর ঝুলাইয়া দি। যমুনার কূলে ইংরাজ-সুরক্ষিত বিশাল কেল্লার ভিতর একটা ঘরে বসিয়া কাগজে অবিশ্রান্ত কলম চালাইয়া চাকুরী বজায় রাখি। চারিটা বাজিতেই চেয়ার ছাড়িয়া উঠি; তাহার পর বাড়ী আসিয়া দরজায় গাড়ীর ঘণ্টিটা একবার বাজাইয়া দি, গাড়োয়ালি চাকর বাহাদুর আসিয়া বাইক্ ঘরে ঢুকায়। উপরে গিয়া সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া একখানা আরামকুর্শিতে গা এলাইয়া শুইয়া পড়ি, চাকর আসিয়া টেব্ল্ ফ্যান্টা চালাইয়া দেয়। ইহার পর ফলের টুক্‌রা, টম্যাটো ও কিছু মিষ্টান্ন সহযোগে চা পান করিয়া কিছুক্ষণ এস্রাজে ছড়্ টানিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া—হয় য়্যালফ্রেড্ পার্কে গিয়া একটা বেঞ্চে বসিয়া থাকি, নয় ক্লাবে গিয়া ব্রিজ্ খেলি। বাড়ী ফিরিয়া ঘড়ি ধরিয়া ঠিক্ ন'টায় আহারে বসি। আহার সারিয়া কিছু পায়চারি করিবার পর, কোনও দিন আর-একদফা এস্রাজ লইয়া পড়ি, কোনও দিন বা মাসিকপত্র লইয়া ঢিলা পায়জামা পরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়ি।—এই জীবন।···শুইবার পর, বালিশের তলা হইতে বেড্-সুইচ্টি লইয়া টিপিয়া দিয়া ঘর যখন অন্ধকার করিয়া ফেলি, দিবসের কার্য্য-তালিকা হইতে ছুটি পাইয়া তখনই ঠিক্ অবসর-প্রাপ্ত মন আমার—আমাকে বুঝিবার চেষ্টা করে। এই অন্ধকারের প্রথম আভাসেই আমি আমার সত্তা সম্বন্ধে

সম্পূর্ণ সচেতন হই, দিনের আলোয় আমার কোন্ অংশ ঠিক্ যে আমি—তাহা বুঝিবার কোনও উপায় থাকে না,—দেহ কাজ করিয়া যায়, মন কাজে লাগিয়া থাকে। ইহার উপর আর কিছু তখন থাকে না। রাতের আঁধারেই আমি প্রথম আমাকে লইয়া পড়ি। এই একটিমাত্র সময়ে আমার সর্ব্বপ্রথম মনে হয়, এই যে জীবন, এই যে বাঁচিয়া থাকা—ইহা একান্ত অর্থহীন। কি যেন একটা অদ্ভুত রকমের অতৃপ্তি দেহমন বিষাইয়া তুলে।

এক একদিন শীতের রাত্রে, বাহিরে যখন পশ্চিমের প্রচণ্ড শীত সমস্ত শহরখানার বুকের ওপর জাঁকিয়া বসিয়াছে, স্লীপিং স্যুট ও 'কিমনো'র উপর ভারী ওভার-কোট্ চড়াইয়া আরামকুর্শিতে শুইয়া মোটা সিগার ফুঁকিতে ফুঁকিতে 'ল্যাম্বে'র "ড্রীম্ চিল্‌ড্রেন্" পড়িতে থাকি। কিছুদূর পড়িয়া, পড়িতে যেন আর পারি না, চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া থাকি, দুই কোণে জল টলমল করিয়া উঠে, বুকের ভিতরটা অজানা ব্যথায় টন্‌টন্ করিতে থাকে। কি যে অনুভব করি তাহা নিজেই বুঝি না, অপরকে বুঝাইব কি! একটা গভীর অবসাদ দেহমন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, বুকের মধ্যস্থলে অদৃশ্য হস্তে কি এক অতৃপ্তির প্রলেপ পড়িতে থাকে। ইহার পর হয় ত পড়িতেও ভাল লাগে না। বই বন্ধ করিয়া পালঙ্কটার দিকে একবার চোখ ফেরাই, শূন্য শয্যাটা করুণ চোখে চাহিয়া থাকে, যেন আমার অতৃপ্তিতে সেই উৎকণ্ঠিত সঙ্কুচিত। সেই মুহূর্ত্তে আলো নিবাইয়া দিলে শয্যাটা মলিনতর হইয়া উঠে, মনে হয় উহাকে যেন বড় আঘাত দিলাম। কিন্তু কিই বা করিতে পারি! মনের একটি বিশেষ অবস্থায় বিজলীর উজ্জ্বল আলোক একেবারে অসহ্য বোধ হয়। তখন সেই অন্ধকার ঘরে বসিয়া আপনার দুর্নিবার একাকিত্বের সহিত বোঝাপড়া করিবার মত কতকগুলা বিশৃঙ্খল চিন্তা আসিয়া জুটে। শয্যাস্পর্শ করিবার প্রবৃত্তি হয় না; গভীর নিশীথে বিগত ও অনাগত চিন্তার দুইধারায় মন বিপর্য্যস্ত হইয়া উঠে। নিজের নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতার এতবড় উপলব্ধি দিবসের আর কোনও সময়ে আমার কাছে ঘেঁসিতে পারে না।...ইহারই পরক্ষণে শয্যায় দেহভার ন্যস্ত করিলেও শান্তি পাই না। চোখ বুজা বা খুলিয়া থাকায় কোনও প্রভেদ হয় না। কিন্তু মুহূর্ত্তে আমার সমগ্র দৈনন্দিন জীবন সম্পূর্ণ বিস্বাদ বোধ হয়। তখন মনে হয়, এইভাবে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত বিনিদ্র শয্যায় অসহনীয় উদ্বেগে পড়িয়া থাকা ও আপনার চিন্তায় আপনি ক্লান্ত হইয়া কোন্ এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়া—ইহা একেবারে নিরর্থক; প্রভাতে একাকী জাগিয়া দাঁতে পেষ্ট্ ঘসিয়া স্নান করিয়া গাড়োয়ালি চাকরের হাতে রান্না খাইয়া, নিরবশেষ মধ্যাহ্ন কেল্লায় কলম পিষিয়া—অপরাহ্ণে আবার ভৃত্য-দত্ত জলখাবার-চা খাইয়া, বেড়াইয়া, তাস পিটিয়া—এই অত্যন্ত শান্তিতে, অতি-শৃঙ্খলায় যাপিত এই যে জীবন—ইহার মত অর্থহীন বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কিছু থাকিতে পারে না। তখনই—কেবল তখনই মনে হয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে কোথায় একটা সুবিপুল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে; এই ভৃত্যের যত্নের প্রাচুর্য্যের মধ্যে, দৈনন্দিন্ জীবনের সুশৃঙ্খলার আতিশয্যের ভিতর, নিরুদ্বেগের চরমসীমাতেও একটা অতি সুস্পষ্ট বিচ্যুতি ধরা পড়ে। কোথায় কি যেন আরও একটু ঘটিবার ছিল, তাহা ঘটে নাই। যেন অতি সুদৃশ্য, রমণীয় কুসুমসম্ভারে গৃহ ভরিয়া গিয়াছে—অথচ কোথাও সুগন্ধের লেশমাত্র নাই, যেন দগ্ধ মরুর উপর কৃষ্ণমেঘ উড়িয়া গেল, একবিন্দু বৃষ্টিপাত হইল না। প্রয়োজন হিসাবে যাহা পাইতেছি—তাহার উপর পাইবার বা চাহিবার বিশেষ কিছু নাই ইহা নিশ্চয়, অথচ কি যেন অতৃপ্তি! স্পষ্ট করিয়া ভাবিলে হয়ত ধারণা করা যায়! আহার্য্যে রান্নার ত্রুটি কিছু লক্ষ্য হয় না, তথাপি রাতের আঁধারে মনে হয়, ঐ গাড়োয়ালিটার রান্নায় মন ভরিয়া উঠিতেছে না, যেন উহার প্রস্তুত আহার্য্য শুধু আহার্য্যই, খাওয়া যায়—উপভোগ করা যায় না; অথচ উহাকে বলিবারও কিছু নাই। আহারের পরও যে হস্তস্পর্শ মনের ভিতর বহুক্ষণ লাগিয়া থাকিতে পারে, সে কথা উহাকে বুঝাইতে যাওয়ার মত হাস্যকর কিছু হইতে পারে না। আমি কিছু চাকরী ত্যাগ করিবার কথা কল্পনা করি নাই। তথাপি মনে হয়, যতক্ষণ কেল্লার মধ্যে কলম চালাইব ততক্ষণ যদি আর একটি মনের চিন্তার ধারা সমস্ত নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নকে সচকিত করিয়া সুবিশাল দুর্গ প্রাকারের মধ্যস্থ অগণিত গৃহাবরোধ অতিক্রম করিয়া সংখ্যাতীত কক্ষের মধ্যে একটি মাত্র কক্ষের একটি বিশিষ্ট কেদারায় উপবিষ্ট একটি মাত্র প্রাণীর কর্ম্মগতির সহিত কোনও উপায়ে কোনও অদৃশ্যসূত্রে সংযুক্ত থাকিতে পারিত!

টেব্‌ল্ ফ্যান্ যেই খুলুক—বাতাস সেই একই প্রকার সঞ্চালিত হইবে, তথাপি কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহ লইয়া যখন অপরাহ্নে আমার গোসাইটোলার বাসায় ফিরিব—তখন যে ঐ হিন্দুস্থানীটা আসিয়া পাখা খুলিয়া দিবে ও তাহার উর্দ্দু-মিশ্রিত হিন্দী ভাষায় দু একটা আলাপ করিবে—এ চিন্তা, কি জানি কেন, এই মধ্যরাত্রির অতি ঘন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে নিতান্ত কষ্টকর হইয়া উঠে। দিবসের বিরামহীন কর্ম্ম-প্রবাহের মধ্যে রহিয়া রহিয়া একটি সুকোমল হস্তস্পর্শ, একটি সান্নিধ্যের মাধুর্য্য অবিশ্রাম মনের মধ্যে গীত-ঝঙ্কার তুলিবে—এম্‌নি ধরণের একটা বিদ্রোহী কল্পনা, নেশার মত এই গৃহাবরুদ্ধ তমিস্রার মধ্যে আমাকে কিছুতে ঘুমাইতে দেয় না।···আমার এই কাহিনী যিনি পড়িবেন তিনিই হয়ত বলিবেন—এত কবিত্বের কি প্রয়োজন ছিল! ব্যবস্থা ত নিজের হাতেই ছিল। হয়ত ছিল, কিন্তু তথাপি ব্যবস্থা হয় নাই। ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়া আমি নালিশ জানাইতে বসি নাই, কাঁদুনি শুনাইব—ইহাও আমার উদ্দেশ্য নহে।···বস্তুতঃ যে বয়সে সংসার প্রবেশের গোপন ইচ্ছাটা প্রথম জাগিয়াছিল, সে সময়টা কাঁচা চাকরীর শঙ্কা বহিয়া নির্ম্মম অবহেলায় কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার পর নিবৃত্তির পণ কঠিন হইয়া বুকের ভিতর বসিয়া গিয়াছে; কিন্তু তথাপি রাতের অন্ধকার এই-যে মোহ সৃষ্টি করেই—তাকেও অস্বীকার করিবার যো নাই। রজনীর অন্ধকারের এই-যে মায়া—দিবসের সূর্য্যালোকে ইহা সকালবেলার শিশিরের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়, তথাপি নিশীথের এই চিন্তার ধারার কথা না বলিয়াও থাকা যায় না। যাহা ঘটে তাহাই বলিতেছি, যাহা ঘটাইতে পারিতাম সে কথা তুলিয়া লাভ নাই। আমি শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়া দিয়া খালাস যে, নিঃসঙ্গতার সমুদ্র পাড়ি দিয়া, সহস্র বন্ধুর মধ্যে একক থাকিয়া আমাকে জীবন কাটাইতে হইবে।···কিন্তু না, রাতের কাহিনীও বলিয়া দিয়াছি; এবার আর একটা কাহিনী বলিব।

আমার সঙ্গীহীন একাকিত্বকে কিছু সহনীয় করিবার উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে আমার বাড়ীখানার গায়ে-লাগা চার-পাঁচজন বাঙ্গালীযুবকগঠিত মেসটায় গিয়া বসিতাম, গল্প করিতাম। মেসের বাড়ীটা আমার বাড়ীর অত্যন্ত গায়ে-লাগা, এমন কি তাহার বাড়ীর নম্বরটা অবধি আমার বাড়ীর সহিত এক। পোষ্ট্‌ম্যান্ কখনও কখনও চিঠি উল্টাপাল্টা করিয়াছে পর্য্যন্ত। কিন্তু সে কথা যাক্। সেই মেসটা সম্প্রতি উঠিয়া গিয়াছে। আমার আপিসে কাজ-করা রুগ্ন টাইপিষ্ট্ ছোক্‌রাটার সিনেমা ও থিয়েটার সম্বন্ধে অনাবশ্যক আস্ফালন আর কানে আসে না, স্থূলদেহ অতি-অলস কেরাণী বাবুটির অতিরঞ্জিতকাহিনী, বাজে তর্ক, গায়ে পড়িয়া উপদেশ বর্ষণ, অকারণ বিদ্যাজাহির আর শুনিতে হয় না, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে-পড়া ছোক্‌রাটার কম্‌প্লেক্‌স্ ভ্যারিয়েব্‌লের প্রপজীশ্‌ন্ মুখস্থ করার শব্দও আর পাই না। কিন্তু সে জন্য দুঃখ করিবার কিছু দেখি না। আমার বক্তব্য অন্য।···আজ সকাল হইতে ঐ বাড়ীটায় ভাড়াটে আসিবার ভূমিকা মানুষে-টানা 'ঠেলা'য় বোঝাই আস্‌বাব পত্র হইতে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। এখন্ বিকালে আপিস হইতে ফিরিবার পর ঐ বাড়ী হইতেই সমুত্থিত একটা সম্মিলিত কণ্ঠোচ্ছ্বাস মাঝে মাঝে বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। আনমনে উৎকর্ণ হইয়া যাই।···বুঝিলাম, বাঙ্গালী চেঞ্জারের দল। শিশুর কল-কাকলী কানে আসে।···একটা স্বর কানে আসিল; আন্দাজে বোধ হইল কর্ত্তার গলা,···"ওগো শুন্‌চ, এ হতভাগা চাকরত ছাই আমার কথা কিছু বোঝে না, তুমি একটু চেষ্টা করে দেখ না!" তখনই নারীকণ্ঠে ধ্বনি শুনি, "···এই শোনো, গঙ্গারাম, বাবুজী তোমাকে সিঙাড়া আন্‌তে বোলা, তা তোম্ পানিফল কেন লে আয়া?-য়্যাঁ?···য়্যাঁ মর্ মুখপোড়া, চুপ করে থাকে যে!···" এম্‌নি সব ভাসা ভাসা টুক্‌রা টুক্‌রা কথা শুনিতে পাই, আর মনে মনে হাসি।···

কয়েক দিন হইতে বৈকালে একটু একটু মাথা ধরিতে-ছিল, কাল হইতে জ্বরভাব হওয়ায় ডাক্তারের কাছ হইতে ঔষধ আনিয়াছিলাম, বাহাদুর তাহারই একদানা দিয়া গেল। অতঃপর সে আমার মাথায় হাত বুলাইতে বসিল। কেমন যেন ভাল লাগিল না। তাহাকে একটা অজুহাত করিয়া সরাইয়া দিয়া এলোমেলো ভাবিতে লাগিলাম। কি জানি কেন, রাতের মায়ার মত, আজ এই অসময়েও সহসা মনে হইতে লাগিল, বাহাদুর যে ঔষধটা খাওয়াইয়া দিয়া গেল উহাতে কোনো উপকার হওয়া সম্ভব নহে। কেন সম্ভব নহে সে কথা ভাবিয়া কিনারা করা শক্ত। কিন্তু মাথায় তাহার কঠিন করস্পর্শ সহ্য করিতে কেমন যেন

অনিচ্ছা হইল। একটা নির্দ্দয় ঔদাস্যে পাশ ফিরিয়া শুইলাম।·· পাশের বাড়ীর বাবুটির আওয়াজ শুনিলাম,"··· "এখন্ বাপু আমি তোমার কড্‌লিভার অয়েল-ফয়েল খেতে পার্‌ব না।···নাও তোমরা তৈরী হ'য়ে নাও, যমুনার দিকে বেড়াতে যাওয়া যাক্।·· বেড়ানই এখন Best ওষুধ।" স্ত্রীর অনুযোগ শাসন কানে আসে, " খুব হ'যেছে নাও, বাজে তর্ক ক'রো না, শাগ্‌গির খেয়ে নাও, আমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্‌বার সময় নেই। সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যা, কোথায় গেলি ?—তোর বাবাকে কম্‌লানেবু দিয়ে যা।" কিশোরী কণ্ঠে "যাই" শব্দ শুনিলাম। অতঃপর অন্যমনস্ক হইযা পড়ি। ক্রমে ঈষৎ ভয় হইতে থাকে। এ কোন্ নূতন উপদ্রব জুটিল! সকলে মিলিয়া কি অবশেষে আমায় পাগল করিয়া দিবে না কি! জোর করিয়া একটা বাঙ্গালা মাসিক লইয়া বসি।

··রেলিং হইতে ঝুঁকিয়া দেখি, আমার নূতন প্রতিবেশীর দল বেড়াইতে বাহির হইলেন। প্রথমে প্রৌঢ় বয়স্ক কর্ত্তা, তাঁহার পিছনে চাকর একটি বছর ছয়েকের ছেলে ও বছর চারেকের মেয়ের হাত ধরিযা বাহির হইল। ইহার পরেই বাহির হইল তিনটি মেয়ে, প্রথমা বয়স্কা—শাড়ীর প্রান্তভাগ সীমন্তের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিপাটিরূপে বেষ্টন করিয়াছে—ভাবে বুঝিলাম ইনিই গৃহিণী, অপরা উনিশ কুড়ি বৎসর বয়সের অপরিণীতা তরুণী ও তৃতীযা এক কিশোরী—বোধ হইল শেষোক্তার নামই হইবে সন্ধ্যা। সন্ধ্যার দেহের বর্ণে সান্ধ্য শ্যামলিমা কিছু স্পষ্ট সত্য, কিন্তু ঐ তম্বী দেহবল্লরী ঘিরিয়া কৈশোরের উচ্ছলতা যে কি মধুরই দেখাইল—তাহা আর কেমন করিয়া বুঝাই! তরুণীকেও দেখিলাম। কিন্তু তরুণীর রূপ বর্ণনায় আমি অনভিজ্ঞ। কাজেই বিশেষ কিছু বুঝাইতে পারিব না। শকুন্তলাকে কখনও চোখে দেখি নাই, কিন্তু কালিদাসের নাটক পড়িয়াছি। মনে হইল, কণ্বমুনির আশ্রমের গাছ-পালাগুলা অকস্মাৎ যেন ভোজবাজিতে উড়িয়া গিয়াছে, ও পর্ণকুটীরটা কোঠায় পরিণত হইয়া এই গোঁসাইটোলায় হাজির হইয়াছে। তৈলহীন ঘনকৃষ্ণ আকুঞ্চিত কেশদাম সুবিন্যস্ত করা হইয়াছে, ঘাড়ের ঠিক্ উপরেই আনত এলো খোপাটির সংহার করা হইয়াছে, জামার গলাটা কিছু বড় হওয়ার, উন্নত গ্রীবার পশ্চাদ্দেশ হইতে পৃষ্ঠের প্রথম অংশের অপরূপ শুভ্রতা, ভোরবেলার যুঁই ফুলের মত ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। সুকোমল মুখখানি সদ্যঃস্ফুট শ্বেত-পদ্মের মত যৌবনসরসীনীরে টলমল করিতেছে। দীর্ঘ ঋজুদেহ বর্ষাধৌত লতার মত ছলছল করিতেছে। চোখ দুটিতে যেন ভোরবেলাকার স্বপ্ন লাগিয়া রহিয়াছে।···ক্ষুদ্র দলটি কোলাহলের একটা মৃদু কল্লোল তুলিয়া অগ্রসর হইল এবং আমি এই আগতপ্রায় গোধূলির পূর্ব্বমুহূর্ত্তটিতে আমার বিগতপ্রায় যৌবনের জন্য একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আরাম-কুর্শিতে শুইয়া পড়িলাম। যে বয়সে সুন্দরী তরুণীর দর্শনে প্রাণের ভিতর সুরের আগুন জ্বলিয়া উঠে, চতুর্দ্দিকে রঙিন নেশার ঘোর লাগিযা যায়, কল্পনা উন্মত্ত হইয়া উঠে, সে বয়স আমার অনেক দিন পার হইয়া গিয়াছে। তথাপি ঐ অস্তমান সূর্য্যের রক্তিম আভায় চোখের উপর যে একটা স্বপ্ন ভাসিয়া উঠিল—তাহা আবার 'বহুদিন বঞ্চিত অন্তরে সঞ্চিত' কি একটা লুপ্তপ্রায় আবেগকে অকস্মাৎ তরঙ্গায়িত করিয়া তুলিল। আবেশে দেহমনে কেমন যেন একটা শিথিল ভাব আসিযা ওমরের সাকী ও দ্রাক্ষাকুঞ্জের মধ্যে আমার বিহ্বল মনকে ছাড়িয়া দিল। সামনের বর্দ্ধিষ্ণু আমরুৎ গাছটায় অপরাহ্নের আলো ঝিলমিল করিয়া ফিরিতেছিল, এক্কায় চড়িয়া স্কুল হইতে কিছু পূর্ব্বে ফিরিয়া আসা হিন্দুস্থানীদের মেয়েটা তেতলা হইতে চীৎকার করিয়া ভৃত্যের উদ্দেশ্যে বলিতেছিল, " বলদেও, হমারে লিয়ে এক-ঠো ডবল ওযালে কাপিবুক্ লে আনা"। কোন্ একটা নাম-না জানা লোক তাহার কোন্ এক পরিচিতের উদ্দেশ্যে মিহিগলায় প্রশ্নক্ষেপ করিতেছিল, " · কহিয়ে জনাব, কঁহা তশ্‌রিফ লে জা রহেঁ· ?"—এই সমস্ত অতিসাধারণ ঘটনাও আজ আমার চোখে নূতন করিয়া লাগিল, ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাহিরের পানে চাহিয়া একবার উচ্চকণ্ঠে বলি "সমস্ত ভাল লাগিয়াছে", কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই যখন আমার চারিদিকের দেয়ালের দিকে দৃষ্টি পড়িল, মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল।···

···সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বাহাদুরকে আলোক সংযোগে এক পেয়ালা চায়ের ফরমায়েস্ দিয়া একখানা স্বরলিপির বই দেখিতেছিলাম, সহসা উচ্চকিত হইয়া উঠি। "···সত্যি, যমুনার জল কি ঘোর কালো ভাই, কাব্যের



যোধাবাই

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সৈয়দ সাদিগ, আলি মির্জা

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

রঙে মিলে গেছে—না ছোট মাসী ?" ছোট মাসী অর্থাৎ তরুণীব জবাব আসে, " সেত সুখেব কথা বে, তুই হলি এ যুগেব নাবীবেশী শ্রীকৃষ্ণ। " কর্তাব হাস্যস্খলিত কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, " আর ইতু আমাদেব শ্রীবাধা।" তরুণী কি যেন উত্তব কবে—উচ্চহাস্যে চাবিদিক কাঁপিযা উঠে।

এই সব অসংলগ্ন হাস্যালাপে নৈশ বাতাস ভাবী হইয়া উঠে। ক্ষণেকেব জন্য মনে হয়, বাঙ্গালা দেশেই বসিযা আছি। কিন্তু তখনি মসজিদেব নিকটস্থ হাঁফানি বোগী মুসলমানটা ভ্রম ভাঙিযা দিযা কাহাকে যেন উদ্দেশ কবিযা বলে—"আদওবজ্ঞ জনাব, আব্ জুবম্ কে কেযা হালৎ ?" যাহাকে প্রশ্ন কবা হয়, সে লোকটা বোধ কবি পুলীস্ কনষ্টেবল হইবে, ভাবী গলায উত্তব কবে, "খুদা কি ইকওবাল্" অর্থাৎ কিনা খোদাব দযায এখানে খুন খাবাপী প্রভৃতি কিছু কম। কিন্তু এসবে মন যায না। কান পডিযা থাকে পাশেব বাডীতে। কর্তা কথা কন, " সন্ধ্যা তুই প'ডতে বস, তোব মাসীব কাছে ট্রান্‌স্লেশন্ কব। তুমি কি ঈকনমিক্স্ নিযে প'ড়েছ, ইতু ?" ইতু অর্থাৎ তরুণীটি তাচ্ছিল্যেব ভঙ্গিতে জবাব কবে, "হ্যাঁ, কত সুখ। আমি এখন পডতে গেলাম আব কি। বইতে আমি এখন হাত দিচ্ছিনে। কাল সঙ্গম দেখ্‌তে যাব, তাই একবাব বঘুবংশ প'ডতে বসেচি।" অতঃপব সুললিত-কণ্ঠে ছন্দোবিশ্লেষসহযোগে মধুব আবৃত্তি শুনা যায—"ক্বচিৎ খগানাং প্রিযমানসানাং কাদম্বসংসর্গবতীব পঙ্‌ক্তিঃ। অন্যত্র মালা সিতপঙ্কজানাং ইন্দীববৈবুৎখচিতান্তবেব।" অনন্তর কানে আসে, " এই সন্ধ্যা, হাঁ ক'বে শুনচিস্ কি ? কই ট্রান্‌স্লেশন্ হ'ল ?—নিযে আয দেখি।" জবাব শুনি, "আহাঃ। আমাব আব খেযে দেযে কাজ নেই ত, দু'দিন বেডাতে এসে এখন পড়াব বই নিযে বসি আর কি! নিজেব বেলায আঁটিসুটি, পবেব বেলায় দাঁতকপাটি।"—একটা কপট কলহের সুব! এম্‌নি কবিয়া সেদিন অনেক বাত্রি পর্য্যন্ত দুর্ব্বল দেহে জাগিযা থাকিয়া প্রতিবেশীর প্রতি কথায কান দি, জোব কবিযা মনকে টানিয়া রাখিতেও ইচ্ছা করে না। অবশেষে কোন্ এক সময়ে পাশের বাড়ী নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমিও গেলেও ইতু ও সন্ধ্যাব কণ্ঠ স্পষ্ট ধরা যায়, "স্বপনে লোটেছি ছিনু কি মোহে জাগাব বেলা হ'ল।" দেখিতে দেখিতে পাশের বাডী জাগিযা উঠিল। কর্তা বলিলেন, " সঙ্গমে স্নান কববে কে কে ?" একটা সম্মিলিত স্বব ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে। ছোট ছেলেমেযে দুটাও যোগ দেয। গৃহিণী বাধা দিযা বলেন, "এখন ত এখানে কিছুদিন থাকা হচ্চে, নাইবাব তাডা কিসেব ? এব পব একদিন নাইলেই চল্‌বে। আজ শুধু নৌকায বেডিযে আসা হবে।" সঙ্গে সঙ্গেই তাহা স্থিব হইযা যায। একটা টাঙা ও একটা এক্কা একসঙ্গে বওনা হয। আমি উপব হইতে নিঃশব্দে চাহিযা থাকি। আমাব চিন্তা আবাব উদ্দামগতিতে ছুটিতে থাকে। এতদিন এলাহাবাদে আছি, কখনও সঙ্গমে স্নান কবাব কথা ভাবি নাই, সঙ্গম ভাল কবিয়া দেখিযাছি বলিযাও মনে পডে না। বিবাট কুম্ভমেলা—একদিনও ভাল কবিযা দেখি নাই। বাঁধেব উপর হইতে একটা দৃষ্টি দিযা আসিযাছিলাম মাত্র। কিন্তু আজ মনে হইতে লাগিল, এই সঙ্গে আমিও যদি যাইতে পাবিতাম। গঙ্গা-যমুনাব মিলন স্থান দেখিবাব জন্য এত বড আকর্ষণ পূর্ব্বে কোনও দিন অনুভব কবি নাই। মনে হইতে লাগিল, উহাবা ফিবিযা সকলে যখন গঙ্গাব শুভ্র বাবিরাশিব সহিত যমুনাব ঘনকৃষ্ণজলেব সুস্পষ্ট বেখাব কথা হাসিযা গাহিযা আলোচনা কবিবে, আমিও যদি তাহাতে যোগ দিতে পারিতাম ! এমন সময বাহাদুব আসিয়া বলিল, চা তৈযাব।

সেইদিন সন্ধ্যায পাশেব বাডীব সম্বন্ধে নূতন করিয়া আব একবাব সচকিত হইযা উঠিলাম, শঙ্খধ্বনিতে। আজ দশ বৎসব পবে এমন সমযটিতে মঙ্গলশঙ্খেব একটি পুণ্যনিনাদ কানে আসিল—বাঙ্গালাব গৃহকল্যাণীব উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায মাথা নত কবিলাম। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম—একজোডা সুকোমল আবক্ত ওষ্ঠাধর শঙ্খমুখের উপব কাঁপিযা কাঁপিযা উঠিতেছে, ধূপ ধূসব কক্ষগুলি কোন্ পুণ্যলোক সৃষ্টি কবিযাছে। ইহাই বাঙ্গালার গৃহ, বাঙ্গালীর প্রাঙ্গণে সন্ধ্যা এম্‌নি করিযা প্রতিদিন উৎসবের মধ্য দিয়া নামিযা আসে। এই সুমধুর নিষ্ঠাটি ভারতের আর কোথাও দেখিযাছি বলিযা মনে হয় না। তাই বিদেশেই ইহা বেশী

মধুর লাগে।···অতঃপর আমার নূতন প্রতিবেশীর সহিত আলাপ করিব স্থির করিয়া বাহির হইলাম।

কয়দিনেই আমার প্রতিবেশী নন্দবাবুর গৃহে আমি আপনার হইয়া উঠিলাম। বিদেশে বেড়াইতে বাহির হইয়া বাঙ্গালী পরিবারের উদারতা একটা দেখিবার বস্তু। ক্রমে এমন হইয়া গেল যে, আমার প্রতিদিনের প্রভাত ও সন্ধ্যা এবং রবিবারের মধ্যাহ্নগুলা নন্দবাবুর বাড়ীতে কাটানো যেন একটা অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গেল।···স্বচ্ছ, সরল, নিরহঙ্কার লোক নন্দবাবু, তেমনি তাঁহার স্ত্রী—গুণের বর্ণনা লিখিয়া শেষ করা যায় না। উঁহাদের বাড়ীতে যে সমস্ত সম্পর্কগুলা পাতানো গেল—সেগুলা কিছু অদ্ভুত। নন্দবাবুকে আমি বলিলাম দাদা, তাঁহার পত্নীকে বৌদি এবং সেই সূত্রে ছেলেমেয়েরা আমায় কাকাবাবু বলিল; ওদিকে ইতু আমাকে বলিল দাদা—আমিও তাহাকে ইতু বলিয়াই ডাকিলাম।

কত কথাই না চলে।—বাঙ্গালা দেশের, কলকাতার;—আমার সমগ্র ভারতভ্রমণের গল্প, এলাহাবাদে সুদীর্ঘ কঠিন নির্ব্বাসনের করুণ কাহিনী।···ইতুর সহিত আলাপ অপেক্ষা আলোচনাই চলে অধিক। সে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স পড়ে, আমিও ঐ বিষয়েরই ছাত্র ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ অবধি। কাজেই আলোচনার স্পীড্ লিমিট্ মনের প্রহরীরা ঠিক রাখিতে পারে না।···ইতু হয়ত প্রশ্ন করে, "দাদা, ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসিক যে ড্যানিয়েল্ ডীফোকে বলা হয়—তা তাঁর বই কি ঠিক উপন্যাস?" উত্তর করি, "ঠিক্ প্রথম ঔপন্যাসিক হিসাবে বোধ হয় ডীফোর নাম করা যুক্তিযুক্ত নয়; তুমি 'লঙে'র বইতেও পাবে স্যামুয়েল রিচার্ডসনের 'পামেলো'র নাম।" ইতু ভাবিয়া বলে, "হাঁ মনে হচ্চে যেন।·· দেখচেন কি ভুলো মন! এখন্ ঠিক্ মনে পড়চে, ডক্টর রয়ও ক্লাসে তাই বলেছিলেন।···আমি লিট্‌রেচারের পেপারটা নিয়ে মুস্কিলে পড়েচি। কি করা যায় বলুন ত? কার বই 'ফলো' করব, তাই আজ অবধি স্থির করতে পারলুম না। আচ্ছা 'কম্পটন্ রিকেট' পড়ব, না 'সেণ্ট্‌স্‌বেরি', না শুধু 'লং'?" উত্তর করিলাম, "দেখ রিকেট এম্-এতে পড়াই ভাল। আর আমি ত লঙের বড় ভক্ত।—সঙ্গে আর দুএকখানা ছোট খাটো বই—এই যথেষ্ট, আর ক্যাজামিয়ার বইও একটু আধটু দেখতে পার—তবে কিনা বই-বিভ্রাট করে ফেলো না।—প্রোফেসরের পরামর্শ না নিয়ে কোনও বইই ছুঁয়ো না।···আর বি-এতে কেম্‌ব্রিজ হিষ্ট্রি থেকে নোট নেওয়া আমি খুব 'পেয়িং' বলে মনে করি নে।"···আবার হয়ত প্রশ্ন হয়, "ল্যাংগোয়েজের জন্য কার বই পড়ব, বলুন দেখি—লাউন্স্‌বেরি—না অটো ইয়েস্‌পার্স্‌ন্?" জবাব দি, "আমি শেষেরটারই পক্ষপাতী।"···এমনি পড়া-শুনোর কথাই চলে বেশীর ভাগ, দৈবাৎ দুটো একটা ফিল্মের কথা, অথবা কন্টিনেণ্ট্যল্ অথার সম্বন্ধে আলোচনা বা কলেজের অধ্যাপকদের কোনও সরস কাহিনী।···নন্দবাবু নিজেও ইংরেজি এবং দর্শন শাস্ত্রে বেশ জ্ঞানী। আর সত্য সত্যই নিজে যথার্থ জ্ঞানী না হইলে কেহ কখনও মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হন না। তিনিও ইতুর আমার আলোচনায় বেশ যোগ দেন। তাঁহার গৃহিণী কলেজে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন; কিন্তু তিনি শ্রোতা হিসাবেই বসিয়া থাকেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও কদাচ দু' একটা কথা বলেন। সন্ধ্যা আসিয়া কেবল আর, এল্, ষ্টীভেন্‌সনের আজগুবি গল্পগুলা শুনিতে ঝোঁক ধরে।

কোনও দিন অপরাহ্ণে হয়ত গিয়া দেখি, নন্দবাবু তাঁহার শিশু পুত্রকন্যাদের সহিত নিজেও শিশু সাজিয়া সূতায় ঢিল বাঁধিয়া 'লংগর' লড়িতেছেন ও তাহাদেরই মত অস্বাভাবিক উচ্চ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া জয় পরাজয় ঘোষণা করিতেছেন। দেখিয়া আমার চক্ষু যেন জুড়াইয়া যায়, তৃপ্তিতে সমস্ত অঙ্গ যেন ভরিয়া যায়। নন্দবাবু হয়ত আমাকে দেখিয়া ঈষৎ লজ্জিত ও বিব্রত হন। আমি তাঁহার বিব্রত ভাব উপেক্ষা করিয়া তাঁহারই সূতা ও ঢিল লইয়া সমান আস্ফালনে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই। আমার জীবনের একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দের প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করি ও একটা অক্লান্ত উন্মাদনায় মাতিয়া যাই। নন্দবাবু, তাঁহার পত্নী, ইতু, সন্ধ্যা প্রত্যেকে অত্যন্ত তৃপ্তিসহকারে সহাস্যে আমার কাণ্ড দেখেন। আমার গাড়োয়ালি চাকর বাহাদুরটা অবধি বিস্মিতদৃষ্টিতে ঘন ঘন উঁকি মারিয়া যায়। বাড়ী আসিয়া মনে হয় সকলে হয়ত আমার নিদারুণ নিঃসঙ্গতায় করুণা করিয়াই শিশুদের সহিত আমার খেলা অতখানি তৃপ্তির সহিত উপভোগ করিয়াছে। করুক, ক্ষতি নাই। এই অতি ক্ষুদ্র ঘটনাই আমার জীবনের আকাশের দিক্-দিগন্ত অবধি দীর্ঘকাল উদ্ভাসিত করিয়া রাখিবে। করুণাই হউক্ বা অন্য যাহাই হউক্, আমার নবীন প্রতিবেশী আজ

আমাকে যে অনাস্বাদিতপূর্ব্ব আনন্দের অধিকার দিয়াছেন তাহার জন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম এবং মনে মনে সেই কথাই উপরের ঐ নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের কাছে জানাইয়া যেন নিশ্চিন্ত হইলাম।

ছুটির দিনে সকলকে সহরের নানা স্থান ঘুরাইয়া আনি,—কোনও দিন বিশ্ববিদ্যালয়, সায়েন্স্ কলেজ, ডক্টর সাহার বাড়ী, মতিলাল নেহেরুর বাসভবন প্রভৃতি—কোনও দিন বা খসরুবাগ, কেল্লা, ক্রস্থয়েট কলেজ ইত্যাদি।···ইতু ও সন্ধ্যা যখন তখন আমার বাসায় আসিয়া অর্গ্যানটার চাবি টিপিয়া নানান্ সুরের গান গাহিয়া, গ্রামোফোনের রেকর্ড-গুলা যদিচ্ছা বাজাইয়া—আমার অন্তর মধুতে কানায় কানায় ভরিয়া দিয়া চলিয়া যায়। আর আমি এক অপরূপ স্বপ্ন-লোকে বসিয়া আমার রাত্রি ও দিনগুলা গভীর তৃপ্তিতে কাটাইয়া দি। মনে হইতে থাকে এই দুটা চোখে চারিদিকে যাহা কিছু দেখিতেছি তাহাই নূতন ও অপূর্ব্ব। আপাততঃ এই জীবন।

প্রায় প্রতি রবিবারেই নন্দবাবুর বাড়ী মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ থাকে—তা ছাড়া যখন তখন চা পান ত আছেই। এখন হইতে আমার আহারের ও জীবনের স্বাদ একেবারে বদলাইয়া গেল। একটুখানি চা খাওয়ার মধ্যে, দুটা ফল ও মিষ্টান্ন চর্ব্বণের ভিতর যে এতখানি আনন্দ নিহিত থাকিতে পারে, ইহা পূর্ব্বে কোনও দিন কল্পনা করি নাই। অন্ন-ব্যঞ্জন যে কেবলমাত্র করস্পর্শে অমৃত হইয়া উঠিতে পারে, ইহা ধারণা করাও আমার মত দীর্ঘ-প্রবাসীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। এমন্ কি বহুকাল পরে রসনায় আমার গাড়োয়ালি চাকরের রান্নার স্বাদও অকস্মাৎ যেন মধুর লাগিল।

আপিসে সমস্তক্ষণ মনের ভিতর যেন গান বাজিতে থাকে। অদূরে কেল্লার সাহেবের কোয়ার্টার হইতে শব্দহীন মধ্যাহ্নে পিয়ানোর ধ্বনি কানে যেন মধু ঢালিয়া দেয়। বস্তুতঃ মধ্যদিনে পাখী যখন গান বন্ধ করিয়া দিয়াছে, চারিদিকে অলস রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, কচিৎ নিস্তরঙ্গ যমুনার বুকে দাঁড় টানার দু'একটা আওয়াজ উঠিতেছে—ঠিক্ সেই সময়টিকে পিয়ানো শুনিবার একটি অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত বলিয়া ইহার পূর্ব্বে কোনও দিন মনে হয় নাই। আপিসের কাজে এমন একটা অদৃষ্টপূর্ব্ব উৎসাহ আসিল, যাহা পূর্ব্বকার ঔদাস্যের বিপরীত। ইদানীং আমার স্বভাবটা কেমন যেন খিটখিটে হইয়া গিয়াছিল, সহসা সেখানে এমন একটা উদারতা আসিয়া ইহাকে রসসিক্ত করিয়া দিল যে আমার আপিসের কেরাণী ও আরদালিরাও তাহা লক্ষ্য না করিয়া পারিল না। শহরের বুকের উপর দিয়া ই, আই, আরের ট্রেণের গমনাগমন, ক্রস্থয়েট কলেজের বাসের দৌড় ও ক্ষণে ক্ষণে গতিরোধ, দলে দলে মহারাষ্ট্রীয় মেয়েদের হাতে হাত দিয়া নিঃশঙ্ক ভ্রমণ, সংখ্যাতীত এক্কার ঘর্ঘর ও টাঙ্গার বিদ্যুদ্‌গতি ধাবন—এই সমস্ত অতি পুরাতন একঘেয়ে ঘটনা আমার চোখে সম্প্রতি নূতনতর হইয়া উঠিল। সমস্তই স্থির আছে, কোথাও কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই, ইহা নিশ্চয়; তথাপি যখন অপরাহ্নের ম্লান আলোয় পিচ্ ঢালা রাস্তার উপর দিয়া বাইসিক্ল চালাইয়া নিঃশব্দে ফিরিতাম তখন সহসা চারিদিকের সমস্ত কিছুই বড় সুন্দর ও সার্থক দেখিতাম, গৃহে ফিরিবার জন্য একটা অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ অনুভব করিতাম। আমার বাসার সম্মুখবর্ত্তী অসম্পূর্ণ পার্কটার পাশ দিয়া যখন বাঁক ঘুরিতাম—তখনই চোখে পড়িত প্রতি-বেশীদের দোতালার বারান্দা হইতে অনেকগুলা চোখ এই দিকে তাকাইয়া আছে। ছোট ছেলে মেয়ে দুটা নিমেষে নীচে নামিয়া আসিত এবং দুটাকেই একবার বাইকে চড়াইয়া 'বেল্' বাজাইয়া ঠেলিতে হইত। ইহার পর আমার চায়ের টেবিলে দুইটি অতিরিক্ত প্রাণীর স্থান করা হইত ও আহার্য্যের বস্তু সেই অনুপাতে কিছু না বাড়াইলেই চলিত না। অতঃপর আহার ও কাকাবাবুর সহিত ইহাদের বহু আধুনিক ও পৌরাণিক আলোচনা চলিত। ছোট তরফ হইতে মাঝে মাঝে যে প্রকার প্রশ্নক্ষেপ হইত তাহা আজ পর্য্যন্ত কোনও 'ক্রিটিকে'র রচনায় পাওয়া যায় নাই এবং ইহারই জবাব যোগাইবার ভার পড়িত আমার উপর। অনন্তর ইতু ও সন্ধ্যা আসিলে হয়ত একটু গ্রামোফোন বাজানো হইত, নয় এস্রাজ চলিত, নয়ত উহাদের কাহাকেও অর্গ্যানে বসাইয়া দিতাম, নতুবা হয়ত দল বাঁধিয়া বেড়াইতে বাহির হইতাম। ফিরিয়া আসিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গল্প-গুজব, গান, হাস্যকৌতুক প্রভৃতি চলিত এবং বাঙ্গালা-দেশ হইতে ন্যূনাধিক আড়াইশত ক্রোশ দূরে এক বাঙ্গালী পরিবারের মধ্যে বসিয়া আমি বাঙ্গালার নাড়ীস্পন্দন অনুভব করিতাম।···

কি একটা ছুটির দিনের পূর্ব্ব রাত্রে নন্দবাবুর বাড়ী গিয়া সকলের সম্মুখে অভিনয়ের ভঙ্গিতে যুক্তকরে কহিলাম, "কাল মধ্যাহ্নভোজনের জন্য অনুগ্রহ করিয়া যদি এ দরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করেন ইত্যাদি···।" নন্দবাবু সহাস্যে বলিলেন, "গৃহ কোথায় পেলেন? 'গৃহিণী গৃহমুচ্যতে'—তা আপনার ত গৃহের বালাই নেই।" হাসিয়া জবাব দিলাম, "সে কথা অবশ্য সত্য। তবে আমার গাড়োয়ালি 'মহারাজে'র রান্না খাওয়াব বলেই যেতে বলচিনে। এ বিষয়ে আমার নিজের নৈপুণ্য প্রমাণ করব; ইতুর বিদ্রূপ ও সন্ধ্যার অবিশ্বাসের হাসির কাল জবাব দেব। আর বৌদি —পান্তুয়া, বরফি, ছানার পায়স—এগুলো আমার নিজের হাতের তৈরী কিনা পরখ করবার জন্য না হয় ডিটেক্‌টিভ্ লাগাবেন।···হাস্‌চেন হাসুন। কিন্তু সত্যি সত্যি নেমন্তন্নটাকে যেন হাসির মনে করবেন না। কাল সকলে নিশ্চয় যাবেন।"

এই ছুটির দিনটা আমার কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া বুঝানো যায় না।—যেন একটা স্বপ্নের মধ্য দিয়া দণ্ড, পল, মুহূর্ত্তগুলি সমান তালে পা ফেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে। আজও সেকথা মনে উদয় হইবামাত্র চোখে নূতন করিয়া যেন একটা স্বপ্ন লাগিয়া যায়, তা সে নিশীথের কর্ম্মহীন অবসরেই হউক, আর আপিসের কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যেই হউক্। বস্তুতঃ সেদিনকার আহারটা একটা অছিলা ছিল মাত্র—বনভোজনের মত। যাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সেদিন আহারের উৎসব করিয়াছি তাহারাই ছিল সেদিনের প্রধান উপলক্ষ্য। আহারের সময় সেই যে সেদিন ইতু—শিশুদের ও সন্ধ্যার আহার্য্য বস্তু ক্রমাগত লুকাইয়া ও চুরির অভিনয় করিয়া কাড়িয়া খাইয়া একটা সুমধুর হট্টগোলের সৃষ্টি করিয়াছিল—ইহাতে সেদিন যে অপরূপ উৎসবের প্রকাশ হইয়াছিল—বিজলিবাতী জ্বালাইয়া ও ইংরেজি বাজনা বাজাইয়া—তাহার সমতুল্য উৎসব কোনওক্রমেই সম্ভব নহে। তাহার সেদিনের সে পলাতকা ঝর্ণার চাঞ্চল্য—সামান্য কথাতেই সুদীর্ঘ উজ্জ্বল উচ্ছ্বসিত হাসি সে যেন এক দুর্লভ আবির্ভাব। আমার জীবনে অনুরূপ সঙ্গলাভ পূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। যে প্রকার নারীর সহিত আমার পূর্ব্বতন পরিচয় ছিল সে অভিজ্ঞতার মধ্যে আর যাহা কিছুই থাক্—গল্প করিবার কিছু যে ছিল না তাহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি। আপিসের যে শ্রেণীর জীব আমাকে তাঁহাদের সঙ্গসুখ দিয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিলেই চলিবে যে আপনাদের শুনাইবার মত কিছু নাই। বস্তুতঃ আমার নিঃসঙ্গ জীবনের মূলে যে আমারই পরিপার্শ্বস্থ পরিচিত ও অপরিচিতদের বিবাহিত জীবনের দৃষ্টান্তগুলা এক একটা সতর্কতার সঙ্কেতের মত হইয়া রহিয়াছে—হয়ত কোন্ অসাবধান মুহূর্ত্তে সেই কথাই বলিয়া ফেলিব। সুতরাং সে সব কথা থাক্। হাঁ, তাহার পর কি বলিতেছিলাম! সেই নিমন্ত্রণের দিনটার কথা। তা যাহা বলিবার ছিল বলিয়া দিয়াছি, আর যাহা বলিতে পারিলাম না তাহা যে ইচ্ছা করিয়া বাদ দিলাম তাহা নয়, বলিবার মত ভাষা আমার নাই। তবে একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি—সেদিন আমার রন্ধন-নৈপুণ্যের প্রমাণদানে বাধা পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ ইতু ও সন্ধ্যা—শেষ অবধি বৌদি পর্য্যন্ত আসিয়া আমার হাতের কাজ কাড়িয়া লইয়াছিলেন এবং বাহাদুর জল তুলিয়া মসলা জোগাইয়া সাহায্য করিয়াছিল মাত্র। অর্থাৎ সংক্ষেপে—নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম আমি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমিই নিমন্ত্রিত বনিয়া গিয়াছিলাম।

ইহারই পরের দিন, অপরাহ্নে যখন আপিস হইতে ফিরিবার উদ্যোগ করিতেছি, যমুনার উপর আকাশ তখন মেঘে কাল হইয়া উঠিয়াছে, পশ্চিমের নববর্ষা দিগন্তে ছায়া-উত্তরীয় মেলিয়া ধরিয়াছে এবং আসন্ন বর্ষণের ইঙ্গিতে স্তিমিত বাতাসে পৃথিবী একটা অস্বাভাবিক নিশ্চলতার মূর্ত্তি ধরিয়াছে। ফিরিবার পথে কিছু দ্রুত পা চালাইতে ছিলাম। প্রথম পথের নির্জ্জনতার মধ্যে আমার দুই চাকার গাড়ীখানা যেন একটা মৃদু সঙ্গীতলহরী তুলিয়া চলিতেছিল। কতদিন কবিতার মুখদর্শন করি নাই, আজ মনে করিতেছিলাম ফিরিয়াই চয়নিকা খুলিব।—সেই—"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী···"।

অস্ফুট গুঞ্জনে আমার ধাবমান দ্বিচক্র-যান-চক্রের গীতচ্ছন্দে আবৃত্তি করিয়া চলিলাম—

"আজিকে এমন দিনে শুধু পড়ে মনে
সেই দিবা—অভিসার
পাগলিনী রাধিকার
না জানি সে কবে কার দূর বৃন্দাবনে।"

বাসাতেই ফিরিতেই কিন্তু বুকটা অকস্মাৎ ছাঁত করিয়া উঠিল। প্রতিবেশীদের গৃহ আজ নিস্তব্ধ কেন? এই কয়মাসে আফিস-ফেরত—উহাদের প্রতীক্ষা ও তদনন্তর সাহচর্য্য—আমার এমনই অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে আমি প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিলাম যে উহারা আমার কেহ নহে এবং এখানে চিরকাল থাকিতেও আসে নাই। এমনই বিচ্ছেদ একদিন নগ্নমূর্ত্তিতে আসিয়া দেখা দিবেই; আর আমার দৈনন্দিন জীবন 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' আমরণ চলিবে। আমার প্রতিবাসীদের এই যে এলাহাবাদ আসা ও আমার প্রবাস জীবন কৃতার্থ করিয়া তুলা—ইহা যে একটা নিতান্ত দৈবাধীন ঘটনা এবং আমার নিঃসঙ্গ জীবনই যে একমাত্র নিয়মিত সত্য—ইহা কয়মাসে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলাম। তাই আজ যখন এ বিষয়ে সহসা সচেতন হইতে হইল, তখনই অন্তরটা ধক্ করিয়া উঠিল। মনে হইল, আজিকার এই অনুপস্থিতিটাই যেন একটা দৈবাধীন ব্যতিক্রম। কিন্তু এ কল্পনা যে বাতুলতা তাহাও বুঝি। তথাপি তাহাদের এই আকস্মিক অনুপস্থিতিতে কেমন যেন বিরক্তি বোধ হয়—সম্ভব নিজেরই উপর। অল্প বিশ্রামের পর সভয়ে চিন্তা করি, মনের এই যে অবস্থা ইহা সত্যই বিরক্তি ত—অভিমান নয় ত! বস্তুতঃ বিরক্তি হইলেও ক্ষমা করা যায়; কিন্তু অভিমান? কাহার উপর অভিমান করিব? তাহারা আমার কে?

আকাশ আর মেঘভার সহ্য করিতে পারিতেছে না, নিম্নে ধরণী তার ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিল বলিয়া। "মেঘদূত" পড়িবার সময়; কিন্তু বিস্বাদ লাগিতেছে।…এস্রাজে একটা মল্লার বাজাইতে বসিলাম; বাদল বাউলের একতারা তখন সুরু হইয়া গিয়াছে। মনটা হঠাৎ খুশী হইয়া উঠিল। চয়নিকা খুলিলাম—

"এমন দিনে তারে বলা যায়।
এখন ঘন ঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে
বাদল ঝরঝরে
তপন হীন ঘন তমসায়।"

মনের মধ্যে শতসুর গুঞ্জরিত হইয়া উঠে—

"সমাজ, সংসার মিছে সব।
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে
আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব॥"

পড়িয়া যেন মাতাল হইয়া যাই; চীৎকার করিয়া পড়ি,

"ওগো প্রাসাদের শিখরে আজিকে
কে দিয়েছে কেশ এলায়ে,
কবরী এলায়ে……"।

বাহাদুর বোধহয় তাহার প্রভুর রকমে কিছু বিস্মিত হয়; আমার কিন্তু গ্রাহ্য নাই।—কবিতার পর কবিতা পড়িয়া যাই। এতদিনের রুদ্ধ আবেগ আজ একেবারে উথলিয়া উঠে। শেলির 'এপিসাইকীডিয়ান্' পড়িব না কি—"Emily, I love thee…", না—"Ode to west wind", না—ব্রাউনিঙের "লাষ্ট্ রাইড্ টুগ্যেদ্র্"! বাহিরে অজস্র বারিবর্ষণ, মনের মধ্যে কাব্যের বর্ষণ। ঠিক্ এমন্ সময়টিতে বাহিরে গাড়ী প্রবেশের শব্দ ও একটা সম্মিলিত কলধ্বনি শুনিলাম। বুঝিলাম আমার প্রতিবাসীরা ফিরিলেন। এইবার উঠিয়া উঁহাদেরই বাড়ী যাইবার কথা ভাবিতেছি, এমন্ সময় সিঁড়িতে চটাপট্ খটাখট্ জুতার শব্দের তরঙ্গ তুলিয়া অত্যুচ্চকণ্ঠে সমস্বরে বর্ষার গান গাহিতে গাহিতে গায়ে ভারী বর্ষাতি চড়াইয়া উপস্থিত হইল—ইতু ও সন্ধ্যা। ইহাদের এই আকস্মিক আবির্ভাবটুকু এই বর্ষণমুখর বাদল-সায়াহ্নে আমার চোখে কি অপূর্ব্বই লাগিল!…দুজনে বর্ষাতিটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হাসিমুখে বাহাদুরকে ডাক দিয়া চায়ের ফরমায়েস করিল। ইতিপূর্ব্বে গাড়োয়ালীটাকে আমার বহু আপ্যায়নে অনেক মিষ্টি সুরে বহুবার আনন্দিত হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই চা বানাইবার আদেশ মিলার পর তাহার মুখের উপর যে-একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তির, একটা গভীর কৃতার্থতার ভাব দেখিলাম তাহা পূর্ব্বে কোনও দিন দেখি নাই—সে কথা শপথ করিয়া বলিতে পারি। সে আমার নোকর—আমার অতিথির হুকুমে তাহার এই 'ধন্যোহং কৃতকৃত্যোহং' ভাব কর্ত্তব্যের দিক দিয়া কতটা স্বাভাবিক হইয়াছে জানি না, কিন্তু তাহার এই অনির্ব্বচনীয় ভাব নিজেও কতকটা উপলব্ধি করিয়াছি বলিয়া সে কথার উল্লেখ করিলাম। মনে হইল, আমিও যদি আজ একটা হুকুম পাই ত সত্যই ধন্য হইয়া

যাই।···ইতু লাফাইয়া উঠিল, "চয়নিকা! গুড্ হেভ্ন্স্! দেখি, দেখি···।" বর্ষার কবিতাগুলা আর একবার করিয়া পড়া হয়। অনন্তর তাহারা দুইজনে গলা মিলাইয়া উচ্চকণ্ঠে গান ধরে, "বহুযুগের ওপর হতে আষাঢ় এল আমার মনে" —আমি সঙ্গে এস্রাজ বাজাই। তারপর আমি আর একটা সুর বাজাই, "এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।" ইতুর চঞ্চলতা কেমন যেন পড়িয়া আসে, আনমনা হইয়া যায়। সন্ধ্যা একাই চীৎকার করে, "এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।"···এমনই কাব্য পড়িয়া, গল্প করিয়া, গান গাহিয়া, নববর্ষার প্রথম সন্ধ্যাটিকে সার্থক করিয়া তুলি এবং তাহাদের বাড়ী পৌঁছাইয়া দিতে গিয়া আর এক দফা গল্পের মধ্যে পড়িয়া রাত করিয়া বাসায় ফিরিয়া আহার শেষে যখন শুইতে গেলাম, মন তখন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল. আমার জীবনে ইহার অধিক আর কি চাহিবার আছে ?

এমনি সুখস্বপ্নে বর্ষার সন্ধ্যাগুলি কাটিতেছিল। কিন্তু এই যে সুখ, ইহা যে স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে—তাহা বুঝিবার দিনও ক্রমে ঘনাইয়া আসিতেছিল; একদিন সেই ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম বিচ্ছেদের দিন সত্য সত্যই আসিয়া পড়িল, আমার আনন্দের কমলবন যেন বাস্তবতার মত্ত হস্তীর পদদলনে বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল।

* * * *

আর একটি বাদল সায়াহ্ন। নন্দবাবুরা আজ বৈকালের গাড়ীতে কলিকাতা রওনা হইয়াছেন। তাঁহাদের ট্রেনে তুলিয়া দিয়া এইমাত্র ষ্টেশ্ন্ হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। বাহাদুরও গিয়াছিল; ফিরিয়া আসিয়া সে ঐ মেঝের কার্পেটের উপর শুইয়া আছে, বোধ করি ঘুমাইয়া গিয়া থাকিবে। আমি দীর্ঘ আরাম-কুর্শিতে বিবশ দেহ এলাইয়া দিয়া বাতায়ন সম্মুখের আকাশের পানে দুই চোখ মেলিয়া ধরিয়াছি। এই মাত্র ক্ষুদ্র এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমার সামনের অংশের আকাশে বেশ দুই চারিটা নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, মনে হইতেছে চুমকি বসানো একখানা নবধৌত নীলাম্বরী। দ্বাদশীর চাঁদ মেঘের মধ্য দিয়া এক একবার দেখা দিতেছে, একটানা কান্নার ফাঁকে এক ঝলক হাসির মত।···ষ্টেশ্ন্ হইতে ফিরিবার পথে টাঙ্গায় ভাবিতেছিলাম, সেকেণ্ড্ ক্লাস বোগিখানা একা পাইয়া উহারা কেমন গুলজার করিয়া চলিয়াছে! ইতু ও সন্ধ্যা হয়ত গান ধরিয়াছে;—আজই আমার অর্গ্যানে যে গানটা গাহিয়াছে, হয়ত বা সেইটাই ধরিয়াছে,—"ভরা থাক্, ভরা থাক্—স্মৃতি-সুধায় বিদায়ের পাত্রখানি।" এখন কি আর ভাবিব! কিছুই ভাবিতে পারি না। সর্ব্বাঙ্গে একটা অস্বাভাবিক অবসাদ; মন একেবারে নিষ্ক্রিয়। কোনও প্রকার দুঃখ বা কষ্ট হইতেছে কি না তাহাও অনুভব করিতে পারিতেছি না, এমনি অবসন্ন বোধ করিতেছি। সমগ্র অনুভূতি যেন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, তথাপি অকস্মাৎ সেই নিমন্ত্রণের দিনটার কথা স্মরণ করি। সেদিন আমার ক্যামেরাটা যথার্থ কাজে লাগিয়াছিল; অনেকগুলা ছবি তুলিয়াছিলাম।··· ইতুর ছবিখানা একবার পাড়িয়া দেখিব না কি! কি প্রয়োজন! উঠিতে ভাল লাগে না।···

স্নিগ্ধ বাতাস বহিতেছে। একবার আলোটা জ্বালিব না কি! এস্রাজ বাজাইব, গান গাহিব, কীট্স্ পড়িব!—

"Thou wast not born for death,
immortal bird,
No hungry generations tread thee down."

কি করিব ভাবিয়া পাই না। নাঃ; আলো জ্বালাইয়া কি হইবে! গান গাহিয়া, কাব্য পড়িয়াও লাভ নাই।··· উঁহাদের সহিত জীবনে আর কখনও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা কম। চিঠিপত্র লেখা সম্বন্ধে অনেক অনুরোধ, অনেক অঙ্গীকার অবধি হইয়া গিয়াছে; তথাপি জানি সে অনুরোধ রাখিবার সে অঙ্গীকার পালন করিবার উৎসাহ কোনও পক্ষেই স্থায়ী হইবে না। বড় জোর উঁহাদের পৌঁছানো সংবাদ একটা মিলিবে, অতঃপর আমার একটা জবাব। তারপর—? তারপর সমস্তই অনিশ্চিত; খুব সম্ভব, যেমন সবক্ষেত্রে হইয়া থাকে, আর চিঠিপত্র চলিবে না—প্রভাতের শিউলির মত আপনা আপনি খসিয়া পড়িবে।···আগামী বৎসর উঁহারা পুনরায় এখানে আসিতে পারেন। কিন্তু—কে বলিতে পারে আমি তখন কোথায় থাকিব! আজ দশবৎসরের অধিককাল এখানে আছি; সরকার আমায় এবার সরাইবেনই—ইতিমধ্যেই আভাস পাইয়াছি। হয়ত বা কোয়েটা যাইতে হইবে, নয়ত বা রাওলপিণ্ডি। সুতরাং সমস্ত সম্ভাবনাই এখন ভবিষ্যতের গর্ভে।···আচ্ছা, উঁহাদের সহিত এই সময় একবার ছুটি

লইয়া কলিকাতা ঘুরিয়া আসিলে হইত না! দেশটাও দেখিয়া আসিতাম। নাঃ, আগে মনে হইলেও হইত! আর তাহাতেই বা কি! একটু হল্লার মধ্যে আরও কিছুক্ষণ কাটিত। কিন্তু সে কতক্ষণ! এতগুলা মাস শেষ হইল, আর বারটা ঘণ্টা কাটিত না!···যাক্ গে, কাল আবার আপিস, আবার সেই পুরাতন জীবন, সেই চিরন্তনী জীবন-যাত্রা।···ওঃ, দশটা বাজিয়া গেল। "বাহাদুর, এ বাহাদুর, উঠো, দেখো, আজ আউর এত্না রাত্‌মে চুলা শুল্‌কানে কা জরুরৎ নেহি হৈ, দুকান্‌সে থোড়া বহুৎ কুছ্ মাঙ্গাও।"··· বাহাদুরকে দোকানে পাঠাইয়া দিলাম। এবার খাইয়া শুইয়া পড়িব। দশটা বাজিয়া গিয়াছে; উহারা এতক্ষণ কতদূর গেল! বক্সার হইবে।

ভারতীয় কুস্তি বিজ্ঞানের প্রচার

শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত

দেখে বড় আনন্দ হলো বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কুস্তি করার সখ বেশ জেগে উঠেছে; কিন্তু এখনও অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বিশেষ এগিয়ে যেতে পারছে না, তার কারণ অনেক বিষয় থাক্‌লেও কুস্তির উপযুক্ত প্রতিযোগিতার অভাব প্রধান।



গণেশ কুণ্ডু (ব্যায়াম সমিতি)—
৯ ষ্টোন বিভাগে রাণার্স

খেলা-ধূলা, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে বাঙ্গালা জগতের কাছে—এমন কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের কাছে—যে কত নীচে তা স্বীকার করতে লজ্জাবোধ করলেও—অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মানুষকে স্বাস্থ্যবান, বলবান করবার বহু উপায় থাক্‌লেও ভারতীয় কুস্তি যে সকল পন্থার শ্রেষ্ঠ তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আবার সেটির উন্নতিসাধনের জন্য ও বহুল প্রচার করবার জন্য কুস্তি প্রতিযোগিতার যে একান্ত



রাধারমণ দাস (ব্যায়াম সমিতি)—
৮ ষ্টোন বিভাগে রাণার্স

প্রয়োজন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। যে বিষয়ে প্রতিযোগিতার অভাব, সে বিষয়ের উন্নতি করা বড় কষ্টকর। প্রতি-

যোগিতার মধ্য দিয়ে সকল বিষয়েরই স্তর উন্নত করা সম্ভবপর।

আমাদের সকল কুস্তিগীর ভায়েরা এখনও সঙ্ঘবদ্ধ হয় নি বলে প্রচারের দিকে বিশেষ এগিয়ে যেতে পারছি না। আমাদের সকল কুস্তিগীর ভায়েদের এখন একান্ত প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া—আর যাতে বাঙ্গালার সাধারণের মধ্যে কুস্তির উপকারিতা ও ভারতীয় কুস্তি-বিজ্ঞানের প্রচার হয় তার চেষ্টা করা। এটি করতে হলে প্রথমে আমাদের একটি সমিতি গড়ে তুলতে হবে। সেই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হবে, নানা উপায়ের দ্বারা ভারতীয় কুস্তি-বিজ্ঞানের প্রচার করা—উন্নতি করা। কুস্তি বিজ্ঞানের একটা প্রাথমিক



সুনীল সেন (ব্যায়াম সমিতি)—
৭ ষ্টোন বিভাগে উইণাস´

নিয়মাবলী গঠন করা, সকল জায়গায় ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করা, আর সমস্ত কুস্তিগীর ভায়েরা এক হওয়া। আমাদের সমস্ত কুস্তিগীর ভায়েদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বাইরের কেউ এসে টাকার লোভ দেখিয়ে বা তোষামোদ করে "মার কাছে মামার বাড়ীর গল্প" না বলে যায়। সেইটিই সব চেয়ে দুঃখের কারণ। আজ ভারতীয় কুস্তিগীররা জগতের মধ্যে কুস্তি-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে এসেছে। এটা মুখের কথা নয়, পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেছে। আমরা সঙ্ঘবদ্ধ নই বলে জগতের সভ্য জাতিদের এটা অস্বীকার করবার উপায় না থাকলেও সহজে তারা এ কথা মানতে চায় না। কিন্তু জগতের অন্যান্য জাতি প্রকাশ না করলেও ভারতীয়-কুস্তির শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করেছে বলে মনে হয়; কারণ তারা সকল দিক দিয়ে চেষ্টা আরম্ভ করে দিয়েছে—যাতে ভারতীয় কুস্তি-বিজ্ঞানের অবনতি ঘটাতে পারে। তাই তারা অলিম্পিকের মারফৎ আমাদের দেশে গুটিকতক লোকের সাহায্যে ভারতে



রবীন বসু (ব্যায়াম সমিতি)—১২
ষ্টোনের উর্দ্ধ বিভাগে রাণার্স´

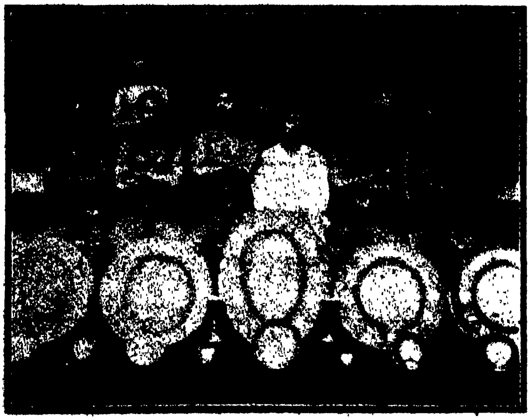
catch-as-catch-can ধারা প্রচার করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। আমি এটা বেশ অনুভব করেছি ও করছি—তারা অর্থের লোভ দেখিয়ে, তোষামোদ করে, সম্মান দিয়ে, বুদ্ধির দ্বারা আমাদের দেশের কুস্তিগীর ভায়েদের ঠকিয়ে—তাদের কার্য্যসিদ্ধি করছে। তাই কুস্তিগীর ভায়েদের কাছে আন্তরিক অনুরোধ তাঁরা যেন এই ধাপ্পাবাজিতে না ভুলে আমাদের জাতির সম্পদ ভারতীয় কুস্তি-বিজ্ঞানকে জগতের কাছে চিরকাল উন্নত করে রাখতে পারেন, তাদের দেখাতে

পারেন জগতের কুস্তি-বিজ্ঞানের ধারাকে নূতন করে গড়বার অধিকার একমাত্র ভারতেরই আছে। আর সে অধিকারের দাবী ন্যায্যত ভারতের। জগতের অন্য জাতির নয়।



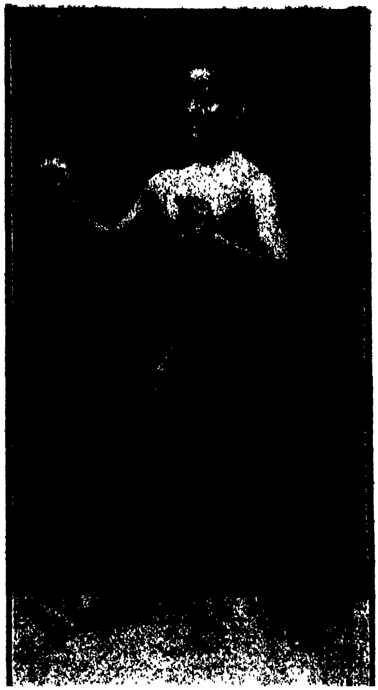
মুরারী বসু (ব্যায়াম সমিতি)—
১২ ষ্টোন বিভাগ—উইনার্স

বাঙ্গালী ভারতীয় কুস্তিতে অন্য প্রদেশ অপেক্ষা অনেক পেছিয়ে আছে—তা অনুভব করে ব্যায়াম সমিতির পরিচালক-



বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় ব্যায়াম সমিতির জয়ীগণ

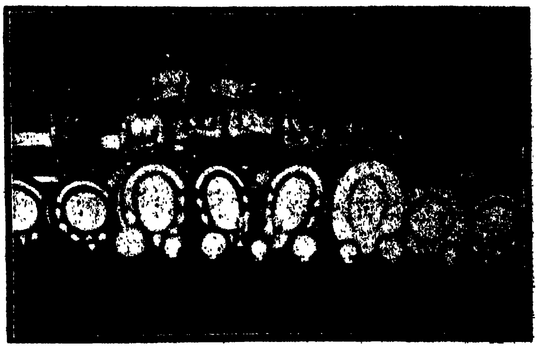
গণ যে ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করেছেন, এর প্রধান উদ্দেশ্য—বাঙ্গালী যুবকদের ভারতীয় কুস্তি-বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত করা। এই রকম প্রতিযোগিতা সর্ব্বত্র প্রবর্তিত হলে সাধারণ বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে সত্য সত্যই ভারতীয় কুস্তির আদর বাড়ে, আর জাতিগত প্রয়োজনীয়তা



বিভূতি দাস (ব্যায়াম সমিতি)—
১২ ষ্টোন বিভাগ—রাণার্স

করে যদি পল্লীতে পল্লীতে ভারতীয় কুস্তি-প্রতিযোগিতার সুরু হয়—তা আনন্দের কথা।

ব্যায়াম সমিতির পরিচালকগণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য—বাঙ্গালী সাহসী হউক, বাঙ্গালী স্বাস্থ্যবান হউক, বাঙ্গালী সবল

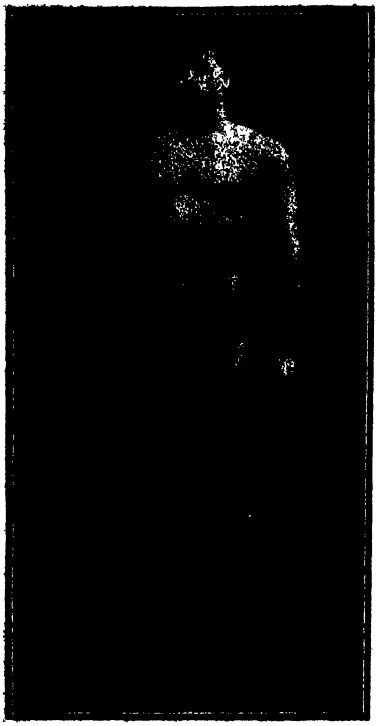


বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতায় জয়ীগণ

হউক। উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য বহুদিন থেকে নানা উপায়ে তাঁরা চেষ্টা করে আসছেন।

গত ২৬শে মাঘ ব্যায়াম সমিতির উদ্যোগে কলিকাতা সিমলা পল্লীতে কালীসিংহপার্কে বঙ্গীয় কুস্তি প্রতিযোগিতা এবং স্বাস্থ্য ও ব্যায়াম প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখোপাধ্যায় ইহার উদ্বোধন করেন। এই কুস্তি প্রতিযোগিতায় ৺ক্ষেত্রচরণ গুহ মহাশয়ের সুযোগ্য শিষ্য শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী ও রামচন্দ্র মজুমদার মহাশয়গণ বিচারকের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

এই প্রতিযোগিতাটি কেবলমাত্র অবৈতনিক (Amatuer)



মুক্তারাম বিশ্বাস (সাঁকারিটোলা মাণিক বাবুর আখড়া)—১১ ষ্টোন বিভাগে উইনার্স

বাঙ্গালী কুস্তিগীরদের জন্যই প্রবর্ত্তন করা হয়েছে। বাঙ্গালী পেশাদার কুস্তিগীর খুব অল্প। যাঁরা সত্যই পেশাদার কুস্তিগীর হতে চান তাঁদের পথ মুক্ত। কিন্তু অবৈতনিক কুস্তিগীরদের জন্য আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ভারতীয় কুস্তি প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন হয়নি যে তার দ্বারা অবৈতনিক কুস্তিগীররা বিশেষ উন্নত হতে পেরেছেন। এ রকম অভাব অনুভব করেই অবৈতনিক কুস্তিগীরদের জন্য ব্যায়াম সমিতি এই প্রতিযোগিতার প্রবর্ত্তন করেছে।

এই প্রতিযোগিতাটি শারীরিক ওজনের অনুপাতে ৭টি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা:—৭ ষ্টোন, ৮ ষ্টোন, ৯ ষ্টোন, ১০ ষ্টোন, ১১ ষ্টোন, ১২ ষ্টোন ও ১২ ষ্টোনের উর্দ্ধে। ভারতীয় পেশাদার কুস্তি প্রতিযোগিতায় পালোয়ানের স্তর নির্ণয় করে প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিক করা হয়। ওজনের ওপর নির্ভর করে বিভাগ করা হয় না। বর্ত্তমানে অবৈতনিক পালোয়ানদের স্তর জানা নেই। সেই জন্য এই রকম একটি প্রতিযোগিতা করাতে হলে উপস্থিত ওজন হিসেবে প্রতিযোগিতা করাবার সুবিধা অনেক ব'লে ভারতীয় কুস্তির চিরাগত প্রথার এটুকু মাত্র লঙ্ঘন করা হয়েছে।

এই প্রতিযোগিতায় ২০টি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে সর্ব্ব সমেত ৭৮জন প্রতিযোগী নাম দিয়েছিলেন।

৭ ষ্টোন বিভাগে ৯জন প্রতিযোগীর মধ্যে ব্যায়াম সমিতির সুনীল সেন উইনার্স ও বিবেকানন্দ ব্যায়াম



৯ ষ্টোন বিভাগের সুবোধ রুদ্র ও ভোলা হালদারের লড়া হইতেছে (উপরে সুবোধ রুদ্র)

সমিতির ভবতোষ দত্ত রার্ণাস হয়। এঁদের দুজনকে দুটি "ব্যায়াম সমিতি চ্যালেঞ্জ কাপ" দেওয়া হয়।

৮ ষ্টোন বিভাগে ১৭জন প্রতিযোগীর মধ্যে সালখিয়া স্বাস্থ্য-সমিতির অপূর্ব্ব সরকার উইনার্স ও ব্যায়াম সমিতির রাধারমণ দাস (২৫ মিনিট কুস্তি করেও অমীমাংসিত থাকার পর ঘাড়ে আঘাত লাগায় তিনি পুনরায় লড়িতে অক্ষম

হওয়ায়) রার্ণাস হন। অপূর্ব্ব সরকার উইনার্স হওয়ায় তাঁকে "অমরনাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ও রাধারমণ দাস রার্ণাস হওয়ায় তাঁকে "রজনী দত্ত মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" দেওয়া হয়।

৯ ষ্টোন বিভাগে ২৯ জন প্রতিযোগীর মধ্যে দর্জ্জিপাড়া তরুণ সঙ্ঘের ভোলা হালদার উইনার্স ও ব্যায়াম সমিতির গণেশ কুণ্ডু রাণার্স হয়। ভোলা হালদার উইনার্স হওয়ায় তাঁকে "কানাই পাঠক মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ও গণেশ কুণ্ডু রার্ণাস হওয়ায় তাঁকে "শৈলেন ঘোষ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" দেওয়া হয়।

১০ ষ্টোন বিভাগে ১৪ জন প্রতিযোগীর মধ্যে পঞ্চানন ব্যায়াম সমিতির সুধীর সাহা উইনার্স ও সালকিয়া জিতেন্দ্র ব্যায়াম ও স্পোর্টিং ক্লাবের ফেলু দে রার্ণাস হন। এই কুস্তিতে উভয়েরই লড়া ভাল হয়। সুধীর সাহা উইনার্স হওয়ায় তাঁকে "ক্যাপ্টেন জে, এন, ব্যানার্জ্জী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ও ফেলু দে রার্ণাস হওয়ায় তাঁকে "হরিদাস মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" দেওয়া হয়।

১১ ষ্টোন বিভাগে শাঁকারিটোলা মাণিকবাবুর আখড়ার মুক্তারাম বিশ্বাস উইনার্স ও চাঁপাতলা ইয়ং জিমনাষ্টিক ক্লাবের ফণী বিশ্বাস রার্ণাস হন। মুক্তরাম বিশ্বাস উইনার্স হওয়ায় তাঁকে "পরেশনাথ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ও ফণী বিশ্বাস রানার্স হওয়া তাঁকে "শ্যামাকান্ত মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" দেওয়া হয়।

১২ ষ্টোন বিভাগে ব্যায়াম সমিতির মুরারী বসু উইনার্স ও ব্যায়াম সমিতির বিভূতি দাস রানার্স হন। মুরারী বসু উইনার্স হওয়ায় তাঁকে "ক্ষেত্র গুহ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ও বিভূতি দাস রানার্স হওয়ায় তাঁকে "ভীমভবানী মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" দেওয়া হয়।

১২ ষ্টোনের ঊর্দ্ধ বিভাগে সালকিয়া স্বাস্থ্য-সমিতির গোষ্ঠ সাধু খাঁ ও ব্যায়াম সমিতির রবীন বসুর মধ্যে প্রথম দিন ২০ মিনিট কুস্তি হয় এবং সকল সময়ই রবীন বসু গোষ্ঠ সাধুখাঁকে নিচে মাটি হতে উঠ্‌তে দেন না। সে দিন কুস্তি অমীমাংসিত থাকায় পুনরায় পরদিন ৫০ মিনিট কুস্তি হয় এবং ৪০ মিনিট রবীন বসু গোষ্ঠ সাধুখাঁকে মাটি থেকে উঠ্‌তে দেন না। পরে বিচারকদের আদেশে দশ মিনিট উপরে কুস্তি হয়। রবীন বসু সকল সময়ই উত্তমরূপে লড়েন এবং প্রতিযোগিতার নিয়মানুযায়ী কোন মীমাংসা না হওয়ায় "টস" হয় এবং গোষ্ঠ সাধুখাঁ "টসে" জিতে উইনার্স ও রবীন বসু রার্ণাস হন। গোষ্ঠ সাধুখাঁ উইনার্স হওয়ায় তাঁকে "অম্বু গুহ মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" ও রবীন বসু রানার্স হওয়ায় তাঁকে "গোঁসাই দাস পাত্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড" দেওয়া হয়।

প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেক উইনার্স ও রাণার্সকে একটি করে ফরগুড শীল্ড ও একখানি করে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।



৯ ষ্টোন বিভাগের ঘনশ্যাম দাস ও বলদেব রায়ের লড়া হইতেছে

এ ছাড়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ জয়ী হ'তে না পারলেও ভাল লড়ার দরুণ ৭ ষ্টোন বিভাগে জোড়াবাগান ব্যায়াম সমিতির নারায়ণ দত্তকে, ৮ ষ্টোন বিভাগে ব্যায়াম সমিতির রামচন্দ্র দেকে ৯ ষ্টোন বিভাগে ব্যায়াম সমিতির সুবোধ রুদ্রকে ও ১০ ষ্টোন বিভাগে চাঁপাতলা ইয়ং জিমনাষ্টিক ক্লাবের নরেন গালকে একটি করে ফরগুড শীল্ড ও একখানি করে প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

এই প্রতিযোগিতায় যে সমস্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে সেগুলি—বাঙ্গালায় বিশিষ্ট পরলোকগত কুস্তিগীরদের স্মরণার্থে নাম করা হয়েছে।

গত ১৪ই ফাল্গুন এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার কর্পোরেসনের চীফ একজিকিউটিফ অফিসার শ্রীযুক্ত জে, সি, মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন ও তাঁহার পত্নী পুরস্কার বিতরণ করেন।

বাঙ্গালায় যুবকদের শারীরিক উন্নতির জন্য ব্যায়াম সমিতির চেষ্টা ও উদ্যোগ সকলের প্রশংসনীয়। এই প্রতিযোগিতা প্রবর্ত্তন ক'রে বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে ভারতীয় কুস্তি প্রচারের যে পথ তাঁরা দেখালেন, তার জন্য সকলেই আনন্দিত।

অরুণ ও অনীতা

মনোজ গুপ্ত

এ্যানিটা তো বাঙ্গালীর মেয়ে নয়, তাই সে আমাদের সব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে নি। তার পরিচিতের মধ্যে সে "লোরেটোর" কলঙ্ক বলেই গণ্য হয়। তা হবে নাই বা কেন? "লোরেটো" থেকে পাশ ক'রে কোন মেয়ে আর রোজ "বাইব্ল" পড়ে—আর কোন মেয়েই বা রবিবার সকালে ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনতে "চার্চ্চে" যায়?—যারা ওখানে যায় তাদের অবশ্য আর একটা বড় উদ্দেশ্য আছে। তাই এ্যানিটা সেকেলে মেয়ের দলেই রয়ে গেল—আর তার মার কোন আশাই মিট্‌ল না। অমন মেয়ে, যে ইচ্ছে করলে অনায়াসে একটা বড় গোছের "সিভিলিয়ান" বিয়ে করতে পারত—সে কি না রইল "বাইব্ল" নিয়ে! পারত কেন? সেবার তো সব ঠিকই হয়েছিল—হঠাৎ ও বেঁকে বসল বিয়ে কোরবে না—তাই তো! নইলে··! তা বলে আপনারা ভাব্‌বেন না—এ্যানিটা সত্যই সেকেলে! তার পোষাক পরিচ্ছদে সেকেলে হবার কোন ইচ্ছাই প্রকাশ পায় না, আর কোন সামাজিক উৎসবে সে নিজেকে দুষ্প্রাপ্যও ক'রে তোলে না। এ্যানিটা কিন্তু সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নি—কালোর দেশে কালো লোককে কালো মনে করার সঙ্কীর্ণতা! শুনেছি কলেজেও সে তার আভিজাত্য বাঁচিয়ে রেখে চল্‌ত—আর বোল্‌ত তাদের কাছে এ দেশের নাকি অনেক কিছু শেখবার আছে! হতেই পারে! কিন্তু এহেন এ্যানিটা যে কেন হঠাৎ অরুণকে এত প্রশ্রয় দিল, তা আমরা কেউ ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পারলাম না। আর অরুণটাও আচ্ছা বেয়াড়া হয়ে গেছে আজকাল! কোন কথা জিগেস করলে শুধু হাসে!. সেই অরুণ—যে মেয়েদের শুধু অস্পৃশ্য নয়, অদ্রষ্টব্য বলে মনে কোর্‌ত। ও এ্যানিটার নাম দিয়েছে "অনীতা"—আর আমরা বলি "আনীতা"—অরুণের সহজ জীবন-যাত্রার মধ্যে আনীতা ধূমকেতু। আজকাল অরুণ রাগ করে—তার কাছে এ্যানিটা হচ্ছে Florence Nightingale—Joan of Arc ইত্যাদি সব কিছু; আর আমরা বলি Mary বা "এহেন"—অবশ্য Mary টা নিজেদের মধ্যে আলোচনায় অন্য আকার ধারণ করে।

*   *   *   *   *

এ্যানিটার সঙ্গে অরুণের আলাপ হয় দার্জ্জিলিংএর "ম্যালে"। স্যুট্ চড়িয়ে—আর যথাসম্ভব 'ক্রিম' মেখে—অরুণ অনেক কষ্টে নিজেকে Anglo-Indian তৈরী করেছিল—আর ইংরিজি বলবার তার একটু দক্ষতাও ছিল; তাই বোধ হয় চট্ করে এ্যানিটা তাকে ভুল করে অ-বাঙ্গালী ব'লে।

অরুণকে রাগিয়ে দিলে তার কাছে অনেক কথা শোনা যায়—আর যত রাগ তার বাড়ে, তত বেশী তার বুদ্ধি খোলে; তাই সুযোগ পেলেই আমরা তাকে রাগাই—আর তার কথাগুলো উপভোগ করি। তাকে রাগাবার সহজ উপায় হচ্ছে ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে ছোট খাট একটা বক্তৃতা দেওয়া কিংবা তাকে 'চালিয়াৎ' বলা। সেদিন আমরা ভগবানকেই target করলাম। অরুণ ব'লে বসল, "Hang Your God!" সামনে দিয়ে যাচ্ছিল এ্যানিটা—একটু থম্‌কে দাঁড়াল, তারপর অরুণের দিকে চেয়ে হাস্‌ল—হাসিটা সম্ভবতঃ অনুকম্পার।

এ্যানিটা রোজই এই বেঞ্চটায় এসে বসে—তা আমরা জানি, আর আজ যে ক'থার সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা ক'রল তাও দেখেছি—কিন্তু বিশেষ খেয়াল হয় নি। অরুণকে বললাম, "এই, ওঠ্; ঐ মেয়েটি রোজ এখানে বসে—আমাদের জন্য আজ বসতে পারছে না।"

হঠাৎ অরুণের সব রাগটা ভগবানকে ছেড়ে গিয়ে পড়ল আজকালকার মেয়েদের ওপর। সে বললে, "ম্যালে আরও অনেক বেঞ্চ আছে, ইচ্ছে করলে বসতে পারে। তোদের অত ভদ্রতা জ্ঞান হ'য়ে থাকে তোরা পালা।" আমরা উঠ্লাম, কিন্তু ও সত্যই উঠ্ল না।

এ্যানিটা ফিরে আসছে দেখে আমরা একটু দূরে একটা বেঞ্চে গিয়ে বস্লাম। হাঁ, ঠিকই তো! এ্যানিটা এসে অরুণের পাশে বসল। অরুণ একটু আড়ষ্ট হয়ে গেল—হওয়াই স্বাভাবিক। এ্যানিটা যে সত্যই অরুণকে কিছু বলতে পারে, তা আমরা ভাবতেও পারি নি।

এ্যানিটা বললে, "Have you hanged God ?"

অরুণ বেজায় চটেছিল; তার একবার ইচ্ছে হল বলে, "That's none of your business"—কিন্তু তা না বলে সে বললে, "Are you a Little Sister ?"

পরিষ্কার বাঙ্গালায় এ্যানিটা বললে, "সে কথা থাক্, আপনি ভারতবাসী হয়ে এত বড় অবিশ্বাসী হলেন কি করে? আমার তো ধারণা ছিল এক ভারতবাসীরাই এখনও ধর্ম্মটাকে জীবনের অপরিহার্য্য অংশ বলে মনে করে।"

"তা করে বলেই আজ তাদের এত উন্নতি। ধর্ম্ম একটা মস্ত বড় বিলাসিতা—সে বিলাসিতায় ডুবে থাকা আমাদের শোভা পায় না। ঘরে যাদের ভাত নেই তাদের ধর্ম্ম করা চলত—যদি ধর্ম্ম করে পেট ভ'রত!"

"ধর্ম্ম ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে?"

"না পারবে কেন?"

"ধর্ম্ম তো একটা বিশ্বাস মাত্র—কোন বিশ্বাস না নিয়ে মানুষ বাঁচবে কি করে—আর ক'রবেই বা কি?"

"করবার তার অনেক কিছু আছে—কাজের অভাব হয় না এত বড় পৃথিবীতে!"

"আচ্ছা বাইবল, গীতা, এ সবের কিছু মূল্য নেই বলতে চান?"

"ওদের যা মূল্য আছে তা যে কোন সাধারণ গল্পের বইএর থাকা সম্ভব। ওদের সাহিত্যিক মূল্য কিছুমাত্র নেই। জীবনের পথে কতটুকু সাহায্য করে যিশুর জীবনী বা কৃষ্ণের বড় বড় বক্তৃতা? তার চেয়ে ঢের বেশী সাহায্য করে John Bojerএর "Great Hunger" বা Turgeneifএর "Fathers and Children"—আপনিই বলুন না—যিশুর জীবনের কতটুকু কাজে লাগে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে?"

"রোজকার জীবন ছাড়াও তো একটা জীবন আছে—"

"হাঁ, কবির কল্পনায় আর ধর্ম্মপ্রচারকের বক্তৃতায়! ওসব ছেলে-ভুলান জিনিষ আজকাল অ-চ-ল।"

"সত্য, আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে আমার হিন্দুর সম্বন্ধে অনেক নূতন ধারণা হল।"

"আমি হিন্দু নই—আমার বাবা-মা হিন্দু বটে!"

"আপনি কি ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছেন?"

"না, কারণ ধর্ম্মই মানি না।"

"কিন্তু লোকে আপনাকে হিন্দুই বলবে।"

"তাতে যায় আসে না।"

* * * * *

এ্যানিটার ওপর আমরা বেজায় চটেছিলাম। আচ্ছা, আপনারাই বলুন চটা উচিত কি না! অরুণকে না হ'লে আমাদের আড্ডা কিছুতেই জ'মে ওঠে না—তাই ওর দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে এক রকম জোর করেই দার্জ্জিলিংএ টেনে নিয়ে এসেছিলাম; অথচ ওকে আজকাল পাওয়াই যায় না। সারা বিকেলটা ওর কাটে এ্যানিটার কাছে। ও আজকাল প্রায় রোজই এ্যানিটার বাড়ী যায়—আর একবার গেলে অনেকক্ষণ থাকে। আমরা বলি, লোককে ভূতে পায় শুনেছি—অরুণকে মানুষে পেয়েছে। আচ্ছা, ওরা কি করে সারা বিকেলটা? কি এত কথা ওদের থাকতে পারে? ঐ নীরস নিরীশ্বরবাদ নিয়ে কতক্ষণ কাটান যায়? দেখলে হয় না—ওরা কি করে এতক্ষণ? বাস্! দেখাই ঠিক হল। Stationএ যেতে গেলে এ্যানিটার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়, কাজেই Stationএ যাবার বিশেষ দরকার হল। নাঃ, আমাদের ঠকিয়েছে! কোথায় ভেবেছিলাম দু'জনে নিরীহ ভগবান বেচারাকে target করে গলার শক্তি পরীক্ষা করছে—তা না বেশ গম্ভীর

হয়ে বসে আছে—ঘরে ঝড়ের চিহ্নমাত্রও নেই। ঘরের ভেতর আলো জ্বলছে—আর বাইরে তার চেয়ে অন্ধকার—তাই তাদের মুখ ভাল করেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। ব্যাপার কি? এরা হঠাৎ এত গম্ভীর হয়ে গেল কেন? কিছুক্ষণ একথা আমাদের মনে ছিল, তারপর সামনের restaurantতে চায়ের ঢেউএ এ্যানিটা আর অরুণ যে কখন ভেসে গিয়েছিল তা জানতেও পারিনি—যখন ফেরার পথেও তাদের ঠিক একইভাবে বসে থাকতে দেখলাম তখনই আবার মনে হল। না, এদের অবস্থা ঠিক বুঝতে পারা গেল না। শেষে অরুণটা কি খ্রীষ্টান হয়ে যাবে? এ্যানিটা নাকি আবার কোন ধর্ম্ম-যাজকের মেয়ে! বেচারা অরুণের বুড়ো বাপ্ এখনও বেঁচে। না, তা হতেই পারে না। এতখানি দুর্ব্বলতা আর যারই থাক্, অরুণের আছে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, এ্যানিটার বাপই বা কি রকম লোক? একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত বাঙ্গালীর ছেলে যে দিনের পর দিন তোমার বাড়ীতে আসছে—তার কোন খবর তুমি রাখ না? আমাদের কাছে এলে অন্ততঃ ওর নাস্তিকতার কথা বলে লোকটাকে একটু ভয় পাইয়ে দিই, তাহলে আর রোজ অরুণের অনুপস্থিতিটা ভোগ করতে হয় না।

* * * * *

টাইগার হিলে যাবার জন্য অরুণকে এত করে বললাম, সে কিছুতেই রাজি হ'ল না। ওর যেন কি হয়েছে। শেষে ওকে উৎসুক করে তোলবার জন্য এ্যানিটার কথাও তুললাম কিন্তু কোন লাভ হ'ল না; কাজেই ওকে ছেড়েই যেতে হ'ল। কিন্তু এ্যানিটা সত্যই গেল টাইগার হিলে। প্রথম আমরা ঠিক করে উঠতে পারি নি—ও সত্যই এ্যানিটা কি না। এ্যানিটা, আমাদের চেনা এ্যানিটা, বেশ সাদাসিধে মেয়ে—তার ওপর "Loreto"র ছাপ পড়ে নি বললেও চলে। আজকের এ্যানিটা কিন্তু ঠিক সে রকমের নয়; তার আজ নিজেকে সুন্দর করে তোলবার চেষ্টার ত্রুটি নেই! মুখে হয়তো ক্রীমও মেখেছে—আর ঠোঁটে লিপ্-ষ্টিক্? কি জানি ওর ঠোঁট তো অত টুকটুকে লাল নয়, আর ও পানও খায় না। হাতের ছোট্ট সোনার ঘড়িটার দিকে বারবার তাকাচ্ছে—সেটা সময় দেখবার জন্য—কি স্রেফ্ ঘড়িটা দেখাবার জন্য—তা ঠিক বলা যায় না।

এ্যানিটার না চেনবার ক্ষমতা দেখলাম বেশ অদ্ভুত। ও আমাদের চেনে না এ কথা কিছুতেই বলা চলে না—এর আগে অনেকবারই চিনেছে—কিন্তু আজ সে মোটেই চিনতে পারল না। এতে ওর ওপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক—একে তো ওর ওপর আমরা মোটেই সন্তুষ্ট নই কোনদিনও। আরও রাগ হ'ল ওর পাশের ঐ ছোঁড়াটাকে দেখে—সাধারণ Anglo-Indian যে রকম হয়ে থাকে—চেহারায় কমনীয়তার চিহ্নও নেই। তার ওপর লোকটা দারুণ অভদ্র; এ্যানিটার পাশে সিগারেট খেতে খেতে চলেছে! যদি ওর সঙ্গে এমন সম্পর্ক হয়—যাতে সিগারেট খাওয়া চলে? না, তা হতেই পারে না, আর হলেও আমরা ওকে অভদ্র বলেই মনে ক'রব!

এ্যানিটা, অরুণের আদর্শ মেয়ে এ্যানিটা! অনিচ্ছা-সত্ত্বেও যেন তার সঙ্গে কোথায় একটা যোগসূত্র এসে গিয়েছিল। ওকে কেউ কিছু বললে আমরা সহ্য করতে পারতাম না, আর ও যে ঐ রকম কার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে—এ কথা আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি নই। ওর সমস্ত গত জীবনটা এক মিনিটে মুছে গিয়ে শূন্য হয়ে যাওয়া চাই, কারণ ও অরুণের কাছে অতবড় আসন না চাইতেই পেয়েছে—আর তাই আমাদের এতটা সময় ওর কথা নিয়েই কাটে! অন্যায় বলতে হয়, আপনারা বলুন।

* * * *

ভেবেছিলাম টাইগার হিলের কথা বলে অরুণকে একটু ব্যস্ত করে তুলতে পারব, কিন্তু ও একটুও ঔৎসুক্য প্রকাশ করলে না। খোঁচা খোঁচা চুল, আর ব্রণ-বহুল মুখ Anglo-Indian শুনেই ও বললে, "ছোঁড়াটা এরই মধ্যে আবার এসেছে।"

"তুই ওকে চিনিস নাকি?"

"হাঁ, আগে একবার এসেছিল এক দিনের জন্য।"

"কি হয় ওর বলতে পারিস?"

"পিসের ভাই।"

"তার মানে?"

"তার মানে আর কি? কোন পুরুষে কেউ হয় না।"

"তবে? কেউ হতে পারে নাকি ভবিষ্যতে?"

"হাঁ, তা পারে বৈ কি! একেবারে পথ-প্রদর্শক! ওটা আবার এক পাদ্রী, না পাদ্রীর ছেলে, এই রকম কি!"

"কেন এ্যানিটা কি Churchএ যাবে নাকি?"

"সেই রকম তো শুনতে পাই—ও বোধ হয় Holy Sister হবে !"

"মোটেই না—চার্চ্চে যাবে বটে, তবে আর একজনের সঙ্গে ।"

*　　*　　*　　*

অরুণ ফিরল দারুণ গম্ভীর হ'য়ে। তাকে কোন কথা জিগেস করতে আমাদের সাহস হল না—যদিও বেশ বুঝলাম সে ফিরছে এ্যানিটার বাড়ী থেকে। এক ঘরেই থাকি কজন, তার মধ্যে একজন যদি ঐ রকম গম্ভীর হয়ে থাকে তাহলে আর কজনের পক্ষে সেই ঘরেই বসে আড্ডা দেওয়া সম্ভব হলেও সুন্দর হয় না ; কাজেই পথ দেখতে হল। আমরা কিন্তু এতটা পছন্দ করি না। বেশ তো একটি মেয়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে, তার সঙ্গে বন্ধুত্বই রাখ না—কিন্তু তার প্রতিটি কাজের ওপর তোমার দৈনন্দিন জীবন নির্ভর করবে এটা কোনমতেই সহ্য করা যায় না। এক এক জনের স্বভাবই থাকে ঐ রকম—হয় তো কোনদিন কিছু দান করে নি—কিন্তু যে দিন দান করল সে দিন নিজেকে নিঃশেষ করেই দান করল। নিজের দিকে চাইবার তার সময় বা সুযোগ হয় না—যদি কেউ তা মনে করে দেয়, সে হেসে বলে, "এই তো ছিল আমার জীবনের আদর্শ—সব কিছু দিতে চেয়েছিলাম একজনকে।"

*　　*　　*　　*

দার্জ্জিলিং ষ্টেশনটা বড় বেয়াড়া জায়গায়। যেখান থেকেই কেন ফিরি না, ষ্টেশনটা মাঝে পড়বেই—আর আমরা একবার ষ্টেশন ঘুরে যাবই। গাড়ীর সময় হয়েছিল, তাই একটু ভিড় ছিল। গাড়ী থেকে একটু দূর দিয়ে আসছিলাম, হঠাৎ আমাদের কার চোখ পড়ল একটা বিশেষ গাড়ীতে—গাড়ীটার বিশেষত্ব এক আমাদের কাছেই ছিল—কারণ গাড়ীর ভেতরে ছিল এ্যানিটা, আর বাইরে দাঁড়িয়েছিল অরুণ! হঠাৎ এ্যানিটা চলে যাচ্ছে যে ? কৈ কিছু শোনা যায় নি তো! অরুণ কি এই জন্যই এত গম্ভীর নাকি ? কে একজন বললে, "চল আমরাও যাই—see off করে আসি"। "দূর! তা কি হয়—ওরা তাতে বিব্রত হবে"—দূরে দাঁড়িয়ে দেখাই ঠিক হ'ল।

দু'জনেই চুপ্ চাপ্! ব্যাপার কি ? শেষে অরুণও কি কবি হয়ে উঠলো নাকি ? গাড়ীর ঘণ্টা পড়ল, আর বেশী দেরী নেই ছাড়বার। অরুণ তার হাতের ফুলের তোড়াটা তুলে ধরলে। এ্যানিটা কি বললে তা শুনতে পেলাম না, কিন্তু অরুণের মুখটা লাল হয়ে উঠলো—গাড়ী আস্তে আস্তে চলে গেল—আর দূরে কত রংএর রুমাল উড়তে লাগল। মনটা বেজায় খারাপ হয়ে যায় এ সময়, তা নিজের কেউ সে গাড়ীতে না গেলেও। আচ্ছা, আর কোন দিনও এ্যানিটার সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে তো! কি এসে যায় তাতে ? তা যায় না সত্যি, তবু এ ক'দিনের পরিচয় তো !

অরুণ সামনে দিয়ে চলে গেল ; আমাদের ডাকলেও না ! একটু পরে আমরাও গেলাম। ঘরে এসে দেখলাম, electric stoveএর ওপর ফুলের তোড়াটা ধরেছে। ব্যাপার কি ? ফুলগুলো পুড়ে যাচ্ছে—ধোঁয়াগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরে উঠে শেষে মিলিয়ে যাচ্ছে। অরুণের ঠিক সেদিকে লক্ষ্য আছে বলে মনে হ'ল না। ও কি যেন ভাবছে ! ও কি ? ওর চোখে জল ? অরুণের চোখে জল ? আমাদের দিকে চোখ তুলে বললে, "ফুল সত্যিই কথা কয়—তা আজ প্রথম জানলাম! ওদের জীবনের ক্ষুদ্র সার্থকতা ওরা পায় নি—অপমানের লজ্জায় ওরা রাঙা হয়ে উঠেছিল—আগুন ছুঁয়ে দিতে ওরা আমায় আশীর্ব্বাদ করলে। মৃত্যুর মুখে আশীর্ব্বাণী কি সুন্দর !"

*　　*　　*　　*

দার্জ্জিলিংএ এসেছিলাম ছুটিটা উপভোগ করতে—কিন্তু এ কি বিভ্রাট সৃষ্টি হ'ল! এ আবহাওয়ার মধ্যে আর থাকা চলল না, কাজেই ফেরার চেষ্টা চলল। কারও আপত্তি ছিল না—কারণ চেনা লোক অনেকেই ফিরে গেছে। হঠাৎ অরুণের নামে এক "তার" এল "এডেন" থেকে। বেশ আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম সবাই। আরও আশ্চর্য্য হলাম তার মর্ম্ম গ্রহণ করে! "তার" করছে এ্যানিটা—সে "এডেন" থেকেই ফিরছে—কলকাতার বাড়ীতে, অরুণ যেন গিয়েই তার সঙ্গে দেখা করে।***যে তিমিরে সেই তিমিরে! হঠাৎ "এডেনই" বা কেন, আর সেখান থেকে ফেরারই বা উদ্দেশ্য কি ? অরুণ একটু সাহায্য করলে। এ্যানিটা যাচ্ছিল Little Sisterদের দলে যোগ দিতে—অর্থাৎ সারা

জীবনটা কোন মঠে কাটিয়ে দেবার উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিল। কিন্তু "এডেন" গিয়ে ফিরল কেন? এখানে অরুণের জ্ঞান আমাদেরই মত; কাজেই ক'লকাতা ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। অরুণ কিন্তু বেশ একটু সন্তুষ্ট হয়ে উঠেছিল।

*　　*　　*　　*

এ্যানিটার বিয়েতে আমরা সবাই গিয়েছিলাম—সকলেই কিছু কিছু উপহার নিয়ে গিয়েছিল এক অরুণ বাদ। এ্যানিটা বললে, "কৈ, তুমি কিছু দিলে না?"

অরুণ তার মুখের দিকে চেয়ে বললে, "তুমি তো উপহার নাও না। সামান্য ফুল তাও ফিরিয়ে দিয়েছিলে।"

"এক সময় নিতাম না, কিন্তু আজ নোব—আজ যে নেবার দিন।"

কে একজন দুষ্টুমি করে বললে, "এটা কি Sisterhoodএর নিদর্শন নাকি?"

হাসতে হাসতে এ্যানিটা বললে, "না, তাকে 'এডেনে'ই বিসর্জ্জন দিয়েছি—আর সেই সঙ্গে ঐ সব খেয়ালগুলো। আদর্শ আমায় ঠকিয়েছে ভুল পথে নিয়ে গিয়ে।"

কামনা

তরলিকা দেবী

অন্তর ক্ষুধা মেটে নাই মম
(তোমায়) অন্তর দিয়ে চাই
ওগো প্রিয়তম জীবন দেবতা
কেমনে তোমায় পাই!

(আমার) অন্তর তলে গোপন কমল
স্পন্দন করে মনে
ক্ষণিক পাওয়ায় জীবন ভরে না
(চাহি) পূর্ণতা মনোবনে!

আধেক ছোঁয়ায় পরাণ ভরে না
নিবিড় করিয়া চাই
আমার মনেতে তোমার প্রাণেতে
না-রবে একটু ঠাঁই

প্রবল বেদনা নিশিদিন ধরি
যে যাতনা দেয় মনে
তারি অনুভূতি তোমারি পরাণে
জাগে যেন ক্ষণে ক্ষণে।

দূরের বন্ধু নিকট হইবে
বুকের আকর্ষণে
বেদনা সিন্ধু মথিয়া আসিবে
সুধারূপ দর্শনে।

এমনি নিবিড় করিয়া তোমারে
চাহি যেগো নিশিদিন
সকলি বিফল হবে কি দেবতা
ভেবে হোলো তনু ক্ষীণ!



জীবনবীমা তহবিলের দাদন

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি যে, জীবনবীমা কোম্পানীর তহবিল বা টাকা উচ্চহারে খাটান দরকার। এ কথা বলা বাহুল্য যে টাকা খাটান ব্যাপারে কোম্পানীকে যথেষ্ট সাবধান হইতে হইবে এবং লগ্নী টাকার নিরাপত্তা বিধান-কল্পে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে। আমরা সকলে জানি কোম্পানীর নূতন বৎসরের প্রিমিয়াম বা চাঁদার আয়ের মোটা অংশ বীমার কাজ সংগ্রহের খরচখরচা বাদ হাতে মজুত হয় এবং প্রতি বৎসর পুরাতন বৎসরের (Renewal Income) প্রিমিয়াম বা চাঁদার অধিকাংশও ঐ সঙ্গে জমা হয়। এই টাকাতেই বীমা-তহবিল গড়িয়া উঠে এবং এই তহবিল উচ্চ সুদের হারে খাটান বীমাকারি-গণের স্বার্থেই প্রয়োজন, সে বিষয়ে আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি।

উচ্চহারে সুদ অর্জ্জনের প্রয়োজন কি ?

আপাত দৃষ্টিতে ইহা মনে হইতে পারে যে জীবনবীমা কোম্পানী প্রিমিয়াম হিসাবে বীমাকারিগণের নিকট হইতে বৎসর বৎসর যে টাকা পাইয়া থাকেন, তাহা দ্বারাই তাঁহারা বীমাকারিগণের দাবী মিটাইতে সমর্থ; কিন্তু এ্যাক্‌চুয়ারীগণ কর্ত্তৃক অঙ্কশাস্ত্র অনুযায়ী প্রিমিয়াম বা চাঁদা স্থির করিবার সময় ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, কোম্পানীর হাতে সঞ্চিত টাকা সুদে বর্দ্ধিত হইবে এবং সেইজন্য টাকা লগ্নি দ্বারা যতটা সুদ অর্জ্জন করা সম্ভব তাহা বাদ দিয়া বীমাকারীর নিকট হইতে "প্রিমিয়াম" বা চাঁদা আদায় করা হয়। প্রধানতঃ এই কারণেই বীমা কোম্পানীর তহবিল লাভজনকভাবে দাদন করিবার প্রয়োজন ঘটে; তা' ছাড়া, অনেকগুলি টাকা একত্র সঞ্চিত হইলে, সেই মজুতী টাকার মূল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য তাহা খাটান প্রয়োজন, কেন না টাকা না খাটাইয়া ফেলিয়া রাখা অর্থনীতিবিরুদ্ধ—বীমাকারী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের পরিপন্থী। মাটির মধ্যে টাকা পুঁতিয়া রাখার যুগ অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। সভ্যসমাজ ব্যাঙ্ক ও যৌথকারবারের মারফৎ দেশের সঞ্চিত অর্থ বৃদ্ধি করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়াছে।

বীমা কোম্পানীর হাতেও দেশের ও দশের বহু টাকা সঞ্চিত হইয়া পড়ে। আমরা গত সংখ্যায় বলিয়াছি—যাঁহারা বীমা করেন তাঁহারা আশা করেন যে, কোম্পানীর হাতে যে টাকা তুলিয়া দিতেছেন, দীর্ঘ সময় পর যখন তাঁহারা সেই টাকা ফেরৎ পাইবেন, তখন সে টাকা অনেকটা বৃদ্ধি হইয়াই ফিরিয়া আসিবে। ইহাকেই চল্‌তি কথায় "বোনাস" বলে। অতএব দাবী মিটাইবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার জন্য এবং বীমাকারিগণকে লভ্যাংশ বা বোনাস দিবার জন্য বীমা কোম্পানীকে তাহার তহবিল নিরাপদভাবে বেশী সুদের হারে খাটাইতে হয়।

জীবনবীমা তহবিলের দাদন

সঞ্চিত টাকার উপর সুদ অর্জ্জন করিতে হইলেই তাহা খাটাইতে হইবে। ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে তহবিল নিরাপদ রাখিয়া জীবনবীমা তহবিলের দ্বারা যথাসম্ভব অধিক সুদ অর্জ্জন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলেই কোম্পানীর পরিচালকদের উপর একটি কঠোর দায়িত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়। অবশ্য নিরাপদে ন্যূনতম সুদ অর্জ্জন করিতে হইলে এদেশে একটা সহজ উপায় আছে; কোম্পানীর কাগজ কিনিলেই সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। সেরূপ করিলে পরিচালকগণের কাজ সহজ হয় বটে, কিন্তু বীমাকারীর প্রতি সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করা হয় না। এতদ্ব্যতীত বীমার বিরাট তহবিল দেশের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে ব্যয়িত হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়।

ব্যাঙ্ক ও জীবন-বীমা কোম্পানীর দাদন

তহবিল লগ্নী করার ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সহিত বীমা কোম্পানীর আপাতঃভাবে একটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু ব্যাঙ্কে চল্‌তি খাতে অনেক টাকা জমা রাখিতে

হয়। তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের আমানতে ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ টাকা পান না। বীমা কোম্পানীর নিকট কিন্তু দশ বৎসরের কম মেয়াদের বীমা করা চলে না, বেশীর ভাগই কুড়ি বৎসরের মেয়াদী বীমা এদেশে প্রচলিত; আজীবন বীমার পলিশির সংখ্যাও বড় কম হয় না। মেয়াদের পার্থক্যের জন্যই ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর দাদননীতি একই প্রকারের হইতে পারে না। ন্যূনকল্পে দশ বৎসরের আগে বীমা কোম্পানীকে কাহাকেও টাকা দিতে হয় না বলিয়া বীমা কোম্পানী অনায়াসেই দীর্ঘ দিনের মেয়াদে টাকা খাটাইতে পারে, কিন্তু ব্যাঙ্ক পারে না। ইহার একটা কারণ উপরেই বলা হইয়াছে; আর একটি কারণও আছে; তাহা এই যে হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ না থাকিলে কেহ ব্যাঙ্কে আমানত রাখিতে পারে না এবং উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পন্ন স্বচ্ছল লোকের সংখ্যা আমাদের দেশে খুব বেশী নাই। কিন্তু আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছলই হউক বা অস্বচ্ছলই হউক, ভবিষ্যতের সংস্থানস্বরূপ বীমা সকলকেই করিতে হয়। প্রতি বৎসরই বীমাকারীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলে। ফলে প্রত্যেক বৎসর একদিকে যেমন কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি হয়, অন্যদিকে দীর্ঘমেয়াদী বীমাপত্রের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এই কারণে দীর্ঘ মেয়াদে তহবিলের টাকা খাটাইবার সুযোগ বীমা কোম্পানীর থাকে, কিন্তু সে সুযোগ ব্যাঙ্ক কখনও পায় না। এ কথা ঠিক যে এদেশের লোন কোম্পানীগুলি অল্পদিনের মেয়াদে টাকা আমানত লইয়া জমি বন্ধকীতে টাকা লগ্নী করার ফলে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে; কেন না লগ্নীকৃত টাকা আর্থিক দুরবস্থার জন্য তাহারা আদায় করিতে পারে নাই, অথচ আর্থিক দুরবস্থার জন্যই আমানতকারিগণ সঞ্চিত টাকা ব্যাঙ্ক হইতে তুলিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা না থাকিলে সহসা আমানত ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতা থাকে না, কাজেই ব্যাঙ্ককে দেউলিয়া হইতে হয়; কিন্তু সহসা আমানত ফেরৎ দিবার প্রয়োজন বীমা কোম্পানীর কখনই হয় না এবং সেই জন্য বীমা-কোম্পানীর হাতে বেশী নগদ টাকা থাকারও দরকার করে না, কিম্বা সহসা নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এমন সম্পত্তি (Liquid Assets) থাকিবার প্রয়োজন করে না। বীমাকারিগণই বীমা কোম্পানীর আমানতকারী, তাঁহারা বীমা কোম্পানীর নিকট হইতে ব্যাঙ্কের মত টাকা ফেরৎ লইবার আশাও করেন না এবং পাইতেও পারেন না। সুতরাং একমাত্র বীমা কোম্পানীর পক্ষেই দীর্ঘ মেয়াদে টাকা খাটাইয়া লাভ করিবার সুযোগ রহিয়াছে। সুতরাং এ ব্যাপারে ব্যাঙ্কের সহিত বীমা কোম্পানীর তুলনা চলে না।

বীমা কোম্পানীর দাদন-নীতি

উপরোক্ত আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে যে বীমা-তহবিলের লগ্নীর উদ্দেশ্য এবং পদ্ধতি কিরূপ হওয়া উচিত এবং কেনই বা সেই পদ্ধতি ব্যাঙ্ক কিংবা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত এ্যাকচুয়ারী মিঃ বেলী বীমা কোম্পানীর লগ্নী সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দ্দেশ দান করেন; অদ্যাবধি বিশেষজ্ঞ মহলে তাহা স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। মিঃ বেলীর মতে মূলধনের নিরাপত্তা সর্ব্বপ্রথম বিবেচ্য এবং তার পর দেখিতে হইবে কিরূপে সর্ব্বোচ্চহারে সুদ অর্জ্জন করা যায়। তিনি আরও বলেন যে বীমা কোম্পানীতে নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এমন সম্পত্তি (Liquid Assets) অল্প কিছু থাকিলেই চলে এবং বেশী অংশটাই দীর্ঘ মেয়াদে খাটান যাইতে পারে এবং খাটান উচিত।

বিভিন্ন দেশের প্রচলিত দাদন-নীতি

হাত দুই এক বৎসর মধ্যে যে কোনও বৎসরের ব্লু-বুক বা বার্ষিক বিবরণ হইতে দেখান যাইতে পারে—ভারতীয় কোম্পানীর বীমা-তহবিল কি ভাবে খাটান হইতেছে :

	শতকরা
সম্পত্তি বন্ধক	১·৪%
পলিশি ঋণ	৮·৬%
সেয়ার ও ষ্টকের বন্ধকীমূলে ঋণ	·১%
কোম্পানীর কাগজ	৬১·৩%
মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির ডিবেঞ্চার	১০·৯%
ভারতীয় কোম্পানীর সেয়ার	১·৮%
জমি ও বাড়ীঘর সম্পত্তি	৩·২%
অন্যান্য	৭·৭%

এখন দেখা যাউক সম্প্রতি আমেরিকা, কানাডা এবং ইংলণ্ডের বীমা কোম্পানীগুলির তহবিল প্রধানতঃ কি ভাবে লগ্নী করা হইতেছে—

আমেরিকা

	শতকরা
বন্ধকীসূত্রে	৩৬.৩%
গভর্ণমেণ্ট এবং মিউনিসিপাল সিকিউরিটী প্রভৃতি	৮.৬%
রেল কোম্পানীর বণ্ড	১৫.৬%
জনহিতকর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান (ট্রাম, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানী প্রভৃতি)	৯.৬%
অন্যবিধ লিমিটেড্ কোম্পানীর সেয়ার	৩.২%
পলিশি বন্ধক সূত্রে	১৮.৪%
জমিজমা	৪.০%
নগদ	১.০%
অন্যান্য	৩.৪%

কানাডা

বন্ধকীসূত্রে	৩৪.৪২%
গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপাল সিকিউরিটী	২৮.৬১%
যৌথ কারবারের সেয়ার	১৪.৮%
জমিজমা	২.৮৭%

ইংলণ্ড

বন্ধকীসূত্রে	২১.২%
গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী	২০.৪%
সেয়ার বাজারে চল্‌তি অন্যান্য সিকিউরিটী	৪২.৩%
বিবিধ	১০.১%

কোম্পানীর কাগজ বনাম বন্ধকী-দাদন

উপরোক্ত তুলনা-মূলক আলোচনা হইতে একটা জিনিষ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায় যে ভারতবর্ষের কোম্পানীগুলি তাহাদের তহবিলের প্রধান অংশ কোম্পানীর কাগজেই লগ্নী করিয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহাদের নিকট হইতে আমরা বীমা-ব্যবসায়ের বর্ণ-পরিচয় শিক্ষা করিয়াছি এবং যাঁহাদের পরিচালন-কুশলতা ও ব্যবসা-বুদ্ধির কাছে আমরা এখনও নাবালক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাঁহারা কিন্তু কোম্পানীর কাগজকে লগ্নী ব্যাপারে বিশেষ আমল দেন নাই। সুতরাং কেন যে ভারতীয় কোম্পানীগুলি ভিন্ন নীতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার আলোচনার প্রয়োজন আছে।

কোম্পানী কাগজ-প্রীতির কারণ কি?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বীমা-তহবিল নিরাপদে খাটাইয়া সর্ব্বোচ্চ সুদ অর্জ্জন করা কোম্পানী পরিচালকগণের একটা প্রধান কর্ত্তব্য এবং দায়িত্ব। ইহা অত্যন্ত শ্রমসাপেক্ষ। ইহার জন্য বিশেষ সতর্কতার সহিত বহু অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিবেচনার প্রয়োজন এবং দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকিলে ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইবার আশঙ্কা থাকে। অপর দিকে কোম্পানীর কাগজ ক্রয় করিতে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি বা বিবেচনার প্রয়োজন হয় না; সহজ অনায়াসলভ্য পথে চলিবার সুবিধা অনেক—এই ভাবিয়াই সম্ভবতঃ এদেশের বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ কোম্পানীর কাগজ খরিদ করিয়া নিজ নিজ দায়িত্ব লাঘব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অনেক কোম্পানী তাহাদের পরিচালন বিধিনির্দ্দেশ বা আর্টিকেলস্ অফ এ্যাসোসিয়েশনে (Articles of Association) ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন যে তাঁহাদিগকে কোম্পানীর কাগজেই বেশী টাকা খাটাইতে হইবে। পরিচালকগণের বিচার বুদ্ধি এবং সততার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারিয়াই বোধ হয় এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইরূপ সতর্কতা কোম্পানী-পরিচালনা সহজ করিতে পারে বটে, কিন্তু বীমাকারীর সকলপ্রকার কল্যাণের দিক দিয়া ইহা দ্বারা সফলতা অর্জ্জন করা সম্ভব হয় না। বিলাতের সুবিখ্যাত বীমা কোম্পানী প্রভিডেণ্ট মিউচুয়াল লাইফ্ এ্যাসোসিয়েশনের ম্যানেজার এবং এ্যাক্‌চুয়ারী মিঃ কুট্‌স্ বলেন—

"বীমা কোম্পানীর পরিচালকগণ যদি লগ্নী ব্যাপারে অনভিজ্ঞ এবং অশিক্ষিত হন তবে আর্টিকেলস্ অফ্ এ্যাসোসিয়েশনে কোম্পানীর কাগজে টাকা লগ্নীর নির্দ্দেশ দেওয়া চলিতে পারে; কিন্তু বীমা কোম্পানীর পরিচালনায় এ পদ্ধতি সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; কেন না ইহার ফলে সুদ অর্জ্জন করিবার ক্ষমতা কম হইয়া যায় বলিয়া চাঁদার পরিমাণ বর্দ্ধিত হারে ধার্য্য করিতে হয়।"

ভারতবর্ষের অনেক কোম্পানীর চাঁদার হার এবং তুলনায় বোনাসের হার লক্ষ্য করিলেই মিঃ কুট্‌সের মতামতের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

এদেশের বীমা কোম্পানীগুলির কোম্পানীর কাগজের

প্রতি পক্ষপাতিত্বের আর একটি কারণ এই যে, এদেশের জনসাধারণ কোম্পানীর কাগজ অত্যন্ত নিরাপদ বলিয়া মনে করেন। সরকারের ঋণ পরিশোধ করিবার ক্ষমতার উপর তাঁহাদের বিশ্বাস আছে; এমন কি যাঁহারা গভর্ণমেণ্টের উৎকট বিরুদ্ধবাদী তাঁহারাও অনেকে এইরূপ ধারণাই পোষণ করিয়া থাকেন। কিন্তু জার্ম্মাণী এবং রাশিয়াতে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঋণ অস্বীকারের দৃষ্টান্ত কিছুদিন পূর্ব্বেও লক্ষ্য করা গিয়াছে। আমাদের দেশেও একদল রাজনীতিবিদ্ মনে করেন যে কতকগুলি সরকারী ঋণ ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক অস্বীকার করা উচিত। যদি ভারতবর্ষ কানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্ত হয়, তবে এই মতাবলম্বীদের আশা পূর্ণ হওয়াও বিচিত্র নহে।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন যে, যেহেতু কোম্পানীর কাগজে লগ্নীকৃত টাকা সহজে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায়, অতএব তাহাতেই বীমা কোম্পানীর টাকা দাদন করা উচিত। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে জীবন-বীমা কোম্পানীর টাকা দীর্ঘ মেয়াদে খাটানর পক্ষে কোনও বাধা নাই এবং সহজেই নগদ টাকায় পরিণত করা যায় এমন ভাবে অযথা বেশী টাকা লগ্নী না করিলেও চলে।

আবার কোম্পানীর কাগজে লগ্নী তহবিল যে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? কোম্পানীর কাগজের বাজার-দর যে ভাবে উঠা নামা করে তাহাতে দেখা যায়, কোন কোন সময় কোম্পানীর কাগজে নিযুক্ত মূলধন অর্দ্ধেক উবিয়া গিয়াছে। এইরূপ পড়্তি বাজারে ভ্যালুয়েশন করিবার সময় মূলধনের মূল্যের এই ঘাট্তির দরুণ কোম্পানীর বোনাস দিবার ক্ষমতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়, এমন কি একেবারেই যে বিলুপ্ত হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

কুফলের দৃষ্টান্ত

বিগত মহাযুদ্ধের সময় কোম্পানীর কাগজের মূল্যের এইরূপ ঘাট্তির দরুণ নর্থ ব্রিটিশের ন্যায় সুবৃহৎ কোম্পানীরও বীমাকারিগণের বোনাস পাঁচ বৎসরের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হইয়াছিল এবং গত ১৯৩১ সালে এই কারণে ইংলণ্ডের বিরাট কোম্পানী—প্রুডেন্সিয়াল সে বৎসর বোনাস কমাইয়া দিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম বীমা কোম্পানী মাদ্রাজ ইকুইটেব্‌ল যখন দেউলিয়া হইতে বাধ্য হয়, তখন বীমাকারিগণের প্রাপ্য টাকা পুরাপুরিই তাহাদের তহবিলে ছিল, কিন্তু এই তহবিল সমস্তই কোম্পানীর কাগজে লগ্নী থাকায় তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে বীমাকারিগণ প্রাপ্য টাকা অপেক্ষা বহু কম টাকা প্রাপ্ত হন। যদি এই কোম্পানীর তহবিল সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে সম্পত্তি বন্ধক-মূলে ন্যস্ত থাকিত, তাহা হইলে বীমাকারিগণকে এইরূপ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইত না।

সম্পত্তি বন্ধকে দাদনের সুবিধা

সম্পত্তি বন্ধকমূলে দাদননীতির মূলসূত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে এইরূপ দাদন দ্বারা প্রচুর সুদ লাভ হইতে পারে এবং তদ্বারা বীমাকারিগণের লাভের সুযোগও বেশী থাকে। সম্পত্তিবন্ধকমূলে দাদননীতির মূলসূত্র এইরূপ:—সম্পত্তির মূল্যের শতকরা ৫০।৫৫৲ টাকার বেশী বন্ধকীসূত্রে দেওয়া হয় না। কোন বীমা কোম্পানীই সম্পত্তির সাধারণ উচ্চতম মূল্যের দ্বারা ঋণের পরিমাণ স্থির করেন না। সম্পত্তি হঠাৎ বিক্রয় করিতে হইলে যে নিম্নতম মূল্য পাওয়া যাইতে পারে তাহারই অর্দ্ধেক টাকা তাঁহারা ঋণস্বরূপ দিয়া থাকেন। সুতরাং তহবিলের সমস্ত টাকা ফেরৎ পাইবার জন্য সকল বন্ধকী সম্পত্তিও যদি বিক্রয় করিতে হয়, তবুও তাহার নিজস্ব মূলধন সব সময়েই ফেরৎ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাউক্ যে, একটা সম্পত্তির বাৎসরিক আয় ৫ হাজার টাকা; ইহার সাধারণ মূল্য আয়ের বিশগুণ অর্থাৎ এক লক্ষ টাকা। কিন্তু বীমা কোম্পানী টাকা ধার দিবার সময় বিবেচনা করেন যে সহসা বিক্রয় করিতে গেলে এই সম্পত্তির দরুণ পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশী দাম পাওয়া যাইবে না; সেইজন্য এই সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া ২৫।৩০ হাজারের বেশী টাকা ঋণ কোম্পানী কখনই দেয় না। বাজার দরের যতই ঘাট্তি হউক, এইরূপ লগ্নী ব্যবস্থায় কোম্পানীর দেওয়া ঋণের আসল টাকা কখনই নষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং নিরাপত্তার দিক হইতেও বন্ধকী দাদন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

একথা সর্ব্ববাদীসম্মত যে বন্ধকীসূত্রে দাদনে সুদের পরিমাণ বেশী পাওয়া যায়। সাধারণতঃ এইরূপ দাদনে

শতকরা ৬।৭৲ টাকা সুদ পাওয়া মোটেই কঠিন নয়। এই ভাবে দাদন করিয়া এই বাজারে কোম্পানীর কাগজ অপেক্ষা শতকরা ২—৩ টাকা বেশী সুদ সব সময়েই পাওয়া যায়। অথচ ইহাতে বাজার দরের উঠ্‌তি পড়্‌তির উপর নির্ভর করিতে হয় না। সুতরাং অনেক সময় অনিশ্চিত বাজারে কোম্পানীর কাগজে টাকা খাটাইয়া বীমাকারীদের স্বার্থহানির আশঙ্কা থাকে। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্; ধরা যাক্ ভারতীয় কোনও একটি উন্নতিশীল বীমা কোম্পানি বিশ বৎসর পূর্ব্বে শতকরা বার্ষিক ৭৲ টাকা সুদে ১ লক্ষ টাকা বন্ধকী সূত্রে খাটাইয়াছেন; এই টাকা যদি কোম্পানীর কাগজে খাটান হইত তাহা হইলে ইহার সুদ গড়পড়্‌তা শতকরা ৪॥০ টাকার বেশী পাওয়ার আশা করিতে পারা যাইত না। সুতরাং এখানে শতকরা ২॥০ টাকা বেশী সুদহিসাবে পাওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্য হইতে বন্ধকী কারবারের খরচ বাবদ যদি শতকরা ১৲ টাকাও বাদ দিয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও শতকরা ১॥০ টাকা হারে বেশী সুদ লভ্য হইতেছে এবং এই অতিরিক্ত সুদ যদি আবার শতকরা ৪॥০ টাকায় খাটান যায় তবে কোম্পানী ৪৭,০৫৫৲ পর্য্যন্ত টাকা লাভ করিতে পারে। ইহাতে মূল দাদনী টাকার প্রায় ৪৭% উঠিয়া আসে। সুতরাং মূল সম্পত্তির মূল্য যদি বাজার মন্দার জন্য কমিয়াও যায়, তবুও কোম্পানীর কোন ক্ষতির কারণই থাকে না। অথচ কোম্পানীর কাগজে ঐ টাকা খাটাইয়া এমতাবস্থায় কোম্পানী উপরোক্ত পরিমাণ লাভ হইতে বঞ্চিত হয়।

কোম্পানীর কাগজে লগ্নীর আর একটি গুরুতর অসুবিধা রহিয়াছে। প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন কোনও কোম্পানীর হাতে উদ্বৃত্ত আয়ের একটা বিরাট অংশ প্রতিবৎসর দাদনের সমস্যা উপস্থিত করে, একথা আমরা মুখবন্ধেই বলিয়াছি। বৎসরান্তে কয়েক লক্ষ টাকা একদিন বিনা সুদে পড়িয়া থাকিলে কোম্পানীর পক্ষে মোটা লোকসানের কারণ ঘটে। ইহার মধ্যে গভর্ণমেণ্টের মেয়াদী ঋণ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পরিশোধিত হওয়ার দরুণ যদি কোম্পানীর হাতে টাকা আসিয়া জমা হয় তবে তাহা শীঘ্র শীঘ্র লগ্নী করিতে না পারিলে ক্ষতির কারণ হয় এবং তখন যদি কোম্পানীর কাগজের বাজার দর চড়া থাকে, তাহা হইতে সুদের দিক হইতেও কোম্পানীর বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। অনেক ভারতীয় কোম্পানী এখন এইরূপ সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন। বন্ধকীসূত্রে দাদন ব্যাপারে এইরূপ অঘটন কখনও উপস্থিত হয় না; এদিক দিয়াও বন্ধকী সূত্রের লগ্নীর শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন।

কোম্পানীর কাগজে তহবিল লগ্নী বীমাকারীর কল্যাণের পক্ষে একটা অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। বিলাতে মিউনিসিপালিটিগুলি জলসরবরাহ, বিজলিবাতি, ট্রাম প্রভৃতি নিজেরা পরিচালন করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য যে বিপুল টাকা ঋণ লইবার দরকার হয় তাহা বীমা কোম্পানীগুলিই সরবরাহ করিয়া থাকে এবং সে দেশের "বিল্ডিং সোসাইটি" বা "গৃহনির্ম্মাণ সমিতি" গুলিও বীমা কোম্পানীর অর্থেই প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ পায়; বীমাকোম্পানীগুলিও অল্প সুদের কোম্পানীর কাগজ পরিহার করিয়া সমাজের কল্যাণকর এই সকল কাজে সহায়তা করিয়া টাকার উপর যথেষ্ট লাভ প্রাপ্ত হয়। আমাদের দেশের ব্যবস্থায় কোম্পানীদের পক্ষে এভাবে টাকা লগ্নী করা সম্ভবপর হয় না। কিন্তু অন্যভাবে গৃহহীন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ভারতীয় বীমাকোম্পানীগুলি যে সাহায্য করিতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল নহে।



শিবপুরে তৃতীয় বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী

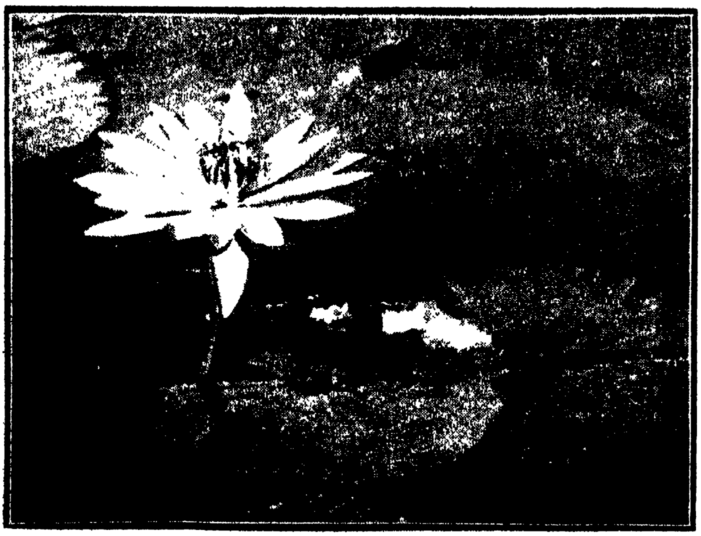
শ্রীসুধাংশুকুমার রায়

সম্প্রতি কলিকাতার উপকণ্ঠে শিবপুরে 'হিন্দুস্থান সঙ্ঘের' উদ্যোগে তথাকার পাবলিক লাইব্রেরী হলে একটি চিত্র ও কারুশিল্পের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রদর্শনীটি ২৬শে জানুয়ারী হইতে এক সপ্তাহকাল খোলা ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিনশতখানি চিত্র, চার পাঁচখানি ভাস্কর্য্য, কুড়ি পঁচিশখানি আলোকচিত্র, কিছু আল্পনা, কিছু রঙিন ঘট, কিছু সূচীশিল্পের নমুনা—প্রদর্শনীতে স্থান পাইয়াছিল; তাহা ছাড়া হাওড়ার দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত কয়েকশত প্রাচীন মুদ্রা ও নানাদেশের নানাবিধ প্রাচীন কারুশিল্পের নিদর্শনও প্রদর্শিত হইয়াছিল।



গোমাতা ও বৎস্য—আর্য্য সিং বীর, শালিমার, হাওড়া

একমাসের মধ্যে কলিকাতায় বিভিন্নস্থানে তিনটি বড় প্রদর্শনী হইয়া যাওয়ার পর এ রকম আর একটি চিত্র-প্রদর্শনী দেখিবার পূর্ব্বে মনে একটি সন্দেহ ও অনিচ্ছার ভাব ছিল। কিন্তু প্রদর্শনীটি দেখিবার পর আনন্দিতই হইয়াছি। ইহার প্রধান কারণ এই যে, প্রদর্শনীটি কোন দলবিশেষের বা ব্যক্তিগত প্রচারমূলক অনুষ্ঠান হয় নি। এমন কি যদিও এখানে অধিকাংশ ছবিই ছাত্র ও তরুণ শিল্পীদের নিকট হইতে আসিয়াছিল—প্রদর্শনীটির ষ্টাণ্ডার্ড বেশ উচ্চ ছিল। শিল্পী যামিনী রায়, সুধাংশু চৌধুরী, পূর্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির ১০।১২ খানি চিত্র প্রদর্শনীতে স্থান পাইলেও এই তরুণশিল্পীদের চিত্রপ্রদর্শনীটির মধ্যে বর্ত্তমান বাঙ্গালার চিত্রশিল্পের ধারা কোন দিকে চলিতেছে, তাহার একটি সমগ্র রূপের অস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। কলিকাতার অন্যান্য প্রদর্শনীতে তরুণদের অঙ্কিত চিত্রগুলিকে অন্যান্য পুরাতন বিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রাবলীর মধ্যে একত্র করিয়া টাঙ্গান হয়। ইহাতে তরুণ চিত্রকরদের চিত্রের ধারা বোঝা যায় না। বিশেষ করিয়া বিখ্যাত চিত্র-করদের চিত্রগুলির আওতায় পড়িয়া বেচারা তরুণেরা পুরোনো শেকড়-তোলা বটগাছের নীচেকার ছোটগাছের মত ভাঙ্গনে মারা পড়ে। তাই এই শিব-পুরের প্রদর্শনীটির মধ্যে তরুণ শিল্পীদের জয়যাত্রার যে নিদর্শন পাইয়াছি, তা অখণ্ড ও অনায়াসলব্ধ।



শালুক ফুল—আর্য্য সিং বীর, শালিমার, হাওড়া

আমরা অবনীন্দ্রনাথের বর্ণের মায়াময় চিত্র, নন্দলালের পদ্ধতিগত পরীক্ষামূলক চিত্র, অসিতকুমারের রেখা-



শাড়ীর পাড়—ত্রিপুরেশ্বর মুখোপাধ্যায়

(হিন্দুস্থান সংঘের সৌজন্যে)

ছন্দে অঙ্কিত সহজ লাবণ্যময় চিত্র, ক্ষিতীন্দ্রনাথের সযত্ন অঙ্কিত রেখাপ্রধান চিত্র প্রভৃতি অনেকদিন হইতে দেখিয়া



মা—অবনী সেন

অভ্যস্ত হইয়াছি। কিন্তু আমরা কি কেবল অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিতকুমার ও ক্ষিতীন্দ্রনাথকে লইয়া আন্দোলন করিয়াই কাটাইব? ইতিমধ্যে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই অচিন্ত্য, বুদ্ধ, প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি আধুনিকদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তেমনই শিল্পক্ষেত্রেও তরুণশিল্পীরা তাঁহাদের শিল্পসম্ভার লইয়া হাজির হইয়াছেন।

বাঙ্গালী-জীবনের নানা দৃশ্য ও ঘটনাকে আধুনিক শিল্পীরা তাঁহাদের চিত্রের বিষয় বস্তু করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে যে চিত্রকলার সৃষ্টি হইতেছে তাহাকে সত্যই বাঙ্গালীর নিজস্ব চিত্রকলা বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি এবং



ফিরতি পথে—অবনী সেন

এই সমস্ত চিত্রাবলীর মধ্যে যে প্রাণ-রসের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা আশা করি দর্শকের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আনন্দ দান করিবে। বাঙ্গালার মাঝি, ভিক্ষুক, গাড়োয়ান, মেছুনী, ঝাড়ুদার, কুলী, রিক্সাওয়ালা, দোকানদার—ইহাদের ছবির মধ্যে তুলিয়া ধরিয়াছেন—এই সমস্ত তরুণ চিত্রকরেরা। সাধারণতঃ ছবির মধ্যে এমন লোকেদের আঁকা হয়, যাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালী জনসাধারণের পরিচয় থাকে না, এমন কি তাঁহারা অধিকাংশই হন দেবতা বা যক্ষ! তরুণ চিত্রকরেরা বাঙ্গালার চিত্রকলায় এই যে চাল এনেছেন

তাহারই মধ্যে ভবিষ্যতের ভারতীয় চিত্রের উন্নতির বীজ গুপ্ত রহিয়াছে।

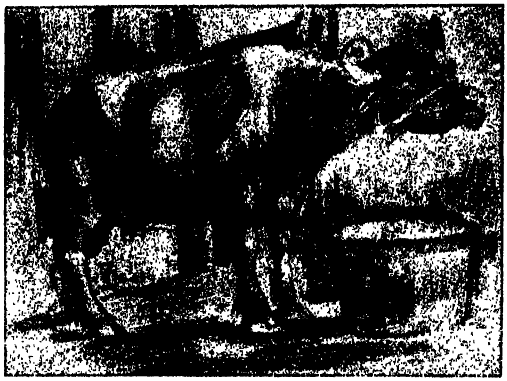
তরুণ শিল্পীরা যে কেবল চিত্রের মধ্যে বিষয়গত স্বাতন্ত্র্য আনিয়াছেন তা নয়, বিষয়বস্তুর বাহন দেশী-বিদেশী নানা অঙ্কন পদ্ধতিকেও তাঁহারা স্বকীয় প্রতিভার দ্বারা উন্নত করিয়াছেন; অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে এই সমস্ত প্রতিভাবান তরুণ শিল্পীর সংখ্যা বেশী নয় এবং জনসাধারণের সঙ্গে এই সমস্ত তরুণ শিল্পীর প্রকৃষ্ট পরিচয় এখনও ঘটে ওঠে নি। তাই পরিচয়পত্রের মত এই ছোট প্রবন্ধখানিকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করিতে



রান্নাঘর—হরিধন দত্ত

সাহস করিয়াছি। প্রদর্শনীতে সর্ব্বপ্রথমই নজরে পড়ে অবনী সেনের মোটা পেন্সিলে আঁকা ছবিগুলি। Academy of Fine Arts-এর বিগত তিন বৎসরের প্রদর্শনীতে তাঁর এই ধরণের ছবিগুলি কলা-রসিকদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু একাডেমির প্রদর্শনীতে তাঁহার ৪।৫ খানার বেশী ছবি থাকে না বলিয়া শিল্পীর প্রতিভার বহুমুখীনতার পরিচয় আমরা পূর্ব্বে পাই নাই—যদিও সে সব ছবির মধ্যে ক্ষমতার প্রকাশ ছিল।

শিবপুর প্রদর্শনীটিতে তাঁহার ২৫।২৬ খানি নানা ধরণের চিত্রের সমাবেশ হওয়ায় অবনীবাবুর চিত্রাবলীর মধ্যে সাহসিক ও সংক্ষিপ্ত রেখাপাতের প্রয়োগ ক্ষেত্রের নির্ব্বাচনে



মহিষ—অবনী সেন (হিন্দুস্থান সংঘের সৌজন্যে)

তিনি যে অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়া থাকেন তা সকলেরই চোখে ধরা পড়েছে। তাঁর "ফিরতি পথে" "মা" ও "Study" চিত্র কয়খানির মধ্যে এই গুণটির সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। তিনি 'মা' চিত্রখানিতে শিশুটির যে সংক্ষেপ অথচ বিশিষ্ট অর্থপূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন এবং 'ফিরতি পথে' চিত্রে মায়ের কাপড়ের ভাঁজ ইত্যাদির যে পরিপূর্ণ রূপ উদঘাটিত করিয়াছেন তাহা এই সংক্ষিপ্ত, সাহসিক



আস্তাবল—সরসী রায়

ও সংযমীর রেখাপাতের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। অবনীবাবুর আর একখানি চিত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যাইতে

পারে। তাঁর অঙ্কিত "মহিষ" চিত্রখানিতে মহিষের সমস্ত অবয়বের মধ্যে তিনি বেশ একটি গুরুত্ব (weight) ফুটিয়ে তুলেছেন, যা মহিষের মত ভারি জীবের মধ্যে একান্তভাবে প্রকাশমান। ছবির মধ্যে বিষয়বস্তুর রূপ ও ভঙ্গি অনুযায়ী গুরুত্ব আরোপ করা কম কৃতিত্বের কথা নহে। প্রদর্শনীতে অবনীবাবুর 'গরুর গাড়ী' চিত্রখানিও এই গুরুত্ব আরোপ ব্যাপারে তাঁহার নৈপুণ্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। ছবিখানিতে গাড়ীর বোঝাই মালের আয়তনের দ্বারা শিল্পী যদিও আমাদের মালের মোট ওজনের কোনই ইসারা দেন নাই বা মালের সুস্পষ্ট রূপও আমাদের নিকট পরিস্ফুট করিয়া তোলেন নাই, তথাপি গরু দুটির অঙ্গ-



বালিকা—বিমল দে

প্রত্যঙ্গের কৌশলপূর্ণ অঙ্কনের দ্বারা তাহাদের অসমর্থতা, পরিশ্রান্ততা এবং অচল অবস্থার তিনি যে অব্যর্থ রূপদান করিয়াছেন তাহারই সাহায্যে শিল্পীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের সিদ্ধিলাভ ঘটিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিমল শীল অঙ্কিত ২খানি ঘোড়ার চিত্রের প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। মোটা পেন্সিলের সাহায্যে সামান্য কয়েকটি টানে ছবির মধ্যে জীবন্তভাব প্রকাশের সম্ভাবনা যে কতখানি, তাহা এই দুটি ছবি দেখিলে সুস্পষ্ট ধরা যায়। সূক্ষ্ম পেন্সিল-স্কেচের মধ্যে বিমল দে মহাশয়ের 'বালিকা' একখানি সুন্দর চিত্র। চিত্রখানির মধ্যে শিল্পীর স্বকীয় প্রকাশভঙ্গি বিদ্যমান। গোবর্দ্ধন আশের "বস্তী" একখানি উঁচুদরের কলার-স্কেচ—কিন্তু Colour Sketch ছবির



গো-যান—অবনী সেন

মধ্যে বস্তীর মানুষ বা গৃহপালিত প্রাণীর কোন চিত্রই শিল্পী আঁকেন নি। এতে ছবিখানিকে পরিপূর্ণ বলে মনে হয় না।

প্রদর্শনীতে যে কয়খানি তৈলচিত্র আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে হরিধন দত্ত মহাশয়ের "রান্নাঘর" আমাদের চমৎকৃত করিয়াছে।

ছবিখানিতে শিল্পী রংয়ের আধুনিক লেপ-পদ্ধতির প্রয়োগ করিয়াছেন। সমগ্র ছবিটি বিষয়বস্তুর সুসংযোজনার দ্বারা



বস্তী—গোবর্দ্ধন আশ

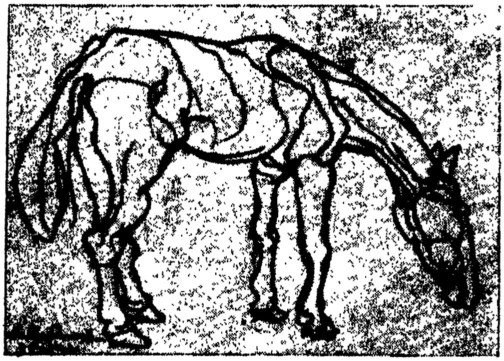
উপভোগ্য করিয়া তোলা হইয়াছে, বিশেষ ভাবে রান্নাঘরের কর্ত্রী-মায়ের রান্নার প্রতি একাগ্রতা ও সঙ্গে সঙ্গে বাম বাহুর বেষ্টনে

কন্তার প্রতি স্নেহ ও আশ্রয় দানের ভঙ্গি—শিল্পী অতি নিপুণ-ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। পাশে ছোট একটি শিশু মাটীতে বসিয়া ছোট ছোট ভাঙ্গা কাঠ উনুনে দিয়া খেলা করিতেছে,



কাঠুরিয়া—সুবোধ রায়

দেওয়ালে মায়ের ছায়া পড়িয়াছে। সমস্তটি মিলিয়া ছবিখানি শিল্পীর অপূর্ব্ব ক্ষমতার প্রমাণ দিতেছে। সরসী রায়ের "আস্তাবল", সুবোধ রায়ের "কাঠুরিয়া" সুন্দর পরিকল্পনা ও নির্ভুল অঙ্কন প্রণালীর জন্য প্রশংসার যোগ্য। ত্রিপুরেশ্বর

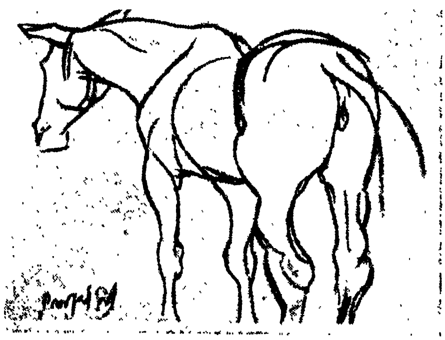


ঘোড়া—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখোপাধ্যায়ের নানাপ্রকার কল্কার ও পাড়ের নক্সা খুব ভাল হইয়াছিল।

আলোকচিত্র বিভাগে শিল্পী আর্য্য সিং বীর মহাশয়ের চিত্রগুলি বাস্তবিক খুব উঁচু দরের—কারণ তাঁহার আলোকচিত্রের মধ্যে শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির নমুনা পাওয়া যায়। তাঁর "গোমাতা ও বৎস্য" এবং "শালুক ফুল" আলোকচিত্র দুইখানির মধ্যে আলো-ছায়ার সমাবেশ এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গত স্থাপনার দ্বারা তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন তা আশা করি চিত্রামোদীদের আনন্দ দিবে।

কারুশিল্পবিভাগে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "চাঁদমালাগুলি" রংয়ের ঔজ্জ্বল্যে ও পরিকল্পনার অভিনবত্বে প্রশংসালাভে সমর্থ হইয়াছিল। কয়েকটি সূচীশিল্পের নিদর্শনে



ঘোড়া—বিমল শীল

(যদিও অনেক এসেছিল) নক্সাগুলির মধ্যে দেশীবিদেশী "পাঁচমিশুলি" ধরণ থাকায় আদৌ ভাল লাগে নাই। হাওড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অঙ্কিত কয়েকখানি পিঁড়ী-চিত্র বেশ ভাল হইয়াছিল।

সর্ব্বশেষে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তা হিন্দুস্থান সঙ্ঘের সভ্যদের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। কারণ কলিকাতার বাহিরে এ রকম বড় চিত্রপ্রদর্শনী খাড়া করার মূলে যে পরিশ্রম ও কষ্টের প্রয়োজন, তাঁহারা তাহা আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করিয়াছিলেন।



অব্যক্ত

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভোরবেলা আসিয়া পৌছিয়াছে।

চারিদিকে পাহাড়ের সারি আকাশের বুকে গিয়া মিশিয়াছে, তাহাদের গায়ের উপর যেন ধোঁয়ার মত মেঘগুলি জমিয়া সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝাপ্‌সা, মেঘলা করিয়া তুলিয়াছে। ভারি মিষ্ট ঝির্‌ঝিরে হাওয়া, মনকে যেন অকারণে পুলকিত করিয়া তোলে।

চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এই প্রথম সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে পা দিল। কলিকাতার গরম, কলিকাতার ধোঁয়া, কলিকাতার কোলাহল, ঐ সব আবেষ্টনীর মধ্যেই এতকাল কাটিয়াছে; স্কুল, কলেজ, অফিস, বাড়ী—সবই ঐটুকু সীমা-রেখার মধ্যে। কত আনন্দ, কত শোক, জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটির পিছনে চিরকালের মত সেই একই পৃষ্ঠপট রহিয়াছে—কলিকাতা। আজ এই চল্লিশ বছর পরে সে প্রথম তাহার চিরকালের অভ্যস্ত পৃষ্ঠপটকে পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, তাই সমস্ত ব্যাপারটা যেন তাহার কাছে বিরাট বিস্ময়, অসীম কৌতূহল—প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা।

স্নান সারিয়া সে বাংলোর বারান্দায় আসিয়া বসিল। নির্জ্জন, ভারি নির্জ্জন; যেন পরম শান্তি, পরম বিশ্রামের মত সেই গভীর নির্জ্জনতা তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। আজ আর অফিস যাওয়ার তাড়া নাই, কিম্বা ছুটীর দিনে তাস খেলিবার ডাক নাই, সে-সব সে পিছনে রাখিয়া আসিয়াছে; আজ তাহার নূতন জীবন আরম্ভ হইল—

দূর পাহাড়ের দিকে চাহিয়া নিজের জীবনের একান্ত গতানুগতিকতার কথা ভাবিতে লাগিল। কোথাও কোন বৈচিত্র্য নাই, সব যথানিয়মে চলিয়া আসিয়াছে। পাঁচজন ছেলের সহিত বাড়িয়াছে, খেলিয়াছে, স্কুলে গিয়াছে; স্কুল ছাড়িয়া কলেজে ঢুকিয়াছে; তখনকার দিনে যেটাকে অভিনব বলিয়া বোধ হইয়াছে, আজ তাহা নিতান্ত একাকার বলিয়া মনে হইতেছে। তার পর কলেজ ছাড়িয়াছে, বিবাহ হইয়াছে—বাবারই অফিসে চাকরীতে ঢুকিয়াছে; ইহাতেও সেই গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম হয় নাই—বাবা মারা গিয়াছেন, মা মারা গিয়াছেন, তাহার নিজের ছেলে-মেয়ে হইয়াছে—তাহারা একটু একটু করিয়া বড় হইয়াছে, কিন্তু সকলের চারিপাশে সেই একটিমাত্র আব্‌হাওয়া। চির-পরিচিত সেই কলতলা এবং সেই সংকীর্ণ বারান্দা—নীল আকাশের প্রসারতাকে বাধা দিয়া পূবে বোসেদের বাড়ী এবং দক্ষিণে মুখুয্যেরা; সবই সেই এক, পরিবর্ত্তনহীন!

আজ ছুটী মিলিয়াছে। বুক দুর্ব্বল, দেহে রক্ত কম, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন চেঞ্জে না গেলে চলিবে না। তাই জোর করিয়া চিরপরিচিত, চিরাভ্যস্ত সংসারকে পিছনে রাখিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে নূতনত্বের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে।

এখানে তাহার মাসতুতো ভাই আছে—রেলের ওভারসীয়ার। বিবাহ করে নাই, বাংলো খালিই পড়িয়া থাকে। যাক্—আশ্রয় মিলিয়াছে ভালই।

সমস্ত রাত্রি সে গাড়ীতে বসিয়াছিল, বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য আজ কিছুমাত্র তন্দ্রালুতা নাই। এই একেবারে নূতন পারিপার্শ্বিকের অত্যাশ্চর্য্য অভিনবতা চোখ হইতে নিদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে।

ইন্দিরা বলিয়া দিয়াছে, পৌছেই চিঠি দিও। কখনও বাইরে যাও নি—কি বিপদে পড়বে, কে জানে!

বেচারী ইন্দু! সংসারের নাগপাশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া আনা গেল না। খরচ বেশী—অসুবিধাও ঢের।···ছোট্ট টিপয়খানি টানিয়া লইয়া কাগজ-কলম গুছাইয়া লিখিতে বসিল। সহসা তাহার মনে হইল, এই তাহার প্রিয়া-সকাশে দ্বিতীয় চিঠি!

শ্বশুরবাড়ী তাহার কলিকাতাতেই—চিঠি লিখিবার প্রয়োজন বেশী হয় নাই। তা-ছাড়া ইন্দু তাহার কাছ-ছাড়া বড়-একটা হয় নাই। তবু প্রথম-যৌবনে প্রেমপত্র লিখিবার মোহে কি একটা চিঠি সে লিখিয়াছিল, আবোল-তাবোল, যা'-তা'—সে কথা আজ মনেও নাই। তার পর এই চিঠি—

কি বলিয়া সম্বোধন করিবে কে জানে! 'প্রিয়তমাসু' লিখিবে?···চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল ইন্দিরার পঁয়ত্রিশ

বছরের গৃহিণী-মূর্ত্তি, বড় যেন লজ্জাবোধ করিতে লাগিল। না, 'প্রিয়তমাসু' আর লেখা যায় না। তাহার চেয়ে 'কল্যাণীয়াসু' বরং চলে। স্ত্রী সকল অবস্থাতেই কল্যাণীয়া—

সে 'কল্যাণীয়াসু' দিয়াই পত্র সুরু করিল।

লিখিল,—

'কল্যাণীয়াসু—

আমি নির্ব্বিবাদে ও নিরাপদে আসিয়া পৌছিয়াছি। গাড়ীতে বিশেষ ভীড় ছিল না, কিন্তু আমি মোটেই ঘুমাইতে পারি নাই। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আশ্চর্য্য ঠেকিতেছিল আমার কাছে, যে অবাক হইয়া চাহিয়া বসিয়াছিলাম। তা ছাড়া তোমার ও ছেলেমেয়েদের কথা মনে হইয়া বড়ই খারাপ লাগিতেছিল।

এখানে জায়গাটি ভালই, চারিদিকে পাহাড় এবং খুব নির্জ্জন। দাদার বাংলোটিও নদীর গায়ে। দাদা ত সব সময় প্রায় লাইনেই থাকেন—তবে চাকরগুলি খুব ভদ্র, অত্যন্ত যত্ন করিতেছে। মোটের উপর আমার শারীরিক আরামের জন্য কোনও ভয় নাই। আমার জন্য ভাবিও না।'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া সে কলম থামাইল। আর কি লেখা যায়?···অনেক ভাবিয়াও বিশেষ কিছু মাথায় আসিল না। তখন সে সুরু করিল—

'তোমরা খুব সাবধানে থাকিবে এবং তুমি প্রায়ই চিঠি লিখিবে। ছোট খুকীকে সাবধানে রাখিও, বেশী যেন ঠাণ্ডা না লাগে। গোকুলকে নিয়মিত পড়াশুনা করিতে বলিও। সতীশের ছেলেমেয়েরা, মেজবৌমা সব কে-কেমন থাকে জানাইও। তোমার নিজের শরীর খুব সাবধান, বেশী অত্যাচার, অনিয়ম করিও না। কারণ এখন তুমি পড়িলে আর কে কাহাকে দেখিবে? ছেলেমেয়ে ও বাটীস্থ সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইও—'

এই পর্য্যন্ত লিখিয়া সহসা যেন সে নিজে-নিজেই বিব্রত হইয়া পড়িল! এইবার ইন্দিরার সম্বন্ধে কি লেখা উচিত? সে কলম হাতে করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল—

মনে পড়িতে লাগিল বিবাহের সময়ের কথা। লজ্জা-জড়িতা, নতমুখী বধূ ইন্দিরার কথা, তাহাদের প্রথম প্রণয় সম্ভাষণ! তারপর একটু-একটু করিয়া চারিপাশের গতানুগতিকতার মধ্যে সে কেমন ভাবে মিশিয়া গেল! সে তাহার পরামর্শদাত্রী, সে তাহার গৃহিণী, তবুও সে সেই চিরাভ্যস্ত সংসারেরই একটা অঙ্গ। ঘনিষ্ঠতা যত বাড়িয়া উঠিয়াছে, যত সে হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে আসিয়াছে, ততই যেন তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু ভাবিবার সম্ভাবনা লোপ পাইয়াছে; সে আছে, সে অপরিহার্য্য, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত!

কিন্তু আজ সেই সংসার হইতে দূরে আসিয়া তাহার কথা ভাবিতে মনটা যেন তোলপাড় করিয়া উঠিল। আজ সহসা মনে হইল—সে ইন্দিরাকে ভালবাসে এবং সে কথাটা সে তাহাকে জানাইতে চায়! সে লিখিতে চায়—'এবং তুমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিও।' সমস্ত বুককে নাড়া দিয়া যেন মনে হইল, হাঁ ইহাই সে চায়, বুক-ভরিয়া বলিতে চায় আমি তোমায় ভালবাসি! ওগো তোমায় ভালবাসি।

কিন্তু ছিঃ! তাহার কানের ডগা যেন লাল হইয়া উঠিল। দিন-দিন তিলে-তিলে তাহাদের সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে আজ আর তাহাকে প্রথম প্রণয়-সম্ভাষণের মত 'তোমায় ভালবাসি' একথা লেখা যায় না। সংসারের সুখে-দুঃখে, নিভৃত পরামর্শে যে একান্ত আপন হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকে সে কেমন করিয়া শুষ্ক কালির অক্ষরে লিখিবে 'তুমি আমার ভালবাসা জানিও?'···সে বড় লজ্জার কথা! আর এই চল্লিশ বছর বয়সে? ছিঃ!

সহসা যেন তাহার মনে হইল তাহার সত্তা তাহার দেহ হইতে পৃথক হইয়া বাহিরে বসিয়া তাহার এই চিঠি লেখার বিড়ম্বনা লক্ষ্য করিতেছে। একথার কোনও মানে নাই, অর্থহীন, তবুও যেন সেই রকম কি একটা মনে হইতেছে। মনে হইতেছে যেন সে বিদ্রূপ করিয়া হাসিতেছে—তাহাকেই!

সে জোর করিয়া কলম দোয়াতে ডুবাইল, লিখিল—

'এবং তুমি আমার—'

কিন্তু তার পর? কথাটার যে মীমাংসাই হয় নাই এখনও।

কি লিখিবে? 'আশীর্ব্বাদ জানিও', শুধু আশীর্ব্বাদ?

মনের মধ্যে আজ এই ভালবাসার আলোড়ন যেন তাহাকে পীড়িত করিতেছিল—সে ভাবিবার চেষ্টা করিল ইন্দিরার গৃহিণী-মূর্ত্তি। তাহার পঁয়ত্রিশ বছরের আট-সাঁট দেহ, তাহার মধ্যে আর কোনও স্বপ্নের ঠাঁই আছে কি?

সেই বকাবকি, ছেলেমেয়েদের শাসন, চাকরদের সঙ্গে বাজারের হিসাব বোঝা, রান্নাঘরের ভীষণ-তাপের মধ্যে ছোট-যায়ের সঙ্গে রাঁধিতে বসা—

ইহার কাছে ভালবাসা নিবেদন, সে-ত বৃথা! সে হয় ত বুঝিবে ইহা শুধু চিঠি-লেখার বাঁধা গৎ, ইহাই নিয়ম। চিঠির শেষের দিকটা সে হয়ত মনোযোগ দিয়া পড়িবেই না, একবার চোখ বুলাইয়া মেয়ের হাতে দিয়া বলিবে—আমার বালিশের নীচে রেখে আয়, আর বাজার বেলায় একখানা পোষ্টকার্ড আন্‌তে বলিস্‌। জবাব দিতে হবে।

এ ভালবাসা জানানোর মধ্যে যে বিশেষ কিছু আছে, সে একবারও সে-কথা ভাবিবে না, ভাবা সম্ভবও নয়। আঠারো বছরের জীবন-যাত্রাকে পিছনে ফেলিয়া আজ সে নূতন করিয়া প্রেম নিবেদন করিতে চায়—এ-কথা কেমন করিয়া ইন্দু ভাবিবে?

না—সে আবার কলম দোয়াতে ডুবাইল। কিন্তু শুধু আশীর্ব্বাদ—শুষ্ক আশীর্ব্বাদ মাত্র?...

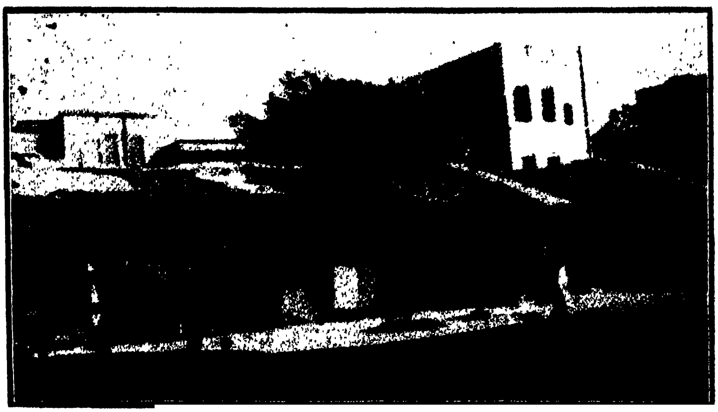
সে আরও মিনিটখানেক ভাবিয়া লিখিল, 'এবং তুমি আমার স্নেহাশীর্ব্বাদ জানিও।'

দূর পাহাড়ের চূড়া ছাড়াইয়া সূর্য্যদেব তখন মধ্য গগনে আসিয়াছিল, পাহাড়ের উপরকার মেঘলা আবরণ ঘুচিয়া গিয়াছে, তাহার কঠিন বন্ধুর দেহ এখন চক্ষুর সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রত্যাবর্ত্তন

শ্রীনিত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বেলা তিনটায় বৃন্দিসির উদ্দেশে নাপোলি ছাড়লাম; কিছু-দূর বেশ সমতল দ্রাক্ষাক্ষেত্র, ছোট ছোট গ্রাম এবং মাঠ লাইনের দুধারে চোখে পড়তে লাগল। তারপর একে একে চারদিক থেকে পাহাড় দৈত্য মাথা তুলে ট্রেণটিকে নিজেদের দুর্ভেদ্য ব্যূহের মধ্যে ঘিরে ফেল্‌লে। বহুদূর পর্য্যন্ত একটি নদী বরাবর লাইনের সঙ্গ ধরে চলেছে। অনেকগুলি ছোট বড় টানেল ফুঁড়ে আমাদের ট্রেণ এই সব পাহাড় দৈত্যদের আগল ভেঙ্গে প্রাণপণশক্তিতে ছুট্‌তে লাগল। ফোগীয়া (Foggia) পার হয়ে ২।৩টি ষ্টেশনের পর আমাদের ট্রেণটা হঠাৎ ভীষণ ঝাঁকানি খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে ট্রেণের মধ্যে খড়-কুটোর বৃষ্টি সুরু হল। সকলে আতঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ল। খড় কুটোর বৃষ্টি একটু কম্‌লে—চোখ মেলবার মত অবস্থা হলে—অনেকে গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে—ব্যাপারটা কি জানবার এবং দেখবার চেষ্টা কোরলেন। আমি তাদের আতঙ্কের অংশ নিলেও ভাষানভিজ্ঞতার জন্য আশা ভরসার অংশ পেলাম না—প্রায় আধঘণ্টা খানেকের পর ট্রেণ আবার চল্‌লো। এবার আমি থার্ড ক্লাশে চলেছিলাম। থার্ড ক্লাশেও লোকের হুড়োহুড়ি বা ভীড় নাই। শুধু বেঞ্চিগুলি কাঠের, সেকেণ্ডক্লাশ বা ফার্ষ্টক্লাশের বেঞ্চিগুলি বনাতের গদীর, তা ছাড়া কাঞ্চন মূল্যের জন্য কৌলীন্য কিছু



প্রাসাদময়ী নগরীর বুকে চমৎকার প্রাসাদের নমুনা

বেশী—এই যা তফাৎ। কাঠের কঠোরতা এড়াবার জন্য বেশী দূরগামী যাত্রীরা ষ্টেশন থেকে বসবার এবং ঠেস্ দেবার বালিশ কিনে নেন। কন্‌ডাক্টারের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে সশস্ত্র সান্ত্রী

ঘোরে। বারি (Bari) থেকে চাঁদের আলোয় মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যেতে লাগল; দিগন্তবিস্তৃত—জ্যোৎস্নাপ্লাবিত সমুদ্র শান্ত, গর্জ্জনহীন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা পরে



রাস্তার ধারে আবর্জ্জনার গাড়ী থেকে ফুটপাথ অবরোধ করে গরুটি দিব্যি নিশ্চিন্তে আহার কোরছে

রাত্রি প্রায় বারটার সময় ট্রেণ বৃন্দিসি পৌঁছিল। বৃন্দিসি ছোট ষ্টেশন। ষ্টেশনে কুলি পাওয়া গেল না। একটা



রাস্তার ধারে ফুটপাথের ওপর জনারণ্যের মাঝে পালোয়ান সিং দিব্যি নিশ্চিন্তে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাধা কোরছে

পুলিশকে আকারে ঈঙ্গিতে বলায় সে একজন লোক ডেকে দিল। সামনে ট্যাক্সি না পাওয়ায় ল্যাণ্ডো করে ইণ্টার-ন্যাশনাল হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এখানে ঘরে জল এবং বাথরুম-ওয়ালা কামরার ভাড়া ২৪ থেকে ৪০ লিরার এবং শুধু ঘরের সর্ব্বাপেক্ষা কম ভাড়া ১২ লিরার।

বৃন্দিসি সহরটি ছোট-খাট। তবে বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—বড় রাস্তাগুলি পিচ্ দেওয়া নয়, পাথর বাঁধান; কিন্তু প্রধান রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তাগুলি পাথর বাঁধান বা পিচ দেওয়া নয়—কাজেই রাস্তায় জল দেবার পর কাদা হয়। ইউরোপে কাদা-ওয়ালা সহুরে রাস্তা এই প্রথম দেখলাম। সহরটি নাপোলী অপেক্ষা অনেক পরিচ্ছন্ন, তবে আরও শান্ত ও কর্ম্মহীন। এখানে ট্রাম নাই। মটর খুব কম; ঘোড়া, গাধা এবং অশ্বতর বাহিত যানই বেশী চোখে পড়ে, মাঝে মাঝে কাশীধামসুলভ গর্দ্দভ সঙ্গীতও শুনা যায়। অন্যান্য সহরের তুলনায় রাস্তায় লোকজনের ভীড়ও খুব কম। রাস্তায় ছেলের দল মহানন্দে খেলা জুড়ে দিয়েছে; চার পাঁচ বছরের

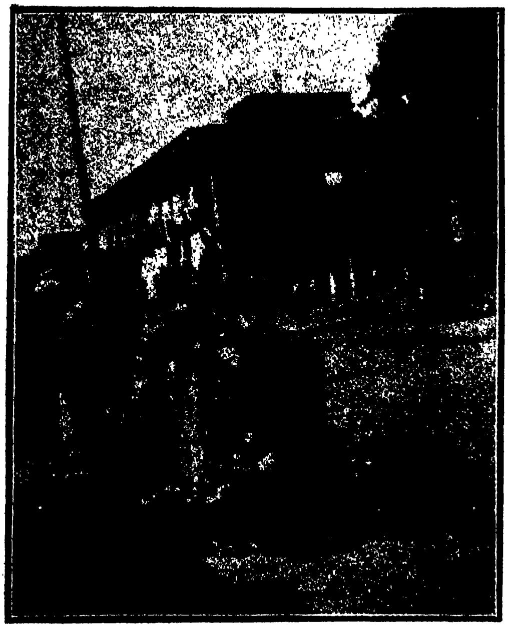


বাসের ধারে ভিখিরীর দল

ছোট ছোট ছেলেরাও নির্ভয়ে মাঝ রাস্তায় খেলায় মত্ত, যানবাহনের ভয় এতই কম। বৃন্দিসিকে দেখে মনেই হয় না যে এটা একটা ইউরোপীয় সহর বা বন্দর, ভারতবর্ষে মফঃস্বলের বড় সহরের সঙ্গে এর তুলনা করা চলে। অপ্রধান রাস্তাগুলির ধারে প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই নীচু জানালার সামনে বসে বাড়ীর মেয়েদিকে কোন না কোন হাতের কাজ করতে দেখা যায়। সহরটির মধ্যে সহুরে আবহাওয়া কোথাও নাই। রাস্তার উপর ছেলের দল লোহার চাকা ঠেঙ্গাতে ঠেঙ্গাতে চলেছে, নূতন বাড়ীর দেয়ালে ধুলো ভরা

রাখিয়েছে, অপরের বাড়ীর রংকরা দরজার খড়ি বা কালা দিয়ে ছেলেরা নাম লিখেছে—এমনি সব অসহুরে অনেক কাণ্ডই চোখে পড়ে। পুরুষ এবং নারীদের পোষাক পরিচ্ছদও সহুরে নয়, তবে পরিচ্ছন্ন। লোকগুলি মোটেই ব্যস্ত নয়, প্রত্যেকেরই গতি অলস—রাস্তার উপর অনেকেই দল বেঁধে জটলা করে। বন্দরটিও মেঠো গোছের—ঘর বাড়ী ত নাই, একটা ক্রেণও নাই। এখানে একদিন সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম—ইতালীয়ান ফিল্ম-শিল্প খুব উন্নত বলে মনে হল না।

নির্দ্দিষ্ট দিনে কন্তে ভার্দ্দে জাহাজ (Conte-verde) বন্দরে ভিড়লো। ইণ্টার ন্যশানাল হোটেলটি বন্দরের প্রায় উপরেই।



ফুটপাথের ওপর আবর্জ্জনার স্তূপ ডাষ্টবিন থেকে উপ্‌চে পোড়ছে। বুভুক্ষু ভিক্ষুক আবর্জ্জনার মধ্যে আহার্য্য খুঁজছে

হোটেল থেকে জিনিষ-পত্র নিয়ে জাহাজের কাছে এলাম। অনেক আগেই "হেগে" এই জাহাজের টিকিট কিনেছিলাম; কাজেই জাহাজের যাত্রীদের তালিকায় আমার নামও ছাপা ছিল। তাই জিনিষপত্রগুলো জাহাজের পাশে যেতেই তাদের মালিকের পরিচয়পত্র নিয়ে চটপট জাহাজে উঠে গেল। কিন্তু গোল বাধল মালিকের ওঠা নিয়ে। যতবারই সিঁড়ি বেয়ে জাহাজে উঠতে যাই, ততবারই সিঁড়ির মুখের লোকটা কি বলে—আর বাধা দেয়। পাশপোর্ট দেখালাম—টিকিট কেনার নজির দেখালাম—তবু সে ছাড়বে না—সামনের একটা ছোট ঘর দেখিয়ে প্রত্যেক বারই আমাকে বাধা



ফুটপাথের ওপর কুলী এবং বেকারদের তাসের আড্ডা

দিতে লাগলো। হঠাৎ মনে হ'ল ইটালি ছাড়বার একটা অনুমতি-পত্র হয়ত নিতে হবে; সেই ঘরে গেলাম—কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানকার মালিকের দেখা পেলাম না। ফিরে এসে সিঁড়ি রক্ষককে ইঙ্গিতে বল্লাম, ওখানে কোন লোক নেই—আমার মালপত্র সমস্ত উঠে গেছে—আমাকে দয়া করে যেতে দাও, এখনি জাহাজ ছাড়বে—সে কিন্তু নাছোড়বান্দা। অবশেষে সাত আটবার ঘোরাঘুরির পর সেই ঘরের রাজকর্ম্মচারীর দেখা মিল্‌লো। তিনি সকল উৎকণ্ঠা এবং আতঙ্কের অবসান করে পাশপোর্টে একটি ষ্ট্যাম্প



ধর্ম্মতলা ও চৌরঙ্গীর মোড়ে একটি চমৎকার দৃশ্য

মেরে সই দিলেন। প্রত্যাখ্যান-লাঞ্ছিত মন জয়ের উল্লাসে খুশী হয়ে উঠলো, এবার আবেদন নিবেদনের বদলে পাশ-

পোর্টটা সিঁড়ি রক্ষকের নাকের উপর ধরে অনুমতির অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি বেয়ে তড়্‌তড়্‌ করে উঠে গেলাম।

জাহাজের ডেকে গিয়ে দাঁড়াতেই চার পাঁচটি কালো



বৌবাজারের ফুটপাথের ওপর লটারীর টিকিট বিক্রয়ের প্রকাশ্য আপিস বোসেছে

মুখের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। পরিচয়ে জানলাম—তারা সবাই বাঙ্গালী!

এর পর আবার সমুদ্রের বুকে জাহাজ চল্‌তে লাগলো, প্রত্যাবর্তন সুরু হ'ল। ভূমধ্যসাগর বেশ শান্ত ছিল। দ্বিতীয় দিন অনন্ত সমুদ্রের কোলে একদিকে অনেকগুলি দ্বীপের অস্পষ্ট ছায়া দেখা গেল, শুন্‌লাম দ্বীপগুলি গ্রীসের নিকটবর্ত্তী। বৃন্দিসি ছাড়ার পর তৃতীয় দিনে জাহাজ



দরিদ্র নিরাশ্রয় ফুটপাথেই নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে

আফ্রিকার আলেক্‌জান্দ্রিয়া বন্দরে বিকালবেলায় নঙ্গর করলে। জাহাজেই পোর্ট-কনট্রোল-অফিসার ওঠেন, তাঁর কাছ থেকে আলেকজান্দ্রিয়ায় নামবার অনুমতি স্বরূপ পাশপোর্টে ছাপ নিয়ে আমরা একদলে পাঁচজন বাঙ্গালী ও একজন সিন্ধু-বাসী—আলেকজান্দ্রিয়া সহর দেখতে বেরুলাম।

জাহাজ থেকে নামবামাত্র আমাদের দলকে ২০।২৫ জন মিশরীয় ঘিরে ফেল্‌লে; কেউ গাইড, কেউ গাড়োয়ান, কেউ সিগারেটবিক্রেতা, কেউ বেচ্‌তে চায় ফেজ্‌, কেউ বা ফটো। লোকগুলো ভয়ানক নাছোড়বান্দা এবং বিশ্রী জ্বালাতন করে। অনেকদূর পর্য্যন্ত তারা পেছন পেছন ধাওয়া করলে। কিছুই নেব না বলাতেও রেহাই নাই। অবশেষে অনেকেই নিরাশ হ'য়ে ফিরলো,



মান্ধাতা আমলের রিকসা ও বিংশ শতাব্দীর ট্রাম পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে চোলেছে

একজন নাছোড়বান্দা গাইড কিছুতেই সঙ্গ ছাড়ল না। আমরা গাইড নেব না—অথচ সেও পথ না দেখিয়ে ছাড়বে না। শেষে সেই অসভ্য আমার কাঁধে হাত দিয়ে অন্য একহাতে আমার হাতটা ধরে ঝাঁকি দিয়ে বল্লে—"চল আমার সঙ্গে, আমি অফিসিয়াল গাইড"। তার এই অশিষ্ট আচরণে বিরক্ত হ'য়ে আমি বল্লাম "যাও, বিরক্ত করো না"। সে অমনি চোখ রাঙিয়ে বলে উঠ্‌লো—"কি, মনে কর কি

তুমি? আমি ব্যবসাদার, তোমার মতন লোক আমার জুতার সমান"। এর পর সে অযথা অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিলে। আমি উত্তেজিত হ'য়ে ধমক দিতেই সে থাপ্পড় উস্‌কিয়ে বললে—"এ ভারতবর্ষ নয় সাবধান"। সামনে তাকিয়ে দেখি বাঙ্গালী সঙ্গীর দল সমস্ত ব্যাপারটা দেখে এবং শুনেও বিনা ভ্রূক্ষেপে নির্ব্বিকার ভাবে আগিয়ে চলেছে। স্বদেশবাসীর এই ব্যবহারে এবং নিজের দৈহিক শক্তির অক্ষমতার জন্য সেই ইতরের অপমান হজম করতে বাধ্য হ'লাম। এর পর সে সামনে এগিয়ে গিয়ে মিষ্টার সেনগুপ্তকে এইভাবে বিরক্ত করায় এবং তিনিও তাকে সরে যেতে বলায় তাঁকে আমারই মত অপমানিত কোরলে। হয়ত লোকটা অভিজ্ঞতার ফলে বুঝেছিল যে ভারতবাসীরা ভীরু, ভদ্রতার আবরণে তাদের দৈহিক অক্ষমতাকে তারা লুকিয়ে রাখে, তাই এইভাবে একজনের পর অন্য একজনকে সে অপমান করতে সাহস করেছিল; কিন্তু বেচারী ঠোকলো এক চীনার কাছে। চীনবাসী ভদ্রলোক সস্ত্রীক, আমাদের দলের আগে আগে চলছিলেন। তাঁকে বিরক্ত করতেই তিনি লোকটাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেন, এতে সে তার বাঁধা বুলি "তুই আমার জুতোর সমান, শূয়ার, ড্যাম" ইত্যাদি ব'লে ভদ্রলোককে মারতে উদ্যত হ'ল। এইবার আমাদের দল তাকে গিয়ে বাধা দিলে—এতে বেশ বচসা বেধে গেল। ইতিমধ্যে একজন তদ্দেশীয় জু ভদ্রলোক ঘটনাস্থলে এসে সেই লোকটিকে স্থানীয় ভাষায় কি বল্লেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে মনে হ'ল—আমাদের সঙ্গে অনর্থক ঝগড়া করার জন্য ভদ্রলোক তাকে তিরস্কার ক'রছেন। অতঃপর লোকটি আমাদিগকে ছেড়ে জু ভদ্রলোকের ওপর তার অপরাজেয় বাক্যবাণ প্রয়োগ ক'রতে লাগল! ভদ্রলোক ইতরের সঙ্গে মৌখিক বচসা না করে তাকে বেশ ঘা কতক বসিয়ে দিলেন, এতে লোকটি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশে একটি ইটের গাদায় ফেলে তাঁর মাথা লক্ষ্য করে একটি প্রকাণ্ড ইট তুল্‌লে। আমরা সকলে মিলে এবং তদ্দেশীয় কয়েকজন লোক বাধা দেওয়ায় ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হল। এমন একটা ব্যাপারেও পুলিশের টিকি দেখা গেল না। এই ঘটনার পর আমাদের জাহাজের বিভিন্ন যাত্রীদল একসঙ্গে মিশে একটা বড় দল হয়ে গেল—চীনে, ভারতীয়, ফরাসী ও স্পেনীয় একসঙ্গে চল্‌লাম। কিছুদূর গিয়ে সহর প্রবেশের মুখে স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগকে আলাদা আলাদা ভাবে খানাতল্লাসী ক'রলে এবং কর দেবার মত তামাক, সিগারেট, এসেন্স ইত্যাদি জিনিষপত্র আছে কি না জিজ্ঞাসা করে ছেড়ে দিলে। আলেকজান্দ্রিয়া সহরটি অত্যন্ত নোংরা। ফুটপাথের ধারে বাড়ীর দেওয়ালময় প্রস্রাবের দাগ ও দুর্গন্ধ। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত আলখাল্লা পরা নোংরা লোকগুলোকে দেখ্‌লে কেমন একটা আতঙ্ক হয়। এদের দৃষ্টি বড় লোলুপ ও লোভী। ইউরোপের কোথাও রাস্তায় একলা ঘুরতে ভয় করে না—কিন্তু এখানকার লোকগুলির চেহারা, পোষাক, দৃষ্টি, ভঙ্গি এবং সহরের বিশ্রী আবহাওয়া সত্যই মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। দল বেঁধে ঘোরা সত্ত্বেও সকলের মনেই যে একটা শঙ্কা উঁকি মারছিল, একথা সকলেই স্বীকার ক'রলেন। রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া খুব কম—তবে ট্রাম আছে, বাসও চল্‌ছে। বন্দরের অপর দিকের সমুদ্রকুলের (quay) ঘর-বাড়ী এবং রাস্তাঘাটগুলি অনেক আধুনিক এবং পরিষ্কার। সহরের সমস্ত অংশই ইউরোপের সহুরে ছাপ বর্জ্জিত। রাস্তার ধারে ফুটপাথগুলিকে সহরের দরিদ্র এবং ভিক্ষুকেরা শয্যা হিসাবে ব্যবহার ক'রছে; রাস্তার ধারে দোকানে লোকগুলো জট্‌লা ক'রছে, তাস খেলছে, গুড়গুড়িতে তামাক টান্‌তে টান্‌তে গল্প ক'রছে—এত অলস জীবন নাপোলীতেও দেখি নাই। ইউরোপের পর এই অলস, নোংরা, অসভ্য, ভদ্রতা-বর্জ্জিত, ভয়ঙ্কর জায়গাটি কারও ভাল লাগে নাই।

রাত্রি এগারটায় জাহাজ আলেকজান্দ্রিয়া ছাড়ল। পরদিন পোর্ট সৈয়দ পৌছলাম। পোর্ট সৈয়দ আলেকজান্দ্রিয়ার তুলনায় অনেক ভাল, লোকজনকে দেখলে ভয় হয় না, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অনেক বেশী। তবে বন্দরের নিত্যসঙ্গী বেশ্যার দালাল, অশ্লীল ছবিবিক্রেতা, পাঁচ মিনিটের ফটো তোলার ফটোগ্রাফার, নেকলেস, ফুল বিক্রেতা ইত্যাদির দল যাত্রীদিগকে ধরতে ছাড়ে না; তবে এরা কেউই বেশী বিরক্ত করে না। যাবার সময় কায়রো থেকে সোজা এসে সন্ধ্যায় জাহাজ ধরেছিলাম, কাজেই পোর্টসৈয়দের সব অংশ দেখা হয় নাই। এবার আমরা কয়েকজনে পদব্রজেই সহরের অনেকখানি বেড়িয়ে এলাম। ইউরোপের পর মধ্যাহ্নের রৌদ্র এখানে বেশ প্রখর লাগছিল, সহরটি

মোটামুটি পরিষ্কার এবং ছোট। এখানে জাহাজ তেল এবং জল নিলে। এর পর সুয়েজে সামান্যক্ষণের জন্য জাহাজ দাঁড়িয়ে যে সব যাত্রীরা পোর্ট সৈয়দে জাহাজ ছেড়ে কায়রো দেখ্‌তে গিয়েছিল তাহাদিগকে তুলে নিলে।

সুয়েজএর পর বেশ গরম পড়ল। কেবিনে ও জাহাজে সর্ব্বত্র হাওয়া-পাম্প হাওয়া ছড়াতে লাগল। এর পর দিগন্ত-পরিব্যাপ্ত অসীম নীল সমুদ্রের কোলে আমাদের জাহাজখানা দামাল ছেলের মত যেন হামা টেনে চল্‌তে লাগল। অনেকদিন একঘেয়ে স্থল দেখার পর আবার এই অনন্ত নীলাম্বুরাশি বড় মিষ্টি লাগ্‌ল। দিনরাত্রির মধ্যে তাস খেলা, বই পড়া, আর চুপ ক'রে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ ছিল না। ডেক-চেয়ারে সমস্ত দেহখানা এলিয়ে দিয়ে অবিচ্ছিন্ন আলস্যে সমুদ্রের বুকের উপর দিগন্ত-প্রসারী দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে চুপ করে একলা চল্‌তে ভাল লাগে। জাহাজের জলকাটার একটানা ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ কাণে আসে, চোখ বুজলে মনে হয় ঠিক যেন বাঙ্গালাদেশে বর্ষার দিনে খিল দিয়ে ঘরে বসে আছি, বাইরে ঝপ্‌ ঝপ্‌ ক'রে বৃষ্টি হ'চ্চে—আর মাঝে মাঝে যেন একটা ঝড়ো হাওয়া দরজার ফাঁকে হুম্‌কি মেরে যাচ্চে। সকালে এবং বিকেল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ আরাম লাগে; কিন্তু দুপুরবেলা এর বুকের দিকে তাকাতে কষ্ট হয়—সূর্য্যকিরণ এর বিস্তৃত মসৃণ বুকে যেন পিছলে পড়ে, তার দিকে তাকালে চোখে কেমন একটা আলোর ঝল্‌কানি লাগে।

আরব সাগরে জাহাজের হাসপাতালে একজন যাত্রী নিউমোনিয়া রোগে মারা গেলেন। তাঁকে সিসের কফিনে পুরে জাহাজের নির্দ্দিষ্ট রাস্তা থেকে জাহাজ সরে গিয়ে তাঁর জল-সমাধি দিয়ে এলো। জাহাজে ক্যাপ্টেনই ধর্ম্মগুরু এবং তাঁর প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা আছে।

এই জাহাজে ভারতীয় প্রায় ১৪ জন ছিলাম; তার মধ্যে বাঙ্গালীই দশ জন। এ ছাড়া স্পেনীয়, জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, চীনা যাত্রীও ছিল, ইংরাজ যাত্রী মাত্র একজন। সম্ভবতঃ ভিন্ন-দেশীয় জাহাজ কোম্পানী বলেই এবং নিজেদের জাতির জাহাজ আছে বলেই ইংরাজেরা এ লাইনে খুব কম ভ্রমণ করে। যাত্রীদের মধ্যে চীনার সংখ্যাই বেশী; এদের অনেকেই জার্ম্মাণ এবং ফরাসী মেয়ে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। ইতালিয়ান লাইনের ব্যবহার পি এণ্ড ও (P & O) কোম্পানীর ব্যবহারের চেয়ে অনেক ভাল। ভারতীয় যাত্রীদের জন্য ভাত, ডাল, মাটন, মুরগী প্রভৃতি আমিষ নিরামিষ দু' রকমই খাবার থাকত এবং খাবারের সঙ্গে যথেষ্ট ফল দিতে আপত্তি করতো না। পি এণ্ড ওর মত ঘড়ি-ধরা নিয়ম-কানুন এদের নয়। ৫।১০ মিনিট আগু-পেছু এলে খাবার পরিবেশনে বিরক্তি প্রকাশ করে না। এদের স্নানের জল পরিষ্কার—অর্থাৎ নোনা নয় এবং স্নানের ঘরে ঠাণ্ডা গরম দু' রকম জলের শাওয়ার আছে। পি এণ্ড ও কোম্পানীর রাওলপিণ্ডি জাহাজ যদিও এটির চেয়ে বড়, তবুও তাতে এ সবের সুবিধা ছিল না। এর কেবিনগুলিতে পাম্প-চালিত হাওয়ার ব্যবস্থা ছাড়াও ছোট ছোট ফ্যান আছে, তবু আমরা এসেছিলাম সেকেণ্ড ইকনমিক ক্লাসে। এই শ্রেণীতে অসুবিধার মধ্যে শুধু বেড়াবার বা খেলবার জন্য ডেকের জায়গা কম। এই ডেকের মাঝেই খানিকটা জায়গা জুড়ে জাহাজ কোম্পানী একটা অস্থায়ী স্নানের চৌবাচ্চা (Swimming Pool) তৈরী করে দিয়েছিল। কারণ এদিকে গরম ক্রমশই বেশী পড়্‌ছিল।

জাহাজে একদিন চীনা যাত্রীরা তাদের গান, বক্তৃতা, ম্যাজিক প্রভৃতি দেখিয়ে "চাইনিজ ডে" ক'রলেন। তাঁদের দেখাদেখি আমরাও অর্থাৎ বাঙ্গালীরাও একদিন "ইণ্ডিয়ান ডে" ক'রলাম।

দূর হতে যখন বোম্বাইয়ের উপকূল দেখা গেল, সমস্ত ভারতীয় বাইরে এসে একেবারে রেলিংএর উপর ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু কূল দেখা যাওয়া এবং বন্দরে জাহাজ ভেড়ার মধ্যে অনেকখানি সময় কেটে গেল। জাহাজ বন্দরে ভিড়বামাত্র আনন্দে বুকখানা নেচে উঠ্‌লো, বহু অচেনা অজানার সঙ্গে পরিচয়ের পর আজ চিরপরিচিতের কোলে প্রত্যাবর্ত্তন। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দিয়ে তার অন্ধ, খঞ্জ, কুষ্ঠগ্রস্ত ভিখিরির দলকে বন্দরে রাস্তায় ষ্টেশনে ভিক্ষা করতে দেখে, তার কটিবাসপরিহিত নগ্নদেহ অপরিচ্ছন্ন দারিদ্র্য-পীড়িত সন্তানদিগকে দেখে, কেবলই মনে হতে লাগলো—স্বাধীন এবং পরাধীন দেশের তফাৎ এইখানেই। পশ্চিমের হাওয়ায় নিশ্বাস নেওয়ার পর ভারতের হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়; পরাধীনতার বিষ এর সর্ব্বত্রে এমনভাবে ছড়িয়ে আছে।

বোম্বাইএ চুঙ্গী বিভাগ (customs) আমার সঙ্গের কয়েকটা খেলনা নিয়ে গোলমাল বাধালে। ইটালী থেকে বাড়ীর ছেলেদের জন্ত কয়েকটা খেলনা, পুতুল, টিনের লাটু ইত্যাদি কিনেছিলাম। বোম্বাইএর চুঙ্গী কর্ত্তারা দাবী করলেন—সেগুলার উপর ট্যাক্স দিতে হবে। বল্লাম—ওগুলোর দাম হয়ত পাঁচ ছ' আনা, কি ট্যাক্স নেবে নাও। তারা দাবী করলে—কেনার ক্যাশমেমো। সে গুলা রাখার কোন প্রয়োজন বোধ না করায় বহু পূর্ব্বেই ফেলে দিয়েছিলাম। যাই হোক্ অনেকখানি সময় নষ্ট করার পর এখান থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। এবার সঙ্গের পাউণ্ডগুলো ভাঙ্গিয়ে টাকা করবার পালা। কুকের লোক বল্লে, সেদিন শিবরাত্রি থাকায় ব্যাঙ্ক এবং তাদের অফিস বন্ধ। মহাবিপদ—ট্যাক্সি ও কুলি ভাড়ার টাকা এবং রেল-মাশুল এখানকার টাকাতেই দিতে হবে, রাজার দেশের পাউণ্ড এখানে অচল; বহু কষ্টে বন্দরেই এক জায়গায় বেশী বাটা দিয়ে কয়েকটি পাউণ্ড ভাঙ্গিয়ে নিলাম। বন্দর থেকেই জাহাজের বন্ধুরা কে কোথায় যে ছড়িয়ে পড়লেন্, ঠিক্ করা গেল না। বোম্বাই-প্রবাসী আমার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে উঠলাম্। তিনি দয়া করে বন্দর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। সেইদিনই কলিকাতার উদ্দেশে বোম্বাই ছাড়লাম। ইউরোপের সহরগুলোর তুলনায় আমাদের সহরগুলোকে এক একটা বিশ্রী অসামঞ্জস্যের সমাবেশ ও বিসদৃশ ব্যাপার ব'লে মনে হয়। কলিকাতা ভারতের শ্রেষ্ঠ সহর, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ মহানগরী। বিদেশী পর্য্যটকদের কাছে কলিকাতার পরিচয় দেওয়া হয়—প্রাসাদময়ী নগরী (City of Palaces)। কিন্তু এই মহানগরীকে যখন ইউরোপের বিভিন্নদেশের রাজধানীগুলি দেখার পর দেখ্লাম—ব্যথায়, বেদনায়, বিরক্তিতে মন এর উপর বিরূপ হয়ে উঠল।

আপনাদের অনেকেরই কলিকাতার সঙ্গে পরিচয় আছে। যাঁদের বিদেশের নগরের সঙ্গে পরিচয় নাই, তাঁরা ভারতের দরিদ্র গ্রামগুলির বা অন্যান্ত সহরের তুলনায় কলিকাতার ঐশ্বর্য্য ও অলঙ্কারের প্রভায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। আমি অস্বীকার ক'র্ছি না যে কলিকাতা ঐশ্বর্য্যময়ী, তাকে প্রাসাদময়ী নগরী বলা খুব বেশী বাহুল্য উক্তি নয়। কিন্তু তবু যাঁরা ভ্রমণকারীর দৃষ্টি নিয়ে একে দেখেছেন, তাঁরা একে অনায়াসেই ভিক্ষুকময়ী নগরী (city of beggers) অথবা 'অদ্ভুত নগরী' ব'ল্তে পারেন। কলিকাতার প্রাসাদময়ী রূপ আপনারা অনেকেই দেখেছেন; আমি শুধু এর বিসদৃশতা ও অসামঞ্জস্যগুলো সংক্ষেপে ব'লব। এ রূপ যে আপনারা দেখেন নাই তা নয়, তবে অনেকেই দেখ্তে দেখ্তে হয়ত এমন অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন যে এর বিসদৃশতা চোখে ঠেকে না। পশ্চিম থেকে ফিরে আসার পর এই ঐশ্বর্য্যময়ী নগরীর যে বিশ্রী রূপ চোখে পড়ে, শুধু সেইটুকু ব'লেই আমার এই দীর্ঘ ভ্রমণকাহিনী শেষ ক'রব।

কলিকাতার সবচেয়ে বড় বিস্ময়—তার নিজের নামে কোন রেল ষ্টেশন নাই। কোন বিদেশী ভারতে পা দিয়ে কলিকাতা আসবার জন্য যদি রেলের টাইম টেবিলে তার নাম খোঁজে, তবে হতাশ হয়ে শেষে রায় দেবে—ভারতবর্ষে কলিকাতা ব'লে কোন সহর নাই—আর থাক্লেও সেখানে রেলপথে যাওয়া যায় না। (লণ্ডনেরও অবশ্য এই দশা।)

দ্বিতীয় বিস্ময়, এখানকার অদ্ভুত জনমণ্ডলী। কায়রোতে দেখেছি—সেখানকার জনসমাজের পরিচ্ছদ বেশভূষা সকলেরই প্রায় এক রকম, ঐশ্বর্য্যের তারতম্য অনুসারে পরিচ্ছদের চাকচিক্যে তফাৎ হয় মাত্র। এডেন, মাল্টা এবং ইউরোপের সর্ব্বত্র প্রায় এই জিনিষই চোখে প'ড়েছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে টুপী, কোট-পেণ্ট্লুন ও জুতা পরে; অবস্থার তারতম্য অনুসারে বেশভূষার চাকচিক্য কম বেশী হয় মাত্র। কিন্তু অদ্ভুত সহর এই কলিকাতা। হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে সামনেই পড়ে বড়-বাজার; এখানে এসে বিদেশী বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাবে—এই পথে যাদের ভিড় তাদের কারও পরণে ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবী, মাথা খালি; কারও বা মাথায় পাগড়ী, কাপড়টা পরবার ধরণ অন্য রকম; কারও পরণে শুদ্ধ মাত্র একটি ময়লা কটিবাস, সারা অঙ্গ নগ্ন; কেউ রংদার বাহারে লুঙ্গী ও মাথায় কেজ পোরেছে; কারও পরণে ঢিলে পাজামা, ভুঁড়ির উপর চুড়িদারের ঝুল, ফলের দোকানে ব'সে গুড়-গুড়িতে তামাক টান্‌ছে; কেউ ধুতির ওপর হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বা গলাবন্দ কোট পরেছে; কেউ বা পুরোদস্তুর, কেউ আধাআধি কোট প্যাণ্টধারী। এ সহরের নিজস্ব বেশভূষা যে কি—বিদেশীর সাধ্য নাই যে তা স্থির করে। তেমনই পাচমিশেলী এর ভাষাও। বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী,

ভাটিয়া, পেশোয়ারী, কাবুলী, চীনে, উড়ে, মদ্রবাসী, পার্শী, বোম্বাইওয়ালা, হিন্দুস্থানী প্রত্যেকেই তাদের বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প'রে, নিজেদের ভাষায় কসরত ক'রে রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, দোকানে, ব্যাঙ্কে ভিড় লাগিয়েছে। সংখ্যায় এরা প্রায় সবাই সমান ; কাজেই বিদেশীর চোখে এদেশের অপরূপ বেশ বিন্যাসে ও অদ্ভুত ভাষায় বিস্ময় লাগবারই কথা।

তৃতীয় বিস্ময়,মহানগরীর প্রাসাদগুলি। এমন অসমাঞ্জস্য-ভাবে রাস্তার দুধারে বাড়ী পশ্চিমের কোন সহরেই দেখা যায় না। বড়বাজারের কথাই ধরুন ; সে রাস্তা বিদেশীর চোখে প্রথম পড়ে। এর দুধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, কিন্তু প্রত্যেকটি পরস্পর থেকে ভিন্ন ; কি রঙে, কি গঠনভঙ্গীতে, কি স্থাপত্যে। একটি বাড়ী অতিআধুনিক, আগাগোড়া কংক্রীটের কাজ—ঠিক তার পাশেরটি জরাজীর্ণ, এখানে সেখানে কতকগুলি টিনের তালি নিয়ে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে, সামনের সেকেলে বারান্দার রেলিংগুলো পতনোন্মুখ—আবার তার পাশের বাড়ীতে হয়ত এত বেশী রংএর বাহুল্য যে দৃষ্টিকটু। এই বিশাল বাড়ীগুলির অধিকাংশ এত ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত যে পশ্চিমের কোন সম-অবস্থা-সম্পন্ন লোক ঐ ধরণের কুঠরীতে বাস করার কথা ভাবতেও পারে না। প্রাসাদময়ী নগরীর প্রাসাদের বিসদৃশতা শুধু বড়-বাজারেই নয়—চৌরঙ্গী, ভবানীপুর, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সার্কুলার রোড এবং কলিকাতার আরও অনেক প্রধান প্রধান রাস্তার উপরেও চোখে পড়ে। স্থাপত্যে, রঙে, বয়সে, গঠনভঙ্গীতে পার্থক্য ছাড়াও প্রকাণ্ড কংক্রীটের বাড়ীর পাশে ছোট ছোট খোলা অথবা টীনের চালা ঘরগুলি শুধু দৃষ্টিকটু নয়, সহরের সৌন্দর্য্যের বিশেষ হানিকর। বিদেশীরা এইগুলি নগরবাসীদের সূক্ষ্মসৌন্দর্য্য-বোধের অভাবের দৃষ্টান্তস্বরূপই মনে করে।

চতুর্থ বিস্ময়—কলিকাতার দোকানপাট। রাস্তার দুধারে ফল, মণিহারী, মিষ্টি, ট্রাঙ্ক, সুটকেশ, কড়াই, বাল্‌তি, পান, বই, কাপড় প্রভৃতি নানা জিনিসের দোকান; অধিকাংশ দোকানেই খদ্দেরকে ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে জিনিস কিন্‌তে হয়। বড় রাস্তার উপর খাবারের দোকান-গুলিতে কাঁচের আলমারির ব্যবস্থা হ'য়েছে—কিন্তু ছোট রাস্তার অনেক দোকানই এ নিয়ম মানে না। এই সব দোকান ছাড়াও ফুটপাথের উপর তেলেভাজা নানা জিনিষ অনাবৃত অবস্থায় বিক্রীত হয়, তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থাই নাই। মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট এবং আরও কয়েকটি রাস্তায় দোকানে গোমাংস বা ছাগমাংস রাস্তার ধারেই ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ দৃশ্য পশ্চিম প্রত্যাগতের চোখে বিসদৃশ বা কটু নয়—কিন্তু আহার্য্যকে এই ভাবে রাস্তার সামনে ধূলো এবং হাজার রকমের রোগজীবাণুর মাঝে অনাবৃত অবস্থায় রাখা দেশবাসীর অজ্ঞতার পরিচায়ক ও পশ্চিমের দোকান পাটের তুলনায় কলিকাতার দোকান-পাট অন্ততঃ দেড়শ দুশ বছর পেছিয়ে আছে। হোয়াইট-ওয়ে-লেডল, আর্ম্মি-নেভি-ষ্টোর এবং লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের কয়েকটি দোকান পশ্চিমের সহরগুলির দোকানের কতকটা পরিচয় দেয়। সে তুলনায় ছোট ছোট ঘরের মধ্যে রাশীকৃত জিনিষের স্তূপের মাঝে উপবিষ্ট এ দেশী দোকানদার এবং সেই দোকান কেমন দেখায়—কতকটা কল্পনা ক'রতে পারেন। অন্য দোকান-গুলি তবু কতকটা বরদাস্ত করা যায়, কিন্তু যখন কলিকাতায় প্রধান প্রধান রাস্তার মাঝে টিনের চালা হ'তে ফেরীওয়ালারা তারস্বরে "লে লে বাবু ; ছ' ছ' পয়সা' ; দো দো আনা নিলামী মাল" "জাপানী মাল ছ' ছ' পয়সা" ইত্যাদি বিভিন্ন আবেদনে সপ্তমে চীৎকার ক'র্ত্তে থাকে এবং কখন কখন তার সঙ্গে ঘণ্টার উৎকট আওয়াজ করে—তখন সত্যই সহরবাসীর বিশেষ ক'রে সহরের বিশিষ্ট নাগরিকদের এবং পুলিশের অর্থাৎ যাদের উপর সহরের শ্রী, সম্পদ ও শান্তি বৃদ্ধির এবং রক্ষার ভার তাদের সুরুচি ও নগরশ্রী জ্ঞানের অভাবে তাদের উপর বিরক্তি এবং ঘৃণার উদ্রেক হয় ; মনে হয় এই জিনিষগুলো কত শ্রুতিকটু, বিশ্রী এবং অসভ্যতার নিদর্শন—তা বুঝবার শক্তি ও রুচি তাঁদের নাই ; আর যদি বা থাকে, তাঁরা কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ।

এর চেয়েও বিশ্রী ফুটপাথের উপর দোকান। লণ্ডন ছাড়া ইউরোপের অন্য সব দেশের রাজধানীর ফুটপাথ এবং রাস্তার চেয়ে কলিকাতার রাস্তা ও ফুটপাথ সরু (নবনির্ম্মিত অঞ্চলগুলির কথা বাদ) ; অথচ জনসংখ্যা ইউরোপের অনেক রাজধানীর চেয়ে কলিকাতার বেশী ; কাজেই এমনই রাস্তায় এবং ফুটপাথে যথেষ্ট ভিড় হয়। আগের চেয়ে বর্ত্তমানে রাস্তায় বাস, মোটর, ট্রাম প্রভৃতি যান বাহনের

সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কাজেই তা' দিকে রাস্তা দিতে গিয়ে পায়ে-চলা পথিকদের রাস্তা ছাড়তে হয়েছে; তাদের জন্য আছে শুধু ফুটপাথগুলি।

এই ফুটপাথের উপর যদি জ্যোতিষী, সন্ন্যাসী, ভিখিরী, চীনেবাদামওয়ালা, পুরণো বইওয়ালা, মনিহারী দোকান, কাটা পোষাকওয়ালা, নাপিত, ফলওয়ালা, ঝুড়িওয়ালা, পুরণো লোহার জিনিসওয়ালা প্রভৃতি বিভিন্ন ব্যবসাদার তাদের পশরা সাজিয়ে ব'সে ব্যবসা চালায়—তা'হলে তারা সহরের শ্রী যে কতখানি হানি করে এবং পথচারীদের কত অসুবিধা ঘটায়—মোটরবিহারী বিশিষ্ট নাগরিকরা তা কি কল্পনা করতে পারেন না? এসবের ওপর যার যেমন খুসী ফুটপাথের ওপর আলো বা ইলেকট্রিকের থামে ছাগল, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি গৃহপালিত জীবগুলি বেঁধে রাখেন। ফুটপাতের ওপরেই গৃহস্থের উনুন ধোঁয়ছে, ফেরীওয়ালা বেগুনী ভাজছে দেখা যায়। ভিখিরী এবং মজুরের দল ফুটপাথগুলিতে গামছা পেতে দিব্যি নিদ্রা দেয়, ঝুড়িগুলির ওপর দল পাকিয়ে ব'সে আড্ডা দেয়, রাস্তার ধারে ফুটপাথ জুড়ে ব'সে থাকে রোগগ্রস্ত আতুরের দল, তাদের পাশেই বিশ্রাম করে গরু, কুকুর, ষাঁড়। এই সব বাধা-বিপত্তি বাঁচিয়ে কলিকাতার পায়ে-চলা নাগরিকদিগকে চ'লতে হয়। অন্য কোন সভ্য দেশে এই অসভ্যতা চলে না—এখানে কেন চল্‌বে? এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করা আবশ্যক—সহরের সংবাদপত্রগুলির সে ভার নেওয়া উচিত। তারা কি এর প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কলিকাতার পঞ্চম বিস্ময়—এর পথবিহারী গো-পাল। সহরের বুকে যানবাহনের মাঝে এমন নিশ্চিন্ত গাম্ভীর্য্যে দল বেঁধে বা একক শৃঙ্গী শ্রেণীকে চোরে বেড়াতে অন্য কোন সভ্য দেশে দেখা যায় না। গড়ের মাঠে গরু চরা তবু মার্জ্জনা করা যায় (ইউরোপের সহরের বুকে এই ধরণের বড় মাঠ গুলিতেও কখন গরু চরতে দেখা যায় না), কিন্তু সহরের বুকে জনবহুল রাস্তার মাঝে এই শৃঙ্গী শ্রেণীকে অবাধে বিচরণ করতে দেখলে যে কোন বিদেশীর মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। এরা সব সময় অহিংস নয়; মাঝে মাঝে এদের মধ্যে যখন মনোমালিন্য ঘটে তখন পুলিশের লাল পাগড়ীকে অগ্রাহ্য করে হিংসানীতির আশ্রয় নিয়ে এমন উপদ্রব আরম্ভ করে যে তার ফলে ছোটখাট দুর্ঘটনা বিরল নয়। তা ছাড়া এই সব স্বেচ্ছাচারীর দল এত অহঙ্কারী যে ট্রাম বাসের ঘণ্টা হর্ণ কিছুই গ্রাহ্য করে না। নির্ব্বিকারভাবে মন্থরগতিতে নিজেদের গন্তব্যপথে চলে।

ষষ্ঠ বিস্ময়—এখানকার যানবাহন। যেমন পাঁচমিশেলি এর লোক, তেমনি অদ্ভুত সমন্বয় ঘটেছে এর যানবাহনে—মানব সভ্যতার প্রথম যুগের গরুরগাড়ী থেকে আধুনিক কালের ট্রাম বাস সব পাশাপাশি চলেছে, মাঝে মাঝে আকাশ পথে সশব্দে এরোপ্লেন উড়তেও দেখা যায়। মানুষে ঠেলা-গাড়ী, গরু-মোষের গাড়ী, রিক্স, অশ্ববাহিত টম্‌টম্ থেকে আরম্ভ করে—ফিটন এবং পাল্কীগাড়ী, মাঝে মাঝে শোভাযাত্রায় চৌঘুড়ি, সাইকেল, মটর, বাস, ট্রাম সব পাশাপাশি চলেছে—এ যেন যানবাহনের ক্রম-বিকাশের চলন্ত প্রদর্শনী। পশ্চিমের নগরগুলিতে গোযান বহুদিন লোপ পেয়েছে—অশ্বযানও বিরল, রিক্স একশ বছরের বুড়ীরাও দেখেছে কিনা সন্দেহ, সাইকেল কয়েকটি ছোট ছোট নগরে চলে—লণ্ডন, পারি বা বের্‌লিনে কাউকে চাপ্‌তে দেখি নাই। কলিকাতায় গরুর গাড়ী থেকে এরোপ্লেন পর্য্যন্ত একসঙ্গে মিশে যাওয়ায় দ্রুতগামী যানগুলির যথেষ্ট অসুবিধা ঘটে এবং মন্থরগতি যানদেরও আশঙ্কার অন্ত থাকে না। যাই হোক্, এদের জন্য আলাদা রাস্তা করা বা মন্থরগতি যানগুলিকে তুলে দেওয়া যখন সম্ভব নয়—তখন সময়ের উপর নির্ভর-করা ছাড়া উপায় নাই।

কলিকাতায় জনসংখ্যা এবং যানবাহনের সংখ্যা যে ভাবে বেড়ে চলেছে এবং দ্রুতগামী যানগুলির বেগ যেভাবে ব্যাহত হচ্ছে—তাতে ভূগর্ভযানের ব্যবস্থার জন্য নাগরিক-দিগকে এবং নাগরিক শ্রেষ্ঠকে এখন থেকে চিন্তা করতে অনুরোধ করা অন্যায় হবে না।

কলিকাতার সপ্তম বিস্ময়—এর প্রাসাদ, প্রাচুর্য্য এবং ঐশ্বর্য্যের মাঝে অপরিসীম দারিদ্র্য এবং নোংরামি। পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য দেশে সহরের বুকে এত ভিক্ষুক দেখতে পাওয়া যায় না। এই ভিক্ষুকদের মধ্যে অনেকে পেশাদার; এই হীন পেশা অবলম্বনের জন্য তাদের চেয়ে বেশী দায়ী জনসমাজ—যারা এদের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখিয়ে এদের এই হীন ব্যবসাকে সাহায্য করেন এবং তাদের চেয়ে বেশী দায়ী সরকার—যে তার প্রজামণ্ডলীর এই হীন নৈতিক অবনতির প্রতিকারের জন্য কোন চেষ্টাই না করে মৌনতা

যারা এই হীন ব্যবসায়ের সম্মতি জানায়। কিন্তু এ ত গেল পেশাদার ভিক্ষুকের কথা। এদের উপর যথেষ্ট ঘৃণা থাকলেও জনসমাজকে ভাবতে অনুরোধ করি—কেন তারা এই হীন ব্যবসা অবলম্বন করেছে। একথা ঠিক, অনেকেই হয়ত বিনা পরিশ্রমে অনায়াসলব্ধ জীবিকার আশায় এই পথ বেছে নিয়েছে; কিন্তু একথা কে অস্বীকার করবে যে এদের মধ্যে অনেকেই জীবিকার জন্য সহস্র চেষ্টা করেও অন্য পথ খুঁজে না পেয়ে বাধ্য হয়ে এই পথ অবলম্বন করেছে। কর্ম্মহারা ছন্নছাড়া জীবনের শেষ পরিণতি ভিক্ষাবৃত্তি। জঠরের জ্বালা নিবারণের জন্য অন্য কোন উপায় না পেলে মানুষ বাধ্য হয় ভিক্ষা করবে—এর জন্য দায়ী কে? তারা—না যারা তাহাদিগকে এই হীনবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করে তারা?

এদের কথা বাদ দিলেও আর এক শ্রেণীর ভিক্ষুক সহরের সর্ব্বত্রই ছড়িয়ে আছে—যারা সত্যই অক্ষম, পঙ্গু, অন্ধ, রোগগ্রস্ত, বিকলাঙ্গ। এদের বিরুদ্ধে বলবার কি আছে? অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত যদি এই সব অসহায়কে রাষ্ট্র থেকে পালনের ব্যবস্থা থাক্‌তো, তাহা হ'লে এদের ভিক্ষাবৃত্তিকে দোষ দেওয়া চলতো। কিন্তু তা যখন নেই, তখন সহরের বুকে দারিদ্র্যের এই সব প্রকট প্রতিমূর্ত্তিগুলির জন্য সরকার এবং করপোরেশনকে দায়ী না করে পারি না। এই দুটি বিরাট প্রতিষ্ঠান যদি সত্যই কোনদিন আন্তরিকভাবে এই সব হতভাগ্য আতুরদের জন্য চেষ্টা করতো, তাহলে এতদিনে কলিকাতা সহরের বুক থেকে ইহাদিগকে অপসারিত করা অসম্ভব ছিল না; কিন্তু আজও তা হয় নাই। এই সব হতভাগ্যেরা শীতগ্রীষ্ম ফুটপাথের ওপর কাটাতে বাধ্য হয়। এদের পাশাপাশি শুয়ে থাকে—গরু, ষাঁড়, ছাগল, কুকুর। বর্ষার দিনে অপরের গাড়ী-বারান্দা হয় এদের আশ্রয় স্থল। এরা মানুষ; কাজেই দারিদ্র্যের মধ্যেও এদের সন্তান-সন্ততি আসে, অনাহারে শীতে তারা মরে, নয়ত শৈশব থেকেই রোগ নিয়ে বাড়তে থাকে। বহু হতভাগাকে অনাহারের জ্বালায় রাস্তার ধারের 'ডাষ্টবিন' থেকে—ধনী ও মধ্যবিত্তের ফেলে-দেওয়া আবর্জ্জনা থেকে, গরু, কুকুর, কাকের সঙ্গে ভোজ্যের সন্ধান ক'রতে দেখেছি; 'ডাষ্টবিন' থেকেই তারা উদরপূর্ত্তি করে। কত ভাগ্যহীন অভাবের জ্বালায় লাজলজ্জা বিসর্জ্জন দিয়ে উলঙ্গ হ'য়ে সভ্য সুসজ্জিত কলিকাতার বুকে বিচরণ করে, কত অভাগ্য হয়ত অনাহারে অনিদ্রায় দুর্ভাবনার তাড়নায় উন্মাদ হ'য়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। এদের জন্য কেউ কোন ব্যবস্থা করে না। এ কি কম লজ্জা ও পরিতাপের কথা।

বিদেশ ভ্রমণের ফলে আমার নিজের যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, সেই অভিজ্ঞতা থেকেই বল্‌ছি—বিদেশীর মনে সহরের সাধারণ শ্রী, সৌষ্ঠব, সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য থেকেই সেই সহরের নগরবাসীদের সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা প্রচ্ছন্নভাবে বাসা বাঁধে। কাজেই প্রত্যেক নাগরিকের কর্ত্তব্য—তার নগরকে সুশ্রী ও সুন্দর করে তোলা। ইউরোপের অধিকাংশ সহরেই বাস-যাত্রীরা বাস থেকে নামবার সময় টিকিটগুলি রাস্তায় ফেলে না, পাছে তাতে সহর নোংরা হয়—এই আশঙ্কায়। বাসের সিঁড়ির কাছেই একটি কাঠের বাক্সে টিকিটগুলি ফেলে দেয়; এ ব্যবস্থা কলিকাতার বাসপ্রতিষ্ঠানও ক'রতে পারেন। অন্য সভ্যদেশে রাস্তায় কেউ থুথু পর্য্যন্ত ফেলে না; কিন্তু কলিকাতায় শুধু এইটুকুতে সহর কতটুকু সুশ্রী হবে! এর রাস্তায় রাস্তায় আবর্জ্জনার স্তূপ, খোলা আবর্জ্জনা ফেলবার পাত্র, ফলের খোসা, ছেঁড়া কাগজ, থুথু, ময়লা—সর্ব্বত্র ছড়ান। এর জন্য নাগরিকেরা কতক পরিমাণে দায়ী, কিন্তু বেশী দায়ী কর্পোরেশন। ইউরোপের কোনও বড় সহরে (নাপোলী ছাড়া) রাস্তার ধারে আবর্জ্জনার স্তূপ জমা হ'য়ে থাকে না, আবর্জ্জনা ফেলবার জন্য ফুটপাথের ওপর খোলা টীনের পাত্র থাকে না, সহরের বুকের ওপর দিয়ে ময়লাবাহী ট্রেন, লরী বা ঘোড়ার গাড়ী দিন দুপুরে চলে না। ময়লা জমা হয় ফুটপাথের নীচে রাখা মুখবন্ধ টীনের পাত্রে; রাত্রি ভোরের আগেই সহরের সব আবর্জ্জনা পরিষ্কার করা হয়, দিন দুপুরে অন্যান্য যানবাহন ও লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়ে আবর্জ্জনার খোলা গাড়ীগুলো রোগজীবাণু ও দুর্গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে ঘুরে বেড়ায় না। এ সম্বন্ধে কলিকাতার নাগরিকদের ও নগরকর্ত্তাদের দৃষ্টি এত কম যে, যেখানে "বাসষ্টপ"—সেখানেই খোলা ময়লার পাত্র রাখতে কেউ আপত্তি করে না। যাত্রীপূর্ণ বাস এসে যেখানে অপেক্ষা ক'রবে, বাসের জন্য যাত্রীরা যেখানে দাঁড়িয়ে থাকবে, সেখানেই ময়লার পাত্রটা রাখা যে অশোভন ও অস্বাস্থ্যকর—এ কাণ্ডজ্ঞানও কি নগরকর্ত্তাদের নাই? ময়লাগাড়ীর মত রাস্তার বুক দিয়ে লোকজনের ভিড়ের মাঝে কাঁচা চামড়ার খোলা গাড়ী যেতে দেওয়াও অনুচিত।

এই সব অস্বাস্থ্যকর আবর্জ্জনা ছাড়াও সহরের বুকে ছড়িয়ে আছে প্রস্রাবাগারগুলি। রাস্তার ধারে এমন দুর্গন্ধময় বিশ্রী ব্যবস্থা কোনও সভ্যদেশে নাই, প্রায় সর্ব্বত্রই লোক-চক্ষুর অন্তরালে মাটির নীচে এর ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে—এ বিষয়ে মেয়েদের জন্য কর্পোরেশন কোন ব্যবস্থাই করে না কেন? যখন ট্রাম বাসে তাদের জন্য শতকরা দশটি আসন নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে, তখন তারা যে রাস্তাঘাটে চলাচল করে এ সংবাদ ত কর্পোরেশনের জানা আছে। কর্পোরেশন যদি সহরটিকে পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করেন, নাগরিকরা আপনি পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে অবহিত হবে। নোংরা জিনিষকে নোংরা ক'রতে দ্বিধা বোধ হয় না, কিন্তু পরিচ্ছন্ন জিনিষকে অপরিচ্ছন্ন ক'রতে স্বতঃই দ্বিধা জাগে। নাগরিকরাই সহর সুশ্রী করুক বোলে কর্পোরেশনের নিজের দায়িত্ব এড়ালে চ'লবে না, কারণ কর্পোরেশন নাগরিকদেরই প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান।

কলিকাতা সহরের সপ্তম আশ্চর্য্য সংক্ষেপে বলিলাম। এ ছাড়া কলিকাতার বুকে ছোট বড় অনেক বিসদৃশ ব্যাপার একটু ভাল করে চোখ মেলে দেখ্‌লেই আপনাদের চোখে পড়্‌বে। এইগুলি ছাড়া কলিকাতার আরও কয়েকটি বিশেষত্ব সহজেই বিদেশীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিম থেকে ফিরে আসার পর কলিকাতার রাস্তা ঘাটে চল্‌লে মনে হয়—এদেশে বোধ হয় স্ত্রীলোক নেই। জনতার মধ্যে মেয়েদের স্বল্পতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুব সম্প্রতি রাস্তাঘাটে, সিনেমায়—মেয়েদের সংখ্যা কিছু বেড়েছে বটে এবং এদের মধ্যে দুই চারজন সুশ্রী মেয়েও দেখা যায়; কিন্তু তবু পাশ্চাত্যদের চোখে এখানকার রাস্তা ঘাটে নারীবিরলতা—বিশেষ ভাবেই অনুভূত হয়।

কলিকাতার আর একটি বিশেষত্ব এর বিভিন্ন পাড়াগুলি। বড়বাজার, শ্যামবাজার, ডালহাউসী ও চৌরঙ্গী এবং বালীগঞ্জ—যেন চারটি বিভিন্ন দেশের চারটি বিভিন্ন সহর। এদের লোকজন, বেশভূষা, ঘরবাড়ী, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে ভাষার পর্য্যন্ত বেশ একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। বিদেশীর চোখে—একই সহরের বুকে এমন সুস্পষ্ট বিভিন্নতা বিস্ময় জাগাবে।

নগরের আলোক সজ্জায় কলিকাতা পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় সহরের অনেক পেছনে পড়ে আছে। বর্ত্তমানে চৌরঙ্গীর কাছে মেট্রো এবং আরও কয়েকটি বড় ইংরেজ ব্যবসাদারের কল্যাণে এখানে পাশ্চাত্য আলোকসজ্জার কিছু আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে কলিকাতাকে রাত্রে পশ্চিমের সহরের মতন সুসজ্জিত দেখায় না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সহরের সর্ব্বত্র প্রমোদ ব্যবস্থা পরিব্যাপ্ত হ'য়েছে। কিন্তু পারী বা বের্লিনের মতন একটা ভাল রেঁস্তোরা কলিকাতায় নাই। ইউরোপের বড় রেঁস্তোরাগুলিতে অল্প ব্যয়ে—যেমন চক্ষু, কর্ণ এবং জিহ্বা এক সঙ্গে তৃপ্ত হয়—তেমন কোন ব্যবস্থাই ক'লকাতায় নাই। যে কয়েকটি ইউরোপীয় নাচঘর বা রেঁস্তোরা আছে, এখানকার ইউরোপীয়ানদের সামাজিক বিধি ব্যবস্থার কঠোরতার ফলে সেগুলি কোন বিদেশীকে আনন্দ দিতে পারে না। পারী, বের্লিন বা লণ্ডনের নাচঘরের সাহায্যে অপরিচয়ের গণ্ডি ডিঙ্গিয়ে সেখানকার সামাজিক জীবনে প্রবেশ করা বিদেশীর পক্ষে সহজ। কিন্তু এখানকার নাচঘরগুলিতে তার উপায় নাই। এ ছাড়া বাঙ্গালা সরকারের আইন-কানুনের বেড়ীতে কলিকাতার নাচঘরের নৈশ জীবন পঙ্গু। কলিকাতা সহরে বেশ্যালয়গুলির অস্তিত্বের কথা সরকার জানে, ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলি যে নাগরিকদের অর্থে চলে একথাও সরকারের অবিদিত নয়। তবু অন্যান্য সভ্যদেশের মত সরকার থেকে পতিতাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। তার ফলে সমগ্র সহরের নাগরিক জীবন ক্রমশঃ রোগগ্রস্ত জীর্ণ হয়ে প'ড়ছে। নগরজীবনের মাঝে পতিতাদের স্থান থাকবেই, নগর সৃষ্টির আরম্ভ থেকে আজ পর্য্যন্ত তারা নগরের একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে গণ্য হয়ে আস্‌ছে। কাজেই ইহাদিগকে লোপ করার চিন্তা বা চেষ্টা করা বৃথা, যতটা সম্ভব এই শ্রেণীকে রোগমুক্ত, পরিচ্ছন্ন, সংযত ও সভ্য করে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সহরের প্রমোদ জীবনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ রঙ্গমঞ্চ। কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের কোন অভিনয়ই বিদেশীকে তৃপ্তি দিতে পারবে না। ভাষানভিজ্ঞতাই যে এর একমাত্র কারণ, তা নয়। ওদের দেশে অপেরা বা ড্রামা ছাড়াও যে সব অবিরাম প্রদর্শনীর (non stop revue) ব্যবস্থা আছে সে রকম কোন ব্যবস্থা কলিকাতার কোন থিয়েটারে নাই। ওদের ঐক্যতান বাদনের সুর, তাল এবং ঝঙ্কার আমাদের রঙ্গমঞ্চে মেলে না। যারা ফ্রেঞ্চ জানে না এমন বিদেশী ফরাসী রঙ্গমঞ্চে গিয়ে যথেষ্ট আনন্দ পায়। কলিকাতারই

অধিবাসীরা আগন্তুক চীনে, যাভা-বাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ভিন্ন ভাষা-ভাষীর প্রদর্শনী দেখে বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকা বিদেশে পাঠায়। অথচ বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চের এমন দুর্দ্দশা যে—ভাষান-ভিজ্ঞের কাছে তা একেবারে মূল্যহীন। ওদেশের অবিরাম প্রদর্শনীর মত, নাচগান, হাসিকৌতুক, বক্তৃতা, ব্যায়াম-কৌশল ইত্যাদি পাঁচ মেশালি জিনিষ সুষ্ঠুভাবে বাঙ্গালার দর্শকদিগকে পরিবেশনের ভার কেউ কি নিতে পারেন না?

কলিকাতার অন্ধকারের দিকটা আমি বেশী করে দেখালাম; কারণ আমি তাকে ভালবাসি, তাকে আমি আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে নিজে দেখ্‌তে চাই—বিশ্বজনকে দেখাতে চাই। আমি যা বল্‌লাম—সেইটাই কলিকাতার একমাত্র পরিচয় নয়, এর বুকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পরেশনাথের মন্দির, কালীঘাটের কলরব, চিড়িয়াখানার হৈ-চৈ, যাদুঘরের মৌন কোলাহল, বিস্তৃত গড়ের মাঠে হাল্কা ঠাণ্ডা গঙ্গার জলো-হাওয়া বিদেশীর মনকে বিস্ময় বিমুগ্ধ কোর্‌বে, আনন্দ দেবে। কিন্তু এদের পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়া যদি আরও সুশ্রী স্বাস্থ্যকর হয় তাহলে এদের সৌন্দর্য্য আরও অনেক—অনেকগুণ বাড়ে না কি?

মাটির দেবতা

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

নিত্য মোর পূজা অর্ঘ্য সিংহাসন তলে
সমর্পণ করি,
হে দেবতা, যাও তুমি দুটি পায়ে দলে।
মঙ্গল কলস আমি ভরি
পুনঃ সযতনে দেব:—দিবানিশি দুয়ারে তোমার
যতনে বহিয়া আনি পুনরায় পূজা উপচার।
কত সাধি—কত কাঁদি—
লও দেব, মোর পূজা লও,
শুধু চাও মোর পানে—সফলতা দাও
ওগো দুটি কথা কও।
রাখো মোর কথা
আমারই রচিত তুমি হে নিখিলভরা
মাটীর দেবতা।

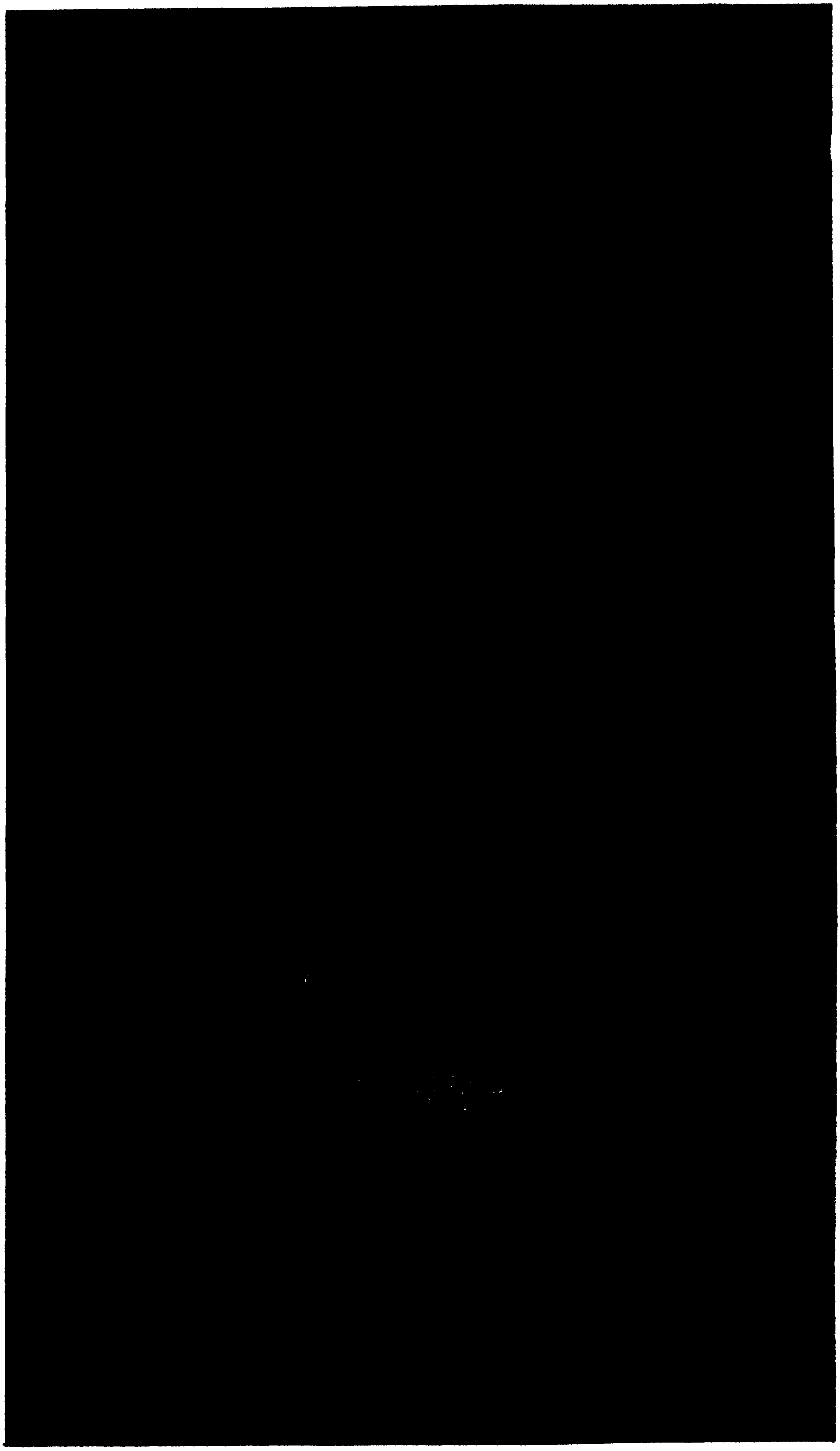
একদা আমিই তোমা করিনু সৃজন।
পায়ের তলার মাটি—তাই আমি করি আহরণ
কল্পনার তুলি দিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ করি দান।
বাড়াইনু তিলে তিলে তোমার সম্মান
জনগণ মাঝে তোমা প্রচারিত করি।
চিত্ত রাখি ভরি
তোমার মহিমা গানে;
সেই তুমি—সেই শিল্পী আমি।
উর্দ্ধলোকে যেতে চাই, মধ্যপথে রথ গেছে থামি;
স্থান কোথা—কোথা মোর স্থান
হে মাটির গড়া ভগবান?

নিজের জীবন ভাঙ্গি খণ্ড খণ্ড করি,
সাধ, আশা, হর্ষ দিয়া ভরি
করিলাম প্রতিষ্ঠা তোমারি
দিলাম তোমার পায়ে পঁহুছি একটী নমস্কার,
তোমারে দেবতা বলি নিবেদিয়া দেই হর্ষব্যথা,
আমারই রচিত ওগো, মাটির দেবতা।

দেবত্বের অহঙ্কারে স্ফীত তুমি—চাও নাই ফিরে
যে তোমা দেবত্ব দিল তার পানে,—
আপনারে ঘিরে
রহিয়াছ বদ্ধ তুমি, অন্ধ তুমি, বধীর পাষাণ।
যেদিন পুতুল গড়ি তার মাঝে দিনু আমি প্রাণ
সেদিন ভাবিয়াছিনু গড়িলাম চিন্ময় সুন্দর।
কিন্তু তারপর
ভেঙ্গে গেল, মুছে গেল সোনার স্বপন—
নির্দ্দয় পাষাণ তুমি বুঝিলাম আমি হে তখন।

আমারই গঠিত মূর্ত্তি আমারেই আজ
করে উপহাস,—
আমারই মঙ্গলবাঞ্ছা আমারই যে আজ
আনে সর্ব্বনাশ।
এ কথা কাহারে কব—?
এ বেদনা জানাব কাহারে?
হে অশুভ, অকল্যাণ, তাই তোমা
বলি বারে বারে,—
যাহা ছিলে তাই হও—ছেড়ে দাও,
মোরে ছেড়ে দাও
তুমি ফিরে যাও।

মাটির ধরণী পুনঃ ফিরে পাক
তার নবীনতা;
ঘুচে যাক ব্যথা
মাটি হয়ে মিশে যাও আমারই গঠিত
মাটির দেবতা।



পার্থ

শিল্পী—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ দাস

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

স্মৃতি-তর্পণ

শ্রীজলধর সেন

(১)

এবার যাঁর স্মৃতি-তর্পণ করব, তাঁর অনুগ্রহেই আমি কলিকাতার বাংলা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশ লাভ করি। 'কলিকাতা' কথাটা না বললে আমার সংবাদপত্র-সেবার কথায় একটু ভুল থেকে যায়। আমি সংবাদপত্র-সেবার প্রথম শিক্ষানবিশী করি—কাঙাল হরিনাথের "গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকায়।"

কাঙাল হরিনাথ—আমরা যখন ছেলেমানুষ, তখন থেকেই "গ্রামবার্ত্তাপ্রকাশিকা" সম্পাদন করতেন। প্রথমে কিছুদিন কলিকাতার আপার সারকুলার রোডে গিরিশ বিদ্যারত্ন যন্ত্রে 'গ্রামবার্ত্তা' ছাপা হোতো। তার পর আমাদের গ্রাম কুমারখালিতে তিনি একটি প্রেস্ স্থাপন করেন। সে প্রেস্ এখনও আছে। সেই চিল-মার্কা একটা মেশিন এখনও কাঙালের কাঙাল সন্তানগণের ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ করছে।

সে কাহিনী এখন থাক। কাঙাল যখন গ্রামে ছাপাখানা করলেন, তখন আমরা বাংলা স্কুলে পড়ি। আমার তখন থেকেই কি একটা ঝোঁক হয়েছিল বলতে গেলে স্কুলের কয় ঘণ্টা সময় ছাড়া, অবশিষ্ট সময় কাঙালের ছাপাখানাতেই বসে থাকতাম। সেই মুদ্রাযন্ত্র, সেই 'গ্রামবার্ত্তা', আর সেই মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ, চুম্বকের মত আমাকে আকৃষ্ট করে রেখেছিল।

তার পর, একটু বড় হয়েই সেই আকর্ষণ এমন প্রবল হয়েছিল যে, আমার বয়স যখন ১৫ বৎসর তখন আমি চুপে চুপে ঘরে বসে একখানি ছোট-খাটো উপন্যাসই লিখে ফেলেছিলাম। সে পাণ্ডুলিপি কিন্তু আর কাউকে দেখাই নি। বলতে গেলে সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। কুড়ি পঁচিশ বছর পরে আমি যখন 'বসুমতী'র সম্পাদক, সেই সময় আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অধুনা পরলোকগত শ্রীমান্ শশধর আমাদের বাড়ীর পুরোণো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে সেই অমূল্য রত্ন বের করেন এবং আগাগোড়া পড়ে বলেন—"দাদা, এর একবর্ণও সংশোধন করতে পারবেন না—যেমন আছে তেমনি ছাপা হবে।" ছাপা হয়েছিল, শ্রীমান্ নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের বিশেষ তাড়নায়; কিন্তু শশধর সে ছাপা বই দেখে যেতে পারেন নি, অকালে কাল বসন্ত-রোগে তিনি দেহত্যাগ করেন। বইখানির ছাপা আজ হবে কাল হবে করে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল।

এ কয়টি কথা বলবার উদ্দেশ্য এই যে এখনকার ছেলেরাই এঁচোড়ে পাকে না—সেকালেও এঁচোড়ে পাকা ছেলে জন্মাতো—এই আমিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সুতরাং সেই সময় থেকেই আমি 'গ্রামবার্ত্তা'য় হাত মক্স করতাম। তার পর কাঙাল হরিনাথ 'গ্রামবার্ত্তা'র জন্য ঋণ-জালে জড়িত হয়ে পত্রিকা ছাপা বন্ধ করতে চান; সে সময় আমরা কয়েকজন 'গ্রামবার্ত্তা' প্রকাশের ভার গ্রহণ করি এবং আমিই তখন 'গ্রামবার্ত্তা'র সম্পাদক হই। আমি তখন গোয়ালন্দে মাষ্টারি করতাম।

পূর্ণ এক বৎসর 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদন করে কাঙালের ঋণ-ভার আরও কিছু বাড়িয়ে দিয়ে আমরাই 'গ্রামবার্ত্তা'র অস্তিত্ব লোপ করি—এডিটার হরিনাথ ষোল আনা 'কাঙাল হরিনাথ' হয়ে বসলেন। তা হলেই বলতে হবে যে, সংবাদপত্রের হাতে-খড়ি আমার শৈশবাবস্থাতেই হয়েছিল। তবে সে হ'ল গ্রামের কাগজ; গ্রামবাসীদের দুঃখ দুর্দ্দশার কথাই 'গ্রামবার্ত্তা'র বক্তব্যের বিষয় ছিল। উচ্চ রাজনীতির সঙ্গে তার কোনই সম্বন্ধ ছিল না। আমরাও সেই ভাবে গঠিত হয়েছিলাম। 'গ্রামবার্ত্তার' সে শিক্ষানবিশী ভবিষ্যতে সংবাদপত্রসেবায় আমাকে বিশেষ কিছু সাহায্য করে নি। এ একেবারে নূতন ক্ষেত্র। তাই বলছিলাম—কলিকাতায় সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে প্রবেশকে আমি নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ বলেই মনে করেছিলাম।

(২)

আমি তখন মহিষাদলে মাষ্টারি করি। হিমালয়-ফেরত মুসাফির তখন আবার নূতন করে ঘর বেঁধেছে। মহিষাদলে কয়েক বৎসর আমার বেশ কেটেছিল। তার পর নানা

কারণে সেখানে মাষ্টারি করা এবং নাবালক রাজকুমারদের অভিভাবকত্ব করা আমার পুষিয়ে উঠ্‌ল না। তখন আমার এমন অবস্থা হয়েছিল যে, সে স্থান ত্যাগ করতে পারলেই বাঁচি। আমার মনের এই অবস্থার কথা আমি 'সাহিত্য'-সম্পাদক পরলোকগত শ্রীমান সুরেশচন্দ্র সমাজপতিকে জানাই। তিনি তখন শ্রীমান হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বর্গীয় পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে গিয়ে ধরেন। পাঁচকড়িবাবু তখন 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক। খুব নাম-ডাক, খ্যাতনামা লিখিয়ে। 'বঙ্গবাসী' অফিসে এবং 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী পরলোকগত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের উপর তাঁর একাধিপত্য ছিল। 'বঙ্গবাসীর'ও তখন খুব প্রভাব। পাঁচকড়িবাবুর প্রতিপত্তির আরও একটা কারণ ছিল। স্বর্গীয় রসিকপ্রবর ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঁচকড়ি বাবুকে 'বঙ্গবাসীর' সম্পাদক করে দেন এবং যোগেন্দ্র বাবু কাগজের স্বত্বাধিকারী হলেও 'ইন্দির' দাদাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান থেকেই—'বঙ্গবাসী'র পরিচালনা করতেন।

সুরেশ ও হেমেন্দ্রের কাছে আমার কথা শুনে পাঁচকড়িবাবু সেই দিনই যোগেনবাবুকে বলেন। যোগেনবাবুও তখন আমার লেখার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে মাষ্টারি ছেড়ে কলিকাতায় আসবার কথা বললেন। সুরেশের চিঠি পেয়ে আমি মহিষাদলের মাষ্টারি ত্যাগ করে কলিকাতায় এসে সুরেশের স্কন্ধে ভর করলাম। সেই দিনই সুরেশ, পাঁচকড়িবাবু ও হেমেন্দ্রের সঙ্গে গিয়ে যোগেন্দ্রবাবুকে অভিবাদন করলাম। তিনি আমাকে মাসিক ৩০৲ বেতনে 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদকীয় বিভাগে নিযুক্ত করলেন। যোগেন্দ্র বাবুই আমাকে কলিকাতার সংবাদপত্রক্ষেত্রে প্রথম প্রবেশাধিকার দেন। আজ আমি তাঁরই স্মৃতি-তর্পণ করব।

(৩)

আমাদের দেশে একটা প্রথা ছিল—কোন কার্য্যে প্রথম যোগদান করতে হলে শুভদিন দেখে যেতে হোতো। এখন আর সে সব দিন-ক্ষণ বাছলে চলে না—কে বা জানে অশ্লেষা, কে বা জানে মঘা। আমিও শুভদিনের জন্য অপেক্ষা না করে পরের দিন বেলা ১২টার সময় 'বঙ্গবাসী' আপিসে গেলাম। সাল তারিখ বার কিছুই মনে নেই, মনে রাখবারও প্রয়োজন তখন অনুভব করি নি। এমন করে এই বৃদ্ধ বয়সে যে স্মৃতি-তর্পণ করতে হবে এ কথা যদি কোন ভবিষ্যদ্বক্তা বলে দিতেন, তা হলে না হয় একখানি ডায়েরী রাখতাম। যাক্ সে কথা।

'বঙ্গবাসী' অফিস তখন কলুটোলা ষ্ট্রীটে। সে অফিসের অনতিদূরেই 'হিতবাদী' অফিস। আমি যখন সম্পাদকগণের অফিস-ঘরে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই ঘরে উপস্থিত রয়েছেন। তিনি বয়সে আমার ছোট ছিলেন। ভগবানের কৃপায় 'বঙ্গবাসী' থেকে অবসর বৃত্তি লাভ করে এখন স্ব-গ্রামে বসে সাধন ভজন নিয়ে আছেন। আমি অফিস-গৃহে প্রবেশ করতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন—বললেন—"আসুন জলধর বাবু, কাল সন্ধ্যার পর যোগেন বাবুর বাড়ীতে আপনাকে দেখেছি। তখন আর পরিচয় করবার অবকাশ হয় নি। মনে করলাম—কাল তো আসছেনই, তখনই পরিচয় করব।" আমি তাঁকে নমস্কার করে তাঁরই বামপার্শ্বে আসন গ্রহণ করলাম।

প্রকাণ্ড ২।৩ খানি টেবিল জোড়া দিয়ে সম্পাদকমণ্ডলীর আপিস বা আসর। তারি চারিপাশে খান ১০।১৫ চেয়ার। তখন আর কেউ ছিলেন না, তাই বিশেষ সঙ্কোচের সঙ্গে হরিমোহনবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাকে কি কাযের ভার দেবেন?" তিনি হেসে বল্লেন—"আমাদের এখানে কারো উপর কোন ভার নেই। বড় বড় কর্ত্তারা যাকে যা করতে বলেন তাকে সেই হুকুমই তামিল করতে হয়। তবে ওরই মধ্যে আমার উপর একটা নির্দ্দিষ্ট কাযের ভার আছে। আমাকে প্রতি শনিবারে বর্দ্ধমানে ইন্দ্রবাবুর কাছে যেতে হয়। তিনি সেখানকার বড় উকীল, অবসর অত্যন্ত কম। আমাকে বর্দ্ধমানে গিয়ে তাঁর বাসায় ধরণা দিতে হয়। শনিবার, রবিবার, সোমবার, এমন কি মঙ্গলবারেও যখন তাঁর অবসর হয় এবং শরীর মন ভাল থাকে তখন তিনি বলতে থাকেন, আর আমি লিখি। তার পরই আমি কলকাতায় চলে আসি। প্রতি সপ্তাহেই এই আমার নির্দ্দিষ্ট কায। কাযেই আপনার সঙ্গে হপ্তায় ২।৩ দিনের বেশী আমার

দেখা হবে না। তা হোক্, আপনাকে সকলেই জানেন। সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু আপনাকে নিয়ে এসেছেন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না। আর, আমাদের সম্পাদকীয় বিভাগে এত লোক যে কাউকে হপ্তায় ২।৪ দিন কিছুই করতে হয় না।”

হরিমোহনবাবুর কাছে মোটামুটি এই সংবাদ পেয়ে খানিকটা আশ্বস্ত হলাম। ভয় ছিল কি জানি আমাকে পরীক্ষা করবার জন্য হয়তো সেইদিনই এমন একটা কিছু লিখতে দেবেন যা আমার বিদ্যাবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাহিরে। সে আশঙ্কা আমার দূর হল।

ক্রমেই যখন বেলা অবসন্ন হতে লাগলো তখন একে একে সম্পাদকীয় বিভাগের ধুরন্ধরগণের আগমন হতে লাগলো। সে কি একজন দুজন? একেবারে ডজন খানেক বললেই হয়। সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু এলেন। আমাকে দেখেই বল্লেন—জলধর এসেছ? বেশ বেশ। দেখ হে হরিমোহন, ওকে কাযকর্ম্ম দেখিয়ে দিও। তার পরই একে একে এলেন—বিহারীলাল সরকার মহাশয় (পরে রায় সাহেব), প্রবীণ সাহিত্য-রথী ক্ষেত্রমোহন গুপ্ত দাদা মহাশয়, হারাণচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় (পরে রায় সাহেব), দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়, আরও কে কে মনে নেই। এঁদের মধ্যে কে কে যে সম্পাদকীয় বিভাগের কর্ম্মচারী এবং কে কে বেড়াতে এসেছেন—তা প্রথম দিনে আমি ঠিক করতে পারলাম না। এঁদের মধ্যে আমার পূর্ব্ব-পরিচিত ছিলেন —হারাণ বাবু। তিনি আমার কাছে এসে মুরুব্বির মত আমার পিঠ চাপড়ে বল্লেন—যাক্, বেশ ভাল হয়েছে— আপনাকে পেয়ে আমরা খুব খুসী হয়েছি। হরিমোহন-বাবুর কাছেই শুনলাম এই কয়জন ছাড়া আরও কয়েকজন নিয়মিত লেখক আছেন। তাঁরা আপিসে বড়-একটা আসেন না। যোগেন বাবুর বাড়ীতেই সন্ধ্যার পর কেউ বা নিজে এসে, কেউ বা লোক মারফত—‘বঙ্গবাসীর’ কপি পাঠিয়ে দেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—অক্ষয়চন্দ্র সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বসু, দেবেন্দ্রবিজয় বসু, পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি, পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন, পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

তা’ হলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, বঙ্গবাসীর তখন এত অধিক লেখক ও সম্পাদকীয় বিভাগে এত অধিক কর্ম্মচারী যে আমার মত দুই এক জনকে যোগেন্দ্র বাবু নিতান্তই দয়া করে নিয়েছেন। কায করবার লোক অনেক আছেন।

(৪)

প্রতিদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে যোগেন্দ্রবাবু আপিসে আসতেন। তিনি প্রথমেই ম্যানেজারবাবুদের ঘরে গিয়ে বসতেন এবং সেখানকার কাযকর্ম্ম হিসাবপত্র দেখতেন। তাঁর আগমন-সংবাদ পেলেই সম্পাদকীয় বিভাগের মহারথিগণ কেহ বা কার্য্যোপলক্ষে—কেহ বা অভিবাদন করবার উদ্দেশ্যে ম্যানেজারবাবুর ঘরে যেতেন। দুই তিন জন আপিসেই বসে থাকতেন, কারণ তাঁরা জানতেন যোগেন্দ্র বাবু একবার সম্পাদকীয় বিভাগে আসবেনই। আমি যে দিন প্রথম গিয়েছিলাম সেদিনও তিনি ম্যানেজার বাবুর ঘরে অনেকক্ষণ বসে থেকে সম্পাদকীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হলেন। আমি দাঁড়িয়ে যথারীতি অভিবাদন করতেই তিনি বললেন—আপনি আজই এসেছেন, আমি মনে করেছিলাম দুই চার দিন বিলম্ব হবে—তা বেশ করেছেন। আপনার এখন ডিউটি হচ্ছে কি জানেন?— কিছুদিন পর্য্যন্ত ‘বঙ্গবাসী’র পুরোণো ফাইল আপনাকে পড়তে হবে, তা হলে আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের policy, আমাদের লিখবার ঢং প্রভৃতি আয়ত্ব করতে পারবেন। জানেন তো ‘বঙ্গবাসী’ সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারক। সেই প্রচারই আমাদের মূলমন্ত্র! আপনি এখন তা হলে ঐ ফাইলই পড়তে থাকুন—তার পর কায করতে আরম্ভ করবেন, তখন আর বাধবে না। আমার মনে হোলো, বলে ফেলি যে ‘বঙ্গবাসীর’ উদ্দেশ্যও জানি, policyও জানি। লেখার ঢংও আলোচনা করেছি। কিন্তু প্রথম দিনেই মনিবের মুখের উপর এমন করে কথা বলা সঙ্গত হবে না মনে করে—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই করব, এই কথা কয়টী বলেই বক্তব্য শেষ করলাম! তিনি তখন আরও দুই চার জনের সঙ্গে কথা বলে চলে গেলেন। অর্থাৎ এখন কিছুদিন আমাকে বঙ্গবাসীর ফাইল উল্‌টাতে হবে। তাঁদের লিখ্‌বার ঢং শিখতে হবে। তাঁদের বলবার ভঙ্গী আয়ত্ত করতে হবে এবং আরও নানা বিষয় শিখতে হবে। আমি তখন সতের আঠারো বছরের যুবক নই; আমার বয়স তখন ত্রিশ পেরিয়ে

গিয়েছে। একটু আধটু লিখতেও পারি বলে মনে গর্ব্বের সঞ্চারও হয়েছে। এমন অবস্থায় যদি বাংলা সংবাদপত্রের অ, আ, ক, খ—এমন করে শিখতে হয় তা হলে মনটা একটু দমে যায় কি না তা সকলেই বিচার করতে পারেন।

কিন্তু উপায় ছিল না। ত্রিশ টাকা বেতনে নিজেকে শিক্ষানবিশীতে ভর্ত্তি করে, আমার যা একটু দর ছিল, তাও কমিয়ে ফেলেছি। এখন মন ভার করলে চলবে কেন? তখন মনে মনে আবৃত্তি করলাম—যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।

বঙ্গবাসীর লেখক হতে গেলে যে আমাকে বহুদিন তপস্যা করতে হবে, তা আমি প্রথম দিনে অসংখ্য সাহিত্যরথী দেখেই এবং আরও অনেকের নাম শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম। সত্য কথা বলতে কি, ওঁদের কারো সম্মুখে কলম ধরবার সাহস বা স্পর্দ্ধা আমার ছিল না। কাযেই আপিসে যাই, বঙ্গবাসীর পুরাতন ফাইল নাড়াচাড়া করি। পড়তে বড় একটা ইচ্ছাও করে না, পড়িও না। পাতা উল্টে সময় কাটিয়ে দিই।

রঙ্গমঞ্চের ভাষায় বলতে গেলে—তখন বঙ্গবাসীতে হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার। যোগেন্দ্র বসু এবং তাঁর সহযোগী ও সহায়কগণ বঙ্গবাসীর ধর্ম্মভবন প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। অন্যান্য বিভাগের কর্ম্মচারীরা তো আছেনই, সম্পাদকীয় বিভাগের পাঁচকড়িবাবু, হারাণবাবু, দুর্গাদাসবাবু প্রভৃতি সকলে ধর্ম্মভবন প্রতিষ্ঠার জন্য একেবারে উন্মত্ত। তাঁরা আপিসে ঘণ্টাখানেকের বেশী কেউই বসেন না। সহরে ও সহরের উপকণ্ঠবাসী সঙ্গতিপন্ন ভদ্রলোকদিগের কাছ থেকে ধর্ম্মভবনের জন্য চাঁদা আদায়েই তাঁরা ব্যস্ত।

যোগেন্দ্র বসু নিজে কোথাও যেতে পারতেন না। তাঁহার সেই স্থূল দেহে ঘোরাফেরা করা এক-রকম অসম্ভব ছিল। কিন্তু তিনি ঘরে বসেই যা করতেন, তাতেই তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে অগ্রসর হত। সে সময়ে যাঁরা 'বঙ্গবাসী' পড়েছেন এবং যাঁরা এখনও পুরাতন 'বঙ্গবাসীর' ফাইল উলটিয়ে পড়বেন, তাঁরা দেখতে পাবেন যোগেন্দ্রবাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি সে সময় সত্যসত্যই পড়বার মত ছিল। বলনার কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী, ভাষার কি ওজস্বিনী শক্তি, শব্দচয়নের কি অপূর্ব্ব প্রতিভা তখন যোগেন্দ্রবাবুর লেখায় দেখতে পাওয়া যেত। তাঁর যে রকম শরীরের অবস্থা ছিল তাতে তিনি নিজে কলম ধরে লিখতে পারতেন না। প্রায়ই সন্ধ্যার পর তিনি তাকিয়া হেলান দিয়ে ঝিমুতেন, আর হারাণবাবু প্রমুখ লেখকগণ কলম হাতে করে সম্মুখে বসে থাকতেন। যোগেনবাবু ঝিমুতে ঝিমুতেই বলতেন, হারানবাবুও কমা, ড্যাস্ অর্থাৎ তিনি থেই হারান নি, যতটুকু বলে শেষ করেছিলেন তা তাঁর বেশ মনে থাকতো; এবং তার পর যে কমা এবং ড্যাশ দিতে হবে তাও তিনি ভুলে যেতেন না। এমনি করে 'বঙ্গবাসীর' প্রবন্ধ লেখা হোতো এবং সেই ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করে শত শত বঙ্গবাসী তাঁর ধর্ম্মভবন প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতেন, সাহায্যও প্রেরণ করতেন।

যোগেন্দ্রবাবুর লেখার আর একটা গুণ ছিল। তিনি একই সময়ে দুইজন লেখককে দুইটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয় বলে যেতে পারতেন। আমি নিজে দেখেছি যে, তিনি একজনকে খানিকটা বলে লিখিয়ে—ঝিমুতে আরম্ভ করলেন, তার পর আর একজনকে বললেন, আপনি লিখুন। এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। আমাকে তিনি কোনদিনই তাঁর সহকারী হতে ডাকেন নি, কারণ তাঁর ঐভাবে প্রবন্ধ লিখবার উপযুক্ত ব্যক্তিই ছিলেন—হারাণবাবু। তিনি কমা, ড্যাশ, সেমিকোলন সব ঠিক ঠিক চালিয়ে যেতে পারতেন এবং যোগেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চেয়ে নীরবে অপেক্ষা করতেও পারতেন। থাক্ সে কথা। এখন আপিসের কথা বলি।

'বঙ্গবাসী'র পাতা উলটিয়েই প্রায় সাত আট দিন কেটে গেল—কেউ কিছু লিখতেও বলে না, আমিও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করি নে। আপনারাই বলুন—সাত আট দিন এই ভাবে বসে থেকে সুস্থ সবল মানুষের কি অবস্থা হয়। আরও বিপদ হ'লো এই যে আপিসের সকলেই আমার উপর মুরুব্বিয়ানা করেন এবং আমাকে নিতান্তই কৃপাপাত্র বলে মনে করেন। অবশ্য যোগেন্দ্রবাবু সম্বন্ধে এ কথা বলতে পারি নে। তিনি প্রতিদিনই আপিসে বা তাঁর বাড়ীতে আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ দিতেন এবং কোনদিনই মুরুব্বিগিরি করেছেন বলে আমার মনে পড়ে না।

আমার বেশ মনে আছে আমার চাকরি আরম্ভের দশবারো দিন পরে বেহারীদাদা খান দুই ইংরেজী কাগজের কয়েকটী সংবাদ দাগ দিয়ে আমাকে অনুবাদ করতে দিয়েছিলেন। 'বঙ্গবাসীতে' এই আমার প্রথম লেখা।

(৫)

সত্যসত্যই 'বঙ্গবাসী' আপিসে আমি বড়ই বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁদের policyর সঙ্গে আমার মোটেই সহানুভূতি ছিল না। তাঁরা যাঁদের এবং যে সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতেন, আমি সে সকল ব্যক্তিকে এবং সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করতাম, সে সকল প্রতিষ্ঠানের সাফল্য কামনা করতাম। আমি তখন কংগ্রেসকে দেশের মুক্তিকামী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতাম। আর আমি যে কাগজে কায করতাম সেই কাগজ কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী ছিলেন, যা তা বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতেন। আমার তা সহ্য হোত না, আমি সত্যসত্যই ব্যথা অনুভব করতাম। তার পর ধর্ম্মভবন—'বঙ্গবাসী'র কর্ত্তা থেকে দ্বারবান পর্য্যন্ত ধর্ম্মভবনের নামে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। আমি কিন্তু কিছুতেই তাঁদের এই উন্মাদনায় যোগ দিতে পারতাম না। এই ধর্ম্মভবনের প্রতি আমার একটুও সহানুভূতি ছিল না। এ অবস্থায় আমাকে যে কিরূপ বিব্রত হতে হয়েছিল, ভুক্তভোগী ব্যতীত কেউ তা বুঝতে পারবেন না।

তবুও চাকরিটি ছেড়ে দিতে পারি নি। শ্রীমান সুরেশ-চন্দ্রের গৃহে থাকি। সুরেশের মা আমাকে ছেলের মত ভালবাসেন। কিন্তু আমারও যে স্ত্রী পুত্র আছে, তাদেরও যে ভরণপোষণ করতে হবে—কাযেই যা হয় হবে বলে দিনগত পাপক্ষয় করতে লাগলাম।

(৬)

মাসখানেক যেতেই একদিন যথাসময়ে আপিসে গিয়ে শুনলাম যে, যোগেন্দ্রবাবু ও পাঁচকড়িবাবু সেইদিন বর্দ্ধমানে চলে গিয়েছেন। যোগেন্দ্র বাবু আদেশ করে গিয়েছেন যে সেই রাত্রেই তাঁরা ফিরে আসবেন। যদি না আসতে পারেন তা হলে সংবাদ পাঠাবেন। যতক্ষণ তাঁরা না আসেন বা সংবাদ না পাঠান, ততক্ষণ 'বঙ্গবাসী' ছাপা বন্ধ থাকবে। সেইদিনই সন্ধ্যার সময় 'বঙ্গবাসী' ছাপা হবার কথা, কারণ পরদিন প্রাতঃকালে কাগজ বাজারে বেরুবে।

হঠাৎ তাঁরা বর্দ্ধমানে গেলেনই বা কেন এবং কাগজ ছাপা বন্ধ রাখবার আদেশই বা করে গেলেন কেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। হরিমোহনবাবুও নেই যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করব; তিনি সেই যে বর্দ্ধমানে গিয়েছেন তখনও ফেরেন নি। অথচ ব্যাপার যে কি তা জানবার কৌতূহল হওয়া সকলের পক্ষেই স্বাভাবিক। আমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত মুরুব্বি-স্থানীয় একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি মশায়? তিনি নিতান্ত কর্কশ স্বরে এবং আঠারো-আনা মুরুব্বিয়ানা প্রকাশ করে যে উত্তর দিয়েছিলেন তা এখনও আমার মনে আছে। তিনি বল্লেন—'তাতে তোমার দরকার কিহে বাপু।' সত্যসত্যই আমার ঘটে ঐটুকু বুদ্ধি যোগায় নি। আমি সামান্য কর্ম্মচারী—আদার ব্যাপারী—আমার জাহাজের খবর নেবার স্পর্দ্ধা হওয়াই অন্যায়। সুতরাং মুরুব্বি মশায়ের এই কর্কশ ও অভদ্রোচিত উত্তর ম্লানমুখে গলাধঃকরণ করতে হোলো। মনে মনে সুধু বললাম—ভগবান, আর একটু বেশী করে বিষয়-বুদ্ধি দাও নি কেন প্রভু!

সকলেই বসে আছি। মুরুব্বিরা কেউ কেউ বারান্দায় গিয়ে দুই তিন জন মিলে কি আলোচনা করতে লাগলেন। কেহ বা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তখনও প্রভুদের দেখা নেই বা সংবাদও এল না; সেই সময় ম্যানেজারবাবু এসে বল্লেন—তাইতো, আপনাদের কতক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হবে তা তো বুঝতে পারছিনে—একটু জলযোগের আয়োজন করি। তাই হোলো। ঘণ্টাখানেক পরেই পূর্ব্বের অপমান ভুলে গিয়ে অম্লান-বদনে জলযোগ করা গেল।

রাত্রি যখন সাড়ে এগারটা, তখন বিহারীবাবুর নামে এক জরুরী তার এল। তার মর্ম্ম এই যে 'বঙ্গবাসী'তে লিখে দিতে হবে—আগামী কল্য হইতে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত 'বঙ্গবাসী'র কোন সম্বন্ধ রহিল না। বিহারীবাবু তাই লিখে দিলেন। সেইটুকু কম্পোজ হয়ে 'বঙ্গবাসী'র ক্রোড়ে স্থান প্রাপ্ত হল। রাত্রি ১২ টার সময় মেশিন চললো। আমাদেরও ছুটী হ'ল। কিসে যে কি হ'লো তা তখনও জানতে পারি নি—আজও জানি নে। সেই দিনের সেই মুরুব্বির কথা—"তাতে তোমার দরকার কি হে বাপু"—সার ভেবেছিলাম।

যিনি আমাকে 'বঙ্গবাসী'তে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁর ভরসায় এই এক মাসকাল নানা তুচ্ছতাচ্ছিল্য সহ্য করেও

আপিসে হাজিরা দিতাম, তিনি যখন এমনভাবে চলে গেলেন তখন আমার মন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌ল। পূর্ব্বেই বলেছি 'বঙ্গবাসী'র কোন ব্যাপারের সহিত আমি সহানুভূতি-সম্পন্ন হতে পারতাম না। অথচ মাস গেলে মাইনে নেব—এ যেন আমার অসহ্য হয়ে উঠ্‌ল। সুরেশ ও অন্যান্য বন্ধুদের কাছে মন খুলেই এ কথা জানালাম। সুরেশ দুই চার দিন অপেক্ষা করতে বললেন। হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিলে কি উপায় হবে। তিন চার দিন পরেই পাঁচকড়ি-বাবু 'বসুমতী'র সম্পাদক হলেন। তিনি সুরেশকে জানালেন যে 'বসুমতী'র স্বত্বাধিকারী আমার পরম বন্ধু পরলোকগত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে ৪০৲ বেতনে 'বসুমতীতে' নিতে সম্মত হয়েছেন।

(৭)

তখন আর কি। দুই একদিন পরেই যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করে আমি সমস্ত কথা খুলে বললাম। আমি যে 'বঙ্গবাসীর' সেবা করতে পারছি নে অথচ মাসে মাসে বেতন নিচ্ছি—এ কার্য্যকে আমার অন্তর কিছুতেই অনুমোদন করছে না। সুতরাং আমি 'বঙ্গবাসীর' কার্য্য ত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছি। গম্ভীরপ্রকৃতি যোগেন্দ্রবাবু স্থিরভাবে আমার কথাগুলি শুনলেন। তারপর বল্লেন—আপনার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি। আপনাকে আমি আট্‌কে রাখবো না। আপনার কথা আমার মনে থাকবে। ব্যস্, দেড়মাস 'বঙ্গবাসী'র সেবা করবার ভান করে অবশেষে অব্যাহতি-লাভ করলাম। যোগেন্দ্রবাবুকে নমস্কার করে চলে এলাম।

যোগেন্দ্রবাবুর যে রকম শরীরের অবস্থা ছিল তাতে কোন সভাসমিতিতে যাওয়া তো দূরের কথা—অনেক সামাজিক নিমন্ত্রণেও তিনি উপস্থিত হতে পারতেন না। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হলে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। 'বঙ্গবাসী' থেকে চলে আসবার পর কিছুদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া কেমন বাধো বাধো ঠেকতো, লজ্জাবোধও হোত, সঙ্কোচও হোত। তারপর অনেকের মুখে শুনতে পেতাম—তাঁর মজলিসে কোনদিন কথাপ্রসঙ্গে আমার নাম উল্লেখ হলে যোগেনবাবু আমার সম্বন্ধে খুব অনুকূল মন্তব্যই প্রকাশ করতেন। সে প্রশংসা-বাদ আর দাখিল করে কায নেই। দুইবার দুইটি বিশেষ ব্যাপারে আমাকে তাঁর সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। সেই দুইটি ঘটনার কথা বলেই আমি আমার স্মৃতি-তর্পণ শেষ করব।

(৮)

'বঙ্গবাসী'র সংশ্রব ত্যাগের তিন চার বৎসর পরের কথা বল্‌ছি। আমি তখন 'বসুমতীর' সম্পাদক। আমাদের যে দিন কাগজ ছাপা হ'তো, 'বঙ্গবাসী'ও সেইদিনই ছাপা হ'তো। একবার আমাদের কাগজের কায বিকেল-বেলাই শেষ হয়েছে, মেশিনে ফর্ম্মা আঁটা হয়েছে। সন্ধ্যা থেকেই ছাপা আরম্ভ হবে। মেঘাড়ম্বর দেখে আপিসের অনেকেই বাড়ী চলে গেলেন, থাকলাম আমি, উপেনবাবু, আর প্রিণ্টার পটোলবাবু (পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)। জমাদার মেশিনে ফর্ম্মা তুলে দিল, ছাপাও আরম্ভ হ'লো। তখন একটু একটু বৃষ্টি নেমেছে। এই বৃষ্টি থামলেই আমরা বাসায় চলে যাবো স্থির করলাম। বৃষ্টি ক্রমেই এল। আমরা বসেই আছি। রাত যখন ৮টা—২।৩ হাজার কাগজও ছাপা হয়ে গিয়েছে, সেই সময় ভীষণ একটা শব্দ করে মেশিন বন্ধ হয়ে গেল। উল্‌ফৎ জমাদার উপরে আপিস ঘরে এসে বল্‌ল—মেশিন ভেঙ্গে গিয়েছে। কিছুতেই আর চলবার উপায় হোল না। আমরা তখন তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে যা দেখ্‌লাম, তাতে বুঝতে পারলাম মেশিনের যে অংশটা ভেঙ্গে গিয়েছে সেটার আর মেরামত চলবে না। নূতন করে গড়ে এনে লাগিয়ে দিতে হবে। সে তো তিন চার দিনের ব্যাপার। এখন কাগজ ছাপা হয় কি করে? পরদিন সকালে 'বসুমতী' বাজারে বের করতেই হবে। এখন উপায়? উপেনবাবু, পটোলবাবু মাথায় হাত দিয়ে বস্‌লেন। আমার অবস্থাও ততোধিক। উপেনবাবু নিরাশভাবে বললেন, কি আর করা যাবে—এ হপ্তায় কাগজ বেরুবার কোন সম্ভাবনাই দেখছি নে।

আমি সহজে দম্‌বার পাত্র ছিলাম না। বললাম—দেখি আর কোন প্রেসে ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারি কি না। উপেনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাবেন? আমি উত্তর করলাম—'হিতবাদী'তে যাবো না। দেখি যদি 'বঙ্গবাসী'র কর্ত্তা যোগেনবাবু এই বিপদে সাহায্য করেন।

উপেনবাবু বললেন—বৃথা চেষ্টা। 'বঙ্গবাসী'র মতের প্রতিবাদ কম করেন নি, অল্প-বিস্তর ঠাট্টা-বিদ্রূপও

করেছেন। এ অবস্থায় যোগেনবাবুর কাছে যাবেন কোন্‌-মুখে। আমি বললাম, যে মুখেই হ'ক, একবার চেষ্টা দেখ্‌বই। তিনি যদি অপমান করে তাড়িয়ে দেন, তাও আমি সহ্য করব।

এই বলেই উল্‌ফৎ জমাদারকে বললাম—একখানা গাড়ী আনো—হ্যারিসন রোডে যোগেনবাবুর বাড়ী যেতে হবে। পটোলবাবু বললেন—এই বৃষ্টির ভেতরে কি করে যাবেন? আমি বল্লাম, যে করে হ'ক যেতেই হবে। তখন সেই মুষল-ধারে বৃষ্টির ভিতর উল্‌ফৎ জমাদারকে সঙ্গে নিয়ে হ্যারিসন-রোডে যোগেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। তাঁর পুত্র বরদাবাবু নীচের বৈঠকখানায় ছিলেন—আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে তিনি অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁকে কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে আমি বললাম, আমি এখনই একবার যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই—আমার বড় বিপদ। আমার কথা শুনে বরদাবাবু তখনই উপরে চলে গেলেন এবং মিনিট খানেকের মধ্যেই নীচে এসে বললেন—চলুন, বাবাকে আপনার কথা বলেছি।

আমি উপরে গিয়ে যোগেনবাবুকে নমস্কার করতেই তিনি বলে উঠলেন—এই প্রবল জলধারার মধ্যে জলধরের আবির্ভাব যে—ব্যাপার কি? আহা, কাপড় চোপড় যে একেবারে ভিজে গিয়েছে। জামা কাপড় খুলে ফেলুন। ওরে, একখানা শুক্‌নো কাপড় এনে দে।

আমি বল্লাম—সে সবের কিছুই দরকার হবে না। আমার বিপদের কথা আগে শুনুন।

তখন, আমাদের দুই তিন হাজার কাগজ ছাপার পর মেশিন একেবারে ভেঙ্গে যাবার কথা তাঁকে বললাম। আমাদের এই বিপদে তিনি সাহায্য না করলে পরদিন 'বসুমতী' কিছুতেই বেরুতে পারে না।

যোগেন্দ্রবাবু একটু চুপ করে থেকেই বল্লেন—কেন বেরুবে না?—আমি সব ব্যবস্থা করছি।—ওরে কে আছিস্‌—প্রেস থেকে জমাদার ও প্রেস্‌ম্যানকে এখনি ডেকে নিয়ে আয়। আমি বললাম—কাউকে যেতে হবে না—আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। গাড়ীতে উল্‌ফৎ জমাদার আছে। সেই গাড়ী নিয়ে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসবে। যোগেনবাবু সে-ই আদেশই করলেন।

একটু পরেই 'বঙ্গবাসী'র জমাদার, প্রেস্‌ম্যান ও আরও দুই এক জন এসে উপস্থিত হলেন। যোগেনবাবু জমাদারকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাগজ কত ছাপা হয়েছে হে? জমাদার বল্ল—হাজার সাত আট হবে। মহাপ্রাণ যোগেনবাবু বলে উঠ্‌লেন, আর ছেপে কায নেই। যাও ফর্ম্মা নামিয়ে ফেল। উলফৎ, তুমি এখনি গিয়ে তোমার ফর্ম্মা আর কাগজ নিয়ে এস। আগে 'বসুমতী' ছাপা হবে—তারপর কাল যখন হয় বঙ্গবাসীর বাকী কাগজ ছাপা হবে। এঁদের কায আগে করে দিতে হবে। আমার দিকে চেয়ে বললেন—আপনি এখনি গিয়ে সব পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিন। লোকজন কাউকে পাঠাতে হবে না। উল্‌ফৎ জমাদার এলেই হবে। আপনাকেও আর আসতে হবে না। আপনার কাগজ ছাপবার সম্পূর্ণ ভার আমি নিলাম। যতক্ষণ আমার প্রেসে 'বসুমতী' ছাপা আরম্ভ না হচ্ছে ততক্ষণ আমি ঘুমুচ্ছিনে। আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যান।

আমি অতি ধীরভাবে বললাম—টাকা কড়ি কি পাঠাবো। মহাপুরুষ গর্জ্জন করে উঠলেন—টাকা!—কিসের জন্য টাকা!—এ বিপদ আমার হতে কতক্ষণ? কিছু করতে হবে না। আমার লোকজন 'বসুমতী' ছাপবে। আপনার উল্‌ফৎ জমাদার সুধু ওয়াচ্‌ করবে।

এমন কথা আর কেউ বলতে পারেন কি না আমি জানি নে। শ্রদ্ধাস্পদ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের মহানুভবতার কথা আমি কোন দিন ভুলতে পারব না।

(৯)

তারপর, আর একবার যোগেন্দ্রবাবুর সঙ্গে নিকট-প্রতিবেশীভাবে তিন চার দিন বাস করতে হয়েছিল। সে লর্ড কার্জ্জনের দিল্লী দরবারে।

যোগেন্দ্রবাবু যে দরবারে যাবেন—এ আমি মনে করি নি। দিল্লী পৌছে দেখি আমার পট্টাবাসের পাশের পট্টাবাস তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তিনি বড়-একটা বেরুতেন না। আমি চারিদিকে ঘুরে ফিরে যখনই অবকাশ পেতাম তখনই যোগেন্দ্রবাবুর ঘরে গিয়ে তাঁর বিছানায় তাঁর পাশে শুয়ে পড়তাম। মহাত্মা যোগেন্দ্রচন্দ্র বড় ভাইয়ের মতন আমার মাথায় হাত বুলোতেন। আর নানা রকমের খাবার খাওয়াতেন। কত যে গল্প তিনি করতেন, তা আর বলতে পারি নে। ঐ গম্ভীরপ্রকৃতি স্থূলদেহ হিমালয় পর্ব্বতের মত মানুষের ভিতর যে এত রহস্য, এত বিদ্রূপ, এত আজগুবী গল্প ছিল—তা কোনদিন ভাবতেও পারি নি। আজ এই এতকাল পরে কলিকাতার বাংলা সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে আমার প্রথম আশ্রয়দাতা মহানুভব অগ্রজপ্রতিম যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের স্মৃতি-তর্পণ করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করলাম।

অপত্য-স্নেহ

শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার

গঙ্গাবতী কিশোরীর ভরসা করে চায় মুক্তি, অথচ কিশোরীই তার যেন মস্ত বড় বাধা। কিশোরীই যেন তাকে ইপ্সিত চলার পথ থেকে আটকিয়ে রাখছে। মানুষ যখন চল্‌তে গিয়ে অদৃশ্য আকর্ষণে চল্‌তে পারে না, পিছু পড়ে থাকে, পিছনটাই বেশি আকর্ষণীয় হয়—তখন পারিপার্শ্বিক যারা থাকে—না চলে যাবার উপদেশ দেয়, তাদের ওপরই সকল দোষটা পড়ে। মানুষের স্বভাব নিজের দুর্ব্বলতা অক্ষমতা অস্বীকার করা। গঙ্গাবতীর বড় ক্রোধ হয় যে কিশোরীবাঈ তাকে একটু নিরিবিলিতে ভাবতে অবসর দেয় না, কাজের কথা আলোচনা করতে দেয় না, কেবলি রূপকথা বাজে গল্প বলে ভুলিয়ে রাখে। গঙ্গাবতী খুব রেগে ঝগড়া করে, বকুনি দেয়, যুক্তিতর্কের অবতারণা করে, কিশোরী অতি চালাক, নিজেও রাগের ভান করে মেয়েকে গঙ্গাবতীর কোলে ফেলে দিয়ে বলে—'অত ঝগড়াঝাটি আমার পোষাবে না। আমি কেন পরের মেয়ে বয়ে ভূতের বেগার খেটে মরি। এই রইলো মেয়ে, নিজে মর বা একে মার, যা তোর খুশী।' কিশোরী গঙ্গাবতীর দুর্ব্বলতা ধরে ফেলেছে, তাই যখন কথায় ভুলিয়ে উঠতে পারে না, তখন মেয়েকে গঙ্গাবতীর কোলে দিয়ে সরে পড়ে। বেশিক্ষণ আড়ালে থাকতে পারে না, কারণ গঙ্গাবতীকে ভাল বিশ্বাস করে না। তার ধারণা যে গঙ্গাবতীর মাথার দোষ হয়েছে, এলোমেলো মাথায় যদি মেয়ের কোন অনিষ্ট করে বসে। এক একবার ঝগড়া করে শাসন করে চলে যায়, আবার মিনিট পাঁচ ছয় পর এসে মেয়েকে কোলে নেয় এবং গঙ্গাবতীর সঙ্গে এমন সব আলাপ জুড়ে দেয়—যে গঙ্গাবতী ভাবনা চিন্তা ভুলে গল্পে না মেতে পারে না।

কিশোরী ও গঙ্গাবতীর সখের ঝগড়া, আড়াআড়ি ও মানাভিমানের দিনগুলি সুখেই চলতে লাগলো। অবশ্য সুখ ব্যাপারটা—নাই মামার চেয়ে কানা মামার মত। নিত্য ঝগড়া করে এরা বেশ আরাম পায় এবং এটা সুখে সময় কাটাবার একটা মস্ত বড় কৌশল। কিশোরী ঝগড়াই করুক, সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম—দোকান চালানো, বাজার সওদা ইত্যাদি সব কাজই করুক, অল্পক্ষণের জন্য গঙ্গাবতীকে অবসর দেয় না। কিশোরী হয়ত বাজারে গিয়েছে, গঙ্গাবতী ইত্যবসরে নিজের পথ নির্দ্দেশ করবার জন্য ভাবতে বসে, কি করে আরম্ভ করবে, কি করা উচিত ছিলো, কি ভুল করেছে—তাই ভাবতে না ভাবতেই—হয় কিশোরী এসে জোটে, নয় মেয়ে কান্না জুড়ে ব্যতিব্যস্ত করে দেয়। কিশোরী গঙ্গাবতীকে একটা কাজে হাত দিতে দেয় না, ঝগড়াঝাঁটি করে মাঝে মাঝে দোকানে বসিয়ে দেয়, গঙ্গাবতীকে একা কোথায়ও যেতে দেয় না, গঙ্গাবতীকে বেশিক্ষণের জন্য বাড়ীতে একা ফেলে কোথাও যায় না। কানাইর ভয়ে সে সর্ব্বদা শ্যেনদৃষ্টিতে গঙ্গাবতীকে পাহারা দেয়; কানাইর দ্বারা কিছু অসম্ভব নেই, আসন্নপ্রসবাকে মারধর করে খুন করতে পারে। কানাই দু'তিন দিন কিশোরীর অনুপস্থিতিতে মেয়েকে মারধর করে হত্যার ভয় দেখিয়ে গঙ্গাবতীর নিকট থেকে টাকা আদায় করে নিয়েছিলো। গঙ্গাবতী মেয়েকে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিলো; তাই কিশোরীর এত সতর্কতা, এত কড়া পাহারা।

দশমাস পর গঙ্গাবতী এক পুত্র সন্তান প্রসব করলো। কিশোরীর আনন্দ আর ধরে না। ছেলের মুখ দেখে আহ্লাদে আত্মহারা। বস্তির বাড়ীতে বাড়ীতে বাতাসা বিলালো, জনে জনে ছেলের প্রশংসা করে বেড়াতে লাগলো। দু'দিনে ছেলের হাত, কোমর, গলা মন্ত্রপূত শিকড়তাবিজে ভরে গেলো; তার ওপর সাধু ফকিরের মন্ত্র, পূজাপালি নিত্যই হচ্ছে।

কিশোরী নিজের খাওয়া পরা ভুলে গেলো; ঘুরে ফিরে কেবল ছেলেকে কোলে নেয়, চুমো খায়, আর পঞ্চমুখে রূপ বর্ণনা করে।

গঙ্গাবতী ছেলের চেহারা দেখে ভীতস্বরে বলে—চেহারাখানা ঠিক্ বাপের মত পেয়েছে দিদি! ভগবান জানেন স্বভাবখানা কি রকম হয়, কতজনের জীবন ব্যর্থ করে দেয়! কিশোরী শাসনের স্বরে বলে—অমন অলুক্ষুণে

ছেলে বহু পুণ্যের জোরে মেলে। কেমন লাল টুকটুকে ছেলে! অমন সুন্দর ছেলে কি ভাল না হয়ে পারে? 'বাপের মত চেহারা, বাপের স্বভাবই পাবে দিদি!' দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পড়ে। 'ষাট্ ষাট্! কি আক্কেলে শত্তুরের মত মা হয়ে খালি খালি অভিশাপ দিচ্ছিস্? বাপের চেহারা পেলেই কি বাপের মত স্বভাব পায়? মার রঙ্ চোখ পেলো, মার গুণ পাবে না কেন শুনি? অমন শত্তুরের মত কথা বলে ছেলের আমার অমঙ্গল ডেকে এনো না বলে দিচ্ছি।' কিশোরী নবজাত শিশুর মাথায় পায়ের ধূলি দেয়।

*   *   *   *

গঙ্গাবতীর মেয়ের খুব অসুখ। কিশোরী ওষুধ আনতে ডাক্তারখানায় গিয়েছে। গঙ্গাবতী নবজাত শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছে, মেয়ে অপর কোণে অত্যধিক দুর্ব্বলতাবশতঃ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। জীর্ণা, শীর্ণা, মাথায় প্রায় চুল নেই, চোখ কোটরগত, দেহে মাংস আছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না, লালরক্তের পরিবর্ত্তে আকাশী রঙের জল। হাড়কটি বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে, রবারের মত পাতলা চামড়া দিয়ে যেন ধরে রাখা হয়েছে, ছিঁড়ে যাবার মত অবস্থা। গঙ্গাবতী শুয়ে শুয়ে ভাবছে—কি উপায় হবে মেয়ের, এতো রোগা মেয়ের এত জ্বর, এ যাত্রায় কি রক্ষা পাবে? কেউ তার থাকবে না! একটি একটি করে তিনটি সন্তান চলে গেলো অভিমানে, আর একটি যাবার পথে। স্বামী থেকেও নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই, স্বস্তি নেই···হঠাৎ পথহারা নির্জ্জন বিভীষিকাময় গহন অরণ্যে ভয়ঙ্কর দৈববিপাকের মত কানাই দোরে এসে একটা অট্টহাসি দিয়ে দাঁড়ালো। ক্ষুদ্র কুঁড়েখানা যেন থর্থর্ করে কেঁপে উঠলো; ঘরের তিনটি প্রাণী শিউরে উঠলো।

'দিব্যি ছেলে হয়েছে, বাচ্ছা শ্যামজীর চেহারাখানাই পেয়েছে দেখচি!'

গঙ্গাবতী ভীতস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো—'বের হ'। বের হ, আমার বাড়ী থেকে।'

'বের হবো বলেই এসেচি, থাকতে আসি নি। গোটা কয়েক টাকা ফেলে দাও দেখি ভালমানুষের মত। চুপটি করে চলে যাই। দিব্যি ছেলে হয়েছে, শ্যামজী পুরস্কার দেবে মাইরি!'

'বের হ! একপয়সা পাবিনে, দূর হ এখুণি।'

'বাবা! অত বোকা পাওনি সুন্দরী! টাকা না দিলে মেয়েকে এক থাপপড়ে সাবাড় করবো।'

'সত্যি বলচি, মাইরি বলচি, আমার কাছে একটি পয়সাও নেই।'

'ওসব ফাঁকি চলছে না চাঁদ; দিবি ত দে, নইলে—'

'তোর পায় পড়ি। পিতা হয়ে অতবড় সর্ব্বনাশ করিস নে।'

'টাকার নিকট পিতাপুত্র নেই, স্ত্রী নেই, কন্যা নেই। টাকার জন্যে আমি সব কিছু করতে পারি। পরের কথা ত দূরের—নিজের স্ত্রী, মেয়েকে বেশ্যা করতে পারি—নিজের হাতে খুন করতে পারি, অতএব বিবিচাঁদ যদি বাঁচবার ইচ্ছে থাকে তবে টাকা ফেলে দাও। আমার স্বভাব ত জানই, কিছু অসম্ভব নেই।'

কানাই অসুরের মত মেয়ের নিকট গিয়ে দাঁড়ালো।

গঙ্গাবতী ব্যস্তভাবে শিশুকে সরিয়ে রেখে বল্লে—'আর একদিন আসিস্। ওরে দস্যু সর্ব্বনাশ করিস নে, আর একদিন আসিস, টাকা নিশ্চয় দেবো।'

'এই ত পথে আসচিস্ বাবা। শ্যামজীর নিকট থেকে যে মুঠোমুঠো টাকা পেয়েচিস্, তার কিছু ভাগ দে। আজ আর কোন কথা মানছি নে বাবা।'

কানাই সত্যসত্য মেয়ের গলা চেপে ধরলো। অচেতন অবস্থায় দুর্ব্বল মেয়ে একটা বিশ্রী শব্দ করে ছটফট করে উঠলো। গঙ্গাবতী পাগলিনীর মত ছুটে এলো মেয়েকে ছিনিয়ে নিতে, পারলে না, মেয়ে ঝাপটা-ঝাপটিতে আরও বেশি গোঁঙায়। গঙ্গাবতী স্বামীর পদতলে লুটিয়ে পড়লে। অসহায়, দুর্ব্বল—ছিন্নলতা ধরণীর ওপর লোটায়, পদদলিত হয়ে কালগর্ভে মিলায়। উন্মত্ত তুফানে আশ্রয়চ্যুত হয়ে চারিদিকে আশ্রয় ভিক্ষা করে করুণস্বরে, মর্ম্মবেদনা পাষাণ-ভেদে, আঘাতের পর আঘাত পায়, দলিত হয়ে আবার দলিত হয়, ভাঙ্গা দেহ আবার ভাঙ্গে, ত্রাণ কি পায়? পায় না, পায় না, পায় না; হায় অসহায়, হায় রে দুর্ব্বল! অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায় ঘা খেতে খেতে একটি করুণ সুর বের হলো 'ওগো! বিশ্বাস করো আমি অসতী নই, আমি টাকা আনি নি। আমার নিকট এক কপর্দ্দকও নেই। কিশোরী এলে চেয়ে রাখবো, চুরি করবো, দেবো

তোমায়, দেবো, সত্য দেবো। যদি না দিই তবে অন্য দিন এসে আমায় খুন করে ফেলো।'

মেয়ে অসুরের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে কখনও চেঁচিয়ে উঠে, কখনও চোখ টাটিয়ে ভীত নয়নে তাকায়, কাঁপে, আশ্রয় চায়, কখনো সিংহনাদে আঁৎকে উঠে। 'আবার চালাকি! এখনো দে বজ্জাত মাগি! মাগীর বদমায়েসী এখনও কমে নি, এবার দেখাচ্ছি বাছাধন!' কানাই মেয়ের গলা চেপে ধরলো। মেয়ে যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠলো। গঙ্গাবতী শিহরে উঠলো, শিশু স্বপনঘোরে মুহুমুহু কেঁপে উঠতে লাগলো। কানাই অটল, অচল, পাহাড়ের মত নির্ভীক, বীর, বলীয়ান, স্পর্দ্ধিত, দুর্দ্ধর্ষ। মেয়ে আর চেঁচাতে পারলে না, শুধু গোঁ গোঁ করে গোঙাতে লাগলো। বলি দেওয়া পাঁঠার মত হাত পা ছুঁড়তে লাগলো।

'তবে রে দস্যু!' গঙ্গাবতী বিদ্যুৎবেগে হিংস্র বাঘিনীর মত কানাইয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। কানাই এক ধাক্কায় গঙ্গাবতীকে মেঝেতে ফেলে দিয়ে পদদলিত করলো। জননী! বুক ফেটে গেছে, পরতে পরতে রক্তস্রোত প্রবল বন্যার মত উদ্বেলিত হয়ে উতলিয়ে পড়তে লাগল। নয়নে দৃষ্টিশক্তি নেই, বিভীষিকা—ভয়াবহ নরক-চিত্র। মুখে শুধু জড়িত ভাষা মূর্চ্ছে মূর্চ্ছে অনন্তে মিলাচ্ছে 'বাঁচাও! কে আছো বাঁচাও দস্যুর হাত থেকে। ওগো বাঁচাও—বাঁচাও —বাঁ—চা—ও।'

কানাই নিজের শিশু মেয়েকে জননীর ক্রোড়ে আছড়িয়ে ফেললে। মেয়ের চোখ ঠিকরে বের হয়ে গেছে, বুকের ধুকধুকানিও বন্ধ হয়ে গেছে। সব শেষ। নেই ক্রন্দন, নেই আশা আকাঙ্ক্ষা, নেই কিছু—খানিক পূর্ব্বেও ত' কত ছিলো?

গঙ্গাবতীর উঠবার শক্তি নেই, বাধা দেবার আর ক্ষমতা নেই, গলায় ভাষা নেই। শুধু শিথিল হাতে মেয়ের মৃতদেহ আগ্নেয়গিরিরূপ পাষাণ বক্ষে চেপে ধরলো। একটা বিশ্রী, ভয়াবহ, ভয়ঙ্কর হাহাকার ঘড় ঘড় করে গঙ্গাবতীর গলা থেকে বের হলো—ও! মা-গো—

গঙ্গাবতী অজ্ঞান হয়ে পড়লো।...কানাই স্ত্রী ও মেয়ের কাছ থেকে সচকিতে সরে এসে একবার তাদের মুখপানে ভাল করে তাকালে; হাততালি দিয়ে পিশাচের মত অট্টহাসি হেসে টলতে টলতে বের হয়ে গেলো।

১২

কিশোরীবাঈর অবস্থা হলো মেঘনা নদীর পাড়ের মত, নীচে ক্ষয় হয়ে গেছে—ওপর থেকে বোঝা না; পাড়খানা শ্যামল ঘাসে ঢাকা, লতাপাতা ডালশাখা কত কি থাকে, পাড় পাড়ের মতই, কিন্তু ঢেউএর ধাক্কায় ধাক্কায় হয় ভিত্তিহীন, হঠাৎ এক সময় সামান্য আঘাতে ধ্বসে পড়ে। মেঘনা নদীর পাড়ের মতই কিশোরীবাঈ ভীতিশূন্য হয়ে পড়েছে, ওপর থেকে বোঝা যায় না। কিশোরীর ওপর দিয়ে কত ছোট বড় বিপত্তি চলে গেছে, কোন দিন একবারে এলে পড়ে নি, স্বামীর মৃত্যুতেও বুঝি এত বড় শোক পায় নি, এত বড় আঘাত পায় নি! স্বামীর মৃত্যুতে সে সান্ত্বনা রেখেছিল প্রতিশোধ নেবে বলে, কিন্তু এখানে সে কি করে সান্ত্বনা নেবে, কি করে মনকে প্রবোধ দেবে? গঙ্গাবতীকে নিজের বোনের মতো ভালবাসে, গঙ্গাবতীর মেয়েকে নিজের পেটের সন্তানের চেয়ে বেশী ভালবাসতো, কার ওপর প্রতিশোধ নেবে, কাকে দোষারোপ করবে? সেদিন কানাইকে পেলে হয়তো খুন করে ফেলতো, কিন্তু যে গেছে—যে সর্ব্বনাশ হয়েছে—তার কি কোন উপায় হবে! সে আসবে না, কোন ক্ষতি পূরণ হবে না।

কিশোরীবাঈ ধীর, স্থির, গম্ভীর। বাহির থেকে বোঝা যায় না, ভেতর পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। গঙ্গাবতীর বাহির, ভেতর দুই সমান। এক মুহূর্ত্ত স্বস্তি পায় না, এক মুহূর্ত্ত নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে না, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে। কে তাকে সান্ত্বনা দিতে পারে? সান্ত্বনা দেবার কোন ভাষা আছে? কিশোরী-বাঈ পালিয়ে পালিয়ে চলে, সর্ব্বদা এড়িয়ে চলে, গঙ্গাবতীর সম্মুখে পড়লে হৃদযন্ত্র বন্ধ হবার উপক্রম হয়। কেউ কারও সামনে যায় না, পরস্পর পরস্পরকে এড়িয়ে চলে। গঙ্গাবতী সর্ব্বদা কাঁদে, দুর্ব্বলতায় মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে, কিশোরী-বাঈ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ে, এক একটা নিঃশ্বাসে যেন এক এক বছরের আয়ু শেষ হ'য়ে যায়। কিশোরী বাঈ রাঁধে-বাড়ে, গঙ্গাবতীকে খাওয়ায়, খেতে চায় না, খেতে পারে না, জোর করে যা পারে তা খাওয়ায়; নবজাত শিশুকে দুধ খাওয়ায়, নিজে প্রায়ই উপোষ করে, খাবার মুখে

তুলতে পারে না—হাত পা' শিথিল হয়ে যায়, গা বমি বমি করে, অস্বস্তি বোধ করে।

গঙ্গাবতী কঠিন রোগে আক্রান্ত হলো। জীবন-মরণ সমস্যা—যে কোন মুহূর্তে হৃদযন্ত্র বন্ধ হয়ে মারা যেতে পারে। কিশোরীবাঈ খাওয়া পরা একমত ভুলে গিয়েছিলো, এবার ভুলেই গেলো। প্রাণপাত করে রোগিনীর সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলো। চিকিৎসার জন্য প্রথম সমস্ত জিনিষপত্র বেচতে, বন্ধক দিতে লাগলো; অল্প জিনিষ দু'দিনেই ফুরিয়ে গেল; বাঁচাতে হবে, যেমন করে হোক বাঁচাতে হবে, অর্দ্ধপ্রবেশ মৃত্যুর ভয়ঙ্কর মুখ থেকে টেনে আনতে হবে। শেষ সম্বল দোকানখানা—তাও বিক্রয় করলো। শেষ কপর্দ্দকখানি খরচ করে বাঁচাবে, তারপর যদি ভিক্ষে করতে হয়, তবে তাই করবে। গঙ্গাবতী ওষুধ খাবে না, ডাক্তারকে পরীক্ষা করতে দেবে না, সে মরবে, ভেবেছিল আত্মহত্যা করে মরবে, কষ্ট করে সাহস যোগাতে হ'লো না; কাল স্বেচ্ছায় এতদিন পরে অনুগ্রহ করে এলো। যমরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে নিজের মহা সর্ব্বনাশ করবে না, অমন সুযোগ কি সে কখনো আর পায়? এ পর্য্যন্ত কোন দিন পায় নি, আর কখনও পাবে না। এত বড় মিথ্যা কথার কিশোরী প্রতিবাদ করে না। সে জানে যে গঙ্গাবতী দুর্ব্বলতাবশতঃ মরতে চাইলেও, কখনও মরতে পারতো না—অপত্য স্নেহের শিকল তাকে বেঁধে রাখতো, মুখে মরণ চাইলেও প্রাণে প্রাণে মরণ কখনো চায় নি, এখনো সে প্রাণে প্রাণে মরণ চায় না।

কিশোরী চট্ করে উত্তেজিত গঙ্গাবতীর কোলে ছোট শিশুটিকে রেখে সরে যায়, বিদ্রোহী মন শান্ত হয়; গঙ্গাবতী আবেশে ঢক্ ঢক্ করে ওষুধ-পথ্য খায়, বাঁচবার চেষ্টা করে; বাঁচতে চায়। অদ্ভুত নারী, অদ্ভুত তার মন, অদ্ভুত তার প্রাণ, আরও অদ্ভুত তার মাতৃত্ব!

গঙ্গাবতী ধীরে ধীরে সেরে উঠলো, সম্পূর্ণ না সারলেও আর কোন ভয় নেই। অত বড় কঠিন আঘাত ও অসুখের পর শরীর ভেঙ্গে পড়েছে, শক্তি সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে, যৌবন এক ধাক্কায় প্রৌঢ়ত্বে পৌচেছে। ধীরে ধীরে সংসারে নামলে, চলন্ত পৃথিবীতে তার গতি পেছনে না সম্মুখে—সে বুঝতে পারে না, সে সম্মুখেই চলে, কিন্তু পৃথিবী পেছনে ঘুরছে না সম্মুখে ঘুরছে তা জানে না, হয়ত গঙ্গাবতী একই স্থানে আছে, হয়ত' অতি এগিয়ে যাচ্ছে, হয়ত' বা পেছনে যাচ্ছে, সে ত' জানে না—বুঝতেও পারে না, শুধু ছেলেকে যক্ষের ধনের মত আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলে।

গঙ্গাবতী মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো। আর কিশোরীবাঈ মেঘনা নদীর ভিত্তিহীন পাড়ের মত হঠাৎ ধ্বসে পড়লো। বাহির থেকে কেউ বুঝতে পারে নি, কেউ আঁচ করতে পারে নি—যে তার সময় ফুরিয়ে এসেছে; জীবন-প্রদীপের তেল বহুদিন হতে ফুরিয়ে গিয়েছিলো, তেলহীন সলতে উস্কে উস্কে কোনভাবে জ্বালিয়ে রেখেছিলো, জ্বালিয়ে রাখতে বাধ্য ছিলো বলে, আর যে তেলহীন প্রদীপে সল্‌তে নেই, মস্তক, বক্ষ পুড়ে গোড়াতে এসে নিবু নিবু করছে, আর যে সলতে নেই—কি দেবে, কি করে ক্ষণিকের তরে জ্বালিয়ে রাখবে? সে যে প্রদীপ! নিজের জন্য জ্বলে নি, অন্যের জন্য নিজের বক্ষে সলতে জ্বালিয়ে রেখেছিলো।

গঙ্গাবতী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো, বিমর্ষ হলো, ভীত হলো, ভীষণ ভাবে দমে গেলো। এক পয়সার সঙ্গতি নেই, কি উপায়ে কিশোরীকে বাঁচাবে ভেবে কোন কূল-কিনারা পেলে না। করুণমুখে কিশোরীর নিকট টাকা চায়, মিনতি করে, অভিমান করে, ঝগড়া করে।

কিশোরী মৃদু হেসে বলে—'টাকা দিয়ে কি হবে? ঘরে যা খাবার আছে তাতে বহু দিন বেশ চলবে। রাক্ষসের মত খেলেও এক মাসে আটা শেষ হবে না।'

'সে ত' বুঝলুম। কোথায় টাকা রেখেছিস লুকিয়ে? ওষুধ কিনতে হবে না? দে লক্ষ্মীটি! টাকা না পেলে আর ডাক্তার আসবে না।'

'না আসে না আসুক! বুড়ী হয়েছি, এখন সুখে মরতে দে। ডাক্তার এনে কোন লাভ নেই, মিছিমিছি টাকার শ্রাদ্ধ।'

'টাকা থাকলে দে, নইলে চল্‌লুম গতর খাটাতে।'

'পাগলামী করিস নে! কোন লোকের মাথা অত খারাপ হয়নি যে তোর মত রোগীকে কাজ দেবে।'

'গতর খাটাতে না পারি, ভিক্ষে করবো, তবু তোকে বাঁচাবো।'

'মরণ বাঁচন যেন তোর হাতে, না? যার সময় ফুরিয়ে গেছে, তাকে কি ধরে রাখা যায়, না রাখবার চেষ্টা করা

ভাল দিদি! ওপরে যে সে বসে আছে, আর কত কাল তাকে বঞ্চিত করে রাখবো?'

একটা মর্ম্মবেদনা হিংসার ছায়া পেয়ে গঙ্গাবতীর বক্ষে নির্ম্মম ঘা মারলো।

কিশোরী বলে চলে 'তুই ভিক্ষে করতে যাবি, তোর ছেলে দেখবে কে? তোর ছেলেকে রক্ষা করবে কে—ঐ দস্যুর করাল খুনী-প্রবৃত্তি থেকে?'

'আমি ওকে কোলে করে ভিক্ষে করতে বের হবো।'

'পাগলী দিদির যা মোটা বুদ্ধি! ভিক্ষেয় কি নগদ পয়সা মেলে? যা তিন চার পয়সা হয় তাতে কি ডাক্তার দেখানো চলবে কখনও?'

'যত দিনেই হোক তবু ডাক্তার আনবো।'

'অত দিন বাঁচলে তো! কচি খোকাকে নিয়ে রদ্দুরে বের হলে নিজেও মরবে, ছেলেটাকেও মারবে—আর কানাই একা পেয়ে আমায় খুন করে প্রতিশোধ নেবে, দিন দুপুরে ডাকাতি করবে।'

গঙ্গাবতী ভয়ে চমকে উঠে, কিশোরীর ছলনা বুঝতে পারে না।...

ক্রমে কিশোরীর অবস্থা বড় শোচনীয় হ'য়ে দাঁড়ালো। বাঁচবার আর কোন আশা নেই, যে কোন মুহূর্ত্তে মারা যেতে পারে। গঙ্গাবতী আসন্ন মৃত্যুযাত্রীর পাশে বসে কেবল কাঁদছে, মন প্রবোধ মানছে না; অনবরত অশ্রুজলে শাড়ীর আঁচল ভিজে যাচ্ছে। কিশোরী গঙ্গাবতীর মাথায় ও সারা গায়ে হাত বুলাতে বুলাতে প্রবোধ দেয়, ব্যর্থ সান্ত্বনা দেয়।...

কিশোরী গঙ্গাবতীর মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে ডাকলে 'গঙ্গা!'

গঙ্গাবতী চমকে উঠে উত্তর দিলে 'দিদি! কি দিদি?'

কিশোরী ক্ষীণস্বরে ধীরে ধীরে বল্‌লে—'শোন, বোন! যাবার বেলায় আর কাঁদিসনে, বড় কষ্ট হচ্ছে, আর কাঁদিসনে—সইতে পারছিনে, বুক বাঁধ দিদি!'

'দিদি! দি-দি!' গঙ্গাবতীর মুখে আর কথা সরলো না, কিশোরীকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ গুঁজে ডুকরিয়ে কাঁদতে লাগলো।

'গঙ্গা! ও গঙ্গা! ছেলেকে একবার আমার কোলে দে তো!'

গঙ্গাবতী ছেলেকে অতি সাবধানে কিশোরীর দুর্ব্বল হাতে দিলে।

কিশোরী ছেলেকে চুমো খেয়ে গঙ্গাবতীর হাতে দিয়ে বল্‌লো—'বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। ছেলেটা বড় ভয় পেয়ে গেছে, ছাখ্! কেমন করে চেয়ে আছে। বুঝতে পারছে, ওরা সব বুঝে, সব বুঝে ওরা। বড় অস্বস্তি বোধ করছি। ওঃ—!' কিশোরী হাঁপাতে লাগলো।

গঙ্গাবতী 'কি হলো' বলে চেঁচিয়ে উঠলো, কিশোরী হাত নেড়ে মানা করলো।

কিশোরী খানিক চুপ করে থেকে ধীরে, অতি ধীরে বল্‌লে—'যাবার সময় একটি কথা বলে যাই; বল্ আজীবন পালন করবি!'

'করবো—করবো! তোমার আদেশ প্রাণ দিয়েও পালন করবো দিদি!'

'যখন যে অবস্থায় পড়িসনে কেন, ছেলেকে ফাঁকি দিবি না, মাতৃত্বের গতিকে বাধা দিবি নে, অপমান করবি নে; সে পর্য্যন্ত ছুটির কল্পনা করতে পারবিনে যে পর্য্যন্ত মাতৃত্বের দাবী সার্থক না হয়। বীর, ধীর, স্থির হয়ে পূর্ব্বের মতই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবি; নিজের নিজত্ব অম্লান বদনে অস্বীকার করবি, যদি সন্তানের অদৃশ্য শক্তি তাও দাবী করে বসে।' কিশোরী খানিক বিশ্রাম করে বল্‌তে লাগলো, বড় আফ্‌শোস্ রয়ে গেলো যে কিছু রেখে যেতে পারি নি। এখন থেকে যে তোর কঠিন সংগ্রাম করতে হবে; আমার শিয়রের নীচে মাটিতে পোঁতা কিছু টাকা আছে, তা দিয়ে এখন কোন ভাবে চালাস, এ শরীর নিয়ে গতর খাটাতে যাস নে; যাস নে কিন্তু, মাথার দিব্যি রইলো। আশীর্ব্বাদ করি ছেলেটি সুখী হোক, তুই পরজন্মে সুখী হোস্।' 'পরজন্ম! পরজন্ম! চাইনে দিদি। মনুষ্যজন্ম আর চাই নে, ও আশীর্ব্বাদ করে অভিশাপ দিয়ো না। অন্য আশীর্ব্বাদ করো!'

কিশোরীর কথা বল্‌বার শক্তি আর নেই, কথা বলতে চায়, বলছেও—কিন্তু ভাষায় ফুটোতে পারলো না, শুধু চোখে মুখে ফুটে উঠলো ব্যথাজড়িত ভাষা, চোখের কোণ বেয়ে গড়াতে লাগলো অশ্রুকণা। শরীর স্থির হয়ে আসছে, চোখ বুজে যাচ্ছে, তাকিয়ে থাকতে চায় নয়ন ঢুলে পড়ে, নাড়ীতে চঞ্চল গতি নেই, ধীরে—অতি ধীরে

চলে, ক্রমে থেমে আসে—বোঝা যায় না; বুকের ধুক্‌ধুকানী ছন্দে ছন্দে নাচে না, হঠাৎ একটু সাড়া দেয় যেন।

গঙ্গাবতী চেঁচিয়ে বললো—দিদি। ও দিদি! ছাখ্ দিদি! খোকা কেমন করে তাকিয়ে আছে। একবার খোকাকে কোলে নিবি নে? দিদি! ধর খোকাকে!'

কিশোরীর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, কথা বলতে পারলে না; খোকাকে বক্ষে নেবার জন্য হাত বাড়ালে, অসাড় হাত তখনি পড়ে গেলো।

গঙ্গাবতী চীৎকার করে উঠলে 'দিদি! হাত সরালে কেন? অত সাধের খোকা তোমার, একবার কি নেবে না?'

কে উত্তর দেবে? শুধু একটা প্রতিধ্বনি হলো। গঙ্গাবতী ছেলেকে কিশোরীর বক্ষে আস্তে আস্তে রাখলে। কিশোরী শিথিল হস্তে চেপে ধরলো। সব শেষ। হাত কঠিন হয়ে গেলো, নয়ন মুদে গেলো, হৃদযন্ত্র থেমে গেলো, শরীর হিম-শীতল হয়ে পড়লো।

গঙ্গাবতী 'দিদি গো' বলে আর্ত্তনাদ করতে করতে কিশোরীর মৃত দেহখানি সাপটে ধরলে। মায়ের রোদনে ছোট শিশু ভয়ে 'মা! মা' অস্ফুট ভাষায় বিষম কান্না জুড়ে দিলে।

কিশোরী মারা গেলো। কিশোরী গঙ্গাবতীর রক্তের সম্পর্কে কেউ নয়, পারিবারিক সম্পর্ক দিয়েও আত্মীয়া নয়, বহুদিনের সুখ দুঃখের ভাগী বন্ধু নয়। কেউ নয়, কিছু নয়, কত দূরের অথচ কত নিকট, কত আপন—আজ গঙ্গাবতী মনে প্রাণে ভাল করেই বুঝতে পারলো যখন সত্যিকারের মৃত্যু এসে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিলে। আজ ভাল করেই বুঝতে পারলো—স্বামী ও কিশোরীর দুজনের ব্যবধান কত বড় পাতাল আকাশ প্রভেদ।

(১৩)

কিশোরীর সঞ্চিত যৎসামান্য যা টাকাকড়ি ছিলো, জিনিষপত্তর ছিলো, তা দিয়ে টেনেটুনে কোনভাবে কয়েক মাস নিরাপদে কাটলো। কিশোরীর সঞ্চিত ধনে গঙ্গাবতী কয়েক মাস দুর্ভিক্ষের হাহাকারে জ্বলে না মরে একটু অলস নিঃশ্বাস ছাড়তে পেরেছে। আর ত' চালাতে পারছে না, ঘরে খাবার নেই, পয়সাকড়িও নেই, চাকরিও জুটছে না। এখন নিজেই বা খায় কি, ছেলেকেই বা খাওয়াবে কি? ছেলে এখন বেশ বড় হয়েছে, শুধু জননীর স্তনদুগ্ধে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতে পারে না; তার ওপর মাতৃস্তনে তেমন দুধ নেই, অতি চেষ্টা করেও দুধ চুষে আনতে পারে না। গঙ্গাবতী ছেলের পাণ্ডুর মুখখানির দিকে করুণনয়নে তাকায়, ক্ষুধার অসহ্য জ্বালা নিজের প্রাণ দিয়ে বুঝতে পারে, জ্বালায় অস্থির হয়, উন্মাদের মত ছটপট করে, কোন হদিস পায় না। কি করবে? কি করে চলবে? কোন্ পথে এগুবে? কি উপায়ে খাদ্য রোজগার করবে? ভাবে, কেবলই ভাবে, হয় শুধু উদ্‌ভ্রান্ত। মিল, ফ্যাক্টারী, দোকান, লোকের বাড়ী—কোথায়ও অনুসন্ধানের বাকি রাখে নি; কেউ চাকরি দেয় নি, দিতে চায় না। করুণ কাহিনী, দুর্দ্দশার কথা কেউ শুনতে চায় না, অবকাশ দেয় না। নাছোড়বান্দা হয়ে দোরে দোরে মাথা ঠুকে ঘোরে, কেউ কেউ দুর্ব্বল রোগা দেহ দেখে অনুকম্পার মুখোস পরে রুদ্র বিদ্রূপে তাড়িয়ে দেয়, কেউ কেউ মুখঝাড়া দিয়ে দূর করে দেয়। রাস্তায়, হাটবাজারে, লোকের বাড়ীতে মাঝে মাঝে ছোটখাট কাজ অতি কষ্টে যোগাড় করে, তাতে দু'জনের ভরণপোষণ করা যায় না, ছেলের পিছেই প্রায় সব ব্যয় হয়। রোজ কাজ জোটাতে পারে না, তার ওপর অসুখ বিসুখ হয়ে প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে। রোজ মাথা ধরে, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, সর্ব্বদা অবসাদ বোধ করে, রাত্রিতে জ্বর আসে।

চলছে না বললেই ত' কোন কিছু আটকে থাকে না, সুখ, দুঃখ সব কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে না, কাউকে অনুগ্রহও করে না। এ চিরন্তন, মামুলী, গতানুগতিক কথা। তবে দুঃখীদের দুঃখ দুর্দ্দশা কিন্তু অচল, শাশ্বত, একটু নড়তে চায় না। গঙ্গাবতীকে দুঃখদুর্দ্দশা বড় ভালবাসে, তাই ষোড়শ উপচারে ঘিরে রেখেছে। গঙ্গাবতীর দিন আর চলতেই চায় না, থেমে যাচ্ছে পদে পদে, সে লোপও পায় না—চলতেও পারে না, অথচ একটি একটি করে দিন ঠিক ভাবেই যায়। দিনের শেষে ঘোমটা পরে আসে রজনী, রজনীর কালো আভরণে লেখা থাকে অভাব, অভিযোগ, হতাশা, ব্যথা, দুঃখ, লাঞ্ছনা, দারিদ্র্যের বিভীষিকা। কিশোরী মারা যাবার পর প্রায় এক বছর এক যুগের মত দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত হয়ে কাটলো। এই দীর্ঘকালে যে কত

বড় দুঃখ দুর্দ্দশা গঙ্গাবতীর ওপর দিয়ে নির্ম্মমভাবে গেছে, তা বর্ণনাতীত। এক একটা দিনের করুণ কাহিনীতে যে এক একটা বিষাদকাব্য রচনা হতে পারে। ভারতবর্ষ জুড়েই যে বিষাদ কাব্য নিত্য হচ্ছে, অশ্রুগঙ্গা কোন পথে বইবে? কাদের সহানুভূতি গেযে আছড়িযে আছড়িয়ে মাথা ঠুকে অনন্তে মিলাবে? স্থানও নেই, স্থান পেলে হয় শুধু বন্যা, প্লাবন, রুধিতে কেউ আসে না, শান্ত কেউ করে না। গঙ্গাবতীর এই বিরাট, মর্ম্মান্তিক, পাষাণভেদী বেদনা, জ্বালা, হাহাকার কিঞ্চিত অনুভব করা যায়, প্রকাশ করা যায় না। এ শুধু করুণ কাহিনী নয, এতে শুধু সহানুভূতির অশ্রু ঝবে না, ভাবপ্রবণতার (sentiment) স্বাভাবিক কান্না আসে না; 'আঃ!' 'উঃ!' করলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যায না; বৈদ্যুতিক পরশে (shock) সর্ব্বাঙ্গ ভাষাহীন জ্বালা পোড়ায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে থাকে; অশ্রুতে অগ্নিবৃষ্টি হয, অগ্নিবাষ্প হু হু করে চারিদিক ছড়ায়, অনুভূতিকে বিকল করে দেয়। এ তো আমার চোখে দেখা, বিচার বুদ্ধিতে অপরের হৃদযের ছবি দেখা, বোঝা মাত্র; কিন্তু যার ওপর দিয়ে এসব ঘটছে, সে দেহ, মন, প্রাণ দিযে মর্ম্মে মর্ম্মে স্পন্দনে স্পন্দনে অনুভব করছে, যার হাড়ে হাড়ে অস্থিমজ্জায় এ আঘাত দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ ধরে লেগে আসছে, তার সঠিক অবস্থা, মনপ্রাণের ভাষাহীন ভাষা বোঝবার মত কি কিছু আছে? সে নিজেও জানাতে পারে না। বৈদ্যুতিক আঘাতের পরিণতি দেখা যায়, কিন্তু তার আঘাত কেমন বোঝানো যায় না। বুভুক্ষুব জ্বালা লোকে অনুভব করে মাত্র, কিন্তু কেউ বোঝাতে পারে না, বর্ণনা করতে পারে না, বুভুক্ষু-জ্বালার কবিত্বময বর্ণনা শুধু নেশার মাতলামী। ওদের রূপ নেই, দেহ নেই, অদৃশ্য শক্তি আছে।

গঙ্গাবতী মরিয়া হযে যুঝছে, যেমনি করে লোক চাই অর্থ, চাই খাদ্য। কল কারখানায় কাজ পায় না, কাকুতি মিনতি করে, দুঃখের কাহিনী বলতে বলতে কেঁদে ফেলে। রোগিণী, শক্তিহীনা, দুর্ব্বল নারীকে কেউ কাজ দেয় না, গঙ্গাবতী ছেলের কথা মনে করে পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে, কেউ কেউ দয়া করেন, নাছোড়বান্দা স্বভাবকে ছাড়তে না পেরে অল্প মজুরীতে কাজ দেন। গঙ্গাবতী বেশিক্ষণ কাজ করতে সক্ষম হয় না, গা থর্ থর্ করে কাঁপে, শরীর অবশ হয়ে যায় প্রাণপণে একটু একটু এগোয়, চলতে পারে না, থামে, আবার চলে চমকে উঠে। চাকরির জবাব হয়, কাজ পায় না; ধর্ণা দিয়ে পড়ে আবার হয়ত' কাজ পায়, আবার কাজ যায়; রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, কোন দিন কাজ পায়, কোন দিন পায় না।

গঙ্গাবতী নিজের অক্ষমতা, শক্তিহীনতা স্বীকার করে না। তাকে লোকে শত্রুতা করে, ষড়যন্ত্র করে কাজ দেয় না, ইচ্ছে করে দাবিয়ে রাখছে, শুকিয়ে মারছে, নিষ্পেষণ করে মারতে চাচ্ছে—কারণ সে নিজকে কারও নিকট বলি দিতে রাজি হয় নি, হবেও না কখনও, দেহের ওপর অধিকার করতে এসে বহু রাজরাজা, ক্ষমতাশালী, দুর্দ্দান্ত মাতাল পদাঘাত খেযে সরে গেছে, নারীত্বের দীপ্তিতে কেউ টিঁকতে পারে নি। এতদিন সে ভদ্র মুখোস-পরা লম্পটদের চাব্‌কিয়ে সাযেস্তা করে এসেছে—তাই আজকাল কেউ কাছে ঘেঁসতে সাহস পায় না—শুধু ফাঁক অনুসন্ধান করে দগ্ধ হযে জ্বলে মরে, প্রতিশোধ নেয় আর্থিক ব্যাপারে। সব বড় লোক দল বেঁধে শত্রুতা করছে, তাকে কপর্দ্দকহীন কবেও তৃপ্ত হয নি, অভাব পূরণের পথ বন্ধ করে তাকে চায় তাদের পথে স্বেচ্ছায় আনতে। গঙ্গাবতী ভাবে, আর আক্রোশে জ্বলতে থাকে।

সকাল বেলা, অতি প্রত্যূষে উঠে কাজের খোঁজে বের হয, সারাদিন আঁতি-পাঁতি করে কাজের অনুসন্ধান করে ব্যর্থ মনোরথ হযে যখন ঘরে ফিরে, তখন আর ধৈর্য্য রাখতে পারে না, বিবেক মনকে বাচিয়ে রাখতে পারে না। জীবনের প্রতি এত নৈরাশ্য হয় যে আত্মহত্যার প্রবল ইচ্ছাকে দমন করা বড় কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। দিশেহারা হয়, উদ্ভ্রান্ত হয়, উত্তেজিত হয, উন্মাদ হয়, পাগল হয়। এ জীবনে সুখ-শান্তি পেলে না, জীবনটা ব্যর্থ হলো। তিনটি সন্তান গেলো, শেষে আরো একটি মেয়ে খুন হলো, কিশোরী মায়া গেলো, একটিমাত্র ছেলে আছে সেও যাবার পথে। নিজে খেতে পায় না, ছেলেকে খাওয়াতে পারে না। দু'জনেই হয়ত' এক সঙ্গে যাত্রা করে মৃত্যুর দ্বারে পৌচেছে। বড় ভয়, বড় আতঙ্ক—যদি মৃত্যু এক সঙ্গে না হয়, যদি দু'জনে পাশাপাশি না চলতে পারে, যদি দু'জনের গতি একই মাপে না হয়, যদি মৃত্যু শান্তি দু'জনকে এক সঙ্গে দান না করে। গঙ্গাবতীর চিরদুঃখী জন্মের মাঝে একটি ছোটখাট পাওয়া

নেই। চিরদুঃখীরাও ছোটখাট পাথেয় থাকে—যাতে জীবনে অন্য কিছু না পেলেও সে স্মৃতির কল্পনায় বেঁচে থাকা যায়, হতাশেও একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে পারে। তার ছেলে আছে একটি, জীবনে এর চেয়ে বড় আকাঙ্ক্ষা, এর চেয়ে বড় সম্পদ আর নেই, অথচ তার নিকট কত ব্যথার, কত জ্বালার, কত বড় বিরাট হাহাকারের ধন। জননী সে—প্রাণপাত করেও যখন ছেলের ক্ষুধার্ত্ত, রুগ্ন পাণ্ডুর মুখে খাদ্য, ওষুধ, পথ্য দিতে পারে না তখন ছেলেকে কি ছেলে বলে মনে করতে পারে, জীবনের আলোক, শান্তি, তৃপ্তি, সমাপ্তি বলে ধারণ করতে পারে? কল্পনা করেও যে মনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। ভাবে—আর ত' কোনই আশা নেই, হয়ত' পরজন্মে সুখ শান্তি মিলতে পারে। আর কেন দুঃখ কষ্ট সয়ে মরার চেয়ে অধম অবস্থায় বেঁচে থাকবে? কিসের আশায় নিবু-নিবু জীবন-প্রদীপখানি জোর জবরদস্তি করে জ্বেলে রাখা? জীবনধারার পরিবর্ত্তন ত' শুধু মরণের ওপর নির্ভর করছে, মরলেই ত' সব চুকে যায়, একটা আকাশ পাতাল আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। এ অবস্থায় বেঁচে থাকাই যে হাস্যাস্পদ ব্যাপার—নিতান্ত বোকামীর, মূর্খতার চূড়ান্ত, অভিশাপের আয়ুকে দীর্ঘ করা, বন্দনা করা। মরবে সে, আবার জন্ম নেবে কল্পনার স্বপ্নপুরীতে, স্বামী ছেলে-মেয়েকে নিয়ে সংসার করবে, জীবন থাকবে অনন্ত, অভাব, অভিযোগ, অশান্তি, হাহাকার কাকে বলে তাও জানবে না—কখনও কোন দুঃস্বপ্নঘোরে।

(১৪)

গঙ্গাবতী ছেলের মাথাটি কোলে করে ভাবছে, কেবলি তন্ময় হয়ে ভাবছে, ভাবনার গোড়া নেই, শেষ নেই, নির্দ্দিষ্ট পথ নেই, অনন্ত ভাবনা, ভাবছে, শুধু ভেবেই যাচ্ছে, কি ভাবছে নিজেই মনে রাখতে পারে না; কি চায়, কি করে ইহাকে কার্য্যকরী করা যায়, কোন্ পথে গিয়ে কোন্ পথ ধরবে, কি করে চলতে হবে? এই ভাবনার কাঠামো। কাঠামোর ওপর যখন রঙচঙ্ পড়ে—নিজেই চিনতে পারে না, কাঠামোর রূপ ভুলে যায়। ভাবতে হয় তাই ভাবে, ভাবতে বাধ্য বলে, পথহীনা বলে আবোল তাবোল ভাবে, দিশেহারা হয়, ব্যাকুল হয়, ভীত হয়, আঁৎকে উঠে চারিদিক খুঁজে, চেয়ে দেখে কিছু নেই—যেমনি সমস্যা তেমনই রয়ে গেছে। জননী ভাবে, শিশু ছেলে কোলে ঘুমায়, কখনো পাশে শুয়ে আপন মনে অচেতন হয়ে থাকে। রুগ্ন শিশুর হাড়ক'টি উঁচু হয়ে আছে, রঙ্ মলিন, চোখের কোণে কালী, শরীরে মাংস নেই, একটি মানুষের আকৃতির চামড়া লটকে আছে নর-কঙ্কালকে আবেষ্টন করে। পেটের অসুখ, জ্বর, কাসি ইত্যাদি লেগেই আছে। ক্রমে অবস্থা খারাপের দিকে গতি নিয়েছে, অবস্থা বেশ রীতিমত খারাপ। জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হয়ে প্রায় সর্ব্বদা থাকে, মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' করে চেঁচিয়ে উঠে। কাসতে কাসতে চোখের শিরায় রক্ত জমে গেছে, এত কাসি হয় যে কাসতে কাসতে দম বন্ধ হয়ে যায়, চোখ মুখ লাল হয়ে যায়, চোখের তারকা নিশ্চল হয়ে ওপরে উঠে যায়। জননী পাগলিনীর মত প্রবোধ দেয়, বুকে মোলায়েম হাতের পরশ বুলায়, নাকে মুখে ফুঁ দেয়। ব্যাকুলভাবে কত কি শুধায়, অজ্ঞান শিশু ভাষাহীন, কিছু বলতে পারে না, আবরণ খুলে দেখাতে পারে না—কত জঞ্জাল, কত আবর্জ্জনা, কত হৃদয়বিদারক জ্বালা-যন্ত্রণা। ভাষার প্রভাবেও বুঝি সান্ত্বনা মিলে, শিশুর কি সান্ত্বনা মিলে? হয়ত' মিলে, নাড়ীতে নাড়ীতে সে মিলন ঘটায়, নইলে হয়ত' হৃদ্-যন্ত্র বন্ধ হয়ে শিশুরা মারা যেতো। গঙ্গাবতী নাড়ীর টানে বুঝতে পারে—নাড়ী ছেঁড়া ধনের প্রাণে কি ঝড় বইছে। মনে হয়, মনে হয় তার বলিষ্ঠ এক হাতে নিজের টুঁটি চেপে ধরে, দুর্ব্বল কোমল অন্য হাতে ছেলের টুঁটি চেপে ধরে, দু'জনেই একত্রে এপার ওপারের সন্ধিস্থলটা পেরিয়ে চলে যায়, আরও তার মনে হয় যে জগতের যত বন্ধু, এক পথের পথিক যত জননী আছে—তাদের দুর্ব্বল হৃদয় থেকে সন্তান ছিনিয়ে এনে সহযাত্রী করে। এক একবার ভাবে, হাত উঠে, হাত বাড়ায়, থমকে যায়, হাত শিথিল হয়ে পড়ে যায়।...পাগলিনী! গঙ্গাবতী পাগলিনী হয়েছে। ভাবে, কেবলি ভাবে—পথ নেই, উপায় নেই, সত্যই কি কোন উপায় নেই, পথ নেই? কি করে এই আসন্ন মৃত্যুর অবিসম্ভাবী নির্ম্মম হাত থেকে মুমূর্ষুকে বাঁচাবে, রক্ষা করবে? জীবনের একমাত্র শেষ সম্বল হারানিধিকে কি করে ধরে রাখবে, মৃত্যু-দুতের হাত থেকে কেড়ে রাখবে? যদি একেই না বাঁচাতে পারলো, রক্ষা না করতে পারলো—তবে কেন সে অত বিপত্তি, অত অত্যাচার, অত নির্ম্মম অবিচারের পর বেঁচে রইলো? কেন সে বেঁচে আছে,

কেন সে অভিশপ্ত সংসারের সংসারী? এর উত্তর গঙ্গাবতী ভাবতে পারে না, মনে হলেও বুঝতে পারে না। বাঁচতে হয় তাই বাঁচে, মানতে হয় বলে সব মানে, এ যে অপ্রতিহত প্রকৃতির ধারা। সে যে সাধারণ মানুষ মাত্র, তাই তার সংসার—সে যে জননী তাই সে এত বড়—তার বুকে যে এখনো একটি সন্তান আঁকড়ে আছে তাই তার বেঁচে থাকবার প্রবল আসক্তি, জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি আনবার প্রবল আকাজ্ক্ষা। মরণেচ্ছু যে খানিক উত্তেজনার প্রলাপ মাত্র; ছেলেকে বাঁচিয়ে তোলা, সুখী করা, ছেলের সুখে নিজে সুখী হওয়াই যে তার প্রবল গুপ্ত অভিলাষ। গভীর জলে নিমজ্জিত জীব পিছল, চলন্ত, ভঙ্গুর, যে কোন জিনিষের ওপর পা স্থাপন করে বাঁচতে চেষ্টা করে, এই যে জীব-ধর্ম্ম।···

অতি ভারাক্রান্ত এ দুনিয়ার মাঝে কি এমন কেউ নেই যে এই দুঃখিনীর শিশুকে বাঁচিয়ে দিতে পারে? এতলোক, এত টাকাকড়ি, এত ঐশ্বর্য্য, এত খাদ্য, এত ওষুধপত্তর—এর কি এক কণাও তাদের দেবার কেউ নেই! কত ঘরে ঘরে কত জিনিষ স্তূপীকৃত হয়ে দিনের পর দিন ধরে পড়ে আছে, কত জিনিষ কত অনাদরে, অপ্রয়োজনে আনাচে কোনাচে পড়ে নষ্ট হচ্ছে, অপ্রয়োজনের নষ্ট জিনিষের একমুষ্টি কি এরা পেতে পারে না! এত ঐশ্বর্য্য যে অত্যাচার করে শেষ করতে পারেনা, এর থেকে কি এরা কিছু পেতে পারে না, এরা ভিক্ষা চায়; হত্যা দিয়ে পড়ে থাকে ফেলে দেওয়া জিনিষের এক মুষ্টি নিতে। চারিদিকে হাহাকার উঠে, চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হয়, বক্ষ ফেটে যায়, গলা শুকিয়ে যায়, শুধু হাহাকার। কেউ দেয় না; কেউ যে নেই, নেই কেউ এদের! ভাবে স্বামীর কথা। হায় রে স্বামী! এখনো কি জাগবে না, এখনো কি তোমার চৈতন্য হলো না, আর কি ফিরে তাকাবে না! যেখানে থাকো, একবার ফিরে তাকাও মুহূর্ত্তের তরে। যত বড় নির্ম্মম, চেতনাবিহীন হও না কেন, লাগবে ঘা, দুলে উঠবেই।···কিশোরী! এখন তুমি কোথায়? কত দূরে আছো? একবার পেছনে তাকিয়ে দেখো! আর বুঝি বাঁচলে না, আর বুঝি বাঁচানো গেলো না, আর বুঝি ধরে রাখা যায় না, প্রতিজ্ঞা যে রক্ষা হয় না, সত্য যে হতাশে ব্যথায় ভেসে যায়! সর্ব্বনাশী কি প্রতিজ্ঞা করালে? আশীর্ব্বাদ করলে কি? এ যে অভিশাপ! নারী হয়ে কি করে কোন প্রাণে আশীর্ব্বাদ করতে পারলি? নারীত্ব কি গলা চেপে ধরে নি, প্রাণে কি সহস্র সহস্র অসহ্য হুল ফোটা দংশন হয় নি। কেন তুমি ভালবাসলে, কেন অত গভীরভাবে ভালবাসলে? কেন কুড়িয়ে এনে ঠাঁই দিলে, কেন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলে? কি সর্ব্বনাশ করেছো, কি মহা ভুল করেছো, কি মহা ক্ষতি করেছো! যা সর্ব্বনাশ করেছো, তা তো আর ফেরানো যাবে না, কি উপায় হবে তবে? আশীর্ব্বাদ ফিরিয়ে নাও, চাই নে আশীর্ব্বাদ। অভিশাপ দাও! প্রাণভরে অভিশাপ দাও। পরপার থেকে অভিসম্পাৎ ক'রো! অভিসম্পাৎ কি করবে না? দয়া কি হবে? ওগো। দয়া করো, অভিসম্পাৎ দাও!

গঙ্গাবতী কি সত্যই অভিসম্পাৎ চায়? না···। কেন?

গঙ্গাবতী ভাবে, হিংসুক লোভীর মত চোখ তাকিয়ে দেখে—কত চিকিৎসক রাস্তার মোড়ে, মাঝে সারিসারি কত ওষুধের দোকান; বড়লোকের বাড়ীতে কত ওষুধ অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে, নর্দ্দমার জলে পড়ে নষ্ট হয় অথচ সে একফোঁটা ওষুধ পায় না; চুরি করে, ফাঁকি দিয়ে—এমন কি ভিক্ষে করেও আনতে পারে না। থমকে থমকে চলে, হাঁ করে ওষুধ পত্তরের পানে তাকিয়ে থাকে; তাড়া খেয়ে সরে পড়ে, চলে, আবার থমকে দাঁড়ায়—নতুন দোকানের পাশে। এমনি চলে কত সময়, কত ভোর, সন্ধ্যা, রাত্রি, কতদিনও এমনই ভাবেই চলে! বড়লোকের বাড়ীর পাশে দাঁড়ায়, সচকিতে চারিদিক তাকায়, আশা মেটে না, আকাজ্ক্ষা পূরণ হয় না, অভাব ছোট হয়ে আসে না, হাহাকার মাথা নিচু করে না। কখনও আবর্জ্জনা ঘেঁটে ওষুধের শিশি পায়। পথের লোককে জিজ্ঞেস করে—শিশিটা কিসের? ওষুধের শিশি হলে আনন্দে আত্মহারা হয়, কাকুতি মিনতি করে সব খবর নেয়, প্রাণখুলে আশীর্ব্বাদ করে। ছেলেকে ওষুধ খাওয়াতে যায়, থমকে উঠে, আঁৎকে উঠে, তাড়াতাড়ি ছুটে যায় ডাক্তারখানায়, ভাল করে খবর নেয় কিসের ওষুধ! ডাক্তারবাবু, কম-পাউণ্ডারের কথা ভিন্ন কাউকে বিশ্বাস করে না। বড়লোকের কথায়ও তার বিশ্বাস নেই। খাবার ওষুধ ভাল করে খোঁজ খবর না নিয়ে কি ছেলেকে খাওয়াতে পারে? রাস্তায়,

নর্দমার পাশে বহুবার সর্দিকাসির ওষুধ পেয়েছে, ছেলের সর্দি কাসি না হলেও একটু আদটু খাওয়াত। এ যাত্রায় যে কঠিন রোগ। কি রোগ তা জানে না, আন্দাজে কুড়িয়ে পাওয়া ওষুধও খাওয়াতে পারে না; সর্দির ওষুধ রোজই দু'তিনবার করে খাওয়ায়, কিন্তু কোন উপকার হয় নি। জ্বরও কমে না; রোগীর অব্যক্ত ব্যথা, যন্ত্রণাও কমে না। পূর্ব্বে ডাক্তারখানা থেকে কুইনাইন কিনে এনে নিজের বা ছেলের জ্বর হ'লে খেতো, ছেলেকে খাওয়াতো, কয়েকদিন পর জ্বর সেরেও যেতো। এবার কুইনাইনেও জ্বর ছাড়ছে না। ভাবে, মিলে ফ্যাকটারীতে যদি কাজ পেতো—তবে ছেলেকে চিকিৎসা করাতে পারতো, ওষুধও খাওয়াতে পারতো, এক পয়সা খরচ পড়তো না। এখন মিলে ফ্যাকটারীতে কাজ নেই, হাতে টাকাকড়িও নেই। টাকা ছাড়া ডাক্তার আসেন না, পয়সা ছাড়া ওষুধ মিলে না। এক পয়সার সঙ্গতি নেই—কি করে ডাক্তার ভাড়া করবে, কি করেই বা ওষুধ কিনবে, কি করেই বা পথ্য যোগাড় করবে? টাকা চাই! কোথায়ও ধারকর্জ্জ পায় না, দ্বারে দ্বারে টাকা ধারের ধর্ণা দেয়—কেউ দেয় না। তার কোন বন্ধুবান্ধব নেই, চেনাশোনা যারা আছে তারা নিজেরাই খেতে পায় না, অন্যকে কি করে সাহায্য করবে—হাতে পয়সাকড়ি থাকে না, ধার দেবে কি!

—ধার পায় না, দান পায় না, সাহায্য পায় না, দয়া পায় না, তবে করবে কি? দুনিয়ার লোককে প্রশ্ন করে, সে করবে কি? এ অবস্থায় তার কি কর্ত্তব্য? তার অতীত বর্ত্তমান অবস্থা সব বর্ণনা করে জিজ্ঞেস করেছে যে সে করবে কি? ধূর্ত্ত দার্শনিক বুলি না আওড়িয়ে উত্তর দাও!

ভাবে, সে কোন পথ না পেয়ে, কারো সাড়াশব্দ না পেয়ে চুরি করবে। সে চুরি করবে! কিন্তু চুরি করতে ত' জানে না; চুরি করবেই বা কোথায়? যাদের আশেপাশে যেতে পারবে তারা যে কপর্দ্দকহীন। সে ধারণাই করতে পারে না—চোরে কি করে টাকা পয়সা চুরি করে। লোকে ত' পথে ঘাটে পয়সাকড়ি ফেলে রাখে না, ঘরদরজা খোলা রাখে না, বাক্স তালা দিয়ে বন্ধ রাখে—তবে চোরে কি উপায়ে চুরি করতে পারে? সে ত' নিত্য রাস্তাঘাটে, বাড়ীবাড়ী আনাগোনা করে—কৈ, একসময়ও টাকাকড়ির সন্ধান পায় না। বাড়ীতে লোক থাকে, চুরি করা কি সুখের কথা! যদি ধরা পড়ে, তবে জেলে পুরবে—তখন ছেলেকে কে দেখবে?...ভিক্ষা? কে দেবে ভিক্ষা? চামচ দিয়ে কি সমুদ্র ছেঁচা যায়? এই ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে যে ভিক্ষুকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলছে। অন্যগতি না থাকায় নয় ভিক্ষাই করলো, যা পাওয়া যায় তাই মস্ত বড়, কিন্তু ভিক্ষে করতে বের হলে মুমূর্ষু রোগীকে কার নিকট রেখে যাবে? এমন একটি লোক নেই—যার নিকট অল্পক্ষণের জন্য রাখতে পারে?...অভাগিনী নারী ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে শুধু ভাবছেই, রোজ ভাবে, আজও ভাবছে, হয়ত' ভবিষ্যতেও এমনই করেই ভাববে। ভাবনার অন্ত থাকবে না, আদি থাকবে না, ধারা থাকবে না, একগতি, হবে না শেষ, পাবে না পথ, মিলবে না কূলকিনারা—শুধু অনন্ত, অসীম, দিকহারা, এলোমেলো, ঘোরপ্যাচ, জটিল।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে বহুক্ষণ। অচেতনপ্রায় বালক একবার শুধু 'মা! মা' রবে কেঁদেছিলো, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে; ঘুম নয়, মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে। গঙ্গাবতীর বাহ্যিক জ্ঞান বিশেষ নেই, নেই-ই। ছেলেকে কোলে নিয়ে সারাদিন যাবৎ বসে আছে, এ পর্য্যন্ত জলস্পর্শ করে নি। নড়ে না চড়ে না, একই ভাবে বসে আছে; গভীর চিন্তিতমুখ, নয়নতারকা নিশ্চল, স্থির, পলকহীন, তাকিয়ে আছে—অথচ দৃষ্টিহীন; রুক্ষ ক্ষিপ্ত বিদ্রোহী চুলগুলি অরাজকতা ঘোষণা করেছে, মলিনবস্ত্র অসংযত, অচেতনপ্রায় শিশুর কোমল সরু ঠোঁটযুগল স্পর্শে আছে মাতৃস্তন। যেন একটি শ্বেতপাথরের মাতৃমূর্ত্তি। এত সুন্দর, এত বিষাদ কাব্যময়, এত করুণ কাহিনীময় নরনারীর মূর্ত্তি কি কখনও দেখেছো? পৃথিবীর কোন মূর্ত্তিতে কি এত কথা গাঁথা আছে? এত কাব্য কি নীরব ভাষায় প্রকাশ করে মর্ম্মে মর্ম্মে? হে সন্তানের দল! একবার অবনত মস্তকে এসে দাঁড়াও, জননীর চরণধূলি তলে; জগতের সকল সন্তানের মস্তক লুটাক ভূমিপর, মিলিতকণ্ঠে গাহি—অমলিন পবিত্র মাতার বন্দনা।

এমনই সময় গির্জ্জার ঘড়ি ঢং-ঢং-ঢং করে বেজে উঠলো; নরনারী আরাধনা করবার জন্যে হৈ-হৈ করে ছুটে আসতে লাগলো; মন্দিরে মন্দিরে কাঁসি, ঘণ্টা, শঙ্খ বিকট ঐক্যতানে বেজে উঠলো, মসজিদে মসজিদে আজানের সাড়া দম্ভভরে প্রকাশ পেলো। ভেঙ্গে ফেলো মন্দির, ভেঙ্গে

ফেলো মসজিদ, ভেঙ্গে ফেলো গির্জ্জা। কি হবে ভণ্ডামীতে—ধর্ম্মের ফন্দিতে, ভগবানের চালচাতুরীতে, তোষামোদ করা দর্শনতত্ত্বে, স্বার্থপর ভগবানের স্তুতিগানে। ও গুলি যে পাগলাগারোদ। ভেবে দেখো একবার সমস্ত দুনিয়াটাকে চিড়িয়াখানা—আর মসজিদ, গির্জ্জা, মন্দিরগুলি পাগলাগারোদ ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে কি-না! সভ্যতার অসভ্যরূপ দিয়ো না! যদি জননীই সন্তানের জন্য অভিসারে যেতে বাধ্য হয়—তবে কিসের মন্দির, কিসের গির্জ্জা, কিসের মসজিদ, কি-ই বা মূল্য থাকে ভগবানের! জননী! জননী যায় অভিসারে! হে সন্তানদল! নিজের ওপর দিয়ে ভাবো জননী যায় দেহ বিক্রয় করতে!···যারা টাকার ওপর নাচে, যারা পুষ্পরথে (এরোপ্লেন) আকাশ পথে চলে, ত্রিশমাইল গতিতে মোটর হাঁকায়, চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নিত্য খেয়ে বিরক্ত হয় না, শ্রমিকের তপ্তরক্ত পান করে ক্লান্ত হয় না। ওদের কথা ছেড়ে দিলাম, কিন্তু যারা টাকা তৈরি করে, লোকের ওপর সর্দ্দারী করে রাজাপ্রজার ব্যবধান দেখায়, সমুদ্রের ওপর সীমানা দেয়, ভূগোলের চিত্রকে লাল, সবুজ, হলদে, কালো কালীতে রঙ বেরঙে চিত্রিত করে নিজের রঙ বাড়াতে চায়, তাই নিয়ে হয় মারামারি, হয় কাটাকাটি—তাদের ডেকে আনো যারা ধর্ম্মের বাবসা করে, পাণ্ডাগিরি করে ভবনদী পার করে, পাপ থেকে ত্রাণ করে, অজ্ঞান তিমির মোহাচ্ছন্ন থেকে মহাজ্ঞান, মহালোকে নেবার জন্যে সর্দ্দারী করে সে সব মহাজ্ঞানী, মহালোকপ্রাপ্তদের ডেকে এনে দেখাও—জননী চলছে অভিসারে। হায়রে জননী! হায়রে সন্তান!···

উৎসবের বিকট হুঙ্কারে গঙ্গাবতী চমকে উঠলো। একটি কথা আবার ভাবলে, যা দিন ভোর ভাবছে; আবার ভাবলে যদি উপায় পাওয়া যায়, যদি শেষ পথ এড়ানো যায়, অন্য কিছু মিলে। লোকে যেমন ফাঁস লাগিয়ে চারিদিক খুঁজে বাঁচবার পথ, রক্ষা পাবার উপায়—যদিও সে জানে যে, সে বাঁচবার সব পথ বন্ধ করে রেখেছে। গঙ্গাবতী ভাল করেই জানে যে আর কোন উপায় নেই, এই তার শেষ পথ, তবু ভাবে, ভেবে ভেবে কাঁদে। আর পথ নেই, সময়ও যে আর নেই, বহুক্ষণ কেঁদে এড়াতে চাইলে, পারলেনা এড়াতে, উঠে দাঁড়ালো। তারপর ধীরে ধীরে সন্তানকে ছেঁড়া কাঁথায় জড়িয়ে ভাল করে শুইয়ে দিয়ে এক পা' সরে গেলো। আবার ভাবনা আসে, ভাবলো; অনেকক্ষণ ভাবলো উপায় নেই, পথ নেই। ভাল করে কাপড় পরলেনা, চুল খুলে আঁচড়ালে না, গা ধুলে না, মুখ হাত পর্য্যন্ত ধুলে না, যেমন ছিলো তেমনি ভাবেই চললো। দোর হ'তে ছুটে ফিরে এলে। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে একটি চুমো খেয়ে বললে তোর জন্য এ পোড়া দেহ বিক্রয় করবো, প্রাণও দেবো, তবু তোকে বাঁচাবো। সতীত্ব! (গঙ্গাবতী চমকে উঠলো ভয়ে) হ্যাঁ! সতীত্ব বিক্রয় করবো! এ পোড়া দেহ তোর তুলনায় অতি তুচ্ছ। না-না! রাগ করিস নে, সতীত্ব তো দেবো না, নারী কি সতীত্ব দিতে পারে? আমি যে নারী, আমি যে জননী! আমি দেহ দেবো, মন ত' দেবো না, কেন পাপ হবে? যদি পাপ হয় তবে ত শুধু আমারই হবে, তোকে যেন স্পর্শে না।' টস্ টস্ করে কয়েক ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু শিশুর ললাটে পড়লো, জননী চুম্বনে চুম্বনে সে অশ্রু ফোঁটাগুলি মুছে নিলো।

···এতো দিন যে সম্পদ প্রাণপণ আঁকড়ে ধরেছিলো, আজ স্বেচ্ছায় তা বিলিয়ে দিতে চললো ছেলের জীবনের বিনিময়ে।···

গঙ্গাবতী শ্যামজীর বাড়ীর সমুখে এসে থমকে দাঁড়ালো, পা কিছুতেই আর এগুতে চাচ্ছে না। সর্ব্বাঙ্গ থর্ থর্ করে কাঁপছে। পা যেন ভেঙ্গে পড়ছে, কি ভীষণ ভারি—এক বোঝা দস্তা পায়ে যেন আঁট করে বেঁধে রেখেছে, পা তুলতে পারছে না, অবশ করে দিচ্ছে। টলতে টলতে আলোক থামে ঠেস দিয়ে কুঁজো হয়ে কোনভাবে খাড়া রইলো। কেন সে এসেছে? কি চায় সে? এমনি যেন ঘোরাঘুরি করতে করতে এখানে এসে পড়ছে। এর কি কোন উদ্দেশ্য লাগে? মনে করো এখন থেকেই তার কাজ আরম্ভ হবে, এখান হতেই তার আরম্ভ। এখন থেকে এ স্থান হতেই যেন আরম্ভ হবে। কি চায় সে? কি উদ্দেশ্য তার? কিছু চায় না সে, কোন উদ্দেশ্য তার নেই। বেশি ক্ষণ মনকে চোখ ঠারা যায় না—ভাবতে হলো যে তার তেমন জরুরি কাজ নেই, উদ্দেশ্য নেই, এমনি এসেছে, যদি একটা কিছু যৎসামান্য উপকার হয়। ক্রমে এগিয়ে চললে—যদি সে কিছু পয়সা পায়, রাস্তায় কতলোকে কত টাকাকড়ি কুড়িয়ে পায়, সে সেই খোঁজে এসেছে; যদি কোন আমাচিত

অনাহুত কোন সৌভাগ্য হঠাৎ কুড়িয়ে পেয়ে ফেলে। ঘোরাঘুরি করতে করতে কাজকর্ম্মও ত' পেয়ে ফেলতে পারে। রোজই পথঘাট আঁতিপাতি করে খোঁজে যদি কোন টাকাকড়ি পায়, যদি কেউ দয়া করে অর্থ দান করেন, যদি কেউ চাকরি দেন, আজও তাই খুঁজতে এসেছে। সে ত' রোজই যাওয়া আসা করে! ধীরে ধীরে সেই কথাতে আসতে বাধ্য হলো। অন্যদিনের মত আজও সব ব্যর্থ হলো; শেষ পথ অস্পষ্ট থেকে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে সম্মুখে প্রসারিত হলো, আর ফাঁকি দেওয়া চলে না, আর বাজে কথা এনে ভুলে থাকা যায় না; অপত্য স্নেহের টান অপ্রতিহত, অপত্য স্নেহ অন্ধ। যে প্রশ্নটা মর্ম্মে মর্ম্মে, হাড়ে হাড়ে, মজ্জাতে মজ্জাতে হুল ফুটিয়ে মারাত্মক হয়ে বাজলো—তার সমাধান করতেই হলো। কি করা যায়? তবে কি দেহ বিক্রয় করতেই হবে। প্রাণমন দিয়ে ভাবছে, আশা করছে প্রতিক্ষণে একটি দৈবঘটন—অঘটনের উত্থানপতনের আলোড়ন, তা কি হবেনা? এখনো সময় আছে, এখনো যদি একটা কিছু ঘটে যায়, যাতে সে এ অবশ্যম্ভাবী বিপদ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাকুল দৃষ্টিতে, সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিক তাকায়, উদ্গ্রীব হয়ে কান পাতে। ঢিব্-ঢিব্-ঢিব্ করে বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়ে, শরীর শিথিল হয়, ইন্দ্রিয় জড় হয়। কৈ? কিছু ত হচ্ছে না। যেমনি পৃথিবী ছিলো, তেমনিই ত আছে। সে যেমনি ছিলো—তেমনি আছে। ঘর, দোর, পথ, ঘোড়াগাড়ি, দালানকোঠা, দোকানপাট সব কিছুই তেমনি আছে। কিছুই ত হয় নি? হচ্ছে না প্রলয়, হচ্ছে না ভূমিকম্প, হচ্ছে না টাকাকড়ির ঝড়, হচ্ছে না জগতব্যাপী বিদ্রোহ, হচ্ছে না মারামারি কাটাকাটি, আসছে না কোন ছোটবড় সৌভাগ্য তেপান্তরের চৌমাথা পেরিয়ে। তবে কি, তবে কি ভগবানের ইচ্ছা, সভ্যজাতির ইচ্ছা যে সে সতীত্ব বিকিয়ে অর্থ উপার্জ্জন করে? এতদিন যা প্রাণপণে রক্ষা করে এসেছে সে অমূল্য সম্পদ কি বিক্রয় করতেই হবে? কৈ কেউ ত সাড়া দেয় না। সাড়া দাও, যে যেখানে থাকো একবার সাড়া দাও, সাড়া দাও; 'মাভৈঃ' করে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল থেকে উঠে এসো। কৈ কেউ ত' এলো না? গঙ্গাবতী ওপরে তাকায়, পাশে তাকায়, নীচে তাকায়, ভাবে হয়ত কেউ আসবে, যেমনি করে পুরাকালের রূপকথাতে স্বয়ং ভগবান ছদ্মবেশ ধরে সতীকে বাঁচাতেন, তেমনি করে। কেউ এলো না। এলে না? যদি নাই বা এলে, তবে সতীর আদর্শ নতুন করে ব্যাখ্যা করো; আজ থেকে প্রচার করো যে মাতৃত্বের নিকট সতীত্ব তুচ্ছ, অপত্য-স্নেহের জন্য সতীত্ব বিসর্জ্জন দেওয়ায় সতীর আদর্শ উচ্চ হয়; জননী যে ভাবেই মাতৃত্ব বাঁচিয়ে রাখুক না কেন তাই সতী নারীর আদর্শ হবে, সন্তানের দাবি পূরণ করা স্বর্গীয় আশীর্ব্বাদ, অসীম পুণ্য।...

গঙ্গাবতী সংস্কারবশতঃ যতই পেছোয়, অপত্য-স্নেহের প্রভাব ততই এগিয়ে দেয়, মানসিক দ্বন্দ্বে তার অবস্থা হলো—নঃ যযৌ নঃ তস্থৌ। একবার এদিকে যতটুকু ঠেলে, পরমুহূর্ত্তে আবার উল্টোদিকে ততটুকু ঠেলে, গতি তখন হয় মন্দ, দাঁড়ায় সন্ধিস্থলে। বাতির থামে হেলান দিয়ে যে কতক্ষণ মনের দ্বন্দ্ব নিয়ে তোলপাড় করছে তার কোন হুঁস্ নেই। সংস্কার বাঁচাতেও পারে না, সংস্কারের প্রভাব ছাড়তেও পারে না, সর্ব্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে সৌভাগ্যকে আনাতে চায়, তাও তেপান্তরকে এড়িয়ে আসে না। এমনি চলছে, হয়ত' কতকাল চলতো কে জানে! হঠাৎ একখানা মোটর ভোঁস্-ভোঁস্ করে সতীরমণীর মর্ম্মরমূর্ত্তি বেষ্টিত গেট পেরিয়ে বের হয়ে এলো। মোটর শাঁ-শাঁ বেগে বের হয়ে চলে গেলো। গঙ্গাবতী দেখলে শ্যামজীকে ও একটী রূপসী যুবতীকে।

গঙ্গাবতী যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। দেবতা তাকে অতবড় বিপদ থেকে বাঁচালেন বলে মনে মনে বহু ধন্যবাদ দিলো, যুক্তকরে অবনত মস্তকে অদৃশ্য দেবতাকে প্রণাম করলে বার বার। এক মুহূর্ত্ত দাঁড়ালে না, ঊর্দ্ধশ্বাসে বাড়ীমুখে ছুটলো। কি সর্ব্বনাশ! মুমূর্ষুকে একলা ফেলে সে এসেছে অভিসারে! ধিক্কারে সারা গা রি-রি করতে লাগলো।...হাঁপাতে হাঁপাতে বাড়ী এসে উন্মাদের মত ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

ঠিক্ তার পর দিন! দিনের আলোকে গঙ্গাবতী লজ্জায় মরমে মরে যেতে লাগলো। সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোক সহ্য হচ্ছে না, আঁধারে মুখ লুকাতে পারলে বাঁচে! শুধু নির্জ্জনতায় চলবে না, জমাট আঁধার চাই, এমনি আঁধার হবে যাতে নিজেরও অনুভব করে বুঝতে কষ্ট হয়। ছেলেকে একা ফেলে রেগে কোন আনাচে কাণাচে লুকোতে পারছে না, ছেলের দিকে না তাকিয়েও উপায় নেই।

ছেলের পাশে বসে শুশ্রূষা না করলেই নয়। গঙ্গাবতী মহা বিপদে পড়লো। মাথা তুলতেই ছেলেকে দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে মাথা নত হয়ে যায়, লজ্জায় আত্মহত্যা করতে চায়। ছিঃ! ছিঃ! ক্ষণে ক্ষণে মন, প্রাণ, বিবেক, দেহ ঘৃণায় রি-রি-রি করে উঠতে লাগলো।

সারাদিন মুমূর্ষুকে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অবসন্ন হয়ে পড়লো। যতই দিন যায়, ঘনিয়ে আসে গোধূলি—ততই মনপ্রাণ দেহ অবসন্ন, শ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ছে। জননী হয়ে আর কতকাল বঞ্চিত করবে, আর কতকাল লৌহকণ্টকচক্রে নিষ্পেষিত করবে। কি অধিকার আছে তার একটি জীবকে হত্যা করবার? কে তাকে বলেছে যে জীবহত্যায় পুণ্য হয় যদি সতীত্বে ছোঁয়া না পড়ে? এ পোড়া দেহ কোন্ ছার—যে জীবন অপেক্ষা প্রিয় ছেলের কল্যাণে বিকোতে পারবে না? একদিকে সতীত্ব, অন্যদিকে পুত্রের জীবন, কোন্টা সে চায়? পুঁথি পুস্তকের কথা নয়, বড়লোকের বড় কথা নয়, তার প্রাণ, বিবেক কোন্টা চায়? সতীত্ব সতীত্ব করে ত এতদিন দর্প করে এলো, সেই দম্ভে চারটি সন্তান মারা গেলো, স্বামীকে হারালো, যে সন্তানটি আছে সেও মৃত্যুযন্ত্রণায় ভুগছে। নিজে নয় কিছু পেলে না; কিন্তু স্বামী বা পুত্রের ত মঙ্গল হওয়া উচিত ছিলো। সতীত্বের দম্ভে কোন উপকার হয় নি, কখনো হবেও না, তবে বিসর্জ্জন দিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি হবেই বা কি—যার ক্ষতিময় জীবন। সতীত্ব বিসর্জ্জনে অন্যের কোন ক্ষতি নেই, তার মহাসর্ব্বনাশ হবে, সংস্কারের হাত থেকে ত্রাণ পাবে না, মানসিক রাজ্য নরক হবে, জীবন্ত অবস্থায় পুড়ে পুড়ে অঙ্গার হবে; ভাবে, বাকিই বা কি আছে! আরো ভাবে—হোক, শুধু তারই ত' হবে, সে সাগ্রহে মাথা পেতে নেবে যত মারাত্মক, যত নির্ম্মম ঘা পড়ুক না কেন! ছেলেকে বাঁচাতে যদি নরকবাস করতে হয় তবে সে অনন্ত নরকবাস করবে হাসিমুখে, মনের সুখে। যদি দেবতার অভিশাপ পড়ে, জগতের সতীরমণীদের অভিশাপ পড়ে, তবে সে আশীর্ব্বাদ বলে গ্রহণ করবে।···ছেলেকে কোলে নিয়ে একটু কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলো। একই প্রশ্ন, একই যুক্তিতর্ক, একই উত্তর বহুদিন যাবৎ ভাবছে, আজো গতানুগতিক ভাবেই চললো। সংস্কারের বিপত্তি, না সত্যের ইঙ্গিত কে জানে? ভুল, না সত্য কে বলবে? যারা এ কাহিনী পড়বে তারা এর উত্তর দিও।

সাঁঝের ক্ষীণালোকে গঙ্গাবতী ভাল করে সাজলো। গা ধুয়ে কাপড় পরলে, জটাবাঁধা চুল অতি কষ্টে এক রকম করে খোঁপা করলে, আঁচলে ময়দা লাগিয়ে মুখে ঘসে-মেজে লাগালে, প্রদীপের কালিতে চোখে সরু কাজল পরলে, ভ্রু'র সন্ধিস্থলে উজ্জ্বল একটি টিপ আঁকলে। সাজ-সরঞ্জাম নেই, আরসী নেই—তবু বহুক্ষণ ধরে প্রসাধন করলে। আজ মনকে দৃঢ় করেছে, কোন কথা ভাববে না। জীবন নিয়ে আর কতকাল ছিনিমিনি খেলবে! সটান অভিসারে গিয়ে নামবে, কিছুই ভাববে না; আর কোন কথা চিন্তা করবে না, আর কোন সমস্যা নেই, চোখ-মুখ বুজে যাবে, দরাদরি করে টাকা আনবে, ডাক্তার ডাকবে, ওষুধ কিনবে, পথ্য করাবে—ব্যস্ দিনের কাজ তার শেষ। কোন কথাই ভাববে না, সেখানে গিয়ে কি অভিনয় করবে নটরাজের সঙ্গে, তাও ভাববে না, মনকে বিশ্বাস নেই, কি জানি কি ভাবতে কি এসে পড়ে, তারপর হয়তো দুর্ব্বলতার, সংস্কারের অসীম হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। সংস্কার জীবনের মস্ত বড় বিপত্তি, খুব বড় শত্রু। আজ আর ছেলেকে জড়িয়ে ধরলে না; চুমো খেলে না, মনপ্রাণ বিবেক এত দুর্ব্বল, এত সতর্ক—যে হয়তো ছেলেকে বাহুডোর থেকে মুক্ত করতে পারবে না, মুক্ত করতে গিয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে পারে। ছেলেকে দূর থেকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি দরজা ভেজিয়ে বের হয়ে পড়লো, ফিরে তাকাতে সাহস পেলে না, একটি শুধু চাপা নিঃশ্বাস শূন্য গগনমার্গে মিলালো।

শিরায় শিরায় উষ্ণরক্ত প্রবাহিত, মাথার পুঞ্জীভূত শিরা উপশিরায় জ্বলছে আগুন, কাঁপছে থর্ থর্ করে সর্ব্বাঙ্গ, শরীর শিথিল, প্রাণ অনুভূতিহীন, মন বিবেক-বিকল। এক এক পা বাড়াতে থমকে যায়, পিছনে হটে যায়। উপায় নেই, আবার ভাবনা চিন্তা, আবার দুর্ব্বলতা! ভাববে না, একটুও চিন্তা করবে না, দুর্ব্বলতাকে পাশে ঘেঁসতে দেবে না। আজ উন্মাদিনী, উন্মত্ত, পাগলিনী! কামের অনাসে নয়, দৈহিক মিলনে নয়, নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, জীবন-মরণ সমস্যায় উন্মত্ত, উদ্ভ্রান্ত পাগলিনী! প্রাণপণ শক্তিতে নিজের নিজত্ব, অস্তিত্ব অন্তরালে লুকিয়ে ক্‌ন্ ক্‌ন্ করে জামজীব বাড়ীতে ঢুকে পড়লো।

শ্যামজী একখানা ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় শুয়ে, পা ত্ব'টি টেবিলের ওপর তুলে দিয়ে হিসাব-খাতা ঘাঁটছেন, এমন সময় গঙ্গাবতী হঠাৎ টেবিলের পাশে এসে থম্‌কে দাঁড়ালে! একটু অস্বস্তি, একটু নীরবতা।...

শ্যামজী চমকে উঠে বল্‌লেন—'কে? কি চাই?'

গঙ্গাবতীর মুখ থেকে কোন কথা সরলো না, শুধু ওষ্ঠদুটি নড়লো মাত্র!

'কে তুমি? কি চাই?'

গঙ্গাবতী অতি চেষ্টায়ও মুচকি হাসতে পারলে না, বল্‌লে—'আমি গো, আমি!'

'এ্যাঁ! গঙ্গাবতী! গঙ্গা-ব-তী! এমন অসময়ে—'

গঙ্গাবতী একটী কথাও বল্‌তে পারল না।

'কি বিপদে পড়া গেলো! কি চাই? কি প্রয়োজন তোমার?'

গঙ্গাবতীর হাবভাবে শ্যামজী বুঝতে পারলেন যে গঙ্গাবতীর মাথা খারাপ হয়ে গেছে; অতি দুঃখ-কষ্ট পেয়ে পাগলিনী হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি পাপ বিদায় করবার জন্য বললেন—'ভিক্ষে চাচ্চো? এখন কোন সুবিধে হবে না, বড্ড ব্যস্ত আছি। অন্য সময় এসো'খন কিছু দেওয়া যাবে। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও—'

'ভিক্ষে! ভিক্ষে!' গঙ্গাবতী এমনি বিকট ভাবে উচ্চারণ করলে যে শ্যামজী চমকে উঠলেন, ঘরের আসবাব-পত্তরগুলি, জানালার সারসিগুলি যেন থর্ থর্ করে কেঁপে উঠলো। শ্যামজী ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতে সাহস পেলেন না! গঙ্গাবতী খানিকক্ষণ দম নিয়ে বলতে লাগলো—'হ্যাঁ ভিক্ষেই চাইচি। সব গিয়েছে, শেষ সম্বল একটী ছেলে, সে মরণের মুখে; না আছে ওষুদ, না আছে পথ্য। তাই—তা--ই'

গঙ্গাবতী আর বল্‌তে পারলে না, ক্ষুদ্র বালিকার মত কেঁদে উঠলো। কত ব্যথার, কত দুঃখের যে অশ্রুফোঁটাগুলি—জানে শুধু সে নিজে, আর জানে তার অন্তর্যামী।

কত কাকুতি মিনতি, কত অশ্রুজল শুধু ভিক্ষের জন্য। বেশি না, যৎসামান্য অর্থ ওষুধ ও পথ্যের জন্য। সব ব্যর্থ হলো। বিগত-যৌবনার কাতরোক্তি আজি ব্যর্থ হলো!

(ক্রমশঃ)

বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ, এম্-এ, এফ্-এস্-এস্, এফ্-আর-ই-এস্

যখন ব্রিটিশ ভারতে ভারতবাসীর পক্ষে কোনও প্রকার উচ্চদায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন ব্রিটিশ ভারতের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে, অনন্যসাধারণ মনীষাবলে যিনি ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বিচার-পতির পবিত্র সিংহাসন অধিকার করিয়া ভারতবাসীর যোগ্যতা প্রতিপাদিত করিয়াছিলেন এবং উক্ত পদে দেশ-বাসীর ভবিষ্যৎ নিয়োগের পথ সহজ ও সুগম করিয়া দিয়া-ছিলেন, দেশহিতকর সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানে যাঁহার কল্যাণময় হস্ত সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিত, সেই সুপণ্ডিত, উদারহৃদয়, নিষ্কলঙ্কচরিত্র, ধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মা শম্ভুনাথ পণ্ডিতের স্মৃতির উদ্দেশে আজ "ভারতবর্ষ" তাহার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করিতেছে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় কৃতনিবাস এক কাশ্মীরীয় ব্রাহ্মণকুলে শম্ভুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সদাশিব পণ্ডিত পারস্য ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং সদর আদালতে পেস্কারের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদৃশ সঙ্গতিপন্ন না হইলেও চরিত্রগুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

শৈশবে শম্ভুনাথ রুগ্ন ছিলেন বলিয়া লক্ষ্নৌনগরীতে মাতুলের নিকট প্রেরিত হন এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে উর্দ্দু ও পারস্যভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তৎপরে কিছুকাল বারাণসীতে অধ্যয়ন করিয়া চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন।

কলিকাতায় হেয়ার স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া তিনি

গৌরমোহন আঢ্য প্রতিষ্ঠিত ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে বিদ্যা-শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন। তখন হার্ম্যান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত উহার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। হার্ম্যান জেফ্রয় অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং ইঁহার উপদেশে শম্ভুনাথ ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে হার্ম্যান জেফ্রয় বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের জন্য একটি তর্কসভার প্রতিষ্ঠা করেন। এই তর্কসভায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং তাঁহার অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষ ও শ্রীনাথ ঘোষ (যিনি পরে কলিকাতা মিউনিসি-প্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন), ইংরাজীতে সুলেখক কৈলাসচন্দ্র বসু, হাটখোলা দত্তবংশোদ্ভব ভবানীচরণ দত্ত প্রভৃতি বক্তৃতা ও তর্কশক্তি অর্জ্জন করেন। ক্ষেত্রচন্দ্র শম্ভুনাথের সমশ্রেণীতে পড়িতেন, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি নিম্নতর শ্রেণীতে পড়িতেন। এই তর্কসভায় ক্ষেত্রচন্দ্র ও শম্ভুনাথ বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতেন। শম্ভুনাথের ক্ষেত্রচন্দ্রের ন্যায় বক্তৃতাশক্তি না থাকিলেও যুক্তিসমন্বিত তর্কশক্তি প্রবলতর ছিল, সেই জন্য হার্ম্যান জেফ্রয় ক্ষেত্রচন্দ্রকে সভার 'ডিমস্থিনীস' ও শম্ভুনাথকে 'ফোশিয়ন' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। উভয়েই ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন, হার্ম্যান জেফ্রয় এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

শম্ভুনাথ গণিতশাস্ত্রের অনুরাগী ছিলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল এবং অধ্যবসায়, মেধা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব সম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র তৎসম্পাদিত 'বেঙ্গলী'তে দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একবার একজন মাতাল সাহেব একটি উলঙ্গ তরবারি হস্তে ছাত্রদিগের খেলার মাঠে উপস্থিত হয়। ছাত্র ও শিক্ষকগণ প্রাণভয়ে পলায়নপর হন, কিন্তু শম্ভুনাথ সাহসসহকারে তাহার সম্মুখে আসিয়া কথোপকথন করিতে করিতে কৌশলে তাহাকে নিরস্ত্র করেন। আর একবার এক ভীষণদর্শন ফকীর একটি ছাত্রকে অবমাননা করে, শম্ভুনাথ একদল ছাত্রের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাকে ধৃত করিয়া তাহার সমুচিত শাস্তি বিধান করেন।

আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে শম্ভুনাথ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে তিনি সদর আদালতে কুড়ি টাকা মাত্র মাসিক বেতনে মহাফেজের সহকারী (Assistant Record-keeper) রূপে কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করেন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় তিনি বাঙ্গালা ও পারস্যভাষায় লিখিত দলিলাদির ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কিছু অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহার অনুবাদগুলি উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয়গণের প্রশংসা লাভ করিত। তাঁহার সৎকার্য্যে প্রীত হইয়া স্যর রবার্ট বার্লো তাঁহাকে তাঁহার অধীনে ডিক্রীজারীর মুহুরীর পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি ডিক্রীজারীর আইন সম্বন্ধে একটি ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশিত করেন। উহা সদর-কোর্টের বিচারপতিগণের এবং গবর্ণমেণ্টের সপ্রশংস দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছিল।

শম্ভুনাথ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিলেও বিদ্যার্জ্জনে বিরত হন নাই এবং সাহিত্যদর্শনাদির চর্চ্চা রাখিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁহার সতীর্থ ভবানীচরণ দত্তের সহিত একযোগে বেকন-সন্দর্ভের একটি ইংরাজী টীকা প্রণয়ন করেন। উহা মেজর ডি-এল-রিচার্ডসনের ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির প্রশংসা লাভ করিয়াছিল।

এই সময়ে তিনি সদর আদালতের প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রাতঃস্মরণীয় দেশসেবক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে "ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ" সম্বন্ধে তাঁহার একখানি ইংরাজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পরে শম্ভুনাথ ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি হইয়াছিলেন, অন্নদাপ্রসাদ ও হরিশ্চন্দ্র উহার উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন।

কিছুকাল ডিক্রীজারীর মুহুরীর পদে নিযুক্ত থাকিবার পর সদর আদালতে মিসিল খাঁর পদ (Reader) শূন্য হয় এবং শম্ভুনাথ উক্ত পদের প্রার্থী হন। কিন্তু উক্ত পদ-লাভে তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হন। অতঃপর তিনি ওকালতী করিবার সঙ্কল্প করেন। তিনি কঠোর পরিশ্রম সহকারে আইন অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং স্বীয় গৃহে একটি আইন সভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বন্ধুর সহিত আপীল আদালতে প্রেরিত মোকদ্দমায় আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করিয়া আইনের জ্ঞান ও তর্কশক্তি বৰ্দ্ধিত করিতেন। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ই নভেম্বর

ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি সদর কোর্টে ওকালতীর সনন্দ প্রাপ্ত হন।

এই সময়ে ভারত গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাসচিব ও শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের সহিত শম্ভুনাথ পরিচিত হন। বেথুন যখন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ করেন তখন যে কয়জন অত্যল্পসংখ্যক বাঙ্গালী তাঁহার সদনুষ্ঠানে আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন তন্মধ্যে শম্ভুনাথ পণ্ডিত অন্যতম। যে কয়জন বালিকা লইয়া প্রথমে বেথুন বিদ্যালয় আরম্ভ হয়, তন্মধ্যে শম্ভুনাথের কন্যা মালতী দেবী অন্যতমা। ইনি বেথুনের বিশেষ স্নেহের পাত্রী ছিলেন এবং ইঁহাকে উপলক্ষ করিয়াই বেথুন ও শম্ভুনাথের পরিচয় হয়।

বেথুনের অনুরোধানুসারে "স্কুল বুক সোসাইটী" কর্ত্তৃক প্রকাশিত "পিয়ার্সনের বাক্যাবলী"র নূতন সংস্করণে শম্ভুনাথ আইন ঘটিত বাঙ্গালা শব্দ ও তাহার ইংরাজী প্রতিশব্দের তালিকা সঙ্কলিত করিয়া দেন। বেথুনের অকাল বিয়োগের পর তাঁহার স্মৃতি-রক্ষার জন্য শম্ভুনাথ যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন।

শম্ভুনাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নামক রাজনীতিক সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতিতে প্রথম কয়েক বৎসর সদস্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ্চ শম্ভুনাথ জুনিয়র গবর্ণমেণ্ট প্লীডার নিযুক্ত হন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন বিভাগ স্থাপিত হইলে তিনি ৪০০৲ টাকা বেতনে উক্ত বিভাগে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি আইন বিষয়ক বক্তৃতাগুলি নিজব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া ছাত্রগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন। এই সময়ে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও পরে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দুপেট্রিয়ট' পত্রেও শম্ভুনাথ মধ্যে মধ্যে আইন-সংক্রান্ত সন্দর্ভাদি লিখিতেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন সিনিয়র প্লীডার রায় রমাপ্রসাদ রায় বাহাদুর অসুস্থতানিবন্ধন অবসর গ্রহণ করিলে শম্ভুনাথ তৎপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই পদে শম্ভুনাথকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল যে তাঁহার প্রজাগণ জাতিধর্ম্মবর্ণনির্ব্বিশেষে এদেশে উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে যখন সদর আদালত ও সুপ্রিম কোর্ট সম্মিলিত করিয়া হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন উদারহৃদয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং উক্ত ঘোষণাবাণী স্মরণ করিয়া একজন দেশীয় ব্যক্তিকে হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির পদে বরণ করিতে পরামর্শ দেন এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদকে বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু যখন নিয়োগপত্র আসিল তখন রমাপ্রসাদ মৃত্যুশয্যায়। দেশবাসীর আশঙ্কা হইল, বোধ হয় বাঙ্গালীর ভাগ্যে এরূপ সম্মানজনক পদপ্রাপ্তি ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু শম্ভুনাথের যোগ্যতা এই আশঙ্কা কতদূর অমূলক তাহা প্রমাণিত করিল। ধর্ম্মপ্রাণ ন্যায়নিষ্ঠ রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিনের প্রস্তাবে হাইকোর্টের প্রথম দেশীয় বিচারপতিরূপে শম্ভুনাথের নিয়োগ মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া অনুমোদন করিলেন। শম্ভুনাথের প্রগাঢ় আইনজ্ঞান, অপূর্ব্ব ন্যায়-পরতা, নিরবচ্ছিন্ন সাধুতা ও অনমনীয় সঙ্কল্পদার্ঢ্য এদেশের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মাধিকরণে যে উজ্জ্বল আদর্শের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছে, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তীরা অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন ও আসিবেন।

যখন মনোমোহন ঘোষ ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ শম্ভুনাথের সাহায্যেই তাঁহারা তাঁহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন (২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১২৭৪ বঙ্গাব্দ) কার্ব্বাঙ্কল রোগে অল্প দিন ভুগিয়া শম্ভুনাথ ৪৭ বৎসর বয়সে অকালে কালকবলে পতিত হন।

তাঁহার মৃত্যুতে দেশে হাহাকার পড়িয়াছিল। সরকারী গেজেটে ব্ল্যাক বর্ডার সহ তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড লরেন্সের শোকসূচক মন্তব্য প্রকাশিত হয় এবং হাইকোর্টের বিচারপতিগণ বিচারগৃহে আন্তরিক শোকপ্রকাশ করেন। তাঁহার অসংখ্য বন্ধু ও গুণমুগ্ধ জনসাধারণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে একটি প্রকাণ্ড সভাও আহূত করেন। এই সভার চেষ্টায় হাইকোর্টে শম্ভুনাথের একটি সুন্দর তৈলচিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট ও

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালও কলিকাতাবাসীর মনে শম্ভুনাথের হৃদয় ও মনের বিবিধ সদ্‌গুণের স্মৃতি চির-জাগরূক রাখিবে। তাঁহার সারল্য, অমায়িকতা, শিষ্টাচার, মিষ্টভাষিতা ও বন্ধুবাৎসল্য সকলের আদর্শস্থানীয় ছিল। তিনি ধর্ম্মভীরু, একেশ্বরবাদী ছিলেন। দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং মাদকতা নিবারণের জন্য তিনি চিরদিন আগ্রহশীল ছিলেন। কত দরিদ্র ও অনাথকে তিনি মুক্ত-হস্তে অর্থসাহায্য ও আশ্রয় দান করিতেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ কাশ্মীর প্রদেশবাসী হইলেও শম্ভুনাথের জন্মস্থান কলিকাতায়, তাঁহার প্রতিভার লীলাক্ষেত্র বাঙ্গালায়। তিনি সর্ব্ববিষয়ে বাঙ্গালী ছিলেন এবং সমসাময়িকগণের মধ্যে শম্ভুনাথ সর্ব্বোচ্চ পদে অধি-ষ্ঠিত হইয়া উহা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, দেশবাসীর পক্ষে অত্যুচ্চ দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্মপ্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া গিয়াছেন এজন্য বঙ্গবাসী চিরদিন গর্ব্ব ও গৌরব অনুভব করিবে।

নিরুদ্দেশ

একরামুদ্দীন

১

আজ ১৩৩১ সালের ফাল্গুনের "ভারতবর্ষ"এ, একটি ছোট গল্প "অস্তের নষ্টামি" পড়িয়া আমার সতর আঠার বৎসরের পূর্ব্বের একটি সত্য ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। তাহা "ভারতবর্ষে" প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

ঐ সময় একদিন মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমার সদর থানার বড়দারোগাবাবু সকালে উঠিয়া বাহিরে আসিতেই থানার ঝাড়ুদার ঝাড়ু দিতে দিতে তাঁহার হাতে একটি চীরকুট কাগজ আনিয়া দিল। বলিল, "কে একজন ইহা আপনাকে দিতে বলিয়া গিয়াছে।"

দারোগাবাবু চীরকুট পড়িয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে—

"মহকুমার হাকিম নিরুদ্দেশ। গতকল্য সন্ধ্যার সময় দুই ক্রোশ দূরে কালিন্দী পুষ্করিণীর পাহাড়ে তাঁহাকে শেষ দেখা গিয়াছিল। তাহার পর তাঁহার আর কোন সন্ধান নাই।"

চীরকুটে কাহারও সহি নাই। কিন্তু এমন গুরুতর ঘটনায় চীরকুট কাহার লেখা, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতে দারোগাবাবুর সময় নাই।

তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঐ ঘটনা সম্বন্ধে রিপোর্ট লিখিয়া বহরমপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট তাহা একটি কনষ্টবল্ দ্বারা পাঠাইয়া দিলেন।

বড় দারোগাবাবুর মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়া থানার সকলের মুখে একটা উদ্বেগের ভাব দেখা দিল। স্থানে স্থানে পাঁচ সাতজনের জটলা হইয়া এই বিষয়ের আলোচনা চলিতে লাগিল। জমাদারবাবু প্রাচীন লোক, তিনি বিজ্ঞের মত মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "এ সেই দীনু ডাকাতের কাজ—আগে তিন তিন্‌টা খুন করেছে—তাকে সে দিন জামিনে খালাস্ দেওয়া এস্-ডি-ওর ঠিক হয় নাই। আর একটা খুন করিয়া নিরাপদ হইতে কে না চায়?" সকলেই বলিয়া উঠিল, "ঠিক্! ঠিক্! ঠিক্!"

২

প্রথম মুন্‌সেফবাবু বিছানা হইতে উঠিবামাত্র তাঁহার সহীস আসিয়া তাঁহাকে একটু চীরকুট দিল। চীরকুটে পূর্ব্বের মত লেখা ছাড়া আরও লেখা ছিল, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া একবার কালিন্দীর পাহাড় পর্য্যন্ত দেখিয়া আসুন।" এ চীরকুটেও কাহারও সহি ছিল না।

বলা বাহুল্য ডাক্তারবাবুর উপদেশ মত মুন্‌সেফবাবু প্রাতঃভ্রমণের জন্য একটি ঘোড়া রাখিয়াছিলেন। চীরকুট পড়িয়াই মুন্‌সেফবাবু সহীসকে বলিলেন, "জল্‌দি [illegible] ঘোড়া তৈয়ার করো

মুন্‌সেফ বাবুর গিন্নী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে

ভোরে ঘোড়ায় চড়ে কোথায় যাবে।" মুন্‌সেফবাবু উত্তর করিলেন, "এস্‌-ডি-ওকে গত সন্ধ্যা হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। কালিন্দীর পাহাড়ে তাঁহাকে শেষ দেখা গিয়াছিল। আমি তাঁহার সন্ধানে কালিন্দীর পাহাড় পর্য্যন্ত যাইব।"

মুন্‌সেফ গিন্নী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আমার মাথার দিব্য যেও না-যেও না। দেখ্‌ছ কি বিদ্রোহীর দল সেখানে লুকিয়ে আছে—ইংরাজের হাকিম দেখ্‌লেই তাকে খুন করবে।"

মুন্‌সেফবাবু বলিলেন, "তবে কি করি? না গেলে দোষ হয়, গেলেও প্রাণের ভয়।" তিনি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

৩

একজন উকিল ছিলেন। তাঁহার সহিত মহকুমার হাকিমের খুব হৃদ্যতা। তাঁহার বাড়ীর মেয়েরা হাকিমের বাড়ী যাতায়াত করিত। সেই উকিলবাবুও লেখকের নামহীন প্রথমোক্ত চীরকুটের মত একটি লিখিত চীরকুট পাইলেন। তাহাতে আরও লেখা ছিল:—"এস্‌-ডি-ওর নিরুদ্দেশে তাঁর বাড়ীর মেয়েরা বড় শোকাকুল হয়েছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার বাড়ীর মেয়েদের পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিবেন। আরও আপনি প্রথম মুন্‌সেফবাবুকে কালিন্দীর পাহাড়ে তদন্তের জন্য পাঠাইবেন। তিনি তাড়াতাড়ি ঘোড়ার গাড়ী ডাকাইয়া তাঁহার বাড়ীর মেয়েদের এস্‌-ডি-ওর বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন এবং নিজে প্রথম্ মুন্‌সেফবাবুর বাড়ীতে চলিলেন।

উকিলবাবুর বাড়ীর মেয়েরা সরোদনে এস্‌-ডি-ওর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এস্‌-ডি-ও গৃহিণী নিশ্চিন্তমনে বসিয়া তরকারী কুটিতেছেন। যাঁহার স্বামী নিরুদ্দেশ তিনি কিরূপে এরূপ নিশ্চিন্ত মনে সংসারের কাজ করিতে পারেন, তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

উকিলগৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার বাবুর কোন সংবাদ পেলেন কি না?" হাকিম-গৃহিণী অম্লানবদনে উত্তর করিলেন, "সংবাদের আর কি দরকার? তিনি বিছানা থেকে উঠে বাইরে মুখ ধুচ্চেন।" উকিল-গৃহিণী বলিলেন, "তবে ত গুজব মিথ্যা। আমাদের বাবু প্রথম মুন্‌সেফবাবুর বাড়ী গেছেন। শীঘ্র একজন চাকর পাঠিয়ে সংবাদ দেন যে এস্‌-ডি-ও নির্ব্বিঘ্নে আছেন।"

৪

সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মুন্‌সেফবাবুর বাড়ীতে একজন চাকর পাঠান হইল। উকিলবাবুর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া প্রথম মুন্‌সেফবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া এস্‌-ডি-ওর অনুসন্ধানে বাহির হইতেছিলেন। এস্‌-ডি-ওর চাকরকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "সংবাদ কি?" চাকর বলিল, "সংবাদ দিতে আসিয়াছি যে বাবু বিছানা হইতে উঠিয়া মুখ ধুইতেছেন।" মুন্‌সেফবাবু হাসিয়া বলিলেন, "ওঃ আজ্ ১লা এপ্রিল, কে আমাদিগকে এপ্রিল ফুল করিয়াছে?"

মুন্‌সেফকে এস্‌-ডি-ওর দুর্ঘটনার সংবাদ দিবার জন্য বড়দারোগাবাবু একজন লোক পাঠাইয়াছিলেন। সে এই সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া যাইয়া দারোগাবাবুকে সংবাদ দিল যে এস্‌-ডি-ওর নিরুদ্দেশ হওয়ার সংবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। রিপোর্ট লইয়া যে কনেষ্টবল বহরমপুর যাইতেছিল, তাহাকে ফিরাইতে একজন লোক বাইক লইয়া ছুটিল।

ইহার পরেই জানিতে পারা গেল যে এতগুলি লোককে এপ্রিল ফুল করিয়াছিলেন একটি উকিলবাবু।



শব্দরত্নাবলী ও মূসা খাঁ

শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ

গত ১৩৪২ সনের চৈত্র-সংখ্যা ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ মহাশয় "শব্দরত্নাবলী ও মূসা খাঁ" শীর্ষক প্রবন্ধে মূসা খাঁর বংশ-পরিচয় ও তাঁহার স্থিতিকাল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত প্রবন্ধে মূসা খাঁর পিতৃ-পরিচয় অর্থাৎ ঈশা খাঁর নাম স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বর্ণিত পুঁথিতে (১) না পাইয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় সন্দেহ করিয়াছেন যে শব্দরত্নাবলীর গ্রন্থকার মথুরেশই এই ভুল করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক। রাজা রাজেন্দ্রলালের পুঁথি ব্যতীত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২) ইণ্ডিয়া অফিস (৩) ও বোড্‌লিয়ন্ পুঁথিশালায় (৪) মথুরেশকৃত শব্দরত্নাবলীর কয়েকখানি পুঁথি রক্ষিত আছে। উক্ত তিন স্থানের পুঁথিতেই মূসা খাঁর পিতৃনাম ঈশা খাঁ বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। যথা :—"আসীৎ ক্ষ্মাতল-মণ্ডলে নৃপকুলৈঃ সংসেবিতঃ শ্রীযুতেভূর্পালঃ শিলমানখাঁন ইতি যঃ কীর্ত্তি প্রতাপোজ্জ্বলঃ। যদ্দোর্দণ্ডপ্রতাপচন্দ্রদহনৈঃ কঃাণ্ডসূর্য্যপ্রভৈঃ প্রত্যর্থি-ক্ষিতিপালকা রণভুবি ক্ষোভাকুলাঃ শেরতে॥ তস্যৈব জগদেক বীর তনুবা খ্যাতো জগন্মণ্ডলে ঈশাখান মহীপতিঃ স্থিরমতিব্যাঙ্গৈক রঙ্গোৎসবঃ। দৃপ্তৈর্দ্বাদশ ভূমিপৈশ্চিরতরং তীক্ষ্ণাংশু চণ্ডপ্রভৈঃ শীলেন প্রতিদেশপালনবিধৌ সংসেব্য মামোহভবৎ॥ এতস্মাদজনি প্রতাপ-মিহিরঃ সৎকীর্ত্তি শীতদ্যুতির্দ্দান শ্রীবলিভূপতিঃ সুমহিম শ্রীরামদেব স্বয়ং। মূসা খাঁন মশনন্দ আলি নৃপতিঃ শ্রীমান মহীমণ্ডলং শাস্তি দ্বাদশ-ভূমিপৈঃ প্রতিদিনং ভ্রূভঙ্গ মাত্রেণ যঃ॥

ঢাঃ বিঃ পুঁথি।

ইণ্ডিয়া অফিস ও বোড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীর পুঁথিতেও দুই একটি শব্দের পার্থক্য ব্যতীত মূসা খাঁর বংশপরিচয় পূর্ব্বোক্তরূপই পাওয়া যায়। সুতরাং রাজা রাজেন্দ্রলাল বর্ণিত পুঁথির ঐ অংশ যে অসম্পূর্ণ তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

কোলব্রুক্ ও উইলসনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত মহাশয় শব্দরত্নাবলীর রচনাকাল ১৫৮৮ শক বা ১৬৩৬ খৃঃ বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শব্দাবলীর কোন রচনাকাল মথুরেশ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সম্পূর্ণ; কিন্তু ইহাতে শব্দরত্নাবলী রচিত হইবার সময় নির্দ্দেশক কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বোড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরীর পুঁথিতে গ্রন্থ রচনার তারিখ নাই। ইণ্ডিয়া অফিসের পুঁথির শেষ পুষ্পিকায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাওয়া যায় :—

"শাকাব্দে রসদোর্ব্বরাংর ধরামানে ধরানির্জ্জরঃ
কোগপোতামলিখঃ কোবিদমতাং শ্রীশব্দরত্নাবলীং

কিন্তু তারিখটি ১৭২৬ শকাব্দ বা ১৮০৪ খৃঃ। সুতরাং ইহা কোনমতেই গ্রন্থরচনার তারিখ হইতে পারে না। এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বোড্‌লিয়ান্ লাইব্রেরী ও ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পুঁথি কয়েকখানিই যথাক্রমে উইলসন্ ও কোলব্রুক্ সাহেব কর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। কোল-ব্রুক্ ও উইলসন্ সাহেবের নিজেদের পুঁথিতেই গ্রন্থ রচনার কোন তারিখ নাই, অথচ তাঁহারা শব্দরত্নাবলীর রচনাকাল ১৫৮৮ শকাব্দ কোথা হইতে পাইলেন তাহা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। কোলব্রুক্ ও উইলসনই সর্ব্বপ্রথম শব্দরত্নাবলীর গ্রন্থকর্ত্তা মথুরেশ ও "সার-সুন্দরী" নামক অমরকোষের টীকা গ্রন্থের রচয়িতা মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরেশ বিদ্যালঙ্কারকৃত সার-সুন্দরীর তারিখ ১৫৮৮ শকাব্দ বা ১৬৬৬ খৃঃ। সম্ভবতঃ কোলব্রুক্ ও উইলসন্ সার-সুন্দরীর তারিখটিকে মথুরেশকৃত শব্দরত্নাবলীর রচনাকাল অনুমান করিয়া এই বিভ্রাটের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র নামের সাদৃশ্য ব্যতীত উভয় মথুরেশের অভিন্নত্ব প্রমাণ করিবার পক্ষে আর কোন যুক্তি বর্ত্তমান নাই। মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার সার-সুন্দরীতে তাঁহার সুদীর্ঘ কুলের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু শব্দরত্নাবলীতে মথুরেশের নাম ভিন্ন আর অন্য কোন পরিচয় নাই। এই সম্বন্ধে আরও একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে সারসুন্দরী ও শব্দরত্নাবলীর গ্রন্থকর্ত্তার একত্ব স্বীকার করিলে এবং উভয় গ্রন্থই ১৫৮৮ শকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া গ্রহণ করিলে আমরা সারসুন্দরীতে ও মথুরেশের আশ্রয়দাতা রাজা মূসা খাঁর উল্লেখ আশা করিতে পারি। কিন্তু সারসুন্দরীর মথুরেশ বিদ্যালঙ্কার তাঁহার গ্রন্থের কোন স্থানে মূসা খাঁর নাম করেন নাই। অপর পক্ষে শব্দরত্নাবলীর প্রারম্ভে মথুরেশ মূসা খাঁ ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং গ্রন্থের প্রতি অধ্যায়ের শেষে তাঁহার স্বকৃত গ্রন্থখানিকে মূসা খাঁর নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। শব্দরত্নাবলীর মথুরেশের পক্ষে একই শকে রচিত অপর আর একখানা গ্রন্থে তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজার সম্বন্ধে নীরব থাকা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় [illegible]

মির্জ্জা নথন বিরচিত "বাহার-ই-স্তান" নামক [illegible] যদুনাথ সরকার মহাশয় সর্ব্বপ্রথম আমাদের [illegible] ইহাতে ১৬০৮ হইতে ১৬২৪ খৃঃ পর্য্যন্ত সময়ের

(১) Raj. Mitra. Notices of Sanskrit Mss. vol III. P. 65.
(২) ঢাঃ বিঃ পুঁথি সংখ্যা ৪৩০৮, ২২ক পত্রঃ।
(৩) I. O. Cat. vol. I. P. 286-87.
(৪) Autnecht, Bod. Cat. P. 193.

ইতিহাস সঙ্কলিত আছে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পারস্য ও উর্দু ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ বোরা এই পুস্তক ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছেন এবং ইহা আসাম গভর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে মুসা খাঁর কার্য্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে। ইহাতে দেখা যায়, ত্রিপুরা জয় করিয়া ফিরিবার অব্যবহিত পরে এবং ১৬২৪ খৃঃএর এপ্রিল মাসে শাহজাহান বিদ্রোহী হইয়া বাঙ্গালা দেশে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে মুসা খাঁ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকাল ভুগিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ফতজঙ্গ রাজকীয় চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছিলেন কিন্তু মুসা খাঁ বাঁচিলেন না। মুসা খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মাশুম খাঁ তখন ১৮।১৯ বৎসরের যুবক। ইব্রাহিম খাঁ তাঁহাকে মুসা খাঁর স্থলাভিষিক্ত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। সুতরাং ১৬২৪ খৃঃএর প্রথমভাগে খাঁর মৃত্যু হইয়াছিল এবং শব্দরত্নাবলী নিশ্চয়ই তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়া থাকিবে। (৫)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত শব্দরত্নাবলীর পুঁথির ২২ ক পত্রে একটি শ্লোকে মুসা খাঁ কর্ত্তৃক বিক্রমপুর বিজয়ের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

"মসলক্ষ্মী নিজবৈরিণাং বরবধূসিন্দুরবিধ্বংসিনী
যদ্বাণী ললিতাসতাং গুণবতামানন্দ হিল্লোলিনী।
শ্রীমচ্চান্দ নরেন্দ্র বিক্রমপুরী যেন স্বহস্তে কৃতা
সোহয়ং শ্রীমশনন্দ আলি নৃপতির্জীয়াচ্চিরং ভূতলে॥"

এই শ্লোকটির প্রথম অর্দ্ধাংশ ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত শব্দরত্নাবলীর পুঁথির অন্ত্য পুষ্পিকার অন্যান্য শ্লোকের সহিত পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়া অফিসের এই পুঁথির পুষ্পিকা শ্লোক কয়েকটি হইতে ইহাও জানা যায় যে মুসা খাঁ ও মহম্মদ খাঁ ব্যতীত ঈশা খাঁর আরও কয়েকটি পুত্র ছিল। নিম্নে শ্লোক কয়েকটি উদ্ধৃত হইল।—

"যল্লক্ষ্মীর্ব্বর বৈরিণাং কুলবধূ সিন্দুর বিধ্বংসিনী
যদ্বাণী ললিতা সতাং গুণবতামানন্দ কিল্লোলিনী।
যদ্রেক্ষোত্তর কল্পনা বিজয়িনী কর্ণাদি পৃথ্বীভুজাং
সোহয়ং শ্রীমশনন্দ এলি নৃপতির্জীয়াচ্চিরং ভূতলে॥
শ্রীমৎখান সহোচ্চদ (মহম্মদ) স্তদনুজো মধ্যাহ্ন চণ্ডদ্যুতিং
বৈরি প্রৌঢ়ি ঘনান্ধকার শমনো গাম্ভীর্যধৈর্যোন্নতিঃ।
শশ্বদ্দিগ্‌বিজয়ী মহেন্দ্র সদৃশঃ সোহয়ং চিরং জীবতাদ্
যদ্বক্ত্র স্মিত বীক্ষিতাস্তনিতরাং ধ্যায়ন্তি দিগ্‌যোষিতঃ॥
এতস্মাদনুজশ্চিরং বিজয়তাং বীরেন্দ্র চূড়ামণিঃ
শ্রীমৎ কাম সহোদরোতি রসিকঃ খাঁনাবত্তলাহ্বয়ঃ।
উত্তুঙ্গীম গজেন্দ্ররাজি তরণি সঙ্গী নমৎ কার্ম্মুকো
যদ ভ্রূভঙ্গ তরঙ্গিতৈর্বিচলিতাঃ প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজঃ॥
তস্মদেপ্যনুজাঃ কৃপার্জ্জুনবলিদোণাগ্নিকর্ণোপমা
যুদ্ধানন্দ খাঁন প্রমুখাঃ সানন্দমত্যুন্নতাঃ।
সৌভ্রাত্রেণ চিরং জয়ন্তি নিতরামত্যোন্য মুৎকণ্ঠিতা.
সংতোষং দধতু ক্ষিতি প্রণয়নে দীর্ঘায়ু বিত্তোৎসবৈ.॥
শব্দরত্নাবলীকোষস্তোষণঃ সুমহাত্মনাং।
মৎসরাণাং বুদ্ধিনাশ বজ্রপাত বিজৃম্ভতে॥
ভূপ শ্রীমশনন্দ এলি সমনুজ্ঞাতো চিরং জীবতাং
শ্রীমদ বল্লভরায় উজ্জ্বলমতিঃ শ্রীরূপদাসোঽপিচ।
যাভ্যামর্ধ বিভাগতঃ (র্দ্ধবিভাগতঃ) ক্ষিতিপতেঃ শ্রীশব্দরত্নাবলী
নিত্যাং সংকৃতি শোভনী শুভকরী যত্নেন নির্বাহিতা॥

উপরোদ্ধৃত অংশটি হইতে বল্লভ রায় ও রূপদাস নামক দুই ব্যক্তির সহিত শব্দরত্নাবলীর একটি সম্বন্ধ সূচিত হইতেছে। তাঁহারা ভাগাভাগি করিয়া মশনন্দ আলির আদেশানুসারে শব্দরত্নাবলী গ্রন্থের ভার লইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অপর পরিচয় অজ্ঞাত।

(৫) যাহার ই-স্থান বর্ণিত ঘটনাটির সন্ধান আমাকে শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দিয়াছেন। এইজন্য আমি তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। লেখক



পাখীর বাসা

শ্রীনরেন্দ্র দেব

প্রাণীজগতে আবাস নির্ম্মাণের অদ্ভুত কৃতিত্ব চ'খে পড়ে একমাত্র বিহঙ্গজাতির। নীড় রচনায় তাদের এমন অপূর্ব্ব কৌশল ও বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় এবং এত বেশী সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় যে, বিস্মিত না হ'য়ে পারা যায় না! কেবলই মনে হয় এতটুকু ছোট পাখী এরা, এদের মধ্যে এমন শিল্প-চাতুর্য্য, এমন কারু-নৈপুণ্য কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল? এত কলাকৌশল কে তাদের শেখালে এবং সে বিদ্যাপ্রয়োগের এতবুদ্ধিই বা পেলে কোথা তারা?—

পাখীর বাসার বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য সব চেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায় পৃথিবীর উষ্ণপ্রধান অঞ্চলে। কারণ, এইসব প্রদেশেই রকমারি পাখীর অসংখ্য আড্ডা; শুধু তাই নয়, রকমারি জীবজন্তুর প্রাদুর্ভাবও সেখানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এই সব জীবজন্তুদের মধ্যে আবার অধিকাংশই পক্ষীসমাজের প্রবল শত্রু! কাজেই, পাখীদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনও সেখানে সব চেয়ে বেশী। বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই আত্মরক্ষার একান্ত আবশ্যকতাই নাকি তাদের নীড় রচনায় নিত্য নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে।



'অরুণ-পাখী'র বাসা—এই দীপ্তপক্ষ অরুণ-পাখীরা (Sun-birds) ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী

'অন্তরীপা' পাখীর বাসা—এই অন্তরীপা পাখীরা (Cape-Tits) দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী

'সীবন-শিল্পী' পাখীর বাসা (টুন্‌টুনি!)—এই সীবন-শিল্পী পাখীরা (Tailor-birds) এশিয়ার অধিবাসী। ভারতবর্ষে যথেষ্ট আছে। এখানে এদের বলে টুনটুনি

'ফুলটুকী' পাখীর বাসা—এই ফুলটুকী পাখীরা (Flower-pecks) চীন জাপানের অধিবাসী

পাখীদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্ত্রস্ত থাকতে হয় বৃক্ষ-কোটরবাসী ও বৃক্ষারোহণদক্ষ জীবজন্তুদের আক্রমণ

প্রতিরোধের জন্য। সরীসৃপ জাতীয় জীবরাই পক্ষীকুলের প্রধান শত্রু! উষ্ণ প্রদেশে এদেরও প্রাদুর্ভাব অত্যধিক এবং গাছের প্রতি শাখা পল্লবে পরিভ্রমণ ক'রতে এরা বিশেষ সুপটু! সুতরাং এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আর কোনও উপায় না দেখেই পাখীরা অনেক ভেবে, অনেক বুদ্ধি ক'রে, শেষে বাবুইয়ের বাসার মত ঝোলা-বাসা তৈরী ক'রতে শিখেছে। এ বাসাগুলি তাদের পক্ষে যেমনই নিরাপদ, তাদের শত্রুর পক্ষে তেমনই বিপজ্জনক। পাখীর শত্রুরা তা জানে বলেই ঝোলা-বাসায় তারা চট্ ক'রে চড়াও হ'তে ভয় পায়।

বাবুইয়ের বাসা আমরা প্রায়ই এখানে দেখতে পাই ব'লে ওর সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোনও কৌতুহল জাগে না বটে, কিন্তু ওর চেয়ে আশ্চর্য্য পাখীর বাসাও পৃথিবীর



কারণ্ডবের বাসা—হংসজাতীয় এই পাখীরা (Flemingo) নদীর ধারে মাটির ঢিবির মত বাসা নির্ম্মাণ করে

আর কোনও দেশে নেই! যাঁরা এই বাবুইয়ের বাসা একটু মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে দেখেছেন তাঁরা জানেন—কি আশ্চর্য্য বুদ্ধিকৌশলে ক্ষুদ্র বাবুই তার দোদুল্যমান বাসাটি বৃক্ষশাখায় গ'ড়ে তোলে! সেলাই ও বোনায় সুনিপুণ কোনও কোনও পাখীর (Tailor-birds) বাসা দেখে মনে হয়, মানুষ হয়ত প্রথম এইসব পাখীর কাছেই সেলাইয়ের কাজ শিখেছিল! এক একখানি বড় পাতার দু'ধার মুড়ে সেলাই ক'রে অথবা দুখানি মাঝারি বা তিনচারখানি ছোট পাতার কিনারা পরস্পরের সঙ্গে সেলাই ক'রে জোড়া দিয়ে সীবন-শিল্পী পাখীরা যে চমৎকার একটি পেয়ালার মত থলে-বাসা তৈরি করে তা যথার্থই বিস্ময়কর! সুতো সংগ্রহ করে এরা রেশমের গুটী থেকে, তা'ছাড়া পথে ঘাটে হাটে মাঠে যেখানে একটুকরো সুতো পড়ে আছে এরা দেখতে পায় তখনি তা তুলে নিয়ে গিয়ে কাজে লাগায়।



'সঙ্ঘচারী'দের বাসা—এই সঙ্ঘচারী বা দোলো তাঁতিরা দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী

ছুঁচের কাজ করে অবশ্য তাদের সেই সূক্ষ্ম সুতীক্ষ্ণ চঞ্চুপুট সেলাইয়ের প্রান্তে ও প্রারম্ভে সুতোয় এরা কোনও গাঁ দিয়ে নিতে অভ্যস্ত নয়। অনেকের ধারণা ওরা সুতোয় গাঁ দিয়ে নেয় এবং গাঁট দিতে জানে, কিন্তু সেটা একেবারে ভুল। তবে সুতোয় গাঁট দিতে না জানলেও বা না দিয়ে সেলাইটা এরা বেশ মজবুদ ক'রতে পারে। এই সংযু পত্রপুটের অভ্যন্তরে এরা তুলা বা কাশ প্রভৃতি পালকের তু নরম ফুল বা তদনুরূপ কোনো কোমল তৃণ সংগ্রহ করে এ আরামপ্রদ নীড় রচনা করে। আমাদের 'টুনটুনি' পাখীরা এ সৌচিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

এই সীবন-শিল্পী পাখীদের ডিমগুলি ছোট ও সংখ্যায় অল্প। কাজেই, এদের ঐ হাল্‌কা ক্ষুদ্র নীড়টুকুতে যে ভার পড়ে তাতে—ওদের সেই বাসার পল্‌কা বাঁধন আল্‌গা হ'য়ে এখনই বুঝি খসে পড়ে যাবে—আমাদের মনে এই রকম আশঙ্কা হ'লেও, প্রকৃতপক্ষে সেরূপ দুর্ঘটনা কোনদিনই ঘটে না। সীবন-শিল্পী পাখীরা বেশ নিরাপদেই তার মধ্যে ডিম ফুটিয়ে বাচ্ছাদের বড় ক'রে ছেড়ে দেয়। এদের এই বাসা খুঁজে বার করা কিন্তু ভারি শক্ত! কোথায় কোন তরুশাখায় পত্রগুচ্ছের অন্তরালে এদের ঐ ক্ষুদ্র নীড় সকলের দৃষ্টির অগোচরে এমন গোপন থাকে, যে সহজে তা দেখা যায় না।

অধিকাংশ পাখীর বাসা—যা আমাদের বিস্ময় ও কৌতূহল



'লালাস্রাবী'দের বাসা—এই লালাস্রাবীরা (Swifts) মলয় দ্বীপের অধিবাসী। এদের মুখনিঃসৃত লালায় তৈরী এই বাসা চীনেদের অতি প্রিয় ও মূল্যবান ভোজ্য

উৎপাদন করে, তার আকৃতি প্রায়ই দেখা যায়—হয় ঘাস-পাতার চাবড়া বাঁধা বা ছাল্‌টির মত কোমল নেমদার ছাউনী ঢাকা, নয়ত জটপাকানো কম্বলের কিম্বা বনাতের টুকরো চাপা দেওয়ার মতো পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর! বিলিতি Chaffinch পাখীর বাসা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে গাছের ডালের ঠেসের উপর বসানো পেয়ালা বা এক পাতি-ভাঁড়ের মত বাসার চেয়ে বৃক্ষশাখা থেকে শূন্যে লম্বমান নীড় রচনায় ঢের বেশী নৈপুণ্য, শ্রম ও ধৈর্য্য থাকা প্রয়োজন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় Cape Tit বা 'অন্তরীপা' পাখীর ছাল্‌টির বাসা আজ বিশ্ববিদিত হ'য়ে পড়েছে। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্ব্বে এক ফরাসী পর্য্যটক প্রথম এই আশ্চর্য্য পাখীর বাসা লক্ষ্য ক'রে এঁকে এনেছিলেন, কিন্তু তিনি এ বাসার মালিক নির্দ্দেশে ভুল করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন এই অদ্ভুত বাসা নির্ম্মাণ করে সম্ভবতঃ সেখানকার Grass warblerরা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে বাসার আসল কারিগর হচ্ছে এক শ্রেণীর ছোট পাখী—তাদের কোনও রকম কিছু আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নেই, অর্থাৎ অত্যন্ত তুচ্ছ ও সাধারণ চড়াই পাখীর মতই তাদের দেখতে। ওখানকার বুয়োররা এ পাখীর নাম রেখেছে 'তুলো-পাখী' (Cotton bird); এরা কিন্তু তুলতুলে নরম 'গাছ-পালক' অর্থাৎ কাশফুলের ন্যায় তৃণজাত কোমল যা কিছু সংগ্রহ করেই বাসা তৈরীর কাজ সমাপ্ত করে না, পশমের সন্ধান ক'রেও ফেরে! ভেড়ার লোম দেখতে পেলেই তারা তুলে নিয়ে যায়। ঠিক যেমন 'সেলায়ে-পাখী' সুতো দেখতে পেলেই তুলে নিয়ে যায়!

এদের বাসা দেখতে পাওয়া যায় প্রায় ঝোপের মধ্যে। অনেকগুলি ডাল-পালা জুড়ে এরা বাসাটি ফাঁদে। সমস্ত বাসাটিই তৈরি করে তারা ভেড়ার লোম ও পশমের তুল্য কোমল উদ্ভিজ্জ রোঁয়ায়। দেখে মনে হবে যেন সেটা কম্বলের ছাঁট বা গাল্‌চের টুকরোয় তৈরী, এমনই সুচারু নৈপুণ্যের সঙ্গে তারা পাটে পাটে বুনে তৈরী করে তাদের সেই বনাতের মত নেমদার বাসা! এর মাথাটি গম্বুজের মত; বৃষ্টির জলে একটুও ভেজে না। এ বাসার প্রবেশপথ ছোট্ট একটু নলের মুখের মত! চূড়োর উপরেই সেটি আছে, কিন্তু প্রবেশ পথের মুখেই অল্প নীচে একটি ছোট্ট জেবের মত বগ্‌লি আছে, গাঁয়ের লোকরা বলে ওটা না কি 'গৃহ-কর্ত্তার' বিশ্রাম কক্ষ!

পরলোকগত ডাক্তার ষ্টার্ক এদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন—বাসার অধিষ্ঠাত্রী পক্ষী-ঠাকরুণ যখনই

বাসা ছেড়ে বাইরে যান, যাবার সময় পাকা গৃহিণীর মতই সতর্কতার সঙ্গে তিনি গৃহদ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে যান। অর্থাৎ বাসায় ঢুকবার সেই নলের মুখটির কিনারা দু'পাশ থেকে টেনে এমন করে মিলিয়ে দিয়ে যান যে ভিতরে রৌদ্র বা বৃষ্টি ত যেতে পারবেই না, এমন কি কোনও শত্রুও চেষ্টা করলে ভিতরে ঢুকতে পারবে না। ডাক্তার ষ্টার্ক একবার লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলেন যে নীড়-লক্ষ্মী স্বয়ং



'তাঁতি-পাখী'দের বাসা (বাবুই !)—আফ্রিকায় এদের বলে তাঁতি-পাখী (Weaver-bird), এখানে এরা 'বাবুই' নামে পরিচিত

কোন সময় বাইরে থেকে ফিরে এসে বহু চেষ্টাতেও প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করতে পারছিলেন না। অনেকক্ষণ কষ্ট পেয়ে তবে কৃতকার্য্য হ'য়েছিলেন। ডাক্তার ষ্টার্কের এই বর্ণনা প'ড়ে মনে হয় যে চোরের ভয়ে মানুষ তার গৃহের দ্বার বন্ধ করতে শিখেছিল কি এদেরই কাছে প্রথম ?

এই গ্রীষ্ম-প্রধান প্রাচ্য-দেশের অধিকাংশ ছোট বড় পাখীই সাধারণতঃ বাসা নির্ম্মাণ করে লতাপাতা খড়কুটো ঘাস ছোটা প্রভৃতি যে কোন লঘু, শুষ্ক ও কোমল জাতীয়



'আখা-পাখী'র বাসা—এই আখা-পাখীরা (Oven bird) দক্ষিণ আফ্রিকার অধিবাসী। এরা মাটির বাসা তৈরী করে নেয়

উদ্ভিজ্জ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে এনে গাছের ডালের উপর জড় করে। কিন্তু দীপ্তপক্ষ অরুণ-পাখীরা (Sun-birds) সেগুলোকে আবার মাকড়সার জাল, গুটিপোকার লালা প্রভৃতি সূক্ষ্ম তন্তু জাতীয় পদার্থ সংগ্রহ ক'রে এমন ভাবে জড়িয়ে নেয়, যে তাদের বাসাটি দেখতে হয় ঠিক একটি



'টিলা-পাখী'র বাসা—এই টিলা-পাখীরা (Moundbird) অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসী। এরা শুষ্ক ঘাস পাতা ও মাটি জড় করে স্তূপ-আকার বাসা নির্ম্মাণ করে

বড় ডিমের খোলের মত! এদের বাসাটি গাছের ডালের উপরে বসানো হয় না। গাছের ডাল থেকে নীচে ঝোলে!

ডিমের খোলার মত এই বাদামী আকারের বাসার গায়ে একপাশে একটি ফুটো আছে—সেটি বাসার ভিতর যাতায়াতের পথ। এই প্রবেশ পথের উপর আবার একটু ছাউনী করা আছে। খুব সম্ভব ডিমে তা' দিতে বসে তরুণী মা একটু বাইরের জগৎটাও উপভোগ ক'রতে চান! তাই সেই সময় তাঁর মাথাটি বা মুখটি তিনি বাড়িয়ে বসে



'গুঞ্জনপক্ষ' তাপসী পাখীর বাসা—মাত্র একটি পাতার ডগায় এই গুঞ্জনপক্ষ (Humming-birds) ক্ষুদ্রকায় তাপসী পাখীরা গাছের আঁশ ও মাকড়সার জাল দিয়ে চমৎকার ছোট্ট বাসা তৈরী করে

থাকেন বাসার দুয়ার পথে গর্ত্ত হ'তে। পাছে তখন উপর থেকে কোনও শত্রু এসে অতর্কিতে তার মুণ্ডপাত ক'রে দিয়ে যায়, এই আশঙ্কায় আত্মরক্ষার সংকল্পে সে বুদ্ধি ক'রে বাসার দুয়ার পথের উপর আবার একটি ছোট ছাউনী নির্ম্মাণ করে রাখে। এই ছাউনী শত্রুর আক্রমণ থেকে যেমন তার মাথাটি বাঁচায়, তেমনি বৃষ্টির ধারা থেকেও তার বাসাটি বাঁচায়! কারণ এই ছাউনীটি না থাকলে বৃষ্টির জল অবাধে সেই গর্ত্তে গিয়ে বাসার মধ্যে জমা হ'ত।

এদের বাসা ঘনপল্লবসমাকীর্ণ বৃক্ষের শাখায় লোক-লোচনের অন্তরালে সংগুপ্ত থাকে না। সবার দৃষ্টিপথের সামনে,এমন কি শুকনো গাছের ডালেও এদের এই ডিম্বাকৃতি বাসাটি এমন ভাবে ঝোলে যে দেখে পাখীর বাসা বলে কারুর মনে কোনও সন্দেহ মাত্র হবে না। বরং সেটির চেহারা দেখে মনে হবে—হয়ত কখন কোন সময়ে কেমন ক'রে গাছের ডালে খানিকটা গোবর মাটির দলা আটকে গেছে! কিন্তু, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে ঠিক এই জাতের পাখীরাই অবিকল এই রকম বাসাই তৈরি করে বটে, অথচ সেগুলি এমন মাটির ঢেলার মত দেখায় না! সেগুলির চেহারা ভাল। দেখলে বনাত-মোড়া বা ছালটি-ছাওয়া কিম্বা নেমদারের তৈরী কিছু ঝুলছে বলে মনে হবে। অথবা গাছেরই এক রকম ফল ব'লেও ভুল হ'তে পারে!

অনেকটা এই ধরণের বাসা তৈরী করতে দেখা যায় Flowerpeck "ফুল্‌টুকী" পাখীদের। এরা চীন, জাপান প্রভৃতি এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চল প্রদেশের পাখী। এদেরও বাসা গাছের ডালে ঝোলে, একপ্রান্ত গাছের ডালের অনেকটা জুড়ে আটকে থাকে, তা ছাড়া এদের বাসার প্রবেশ পথের উপর আর কোনও ছাউনী নেই। এ বাসাগুলি দেখতে বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার, কারণ এরা পাচ রকম উপকরণ সংগ্রহ করে এনে নীড় রচনা করে না। কেবলমাত্র উদ্ভিজ্জ



'মধুপায়ী'দের নৌকা-বাসা—ঘাস ও পশম সংগ্রহ করে এই মধুপায়ী পাখীরা (Lanceolate Honey-Eater) গাছের সরু ডালে নৌকার মত ঝোলা বাসা নির্ম্মাণ করে

পালক ও মাকড়সার জালের সাহায্যে এমন চমৎকার বাসা বোনে এরা—যে এই পাখীর বাসা একটি অনায়াসে ভাঁজ

করে নিয়ে রক্ত-থলিরূপে ব্যবহার করা চলে! বাসাগুলি আকারে অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং একেবারে গাছের মগডালে ঝোলে ব'লে সহজে কারুর চোখে পড়ে না। এদের চূড়ান্ত নির্ভিকতা দেখে মনে হয়—এরা কোনোদিন উৎপীড়িত হয় নি অন্য কোনও জীব-জন্তুর অতর্কিত আক্রমণে!

এ অঞ্চলে আর এক রকম পাখী আছে যারা তাঁতে-বোনার মত সুন্দর করে বাসা বোনে। এদের বলে 'তাঁতি পাখী' বা 'বাবুই' (weaver bird); আফ্রিকা দেশেও এদের খুব দেখতে পাওয়া যায়। এদের বাসা তৈরীটা যথার্থই এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! কত বড় নিপুণ কলা-কুশল ও বয়নদক্ষ পাখী এরা—তা মুহূর্ত্তে বোঝা যায় এদের বিস্ময়কর বাসা বোনা দেখে। ঘাসপাতার চাপ্ড়া জমিয়ে বাসা করা—আর এদের এই বোনা বাসায় যে কত প্রভেদ তা' দেখলেই বোঝা যায়। এই বাসা বোনার প্রতিযোগিতায় যদি কেউ স্বর্ণপদক পাবার অধিকারী বলে বিবেচিত হয়—তাহ'লে আমাদের 'বাবুই' ও এই 'বায়া তাঁতি' বলে এশিয়াবাসী পাখীরাই একমাত্র তা দাবী ক'রতে পারে। এদের বাসা ঝোলে গাছের ডালে এক লম্বা সুতোয় বাঁধা। এ বাসাগুলির আকার অনেকটা বেলুনের মত! উপর দিকটা মোটা, নীচের দিকটা সরু। সেই চওড়া অংশেই অর্থাৎ বেলুনের মাথার দিকটাতেই পাখীর আসল-নীড়। তলার দিকটায় বাসার মধ্যে প্রবেশ করবার দীর্ঘ সরু গলি পথ মাত্র! পাখীর ডিম ও বাচ্ছাগুলো পাছে গড়িয়ে বাইরে পড়ে যায়—এই সম্ভাবনাটা রোধ করবার জন্য তারা একটা শক্ত বেড়া গলিপথ সুরু হবার মুখেই খাড়া করে রাখে। এটা সর্ব্বাগ্রেই তৈরী করে ফেলে বলে 'বেলুন-বাসার' মাথার দিকটা বোনবার সময় তারা এই বেড়াটার উপর বসেই কাজ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই তাঁতি জাতীয় এক রকম পাখী আছে, তাদের বলে 'সংজ্ঞচারী' বা 'দোলো তাঁতি' অর্থাৎ, এরা একসঙ্গে দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। একটি গাছে দশ বারো জোড়া পাখী প্রকাণ্ড এক ঘাসের ছাউনী বুনে ফেলে এবং ছাউনীর তলায় প্রত্যেক জোড়া পাখী তাদের নিজের জন্য পৃথক পৃথক এক একটি ক্ষুদ্র নীড় রচনা করে নেয়। দোলো তাঁতিরা দেখতে অত্যন্ত সাদা-সিধে রকমের। চড়াই পাখীর মতই ছোট ছোট পাখী। এদের নর ও মাদার মধ্যে পার্থক্য এই যে নরগুলোর প্রায়ই খুব উজ্জ্বল পীতাভ রং হয়, কিন্তু মাদীগুলোর তা নয়। এরা যে এই একা বাস না ক'রে সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে বাস করে তার প্রধান কারণ শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধে সুবিধা হবে বলে। মানুষও ঠিক এই একই কারণে একদিন সমাজবদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

খড়-কুটো ও ঘাসপাতার চাপ্ড়া বেঁধে বাসা করা, মাকড়শার জাল ও গুটিপোকার লালার সাহায্যে কঞ্চি, বেত, সরু সরু ডাঁটা, চিয়াড়ি, লতা, শোণ প্রভৃতি বুনে বাস করা ছাড়া নিজেদের মুখনিঃসৃত লালার আঠায় ঘাস পাতা আটকে বা কেবলমাত্র মুখের লালা শুকিয়ে নিয়ে একরকম বাসা তৈরী করে একশ্রেণীর পাখীরা। এই বাসাগুলি গড়ে নেবার আশ্চর্য্য কৌশল দেখে বিস্ময়ে অবাক হ'তে হয়। একেই ত পাখীর মুখে লালা গড়াতে দেখা যায় না। একমাত্র বিলিতি সুইফট্ পাখীর মুখ দিয়ে প্রচুর লালা ঝরে, এদের 'লালাস্রাবী' নাম দেওয়া যেতে পারে। সেই গাঢ় আঠা-আঠা লালার সাহায্যে তারা ঘাস পাতার চাবড়া জুড়ে নিজেদের অত্যন্ত স্থূল রকমের একটা বাসা তৈরী ক'রে নেয়। তবে আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে সুইফট্ জাতীয় যে সব লালা-নিঃস্রাবী পাখী আছে তারা বেশ যত্নের সঙ্গে নিজেদের মুখনিঃসৃত লালার আঠায় অতি পরিপাটি রকমের বাসা নির্ম্মাণ করে।

মধ্য আমেরিকায় একজাতীয় সুইফ্ট আছে, তারাও অতি চমৎকার বাসা তৈরী ক'রতে জানে। অনেকটা তাঁতি পাখীদের বোনা-বাসার ধরণে উৎকৃষ্ট নীড় রচনা করে এরা। চোঙার মত দীর্ঘ প্রবেশ পথের উপরে ছাউনী-ঢাকা সুন্দর বাসকক্ষ। তবে এদের বাসা গাছের ডালের পরিবর্ত্তে পাহাড়ের চূড়োর গায়ে ঝোলে। বাসাটি আগাগোড়া তুলোর মত বা পালকের মত নরম তুলতুলে। কোন ফুল ফলের সাহায্যে তৈরী করে নেয় তারা, নিজেদেরই মুখের লালার সাহায্যে এঁটে। আসল প্রবেশ পথের কিছু উপরে শত্রুকে প্রতারিত করবার জন্য এরা এক একটি মিথ্যা দ্বারপথ নির্ম্মাণ করে রাখে।

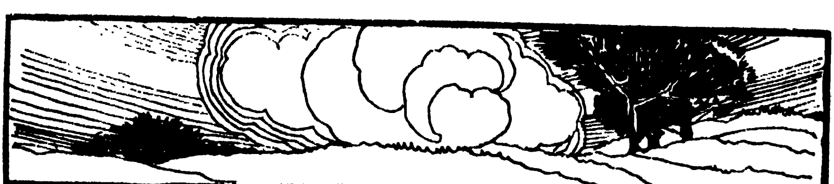
আমাদের প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সব সুইফ্ট্ জাতীয় লালাস্রাবী পাখী আছে, তারা তাদের মুখনিঃসৃত লালার

সাহায্যে পর্ব্বতগাত্রে বা গুহাভ্যন্তরের পাষাণ-বক্ষে শুষ্ক শ্যাওলা ঝাঁঝি প্রভৃতি জুড়ে আধখানা সরার মত একরকম অদ্ভুত বাসা তৈরী করে। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত আর একদল পাখী কেবলমাত্র তাদের মুখনিঃসৃত শুষ্ক লালার সাহায্যেই নিজেদের ছোট ছোট নীড় রচনা ক'রে নেয়! অপর কোনও উপকরণের উপর নির্ভর করে না এবং ব্যবহারও করে না। এই পাখীর বাসাই চীন দেশের প্রিয়খাদ্যরূপে আজ জগদ্বিখ্যাত হ'য়ে পড়েছে। বাজারে এই পাখীর বাসা এক একটির দাম মাছ মাংসের দামের চতুর্গুণ! পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বত গুহাগুলি এদের নীড় রচনার প্রধান আড্ডা! পাখীর বাসা ব্যবসায়ীরা এই সকল গুহা বহু অর্থ দিয়ে মালিকদের কাছে ইজারা নেয়। কারণ সেখান থেকে এই প্রিয়খাদ্য পাখীর বাসা সংগ্রহপূর্ব্বক তারা উচ্চমূল্যে বিক্রয় ক'রে অনেক টাকা লাভ করে।

কাদা-মাটির সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করে এমনতর পাখীও পৃথিবীতে অনেক আছে। বিলাতি চড়াই তার মধ্যে অন্যতম। পূর্ব্বোক্ত সুইফ্‌ট জাতীয় পাখীরা এক সময় বিলাতে 'এডিব্‌ল্ সোয়ালো' বা 'ভোজনীয় চড়াই' ব'লে পরিচিত ছিল। কিন্তু আসল চড়াই যারা—তাদের নাম ছিল সেখানে 'মেটে-ঘরামী' (Mud-Builders). কারণ তারা কাদা-মাটির সাহায্যে বাসা নির্ম্মাণ করে বাস ক'রতো। দক্ষিণ আমেরিকায় একজাতীয় পাখী আছে তাদের বলে Oven-Bird বা "আখা-পাখী"। গায়ের রং ঈষৎ পাটকিলে, দেখতে ভারি ভদ্র! এদের প্রকাণ্ড বাসাটি এরা বেশ শক্ত ভিতের উপরই গ'ড়ে অর্থাৎ গাছের মোটা ডাল বা কাণ্ডের মজবুদ অংশ বেছে নিয়ে তারা বাসা ফাঁদে। আড়াল আব্‌ডালের ধার ধারে না, গোপনতার আশ্রয় খোঁজে না, কারণ এরা জানে এদের বাসায় হানা দেওয়া বড় কঠিন। শত্রু সহজে তার মধ্যে প্রবেশ ক'রতে পারবে না। গম্বুজের মত তাদের সেই মাটির বাসার এক ধারে যে প্রবেশ দ্বার আছে, প্রখর রৌদ্রতাপে শুকিয়ে তা ঝামার মত শক্ত হয়ে থাকে। সেটা ভাঙা আয়াস-সাধ্য ব্যাপার। দ্বারপথে কেউ প্রবেশ ক'রতে পারলেই যে একেবারে অন্দর-মহলে গিয়ে হাজির হ'তে পারবেন তার উপায় নেই। কারণ সদরের সঙ্গে অন্দরের সরাসরি যোগ রাখে না তারা। সদরে ঢুকেই বাধা পাবে সে এক কঠিন প্রাচীরে। "আখা পাখী" সদরের পথে এই আড়ালটুকু তুলে তার অন্তঃপুরের মর্য্যাদা রক্ষা করেছে। এই প্রাচীরের ওপারে তার অন্দরের ঘর, সেখানে বসে নবীনা জননী ডিম ফুটিয়ে বাচ্ছার মুখ দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেন।

অষ্ট্রেলিয়ায় এক রকম 'টার্কি' বা পেরু জাতীয় পক্ষী দেখা যায় তাদের বলে 'Brush-Turkey' বা 'ঝোপ্‌ড়া-পেরু'; আসল টার্কীদের সঙ্গে অবশ্য এদের কোনই সম্বন্ধ নেই! এরা যে বাসা তৈরী করে, তাকে বাসা না বলে 'ডিম ফোটাবার বেদী' বলা যেতে পারে। কারণ পুরুষ পেরু প্রাণপণে মুঠো মুঠো মাটি খুঁড়ে তুলে জড়ো করে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সেটা ফুটকয়েক উঁচু এবং হাত কয়েক লম্বা চওড়া একটা ঢিবি হয়ে ওঠে! তখন মাদীরা এসে সেই বেদীর উপর চড়েন এবং মাটী সরিয়ে গর্ত্ত ক'রে তার মধ্যে ডিম পাড়েন।

মাদীরা ডিম পেড়ে উঠে এলে নর গিয়ে সে ডিমের উপর মাটি চাপা দেয়। মাটির তাতে ডিম পরিণত হ'তে থাকে। নর পাহারা দেয়, মাঝে মাঝে উঠে মাটি আল্‌গা ক'রে দিয়ে আসে—যাতে ডিম ফুটে বাচ্ছাদের বেরিয়ে আসতে কোন অসুবিধা না হয়। এইভাবে মাস দেড়েক যাবার পর ডিম ফুটে বাচ্ছারা বেরিয়ে আসে এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জন সুরু ক'রে দেয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জাতীয় পাখীর ভিন্ন রকম বাসা হ'লেও প্রত্যেক জাতির বাসা-নির্ম্মাণ কৌশল একই রকম এবং এই বাসা নির্ম্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য সন্তানের জন্ম, জীবনরক্ষা ও পালন!



বিরহ-মিলন-কথা

শ্রীহীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

৫

বাড়ীর গেটের মধ্যে তারা যখন নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকলো তখন জ্যোৎস্নালোকিত লনে প্রত্যহের মত প্রতাপবাবুকে কেন্দ্র ক'রে সান্ধ্য-মজলিস পরিপূর্ণভাবে জমে উঠেচে। বিজনকে দেখেই তিনি ইজিচেয়ারটাতে সোজা হ'য়ে উঠে ব'সে অকৃত্রিম আবেগে তাকে আহ্বান করলেন। বিজন অত্যন্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে এগিয়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি পরম সমাদরে হাত ধরে নিজের পাশে বসালেন। তারপর মাধবীকে চা পাঠিয়ে দেবার কথা ব'লে গল্প জুড়ে দিলেন।

আনন্দহীন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে মাধবী অন্দরের উদ্দেশে প্রস্থান ক'রলো। ইচ্ছা নিরালায় চারদণ্ড সবিতার কাছে ব'সে নিজের বুকের জ্বালা স্নিগ্ধ করে। শৈবালের আজকার আচরণ এতক্ষণ পর্য্যন্ত তার কাছে ছিলো রহস্যে অজ্ঞাত; হঠাৎ তার উপর পড়লো তীব্র আলো এবং মুহূর্ত্তে সেই রহস্যের তলদেশ অবধি মাধবীকে একেবারে নির্লজ্জ স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিল। কোথাও আর কিছু ঝাপ্‌সা অস্পষ্ট থাকলো না।

আজ তার প্রতি শৈবালের এই অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত আচরণ একই সঙ্গে তাকে মর্ম্মাহত ও বিস্মিত করেছিলো। একটা সামান্য ঘটনা—যা তাদের মধ্যে সহস্রবার ঘটেচে সেই অতি নগণ্য কারণ—নিয়ে অকস্মাৎ শৈবাল তাকে যে রকম কটুক্তি ও শ্লেষ ক'রলো—নবাগত অতিথিকে করলো অপমান—তাতে শৈবালের মত শিক্ষিত ভদ্র বিনয়ী স্নেহশীল যুবকের রাতারাতি এমনতর অস্বাভাবিক এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্ত্তনের কোন সঙ্গত কারণ মাধবী খুঁজে পাচ্ছিলো না। তার বেদনা-কাতর মন বার বার সেই অদৃশ্য জিনিসের সূত্র ধরবার প্রয়াস করছিলো, যা শৈবালের মত মানুষেরও এমনতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়েচে। মাধবী যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারে নি ব'লে শৈবাল এই মূর্ত্তি ধরেচে—এ কথা সে কিছুতেই নিসংশয়ে মেনে নিতে পারছিলো না। কারণটা তার কাছে রহস্যেই আবৃত থাকলো। তার পর শৈবালের সঙ্গে যখন পথের মাঝখানে দেখা হ'লো এবং শৈবাল তার আনন্দোজ্জ্বল মুখের উদ্যত আহ্বানকে উপেক্ষা ক'রে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলো, তখন তার মুখ চোখ থেকে তাদের দুজনের প্রতি যে নিবিড় ঘৃণা ও তিক্ত বিরক্তি বর্ষিত হ'য়েছিলো—মাধবীর চোখে তা এড়ায়নি এবং সেই নিমিষেই তার চোখের সামনে থেকে কাল রহস্যের পরদাখানা সরে গিয়ে সমস্ত কিছু সূর্য্যের খরতর আলোর মত স্পষ্ট হ'লো—প্রত্যক্ষমান হ'লো। মাধবী এখন বুঝতে পারলো—শৈবালের এই ক্রোধ ঘৃণা বিরক্তি, এই পাষাণের মত নির্ম্মমতা—এ সবের উৎস কোথায়!

বিজনের সঙ্গে মাধবীর প্রথম সাক্ষাৎ হ'লো আজ এই প্রথম। কিন্তু এই যুবকটির প্রতি তার শ্রদ্ধার কৌতুহলের আর অবধি ছিলো না—যদিও এর আগে দুজনের চার চোখে কখনো মিলন হয় নি; অপরিচিত বিজন সম্বন্ধে তার এতটা শ্রদ্ধা ও কৌতুহলের কারণ আছে। সবিতার মুখ থেকে বিজন সম্বন্ধে কত কি যে শুনেচে—তার আর ইয়ত্তা নেই। দিনের পর দিন এমনই ক'রে গল্প শুনে মাধবীর নিভৃত অন্তরের গোপন বেদী বিজনের প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৌতুহলে এমনই পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠলো—যে যখনই বিজনের প্রসঙ্গ উঠতো তখনই মাধবী সমস্ত ইন্দ্রিয় উন্মুখ ক'রে তার কথা শুনতো। কখন কখন তার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে সাগ্রহে সবিতাকে প্রশ্ন ক'রতো। নিজের ভাই সম্বন্ধে এই গভীর শ্রদ্ধা, এই অপরিসীম কৌতুহল—একদিকে সবিতাকে যতখানি গর্ব্বিত ও পুলকিত ক'রতো, অন্যদিকে যে আর একজন ঠিক ততখানি বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হ'তো—সে শৈবাল। কত দিন এমন ঘটনা ঘটেছে: হয়তো মাধবী, শৈবাল ও সবিতা একসঙ্গে ব'সে ক'রছে গল্প, একথা ওকথা সে কথার পর হঠাৎ উঠলো বিজনের কথা, মাধবীর কৌতুহল ও আগ্রহ মুহূর্ত্তে উদ্দীপিত হ'য়ে উঠলো। মাধবীর তার সম্বন্ধে এতটা শ্রদ্ধা ও কৌতুহল শৈবাল কিছুতেই সহ্য করতে পারতো না। সে চায় না, বিজনের সম্বন্ধে মাধবীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা বা আগ্রহ থাকে। তাই একজন যখন

তন্ময় হ'য়ে সবিতার মুখের দিকে চেয়ে গল্প শুনতো—ঠিক তারই পাশে ব'সে আর একজন ঈর্ষা ও বিরক্তিতে দগ্ধ হ'য়ে অন্যদিকে চেয়ে অবজ্ঞা দেখাবার চেষ্টা করতো, সবিতার সেই কথার মাঝে অন্য কথা এনে আলোচনা থামাতে চাইতো কিম্বা সবিতাকে এমন একটা ফরমাস করতো—যাতে কিছুক্ষণের জন্য সবিতাকে উঠে অন্যত্র যেতে হয় এবং আলোচনা বন্ধ হয়। তার নিজের মনের এই পুঞ্জীত বিরক্তি এবং বিজনের প্রতি তিক্ত অবজ্ঞা পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশ ক'রতে না পেরে শৈবাল অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হ'তো। তবু আভাষে ইঙ্গিতে মাধবীকে একথা বার বার না ব'লেও সে থাকতে পারতো না: কে না কে একটা লোক, তার সম্বন্ধে তোমার এই নিরর্থক কৌতুহল কেন? কেন সময় নষ্ট করো তার কথা শুনে? তোমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ? মাধবী হয়তো এ ইঙ্গিত বুঝতো না—হয়তো বুঝেও তার মনের কৌতুহল চেপে রাখতে পারতো না। দিনের পর দিন এইভাবে যেতে লাগলো এবং কতদিন এই একই নাট্য-দৃশ্যের পুনরাভিনয় হ'লো দুজনের মধ্যে। তবু শৈবালের এই তিক্ত বিরক্তি ও নির্ম্মম অবজ্ঞা মাধবীর গভীর শ্রদ্ধাকে—অপরিসীম কৌতুহলকে তিলার্দ্ধ কমাতে পারলে না। বরঞ্চ শৈবালের মনে হ'লো, মাধবীর শ্রদ্ধা ও আগ্রহ উত্তরোত্তর বাড়ছে।

মাসখানেক আগেকার এক রাত্রি। সেদিন তারা সবাই নৌকায় ক'রে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছিলো। সে রাত্রি ছিলো শুক্লাচতুর্দ্দশী। চাঁদের স্বচ্ছ আলোয় সমস্ত আকাশ, নিস্তরঙ্গ গঙ্গা, দুতীরের সুষুপ্ত তরুশ্রেণী—কি সুন্দর, কি মায়াময় হ'য়ে উঠেছিলো। আশপাশে কোথাও কোন সাড়া শব্দ ছিলো না, শুধু শান্ত জলের বুকে ছপাৎ ছপাৎ ক'রে দাঁড়ের শব্দ ক'রে নৌকাখানি মন্থরগতিতে অগ্রসর হচ্ছিলো। সেই নৌকার একদিকে ব'সে মায়ারাণী ক্ষিতি আর সুনীলকে বলছিলো গল্প—আর তারই একটুখানি তফাতে এরা ব'সে গল্প ক'রছিলো। একথা সেকথার পর সবিতা মাধবীকে বললে যে—সে আজ একখানা বিজনের চিঠি পেয়েছে। কি চিঠি? সবিতা ব'লতে লাগলো: বিজন চিঠিতে জানিয়েছে যে সে খুব শীগ্‌গীর একটা কাজে কলিকাতায় আসছে এবং ফেরবার পথে কয়েকদিন তার কাছে থেকে যাবে। মাধবীর দুটি চোখে কৌতুহলের শিখা উঠলো উজ্জ্বল হ'য়ে, উত্তেজনায় সে সোজা হ'য়ে ব'সে চিঠিতে আরো কি কি লিখেছে তাই শুনতে লাগলো। এই অবস্থায় আর এক মুহূর্ত্তও সেখানে ব'সে থাকা শৈবালের পক্ষে সম্ভব হ'লো না। ক্রোধে ক্ষোভে বিরক্তিতে ও ঈর্ষায় তার সমস্ত বুকটায় এমনই জ্বালা ধরলো—যে তৎক্ষণাৎ তাকে সে স্থান ত্যাগ ক'রে গিয়ে ব'সতে হ'লো নৌকার মুখে। এমনতর কত দিনের কত ঘটনা মাধবীর মনে পড়তে লাগলো। অতীত দিনের শৈবালের সেই সব আচরণের পুঙ্খানুপুঙ্খ মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ ক'রে আজ মাধবী প্রথমটায় বিস্মিত হ'লো, তার সম্পূর্ণ অগোচরে জিনিষটা যে এতখানি প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছিলো তা জানবার সুযোগ তার হয় নি, যখন সুযোগ হ'লো—

সংসারের প্রয়োজনীয় ছোট বড় কাজগুলি সম্পন্ন করবার আয়োজন শেষ ক'রে সবিতা দালানে মাদুর বিছিয়ে ব'সে-ছিলো। মাধবীকে দেখে স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকলে: 'আয়।'

মাধবী কাছে এসে বসলে পর সবিতা পুনরায় স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে: 'কাপড় ছেড়ে এসে একেবারে নিশ্চিন্দি হ'য়ে বসলি নে কেন মা!'

মাধবী শ্রান্ত কাতরকণ্ঠে বললে: 'আর পারছি না কাকীমা। আজ এমনই ক্লান্ত হ'য়ে প'ড়েছি যে এখন এক পাও নড়বার শক্তি নেই। এখন তোমার কোলে মাথা রেখে শুই কাকীমা।

তার মুখে চোখে কণ্ঠস্বরে এমনই একটা গভীর শ্রান্তি অবসাদ ফুটে উঠেছিলো—যে সবিতা কাপড় ছেড়ে আসবার জন্য আর তাকে জেদ করলো না। একান্ত আগ্রহে এই প্রাণাধিক প্রিয় মেয়েটির মাথা নিজের কোলে তুলে নিলে। মাধবীর মনে হ'লো—অন্তর বাহিরের সমস্ত যন্ত্রণা শ্রান্তি মুহূর্ত্তে যেন কোথায় অন্তর্হিত হ'লো। কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি। আঃ! দালানের সামনেই আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ স্থির হ'য়ে র'য়েছে—আর তার সেই আলোর নীচে সমস্ত পৃথিবী মাঠ নদী অরণ্য ঐ সামনের নারকেল গাছের শ্রেণী—সবই আচ্ছন্ন হ'য়ে নির্ব্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। কারোর জন্য কারোর উদ্বেগ নেই, আশঙ্কা নেই, চাঞ্চল্য নেই। সবাই বিচ্ছিন্ন—আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ। এই উদাসীন স্বার্থপর পৃথিবীর দিকে চেয়ে থাকতে মাধবীর ক্লেশ বোধ হ'লো।

সবিতা মাধবীর কপালে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে : 'আজ বুঝি খুব বেড়িয়েছিস।'

'হাঁ কাকীমা, আজ মাঠে খুব বেড়িয়ে এলাম।'

'বিজন বুঝি বাইরে ওঁদের সঙ্গে গল্প ক'রছে ?'

'সে আর বলতে। বাবা তো ঐ রকম লোকই চান। ওঁকে আজ আর সহজে ছাড়ছেন না।'

সবিতা আস্তে আস্তে তার কপালে হাত ব'লাতে লাগলো। মাধবী নীরবে সামনের স্থির চাঁদের দিকে চেয়ে পরম আবেগে সবিতার স্নেহের পরশটুকু উপভোগ ক'রতে লাগলো। মিনিট দুই নীরবে কাটবার পর সবিতা বললে : 'একটু আগে শৈবাল এসেছিলো রে।'

'কেন কাকীমা ?'

'কলকেতা থেকে একটা জিনিষ কিনতে দিয়েছিলুম, সেটা দিয়ে গেলো।'

'তারপর ?'

'তারপর জিগেস করলুম : ওরা দুজনে তো ষ্টেশনের দিকেই গেছে—শৈবাল, তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি ?' বললে : 'না।'

মাধবী সমস্তই বুঝলে। বললে : 'আর কি বললে শৈবালদা ?'

'বিশেষ কিছুই না' সবিতা মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে বললে : 'ওর মন আজ খুব খারাপ, বোধ হয় কিছু একটা হ'য়েছে।'

'কি ক'রে বুঝলে কাকীমা ?'

'তা কি আর বুঝি না রাণী' সবিতা বললে : 'অন্যদিন শৈবাল আমার কাছে এসে সহজে গল্প ছেড়ে উঠতে চায় না —আজ এসেই জিনিষটা দিয়ে মুখখানা ভার ক'রে চলে গেলো। চা খেতে বললুম, খেলে না—রাত্তিরে এখানে খাবার নেমন্তন্ন করলুম, রাজী হ'লো না—দুটো একটা কথার সংক্ষেপে জবাব দিয়ে চলে গেলো। ওর মত ছেলের মন সহজে তো এত খারাপ হয় না—তাই বোধ হয় গুরুতর একটা কিছু ঘটেছে। তুই কিছু জানিস ?'

'আমি কি ক'রে জানবো, কাকীমা' মাধবীর কণ্ঠে একটা সুকুমার সজলতা দুলে উঠলো : 'শৈবালদা কি আমাকে সব কথা বলে ?'

একদিকে যেমন একটা বিপুল অভিমানে মাধবীর বুক ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হ'য়ে উঠছিলো, অন্যদিকে দুর্ভাবনাও বড় কম হ'লো না। বিজন তাদের অন্তঃসলিলার মত এই কলহের আভাস পেয়েছে, যদিও সে প্রাণপণে এটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রেচে—কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নি। বিজন জেনেছে, সবিতাও জানবে—তখন এতবড় লজ্জার বোঝা মাধবী বইবে কেমন ক'রে। এই কলহ যদি অন্য কিছুকে কেন্দ্র ক'রে উত্তাল হ'য়ে উঠতো, তবে বিশেষ কিছুই এসে যেত না, কিন্তু এ কলহ যা নিয়ে তা যে ভয়ানক লজ্জাকর। এত লজ্জাকর—যে সে কথা ভাবলেও পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত কণ্টকিত হ'য়ে ওঠে। মাধবীর বার বার মনে হ'তে লাগলো : কেন শৈবাল অনর্থক এমন ক'রে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে এবং তাকে এমনভাবে দগ্ধাচ্ছে। বিজনের প্রতি তার হৃদয় শ্রদ্ধায় উন্মুখ হ'য়েই থাকে, এমনতর পরিপূর্ণ আনন্দে যদি তার সঙ্গে সে মেলামেশা করে—তবে দোষ হয় কোথায় ? অন্যের মধ্যে শ্রদ্ধা করবার মত বস্তু থাকলে কে না তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়। এমন সজ্জন মাননীয় আত্মীয় বাড়ীতে এলে কার না লোভ হয়—নিবিড় ঘনিষ্ঠতা কর্ত্তে, যার সাহচর্য্যে এত মধু এত রস এত আনন্দ। যে কারণে শৈবালের এই বুকভরা বিদ্বেষ ঈর্ষা ক্রোধ ক্ষণে ক্ষণে উৎসারিত হ'চ্ছে—তা যে কতখানি মিথ্যে, কত বড় ভুল—একথা শৈবালের চেয়ে কে বেশি জানে ? তবু তার বুকের জ্বালা শান্ত হয় না কেন ? ঈর্ষা কি মানুষকে এতখানি আত্ম-বিস্মৃত করে। মানুষের জীবনে তার এতটা প্রভাব !

মাধবীর মন অত্যন্ত স্পর্শাতুর। বাড়ী ফেরবার সময়ে বিজনের সেই বিমর্ষ মুখখানি মনে পড়ে তার চোখে জল এসে পড়লো। অন্য কিছুই নয়, শুধু বিজন তার সাহচর্য্যের একটুকু আনন্দ চেয়েছিলো—তা ইচ্ছাসত্ত্বেও সে দিতে পারে নি। শৈবাল বাদ সাধলো। আর কদিন পরেই সে তো চলে যাবে। হয়তো আর আসবে, না হয়তো তাদের এই শেষ দেখা। যদি আবার কখন বিজন আসেও—তখন এমন ক'রে তাকে গ্রহণ করবার মত মন হয়তো তার থাকবে না, থাকলেও এমনতর সুবর্ণ সুযোগ কোথা পাবে তার সঙ্গে মিলিত হবার ? হয়তো কত পরিবর্ত্তন হবে। কিন্তু এ দুঃখ কি তার কোন কালে যাবে, যে বিজন তার কাছ থেকে নিরানন্দে বিদায় নিয়েছে,

একটু আনন্দও দিতে পারে নি—অথচ বিনাদ্বিধায় তার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ ক'রতে সে যে কোন মুহূর্ত্তে পারে। মাধবীর বুকের তলা থেকে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে সেই স্তব্ধ জায়গায় ছড়িয়ে পড়লো।

সবিতা পুনরায় বলতে লাগলো: 'এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে শৈবাল যখন চলে যাচ্ছিলো, তখন আর আমি থাকতে না পেরে ডাকলুম। বললুম: শৈবাল আমি তো তোমার মায়ের মতন—আমার কাছে কিছু লুকিয়ো না—তোমার কি হ'য়েচে আমাকে বলো। তখন ও আমাকে বললে: 'এখন আমি একথা বলতে চাই না জ্যাঠাইমা, আপনি নিজেই একদিন সব জানতে পারবেন।'

মাধবী রুদ্ধনিশ্বাসে বিবর্ণ মুখে বললে: 'তারপর।'

'তারপর আর কি, চলে গেলো' সবিতা মাধবীর মুখের উপর একটুখানি ঝুঁকে পড়ে বললে: 'আমাকে হয়তো একথা বলতে ওর বাধবে, কিন্তু তুই ওর কাছে গিয়ে ব্যাপারটা কি শুনে এসে আমাকে জানাতে পারিস রাণী?'

মাধবী সবিতার মুখের দিকে চেয়ে সহজ কণ্ঠে বললে: 'তোমাকেই যখন লুকোলে, তখন আমাকেই বা একথা কেন বলবে কাকীমা। আর তোমারই বা একথা জানতে এত গরজ কেন কাকীমা?'

সবিতা এর উত্তরে কি বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় ভোলা এসে দাঁড়ালো ঠিক সামনে। সবিতা বিরক্ত হ'লো।

'কি চাস?'

'বাবু চা চাচ্ছেন। দু কাপ চাই।'

'চা কোথা পাবো? কেউ তো চায়ের কথা বলে যায় নি!'

'দিদিমণিকে তো ব'লে দিয়েচেন।'

'দিদিমণিকে? দিদিমণি ব'লতে ভুলে গেছে। ও আর এখন চা করতে পারবে না। তুই ইলেকটি্ক ষ্টোভ জ্বেলে ক'রে নিয়ে যা। বাবা রে বাবা—কেবল চা কর, আর চা কর।'

ভোলা অন্তর্ধ্যান হ'লো। মাধবী এই মারাত্মক ভুলের জন্য ভয়ানক লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। ভাবলে দুপুর বেলাকার মত এবারও ভুলের জন্য তিরস্কার অনিবার্য্য—কিন্তু সবিতা সে সবের ধার দিয়েও গেলো না। মাধবীর মুখের উপর ঝুঁকে তার কপালে চুম্বন ক'রে নিজের বুকভরা স্নেহ কণ্ঠে একেবারে ঢেলে দিয়ে অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধস্বরে বললে: 'আজকাল এত মনভোলা হ'য়েছিস যে? কি এত ভাবিস, হাঁ রে?'

মাধবী আর থাকতে পারলে না। তার বুকের ভেতরটায় আজকার অনেক আঘাত অপমান জ্বালা পুঞ্জীত হ'য়েছিলো, সবিতার স্নিগ্ধ কথা কটি বুকের ঠিক সেই জায়গায় গিয়ে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গেই সে সবিতার কোলে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠলো। এ কি হ'লো! এ কি হ'লো! অপরিসীম বিস্ময়ে সবিতা নির্ব্বাক হ'য়ে গেলো। কয়েক মুহূর্ত্ত তার এমন শক্তি রইলো না যে—মাধবীকে বুকে তুলে নিয়ে তার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করে। একটু পরে অসহ্য বিস্ময়ের ভাবটা সজোরে কাটিয়ে সবিতা কোনরকমে শুধু বলতে পারলে: 'কি হ'লো এ্যাঁ।'

মাধবী তেমনই মুখ গুঁজে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলতে লাগলো: 'তোমরা সবাই যদি আমাকে এমন করো, তা'হলে আমি কি করবো বলো ত!'

সবিতা তার মুখের উপর ঝুঁকে প'ড়ে ব্যাকুলকণ্ঠে বলতে লাগলো: 'কে তোকে কি ক'রেছে মা, এ্যাঁ? বল্। এই দেখ, কথা কয় না। মুখখানা তো-ল ও রাণী!' ব'লে জোর ক'রে তার অশ্রুসিক্ত মুখখানি তুলে আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললে: 'তোকে কে কি ব'লেছে মা, বল তো।'

'কেন তুমি তো।'

'আ-মি?'

'হাঁ সকালবেলা কেন তুমি ওদের সামনে আমাকে অমন ক'রে বকলে? আমার বুঝি দুঃখ হয় না।'

সবিতার সেই ঘটনা স্মরণ হ'লো। হয়তো সেই তিরস্কার কিছু কঠিন হ'য়েছিলো, কিম্বা তা হয়তো নয়। অপরিচিত বিজন উপস্থিত ছিলো ব'লে সেই তিরস্কার এই অভিমানিনী মেয়েটির বুকে খুব বেশি ক'রে বেজেছে। আসল কথা তাই। ইতিপূর্ব্বে তাকে কতবার কত তিরস্কারই তো ক'রেছে এই তিরস্কারের চেয়ে সে সব হয়তো অনেক কঠিন—কিন্তু তাতে এমনতর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদা দূরে থাক, মাধবী মৃদু মৃদু হাসতো—সেই নিয়ে করতো সকৌতুকে কলহ। এইসব কথা মুহূর্ত্তে স্মরণ করে সবিতার বুকের ভেতরটা বেদনায় অনুশোচনায় উঠলো টন টন ক'রে। দুটি ব্যগ্র বাহু দিয়ে প্রাণাধিক প্রিয় মেয়েটিকে

এমন ব্যাকুলভাবে জড়িয়ে ধরলো, যে তার অতি দ্রুত বক্ষ—স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব ক'রলে—মাধবীর বেদনার আর অন্ত রইলো না। নিজেকে প্রবল লজ্জার হাত থেকে রক্ষা ক'রতে যে মিথ্যা দোষারোপ ক'রলে—তা সত্য মনে ক'রে সবিতা যে কত বড় ব্যথা পেয়েছে—তা তার বেশী কে আর জানলে!

সবিতা সেইভাবে তাকে বুকে জড়িয়ে অব্যক্তকণ্ঠে যে কত কথাই ব'লে গেলো, তার আর ইয়ত্তা নেই। এমন ক'রে খানিকটা সময় কেটে গেলো।

তারপর সবিতা বললে : 'এইবার খাবার দি—খা!'

'এখন খেতে একেবারে ইচ্ছে ক'রছে না কাকীমা।'

'তা হোক মা, তবু কিছু খা। সেই কখন দুটি ভাত খেয়েছিস, তারপর তো পেটে কিছুই পড়ে নি। মুখখানা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কিছু খা।'

'পারলে খেতুম কাকীমা—ব'লতে হ'তো না। একেবারে রাত্তিরেই খাবো।'

একটু পরে মাধবী হঠাৎ বলে উঠলো : 'ঐ যাঃ একেবারে ভুলে গেছি। আমাকে এখন একবার শৈবালদার কাছে যেতে হবে, তখন ব'লে গেছে।'

সবিতা বললে : 'বেশ তো, যা না। আর পারিস তো সেই কথাটা জেনে নিস। কিন্তু অন্যদিনের মত ফিরতে যেন দেরী করিস নে।'

'না কাকীমা, আমি এখ্‌খুনি আসবো' ব'লে অকস্মাৎ হাত দিয়ে সবিতার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে তাকে বিস্ময়ে স্তব্ধ ক'রে মাধবী উপরে চলে গেলো।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে কি একটা কাজে রান্নাঘর থেকে বেরোতেই যে জিনিষ সবিতার চোখে পড়লো তা অতীব বিস্ময়কর। ইন্দ্রাণীর মত বহুমূল্য বেশে সজ্জিত হ'য়ে তারপাশে রূপের কমল ফুটিয়ে মাধবী চলেছে শৈবালের বাড়ী।

৬

উচ্ছ্বসিত অভিমান এবং বেদনা বহন ক'রে মাধবী যখন শৈবালের বাড়ীর অন্দরে নিঃশব্দে গিয়ে ঢুকলো, তখন মায়ারাণী খাবার দালানে বসেছিলেন। অদূরে সিঁড়ির সামনে লুচি তরকারি প্রভৃতি আহার্য্য থালায় পরিপাটি ক'রে সাজানো র'য়েছে। এ যে তাঁর কোন ছেলের খাবার এবং তিনি তারই জন্য যে অপেক্ষা ক'রে বসে আছেন, একথা খুব সহজেই মাধবী বুঝলে। কিন্তু অন্যদিনের মত সহজেই তাঁর কাছে যেতে পারলে না। ভয় হ'তে লাগলো—যদি শৈবালের আচরণে কথার আভাসে এ কথা জানতে পেরে থাকেন। জানা তো বিচিত্র নয়, আজ শৈবাল উন্মাদের মত যে সব কাণ্ড করছে। নিজের দ্বিধা দুর্ব্বলতা কাটিয়ে মায়ারাণীর পাশে গিয়ে ব'সতেই তিনি এমন সস্নেহে আহ্বান করলেন যে মাধবীর চোখে আবার জল এসে পড়লো। মাধবীকে তিনি নিজের মেয়ের মতই ভালবাসতেন এবং এমন সস্নেহ আহ্বানেও সে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ প্রতি পদের আঘাত অপমান লাঞ্ছনার জ্বালা বৈশাখের তপ্ত পুঞ্জ মেঘের মত তার সারা হৃদয়াকাশ ব্যাপ্ত হ'য়ে র'য়েচে এবং তাই তো তার গায়ে একটুখানি সজলতার আভাষ লাগা মাত্রই তা এমনভাবে অশ্রু হ'য়ে ঝরে পড়তে চাইছে।

এ কথা সে কথার পর মাধবী এক সময়ে জিগ্‌গেস করলে : 'শৈবালদা কোথায় জ্যাঠাইমা?'

'কেন ওপরেই তো আছে' ব'লে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে : 'কি হ'লো? খোকা আসছে?'

মায়ারাণীর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে মাধবীও সেইদিকে তাকালো। ঝি কাছে এসে বললে : 'না মা, খোকাবাবু এল নি।'

মায়ারাণী বললেন : 'এলো না কি? খাবার দেওয়া হ'য়েচে ব'লেছো?'

'তা আর বলি নি মা' ঝি হাতমুখ নেড়ে বললে : 'কত বললুম কত খোসামোদ করলুম খোকাবাবু খাবে চলো। সে বল্‌লে, না—না আমি খাবো নি, তুই যা। আমি আজ উপোস ক'রে থাকবো। কি রাগ মা ছেলের। আমার কথা গেরাজ্যি ক'রবে নি মা, তুমি নিজে গে ভুইলে ভাইলে নে এসো। একরত্তি ছেলেকে তো না খাইয়ে রাখা যায় না।'

মায়ারাণী স্নেহস্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন : 'পাগল।' তারপর রন্ধনরত বামুনের উদ্দেশে বললেন : 'ও ঠাকুর খাবারটা এখন তুলে রাখো। একটু পরে শৈবালের সঙ্গেই না হয় খাবে। ছেলে এখন রেগে আগুন হ'য়ে আছে; আমার কথা কি শুনবে?'

মাধবী আস্তে আস্তে জিগ্‌গেস ক'রলে : 'সুনীল খাবে না কেন জ্যাঠাইমা। কার ওপর রাগ হ'লো ওর ?'

'তোমার শৈবালদার ওপর'। মায়ারাণী হাসতে হাসতে বললেন : 'আজ তো তিনি মিলিটারি মেজাজ নিয়ে বাড়ী ঢুকেছেন। খোকা সন্ধেবেলা পড়া ছেড়ে কেরম খেলছিলো—বাড়ীতে ঢুকেই তো তাকে একচোট কানটা মলে দিলে। তারপর চাকরকে ধমকায়, ঝিকে বকে, একে চোখ রাঙায়, সামান্য খুৎ ধরে এমন সব গোলমাল ক'রছে আজ। তাই বলাতে আমার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে ওপরে চলে গেলো। ও ঠাকুর, খোকাবাবুর খাবারটা তুলে নিয়ে যাও, এখুনি কিসে মুখটুখ দেবে।'

মাধবী বিবর্ণ নতমুখে নিঃশব্দে বসে রইলো। তারপর মুখ তুলে নিরসকণ্ঠে বললে : 'হঠাৎ এমন ক'রছে কেন ? কি হ'য়েছে শৈবালদার ?'

'সে তোমার শৈবালদাই জানে' মায়ারাণী হাসিমুখে বললেন : 'বাইরের কারোর সঙ্গে গোলমাল বিবাদ হ'য়ে থাকবে বোধ হয়।'

মাধবী সভয়ে বিবর্ণমুখে বললে : 'আপনি জানলেন কি ক'রে ? শৈবালদা বুঝি তাই বললে ?'

'না, আমি এমনি আন্দাজে বলছি' মায়ারাণী হেসে বললেন : 'তুমি তো তার কাছেই যাচ্ছো, একবার জিগ্‌গেস ক'রো না।'

মাধবী জোর ক'রে হাসলে। তারপর দুটো চারটে কথা কয়ে উঠে দাঁড়াতেই মায়ারাণী বললেন : 'কাল সকালে তোমাদের দুজনকার এখানে নেমন্তন্ন—সেটা মনে আছে তো ?'

'আছে, জ্যাঠাইমা।'

'আচ্ছা, আর একবার নয় সকালে শৈবালকে পাঠাবো।'

'তার আর দরকার কি জ্যাঠাইমা। একথা কি আমি ভুলে যাবো।'

মায়ারাণী ক্ষণকাল তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন : 'আজ তোমার মুখ এতো শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন রাণু ? কি হ'য়েচে ? শরীর বুঝি ভাল নেই ?'

'না, শরীর তো আমার বেশ ভালই আছে জ্যাঠাইমা।'

'তবে ? এখনও বুঝি কিছু খাওয়া হয় নি ?'

মাধবী মনে মনে অত্যন্ত খুশী হ'য়ে উঠলো। এই না, খাওয়ার দোহাই দিয়ে কখন তাড়াতাড়ি এই লজ্জাকর প্রসঙ্গটার ইতি ক'রতে পারলেই সে বাঁচে। তাই সলজ্জে হেসে মৃদুকণ্ঠে বললে : 'বাড়ীতে এখন গিয়েই খাবো।'

মায়ারাণী বললেন : 'তা খেয়ো, কিন্তু এখন এখানে কিছু খাও তো। তুমি বসো, আমি ওঘর থেকে তোমার খাবারটা নিয়ে আসি।'

মাধবী তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে সবিনয়ে বললে : 'এখন খাবার থাক জ্যাঠাইমা, শৈবালদার কাছ থেকে হ'য়ে আসি—তার পর না হয় খাবার দেবেন !'

'কেন রাণু, এখনই খেয়ে যাও না। খাওয়া হয় নি ব'লে তোমার মুখখানা যে একেবারে শুকিয়ে উঠেছে।'

'আমি এখনি আসছি তো জ্যাঠাইমা।'

'এসে খাবে তো ?'

'হাঁ খাবো।'

'তাহ'লে কিন্তু বেশী দেরী ক'রো না যেন। গল্প ক'রতে ব'সলে তো তোমাদের দুটির আবার নাবার খাবার কথাও মনে থাকে না।'

'না জ্যাঠাইমা আমি এখনই আসবো।'

'তোমার দয়া' মায়ারাণী স্নেহস্নিগ্ধ হাসি হাসলেন, তার পর বললেন : 'তুমি ওপরে যাচ্ছো রাণু, তাকে ব'লে দিয়ো তার চা আর জলখাবার এখনি নিয়ে যাচ্ছে। মনে ক'রে ব'লো, নইলে যে মেজাজে আছেন—একটু দেরী হ'লে দেবে হয়তো সব ছুঁড়ে ফেলে। ঠাকুর চায়ের জল হ'লো ?'

রান্নাঘর থেকে ঠাকুরের প্রত্যুত্তর আসবার আগেই মাধবী সেখান থেকে সরে গেলো। শৈবালের এই ক্রোধ ক্ষোভ কি ভাবে এবং কোথা থেকে যে উৎসারিত হ'চ্ছে—তা নিঃশব্দে হৃদয়ঙ্গম ক'রে সে ভীত হ'য়ে উঠলো। একখণ্ড মেঘকে কেন্দ্র ক'রে নদীতে যে আবর্ত্ত জেগেছে তা সহজ নয় এবং কি ক'রে যে এই আবর্ত্ত সহজ জলধারার সঙ্গে এক হ'য়ে প্রবাহিত হবে—তা কল্পনা ক'রে মাধবীর মাথা টিপ টিপ ক'রতে লাগলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে তার মনে হ'লো এমনই হয়তো হয়। যখন ঈর্ষা ও ক্রোধের আগুনে অস্থির হ'য়ে আত্মবিস্মৃত মানুষ কাউকে দংশন ক'রতে উদ্যত হয়, তখন নিজের ভাল মন্দ ভবিষ্যতের ফলাফল ভাববার অবসর তার থাকে না। ঈর্ষার বহ্নিতে

অস্থির হ'য়ে কোন রকমে দংশন ক'রে বুকের অনির্ব্বাণ জ্বালাটা মেটাতে পারলেই সে বাঁচে। মাধবী যেন এই মুহূর্ত্তে শৈবালের বুকের চেহারাটা আরও স্পষ্ট নিখুঁতভাবে দেখতে পেলে। ঈর্ষার কি দাহ প্রতিমুহূর্ত্তে তার বুকটায় জ্বলে উঠে তাকে অস্থির চঞ্চল ক'রে তুলছে। কিন্তু কেন এ ঈর্ষা? কেন? কেন? কেন? এ অস্থিরতা, এ চাঞ্চল্যই বা কিসের জন্য?

সুসজ্জিত ত্রিতল বাড়ী। একবারে উপরতলাকার একখানি বড় ঘরে শৈবাল থাকে, সম্ভব অসম্ভব নানা রকম সংশয়ের গুরুভার বুকে নিয়ে মাধবী উপরে উঠলো। শৈবালের দরজার পরদাখানি বাতাসে দুলছে—অন্যদিনের মত আজ পরদা সরিয়ে নিঃসঙ্কোচে ঘরে ঢুকতে পারলে না। দরজার বাইরে থমকে দাঁড়ালো। হঠাৎ কেন না জানি—তার ঘরে ঢোকবার সাহস কোথায় অন্তর্হিত হ'লো—যেন সেই নিজে অপরাধ ক'রেছে। এই দেয়াল-ঘেরা ঘরের মধ্যে তার অতি পরিচিত একজনের কঠিন নির্ম্মম মুখচ্ছবি কল্পনা ক'রে তার বুক ঢিপ ঢিপ ক'রতে লাগলো। নিমেষ মাত্র, পরক্ষণেই নিজেকে সংযত ক'রে, মুখ চোখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল করবার প্রয়াস ক'রে—মাধবী পরদা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো।

আধুনিক ফ্যাসানে সুসজ্জিত ঘরটির মাঝখানে একখানি দামী খাট। তার ঠিক শিয়রে একটি ছোট্ট গোল টুলের উপর নীল শেড দেওয়া টেবল-ল্যাম্প বিছানার একাংশ আলোকিত ক'রে জ্বলছে। আর সর্ব্বত্র পড়েছে সেই শেডের স্নিগ্ধ ছায়া। আলোর ঠিক নীচে মাথা রেখে শৈবাল বিছানার উপর শুয়ে র'য়েছে তার বুকের উপর একখানি বই মুখ গুঁজে অভিমান ভরে পড়ে র'য়েচে। ঘরখানি এমন স্তব্ধ যে কান পাতলে বোধ করি চঞ্চল মুহূর্ত্তগুলির পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। শৈবাল স্তব্ধভাবে জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিলো, ল্যাম্পের তীব্র আলোয় মাধবী নিমেষের জন্য তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে সেই মুখ পরিপূর্ণভাবে দেখতে পেলে। তার মনে হ'লো—শৈবালের এ মুখে রাগ দ্বেষ হিংসা বা আনন্দ কোন কিছুই নেই। ও মুখ যেন পাথর দিয়ে তৈরী—এক নির্ম্মম মৌনতা যেন ও মুখের প্রতি-স্থানে মাখানো র'য়েছে। পদশব্দে শৈবাল মুখ ফিরিয়ে মাধবীর মুখের দিকে একবার তাকালে মাত্র, তার মুখে চোখে বিস্ময়ের কোন চিহ্নই ফুটে উঠলো না বা একটি কথাও তাকে সম্বোধন ক'রে বললে না; সমস্ত মুখে সেই নির্ম্মম মৌনতা নিয়ে শৈবাল বুকের ওপর থেকে বইখানা তুলে চোখের সামনে ধরে মনোযোগ দিল।

তার এই কঠিন নির্ম্মম অবজ্ঞা, এই আচরণ অপ্রত্যাশিত নয়—বরঞ্চ মাধবী প্রথমটায় এমনতর একটা কিছু প্রত্যাশাই করেছিলো—তাই এই আচরণ তাকে আঘাত ক'রলেও নিরাশ ক'রতে পারলে না। সে যে জানে, আগুন একেবারে নির্ব্বাপিত হবার ঠিক পূর্ব্বাহ্ণে একবার জ্বলে উঠবেই। সেই জন্য এই বেদনা নিঃশব্দে বহন ক'রে হাসিমুখে খুব সহজ লীলায়িত ভঙ্গিতে সে এগিয়ে গেলো এবং শৈবালের শয্যার একপাশে ব'সে তার মুখের দিকে সকৌতুকে তাকিয়ে রইলো। তার অঙ্গের এই প্রসাধন, মুখের এই হাসি—এমনতর বাধাহীন নিঃসঙ্কোচ আচরণ দেখে কেউ একথা অনুমানও ক'রতে পারবে না—কি ব্যথায় এখন এই মেয়েটি নিরন্তর দগ্ধ হ'চ্ছে। কিন্তু শৈবালের মুখ কঠিনতর হ'য়ে উঠলো।

মাধবী আস্তে আস্তে ডাকলে: 'শৈবালদা!'

শৈবাল মুখ ফিরিয়ে মাধবীর উজ্জ্বল মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকালে। সে মুখ তেমনই কঠিন—চোখের চাউনিতে ঘৃণা রাগ হিংসা কিছুই প্রকাশ পেলে না। এই নির্ম্মম মৌনতায় মাধবীর নিঃশ্বাস যেন রুদ্ধ হ'য়ে এলো। সে ভাবছিলো, এই নির্ম্মম মৌনতার প্রাকার- ভেঙে কোন রকমে কি এই নিষ্ঠুর লোকটার কোমল উৎসে সজোরে ঘা দেওয়া যায় না!

মাধবী হেসে বললে: 'আমার ওপর রাগ ক'রেছো শৈবালদা? ওকি, বই পড়তে আরম্ভ করলে যে? বাবা রে বাবা, বইখানা দু'মিনিট বন্ধ ক'রে রাখতে পারো না? আমাকে এমন ভাবে তাচ্ছিল্য ক'রতে হয় বুঝি।' ব'লে সে অনাবশ্যক হেসে উঠলো। কিন্তু তাতে শৈবালের মনোযোগ এতটুকু বিক্ষিপ্ত হ'লো না। বরঞ্চ মাধবীর কথার মাঝখানে যখন সে মুখ ফিরিয়ে বইতে মনোযোগ দিল, তখন তার মুখ-চোখের ভাবে যেন এই কথাটা খুব সুস্পষ্ট ভাবেই প্রকাশ হ'য়েছিলো, বাজে কথা বলবার জায়গা এ নয়।

অন্যদিন হ'লে মাধবী হয়তো এই অবস্থায় তার হাত থেকে জোর ক'রে বইখানা কেড়ে নিতো—কিন্তু আজ তার

আর এ সাহস হ'লো না। তার মনে হ'লো, শৈবালের উপর যে অধিকার তার ছিলো—তা থেকে যেন সে নিঃশেষে বঞ্চিত হ'য়েছে। শৈবালের এই অবজ্ঞা যে তাকে কতখানি আহত ক'রেছে—একথা হয়তো শৈবাল জানতে পারতো, যদি তখন একটিবারমাত্র মাধবীর সেই বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকাতো। নির্ম্মম আঘাতে হয়তো জ্বালা আছে, কিন্তু অবহেলার মত ভয়ানক মর্ম্মান্তিক আর কিছু নেই। মাধবীর মুখের হাসি গেলো মিলিয়ে, শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে: 'আমার সঙ্গে আর কথা কইবে না?'

তথাপি শৈবাল নিঃশব্দে বই পড়তে লাগলো। কোন জবাব দেওয়া তো দূরের কথা, বরঞ্চ এমন ভাব দেখিয়ে বইয়ের একখানা পাতা উল্টিয়ে পড়তে লাগলো তাতে মনে হয় যে—সে ছাড়া আর কোন রক্ত-মাংসের জীব ঘরে আছে এবং তাকেই উদ্দেশ ক'রে কথা ব'লছে—এ যেন সে জানে না বা জানা প্রয়োজনই মনে করে না।

অব্যক্ত অভিমানে মাধবীর অন্তর উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। মাথার শিয়রে টেবল-ল্যাম্পের উপর নিবিড় সবুজ শেডখানি ঘরখানির উপরনীচে আলো-ছায়ার একটি অনির্ব্বচনীয় স্নিগ্ধ মাধুর্য্য বিস্তার ক'রেছিলো—সেই স্নিগ্ধ আলো-ছায়ার মধ্যে মাধবীকে দেখাচ্ছিলো কাব্যের আশাহতা ব্যথাতুরা নায়িকার মত। শৈবালের এই নির্ম্মম অবজ্ঞায় সে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবেই থাকলো, তারপর অভিমান-ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে: 'তোমার সঙ্গে আমি কি করেছি শৈবালদা, যে পাশে এসে বসেছি তবু এমন ক'রে অবজ্ঞা ক'রছো? আমার কি দোষ ব'লে দাও?'

শৈবাল তার দোষ ত্রুটি দেখাবার জন্য এতটুকু উৎসাহ প্রকাশ ক'রলে না। তেমনই মন দিয়ে বই পড়তে লাগলো।

মাধবী এইবার একটু অধৈর্য্য হ'লো। বিচলিতকণ্ঠে বললে: 'ওসব কথার উত্তর না দিতে চাও, নেই দিলে। কিন্তু বইটা কি দু'মিনিটের জন্যও বন্ধ ক'রে রাখতে পারো না শৈবালদা? তোমার সঙ্গে আমার অন্য দরকারী কথা আছে।'

এইবার শৈবাল মাধবীর মুখের দিকে তাকালে। বললে: 'আমার সঙ্গে? আমার সঙ্গে আবার তোমার কি দরকারী কথা?'

'কেন, তোমার সঙ্গে কি আমার কোন দরকারী কথাই থাকতে পারে না?'

'না।'

'একদিনেই তোমার কাছে আমি এমন হয়ে গেলুম?'

শৈবাল নীরব।

'আমার কথা না হয় যাক, কিন্তু তুমি আমাকে দুপুর-বেলা ডেকে পাঠিয়েছিলে কেন?'

'তার আর প্রয়োজন নেই এখন।'

'কিন্তু কি দরকার ছিলো তা বলবে কি?'

'না।'

'সেকথাও আমাকে জানানো দরকার মনে করো না?'

'না।'

মাধবী বিবর্ণ মুখ নত ক'রে বসে রইলো।

'আমার সঙ্গে বোধ হয় তোমার আর কোন দরকার হবে না?'

'আশা করি তাই। আর আমাকে তোমার কিছু জিগ্‌গেস করবার আছে?'

'না।'

'তবে এখন যেতে পারো। আমি এখন পড়ছি। এখানে এসে সময় নষ্ট ক'রে আর কি হবে।'

মাধবী চকিত হয়ে উঠলো। যে আবর্ত্ত নদীতে জেগেছে তা যে সহজ নয় এবং তা মিলিয়ে যেতে সময় লাগবে, এ জানা কথা। তবু মাধবী আশা ক'রেছিলো, শৈবালের কাছে নিজে এমনভাবে এলে হয়তো শৈবাল শান্ত হবে। মনের মধ্যে আর কারোর কোন বিক্ষোভ দাহ ঈর্ষা গ্লানি থাকবে না। তাদের মধ্যে আবার ফিরে আসবে সেই শুভ্র প্রীতি ও মমতা। কিন্তু সব আশা ব্যর্থ হ'লো—শৈবালের নিষ্ঠুর অবজ্ঞা মর্ম্মান্তিক হ'য়ে বুকে বাজলো। এটা সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত না হ'লেও শৈবালের দিক দিয়ে এ আচরণ খুব অস্বাভাবিক নয়—কিন্তু সে যখন এই ইঙ্গিত করলে তখন মাধবী বিস্ময়ে চকিত হ'য়ে উঠলো। একমুহূর্ত্ত রক্তহীন বিবর্ণমুখে বিহ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে: 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছো?'

'না তাড়িয়ে দেব কেন? আর তা ছাড়া এ আমার বাড়ী নয়, তোমাকে তাড়িয়ে দেবার কোন অধিকার আমার নেই।'

'অধিকার থাকলে বোধ হয় দিতে ?'

'এ সব অর্থহীন প্রশ্নের জবাব দেবার সময় আমার নেই।'

'সময় আছে কি না জানি না' মাধবী সজলকণ্ঠে আস্তে আস্তে বললে : 'কিন্তু সে অধিকার থাকলে তুমি দিতে। আজ তুমি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার ক'রেছো, তারপর আমাকে এত বড় অপমান ক'রলেও আমি আশ্চর্য্য হবো না।'

তার সজলকণ্ঠের এই অভিযোগের পর নীরব হ'য়ে থাকা শৈবালের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হ'য়ে উঠলো। বইখানা বুকের উপর উপুড় ক'রে মুখ ফিরিয়ে বললে : 'চোখে আঙুল দিয়ে গর্হিত কাজ দেখিয়ে দিলে যদি অপমান করা হয় তবে তাই। কিন্তু এততেও তোমার চোখ ফুটলো না, ধিক্।'

শৈবালের কাছ থেকে আঘাত এই প্রথম নয়—কিন্তু এই কথাটি একটা বিশ্রী ইঙ্গিত নিয়ে তীরের মত তার বুকের কোমল স্থানে গিয়ে বিঁধলো এবং দেখতে দেখতে বেদনায় অপমানে তার মুখ উঠলো লাল হ'য়ে। এত বড় নিষ্ঠুর অভিযোগের প্রত্যুত্তর দেয়—কয়েক মুহূর্ত্ত এ শক্তিও তার রইলো না। একটু পরে রক্তহীন বিবর্ণ মুখে বললে : 'কি গর্হিত কাজ আমি ক'রেছি ?'

তার অস্বাভাবিক নীরস কণ্ঠস্বর শৈবালের কানে ঠেকলো, কিন্তু সে কোন জবাব দিল না।

মাধবী সেইভাবে স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে কোন রকম জবাব না পেয়ে অবশেষে আস্তে আস্তে বললে : 'আমি বিজনবাবুর সঙ্গে মিশেচি বলেই তো তোমার যত রাগ—কিন্তু তিনি আমাদের পরম আত্মীয় অতিথি—তাঁকে আমি অবহেলা ক'রতে পারি না। তিনি যে কদিন দয়া ক'রে আছেন, তাঁর সঙ্গে আমাদের এইরকমভাবে মেলামেশা ক'রতেই হবে।'

পুনরায় শৈবালের বুকে ঈর্ষার তীব্র আগুন জ্বলে উঠলো। কি দাহ তার! মাধবীর দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থেকে বললে : 'এসব কথার মানে কি ? আমার কাছে এসব কথা বলবার কি উদ্দেশ্য তোমার ?'

'উদ্দেশ্য আবার কি ? মাধবীর চোখে তখন জল এসে পড়েছিলো—অভিযোগসজলকণ্ঠে বললে : 'আমি বিজনবাবুর সঙ্গে এইরকমভাবে মেলামেশা করছি বলেই তো তুমি আজ আমাকে এমনভাবে অপমান ক'রছো। কি দোষ এতে হ'য়েছে ? অতিথি বাড়ীতে এলে কে না এমন করে ?'

শৈবালের বুকে তখন জ্বালা ধরেছে। সে যে সুযোগ এতক্ষণ খুঁজছিলো এইবার তা মিলে গেল। মাধবীর কথা শেষ হ'তেই অত্যন্ত শ্লেষ ক'রে বললে : 'অতিথি আমাদের বাড়ীতেও এসে থাকে এবং আমরাও অতিথি-সেবা ক'রে থাকি ; কিন্তু তোমার মত এমন নির্লজ্জভাবে অতিথিকে নিয়ে মেতে উঠি না—যাতে সবাই ঘৃণায় ছি ছি করে।'

মাধবী রুদ্ধ অভিমানে সতেজে বললে : 'না, এক তুমি ছাড়া আর কেউ ছি ছি ক'রতে পারে না।'

'ক'রব না ছি ছি' শৈবাল আরও বেশি জ্বলে উঠে বললে : 'একটা অজানা অচেনা কে না কে, তার সঙ্গে একদিনের আলাপে যে সব কাণ্ড ক'রছো—তারপর মুখ খুলে কথা কইতে বাধে না তোমার ? তোমার এতটুকু লজ্জা-সরম যদি থাকতো তা' হ'লে মাথা নীচু ক'রে থাকতে—কিন্তু সে বোধের বালাই কি ছাই তোমার আছে ?' মাধবীর চোখ দিয়ে বড় বড় জলের ফোঁটা টপ টপ ক'রে পড়তে লাগলো। সেইদিকে চেয়ে শৈবাল ব'লে যেতে লাগলো : 'তোমার মন আমি ভাল ক'রেই জানি। আজ তোমার মনের যে কি ভাবে পরিবর্ত্তন হ'য়েছে তাও আমার জানতে বাকি নেই—অনেকদিন আগে থেকেই তার আভাষ পেয়েছিলাম। এখন তাকে নিয়ে যা প্রাণ চায় করো, মুখ ফিরিয়ে দেখতেও যাবো না, কিন্তু জিগ্‌গেস করি, আমার সঙ্গে এই রকম জঘন্য চাতুরী খেলতে তোমার একটুও বাধলো না ?'

মাধবী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বললে : 'কি চাতুরী তোমার সঙ্গে আমি খেলেছি ?'

'কি চাতুরী ? এখনও মুখ ফুটে একথা জিগ্‌গেস ক'রছো ?'

'হাঁ আমি জানতে চাই। এরকম ভাবে আর আমি তোমাকে অপমান ক'রতে দেব না। সকল জিনিষের একটা সীমা আছে।'

'সে সীমাজ্ঞান তোমার আছে নাকি ?' শৈবালের মুখ চোখ রাগে রক্তবর্ণ হয়ে উঠলো। বললে : 'কি

চাতুরী খেলেছো জানো না ? আজ বিজন আসবে তুমি জানতে না ? জেনে শুনে মামীমার বাড়ীর মেয়েদের কাছে আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করো নি ? আজ সকাল-বেলাতেও আমাকে বলো নি—ও হঠাৎ এসে পড়েছে ? এসব জঘন্য চাতুরী ছাড়া আর কি ?'

মাধবীর মুখ চোখ রাগে রাঙা টকটকে হ'য়ে উঠলো। সেও তীক্ষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল : 'এ দোষ তোমার। তুমিই তো আমাকে এইরকম করতে বাধ্য করিয়েছো।'

'আমি ?'

'হাঁ তুমি' মাধবীর পাতলা ঠোঁট দুখানি তখন থরথর ক'রে কাঁপছে—বললে : 'আমার বাড়ীতে অতিথি এসেছে, তুমি কি ক'রে তাকে ফেলে থিয়েটার যাবার জন্য আমাকে জোর ক'রছিলে ? তোমার মুখে জোর ক'রে সে অনুরোধ করতে বাধে নি তখন ? অতিথিসেবায় কেমন যে অভ্যস্ত, তার তো এই প্রমাণ।' ব'লে মাধবী মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকালে।

অতর্কিত আক্রমণ। তার সেই তীব্র ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর সেই মূহূর্ত্তে শৈবালের মুখে এলো না। কিন্তু মাধবীর প্রত্যেক কথাটি তার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিল। আর সেই আগুনের অসহ্য দাহ তাকে ক'রে তুললে অস্থির এবং সেই আঘাতের দশগুণ জ্বালা তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্য শৈবাল শাণিত অস্ত্রের অনুসন্ধান ক'রতে লাগলো।

মাধবী বলতে লাগলো : 'আমার সঙ্গে যা করো—তা নয় আমি সইতে পারি, কিন্তু বিজনবাবুর সঙ্গে যে ব্যবহার তুমি ক'রেছো—তা আমি কোন দিন ভুলবো না। জিগ্‌গেস করি, তিনি তোমার কি ক'রেছিলেন—যাতে তাঁর সঙ্গে এমনতর ব্যবহার ক'রলে ?'

'তোমার স্পর্দ্ধার সীমা অতিক্রম করে গেছে' শৈবাল উত্তেজনায় বিছানাতে উঠে বসলো। মাধবীর দিকে কঠিন-ভাবে তাকিয়ে বললে : 'বিজনের হ'য়ে আমার কাছ থেকে কৈফিয়ৎ নেবার জন্য কি তুমি এখানে এসেছো ? আমি জানতে চাই।'

'বিজন নয়, বিজনবাবু বলতে হয়' মাধবী তাচ্ছিল্য ক'রে বললে : 'না—তাঁর হ'য়ে কৈফিয়ৎ চাইতে আমি আসি নি—কারণ তিনি এ সব তুচ্ছ নগণ্য জিনিষ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না। আমি নিজেই বলছি, ওঁর মত একজন মাননীয় লোকের সঙ্গে তোমার এমন ব্যবহার করা মোটেই উচিত হয় নি।'

'তাহ'লে উচিত অনুচিতের শিক্ষা দিতেই এসেছো ?' শৈবালের অন্তরের দুর্নিবার ক্রোধ তার কথা দিয়ে ফেটে পড়লো। তীব্র কটুকণ্ঠে বললে : 'রাণী, মেয়েরা যখন নিজেদের সীমা অতিক্রম ক'রে যায়—তখন বোধ হয় তারা তোমার মতই নীচ হীন মর্য্যাদাজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়ে।'

'তা পড়ে' মাধবীর অসামান্য সুশ্রী মুখে এক ঝলক গাঢ় রক্ত উঠে এলো, দাঁত দিয়ে নীচের পাতলা ঠোঁটটা চেপে কটুকণ্ঠে সেও জবাব দিলে : উচিত অনুচিতের ভেদাভেদ মানুষকে শেখাতে হয় না, কিন্তু তোমাকে শেখানো খুব দরকার। ওরকম সাধারণ শিক্ষার অভাব আজও তোমার আছে।'

অপরিসীম বিস্ময়ে শৈবাল মনে মনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলো। আঘাত যেখানে দেওয়া হয়, প্রতিঘাত সেখান থেকে ফিরে আসে—এই নিয়ম। কিন্তু এমনভাবে ? হাঁ, শৈবাল তার আচরণে কথায় আজ প্রতিপদে তাকে ক'রেছে নির্ম্মম আঘাত, কিন্তু প্রতিঘাত যে দশগুণ জ্বালা নিয়ে ফিরে আসবে এ যে-কল্পনাতীত। ঐ যে মেয়েটি তার শয্যার একধারে বিবর্ণ নতমুখে বসে রয়েছে, ওর মধ্যে আঘাত দেবার এতখানি শক্তি এলো কোথা থেকে ? আশৈশব শৈবালের সঙ্গে যে তার পরিচয়—কই কখন এ দিকটার পরিচয় সে তো পায় নি। আজ মাধবী যে শৈবালের বুকের ছাই চাপা ঈর্ষার বহ্নিকে পরিপূর্ণভাবে জ্বালিয়ে দিয়েছিলো তার দাহ সহজ নয়। বুকের এই নিরন্তর দাহ তার একটুখানি স্নিগ্ধ হ'তো—যদি শৈবালের এই নির্ম্মম আঘাতে বিচলিত হ'য়েও নীরবে তার সামনে নিজের সব অপরাধ স্বীকার ক'রতো। এই দিকটার কথাই সে ভেবে রেখেছিলো এবং নিজের এই জয়গৌরবের কথাটা তার দগ্ধ অন্তরখানিকে কত দুঃসহ—কত চরমতম মুহূর্ত্তে সান্ত্বনাস্নিগ্ধ ক'রেছে। কিন্তু মাধবীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে এই ভয়ানক আঘাত তাকে বিস্ময়ে বিহ্বল ক'রে তুললে। কিন্তু বিস্ময়েই এই বিহ্বলতা মুহূর্ত্ত স্থায়ী হ'লো মাত্র, পরক্ষণেই ক্রোধে ক্ষোভে অপমানে তার দগ্ধ বুকখানা অশান্ত সমুদ্রের মতো দুলে উঠলো। তিক্তকটু শ্লেষ তীরের মত তার মুখফেটে যেন বেরিয়ে এলো : 'তাহ'লে

আমার শিক্ষার অভাব দূর ক'রতে এখানে এসেছো? আজকাল সকলের সব রকম অভাব মিটিয়ে বেড়ানোই তোমার কাজ হ'য়েছে নাকি? সাধু, সাধু।'

এতটা বিশ্রী ইঙ্গিত মাধবী আশা করে নি। তাই তিক্তকণ্ঠে জবাব দিলে: 'সকলের কথা জানি না, কিন্তু তোমার কথা জানি। তোমার নীচতার সংকীর্ণতার অন্ধকার দূর করতে পারি, এত আলো আমার নেই।'

'নেই? কেন তোমার সেই তিনি এখনও তোমাকে এত আলো দেন নি?'

'দিয়েছেন বৈ কি, কিন্তু সে আলো অপাত্রে এবং অকাজে খরচ করতে নিষেধ আছে' মাধবীর চোখ মুখে শৈবালের প্রতি নিবিড় ঘৃণা তাচ্ছিল্য যেন উপচে পড়তে লাগলো— বললে: 'তাঁকে ব্যঙ্গ ক'রতে তোমার লজ্জা করে না? মনে রেখো সব দিক দিয়ে তিনি তোমার চেয়ে ঢের বড়। তাঁর সঙ্গে তোমার নামটা পর্য্যন্ত উচ্চারণ ক'রলে তাঁকে অপমান করা হয়। তাঁর সিকির সিকি যোগ্যতা যদি তোমার থাকতো, তাহ'লে পশু না হ'য়ে তুমি মানুষ হ'তে।'

'হাঁ গায়ের রঙটা অন্ততঃ আমার চেয়ে তার ফর্সা, আর চাকরীটা ক'রেও ভাল জায়গায়' শৈবাল বললে: 'তোমার মত মেয়েকে হাতের মুঠোয় ক'রতে এর চেয়ে বেশি কিছু দরকার হয় না। কিন্তু লোকে যাই বলুক— তোমার সতীত্বের—তোমার একনিষ্ঠতার প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারছি না। সীতা সাবিত্রীর আগে জন্মালে তাঁরা নিশ্চয় তোমারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রতেন।'

মাধবী কয়েক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে তার মুখের দিকে চেয়ে অকস্মাৎ কাঁদো কাঁদো হ'য়ে বললে: 'ভদ্রমহিলার সম্মান রাখবার শিক্ষাও কি হয় নি তোমার?'

'তা হ'য়েছে কিনা জানি না' শৈবাল মর্ম্মান্তিক রূঢ়ভাবে জবাব দিলে: 'কিন্তু তোমাকে আমি ভদ্রমহিলার মর্য্যাদা দিই না। সে আত্মসম্মান, সে মর্য্যাদাবোধ যদি তোমার বিন্দুমাত্র থাকতো—তাহ'লে গায়ের রঙ আর ভাল জায়গার চাকরী দেখে এই তুচ্ছ লোভে আর একজনের কাছে এত সহজে বিকিয়ে যেতে না। তুমি যাও—যে বিশ্বাসঘাতকতা, যে পাপ তুমি ক'রেছো—তারপর তোমার সঙ্গে কথা কইতেও আমার মর্য্যাদায় বাধে।'

'যাচ্ছি' মাধবী উঠে দাঁড়িয়ে বললে: 'মনে থাকে যেন, আজ এই শেষ। কিন্তু সংসারে মানুষ যে কত নীচ কত ইতর হ'তে পারে তার প্রমাণ তুমি। এ পরিচয় আগে পেলে তোমার ছায়া পর্য্যন্ত মাড়াতাম না।' তারপর আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠল: 'মাগো—তুমি মানুষ নও—তুমি কষাই, তুমি পশু।'

'আর আমার ছায়া মাড়িয়ো না' শৈবাল চীৎকার ক'রে বলে উঠলো: 'তোমার মত অসতী মেয়ের ছায়া মাড়াতে আর আমার প্রবৃত্তি হবে না।'

ব'লেই তাকিয়ে দেখলে মাধবী স্থির রক্তহীন বিবর্ণমুখে তার দিকে চেয়ে আছে, তার এই অতীব নিষ্ঠুর আঘাত মর্ম্মে বিদ্ধ হ'য়ে তাকে যেন একেবারে অবশ ক'রে দিল। তার এই আঘাত যে কি মর্ম্মান্তিক হ'য়ে মাধবীর বুকে বিঁধেছে—তা চক্ষের পলকে হৃদয়ঙ্গম ক'রে শৈবালের দগ্ধ বুকখানা একটুখানি স্নিগ্ধ হ'লো। কিন্তু নিমেষমাত্র পরক্ষণেই মাধবী মুখ ফিরিয়ে দ্রুতপদে পরদা ঠেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। পরদাটা দুলে পুনরায় স্থির হ'লো। শৈবাল সেই নিস্তব্ধ নিঃসঙ্গ ঘরে একা সেইভাবে ব'সে সমস্ত ঘটনাটা একবার ভেবে নিলে এবং বিছানায় শুয়ে পড়ে তার মনে হলো, মাধবীর সঙ্গে আজ তার সমস্ত সম্বন্ধ চিরজন্মের মত যেন ছিন্নভিন্ন বিধ্বস্ত হ'য়ে গেলো।

(৭)

নিঃসঙ্গ ঘরের গভীর স্তব্ধতার সমুদ্রে ডুবে শৈবালের মনে একে একে কত চিন্তা যে বন্যার জলের মত হুহু ক'রে আসতে লাগলো তার সংজ্ঞা নেই। এই একটু আগে এই ঘরে যে ঘটনা ঘটে গেলো—তা যদিও প্রীতিকর নয়, তবুও সেজন্য শৈবাল এতটুকু ক্ষুব্ধ বা অনুতপ্ত হ'লো না। আজ তার সমস্ত মন মাধবীর প্রতি এমনি নিবিড় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো যে তার চিন্তা পর্য্যন্ত মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারলে সে বাঁচে। মাধবীর রূঢ় প্রত্যুত্তরগুলি তার সমস্ত বুকটাকে তখন নিরন্তর দগ্ধ ক'রছিলো এবং সেই দগ্ধ বুকের কঠিন জ্বালা নিয়ে শৈবাল মনে মনে তাকে যতদূর সম্ভব নীচ হীন তুচ্ছ হেয় প্রতিপন্ন ক'রে অবশেষে নিশ্চিন্ততার ভাণ ক'রে ব'লে উঠলো: 'এই আমি চেয়েছিলাম, এই আমি চেয়েছিলাম। তার মত

নীচ মর্য্যাদা-জ্ঞানহীন অসতী মেয়েকে অপমান ক'রে আমার কাছ থেকে তাড়িয়ে আমি বাঁচলাম। ওটার সঙ্গে সব সম্বন্ধ আমার শেষ হ'লো! যাক্।'

একটু পরে ঘরের পরদা সরিয়ে ঝি মুখ বাড়িয়ে বললে: 'ও দাদাবাবু, খেতে এস না গো—মা যে খাবার নে ব'সে আছে।'

শৈবাল অত্যন্ত শুকনো কণ্ঠে বললে: 'তুমি যাও ঝি, আমি যাচ্চি।'

'দেরী ক'রো নি, চট্‌পট এস' ব'লে পরদা ফেলে ঝি অদৃশ্য হ'লো।

আহারে রুচি তার অনেকক্ষণ চলে গিয়েছিলো। তবু শৈবাল উঠে দাঁড়ালো। তার একবার মনে হ'লো—মাকে ব'লে পাঠায়, আজ আর কিছু খাবে না। শরীর তার ক্লান্ত—মন নির্জীব অবসন্ন আনন্দহীন। খাবারগুলো মুখে সকালবেলাকার মতই হয়তো তিক্ত বিস্বাদ লাগবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই তার মনে হ'লো, কিসের জন্য তার এমনতর হ'চ্ছে—খাবার কেন সে প্রত্যাখান করতে যাবে? শৈবাল তার পঙ্গু চিন্তাটাকে সজোরে মন থেকে ঠেলে সরিয়ে দিলে। মাধবীর জন্য তার মন এমনতর হবে কেন? তাকে এমন কঠিন আঘাত ক'রে তাড়িয়ে দেওয়া যেন নিতান্ত একটা সামান্য ঘটনা—যা এতক্ষণ মনে রাখাও উচিত নয়, এই রকম একটা তাচ্ছিল্যের ভাব মনে নিয়ে শৈবাল সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

দালানের সেই জায়গাটায় পাশাপাশি দুখানি পিঁড়ি পাতা এবং তারই সামনে দুখানি ছোট বড় থালায় পরিপাটি ক'রে আহার্য্য সাজানো র'য়েছে, তারই সুমুখে ব'সে মায়ারাণী ছেলেদের জন্য অপেক্ষা ক'রে বসে র'য়েছেন। একটু পরে শৈবাল ও সুনীল এসে সেই আসনে পাশাপাশি ব'সলো এবং নিঃশব্দে খেতে লাগলো। মায়ারাণী শৈবালের রুক্ষ বিপর্য্যস্ত চুল এবং বিমর্ষ কঠিন মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে বললে: 'রাণীটা গেল কোথায় জানিস?'

'কোথায় আবার যাবে, বাড়ী গেছে' শৈবাল মুখ তুলে জিগ্‌গেস ক'রলে: 'কেন?'

'তার যে এখানে জল খাবার কথা ছিলো' মায়ারাণী উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললেন: 'বেশ মেয়ে তো, তার জন্য জলখাবার নিয়ে ব'সে আছি—আর সে না বলে বাড়ী চলে গেলো?'

'সে কি খাবে ব'লেছিলো নাকি?'

'তা নয় তো কি শুধু শুধু তার জন্য জলখাবার সাজিয়ে ব'সে আছি নাকি?' মায়ারাণী বললেন: 'আজ যখন এসে আমার পাশটিতে ব'সলো—দেখলুম মেয়েটার মুখখানি শুকিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেছে। জিগ্‌গেস ক'রে জানলুম, খাওয়া দাওয়া না ক'রে খালি পেটে খুব বেড়িয়েছে—তাই শ্রান্তিতে মুখখানি শুকিয়ে উঠেছে। যা-হোক খাবার আনবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই আমাকে ধ'রে বললে: এখন খাবার থাক জ্যাঠাইমা, আমি শৈবালদার সঙ্গে দেখা ক'রে এখনি আসছি—এসেই খাবো। আপনি খাবার ঠিক ক'রে রাখুন। এ পর্য্যন্ত ব'লে গেলো। আর এলো না। কি হ'লো রাণীর ব'লতে পারিস?'

'কি ক'রে জানবো।'

'ভাবছি একবার ঝিকে পাঠাই।'

'দরকার নেই।'

'দরকার নেই?'

'না নেই। তার বয়েস হ'য়েছে। এ জ্ঞান তার যথেষ্ট হ'য়েছে যে এভাবে চ'লে গেলে গুরুজনের অসম্মান করা হয়।'

'কি যে বলিস। সে কি অসম্মান করবার জন্য একাজ ক'রেছে?'

'না, এ বললে রাণীকে ছোট করা হয়' মায়ারাণী বললেন: 'খাবে ব'লে ক্ষিদে নিয়ে না খেয়ে বাড়ী থেকে চলে গেলো—এ তোমাদের প্রাণে লাগে না, কিন্তু মেয়েদের বুক যে ফেটে যায়। মেয়ে হ'লে বুঝতে এ কথা' একটুখানি চুপ ক'রে থেকে পুনরায় বললেন: 'যাক্, কাল ও এলেই সব জানতে পারবো। হাঁ ভাল কথা—কাল সকালে তোমাকে একবার ওদের বাড়ী যেতে হবে।'

'কেন?'

'কাল বিজন আর রাণীকে দুপুরে এখানে খাবার নেমন্তন্ন ক'রেছি। তুমি আর একবার গিয়ে ভাল ক'রে ব'লে এস।'

'হঠাৎ তাদের নেমন্তন্ন করবার হেতু?'

নেপথ্যে যে বিচিত্র নাটকের অভিনয় চলছে তা

মায়ারাণীর একেবারে অজ্ঞাত। সেই জন্য শৈবালের কণ্ঠস্বরের তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি ক'রতে না পেরে বললেন: 'হেতু আবার কি, আপনার লোক। তোমার বিজনের সঙ্গে আলাপ হ'য়েছে ?'

'না।'

'না কেন ? আলাপ ক'রলেই তো পারতে। কি চমৎকার ছেলে বিজন: রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য কিছুই দিতে ভগবান কার্পণ্য করেন নি। কাল গিয়ে ভাল ক'রে আলাপ ক'রে এস।'

'আমি পারবো না।'

'পারবে না কেন ?'

'কেন আবার কি ? যার তার সঙ্গে আলাপ ক'রে সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই।'

মায়ারাণী বিস্মিত হ'য়ে শৈবালের কঠিন মুখের দিকে তাকালেন। বিস্মিত হবার কথাই তো। শৈবাল বরাবর অত্যন্ত মিশুক—কোন শিক্ষিত গুণী লোকের সঙ্গে আলাপ ক'রতে—তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে শৈবালের কোনদিন উৎসাহের অভাব হয় নি। এই সে চায় এবং এই রকমে কত গুণবান লোকের সঙ্গে তার যে আলাপ হ'য়ে বন্ধুত্ব হ'য়েছে ও তাদের কতবার যে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ক'রে খাইয়েছে সেই সব কথা নিমেষে স্মরণ ক'রে মায়ারাণীর বিস্ময়ের আর অবধি রইলো না। সেই শৈবালের আজ এ কি হ'লো ? মায়ারাণীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বিজনের মত হীরের টুকরো ছেলের সঙ্গে আলাপ ক'রতে উৎসাহিত হওয়া তো দূরের কথা—তার সম্বন্ধে এমনভাব প্রকাশ করলো যেন বিজনের প্রতি তার কতই না অশ্রদ্ধা, অথচ দুজনের মধ্যে অপরিচয়ের প্রাকার খাড়া হ'য়ে র'য়েছে। শৈবালের এই আচরণের মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য্য উপলব্ধি ক'রতে না পেরে মায়ারাণী বললেন: 'বিজন কি যে-সে নাকি ? তার সঙ্গে আলাপ ক'রলে সময় নষ্ট হয় ? জানো সব দিক দিয়ে ওরকম ছেলে বড় একটা দেখা যায় না। না জেনে শুনে লোককে এমন ক'রে তাচ্ছিল্য করো কেন ? ঠাকুর খোকার দুধটা গরম হ'লো ? এইবার নিয়ে এসো। হাঁরে আর কিছু নিবি খোকা ? দেখো, ছেলে কথা কয় না। বাবা রে বাবা—ঐটুকু ছেলের রাগ দেখো না।'

ব'লে শৈবালের দিকে মুখ ফেরাতেই সে বললে: 'খুব জানি। তোমাদের মেয়েদের কাছেই ও মস্ত লোক। আমরা ওরকম ঢের দেখেছি। তোমরা কখন দেখো নি, তোমরাই ভালো ক'রে দেখো।'

মায়ারাণী ক্ষণকাল শৈবালের মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললেন: 'আমি যে ওকে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াই এ তোমার ইচ্ছে নয়, কেমন ?'

'আমার ইচ্ছে অনিচ্ছে কিছুই নেই। মোটকথা আমি তাকে নেমন্তন্ন ক'রতে যেতে পারবো না।'

'কেন পারবে না, শুনি ?'

'তা জানি না, পারবো না—শুধু এইটুকু জেনে রাখো। কারণ শুনে আর কাজ নেই' শৈবাল অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্লান্তকণ্ঠে বললে: 'ওসব কথা আর আমার ভাল লাগে না মা। আমার খাওয়া হ'য়ে গেছে, তুমি মসলা দেবে চলো।'

শৈবালের থালাটা চকিতে দেখে মায়ারাণী তার মুখের দিকে ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন: 'আমি আজ উপোস ক'রে রাত কাটাই, এই তুমি চাও ?'

শৈবাল ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললে: 'কি ব'লছো মা ?'

'বলবো আবার কি' মায়ারাণী বললেন: 'পরের ওপর রাগ ক'রে কিসের জন্য তুমি না খেয়ে উঠে যাচ্ছো শুনি ? তুমি কি ভাবো, তুমি না খেয়ে এই রকম ভাবে উঠে গেলে আমি খুব শান্তি পাবো ?'

'রাগ ক'রে উঠে যাচ্ছি ? রাগ আবার কার ওপর ক'রতে যাবো ?' শৈবাল বললে: 'আজ আমার ক্ষিদে নেই।'

'ও ছল ক'রে আমাকে ভুলিয়ো না' মায়ারাণী মুখ ফিরিয়ে বললেন: 'ও আমি খুব বুঝি।'

'বেশ তাই' শৈবাল সরোষে বললে - 'কিন্তু তোমার একথা জানা উচিত আমি সুনীল নই। পরের ওপর রাগ ক'রে খাবার ফেলে উঠে যাবার বয়েস আমার পার হ'য়ে গেছে।' ব'লে শৈবাল উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি কলতলার কাছে গেলো এবং ক্ষিপ্রগতিতে হাত মুখ ধুয়ে ফিরে এসে তারের গা থেকে তোয়ালে নিয়ে হাত মুখ মুছতে লাগলো।

মায়ারাণী উঠে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে উদ্দেশ ক'রে বললে: 'ঠাকুর আমার খাবারটা ঝি চাকরদের ভাগ ক'রে দিয়ো, আজ আমি খাবো না।'

শৈবাল চলেই যাচ্ছিলো—মার কথাটা তার কাণে গিয়ে

ঠেকলো। আজ এক জন—যতই দোষ তার থাক—তারই নিষ্ঠুর অপমানে আহত হ'য়ে মুখের আহার্য্য ফেলে চলে গেছে এবং আর একজন তারই জন্য মুখের আহার্য্য ত্যাগ ক'রতে যাচ্ছে, নিমেষে সমস্ত ঘটনাটা বিদ্যুৎগতিতে তার অনুভূতির মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে গেলো। সিঁড়ির কাছ থেকে ফিরে এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে: 'তুমি তাহ'লে না খেয়ে থাকবে ?'

মায়ারাণী নিঃশব্দে মুখ ফিরিয়ে রইলেন। হাঁ—না—কোন জবাবই দিলেন না।

শৈবাল ক্ষণকাল সেইভাবে তাকিয়ে থেকে বললে: 'খাবে না তো? বেশ। কিন্তু আমি যদি কাল শুনি আমার জন্য তুমি মিথ্যে উপোস ক'রে রাত কাটিয়েছো তাহ'লে আমি নিজের ওপর এমন একটা কিছু ক'রবো, যাতে আমার জন্য তোমাকে সারা জীবন চোখের জল ফেলতে হবে।' ব'লে শৈবাল ক্ষিপ্রপদে উপরে উঠে গেলো।

এ কি কথা! এ কি কথা! মায়ারাণীর পা থেকে মাথা অবধি অমঙ্গল আশঙ্কায় একবার কেঁপে উঠলো এবং দেখতে দেখতে তাঁর দু'চোখ ছাপিয়ে হু হু ক'রে জলধারা নেমে এলো, চোখ মুছতে মুছতে তিনি সেই চির-অদৃশ্য দেবতার উদ্দেশে কত কথাই অস্ফুটে বলতে লাগলেন।

শৈবাল নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ক্লান্ত অবসন্ন জর্জ্জরিত দেহ-মন নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই তার মনে পড়লো—কাল সকালে বিজন আর রাণীর এখানে নিমন্ত্রণ আসবার কথা। বিজন আসবে এ নিশ্চয়, কিন্তু রাণী কি আসবে? বোধ হয় আসবে না। শৈবাল ভেবে দেখলে রাণীর আসবার কোন পথই সে রাখে নি। না রাখুক, তবু রাণীর পক্ষে কাল এখানে আসা একেবারেই অসম্ভব নয়। সে নিশ্চয় আসবে—আসবে—আসবে। আত্মসম্মানের বালাই তো তার নেই। তা যদি থাকতো, তাহ'লে বিজনের মত লোকের কাছে এত সহজে বিকিয়ে যেতো না। সে অসতী কুচক্রী শয়তানী—এতে কোন ভুল নেই, ভুল নেই, ভুল নেই; এ তার স্থির ধারণা। যাক্ ভালই হ'য়েছে, তার সঙ্গে নির্ম্মমভাবে সব সম্পর্ক চুকিয়ে শেষ ক'রে। কিন্তু কাল যদি বিজনের সঙ্গে সে আসে? বিজন আর রাণী তার চোখের আড়ালে যাই করুক, শৈবালের চোখের সামনে যে দুজনে আনন্দ গুঞ্জনে হাসিতে গল্পে আত্মহারা হ'য়ে থাকবে—এ সে সহ্য ক'রতে পারবে না, কোন মতেই সহ্য ক'রতে পারবে না। তারা দুজনে যতক্ষণ সামনে থাকবে, সেই সময়টা তাকে অন্যত্র কোথাও যেতেই হবে। নিজের মনে মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা ক'রেই ক্রোধে এবং ঈর্ষায় তার বুকের ভেতরটা পুনরায় রি রি ক'রে জ্বলে উঠলো। বিছানাটা যেন কাঁটার মত বিঁধে তাকে শয্যায় আর এক দণ্ড তিষ্ঠতে দিলে না। বিছানা থেকে উঠে জানালা কাছে গিয়ে পরদাটা সরিয়ে বাইরের স্বচ্ছ আলোকি রাত্রির দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মনে হ'লো মাধবী ওপর রাগ ক'রলেও তাকে বেশি সম্মান দেওয়া হয়, তা সম্বন্ধে মনকে ক'রতে হবে নিতান্ত নির্লিপ্ত উদাসীন। আ হাঁ—বিজন আর রাণী যদি কাল আসেই তবে সে অন্যত্র যেতে যাবে কেন? বিজন আর রাণী যদি পরস্পরকে নিয়ে আনন্দে গল্পে বিভোর হ'য়ে থাকে তবে শৈবালের ত সহ্য না হবার কি কারণ? এ কি তবে বিজনের প্রতি তার গভীর ঈর্ষা? নিরালা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা মনে উদয় হ'তেই আপনা আপনি তার নিজের অন্তরে আগুন জ্বলে উঠলো। ঈর্ষা? ঈর্ষা করবার মত কি যোগ্যতা ঐ খেলো হিপক্রিট লোকটার আছে, যার বিদ্যার দৌড় মেয়েদের কাছ অবধি। ঐ লোকটাকে কি শৈবাল মানুষের মধ্যে গণ্য করে? এ তার বিজনের প্রতি ঈর্ষা নয় রাগ নয় অভিমান নয়, এ হ'চ্ছে মাধবীর প্রতি তার নিবিড় ঘৃণা—যার জন্য কাল তাদের শুভাগমনের আগেই তাকে অন্যত্র যেতে হবে। যাবে, কিন্তু অকারণে নয়। যাদের সংসারের সঙ্গে তাদের নিবিড় আত্মীয়তা প্রীতি মমতা ভালবাসা—আবাল্য যে রাণীকে সে স্নেহ ক'রে এসেছে, যাকে নিজে শিখিয়েছে লেখাপড়া—যার সুখ দুঃখের অংশ চিরকাল আনন্দে দরদে গ্রহণ ক'রে এসেছে—সেই মেয়ের এতখানি জঘন্য মনোবৃত্তির প্রকাশ সে দেখবে কি ক'রে? কি ক'রে দেখবে একজন লোভ দেখিয়ে তাকে অনায়াসে ক'রেছে করতলগত এবং সেই লোভে তার জন্য শৈবালের সঙ্গে কুৎসিতভাবে বিবাদ ক'রতেও তার বাধে নি। ছি, ছি। শৈবাল নিজের মনে ব'লে উঠলো: এ ঈর্ষা নয় এ হ'চ্চে রাণীর প্রতি নিবিড় ঘৃণা—যার জন্য তার কদর্য্য উপস্থিতি আমাকে কিছুক্ষণের জন্য গৃহছাড়া ক'রবে। যাক্ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ঐ অসতী কুচক্রীর নাগপাশ থেকে এত সহজে মুক্ত হ'তে পেরেছি। মাধবীর চেহারা খানা মনে প'ড়তেই ঘৃণায় শৈবালের সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠলো। তার সমস্ত দেহ কুৎসিতভাবে বিষাক্ত—তার নিশ্বাসে বিষ, মুখে চোখের চাউনীতে কি ন্যাক্কারজনক মালিন্য! কেমন ক'রে ওর সাহচর্য্য সহ্য করা শৈবালের পক্ষে এতদিন সম্ভব হ'য়েছিলো—কেমন ক'রে? এই রকমে শৈবাল মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে পুনরায় বিছানায় এসে শুলো এবং তার মুখের সামনে অত্যন্ত ঘৃণাভরে মাধবী যে বিজনের সঙ্গে তার তুলনা ক'রে তাকে নীচ হেয় ক্ষুদ্রতর ক'রেছে, সেই সব কথা পুনর্ব্বার মনে পড়ায় শৈবালের দুচোখ দিয়ে অসহ্য জ্বালায় যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগলো।

(ক্রমশঃ)



সুরের জন্ম

শিল্পী—শ্রীযুক্ত হেমদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

Bharatvarsha Halftone & Printing Works

বৃহৎ বঙ্গ

ডক্টর শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার এম-এ, পি-এইচ-ডি

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গ-সাহিত্যে সুপরিচিত। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনার পথ প্রদর্শন করিয়া তিনি অপূর্ব্ব কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন ও বহু লুপ্ত রত্নের উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে তিনি এই একটি মাত্র বিষয়ে যাহা করিয়াছেন, যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই তাহা পরম শ্লাঘার বিষয় বলিয়া গণ্য হইত। তিনি যদি বৃদ্ধবয়সে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর লইয়া সাহিত্য চর্চ্চায় বিরত হইতেন—তাহা হইলেও এক জীবনের পক্ষে তিনি যথেষ্ট করিয়াছেন—একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইত।

কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসাও যেরূপ প্রবল, তাঁহার অধ্যবসায়ও তেমনই অদম্য। শেষ জীবনে বিশ্রাম লাভ করিবার প্রলোভন সত্বেও তিনি যে দুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সম্প্রতি 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক তাঁহার এক অতি বৃহৎ গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পত্রসংখ্যা বার শতেরও অধিক। ইহাতে বঙ্গদেশের—তথা পূর্ব্বভারতের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, নৈতিক, শিল্প ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। এক কথায় বাঙ্গালা দেশের সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তাহার প্রায় সমস্তই দীনেশবাবু এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন এক জন লেখকের পক্ষে এই কাজ যে কত দুঃসাধ্য তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিবেন। এই গ্রন্থে ভুল ত্রুটি অনেক আছে সত্য, কিন্তু ইহা বহু মূল্যবান জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। কিংবদন্তী, জনশ্রুতি, লোক-সাহিত্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সাধারণের অজ্ঞাত কত তথ্য যে গ্রন্থকার সংগ্রহ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ভবিষ্যতে যাঁহারা বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিবেন তাঁহারা এই গ্রন্থে এমন অনেক প্রয়োজনীয় মাল-মসলা পাইবেন যাহা অন্যত্র দুর্ল্লভ।

বৃহৎ বঙ্গ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে লিখিত ইতিহাস নহে—সুতরাং সেই মাপকাঠিতে ইহার বিচার করিলে গ্রন্থকারের প্রতি অন্যায় করা হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন; "ঐতিহাসিক কিংবদন্তী বা উপগল্প, তাহার যে মূল্যই থাকুক না কেন, তাহা আমি বাদ দিই নাই।...এই পুস্তকের ভাষা হয়ত ঠিক বিজ্ঞান-সঙ্গত, ওজন করা নির্লিপ্ত ঐতিহাসিকের ভাষা হয় নাই। আজ বঙ্গের শ্মশানের উপর দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী লেখক যদি মাঝে মাঝে অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া থাকেন, কিংবা কিছু বিচলিত হইয়া উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া থাকেন—তবে আশা করি তিনি ঐতিহাসিকগণের ক্ষমা হইতে বঞ্চিত হইবেন না। বিশেষ এই পুস্তক শুধু ঐতিহাসিকগণের জন্য লিখিত হয় নাই, বঙ্গের জনসাধারণের মনে স্বদেশ প্রীতি জাগ্রত করা আমার অন্যতম লক্ষ্য। নীরস ও শুষ্ক গবেষণায় তাহারা আকৃষ্ট হইবে না—এজন্য যদি রস-সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ভাষায় মাঝে মাঝে কিছু রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়া থাকি, তাহাতে আমি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" (পৃঃ ১৮৶০)

বৃহৎ বঙ্গের সমালোচনা করিতে অথবা ইহার প্রকৃত স্বরূপ ও মূল্য কি বুঝিতে হইলে উদ্ধৃত কথাগুলি বিশেষ-ভাবে স্মরণ করিতে হইবে। সুদীর্ঘ জীবনের অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থকার বঙ্গদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যেখানে যাহা কিছু পাইয়াছেন তাহা সংগ্রহ করিয়া পাঠককে উপহার দিয়াছেন। প্রতি পদে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কষ্টিপাথরে মূল্য যাচাই করিয়া অথবা সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা সত্য মিথ্যার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিয়া তিনি অগ্রসর হন নাই। সুতরাং তাঁহার কোন কোন মত অগ্রাহ্য হইবে—কোন কোন মত গ্রাহ্য হইবে—তাহার বিচারের ভার ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের হস্তেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন "আমার এই পুস্তক ভাবী ঐতিহাসিক-গণের পক্ষে একখানি পাদপীঠরূপে গণ্য হইলে ধন্য হইব।"

গ্রন্থরচনার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম।

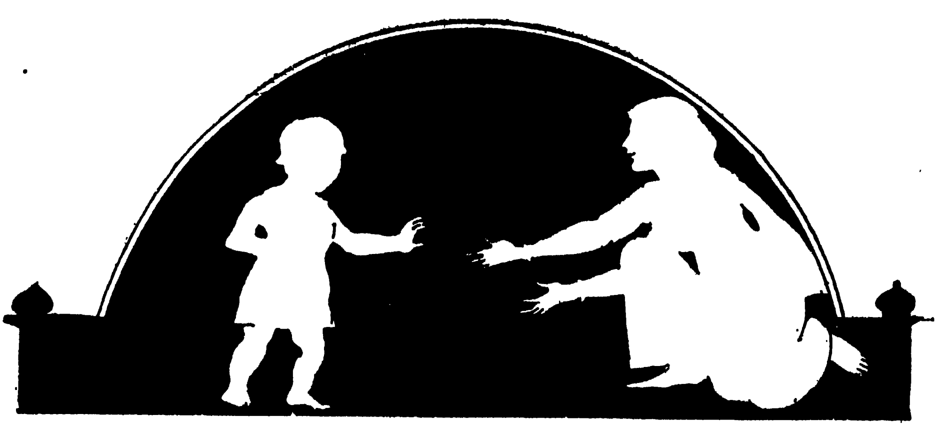
অতঃপর এই গ্রন্থে যে সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ রাজনৈতিক ইতিহাস। সুদূর প্রাচীনকাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে গ্রন্থকার মগধের রাজবংশের বর্ণনা করিয়াছেন—যেমন মৌর্য্য, সুঙ্গ, কাণ্ব, গুপ্তবংশ প্রভৃতি। ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন "বঙ্গদেশের শিক্ষা-দীক্ষার মূল-প্রস্রবণ মগধ কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত ছিল; মগধের উচ্চ শিক্ষা, মগধের শিল্পকলা সমস্তই উত্তরকালে পূর্ব্বদিক আশ্রয় করিয়া গৌড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, মগধকে বাদ দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করা চলে না। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাসে মগধকে বাদ দেন নাই" (১৯ পৃঃ)। অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন "পূর্ব্বভারতের সভ্যতার—বিশেষ করিয়া মগধের শিক্ষা-দীক্ষার আমরা বাঙ্গালীরাই উত্তরাধিকারী হইয়াছি" (১৭৪ পৃঃ)। আমরা এ বিষয়ে গ্রন্থকার বা রাখালবাবুর সহিত একমত হইতে পারি না। গ্রন্থকারের যুক্তি যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়—তবে 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক গ্রন্থে মগধের ইতিহাস না লিখিয়া 'বৃহৎ মগধ' নামক গ্রন্থে বাঙ্গালার ইতিহাস লেখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

গুপ্তযুগ পর্য্যন্ত মগধের রাজবংশের আলোচনা করিয়া তৎপর গ্রন্থকার বাঙ্গালার রাজবংশের বিবরণ দিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন যুগের ধর্ম্মমত, সামাজিক রীতি-নীতি, শিল্পকলা, বিদ্যাচর্চ্চা প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচ্য বিষয়ের যে একটি তালিকা দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই পুস্তকে সিংহলী ও বঙ্গভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি; জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছি; নব্য-ন্যায় ও স্মৃতির মত জটিল ও একান্ত দুরূহ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজের অসামর্থ্য বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি। বৌদ্ধ বিহার, নবদ্বীপের টোল, বাঙ্গালার গণিত, মস্‌লিনও রেশমের ব্যবসায়, কৃষিতত্ত্ব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও বৈষ্ণবধর্ম্ম, তন্ত্রশাস্ত্র, সহজিয়া, মস্করীদের চিত্র, শঙ্খ ব্যবসায়, কৌলীন্য ও শিল্প সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা, দীপঙ্কর, জয়দেব, মহাপ্রভু চৈতন্য ও তাঁহার বহুসংখ্যক পার্শ্বদগণের জীবনী এবং নানা প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত লইয়া আমি চর্চ্চা করিতে চেষ্টা পাইয়াছি।" (১৸৴০ পৃঃ)

এই সুদীর্ঘ তালিকা হইতেই পাঠকবর্গ গ্রন্থের প্রকৃতি ও স্বরূপ সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করিতে পারিবেন।

বৃহৎ বঙ্গ গ্রন্থের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশ বাঙ্গালার চিত্র-শিল্প ও কারুশিল্পের বিবরণ ও তদ্বিষক বহুসংখ্যক ছবি। এগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, সাধারণতঃ দুষ্প্রাপ্য। এ সমুদয়ের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থকার বাঙ্গালার সভ্যতার ইতিহাসের একটি বিস্মৃত লুপ্তপ্রায় অধ্যায় উদ্ধার করিয়াছেন। ২৩৮ ক, ২৩৯ ক, এবং ৪১৮ ক-চ প্রভৃতি সংখ্যক ছবিগুলি বাঙ্গালার শিল্পের অপূর্ব্ব নিদর্শন। এই সমুদয় মালমসলা ধীরে ধীরে সংগ্রহ হইলেই তবে বাঙ্গালার শিল্পের ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে। এ বিষয়ে গ্রন্থকার এক প্রকার প্রথম পথপ্রদর্শকের কার্য্য করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।



বৈদিকযুগের শিক্ষাপদ্ধতি

অধ্যাপক শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী

উপনয়ন ও ব্রহ্মচর্য্য

১

সংহিতাযুগ

প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ দ্বিজাতির জীবনকে চতুরাশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রথম আশ্রমটি বিদ্যার্জ্জনের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। উহার নাম দেওয়া হইয়াছিল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রম। উপনিষৎসমূহে চতুরাশ্রমেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—(ছান্দোগ্য ২-২৩-১, বৃহদারণ্যক ৪ ৪-২২, শ্বেতাশ্বতর ৬ ২১)। প্রথম আশ্রমটির উল্লেখ ঋগ্বেদ (১০-১০৯-৫), অথর্ব্ববেদ (৬-১০৮ ২ ; ৬-১৩৩ ৩ ইত্যাদি) এবং ঐতরেয় (৫-১৪, ২২-৯), তৈত্তিরীয় (৩-৭ ৬-৩) ও শতপথব্রাহ্মণে (১১-৩-৩) দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ১০৯তম সূক্তের পঞ্চম ঋকে "ব্রহ্মচারী" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সেখানে বৃহস্পতি পত্নী অভাবে ব্রহ্মচর্য্য আচরণ করিতেছেন এরূপ বলা হইয়াছে। "ব্রহ্মচর্য্য" শব্দের নিরুক্ত আচার্য্য সায়ন এইরূপে বিবৃত করিয়াছেন—'ব্রহ্ম' অর্থ বেদ। সার্থকভাবে বেদ অধ্যয়ন করিবার জন্য বিদ্যার্থীকে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় ; কতকগুলি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়—যেমন যজ্ঞীয় অগ্নিতে প্রাতে ও সায়াহ্নে আহুতি দেওয়ার জন্য অরণ্য হইতে সমিধ সংগ্রহ, ভিক্ষাচরণ, বীর্য্যধারণ ইত্যাদি। বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদার্থ ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে এই যে নিয়ম প্রতিপালন ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান—তাহাই "ব্রহ্মচর্য্য"। ("ব্রহ্ম বেদঃ, তদ্ অধ্যয়নার্থং আচর্য্যং আচরণীয়ং সমিদাধান—ভৈক্ষ্যচর্য্যোর্দ্ধ—রেতস্কত্বাদিকং ব্রহ্মচারিভিঃ অনুষ্ঠীয়মানং কর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যম্"—অথর্ব্ববেদ, একাদশ কাণ্ড, তৃতীয় অনুবাক্, দ্বিতীয় সূক্ত, সপ্তম মন্ত্রের ভাষ্যে)। ঋগ্বেদ হইতে জানা যায়, ব্রহ্মচারীদের মধ্য হইতে যজ্ঞের জন্য ব্রহ্মা, উদ্গাতা, হোতা, অধ্বর্য্যু প্রভৃতি ঋত্বিক্ মনোনয়ন করা হইত। (১০।৭১।১১)

যজুর্ব্বেদে (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৬।৩।১০।৫) বলা হইয়াছে ;—"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঃ ঋণবান্ জায়তে। ব্রহ্মচর্য্যেণর্ষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ। এস বা অনৃণী যঃ পুত্রো যজ্বা ব্রহ্মচারী।" ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক বেদ অধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ পরিশোধ করা হইয়া থাকে। এখানে ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ—এই তিন ঋণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রে এই তিন ঋণই পাঁচঋণে দাঁড়াইয়াছে এবং পঞ্চ যজ্ঞতত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাইতেছি, যজুর্ব্বেদ সংহিতার যুগেই বেদপন্থী সমাজে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল যে ব্রতধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ বালক মাত্রেরই বেদ অধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য। পূর্ব্বতন ঋষিগণ যে জ্ঞান সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন তাহার ব্যবহার না করিলে তাঁহাদের প্রতি কর্ত্তব্য অসমাপ্ত থাকে ; ব্রাহ্মণকুমারকে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়া মরিতে হয়।

অথর্ব্ববেদের একাদশ কাণ্ডের তৃতীয় অনুবাদকে তৎকালীন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ ও বিধি ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। এই বর্ণনার সহিত পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও গৃহ্যসূত্রাদির বর্ণনার সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। তাহাতে অনুমান করা যাইতে পারে অথর্ব্বসংহিতার যুগেই বৈদিক সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। আচার্য্যের নিকট উপনীত হইয়া বালক যেন নূতন জীবন লাভ করে। ব্রহ্মচারী যেন আচার্য্যের গর্ভে তিন রাত্রি অবস্থান করে। সে যখন নূতন জন্ম লইয়া ভূমিষ্ঠ হয় তখন তাহাকে দেখিবার জন্য দেবতারাও উপস্থিত হইয়া থাকেন। ("আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভমন্তঃ। তং রাত্রীস্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি তং জাতং দ্রষ্টুং অভিসংযন্তি দেবাঃ" অথর্ব্ব বেদ ১১ ৫, ৩)। আচার্য্য সায়ন এস্থলে ভাষ্যপ্রসঙ্গে বিবৃত করিয়াছেন, মাতা পিতা এই জড় দেহ উৎপাদন করেন মাত্র। উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা মানবক আচার্য্যের নিকট হইতে যে নূতন জন্ম লাভ করে তাহাই শ্রেষ্ঠ জন্ম, ঐ বিদ্যাশরীরই উৎকৃষ্ট শরীর। আমরা অথর্ব্ববেদের বর্ণনা হইতে জানিতে পাই—ব্রহ্মচারী কৃষ্ণমৃগের অজিন পরিধান করিত ; মেখলা ধারণ করিত, দীর্ঘ শ্মশ্রু রক্ষা করিত এবং ভিক্ষাচরণ করিত। ব্রহ্মচারী প্রাতে ও সায়াহ্নে অগ্নিতে সমিধ আধান করিত এবং তজ্জনিত তেজের দ্বারা সন্দীপিত হইয়া সর্ব্বদা অবস্থান করিত। ব্রহ্মচারী বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া আচার্য্যকে দক্ষিণা প্রদান করিত।

অথর্ব্ব বেদ ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলেন, ব্রহ্মচারী সর্ব্বদেবের নিবাসভূত। সকল দেবতাই তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ ("তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি" ১১।৩।১।১)। পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচারী সমিধ আধান, মেখলা ধারণ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহাদি নিয়ম জাতের অনুষ্ঠানের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি সমুদয় লোককে পূর্ণ করিয়া থাকেন। (অথর্ব্ব বেদ ১১-৩-১-২, ১১-৩-১-৪)

"ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজারাষ্ট্রং বিরক্ষতি।
আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণম্ ইচ্ছতে॥ ১১, ৫, ১৭
ব্রহ্মচর্য্যেণ কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিম্। ১১, ৫, ১৮
... ...
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুম্ অপাঘ্নত।
ইন্দ্রোহ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ॥ ১১, ৫, ১৯

ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্থার দ্বারা রাজা রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন, আচার্য্য স্বয়ং ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াই বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীকে শিষ্যরূপে পাইতে ইচ্ছা করেন। কন্যা ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা যুবক পতি লাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্যরূপ তপস্থার অনুষ্ঠান করিয়াই দেবতারা মৃত্যুকে প্রতিহত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ব্রহ্মচর্য্য বলেই দেবগণের জন্য স্বর্গ আহরণ করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি, তৎকালে নৃপতিরাও ব্রতপরায়ণ হইয়া বেদবিদ্যার চর্চ্চা করিতেন এবং এই জ্ঞান বলেই তাঁহারা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। বালকদের ন্যায় বালিকারাও বিবাহের পূর্ব্বে নিয়ম গ্রহণ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিত।

২

ব্রাহ্মণ-যুগ

শতপথ ব্রাহ্মণ (১১-৫-৪) উপনয়নের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উপনয়নের দ্বারা মানবক তাহার আচার্য্য হইতে নূতন জ্ঞানময় দেহলাভ করে, এই কথাটি রূপকচ্ছলে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—আচার্য্য তাঁহার দক্ষিণ হস্ত মানবকের মস্তকোপরি স্থাপন করেন, তাহা দ্বারাই সে গর্ভলাভ করিয়া থাকে (তেন গর্ভী ভবতি)। তৃতীয় রাত্রিতে আচার্য্য হইতে ভ্রূণ নির্গত হইয়া থাকে এবং সাবিত্রীমন্ত্র শিক্ষা করিয়া সে যথার্থ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সে আচার্য্যের মুখ হইতে নিঃসৃত দৈবজীবের মত (শতপথ ব্রাহ্মণ ১১-৫-৪-১৭)।

উপনয়ন অনুষ্ঠানের দ্বারা বিদ্যারম্ভ হইত। কখন কখন পিতা নিজেই ছেলেকে উপনীত করিয়া বিদ্যা ও যজ্ঞীয় অনুষ্ঠান—উভয়ই শিক্ষা দিতেন (শতপথ ১-৬-২-৪)। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা আচার্য্য দ্বারাই পুত্রকে উপদিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিতেন।

বিদ্যার্থীকে সমিধ হস্তে নিয়া আচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইতে হইত। ইহা দ্বারা আচার্য্যের আনুগত্য ও যজ্ঞীয় অগ্নি সংরক্ষণের সঙ্কল্প জ্ঞাপিত হইত।

গোপথ ব্রাহ্মণ হইতে জানা যায়, এক একটি বেদ ১২ বৎসর ব্যাপিয়া পড়িতে হইত। তাহা হইলে যে চারিটি বেদ পড়িতে ইচ্ছা করিত তাহাকে ৪৮ বৎসর গুরুগৃহে অবস্থান করিতে হইত। অবশ্য সকলে এত দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিত না। সংক্ষেপে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার ব্যবস্থাও ছিল। উপনিষৎ যুগে সাধারণতঃ অধ্যয়নকাল ছিল ১২ বৎসর।

বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীকে কঠোর ব্রতপরায়ণ হইয়া নানা প্রকার বিধি-নিষেধ মানিয়া গুরুকুলে অবস্থান করিতে হইত। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, (১১-৩-৩-২) 'যে ব্রহ্মচারীর জীবনে পদার্পণ করে সে একটি দীর্ঘকাল স্থায়ী সত্র অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল বুঝিতে হইবে।' গোপথ ব্রাহ্মণ বলেন (পূর্ব্বভাগ, দ্বিতীয় প্রপাঠক, ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ) ব্রহ্ম সকল প্রজাকেই মৃত্যুর হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, কেবল ব্রহ্মচারীকে দেন নাই। ("ব্রহ্ম হবৈ প্রজা মৃত্যবে সম্প্রযচ্ছৎ, ব্রহ্মচারিণমেব ন সম্প্রদদৌ।" মৃত্যু ব্রহ্মকে বলিলেন, ইহাতেও আমার অধিকার চাই। ব্রহ্ম বলিলেন, ব্রহ্মচারী যে রাত্রিতে অগ্নিতে আধানের নিমিত্ত সমিধ সংগ্রহ না করিবে সে রাত্রিটি তাহার আয়ু হইতে কর্ত্তিত হইবে। ("যাং রাত্রীং সমিধম্ অনাহৃত্য বসেৎ তাম্ আয়ুষোঽ বরুন্ধীয় ইতি।" গোপথ ব্রাহ্মণ ১।৬)। অতএব ব্রহ্মচারী প্রত্যহ প্রাতে ও সায়ংকালে সমিধ সংগ্রহ করিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা করিবে। শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন, ইহাতে ব্রহ্মচারীর মন অগ্নি দ্বারা, পবিত্র তেজের দ্বারা উদ্দীপিত হইয়া থাকে।

ব্রহ্মচারীকে প্রত্যহ ভিক্ষাচরণ করিতে হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে ভিক্ষার উদ্দেশ্যটি এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে, "নিজেকে যেন দরিদ্র মনে করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সে ভিক্ষাচরণ করিয়া থাকে" (১-৩-৩-৫)। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে, ছাত্রজীবনে দীনতা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু সমাবর্ত্তনের পরে অর্থাৎ ছাত্রজীবন পরিসমাপ্ত হইলে ভিক্ষাচরণ নিষিদ্ধ ছিল। (শতপথ ১১-৩-৩-৭)।

ব্রহ্মচারী আচার্য্যের গৃহস্থালী সংরক্ষণ করিত এবং অরণ্যে গো-চারণ করিত। (শতপথ ব্রাহ্মণ ৩—৬—২—১৫)।

ব্রহ্মচারীর পক্ষে দিবানিদ্রা, মধুপান, উচ্চ শয্যায় শয়ন ও নৃত্যগীতাদি অনুশীলন নিষিদ্ধ হইয়াছিল। (শতপথ ১১-৫-৪-৫, ১৮ ; গোপথ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বভাগ ২—৭)।

গোপথ ব্রাহ্মণ বলেন, বিদ্যার্থী যতদিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিয়া গুরুকুলে অবস্থান করিবে ততদিন তাহাকে আভিজাত্যের অভিমান, যশোলিপ্সা, নিদ্রালুতা, ক্রোধ, শ্লাঘা সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং গন্ধদ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া চলিতে হইবে। ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া সে এই যে সব ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিল ভবিষ্যতে যখন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সমাবর্ত্তন সংস্কারের পরে গৃহস্থ-জীবন অবলম্বন করিবে তখন সে এই সমুদয় অধিকমাত্রায় ফিরিয়া পাইবে।

'যদি সে আভিজাত্যের গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া মৃগচর্ম্ম পরিধান করে, তাহা হইলে সে যখন অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া স্নাতক হইবে—তখন মৃগের মত ব্রহ্মবর্চ্চসী হইবে।'

("যদ্ অগাজিনানি বস্তে তেন তদ্ ব্রহ্মবর্চ্চসম্ অবরুন্ধে, যদস্ত মৃগেষু ভবতি স হ স্নাতো ব্রহ্মবর্চ্চসী ভবতি"—গোপথ ব্রাহ্মণ, পূর্ব্বভাগ, দ্বিতীয় প্রপাঠক, তৃতীয় ব্রাহ্মণ)।

'ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির কথা ভুলিয়া গিয়া অহরহ গুরুর জন্য কাজ করিয়া যাইতেছে ; তাহার ফলে সে ভবিষ্যতে তাহার আচার্য্যের মত যশস্বী হইবে।' (ঐ)

'বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীরূপে সে এই যে নিদ্রার আক্রমণকে প্রতিহত করিয়া চলিয়াছে তাহার ফলে ভবিষ্যতে তাহার "অজগরের" মত সুনিদ্রালাভ হইবে।' (ঐ)

'ব্রহ্মচারী ক্রোধকে দমন করিয়া রাখে, পরুষ বাক্যদ্বারা কাহাকেও সন্তাপিত করে না ; তাহার ফলে পরিণামে তাহার "বরাহ"তুল্য ক্রোধলাভ হইবে।' (ঐ)

'ব্রহ্মচারী এই যে দৈহিক সৌন্দর্য্যের প্রতি উদাসীন থাকিয়া যতিধর্ম

অবলম্বনপূর্ব্বক জীবন-যাপন করিতেছে, নগ্ন কুমারী দৃষ্টিপথে পড়িলেও সংযমের কষাঘাতে চক্ষুকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া আনিতেছে—তাহার ফলে পরিণামে তাহার কুমারীর মত সৌন্দর্য্যলাভ হইবে।' (ঐ)

'বিদ্যার্থী ব্রহ্মচারীরূপে সে যে নিজেকে সর্ব্ববিধ গন্ধদ্রব্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে তাহার ফলে সে যখন অধ্যয়ন সমাপ্তির পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে তখন ওষধি বনস্পতির পুণ্যগন্ধ প্রাপ্ত হইবে।' (ঐ)

(৩)

আরণ্যক ও উপনিষদযুগ

প্রাচীনতর উপনিষদগুলিতে পুত্র বা উপনীত শিষ্য ব্যতিরেকে অপর কাহাকেও উপনিষদ বিদ্যা প্রদান বারবার নিষিদ্ধ হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক বলেন, 'এইসব সংহিতা এমন কাহাকেও দিবে না যে শিষ্য নহে, যে সম্পূর্ণ এক বৎসর শিষ্যরূপে যাপন করে নাই এবং যে ভবিষ্যতে আচার্য্য হইতে ইচ্ছুক নহে'। ("তা এতাঃ সংহিতা নানন্তেবাসিনে প্রব্রুয়াৎ নাসংবৎসরবাসিনে নাপ্রবক্ত ইত্যাচার্য্য আচার্য্যা ইতি" ঐতরেয় আরণ্যক ৩.২.৬.৯)। ছান্দোগ্য উপনিষদের মতে 'পিতা এই ব্রহ্মবিদ্যা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিতে পারেন অথবা উপযুক্ত শিষ্যকে বলিতে পারেন। সসাগরা বিত্তপূর্ণা পৃথিবীর বিনিময়েও অপর কাহাকেও তিনি ইহা বলিবেন না, কারণ ইহা তদপেক্ষাও মহৎ।' (ইদং বাব তজ্ জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় পিতা ব্রহ্ম প্রব্রুয়াৎ প্রণায্যায় বান্তেবাসিনে। নান্যস্মৈ কস্মৈচন যদ্যপ্যস্মা ইমাম্ অদ্ভিঃ পরিগৃহীতাং ধনস্য পূর্ণাং দদ্যাদ্ এতদেব ততো ভূয় ইতি"। ছান্দোগ্য ৩.১১.৫-৬)। শ্বেতাশ্বতর অনুশাসন দিতেছেন, পুরাকালে উক্ত বেদান্তের সেই গুহ্যতত্ত্ব এমন কাহাকেও বলিবেন না যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ প্রশস্ত হয় নাই, যে পুত্র বা শিষ্য নহে। (বেদান্তে পরমং গুহ্যং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্। নাপ্রশান্তায় দাতব্যং না পুত্রায় অশিষ্যায় বা পুনঃ ॥" শ্বেতাশ্বতর ৬-২২)

উপনিষদ হইতে জানা যায়, দেবতা ও মানুষরা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য সমিৎপাণি হইয়া আচার্য্যের সমীপে উপনীত হইতেন। ইন্দ্র ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য প্রজাপতির অন্তেবাসীরূপে ১০১ বৎসর অধিবাস করিয়াছিলেন (ছান্দোগ্য ৫-৩)। আরুণি সমিৎপাণি হইয়া চিত্র গার্গ্যায়ণির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন (কৌশিতকী .-১)। প্রশ্নোপনিষৎ হইতে জানা যায়, ভরদ্বাজপুত্র সুকেশ, শিবিপুত্র সত্যকাম, সৌর্য্যপুত্র গার্গ্য, অশ্বলপুত্র কৌশল্য, ভৃগুপুত্র বৈদর্ভি, কত্যপুত্র কবন্ধী— ইঁহারা ব্রহ্মান্বেষী হইয়া সমিধহস্তে ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। (প্রশ্ন .।১)

ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য ব্রহ্মচারীকে তাহার সমগ্র জীবন নিয়োজিত করিতে হইত। ব্রহ্মান্বেষণ কেবল ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইহা সকল আশ্রমের সাধনার ভিতর দিয়াই ওতপ্রোত ও মুখ্যভাবে জড়িত ছিল। শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ গুরুকুলে বাস করিয়া নানা বিদ্যায় অধীয়ান হইয়া যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন তখন পিতার সহিত কথোপকথনে বুঝিতে পারিলেন, তিনি পরাবিদ্যালাভ করিতে পারেন নাই (ছান্দোগ্য ৬-১)। উপকোশল কামলায়ন কঠোর তপস্যা পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াও আচার্য্য কর্ত্তৃক ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযুক্ত বিবেচিত হন নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে শম দম প্রভৃতি যে সকল গুণ-সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মবিদ্যালাভের উপযুক্ত হওয়া যায়, জীবন সংগ্রামে অনভিজ্ঞ অপরিণত-বয়স্ক বিদ্যার্থীর মধ্যে ঐ সমস্ত গুণের সম্পূর্ণ বিকাশ সচরাচর সম্ভবে না। জীবন পথে চলিতে চলিতে নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন ও প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় শক্তিমান্ পুরুষদের ভিতরেই পরিণত বয়সে ঐ সব সদ্গুণের যথাযথ বিকাশ সম্ভবপর হইয়া থাকে।

উপনিষদের কতকগুলি উক্তি হইতেও এ কথা প্রমাণিত হয় যে ব্রহ্মচর্য্য পাঠ্য জীবনের কয়েক বৎসরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে ব্যাপকভাবে সমগ্র জীবনের মধ্যেই ওতপ্রোতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাচীনরা নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 'ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে বেদাধ্যয়নের দ্বারা, যজ্ঞের দ্বারা, দানের দ্বারা, তপস্যার দ্বারা এবং উপবাসের অনুষ্ঠান দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে যিনি জানেন তিনি মুনি হন। সেই ব্রহ্মলোককে প্রাপ্ত হইবার জন্য পরিব্রাজকেরা গৃহত্যাগ করেন। ইহা জানিয়া প্রাচীনেরা সন্তান-সন্ততি চাহিতেন না এবং পুত্র, বিত্ত ও লোকের 'এষণা' হইতে মুক্ত হইয়া পরিব্রাজকরূপে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন।' (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২২)। ছান্দোগ্যে জানা যায়, 'কর্ত্তব্যের তিনটি শাখা ; যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান—এইটি প্রথম (গৃহস্থ আশ্রম) ; তপস্যা দ্বিতীয় (বানপ্রস্থ) এবং সর্ব্বদা শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করত ব্রহ্মচারীরূপে আচার্য্যকুলে বাস—ইহাই তৃতীয়। (এখানে 'ব্রহ্মচারী' অর্থে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বুঝিতে হইবে)। ইহারা সকলেই পুণ্যলোকে গমন করিয়া থাকেন কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মসংস্থই অমৃতত্ব লাভ করিয়া থাকেন। এখানে সন্ন্যাস বা চতুর্থ আশ্রমের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। (ছান্দোগ্য ২।২৩।১)। ছান্দোগ্যের অন্যত্র আরও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, "ব্রহ্মান্বেষণপরায়ণ ব্যক্তি যথাবিধি গুরু শুশ্রূষাদি কর্ম্ম করিয়া অবশিষ্ট সময়ে বেদ ও বেদার্থ পরিজ্ঞাত হইয়া আচার্য্যকুল হইতে সমাবর্ত্তন করিবেন। তৎপর গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পবিত্র বেদাধ্যয়ন করত অপরাপরকে ধার্ম্মিক করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে আপনাতে প্রত্যাহৃত করিবেন এবং তীর্থাতিরিক্ত স্থানে হিংসা কার্য্য হইতে বিরত হইবেন। "অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ")। সেই লোক এইরূপে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন না।" (ছান্দোগ্য ৮-১৫)। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, যজ্ঞানুষ্ঠান, মৌনব্রত, উপবাস এবং আরণ্যক জীবন যাপন প্রভৃতি শেষোক্ত তিন আশ্রমের কর্ত্তব্যও পরিণামে ব্রহ্মচর্য্যের নামান্তর মাত্র। (ছান্দোগ্য ৮-৫)।

কেনোপনিষদে তপস্যা, আত্মসংযম ও কর্ম্মকে ব্রাহ্মী উপনিষদের প্রতিষ্ঠা বলা হইয়াছে। (কেন ৪।৮)। কঠোপনিষদের মতে সকল প্রকার বেদাধ্যয়ন, যাবতীয় তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা

একমাত্র তাঁহাকেই জানিতে হইবে। (কঠ ১।২।১৫)। প্রশ্নোপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়, যখন সুকেশা, সত্যকাম প্রভৃতি ছয়টি ঋষিকুমার ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইয়া ভগবান্ পিপ্পলাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ" পুনরায় তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া সংবৎসর যাপন কর।' (প্রশ্ন ১।২)। ইহা দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের যোগ্যতা অর্জ্জিত হইবে।

উপরি উক্ত প্রমাণ পরম্পরা হইতে প্রতীত হইতেছে, উপনিষৎ প্রতিপাদিত এই ব্রহ্মবিদ্যা সকল আশ্রমের ভিতর দিয়া সমগ্র জীবনের গভীর প্রচেষ্টার দ্বারাই লভ্য। এই যে চতুরাশ্রম—ইহার প্রত্যেকটিই ছিল একটি সুনিয়ন্ত্রিত তপস্যার অনুষ্ঠানক্ষেত্র। তপস্যাই ছিল জীবনের মূল সূত্র। উপনিষদে ভূয়োভূয়ঃ এই তপস্যার শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাই (২-৪), যাজ্ঞবল্ক্য তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত নির্জ্জন অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন এবং কঠোর তপস্যার দ্বারা সংসার বন্ধন নিঃশেষে ছিন্ন করিয়াছেন। ছান্দোগ্যে দেখিতে পাওয়া যায় (৪-১০), ব্রহ্মচারী উপকোশল কৃচ্ছ্র তপস্যা করিতে করিতে এতটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পরিশেষে আহার করিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। বরুণ পুনঃ পুনঃ তাঁহার পুত্র ভৃগুকে বলিতেছেন, "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব।" (তৈত্তিরীয় ৩।৪) তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টা কর।"তপো ব্রহ্মেতি" তপস্যাই ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন।

ছান্দোগ্য উপনিষদ মানুষের জীবনকে একটি দীর্ঘস্থায়ী যজ্ঞরূপে কল্পনা করিয়া বলিতেছেন, 'মানুষ তাহার সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপিয়া যেন একটা যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করিতেছে। শৈশব হইতে যৌবনমধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত চব্বিশ বৎসর ধরিয়া যেন এই জীবন যজ্ঞের প্রভাতী অনুষ্ঠানগুলি (প্রাতঃসবন') সম্পন্ন হইতেছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অভিলষিত বস্তুর অপ্রাপ্তি হেতু যে দুঃখ ও অসন্তোষভোগ—ইহাই এই জীবন যজ্ঞের 'দীক্ষা'। এই যে আহার, পান, সুখভোগ—ইহাই হইল 'উপসদ'। মানুষ যে হাসে, ভোজন করে, মৈথুন ক্রিয়া করে—সেগুলি যেন এই যজ্ঞের স্তোত্র পাঠ। তপস্যা, দান সরলতা, অহিংসা, সত্যকথন—এগুলি যেন দক্ষিণা। আর দীর্ঘ জীবনের অবসানে যে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়া—তাহাই হইল যজ্ঞসমাপ্তিসূচক 'অবভৃথ স্নান।' (পুরুষো বাব যজ্ঞস্তস্য যানি চতুর্ব্বিংশতি বর্ষাণি তৎ প্রাতঃসবনম্। স যদ্ অশিশিষতি যৎ পিপাসতি যন্ন রমতে তা অস্য দীক্ষাঃ। অথ যদ্ অশ্নাতি যৎ পিবতি যদ্ রমতে তদ্ উপসদৈ রেতি। অথ যদ্ধসতি যজ্জক্ষতি যন্মৈথুনং চরতি স্তুতশস্ত্রৈব তদেতি। অথ যত্তপো দানম্ আর্জ্জবম্ অহিংসা সত্যবচনম্ ইতি তা অস্য দক্ষিণাঃ। মরণম্ এবাস্যাবভৃথঃ।" (ছান্দোগ্য ৩।১৬ ১৭)

কাগজ প্রস্তুত প্রণালী

শ্রীমনীশচন্দ্র ভদ্র

বাংলাদেশে যে কয়েকটি গৃহশিল্প বর্ত্তমান আছে তন্মধ্যে কাগজ-শিল্প অন্যতম। এই কাগজ শিল্প বাংলাদেশের বহু পুরাতন হস্তশিল্প হইলেও এতদিনে ইহার বিশেষ উন্নতি হয় নাই—প্রধান কারণ অন্যান্য দেশে গভর্ণমেণ্টের "শিল্পে সরকারী সাহায্য দান" বলিয়া একটি বিভাগ আছে—আমাদের দেশে এরূপ কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য বর্ত্তমানে দেশে শিল্প উন্নতির জাগরণে প্রত্যেক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট কিছু কিছু করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু উহা এখনও বিশেষ ভাবে ব্যাপক হয় নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রণালীতে গঠিত বলিয়া বাংলাদেশের নিরক্ষর শিল্পিগণ ইহা ধরিতে পারিতেছে না।

ঢাকা জেলায় অন্তর্গত আইরল বা আরিয়ল একটি ছোট গ্রাম হইলেও কাগজ-শিল্পে গ্রামখানিকে বর্ত্তমান শিল্পজাগরণের দিনে এমনই প্রসিদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে যে ইহার আদর কোন বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ গ্রাম হইতে কম নহে। ঐ গ্রামে বহু লোক এই কাগজ তৈয়ার করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে। যদিও কাগজগুলি অতিশয় প্রাচীন প্রথায় তৈয়ার হইতেছে, তবুও ইহা ব্যবহার উপযোগী—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

আজ বাংলাদেশে নানা গ্রামে কাজের অভাব এবং কাজ পাইলেও পয়সা সেরূপ পাওয়া যায় না বলিয়া অনেক শিক্ষিত যুবক কাজ অভাবে বেকার অবস্থায় ঘুরিতেছে। ঐ সকল বেকার যুবক যদি কাগজ প্রস্তুত করে তবে তাহারা অনায়াসেই জীবিকা উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিতে পারে। ইহাতে মূলধন খুব সামান্য হইলেই চলে—এমন কি ১০৲।১৫৲ টাকা হইলেই চলে।

অন্যান্য জিনিষ তৈয়ারীর পক্ষে অর্থনীতির হিসাবে চাহিদা ও সরবরাহের সমস্যা আসিতে পারে এবং অর্থনীতির দিক দিয়া লোকসান হইতেও পারে—কারণ সরবরাহ বেশী হইলে চাহিদা না থাকিলে মূল্য পাওয়া যাইবে না ; কিন্তু এই কাগজের বেলায় সেরূপ কোন সমস্যা আসে না—কারণ কাগজ নিত্য প্রয়োজনীয় এবং বাংলাদেশে ২১টি কল ব্যতীত কাগজের বিশেষ কোন কারখানা নাই যাহাতে কলে প্রস্তুত মালের সঙ্গে ইহা পারিবে না। বিদেশ হইতে যত কাগজ আমদানী হয় সে তুলনায় বাংলার কাগজের কল বোধহয় দুই আনা কাগজ ও সরবরাহ করে না। ইহাতেই মনে হয় এই কাগজ-শিল্পের উন্নতি এবং এই শিল্পকে একটি কুটীর শিল্পরূপে গ্রহণ করার অনেক সুবিধা আছে। এই শিল্পকে নিজেদের জীবিকা অর্জ্জনের পথরূপে ধরিলে কয়েক শত যুবক যে বেকার অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। নিম্নে কাগজ প্রস্তুত প্রণালী সাধারণ ভাবে বুঝাইয়া দেওয়া হইল।

কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে নিম্নোক্ত আটটি প্রণালী পালন করিতে হইবে।

(ক) প্রথম অবস্থায় পাটকে (Jute) চুনের জলে ভিজাইয়া নরম করিতে হয় এবং পরে রৌদ্রে শুকাইতে দিতে হয়। এরূপ করিলে পাটের শক্তি কমিয়া নরম হয় এবং ইহা কাগজের একটি প্রধান উপাদানরূপে পরিণত হয়। পাটের দাম বর্ত্তমানে খুবই কম এবং ইহার বাজার পাওয়া যাইতেছে না ; যদি শিক্ষিত যুবক এই কাগজ প্রস্তুত প্রণালী তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের একটি ব্রতরূপে গ্রহণ করে, তবে এই পাটের একটি বিশেষ ব্যবহার হয় এবং অনেক যুবকের কষ্ট দূর হয়। এই কাগজ প্রস্তুত প্রণালী ব্যাপক ভাবে ছড়াইয়া পড়িলে বাংলাদেশের একটি পুরাতন শিল্পের উন্নতি হয় এবং ইহার চাহিদা ও বৃদ্ধি হয়। আইরলে ঐ কাগজ খুব সামান্যভাবে প্রস্তুত হয় বলিয়াই ইহার চাহিদা এত বেশী নয় এবং ঐ কাগজের উন্নতি বিশেষ হইতেছে না—কারণ ইহা সাধারণের হাতে রহিয়াছে। তাহারা ইহার উন্নতিকল্পে মোটেই চেষ্টা করে না। এই কাগজ প্রস্তুত নানা স্থানে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িলে পাটের দাম ও শেষে বৃদ্ধি পাইবার আশা করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে কত শিক্ষিত যুবকের অন্নকষ্টও দূর হইতে পারে। অন্যান্য যতপ্রকার শিল্প আছে ঐ গুলি আরম্ভ করিতেও বেশী টাকা পয়সার দরকার, পক্ষান্তরে বাজার ও এত বড় নহে। কাগজের বাজার এত বড় যে বিক্রয়ের জন্য বিশেষ কষ্ট করিতে হয় না। বাজারে সকল প্রকার কাগজের ব্যবহারই আছে ; কাগজ খারাপ প্রস্তুত হইলেও বাজার আছে।

(খ) ঐ প্রকার শুক্না পাটকে ঢেঁকির সাহায্যে থেঁৎলা করিতে হয় এবং জলে ভিজাইয়া থেঁৎলা করিয়া মাড়াইয়া ছোব্ড়া ছোব্ড়া করিতে হয়—পরে ইহা ছাঁকা ছাঁকা অবস্থায় থাকিবে। যে সকল পাট পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকে উহাও এই কাগজ প্রস্তুত কাজে আসে।

(গ) ঐ অবস্থায় পায়ে মাড়ান হইলে ঢেঁকির সাহায্যে থেঁৎলাইয়া পাটগুলির রং বিবর্ণ করিতে হয় ; তৎপর উহা পরিষ্কার করার জন্য Bleeching Powderএর সাহায্যে মাড়াইয়া পরে জলে ধৌত করিতে হয়। ধৌত করার সময় একটি ছাক্‌নির সাহায্যে ছাঁকিয়া উঠাইতে হয়।

(ঘ) Bleeching Powderএর সাহায্যে ধৌত করিয়া একটি বড় গামলায় রাখিতে হয়। বড় গামলায় ধৌত করিলে অনেক সময় বিশেষ পরিষ্কার হয় না বলিয়া নদী বা পুকুরে বিস্তৃতভাবে ধৌত করা আবশ্যক।

(ঙ) ঐ প্রকার পরিষ্কৃত ছোব্ড়াগুলিকে রঞ্জন, ফিটকারী ও China Clay মিশ্রিত করিয়া কিছু সময় রাখিয়া দিতে হয় ইহাতে সকল জিনিষ খুব সমভাবে মিশিয়া এক হইয়া যায়।

(চ) তৎপর একটি বড় গামলায় ঐগুলিকে রাখিয়া আরও কিছুক্ষণ মিশাইয়া খুব চিকন জালের মত বাঁশের ছাক্‌নির সাহায্যে ঐ মসৃণ পদার্থকে ঐ জালের উপর পাতলা sheetএর মত একটা layer পড়ার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। দুই এক সেকেণ্ডের মধ্যে layer পড়িলে উহা উঠাইয়া পরিষ্কৃত স্থানে একটির উপর আরও একটি রাখিতে হয়—একটির উপর আরও একটি রাখাতেও উহা গায়ে লাগে না।

(ছ) ঐগুলি কিছুক্ষণ পর জল নিষ্কাষণ হইলে দুইদিকে খুব পাতলা ময়দার মণ্ড বা চাউলের মণ্ড মাখাইয়া টিনের উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শুকাইতে দিতে হয়। ময়দা ব্যবহার করিলেই glazed কাগজ হয় ও দেখিতে ভাল হয়।

(জ) কাগজগুলি শুকাইয়া গেলে খুব মসৃণ হইবে না। মসৃণ করিবার জন্য খুব পরিষ্কৃত ও মসৃণ শ্বেত পাথরের সাহায্যে পালিশ করিতে হয়। পালিশ করিয়া শুকান হইয়া গেলেই ব্যবহার উপযোগী হয়।

নিম্নে কাগজের উপাদান ও খরচের বিবরণ দেওয়া হইল।

একরিমে নিম্নোক্ত জিনিষ ও খরচ লাগে !—

৷১ এগার সের পাট	৸/০
/৵০ পোয়া রজন	৲১৫
ফটকিরি	৲১০
ব্লিচিং পাউডার /৷০	/০
ময়দা—/১	/১৫
China Clay /৷০	৵০
	——
	১৶০

যেহেতু China Clay ব্যবহার হয় খুব ভাল এবং glazed paperএ সেই হেতু সাধারণ কাগজে উহা ব্যবহার না করিলে আরও কম খরচ লাগে। যদি কোন লোক নিজে খাটিয়া সাধারণ একটি মজুরের সাহায্যে কাগজ তৈয়ারী আরম্ভ করে তবে সে অনায়াসে দৈনিক একরিম কাগজ তৈয়ার করিয়া ১৲ টাকা হইতে ১৷০ টাকা উপায় করিতে পারে। শিক্ষিত যুবক আরও improved method apply করিয়া ঐ প্রকার কাগজের আরও উন্নতি করাইতে পারে।

এই প্রকার স্বাধীন ব্যবসায়ে বিশেষ Capital আবশ্যক না হওয়ায় সাধারণ বেকার যুবকের পক্ষেও ইহা কঠিন নহে। এই শিল্প যদি হাতে না করিলে কঠিন বলিয়া মনে হয় তবুও উপরোক্ত নিয়মে চেষ্টা করিলে অল্পদিনেই শিক্ষা করা যায়। ইহার প্রত্যেকটি জিনিষই সহরে, বন্দরে পাইবার সুবিধা থাকা দরুণ সকলেরই সুবিধা। এখন উৎসাহী ও চেষ্টাশীল যুবক যদি এই শিল্পকে তাহাদের একটি উপায়ের পথ বলিয়া ধরে তবেই আমার এ পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

সোনার তরী

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

এমন রাত্রি হেরি নাই কভু,—এল জ্যোৎস্নার বান
নিখিল ভুবনে এমন রাত্রি, ইহজীবনের আগে
এমন মধুর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করিয়া প্রাণ
কে জানে কখনও এসেছিল কিনা,—বড় বিস্ময় লাগে!

বিস্ময় লাগে নেহারি তোমায়, নয়ন লোভন রূপে,
জ্যোৎস্না সায়রে সাঁতারিয়া এলে পূর্ণচাঁদের সাথী,
না জানি কখন সোনার স্বপন রচিয়াছ চুপে চুপে
দেহ-যমুনায় জাগিল জোয়ার,—আজিকে শুক্লারাতি!

সুন্দর তুমি, সুন্দর তব সোহাগে বদ্ধ আঁখি
আরো সুন্দর মিলিত অধর মম চুম্বন তলে,
হৃদি-পিঞ্জরে হ'ল কি বন্ধ নীল আকাশের পাখী
বাহুবন্ধন সুন্দর হ'ল সুন্দর তব গলে।

হেনার গন্ধ ভাসিয়া আসিছে, ফুটেছে পারুল জুঁই,
দখিনা হাওয়ায় আনমনা যদি বসন অসম্বৃত
ওগো সুন্দরী বুকের আড়ালে তোমারে লুকায়ে থুই,
ক্ষমা করো মোরে বিশ্বভুবন যদি হই বিস্মৃত।

এমন রাত্রি তুমি কাছে আছ ছায়াবীথি নির্জ্জন
হাতে হাত রাখ, নয়নে নয়ন, মাথা রাখ এই বুকে,
প্রদীপ-শিখায় বুঝি পতঙ্গ করিবে বিসর্জ্জন
শত জনমের কামনার দেহ উন্মাদ কৌতুকে।

এমন রাত্রি করো না বিফল, কথা কও সুন্দরী,
দু'জনে মিলিয়া জ্যোৎস্না সায়রে ভাসাই সোনার তরী।

সেদিন রাতে

অলোক রায়

ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্···মেয়েদের বোর্ডিংয়ে রাত্রির খাইবার ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে। দ্বিতলের সিঁড়ি বাহিয়া রং বেরংএর শাড়ীর অঞ্চল উড়াইয়া, বিনুনী দোলাইয়া, খোঁপা নাচাইয়া—বব্ করা চুল ঈষৎ হিল্লোলিত করিয়া—পর্ব্বতের গাত্রে প্রবাহিত নির্ঝরের ন্যায় সাবলীলগতিতে একদল মেয়ে খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্—তখনো ঝিয়ের হাতে ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে।

খাইবার ঘর দুইটি। সারি সারি টেবিল পাতা। প্রথম ঘরটিতে প্রবেশ করিয়াই প্রথম যে টেবিলটি চোখে পড়ে—তাহাতে বেশ হল্লা চলিয়াছে। মায়ের স্বহস্তে নির্ম্মিত ঘি উপস্থিত সকলের পাত্রে পরিবেশন করিতে করিতে ললিতা কহিল—"জানিস, আজ ভারী মজা হয়েছে। Economics-এর প্রফেসরের পেছন পেছন ক্লাশে ঢুকেই দেখি, আমার জায়গায় বড় বড় করে লেখা রয়েছে—

ললিতা তোমার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ
আমার মন ভুলায় গো।
তোমার ঐ খাঁদা নাকের মাধুরী
আমার কাঁদন জাগায় গো॥"

বলিয়া সে একদফা খুব হাসিয়া লইল। এক কথায় যাহাকে বলে Optimist, ললিতা তাহাই। বিষাদের অন্ধকার হইতে আনন্দের আলোকই তাহার দৃষ্টিতে প্রবল পড়ে, কালবৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্যের মৃত্যুর নিদারুণ লীলার বিভীষিকা ডুবাইয়া তাহার চোখে পড়ে—জ্যোৎস্না-হসিত নীলাকাশের প্রসন্ন ঔজ্জ্বল্য। জীবন তাহার চলিয়াছে শান্ত নদীতে পালতোলা নৌকার ন্যায় হাল্কা সুরে, কোন ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া তাহার সে সুর নষ্ট হয় নাই। তাই কোন কিছুরই গুরুত্ব খুঁজিয়া বাহির করিবার স্বভাব তাহার নয়—সরস হাসির দিকটা দেখিয়াই সে খুসী হইয়া উঠে।

হাসি থামিলে সে কহিল,—"সত্যি ভাই, ইকনমিক্সের লেক্‌চারের একটা অক্ষরও যদি আমার কাণে আসে—সারাটা ক্লাশ আমি শুধু হেসেছি।"

অদূরে বসিয়াছিল বাসন্তী। রূপসী বলিয়া তাহার নাম আছে এবং শত্রুপক্ষের মতামতে কর্ণপাত করিলে শুনা যায়, তাহার সৌন্দর্য্য বিষয়ে সে বেশ conscious।

গম্ভীর মুখে সে কহিল—"আমি হ'লে কিন্তু ঠিক উল্টোটা করতাম। ছেলেদের এ নির্লজ্জ পরিহাসে আমাদের সম্ভ্রমহানি হয় বলেই আমার বিশ্বাস, এসব ছেলের কবিত্ব-রসের জন্য চাব্‌কে দেওয়াই উচিত।" বলিয়া সে সগর্ব্বে সকলের পানে চাহিল।

কোন দিক হইতে কোন উত্তর আসিল না। ললিতার পরিহাস যে প্রসন্ন আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল, বাসন্তীর কথার গাম্ভীর্য্যে তাহা এক নিমেষে অন্তর্হিত হইল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া সেই আবার কথা কহিল—"সেদিন কি হয়েছিল জানিস্ অতসী! সেই যে চশমা-পরা রোগা ছেলেটা—সেকেণ্ড বেঞ্চের একেবারে শেষ দিকে যে বসে—ওই যে তোমরা যাকে বলো 'সবুজ কবি'—কদিন ধরে ও আমার দিকে এমনভাবে চাইতো—যে ইচ্ছে করতো চোখ দুটো গেলে দি। বোধ হয় ১০।১২ দিন সমানে হাঁ করে আমায় দেখতো—প্রতিদিন, একদিনও বাদ যায় নি।"

ললিতা খোঁচা খাইয়া অপ্রসন্ন হইলেও বৃথা তর্ক করিতে রাজী ছিল না, কিন্তু এখন সহসা ফস্ করিয়া বলিয়া বসিল—"অর্থাৎ ১০।১২ দিন ধরে তুই সব সময় হাঁ না করলেও ওর দিকে চেয়ে থাকতিস্?"

বাসন্তী দমিবার পাত্রী নহে। কহিল—"দেখেছি তো! আর দেখে ভেবেছি—কি করলে ওকে ঠিক শাস্তি দেওয়া হয়।" তারপর একটু হাসিয়া কহিল—"শাস্তিও হয়েছে বাবা! এর পর লেকে প্রায়ই দেখতুম, এত ট্রাম থাকতে ও ঠিক আমি যে ট্রামে যাবো সেই ট্রামে উঠে বস্‌বে।"

অতসী কহিল—"কিন্তু এটা তো accidentalও হতে পারে?"

বিজয়িনীর ভঙ্গীতে মাথা দুলাইয়া বাসন্তী কহিল—"accidental নয়—তা আমি ওর ভাব দেখেই বুঝতুম।"

টেবিলের অপর প্রান্ত হইতে বাসন্তীর অনুরাগিনী লীলা প্রশ্ন করিল,—"তার পর ?"

"তারপর! সেদিন দাদাকে সব খুলে বল্লুম—দাদা আমার তাকে এমনই শাস্তি দিলো—যে ভাঙা নাক নিয়ে ও কেঁদে বল্‌লো—আমি আর কখনো তাঁর দিকে চাইবো না, তিনি দেবী, আমাদের সাধ্য কি যে তাঁকে অপমান করি।"

টেবিলের ঠিক মাঝখানে বসিয়াছিল সুব্রতা। একটা কথাও সে কহে নাই এতক্ষণ—এইবার বেশ দৃঢ়স্বরেই কহিল—"কিন্তু ওরকম মার খেয়ে দেবীত্বের পদলাভে আমার এক ফোঁটাও লোভ নেই। I pity the poor boy."

বাসন্তীর অপূর্ব্ব সুন্দর চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল, সুব্রতার পানে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানিয়া সে কহিল—"ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশার পক্ষপাতী আমি নই। ওরা আমার দু-চকের বিষ, ওদের আমি ঘৃণা—হ্যাঁ ঘৃণা করি।"

শেষের কথা কয়টা সে বেশ জোর দিয়া উচ্চারণ করিল। বাসন্তীর এ কথায় একজনের প্রতি একটা বিশেষ ইঙ্গিত ছিল এবং স্পষ্টভাবে বলিয়া না দিলেও সকলেই প্রায় সে কথা বুঝিল।

সুব্রতা রাগ করিল না, কিন্তু মুখের ভাবে বুঝা গেল দুঃখিতা হইয়াছে। সে কহিল—"বাসন্তী রাগ করিসনে ভাই! মানুষকে ঘৃণা করা কি এতই সোজা? আমার ঠাকুরদা বল্‌তেন—আর যাই করিস্, কাউকে ক্ষমা করতে যেন ভুলিস্‌নে দিদি। এতে যদি ঠকতে হয় তবে সেও ভাল; যাকে তুই ক্ষতি বলে ভয় করলি, অন্তরের লাভের খাতায় সে অনেক বড় হয়েই জমা হয়ে রইলো।"

বাসন্তী কহিল—"কি জানি ভাই, ওসব বড় বড় কথা হয়তো আমার মত সামান্য মেয়ের বোঝা সহজ নয়। ওরা আমাদের অপমান করবে—আর আমরা ক্ষমার পর ক্ষমা করে যাবো, অত খানি মহানুভবতা হয়তো আমার নেই?"

"অপমান?" এইবার সুব্রতা সত্যই হাসিল—"অপমান তুই কোথায় দেখলি রে? অনেক ছেলের সঙ্গে অবাধে অনেকদিন আমি মিশেছি—কিন্তু কই? কেউ অপমান করেছে বলে তো মনে পড়ে না।" তাহার পর একটু থামিয়া গম্ভীরস্বরে সে কহিল—"অথচ দেবী আমি নই, সামান্য স্নেহ ভালবাসা-ভরা নারী। শিশুর সরলতায় তো দোষ নেই ভাই—ওদের অপরাধেও তাই অপমান হয় না। বয়সে হয়তো ওরা আমাদের সমান—কেউ কেউ বা বড়ও হতে পারে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতায় ওরা আমাদের চাইতে অনেক ছেলেমানুষ। বাঙ্গালীর মেয়ে, ঘরের ভেতরেই আমরা মানুষ, তাই সংসারের অভাবঅভিযোগ, ভালমন্দ দোষ ত্রুটী অতি অল্পবয়সেই আমাদের মনে গভীর দাগ কেটে রাখে, কিন্তু লেখাপড়া আর বাইরের খেলাধূলার ভেতরে মানুষ ওরা—জগতের খারাপ দিকটার অভিজ্ঞতা তাই ওদের এত কম। তাই এত অল্পতেই ওদের এত উচ্ছ্বাস—কিন্তু অপমান মনে না করে তা' শুধরে দেওয়াই কি ভাল নয়? নইলে আমাদের অভিজ্ঞতারই বা মূল্য রইলো কি?"

সকলে খাওয়া ভুলিয়া তাহারই মুখপানে চাহিয়াছিল; সেদিকে দৃষ্টি পড়ায় সুব্রতা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। কি তুচ্ছ কথা হইতে কত অবান্তর কথাই হয়তো কহিয়া ফেলিয়াছে সে, কিন্তু অন্তরের গভীরতম স্থানেই আঘাত করিয়াছিল বাসন্তী—তাই এত কথা বলা।

*   *   *   *

একটি মেয়ে আসিয়া চিঠি বিলি করিয়া গেল। সুব্রতার নামে দুখানি আছে। প্রথমটির প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই কোথা হইতে যেন এক ঝলক আলো আসিয়া পড়িল তাহার চোখের তারকায়—কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্য। তৎক্ষণাৎ আত্মসংবরণ করিয়া সে দ্বিতীয় চিঠিটা খুলিয়া ফেলিল। চিঠিতে লেখা ছিল;—

ভাই আমার আকাশের তারা,

কত দিন তোমার দেখা পাই না, নিজে লিখিতে জানি না বলিয়া লিখিতেও পারি না। কিন্তু তুমি তা জানো, তোমার সাথে ভাব করিয়া আমি ভুলিয়াছি, ভুলিয়া কাঁদিয়াছি, কাঁদিয়া মরিয়াছি। স্বপনে তোমায় দেখি, দেখিয়া আরও দেখিতে ইচ্ছা করে ইত্যাদি ইত্যাদি—

চিঠির শেষ ভাগে লেখা রহিয়াছে আকাশের তারা যেন পত্রপাঠ মাত্র অবশ্য অবশ্য উত্তর দেয়—চিঠি না পাইয়া সে অস্থির হইয়া পড়িয়াছে⋯ইতি

'আকাশের তারা'

সুব্রতা বুঝিল লেখক হইতেছেন—স্বয়ং 'আকাশের তারার' বুড়া স্বামীটি। বৃদ্ধের এই তৃতীয় পক্ষ, প্রায়

নাত্‌নীর সমান। কিন্তু বৃদ্ধের প্রেমোচ্ছ্বাসে এখনও ভাঁটা পড়ে নাই। এই অশিক্ষিতা সরলপ্রাণ মেয়েটির জন্য তাহার অন্তরে ভারি দুর্ব্বলতা ছিল, তাই অবস্থার আকাশ-জোড়া প্রতিবন্ধক থাকিতেও দুজনের সখিত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

দ্বিতীয় টেবিলে চিঠি পড়িয়া একটি মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিতেছে এবং চারিপার্শ্বের মেয়েরা মধুলোভী মক্ষিকার ন্যায় সতৃষ্ণনয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

হাসিতে হাসিতেই মেয়েটি কহিল—"মাগো! এমন হাসির কাণ্ড—হিঃ হিঃ—আমার জীবনে কখনো ঘটে নি—পড়ে দ্যাখ—হিঃ হিঃ।" মেয়েরা আগ্রহের সহিত পড়িল, কিন্তু হাসিল না কেহই। এই রকম একটা কিছুরই আশঙ্কা করিতেছিল তাহারা, কিন্তু যখন সত্যই আশঙ্কার বিষয়টি এমন সুনিশ্চিতভাবে ঘটিয়া গেল তখন একজন দুর্ভাগার অজ্ঞানমূঢ়তায় তাহাদের নারী-হৃদয় সজল হইয়া উঠিল। মলিনমুখে পত্র ফিরাইয়া দিয়া পুনঃ পুনঃ তাহারা কহিতে লাগিল—"কিন্তু সব দোষ তোর নীলিমা। তখনই বলেছিলুম এর ফল ভাল হবে না, ও বেচারা অতিরিক্ত ভালমানুষ ভাই, মোটেই ভাল করিস নি।"

নীলিমা রাগিয়া উত্তর করিল—"আমি কি জানতুম নাকি—যে ও এত বোকা? ছিঃ ছিঃ, কি কথার ছিরি! তোমাকে না পেলে জীবন আমার ব্যর্থ হবে—ল্যাবরেটারী থেকে নাইট্রিক আ্যসিড্ এনে রেখেছি—মৃত্যুই এ ভাগ্যবানের একমাত্র সাথী—হিঃ হিঃ।"

এ মেয়েটির উচ্ছৃঙ্খল জীবনে সংযমের লেশমাত্র ছিল না। অনেকের জীবনের উপর দিয়া নিষ্ঠুর গতিতে সে চলিয়াছে—কোথাও কেহ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। অতি বড় নির্ম্মমতায়ও তাহার চোখে কেহ জল দেখে নাই—বোধ হয় কাঁদিতে পারিলেই ও বাঁচিয়া যাইত, কিন্তু আজ জয়ের উল্লাসে অন্ধ হইয়া সুনিশ্চিত মৃত্যুর পানেও ছুটিয়া চলিয়াছে।

দুইটি মেয়ে চোরের মতো পা টিপিয়া টিপিয়া দরজার নিকট দাঁড়াইয়া একটা নীরব ইঙ্গিত করিল। তাহাদের সংযত পরিচ্ছন্ন বেশ দেখিয়া মনে হয়, তাহারা এইমাত্র বেড়াইয়া ফিরিয়াছে। Superintendentএর আদেশ অনুসারে ৭টায় না ফিরিয়া, আধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া ফেলিয়াছে—তাই এ সতর্কতা।

Matron তখন অপর কক্ষের খাওয়া পরিদর্শন কার্য্যে ব্যস্ত, অতএব মেয়ে দুইটি সেইদিকের দরজাটা একটু ভেজাইয়া হেঁট হইয়া তাহাদের স্ব স্ব স্থানে আসিয়া বসিল এবং সযত্নে লুক্কায়িত এমন কতকগুলি জিনিষ বাহির করিল—যাহাতে অপর মেয়েদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। কিছু কাঁচা কুল, কিছু নূতন পাকা তেঁতুল, কিছু ডালমুট। একটা কাগজের মোড়ক খুলিয়া বাহির হইল—কয়েকটা মোমবাতী। তাহাদের মধ্যে একজন কহিল—"দেখলি তো কি মজা হবে?"

মজাটা হইল এই যে—কাল ইহাদের লজিক পরীক্ষা। অতএব সারাটা দিবস গল্প করিয়া এবং চিনাবাদাম খাইয়া সহসা তাহারা আবিষ্কার করিয়া বসিল—দিনের পড়াটা কি আবার একটা পড়া? রাত্রে Superintendentকে ফাঁকি দিয়া মোমবাতীর আলোকে যে পড়া হইবে—তাহাই যথার্থ পড়া।

সকলেরই প্রায় খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল—একজন একজন করিয়া উপরে পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল, রহিল কেবল সুব্রতা। বারান্দা পার হইয়া সে চলিল রন্ধনগৃহের দিকে। রন্ধন কক্ষের দরজায় গিয়া সে হাঁকিল—"শৈলর মা"। শৈলর মা বাহির হইয়া আসিয়া একগাল হাসিয়া কহিল—"দিদিমণি যে গো!"

সুব্রতা কহিল,—"ওপরে লীলার জন্য শীগ্‌গির শীগ্‌গির একবাটি দুধ গরম করে দাও দেখি! দুপুরে বেচারী কিছু খেতে পারে নি, খুব শীগ্‌গির—বুঝলে?"

শৈলর মার বুঝিতে বিলম্ব হইল না। দুধের কড়াটা জ্বলন্ত উনানে চাপাইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—"হ্যাঁ দিদিমণি, সেই যে চিঠিটা লিখে দেবে বললে···তা এখন তোমার সময় হবে তো?"

একটা পিঁড়ি টানিয়া বসিয়া জামা হইতে কলমটা বাহির করিয়া সুব্রতা কহিল—"হ্যাঁ, কি লিখতে হবে বলো।"

শৈলর মা একখানা চিঠি লিখিবার কাগজ সংগ্রহ করিয়া আনিল এবং অনর্গল বকিয়া চলিল—

বাবা শৈল! তুমি বেশ ভাল করে নেকাপড়া করবে, নেকাপড়া করলে বড়লোক হবে। বেশী জলে জলে ঘুরো

না, বড়শী নিয়ে এখন আর ক'দিন ঘোষপাড়ার পুকুরে যেও না, নেলির মা টাকাটা দিয়াছে তো? হরিহরের পায়ের ঘা সারিয়াছে কি না, বিধানদের গাইটি কি বাছুর দিল……

সুব্রতা যথাসম্ভব লিখিয়া গেল।

ওদিকে কড়াইতে মাছ সাঁতলাইতে সাঁতলাইতে অসহ্য এতক্ষণ বক্রদৃষ্টিতে রাজুর পান ভাগ করা দেখিতেছিল। সমস্ত ছোট পানগুলা অসহ্যের ভাগে দিয়া বড়গুলা নিজের দিকে রাখিয়া যখন রাজু উভয়ের সমান প্রাপ্যের পরিচয় দিল, তখন অসহ্যের সহ্যের বাঁধ ভাঙিয়াছে। জ্বলন্ত কড়াটাকে দুইহাতে মাটিতে দুম্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া অসহ্য সিংহীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল—

"বলি ও আজু! আমার পানগুলোর কি ব্যামো হয়েছে নাকি? যে শুকিয়ে ছোট হয়ে গেল? বলি পয়সা কি আমি কম দি ছি নাকি? এ্যাঁ?"

শৈলর মা বলিয়া চলিয়াছে—দ্যাখো বাবা—বেণী কুল খেও না, এখন অসুখ বিসুখের সময়……

অসহ্যের শ্রবণেন্দ্রিয়ে সে কথা প্রবেশ করিল। সম্প্রতি কলহটাকে ধামা চাপা দিয়া সুব্রতার সুমুখে আসিয়া প্রসন্ন মুখে কহিল—"আমারও যে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে আমার ক্যাবলাকে।"

সুব্রতা মুখ তুলিয়া চাহিল—"কিন্তু রাজু, আজ তো আমার সময় নেই, কাল লিখে দেবো—কেমন?"

সুব্রতার মিষ্ট কথায় রাজু সন্তুষ্ট হইল—"তা আর বল্‌তে দিদিমণি! শুধু শুধু আমাদের দিকটা দেখলেই তো আর চলবে না, এই মোটা মোটা বই পড়া তো তোমার আছে, যেদিন তোমার সময় হবে লিখে দিয়ো…" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

দুধ গরম হইয়া গিয়াছিল, গরম দুধের বাটীটা নিজের অঞ্চল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া সে উপরে উঠিয়া আসিল। পড়ার ঘরে তখন একেবারে নীরব নিস্তব্ধতা, কারণ এখনই Superintendent আসিয়া দেখিয়া যাইবেন—কে কি করিতেছে। পরদাটা একটু ফাঁক করিয়া সুব্রতা গলাটাকে যথাসম্ভব খাটো করিয়া কহিল—'বুঝলি অতসী?' অতসীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না এবং ঈষৎ হাসিয়া মাথাটিকে একদিকে কাত করিয়া জানাইল যে সে বুঝিয়াছে।

নিশ্চিন্ত হইয়া সুব্রতা তখন sick-roomএ প্রবেশ করিল। রুগ্না লীলা তখন শয্যার উপর উপুড় হইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে। সুব্রতা তাহার মাথায় একটা হাত রাখিতেই সে চমকিয়া উঠিল এবং অসহ্য আবেগে কাঁদিয়া উঠিল। পরিহাসের সুরে সুব্রতা কহিল, "ওমা! কে বলবে—যে লীলা আমাদের কলেজে পড়ে, একেবারে কচি খুকী যে গো! মায়ের বুকের কাছে কেঁদে চলেছে—ওঁয়া ওঁয়া—হ্যাঁ?"

লজ্জিতা লীলার ক্রন্দন থামিল। কিন্তু দুধের বাটিটার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই সে জ্বলিয়া উঠিল—"ও ছাই ভস্ম আর আমি খাব না, কিছুতেই খাব না, মেরে ফেললেও খাবো না।

সুব্রতা তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"ছিঃ লীলা, লক্ষ্মী বোনটি আমার! আর ক'টা দিনই বা, তুমি যেদিন সেরে উঠবে, আমি নিজের হাতে তোমায় রেঁধে খাওয়াবো। এই দ্যাখো! তোমার জন্য আমি নিজে দোকান থেকে আঙুর কিনে এনেছি।"

এ জিনিষটা লীলার খুব প্রিয়, অতএব বাক্য ব্যয় না করিয়া এক হাতে নাক টিপিয়া অপর হাতে দুধের বাটিটা মুখের নিকটে ধরিল।

খাওয়া শেষ হইলে সে কহিল—"জানো সুব্রতাদি! কাল রাতে আমার একদম ঘুম হয় নি, সারাটা হষ্টেল একেবারে চুপ, আর ঘরের ভেতর উঃ কি ভীষণ অন্ধকার, মায়ের কথা ভেবে এমন কান্না পাচ্ছিল আমার"…বলিতে বলিতে আবার তাহার চোখ দুইটা সজল হইয়া উঠিল।

সুব্রতা সস্নেহে তাহার কেশগুচ্ছের ভিতর আঙুল চালাইতে চালাইতে কহিল—"তা পাঁচুর মাকে দিয়ে আমায় ডেকে পাঠালি নে কেন? কি করবো বল! Superintendentএর কড়া হুকুম, নইলে তো আমিই তোর কাছে শুতে পারতুম, আমায় জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকলে তো আর তোর ভয় করে না—না লীলা?"

লীলা কহিল—"হ্যাঁ, একটুও ভয় করে না। তাইতো তোমায় এত ভাল লাগে সুব্রতাদি! জানো—মায়ের কাছে আমি তোমার কত গল্প করি, মা তোমায় ভীষণ ভালবাসেন—দাদাও। দাদা তো প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন। সত্যি তুমি যদি আমার বৌদি হতে

ভাই, কি মজাই না হোত তাহলে, রোজ তোমার বুকের কাছে মাথা রেখে ঘুমোতুম, সত্যি হবে—এঁ্যা ?

সুব্রতা মৃদু হাসিল—"অন্ততঃ তোর দাদার লোভে না হোক, তোর লোভে তো বৌদি হতে ইচ্ছে করছে। সে নয় পরে ঠিক করা যাবে, এখন তুই লক্ষ্মী মেয়েটির মত ঘুমো তো লীলা।"

"কিন্তু তুমি বলো যে আমি না ঘুমোলে আমায় ছেড়ে পালাবে না—বলো ?"

"না পালাবো না।" বলিয়া সুব্রতা আবার তাহার চুলে হাত বুলাইতে লাগিল। চুলের ভিতর মৃদু আঙুল চালনায় তাহার নাম ছিল। রাত্রে কাহারো ঘুম না আসিলে—ডাক পড়িত সুব্রতার—শিয়রে বসিয়া তাহার সুন্দর আঙুলগুলি দিয়া সে এমন করিয়া চুল লইয়া নাড়াচাড়া করিত যে ঘুম পাড়ানী মাসিপিসির আগমনে কণামাত্র বিলম্ব হইত না।

মেয়েরা কহিত—"জানিস্ সু। তোর বর তোর কিছু চাইবে না—না তোর গান, না তোর বাজনা, না তোর বিদ্যে—একবার যদি এমনি কায়দা করে চুলে হাত ঢুকোস্ বাস্ তাহলেই একেবারে কুপোকাৎ।"

সুব্রতার কথায় সুস্থির হইয়া তাহারই একটা হাত নিজের হাত দিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলিয়া লীলা চোখ বুজিল।

খোলা জানালা দিয়া একঝলক চাঁদের আলো আসিয়া লীলার শ্রান্তমুখে এবং তাহার বিশ্রস্ত চুলের উপর পড়িয়াছিল। লীলার গভীরভাবে নিশ্বাস উত্থানপতনের শব্দে সুব্রতা বুঝিল যে সে ঘুমাইয়াছে। এমন সময় বিছানা হস্তে পাঁচুর-মা আসিয়া উপস্থিত হইল এবং গলাটাকে সপ্তমে চড়াইয়া মিশি দেওয়া কাল দন্তপাটী বিকশিত করিয়া কি একটা কথা বলার উপক্রম করিতেই—অধরে আঙুল চাপিয়া সুব্রতা তাহাকে চুপ করিতে আদেশ করিল। তাহার পর ধীরে ধীরে সরিয়া আসিয়া কহিল—"দ্যাখো পাঁচুর-মা! রাত্তিরে খুব সাবধান হয়ে ঘুমিয়ো—ও যদি ভয় পায় বা কেঁদে ওঠে, তেতালা থেকে আমায় ডেকে দিয়ো—কেমন!"

পাঁচুর-মা ফিসফাস করিয়া কহিল—"তা আর বলতে! আমার এ পোড়া চোখে কি আর ঘুম আছে দিদিমণি। সারারাত্তির কেবল এপাশ—আর ওপাশ।"

সুব্রতা লীলার শয্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল—না, সে মুখে কোন উদ্বেগের চিহ্ন নাই—দিব্য প্রশান্ত। চোখের কোণে তখনো একফোটা জল চাঁদের আলোয় চক্ চক্ করিতেছিল, গভীর স্নেহে নিজের অঞ্চল দিয়া অশ্রুবিন্দুটি মুছিয়া লইয়া গায়ের চাদর আর একবার টানিয়া দিয়া পাঁচুর মাকে আর একবার উপদেশ দিয়া সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

ওদিকে পড়ার ঘরে মহোল্লাসে পড়া চলিয়াছে। কিছু সময় যাইতেই American Superintendent প্রবেশ করিলেন—মাথার চুলে এবং কপালের কুঞ্চিত রেখায় বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পরিস্ফুট, কিন্তু সযত্নপ্রসাধনে তাহা চাপা দিবার প্রয়াসের অভাব হয় নাই।

ঘরের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি ঘুরাইয়া তিনি সুব্রতার শূন্য আসনের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাশের মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—"Where is Subrata ?"

অতসী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং গলাটাকে যথাসম্ভব মেমেদের ভঙ্গীতে মিহি করিয়া কহিল—Oh! she has got such a bad headache. She came to the study, but couldn't read a single word. If you would see her once."

বাধা দিয়া মোলায়েম হাসিয়া মেম কহিলেন—"Really I am very very sorry. Please tell her that I shall see her to-morrow. I have to go out just now." এবং পরে তর্জ্জনী হেলন করিয়া অতসীর পানে চাহিয়া কহিলেন—"But you must take care of her!"

ঔষধে যে ফল ফলিবে অতসী তাহা বিলক্ষণ জানিত—মেমের কথায় সে মাথা হেলাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিল। পাশের চেয়ারে উপবিষ্টা মেয়েটি মুখে আঁচল চাপিয়া বইয়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া অত্যন্ত মনোযোগের পরিচয় দিল।

বাহিরের সিঁড়িতে মেমের জুতার শব্দ ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল, মেয়েরা কাণ পাতিয়া সেই শব্দ শুনিতেছিল; এবার পরদাটা ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া অতসী কহিল, —"দেখলি মজাটা, বুড়ো হয়েছেন তবু চুলের বাহার—আর

lipstick ঘষা দেখো! আর গাউনেরই বা কি বাহার, অথচ পরি আমরা একদিন একটা নীলাম্বরী—অমনি এমন কটাক্ষপাত করবেন—যেন মহা অন্যায়ই করে ফেলেছি।"

অবাধ্য চুলগুলাকে হাতে জড়াইতে জড়াইতে নীলা কহিল—"সে তো তবু ভাল! সেদিন কি করেছেন জানিস্? সেই আমার মাসতুতো ভাই সুনীলদা! এতদিন পরে দেশে ফিরে—এসেছিল আমার সাথে দেখা করতে! আমার তো প্রাণটা আইঢাই করছিল—কখন একবার ছুটে ওর কাছে গিয়ে গল্প শুনবো, আর উনি আরম্ভ করলেন প্রশ্নের পর প্রশ্ন—"তোমার কি রকম ভাই? নাম কি! পিতার নাম কি, তস্য পিতার নাম কি—প্রথম কোথায় দেখা হইয়াছিল—ইত্যাদি ইত্যাদি···এমন রাগ হচ্ছিল বুড়ীর ওপর।"

পুষ্প কহিল—"বুড়ী আবার তুই কোথায় দেখলি রে নীলা? এখনো যে ওর"···বলিয়া সে সুর ধরিল,—

মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী—
সখী জাগো, সখী জাগো?

Logic বই হাতে পরীক্ষার্থী সাধনা উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেই সুর নকল করিয়া গাহিল,—

"মোরা যে Logic সাগরে হাবুডুবু
সখী থামো সখী থামো—"

মেয়েরা সবাই হাসিল—একেবারে পশ্চাতে দরজার নিকট একখানা অপাঠ্য পুস্তকে মনোনিবেশ করিয়াছিল কমলা—এবার পুস্তকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—

"শ্রীল শ্রীযুক্তা সমবেতা ভদ্রমহিলাগণ! আমি সম্প্রতি একটি অভিনয় করিতে পরম উৎসাহিতা।···কেবল আপনাদের অনুমতির প্রতীক্ষা··"

সকলে সমস্বরে কহিল—"নিশ্চই নিশ্চই"। কমলা সকলের সুমুখে অগ্রসর হইয়া আসিল এবং মীনাদির দিকে একবার চাহিয়া প্রস্তুত হইল।

মীনাদি M. A. ক্লাশের ছাত্রী। সম্মুখে তাহার M. A. পরীক্ষা—কিন্তু সে জন্য চিন্তা ভাবনার লেশমাত্র নাই। বেশের প্রতিও তাহার অপরিসীম ঔদাস্য। শাড়ীটা উল্টা পরিল কি সোজা পরিল, কোন পায়ের জুতা কোন পায়ে আশ্রয় নিল—সেদিকে দৃষ্টিপাত করিতে কেহ তাহাকে কখন দেখে নাই। একদিন কলেজে যাইবার সময় যে কাপড়টি পরিত, যেমন করিয়া চুল বাঁধিত, যে পিনটিতে কাপড় আটকাইত, তাহার পরদিন স্নানের পূর্ব্বে আর তাহার পরিবর্ত্তন হইত না। সারাদিনের কর্ম্মব্যস্ততায় এবং রাত্রির নিদ্রার সুস্থতায় তাহার সুমুখের কাপড়টি একেবারে 'রাইট্ এবাউট টার্ণ' করিয়া পিছনে গিয়া হাজির হইত। কিন্তু ঠিক সেইরূপ অবস্থার একটা ছেঁড়া নাগরায় পা ঢুকাইয়া একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করিয়া সে Reading Roomএ ঢুকিত এবং একটার পর একটা খবরের কাগজ শেষ করিয়া চলিত।

কমলা কাপড়টাকে উল্টাইয়া স্যাণ্ডেলে অর্দ্ধেক পা এবং মাটিতে অর্দ্ধেক পা দিয়া অনুরূপ ভঙ্গীতে আসিয়া ধপ করিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া একটা কাগজের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। এ সকল কর্ম্মে তাহার অক্লান্ত সহচরী নীলা তখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নীলা কহিল—"মীনাদি আমার সেই Logicএর প্রশ্নটা···"

হতাশ ভাবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কমলা কহিল—"আরে যাঃ!"

নীলা কহিল—"কি হোল মীনাদি, কারো খারাপ খবর···"

ঈষৎ মস্তক দোলাইয়া কমলা কহিল—"আগেই বলেছি আমি! আরে যুদ্ধ কি একটা মুখের কথা? ইটালী হুঙ্কার ছাড়লেন—অ্যাবিসিনিয়া অমনি সার্টের হাত গুটিয়ে Boxingএর Poseএ দাঁড়ালেন।"

নীলা কহিল—"কিন্তু মীনাদি তোমার কাপড়টা যে···"

কাগজের উপর হইতে মুখ না তুলিয়াই কমলা কহিল—"ঠিক কথা, কেন পুরুষের চাইতে ছোট কিসে আমরা? সুন্দর স্পিচ দিয়েছে অনিলা দেবী—নারীর স্বাধীনতা···"

নীলা কহিল—"কিন্তু আমার সেই English essayটা যদি একটু correct করে দাও মীনাদি···"

কমলা কহিল;—"এই রে সেরেছে! দামোদরের বাঁধ আবার ভাঙলো—নাঃ! এই দুরন্ত নদীগুলো নিয়ে হয়েছে মহা মুস্কিল।"

মেয়েরা উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। কেবল মীনাদি ছেলেমানুষের ন্যায় লজ্জায় মুখ নীচু করিলেন। এই আপন-

ভোলা মানুষটিকে সকলেই অতিরিক্ত ভালবাসিত, তাই স্নেহের উপদ্রব অত্যাচারেরও আর সীমা ছিল না।

এইবার নীলার পালা। কমলা কহিল—"হ্যাঁ ভাই নীলা, তোর নাকি বিয়ে?"

অত্যন্ত সলজ্জভাবে মাথা নীচু করিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া নীলা কহিল,—"বলিস নে ভাই, আমার বড্ডো লজ্জা করে!"

কমলা কহিল—"এতে আর লজ্জা কি, বলই না সত্যি কি না।"

"আচ্ছা তোর বরের নাম কি রে নীলা?"

নীলা লজ্জায় জড়োসড়ো হইয়া কহিল—"পরম পূজনীয় শ্রীল শ্রীযুক্ত পদপদকান্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীচরণ কমলেষু।"

মেয়েরা সজোরে টেবিলের উপর বই ছাড়িয়া হাসিয়া গড়াইল।

কমলার প্রশ্ন কিন্তু চলিয়াছে—"কি কাজ করেন রে?"

চোখ দুইটাকে যথাসম্ভব বড় করিয়া নীলা উত্তর দিল—"সে ভয়ানক বড় কাজ।"

কমলা প্রশ্ন করিল—"I. C. S.!"

"উহুঁ, হোল না।"

"তবে কি Deputy Magistrate?"

"উহুঁ।"

"পাটের দালাল?"

"তবে কি ছাই বলই না!"

নীলা সগর্ব্বে কহিল—"শূয়োরের ব্যবসা!"

মেয়েরা কথাটা খুব উপভোগ করিল, এমন সময় ভারী পরদাটা সরাইয়া সুব্রতা প্রবেশ করিল।

সকলে সমস্বরে কহিল—"তুই miss করলি সু!"

সুব্রতা হাসিয়া কহিল—"অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়, তা' থামলি কেন কমলা···চলুক না!"

কমলা দাঁড়াইয়া দুই বাহু যথাসম্ভব বিস্তৃত করিয়া কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গীতে কহিল,—

"সুব্রতা সুব্রতা!
তুমি কি বনের লতা
তুমি কি কচুর পাতা
না হয় গাছের পাকা আতা
সুব্রতা সুব্রতা।"

মেয়েরা কহিল—"বাঃ বেশ তো"। কমলার কবিতা তখনো শেষ হয় নাই···"সুব্রতা সুব্রতা

তুমি কি অঙ্কের খাতা?
তুমি যে সুখের আলো
তুমি যে দুখের কালো
নহ তুমি উর্ব্বশী
হে কমলার মানসী"

সুব্রতা কহিল—"ধন্যবাদ!"

মেয়েরা আজ অসম্ভব পড়া করিয়াছে, অধিক রাত্র জাগিয়া পড়িলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল, অতএব একজন একজন করিয়া এইবার বই খাতা বন্ধ করিয়া পাঠ্য অভিনয়ের যবনিকা টানিয়া দিয়া তাহারা শয্যার উদ্দেশে চলিল।

পড়ার ঘরে রহিল কেবল সুব্রতা এবং পুষ্প। নিদ্রালস চোখ দুইটাকে টানিয়া টানিয়া পুষ্প কহিল—"উঃ! কি বিচ্ছিরি কাজ ভাই monitress-এর; বসে থাকো হাঁ করে, যতক্ষণ না সময় হয়—এদিকে যে চোখের পাতা জড়িয়ে এল ঘুমে—তা তো আর কেউ শুনবে না···"

সুব্রতা হাসিল—"বুঝেছি, আর ভূমিকা না করে ঘণ্টাটা আমার হাতে দিয়ে যা! আমিই বাজিয়ে দেবো।"

দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া পুষ্প কহিল—"আঃ বাঁচালি ভাই! সত্যি তুই যদি না থাকতিস্ সু, এ হষ্টেল সাহারা মরুভূমিতে পরিণত হইত, গাছ নাই, পালা নাই, জল নাই, ফল নাই···"

সুব্রতা কহিল—"শুনে সুখী হলুম, সম্প্রতি কবিত্ব-রসটা একটু চাপা দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোগে যা।"

আরেকবার ধন্যবাদের পালা সাঙ্গ করিয়া পুষ্প চলিয়া গেল।

আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তাহারই স্নিগ্ধ আলোয় কলিকাতার সমস্ত কদর্য্যতা ডুবিয়া গিয়াছে। সুব্রতা পড়ার ঘরের সুমুখের ছোট বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল; সারি সারি টবে অজস্র ফুল ফুটিয়াছে, একটি রজনীগন্ধার গাছ দুইবাহু তুলিয়া কয়েকটি ফুল কাহার উদ্দেশে নিবেদন করিতেছে!

একটা চেয়ার বারান্দায় টানিয়া অর্দ্ধেক চাঁদের আলো এবং অর্দ্ধেক লাইটের আলোয় বসিয়া সুব্রতা কাপড়ের তলা

হইতে লুকানো চিঠিটা বাহির করিল। দীর্ঘ চিঠি—পড়িতে পড়িতে সুব্রতা তন্ময় হইয়া গেল।

চিঠিতে লেখা ছিল—"অনেক দিন পরে তোমায় লিখছি না? হ্যাঁ অনেক দিন। আমি এখন বল্টিক সাগরের ওপর দিয়ে চলেছি। রাত হয়েছে অনেক, কিন্তু চোখে আজ আমার ঘুম নেই। নানারকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা মাথায় এসে ভীড় জমিয়েছে—এত জমিয়েছে—এত শীতেও তাই মাথাটা যেন একেবারে গরম হয়ে উঠলো। ইচ্ছে করছে—বাইরে ডেকএর ওপর মুক্ত-বাতাসে গিয়ে দাঁড়াই, কিন্তু বাইরে এতো শীত যে ডেক্এ যাওয়া অসম্ভব। অতএব আমারই Cabinএর একটা জানালা খুলে দিয়েছি। যতদূর চোখ যায় তুষারের শুভ্রতা—সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। একটা জাহাজ বরফ ভেঙে রাস্তা করে দিয়েছে—তুষারের শুভ্রমায়াপুরীর ভেতর দিয়ে এক সঙ্কীর্ণপথ বেয়ে আমাদের যাত্রা সুরু হয়েছে।

অন্ধকার রাত নয় আজ, শুক্লপক্ষের পূর্ণিমার কাছাকাছি কোন একটা তিথি হবে। এই জ্যোৎস্নায় দিগন্তরাল-প্রসারিত শুভ্র তুষারের মৌনতা দেখে আমার মনে পড়ছে আমাদের দেশেরই একজন লেখক যে রাত্রির রূপ বর্ণনায় বলেছেন—আকাশ পাতাল জোড়া আসন করে নিমীলিত-নেত্রে যেন কোন যোগী মহাতপস্যায় বসেছেন···। ধ্যানেই বসেছেন, তাই কোথাও সাড়া নেই, বিন্দুমাত্র শব্দ নেই, আকাশের অগণিত তারা, ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের টুকরো আর সমস্ত পৃথিবী সেই যোগিনীর মুখের পানে চেয়ে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছে।

তুষারের রাজ্য থেকে যে বাতাসটা এসে আমার চুলগুলো নিয়ে খেলা করছে—তুহিন-শীতল ওর স্পর্শ। তবু ওকে ভাল লাগছে, রোগতপ্ত ললাটে এ যেন কার স্নেহস্পর্শ। এই মৌনতার গাম্ভীর্য্য দেখে আমার মনে পড়ছে আর একজনকে।

তোমার মনে পড়ে সুব্রতা, যেদিন আমি প্রথম দেশের মাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকেই এসেছিলেন, মা বাবা ভাই বোন বন্ধু বান্ধবী—আর এসেছিলে তুমি। আসন্ন বিদায় ব্যথায় কারো চোখই শুকনো ছিল না, কেবল তোমার চোখেই জল দেখি নাই। তোমার মুখের প্রতিটি রেখার, দুই চোখের অদ্ভুত উদাস দৃষ্টি দেখে আমার সেদিন মনে হয়েছিল—তুমিও যেন কোন তপস্যায় বসেছো—তোমার সেই মৌনতা ভাঙবার সাধ্য আমার নেই।

মনে পড়ে সেই ছোটবেলার কথা? সেই যেদিন তোমার আদরের মিনিবেড়ালের কবরের ওপর সন্ধ্যামালতীর মালা রেখে দুজনে গলা জড়িয়ে কেঁদে ভাসিয়েছিলুম, যেদিন বৈঁচিফলের লোভে সুবর্ণরেখার পার দিয়ে হাত ধরাধরি করে দুজনে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে ছুটেছিলুম? আজ আমার সব মনে পড়ছে। মনে পড়েছে এমনই এক জ্যোৎস্নারাতে তোমাদের ছাতে বসেছিলুম—তুমি আর আমি। চাঁদের আলো তোমার মুখের ওপর পড়ে কি এক মায়ার সৃষ্টি করেছিল—আমার অন্তরের যে মহাসতী প্রকাশ পাবার জন্য এতদিন মাথা খুঁড়ে মরছিল—তাকেই ভাষা দেবার জন্য ঠোঁট দুটো আমার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু তোমার অবিচলিত চোখের দৃষ্টির পানে চেয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম।

আজ আবার তোমায় কাছে পেতে ইচ্ছে করছে, খুব কাছে—একেবারে আমার পাশের চেয়ারটায়। বাতাসে তোমার চুল উড়বে, চাঁদের আলোয় তোমার কাণের পাথর দুটো জ্বলে উঠবে—আর তোমার কোলে মাথা রেখে আমি বিজয়ীর দৃষ্টিতে তারায় ভরা আকাশের পানে চাইবো"—

একবার, দুইবার, পড়া যেন আর শেষ হইতে চাহে না। চিঠির প্রত্যেকটা কথা এক পরিচিত সুর লইয়া তাহার চারিপার্শ্বে গুঞ্জরিয়া মর্ম্মরিয়া উঠে। সুব্রতা ভুলিয়া গেল যে আজই তাহার Economicsএর essayটা শেষ করিতে হইবে, ভুলিয়া গেল যে তাহার ঘণ্টা বাজাইবার সময় চলিয়া যাইতেছে, ভুলিয়া গেল যে Superintendentএর ফিরিবার আর বাকী নাই—তাহার পক্ষীরাজ তখন ছুটিয়াছে অচিনদেশের চিরপরিচিত রাজপুত্রের উদ্দেশ্যে। আকাশের তারা লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া কহিতেছে—ছি! ছি! দুইপার্শ্বের বৃক্ষশ্রেণী ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিতেছে—লজ্জা নাই? লজ্জা নাই? কিন্তু সুব্রতার পক্ষীরাজের থামিবার উপায় নাই—আহ্বান আসিয়াছে তাই সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া তেপান্তরে বিস্তীর্ণ মাঠের বুক চিরিয়া তাহার ছুটিতেই হইবে।

ঢং ঢং ঢং ঢং করিয়া পড়িবার ঘরের বড় ঘড়ীটায় ১১টা

বাজিয়া গেল। সুব্রতা চমকিয়া ঘড়ীর পানে চাহিল—সাড়ে দশটায় ঘণ্টা দিবার কথা, কিন্তু এগারটা বাজিয়া গিয়াছে। ছিঃ ছিঃ ভারি অন্যায় হইয়া গিয়াছে তাহার। তবু ভাল যে Superintendent আসিয়া পড়েন নাই—তাহা হইলে আজিকার লজ্জার আর সীমা রহিত না।

ঘণ্টা হাতে সুব্রতা উঠিয়া দাঁড়াইল, বারান্দায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজাইতে লাগিল—ঝিন্ ঝিন্ ঝিন্—সুব্রতার চুড়ীর মধুর শব্দের সহিত মিলিয়া মেয়েদের শুইবার ঘণ্টা বাজিয়া চলিয়াছে।

দ্বিতল এবং ত্রিতলের ঘরে ঘরে আলো নিভিয়া গেল। চুলবাঁধা সাঙ্গ করিয়া মেয়েরা যে যাহার শয্যায় শুইয়া পড়িল।

লীলার ঘরে আসিয়া সুব্রতা দাঁড়াইল। চাঁদের আলো এখনও তাহার সুন্দর আননে পড়িয়া হাসিতেছে। চোখের কোনে আর জল নাই, বোধ হয় কোন একটা সুখস্বপ্ন দেখিতেছে—অধরপ্রান্তে হাসির রেখাটি তখনও মিলাইয়া যায় নাই। অদূরে বিছানার উপর চিৎপাৎ হইয়া সগৌরবে নাসিকাগর্জ্জন করিয়া পাঁচুর মা তাহার অনিদ্রার পরিচয় দিতেছে।

সুব্রতা ত্রিতলে উঠিয়া আসিল। সকল কক্ষেই আলো নিভিয়া গিয়াছে—কেবল একটি কক্ষে মোমবাতী জ্বালাইয়া Logic পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার পড়া তৈয়ারী হইতেছে। সকলেরই সুমুখে বই খোলা, কিন্তু বলা বাহুল্য সেদিকে দৃষ্টি কাহারও নাই। পিছন ফিরিয়া পরীক্ষার্থিগণ মহোৎসাহে কুলের পুটুলী নিঃশেষ করিয়া চলিয়াছে।

সুব্রতা আসিয়া দ্বারে মৃদু করাঘাত করিবামাত্র একসঙ্গে সব আলোগুলা নিভিয়া গেল এবং মেয়েরা চটাপট বিছানায় শুইয়া গভ ভাবে নিঃশ্বাস লইয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিল যে তাহারা অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একটি মেয়ে তাড়াতাড়ি শুইতেও পারে নাই, দেয়ালে মুখ গুজিয়া বসিয়া বসিয়াই সে ঘুমাইতেছে।

সুব্রতা কহিল—"ইস্! সবার যে একেবারে মাঝ রাত দেখছি!"

মুহূর্ত্তে মেয়েদের গভীর নিদ্রা ভাঙিয়া গেল; একসঙ্গে চীৎকার করিয়া তাহারা কহিল—"ওমা তুমি? আমরা ভয়ে মরে যাচ্ছিলুম Miss Thomas ভেবে।" সাধনা কহিল—"কি মিষ্টি কুল ভাই, খাবে? সুব্রতাদি।"

"না রে, শরীরটা ভাল নেই—" বলিয়া সুব্রতা তাহাদের সতর্ক করিয়া দিল—"ছাখ পরদাগুলো ভাল করে টেনে দিস, নইলে বাইরে থেকে আলো দেখা যায়।"

সুমুখের ছোট ছাদটুকু পার হইয়াই সুব্রতার ঘর। ঘরের অপর মেয়েদের পরীক্ষা নাই—তাহারা সকলেই এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বারান্দায় একটা খুঁটিতে হেলান দিয়া সুব্রতা বসিল। উপরে মেঘের ফাঁকে চাঁদের লুকোচুরী খেলা চলিয়াছে; তারাগুলি মুখ টিপিয়া সকৌতুকে সে রহস্যলীলা উপভোগ করিতেছে।

অনেক দিন! এতদিন পরে মনে পড়িল তোমার? মনে পড়ে কি না সে সব দিন? কি না মনে পড়ে সুব্রতার? সে সব কথা কি ভুলিবার? সুব্রতা কিছু ভোলে নাই। তপস্যা? হাঁ তপস্যাতেই তো বসিয়াছে সে, কিন্তু কেবল এ জন্মের তপস্যা নয়—জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সুব্রতার তপস্যা চলিয়াছে; কিন্তু ভোলানাথ! একবারও তো মুখ তুলিয়া চাহ নাই। সুব্রতা ভোলে নাই, তুমিই তো ভুলিয়া গিয়াছিলে অভাগিনীকে। তোমার প্রেম যে সুব্রতার দেহরক্ষী—তাই তো নির্ভয়ে সকলের সঙ্গে মিশিয়াও সে আপনাকে হারায় নাই—কোন প্রলোভনই তাহাকে জয় করিতে পারে নাই।

কিন্তু আজ আর কোন দুঃখ নাই। সুদীর্ঘ দিবসের নীরব চোখের জলের উপর, তোমার প্রসন্ন হাসিটি পড়িয়াছে। ভুলিয়াছে? সুব্রতা কিছু ভোলে নাই—কিছু ভোলে নাই বন্ধু। ভুলিতে পারে নাই—

আকাশের চাঁদটা গড়াইতে গড়াইতে ঠিক তাহার মাথার উপর আসিয়া হাসিতেছে। সুব্রতা উঠিল। ঘুম আর তাহার চোখে আসিবে না আজ—কিন্তু তবুও তো শুইতে হইবে।

ধীরপদে সুব্রতা তাহার শয্যার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল।

ধরণীর প্রেম

শ্রীনিত্যধন ভট্টাচার্য্য এম-এ, কাব্যসাংখ্যতীর্থ

স্মৃতিহীন কোন্ শান্ত অবিজ্ঞাত গোধূলি সন্ধ্যায়
দেখা হ'ল দুজনাতে মহাশূন্যে নভোনীলিমায়
নয়নে নয়নে
সীমাহীন শব্দহীন মৌন নিরয়নে ;
কোমল ও বরবপু হ'তে যৌবনের দীপ্ত তেজোলিখা
চকিতে আঁকিয়া দিল দয়িতের নীলিম ললাটে বরণের টীকা।
ধীরে ধীরে দেখা দিল বিচিত্র বিকাশে
লক্ষকোটী জ্যোতির্ম্মূর্ত্তি রজনীর গাঢ় অবকাশে
নিঃসঙ্গ আকাশে
শশী ও তপন মিলি দিবানিশি নভ-আঙিনায়
বয়নিল সুখশয্যা রূপায় সোনায় ;
অন্তরের রূপলেখা বিকশিল মহামহিমায়
আলোকে ছায়ায়।
তারি তালে তালে
ফুটিল অনন্ত প্রেম সীমাশূন্য অফুরন্ত কালে।
তখন ছিলে গো তুমি নীলিমার প্রেয়সী ঘরণী,
হে মোর ধরণী !

রজনীর অন্ধকারে পৃষ্ঠে তব অন্তরাল করি'
কত লক্ষ যুগ যুগ ধরি'
অত অগণিত সূর্য্য বারে বারে উঠিল ডুবিয়া
সীমাহারা কালবক্ষে অতি ক্ষীণ অঙ্কপাত দিয়া।
ক্রমে ক্রমে রূপদীপ্তি এলো ম্লান হ'য়ে,
নীলবক্ষে শ্যামরূপ এক হ'য়ে আসিল মিশায়ে ;
কক্ষে শ্লথ হ'য়ে এলো গতি ;—
পূর্ণ যৌবনের শেষে দেখা দিল প্রৌঢ়ত্বের পুণ্য পরিণতি
অলস—মন্থর—
আপন গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ করি দিগন্তর।

প্রজ্জ্বলন্ত বক্ষোপরে জনমিল ধীরে ধীরে শ্যাম স্নেহাঞ্চল ;
আত্মকেন্দ্রী সুখলিপ্সা—বিলাস চঞ্চল
আপনার অগোচরে দেখা দিল অতি চুপে চুপে
স্নেহাতুর মাতৃ-বক্ষে সন্তানের আকিঞ্চন রূপে।
অয়ি স্নেহভারাতুর শ্যামল বরণী
কোটী জীব হৃদয়ের সন্তাপহরণী,
হে মোর ধরণী।

নিভেছে রূপের আলো ; নিশিদিন তব বক্ষ ভরি
জন্ম মৃত্যু পরশনে অন্তরাত্মা উঠিছে শিহরি' ;
অগণ্য সন্তানসঙ্ঘ বক্ষে জড়াইয়া ধরি' মাতৃগরিমায়
উদাস চাহিয়া আছ দুরান্ত সন্ধ্যায়,—
যেথা আজো চলিতেছে রূপের নর্ত্তন
গগনের মহাবক্ষে তালে তালে করি' আবর্ত্তন।
নীলিম দয়িত তব আকুল আগ্রহে
চাহি' রহে
আজো তব শ্যামস্নিগ্ধ তৃপ্ত মুখপরে
পরম আদরে।
তোমার বাসন্তীরূপে—ফুলদল কিসলয় সমৃদ্ধ শোভায়
যেন কোন্ মোহন আশায়
নিদাঘে উজলি' উঠে দীপ্তিভরা আঁখি দুটী তার,
মেঘে পুনঃ ঢাকে মুখ কি জানি আবার ;
শরৎ প্রভাতে হেরি' মহামাতৃমূর্ত্তি তব নিখিল ভরণী
হেমন্ত উষায় মৌন শিশির অশ্রুতে
অভিষিক্ত করে তব নিঃসঙ্গ সরণী,—
হে মোর ধরণী !



নদীয়া জেলার কয়েকজন সমন্বয়পন্থী সাধক

শ্রীতারাপদ দাশ এম-এ, বি-টি

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে যখন পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ও সংঘাতে আমাদের এ দেশীয় ইংরেজী শিক্ষিত সহরবাসীর অধিকাংশই পাশ্চাত্য চালচলন ও জড়বাদের অন্ধানুকরণে ব্যস্ত ছিলেন, যখন তাঁহাদের অনেকেই প্রাচীন আর্য্য মনীষীদের সাধনালব্ধ অধ্যাত্মসম্পদ ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় উচ্চ তত্ত্বসমূহের কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিলেন, সেই সময়েই আবার একদল সাধুসন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ ও আউলকীর্ত্তন এ দেশের প্রাচীন ভাবধারা ও পরমার্থসাধনের জটিল তত্ত্ব অতি সরল ভাষায় সহজগান, ছড়া ও উপদেশের মধ্য দিয়া নিভৃত পল্লীতে সাধারণের প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে জনাকীর্ণ সহর থেকে দূরে গ্রামেই অবস্থান করিতেন। তাঁহাদের জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা অতি সাধারণ ও সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী গৃহস্থের ঘরে জন্মিয়াছিলেন। পুঁথিগত জ্ঞান ইঁহাদের অনেকের মধ্যেই অতি সামান্য পরিমাণে লক্ষিত হইত। কিন্তু সরল সহজ ধর্ম্মজ্ঞান তাঁহাদের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত্ত ছিল। উহার বলে ও গুরুমুখী সাধন নিষ্ঠায় তাঁহারা সাধন জগতে অতি উচ্চস্তরে উন্নীত হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রায়ই কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেশী দিন থাকিতেন না। আত্মভোলা এই গৃহছাড়ার দল পরিব্রাজকরূপে দেশের মধ্যে বিচরণ করিতেন। ভ্রমণ করিতে করিতে যখনই তাঁহারা কোনও লোকালয়ের প্রান্তভাগে, নদীতীরে, শ্মশানে বা কোনও বটবৃক্ষতলে কয়েকদিনের জন্য আস্তানা করিতেন, তখনই তাঁহাদের নামমাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া দলে দলে আবালবৃদ্ধ গ্রামবাসী তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমাগত হইতেন। তখন এই সমস্ত মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের অনেকে সমবেত নরনারীর মধ্যে সরলভাষায় শাশ্বত শান্তিলাভের দুর্গম পথের বার্ত্তা প্রচার করিতেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার যখন তখন ইচ্ছামত ভগবৎ বিষয়ক গান রচনা করিয়া লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে নিজেদের স্বাভাবিক মধুরস্বরে গাহিতেন। এই সমস্ত গানের কথা, সুর, তান, লয় ইত্যাদি অতিসহজ কথ্যভাষায় রচিত হইলেও উহাদের আধ্যাত্মিকতা ও গভীরভাব অতুলনীয়। প্রত্যেক আউলবাউল, ফকির-দরবেশের একদল বিশেষ অনুরাগী ভক্ত দৃষ্ট হয়। ইঁহারা অন্তরঙ্গভাবে গুরুর সহিত বাস করিতেন।

গুরুর সঙ্গে সঙ্গে দেশময় পর্য্যটন করিয়া ভাবের বাহকরূপে তাঁহার উপদেশ লোকসমাজে প্রচার করিতে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের কোনও গৃহবন্ধন ছিল না। তাছাড়া সাধনভজনানুরাগী সাধারণ হিন্দু মুসলমান গৃহস্থও ইঁহাদের অনেকের শিষ্যমণ্ডলীতে স্থান পাইত। এই সকল গৃহী ভক্তের সাহায্যে গুরুর ভাব বিশেষভাবে লোকালয়ে প্রচারিত হইত। পরিব্রাজক গুরু কখন কখন তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তখন সেইস্থানে মহানন্দের সাড়া পড়িয়া যাইত। তাঁহাদের নিজগ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী লোকালয়ের বহুলোক গুরুর মুখের উপদেশ শুনিতে সমবেত হইত। ভক্তের বাড়ীতে তখন একটি আসর বসিত। সেই আসরে গুরুর সাঙ্গপাঙ্গ ও গুরু স্বয়ং সাধনভজনবিষয়ক কথা সরলভাবে বুঝাইতেন। এই সকল ভগবৎ-কথার আলোচনাপ্রসঙ্গে হিন্দুমুসলমানশাস্ত্রবর্ণিত অনেক জটিল তত্ত্বের অবতারণা হইত। উপস্থিত সাধারণ পল্লীবাসীকে উহা সরলভাবে বুঝাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে গানের দ্বারা আলোচনার মর্ম্ম বলিয়া দেওয়া হইত। এইরূপে দুর্ব্বোধ্য ধর্ম্মতত্ত্ব সাধারণের নিকট বেশ চিত্তাকর্ষক হইত।

পরিব্রাজক সাধু ফকিরের সমাগমে এই সমস্ত সাময়িক ধর্ম্মালোচনা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে তদানীন্তন বাঙ্গালার পল্লীসমাজে বিশেষ নৈতিক প্রভাব বিস্তার করিত। যে যুগের মহাপুরুষদের কথা বলা হইতেছে, তখন হইতেই এদেশের নাগরিক জীবনে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন শিথিল হওয়ার হেতু স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহনরূপে গ্রহণ করাতে সংস্কারপন্থী ও সংরক্ষণশীলদের মধ্যে পরস্পর যে অনৈক্যের সূত্রপাত হইল,

পরোক্ষভাবে তাহাই আজ মিলনের অন্তরায় ঘটাইবার অন্যতম কারণ। তারপর প্রথম যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরা নানারকম ভোগোপকরণসমৃদ্ধ সহরের সংস্পর্শে আসিয়া, তথায় স্থায়ীভাবে বসতিস্থাপন করিয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের জন্মভূমি *পল্লীর সহিত সমস্ত সংশ্রব ছিন্ন করিতে লাগিল।* ফলে সহরের আধুনিক শিক্ষিত ও সভ্যসমাজের সহিত পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত লোকের বিষম ব্যবধানের সৃষ্টি হইল। অন্যদিকে কলিকাতায় শিক্ষিত হিন্দুসমাজে চরমসংস্কারপন্থীরা ব্রাহ্মসমাজের পত্তন করাতে ধর্ম্মসম্বন্ধে আর একটি স্বতন্ত্রদলের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ধর্ম্মবীর কেশবচন্দ্র সেন, আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ স্বনামধন্য নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় এই নূতন দল দেশের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। প্রাচীন আর্য্য মনীষীদের বেদবেদান্ত ও উপনিষদের আলোকে নবযুগের এই সমস্ত মহাপুরুষদের মতবাদের তুলনামূলক আলোচনায় ইঁহারা প্রত্যেকেই যে সমন্বয়পন্থী সংস্কারক ছিলেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর সমন্বয়পন্থী সাধকদের মধ্যে তাঁহাদের স্থানও অতি উচ্চে; কিন্তু তদানীন্তন কালে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সূত্রপাত থেকেই পৌরাণিক অনুষ্ঠানবহুল ও সংরক্ষণশীল সাধারণ হিন্দুসমাজ উহাকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধভাবাপন্ন মনে করিতে লাগিল। ফলে চরমসংস্কারপন্থী ব্রাহ্মমতানুবর্ত্তীদের সহিত মধ্যপন্থী শিক্ষিত হিন্দুসাধারণের বিরোধ আরম্ভ হইল।

বাহিরের আবহাওয়ায় এইরূপে যখন আমাদের শিক্ষিতদের পরস্পরের মধ্যে এবং নাগরিক ও পল্লীসভ্যতার সহিত পরস্পর মনোমালিন্য ও বিরোধ উপস্থিত, সেই সময় এই সকল সাধুসন্ন্যাসী, আউল-বাউল ও ফকির-দরবেশের কণ্ঠে পল্লীমায়ের অঙ্গনে অঙ্গনে সাম্যের ও সমন্বয়ের সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। ভারতীয় ইতিহাসে রামানন্দ, কবীর, নানক, চৈতন্য ইত্যাদি মহাপুরুষগণ ধর্ম্মজগতে সমন্বয়মূলক যে উদার মতবাদ প্রচার করিয়া হিন্দুমুসলমান উভয়ের মধ্যে ঐক্যের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যেন তাহারই শেষ পরিকল্পনার জন্য ও বৈদেশিক জড়বাদের সংক্রমণ হইতে এদেশবাসী হিন্দুমুসলমানকে রক্ষা করিবার জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে এই সকল মহাজনের আবির্ভাব হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণপরমহংস প্রমুখ কতিপয় বিশেষ শক্তিশালী মহাপুরুষ দৈববশে বর্ত্তমান সভ্যতার *লীলাভূমি* কলিকাতা নগরীর নিকটে অবস্থান করায় এবং তাঁহাদের জীবদ্দশায় পাশ্চাত্য শিক্ষালোকপ্রাপ্ত অথচ প্রাচ্য ধর্ম্মবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রে বিশ্বাসী বিবেকানন্দপ্রমুখ প্রতিভাবান মনীষীর গুরুপদে বৃত হওয়ায়, তাঁহাদের অলোকসামান্য অদ্ভুত পুণ্যজীবনকাহিনী অধুনা সভ্যজগতের অনেক স্থলেই প্রচারিত হইয়াছে। অথচ এই একই ভাবধারার প্রবর্ত্তক ও প্রচারকরূপে আর একদল সাধুসন্ন্যাসী ফকির-দরবেশ বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলায় সহর থেকে দূরে অখ্যাত পল্লীর নিভৃতদেশে বর্ণজ্ঞানহীন হিন্দুমুসলমান অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রেমের যাদুমন্ত্রে ঐক্যসাধনব্রতে অমূল্য জীবন যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের কথাই বর্ত্তমানে শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট অজ্ঞাত। সুখের বিষয় এই যে, কিছুকাল হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে।

অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার অধিকাংশ জেলাতেই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ও উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত এই সকল সাধুপুরুষদের অদ্ভুত কীর্ত্তিকলাপ অবগত হওয়া যায়। এ বিষয়ে অন্যান্য জেলার তুলনায় নদীয়া জেলার স্থান কোনক্রমেই কম নহে; বরং অনেক জেলার চেয়ে বেশী।

পূর্ব্বোক্ত সময়ের কিছু পূর্ব্বে ও মধ্যে এই জেলায় আউলচাঁদ, মৌনীবাবা, তান্ত্রিকসাধক শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, কাঙ্গাল হরিনাথ, লালনসা ফকির ও তাঁহার দুই প্রধান শিষ্য হিরুসা ও পাঞ্জুসা ফকির আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তারপর বর্ত্তমান শতাব্দীতেও এ জেলার কুতুবপুরের বিখ্যাত সাধু নিগমানন্দ পরমহংস ও খোকসা জানিপুর শ্রীরাজপুর আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তরুণ সাধক ৺রাধারমণ সরস্বতীর নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে সাধু আউলচাঁদ ও নিগমানন্দ ব্যতীত অন্য সকলেই কুষ্টিয়া মহকুমার লোক। বড়ই আনন্দের বিষয় এই যে, আমাদের সমগ্র জেলার গৌরবস্থল প্রবীণ সাহিত্যিক রায় জলধর সেন বাহাদুর কাঙাল হরিনাথের পুণ্য জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া

শিক্ষিত-সমাজে প্রচার করিয়াছেন। তান্ত্রিকপ্রবর শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের খ্যাতিও বিচারপতি 'উড্রফে'র তন্ত্রালোচনার সময় বেশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। আউলচাঁদ ও মৌনীবাবার সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীও শ্রীযুক্ত গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'জীবনী সংগ্রহে' প্রকাশিত হইয়াছে। তবে মৌনীবাবা সম্বন্ধে উক্তপুস্তকে কয়েকটি ভুল দেখা যায়। তিনি কায়স্থ ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাসস্থান আজুদিয়া গ্রাম, আমার নিজগ্রামের দুই তিন মাইলের মধ্যে। সঠিকভাবে জানিয়াছি তিনি গোপকুলে জন্মিয়াছিলেন। অদ্ভুতকর্ম্মা সমন্বয়পন্থীসাধক লালন-সাঁইজীর সম্বন্ধেও কিছুকাল হইতে মাসিক পত্রাদিতে আলোচনা হইতেছে। তাঁহার রচিত আধ্যাত্মিকভাব ও দেহতত্ত্ব সমন্বিত অসংখ্য গানেরও দুইচারিটি মাসিকপত্রের পাঠকদের নিকট উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাঁহার জীবনী বিস্তারিত ভাবে লিপিবদ্ধ হয় নাই।

তাঁহার অসংখ্য সাধন সঙ্গীত ধারাভাবিকভাবে প্রকাশ করিতে পারিলে, তাঁহার জীবনী ও সাধনার মূল সুর সম্বন্ধে অনেক আলোক পাওয়া যাইত। অবশ্য এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে অনেক কষ্ট স্বীকার দরকার। যেহেতু লালনের জীবদ্দশায় তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত অন্তরঙ্গ ভক্তদের কেহই জীবিত নাই। তাঁহার জন্মস্থানও অনেক পূর্ব্বে গৌরী নদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। তত্রত্য অধিবাসীরা কে কোথায় স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তাহারও কেহ সন্ধান রাখে না। বর্ত্তমানে কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী সেঁউতিয়া গ্রাম শুধু এই মহাপুরুষের পবিত্র সমাধি শেষ-চিহ্নস্বরূপ বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এখানে যাইয়া মরমী ভক্ত ও ভাবুকগণ লালনের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুই একবিন্দু প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত জীবন-রহস্য সন্ধান করিতে গেলে ব্যর্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বরং এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মহকুমার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সন্ধ্যার পর সাধারণ হিন্দু মুসলমানের দেহতত্ত্ব, ফকিরী ও বাউল গানের একতারার আসরে যোগ দিলে উদ্দেশ্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইতে পারে। এই সমস্ত আসরে খ্যাত অখ্যাত অনেক সাধুসন্ন্যাসী ফকির দরবেশের গান পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের মধ্যে 'পাল্লা' দিয়া গাওয়া হয়। সময় সময়ে এই সমস্ত গানের আসর দিনের পর দিন চলিতে থাকে। এক পক্ষ পরাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত গান সমভাবে চলে। আমার এইরূপ আসরে যোগদানের সৌভাগ্য কয়েকবার ঘটিয়াছে।

দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, গায়কদের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্ণজ্ঞানহীন দুই এক জন চারি পাঁচ শত গান শুনিয়া শুনিয়া কণ্ঠস্থ করিয়াছে। উহার মধ্যে লালন সাঁইজী ও তাঁহার প্রধান শিষ্যপ্রশিষ্য হিরুসা ও পাঞ্জুসার রচিত গানের সংখ্যাই বেশী। নাড়ার দলের লোকই এই সমস্ত গান বেশী যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এস্থলে আর একটী কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, লালনের জীবদ্দশাতেই তাঁহার অনুগত গৃহস্থ ভক্তমণ্ডলী লইয়া একটি স্বতন্ত্র সমাজের অভ্যুদয় হইয়াছিল। কুষ্টিয়া মহকুমার মধ্যে ইহারা নাড়ার ফকির বা দল নামে সাধারণে অভিহিত। অবশ্য বাঙ্গালার ইতিহাসে হিন্দুদের মধ্যে এইরূপ একটি পৃথক দলের গোড়া পত্তন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালেই বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। কিন্তু কুষ্টিয়া মহকুমার এই নাড়ার দল সাধারণ পল্লীবাসী মুসলমান। অন্য মুসলমানদের চাল-চলনের সহিত ইহাদের বেশ সাদৃশ্য আছে, অথচ ইহাদের ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ পৃথক। ইহারা মুসলমান সমাজের নমাজ পড়া সম্বন্ধে কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম পালন করে না। হিন্দুদের দেবদেবীর পৌরাণিক কাহিনীও ইহাদের মধ্যে আলোচিত হয়। এ বিষয়ে ইহারা লালন সাঁইজী, হিরুসা ও পাঞ্জুসা ফকিরের পদাঙ্ক সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি কল্পনা ইহাদের নিকট ধর্ম্মবিশ্বাস-হীনতার পরিচায়ক নহে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মেও ইহাদের অগাধ বিশ্বাস। এমন কি দশ পনর বৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণবদের অনেক মহোৎসবেও ইহারা সানন্দে যোগদান করিত।

ইহাদের কেহই হিন্দুশাস্ত্রে নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ করিত না। এই সমস্ত নাড়ার ফকির বা দলের মধ্য দিয়া লালন সাঁইজী, হিরুসা ও পাঞ্জুসা ফকিরের যে উদার সমন্বয়মূলক সাধনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইত, তাহা ক্রমেই লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। নাড়ার দলের মধ্যে উপযুক্ত নেতার অভাবে, তাহাদের সংখ্যাল্পতায় এবং গোঁড়া মৌলবীদের প্রচারের ফলে আজকাল নাড়াদের অনেকেই পূর্ব্বের মত হিন্দুর দেবদেবী সম্বন্ধে প্রকাশ্য আলোচনার

বা মহোৎসব ইত্যাদিতে যোগদানে ভয় পায়। তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমান সমাজের অনেক আচার-ব্যবহারও পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তবে নাড়ার দল ছাড়া অন্য মুসলমানদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ এখনও ততদূর অগ্রসর হয় নাই। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নাড়ার দলের মতবাদে যোগ দিতে বা আলোচনা করিতে হিন্দুর ধর্ম্মবিশ্বাসে কোথাও বাধে না বলিয়া নাড়াদের মধ্যে অনেকেই হিন্দুদের নিকট থেকেই বেশী সহানুভূতি পাইয়া আসিতেছে। তাহাদের গানের আসরও হিন্দুদের বাড়ীতেই ভাল জমিয়া থাকে।

যাহা হউক, এক্ষণে গানের মধ্য দিয়া কিরূপে লালন সাঁইজী ও তৎশিষ্য হিরুসা ও পাঞ্জুসা ফকিরের উদার সমন্বয়ের ভাব নদীয়া জেলার গ্রামসমূহে প্রচারিত হইয়া লোকশিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দেখাইবার জন্য তাঁহাদের রচিত কয়েকটি গান এস্থলে উদ্ধৃত করিলে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি। লালন সাঁইজীর গান কিছু কিছু পত্রিকাদিতে মুদ্রিত হইয়াছে। তাহার অপ্রকাশিত গানের অনেকগুলির সন্ধান করিয়াছি। কিন্তু আরও অনেক বাকি। সেজন্য ভবিষ্যতে ধারাবাহিক ভাবে তাঁহার বিষয়ে আলোচনার আশায়, তাঁহাকে বাদ দিয়া আজ হিরুসা ও পাঞ্জুসা ফকিরের সংগৃহীত বহু গানের মধ্যে কয়েকটির আলোচনা করি। যতদূর জানি তাঁহাদের গান এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার সুযোগ পায় নাই। এই সমস্ত গানের মধ্যে উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব, জটিল দেহতত্ত্ব এবং হিন্দু মুসলমান ধর্ম্মের সমন্বয়সাধন প্রণালী বিশেষরূপে পরিস্ফুট। গুরুমুখী সাধনার উপর অটুট বিশ্বাস ইহাদের প্রতি পংক্তিতে বিদ্যমান। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা-ভাষীর নিকট গ্রাম্য দোষ দুষ্ট এবং ছন্দোবদ্ধ পদ্যানুরাগীর নিকট ছন্দজ্ঞানের অভাব সূচিত হইলেও, এই সমস্ত গানের অনেকগুলির মধ্যে সরস ও সরল রচনার সাবলীল প্রকাশ দৃষ্ট হয় এবং অনেক সময়ে ইহাদের মাধুর্য্য ও গভীর ভাব রসিকজনের বিশেষ অনুভব যোগ্য। বলাবাহুল্য এই সমস্ত গানের উদার ভাব নদীয়া জেলার সাধারণ গ্রামবাসীদের মনোজগতে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত স্নেহশীতল সমন্বয়ের ধারা এখনও নাড়ার দলের মধ্যে গোপনে বহিয়া যাইতেছে।

গান—

(১)

ত্রিবেণীর ত্রিধারে, সুধারে জোয়ারে ভাসে।
সুখ সাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥
উতলে সুধা সিন্ধু, সুধারে সুধার বিন্দু,
সুখময় সিন্ধুজল ছল ছলে;
সাঁতার খেলে এ জীব নিস্তারিতে,
জোয়ায় এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥

.. ..

মন ধরবি যদি অধর মানুষ,
থাক নদীর কূলে বসে।
জোয়ারের ভাঁটা শেষে,
মানুষ যায় অচিন দেশে॥
অনুরাগী যে হইবে,
ত্রিবেণীর রূপ সে দেখ্‌বে সহজে।
অধর ধরে যাবে ঐ চরণে মিশে।
সাঁই হীরু চাঁদ কয়, মানুষ খুঁজে,
পাঞ্জু মলি তুই দেশ বিদেশে॥

এই গানটি জটীল দেহতত্ত্ব বিষয়ক। ইহার রচনার পারিপাট্যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মানব দেহে কফ, পিত্ত, বায়ু বা ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্নার অবস্থিতি। ইহাকেই ত্রিবেণী অর্থাৎ তিনটি নদীসঙ্গমের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অধর মানুষ অর্থাৎ সেই পরম ব্রহ্মকে পাইতে হইলে সাধককে দেহস্থিত নদীর কূলে ভাটার শেষ প্রতীক্ষায় উজানের সময় পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিতে হইবে। শেষে উজান পথে যাইয়া ঊর্দ্ধদিকে ক্রমে অগ্রসর হইলে অধরকে ধরা যাইবে। তজ্জন্য দেশ বিদেশ অর্থাৎ বাহিরে না যাইয়া দেহের মধ্যেই সন্ধান করিতে হইবে। যেহেতু "যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে" তাই হিরু সাঁইজী তাঁহার প্রিয় শিষ্য পাঞ্জুকে সাবধান করিয়া বলিতেছেন "মানুষ খুঁজে পাঞ্জু মলি তুই দেশ বিদেশে।"

গান—

(২)

গুরু বিনে মনের কথা বলব না,
কারে বলব না, কিছু শুনব না।

ব্যথার ব্যথিত বিনে অন্যজনে
বলেও কিছু হবে না ॥
... ...
কেন বেনা-বনে মুক্তা ফেলে,
মন হ'য়েছ দিন কানা।
না ক'রে ভজন সাধন—যারে তারে বল না,
পাষাণ দলন তাতে হবে না ॥
কারে ঠেসেঠুসে ভজাইলে, কখন সে ভজবে না।
যেমন কাঠুরিয়া এক মাণিক পেয়ে
বাজারেতে যায় রে ধেয়ে ;
দোকানেতে ফেলে দিয়ে,
মূল্য নিতে জানে না ॥
এমন অবোধ কাঠুরের হাতে
মাণিক কভু দিও না ॥

এই গানটিতে ভজনসাধন সম্বন্ধে গুপ্ত রহস্য যত্র তত্র অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। সাধনভজন দ্বারা গুরু মন্ত্রে সিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত শিষ্যের কল্যাণার্থ "আপন মরম কথা, না বলিও যথা তথা, আপনি হইয়া সাবধান।" এই মন্ত্রগুপ্তির উপদেশ ভারতীয় সাধনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

গান—

(৩)

মুখে বল্লে কি হয়, গুরু ধরে সাধন জান্‌তে হয়।
ডুবে দেখ মনোরায় ॥
নিষ্ঠারতি যার হ'য়েছে, রসরতি সেই চিনেছে।
(এ ভাবে) উজানে সে তরী ব'য়ে যায় ॥
... ...
আস্‌মানে তিন রতি রয়, জমিতে তিন রসের উদয়।
সুরসিক শুভযোগে মিলন করে তায় ॥
অধীন পাঞ্জু কেঁদে বলে, গুরু সুখে সুখী হলে,
সে জন সহজ মানুষ ধরেছে নিশ্চয় ॥

এই গানে একনিষ্ঠভাবে গুরুমুখী সাধনায় সিদ্ধিলাভের কথা বলা হইয়াছে। তারপর—

"মহাভাবের মানুষ যে জন,
তার নয়ন দেখ্‌লে যায় গো চেনা।
যে মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা ॥"

এইভাবে সাধনপথের পথিক যে সর্ব্বদা উজান মুখে চলে তাহার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। সত্বঃ, রজঃ, তমঃ—তিন রস এবং নিষ্ঠা, প্রেম ও আনন্দ—তিন রতিরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

গান—

(৪)

যারে ডাকি আমি দয়াল বলে।
আছে অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পরে নিত্য কমলে ॥
মানুষ অতি গোপনে,
চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ নাই সেখানে ;
(ও সেই) অটলবিহারীর কিরণ আছে দ্বিদলে ॥
আছে অধর নাম ধরে, জীবের সাধ্য কি ধরে তারে।
রূপের কিরণ মেলে ভাগ্য ফলে, গুরুর দয়া হ'লে ॥
... ...
যোগেশ্বরীর মহাযোগে সেরূপের কিরণ আসে পাতালে।
ও সেই শুভ যোগ যদি মেলে, পাঞ্জু কেঁদে বলে ॥

গান—

(৫)

বেদে পুরাণে তার চিহ্ন নাই ;
বিনা সাধনে তার কি ধরা যায়।
... ...
তার কিঞ্চিৎ রূপে জগৎ আলো,
চর্ম্ম চক্ষে টের না পায়।
দিব্য নয়ন হ'লে পরে
দেখ্‌তে পায় সে জ্যোতির্ম্ময় ॥
নিরাকারে নিরঞ্জন, তারি আকার জগৎময়।
নূরের হিল্লোলে মানুষ স্বরূপ দ্বারে
বাবাম দেয় ॥
দেখ্‌লে সে দ্বার—হয় চমৎকার,
জীব কি তার মর্ম্ম পায়।
পাঞ্জু বলে সাধুজনে, যোগ-ধেয়ানে ধরে তায় ॥

এই দুইটি গানের তুলনা নাই। পরম ব্রহ্মের সন্ধান লইতে যাইয়া সাধক পাঞ্জু সাঁইজী সেই অগম দেশের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উপনিষদের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ নাই সেখানে
... ...
তার কিঞ্চিৎ রূপে জগৎ আলো।"

ইহার সহিত "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকা·····তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" এই উপনিষদের বাণী বা গীতোক্ত "নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো, ন শশাঙ্কো, ন পাবকঃ" এই উক্তির আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান।

মনে হয় সেই প্রাচীন আর্য্য বাক্যই বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

গান—

(৬)

কি আশ্চর্য্য হায় রে! ত্রিভঙ্গ সিন্ধুনীরে—
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে, জগৎ মাতায় রে॥
ক্ষণে ক্ষণে ঝলক মারে,
ক্ষণে লুকায় নীরান্তরে!
নিরাকারে নিরঞ্জন,
ফুলে বারাম দেন রে॥
গগনেরও পর পারে,
ফুলের মূল নিগম সহরে।
দৈবযোগে ফুল বিকশিত,
পাতালে উদয় রে॥

··· ··· ··· ···

ফুলেতে উৎপত্তি প্রলয়,
অমূল্য গুণ প্রকাশিত তায়।
যে রসিক সে ফুল ধরে,
শমন জ্বালা নাই রে॥

··· ··· ··· ···

সাধুজনে করে সাধন,
পাঞ্জুর ভাগ্যে নাই রে॥

এই গানটিতে ফুলের সহিত ব্রহ্মের রূপকচ্ছলে উপমা দেওয়া হইয়াছে। "গগনেরও পরপারে ফুলের মূল নিগম সহরে। দৈবযোগে ফুল বিকশিত, পাতালে উদয় রে॥" ইহার সহিত "ঊর্দ্ধমূল অধঃ শাখমশ্বত্থং···" গীতোক্ত এই বাণীর সাদৃশ্য রহিয়াছে। এস্থলে ঊর্দ্ধে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্র হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত যাহার মূল এবং অধঃ অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের নিম্নে যাহার শাখা—এইরূপ অশ্বত্থরূপী দেহের কথা বুঝিতে হইবে।

গান—

(৭)

যে দ্বারেতে ধরা যায়, সে মূলাধার;
শুনে চমৎকার।
সে দ্বার ভুজঙ্গ, জীবের প্রাণে
বাঁচা হয় ভার॥
ব্রহ্মাণ্ড পর মণি-কোঠা,
পাতালে দ্বার কপাট-আঁটা
যে দেখে সে দ্বার,
কামভুজঙ্গে দংশে মারে তায়।
মায়া বিষে নাহি ভয়,
দ্বারে বসে কয় নি হায়
শুভযোগে কপাট খোলে,
যদি মূলাধার॥

এই গানটিতে ব্রহ্ম সাধনার মূল মূলাধারে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উহাকে দ্বাররূপে কল্পনা করিয়া ভুজঙ্গের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ষট্‌চক্রভেদ সাধনায় মূলাধারের পরেই শক্তিরূপিণী কুলকুণ্ডলিনীর কথা আছে, সম্ভবতঃ এ স্থলে কুলকুণ্ডলিনীকেই আকারগত সাদৃশ্যের জন্য ভুজঙ্গ বলা হইতেছে। তারপর "ব্রহ্মাণ্ডপর মণিকোঠা"—ইহাতে ষট্‌চক্রের সর্ব্বোচ্চ স্তরের ইঙ্গিত আছে। সুতরাং এই গানটিতে ষট্‌চক্র সাধনার অভাব স্পষ্ট বুঝা যায়।

এক্ষণে গোপীভাবের ভজন বা প্রকৃতি ভজন সম্বন্ধে দুই একটি গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব—এ বিষয়েও পাঞ্জুসাঁইজীপ্রমুখ সাধকফকিরেরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন ও বাঙ্গালী হিন্দুর পরব্রহ্মাকে শক্তিময়ী মাতৃরূপে কল্পনা বা বৈষ্ণবমতাবলম্বীদের হলাদিনীশক্তি রাধা ও অন্য গোপীদের বিশুদ্ধ প্রেমের মধুর ভজন কত গভীর ভাবে আয়ত্ব করিয়াছিলেন।

গান—

(৮)

যে জানে ব্রজ গোপীর মহাভাব,
ও সে জ্যান্তে মরে, কৃষ্ণ-প্রেমের করে আলাপ।
অনুরাগের জোরে, বিধির কলম নাহি সে মানে;
বেদবেদান্ত দূরে রেখে, করে প্রেমলাভ।

··· ··· ··· ···

ও সাঁই হিরু চাঁদ কয়,
সে প্রেম কি যারে তারে হয়।
পাঞ্জু রে তোর মুখের কথা,
গেল না তোর স্বভাব॥

নিষ্কাম বিশুদ্ধ গোপী-প্রেমের তুলনা নাই। এই পথের পথিকের জ্ঞানমার্গের অবলম্বনে বেদবেদান্তের দরকার নাই। তাই হিরু সাঁইজী বলিতেছেন—"অনুরাগের জোরে, বিধির কলম নাই সে মানে; বেদবেদান্ত দূরে রেখে করে প্রেমলাভ।"

গান—

(৯)

গোপীর প্রেম সহজ মানুষে জানতে পায়।
রাধা কৃষ্ণ যে প্রেম সাধে, জীবের সাধ্য নয়॥
চণ্ডীদাসের গৃহে, দয়া করে বাশুলি এসে,
সহজ ভজন গোঁসাই আদেশে জানায়।
যে প্রেম কিশোর কিশোরী সাধিল ব্রজপুরে।
পাঞ্জু কেঁদে বলে, কবে তা' হবে॥

এস্থলে সহজিয়া ভজনের কথা বলা হইতেছে। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ইত্যাদি এই পথের পথিক ছিলেন। বৃন্দাবনে কিশোর-রাখাল শ্রীকৃষ্ণ কিশোরী রাধার সহিত নিষ্কাম প্রেমের চরম বিকাশ দেখাইয়াছেন। ইহাও সহজ প্রেমের আদর্শ, কিন্তু সহজ প্রেমসাধন বড় নিগূঢ় রহস্য। তাই পাঞ্জু বলিতেছেন "চণ্ডীদাসের গৃহে বাশুলি এসে, সহজ ভজন গোঁসাই আদেশে জানায়।"

গান—

(১০)

প্রেম নদীতে ডুবে দেখ না মন।
ভবে প্রেম হয়েছে কেমন ধন॥
চণ্ডীদাস আর রজকিনী মন,
তারা প্রেমে ডুবে জয় করে শমন।
তারা সহজ প্রেমের প্রেমিক হয়ে,
দেখ স্বধামে করে গমন॥
প্রেম করেছে শ্রীরূপ সনাতন,
তারা পরশ ফেলে,সুরস চিনে ভ্রমে বনে বন।
তাকি সামান্য এ জীব জানে,
জানে সাধুজন হয়ে চেতন॥

সহজ প্রেমের সাধনায় চণ্ডীদাস ও রামী রজকিনী সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সহজ প্রেম-সাধনার সঙ্গিনী রামী রজকিনীর মত বিশুদ্ধ প্রেমের অধিকারিণী হওয়া চাই। যাঁহার বর্ণনায় চণ্ডীদাস বলিয়াছেন "রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, কাম গন্ধ নাহি তায়।"

গান—

(১১)

আমার অধর চাঁদ বিরাজ করে ভক্তের দ্বারে।
ও সে ধনী মানীর নয় রে,ভক্তের কাঙ্গাল ও সাঁই মোরে॥
কেউ ধরব বলে হয় সন্ন্যাসী,
বৈরাগী কেউ তীর্থবাসী।
ব্রহ্ম পিয়াসী তারা জনম ভরে ঘুরে মরে
ভক্ত পায় মূলাধারে॥
এক জোলার ছেলে ভক্ত কুবের, ঘরে বসে
গুরু ভজে—সে পায় তারে।
আর মুচিরামের স্বর্গে ঘণ্টা,
পাঞ্জু মরে অহঙ্কারে॥

সাধক রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—"মুক্তি ভক্তির দাসী" অর্থাৎ ভক্তির সাধনায় মুক্তিলাভ অবশ্য ঘটিবে। এই ভাবেরই প্রতিধ্বনি উপরের গানটিতে পাওয়া যাইতেছে।

জ্ঞানমার্গের কঠোর সাধনা বিধিনিষেধের গণ্ডীর মধ্য দিয়া ক্ষুরধারশাণিত দুর্গম পথে। নেতি নেতি বিচার করিয়া রূপ হইতে অরূপে, সসীম হইতে অসীমে, সাকার হইতে নিরাকারে গমন। বহুর মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ম্"এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে জ্ঞানের গহনে বিচরণ করিয়া অরূপ রতন লাভ করা যাহাদের নিকট অসাধ্য, তাহারা শুধু অহেতুকী ভক্তি নিষ্ঠার বলে প্রাণারাম বিগ্রহের মধ্যে তাঁহাকে খুঁজিয়া পান। তাই সাধক পাঞ্জু বলিতেছেন "আমার অধর চাঁদ বিরাজ করে ভক্তের দ্বারে। এক জোলার ছেলে ভক্ত কুবের—ঘরে বসে, গুরু ভজে, সে পায় তারে॥"

... ...

এক্ষণে হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের যে উদার মতবাদ লালন সাঁইজীর ও তাঁহার প্রধান শিষ্যপ্রশিষ্য হিরু ও পাঞ্জু সাঁইজীর আজীবন সাধনার মধ্য দিয়া দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত

হইয়াছিল, তাহার স্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ পাঞ্জু সাঁইজীর রচিত আরও দুইটি গান এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। বাহিরে নামগত ভেদ থাকিলেও, হিন্দু মুসলমান বা অন্য ধর্ম্ম সাধনার মূলে যে সবই এক ভাব—তাহা নিম্নলিখিত প্রথম গানটির প্রত্যেক ছত্রে বিদ্যমান।

গান—

(১২)

ওগো মিল্‌বে গুরু কল্পতরু যে করে ধেয়ান্।
এবার ছত্রিশ জাতের কর্ত্তা গুরু, হিন্দু মুসলমান॥
হিন্দু তরে হরিনামে, হজরত তরায় মুসলমান।
হরি আল্লা একই রূপ দেখ না বিধান॥

... ...

কেউ ভজে নীরদ—হ্লাদিনী,
কেউ বলে নবি আল্লা গণি।
কেউ ছোন্নতে সাফ্ করে তনু, কেউ ফোঁড়ে দুই কাণ;
এ সকল বিধির কাহিনী।

... ...

পাঞ্জু করে ঠেলাঠেলি, হল না জ্ঞান॥
"হরি আল্লা একই রূপ দেখ না বিধান।

... ...

কেউ ভজে নীরদ হ্লাদিনী,
কেউ বলে নবি আল্লা গণি।"

এই দুইটি লাইনে যে মধুর সমন্বয়ের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা আজকের এই দ্বন্দ্ব কোলাহলের দিনে প্রত্যেকেরই প্রণিধানযোগ্য। একদিন যে সুরের গানে আমরা দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কত বিরোধ তুচ্ছ করিয়া হিন্দু-মুসলমান ভা'য়ে ভা'য়ে গলাগলি করিয়া বাঙ্গালার পল্লীতে পল্লীতে সুখের নীড় বাঁধিয়াছিলাম, আজ তাহা উপেক্ষা করিয়া আমরা কি ক্রমেই স্বখাত-সলিলে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছি না?

গান—

(১৩)

জাতের বড়াই কি,
একাল পরকালে জাতে কর্‌লে কি?
আমার মনে বলে,
অগ্নি জ্বেলে দেব রে জাতের মুখে।
এক জাতের বোঝা লয়ে,
মিছে মলাম বয়ে;
চিরদিন কাল কাটালাম্,
মানী মানুষ হয়ে।
মানের গৌরব কুলের গৌরব ধাঁধা বাজী সব দেখি।
মৃত্যু হলে যাবে চলে, জাতের উপায় হবে কি?॥

এস্থলে জাতের বিড়ম্বনা অসহ্যবোধে পাঞ্জু সাঁইজী বলিতেছেন "আমার মনে বলে—অগ্নি জ্বেলে, দেবেরে জাতের মুখে।" যে জাতি ইহকাল ও পরকাল কোথায়ও সাধন-পথে সাহায্য করে না, যাহা মৃত্যুর সাথে সাথে লোপ পায়, সেই জাতি জাতি করিয়া আমরা শুধু অহর্নিশি ধাঁধার সৃষ্টি করিতেছি। এই উক্তির পর আর একজন মানব প্রেমিকের মহাবাণীর কথা মনে পড়ে। "শুনহে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য—তাহার উপরে কেহ নাই॥" কিন্তু জাতি নিগড়বদ্ধ আমরা—বহুবার বহুভাবে একথা শুনিয়াছি। শোনার পর জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে নররূপী নারায়ণকে হৃদয়াসনে স্থান দিতে পারিয়াছি কি? যেহেতু এই সমস্ত সমন্বয়পন্থী সাধু ও ফকিরের প্রতি পল্লীগ্রামের সাধারণ হিন্দু মুসলমানের অচলা ভক্তি ছিল, তাহাতে ইহা সহজেই অনুমেয় যে তদানীন্তন পল্লীসমাজে লোক-শিক্ষার উপর ইহাদের একতারার সুর কি মধুর একতার ভাব আনয়ন করিত!

উপসংহারে—আমার প্রিয় জন্মস্থানের যে সমস্ত সরল বিশ্বাসী হিন্দু-মুসলমান ভাইদের ফকিরী, দেহতত্ত্ব ও বাউল গানের একতারার আসরে যোগদান করিয়া সমন্বয়ের সুরে ভরা, দেশের এই অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিক গানগুলির উদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাঁহাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মারণ-রশ্মি

শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘোষাল

"সেই আদি যুগে যবে অসহায় নর" ক্ষুধার তাড়নায় আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তীক্ষ্ণ দন্ত ও নখাদিসংযুক্ত না হওয়ায় তাঁহারা বিশেষ বেগ পাইয়াছিলেন। শিকার ত দূরের কথা—কঠিনাবরণযুক্ত ফলাদি ভক্ষণও কষ্টকর হইয়া উঠে; এই জন্যই তাঁহারা প্রকৃতির কোল হইতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রস্তরাদি সংগ্রহ করিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য চালান। ঐ সকল প্রস্তরাদিই বর্ত্তমানে প্রাসায়ুধ বলিয়া পরিচিত। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যায়, বুদ্ধিবৃত্তি বাড়িয়া উঠে—সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্রাদির প্রচলন হয়। ক্রমে ধাতুর আবিষ্কার। তরবারি, কুঠার ও বর্শার সৃষ্টি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, নানা দলের নানা মত হয়, ফলে পরস্পর কাটাকাটি হানাহানি পড়িয়া যায়। তখন আর ধনুর্ব্বাণ, তরবারি, বর্শা মাত্র শিকারাস্ত্র নহে, যুদ্ধাস্ত্র হইয়া উঠে।

স্বার্থের দাবী ক্রমেই প্রচণ্ড হইতে প্রচণ্ডতর হয়। মন রক্তমুখী হয়—তখন অল্প হত্যায় তৃপ্তি আসে না। হত্যার নেশা বাড়িয়া যায়। ফলে আগ্নেয়াস্ত্রের সৃষ্টি। অগ্নিনালিকা অগ্নি বর্ষণ করে, কামান গোলা বর্ষণে প্রকৃতিকে প্রকম্পিত করিয়া তুলে। নেশা বাড়িয়া যায়। ডিনামাইটের আবিষ্কার হয়। মুহূর্ত্তে শতবর্ষের সাধনা ভস্মস্তূপে পরিণত হয়। ইহাতেও তৃপ্তি নাই—বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হয়। সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ মুহূর্ত্তেই নষ্ট হয়।

অনুসন্ধিৎসু মন ধ্বংসের রুদ্র লীলা আরও প্রচণ্ডভাবে প্রত্যক্ষ করিতে চায়। সম্প্রতি সভ্যজগতের বিভিন্ন দেশে এক মারণ-রশ্মির পরিকল্পনা হইয়াছে। এই রশ্মিপাতে মুহূর্ত্তে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, লক্ষ লক্ষ এঞ্জিন শক্তিহীন হইয়া পড়িবে এবং লক্ষ লক্ষ 'এরোপ্লেন' শূন্য হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইবে। গত কয় বৎসর ধরিয়া ইহা লইয়া বিরাট গবেষণা চলিয়াছে, এতদ্‌বিষয়ে কোন দেশ কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছে মোটামুটি তাহার এক হিসাব দেওয়াই বর্ত্তমান ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই ইতালীর প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক মার্কোনির কথা বলি। সম্প্রতি রোমার নিকটস্থ বোসিয়ায় তিনি সিনর মুসোলিনীর সম্মুখে তাঁহার গবেষণালব্ধ ফল প্রদর্শন করেন। তাঁহার পরীক্ষাকালে রোমা হইতে অস্তিয়াগামী পথের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পরিমিত স্থানের সকল মোটর গাড়ীরই গতিরুদ্ধ হয়। চালকের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও গাড়ী একটুও নড়ে নাই। অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ীগুলি স্বেচ্ছায় চলিতে থাকে। প্রকাশ, ঐ অর্দ্ধঘণ্টাকাল যাবৎ উক্ত অর্দ্ধ মাইল স্থান মার্কোনি আবিষ্কৃত রশ্মি দ্বারা পরিব্যাপ্ত ছিল। ঐ রশ্মি মোটরমধ্যস্থ 'ম্যাগ্‌নেটো' যন্ত্রকে বিকল করিয়া রাখে।

বেভেরিয়া প্রদেশস্থ এক বৈজ্ঞানিক উহার অনুরূপ এক রশ্মির সন্ধান পাইয়াছেন; উহা এরূপ শক্তিশালী যে দুই মিনিটকাল মধ্যেই উহা যে কোন 'ম্যাগনেটো' গলাইয়া নষ্ট করিতে পারে। ঐ রশ্মি ইচ্ছানুসারেই নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

বৃটনও এ বিষয়ে অগ্রণী। ওয়েলস্‌বাসী বৈজ্ঞানিক গ্র্যাণ্ডালম্যাথ্‌ ও লিসেস্‌টার কলেজের লেক্‌চারার চ্যাডিফিল্ড মারণরশ্মি বিষয়ে বিস্তর গবেষণা করিতেছেন এবং প্রভূত উন্নতিও করিয়াছেন। গ্র্যাণ্ডেলম্যাথ্‌ ইতিমধ্যে যে যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা চল্লিশ হাত দূরস্থিত একটি মূষিককে একেবারেই বিনষ্ট করা যায় এবং মোটর গাড়ীও ইচ্ছানুসারে থামান চলে।

চ্যাডিফিল্ড আবিষ্কৃত রশ্মিও বিশেষ শক্তিশালী। তিনি বলেন তাঁহার রশ্মিপাতে প্রাণীকুল প্রথমতঃ বেশ আরাম বোধ করিবে, একটু কবোষ্ণভাব আসিবে—পরে সমুদয় স্নায়ুগ্রন্থি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। তাঁহার মতে মারণ-রশ্মি অতি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক প্রবাহের এক উত্তম পরিবাহক।

ফরাসীদেশে হের কাল্‌হাস্‌ নামে এক জার্ম্মাণ তত্রত্য এড্‌মণ্ড ডি ক্রিশ্‌মাস্‌ নামক এক ফরাসী ইঞ্জিনীয়রের সহায়তায় একপ্রকার পিস্তল আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐ পিস্তল ছুঁড়িলে উহা হইতে এক অতি তীব্র রশ্মিপাত হয়। উক্ত রশ্মি প্যারী সহরের বাহিরে কোন গ্রামে এক নৃত্যরত

সম্প্রদায়ের উপর ফেলা হয়। যতক্ষণ রশ্মিটি ছিল ততক্ষণ উক্ত সম্প্রদায়স্থ লোকগুলি একভাবেই শক্তিহীন অবস্থায় ছিল। রশ্মি অপসারিত হইলে তাহারা লুপ্ত শক্তি ফিরিয়া পায়।

পূর্ব্বোক্ত এড্‌মণ্ড ডি ক্রিশ্‌মাস্‌ বলেন, তিনি ৩০০০০০০ বাতির এক উজ্জ্বল রশ্মির সন্ধান করিয়াছেন—যাহার অবস্থিতি মাত্র ১/১০ সেকেণ্ড, কিন্তু উহা পাতে শূন্যস্থ 'এরোপ্লেন' চালক দুই মিনিটকালের জন্য অন্ধ হইয়া যাইবে।

পরিশেষে নিউইয়র্কের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডাঃ টেস্‌লার কথা বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করি। তিনি যে শক্তিশালী রশ্মির আবিষ্কার করিয়াছেন—প্রকাশ তদ্দ্বারা এককালে সহস্র সহস্র 'এরোপ্লেন'কে মাটিতে নামিতে বাধ্য করা যায় এবং লক্ষ লক্ষ শত্রুর ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি উহা জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) ইচ্ছানুসারে বিশ্বশান্তির প্রচেষ্টায় ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। তিনি আশা করেন এই রশ্মি দ্বারায় যুদ্ধবৃত্তি চিরদিনের জন্য বিশ্ব হইতে লুপ্ত হইবে। ঈশ্বর তাঁহার সাধুসংকল্প সার্থক করুন।

"ঈশ্বর কোথায় ?"

সাহিত্যরত্ন শ্রীসতীশচন্দ্র বৈদ্য

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে মানসিক হতবুদ্ধি ও বিহ্বলচিত্ত জননায়ক পাঞ্জাবকেশরী শ্রীযুত বিরলার নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে অনুসন্ধিৎসাপরায়ণ চিন্তাশীল মানবের মনে এই জগৎ সম্বন্ধে যত প্রকার প্রশ্ন ও সমস্যা উদিত হইতে পারে তাহার প্রায় প্রত্যেকটি জাগিয়াছিল এই কর্ম্মবীরের হৃদয়ে। উত্তর ও সমাধানের ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছেন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র পত্রিকায়। মানবহৃদয়ে এতাদৃশ বিহ্বলতা অসম্ভব কিছুই নহে।

তাঁহার এই বিহ্বলতার মূলে নিহিত আছে—(১) কর্ম্মফলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও (২) জাগতিক ব্যাপারে দুঃখকষ্ট, অত্যাচার ও উৎপীড়নের প্রভাব। এই দুইটি মূল কারণ বশতঃ তিনি এত অধিক বিচলিত হইয়াছিলেন যে তিনি ভাবাতিশয্যে ঈশ্বর ও পরলোকের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন।

ইহাতে সাধারণ মানবের মনে নাস্তিকতা ও সন্দেহবাদের বীজ উপ্ত হয় এই আমাদের আশঙ্কা। তন্নিবন্ধন ঈশ্বরের পৌরুষেয়তা, সৃষ্টিরহস্য, জন্মান্তরবাদ ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্টের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ইহা স্বর্গীয় লালাজীর প্রতি কোনরূপ ভ্রুকুটীও নহে, আক্রমণও নহে। যাঁহারা তাঁহার ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহার চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত এবং তাঁহার উক্ত পত্র পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন যে তিনি ছিলেন আস্তিকদের মধ্যেও আস্তিক (Theist of the theists)। চার্ব্বাকীয় দর্শন তাঁহার মন আলোড়িত করে নাই, সন্দেহবাদী তিনি ছিলেন না—জগৎ সৃজন-শক্তির পৌরুষেয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ করিলেও সেই বিশ্বব্যাপী শক্তির (All-pervading, impersonal, omnipotent, immanent, omniscient and omnipresent Energy or Activity) অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। তিনি ছিলেন কর্ম্মবীর। "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমা" উপনিষদের এই বাণী ছিল তাঁহার কর্ম্মজীবনের প্রেরণা; কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই প্রেরণাকে অধিকতর কার্য্যকারিণী করিয়া তোলে নাই গীতার সেই অমৃতময়ী বাণী—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥ ২।৪৭

"কর্ম্ম করিয়া ভাল হইবে কি ?" এই প্রশ্ন লালাজীর মনে

(১) এই পত্রখানি লালাজি প্রতিষ্ঠিত 'পিপলস' পত্রিকায় তাঁহার স্মৃতি বার্ষিকী লিপিতে প্রকাশিত হয় এবং ৩রা অগ্রহায়ণের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা মধ্যাহ্ন সংস্করণে উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়।

যেমন জাগিয়াছিল, ঠিক সেই একই প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল কুরুক্ষেত্রে ধনঞ্জয়ের মনে—যার জন্য আশ্বাস দিয়াছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে নহে, কর্ম্ম ফলের জন্য কর্ম্ম করিও না—কিংবা কর্ম্ম না করাতেও যেন তোমার নিষ্ঠা না হয়। লালাজীর জীবনের এই বিরাট অভাব তাঁহাকে তৃপ্তি দেয় নাই—কর্ম্মে আশানুরূপ কর্ম্মফলাভাবে তিনি ভোগ করিয়াছেন—বিরাট নৈরাশ্য ও তজ্জনিত মর্ম্মান্তিক মনোবেদনা। এত ভীষণ মানসিক যাতনা ও প্রগাঢ় বিহ্বলতা তাঁহার শেষ জীবনে দৃষ্ট হইত না—যদি তিনি বুঝিতেন এবং মানিতেন—

"জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তা হয়নি হারা—"

ঈশ্বরের পৌরুষেয়তা

সৃষ্টি শক্তির অস্তিত্ব তিনি মানিয়াছেন, কিন্তু পৌরুষেয়তা নয়—সে জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ। সাধারণ লোকের পক্ষে সর্ব্বব্যাপী অপৌরুষের শক্তির কল্পনা করা শক্ত ব্যাপার। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক। ঝড় একটি শক্তি, যার বলে গাছপালা ও অট্টালিকা ভূমিসাৎ হয়; বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ সত্য—কিন্তু কেহ কখনও এই শক্তিকে দেখিয়াছেন? তা নয়—অথচ স্বীকার করি তার অস্তিত্ব, আরোপ করি এই শক্তি বরুণ দেবতার উপর। বাস্তব পক্ষে বরুণের কোন অস্তিত্ব নাই—আছে তার সেই আরোপিত শক্তির। সেইরূপ জ্ঞানীর নিকট হস্তপদাদি-সংযুক্ত ঈশ্বর মিথ্যা হইলেও তাঁহার উপর আরোপিত শক্তির অস্তিত্ব অতি সত্য—পরম সত্য ও চরম সত্য।

প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে—যার অস্তিত্ব নাই, তার অবতারণা কেন? বাস্তব জগতে এমন কতকগুলি ব্যাপার সংঘটন হয় প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য যার আগমন বা অবতারণা—কিন্তু কার্য্যকালে তার কিছুই থাকে না। সাধারণের জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ববাদও তাই; জগতসৃষ্টিকারিণী শক্তির অস্তিত্ব অনুভবের জন্য সাকারবাদের অবতারণা; কিন্তু এই অনুভূতির পর সিদ্ধ অবস্থায় সাধক বুঝিতে পারেন—বাস্তব পক্ষে ইহা অরূপ ও অসীম। ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ—এই সত্য উপলব্ধির জন্য—এই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে যে বিশেষ ত্রিভুজটি অঙ্কন করিতে হইয়াছিল বিদ্যালয়ের কৃষ্ণ কাষ্ঠ ফলকে অঙ্কিত সেই ছোট ত্রিভুজ বিশেষের সঙ্গে উক্ত জ্যামিতিক সত্য-জ্ঞানের যে সম্বন্ধ—সাকার ঈশ্বরের (কৃষ্ণই হউক, কালীই হউক, ঈশা হউক, মুশা হউক, মহম্মদ হউক, আর রামকৃষ্ণই হউক) সঙ্গে সৃজিকা শক্তিরও সেই সম্বন্ধ—বরুণের সহিত বাত্যাশক্তিরও সেই সম্বন্ধ—ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মশক্তিরও সেই সম্বন্ধ।

সৃষ্টি রহস্য

কেন জগৎ সৃষ্ট হইল? উত্তর খুব শক্ত নয়। যেমন জলের স্বভাব শৈত্য, অগ্নির স্বভাব উত্তাপ, নবজাত শিশুর স্বভাব হস্তপদসঞ্চালনাদি ক্রীড়া—তেমনই শক্তি-মাত্রেরই স্বভাব আত্মপ্রকটন। ইহা ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যও বটে। এই দৃশ্যমান জগৎ জগৎ সৃজন-শক্তির স্বভাব-সিদ্ধ আত্মপ্রকটন মাত্র। এই জগতে সদসৎ উত্থানপতন আলোড়নবিলোড়ন যাহা কিছু সম্ভব হইতেছে সবই সেই একই শক্তিসম্ভূত। জ্ঞানী সংসারাভিজ্ঞ বৃদ্ধ পিতামহ স্বজন-পরিজনবর্গের মধ্যে সাংসারিক ব্যাপারের বিভিন্ন শাখার কার্য্যাবলী ন্যস্ত করিয়া অলসভাবে বসিয়া থাকিলেও তৎপরিবার সম্পর্কিত সদসদ্ কার্য্যের জন্য তিনি দায়ী—যদিও বাস্তব পক্ষে তিনি স্বহস্তে কিছুই করেন না এবং অন্যায় অসৎ কার্য্য কোনমতেই সমর্থন করেন না; ঠিক তেমনই এই জগতের যাবতীয় কার্য্য হইতে দূরে থাকিয়াও সৃষ্টিশক্তি সৃষ্টির সকল কার্য্যের মূল নিদান—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তিনি কিছুই করেন না বা যা কিছু অন্যায়, অসৎ, অত্যাচার ও অবিচার তার কিছুই সমর্থন করেন না।

জন্মান্তরবাদ

পাপীর দুঃখভোগ ও পুণ্যবানের সুখভোগ এই আদ্য ও সহজ জ্ঞান সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বসমাজে মানব-মাত্রেরই আছে—অথচ বাস্তব জগতে ইহার ব্যতিক্রমও আছে এবং এই ব্যতিক্রমই জন্মান্তরবাদ প্রমাণ করে। ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদও সেই একই সত্য প্রমাণ করে। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মত ও তাহাই—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ।

৪।৫ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

এই জীবজগতের কথা—বিশেষতঃ জন্মমৃত্যুরহস্য সম্বন্ধে ধীরভাবে প্রণিধান করিলে এই সত্য স্বতঃই প্রকটিত হয়। সাধকজীবনের আদি অবস্থায় এই সত্যের বিকাশ হয়—সূক্ষ্মদেহী সাধক নবব্রতী সাধককে কতভাবে সাহায্য করে তাহা কেবলমাত্র ঐ পথের পথিকই জানেন। সর্ব্বশেষে আজকাল এমন জাতিস্মর লোকও জন্মগ্রহণ করিতেছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় যাহারা পূর্ব্বজন্মের সকল বৃত্তান্ত অনায়াসে বলিতে পারেন এবং বিবৃতি ও ব্যবহারে হুবহু মিলও রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা প্রত্যক্ষতর প্রমাণ আর কি আছে ?

"পরলোকে সৎকার্য্যের পুরস্কার ও অসৎকার্য্যের দণ্ডবিধান"—এই ধারণা সত্য হইলে ইহাও সত্য যে এই জগতের নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত ব্যক্তির কোন অভিযোগ করা উচিত নয়—তার দুঃখকষ্টের জন্য বিনা আপত্তিতে সব কিছু সহ্য করিয়া যাওয়াই তার কাজ, এমন কি দুঃখ অপনোদনের চেষ্টাও অন্যায়ের শাস্তিরূপ দণ্ড অপনোদনের চেষ্টার নামান্তর মাত্র। এই যুক্তি অকাট্য নহে। কর্ম্মফলই কর্ম্মের প্রযোজক—কর্ম্ম হইতে কর্ম্মের উৎপত্তি; কর্ম্মজ কর্ম্ম কখনও অলসতা উৎপাদন করিতে পারে না। পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মফল কখনও মানুষকে এজন্মে অলস করিতে পারে না; কর্ম্ম বা কর্ম্মফলের তাহা স্বভাব নয়, সুতরাং পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মের দোহাই দিয়া যদি কেহ এজন্মে অলসভাবে বসিয়া থাকে তাহাতে তাহার দুঃখের লাঘব হয় না, বরং বৃদ্ধি হয়। জীবজগতে হ্রাসবৃদ্ধি উত্থানপতন অবশ্যম্ভাবী। উত্থান ও উন্নতি সর্ব্বজীবের স্বাভাবিক কামনা—ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। শারীরিক দুঃখকষ্ট ক্ষুৎপিপাসার আকার ধারণ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব্বজন্মের দুষ্কর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধান করে এবং পরোক্ষভাবে জীবের কাম্যবস্তু ও উন্নতিরূপ মঙ্গল আনয়ন করে—তাহা ইহজন্মেই হউক, আর পরজন্মেই হউক। জীবন সংগ্রামে স্বীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাম্য বস্তু লাভ করিতে তাহাকে বিরুদ্ধশক্তির সহিত অবশ্যই সংগ্রাম করিতে হইবে—জয়লাভ করিতে দুঃখকষ্টকে বরণ করিতেই হইবে। দুঃখ অপনোদনের চেষ্টারূপী যে কষ্টভোগ তাহার দুই প্রকার ফল হয়—(১) প্রাক্তন দুষ্কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত ও (২) দুঃখমূলক সদনুষ্ঠানজনিত সুখপ্রাপ্তি—তাহা ইহলোকেই হউক আর পরলোকেই হউক।

লালাজীর চঞ্চলতার দ্বিতীয় কারণ, দৃশ্যমান জগতে দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অন্যায় ও যুক্তিহীন অত্যাচার ও উৎপীড়ন, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কৃতঘ্নতা, বিপদে আত্মীয়ের—অতি-আত্মীয়ের স্বজনবিরোধিতা, মানুষের হীনতা, দীনতা, হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ ও সর্ব্বোপরি নির্লজ্জ স্বার্থপরতা—স্বল্প কথায় আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখকষ্টের অনিবার্য্য অস্তিত্ব তাঁহার হৃদয় বিচলিত করিয়াছিল।

মঙ্গলামঙ্গলবাদ

দৃশ্যমান জগতের মঙ্গলময় ও অমঙ্গল ব্যাপারের সম্মুখীন হওয়া মানবমাত্রেরই একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার—সুতরাং মঙ্গল ও অমঙ্গল এই কথা দুইটি অভিধান হইতে উঠাইয়া দেওয়া কত দূর সঙ্গত তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অমঙ্গল কথাটি এই স্থানে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে; শারীরিক, মানসিক, প্রাকৃতিক ও নৈতিক সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট ও পাপপ্রলোভনই অমঙ্গল।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত নৈপুণ্যময় জগতে সর্ব্বত্র সুচারু সুসঙ্গত বিধানাবলীর মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতার করুণ হস্তের প্রলেপন অবলোকন করিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন যে জগতে অমঙ্গল নামধেয় কিছুরই অস্তিত্ব নাই; যাহা কিছু আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করি—তাহা শুধু অজ্ঞানতা ও অদূরদর্শিতার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে; মূলতত্ত্ব আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে বাস্তবপক্ষে অমঙ্গলের কোন প্রকার অস্তিত্ব নাই।

অজ্ঞান, অদূরদর্শী ও মূলতত্ত্ব-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি মঙ্গল অমঙ্গল নির্ণয়ে অসমর্থ হইতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের সত্যোদ্ঘাটনের অসামর্থ্য হইতে কি প্রকারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে জগতে কোন প্রকার অমঙ্গলের অস্তিত্ব নাই! পক্ষান্তরে এই অসামর্থ্য অমঙ্গলের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল অনুকূল সাক্ষ্যই প্রদান করিতেছে। ম্যাক্সমুলার বলেন যে ভারতীয় প্রধান প্রধান দার্শনিকমত-সমূহের মূলপ্রতীতি এই যে—এই জগৎ দুঃখ ও অমঙ্গলে

পরিপূর্ণ—ইহার কারণ ও ইহা হইতে পরিত্রাণের উপায় অবশ্যই উদ্ভাবনীয়। দুঃখের দারুণ দৃশ্য শ্রীচৈতন্যকে সংসার-ত্যাগী করিয়াছিল, কষ্টের করুণকাহিনী শ্রীগৌতমকে বুদ্ধ করিয়াছিল। অজ্ঞানতাজনিত অমঙ্গলরাশি হইতে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ ভারতীয় দর্শনের উদ্দেশ্য; কিন্তু সমুদয় মতের নীতি এক নহে। প্রাচ্য দার্শনিক পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্য মায়া নামে অভিহিত করিয়া এই অমঙ্গলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

বাক্যসর্ব্বস্ব নাস্তিকের ক্ষুদ্রার্থ তর্কের মোহ কাটাইতে না পারিয়াই উপযুক্ত দার্শনিক পণ্ডিতগণ অমঙ্গলের অনস্তিত্ববাদের অবতারণা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। নাস্তিকদের তর্কের আকার এই প্রকার—"যদি জগতে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় কোন বিধাতা থাকেন তবে দুঃখকষ্টের অস্তিত্ব সম্ভব নহে; কেবলমাত্র তখনই দুঃখকষ্ট সম্ভব হয়, যখন জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ নহেন—সর্ব্বব্যাপী নহেন—সর্ব্বশক্তিমান নহেন। ভগবান বলিলে আমরা উপযুক্ত গুণসম্পন্ন সাকার ভগবানই বুঝি; উহার যে কোন গুণের অভাব হইলে তিনি আর ভগবান নহেন; সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে অমঙ্গল ও ভগবানের অস্তিত্ব একই সময় সম্ভব নহে"। এই বাকবিতণ্ডা ও বিপদ হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার না করিয়া অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেছেন। কিন্তু ধীরভাবে আলোচনা করিলে তাঁহাদের প্রমাদ কোথায় নিহিত আছে সহজেই গোচরীভূত হইবে। অধিকন্তু ইহাও প্রমাণিত হইবে যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াই তাঁহারা নাস্তিক হইতেও নাস্তিক হইয়াছেন।

ভগবান মঙ্গলময়। মঙ্গলই তাঁহার উদ্দেশ্য। জীবের মঙ্গলবিধানই তাঁহার ঐকান্তিক ইচ্ছা। ইহা সার্ব্বজনীন সত্য, যে নৈতিক বল, চরিত্র বল ও ন্যায়পরায়ণতাই মানবকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করে। এই বিশাল কর্ম্মময় জগতই উপরোক্ত সদ্গুণাবলীর অনুশীলনক্ষেত্র ও শিক্ষাগার; ইহার একদিকে অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট, মিথ্যামোহ, পাপপ্রলোভন, অন্যায় অত্যাচার—অন্যদিকে অসীম সুখ, সত্য, পুণ্য, পবিত্রতা, পুরস্কার ও পরিতোষ রহিয়াছে। মানবকে মঙ্গলের দিকে—পুণ্যের দিকে—অগ্রসর হইতে হইলে এই নৈতিক শিক্ষাগারে পাপ প্রলোভনাদি হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বর্গীয় প্রেমালোকের দিকে প্রধাবিত হইতে হইবে; ইহাই মঙ্গলময়ের বিধান। মঙ্গলের জন্যই উপায়রূপে অমঙ্গলের অবতারণা। নিষ্ঠীবনাদি পরিত্যাগ মানবের স্বাভাবিক কর্ম্ম; এই সমুদয় কার্য্য সম্পাদনে তাহার কোনরূপ কৃতিত্ব নাই। তদ্রূপ পাপ মিথ্যাদি প্রলোভনবিহীন সৎকর্ম্মে বা সত্যকথনেও কোনরূপ কৃতিত্ব নাই—কিংবা নৈতিক বা চরিত্রবলের কোন নিদর্শন নাই। উহা তখন স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়াই গৃহীত হয়। অসংখ্য বন্ধনমাঝে নৈতিকবল, চরিত্রবল ও ন্যায়পরায়ণাদি সদ্গুণরাশি প্রকাশিত হয়; মানব উন্নত হইতেও উন্নততর হয়; 'মুক্তির স্বাদ' গ্রহণ করিবার অবসর পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অমঙ্গলের অস্তিত্ব মঙ্গলময়ের অস্তিত্বের পরিপন্থী নহে—পরন্তু উহা অনুপন্থী।

সর্ব্বশক্তিমত্তার প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কতিপয় তার্কিক পণ্ডিত বলেন—অমঙ্গলের সাহায্য ব্যতীত মঙ্গলবিধান করিতে না পারিলে মঙ্গলময় কি প্রকারে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া অভিহিত হইবেন? উত্তর এই—একই স্থানে দুইটি বিরুদ্ধ ভাবের সমাবেশ থাকিতে পারে না। দুই ও এক নিজের বিরুদ্ধভাব দ্বিত্ব ও একত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া দ্বিত্ব, একত্ব বা অন্য কোন তৃতীয় প্রকার ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে দুই দ্বিত্ব-ভাব বিনষ্ট করিয়াই একত্ব বা অন্য কোনপ্রকার তৃতীয় ভাব গ্রহণ করিয়া একক সংখ্যা বা অন্য কোন তৃতীয় সংখ্যা হইতে পারে—সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ইহাকে পরমসত্য কহে; ইহাকে উল্লঙ্ঘন করার নাম উচ্ছৃঙ্খলতা। ভগবান স্বয়ংও স্বরচিত নিয়মানুবর্ত্তী। সর্ব্বশক্তিমান হইবার নিমিত্ত তিনি কি নৈতিক, কি প্রাকৃতিক কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন না। তিনি উচ্ছৃঙ্খল নহেন। নৈতিক ও চরিত্র-বলের উৎকর্ষ সাধন করিতে—মনুষ্যসমাজকে মঙ্গলের পথে প্রধাবিত করিতে পাপপুণ্য সত্যাসত্য ধর্ম্মাধর্ম্ম মঙ্গলামঙ্গল সকলেরই প্রয়োজন আছে; এমতাবস্থায় অমঙ্গলের সমূহ বিলোপসাধন উচ্ছৃঙ্খলতার ও নীতি-বিগর্হিত কার্য্যের নামান্তর মাত্র। উহা মঙ্গলময়ের অসামর্থ্যের লক্ষণ নহে—বরং উহা তাঁহার স্বরচিত নীতি।

যদি ভগবান মঙ্গলময় হইতেন এবং অমঙ্গলের সোপান

অতিক্রম করিয়াই যদি মানুষ প্রকৃত সুখময় জীবন লাভ করিত তবে কেন কোন কোন মানব সমগ্র জীবন কৃচ্ছ্র-সাধনপূর্ব্বক নানাপ্রকার প্রলোভনাদি পরিত্যাগ করিয়াও উত্তরকালে সুখী হইতে পারেন না—কিংবা কেনই বা কোন নরাধম ভীষণ কলুষিত জীবন-যাপন করিয়াও পরিণামে যথেষ্ট সুখভোগের অধিকারী হইয়া থাকে? এই প্রশ্নের মূলে আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিয়াছে এবং এই সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে (জন্মান্তর বাদ)। অধিকন্তু পাপাত্মার সুখভোগ ও পুণ্যাত্মার দুঃখভোগ—এর দৃষ্টান্ত খুব বেশী নহে। জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে সর্ব্বত্রই দেখা যায়—সাহসী, নীতিবান, ধর্ম্মভীরু, মিতাচারী ও চরিত্রবান জাতি মাত্রই উন্নতি করিয়াছে ও জীবন-সংগ্রামে আত্মরক্ষা করিয়াছে। পক্ষান্তরে ভীরু, অত্যাচারী, স্বার্থান্বেষী, চরিত্রহীন, অধর্ম্মাচারী, লোভপরায়ণ, নীতিজ্ঞান-হীন জাতি আপাতদৃষ্টিতে সমৃদ্ধিশালী বলিয়া মনে হইলেও স্বল্পকালমধ্যে মধুমাসের শক্তু কণার মত কোথায় উড়িয়া যায় তাহার নিশ্চয়তা থাকে না—উন্নতি ত দূরের কথা। সমষ্টি সম্বন্ধে যাহা সত্য, ব্যষ্টি সম্বন্ধেও তাহা সত্য।

অমঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা থাকিলেও উহা অভিপ্রেত নহে। এজন্যই পাপের প্রায়শ্চিত্ত বিধান এবং ইহাতেই মঙ্গল ও নীতির ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে, পাপানুষ্ঠান হ্রাস পাইতেছে। পাপের ভীষণতা স্পষ্টতর করিবার নিমিত্তই অধিকাংশ স্থলে গুরুতর শাস্তি কেবলমাত্র পাপীর স্কন্ধে পতিত হয় না, অধিকন্তু তাহার স্বজনবর্গও ইহার অংশ গ্রহণ করে। এই বিধানও অমঙ্গলজনক নহে। বিনা-অপরাধে স্বজনবর্গ কষ্টভোগ করিবে এই আশঙ্কায় বহু লোককে অন্যায় আচরণে বিরত হইতে দেখা যায়। এইভাবে জগতে পাপানুষ্ঠান উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। আরমষ্ট্রং বলেন, এই বিরাট বিশ্বপরিবারে স্বকীয় পাপপুণ্যের ফল যদি স্বজনবর্গ গ্রহণ না করে তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক নরনারী, বালক-বালিকা নির্জ্জন কারাবাসের দুর্ব্বহ জীবনযাপী স্বাতন্ত্র্যবাদী অপরাধীস্বরূপ। কারণ সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাব, সুখে দুঃখে সহানুভূতি ও সমবেদনা তাহাদের মধ্যে বিরাজ করে না; কিন্তু এই পৃথিবী তাদৃশ গুণাবলীতে বিভূষিত উপনিবেশ ভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সকলের তরে সকলে আমরা—
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

দ্বিতীয়তঃ আপাতঃদৃষ্টিতে আমাদের মনে হইতে পারে যে একের অপরাধে অন্যের শাস্তি হইতেছে; কিন্তু বাস্তব পক্ষে সর্ব্বকালে ও সর্ব্বত্র তাহা নহে—ইহজন্মে নিরপরাধ ব্যক্তি ও তাহার পূর্ব্বজন্মকৃত অসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করে। (জন্মান্তরবাদ)

দুঃখ কষ্ট ভগবানের মঙ্গলাশীষ। স্বর্ণকারের শত সহস্র আঘাত ও অগ্নির অনন্ত দহন স্বর্ণের কান্তি বর্দ্ধন করে; খনির তিমিরগর্ভে সুখাসীন অবস্থায় তাহার স্বরূপ বিকশিত হয় না। আপাতদৃষ্টিতে একটি অমূলক যুক্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে পরিতাপ ও দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়াই যদি জীবন অতিবাহিত হইল—তবে মানবশিশু কি ভগবানের আদেশ গ্রহণ করিবে—সে কি ধর্ম্মদ্রোহী ও নাস্তিক হইবে না? বাস্তবজগতে ধার্ম্মিক অধার্ম্মিক, নাস্তিক আস্তিক, সদাচারী অসদাচারীর জীবনী আলোচনা ক্রমে তাহাদের কার্য্যাবলী বিশ্লেষণ করিলে উক্ত যুক্তির অনুকূল সাক্ষ্যের বিনিময়ে প্রতিকূলসাক্ষ্যই পাওয়া যায়। বাচনিক সত্য অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক ও ব্যবহারিক সত্যই সঠিক মূল্য বহন করে এবং ইহাই প্রতিপাদন হয় যে দুঃখের মূলেই মঙ্গল নিহিত আছে।

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল মা দয়া তব, জেনেছি মা দুঃখহরা।

অধিকন্তু ইহাও প্রত্যক্ষ গোচর হয় যে অধিকাংশস্থলে দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, নীতিপ্রেম, পাপভীতি, ভগবদ্‌প্রেম ও ন্যায়পরায়ণতাদি সদ্‌গুণরাশির উদ্ভবস্থান দুঃখ-কষ্ট ও বেদনা।

সর্ব্বশেষে আধিভৌতিক দুঃখ-কষ্টের কথা আলোচনা করা যাউক। আগ্নেয়গিরিস্ফোটন, নক্ষত্রচ্যুতি ও ভূমিকম্পাদি প্রকৃতিজাত দুর্ঘটনাতে যে জগতে এইরূপ ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ও অনিষ্ট অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতেছে ইহার দ্বারা জগতের নৈতিক-শিক্ষার কি কাজ হইতেছে বা কি প্রকার মঙ্গল সাধিত হইতেছে? পরন্তু ইহা ত মনুষ্যের স্বাধীনতা-জনিত বা অজ্ঞানতাপ্রসূত দুষ্কর্ম্ম নহে যে যাহাতে ভবিষ্যতে এতাদৃশ ব্যাপার না ঘটে তজ্জন্য কর্ত্তব্যের প্রায়শ্চিত্ত বিধানকরতঃ সন্তুষ্ট থাকিব? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়া

খুব অসমীচীন না হইলেও কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলে ইহা সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে এইরূপ ঘটনেরও একটি সুযুক্তি আছে। আমরা পৃথিবীর লোক। জন্মগ্রহণ করার পরমুহূর্ত্ত হইতে মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পৃথিবীর সঙ্গে সম্বন্ধ। পৃথিবীর কথাই পূর্ব্বে বিবেচিত হউক। পৃথিবীতে ভূমিকম্প একটি দুর্ঘটনা। ভগবান কেন মানবশিশুর উপর এই অমঙ্গল টানিয়া দিলেন ?

পূর্ব্বেই নির্দ্দেশিত হইয়াছে যে ভগবান সর্ব্বশক্তিমান হইলেও উচ্ছৃঙ্খল নহেন। পরম সত্য প্রাকৃতিক নিয়ম তিনি উল্লঙ্ঘন করেন না। এই পৃথিবী আদি অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইতে কত যুগ-যুগান্তর অতিবাহিত হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে ? পৃথিবীর এবম্প্রকার অবস্থাপ্রাপ্তি কি প্রকারে সম্ভব হইয়াছে তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছেন এবং তাহা অসত্য বলিয়া কোন প্রমাণ দেওয়া যায় না। তরল পদার্থ নানাপ্রকার প্রাকৃতিক নিয়মচালিত শক্তির ঘাতপ্রতিঘাতে বহু শতাব্দী পরে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সার পদার্থে পরিণত হয় এবং উত্তরোত্তর উক্ত প্রণালীতে সেই তরল পদার্থসমূহ পৃথিবীর বর্ত্তমান আকার-ধারণ করে। এই মধ্যযুগে পৃথিবীর বুকের উপর দিয়া কত শত ঝড় ঝঞ্চাবাত প্লাবন উত্থান পতন কম্পন উল্লম্ফন চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবী যেমন ক্রমে ক্রমে পূর্ণ-সৌষ্ঠবতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘাতপ্রতিঘাতজনিত গাঢ় পদার্থের কম্পন উল্লম্ফনও উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। যে শুভ-মুহূর্ত্তে এই পৃথিবী পূর্ণ-সৌষ্ঠবতা প্রাপ্ত হইবে কেবলমাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতেই সকল প্রকার অনিষ্টজনক প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা অর্থাৎ ভূমিকম্পাদির সম্ভাবনা নষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নভোমণ্ডল সম্বন্ধেও সেই কথা। কোন ধীশক্তিসম্পন্ন মানব ইচ্ছা করেন না যে ভূমণ্ডল বা নভোমণ্ডল পূর্ণ-সৌষ্ঠবতা প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানবসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা নাই। এতন্নিবন্ধন নানা-প্রকার সাময়িক অনিষ্টাশঙ্কা সত্ত্বেও সুদূর ভবিষ্যতের সেই শুভ মুহূর্ত্তাগম অপেক্ষা করার বিনিময়ে ভূমণ্ডল মানব-বাসোপযোগী আকার ধারণ করিলেই মানব সৃষ্টি সুলভ মনে করা হইয়াছে। সুতরাং এতাদৃশ প্রকৃতি-নিয়ম-জাত সাময়িক অনিবার্য্য বিপদসমূহ ভগবদ্‌কার্য্যের ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতার পরিচায়ক নহে—ইহা কেবলমাত্র সদুদ্দেশ্যকৃত কর্ম্মের অনিবার্য্য পারিপার্শ্বিক ফলমাত্র।

এক্ষণে আমরা অনায়াসে এই চরমসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে এই জগতের কি শারীরিক, কি মানসিক, কি নৈতিক, কি প্রাকৃতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি আধিভৌতিক, কি আধিদৈবিক—সকল প্রকার দুঃখ-কষ্টের—এমন কি পাপপ্রলোভনাদিরও যে কেবলমাত্র অস্তিত্ব আছে তাহা নহে, পরন্তু পরমমঙ্গলময় পরমেশ্বরের মঙ্গলময় বিধান অক্ষুণ্ণ রাখিতে ব্যাপকরূপে গৃহীত এই অমঙ্গলরাশির একান্ত প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।



সাময়িকী

নেমাস্থার নির্দ্ধারণ—

নূতন শাসন সংস্কারের কথা যখন আলোচিত হয়, তখন অনেকেরই যাহা বিশ্বাস হইয়াছিল, সেই কথা ভারত-সরকারের বর্ত্তমান ব্যবস্থাসচিব স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ভারত-সভায় যখন তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয় তখন তিনি বলিয়াছিলেন, আমরা শাসন সংস্কার চাহিয়াছিলাম এবং পাইতেছি বটে, কিন্তু তাহার ফল কি হইবে মনে করা দুষ্কর। যদি আমাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হয়, তবে গণতন্ত্রমূলক শাসন-পদ্ধতির ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহিত হইবে? বাস্তবিক মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার যে প্রায় সকল দিকেই ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার সর্ব্বপ্রধান কারণ অর্থাভাব। আমাদের প্রধান কথা বাঙ্গালা লইয়া; এই বাঙ্গালায় আমরা দেখিয়াছি, অর্থাভাবে সেচের ব্যবস্থা হয় নাই, নদীর সংস্কার হয় নাই, শিল্প প্রতিষ্ঠা হয় নাই, স্বাস্থ্যোন্নতির উপায় হয় নাই—এমন কি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করাও সম্ভব হয় নাই অর্থাৎ যাহা লইয়া সরকারের প্রতি লোক আকৃষ্ট হইতে পারে, তাহার কিছুই হয় নাই। কেবল পুলিসের ব্যয় বাড়াইয়া আর সরকারের তরবারি আস্ফালন করিয়াই মানুষকে সরকারের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় না। মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের সময় প্রদেশসমূহের সঙ্গে ভারত সরকারের লেন-দেনের যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালার প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অবিচার হইয়াছিল। এমন কি, শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাকে ভিক্ষার্থী হইয়া ভারত সরকারের দ্বারে দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। ভারত সরকার যে উদারতার পরিচয় দেন নাই, তাহাও সকলেই জানেন। উদারতার পরিচয় দিবার সুবিধাও তাঁহাদের ছিল কি না সন্দেহ। কেন না তাঁহাদের আত্মরক্ষার উপায়ও যে অধিক ছিল এমন বলা যায় না। এই অর্থাভাবের মূলে যে কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা রহিয়াই গিয়াছে। এ দেশের শাসনপদ্ধতি দেশের লোকের আর্থিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া রচিত হয় না। এই শাসনপদ্ধতি বিদেশীদিগের দ্বারা রচিত হইয়াছিল। যখন যেমন প্রয়োজন হইয়াছে, তাহাতে তখন তেমনই পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে এবং সর্ব্বক্ষেত্রে বিদেশীদিগের স্বার্থের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রক্ষা করা হইয়াছে। সে শাসন স্বৈর-শাসন ছিল বলিয়াই শাসনের সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। কেন না, স্বৈর-শাসনেই কতকগুলি লোক যেমন অধিক অর্থ লয়, তেমনই আবার মোটের উপর ব্যয়ের আধিক্য থাকে না। কিন্তু গণতন্ত্র এই ব্যবস্থা সমর্থন করে না। যখনই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় বাড়িয়াছে এবং সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার কোন পথই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হয়। সে কালে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যা একটি প্রদেশ ছিল। এই একটি প্রদেশ মাত্র একজন ছোটলাট একজন চিফ সেক্রেটারী লইয়া শাসন করিতেন। কাজেই শোষণের পরিমাণ অল্প ছিল। শাসনসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অল্পদিন পূর্ব্বে যে লাটের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার শাসন-পরিষদ ও মন্ত্রিমণ্ডল একেবারে সাতজন লোক লইয়া গঠিত হইল। এই সাত জনের বেতন আবার সিভিলিয়ানী বেতনের সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় স্থাপিত হইল। এইরূপ বেতনের চাকরী এ দেশে পূর্ব্বে অধিক ছিল না। তিনজন মন্ত্রীর বেতনে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় হইতে লাগিল। আর সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরের বহরও বাড়িয়া গেল। এ দিকে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালার অঙ্গচ্যুত হইল, সুতরাং বাঙ্গালার আয় কমিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন। ব্যয় হ্রাস করিবার প্রকৃত পথ অবলম্বিত হইল না। শাসন সংস্কার প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে একবার—আর পরে একবার—বড় কর্ম্ম-চারীদের বেতনের হার বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে বাঙ্গালা সরকার প্রায় দেউলিয়া হইয়া উঠিল। অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে প্রতি বৎসর দুই কোটি টাকা ঋণ করিয়াও বাঙ্গালার লোকের প্রকৃত কল্যাণকর কোন কাজ চালান সম্ভব হইল না। এই সময়ে বাঙ্গালার লোক নিরুপায় হইয়া

দুইটি আয় হইতে লক্ষ টাকা দাবী করিতে লাগিল—(১) পাটের উপর রপ্তানী-শুল্ক (২) বাঙ্গালায় আদায়ী আয়করের টাকা। পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের টাকা লইয়া যে তর্ক-বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, সে দীর্ঘ কথা আলোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই এবং পাঠকগণ একাধিকবার সে বিষয়ে আলোচনা শুনিয়াছেন। যদিও ভারত সরকার দৃঢ়তা সহকারে বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, এ টাকায় বাঙ্গালা আপনার অধিকারের কথা বলিতেই পারে না, তথাপি ভারত সরকারের সে কথা যে অসঙ্গত, তাহা পার্লামেন্টের নির্দ্ধারণে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই নির্দ্ধারণেই স্বীকার করা হয়, যে প্রদেশে উৎপন্ন পাটের উপর রপ্তানী শুল্কে যত টাকা আদায় হইবে সে প্রদেশকে তাহার অন্ততঃ অর্দ্ধাংশ দিতে হইবে। "হোয়াইট পেপারের" এই নির্দ্ধারণ নূতন ভারত শাসন আইনে গৃহীত হইয়াছে।

এদিকে ভারত সরকারও বিশেষ বুঝিয়াছেন, বাঙ্গালার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র একটা ব্যবস্থা না করিলে বাঙ্গালা বঙ্গোপসাগরের জলে না ডুবিলেও আর্থিক দুর্গতির গোষ্পদেই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সেই জন্য ১৯৩৪।৩৫ খৃষ্টাব্দের বাজেটের আলোচনার সময় ভারত সরকারের অর্থ-সচিব বলিয়াছিলেন, বাঙ্গালার সম্বন্ধে কিছু না করিলেই নহে। সেই জন্য তিনি স্থির করেন, হোয়াইট পেপারের নির্দ্ধারণানুসারে পাটের রপ্তানী শুল্কের টাকার অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালা সরকারকে দেওয়া হইবে। বাঙ্গালাকে কোনরূপ সাহায্য দানের প্রস্তাবে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি যে সব প্রদেশ একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতেন, তাঁহারও এ প্রস্তাবে আপত্তি করিতে পারেন নাই। কিন্তু ইহাতে যে বাঙ্গালার দুঃখ ঘোচে নাই, তাহা বাঙ্গালীকে আর নূতন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না। দুঃখ ঘুচিবে কিরূপে? যাহার সাধারণ শাসনব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বৎসরে দুই কোটি টাকার প্রয়োজন, সে বার্ষিক ৫০ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা লইয়া কিরূপে আপনার অভাব পূরণ করিতে পারে?

নূতন শাসনপদ্ধতিতে সে দুঃখ ঘুচিবার কোন উপায় হয় নাই। তাহার একমাত্র কারণ এই যে ভারত সরকারের বাজেটে যে টাকা উদ্বৃত্ত হইবে সার অটো নিমায়ার তাহারই বণ্টনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। আয় বৃদ্ধির বা ব্যয় হ্রাসের কোন ব্যবস্থা তিনি করেন নাই—করিবার ভারও তাঁহার উপর ছিল না। ইহার উপর আবার নবগঠিত সিন্ধু ও উড়িষ্যা প্রদেশদ্বয়কে—"ঘর বসতের জন্য" টাকা দিতে হইয়াছে; এক সিন্ধুকেই এক কোটির অধিক টাকা না দিলে কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ সম্বন্ধেও প্রায় ঐরূপ টাকার ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন উড়িষ্যাকে ৪০ লক্ষ, আসামকে ৩০ লক্ষ এবং যুক্ত-প্রদেশকে ৫ বৎসরের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা দিয়া নূতন শাসন-পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। সুতরাং সার অটো নিমায়ারের পক্ষে অধিক উদার হইবার উপায়ও যে ছিল না, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। তিনি স্বয়ং যে তাহা বোঝেন নাই এমন নহে এবং বুঝিয়াই একটু আশার সুযোগ লোককে দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখনই রেলের আয় ও আয়করের টাকা বৎসরে তের কোটি টাকার উপর উঠিবে, তখনই নিম্নলিখিত হারে ঐ অতিরিক্ত টাকা প্রদেশ-গুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে—

বাঙ্গালা	২০
বোম্বাই	২০
মাদ্রাজ	১৫
যুক্তপ্রদেশ	১৫
বিহার	১০
মধ্যপ্রদেশ	৫
আসাম	২
সিন্ধু	২
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত	১

কিন্তু কিছুকাল হইতে রেলে যেরূপ লোকসান হইতেছে, তাহাতে সে লোকসান পূরণ হইয়া লাভের খাতে কিছু পড়িতে অনেক দিন লাগিবে। সামরিক প্রয়োজনে যে সব রেলপথ রচিত হইয়াছে, সে সব ধরিলে কত কালে যে লাভ হইবে তাহা বলা দুষ্কর। সুতরাং ঐ আশায় যদি থাকিতে হয়, তবে সার অটো নিমায়ারের নির্দ্ধারণের কলস গলায় বাঁধিয়া আমাদিগকে বিনাশের সলিলেই আত্মবিসর্জ্জন করিতে হইবে।

আপাততঃ কি পাওয়া যাইবে, তাহাই দেখা যাউক। সার অটো নিমায়ার যত সদুদ্দেশ্যপরায়ণই কেন হউন না, তাঁহার হাতে বণ্টন করিবার টাকা অধিক ছিল না। অপেক্ষাকৃত অল্প টাকা লইয়াই তাঁহাকে কাজ সারিতে

হইয়াছে। তাঁহার হিসাবে বাঙ্গালার ভাগ্যে বার্ষিক আয় বৃদ্ধি ৭৫ লক্ষ টাকা। এই ৭৫ লক্ষ টাকার হিসাব আবার এইরূপ—

(১) গত কয় বৎসরে বাঙ্গালা সরকারকে বাধ্য হইয়া যে টাকা ঋণ করিতে হইয়াছে, সে টাকা আর ভারত সরকারকে ফিরাইয়া দিতে হইবে না। তাহা হইলেই সেই বাবদে দেয় বার্ষিক ৩৩ লক্ষ টাকা হইতে বাঙ্গালা অব্যাহতি লাভ করিবে।

(২) এই ৩৩ লক্ষ ব্যতীত বাঙ্গালাকে পাটের রপ্তানী শুল্কের আরও শতকরা সাড়ে ১২ টাকা দেওয়া হইবে। ইহাতে বাঙ্গালার আয় ৪২ লক্ষ টাকা বাড়িবে।

যদি পাট শুল্কের আয় সবটাই বাঙ্গালা পাইত, তাহা হইলে বাঙ্গালার অতিরিক্ত আয় যাহা হইত তাহাতে তাহার সাধারণ শাসনকার্য্যের জন্য আর ঘাটতি হইত না। কিন্তু এখন যাহা হইল, তাহাতেও ঘাটতির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় এক কোটি টাকা থাকিয়া যাইবে। কেবল তাহাই নহে, এই শতকরা সাড়ে ১২ টাকায় যে আমরা ৪২ লক্ষ টাকাই পাইব তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না। কারণ পাটের উপর এই রপ্তানী-শুল্ক হ্রাস করিবার যে প্রয়োজন হইতে পারে, তাহার লক্ষণ ভালরূপই দেখা যাইতেছে। সকল দেশই পাটের পরিবর্ত্তে থলিয়া প্রভৃতির জন্য অন্য নানা জিনিষ ব্যবহারের চেষ্টা করিতেছে। ইহার কারণ এই যে এখন আর কোন দেশই নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহে না। তথাপি যে তাহারা পাটের ব্যবহার বন্ধ করিতে পারে নাই, তাহার একমাত্র কারণ পাটের মূল্যের অল্পতা। এই স্বল্পতা যে দিন থাকিবে না, সেই দিনই দুনিয়ার বাজারে পাটের চাহিদা কমিয়া যাইবে। মূল্য কম রাখিতে হইলে এই শুল্কের পরিমাণ হ্রাস করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কাজেই ৭৫ লক্ষ টাকাই যে আমরা পাইব, এ আশা অদূর ভবিষ্যতে দুরাশাও হইতে পারে। এ অবস্থায় বাঙ্গালার পক্ষে সার অটো নিমায়ারের নির্দ্ধারণ মরুভূমিতে মৃগতৃষ্ণিকা ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে?

যে বাঙ্গালা সরকার আজ প্রায় ১৮ বৎসর ধরিয়া সমগ্র পাটশুল্ক পাইবার জন্য তারস্বরে চীৎকার করিয়া আসিয়াছেন, সেই সরকার যে সার অটো নিমায়ারের নির্দ্ধারণে আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন মনে করিবেন, ইহা মনে হয় না। বাঙ্গালা সরকার কি করিবেন বা না করিবেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরা—বাঙ্গালার লোক—এই নির্দ্ধারণে কোনরূপেই সন্তুষ্ট হইতে পারি না। আমরা পাটের রপ্তানী-শুল্কের সমস্ত টাকা আমাদের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য বলিয়া দাবী করি। ইহা ব্যতীত আমাদিগকে আয়করের অন্ততঃ কতকাংশ দিতেই হইবে। এই স্থলে বলা যাইতে পারে, আয়কর হইতে সরকারের যে টাকা হয়, তাহার শতকরা ৩৬ টাকা অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশেরও অধিক বাঙ্গালায় আদায় হইয়া থাকে। যে প্রদেশ বৎসরে এত টাকা আয়কর হিসাবে আদায় করে তাহাকে সেই করের টাকায় বঞ্চিত করা কিরূপে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? সকলেই অবগত আছেন, বাঙ্গালায় লোকপ্রতি ব্যয় বিহার ও উড়িষ্যা ব্যতীত আর সব প্রদেশের তুলনায় অল্প। কাজেই বাঙ্গালার আয় বৃদ্ধি যত প্রয়োজন, তত বিহার ও উড়িষ্যা ব্যতীত আর কোন প্রদেশের নহে। শিক্ষায় হউক, চিকিৎসায় হউক, অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাঙ্গালার ব্যয় করিবার ক্ষমতা অনেক অল্প। অথচ বাঙ্গালার স্বাস্থ্য যত শোচনীয় তত আর কোন প্রদেশেরই নহে। এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, সার অটো নিমায়ারের নির্দ্ধারণ কোনরূপেই বাঙ্গালার অভাব বিবেচনায় তাহার উপযোগী বলা যায় না।

সংক্ষেপে—আমরা বর্ত্তমানে কি চাহিতেছি তাহা এইরূপে বলিতে পারি—

(১) পাটের উপর রপ্তানী শুল্কের সমগ্র আয় বাঙ্গালাকেই দিতে হইবে।

(২) আয়করের যে টাকা বাঙ্গালায় আদায় হইবে, তাহার অন্তত অর্দ্ধাংশ বাঙ্গালাকে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) বাঙ্গালা সরকারকে দেশের লোকের নির্দ্ধারণ অনুসারে ব্যয় সঙ্কোচ করিতেই হইবে।

বাঙ্গালা সরকার মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের পর দুইবার ব্যয় সঙ্কোচের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য কমিটী গঠিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু কমিটীর নির্দ্ধারণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান নাই অর্থাৎ সে সকল নির্দ্ধারণ

তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, মন্ত্রী ও শাসন-পরিষদের মেম্বারের সংখ্যা হ্রাস করিতেও তাঁহাদিগের মন সরে না। নূতন শাসনসংস্কারেও তাঁহারা এই ব্যয় হ্রাস করিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সার অটো নিমায়ার বাঙ্গালার প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে পারেন না—করিবার প্রয়োজনও তাঁহার নাই। কিন্তু বাঙ্গালার ব্যবস্থা যদি বাঙ্গালীকেই করিতে দেওয়া না হয়, তবে সে ব্যবস্থা অব্যবস্থাই হইতে পারে, এ সম্ভাবনার বিষয় উপেক্ষা করা চলে না। বাঙ্গালার যদি প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হয়, তবে আপাতত প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। সেই প্রয়োজন কিসে সিদ্ধ হইতে পারে, সে বিষয়ে বাঙ্গালা সরকার ও ভারত সরকার বাঙ্গালীর মত লইয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

কংগ্রেস—

এবার লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু সভাপতি হইয়াছিলেন। ইহাতেই কংগ্রেসের চিরাগত একটি পদ্ধতি পরিত্যাগ করা হইয়াছিল। কংগ্রেসের স্থাপনাবধি ৫০ বৎসরকাল এই শিষ্টাচারসঙ্গত ব্যবস্থা লক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সে প্রদেশের কেহই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন না। যদি পণ্ডিত জওহর লালকে কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহিত করিতে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন বলিয়াই অনুভূত হইয়াছিল, তবে তাঁহাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি করিলে যে সে কাজ একেবারেই অসিদ্ধ হইত এমন মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টা ও বিশেষ উদ্যোগে জওহর লালজীই সভাপতি হইয়াছিলেন। অনেকের বিশ্বাস, সমাজতন্ত্রী দলের সহিত ধনিক দলের—স্থায়ী না হইলেও একটা অস্থায়ী—ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় মহাত্মা গান্ধী এই কাজ করিয়াছিলেন। সমাজতন্ত্রী দলে জওহর লালের প্রভাব অসাধারণ এবং তিনি চেষ্টা করিলে সে দলকে জমীদার, ব্যবসায়ী, কলকারখানার মালিক, ব্যবহারাজীব প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেসের মধ্যে রাখিতে পারিবেন, এই আশাতেই নাকি মহাত্মাজী—প্রত্যক্ষভাবে কংগ্রেসে না থাকিলেও পরোক্ষভাবে—তাঁহার সভাপতি নির্ব্বাচন হইতে প্রায় সকল ব্যাপারেই আপনার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গতবার কংগ্রেসের অধিবেশনের পর আমরা যেমন বলিয়াছিলাম কংগ্রেস দেশের লোককে ভবিষ্যৎ কার্য্য সম্বন্ধে কোনরূপ নির্দ্দেশ দেন নাই, এবারও তেমনই বলিতে হইতেছে, সেরূপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ পাওয়া গেল না। অথচ বর্ত্তমানে তাহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একদিকে শাসনপদ্ধতির পরিবর্ত্তন, আর একদিকে দেশের রাজনীতি-ক্ষেত্রে নানা মতের সংঘর্ষ—আর ব্যবসা মন্দায় দেশের দুর্গতি ও বেকারসমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি, এই সকলের সম্মিলনে যে অবস্থার উদ্ভব হইতেছে, তাহাতে দেশকে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দান ব্যতীত কিছুতেই কংগ্রেসের সার্থকতা সাধিত হইতে পারে না।

এবার কংগ্রেসের অধিবেশনে লক্ষ্য করিবার বিষয়গুলির মধ্যে একটিতে বাঙ্গালার লজ্জিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। কংগ্রেসে বাঙ্গালার স্থান ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির দলাদলিতে যে কংগ্রেসে বাঙ্গালার মত অনায়াসেই উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা বুঝিয়াও যে বাঙ্গালার কংগ্রেসকর্ম্মীরা আপনাদের বিবাদ আপনারা মিটাইয়া লইতে পারিতেছেন না, এ দুঃখ রাখিবার স্থান বাঙ্গালার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বার বার বাঙ্গালার এই দ্বন্দ্বে হস্তক্ষেপ করিবার জন্য অন্য প্রদেশ হইতে বিচারক আনা হইয়াছে এবং তার পর বিচারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। এ অবস্থায় মীমাংসার আশা যে সুদূরপরাহত, তাহা বলা বাহুল্য।

লক্ষ্ণৌনগরে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে বাঙ্গালার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। লক্ষ্ণৌ সহরে কংগ্রেসের ইহাই তৃতীয় অধিবেশন। প্রথম অধিবেশন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে; এই অধিবেশনের সভাপতি বাঙ্গালী রমেশচন্দ্র দত্ত। দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে; তাহাতেও সভাপতি বাঙ্গালী অম্বিকাচরণ মজুমদার। ইহা হইতেই তৎকালে কংগ্রেসে বাঙ্গালীর প্রভাব বুঝিতে পারা যায়। আর এবার লক্ষ্ণৌয়ের অধিবেশনে বাঙ্গালী একেবারেই অবজ্ঞাত। এই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার জন্য কেবল অন্য প্রদেশের

লোকের ঈর্ষাকেই দায়ী করিলে চলিবে না। বাঙ্গালীর যদি স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা থাকিত, তবে তাহাকে অবজ্ঞা করিবার সাধ্য কাহারও থাকিত না। অবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে কেহ কেহ এমন সন্দেহও করিতেছেন যে বাঙ্গালার কংগ্রেসী দলে এই যে দলাদলি, ইহারই পশ্চাতে অন্য কোন দলের গূঢ় অভিসন্ধি বিদ্যমান রহিয়াছে। এ কথা সত্য কি না বলা যায় না এবং সত্য হইলেও বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই—বাঙ্গালায় যে দুইটি দল কংগ্রেসের মধ্যে বিবদমান, তাঁহাদের একটিতে



জওহরলাল নেহেরু

এমন লোকেরও অভাব নাই যাঁহারা প্রকাশ্যে স্বীকার করিয়াছেন যে কংগ্রেসের সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল তাহাই নহে, কংগ্রেসের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ না থাকিলেও সরকারের সহিত তাঁহাদের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়।

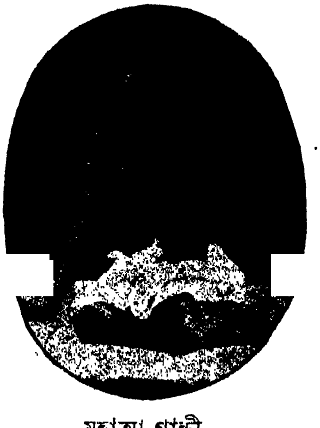
কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে। ইনি যে বিনা-বিচারে বন্দী হইয়া আছেন তাহা জানিয়াও যখন তাঁহাকে মনোনীত করা হইয়াছে, তখন কেন যে তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে আর কাহাকেও তাঁহার পরিবর্ত্তে কাজ করিতে দেওয়া হইল না, তাহাতে অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিতেছেন। সুভাষবাবু বলিয়াছেন, কংগ্রেস যদি তাঁহাকে কংগ্রেসের পক্ষ হইতে বিদেশে প্রচার কার্য্য পরিচালনার অধিকার দিতেন, তবে তিনি সে কাজ পরিচালিত করিতে পারিতেন এবং হয় ত গ্রেপ্তার ও আটক নিশ্চয় জানিয়া স্বদেশে ফিরিতেন না। সে সম্বন্ধে সভাপতি কৈফিয়ৎ দিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র সে অধিকার চাহিয়া যে কোন পত্র লিখিয়াছিলেন, এমন সন্ধান কংগ্রেসের দপ্তরে পাওয়া যায় না। অথচ সুস্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে, কংগ্রেস তাহার এই অধিকার যাচ্ঞার বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না এবং এ বিষয়ে কংগ্রেসের অজ্ঞতা প্রকাশের কোন কারণ থাকিতে পারে না।

যে বাঙ্গালীর চেষ্টায় কংগ্রেস স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল এবং কংগ্রেস দীর্ঘকাল যে বাঙ্গালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, সেই বাঙ্গালা যদি আজ কংগ্রেসে অন্য কোন প্রদেশের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা অনিবার্য্য বলিয়া গ্রহণ করে, তবে তাহাতে বাঙ্গালার আত্মসম্মানজ্ঞানের অভাব ব্যতীত আর কিছুই সপ্রকাশ হইবে না। এ অবস্থায় বাঙ্গালীর কর্ত্তব্য কি তাহা অবশ্যই বাঙ্গালীকে বলিয়া দিতে হইবে না। বাঙ্গালাকে এখন স্বাবলম্বী হইয়া আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং বাঙ্গালীর নেতৃত্বে এমনভাবে একতাবদ্ধ হইতে হইবে যে সরকার বা কংগ্রেস কেহই কোন বিষয়ে বাঙ্গালার মত অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। যদি বাঙ্গালা ইহা না করিতে পারে, তবে তাহাকে অনিবার্য্য দুর্গতি হইতে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

গ্রাম উদ্যোগ সংঘ—

মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের রাজনীতিক কার্য্যের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, তখন তিনি কংগ্রেস কর্ত্তৃক গঠিত "নিখিল ভারত গ্রাম উদ্যোগ সংঘ" নামক একটি প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের গ্রামগুলির অবস্থা সর্ব্বপ্রকারে উন্নত করাই এই সংঘের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। ঐ সংঘ ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে যে কাজ করিয়াছেন, তাহার একটি বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহাই সংঘের

প্রথম বার্ষিক কার্য্য বিবরণ। প্রথমে লোক মনে করিয়াছিল যে, সংঘ শুধু কুটীর শিল্পসমূহের পুনরুজ্জীবনেই সকল শক্তি ব্যয় করিবেন। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে, সংঘ তাহা না করিয়া গ্রামবাসী দরিদ্র অশিক্ষিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্যোন্নতি এবং তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার্য্য দানের ব্যবস্থাতেও মনোযোগী হইয়াছেন। আমাদের খাদ্য সমস্যা বর্ত্তমানে কিরূপ জটিল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। কেহ চেষ্টা করিলেও কলিকাতার মত বড় সহরে বসিয়া ঢেঁকিছাঁটা চাউল, যাঁতায় ভাঙ্গা গম, ঘানির তৈল প্রভৃতি ভেজাল-হীন খাদ্য সহজে সংগ্রহ করিতে পারেন না। এই গ্রাম-উদ্যোগ-সংঘ সে জন্য সর্ব্বপ্রথমে সেইরূপ কতকগুলি খাদ্য সরবরাহে মন দিয়াছেন। এই সকল খাদ্য সরবরাহ করিতে গেলেই যে কুটীর-শিল্পের প্রকারান্তরে সাহায্য করা হয়, তাহা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। চাউলের কলের সহিত প্রতিযোগিতায় আমাদের ঢেঁকী অচল হইয়া গিয়াছে; আটার কলের প্রচলনের ফলে আটা ভাঙ্গিবার যাঁতা আর দেখা যায় না; কানপুরের তেলের কলগুলি সমগ্র ভারতের ঘানি অচল করিয়া দিয়াছে। সংঘের চেষ্টার ফলে দেশে আবার নানাস্থানে ঢেঁকী, যাঁতা ও ঘানির প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কলগুলির মারফতে দেশে যে ভেজাল খাদ্য চলিয়াছে, সংঘ যদি তাহার গতিরোধ করিতে কথঞ্চিত পরিমাণেও সফল হয়েন তাহা হইলে তাহা কম শ্লাঘার কথা হইবে না। চাউল, আটা ও তেল ভারতবাসীর সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিক প্রয়োজনীয় খাদ্য। ঐ খাদ্যদ্রব্যগুলি যদি অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়, তবে তাহাতে ভারতবাসী তাহাদিগের হৃতস্বাস্থ্য অচিরেই পুনরায় লাভ করিতে পারিবে। ঐ সঙ্গে সংঘ গুড় প্রস্তুত কার্য্যে উৎসাহদান করিতেছেন। নানাস্থানে নারিকেল ছোবড়া হইতে দড়ি প্রস্তুত হইতেছে, কাপড় কাচা সাবান যাহাতে আর বিদেশ হইতে আমদানী করিতে না হয় সে জন্যও সংঘ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। সংঘের আর একটি কার্য্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশে মৃত পশুগুলি গ্রামের বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়; সেগুলিকে কোনপ্রকারে কাজে লাগাইবার কোন চেষ্টাই করা হয় না। সংঘের ব্যবস্থায় অনেক স্থানে মৃত পশুর চামড়া কাজে লাগান হইতেছে; চামড়া পরিষ্কার করিয়া সিরিষ প্রস্তুত হয়; চর্ব্বি বা তেল জ্বালানি হিসাবে কারখানার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়; মাংস, হাড় ও রক্ত শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া তদ্দারা জমীর সার প্রস্তুত করা হয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, মৃত পশুর দেহের কোন অংশই যাহাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য সংঘ ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নাই। সংঘের প্রধান কার্য্যালয়ের জন্য শেঠ যমুনালাল বাজাজ ওয়ার্দ্ধা সহরে একটি প্রকাণ্ড বাটী ও ৪৫ বিঘা জমী দান করিয়াছেন। তাহার পার্শ্বে আরও ৬০ বিঘা জমী পাওয়া যাইবে। অপর একজন ভদ্রলোক সংঘকে ৫০০ পুস্তক দান করিয়াছেন। প্রথম বর্ষেই সংঘ ৪৭ হাজার ৯ শত ৫০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংঘের এই কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে আশান্বিত না হইয়া থাকা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর মত লোক যে সংঘের প্রধান কর্ম্মী, সেই সংঘের দ্বারা দেশ যে লাভবান হইবে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? যখন সংঘ প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আমরা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগকে এই সংঘের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন মাত্র হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের সহযোগিতা ও সাহায্য পাইলে এই সংঘ আরও চতুর্গুণ উৎসাহে কার্য্য করিতে পারেন—দেশবাসী সে আশা কি করিতে পারে?



মহাত্মা গান্ধী

ব্যবস্থা পরিষদে কংগ্রেস দল—

ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদের গত সদস্য নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে কংগ্রেস হইতে স্থির হয় যে, কংগ্রেস দলের কর্ম্মিগণ নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়া পরিষদে প্রবেশ করিবেন। তদনুসারে ৪৪ জন কংগ্রেস সেবক ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাহার পর এই দলের ৪ জন সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং ৪টির মধ্যে তিনটি

স্থান হইতে পুনরায় কংগ্রেস কর্ম্মীরাই নির্ব্বাচনে জয়ী হইয়াছেন। বোম্বায়ের ভূতপূর্ব্ব এডভোকেট জেনারেল শ্রীযুত ভুলাভাই দেশাই পরিষদে কংগ্রেস দলের নেতা নির্ব্বাচিত হইয়া এতদিন কাজ করিয়াছেন। পরিষদের শীতের অধিবেশনে মোট ৩৫ বার সরকারের সহিত শক্তি-পরীক্ষার প্রয়োজন হইয়াছিল এবং কংগ্রেস দল ২৮ বারই অধিক ভোট লাভ করিয়া গভর্ণমেণ্টকে পরাজিত করিয়াছেন। পরিষদের অন্যান্য কয়েকটি দলের সদস্যগণও প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কংগ্রেস দলের সঙ্গে ভোট দিয়াছেন ও তাহার ফলে কংগ্রেস দলের পক্ষে এতবার জয়লাভ করা সম্ভব হইয়াছে। পরিষদে যে "কংগ্রেস জাতীয় দল" আছে তাহার সদস্যগণ শুধু সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ব্যাপারে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন—অপর সকল বিষয়েই কংগ্রেস দলকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন। পরিষদে ৪ দিন ধরিয়া জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটীর রিপোর্ট আলোচিত হইয়াছিল; সভায় কংগ্রেস দল কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই বটে, কিন্তু সমগ্র রিপোর্ট পরিষদ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছিল। রাজনীতিক বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান, ভারতের শ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতি সাধন, সীমান্ত প্রদেশস্থ একটি সম্প্রদায়ের উপর প্রদত্ত আদেশ প্রত্যাহার—প্রভৃতির জন্য পরিষদ হইতে গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছে। পরিষদ ভারত গভর্ণমেণ্টের সৈন্যবিভাগের ও রেল বিভাগের সমস্ত ব্যয় নামঞ্জুর করিয়া দিয়াছিলেন এবং লবণ শুল্ক ও ডাকের মাশুল কমাইয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত ভারত গভর্ণমেণ্টের সমগ্র বাজেটটি পরিষদ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও ভারত গভর্ণমেণ্ট এদেশে যে নীতি পরিচালিত করিতেছেন পরিষদের কংগ্রেস দল তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন এবং বৃটেনের সহিত ভারতের যে বাণিজ্য চুক্তি হইয়াছিল তাহা এখনই বাতিল করিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। পরিষদের সিমলা অধিবেশনও এক মাস কাল চলিয়াছিল এবং তাহাতে কংগ্রেস দলের বাধা প্রদানের ফলে গভর্ণমেণ্টকে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। এবার অর্থাৎ ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের বাজেট অধিবেশনেও কংগ্রেস দলের চেষ্টায় গভর্ণমেণ্টের রেল ও সৈন্য বিভাগের ব্যয় নামঞ্জুর করা হইয়াছে। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতি গভর্ণমেণ্ট যে ব্যবহার করিয়াছেন, পরিষদ তাহার নিন্দা করিয়াছেন। পরিষদ গভর্ণমেণ্টকে লবণ শুল্ক তুলিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন এবং পোষ্টকার্ডের মূল্য অর্দ্ধ আনা করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু গত বৎসরের মত এ বৎসরও বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বলে পরিষদের সকল নির্দ্দেশই পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে কিছু আইসে যায় না। দেশবাসীকে এবং জগতের সকল সভ্য জাতিকে দেখান হইয়াছে যে, ভারতের গভর্ণমেণ্ট এদেশের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের কোন পরামর্শই গ্রহণ করেন না—উপরন্তু সকল সময়েই স্বৈরাচার অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাই দেশের প্রকৃত অবস্থা। কংগ্রেস দল পরিষদে প্রবেশ না করিলে গত কয়েক বৎসরের মত গভর্ণমেণ্ট নির্ব্বিবাদে পরিষদের দ্বারা তাঁহাদিগের ইচ্ছামত সকল কার্য্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতেন। আগামী নভেম্বর মাসে দেশে নূতন নির্ব্বাচন হইবে—এই নির্ব্বাচনে যাহাতে জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিরা অধিক সংখ্যায় সকল প্রাদেশিক পরিষদে প্রবেশ করিতে পারেন, এখন হইতে দেশবাসীদিগকে সে বিষয়ে অবহিত হইয়া আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। নূতন শাসন সংস্কারের দ্বারা দেশ যে লাভবান হইবে না, তাহা জানিয়াও আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের সকল কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে।

ভারতে জাপানের বাণিজ্য—

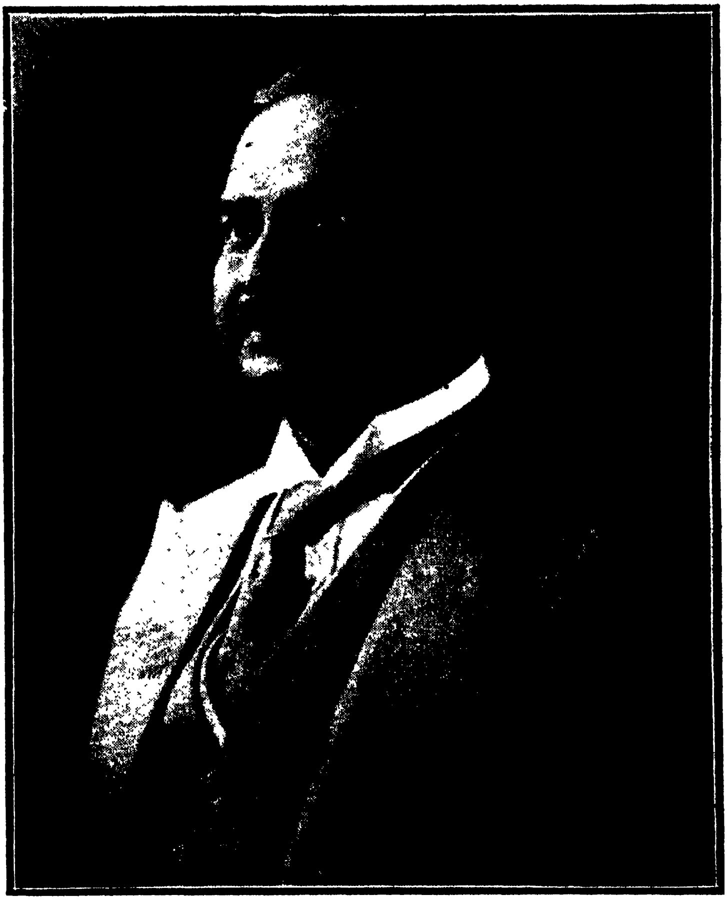
ভারতবর্ষে জাপানী দ্রব্যের ব্যবহার গত ৫০ বৎসরে কিরূপ বাড়িয়া গিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে মাত্র ৫ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের জাপানী মাল ভারতে আমদানী হইয়াছিল; আর ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ভারতে ৫৪ কোটি ৭০ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের মাল আমদানী হইয়াছে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে জাপানে প্রায় কোনপ্রকার শিল্পই ছিল না। শুধু কৃষির উপর নির্ভর করিয়া জাপানবাসীদিগকে দিন যাপন করিতে হইত। তাহার পর তিনটি যুদ্ধের সময় জাপান শিল্পোন্নতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছিল ও ক্রমে ক্রমে শিল্পের উন্নতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। জাপানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা হইয়াছিল, গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময়। সে সময়ে ইউরোপখণ্ডের সকল দেশ যখন

নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লইয়া ব্যস্ত ছিল, তখন সেই সুযোগে জাপান সকল দেশকে শিল্পজাত দ্রব্য সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। জাপানকে বহু কাঁচা মালও আমদানী করিতে হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপানকে ৭৩ কোটি ১০ লক্ষ মুদ্রার তুলা ও ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ মুদ্রার পশম আমদানী করিতে হইয়াছিল। ভারত হইতেই জাপানকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাঁচা মাল সংগ্রহ করিতে হয়; তুলা ও লৌহ—জাপান ভারত হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করিয়া থাকে। জাপান ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে ২০ লক্ষ গাট ভারতীয় তুলা গ্রহণ করিয়াছে। জাপানের রপ্তানী মালের মধ্যে বস্ত্রই সর্ব্বপ্রধান। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে মোট ৪৯ কোটি ১০ লক্ষ মুদ্রা মূল্যের বস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে। মোট জাপানী রপ্তানী মালের উহা শতকরা ৩৭ ভাগ। ভারত যেমন জাপানকে প্রচুর পরিমাণ কাঁচা তুলা প্রদান করে, তৎপরিবর্ত্তে তেমনই প্রচুর জাপানী বস্ত্রও ভারতে আমদানী হইয়া থাকে। এক ইংলণ্ড ছাড়া অন্য কোন দেশ হইতে ভারতে এরূপ অধিক মূল্যের মাল আমদানী হয় না। ভারত হইতে ল্যাঙ্কাসায়ারে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার গাট তুলা রপ্তানী হইয়াছিল; কিন্তু ঐ বৎসর ভারত হইতে জাপানে ২০ লক্ষ গাট তুলা গিয়াছে।

জাপানের সহিত ভারতের নূতন বাণিজ্য সন্ধি হইবার সময় আসিতেছে; এ অবস্থায় উভয় দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক সর্ত্তে যদি সন্ধি হয়, তবেই ভারত রক্ষা পাইবে। নচেৎ ভারতের শিল্পসমূহকে একদিকে বৃটীশের সহিত প্রতিযোগিতা ও অপর দিকে জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা হইতে রক্ষা করা সম্ভব হইবে না।

মেয়র ও ডেপুটী মেয়র—

এবার যে নির্ব্বিবাদে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচন শেষ হইয়াছে, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পাল কোম্পানীর সার হরিশঙ্কর পাল এবার মেয়র ও ব্যবসাক্ষেত্রে সুপরিচিত মিষ্টার আবদার রহিম ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। উভয়েই কলিকাতায় সুপরিচিত। সার হরিশঙ্কর বহুদিন হইতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার থাকিয়া এবং নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া দেশ সেবায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। মিঃ আবদার রহিম ও কলিকাতা কর্পোরেশন, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা, ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিয়াছেন।



মেয়র

আমরা আশা করি দলাদলি হইতে দূরে থাকিয়া উভয়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ



ডেপুটি মেয়র

করিবেন। এবার কর্পোরেশনে কংগ্রেস দল মেয়র ও ডেপুটী মেয়র নির্ব্বাচনে যোগ দেন নাই।

কচুরীপানা নাশ—

কচুরীপানায় বাঙ্গালার কিরূপ ক্ষতি হইতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বহুদিন বহু বিবেচনার পর বাঙ্গালা সরকার অনন্যোপায় হইয়া কচুরীপানা নাশের উদ্দেশ্যে এক আইন প্রণয়ন করিয়াছেন এবং সেই আইন ব্যবস্থাপক সভার সমর্থন লাভও করিয়াছে। কিন্তু আইন অপেক্ষা আদর্শ প্রতিষ্ঠায় কাজ অধিক সম্পন্ন হয়। আমরা দেখিয়া আনন্দ লাভ করিলাম, বাঙ্গালা সরকারের কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী নবাব সার কে, জি, মহিউদ্দীন ফারুকী সাহেব এ বিষয়ে স্বয়ং সচেষ্ট হইয়াছেন। পরিভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি একাধিক স্থানে কচুরীপানা নাশের প্রয়োজন লোককে বুঝাইয়া দিয়া আপনার আদর্শের দ্বারা লোককে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছেন। তিনি স্বয়ং পানাপূর্ণ জলাশয়ে যাইয়া পানা তুলিয়া ফেলিতে আরম্ভ করায় স্থানীয় ইতর ভদ্র সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন এবং জলাশয় পানামুক্ত হয়। তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা যদি ত্যক্ত না হইয়া অনুসৃত হয়, তবে যে অতি অল্পদিনের মধ্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। মন্ত্রীরা যদি আপনাদিগকে দেশের লোক মনে করিয়া দেশের কল্যাণকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তবেই তাঁহারা আপনাদিগকে প্রকৃত popular minister বলিবার অধিকার লাভ করেন। এই কার্য্যের দ্বারা নবাব সাহেব আমাদিগের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।

রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্রনাথ মিত্র—

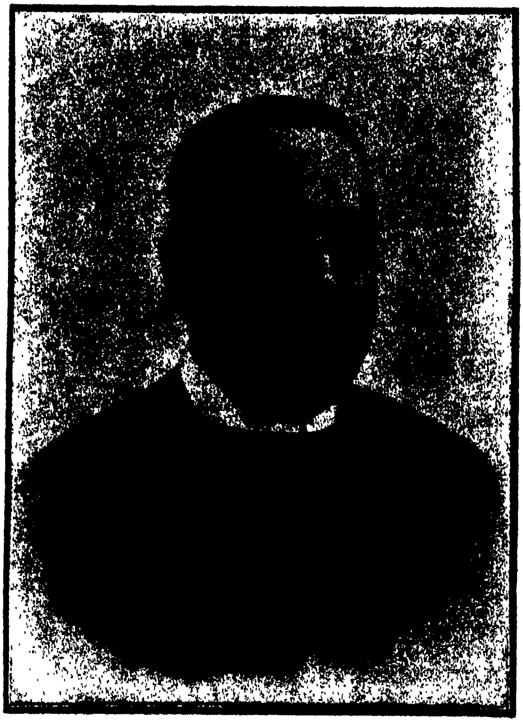
আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম, কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক রায় বাহাদুর শ্রীযুত খগেন্দ্র-নাথ মিত্র মহাশয় আগামী আগষ্ট মাসে ডেনমার্ক দেশের কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের আন্ত-র্জাতিক কংগ্রেসে যোগদান করিবার জন্য ১৬ই মে বিলাত যাত্রা করিতেছেন। রায় বাহাদুর বাঙ্গালা দেশে নানা কারণে সুপরিচিত। তিনি ২২ বৎসর কাল কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের কার্য্য করিবার পর ৮ বৎসর যথাক্রমে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টারের কাজ করিয়া সরকারী চাকরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে খগেন্দ্রনাথ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। খগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে কোন অধ্যাপক স্কুল-ইন্সপেক্টার নিযুক্ত হন নাই এবং শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারী হইয়াও তিনিই সর্ব্বপ্রথম গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবস্থা-পরিষদ ও রাষ্ট্রীয় পরিষদের সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের পাঠকগণের নিকট ভারতবর্ষের লেখক হিসাবে খগেন্দ্রবাবু বিশেষ পরিচিত। খগেন্দ্রবাবু প্রথমে বিলাতে যাইয়া জুলাই মাসে লণ্ডনে জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদের এক সম্মিলনে যোগদান করিবেন। তৎপরে তাঁহার কোপেন-হেগেনে যাইবার কথা। পরিণত বয়সে খগেন্দ্রবাবু এই প্রথম বিলাত যাইতেছেন। আমরা তাঁহার এই যুবজনোচিত উৎসাহের জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করিতেছি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দ্বারা তিনি বাঙ্গালীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিবেন।

শোক-সংবাদ

সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক—

গত ১০ই এপ্রিল ৬৩ বৎসর বয়সে সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের মৃত্যু একান্তই অপ্রত্যাশিত। সুরেন্দ্রনাথের পিতা ভবানীপুরে প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন। তারকেশ্বরের নিকটে সিঙ্গুর তাঁহার বাসগ্রাম। রাজেন্দ্রনাথ স্বীয় চিকিৎসা নৈপুণ্যে যথেষ্ট পসার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পসারের অনুপাতে টাকা রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দয়াশীলতাই তাহার কারণ। সুরেন্দ্রনাথ আইন পরীক্ষায় পাশ করিয়া আলিপুরে ওকালতী করিতে থাকেন। এই সময় হইতেই তিনি রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়েন। তিনি রাজনীতিতে সার সুরেন্দ্রনাথের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন এবং কখনই তাঁহার মডারেট অনুভবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতা যাঁহারা জানিতেন, তাঁহারা তাঁহার এই মতের জন্য তাঁহাকে কখনই দোষ দিতেন না। তিনি সেকালের কংগ্রেসে সুপরিচিত ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিলেন। বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের সুযোগ লইয়া বোম্বাই যখন তাহার কলের কাপড়ের দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি করে, তখন তাহাদিগকে সে কার্য্যে বিরত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে বাঙ্গালা হইতে যাঁহাদিগকে পাঠান হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।

সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙ্গালার স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রী হইয়া যখন কলিকাতা কর্পোরেশনে বেসরকারী চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন, তখন তিনি সুরেন্দ্রনাথকেই সর্ব্বপ্রথম এই পদ প্রদান করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ শাসনসংস্কারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়া নানারূপ সংস্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা সরকারের ব্যয় সঙ্কোচ কমিটীর সদস্য ছিলেন। তিনি যেবার মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, সেবার স্বরাজ্য দলের চেষ্টায় নির্ব্বাচন নাকচ হইয়া যায়। তাহার পর তিনি সচিবের পরামর্শ-পরিষদে সদস্যের পদ লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। তথা হইতে তাঁহার স্নেহভাজন বন্ধু জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল—"বিদেশে নির্ব্বাসনে আসিয়া ধনে প্রাণে আমি যাইতে বসিয়াছি। এখন বুঝিতেছি, দয়াময়ের উদ্দেশ্য যে আমি কষ্টই পাই। কাজেই সব দিক হইতে তাহা সহ্য করিতে হইবে। তোমার মত সস্নেহ বন্ধুবান্ধব ২।৪ জন এখনও দেশে আছেন, এই মাত্র আমাদের ভরসা। অনাশ্রয় পিতৃমাতৃহীন শিশু ভাইঝি ও ভাইপোদের—সম্মানের লোভেই হউক, আর যাহার জন্যই হউক, ছাড়িয়া চলিয়া আসা—এইটাই ! জীবনের



সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাপ। হিন্দুর পক্ষে ইহা অপেক্ষা গুরুতর পাপ বড় বেশী নাই। কাজেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের আরও অনেক বাকী আছে।" * * * "আমি এখানে আসিয়া অবধি একমাত্র মন্ত্র লইয়াছিলাম, non-communal electorate। এখন বুঝিতেছি যে সার জন সাইমন তাহা recommend করিলেও এখানে পার্লামেণ্ট তাহা গ্রহণ করিবে না। মুসলমান ও শিখ উভয়েই কম্যুনাল represen-

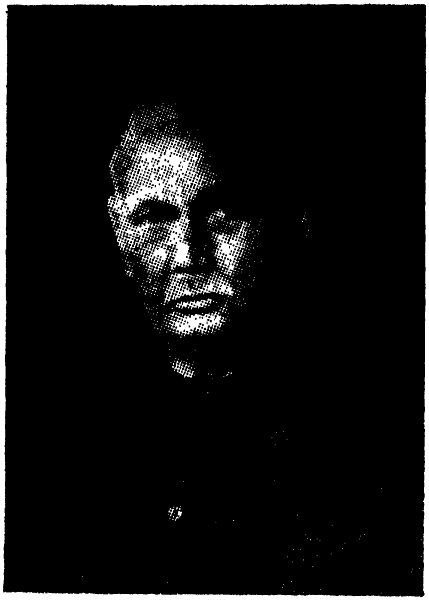
tationএর জন্য নিতান্ত ব্যগ্র। তাহারাই দেশের army race ; কাজেই তাহাদের মত কখনই উপেক্ষিত হইবে না। সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধির ব্যবস্থা থাকিলে শাসন সংস্কারের যতই প্রসার হউক, তাহাতে দেশের কোন উন্নতি হইবে না ; তাই আমার কোন interest নাই। সেই জন্য আমি রাজনীতিক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিব। জঘন্য সাম্প্রদায়িক politicsএ হাত দিতে আর প্রবৃত্তি নাই। জীবনের সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে; দেবতার আরতির আয়োজনই শ্রেয়ঃ। যদি দয়াময়ের ইচ্ছায় ২।৪ দিন শান্তি ও বিশ্রাম লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব।"

দেশে ফিরিয়া তিনি স্বগ্রামের উন্নতি সাধনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। গ্রামের ম্যালেরিয়া মুক্তির চেষ্টা তিনি পূর্ব্ব হইতেই করিতেছিলেন। শেষে লক্ষ টাকা ব্যয়ে তথায় পিতার নামে একটি হাসপাতাল ও মাতার নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। এই বিদ্যা-লয়ের জন্য তিনি প্রায় ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

রাজনীতিতে তিনি মডারেট হইলেও যে দিন কলিকাতায় শ্রীমতী বাসন্তী দেবী প্রমুখ তিন জন মহিলাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে, সে দিন সেই কার্য্যের প্রতিবাদে বড়লাট লর্ড রেডিংএর জন্য অনুষ্ঠিত ভোজসভা হইতে তিনি চলিয়া গিয়া-ছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি ৪ মাসের জন্য বাঙ্গালা সরকারের রাজস্ব সচিবের পদ গ্রহণে সম্মতি দান করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পক্ষে সে পদ গ্রহণ সম্ভব হয় নাই। আমরা তাঁহার বিধবাকে তাঁহার এই শোকে আমাদিগের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

প্রমথনাথ বিশ্বাস—

প্রমথনাথ বিশ্বাসের মৃত্যুতে বাঙ্গালার সাহিত্যিক সমাজ একজন অকৃত্রিম সাহিত্য সেবক হারাইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল। গত ২৯শে চৈত্র তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি স্বগ্রামের প্রসিদ্ধ কবি মনোমোহন বসু মহাশয়ের অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি সাগ্রহে ইংরাজি ও বাঙ্গালা—বিশেষ বাঙ্গালার দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। তাঁহার দক্ষযজ্ঞ ও শকুন্তলা নাটকদ্বয় সাধারণে আদৃত হইয়াছিল এবং ঐ দুইখানি নাটকের জন্য ও অন্য নানা উপলক্ষে তিনি অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত রচনাই খাঁটি বাঙ্গালাভাবে অনুপ্রাণিত। তাঁহার

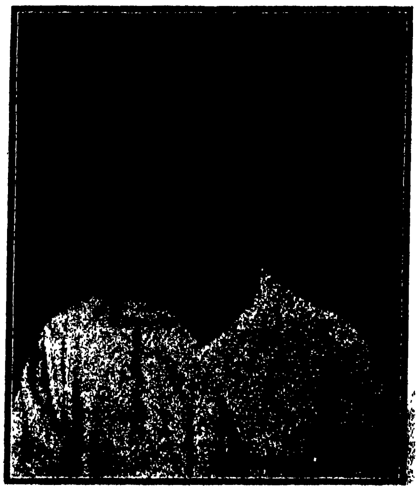


প্রমথনাথ বিশ্বাস

পত্নীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার রচিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক প্রিয়ব্রত সরকার—

বিদ্যাসাগর কলেজের রসায়নবিভাগের খ্যাতনামা অধ্যাপক প্রিয়ব্রত সরকার মহাশয় গত ২রা জ্যৈষ্ঠ মাত্র



প্রিয়ব্রত সরকার

৫৩ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইলাম। তাঁহার আদি নিবাস কলিকাতাতেই; তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে রসায়ন শাস্ত্রে এম-এ পাশ করিয়া প্রথমে কিছুকাল বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। প্রায় ২৩ বৎসরকাল তিনি প্রশংসার সহিত এই কলেজে কার্য্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কলেজের রসায়ন বিভাগের ভার প্রদান করা হইয়াছিল। নিরহঙ্কার, সরল ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য কলেজে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। যৌবনে তিনি ক্রিকেট খেলা ও সন্তরণে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ রায়—

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট পাবনানিবাসী শ্যামাচরণ রায় মহাশয় গত ১২ই মার্চ্চ ৭৭ বৎসর বয়সে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। রায় মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন, তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় তৃতীয়, বি-এ পরীক্ষায় প্রথম ও বি-এল পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার সার নীলরতন সরকার, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং সার আশুতোষের অনুরোধেই তিনি ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে পাবনা হইতে কলিকাতায় ওকালতী করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা ও নির্ভীক ছিলেন এবং চিরদিন সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। তিনি যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগের আদর্শ ক্রমেই লোপ পাইতেছে।



শ্যামাচরণ রায়

ওয়াজিদ আলি খাঁ পানি—

মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত করাটিয়া গ্রামের খ্যাতনামা জমীদার ও জননায়ক ওয়াজিদ আলি খাঁ পানি সাহেব গত ২৭শে এপ্রিল পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের নিকট 'আটিয়ার চাঁদ' বা 'চাঁদ মিয়া' নামে পরিচিত ছিলেন। চাঁদ মিয়া সাহেবের পূর্ব্বপুরুষগণ এদেশে



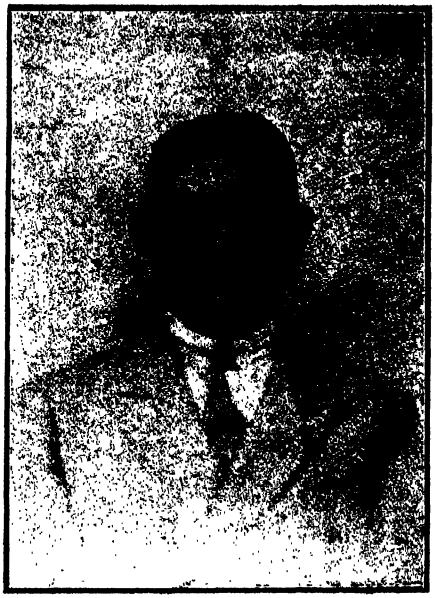
ওয়াজিদ আলি খাঁ পানি

মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে বড় বড় রাজকার্য্য করিয়া প্রভূত ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। চাঁদ মিয়া সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন নাই বটে, কিন্তু নিজ গ্রামের ও প্রজাসাধারণের উন্নতি বিধানের জন্য তিনি যে

সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা সাধারণতঃ অতীব দুর্লভ। তিনি স্বীয় গ্রামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, একটি উচ্চ শ্রেণীর মাদ্রাসা ও একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ স্থাপন ব্যাপারে তিন লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অন্যান্য সৎকার্য্যেও তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি 'ওয়াকফ' করিয়া তাহার আয় জনহিতকর কার্য্যে ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। গত অসহযোগ আন্দোলনের সময় চাঁদ মিয়া সাহেব উক্ত আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন এবং কারাদণ্ড লাভ করিয়া দেশবন্ধু দাশ, মৌলানা আজাদ প্রভৃতির সহিত আলিপুর জেলে বাস করিয়াছিলেন। ধনী হইলেও তিনি কখনও বিলাসী ছিলেন না এবং সহরের চাকচিক্যে মুগ্ধ না হইয়া সারাজীবন গ্রামে বাস করিয়া গ্রামবাসীদিগের দুঃখদুর্দ্দশার প্রতীকারে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার মত জমীদার এদেশে ক্রমেই দুর্লভ হইয়া পড়িতেছে।

জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা—

কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা মহাশয় গত ১১ই বৈশাখ মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা ব্যথিত হইয়াছি। কামরূপ হইতে কলিকাতা ফিরিবার পথে ট্রেনে সহসা [illegible] হওয়ায় তাঁহাকে হাসপাতালে আনিয়া অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাসস্থান হুগলী জেলার জগাদণ্ড গ্রামে। তাঁহার পিতা বৈকুণ্ঠনাথ কাঁথিতে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র তমলুকে উকীল ছিলেন। এম এ ও বি এল পাশ করিয়া তিনি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন—ঐ সঙ্গে প্রথম তিন বৎসর তিনি বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকের কার্য্যও করিয়াছিলেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বিলাতে যাইয়া ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি পরোপকারী ও দেশপ্রেমিক ছিলেন—তাঁহার দেশের বাটীটি তিনি কংগ্রেসের কার্য্যের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক দান ছিল। একান্নবর্ত্তী পরিবারের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি বন্ধু আত্মীয় স্বজনকে প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার দুইটি

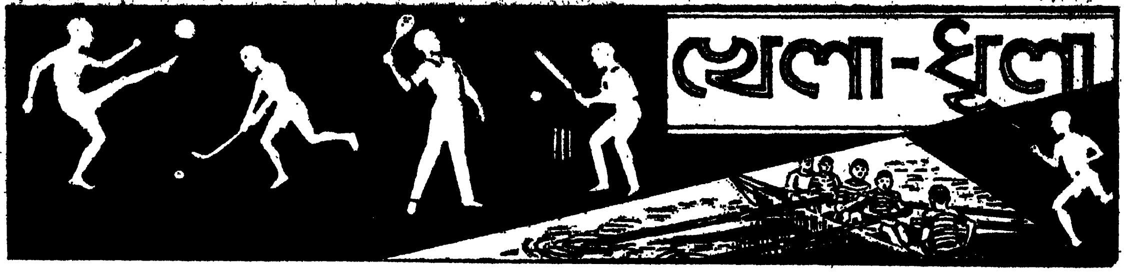


জ্যোতিষচন্দ্র হাজরা

ভ্রাতুষ্পুত্র ও বর্ত্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। জ্যোতিষচন্দ্রের বিধবা পত্নী ও দুই পুত্র বর্ত্তমান।

'ভারতবর্ষে'র প্রচ্ছদপট—

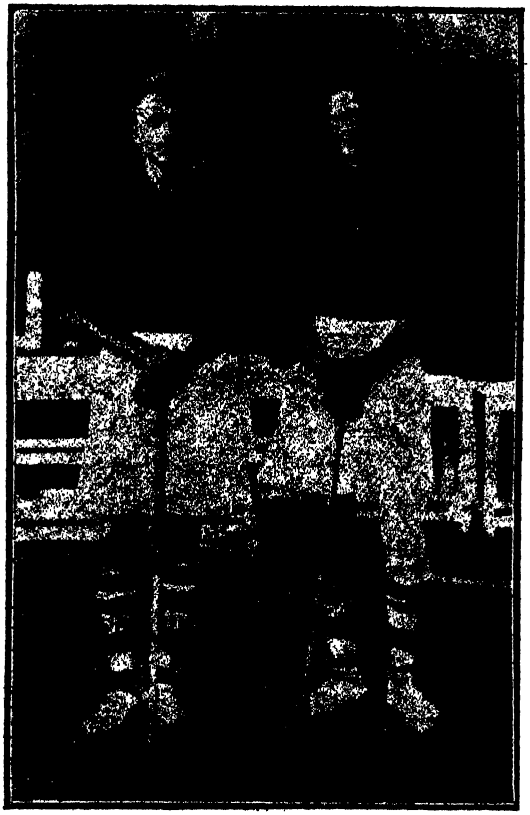
আমাদের শুভানুধ্যায়ী গ্রাহক গ্রাহিকাগণ সর্ব্বদা অনুরোধ করেন, যে ভারতবর্ষের প্রচ্ছদপটে যে সকল খ্যাতনামা ব্যক্তির সুন্দর ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশিত হয়, তাহা প্রচ্ছদপটে ছাপা হওয়ায় যখন তাঁহাদের হস্তগত হয় তখন সে গুলি মলিন হইয়া যায় এবং সেইজন্য বাঁধাইয়া রাখিবার অবস্থা থাকে না। এই কারণে আমরা স্থির করিলাম যে, আগামী আষাঢ় মাস (চতুর্ব্বিংশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা) হইতে ঐ ত্রিবর্ণ চিত্র ভারতবর্ষের মধ্যে দিব এবং প্রচ্ছদপটের জন্য অন্য ব্যবস্থা করিব। তাহা হইলে ঐ চিত্রগুলি বাঁধাইয়া রাখিবার উপযুক্ত অবস্থায় গ্রাহকগণের হস্তগত হইবে।



হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন ঃ

১৯৩৬ সালে কাষ্টমস্ লীগ চ্যাম্পিয়ন হলো। রেঞ্জার্স রানার্স আপ্ হয়েছে। উভয়েরই পয়েণ্ট সমান হয়েছিল, কিন্তু কাষ্টমসের গোল এভারেজ বেশী থাকায় তারাই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। গোল এভারেজে চ্যাম্পিয়ন সিপ্ স্থিরকৃত হওয়ার পক্ষপাতী আমরা নই। উভয় দলে পুনরায় একটি খেলা হয়ে তার জয় পরাজয়ের উপর চ্যাম্পিয়নসিপ্ ঠিক হওয়াই উচিত বলে মনে হয়। গত বৎসরের চ্যাম্পিয়ন মোহন-বাগান দ্বিতীয় বিভাগে নেমে যেতে যেতে বেঁচে গেছে—ঐ গোল এভারেজের জোরে। দ্বিতীয় বিভাগে লিলুয়া ও ডেভন্স নেমে গেলো আর গ্রিয়ার ও পোর্টকমিশনার প্রথম বিভাগে উঠ্‌লো। গ্রিয়ার একটা খেলাতেও হারে নি। দুটো খেলায় ড্র করেছে। তাদের এই প্রশংসনীয় দক্ষতায় আমরা বিশেষ খুশি হয়েছি।

কাষ্টমস ১৪টা খেলায় ১১টায় জয়ী, ২টায় ড্র ও ১টায় হেরে মোট ২৪ পয়েণ্ট পেয়ে প্রথম, রেঞ্জার্স ১১টায় জয়ী, ২টায় ড্র করে ২৪ পয়েণ্ট পেয়ে দ্বিতীয়, তারা একটাতেও হারে নি এবং সেণ্ট জোসেফ ২০ পয়েণ্ট করে তৃতীয় হয়েছে।



বিখ্যাত খেলোয়াড় ভ্রাতৃদ্বয়—ধ্যানচাঁদ ও রূপ সিং
ছবি—জে কে সান্যাল

বাইটন কাপ্ ঃ

আগা খাঁ কাপ্ বিজয়ী বোম্বাই কাষ্টমস্ এবার বাইটন কাপ্ বিজয়ী হয়েছে। তারা কলিকাতার হকি লীগ চ্যাম্পিয়ন কাষ্টমস্ দলকে ২—১ গোলে হারিয়েছে। খেলাটি ড্র হওয়াই উচিত ছিল। কলিকাতা কাষ্টমসের পক্ষে বলা যেতে পারে যে তারা সপ্তাহের ছয়দিনের পাঁচদিন খেলতে বাধ্য হয়েছিল। ফাইনাল খেলার পূর্ব্ব দুদিন বিখ্যাত ঝান্সি হিরোজের সঙ্গে তাদের খেলতে হয়। সে খেলায় তাদের সেরা খেলোয়াড় ওয়েষ্টন আহত হওয়ায় ফাইনালে খেলতে পারে না, পুরাতন খেলোয়াড় সওকাত আলি খেলতে বাধ্য হয়। এই হ্যাণ্ডিকাপ নিয়েও তারা ভাল খেলেছে ও প্রথমে গোল দেয়। এই দুই কাষ্টমস্ দল ১৯৩২ সালে বোম্বাইয়ে আগা খাঁ কাপের ফাইনালে মিলিত হয়েছিল। সে খেলায় বোম্বাই দল কলিকাতাকে ৫—২ গোলে পরাজিত করে।

কলিকাতায় এই দুই কাষ্টমস দলের মধ্যে প্রীতিসম্মিলন

হকি খেলা হয়। তাতে কলিকাতা কাষ্টমস ২—০ গোলে জয় লাভ করে। বাইটন ফাইনাল খেলায় বোম্বাইয়ের যে সকল খেলোয়াড় ছিল, একমাত্র হাফ্ব্যাকে সেলিম ছাড়া সকলেই সেদিন খেলেছিল। কলিকাতা কাষ্টমসের সেণ্টার ফরওয়ার্ড



আগা খাঁ ও বাইটন কাপ্ বিজয়ী বোম্বাই কাষ্টমস্ দল

ছবি—জে কে সান্যাল

ওয়েষ্টন একাই দু'টি গোল করে। তাই মনে হয় যে ওয়েষ্টন খেলতে পারলে খেলার ফলাফল উল্টে যেতেও পারতো।

বোম্বাই কাষ্টমস্ মোহনবাগানকে ১—১, ৩—১, রামপুরকে ৩—১, ভূপালকে ৬—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে যায়।

কলিকাতা কাষ্টমস্ বি ওয়াইএর সঙ্গে ওয়াক্ ওভার পেয়ে, খাল্সা ক্লাবকে ৪—১, বি জি প্রেসকে ১—১, ২—১, ঝান্সি হিরোজকে ০—০, ১—০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠে।

বাইটন কাপ পরিচালনায় নানা গলদ হয়েছে। আম্পায়ারিং ভাল হয়নি। ঝান্সি হিরোজ ও কলিকাতা কাষ্টমসের প্রথম দিনের খেলায় ধ্যানচাঁদ একটি গোল দেন, কিন্তু আম্পায়ার তাহা বাতিল করেন রূপসিংয়ের অফ্ সাইড অজুহাতে। কিন্তু যাঁরা ঐ গোলের নিকটে ছিলেন এমন বহু দর্শক রূপসিং অফ্ সাইডে ছিলেন না বলে মতপ্রকাশ করেছেন। সেদিন কাষ্টমস দল অত্যন্ত rough game খেলেছে, আম্পায়ারের তাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কড়া হওয়া উচিত ছিল। কাষ্টমসের রাইট ব্যাক ও হাফ ব্যাক হজেস ও স্মিথ অন্যায় বাধা দান ও ফাউল করে যেন তেন প্রকারেণ, ধ্যানচাঁদ ও রূপসিংকে গোল দিতে বাধা দিয়েছে। অনেক স্থলে advantage rule না দেওয়ায় ঝান্সিদেরই ক্ষতি হয়েছে। পরের দিনের খেলায় দুই আম্পায়ারই বদল হওয়ায় সাধারণে সুখি হয়েছিল। কিন্তু আম্পায়ার এসোসিয়েশন এই বদলের বিরুদ্ধে তাঁদের মিটিংয়ে আপত্তি করেছেন। অর্থাৎ আম্পায়ার যতই অন্যায় অবিচার করুন না কেন, তাঁদের পরের দিনের খেলাতেও বদলান যাবে না।

দ্বিতীয় দিনে কাষ্টমস্রা ভাল খেলেছিল ও অন্যায় ফাউল করে নি। ঝান্সিহিরোজ, বিশেষত্ব তাদের রূপসিং ও ধ্যানচাঁদ, তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। কাষ্টমসের



লীগ চ্যাম্পিয়ন ও বাইটন কাপে রানার্স আপ

কলিকাতা কাষ্টমস্ দল ছবি—জে কে সান্যাল

হজেস ভীষণ খেলেছে, এ দিনের জয়ের গৌরব সর্বাগ্রে তারই প্রাপ্য। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ৮ মিনিট পরে ওয়েষ্টন গোল দেয়। তারপর থেকে ঝান্সিরা গোল পরিশোধ

করতে অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করেও বিপক্ষের রক্ষণ-ভাগের প্রাণপাত চেষ্টার কাছে সক্ষম হ'তে পারলে না। তারা রক্ষণভাগে ৮ জন খেলোয়াড় নিযুক্ত করে অভূতপূর্ব্ব বিক্রমে গোল রক্ষা করলে। ১৯৩৩ সালে বাইটন কাপ ফাইনালে কাষ্টমসরা ঝান্সিহিরোজের কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হয়েছিল, তার শোধ এতদিনে নিলে।

আগা খাঁ কাপ্ ঃ

বোম্বাই কাষ্টমস্ ৭—১ গোলে কিরকীকে হারিয়ে উপর্য্যুপরী তিনবার আগা খাঁ কাপ বিজয়ী হয়েছে। খেলাটি মোটেই কাপ্ ফাইনালের মতো প্রতিযোগিতামূলক হয় নি। কিরকী দলের গোলরক্ষক মার্চ্চেণ্ট ব্যতীত কেহই খেলতে পারে নি। সে অনেকগুলি গোল আশ্চর্য্যরূপে বাঁচিয়েছে। প্রথমার্দ্ধে বোম্বাই কাষ্টমস্ চারটি গোল দেয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে মার্চ্চেণ্টের অপূর্ব্ব গোলরক্ষার জন্য, তারা আর গোল করতে পারে না। দশ মিনিট খেলার পর কিরকী দলের রামা হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে একটি গোল দিলে, বোম্বাই দল অমিত-বিক্রমে বিপক্ষ দলকে আরো তিনটি গোল দেয়।

লক্ষ্মীবিলাস কাপ্ ঃ

ঝান্সি হিরোজকে লক্ষ্মীবিলাস কাপ জয় করেই এবার ফিরে যেতে হলো। তারা ফাইনালে মোহনবাগানকে ৬—২ গোলে হারিয়েছে। ১৯৩৪ সালে বাইটন কাপ্ খেলায় মোহনবাগানের কাছে ঝান্সি হিরোজ ২—১ গোলে হেরেছিল। সে হারের প্রতিশোধ এবার তারা নিলে। মোহনবাগান প্রথম হাফে বেশ ভালো খেলেছিল। খেলা আরম্ভের তিন মিনিট পরেই তাদের রাইট আউট বেণীপ্রসাদ প্রথম গোল করে। ১৭ মিনিট পরে ধ্যানচাঁদের গোলরক্ষক নির্ম্মল কতকটা বাঁচালে ঐ ফিরতি বল ধ রূপসিং গোল শোধ দেয়। হাফ টাইমে খেলা সম সমান থাকে। দ্বিতীয় হাফে মোহনবাগান ক্ষমতাশ দলের নিকট পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হন। ঝ দল এই হাফে প্রশংসনীয় খেলা খেলে।



লক্ষ্মীবিলাস কাপবিজয়ী ঝান্সি হিরোজ দল

ছবি—জে কে সান্যাল



লক্ষ্মীবিলাস কাপ বিজিত মোহনবাগান দল

ছবি—জে কে সান্যাল



অলিম্পিক খেলায় নির্ব্বাচিত ভারতীয় হকি দল। ইহারা রেষ্টদলকে ৭—২ গোলে পরাজিত করেছেন

—জে কে সান্যাল

বার্লিনগামী ভারতীয় দল ঃ

সমগ্র ভারতের বাছাই দল ৭—২ গোলে রেষ্ট দলকে একজিবিশন খেলায় হারিয়ে দিয়েছে। এই খেলায় প্রায় তিন হাজার টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছিল, ধ্যানচাঁদ একাই চারটি গোল, রূপসিং, জাব্বর ও এমেট প্রত্যেকে একটি গোল দিয়েছে। রেষ্ট দলের পক্ষে সুভান ও ইস্‌মাইল দু'টি গোল দিয়েছেন। বাণী খাঁ ও জাব্বর বাছাই দলের হয়ে খেলেছেন, এই দু'জন ছাড়া সবাই অলিম্পিকের মনোনীত খেলোয়াড়।

নিম্নলিখিত খেলোয়াড়রা অলিম্পিকে খেলবার জন্য মনোনীত হয়েছেন। তারা বোম্বাই থেকে আন্দাজ ২৫শে জুন তারিখে যাত্রা করবেন।

আর জে এলেন (বাঙ্গলা), সি ট্যাপ্‌সেল (বাঙ্গলা), গুরুচরণ সিং (পাঞ্জাব), মহম্মদ হুসেন (মানাভাদার), ফিলিপ্‌স্ (বোম্বাই), আসান খাঁ (ভূপাল), কুলেন (মাদ্রাজ), জে গ্যালিবর্ডি (বাঙ্গলা), বি নির্ম্মল (বোম্বাই), এম এন মাসুদ (মানাভাদার), আর কার (বাঙ্গলা), ধ্যানচাঁদ (আর্ম্মি), রূপসিং (ইউ পি), এমেট (বাঙ্গলা), এম জাফর (পাঞ্জাব), পি পি ফার্ন্নাণ্ডেজ (সিন্ধু), সাহাবুদ্দিন (মানাভাদার)।

প

চ্যাম্পিয়নসিপ

হেক্ট ৬—২, ৭—৫, ৬—২ (
মেঙ্গলকে হারিয়ে জু কা স্লো ভি
চ্যাম্পিয়নসিপ বিজয়ী হয়েছে। তার
খেলাতেও হেক্ট মেঙ্গলকে হারিয়েছি

ষ্ট্যাডিয়ম ঃ

ফুটবল খেলার আরম্ভের সঙ্গে স
বহুকালের অভাব ষ্ট্যাডিয়মের কথা
জাগে। মহারাজা সন্তোষের '
আকাশ-কুসুমই হয়ে রইল। দর্শক
একমাত্র গতি হেডওয়ার্ড কোম্পা
ঝান্সি হিরোজ ও কলিকাতা কাষ্টম
সেমিফাইনাল খেলার প্রথম দিনে এ



ক্রাউন স্পোর্টসে ১০০, ১৫০, ২২০ গজ ও হাইজাম্প বিজয়িনী তরুণী মিস এন বি

ছবি—জে

বিদেশী লোকের এখানকার দর্শকের আসনের বিষয়ে তাঁর ধারণা ও মতামত এখানে উল্লেখ করছি। ইনি বোম্বাই



মাইল রেস বিজয়ী ১৯ বৎসর বয়স্ক পি বি চন্দ্র
ইনি এ বৎসরে বিভিন্ন দৌড়ে ১২ বার
প্রথম হয়েছেন —জে কে সান্যাল

প্রবাসী, ছুটিতে এখানে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখবেন, বোম্বাই কাষ্টমসই বাইটন কাপ-বিজয়ী হবে, যদি হিরোজ বা কলিকাতা কাষ্টমস সেই ফাইনালে উঠুক। এখানকার খেলার জনতা দেখে তিনি প্রীত হয়েছেন, এরকম জনতা বোম্বাইএ হয় না। কিন্তু প্রবেশের বন্দোবস্ত বিশেষ খারাপ, ঢুকতে অনেক সময় নষ্ট হয়। আরো অধিক সংখ্যক গেট থাকা উচিত। খেলা দেখতে এসে এত অধিক সময় অপব্যয় করা বোম্বাইতে চলে না। আরো একটা বন্দোবস্ত বোম্বাইতে আছে, এখানে তার প্রচলন হলে অনেক সুবিধা হবে। সেখানে টুর্ণামেণ্ট হিসাবে সীজন টিকিট বিক্রয় হয়—যেমন আগা খাঁ কাপের সকল খেলা দেখবার জন্য ৬৲ বা ৭৲ টাকা দামে টিকিট বিক্রয় হলো। এরূপ বন্দোবস্ত এখানে করলে দর্শক ও কণ্ট্রাক্টর উভয়েরই সুবিধা হয়। এখানে কেবল কম্‌প্লিমেণ্টারী সীজন টিকিটের দু'টি গেট আছে দেখা যায়। কিন্তু সে টিকিট তো সংগ্রহ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। কণ্ট্রাক্টরদের পরিচিত, আত্মীয়বর্গ প্রভৃতি তা' পেতে পারে। সাধারণে তা পায় না, এতে তাদের কোন সুবিধাই হয় না। হেণ্ডওয়ার্ড কোম্পানী যদি সীজন টিকিটের প্রচলন করেন তবে তাঁদের ও দর্শকদের বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয়। লীগ খেলার জন্য এবং শীল্ড খেলার জন্য পৃথক পৃথক সীজন টিকিট কিছু কম মূল্যে বা দুই খেলার সীজন টিকিট আরো সুবিধায় দেওয়া যেতে পারে। যেমন ট্রাম ও বাসের মাসিক টিকিটের প্রচলন হওয়ায় কোম্পানীর আয় বেড়েছে বই কমে নি। তাঁদেরও ইহাতে আয় বাড়বে, কমবে না। অনেকের ইচ্ছা থাকলেও, ভিড় ঠেলে ঘণ্টাধাধিক লাইনে সার দিয়ে



সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী
কুমারী হিরণ্ময়ী বসু দৌড়ে, হাইজাম্পে ও নীচু বেড়া
দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কুমারী
হিরণ্ময়ী এ বৎসরে ৫টি প্রতিযোগিতায়
প্রথম, ৫টিতে দ্বিতীয় ও ৩টিতে
তৃতীয় স্থান অধিকার
করেছে —জে কে সান্যাল

ঢুকবার সামর্থ ও সারকাশ না থাকায় খেলা দেখতে পারেন না। তাঁরা ঐরূপ বন্দোবস্ত হলে খেলা দেখতে পারেন। সীজন টিকিট হোল্ডারদের জন্য আলাদা পৃথক রিজার্ভ জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে দিতে পারলে আরো ভাল হয়। কণ্ট্রাক্টররা হয়তো বলবেন যে এরূপ বন্দোবস্ত করতে হলে পুলিসের অনুমোদন চাই। বেশ তো—আই এফ এ ও তাঁরা চেষ্টা করলে সাধারণ দর্শকদের জন্য এই বন্দোবস্তে পুলিসের অনুমোদন আদায় করা দুঃসাধ্য হবে বলে মনে হয় না। পুলিসের ইহাতে আপত্তি থাকবার কোন কারণও দেখা যায় না। ক্লাব মেম্বারদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আসন



রাজারাম সাহু

ইনি ১৯৩৪ সালে বেঙ্গল অলিম্পিক ট্রায়ালের ১০০ মিটার সন্তরণ প্রতিযোগিতায়, পাতিয়ালায় নিখিল ভারত সন্তরণে, ও পশ্চিম এশিয়ার সন্তরণ প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন

রিজার্ভ থাকে—তাঁরা যখন ইচ্ছা গিয়া সেখানে বসতে পারেন। তাঁরাও তো একরকম সীজন টিকিট হোল্ডার।

ষ্টাডিয়ম হবার কোন আশাই যখন নিকট ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে না, তখন উপস্থিত বন্দোবস্তকে যতদূর সম্ভব সুবিধাজনক করা যেতে পারে সে বিষয় আই এফ এ ও হেডওয়ার্ড কোম্পানীর দৃষ্টি দেওয়া দরকার। আই এফ এর কর্ত্তারা তো ক্লাব এন্‌ক্লোজারে বসে আরামে খেলা দেখেন তাদের তো কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। সাধারণের কষ্ট তাঁরা বুঝবেন না, বা বুঝতে চেষ্টাও করেন না। কেবল টাকার দরকার হলে চ্যারিটি ম্যাচের ব্যবস্থা করে অর্থ সংগ্রহের জন্য সাধারণকে আবেদন নিবেদন করে টাকা তুলে নিয়েই তাঁদের কর্ত্তব্য শেষ হলো মনে করেন।

এফ্ এ কাপ্ ঃ

বিলাতের বিখ্যাত এফ এ কাপ বিজয়ী হয়েছে এবার আর্সেনাল দল এক গোলে শেফিল্ড ইউনাইটেডকে হারিয়ে। এরা গতবার লীগ চ্যাম্পিয়ন ছিল। গত বৎসর শেফিল্ড ওয়েডনেস্‌ডে এই কাপ বিজয়ী হয়েছিল। এবার নিয়ে আর্সেনাল এফ এ কাপ ফাইনালে চারবার উঠেছে, তারা দু'বার কাপ্ বিজয়ী হলো। ১৯২৯ সালে হাডারফিল্ড টাউনকে ২—০ গোলে হারিয়ে বিজয়ী হয়েছিল।

উভয়দলই খেলার দিনের সকালবেলাটা শান্তভাবে অতিবাহিত করেছে। আর্সেনাল লাঞ্চে চা ও টোষ্ট ছাড়া অন্য কিছু খায় নি। শেফিল্ড ইউনাইটেড পূর্ব্ব অপরাহ্ন ষ্টাডিয়ম থেকে কয়েক মাইল দূরে সূর্য্যতাপ সেবন করে স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শরীর সুস্থ রাখতে চেষ্টা করেছে।

বিলাতে বিশেষ বিশেষ খেলাতে খেলোয়াড়রা নিজেদের উপযুক্ত রাখতে কত চেষ্টা ও যত্ন করে।

ফুটবল লীগ ঃ

লীগের খেলা আরম্ভ হয়েছে, ২৭শে এপ্রিল থেকে। হকি খেলা শেষ না হওয়ায়, দু'চারটি খেলা হয়েছিল। ৪ঠা মে থেকে পুরাদমে লীগ খেলা চলছে।

গত দু' বৎসরের চ্যাম্পিয়ন মহমেডান স্পোর্টিং দল এবার গোড়া থেকেই ভাল খেলছে। তাদের এবারও লীগ-বিজয়ী হবার বিশেষ সম্ভাবনা। তারা কালীঘাটকে ২—০ গোলে, এরিয়ান্সকে ৪—০ গোলে ও ডালহৌসীকে ৪—০ গোলে পরাজিত করেছে। সেণ্টার ফরওয়ার্ড রসিদ সুযোগ নষ্ট করে না, তার খেলা বেশ উচুদরের হচ্ছে। এরিয়ান্স প্রথম হাফে বেশ ভালো খেলেছিল। মহমেডানরা কোন গোল করতে পারে নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বায়ুর সানুকুল্যে খেলে তারা চার গোল দেয়।

ইষ্টবেঙ্গল ৪—০ গোলে এটাচড্ সেক্সনকে হারিয়েছে।

ডেভন্সের স্থলে এটাচড্ সেক্সন খেলছে। তারা বিশেষ কিছু করতে পারবে না। ইষ্টবেঙ্গল মহমেডান স্পোর্টিংএর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফরওয়ার্ড রহমত ও তার ভাই হবিবকে সংগ্রহ করেছিল। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে তারা দু'জনেই খেলবে না, বোধহয় কোন গোপনীয় কারণে। ব্লাকওয়াচ যে ক'টি খেলা খেলেছে, তাতে জিতেছে। তবে এখনও কোন সমকক্ষ দলের সঙ্গে খেলে নি। যদি কোন দল লীগ চ্যাম্পিয়নকে হটাতে পারে তো এরাই।

মোহনবাগান তাদের এ বৎসরের প্রথম খেলা আরম্ভ করেছে এরিয়ান্সের সঙ্গে। খেলাটি ড্র হয়েছিল, কোন পক্ষ গোল করতে পারে নি। খেলাতে মারামারি হয়েছে। এরিয়ানরাই এ বিষয়ে প্রথম দোষী। তাদের দু'জন খেলোয়াড় আহত হয় এবং পরের দিনও মহমেডান স্পোর্টিংএর সঙ্গে খেলায় তারা খেলতে পারে নি। মোহনবাগানের ব্যাক, হাফব্যাক, ফরওয়ার্ড কেহই প্রশংসাযোগ্য খেলা দেখাতে পারে নি। যে রকম খেলা দেখাচ্ছে তাতে তাদের ভবিষ্যৎ বড় সুবিধার নয় বলেই মনে হলো, যদি না তারা অন্য ভাল খেলোয়াড় নামাতে পারে। কলিকাতার সঙ্গে অনক কষ্টে এক গোলে জিতেছে। কাষ্টমসের সঙ্গে শুকনো মাঠে খেলেও হারতে হারতে অনেক কষ্টে ড্র করেছে। ই বি আর দলে আনোয়ার, মন্টু দত্ত, সামাদ খেলায় তারা ভাল খেলছে।

আই এফ এর নূতন সেক্রেটারী ঃ

এ এল প্রেষ্টন আই এফ এর নূতন সেক্রেটারী হয়েছেন ম্যাগননির স্থলে। ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারীর সম্বন্ধে নানা কথা রটে। গত মার্চ্চ মাস থেকে তাঁর বিপক্ষে তিনটি 'নো-কনফিডেন্স' মোশন উঠেছিল। এপ্রিল মাসে চোদ্দজন মেম্বর স্বাক্ষরিত তাঁর অবিলম্বে ইস্তফার জন্য মোশন উঠ্‌লে, তিনি তখনি ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। সেক্রেটারী স্বাক্ষরিত গত বৎসরের হিসাব নিকাশ নাকি এখনও আই এফ এ মিটিংএ দাখিল হয় নি। গত বৎসরে car allowance বলে ম্যাগননি সাহেব ৩০০০৲ হাজার টাকা নিয়েছেন। কিন্তু বাঙ্গালী সেক্রেটারী উহা নেন নাই বলে শোনা যায়। নব নিযুক্ত সেক্রেটারী মিষ্টার প্রেষ্টন ঐ টাকা নেবেন কিনা তা এখনও জানা যায় নি।

বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাচ্ খেলা ঃ

কেম্ব্রিজ ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাচ-খেলা প্রতিযোগিতায় এবারও কেম্ব্রিজ জয়ী হয়েছে পাচ লেংথে, ২১ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে। অক্সফোর্ড ১৮ মিনিট পরে পৌছিয়েছে।

এই প্রতিযোগিতা প্রথম আরম্ভ হয় ১৮২৯ সালে। এবারের রেসটি ৮৭ সংখ্যক। যুদ্ধের সময় থেকে কেম্ব্রিজ দল একাদিক্রমে বারো বার বিজয়ী হয়েছে, কেবল ১৯২৩ সালে অক্সফোর্ড জিতেছিল।

বিলাতে ভারতীয় ক্রিকেট দল ঃ

ভারতীয় ক্রিকেট দল বিলাতে তাঁদের প্রথম খেলা উষ্টার্সের সঙ্গে আরম্ভ করে তিন উইকেটে পরাজিত

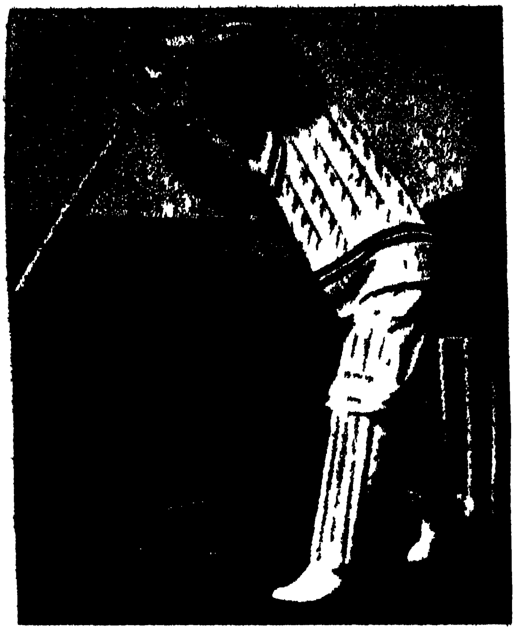


জে এইচ হিউম্যান

হয়েছেন। ইহার আগে ফ্রিম্যানের ১২জনের সঙ্গে ভারতীয় ১২জনের একদিনের খেলায় ড্র হয়; উষ্টার্স খুব শক্তিশালী দল নহে। সাউথ আফ্রিকার ক্রিকেট দলও এঁদের সঙ্গে প্রথম খেলা আরম্ভ করেছিল এবং এক ইনিংস ও ১৬৬ রানে জয়ী হয়েছিল। তাদের বিপক্ষে উষ্টার্সরা মাত্র ৯৯ ও ৯৫ রান করতে পেরেছিল দু' ইনিংসে। এঁদের সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলার ফলাফল দেখে ভারতীয় দলের অন্যান্য কাউন্টিদের সঙ্গে



হুসেন



মহাবাজকুমাব ভিজ্যানাগ্রাম—ভাবতেব ক্রিকেট দলের ক্যাপ্‌টেন, বযস ৩১। ইনি ১৯৩০ ৩১ সালে হবস ও সাটক্লিফকে ও ১৯৩৪ সালে কনষ্টানটাইনবে ভাবতে আনিযেছিলেন



পি, ই পালিগা, বযস ২৬। ইনি ১৯৩২ সালেব ভাবতেব দলে ছিলেন এবং ৬১৫ বান করেছিলো ও ২৪টা উইকেট নিযেছিলেন। শেষেব দিকে মোচকান গ্রন্থিব জন্য খেলতে পাবেন নি। ইনি বা হাতে সো বল দেন



এন পি জস, বযস ৩৪। ১৬ বৎসব পূর্ব্বে কোযাড্রাঙ্গুলাব খেলায় হিন্দুদেব পক্ষে প্রথম খেলেন ও এখনও খেলছেন।



এম বাকাজিলানী, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি ক্রিকেট খেলোযাড, বযস ২৫। ১৯৩২ সাল থেকে ৩ সীজনে ইনি



ভি এম মার্চ্চেণ্ট, বয়স ২৫। ইনি বারো বৎসর বয়ক্রম থেকে ক্রিকেট খেলছেন, আঘাতের জন্য অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে খেলতে পারেন নি

২২ রানে, ব্যানার্জ্জি ২ উইকেট রানে, নাইডু ২ উইকেট ৩৭ রানে

দ্বিতীয় ইনিংস :—ব্যানা উইকেট ৬৫ রানে, নাইডু ৩ উ ৯৬ রানে, অমরনাথ ১ উইকেট রানে নিয়েছেন।

ভারতের পক্ষে—নাইডু ৮৩, প ৬৩, ভিজিয়ানাগ্রাম (রান আ ৬০, মার্চ্চেণ্ট ৫৯, অমরনাথ দ্বিতীয় ইনিংস—হিন্দেলকার ৩০, ২১, অমরনাথ ১৫, ব্যানার্জ্জি ১২

অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় ইনিংস হবার পরে অতি অল্প সময়ই থাকে। ভারত ১৪৫ রান করতে হবে। তাঁরা দ্রুত রান তুলবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও খেলা শেষে মাত্র রান ৫ উইকেটে করতে পারেন। ৪৫ রান করবার সময় পেলে জয়ী হতে পারতেন।

বিশৃঙ্খল ঠাণ্ডা বাতাস বহায় ভারতীয়রা অসা

খেলাতে জয়ের আশা করা বাতুলতা। তবে খেলাতে কিছু নিশ্চয়তা নাই—এই ভরসা। পালিয়া হিউম্যানের ক্যাচ ফেলাতে ভারতীয়দের হার হলো।

ভারতীয় দল :—২২৯ ও ১৫০; প্রথম ইনিংসে, মার্চ্চেণ্ট (নট-আউট) ৪৪, পালিয়া ৪২, নাইডু ৪০। দ্বিতীয় ইনিংসে হুসেনের ৫৫ রানই ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ রান।

উষ্টার্স :—২৪৮ ও ১৩৪ (৭ উইকেট); প্রথম ইনিংসে, ওয়ার্থ ৫৮, হিউম্যান ৫৪; দ্বিতীয় ইনিংসে, হিউম্যান নট-আউট) ৬৮, বুল ৩৩।

ভারতের দ্বিতীয় খেলা হয়েছিল অক্সফোর্ডের সঙ্গে। াভাবে এই খেলাটি ড্র হয়েছে।

অক্সফোর্ড :—২০২ ও ২৯৭।

-৩৫২ ও ১০৩ (৫ উইকেট)

পক্ষে—সিঙ্গলটন ৫১, বার্টন ৩৫, ডারওয়াল (নট আউট) ৩০। দ্বিতীয় ইনিংস—কিম্পটন ৭৭,



আমির ইলাহী, বয়স ৩২। ইনি স্লো বোলার

ভারতবর্ষ

সূচিপত্র

ত্রয়োবিংশ বর্ষ—দ্বিতীয় খণ্ড ; পৌষ ১৩৪২—জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৩

লেখ সূচি (বর্ণানুক্রমিক)

চিত্র সূচি (মাসানুক্রমিক)

পৌষ, ১৩৪২

বহুবর্ণ চিত্র

মাঘ, ১৩৪২

বহুবর্ণ চিত্র



সাগর সঙ্গমে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সেন গুপ্ত